ভারতবর্ষ

-শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

ষট্চত্বারিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ—১৩৬৫—জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

চিত্রসূচী—মাসানুক্রমিক

শিল্পী : শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা এম-এ মিলন ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

পৌষ—১৩৬৫

দ্বিতীয় খণ্ড | ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

কবি পরিণতি

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

কবির আরম্ভ যেমন কৌতূহলের জিনিস, কবির পরিণামও তেমনি কৌতূহলের—পরিণামই হয়ত বেশী চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ। আরম্ভের আশা ভরসা, গুণধর্ম্ম পরিণামে কি রকমে সমর্থিত উপচিত পরিপূরিত হয়েছে, কিম্বা পরিবর্ত্তিত এমন কি পর্য্যুদস্ত হয়েছে, সে ইতিহাসের রহস্য জিজ্ঞাসুচিত্ত আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন—এ বিষয়ে আমরাও আজ কিছু দেখতে প্রয়াস করব।

সেক্সপিয়রের দিয়েই আরম্ভ করি—তাঁর উদাহরণ যেন সকল কবিপ্রাণের প্রতিকৃতি, তিনি যেন কবিকুলেরই প্রতিভূ। যাঁর আরম্ভ Venus and Adonis, আর The Rape of Lucrece দিয়ে তাঁর পরিণতি Winters Tale, Tempestএ গিয়ে। সেক্সপিয়রকে যদি নমুনা হিসাবে গ্রহণ করি, তবে কবির জীবনকে, হয়ত মানব-জীবন মাত্রকেই, মোটের উপর তিনটী পর্য্যায়ে ভাগ করতে পারি। প্রথমে জোয়ারের আরম্ভ—যৌবনের ক্রমোদ্ভিন্ন উল্লাস উৎসাহ উদ্দীপনা, প্রচুর হাসি-কান্না; তারপর জোয়ারের শেষে, মধ্য বয়সে, প্রৌঢ়ত্বের সূচনায় একটা প্রতিক্রিয়া, জীবনের সঙ্গে গাঢ়তর ও রূঢ়তর পরিচয়ের ফলে একটা বিপর্য্যয়ের ব্যর্থতার, বিষাদের কারুণ্যের অনুভূতি—সেক্সপিয়রের দ্বিতীয় যুগ, যাকে বলা

হয় তাঁর আঁধারের—মহাট্রাজেডির যুগ; তারপর শেষে ঝড়ের অন্তে একটা শান্তি ও সামঞ্জস্য, প্রসন্নতা ও ক্ষমার পরিবেশ। প্রথম যুগে যৌবনরাগে রঙীণ সেক্সপিয়র এই যেমন বলেছেন—

If music be the food of love, play on.
Give me excess of it, that, surfeiting,
The appetite may sicken and so die.
That strain again! It had a dying falb;
O, it come O'er my ear like the sweet sound
That breathes upon a bank of violets,···
(Twelfth night I···I)

দ্বিতীয় যুগের ঘন-ঘোর গুরু গাঢ় রুদ্রতার সঙ্কটের সংগ্রামের লীলা—

Howl, howl, howl, howl! O. you are
men of stones!
Had I your tongues and eyes, I'd use
them so
That heaven's vault should crack···
(King Lear V. 3.)

পরিশেষে একটা উপশমের, প্রশান্তির, প্রসন্নতার, প্রপত্তির, ক্ষমা ও ক্লান্তির আবহাওয়া—

But this rough magic
I here abjure; and when I have requir'd
Some heavenly music—which even now
I do—
To work mine end upon their senses that
This airy charm is for, I'll break my staff,
Bury it certain fathoms in the earth,
And deeper than did ever plummet sound
I'il drown my bo k. (Tempest V···I)

আর একজন কবির কথা বলি—William Blake-এর দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। তবে ব্লেক দেখিয়েছেন দুটি পর্য্যায়ের দুটি জীবনের অবস্থান্তর বা বৈসাদৃশ্য। প্রথম জীবনে হল—যাকে তিনি বলেছেন Songs of Innocence—তাঁর কবিচিত্ত প্রস্ফুরিত হয়েছে সরলতার শুচিতার অনভিজ্ঞতার মধুছন্দে—এ যেন শৈশবের স্বচ্ছ স্বপ্নালু কল্পনা। কিন্তু বয়সের সঙ্গে ভোরের স্নিগ্ধতা পেলবতা শুভ্রতা মিশে যায়—আসে ক্রমে পরিণত বয়সের খররৌদ্র; হয় স্বপ্নভঙ্গ, আসে কঠোর বাস্তবের, ঘাত-প্রতিঘাতের, কর্কশের, অসুন্দরের সঙ্গে পরিচয়। আদি মানব-মানবী নন্দনে যেমন ছিলেন জ্ঞানবৃক্ষের ফল আস্বাদনের পূর্ব্বে, আর যেমন হয়েছিলেন সেই ফল আস্বাদনের পরে। এই দ্বিতীয়পর্ব্বের আত্মপ্রকাশকে কবি নাম দিয়েছেন Songs of Experience। শুনুন একটা Song of Innocence

The moon like a flower
In heaven's high bower,
With silent delight
Sits and Smiles on the night

কিম্বা এই আর একটি

When the voices of children are heard
on the green
And laughing is heard on the hill,
My heart is at rest within my breast
And everything else is still.

এবার শুনুন বিপরীত বা বিসম্বাদী রাগ, একটা Song of Experince. সেই পরিচিত বিখ্যাত—

Tiger! Tiger! burnig bright
In the forest of the night,
What immortal hand or eye
Dare frame thy symmetrig?

অথবা—

The Rhine was red with human blood,
The Danube rolled a purple tide
On the Euphrates Satan stood
And ever Asia stretched his pride.

কিন্তু দ্বিতীয় ব্লেক প্রথম ব্লেকের বিপরীত নয়, পরিণত পরিপক্ক রূপ মাত্র, তরুণের আস্তিক্য প্রৌঢ়ত্বের দ্বন্দ্বও রুক্ষতার মধ্যেই অনুস্যূত হয়ে চলেছে—

I know thee. I have found thee, and I will
not let thee go;
Thou art the image of God who dwells in
darkness of Africa,

And thou art fall'n to give me life in
regions of dark death

কিন্তু বৈপরীত্য, একটা বিরুদ্ধতাই, দেখা দিয়েছে আধুনিক আইরিশ কবি ইয়েট্‌স এর মধ্যে।

বিষয়টি খুবই আলোচিত হয়েছে, বলা হয়েছে পর্য্যন্ত যে প্রথম যুগের ইয়েট্‌সই আসল ইয়েট্‌স, শেষের ইয়েট্‌স ইয়েট্‌সের প্রেতমূর্ত্তি। হয়ত এটি অত্যুক্তি। কিন্তু বৈসাদৃশ্য ও বৈপরীত্য যে বিশেষ প্রকট, তাতে সন্দেহ নাই। স্বপ্নের কল্পরাজ্যের আন্তর অনুভবের সূক্ষ্মদর্শী দিব্যদর্শী কবি, মধুছন্দ মধুবাক তাঁর—

In all poor foolish things that live a day
Eternal Beauty wandering on her way

কিম্বা—

The wrong of unshapely things is a wrong
too great to be told
A hunger to build them anew, and sit on a
green knoll apart,
With the earth and the sky and the water
remade, like a Casket of gold
For my dream of Your image, that blossoms,
a rose in the deeps of my heart.

এই যে কল্পলোক, নন্দন কানন, আন্তর চেতনার নিভৃত চিত্তের স্বর্গরাজ্য, কবির ভাষায় তাই হ'ল Innisfree The Isle of Innisfree—কিন্তু প্রৌঢ়ত্বের পরে, প্রায় বার্দ্ধক্যের কি একটা বিপর্য্যয় ঘটে গেল তাঁর চেতনায়—একটা ঝড় এসে, কোন রূঢ় হস্ত এসে সে সব উড়িয়ে নিল, মুছে দিল। কবি হয়ে উঠলেন মাটির মানুষ, বাস্তবের অধিবাসী। তাঁর কণ্ঠ থেকে কি একটা যাদু উবে গেল, কবি নয় তিনি হয়ে, পড়লেন বক্তা শুধু। এখন তাঁর বলতে লজ্জা হল না—

You think it horrible that lust and rage
Should dance attention upon my old age;
They were not such a plague when
I was Young,
What else have I to spur me into song?

সত্যই ত Songs of Innocence আর তাঁর কণ্ঠে নাই, কিন্তু এসেছে সেখানে Songs of experience এবং যতটা অকবির ভঙ্গিতে শাদা সহজ গলায় বলতে চেয়েছেন ততটা অকবি বা কর্কশ-কণ্ঠ তিনি হতে পারেননি। এখনও তিনি সত্যকে সুন্দরকে চান, কিন্তু কল্পনার মানস জল্পনার ফুলঝুরি নয়, চান সত্য—হোক না তা রূঢ়তর সত্য, সুন্দরকেই চান—হোক না তা নিরাভরণ পেশী-স্নায়ুর দৃঢ় অস্থান—বলছেন ত—

Grant me an old man's frenzy,
Myself must I remake
Till I am Timon and Lear.
Or that William Blake
Who beat upon the wall
Till Truth obeyed his call…

তিনি এখন চান A old man's eagle mind, তাঁর দেশের নাম এখন আর Innisfree নয়, তা হ'ল Byzantium—ফলতঃ আমি মনে করি যতই বৈসাদৃশ্য ও বৈপরীত্য থাক ইয়েট্‌সের এই দুটি পর্য্যায়ে, একটি আর একটির খণ্ডন নয়, পরিপূরক—একই জিনিষের দুটি পীঠ, অথবা সুমেরু-কুমেরু।

আর একজন কবি কিন্তু সত্য সত্যই কবি-প্রেরণা, কবি-চিত্তই হারিয়েছেন তাঁর উত্তর জীবনে। আমরা জানি মহাকবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ শেষ বয়সে লিখে গিয়েছেন পদ্যাকারে গদ্য—কাব্য নয়, কথামালা। কবি-চিত্তের এই ক্রম-অবনতি বা অস্তগমন তাঁর শেষ পৈঠায় চরমে পৌঁচেছিল একজন ফরাসী কবির মধ্যে—আর্থার র্যাঁবো (Arthur Rimbaud) অল্প বয়সেই তাঁর মৃত্যু হয় (মাত্র ৩৭ বৎসর, যদিও কীট্‌স আরো অল্প বয়সে মারা যান—তবে কীট্‌সের কবিপ্রতিভা শেষ পর্য্যন্ত অটুট ছিল)। কিন্তু তাঁর কাব্য-জীবন শেষ হয় কুড়ি বৎসর বয়সেই, তারপরে সরস্বতীর সেবা আর করেন নাই—যাপন করেছেন ভবঘুরের দীনহীন জীবন। সে যা হোক, আমাদের বিষয় হোল কবির কাব্য-পরিণতি কথা, কাব্য-বহির্ভূত জীবনের কথা নয়।

প্রশ্নটি এখন আমরা আমাদের রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে তুলতে চাই। পূর্ব্ব রবীন্দ্রনাথ আর উত্তর রবীন্দ্রনাথ বলে কিছু আছে কি? থাকলে কি ধরণের পার্থক্য তা?

প্রথমত একটা জিনিষ দেখান হয়ে থাকে—ভাষার দিক দিয়ে। উত্তর রবীন্দ্রনাথের ভাষা হয়েছে যথাসম্ভব সহজ, সরল, নিরলঙ্কার, সাজসজ্জাহীন—যথাসম্ভব মুখের ভাষা সকলের ভাষা—পণ্ডিতের আলঙ্কারিকের পোষাকী ভাষা নয়, তা হল দৈনন্দিনের আটপৌরে চলন-বলন। ভাবের দিক দিয়েও বলা হয়েছে পূর্ব্ব-রবীন্দ্রনাথ হলেন যৌবন রসোচ্ছল, পার্থিব সৌন্দর্য্যের ঐশ্বর্য্যের পূজারী, মাটির সন্তান—তিনি মাটির রসে মশগুল—স্বর্গে, ওপারে তিনি দৃষ্টি দিয়েছেন, কিন্তু তাতে জের টেনেছেন এই মাটির চোখেরই রঙরাগ। উত্তর রবীন্দ্রনাথ ছড়িয়েছেন একটা ত্যাগের তপস্যার কঠিন-কঠোর না হলেও, একটা আত্মস্থ স্থৈর্য্যের সমাহিতির, বিরতির আবহাওয়া।

রবীন্দ্রনাথের দুই পর্ব্বে একটা বিভিন্নতা থাকলেও, বৈপরীত্য কিন্তু কিছু নাই। এখানে উত্তরপদ পূর্ব্বপদের সহজ স্বাভাবিক ক্রমিক পরিণতি মাত্র। রবীন্দ্রনাথ হলেন মুখ্যতঃ মূলত মিলনের, সমন্বয়ের, সামঞ্জস্যের কবি। তাঁর চিত্ত, তাঁর অনুভব, তাঁর দৃষ্টি সকল রকম দ্বন্দ্ব বা বৈসাদৃশ্যের মধ্যেই মিলনের সূত্র আবিষ্কার করে চলেছে। আশাভঙ্গের, নৈরাশ্যের, আত্মপ্রতিবাদের বা প্রত্যাখ্যানের বা বিমুখতার পর্ব্ব এসে জীবনের ধারাবাহিকতায় ব্যাঘাত ঘটায় নাই। জীবনের মধ্যে এলেন তিনি, জীবনকে গ্রহণ করলেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে, তার গুণগান গৌরব কীর্ত্তন করলেন, তবে তার নিভৃত অলক্ষ্য উৎসের সংযুক্ত রেখেই, সর্ব্বদা সেই ও-পারের অপারের ভাবনাকেও ইহের-এসবের মধ্যে অন্তঃসারী ফল্গুধারা হিসাবে নিহিত রেখে। তবে কালের ক্রম-পরিণাম ধারায় এই অন্তঃপ্রবাহের সুরই প্রকট হয়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, কিন্তু পুরাতন পূর্ব্বতনকে প্রত্যাখ্যান করে নয়। জীবনের অন্তে পৌছলেন যখন সহজ স্বাভাবিক গতিছন্দে, যেসব বন্ধুদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, সাগ্রহে পরিচয় নিয়েছিলেন, তাদের থেকে সরে চলে যাবার পালা এল, তখন দুঃখ, ক্ষোভ বা অনুযোগ বা বিরোধীভাব কিছু নাই। পরিবর্ত্তন যদি হয়ে থাকে তবে হয়েছে কতকটা এই ধরণের—আদি জীবনে যে তারটা ছিল সরু, শেষ জীবনে তা মোটা হয়েছে—আর যে তার ছিল মোটা, তা শেষে হয়েছে সরু—মুখ্য যা ছিল তা হয়েছে গৌণ, গৌণ যা ছিল তা হয়েছে মুখ্য। বয়সের ফলে কণ্ঠে পরিবর্ত্তন এসেছে, কিন্তু স্বর বদলালেও সুর বেশী কিছু বদলায় নাই। পরিবর্ত্তন হল পরিণতি ও পরিপক্কতা। যা ছিল উজ্জ্বল তা হয়েছে গাঢ়, যা ছিল ভাবাবেশ তা হয়েছে পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি, যা ছিল অতিরূপ ভূয়িষ্ঠ তা হয়েছে নিত্যনৈমিত্তিক—ভরা ভাদরের পরে এ যেন, কালিদাসীয় উপমায়, তনুগাত্রযষ্ঠি শারদশ্রী। কবি-চিত্তের এই ক্রমধারা অনুসরণ করি যদি প্রথম পর্ব্বে, প্রভাত সঙ্গীত—

আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙ্গিব পাষাণ কারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিব যে পরাণ ঢালি।
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খল খল, গেয়ে কল কল, তালে তালে দিব তালি।
এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে—প্রাণ হয়ে আছে ভোর।

(নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ)

তারপর দ্বিতীয় পর্ব্ব, ভাবোচ্ছ্বাস যখন গাঢ় হয়েছে, তারল্যের পরিবর্ত্তে এসেছে নিবিড়তা, কণ্ঠে উদাত্ত গাম্ভীর্য্য, ভাবে গভীরতা—

স্বর্গের উদয়াচলে মূর্ত্তিমতী তুমি হে উষসী,
হে ভুবনমোহিনী উর্ব্বশী।
জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদি রক্তে আঁকা তব চরণ শোনিমা—
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ব বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার। (উর্ব্বশী)

তৃতীয় পর্ব্ব, যাকে বলা যায় কবিচিত্তের পরিপূর্ণতা, পূর্ণাঙ্গতা, রবি-পরিক্রমার মধ্যাহ্ন-স্থিতি যেন—স্থিতির সঙ্গে গতির, গাঢ়তার সঙ্গে নমনীয়তার, দৃষ্টির সঙ্গে অনুভূতির সাযুজ্য মিলন হয়েছে—কেন্দ্রমুখী ও কেন্দ্রবিমুখী প্রেরণা সাম্যতা লাভ করেছে—

হে হংসবলাকা
আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা।
শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
তৃণদল
মাটির আকাশ-পরে ঝাপটিছে ডানা ;
মাটির আঁধার-নীচে, কে জানে ঠিকানা— (বলাকা)

অথবা,

খোল খোল হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা—
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।
কবে সে যে এসেছিল আমার হৃদয়ে যুগান্তরে
গোধূলি বেলার পান্থ জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে
লয়ে তার ভীরু দীপশিখা!
দিগন্তের কোন পারে চলে গেল আমার ক্ষণিকা—
(পূরবী)

তারপর চতুর্থ পর্ব্বে—সব শেষের গান—কণ্ঠ প্রশান্ত পরিচ্ছন্ন অনুদাত্ত কোমল হয়ে চলেছে পরমনিবৃত্তির মধ্যে মিলিয়ে যাবার পথে যেন—পরমনিবৃত্তি কিন্তু যার মধ্যে, আমি ইতিপূর্ব্বে বলেছি যেমন, সকল বৃত্তিই আশ্রয় নিয়েছে সংহত সংবৃত হয়ে, স্বরূপের সার্থকতার মধ্যে—

পথ রেখা লীন হল অস্তগিরিশিখর-আড়ালে,
দূর দীপ্তি দেয় ক্ষণে ক্ষণে—
স্তব্ধ আমি দিনান্তের পান্থশালা দ্বারে,
শেষ তীর্থ-মন্দিরের চূড়া!
সেথা সিংহদ্বারে বাজে দিন-অবসানের রাগিণী
যার মূর্ছনায় মেশা এ-জন্মের যা-কিছু সুন্দর,
স্পর্শ যা করেছে প্রাণ দীর্ঘ যাত্রাপথে
পূর্ণতার ইঙ্গিত জানায়ে।
বাজে মনে—নহে দূর, নহে বহুদূর।

কবি-পরিণামের আর একধারা আছে—সেটি এখানে উল্লেখ করতে পারি মাত্র। কবিত্বের ক্রমগতি যেখানে অর্থ-অবগমন বা অস্ত-গমন নয়, নিম্নাভিমুখী গতি নয়, সমতলবর্ত্তী গতিও নয়—যা হল উর্দ্ধায়ন অর্থাৎ কবি আর শুধু কবি নন, হয়ে উঠেছেন ঋষি, মানুষী বাক ছাড়িয়ে কণ্ঠ উচ্চারণ করেছেন দৈবী বাক—কারণ তার চেতনাও চিত্ত হয়ে উঠেছে অনুরূপ—উদাহরণ শ্রীঅরবিন্দ। মানুষী কবিকণ্ঠ শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে আদিপর্ব্বে বলেছে—

Are we more than Summer flowers ?
Shall a longer date be ours ;
Rose and Spring-time, Youth and we
By the everlastlng Sea ?

এ সার্ব্বজনিক সমস্যার উত্তর দিব্য কবিকণ্ঠ—

In the ending of time, in the sinking of space
What shall Survlve ?
Hearts once alive,
Beauty and Charm of a face ?
Nay, these Shall be safe in the breast
of the One
Man defied
World-Spirits wide
Nothing ends, all but began

প্রথম যৌবনের ভাবন ও ভাষণ প্রতিফলিত। এই যে, কথায় তিনি শেষ করলেন তাঁর "উর্ব্বশী"—

..................So pressing back
The longed-for sacred face, lingering
he kissed.
Then love in his Sweet heavens
was Satisfied.
But for below through silent mighty Space
The green and Stremous earth
abandoned rolled

উর্ব্বশী-পুরুরবার মিলন হ'ল, প্রেমের সার্থকতা হ'ল—কিন্তু এই মর পৃথিবীতে নয়, আর এক উর্দ্ধতর লোকে—বেচারী পৃথিবী পড়ে রইল যে তিমিরে সে তিমিরে। একটা নিবিড় মানুষী কারুণ্য, পার্থিব সাধ আশা আকাঙ্ক্ষা যে অর্দ্ধস্ফুট দীর্ঘশ্বাসের ভিতর দিয়ে ফেটে পড়ছে। কিন্তু মানুষী কামনার দীর্ঘরজনী শেষ হবে, শেষ হ'ল একদিন—পৃথিবী আর অসহায়ভাবে পরিত্যক্ত রইলনা। "সাবিত্রীর" ঋষি-কবি দিব্যবার্ত্তা আনলেন, বার্ত্তা শুধু নয়, দিব্য-সিদ্ধি এনে ধরলেন মানুষের পৃথিবীর কাছে, "সাবিত্রী"র আরম্ভে এই অমর বাণী দিয়ে—

It was the hour before the gods awake…
সময় হয়েছে, দেবতারা জাগছে,—উর্দ্ধলোক থেকে, তাদের নিজেদের স্বর্গ থেকে দেবতারা নেমে আসছে এই ভূতলে মানুষী রূপধারণ করে, এই মর্ত্ত্যলোকের মানুষ ও উর্দ্ধের চেতনায় পূর্ণ হয়ে দেবতার রূপ ধারণ করেছে—নবসৃষ্টির এই ত নব জাতি—রূপান্তরিত প্রকৃতি এসেছে যাঁদের কল্যাণে—
The Sun-eyed children of a marvellous dawn.
The great creators with wide brows of Calm,
The massive barrier-breakers of the world
… … … …
The architects of immortality
… … … …
Their tread one day shall change the Suffering earth
And justify the light on Nature's face.

অন্ধকারের পিপাসা

সুনীল বসু

এই অন্ধকারের গভীরে আমি ডুবে আছি
যেমন অরণ্যে, জলে ডোবে হিপোপটেমাস্,
রাত্রির বৃক্ষের ছায়া, তারার রূপালি মাছি
আঁকে চিত্রপট,—আমি যেন অন্ধকারে ক্লান্ত ঘাস।

অন্ধকার! আমায় আবদ্ধ করো তোমার তুষারে
রাত্রির প্রচণ্ড ছায়া দিগন্তে জাগুক,
আমার বিস্তীর্ণ অগ্নিদগ্ধ বুক
ধূলায় লুণ্ঠিত হোক, নিক আশ্লেষে তোমারে।

দিবস জল্লাদ, বেকারের বীভৎস হাহাকার
নৈরাশ্য-সমস্যা মৃত্যু। আর
তুমি রাত্রির শরীর গাঢ় অন্ধকার,—
কাক্‌জোছনায় রূপার ফেনার
সমুদ্রের জলে তুমি জলকন্যা আমার!

অন্ধকার তুমি হিম-জল,—
জলপ্রবাহের আশ্চর্য সংগীত তোমার শরীরে;
তোমার প্রাচীন গহ্বরে আমাকে
সমাবৃত করো ধীরে ধীরে॥

জীবনে বৈচিত্র্য চাই

পুলক আঢ্য

জীবনে বৈচিত্র্য চাই—উদ্দাম-আরণ্য অনুভূতি,
প্রত্যহের প্রয়োজন ভুলে যেয়ে কিছুক্ষণ তাই—
যান্ত্রিক জীবনটাকে আলস্যের আমেজে ভিজিয়ে
আনন্দ রসের খোঁজে—ছুটি ইতি উতি।

চলার ছন্দেতে চাই—কিছু কমা, খানিকটা ছেদ,
রুটির রুটিন হতে চায় মন কিছুটা বিরতি।
জীবনের মুক্তি চাই—জীবিকার অক্টোপাশ হতে,
কিছুটা সময় চাই—একান্ত নিজের কোরে পেতে।

তাই তো চলার ছন্দে মাঝে মাঝে হই ছন্নছাড়া,
লোকে কয়—'উচ্ছৃংখল, সমাজের যোগ্য নও তুমি'
বোঝেনা আদিমরক্ত নাচে আজো শিরায় শিরায়
অরণ্যের আবাহন মর্মরিত প্রতি রোমকূপে।

জীবনে বৈচিত্র্য চাই—আনন্দের অমৃতপরশ,
কিছুটা সময় চাই—বেহিসাবী বিচিত্র যৌবন।

শুভদৃষ্টি

সতীন্দ্র ভৌমিক

ওপাশে রুমা, এ পাশে আমি—মাঝখানে শ্বেতপাথরের টেবিল। বয় এইমাত্র চপ্ দিয়ে গেল, পর্দাটা এখনো দুলছে।

রুমা তার এলোমেলো চুলসমেত মাথাটি এলিয়ে দিল টেবিলটার এক পাশে।

রুমা এবার মাথা তুললো। ওর কোমল মুখে নেমে এসেছে সারাদিনের ক্লান্তি। চোখের মণিতে দুর্জয় অভিমানের চিহ্ন। শ্রান্তস্বরে বলল রুমা, 'বেশ লাগছে সমীরদা!'

প্রগলভতার লোভ সংবরণ করতে না পেরে বললাম, 'কে, চপ না আমি?'

রুমা স্মিত হেসে বলল, 'খুব ক্লান্তি লাগছে!'

চা খেতে খেতে রুমা বলে, দেখুন, পুরুষমানুষ বড় স্বার্থপর হয়। এরা আপদে নিষ্ঠুর, কিন্তু বলে কর্তব্যপরায়ণ।

সে এমন স্নিগ্ধস্বরে কথাগুলো বলছিল যে প্রতিবাদ করাটাও নিতান্ত রূঢ়তা বলে মনে হলো। চায়ের কাপে আর একবার অধরস্পর্শ করে ও জের টেনে চলে, এই দেখুন না, রবিদাকে কত করেই না লিখলাম, কিন্তু তার এক কথা; 'এখন বিয়ে করবার সময় হবে না!'—এদিকে দিদি তো ভেবে ভেবে একসা—কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, 'মেয়েরা বড়ো সন্দিহান!'

'পুরুষদের কটুকথা বলবার শোধ তুলছেন বোধ হয়?'—রুমা হেসে ফেলে। 'তারপর আমিই মৎলব বাৎলে দিই! এ ভাবে হবে না দিদি, তার করে দাও, আমরা মদনপুর যাচ্ছি—অমুক তারিখ বিয়ে, রবিদা বর না হলেও আটকাবে না! ব্যস্ দিদির মনে প্ল্যানটি ধরল। তাই তো উড়ে এলাম, আর আপনাকেও না-হোক ঘণ্টা চারেক ওয়েটিং রুমে বসিয়ে কষ্ট দিলাম!'—দম নেবার জন্য রুমা এবার থামল।

আমি বললাম, শেষ পর্যন্ত বর রবি রায়ই হবেন তো?

'আহা যেন জানেন না?'—রুমা কটাক্ষ হানলো।

হেসে বললাম, 'ব্রেভো' ঝুনুদি তবে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন বলো। এতদিন তো বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল, বরই কনেকে বিয়ে করবে, এখন দেখছি কনেও বরকে বিয়ে করে!

'যান, আপনি বড্ড ঠাট্টা করেন।'—রুমা উঠে পড়ে চেয়ার ছেড়ে। 'কই চলুন, এখানে বসে থাকলেই চলবে নাকি, ওদিকে তো দিদি একা একা বসে হাঁপিয়ে উঠছে!—রুমা পর্দা সরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

ঝুনুদি শিয়ালদহ স্টেশনে বসে আছেন। তাঁর জন্য কাগজে জড়িয়ে একটি চপ নেই।

গাড়ি ছাড়বার সময় ঝুনুদি বললেন, চল না মদনপুর?

চোখ কপালে তুলে বললাম, 'জানতে পারলে বাড়ি থেকে বের করে দেবে, তা জানো?'

ঝুনুদি হেসে উঠলেন। বললেন, 'আহা ষাট, বিয়েতে কিন্তু যেয়ো—তুমিই তো কনে-কর্তা!'

'আলবৎ!'

গাড়ি ছেড়ে দিল। মেল্ ট্রেনের মতো রুমা রুমাল নেড়ে বিদায় জানালো।

মদনপুর ঝুনুদির ক্লাসমেটের বাড়ি। সেখানেই বিয়ের ব্যবস্থা ঠিক হয়েছে। বিয়ের পর ঝুনুদি চলে যাবেন রবি রায়ের সঙ্গে মাইথন, আর রুমা ফিরে যাবে কাকিমার কাছে।

সমীরের মনে পড়ে গেল সেদিনের কথা।

তুফানগঞ্জ যাবে। হঠাৎ নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। অদূরে তিনটি শৈলশিখরের গলাগলি করে ধরে থাকা দৃশ্যটি বেশ লাগছিল সমীরের। স্টেশনটির নাম বুঝি ওই থেকেই হয়েছে, 'তিন পাহাড়!' ধীরে ধীরে সমীর এগিয়ে

চলে পাহাড়ের দিকে। সমীর যত এগোয়, পাহাড়টিও ততই কাছে সরে আসছে—তবুও তার কাছে পৌঁছবার আগেই সূর্য সোনালি টোপর পরে টপ করে ঢুকে গেল দিগন্তের বাসরঘরে। পাহাড়ের কোলঘেঁষে ঘনিয়ে এল অন্ধকার। হঠাৎ সমীরের মনে পড়ল, 'তাইতো উঠব কোথায়?' এমন সময় দেখতে পেল পাহাড়কে পিছনে ফেলে দুটি মেয়ে কথা বলতে বলতে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। সমীর দাঁড়িয়ে পড়ে পথের উপরেই। মেয়েদুটি হঠাৎ চমকে ওঠে যেন—তারপর পাশ কাটিয়ে চলে যায়। সমীরই কথা বলে ওঠে এবার, 'শুনুন।' কথা থেমে যায় তাদের। পথের বুকে পড়ে থাকা একটি মাঝারি গোছের নুড়িতে চোট লাগে বড়ো মেয়েটির। ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'কিছু বলছেন?'

'হোটেল আছে এ অঞ্চলে '—সোৎসুক মুখে তাকায় তাদের দিকে।

তারপর থেকেই ওদের সঙ্গে তার হৃদ্যতা। হোটেলে আর উঠতে হয়নি সমীরকে—সোজা ঝুনুদির কাকির বাড়িতেই উঠেছিল। সমীরের আজও আশ্চর্য লাগে, কেমন করে সব ঘটনা ঘটে। কে কোথায় গিয়ে ডেরা ফেলে!

রুমা আর ঝুনুদি দুই বোন। সংসারে তাদের নিজের বলতে ওই কাকিমা আর এক দুর সম্পর্কের মাসি। বাবা-মা'র মৃত্যুর পর তাঁরা দুজন দুই বোনকে ভাগাভাগি করে নেন। দু-জনকে একসঙ্গে মানুষ করবার সামর্থ্য কারোরই নেই। ঝুনুদি গতবার বি-এ ফেল করেছেন—আর পড়েন নি। স্থানীয় স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন, আর রুমা এবার আই-এ দিয়েছে।

মাসির এক সম্পর্কের ভাই রবি—রবি রায়, তাঁরই সঙ্গে বিয়ে হবে ঝুনুদির আগামী একুশে মার্চ।

আজ সেই একুশে মার্চ। বিয়ে হয়ে গেল ঝুনুদির। না আমি যেতে পারিনি। গার্ডিয়ানের চোখ-রাঙানির উত্তাপে আমার সবুজ মনের আশা পুড়ে শাদা হয়ে গেছে। তখন আমি সবেমাত্র থার্ড ইয়ারের ছাত্র। বাড়ি থেকে বলল, 'তোমার আবার মেয়েবন্ধু কিসের?' ওই এক প্রশ্নেই আমি সুবোধ বালক বনে যাই। সত্যিকথা বললে হয়তো সেদিনও এয়ারপোর্টে যেতে পারতাম না। রোজের মতো খাতা-বই নিয়ে বেরিয়েছি—সবাই জানে কলেজই যাচ্ছি। সেদিন যে কলেজ আমার দমদম এয়ারপোর্ট সে কথা—দেবা জানন্তি ন মনুষ্যাঃ! আমার বয়েসটা তখন এমন কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, সে সময় কোনো অনাত্মীয় তরুণীকে এয়ারপোর্টে রিসেপ্‌শন জানানো দুষ্কর। এ বয়েসে কোনো মেয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বা বিনয়সূচক কথা বলা শাস্ত্রের নিষেধ। চিঠিপত্র আসত বন্ধুর ঠিকানায়। সমবয়সী বন্ধু হলেও তার শতগুন মাপ। কারণ সে চাকুরে। কাজেই বিয়েতে আর যেতে পারিনি—এমন কি কোনো উপহারও পাঠানো হয়নি।

একুশবছরের ছাত্র অভিভাবকের কাছে পেট্রোলের ট্যাঙ্ক, আর মেয়ে হচ্ছে দেশলাই। কাজেই এ অগ্নিকাণ্ড আমার অভিভাবকগণ ঘটতে দেননি।

একুশবছর গতবছর ফেলে এসেছি, এখন আমি বাইশ বছরের যুবক। নতুন চাকরিতে ঢুকেছি। পূর্ণ সাবালকত্ব না পেলেও এখন সাবালকের প্যানেলে আমার নাম উঠেছে। রুমার সঙ্গে তাই মাঝে মাঝে চিঠিপত্র বিনিময় হচ্ছে। ওই লিখেছে, ঝুনুদির নাকি সেদিন আমি না যাওয়ায় চোখে জলই এসে গিয়েছিল।

দেখতে দেখতে দু-বছর কেটে গেল। ঝুনুদি প্রথম প্রথম চিঠিপত্র লিখলেও শেষপর্যন্ত তার জের টানতে পারেনি। রুমার কাছে নিয়মিতই খবর পাই। সে এখন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা। বি-এ পড়বার ইচ্ছে থাকলেও সুযোগ পাচ্ছে না—তাই কচিমনকে ধমকে ধমকে আধপাকা করবার কাজে লেগে গেছে। এমনি একদিন তার চিঠি পেলাম, 'স্টেশনে থাকবেন, যাচ্ছি!' নাটকীয় ঘটনা ঘটবে নাকি আবার? মনে মনে একটু শঙ্কিতই হয়ে পড়লাম।

শেষ পর্যন্ত নাটক আর ঘটেনি। একটি শুধু মিলনাত্মক গল্প জমে উঠতে চাইছিল, এমন সময় রুমা তার ছেদ টেনে দিলে। কাকিমার এক আত্মীয় যুবক—গগন নাকি নাম—সে নাকি সরাসরি রুমার দাবি পেশ করে বসেছে! তাই কাকিমা রুমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন কলকাতায়।

বেথুনে ভর্তি হয়ে গেল রুমা। হোস্টেলেই থাকবে।

ধীরে ধীরে রুমার আধিপত্য আমাদের বাড়িতে স্বীকৃত হয়ে গেল। সময় অসময়ে যাতায়াত, এ পুজোয় সে পার্বণে নিমন্ত্রণ তার বাধা।

আমাকে শুনিয়ে মাকে প্রণাম করে রুমা বলে, 'এখন থেকে মা শুধু আপনার মা-ই নন সমীরদা, আমারও মা!' মা সস্নেহে রুমাকে কাছে টেনে নেন।

একদিন কথায় কথায় বলছিলাম, 'ঝুনুদিটা কী। একদম ভুলেই গেলেন।'

রুমা হেসে বলল, 'তাতে কী হয়েছে, আমি তো আপনাকে ভুলছি নে!'

সেদিন কথাটা শুনে ভালোই লেগেছিল বোধ হয়।

রুমার বি-এ পরীক্ষা হয়ে গেছে। দু-জনে একদিন চাইনীজ আর্ট এক্‌জিবিশনে গেছি। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। ট্যাক্সিতে ফিরছি। রুমা হঠাৎ কথার মাঝ-খানে জিজ্ঞেস করে বললো, 'এখন আমি কী করব সমীরদা।' আমি হেসে বললাম, 'সিভিল গ্রাজুয়েশনটা এবার নিয়ে নাও না!'

রুমার ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি খেলে গেলেও মন তাতে সায় দিতে পারে নি। আশ্চর্যের বিষয়, এর পর রুমা আর একটি কথাও বলে নি। বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে একমনে। হঠাৎ দেখতে পেলাম তার চোখের পল্লবে দুর্বাদলের উপর শিশির বিন্দুর মতো জল জমেছে। বিমূঢ় হয়ে ভাবছি, এ আবার কী হলো।

'কী হলো রুমা!'

রুমা কথা শেষ হতেই সজল চোখে তাকালো আমার দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হলো, আমি রুমাকে ভালোবাসি!

গাড়ি থামলে রুমা মুখবুজে নেমে গেল। সারা রাস্তায় সে একটি কথাও বলে নি। আমিও গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালাম মোহাবিষ্ট মনে। দু-এক পা গিয়েই রুমা ঘুরে দাঁড়াল। আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফেললাম সেই দিকে। রুমা উঁচু হয়ে প্রণাম করল আমাকে। তারপর হেসে বলল, 'চলি সমীরদা!' হাসির ঝলকে ও নিজের রুদ্ধ কণ্ঠও চাপা দিতে পারে নি। আমি অবাক হয়ে ভাবছি, এ আবার কী।

দিন সাতেক পর হোস্টেলে গিয়ে শুনতে পেলাম, রুমা চলে গেছে হোস্টেল ছেড়ে। চমকে উঠলাম শুনে, কোথায় গেল রুমা?

এই ঘটনার পর দু-একদিন পর ঝুনুদির চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন, 'রুমা আমার কাছে এসেছে!' সঙ্গে পুনশ্চ দিয়ে লিখেছেন, 'তোমাকে একটি কথা বলতে ভুলে গেছি সমীর, ম্যাট্রীক পাশ করবার পরই আমার আগেই রুমার বিয়ে হয়ে যায় এবং ছ-মাস পরই ওর স্বামী মোটর অ্যাক্সিডেণ্টে মারা যায়। সেই থেকে ও আমাদের কাছেই থাকে।'

মাথাটা আমার ঝিমঝিম করে উঠল। নিজেকে কী বলে সান্ত্বনা দেব ভেবে পেলাম না। এখন বুঝলাম, ঝুনুদি কেন পুনশ্চ দিয়ে এ কথাটা লিখলেন, আর রুমাই বা কেন সেদিন কেঁদেছিল হঠাৎ। সেই চাপা পড়া প্রসঙ্গ আজ যে এমন নির্দয়ভাবে আমার জীবনে এসে উদ্‌ঘাটিত হবে—তা কি কোনোদিন ভেবেছিলাম?

ছ-বছর কেটে গেছে তারপর। আজ আমার বিয়ে। হঠাৎ রুমার কোমলস্মৃতি মনে পড়ে বুকটা কেমন করে উঠল। রুমার, এমন কি ঝুনুদির ঠিকানাও জানা নেই যে চিঠি লিখে অতীতের স্মৃতির সঙ্গে বর্তমানের বিস্মরণের সেতু গাঁথবো।

শানাই বাজছে বেহাগরাগিনীতে। আমি ছাদনা-তলায় নক্সা আঁকা পিড়িতে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছি—এমন সময় কন্যা এলেন মালা-হাতে। সাতপাক ঘুরিয়ে যখন কন্যাকে দাঁড় করানো হলো শুভদৃষ্টি এবং মালা-বদলের জন্যে—ঠিক সেই মুহূর্তে আমার দৃষ্টি পড়ল একটি মেয়ের উপর। মেয়েটি এককোণের ইঁদারার সানবাঁধানো চত্বরে দাঁড়িয়ে আছে। কাপড় তার গাছকোমর করে পরা। হাতে কপিকলের দড়ি। জল তুলছে বোধ হয়। আমি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি সেই দিকে—হঠাৎ রুমার উজ্জ্বল চোখদুটি মিলে গেল আমার দৃষ্টিকোণের সঙ্গে।

বন্ধুরা বলল, 'ওকি রে, কোন্ দিকে তাকিয়ে আছিস? লজ্জা কিসের, রাজকন্যার মুখ দেখ!'

দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখি আমার ভাবীবধূ মালা-হাতে অবনতনেত্রে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

শুভদৃষ্টির পর রুমাকে আর দেখতে পাই নি!

পুণ্যভূমি তারকেশ্বর

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রায় জন্মাবধি পুণ্যভূমি তারকেশ্বরের সহিত পরিচিত। অতি শৈশবে তারকেশ্বর তীর্থ দর্শনে গিয়াছিলাম—কবে তাহা মনে নাই। আমার প্রতিবেশিনী বিনোদিনী দাসী এক কুম্ভকার-কন্যা (বালবিধবা) আমাকে শৈশব হইতে লালন পালন করিয়াছিলেন—তিনি প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে সন্ন্যাস করিতেন—মাসের প্রথম দিকে একদিন তারকেশ্বরে যাইয়া "উত্তরীয়" (গলায় ঝোলানো মালার মত সুতার গোছা) লইয়া আসিতেন; সারা মাস একাহার হবিষ্যান্ন ভোজন করিতেন ও চৈত্র-সংক্রান্তির সময় তারকেশ্বর যাইয়া পূজা দিয়া আসিতেন। তাঁহার সহিতই প্রথম বাবা তারকনাথকে দর্শন করিতে যাই। ১৯১২ সালে তিনি পরলোকগমন করেন—মৃত্যুর দিন সকালে তাঁহাকে তীরস্থ করি ও প্রায় ১টার সময় অন্তর্জলি অবস্থায় তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। তখনও দেশে বৃদ্ধবৃদ্ধাদের গঙ্গাতীরস্থ করা রীতি ছিল—অন্তর্জলিও করা হইত। সারা দেশেই সেই প্রথা প্রচলিত ছিল। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ব্রাহ্মকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন এবং বিলাত-ফেরত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ছিলেন। তিনিও তাঁহার 'পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে' গানে লিখিয়াছেন—

> পরিহরি ভব সুখ দুখে যখন মা
> শায়িত অন্তিম শয়নে,
> বরিষ শ্রবণে সম তব জলকলরব
> বরিষ সুপ্তি মম নয়নে,
> বরিষ শান্তি সম শঙ্কিত প্রাণে
> বরিষ অমৃত মম অঙ্গে
> মা ভাগীরথী, জাহ্নবী, সুরধুনি
> কল-কল্লোলিনী গঙ্গে।

এই ত অন্তর্জলির কথা। রামপ্রসাদের গানেও আছে "অর্দ্ধ অঙ্গ থাকবে স্থলে, অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে।" রামপ্রসাদ সেকালের কবি, এ কালের কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ও একই প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

আমরা সেজন্য ১৯১০ সালে মাতামহীকে (আমার একমাত্র মাতুলের অকাল মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল তিনি আমাদের গৃহে বাস করিয়াছিলেন) এবং ১৯১৮ সালে পিতামহীকেও মৃত্যুর কিছু সময় পূর্বে তীরস্থ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম।

বিনোদিনীর সহিত কোন সালে তারকেশ্বর যাই, তাহা মনে নাই। তাহার পর কৈশোরে বন্ধুদের সহিত একবার পদব্রজে তারকেশ্বর গিয়াছিলাম। দেশের সকল লোক (রেলপথ হওয়ার পূর্বে ও পরে বহু বৎসর পর্য্যন্ত) আমার বাসস্থান আগড়পাড়া হইতে নৌকাযোগে বৈদ্য-বাটী যাইয়া নিমাই-তীর্থের ঘাটে গঙ্গাস্নান করিয়া ও মাটীর পাত্রে গঙ্গাজল লইয়া পদব্রজে তারকেশ্বর যাইতেন। পথ তখন বর্তমানের মত মসৃণ হয় নাই—ইট, কাদা, পাথর দিয়া তৈয়ারী অসমতল পথে চলিতে চলিতে পা ক্ষতবিক্ষত হইত—কিন্তু মানুষ পুণ্যক্ষেত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহা গ্রাহ্য করিত না। বলশালী ব্যক্তিরা বাঁকে করিয়া জল বহিয়া লইয়া যাইত। বহু বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে জলপূর্ণ কলসী লইয়া যাইতে দেখিয়াছি। শুধু কি তাই—বাবার নিকট প্রার্থনা জানাইয়া যে সফল-কাম হইত, সে বৈদ্যবাটী হইতে বাবার মন্দির পর্য্যন্ত দীর্ঘ পথ দণ্ডী খাটিত—অর্থাৎ নিজে শয়ন করিয়া পথ মাপিতে মাপিতে যাইত। এখনও বহু লোক দীর্ঘ দণ্ডী খাটে—অনেকে দুধপুকুরে স্নান করিয়া বাবার মন্দির কয়েকবার ঐ ভাবে প্রদক্ষিণ করিয়া দণ্ডী খাটে।

তাহার পর সারা জীবনে কতবার তারকেশ্বরে গিয়াছি, তাহার হিসাব নাই। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের সময় বহু দিন বেলা ১টায় মোটরে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া রাত্রি ১২টায় কলিকাতায় ফিরিয়া দিনের ঘটনার বিবরণ লিখিয়াছি ও পরের দিন সকালে সে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তখন দৈনিক বসুমতীর সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করিতাম ও প্রধানতম সংবাদ-সংগ্রাহক ছিলাম। বসুমতীর মালিক স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তখন নিজস্ব মোটরগাড়ী কিনিয়া-ছেন ও তাহা আমরা সকল কাজেই ব্যবহার করিয়াছি।

আমার মাতুলালয় তারকেশ্বরের নিকটস্থ হরিপাল গ্রামে। মাতুল-পুত্র কলিকাতাবাসী—কাজেই সে স্থানের সহিত আর সম্পর্ক নাই। বাল্যকালে মাতামহীর মুখে এলোকেশীর মামলার গল্প শুনিয়াছি ও নূতন রেলপথ খোলায় লোকের আনন্দের খবর শুনিয়াছি। সাধারণ মানুষ তখন গান বাঁধিয়াছিল—

> "দে পিসি ভাত চড়িয়ে
> কলকাতাটা আসি বেড়িয়ে।"

অর্থাৎ বহু পথ পদব্রজে হাঁটিয়া যে কলিকাতায় যাইতে হইত, রেল খোলায় বাড়ীর দরজা হইতে গাড়ী চড়িয়া কলিকাতা ঘুরিয়া আসা সম্ভব হইল—উহা কি কম আনন্দের কথা।

তারকেশ্বরে ধর্ণা দেওয়ার গল্প বাল্যকাল হইতে শুনিয়াছি। আমার মাতামহের দ্বিতীয় ভ্রাতা (মাতামহ তৃতীয় ছিলেন) দুরারোগ্য রোগে অকালে প্রাণত্যাগ করেন—তাঁহার রোগমুক্তির জন্য তারকেশ্বরে ধর্ণা দিয়া কোন ফল হয় নাই। ১৯৩০ সালে আমার অগ্রজও দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইলে আমার মাতৃস্বরূপা বাল-বিধবা সহোদরা তারকেশ্বরে যাইয়া ধর্ণা দিয়াছিলেন—কিন্তু কোন ফল হয় নাই—৯ মাস ভুগিয়া দাদা অকালে পরলোকগমন করেন।

সেদিন বর্তমান মোহান্ত মহারাজের কাছেও শুনিলাম, বৎসরে

প্রায় ৩ হাজার নরনারী ধর্ণা দিতে আসে—তন্মধ্যে অর্দ্ধেক সফল-কাম হয়—অনেকে ফলাফল না জানাইয়াই চলিয়া যায়—অনেকে তাহাদের বিফলতার কথাও জানাইয়া যায়। তারকেশ্বর মঠ হইতে বর্তমানে খ্যাতনামা কোবিদ ও অধ্যাপক ডাক্তার অমরেশ্বর ঠাকুরের সম্পাদনায় 'পুণ্যভূমি' নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে—তাহাতে ধর্ণা দেওয়ার বিবরণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

মোহান্ত মাধব গিরির সময় এলোকেশীর মামলা হইয়াছিল—সে ইতিহাসের কথা। মাধব গিরির পর পূর্ণ গিরি ও তৎপরে সতীশ গিরি মোহান্ত হন। সতীশ গিরির সময় তারকেশ্বরের অনাচার চরমে উঠে—সে জন্য ১৯২২।২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ আন্দোলন হয়। সে আন্দোলনে বহু মারপিঠ, দাঙ্গাহাঙ্গামা, ধরপাকড়, কারাদণ্ড প্রভৃতি হইয়াছে। সে সত্যাগ্রহে নিগ্রহ বা কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন এমন বহুলোক এখনও সারা বাংলাদেশে জীবিত আছেন। স্বামী বিশ্বানন্দ ও স্বামী সচ্চিদানন্দ নামক দুইজন সন্ন্যাসী সত্যাগ্রহ পরিচালনা করিতেন। সতীশ গিরির লোক বৃদ্ধ সচ্চিদানন্দকে একদিন এত অধিক প্রহার করিয়াছিল যে তিনি কয়েকঘণ্টা অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন ও লোক মনে করিয়াছিল, তাঁহার আর জ্ঞান হইবে না। সেদিন তারকেশ্বরে যাইয়া বহু সময় তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকার সুযোগ আমার হইয়াছিল। দীর্ঘকাল সত্যাগ্রহের পর বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার নেতৃত্বে মামলা চলে। সতীশ গিরি ধৃত হইয়া হাজত বাস করে ও হাজতেই তাহার মৃত্যু হয়। তৎপূর্বে মঠের বহু সম্পত্তি সে বেনামা করিয়াছিল এবং প্রচুর ধনরত্ন বিহারে সরাইয়া ফেলিয়াছিল। সতীশ গিরিও তাহার চেলা প্রভাত গিরি উভয়েই বিহারবাসী ছিল। বহু বৎসর মামলার পর হাইকোর্ট হইতে তারকেশ্বর মঠ পরিচালন সমিতি ও মোহান্ত নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। স্বর্গত পণ্ডিতপ্রবর (তিনি সরকার প্রদত্ত মহামহোপাধ্যায় উপাধি ত্যাগ করিয়াছিলেন) পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের চেষ্টায় বাঙ্গালী সন্ন্যাসী পূজ্যপাদ দণ্ডীস্বামী জগন্নাথ আশ্রম মহোদয়কে তাঁহার কাঁকোস্থিত আশ্রম হইতে আনিয়া মোহান্তপদে বৃত করা হয় ও প্রায় ২১ বৎসর পূর্বে তিনি তারকেশ্বরে আগমন করেন। তৎপূর্বে তারকেশ্বর মঠ ও ষ্টেট-রিসিভারের অধীন ছিল। রিসিভারের সময়ে পূর্বাবস্থার বিলোপ হইলেও পুরাতন কর্মচারীবৃন্দ থাকায় যাত্রী সাধারণের সুখ সুবিধা অধিক বর্দ্ধিত হয় নাই। জগন্নাথ আশ্রম মহারাজের সময়ে যাত্রীগণের অভাব অভিযোগ বহুল পরিমাণে দূর করা হয় এবং মঠের স্থাপিত উচ্চ বিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতির পরিচালনার সুব্যবস্থা হয়। মোহান্তের প্রাসাদে সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়—এখন সেখানে ৪০টি ছাত্র থাকিয়া শিক্ষা ও অন্নাদি লাভ করিয়া থাকে। ৫।৬ জন সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া তাহাদের শিক্ষাদান করিতেছেন। কিন্তু বাঙ্গালীর অদৃষ্ট মন্দ—কাজেই মঠ পরিচালন ব্যাপারে মোহান্তের সহিত কমিটীর মতভেদ উপস্থিত হইল। বহু চেষ্টার পরও সে মতভেদ দূর করা সম্ভব হইল না—পরিচালন ব্যবস্থা লইয়া বহু মামলার উদ্ভব হইল। শান্তিপ্রিয় ও সাধনারত শ্রীশ্রীজগন্নাথ আশ্রম সে সকল গণ্ডগোল সহ্য না করিয়া তাঁহার তরুণ শিষ্য শ্রীশ্রীহৃষীকেশ আশ্রমকে মোহান্তের কার্য্যভার প্রদান করিয়া নিজ-আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন। গত ৬ বৎসর কাল হৃষীকেশ আশ্রমই মঠ ও সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

জগন্নাথ আশ্রম মহারাজের সময় বহুবার মঠে যাইয়া রাত্রিবাস করার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। সাধারণ যাত্রীদের সহিত মেলা-মেশা করিয়া শুনিয়াছি—এখন আর কাহারও নিকট অন্যায়ভাবে অর্থ আদায় হয় না। যে সকল যাত্রী ধর্ণা দিতে আসে, তাহাদের ও তাহাদের সঙ্গীদের উপযুক্তভাবে দেখাশুনার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। মধ্যাহ্নে বাবার ভোগ (লুচি, মিষ্টান্ন ও পায়েস) সকল যাত্রীর মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা আছে। দরজায় অর্থ দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয় না। স্বেচ্ছায় যিনি যাহা দেন—তাহাই গ্রহণ করা হয়। মোহান্ত প্রত্যহ একবার কিছুক্ষণের জন্য মন্দিরে পূজা করিয়া গদীতে বসিয়া সকল বিষয় দেখাশুনা করিয়া থাকেন। বর্তমান মোহান্ত হৃষীকেশ আশ্রম অতি অল্প বয়সেই গুরুর আশ্রমে গমন করেন ও তথায় থাকিয়া শিক্ষাদি লাভ করিয়াছেন। তিনি সুপণ্ডিত এবং তাঁহার তেজোদ্দীপ্ত শরীর দেখিলেই বুঝা যায়, যে তিনি তপস্যা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। মঠে সদাব্রতের ব্যবস্থা আছে; অতিথি অভ্যাগত ও সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রত্যহ অন্ন দান করা হয়। মোহান্তের বাড়ী রাজপ্রসাদ তুল্য। নিম্নতলের ঘরগুলি অফিস, ছাত্রাবাস, চতুষ্পাঠী, অধ্যাপকদের ও কর্মীদের বাসস্থান প্রভৃতি রূপে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতলে অধিকাংশ হলঘর ফাঁকা পড়িয়া থাকে। একটি বড় হলে প্রত্যহ সন্ধ্যায় ভাগবতাদি পাঠ হইয়া থাকে। মোহান্ত মহারাজ একটি ঘরে বাস করেন ও একটি হলে বসিয়া দর্শনার্থীদের দর্শনদান করিয়া থাকেন। পূজ্যপাদ জগন্নাথ আশ্রমের নিকট শুনিয়াছিলাম, তাঁহার বাসের জন্য স্বতন্ত্র একটী কুটীর নির্মাণ করিয়া দিলে তিনি তথায় বাস করিবেন ও বর্তমান অট্টালিকায় কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইবে। শুনিলাম, অর্থাভাবে সে ব্যবস্থা সম্ভব হয় নাই। অর্থব্যয় লইয়া এখনও মোহান্তের সহিত কমিটীর দ্বন্দ্ব লাগিয়া আছে—কমিটীর সদস্যগণ সকলেই সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি—কেন যে এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয় না, তাহা বুঝি না। প্রাক্তন মোহান্ত ত্যাগী ও বিবেচক ব্যক্তি ছিলেন—বর্তমান মোহান্ত ত বয়সে নবীন, কর্ম করিবার জন্য আগ্রহশীল ও জনকল্যাণব্রতী। মীমাংসার অসুবিধা কি, জানা যায় না।

তারকেশ্বরে যাত্রী সমাগম যত অধিক, সে পরিমাণে যাত্রী-দিগের বসবাস বা সুখ সুবিধা বিধানের ব্যবস্থা নাই। পাণ্ডাদের অত্যাচার হয় ত নাই, কিন্তু সুবিধা পাইলেই যে অশিক্ষিত, ধর্মান্ধ ব্যক্তিদের কাছে অন্যায়ভাবে অর্থ আদায় করা হয়, একথা অস্বীকার করা যায় না। ইলেকট্রীক কোম্পানী কাজ আরম্ভ করিয়াছে বটে, কিন্তু সর্বত্র আলোর ব্যবস্থা হয় নাই। শুনিলাম, অর্থের অভাবে

মোহান্তের বাসগৃহে এখনও বিজলী বাতি জ্বলে নাই। প্রাচীনকালের যাত্রীনিবাস বা চটিগুলি এখনও সেইভাবেই আছে—নূতন ধরণের ভাল ধর্মশালা নির্মিত হয় নাই।

বহুপূর্বে একবার চৈত্রমাসে গাজনের সময় তারকেশ্বরে গিয়াছিলাম। তাহার পর কয়েকবৎসর পূর্বে শ্রদ্ধেয় সুহৃদ শ্রীযুত প্রহ্লাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিমন্ত্রণে একবার গাজন মেলা দেখিতে তারকেশ্বর গিয়েছিলাম—তখন পূজ্যপাদ জগন্নাথ আশ্রম মোহান্ত এবং প্রহ্লাদবাবু ষ্টেটের ম্যানেজার; যদিও সে সময় কয়েক লক্ষ যাত্রী সমাগম হয়, তথাপি ষ্টেট কর্তৃপক্ষ তথা মোহান্ত তাহাদের জল ও আলো সরবরাহ, পায়খানা প্রভৃতির ব্যবস্থা, সম্ভব মত সুখাদ্য পরিবেশন, রোগে চিকিৎসা, পূজার্চনার সুযোগ দান প্রভৃতিতে বিশেষ অবহিত ছিলেন। এত অধিক লোকের জন্য যে অস্থায়ী ব্যবস্থা করা হয়, তাহা কখনই—একেবারে ত্রুটিশূন্য হইতে পারে না। আমরা মন্দির বা সম্পত্তির আয় ব্যয় সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করি নাই। তথাপি একথা অবশ্যই বলিব যে, সেখানে প্রত্যহ শত শত ও বিশেষ উৎসবে বা মেলায় লক্ষ লক্ষ যাত্রী সমাগম হয়, সেখানে জল, আলো ও খাদ্যের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা, বিশেষ উৎসবে বা মেলায় স্বয়ং-সেবকদল লইয়া আগত নরনারীদের সুখসুবিধাবিধান ব্যবস্থা প্রভৃতি অবশ্য কর্তব্য। তরুণ মোহান্ত মহারাজকে এ সকল বিষয়ে অবহিত হইয়া কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করি। মন্দির ও মোহান্তের প্রাসাদ সংলগ্ন সহরটি কবে, কাহারা, কি ভাবে নির্মাণ করিয়াছিল জানি না, তবে উহা সংস্কার সাধন ও নূতন করিয়া পথ, ঘাট, ড্রেণ, গৃহ, স্যানিটারী পায়খানা প্রভৃতি নির্মাণ করা আজ বিশেষ প্রয়োজন। এ বিষয়ে অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন হইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবশ্যই সে কার্যে অগ্রসর হইবেন। কমিটির সদস্যগণ এতদিন কেন এ সকল বিষয়ে অবহিত হন নাই জানি না। মোহান্ত তীর্থ-গুরু ও ধর্ম-গুরু—দেবস্থান রক্ষা, পূজার্চনা, সাধনা, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা যেমন তাঁহার নিত্যকর্ম, তেমনই দুর্গত নরনারীগণের সেবাও তাঁহার কর্তব্য। সাধারণ, দরিদ্র, অশিক্ষিত, ধর্মান্ধ যাত্রীরা যাহাতে কোনরূপ দুঃখ কষ্ট না পায়, যাহাতে তাহারা অনায়াসে বাবার পূজা করিয়া তৃপ্তি লাভ করে, তাহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থায় মোহান্তের নিযুক্ত কর্মীদের সর্বদা অবহিত থাকিতে হইবে এবং মোহান্ত মহারাজকে নিজেও সে সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধানে কিছু সময় ব্যয় করিতে হইবে।

অত্যাচার অনাচারের দিন শেষ হইয়াছে—তাই বলিয়া কাহারও নিষ্ক্রিয় বা উদাসীন হওয়া চলিবে না। সেবা ধর্মই এ যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম—সেই সেবা দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় আমরা যেন বিরত না হই।

তারকেশ্বর প্রাচীন তীর্থ—তাহার ইতিহাস প্রায় অজ্ঞাত। কিম্বদন্তীর উপর যে ইতিহাস গ্রথিত, তাহার আলোচনায় কোন লাভ নাই। তবে তীর্থ-মাহাত্ম্য আজও অটুট আছে। শত শত বৎসর ধরিয়া আর্ত, পীড়িত, শরণাগতের দল তারকেশ্বরে পূজা দিয়া, মানত করিয়া, ধর্ণা দিয়া, দণ্ডী খাটিয়া অভীষ্টলাভ করিয়া আসিতেছে ও আসিবে, এই কার্য্য স্মরণাতীত কালের, ইহার মধ্যে কোন ছেদ নাই—মাধব গিরি বা সতীশ গিরির দারুণ অনাচারের সময়ও ভক্তগণ তারকেশ্বরে তীর্থযাত্রা বন্ধ করে নাই—শত বিপদ মাথায় লইয়া লোক বাবার চরণে শরণ লইতে গিয়াছে; আমাদের বিশ্বাস, বর্তমানের জড়বাদজর্জরিত, ইহকালসর্বস্ব লোকেরাও সেই পথ ত্যাগ করে নাই, করিবে না, করিতে পারে না। তাই আজও তারকেশ্বরে যাইলে আমরা যাত্রীর ভিড় দেখি, মন্দির চত্বরে বহুলোককে ধর্ণা দিতে দেখি, মন্দির প্রাঙ্গণে বহুলোককে দণ্ডী খাটিতে দেখি। এইসব মূক জনগণের উপযুক্ত সুখসুবিধার ব্যবস্থা যুগধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ব্যবস্থাও যেন যুগোপযোগী হয়—তাহা গ্রহণ করিয়া গ্রহীতাও যেন নিজেকে ধন্য মনে করে।

তারকেশ্বর তীর্থ কলিকাতার অতি নিকটে—বর্তমানে বৈদ্যুতিক রেলের ব্যবস্থা হইয়াছে। তীর্থস্থান ফাঁকা মাঠের উপর—জনবহুল স্থান নহে। মন্দির কর্তৃপক্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্যোগী হইলে তথায় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, আবাসিক কলেজ, কৃষি-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি অতি সহজে গড়িয়া উঠিতে পারে। মন্দির-মঠ হইতেই চিরদিন এদেশে শিক্ষা বিস্তার করা হইয়াছে—তারকেশ্বর মঠ সে আদর্শে অনুপ্রাণিত হউক—বাবা তারকনাথের আশীর্বাদ সকলকে কর্ম প্রেরণা অবশ্যই দান করিবে; দণ্ডী মোহান্ত মহারাজের দণ্ডের প্রভাবে তারকেশ্বর হইতে সকল অত্যাচার অনাচার যেন বিতাড়িত হয়, সর্বান্তঃকরণে ইহাই আমরা প্রার্থনা করি।

শিক্ষার্থীর বিশৃঙ্খলা

শ্যামলী

মানুষ সারা-জীবনই শিক্ষালাভ করে, তবুও যখন সে স্কুলে কলেজে প্রবেশ করে অধ্যয়নরত থাকে তখনই তাকে প্রকৃত শিক্ষার্থী বলা হয়। সেই হিসাবে আমিও দীর্ঘকাল শিক্ষার্থিনী ছিলাম, কিন্তু এখন যেমন যখন-তখন যেখানে-সেখানে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে উপদেশ বর্ষণ হয়ে থাকে, আমার শিক্ষাকালে তেমন উপদেশ বর্ষণ দেখিনি। আর সব চেয়ে মজার কথা এই যে, প্রত্যেক উপদেষ্টাই ধরে নেন যে শিক্ষার্থীরাই উপদিষ্ট হবার পাত্র, শিক্ষার্থীরাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ। মনে হয়, ভেবে দেখা হয়না শিক্ষার্থীদের উপর এই দোষারোপ কতদূর ন্যায়সঙ্গত।

এই তো, সেদিন ছাত্রদের উপস্থিতিতে জনৈক বয়স্ক শিক্ষক এক বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্রে সমবয়স্ক অপর শিক্ষককে লগুড়াঘাতে অপমানিত করলেন। দিল্লীতে এক বিদ্যালয়ের দরজায় ছুটির পর হাজার খানেক ছাত্রের সামনে দুইটি শিক্ষক কথাকাটাকাটি করে পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন! তাঁরা পরস্পরের গলাটিপে শ্বাসরোধ করতে উদ্যত হলে ছাত্রদল তাঁদের টেনে হিঁচড়ে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ ছাড়ায়। পড়ুয়াদের উপস্থিতিতে শিক্ষকদের এইরূপ ব্যবহার লজ্জাজনক নয় কি? এঁরা ভবিষ্যতে ছাত্রদের কাছে কতটা সম্মান পেতে আশা করেন?

নাম-করা ডাক্তাররা বলছেন, ধূমপান ফুসফুসের অনিষ্ট করে। পান-তামাকও নাকি দাঁত নষ্ট করে। ভারতীয় মাতা-পিতা চিরকালই ছেলে-মেয়েদের ধূমপান ও তাম্বুল সেবন করতে বারণ করে আসছেন; কারণ তাঁরা মনে করেন—ধূমপানে শ্বাস ক্রিয়া ব্যাহত হয়, পান দাঁত নষ্ট করে এবং সুপারী চর্ব্বণে তোতলামি জন্মায়। তথাপি বড় বড় সহরেও অনেক শিক্ষক পান চিবুতে চিবুতে ক্লাশে আসেন, অনেকে আবার ছাত্রদের দিয়েই নিজেদের পান সিগারেট কেনান। যে কোন শিশুই মাতা-পিতাকে অপর বয়স্ক ব্যক্তি অপেক্ষা সম্মান করে, সুতরাং যে শিক্ষক যত পান তামাক প্রভৃতির প্রতি অনুরাগী, পিতৃমাতৃভক্ত ছাত্রদের চক্ষে তিনি ততই কম সম্মানীয় হয়ে পড়েন। কিন্তু স্বভাবতঃ অধিকতর অনুকরণপ্রিয় বলে অনেক ছাত্র শিক্ষকদের নকলও করে; তখন তারা শিক্ষকদের সামনেই পান চিবুতে বা ধূমপান করতে ইতস্ততঃ করে না। ছাত্রের এই উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য দায়ী কে?

ক'জন শিক্ষক-শিক্ষিকা আজকাল যত্ন নিয়ে পড়ান? বাংলা দেশেই এক বিদ্যালয়ে ত্রৈমাসিক পরীক্ষায় দশমিকের একটি অঙ্ক কোন পরীক্ষার্থীই করতে পারেনি। জনৈক ছাত্র এই প্রথম গণিতে ১০০।১০০ পেল না। তার পিতা এই অসাফল্যের কারণ জানতে চাইলে পত্রের উত্তর হল, এই নিয়মের অঙ্ক ক্লাসে শেখান হয়নি। পিতা গণিতের শিক্ষকের নিকট নালিশ আনলেন। শিক্ষকমশায় বললেন, "শেখান হয়নি, তবে হবে।" প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে তার কারণ "সিলেবাসে" নিয়মটি শেখাবার আদেশ রয়েছে। স্কুল পরিদর্শকগণ স্কুল পরিদর্শনে এসে নাকি দেখবেন—প্রশ্নপত্রে এই নিয়মের প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে কিনা। মনে হয় প্রশ্নপত্র দেখে স্কুল-পরিদর্শক ধরে নেবেন "সিলেবাস" অনুসরণ করে পড়ান চলছে। পরিদর্শক সন্তুষ্ট হলেন, শিক্ষককে উপরওয়ালার নিকট জবাবদিহি করতে হল না। কিন্তু না শিখিয়ে প্রশ্ন করার জন্য শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের মনোভাব কিরূপ হল? "পাবলিক" পরীক্ষা-গুলিতেও "পেপার-সেটার" ও পরীক্ষা-পর্ষদের ভুল-ভ্রান্তির জন্য "সিলেবাসের" বাইরে থেকে প্রশ্ন তো হামেশাই আসে এবং তার ফলে পরীক্ষার হলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এই বিশৃঙ্খলার জন্য পরীক্ষার্থীদের দায়ী করা অন্যায় নয় কি? শিক্ষক বা পরীক্ষকদের ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে এরূপ অদ্ভুত ছিনিমিনি খেলার অধিকার কে দিল?

আর এক শিক্ষক-সম্প্রদায় আছেন যাঁরা ইচ্ছা করে সাপ্তাহিক ও ত্রৈমাসিক পরীক্ষাগুলিতে ছাত্রদের কম নম্বর দিয়ে থাকেন। তাঁরা বলতে চান—কম নম্বর পেলে ছাত্র-ছাত্রী অধিকতর মনোযোগ সহকারে পাঠাভ্যাস করবে ও ভবিষ্যতে ভাল 'মার্ক' পাবে। কিন্তু কম নম্বর পেতে পেতে ছাত্র-ছাত্রীর মন দমে যায় না? দমে যাওয়া মন সহজে ওঠে? উৎসাহ ব্যতিরেকে কাজে রুচি আসে কি? এই সহজ সত্য কি শিক্ষকদের অজ্ঞাত?

আমি সেই শিক্ষকদের ব্যবহার আরও গর্হিত বলে মনে করি, যাঁরা—ত্রৈমাসিক পরীক্ষায় ফেল হওয়া ছাত্রদের বলেন "প্রাইভেট টিউটর" ব্যতীত তাদের পাশ করার সম্ভাবনা নেই। এ যেন হাতে ধরে "প্রাইভেট ট্যুইশন" চাওয়া। সত্যি, অনেক শিক্ষক ক্লাসের পড়ান অবহেলা করে ঘুরে ঘুরে "প্রাইভেট ট্যুইশন" করবায় জন্য শক্তি বজায় রাখতে চান। এইরূপ শিক্ষকের শিক্ষণের উপর কজন ছাত্র আস্থা রাখতে পারে? বল বাহুল্য এঁরা ছাত্রদের আকৃষ্ট করতে পারেন না।

কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক অনুকরণীয়। পিতা কন্যার স্কুল হতে সাত মাইল দূরে সরকারী কোয়ার্টার পেলেও নবম শ্রেণীর ছাত্রী অপর্ণা নূতন বাড়ীর পাশে নূতন স্কুলে ভর্ত্তি হতে চাইল না। সাত মাইল পথ "পাবলিক" বাসেই যাওয়া আসা করে পুরোণ স্কুলেই রইল। অপর্ণাকে বললাম, "আমাদের ছেড়ে গেলে না কেন? আমাদের স্কুলের না আছে নিজস্ব বাড়ী, না আছে খেলার মাঠ। এই স্কুলে ভালবাসার মত কি পেলে?" ইতস্ততঃ না করে অপর্ণা উত্তর দিলে "আমি যে আপনাদের ভালবাসি।"

এই প্রসঙ্গে শিক্ষকদের কী বলবার আছে? তাঁরা দুঃখ করেন—তাঁদের মত শিক্ষাপ্রাপ্ত অন্যান্য কর্মী অপেক্ষা তাঁরা কম পারিশ্রমিক পান, অনেকের বেতন নাকি এত কম যে দু'বেলা অন্ন-সংস্থানই দুঃসাধ্য, ক্লাসে

ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান ; সুতরাং তাঁরা কিরূপে নির্ভাবনায় সন্তুষ্ট-চিত্তে শিক্ষাদান করবেন? এই অসন্তোষের জন্য সমাজের উপর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টায় শিক্ষকগোষ্ঠী হরতালের হুমকি দেন, অনেকে হরতাল করেন। এই ভাবে শিক্ষকগণও ক্রমশঃ শিক্ষণের মর্য্যাদাকে ভাড়াটে মজুরের শ্রম-বিক্রয়ের পর্য্যায়ে এনে ফেলছেন।

অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অভিযোগগুলি অমূলক নয়। অনেক স্কুলে শিক্ষকগণ মাসের পর মাস বেতন পান না। কারণ? হয় স্কুল কমিটি, সাহায্যকারী সরকার, মিউনিসিপ্যাল কমিটি বা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের নিয়ম মাফিক জমা খরচের হিসাব দিতে পারেন না, অথবা সাহায্য-কারীদের কে কি হারে সাহায্য দেবেন অনেক ক্ষেত্রে তাই স্থির হয়ে ওঠে না। অনেক সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীদের কম পারিশ্রমিক দিয়ে পুরো বেতন পাবার স্বীকৃতি লিখিয়ে নেওয়া হয়। বাকি টাকা কোথায় যায়? স্কুল-কমিটিগুলিই জানেন। কিন্তু এইরূপ গোলযোগের জন্য কার সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়? ছাত্র-ছাত্রীদেরই। আবার শিক্ষকদের এই গোলযোগের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে লড়তে দেখে শিক্ষার্থী সম্প্রদায়ও জোট পাকায় এবং কারণে অকারণে নিজেদের অভিযোগ খাড়া করে। এরূপ অভিযোগ করা ভুল হতে পারে, তবে এই ভুল পথ ছাত্রেরা অনুসরণ করে শিক্ষকদের অনুকরণ করেই।

এখানেই এই প্রবন্ধের সমাপ্তির রেখা টানতে পারছি না। শিক্ষার্থীদের বিপথে পরিচালনার কথা যখন উঠলই, দেখা যাক্ কি ভাবে বা কাদের দ্বারা এরা কতখানি বিপথে পরিচালিত হয়। বিনা দ্বিধায় বলা যেতে পারে—রাজনীতি নিয়ে যাঁদের খেলা তাঁরাই এই ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অধিক দায়ী। আজকের কথা নয়, সুদূর উনিশশো চব্বিশ খৃষ্টাব্দেও কলকাতার মাঠে মাঠে শুনেছি ম্যাজিক লণ্ঠন সমভিব্যাহারে রাজনীতিকগণের ভাষণ। তাঁরা বোঝাতে চাইতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কোনও মূল্য নেই। পর্দায় দেখাতেন মোটা মোটা বইএর চাপে পড়ে ছাত্রের দুঃস্থ অবস্থা। এই বক্তৃতাগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তখন যারা স্কুল কলেজ ছেড়েছিল আজ স্বাধীনতা লাভের পর তারা বেশী লাভবান হয়েছে, না যারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আঁকড়ে ছিল তারা বেশী লাভ করছে? এর উত্তর অনাবশ্যক।

কে যে বর—একথা বারবার স্মরণ করিয়ে কি কাকেও ভাল করা যায়? ভাষণ দিয়ে বারে বারে শিক্ষার্থীদের অশিষ্ট আচরণ দূর করতে বললে কতটুকু সুফল পাওয়া যাবে? এতে বরং ছাত্রদল অধিকতর উত্যক্ত হয়ে উঠবে বলেই মনে হয়। ছাত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করতে হলে শিক্ষকদের সাথে বোঝাপড়া করে সুফলদায়ী মীমাংসায় আসাই সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন। কারণ শিক্ষকই ছাত্র তৈরী করেন। জাতি গঠন তাঁরই হাতে। নিজেদের সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সজাগ থেকে রাজনীতিকদেরও বর্ত্তমান শিক্ষার্থীদের ঘাঁটান উচিত নয়, কারণ আজকের শিক্ষার্থী কাল শিক্ষক বা রাজনীতিক হবে।

সব শেষে মাতাপিতাদেরও কিছু বলতে চাই। শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তাঁদেরও বড় রকমের দায়িত্ব রয়েছে। ছেলে-মেয়ের সমানে তাঁরা যেন কখনও কোন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর প্রশংসা বা নিন্দা না করেন, রাজনৈতিক দলগুলি সম্বন্ধেও যেন অযথা সমালোচনা না করেন। ছেলে-মেয়ের দোষ ক্রটির প্রতি মাতাপিতা যে উদাসীন থাকবেন না তাতো বলাই বাহুল্য।

জন (তা) সাধারণ

শঙ্কর গুপ্ত

জনৈক রিপোর্টারকে একবার একটি প্রশ্ন করেছিলাম—উত্তরে তিনি মৃদু হেসেছিলেন। সে সময় তেনজিংকে কলকাতায় পৌর-সম্বর্দনা জ্ঞাপন করা হচ্ছিল। কাগজে এক জনতার ছবি প্রকাশিত হয়। নিচে লেখা ছিল তেনজিঙের সম্বর্ধনায় উল্লসিত জনতা। তারই দু একদিনের মধ্যে সংবাদপত্রে শ্যামাপ্রসাদের শোকযাত্রার খবর চিত্রসহ প্রকাশিত হয়। ছবির নিচে লেখা শ্যামাপ্রসাদের মহাপ্রয়াণে শোক-জনতার একাংশ। আমার প্রশ্নটি ছিল জনতার ছবি সংক্রান্ত—তেন-জিঙের সম্বর্দ্ধনা এবং শ্যামাপ্রসাদের শোকযাত্রা উভয় চিত্রেই জনতার রূপ আমার একই রকমের বোধ হয়েছিল। তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—একই ছবি কি বিভিন্ন ক্যাপশনে আপনারা ছেপে দেন? উত্তরের পরিবর্তে তাঁর মৃদু হাসি লক্ষ্য করে তাঁকে সে বিষয় পীড়াপীড়ি করিনি, তবু ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করার ইচ্ছা ছিল। সে ইচ্ছা আরো বলবতী হল সাম্প্রতিক ট্রাম ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণের স্থান লক্ষ্য করে।

ধর্মঘটের সঙ্গে ধর্মের কতটা সম্বন্ধ তা ধারণা করার মত বুদ্ধি আমার ঘটে নেই। কিন্তু সাধারণের পরিবহন ব্যবস্থার সঙ্গে আমার যে প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে তাতে পরিবহনের অভাব ঘটলে সকলের সঙ্গে আমিও অত্যন্ত কষ্টে পড়ি। বিষম কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, গত ট্রাম ধর্মঘটের সময় কখন এ পক্ষ, কখনও সে পক্ষ তাঁদের নিজেদের মীমাংসা চেষ্টার ফাঁকে ফাঁকে প্রয়োজনমত জনসাধারণের উল্লেখ করছেন। রাজনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ হলেও গণতন্ত্রে প্রচ্ছন্নভাবে জন-সাধারণ যে অংশ গ্রহণ করে তা একান্ত পরোক্ষ এবং নিতান্ত গৌণ

বলে আমার বিশ্বাস জন্মেছে। যাঁরা যা করার ঠিকই করে যান। সে সময় জনসাধারণের চিন্তায় তাঁদের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে না। যখন ঠেকে যাবার সময় আসে তখন জনসাধারণের ধুয়া তোলার প্রয়োজন দেখা দেয়। হাতের পাঁচের মত জনসাধারণ কথাটিকে ব্যবহার করা হয় মাত্র। জনসাধারণের সঙ্গে গড্ডালিকার নিকট-সাদৃশ্য লক্ষ্য করে বোধহয় দ্বিজেন্দ্রলাল 'মানুষ আমরা নহি ত মেষ' স্মরণ করাতে চেয়েছিলেন। যার খুশী মেষপালক হতে চাইলে জনসাধারণের পক্ষে কোন প্রতিবাদের উপায় না থাকার কারণ—জনসাধারণ কোন প্রতিষ্ঠান নয়। ভিড় আছে, জনতা আছে, কিন্তু তা জনসাধারণ নয়।

জনসাধারণের মুখপাত্র নেই। আমার খেয়াল হল আমি দুকথা বললাম, আপনার অবসর হল আপনি দুকথা বললেন। কিন্তু বাস্তবিক যদি জনসাধারণের উত্তর দেবার ক্ষমতা থাকত তাহলে জনসাধারণ আমাকে বলত, তুমি বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম কর; আপনাকে বলত, আপনি গঙ্গার ধারে মাথায় একটু ঠাণ্ডা হাওয়া লাগান গিয়ে। জনসাধারণের যদি উপায় থাকত—জনসাধারণ যদি একটা দলের মত বা একটা ইউনিয়নের মত বা একটা সেনাবাহিনীর মত বস্তু হত—তাহলে সে তার কথা বলতে পারত। কিন্তু পাঁচদিনের পর দশদিন, বিশদিনের পর চল্লিশ দিন কেটে গেলেও জনসাধারণ কিছু কয়তে পারে নি—শুধু হেঁটেছে, বাসে গুঁতোগুঁতি করেছে, ঘেমেছে, ভিজেছে আর কষ্ট পেতে পেরেছে। খবরের কাগজে কখন ছাব্বিশদিনের মাথায়, কখন সাইত্রিশ দিনের মাথায়—কখন মালিক পক্ষকে, কখন ধর্মঘটি পক্ষকে এক একবার জনসাধারণ জনসাধারণ—করতে দেখেছে। আমি এবং বাকী ন লক্ষ নিরানব্বই হাজার নশ নিরানব্বই জন ট্রামযাত্রী ক্লোরফরম দেওয়া রোগীর জ্ঞান ফেরার সময় দূরাগত ধ্বনি কানে আসার মত মাঝে মাঝে আমাদের নামোচ্চারিত হতে শুনেছি। কিন্তু বলতে পাইনি—না বাপু—আমরা কিছু বলিনি, তোমরা নিজেরা যা হয় কর, আমাদের জড়িও না। আমাদের মুখের ঘোলকলা পূর্ণ হয়েছে।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে, পাবলিক মেমরি ইজ ভেরি শর্ট। জনসাধারণের শ্যামা ঘেন্না করার ক্ষমতা অসীম। তারা কিছু মনে রাখে না; শুধু গড্ডালিকা—অর্থাৎ ভেড়ার স্বগোত্র নয় ইংরেজী প্রবাদ অনুসারে জনসাধারণ গাধার গোষ্ঠীভুক্তও বটে—তাদের মাথায় কিছু থাকে না। আমাদের পিতামহরা সুরেন্দ্রনাথকে জাতীয়তার জনক বলেও জুতোর মালা ছুঁড়েছিলেন, আমাদের পিতৃস্থানীয়েরা চিত্তরঞ্জনকে দেশবন্ধু বলেও গালিগালাজ করেছিলেন, আমরা গান্ধীকে মহাত্মা বলেও শেষটায় হত্যাই করে ফেলেছি। পাবলিক মেমরি যে শর্ট এক হিসেবে তাতে কোন ভুল নেই; এখুনি পায়ের ধুলো নেওয়া, তখুনি মাথায় পা দিয়ে যাওয়া থেকে সেটা প্রমাণ হয়। কিন্তু সেই ভরসায় যে সকলেই আমাদের হাতে তামাক খেয়ে যাবে এ কেমন কথা!

এ নিবন্ধের অবতারণার কারণ আমি সাধারণ মানুষ হিসেবে নিজেকে ব্যষ্টিগতভাবে জনসাধারণ বলে মনে করি এবং জনতার সঙ্গে জনসাধারণের কোথাও একটা পার্থক্য আছে এমন একটা বিশ্বাস জন্মেছে। ফলে এটা ধরে নিয়েছি যে বাজার করে ফেরার পথে চোর ধরা পড়েছে শোনামাত্র থলিটা অন্যের জিম্মায় রেখে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে উক্ত তথাকথিত চোরকে বিনা প্রমাণে দুটো ঘুঁসি এবং তিনটে থাপ্পড় মারায়—আমার মত বিরোধী অনেকেই আছেন। ভিড়ের মধ্যে গিয়ে পড়লে স্বাতন্ত্র্য এবং বিবেচনা বর্জন যাঁরা অবশ্য কর্তব্য বিবেচনা করেন না, তাঁরাই আসলে জনসাধারণ; বাকী সবটা জনতা। এই জনতাকে বোধহয় ইংরেজীতে পাবলিক বলে। এদের স্মৃতিশক্তি দুর্বল। একবার মার মার রব তুললে এরা দিগ্বিদিক ভুলে মারমুখী হবে—কাকে মারতে হবে না জেনেই। 'জয় সম্রাট শাজাহানের জয়' বলার পর একটা বক্তৃতায় সে মতের পরিবর্তন ঘটিয়ে 'জয় সম্রাট আলমগীরের জয়' বলান যেতে পারে। লাগ-সই আর একটা বক্তৃতা দিতে পারলে 'উভয়েই নিপাত যাক' জীগীরও তোলান যেতে পারে। এই পাবলিক ওপিনিয়নকে রাজনৈতিক, নাইদার পাবলিক নর ওপিনিয়ন বলতে ভরসা পায়—আর সে কারণে গ্রাহ্য করে না।

জনতার মধ্যে মারমুখো গুণটি লক্ষ্য করে স্বার্থান্বেষীরা প্রতিপক্ষকে ভীত করার বাসনায় জনসাধারণের ধুয়া তোলেন। স্বার্থান্বেষীদের প্রতি আমাদের নিবেদন—যাদের লেলিয়ে দেওয়া চলে তাদের আমরা সারমেয় বলে জানি, তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সংস্রব নেই। আমরা শান্তিপ্রিয় নির্বিরোধী নাগরিক। কেউ পা মাড়িয়ে দিলে তার নাকে ঘুঁসি না মেরে পাটা সরিয়ে দিতে (পারলে নিজেরটা সরিয়ে নিতে) আমরা অভ্যস্ত। শান্ত, শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন, রুচিবান, ভদ্র নাগরিকদের মোটামুটি সহ্যশক্তি ভালই। তবু সে সহ্যের সীমা আছে। জনসাধারণের কাঁধে বন্দুক রেখে দাগার অভ্যাস একবার করলে তা কাটান শক্ত। তবে বরাবর তা করলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা ঘটে।

সুতরাং জনসাধারণ-টাধারণ জানি না, একজন যাত্রী হিসাবে বিয়াল্লিশ দিন ধরে ট্রাম, অর্থাৎ সাধারণের পরিবহন, ধর্মঘট হওয়ায় আমরা অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছিলাম এবং তা আমাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছিল। টাটা কোম্পানীতে ধর্মঘট হয়েছিল; তাতে পরোক্ষভাবে জাতির কতটা ক্ষতি হয়েছিল জানা নেই, তবে প্রত্যক্ষভাবে সাধারণ মানুষের কোন দুর্ভোগ হয়নি। কিন্তু ট্রাম ধর্মঘটে শ্রমিক এবং মালিক পক্ষ ছাড়াও দৈনিক দশলক্ষ-যাত্রী সাধারণের সুবিধা অসুবিধার প্রশ্ন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। ধর্মঘট দাবী জানাবার একটা চরম পন্থা। ভারতের সংবিধানে ব্যক্তি স্বাধীনতা স্বীকৃত। আইনজ্ঞ নই, যতটা মনে হয় তার অর্থ পরের কোন অসুবিধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছামত কাজ করার অধিকার। অর্থাৎ কাউকে বুকে বসালে কেউ বাধা দেবে না, নিজের দাড়ি ওপড়ালেও কেউ পুলিশ ডাকবে না, তবে পরের বুকে বসে দাড়ি ওপড়ানোর বাসনা যদি কারো চাপে তাহলে রাষ্ট্র সেখানে সম্মতি দিতে অসম্মত হবে। আমি শ্রমিক পক্ষের ভাগ্নে অথবা মালিক পক্ষের জামাই নই, উভয় পক্ষকেই আমার প্রশ্ন—কোন কারণেই দৈনিক দশলক্ষ আরোহীর কষ্টকে নিয়ে দীর্ঘ

বিয়াল্লিশটা দিন ধরে খেলার, তা সে যত ছেলেখেলাই হোক, অধিকার কারো আছে কি না এবং তা মাত্রাজ্ঞানবিশিষ্ট কি না। সংবিধানের আইনে পটু কেউ যদি আমাদের বুঝিয়ে দেন এই ধরণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোক্তাদের কি ভাবে নিবৃত্ত করা যায়—তবে আমাদের প্রাণটা বাঁচে কাজেই বড় উপকার হয়। আর যদি জানা যায় যে কোন প্রতিকার নেই তাহলে দাড়ি রাখি। যার না আলস্য হবে আমার বুকে বসে পরমানন্দে দাড়ি ওপড়াতে পারবেন।

আমাদের পাড়ার চৌমাথায় মাঝে মাঝে একজন পাগল (আমার দিকে সন্দিগ্ধ হয়ে তাকাবার প্রয়োজন নেই) ট্রাফিক পুলিশ সাজে। ঐ মোড়ে যানবাহন স্বয়ংক্রিয় লাল নীল বাতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। গাড়ী-গুলো যখন লাল আলো দেখে থামে, সে তখন থামবার সঙ্কেত দেখায়—আবার যখন নীল আলো জ্বললে চলতে সুরু করে তখন সে গাড়ীগুলোকে চলে যাবার সঙ্কেত দেয়। কোন সময় বা একটা প্রকাণ্ড সরকারী দোতলা বাস ষ্টপেজ ছাড়লেই পিছন থেকে ঠেলা দিয়ে দেয়। তার ভাবটা দেখ, কেমন ঠেলে দিলাম বলে চলতে আরম্ভ করল। যখন কোন ধর্মঘট হয় লক্ষ্য করেছি কয়েকজন রাজনীতিক সেখানে ছুটে পড়েন এবং খুব হন্তদন্ত ভাব দেখান। তাঁদের সত্যিতে কোন ধর্মঘট করাবার ক্ষমতা আছে কিনা সন্দেহ, থাকলেও মেটানর ক্ষমতার যে অভাব আছে তার সন্দেহাতীত প্রমাণ—বিয়াল্লিশ দিন। ঐ সব গৌড়জনদের দেখলে আমার ঐ চৌমাথার পাগলটির কথা মনে পড়ে (আমি নিরুপায়)।

গ্র্যাণ্ড হোটেলের তলায় পাজামা-পরা হিন্দী চিত্রাভিনেত্রীকে দেখে শিস দিয়ে ওঠার জন্যে যারা জিভের নিচে দুটো আঙুল পুরে তৈরী থাকে এবং যাদের ভিড়ে যানবাহন চলাচলের বিঘ্ন অপসারণে পুলিশ তৈরী থাকে তাদের কথা জানি না; ছাঁপোষা ভদ্র গৃহস্থ মস্তিষ্কবিশিষ্ট নাগরিকদের কথা বলতে পারি—যখনি নেতারা হুমকী ছাড়েন 'জন-সাধারণ এর জবাব দেবে' এই নাগরিক সাধারণ তখন হয় ত কোন যানের হাতল ধরে প্রাণপণে চাকার নিচে চলে যাওয়া থেকে জান বাঁচাচ্ছেন—জবাব দেবার অবস্থা নেই, উপায় নেই, ইচ্ছে নেই। তা যদি থাকত তবে তাঁরা তৃতীয় দিনেই ট্রাম চলতে বাধ্য করতে পারতেন—এক-চল্লিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করার কষ্টভোগ করতেন না।

খানিক বাক্‌স্বাধীনতার চর্চা করার জন্যে এসব কথা বলছি না। কে জানে হয়ত কাল থেকে বিদ্যুত বা পরশু থেকে পানীয় জল সরবরাহ ক্ষেত্রেও দু চার মাস ধরে ধর্মঘট চলতে পারে। তখন আমাদের মারা গেলে চলবে না, কারণ সহানুভূতি বজায় রাখতে হবে। একজন নাগরিক হিসেবে এই সব দিনের পর দিন চলা কারণে অসম্পৃক্ত কিন্তু কার্যে-ক্লেশদায়ী ধর্মঘট সম্পর্কে আমাদের কি মনে হয় তাই জানালাম। যাঁরাই ধর্মঘট করেন তাঁদেরই মনে মনে একটা স্বকল্পিত মধুর ধারণা আছে যে তাঁদের ওপর জনসাধারণের সহানুভূতি বুঝি অফুরন্ত। সে ধারণা ভুল। যখন প্রত্যহ কোন না কোন শোভাযাত্রা রাজভবনের কাছে পথ-রোধ করে থাকে তখন রোজই এসপ্লানেড পর্যন্ত হেঁটে এসে বিপর্যস্ত যানবাহন ব্যবস্থার মধ্যে কোন রকমে সারাদিনের ক্লান্তির পর (মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হলে টিফিনে জলখাবারে জলই বেশী, খাবার কম) সাধারণ মানুষ যখন বাড়ী ফিরতে চান তখন কি করে প্রত্যাশা করা যায় যে তাঁদের সহানুভূতির ভাণ্ডার অক্ষয় থাকুক। যে দলেরই হোক যত গুরুতর কারণই থাক, নিত্য কেন জনসাধারণ অকারণ দুর্ভোগ সইবে। শোভাযাত্রাকারীদের অসন্তোষের মূলে জনসাধারণের ত কোন অপরাধ নেই। যাঁদের গাড়ী আছে তাঁদের অসুবিধা হয় না, কষ্ট হয় আমাদেরই —যারা ট্রামে বাসে যাতায়াত করি। আমাদের জন্যে ত কারো সহানুভূতি হয় না। কারো ত মনে হয় না দিনের পর দিন এমন করলে মূক জনসাধারণের ওপর জুলুম করা হয়। কর্তব্য কি কেবল এক তরফা। আমরাই কি নিরীহ এবং উপায়হীন বলে চোর দায়ে ধরা পড়ে গেলাম যে নিয়মিত ভাবে আমাদেরই কাছে সহানুভূতির মাশুল আদায় করা হবে।

জনসাধারণের কথা না বলে, জনসাধারণের কথা ভাবলে তারা যথার্থ উপকৃত হবে।

কমলমণি (বিষবৃক্ষ - বঙ্কিমচন্দ্র)

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

উদ্বেলিত সুধা-সিন্ধু নারী রত্নসার
রঙ্গে রঙ্গে টল টল—ওগো চতুরিকা
তোমার তুলনা কোথা ? দুঃখের সংসার
স্পর্শে তব হয়ে ওঠে কুসুম মালিকা !
গৃহিণী সচিব সখা প্রেয়সী কল্যাণী
সোহাগের পক্ষ দায়ে রাখি পতিধনে
পুত্র দুলালেরে লয়ে লক্ষ্মী স্বরূপিণী
খেলেছ সংসার খেলা প্রীতি স্নিগ্ধ মনে।
সংসারেতে দুঃখ কোথা ? কোথা হানা হানি ?
কোথায় বিরহ বিষ ? কোথা হাহাকার ?
তোমার হাসির ঘায়ে অয়ি সুকল্যানি
পালায় কলহ দুঃখ বেদনার ভার।
দেখনি দুখের মুখ তুমি ভাগ্যবতী
নিজ সুখে সুখী সবে করিয়াছ সতি।

ভুল
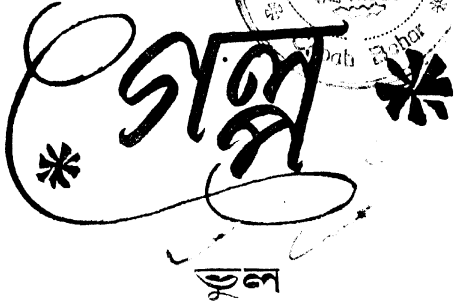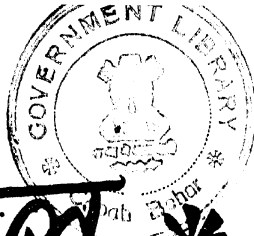
শ্রীসুধীররঞ্জন গুহ

ঘরে পা দিতে যাচ্ছে এমন সময়ই চিন্ময়ের কানে ভেসে এলো অমিয়বাবুর গলা, তোর জন্যেই আজ আমাদের এই দুরবস্থা! খেতে পারছি না, পরতে পারছিনা, ছেলেমেয়ে-গুলো সব অমানুষ হ'য়ে যাচ্ছে······

কান্নার ছোঁয়া রুমার উত্তরে। সুরেও লজ্জা—এ-কথা তুমি আর বোল না বাবা।

বো-ল-না বাবা! বিকৃত সুর অমিয়বাবুর। পরেই ঘন গম্ভীর—একশ'বার বলব। মুখে কালি দিয়েছিস তুই। বলব না আবার।

রুমার মনের কান্না বের হ'ল ঢেউ হ'য়ে—রোজ বলে' তিলে তিলে মারো কেন তবে? বিষ এনে দাও এক-দিনেই শেষ হ'য়ে যাই···

চিন্ময়ের যাওয়া হ'ল না আর। ফিরতে হ'ল। মন-ময় তখন শুধু প্রশ্নের ঝড়: কি করে রুমা কালি দিয়েছে অমিয়বাবুর মুখে! রুমা কি তবে তার সব কথা তার কাছে বলেনি? ফাঁকি দিয়েছে তাকে!!

চিন্ময়ের সে-চিন্তাই এনে দিল জিজ্ঞাসা। বলল রুমাকে, একদিন আড়ালে দাঁড়িয়ে তোমার ওপর তোমার বাবার গলা শুনলাম, তোর জন্যেই আজ আমাদের এই দুরবস্থা! খেতে পারছি না, পরতে পারছি না···তোমার উত্তরটাও শুনলাম। কি ব্যাপার রুমু?

ছায়া পড়ল রুমার ফর্সা মুখে। দরজার দিকে একবার চোখ ফেলে জানাল, বলব চিন্ময়—সব কথাই তোমার কাছে বলব। কিন্তু আজ নয়।

কেন?

পরিবেশ দরকার।

কয়েক দিন পরে। চিন্ময় গড়ের মাঠে গিয়েছে রুমাকে নিয়ে। পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কতো লোক। তা'হলেও নিরালা।

তোমার জীবনের সব কথাই নাকি আমার কাছে বলা হ'য়েছে তবে এ-আবার কি কথা রুমা? জিজ্ঞেস্ করল চিন্ময়।

রুমা ঘন হ'য়ে বসল। সুরু করল, শহুরে গ্রাম ছিল আমাদের। ছেলেমেয়ে মিলে একটী সমিতি করেছিলাম। অরুণ ছিল আমাদের নেতা। পাশের গ্রামে একবার কলেরা লাগল। সেখানে রোগীকে সেবা করবার জন্যে নিয়ে গেল আমাকে···বলেই থামল রুমা।

এমন জায়গায় থাম্‌লে! তারপর?

তারপর! কথা কাঁপছে রুমার—তোমাকে ছুঁয়ে বলছি চিন্ময়! কোন অপরাধ আমার নেই; কোন দোষও আমি করিনি। উল্টে অরুণকে সেদিন আমার মুখে যা এসেছিল তাই বলে দিয়েছিলাম। কিন্তু তা তো কেউ জানল না! সকলে জানল···

মিথ্যেটাই সত্য বলে জানল?

তাইতো হয়। মেয়েদের সম্বন্ধে আলোচনা বড় মুখ-রোচক; আরো গ্রাম-দেশে।

তাতে তোমাদের এ-পরিণতি হ'ল কেন?

বাবার একখানা দোকান ছিল হাটখোলায়। বাবা কান পাততে পারত না বাইরে, পা ফেলতে পারত না পথে। কাজেই দোকানখানা বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মরলাম আমরাও। তবুও মরার ওপরে খাঁড়ার ঘা। নিষ্ঠুর সমালোচকদের কথার ছুরি থাম্‌ল না। শেষে নিরুপায় হ'য়ে একদিন রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। সঙ্গে নিয়ে এলাম দারিদ্র্য—তা' তো তুমি দেখছই।

কিন্তু এতোদিন এ-কথা আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলে কেন?

ভয়ে!

কিসের ভয়?

হারানোর ভয়। ভেবেছিলাম, তুমিও হয়তো আমাকে বিশ্বাস করতে পারবে না। সত্যি বলো! চিন্ময়ের হাতখানি নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে রুমা আবার অনুরোধ করল, বিশ্বাস করলে আমাকে?

সত্য না বলে' কিছু মিথ্যে বানিয়ে বল্‌লেও অবিশ্বাস করত না চিন্ময়। তবুও তার বলতে ইচ্ছা হ'ল। কোন ঘটনাকে গোপন রাখলেই সত্যের গন্ধ থাকে বলে মনে হয়। কিন্তু রুমা ব্যথা পাবে মনে করে সে-কথা বল্‌ল না চিন্ময়। বল্‌ল, তুমি আমার কাছে মিথ্যে বলবে এটা আমি ভাবতেই পারি না রুমু।

একেই তো মায়ামাখা চোখ রুমার—তাকালেই নেশা লাগে। চিন্ময়ের উত্তর শুনে সে-চোখ উঠল হেসে—যেন সুরেখা ঝঙ্কার। ভারী সুন্দর লাগল দেখতে; বিকেলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হার মেনে গেল তার কাছে।

তারপরেই আবার পট পরিবর্তন। হঠাৎ মুখখানা ম্লান হয়ে গেল রুমার।

পশ্চিমের আকাশে তখন আবীর ছড়ান। রুমার মুখের ঐ কালিমার ছোঁয়ায় যেন সন্ধ্যা নেমে এলো একটু আগেই। চোখের পলকে আলো জ্বলে উঠল ক্যাজুরিণা এভেনিউ আর রেড রোডে। রুমাও হঠাৎ বলে উঠল, আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না চিন্ময়। মেয়ের অপবাদকে কি করে যে তার বাবা রোজ রোজ এমন করে মনে করিয়ে দিতে পারে…তাই ভাবছি…

কি ভেবেছ?

সংসারের এই দারিদ্র্য! কবে যে দু'বেলা পেট ভরে…

আর বোল না রুমু, সবই তো আমি দেখ্‌ছি, জানি।

কথা থামাল রুমা, কিন্তু চোখের জল থামাতে পারল না। কয়েক ফোঁটা গরম জল গড়িয়ে পড়ল চিন্ময়ের হাতে।

বল্‌বে না তো কি ভেবেছ?

থাক্, মরা ভাবনা।

তারপরে কেটে গেছে কয়েক মাস। একদিন দুপুর গড়িয়ে গেছে বিকেলের কোলে। রাস্তায় চলতি পায়ে হঠাৎ ডালহৌসির এক কোণে দাঁড়িয়ে পড়ল চিন্ময়। দেখল, বেশ জোর পায়ে রাস্তার জনতার মাঝে মিশে যাচ্ছে রুমা। ভালো করে তাকাল চিন্ময়—অবশ্য ওকে দু'বার দেখতে লাগে না।

চিন্ময়ের পা চল্‌ল আরো তাড়াতাড়ি। গিয়ে ধরল রুমাকে। জিজ্ঞেস্ করল, এ ভর-দুপুরে তুমি আপিস পাড়ায়!

মুখখানা রাঙা হ'য়ে গেল রুমার। এই তো…এই… আটকে গেল কথাটা।

পরিষ্কার করে বলো না?

সে অনেক কথা।

সংক্ষেপে বলো।

তা'তে বিকৃত হবে।

চলো তবে কোথাও বসি।

তাই করল ওরা।

তর্ সইছিল না চিন্ময়ের। বলে উঠল, এবার সুরু করো।

জড়তা দূর হয়েছে রুমার—তোমার দেখি খুব উৎসাহ।

নিশ্চয়ই—কাব্যেরও কাব্য হয়তো।

হাঁ। সাহিত্যিক হ'লে গল্প, উপন্যাস লিখতে পারতে। যাক্—বাদলের একটা চাকরী ঠিক করেছি।

অফিসারের সঙ্গে তোমার জানা-চেনা ছিল নাকি?

না।

এম্‌নি টোপ ফেলে ভাইয়ের চাকরী যোগাড় করে দিলে তুমি! কি ক'রে হ'ল?

প্রথম সংসারের অভাবের কথা বলে সাহায্য চাইতে গিয়েছিলাম। তারপরে চাকরীর কথাটা তুলি।

মানে অনেক দিন গিয়ে গিয়ে জমিটা প্রস্তুত করতে হ'য়েছিল তো?

একটু রাগ হ'ল রুমার—যা খুশী বলো।

চিন্ময়েরও তখন রাগ—আশ্চর্য! আমার বলাটা হল অন্যায়। তারপরেই গম্ভীর হয়ে বল্‌ল—না খেয়ে মরতে পারো না?

আমি পারি।

তবে?

তিনদিন আগে থেকে বাড়ীতে রান্না হয়নি। ছোট

ভাই-বোনেরা ক্ষুধায় ছটফট করছে। কাঁদল তারা। ধমক দিলাম। ধমক খেয়ে চুপ করে রইল। কিন্তু ক্ষুধার জ্বালায় কেঁদে উঠল আবার। চোখের সাম্‌নে এ-দৃশ্য দেখে নিজেও কেঁদেছিলাম। তার ওপরে বাবার গাল-মন্দ—সে-ই কথা! আমার জন্তেই সব—আমিই দায়ী। শুনে পাগল হ'য়ে উঠলাম। সেদিনের সে-রাতটা যে কি গেছে আমার। ঘুম এলো না, এলো চিন্তা। একদিকে দাঁড়াল ন্যায় নীতি, আরেক দিকে তীব্রতম দারিদ্র্য। বিরাট মানসিক দ্বন্দ্ব চল্‌ল সারা রাত।

কখন সিদ্ধান্তে পৌছলে।

সকালে। ভয়ে বাবার কাছে না গিয়ে ভাই-বোনেরা সব ছুটে এলো আমার কাছে—কাঁদল, দিদি! দিদি!! আর পারি না···মরলাম! তখন ওদের বাঁচানই বড় হ'য়ে উঠল আমার কাছে। তক্ষুণি! আদর্শ, ন্যায়, নীতি, সমাজের মাপকাঠি সব ভেসে গেল ওদের চোখের জলে।

জীবনে একবার কলঙ্ক মেখেছ তবুও ভয় বলে তোমার কিছু নেই?

শিউড়ে উঠল রুমা, যথেষ্ট আছে চিন্ময়।

কাজে তো নির্ভীকতার পরিচয় দিলে।

ম্লান হাসি হাসল রুমা। বিশ্বাস করো চিন্ময়। মিঃ সরকারের বয়েস ভাঁটীতে।

তা' তো আর তুমি প্রথমজেনে যাওনি? যাক্ তারপর?

মুচকি হেসে জানাল রুমা, কিন্তু মনটা রঙীণ।

কি করে বুঝলে?

যে-মন দিয়ে মেয়েরা পুরুষকে বোঝে।

অতি সূক্ষ্ম কথা।

বেশী সূক্ষ্ম নয়—সাদা চোখেও চোখ দেখে বোঝা যায়। মুখে একটু একটু হাসি! কথাও অনেক বলতে চান।

কেন চাইবে না। ওদের বাড়ী আছে, গাড়ী আছে; কথাও অনেক থাকতে দোষ কি। তা'ছাড়া যা বলেছে তা' নিশ্চয়ই ফলে-ফুলে মধুবর্ষী—কেমন? শোনা যাক্।

না শুনলেই নয়?

বলতেই বা আপত্তি কেন?

বলে, আমার কি রাজত্ব আছে নাকি? কোথা থেকে সাহায্য করব?

উত্তরে কি বলো তুমি?

ফুলিয়ে বেলুন করি। বলি, এতো বড় একজন অফিসার···

তাতেই ঔদার্যের বহর! তার পকেটের টাকা তোমার হাতে আসে?

একটু অভিনয়ও করি। কিছু বলি—আর কিছু হাসি দিয়ে আড়াল করে রাখি।

কিন্তু তোমার অভিনয় দেখে যদি আর কেউ কাঁদে!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে জানাল রুমা, আমিও তা' মনে ক'রে ব্যথা পাই।

মিথ্যে কথা। যদি ব্যথাই পেতে তবে একদিনও যেতে পারতে না ওখানে।

কিন্তু আমার যে অন্য হিসেব।

কি হিসেব?

তোমার পবিত্র ভালবাসা পেয়েছি বলেই এমন অভিনয় করতে পেরেছি আমি।

কিন্তু মানুষের মন! এবারে আর চিন্ময় বিশ্বাস করতে পারল না রুমাকে। প্রেমপূর্ণ একটা মনের মূল্য দিতে পারল না সে, ঘৃণা হ'ল রুমার ওপর। ভাবল, লুকিয়ে লুকিয়ে মিঃ সরকারের কাছে অনেকদিন গিয়েছে রুমা। যেতে যেতে মাঝখানের দূরত্ব গিয়েছে কমে। তা' না হ'লে কি পেয়ে প্রতিদানে এতোদাম দেয়? সাময়িক সাহায্য থেকে একটা স্থায়ী সাহায্য!

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বের হ'ল চিন্ময়ের—তা'র জীবনে রুমা কি? কেন? কতোটুকু?—নিজেই উত্তর পেল করুণ নীরবে। পাঁজরের হাড়গুলো খট্ খট্ ক'রে উঠল একসঙ্গে! ব্যথায় টন্ টন্ করে উঠল মন—রুমু! মন দেখ্‌ল না—মন দিল না!—শুধু ফেলে দিয়ে গেল বেদনার কালীয়দহে! অভিনয় করে গেল জীবন-খেলায়! এতো-টুকু লাগে না ওর।

রুমার মনেও এখন তার অভিনেত্রী জীবন নিয়ে প্রশ্নের ঝড়! জিজ্ঞেস্ করে নিজেকে, উত্তর করে নিজেই। একবার মানসিক কোন্ প্রশ্নের উত্তরে নিজেই বলে উঠল, সত্যি অন্যায়! ভাবতে ভাবতে মিঃ সরকারের কাছ থেকে সেদিন পর্যন্ত যতো টাকা এনেছিল সে-অঙ্কটা ভেসে উঠল চোখের সাম্‌নে। বেশ মোটা সেটা! তার-পরে আবার ভাইয়ের চাকরী—আরেকটা সাম্রাজ্য!

আরেকটা ভাবনার বুদ্‌বুদ্‌ ভেসে উঠল রুমার মনে—সে তবে প্রতারক ?—মিঃ সরকারের রঙীণ মনের সুযোগ নিয়ে—নিয়েছে দানের পর দান।—প্রতিদানে ?—না তো!—একদিন পান-পাত্র সাম্‌নে নিয়ে মানুষ যেমন তৃষ্ণাভরা চোখে তাকায়, তেমন চোখে তাকিয়েছিল মিঃ সরকার। তার মাথায় রেখেছিল হাত। আরেকদিন হাতখানি রেখেছিল পিঠে। কি যেন বলতে গিয়েও বল্‌ল না আর। মুখের দিকে তাকিয়েই ফিরিয়ে নিল কথাটা।

চিন্তার স্রোত ঘুরল রুমার।—মিঃ সরকারের না-বলা কথাটা সে নিজেই বের করতে পারত। ঠিক পারত। মিঃ সরকারের চোখের ভেতর দিয়ে যে রঙীণ মনটা তখন উঁকি দিয়েছিল তাতে একটু দখিন্‌ বাতাসের ছোঁয়া দিলেই সে-কথা বেরিয়ে আসত বন্যার স্রোতের মতো। কিন্তু তা' সে করেনি। সে হ'য়ে রয়েছিল নিষিদ্ধ পানীয়; শরীরকে ছেড়ে না দিয়ে রয়েছিল শক্ত হ'য়ে।

রুমা এখন একা। নীরব ঘর। নিঃশব্দে নিজের অন্তঃস্থলে গিয়ে পৌঁছাল সে। দুনিয়া মুছে গেল তার চোখ থেকে। শুধু চিন্তা নিয়ে সে, আর রইল মিঃ সরকার। স্মৃতির বন্যায় ভেসে ভেসে মিঃ সরকার যেন কাছে এসে দাঁড়াল রুমার। মনের চোখে দেখে চম্‌কে উঠল সে, মিঃ সরকার! এতোগুলো টাকা দিয়ে প্রতিদানে কিছু পায়নি বলে তা' কি সবই আজ আদায় করতে এসেছে? কিন্তু কোথা থেকে দেবে সে? তাড়াতাড়ি চোখ বুজল রুমা।

চোখ যখন খুল্‌ল মিঃ সরকার তখন ওখানে নেই। একি তবে স্বপ্ন? মনে করল রুমা। তা যা হ'ক। টাকা পরিশোধ করে দেবে সে। কিন্তু—কিন্তু কম টাকা তো আনেনি! যথেষ্ট! কি করে পরিশোধ করবে তা? একমাত্র ভাইয়ের চাকরী। যা দুর্মূল্যের বাজার, ভাইয়ের টাকায় সংসারের দৈনিক অভাবের সঙ্গেই যুদ্ধ চলে না। তা হ'লে? এ ঋণ পরিশোধ না হ'লে কতোদিন এ-গোপন ঋণের বোঝা, যা' টাকার অঙ্কের চেয়েও অনেক-গুণ বেশী ওজন—তা বয়ে চলবে? আর তো পারছে না 'সে! তার বিবেক ক্লান্ত।

ধীরে ধীরে আবার মনের গহন-গভীরে নাবল রুমা। ধরল মনের নাড়ী। অনুভব করল, মিঃ সরকারের সঙ্গে দীর্ঘদিন অভিনয়ে তা খেয়ে খেয়ে জেগে উঠেছে একটা নূতন মন! সে-মন যেন মিঃ সরকারের জন্যে কেমন বেদনা-ভরা; তার ব্যর্থ আশার জন্যে সহানুভূতিপূর্ণ। সেই বেদনা আর সহানুভূতির একটা কাঁটা রুমার বিবেকের কোমলতম জায়গায় আঁচড় কাটতে লাগল বার বার।

আরেকটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল রুমার—মানুষের বয়েস বাইরে; তার আশা আর তার মনের কোন বয়েস নেই। তাইতো ওখানে গেলে তাকে দেখেই মিঃ সরকারের চোখ দিয়ে বের হয় কতো আশার কথা, নীরবে জানায় কতো তৃষ্ণা। পরে, প্রত্যেক দিনই তার বিদায় বেলায় কেমন হতাশ ভাবে তাকিয়ে থাকে সে। দপ্‌ করে আলো নিভে যাওয়া মুখখানি—সে মুখখানি পাণ্ডুর, ম্লান!

আচ্ছা! আবার ভাবনার পথ ঘোরে রুমার। সেই ম্লান মুখখানিতে কি পরিতৃপ্তির হাসি ফোটান যায় না? একদিনও কি বিদায় বেলায় মিঃ সরকারের মুখে দেখতে পাবে না এক ঝলক হাসি? পূর্ণিমার জোছনার মতো ফুট্‌ফুটে স্বচ্ছ হাসি? পারে না-কি তাকে প্রাঞ্জল করতে ...অন্ততঃ একটা দিনের জন্যে...কৃতজ্ঞতা! কলুষিত কৃতজ্ঞতা!

মাসের শেষ দিক। হাত টানাটানির দিন। দারিদ্র্য আভরণ নয়, অভিশাপ। অভিশপ্তা রুমা আবার বেরুল হাত পাততে।

কিন্তু আগের রুমার সঙ্গে সেদিনের রুমার পার্থক্য অনেক—যেমন শীত আর বসন্তে। পোষাকের বাহার নেই, রয়েছে যথেষ্ট বিন্যাস। কানে দিয়েছে ঝুঁটমুক্তা। পাৎলা ঠোঁট দু'খানিতে মুচকি হাসির মতোই গলায় ছোট্ট একটু চেনের হাসি। নিজেও হাসি ভরা, গানে ভরা। পায়ে নেই জড়তা, গতি সাবলীল। কণ্ঠের অশ্রুত গান আর পায়ের অদেখা নূপুরের নীরব ঝঙ্কার ঐকতানে তাকে করেছে ছন্দময়ী। মনোবীণার তারে তারে কতো সুর, কতো রাগ কতো রাগিণী।

রুমাকে দেখেই মিঃ সরকার বলে উঠল, অনেকদিন পরে যে! এতোদিন আসোনি কেন?

প্রয়োজনের চরম মুহূর্তেই বিরক্ত করতে আসি।

তাহ'লে স্বার্থপর ?

ঠিকানা তো জানাই আছে, নিজের স্বার্থের জন্যে খোঁজ করলেই পারতেন। তা'ছাড়া মনে মনে ডাকলেও হয়তো প্রতিধ্বনি জাগত আমার মনে, বলেই স্বপ্নভরা চোখে রুমা তাকিয়ে রইল মিঃ সরকারের দিকে।

মিঃ সরকারও রুমার দিকে তাকিয়ে থাকে বিস্মিত আর অবাক চোখে।

চোখের সে ছোঁয়ায় ভেতরে ভেতরে রুমা কাঁপছে। আঁখি-পল্লবে তারই ঢেউ। বাঁকা চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, অন্যদিন দেখি কথার ফুলঝুরি! আজ এমন নীরব কেন ?

একটা জরুরী কাজ করছি।

রোজই তো শুনি অনেক কাজ, জরুরী কাজ! শেষ পর্যন্ত দেখি অনেক কথাই বলেন।

না-হে না! আমার কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গেই যদি তোমাকে টাকা দিয়ে বিদায় করে দি' সেটা একান্তই অন্তরশূন্য শুষ্ক দানের মতো বলে মনে হয়। তাই—যাক্! আজ সত্যি অনেক কাজ। দেখ কতো ফাইল জমা হ'য়ে আছে পাহাড়ের মতো। এগুলো পরিষ্কার না করলে আমিই চাপা পড়ে মরব।

উপচারে মনের অঞ্জলি উন্মুখ। অভিমানে রাঙা হ'য়ে রুমা বলল, বেশ আমি তবে যাচ্ছি—বলেই প্রণাম করতে গেল মিঃ সরকারকে।

মিঃ সরকার তাড়াতাড়ি চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়িয়েছে এখন। বাধা দিতে গিয়ে হাত দুখানি ধরল রুমার। রুমা বৈদ্যুতিক হয়ে উঠল তাতেই: মনের মুকুল হল কুসুমিত। চোখে ফুটে উঠল বিলোল দৃষ্টি। মিঃ সরকারের বুকের কাছে এসে মুখ লুকাল সে-প্রশস্তে; যেন পারছিল না আর।

বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে উঠল মিঃ সরকারও—একি রুমা! একি তুমি!! আমি তো তোমাকে···তোমাকে যে আমি ছোট বোনের মতোই মনে করেছি—আদর করে হাত দিয়েছি মাথায়, স্নেহে হাত বুলিয়েছি পিঠে···

একটা মুহূর্ত! সে মুহূর্তেই কাল-বৈশাখার প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেল রুমার ওপর দিয়ে। তাতেই ঝড়ে-পড়া মানুষ রুমা। চুলগুলো এলোমেলো, অবিন্যস্ত কাপড়। মিঃ সরকারের ঘর থেকে যখন বেরিয়ে গেল সে অফিসের বেয়ারাটা পর্যন্ত তাকিয়ে থাকল রুমার দিকে।

সখারাম গণেশ দেউস্কর

শ্রীসঞ্জীবকুমার বসু

পাঠকেরা জানেন কিনা জানি না যে, 'সখারাম গণেশ দেউস্কর'—এই নামের মধ্যে তাঁর নিজের নাম, পিতৃনাম ও বংশ-পরিচয় নিহিত। তাঁর নাম সখারাম, পিতার নাম গণেশ এবং বংশের নাম দেউস্কর। সখারাম জাতিতে ছিলেন অবাঙ্গালী। বোম্বাই প্রদেশের রত্নগিরি জেলায় ছত্রপতি শিবাজীর আলবান নামক দুর্গের নিকটবর্তী দেউস গ্রামে তাঁর পূর্ব পুরুষের বাড়ী ছিল। সখারাম মহারাষ্ট্রের এক শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পরিবারের কৃতী সন্তান ছিলেন। ১৮৬৯ সালে ১৭ ডিসেম্বর তাঁর জন্ম হয়।

অবাঙ্গালী হয়েও তিনি বাংলাদেশের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি, ভাষা ইত্যাদি গ্রহণ করে বাঙ্গালী জাতির সহিত একাত্ম হয়ে যান। বাস্তবিকই একদা মারাঠি যুবক যে ভাবে বাংলা সাহিত্যের সাধনায় সারাজীবন চেষ্টা ও সৃষ্টি করে গেছেন তা সত্যই বিস্ময়কর। একদিকে যেমন সাহিত্য সাধক, আবার অপর দিকে নির্ভীক সাংবাদিক ও দেশপ্রেমিক ছিলেন। তাঁর 'দেশের কথা' পুস্তকখানি সেই সাক্ষ্য বহন করছে। ব্যক্তিগত জীবন তাঁর বিশেষ সুখের ছিল না, পাঁচ বছর বয়সে তার মা মারা যান এবং আর্থিক দৈন্য তাঁর লেগেই ছিল। কিন্তু কোন দুঃখ বা দৈন্য তাঁর উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে পরাভূত করতে পারে নি। ছোট বেলায় পিতার নিকট হতে তিনি রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শুনতেন এবং অধ্যাত্ম শিক্ষার জন্য সখারামকে বেদ পাঠের ব্যবস্থা করা হয়। কিছুকাল বেদপাঠের পর তাঁকে দেওঘর উচ্চ-ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করা হয়।

তখন মাইকেলের চরিতকার যোগেন্দ্রনাথ বসু এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। কাজেই তাঁর সান্নিধ্যে এসে সখারাম বাংলা শেখেন এবং সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হন। এইখান থেকে তার বিকাশ সুরু হয়। তিনি যোগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে থেকে সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম্মালোচনা

প্রভৃতিতে যোগ দিতেন এবং ক্রমশ তার লেখার দিকে ঝোঁক গেল। তিনি কয়েকটা মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন। এমন কি তখনকার দিনে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশ হতে দেখে অনেকের তাঁর উপর নজর পড়ল—কারণ তখন 'সাহিত্য' পত্রিকায় যাঁরা লিখতেন তাঁদের সাহিত্যিক বলা হত ; কাজেই এই ভাবে সখারাম সাহিত্য আসরে নিজগুণে সমাদৃত হতে লাগলেন। দেওঘরে থাকাকালীন তিনি আর এক বিরাট পুরুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তাঁর শিক্ষায় ও প্রেরণায় সখারামের মধ্যে দেশাত্মবোধ জেগে উঠেছিল—তিনি হলেন ঋষি রাজনারায়ণ বসু। এ বিষয়ে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সখারাম সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন :—

"তিনি অবসর পাইলেই রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের গৃহে যাইতেন। বসু মহাশয় পরম ধার্ম্মিক, সুপণ্ডিত, সাহিত্যানুরাগী ও মজলিসী লোক ছিলেন। সখারাম নানা বিষয়ে তাঁহার সহিত আলোচনা করিতেন। সেই মজলিসে সখারামের সহিত আমার পরিচয় ঘনীভূত হয়।"

(আর্য্যাবর্ত্ত, অগ্রহায়ণ ১৩১৯)

আর্থিক অভাব থাকার দরুণ সখারাম অল্প বয়সে জীবিকার জন্য ১৮৯৩ সালে দেওঘরের স্কুলে ১৫৲ টাকা মাইনেতে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন এবং অবসর সময় পড়াশুনা ও সাহিত্য চর্চ্চা করতেন। তখনকার 'হিতবাদী' কাগজে তিনি নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন। দেওঘরের শাসক তখন ছিলেন—মিঃ হার্ড, ইনি আবার স্কুল-কমিটির সভাপতি ছিলেন। মিঃ হার্ড সখারামকে খুব ভাল চোখে দেখতেন না। কারণ তাঁর বাংলা রচনার মধ্য দিয়ে যে স্বাদেশিকতা ও স্বাধীন চিন্তা প্রকাশ পেয়েছিল তাতে মিঃ হার্ড ভাবলেন—সখারাম একেই জাতিতে মারাঠী, তার উপর বাংলাভাষার অধিকারী। একে (হয়ত রাজনৈতিক কারণে) এখনই ধ্বংস করা দরকার। তাই তিনি সখারামকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করলেন, এমন কি তাঁর পক্ষে দেওঘরে বাস করা ক্রমশঃ অসম্ভব হয়ে উঠল। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন :—

"যোগীন্দ্রবাবু ও সখারাম দুই জনেরই বাংলা লেখক 'অপবাদ' ছিল। তাই দুই জনে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোপানলে পতিত হইয়া চাকরি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।"

দেওঘরের ক্ষুদ্র পরিবেশ ত্যাগ করে সখারাম কলকাতায় বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে নিজের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পেলেন। তিনি সোজা হিতবাদী'র সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সহিত দেখা করলেন, সমস্ত শুনে সম্পাদক মহাশয় বিপন্ন সখারামকে তাঁর পত্রিকায় প্রুফ-রীডারের চাকরী দিলেন ৩০৲ টাকা বেতনে। তারপর ক্রমশ নিজের প্রতিভার গুণে সখারাম কালীপ্রসন্নের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলেন। ১৯০৭ সালে কালীপ্রসন্ন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য জাপানে গেলে 'হিতবাদী'র সমস্ত পরিচালনার দায়িত্ব সখারামের উপর ছেড়ে দিয়ে যান। জাপান থেকে ফিরে আসার পথে কালীপ্রসন্ন ইহলোক ত্যাগ করেন। তখন সখারাম পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন ৯০৲ টাকা বেতনে।

কিন্তু চার পাঁচ মাস পরে রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশের বিষয় নিয়ে সখারামের সহিত কাগজের মালিকদের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়াতে তিনি 'হিতবাদী'-সম্পাদক পদ থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। সুরাট কংগ্রেসে তিলকের সমর্থকেরা যে দক্ষযজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন, সেই কারণে হিতবাদীর মালিক তিলকের বিরুদ্ধে লিখবার জন্য সখারামকে নির্দ্দেশ দেন, কিন্তু তিলক ছিলেন সখারামের গুরু ; তাঁর নিকট তিনি স্বাদেশিকতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন—সেই গুরুকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য লেখনী ধারণ—এ কথা চিন্তা করতেও তাঁর সমস্ত অন্তর ব্যথায় বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তাই তিনি নিজের দারিদ্র্যের কথা, পরিবারের কথা ভুলে গিয়ে এককথায় চাকরি ছেড়ে দিলেন। ভাবলেন —'যদি ভিক্ষা করতে হয় সেও ভাল তবু এ কাজ করব না।'

পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি সখারাম ইতিহাস চর্চ্চা করতেন এবং ক্রমশঃ তিনি ইতিহাসে জ্ঞান অর্জ্জন করলেন। সারা জীবন ইতিহাস নিয়েই পড়াশুনা করতেন। কিছুদিন বেকার থাকার পর সখারাম জাতীয় বিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হন। কিন্তু নিশ্চিন্ত জীবন যাপন তার ভাগ্যে নেই, তাই তাকে বারবার জীবন-যুদ্ধ করতে হয়েছে তবু মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেন নি। জাতীয় বিদ্যালয় থেকে তিনি মর্য্যাদা রক্ষার জন্য চাকরী ছেড়ে দিলেন। এ বিষয়েও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন :—

"সরকার হইতে তাঁহার সামান্য আয়ের উপায় "দেশের কথা" ও "তিলকের মোকদ্দমা" পুস্তকের প্রচার বন্ধ হইয়া গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে 'জাতীয় পরিষদে'র শঙ্কিত কর্তৃপক্ষীয়দিগের ভাব বুঝিয়া সখারাম অধ্যাপক-পদ ত্যাগ করিলেন।"

সখারাম অক্লান্তকর্ম্মী ছিলেন। জীবনে যে কয়দিন জীবিত ছিলেন তার মধ্যে তিনি বাংলা সাহিত্যের সেবা করে গিয়েছেন। তিনি নিম্নলিখিত বইগুলি রচনা করেন। (১) 'এটা কোন যুগ' (২) মহামতি রাণাডে' (৩) 'ঝাঁন্সীর রাজকুমার' (৪) 'বাজীরাও' (৫) 'আনন্দ বাঈ' (৬) 'শিবাজীর মহত্ত্ব' (৭) 'দেশের কথা' (৮) কৃষকের সর্ব্বনাশ' (৯) 'শিবাজীর দীক্ষা' (১০) 'শিবাজী' (১১) 'তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত (১২) 'বঙ্গীয় হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ' ? ইত্যাদি। ইহা ছাড়া তিনি 'সাহিত্য', 'প্রতিভা', 'বেদব্যাস', 'ভারতী', 'ধরণী', 'সাহিত্য-সংহিতা', 'বঙ্গদর্শন', 'প্রদীপ', প্রভৃতি পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লেখেন, যার এখনও অনেক লেখা পুস্তকাকারে প্রকাশ হয়নি। তাঁর রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হল 'দেশের কথা', এই গ্রন্থে তিনি লেখেন :—

"ভারতীয় কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসমিতি বৃটিশ শাসনে ইংরেজের প্রদত্ত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রধানতম সুফল। এরূপ অনুষ্ঠান এদেশে পূর্ব্বে ছিল না। সুতরাং, ইহা দেশের রীতির অনুকরণে পরিচালিত করিতে না পারিলে, সুফল লাভের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত হইবে। পাশ্চাত্য দেশে প্রজার রাজনীতিক আন্দোলনে যে আশু সুফল লাভ হয়, তাহার কারণ এই যে, অত্রত্য প্রজাসমাজের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত এই সকল আন্দোলনে অন্তরের সহিত যোগদান করে।

আমাদের দেশে অজ্ঞতার জন্য অনেকেই এই আন্দোলনের সংবাদ পর্য্যন্ত রাখেনা, সমাজের সকলে জাতীয় মহাসমিতির কার্য্যে সমান উৎসাহ প্রকাশ করেন না। কাজেই ক্ষমতাপ্রিয় যথেচ্ছাচারী রাজপুরুষেরা আন্দোলনকারীদিগের মুষ্টিমেয়তা বা সংখ্যার অল্পতা অনুভব করিয়া প্রতীকারে ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহাতে জাতীয় মহাসমিতির অকিঞ্চিৎকরতা প্রতিপন্ন হয়না, আমাদিগের অকর্ম্মণ্যতা ও অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়...।"

জীবনে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে একদিন সখারাম কঠিন অসুখে আক্রান্ত হলেন এবং কিছুদিন পরে তার কর্ম্মময় জীবনের অবসান হল। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সখারামের একজন গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে গুণকীর্ত্তন করতে গিয়ে তিনি যে কথা বলেছিলেন তা সখারামের চরিত্রকে আরও উজ্জ্বল করেছে। তিনি বলেছিলেন :—

"পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর আর ইহজগতে নাই। ইনি দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। দেশাত্মবোধের প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি বাণীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যেই ইনি সংবাদপত্রের সেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন। সখারামবাবু কর্ম্মী ছিলেন—ইনি কর্ম্ম করিতেন, কিন্তু কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। ইনি মহারাষ্ট্রীয় হইলেও বঙ্গদেশকে এবং বাঙ্গালীকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন এবং বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধনকল্পে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ইঁহার অকালমৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আমরা সেই ক্ষতিতে মর্ম্মাহত হইয়াছি।"...

"সাহিত্যসেবীর চিরন্তন অভিশাপ দারিদ্র্য দেউস্করের চিরজীবনের সঙ্গী ছিল। মৃত্যুশয্যায় সেই দারিদ্র্যের যাতনা ও রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিয়া গত ৮ই অগ্রহায়ণ শনিবার প্রভাতে তিনি ধরার বন্ধন ছিন্ন করিয়া পৃথিবীর সুখ-দুঃখের অতীত হইয়াছেন। ভগবান্ কর্ম্মক্লান্ত, পথশ্রান্ত পথিকের কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া করুণার পরিচয় দিয়াছেন। পরলোকে তিনি তাঁহাকে শান্তিদান করুন।"

('বসুমতী' হইতে ১৩১৯ সালের মাঘ-সংখ্যা 'সাহিত্যে' উদ্ধৃত)

উপাজ্ঞা

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

তোমাকে অনেক দিতে চেয়ে আমি কিছুই দিইনি,
অথবা সে, যা দিয়েছি কিছু দীর্ঘ নয়।
যদিও সমস্ত গান, শব্দে এ-হৃদয়
আলোড়িত, তবু মনে হয়
অপর্যাপ্ত কী-যে দিতে অবশেষে দিইনি কিছুই !

হয়ত সামান্য এই ভাষা—
তবুও জড়িয়ে থাকে হৃদয়ের রঙিন পিপাসা।
একটি কম্পিত ভালবাসা।
যদিও একটি গান আনে এ-হৃদয়
—তবুও কখনো তুচ্ছ নয় :
জ্যোৎস্নারও আছে পরিচয়।

কতটুকু দিতে পারি ?—
পরিব্যাপ্ত হৃদয়ের কতখানি সুর
জ্বেলে জ্বেলে দিতে পারি ?—এ নয় রোদ্দুর।
সামান্যই পুঁজি এ-যে, তবু যেন দেবার প্রয়াসে
ঢেউয়ের মতই অনায়াসে
একটি সার্থক ইচ্ছা ভাসে।

তোমাকে দেবার মত অবশিষ্ট কিছু নেই আর
—শূন্য হাত, মুঠি মেলিলাম।
তবু জেনো, যা দিয়েছি তারো আছে দাম :
স্খলিত শিশিরকণা মৃত্তিকার 'পরে
জ্বেলে দিতে নীলকান্তি অলক্ষিতে সেও কাজ করে।
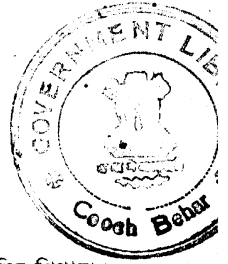
মানবতার সাগর-সঙ্গমে, সুইডেনে আর সোবিয়েতে

শচীন সেনগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সিন্ধুপ্রদেশের উপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে ভাবতে লাগলাম —ভারতের এই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে, মোহেঞ্জোদড়োয় আর হরপ্পায় (বর্ত্তমানের লরকানি আর মণ্টোগোমারি জেলায়) পাঁচ হাজার বছর আগেকার মানব সভ্যতার স্বাক্ষর রয়েছে। তিন হাজার বছর আগে আর্য্যরা এই অঞ্চলেই বসতি স্থাপন করে ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতার ভিত্ রচনা করেন। খৃষ্ট জন্মের ৫০০-৪০০ বছর আগে পারসিক কুরুশ আর দারায়ুস্ এই অঞ্চলেই তাঁদের রাজ্যের বিস্তার করেছিলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৭ অব্দে আলেকজান্দারও এই অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করেন, যার মূল উৎপাটন করে ফেলেন অশোকের পিতামহ মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত। কুরুশের অভিযান থেকে শুরু করে (খ্রীঃ পূঃ ৫০০) ভাস্কোদিগামার কালিকাটে অবতরণকাল (১৪৯৮) পর্য্যন্ত দু'হাজার বছর ধরে অগণ্য ভাগ্যান্বেষী, পরস্বাপহারী, সাম্রাজ্য-বিলাসী দুর্দ্ধর্ষ দস্যু, সম্রাটোপাধিক দিগ্বিজয়ী, তাঁদের স্বর্ণ ও রাজ্যলোলুপতার, শাঠ্যের, নির্ম্মমতার এবং বীরত্বেরও নানা পরিচয় রেখে গেছেন এই অঞ্চলে। আর এই অঞ্চলে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে নিয়ে সারা ভারতের ভাগ্য যেমন পরিবর্ত্তন করেছেন, তেমন ভারতের রূপও বার বার বদলে দিয়েছেন। তাঁদের অনেকে ফিরে গেছেন তাঁদের স্বদেশে। অনেকে জয়লব্ধ এই দেশকেই তাঁদের স্বদেশ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। অনেকে জেতা-বিজেতার সম্বন্ধ মুছে ফেলে দিয়ে একেবারে মিশে গিয়েছেন এই জাতির মানুষের সঙ্গে।

প্লেনের জানালায় ঝুকে পড়ে আমি আমার সারা-মনকে দৃষ্টির মাঝে সংহত করে দেখবার চেষ্টা করলাম—আট-নয় হাজার ফিট নীচেকার মাটিতে তাঁদের পদচিহ্নের কোন সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। বৃথাই চেষ্টা! সব ধুয়ে গেছে, মুছে গেছে,—যেমন রক্তধারায়, তেমন কালের আবর্ত্তে। কিন্তু প্রত্যক্ষ পরিচয় রয়েছে সাহিত্যে, শিল্পে, স্থাপত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, জয়ের অপরাজেয় ভারতীয় জাতি-সত্তার পরকে আপন করে নেবার প্রসাদগুণে।

দেখতে পেলাম সিন্ধু নদ অতিক্রম করে চলেছি। বিশাল নদীগর্ভে এখন জল যা আছে, তার চেয়ে বালির পরিমাণ বেশি। কিন্তু আমার মনে হোলো ওই জল কুড়ি শতাব্দীকাল কত বিভিন্ন জাতির, কত দিগ্বিজয়ার, কত সাধারণ সৈনিকের, কত সামরিক হস্তী-অশ্বের রক্তে, আর কত সর্ব্বহারা নর-নারীর অশ্রুধারায় কতবারই না স্ফীত হয়েছে, ফেনিল হয়েছে! আলেকজান্দার কোন যায়গাটায় নৌ-সেতু রচনা করে এই সিন্ধু অতিক্রম করেছিলেন, পৌরবরাজ পুরু পরাজিত হয়েও মনের বলের পরিচয় দিয়ে হৃতরাজ্য ফিরে পেয়েছিলেন কত মাইল উত্তরে বা দক্ষিণে, তা কিছুই অনুমান করবার উপায় নেই। কিন্তু এ-কথা বুঝতে পারলাম যে, আলেকজান্দার যখন সিন্ধু নদে তরণী ভাসিয়ে ভারত ত্যাগ করেছিলেন, তখন নদের যে জায়গাটা আকাশ পথে এই মাত্র অতিক্রম করে এলাম আমরা, সেই জায়গাটার অনেক নীচ দিয়ে জল-পথে তিনিও চলে গিয়েছিলেন আজ থেকে দু'হাজার দু'শ ছিয়াশী বছর আগে। ভারত ছেড়ে পারশ্যের ব্যাবিলনে তিনি দেহ রক্ষা করেছিলেন। তিন বছর আগে সেই ব্যাবিলনের উপর দিয়েও একবার উড়ে গিয়েছিলাম। ব্যাবিলনের যে-রূপ, আর যে-স্বরূপ আর সৌন্দর্য্য আলেকজান্দারকে তার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল, আমার দেখা ব্যাবিলন তার কোন পরিচয়ই যেমন রক্ষা করে না—তেমনি যে-সম্পদের সংবাদ পেয়ে দু'হাজার বছর ধরে বিদেশীরা বার বার ভারতের উত্তর-পশ্চিম দুয়ারে নির্মম আঘাত হেনেছে, তাও আজ চোখে পড়ে না। অথচ ইতিহাসে পাওয়া যায় এক-একজন লুণ্ঠনকারী কোটী কোটী সুবর্ণমুদ্রা, স্বর্ণ ও রৌপ্য অলঙ্কার, মণি-মুক্তা হীরক ভারে ভারে লুটে নিয়ে গিয়েছেন। ভারতকে কখনো সাময়িকভাবে, কখনো শতাব্দীর পর শতাব্দী পরবশতা স্বীকার করে নিতে হয়েছিল সত্য, কিন্তু প্রতিরোধ সে করেছিল। সকল সময়ে দুর্ব্বলতাই প্রকাশ করে নি, বিশ্বাসঘাতকতারই পরিচয় দেয়নি—বীরত্বেরও পরিচয় দিয়েছে, লুণ্ঠনকারীদের বিতাড়িতও করেছে অনেকবার। এত দীর্ঘকালীন প্রতিরোধের ধারাবাহিক বীরত্বময় বিবরণ, ইতিহাসে খুব বেশি পাওয়া যায় না। ওই যুগের ভারত-ইতিহাসে কেবল আলেকজান্দার-মহম্মদ-বিন-কাশিম-সুলতান মামুদের, মহম্মদ ঘুরীরই বিবরণ পাওয়া যায়না—পুরু, মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত দাহির, হিন্দুশাহী জয়পাল, আনন্দপাল, দ্বিতীয় ভীমপাল, পৃথ্বিরাজ চৌহান প্রভৃতির অমিতবিক্রমেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তৈমুরলঙ্গ, বাবর, নাদিরশা মুসলিম-রাজ শক্তিকে বিপর্য্যস্ত করেন। চিন্তার আর শেষ নেই।

—'দাদা কি ঘুমিয়ে পড়েছেন?'

—'না ভাই, ভারতের ইতিহাস ধ্যান করছিলাম।'

—'কিন্তু ভারত আমরা পেছনে ফেলে এলাম যে!'

—'কাবুল অতিক্রম না করে, তা স্বীকার করি কি করে? কাবুল, কান্দাহার হিন্দু ও মুসলিম ভারতেরই চৌহদ্দিতে ছিল।'

—'সে ত কোন্ অতীতকালের কথা।'

—'সেই অতীতকালের কথাই এতক্ষণ ভাবছিলাম, ভাই।'

—'কিন্তু পাহাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখুন, গাছ-পালা কিছুই নেই।'

—'ও-গুলো পাহাড় কি নর-কঙ্কাল, তাই আমি ভাবছি।'

—'নর-কঙ্কাল বলছেন কি!'

'তৈমুর দিল্লীর যত নাগরিক হত্যা করেছিলেন, তাদের ছিন্নমুণ্ড যখন এক জায়গায় জড়ো করা হয়েছিল, তখন তা দেখতে পাহাড়ের

মতো হয়েছিল। আর দুইহাজার বছর ধরে যত নর-কঙ্কাল জড়ো হয়েছে এই অঞ্চলে, তাতে কতগুলো পাহাড় হতে পারে ভাব'ত।'

—'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছিনা, দাদা।'

—নেপোলিয়ান যখন দিগ্বিজয়ে বার হয়েছিলেন, তখন তিনি যত সৈন্য নিয়ে বেরিয়েছিলেন, তার একশভাগের একভাগমাত্র পারীতে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন। হতদের সবাই যে যুদ্ধে নিহত হয়েছিল তা নয়; রোগে, অনশনে, ক্লান্তিতেও বহুসংখ্যক প্রাণ দিয়েছিল। তবুও ত ইউরোপে তখনো সুনির্ম্মিত পথ ছিল। কিন্তু এই পাহাড়ী-পথ দিয়ে দেড়-হাজার বছর ধরে দিগ্বিজয়ীদের অভিযান সাফল্যমণ্ডিত করতে যত সৈন্য যাওয়া-আসা করেছে, তাদের কতগুলোকে এই পথেই প্রাণত্যাগ করতে হয়েছে রোগে, শ্রান্তিতে, অনাহারে, তা কল্পনায় আনতে পার? আর জেনে রাখ, এই অঞ্চলের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রাণঘাতী যুদ্ধ হয়েছিল; সূচ্যগ্র মেদিনী কেউ বিনাযুদ্ধে ছেড়েও দেয়নি, কেড়েও নিতে পারেনি। মানুষ যদি পাথরে গড়া হোতো, তাহলে নিহতদের আর মৃতদের কঙ্কালে এমন কত পাহাড় তৈরি হোতো বলত।'

—'সত্যি কি বর্ব্বরতারই যুগ ছিল!'

—'না, না, বর্ব্বর যুগে তা হয়নি। গ্রীক-সভ্যতা, রোমান-সভ্যতা,-ব্যাবিলনিয়ান, সুমেরিয়ান, খৃষ্টীয়, ইসলামিক সভ্যতার উদ্ভবের সময়েই এ-সব অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিংশ শতকের সভ্যতার দিনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যত সামরিক আর বেসামরিক নর নারী-শিশু নিহত হয়েছে, মৃত্যুমুখেপতিত হয়েছে, তার আগেকার শতবর্ষে ইউরোপের নানা যুদ্ধেও তার বেশি লোক নিহত হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দুইকোটী বিশ লক্ষ সামরিক ও অসামরিক লোক মারা গিয়েছে। নেপোলিয়ান মাত্র ছয়লক্ষ সৈন্য নিয়ে ইউরোপ বিজয়ে বার হয়েছিলেন, আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবীর জাতিসমূহ যে সৈন্য-সমাবেশ করেছিল (mobilised into the army) তার সংখ্যা এগারো কোটী! বিজ্ঞানীরা বলছেন—তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে যদি আণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, রকেট-বোমা ব্যবহৃত হয়, তা হলে মানব-সভ্যতা সমগ্রভাবে বিধ্বস্ত হবার আশঙ্কার সঙ্গত কারণ রয়েছে। সভ্যতার গরব যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, যুদ্ধের বীভৎসতা আর হতাহতের সংখ্যাও ততই উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। এমনকি আজও যারা ভূমিষ্ঠ হয়নি, তাদেরও জীবনে মৃত্যুর ছায়া পড়েছে!'

—'আমরা অসহায়ের মতোই এই ধ্বংসের বিশ্বব্যাপী আয়োজন দেখছি।'

—'আমাদের আজকার অসহায়তা আমাদের দুর্ভাগ্যেরই কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু সভ্যতার প্রসার আবার দিকে দিকে আশার আলোও জ্বেলে তুলেছে। তাই ত ঠিক এই মুহূর্ত্তেই পৃথিবীর দশদিক থেকে প্লেনে, ট্রেণে, জাহাজে, শত-শত নর-নারী আমরা ডিজ্‌আর্ম্মামেণ্ট অ্যাণ্ড ইন্টার ন্যাশনাল কো-অপারেশনের দাবী কণ্ঠে নিয়ে স্টকহোলম-কংগ্রেসে মিলিত হতে চলেছি।'

প্লেন কাবুলের কাছাকাছি চলে এসেছে। নীচে তাকিয়ে কাবুল উপত্যকাটি বেশ দেখতে পাচ্ছি।

কাবুলীওয়ালাটি বল্লে—'মাঠগুলো দেখুন বাবুজি, কেমন ফসল ফলেছে।'

সত্যিই দেখবার মতো। ফসল কেটে মাঠে ফেলে রেখেছে সারির পর সারি। প্লেন থেকে দেখে মনে হয়, সোনার তরঙ্গ যেন নৃত্য করছে।

—'আমারো ক্ষেতে এমনই ফসল ফলেছে।' কাবুলীওয়ালা বল্লে—সে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে উঠে দাঁড়াচ্ছে, মাঝে-মাঝে জানালায় মাথা ঠেকিয়ে দেখবার চেষ্টা করছে তার ছোট্ট গ্রামখানি কোথায়!

ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ের পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে সমগ্র কাবুল শহরটি কখনো উপর থেকে, কখনো তির্য্যক্‌ভাবে দেখাতে দেখাতে আরিয়ানার পুষ্পক-রথ সাড়ে তিনঘণ্টার যাত্রা শেষ করে কাবুল এয়ার-পোর্টের মাটি স্পর্শ করল। শহরটি উপর থেকে খুবই সুন্দর দেখালো। চারিদিকেই পাহাড়। তারই মাঝ দিয়ে কাবুল নদী বয়ে গেছে। ধূম্র পাহাড়ের বেষ্টনী, উপরে নীল আকাশ, আর নীচে শস্যক্ষেতের আর আঙুর-আনার গাছের শ্যামল শোভা।

বাবর শা' ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আগে কাবুল জয় করেছিলেন। কিন্তু কাবুলের ক্ষুদ্র রাজ্য তাঁর বিজীগিষাকে পরিতৃপ্ত রাখতে পারল না। তাঁর ধমনীতে পিতৃকুল থেকে এসেছিল তৈমুরের রক্ত, আর মাতৃকুল থেকে এসেছিল চেঙ্গিজ খাঁর রক্ত। ও'রা দুজনাই ছিলেন এসিয়ার ত্রাস। বাবর এসেছিলেন ফারগণা থেকে। তা ছিল তুর্কস্তানে। তৈমুরের রাজধানী ছিল সমরকন্দে। তাও ওই তুর্কস্তানে। আজকাল ওই দুইটি যায়গাই সোবিয়েৎ সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকের অংশ রিপাবলিক অব উজ্‌বেকিস্তানের অন্তর্গত। বাবর কাবুলের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি বলতেন, এমন সুন্দর যায়গা পৃথিবীতে আর নেই। ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ভারতেই তিনি দেহরক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর দেহ সমাহিত করা হয় কাবুলে, তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুসারে।

কাবুলে আমাদের অগ্রগামী কয়েকজন ডেলিগেট বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন। প্রথমার্দ্ধের অধিকাংশ তার আগের দিন মোবিয়েতে রওনা হয়ে গেছেন। আমাদের দলটিকেও দুভাগে বিভক্ত করা হোলো। ঠিক হলো একদল ঘণ্টাখানেকের মাঝেই টাসকেণ্টের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাবে; আর একটি দল পরের দিন রওনা হবে। আমি কাবুলে থাকতে রাজী হলাম না। আমি তখন হিন্দুকুশ অতিক্রম করবার থ্রিল উপভোগ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছি, কাবুলের সস্তা ফল খাবার লোভ আমার আদৌ হোল না।

কাবুলে আমাদের দলে যাঁরা নতুন করে ভিড়লেন, তাঁদের মাঝে দেওয়ান চমনলাল সুপরিচিত ব্যক্তি। স্বাধীনতার সংগ্রামের দিনে তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। স্বাধীনতার পরে কিছুকাল ডিপ্লোমেটিক সার্ভিসে কাজ করেন। এখন তিনি কংগ্রেস দলের নির্ব্বাচিত এম-পি। অমায়িক লোক তিনি, যেমন মিষ্টভাষী, তেমন সদালাপী। বক্তৃতাও ভালোই দেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী, ডাক্তার হেলেন চমনলাল।

তিনি ছিলেন বিদেশিনী, বিয়ে করে হয়েছেন ভারতীয়া। তিনি যেন স্থিরা সৌদামিনী—যেমন সুন্দরী, তেমনই আভিজাত্য মণ্ডিতা।

দ্বিতীয়া মহিলাটি মিসেস রোড়া মিস্ত্রী। তিনি তরুণী, সুন্দরী, এবং বিদুষী। তিনি একজন সমাজ-সেবিকা। হায়দারবাদে বিকলাঙ্গ নরনারী শিশুদেরকে আশ্রয় দেবার এবং তাদেরকে কাজের উপযোগী করে গড়ে তোলবার জন্য 'আরাম-ঘর' নামক একটি আশ্রম আছে। পরিচালনার দায়িত্ব ইণ্ডিয়ান কনফারেন্স অব সোশ্যাল ওয়ার্ক (অন্ধ্র-শাখা) গ্রহণ করেছেন। রোড়া মিস্ত্রী তার চেয়ারম্যান। বেশ বলতে-কইতে ও লিখতে পারেন। স্টকহোল্মে ভারতীয় ডেলিগেশনের নেত্রী মিসেস রামেশ্বরী নেহেরুর সেক্রেটারীর কাজ বেশ দক্ষতার সঙ্গে তিনি সম্পন্ন করেন।

কাবুল যতই চিত্তরঞ্জন হোক, এয়ারপোর্টটি কিন্তু আদৌ আরাম-প্রদ নয়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেই ভাপসা-গরমে হাঁপিয়ে উঠলাম। তার ওপর চায়ের তৃষ্ণায় চাতক। ট্রেড ইউনিয়ান কর্মী অজিত পাল বল্লেন—'চা খাবেন, তা এতক্ষণ বলেননি কেন ?'

গোপাল হালদার ঝিমুচ্ছিলেন। চা পাবার সম্ভাবনা আছে শুনেই তিনি লাফিয়ে উঠলেন।

—'সত্যি বলছ অজিত, চা পাওয়া যাবে?' করুণকণ্ঠে গোপাল জানতে চাইলেন।

—'পাওয়া যাবে মানে! এটা কি এয়ারপোর্ট নয়? দস্তুর মতো রেস্তোরাঁ রয়েছে। চলুন, আমার সঙ্গে।'

গোপাল আর আমি এগুতেই নিঃশব্দে আমাদের সঙ্গ নিলেন উমা, শোভা, আর আমার 'লিটল সিস্টার' জয় আপ্পা। ব্যারাক বাড়ীর মতো একটা বাড়ীর লম্বা বারান্দার শেষ প্রান্তে গিয়ে রেস্তোরাঁর সন্ধান পেলাম। রেস্তোরাঁটি পরিচ্ছন্ন নয়, আসবাবপত্রও জীর্ণ। কাউণ্টারে বিরাজ করছেন একটি বিশাল কায়া আফগান-নারী। তাঁর মাথার চুল কাঁচা-পাকা এবং বব্ করা। ওপরের মাড়ীতে দুটি দাঁত নেই। তীক্ষ্ণকণ্ঠে অনর্গল কী যেন বকে যাচ্ছেন তিনি।

কয়েকখানি আসন দখল করে বোসলাম আমরা। কিন্তু আমরা যা চাই, তা বোঝাবো কাকে? কাউণ্টারের কর্ত্রী ত আমাদের দিকে কৃপাদৃষ্টি ফেলছেন না। তিনি তাঁর বয়-বেয়ারাদেরকে সাম্নে দাঁড় করিয়ে হাত নেড়ে, চোখ ঘুরিয়ে, অনর্গল বকেই যাচ্ছেন।

অনেকক্ষণ তাঁকে দেখে-দেখে আমি গোপাল হালদারকে জিজ্ঞাসা করলাম—'এই রকম নারী আর কোথায় দেখেছেন, বলুন ত?'

—'চা না পেলে নর অথবা নারী কোন-কিছুই আমার মনে রেখাপাত করবেনা।' তিনি বল্লেন।

—'ডিকেন্সের নভেলে এই ধরণের নারীর বিবরণ পাওয়া যায়। 'এ টেল্ অব টু সিটিজ' উপন্যাসের মাদাম দেফার্জের মদের দোকান মনে পড়ে ত? অবশ্য তিনি আদৌ অপ্রয়োজনে কথা কইতেন না, বিনা বাক্যব্যয়ে বুনেই যেতেন। তাঁর দৃষ্টি তাঁর জিহ্বার কাজ করত।'

গোপাল বল্লেন—'ডিকেন্স আমেরিকায় গিয়েছিলেন পড়িছি, কিন্তু আফগানিস্তানে এসেছিলেন শুনিনি।'

—'নারীর অসংখ্য রূপের এই রূপটি দেশে-দেশেই দেখতে পাওয়া যায়। তা দেখবার জন্য আমেরিকাতেও যেতে হয়না, আফগানিস্তানেও আসতে হয় না।'

অজিত পাল ট্রেড-ইউনিয়নের তরুণ কর্মী। তাই বয়-বেয়ারাদের চিত্ত জয় করে চা আর কেকের ব্যবস্থা করে ফেল্ল, ভারতীয় কারেন্সীকে আফগানীতেও এক্সচেঞ্জ করে নিল।

দেওয়ান চমনলাল সদল এগিয়ে এলেন এবং কাছেই একটি টেবিলে তাঁরা সকলে বোসলেন। তাঁর দলে দুটি আফগান তরুণ ছিলেন। ইউরোপীয়ান পোষাক-পরিহিত এই তরুণ দুটিকে প্রথম দৃষ্টিপাতে ইউরোপীয়ান বলেই ভুল হয়। চমৎকার ইংরিজি বলেন। চমনলাল হয়ত ওঁদের কারু পিতৃবন্ধু। আফগান তরুণ দুটি দেখতে পেলাম তাঁর সব কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনছেন, এবং বিনীতভাবে জবাব দিচ্ছেন। কানে এলো চমনলাল নির্দ্দেশ দিচ্ছেন—দিল্লীতে তাঁর নাম করে তার করে ক'ঝুড়ি আম আনিয়ে কাবুলে কাকে কাকে তাঁর প্রীত উপহার স্বরূপ পাঠিয়ে দিতে হবে। একটি আফগান তরুণ প্রতি নির্দ্দেশই বিনম্রভাবে গ্রহণ করছিলেন।

আমার ইচ্ছে করছিল তরুণদুটিকে ডেকে কাছে বসিয়ে আজকার আফগান তরুণ-তরুণীদের সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করি। কিন্তু খবর এলো প্লেন তৈরি, এখুনি উঠতে হবে। আমাদের দলের যাঁরা কাবুলে রাত কাটাবেন, তাঁরা শহরে চলে গেছেন। আরিয়ানা তাঁদের থাকবার জন্য কাবুল-হোটেল ঠিক করে রেখেছিলেন।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে আমরা সবাই সোবিয়েৎ প্লেনে উঠলাম, এই শ্রেণীর প্লেনগুলো আকারে ডাকোটারই সমান। কিন্তু পরিচ্ছন্নতায়, সাজ-সজ্জায়, মনোমোহন। সোবিয়েৎ সরকার এই প্লেনেরই একখানি ভারতের প্রাইম মিনিষ্টারকে প্রীতি-উপহার দিয়েছেন। আমরা সকলে আসন গ্রহণ করতে না করতেই ইলুশিন আকাশে উড়ল। আসনের পাশে প্লেনের বডির গা দিয়ে রবারের নল চলে গেছে দেখতে পেলাম। আর দেখলাম দুটি করে রবারের থলি আর মুখোস প্রতি পংক্তির আসনের মাঝখানকার শূণ্য স্থানে ঝোলানো রয়েছে। বুঝলাম ওগুলি অক্সিজেন-মাস্ক, হিন্দুকুশ পর্ব্বত-শ্রেণী উল্লঙ্ঘন করবার সময় ওগুলি নাকে-মুখে পরতে হবে।

হিন্দুকুশ একটিমাত্র পাহাড় নয়, একটি রেঞ্জ—পাহাড়ের পর পাহাড়, তারও পর পাহাড়, প্রায় তিনশ সাড়ে-তিনশ মাইল স্থান জুড়ে। ওর সাধারণ উচ্চতা বারো হাজার থেকে আঠারো হাজার ফুট; দার্জ্জিলিংয়ের দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ উঁচু। কিন্তু তার চেয়েও উঁচু অনেক চূড়া আছে। তার কোন-কোনটা পঁচিশ হাজার ফুটও উঁচু। ইলুশিন প্লেনগুলো উঁচু শিখরগুলির উপর দিয়ে উড়ে যেতে পারে না। তাই উঁচু শিখরগুলিকে এড়িয়ে এড়িয়ে উড়ে চলে। আর উঁচু দিয়ে অত্যন্ত দ্রুত এবং অবিরত গতি পরিবর্ত্তন করতে করতে উড়ে যায় বলে

আরোহীদের শ্বাস কষ্ট হতে পারে। সেই জন্যই অক্সিজেন-মাস্কের ব্যবস্থা।

হিন্দুকুশ রেঞ্জের কাছাকাছি যেতেই এয়ার-হস্টেস আর স্টুয়ার্ড প্রত্যেক আরোহীর মুখে মাস্ক পরিয়ে দিলেন। মুহূর্তেই হাসি-গল্প বন্ধ হয়ে গেল। প্লেনের ভিতরে থম-থম স্তব্ধতা। কখন কী হয়, তারই উৎকণ্ঠা সকলকেই হতবাক্ করে দিল। অপেক্ষাকৃত নীচু পাহাড়-গুলো অনেক নীচুতে রেখে, উচ্চতর শৃঙ্গগুলিকে এড়িয়ে এড়িয়ে ইলুশিন প্রশান্ত গতিতে উড়ে চলেছে, নাচুনি নেই, কাঁপুনি নেই। যে পাহাড়গুলো এতকাল অজেয় থাকবার গরব নিয়ে নীল আকাশে স্পর্দ্ধার চূড়া খাড়া করে দাঁড়িয়েছিল, তারাও যেন মর্ত্যের আজকার মানুষের অপরিসীম শক্তির পরিচয় পেয়ে মূক ও মৌন রয়েছে। শুধু উচ্চতম শৃঙ্গগুলি যেন তাচ্ছিল্যভরে মানুষের এই সিদ্ধিকে না-বালকের প্রকৃতি-জয়ের খেলার অতিরিক্ত কোন মূল্যই দিচ্ছে না। তাদের গায়ে বরফ জমে রয়েছে। ধূসরের-শুভ্রের সে মিতালী বিস্ময়কর কিন্তু চিত্তহারী নয়, কেননা সূর্য্যের আলো তাদের উদ্ভাসিত করেনি; কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ তাতে নেই। মনে হয় পাহাড়ের যায়গায় যায়গায় কেউ যেন চূণ মাখিয়ে রেখেছে।

অক্সিজেন-মাস্ক পরে কোন অসুবিধে হচ্ছিল না। ওটা না পরলে কী অসুবিধে হয়, তাই দেখবার বড় ইচ্ছে হোলো। মাস্কটা খুলে ফেল্লাম। কিন্তু অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের সুযোগ পেলাম না। মিনিট খানেক যেতে না যেতেই রুশী হস্টেস ছুটে কাছে এসে ইংরেজীতে বল্লেন—ও কী করেছেন।

—'হাঁপানিতে কখনো ভুগিনি। তাই শ্বাসকষ্ট ব্যাপারটি কী, একটু পরখ করে দেখছি।'

—'না, না, ওতে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে।' মাস্কটা আমার মাথার সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দিতে দিতে তিনি বল্লেন—'আপনারা এখন সোবিয়েৎ সীমানায় এসে পড়েছেন। এখন থেকে আপনাদেরকে নিরাপদ রাখবার দায়িত্ব আমাদের।'

—'কিন্তু মুখে এই মাস্ক বেঁধে দিয়েই কি সব-বিপদ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে পার? ওই ত আর একটু হলেই বাঁদিকের ওই উদ্ধত পাহাড়টা প্লেনের বাঁ দিকের পাখাটা ভেঙে দিত। ওই ছাথ ডান দিকের পাহাড়টা দৈত্যের মতো এগিয়ে আসচে। হাড়-গোড় ভেঙ্গে মরার চেয়ে নিমেষে দম আটকে মরা কি ভালো নয়, নাতনি?'

নাতনী কোন জবাব দিলেন না। মাস্কটি বেঁধে দিয়ে ছুটে চল্লেন ঘন-ঘন বমনের শব্দ পেয়ে। জনকয়েক নর এবং নারী পীড়িত হয়ে পড়েছেন: ফ্রাইটে নয় ফ্লাইটে। তাঁদের মাঝে শোভা আর রাণীও ছিলেন। উমা খুব বাহাদুরী করে তাদের সেবা করছিলেন; কিন্তু পরে পামীর পার হবার সময় তিনিও কাৎ হলেন। হিন্দুকুশ মানুষের কাছে পরাজয় সহজভাবে স্বীকার করবেন না বলেই জনকয়েককে কিছুটা শিক্ষা দিয়ে রেহাই দিলেন।

কিন্তু প্রকৃতি কি সত্যই পরাজিত? আমরা হামেসাই বলে থাকি মানুষ প্রকৃতিকে জয় করেছে। প্রকৃতি যেন আমাদের প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী; যেন আমরা তার সন্তান নই; যেন সে যুগ যুগ ধরে আমাদের ব্যবহারের জন্য, আমাদের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল হয়ে বসে নেই! আসলে আমরা প্রকৃতির দান পাবার যোগ্য হচ্ছি, জয়-পরাজয়ের কোন কথাই নেই। প্রকৃতি যদি বিরোধিতা করতে চাইত, তাহলে তার বুকের স্নেহ (তেল একটা স্নেহ-পদার্থ) অন্তরের উষ্মা দিয়ে বাষ্প করে দিত, পেট্রোল তৈরি হোত না; এখনই এমন ঘন-কুয়াশা সৃষ্টি করত যে, এই ইলুশিন মুহূর্ত্তে পথভ্রান্ত হয়ে পাহাড়ে আঘাত খেয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। আজ যেমন মানুষে-মানুষে সহযোগিতা বড় কথা হয়ে উঠচে, তেমনই বড় কথা হয়ে উঠচে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সহযোগ। জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন ক্রমশই অবান্তর হয়ে যাবে।

তৈমুর, বাবর, আরো অগণ্য-দিগ্বিজয়ী এই হিন্দুকুশ পার হয়েই ভারত-জয়ে যাত্রা করেছিলেন। আমাদেরকে তারা পরাজিতও করে-ছিলেন, কিন্তু আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতে পারেন নি। তিন বছর আগে ওই তৈমুর-বাবরের দেশেরই শান্তি কমিটির সভাপতি এক প্রভাতে আমাকে হাত ধরে এরোপ্লেন থেকে নামিয়ে নিয়ে বলেছিলেন—এত আগে-ভাগে প্লেনে উঠে বসেছিলে কেন? যতক্ষণ তোমরা আমাদের মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকবে, ততক্ষণই ভারতের বন্ধুত্বের মধুর স্বাদ আমরা পাব। তা থেকে কেন বঞ্চিত করেছিলে? (ক্রমশঃ)

সে মেয়েটি

শ্রীমঞ্জুষ দাশগুপ্ত

একদিন এই পথে সে মেয়েটি গিয়েছিল চলে
বেনারসী শাড়ী পরে অঘ্রাণের শিশির সকালে—
কাঁসাই-এর নীল জলে উঠেছিল ঝিলমিল ঢেউ—
ঝিরিঝিরি বাতাসেরা নেচেছিল তারি তালে তালে।

তারপর সময়ের পেণ্ডুলাম চলেছে নিয়ত
কতদিন হেঁটে গেছে এ ধূসর পৃথিবীর বুকে,—
হাজার নতুন প্রাণ উড়িয়েছে নতুন পতাকা—
খেলেছে হাজার খেলা কভু সুখে কখনও বা দুখে।

সকলেই ভুলে গেছে—কেউ তারে রাখে নাই মনে,
শুধু সে কাঁসাই আর আমি কাঁদি তারই স্মরণে।

বারামুলা

পথে বাস থামলো। একটা বাসের যন্ত্রে কি গোল বেধেছে। হাঁটতে হাঁটতে চলেছি। আর এইসব গল্প চলছে। শ্মশানে গেলে বৈরাগ্য আসে, প্রেক্ষাগারে গেলে চঞ্চলতা, তীর্থে গেলে ধর্মবোধ। এও তো তীর্থ। পথের ধারে ফলক। কাশ্মীরের স্বাধীনতা রক্ষায় ১৯৪৭এর ২৭শে অক্টোবর শিখ বীরদের মৃত্যু-জিৎ স্মৃতি। এদের পুরোধা ছিলেন রণজিৎ রায়; বাঙ্গালী নন্‌, শিখ কর্ণেল। বাহিনীর সঙ্গে তিনিও এখানে আত্মদান করেন। রণজিৎরায় বাঙ্গালী নন্‌, কিন্তু বারামুলা শত্রুমুক্ত করার জন্য চরম নেতৃত্ব করেছে বাঙ্গালী; রেঙ্গুনে জন্ম, বিলেতে শিক্ষা, ভারতে কর্মস্থান, বাঙ্গালী ব্রিগেডিয়র এল্‌, পি, সেন।

আর মনে পড়লো মহাপ্রাণ মক্‌বুল শেরওয়ানীর কথা। ব্রিগেডিয়র ওসমান পুঞ্চে আত্মদান করে অমর হয়ে গেছেন। তার নাম অনেকে জানে। কিন্তু মক্‌বুল শেরওয়ানীর রক্তে পূত বারামুলা। একদিন সীমান্তের আবদুল কৈয়ায়ুম, বম্বের মহম্মদ আলি জিন্না আর মকবুল শেরওয়ানী একই প্রতিষ্ঠানে থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে কাজ করেছে। কিন্তু জিন্না দেখলেন মুসলমান রাজত্বের অবসর। সাহায্য পেলেন ইংরাজ কুটনীতিজ্ঞের। যে ভেদাভেদ ছিল না ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সে ভেদাভেদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে ভারতকে দু'টুক্‌রো কর্‌লো। এই জিন্না দাদাভাই নৌরজীর আশ্রিত ও প্রিয় শিষ্য ছিল; কংগ্রেসে ছিল প্রতিষ্ঠা। আবদুল কয়ায়ুম কংগ্রেসের বিশ্বস্ত অনুচর। ১৯৪২এর সেই ব্যাপক ধরপাকড়ের সময়ে ইংরাজ কুটনীতি তাঁর কানে কি মন্ত্র ফুঁকলো কে জানে! নেতারা তখন আগা খাঁ প্রাসাদে বন্দী। আবদুল কায়ুম একেবারে ইংরেজভক্ত কংগ্রেসদ্রোহী, জিন্নার পার্ষদ হয়ে দেশকে তাক্‌ লাগিয়ে দিলেন। মকবুল শেরওয়ানী মুসলমান হয়েও অন্য ধাতের। শ্রীনগরে জিন্নাকে প্রকাশ্য সভায় তেড়ে বল্লেন,—কাশ্মীরে শুধু কাশ্মীরীই আছে। হিন্দু বা মোস্লেম, বৌদ্ধ বা খৃষ্টান—ও সবাই কাশ্মীরীই। আর কেউ নয়। সেই মকবুল আছে বারমুলায়। তাকে ঘায়েল করা চাই। সম্ভ্রান্ত, সদালাপী, সম্মানিত মকবুলকে পথে বেঁধে কোড়া মারা রক্তে পূত বারামুলা। বারামুলায় ধ্বংস হয়েছে প্রেজেন্টেশন কনভেন্টের গীর্জা, হাঁসপাতাল। নিরীহ নারী আর মুমূর্ষ বৃদ্ধ ইংরাজ প্রাণ দিয়েছে হানাদারদের হাতে। ঝড়ের রাতে একটি তারার মতো সেই হত্যার মধ্যে একটিমাত্র নাম মনে পড়ে তেরেসিলিন্—মাষ্টার তেরেসিলিন। কিছু বলেনি সে, কিছু করেনি। গির্জার বেদীর কাছে নীরবে দাঁড়িয়ে, বুকে এক শপথ বেঁধে—তোমার পবিত্রতা রক্ষা করবো প্রভু আর কি দিয়ে, কি শক্তি আমার? আমার রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, নীরব ঘোষণা দিয়ে। তেরেসিলিনের বুকে গুলি লেগেছিলো। সেই বেদীমূল রক্তাক্ত হয়েছিল তরুণীর আত্মদানে। সেই বারামুলা। গল্প চলছে।

বাসে চলেছি। কথায় কথায় এসে গেল ওসমানের কথা। এক দিকে ওসমান, অন্যদিকে এব্রাহিম খাঁ। এব্রাহিম খাঁ পুঞ্চের লোক। পুঞ্চের রাজার বদান্যতায় প্রতিপালিত, শিক্ষিত। তার বদান্যতায় ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফিরেছে। সেই ফিরে শত্রু হোলো পুঞ্চের। হানাদারদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নেতা হবার জন্য উঠে পড়ে লাগলো। লাগবেনা কেন? জিন্না আর আবদুল কায়ুমের আদর্শ তো তার চোখের ওপর! কিন্তু ইতিহাস পাঠকের মন এই ঘটনায় কাবু হবে না; দেশাত্মবোধের ইতিহাস এমনি ঘটনায় কালীময় হবে না। যেমন আছে এব্রাহিম, তেমনি আছে ওসমান। যেমন আছে মীরজাফর, তেমনি আছে মোহনলাল। ওসমান পাঞ্জাবের নয়। উত্তরপ্রদেশের, আজমগড়ের। কাশীতে লেখাপড়া। কাশীর শিক্ষাদীক্ষায় বরাবর একটা ঘরোয়া ভাব থেকে এসেছে। সাম্প্রদায়িকতা এই গোঁড়াদের সহরে কম। ছাত্রেরা খুব মিলেমিশে পড়াশুনা করে। সেকালের আলিগড়ের ঠিক বিপরীত আবহাওয়া। ওসমান স্যাণ্ডহার্ষ্ট থেকে পাশ করে নৌশেরার কাছে ঝানগড়ের প্যারাব্রিগেডের অধিনায়ক। প্রথমটায় একটা ধাক্কা খান ওসমান, ঝানগড়ে হেরে যান। ব্যস্—আর দেখে কে? দিনরাত সমান খেটে সিংহবিক্রমে দল গড়ে তুলে আক্রমণ চালিয়ে পর পর হানাদারদের মারের পর মার দিয়ে কোট, নৌশেরা কেড়ে নিলেন। তারপর সেখানে তুমুল যুদ্ধ। দিনরাত ব্যাপী যুদ্ধ। নৌশেরা থেকে ঝানগড়। চলেছে বিজয় অভিযান। তখন বিপুল জয়ধ্বনি, বিপুল হর্ষ। এই হর্ষের মধ্যে ওসমান অতর্কিতে প্রাণ হারালো শত্রুর বোমায়। সেদিন যুদ্ধ থামে নি। যুদ্ধজয় থামেনি। কিন্তু ওসমানের জন্য প্রতিটি চোখে জল। সেই অমর দেহ দিল্লিতে আনা হয়। বিরাট শোভাযাত্রার ছবি আজও চোখে ভাসে। ওসমান। ব্রিগেডিয়র ওসমান। বারামুলায় এলে বারামুলার বিধ্বস্ত অঞ্চল দেখলে কে না মনে করবে ওসমানকে, রণজিৎ রায়কে, মকবুল শেরওয়ানীকে।

হিন্দু-মোশলেম ঐক্য, অনৈক্য নিয়ে অনেক রকমের কথা অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলে গেছেন। কিন্তু সব কথার ওপর যে মানবতা-বাদ বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন সেই কথাই শেষ পর্য্যন্ত হৃদয়ে ঘা দেয়। মানুষ যদি মূলতঃ মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার করে, বাকী

সব হয়ে যায় বাহ্য। দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, অত্যাচারের বিপক্ষে সংগ্রাম। এ সংগ্রামে সাড়া দেওয়া মনুষ্যত্বের এক ধরণের বিকাশ। দেশ তোমার বা আমার নয়; সবার। যখন দেশের প্রতিপক্ষকে আঘাত হানতে হয় তখন সব ভুলে আঘাত হানতে পারলেই সে মহাবীর; জয় পরাজয় আরও পরের কথা। মানুষ মানুষকে রাজনৈতিক কারণে, অর্থনৈতিক কারণে, স্বার্থে, দ্বেষে, হিংসা করছে; করেছে। কিন্তু যেই শুনি দেশের হয়ে কেউ আত্মদান করেছে, অমনি মন কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে, তখন জাতি, বর্ণ, সংজ্ঞা সমাজের বিদ্বেষ ভুলে যাই। লক্ষ্য করে দেখেছি মোস্লেম বিদ্বেষীও ওসমানের কথা ভাবতে গিয়ে খুশী হয়, গর্বিত বোধ করে। রাজনীতির উর্দ্ধে এই যে স্বভাবসুলভ মানবচেতনা, একে আশ্রয় করেই নতুন সমাজ গড়তে হবে আমাদের।

উলার থেকে বারামুলার পথ। মাঝে সোপার পড়ে। ঝিলম বাঁ ধারে। সহরের উপকণ্ঠ দিয়ে বাস চলেছে। সহর একটু নীচে নদীর তীরে। পথ পাহাড়ের উপর দিয়ে। বারামুলায় পৌঁচেছি, বিকেল তখন চারটে।

বারামুলার কথা আগে বলেছি। বরাহমূল প্রাচীন শহর, বহু প্রাচীন। ভারতবর্ষে কুশানরা আসে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে। কনিষ্ক (৭৩—১২৩) এখানে প্রথম বৌদ্ধ মহাসভা করেন ষড়র্হদ বনে। তার বর্ণনা হুয়েনসাংয়ের কাছ থেকে পাওয়া যায়। হুয়েনসাং আসেন কনিষ্কের বহুপরে। প্রায় ৫০০ বৎসর পরে। কনিষ্কের পরে হবিষ্ক বরাহমূলের কাছে নগরী নির্মাণ করেন হুষ্কপুর। বরাহমূল থেকে কিছু দূরে হুষ্কর গ্রামে এখনও লোক বাস করে। হুষ্কর আর বর্ত্তমান বারামুলার মধ্যে বরাহমূলের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এই সব ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ছিল ভারত বিখ্যাত বিষ্ণুর বরাহ অবতারের বিরাট মূর্ত্তি।

মহাবরাহঃ শুশুভে কাঞ্চনং কবচং দধৎ
পাতালে তিমিরং হন্তং বহন্নিভ রবিপ্রভাঃ॥

এ মূর্ত্তির বিশদ বিবরণও হুয়েনসাং দিয়ে গেছেন। আরও দিয়ে গেছেন বরাহমূলের বৌদ্ধ স্তূপ ও চৈত্যের বিবরণ। এখানকার বৌদ্ধ বিহারে তিনি বাস করে যান। তখন বৌদ্ধদের কতো সম্মান, কতো সম্মান বিদগ্ধজনের। কাশ্মীর-রাজ স্বয়ং তাঁর মা ও ভাইকে পাঠিয়ে দেন বিদেশী পণ্ডিতকে স্বাগতাভিনন্দন জ্ঞাপন করতে। বরাহ মূর্ত্তি ছিল বিরাট এবং লোহার তৈরী। মন্দিরের ছাদে গাঁথা চুম্বক। সেই চুম্বকের আকর্ষণে মূর্ত্তি আকাশে নিরালম্ব হয়ে দুলতো। লোকে চমৎকৃত হোতো দেখে। সিকন্দর বুত শিকন এই মন্দির চূর্ণ করেন।...

ভাবছি এই সব কথা। হঠাৎ এক শিখ-শিক্ষক ডেকে বল্লেন "যাবেন এখানকার গুরুদ্বারায়? মস্ত গুরুদ্বারা; প্রসিদ্ধ।"

হবেনা কেন? তীর্থস্থান যে। যে মন্দির দেখলাম আজও আছে তা শিব মন্দির। শিবের লিঙ্গমূর্ত্তির গায়ে মানুষের আকারে মুখ উৎকীর্ণ করা। আরও দূরে গেলে স্তূপ দেখা যাবে। জুকর-গাঁয়ের ভগ্নাবশেষ দেখা যাবে।

বারামুলার বাজার

আরও এগিয়ে গেলে গিরিবর্ত্ম, যার মধ্য দিয়ে ঝিলাম চলেছে কৃষ্ণ গঙ্গার দিকে মুজঃফরাবাদে। ডান দিকে কাজিনাগ পাহাড়ের সার; বাঁদিকে পীরপঞ্জল। গভীর খাদের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে ঝিলাম চলেছে। ঝিলামের পাশে পাশে মোটর পথ। বারামুলা, উরি, পুঁছ—প্রাচীন পর্ণোৎস—এ পথের তুলনা নেই, এতো সুন্দর, এতো রমণীয়। মাত্র এই পথে মোটর চড়ে আসার বিলাসেই বহু পশ্চিমী পর্য্যটকরা কাশ্মীরে বেড়াতে আসতো। পথের মায়ায় লোক ঘোড়ায় আসতো, কত লোক নৌকায়।

বেশ একটা বাজার বারামুলায়। বড় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ভর্মা বাজারটার একটা স্কেচ নিলে। আমি শুধু পথটার দিকেই চেয়ে রইলাম। আফশোষ করে সর্দারজী বললেন—এই পথ গিয়েছে মারি, রাওলপিণ্ডি। সেদিন আর নেই। কি পথই ছিল। এখন হানাদার-দের এলাকা হয়ে গিয়েছে। পথের পানে চাই আর ভাবি—'না হলেও পারতো নিষিদ্ধ রাজ্য—নিষিদ্ধ পথ। দেশে দেশে মৈত্রী রেখেও তো আপোষে মিলে মিশে থাকা যেতো। কে থাকতে দেয় না? পথের ধারে এই যে মধু বেচছে লোকরা, এই যে ডিম বেচছে বুড়োটা একি নিষেধ করেছে, করতে চায়…? বেশীক্ষণ ভাবতে দিলে না। বাঁ ধার ধরে নেমে যেতেই সারি সারি ভাঙ্গা বাড়ী আর মসজিদ আর গুরদ্বারা দেখলাম। সমস্ত যেন লণ্ড ভণ্ড করে দিয়ে গেছে কেউ।—হানাদারেরা এলো বাবু, তীরের মতো এলো, হৈ রৈ করতে করতে; মশাল নিয়ে, বন্দুক নিয়ে, হাত বোমা নিয়ে। বেশীর ভাগ নষ্ট করলো মেয়ে, মুসলমান মেয়ে; মুসলমান প্রাণ, হিন্দুদের দোকানপাট—কেউ বাদ গেল না।

ভাল লাগছে না লোকটার কথা। কোথায় যেন একটা দারুণ অসত্য উপলব্ধি করি। কোথায় যেন মানুষের কাছে মানুষ বারংবার বঞ্চনা করে যাচ্ছে, আর তার ঋণ শোধ করতে হচ্ছে নিরীহ প্রাণীর রক্তপাতে। মুষ্টিমেয় কয়েকটী লোক একটা ভণ্ড, অন্তঃসারশূন্য চিন্তাধারায় প্লাবিত করছে বিশ্বশুদ্ধ শান্তির পথ। স্তোকে, বঞ্চনায়, ধাপ্পাবাজীতে বিভ্রান্ত হচ্ছে অপরে এবং হানাহানি করে সারা হচ্ছে। কেন শান্তি-পিয়াসী-সহস্র অশান্তির উৎসমুখের এই কয়েকটা দানবকে দমিত করতে পাবেনা?

কিন্তু বারামুলা আমায় আনন্দ দিলো না। অত্যন্ত ব্যথা নিয়ে ফিরে এলাম চিনারবাগে। এসে ভাবতে লাগলাম—ক্ষীরভবানীর কথা। ডায়েরীতে লিখলাম—মন ফুলের মতো। বাইরের আলো বাতাস লেগে ফুটে ওঠে। তখন মন ওঠে খুশীতে ভরে। প্রসন্ন চাহনিতে জগতকে লাগে সুন্দর। আবার ঐ বাতাস বয়েই ধুলো আসে। তখন ফুল যায় ধুলোয় ভরে। কিন্তু যদি সেই ফুল দিই দেবতার পায়ে তখন তা হয়ে ওঠে নির্মাল্য; মলিনতাহীন। ধুলো যায় ধুয়ে। মন আবার সার্থকতায় সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। বলতে ইচ্ছা করে পূর্ণমিদং।

আমি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েই ছিলাম। হঠাৎ কান্নার শব্দে জেগে উঠি। উঠতে যেতেই বেণু টের পেলো। কিন্তু যখন বল্লাম 'এখুনি ফিরবো' তখন বোধহয় সকলেই পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছিলো।

কিন্তু কান্না আমি ঠিকই শুনেছি। সবদিক খুঁজলাম—কোথাও কেউ নেই। চিনারের তলায় ক্যাম্প অফিসের কাছে তিনটি মেয়ে মিলে দিব্যি গল্প জুড়েছে। পূর্ণিমার রাত্রি। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় চারধার যেমন স্পষ্ট, গাছের তলায় ছায়া তেমনি নিবিড়।

কানে সেই কান্না।

রান্নার ঘেরা জায়গাটায় গিয়ে দেখি একগাদা কাঠের ওপর বসে কান্তা আর তার পাশে কনট্রাক্টরটা—লম্বা চেহারার লোক এ হুরা। কান্তা তাকে ধাক্কা দিয়েছে। সে হুমড়ি খেয়ে একটা খালি টিনের ওপর পড়ে শূন্যগর্ভ শব্দ তুলেছে। কাপড় সামলে কান্তা উঠতে যাবে। দ্বিতীয় কনট্রাক্টর রত্না এসে তাকে হাত ধরে টেনে বোটের মধ্যে নিয়ে গেল।

কিন্তু হুরা ওঠেনি। এতক্ষণে আত্মপ্রকাশ করে আমি তাকে তুলতে গেলাম। দেখলাম মনের নেশায় তার ওঠবার ক্ষমতা নেই। টীনের শব্দে চিনার তলার ছেলেমেয়েরাও জুটেছে। আমি তাদের মধ্যে দুটী শিক্ষক যুবককে বললাম—তাকে হাসপাতাল বোটে নিয়ে যেতে।

আমার কাজ শেষ হয়নি। কে কাঁদছে। কান্তা কাঁদেনি। বেশ করুণ কান্না। চাঁদের আলোয় চলতে লাগলাম। সাঁকো পার হলাম। বাঁধের দেয়ালের ধার ধরে ধরে পোলো-গ্রাউণ্ডে এসে দাঁড়ালাম। হ্যাঁ, দুজন পাঁচিলের নীচে বসে কথা বলছে। দুজনেই মেয়ে। কথাবার্ত্তা কানে আসছে। চুপি চুপি কথা শুনতে চাইনি। কিন্তু প্রথম কথাটা কানে আসতেই আর পারিনি বাকীটুকু না শুনে। একই সঙ্গে প্রায় ওদের চিনতেও পারলাম যেন। চিনারবাগে প্রথমদিন বোট ঠিক করে দেবার সময়ে শোভা আর মীনাক্ষী বলে যে মেয়ে দুটীকে নিয়ে বিপদে পড়েছিলাম তারাই।

"না শোভা আমায় ভুল বুঝিস না…" কাঁদছে মীনাক্ষী—"ভালবাসি তোকে, এতো ভালবাসি যে বাবা মার নিষেধ সত্ত্বেও আমি চলে এসেছি শুধু তোর জন্যে—"

"আর তার টাকা আমায় দিতে হয়েছে। তুই দিস্ নি। তোকে আমি দোষ দিই না; তোর দোষ নয়; দোষ আমার ভাগ্যের। বার-বার সমস্ত প্রাণ দিয়ে একের পর এক এক একজনকে বাঁধতে চেয়েছি। কেবল হেরে গেছি। ভালবাসতে পারি, খুব পারি। কিন্তু তোরা অকৃতজ্ঞ; ভালবাসার পরেও কিছু চাস্। আমি যে তা তোদের দিতে পারি না।"

মীনাক্ষী জড়িয়ে ধরেছে শোভাকে—"শোভা, আমি ক্ষমা চাইছি শোভা। আর অমৃত বন্ধুর সঙ্গে কথা বলবো না শোভা…"

"কেন বলবি না? আমার নাম ডোবাবার জন্য? অমৃত বন্ধুর সঙ্গে ভাব করিয়ে কে দিল? আমিই। তোর মন যাতে ভাল থাকে সেজন্য। কিন্তু অমৃতবন্ধু তোর আস্কারা না পেলে আমায় শাসালো কেন? আমি আমার কপালকে ঘৃণা করি, ঘৃণা করি আমার শরীরকে। আমার মনের মতো সবল দেহ নিয়ে কেন আমি জন্মাইনি। এই সোজা সোজা হাত পা, এই সরু বুক, শক্ত চোয়াল, তোর ভালো লাগবে কেন? আমি বিধাতার অভিশাপ রে মীনা, আমি অভিশাপ।"

মীনাক্ষী ডুকরে কেঁদে জড়িয়ে ধরে শোভাকে—সরে আসি। ধীরে ধীরে বাঁধ ধরে নেমে যাই চিনার বাগে।

বিছানায় গা দিয়েছি, বিহারীলাল আর গুপ্তা বলে উঠলো "ব্যাপার কি?"

"পূর্ণিমার রাত। চাঁদে পেয়েছে সকলকে। শিকার চলছে। কেউ ব্যাধ কেউ হরিণ। এ চিনার বাগ। এর মাটীতে শিকারের লোভ।"

ক্রমশঃ

কী চাই ?

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

কী চাই ? তাই কি চাই স্পষ্ট জানি ? আজ চাই মান, যখন দেখি মানীর মর্যাদার স্পর্শে বাড়ে মান। আবার কখনও করি মানীর হিংসা, যখন সে অগ্রাহ্য করে আমার ব্যক্তিত্বকে তার মাঝে দেখে ক্ষুদ্রত্ব। যশ চায় জীব। তারও প্রাণ ক্ষণিক—যদি সে যশের মূলে থাকে সংসারের তুচ্ছ সাফল্যের ক্ষণিক প্রভা। নিরাময়তা, দারিদ্র্য-দুঃখের অবসান, শ্রদ্ধা, স্নেহ চায় মানুষ। কিন্তু তাদের মাঝে বিরাজ করে জটিলতা। তাদের রূপও বহু। অথচ অন্তরাত্মা চায় অনেক কিছু নিজের বিশিষ্টতা অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রয়োজনে।

জগতে মানুষ থাকতে পারেনা একাকী। তার জীবনে চায় সে সহযোগ ভিন্ন জীবনের। পৃথিবী তার বৈরী-পুরী। নীরবে চক্ষু মেলে মানুষ দেখে উন্মত্ত আর সঙ্কুল এ বিশ্ব। সে তার অভিব্যক্তির আদিযুগ হতে সঙ্ঘ বেঁধেছে, নিজের রক্ষার তাগিদে।

আত্ম-কেন্দ্রিক বহু চক্রের মাঝে তার বাসা। এ প্রয়োজন যেমন অনিবার্য্য, তেমনি স্বার্থ-বিরোধী। যে কর্ম্মে নিজের সুখ তাতে যদি বহুর বা সঙ্ঘের সুখের হয় বিঘ্ন, মানুষকে করতে হয় সঙ্কোচ, আপনার তৃপ্তির বাসনাকে। মাত্র তাই নয়। যে কার্য্য তার পক্ষে ধার্য্য হয়েছে অন্যায় অপরাধ, সে বাথার দৃষ্টিতে কাঁদতে দেখে বিচারের বাণীকে শক্তের অপরাধে। অথচ সঙ্ঘ জীবন ব্যতীত গত্যন্তর নাই বুদ্ধি-সহায় জীবের!

এই সব কথা ভেবে প্রত্যেক জনসঙ্ঘের প্রবল নেতা সংবিধান করে নীতি, জীবের স্বেচ্ছাচারকে সীমাবদ্ধ করতে জন-কল্যাণের মানসে। কখনও জন-কল্যাণের অজুহাতে। ভিন্ন সমাজের সঙ্ঘ-পতি যদি পায় কর্তৃত্ব সমাজের উপর; অতিবড় সুষ্ঠু হ'লেও সে চায় নিজের আদর্শ মতে গড়তে বিধি-বিধান। সর্ব্বকল্যাণের আদর্শ জগতের ইতিহাসে মেলেনি। তাই বিধি-বিধানের মাঝে দেখা যায় বিজেতা-দলের প্রাধান্যের প্রক্ষেপ। ভারতবাসী দশ বৎসর পূর্ব্বে সে অবমানের দীনতায় হ'ত ক্ষুব্ধ।

প্রাচ্যে বিশেষ ভারতবর্ষে ধর্ম্মকে প্রধান স্থান দিয়েছিলেন সঙ্ঘ-নেতারা। তাঁদের আদর্শ ধর্ম্ম ছিল—পরকালের সুখের কামনা এ জীবনের কর্মে। বহু স্তোত্র-মুখর ছিল ভারতবর্ষ। আজিকার সন্দেহের দিনেও তারাও নির্ব্বাসিত হয় নি সমাজ থেকে। অন্ততঃ বিধি আছে, এবং তাদের বিষয় নির্ভীক গবেষণা করলে এ কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে নিত্য-কর্ম্মের মাধ্যমে মানুষ যাতে চরম জ্ঞান লাভ করতে পারে, তার ব্যবস্থা প্রভূত পরিমাণে করেছিলেন আর্য্য-ঋষিরা। ধ্যান-গম্ভীর ভূধরের নিভৃত নিরালায় ধ্যানমগ্ন হ'য়ে ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভের শিক্ষার সুস্পষ্টরূপ ছিল গুরু-মুখ-নিঃসৃত। যোগের বিধান অল্পের জন্য। কিন্তু আর্য্য-ঋষিরা এ কথা মেনে নিয়েছিলেন যে জীবনের অন্তরাত্মার আদি-বাণী—বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে তো মোর নয়। তাঁরা জানতেন পৃথিবীর কাজের মাঝেই মনে জাগবে বৈরাগ্যের সুর—শাশ্বতকে জানবার প্রয়োজনে।

আমি যখন আমাদের ও বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-বিধি ও স্তোত্র-মালা অনুশীলন করি তখনই মনে হয় যে কবি ও ঋষিরা পূর্ণরূপে মেনে নিয়েছিলেন আমাদের আদিম সংস্কারগুলিকে। তাঁরা জানতেন পৃথিবীর মঙ্গলের ভিতর হতে অভিব্যক্ত হবে—জ্ঞান এবং কল্যাণ-মুখ বাসনা। তারাই আনবে চরম জ্ঞান এবং বৈরাগ্য।

সংসারের প্রয়োজনকে তো দূরে ফেলিবার উপায় নাই তাকে বুঝে তার সম্মুখীন না হ'লে। সে চায় সম্মুখ সমর। বিশ্ব-বিধাতা নিশ্চয় চান তার পরাজয়। কিন্তু মায়া-রূপে যখন সংসার হ'য়েছে গড়া, সেথা আদর্শ জীবন যাপন করলে তবে মুক্তি। তাই আয়োজন—স্তব, স্তুতি, পূজাপাঠ, কল্যাণকর বিধি নিয়ম। শম, দম, নিয়ম, প্রাণায়াম তুলবে মানুষকে সে কর্ম্ম ভূমি হতে যেথায় তার জন্ম এবং বিচরণ।

তাই স্তবের মাঝে দেখি—কোথাও স্পষ্ট যাচিঞা—দেহি, ধেহি। আবার কোথাও দেখি স্তবের ফলস্তুতিতে স্পষ্ট করে বিবৃতি পারিতোষিকের।

সেই ফলের কথা ভাবলেও মনে হয় ঋষি ও কবিরা লক্ষ্য করে-ছিলেন জীবের আদিম প্রয়োজন। আমি গোটাকতক মাত্র দৃষ্টান্ত দেব হেথায়।

মাত্র স্তবস্তুতিতে কেন বৈদিক সাহিত্য হতে সকল হিন্দু ও বৌদ্ধ-গ্রন্থে দেখি—পিতামাতা গুরুজনের সেবা ও কর্তৃত্ব স্বীকার। পিতৃদেবো ভব এ কথার প্রতিধ্বনি সর্ব্বত্র। ভরতকে সান্ত্বনা দেবার সময় শ্রীরামচন্দ্র বলেন নাই, নিজে পিতা তাঁকে বনবাসী ক'রে অন্যায় করেছেন। বল্লেন—

আত্মানমনুতিষ্ঠ ত্বং স্বভাবেন নরর্ষভ।
নিশম্য তু শুভং বৃত্তং পিতুর্দশরথস্য চ।

হে নর শ্রেষ্ঠ পূজ্যপাদ পিতার পুণ্যচরিত্র অনুসরণ ক'রে তুমিও নিজের শুভধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।

পতিব্রতা নারী কৌশিক নামক শাস্ত্রজ্ঞ মুনিকে বুঝিয়েছিলেন যে পতিশুশ্রূষা হতে মহান ধর্ম্ম নাই নারীর পক্ষে। মহাভারতের স্কন্দে স্কন্দে এমন কথার মাঝে সংসার ধর্ম্মের আদর্শ গীত। বলাবাহুল্য এমন শিক্ষার ফল বহুমূল্য।

প্রত্যুষে উঠে স্তব পাঠ করবে, সারাদিন সকল কর্ম্ম ভগবানের নাম স্মরণ ক'রে করবে, কর্ম্মফল অর্পণ করবে শ্রীকৃষ্ণে বা তাঁর খণ্ড দেবতায় এ শিক্ষা গৃহীর। সে সব শ্লোক বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে কোন্ ভয়কে দূর করবার সঙ্কেত তাদের মাঝে বিদ্যমান। আমি বলছি না

স্তোত্র—যদিও বহু স্তব বিশেষ কবচের বিধানে নানা শ্রেণীর আশার বাণী লিপিবদ্ধ।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুংলঙ্ঘয়তে গিরিম
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্।

ভয় নাই বল্লেন ঋষি। ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞের ভাষা শব্দ মুখর। বলবান গিরি লঙ্ঘন করে। তোমার নিশ্চয় সাধ গিরি লঙ্ঘনের উপযোগী সুস্থ সবল কমনীয় দেহের। কোনো চিন্তা নাই। এসব যাঁর কৃপায় বন্দনা কর সেই শক্তি ও আনন্দের আধার। তিনি পরমানন্দ মাধব। বল আসে দেহে ও মনে—তখন জানতে ইচ্ছা হয় কে সে বলের দাতা যাঁর কৃপা এত মধুর। এ চিন্তায় বাচাল হবার বা পাহাড় চড়বার তুচ্ছ ভাবনা উবে যাবে—মানুষের জ্ঞান-প্রধান জিজ্ঞাসু মন ধীরে ধীরে লাভ করবে জ্ঞান তাঁর যিনি—পরমানন্দ মাধব।

তখন জ্ঞান ফুটবে অর্গের সেই স্তরের—যাতে সরস্বতী দেবীকে বলা হয়েছে—নিঃশেষজাড্যাপহা। তিনি মনের জড়তাকে অপহরণ ক'রে নিঃশেষ করে দেন। জ্ঞান মানুষের স্বভাব। মোহ তাকে ঢেকে রাখে। বিদ্যা মূঢ়োকে নিঃশেষ করে।

এমনি প্রার্থনা আবার করি—

প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গাদুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা।

আপদ যায় দুর্গা নামে। এ আপদ যে যেমন বোঝে নিজের বুদ্ধির স্তরে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক প্রভৃতি সকল আপদই জীবের স্ফূর্ত্তির বিরোধী। কিন্তু তমোনাশের কবিতা মাধুর্য্যের অর্থ নয় কি জ্ঞানের উন্মোচন ও উদ্বোধন?

মাত্র সাধারণ আপদ, বিপদ, স্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতির উপায় রূপে নির্দ্ধারিত হয়নি সকল শ্লোক। নিষ্কামকর্ম এবং শরণ—জীবনের উৎকৃষ্ট পথে অগ্রসর হবার দুটি বিশেষ উপায়ের সার হৃদয়ঙ্গম হয় এই নিত্য প্রভাতের আবৃত্তি হ'তে—

প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্।

হে জগতের জননি, প্রাতঃকালে উঠে শোবার সময় অবধি এবং সায়াহ্ন হ'তে আবার প্রভাতে ওঠা অবধি যা কিছু করব মা, সবই তোমার পূজা। এ হ'তে মহান প্রতিজ্ঞা কী হ'তে পারে। নিজের বা পরের অপকার করবার সময় নিশ্চয় মনে আসবে যে এতো তাঁর পূজা নয়। আবার পরকে বুঝব আপনজন। তখন তার সেবা, তার সখ্য, তার প্রতি মৈত্রী এবং করুণা সমৃদ্ধ হবে।

আর একটি প্রভাতের শ্লোকের কথা বলি। নবগ্রহস্তোত্র। সে স্তোত্রপাঠের ফল সম্বন্ধে স্পষ্ট বলা হয়েছে—ব্যাস বলেছেন এই স্তোত্র যে প্রণত এবং শুচি হয়ে পাঠ করবে তার হবে—

ঐশ্বর্য্যমতুলম—ঐশ্বর্য্য মানে পার্থিব ধনদৌলত তেমনি মনের চরিত্রের উৎকর্ষতার লক্ষণ। কিন্তু পরের কথাগুলি হতে প্রথম অর্থই মনে হয়। যা'হক, তারপর হয়—

আরোগ্য—অবশ্য কাম্য। এবং একথা স্মরণ করে মানুষ যত্নবান হবে দেহের প্রতি। তারপর—

পুষ্টিবর্দ্ধন—কাম্য। তথা—

নরনারীপ্রিয়ত্ব। এ ইঙ্গিত চরিত্রগঠনে সর্ব্বত্র। অদ্বেষ্টা সকল ভূতের—ভারত-কৃষ্টির সার।

কিন্তু যখন শ্লোকের অর্থ বুঝি তখন দেখি তার মাঝে আত্মোন্নতির যথেষ্ট উপায় আছে—যদিও প্রার্থনার দেবতা নবগ্রহ। সূর্য্য সর্ব্বপাপোঘ্ন। শশী—শম্ভোর্মুকুটভূষণ। ইত্যাদি।

সকল স্তব স্তোত্রে ধীরভাবে বোঝা যায় কোন্ কর্ম্মকে শুভ বলেছেন শাস্ত্রকার এবং বহু দেবতার স্তবে কোন্ উপাধি উল্লিখিত। সকল শ্রেণীর সকল স্তরের লোকের—কী চাই?—প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। কিন্তু ফলশ্রুতি অতি সাধারণ লোককে ধর্ম্মকার্যে নিযুক্ত করবার প্রথা। শ্লোক বিচার করলে তার অন্তর্নিহিত শব্দগুলি হৃদয়ঙ্গম হবে। প্রথমে হয়তো সাংসারিক সুবিধার জন্য প্রবৃত্ত করে মানুষকে কিন্তু ক্রমশঃ মূর্ত্ত হয় দেব-বিভূতি স্তবের শব্দ বিচার করলে।

একটি উদাহরণ দিই। অতি উদার শ্লোক। বিশ্বসার তন্ত্রে আপদুদ্ধার কল্পে এ শ্লোক। এর প্রতিছত্রের শেষে অতি কল্যাণকর শরণের কথা—

নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে।

দুর্গার বিভূতি বলা হয়েছে—তিনি সানুকম্পা জগদ্ব্যাপিকা বিশ্বরূপা, জগদ্বন্দপাদারবিন্দ, জগচ্চিন্তমানস্বরূপা, মহাযোগিনী জ্ঞানরূপা ইত্যাদি ইত্যাদি। অতি গভীর তত্ত্ব-মূলক এ-সব শব্দ। শেষে বলা হয়েছে তিনি শরণীয়া এবং দেবী প্রভৃতি। ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাম দেবী যারা রোগে পীড়িত এবং

নৃপতি-গৃহ-গতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং
ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ।

নৃপতির অত্যাচার ছিল সেদিন যেমন ছিল দস্যুর উৎপীড়ন। লোককে এই স্তব আবৃত্তি করতে বলা হ'ল, সে সব অত্যাচার স্মরণ করিয়ে দিয়ে। কিন্তু একবার বুঝলে তখন মানুষ নিশ্চয় ভাবতো আনন্দময় বিশ্বসম্রাটের কথা এবং যত কু-ভাব, অহমিকা, অস্মিতা প্রভৃতি হরণের দেবী—শ্রীশ্রীদুর্গামাতার কথা। তুচ্ছে আরম্ভ পরিণতি মহতে।

অথচ এইসব শ্লোক হ'তে কয়েকটা কথা স্পষ্ট বোঝা যায়—সংসারের বাস্তব প্রয়োজন উপেক্ষা করে, তাদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে, বিক্ষিপ্ত মনে ভগবান বা ভগবতীর বিভূতি ধ্যানে আত্মোন্নতি সম্ভবপর নয়। যদি চক্ষু মুদলে—রাজার পেয়াদা, বা দস্যুর পদধ্বনি বিব্রত করে অথবা অসুস্থতা অসহ্য হয় উৎপীড়ক মানুষ পারেনা আগুয়ান হ'তে শুভ যাত্রা পথে।

অবশ্য সংস্কৃত-সাহিত্যে স্তবস্তুতি অসংখ্য। আমি দু-একটি আরও উল্লেখ করব। মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

নারদ পঞ্চরাত্রে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম এক অপূর্ব্ব স্তোত্র।

একশো আট নামে সকল তথ্য আছে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে। কিন্তু এ পাঠের ফল কি ?

অনুপত্রবদুঃখঘ্ন, পরমায়ুবর্দ্ধনম। অপুত্রের পুত্র লাভ হয়। অগতির গতি হয়। দরিদ্রের প্রচুর ধন হয়। অথচ শেষে—অন্তে কৃষ্ণস্মরণদং ভবতাপভয়াপহম—ভবের দুঃখে সবাই দুঃখী। শ্রীকৃষ্ণ শরণে পরমানন্দ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বালকৃত কৃষ্ণস্তোত্রে শুনি—

ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং প্রাতরুত্থায় য পঠেৎ
বহ্নিতো ন ভবেৎ তস্য ভয়ং জন্মনি জন্মনি—

বহ্নি ভয় অবশ্য বাহিরের অগ্নি এবং অনুতাপ বহ্নি।

শত্রুগ্রস্তে চ দাবাগ্নৌ বিপত্তৌ প্রাণসংকটে
স্তোত্রমেতৎ পঠিত্বা তু মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
শত্রুসৈন্যং ক্ষয়ং যাতি সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ
ইহলোকে হরে ভক্তিমন্তে দাস্যং লভেদ্ ধ্রুবম।

শত্রুর গ্রাস, দাবাগ্নি, বিপদ, প্রাণসংকট সবই লোপ পায় কৃষ্ণস্তোত্র পাঠ করলে। ইহলোকে হরিভক্তি হয়, জীবান্তে তাঁর দাস্য লাভ হয়। এতে দাস্যকে দেওয়া হল উচ্চস্থান।

শিব শ্মশানবাসী বৈরাগী, যোগেশ্বর। যোগের সময় দীপশিখা যেমন বায়ুহীন স্থলে স্থির হ'য়ে জ্বলে, শিবলিঙ্গ তার প্রতীক। শিবলিঙ্গ ইঙ্গিত মহাদেবের যোগাবস্থার একাগ্রতার। কাজেই ধারণা সাধারণ যে, শিবের পূজা সংসারীর নয়। যোগী হ'তে গেলে প্রথম আবশ্যক বৈরাগ্য। কিন্তু মহাপুরুষদের লিখিত স্তবে পাই দেবাদিদেব যোগেশ্বরের পূজা গৃহীরও কর্ত্তব্য। ফলশ্রুতি এ সত্যের প্রমাণ।

প্রভুং প্রাণনাথং বিভুং বিশ্বনাথং
জগন্নাথ নাথং সদানন্দভাজম্
ভবদ্ভব্যভুতেশ্বর ভূতনাথং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে।

এক অপূর্ব্ব মনোরম শ্লোক। আমার জননীদেবী এ শ্লোক তন্ময় হয়ে আবৃত্তি করতেন এবং নিজের পুত্রবধুকে শিখিয়েছিলেন। ফল কী এ স্তোত্র পাঠে? যে ভক্তিভাবে এ স্তোত্র প্রভাতে পাঠ করে সর্ব্বদা ভর্গভাবানুরক্ত তেমন ভক্ত—

স পুত্রং ধনং ধান্যমিত্রং কলত্রং
সমগ্রং সমাসাদ্য মোক্ষং প্রযাতি।

পুত্র, ধন, ধান্য, মিত্র, কলত্র সকল লাভ করে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। অথচ শিব, শঙ্কর, শম্ভু, ঈশান স্বয়ং—শ্মশানে বসন্তঃ মনোজং দমন্তঃ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে হিমালয়কৃত শিবস্তোত্র পাঠের ফল বিশাল।

স্তোত্রমেতন্মহাপুণ্যং ত্রিসন্ধ্যাং য পঠেন্নর
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো ভয়েভ্যশ্চ ভবার্ণবে।
অপুত্রো লভতে পুত্রং মাসমেকং পঠেদ যদি।

একমাস পুত্রলাভের বাসনায় পাঠ করলে কিন্তু ভক্তি বাড়বে, পুত্রলাভের বাসনা হবে ম্লান। সে যা' হ'ক আরও শুনি —

ভার্য্যাহীনো লভেদ্ ভার্য্যাং সুশীলাং সুমনোহরাম
চিরকালগতং বস্তু লভতে সহসা ধ্রুবম।
রাজ্যভ্রষ্টো লভেদ্ রাজ্যং শঙ্করস্য প্রসাদতঃ
কারাগারে শ্মশানে চ শত্রুগ্রস্তেঽতি শঙ্কটে।
গম্ভীরেঽতিজলাকীর্ণে ভগ্নপোতে বিষাদনে
রণমধ্যে মহাঘোরে হিংস্রজন্তু সমন্বিতে
সর্ব্বতো মুচ্যতে স্তুত্বা শঙ্করস্য প্রসাদতঃ।

নিশ্চয়ই গৃহীর শিবপূজা বাঞ্ছনীয়। গৃহী কেন নাবিক যোদ্ধা প্রভৃতির পক্ষে শঙ্কর পূজ্য—মাত্র বৈরাগীর তিনি দেবতা নন।

স্তব-স্তুতি-সাহিত্য আলোচনা করলে স্পষ্ট ধারণা হয় যে পূজা-আর্য্যঋষিরা মাত্র পরপার-চাওয়া লোক ছিলেন না বাস্তবকে দূরে ফেলে। সংসার ছিল একটা আশ্রম। তার মাঝে দস্যুভয়, ব্যাধির ভয়, মানুষ এবং প্রাকৃতিক শত্রুর ভয় বিদ্যমান ছিল সদাই। রাজভয়ও সেদিন ছিল আজও যেমন সকল সমাজে বিদ্যমান—সমাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি সত্ত্বে। কারণ পদের বলে পরের উপর কর্ত্তৃত্ব করবার কু-অভিপ্রায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে। সংসার করতে গেলে—সুশীলা, মনোরমা, মনোবৃত্ত্যানুসারিণী ভার্য্যা চাই। সুবোধ পুত্র আবশ্যক, মিত্র চাই অভীষ্ট। কিন্তু এসব চাই কেন ?

এই চাওয়া স্তুতি নির্দ্দেশ করেছে। চাই মোক্ষ, চাই পরপারে সুখ। কি বিভূতিকে সদা মনে রাখলে তবে স্পষ্ট দৃষ্টি হবে জীবের, সেকথা পাওয়া যায় স্তবে। তাই বুঝতে হবে যে সাংসারিক যে সুবিধা, যে চাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় স্তোত্র, মাত্র তার প্রতি চিত্ত সমাবেশ করলে হবে না। সমস্তটি বুঝলে প্রতি স্তোত্র হ'তে উপদেশ পাওয়া যাবে যে নিরাময়, নির্ব্বৈর পুণ্যবান হয়ে পবিত্র সংসারে ভক্তির সাথে বাস করলে প্রতি প্রভাতে প্রত্যহ সায়াহ্নে জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে বিভূতি। তখন মানুষ আপনাকে পুণ্যপথে পরিচালিত করবে। তারই ফলে বুঝবে—

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন ভ্রাতা
ন পুত্রো ন পুত্রী না ভৃত্যো ন ভর্ত্তা
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব
গতিস্তং গতিস্তং ত্বমেকা ভবানি।

কিন্তু যোগী-শ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্য্যকে বাস্তবকে মেনে বলতে হয়েছে—

কুকর্ম্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ
কুদৃষ্টিঃ কুবাক্য-প্রবন্ধঃ সদাহং গতিস্তং গতিস্তং গতিস্তং ভবানি।

যে দোষ এড়াবার জন্য শরণ আবশ্যক তিনি সেগুলির বর্ণনা দিয়েছেন ;

বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে
জলে চানলে পর্ব্বতে শত্রুমধ্যে
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি

গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি।
অনাথো দরিদ্রো জরারোগযুক্তো
মহাক্ষীণ দীনঃ সদা জাড্যবক্ত্রঃ।
বিপত্তৌ প্রবিষ্টঃ প্রনষ্টঃ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি।

এ শ্লোক শঙ্করাচার্য্য বিরচিত। আমার মনে হয়—যোগী যিনি বুঝিয়েছিলেন—মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা। কিন্তু সে চরম অবস্থা ধ্যানযোগের দ্বারা পাবার পূর্ব্বে—হতে হ'বে ভক্তিমান-শরণাগত।

পরমহংসদেবের জীবনেও তাই দেখি। তিনি মহাযোগী—কিন্তু সংসারী কী চায়, তা বুঝে বলেছিলেন—শরণ লও, ব্যাকুল হও।

অলমতি, পূজা পাঠ, স্তোত্র, স্তব সমস্ত পর্য্যালোচনা করলে রূপ পাওয়া যায়—কী চাই—এ অস্পষ্ট প্রশ্নের। শেষ কথা—শরণ।

সর্বোদয় ছাত্র অধ্যাপক শিবির

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

"আমি চিন্তা বিপ্লব ঘটাতে চাই, পন্থা-বিপ্লব ঘটাতে চাই। ঋষিরা বলেছেন, যুবকদের রুচি নব ব্রহ্মের সৃষ্টিতে। তাইতো আমি আপনাদের জন্য এই নবব্রহ্ম রচনার সৃষ্টি করিতেছি।"—কথাগুলি বলেছেন বিনোবাজী। কিন্তু এই যুবকদের কোন বয়ঃসীমা নেই। মনের সজীবতায় যারা তরুণ, নৈরাশ্যের অন্ধকারে যারা ভেঙ্গে পড়ে না, তারাই যুগে যুগে নতুন সমাজ রচনায় অগ্রণী হয়। প্রচলিত ব্যবস্থার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে যারা অজানাকে জানতে ভয় পায় তারা বয়সে যুবক হলেও তরুণ নয়। তরুণ তারাই যারা স্বপ্ন দেখে। নিজেদের জীবনকে ভবিষ্যতের স্বপ্নের রঙ্গে যারা রঙ্গীণ করে তোলে তারাই তরুণ।

"স্বপ্ন আমার জোনাকি-
দীপ্ত প্রাণের কণিকা
স্তব্ধ আঁধার নিশীথে
উড়িছে আলোর কণিকা।"

স্বাধীনোত্তর ভারতে নতুন জীবনে রচনার স্বপ্ন দেখেছিলেন গান্ধীজী। কিন্তু তাকে রূপ দেবার সময় তিনি পাননি। এগিয়ে এলেন তাঁরই পথ ধরে তাঁর উত্তর সাধক বিনোবা ভাবে। স্তব্ধ আঁধার নিশীথে স্বপ্নের উত্তরীয়ে ঢেকে দিলেন সমগ্র দেশকে। সে স্বপ্ন হল সর্বোদয়।

কিন্তু কী এই সর্বোদয়? বাংলাদেশের শিক্ষিত জনকে তার সঙ্গে পরিচয় করাবার উদ্দেশ্যে গত পাঁচ বছর ধরে ছাত্র অধ্যাপক শিবিরের আয়োজন হয়ে আসছে। সর্বোদয় প্রকাশন সমিতির উদ্যোগে ষষ্ঠ শিবির অনুষ্ঠিত হল গত ৬ই থেকে ৯ই নভেম্বর বলরামপুরের অভয় আশ্রম কেন্দ্রে।

বলরামপুর খড়্গপুর ষ্টেশন থেকে চার মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে গান্ধীজী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষার বিদ্যায়তন তো আছেই, তা ছাড়াও আশ্রমের উদ্যোগে অম্বর চরখা, গ্রামোদ্যোগী সাবান প্রভৃতি পল্লীশিল্পের অনুষ্ঠানও আছে। এখানে কস্তুরবা মহিলা শিক্ষাকেন্দ্রেও বহু মহিলা গ্রাম সেবার দীক্ষা নিচ্ছেন।

৬ই নভেম্বর হাওড়া ষ্টেশন থেকে সকালের নাগপুর প্যাসেঞ্জারে আমরা যাত্রা করলাম। আমাদের সংগে ছিলেন সুপরিচিত সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, অধ্যাপক সুধীরচন্দ্র লাহা, অধ্যাপক সুদিনকুমার ভট্টাচার্য, শ্রীমনকুমার সেন, সার্ভিস সিভিল ইণ্টার ন্যাশনালের দু জন জাপানী মহিলাকর্মী এবং কলেজের ছাত্র-ছাত্রী যুবকরা। হাওড়া ষ্টেশন থেকে প্রায় তিন ঘণ্টার পথ। যৌবনের উচ্ছ্বাস, অবিশ্রান্ত সংগীত-লহরীর উপর তরঙ্গিত হতে হতে আমরা গিয়ে পৌছলাম বেলা বারটা নাগাদ। ষ্টেশনে সর্বসেবাসংঘের যুব নেতা, সুলেখক শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বলরামপুর উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বয়স্কদের এবং ছাত্রীদের জীপে উঠিয়ে দিয়ে আর সংগের জিনিসপত্র-গুলিকে গাড়ীতে চাপিয়ে দিয়ে আমরা পদব্রজেই যাত্রা করলাম। ধানের ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে রাঙ্গামাটির পথ—তার উপর দিয়ে এগিয়ে চলল প্রায় একশত জনের এক বিরাট দল। উপরে স্বচ্ছ আকাশ, আর পাশে হিল্লোলিত শ্যামলিমা—দলের মধ্য থেকে কে যেন গেয়ে উঠল, 'এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।' সত্যই তো, চকিত হয়ে উঠল সকলে—আর সেই সুরের রেশ ধরেই পৌছে গেলাম আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে। পথে পড়ল বুনিয়াদী বিদ্যায়তনের কেন্দ্রটি। ১৯৫৫ সালে বাংলা দেশ পরিক্রমার সময় বিনোবাজী এখানে দুদিন অবস্থান করেছিলেন।

এই নঈ তালিম কেন্দ্র থেকে প্রায় এক মাইল দূরে অভয় আশ্রমের দ্বিতীয় কেন্দ্রটি অবস্থিত। সেখানেই শিবিরের ব্যবস্থা হয়েছে। চার দিকে জল বেষ্টনীর মধ্যে ছোট্ট একটি দ্বীপ যেমন বলা কওয়া নেই হঠাৎ মাথা উঁচিয়ে জেগে থাকে, তেমনি বিস্তৃত ধানক্ষেতের মধ্যখানে এই আশ্রমটি দাঁড়িয়ে আছে প্রকৃতির ছন্দকে একটুও ম্লান না করেই। সেখানে পৌছুতেই বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলির মহাধ্যক্ষ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী এবং অন্যান্য আশ্রমিক বন্ধুরা এগিয়ে এলেন সকলকে অভ্যর্থনা করতে।

আহার ও বিশ্রাম অন্তে সেইদিন বেলা সাড়ে তিনটের সময়

আনুষ্ঠানিকভাবে শিবিরের উদ্বোধন হল। ভূদান নেতা এবং উড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী শিবিরের উদ্বোধন করলেন। প্রারম্ভে শিবির আহ্বানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু বললাম। তারপর অভয় আশ্রমের নায়ক ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ বসু অভয় আশ্রমের পরিচয় দিলেন। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পূর্বে অভয় আশ্রমের প্রধান কেন্দ্র ছিল কুমিল্লাতে। খাদি উৎপাদন তখনকার দিনে প্রধান কর্ম থাকলেও এই আশ্রমকেই কেন্দ্র করে একদল ত্যাগী কর্মীর সৃষ্টি হয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের ত্যাগ ও নিষ্ঠা আজ সকলেই সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে। আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। নতুন ভারত গঠনের দায়িত্ব এসেছে সমগ্র দেশবাসীর উপর। দেশ কল্যাণের দায়িত্ব তো কেবল সরকার বা কয়েকটি দলের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। সেকাজ সকলেরই। খাদির কাজকে কেন্দ্র করে অভয় আশ্রমও আজ নতুন দেশ গঠনের কাজে ব্রতী হয়েছে।

উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও সর্বোদয়ের কর্মধারা সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা করলেন। তাঁর প্রত্যেকটি কথায় বুদ্ধিদীপ্ত মুক্তমনের পরিচয় পেয়ে সকলের মন আশার আনন্দে কানায় কানায় ভরে উঠল। তিনি বললেন, আজকের যুগ অণুবোমার যুগ। কিন্তু এতো ভয়ের নয়, এ-যে ভয় ভাঙ্গারই যুগ। যদি কেবল একটি রাষ্ট্রের হাতে অণুবোমার মত মারণাস্ত্র থাকত তবে তা মানুষের ভয়ের কারণ হত—কিন্তু এই অস্ত্র তো আজ কয়েকটি রাষ্ট্রের অধিগত হয়েছে। ফলে কেউ আর যুদ্ধ করতে ভরসা পায় না। এ তো আশার কথা। মানুষ যতই বুঝছে যে, যুদ্ধের উপর তার ভরসা নেই—ততই তার মন যুদ্ধ থেকে সরে যাবে। বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সাহিত্যের অনুশীলন প্রভৃতি সব কিছুই আজ সর্বমানব কল্যাণের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সর্বোদয়ের লক্ষ্যও তাই। ভারতবর্ষে সর্বোদয়ের নাম নিয়েই একাজ হচ্ছে—কিন্তু সর্বোদয়ের নাম না নিয়েও এবং ভিন্ন ভাবে হলেও একই লক্ষ্যের অভিমুখে পৃথিবীর সমস্ত দেশের চিন্তাশীল মানুষ এগিয়ে চলেছেন।

প্রথম বৈঠক শেষ হবার কিছু পরেই আশ্রমবাসীদের সংগে শিবিরাগতরা একত্র হলেন মুক্ত প্রাঙ্গণে। পশ্চিম আকাশকে লাল করে দিয়ে সূর্যি ঠাকুর তখন কোথায় ঘুম-ভাঙ্গানী গান শোনাতে চলে গিয়েছেন। আশ্রমের সন্ধ্যা। প্রার্থনার সময় এটা। উপনিষদ ও গীতার অংশ বিশেষের বাংলায় পদ্যানুবাদ আবৃত্তি হল। তারপর রবীন্দ্র সংগীত। সমাপ্ত হয়ে প্রার্থনা। শিবিরাগতরা ছড়িয়ে পড়লেন নানান দিকে ছোট ছোট দলে। এখন কোন কাজ নেই। আপন আপন খুশীর রসে ছোট ছোট দল উচ্ছল হয়ে উঠল। আমাদের প্রাত্যহিক জীবন থেকে একেবারেই ভিন্ন শিবিরের এই যৌথ জীবন। কিন্তু তা ছন্নছাড়া নয়। যেন ছন্দে গাঁথা কবিতা। ভোর সাড়ে চারটায় শয্যা ত্যাগ আর সাড়ে নয়টায় শয্যাগ্রহণ—এরই মধ্যে নানান কাজের কড়াকড়ি। প্রার্থনা দিয়ে শুরু আর নিবেদন অর্থাৎ নৃত্য, গীতাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা বিরতি।

পরদিন। প্রাতঃকালীন প্রার্থনার পর দেড় ঘণ্টা শরীর শ্রমে নির্ঘণ্ট। মাটির ঢিপি কেটে সমান করতে হবে, আর সেই মাটি সরিয়ে ফেলে আসতে হবে কিছু দূরের একটি সব্জীর ক্ষেতে। ঝোড়া কোদাল হাতে সকলে গিয়ে জমা হলেন ঢিপির কাছে। কিন্তু কাজ আরম্ভ করতে একটু দেরী হয়ে গেল। ঝোড়া কোদাল হাতে নিয়েই দাঁড়িয়ে আছেন—সকলেরই দৃষ্টি একদিকে একজনের উপর নিবদ্ধ। তিনি শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী। খালি গা, ছোট কাপড়কে আরও ছোট করে আঁট করে বাঁধা। মাথায় এক ঝুড়ি ভর্তি মাটি—সকলের আগে এসেছেন, সকলের আগে কাজ শুরু করে দিয়েছেন তিনি। এক এক করে ভারতবর্ষের তেরটি রাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীদের ছবি ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মাথা নত হল তাঁর পায়ের কাছে।

যথারীতি প্রাতরাশ ও স্নানাদির পর আলোচনা বৈঠক শুরু হল। আলোচনার সূত্রপাত করলেন শ্রীনারায়ণ চৌধুরী। সংস্কৃতির সন্ধিক্ষণের উপর একটি মনোজ্ঞ ভাষণে বর্তমান বাংলা সাহিত্যে যে সংকট দেখা দিয়েছে তার উপর নতুন আলোকপাত করলেন তিনি। সাহিত্যিকের সামনে যদি কোন আদর্শ না থাকে, কোন আশাবাদের আলোকবর্তিকা না থাকে—শুধু শিল্পের জন্য শিল্পসৃষ্টি বা শিল্পীর নিছক আত্মতৃপ্তিই যদি সাহিত্য রচনার একমাত্র প্রেরণা হয় তবে সাহিত্য সাধনা কেমন করে একাঙ্গী হয়ে যায়—তার কথাই সুন্দর করে বললেন তিনি। একটি একটি করে তিনি বাংলা সাহিত্য থেকে দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন—আর তারই সংগে দেখালেন পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের সাহিত্য দৃষ্টি। উত্থাপিত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরও তিনি দিলেন। তাঁর পরে গ্রামস্বাবলম্বন সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করলেন অধ্যাপক সুদিন কুমার ভট্টাচার্য। বর্তমান জাগতিক পরিস্থিতিতে গ্রামস্বাবলম্বনের অনিবার্যতা স্বীকার করেও তিনি কুটির-শিল্প ও যন্ত্রশিল্পের ব্যবসা এবং স্বাবলম্বনের ইউনিট সম্পর্কে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। এই আলোচনার ক্রম অনুসরণ করে শ্রীসুধীরচন্দ্র লাহা এবং শ্রীশৈলেশ-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রাম-স্বাবলম্বনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করলেন।

বেলা সাড়ে এগারটায় ভোজন, তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম, আবার আড়াইটেয় বৈঠক। কিন্তু বিশ্রামের জন্য অবসর থাকলেও অবকাশ কোথায়! সর্বসেবা সংঘের অধ্যক্ষ শ্রীধীরেন্দ্র মজুমদার ইতোমধ্যে এসে গিয়েছেন। শিবিরের মূল আকর্ষণ এবং হোতা তিনি। শিবিরে সমাগত সকলেই তাঁর কথা শুনবেন বলে আগ্রহান্বিত। আড়াইটের অনেক আগেই এক একজন আলোচককে কেন্দ্র করে ছোট ছোট দলে বৈঠক শুরু হয়ে গেল।

শিবির উপলক্ষে আশ্রমিকরা একটি ছোট প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। বুনিয়াদী শিক্ষার বিভিন্ন দিক, গ্রামীণ পরিবেশে শিক্ষার স্থান—প্রদর্শনীটি মূলত এইসব বিষয়েরই তথ্যমূলক প্রাচীরপত্রে ভর্তি ছিল। শ্রীধীরেন্দ্র মজুমদার এটির উদ্বোধন করার পর শিবিরের বৈকালিক বৈঠক শুরু হয়ে গেল। আনুষ্ঠানিক ভাবে ধীরেন্দ্রবাবু কোন ভাষণ

দিলেন না। সর্বোদয়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তিনি প্রশ্ন আহ্বান করলেন, আর একটি একটি করে সেগুলির উত্তর দিলেন। সর্বোদয় কি বিজ্ঞান-বিরোধী, ধর্মীয় আন্দোলনের সংগে সর্বোদয়ের প্রভেদ কোথায়, হিংসা মুক্তির পথ কী, শোষণের প্রকৃত অবসান কোন্ পথে হতে পারে, প্রতিভার স্ফুরণ কিসে হতে পারে—এই রকম নানান বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হল—আর তিনি অত্যন্ত সুন্দর করে প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তাঁর কথার মধ্যে বিজ্ঞানের দৃঢ়তা, চিন্তার স্বচ্ছতা এবং কর্মযজ্ঞের আন্তরিকতা সকলের মনকেই স্পর্শ করল—সকলের হৃদয়কেই আলোড়িত করল। তার পরে গান্ধী স্মারক নিধির প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীরঘুনাথ ধোত্রে শিক্ষিত সমাজের কাছে সর্বোদর কী আশা রাখে তার কথা বললেন।

শিবিরাগতরা নিজেরাও যাতে আলোচনা করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল পরদিন সকালের বৈঠকে। 'শিক্ষা ও সমাজ' এই ছিল আলোচনার বিষয়বস্তু। সমাগত অধ্যাপক ও ছাত্ররা শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেন। পরিশেষে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়-চৌধুরী সর্বোদয়ের দৃষ্টি সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিলেন। আজকের দিনে শিক্ষা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। মাতৃগর্ভ থেকে মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত মানুষের শিক্ষা, কাজ—আর তা সমাজের সংগে ওতোপ্রোত ভাবেই যুক্ত—গ্রামদান ও গ্রামস্বরাজের মধ্যে এই সমাজ-মূলক শিক্ষার যে সম্ভাবনা রয়েছে সেই কথাই তিনি বললেন। আলোচনা চক্রের পরে ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ বসু কুটীর শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করলেন। কুটীর শিল্পের প্রয়োজন কেন, সেকথা তো বললেনই—উপরন্ত ছাত্রদের মধ্যে আজ যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে সে সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বললেন যে, এর জন্য আমাদের মত বৃদ্ধের দলই দায়ী। স্বাধীনতা লাভের পর ত্যাগ আর সংগ্রামের পাসপোর্ট নিয়ে বৃদ্ধেরা যদি সকলেই ক্ষমতা লাভের দিকে না যেতেন—ক্ষমতা নিরপেক্ষভাবে তাঁরা যদি দেশগঠনের কাজে অগ্রসর হতেন, তবে ছাত্র-যুবকদের সামনে একটি আদর্শ তুলে ধরতে পারতেন। যৌবনকাল স্বভাবতই প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরা। তাকে গঠনমূলক কাজে—যে কাজে এডভেঞ্চার আছে—তাতে নিয়ে যেতে না পারলে—হয়-সে ধ্বংসাত্মক কাজে নিযুক্ত হবে নয়ত অনিয়ন্ত্রিত যৌবনের উচ্ছ্বাসে নিজেদের জীবনকেই বিশৃঙ্খল করে দেবে।

বিকালে আলোচনার কোন কর্মসূচী ছিল না। অভয় আশ্রমের বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি আমরা ঘুরে দেখলাম। নঈ তালিম আশ্রমের প্রাঙ্গণে একটি জনসভার আয়োজন হয়েছিল। তাতে ধীরেনবাবু ডাঃ কালিদাস নাগ বক্তৃতা করলেন। সান্ধ্য প্রার্থনার পর শিবির নেতারা ডাঃ নাগের সংগে মিলিত হলেন। তিনি সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসেছেন তার কথা বললেন। তিনি বললেন, ভৌতিক বিষয়ে পাশ্চাত্যের দেশগুলি যতই বড় হোক না কেন—সেখানেও আজ আধ্যাত্মিক ক্ষুধা দেখা দিয়েছে। তাই অন্যান্য দেশের চিন্তাশীল লোকেরা আজ বিশ্বমানবের কথা চিন্তা করছেন।

অতি উৎসাহী কেউ বোধহয় ঘড়ি ভুল দেখেছে। অন্ধকার তখন একটুও স্তিমিত হয়নি। ঘুম ভাঙ্গানী গান নয়—নির্মমভাবে বেজে উঠল অনভ্যস্ত হাতের ঘণ্টা। উঠে পড়লাম আমরা। না ভুলই হয়েছে—সাড়ে চারটের এখনও একঘণ্টা বাকি। শুয়ে পড়লাম আবার—ঘুম আসবে কি! আনন্দ কোলাহল শুরু হয়ে গিয়েছে—কোথাও গানের হল্লা—আর পাশেই কর্মযজ্ঞের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। আজ শিবিরের শেষ দিন। কী পেলাম, কী নিয়ে যাচ্ছি তার খতিয়ান করার সময় এখন নয়। মধুর পরিবেশই এখন সমস্ত মনকে ছেয়ে আছে। প্রাতঃ-কালীনঅধিবেশন বসল। উড়িষ্যার শ্রীমনোমোহন চৌধুরী এসে গিয়েছেন। বয়সে তিনি তরুণ কিন্তু অভিজ্ঞতায় প্রবীন। তাঁকেই আহ্বান করলাম। তত্ত্বের কথা নয়, প্রাণের কথাই বললেন তিনি। সর্বোদয় কেবল ত্যাগ করার মন্ত্র দেয়? সংসারের দিকে চেয়ে দেখুন তো একবার। ছেলের পরীক্ষা শুল্ক দিতে হবে, কিন্তু মায়ের কাপড়টাও ছিঁড়ে গিয়েছে, নতুন একটার যে বিশেষ প্রয়োজন। একই সংগে জুটো হবে তার সংস্থান নেই। থাক কাপড় এখন, ছেলের পরীক্ষার শুল্কই দিয়ে দিলেন মা আগে। একি ত্যাগ, না এ প্রাণের পরিচয়। সর্বোদয় সারা প্রাণে জীবনের সোনার কাঠি ছোঁয়াতে চায়।

এই সর্বোদয়ের, এই প্রাণের, এই স্বপ্নের কথাই শোনাতে হবে দেশের আবালবৃদ্ধ বনিতাকে—যাঁরা মনে মনে তরুণ, যাঁরা জড় নন। তাই শিবিরের শেষ অধিবেশনে ঘোষণা করা হল পশ্চিমবংগ সর্বোদয় যুব সম্মিলনী প্রতিষ্ঠার কথা। অধ্যাপক সুদিনকুমার ভট্টাচার্য এবং শ্রীভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এর আহ্বায়ক ও যুগ্ম-আহ্বায়ক হলেন; শিবিরের সমাপ্তি ভাষণে শ্রীধীরেন্দ্র মজুমদার ছাত্র-ছাত্রীদের আহ্বান করে বললেন যে, তাঁরা যেন সর্বোদয় ভাবধারা বুঝতে চেষ্টা করেন। নিজেদের ধীশক্তিকে নতুন নতুন বিচারধারায় ও অভিজ্ঞতায় পুষ্ট করুন, আর সংগে সংগে আপন আপন ক্ষেত্রেও শান্তিপথের অনুসরণ করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন।

এবার বিদায় নেবার পালা। কিন্তু এ যে কঠিন কাজ। চারদিনের নিবিড় পরিচয়ে 'যাই' বলা যায় না। তাই আশ্রমিক আর শিবিরাগত সকলের মন এস-এস-এসর সুরে ভরে গেল। বেরিয়ে পড়লাম আমরা সেই রাঙ্গামাটির পথে। হিজলী বন্দীশালার উঁচু গম্বুজটা তখন সূর্যালোকে ঝলমল করছে।

ক্লান্ত সুর

অমলেন্দু মিত্র

ছেলেদের নিয়ে একটা ড্রামা হবার কথা! আমি আর বিজনবাবু ডিরেক্‌শান্ দিচ্ছি। সেদিন রিহার্সেল দিতে দিতে হঠাৎ একটা জায়গায় খট্‌কা বেধে গেল। আমি একরকম দিলাম—বিজনবাবুর পছন্দ হোল না। বিজনবাবু এক রকম 'এক্সপ্রেশান' দিলেন, আমার পছন্দ হোল না। অথচ, দু'জনেই বুঝছি, মনের মত 'এক্সপ্রেশান' আস্‌ছে না কিছুতেই। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। ছেলেদের বিদায় করে দিলাম বিরক্ত হয়ে। বিজনবাবু বললেন, "এ জায়গাটা ঠিকমত 'এক্সপ্রেশান' দিতে পারেন, একমাত্র যতীনদা!"

"যতীনদা!" বিস্মিত হয়ে বললাম; অমন হাবাগোবা নিরীহ চেহারা—উনি 'এক্সপ্রেশান' দেবেন?"

বিজনবাবু হাসলেন: "তুমি নতুন এসেছো তাই জানো না, যতীনদার কী পার্টসই ছিল। ছিল কেন আছে! অথচ উনি সব ছেড়ে দিয়েছেন! প্রতিজ্ঞা করেছেন, জীবনে আর রিসাইটেশান্ বা ড্রামার ডিরেক্‌শানে থাকবেন না!"

"কেন বলুন তো?"

"সে এক কাহিনী—উপন্যাসই বলতে পারো! তবে সে কথা তোমার শোনবার ধৈর্য এখন হয়ত থাকবে না। বেলা তো শেষ হ'ল, ছেলেদের পিছনে খাটতে খাটতে!"

"যাক্ আপনার বেলা, দুর্যোগের ঘন রাত্রি নেমে আসুক, তবু শুনব যতীনদার কাহিনী। চলুন রেষ্টুরেণ্টে। যত কাপ চা খেতে পারবেন, খাওয়াবো। গল্প আমার শোনা চাই-ই।"

বিজনদা সম্মত হলেন। দু'জনে এসে ঢুকলাম রেষ্টুরেণ্টে। তারপর একটা কর্ণার বেছে নিয়ে বসা গেল আরামে। বললাম, "বৌদিকে তো বাপের বাড়ী ঠেলেছেন—বাড়ী ফিরবার তাড়া নেই, সুতরাং ঘড়ির দিকে না তাকিয়ে গল্প বলবেন কিন্তু!"

বিজনদা হাসলেন, "তুমি তো বেশ হে ছোকরা! গল্পে যদি রোমান্স না থাকে।"

টেবিল চাপড়ে বললাম; "রোমান্স থাকতে বাধ্য। জীবনকে অস্বীকার করে মানুষে, রোমান্সের ছোঁয়া রূঢ় হাতে ভেঙ্গে গেলে—নৈলে এমন কোন ঘটনা ঘটা সম্ভব নয়, যার দ্বারা মানুষে অমন প্রতিজ্ঞা করে বসতে পারে।"

"বটে! তুমি ভুলে যাচ্ছ নন্তু, যতীনদা একজন মাষ্টার এবং ছেলেদের স্কুলের ভিতর কোন রোমান্সই ঘটতে পারে না। এ একেবারে ড্রাই ঘটনা।"

জবাব দিলাম; "বিজনদা! আপনার মত অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে হবে না আশা করি। রোগের সংক্রমণ বলে বস্তুটা জানেন? "ক্যারিয়ার" সংক্রমণ নিয়ে আসে, নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যের পাতায় দেখেছেন। তেমনি ছেলেদের মধ্যে কতজন যে রোমান্সের ক্যারিয়ার হয়ে আছে, তা একদিন আপনাকে শোনাবো। তুচ্ছ একটা উদাহরণ দিয়ে পরিষ্কার করছি কথাটি। কলেজে পড়ার সময় একদিন এক উৎসব মেলায় হাজির ছিলাম বন্ধুর সঙ্গে। সে রকম অমানুষিক ভীড় সচরাচর দেখা যায় না। গরমে পচে মরে যাচ্ছি—হাঁফ ধরে গেছে। অথচ রসিক বন্ধু অবলীলায় রোমান্স খুঁজে বের করে পুলকিত হল। বললে, "দেখ ভাই নন্তু, দেখ কত লোক! বল দেখি, কত যুগলের মধুস্মৃতি বহন করছে এরা?" বন্ধুর রসজ্ঞান দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আশা করি বিজনদা আপনি বুদ্ধিমান লোক, আমার বক্তব্য বুঝতে পারছেন।"

সামনের ডিসের খাবার এক হাতে তুলে নিয়ে অন্য হাতে আমার পিঠ চাপড়ে বললেন বিজনদা; "সাবাস ছোকরা, অনেক জ্ঞান অর্জন করেছো। তাহলে তোমাকে গল্প বলা যেতে পারে। হ্যাঁ যতীনবাবুর রোমান্স ভঙ্গের কাহিনীই তোমাকে শোনাবো—"

....“যতীনদার আজকের চেহারা দেখে ওঁর সম্পর্কে কিছুই বোঝা যায় না, কিন্তু সত্যিই উনি একজন বড় এক্টর ছিলেন। স্কুল কলেজ জীবনে ড্রামা বা সোসিয়েলে নাম কিনেছিলেন খুবই। ইচ্ছাও ছিল অভিনয় লাইনে চলে যাবেন। অমন প্রাণবন্ত অভিনয় বড় বড় অভিনেতা ছাড়া এ্যামেচারদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। সিরিয়স চরিত্রে বা ভিলেনের চরিত্রে, ওঁর অভিনয় মনে দাগ রাখার মত। একবার দেখলে জীবনে ভোলা যেত না। অজস্র লোকের প্রশংসা কুড়িয়েছেন, পেয়েছেন কত মালপত্র, মেডেল। তুমি জানো নন্তু, যারা এ সমস্ত সোসিয়েলের ব্যাপারে থাকে, তারা ক্রমেই পপুলার হয়ে ওঠে। যতীনদাও তাই হয়েছিলেন। কলেজ-বন্ধুরা ‘যতীন’ বলতে পাগল। মেয়েরা যতীনদার সঙ্গে দাঁড়িয়ে একটু কথা বলবার সুযোগ পেলে নিজেদের ধন্য মনে করত। যতীনদা আবার ছিলেন ওদিকে বড় দুর্বল! কেন জানিনে, আজও এ বয়সে কোন মেয়ের মুখের পানে তাকিয়ে যতীনবাবু কথা বলতে পারেন না। অথচ মেয়েদের প্রসঙ্গে তাঁর যেমন রুচি, তা বোধ হয় ষ্টাফের মধ্যে কারও নেই....”

মনে পড়ল, যতীনবাবু স্ত্রী প্রসঙ্গে নানা রকম কুৎসিত আলোচনা স্বচ্ছন্দে করে থাকেন। মেয়েদের ছবি, পত্র-পত্রিকায় দেখলে অনিমিষে চেয়ে চেয়ে দেখেন, তারপর অশ্রাব্য মন্তব্য প্রকাশ করে হাসির তুফান ছুটিয়ে দেন।

বিজনবাবু চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন; “এইটিই কাল হ’ল যতীনদার! অবশ্য কলেজ ইনুভারসিটির লাইফে মেয়েদের সাহচর্যে এসে স্বামীজি সেজে বসে কেউই থাকে না। অল্প-বিস্তর প্রেমে পড়ার চেষ্টা সবাই করে। খোসা-মুদি করে, চা খাওয়ায়, সুযোগমত রেষ্টুরেণ্টে টেনে নিয়ে গিয়ে; সিনেমা থিয়েটারে সঙ্গিনী করতে পারলে তো কথাই নেই। যতীনদার মত উঁচু দরের অভিনেতা যে কারও আত্মদানকে বরণ করে নেবেন, এতে আর আশ্চর্যের কি আছে।”

“দেখুন”...মিনমিনে গলা শুনে যতীনদা সেদিন ফিরে দাঁড়ালেন একটা মিটিং-এর পর। একটি মেয়ে, তাঁরই ক্লাসের, ভারী শান্ত, মিষ্টি স্বভাবের। সুমিতা, নিতান্ত অসহায়ভাবে হাত কচলাচ্ছে। অথচ কিছু বলতে পারছে না। যতীনদা, সুমিতাকে দেখেছেন অনেকদিন ধরে। আলাপ করবার জন্য মনে মনে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। অথচ ও এমন একটি অপরিচয়ের বর্ম দিয়ে নিজকে আবৃত করে রেখেছে যে কাছে ভিড়বার উপায় ছিল না। কোন-দিন ভুল করেও যতীনদাকে অভিনয়-নৈপুণ্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে আসেনি। একেবারে মা-টাইপের মেয়ে। বিবাহপূর্ব-প্রেমে হাবুডুবু খাবার জাত ও নয়। তাই যতীনদা, নিজের নিরুদ্ধ উচ্ছ্বাস নিয়ে নিজেই দগ্ধে মরেছেন। অথচ এই মেয়েটিই তাঁকে আজ কি বলতে চায়? আশ্চর্য নয় কি? যতীনদা একটু থতমত খেয়ে-ছিলেন প্রথমটায়, তারপর তাড়াতাড়ি সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন; “কিছু বলছিলেন?”

সুমিতা বলল, “একটু পৌঁছে দিন না বাড়ীতে। একলা যেতে পারব না গলিপথে।”

এত ছেলে থাকতে তাঁকে কেন বেছে নিল সুমিতা, তা বুঝতে না পারলেও যতীনদা আর দেরী করলেন না। সুমিতার সঙ্গে হাঁটতে সুরু করলেন। তখন স্ত্রীলোকের উপর অস্বাভাবিক দুর্বলতা ছিল না যতীনদায়। তরুণ বয়স তো! দুর্বার মন। তাই চট করে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, “আচ্ছা এত ছেলে থাকতে হঠাৎ আমার উপর এত আস্থা হ’ল কি করে আপনার?”

সুমিতা পিছন ফিরে দেখে নিলে একবার। পথটা সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে। বিশেষ কেউ নেই। সে হেসে উঠল মধুরভাবে খিল খিল করে; “কেন জানেন? ক্লাসের সবাই আপনার সঙ্গে আলাপ করে কিন্তু আমার কেমন যেন লজ্জা লাগে। অথচ আপনার সঙ্গে আলাপ করবার আগ্রহ কি আমার কম!”

যতীনদা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বলে কি মেয়েটা। নিস্পৃহ, নিরুত্তাপ আচার আচরণ দেখে ঘুণাক্ষরেও কোনদিন টের পায়নি যে ওর অন্তরের নিভৃতে যতীনদার সঙ্গে পরিচিত হবার বাসনা অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে। কিছু একটা জবাব দেবার আগে সুমিতা আবার হেসে উঠল; “অথচ দেখুন, ভীড়ের মধ্যে আপনার মত প্রতিভার সঙ্গে আলাপ করব ভাবতে পর্যন্ত পারিনে!”

যতীনদা এতক্ষণে লাগসৈ কথা একটা খুঁজে পেয়েছেন। বলে উঠলেন; “অনেক মেয়েই আলাপ করেছে গায়ে পড়ে, তাদের কারও প্রতি আগ্রহ নেই আমার। আপনি

আলাপ করেন না, অগ্রাহ্যের ভাব দেখিয়ে যান নির্বিকারে আর ততই যেন ব্যাকুল হয়ে উঠে—যেভাবে হোক আলাপ করতেই হবে। প্রাণ যায় সে-ও স্বীকার। আজ সে দুর্ভাবনার অবসান হোল—আপনার দয়া আছে।”

সুমিতা লজ্জিত হল না এতটুকুও। বললে, “এ আপনার মুখেই মানায়: ষ্টেজের লোক তো!”

যতীনদা ক্ষিপ্র হয়ে উঠলেন; “বিশ্বাস করুন সুমিতা দেবী, আমি অভিনয় করছিনা—আপনার বন্ধুত্ব আমার একান্ত কাম্য!”

“তবে ‘আপনি-আজ্ঞে’ ত্যাগ করুন!”

“আপনাকেও ত্যাগ করতে হবে।”

“আপত্তি নেই” সুমিতা আর একবার হাসি ছিটিয়ে বললে; “এত মেয়ের সঙ্গে মিশেছো, কারও সঙ্গে প্রেমে পড়তে পারো নি বুঝি?”

মিতভাষী ধীর, শান্ত মেয়ে সুমিতার প্রগল্‌ভতা দেখে যতীনদা বিস্মিত হলেন খুবই, তবু উত্তর বেরুলো ঠিক ঠিক। বললেন, “যদি পড়ি তাহলে তুমিই হবে আমার প্রথমা।”

সুমিতা এতটুকু বিচলিত হল না। যেন জানতই এ-কথা যতীনদা বলবেন। সহজ কণ্ঠে জবাব দিলে, “জানো তো আমরা ব্রাহ্মণ। খুব কি সুবিধা হবে?”

ষ্টেজ-ফ্রী যতীনদার জবাব দিতে বেগ পেতে হল না। বললেন, “ভালবাসা জাতি মেনে চলে না। তোমার জন্য প্রয়োজন হলে আজীবন তপস্যা করব।”

“ও!”···অপাঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা ভঙ্গিমা করল সুমিতা, “আচ্ছা এইবার এখান থেকে তোমাকে অভদ্রের মত বিদায় দিচ্ছি—আমার বাড়ীতে বাবা-মা সবাই ভীষণ গোঁড়া—কি ভেবে বসবেন বলা যায় না। কিছু মনে কোর না যেন, তাহলে ভারী দুঃখ পাবো!”

গ্যাসের আলোয় নজরে পড়ল যতীনদার, সুমিতা ওর রুমালখানা মুখের উপর বুলিয়ে নিচ্ছে। নিমেষে দুষ্টুবুদ্ধি খেলে যায় যতীনদার মাথায়! সুমিতা রুমালখানা নামিয়ে নিতেই যতীনদা, আচমকা সেটা ছিনিয়ে নিলেন; “বেশ, প্রথম আলাপের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ, এটা জোর করেই নিচ্ছি।”

সুমিতা ব্যাকুল হয়ে উঠল, “ছিঃ···ছিঃ···ছিঃ, কি করো! ওটা ভারী নোংরা হয়ে আছে! দাও, তোমাকে কাল ভাল রুমাল দেবো।”

যতীনদা তখন সেটা পকেটস্থ করে ফেলেছেন, “দিতে চাও দিও, আপত্তি করব না; কিন্তু এটা কিছুতেই ফেরত পাবে না, বুঝলে?”

হাসতে হাসতে যতীনদা ভারী উল্লসিত হয়ে হোষ্টেলে ফিরে এলেন। সুমিতাও তার মনের গভীরে সুতীব্র আনন্দের ঢেউ নিয়ে বাড়ী ফিরল সেদিন।

সামান্য অপরিচয়ের বাধাটুকু ছিল মাত্র। তারপর বুঝতেই পারছ নন্ত, ওরা দুজন ভেসে গেল মনের আবেগে। জানাজানি হতে বাকী রইল না। সবাই টের পেল। সুমিতার বাপ-মা কড়া হাতে রাশ টানলেন। কিন্তু যখন রাশ টানা হয়েছে তার অনেক আগেই যতীনদা কড়া হাতে চাবুক কষিয়েছেন। সুমিতার গর্ভে তাঁর সন্তান তিলে তিলে বিকশিত হয়ে উঠছে। তবু কোন ফল হ'ল না। অসামাজিক বিয়ের চেয়ে বোধ হয় মেয়ের এই দশাই, বেশী কাম্য বলে মনে করেছিলেন ওর অভিভাবকেরা! তাঁরা খুঁজে পেতে যে ভাবে হোক, একজন উদার সমাজ-হিতৈষীকে ধরে এনে সুমিতার সঙ্গে মহাসমারোহে বিয়ে দিয়ে দিলেন। উদার যুবক সমস্ত জেনে শুনেই সুমিতাকে বিয়ে করে নিয়ে গেল। যতীনদা বহু মেলোড্রামা ঘটিয়েছেন, কিন্তু জীবনের প্রকৃত রঙ্গমঞ্চের আলো আর রঙের জৌলুষে ক্ষণিকের উচ্ছ্বাসকে দর্শকরা বরদাস্ত করে; কিন্তু আসল জীবনের কঠিনতম নিষ্ঠুর সত্যকে কেউ সহ্য করতে রাজী নয়। সুতরাং অবহেলিত, অবজ্ঞাত জীবন-নাটক যখন মঞ্চ বিফল বলে প্রমাণিত হল, যতীনদা পালালেন কোলকাতা থেকে। নিজকে নির্বাসিত করলেন কাপুরুষের মত, জনসমাজ ও রঙ্গপট থেকে।”

···“ছেলেরা কয়দিন তাঁর খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করলে, তারপর সেই পুরানো দুনিয়া সেই পুরানো গতানুগতিক চালেই বইতে লাগল। কে কার খোঁজ রাখে? যে যায়, তার জন্য বসে থাকা মিছে। একটি তারকা খসে পড়ে তো নতুন তারকার জন্ম হয় আবার। যতীনদা, যে মনে মনে অভিমান করেন নি তা নয়! ভেবেছিলেন, তাঁর অভাবে কলেজ বুঝি অচল হয়ে গেছে। বন্ধু, বান্ধব, বান্ধবীরা সবাই বুঝি ব্যাকুল হয়ে উঠবে। কিন্তু যখন টের পেলেন, কেউ তাঁর জন্য মাথা ঘামায় না, কলেজে সোসিয়েল, থিয়েটার কিছুই আটকে নেই তাঁর জন্যে, মন

ভেঙ্গে গেল যতীনদার। ফিরলেন না কোলকাতা। ভাবলেন পড়াশুনো ছেড়ে দেবেন।"

..."বছর দুই বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়ালেন, দেশে বিদেশে। বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজন, কেউ কোথাও তো ছিল না তাঁর—সুতরাং ধরে বেঁধে রাখবে কে? কে-ই বা পরিচালনা করবে। যাই হোক, কোলকাতা থেকে অনেক দূরে, এক মফঃস্বলে এসে যতীনদা হাজির হলেন মাসীর বাড়ী। মাসীও একা পড়ে গেছেন। তাঁর ছেলে-মেয়ে স্বামী সব মারা গেছেন। যতীনদাকে তিনি ফিরতে দিলেন না। জমির চাল, পুকুরের মাছের মাথা, আর প্রজাদের দুধ ঘি খাইয়ে শরীর এবং মন দুটোকেই চাঙ্গা করে তুললেন, কিছুদিনের মধ্যেই। যতীনদা এতদিনে টের পেলেন, সংসারটা পাগলামির জায়গা নয়। সন্ন্যাসী যদি নিতান্তই না হওয়া যায়, তাহলে মনুষ্য সমাজে, ভদ্রভাবে বাস করতে গেলে, অন্ততপক্ষে একটা ডিগ্রী এবং ছোট হলেও কোন রকম চাকরী চাই। চোখ মেলে নজরে পড়ল, সবাই তাই করছে। একটা মেয়ের জন্যে সংসার ত্যাগ করার মত মূর্খামি আর কিসে আছে!"

..."নিছক উন্মাদনা বা 'ইনস্যানিটির' মধ্যে মিছিমিছি দুটো বছর জলে গেল যতীনদার। মন থেকে সব কিছু ঝেড়ে মুছে ফেলে ঐ অঞ্চলেরই কাছাকাছি একটা কলেজে আবার গিয়ে ভর্তি হলেন।

গরমের ছুটির আগে কলেজে সোসিয়েল হবে। সেই পুরানো আনন্দ আর স্ফূর্তি নিয়ে হৈ হৈ করে ভীড় জমালেন যতীনদা। মনের গ্লানিটুকু কোন সময় শরতের মেঘের মত হালকা হয়ে দিগন্তের বাইরে চলে গেল, তা টেরই পেল না। পুরোদমে ড্রামার রিহার্সেল চলতে লাগল।"...

বিজনদার চা ফুরিয়ে গেছে দেখলাম। সুতরাং ফের আনিয়ে নিলাম এককাপ। বিজনদা ভারী খুশি হয়ে বললেন, "আমার ষ্টকে এমনি গল্প অনেক আছে, শুনবে প্রত্যেক দিন?"

"শুনব! আলবৎ শুনব। এখন আপনি দয়া করে যতীনদার কাহিনীটি শেষ করুন"—কাপে চা ঢেলে এগিয়ে দিলাম।

বিজনদা একটি সিগারেট ধরিয়ে বার কতক টান দিয়ে বললেন, "জানো নন্তু, কোন ছেলে যখন একবার প্রেমে পড়ে, তখন ভাবে 'আমার মত প্রেমিক পৃথিবীতে আর নেই। যাকে চেয়েছি, তাকে যদি না পাই, জীবন রাখব না। দুশ্চর তপস্যায় কাটিয়ে দেবো, বিরহের হোমানল জ্বেলে। অথচ সেই মূর্খ-ই দ্বিতীয়বার প্রেমে পড়ে আবার নিঃসংশয়ে ভেবে বসে; "অহো! আমার মত প্রেমিক দুনিয়ায় আছে কে?" যতীনদারও ঠিক তাই হল। বাপ-মা নেই, সংসারের বন্ধন নেই—বেপরোয়া জমাট সোসিয়েলের হোতা যতীনদা, কি আর একলা থাকতে পারেন! প্রেমিকা এবার বাড়ী বয়ে হাজির হলেন। কলেজে অবশ্য পড়েছে কিছুকাল। আই-এ পাশ। যতীনদার পাড়ারই মেয়ে। মাসীর কাছে আসত রান্না শিখতে। মাসী নাকি রকমারী রান্না জানেন। সেগুলো শিখতে পারলে পাত্রের বাজারে তৃপ্তির দাম বেড়ে যাবে অনেকখানি। বুঝতেই পারছ, যতীনদা ওর রান্না খেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। জানো ব্রাদার, বাঙ্গালীর ছেলেরা বড় দুর্বল। মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হলেই প্রেমে পড়ে, আর প্রেমে পড়লেই বিয়ে করতে চায়। সে বিয়ে যদি না হয়, তাতে নাকি জীবন ব্যর্থ হয়ে যায় তাদের।"

আমি বাধা দিলাম, "শুধু ছেলেদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিলেন যে বিজনদা! মেয়েরা কি একেবারে নির্দোষ! তারা প্রশ্রয় না দিলে সাধ্য কি, ছেলেরা কাছে এগোয়!"

"সে কথাও বলছি ভায়া, ব্যস্ত হয়ো না—আমাদের মেয়ের মত ন্যাকা মেয়ে পৃথিবীতে খুব কমই আছে। তারা অনাত্মীয় ছেলের সঙ্গে আলাপ করবার সময়, দেহ ও মন সম্পর্কে এত সচেতন হয়ে ওঠে যে ওদের প্রেমে না পড়লে কাল্পনিক বেদনাবোধে বুক যেন ভেঙ্গে যায়। এই জন্যই বাঙ্গালী ছেলে-মেয়েদের আলাপ করাটা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত আইন করে।"

"অতি সুন্দর প্রস্তাব বিজনদা! আপনি যখন ল' মিনিষ্টার হবেন, তখন অবশ্যই এই আইন চালু করবেন দেশে, এখন যতীনদার কাহিনীটি চলুক"—

..."আই-এ পাশ তৃপ্তি রায়ও যতীনদার স্বজাতি ছিল না দুর্ভাগ্যক্রমে, তবুও স্বগোত্রীয় করে নেবার জন্য যতীনদা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন।"

এ ব্যাপারে মহীয়সী মাসীর পূর্ণ সমর্থন ছিল। মা-মরা যতীনদার প্রতি অতিরিক্ত স্নেহবশতঃ আই-এ পাশ তৃপ্তি রায়ের হৃদয়াবেগে ইন্ধন জুগিয়ে গেলেন শেষ পর্যন্ত, যতক্ষণ না মেয়েটি যতীনদার জন্য পাগল হয়ে উঠল। কিন্তু তারা পাগল হলেও বাইরের লোকের মাথা ঠিকই ছিল। স্থূল মস্তিষ্ক এবং চক্ষুকর্ণের সাহায্যে তারা ব্যাপারটির সরল নির্গলিতার্থ বের করে রটাতে লাগল বাইরে। তৃপ্তি রায়ের অভিভাবককুল মেয়ের রাশ টেনে ধরলেন। কিন্তু বাইরের রাশ টানবার চেষ্টা করলেও মনের রাশ টানা গেল না। একজনকে ধরল ইনস্যানিটি, অপরকে হিষ্টিরিয়া। যতীনদা বললেন, তৃপ্তি রায়কে না পেলে আত্মঘাতী হবেন। তৃপ্তি রায় বললে, কেরোসিন ঢেলে পুড়ে মরবেই, যদি তার ইচ্ছায় বাধা পড়ে।

দু'জনকে অবোধ শিশু ভেবে মাসী যে খেলার আসর পাততে চেয়েছিলেন, তা এ ভাবে ভেঙ্গে যাবে জানলে, কবে বিদায় করতেন তৃপ্তিকে। বেচারী মাসী নিরুপায় হয়ে ছোটাছুটি করতে লাগলেন। যতীনদা কলেজ যাননা। প্রত্যেকদিন এক একটা উপসর্গ দেখা দেয়। কোনদিন সকাল থেকে অজ্ঞান, কোন দিন পাঁচবার আত্মহত্যার ব্যর্থ প্রচেষ্টা, কোন দিন না খাওয়া, না স্নান অবস্থায় নগ্নগাত্রে, নগ্নপদে পথে পথে পরিক্রমা। তৃপ্তি রায়ও পাল্লা দিয়ে জীবন রঙ্গমঞ্চে যতীনদার বিপরীত চরিত্রে উপযুক্ত পার্ট করে যেতে লাগল। এ সমস্তর বিশদ বিবরণ শুনে কোন লাভ নেই নন্তু—পদাবলী সাহিত্যেই সব পাবে—তবে পার্থক্য এইটুকু যে পদাবলীর নায়িকার লৌকিক বিবাহের প্রয়োজন হয়নি—চায়ওনি কেউ। এরা বিবাহের মাধ্যমে চেয়েছিল দু'জনকে। শেষটায় অনেক হাঙ্গাম হুজ্জুত পুহিয়ে যতীনদা তৃপ্তি রায়কে পেয়েছিলেন। এতবড় ঘটনাটার পর ওঁদের হঁস হল, মাসীর আশ্রয়ে আর থাকা চলে না। লোক-লজ্জা বলে বস্তু আছে একটা। প্লেটোনিক লভের মহিমা লোকে বোঝে না, উল্টে বেহায়ার মত অঙ্গুলি নির্দেশ করে হাসে। চটপট বি-এ পরীক্ষাটা দিয়ে যতীনদা সস্ত্রীক পালিয়ে গেলেন। পরীক্ষার ফল বেরুনোর পর এই চাকরী নিয়ে স্বস্তি পেলেন খানিকটা।···

···নন্তু, তুমি আধুনিক উপন্যাস—গল্প প্রচুর পড়েছো, সিনেমাও দেখেছো নিশ্চয়ই। অনেক নাটকীয় পরিস্থিতি জীবনে ঘটে যা আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় বাস্তবে অসম্ভব—অনেকটা সেই রকম ঘটনাই ঘটল যতীনদার জীবনে; নৈলে এ গল্প তোমাকে বলতে বসব কেন আজ!···

···মাস্টারী নিয়ে তো যতীনদা মনের সুখে খুব সংসার করতে লাগলেন। সুমিতা বলে কোন মেয়ের সঙ্গে কোন দিন তাঁর আলাপ হয়েছিল, বা তাকে পাবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলো তা স্বপ্নের মত আবছা হয়ে এসেছে। তৃপ্তিকে স্ত্রীরূপে পেয়েই তিনি চূড়ান্তরূপে পরিতৃপ্ত। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ছেলেদের এই-ই হয়ে থাকে। ভাববার সময় কোথায় বল? সকালে টিউশানী, সন্ধ্যায় টিউশানী, দুপুরে স্কুল। অবশিষ্ট সময়টুকু শ্রীমতী তৃপ্তির কলগুঞ্জন শুনেই কেটে যায়। সুমিতার ঠাঁই কোথায় সে আসরে?

যদি বা তার সম্ভাবনা ছিল, কয়েক বছরের মধ্যে চার পাঁচটি ছেলে-পিলে জন্মিয়ে যতীনদাকে ঘোর সংসারী করে তুললে। অবশ্য ড্রামার রিহার্সেল বা রিসাইটেশানে তাঁর উৎসাহ তেমনিই ছিল। তুচ্ছ কোন উপলক্ষ ঘটলেই যতীনদা নিজে থেকে ছেলে বাছাই করে রিহার্সেল দিতে উঠে পড়ে লাগতেন। বলতেন, ড্রামাই তাঁর জাবন!"···

···বছরের প্রথমে সেবার নতুন ছেলে ভর্তি হয়েছে একদল। যতীনদা ষ্টাফ্‌রুমে অবসরের ঘণ্টায় বসে আছেন। সহসা একটি ছেলে এসে দাঁড়াল সামনে। ওকে আগে কখনও দেখেননি যতীনদা। কিন্তু দেখেই চম্‌কে উঠলেন। কিশোর বয়সের যতীনদা যেন নিজেকেই দেখছেন। কিছু বলবার আগে যতীনদার হাতে ছেলেটি একটি চিঠি দিল। ব্যগ্র হয়ে খুলে দেখলেন, মাত্র দুটি লাইন লেখা—আপনি আছেন বলেই রথীনকে ভর্তি করলুম! নজরে রাখবেন—ইতি সুমিতা।

নিঃসঙ্গের মত যতীনদার সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মন কেঁপে উঠেছিল থর থর করে। সেই সুমিতা! বিদ্যুৎ-চমকের মত পশ্চাৎপট উদ্ভাসিত হয়ে ছায়া মিছিল পার হতে থাকে সব ঘটনার। সেই প্রথম দিনের আলাপ—তারপর বন্ধুত্ব কি ভাবে একটু একটু করে বেড়ে চলল···শেষ সেই দুর্যোগের দিন!···রথীন?···ওর অস্তিত্বের মধ্যে নিজে বেঁচে উঠতে চেয়েছিলো!

রথীন তার পায়ের ধুলো নিলে মাথায়। যতীনদার

ইচ্ছা করছিল, বুকে জড়িয়ে ধরেন ছেলেটিকে। কিন্তু স্বভাবতই তিনি একটু সংযত হয়েছেন আজকাল। তাই মনের আবেগ বা উচ্ছ্বাস কিছুই প্রকাশ করলেন না। মাথায় একটু হাত ছুঁইয়ে বললেন, 'যখন যা দরকার হবে, আমাকে বোল, বুঝলে ?'

ছেলেটিকে বিদায় করতে পারলে বাঁচেন যেন। একটু একলা থাকতে চান যতীনদা। সুমিতা এসেছে। আবার এসেছে সে এত কাছে যে একদিন নাগাল থেকে ফস্‌কে গিয়েছিল। নিজকে মনে মনে ভাবতে লাগলেন, সেই যুবক বয়সে যেন কলেজে পড়ছেন। নিত্য-নতুন ভাবে সুমিতার সঙ্গে মিলনের ছল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ভাল লাগার বিচিত্রতর উপায় বের করে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছেন। আর সুমিতা ? যতীনদাকে খুশি করবার জন্যই দিনের দিন, সাজ পোষাক বদলে এসেছে। কলেজ পালিয়ে সিনেমা নয় পার্ক !···ছায়া ছবির প্রবাহ ধারায় মনের তরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠল! তৃপ্তির বাহু বন্ধনে বাঁধা পড়ে কী একটা অসার ভাব-বিলাসে মগ্ন হয়ে রইলেন এতদিন, তার জন্য ধিক্কার জাগতে লাগল বারবার। সুমিতাকে হারিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, জীবনে আর বিয়েই করবেন না। কিন্তু সবই করতে হল !···সুমিতার কাছে দেখানোর মত মুখ তাঁর আর নেই।···

···"জানো নন্তু, যতীনদা যে টানাপোড়েনের মধ্যে পড়লেন তার কোন মীমাংসা নেই ; সমাধান নেই সে সমস্যার। সুমিতার সঙ্গে দেখাও হল। কিন্তু মন খুলে কথা বলবার উপায় নেই। সুমিতা সাবধানী হয়ে গেছে। স্বামী মারা যাবার পর চেহারায় বেশে বাসে যতদূর সম্ভব দৈন্য টেনে এনে নিজেকে বুড়িয়ে দিতে চেয়েছে। যতীনদা নিজে যে একজন ইস্কুল শিক্ষক, সে-কথা ভুলে গিয়ে ওদিকটায় ইঙ্গিত করবার চেষ্টাও করে-ছিলেন কিন্তু সুমিতা আমল তো দেয়নি বরং কঠোর নির্দেশ জারী করে দিয়েছে ; 'রথানকে মানুষ করে তোল যতীনদা—তাহলেই বুঝব তোমার প্রকৃত টান আছে। আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নয়! দেখা করার চেষ্টাও চলবে না।"

যতীনদা বহু মেহনত করে নিজেকে সামলেছেন আবার। যে তীর শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে, তাকে ফেরান যায়না। এর উপর ছেলে বড় হয়েছে। তার সামনে উদ্ধত যৌবন আপনা-আপনিই মাথা নীচু করে।"

···নিষেধের তর্জনী সঙ্কেতে সুমিতার সঙ্গে লৌকিক দেখা সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ হয়ে গেল কিন্তু অন্তরের অলৌকিক রসের উৎস মুখ বন্ধ হল না। যত আবেগ, যত উচ্ছ্বাস, যত ফেনিলতা সবই আবর্তিত হতে লাগল রথানকে কেন্দ্র করে।

বেচারী তৃপ্তিও হয়ত স্বামীর পরিবর্তন লক্ষ্য করে আঁচ পেয়েছিল ব্যাপারটার। প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করবার জন্য স্নায়ুযুদ্ধে তাকেও নামতে হল! যতীনদা টের পাননি, 'ইনটেলেকচুয়ালি' শ্রীমতী তৃপ্তি তাঁর মন থেকে সুমিতাকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। আগেই বলেছি তোমাকে নন্তু, যতীনদা দুর্বল প্রকৃতির মানুষ। সময় সময় তিনি নিজেই বুঝতে পারতেন না, সুমিতাকে সত্যিই ভালবেসেছিলেন কিনা ? তৃপ্তির মত এত গভীরভাবে মনকে নাড়া দিতে সুমিতা কোনদিন পেরেছিল কিনা ?

যখন বাড়ীতে থাকেন, ততক্ষণ সুস্থ থাকেন বেশ। তৃপ্তিকে নিয়ে। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। কিন্তু স্কুলে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে একটা প্রদাহ দেখা দেয়। কেমন অশান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেনিয়ে ওঠে বুকের মধ্যে। রথীনের ক্লাসে গিয়ে ওর পানে তাকিয়ে তাকিয়ে পলক পড়ে না—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওকে পড়া জিজ্ঞাসা করেন, ছলছুতোয় কাছে ডাকেন পিঠ চাপড়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। মনটা আবার ছলছল করে ওঠে। কিশোরী সুমিতা আর যতীনদার বাসনা-কামনার মূর্ত রূপ। আজ-কালের স্রোতে সেসব ধুয়ে মুছে গেছে !

স্কুলে সহজ হতে পারেন না। শান্তি পান না। থেকে থেকে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন। ভাবেন, এই বুঝি বা রথান নিয়ে এল এক টুকরা কাগজ সুমিতার কাছ থেকে। কিন্তু নিষ্ঠুরা সুমিতা এটুকু প্রশ্রয় দিয়ে ছেলের কাছে নিজকে খেলো করতে রাজী নয়। বারবার মনের আশা ব্যর্থ হয়েছে। যতীনদা স্ত্রীর মধ্যে সুমিতার স্মৃতি জড়িয়ে মনকে শান্ত করবার প্রয়াস পেয়েছেন কিন্তু সে ক্ষণিক। জীবনের প্রথমা নারীর সৃষ্ট ক্ষত অত সহজে ঝেড়ে ফেলা যায় না।···

···গরমের বন্ধের আগে আবার স্কুলে গোসিয়েল

আসছে। নাটক হবে না, হবে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। ছাত্র নির্বাচন করেছেন যতীনদা। সহসা অপ্রত্যাশিত-ভাবে রথান নিয়ে এল লিপি ?

"যতীনদা! নাটকের ভক্ত ছিলুম। রথীনকে উপযুক্ত শিষ্য করে তোল। তুমি চেষ্টা করলে ও ফাস্ট হতে পারে। এই আমার আন্তরিক বিশ্বাস।"

যতীনদার মাথায় উন্মাদনা ভর করল নিমেষে। রথীনকে ফাস্ট করাতে হবে রিসাইটেশানে। সুমিতা খুশি হবে। ওর খুশি-মুখ স্মরণ করে যতীনদার দেহে মনে শিহরণ খেলতে লাগল।

অনেক বেছে বিরাট একটা গদ্য কবিতা নির্বাচন করলেন রথীনের জন্য। কাজটা উপযুক্ত হয়নি। কারণ যে ছেলের আবৃত্তি সম্পর্কে কোন কানই নাই, তাকে অতবড় কবিতা শেখানো চলে না। তার উপর রথীন একেবারে গবেট। আমরা সবাই বললুম, "আপনি করছেন কি যতীনদা! ও একেবারে অকাট! তার চেয়ে আমাদের হরেন মুখুজ্জেকে দিন, অল্প চেষ্টাতেই মাত করে দেবে।" কিন্তু যতীনদার ভিতরে ভিতরে এতকাণ্ড তা কি জানতাম! উনি জবাব দিলেন; "তোমরা কিছু জানো না, এরমধ্যে দারুণ সম্ভাবনা আছে—স্কুলের কোন ছাত্রেরই তা নেই। তোমরা ওদের নিয়ে দেখো। আমি রথীনকে এটা শেখাবোই!"

তারপর বুঝলে ভায়া, রথানকে নিয়ে সে কি অমানুষিক পরিশ্রম। কোন নারীর প্রেরণা না থাকলে যে মহৎ কাজ হয় না, আন্তরিক প্রচেষ্টায় কাউকে দিয়ে কিছু করানো যায় না, সেবার প্রমাণিত হল। রাতদিন যতীনদা রথানকে তালিম দিতে লাগলেন। হাত-পা নেড়ে মুখভঙ্গী করে—স্বরের ওঠানামা, পরিবর্তন···ইত্যাদি, কত যে কসরৎ যতীনদা ছুটির পর প্রত্যহ রাত্রি আটটা নয়টা পর্য্যন্ত, আলো জেলে সুরু করে দিলেন—দেখে আমরা সবাই 'থ' বনে গেলাম। যতানদারও অভিনয়-প্রতিভা বা নৈপুণ্য দেখে আমরা মুগ্ধ। ওঁর ভিতরে এত যে আবেগ ছিল, এত দক্ষতা ছিল কে জানত! ঐ রিহার্সেল দেখতেই আমরা খেয়েদেয়ে এসে আবার জুটে পড়তাম।

যা হোক, রথীনকে তো একরকম তৈরী করলেন যতীনদা। তার উপযুক্ত প্রমপটিং না হলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। যতীনদা যদি উইংসের পাশে থেকে প্রম-পটিং করেন, রথীন বিদ্যালয়ের সেরা রিসাইটার বলে নাম কিনবে। সেরা রিসাইটারকে এবার ইণ্টার স্কুল রিসাই-টেশানে পাঠানোর কথা আছে।···

···নেমন্তন্ন পত্রের সঙ্গে যতীনদা সাহস করে লিখে পাঠিয়েছিলেন সুমিতাকে; তোমাকে খুশি করবার জন্য কি অসাধ্য সাধন করেছি এসে নিশ্চয়ই দেখে যাবে, আশা করি।

অনেক ভরসা ছিল যতীনদার, সুমিতা সম্মতি জানিয়ে লিখে পাঠাবে। কিন্তু লিখিত জবাব এল না। এল মুখের জবাব রথীনের মারফৎ; "মা আসতে পারবেন না বলেছেন।

যতীনদা মনে মনে আহত হলেন একটু। কিন্তু দমলেন না। আসন্ন সোসিয়েলকে সার্থক করে তুলতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

এবার শ্রীমতী তৃপ্তির স্নায়ুযুদ্ধের শেষ রজনী। ঘটনাটি তুমি কল্পনা করে নাও নন্তু, আমি লেখক বা চিত্রকর নই যে হুবহু বর্ণনা করব—সাধারণভাবে একটা পাটাতন তার একটা পাশে খানিকটা আড়াল করা হয়েছে—যেখানে বসে সহজেই প্রমপটিং করা চলে।

পরপর কয়েকটি একঘেয়ে আবৃত্তি হয়ে গেল। যতীনদা কোনটাই তামিল দেননি এবার। সুতরাং ভাল হয়নি। যতীনদা আশায় আছেন। পাকা ওস্তাদের মত শেষ মার দেবার জন্য।

আর মিনিট দুই পর রথীনের পালা। যতীনদা উইংসের আড়ালে ঠিকমত জায়গাটিতে এসে বসেই চম্‌কে উঠলেন দারুণ। ঠিক সরাসরি দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে শ্রোতা-দের একটা পাশে। যেখানে প্রায় গলাগলি হয়ে বসে আছে তৃপ্তি আর সুমিতা। একেবারে গা ঘেঁষে সখীর মত। সুমিতাকে আজ আশ্চর্য সুন্দরী লাগছে। কে বলবে ও রথীনের মত অতবড় ছেলের মা। হালকা সাজসজ্জাতেই এত মানিয়েছে যে যতীনদার মাথার ভিতর সব গোলমাল হয়ে গেল। দ্বিতীয়বার তাকিয়ে দেখলেন, তৃপ্তি দারুণ একটা কঠিন ভঙ্গী নিয়ে চেয়ে আছে তাঁর মুখের পানে। আর ভাববার অবকাশ মেলে না। রথীন

এসে দাঁড়িয়েছে পাটাতনে। কিন্তু তৃপ্তি কি দেখছে অমন করে রথীনের মুখপানে—তারপর যতীনদার মুখে? ও কি মিল খুঁজে পেয়েছে দু'জনের মুখে? নৈলে অত আগুন কেন তৃপ্তির চোখে? ঘৃণা আর তিক্ততায় কি তামাটে হয়ে উঠেছে ওর মুখ? কিন্তু সুমিতার প্রসন্ন সুন্দর দাক্ষিণ্যভরা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখ্ছে রথীনকে একবার, আর যতীনদাকে পরমুহূর্ত্তে। যতীনদা কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন। রথীন সুরু করে দিয়েছে পার্ট···, কি যেন বললে ও?···না, থেমে গেছে রথীন! যতীনদা ধড়ফড় করে একটা লাইন বলে উঠলেন। রথীন ঘাড় ফিরিয়ে মাথা নাড়ে। ভুল হয়েছে।

তবে কোনখানটা? যতীনদা বলে উঠ্লেন; "আবার গোড়া থেকে ধর!" রথীন গোড়া থেকে সুরু করলে। যতীনদা দুটো লাইন পর পর বলে মুখ তুললেন···! না, তৃপ্তি আর সুমিতা!···কি ভেবেছে ওরা? কে আসতে বলেছিল ওদের এখানে? ছিঃ···ছিঃ···!

নাঃ রথীন আবার থেমে গেছে।

বল···বল না···, যতীনদা ফের একটা অবান্তর লাইন আউড়ে গেলেন। রথীন ঘাড় নাড়লে পাশ ফিরে। সে ততক্ষণে নার্ভাস হয়ে পড়েছে। এর আগে কোন-দিন অভ্যাস ছিল না জনতার সামনে দাঁড়ানোর। শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন শোনা গেল···কলরব বাড়ছে। মাষ্টারমশাইরা চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। কিন্তু গোলমালটা যে কোথায়, যতীনদা ঠিক ঠিক ধরতে পারছেন না। তৃপ্তি আর সুমিতা! রথীন আর সুমিতা! সামনে তাকালেন বিহ্বলভাবে। আবার চম্‌কে উঠ্লেন। তৃপ্তির মুখে একটি আশ্চর্য্য হাসির আবেশ। কিন্তু সুমিতা? তৃপ্তির ঘৃণা বিদ্বেষ তার মুখে গিয়ে জমা হয়েছে। ওর দুটো চোখ থেকে ছুরির মত শানিত দৃষ্টি-বাণ ছুটে আস্‌ছে যতীনদার মুখের উপর।

ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে দেখলেন, পিছন থেকে একজন শিক্ষক বলছেন রথীনকে, "চলে এসো, চলে এসো না!"

রথীন পালিয়ে বাঁচল। সভাস্থলে বিদ্রূপের ধ্বনি উঠ্ল। ছাত্ররা চীৎকার করতে লাগল। যতীনদা মাথায় হাত রেখে বসে রইলেন। সভা ভেঙ্গে গেল। আমরা সবাই দৌড়ে এলাম, "কি হয়েছে। যতীনদার কি হোল?"

যতীনদা তখন উত্তেজনায় সংজ্ঞা হারাবার মুখে। জল পাখা করে সুস্থ করলাম। ধাতস্থ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এই শেষ! কোনদিন আর আবৃত্তি অভিনয়ে আমি নেই।"

বিজনদা চুপ করলেন। আমি বললাম, "তারপর? সুমিতাই বা কোথায়? রথীনেরই বা হল কি?"

বিজনদা উঠে দাঁড়ালেন লম্বা নিঃশ্বাস ছেড়ে, "সে কথা শুনে কাজ নেই ভায়া! সুমিতা রথীনকে নিয়ে চলে গেছে! যতীনদাও সেই থেকে আর অভিনয় লাইনে নেই। জীবনের যা শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, তা নিছক এক নারীর মোহে পড়ে দুর্বল সেণ্টিমেণ্টের বশে ত্যাগ করেছেন।" কাঁধে একটা চাপড় দিয়ে বিজনদা মন্তব্য করলেন, "তাই বলি ভায়া, মেয়েদের সম্পর্কে একটু সাবধানে চলো। দরকার হলে বিয়ে করবে, তবু প্রেম নয় কভু!"···

ঐতিহাসিক

গৌরীশঙ্কর দে

মনে পড়ে আরো একবার
থিরথির কাঁপা অন্ধকার,
হয়তো ঝিলের রূপে রেশমামহল একাকার।

মৃদু আলো গবাক্ষের পাশে
শাহজাদী আসে,
দেখে তাকে রাজপথে থেমে যেতে পারে মুসাফির।

শিরীষ ফুলের মতো ওড়নাটি আতরে মদির।

সহসা আরক্ত শিখা বিদেশী বহ্নির লালসায়
জ্বলে যায় রূপসীর অস্পষ্ট শরীর।

রাগপ্রধান—দাদরা

ঝির ঝির ঝির ঝরণাধারা
ঝিকিমিকি তারা,
বনের ধারে মনের ময়ূর
হেসেই হল সারা।

চম্‌কে দুটি পাখী,
ডালে ডালে কাঁপন লাগে
পাতায় পাতায় রাখী
খুসীতে হয় হারা।

কথা, সুর, স্বরলিপি ঃ—বসন্ত মুখোপাধ্যায় সংগীতরত্ন

°

স া ম I গ া প I ক্ষ া প I ধ প া I স প া I ধ প া I ম ম া I া া া
ঝি ০র ঝি ০র ঝি র ঝ ০র ণা ধা রা ০ ঝি কি া মি কি ০ তা রা ০ ০ ০ ০
গ গ ম I ধ প া I গ া ম I রে স া I স স া I রে নি া I স স া I া া া
ব নে ০র ধা রে ০ ম নে ০র ম য়ূ র হে সে ই হ ল ০ সা রা ০ ০ ০ ০
\+ ° + • + • +

• •
প প া I নি নি া I স স া I া া া
চ ম্ কে দু -টি ০ পা খী ০ ০ ০ ০
\+ ° + •

• ° • ° ° ° ° •
স স গ I রে রে া I স স া I স নি া I ধ ধ নি I ধ প ধ I প ম া I া া া
ডা লে ০ ডা লে ০ কাঁ প ন লা গে ০ পা তা য় পা তা য় রা খী ০ ০ ০ ০
\+ • + • + • + •
স ম া I গ প া I ক্ষ প া I া ম া I
খু সী ০ তে হ য় হা রা ০ ০ ০ ০
\+ • + •

জেবউন্নিসার আত্মকাহিনী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। আমি এক ভীষণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। আমি আমার বুদ্ধিমতী এবং বিশ্বস্ত পরিচারিকা গুলসনের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। গুলসন আমার হস্তে বাদশাহের একখানি নকল পাঞ্জা পুরে দিল। আমি গুলসনের ইঙ্গিত বুঝতে পারলাম। এই পাঞ্জা নিয়ে আমি কুমার রাজসিংহের দুর্গে প্রবেশ করব—মারাঠা বন্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। এই পাঞ্জা অত্যন্ত প্রাণবস্তু। আমাদের সঙ্গে বন্দীকে গোপন হত্যার ফারমান।

গভীর রাত্রি, ঘন অন্ধকার; আকাশে বিদ্যুৎ ঘনমেঘকে আরও স্পষ্টতর করে তুলেছে। আমি আর গুলসন-ঘনকৃষ্ণ বোরখা পরিধান করে নিরাভরণ শিবিকায় আরোহণ করলাম। সঙ্গে একটি তৃতীয় বোরখা এবং সেই নকল পাঞ্জা ও ফারমান। আমরা কুমার রামসিংহের দুর্গের পশ্চাদ্দেশে উপস্থিত হলাম। নিশ্চয়ই আমি সুস্থ মস্তিষ্ক ছিলাম না—এই নৈশ অভিযানের দায়িত্ব, গুরুত্ব এবং পরিণতি আমি চিন্তা করিনি। আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল-যদি আমাদের এই মুঘলবংশের রাজ-অতিথি অসুস্থ না হন, তবে আমি তাকে এই তৃতীয় বোরখাটি উপহার দিব, আর এই পাঞ্জার সাহায্যে তাঁকে মুক্ত করব; মৃত্যুর পরওয়ানা দিয়ে মৃত্যু থেকে তাঁকে রক্ষা করব। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে বলব, বাদশাহ আলমগীরের আদেশে গভীর অন্ধকারে বন্দীকে অন্য দুর্গে স্থানান্তরিত করবার আদেশ নিয়ে এসেছি। সেখানে তাঁকে হত্যা করা হবে। বাদশাহ আলমগীরের এইরূপ গোপন কার্য্যকলাপ অপ্রত্যাশিত নয়, অসম্ভাব্য ও নয়।

রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। দূরে প্রাসাদরক্ষী চীৎকার দিয়ে জানিয়ে দিল-রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত। আমরা শিবিকা থেকে অবতরণ করে দুর্গের বহির্দ্দেশে অপেক্ষা করলাম। সমস্ত পুরী নিস্তব্ধ; আমি আমার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনছিলাম। আমার কখন যে সময় অতিবাহিত হল, জানিনা প্রহরী আবার উচ্চ কণ্ঠে জানিয়ে দিল দুই ঘড়ি অতিবাহিত। বুঝতে পারলাম-প্রহরী প্রায় সকলেই নিদ্রিত, আমরা ধীরপদে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হলাম। আমরা দুজনে দ্বাররক্ষীকে পাঞ্জা দেখালাম, প্রহরী জানাল বন্দী অসুস্থ। সম্মুখ তোরণের পশ্চিম পার্শ্বে রক্ষীশালা—তার পশ্চিমে অলিন্দ—অলিন্দের শেষ প্রান্তে মারাঠা বন্দীর ক্ষুদ্র শয়ন কক্ষ। সম্মুখে অস্পষ্ট আলো। গুলসন শেষবার প্রহরীকে বাদশাহ আলমগীরের আদেশ জানিয়ে দিল। বন্দীকে এই মুহূর্তে দুর্গ থেকে অপসারণ করতে হবে এবং রাত্রিশেষের পূর্ব্বেই তাঁকে হত্যা করতে হবে। ব্যবস্থা গোপনে তার কবরের শেষ হবে।

প্রহরী বন্দীকে জাগ্রত করতে অগ্রসর হল। আমরা মৃদু আলোক দেখলাম, বন্দী যেন ধ্যানমগ্ন যোগাসনে উপবিষ্ঠ, সম্মুখে একটি প্রদীপ এবং একখানি গ্রন্থ। বন্দী যেন কার অপেক্ষা করছিলেন-তাঁর আননে অপূর্ব্ব দিব্য প্রশান্তি। প্রহরীর পদশব্দে তিনি আসন ত্যাগ করে পার্শ্বস্থ উন্মুক্ত ছুরিকা হস্তে অগ্রসর হলেন। গুলসন প্রহরীকে ইঙ্গিত করল—প্রহরী দূরে সরে গেল। গুলসন অতি বিনম্র স্বরে বন্দীর নিকট নিবেদন ক'রল, "বাদশাজাদী জেবুন্নিসা।" শিবাজী স্তম্ভিত। শিবাজী একপদ পশ্চাতে সরে গেলেন। গুলসন আবার নিবেদন করল, বাদশাহ আলমগীরের কন্যা জেবুন্নিসা। "বাদশাজাদী এসেছেন আপনাকে জীবিত দেখতে এবং জীবন্ত আপনাকে কারা-মুক্ত করতে। বাদশাই আলমগীর আপনাকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সে প্রতিশ্রুতি বাদশাজাদী পালন করবেন। আপনি বিশ্বাস করুন, বাদশা আলমগীরের কন্যা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। এই রাত্রির অন্ধকারে বাদশাহজাদী গোপনে বাদশাহের পাঞ্জা আপনার জন্য একটি বোরখা এবং একখানি শিবিকা সংগ্রহ ক'রে এনেছেন। আর মুহূর্ত বিলম্ব করবেন না, প্রাসাদের প্রহরী নিদ্রামগ্ন। এই গভীর রাত্রে কেহ সন্ধান পাবে না। আপনার মুক্তির ব্যবস্থা ক'রে বাদ-শাহজাদী তাঁর পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রবে, মোগলবংশের কলঙ্ক স্খালন করবেন।"

মারাঠা বীর শিবাজী নিশ্চল, নিস্তব্ধ। প্রদীপের মৃদু আলোকে বুঝতে পারলাম, তাঁর ওষ্ঠাধর কম্পিত হচ্ছিল। তিনি অবনত মস্তকে মৃদুস্বরে বললেন, "বাদশাজাদী! আমার সশ্রদ্ধ সেলাম গ্রহণ করুন। আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। কুমার রামসিংএর নিকট প্রেরিত আপনার লিপি আমি দেখেছিলাম। আমি জানি, মুঘলবংশের গৌরব রক্ষা করবার জন্য আপনি কত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আপনি ভীষণ বিপদ তুচ্ছ ক'রে এই রাত্রির অন্ধকারে একটিমাত্র পরিচারিকা সঙ্গে নিয়ে এই প্রাসাদে এসেছেন। বাদশাজাদী! আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমার পলায়নের সংবাদ কাল প্রভাতে বাদশাহের অগোচর থাকবে না। তিনি যদি জানেন, আপনি আমার মুক্তির ব্যাপারে জড়িত আছেন, এই নিয়ে আপনার কলঙ্ক হবে। সেই কলঙ্ককালিমা আপনার ললাটে চিরকাল লিপ্ত থাকবে। আমারও সুনাম নষ্ট হবে। মানুষ জানবে যে একজন নারীর অঞ্চলের অন্তরালে মারাঠা বীর শিবাজী মুঘল দুর্গ ত্যাগ ক'রেছেন। আমি অনুরোধ করছি-আপনি এই মুহূর্তে এই গৃহ ত্যাগ করুন। আপনার শুভেচ্ছার জন্য আমি আবার আপনাকে আমার সেলাম জানাচ্ছি।"

আমি স্তম্ভিত হ'লাম। অতি মৃদু অঙ্গুলী সঞ্চালনে আমার

অবগুণ্ঠন মোচন করলাম। নয়নের ভাষায় আমি তাঁকে বল্লাম—"মারাঠা বীর কি জানেন না যে তাঁর জীবন কত বিপন্ন। বাদশাহ আলমগীরের বিবরে একবার যে প্রবেশ ক'রেছে তার পক্ষে জীবন্ত প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব। এই মারাঠা বীরের প্রাণের বিন্দুমাত্র শঙ্কা নাই ?" আমার অবগুণ্ঠনমুক্ত আননের দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করে তিনি বল্লেন, "বাদশাজাদী ! আমি আপনার মনোভাব বুঝতে পারছি। আমায় ক্ষমা করুন। আমি হিন্দু। পরনারীকে মাতৃবৎ জ্ঞান করি। আপনি যদি আমার কল্যাণ কামনা করেন তবে আমার কল্যাণের জন্য এই মুহূর্ত্তে এইস্থান ত্যাগ করুন। আমার মুক্তির উপায় আমি স্থির করেছি, গুরু আমার সহায়।"

আমি মারাঠা বীরের ভবিষ্যৎ কল্পনা ক'রে শিহরে উঠলাম। সুকৌশলী বাদশাহের শতপ্রকার কৌশলের সঙ্গে মারাঠা বীর কি পরিচিত ন'ন ? নির্ভীক, আত্মবিশ্বাসী মারাঠাবীরকে আল্লহ রক্ষা করুন।

অতি দ্রুতপদে গুলসন এবং আমি জয়পুর প্রাসাদ পরিত্যাগ করলাম। তোরণের প্রধান প্রহরীকে গুলসন জানিয়ে দিলো-বন্দী অত্যন্ত অসুস্থ। সুতরাং তাঁকে স্থানান্তরিত করা সম্ভব নয়।

সে কাহিনী গুলসন জানে, আমি জানি, আর জানে সর্ব্বলোকদর্শী অদৃশ্যদেবতা।

তৃতীয় স্তবক

আজ ত পাদশাহ বেগমের কোন পত্র আমার নিকট আসেনি। প্রতিদিন তাঁর পত্রের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষায় প্রতীক্ষা করছি। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে খণ্ড খণ্ড সংবাদ সুদূর দাক্ষিণাত্য থেকে ভেসে আসছে। বাদশাহ আলমগীর পুত্র-বধের জন্য বদ্ধ-পরিকর। শাহজাদা আকবর কি আবার রাজপুতদের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন ? বাদশাহের সেনাপতি শিহাবুদ্দিন খান ? শাহজাদা মোয়াজ্জম সম্রাট স্বয়ং তিনদিক থেকে শাহজাদা আকবরকে অবরোধ করবার চেষ্টা করছেন। সমস্ত ফৌজদারদের উপর নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে পর্য্যন্ত একটা পিপীলিকাও—প্রহরীর বেষ্টনী ভেদ করতে পারবে না। সম্রাট স্বয়ং আজমীর থেকে পুত্রবধ যজ্ঞের আয়োজন করছেন। পাদশাহ বেগম, তুমি তো একবার পিতার সঙ্গে পুত্রের, ভ্রাতার সঙ্গে ভ্রাতার আত্মঘাতী সংগ্রামের স্ফুলিঙ্গ নির্ব্বাপিত করবার চেষ্টা করেছিলে। আজ কি তুমি মুঘল সাম্রাজ্যের এই আত্মঘাতী সংগ্রামের পুনরাবৃত্তি নিরোধ করবার জন্য বিন্দুমাত্র অঙ্গুলী সঞ্চালন করবে না ? পাদশাহ বেগম, শাহজাহানের সন্তানদের মধ্যে একজন তুমিই—বাদশাহ আলমগীরের অসন্তোষ, ভ্রূকুটি জিঘাংসা অতিক্রম করে, তাঁকে উপদেশ দিতে পারো। আজ বাদশাহ আলমগীর নিরস্ত্র, রক্ষীহীন তোমার কক্ষে প্রবেশ কত্তে সাহস করেন। তোমার সঙ্গে তিনি প্রহরের পর প্রহর রাজনীতি পরিবারের অতীত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তুমি দেখেছ তোমার চক্ষুর সম্মুখে তোমার প্রিয়ভ্রাতা দারা, কাফের অপবাদে, মোল্লার বিচারে নিহত হয়েছেন। শুজা পরাজিত হয়ে সুদূর আরাকানের নিশ্চহ্ন হয়ে গেছেন। সরল বিশ্বাসী মুরাদ বক্সকে সুরাপানে অচেতন করে নিদ্রিত নিরস্ত্র বন্দী করা হয়েছিল, গোয়ালিয়র দুর্গে আলী নকীর পুত্র অভিযোগ করল—"আমার পিতাকে বিনা অপরাধে গুজরাটের সুবাদার মুরাদ বক্স হত্যা করেছেন ; বাদশাহ আলমগীরের নিকট আমি বিচারপ্রার্থী।" এই হত্যার অপরাধে মুরাদ ফরিয়াদীর সম্মুখে বক্সের শিরচ্ছেদ করা হয়েছিল ; এবং তাঁর ছিন্নমুণ্ড ফরিয়াদীকে প্রদান করা হল—উদ্দেশ্য ভবিষ্যতে যেন আর কেহ নিজকে মুরাদ বক্স বলে নিজেকে প্রচার করতে না পারে। কারণ এই ফরিয়াদী হবে মুরাদ বক্সের হত্যার প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

পাদশাহ বেগম ! তোমার সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত শুভেচ্ছা সত্ত্বেও তুমি ভ্রাতৃহত্যার নিবারণ করতে পারনি। তবু তোমার শুভবুদ্ধিও পরামর্শ দিয়ে তুমি মুঘল রাজপরিবারকে নূতন করে সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছ—নূতন প্রীতির বন্ধ গড়ে তুলেছ। স্বর্গীয় দূতের মত তোমার আশীর্ব্বাদ মুঘল রাজপরিবারকে নূতন জীবন দান করেছ। তোমারই পরামর্শে বাদশাহ আলমগীর নূতন করে মুঘল রাজপরিবারের সন্তানদের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। সম্রাট শাহজাহান চেয়েছিলেন, দারা শিকোর পুত্র সুলেমান শিকোর সঙ্গে আওরঙ্গজেবের কন্যা জেবুন্নিসার বিবাহ দিয়ে সিংহাসনের দ্বন্দ্ব প্রতিরোধ করবেন। পাদশাহ বেগম তুমি তো জান আওরঙ্গজেব কূটবুদ্ধির প্রভাবে পারস্যের বাদশাজাদা ফারুখের সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাব করে সে চেষ্টা ব্যর্থ করেছিলেন। তুমি কিন্তু তাতে নিরাশ হওনি—তুমি দারার কন্যা জাহানজেব বানুকে আপনার স্নেহাঞ্চলের অন্তরালে আশ্রয় দিয়েছ এবং শাহজাদা আজমের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলে। সুলেমান শিকোর কন্যা সলিমাবানুকে শাহজাদা আকবরের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছি।

পাদশাহ বেগম, আমার কি মনে হয় জান ? মুঘল রাজপরিবারের উপর বিধাতার একদিকে আশীর্ব্বাদ, অন্যদিকে অভিশাপ। এই আশীর্ব্বাদের জন্যই তৈমুরবংশে জন্মেছিলেন বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, দারাশিকো আর তুমি। বিধাতার আশীর্ব্বাদে পানিপথের যুদ্ধে মাত্র দুইটী কামানের সাহায্যে বাবর হিন্দুস্থান বিজয় করেছিলেন।

হিন্দুস্তান বিজয়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আশৈশব সুরাপানের অভ্যাস আল্লার নামে বাবর একনিমেষে পরিত্যাগ করেছিলেন। পর মুহূর্ত্তে বেজে উঠল পানপাত্রের ঝনঝন শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার তিনশত সহচর পানপাত্র দূরে নিক্ষেপ করে ফেল্ল। ধর্ম্মের নামে যুদ্ধ—হয় হিন্দুস্থান, নয় মৃত্যু।

ক্রমশঃ

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৮৭৮ সালে প্রকাশিত বঙ্কিমের ঘোষণার পর রবীন্দ্রনাথ "যুরোপ প্রবাসীর পত্র" রচনা করেন। ১৮৮১ সালে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "আমার বিশ্বাস, বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষায় লেখা বই এই প্রথম।...বাংলা চলতি ভাষার সহজ প্রকাশ-পটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে।"

এই সময় থেকে বাংলা গদ্যে একটি কৌতুকপ্রদ ব্যাপার দেখা গেল। প্যারীচাঁদ নিজে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির কথোপকথনের ভাষায় ভদ্রজনের কথোপকথন হলে সাধুভাষা-মেশানো কথ্যভাষা ব্যবহার করতেন —খাঁটি কথ্যভাষা ব্যবহার করতেন না, তা আগেই দেখা গেছে। লেখকের বর্ণনা ও মন্তব্যের ভাষায় তিনি শুধু সাধুভাষাই ব্যবহার করতেন। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বরাবর ঐ রীতি রক্ষা করে চলেছিলেন এবং তাঁর বইএর চরিত্রগুলির কথোপকথনের ভাষায় প্রথমদিকে কেবল সাধুভাষা ব্যবহার করলেও পরে বাংলা সাহিত্যের প্রথম বাঙালি ঔপন্যাসিক প্যারীচাঁদের দৃষ্টান্তই অনুসরণ করেন। কিন্তু আরো পরের সাধুভাষার ঔপন্যাসিকেরা মন্তব্য প্রকাশ ও বর্ণনা প্রদানের ভাষায় নিজেরা গম্ভীর-ভাবে সাধুতা বজায় রাখলেও চরিত্রগুলির মুখে কথোপকথনের জন্যে খাঁটি চলতি ভাষাই ব্যবহার করেছেন। ভাবটা এই রকম যে, তাঁরা সাধুভাষার পক্ষপাতী হলেও তাঁদের তৈরি চরিত্রগুলো যদি রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষের মতো স্বাধীনভাবে ঘরোয়া ভাষায় কথা বলে, তাহলে তাঁরা তাদের স্বাধীনতায় হাত দিতে চান না। তাঁদের রচনায় দেখা যায়, লেখক সাধুভাষী—কিন্তু তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি কথ্যভাষাই বেশি পছন্দ করে। এই অসঙ্গতি যুক্তিবিহীন; পাঠক যদি ভদ্র সমাজের মার্জিতরুচি নায়ক-নায়িকার মুখে চলতি ভাষা বরদাস্ত করতে পারে, তাহলে সে লেখকের বর্ণনাও সেই ভাষায় রচিত হলে আপত্তি করবে কেন? ঐ বিসদৃশ ভাষাবৈষম্যের একটি কারণ হচ্ছে পূর্ববর্তী বিশুদ্ধ সাধুভাষার দৃঢ়মূল কিন্তু অনাবশ্যক অভ্যাসের জের; অন্য কারণ, সমকালীন নাটকের সংলাপের প্রভাব। নাটকে স্বাভাবিকতা রক্ষার জন্যে সংলাপে যেমন যথাসম্ভব স্বাভাবিক কথ্যভাষা ব্যবহার করা হত, উপন্যাস প্রভৃতি অন্য গদ্য রচনাতেও তেমনি স্বাভাবিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে কথোপকথনে ক্রমাগত চলতি ভাষার পরিমাণ-বৃদ্ধি পেতে থাকে।

কিছুদিন পরে এই অবস্থার অবসান হল; সাধুভাষার ক্রিয়াপদ ও ও সর্বনামের পরিবর্তন সাধন করে কিন্তু তৎসম শব্দের পরিমাণ অক্ষুণ্ণ রেখে শিষ্টজনসম্মত এক চলতি ভাষায় সবরকমের গদ্যরচনা লেখা আরম্ভ হল। এ-ভাষাও ঠিক মুখের ভাষা নয়; কারণ, লেখার সময় বাধ্য হয়ে বেশি তৎসম শব্দ ব্যবহার করলেও মুখের ভাষায় বেশির ভাগ শিক্ষিত ভদ্রজনও খুব বেশি তৎসম শব্দ প্রয়োগ করেন না। আরো পরে সাধুভাষার সংস্কৃতঘেঁষা অব্যয় ও নানা উপসর্গ তুলে দিয়ে খাঁটি ঘরোয়া বাগ্‌ভঙ্গি ও বুলির ব্যবহার চালু করা হল। অন্যদিকে, সাহিত্যপাঠ ও সাহিত্যচর্চার প্রভাবে শিক্ষিত বাঙালীর মুখের ভাষায় তৎসম শব্দের ব্যবহারও বাড়তে লাগল। অবশেষে, বেশ কিছু তৎসম শব্দভরা কথ্যরীতির বাগ্‌ভঙ্গিযুক্ত এক "সাহিত্যিক" চলতি ভাষাকে ভদ্রসভায় কথিত মুখের ভাষারূপে মেনে নিতে কলিকাতার প্রাধান্যশালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আর কারো আপত্তি থাকল না। লেখকগোষ্ঠীও নিজেদের ভাষার আভিজাত্য সম্বন্ধে আশ্বস্ত হয়ে রচিত গল্প-উপন্যাসে চরিত্রগুলির কথোপকথনের মতোই সংলাপযোজক বর্ণনা ও নিজেদের মন্তব্যসমষ্টিও চলতি ভাষায় লেখা সুরু করলেন। গদ্যভাষার এই ক্রম-বিবর্তন বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বেশ একটা লক্ষ্য করার বিষয়।

তাহলে, প্রথম উদ্ভবের পর থেকে আজ পর্যন্ত গদ্যভাষার পরিণতির স্তরবিন্যাস আলোচনা করলে, এইরকম একটা শ্রেণীপর্যায় অনায়াসেই প্রত্যক্ষ করা যায়:—

বাংলা গদ্যভাষার দুটি শাখা; সাধুভাষা ও চলতি-ভাষা; এদের প্রথমটির ধারাপ্রবাহ ক্রমশ দ্বিতীয়টির বর্ধমান প্রভাবের অন্তর্লীন হচ্ছে। সাধুভাষার রচনাবলী বিশ্লেষণ করলে এই স্তরপরম্পরা চোখে পড়ে:—

প্রথম স্তর: অবিন্যস্ত বিদ্যালঙ্কারি ভাষা; কথ্যভাষার লেশমাত্র নেই—কথাবার্তা বিশুদ্ধ সাধুভাষায় রচিত; কচিৎ গ্রাম্য ভাষার অসঙ্গত প্রয়োগের অসুন্দর প্রক্ষেপ।

দ্বিতীয় স্তর: সুবিন্যস্ত বিদ্যাসাগরি ভাষা; আদ্যন্ত সমগ্র রচনা

সাধুভাষায়, কিন্তু তার ভিত্তি মৌখিক ভাষা এবং কথোপকথনে কথ্য-রীতির ঈষৎ স্পর্শ দেখা যায়।

তৃতীয় স্তর : প্যারীচাঁদ-বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা ; কথোপকথনে সাধু-চলিত মিশ্রভাষা, আর সব খাঁটি সাধুভাষায় লেখা।

চতুর্থ স্তর : রবীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমার-শরৎচন্দ্রের ভাষা ; কথোপ-কথন বিশুদ্ধ চল্‌তি ভাষায়, অন্য যা কিছু পূর্ববৎ সাধুভাষায়।

এর পরের স্তরে এসে সাধুভাষা চল্‌তিভাষার মধ্যে আত্মবিলোপ করতে বাধ্য হয়েছে। এই চতুর্থ স্তরের ভাষা ব্যবহার করতে অভ্যস্ত অনেক প্রবীণ লেখককে পরিণত বয়সে সাম্প্রতিক কালে আদ্যোপান্ত চল্‌তি ভাষায় কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধ রচনা করতে দেখা যাচ্ছে। তা থেকে একদিকে যেমন কথ্যভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়, আর একদিকে তেমনি আলোচ্য নিবন্ধের বক্তব্য প্রতিপন্ন হয়ে যায়। প্রমথনাথ বিশি, নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি সুলেখক তো বটেই, মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মতো সাধুভাষার গোঁড়া সমর্থকরাও জীবনের শেষ প্রান্তে এসে চল্‌তি ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করেছেন। প্রমথনাথ বিশি মহাশয়ের উপন্যাসসমূহ আলোচনা করলে দেখা যায়, কি ভাবে তাঁর রচনাতেও চতুর্থ স্তরের সাধুভাষা শেষ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ কথ্য-ভাষার মধ্যে নির্বাণমুক্তি লাভ করেছে। তাঁর "কেরি সাহেবের মুন্সি" কথ্যভাষার বিজয়বার্তা ঘোষণা করে।

আবার, চল্‌তি ভাষার বিবর্তন পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, প্যারী-চাঁদের রচনায় ক্ষীণ ধারায় উদ্ভূত হয়ে এই ভাষা অচিরে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে। সেই পর্যায়গুলি মোটামুটি এই :—

প্রথম পর্যায় : টেকচাঁদ ঠাকুরের ব্যবহৃত ভাষা ; কথোপকথনে ভাঙা ভাঙা কথ্যভাষার প্রয়োগ।

দ্বিতীয় পর্যায় : হুতোমি ভাষা ; ঈষৎ অমার্জিত ও পরিহাস-লঘু ভাষা উচ্চভাব বিকাশের অনুপযুক্ত।

তৃতীয় পর্যায় : রবীন্দ্রনাথের ভাষা ; সবরকম রচনার উপযোগী কথ্যভাষার সন্ধান লাভ।

চতুর্থ পর্যায় : প্রমথ চৌধুরীর ভাষা ; তাঁর অনুগামী ও শিষ্যদের রচনায় ক্ষিপ্র, লঘু, বাক্‌পটু অথচ গুরু ভার বহনে সমর্থ চল্‌তি ভাষা।

বঙ্কিমচন্দ্র-বর্ণিত দুটি আলাদা গদ্যভাষা স্বতন্ত্র পথে বিকশিত হয়েছে, এ ব্যাপারটা বুঝতে হবে।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁর রচনায় ব্যঙ্গচ্ছলে নীচ ব্যক্তির বা অধম জীবের মুখের ভাষায় ভিন্ন সামান্য গ্রাম্য চল্‌তি ভাষাকেও আমল দেন নি। তাঁর লেখা আলাপনের ভাষা গুরুগম্ভীর সংস্কৃতপ্রধান সাধুভাষা। বিদ্যাসাগর ঐ ভাষাকে মার্জিত করলেন, কিন্তু রচনাবলী সাধুগদ্যেই লেখা হতে লাগল। তারপর বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানত প্যারীচাঁদের প্রভাবে চল্‌তি ভাষার মর্যাদা স্বীকার করে কেবল কথাবার্তার ভাষায় সাধুভাষার সঙ্গে "অপর ভাষা" কিছু পরিমাণে মেশালেন। এই স্তরের ভাষায় বহু গদ্যগ্রন্থ রচিত হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের গল্প-উপন্যাস এইভাবেই লেখা হয়। তারপর রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার ও শরৎচন্দ্র—তিন মহারথী চতুর্থ স্তরের সাধুভাষায় গদ্য রচনা আরম্ভ করলেন—যাতে আর সব সাধুভাষায় লিখে মুখের আলাপাদি কথ্য ভাষায় লিখিত হল। এই ধারা আজও বর্তমান এবং বাংলা গদ্যের জগতে এই স্তর আজ পর্যন্ত সংরক্ষিত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী এই ধরণের সাধুভাষাতেই লিখিত। ১৯১৫ সালে রবীন্দ্রনাথ "ঘরে-বাইরে" উপন্যাসে এই স্তর অতিক্রম করেন। ১৮৭৮ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত ৩৭ বছর সময় তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল প্রবন্ধ থেকে উপন্যাসের ক্ষেত্রে চলতি ভাষার গাড়িতে চেপে যেতে।

ওদিকে চলতি ভাষায় লেখার যে প্রয়াস ১৮৫৫ সালে প্যারীচাঁদের দ্বারা সুরু হয়েছিল, তা সাত বছরের মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহের হাতে খাঁটি কথ্যভাষায় পরিণত হলেও এই দ্রুত গতিকে অপ-গতি বলতে হবে, প্রগতি বলা চলবে না। কারণ, হুতোম প্যাঁচার হাতে কথ্যভাষা খুব নিম্ন স্তরে এসে পড়েছিল যাতে মহৎ সাহিত্য গড়া যায় না। নাটকে অবশ্য মধুসূদন ঠিক পথের সন্ধান পেয়েছিলেন। কিন্তু সব রকমের গদ্য রচনার উপযোগী চলিত ভাষার সন্ধান দিলেন রবীন্দ্রনাথ। চতুর্থ পর্যায়ে বীরবলের চেষ্টায় এই ভাষা এখন সেই উৎকর্ষ অর্জন করেছে সাধুভাষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরি ভাষা যা করেছিল। কিন্তু সাধুভাষায় যেমন বঙ্কিম-চন্দ্রের মতো কুশলী শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছিল, এই চলতি ভাষায় এখনও তেমন স্রষ্টা দেখা যায় নি।

লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, সাধুভাষা বিবর্তনের পথে স্বাভাবিক ভাবেই চল্‌তি ভাষার মধ্যে আত্মবিলোপ করছে। যাঁরা এখনও চতুর্থ স্তরের সাধুভাষায় গল্প-উপন্যাস রচনা করেন, তাঁরা চতুর্থ পর্যায়ের কথ্য-ভাষার শিল্পীদের তুলনায় অন্তত ভাষার ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ। এইজন্যে সাহিত্যপ্রতিভা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য না করেও অসঙ্কোচে বলা যায় যে, ভাষার ব্যাপারে তারাশঙ্করের তুলনায় বুদ্ধদেব বসু অনেক বেশি প্রগতি-সম্পন্ন লেখক।

প্রমথ চৌধুরীর ভাষা সর্বাংশে না হলেও অনেক পরিমাণে বিদগ্ধ জনের মুখের ভাষা। কথা বলতে বলতে বীরবলি শব্দানুপ্রাস রচনা করা সাধারণ শিক্ষিত লোকের পক্ষে অসম্ভব। তবু, "চার ইয়ারি কথা"-র ভাষা "ভাগীরথী-উভকূল"-এর শিক্ষিত জনের মুখের ভাষাই বটে। আরো পরে বুদ্ধদেব বসুও ঠিক ঐ ভাষাতেই তাঁর উপন্যাস লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের "ঘরে-বাইরে" থেকে "প্রগতি-সংহার" পর্যন্ত গদ্যভাষা কম-বেশি তৈরী করা ভাষা হলেও কথ্যভাষাই তার ভিত্তি বটে। রীতি বা style-এর প্রভেদ যতই থাক না কেন, দিলীপকুমারের উপন্যাসের ঈষৎ তৎসমবহুল ভাষা, "যাযাবর"-এর রম্যরচনার ভাষা আর সৈয়দ মুজতবা আলির সংস্কৃত ও ফার্সি-মেশানো ভাষা—সবই মৌখিক ভাষার ভিত্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। ভাষা শিল্পের বয়ন-বিন্যাসের দিক থেকে এঁরা সকলেই বীরবলের ভাবশিষ্য—এমন অগণিত দীক্ষিত লেখক প্রমথ চৌধুরী তাঁর প্রভাবে গ'ড়ে তোলার ব্যবস্থা করে গেছেন। চলতি ভাষার লেখকবর্গ তাঁর কাছে চিরঋণী থাকবেন।

বর্তমানে সাধুভাষা হিসেবে একমাত্র চতুর্থ স্তরের সাধুভাষা রয়ে গেছে। জীবন্ত না থাকলেও, যুগ-প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলেও, এভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখা নিরর্থক। জনকয়েক লেখক একরকম জোর করেই আজও অন্যতর লেখ্য ভাষা বা standard writing language-রূপে একে বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন; আর একটু বিবর্তিত হলেই পরের ধাপে এ-ভাষা অনিবার্যভাবে চল্‌তি ভাষায় পরিণত হওয়ার কথা। এর প্রস্তরীভূত অবস্থার একমাত্র সার্থকতা হবে বৈসাদৃশ্য স্পষ্টীকৃত করে প্রগতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করা। এই সত্য উপলব্ধির পর সাধুভাষার শক্তিশালী লেখকেরা যত তাড়াতাড়ি ঐ স্তর অতিক্রম করে আসতে পারেন, ততই বাংলা সাহিত্য ও তাঁদের পক্ষে মঙ্গল। ফসিলের দ্বারা বিবর্তনের পথে বাধা সৃষ্টি করা সম্পূর্ণ নিষ্ফল। দুঃখ এই যে, ঐ পুরাতন ধারায় এখনও গদ্য রচনা করার জন্যে কোন কোন শক্তিমান্ চিন্তাশীলের চিন্তাশক্তি অকেজো ও অপটু বিকাশবাহনের দ্বারা ব্যাহত হয়ে অভিব্যক্ত হচ্ছে। চতুর্থ স্তরের সাধুভাষার আর কোন ভাষাতাত্ত্বিক বা সাহিত্যিক প্রয়োজন নেই, কেবল গত যুগের তুলনায় বর্তমান কালের ভাষাগত প্রগতির পরিমাণ নিজ অস্তিত্বের দ্বারা অহরহ নির্দেশ করা ছাড়া।

"য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র" চল্‌তি ভাষায় লিখে নবযুগের পত্তন করে দিলেও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তখন ঐ ভাষায় আর তাঁর প্রধান গদ্যরচনা-কার্য পরিচালিত করেন নি। তখন সাহিত্যের আসরে বঙ্কিমচন্দ্র-সমর্থিত কথ্যভাষামিশ্রিত সাধুভাষার প্রবল প্রতাপ। রবীন্দ্রনাথ নিজেও দীর্ঘকাল ঐ ভাষায় প্রধান প্রধান গদ্য রচনাগুলি নিষ্পন্ন করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কি ভাবে ধীরে ধীরে গদ্য রচনাগুলির বিভিন্ন স্থানে কথ্য-ভাষার প্রভাব বাড়িয়ে দিলেন, এখন তাই দেখা যাক। দুর্গেশনন্দিনী থেকে সীতারাম পর্যন্ত ১৮৬৫-৮৪ সালের মধ্যে বিশ বছরে লেখা চোদ্দ-খানি উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে কথোপকথনের ভাষায় কিভাবে মিশ্রভাষার ব্যবহার করা হয়েছে, তার দৃষ্টান্তগুলি আলোচ্য। প্রথমে দুর্গেশনন্দিনী গ্রন্থে আশমানীর মুখের ভাষার উপর নজর পড়ে :—

"বলি কথাই কও না, খেও এর পরে।...আজি স্বামীঠাকুরকে বলে দেব, ঘরের ভিতরে কে ও? ও মাগী যে জেতে চাঁড়াল। আমি যে চিনি! উঠে আমায় দ্বার খুলে দাও।...সে কি! না খাও তো আমার মাথা খাও। এ যে পেট আর ভরে না। অলপ্পেয়ে। তুমি হাত ধোবে? আমি তোমাকে ঐ এঁটো আবার খাওয়াব। সে কি! হাত ধোও যে? ভাত খাও না।...খাও না খাও, একবার পাতের কাছে বোসো।...শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণে ছুঁলে কি হয়?...তুমি আমায় কেমন ভালোবাসো, আজ বুঝিয়া পড়িয়া তবে আমি যাব। তুমি আমার কথায় এই রাত্রে নাইতে পারো?...তবে রে বিট্‌লে, আমার এঁটো নাকি খাবি নে?...আমরা তোমার সঙ্গে পলাইয়া যাব।"

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত বিষবৃক্ষ উপন্যাসে ১৮৭৩ সালে দেখা যায়। দেবেন্দ্রের মুখের ভাষা :—

"আমি তোমারই আশায় এসেছি।"

কমল বল্‌ছে :—

"তোমায় পায়ে ঠেলেছেন বলে তোমার অন্তর্দাহ হতেছে।"

আর তার স্বামী বল্‌ছেন :—

"হে হুঁকে! তুমি পেটে ধর গঙ্গাজল, মাথায় ধর আগুন! তুমি সাক্ষী, যারা আমার উপর রাগ করেছে, তারা এখনি আমার সঙ্গে কথা কবে—কবে—কবে।"

অন্যত্র দেবেন্দ্র বল্‌ছে :—

"বাবা! কোন্ গাছ থেকে? তুমি কাদের পেত্নী গা? পারলেম না বাপ! আজ ফিরে যাও, অমাবস্যায় লুচি-পাঁঠা দিয়ে পুজো দেব—আজ একটু কেবল ব্রাণ্ডি খেয়ে যাও। তুমি কে বট হে, তোমায় চেন চেন করি,—কোথাও দেখেছি হে।"

এ রকম দৃষ্টান্ত প্রচুর পরিমাণে আছে। সম্ভবত এই ভঙ্গির অনুকরণেই পরে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকে সাধু ভাষায় আর সব অংশ লিখে খাঁটি কথ্যভাষায় সম্পূর্ণ কথোপকথন লিখতেন। ১৯০১ সালে "চোখের বালি" উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সহসা সম্পূর্ণ সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন। বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উনিশ শতকেই গল্প রচনায় চতুর্থ স্তরের সাধুভাষা ব্যবহার করলেও "ঘরে-বাইরে" রচনার পূর্ববর্তী কয়েক বছরে তিনি আবার একেবারে দ্বিতীয় স্তরে বিদ্যাসাগরি ভাষার যুগে ফিরে গিয়ে খাঁটি সাধুভাষায় সমস্ত গদ্যরচনা লিখতে আরম্ভ করেন। সম্ভবত তিনি ভেবেছিলেন যে খানিকটা সাধু ও খানিকটা চলতি ভাষায় লেখা অর্থহীন; হয় সবটাই সাধুভাষায় লেখা ভালো, নয় পুরো চলতি ভাষায় লেখা উচিত। সেইজন্যে বিংশ শতকের প্রথম কয়েকটি বছর তিনি সাধুভাষায় বিদ্যা-সাগর-গঠিত স্তরে, যদিও নিজের রীতিতে, গদ্যরচনাগুলি নিষ্পন্ন করেন। তারপর ১৯১৪ সাল থেকে তিনি একেবারে মার্জিত চলিত ভাষার গদ্যে অর্থাৎ তাঁর নিজেরই ১৮৭৮ সালে প্রবর্তিত তৃতীয় পর্যায়ের চল্‌তি ভাষায় উপনীত হন। রবীন্দ্রনাথের ভাষাবিবর্তনের এই বিচিত্র গতি পরম কৌতূহলের বিষয়। তিনি ১৮৮১ সালে "বৌ ঠাকুরাণির হাট"-এ বঙ্কিমি গদ্যভাষা বা কথ্যমিশ্র সাধুভাষা, যদিও কম পরিমাণে, ব্যবহার করেছেন। এটি তৃতীয় স্তরের সাধুভাষা। আবার ১৮৯৫ সালে চতুর্থস্তরের গদ্যভাষা ব্যবহার করার পর ১৯০১ সাল থেকে তাঁকে "চোখের বালি"-তে দ্বিতীয় স্তরের গদ্য ব্যবহার করতে দেখা গেল। ১৯১৪ সালে তিনি ১৮৭৮ সালের ভাষায় ফিরে গেলেন। এরপর আর তিনি পশ্চাদ্‌গতি অবলম্বন করেননি একটিমাত্র গল্পে ছাড়া।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যভাষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি বারবার রচনার রীতি ও ভাষার স্তর পরিবর্তন করেছেন। এই চঞ্চল সাহিত্যপ্রয়াসের মনস্তাত্ত্বিক কারণ দুর্বোধ্য নয়। সাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে কোন্‌টির সাফল্যলাভ অনিবার্য, সে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সংশয় ছিল; তা ছাড়া, তাঁর অসামান্য বহুমুখী প্রতিভা বিভিন্ন পন্থায় আত্মবিকাশের পথে চরিতার্থতার সন্ধান করেছে। সাধু ও চলিত, দু ভাষাতেই যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন, দুটিতেই রচয়িতা

আত্মপ্রকাশ করতে পারেন বটে, কিন্তু দুটি প্রকাশের ধারা এবং তার রূপ ও রস স্বতন্ত্র। ১৮৭৮ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত ৩৭ বছর সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মতো মনস্বী পুরুষকেও অন্তত চারবার গদ্যভাষার স্তর বদল করতে দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত তিনি কথ্যভাষার কণ্ঠেই বিজয়মাল্য অর্পণ করেন। ১৯১৫ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত ২৬ বছর কাল তিনি অসংকোচে বাধাহীনভাবে চলতি ভাষায় সমস্ত গদ্যরচনা প্রণয়ন করেছেন। এমন-কি, শেষদিকে তাঁর কবিতা রচনাতেও কথ্য ভঙ্গিমা প্রভাব ছড়িয়ে দেয়। সে-সম্বন্ধে বাংলা কাব্যের শ্রেষ্ঠ ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় কিছু আলোচনা করেছেন। বিদ্যাসাগরের গদ্য রচনা প্রসঙ্গে তাঁর আহৃত অনুরূপ রবীন্দ্রকাব্যের একটি দৃষ্টান্ত আগে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এইসব প্রমাণ থেকে বোঝা যায়, আচার্য সুকুমার সেন, প্রমথনাথ বিশি প্রভৃতি মনীষীরা ক্রমশ চলতি ভাষায় লিখতে আরম্ভ করে ঠিক পথেই এগিয়ে চলেছেন। তাঁদের মধ্যে এখনও যে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব দেখা যাচ্ছে, তা রবীন্দ্রনাথের চিত্তচাঞ্চল্যেরই অনুরূপ ; যথাকালে তার অবসান হবে।

কতকগুলি দৃষ্টান্ত আলোচনা করে রবীন্দ্রগদ্যভাষার বিবর্তন ব্যাখ্যা করা যাক। ১৮৭৮ সালে তাঁর রচিত চলতি ভাষা ছিল এই রকম :—

"মেঘ, বৃষ্টি, বাদল, অন্ধকার, শীত—এ আর এক দণ্ডের তরে ছাড়া নেই। আমাদের দেশে যখন বৃষ্টি হয়, তখন মুষলধারে বৃষ্টির শব্দ, মেঘ, বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড়—তাতে একটা কেমন উল্লাসের ভাব আছে ; এখানে এ তা নয়, এ টিপ্ টিপ্ করে সেই একঘেয়ে বৃষ্টি ক্রমাগতই অতি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চলছে তো চলছেই। রাস্তায় কাদা, পত্রহীন গাছগুলো স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে, কাচের জানলার উপর টিপ্‌টিপ্ করে জল ছিটিয়ে পড়্‌ছে। আমাদের দেশে স্তরে স্তরে মেঘ করে ; এখানে আকাশ সমতল, মনে হয় না যে মেঘ করেছে, মনে হয় কোনো কারণে আকাশের রংটা ঘুলিয়ে গিয়েছে, সমস্তটা জড়িয়ে স্থাবর জঙ্গমের একটা অবসন্ন মুখশ্রী।"

এই ভাষার ক্রিয়াপদ, সর্বনাম, অব্যয় চলতি ভাষার ; কিন্তু শিক্ষিত জনসুলভ তৎসম শব্দের যথেষ্ট ব্যবহারও এতে আছে। মুখের ভাষায় কেউ "অতি নিঃশব্দ পদসঞ্চার" বললে সাধারণ লোকে হেসে ওঠে। কিন্তু শিক্ষিত ভদ্ররুচি বিদগ্ধ জন তাতে সঙ্কুচিত হবেন না। তিনি ঘরোয়া আলাপেও কিছু বেশি তৎসম শব্দ ব্যবহার করেন। রবীন্দ্রনাথের মুখের ভাষা যাঁরা শুনেছেন তাঁরা জানেন যে তিনি সাধারণ কথোপকথনেও শুধু যে সাজিয়ে গুছিয়ে বলতেন, তাই নয়, একটু "সাহিত্যিক" ধরণের ভাষাই ব্যবহার করতেন। শিক্ষিত অধ্যাপকবৃন্দও, বিশেষত সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক হলে, মুখের ভাষাতেও কিছু বেশি তৎসম শব্দ ব্যবহার করেন যা সাধারণ লোকে করে না। কেবল তদ্ভব ও দেশী শব্দের সাহায্যে মনের গভীর গোপন কথাও নিতান্ত অন্তরঙ্গ জনকেও বলা যায় না।

১৮৮১ সালেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে প্যারীচাঁদ ও বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার অনুসরণ করেন। তিনি কথোপকথনে বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় অনেক কম কথ্যভাষা ব্যবহার ক'রে "বৌঠাকুরাণির হাট" রচনা করেন। "চোখের বালি," "নৌকাডুবি" প্রভৃতি পুরোপুরি সাধুভাষায় রচিত। "বৌঠাকুরাণির হাট"-এ এক জায়গায় ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বোদ্ধৃত ভাষার দৃষ্টান্তের মতোই :—

"তুমি আমার সুভদ্রা, আমি তোমার জগন্নাথ !...মর্ মিন্‌সে, সুভদ্রা যে জগন্নাথের বোন !...আমি যে ঠাট্টা করিতেছিলাম, এইটে আর বুঝিতে পারিলে না ? ছি প্রিয়তমে।"

১৮৯৫ সালে "অতিথি" গল্পে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :—

এমন সময় এক ব্রাহ্মণ বালক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, তোমরা যাচ্ছ কোথায় ?" প্রশ্নকর্তার বয়স পনেরো-ষোলর অধিক হইবে না। মতিবাবু উত্তর করিলেন, "কাঁঠালে।" ব্রাহ্মণবালক কহিল, "আমাকে পথের মধ্যে নন্দীগাঁয়ে নাবিয়ে দিতে পারো ?" বাবু সম্মতি প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি।"

কেবল রীতির জোরেই সাধুভাষায় লিখেও রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাধুভাষা থেকে স্বতন্ত্র ধরণের ভাষা গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর খাঁটি সাধুভাষার চরম উৎকর্ষের একটু নমুনা ১৮৯৫ সালেরই আর এক রচনা থেকে দেওয়া হল :—

"আয়নায় আমার প্রতিবিম্বের পার্শ্বে ক্ষণিকের জন্য সেই তরুণী ইরাণির ছায়া আসিয়া পড়িল—পলকের মধ্যে গ্রীবা বাঁকাইয়া তাহার ঘনকৃষ্ণ বিপুল চক্ষু তারকায় সুগভীর আবেগতীব্র বেদনাপূর্ণ আগ্রহ কটাক্ষপাত করিয়া সরস সুন্দর বিম্বাধরে একটি অস্ফুট ভাষার আভাসমাত্র দিয়া লঘু ললিত নৃত্যে আপন যৌবনপুষ্পিত দেহলতাটিকে দ্রুতবেগে ঊর্ধ্বাভিমুখে আবর্তিত করিয়া মুহূর্তকালের মধ্যে বেদনা, বাসনা ও বিভ্রমের, হাস্য, কটাক্ষ ও ভূষণজ্যোতির স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি করিয়া দিয়া দর্পণেই মিলাইয়া গেল। গিরিকাননের সমস্ত সুগন্ধ লুণ্ঠন করিয়া একটা উদ্দাম বায়ুর উচ্ছ্বাস আসিয়া আমার দুইটা বাতি নিবাইয়া দিত ; আমি সাজসজ্জা ছাড়িয়া দিয়া বেশগৃহের প্রান্তবর্তী শয্যাতলে পুলকিত দেহে মুদ্রিত নেত্রে শয়ন করিয়া থাকিতাম—আমার চারিদিকে সেই বাতাসের মধ্যে, সেই আরাবলী গিরিকুঞ্জের সমস্ত মিশ্রিত সৌরভের মধ্যে যেন অনেক আদর, অনেক চুম্বন, অনেক কোমল করস্পর্শ নিভৃত অন্ধকার পূর্ণ করিয়া ভাসিয়া বেড়াইত, কানের কাছে অনেক কলগুঞ্জন শুনিতে পাইতাম, আমার কপালের উপর সুগন্ধ নিঃশ্বাস আসিয়া পড়িত এবং আমার কপোলে একটি মৃদু সৌরভ রমণীয় সুকোমল ওড়্‌না বারম্বার উড়িয়া উড়িয়া আসিয়া স্পর্শ করিত। অল্পে অল্পে যেন একটি মোহিনী সর্পিণী তাহার মাদকবেষ্টনে আমার সর্বাঙ্গ বাঁধিয়া ফেলিত, আমি গাঢ় নিঃশ্বাস ফেলিয়া অসাড় দেহে সুগভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িতাম।"

রবীন্দ্রনাথের এই ভাষা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত। সংস্কৃত সাহিত্যে ঘন ঘন ব্যবহৃত বহু সৌন্দর্যদ্যোতক বর্ণনা ও বিশেষ বিশেষ বাক্যাংশ রবীন্দ্রনাথ তাঁর ১৯১৫-পূর্ববর্তী রচনায় প্রায়ই ব্যবহার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তো সংস্কৃত ভাষার শব্দ-সৌন্দর্য ও ধ্বনিঝঙ্কারে নিতান্ত মুগ্ধ ছিলেন। বরং বঙ্কিম-যুগের সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি গদ্য লেখকদের রচনায় তদ্ভব শব্দের বেশি ও তৎসম শব্দের কম ব্যবহার চোখে পড়ে। প্রতাপচন্দ্রের "বঙ্গাধিপ পরাজয়" উপন্যাসের এক এক জায়গায় চলতি ভাষার প্রয়োগ প্রায় আধুনিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ১৯০১ সালে "চোখের বালি" উপন্যাসে কথোপকথনেও এই রকম বিশুদ্ধ সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন :—

বিহারী খাট হইতে উঠিল—অগ্রসর হইয়া কহিল, "মহেন্দ্র, তুমি বিনোদিনীকে কাপুরুষের মতো অপমান করিয়ো না—তোমার ভদ্রতা যদি তোমাকে নিষেধ না করে, তোমাকে নিষেধ করিবার অধিকার আমার আছে।"

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "ইহারই মধ্যে অধিকার সাব্যস্ত হইয়া গেছে? আজ তোমার নূতন নামকরণ করা যাক—বিনোদ-বিহারী।"

"ঘরে-বাইরে" উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ চতুর্থবার ভাষার ধারা পরিবর্তন করে সর্বত্র কথ্যভাষার সাহায্য গ্রহণ করলেন। য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, বৌ ঠাকুরানির হাট, অতিথি, চোখের বালি ও ঘরে-বাইরে তুলনামূলক-ভাবে আলোচনা করলে তাঁর গদ্যভাষার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলি বেশ ধরা যায়।

১৯১৩ সালে প্রকাশিত "সিন্দুরকৌটা" উপন্যাসে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩—১৯৩২) চতুর্থ স্তরের সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন :—

হাইকোর্ট বন্ধ হইবার পরদিন অন্তঃপুরমধ্যে বিজয় বৈকালিক চা-পান করিতে বসিয়াছিল। তাহার বিধবা ভ্রাতৃজায়া আসিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো, শুনলাম নাকি তুমি পশ্চিম বেড়াতে যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ বৌদিদি।"

"কোথা কোথা যাবে?"

বিজয় চা-পান শেষ করিয়া, রুমালে মুখ মুছিয়া, পকেট হইতে সিগারেট-কেসটি বাহির করিতে করিতে বলিল—"প্রথমে যাব গয়া। বুদ্ধগয়ায় দুই একদিন থেকে সেখান থেকে যাব এলাহাবাদ।"

প্রভাতকুমার ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬—১৯৩৮) বরাবরই কথোপকথনে কথ্যভাষা আর বর্ণনায় সাধুভাষা ব্যবহার করেছিলেন। শরৎচন্দ্র চলতি ভাষায় অন্য গদ্যরচনা সম্পন্ন করলেও তাঁর উপন্যাসে বরাবর ঐ চতুর্থ স্তরের সাধুভাষা প্রয়োগ করেছেন। এখনও যে-সব খ্যাতনামা সাহিত্যিক সব ধরণের রচনায় না হলেও উপন্যাসে ও গল্পে ঐ ধরণের সাধুভাষার আশ্রয় মাঝে মাঝে নিয়ে থাকেন, তাঁদের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বাধিক জনপ্রিয়।

১৮৬৯ সালের "বঙ্গাধিপ পরাজয়" উপন্যাসের এক জায়গায় দেখা যায় :—

"বেলা প্রায় চারদণ্ড আছে। মাঘ মাস, মাঠের জল শুকিয়েছে। কিন্তু জাঙ্গালের উত্তর খাদের গভীরতা বশত ছোট ছোট জেলে ডিঙ্গি যেতে পারে, এমন জল আছে। জাঙ্গালের দক্ষিণের খাদ শুষ্ক ও জলহীন। একে শীতকাল, তাতে আবার অপরাহ্ন; দিবাকর শ্রান্ত হয়ে যেন বেগার সাধিতে ঢিলে রকমে চৌকিদারের মতো আধচোখ বুজিয়ে ঢুলচেন।"

এই ধরণের সহজ চলতি ভাষা। এ সবই সমসাময়িক কালের প্যারীচাঁদ-কালীপ্রসন্ন-বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আগত কথ্যভাষার মিশ্রণ-প্রবণতার প্রভাব। উপন্যাসটি মোটের উপর সাধুভাষায় লেখা। "বঙ্গাধিপ-পরাজয়" বা তারকনাথ গাঙ্গুলির "স্বর্ণলতা" (১৮৭৪) ধরণের রচনার গদ্যভাষায় নতুন কোন ধারার উদ্ভব ঘটেনি। বাংলা সাহিত্যে প্রভাব বিস্তারের দিক থেকেই বিভিন্ন গ্রন্থের গুরুত্ব বিচার করা উচিত। সে হিসেবে যেমন "আলালের ঘরের দুলাল"-এর গুরুত্ব অসামান্য—কিন্তু "ফুলমণি ও করুণার বিবরণ" একেবারে গুরুত্বহীন, তেমনি প্রতাপচন্দ্র, তারকনাথ প্রভৃতি সকলেই প্রধান গদ্যপ্রবর্তক বিভিন্ন পূর্বসূরীদের প্রবর্তিত গদ্যভাষার দ্বারা প্রভাবিত বলে একরকম উপেক্ষণীয়। রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮—১৯০৯) বঙ্কিম-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন। তাঁর রচনারীতি বঙ্কিমের মতো বর্ণাঢ্য বা চিত্রশোভিত ছিল না। কিন্তু শান্ত সরল ভঙ্গির জন্যে তাঁর ভাষাও বেশ উপভোগ্য। সঞ্জীবচন্দ্র (১৮৩৪-৮৯) "পালামৌ" প্রবন্ধে খাঁটি রচনাসাহিত্য সৃষ্টি করে-ছিলেন এবং এরচেয়ে ভালো Belles Letters বা রম্য রচনা বাংলা সাহিত্যে কমই রচিত হয়েছে। কিন্তু এঁদের প্রত্যেকের রচনা বিবর্তনের পারম্পর্য রক্ষা করে যুগপ্রভাব নির্দেশে সহায়ক হলেও স্বতন্ত্রভাবে সকলের রীতি আলোচনা করা অনাবশ্যক। প্রধান ধারা-গুলির গতিপথ অনুসরণ করাই এই নিবন্ধের পক্ষে যথেষ্ট।

প্রভাতকুমার ও শরৎচন্দ্র তাঁদের গদ্যরচনায় ভাষার রূপরচনা ও ঐশ্বর্যবিধান অপেক্ষা সরলতা ও ভাবসমৃদ্ধি অনুশীলনের চেষ্টা বেশি করে করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যে সব বিস্ময়াবহ সৌন্দর্যচিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তেমন কিছু শরৎচন্দ্র ও প্রভাতকুমারের ভাষায় আঁকা যেত না। শরৎচন্দ্রের "আঁধারের রূপ" বা সাইক্লোন বর্ণনা প্রশংসনীয় হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রী-র রূপ বর্ণনা, জেবউন্নিসার চিত্তবিক্ষোভবিবৃতি বা রবীন্দ্রনাথের "দুরাশা", "ক্ষুধিত পাষাণ" প্রভৃতি গল্পের ভাষার চিত্রসৌন্দর্য শরৎচন্দ্রের রচনায় অপ্রাপ্য। কিন্তু সংক্ষেপে বোঝাবার ক্ষমতা, ভাবুকতা ফুটিয়ে তোলা—বিশেষ করে হৃদয়ের গভীরতম স্তরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবগুলির পূর্ণায়ত প্রস্ফুটনে শরৎচন্দ্র ও প্রভাতকুমারের কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়। "রত্নদীপ" উপন্যাসে প্রভাত-কুমার আর "শ্রীকান্ত" উপন্যাসে শরৎচন্দ্র সরলশ্রী অনাড়ম্বর বর্ণনা দিয়ে একরঙা ভাষার তুলিতেই সুকুমার অনুভূতিরাশির সূক্ষ্মতম কম্পন পর্যন্ত রেখায়িত করেছেন। কিন্তু তাঁদের সাহিত্যিক কৃতিত্ব অনিন্দনীয় হলেও তাঁদের গদ্যভাষায় এমন কোন অভিনব প্রবর্তনা নেই যার আলোচনা বাংলা গদ্যের বিবর্তনরহস্য বোঝার জন্যে অপরিহার্য।

ক্রমশ

এ ডে'জ প্লেজার

শ্রীতন্ময় বাগচী

চারিদিকের শান্ত নিস্তব্ধ এক সন্ধ্যা।

ঝোপে ঝাপে ঢাকা এক সাগর তীরে বসে আছে তরুণ-তরুণী। পিঠের কাছের একটা মোটা পাথর তাদের আড়াল করে রেখেছে। তার ওপর ঝড় জলের আঘাত সহ্য করেও একটা তক্তা পাতা আছে। সেটি হয়েছে আসন। সামনের এ্যাশ্‌বীচের ছোট ছোট ঝোপের মধ্যে দিয়েও তারা দেখতে পাচ্ছে শান্ত সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ রূপ। তারি ছোট ছোট ঢেউ এসে লাগছে তীরের নুড়ির গায়ে।

সহরের কোলাহলের বহু দূরে এই যায়গাটি। পাড় ধরে বেড়াতে বেড়াতে তারা এটি আবিষ্কার করেছে। তরুণী নীরব, তরুণ কিন্তু মুখর।

এই শান্ত নির্জনের মাঝে গড়ে তুলব বাড়ি। বরফের মত সাদা হবে তার রং। খড়ের চালের ওপর আইভি লতা গজিয়ে উঠবে।

'জানলাগুলো থাকবে খুব পুরানো। তার শার্সি হবে এতটুকু কিন্তু রং থাকবে সবুজ। দরজার ওপর দেওয়ালের গায়ে ঝুলবে বনের সবচেয়ে বড় হরিণের মাথা। বছরের পর বছর চড়াই আর শালিখ এসে বাসা বাঁধবে গোয়াল-ঘরের চালে কিংবা ঘুলঘুলিতে।'

'এখানে ক্ষেত খামার কোথায় যে পাখিগুলো বেঁচে থাকবে?'

'ক্ষেত খামার না থাক্ তবু ওদের থাকতেই হবে। আমি দেখব রোজ সন্ধ্যায় ওরা বাড়ি ফিরে আসবে, আর তাদের বাচ্চারা কেমন আনন্দে কিচির-মিচির সুরু করে দেবে!'

'শালিখ আর চড়াই না হয় থাকথে, কিন্তু তা বলে ওদের বাচ্চাগুলো নয়। ওরা বড় জ্বালায়। তার চেয়ে একটা বেশ বড় সবুজ রং-এর টিয়া পাখি থাকবে। আমরা কফি খেতে ঢুকলেই সে সাদর সম্ভাষণ জানাবে!'

'টিয়া পাখির সাথে একটা বাচ্চাকেও থাকতে হবে।'

'বেশ। তবে বাচ্চা কিন্তু খুব ছোট্ট হওয়া চাই।'

'হ্যাঁ দেখ—ঠিক এতটুকু…'

'খাবার ঘরের দরজার রং হবে সবুজ, আর সেগুলো খুব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হবে। দরজার ওপর-তাকে থাকবে নানা রকমের অদ্ভুত সব বাসন। চেয়ারগুলোরও রং হবে সবুজ। আর তার গায়ে থাকবে লাল ফুল আঁকা। এ ছাড়া ঘরের এক কোণে একটা সবুজ টেবিলের ওপর তামার চায়ের সরঞ্জাম থাকবে।'

'আর দেওয়াল-ঘড়ী?'

'হাঁ তাও থাকবে। দেয়ালে ঝুলবে আদাম-ইভের পতনের ছবি, আর লোহিত সাগরে ফ্যারাও-এর ডুবে-মরা ছবি।'

'কিন্তু বৈঠকখানা?'

'বৈঠকখানায় থাকবে শুধু তিনটে জানলা—যাতে করে গাছের ফাঁক দিয়ে সমুদ্র দেখা যাবে।'

'তাহলে যে সারাক্ষণ রৌদ্র ঢুকবে!'

'জানলাগুলো খোলা থাকবে ভেবেছ? না…না… সুগন্ধ লতার ঝাড়ে ঢেকে যাবে জানলা। তাহলে রোদ্দুর সোজা ঢুকতে পারবে না। কতক ফালি টুকরো এসে পড়বে শুধু। ঘরের মাঝখানে থাকবে ডিমের মত মেহগিনির টেবিল, তার পাগুলো হবে নখের মত। নীচু নীচু গদিতে মোড়া চেয়ার আর এক কোণে পিয়ানো। জানলার নীচেই থাকবে রাঙা টবের ওপর পাম গাছের চারা।'

'আমার সেলাই-এর টেবিল কোথায় থাকবে ?'

'সেটা থাকবে জানলার ঠিক নীচে। পুরাণো গীর্জার জানলার মত সেটা শিসের শার্সিতে আঁটা। তাতে গাঢ়ো লাল নীল আর হলদে রং-এর থাকবে সাধু সন্ন্যাসীর ছবি। তাকের ওপর উঠবে ফার্ণ আর আইভি লতা। বড় বড় টবে থাকবে হলদে আর সাদা শালুক। আর কাঁচের গ্লাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে সোনালি মাছ। তুমি নিজে হাতে তাদের খাবার দেবে। আরো চাই ক'একটা বরফের মত সাদা, সমুদ্রের মত নীল আর ঝরা ফুলের মত ক'একটা পায়রা। বারান্দার সিঁড়িতে তুমি যখন শুভ্র পোশাক, নীলাভ জুতো মোজা, আর গলায় রক্ত-প্রবালের মালা পরে দাঁড়িয়ে থাকবে তখন তারা তোমার মাথার ওপর ঘুরে বেড়াবে। তোমার গায়ে বসবে, মাথায় চড়বে, আবার হাত থেকে ধান খেয়ে যাবে…'

তরুণী আরো একটু সরে এলো তরুণের কাছে।

'আমার পড়বার ঘর ?'

'তোমায় ঘর হবে পূর্বদিকে। জানলার সামনে নীরব প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে থাকবে প্রকাণ্ড এক বাদাম গাছ। গাছের নীচে থাকবে সবচেয়ে কচি সবচেয়ে কোমল ঘাসের ওপর বেতের চেয়ার টেবিল আর ঝুলবে দোলনা। দু' ফুট লম্বা একটা দূরবীণও বাদ যাবে না। সেটার কাজ হবে জাহাজের যাতায়াত লক্ষ্য করা।'

'আসবাব পত্র ?'

'সেগুলো তোমার যখন হবে, তখন ঠিক করবে তুমি।'

'না…না তোমাকেই বলতে হবে।'

'সাদার মাঝে সোনালী রেখা আর তার ওপর ফিকে নীল জমিতে ফুল তোলা রেশমের গদি। চামড়ার মত কাগজ-ঢাকা দেওয়ালে থাকবে সোনালী আভা আর পর্দার কাপড় ও রং হবে চেয়ারের মতই। ঘরের ঠিক মাঝখানে পাতা থাকবে লম্বা টেবিল। মাথাটা বেঁকানো আর ধারে ধারে সোনার জল লাগানো। তার ওপর কাঁচের ফুল-দানিতে ঝুলবে তিনকোনা কাঁচ।'

'সব তো হোল, কিন্তু উনুনের কি ব্যবস্থা হবে শুনি ?'

'উনুন কি হবে ? বসন্ত আর গরমকালে বাড়ি-ঘর বেশ গরম থাকবে আর শরৎ-শীতে তো কোপেনহেগেনে থাকব গিয়ে।'

'বাকি রইল তোমার পড়ার ঘর আর বেডরুমটা।'

'আমার পড়ার ঘরও হবে ঐ পূবদিকেরই কোণে। জানলা দিয়ে দেখা যাবে ক্রোশের পর ক্রোশ ধরে শুধু বন জংগল আর পাহাড়। বিদায়ী সূর্যের শেষ আলোয় উদ্ভাসিত কত করুণ ছবি। জানলা হবে মোটে একটা—তার ওপর ঝুলবে মোটা ভারি পর্দা। কাপড়-চোপড়ের বদলে থাকবে শুধু বাঘ সিংহের ছাল চামড়া। আসবাব হবে শক্ত ওক্ কাঠের—যাতে একটা গুরু গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। ছবিগুলো হবে সেকেলের বীর পুরুষদের মত। দেওয়ালে ঝুলবে অস্ত্রশস্ত্র; আর একটা গোপন দরজা। বই-এর পিছন দিকে একটা মরচেধরা পেরেকে লেগে থাকবে গোপন কলা-কৌশল।'

অজানা আশংকায় অহেতুক শিউরে ওঠে তরুণী!

'সেই গোপন দরজা দিয়ে কোথায় যাওয়া হবে শুনি ?'

'অ…নে…ক অ…নে…ক নীচের অন্ধকার সুড়ঙ্গে। যেখানে একশ' বছর আগে এক বাড়ির মালিককে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছিল। না…তা নয়। দরজা দিয়ে যাওয়া যাবে গোল ঘরটিতে—যেখানে তুমি পালংকে শুয়ে থাকো। মাথার কাছের মার্বেলের টেবিলের ওপর নিট মিট করে প্রদীপ জলছে। সেই আলো-আঁধারের মাঝে তুমি যেন কি দেখছ আর ভাবছ। বই পড়ছিলে কিন্তু এখন সেটা সাদা ধপধপে চাদরের ওপর অনাদৃতভাবে পড়ে আছে। গলার নীচে দু'হাত রেখে শুয়ে আছে;—কালো নরম চুলগুলো মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। বড় বড় দু' চোখে স্বপ্নাতুর ভাব যেন কিসের প্রতীক্ষায় আছে! যেন কোন গোপন ইংগিত শুনছ! হঠাৎ শুনতে পেলে গুপ্ত দরজা খোলার একটু আওয়াজ। তোমার ঠোঁটের ওপর খেলে গেল এক টুকরো ছোট্ট শান্ত হাসি! নড়লে না—সেই ভাবেই শুয়ে রইলে। চোরের মত পায়ের খুট্ খুট্ অস্পষ্ট শব্দ যেন ক্রমেই এগিয়ে আসছে। টেবিলের ওপর বইটা ছুঁড়ে ফেলে দু'চোখ বুঁজে পাশ ফিরে শুলে। ধীরে ধীরে দরজাটা খুলে গেল। তারপর একটা মুখ

নিঃশব্দে নেমে এলো তোমার মুখের ওপর! আনন্দের অস্ফুট একটু শব্দ করে তুমি তার গলাটি জড়িয়ে ধরলে…'

চারিদিকের সুবাসিত গন্ধ-বন্যার মাঝে এমনিভাবে তরুণ-তরুণীর কল্পনা ডানা মেলে দিয়েছে। সমুদ্র তটে এসে আছড়ে পড়ছে ছোট্ট ছোট্ট শান্ত ঢেউ। চারদিকে ধীরে ধীরে নামছে অন্ধকারের স্বচ্ছ আবরণ। তাদের দৃষ্টি চলে গেছে বন-ঝোপের ঘন সবুজ মাথা ভেদ করে সুদূরের আকাশের গায়ে। ধীরে ধীরে প্রকাণ্ড থালার মত সূর্য ডুবে গেল মেঘের কোলে। টুপটাপ করে পড়তে সুরু হোল শিশিরের ফোঁটা! তরুণ উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'চল এবার ওঠা যাক্। মা বোধ হয় চা নিয়ে অপেক্ষা করছেন।'

ক্লান্ত শূন্য মনে বন জংগল পার হয়ে তারা এগিয়ে চলল ষ্টেশনের দিকে।

'এখান থেকে আর যেতে ইচ্ছে করছে না'—হঠাৎ থেমে পড়ে তরুণী বলে উঠল।

শংকার চিহ্ন ফুটে উঠল তরুণের চোখে-মুখে।

'তোমার তো কিছুই অজানা নেই…'

'না…না…ঠিক আছে। সত্যি কি অবুঝের মত কথাই না বললাম!'

ষ্টেশনে এসে পড়ে দু'জনে। টিকিট ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে তরুণ একটু ইতস্তত: করতে থাকে।

তরুণীর চোখে এড়াল না তরুণের ইতস্তত: ভাব। সাগ্রহে বলে ওঠে—'হ্যাঁ থার্ড ক্লাসই কাটো। এ সময় ট্রেণে তেমন ভীড় থাকে না। তাছাড়া আজ অনেক খরচ হয়ে গেছে সে খেয়াল আছে?'

* গুস্তাব বিয়েড্ অবলম্বনে।

নাম ও প্রেম

(Spenser-এর একটি সনেটের অনুবাদ)

শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত এম-এ

লিখ্‌লাম নাম তার একদিন বালুকা-বেলায়
পরক্ষণে ঢেউ এসে মুছে নিল চোখের নিমেষে;
আবার লিখেছি নাম, অমনি জোয়ার ধারা এসে
আমার যত্নের লেখা ধুয়ে দিল এক লহমায়।
'বৃথা আশা, বললে সে, 'বৃথা এ-চেষ্টার ইতিহাস',
অমর করার সাধ ক্ষণস্থায়ী যা' এই ধরায়;
আমি নিজে ভালোবাসি এই অবক্ষয় যে হেথায়,
মুছুক এমনি ক'রে আমার এ-নামের আশ্বাস।'

'তা' তো নয়'—আমি বলি—'তুচ্ছ যা' মিলাক ধূলি' পরে,
তুমি র'বে চিরদিন এ-ধরায় যশের অমৃতে;
আমার কবিতা দেবে অমরতা তোমায় আদরে,
তোমার মধুর নাম লিখে' দেব স্বর্গ-সরণিতে!
মরণ আসবে যবে ধরণীরে পরাজয় দিতে,
আমাদের প্রেম শুধু বেঁচে র'বে অমর অক্ষরে।'

জীবন সন্ধ্যায় তুমি

(W. B. Yeats অবলম্বনে)

শ্রীপঞ্চানন বসু

জীবন সন্ধ্যায় তুমি পক্ককেশে ঘুমচোখে ব'সে,
তন্দ্রায় জড়িত শ্লোকে এ-কবিতা পড়বে সাদরে,
কোমল দৃষ্টির মায়া, ধরা দেবে স্বপ্নের গোচরে,
পুষ্পিত একদা চোখে এবং যে গভীরতা খ'সে;

অনেকে বেসেছে ভালো তোমারি-সে মুহূর্ত্ত উচ্ছল,
লাবণ্য অথবা প্রেমে—অকৃত্রিম কিম্বা ছলনার,
কিন্তু সে বেসেছে ভালো পরিব্রাজ আত্মাকে তোমার,
এবং তোমার দুঃখ বিচলিত মুখের সম্বল;

আপন গম্ভীর বৃত্তে সবিষাদে চিন্তানত শিরে
তুলবে গুঞ্জনে শেষে—সেই প্রেম ধীরপদে তার
কেমনে লঙ্ঘন ক'রে মস্তকের উত্তুঙ্গ পাহাড়
লুকাল নীরবে মুখ এক ঝাঁক তারকার ভীড়ে।
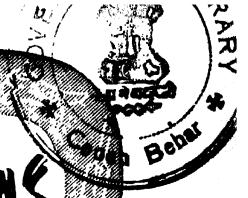
তোমরা কি লক্ষ্য করেছ ?

উপানন্দ

ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট। তাকে দেখা যায় না। সে আসে যেন হঠাৎ মেঘ-ভাঙা রৌদ্রের মত। জীবনের বীজ যেমন ভাবে বুনে যাবে তোমরা, তেমন ভাবে ফল্‌বে ফসল। সেই ভবিষ্যৎই আন্‌বে তোমাদের শস্য সঞ্চয়ের দিন, সেদিন পড়বে মনে কোন্ ক্ষেতে ভুলে-যাওয়া কোন্ ঋতুর রৌদ্র আলো আর বৃষ্টি ধারায় বীজ বুনেছিলে তোমরা। ফসল যদি ভালো না ফলাতে পারো, তা হোলে চোখের জলে কাটিয়ে দিতে হবে জীবনের সুদীর্ঘ দিনগুলি, অনাদরে, অবহেলায়, দারিদ্র্যে আর অর্দ্ধাশনে—কত কষ্টই না পেতে হবে! কিন্তু তখন আর কোন উপায় থাকবে না যাতে করে রীতিমত অর্থোপার্জ্জন করে দুঃখকষ্টের লাঘব করতে পারো। প্রত্যেকটী মুহূর্ত্ত চলেছে অবিরাম গতিতে—তার চলার শব্দ শোনা যাচ্ছে ঘড়ির কাঁটায়—টিক্ টিক্—টিক্ টিক্। আজ যে কাজটা ভালো করে করা হোলো না, যে পড়াটা ভালো করে তৈরী করা গেল না, যে আঁকটা ভালো করে কষে উত্তর মেলানো হোলো না, সেই রইলো পড়ে ভুলে-যাওয়ার অন্ধকারে, ফলে আর তার দিকে ভালো করে দৃষ্টি দেবার আসবে না অবসর। এম্নি করে পেছনে-ফেলে-রেখে যাওয়া কাজগুলো আর পাওয়া যাবে না খুঁজে। সময়ের মূল্য ও শিক্ষার আবশ্যকতা যারা উপলব্ধি করতে পারে না ছাত্র জীবনে, তারাই উত্তর-কালে পায় অশেষ দুর্গতি সমাজ সংসারের সর্ব্বক্ষেত্রে। এজন্যে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে জীবনের বীজ বুনে যাও উর্ব্বর করে জ্ঞানের ক্ষেত্র।

তোমরা কি লক্ষ্য করেছ টুকরো টুকরো পড়ে থাকে তোমাদের মন নানাদিকে, তাই পড়বার সময়ে কথা বল্‌তে থাকো আর সঙ্গীদের সঙ্গে গল্প করো আবোল তাবোল। যা কিছু বল্‌বার বা জিজ্ঞাসা কর্‌বার থাকে, তাও মন থেকে যায় হারিয়ে—যা পড়ো, তাও আলোচনা কর্‌বার জন্যে ইচ্ছুক হওনা, তাই পড়ার মত পড়া হয় না। তোমাদের অলস কল্পনার রঙীণ ফানুসগুলো উড়িয়ে দিয়ে, মানুষ হবার পথের দিকে চেয়ে দেখো না। টুকরো টুকরো মন নানা দিক থেকে গুটিয়ে এনে বইয়ের পাতায় পাতায় টেনে রেখে দাও, যেন লেখাপড়া সার্থক ও সুন্দর হয়ে ওঠে। বই পড়া খুবই দরকার, গ্রন্থের মত পরম বান্ধব, পবিত্র সহচর কোথায় পাবে?

সাগর পারের ছেলে মেয়েরাই শুধু নয়, আজকের দিনে অবাঙালীরাও খুব অধ্যয়ন করে—তারা আজ তোমাদের ওপর টেক্কা দিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করেছে কিন্তু তোমাদের মন উড়ে বেড়াচ্ছে চারিদিকে—তোমরা চলেছ খেলার মাঠে, সিনেমা হলে, তাসের আড্ডায় আর পাড়া বেড়াতে, পরীক্ষার কিছু আগে অমনি টেনশন নিয়ে পড়তে বসো, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে কিনা তার অনিশ্চয়তার ঘূর্ণী হাওয়ায় শেষ পর্য্যন্ত পাক খেতে থাকো—এম্নিভাবে আত্মনাশী নীতি অবলম্বন করেছ তোমরা অধিকাংশ বাঙালী ছাত্র ছাত্রী। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে হটে আসছে আজ বাঙালী, এই শোকাবহ, এই ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা একবারও ভেবে দেখো—গৃহ-শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীকে পর্য্যন্ত তোমরা অগ্রাহ্য করো, তাঁরা পড়াতে এলে হয় আবোল তাবোল গল্প করো, নয় আজ আর পড়বো না বলে বিদায় করে দাও—এম্নি করে নিজেরা নিজেদের ফাঁকি দিয়ে চলেছ, জাতিকে নিয়ে চলেছ অবনতির পথে, অভিভাবক ও পরিবারবর্গকে দিচ্ছ মর্ম্মান্তিক বেদনা।

পাঠ কঠিন হোলে ভয় পাবে কেন? বরং যত কঠিন হবে, ততই তাকে বেশী মনোযোগ দেবে—শুদ্ধরূপে মুখস্থ কর্‌বার চেষ্টা করবে। আজ তোমাদের উচ্চারণ দোষ ঘটছে এমন এক শ্রেণীর লোকের কু-শিক্ষার—যা হয়ে উঠছে হাস্যোদ্দীপক ও গ্লানিকর, তাই তোমাদের মুখে শুনি—'ডিস্‌চার্জ্জের' বদলে 'ডিচার্জ্জ', 'আকস', শুনি 'আস্‌কের বদলে—এ্যাকের বদলে শুনি এ'ক, ব'ড়োর বদলে শুনি 'বরো'। ঠিক মত উচ্চারণ না হোলে কথা বুঝবার অবকাশ কোথায়? 'সঙ্গে,' শব্দটী ভুলে গেছ—'সাথে' বলো, যা একমাত্র কবিতাতেই প্রচলিত—এটী গভীর অনুতাপের বিষয়। সে বকেছ এর পরিবর্তে বল্‌তে শিখেছ সে

'বকা পেয়েছে। সে ডাকছে, না ব'লে তোমরা বলো—'সে ডাকে' এই সব শ্রুতিকটু শব্দ করেছ তোমরা পুঁজি। অসংখ্য বানান ভুল দেখা যায় তোমাদের লেখায়, তার কারণ তোমরা অন্যমনস্ক। পূর্ব্বে নোট বই বা গৃহ-শিক্ষকের প্রচলন ছিল না। সে সময়ে সেই উনবিংশ শতাব্দীতে আর বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালীর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনা হয়েছিল—দারিদ্র্যলাঞ্ছিত গৃহে গৃহে জন্মেছিলেন বাঙালীর শ্রেষ্ঠ মনীষীরা বঙ্গ জননীর প্রাতঃস্মরণীয় সন্তানরা—আর আজ ?

তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের উন্নতি বা অবনতির ওপর দেশের ও জাতির উন্নতি বা অবনতি সমসূত্রে আবদ্ধ? তাই বলি, তোমরা পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী হয়ে ভাঙা বাংলার ঐতিহ্য-হারানো জীর্ণ প্রাকারের ছিন্ন পতাকাগুলিকে তুলে নিয়ে ভূমণ্ডলের ওপর বাঙালীর গৌরব পতাকা তুলে ধরবার জন্যে ঐকান্তিক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও—ভারতের সমস্ত সঙ্কীর্ণ নীতিকে পদদলিত করে, সমস্ত বাধা বিঘ্ন তিরোহিত করে তোমরা স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষ, ভারত-ভাস্কর রবীন্দ্রনাথ, বাগ্মীপ্রবর বিপিনচন্দ্র পাল, আচার্য্য জগদীশ চন্দ্রের মত নিজেদের জীবন গঠন করে ভাগ্যবিড়ম্বিতা বঙ্গজননীকে রাজ-রাজেশ্বরী করে তোলো। এখন তোমাদের কাছে বড় বড় মনীষীদের কথা বলছি—শোনো।

গ্রন্থ পাঠ সম্পর্কে সোপেনহার বলেছেন, যে কোন প্রয়োজনীয় উল্লেখযোগ্য বই পেলেই, অবিলম্বে দু'বার পাঠ করে নেওয়া উচিত—দু'বার অন্তত না পড়লে কোন বই সম্যকভাবে উপলব্ধি হয় না। প্রথমবার পড়বার সময় হয়তো চিত্তের অস্থিরতা থাকে, সুষ্ঠুভাবে অধ্যয়ন করবার মেজাজের অভাব ঘটে, এজন্যে বইয়ের সঙ্গে নিবিড় সঙ্গলাভ হয় না, কিন্তু দ্বিতীয়বার পাঠের পর সে অবস্থা আর থাকে না, গ্রন্থের পরিচয় পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায়। চার্লস ব্রে বলেছেন, প্রত্যেক ভালো বই অন্ততঃ তিনবার পড়ে নিলে তবে ঠিক মত পড়া হয়। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ যতবার পড়া যায়, ততবারই পড়তে ইচ্ছা হয়—যে সব গ্রন্থ ক্লাসিক মর্য্যাদালাভ করেছে, তারা আমাদের কাছে চির নূতন।

কোল্ বজের কতকগুলি প্রিয় গ্রন্থ ছিল, তার মধ্যে অন্যতম 'পিল্‌গ্রিমস্ প্রোগ্রেস'—এই বইখানি তিনি বহুবারই পোড়েছেন—কখন দার্শনিক দৃষ্টি নিয়ে ধর্ম্মযাজকের মত, কখন ভক্তির প্রগাঢ়তায় ভাগবতের মত, কখন বা কবির হৃদয় নিয়ে সারস্বতের মত—প্রত্যেকবারেই নব-নব ভাবের রসাস্বাদন করে তিনি আনন্দে বিভোর হয়েছেন। জন ষ্টুয়ার্ট মিল পোপের হোমার পড়েছেন বিশ ত্রিশবার। মিলের মতই একাধিকবার পড়েছেন অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি।

'হাম্‌ফ্রে ক্লিনকার' বইখানি পঞ্চাশবার পড়েছেন রাগবির ডাঃ আর্ণল্ড। বারে বারে একখানা বই পড়াটাই বড় কথা নয়, পড়ার মত পড়াই হচ্ছে আসল কথা। লরেন্স ষ্টার্ণ বলেন, এরিষ্টটলের 'মেটাফিজিক্স' চল্লিশবার পড়েও আভিসেন্না ও লিসেটাস বিন্দু বিসর্গ বুঝতে পারেন নি, তবু তাঁরা বারে বারে পড়েছেন, শেষে বুঝতে পেরে বইখানি মুড়ে রেখেছিলেন।

'ক্লারিসা' বইখানি সতেরো ঘণ্টা ধরে প্রত্যহ পড়তেন বেঞ্জামিন রবার্ট হেডেন। জেন অষ্টেনের প্রত্যেক উপন্যাসই মুখস্থ ছিল লর্ড রোসবেরির। প্রত্যেক বছরে একবার করে তিনি স্কটের সব উপন্যাস পড়তেন। আমাদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা বঙ্কিম, শরৎ ও রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী বারে বারে পড়ে থাকেন, অনেকের মুখস্থও হয়ে গেছে।

কয়েক বছর আগেকার কথা—'দি টাইমস্' পত্রিকায় একটি সাহিত্য পরিষদের পরিচয় দেওয়া ছিল। এই পরিষদের সভ্য হোতে গেলে, থ্যাকারের 'এস্‌মণ্ড' বইখানি পঁচিশ বার পড়ে নিতে হবে নতুবা সভ্য হওয়া যাবে না। কার্লাইলের ভক্ত রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার স্কট কার্লাইলকে বলেছিলেন যে, 'ফ্রেঞ্চ রেভলিউসন' বইখানি তিনি চার বার পড়েছেন,—গেঁথে আছে তাঁর মনে এই বইয়ের প্রত্যেকটী কথা। প্যাটারের 'ষ্টাডিজ ইন্ দি হিষ্ট্রি অব দি রেনেসাঁস' বইখানি অস্কার ওয়াইল্ডের মতে সোনার বই। এই বইখানি না নিয়ে তিনি কোথাও বেড়াতে যেতেন না।

একদা ওয়াল্ট হুইটম্যানের সদ্যপ্রকাশিত লিভস অব গ্রাস' কবিতার বইখানি দিয়েছিলেন ফোর্ড ম্যাডক্স ব্রাউন, এ্যানি গিলক্রাইষ্টকে। এই বই পেয়ে শ্রীমতী গিলক্রাইষ্ট আনন্দে অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন এই বই পাবার পর তাঁর কাছে আর কোন বই পড়বার মত বলে বিবেচিত হয় নি। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন—'এটা আমাকে একেবারে মন্ত্র মুগ্ধ করেছে, বারে বারে পরমবিস্ময়ে আর আনন্দে পাঠ করি—'

টেনিসনের 'মড' প্রথম প্রকাশিত হোলে বার্ক বেক হিল রাত্রিদিন সব সময়েই তাঁর কাছে মডের এক কপি রাখতেন। কৈশোরোত্তর দিনে মার্ক প্যাটিসন এতবার পড়েছেন গিলবার্ট হোয়াইটের 'ন্যাচার্ল হিষ্ট্রি অব সেলবোর্ণ' যে বইয়ের প্রত্যেক পৃষ্ঠাটী তাঁর মুখস্থ ছিল, আর গিবনের আত্মচরিত পড়ে পড়ে তাঁর এমনই অবস্থা হয়েছিল যে প্রত্যেকটী অনুচ্ছেদ তিনি মুখস্থ বলতে পারতেন।

ফ্রেডারিক হ্যারিসন বলেছেন—'স্বজাতীয় স্বনামধন্য কবিদের গ্রন্থ শুধু পড়া নয়, বারে বারে এমন ভাবে পড়া দরকার যাতে তাঁদের গানের সুর, তাঁদের মন মেজাজ, তাঁদের ভাব-অনুভাব আমাদের অন্তরে, আমাদের প্রকৃতিতে মিশে যায়—যে পৃথিবী তাঁরা আমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, সেই পৃথিবীতে যতদিন আমরা বেঁচে থাকবো, ততদিন তাঁদের অনুধ্যান করবো আর পরিপুষ্টিলাভ করবো তাঁদের মানসিক ভোজ্য গ্রহণ করে—'

কী অসাধারণ কবিপ্রীতি আর কাব্যানুরাগ! এইসব মনীষীর মর্ম্মের মর্ম্মর বাণী যেন তোমাদের মনে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে যাতে তোমরাও এঁদের মত গ্রন্থপাঠ করে জ্ঞানী হোতে পারো। আজকের দিনের পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিদের মত জ্ঞান-তপস্বী, তাই এঁরা কোন কাজে ফাঁকি দেন না—একনিষ্ঠ সাধনায় রত থাকেন যে কাজই করুন না কেন। আজ তাই পাশ্চাত্য জগতের

ঘরে ঘরে দেখা দিয়েছে উন্নত বলিষ্ঠ প্রজ্ঞাবান দীপ্তিমান অতি-মানুষ। দুঃখ এই, পাশ্চাত্য জাতির ভালো দিকটা আমরা গ্রহণ করলাম না, অনুকরণ করলাম তার খারাপ দিকটা, তাই এসেছে পতন। নিজের জন্মভূমির ওপর যদি এসে থাকে তোমাদের সহজাত ভালোবাসা, হৃদয়-মন ও দেহের পরিপূর্ণ শক্তির সাহায্যে জন্মভূমিকে গড়ে তোলবার থাকে অদম্য স্পৃহা, তাহোলে তোমরা তোমাদের ছাত্রজীবনকে সুমহান্ করে তোলো, বাঙালীর হৃত গৌরব ও সম্পদকে উদ্ধার করে এনে আমাদের আজকের দিনের কলঙ্ক দূর করো। তোমাদের আপনা থেকে মনে জেগে উঠুক জিজ্ঞাসা—'আমরা আজ কোথায়?' আমাদের বিদায় গোধূলিতে জন্ম নেবে তোমাদের নবীন যুগের উষা-ভাবী বাঙলার গৌরব। আশা করে আছি তোমরা একদিন বাঙালীর মুখ রক্ষা করবে। দুঃখের বিষয় পাঠ করেও আজকের দিনে কেউ প্রকৃত জ্ঞানী হয়ে উঠতে পারছে না। পল্লব-গ্রাহী বিদ্যার্জন করে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সে নিজেকে অসহায় বোধ করছে। সাধারণ স্নাতকোত্তর ছাত্রের মধ্যেও বিশেষ জ্ঞানবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না, স্বতন্ত্র ভাবে চিন্তা করে বিচার বোধশক্তি প্রকাশ করবার ক্ষমতা যা ছিল বাঙালীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, আজ তা অবলুপ্ত প্রায়—প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আজকের দিনের বাঙালী ছেলেমেয়েরাই কেবল পিছিয়ে পড়ছে, এটা গভীর অনুতাপের কথা। তোমরা এগিয়ে চলো।

অর্দ্ধশিক্ষিত লোকের মতই সাম্প্রতিক শিক্ষিত লোকের চালচলন কথাবার্ত্তা আর হাবভাব লক্ষ্য করা যায়। যেসব কুসংস্কার, চিত্তের মলিনতা, মিথ্যা ভাষণ, ধাপ্পাবাজি, মানসিক দৈন্য ও কূটচক্রান্ত সাধারণ অশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে রয়েছে, সেই সবই এদের মধ্যে অন্তর্নিহিত—ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে এবং কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষকে হয়রাণ করে, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও বিমূঢ়তার পরিচয় দিয়ে তারা স্বদেশেরই অকল্যাণ করে থাকে, শুধু নিজেদের নয়।

বর্ত্তমানের তমসাচ্ছন্ন সভ্যতার রাজপথে শুরু হয়েছে তোমাদের দৈনন্দিন পদচারণা—নানা প্রলোভন তোমাদের চারিদিকে ভ্রাম্যমান; এরই ভেতর তোমাদের খুঁজে নিতে হবে কোথায় অতীতের গৌরবোজ্জ্বল দীপশিখা রয়েছে। তথাকথিত সাধারণ স্নাতকোত্তর ছেলেমেয়েদের মত তোমরা যেন কুপ্রবৃত্তি, কুবুদ্ধি ও কুসঙ্গের চাপে পড়ে নিজেদের আত্মবিলোপ সাধন করো না—ভবিষ্যৎ জীবনকে যেন করোনা করুণ ও অশ্রুস্নাত। জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্পকলা বিষয়ক নানা মূল্যবান গ্রন্থ পড়ে জ্ঞান আহরণ করবার চেষ্টা করো—আর তা কার্য্যে প্রয়োগ করে দেশের সুসন্তান হবার জন্যে প্রস্তুত হও—কেবলমাত্র উত্তেজক চটুলতার গ্রন্থ পড়ে আর সিনেমা দেখে অমূল্য সময় অপচয় করো না, এই আমার অনুরোধ তোমাদের কাছে।

পাখী ও কবি

'বৈভব'

ওগো পাখী গাও গান
কাহার তরে?
কে শোনে ও গান তব
সোহাগ ভরে?
বনানীর মনপ্রাণ
করে কেন আনচান
শুনিয়া তোমার গান
শাখার পরে
তুমি পাখী গান গাও
কাহার তরে?

কেন তুমি গান গাও
কেন একেলা
কিছু কি লাগেনা ভালো
পৃথিবী-খেলা?
তুমি বুঝি বাসো ভালো
ঊষার অরুণ আলো
তারি তরে গান ঢালো
প্রভাত বেলা?
পৃথিবী কি শুধু ওগো
মায়ার খেলা?

নই আমি নই কেউ
ওগো ও কবি!
আমার প্রভাত গান
জাগায় রবি।
কাহারেও চাহি নাই
যেখানেতে সীমা নাই
সেখানেতে উড়ে যাই
ফেলিয়া সবি।
নই আমি নই কারো
ওগো ও কবি!

তোমার পৃথিবী আর
বনানী ফেলি
সুনীল আকাশ বুকে
একেলা খেলি।
অসীমের গান গাই
অসীমের প্রাণ পাই
দেখি তার সীমা নাই
নয়ন মেলি,
সুনীল আকাশ বুকে
একেলা খেলি।

যখন বাতাস ঠেলি
উপরে উঠি
মনে হয় পৃথিবী সে
দিয়াছে ছুটি;
অজানা কি হিল্লোলে
আমার হৃদয় দোলে
সেথা অসীমের কোলে
উঠি গো ছুটি,

পৃথিবী যে আজ মোরে
দিয়াছে ছুটি !
সেথানেতে নির্জনে
কাটাই ভালো
সহসা যে নিভে যায়
পরাণ আলো ;
গান মোর থেমে যায়
প্রাণ করে হায় হায়
চারিধার চোখে ভায়
কি ঘোর কালো !
সেথানে একেলা আমি
ছিলাম ভালো।

পৃথিবী ডাকিয়া কয়
'আয় রে নামি
আমার এ কলরোল
গিয়াছে থামি।'

সুদূরের কুয়াসার
কল্পনা পাখা-ভার
বহিতে পারি না আর
ফিরিনু আমি

পৃথিবী ডাকিল হায়—
—আয় রে নামি !

যাই যাই ছুটে যাই
আকাশ বুকে
লাগে নাকো ভালো মোর
স্নেহ ও সুখে

আকাশ ডাকিছে ওই,
'কই পাখী, কই কই—
মোর বুকে প্রাণ তুই
যাস্ কি দুখে ?'

যাই যাই ছুটে যাই
আকাশ বুকে !

জাতকের গল্প

রথীন দেব

জাতকের গল্প শোনার আগে, 'জাতক' কি ?—এই সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা রাখা ভালো। ভগবান বুদ্ধের বোধি-সত্ব-জীবনের বিভিন্ন কাহিনী নিয়েই 'জাতক' এর সৃষ্টি।

খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৫২৯ বছর আগে কপিলাবার রাজকুমার শাক্যসিংহ গয়ায় বোধিবৃক্ষ মূলে 'বুদ্ধত্ব' লাভ করেন। বুদ্ধজন্ম লাভের আগে ইনি মানুষ, পশু-পাখী, প্রাণী ইত্যাদি বহুরূপে অনেকবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান বুদ্ধ ছিলেন 'জাতি-স্মর'। পূর্ব পূর্ব জন্মের অনেক কথাই যাদের পরজন্মে মনে থাকে, তাদেরই বলে 'জাতিস্মর'।

ভগবান বুদ্ধ তাঁর পূর্ব জন্মের যে সকল কাহিনী শিষ্য-দের কাছে গল্পচ্ছলে বর্ণনা করেন, সে সব কাহিনীই 'জাতক' নামে অভিহিত হয়।

জাতকের কাহিনীগুলো পাঠ করলে তোমরা জীবনের অনেক উচ্চ আদর্শ লাভ করবে। আজকে তোমাদের কাছে জাতকের একটি গল্প বলছি, শোন :

হিন্দুর প্রধান তীর্থক্ষেত্র কাশীর নাম তোমরা সবাই শুনে থাকবে আশা করি। এই কাশীরই রাজধানী বারাণসীতে অনেক কাল আগে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। এই রাজার রাজত্বকালে কাশীর কোন এক গভীর বনে বোধিসত্ব এক বাবুই পাখীর গর্ভে পাখী-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই বনে অসংখ্য বাবুই পাখীর বাস ছিল। এরা পরম নিশ্চিন্তে আনন্দের ভেতর দিয়েই দিন অতিবাহিত করছিলো, হঠাৎ একদিন এক বিপদ এসে দেখা দেয়! কোন এক নিষ্ঠুর ব্যাধ একদিন কৌশলে ফাঁদ পেতে অনেকগুলো বাবুই পাখী ধরে নিয়ে যায় এবং ওদের বিক্রী করে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে। লোভী ব্যাধ এরপর রোজ এসে অনেক বাবুই পাখী ধরে নিয়ে যেতে থাকে। বাবুই পাখীরূপে বোধিসত্ব তাঁর বংশের আসন্ন ধ্বংসের কথা চিন্তা করে প্রথমে একটু অভিভূত হয়ে পড়েন ; পরে নিজ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বলে ব্যাধরূপ শাসনের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার এক সুন্দর উপায় আবিষ্কার করলেন। তিনি এক সময় বনের সকল বাবুই পাখীকে জমায়েত করে বললেন,—"ছাখো, দুষ্ট ব্যাধ আমাদের বংশ ধ্বংস করতে উদ্যত। এ বিপদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য আমি এক বুদ্ধি করেছি, যার ফলে ঐ পাপিষ্ঠ ব্যাধ আর আমাদের ধরতে সক্ষম হবে না।" এই বলে বাবুই পাখীরূপী বোধিসত্ব একটু থামলেন, তারপর একটু চিন্তা করে নিয়ে ফের বলতে আরম্ভ করলেন, "দেখো, এবার থেকে ব্যাধ যখনি আমাদের উপর জাল নিক্ষেপ

করবে অমনি সাথে সাথেই আমরা জালের ফাঁকে ফাঁকে মাথা রেখে জাল শূন্যে তুলবো ; তারপর নিকটবর্তী কোন কাঁটা-ঝোপে জালটি নিক্ষেপ করে যে যার ছিদ্র পথে পালিয়ে যাব। ফলে এই হবে, দুষ্ট ব্যাধ আমাদের ধরতে পারবে না ; কাঁটা বন থেকে জাল খুলে নিতে ব্যাধের খুবই পরিশ্রম হবে।

পরদিন ব্যাধ যখন পূর্বদিনের নিক্ষিপ্ত জাল গুটাতে এলো সে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল কে বা কারা জালটিকে একটা গভীর কাঁটা বনে নিক্ষেপ করেছে, আর একটি বাবুই পাখীও জালের ভেতর আবদ্ধ নেই।

পর পর কয়েকদিন এ ভাবেই চলছে দেখে ব্যাধের বউ নিরাশ হয়ে পড়ল। অতঃপর সে কি করবে ; কি ভাবে সংসার চালাবে ঠিক করতে না পেরে ঘরে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল।

বউকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে ব্যাধ ব্যাপারটা বুঝতে পারলে। সে ওর বউকে বললে, "দেখো, তুমি হতাশ হয়ো না। বাবুই পাখীরা নিশ্চয়ই কোন বুদ্ধিমানের পরামর্শে একতা মেনে চলছে। তুমি একটুও ভেবো না, ওদের ঐ ঐক্য একদিন ভাঙ্গবেই। তারপর আমি আগের মতোই অনেক অনেক বাবুই-পাখী ধরতে পারবো। এখন আমি শুধু গোপনে গোপনে খোঁজ রাখি ওদের ভেতরে ঝগড়া বাঁধে কখন।"

ব্যাধ পরদিন থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে বাবুই-পাখীদের চলা-ফেরা লক্ষ্য করতে থাকে।

এ ভাবে কিছুদিন অপেক্ষা করার পর ব্যাধের আশা সফল হলো। সেদিন এক বাবুই-পাখী মাটিতে নামবার সময় অজানিতে অপর একটা বাবুই পাখীর ঘাড়ের ওপর চেপে বসে। ফলে এই হলো, দুজনের ভেতর ভীষণ ঝগড়া বেঁধে গেল। ক্রমে ক্রমে এই সামান্য ঝগড়াই দানা বেঁধে বনের অন্যান্য বাবুই-পাখীদের ভেতরও ছড়িয়ে পড়ল।

বাবুই-পাখীরূপী বোধিসত্ব অনেক চেষ্টা করেও ওদের ওই বিবাদের নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হলেন না। তিনি তখন বুঝতে পারলেন এই বিবাদ, এই অনৈক্যের ফলেই একদিন এই বাবুই গোষ্ঠী ধ্বংস হবে। ঐ ভেবেই তিনি তাঁর নিজ পরিজন পরিবারবর্গসহ উক্ত বাসস্থান পরিত্যাগ করে অন্যত্র এক নিরাপদ স্থানে প্রস্থান করলেন।

অচিরেই দুষ্ট ব্যাধ অনৈক্যের সুযোগে বনের অবশিষ্ট বাবুই পাখীগুলোকে জালে আবদ্ধ করে ধরে নিয়ে গেল। বাবুই পাখীরূপী জ্ঞানী বোধিসত্বের বাণী এ ভাবেই মর্মান্তিক সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল।

আমার 'কিশোর জগৎ'এর কিশোর-কিশোরী ভাই-বোনেরা, উপরে যে জাতকের গল্প তোমাদের কাছে বলা হলো, ঐ গল্প থেকে তোমরা কি শিক্ষা পেলে বলতো ? একতা ? হাঁ, এই জাতকের গল্পে আমরা স্পষ্টই দেখছি, যতক্ষণ আমাদের ভেতর একতা থাকে, ততক্ষণ জগতের কোন শত্রুই আমাদের চুলমাত্র ক্ষতি করতে পারে না, কিন্তু নিজেদের ভেতর অনৈক্যের ফলেই আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত বাবুই পাখীদের মতো বিপদগ্রস্ত হতে পারি।

হেমন্ত ভোর

শ্রীমঞ্জুষ দাশগুপ্ত

পাণ্ডুর চাঁদ হিজলের বনে ধীরে
　　ডুবে গেলে পরে শতেক পাখির ঝাঁক
শিশিরের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে আসে ছুটে
　　পার হয়ে দূর অজয় নদীর বাঁক।
ধানে ভরা ক্ষেত রোদের উত্তরীয়
　　পরে নিয়ে দেহে সেজেছে পরীর মত—
রামধনু রঙ প্রজাপতি মেয়ে এক
　　গাঁদার বক্ষে মধু লজ্জায় নত।
এলায়িত-কেশ-দেহাতী মেয়েরা সবে
　　চঞ্চল পায়ে ঝুড়ি মাথে কাজে যায়,
তাদের গায়ের কাপড় সরিয়ে দিয়ে
　　শীত শীত হাওয়া সুড় সুড়ি দিয়ে যায়।
হেমন্ত ভোরে দোলা লাগে সারা প্রাণে
　　মন উড়ে যায় আকাশে নীলের টানে॥

উৎসবের পরে

শ্রীআশাবরী দেবী বি-এ

সামনের বড়ো রাস্তাটা শেষ হলেই একটা প্রকাণ্ড বাড়ী দেখা যায়—সেইটাই অরুণাদের বাড়ী। ওপর তলায় কোণের দিককার ঘরে অরুণা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে অঙ্ক কষছে। একটুপরেই অরুণা তাকিয়ে দেখে ঘড়িটা বইএর র‍্যাকের পাশে দাঁড়িয়ে টিকটিক করে সাড়ে তিনটের ঘর পার হয়ে যাচ্ছে। অরুণা খুব ব্যস্ত হয়ে খাতাপত্র তুলে ফেললো। পেনসিল কলম ঠিক জায়গায় রেখে আঁচলটা মেঝের থেকে তুলে চেয়ার হ'তে উঠে পড়লো। ঘর হ'তে বেরিয়ে ভেতরকার টানা বারেণ্ডায় দাঁড়িয়ে দেখে নিলো কে কোথায় আছে?

দুপুর গড়িয়ে গেছে—একটু পরেই আবার কাজকর্ম আরম্ভ হয়ে যাবে সংসারের—তাই এই পূর্বমুহূর্তের বিশ্রামের আরামটুকু সকলেই চুপচাপ উপভোগ করছে—সমস্ত বাড়ী নিস্তব্ধ—নীচের চক মেলানো উঠোনে কেউ নেই। দোরগুলি সব বন্ধ—কেবল কোন ঘর হতে হঠাৎ ওর ছোট বোন বরুণার উৎসাহপূর্ণ গলার স্বর ও হাসি শোনা গেলো! অরুণা আবার সচকিত হ'য়ে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলো। সিঁড়ী দিয়ে টপাটপ নামতে নামতেই ও চেঁচামেচি শুরু করলো—"ও ঠাকুর, ঠাকুর। কখন উঠবে তুমি? বিকেল হয়ে গেলো যে—চা করো—শিগগির ওঠো—!" ঠাকুর বেচারী নীচের ধোয়ামোছা দালানের লাল মেঝেয় গামছাটি পেতে মধুর মধ্যাহ্নের নিদ্রায় মগ্ন ছিলো—তন্দ্রা ভেঙে আবার দুঃখ কষ্টময় পৃথিবীর উনুন আর রান্না-পরিবেশনের চিন্তায় ফিরে এলো—ভাঙা ভাঙা গলায় উত্তর দিলো—"এই যে যাই গো দিদিমণি!" অরুণা ততোক্ষণে আবার ওপরে উঠে গেছে মায়ের সন্ধানে। মা পুবের বার করা ছাতে মাদুরের ওপর হতে সারাদিন রোদ খাওয়া গরম পোষাকগুলি ঝিকে দিয়ে তুলিয়ে গুছিয়ে রাখছিলেন। অরুণা মার কাছে দৌড়ে গিয়ে বললো—"মাগো! আমি রত্নাদের বাড়ী কি পোরে যাবো বলো না? ঠিক পাঁচটায় পৌঁছানো চাই রত্নু বোলেছে। সাড়ে পাঁচটায় ওদের নাটক শুরু—আমার গান গাইতে হবে।"

"কি নাটক হবে রে? আজকাল আবার জন্মদিনে সব এত ঘটা মেয়েদের···আর বাঁচি না!" মা ওর দিকে একবার চেয়ে আবার কাজে মন দিলেন।

"লক্ষ্মীর পরীক্ষা হবে—কি মুস্কিল বলোনা—কি পরবো? ভূত হয়ে যাই তাহলে···?" অরুণা রাগ করে ফিরে চললো। মা একটু হেসে এবার কিছু ভাঁজ করা পোষাক নিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বললেন, "রুনু! এতো বড়ো হলি এখনও নিজের পোষাক নিজে ঠিক কোরতে শিখলি না? ছাখ তো এই কাপড়ের বোঝা তুলতে হবে···তুই যা না বাপু বৌমার কাছে!" অরুণা ক্ষুন্নমনে এবার বৌদির ঘরের দিকে চললো দক্ষিণের বারেণ্ডাটা পার হয়ে। বৌদির ঘরের পর্দাটা একটু সরিয়ে দেখলো—খাটের ওপর শুয়ে বেশ ভালো ঘুম দিচ্ছেন বৌদি। অরুণা রেগেই ছিলো—আরও রেগে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে একটি ঠেলা দিয়ে বললো, "বৌদি, ও বৌদিভাই! ওঠো না—এক্ষুণি যে দাদা এসে যাবে অফিস হতে!" বৌদি আচম্কা ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে একটু লজ্জিতভাবে হেসে বললেন—"কি ভাই রুণা?—ঘুমিয়ে পড়েছিলুম বুঝি?···সত্যি ভাই কাল রাত্তির জেগে তোমার দাদার পুলোভারটা শেষ করলুম কিনা? তাই ঘুম—" "আচ্ছা বাপু তা' বুঝতে পারছি যে তুমি রোজই রাতে দাদার একটা কোরে পুলোভার-বোনা শেষ করো বললেই দুপুরবেলা ঘুমিয়ে পড়ো—" অরুণা বাধা দিয়ে হেসে উঠলো, "এখন রত্নাদের বাড়ী আজ যে রত্নুর "বার্থ-ডে সেলিব্রেশন"—আমায় স্টেজে গাইতে হবে—জামা কাপড় ঠিক কোরে দাও না দিদিভাই—খুব ভালো কোরে সাজিয়ে দেবে কিন্তু—নয়তো অত লোক দেখে কি মনে কোরবে—একটু বাড়াবাড়ি জন্মদিনে এতো ঘটা···হলোই বা একমাত্র মেয়ে—না বৌদি?" "হ্যাঁরে বড়লোক বেশি হয়ে গেলে মানুষে ঐসব করে—তা তুই এতোক্ষণ গা হাত মুখ ধুয়ে আসতে পারিসনি রুনু—সাত তাড়াতাড়ি মেয়ে এসে বৌদিকে জাগাতে বসেচেন···! দুজনেই ধরা পড়ে গিয়ে ননদ-ভাজে এবার একসঙ্গে হেসে ফেললো।

বৌদি অরুণাকে নিজের সব বাছা গয়না আর শাড়ী পরিয়ে, লম্বা বেণীতে জরী ঝুমকো দুলিয়ে রাজকন্যার মতো করে সাজিয়ে দিলেন। অরুণা বড়ো আয়নায় নিজেকে দেখে ভারী খুশী হয়ে বৌদির ঘর হ'তে বেরিয়ে আসতে আসতেই বাবা দাদা অফিস হতে ফিরলেন। অরুণা চেঁচিয়ে বল্লো, "সফার, গাড়ীতে আমি যাবো—!" তখুনি ঢং ঢং করে বসবার ঘরের দেয়াল-ঘড়িতে পাঁচটা বাজলো আর অরুণা মহাব্যস্ত হয়ে সেখান হতেই—"মা গো! আমি রত্নুদের বাড়ী চললাম—এই যে রত্নুকে দেবার জন্য শাড়ীর প্যাকেটটা নিয়েচি!" বলেই দুড়দুড় করে নীচে নেমে মোটরে উঠে ড্রাইভারকে রত্নাদের বাড়ী যেতে বললো। গাড়ী স্টার্ট দেবে এমন সময় বরুণা সেজেগুজে ছুটতে ছুটতে এসে উঠলো গাড়ীতে। "তুই কেন আসছিস আবার?" বলে অরুণা ছোটবোনকে তাড়া দিতে গিয়ে দেখে মা নিচে নেমে এসেছেন। গম্ভীর মুখে বললেন, "তুমি স্বার্থপরের মতো উৎসবের আনন্দে একাই আত্মহারা হতে চাও? ছোট বোনটিকে ফেলে কেউ যায়?"

মোটর এসে রত্নাদের বিরাট আলো-ঝলমলে বাড়ীর হাতার মধ্যে ঢুকলো। সুন্দরী রত্না অপরূপ সেজে নিজে দাঁড়িয়ে সকলকে অভ্যর্থনা করছিলো। অরুণা তাকে হাসিমুখে বললে, "রত্নু, তুই সত্যি আজ ঠিক গল্পের রাজকন্যার মতো হয়ে গেছিস।" "বাঃ তোকে যে কতো সুন্দর দেখাচ্ছে জানিস না—!' রত্না খুব খুশী হয়ে বললো। দুই বন্ধুতে গল্প হ'তে হতে হঠাৎ রত্না গেটের দিকে চেয়ে বললো "ঐ যে

ভাই মিস বার্চ এলেন—একটু দাঁড়া রুণা !" বলে তাড়াতাড়ি রত্না চলে গেলো। অরুণা চেয়ে দেখলো একটি ইংরাজ মেয়ে ঠিক অরুণাদের গাড়ীর মত সবুজ মোটর হ'তে নেমে আসতে রত্নাই তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে বসাবার ঘরে চললো। হঠাৎ মনে পড়লো বরুণা কই? এ বাড়ী তার অচেনা—অরুণাকে ছেড়ে সে ভীতু মেয়ে একা কোথায় গেলো? তবে সে গাড়ী হতে নামেনি? রত্নাই আসতে অরুণা বরুণার কথা জিজ্ঞাসা করলে। খোঁজ নিয়ে লোক এসে বললে অরুণাদের গাড়ীর ড্রাইভার বলেছে বরুণা বহুক্ষণ নেমে গেছে দিদির পিছনেই! অরুণা অস্থির হয়ে রত্নাকে বললো "বুলুকে না খুঁজে পেলে গান গাইতেই যে পারবো না রত্নু!" ঠিক এই সময় নাটক শুরু হওয়ার ঘণ্টা বেজে ওঠায় অরুণাকে আর কোনো কথা না বলে ষ্টেজে উঠে গানের দলে বসতে হলো। সারাক্ষণ অরুণার চোখ দুটি সমুখের বিরাট ভীড়ের মধ্যে ঘুরতে লাগলো—গলা যেন ওর বুঁজে আসতে লাগলো। কোথাও কিন্তু বুলুর বড়ো বড়ো চোখ, কোঁকড়া চুলে ঘেরা মুখখানি দেখা গেলো না। গানের দলে একটি নতুন মেয়েকে দেখলো অরুণা—মধুর সতেজ গান তার—যতোবার অরুণার তাল কাটছিলো সুরে, সে তাড়াতাড়ি নিজের সুরে তা ঢাকা দিয়ে দিচ্ছিলো। সামান্য সাধারণ তার বেশভূষা, কিন্তু কি মিষ্টি কোমল মুখখানি হাসি আর মায়া-মাখানো।

নাটক হাততালির মধ্যে শেষ হতেই—ওদিকে খাবার আয়োজন তৈরী। রত্নাকে উপহার দিয়ে অরুণা ও আর সকলে একে একে স্রোতের মতো শুভ ইচ্ছা জানাতে লাগলো। দেখতে দেখতে বিরাট টেবলটি বিচিত্র উপহার ঐশ্বর্যের রাশিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। রত্নাই গর্বের হাসিভরা মুখে মধুর কথায় সকলের খাবার আয়োজনের তদারক করছিলো; গানের দলের সেই নতুন মেয়েটি—সুপর্ণার এতোক্ষণে অরুণার সঙ্গে বেশ আলাপ হয়ে গেছে—দুজনেই উৎসুক দৃষ্টিতে বরুণার সন্ধান করছিলো। সকলের শেষে সুপর্ণাও সলজ্জ মুখে একগাছি শুভ্র যুঁইয়ের মালা জড়ানো, সুন্দর একটি হাতে বাঁধানো খাতা দিয়ে তার শুভ ইচ্ছা জানালো। রত্নাইর মুখে অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠলো আর তার ধনী বন্ধুরা কাড়াকাড়ি করে খাতাটির বাঁধন খুলে পাতা উল্টে দেখতে লাগলো। পাতায় পাতায় সুপর্ণার নিজের আঁকা অপূর্ব সুন্দর রং দেয়া সব ছবি ও সঙ্গে সঙ্গে মুক্তা অক্ষরে লেখা কয়েকটি কবিতা! একটা চাপা বিদ্রূপের ভঙ্গী রত্নাই ও তার ধনী বন্ধুদের মধ্যে খেলে বেড়াতে লাগলো। অরুণা মর্মাহত হলো রত্নাইর সুপর্ণার সঙ্গে এই ব্যবহারে। ও সুপর্ণাকে বললো, "ভাই তুমি কোথায় থাকো? তুমি এদের বাড়ী এলে কেন? আমার বড় খারাপ লাগছে—" "হ্যাঁ ভুল করেছি ভাই এখন বুঝলুম —তোমায় যখন বন্ধুরূপে পেলুম, এবার আর রত্নার কাছে আসবো না।"

এর পরেকার ঘটনা অরুণার সমস্ত মন ভয়ে দুঃখে আকুল করে তুললো। বরুণাকে কোনোখানে পাওয়া গেলো না। কাঁদতে কাঁদতে পাগলের মতো অবস্থায় অরুণা বাড়ী পৌঁছালো। সে রাত যে তাদের বাড়ীতে কি ভাবে কাটলো! হৈ চৈ পুলিশে খবর দেয়া, আর বাড়ীতে কান্নার রোল!

গভীর রাত···অন্ধকার ঘর। কেঁদে ফেলে অরুণার তন্দ্রা ভেঙে গেলো! বুলু যেন ওকে ডাকছে স্বপ্নে দেখছিলো—"বুলু" বলে জড়িয়ে ধরতে যেতেই বুলু কোথায় যেন মিলিয়ে গেলো! অরুণা উঠে বসলো চোখের জল মুছে। জিরো পাওয়ার আলোয় মার মুখ দেখে ওর যেন বুকটা ভেঙে গেলো। ঘুমের মধ্যে মার চোখে জলের রেখা···আত্ম-গ্লানিতে মন ভরে উঠলো অরুণার···তারই দোষে ছোট বোনটি হারিয়ে গেলো। নিজের আনন্দে, হাসি গল্পে বন্ধুর সঙ্গে আলাপে এমন মত্ত হয়েছিলো অরুণা যে বেচারী বুলু অচেনা জায়গায় কোথায় রইলো—মনেও পড়লো না!

মন ঠিক করে অরুণা আস্তে আস্তে নীচে নেমে এলো। দোর ভেজিয়ে বাড়ীর হাতা পার হয়ে গেটের কাছে এসে দাঁড়াতে বড়ো ভয় ভয় করতে লাগলো অরুণার।—না! ভয় করলে চলবে না—তার দোষেই বুলু হারিয়েচে—তাকে যেমন করে হোক খুঁজে বার করতে হবে! গেট খুলে অন্ধকার নির্জন পথে অরুণা এগিয়ে চললো। প্রতি পদক্ষেপে নিজেই নিজের পা ফেলার শব্দে, নিঃশ্বাস ফেলার শব্দে ও চমকে উঠতে লাগলো ভয়ে! রাস্তার মোড়টায় পৌঁছতেই দেখলো বাঁ ধার দিয়ে একটা আব-ছায়া সাদা মতন কি একটা আস্তে আস্তে এগুচ্ছে···ও বাবা! সেটা আবার ওকেই লক্ষ্য করে আসছে যে। অরুণা একটা গোঙানীর মতো শব্দ করে, ভয়ে পাগল হয়ে দৌড়ে সাদাটাকে পার হতে যেতেই প্রচণ্ড এক ধাক্কায় দুজনেই গড়াতে গড়াতে পড়ে গেলো রাস্তার পাশের ঢালু এবড়ো খেবড়ো মাঠের মধ্যে।

ভোরের আলো খুব সামান্য আভাষ দিচ্ছে—অরুণার ভয়ে আচ্ছন্ন ভাবটা ঠাণ্ডা বাতাসে যেন কেটে এলো। সারা গা, হাতপা ছড়ে গেছে শক্ত মাটি-কাঁকরে। চোখটা অল্প মেলে অবাক হয়ে দেখলো পাশেই একটা ছোট্ট মতন কে পড়ে আছে—সেও হঠাৎ "উ বাবা গো!" বলে উঠে বসলো···ভোরের প্রথম আলোয় মাঠের মাঝে এ কি স্বপ্ন না সত্য? "বুলু!" অরুণা প্রায় কেঁদে ফেললো আনন্দে। "দিদিভাই" লাফিয়ে এসে বরুণা তার কোলে বসে বললো, "ও দিদি, আমি আমাদের বাড়ী খুঁজছিলুম—আমি আমাদের বাড়ী খুঁজছিলুম।"

বিস্ময়ের প্রথম আবেগ কাটলে বরুণা সব বললো—অরুণা যে ওকে সঙ্গে না নিয়েই কি কোথাও ঠিক করে না বসিয়ে দিয়ে এগিয়ে যাবে—তা প্রথমটা বরুণা বুঝতে পারে নি। দিদি চলে যাবার পর কিছুক্ষণ একা গাড়ীতে বসে থাকবার পর বরুণা গাড়ী হ'তে নেমে ভীড়ের মধ্যে যেতেই তার যেন কেমন সব গোলমাল লাগলো। দিদিকে কোথাও দেখতে না পেয়ে লজ্জা ও ভয়ে ফিরে এসে আবার গাড়ীতে উঠে বসে দেখে ড্রাইভারটা নেই। ও পেছনের সীটে বসে থাকতে থাকতে তন্দ্রায় ঢুলে পড়েছিলো—হঠাৎ গাড়ী চলার ঝাঁকুনী পেয়ে চেয়ে দেখে একজন অল্পবয়সী মেমসাহেব মোটর চালিয়ে যাচ্ছেন। বরুণার কান্নাকাটিতে তিনি বিব্রত হয়ে পড়লেন। বরুণা বা তিনি কেউ কারও কথা বুঝতে পারল না। তাঁদের বাড়ীতে পৌঁছে তিনি ও তার বাবা মা বরুণাকে অনেক আদর যত্ন করলেন কিন্তু বরুণার ওসব কিছুই

ভালো লাগছিলো না। পরদিন সকালে তাঁদের বাড়ীতে একটি বাঙালী মেয়ে বেড়া'তে এসে বরুণার কাছে সব শুনে তাঁদের বলে বরুণাকে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের বাড়ী নিয়ে এলো—অরুণার সঙ্গে নাকি তার আলাপ হয়েছে—তবে বাড়ী চেনে না—বাড়ী খুঁজে বরুণাকে পৌঁছে দেবেন তার বাবা! বরুণা অস্থির হয়ে তাদের বাড়ী হ'তে আজ বেরিয়ে পড়েছিলো বাড়ী যাবার জন্য!

এদিকে রোদ উঠে গেছে—দুই বোনকে খোঁজার জন্য দুদিক হতেই অরুণা বরুণার বাবা ও সুপর্ণার বাবা এসে পৌঁছলেন ওদের কাছে! তারপর আর কি! এবার বরুণার জন্মদিনে ওদের বাড়ীতেও এক বিরাট আনন্দোৎসব হলো। তবে নাটক বা স্কুল সুদ্ধ নিমন্ত্রণ হয়নি। সুপর্ণা অরুণা বরুণা অনেক অনাথ শিশুদের খাবার ও পোষাক দিলো। সুপর্ণা ওদের বাড়ীরই একজন এখন। তার ছবি আঁকার গান গাওয়ার আর কবিতা লেখার পরম প্রিয় অংশভাগী অরুণা বরুণাই এখন!

পতিঘাতিনী সতী

শ্রীআর্য্যকুমার পালিত

রামচন্দ্র প্রজানুরঞ্জনের জন্য সীতাকে বনবাসে দিয়াছিলেন। কোনও সতী প্রজানুরঞ্জনের জন্য স্বামীকে প্রাণদণ্ড দিয়াছিলেন এমন কথা তোমরা কোথাও শুনিয়াছ? এমন রাণী তোমাদের দেশে ছিলেন। বেশী দিনের কথা নয়, মাত্র আড়াই শত বৎসর আগে। তোমাদের দেশের ইতিহাস নাই তাই তোমরা তাঁহার কথা জান না। অন্য দেশের হইলে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসে লিখিত হইত। পতিকে হত্যা করিয়া কে কোথায় সতী হয়? এমন দৃষ্টান্ত তোমাদের দেশে রহিয়াছে। ইহা তোমাদের কম গৌরবের বিষয় নয়।

মেদিনীপুরের চেতো-বরদার তালুকদার—বাঙ্গলার শেষ বিদ্রোহী বীর শোভা সিংহের কন্যা ছিলেন চন্দ্রপ্রভা। বর্দ্ধমান রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীর ছুরিকাঘাতে শোভা সিংহের মৃত্যু হইলে বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ চেতো-বরদা হইতে চন্দ্রপ্রভাকে হরণ করিয়া আনেন। ইঁহার সঙ্গে তিনি লালবাঈ নাম্নী আর এক মুসলমান রমণীকেও আনেন। রঘুনাথ সিংহ চন্দ্রপ্রভাকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকে পাটরাণী করেন। রঘুনাথ সিংহ খুব সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন। লালবাঈ খুব ভালো গান গাইতে পারিতেন বলিয়া তিনি তাঁহার অনুরাগী হন। লালবাঈএর জন্য বিষ্ণুপুরে তিনি এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং তাহার সম্মুখে এক প্রকাণ্ড বাঁধ কাটাইয়া দেন। লালবাঈএর নাম অনুসারে ঐ বাঁধের নাম নাকি লাল-বাঁধ হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরে এখনও ঐ বাঁধ রহিয়াছে।

রঘুনাথ সিংহ অধিকাংশ সময়ই লালবাঈএর প্রাসাদে কাটাইতে লাগিলেন। তিনি রাজকার্য্যে অবহেলা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রপ্রভা রঘুনাথ সিংহের ভ্রাতা গোপাল সিংহের সাহায্যে রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। ক্রমে রঘুনাথ সিংহের ঔরসে লালবাঈএর এক সন্তান জন্মিল। সন্তান প্রায় ছয় মাসের হইল। লালবাঈ হিন্দুর ছেলের ন্যায় সেই ছেলের অন্নপ্রাশন করিবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করিলেন। রাজাও সম্মত হইলেন।

সমস্ত আয়োজন হইল। হিন্দু মুসলমান যত প্রজা একত্র ভোজন করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইলেন। হিন্দু প্রজাগণ প্রমাদ গণিলেন। তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া চন্দ্রপ্রভার নিকট উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রপ্রভা সকলকে আশ্বাস দিলেন।

ভোজনের সময় হইল। রঘুনাথ সিংহ সকলকে ভোজন করাইবেনই। হিন্দুদের জাতি যায়। চন্দ্রপ্রভা গোপাল সিংহকে দিয়া স্বামীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রঘুনাথ চন্দ্রপ্রভার নিকট আসিলেন। চন্দ্রপ্রভা গোপাল সিংহকে বলিলেন—"হত্যা কর।" গোপাল সিংহ রঘুনাথকে হত্যা করিলেন।

দলমাদল কামান দাগিয়া লালবাঈএর প্রাসাদ উড়াইয়া দেওয়া হইল। লালবাঈ সন্তানকে লইয়া প্রাসাদের মধ্যেই ছিলেন। কথিত আছে—প্রাসাদের ধ্বংস স্তূপের মধ্যে লালবাঈএর কয়েক টুক্‌রা মাংস মাত্র দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল!

তারপর! চন্দ্রপ্রভা কি করিলেন! তিনি স্বামীর শ্মশানে গিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার চারিদিকে তুঁষের স্তূপ সাজাইতে বলিলেন—তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিতে বলিলেন!! পতিহত্যার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ চন্দ্রপ্রভা তুঁষের আগুনে আত্ম-বিসর্জ্জন করিলেন!

তখন হইতে চন্দ্রপ্রভার নাম, "পতিঘাতিনী সতী" হইল। তিনি যে স্থানে আত্ম-বিসর্জ্জন করিলেন সেই স্থানের নাম হইল—"পতিঘাতিনী সতী ঘাট।"

এখনও বিষ্ণুপুরবাসী বিষ্ণুপুরের কোনও বিশেষ স্থানকে "পতিঘাতিনী সতী ঘাট" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

বেদান্ত দর্শন—শঙ্কর ভাষ্য

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

সৎ ও অসৎ

ঙ্কর জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন, কিন্তু তাহার ব্যবহারিক ত্তা আছে, তাহাও বলিয়াছেন। ব্যবহারিক সত্তা —আমাদের ইন্দ্রিয়ের নিকট যে সত্তা প্রকাশিত হয় সেই ত্তা। তাহা সামুৎপাদিক, তাহার উৎপত্তি আছে, বিনাশও াছে, তাহা আমাদের জীবনযাত্রার জন্য কাজে লাগে, ন্তু তাহার পারমার্থিক সত্তা নাই। তাহা নিত্য হে। পারমার্থিক সত্তা কেবল ব্রহ্মের আছে। ব্রহ্মে কানও পরিবর্ত্তন নাই। তাহা নিত্য, স্থির, অচঞ্চল। ারমার্থিক এবং ব্যবহারিক সত্তার মধ্যে এই ভেদ দর্শনের াদিম যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। উপনিষদে অসৎ ব্দ কোন কোনও স্থলে অপ্রকাশিত অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্তু বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে! "সৎ" এই অসতের প্রকাশিত অবস্থা। কিন্তু পরে 'সৎ' শব্দ যাহা নিত্য, াহার পরিবর্ত্তন নাই, তাহা বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইয়াছে। ই নিত্য বস্তুর সন্ধান গ্রীক দর্শনেও বহুদিন ধরিয়া চলিয়া-ছিল। মিলেসিয়ান দার্শনিকদিগের 'উপাদান' (matter) ম্পিওক্লিসের মৌলিক দ্রব্য, আনেক্সগোরাথের Homoiomeriac", পাইথাগেরাথের সংখ্যা, ডেমক্রি-াসের পরমাণু (atoms) এবং প্লেটোর Ideas সকলই তের সন্ধান হইতে উদ্ভূত। ইয়োরোপের মধ্যযুগের দর্শনে সার" (Essence) বা স্বরূপ এবং অস্তিত্বের ভেদের অনু-ন্ধান চলিয়াছিল। ক্যাণ্ট "সৎ"কে স্বগত বস্তু (Thing in tself) বা nonmenon নাম এবং অজ্ঞাত nonmenon এর উপরিভাগের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নশ্বর ঘটনাদিগকে phenmenon সমুৎপাদ) নাম দিয়াছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানে ড়িৎই একমাত্র সৎ বস্তু বলিয়া পরিচিত। বর্ত্তমান কালে র্শনে Being (সত্তা) ও Existence এর মধ্যেও ভেদ নির্দ্দেশ করা হয়। যাহা দেশ-কালে প্রকাশিত হয়, তাহাই (Existence): যাহা দেশ-কালে প্রকাশিত হয়না, কিন্তু যাহার অপ্রকাশিত সত্তা আছে, তাহাই Being। Being নির্গুণ অর্থাৎ অন্য কিছু হইতে তাহাকে বিশিষ্ট করিবার কোনও গুণ তাহাতে নাই। Existence গুণ-বিশিষ্ট সত্তা! Being সত্তা মাত্র, কেবল সত্তা। শঙ্কর দেশ ও কালে অপ্রকাশিত, কার্য্য কারণের নিয়মের অতীত ব্রহ্মকেই 'সৎ' বলিয়াছেন। তদতিরিক্ত যাহা, যাহা দেশ, কাল, কারণ ও কার্য্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ ও আমাদের ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রকাশিত, তাহা অসৎ। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় ও নিষ্কল। তিনি জগৎ রূপে প্রকাশিত হন, এ কথা শঙ্কর বলেন নাই। বহুধা বিভক্ত জগৎ তাহাতে অধ্যস্ত হয়, অর্থাৎ জগতের ভ্রান্তি হয়, এই কথা বলিয়া-ছেন। পারমেনিদিস্ সর্ব্বব্যাপী সত্তাকে একমাত্র সত্য বলিয়াছিলেন। তাহার মতে সত্তার নানা বিশিষ্ট রূপের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। সৎ ও অসতের দ্বন্দ্ব বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের দ্বন্দ্ব। সৎএর বিশেষ বিশেষ রূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, 'সৎ' বুদ্ধি গ্রাহ্য। বুদ্ধির জ্ঞান সত্য, ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান মিথ্যা, শঙ্কর বুদ্ধির জ্ঞানকেও সত্য বলেন নাই। তাঁহার মতে দেশ, কালও কারণ দ্বারা বদ্ধ কিছুই সত্য হইতে পারে না। বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সর্ব্ব বস্তু দেশ-কাল ও কারণে বদ্ধ রূপে প্রকাশিত হয়।

যাহা অসৎ তাহার প্রতীতি হয়, কিন্তু এই প্রতীতি মিথ্যা। অসতের অস্তিত্বই নাই। এই মিথ্যা প্রতীতির উৎপাদনের হেতু অবিদ্যা। মানুষের বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় এমন ভাবে গঠিত যে তাহা দ্বারা সকল বস্তুই দেশ-কালও কারণে বদ্ধরূপে প্রতীত হয়, এক অখণ্ড বস্তু খণ্ড খণ্ড রূপে আবির্ভূত হয়। এই খণ্ড খণ্ডরূপে এক বস্তুর আবির্ভাব ভাণ মাত্র, তাহার বাস্তবতা নাই। তাহা ভাণ (appear-ance), সৎ (Reality) নহে। শঙ্কর বলেন—ঘট প্রভৃতি ইয়ত্তা-পরিচ্ছিন্ন (নির্দ্দিষ্ট পরিমাণযুক্ত) সকল বস্তুই অন্তবৎ, তাহাদের বিনাশ আছে, তাহারা অসৎ। যাহাই দেশে অবস্থিত, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভাজ্য। তাহা উৎপন্ন কার্য্য, সৎ নহে। সত্ত্বের উৎপত্তি নাই।

তাহা অবিভাজ্য, তাহা দেশে বিস্তৃত নহে। দেশের বিভুত্ব আপেক্ষিক, নিরপেক্ষ নহে। যাহা দেশে সীমাবদ্ধ, কালেও তাহা সীমাবদ্ধ। ব্যবহারিক জগতে কাল সত্য হইলেও তাহার বাহিরে কালের অস্তিত্ব নাই। কালে যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ হয় তাহা সৎ নহে।

শঙ্কর কার্য্যকারণ তত্ত্বের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। শঙ্কর কারণ হইতে কার্য্যের ভেদই স্বীকার করেন না। কার্য্যকারণ শৃঙ্খলাবদ্ধ অসংখ্য বস্তুর সমষ্টি জগতের পারমার্থিক অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। কারণ ও কার্য্যের মধ্যে যদি ভেদ না থাকে, কার্য্য ও কারণ যদি একই হয়, তাহা হইলে কার্য্যরূপে পরিবর্ত্তনের অস্তিত্ব নাই, তাহা ভাণ মাত্র। আছে শুধু সৎ, এক, অদ্বিতীয় অপরিণামী, নিষ্ক্রিয়, পূর্ণ সত্তারূপ অনন্ত ব্রহ্ম। সসীমত্ব অভাববাচক। তাই সকল সসীম বস্তুই যেন সসীমত্ব অতিক্রম করিতে চায়। এই আপনাকে অতিক্রমণ চেষ্টার ফলই পরিবর্ত্তন। পরিবর্ত্তনের ফলেই প্রত্যেক সসীম বস্তু নশ্বর। এই পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়, আমাদের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক গঠন প্রকৃতির ফলে। বাস্তবিক পরিবর্ত্তন নাই।

সামুৎপাদিক জগৎ—ভাণের জগৎ—নামরূপবিশিষ্ট বস্তুদিগের জগৎ, যে জগৎ দেশ, কাল ও কার্য্য কারণের জগৎ। তাহার নিম্নে যে অপরিবর্ত্তনীয় দেশ-কাল কারণাতীত বস্তু নিশ্চল স্বরূপে বর্ত্তমান, তাহাই সৎ, তাহা ব্রহ্ম।

শঙ্কর দর্শনে কর্ম্মনীতি

শঙ্করের মতে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারই জীবনের লক্ষ্য। ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের ফলে সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি এবং পরমানন্দ লাভ হয়। দেহাত্ম-বুদ্ধি যাবতীয় দুঃখের মূল। যত দিন জীব দেহকেই আত্মা বলিয়া গণ্য করে, ততদিন সে পাপ ও দুঃখে মগ্ন থাকে। কিন্তু যখন সে বিশ্বের আত্মার সঙ্গে আপনাকে অভিন্ন মনে করিতে সমর্থ হয়, তখন তাহার যাবতীয় দুঃখের মূলোচ্ছেদ হয়। আত্ম-সাক্ষাৎকারের সহায়। যে সকল কর্ম্ম, তাহাই ধর্ম্ম বা সৎকর্ম্ম, যে সকল কর্ম্ম তাহার প্রতিবন্ধক, তাহা অধর্ম্ম বা অসৎ কর্ম্ম। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের জ্ঞানের জন্য সত্য কি, মিথ্যা কি—তাহার জ্ঞান আবশ্যক। জগৎ ব্রহ্মের প্রকাশ। এই জ্ঞান হইলে সমস্ত জগতের প্রতি প্রীতির উদ্ভব হয়। তাহার ফলে শান্তি অধিগত হয়। জগতের প্রতি—সর্ব্ব জীবের প্রতি প্রীতি—হইতে সর্ব্ব জীবের মঙ্গলের জন্য আত্ম-ত্যাগের ইচ্ছা উদ্ভূত হয়। আপনার সুখের জন্য চেষ্টার বিরতি হয়। স্বার্থপরতাই সর্ব্ব অমঙ্গলের মূল। সর্ব্বজীবে মৈত্রী ও করুণা, ক্ষুদ্র পারিবারিক স্বার্থ অতিক্রম করিয়া সর্ব্ব জীবের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ মঙ্গলের নিদান।

গীতা শাস্ত্র-বিধানকেই কর্ত্তব্য কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে প্রমাণ বলিয়াছেন এবং তদনুসারে কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন। যে শাস্ত্রবিধি অগ্রাহ্য করিয়া কামনার বশে কর্ম্ম করে, গীতার মতে সে সিদ্ধি (পুরুষার্থ অর্জ্জনে যোগ্যতা) প্রাপ্ত হয় না এবং ইহলোকে সুখও সে লাভ করে না, পরমাগতির তো কথাই নাই। শঙ্করের মতও তাহাই। তাঁহার মতে শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম পাপ! স্বাধ্যায়, যজ্ঞ, উপবাস ও প্রায়শ্চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহায়ক। কিন্তু বৈদিক যাগ-যজ্ঞের ফলে অভ্যুদয় লাভ হইলেও মোক্ষলাভ হয়না। তাহাদ্বারা লোকে স্বার্থের গণ্ডী অতিক্রমের ক্ষমতা লাভ করে। ভক্তি জ্ঞানের জন্য এবং ধ্যানের জন্য প্রয়োজনীয়। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির মধ্যে মুক্তির সাধন জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম জ্ঞানের সহায়ক। যাহার মন বিশুদ্ধ, যিনি কামনাধীন এবং যিনি ইহজন্মে ও পূর্ব্বজন্মে কৃতকর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাহার মনেই ব্রহ্ম জ্ঞান লাভের ইচ্ছা উদিত হয়।

শঙ্কর বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বিধুর অর্থাৎ অনাশ্রমী থাকা অপেক্ষা আশ্রমে অবস্থান শ্রেষ্ঠ। শ্রুতি ও স্মৃতির বচন দ্বারা তিনি ইহার সমর্থন করিয়াছেন। (শ-ভ ৩।৪।৩৯) কিন্তু অনাশ্রমী ও দরিদ্রগণ জপ-উপবাস, দেবসেবা প্রভৃতি দ্বারাও যে জ্ঞান লাভ করিতে পারে তাহাও বলিয়াছেন। (৩।৪।৩৮)। অনাশ্রমী যাহারা ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তাহারা তাহাদের জন্মান্তর সঞ্চিত কর্ম্ম সংস্কারের বলেই বিদ্যালাভ করে। শূদ্রগণও যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সমর্থ, তাহা শঙ্কর স্বীকার করিয়াছেন।

চতুরাশ্রমের মধ্যে পারিব্রজ্য বা সন্ন্যাস আশ্রমকেই শঙ্কর শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, কারণ সন্ন্যাস পরমাত্মবিজ্ঞানের বা
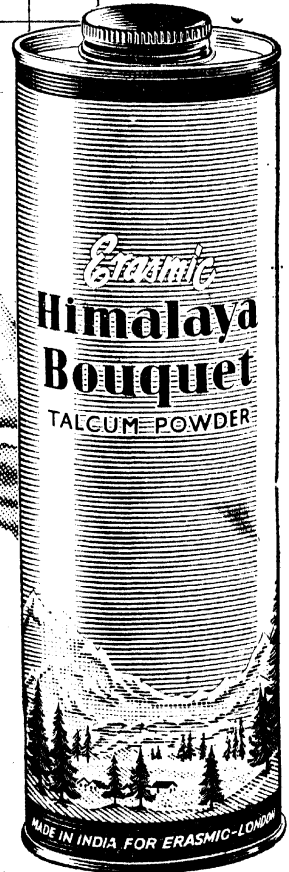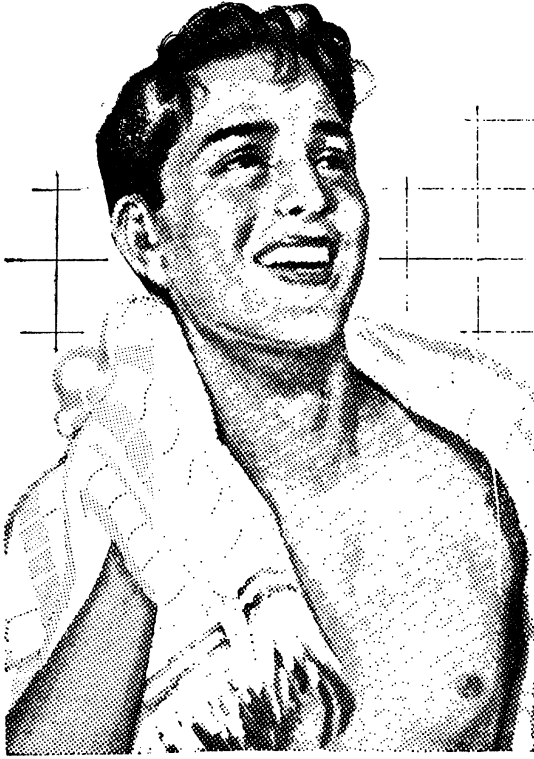
পরমার্থপ্রাপ্তির হেতু। অন্য তিন আশ্রমী পুণ্যলোকভাগী। কিন্তু "ব্রহ্মসংস্থ" পরিব্রাজক মোক্ষভাগী। "ব্রহ্মসংস্থ" শব্দের অর্থ ব্রহ্মে সর্ব্ব ব্যাপারের পরিসমাপ্তি। অনন্যব্যাপার বা অনন্যচিত্ত হইয়া ব্রহ্মচিন্তনে তৎপর হওয়াই ব্রহ্মসংস্থ হওয়া। সেরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠা অন্য তিন আশ্রমে অসম্ভব। অন্যান্য আশ্রমী আশ্রম-বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিলে পাপভাগী হন। কিন্তু পরিব্রাজকের কর্ম্ম ত্যাগে প্রত্যবায় হয় না। শম-দমাদি দ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠতা পোষণ করা প্রব্রজ্যাশ্রমের কার্য্য, যজ্ঞাদি করা অন্যান্য আশ্রমীর কার্য্য। যজ্ঞাদি ত্যাগ করিলে সন্ন্যাসীর অধর্ম্ম হয় না। তাহাতে বরং আশ্রম-বিহিত কর্ত্তব্যই করা হয়। প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ মাত্র মোক্ষ-ভাগী হইলে জ্ঞানের সার্থকতা থাকে না। এ আপত্তি হইতে পারে না, কেননা পারিব্রাজ্য ব্রহ্মজ্ঞান পরিপাকের অসাধারণ উপায়। (শ-ভাং ৩।৪.২০) অন্য আশ্রমীকে মুক্তি লাভের পূর্ব্বে সন্ন্যাসী হইতে হইবে।

ব্রাহ্মণের বিশেষত্ব সম্বন্ধে শঙ্কর বৃহৎ আরণ্যকের এই শ্লোকের উদ্ধার করিয়াছেন; "তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যাং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্টাসেৎ। বাল্যঞ্চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্বিদ্য অথ মুনিঃ। অমৌনঞ্চ মৌনঞ্চ নির্বিদ্য অথ ব্রাহ্মণঃ।" সেই হেতু ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বাল্যে অবস্থান করিবেন। বাল্যও পাণ্ডিত্য লব্ধ হইলে মুনি হইবেন। মৌন ও অমৌন নিশ্চিতরূপে লাভ করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায়। মুনি শব্দের অর্থ নিরন্তর মননশীল। বাল্য শব্দের অর্থ বালভাব বা সারল্য (শুভবুদ্ধি)। অধ্যয়নজাত ব্রহ্মবুদ্ধির নাম পণ্ডা। পণ্ডা বিশিষ্ট ব্যক্তিই পণ্ডিত। ব্রাহ্মণের বিশেষত্ব সম্বন্ধে শঙ্কর নিম্নের স্মৃতি বাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

যং ন সন্তং ন চা সন্তং নশ্রুতং ন বহুশ্রুতম্ ।
ন সুবৃত্তং ন দুর্বৃত্তং বেদকশ্চিৎ 'স ব্রাহ্মণঃ' ॥
গূঢ়ধর্ম্মাশ্রিতো বিদ্বান অজ্ঞাত ঋষিতং চরেৎ ।
অন্ধবৎ জড়বচ্চাপি মূকবৎচ মধং চরেৎ ॥ (৩.৪।৫০)

যিনি আপনার কুলীনত্ব, অকুলীনত্ব, পাণ্ডিত্য, অপাণ্ডিত্য, সদাচারিত্ব অসদাচারিত্ব জ্ঞাত নহেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। তিনি গূঢ় ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া (লোকের) অজ্ঞাত আচরণ করেন, এবং অন্ধ, জড় ও মূকের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করেন।

গৃহী সম্বন্ধে শঙ্কর বলিয়াছেন—গৃহী কেবল স্বীয় আশ্রম বিহিত কর্ম্ম করেন না, অন্য আশ্রম বিহিত অহিংসা সংযমাদির অনুসন্ধানও করেন। (৩।৪।৪৮)

শঙ্কর সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে জাতি বৈষম্যের স্থান দান করেন নাই। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের সন্ন্যাস ধর্ম্মের বিধান দেন নাই।

ব্রহ্ম-জ্ঞানীর করণীয় কোনও কর্ম্ম নাই। গীতার ৪।২০ শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্কর লিখিয়াছেন "নিজের প্রয়োজনের অভাবহেতু লোক সংগ্রহের জন্য অথবা জীবন রক্ষার জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও তিনি কোনও কর্ম্ম করেন না।" তাহার কর্ম্ম কোনও কামনাপূরণের উদ্দেশ্যে কৃত হয়না। সাংসারিক কর্ম্ম সংসারী জীবের জন্যই বিহিত। যিনি সর্ব্ব কামনা ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার কোনও কর্ম্ম নাই। গীতার ৪।২১ শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্কর "কিল্বিষ" শব্দের ব্যাখ্যায় ধর্ম্ম-কর্ম্মকেও কিল্বিষ (পাপ) বলিয়াছেন। কেননা ("ধর্ম্মোঽপি মুমুক্ষোরনিষ্টরূপত্বাৎ কিল্বিষমেব বন্ধাশাদকত্বাৎ) বন্ধের জনক বলিয়া ও মোক্ষকামীর অনিষ্ট-রূপ বলিয়া ধর্ম্ম ও কিল্বিষ। কর্ম্ম কামনার ফল বলিয়া বন্ধের জনক। কিন্তু তাহা যখন নিষ্কামভাবে কৃত হয়, তখন তাহা হইতে বন্ধ হয় না। "কেবল শারীর কর্ম্ম" অর্থাৎ শরীররক্ষা মাত্র যাহার প্রয়োজন, তাহা দ্বারাও বন্ধ হয়না। কোনও পাপ বা পুণ্য নিষ্কাম কর্ম্মীকে স্পর্শ করে না। ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে কোনওরূপ কর্ম্মের বিধি শঙ্কর দেন নাই। কিন্তু তাঁহার নিজের জীবনের অধিকাংশ জীবের মঙ্গলের জন্যই ব্যয়িত হইয়াছিল। সমগ্র ভারতে তিনি ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। অজ্ঞানান্ধ-লোকের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিনের চেষ্টায় তিনি আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, আপনার মুক্তিতে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন নাই। অজ্ঞানকেই তিনি জীবের প্রধান শত্রু মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার সমগ্র জীবন সেই অজ্ঞান দূরীকরণে ব্যয় করিয়াছিলেন।

কোনও কোনও সমালোচকের মতে শঙ্করের মতে ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। জাগতিক সকল বস্তুই যদি মায়িক হয়, কোনও ভেদই যদি জগতে না থাকে, তাহা হইলে পাপ ও পুণ্যের ভেদও মিথ্যা। এই সমালোচনায় কোনও গুরুত্ব নাই। শঙ্কর জগতের ব্যবহারিক অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। মুক্তি পর্য্যন্ত প্রত্যেক জীবের নিকট এই জগৎ ব্যবহারিকভাবে সত্য

এবং মুক্তি লাভের প্রধান উপায় যদিও ব্রহ্মজ্ঞান, তথাপি সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় বলিয়া অনেক কর্ম্ম করণীয় ও অনেক কর্ম্ম বর্জ্জনীয় ইহা শঙ্কর অস্বীকার করেন নাই। সত্য, অহিংসা, শম, দম, তিতিক্ষা প্রভৃতি সৎকর্ম্ম; মিথ্যা, স্বার্থপরতা, হিংসা প্রভৃতি অসৎ কর্ম্ম। যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনি পাপ ও পুণ্যের ভেদকে অজ্ঞানীর পক্ষে মিথ্যা বলিবেন না এবং নিজেও কখনও পাপ কর্ম্ম করিবেন না। কেন না দেহে আত্মবুদ্ধি হইতেই পাপে প্রবৃত্তি হয়। যাহার দেহে আত্ম-বুদ্ধি নাই, পাপ কর্ম্মে তাহার প্রবৃত্তি হইতেই পারে না।

শ্রুতিতে অনুজ্ঞা ও পরিহার আছে, অর্থাৎ কোনও কোনও কর্ম্ম কর্ত্তব্য এবং কোনও কোনও কর্ম্ম পরিহর্ত্তব্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মই যদি একমাত্র সত্য বস্তু হন, জীব ও ব্রহ্মে যদি ভেদ না থাকে, জগৎ যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে এই সকল অনুজ্ঞা ও পরিহার অর্থহীন হইয়া পড়ে। এই আপত্তির উত্তর শঙ্কর নিজেই যাহা দিয়াছেন তাহা এই (শ-ভা ২।৩।৪৮); আত্মা এক হইলেও জীবের দেহ সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনুজ্ঞা ও পরিহার সার্থক হয়। যতদিন সম্যক দর্শন অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান না হয়, ততদিন ঐ ভ্রম নিবারিত হয়না। ততদিন অবিদ্যাজনিত নানা ভেদ বর্ত্তমান থাকে। যাহার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে তাহার ত্যজ্য ও অত্যজ্যবুদ্ধি নাই, সুতরাং তাহার নিযোজ্যতা (অর্থাৎ এই কর্ম্ম কর, ইহা করিও না) অসম্ভব। আত্মার অতিরিক্ত হেয় ও উপাদেয় যে দেখে না, বিধি-নিষেধ তাহাকে কিসে নিয়োগ করিবে? একাত্মদর্শী নিয়োজ্য নহেন। জ্ঞানীর নিয়োগ না থাকিলেও তাঁহার যথেচ্ছাচার সম্ভবপর নহে। কেন না তাহার অভিমান (যাহা কর্ম্মের প্রবর্ত্তক) নাই। যেমন অগ্নি এক হইলেও অশুচি জ্ঞানে শ্মশানের অগ্নি ত্যজ্য, শুচিজ্ঞানে অন্য অগ্নি গ্রাহ্য, সূর্য্যালোক এক হইলেও অশুচি দেশস্থ সূর্য্যালোক পরিহার্য্য, শুচি দেশের সূর্য্যালোক গ্রহণযোগ্য, সমস্তই মৃত্তিকার বিকার হইলেও হীরকাদি আদরণীয়, মৃতদেহাদি বর্জ্জনীয়, তেমনি আত্মা এক হইলেও দেহাদি উপাধি সম্পর্ক আছে বলিয়া অনুজ্ঞা ও পরিহার সার্থক হয়।

জগৎ মায়িক হইলেও, শঙ্কর তাহার পারমার্থিক অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেও, তাহার ব্যবহারিক অস্তিত্ব আছে বলিয়াছেন, তাহাকে আকাশে গন্ধর্বনগরের ন্যায় একেবারে অস্তিত্বহীন বলেন নাই। অনিত্য হইলেও, যতদিন অবিদ্যা দূরীভূত না হয়, ততদিন জীবের নিকট জগতের অস্তিত্ব আছে। অবিদ্যার নাশ ও ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্ভবের জন্য কতকগুলি কর্ম্ম করণীয়, কতকগুলি ত্যাজ্য। সুতরাং শঙ্করের মতের সহিত নৈতিক বিধি ও নিষেধ সংযত হয়না, এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর।

"অহং ব্রহ্মাস্মি" ইহার অর্থ ব্রহ্মের সহিত কর্ম্মী জীবের "মুখ্য সামান্যাধিকরণ্য" নহে, অর্থাৎ অহংকার-সমন্বিত জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন ইহা নহে। ইহা "বাধসামান্যাধিকরণ্য" বোধক, অর্থাৎ অবিদ্যার অপগমে ব্রহ্ম ও জীবের একত্ব-বোধক।

শঙ্কর চিত্ত-শুদ্ধিকে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য অপরিহার্য্য বলিয়াছেন। চিত্তশুদ্ধির অর্থ রজঃ ও তমোগুণের অভিভব ও সত্ত্বগুণের প্রস্তাব। নিঃস্বার্থ কর্ম্ম ও সাধন ব্যতীত সত্ত্বগুণের প্রাচুর্য্য অসম্ভব। যাহার নিকট "অহং" ও 'মম' অর্থহীন, তিনিই আত্মাকে জানিয়াছেন। কাম বিনষ্ট না হইলে অবিদ্যার ধ্বংস এবং আত্ম-জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। অবিদ্যাকে কেবল অস্বীকার করিলেই অবিদ্যার ধ্বংস হয় না। শুধু শ্রবণ (উপদেশ শ্রবণ) দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান অনুভবের বিষয়, বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে। ইহা ব্রহ্মের সহিত একত্বের অনুভব। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত এই অনুভব হইতে পারে না। সুনীতি বর্জন করিয়া দৈহিক সুখের পশ্চাতে ধাবমান ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে না।

শঙ্কর মতে ব্রহ্মজ্ঞানী পাপপুণ্যের অতীত। পাপ-পুণ্যের ভেদ মায়াবদ্ধ সংসারী জীবের পক্ষে সত্য, কিন্তু তাহা পারমার্থিক সত্য নহে। যতদিন জীব আপনাকে তাহার বহিস্থ জগৎ হইতে পৃথক মনে করে, প্রত্যেক আপনাকে "আমি" অন্যান্য আমি হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে, ততদিনই ন্যায়ান্যায় ও পাপ পুণ্যের ভেদ সত্য। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানে যখন সকল ভেদ বিদূরিত হয়, তখন কাহার প্রতি কে অন্যায়াচরণ করিবে, কাহার অনিষ্ট করিয়া কে পাপভাগী হইবে? জীব ক্রমে ক্রমে "আমিত্বে"র—স্বার্থের—বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। এই মুক্তি যখন সম্পূর্ণ হয়, যখন আত্মপর-ভেদ বিলুপ্ত হয়, তখন সুনীতি দুর্নীতির ভেদও লুপ্ত হয়। "আমিত্বের" সংকীর্ণ গণ্ডী ক্রমে ক্রমে প্রসারিত করিয়া

জীবকে বিশ্বের সার্থিক আত্মার সহিত একীভূত করাই সুনীতির লক্ষ্য। জীব যখন এই আমিত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, তখন তাহার সমসীত্ব বিলুপ্ত হয়। ন্যায়ান্যায় ও পাপ-পুণ্যের ভেদ সসীম জীবের পক্ষেই সত্য, কিন্তু জীব যখন সসীমত্ব অতিক্রম করিয়া অসীমের সহিত এক হইয়া যায়, তখন সে ভেদও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। সুনীতির ভেদ সেই জন্যই শঙ্করের মতে আপেক্ষিক, অনপেক্ষ নহে। সুনীতির লক্ষ্য জীবকে অসীমত্বে উত্তীর্ণ করা। সেই লক্ষ্য অধিগত হইলে তাহার প্রয়োজন লুপ্ত হয়। অনেকে সমাজের মঙ্গলকেই সুনীতির লক্ষ্য বলেন। কিন্তু সমাজই তো একমাত্র সত্য বস্তু নহে। সমাজের উপরে ঈশ্বরের সহিতও মানবের সম্বন্ধ আছে। সমাজ-সেবা দ্বারা ঈশ্বরের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ যখন পরিপূর্ণভাবে অনুভূত হয়। তখন সমস্ত ভেদ বিলুপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়ান্যায়ের ভেদেরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

শঙ্করের কঠোর বৈরাগ্যবাদ অনেকের অপ্রীতিকর। ঈশ্বর মানুষের ভোগের জন্য যে সকল ভোগ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাদের সম্পূর্ণ বর্জনের কোনও হেতু অনেকে দেখিতে পান না। শঙ্করের বৈরাগ্যবাদ তাঁহার তাত্ত্বিক দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। জগতের সকলই অস্থায়ী—কিছুরই চিরস্থায়ী মূল্য নাই। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ভোগের প্রতি আসক্তি, যাহা পরম পুরুষার্থ লাভের প্রতিবন্ধক, তাহার বর্জনের বিরুদ্ধে কোনও আপত্তিই টিকিতে পারে না। ভোগের সহিত সন্ধি করিয়া। ভোগাসক্তি অতিক্রম করা সম্ভবপর হয় না। তাই শঙ্করের মতে পরমপুরুষার্থ সর্ব্বস্ব-ত্যাগ ভিন্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

শঙ্কর জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন। জগৎ যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে জাগতিক অবস্থার উন্নতি-সাধনের প্রচেষ্টা নিরর্থক। সামাজিক জীবনের মূল্যও শঙ্করের মতে নাই—ইহা কেহ কেহ বলেন। শঙ্কর মায়িক জগতের বন্ধন হইতে মুক্তি চাহেন, জাগতিক অবস্থার উন্নতি তাঁহার লক্ষ্য নহে। কিন্তু তিনি জগতের ব্যবহারিক অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। রাজতন্ত্র ভালো কি প্রজাতন্ত্র ভালো, পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের মধ্যে কোন্‌টি উৎকৃষ্টতর, এ সকল রাজনৈতিক ও আর্থিক মতের আলোচনা না করিলেও, শঙ্কর সকল মানবের মঙ্গলই চাহিয়াছেন। কোন্ পথে সকলে পরমার্থলাভ করিতে পারে, তাহার নির্দেশ করিয়াছেন, প্রত্যেকের আমিত্বের প্রসারের উপদেশ দিয়া—স্বার্থপরতার সংকোচ সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। কাম্যবস্তুর উপভোগের দ্বারা কামনা শান্ত না হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় বলিয়া তিনি নিত্য নূতন নূতন অভাবের সৃষ্টি ও তাহার পূরণের ব্যবস্থা না করিয়া ভোগ-বাসনাকে সংযত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং মানবের দুঃখ মুক্তির উপায় সর্ব্বত্র প্রচারের জন্য ভারতের এক প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি কাহাকেও তাহার সাংসারিক কর্ত্তব্যে অবহেলা করিতে বলেন নাই, কাহাকেও ঈশ্বরে ভক্তি না করিতে শিক্ষা দেন নাই। কাহাকেও শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করিতে উপদেশ দেন নাই। বরং বিধি-নিষেধ পালন মুক্তির দ্বার বলিয়াছেন। বিধি-নিষেধের উদ্দেশ্য যখন সিদ্ধ হয়, তখনই শঙ্করের মতে তাহা অর্থহীন হয়, তাহার পূর্ব্বে নহে। জগৎ যে ঊর্দ্ধমূল, ঈশ্বরে তাহার মূল নিহিত, একথা শঙ্কর বারংবার বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন সামুৎপাদিক জগৎকে অতিক্রম করিয়াই যেমন সতে পৌঁছিতে হয়, তাহা বর্জন করিয়া নহে তেমনি নৈতিক বিধি-নিষেধ পালন করিয়াই মুক্তি অধিগত হয়, বর্জন করিয়া নহে।

আঞ্চলিক লোকসঙ্গীত

শ্রীজয়দেব রায়

বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার লোকসঙ্গীত প্রচলিত আছে। লোকসঙ্গীতের এই বৈচিত্র্য গৃহস্থ ঘরের বধূকন্যাদের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিলক্ষিত হয়।

এই প্রবন্ধে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত এই শ্রেণীর কতকগুলি আঞ্চলিক লোকসঙ্গীত লইয়া আলোচনা করা হইল। অবশ্য টুসু, ভাদু, চটকা, ভাওয়াইয়া প্রভৃতি শ্রেণীর গানও এক একটি অঞ্চলের বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত। আলোচ্য প্রবন্ধে সেই গানগুলি সম্পর্কে কোন আলোচনা করা হয় নাই।

চট্টগ্রামের অধিবাসীদের নাবিকবৃত্তির খ্যাতি আছে। দূর দূর সাগরে এখানকার নৌজীবিগণ সারা বৎসর পাড়ি দিয়া বেড়ায়, আর কর্ণফুলী নদীর তীরে কোন নির্জন বটছায়ায়, আরাকান পার্বত্য অঞ্চলে কোন ঝর্ণার ধারে বসিয়া তাহাদের বধূরা অশ্রু বিসর্জন করে—

অ ভাই, চাঁদ মুখে মধুর হাসি
দেখাল্যা বানাইলি সাম্পানের মাজি।
বাহার মারি যারগে সাম্পানরে।
ন মানে উজান ভাতি।
কুতুব দিয়ার পাছিম ধামে সাম্পানঅলার ঘর।
লাল বঅটা তুলি দিয়ে সাম্পানর উঅর॥
রঙ্গ্যা বন্ধু গেল ছাড়িয়ে সদা দিলে মোর দাগ লাগাই
এমন রসের কালে কার সোয়ামী ঘর ত নাই?

হাওড়া জেলার মেয়েলী গানের মধ্যে শ্লেষ ব্যঙ্গ জড়িত আছে। রসিকতা করিবার জন্যই নিম্নের গানটী রচিত। এগুলির মধ্যে সমাজ-চেতনাও প্রকাশ পাইয়াছে—

তারিণি মা, হাতির উপর কেন এত আড়ি।
মানুষে মেলে টেরটা পেতে, তোমায় যেতে হ'ত হরিণবাড়ি।
সুরকি কুটে সারা হতে, তোমার মুকুট যেত গড়াগড়ি।
পুলিসের বিচারে শেষে সঁপতো তোমায় প্রাণ জুরী।
সিঙ্গী মামা টেরটা পেতেন ছুটতে হ'ত উকিল বাড়ি॥

হুগলি জেলার গ্রামাঞ্চলে জেলেনীদের মধ্যে 'জালের বারশে' নামক একশ্রেণীর গানের প্রচলন আছে। এই গানগুলিও পেশাদারী গানেরই অঙ্গীভূত—

জালের মাথায় জাল দড়িরে আমার মাথায় রে ডালি।
ওরে কেমনে বেচিব মাজুরে ঐ না গৃহস্থের বাড়ীরে॥
(নছিব এই ছিল)
কি খেনে জল আনতে গেলাম রে উজান নদীর ঘাটে।
ওরে সেইখেনে পুড়িল কপাল রে ওই-না হলকা জালের সাথেরে।
সাত ভাইয়ের বুন আমিরে পরমা সুন্দরী,
ওরে ছোটভাই বৌদি দিছলো গালিরে জ্বালিয়ে ভাতারি রে।
নছিব এই ছিল॥

জেলেনীদের ন্যায় গোয়ালিনীদের মধ্যেও বিশেষ শ্রেণীর গানের চলন আছে। বারাসত অঞ্চলের গোয়ালিনীদের মধ্যে উত্তরবঙ্গের মাণিক পীরের গানের ন্যায় একশ্রেণীর পীরের গান প্রচলিত, যেমন—

'ভিক্ষা নাহি লিব মাতা তোমার বাসরে
থোড়া দুগ্ধ দাও মতো খেয়ে যাব ঘরে।'
দই-দুধ নাই মাণিক বলি গো তোমারে
আছে একটি বাঁজা গাই খাও না দুইয়ে।
কেমনি সত্যবাক্ ফকীর দেখিব তোমারে।
বাঁজা গায়ের দুগ্ধ আজ খাইব দুইয়ে॥

ত্রিপুরা জেলার ঘরোয়া গানের মধ্যে মাতৃহৃদয়ের স্নেহমমতা ঝরিয়া পড়িতেছে। ঘরে শিশুর জন্য বন্দিনী মাতার কণ্ঠে আকুল রোদন ধ্বনিত হইতেছে—

না খাওয়াইলাম ছাওয়ালে দুধ,
না দেখিলাম তার চন্দ্রমুখ,
না কহিলাম স্নেহরসের কথা রে।
যখন শিশু ক্ষুধায় জ্বলে কাঁদিবে মা-মা ব'লে
দেবতার প্রাণে নিশ্চয় বাজিবে রে।
সঙ্গের সাথিরা ভাই, কইও তার ঠাঁই
দুধের শিশু রাখিতে যতনে রে॥

পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব ও উত্তরবঙ্গেই মেয়েলী গানের বৈচিত্র্য অধিক। পশ্চিমবঙ্গের কীর্তনের সুর অন্য গানকে ভাসাইয়া দিয়াছে।

পল্লীবঙ্গের নারীদের বিদ্যা বুদ্ধি বেশী না থাকিলেও তাহাদের পরিগ্রহণ ক্ষমতা (adaptability) অসীম। ছড়া পাঁচালীর গীতাংশ তাহারা নিজেদের মনোমত করিয়া গড়িয়া লয়—

থাকো বিটি থাকো বিটি কিলগুড়ি খায়্যা;
আগুন মাসে নিম্ তোমায় কাঁহ্যা ধান কাট্যা।
কাঁহ্যা ধান চুটুর মুটুর, চ্যাপা ধানের খই,
লরা লম্বা সবরী কলা গোয়াল-মারা দই॥

কন্যার দ্বিরাগমন উপলক্ষে চট্টগ্রাম অঞ্চলে একশ্রেণীর ছড়াগান প্রচলিত আছে। এগুলি সখীরা সমবেত কণ্ঠে গায়—

দয়াল বড় মিঞার ঝি
জোরকারা বাজাইয়া যার গৈ বারই পাড়া দিই।

বারই পাড়ায় মাইয়া পোয়া খিয়াই ওঁ-অনা চায়
জোরকারার ধমকে ভইনউন চমকি আছাড় খায় ॥

যশোহর জেলার মুসলমান কৃষক বালিকাদের গান নালগীত। নীলের গানের সঙ্গে নামের মিল থাকিলেও বিষয়ের কোনই সামঞ্জস্য নাই। সাধারণতঃ পৌষ মাঘ মাসেই নাল গান গাওয়া হয়, মাঘমণ্ডলের গানের মতই এগুলিও রৌদ্রের আবাহনী ছড়া—

গুমুজে ঠেকেছে মাথা সোনার মুকুট পরা
আগুন পানির গড়া মানুষ কোমরেতে,
আঁটাদনে মানুষ করা ;
আচ্ছা চেহারা ধরলি তুই, না বেটী না কি বেটা,
মর্তের মা আসমানের বাপ চেনা বড় লেটা ॥

উত্তরবঙ্গের নারীদের মধ্যে প্রচলিত ধামালী গানের মধ্যে মৈমনসিং গীতিকার প্রতিধ্বনি পাওয়া যাইতেছে—

রাধা—লজ্জা নাইরে নিল ইচ্ছা কানাই, লজ্জা নাইরে তর
গলাত কলসী বান্ধিয়া যমুনাত্ ডুইব্যা মর ॥
কৃষ্ণ - কোথায় পামো কলসী রাধে, কোথায় পামো দড়ি
তুমি হও যমুনা রাধে, আমি ডুইবা মরি ॥

মহুয়া পালায় আছে—

লজ্জা নাইরে নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তোর।
গলায় কলসী বাইন্ধ্যা জলে ডুব্যা মর ॥
কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ি।
তুমি হও গহিন গাঙ আমি ডুব্যা মরি ॥

চব্বিশ পরগণা অঞ্চলের কৃষাণী বালিকাদের কণ্ঠে ঘেঁটুর গান আর একটি ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। ফাল্গুন সংক্রান্তির দিন কৃষাণী গৃহস্থঘরের বালিকারা দল বাঁধিয়া চা পান ও উতোরের মধ্যে দিয়া ঘেঁটুর গান গাহিয়া থাকে। একদল গান গাহিয়া অনুরোধ জানাইল—

—বেশ তো ভাই, বল না সই, সমিন্তা এই
তোমার কেমন ভাই।
দিদিশাশুড়ী ভাউবে তোমার হোক না সমিস্তা যেমন ॥

অপর দল চাপান দিল—

বলিলো, বাঁশ গাছেতে ফলছে কাঁঠাল
ও তার বড় বড় কোয়া।

ঘেঁটুর দল জবাব দিল—হ্যাঁ ভাই বর—এই ফাগুন মাসে,
কাঁঠাল ফলে বুঝি বাঁশের গাছে ?

অপর দল আবার প্রশ্ন করিল—

বাঁশ গাছেতে ফলছে কাঁঠাল ও তার বড় বড় কোয়া।
মুড়ির সনে খেতে গেলেই ভাল, নয় তো সব ভোঁয়া।
কাঁচায় না খায় ঝোলে ঝালে, পাকায় না খায় খুলে,
স্বর্গ দ্বারে পৌঁছে যায় ও সে খেলে পায়ে দলে ॥

সবাই এক সঙ্গে—ও দিদি খেলে পায়ে দলে ? ঘেঁটুর দল এবার নিজেরাই সমস্যার সমাধান করিল—

ওগো দিদি, ও দিদির সই—এর ভাঙানিটা হচ্ছে মই—
বোঝো গো শুয়ে খেয়ো দই—না বোঝো তো কররে হৈ চৈ ॥

মেয়েলী গানের মধ্যে এই শ্রেণীর দ্বৈতস্বরের মধ্য দিয়া নাটকীয় বৈচিত্র্য সঞ্চারের চেষ্টা হয়। ঢাকা অঞ্চলের একটি গানের মধ্যে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মান-অভিমান, আদর-আবদারের সুন্দর ইঙ্গিত করা হইয়াছে—

স্ত্রী—লাল নীল চউর বাইয়া
হাটে যাওরে সোনার নাইয়া।
লাল বাদাম উড়াইয়া, দিলাম কিন্তু কইয়া—
আমার লাইগা আনে জানি মেঘ ডম্বুর শাড়ী ;
নইলে কিন্তু আড়ি—
স্বামী— থাকো থাকো সোনার কইন্যা
পন্থের দিকে চাইয়া,
গেলাম তোমায় কইয়া—
তোমার লাইগা সেই না শাড়ী আসমু আমি লইয়া ॥

বহু মেয়েলী গানই মেয়েদের জবানীতে পুরুষদের কণ্ঠেই গতি হয়। এই গানগুলির অধিকাংশই প্রেমের কমনীয় সুকুমার দিকটিরই পরিচয় প্রকাশ করে। বহু কর্ম সঙ্গীতের মধ্যেও এই প্রথার প্রচলন আছে। নিম্নের গাড়োয়ানী গানটিতে গাড়োয়ানকে ঘরে ফিরিবার অনুরোধ করা হইয়াছে গাড়োয়ানী গান নিশ্চয় স্ত্রীলোকদের গাহিবার কথা নয়।

উজান উজান করে গাড়ীয়াল উজালে বাঘের ভয়।
গাড়ী থইর‍্যা গাড়ীয়াল বাড়ি ফির‍্যা যায়,
ভাতও না খাইয়্যা গাড়ীয়াল মুখে না দ্যয় পান,
চালের বাত্তা থইয়্যা কন্যা জুড়িছে কান্দন ॥

দক্ষিণ বঙ্গের ব্রহ্মপুত্র তীরাঞ্চলের সকল পল্লীতে এককালে বরিপুজা নামে একটি বিশেষ শ্রেণীর মেয়েলী গান শোনা যাইত। বরিপুজা কার্ত্তিক পুজারই রূপ ভেদ।

পল্লীবঙ্গের নিম্নশ্রেণীর কন্যা বধূদের নানাপ্রকার বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী অবলম্বনেই এই সকল গান রচিত ; ইহাও এক শ্রেণীর কর্ম সঙ্গীত—

সখিরে—ওরে ও বাবুই রে
তুই মোর পাক না ধান খাইলি।
এক বাবুই কালীয়া, এক বাবুই ধলিয়া
এক বাবুইর কপালে তেলক।
হাতে লৈয়া ধনু তীর কোণায় বৌ সাজিল রে—
একলা পুতের বৌ সাত ক্ষেত রাখে রে—
(ধুয়া—তুইসোর পাক্না ধান খাইলি) ॥
শাশুড়ী আর বৌ গেল বাদুড় মারিতে রে
(অমুকের) মায় যায় গণ্ডার শিকারে রে ?
(অমুকের) বউ যায় গণ্ডার বাঁধিতে রে
(ধুয়া—তুই মোর পাক্না ধান খাইলি ॥

দেবী মনসা, লক্ষ্মী মাতার ন্যায় ষষ্ঠীদেবী ও নারীগণের নিত্য আরাধ্যা। বাঙলাদেশে সর্বত্রই ষষ্ঠি ব্রতের চলন আছে। উত্তর বঙ্গের দিনাজপুর অঞ্চলে 'বাইটোর গান একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর লোক সঙ্গীতে পরিণত হইয়াছে। শোলার সঙ্গে কলা বউ-এর শুভবিবাহ ও তাহার সন্তান কামনায় এয়ো স্ত্রীরা ফুলের পুষ্প সাজাইয়া গান গায়—

আগাহাটের বামনা রে, পাছা হাটের বামনা।
কলাতি পুছেছে—ও বামনা ঠাকুর রে।
কি করিবেন আগ্ বল হাটের বজারে।
তোর মাথা হইয়াছে পাকিয়া শণ
কোমর হইয়াছে ধনুক বাণ
এখন কি তোমাকক সাজে ছাওয়ালে বাপ রে ॥

—তেইশ—

—ডেকেছিলে কেন ?

ঘরে বিকেলের নীলাভ ছায়া পড়েছে। বাইরে রোদ ছিল, কিন্তু তার পথ জুড়ে রয়েছে সামনের কানা দেওয়ালটা। ক্যালেণ্ডারের রঙিণ ছবিটা বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। পূরবী বসে আছে চুপ করে। চোখের দৃষ্টি টেবিলের উপর—একখানা খাতার শাদা পাতা খোলা সেখানে।

—ডেকেছ কেন ? কী হয়েছে ?—আবার মৃদু গলায় জিজ্ঞাসা করল সত্যজিৎ।

সমস্যাটা বাড়ীর নয়। পা দিতেই কাকিমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল—কোনো বিশেষ কিছু হলে তাঁর মুখ থেকেই জানতে পারত সত্যজিৎ। অতএব ব্যাপারটা পূরবীরই ব্যক্তিগত।

এইবার টেবিলের ড্রয়ারটা টানল পূরবী। বের করে আনল একখানা চিঠি। বললে, পড়ুন।

খামের উপরে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নাম। বাংলা দেশেরই একটি মফঃস্বল শহরের ঠিকানা।

—কী ব্যাপার ? সন্ন্যাসিনী হতে যাচ্ছ নাকি ?

নীলাভ বিকেলের আলোয় বিষণ্ণ হাসি হাসল পূরবী।

—পড়েই দেখুন।

টাইপ করা ছোট একটি চিঠি, একটা ব্যাকরণ ভুল আছে তাতে। আর তার বক্তব্য হল : তোমার দরখাস্ত আমরা পেয়েছি। তুমি স্বচ্ছন্দেই ওখান থেকে ট্রান্সফার নিয়ে এখানে এসে ভর্তি হতে পারো। আমরা তোমাকে থাকা খাওয়া ছাড়াও পঞ্চাশ টাকা স্টাইপেণ্ড দেব। আমাদের সর্ত যদি তুমি মেনে চলতে রাজী থাকো, তা হলে তোমার অভিভাবকের চিঠি নিয়ে পত্রপাঠ আমাদের জানাও। চিঠির নিচে সেক্রেটারির দস্তগত।

চোখ তুলে সত্যজিৎ বললে, এর মানে ?

—ওদের ওখানে একটা দরখাস্ত করেছিলুম।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কারণটা কী ? কলকাতা ছেড়ে পালাতে চাও কেন ?

—আমার আর ভাল লাগছে না।

মুহূর্তে সারা মন কালো হয়ে উঠল সত্যজিতের। পূরবী চলে যেতে চায়। কেন চায় ? সত্যজিৎ তাকে ভালোবেসেছে বলে ? তাকে বিয়ে করতে চেয়েছে—সেই ভয়ে ? সংকোচেই হোক, আর সত্যজিতের ব্যক্তিত্বের জন্যেই হোক—মুখ ফুটে বলতে পারেনি : তোমাকে আমি চাই না—তুমি দস্যুর মতো আমাকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা কোরো না, তাই এইভাবে আত্মরক্ষা করবার পথ খুঁজছে ?

অথচ, সত্যজিৎ ভেবেছিল, পূরবী খুশি হয়েছে। মনে করেছিল, সে যে তাকে চেয়েছে এর চাইতে বড় সৌভাগ্য পূরবীর কল্পনাতেও ছিল না। সমস্ত জিনিসটাই নিজের দিক থেকে সে বিচার করেছিল, পূরবীর যে একটা আলাদা মন আছে, সত্যজিতের খেয়াল ছাড়া তারও যে একটা আলাদা সত্তা আছে—এই কথাটাই সে ভাবতে পারেনি। আমি ক্লান্ত, অতএব তোমার কাছে এসেছি ; বনশ্রীকে নিয়ে পুরোনো নাটক আর জমবে না। অতএব এ-বার তোমাকেই নতুন নায়িকা নির্বাচন করা যাক। কিন্তু তার খেলায় পূরবী তৎক্ষণাৎ খেলনা হয়ে সাড়া দেবে

—নিজের সম্পর্কে এতখানি শ্রদ্ধা না থাকলেই তার ভালো হত।

পকেট থেকে চুরুট বের করে তার গোড়াটা হিংস্রভাবে দাঁতে চেপে ধরল সত্যজিৎ। বললে, অনার্স পড়ায় ওখানে?

—জানিনা। না থাকলে ছেড়ে দিতে হবে।

—ওঃ! চুরুটে দেশলাই ধরিয়ে সত্যজিৎ জিজ্ঞেস করল: কিন্তু সর্তের কথা আছে চিঠিতে। সেগুলো কী?

—ওঁদের নার্সারি স্কুলে পড়াতে হবে। সকালে তিন ঘণ্টা করে পড়াতে হবে। খাওয়া নিরিমিষ। থিয়েটার সিনেমা দেখা চলবে না, বাইরে মেলামেশা চলবে না—ওঁদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে যোগ দিতে হবে—

—অর্থাৎ পুরোদস্তর 'নানারী'? তার পরের স্টেজটা কী? ওখানকার সেবিকা? গৈরিকপরা ভৈরবী?

পুরবীর ম্লান মুখ পাণ্ডুর হল।

—অনেকে তাও করেন। কেউ কেউ চলেও এসেছেন।

—আর তুমি?

সত্যজিৎ স্থির দৃষ্টি মেলে ধরল পূরবীর মুখের উপর: তুমি কী করতে চাও?

—এখনো কিছু ভাবছি না। পরে ভাবব।

—কাকা-কাকিমার আপত্তি হবে না?

ওঁদের টাকার দরকার। গোটা ত্রিশেক করে পাঠাতে পারব।

মিনিট দুই ঘরটা স্তব্ধতায় ডুবে রইল। বিকেলের নীল ছায়া আরো গভীর হয়ে সমুদ্র নীল রঙ ধরল। পাশের ঘরে অন্য ভাড়াটেরা দেওয়ালে বোধ হয় পেরেক পুঁতছে—তারই একটা চাপা আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল তালে তালে।

—তা হলে আমাকে ডাকলে কেন? সব তো ঠিকই করে ফেলেছ দেখছি।

এইবারে কথা বলবার সময় এসেছিল পুরবীর। বলতে চেয়েছিল, তোমার জন্তেই তো আমি পালাতে চাইছি। কলেজে তোমার আমার সম্পর্কের কথা আর গোপন নেই—মেয়েদের মধ্যে গুঞ্জনটা এখন সরব হয়ে উঠেছে। সেদিনও ক্লাসে ইতিহাসের প্রফেসার কে-কে-এল কী একটা কথায় 'মাই ইয়াং ফ্রেণ্ড প্রফেসার মুখার্জি' বলে যে বাঁকা দৃষ্টি পুরবীর মুখের উপর ফেলেছিলেন, সে-কথা সে ভুলতে পারেনি—আরো ভুলতে পারেনি, পাশের মেয়েটির রুমাল চাপা দেওয়া মুখ রুদ্ধ হাসিতে লাল টকটকে হয়ে উঠেছে।

পুরবী বলতে চেয়েছিল, আমাকে যদি নিতেই চাও—তা হলে তোমার দাবীটাকে পাকা করে নাও। এমনভাবে—সকলের সামনে, চারিদিকের নিষ্ঠুর কৌতুকের কাছে আর মেলে রেখো না। আর যদি এখনো তোমার সময় না হয়ে থাকে—তা হলে কিছুদিনের জন্যে আমিই দূরে সরে যাই। শুধু কি নিজের লজ্জাতেই আমি সরে যেতে চাইছি? ওদের মন লঘু—ওদের রুচি ইতর। ওরা কী করে বুঝবে তোমাকে, কী করে জানবে তুমি কত বড়—কী করে ওরা দেখবে তোমার সম্রাটের মহিমা! সে মন, সে দৃষ্টি ওদের নেই। তাই ওরা তোমাকে লঘু করতে চায়, অশ্রদ্ধার মন্তব্য করে। সে আমি সইতে পারব না। নিজের লজ্জার চাইতেও তোমার অপমান আমার বুকে অনেক বেশি করে বাজে। তাই আমি সেই অপমান থেকে তোমাকে আড়াল করতে চাই। জানি, তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়ার মতো বেদনা আমার আর নেই, সারাদিনে একটি বারও তোমাকে আমি দেখতে পাব না সে-কথা আমি ভাবতেই পারি না। কত দুঃখে তোমার কাছ থেকে সরে যেতে চাইছি—সে-কথা তুমি বোঝো, ক্ষমা করো আমাকে। আর যদি পারো, এখনই তোমার কাছে আমায় তুলে নাও—আমি তো অপেক্ষাই করে আছি।

কিন্তু এ-সব কথা রাত জেগে ভাবা যায়; সামনের কানা দেওয়ালটার উপর নিশীথ রাত্রের কালো ছায়া ভাসতে থাকলে, রেডিয়োর শেষ প্রোগ্রামে রবীন্দ্র সঙ্গীতের করুণ মূর্ছনায় ঘর ভরে গেলে যখন বুকের মধ্যেও বাজতে থাকে:

"পথিক আমি এসেছিলেম
তোমার বকুল তলে,
পথ আমারে ডাক দিয়েছে
এখন যাব চলে—"

সেই সময় সব কথা সাজিয়ে বলতে পারে পূরবী। কিংবা অন্যমনস্ক হয়ে চশমা খুলে রেখে অনেকক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে মাথার ভিতর একটা তীব্র যন্ত্রণা আরম্ভ হয়ে গেলে তখন নিজের একটা কথাও সে আড়াল রাখতে পারে না। কিন্তু এখন? এই বিকেলে? সত্যজিতের মুখোমুখি? না—না।

পূরবী জবাব দিল না।

সত্যজিৎ চুরুটে টান দিলে—আগুন নিবে গেছে। নিজের মনেও কোথাও কী একটা নিভে গেছে তার। কথা বলবার উৎসাহ হচ্ছে না। তবু আস্তে আস্তে বললে, এতে বিপদের কী আছে? ইচ্ছে হয়—যাও।

পূরবীর বুকের মধ্যে ঘা লাগল। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে এল শরীর। সত্যজিৎ ভুল বুঝেছে? নাকি এমনিই নিষ্ঠুর হয় পুরুষেরা?

—আপনার আপত্তি নেই?

—আমি কেন আপত্তি করব?—অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল সত্যজিৎ।

পূরবীর চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হল। তুমিই তো দূরে সরিয়ে দিচ্ছ আমাকে। তোমার জন্যেই তো আমি নির্বাসনের পথ খুঁজে নিয়েছি। না—নিজের জন্য নয়। তোমাকে নিয়ে লজ্জা আমার যতই বড় হোক—তাতেও আমার সুখ আছে। কিন্তু ওরা তোমাকে ছোট করতে চাইছে। ওদের হীনতার পঙ্ক ছিটিয়ে দিতে চাইছে তোমার গায়ে। সেইটেই আমি সইতে পারি না। তুমি একবার জোর ক'রে বলো—'যেতে দেব না'—একবার হাত বাড়িয়ে বলো: 'এসো আমার সঙ্গে।' তা হলে —তা হলে—

গলার শিরায় এসে থর থর করে কাঁপতে লাগল কথাগুলো। কিন্তু মুখ ফুটে একটা শব্দও বেরুল না।

মাথা নিচু করে প্রায় নিঃশব্দ গলায় পূরবী বললে, তা হলে যেতেই বলছেন?

—এখানে যদি ভালো না লাগে, যাবে বই কি। আর টাকারও তো দরকার।

—হ্যাঁ টাকার খুব দরকার।—পূরবীর মুখে হাসির রেখা দিল। সে হাসিটা দেখতে পেলোনা সত্যজিৎ—পেলে চমকে উঠত।

আচ্ছা, আসি তবে—

সত্যজিৎ আর একটা কথাও বলল না—ফিরেও তাকালো না পূরবীর দিকে। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যন্ত্রণায় দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরল পূরবী—সারা শরীর কান্নায় টলমল করে উঠল।

ভেবেছিল, হেসে উঠবে সত্যজিৎ। সেদিনের মতো তার হাত টেনে নেবে মুঠোর ভিতর। বলবে, এইজন্যে তোমার এত ভয়? এরই জন্যে তুমি পালাতে চাও? আমি? আমি আছি। তাকাও আমার দিকে। তোমার সব ভাবনা—সব লজ্জা আমি তুলে নিলাম!

কিন্তু সত্যজিৎ বুঝল না। বুঝতে চেষ্টাও করল না। পুরুষ এই রকমই। এই ওদের নিয়ম।

টেবিলের উপর মাথা গুঁজে কাঁদবার সময়টুকুও পূরবী পেলো না। মা এসে পড়েছেন।

—সতু কোথায়? চা খেয়ে গেল না?

—কাজ আছে, চলে গেলেন—

ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল পূরবী। মা-র কাছে কান্না লুকোবার মতো এ বাড়ীতে কোথাও জায়গা নেই—এক স্নানের ঘরটা ছাড়া।

পথে বেরিয়ে এল সত্যজিৎ। আকাশে কনে-দেখা আলো। আত্মগ্লানিতে জ্বলতে লাগল মন। ঠিকই হয়েছে—তার পাওনাই পেয়েছে সে। নিজের প্রয়োজনে পূরবীকে সে ব্যবহার করতে চেয়েছিল, ভালোবাসাটা ছিল এক তরফা, সবটাই ছিল নিজের স্বার্থে জড়ানো। তার পুরো জবাবটাই পেয়েছে।

বীথি সামনে থাকলে হেসে উঠত।

—অনুগ্রহের দিন চলে গেছে ছোড়দা। অনুগ্রহ কথাটাই মানুষকে অপমান করা। শ্রদ্ধা করতে জানো না, দয়া করতে গিয়েছিলে। কিন্তু ইতিহাসের চাকা উল্টো দিকে ঘুরছে—সেটা ভুলো না।

ঠিক। কিন্তু সব যেন কেমন ফাঁকা হয়ে গেছে। কোথাও কোনো অবলম্বন নেই। মাঝিহীন নৌকোর মতো মন ক্লান্ত বিকেলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলছে। আপাতত তার কোনো কাজ নেই—কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই, তার চোখের সামনে কোনো কিছুর কোনো অর্থ নেই।

রাস্তার ল্যাম্পপোষ্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে চিনে বাদাম চিবুনো যেতে পারে ; সামনের উঁচু প্রাচীরটা জুড়ে সিনেমার পোষ্টার পড়েছে—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা যেতে পারে সেগুলো। নইলে বাড়ী ফিরে গিয়ে শোনা যেতে পারে ইন্দ্রজিতের বীভৎস চিৎকার—ভিলোঁর কবিতা—

ভিলোঁ! He was a Bohemian! উদ্দাম বেপরোয়া জীবন। লাইফ অ্যাণ্ড ওয়াইন। অ্যাণ্ড লাইফ?

পাশে একটা গাড়ী এসে থামল। একদা ছাত্র আন্দোলনকারী, অধুনা সরকারী চাকুরে পরিতোষ।

—হ্যালো অধ্যাপক!

—হ্যালো!

—কোথায় যাচ্ছিস?

—কোথাও না।

—জাষ্ট স্ট্রলিং?

—হুঁ।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে পরিতোষ বললে, ছবি দেখতে যাবি? মেরিলিন মুনরোর? যদি অবশ্য অধ্যাপকের নীতিতে না বাধে—

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল সত্যজিৎ। তারপর পরিতোষের খুলে দেওয়া গাড়ীর দরজায় পা বাড়িয়ে বললে, চল্—

ক্রমশঃ

অষ্টাপদী

শ্রীকালিদাস রায়

(১)

মনে রাখিবার মতো কি দিয়াছি? তাই লজ্জা পাই।
বলিতে পারিনা তাই মোর দান ভুল না, ভুল না।
আমার এ তুচ্ছ দান পাবে কি তোমার মনে ঠাঁই?
তুমি যদি এর সাথে কর অন্য দানের তুলনা?

শুনেছি প্রেমের দান ভুলেনাক প্রেমিকের মন,
যত তুচ্ছ হোক তাহা সে কভু তা যায় না পাশরি।
অশোক কিংশুক চম্পা আলোকিত করে উপবন,
তবু কেন মধুপের প্রীতি লভে তৃণের মঞ্জরী?

(২)

আমার বলিবার যা কিছু আছে, তার
সকলি বলি সোজা ভাষাতে।
রচি না প্রহেলিকা রচি না কুহেলিকা
গহন বানাবার আশাতে।
রসিক মনে তব দ্যোতনা পাবে নব,
করুণা কর যদি কবিরে।
আমার লঘু কথা লভিবে গহনতা
গাহন কর যদি গভীরে।

(৩)

ক্ষুধার তাড়নে শ্যেন পাখী ধরে কপোতে নখের চাপে
মার মমতায় চঞ্চুটি তার কাঁপে।
তবু তারে তার বধিতেই হয়, রক্ত যখন ঝরে
নয়নে তাহার অশ্রুর ধারা ক্ষরে।
ক্ষুধার জ্বালায় মানুষও তেমনি করে যেই পাপাচার
ধৌত তা হয় অশ্রু সলিলে তার?
হয় কি চিত্রগুপ্তের খাতে পৃথক করি তা জমা?
শ্যেনের মতন মানুষ পায় কি ক্ষমা?

(৪)

মনের আকাশে বিরাজ করিছে শাশ্বত ছায়াপথ,
অই পথ বাহি নামে প্রতি নিশি দেবতার মায়ারথ।
অই পথ দিয়া কবিকল্পনা ধায় অনন্তধামে,
অই পথ দিয়া বাণী-বীণা হতে অমৃতের ধারা নামে।

অই ছায়াপথে দেবতানরের মধুর মিলন ঘটে,
সে মিলনবাণী তারায় তারায় রটে গগনের পটে।
সে মিলনবাণী ধ্বনিত বিশ্বে কাব্যে, কথায়, গানে।
এই সুগোপন স্বপনবারতা কবিরাই শুধু জানে।

নূতন দিক দর্শনে ভাস্কর শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

রাধিকা রায়চৌধুরী

প্রবীণ ভাস্কর শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় রায়চৌধুরী শিষ্য দেবীপ্রসাদ সম্বন্ধে বলেছিলেন :—

The heroic sized statues of Sir Surendranath Banerjee and Sir Ashutosh Mukerjee in the Curzon Park and Esplanade of Calcutta Proclaim the vigour and firm execution of the Artist, My great joy in his successful career and attainments in the plastic art in particular, could only be expressed by the ancient verse :—সর্বত্র বিজয়মিচ্ছেৎ ছাত্রাত্‌ পরাজয়ম ; The Victory lies in seeking defeat at the hands of his pupil or son.

I conclude with the prayer that the contributions of his mature manhood may reveal still higher possibilities or creative excellence as he goes a head with flying colours and the vigorous steps of a conquering hero in the realms of Art. (Choudhury and his Arts).

॥ পাটনার শহীদ স্মারকমূর্ত্তি ॥

স্বাধীনতা যুদ্ধের সাতজন নির্ভিক সৈনিক—সরকারী সৈন্যের গুলিতে আহত সঙ্গীসহ লক্ষ্যস্থলে অগ্রসরমান

বিগত ২৮ বছরের কর্ম্মক্ষেত্র মাদ্রাজকে কেন্দ্র করিয়া দক্ষিণ ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র দেবীপ্রসাদের প্রতিভার অমর স্বাক্ষর বর্ত্তমান রহিয়াছে।

উত্তর ভারতের প্রথম অভিযাত্রায় পাটনার সহীদ স্মারকের বিরাটত্ব, ও সর্ব্বাঙ্গীণ বৈশিষ্ট্য, শ্রেষ্ঠতায় অতীতের বহু বৈদেশিক শিল্পীর কাজকে ম্লান করিয়া দিয়াছে।

পাটনার সহীদ স্মারকের মূর্ত্তিগুলি প্রায় কুড়ি ফুট উচ্চ বাঁধান মঞ্চের উপর প্রতিষ্ঠিত। সাতজন স্বাধীনতা যুদ্ধের নির্ভীক সৈনিক, পতাকা হস্তে লক্ষ্য স্থল সরকারী সেক্রেটারীয়েটের দিকে অগ্রসর হইতেছে। সরকারী সৈন্যের গুলিতে আহত সাথীকে জড়িয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে সম্মুখ পানে চলিয়াছে। প্রতিটি দেশ প্রেমিকের চোখে মুখে দুর্নিবার পণের দৃঢ়তা। উপরে মুক্ত আকাশ—পায়ের তলে কঠিন পাষাণ। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।

স্বাধীনতা যুদ্ধের বেদনা ও শৌর্য্যের বহু বিক্ষিপ্ত ঘটনা যাহা চোখে দেখিয়াছিলাম, চলমান জীবনের অগ্রগতির পথে ক্রমশঃ সেই স্মৃতি বিলীন হইয়া ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহারই একটী ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ভাস্কর দেবীপ্রসাদ যে জীবন্ত মূর্ত্তিগুলি তৈরী করিয়াছেন, তাহা দর্শক-মনকে বিগতদিনের উদ্দীপনাময় ঘটনার সম্মুখীন করিয়া, মর্ম্মান্তিক বেদনা ও বিজয় গৌরবের অংশীদার করিয়া তুলে। ইতিহাসের এত বড় চাঞ্চল্যকর রূপায়ণ, চোখে না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর নয়।

পাটনার সহীদ স্মারকের আবরণ উন্মোচন করিতে গিয়া রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিয়াছিলেন "বিখ্যাত ভাস্কর শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী এই ভাবোদ্দীপক ভাস্কর্য্য শিল্পের উদ্ভাবক ও রচয়িতা বলিয়া তাহাকে আমি অভিনন্দন জানাইতেছি। যাহারা এ শিল্পকার্য্য দেখিবেন তাহারাই সহীদ তরুণদের সাহস ও আত্মত্যাগের দ্বারা প্রভাবিত হইবেন। শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী অতি নিখুঁত ভাবে এই মূর্ত্তিগুলি প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়া তাহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।" সহীদ স্মারকের প্রতিষ্ঠার পর নূতন দিল্লীতে National Art gallery'র সম্মুখে যে মূর্ত্তিগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার নাম দেওয়া হয়েছে 'শ্রমের জয়যাত্রা'। এই compositionটী ১৯৫৬ ইংরেজীতে নূতন দিল্লীর All India contemporary sculptural exhibition ভাস্কর্য্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

॥ একলা চলরে ॥

কলিকাতার চৌরঙ্গী রোড্ ও পার্ক স্ট্রীটের সংযোগস্থলে স্থাপিত জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর এই বিরাট মূর্তিটির সম্প্রতি আবরণ উন্মোচন করেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু। মূর্তির পাদদেশে উপবিষ্ট ভাস্কর শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীকে দেখা যাচ্ছে।

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে নির্মীয়মান মহাত্মা গান্ধীর বিরাটকায় মূর্তি।

মর্য্যাদা লাভ করে পুরস্কৃত হয়েছিল। National Art gallery'র কর্তৃপক্ষ শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীকে দিয়ে life size bronze statue তৈরী করিয়ে জাতীয় মর্য্যাদায় তাহা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। উচ্চ মঞ্চের উপর প্রতিষ্ঠিত 'শ্রমের জয়যাত্রা' ভারতীয় সাধারণ দরিদ্র শ্রমজীবীদের মূর্ত্তপ্রতীক।

দেবীপ্রসাদের দৃষ্টির প্রখরতা ও অনুভূতির গভীরতা, কর্ম্মমুখর মানুষগুলিকে কোন এক গ্রাম প্রান্ত হইতে নগরীতে লইয়া আসিয়াছেন এবং সাধনার সমস্ত শক্তি দিয়া ইহাদের গড়িয়া তুলিয়াছেন। শ্রমিকের যে শক্তি আমাদের চোখে পড়লেও মনে পড়ে না, তাহাদের হৃদয়গ্রাহী পরিচয় শিল্পী আমাদের দিয়াছেন।

তিনি সচেতন। তাই তিনি আপনার সৃষ্টির সৌন্দর্য্য ও নিরাপত্তা রক্ষায় প্রথম থেকেই তৎপর আছেন। তিনি আজ পর্য্যন্ত যত অতিকায় মূর্ত্তি তৈরী করেছেন, সমস্তই বিদেশ থেকে bronze casting করে আনা হয়েছে। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার পর তিনি স্বদেশেই bronze casting এর সুব্যবস্থা করতে কৃত সংকল্প হন। বহু অর্থ ব্যয় করে, সামান্য একটী কারিগরকে দিয়ে নিজ তত্ত্বাবধানে গড়ে তুলেছেন একটী কর্ম্মকেন্দ্র। সেখান থেকে সর্ব্ব প্রথম তৈরী হয়েছে, পাটনার সহীদ স্মরকের সাতটী মূর্ত্তি তারপর 'শ্রমের জয়যাত্রার' চারটী মূর্ত্তি।

মাদ্রাজ আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে, তিনি সপরিবারে বাংলায় চলে গিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু ষাট বছর বয়সেও
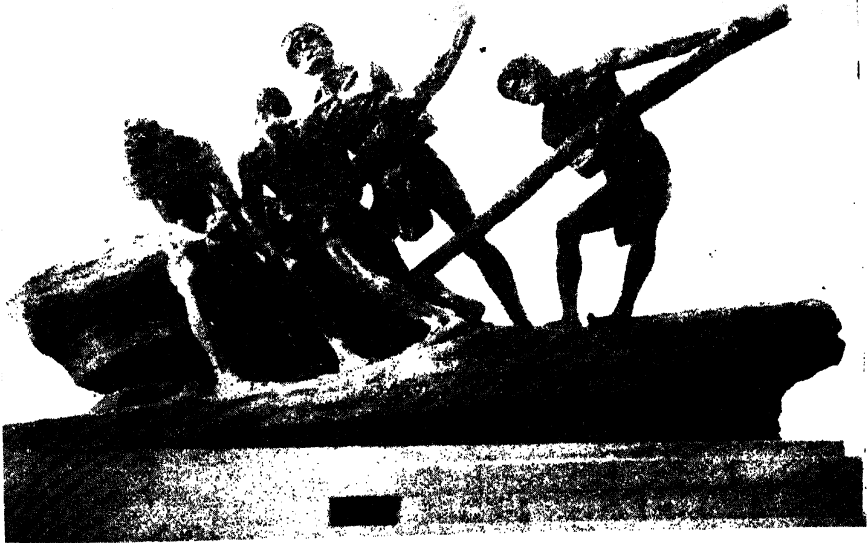
॥ শ্রমের জয়যাত্রা ॥

চারজন শ্রমিকের তীব্র দারিদ্র্যের শুদ্ধ রূপ এবং সম্মিলিত উদ্যমে অপরাজেয় কর্ম্মশক্তির গতিবেগ—এই দুই উপেক্ষিত সত্যের বাস্তব প্রকাশে সুপরিস্ফুট বিরাট ব্রোঞ্জ মূর্ত্তিগুলি উচ্চ মঞ্চের উপর হইতে, বিপুলভাবে দর্শক মনকে আকর্ষণ করে। বিস্ময়, সহানুভূতি ও জীবন-জিজ্ঞাসায় মনকে আন্দোলিত করে তোলে। গভীর ভাবে উপলব্ধি করিতে হয় আমাদের দেশের শ্রমজীবীদের অবস্থা। এইরূপ বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে এবং তার সার্থক রূপায়ণে, ললিত কলা একাডেমীর সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী অপেক্ষা, জীবন দরদী শিল্পী আমাদের নিকট একাত্মা হইয়া উঠেন। শ্রমের জয়যাত্রা জাতীয় ভাস্কর্য্যে এক নূতন দিক দর্শন।

ভাস্কর দেবীপ্রসাদ স্তূপীকৃত কাদার তালে যে সন্তানের জন্মদান করেন, তার সুস্থভাবে বেঁচে থাকার গভীর দায়িত্ববোধে জনকের মত যুবশক্তির অধিকারী দেবীপ্রসাদের পক্ষে কর্ম্ম বিরতি সম্ভব নয়। আবার ফিরে এসেছেন মাদ্রাজে। এবার আর নগরীর পরিবেশে নয়, শুভানুধ্যায়াদের মুখরতা থেকে বহু দূরে একটী নির্জ্জন অঞ্চলে নিয়েছেন আস্তানা। সঙ্গে আছে দুইজন একান্ত প্রিয় ছাত্র চুনী বিশ্বাস ও ভি, কে, নাম্বুদ্রীপাদ (কেরালা) আর্ট কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করেও গুরুকে আঁকড়ে পড়ে আছেন।

পাহাড়ের গায় ছায়াশীতল কর্ম্মকেন্দ্রটী রূপান্তরিত হয়েছে ভাস্করের বিরাট ষ্টুডিয়োতে। বিভিন্ন বিভাগে পূর্ণোদ্যমে চলেছে কাজ—তৈরী হচ্ছে বড় বড় মূর্ত্তি। নানা প্রান্তের চাহিদা। দেবীপ্রসাদের কর্ম্মের নেই বিরতি—'একলা চলরে' এই বাণীর মূর্ত্ত প্রতীক—এক বিরাটকায় পুরুষ এগিয়ে চলেছেন—সত্য সন্ধানীর যুগযুগান্তব্যাপী অভিযাত্রায় মহাত্মা গান্ধীজী।

দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র

শ্রীহারাধন দত্ত

বাংলাদেশে কৃষ্ণনগর ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নাম সুপ্রসিদ্ধ। এ পর্যন্ত কৃষ্ণনগর ও কৃষ্ণচন্দ্রের উপর অনেকগুলি ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আবার কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলই বোধ হয় এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য গ্রন্থ। কারণ অন্নদামঙ্গল কেবল কাব্য নহে—কাব্যে ইতিহাস। রঘুনন্দন মিত্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন। অন্নদামঙ্গলে কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনা প্রসঙ্গে এই দেওয়ান ঘুনন্দনের উল্লেখ আছে। দেওয়ান রঘুনন্দন সম্পর্কে বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে কিছু কিছু উল্লেখ আছে বটে—কিন্তু কোথাও বিস্তৃত আলোচনা নেই। আমি যে রঘুনন্দন মিত্র সম্বন্ধে বলছি—মনে রাখা প্রয়োজন তিনি কৃষ্ণচন্দ্র সরকারের দেওয়ান। কারণ কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক দুই-জন রঘুনন্দন মিত্র প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। দুইজনেই দেওয়ান উপাধি-ধারী, দুই জনেই কৃষ্ণচন্দ্র রাজবংশে পরিচিত ছিলেন। এ জন্যই দুই রঘুনন্দনকে অভিন্নরূপে কল্পনা করে ইতিপূর্বে কোন কোন গ্রন্থকার ভুল করেছেন। ইতিপূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগ্রন্থ, 'রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক ডক্টর মদনমোহন গোস্বামী। বলা বাহুল্য ভারতচন্দ্রের উপর এমন সর্বাঙ্গ সুন্দর গ্রন্থ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি। অধ্যাপক ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সত্যই বলেছেন…"অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মদনমোহন গোস্বামীর রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, কবি সম্বন্ধে, বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে, এবং বঙ্গীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে বহু বৎসর ধরিয়া একখানি প্রামাণিক, আদর্শ ও অনুকরণীয় পুস্তকরূপে বিরাজ করিবে।" এই গ্রন্থের, "মহারাজ কৃষ্ণ-চন্দ্র ও কৃষ্ণনগর রাজসভা" শীর্ষক আলোচনায় দেওয়ান রঘুনন্দনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। রঘুনন্দনের ঐ পরিচয় প্রমাদপূর্ণ বলেই আমার মনে হয়েছে। তবু ইহা ঐ গ্রন্থের ত্রুটি হিসাবে আমি উল্লেখ করছি না। বরং ঐরূপ বিরাট কার্যে ঐরূপ ত্রুটিকে বিবেচনার মধ্যে না আনাই উচিত। তৎসত্ত্বেও কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ দেওয়ান সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। এখানে ঐ বিষয়েই কিছু উল্লেখ করছি।

ডক্টর গোস্বামী মহাশয় গ্রন্থের ৪০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—"রঘুনন্দন মিত্র কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন। ইনি নবাবের নিকট হইতে 'মুস্তৌফী' উপাধি প্রাপ্ত হন। হুগলীর সাত ক্রোশ উত্তরে শ্রীপুরে ইহার বাস ছিল। এই মুস্তৌফী উপাধিযুক্ত দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন না। কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ানের বাস হুগলীর শ্রীপুরেও ছিল না। প্রথমতঃ এই মুস্তৌফী দেওয়ান রঘুনন্দনের কিছু পরিচয় দিতেছি।

দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র-মুস্তৌফী উলার রামেশ্বর মিত্র-মুস্তৌফীর পুত্র ছিলেন। রামেশ্বর নবাব সরকারে কাজ করতেন। তিনিই প্রথম 'মুস্তৌফী' উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে তিনিই নদীয়া জেলার উলার গঙ্গাতীরে বসতি স্থাপন করেন। রামেশ্বরের ১০টি পুত্রের মধ্যে রঘুনন্দন, অনন্তরাম, মুকুন্দরাম ও শিবরাম বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। রঘু-নন্দন ছিলেন রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। রামেশ্বর উলার (বীরনগরের) মুস্তৌফী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। রঘুনন্দন একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। রঘুনন্দন তাঁর পিতার সঙ্গে ঢাকার রাজ সরকারে কাজ করতেন। রামে-শ্বরের মৃত্যু হয় ১৬৩০ শকাব্দের কিছু আগে। রঘুনন্দন গণনা কার্যে পারদর্শী ছিলেন। রামেশ্বরের মৃত্যুর পরে রঘুনন্দন গণনা দ্বারা তাঁর বংশধরগণের সুখ সমৃদ্ধির স্থান অবগত হন এবং ১৬৩০ শকাব্দে (১৭০৭ খৃঃ ১১১৪ সালে) তিনি স্ত্রী পুত্রাদিসহ উলা ত্যাগ করেন এবং হুগলী জেলার শ্রীপুর গ্রামে গঙ্গাতীরে বসতি স্থাপন করেন। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে বাঁশবেড়িয়ার রাজা রঘুদেব রায়ের নিকট ৭৫ বিঘা মহাত্রাণ ভূমি গ্রহণ করে উলার বাটীর অনুকরণে তথায় গড়বেষ্টিত বাটী, দীর্ঘিকা, চণ্ডীমণ্ডপ ও দেবালয়াদি নির্মাণ করেন। রঘুনন্দনের উলা ত্যাগের একটি কারণ এই যে উলা হইতে গঙ্গা বহু দূরে সরিয়া যায়। এই গঙ্গা-বিবর্জিত দেশে ধার্মিক রঘুনন্দন বাস করা অকর্তব্য বিবেচনা করেন। ইতিপূর্বে উলার পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা যে প্রবাহিত হইত তার প্রমাণ আছে 'কবিকঙ্কন চণ্ডীতে' এবং উলা নিবাসী দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গঙ্গা-ভক্তি তরঙ্গিনীতে (১২৮৪)। নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে এই রঘুনন্দন মুস্তৌফীর সদ্ভাব ছিল। এই রঘুনন্দন একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন এবং এই জন্যই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সন ১১৩৭ সালের ১৬ই ভাদ্র তারিখে একখানি দান পত্র দ্বারা রঘুনন্দনকে গঙ্গার পূর্বতীরে পলাসী বেলগাঁ, কলিকাতা ও হাবেলী সহরে বাগিচা করিবার জন্য ৩০ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেছিলেন। রঘুনন্দন বৃদ্ধ বয়সে সন ১১৩৭ সালে ৭টি পুত্র রেখে ইহলোক ত্যাগ করেন। রঘুনন্দনের বিস্তৃত বংশ আজও শ্রীপুরে বর্তমান আছে। উলা ও শ্রীপুরের মুস্তৌফী বংশ সম্বন্ধে শ্রীসুজন নাথ মিত্র মুস্তৌফী লিখিত 'উলা বা বীরনগর' ও 'মুস্তৌফী বংশ পরিচয়' গ্রন্থে সুপ্রচুর তথ্য ও উপাদান আছে। উক্ত দুই গ্রন্থে দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র মুস্তৌফীর একটী সংক্ষিপ্ত জীবনীও লিখিত আছে। এ ছাড়া The modern history of Indian chiefs, Rajas and Zaminders, Part II গ্রন্থে মুস্তৌফী বংশের বিবরণ আছে। ডক্টর গোস্বামী মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান রঘুনন্দন সম্পর্কে প্রামাণ্য সমর্থন হিসাবে "কাল পেঁচার বঙ্গদর্শন" হতে যে অংশটি ভূমিকায় ব্যবহার করেছেন তা উলা ও পরে শ্রীপুরে মিত্র মুস্তৌফীর সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কিন্তু এই রঘুনন্দন কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন না, একথা আগেই বলা হয়েছে।

নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের যিনি দেওয়ান ছিলেন তাঁর নামও রঘুনন্দন মিত্র। এই রঘুনন্দনের মুস্তৌফী উপাধি ছিল না। এই রঘুনন্দনের জীবন কাহিনী সুবিস্তৃত কোথাও নাই। সুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী[১] তাঁর উলা বা বীরনগর ও 'মুস্তৌফী বংশ পরিচয়' উভয় গ্রন্থেই রঘুনন্দন মিত্র মুস্তৌফী সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে উভয় গ্রন্থের পাদটীকায় বলেছেন—"কোন কোন লোকের ধারণা আছে যে উলার রঘুনন্দন মিত্র মুস্তৌফী ও নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান বিখ্যাত রঘুনন্দন মিত্র একই ব্যক্তি। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান বিখ্যাত রঘুনন্দন মিত্র বর্দ্ধমান জেলার চাঁড়ুলগ্রাম নিবাসী ছিলেন। রঘুনন্দন মিত্র মুস্তৌফীর বংশেরই এক ব্যক্তি এই কথা বলেছেন। এখানেই কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান রঘুনন্দন সম্পর্কে সকল সংশয় কাটিতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান রঘুনন্দন সম্পর্কে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করছি।

শিবনিবাস[২] নদীয়ার ইতিহাসে সুপরিচিত। ইহা একদা কৃষ্ণচন্দ্রের সাময়িক রাজধানীও ছিল। শিবনিবাস সন্নিহিত গ্রামাঞ্চলে আজিও একটি ছড়া শোনা যায়। তাহা এই—

শিবনিবাসী, তুল্যকাশী, তাহে নদী কঙ্কন,
কোথা হতে এলে তুমি রাঢ়ের রঘুনন্দন।

এই রাঢ়ের রঘুনন্দনই কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান। ইনি নানাবিধ কল্যাণকর জনহিতকর কাজের জন্য নদীয়ার বিস্তৃত জনপদে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর স্মৃতিবিজড়িত "দেওয়ান বেড়"গ্রামও শিবনিবাসের সন্নিবিষ্ট। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর পরিত্রাতা দেওয়ান রঘুনন্দনকে এই গ্রামটি পুরস্কার স্বরূপ দান করেছিলেন। এই "দেওয়ানবেড়"গ্রামেই আজিও রঘুনন্দনের বংশধরেরা বাস করছেন। সুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী অন্য একটি প্রবন্ধে এই রঘুনন্দন সম্পর্কে বলেছেন—"রঘুনন্দন মিত্র জেলা বর্দ্ধমানের ডাঁইহাটের নিকট চাঁড়ুল গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। রঘুনন্দনের দেওয়ানবেড় এখন একপ্রকার জনশূন্য হইয়াছে। তাঁহার বংশে এখন নাম করিবার মত আছেন পাবনার সাবজজ শ্রীযুক্ত রোহিণীকান্ত মিত্র বি, এল মহাশয়। ইনি দেওয়ান রঘুনন্দনের প্রপৌত্র। শ্রীযুক্ত রোহিনীবাবুর জ্যেঠতাত কন্যাকে ভারতবর্ষ সম্পাদক রায় জলধর সেন বাহাদুর প্রথমপক্ষে বিবাহ করিয়াছিলেন।"

আর একখানি গ্রন্থে এই রঘুনন্দনের সামান্য উল্লেখ আছে দেখা যায়। এই গ্রন্থের নাম 'তীর্থমঙ্গল'। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে কবি বিজয়রাম সেন এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কবি বিজয়রাম সেনের বাস ছিল শিবনিবাসের নিকটবর্ত্তী ভাজনঘাট গ্রামে—কাব্য মধ্যেই এর উল্লেখ আছে—

শিবনিবাস সন্নিধানে ভাজনঘাট ধাম
কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে[৩] কহে সেন বিজয়রাম।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত 'তীর্থমঙ্গলে'র ১৯৪ পৃষ্ঠায়—রঘুনন্দন মিত্রের নামটি ছন্দের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

ছয়দণ্ড বেলা হইল কাটোয়া সহরে
বাহবলি মাঝিগণ চলিল সত্বরে
ডাহিনে রহিল বারবানার বামে মাটিয়ারী
রঘুনন্দন মিত্রের শিব তথায় সারি সারি
দ্বাদশ শিব মিত্র করেছেন স্থাপন
তাহা প্রণমিয়া সবে করিল গমন
ডাহিন ভাগে দাঁইহাট, বুড়ারাণীর ঘাট
মাণিকচন্দ্রের ঘাট তথা, অতিবড় ঠাট। (তীর্থমঙ্গলে)

গ্রন্থ সম্পাদক নগেন্দ্রনাথবসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ২১৫নং পাদটীকায় এই রঘুনন্দন মিত্র সম্বন্ধে লিখেছেন—"রঘুনন্দন মিত্র দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ বংশোদ্ভব। ইনি দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্রনামে পরিচিত। প্রসিদ্ধ বর্গীর হাঙ্গামা সময়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নবাব আলীবর্দ্দী খাঁকে যুদ্ধকার্য্যের ব্যয়নির্বাহ জন্য নজরাণা স্বরূপ বারলক্ষ টাকা দিতে অসমর্থ হওয়ায় কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। দেওয়ান রঘুনন্দনের কর্ম্মকুশলতায় নজরাণার টাকা প্রদত্ত হইলে মহারাজ মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু রঘুনন্দন অনেকের বিদ্বেষ ভাজন হইয়া, শেষে দেওয়ান মাণিকচাঁদের কোপে পড়িয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী 'দেওয়ানবেড়' নামক গ্রামে রঘুনন্দনের বংশধরেরা এক্ষণে বাস করিতেছেন।"[৪] মাটিয়ারীতে রঘুনন্দন মিত্র প্রতিষ্ঠিত যে দ্বাদশ শিবমন্দিরের উল্লেখ রহিয়াছে—তাহা ঐতিহাসিক সত্য। শুনেছি ঐ দ্বাদশ শিবমন্দির এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না—গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে। মাটিয়ারীর ঐ দ্বাদশ শিবমন্দির সম্বন্ধে ঐতিহাসিক Dr. K. K. Dutta লিখেছেন—"Matiari, a big village situated just opposite Dainhat, famous for the images of Ramasita Raghunandan Mitra, the Dewan of Maharaja Krisn Chandra of Nadia founded here twelve Sivo images"[৫]। পূর্ব্বোক্ত 'তীর্থমঙ্গল' ঐ শতাব্দীর ইতিহাস রচনার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় কেহ কেহ তাহাও উল্লেখ করেছেন। তীর্থমঙ্গল-সম্পাদক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—"গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিলে দেখিতে পাই, ইহাতে সে সময়কার বাঙালীর সমাজচিত্র, দেশের অবস্থা, লোকের মনের অবস্থা এবং ইংরাজাধিকারের সর্ব্বপ্রথম অবস্থার চিত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, এজন্য এই তীর্থমঙ্গল কেবল তীর্থযাত্রীর পক্ষে নহে, অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাসের একটি উপাদেয় অধ্যায় বলিয়া সর্ব্বজনসমাদৃত হইবে।" এই তীর্থমঙ্গল সম্পর্কে Dr. K. K. Duttaও লিখেছেন—

(১) সুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী উলার মুস্তৌফী বংশের সন্তান।

(২) শিবনিবাস—(ভারতবর্ষ—চৈত্র—১৩৩১)

(৩) এই কৃষ্ণচন্দ্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নহেন ইনি ভূকৈলাস রাজবংশের পূর্বপুরুষ।

(৪) 'তীর্থমঙ্গল' (গৌড়ীয় সাহিত্যপরিষৎ প্রকাশিত) পাদটীকা।

(৫) Studies in the History of Bengal Suba, P-398.

"It is a Contemporary work on travels of much historical value···The description being accurate are of much importance for a student of history"[৬] দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র মুস্তোফী বর্দ্ধমানের মাটিয়ারীতে দ্বাদশ শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন নি এবং তিনি দেওয়ান বেড়ের সহিতও সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। বন্দী কৃষ্ণচন্দ্রকে রঘুনন্দন মিত্র মুস্তোফী বন্দীমুক্ত করেছিলেন কিনা এ ইতিহাসও নেই।

নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র সম্বন্ধে বর্তমানে শ্রীকালীকিঙ্কর দে বি-এল, মহাশয় কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। রঘুনন্দন কেমন করে শিবনিবাসের পাশ দিয়ে চুর্ণীর প্রবাহ এনেছিলেন—এতৎসম্পর্কে তিনি উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন। তিনি একস্থলে এই রঘুনন্দন সম্পর্কে লিখেছেন—"রঘুনন্দন ছিলেন বিশ্বামিত্র গোত্রজ দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সন্তান। মধ্যবিত্ত সংসারে তাঁহার জন্ম। পূর্ব্বনিবাস কোন্নগরে—পরে বর্দ্ধমান জেলার দাঁইহাটের নিকটে চাণ্ডুলী গ্রামে। অল্প বয়সেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। আলিবর্দ্দী ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রাজ্যারোহণের পরেই টাকার তাগিদে ১২ লক্ষ নজরাণার দায়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে অবরোধ করিলে, সামান্য কর্ম্মচারী রঘুনন্দনের একমাত্র উদ্যোগে তিনি কারামুক্ত হন। তদবধি তিনি নদীয়া রাজার দেওয়ান, শুধু দেওয়ান নয়—সর্ব্বাধিকারী ক্ষমতাযুক্ত দেওয়ান। তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় নদীয়া রাজার আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাস হইতে বর্গীর হাঙ্গামা সুরু হইল। রাজপরিবার ও ধনৈশ্বর্য্য রক্ষার জন্য নিভৃতস্থানে রঘুনন্দনেরই পরিকল্পনায় বিশাল নগরী শিবনিবাসের পত্তন হইল। অট্টালিকাসমূহ তদানীন্তন ইউরোপীয় প্রাসাদাদি হইতে কোন অংশে ন্যূন ছিল না তাহা বিশপ হেবার সাহেব বলিয়া গিয়াছেন। ২ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এই শিবনিবাসেই অগ্নিহোত্র বাজপেয় যজ্ঞ সমাহিত হইল এবং এই শিবনিবাস নগরীর পাদমূলে ভগীরথের মতই তিনি বহতা নদী আনিয়াছিলেন।"[৭] এইগুলি ছাড়া দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্ররায়ের ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত" (সংবৎ ১৯৩২) কুমুদচন্দ্র মল্লিকের "নদীয়া কাহিনী" প্রভৃতি গ্রন্থে কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান রঘুনন্দন সম্পর্কে পরিচয় আছে। কিন্তু সেখানে রঘুনন্দনের পূর্ব্ব জীবনের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

নদীয়ার দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র বিচক্ষণ কর্ম্মকুশল ও সূক্ষ্ম রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। আর রঘুনন্দন মিত্র মুস্তোফী ছিলেন ধার্মিক ও সাধক। রঘুনন্দনের জন্ম হয় সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে। রঘুনন্দন মিত্র মুস্তোফীর জন্ম হয় অভিজাত মুস্তোফী বংশে। নদীয়া রাজের দেওয়ান রঘুনন্দনের বিচক্ষণতা, বুদ্ধি ও কর্ম্মকুশলতা সম্বন্ধে রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিতম' (১৮১১) ও 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত' গ্রন্থে ইঙ্গিত আছে। মুস্তোফী রঘুনন্দন মিত্রের মৃত্যু ঘটে বৃদ্ধবয়সে অতি সাধারণ ভাবে। কিন্তু দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্রের মৃত্যুকাহিনী অতি করুণ। ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত গ্রন্থের ৬৮-১০৬ পৃষ্ঠায় এই রঘুনন্দনের মৃত্যুকাহিনীর এক করুণ চিত্র অঙ্কিত আছে। উলার রঘুনন্দন মিত্র মুস্তোফী ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে উলা ত্যাগ করে হুগলী জেলার শ্রীপুর গ্রামে বাস করেন, ১৭১০ খ্রীঃ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হতে মহাত্রাণ জমি পান এবং ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ বয়সে মারা যান। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ১৮ বৎসর বয়সে ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে নদীয়ার রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার রাজত্বের প্রথম দুই বৎসর ১৭২৮-১৭৩০ উলা-ত্যাগী শ্রীপুর নিবাসী রঘুনন্দন মিত্র মুস্তোফীর নদীয়ার দেওয়ান হইবার সুযোগ অত্যন্ত ক্ষীণ। এতক্ষণে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সমসাময়িক দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র মুস্তোফী ও দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র উভয়ের সম্বন্ধেই বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করেছি। উভয় রঘুনন্দনের মধ্যে এই বিভিন্নতা হতেই বোঝা যাবে যে শ্রীপুরের রঘুনন্দন মিত্র মুস্তোফী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন না।

---

(৬) Alivardy & His times—P-285-86

(৭) দুই শতাব্দী পূর্ব্বে নদী পরিবহনে কৃতিত্ব—বসুমতী (কার্ত্তিক—১৩৬১)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বৃহস্পতি ওরফে বিরুবাবু আহারাদির পর নিজের ঘরে ইজিচেয়ারে বসিয়া ইজিপ্টের বইটিই পড়িতেছিলেন। অত্যন্ত স্বল্পভাষী লোক তিনি, স্বল্পাহারীও। অনেকরকম রান্না হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি নিজে বেশী কিছু খান নাই। দুই আঙুলে করিয়া তুলিয়া তুলিয়া সব জিনিসই একটু আধটু চাখিয়াছিলেন। চাখিতে চাখিতেই তাঁহার পেট ভরিয়া গিয়াছে। ভাত যৎসামান্য খাইয়াছেন, ডালই একটু বেশী প্রিয় তাঁহার, প্রায় আধ বাটিটাক্ চুমুক দিয়া খাইয়াছেন সেটা। আপেল স্টাফিংটাও তাঁহার মন্দ লাগে নাই। চম্পার রান্নার হাত আছে। চম্পার গান-বাজনাও খুব ভালো লাগিয়াছে তাঁহার। কিন্তু মুখভাবে সেটা প্রকাশ করেন নাই। ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মনে মনে উপভোগ করিয়াছেন তাহা। বাবা যে ইহাতে আনন্দ পাইয়াছেন ইহাতেই বেশী খুশী তিনি। কিন্তু এ খুশীভাবটাও তিনি চাপিয়া রাখিয়াছেন, প্রকাশ করেন নাই, সাধারণত করেন না। এক-দুই-তিনকে কি গল্প বলিবেন তাহা তিনি ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন। ফারাও খুফুর পুত্র খুফুকে যে যাদুকরের গল্পটা বলিয়াছিলেন সেই গল্পটাই তিনি উহাদের শুনাইবেন। সম্ভবত উহাদের ভালো লাগিবে। যাদুকর দেশি হাঁসের মুণ্ড কাটিয়া তাহা আবার জুড়িয়া দিয়াছিল।...সহসা অন্য একটা কথা মনে হওয়াতে তাঁহার ভ্রূকুঞ্চিত হইয়া গেল। তাঁহাদের বাড়ির কাছে একটা পীর-পাহাড় আছে। তাহার তলায় কোন ঐতিহাসিক রহস্য আত্মগোপন করিয়া নাই তো! হারাপ্পা, মহেঞ্জোদাড়ো তো ওইরূপ পাহাড়ের মতোই ছিল। স্বর্গীয় রাখাল বাঁড়ুয্যে কল্পনার জোরে সেই সব পাহাড়ের তলায় অতীতের ইতিহাস দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই পাহাড়টা খুঁড়াইয়া দেখিলে ক্ষতি কি। তাহা কি সম্ভব? গভর্ণমেণ্টকে বলিলে শুনিবে কি? শুনিবে না, পীরপাহাড়কে খুঁড়িতে সাহসই করিবে না। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাই বাধিয়া যাইবে হয় তো। মনে পড়িল নকুলদা যখন এক স্টোন-কণ্ট্রাক্টার মাড়োয়ারির নিকট চাকুরি করিতেন তখন এই পাহাড়ের তলায় না কি কয়েক ঘড়া মোহর পাইয়াছিলেন। কাহাকেও সেকথা বলেন নাই অবশ্য, খুব চাপা প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু ওই পাহাড়-খোঁড়ার পর হইতেই তাঁহার অবস্থা ফিরিয়া যায়।...বৃহস্পতি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। পাহাড় খুঁড়িবার সময় দু'একটা পাথরে কি যেন লেখাও ছিল, কারুকার্য্যও ছিল। ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন। বাবার জন্য যে দুশ্চিন্তা তাঁহাকে পীড়িত করিতেছিল, সে দুশ্চিন্তার মেঘ আগেই কাটিয়া গিয়াছিল, তাই তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া নিজের খেয়ালে নিজের জগতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

সহসা তাঁহার মনে হইল, ভাগ্যে কয়েকখানা বই সঙ্গে আনিয়াছিলাম।

উষা নিজের ঘরে বিছানায় বসিয়া সদানন্দের পা টিপিয়া দিতেছিল। আহারাদির পর সদানন্দের দিবা-নিদ্রা দেওয়ার অভ্যাস আছে। নিদ্রার পূর্ব্বে পা-টেপানোটাও তাঁহার একটা বদ-অভ্যাসের মধ্যে। পূর্ব্বে চাকর দিয়া টিপাইতেন, কিন্তু এখন উষা নিজেই টিপিয়া

দেয়। চাকরদের হাতের ছোঁয়াচে চর্ম্ম-রোগ হইতে পারে এই ধারণা যেদিন হইতে তাহার মাথায় ঢুকিয়াছে সেদিন হইতে সে সদানন্দের পায়ে কোনও চাকরকে হাত দিতে দেয় না। এমন কি তাঁহার কাপড় চোপড়ও নিজেই কাচিয়া দেয়। প্রায় প্রকাশ্যভাবেই সে সদানন্দের সেবা করিতেছিল, ঘরের কপাটটা ভেজানো ছিল শুধু। স্বামীর পদ-সেবা করিতেছে তাহাতে লজ্জার কি আছে। সন্ধ্যাটারই বরং লজ্জা-সরম নাই, দুপুরে স্বামীকে লইয়া ঘরে খিল দিয়াছে। উষা পান চিবাইতেছিল, ঠোঁট দুটি লাল, মাথার চুল আলুলায়িত, একটা সুন্দর কেশ-তৈলের সৌরভে ঘরের বাতাস আমোদিত, চোখের দৃষ্টি আনন্দে সোহাগে টলমল করিতেছে। পা টিপিতে টিপিতে সে স্বামীকে ভর্ৎসনা করিতেছিল। ইদানীং কিছুদিন হইতে সে স্বামীর সহিত যে আলাপই করুক না কেন, তাহাতে ভর্ৎসনার সুর ফুটিয়া ওঠে।

"তুমি এসে থেকে তো বাবার কাছে একবারও বসলে না। বাইরে বাইরে খালি বাজে গল্প করে' বেড়াচ্ছ। কাছে বসলে বাবা কত খুশী হ'ন। কি যে মুখ-চোরা স্বভাব তোমার—"

"কেষ্ট-দা'ও তো যান নি"

"কেষ্ট-দার কথা ছেড়ে দাও। বুনো লোক। জানোয়ারদের সঙ্গই ওঁর ভালো লাগে"

"রঙ্গনাথ গিয়েছিল কি—"

"গিয়েছিল একবার সকালের দিকে, তুমি তখন চান করছিলে। গিয়ে বসে' বাবার পায়ে হাত বুলিয়ে দিলে, এদিকে বেশ লেফাপা-দুরস্ত আছে তো। দাদার জামাইটিও বেশ হয়েছে। ঘুরছে ফিরছে বাবার কাছে গিয়ে বসছে। তুমিই খালি এড়িয়ে চলছ—"

"গুরুজনদের সামনে গিয়ে কেমন যেন স্বস্তি পাই না। কি গল্প করব ওঁর সঙ্গে—"

"যে কোনও বিষয়ে গল্প করতে পার! বাবার সঙ্গে যে কোনও বিষয়ে গল্প করা যায়। সোমনাথ তার ওপরওলা কি এক সাহেবের সম্বন্ধে গল্প করছিল। রঙ্গনাথ গাছপালা নিয়ে কি সব বলছিল, কে একজন বুড়ো মুসলমান এসেছিল সে তো সমস্তক্ষণ আখ আর গুড়ের গল্পই করলে। বাবা সবার সঙ্গেই বেশ সায় দিয়ে দিয়ে গল্প করলেন—"

"আমি বাবার সঙ্গে কি নিয়ে গল্প করব তাতো মাথাতেই আসছে না"

"বই টই নিয়ে বলো না কিছু। বাবা এককালে খুব বই পড়তেন। বাংলা ভাষায় যত বই বেরুত সব বাবা কিনতেন, কি প্রকাণ্ড লাইব্রেরি ছিল আমাদের। এ গ্রামের সব বাঙালী আমাদের বাড়ী থেকে বই নিয়ে পড়ত। সেই জন্যেই সব হারিয়ে গেছে। যে বই নিয়ে যায় সে তো আর ফিরিয়ে দেয় না, সে পাট নেই কারও—"

সদানন্দের ঘুম আসিতেছিল।

জড়িতকণ্ঠে বলিলেন, "বেশ, সন্ধ্যের পর বসব গিয়ে—"

"আর দেখ, এক-দুই-তিনকে তুমি একটু শাসন কোরো। বড্ড বেড়েছে ওরা—"

"আচ্ছা"

"আর দেখ, আমাদের চাকরটাকে কিছু টাকা দিয়ে কাটিহারে পাঠিয়ে দিই, কি বল, কিছু তরকারি, ফল, চা কফি হরলিকস্ কোকো এইসব কিনে আনুক। কুমার বেচারা একা আর কত সামলাবে। দাদা অবশ্য এসেই ওকে কিছু টাকা দিয়েছেন। কিন্তু আমাদেরও তো কর্ত্তব্য আছে—"

"বেশ—"

সদানন্দের নাকটা হঠাৎ ডাকিয়া উঠিল।

উষা তাহার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া তাহার পর মৃদু হাসিল। দ্বিতীয়বার নাক ডাকিতে সে ধীরে ধীরে তাহার গায়ে একটা চাদর ঢাকা দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। উষা দিবা-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে, কে যেন তাহাকে বলিয়া দিয়াছে দিনে ঘুমাইলে আরও মোটা হইয়া যাইবে।

এক-দুই-তিনকে লইয়া স্বাতী পেয়ারা গাছগুলির তলায় তলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। গাছ-পাকা পেয়ারার উপর তাহার খুব লোভ। কুমার—স্বাতী-সোমনাথের জন্য একটি আলাদা তাঁবুর ব্যবস্থা করিয়াছিল দক্ষিণ দিকের মাঠে। সোমনাথ আহারান্তে সেই তাঁবুর ভিতর ঢুকিয়াছিল। সে মনে মনে প্রত্যাশা করিয়াছিল স্বাতীও আসিবে। আসিলে তাহাকে বিলাতী মাসিক পত্রিকায়

প্রকাশিত একটি ছবি দেখাইবে সে। পত্রিকাটি সে স্টেশন স্টলে কিনিয়াছিল কিন্তু ট্রেনের ভীড়ে স্বাতীকে দেখাইতে পারে নাই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরও যখন স্বাতী আসিল না তখন সোমনাথ তাঁবু হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে অবশেষে পেয়ারা গাছগুলির নীচে আসিয়া পড়িল।

"এ কি, এতো খাওয়ার পর আবার পেয়ারা খাবে না কি"

স্বাতী আসল কথাটি চাপিয়া গেল। ইহাই তাহার স্বভাব।

"দাদুর জন্যে খুঁজছি। দাদু পেয়ারা খুব ভালোবাসেন তো—"

ভুই বলিয়া উঠিল—"একটু আগে যে পেয়ারাটা পেলাম সেটা তো আমরাই খেলাম ভাগ করে'। দাদুর জন্যে রাখলে না তো—"

"ও পেয়ারা কি দাদুকে দেওয়া যায়। পাকেই নি—"

এক বলিল, "না জামাইবাবু, সুন্দর ছিল পেয়ারাটা—"

"চুপ কর ফাজিল কোথাকার"—ধমকাইয়া উঠিল স্বাতী। তাহার পর ঘাড় বাঁকাইয়া মুচকি হাসিয়া সোমনাথকে বলিল—"ওই অনেক উঁচুতে চমৎকার পেয়ারা রয়েছে। পেড়ে দেবে ?"

প্রায় মগডালের কাছাকাছি একটা বড় পাকা পেয়ারা ছিল। সোমনাথ মালকোঁচা মারিয়া গাছে উঠিবার আয়োজন করিতে লাগিল। তরুণী স্ত্রীর অনুরোধ উপেক্ষা করা যায় না।

কিরণও খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়াই কৃষ্ণকান্তকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারও উদ্দেশ্য ছিল স্বামীকে ভর্ৎসনা করিয়া কিছু নীতি-উপদেশ দেওয়া! কিন্তু কৃষ্ণকান্তকে সে ধরিতেই পারিল না! কৃষ্ণকান্ত আহার শেষ করিয়াই নিজের বন্দুকটি লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোথা গিয়াছেন, কেহই বলিতে পারিল না। বন্দুকের খালি বাক্সটার দিকে চাহিয়া কিরণ খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর চিঠি লিখিতে বসিল। চিঠি লিখিল পুত্র ঘণ্টুকে।

"বাবা ঘণ্টু, তোমার দাদু অনেকটা ভালো আছেন। বিপদটা আপাতত কেটে গেছে মনে হচ্ছে। খবর পেয়ে সবাই এসেছে। বাড়ি এখন জমজমাট। উষা তার তিন ছেলে নিয়ে এসেছে। দাদার ছেলে-মেয়েরা এসেছে সবাই, গগনের বউও এসেছে। দাদা-বউদি তো এসেছেনই। সন্ধ্যা-রঙ্গনাথও এসেছে। সোমনাথ-স্বাতীও। সেজদাও সপরিবারে আসছেন, খবর এসেছে আজ। এ সময় তুমি না থাকাতে আমার বড়ই কষ্ট হচ্ছে। তুমি যেমন করে' পার ছুটি নিয়ে চলে' এস। সবাই নিজের নিজের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এসেছে, আমার ছেলেটিই আমার কাছে নেই, একি ভালো লাগে কখনও ? তুমি আমার চিঠি পাওয়া মাত্র ছুটির দরখাস্ত কোরো, যদি ইতিমধ্যে না করে' থাকো। দরখাস্তে লিখে দিও না হয়—মায়ের খুব অসুখ করেছে—"

এই একটি কথাই সে নানা সুরে লিখিতে লাগিল।

পার্ব্বতী পুরসুন্দরীকে লইয়া পড়িয়াছিল।

"নিয়ে আসি না একটু তেল। তুমি আপত্তি করছ কেন"

"না এখন তেল মাখাতে হবে না আমার পায়ে। বিছানার চাদরটা তেলে মাখামাখি হয়ে যাবে, আজই বার করেছি ওটা"

"হলেই বা, আরও তো চাদর আছে—"

"তুই গড়িয়ে নে না একটু, আমাকে নিয়ে পড়লি কেন—"

"ঘোরাঘুরি তোমার কম হচ্ছে না। হাঁটুর ব্যথাটি যদি বাড়ে তখন আমাকেই ভুগতে হবে যে। আমি উনুনে তেলের বাটিটা চড়িয়ে এসেছি, নিয়ে আসি"

পার্ব্বতী দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

পুরসুন্দরী অর্দ্ধ-স্ফুট-কণ্ঠে বলিলেন, "জালিয়ে খেলে মেয়েটা—"

বৃহস্পতি কোণের দিকে একটা ইজি চেয়ারে বসিয়া পড়িতেছিলেন। বই হইতে মুখ না তুলিয়াই তিনি বলিলেন, দিক না একটু তেল মালিশ করে'। ঠিকই তো বলছে ও, হাঁটুর ব্যথাটা বাড়লে মুশকিল হবে—

পুরসুন্দরী বাদ-প্রতিবাদ পছন্দ করেন না, অপ্রসন্নমুখে পাশ ফিরিয়া নীরবে শুইয়া রহিলেন।

টেলিগ্রাম করিবার জন্য দিগন্তর সহিত সন্ধ্যাও পোস্টাফিসে গিয়াছিল। উষা ঠিক খবরটি জানিত না। সন্ধ্যা রঙ্গনাথের সহিত নিজের ঘরে গিয়া খিল দিয়াছিল এইটুকুই উষা দেখিয়াছিল, কিন্তু একটু পরেই যে সন্ধ্যা অন্য দরজাটি দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল তাহা উষা দেখে নাই। সন্ধ্যার দিনের বেলা ঘুম আসে না। দিনের বেলা সে পড়া-শোনা করে। কিন্তু রঙ্গনাথের দিনের বেলা না ঘুমাইলে চলে না। তাহার আর একটি বদ-অভ্যাস আছে। সন্ধ্যা পাশে না শুইলে তাহার ঘুমই আসে না। রঙ্গনাথ ঘুমাইয়া পড়িতেই সন্ধ্যা নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। বাহিরে আসিয়াই দেখিতে পাইল—দিগন্ত কোথা যেন যাইতেছে।

"কোথা যাচ্ছিস এ সময়ে—"

"পোস্টাফিসে টেলিগ্রাফ করতে। দাদা বললে পাক-প্রণালী চাই দু'তিন রকম। আমার এক বন্ধুকে টেলিগ্রাম করে' দি, সে খুঁজে কিনে পাঠিয়ে দেবে—"

"পাক-প্রণালী? কি হবে?"

"দাদা বলছে দাদুকে নতুন নতুন তরকারি রান্না করে' খাওয়াবে রোজ।"

"আইডিয়াটা চমৎকার, না?"

কপাল হইতে চুলের গোছা সরাইয়া দিগন্ত সন্ধ্যার মুখের দিকে চাহিল। সন্ধ্যা দেখিল তাহার চোখের দৃষ্টি দাদার নূতন আইডিয়ার কিরণে ঝলমল করিতেছে। তাহার হঠাৎ খুব ভালো লাগিয়া গেল দিগন্তকে। নূতন আলোকে তাহাকে যেন দেখিতে পাইল।

"চল আমিও তোর সঙ্গে যাই, গ্রামের ভিতর যাইনি অনেক দিন। সেই ছেলেবেলায় যেতুম"

"চল"

পোস্টাফিসের কাছাকাছি আসিয়া সন্ধ্যা বলিল, "তুই টেলিগ্রাম কর, ততক্ষণ আমি কাশী সিংয়ের বাড়িটা ঘুরে আসি। ওরা কেউ আছে কিনা কে জানে—"

পোস্টাফিসের পিছনেই কাশী সিংয়ের বাড়ি। কাশী সিং এককালে এখানকার থানার হাবিলদার ছিল। আদি বাড়ি তাহার মুঙ্গের জেলায়। এইখানেই পুলিশের চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করে। সেই সময় সূর্য্যসুন্দর চেষ্টা করিয়া তাহাকে স্থানীয় জমিদারের কাছারিতে উচ্চ-শ্রেণীর সিপাহীর পদে বহাল করাইয়া দিয়াছিলেন। জমিদারই তাহাকে গ্রামের মধ্যে কিছু জমি দান করেন। সেই জমির উপর কাশী সিং বাড়ি করিয়াছিলেন। সেই হইতেই কাশী সিংয়ের সহিত সূর্য্যসুন্দর পরিবারের হৃদ্যতা। কাশী সিংয়ের বউ প্রায়ই নানা রকম খাবার ঘরে প্রস্তুত করিয়া সূর্য্যসুন্দরের ছেলে-মেয়েদের জন্য লইয়া যাইত। চিঁড়া বা মুড়ির মোয়া, ঠেকুয়া, খাবুনি, ব্যাসনের সন্দেশ, ডাল-মাড়া প্রভৃতি একদিন উষা ও সন্ধ্যার হৃদয় হরণ করিয়াছিল। কাশী সিংয়েরও দুটি মেয়ে ছিল, বুধিয়া আর সীতিয়া। উষা আর সন্ধ্যার খেলার সঙ্গী ছিল তাহারা। কাশী সিং বহুদিন পূর্বেই মারা গিয়াছেন। কাশী সিংয়ের স্ত্রী বাঁচিয়া আছে এখনও।

সন্ধ্যা তাহার কাছে গিয়াই উপস্থিত হইল।

"চাচী চিনতে পার আমাকে—"

চাচী উঠানে নামিয়া আসিল এবং মুখ তুলিয়া কপালে বাঁ হাতটা রাখিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সন্ধ্যাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সন্ধ্যা দেখিল চাচীর চুলগুলি সব পাকিয়া গিয়াছে। দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ। চাচীর শিরাবহুল জরা-কুঞ্চিত কপালের চামড়াটা আরও কুঞ্চিত হইয়া গেল। চাচী সন্ধ্যাকে চিনিতে পারিল না।

"চিনতে পারলে না তো, আমি সন্ধ্যা"—

চাচী বাঙালীদের সঙ্গে আধা-বাঙলা আধা-হিন্দীতে কথা বলে।

"আরে সন্ঝা-মাই। আমি শুনেছি তোরা এসেছিস। যেতে পারি নি, আঁখে আর ভালো সুঝে না। সীতিয়াকে রোজ যেতে বলি, সে-ও পারে না, তার কোমরে দরদ—

"সীতিয়া আছে না কি এখানে—"

"আছে। শুয়ে আছে ঘরে। এ সীতিয়া—দেখি দেখি কে আয়ল বা—"

সীতিয়া বাহির হইয়া আসিল কোমরে হাত দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে, মুখে এক মুখ হাসি। সীতিয়াকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল সন্ধ্যা। এ কি চেহারা সীতিয়ার। এত মোটা হইয়াছে। সীতিয়া কথা বলিল পরিষ্কার বাংলাতে।

"কাকাবাবুর অসুখ করেছে, তোরা এসেছিস, সব

আমি জানি, কিন্তু কি করব, চলতে পারছি না কোমরে এত ব্যথা”

“কি হয়েছে কোমরে”

“বাত”

“এত অল্প বয়সে বাত! ডাক্তার দেখিয়েছিস?”

“দেখিয়েছি। হাঁসপাতালের নতুন ডাক্তারবাবু একটা মালিসের ওষুধও দিয়েছেন। লাগাচ্ছি তো, কিন্তু কমছে না”

“তুই গগনকে দেখা। আমি ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—”

“গগন কে”

“দাদার বড় ছেলে। সে ডাক্তার হয়েছে যে, শুনিস নি?”

এই সংবাদে কাশী সিংয়ের স্ত্রীর মিশি মাখানো দাঁতগুলি আনন্দে বাহির হইয়া পড়িল।

“খোঁকাবাবু ডাকৃটর বন্ গৈশন! শিউজি বাঁচিয়ে রাখুন তাকে।”

পাঁচ ছয় বৎসরের একটি উলঙ্গ বালক লাফাইতে লাফাইতে বাহির হইতে ভিতরে ঢুকিল। তাহার প্রকাণ্ড টিকি, নাক-বোঝাই সর্দি। গায়ে একটা নীল সোয়েটার রহিয়াছে বটে, কিন্তু বাকী সমস্তটা উলঙ্গ। কোমরে একটা লাল ঘুনসি, তাহাতে ছোট্ট একটা বুটিয়া ঝুলিতেছে।

“শিউযতন, গোড় লাগ। মৌসি—”

“তোর ছেলে?”

সীতিয়া হাসি মুখে ঘাড় নাড়িল।

“বড় দুষ্টু, দিন রাত রাস্তায় খেলছে”

শিউযতন কোন রকমে প্রণামটা সারিয়া আবার লাফাইতে লাফাইতে রাস্তায় বাহির হইয়া গেল।

“আয় ঘরে বসবি আয়—”

সন্ধ্যা অনুভব করিল, সীতিয়া আর বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছে না। তাহার সঙ্গে ঘরের ভিতরই ঢুকিল। গিয়া দেখিল সেখানেও একটি তিন চার মাসের ছেলে নিজের হাতের মুঠা দুইটি দেখিয়া দেখিয়া হাত পা ছুঁড়িয়া খেলা করিতেছে। চমৎকার স্বাস্থ্যবান শিশু। তাহার গায়ে ফুলদার রঙীন রেজাই ঢাকা, মাথায় লাল টুপি। ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছে কি করিয়া রেজাইটা লাথি মারিয়া সরাইয়া দিবে। চোখের কাজল সারা মুখে মাখিয়াছে। সন্ধ্যা নিজে যদিও নিঃসন্তান, কিন্তু শিশুদের সম্বন্ধে অনেক পড়াশোনা করিয়াছে সে। তাহার মনে হইল সীতিয়াকে এ বিষয়ে জ্ঞানদান করা তাহার কর্তব্য। সে বিছানার একধারে বাগাইয়া বসিল। চাচীও কয়েকটি লাড্ডু লইয়া প্রবেশ করিল।

“খা—”

লাড্ডুগুলি দিয়াই চলিয়া গেল চাচী। বারান্দায় গিয়া ‘বরসী’ হইতে আগুন লইয়া তামাক সাজিতে বসিল। চাচী তামাক খায়।

ছেলেবেলায় লাড্ডু পাইলে সন্ধ্যা উল্লসিত হইয়া উঠিত, এখন ততটা হইল না। সে কিন্তু মুগ্ধ হইয়া গেল চাচী যে পাত্রটিতে লাড়ু আনিয়াছিল সেই পাত্রটি দেখিয়া। প্লেটের মতো, কিন্তু কাচের বা চীনেমাটির নয়, বেতের। তাহাতে নানা রকম রংও রহিয়াছে, চমৎকার দেখিতে। গৃহ-শিল্প সম্বন্ধেও অনেক পড়াশোনা করিয়াছে সে। অনেক ভাবিয়াছেও।

সীতিয়াকে জিজ্ঞাসা করিল, “এটা কোথা থেকে কিনেছিস্। বেশ”

“ভিখ্‌নার বউ তৈরি করে’ বিক্রী করে”

“কোথা থাকে সে”

“কাজি গাঁয়ে। তুই নিবি? এইটেই নিয়ে যা না”

“দে—”

বাল্যসঙ্গিনীর নিকট হইতে এই সামান্য উপহার পাইয়া সন্ধ্যা সহসা যেন অভিভূত হইয়া পড়িল।

“আমি কিন্তু ভিখ্‌নার বউয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই”

“আচ্ছা, খবর পাঠিয়ে দেব তাকে”

সন্ধ্যা নিমেষের মধ্যে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিল কি করিবে। ভিখনার বউ বেতের বাসন তৈয়ারি করিতেছে, এই অবস্থায় তাহার একটি ফোটো তুলিবে সে। বাসনগুলির ফোটো তুলিবে, দৃষদ্বতীতে এ বিষয়ে একটা প্রবন্ধও লিখিবে। তাহার পর সে নিজের গলা হইতে সোনার সরু হারটা খুলিয়া সীতিয়ার ছেলের গলায় পরাইয়া দিল।

“ওকি করলি”

“দিলুম তোর ছেলেকে। তোর বড় ছেলেকে একটা

ফুল প্যাণ্টও করিয়ে দেব আমি। রমজানিয়া এসে মাপ নিয়ে যাবে—

সীতিয়া হাসিয়া বলিল, "রমজানিয়া অনেকদিন হ'ল মারা গেছে। তার ছেলে গোহর এখন দর্জির কাজ করে—"

"রমজানিয়া মারা গেছে? বেশ, গোহরকেই পাঠাব তাহলে—। বুধিয়ার খবর কি"

"বুধিয়া শ্বশুর বাড়িতে আছে"

"ভাল আছে বেশ?"

"খুব ভালো নেই। তার স্বামীটা বড় মারখুণ্ডা। তোর ছেলেমেয়ে কি"

"আমার এখনও হয় নি ভাই"

"কেন?"

"এমনি"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল, "আমি পড়াশোনা নিয়ে থাকি। সমাজের নানারকম কাজকর্ম করারও ইচ্ছে আছে। কোলে কাঁখে ছেলেমেয়ে থাকলে ওসব হ'ত না"

"তা বটে। আমার মাত্র দুটো ছেলে, তাতেই পাগল করে' দিয়েছে আমাকে। কিন্তু ছেলে হওয়া বন্ধ করেছিস কি করে'। কোন ওযুধ খেয়েছিস?"

"না"

সন্ধ্যা জন্ম-নিরোধ সম্বন্ধেও প্রচুর পড়াশোনা করিয়াছে। স্থির করিল এ বিষয়েও পরে সে সীতিয়ার সহিত আলোচনা করিবে।

"লাড্ডু খাচ্ছিস না যে—"

"অনেক বেলায় খেয়েছি। সঙ্গে নিয়ে যাই, পরে খাব—"

বারান্দায় চাচীর হুঁকার শব্দ শোনা গেল।

ক্রমশঃ

প্রণয়, বিবাহ ও দাম্পত্যজীবন

উপাধ্যায়

সপ্তম ভাব

জন্ম কুণ্ডলীর লগ্ন বা তনু ভাব থেকে সপ্তম গৃহটী বিবাহ, পতি ও পত্নী ভাবের নির্দ্দেশ করে—স্ত্রীলোকের পক্ষে জন্মকুণ্ডলীতে লগ্ন ও রাশি থেকে সপ্তম স্থানটী উক্তভাবগুলির নির্দ্দেশক। বিবাহের সম্ভাবনাকে বিশেষভাবে পরিবর্ত্তন ও প্রতিহত করে রবি চন্দ্রের অশুভ প্রেক্ষা বা দৃষ্টি। স্ত্রীর বিষয়ে বিচার করতে হোলে পুরুষের কোষ্ঠীতে লগ্ন, শুক্র ও চন্দ্র থেকে সপ্তম রাশির অবস্থা ও গ্রহসমাবেশে বলাবল লক্ষ্য করা প্রয়োজনীয়। স্বামী সম্পর্কে স্ত্রীলোকের কোষ্ঠীতে শুধু লগ্ন ও রাশি থেকে সপ্তম স্থানটী সবটুকু নয়, রবি ও মঙ্গল থেকে সপ্তম স্থান ও বিচার করা দরকার।

সপ্তম স্থানে রবির অবস্থান সম্পূর্ণ ভালো বলা যায় না, তার কারণ স্নেহ ভালোবাসা বৃদ্ধিকারক, সৌভাগ্যপ্রদ এবং উচ্চাভিলাষী পতি বা পত্নীদায়ক হোলেও, গ্রহটী দাম্পত্য-ঐক্য দেয় না—দম্পতীর মধ্যে মতানৈক্য থেকে আসে মনোমালিন্য ও প্রণয়ভঙ্গ। সপ্তমে চন্দ্র সুখের বিবাহ ঘটালেও সামাজিকতার ক্ষেত্রে অসাফল্য ও স্বজনকুটুম্ব বিরোধ আনে। এখানে মঙ্গলের অবস্থিতি মোটেই সুখকর নয়। স্নেহ প্রীতি ব্যাপারে স্ত্রী বা পুরুষের ব্যগ্রতা ও গাঢ় ভাবপ্রবণতা থাকলেও অতিরিক্ত প্রভুত্ব-প্রিয়তার জন্য বিষময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়—গ্রহটী মিলন ঘটিয়ে দেয় এমন একটী নারী বা পুরুষের সঙ্গে—যার ভেতর আছে অসমসাহসিকতা, নির্ভীকতা ও উগ্রস্বভাব।

সপ্তম স্থানে বুধ পতি বা পত্নী সম্পর্কে অশুভপ্রদ বলা যায় না। অত্যন্ত চটুপটে বুদ্ধিমান্ পতি বা বুদ্ধিমতী পত্নীলাভ, কথাবার্ত্তায় থাকে তার ক্ষিপ্রগতি আর সময়ে সময়ে দেখা যায় তার স্পষ্টবাদিতা। সপ্তম স্থানে বৃহস্পতি নারীকে সৌভাগ্যবতী করে আর উত্তম স্বামীলাভ হয়—এই গ্রহের সপ্তম ভাবে অবস্থিতি খুব সুখকর বিবাহ ও মিলন ঘটায়, উদারও মহৎ স্বামী বা পত্নীর আনুকূল্যে দাম্পত্যজীবন সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে। অবশ্য গ্রহের রাশিচক্র অনুসারে প্রতিকূলগতি হোলে শুভ ফলের হ্রাস হয়ে থাকে।

সপ্তমে শুক্র প্রণয় ও কাম বৃদ্ধিকারক, এর আনুকূল্যে সৌভাগ্য ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ বিবাহ হয়। বিবাহের পরেও দম্পতীর মধ্যে মনের সুন্দর মিলও সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশ পায়। সপ্তমে শনি বিবাহিত জীবনে বিশ্বস্ততা আনে বটে, কিন্তু কোন মাধুর্য্য সৃষ্টি করে না—উদাসী বা উদাসিনী স্বামী বা স্ত্রী নিয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করতে হয়। তা ছাড়া বিবাহে বিলম্ব বা বাধা আনে, আর সৌভাগ্য বৃদ্ধিও হয় না আশানুরূপভাবে। সপ্তমে রাহু বা কেতুর অবস্থান অশুভ। কেননা এরা বিবাহের ব্যাপারে দাম্পত্যজীবনে বহু গণ্ডগোলও বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে। স্ত্রী বা স্বামী প্রচণ্ড স্বভাববিশিষ্ট ও অব্যবস্থিতচিত্ত হয়। স্ত্রী বা স্বামীর মধ্যে এই গ্রহ মানসিক বিকৃতি, সাময়িক উন্মাদনা, অত্যধিক ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, স্বার্থগৃধ্নুতা, তীব্র কলহ ও মনোমালিন্য এবং অবশেষে বিচ্ছেদ এনে দেয়—স্ত্রী বা স্বামীর স্বার্থপরতা ও হৃদয়হীনতা কেবলমাত্র দাম্পত্য জীবনকেই বিষময় করে না, সন্তান ও পরিবারবর্গও উৎপীড়িত হয়। রাহু কিম্বা কেতু সপ্তম স্থানে থাকলে দুঃখজনক শোকাবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, আর দাম্পত্যজীবন একেবারে নষ্ট হয়ে যায়।

দাম্পত্য সুখের হানি হয় যদি সপ্তমাধিপতি ষষ্ঠ বা অষ্টম স্থানে অবস্থান করে আর দ্বিতীয় স্থানে অশুভ গ্রহের

দৃষ্টি পড়ে। দুইটী পাপগ্রহের মধ্যবর্ত্তী সপ্তম স্থান হোলে পাপযোগের দরুণ দাম্পত্যজীবন অত্যন্ত করুণ ও দুঃখময় হয়ে ওঠে। স্ত্রীলোকের কোষ্ঠীতে অষ্টম স্থানটী এ সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে পাপগ্রহ, বিশেষতঃ মঙ্গল থাক্‌লে নারীর বৈধব্য ঘটে, আর শনি থাকলে বিবাহিত জীবনে কোন মাধুর্য্য থাকে না। সপ্তম স্থানে শনি ও চন্দ্র একত্র থাক্‌লে স্ত্রীলোকের একাধিক বিবাহ হয়ে থাকে। দ্ব্যাত্মক বা দ্বিস্বভাব রাশি সপ্তম স্থান হোলে এবং সেখানে শুক্র কোন পাপ গ্রহের সঙ্গে সহাবস্থান করলে একাধিক বিবাহ সূচিত হয়। শুক্র মঙ্গলের দ্বারা সপ্তম স্থানে পীড়িত হওয়া অশুভব্যঞ্জক। এরূপ যোগে বিশৃঙ্খল অবস্থা ও কলহ বিবাদ বা দাঙ্গা হাঙ্গামায় দাম্পত্যজীবন নষ্ট হয়ে যায়, ফলে দম্পতীর মধ্যে শান্তি সুখ তিরোহিত হয়, অবশেষে স্বামী স্ত্রীর ভিতর সুদীর্ঘকাল ধরে বিচ্ছেদ ঘটে থাকে।

চির-কৌমার্য্যযোগ দেখা যায় জন্মকুণ্ডলীর ভিতর পঞ্চম ও সপ্তমাধিপতির অশুভ দৃষ্টির বিনিময়ে। স্ত্রীলোকের সংসর্গে এসে অর্থহানি ঘটে যদি সপ্তম স্থানে রবি ও রাহু একত্র থাকে। পুরুষের কোষ্ঠীতে চতুর্থ সপ্তম ও দ্বাদশ স্থানে পাপগ্রহ থাকা অশুভপ্রদ, কেননা এরূপ যোগে স্ত্রী ও সন্তানলাভ জীবনে সম্ভবপর হয় না। শুভ সংযোগে যদি লগ্নাধিপতি সপ্তম স্থানে অবস্থান করে, তাহোলে স্বামী বা স্ত্রী উচ্চবংশোদ্ভূত হয়। লগ্নে বা সপ্তম স্থানে চন্দ্র আর নবাংশে সিংহ লগ্ন হোলে স্ত্রীর চরিত্র ভালো হয় না, এই ভ্রষ্টা স্ত্রীর মধ্যে লাম্পট্যদোষ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

লগ্নাধিপতি ও সপ্তমাধিপতি একত্র থাক্‌লে, সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হোলে বা দৃষ্টি-বিনিময় কর্‌লে অল্প বয়সে বিবাহ হয়, তা ছাড়া অনুরূপ ফল ঘটতে দেখা যায়—লগ্নে, দ্বিতীয়ে বা সপ্তম স্থানে শুভ গ্রহ থাক্‌লে। সপ্তম স্থানে যে গ্রহ থাকে, সেই গ্রহের দশায় অথবা সপ্তমাধিপতির বা সপ্তম-দশা গ্রহের দশায় কিম্বা চন্দ্র ও শুক্রের দশায় বিবাহ হয়। বিবাহের সম্পর্কে গণনা কর্‌বার সময় শুধু এদের দশা অন্তর্দশা দেখলেই হবে না, তৃতীয় ও একাদশ স্থানের অবস্থাও লক্ষ্য কর্‌তে হবে; কেননা বিবাহের কারণ,যোগা-যোগ ও পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাবে তৃতীয় স্থান থেকে—আর বিবাহের পরিণতি বা পরবর্ত্তী অবস্থা অর্থাৎ দাম্পত্যজীবন, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রীতি ভালবাসা প্রভৃতি নির্দ্ধারণ কর্‌তে হবে একাদশ স্থান থেকে। কেবলমাত্র যোটক বিচার করে বিবাহের মতামত দেওয়া উচিত নয়।

দম্পতীর যৌন সম্বন্ধ কিরূপ হবে সেটা শুধু যোনিকূট বিচার কর্‌লে চল্‌বে না, উভয়ের মঙ্গল ও শুক্রের অবস্থা ও অবস্থান দেখতে হবে—একজনের মঙ্গলের সঙ্গে অপরের শুক্রের কি রকম যোগ আছে তাও দেখা আবশ্যক! নারী-পুরুষের পরস্পরের শুক্র-মঙ্গলের কোন সম্বন্ধ বা যোগাযোগ না দেখা গেলে উভয়ের চন্দ্র-মঙ্গলের মধ্যে কোন সম্বন্ধ হয়েছে কিনা তা দেখা দরকার। নারী পুরুষের ভিতর একজনের শুক্রের সঙ্গে অপরের মঙ্গলের শুভাশুভ সংযোগ বা সম্বন্ধের উপর তাদের যৌন আকর্ষণ নির্ভরশীল। শুভ হোলে যৌন সংসর্গ প্রীতিকর হয়ে দাম্পত্যজীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলে, অন্যথায় বিবাহিত জীবনের পরিণতি দুঃখময় ও করুণ ঘটনাবহুল হয়ে থাকে—মিলনের পরি-বর্ত্তে বিচ্ছেদের পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায়।

বিবাহ নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে লগ্ন, লগ্নাধিপতি, শুক্র ও মঙ্গলের বলাবল ও অবস্থিতি এবং রবি ও চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি-সম্বন্ধ প্রভৃতি বিচার করে মতামত প্রকাশ করা আবশ্যক। শুক্র প্রণয়, আসঙ্গলিপ্সা ও পরিণয়-কারক গ্রহ। পাশ্চাত্য জ্যোতিষীরা এই গ্রহটীর ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন, জন্ম-কুণ্ডলীর এক একটি রাশিতে এর অবস্থানুসারে যে সব ফলের তারতম্য লক্ষ্য করেছেন, তা নিম্নে দেওয়া গেল। তাঁরা বলেন মেষ রাশিতে শুক্রের অবস্থিতি অশুভপ্রদ—যৌন উত্তেজনার আতিশয্য দোষ, উচ্ছ্বাস ও আবেগ এবং প্রেমে পড়বার জন্যে ব্যাকুলতার সৃষ্টি হয়। বৃষ রাশিতে শুক্রের অবস্থিতি অশুভ নয়—একনিষ্ঠ প্রেম ও প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর প্রতি গভীর বিশ্বাস ও আনুগত্য-স্বীকৃতি এই শুক্রের অবস্থানের বৈশিষ্ট্য। মিথুনে শুক্র ব্যভিচার-প্রদাতা—একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে একই সময়ে প্রণয়াসক্তি নানা দুঃখকষ্ট, বিপর্য্যয়, বাধাবিপত্তি ও চিত্ত বিভ্রম সৃষ্টি করে। কর্কটে শুক্র থাকলে বিশেষ সতর্ক হওয়া দরকার কেননা হৃদয়ের ভালোবাসা অপরিবর্ত্তনীয় ও স্থিতিশীল না হোলে, দাম্পত্য জীবন নৈরাশ্যপূর্ণ ও সংঘাতময় হবে। সিংহে শুক্র শুভপ্রদ—দম্পতীর মধ্যে সংযম ও একনিষ্ঠ ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায়,তা ছাড়া সৌভাগ্য বৃদ্ধি প্রীতি [illegible]

সুযোগ প্রাপ্তি ঘটে। কন্যায় শুক্র স্বৈরাচার আনে, শাস্ত্র-সম্মত বিবাহ বন্ধনে স্পৃহা থাকে না, হোলেও আবার বিবাহ হয়, স্বেচ্ছাতান্ত্রিক জীবন অবলম্বন ও মুক্ত প্রেম প্রত্যক্ষ করা যায়। কোনরূপে বিবাহ হোলেও স্বামী বা স্ত্রীর স্বাস্থ্য দুর্ব্বল হয় আর ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্য ঘটে। তুলায় শুক্র শুভ—সুদৃঢ় প্রণয়, বিবাহে সাফল্য, মধুর দাম্পত্য-জীবন, পারস্পরিক প্রণয় সংক্রান্ত ব্যাপারে গভীর আবেগ, সৌভাগ্য বৃদ্ধি ও সামাজিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। বৃশ্চিকে শুক্র থাকলে প্রণয়ক্ষেত্রে অপরের সঙ্গে মেলামেশায় মানুষকে সতর্ক করে না, বরং প্রণয়ে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয় সামান্য কথাতেই। ধনুস্থ শুক্র প্রণয়ের ক্ষেত্রে কিছু অদ্ভুত অবাঞ্ছনীয় ঘটনা-প্রবাহ এনে দেয় যার ফলে সুখী হওয়া যায় না, তবে সমাজের উচ্চ স্তরের ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে এসে সৌভাগ্যলাভ, কর্ম্মোন্নতি ও নানাবিধ পার্থিব আশা আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা প্রভৃতি ঘটে থাকে, তাতে দম্পতীর মধ্যে একটীকে নৈরাশ্যপূর্ণ অবস্থায় অরণ্যে রোদন করতে হয়।

মকরে শুক্র অদ্ভুতভাবে নারীপুরুষকে আকর্ষণ করে ও আসঙ্গলিপ্সার দিকে মোহজাল বিস্তার করে—আর চিত্ত বিভ্রম আনে। প্রেমপ্রীতি ভালোবাসা বিষয়ে দেখা যায় অতিরিক্ত উচ্চাভিলাষ। কুম্ভে শুক্র প্লেটোনিক ধরণের ভালো-বাসা সৃষ্টি করে, প্রণয় মিলনে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি ও তজ্জনিত দারুণ অবসাদ আসে, মনে ধিক্কার জন্মে, বিবাহেও বিলম্ব ঘটে। বিবাহ হোলেও সে বিবাহ সুখের হয় না।

যৌন আকর্ষণও সম্মিলনে সর্ব্বতোভাবে সাফল্যদান করে মীনে শুক্র, বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হয় একনিষ্ঠ ভালোবাসার মাধ্যমে।

তনু বা সপ্তম ভাবের নবাংশ বা দ্বাদশাংশের অধিপতি শুক্রগ্রহ হোলে আর তা'তে অন্যগ্রহের যোগ থাকলে বিবাহে বিলম্ব ঘটে না। লগ্নে, চতুর্থে, সপ্তমে, অষ্টমে বা দ্বাদশে মঙ্গল থাকলে স্ত্রীলোকের স্বামী বিয়োগ আর পুরুষের স্ত্রী বিয়োগ হয়। ষষ্ঠে মঙ্গল, সপ্তমে রাহু ও অষ্টমে শনি অশুভপ্রদ—স্ত্রী বিয়োগ আনেই। মেয়েদের পক্ষেও অশুভ ফল দাতা। কোষ্ঠীতে লগ্ন, ষষ্ঠ বা দ্বিতীয়াধিপতি পাপগ্রহ যুক্ত হয়ে সপ্তমে অথবা পাপযুক্ত শনি সপ্তমাধিপতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে অবস্থান করলে জাতক পরস্ত্রীরত হয়।

সপ্তম ও দ্বিতীয়াধিপতির সঙ্গে সম্বন্ধে আবদ্ধ গ্রহের দশা ও অন্তর্দ্দশায় কিম্বা পত্নীকারক গ্রহ চন্দ্র ও শুক্রের দশায় অথবা লগ্নপতি ও সপ্তমপতির দশায় বা এদের মধ্যে অন্যতম কোনগ্রহের দশায় বিবাহ ঘটে। ষষ্ঠস্থানে মঙ্গল, সপ্তমে রাহু এবং অষ্টমে শনি অবস্থান করলে কিছুতেই স্ত্রী বেঁচে থাকে না। এর সঙ্গে যদি জাতকের কোষ্ঠীতে শুক্র, চন্দ্র ও সপ্তমপতির অবস্থান ভালো হয় অর্থাৎ তারা যদি বলবান হয়, তা হোলে বহু বিবাহ হবে, আর বারে বারে স্ত্রীবিয়োগ ঘটবে। ঐ মঙ্গল, রাহু বা শনির দশান্ত-র্দ্দশাতে প্রায়ই মৃত্যুযোগ পড়বে। ষষ্ঠ ও অষ্টম স্থানস্থ পাপ-গ্রহই পত্নীনাশ ও পত্নী সম্বন্ধীয় অশুভ ঘটনার স্রষ্টা।

সপ্তম স্থানে দুর্ব্বল চন্দ্র পাপগ্রহ সংযুক্ত হোলে চরিত্র-হানি ঘটে। একাধিক নারীর সহিত অবৈধ সম্বন্ধ ঘটে সপ্তম স্থানে শুক্র ও বুধ একত্র থাকলে। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীর মৃত্যু হয় যদি পঞ্চমাধিপতি সপ্তমে, সপ্তমাধিপতি পাপগ্রহ সংযুক্ত আর শুক্র দুর্ব্বল হয়।

স্ত্রীলোকের কোষ্ঠীতে দেখতে হয় লগ্ন, রবি ও মঙ্গলের সপ্তম রাশিতে পাপগ্রহ বা শুভগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি। রবি ও শনি, অথবা রবি ও মঙ্গলের অশুভ প্রেক্ষা দাম্পত্য-জীবনকে বিষময় করে তোলে—রবি বা মঙ্গলের সঙ্গে রাহুর যোগ বা দৃষ্টি দাম্পত্য সুখ হানিকারক। সপ্তমে পাপগ্রহ দাম্পত্যজীবনকে কখন সুখী করে না। বহু কষ্ট, ঝঞ্ঝাট ও অশান্তি এসে মানুষকে পীড়া দেয়। অষ্টমে পাপগ্রহ যৌন-সাহচর্য্যের পক্ষে প্রতিকূল ও অশান্তি-দায়ক।

সপ্তমাধিপতির দশা বা অন্তর্দ্দশায় তার সঙ্গে অন্য গ্রহের দশা বা অন্তর্দ্দশা (বিশেষতঃ তনু, ধন, পঞ্চম, নবম, দশম বা একাদশাধিপতির দশা বা অন্তর্দ্দশা) একত্র হোলে সাধারণতঃ বিবাহ হয়ে থাকে—শুভগ্রহ হোলে নিশ্চয়ই বিবাহ হয়—কোন বাধা বিঘ্ন ঘটে না। চন্দ্র বা শুক্র যে সময়ে পঞ্চম বা সপ্তম গৃহের ওপর দিয়ে যায়, সে সময়ে বিবাহ যোগ পড়ে।

পঞ্চমে পাপগ্রহ নারীপুরুষের চারিত্রিক অধঃপতন আনে কাম রিপুর তাড়নায়, এজন্যে বিবাহ দেওয়ার পূর্ব্বে পঞ্চম স্থানটী বিচার করে দেখা দরকার। প্রথম দৃষ্টিতেই প্রণয়তৃষ্ণা ও যৌনোদ্দীপনা প্রবল হয়ে ওঠে যদি কোন নারী

ও পুরুষের মধ্যে একজনের মঙ্গল অপরের শুক্রস্থানে অবস্থান করে।

নারীর আকৃতি, প্রকৃতি, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি বিচার হয় তার রাশি ও লগ্ন থেকে। তার পারিবারিক সুখ ও স্বামীর স্বভাব বিচার করতে হয় সপ্তম স্থান থেকে। যে স্ত্রীলোকের কোষ্ঠীতে শুক্র ও মঙ্গল কোন রাশিতে নবাংশ ক্ষেত্র-বিনিময় করে, সে অসতী। শুক্র, রবি ও চন্দ্র সপ্তমস্থানে একত্র থাকা অশুভ, এরূপ যোগে স্বামীর সম্মতিক্রমে জাতিকা পরপুরুষের প্রতি প্রণয়াসক্ত ও ব্যভিচারিণী হয়। যে নারীর সপ্তম স্থানে কোন নীচস্থ গ্রহ শুভ গ্রহের দৃষ্ট হয়ে অবস্থান করে, সে নারী স্বামীর উপেক্ষিতা ও অনাদৃতা হয়। সপ্তম স্থানে রবি থাকলে স্ত্রীলোক স্বামী-পরিত্যক্তা হয়। লগ্নে রবি অথবা মঙ্গল কোন জাতিকার পক্ষে শুভ নয়, কেন না সে দারিদ্র্যপীড়িতা হয়। লগ্নে রবি, শনি ও মঙ্গলের একত্র অবস্থিতি জাতিকাকে অসতী, অসুখী, ক্রূর ও কলহপ্রিয় করে। রবি অথবা মঙ্গল, শুক্র ও রাহু লগ্নে থাকলে জাতিকা একাধিক ব্যক্তির সহিত প্রণয়াসক্তা হয়।

শনি দ্বারা পূর্ণ দৃষ্ট মঙ্গল সপ্তমে থাকলে স্ত্রীলোকের গর্ভ নষ্ট হয়। কেন্দ্রে শুভগ্রহ এবং মিথুন, কন্যা, তুলা, ধনুর প্রথমার্দ্ধ বা কুম্ভ রাশি পতিস্থান হোলে,জাতিকার স্বামী ধনৈশ্বর্যশালী ও সম্ভ্রান্ত—আর জাতিকাও উত্তম প্রকৃতি-বিশিষ্টা, বিশ্বাসী ও সুখী হয়। বৃহস্পতি বলী হয়ে রাশি থেকে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশমে থাকলে আর চন্দ্রের শুভ প্রেক্ষাবর্ত্তী হোলে, জাতিকা রাণী বা বিশেষ ঐশ্বর্য্যশালিনী হয়। যে নারীর জন্মকুণ্ডলীতে বৃহস্পতি, মঙ্গল, রবি ও বুধ বলী হয় আর সমরাশিতে হয় লগ্ন, সে নারী বিখ্যাত, সুপ্রতিষ্ঠিতা, বিশিষ্ট বিদগ্ধা, ধর্ম্মপ্রাণা ও ঈশ্বরানুরাগিনী হয়।

যখন কোন নারী বা পুরুষের লগ্নাধিপতি সংক্রমণে অপরের লগ্নে আসে, তখনই তাদের দুজনের মধ্যে ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব নিবিড়ভাবে ঘটে।

মোটামুটিভাবে প্রণয়, বিবাহ, পতি বা জায়াভাব ও দাম্পত্য জীবনের বিচারপদ্ধতি এবং তার সঙ্গে গ্রহযোগাযোগ, দৃষ্টি ও অবস্থান হেতু বিভিন্ন ফলাফল বলা গেল। গ্রহগণের পূর্ণ দৃষ্টিই কোষ্ঠী বিচারে গ্রাহ্য হয়ে থাকে—পাদ, অর্দ্ধ, ত্রিপাদ দৃষ্টির ফল উল্লেখযোগ্য হয় না। দ্রষ্টা গ্রহ শুভ কিম্বা অশুভ কিনা এবং কোন্ ভাবের অধিপতি হয়ে গ্রহটী কোন্ ভাবকে পূর্ণ দৃষ্টি করছে, তার অবস্থিতি কোথায়?—স্বক্ষেত্রে, মূল ত্রিকোণে, শত্রু অথবা মিত্র গৃহে কিনা, এসব বিচার করে তবে ফলাফল বলা দরকার। তাঁছাড়া ষড়বর্গ, অষ্টবর্গ, নবাংশ, স্ফুট, ভাব প্রভৃতিও বিচার আবশ্যক। নতুবা সঠিকভাবে কিছুই বলা যায়না। শত্রুক্ষেত্রস্থ গ্রহ ভাবফলের হানি আর মিত্রক্ষেত্রস্থ গ্রহ ভাবফলের বৃদ্ধি করে। বর্গ বলে বলী গ্রহ শক্তিসম্পন্ন। স্বক্ষেত্রে মূল ত্রিকোণে তুঙ্গস্থানে যে গ্রহ যে ভাবে থাকে, সেই ভাবের সে বৃদ্ধিকারক হয়। পাপগ্রহ যে ভাবে থাকে বা বৃদ্ধি করে, সেই ভাবের হানি হয়, তবে স্বক্ষেত্রে ভাবফলের বিশেষ অনিষ্ট করেনা। শুভ বা অশুভ গ্রহ উচ্চস্থ হোলে শুভফলদাতা, নীচস্থ হোলে অশুভদায়ক। গ্রহ যত সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয়, ততই সে দুর্ব্বল। পনরো অংশের মধ্যে দুইটী মিত্রগ্রহ মিলিত হোলে পরস্পর শুভফলদাতা হয়—শত্রু মিত্র গ্রহের দৃষ্টিতেও এইভাবে ফলের হানি ও উৎকর্ষ ঘটে।

* * *

পৌষ মাসের ব্যক্তিগত রাশির ফলাফল

মেষ

এই মাসে মেষরাশিগত জাতকের পক্ষে শুভাশুভ মিশ্রিত ফল। শুভাপেক্ষা অশুভ ফলাধিক্য দেখা যায়। বহুকার্য্যে বাধা, শারীরিক কষ্ট, ভ্রমণে ক্লান্তি, অন্যায় দোষারোপ, প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা লাঞ্ছনা ভোগ এবং মানসিক কষ্টভোগ। অশ্বিনী নক্ষত্রজাত ব্যক্তিরই বেশী পরিমাণে অশুভ ফলভোগ করতে হবে।

দেহভাব ভালো যাবে না,—যাঁদের ব্লাডপ্রেসার বা রক্তের চাপ বৃদ্ধিজনিত পীড়া আছে তাঁদের পক্ষে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। রক্ত ও পিত্তের দোষজনিত অসুস্থতা যাঁদের আছে তাঁদের ব্যাধি হবার সম্ভাবনা। জীবনীশক্তি এ মাসে কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল। সন্তানাদির শরীর ভালো যাবেনা। পারিবারিক কলহ ও অশান্তি, স্বজনবর্গের সঙ্গে মনো-

মালিন্য প্রভৃতি থেকে দুঃখ পেতে হবে। তাছাড়া আত্মীয় বা নিকট বন্ধুহানির জন্য কিছু মানসিক আঘাতের সম্ভাবনা। প্রতিকূল অবস্থার ভেতরও আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালো যাবে। আয় বৃদ্ধি হোলেও তদনুপাতে ব্যয়াধিক্যের জন্যে আশানুরূপ সঞ্চয় হবেনা। ব্যয়কুণ্ঠতার দিকে দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও খরচের খাতায় বেশী অঙ্কপাত হবে। কোনপ্রকার লগ্নী বা ফাট্‌কার ব্যাপারে গেলে অর্থনৈতিক অবস্থা আদৌ সুবিধাজনক হবেনা।

বিষয় সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু শুভ, অনাদায়ী বাড়ী ভাড়া প্রভৃতি বিষয়ে শুভ। জমিজমা বৃদ্ধি, আসবাব-পত্র ক্রয় যোগ। চাকুরির ক্ষেত্রে মিশ্রফল, ভালো মন্দ, খ্যাতি অখ্যাতি, উন্নতিতে বাধা—উপরওয়ালার সঙ্গে কাজকর্ম্ম ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক হয়ে চলা দরকার, কারণ সামান্য দোষ ত্রুটি থেকে কর্ম্মোন্নতির পথে বাধা আস্‌তে পারে। ব্যবসা ও প্রোফেসানে কিছু উন্নতি ঘটবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে সামাজিক আনন্দ উপভোগ, আমন্ত্রণ লাভ, রোমান্টিক আকর্ষণ বা আবেষ্টনীর মধ্যে স্বচ্ছন্দতা, প্রণয়ে সাফল্য ও যোগাযোগ, ভ্রমণ প্রভৃতি দেখা যায়। মাসের শেষের দিকে সাংঘাতিক ধরণের প্রণয়াকর্ষণের সম্ভাবনা। ষষ্ঠে রাহু আনন্দ ও সুখদাতা।

বৃষ

রবি, মঙ্গল এবং শনি দুঃস্থানগত হোলেও বোধের জন্য ক্ষতি কর্‌তে পার্‌বেনা। পারিবারিক অশান্তি, সাংসারিক ব্যয়সংক্রান্ত ব্যাপারে স্ত্রীর সহিত মতদ্বৈধ, অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত মনোমালিন্য হোতে পারে তাদের সঙ্গে ব্যবহারে সতর্ক না হোলে। উদরঘটিত পীড়া, রক্তচাপ বৃদ্ধি বেশী হবে (High blood pressure) এজন্যে পথ্য বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি নেওয়া দরকার। আর্থিক অবস্থা (বিশেষতঃ নগদ টাকা) আশানুরূপ নয়। ব্যয় বৃদ্ধি। ভূসংক্রান্ত বিষয়ে কোন শুভ সম্ভাবনা নেই—ভৃত্য, ভাড়াটিয়া, প্রতিনিধি বা কর্ম্মচারীদের কাছ থেকে ব্যবহার ভালো পাওয়া যাবেনা। চাকুরীর ক্ষেত্রে সুবিধা বা উন্নতির যোগ দেখা যায়না। ব্যবসায়ীর পক্ষে শুভ—ব্যবসায় ক্ষেত্রে কোনপ্রকার বাধা বিপত্তি ঘটবে না, অর্থাগম হবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রথম ও শেষ সপ্তাহ ভালো, মধ্যে দুইটি সপ্তাহ নানাপ্রকার উদ্বেগ, আশাভঙ্গ, অশান্তি ও প্রণয়ে বিপত্তি ঘট্‌তে পারে—কলহ বিবাদ ঘট্‌লে তা গুরুতর হোয়ে উঠ্‌তে পারে। পঞ্চমে রাহু অর্থহানি, সন্তান পীড়া ও ভয়ের সৃষ্টি কর্‌বে।

মিথুন

স্ত্রীর সহিত কলহ, মামলা মোকদ্দমা, অপবাদ ও কর্ম্মে বাধা। বয়স্ক সন্তানদের সহিত ব্যবহারে সতর্কতা ও বিশেষ বিবেচনা অবলম্বন আবশ্যক। শারীরিক অবস্থা মোটামুটি ভালো যাবে। আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধি ঘট্‌বে। নগদ টাকার অভাব হবেনা, কিন্তু মাসের শেষেও কিছু থাক্‌বেনা। প্রথম দশদিন বেশ ভালো বলা যায়। অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু লাভেরও যোগ আছে, কিন্তু স্পেকুলেশনের ব্যাপারে লাভ হবে না। ভূম্যধিকারীদের পক্ষে ভালো সময়, লাভ হবে, বাড়ী ভাড়ার বিষয়ে শুভ-যোগ। মাসের শেষের দিকে ভূ-সম্পত্তিলাভ বা ক্রয় করার সম্ভব। কৃষি কাজে যারা লিপ্ত, তারাও অনেক সুবিধা পাবে। মামলা মোকর্দ্দমায় সুবিধা হবে না। চাকুরির ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা হবে—শত্রু দমন, প্রতিযোগীর পরাজয়, সহকর্ম্মীদের সন্তোষ লাভ এবং উপরওয়ালার সুনজর আশা করা যায়। মেজাজ গরম কর্‌লে এসব শুভ ফল ঘট্‌বে না, বরং ক্ষতি হবে। এই রাশির মেয়েদের পক্ষে নানা-প্রকার অসুবিধা ভোগ ঘট্‌বে; এজন্যে সর্ব্বপ্রকার কাজে সংযম, ধৈর্য্য ও সংরক্ষণশীলতা আবশ্যক। সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেবার সময়ে সতর্ক হওয়া দরকার—পার্টিতে না যাওয়াই ভালো, পুরুষের সঙ্গে বেশী মেলামেশার ফল খারাপ হোতে পারে, এদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

কর্কট

এ মাসে কর্কট রাশির ব্যক্তিদের ফলাফল মিশ্র—অর্থাৎ জয় ও পরাজয়, লাভ ও ক্ষতি শারীরিক ও মানসিক সুখ ও দুঃখ—দুইই হবে। এদিক দিয়ে অশ্লেষানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিরাই বিশেষ বোধ করবেন—পুনর্ব্বসু ও পুষ্যাজাত ব্যক্তিদের তুলনায় কিছু কম অনুভূত হবে। মাসের প্রথমার্দ্ধে সন্তানাদির স্বাস্থ্যহানি ও পতনাদি দুর্ঘটনার আশঙ্কা, নিজের ব্যাধি না হোলেও শারীরিক দুর্ব্বলতা

বোধ হবে, এজন্য কষ্টভোগ। মাসের শেষার্দ্ধ নিজের ও পরিবারবর্গের পক্ষে শুভ। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মনোমালিন্য ও মতভেদের জন্যে কিছুটা অশান্তি-ভোগ। প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিতভাবে আর্থিক লাভ ও ক্ষতি হবে। প্রতারণা ও চুরি—এ দুটির জন্য সতর্ক হওয়া দরকার। পথে পকেট-মারের দৃষ্টি পড়বে। বাড়তি খরচ হবার যোগ আছে। এ মাসে স্পেকুলেশন না করাই ভালো, কেন না অপ্রত্যাশিত রাজনৈতিক ঘটনার জন্যে বাজার দর অনিশ্চিত। ভূম্যধিকারীরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না, তবে প্রজা, ভাড়াটিয়া, প্রতিনিধি, অংশীদার প্রভৃতির সঙ্গে কিছু কিছু বাদ বিসম্বাদ ও মন কষাকষি হবে। চাকুরীজীবীদের পক্ষে মাসের প্রথম দিকটা ভালো নয়, উপরওয়ালার অসন্তোষ দেখা দিতে পারে কিন্তু চুপ চাপ করে এড়িয়ে গেলে পরিণতি ভালো হবে না, সাহসী হয়ে এগিয়ে যেতে হবে প্রতিবাদ জানাবার জন্যে তবে অসন্তোষের উপশম হবে। উচ্চ সামাজিক প্রতিষ্ঠা-ভিলাষী মেয়েরা এ মাসে সুযোগ পাবেন না, ফলে নৈরাশ্যের কারণ ঘটবে—মেলামেলার পরিণতি মানসিক কষ্টভোগ এসে দাঁড়াবে।

সিংহ

সিংহ রাশির দ্বিতীয়ে রাহু অর্থ হানি, কলহ এবং মন কষাকষির কারণ ঘটাবে; বৃহস্পতি সৃষ্টি করবে বাধা ও শারীরিক অসুস্থতা, স্ত্রীর পক্ষে অশুভ—বিপন্নতার সম্ভাবনা। নবমে মঙ্গল ব্যয়কারক হবে, পঞ্চমে শনি ও বুধ দুঃখদাতা বিশেষতঃ সন্তান সম্পর্কে, তাছাড়া ক্ষতিকর হবে নানাপ্রকার পরিকল্পনায়, মঘা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিরা সব চেয়ে বেশী কষ্ট পাবে, পূর্বফল্গুনী নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিদের পক্ষে অত্যন্ত অশুভ ঘটবে, কিছুটা ভোগ করবে উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিরা। শারীরিক অবস্থা দুর্ব্বল হ'য়ে পড়বে, যাদের রক্তঘটিত পীড়া বা রক্তপাত উপসর্গ-জনিত ব্যাধি আছে, তাদের সতর্ক হওয়া দরকার। দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে, তা থেকে ও রক্ত ক্ষয় হবে। পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি পাবে। বন্ধুদের সঙ্গে সদ্ভাব ঘটবে না। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে বিচ্ছেদ। এ মাসে সকল কাজই গতানুগতিকভাবে করে যাওয়াই ভালো। আর্থিক সুবিধা হবে না, বরং পাওনাদারের তাগাদায় বিব্রত হোতে হবে। টাকাকড়ি কোন কাজে লাগালে অপব্যয় হবে। বাড়ী-ভাড়া সংক্রান্ত কাজে সুবিধা সুযোগ আছে—ভূসম্পত্তির ব্যাপারে অর্থ নিয়োগ না করাই ভালো। চাকুরীজীবীর পক্ষে এ মাসটী ভালো নয়, মাসের শেষার্দ্ধে উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবার আশঙ্কা—নিজের কাজ ছাড়াও অতি-রিক্ত কাজ বা বেশী দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হবে কর্ম্মদক্ষতা আছে কিনা সে সম্বন্ধে পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে; পেশাদারী কর্ম্ম ও ব্যবসায়ে মোটামুটিভাবে মাসটী অতি-ক্রান্ত হবে। যে সব নারী গৃহস্থালীর কাজ নিয়ে আছেন তাঁদের পক্ষে মাসটী শুভ—কিন্তু যাঁরা স্বার্থসিদ্ধির জন্যে সামাজিক মেলামেশা করে থাকেন, ক্লাবে পার্টিতে যোগ দান করতে অভ্যস্ত, তাঁরা দুঃখ বা নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যে সময় অতিবাহিত করবেন।

কন্যা

পীড়া ও ভয়। ভ্রমণে ক্লান্তি। মাসের প্রথম দিকে সাফল্য, সুখ, উত্তম বন্ধুত্বলাভ, সৌভাগ্য সুখ, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, সুসংবাদপ্রাপ্তি প্রভৃতি দেখা যায়; শেষের দিকে অশুভ বার্ত্তা, শত্রুবৃদ্ধি, আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, স্বজন-বিরোধ। দুর্ঘটনার ভয় আছে, সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা বা হাসপাতালের ব্যবস্থা না করলে গুরুতর অবস্থা ঘটতে পারে। প্রথমার্দ্ধে পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা শান্তিপূর্ণ। পরে স্বজনবর্গের সঙ্গে মতভেদ। আর্থিক অবস্থা সন্তোষ-জনক ও আশাপ্রদ। ব্যয়ের দিকে সংযত না হোলে মাসের শেষের দিকে টান ধরবে। এ মাসে বিলাসব্যসনের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা উচিত নয়। স্পেকুলেসনে ক্ষতি। ভূম্যধিকারীদের পক্ষে সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে নৈরাশ্য-জনক পরিস্থিতি। বাড়ী ভাড়া প্রভৃতি বিষয়ে আশাপ্রদ কিছু হবে না। মামলা মোকর্দ্দমা এড়িয়ে চলাই ভালো, অন্যথা মাসের শেষে পরিস্থিতি জটিল হবে। মাসের প্রথমার্দ্ধ চাকুরীজীবীদের পক্ষে কিছু শুভ। পদমর্য্যাদা-লাভ, শত্রু জয়, উপরওয়ালার প্রীতি প্রভৃতিযোগ আছে। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে মাসটি শুভ। মেয়েদের পক্ষে মাসের শেষার্দ্ধটী বিশেষ ভালো। যে সব নারী চাকুরীজীবী তাদের পক্ষে এ মাসটী ভালো যাবে।

তুলা

এ মাসে তুলা রাশির ব্যক্তিদের পক্ষে নানাপ্রকার বাধা বিপত্তির কারণ দেখা যায়। মাসের প্রথমার্দ্ধে ভ্রমণ-জনিত ক্লান্তি, ব্যর্থ চেষ্টা, উদ্বিগ্নতা, কার্য্যে বাধা ও অপবাদের আশঙ্কা—শেষার্দ্ধে শত্রু দমন, উত্তম সঙ্গীলাভ, অর্থাগম ও বিলাস ব্যসনের উত্তম দ্রব্যাদিলাভ। অম্ল, পাকাশয় প্রদাহ, অজীর্ণদোষ প্রভৃতি ঘট্‌তে পারে। স্থায়ী চক্ষুরোগে যাঁরা ভুগ্‌ছেন তাঁদের পক্ষে কিছুটা ভালো হবে। আর্থিক স্বচ্ছন্দতা। স্পেকুলেসনে কিছু সাফল্য। ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী বাড়ীওয়ালা প্রভৃতির পক্ষে এ মাসটী আশাপ্রদ নয়—টাকাকড়ি ও উৎপন্ন দ্রব্য ঠিক মত পাওয়া যাবে না। রাজনৈতিক চক্রীদের আন্দোলন, সরকারী নীতি-ভেদকারীদের চক্রান্ত প্রভৃতি এর কারণ হয়ে উঠবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের কাজ বেশ জোরে চল্‌বে। চাকুরীজীবীদের পক্ষে এ মাসটি শুভ বলা যায় না, ক্রমাগত উপরওয়ালার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। মেয়েদের পক্ষে এটি কষ্টের মাস। প্রণয়ের দিকে অনুরাগ প্রকাশ করলে ব্যর্থতার সম্ভাবনা। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে স্নেহ প্রীতি ব্যাপারে বেশী ঘনিষ্ঠতা না করাই মঙ্গলজনক।

বৃশ্চিক

বৃহস্পতি ব্যয়স্থ হোলেও নিরপেক্ষ থাকবে। শুক্র ও মঙ্গল শুভদাতা হবে। রবি, বুধ, শনি বিশেষ অশুভদায়ক হবে না। স্বাস্থ্যোন্নতি, কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ, সৌভাগ্য, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, উত্তম বিদ্যার্জ্জন, পরীক্ষায় সাফল্য, উপহারপ্রাপ্তি, শত্রুজয় প্রভৃতি সূচিত হয়। শত্রুরা বাধা দিতে পারে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাদের চেষ্টা ফলবতী হবে না—স্বজনবর্গ ও স্বার্থগৃধ্নু ব্যক্তিরা নানাভাবে ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে কিন্তু কেহই সুবিধা করতে পারবেনা। যাদের রক্তচাপের আধিক্য তারা সতর্ক হবে, পারিবারিক শান্তি থাকবে। যে সব ঘটনা বাদ-বিসম্বাদপূর্ণ হয়ে দুঃখজনক পরিস্থিতি এনেছে সেগুলির নিষ্পত্তি হ'বে। কোন আত্মীয়-স্বজন বা অন্তরঙ্গ ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। আশানুরূপ আয় হোলেও শেষ পর্য্যন্ত ব্যয়াধিক্যের জন্য অসুবিধাভোগ। কোন প্রকার স্পেকুলেশন করলে ভীষণ ক্ষতি হবে। উৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচুর্য্য হওয়া সত্বেও হস্তগত হবার সময়ে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হোতে পারে। ভূম্যধিকারীর পক্ষে এ মাসটী শুভাশুভ মিশ্রিত। যে সব মামলা-মোকদ্দমা মুলতুবী আছে, সেগুলির বিচার হয়ে যাবে আর জয়লাভ হবে। বহু গোলমালের নিষ্পত্তি ও মিটমাট হয়ে যাবে। পদোন্নতিযোগ আছে—বেকার ব্যক্তিরা কর্ম্মলাভ করবে। চাকুরির ক্ষেত্রে শুভ সম্ভাবনা—উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এলে লাভ হবে। আয় ও লাভ আশাপ্রদ। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীদের পক্ষে অর্থোপার্জ্জন যোগ আছে। অবিবাহিতা মেয়েদের পক্ষে এ মাসে বিবাহের কথাবার্ত্তা বা যোগাযোগ হবে। রোমান্সের ব্যাপার ঘনীভূত হয়ে আসবে তাদের কাছে যারা এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন। যে সব নারী শিল্পী, গায়িকা, কবি বা সাহিত্যিকা, তারা নানাপ্রকার সুযোগ, সুবিধা ও সুনাম পাবে।

ধনু

পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রাশ্রিত ধনুরাশির পক্ষে কিছু শুভ। অপর দুটি নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিরা অনেক অসুবিধা, অশান্তি ও অসোয়াস্তি ভোগ করবে। আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, শত্রুবৃদ্ধি, ধনক্ষয়, উদ্বেগ ও মর্য্যাদা হানির আশঙ্কা, তাছাড়া কোন কাজে হস্তক্ষেপ করলে তার সাফল্য বিলম্বে আস্‌বে। সামান্য রকম শারীরিক অসুস্থতা ঘটবে। যাদের ব্লাড-প্রেসার বেশী, তাদের সতর্ক হওয়া আবশ্যক। কোন সন্তানের পীড়ার জন্য মানসিক উদ্বিগ্নতা। দুর্ঘটনার যোগ আছে। আর্থিক অবস্থা ভালোমন্দ মিশ্রিত। স্পেকুলেশনে ক্ষতি হবে। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা প্রভৃতির পক্ষে শুভ হবে। উৎপন্ন দ্রব্যাদি, ভাড়া বিলি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ। জমি বা বাড়ী ক্রয় হোতে পারে। চাকুরির ক্ষেত্রে মোটামুটি ভালো। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীরা নানা সুযোগ পাবে, তাদের অর্থাগমও ভালোই হবে। মেয়েদের পক্ষে স্পষ্ট উক্তি বা উত্তেজক মন্তব্য প্রকাশ করা ক্ষতিকর, এ বিষয়ে সতর্ক হোতে হবে। আমোদ প্রমোদে, ভোজে বা আহার বিহারে কিম্বা অপরিচিত স্থানে অবস্থান সম্পর্কে নিজেদের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক—এই সব স্থানে ভিন্ন পুরুষের সংস্পর্শে আসা বা বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়ে সামাজিক উদারতা প্রকাশ করা

আদৌ শুভজনক হবে না। প্রণয়ানুরাগে বিপত্তি। চাকুরীজীবী মেয়েদের পক্ষে আত্মসচেতন হওয়া আবশ্যক।

মকর

কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে, কর্ম্মে সাফল্যও লাভ ঘটবে। মধ্যে কিছু দুঃখকষ্ট ভোগ। অপবাদ ও পদমর্য্যাদা হানিকর পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। গুহ্য প্রদেশ হোতে রক্তস্রাব, সন্তানদের পীড়া, হজমের গোলমাল, পারিবারিক অশান্তি, অকারণ উদ্বেগ, মানসিক পীড়া প্রভৃতি আশঙ্কা করা যায়। রোজগারের কয়েকটি পথ বিস্তৃত হবে। এমাসে স্পেকুলেশন না করাই বাঞ্ছনীয়, কেননা ক্ষতি হোতে পারে। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা প্রভৃতির পক্ষে এ মাসটী সাধারণভাবে যাবে। লোকের সঙ্গে আচার ব্যবহারে নিজের অদূরদর্শিতা ও হঠকারিতার জন্যে দুঃখ ও অবসাদ এনে দেবে। চাকুরীজীবীরাও বিশৃঙ্খলতার ভেতর দিয়ে কষ্ট পাবে। লগ্নী কারবারও টাকা লেনদেন সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন দরকার। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে মোটামুটি ভালো। নারীদের পক্ষে এ মাসটী ভালো নয়—গার্হস্থ্যজীবন থেকে সুরু করে সামাজিক জীবন পর্য্যন্ত প্রতিটি স্তরে বাধা বিপত্তি, কলহ ও অশান্তি ভোগ আছে। কোনপ্রকার কলহ বিবাদ বা ঝঞ্ঝাটে গেলেই বিপন্নতার ও লাঞ্ছনার আশঙ্কা। কথায় কান দিলেও কথা না বলাই ভালো।

কুম্ভ

কর্ম্মে সাফল্য লাভ, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি, মর্য্যাদা ও সম্মান, অর্থসুখ, সন্তানদের ভক্তি শ্রদ্ধা লাভ, খ্যাতি প্রতিপত্তি ও সুনাম, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি যোগ আছে। সামান্য কলহ বিবাদ আর বুঝাপড়ায় ভুল ঘটতে পারে। বন্ধুদের সম্প্রীতি ও সাহচর্য্য থেকে কর্ম্মসিদ্ধি বা কর্ম্মযোগাযোগ। পারিবারিক শান্তি। ভ্রমণ বর্জ্জনীয়। জনপ্রিয়তা লাভ। আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখা যায়। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা, সম্পত্তিশালী ব্যক্তি প্রভৃতির পক্ষে বিশেষ আয় বৃদ্ধি। ক্রয় বিক্রয়ে লাভ। বন্ধকী কারবারেও শুভযোগ। বেকার ব্যক্তির কর্ম্ম প্রাপ্তি। পদোন্নতি হবে। যারা ফৌজদারী সোপর্দ্দ তাদেরও দণ্ডের লাঘব হবে। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে এ মাসটী খুব ভালো। মেয়েদের পক্ষেও সাংসারিক, সামাজিক ও কর্ম্মক্ষেত্রে বহু সুযোগ, উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির যোগাযোগ ঘটবে।

মীন

পীড়া, ভয়, উদ্বেগ ও মানসিক অশান্তি। রেবতী নক্ষত্রে জাত ব্যক্তির পক্ষে অশুভ খুব কমই হবে। বায়ু ও পিত্ত প্রকোপ জন্য কষ্টভোগ। ভ্রমণে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে শান্তি শৃঙ্খলা ক্ষুণ্ন হবে না। আসবাবপত্র বা বিলাস বাসনের দ্রব্যাদি ক্রয়। আয়ও ব্যয় উভয় দিকেই বৃদ্ধি পাবে। প্রতারণার জন্য ক্ষতি—অর্থোপার্জ্জন বেশী হোলেও লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে অকারণ অত্যধিক ব্যয় না ঘটে। স্পেকুলেশন একেবারেই বর্জ্জনীয়। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলতার আশঙ্কা করা যায়। ভূম্যধিকারী বাড়ীওয়ালা প্রভৃতির পক্ষে মোটামুটি ভালোই যাবে কিন্তু ভাড়াটিয়া, পাশের জমির মালিক, এজেন্ট বা দালালের সঙ্গে কলহ বিবাদ ঘটতে পারে। নিজের স্বত্বাধিকার নিয়ে সম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারার সময়ে গণ্ডগোলের আশঙ্কা আছে। এক্ষেত্রে বিবেচনা না করে অবিলম্বে আদালতের আশ্রয় লওয়া অনুচিত। চাকুরীর ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে শুভ। প্রণয় সংক্রান্ত ব্যাপারে, পার্টিতে যোগদানে, কোর্টশিপ প্রভৃতি বিষয়ে মেয়েদের পক্ষে অসাফল্য।

* * *

ভবিষ্যদ্বাণী

১৯৬২ খৃষ্টাব্দে মকর রাশিতে যখন আটটী গ্রহের সমাবেশ হবে তখন পৃথিবীর পক্ষে অত্যন্ত অশুভ। সারা পৃথিবী ব্যাপী রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবর্ত্তের ভেতর তৃতীয় মহাযুদ্ধের ভেরী বেজে উঠতে পারে। ভারতবর্ষের রাশি মকর, এই রাশিতে আটটী গ্রহের অবস্থিতি হেতু ভারতের বিপন্নতা গভীর উদ্বেগের সঞ্চার করবে এবং দিল্লী প্রভৃতি স্থানে বহুবিধ অশুভ ঘটনার সমাবেশ হবে। উক্ত বর্ষটী ভারতবর্ষের পক্ষে আদৌ শুভ হবে না। পাকিস্তানের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে দূরীভূত হবে না। এই বৎসরের পর সেখানে গণতান্ত্রিক শাসন প্রচলিত হবে, তৎপূর্ব্বে নয়।

* * * *

এ মাসে শনি ও মঙ্গল ভারতের পক্ষে অশুভ হওয়ায় ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে, ব্যবসা বাণিজ্যে, শিক্ষা ব্যবস্থায় ও শিক্ষা বিভাগের নানাস্তরে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। গুপ্ত অপরাধ বৃদ্ধি, গুপ্ত ষড়যন্ত্র, ব্যয় বৃদ্ধি, হাসপাতাল প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের ভেতর বিশৃঙ্খলতা, জনসাধারণের অর্থনৈতিক সঙ্কট ও সর্ব্বত্র দুর্নীতির বৃদ্ধি ও প্রাধান্য দেখা যাবে। শিশুদের স্বাস্থ্যহানি ও শিশু মৃত্যু বৃদ্ধি পাবে। পাকিস্তানের পক্ষে রবি, মঙ্গল ও শনি অশুভ হওয়ায় আইন আদালত, রাজস্ব, ধর্ম্ম ও সাধারণ কর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে ভালো বলা যায়না। মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাবে, আর সাধারণের ভেতর নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটবে। নারী সমাজের পক্ষেও মাসটী শুভ হবে না। কাশ্মীর সংক্রান্ত ব্যাপারে পাকিস্তানের পক্ষে কোনপ্রকার নিষ্পত্তির চেষ্টা দেখা যাবেনা।

নৃত্যময় ভারত

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের খেলায় প্রমত্ত পরমপুরুষ। তাঁর নৃত্যের তালে তালে সৃষ্ট হচ্ছে কোটি সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রের জগত, মানুষ-পশু-পাখী, দৃষ্ট-অদৃষ্ট কত কিছু। তাঁর নৃত্যের তালে বিকশিত হচ্ছে মায়াময় বিশ্বের সৌন্দর্য রাশি। ধ্বংসের করাল ছায়া নেমে আসছে, মৃত্যু আসছে, তাঁরি নৃত্যের গতিচ্ছন্দে। মহাকালের হৃদ্‌স্পন্দন-ধ্বনিতে অনুরণিত তাঁর নৃত্যতাল।

নেচে চলেছে বিশ্বজগত। সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তন নৃত্য চলেছে গ্রহ-উপগ্রহের। অগণিত তারার মালিকা নেচে চলেছে কাল থেকে কালান্তরে। এনৃত্যের বিরাম নেই, নৃত্যতালের শেষ নেই।

মানুষের হৃদয় জন্ম থেকে নেচে চলেছে। তারও বিরাম নেই। আছে জীবনের শেষে মৃত্যুতে। তাই ছোট শিশু চলতে শেখার আগেই নাচতে শেখে, কিছু বলতে শেখার আগেই তার অন্তরের উল্লাসকে প্রকাশ করতে শেখে নেচে।

আদিম মানুষও তেমনি ভাষা-সৃষ্টি করে ভাব-বিনিময় করতে শেখার আগেই নাচতে শিখেছিল। যেমন করে আকাশের মেঘ দেখে ময়ুর নাচে, মাতৃস্তন্যপানের আনন্দে নেচে বেড়ায় গো-বৎস আর হরিণ-শিশুরা। আদিম মানুষ নেচেছে—তার প্রণয়ী বা প্রণয়িনীকে আকৃষ্ট করার জন্যে নেচেছে—প্রেম নিবেদনের উদ্দেশ্যে নেচেছে, বিরহে নেচেছে, মিলনে নেচেছে, জীবনের উপচীয়মান শক্তির তাড়নায় নেচেছে, তার বীর্যকে প্রকাশের উদ্দেশ্যে নেচেছে, প্রাণী-শিকারের আনন্দে নেচেছে, যুদ্ধ-জয়ের আনন্দে নেচেছে। সে ভয়ে নেচেছে, প্রাকৃতিক শক্তির অমোঘতা দেখে নেচেছে, অজানা অশান্ত শক্তিকে প্রসন্ন করার আকুতি নিয়ে নেচেছে—প্রার্থনা জানাতে নেচেছে—দেবতার লীলা প্রকাশের উদ্দেশ্যে নেচেছে। সর্বোপরি সে আত্মপ্রকাশের তাড়নায় নেচেছে।

জোসেফ বেকার অঙ্কিত নিস্কেয়ুনার (অ্যামেরিকার) শেকারদের উপাসনা-নৃত্যের চিত্র। কীর্ত্তনের ঢংএ বৃত্তাকারে ও হস্ত উত্তোলন করে নৃত্যের ভঙ্গিমা লক্ষ্যণীয়। "লেস্‌লিস্ পপুলার মান্থলি"-তে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এই চিত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল।

মানব-সভ্যতার আদি লীলাভূমি ভারত। সমগ্র পৃথিবী যখন অজ্ঞতার অন্ধকার-গহ্বরে, ভারত জ্বালিয়েছে প্রদীপ্ত জ্ঞানের আলো। ভারতের তপোবনে উদ্‌গ্রীব হয়েছে সামগান, আচরিত হয়েছে যজ্ঞানুষ্ঠান, সে অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তুলেছে, সুন্দর করে তুলেছে নৃত্য।

দেবতার পূজায় মানুষের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহে ভাবপ্রকাশের জন্যে প্রাচীন ভারতীয়দের মনোভাব যেমন ভাষায় ব্যক্ত হয়ে ছন্দোবদ্ধ হয়ে সাহিত্যের সৃষ্টি করেছে, তাঁদের আত্মপ্রকাশের দেহভঙ্গিও জন্ম দিয়েছে সুষ্ঠু নৃত্যকলার। যে-কলার শিক্ষাও শিক্ষণ হয়েছে মহাভারতের যুগে কেন—তার অনেক আগেই। কোন সুপ্রাচীনকালে মহর্ষি ভরত নাট্যবেদ রচনা করেছিলেন তা কেউ বলতে পারেন না। ভারতের মানুষ নাট্যকে (নৃত্যকলা) পেয়েছে ব্রহ্মার কাছ থেকে অন্যান্য বেদের মত—কোন সুদূর অতীতে—অনাদি কালের কোন অজানা মুহূর্তে।(১) নারদের সঙ্গীত-মকরন্দ কখন রচিত হয়েছে তাও কেউ ঠিক বলতে পারেন না। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে নৃত্যশাস্ত্র 'শিল্লাদিক্রম' রচিত হয়। তারপরে নন্দীকেশরের অভিনয় দর্পণ, ধনঞ্জয়ের দশরূপক, শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীত রত্নাকর' রচিত হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তখন নৃত্যশাস্ত্র রচনার কথা কল্পনাও কেউ করতে পারেনি।

ভারতের দেব-দেবী নৃত্য পরায়ণ, অপ্সর-অপ্সরী নৃত্য-চঞ্চল। অবতার-শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের রাস-নৃত্য-লীলা বর্ণনায় ভক্তিশাস্ত্র ভাগবত মধুর। প্রাচীন ভারতীয় রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় মন্দিরে মন্দিরে, আরাধনায় নৃত্যের প্রয়োগে অতি প্রাচীনকালেই ভারতীয় নৃত্য একটা উচ্চাঙ্গের শিল্পকলায় রূপায়িত হয়। এক থেকে দশগণনার বিদ্যা যেমন সারা জগৎ শিখেছে ভারতের কাছ থেকে, তেমনি নৃত্য-কলাও শিখেছে ভারতের কাছ থেকেই(২)। নৃত্যক্রিয়া সকল দেশের মানুষেরই স্বাভাবিক কর্ম—কিন্তু সে যেন পাখীর নৃত্য, মৃগশিশুর নৃত্য। নৃত্য-শিল্প তারা পেয়েছে ভারতের কাছ থেকে। প্রশ্ন আসবে, তার প্রমাণ? ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যাবে কিনা জানি না, তবে লাক্ষণিক প্রমাণ অনেক আছে। একটু লক্ষ্য করলেই তা বুঝতে পারা যাবে।

বৌদ্ধ যুগে সারা এশিয়ায় ভারতের ধর্ম, সভ্যতা, সঙ্গীত, সাহিত্য ছড়িয়ে পড়েছিল। সে সঙ্গে ভারতের নৃত্য-কলাও বিস্তার লাভ করেছিল। জাপানীও জাভানী নৃত্য-কলায় তার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। ইউরোপ প্রভৃতি দেশে বিশেষ করে গ্রীসে এ শিল্প বৌদ্ধযুগের আগেই গিয়ে পৌচেছিল—ব্যবসায়ী ও আক্রমণকারীদের সঙ্গে। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে এদেশের নৃত্য রূপান্তর লাভ করেছে। বিভিন্ন কাল ও বিভিন্ন দেশের মানুষের আত্মপ্রকাশের বিভিন্নতাই রয়েছে এই রূপান্তরের মূলে। তবু এই বিকাশ-বৈচিত্র্যের মধ্যেও সূক্ষ্ম সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। বহুদর্শী ও অন্তর্দর্শীদের চোখে তা ধরা পড়ে।(৩)

কোথায় কোথায় ভারতের নৃত্য নবরূপ লাভ করেছে। নূতনরূপে সে আবার ভারতে ফিরে এসেছে। এসেও আবার পরিবর্ত্তিত হয়েছে। মোগল পাঠানদের সঙ্গে যে-নাচ এসেছে এ প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রমাণ করা যেতে পারে, আধুনিক কালের যে স্কোয়ার ডান্স—তারও মূলে রয়েছে ভারতীয় নৃত্য। কোন ভারতীয় সেখানে এ নৃত্য প্রচার করে এলেন? প্রশ্ন আসতে পারে বিদ্রূপবাণের তীক্ষ্ণতা নিয়ে। আপাত-দৃষ্টিতে কোনও ভারতীয় নৃত্যের সঙ্গে এর যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে এ যোগসূত্র অনুভব-গম্য হতে পারে।

ইংরেজেরা ভারত অধিকার করার অনেক আগেই

(১) অ্যামেরিকার নৃত্য-সম্রাজ্ঞী লা মেরী এ-সত্য অনুভব করতে পেরেছেন।

"Its birth is beyond the portals of time and it is ageless." (The Gesture Language of Hindu Dance : La Meri)

(২) লা মেরীর মনেও একথা জেগেছে।

"It is probable that all forms of dance arts are outgrowths of it." (La Meri).

(৩) মনীষী Beryl De Zocte ও এ যোগসূত্র লক্ষ্য করেছেন।

"Yet I believe that far away as it seems in some respects and obviously embodying a very different physical as well as spiritual tradition, the classical dance of India is closely related to the classical tradition of the west, as to every other dance tradition in the world, all of which necessarily vary in the richness of their dance vocabulary according to the capacity for expression in the body of the dances. (The Other Mind : Beryl De Zocte. P 12)

ইউরোপীয় ধর্মযাজকেরা এদেশে আসতে আরম্ভ করেন। ইউরোপীয় দস্যুও বণিকদের সঙ্গে সঙ্গেই। এদেশকে সে ধর্মযাজকেরা শুধু ধর্মশিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন, আর এই ধর্মের দেশ ভারত থেকে কিছু নিয়ে যান নি—একথা গর্ব করে কেউ বলতে পারবে না।

ইউরোপীয়রা যখন এদেশের ধর্মপ্রচার ও ধনলুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে পড়তে লাগল তখন চৈতন্যদেবের প্রেম-ধর্ম সারা ভারতকে কীর্তন-নর্তনে মাতিয়ে তুলেছে। সে কীর্তন-নর্তনের কি দুর্দম আকর্ষণী শক্তি ছিল তার প্রমাণ গৌড়ের কাজী—যিনি হিন্দুধর্মের ঘোরতর বিদ্বেষী হওয়া সত্ত্বেও চৈতন্যদেবের কীর্তন-নর্তনে যোগ দিয়েছিলেন। যবন হরিদাস সেই কীর্তন-নর্তনে আকৃষ্ট হয়ে পরম-বৈষ্ণবে রূপান্তরিত হন। হরিনামানন্দে যখন মেতে উঠেছিল সারাভারত তখন ইউরোপীয় ধর্মযাজকেরা এসে তার দ্বারা প্রভাবিত হননি, একথা কেউ জোর করে বলতে পারেন না। বরং অত্যন্ত গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ ইংলণ্ডে ১৭৪৭ ইংরেজিতে শেকিং কুয়েকার্স সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়। কীর্তন-নর্তনকে তাঁরা ভগবদুপাসনার পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁদের কীর্তন-নর্তনের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা চৈতন্যোত্তর যুগের ভারতীয়দের নৃত্য থেকে মোটেই পৃথক্ নয়।—"In England, the early shaker had danced the same way: Singing, Shouting or Walking the floor, under the influence of spiritual signs showing each other about—or swiftly passing or repassing each other like clouds agitated by a mighty wind," ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের ম্যানচেষ্টার থেকে মাদার এন, লি, অ্যামেরিকার নিউ লেবাননে গিয়ে শেকার সম্প্রদায় গঠন করেন—কীর্তন নৃত্যের মাধ্যমে উপাসনা প্রবর্তন করেন। দলে দলে পুরুষ-নারী তাঁর সম্প্রদায়ে যোগ দিতে লাগল। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে মাদার এন, লির মৃত্যুর পর ফাদার জেমস্ হুইটটেকার গুরু হন। তিনিও ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে দেহ-রক্ষা করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী গুরু ফাদার জোসেফ ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে কীর্তন-নৃত্যের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা বিধান করেন। তাতেই অ্যামেরিকান স্কোয়ার অর্ডার শাফল্ নৃত্যের সৃষ্টি হয়। আজকালকার স্কোয়ার ডান্স তারই উত্তরাধিকারী। ইহা থেকে স্পষ্ট অনুভব হবে, কিভাবে ভারতীয় বৈষ্ণবদের কীর্তননৃত্য অ্যামেরিকান স্কোয়ার ডান্সের জন্ম দিয়েছে। নিস্কেকুনার (আমেরিকার) শেকারদের উপাসনা নৃত্যের (জোসেফ বেকার অংকিত) যে ছবি লেসলি'স পপুলার মান্থলি'তে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল তার থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে ভারতীয় কীর্তন-নৃত্যের মাধ্যমেই সেই সুদূরদেশের পুরুষ-নারী ভগবানের নিকট আত্ম-নিবেদন করতে শিখেছিল। সে-কীর্তন-নৃত্যই ধীরে ধীরে আধুনিক কালের 'স্কোয়ার অর্ডার ডান্সে' রূপান্তরিত হয়েছে। এমনিভাবেই সারা পৃথিবীর মানুষকে নৃত্যকলায় দীক্ষা দিয়েছে ভারত। একথা অস্বীকার করা—জেনেশুনেও সত্যকে অগ্রাহ্য করার নামান্তর।

সংসার

নিশীথ মিত্র

ঘোষপাড়া লেনে ওরা দু'টি থাকে
একখানা খিজিঘর মোংরা স্যাঁতসেঁতে,
চুণবালি নেই প্রায় রুগ্ন একফালি
দৃষ্টির দেয়াল ; তবুও পথের বাঁকে
এ-মূর্তির অলস খেয়াল নক্ষত্রের অবাক রঙেতে
মনে হয় বিচিত্র বর্ণালী !
ছোট্ট এই বারান্দার ধারে সে থাকে একেলা ব'সে,
কখনো সে বাঁধে চুল সায়াহ্নের ডালে ডালে
বেসুর ব্যথায়—প্রণব এলো না তবু অফিসের তন্দ্রা ঠেলে ?

সুদূর আকাশে ব্যর্থ নক্ষত্রেরা খ'সে
বিদ্যুৎ ছড়ায় যেন দিগন্তের ছন্দহীন পালে ;
জানি, জানি, ওই মন স্বস্তি পাবে বাড়ীতে প্রণব এলে।

তারপর খিজি ঘর ধুনোর ধোঁয়ায়
ভ'রে ওঠে স্বপ্নে অর্ঘ্যে ব্যাকুল সন্ধ্যায়।

আদালত অবমানার দায়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ

শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত এম. এ

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে। ক'লকাতার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। দলে দলে লোক চলছে রাজধানীর রাজপথ দিয়ে। সকলের চোখে-মুখে অধীর উৎকণ্ঠার ছাপ আর কণ্ঠে অস্ফুট গুঞ্জন। জন-স্রোত শেষ হোল কলকাতার সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের (High Court) প্রাঙ্গণে এসে। বিভিন্ন স্রোতধারার সমাবেশে সেখানে সৃষ্টি হয়েছে বিশাল জনসমুদ্রের—আদালত কক্ষে কোথাও আর তিলধারণের স্থান নাই। আজ সুরেন্দ্রনাথের আদালত অবমাননার মামলার রায় বেরুবে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের জন-জাগ্রত আত্মার ও শক্তির প্রতীক। তাঁর প্রতি বিদেশী শাসকের ন্যায়ের বিধান কি হয়, তাই জানবার জন্য অসীম আগ্রহে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠছে অপেক্ষমান উদ্বেলিত জনতা। প্রায় একশতাব্দী আগে এই সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক শাসকের ন্যায়ের বিধান—জালিয়াতি, জোচ্চুরী, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনাকে আশ্রয় করে নিছক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্যই নির্দোষ নন্দকুমারকে ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়েছিল। সেই সাম্রাজ্যবাদী শাসককুলের নির্লজ্জ ন্যায়দণ্ডই আবার সমুদ্যত হয়েছে নব্যভারতের সুরেন্দ্রনাথের উপরে বিদেশী বিচারপতির নির্বিবেক অবিবেচনা প্রসূত কার্য্যের নির্ভীক সমালোচনার জন্য।

সুরেন্দ্রনাথের অপরাধ,—"বেঙ্গলী" সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁর একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পিতা ভুবনমোহন দাশ সম্পাদিত "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন" পত্রিকায় কিছুদিন আগে একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল যে, একটি মামলার বিচারের সময়ে বিচারপতি নরিশের আদেশে মামলায় সনাক্ত করবার জন্য হিন্দুর পবিত্র পরমারাধ্য 'শালগ্রাম শিলা'কে আদালতে উপস্থিত করা হয়েছিল। পবিত্র শালগ্রাম শিলার অবমাননায় সমগ্র হিন্দুসমাজের মধ্যে যে বিক্ষোভ সঞ্চারিত হয়েছিল তারই অভিব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করে "বেঙ্গলীর" সম্পাদকীয় স্তম্ভে। "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নের" সংবাদটির উপর ভিত্তি করে ২রা এপ্রিল, ১৮৮৩ খৃঃ তারিখের 'বেঙ্গলীতে' নরিশের অবিবেচনা-প্রসূত কার্য্যের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় প্রতি-বাদ জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখলেন সুরেন্দ্রনাথ। প্রসঙ্গতঃ সাম্রাজ্য-বাদী শাসক গোষ্ঠীর দুঃশাসনের বিরুদ্ধে এতদিন নব্যভাবাপন্ন দলই প্রতিবাদ করে আসছিল। নরিশের এই অবিবেচনা-প্রসূত কার্য্যের দম্‌কা হাওয়ার সেই অসন্তোষের আগুন ছড়িয়ে পড়ল আমাদের দেশের সংরক্ষণশীল মহলেও। জনবুলের মর্য্যাদাবোধে লাগলো আঘাত। আর যায় কোথায়? রুজু হয়ে গেল সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা। দেশের চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল? সুরেন্দ্র-নাথের বিচার দেখবার ও শোনবার জন্য ৫ই মে আদালত প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল।

অবশেষে রায় বেরুল। স্যার রিচার্ড গার্থের নেতৃত্বে পাঁচজন বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত বিচারক মণ্ডলী সুরেন্দ্রনাথকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। দু মাসের কারাদণ্ডের আদেশ হোল। প্রসঙ্গতঃ এই পাঁচ জন বিচারপতির মধ্যে স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র ছিলেন অন্যতম। তিনি অন্য চারজন বিচারকের সাথে একমত হতে পারেন নি; কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে নিজের দৃপ্ত মত প্রকাশ করলেন যে, এই ক্ষেত্রেই শুধু অর্থ-দণ্ডই যথেষ্ট—কারাদণ্ড অনভিপ্রেত। স্যার রমেশচন্দ্রের সুচিন্তিত অভিমত অন্য চারজন বিচারকের মনঃপূত হয় নি। উদ্ধত কালা নেটিভকে তারা সহজে ছেড়ে দিতে স্বীকৃত নয়।

জনসাধারণের উত্তেজনা এখন আর মৃদু গুঞ্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। সুরেন্দ্রনাথের দণ্ডাদেশ ঘোষণার সাথে সাথে আদালতে সমবেত জনতার চাপা উত্তেজনা ফেটে পড়ল প্রতিবাদের প্রবল হুঙ্কারে। মুহূর্ত্তের মধ্যে মুখে মুখে মহানগরীর সর্ব্বত্র এই সংবাদ তড়িৎবেগে ছড়িয়ে পড়ল। ক'লকাতার জনতা এর আগে আর কখনও বোধহয় এত উত্তেজিত বা বিচলিত হয়ে ওঠেনি। সবচেয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো যুবক ও ছাত্রসমাজ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য যে উত্তরকালে যিনি কলিকাতা হাইকোর্টের সুবিখ্যাত বিচারপতি হয়েছিলেন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্যের পদ অলংকৃত করেছিলেন বাংলার সেই পুরুষ-ব্যাঘ্র স্বনামধন্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। তিনিও আদালত প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন রায় শুনবার গভীর আগ্রহে। সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের সংবাদে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে তিনিও সতীর্থদের সঙ্গে যোগদান করেছিলেন প্রতিবাদ জ্ঞাপন ও বিক্ষোভ প্রদর্শনে। ছাত্র ও যুবশক্তির বিক্ষোভ অবিলম্বেই প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করল। আজ-কের দিনের মতই সে দিনেও সার্শীর কাচ ভেঙ্গে, পুলিশের উপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে সেই বিক্ষোভ অভিব্যক্তি লাভ করল। এতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই এই রকমই ঘটে থাকে। কোন অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন—যার ভিতরে কখনো কখনো উচ্ছৃঙ্খলতাও দেখা দেয়—তা সর্ব্বদেশেই সর্ব্বকালে ছিল এবং পরেও থাকবে। যে সব উন্নাসিক নীতিবাগীশের দল একে 'এ পোড়া দেশের পাপ' অথবা 'বর্ত্তমান যুগের অভিশাপ' বলে আখ্যা দেবার চেষ্টা করেন, তাঁরা ঐতিহাসিক সত্যকেই অস্বীকার করেন। বিক্ষুব্ধ জনগণের প্রতিবাদের এই বহ্নি প্রকাশে স্বভাবতঃই আতঙ্কিত হয়ে পড়ল বিদেশী সরকার, তাই অন্যান্য অভিযুক্ত বন্দীদের মত সুরেন্দ্রনাথকে খোলাখুলিভাবে পুলিশের গাড়ীতে জেলে পাঠাতে সেদিনের সেই ধুরন্ধর শাসক গোষ্ঠীরও সাহস হয়নি। অতি সন্তর্পণে বিচারপতিদের প্রবেশ ও

নিষ্ক্রমণের পথ দিয়ে সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে পালিয়ে যায় আলিপুর জেলে—ধূর্ত্ত শৃগাল যেম্‌নি করে গৃহস্বামীকে ফাঁকি দিয়ে তার শিকার নিয়ে পালিয়ে যায় খিড়কির দরজা দিয়ে। যেদিন তার দণ্ডাদেশ ঘোষিত হয় সেইদিনই তার প্রতিবাদে সমগ্র মহানগরীতে স্বতস্ফূর্ত্তভাবে হরতাল পালিত হয়।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই বোধ হয় তাঁর যুগের সর্ব্বপ্রথম ভারতবাসী—যিনি জনসাধারণের জন্য কারাবরণ করেন। "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকার সম্পাদক রবার্ট নাইটও সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন। একটা কথা আছে যে, অকল্যাণ থেকেই কখনও কখনও কল্যাণের উদয় হয়। সুরেন্দ্রনাথের কারাবরণ আগামী দিনের জন্য সুফলই প্রসব করেছিল। এর ফলে তার জনপ্রিয়তা পূর্ব্বের থেকেও বেড়ে গেল। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে সর্ব্বভারতীয় জাতীয়তাবোধের জন্ম হয়েছিল, তার বীজ বপন হোল ১৮৮৩ খৃঃ ৫ই মে। সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে আহূত প্রতিবাদ সভায় এত বেশী জনসমাগম হয়েছিল যে কোনও বক্তৃতা গৃহে সেই বিপুল জনতার স্থান সঙ্কুলান অসম্ভব হয়ে পড়ল। সুতরাং খোলা ময়দানে সভার আয়োজন করা ছাড়া উপায় রইল না। সেই থেকেই খোলা ময়দানে জনসভার সূত্রপাত হোল। এই উপলক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব ঐক্য পরিলক্ষিত হল। শুধু শিক্ষিত শ্রেণীই নয়, সাধারণ লোকেরাও প্রতিবাদ সভায় দলে দলে যোগদান করল। মাত্র ক'লকাতা সহরেই এই প্রতিবাদ জ্ঞাপন সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলার প্রতিটি জিলায়, প্রতিটি সহরে এই প্রতিবাদ স্বতস্ফূর্ত্তভাবে ফেটে পড়েছিল। শুধু তাই নয়, এই প্রতিবাদের ঝড় বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম করে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলকেও আলোড়িত করে তুলেছিল।

লাহোর, অমৃতসর, আগ্রা, ফয়জাবাদ, পুণা প্রভৃতি সহরেও সুরেন্দ্রনাথের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এইভাবে সুরেন্দ্রনাথের দণ্ডাদেশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসীকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল—প্রাদেশিকতা বিবর্জ্জিত এক জাতীয়তাবাদ গঠনে।

এই ঘটনায় সুরেন্দ্রনাথ সাংবাদিক জীবন গ্রহণে এক নূতন প্রেরণা লাভ করলেন। তাঁর "বেঙ্গলী" পত্রিকার জনপ্রিয়তাও অসম্ভব বেড়ে গেল এবং অল্পকালের মধ্যেই ভারতের সেই সময়কার সংবাদপত্রগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকারূপে পরিগণিত হ'ল।

কৃষ্ণনগরের তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটি জাতীয় তহবিল গঠনে উদ্যোগী হলেন সুরেন্দ্রনাথের কারাবরণকে উপলক্ষ করে। প্রায় ২০,০০০ কুড়ি হাজার টাকার মত সংগৃহীত হল। সেই টাকা উত্তরকালে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনকে অর্পণ করা হয়েছিল। পরবর্ত্তীকালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে সেই টাকাটায় যথেষ্ট কাজ দিয়েছিল। এমনি করে সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের ভিতর দিয়ে সূচিত হয়েছিল ভবিষ্যতের সংগঠিত সর্ব্ব ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিশালী এক নতুন আন্দোলন।

নীলাচলে মহাপ্রভু

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

নির্মল আকাশে হাসে শরতের চাঁদ,
সুমন্দ পবনে হিন্দোলিত হয় পেলব বন পল্লবদল,
ফুল্লমল্লীমালতীযূথীর গন্ধে বিহ্বল বৃন্দাবনে
বেজে উঠে মনকাড়া মুরলী,
ব্রজ-যুবতীর মন-যমুনায় জাগে জোয়ার।

শীতের আকাশেও উঠে পূর্ণিমা শশী
মাঘী পূর্ণিমা-নিশীথেও বেজে উঠে বাঁশি
'কৃষ্ণ-বর্ণ শিশু এক মুরলী বাজায়'
বিষ্ণু-প্রিয়ানাথকে বাহির করে পথে,
মাঘের রাতের তন্দ্রাহীন চাঁদ হাসে আকাশে।

ঘরে ঘরে নবদ্বীপের দীপ যায় নিবে,
অমাবস্যার নিরন্ধ্র অন্ধকার
পূর্ণ চাঁদের মুখে পরিয়া দেয় অশ্রু মেঘের মুখোস,
গৌড়-বঙ্গ ভরে যায় করুণ হাহাকারে!
খোল-করতালে বেজে উঠে
অন্তর্গূঢ় ঘন ব্যথার গুরু গুরু গম্ভীর ধ্বনি।

নবদ্বীপের ধরণী ধূলায় পড়ে কাঁদে বিষ্ণুপ্রিয়া,
সমুন্নতোজ্জ্বলরসের লীলা চলে নীলাদ্রির কোলে
ধূলার পরে ঘাস ফুলের চোখে ঝরে শিশির বিন্দু;
উজ্জ্বল তারা জ্বল্‌জ্বল্ করে সুদূর নীলকাশে।

শিশু মন

সুপ্রিয়া ঠাকুর

প্রত্যেক শিশুই নিজস্ব কতকগুলি সৎ ও অসদ্‌গুণের উপাদান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। শৈশব এবং কৈশোরে শিশুর পরিবেশ ও পিতামাতার পরিচালনার তারতম্য অনুসারে কোথাও সদ্‌গুণগুলি নষ্ট হয়ে অসদ্‌গুণগুলি প্রাধান্য লাভ করে, আবার কোথাও বা সঙ্কুচিত হতে হতে অসদ্‌গুণগুলির মৃত্যু হয় এবং সদ্‌গুলি পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। অসদ্‌গুণগুলি প্রাধান্য লাভ করলে মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা ইত্যাদি যে সমস্ত বদ্ অভ্যাস ছেলেদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলির সম্বন্ধেই এবার আমরা আলোচনা করব।

ছেলেরা মিথ্যা কথা বলে কেন?—

দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন, শিশু যখন মিথ্যা কথা বলে তখন পিতামাতার কর্ত্তব্য শিশুর ত্রুটি দেখার চেয়ে নিজেদের ত্রুটির প্রতি বেশী সচেতন হওয়া—নিজেদেরই এর জন্যে দায়ী করা।

এ কথা তো আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, কোন ছেলেই মিথ্যাবাদী হয়ে জন্ম নেয় না, বরং সত্য বলাই তাদের স্বভাব। যেমনটি দেখে, যেমনটি শোনে বা যেমনটি ঘটে হুবহু তারই একটি বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করে তারা; কারণ তাদের অভিজ্ঞতা যেমন কম কল্পনাশক্তিরও তেমনই অভাব। তাই কোন কিছুকেই নিজের মত করে সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে পারে না, কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে থাকে, ততই বুঝতে পারে যে সব সময় সত্য কথা বলার বিপদ আছে অনেক।

ছেলেরা সাধারণতঃ দুটি কারণে মিথ্যা কথা বলে, একটি হচ্ছে আত্মরক্ষা এবং অন্যটি আত্মগৌরব। অতএব বুঝতে পারছেন বোধ হয়—এর উৎপত্তি ভয় থেকে না হয় গর্ব্ব বা অহংকার থেকে। আত্মগৌরব প্রচারের জন্য শিশু যখন মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তখন বুঝতে হবে যে তার মধ্যে আত্মদীনতার ভাব কাজ করছে। অর্থাৎ মনের ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করার শক্তি তার নাই, অথচ কাজে কর্ম্মে আর পাঁচজনের চেয়ে বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাকে ক্রমাগত উৎসাহিত করছে। এই সব ক্ষেত্রে আপনার কি ধরণের ব্যবহার আপনার সন্তানের পক্ষে কল্যাণকর হবে তাই বলার চেষ্টা করছি:

১। সহানুভূতিশীল বন্ধু হবেন—

কোন রকম শাসনের ধার দিয়েও যাবেন না, এমন কি অভিভাবকের সুরও যেন আপনার কথাবার্ত্তার মধ্যে না থাকে। বরং প্রথমেই তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন যে এই মিথ্যে বলার পিছনে তার মনে যে গভীর দুঃখ এবং লজ্জা আছে তা আপনি অনুভব করতে পারেন এবং এই অবস্থায় অনেকেই এমনই মিথ্যে বলে থাকে। তার অক্ষমতার জন্যে আপনারও যে দুঃখের সীমা নাই, এটুকুও প্রকাশ করতে ভুলবেন না। তারপর বোঝাবেন যে মিথ্যেটা একবার ধরা পড়ে গেলে, কোনদিনই আর—কেউ বিশ্বাস করবে না, তখন সত্য বললেও লোকে মনে করবে, যে মিথ্যাই হয়ত বলছে। অতএব যে উদ্দেশ্য নিয়ে সে আজ মিথ্যা বলছে তার সবটুকুই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

২। সম্ভবমত তাকে সাহায্য করুন—

অন্যের সঙ্গে তুলনায় নিজের অক্ষমতার কথা বুঝতে পারে বলেই শক্তি অর্জ্জন করার ইচ্ছাও এই ধরণের ছেলেদের মধ্যে প্রবল হয়ে দেখা দেয়। অপারগ হলে বিকৃত উপায় অবলম্বন করে তা পূরণ করার চেষ্টা করে। অতএব এই সময় তাকে যদি পড়াশুনার উন্নতিতে এবং খেলাধুলার

নিপুণতা লাভে সাহায্য ও উৎসাহ দান করেন তবে সুফল হতে পারে। আরও একটা দিক লক্ষ্য রাখবেন, সেটা হল তার স্বাস্থ্য। হ্যাঁ, যে দিক্‌টায় তার স্বাভাবিক উন্নতি দেখতে পাচ্ছেন সেই দিকটাতে বেশী করে ঝোঁক দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন যে একটা মানুষ সবদিকেই সমানভাবে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে না।

আত্মরক্ষার জন্য যে সব ছেলেরা মিথ্যা কথা বলে তাদের পিতামাতা যে "তাড়নে বহবে গুণা" পক্ষপাতী, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ, অর্থাৎ ছেলে-মেয়েদের দোষের জন্যও কঠোর শাসন করে থাকেন। আপনার ছেলেমেয়েদের বেলাতেও যদি এমনই ঘটে থাকে কিংবা আপনার ব্যক্তিত্ব যদি তাদের ভয়ের কারণ হয়ে থাকে, তবে অবিলম্বে তা দূর করার চেষ্টা করুন। কারণ এই ভয় বস্তুটি তাদের জীবনে কোন কল্যাণ তো আনতে পারবেই না, বরং মিথ্যা কথা বলতে আরও তাদের কুশলী করে তুলবে। আপনাকে ঠকাবার নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করতে সাহায্য করবে।

এই রকম অবস্থায় কি কি উপায় অবলম্বন করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে তারই আলোচনা করছি :

১। রাগ সংযত করবেন—

ছেলেমেয়ে মিথ্যে বললে রাগ না হয়ে পারে না। খুব সত্যি কথা, তবুও তারই মঙ্গলের জন্যে সংযত হবেন। কারণ রাগ হলেই স্বভাবিক নিয়মে তাকে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছে আপনার হবেই। তার চেয়ে ঠাণ্ডা মাথায় তার মিথ্যে বলার কারণটা অনুসন্ধান করবেন।

২। মিথ্যা বলার সুযোগ দেবেন না—

আপনি হয়ত বলবেন যে সেটাও কি আপনার হাতে? নিশ্চয়ই, ধরুন আপনি কোথাও বাইরে গিয়েছিলেন। এসে দেখলেন যে আপনার সখের ফুল-দানিটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে আছে। এই অবস্থায় আপনার সব ছেলে মেয়েদের ডেকে নিয়মিত একটা আদালত বসিয়ে যদি প্রকৃত দোষীকে ধরার চেষ্টা করেন তাহলে অতি-বড় সাহসী ছেলেও সত্যি বলবে না। ধরুন, যদি সে এসে নিজের দোষ স্বীকার করে। কি তখন করবেন আপনি? মার-ধর করবেন? তাহলে তারপর থেকে আপনার কাছে আর সে কখনই সত্যি কথা বলতে চাইবে না। যদি সত্যি কথা বলার জন্যে ক্ষমা করেন, তবে সে অন্যায় কাজ করতেও আর ভয় পাবে না। কারণ, সে জানে যে আপনার কাছে এসে স্বীকার করলে, আপনি তাকে ক্ষমা করবেন। তার চেয়ে তাদের এই কথাটাই বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন যে জিনিষটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্যে আপনি দুঃখ পেয়েছেন খুবই। কিন্তু এই ধরণের অন্যায়টা যে করেছে তার জন্যে দুঃখ পেয়েছেন আরও অনেক বেশী।

৩। ছেলেদের সামনে মিথ্যা বলবেন না—

মা এবং বাবার সঙ্গেই শিশুর প্রথম ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত। তাঁদের আচার আচরণ দেখেই সে অভ্যাস গঠন করতে সুরু করে। অতএব ছেলেদের সামনে এবং তাদের সঙ্গে ব্যবহারে আপনাকে সব সময়ের জন্য সত্যবাদী হতেই হবে। না হলে ছেলেদের মনে এমন ধারণা হতে পারে যে সব সময় সত্যি কথা বলার দরকার হয় না।

৪। মিথ্যা আশ্বাস দেবেন না—

অনেক সময় ছেলেদের একটা অন্যায় আবদার ভোলাতে গিয়ে আমরা তার চেয়ে ভাল কিছু দেওয়া বা তার মনের মত কোথাও নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকি। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি আমরা আর প্রায়ই পালন করি না। এমনটা করা মোটেই উচিত নয়। কারণ, এতে ছেলেদের মিথ্যা বলার উৎসাহই দেওয়া হয়। তাই এমন প্রতিশ্রুতি তাঁদের দেবেন না যা পালন করতে পারা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। এতে আপনার ওপর ছেলেদের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে আপনার কোন সদুপদেশই পালন করতে চাইবে না। কারণ, তাদের চোখে আপনি অনেকখানি হাল্কা হয়ে গেছেন তখন।

৫। শাস্তির ভয় দেখাবেন না—

ছেলে মেয়েকে আগে থেকে শাস্তির ভয় দেখিয়ে কোন অন্যায় নিবারণ করার চেষ্টা করবেন না। কারণ, ছেলেদের স্বাভাবিক ঝোঁক হচ্ছে, আপনি যা করতে বারণ করবেন, তাই করা। যদি একান্ত মনে কারণ যে ভয়

দেখান দরকার। তাহলে সেই অপরাধ করার জন্যে তাকে শাস্তি দিতেই হবে।

৬। বাহিরের আচার আচরণের নির্দ্দেশ দেবেন না—

ইস্কুলে বা অন্য কোথাও যাবার সময় সাধারণতঃ আমরা ছেলেমেয়েদের "এটা করো, ওটা করো, অমুকটা করো না" ইত্যাদি নির্দ্দেশ দিয়ে পাঠাই। এমন করবেন না। কারণ, ফিরে এলেই আপনি আপনার নির্দ্দেশগুলি পালিত হয়েছে কিনা জানতে চাইবেন। ছেলেরা আগে থেকেই ধরে নিয়েছে যে আপনার এই নির্দ্দেশগুলি যদি পালন না করে তবে আপনার কাছে বকুনি খেতে হবে। তাই তারা আপনাকে ভুলেও সত্য কথা বলবে না। তাদের পছন্দ মত আপনার নির্দ্দেশগুলি পালন করবে। বাকিগুলি করবে না। ধরুন বাড়ী এলে আপনি হয়ত তাকে আর কিছু জিজ্ঞেসই করলেন না। তবুও সে মিথ্যে বলার জন্যেই প্রস্তুত হয়ে আপনার সামনে এসেছিল, মনে রাখবেন।

৭। সন্দেহ করবেন না—

সন্দেহ করে কোন সময়েই ছেলে-মেয়েদের বিরক্ত করবেন না। অনেক মাকে এমন কথা ছেলেদের বলতে শুনবেন—"তোমরা কি কর না কর—আমি সব বুঝতে পারি।" "তোমরা কোন অন্যায় করলে তোমাদের মুখ দেখলে আমি ধরতে পারি।" "আমার কাছে লুকিয়ে রাখা সহজ নয়" ইত্যাদি। কখনও এমন কথা বলবেন না। কারণ, সত্যিই তো তাদের সব অন্যায় বুঝতে পারা বা জানতে পারা সম্ভব নয়। মাঝ থেকে অকারণে দোষারোপ করার জন্যে বিরক্ত তো হবেই তারা, আপনার ওপর শ্রদ্ধাও তাদের কমতে থাকবে, তখন আপনার সামনে মিথ্যে বলতেও তারা আর ভয় পাবে না।

৮। বাস্তব উপমা দ্বারা কুফলগুলি বোঝাবে—

অলীক কাহিনীর চেয়ে দৈনন্দিন জীবনে মিথ্যা বলার যে কুফলগুলি সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় সেইগুলি ছেলে মেয়েদের দেখিয়ে দেবেন। এতে প্রত্যক্ষ ভাবে তারা বুঝতে পারবে এবং নিজেরাই সাবধান হওয়ার চেষ্টা করবে।
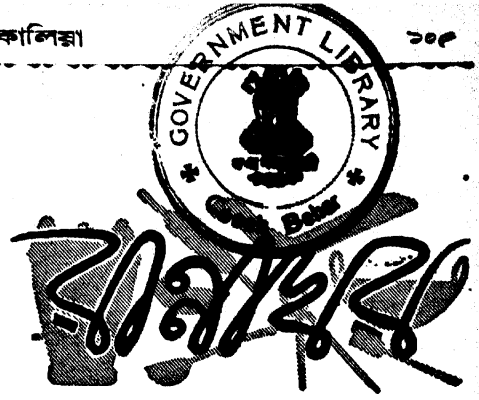
মোচার কালিয়া

উপকরণ:—মোচা, আলু, আদা, লঙ্কা, হলুদ, জিরে, তেজপাতা, গরম মসলা, ঘি, তেল, নুন, অল্প মিষ্টি ও কিছু ব্যসন।

প্রথমে মোচাগুলি কেটে নিন, মোচা খুব ছোট ছোট কুচি করবেন না। মোচার খোলা ছাড়িয়ে ফুলের মধ্যে যে একটা শক্ত কাঠি থাকে তাহা ফেলে দেবেন। তারপর ২।৩ কুচি ক'রে কেটে রাখুন। মোচাগুলি ঐ ভাবে কেটে যেদিন রাঁধবেন তার আগের দিন জলে ভিজিয়ে রাখবেন।

পরদিন রাঁধবার আগে বেশ ভাল ক'রে ধুয়ে নেবেন এবং ডেকচিতে ক'রে সিদ্ধ করতে দেবেন। এদিকে আলুগুলি চার টুক্‌রো ক'রে কেটে রাখবেন। তারপর মোচাগুলি সিদ্ধ হয়ে গেলে জল ঝরিয়ে নিয়ে তাতে আদা-লঙ্কা-হলুদ-বাটা, নুন, অল্প কিছু মিষ্টি ও ব্যসন দিয়ে বেশ ক'রে চট্‌কিয়ে মাখুন। ব্যসন ও মসলা পরিমাণ মত দেবেন। তারপর ছোট ছোট বড়ার আকারে ছাঁকা তেলে ভেজে নিন। এবার আলুগুলি বেশ ভাল ক'রে কসে নিন। কস্‌বার সময় লঙ্কা, তেজপাতা ও জিরে ফড়ন দেবেন। এই সময় অল্প দই—অভাবে সামান্য তেঁতুল অল্প একটু জলে গুলে সেই জলটুকু ছেঁকে নিয়েও দিতে পারেন। আদা-লঙ্কা-জিরে-হলুদবাটা দিয়ে বেশ ভাল ক'রে কস্‌বেন। কসা হয়ে গেলে পরিমাণ মত জল ঢেলে দিন, ফুটে উঠলে মোচার বড়াগুলি দিয়ে দেবেন। অল্প রস থাক্‌তে থাক্‌তে ঘি ও গরম মসলা দিয়ে নামিয়ে নেবেন। ইহা আমি নিজে অনেকবার করেছি এবং খেতে খুব সুন্দর লাগে।

থোড়ের বড়া

থোড়গুলি প্রথমে চাকা চাকা ক'রে কেটে একটু নুন মাখিয়ে রাখুন। থোড়ের বড়া করতে হলে রাঁধবার আগের দিন সন্ধ্যায় কিছু মটর ডাল ভিজিয়ে রাখবেন। পরদিন সকালে রাঁধবার আগে ভিজে ডালগুলি ভাল ক'রে বেটে নিবেন। মটর ডালের ব্যসন হলেও চল্‌বে, কিন্তু মটর ডাল বেটে নিলেই স্বাদ ভাল হয়। এবার ঐ ডাল-বাটায় নুন, লঙ্কা ও অল্প মিষ্টি দিয়ে ভাল ক'রে ফেটিয়ে নিন। তারপর থোড়ের চাকাগুলিতে বেশ পুরু ক'রে মাখিয়ে ঐ কাঁচা বড়াগুলির উপর অল্প ক'রে গোটা পোস্তদানা ও জিরে ছড়িয়ে দিয়ে ছাঁকা তেলে ভেজে গরম গরম পরিবেশন করুন। মনে রাখবেন, এই বড়া ঠাণ্ডা অপেক্ষা গরম গরম খেতেই ভাল লাগে বেশী।

—শ্রীমতী রাণী চক্রবর্ত্তী

(বাগবাজার, চন্দননগর)

আল্পনা—
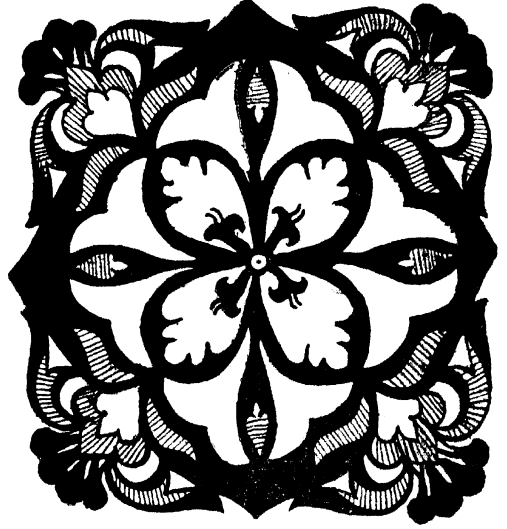
—ইন্দিরা বিশ্বাস

মনে পড়ে ?

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

মনে পড়ে তরু, তব ছায়াতলে
একটি বালক করিত খেলা—
সকাল বেলা ?
তখন তরুণ তপন-কিরণ
মনে হ'ত যেন তরল হিরণ,
তব শাখে শাখে বসি' ঝাঁকে ঝাঁকে
হাজার পাখীর কুম্ভমেলা।
আছে কিগো নদী, তব বালুকায়
আজিও তাহার চরণ-রেখা,
স্মৃতিটি লেখা ?
তব জলতলে আজো কি তাহার
বিম্বিত কচিমুখ বারবার ?
ঐ উচ্ছল কলগীতি তারি
কচি কণ্ঠের কাছে কি শেখা ?

ওগো বনভূমি, একটি বালক—
তার কথা তব পড়ে কি মনে
অশ্রুসনে ?
তব মর্মরে, শ্যামসুষমায়,
লতাপুষ্পের ললিত মায়ায়,—
আজিও কি তারে খুঁজিছ বৃথাই
ব্যাকুল অলির গুঞ্জরণে ?
পল্লী-জননী, ভুলেছ কি তার
মুগ্ধ আঁখির দৃষ্টিখানি ?
নাহি সে জানি।
তোমার কুটীরে, হাটমাঠঘাটে
আজ তার দিন নাহি আর কাটে ;—
সে তব দুলালে সংসার মাগো,
টানায় নিঠুর কারার ঘানি !

ফুলের মত...

আপনার লাবণ্য রেক্সোনা ব্যবহারে ফুটে উঠবে!

নিয়মিত রেক্সোনা সাবান ব্যবহার করলে আপনার লাবণ্য অনেক বেশি সতেজ, অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে! তার কারণ, একমাত্র সুগন্ধ রেক্সোনা সাবানেই আছে **ক্যাডিল** অর্থাৎ ত্বকের সৌন্দর্য্যের জন্যে কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ।

রেক্সোনা সাবানের সরের মত ফেণার রাশি এবং দীর্ঘস্থায়ী সুগন্ধ উপভোগ করুন; এই সৌন্দর্য্য সাবানটি প্রতিদিন ব্যবহার করুন। রেক্সোনা আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তুলবে।

রেক্সোনা—একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত সাবান

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারি লিমিটেড-এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

R.P. 146-X52 BG

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর পত্র

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত

Presidency College
Calcutta.

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমীপেষু—

দৈবক্রমে আপনার একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম। তাহার পর আপনার সব বই আনিয়া পড়িয়াছি। অতি-মানুষ কদাপি দেখা যায়। আপনি সাধারণ জীবনের কথাই লিখিয়াছেন, যাহা দ্বারা জাতীয় জীবন রচিত হইতেছে। তাহাতে যে কি মহত্ত্ব আছে ও কি মহত্ত্ব সম্ভব তাহা আমরা দেখিয়াও দেখি না, অথচ তাহা আমাদের সম্মুখেই ঘটিতেছে। অপ্রাকৃত ও অসম্ভাবিত চরিত্রের কথা বলেন নাই, বহুভাষী নবনী-গঠিত পুরুষের পরিবর্ত্তে পুরুষের পুরুষত্ব এবং নারীকে পুতুলরূপে না আঁকিয়া তাহার নারীত্ব দেখাইয়াছেন। যাহা ক্ষণিক ও ক্ষুদ্র তাহার পরিবর্ত্তে যাহা চিরন্তন তাহাই চিত্রিত করিয়াছেন। প্রচলিত সমাজের নিষ্ঠুরতা অনেক সময় ইচ্ছাকৃত নহে, ইহা অনেক সময় বালকের অজ্ঞানতা নিবন্ধন ক্রূরতার ন্যায়। জ্ঞান ও তর্ক দ্বারা যাহা অপ্রতিষ্ঠিত থাকে অনেক সময় হৃদয়ের পরিচালনে তাহা সম্ভবিত হয়। কারণ এই সর্ব্ব-ব্যাপী দুঃখ হইতে কে পরিত্রাণ পাইয়াছে সে কথা স্মরণ থাকিলে কে অন্যের বোঝা বাড়াইতে চায়? যে দুঃখ কাহারও জীবন ভাঙিয়া দেয় সেই দুঃখই আবার অন্যকে দুঃখের অতীত করিয়া দেয়। সফলতা যে কত ক্ষুদ্র, বিফলতা যে কত বড়। আপনার পথ-নির্দ্দেশ পড়িতে পড়িতে ভয় হইয়াছিল যে অত কষ্টের পর সফলতার মোহ ভুলিতে পারিবেন না, যে দেখিয়া সুখী হইলাম যে—যে-পথটা বড় তাহা নির্দ্দেশ করিতে ভুলিয়া যান নাই। আমি সাহিত্য পরিষদ সংশ্রবে দুই একটা বিষয়ে যেরূপ আশান্বিত হইয়াছি অন্য বিষয়ে সেইরূপ ক্ষুব্ধ হইয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ অনেক বিষয়েই আমাদের প্রযত্ন সফলতার দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহা ব্যর্থ করিবার জন্যও অনেক নিরাশার কারণ উদ্ভুত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। তাহার একটী এই যে—ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইলে বহিঃদৃষ্টি ও অন্তঃদৃষ্টি ক্ষুদ্র হইয়া যায়। আর একটী এই যে—বহু প্রয়াসে পূর্ব্বে যাহা সাধিত হইয়াছিল সফলতা আসিলে পরে এগুলি অল্প আয়াসেই সম্পন্ন করিতে চাহি। যদি সফলতা আসিয়া থাকে তবে তাহাও দেবতার করুণা, আমাদের তাহাতে কি বলিবার আছে? কেবল বলিবার কথা এই যে, যে করুণা আমাদের অনুপযুক্ত জীবনে প্রসারিত হইয়াছে সেই দান যেন আমাদের জীবনকে আরও পূর্ণতর করিতে পারে। যে মহত্ত্বের কথা বলিয়াছি তাহা তখনই শক্তিবান হইবে যখন লেখকের জীবন লেখা হইতে মহত্তর হয়।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

[পত্রখানিতে কোন তারিখ নাই, অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ইহা লিখিত। এই সঙ্গে পত্রখানির ছবিও প্রকাশিত হইল। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিক উৎসবের সময় আমরা তাঁহার এই পত্রখানি প্রকাশ করিতে পারিয়া ধন্য হইলাম। যাঁহাদের কাছে আচার্য্যদের লিখিত এই রকম পত্রাদি আছে তাঁহারা দয়া করিয়া যদি সেগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে দেশের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইবে।]

শ্মশানের স্বরূপ

শ্রীসুধীর গুপ্ত

(১)

কে বলে শ্মশানে ছাই হ'য়ে যাবে
এই স্নেহ-মাখা আঁতুড়-ঘর ?
রূপ তো পোড়ে না—রূপ তো মরে না—
লভে সে শুধুই রূপান্তর।
শ্মশান-অনলে আতঙ্ক কেন ?
শোণিতে রক্ত হয়েছে আঁখি ;
নব-জাতকের জীবনোল্লাস
রোদন-বোধনে শুনিছো নাকি !

(২)

এই দেহাধারে জীবন যখনই
আপনারে আর রাখিতে নারে,
ভগ্নভাণ্ড শ্মশানে সঁপিয়া
ছলকিয়া ওঠে নোতুন ভাঁড়ে ;—
জীবন-রসের সরস সুধায়
অপরূপ রূপ কী সুন্দর !
রূপ তো পোড়ে না—রূপ তো মরে না—
প্রেমে শুধু পায় রূপান্তর।

(৩)

বামাচারে আর কামাচারে তুমি
চিতায় পুড়িলে চোখেরও মণি ;
দেখিলে না হায় এ মহা-পৃথিবী
রূপের—প্রেমের—রসেরই খনি ;
মরকতে-মোড়া আকাশ-তলায়
শ্মশানে শিবের জ্বলিছে ধুনি ;
সতী-শবাহত কাপালিক শিবও
উমারে লভিয়া হয়েছে মুনি।

(৪)

লণ্ডভণ্ড ভাণ্ড দেখিয়া
ভণ্ড সাধক, মরিছো ভয়ে ;
অবাক্ কাণ্ড দেখেও দেখো না ?—
গড়া-ই চলেছে অবক্ষয়ে।
জীবন কেবলই এগিয়ে চলেছে
শ্মশান-ভস্মে করিয়া ভর ;
পুড়িয়া পুড়িয়া খাদও খাঁটি হয় ;—
রূপও প্রেমে পায় রূপান্তর।

(৫)

মরা-কান্নার সময় কোথায় ?—
খণ্ড খণ্ড সতীর দেহে
উমাই আবার অপরূপ রূপে
শিবের হৃদয় জিনিবে স্নেহে।
দিব্য নয়নে রূপ দেখে লও—
বিশ্ব-রূপের রূপান্তর ;
শ্মশানই সূতিকা—সূতিকা শ্মশান ;—
কে বলে শ্মশান ভয়ঙ্কর ?

হীরেন্দ্র নারায়ন মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

অতসীর যখন সংজ্ঞা ফিরে এলো তখন রাত্রি প্রায় এগারোটা। পুণ্যস্নান মহাযোগে চঞ্চল মহানগরীর স্নায়ু-কেন্দ্রে শ্রান্তির অবসাদ নেমে এসেছে। অমৃতলেহী পিপীলিকার দল পুণ্যকণা মুখে নিয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে আবার আপন আপন বিবরে প্রবেশ করেছে। দিগন্তের তীর্থযাত্রীরা গিয়ে ভিড় জমিয়েছে রেল স্টেশনের চত্বরে মুসাফিরখানায় আর ফুটপাতে। কোলাহল থেমে গিয়েছে। মানুষের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস আর পেট্রোলের ধোঁয়ায় জমাট-বাঁধা ঝাঁজালো বাষ্প ধীরে ধীরে গলে' পড়ে হিমসিক্ত বাতাসের স্পর্শে।

সংজ্ঞা হয়তো ফিরেছিল অনেক আগেই। অনেক আগে অতসী একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখেছিল যে, তাঁবুর ভিতর একখানা বড় বেঞ্চিতে সে শুয়ে আছে। অবস্থাটা ভেবে নেবার মত মনের সক্রিয়তা ছিল না তার। হাত পা নড়াবার শক্তিটুকুও ছিল না দেহে। অস্থিমজ্জা যেন পাথরে চোট খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। চোখ ফেরাতে কপালের শিরাগুলো ঝন্‌ঝন্‌ করে। মনে হয়, বুঝি ছিঁড়ে পড়বে।

চারিদিকে অচেনা লোকজন। ভদ্রলোকের ছেলে সব। তাঁবুর ভিতরে বাইরে ব্যস্ত হয়ে কারা সব ঘোরা-ফেরা করে!···দীনু!···দীনু নাই তো ওদের ভিতর?

মগজের ভিতর কিলবিল করে উঠেছিল অসংখ্য স্নায়ু-কীট। কেমন একটা ভয়, একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় ওর সর্বাঙ্গ আবার থর থর করে কেঁপে উঠেছিল। বুঝে উঠতে পারে নি, ভেবে উঠতে পারেনি—কেমন করে কোথায় এসে পড়েছে সে।

ওর মুখপানে চেয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন একটী সুন্দরী ভদ্রমহিলা। বয়েস হলেও ছাপ পড়েনি চোখে-মুখে। পরণে বাদামি রঙের রেশমি শাড়ি। আঁচলটা পিঠের ওপর ছড়ানো। মিষ্টি একটু হেসে বলেছিলেন: ভয় কি! এখুনি সেরে উঠবে।

ভয়!···ভয়। হাঁ, সত্যি ভয়। কেমন একটা অজানা ভয়ে আবার অসাড় হয়ে গিয়েছিল অতসীর সারা দেহ। চোখদুটো বন্ধ করেছিল। তারপর জানে না সে কেমন করে তাঁবু থেকে এসে পড়েছে এই ঝক্‌ঝকে ঘরে নরম বিছানার ওপর। দামী আসবাবে সাজানো বড়লোকের বৈঠকখানা। একপাশে একটা কৌচের ওপর শুয়ে আছে সে!

গঙ্গার ঘাটে অসংখ্য যাত্রীর ভিড়ে পথ হারিয়ে অতসী ছিটকে পড়েছিল। ভিকিরীদের দলে দীনুকে খুঁজতে গিয়ে বৃন্দাবনের রজ বিক্রি করা তার হয় নি। জন-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে ভাসমান তৃণের মত শীর্ণ দেহটা কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পড়েছিল সে-জ্ঞান তার ছিল না। চেরিক্লাব ও সবুজ-সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবকদের অনুগ্রহে সংজ্ঞাহীন দেহটা আশ্রয় পেয়েছিল ময়দানের তাঁবুতে। সংজ্ঞা যখন ফিরেছিল তখন পাশ ফিরবার শক্তিটুকুও ছিল না দেহে। মানুষের পাষাণ চাপে হাড়-গোড় আর পেশিগুলো যেন থেঁতো হয়ে গিয়েছিল। নিঃশ্বাস নিতে পাঁজরার হাড় ক'খানা টনটন করে।

পরণের কাপড়খানা কখন খুলে পড়েছে, অতসী বুঝতেও পারে নি। বুঝলো তখন যখন মনে হলো কে ওর খালি গায়ে হাত বুলচ্ছে। অস্বস্তি হলেও প্রতিবাদ করতে পারে না। নিদারুণ অবসাদে দেহমন আচ্ছন্ন। কথা বলবার ক্ষমতাটুকুও যেন লোপ পেয়েছিল। মগজের ভিতর বার-

যার শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছিল একটি প্রশ্ন: কেন বাঁচলো? আবার কেন বেঁচে উঠলো সে?

দরজা জানালা বন্ধ। গরম জলে তোয়ালে ভিজিয়ে জোরে-জোরে গা-টা মুছিয়ে দিয়ে মিসেস চৌধুরী হেসে বললেন: অনেকখানি আরাম পাবে এবার।

একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখে, অতসী চোখদুটো আবার বন্ধ করে। কি বলবে ভেবে পায় না। মনটা নিবন্ত প্রদীপের মত মিটমিট ক'রে ঝিমিয়ে আসে।··· ইনিই! হাঁ, এঁকেই সে দেখেছিল তাঁবুতে।

চাদরটা গলা পর্যন্ত টেনে দিয়ে মিসেস চৌধুরী চাদরের ভিতর দিয়ে আবার হাত বুলোতে লাগলেন ওর গায়ে। অতসীর দম বন্ধ হয়ে আসে। অদম্য শিহরণে বুকের ভিতরটা শিউরে ওঠে। সারা দেহ যেন কাঠ হয়ে আসে সংকোচের আড়ষ্টতায়। জিবটা শুকিয়ে আসে।

কি নাম তোমার?

অতসী উত্তর দিতে পারে না। ঠোঁটদুটো কাঁপে। অনেককষ্টে নিজেকে সংযত করে নিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বলে: অ-ত-সী।

অতসী!···বাঃ! বেশ সুন্দর নাম তো তোমার! হলদে রঙের ছোটছোট ফুল। বনে জঙ্গলে ফুটে থাকে। তার চেয়েও সুন্দর তোমার চোখদুটো।···গেরণের যোগে চান করতে এসেছিলে বুঝি?

না: একটা দীর্ঘশ্বাসে অতসীর গলাটা রুদ্ধ হয়ে আসে। আবার চোখদুটো বন্ধ ক'রে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে।

তবে?

মিসেস চৌধুরীর মনে ভিড় করে অজস্র প্রশ্ন। কিন্তু অতসার বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে ওঠে নিরুদ্ধ উত্তর-গুলো।···পুণ্যি! পুণ্যি করতে সে আসে নি। আর জন্মে যত পাপ করেছিল, সব কাঁড়ি হয়ে জমে আছে ওর কপালে। সে পাপ জলে ধুয়ে মুছবে না।

জোর ক'রে অতসী চোখদুটো খুলে তাকাবার চেষ্টা করে। শঙ্কিত দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে আর একবার দেখে নেয়।···না, নেই। আর কেউ তো নেই ঘরে। দু পাশের দরজা বন্ধ।···তবে?

বিস্ময় কাটে না। বিহ্বল দৃষ্টিতে অতসী চেয়ে থাকে। কিন্তু মুখে কথা সরে না। হৃৎপিণ্ডটা অস্বাভাবিক দ্রুত হয়ে উঠেছে। ঠিক ভয় নয়। কেমন একটা অজ্ঞাত অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে আসে ওর নারীত্বের সুরেলা পর্দাগুলো।···মেয়েমানুষ! এতক্ষণ এই একলা ঘরে ওর দেহটাকে নিয়ে যে অমন করে চটকাচ্ছিল, সে পুরুষ নয়, মেয়েমানুষ!···ছি! ছি!···অতসী ভাবতে পারে না।

পদ্ম মাঝে মাঝে পুরুষের মত তাকিয়ে থাকতো ওর দিকে। গন্নাকাটা ঠোঁটের ফাঁকে দাঁতগুলো যেন ইস-পিস করতো কামড়াবার জন্যে। খেপা শেয়ালের মত তার চোখের চাউনি দেখে অতসীর গা-টা কেমন শিরশির করে উঠতো।

সঙ্গে যারা ছিল তাদের বুঝি খুঁজে পাওনি?

কেউ ছিল না সঙ্গে: কম্পিতকণ্ঠে অতসী উত্তর দেয়।

একলা গিয়েছিলে ওই ভিড়ের মাঝখানে?

হাঁ: অতসী চোখদুটো বন্ধ করে। কি বলবে, ভেবে পায় না। একটু থেমে, ইতস্তত করে বলে: আমাকে যদি একখানা ছেঁড়া কাপড় দিতেন, বাসায় ফিরে যেতাম। আমি পারবো এখন হেঁটে যেতে।

চাদরখানা পিঠের দিকে টেনে নিয়ে অতসী বিব্রত-ভাবে উঠে বসবার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। পরণে কাপড় নাই। লজ্জায় জড়সড় হয়ে অতসী মুখখানা ঢাকে।

টেবিলের ওপর থেকে প্যাকেটটা নিয়ে নতুন এক-খানা শাড়ি, একটা পেটিকোট আর ব্লাউস অতসীর হাতের কাছে দিয়ে মিসেস চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন। ওর মুখের ওপর থেকে চাদরটা সরিয়ে দিয়ে বললেন: পরো। এত লজ্জা কিসের? ঘরে তো পুরুষ মানুষ নেই কেউ।

লজ্জা কিসের?···পুরুষ মানুষ নাই বলে ওর লজ্জা থাকবেনা! অতসীর মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে। ওর চেনা পৃথিবীটা যেন তালগোল পাকিয়ে চোখের দূরে সরে যায়। ভাবতে পারে না কেমন করে কোথা থেকে কোথায় ছিটকে এসেছে সে!···কে এই ভদ্রমহিলা?

ফুলের মত...

আপনার লাবণ্য রেক্সোনা ব্যবহারে ফুটে উঠবে!

নিয়মিত রেক্সোনা সাবান ব্যবহার করলে আপনার লাবণ্য অনেক বেশি সতেজ, অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে! তার কারণ, একমাত্র সুগন্ধ রেক্সোনা সাবানেই আছে **ক্যাডিল** অর্থাৎ ত্বকের সৌন্দর্য্যের জন্যে কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ।
রেক্সোনা সাবানের সরের মত ফেণার রাশি এবং দীর্ঘস্থায়ী সুগন্ধ উপভোগ করুন; এই সৌন্দর্য্য সাবানটি প্রতিদিন ব্যবহার করুন। রেক্সোনা আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তুলবে।

রেক্সোনা—একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত সাবান

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারি লিমিটেড-এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

R.P. 146-X52 BG

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর পত্র

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত

Presidency College
Calcutta.

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমীপেষু—

দৈবক্রমে আপনার একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম। তাহার পর আপনার সব বই আনিয়া পড়িয়াছি। অতি-মানুষ কদাপি দেখা যায়। আপনি সাধারণ জীবনের কথাই লিখিয়াছেন, যাহা দ্বারা জাতীয় জীবন রচিত হইতেছে। তাহাতে যে কি মহত্ত্ব আছে ও কি মহত্ত্ব সম্ভব তাহা আমরা দেখিয়াও দেখি না, অথচ তাহা আমাদের

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

সম্মুখেই ঘটিতেছে। অপ্রাকৃত ও অসম্ভাবিত চরিত্রের কথা বলেন নাই, বহুভাষী নবনী-গঠিত পুরুষের পরিবর্ত্তে পুরুষের পুরুষত্ব এবং নারীকে পুতুলরূপে না আঁকিয়া তাহার নারীত্ব দেখাইয়াছেন। যাহা ক্ষণিক ও ক্ষুদ্র তাহার পরিবর্ত্তে যাহা চিরন্তন তাহাই চিত্রিত করিয়াছেন। প্রচলিত সমাজের নিষ্ঠুরতা অনেক সময় ইচ্ছাকৃত নহে, ইহা অনেক সময় বালকের অজ্ঞানতা নিবন্ধন ক্রূরতার ন্যায়। জ্ঞান ও তর্ক দ্বারা যাহা অপ্রতিষ্ঠিত থাকে অনেক সময় হৃদয়ের পরিচালনে তাহা সম্ভবিত হয়। কারণ এই সর্ব্ব-ব্যাপী দুঃখ হইতে কে পরিত্রাণ পাইয়াছে সে কথা স্মরণ থাকিলে কে অন্যের বোঝা বাড়াইতে চায়? যে দুঃখ কাহারও জীবন ভাঙিয়া দেয় সেই দুঃখই আবার অন্যকে দুঃখের অতীত করিয়া দেয়। সফলতা যে কত ক্ষুদ্র, বিফলতা যে কত বড়। আপনার পথ-নির্দ্দেশ পড়িতে পড়িতে ভয় হইয়াছিল যে অত কষ্টের পর সফলতার মোহ ভুলিতে পারিবেন না, যে দেখিয়া সুখী হইলাম যে—যে-পথটা বড় তাহা নির্দ্দেশ করিতে ভুলিয়া যান নাই। আমি সাহিত্য পরিষদ সংশ্রবে দুই একটা বিষয়ে যেরূপ আশান্বিত হইয়াছি অন্য বিষয়ে সেইরূপ ক্ষুব্ধ হইয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ অনেক বিষয়েই আমাদের প্রযত্ন সফলতার দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহা ব্যর্থ করিবার জন্যও অনেক নিরাশার কারণ উদ্ভূত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। তাহার একটী এই যে—ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইলে বহিঃদৃষ্টি ও অন্তঃদৃষ্টি ক্ষুদ্র হইয়া যায়। আর একটী এই যে—বহু প্রয়াসে পূর্ব্বে যাহা সাধিত হইয়াছিল সফলতা আসিলে পরে এগুলি অল্প আয়াসেই সম্পন্ন করিতে চাহি। যদি সফলতা আসিয়া থাকে তবে তাহাও দেবতার করুণা, আমাদের তাহাতে কি বলিবার আছে? কেবল বলিবার কথা এই যে, যে করুণা আমাদের অনুপযুক্ত জীবনে প্রসারিত হইয়াছে সেই দান যেন আমাদের জীবনকে আরও পূর্ণতর করিতে পারে। যে মহত্ত্বের কথা বলিয়াছি তাহা তখনই শক্তিবান হইবে যখন লেখকের জীবন লেখা হইতে মহত্তর হয়।

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

[পত্রখানিতে কোন তারিখ নাই, অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ইহা লিখিত। এই সঙ্গে পত্রখানির ছবিও প্রকাশিত হইল। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিক উৎসবের সময় আমরা তাঁহার এই পত্রখানি প্রকাশ করিতে পারিয়া ধন্য হইলাম। যাঁহাদের কাছে আচার্যাদের লিখিত এই রকম পত্রাদি আছে তাঁহারা দয়া করিয়া যদি সেগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে দেশের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইবে।]

শ্মশানের স্বরূপ

শ্রীসুধীর গুপ্ত

(১)

কে বলে শ্মশানে ছাই হ'য়ে যাবে
এই স্নেহ-মাখা আঁতুড়-ঘর ?
রূপ তো পোড়ে না—রূপ তো মরে না—
লভে সে শুধুই রূপান্তর।
শ্মশান-অনলে আতঙ্ক কেন ?
শোণিতে রক্ত হয়েছে আঁখি ;
নব-জাতকের জীবনোল্লাস
রোদন-বোধনে শুনিছো নাকি !

(২)

এই দেহাধারে জীবন যখনই
আপনারে আর রাখিতে নারে,
ভগ্নভাণ্ড শ্মশানে সঁপিয়া
ছলকিয়া ওঠে নোতুন ভাঁড়ে ;—
জীবন-রসের সরস সুধায়
অপরূপ রূপ কী সুন্দর !
রূপ তো পোড়ে না—রূপ তো মরে না—
প্রেমে শুধু পায় রূপান্তর।

(৩)

বামাচারে আর কামাচারে তুমি
চিতায় পুড়িলে চোখেরও মণি ;
দেখিলে না হায় এ মহা-পৃথিবী
রূপের—প্রেমের—রসেরই খনি ;
মরকতে-মোড়া আকাশ-তলায়
শ্মশানে শিবের জ্বলিছে ধুনি ;
সতী-শবাহত কাপালিক শিবও
উমারে লভিয়া হয়েছে মুনি।

(৪)

লণ্ডভণ্ড ভাণ্ড দেখিয়া
ভণ্ড সাধক, মরিছো ভয়ে ;
অবাক্ কাণ্ড দেখেও দেখো না ?—
গড়া-ই চলেছে অবক্ষয়ে।
জীবন কেবলই এগিয়ে চলেছে
শ্মশান-ভস্মে করিয়া ভর ;
পুড়িয়া পুড়িয়া খাদও খাঁটি হয় ;—
রূপও প্রেমে পায় রূপান্তর।

(৫)

মরা-কান্নার সময় কোথায় ?—
খণ্ড খণ্ড সতীর দেহে
উমাই আবার অপরূপ রূপে
শিবের হৃদয় জিনিবে স্নেহে।
দিব্য নয়নে রূপ দেখে লও—
বিশ্ব-রূপের রূপান্তর ;
শ্মশানই সূতিকা—সূতিকা শ্মশান ;—
কে বলে শ্মশান ভয়ঙ্কর ?

(পূর্বানুবৃত্তি)

অতসীর যখন সংজ্ঞা ফিরে এলো তখন রাত্রি প্রায় এগারোটা। পুণ্যস্নান মহাযোগে চঞ্চল মহানগরীর স্নায়ু-কেন্দ্রে শ্রান্তির অবসাদ নেমে এসেছে। অমৃতলেহী পিপীলিকার দল পুণ্যকণা মুখে নিয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে আবার আপন আপন বিবরে প্রবেশ করেছে। দিগন্তের তীর্থযাত্রীরা গিয়ে ভিড় জমিয়েছে রেল স্টেশনের চত্বরে মুসাফিরখানায় আর ফুটপাতে। কোলাহল থেমে গিয়েছে। মানুষের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস আর পেট্রোলের ধোঁয়ায় জমাট-বাঁধা ঝাঁজালো বাষ্প ধীরে ধীরে গলে' পড়ে হিমসিক্ত বাতাসের স্পর্শে।

সংজ্ঞা হয়তো ফিরেছিল অনেক আগেই। অনেক আগে অতসী একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখেছিল যে, তাঁবুর ভিতর একখানা বড় বেঞ্চিতে সে শুয়ে আছে। অবস্থাটা ভেবে নেবার মত মনের সক্রিয়তা ছিল না তার। হাত পা নড়াবার শক্তিটুকুও ছিল না দেহে। অস্থিমজ্জা যেন পাথরে চোট খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। চোখ ফেরাতে কপালের শিরাগুলো ঝন্‌ঝন্ করে। মনে হয়, বুঝি ছিঁড়ে পড়বে।

চারিদিকে অচেনা লোকজন। ভদ্রলোকের ছেলে সব। তাঁবুর ভিতরে বাইরে ব্যস্ত হয়ে কারা সব ঘোরা-ফেরা করে!···দীনু!···দীনু নাই তো ওদের ভিতর?

মগজের ভিতর কিলবিল করে উঠেছিল অসংখ্য স্নায়ু-কীট। কেমন একটা ভয়, একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় ওর সর্বাঙ্গ আবার থর থর করে কেঁপে উঠেছিল। বুঝে উঠতে পারে নি, ভেবে উঠতে পারেনি—কেমন করে কোথায় এসে পড়েছে সে।

ওর মুখপানে চেয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন একটী সুন্দরী ভদ্রমহিলা। বয়েস হলেও ছাপ পড়েনি চোখে-মুখে। পরণে বাদামি রঙের রেশমি শাড়ি। আঁচলটা পিঠের ওপর ছড়ানো। মিষ্টি একটু হেসে বলেছিলেন: ভয় কি! এখুনি সেরে উঠবে।

ভয়!···ভয়। হাঁ, সত্যি ভয়। কেমন একটা অজানা ভয়ে আবার অসাড় হয়ে গিয়েছিল অতসীর সারা দেহ। চোখদুটো বন্ধ করেছিল। তারপর জানে না সে কেমন করে তাঁবু থেকে এসে পড়েছে এই ঝক্‌ঝকে ঘরে নরম বিছানার ওপর। দামী আসবাবে সাজানো বড়লোকের বৈঠকখানা। একপাশে একটা কৌচের ওপর শুয়ে আছে সে!

গঙ্গার ঘাটে অসংখ্য যাত্রীর ভিড়ে পথ হারিয়ে অতসী ছিটকে পড়েছিল। ভিকিরীদের দলে দীনুকে খুঁজতে গিয়ে বৃন্দাবনেব রজ বিক্রি করা তার হয় নি। জন-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে ভাসমান তৃণের মত শীর্ণ দেহটা কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পড়েছিল সে-জ্ঞান তার ছিল না। চেরিক্লাব ও সবুজ-সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবকদের অনুগ্রহে সংজ্ঞাহীন দেহটা আশ্রয় পেয়েছিল ময়দানের তাঁবুতে। সংজ্ঞা যখন ফিরেছিল তখন পাশ ফিরবার শক্তিটুকুও ছিল না দেহে। মানুষের পাষাণ চাপে হাড়-গোড় আর পেশিগুলো যেন থেঁতো হয়ে গিয়েছিল। নিঃশ্বাস নিতে পাঁজরার হাড় ক'খানা টনটন করে।

পরণের কাপড়খানা কখন খুলে পড়েছে, অতসী বুঝতেও পারে নি। বুঝলো তখন যখন মনে হলো কে ওর খালি গায়ে হাত বুলচ্ছে। অস্বস্তি হলেও প্রতিবাদ করতে পারে না। নিদারুণ অবসাদে দেহমন আচ্ছন্ন। কথা বলবার ক্ষমতাটুকুও যেন লোপ পেয়েছিল। মগজের ভিতর বার-

বার শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছিল একটি প্রশ্ন: কেন বাঁচলো? আবার কেন বেঁচে উঠলো সে?

দরজা জানালা বন্ধ। গরম জলে তোয়ালে ভিজিয়ে জোরে-জোরে গা-টা মুছিয়ে দিয়ে মিসেস চৌধুরী হেসে বললেন: অনেকখানি আরাম পাবে এবার।

একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখে, অতসী চোখদুটো আবার বন্ধ করে। কি বলবে ভেবে পায় না। মনটা নিবন্ত প্রদীপের মত মিটমিট ক'রে ঝিমিয়ে আসে।··· ইনিই! হাঁ, এঁকেই সে দেখেছিল তাঁবুতে।

চাদরটা গলা পর্যন্ত টেনে দিয়ে মিসেস চৌধুরী চাদরের ভিতর দিয়ে আবার হাত বুলোতে লাগলেন ওর গায়ে। অতসীর দম বন্ধ হয়ে আসে। অদম্য শিহরণে বুকের ভিতরটা শিউরে ওঠে। সারা দেহ যেন কাঠ হয়ে আসে সংকোচের আড়ষ্টতায়। জিবটা শুকিয়ে আসে।

কি নাম তোমার?

অতসী উত্তর দিতে পারে না। ঠোঁটদুটো কাঁপে। অনেককষ্টে নিজেকে সংযত করে নিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বলে: অ-ত-সী।

অতসী!···বাঃ! বেশ সুন্দর নাম তো তোমার! হলদে রঙের ছোটছোট ফুল। বনে জঙ্গলে ফুটে থাকে। তার চেয়েও সুন্দর তোমার চোখদুটো।···গেরণের যোগে চান করতে এসেছিলে বুঝি?

না: একটা দীর্ঘশ্বাসে অতসীর গলাটা রুদ্ধ হয়ে আসে। আবার চোখদুটো বন্ধ ক'রে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে।

তবে?

মিসেস চৌধুরীর মনে ভিড় করে অজস্র প্রশ্ন। কিন্তু অতসীর বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে ওঠে নিরুদ্ধ উত্তর-গুলো।···পুণ্যি! পুণ্যি করতে সে আসে নি। আর জন্মে যত পাপ করেছিল, সব কাঁড়ি হয়ে জমে আছে ওর কপালে। সে পাপ জলে ধুয়ে মুছবে না।

জোর ক'রে অতসী চোখদুটো খুলে তাকাবার চেষ্টা করে। শঙ্কিত দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে আর একবার দেখে নেয়।···না, নেই। আর কেউ তো নেই ঘরে। দু পাশের দরজা বন্ধ।···তবে?

বিস্ময় কাটে না। বিহ্বল দৃষ্টিতে অতসী চেয়ে থাকে। কিন্তু মুখে কথা সরে না। হৃৎপিণ্ডটা অস্বাভাবিক দ্রুত হয়ে উঠেছে। ঠিক ভয় নয়। কেমন একটা অজ্ঞাত অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে আসে ওর নারীত্বের সুরেলা পর্দাগুলো।···মেয়েমানুষ! এতক্ষণ এই একলা ঘরে ওর দেহটাকে নিয়ে যে অমন করে চটকাচ্ছিল, সে পুরুষ নয়, মেয়েমানুষ!···ছি! ছি!···অতসী ভাবতে পারে না।

পদ্ম মাঝে মাঝে পুরুষের মত তাকিয়ে থাকতো ওর দিকে। গন্নাকাটা ঠোঁটের ফাঁকে দাঁতগুলো যেন ইস-পিস করতো কামড়াবার জন্যে। খেপা শেয়ালের মত তার চোখের চাউনি দেখে অতসীর গা-টা কেমন শিরশির করে উঠতো।

সঙ্গে যারা ছিল তাদের বুঝি খুঁজে পাওনি?

কেউ ছিল না সঙ্গে: কম্পিতকণ্ঠে অতসী উত্তর দেয়।

একলা গিয়েছিলে ওই ভিড়ের মাঝখানে?

হাঁ: অতসী চোখদুটো বন্ধ করে। কি বলবে, ভেবে পায় না। একটু থেমে, ইতস্তত করে বলে: আমাকে যদি একখানা ছেঁড়া কাপড় দিতেন, বাসায় ফিরে যেতাম। আমি পারবো এখন হেঁটে যেতে।

চাদরখানা পিঠের দিকে টেনে নিয়ে অতসী বিব্রত-ভাবে উঠে বসবার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। পরণে কাপড় নাই। লজ্জায় জড়সড় হয়ে অতসী মুখখানা ঢাকে।

টেবিলের ওপর থেকে প্যাকেটটা নিয়ে নতুন এক-খানা শাড়ি, একটা পেটিকোট আর ব্লাউস অতসীর হাতের কাছে দিয়ে মিসেস চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন। ওর মুখের ওপর থেকে চাদরটা সরিয়ে দিয়ে বললেন: পরো। এত লজ্জা কিসের? ঘরে তো পুরুষ মানুষ নেই কেউ।

লজ্জা কিসের?···পুরুষ মানুষ নাই বলে ওর লজ্জা থাকবেনা! অতসীর মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে। ওর চেনা পৃথিবীটা যেন তালগোল পাকিয়ে চোখের দূরে সরে যায়। ভাবতে পারে না কেমন করে কোথা থেকে কোথায় ছিটকে এসেছে সে!···কে এই ভদ্রমহিলা?

এত কেন?···জামা!···না, না। জামা আমার লাগবে না।

চোখদুটো রগড়ে নিয়ে ধীরে ধীরে অতসী উঠে বসে। শরীরটা মাতালের মত টলটল করে।

মিসেস চৌধুরী তার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন দরজাটা টেনে দিয়ে।

অতসী চায় নি কিছু খেতে। কিন্তু মিসেস চৌধুরী তাকে জোর করে খাওয়ালেন দুখানা টোস্ট, আর এক-বাটী গরম দুধ।

নিতান্ত নিষ্ক্রিয় কাঠ-সোলার পাখীর মত অতসী আত্ম-সমর্পণ করে। কিন্তু ওর সারা অন্তর ভেঙে পড়তে চায় আর্তনাদে: না—না। এসব কেন? এসব তো ওদের জন্যে নয়। ও যে পথভিকিরীর মেয়ে। দুবেলা পেটের দুমুঠো ভাত আর পরণের একখানা ছেঁড়া কাপড়ও জোটে না ওর।

কথাগুলো মুখে আসে, কিন্তু বলতে পারে না অতসী। ঠোঁটের কাছে এসে আটকে যায়। চোখদুটো জলে ঝাপসা হয়ে আসে।

মিসেস চৌধুরী এতক্ষণ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন অতসীর মুখপানে: এত মিষ্টি চেহারা! তবুও যেন কি নেই ওর। হয় কোনদিন পায় নি কিছু, না-হয় পেয়ে হারিয়েছে সব।

হঠাৎ অতসীর চোখে জল দেখে কেমন হকচকিয়ে গেলেন মিসেস চৌধুরী: কষ্ট হচ্ছে তোমার?

না।

তবে?

অতসী উত্তর দেয় না। উত্তর ওর যোগায় না আর। দৃষ্টিটা মাটির দিকে নামিয়ে চোখের জল সামলে নেয়। ইচ্ছা করে, সব কথা খুলে বলে ওর আশ্রয়দাত্রীকে। কিন্তু পারে না। ভয়ে বুকের ভিতরটা জড়সড় হয়ে যায়। ···যখনই শুনবেন ও বস্তিতে থাকে, ঘেন্নায় নাকটা কুঁচকে যাবে। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উঠে যাবেন ঘর থেকে।

জোর ক'রে একটু হাসি টেনে এনে মিসেস চৌধুরী বলেন: মুখে না বললে কি হয়! কষ্ট যে তোমার হচ্ছে তা বেশ বুঝি।···সারা রাত ধ'রে বাড়ীর লোকেরা খুঁজে বেড়িয়েছে; এখনো হয়তো তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে সহরময়। তাঁরা তো জানেন না তুমি কোথায় এসে পড়েছ।···ড্রাইভারকে বলছি, গাড়ী নিয়ে তোমায় পৌঁচে দিয়ে আসুক।

এবার আর অতসী পারে না নিজেকে ধরে রাখতে। আর্তনাদ বেরিয়ে আসে ওর অবসন্ন কণ্ঠস্বরের পর্দাগুলো ভেঙে: না—না। ড্রাইভার লাগবে না। কোনকিছু লাগবে না আমার। আমি পায়ে হেঁটেই যাবো।··· কোথায় পৌঁছে দিয়ে আসবে আমাকে! খোলার বস্তিতে থাকি আমরা। আমরা নই, শুধু আমি—আমি একলা। ছিল—সবই ছিল। কিন্তু আজ আর নাই কিছু। জন্ম আমার ভিকিরীর ঘরে হয়নি। অন্ধ বাপের হাত ধরে আমিই প্রথম হলাম পথভিকিরী। বাবা রেহাই পেলেন, কিন্তু আমার মরণ হলো না।···কেন বাঁচালেন আপনারা?

মনে হলো অতসী বুঝি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে। কৌচের হাতলটা ধ'রে প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে। আকস্মিক উন্মত্ত রক্তপ্রবাহে শরীরটা তালপাতার মত কাঁপে।

হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে কল্পনা চৌধুরীর উন্মুখ অনুভূতি-গুলো ক্ষণেকের জন্যে পিছিয়ে দাঁড়ায়। ভিকিরী! ভিকিরীর মেয়ে! খাপরা-খোলার নোংরা বস্তির কোন অন্ধকার ঘরে থাকে। হয়তো কদর্য ঘৃণ্য জীবন যাপন করে।···অল্প বয়েস। অমন মিষ্টি চেহারা! নাক-মুখ-চোখ—

ভাবতে শরীরটা কেমন শিউরে ওঠে। তবুও যেন মন থেকে সরাতে পারেন না অতসীকে।···হোক গরীব। গরীব বই তো নয়। জন্ম ওর নিশ্চয়ই হয়েছিল ভদ্র-লোকের ঘরে। মুখে চোখে আজও সেই লাবণ্য মাখানো আছে। অভাবে অযত্নে পেশিগুলো শীর্ণ হলেও, ওর যৌবন যায়নি এখনও। দুদিন স্বাচ্ছন্দ্যের স্বাদ পেলে আবার ফুটে উঠবে রূপ।···রোগ! রোগ ওর নেই কিছু। ওর দেহের প্রতিটি রহস্য তন্ন তন্ন করে উদ্ভিন্ন করেছেন মিসেস চৌধুরী। উনি পারেননি লোভ সামলাতে।··· অল্প-বয়সী মেয়েদের ওপর ওঁর লোভ পুরুষের চেয়ে কম নয়।

একটু ইতস্তত করে মিসেস চৌধুরী বললেন: থাকবে তুমি এখানে?···কোনো অসুবিধে হবে না।

না।··না—না। মাপ করুন: মাথাটা ঝাঁকিয়ে অতসী সিধে হয়ে উঠে বসে। হাত দুটো জোড় ক'রে বলে: দয়া করে আমার জন্যে আপনারা যা করেছেন, তাই অনেক।···আমি গরীব। পথের কাঙাল, আপনার ঋণ শোধ করতে পারবো না কোনদিন।

মিসেস চৌধুরী নীরব হয়ে গেলেন। কেমন একটা অস্বস্তিতে মনটা ভরে উঠলো: গরীব—পথভিকিরী। লোকের দরজায় দরজায় হাত পেতে বেড়ায়। কিন্তু এখানে ও পায়েনা থাকতে!

হাত দুটো কপালে ছুঁইয়ে অতসী ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। পা ফেলতে শরীরটা টলটল করে। মেরুদণ্ডটা নুয়ে পড়ে দেহের ভারে তবুও দাঁড়ায় না। মনের বেগে শরীরটাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে রাস্তায় নামে।

মিসেস চৌধুরীর অমন তীব্র সচেতন মনও মুহূর্তের জন্যে কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে বসে রইলেন সোফার হাতলে পিঠ দিয়ে। পরাজয়ের গ্লানিতে মনটা রী-রী করে ওঠে।···এতটুকু পরাজয় সইবার মত প্রস্তুতিও ওঁর জীবনে ছিল না কোনদিন।

অন্যমনস্কতা কাটলো বিভোরের সাড়া পেয়ে।

সার্ভিস ক্যাম্পের ভলান্টিয়ারদের নিয়ে হঠাৎ বিভোর সেন এসে উপস্থিত হলো প্রাতরাশের উদ্দেশ্যে।

লীলা মস্কো থেকে চিঠি দিয়েছে শেফালির কাছে। ওরা ভালোই আছে।···শুনেছো?

না: কল্পনা উঠে দাঁড়ালেন নিতান্ত যন্ত্রপুত্তলির মত।

ক্রমশঃ

গান্ধীজির আদর্শে দেশ গঠন—

কলিকাতা চৌরঙ্গী রোড ও পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে একটি ১০ ফিট উচ্চ ব্রোঞ্জপাথরের বেদীর উপর মহাত্মা গান্ধীর একটি ১১ ফিট উচ্চ মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে—তাহা খ্যাতনামা ভাস্কর ও শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী নির্মাণ করিয়াছেন। ৩০শে নভেম্বর অপরাহ্নে ৫ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে শ্রীজহরলাল নেহরু সেই মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন ও বলেন—গান্ধীজির জীবনের আদর্শ ও বাণী অনুসরণের দ্বারা ভীতি ও সংশয়মুক্ত হইয়া শৃঙ্খলাবোধ ও ঐক্য সাধনের মাধ্যমে দেশকে সমাজবাদের পথে পরিচালনায় উদ্যোগী হওয়া আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্তব্য। পশ্চিমবঙ্গ-মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ঐ সভায় ঘোষণা করেন যে শীঘ্রই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর একটি মূর্তি কলিকাতায় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। মূর্তির আবরণ উন্মোচনের পর শ্রীনেহরু ১০ মিনিট কাল তথায় থাকিয়া মূর্তিটি দর্শন করেন। মূর্তিটিতে লেখা আছে—"মৃত্যুর মর্মে জীবন আছে, অসত্যের অন্তরে সত্য আছে, তমসার গর্ভে আলোক আছে, তাই বুঝিয়াছি—ঈশ্বরই জীবন, ঈশ্বরই সত্য, ঈশ্বরই প্রেম।" কলিকাতায় ঐ মূর্তি বাঙ্গালী তথা কলিকাতাবাসী সকলকে সর্বদা গান্ধীজির জীবন ও আদর্শের কথা মনে করাইয়া দিবে।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা—

গত ১লা ডিসেম্বর আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মশতবার্ষিক উৎসবের দ্বিতীয় দিনে প্রধান-বক্তারূপে সর্বজনশ্রদ্ধেয় বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাব্রতী শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার বক্তৃতায় সকল বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞানের ছাত্রকে বাংলা ভাষায় তাঁহাদের গবেষণার ফল প্রকাশ করিতে আবেদন জানাইয়াছেন। তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত হইতে জগদীশচন্দ্র বসুর বাংলা ভাষায় লেখার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের কথা, আজও বহু বৈজ্ঞানিক তাঁহার গবেষণার ফল মাতৃভাষায় প্রকাশ না করিয়া ইংরাজি ভাষায় প্রকাশ করিতে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমরা দীর্ঘ দিনের সাংবাদিক জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখিতে পাই, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, গণিত, প্রাণী বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে অতি অল্পসংখ্যক প্রবন্ধই সাময়িক পত্রে প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়। দর্শন, অর্থনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে বাংলায় কিছু কিছু পুস্তক রচিত হয় বটে, কিন্তু বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে আদৌ আগ্রহশীল নহেন। আচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথ বিষয়টি উল্লেখ করিয়া বাংলা দেশের ও মাতৃভাষার প্রতি যে শ্রদ্ধাপ্রীতি প্রকাশ করিলেন, সে জন্য তিনি দেশবাসী সকলের কৃতজ্ঞতার পাত্র। এই সত্য কথা প্রকাশ করায় আমরাও তাঁহাকে অন্তরের অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

কলিকাতায় শ্রীনেহরু—

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু গত ৩০শে নভেম্বর এক দিনের জন্য আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম শতবার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্য কলিকাতায় আসিয়া ৫টি অনুষ্ঠানে ২ ঘণ্টা ২০ মিনিট বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন। গান্ধী মূর্তির উন্মোচনে ১ ঘণ্টা, জগদীশ বসু উৎসবে ৩৫ মিনিট, আন্তর্জাতিক ছাত্রসমিতির সভায় ২০ মিনিট, পশ্চিমবঙ্গ সমাজ-সেবা সমিতির অনুষ্ঠানে ১৫ মিনিট এবং সমাজ কল্যাণ ও ব্যবসা পরিচালন পরিষদে ১০ মিনিট বক্তৃতা করিয়াছিলেন। খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবনে তিনি ১৫ মিনিট ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তাহা ছাড়াও বহু লোকের সহিত তিনি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ে কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীনেহরু এই বয়সে যেরূপ কাজ করেন, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। রাজভবনে সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর নূতন সভাপতি শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী ললিতা বসুর সহিতও তাঁহার আলাপ আলোচনা হইয়াছে। নেতাজীর কন্যা অনিতাকে ১৯৬০ সালে ভারতে আনয়ন সম্পর্কে শ্রীমতী ললিতা শ্রীনেহরুর পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। গত ১১ বৎসর

কাল শ্রীনেহরু প্রায় প্রত্যহই এইরূপ কর্মবহুল জীবন যাপন করিয়া থাকেন।

বিজ্ঞান প্রদর্শনী—

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা বসুবিজ্ঞান মন্দিরে গত ২৯শে নভেম্বর সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীহুমাউন কবীর এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। গত প্রায় ১০০ বৎসরের এ দেশে বিজ্ঞান-চর্চার উন্নতির ইতিহাস তথায় দেখানো হইয়াছে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ও গবেষণার সামগ্রীগুলিও প্রদর্শিত হইয়াছিল। ১০।১২ দিন প্রদর্শনী খোলা ছিল এবং হাজার হাজার ছাত্র তাহা দেখিয়া শিক্ষা ও আনন্দলাভ করিয়াছে।

পাকিস্তান সমস্যা—

গত ৫ই ডিসেম্বর দিল্লীতে লোকসভার অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যেক শান্তিকামী ব্যক্তিই চঞ্চল হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পাকিস্তানের সহিত ভারত যুদ্ধ করিতে চাহে না বটে, কিন্তু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের ব্যবহারের ফলে এখন যুদ্ধের কথা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না—সে জন্য ভারতকে যুদ্ধের প্রস্তুতি করিতে হইতেছে। ছিট-মহল আদান-প্রদান প্রভৃতি নানা বিষয়ে শ্রীনেহরু এত অধিক উদারতা প্রদর্শন করেন যে, সে জন্য এক-দল দেশবাসী তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হন। এ কথা সত্য যে, পাকিস্তান হানাদারেরা এ পর্য্যন্ত এত অধিকবার ভারত আক্রমণ করিয়াছে যে, ইচ্ছা করিলে বহু পূর্বেই ভারত সেই কারণে পাকিস্তান আক্রমণ করিতে পারিত। সে আক্রমণের ফল কি হইত, সে কথা আমরা আলোচনা করিব না—তবে আক্রমণ যে অন্যায় হইত না, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। পাকিস্তানে দারুণ অভাব, সে তুলনায় ভারতে প্রাচুর্য্য আছে। সেজন্য সীমান্তবাসী পাকিস্তানীরা প্রায়ই ভারত-সীমান্তে প্রবেশ করিয়া গরু, ছাগল, মাঠের ধান, গাছের ফল, এমন কি ধনরত্ন প্রভৃতিও লুঠ করিয়া লইয়া যায়। পাকিস্তান সরকার এ সকল কার্য্যের প্রতীকারে আদৌ অবহিত হয় না। স্বাধীনতা লাভের পর ১১ বৎসর অতীত হইলেও পাকিস্তানে আজ পর্য্যন্ত কোন স্থায়ী শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় নাই। ফলে এইরূপ অনাচার বন্ধ করার শক্তিও তাহাদের নাই। এতদিন পর্য্যন্ত শ্রীনেহরু একথা বিচার করিয়া পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কিছু করেন নাই। কিন্তু সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কতকগুলি ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয় যে পাকিস্তানের বর্তমান শাসকগণ হানা-দারদের এ সকল কার্য্যে বাধা না দিয়া বরং উৎসাহ দান করিতেছেন—সেজন্য সীমান্তের অনাচার দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হইবার পর সেখানে যেভাবে হিন্দুদের নির্য্যাতন করা হইতেছে, তাহা মনে করিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়। গত ৪ঠা ডিসেম্বর খবর আসিয়াছে যে বরিশালে দুইশতাধিক নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তন্মধ্যে খ্যাত-নামা এডভোকেট ৭০ বৎসর বয়স্ক শ্রীঅবনীনাথ ঘোষ, রামচন্দ্রপুরনিবাসী জমীদার শ্রীশচীন্দ্রনাথ গুহ, কংগ্রেস নেতা শ্রীপ্রাণকুমার সেন প্রভৃতি আছেন। ২০০ জন সকলে হিন্দু নহেন—তন্মধ্যে কিছু জাতীয়তাবাদী মুসলমান আছেন। তথায় আদেশ হইয়াছে যে, যে কেহ বর্তমান শাসকদের কার্য্যের নিন্দা করিবে, তাহাকেই নিরাপত্তা আইনে ধরিয়া আটক রাখা হইবে। এই সকল ঘটনা ছাড়াও পূর্বপাকিস্তান সীমান্তে বহু স্থানে পাকিস্তানী সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে ও বহুস্থানে ভারত-এলাকার বহু গ্রাম পাকি-স্তানী সৈন্যরা বলপূর্বক দখল করিয়া আছে। সৈন্যদলের দ্বারা ফসল বা বনের গাছ চুরি নিত্য ঘটনা। এই সকল সংবাদ পাইয়া শ্রীনেহরু চিন্তিত হইয়াছেন; ওদিকে আমেরিকা পাকিস্তানকে গত কয় বৎসর ধরিয়া প্রচুর যুদ্ধ সরঞ্জাম সর-বরাহ করিয়াছে। এখন ভারত যদি পাকিস্তান আক্রমণ করে ও আমেরিকা পাকিস্তানের সাহায্যে অগ্রসর হয়, তবে তাহা যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইঙ্গ-মার্কিণ গোষ্ঠীর সহিত এখনও সোভিয়েট-চীন গোষ্ঠীর কোন আপোষ হয় নাই—হবে বলিয়া আশাও দেখা যায় না। এ সময়ে শ্রীনেহরুর কাজের জন্য তাঁহাকে গালি না দিয়া প্রত্যেক দেশবাসীকে এ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের উপায়ের কথা চিন্তা করিতে হইবে। আমরা প্রত্যেক দেশবাসীকে যেমন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলিব, তেমনই যুদ্ধের ভয়াবহতার কথা

চিন্তা করিয়া শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য চেষ্টিত হইতে অনুরোধ করিব।

দণ্ডকারণ্য ব্যবস্থা—

পশ্চিমবঙ্গে এত অধিক সংখ্যায় পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তু সমাগম হইয়াছে যে পশ্চিমবঙ্গে তাহাদের বসবাসের ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আর সম্ভবপর নহে। যে কেহ কলিকাতা ও সহরতলীতে ভ্রমণ করিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। শুধু সহরতলী নহে, নদীয়া, ২৪ পরগণা, হুগলী, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় ও কতকগুলি স্থানে উদ্বাস্তুর ভিড় এত অধিক যে সে সকল লোককে অন্য স্থানে প্রেরণ করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। সে জন্য কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার উদ্যোগে ও চেষ্টায় মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও অন্ধ্র তিনটি রাজ্যের সংযোগস্থলে তিনটি রাজ্য হইতে কিছু কিছু অংশ লইয়া একটি 'দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা' প্রস্তুত করা হইয়াছে। ঐ স্থানে চাষের জমী বেশ ভাল ও পরিমাণে বেশী,ঐ অঞ্চলে লোকবসতি খুব কম; স্থানটি নদীবহুল, বর্ষায় ভাল বৃষ্টি হয়, বহু স্থান জঙ্গলে পূর্ণ এবং তথায় বহু প্রকারের খনিজ পদার্থ আছে। তথায় আপাতত ২০ লক্ষ বাঙ্গালী উদ্বাস্তুকে লইয়া গিয়া পুনর্বাসন প্রদান করা হইবে। ধনী, শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকগণ তথায় যাইলে নূতন নূতন ব্যবসার সুযোগ ও সন্ধান পাইবেন। কৃষক, মৎস্যজীবী, কর্মকার, সূত্রধর, কুম্ভকার, ধোপা, নাপিত, ছোট ছোট ব্যবসাদার প্রভৃতির কর্ম-সংস্থানের সুযোগ তথায় খুবই বেশী। সরকার আপাততঃ ক্যাম্পে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদিগকে সরকারী ব্যয়ে তথায় লইয়া যাইবেন এবং সরকারী ব্যয় ও ব্যবস্থায় তাহাদের পুনর্বাসনের সুযোগ করিয়া দিবেন। যদি সৌভাগ্যক্রমে তথায় বহু বাঙ্গালী গমন করে, তবে ক্রমে ঐ অঞ্চল নব বাংলায় পরিণত হইবে। বাঙ্গালী যদি তথায় না যায়, তাহা হইলে পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী প্রভৃতি যাইয়া ঐ স্থান ক্রমে দখল করিয়া লইবে। পাঞ্জাব ও মাদ্রাজে লোক সংখ্যা অধিক বলিয়া সে সকল রাজ্যের পরিচালকগণও অন্য রাজ্যে অধিবাসী প্রেরণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। উদ্বাস্তু পাঞ্জাবীরা ত তথায় যাইবার জন্য উৎসুক। বাংলা দেশে শুধু উদ্বাস্তুদের বাসস্থান ও কর্ম সংস্থান সমস্যা হয় নাই—পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী অধিবাসীদেরও সে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। এ অবস্থায় প্রত্যেকের দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া কর্তব্য স্থির করা প্রয়োজন হইয়াছে। বাঙ্গালী চিরকাল বিদেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশের কথা বাদ দিলেও দেখা যায়, সিংহল, ব্রহ্ম, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী পরিবার আজও সুখে বাস করিতেছে। কাজেই দণ্ডকারণ্যে যাইতে বাঙ্গালীর ভীত হওয়ার কারণ নাই। সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন যে, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা কমাইয়া ফেলা ছাড়া এখানে সুখে ও শান্তিতে বাস করার অন্য উপায় নাই। এই ভাবে থাকিলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে ও ক্রমে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। কাজেই আমরা মনে করি, শ্রীখান্না দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা করিয়া বাঙ্গালী জাতির একটি বিশেষ উপকার করিয়াছেন ও প্রত্যেক বাঙ্গালীর এই সুযোগ গ্রহণ করা বা অপরকে গ্রহণ করিতে উৎসাহিত করা একান্ত কর্তব্য।

সর্বোদয় আলোচনা—

গত ৯ই ডিসেম্বর উড়িষ্যার প্রাক্তন প্রধান-মন্ত্রী ও বর্তমান ভূদান নেতা শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী কলিকাতায় আসিয়া ভূদান যজ্ঞ কার্য্যালয়ে কলিকাতার সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হইয়া দুই ঘণ্টাকাল সর্বোদয় আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। বৈঠকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাশ, নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, সুধীরচন্দ্র লাহা, ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ চৌধুরী, সমরেন্দ্র বসুঠাকুর প্রভৃতি বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন ও সর্বোদয় সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করেন। নবকৃষ্ণবাবু তাঁহার স্বভাবসুলভ বিনয় সহকারে এই আন্দোলনে বাংলার সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদিগের সহযোগিতা ও সাহায্য কামনা করিয়া সর্বোদয়ের আদর্শ ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি জানান—তিনি আচার্য্য শ্রীবিনোবা ভাবেজিকে বলিয়াছেন—বিনোবাজী যেন কিছুকাল কলিকাতায় বাস করিয়া কলিকাতাবাসী চিন্তাশীল-ব্যক্তি-

দিগের নিকট সর্বোদয়ের কথা স্থাপন করেন ও তাঁহাদের বিচারের দ্বারা ঐ আন্দোলনের সার্থকতা প্রচারের চেষ্টা করেন। ইহা বাংলা দেশ ও বাঙ্গালী জাতির পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে ভাবেজীর ভ্রমণের ফলও তিনি সভায় ব্যক্ত করেন। নবকৃষ্ণবাবুর মত সুধী, প্রাজ্ঞ ও ধীরবুদ্ধি সর্বোদয় নেতার এই প্রচার কার্য্য অবশ্যই সুফল দান করিবে।

সেবা কার্য্যে আগ্রহের অভাব—

শ্রীজহরলাল নেহরু ৩০শে নভেম্বর দমদম বিমান ক্ষেত্র হইতে যাইয়া সকাল ঠিক সাড়ে ১০টার সময় কলিকাতা ১৩৬।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে পশ্চিমবঙ্গ সমাজসেবা সমিতির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একস্-রে ক্লিনিক উদ্বোধন করিয়াছিলেন—তিনি তথায় বলেন—ভারতে সমাজসেবা মূলক প্রতিষ্ঠানাদি গড়িয়া তুলিতে জনসাধারণ আজকাল আর বেশী উদ্যোগী হইতেছে না—সে জন্য আমি উদ্বিগ্ন হইয়াছি। এই ধরণের প্রতিষ্ঠানাদি জনসাধারণের উদ্যোগে অধিকতর সংখ্যায় গঠিত হইতে দেখিলে আমি সুখী হইব। মিনার সিনেমা গৃহে ঐ অনুষ্ঠান হয়। সভায় ২০১৪৫৫ টাকার একখানি চেক ঐ কাজের জন্য শ্রীনেহরুকে দেওয়া হইলে তিনি তাহা সমিতির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেনের হাতে দেন। সভায় সার বিজয়প্রসাদ সিংহরায়,ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও শ্রীঅশোককুমার সেনও বক্তৃতা করেন। ঐ ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার ফলে বহুলোকের যক্ষ্মারোগ প্রথমেই ধরা পড়িবে ও তাহারা চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য লাভের সুযোগ পাইবেন। পশ্চিমবঙ্গ সমাজ-সেবা সমিতি পশ্চিমবঙ্গে বহু জনকল্যাণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

নেতাজী দুহিতার ভারতাগমন—

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী ললিতা বসু ভিয়েনা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া এক সাংবাদিক বৈঠকে জানাইয়াছেন—নেতাজীর কন্যা শ্রীমতী অনিতা ১৯৬০ সালে পরীক্ষা দিবার পর স্থায়ীভাবে এ-দেশে বাস করিবার জন্য ভারতে চলিয়া আসিবেন। গত ২৬শে নভেম্বর অনিতার জন্মদিন গিয়াছে—ঐ দিন অনিতা ১৭ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। অনিতা নিজেকে সম্পূর্ণ ভারতীয় বলিয়া মনে করে এবং ভারতীয় পোষাক ও ভারতীয় আচার ব্যবহার তাহাকে আকৃষ্ট করে। সে স্কুলে পরীক্ষায় প্রত্যেকটি বিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করে। শ্রীজহরলাল নেহরুও অনিতাকে ভারতে আনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমতী ললিতা ৩ মাস কাল ভিয়েনায় অনিতা ও তাহার মাতার সহিত বাস করিয়া আসিয়াছেন। সেখানকার স্কুল ফাইনাল এ দেশের বি-এ পরীক্ষার সমান। অনিতা এদেশে আসিয়া আইন পড়িবে ও সমাজসেবার কাজ করিবে। ললিতা সমবায় বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন ও সমবায় আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিবেন। এদেশ হইতে ললিতা সমবায়-প্রথায় প্রস্তুত শাড়ী বিদেশের বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন।

উন্নতির সুযোগের দ্বার উন্মোচন—

৩০শে নভেম্বর সন্ধ্যায় শ্রীজহরলাল নেহরু কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারে সমাজ কল্যাণ ও ব্যবসা পরিচালন পরিষদের নূতন ব্লকের ভিত্তি স্থাপন করিবার সময় বলেন—"উন্নতি করিবার সুযোগের দ্বার অবাধে সকলের জন্য খুলিয়া দিতে হইবে—তবেই আমরা প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে আবিষ্কার করিতে পারিব।" পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার শ্রীবিধানচন্দ্র রায় এই পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি—এ সংবাদ জানিয়া শ্রীনেহরু বলেন—"আমি যখনই কলিকাতায় আসি, তখনই ডাক্তার রায়ের নব নব কীর্তির সহিত আমার পরিচয় ঘটে। প্রতিষ্ঠার পর গত ১৬ বৎসরে ঐ পরিষদ হইতে ১০১৬ জন লেবার অফিসার শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন—তন্মধ্যে ২৫৪ জন কেন্দ্রীয় সরকারে কাজ পাইয়াছেন—৫৮৪ জন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। ঐ উপলক্ষে পরিষদের একজন প্রাক্তন ছাত্র শ্রীঅতুল বসু অঙ্কিত ডাক্তার বিধানচন্দ্রের এক বিরাট তৈলচিত্র পরিষদকে উপহার দেন—তাহা শ্রীনেহরু পরিষদের পক্ষ হইতে সানন্দে গ্রহণ করেন। এই প্রতিষ্ঠান ব্যবসা ক্ষেত্রে বাঙ্গালীকে নবতর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দান করিয়া সমৃদ্ধ করিবে।

নূতন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি—

গত ২৫শে নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সাধারণ সভায় সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয় এবং প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী

শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নূতন সভাপতি নির্বাচিত হন। শ্রীঅতুল্য ঘোষ সহ-সভাপতি ও শ্রীবিজয় সিং নাহার কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। শ্রীবিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায় সাধারণ সম্পাদক এবং শ্রীনির্মলেন্দু দে, শ্রীমতী আভা মাইতি ও শ্রীবীজেশচন্দ্র সেন সম্পাদক মনোনীত হন। শ্রীলাবণ্যপ্রভা দত্ত ও ডাক্তার জীবনরতন ধর সহ-সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর নস্কর প্রভৃতিকে লইয়া মোট ৩০ জন কার্য্যনির্বাহক সমিতির সদস্য হইয়াছেন। যাদবেন্দ্রবাবু সর্বজন শ্রদ্ধেয়—তাঁহার সভাপতিত্বে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস দুর্নীতিমুক্ত হইলে সকলেই আনন্দিত হইবেন, দেশে কংগ্রেসের প্রতিপত্তিও বর্দ্ধিত হইবে।

কলিকাতায় চুরির হিড়িক—

সম্প্রতি কলিকাতা-সিমলা অঞ্চলে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর চুরি বাড়িয়াছে। চোর রাত্রিতে বড় রাস্তার ধারে দোকানসমূহের তালাগুলি খুলিয়া লইয়া যায়—স্থানীয় থানায় খবর জানাইলেও কোন প্রতিকার হয় না। আমরা এ বিষয়ে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করি। একই দোকানে বার বার চুরির ফলে লোক ব্যতিব্যস্ত হইতেছে। কলিকাতায় রাত্রিকালে পুলিস পাহারার কোন ব্যবস্থা আছে বলিয়া মনে হয় না।

বর্ত্তমান বৎসরে খাদ্য উৎপাদন—

নয়া দিল্লীর কেন্দ্রীয় খাদ্যদপ্তর প্রকাশ করিয়াছেন যে সমগ্র ভারতে এবার যেরূপ পরিমাণ ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে, পূর্বে তাহা হয় নাই। এ বৎসরের উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ ২ কোটি ৯০ লক্ষ টন। পূর্ব ২ বৎসরে যথাক্রমে ২ কোটি ৪৮ লক্ষ ও ২ কোটি ৮২ লক্ষ টন ধান্য উৎপন্ন হইয়াছিল। কোন কোন স্থানে ধান্য কম উৎপন্ন হইলেও ভারতে ধান চাষের জমীর পরিমাণ বাড়িয়াছে এবং উড়িষ্যা, অন্ধ্র প্রভৃতি রাজ্যে আশাতীত ফসল ফলিয়াছে। জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা প্রভৃতি ফসলও প্রচুর উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা আশার কথা হইলেও আমরা যেন আগামী বৎসরে খাদ্য উৎপাদন সম্বন্ধে অধিকতর আগ্রহান্বিত হই—কারণ খাদ্য দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য বলিয়া আমাদের খাদ্যের পরিমাণ আমরা কমাইতে বাধ্য হইয়াছি—তাহার ফলে শরীরের পুষ্টি কমিয়া যাইতেছে ও শরীরের কর্মক্ষমতা হ্রাস পাইতেছে। আমাদিগকে এখনও বিদেশ হইতে বহু পরিমাণ গম আমদানী করিতে হয়—কারণ চালের পরিবর্ত্তে, অভাবে পড়িয়া, আমরা অধিক গম ব্যবহার করি। কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় সরকার অধিক খাদ্য উৎপাদনে অবহিত হইয়াছেন; আশা করি দেশবাসী জনসাধারণও এ কার্য্যে আগ্রহান্বিত হইয়া নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনে বিমুখ থাকিবেন না।

শ্রীনবগোপাল দাস—

খ্যাতনামা লেখক ও অর্থনীতিবিদ পণ্ডিত শ্রীনবগোপাল দাস সম্প্রতি আই-সি-এস চাকরী—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুর্নীতি দমন বিভাগের সেক্রেটারী ও হাওড়া ইম্প্রুভমেণ্ট

শ্রীনবগোপাল দাস

ট্রাষ্টের চেয়ারম্যানের পদ ত্যাগ করিয়া বোম্বায়ে ভারতীয় কর্ম সংস্থান সমিতির ডিরেক্টার-জেনারেলের কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। তিনি দুর্নীতি দমনের জন্য কলিকাতা পুলিস হাসপাতাল, শিবপুর বাগান প্রভৃতির ষড়যন্ত্র ধরিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বহু উপন্যাস ও অর্থনীতি পুস্তক লিখিয়াও খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

ছোট্ট মুন্নি কেন কেঁদেছিল

মুন্নি ফোঁপাতে আরম্ভ করল তারপর আকাশফাটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। মুন্নির বন্ধু ছোট্ট নিনু ওকে শান্ত করার আপ্রান চেষ্টা করছিল, ওকে নিজের আধ আধ ভাষায় বোঝাচ্ছিল—"কাঁদিসনা মুন্নি—বাবা আপিস থেকে বাড়ী ফিরলেই আমি বলব—" কিন্তু মুন্নির ভ্রুক্ষেপ নেই, মুন্নির নতুন ডল পুতুলটির দুধে আলতায় মেশানো গালে ময়লার দাগ লেগেছে, পুতুলের নতুন ফ্রকের ওপর পড়েছে ময়লা আঙ্গুলের ছাপ—আমি আমার জানলায় দাঁড়িয়ে এই মজার দৃশ্যটি দেখছিলাম। আমি যখন দেখলাম যে মুন্নি কোন কথাই শুনছেনা তখন আমি নিজে এলাম। আমাকে দেখেই মুন্নির কান্নার জোর বেড়ে গেল—ঠিক যেমন 'এঙ্কোর, এঙ্কোর' শুনে ওস্তাদদের গিটকিরির বহর বেড়ে যায়। আমাদের প্রতিবেশির মেয়ে নিনু—আহা বেচারা—ভয়ে জবুথবু হয়ে একটা কোনায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঠিক কি করব বুঝতে পারছিলামনা। এমন সময় দৌড়ে এলো নিনুর মা সুশীলা। এসেই মুন্নিকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—"আমার লক্ষ্মী মেয়েকে কে মেরেছে?"

কান্না জড়ানো গলায় মুন্নি বলল—"মাসী, মাসী, নিনু আমার পুতুলের ফ্রক ময়লা করে দিয়েছে।"

"আচ্ছা, আমরা নিনুকে শাস্তি দেব আর তোমাকে একটা নতুন ফ্রক এনে দেব।"

"আমার জন্যে নয় মাসী, আমার পুতুলের জন্যে।"

সুশীলা মুন্নিকে, নিনুকে আর পুতুলটি নিয়ে তার বাড়ী চলে গেল আমিও বাড়ীর কাজকর্ম্ম সুরু করে দিলাম। বিকেল প্রায় ৪ টার সময় মুন্নি তার পুতুলটা নিয়ে নাচতে নাচতে ফিরে এলো। আমি উঠোন থেকে চিৎকার করে সুশীলাকে বললাম আমার সঙ্গে চা খেতে।
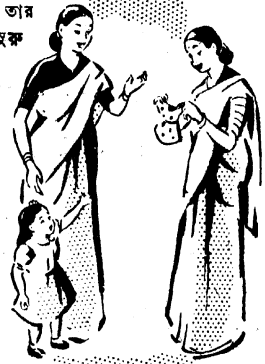
যখন সুশীলা এলো আমি ওকে বললাম "ডলের জন্যে তোমার নতুন ফ্রক কেনার কি দরকার ছিল?"

"না বোন, এটা নতুন নয়। সেই একই ফ্রক এটা। আমি শুধু কেচে ইস্ত্রী করে দিয়েছি।" "কেচে দিয়েছ? কিন্তু এটি এত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।"

সুশীলা একচুমুক চা খেয়ে বলল—"তার কারন আমি ওটা কেচেছি সানলাইট দিয়ে। আমার অন্যান্য জামাকাপড় কাচার ছিল তাই ভাবলাম মুন্নির ডলের ফ্রকটাও এই সঙ্গে কেচে দিই।"

আমি ব্যাপারটা আর একটু তলিয়ে দেখা মনস্থ করলাম। "তুমি তখন কতগুলি জামাকাপড় কেচেছিলে? আমাকে কি তুমি বোকা ঠাউরেছ? আমি একবারও তোমার বাড়ী থেকে জামাকাপড় আছড়ানোর কোন আওয়াজ পাইনি।"

সুশীলা বলল, "আচ্ছা, চা খেয়ে আমার সঙ্গে চল, আমি তোমায় এক মজা দেখাবো।"

সুশীলা বেশ ধীরেসুস্থে চা খেল, আর আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। আমার মনের অবস্থা কিন্তু অন্যরকম। আমি একচুমুকে চা শেষ করে ফেললাম।

আমি ওর বাড়ী গিয়ে দেখলাম একগাদা ইস্ত্রীকরা জামাকাপড় রাখা রয়েছে। আমার একবার গুনে দেখার ইচ্ছে হোল কিন্তু সেগুলি এত পরিষ্কার যে আমার ভয় হোল শুধু ছোঁয়াতেই সেগুলি ময়লা হয়ে যাবে। সুশীলা আমাকে বলল যে ও সব জামাকাপড়ই সানলাইটে কেচেছে। ওই গাদার মধ্যে ছিল—বিছানার চাদর, তোয়ালে, পর্দ্দা, পায়জামা, সার্ট, ধুতী, ফ্রক আরও নানাধরনের জামাকাপড়। আমি মনে মনে ভাবলাম বাবা: এতগুলো জামাকাপড় কাচতে কত সময় আর কতখানি সাবান না জানি লেগেছে। সুশীলা আমায় বুঝিয়ে দিল—"এতগুলি জামাকাপড় কাচতে খরচ অতি সামান্যই হয়েছে—পরিশ্রমও হয়েছে অত্যন্ত কম। একটি সানলাইট সাবানে ছোটবড় মিলিয়ে ৪০-৫০টী জামা কাপড় স্বচ্ছন্দে কাচা যায়।"

আমি তক্ষুনি সানলাইটে জামাকাপড় কেচে পরীক্ষা করে দেখা স্থির করলাম। সত্যিই, সুশীলা যা বলেছিল তার প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। একটু ঘষলেই সানলাইটে প্রচুর ফেণা হয়—আর সে ফেণা জামাকাপড়ের সুতোর ফাঁক থেকে ময়লা বের করে দেয়। জামাকাপড় বিনা আছাড়েই হয়ে ওঠে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল।

আর একটি কথা, সানলাইটের গন্ধও ভাল—সানলাইটে কাচা জামাকাপড়ের গন্ধটাও কেমন পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে। এর ফেণা হাতকে মসৃণ ও কোমল রাখে। এর থেকে বেশি আর কিছু কি চাওয়ার থাকতে পারে?

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত

শ্রী'শ'—

॥ মর্ম্মবাণী ॥
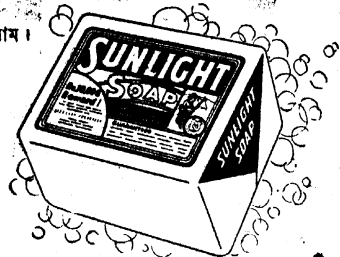
নববিবাহিতা অরুণার বিস্মিত চোখের সামনে ঘটে যায় ঘটনাগুলো। বিয়ের পরদিন অরুণা যখন শ্বশুর বাড়ীতে পৌছাল, স্বামী তার গাড়ী থেকে নেমে সোজা চলে গেল নিজের ঘরে, তার মার শত ডাককে উপেক্ষা করে—বন্ধ হল তার ঘরের দরজা সশব্দে। বাড়ীর লোক সব ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল, ডাক্তার এল। অরুণাকে তার ননদ বসিয়ে রেখে গেল একটা ঘরে। স্তম্ভিত বিস্ময়ে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখে যেতে লাগল অরুণা এই সব অদ্ভুত ব্যাপার। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল ননদ—বোঝাল অরুণাকে ব্যাপার কিছু গুরুতর নয়, পরে সব বুঝিয়ে বলবে, এখন বিশ্রাম করুক। কিন্তু অরুণার মন তাতে বোঝে না। রাত্রে যখন সবাই ঘুমে অচেতন অরুণা শয্যা ছেড়ে উঠে আস্তে আস্তে স্বামীর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। দরজা ভেজান ছিল—অরুণা ঢুকে পড়ে ঘরের মধ্যে। প্রথমেই ধোঁয়া আর একটা গন্ধে তার বুঝি মাথা ঘুরে যায়,—ধীরে ধীরে তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে অদ্ভুত মূর্তি, অদ্ভুত চিত্র, অদ্ভুত শবাধার, আর তার মাঝে তার স্বামী বরুণ অদ্ভুত বেশে বিড় বিড় করে বকে চলেছে। স্তম্ভিত অরুণা পায়ে পায়ে ঘরের মধ্যে এগিয়ে যায় স্বামীর অজান্তে। তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে অতীত মিশরের মূর্তি, চিত্র প্রভৃতির এক অদ্ভুত সমাবেশ। স্বামী তার তখন প্রার্থনায় রত মিশরের পুরাণ দেবতা অদ্ভুত দর্শন আমন দেবের সামনে। আস্তে আস্তে ভীতবিহ্বল অরুণা ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করে, কিন্তু পায়ের ধাক্কায় কি একটা উল্টে পড়ে শব্দ হয়ে ওঠে। বরুণ চকিতে উঠে দাঁড়ায়, দ্রুত পায়ে অরুণার কাছে এসে বলে,—তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম আইসিস, এতদিনে তুমি এসেছ।...তারপর বকে চলে বরুণ, চোখে তার উন্মাদের সুস্পষ্ট লক্ষণ! অরুণাকে বলে,—আইসিস তোমার প্রাণহীন দেহকে মমি করে রেখে দেব যাতে কেউ না তোমাকে চুরি করে নিয়ে যেতে পারে। বিস্মিত অরুণা এবার বিচলিত হয়ে ওঠে। চকিতে সে দরজার দিকে এগিয়ে যায়, কিন্তু বরুণও ছুটে আসে চিৎকার করে—যেওনা আইসিস বলে তাকে ডাকে। বাড়ীর লোক সব উঠে পড়ে, বরুণকে ধরে রাখে, আর ত্রস্ত অরুণা নিজের ঘরে গিয়ে পড়ে। ক্রমশঃ সব কিছুই বোঝা যায়। ইতিহাসের কৃতী ছাত্র বরুণ মিশরের পুরাণ ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে করতে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, ক্রমশ তার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে উন্মাদের সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। বিয়ে হলে সুন্দরী, শিক্ষিতা স্ত্রীর সান্নিধ্যে হয়ত এই বিকার কেটে যাবে মনে করেই তার বিবাহ দেওয়া হয়েছে; কিন্তু ফল তাতে ভাল কিছুই হল না, উল্টে নববিবাহিতা স্ত্রী অরুণাকে সে মনে করল অতীত মিশরের বিস্মৃত ইতিহাসের এক রাজকুমারী বলে।—এই সব তথ্য জেনে আশাহত অরুণা আর এই অসহনীয় অবস্থার মধ্যে থাকতে রাজী হল না,—সে বাপ মার কাছে ফিরে যেতে চাইল; কিন্তু পিতা, মামা, ননদ প্রভৃতির অনুরোধে থেকে গেল শ্বশুর গৃহে, আর নিজের ভাগ্যের প্রতি, স্বজনগণের প্রতি প্রতিশোধ নেবার এক অজানা আকাঙ্ক্ষাতেই বোধ হয় স্বামীর পাগলামীর মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে নিজেও পাগল হবার চেষ্টা করতে লাগল। শেষে স্বামীর পরিচর্য্যায় নব-নিযুক্ত এক নার্সের উপদেশে তার মোহ ভঙ্গ হল,—স্বামী গৃহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল মুক্তির সন্ধানে, আর ঐ নার্সের সহায়তায় নার্সিং শিখে রুগীদের পরিচর্য্যায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখল। পরে স্বামী বরুণের মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের খবর যখন তার কাছে পৌছাল তখন শত চেষ্টাতেও সে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না,—রাঁচীর হাসপাতালে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হল।

এই হল 'মর্ম্মবাণী' ছবিটির গল্পাংশ। শ্রীমনোজ

ভট্টাচার্য্য লিখিত চিত্রটির গল্পাংশ বেশ সবল ও গতিশীল, আর মনকে ধরে রাখবার মতন উত্তেজনা, উদ্বেগ প্রভৃতির প্রাবল্য থাকায় গল্পটিও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। সাধারণ সামাজিক চিত্রের চেয়ে গল্পটি ভিন্ন ধরণের হওয়ায় ঔৎসুক্যও জাগায় মনে। তাছাড়া আজকের সমাজের একটি সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এই চিত্রের মাধ্যমে। স্বামীর কোনও বিকারের জন্য স্বামীকে ত্যাগ করা উচিত কিনা সে প্রশ্ন এই চিত্রে পাওয়া যায়।

অভিনয় প্রশংসার যোগ্য হয়েছে। নার্সের ভূমিকায় মঞ্জু দের সাবলীল অভিনয় মনে রাখবার মতন। কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, রাজলক্ষ্মী, অনুপকুমার প্রভৃতির অভিনয়ও চরিত্রানুযায়ী হয়েছে। নায়ক বরুণের ভূমিকায় অসীমকুমারের অভিনয় আশানুরূপ না হলেও খুব খারাপ হয়নি। চিত্রগ্রহণ, শব্দগ্রহণ, বহির্দৃশ্য প্রভৃতির দিক দিয়ে চিত্রটি প্রশংসার দাবী করতে পারে, আর শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষকে সঙ্গীত পরিচালনার জন্য ও বিশেষ করে আবহ

নর্মদা চিত্র পরিবেশিত "জন্মান্তর" চিত্রের একটি নাটকীয় মুহূর্তে পাহাড়ী সান্যাল ও অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়।

অভিনয়ের দিক থেকে সব চরিত্রগুলিই যে সু-অভিনীত হয়েছে একথা বলা চলে। বিশেষ করে অরুণার ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় বেশ উচ্চস্তরের হয়েছে। বরুণের ভগ্নীর ভূমিকায় নবাগতা সুপ্রিয়া চৌধুরীর অভিনয় দেখে মনে হয় তাঁর ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। বরুণের পিতার ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস ও মাতার ভূমিকায় চন্দ্রাবতীর

সঙ্গীতে তবলার বোলে বরুণের ঘরের রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করার অপূর্ব্ব দক্ষতার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য শ্রীসুশীল মজুমদারের কৃতিত্বও কম নয়। তাঁর পরিচালনাগুণেই চিত্রটি এরূপ চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। তাঁকে এবং প্রযোজক শ্রীঅজিত নাগকে এরূপ চিত্র নির্ম্মাণের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

তবে "মর্ম্মবাণী" চিত্রটি যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে একথা বলা ঠিক হবে না। এর ত্রুটি বিচ্যুতিও আছে অনেক। প্রথম আরম্ভটাই মনকে চিত্রের ওপর কিছুটা বিরূপ করে তোলে। নায়িকা অরুণার বিয়ের রাতের ঘটনা দিয়েই ছবিটির আরম্ভ। কিন্তু কেমন যেন সাজান সাজান কথা-বার্ত্তা, চলাফেরা—যেন ষ্টেজ এ্যাক্‌টিং হচ্ছে। তার ওপর অরুণার বান্ধবীদের ন্যাকামিভরা কথাবার্ত্তা, হৈ-হুল্লোড় ও. অকারণ অতিরিক্ত হাসাহাসির দাপটে প্রথম দিকটায় মনে হয় আর একটি অতি সাধারণ ছ্যাবলামীভরা ছবির সূত্রপাত হচ্ছে। পরে অবশ্য সে ভাবটা কেটে যায় অরুণার শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার পর থেকে। বোধ হয় হাসিকান্নার কনট্রাষ্ট দেখাতে গিয়ে এইটি ঘটেছে; কিন্তু এখানে এই কনট্রাষ্ট ছবির প্রধান ভাবকে ব্যাহত করেছে। অরুণার বান্ধবীদের হাল্কা কথাবার্ত্তাগুলা বাদ দিলেই ভাল হত, আর ছবিটির আরম্ভও অন্য ভাবে করা চলত। যেমন—অরুণা বিয়ের পরদিন শ্বশুর বাড়ীতে আসছে স্বামীর সঙ্গে মোটরে করে। (সেই সঙ্গে কাষ্টিং ইত্যাদিও চলমান মোটরের সঙ্গে দেখান চলে)। গাড়ী এসে শক্তিগড়ে অরুণার শ্বশুর বাড়ীতে দাঁড়াল এবং ঘটনাগুলা ঘটে যেতে লাগল। তারপর স্তম্ভিত অরুণা যখন বসে বসে ভাবছে তখন ফ্ল্যাস্ ব্যাক্ করে গত রাত্রের বিয়ে বাড়ীর ঘটনাগুলা দেখান চলত। ছবির প্রথম আরম্ভটার ওপর এদেশী পরিচালকরা বিশেষ মনোযোগ দেন না—এটা ঠিক নয়। প্রথম আরম্ভটা ইম্‌প্রেসিভ্ হলে দর্শক-মনকে অনেকটা জয় করে ফেলে। আরম্ভের মৌলিকতা পরিচালকের প্রগতিশীল মনের পরিচয়ও বহন করে,—এ বিষয়ে পরিচালকদের সজাগ থাকা উচিত। ছবিটি এমনিতেই অতিরিক্ত সিরিয়াস্‌নেস্ ও সাস্‌পেন্স ভারাক্রান্ত হয়েযেন সারাক্ষণ দর্শকমনকে চেপে রাখে। তার ওপর মাঝে মাঝে অযথা সাস্‌পেন্সের সৃষ্টি করাও উচিত হয়নি। যেমন, অরুণা যখন বরুণের ব্রেণ্ অপারেশনের খবর পেয়ে ট্যাক্সি করে কলিকাতা থেকে শক্তিগড়ে যাচ্ছে তখন রাস্তায় গাড়ী বিকল হয়ে যাওয়া প্রভৃতি দেখিয়ে অহেতুক সাস্‌পেন্সের সৃষ্টি করা হয়েছে, অথচ অরুণার যাওয়া না যাওয়ার ওপর বিকৃত মস্তিষ্ক বরুণের জীবন নির্ভর করছিল না। বরুণের জীবন রক্ষা পাওয়া বা আরোগ্য হওয়া নির্ভর করছিল অস্ত্রোপচারের সাফল্য-অসাফল্যর ওপরই। দ্রুতগামী ট্যাক্সির আওয়াজও অতিরিক্ত হয়ে কর্ণপীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল। মোটরের ইঞ্জিনের আওয়াজ ওরকম অস্বাভাবিক করা উচিত হয় নি। এ সব ছাড়া ছবিটির মূল উদ্দেশ্যটিও খুব পরিষ্কার হয়ে ওঠে নি। একটি পারিবারিক সমস্যা—বিকৃত মস্তিষ্ক স্বামীকে ছেড়ে আসা উচিত কি স্বামীর কাছে থাকা উচিত—এই সমস্যার প্রতি একটা ইঙ্গিত আছে বটে কিন্তু সমাধানটি খুব স্পষ্ট নয়। অরুণার স্বামীর কাছে থাকা বা না থাকার ওপর নির্ভর করছিল না বরুণের আরোগ্য হওয়া—সেটা নির্ভর করছিল সুচিকিৎসার ওপর, আর এর অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল বরুণের মার অন্ধ মাতৃ-স্নেহ—যে স্নেহ সন্তানকে পাগল বলে, বিকৃত মস্তিষ্ক বলে বোঝবার সাধারণ জ্ঞানটুকুও হরণ করে রেখেছিল, আর তাই উন্মাদ আশ্রমের দক্ষ চিকিৎসার সুযোগ লাভ করা তার হয়ে উঠছিল না। শেষে যখন বাধ্য হয়ে বরুণকে সেখানে পাঠাতে হল ও সর্ব্বশেষে মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করা হল তখনই সে আরোগ্য লাভ করল। তার স্ত্রীর তার কাছে থাকা না থাকার ওপর তার আরোগ্য হওয়া নির্ভর করে নি। বরঞ্চ অরুণা থেকে তার স্বামীর পাগলামীকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছিল আর নিজেও পাগল হতে যাচ্ছিল। তার চলে আসাটাই উচিত হয়েছে, আর ফিরে যাওয়াটাও মধুর হয়েছে। এরকম ঘটনাবহুল চিত্রে ঘটনাই হয় প্রধান, তাই তার অন্তর্নিহিত পারিবারিক বা সামাজিক সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করে অহেতুক জটিলতার সৃষ্টি না করাই ভাল। যাই হোক—অভিনয়, পরিচালনা, আবহ সঙ্গীত, চিত্র গ্রহণ, ঘটনাবাহুল্য প্রভৃতি সব দিক দিয়েই এই চিত্রটি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছে,—আমরা চিত্রটির শিল্পী গোষ্ঠীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

*　　*　　*　　*

খবরাখবর ঃ

বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী রাজ্য সভায় জানিয়েছেন যে কাঁচা ফিল্ম আমদানী কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাতে চলচ্চিত্র শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে যে ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তা ঠিক নয়; কারণ যে পরিমাণ ফিল্ম আমদানী করা হচ্ছে তা সিনেমা শিল্পের চাহিদা মেটাবার পক্ষে

পর্য্যাপ্ত বলেই তিনি মনে করেন। তা ছাড়া চলতি লাইসেন্সিং সময়ে সরকার ১১৫ কোটি ফিট্ ফিল্ম আমদানীর ব্যবস্থা করেছেন। সিনেমা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির হিসাব মত প্রায় ৯০ থেকে ৯৫ কোটি ফিট্ ফিল্ম লাগে। বাণিজ্য ও শিল্প উপ-মন্ত্রী শ্রীসতীশচন্দ্র জানিয়েছেন যে মাদ্রাজকে এখন শতকরা ত্রিশভাগ ফিল্ম দেওয়া হচ্ছে এবং বোম্বাই ও কলিকাতা যথাক্রমে পঞ্চাশ ও এগার ভাগ করে পাচ্ছে। তিনি আরও জানিয়েছেন যে পূর্ব্ব জার্ম্মানীর একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ভারতে কাঁচা ফিল্ম তৈরীর একটি কারখানা স্থাপন সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলছে।

*　　*　　*

ভারত-জাপান মিলিত প্রচেষ্টায় একটি চলচ্চিত্র নির্ম্মাণ হবে বলে জানা গেছে। জাপানের মোশান্ পিক্‌চার এসোসিয়েসনের সভাপতি মিঃ সিরো কিদো মাদ্রাজের এ, ভি, এম্, ষ্টুডিওর স্বত্বাধিকারী শ্রী এ, ভি, মৈয়াপ্পানের সহযোগিতায় দক্ষিণ ভারতে একটি চিত্র নির্ম্মাণের প্রস্তাব করেছেন। দক্ষিণ ভারতের মাদুরাই, রামেশ্বরম, ব্যাঙ্গা-লোর, মাইশোর প্রভৃতি স্থানে এই ছবিটির চিত্রগ্রহণ করা হবে বলে জানা গেছে।

*　　*　　*　　*

রিচার্ড ম্যাসন-এর বিখ্যাত গল্প "The Wind Cannot Read" অবলম্বনে যে ব্রিটিশ চিত্রটি ভারতে তোলা হবে তাতে আগ্রার তাজমহল, দিল্লীর লাল কেল্লা, এক মহারাজার বিশাল প্রাসাদ, জয়পুরের বহু পুরাতন ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি দেখান হবে। Dirk Bogarde ও Yoko Tani এই চিত্রে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন।

*　　*　　*　　*

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বিচারক" গল্পটি প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় চিত্ররূপ লাভ করছে। উত্তমকুমার ও অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় প্রধান ভূমিকায় আছেন। এই চিত্রের একটি নতুনত্ব হচ্ছে জলের তলের চিত্রগ্রহণ, আর এতে দেখা যাবে বিগত দিনের বিখ্যাত সাঁতারু প্রফুল্লকুমার ঘোষকে। পরিচালক মুখোপাধ্যায় মাদ্রাজ গেছেন জলতলের চিত্রগ্রহণের জন্য। চিত্রটির সঙ্গীত পরিচালনা করছেন ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ।

পরিচালক সুশীল মজুমদার "আর্ট এণ্ড কালচার পিক্‌চার্স"-এর নতুন চিত্র "অগ্নিসম্ভবা"-র কাজে ব্যস্ত আছেন। ছবি বিশ্বাস, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এই চিত্রে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

হিতেন বোস প্রভাক্‌সন্সের প্রথম চিত্র "দেবর্ষি নারদের সংসার"-এর চিত্রগ্রহণ চলছে। চিত্রটির গল্পাংশ লিখেছেন "নবরত্ন" এবং পরিচালনা করছেন "পঞ্চভূত"। ছবি বিশ্বাস, জহর রায়, নৃপতি, নবদ্বীপ প্রভৃতিকে এতে দেখা যাবে।

শঙ্করের পুরস্কার প্রাপ্ত গল্প "কত অজানারে"-র চিত্ররূপ দিচ্ছেন 'মিত্রা প্রডাকসন্স'। পরিচালনা করবেন ঋত্বিক ঘটক এবং সঙ্গীত রচনার ভার নিয়েছেন সলিল চৌধুরী।

*　　*　　*　　*

হাওড়ার "বঙ্গবাসী" সিনেমার বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসবে বহু সিনেমা শিল্পী ও গুণীজনের সমাবেশ হয়েছিল। সিনেমার ম্যানেজিং-ডিরেক্টার শ্রীশিশিরকুমার মুখোপাধ্যায় ও তাঁর ভ্রাতারা অভ্যাগতজনকে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করেন।

*　　*　　*　　*

লিটল্ থিয়েটার দল তাঁদের তৃতীয় নাটক-উৎসব সুসম্পন্ন করেছেন। এঁদের অভিনীত নাটকের মধ্যে বাংলা ভাষায় অভিনীত সেক্সপীয়রের 'ম্যাক্‌বেথ' ও 'ওথেলো' এবং 'নীচের মহল' ও উৎপল দত্ত রচিত 'ছায়া-নট' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। আমরা "লিটল্ থিয়েটার গ্রুপ্"-কে তাঁদের অভিনয় প্রচেষ্টায় সাফল্যের জন্য ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ২২৭ (আর কানহাই ৬৬, স্মিথ ৬৩ ; সুভাষ গুপ্তে ৮৬ রাণে ৪ উইকেট)

ও **৩২৩** (সোবার্স নট আউট ১৪২, স্মিথ ৫৮, বুচার নট আউট ৬৪)

ভারতবর্ষ ঃ ১৫২ (উমরীগড় ৫৫, রামচাঁদ ৪৮ ; গিলক্রাইষ্ট ৩৯ রাণে ৪, হল ৩৫ রাণে ৩ উইকেট)

ও **২৮৯** (৫ উইকেটে। পঙ্কজ রায় ৯০, রামচাঁদ নট আউট ৬৭)

খেলা হয় ২৮, ২৯, ৩০শে নভেম্বর, ২, ৩রা ডিসেম্বর।

বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম টেষ্ট ক্রিকেট খেলা অমীমাংসিত থেকে যায়। দশ বছর আগে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বনাম ভারতবর্ষের দ্বিতীয় এবং পঞ্চম টেষ্ট খেলা বোম্বাইয়ের এই ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় এবং দুটি টেষ্ট খেলাই ড্র যায়। বেশ কিছুদিন বোম্বাই সম্বন্ধে একটা প্রবাদ চালু চলছিল, এখানে অনুষ্ঠিত টেষ্ট খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয় না।

বোম্বায়ে অনুষ্ঠিত টেষ্ট খেলার হিসাব নিলে দেখা যায়, ১৯৩৩ সালে জার্ডিনের অধিনায়কত্বে ইংলণ্ড দল ৯ উইকেটে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে ; ১৯৫৫ সালে ভারতবর্ষ ১০ উইকেটে পাকিস্থানকে পরাজিত করে এবং ১৯৫৫ সালে ভারতবর্ষ নিউজিল্যাণ্ডকে পরাজিত।

এ পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে ৬টি টেষ্ট খেলা হয়েছে ; ৩টি খেলা ড্র গেছে, ৩টি খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়েছে।

ভারতীয় দলের অধিনায়ক গোলাম আমেদ অসুস্থতার দরুণ প্রথম টেষ্ট খেলায় যোগ দিতে পারেন নি। পলি উমরীগড় ভারতীয়দল পরিচালনা করেন। টসে জিতে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল প্রথম ইনিংসের খেলার সূচনা করে। দলের মাত্র ২ রাণে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ১ম উইকেট পড়ে যায় ; হাণ্ট গোল্লা ক'রে আউট হ'ন। লাঞ্চের সময় সময় দেখা গেল ৩টে উইকেট পড়ে ৭১ রাণ উঠেছে। চা-পানের বিরতির সময় ৪টে উইকেট পড়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ১৫৪ রাণ দাঁড়ায়। ২২৭ রাণে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংসের সমাপ্তি ঘটে। কানহাই এবং কোলী স্মিথের যথাক্রমে ৬৬ ও ৬৩ রাণের দরুণই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল শোচনীয় অবস্থা থেকে এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে যায়।

২য় দিনে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস মাত্র ১৫২ রাণে শেষ হয়। ফলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৭৫ রাণে অগ্রগামী হয়। ভারতীয় দলের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী ছিলেন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের পেস বোলার গিলক্রাইষ্ট এবং হল। দলের কোন রাণ হবার আগেই নরী কন্-ট্রাক্টার আউট হন। ভারতবর্ষের অবস্থা আরও শোচনীয় হ'ত যদি না কোলীস্মিথ তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে রাম-চাঁদের ক্যাচটা হাতছাড়া না করতেন। রামচাঁদের রাণ তখন ছিল মাত্র ৩। ভারতীয় দলের মোট ১৫২ রাণের মধ্যে উমরীগড় এবং রামচাঁদের ৫ম উইকেটের জুটিতে ভারতবর্ষের ৮০ রাণ ওঠে। এঁরা দুজন দলের পতনের মুখে অতি ধৈর্য্যের সঙ্গে খেলেছিলেন।

৩য় দিনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ২য় ইনিংসের খেলায় ৪ উইকেট হারিয়ে ২৫৩ রাণ করে। সোবার্স ৯৫ রাণ এবং বুচার ৪১ রাণ ক'রে নট আউট থাকেন। এই দিনের খেলায় সুভাষ গুপ্তের বলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের কানহাই আউট হ'লে সুভাষ গুপ্তে টেষ্ট খেলায় ১০০ শত উইকেট লাভ করার গৌরব লাভ করেন। এই শত উইকেট পেতে তাঁকে ২২টি টেষ্ট ম্যাচ খেলতে হয়েছে এবং এই ২২টি টেষ্ট খেলায় তিনি মোট উইকেট পেয়েছেন ১০২টি।

সুভাষ গুপ্তে প্রথম টেষ্ট ম্যাচ খেলেন—ইংলণ্ডের বিপক্ষে (ক'লকাতায় ৩য় টেষ্ট ১৯৫১ সালের ৩১ ডিসেম্বর)।

৩য় দিনের খেলার শেষে দেখা গেল ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ

৩২৮ রাণে এগিয়ে আছে, হাতে জমা ৬টা উইকেট। খেলা শেষ হ'তে পুরো দু'দিন বাকী।

৪র্থ দিনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজদল ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড ক'রে দেয়—রাণ দাঁড়ায় ৪ উইকেটে ৩২৩।

ভারতবর্ষ ২ উইকেট হারিয়ে ২য় ইনিংসের খেলায় ১১৭ রাণ করে। রায় ৫৪ রাণ এবং মঞ্জুরেকার ১৭ রাণ ক'রে নট আউট থাকেন।

৫ম দিন খেলা শেষ হওয়ার নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ভারতীয় দলকে আউট করতে না পারায় প্রথম টেষ্ট খেলা অমীমাংসিত থেকে যায়। ভারতীয় দলের রাণ দাঁড়ায় ৫ উইকেটে ২৮৯। পঙ্কজ রায় দলের সর্ব্বোচ্চ ৯০ রাণ করেন। রামচাঁদ ৬৭ রাণ ক'রে নট আউট থাকেন।

২য় টেষ্ট, কানপুর ঃ ১২, ১৩, ১৪, ১৬ ও ১৭ই ডিসেম্বর।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ২২২ (আলেকজাণ্ডার ৭০ ; সুভাষ গুপ্তে ১০২ রানে ৯ উইকেট)।

ও **৪৪৩** (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। সোবার্স ১৯৮, সলোমন ৮৬, বুচার ৬৯)

ভারতবর্ষ ঃ ২২২ (উমরীগড় ৫৭, রায় ৪৬ ; হল ৫০ রানে ৬ উইকেট)

ও **২৪০** (পি রায় ৪৫, কনট্রাক্টর ৫০ ; হল ৭৬ রানে ৫ এবং টেলর ৬৮ রানে ৩ উইকেট)

কানপুরে ম্যাটিং উইকেটে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ২০৩ রানে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে।

১মদিনের খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংস ২২২ রানে শেষ হয়। কোন উইকেট না পড়ে ভারতবর্ষের ২৪ রান ওঠে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংসে সুভাষ গুপ্তে ১০২ রানে ৯টি উইকেট পান। তিনি ভারতীয় দলের মধ্যে প্রথম বোলার হিসাবে টেষ্ট ক্রিকেট খেলার এক ইনিংসে ৯টি উইকেট পেলেন। টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় এক ইনিংসে ৯টি উইকেট পাওয়া এক দুর্লভ সম্মান। এ পর্য্যন্ত মাত্র এই ৬ জন খেলোয়াড় টেষ্ট ক্রিকেটের এক ইনিংসে ৯টি উইকেট পেয়েছেন :

(১) হিউ টেফিল্ড (দক্ষিণ আফ্রিকা) ১৩১ রানে ৯টি উইকেট ; (২) জিম লেকার (ইংলণ্ড) ৫৩ রানে ১০টি উইকেট ; (৩) জি এ লোম্যান (ইংলণ্ড) ২৮ রানে ৯ উইকেট ; (৪) এস এফ বার্ণেস (ইংলণ্ড) ১০৩ রানে ৯টি উইকেট ; (৫) এ, এ, মেইলী (অষ্ট্রেলিয়া) ১২১ রানে ৯ উইকেট ; (৬) সুভাষ গুপ্তে (ভারতবর্ষ) ১০২ রানে ৯টি উইকেট।

২য় দিনে ভারতবর্ষের ৫টা উইকেট পড়ে গিয়ে রান দাঁড়ায় ২০৯।

৩য় দিনে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস ২২২ রানে শেষ হয়। ৩য় দিনে ৪৫ মিনিটের খেলায় ভারতবর্ষের বাকি ৫টা উইকেটে মাত্র ১৩ রান ওঠে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের হল ৫০ রানে ৬টা উইকেট পান। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ২য় ইনিংসের খেলায় ৫টা উইকেট পড়ে ২৬১ রান ওঠে। সোবার্স ১৩৬ রান করে নটআউট থাকেন।

৪র্থ দিনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ৭ উইকেটে ৪৪৩ রান উঠলে পর তারা ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করে।

ভারতবর্ষের কোন উইকেট না পড়ে ৭৬ রান ওঠে। ফলে খেলায় জয়লাভের জন্যে ভারতবর্ষের ৩৬৮ রান প্রয়োজন হয়, হাতে সময় ৩৩০ মিনিট।

৫ম দিনে অর্থাৎ খেলার শেষদিনে চা-পানের ঠিক ১২ মিনিট পর ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ২৪০ রানে শেষ হয়ে যায়। ফলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ২০৩ রানে জয়ী হয়।

সাঁতারু অনুরাধা গুহঠাকুরতা ঃ

কুমারী অনুরাধা গুহঠাকুরতা ন্যাশানাল সুইমিং এসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সন্তরণ

কুমারী অনুরাধা গুহঠাকুরতা

প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার ব্রেষ্ট স্ট্রোকে দূরত্বপথ ১ মিঃ ৩৬.৩ সেকেণ্ডে অতিক্রম ক'রে নতুন ভারতীয় এবং রাজ্য রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন।

বাঘের লুকোচুরি : ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় শুধু সুদক্ষ ও নির্ভীক শিকারীহিসাবে নহেন, সাহিত্যিকরূপেও শিকারক্ষেত্রকে অধিকার করিয়া লইয়াছেন। শিকারকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের মনে যে আশা-নিরাশা, যে উৎসাহ-অবসাদ, বিশেষতঃ কৌতূহল ও কৌতুকরসের যে একটা চলমান আব-হাওয়ার সৃষ্টি হয়, সেই মানবিক ভাবের আব-হাওয়ার উপরেই তাহার অপ্রতিহত সাহিত্যিক শিকার-মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত। এই হাস্য-পরিহাসপূর্ণ, মানবিক আবেগে স্পন্দিত আবেষ্টনীর মধ্যে যে আসিয়া পড়ে, শুধু বাঘ মহাশয় নহেন, সেই ব্যক্তি মহাশয়ও তাঁহার লক্ষ্যভেদের বস্তু। "টকি", "বড়দা", "পানের বরজে ব্যাঘ্রের" সংবাদদাতা জয়নাল, কলির ভীম চৌবেজী, বন্ধু, বন্ধুপত্নী, হস্তীলাঙ্গুল অবলম্বনে দোদুল্যমান, ব্যাঘ্রভীত মাহুতপ্রবর, নিলোভ গাইড বেঁটে নির্লোভ, বৈষ্ণব বাঘ, হা-হুতাশ বাবু, সকলে মিলিয়া এমন একটি উপভোগ্য মজলিশ গড়িয়া তুলিয়াছেন, যে ব্যাঘ্র-শিকারটা গৌণ পর্য্যায়ে পড়িয়া গিয়াছে। পাঠকের মনোযোগ বাক্য-বুলেট ও বন্দুকের বুলেটের মধ্যে যেন দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া পড়ে। আমাদের রঙ্গমঞ্চের মেলোড্রামায় যেমন নাটকের উপসংহার অপেক্ষা উহার আয়োজন পর্ব্ব আরও চিত্তাকর্ষক, এই শিকার-কাহিনীতেও তাহাই। মানবিক মেলোড্রামার নায়ক ও আরণ্য মেলোড্রামার নায়ক ব্যাঘ্রের উপসংহার এক মুহূর্ত্তের সংহারের মধ্যেই নিঃশেষ—আকস্মিক পতন ও মৃত্যু উভয়েরই ললাটলিপি। ট্রাজেডির নায়কের মত বাঘ মরিবে, তাহা আমরা পূর্ব্ব হইতেই জানি—সুতরাং এই পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত এবং অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুতে আমরা বিশেষ অভিভূত হই না। কিন্তু এই অপরিহার্য পরিণামের তোড়-জোড়টাই আমাদের মনে বিশেষভাবে রসোদ্দীপক। তা ছাড়া এই বইখানিতে ব্যাঘ্রের জীবন তত্ত্বের অনেকখানি রহস্য আমাদের নিকট উদ্‌ঘাটিত হয়। ব্যাঘ্র-মহারাজের খেয়াল-মেজাজ তাঁহার অভ্যাস-আচরণ, বিভিন্ন পরিবেশে তাঁহার বিচরণ পদ্ধতির পার্থক্য, মানব সমাজের সহিত তাঁহার শ্যালক-ভগিনীপতি সুলভ (কে কোন অংশ অভিনয় করে তাহা পাঠকই অনুমান করিবেন) সুমিষ্ট রহস্যময় রক্ত-সম্পর্ক, এ সবই ইঙ্গিতের ঝলকে, বাচন-ভঙ্গীর কুশলতায় উপভোগ্যভাবে ফুটিয়াছে। মোট কথা, বইখানিতে 'বাঘোয়ারা' নামে এক নূতন ভৌগোলিক ভূখণ্ড আবিষ্কারের খবর পাওয়া যায়। জানিনা এই ব্যাঘ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল নিয়োগের ক্ষমতা কাহার হাতে ন্যস্ত আছে; আমার হাতে থাকিলে আমি নিশ্চয়ই লেখককেই ঐ সম্মানে-বিপদে মাথামাথি পদে নিয়োগের রাজটিকা পরাইতাম। আমরা শীকার সম্বন্ধে একেবারে অব্যবসায়ী—এক বইয়ের জঙ্গল ছাড়া আর কোন জঙ্গল ঘাঁটি না। সুতরাং তাঁহার শিকার-অভিসারে এক মানস-সঙ্গী হওয়া ছাড়া আমাদের আর উপায়ান্তর নাই। সময় সময় দুধ অপেক্ষা ঘোলের স্বাদই স্বাদুতর। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করি যে তিনি এইরূপ শিকার-অভিজ্ঞতার সরস বর্ণনা লিখিয়া আমাদের রসনাকে এইরূপ পরোক্ষ স্বাদুতার পরিতৃপ্ত করিবেন।

[প্রকাশক :—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং লিঃ, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড। মূল্য—দুই টাকা]

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজা রামমোহন : শ্রীতাপসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের নবজাগৃতির পিতা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে যত অধিক পুস্তক প্রকাশিত হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গলের কথা। লেখক পণ্ডিত-ব্যক্তি—বহু গ্রন্থ পাঠ ও আলোচনার ফলে রামমোহন সম্বন্ধে তাঁহার মনে যে রেখাপাত হইয়াছে, তাহাই এই গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। স্বর্গত কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমিকায় ঠিকই লিখিয়াছেন—"রামমোহনের প্রতি লেখকের আন্তরিক দরদ গ্রন্থখানিকে রসাঢ্য করিয়াছে। বাংলাদেশের এই বীর রাজার ব্যক্তিস্বাধীনতা ও তেজস্বিতার নিকট সে যুগের গর্বিত শাসকদিগকেও মাথা নত করিতে হইত।" বইখানির ভাষা সাবলীল—গল্পের মত। পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ করা যায় না।

[প্রাপ্তিস্থান—রীডার্স কর্ণার, ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬ মূল্য—একটাকা ৭৫ নয়া পয়সা।]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সাতটী তারা : শ্রীনারায়ণ সেনগুপ্ত

আলোচ্য গ্রন্থে সাতটি ছোট গল্প আছে, তার মধ্যে ছয়টি সংহতি সচিত্র ভারত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে গ্রন্থকারের বৈশিষ্ট্য ও চমৎকারভাবে গল্প বলার ভঙ্গিমা লক্ষ্য করা গেল। সারথী গল্পের মল্লিকা বাগ্‌চি বিশেষভাবে মনে রেখাপাত করেছে, তাছাড়া নিশাচর গল্পের অমিত ও এলার অবৈধ প্রেমের মর্ম্মান্তিক পরিণতি, পারুল বৌদির জীবনকাহিনী উপভোগ্য হয়েছে। অন্যান্য গল্পগুলি মন্দ নয়। গল্পগুলি পড়ে গ্রন্থকারের আশাপ্রদ ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করা গেল।

[প্রকাশক—সংহতি প্রকাশনী, ২০৩/২ বি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬]

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মনের মানুষ : শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক সৌরীন্দ্রমোহন তাঁর এ উপন্যাসে দুই জোড়া দম্পতির জীবনের দুঃখ-কষ্ট অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ে কাহিনীর ইন্দ্রজাল রচনা করেছেন। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি না থাকলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সত্যিকারের প্রীতিপ্রেম ভালোবাসা গড়ে উঠতে পারে না। অসীম আত্মত্যাগের দ্বারা যে কণিকার মত স্ত্রীরা অশান্তির ধূ ধূ বালুচরে ও শান্তির স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেন লেখকের শক্তিশালী কলম তা প্রত্যক্ষ করেছে। এ উপন্যাসের আদর অবশ্যম্ভাবী।

[প্রকাশক—অক্ষয় লাইব্রেরী। ৪নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য—দুই টাকা]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী : শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ভজন ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
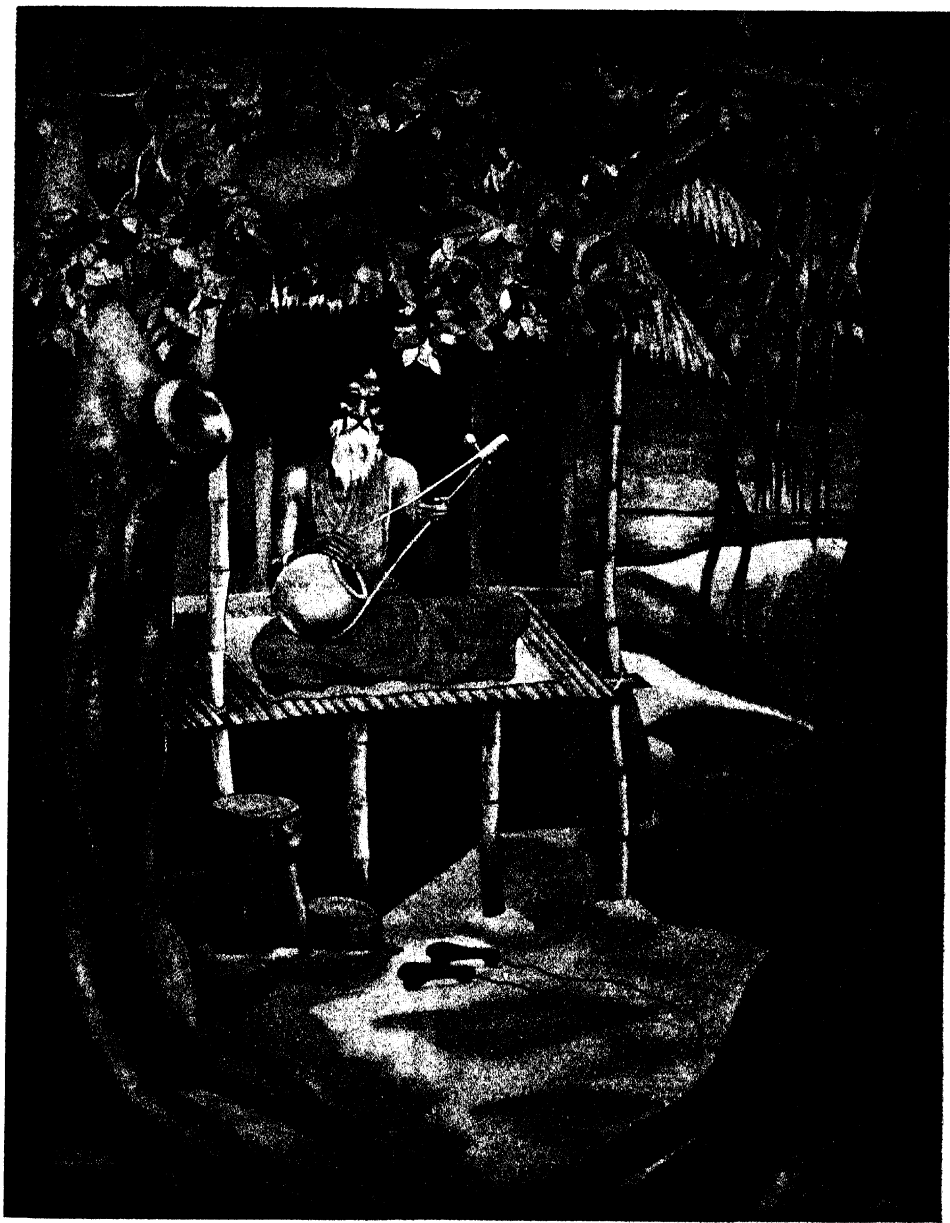
মাঘ—১৩৬৫

দ্বিতীয় খণ্ড | ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-মীমাংসায় আনন্দবর্ধন

অধ্যাপক শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য

সেকালের সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা সাহিত্যতত্ত্বের নানা সমস্যার সমাধানে যে অপূর্ব প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে গেছেন, তা একালে পরম বিস্ময়ের বস্তু। ভরত ভামহ দণ্ডী উদ্ভট বামন রুদ্রট—এঁরা সকলেই ছিলেন সাহিত্যিক তত্ত্ববিচারে এক একটি দিক্‌পাল। এঁদের পর ধ্বনিপ্রস্থানের মহানায়ক আনন্দবর্ধনের অভ্যুদয়কাল। কাব্যরসিকদের পক্ষে সে এক অসামান্য সৌভাগ্যসময়।

আনন্দবর্ধন ছিলেন একাধারে কাব্যতত্ত্ববিচারক, কবি ও দার্শনিক। তাঁর লেখা 'ধ্বন্যালোক' এবং 'দেবীশতক' দুখানি বই ছাপা হয়ে গেছে। ধ্বন্যালোকে তাঁর রচিত আরও দুখানি বইএর নাম পাওয়া যায়—প্রাকৃত কাব্য 'বিষমবাণলীলা' আর সংস্কৃত কাব্য 'অর্জুনচরিত'। এ ছাড়া, আনন্দবর্ধন 'তত্ত্বালোক' নামে একখানি অদ্বৈত-নিবন্ধ লিখেছিলেন এবং বৌদ্ধ ন্যায়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ধর্মোত্তরকৃত 'প্রমাণবিনিশ্চয়টীকা'র টীকা রচনা করেছিলেন। এই অসাধারণ মনীষীর জীবনকথা এইমাত্র জানা যায় যে, তিনি খৃষ্টীয় নবম শতকে কাশ্মীর দেশে অবন্তিবর্মার রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল গোণ উপাধ্যায়।

ধ্বন্যালোকের মধ্য দিয়েই আনন্দবর্ধনের গৌরবদ্যুতির

পরম প্রকাশ। একশ বারটি ধ্বনিকারিকায় 'বৃত্তি' অর্থাৎ ব্যাখ্যানরূপে তিনি 'ধ্বন্যালোক' বা 'সহৃদয়ালোক' রচনা করেন। গ্রন্থের চারটি পরিচ্ছেদের নাম 'উদ্দ্যোত'। 'আলোকে'র 'উদ্দ্যোত'ছটায় সাহিত্যপথের অলি-গলি উদ্ভাসিত করে আনন্দবর্ধন সেযুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যবিচারক বলে খ্যাতিলাভ করেছেন। সাহিত্যের আসরে ধ্বনিকে যোগ্য মর্যাদা দিয়ে আনন্দবর্ধন কার না আনন্দ বর্ধন করেছিলেন ?—

ধ্বনিনাতিগভীরেণ কাব্যতত্ত্বনিবেশিনা।
আনন্দবর্ধনঃ কস্য নাসীদানন্দবর্ধনঃ॥

ধ্বন্যালোকের মুখ্য বক্তব্য এই যে, শব্দ ও অর্থের সমন্বয়ে কবি যে সাহিত্য সৃষ্টি করেন, তার শব্দার্থের বহিরঙ্গে প্রাণসত্তার সন্ধান পাওয়া যায় না। কবিনির্মিতির আসল রূপটি ধরা পড়ে অন্তর্নিগূঢ় আভাসে ইঙ্গিতে ব্যঞ্জনায়। উৎকৃষ্ট সাহিত্যরচনায় শব্দ ও অর্থ উভয়েই নিজেদের অন্তরালে রেখে আর একটি ব্যঙ্গ অর্থের প্রতীতি জন্মায়। ব্যঞ্জিত বা প্রতীয়মান অর্থই ধ্বনি। এটিই কাব্যের আত্মা বা সারবস্তু।

যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃতস্বার্থৌ।
ব্যঙ্‌ক্তঃ কাব্যবিশেষ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ॥

ধ্বনির ভেদপ্রভেদ অনেক, ধ্বননের প্রকারও নানারূপ। সাধারণত উৎকৃষ্ট সাহিত্যসন্দর্ভের বিভিন্ন অংশে বা বিভিন্ন কবিতায় পৃথক পৃথক্ অর্থ ধ্বনিত হতে দেখা যায়। কিন্তু কবিকৌশলের এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়, যেখানে সমগ্র রচনাটিই অখণ্ডরূপে কোন একটি বিশিষ্ট ধ্বন্যর্থ বহন করে।

আনন্দবর্ধন যেসব ধ্বনির উদাহরণ দিয়েছেন, তার মধ্যে একটি এই—

ভ্রম ধার্মিক বিস্রব্ধঃ স শুনকোঽদ্য মারিতস্তেন।
গোদাবরীনদীকূললতাগহনবাসিনা দৃপ্তসিংহেন॥

'হে ধার্মিক, তুমি নির্ভয়ে ভ্রমণ কর, গোদাবরীতটের লতাগহনবাসী এক ভয়ঙ্কর সিংহ আজ সেই কুকুরটিকে নিহত করেছে।'

কবিতাটি শোনামাত্র মনে হয় যে, ধার্মিককে যথেচ্ছ বিচরণে অভয়দানই যেন এর উদ্দেশ্য। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়—ভীতি উৎপাদনই ছিল শ্লোকটির গূঢ় অভিপ্রায়। এতে কবি কৌশলে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুকুরটি নিহত হলেও তার নিহন্তা 'দৃপ্তসিংহ' সেখানেই বাস করছে। প্রকৃতপক্ষে, যাতে গোদাবরী-লতাকুঞ্জের নির্জনতা অক্ষুণ্ণ থাকে, যাতে সেখানে অবাঞ্ছিত আগন্তুকের আকস্মিক প্রবেশে গোপন মিলন ব্যাহত না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই কবিতাটির সৃষ্টি। এটি হল বিচ্ছিন্ন খণ্ডধ্বনির দৃষ্টান্ত।

ধ্বন্যালোকে সামগ্রিক ধ্বনির দৃষ্টান্ত হচ্ছে রামায়ণ ও মহাভারত। আনন্দবর্ধনের মতে মহাভারতকার ভারত-কাহিনীর নিগূঢ় ব্যঞ্জনার মাধ্যমে এই তত্ত্বই বোঝাতে চেয়েছেন যে, পাণ্ডবাদিচরিতের মত সমস্ত সংসারবৃত্তই বিয়োগান্ত এবং অসার আড়ম্বর।

অয়মর্থো ব্যঙ্গ্যত্বেন বিবক্ষিতো যদত্র মহাভারতে পাণ্ডবাদিচরিতং যৎ কীর্ত্ততে তৎ সর্বম্ অবসানবিরসম্ অবিদ্যাপ্রপঞ্চস্বরূপঞ্চ।

মহাকবিদের কাব্য-নাটকে সামগ্রিক ধ্বনির আরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সূক্ষ্মদর্শী মনীষীরা কালিদাসের শকুন্তলা নাটকেও একটা প্রতীয়মান ধ্বন্যর্থ আবিষ্কার করেছেন। তাঁদের মতে নাটকের প্রথম অংশে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার স্বচ্ছন্দ মিলন ও অপ্রত্যাশিত বিচ্ছেদের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে অসংযমের অমঙ্গল, আর নাটকের দ্বিতীয় অংশে সন্তাপ-শুদ্ধ বিরহোত্তর মিলনে ধ্বনিত হচ্ছে দাম্পত্য প্রণয়ের প্রসন্ন পরিণতি। শকুন্তলা নাটক সামগ্রিক ধ্বনির উদাহরণ।

আনন্দবর্ধন ধ্বনিবাদের প্রবর্তক নন। ধ্বন্যালোকের মূল কারিকাগুলিও অনেকের মতে কোন এক পূর্বসূরির রচনা। অতি প্রাচীন যুগ থেকে ধ্বনিবাদ সম্পর্কে নানা-জনের মনে যে সব সংশয় দেখা দিয়েছিল, তা নিরসনের জন্য কারিকাকার লেখনী ধারণ করেন। তিনি গ্রন্থারম্ভে বলেছেন—

কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি বুধৈর্যঃ সমাম্নাতপূর্ব-
স্তস্যাভাবং জগদুরপরে ভাক্তমাহুস্তমন্যে।
কেচিদ্বাচাং স্থিতমবিষয়ে তত্ত্বমূচুস্তদীয়ং
তেন ব্রূমঃ সহৃদয়মনঃপ্রীতয়ে তৎস্বরূপম্॥

'যে ধ্বনিকে প্রাচীন পণ্ডিতেরা কাব্যের আত্মা বলে ঘোষণা করে গেছেন, একদল লোক তার অস্তিত্বই অস্বীকার করেন। কেউ বলেন—অলঙ্কারের মধ্যেই ধ্বনি অন্তর্ভূত হয়ে আছে; অপরে সিদ্ধান্ত করেন যে, ধ্বনি এমন এক অস্পষ্ট বস্তু, যা বাক্য দিয়ে বোঝান যায় না। তাই আমি সহৃদয় জনের প্রীতির জন্য ধ্বনির স্বরূপ বর্ণন করছি।

দেখা যাচ্ছে, আনন্দবর্ধনের বহু পূর্বে ধ্বনিবাদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে নানারূপ মতবাদ গড়ে উঠেছিল।

আনন্দবর্ধন বলেছেন যে, যে কাব্য রসভাবাদি তাৎপর্যরহিত, যার ধ্বন্যর্থ প্রকাশের শক্তি নেই, যা কেবল শব্দ ও অর্থের বাহ্য বৈচিত্র্য সম্বল করে রচিত হয়, তেমন কাব্যের মূল্য ছবির চেয়ে বেশী নয়। তা উত্তম কাব্যের মর্যাদা পায় না।—

রসভাবাদিতাৎপর্যরহিতং ব্যঙ্গার্থপ্রকাশনশক্তিশূন্যং চ কাব্যং কেবলবাচ্যবাচকবৈচিত্র্যমাত্রাশ্রয়েণোপনিবদ্ধমালেখ্যপ্রখ্যং যদাভাসতে তচ্চিত্রম্। ন তন্মুখ্যং কাব্যম্।

অবশ্য শব্দ ও অর্থ এই দুটি বস্তুই যে সাহিত্যশরীরের স্থূল কাঠামো, সে বিষয়ে বিসংবাদ নেই। কিন্তু রস, অলঙ্কার, রীতি, বক্রোক্তি ও ধ্বনি—এগুলির মধ্যে কোন্‌টি কবিকর্মকে সাহিত্যের শ্লাঘ্য পদবীতে পৌঁছে দেয়, তা নিয়েই মতভেদ। ধ্বনিবাদীরা রস ও বক্রোক্তির উপাদেয়তা অগ্রাহ্য করেন না। ধ্বনি যে রসের আনুকূল্যেই সহৃদয়হৃদয়কে আহ্লাদিত করে, সে কথা আনন্দবর্ধনও স্বীকার করেন। বক্রোক্তি যে ধ্বনি-কবিতার সাহচর্যে মনোহর হয়ে ওঠে, তাও তিনি মানেন। কিন্তু আনন্দবর্ধনের বিচারে অলঙ্কার ও রচনারীতি এ দুটি কাব্যসৌন্দর্যের পক্ষে নিতান্তই বহিরঙ্গ—রত্নাভরণ ও প্রসাধন বস্তুর মত বাহ্যশোভার পরিপোষক মাত্র। এরা রসিক হৃদয়ে আনন্দ জন্মাতে পারেনা। উচ্চকোটির কাব্যনির্মাণে এদের ভূমিকা একান্ত গৌণ। অবশ্য একথা সত্য যে, উজ্জ্বল রত্নকুণ্ডল, রক্তিম কুঙ্কুমবিন্দু এবং মনোহর বর্ণকরাগ যেমন কমনীয় রমণীমুখের শ্রী বৃদ্ধি করে, রীতির বিশুদ্ধি এবং অলঙ্কারের সমৃদ্ধিও তেমন কাব্যের মাধুর্য বাড়ায়। কিন্তু মুখের আসল সৌন্দর্য থাকে লাবণ্যে, কাব্যের প্রকৃত জীবন পাওয়া যায় ধ্বনিতে। আভরণ বা প্রসাধনের অভাবে যেমন লাবণ্যময় মুখ শ্রীহীন হয়না, অলঙ্কার বা রীতির দৈন্যেও তেমন ধ্বনিময় কাব্য সৌন্দর্যহীন হয় না।

আনন্দবর্ধন ছিলেন একজন পরিনিষ্ঠিত সাহিত্যসমীক্ষক। তিনি সমকালীন সাহিত্যিক সমাজের চতুর্দিকে একটা অবসাদ লক্ষ্য করেছিলেন। হয়ত তাঁর সময়ে কাব্যপদ্ধতির গতি বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিকতায় নিবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। আনন্দবর্ধন তাই কবিকুলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে,

'কাব্যজগতের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে কবি হচ্ছেন স্বাধীন সৃষ্টিকর্তা। তিনি যেমন ইচ্ছা করেন, বিশ্বসংসারকে তেমন রূপ দিতে পারেন'।

অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ।
যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথৈব পরিবর্ততে॥

এই পুরাণ উদ্ধৃতি তুলেই আনন্দবর্ধন ক্ষান্ত হয়নি। তিনি কবিপ্রতিভার সীমাহীন শক্তির উল্লেখে আরও বলেছেন—

'এমন কোন বস্তুই নেই, যাকে রসতৎপর কবি আপন ইচ্ছামত রসের রসায়নে পরম রমণীয় করে তুলতে পারেন না'।

নাস্ত্যেব তদ্বস্তু যৎ সর্বাত্মনা রসতাৎপর্যবতঃ
কবেস্তদিচ্ছয়া তদভিমতরসাঙ্গতাং নাধত্তে।
তথোপনিবধ্যমানং বা চারুত্বাতিশয়ং ন পুষ্ণাতি।

এ ধরণের সূক্ষ্ম সমীক্ষণে এবং সত্য বিদগ্ধ বচনে আনন্দবর্ধন অসাধারণ।*

* কলিকাতা আকাশবাণী হইতে প্রচারিত।

তুইরেংপার মেলা

প্রশান্ত চৌধুরী

তুইরেংপা ঠাকুরের পূজো।
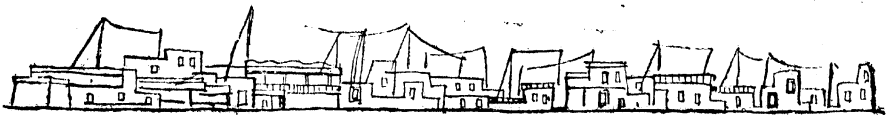
মাদল আর শিঙা থরথর করে কাঁপিয়ে তুলেছে বাতাসকে।

কাঁপলে সবই সুন্দর হয়। সুন্দর হয় বাতাসে-কাঁপা গাছের পাতা, নদীর জল, ধানের শিষ। সুন্দর হয় নাচনে-কাঁপা মেয়েদের আঁচল, খোঁপার ফুল, চুলের গোছা। মাদলে-কাঁপা বাতাসটাও তাই আজ সুন্দর না হয়ে যায় কোথায়?

ছোট ছোট পাহাড়। শেষ নেই তার। একটার শেষ হবার আগেই আরেকটার সুরু। আর, তার ফাঁকে ফাঁকে জল-থিক্ থিক্ মাটি। মস্ত একটা কুমীর যেন ডুব দিয়ে চান সেরে শুয়ে আছে রোদে পিঠ পেতে। সে কুমীরের কে জানে কোথায় মুখের দাঁত, কোথায় বা ল্যাজের ডগা। কুমীরটা বুঝি মাঝে মাঝে নাড়া দেয় পিঠ। তখন ওদের অনেক কষ্টে গড়ে তোলা ঘর দোর সংসার কেমন টুপটাপ করে ভেঙে পড়ে। ওরা কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতেই আবার কোমর বেঁধে লেগে যায় ঘর বাঁধার কাজে—ঐ দুষ্টু কুমীরের পিঠেই।

দুষ্টু নয় গো, দুষ্টু নয়;—লক্ষ্মী। লক্ষ্মী কুমীর, সোনা কুমীর, ভাল কুমীর। তোমার পিঠ চুলকোলে তুমি পিঠ নাড়া দাও না? দেয় না তোমার গোরু? তোমার মোষ? তোমার পুষি বেড়ালটা? তাই বলে কি দুষ্টু ওরা? কুমীরই বা দুষ্টু হবে কেন? দুষ্টু হলে ত খালি খালি নাড়া দিত ওর পিঠ। তারপর ডুব দিত জলের মধ্যে। যে-জলের তলায় বসে আছে পাতালের রাজা বাসুকী। আর তখন সেই বাসুকী টপ্ টপ্ করে গিলে ফেলত সকলকে।

দুষ্টু নয় বলেই ত তা' ও' করেনি। দুষ্টু হলে কি ওর পিঠে ফলতো অত বাঁশ? অত বেত? অত কচু? অত কলাগাছ? অত ধান?

তুমি যাবে ওদের কাছে? থাকবে ওদের মাঝে? তাহলে টিলার মাথায় উঁচু জমির ওপর হাত পাঁচেক উঁচু করে বাঁধো বাঁশের মাচা বেশ শক্ত মজবুত করে। তারপর সেই মাচার ওপর গড়ে তোল তোমার ঘর। চালে বিছোও তলতা বাঁশ, আর গাছের পাতা! মাচার নিচে মাটির ওপর থাকুক তোমার মুরগী আর শুওরের পাল, ওপরে থাক তুমি তোমার মা-বাপ ভাই-বোন ছেলে-মেয়ে ভাইপো-ভাইঝি নিয়ে।

টুকরো করে কাটো কলাগাছের থোড়, কুচি কুচি কর নরম-নরম বেতের ডগা—একটু মরিচ মিশিয়ে রাঁধো তরকারী, খাও তারপর ভাতের সঙ্গে পেট পুরে। অভাব কি তোমার?

তারপর, খেয়েদেয়ে মোটা বাঁশের চোঙার মধ্যে সরু বাঁশের আরেকটা চোঙা গুঁজে তার মাথায় বসিয়ে দাও কল্কে। ঠ্যাঙ্ ছড়িয়ে টানো তামুক ভুকভুক করে।

সন্ধের পর যখন চাঁদ দেবতা হেসে উঠবে তোমার বাঁশবাগানের মাথার ওপর, তখন তোমার উঠোনে বসানো মদ-ভর্ত্তি মস্ত মাটির গামলার চারিদিকে বাড়ির সবাইকে নিয়ে গোল হয়ে বসে বাঁশের নল দিয়ে টানো মদ। টানতে টানতে পেট যখন ভরে যাবে, মাথার মধ্যে ঘুম-ঘুম সুড়সুড়ি উঠবে, তখন ঘরে উঠে দাও কষে ঘুম। পরদিন সকালে উঠে লেগে পড় সংসারের কাজে।

এমনি করে একদিন তুমি বুড়ো হবে। আর কাজ করতে পারবে না। চোখে দেখবে আবছা, কানে শুনবে ঝাপসা। চলবে কেঁপে কেঁপে, খাবে ফোক্‌লা দাঁতে, বসবে হাঁটুর মধ্যে নড়বড়ে মাথা গুঁজড়ে। তামাক

টানতে টানতে বিষম খাবে। দেখতে-দেখতে—দেখতে পাবে না আর, শুনতে-শুনতে শুনতে পাবেনা। দেখবে না, শুনবে না, নড়বে না, কাঁদবে না, হাসবে না;—তুমি মরে যাবে।

তুমি মরে যাবে। তখন ওরা আগুনে জল ফুটিয়ে সেই জলে নাওয়াবে তোমার দেহটাকে, সাজাবে ফুল দিয়ে, বুকের ওপর রাখবে পান-সুপুরি। তারপর পাড়া-পড়শী সবাই মদ খাবে আর নাচবে। শুধু তোমাকে আনন্দ দেবার জন্যেই।

তারপর নিয়ে যাবে তোমার দেহটাকে ন্যাড়া পাহাড়ের ওপর। চাপাবে আগুনে। আগুনের আঁচে পুড়ে ছাই হয়ে হাল্‌কা ফুরফুরে হয়ে যাবে তোমার দেহ। উড়বে বাতাসে। ওরা তখন ফিরে যাবে। রেখে যাবে মদ, রেখে যাবে মুরগী। শুধু তোমার জন্যেই। সেই মদ-মুরগী খেতে তোমার ইচ্ছে হবে না মোটেই। তাই মদের পাত্র উল্টে যাবে, মুরগীরা চলে যাবে বনের মধ্যে। আর তুমি? সেই অনেক হালকা তুমি তখন অদৃশ্য চিল কিংবা ঘুঘুর পিঠে চড়ে চলে যাবে সেই স্বর্গে, যেখানে থাকেন তুইতুংপা, শিবরাই, তুইরেংপা নামক দয়ালু সর্বশক্তিমান দেব্‌তারা।

তুইরেংপা পূজোর মেলা। বাজনা-বাদ্যি উঠেছে বেজে। যার সঙ্গে যার দেখা হচ্ছে, হেঁট হয় বলছে চুবাই, অর্থাৎ নমস্কার। খুশিতে টলমল করছে সবার মন।

যে বারেইন্‌ অর্থাৎ বারোয়ারীতলা এতদিন জঙ্গলের মাঝখানে অনাদরে ঢাকা পড়েছিল ঝরাপাতায়, আজ ওরা তাকে সাফ্‌-সুদরো করে নিয়ে সাজিয়েছে ফুল দিয়ে, রঙীন কাপড় দিয়ে, নিশেন দিয়ে। বারেইন্‌-এর এখানে-ওখানে খোঁটায় বাঁধা আছে শুওর, চম্পুইয়ের মধ্যে চাপা আছে মোরগ। তুইরেংপার কাছে ওদের সম্বচ্ছরের মানৎ। গুণতিতে হবে ওগুলো দেড়শোরও বেশি। তুইরেংপা আজ সব খাবেন। বছরে একদিন খান কিনা উনি, তাই ক্ষিধেটা একটু বেশি হবে বৈকি।

তুইরেংপার খাওয়া হলে সেই প্রসাদী মাংস খাবে ওরা সকলে। তারপর সারারাত নাচবে, গাইবে, মদ খাবে।

ঐ খুশি-ঝলমল বারেইন-এর মণ্ডপেই দেখা হল দুজনের। ষোল বছরের মেয়ের সঙ্গে আঠারো বছরের হৃষ্টপুষ্ট এক জোয়ান ছেলের। বারেইন-এর নাচের ভিড় থেকে সরে গিয়ে দুজনে বসল এসে জল-ঝিরঝির একটা রোগা নদীর ধারে।

: নাম কি তোমার?—শুধালো ছেলেটি।

মাথা নিচু করে মেয়েটি বললে: সেঙা।—তোমার?

: লাবুই।

চুপচাপ কিছুক্ষণ। শুধু ঘাস ছেঁড়া আর জলে পা নাড়া খানিক।

তারপর,—

: কোথায় ঘর? কার মেয়ে?

: 'গালিমে'র।

: গালিমের? মানে মোড়লের?

: হ্যাঁ।—তুমি?

: ভিন্‌ গ্রামের। এসেছি তোমাদের পূজা দেখতে। দেশ ছিল শুনেছি আমার মেঘলা নদীর তীরে। বাপ এসেছিল এখানকার হাটে তুলসীকাঠের মালা আর লাল-তামার ঘটি বেচতে। এসেছিলুম সেই বাপের সঙ্গে ছোট্ট-বেলায়। মা ছিল না কি না। তোমাদের এই পাহাড়ী দেশের হাটে মালা বেচতে এসে বাপও মরে গেল পেটের রোগে। ঐ তিনখানা পাহাড়ের পরে যে গ্রাম, সেই গ্রামের 'গাবুর' আমায় তুলে নিয়ে গেল ঘরে। সেই আমার ধর্মবাপ।

: জন খাটছো নাকি কোথাও?—শুধোয় সেঙা।

: না তো।—বলে লাবুই: তোমাদের ঘরে এসেছে নাকি জন?

ঘাড় নাড়ে সেঙা মুখ নামিয়ে। লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে ওর মুখ। এখনো জন আসেনি ওদের ঘরে।

'জন খাটা' কাকে বলে জান না বুঝি? ওদের জোয়ান ছেলেরা যায় কুমারী মেয়েদের বাপের বাড়ি। উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাঁকে—'জন খাটতে এসেছি গো।'—মানে, আইবুড়ো ছেলে আমি এসেছি তোমাদের মেয়েটিকে বিয়ে কোরে ঘর বাঁধতে। পছন্দ হয় কি না ছাখো। জোয়ান ছেলের হাঁক শুনে তখন বেরিয়ে আসে মেয়ের

বাপ-ঠাকুর্দা-কাকা-জ্যাঠা, ফাঁক-ফোকরে উঁকি মারে মেয়ের মা-খুড়িরা, উঁকি মারে মেয়ে নিজেও। মেয়ের বাপ-দাদা শুধোয়, নাম কি? বাস কোথায়? বাপ কে বটে গো? শুনে-টুনে যদি পছন্দসই লাগে, তখন এগিয়ে দেয় তামুক। বলে, হলুম রাজি। খাটতে পার জন।

তখন থেকে সেই জোয়ান ছেলে জনমজুরের কাজ করতে থাকে মেয়ের বাপের কাছে, পুরো পাঁচটি বছর ধরে। পাঁচ বছর পুরোলেই জন হয়ে যায় জামাই। মেয়ের বাপ তখন মেয়ে-জামাই আত্মীয়-স্বজন আর মদ নিয়ে যায় জামাই বাড়ি। দু-পরিবারের সবাই মিলে বসায় মদের উৎসব, চালায় নাচ-গান।

তুইরেংপা পূজোর পরদিন সকালে গালিমের বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়াল লাবুই। হাঁক দিল বুক চিতিয়ে: জন খাটতে এসেছি গো।

গালিম ছিল না ঘরে। পুরুষেরা কেউই নয়। বারেইন-এই পড়ে আছে তখনো মদের নেশায় চুর হয়ে। হাঁক শুনে তাই উঁকি মারে শুধু সেঙার মা। বলে: কে বট গো তুমি?

: লাবুই গো। ভিন্‌গাঁয়ের গাবুরের ধম্মছেলে। জমি আছে, জমা আছে। রাজি থাক ত বল, নৈলে ফিরে যাই, তাড়া আছে।

একটা ল্যাংটো ছেলে বেরিয়ে এসে বাড়িয়ে দেয় বাঁশের চোঙার হুঁকো। সেঙার মা বলে: সেঙার কাছে কাল রাতে শুনেছি তোমার বেত্তান্ত। তামুক খাও, পুরুষরা আসুক, তখন হবে পাকা কথা।

লাবুই বলে: লাও কাণ্ড! পাকাই যদি হল না কথা—ত তামুক টানি কোন্ সুবাদে গো? নিয়ম-কম্ম কি সব ভাসিয়ে দিয়েছ নাকি? থাক্ তবে গো, নাও ফিরিয়ে তোমাদের হুঁকো, আমি না হয় চলি।

: যেও না বাছা। হুঁকোর আগুন না নিবিয়ে টানো দিকি বসে বসে; রান্না চাপাই তোমার জন্যে।

চলে গেল সেঙার মা। আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে লাবুইয়ের দিকে তাকিয়ে একবার মুচকি হেসে সেঙাও অনুসরণ করল তার মাকে। লাবুই পরমানন্দে তামুক টানতে টানতে একসময় হেঁকে বলল: যাচ্ছি গো আমি একবার। ধম্মবাপকে জানিয়ে আসছি কথাটা। নইলে ভাববে বুঝি সাপে কেটে নীল হয়ে পড়ে আছি কোন্ অজগর-বিজগর বনের মধ্যে।

কিন্তু হল না আর ফিরে আসা। ঘরে ফিরে অবাক হয়ে শুনলে, ধম্মবাপ তার বছর তিনেক আগে থাকতেই ঠিক করে রেখেছে বাড়ি, যে বাড়িতে জন খাটবে লাবুই। তারপর পাঁচবছর পরে সাত গামলা মদের সঙ্গে নিয়ে আসবে ঘরে নতুন বৌ। নাম তার সেঙা নয়, সিস্‌মি।

আর সেঙা?

অনেক বেলায় তার বাপ গালিম ফিরে এল টলতে টলতে, সঙ্গে নিয়ে এক যেন বাঁখারির মতন মানুষ। জানালে—মানুষটা এ-অঞ্চলের সেরা অচাই (অর্থাৎ ওঝা) ঝাপুর, তারই যোগ্য ব্যাটা হাপুর। এসেছে, সেঙার জন্যে পাঁচবছরের জন খাটতে।

পরের বছর তুইরেংপার মেলায় আবার দেখা ওদের। আবার সেই রোগা নদীর জলে পা ডুবিয়ে বসা।

লাবুই বললে: পারি না রে আর। সিস্‌মির আদি-খ্যেতায় ন্যাকার আসে। ফাঁক পেলেই গায়ে এসে ঢলে পড়ে। রাতের বেলায় সবাই ঘুমোলে টেনে তুলে বলে চাঁদের আলোয় বসবি চল্ না ঐ টিলার ওপর।

সেঙা বললে: ঐ বাঁখারি হেন লোকটাকে নিয়ে আমারও হয়েছে জ্বালা। তামুকের কল্‌কে নেবার ছল করে কেবল আমার গা ছোঁবার চেষ্টা ওর। মদের আসরে ঠিক আমার পাশে এসে বসবার তাল। ওর কুতুরে চোখের পরতে পরতে শুধু লালসা আর লালসা।

লাবুই বললে: তুইরেংপার কাছে মানৎ করেছি একজোড়া মুরগী; যেন সিস্‌মিকে ঘুঘুর পিঠে চড়িয়ে সগ্‌গে টেনে নেন উনি শিগ্‌গিরই।

সেঙা বললে: আমিও মানৎ করেছি খয়েরি শুওর; যদি ও হাপুরকে সগ্‌গে তুলে নেন তুইরেংপা।

: কিন্তু তুইরেংপা, তুইদুংপা, শিবরাই কোন ঠাকুরই যদি কানে না তোলেন আমাদের কথা?

: তাহলে চার বছর পরে ঐ হাপুরটাকে নিয়েই জলতে হবে সারা জীবন। ভাবলেও কান্না আসে। ওটার কোন গুণ নেই রে। সেদিন আগাছার জঙ্গলে আগুন

লাগিয়ে সবাই যখন 'জুমের গান' গাইছিলুম দল বেঁধে, ওর গলাটা এমন বেসুরো বলছিল যে, সক্কলকার ভুরু কুঁচকেছে।

: আর আমার ঐ সিস্‌মি! সেদিন শিবরাই পুজোর নাচের সময় এমন বেতালা নাচলে যে, কুমীরের মতন দাঁত থাকলে মেয়েরা সবাই সেদিন ওকে চিবিয়েই খেয়ে ফেলত।

লম্বা নিশ্বাস ফেলে সেঙা বললে: না চেহারার জৌলুষ, না গুণপনা একরত্তি—এমন মানুষকে নিয়ে ঘর বাঁধার চেয়ে সাপে কেটে নীল হয়ে বনের মধ্যে পচে যাওয়াও ভাল।

লাবুই বললে: আমার কি অবস্থা জানিস? রাত-দুপুরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হয়ত তোর স্বপ্ন দেখছি, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়। দেখি ঐ খাঁদানাকী উট্‌কপালী চিরুণদাঁতী কুচ্ছিৎ সিস্‌মিটা আমার পা টিপে দিচ্ছে। পা টেনে নিলে বলে,—'আহা আমার জন্যেই ত জন খেটে তোর গা-গতরের ব্যথা, পা নে, ঘুমো তুই—আমার কষ্ট নেই কোন।'

সেঙা ঠোঁট উল্টে বলে: ন্যাকা!

লাবুই বলে: শিবরাই ঠাকুরের এ কিন্তু বড় অন্যায় নিয়ম-রীতি সেঙা! বাপের কথা অমান্য করলেই কি না পাঠিয়ে দেবেন পাতালের রাক্কস-খোক্কাসদের মুখে! কেন রে বাপু? বাপেদের কি আর বুদ্ধিসুদ্ধির ভ্রম হতে নেই?

সেঙা বলে: ও বিধানের কি কোন নড়চড় নেই রে?

হতাশ ভাবে মাথা নাড়ে লাবুই: না! আমাদের গ্রামের বুড়ো অচাই-এর মুখে শুনেছি ত বেদ-পুরাণের কথা।—ঐ যে সেই সকালে, যখন সুজ্জি-চাঁদে ঝগড়া হয়নি, এক সঙ্গে এক আকাশে পাশাপাশি উঠত যখন ওরা দিনমানে, আর রাত্তিরে থাকত ঘুটঘুটি আঁধারে—সেই যুগে ছিল এক পাজী ছেলে, লুসাই। বাপের কথার অমান্য করেছিল সে একদিন। সঙ্গে সঙ্গে শিবরাই ঠাকুর প্রকাণ্ড এক অজগরের রূপ ধরে দিলেন তার মাথায় এক ছোবল।

সেঙা শিউরে উঠে বললে: মরে গেল তক্ষুণি?

লাবুই বললে: দূর, তাহলে আর পাপের শাস্তি হল কী? যাতনায় ছট্‌ফট্ করতে লাগল লুসাই। মরে না, শুধু কাৎরায়। তখন দৈববাণী হল, 'লুসাই, ছুটে গিয়ে পড় আগে তোর বাপের পায়ে, তবে যাবে যাতনা।' সেই শুনে ছুটতে ছুটতে যেই না গিয়ে বাপের পা ছোঁয়া, অমনি কোথা থেকে লুসাইয়ের মাথার ওপর এসে পড়ল কালো কুচকুচে এক বিষপাথর। আর সঙ্গে সঙ্গে মাথার যাতনা একেবারে শীতল!

হতাশ হয়ে সেঙা বললে: তাহলে আমাদের কি আর কোন উপায়ই নেই?

লাবুই বললে: সারা বছরটা ধরে ত শুধু সেই কথাটাই ভেবে চলেছি।

পরদিন সকালে তুইরেংপার বাসি পুজো শেষ করে যে যার গ্রামে ঘরে ফিরে যাবার আগে সবাই এসে ভিড় জমালে সেঙার বাবা গালিমের বাড়ির উঠোনে।

ব্যাপার কি? না, সেঙাকে অপদেবতায় পেয়েছে।

সেঙা হাসছে কাঁদছে দাঁত কিড়মিড় করছে। সেঙা বাপের শাসন মানছে না, বুকের বসন রাখছে না, দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সারা উঠোন বন-শুওরের পারা। সেঙা এমন ভাষায় কথা বলছে, যার মানে বোঝা যাচ্ছে না একতিল, শুধু তার খোনা গলার আওয়াজ শুনে শিউরে উঠছে সবাই!

সেঙার-মা জড়িয়ে ধরলে তার হবু-জামাইয়ের হাত। বললে: ও বাছা, তুই ত এ-অঞ্চলের সেরা অচাইয়ের পুত, দে আমার মেয়ের দেহ থেকে ঐ পেত্নীটাকে খেদিয়ে।

বলবার আগেই তৈরী হয়ে এসেছে হাপুর। সারা গায়ে তার তেল মাখা, পরণের কাপড় গুটিয়ে তোলা। সরু সরু পা। উরুৎ যেন বেতের গোড়া; তেমনি লিক-লিকে আর বাঁকা। গলায় ঝুলছে মালা; তাতে বাঘের নখ, গণ্ডারের খড়্গ, গোসাপের ল্যাজ, বাদুড়ের ঠ্যাং, আরো কি কি যেন বাঁধা। তুইরেংপার বেদির ধুলো মুঠি ভরে তুলে এনেছে ও'।

সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল তার মন্তর-তন্তর, তার ভূত ঝাড়ার বিদ্যের কারচুপি। কথা নেই কারুর মুখে। চোখের তারা পাথর-নিথর।

সেই রোগা-রোগা পা তুলে তুলে কেমন ডিং মেরে মেরে বেড় দিতে লাগল হাপুর সেঙাকে। না, না, সেঙাকে নয়; সেঙার ভেতরকার সেই পেত্নীটাকে।

পেত্নীটা চুপচাপ।

মুখোমুখি দাঁড়াল হাপুর।

পেত্নীর মুখে কথাটি নেই।

হাপুর এইবার শূন্যের দিকে তাকিয়ে ডাক দিলে তুইরেংপা তুইদুংপা শিবরাই নামক সব বড় দরের ঠাকুরদের। ডাক দিলে ছোটদরের বনদেবতা ঝিংরেপা, জলের ঠাকুর গাংরেপা, আর ভূতের ঠাকুর বরাইপালুকে। সবাইকে ডাক দিয়ে সাতবার কান মুলে, এগারো বার আঙ্গুল মটকে, তিনবার হাতের মুঠিতে ফু দিয়ে ছুঁড়ে দিলে ধুলো সেঙার দেহের ওপর।

সব বৃথা!

হাহা করে হেসে উঠে সেঙা একটা জ্যান্ত মুরগীর ঘাড় মটকে কাঁচা রক্তয় মুখ দিলে!

শিউরে উঠল সবাই! কেঁদে উঠল কচির দল। লাজে ঘেন্নায় দুঃখে হাপুর ভিড়ের মাঝে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়াল।

এল এবার হাপুরের বাপ ঝাপুর, অচাইয়ের সেরা অচাই, ওঝার সেরা ওঝা।

কিন্তু তারও ঐ এক হাল। সেঙা হাসে হা-হা। সকলে করে হায় হায়। ঝাপুর যাকে ভাল করতে পারলে না, তাকে বাঁচায় কার ক্ষ্যামতা এ বিশ্ব-সংসারে?

এমন সময় ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল লাবুই। বললে: বাপ ছিল আমার মেঘনানদীর পারের মানুষ। সে যখন মোলো, চার বছরেরটি আমি। বাপের ফেলে-যাওয়া তুলসীর মালা নিয়ে খেলা করছি আর কাঁদছি, এমন সময় উদয় হলেন এক দেবী। সোনাবরণ তার রঙ, চাঁপা ফুলের বাস তার অঙ্গে। বললেন, বাপ গেল বলে কাঁদিসনি লাবুই। আমি মেঘনা ঠাকরুণ। তোর কানে দিচ্ছি ভূত তাড়াবার মন্তর। কিন্তু একটিবার মাত্তর কাজে লাগবে এ মন্তর, তার পরেই তুই ভুলে যাবি সব।

শুনে ছুটে এল সেঙার মা, ছুটে এল গালিম। জড়িয়ে ধরল লাবুইয়ের হাত।

: বাঁচা বাছা, বাঁচিয়ে দে আমার মেয়েটাকে।

দাঁড়াল লাবুই টান্ হয়ে। বললে: কিন্তু এতবড় দামী মন্তরটা যেমন জন্মের মতন খরচ করব, তেমনি বেঁচে উঠলে সেঙা হবে আমার জিনিষ। তোদের কারুর থাকবে না তার ওপর কোন জোর, কোন মালিকানা।

কথা কয় না সেঙার মা। জবাব দিতে পারে না গালিম।

পাঁচজনে কিন্তু ঘাড় নেড়ে বলে: বটেই ত। যে-সেঙা ছিল ওর বাপের মায়ের, সে-সেঙাকে ত পেত্নীতে খেয়ে সাবাড় করে দিয়েছে কখন্। এখন যদি আবার ঐ দেহে নতুন জীবন দেয় লাবুই ত সে-সেঙা ত লাবুইয়েরই বটে গো। এর আর ভাবনার কি আছে?

শেষ অবধি রাজি হল গালিম। বললে: তাই হবে। তবু বাঁচা ওকে।

আশ্চর্য!

ধূলোও নিলে না মুঠিতে, তেলও মাখলে না গায়ে, ডিং মেরে মেরে ঘুরলেও না লাবুই। চিৎকার করে শুধু হাঁক দিলে তিনবার: মেঘনা, মেঘনা, মেঘনা। তারপর মুরগীর ডানা ঝাপটের মতন ফরফর করে বলে গেল এক নিঃশ্বাসে এমন সব কথা, যার মানে বোঝার সাধ্যি ছিল না কারুর। বোঝা গেল শুধু শেষের কথাগুলো: আমি মেঘনার ছেলে লাবুই। যে আছিস ভালয় ভালয় চলে যা সেঙার দেহ ছেড়ে, নইলে ছুঁড়তে হবে নাগবাণ।

সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজী! সেঙা বুকের বসন গুছিয়ে নিয়ে লজ্জায় দৌড় দিলে ঘরের মধ্যে।

চিৎকার করে উঠল সবাই: জয় মেঘনার জয়!

সাঝের আঁধার। নদীর ধারে এসে বসেছে ওরা দুজনে।

সেঙা বললে: বাব্বা! বুদ্ধিটা খুব দিয়েছিলি বটে তুই লাবুই। কিন্তু চেঁচাতে আর লাফাতে দম বেরিয়ে গিয়েছিল। আর ঐ মুরগীর কাঁচা রক্তে ঠোঁট ছুঁইয়ে অবধি এখনও গুলোচ্ছে যেন গা!

: হুঁ।—লাবুই বললে: আমার ধম্ম-বাপ শুধোলো আমায়, ঐ মেয়েটাকে নিয়ে করবি কি তুই লাবুই? বললুম, বিয়ে করি যদি? বাপ বললে, আমার আপত্তি নেই। স্বয়ং মেঘনা যখন ও মেয়েকে তোর হাতে তুলে দিয়েছেন, আমরা বারণ করবার কে?

সেঙা বললে: আমরা যা চেয়েছিলুম তাই হল শেষ অবধি। আর বাধা রইল না কোন দিকে। কি বল্ লাবুই?

: হ্যাঁ।

: কিন্তু জানিস লাবুই ?—জলে পা নাচাতে নাচাতে বললে সেঙা: আমি যখন ভূতে-পাওয়ার ঢং করে হাসছিলুম, কাঁদছিলুম, দেখছিলুম আড় চোখে চেয়ে—ঐ হাপুরটার চোখে জল আর জল।

: আর আমি যখন ভূত ছাড়াবার ঢং করে এগিয়ে যাচ্ছিলুম, সিস্‌মি আমার পা-দুটো জড়িয়ে ধরে বলছিল, যাসনি লাবুই, যাসনি'। তখন ওর দুগাল বেয়ে জল গড়াচ্ছিল রে।

সেঙা বললে: জানিস লাবুই, আমি কতদিন দেখেছি, ঐ হাপুরটা রোজ রাতে জেগে বসে থাকত আমার শিয়রের কাছে; যাতে আমায় মশায় না কাটে, সাপে না দংশায়।

লাবুই বললে: একবার গা তেতেছিল আমার। দশ দিন লেগেছিল শীতল হতে। তা' জানিস সেঙা, সিস্‌মিটা সেই দশদিন দাঁতে কাটেনি রে এক কণা কিছু।

সেঙা বললে: জানিস লাবুই, তুই যখন সকালে উঠোনে দাঁড়িয়ে বললি, 'বাঁচাবার পর সেঙা আমার হবে' —তখন সে কথা মেনে নিতে আমার বাপ-মায়ের দেরি হল। কিন্তু ঐ হাপুর, আমি নিজের কানে শুনেছি রে, দৌড়ে এসে আমার বাপকে বললে, 'তা হোক্, তা হোক্, ও' নাই বা হল তোমার, নাই বা হল আমার, ও' প্রাণে বাঁচুক।'

লাবুই বললে: তোর ঐ হাপুর এসেছিল রে দুপুরে আমার কাছে। আড়ালে আমায় টেনে নিয়ে গিয়ে বললে—'সেঙা তামুক খেতে খেতে কাশে; ওকে তামুক খেতে দিও না গো।'

সেঙা বললে: তোমার ঐ সিস্‌মিও এসেছিল গো আজ ভর-দুপুরে লুকিয়ে আমার ঘরে। তোর নাম করে বললে—'মানুষটা মদ খেতে খেতে কাৎরায় পেটের যাতনায়;—দিওনা গো ওকে বেশি মদ খেতে।'

অনেক রাত।

মাচার নিচে একটা দুষ্টু শুওর শুধু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে তখনো। বাকি সব নিথর নিঝুম। আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে এসে দাঁড়াল লাবুই।

চমকে উঠল গালিম: এখনই নিয়ে যাবি সেঙাকে?

লাবুই ফিসফিসিয়ে বললে: না। কোন দিনই না। ও'ত আমার জিনিষ। ওকে আমি আবার ফিরিয়ে দিলুম তোর হাতে। চললুম। বলে দিস তোর মেয়েকে। ঘুমোচ্ছে ও'। জাগাতে চাই না এত রাতে।

পরের দিন ভোরে উঠে শুনল সেঙা খবরটা। শুনে চমকে উঠল একবার। তারপর এগিয়ে গেল ঘরের অন্ধকার কোণে, যেখানে বসে হাপুর কাঁদছিল তখনো মাথা গুঁজে।

হাপুরের হাড়-জিরজির বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সেঙা বললে: চ', খাসনি কাল সারাদিনে কিছু। খেয়ে নিবি চ' দুটো।

ওদিকে তখন কালো কুচ্ছিৎ সিস্‌মির হাত ধরে তিনটে পাহাড় পেরিয়ে নিজেদের গাঁয়ে ঢুকছে লাবুই।

চির বিচ্ছেদের পরে

শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত এম-এ

মনে হয় কিছুক্ষণ—এই মাত্র কিছুক্ষণ আগে
সে আমারি কাছে ছিল! দাঁড়াই নদীর ঘাটে যেয়ে
একান্তে নীরবে একা—মনের বিষণ্ণ পথ বেয়ে
মুছে'-যাওয়া অতীতের কথাগুলি একে একে জাগে।
সে-কথাই বারবার মনে করা বড় ভালো লাগে,
অশোক ফুলের মতো হাসি তার দেখি যেন চেয়ে;
কোকিলের সুর নিয়ে জেগে-ওঠা যৌবনের মেয়ে
রূপ ধ'রে দেহে তার দাঁড়ায় সে নয়নের আগে!

আর শুনি কণ্ঠস্বর! অদেখার ব্যবধান ভেঙে
প্রাণের দুয়ারে এসে মনের মিনতি রেখে যায়;
বুকখানি অগোচরে ওঠে নিতি বেদনায় রেঙে,
রাতের স্বপন নিয়ে তারে যেন কি কথা জানায়!
দাঁড়াই নদীর ঘাটে—নদীটিরে ডেকে
বলি একা—
'নদি, তোর এই সুর তারি কি কণ্ঠের
কাছে শেখা?'

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরের দিন সকালে চিনারবাগেই এক সভা হোলো। কাশ্মীর রাজ্যের অন্যতম মন্ত্রী শ্যামলাল শরাফ আমাদের ক্যাম্পে ভাষণ দিতে এলেন। সমস্ত ছেলে মেয়েরা জড়ো হয়েছে ; শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীরা। বক্তৃতা শোনা গেল। তারপর অবকাশ। বিকেলে নিমন্ত্রণ আছে চায়ের জলসায় বক্সী গোলাম মহম্মদের বাড়ী। সেখানে গান বাজনার ব্যবস্থাও আছে।

শ্যামলাল শরাফ বক্তৃতা দিচ্ছেন

কাজেই দিনমানটা আমার পক্ষে ছিল মন্থর। কান্তা যথারীতি রান্নাঘরের তদারক করছে দুজন শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে। মোটা কণ্ট্রাকটর বসে বসে সব তদারক করছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শূন্যমনে দেখছি, পিঠের ওপর বিরাট এক চড়।

সঙ্গে সঙ্গে ডান কাঁধের ওপর দুহাত দিয়ে পিছন থেকে হাতখানা ধরে কাঁধের ওপর দিয়ে টেনে পতিরামকে পিঠে এক ঝাঁকানি দিতেই ও চিৎকার করে উঠলো—"হতভাগা বাঙ্গালী মেরে ফেল্লে।"

নামিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বললো "বত্তমীজ, বেয়াদব! আমাদের দেশে মোষের দুধ খেয়ে তাকৎ বেড়েছে না? বাংলার দেড়-পোয়া গরুর দুধ খেলে পেতে এ তাকৎ? জানো শকুন্তলা বহিন্ বাংলার গরু আর আমাদের ছাগল।"

আমি বলি "আর বাংলার ছাগল এখানকার ম্যাষ্টর! যে পরিমাণ দেহের স্থূলতা বাড়ছে তোমাদের মোষের দুধে আর গমে, সন্দেহ হয় বুঝিবা বুদ্ধিতে তোমাদের চেয়েও মোটা হয়ে যাবো।"

শকুন্তলা বলে—"বাঃ দিব্যি ঝগড়া চলে তো আপনাদের!"

পতিরাম বলে, "জান না? আরে ওকে যে আমি ভালবাসি। কাশ্মীরে এসেছি। এতো মুহব্বতের জায়গা। পুরি হালুয়া খাও আর ভালবাসো।"

শকুন্তলা জিভ কেটে গাল লাল করে বলে—"ভাই সাব্, চারধারে ছাত্রছাত্রী, এসব কি বলছেন? শুনতে পাবে যে।"

"আ খেলে যা। যে শুনবে শশুরা শুনুক না। ভালবাসা কি খারাপ জিনিষ নাকি? আমি এই পাজী বাঙ্গালীকে ভালবাসি, ঐ রসুইকরটাকে ভালবাসি, তোমায়, গফ্‌ফারাকে ভালবাসি। তাও সে এতটুকু নয়। এতোখানি এতোখানি ভালবাসি।" বলে দুহাতের পাঞ্জা চওড়া এক করে দেখালো।

বিকেলে সকলেই সাজগোজ করে গেলাম মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীর জলসায়। চিনারবাগেই বক্সী গোলাম মহম্মদের বাড়ী। সুসজ্জিত একখানি বাংলোয় আভিজাত্য আছে, আতিশয্য নেই। বক্সী সাহেব প্রতিদিন বাগানে একটা সময়ে দেড়ঘণ্টা বসেন। সাধারণ লোক যে কোনও নালিশ নিয়ে, আর্জি নিয়ে এইঘণ্টা কাল ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারে। সেই সাধারণের—বসার—বাগানটা পেরিয়ে ভিতরের বাগান-খানায় ঢুকতেই চোখে পড়লো ম্যাগনোলিয়া গাছের সার।

বক্সী সাহেবের গঠন ও মুখশ্রী খাঁটী পাঠান রক্তের আভাস জানায়। শক্ত সুঠাম চেহারা। মনোবলও শক্ত। একসঙ্গে দাঁড়িয়ে বহু ফোটো নিলে ছেলেরা। এক সময়ে এতোগুলি ক্যামেরা ওঁর সামনে ক্লোনষ্ট

সভায় কেউ ধরেনি। যেন ফটো-গ্রাফারের বাজার। খাবার আয়োজন সুস্পষ্ট ও প্রচুর। তারপর কাশ্মীরী গান শোনার ভাগ্য। সেই বাংলার বৈরাগী সুরে হাব্বার গান, লাল দেদের গান। একখানা জোরালো গান শুনলাম, সেখানা গালীবের।

সাবাস তোরে দিইপিয়ালা
শেষ হয়ে তুইবুঝতে দিলি
অশেষ রসের পাত্র সে-কি
নৈলে তারে চাইতো কে
সাবাস তোরে মস্তশালা
ধুইয়ে দিলি সুরারধারে
মসজিদে যা পাপ করেছি
নৈলে বোঝা বইতো কে
সাবাস আঁখি রক্ত আঁখি
মুদে আসিস নেশার ঘোরে
নয়ন মেলে দেখিযাহা
দেখতে তাহা চাইতো কে
ফেনা বলেই ভাঙ্গলেসে তো
পেয়ালা তোর ঠোঁটের পরে
আমি তো কই ভেঙ্গে ভেঙ্গেও
বলতে নারি "চাই তোকে।"

দ্বিতীয় গানখানা যেন আগুন ঝরানো গান :—

ছুটে আসি দুরন্ত বন্যায়
শান্তির সমতলে তূর্ণ।
যৌবন শক্তি সে কতদিন ?
জানি একদিন হবে চুর্ণ !
ঝর্ণার উৎসের বক্ষে
স্ফীত মোর যাত্রা সে বন্ধুর ;
জীবন সে ডাক দেয়-বারবার,
ডাক দেয় হাতছানি সিন্ধুর ॥

ফটোগ্রাফ্যের বাজার

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির জলসা

ছুটে যাই উন্মাদ, দৃকপাত
কিছু নাই বাধা কোনো বন্ধ,
পথ মোর রক্তেতে পিচ্ছিল,
গতি মোর দুরাশায় অন্ধ।
হানি হানি চন্দ্রাসু বৃষ্টি,
ছুটে যাই নব পথ সৃষ্টি,

বিশ্রাম নাই মোর, চাইনা ;
অতন্দ্র সন্ধানী দৃষ্টি।
এখনও এখনও আছে যৌবন,
আছে রোষ, আছে ক্ষোভ গর্জন ;
মর্মে ব্যগ্র উৎকণ্ঠা
শুনিতে সবার হৃদ স্পন্দন।
শান্ত সে গম্ভীরের বক্ষে

নিদ্রিত আছে কত শুক্তি
সেথা নব মুক্তার মাল্য
লভিব, পাইব নব মুক্তি ॥
বিশাল বিপুল সেই গর্জন
বুকে তার গভীরের স্পন্দন
শোনে মোর বক্ষের ক্রন্দন
তারি লাগি মত্ত এ ভাবাবেশ।
বন্যা আমি যে মহাবন্য
ছিঁড়ে নিয়ে নামি যে অরণ্য
বুকে তবু আশা মোর ধন্য
সাগরের বুকে মোর সব শেষ ॥

বক্সি গোলাম মহম্মদ

এটা কোরাসে গাইলো। প্রথমে একজন পুরুষ, তারপর পুরুষ আর মেয়ে মিলে। মীর্জা গোলাম হাসান বেগ, আধুনিক কাশ্মীরের কবি, তাঁর নিজের দেওয়া সুর। কবিকে প্রণতি জানালাম।

কাশ্মীরের নব পর্য্যায়ে যে সব কবি এসেছেন তাদের কাব্য আলোচনা করার অবসর পরে পাবো। কিন্তু এই কাব্য আলোচনার সূত্রপাত হোলো এই সন্ধ্যার সভায়। গোলাম হাসান বেগের [illegible] শোনার পর এই আধুনিক কবিদের রচনার প্রতি একটা [illegible] জন্মালো। এখানেই ভাব হোলো আমাদেরই দলের পারসী—আরবীর প্রফেসর মজিদের সঙ্গে। কথা রইলো পাহালগ্রামে তাঁর সঙ্গে এই আলোচনা করবো। ভদ্রলোক আসল কাশ্মীরী জানেন। তাই কাশ্মীরী কাব্য এঁর কাছে জানার সৌভাগ্য পরে হয়েছিল।

বীণা নয়, অদ্ভুত এক যন্ত্র দেখলাম কাশ্মীরে, বাজনাও শুনলাম। নাম সন্তুর। চৌকা কাঠের বাক্সের মতো। আকারে যেন ট্রাপিজিয়ম। তার ওপর ঘন সন্নিবিষ্ট তার, ওপরে নীচে চাবী দিয়ে বাঁধা। প্রথমটা পুরো লম্বা, পরেরটা তার চেয়ে ছোটো শেষটা একেবারে ছোটো, এমনি একসার। ঠিক তার উল্টো ভাবে সাজানো অমনি ছোট থেকে বড় তার। বাঁধারে ওপরের সারের বড় তার, তো নীচের সারের ছোটো তার। ডান ধারের ওপরের সারের ছোটো তার, তো নীচের সারের বড় তার। এই বাক্স কলমের মতো কাঠির সাহায্যে দুহাতে দুটো কাঠি দিয়ে বাজায়। কাঠিটার ডগা অর্দ্ধচন্দ্রের মতো বাঁকা। খুব কাছে থেকে বাজলেও বেশ স্পন্দ, রণন আর মূর্চ্ছনা আছে। গমক নেই। কিন্তু নরম ভাবালু গানের সঙ্গেও যেমন, জোরালো অগ্নিস্রাবী গানের সঙ্গেও তেমন, সমান জোরে চলে।

আমাদের ছেলে মেয়েরাও গান গাইলো, আবৃত্তি করলো। জলসা জমলো খুব। মেয়েরা বলে বসলো, "আমরা মন্ত্রী সাহেবের বাড়ী এলাম, তাঁর বাড়ীর লোকের সঙ্গে ভাব করবো।"

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা ভিতরে ঢুকে গেলো। অমন অমায়িক আর সরল লোক কি করে রাজনীতি করেন আমার ভাবতে কষ্ট হোলো।

পরশু পাহালগাম যাবো। আজ সন্ধ্যায় কেবল ঘোরা। আমি কেন জানিনা সব দল থেকে আলাদা হয়ে গেছি। বেণু, অসিত, জগজীবন, মনোরমা সকলে দল বেঁধে গেছে প্রথম চিনারবাগে, সন্ধ্যায় বেরুবার মতো সাজপোষাক আনতে। আমায় বলে গেছে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে। আমার উচিত ছিল অপেক্ষা করা। কিন্তু অজ্ঞাতে কখন পা চলতে সুরু করেছে। চলতে চলতে কোথায় চলে গেছে কোনও খবর রাখেনি। প্রতিপদের সন্ধ্যা। প্রথম দিকটা অন্ধকার। একটা জায়গায় দেখলাম অনেক বাড়ী ঘর দোর পুড়ে গেছে। কবে হয়তো আগুন লেগেছিল। আমি ঝিলমের বাঁধ কতদূর—কোথায় হেঁটে গেছি জানিনা। এক সময় মনে হোলো পথ ভুলেছি। পথে আলো নেই। বিরাট বিরাট চিনারে ঢাকা পথ। তাতে পথ আরও নিবিড়, আরও অন্ধকার। বহুক্ষণ হাঁটার পর পথঘাট যখন বেশ নির্জন বোধ হতে লাগলো তখন একজনকে জিজ্ঞাসা করে পথ জেনে নিলাম। খানিকটা হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ বুঝলাম পাশে কে যেন হাঁপাতে হাঁপাতে আমায় ধরলো। চমকে বললাম—"তুমি?"

"পথে তো আর চেঁচাতে পারি না। অনেক দূর থেকে দেখেছি। তারপর ছুটতে ছুটতে আসছি আপনাকে ধরবো বলে।"

"একা নাকি? একা কেন? আর কেউ নেই সঙ্গে?"

"[illegible]।"

"কোথায় গেল?"

"কাটিয়ে পালিয়ে এলাম।"

শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "কেন? কে ছিল?"

"কে ছিল বলবোনা ; আপনি অনুমান করে নেবেন। আমি মোড়ের মাথায় অপেক্ষা করছিলাম। তিনি পান কিনতে ফুটপাতের ওপারে গিয়েছিলেন। আমি দেখলাম আপনি একা একা আপন মনে চলেছেন। তাড়াতাড়ি ছুট মেরে এই অন্ধকার পথটায় ঢুকে পড়লাম। অন্যায় করেছি? রাগ করলেন?"

"রাগ করিনি, কিন্তু অন্যায় করেছো।" কণ্ঠে রূঢ়তা।

"কি অন্যায় করলাম?" চমকে জিজ্ঞাসা করে।

"যেখানেই গোপন, সেখানেই প্রতারণা, সেখানেই পাপ। সত্য স্বয়ং প্রকাশ। প্রকাশ্যে যাকে আনতে ভয় পাও তা পাপ।" বিরক্তি চাপতে পারিনি।

"কিন্তু আমি জানতাম আমি আপনার কাছে এলেই পাপ থেকে দূরে থাকবো।" মিষ্টি গলা। নরমই নয়, ভিজেও।

"আর তা হয় না। আমার কাছে এলে শান্তি পেতে পারো, শাড়ী তো পাবে না, দুল তো পাবে না, লাল রংয়ের কাশ্মীরী কাজ করা জুতো তো পাবে না।" ইচ্ছে করে শক্ত করে করে চিবিয়ে বলি।

ও যেন চমক খায়। একটু থেমে বলে—"আপনি আমার সম্বন্ধে আর কি জানেন বলুন।"

আমি তো গুপ্তচর নই ; পুলিশও নই। তবু অনেক কিছুই জানি। শুধু জানিনা—এতো জেনে শুনেও, এতো ভাল হয়েও তুমি আত্মবিক্রয় করছো কেন?"

"আত্মবিক্রয়?" ধরা পড়ার মতো আঁতকে বলে উঠলো।

"হ্যাঁ। মাঝ রাতে কাঠের গাদায় বসে কাঁদতে কার ভাল লাগে। মত্ত পুরুষকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে অন্যপুরুষের কাছে আশ্রয় চাওয়াই বা কার ভাল লাগে?"

"আর কি জানেন আপনি?" রুদ্ধস্বরে বলে কান্তা।

"আর? আর জানি যে তুমি ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছো কিন্তু পাহালগাম ঘুরে না আসা পর্য্যন্ত যেতে পারছোনা—কারণ সর্ত্ত আছে।"

"চাইছিলাম যেতে, আর যাবো না।"

"কেন?"

"কষ্ট হলে আপনার কাছে আসবো।"

"না। আসবে না। আমি অত্যন্ত দুর্বল এবং ভীরু। সৎ নামের লোভ আছে ; অসৎ নামে ভয় আছে। সাধুত্বের ভড়ং আছে, শক্তি নেই। স্ত্রী সংসার আছে ; গৃহস্থ আমি। আমার ঝামেলা পোয়াবার সামর্থ্যও নেই সাহসও নেই।"

"তবে আমায় অমন শ্যেন দৃষ্টি দিয়ে দেখেন কেন?"

"খাঁচায় পোরা হরিণ আর বাঘ একই দৃষ্টি নিয়ে দেখি, গণ্ডার আর
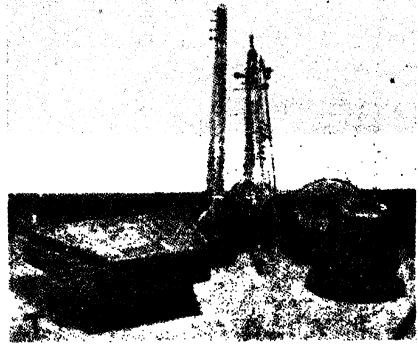
কাশ্মীরের বাজনা

সাপ একই দৃষ্টি নিয়ে দেখি ; সে দৃষ্টি কি জানো? করুণা। কত স্বাধীন থাকতে পারতো এরা! মানুষের খেয়াল খুশীর দাদন জোগাতে আজ এরা বন্দী। একে তুমি শ্যেন দৃষ্টি বলো?"

বড় রাস্তায় পড়ে কান্তা হঠাৎ মোড় ফিরে হন্ হন্ করে এগিয়ে চলে গেল। বুঝলাম আমায় মুক্তি দিয়ে গেল। কিন্তু কি সত্যই দিয়ে গেল?

বেণু যদি রাতে প্রশ্ন করে জবাব পেয়ে থাকে, অসিত যদি বেণুকে বলে থাকে দাদার মন কেমন করছে বৌদির জন্য, অন্যায় করেনি।
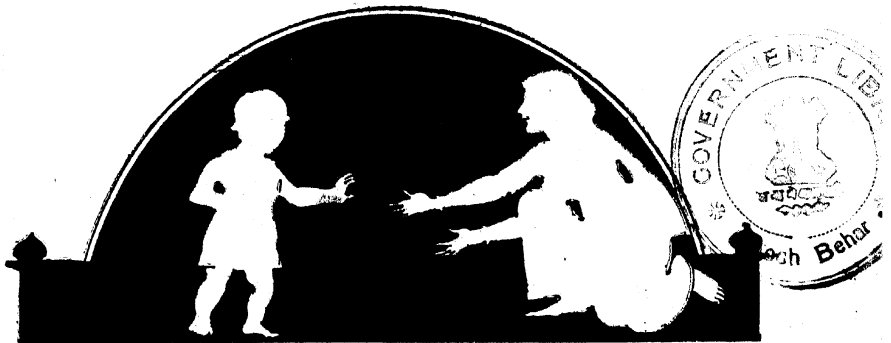
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সাধুভাষার পাশাপাশি চলতি ভাষার রচনা ক্রমশ বাড়্তে থাকে। অচিরে এমন অবস্থা দেখা গেল যখন "যাইতে যাইতে পড়িয়া গিয়া লাগিয়াছিল বলিয়া রোদন করিয়াছিলাম"—ধরণের সাধুভাষার অসমাপিকা ক্রিয়াপদের ব্যবহারবহুল গদ্য আধুনিক শিক্ষিত মনে বিতৃষ্ণার উদ্রেক করতে লাগল। সাধুভাষার ঐ রঙ্গানুকৃতিটি পরম শ্রদ্ধেয় দিলীপকুমার রায় মহাশয়ের রচনা। নাটকে গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল সকলেই মধুসূদনের অনুকরণে ও অনুসরণে কথ্যভাষা ব্যবহার করে যাচ্ছিলেন। এই সাহিত্যিক চলতি ভাষায় তৎসম শব্দের সংখ্যা ছিল প্রচুর; কিন্তু করিলাম, করিয়া এ সবের বদলে করলাম, করলেম, করলুম, করে—তাঁহারা, আমাদিগের প্রভৃতির স্থানে তাঁরা, আমাদের—বাহিরে, নিকটে বাদ দিয়ে বাইরে, কাছে—এই সব মৌখিক ভাষায় ব্যবহৃত পদ গৃহীত হল। রাজধানী বলে কলকাতা ও তার চার পাশের এলাকার ভাষা সর্বত্র স্বীকৃত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বৈশিষ্ট্য অভিশ্রুতির প্রয়োগ সাহিত্যিক কথ্যভাষায় আরো বেড়ে গেল। বিশুদ্ধ কথ্যভাষা লেখার ইচ্ছায় কেউ কেউ ভিতরে, উপরে, ঘিরে, বিকাল শব্দগুলির পরিবর্তন করে ভেতরে, ওপরে, ঘেরে, বিকেল রূপে লিখ্তে আরম্ভ করলেন। চব্বিশ পরগণা অঞ্চল বা দক্ষিণবঙ্গের মৌখিক ভাষার প্রভাবে, স্বরধ্বনি—আ ও—ই ক্রমশ—এ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হল অনেক ক্ষেত্রে। এই নতুন "কলকেতিয়া" চলতি ভাষায় বিবেকানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতি অনেক শক্তিশালী লেখক উচ্চ চিন্তাসমূহ সার্থকভাবে লিপিবদ্ধ করতে লাগলেন। ১৯০০ সালে বিবেকানন্দ "বাঙ্গালা ভাষা" প্রবন্ধে লিখ্লেন :—

"চলতি ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য, গবেষণা মনে মনে কর? তবে লেখ্বার বেলা ও একটা কি কিম্ভুতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন, বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে-ভাষা কি দর্শন, বিজ্ঞান লেখ্বার ভাষা নয়? যদি না হয় তো নিজের মনে এবং পাঁচ জনে ও সকল তত্ত্ববিচার কেমন করে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ, ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষায় যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন তেমন কোন তৈরি ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে যেন সাফ্ ইস্পাত, মুচ্ড়ে মুচ্ড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে সেই—এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা সংস্কৃতর গদাই লস্করি চাল—ঐ এক চাল—নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে।

"যদি বল, "ও কথা বেশ; তবে বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্টি গ্রহণ করব?" প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়্ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ এক কলকেতার ভাষা। পূর্ব পশ্চিম যে দিক হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি, সেই ভাষাই লোকে কয়। তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্ ভাষা লিখ্তে হবে। যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে, তত পূর্ব পশ্চিমি ভেদ উঠে যাবে এবং চট্টগ্রাম হতে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত ঐ কলকেতার ভাষাই চলবে। কলকেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হয়ে যাবে। বুদ্ধিমান অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন। গ্রাম্য ঈর্ষাটিকেও জলে ভাসান দিতে হবে।"

বিবেকানন্দ নিজে তাঁর বাংলা গদ্য রচনায় ঐ প্রবন্ধে সমর্থিত আদর্শই গ্রহণ করেছিলেন। সেই জন্যে তিনি প্রথম শক্তিশালী চলতি ভাষার প্রবর্তন বাংলা গদ্য সাহিত্যে যাঁরা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম এবং ১৯০২ সালে তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত কথ্যভাষার শ্রেষ্ঠ লেখক। তাঁর পুরুষালি ভাষায় "বসুধৈব কুটুম্বকম্" নীতিই গৃহীত হয়েছিল। প্যারীচাঁদ-বঙ্কিমচন্দ্রের মতো তিনিও দরকার হলেই প্রচুর ফার্সি শব্দ যথার্থভাবে প্রয়োগ করেছেন। তার জন্যে তাঁর ভাষার শক্তি ও শ্রীর সঙ্গে গতি ও অব্যর্থতা খুব বেড়ে গেছে। এখানে একটু নমুনা দেওয়া হল। আরো বেশি উদাহরণ পাওয়া যাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, পরিব্রাজক এবং ভাববার কথা বই তিনটিতে।

"লক্ষ্ণৌ শহরে মহরমের ভারি ধুম। বড় মসজেদ ইমামবারায় জাঁক-জমক রোশ্নির বাহার দেখে কে! বেসুমার লোকের সমাগম। এ

দর্শকবৃন্দের ভিড়ের মধ্যে দূর গ্রাম হতে দুই ভদ্র রাজপুত তামাসা দেখতে হাজির। ঠাকুর সাহেবদের, যেমন পাড়াগেঁয়ে জমিদারের হয়ে থাকে, বিস্তাস্থানে ভয়েবচ। সে-মোসলমানি সভ্যতা, কাফগাকের বিশুদ্ধ উচ্চারণসমেত লক্ষরি জবানের পুষ্পবৃষ্টি, আবাকাবাচোস্ত পায়জামা, তাজ-মোড়াসার রঙ্গবেরঙ্গ শহরপসন্দ্ ঢঙ্ অতদুর গ্রামে গিয়ে ঠাকুর সাহেবদের স্পর্শ করতে আজো পারে নি। কাজেই ঠাকুররা সরল, সিধে, সর্বদা স্বীকার করে জমামরদ কড়াজান আর বেজায় মজবুত দিল্।"

এই গদ্যরচনায় ফার্সির প্রয়োগ লক্ষ্য করার বিষয়। ইসলামি সংস্কৃতি প্রসঙ্গে ফার্সি শব্দাবলীর এই ব্যবহার সুসঙ্গত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যে, স্বনামধন্য মুসলমান গদ্যলেখক মির মশর্‌রফ্ হোসেন মরহুম ১৮৬৯ সালে "রত্নবতী" আর ১৮৮৬ সালে "বিষাদসিন্ধু" নামে যে দুটি বই লিখেছিলেন তাদের কোনটিই স্বামীজির উল্লিখিত রচনার মতো ফার্সিবহুল বাংলায় লেখা নয়। বরং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে হোসেন আদ্যন্ত পরিপ্লুত। এক শ্রেণীর মুসলমান লেখক বাংলা ভাষার উপর উর্দু তথা ফার্সির বাড়াবাড়ি রকমের প্রয়োগ করতে চাইলেও সে-প্রচেষ্টা কার্যকরী হবার কোন সম্ভাবনা নেই। সেকালের মুসলিম লেখকদের শুভবুদ্ধি একালেও অচিরে দেখা যাবে।

ইতিমধ্যে বিবেকানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী এতদুর সফল হয়েছে যে, পূর্ব-পাকিস্থানের রাজধানী ঢাকাতেও খাঁটি পশ্চিমবঙ্গীয় উপভাষার ভিত্তিতে গঠিত কলকাতার কথ্যভাষাই শোনা যাচ্ছে। সেখানে শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান সমাজ কিছু ফার্সিমেশানো যে বাংলাভাষা ব্যবহার করছে, তা কলকেতিয়া কথ্যভাষা। ভবিষ্যতে অন্তত ভাষার ক্ষেত্রে দুই বঙ্গ যে একত্র থাকবে, তার লক্ষণ বেশ স্পষ্ট।

১৯১৪ সালে প্রমথ চৌধুরী চলতি ভাষায় প্রথম সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের আগে ১৮৯১ সালে রবীন্দ্রনাথ "য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি" প্রকাশ করেন। এর ভাষাতে বিশেষ কিছু পরিবর্তন দেখা যায় না। কেবল এর ভাষা থেকে এটা প্রমাণ করা যায় যে, সাহিত্যে যে চলিত ভাষা ব্যবহার করা হবে, তাতে যথেষ্ট পরিমাণে তৎসম শব্দ, সাহিত্যিক কলাকারু ও প্রয়োগ কৌশল অবাধে স্থান লাভ করতে পারবে। রবীন্দ্রনাথ ঐ বই এ লিখেছেন :—

"মানুষের মতো এত বড় একটা উন্নত জীব যে সহসা এতটা উৎকট দুঃখ ভোগ করে, তার একটা মহৎ নৈতিক কিংবা আধ্যাত্মিক কারণ থাকাই উচিত ছিল ; কিন্তু জলের উপরে কেবল খানিকটা ঢেউ ওঠার দরুণ জীবাত্মার এত বেশী পীড়া নিতান্ত অন্যায় অসঙ্গত এবং অগৌরবজনক বলে বোধ হয়। কিন্তু জাগতিক নিয়মের প্রতি দোষারোপ করে কোন সুখ নেই, কারণ সে-নিন্দাবাদে কারো গায়ে কিছু ব্যথা বাজে না এবং জগৎরচনার তিলমাত্র সংশোধন হয় না।"

১৯১৪ সালের আগে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি বহু গদ্যলেখক নানা রচনার দ্বারা বাংলা গদ্যের পরিমাণ যেমন বাড়িয়ে দেন, নানা স্তরের সাধুভাষাও তেমনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৭৮-১৯১৪ সময়ের মধ্যেই একদিকে সাধুভাষায় পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ, উপন্যাস ও গল্প-সাহিত্যে কথোপকথন বাদে অবশিষ্ট অংশ রচনা এবং অন্যদিকে চলতি ভাষায় প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প, নাটক সর্বাংশে আর সাধুভাষায় লেখা কথাসাহিত্যের কেবল কথোপকথন-অংশ রচনা চলতে থাকে। এই সময়ে কথ্যভাষার প্রসার ও প্রভাব, সাধুভাষার উপর বিস্তৃত হয় এবং সাধুভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্র ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসতে থাকে। ১৯১৪ সাল থেকে সাহিত্যের সকল অঙ্গে তো বটেই, জীবন ও রচনার অন্য সব ক্ষেত্রেও কথ্যভাষা ক্রমাগত প্রাধান্য বাড়িয়েই চলেছে।

১৯১৫ সালের আগে রবীন্দ্রনাথ সাধুভাষার গদ্যের ধারাটির যথোচিত চর্চা ও উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন। ১৯১৫ সালে "ঘরে-বাইরে" উপন্যাসে তিনি তাঁর গদ্যে চলতি ভাষার আশ্রয় পাকাপাকিভাবে নিলেন। অসামান্য প্রতিভার শক্তিতে তিনি চলতি ভাষায় গদ্য রচনার কাজে প্রমথ চৌধুরী এবং অন্য সবাইকে চোখের নিমেষে ছাড়িয়ে গেলেন। "সবুজপত্র"—প্রতিষ্ঠাতা প্রমথ চৌধুরীর রচনার তুলনায় রবীন্দ্রনাথের চলতি ভাষার রচনাবলী সাহিত্যগুণে অনেক বেশি উন্নত।

ঘরে-বাইরে লেখার আগেও রবীন্দ্রনাথ চলতি ভাষায় অনেক লেখাই লিখেছিলেন। কিন্তু এই উপন্যাসে তাঁর ভাষার রীতি একেবারে বদলে গেছে। তার অনুরূপ ভাষায় এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ কথা বলতে পারত না। তবু তাকে কথ্যভাষাই বলতে হবে। পরে এর উদাহরণ দেওয়া হল :—

"মা গো! আজ মনে পড়্ছে তোমার সেই সিঁথের সিঁদুর, চওড়া সেই লালপেড়ে শাড়ি, সেই তোমার দুটি চোখ—শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর। সে যে দেখেছি আমার চিত্তাকাশে ভোরবেলাকার অরুণ-রাগরেখার মতো। আমার জীবনের দিন যে সেই সোনার পাথেয় নিয়ে যাত্রা করে বেরিয়েছিল। তার পরে? পথে কালো মেঘ কি ডাকাতের মতো ছুটে এল? সেই আমার আলোর সম্বল কি এক কণাও রাখ্‌ল না? কিন্তু জীবনের ব্রাহ্ম মুহূর্তে সেই যে উষাসতীর দান, দুর্যোগে সে ঢাকা পড়ে, তবু সে কি নষ্ট হবার?"

এর দুবছর পরে রবীন্দ্রনাথ "তপস্বিনী" (১৯১৭) গল্পে আবার ১৮৯৫ সালের মতো চতুর্থ স্তরের সাধুভাষায় মাত্র একবারের জন্যে ফিরে যান। তারপর তিনি কথ্যভাষাতেই তাঁর গদ্যের চরমোৎকর্ষ সাধন করেন। তা দেখা গেল "শেষের কবিতা" উপন্যাসে। এর ভাষায় শাণিত বুদ্ধির যে বিদ্যুজ্জ্যোতি দেখা গেল, আজ পর্যন্ত চলতি ভাষার সাহিত্যে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন নিদর্শন লিপিবদ্ধ হয়নি :

"অমিত বলে, ফ্যাশানটা হল মুখোশ, স্টাইলটা হল মুখশ্রী। ওর মতে যারা সাহিত্যের ওমরাও দলের, যারা নিজের মন রেখে চলে, স্টাইল তাদেরই। আর যারা আমলা দলের, দশের মন রাখা যাদের ব্যবসা, ফ্যাশান তাদেরই। বঙ্কিমি স্টাইল বঙ্কিমের লেখা বিষবৃক্ষে, বঙ্কিম তাতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন ; বঙ্কিমি ফ্যাশান নসিরামের লেখা "মনোমোহনের মোহনবাগানে" ; নসিরাম তাতে বঙ্কিমকে দিয়েছে মাটি করে।...অক্সফোর্ডের বি, এ,-র মুখে এসব

কথা শুনতে আমার ভালো লাগে। কেন না, আমার বিশ্বাস, আমার লেখার স্টাইল আছে—সেই জন্যেই আমার সকল বইএরই এক সংস্করণেই কৈবল্যপ্রাপ্তি, তারা "ন পুনরাবর্তন্তে।"

এর মধ্যে ইংরেজি, ফার্সি, সংস্কৃত সব শব্দই অবাধে অসংকোচে আশ্রয় পেয়েছে। এই হল গুণে সেরা ভাষা—যাতে প্রয়োজন হলে ভাব প্রকাশের গরজে যে কোন বিদেশি শব্দকে আহ্বান করা যায়। অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য না হলে তৎসম, ভগ্নতৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শ্রেণীনির্বিশেষে যে কোন শব্দই এই কথ্যভাষার দরবারে আসন সংগ্রহ করতে পারে। "শেষের কবিতা" (১৯২৮) উপন্যাসের প্রায় দশবছর পরে লিখিত দিলীপকুমার প্রণীত "তরঙ্গ রোধিবে কে?" (১৯৩৮) উপন্যাসের ভাষায় দেখা যায়:—

"হয়েছে কি, বলতও, এখানে ভাবকে কানের কাছে এত বেশি মাশুল দিতে হল যে, শ্রুতির দেউড়ি পেরিয়ে অন্তরের অন্দরমহলে পৌঁছতে পৌঁছতে সে প্রায় দেউলে। কিন্তু চিত্তাকাশে স্ফুরৎ বিদ্যুদ্দামের রাগে মেঘমন্দ্রের তাল দেয় কে?...তথাস্তু! পুত্রপৌত্রাদিক্রমে তোমরা ফুলের ঘায়েই মূর্ছা গিয়ে রসিক নাম কিনে খুশমেজাজে বাহাল তবিয়তে কুহুধ্বনি করো। আমরা চাই জীবনের সিম্ফনি—তাতে শুধু সুস্বরই নয়—সুস্বর বিস্বরে মিলে স্বরসঙ্গতি—হার্মনি। যাতে সবাই অতি সহজেই মঞ্জুল, তাতেই মহতী বিনষ্টিঃ। আমরা চাইব পুষ্পরঞ্জিত কুঞ্জে লাস্যময়ী ঝর্ণার কুলুকুলু ধ্বনি না; ছুটব ব্যাদিতব্যদান দংষ্ট্রাকরাল ধারালো গুহাগহ্বর ডিঙিয়ে পৌঁছতেঃ যেখানে জ্বলছে ছায়ালেশহীন নির্মেঘ গগনচুম্বী তুষারমৌলি।"

এই অংশ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই ভাষা বাংলা মৌখিক ভাষা হলেও এর বহনসামর্থ্য এত বেশি যে, এতে ফার্সি, ইংরেজি, সংস্কৃত বাক্যাবলী, শব্দনিচয় ও পদাংশ, তদ্ভব ও দেশজ শব্দসমষ্টির সঙ্গে অনায়াসে একত্র ঠাঁই পায়। এই চলতি ভাষার প্রধানতম যোগ্যতা এই যে, এর সর্বনাম, ক্রিয়াপদ, অব্যয় ও দুএকটি প্রয়োগ-রীতি অক্ষুণ্ণ রেখে এতে যে কোন ধরণের শব্দ অনায়াসে নেওয়া যায়। একই অর্থদ্যোতক তৎসম ও তদ্ভব শব্দ দুটির মধ্যে যে কোনটিকে অথবা দুটিকেই যথাক্রমে নেওয়া চলে, কোন অসুবিধা হয় না। সুতরাং এর স্থিতিস্থাপকতা প্রায় সীমাহীন।

নাটকের সংলাপে এই কথ্যভাষার ভারবহনক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় সবচেয়ে ভালোভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায়। তাঁর ভাষার চেয়ে উৎকৃষ্ট সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ সংলাপের ভাষা বাংলা নাট্যসাহিত্যে কেউ আজ পর্যন্ত রচনা করতে পারেননি। এই ভাষায় প্রচুরতর তৎসম শব্দ চলতি ভাষার ক্রিয়াপদের সঙ্গে সুন্দর মানিয়ে গেছে। তাঁর নাটকে নাট্যকারের বিবৃতি অবশ্য সাধুভাষাতেই লেখা।

"স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ভালবাসার সম্বন্ধ। সে যেমন-তেমন ভালবাসা নয়। যে ভালবাসা প্রিয়জনকে দিন দিন হেয় করে না, দিন দিন প্রিয়তম করে, যে ভালবাসা নিজের চিন্তা ভুলে যায়—আর তার দেবতার চরণে আপনাকে বলি দেয়, যে ভালবাসা প্রভাতসূর্যরশ্মির মতো যার উপরে পড়ে তাকেই স্বর্ণবর্ণ করে দেয়, ভাগীরথার বারিরাশির মতো যার উপর পড়ে তাকেই পবিত্র করে দেয়, দেবতার বরের মতো যার উপর পড়ে তাকেই ভাগ্যবান্ করে—এ সেই ভালবাসা...চেয়ে দেখ, ঐ রৌদ্রদীপ্ত গিরিশ্রেণী, দূরে ঐ ধূসর বালুস্তূপ। চেয়ে দেখ, ঐ পর্বতস্রোতস্বতী যেন সৌন্দর্যে কাঁপছে।"

বহুগুণসমৃদ্ধ এই চলতি ভাষাকে প্রাপ্য মর্যাদা দেবার জন্যে প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮—১৯৪৬) যখন ১৯১৪ সালে "সবুজপত্র" প্রকাশ করলেন, তখন ঐ পত্রিকার সব রচনাই যদিও খাঁটি চলিত ভাষায় লেখা ছিল না, তবু কথ্যভাষায় লিখিত যে পরিমাণ রচনাবলী এতে প্রকাশিত হয়েছিল, তার জন্যেই বহু প্রাচীনপন্থী সমালোচক এই পত্রিকার বিরুদ্ধে দাঁড়ান। অনেকদিন পরেও মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮—১৯৫২)-এর মতো নাম-করা সমালোচকও এই অভিমত প্রকাশ করেন:—

"একদিন রবীন্দ্রনাথ ভাষার একটা রীতিবৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন—সবুজপত্র তাহার বাহন হইয়াছিল; শুধু বাহন নয়, ভাষার সংস্কারকার্যে ব্রতী হইয়া রীতিমতো আন্দোলন সুরু করিয়াছিল।...বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে "সংস্কৃত" ও "পণ্ডিতি" ইত্যাকার গালি বর্ষিত হইতে লাগিল; ইহাদের প্রধান আপত্তিই যেন এই যে, ভাষার ভিতরেও ব্রাহ্মণের আধিপত্য থাকিবে কেন?...সাধুভাষার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন নিতান্তই আক্রোশমূলক বলিয়া মনে হয়। ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের একটা অকারণ বিরাগ ছাড়া ইহার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।"

বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের উপস্থাপিত যুক্তিসমূহ মোহিতলাল খেয়াল রাখেন নি। একমাত্র বিবেকানন্দের বক্তব্যের দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, মোহিতলালের আপত্তি সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। তা ছাড়া, সাধুভাষাপন্থীদের মনে চলতি ভাষা ও তার সমর্থকদের সম্বন্ধে বরাবর যে বিরাগ দেখা গেছে, চলতি ভাষার পন্থীদের মনে সে-রকম কিছু কখনও দেখা যায় নি। মোহিতলালের মতো আরো অনেকের তীব্র আপত্তি প্রবল বাতাসে তৃণের মতো উড়িয়ে দিয়ে চলতি ভাষা গোঁড়া ও রক্ষণশীল পত্রিকাগুলিতেও স্থান সংগ্রহ করে নিল। সাধুভাষার লেখকদের মধ্যে ক্রমশ কথ্যভাষায় লেখার প্রবণতা দেখা গেল। পরম কৌতুকের বিষয় এই যে, স্বয়ং মোহিতলাল মৃত্যুর কিছুকাল আগে প্রচারিত এক বেতার-বক্তৃতায় চলতি ভাষার ব্যবহার করেন। এ থেকে বোঝা গেল, এ যৌবনজল-তরঙ্গ রোধ করার ক্ষমতা কারো নেই।

চলতি ভাষায় সুন্দররূপ রচনাশক্তি যে কত বেশি, তার নিদর্শন দেওয়া যাক "চার ইয়ারি কথা" থেকে; বীরবল শুধু বাকচাতুর্য নয়, বাক্‌সৌন্দর্যও রচনা করতে জানতেন; তার প্রমাণ ১৯১৫ সালের এই ভাবময় সুষমামণ্ডিত বর্ণনায় পাই:—

"মানুষের চোখে এমন জ্যোতি আমি জীবনে আর কখনও দেখি নি। সে-আলো তারার নয়, চন্দ্রের নয়, সূর্যের নয়—বিদ্যুতের। সে-আলো জ্যোৎস্নাকে আরো উজ্জ্বল করে তুললে, চন্দ্রালোকের বুকের

ভিতর যেন তাড়িত সঞ্চারিত হল। বিশ্বের সূক্ষ্ম শরীর সেদিন এক মুহূর্তের জন্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ হয়েছিল। এ-জড়জগৎ সেই মুহূর্তে প্রাণময়, মনোময় হয়ে উঠেছিল।...আমি আমার সঙ্গিনীর দিকে মুখ ফেরালুম। দেখি, কিছুক্ষণ আগে যে-চোখ হীরার মতো জ্বলছিল, এখন তা নীলার মতো সুকোমল হয়ে গেছে; একটি গভীর বিষাদের রঙে তা স্তরে স্তরে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে; এমন কাতর, এমন করুণ দৃষ্টি আমি মানুষের চোখে আর কখনও দেখিনি। সে-চাহনিতে আমার হৃদয়-মন একেবারে গলে উথলে উঠল। আমি আস্তে তার একখানি জ্যোৎস্নামাখা হাত আমার হাতের কোলে টেনে নিলুম; সে-হাতের স্পর্শে আমার সকল শরীর শিহরিত হয়ে উঠল, সকল মনের মধ্য দিয়ে একটি আনন্দের জোয়ার বইতে লাগল। আমি চোখ বুজে আমার অন্তরে এই নব-উচ্ছ্বসিত প্রাণের বেদনা অনুভব করতে লাগলুম।"

দেখা গেছে যে, বিদ্যাসাগরের ভাষার তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা সঙ্গীতময়। এই মনোরম সঙ্গীতছন্দ মৌখিক ভাষার গদ্যেও যে শোনা যায়, তার সহস্র প্রমাণ আছে। আধুনিক বাংলা গদ্যে। একটি উদাহরণ দেখা যাক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫২) বিরচিত শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধাবলী থেকে :—

"বর্ষার মেঘ নীল পায়রার রং ধ'রে এল, শরতের মেঘ সাদা হাঁসের হাল্‌কা পালকের সাজে সেজে দেখা দিলে, কচি পাতা সবুজ ওড়না উড়িয়ে এল বসন্তে, নীল আকাশের চাঁদ রূপের নূপুর বাজিয়ে এল জলের উপর দিয়ে, কিন্তু এদের এই অপরূপ সাজ দেখবে যে সেই মানুষ এল নিরাভরণ, নিরাবরণ।"

এর তুলনা সাধুভাষায় বিরল। এর পর যদি কেউ বলেন, চলতি ভাষায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে না, তাহলে বুঝতে হবে, এখানে রুচির তারতম্যই সত্যের স্বীকৃতি দানে প্রতিবন্ধক, অন্য কোন কারণ নয়।

বাঙালি মুসলমানের লেখা চলতি ভাষাতেও যে কি পরিমাণ তৎসম শব্দ থাকতে পারে, তার একটু নজির দেখলে বোঝা যাবে যে, চলতি ভাষাতেও সাধুভাষার প্রকৃত সম্পদ্ সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারের ধ্বনিগাম্ভীর্য অনায়াসে জায়গা করে নিতে পারে। সাধুভাষার সার নির্যাস এইভাবে আত্মস্থ করা কথ্যভাষার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। সৈয়দ মুজতবা আলি লিখেছেন :—

"তাই মনে হয়, যিনি বহু রসের সাধনা আজীবন করেছেন, বৃদ্ধ বয়সে সর্ব রস মিলে গিয়ে তাঁর মনে এক অনির্বচনীয় সামঞ্জস্যের অভূতপূর্ব শান্তি এনে দেয়। অথবা কি দীর্ঘ দিনযামিনী গীতার আসঙ্গ লাভ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই বৈরাগ্যবিজয়ী কর্মযোগে দীক্ষা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, যেখানে মানুষ কর্ম করে অনাসক্ত হয়ে, কেবলমাত্র বিশ্বজনের উপকারার্থে? তাই মনে হয়, সাধনার উচ্চতম স্তরে উত্তীর্ণ হয়েও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্পর্শকাতরতা লোপ পায় নি—লোকমাল্যকে সম্পূর্ণ পুলক স্বহস্তে নিবেদন করতে পারেননি বলে ব্যথিত হয়েছিলেন। কিন্তু সে-বেদনা প্রকাশ করেছেন শোকে আতুর না হয়ে, গাম্ভীর্য এবং শান্ত রসে সমাহিত হয়ে।"

এই রচনা বিষয়ানুগ চলিত ভাষার সংস্কৃত শব্দপ্রিয়তা ও শব্দ-গ্রহণ ক্ষমতার পরিচায়ক।

১৯১৭ সালে প্রকাশিত "বীরবলের হালখাতা"-র "কথার কথা" প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী তাঁর অভিমত এইভাবে ব্যক্ত করেন :—

"আসল কথাটা কি এই নয় যে, লিখিত ভাষায় আর মুখের ভাষায় মূলে কোন প্রভেদ নেই? ভাষা দুয়েরই এক, শুধু প্রকাশের উপায় ভিন্ন। একদিকে স্বরের সাহায্যে, অপরদিকে অক্ষরের সাহায্যে। বাণীর বসতি রসনায়। শুধু মুখের কথাই জীবন্ত। যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই, সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত—কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়। ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ হতে মানুষের মুখে নয়। উল্টোটা চেষ্টা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে।...যে কথাটা নিতান্ত নহিলে নয়, সেটি যেখান থেকে পারো নিয়ে এসো, যদি নিজের ভাষার ভিতর তাকে খাপ খাওয়াতে পারো। কিন্তু তার বেশি ভিক্ষে, ধার কিম্বা চুরি করে এনো না।"

এই প্রবন্ধটি ১৯০২ সালে প্রথম লেখা হয়। এতে স্বামীজির কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর মতের কোন মৌলিক প্রভেদ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, ভাষা যত বেশি লোকের বোধগম্য হবে, ততই ভালো। সেইজন্যে লৈখিক ও মৌখিক ভাষার প্রভেদ স্বীকার করেও তিনি কথ্যভাষার অনুকূলে রায় দিয়ে গেছেন। বিবেকানন্দ ও বীরবলও এক মতের সমর্থক। তবে একটা ব্যাপার বোধহয় চৌধুরী মহাশয় লক্ষ্য করেননি। ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে, এ কথা লাখ কথার এক কথা বটে, কিন্তু ভাষা আবার কলমের মুখে আসে, এ কথা লাখ কথার এক কথা বটে, কিন্তু ভাষা আবার কলমের মুখ থেকে মানুষের মুখে যায়, এ কথারও মার নেই। এ বিষয়ে পরিশিষ্ট অংশে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হবে।

কথ্যভাষায় লেখা সুরু করা মাত্রই যে বাঙালি গদ্যলেখকেরা উপযুক্ত অনুপাতজ্ঞান অর্জন করতে পেরেছিলেন, তা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই চলতি ভাষার লেখা চতুর্থস্তরের সাধুভাষার ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। স্বয়ং বীরবলও ভুল করেছেন; খাঁটি চলতি ভাষায় "নহিলে" অচল; তবুও তিনি ঐ শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ "শেষের কবিতা" উপন্যাসে "ব্যাবসা"-র মত প্রচলিত উচ্চারণদ্যোতক বানানও ব্যবহার করেছেন কেবল মৌখিক ভাষার বিশুদ্ধ রূপ রচনার খাতিরে। বাংলা গদ্যভাষার এই শাখায় এখনও অনেক ভাঙাগড়া চলবে। তারপর এমন একটা মাত্রাজ্ঞান গড়ে তোলা যাবে যার জোরে কোন ভালো লেখকের লেখা আর শুধু যে একটা নির্দিষ্ট অনুপাত থেকে বিচ্যুত হবে না তাই নয়, ঠিক কোন্ অনুপাতে কোন্ জাতের শব্দ আর তার প্রয়োগকৌশল গ্রহণ করতে হবে, সে-সম্বন্ধেও লেখকদের একটা সহজবোধ দেখা যাবে।

ক্রমশ

√শেষ রক্ষা

শ্রীগোপী ভট্টাচার্য

(সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম। বনমালির আসবাবপত্রের ধুলা পরিষ্কার করিতেছে। কলিংবেল বাজিয়া উঠিল। বনমালী দরজা খুলিতে ভুধরবাবু প্রবেশ করিলেন।)

ভূধর। তোমার নামটা কি যেন বললে—

বনমালী। আজ্ঞে, বনমালী। পদবী হোল গে' মালাকার।

ভূধর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বনমালী মালাকার। খাসা নাম বটে তোমার। কিন্তু, তা যেন হোল বনমালী, এখন আমি কি করি বলতো।

বনমালী। আজ্ঞে, আপনার প্রয়োজনটা যদি খুব জরুরী হয়। তাহলে নয় অপেক্ষা করেই যান।

ভূধর। কিন্তু, তুমি যে আবার বলছ, গাঙ্গুলী মশাই কখন ফিরবেন তা বলে যান নি।

বনমালী। আজ্ঞে, সেটা ঠিক। এখুনি ফিরতে পারেন। আবার দু'ঘণ্টা নাও ফিরতে পারেন। তা আপনার কি আসবার কথা ছিল?

ভূধর। আজ সকালেই ফোনে কথা হয়েছে। ছ'টায় আসতে বলেছেন। (হাতঘড়ি দেখিয়া) অবশ্য ছ'টা এখনো বাজেনি। বাকি আছে দু' তিন মিনিট।

বনমালী। তাহলে আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসুন। বাবু ঠিক ছ'টায় এসে যাবেন। একটুও এদিক সেদিক হবে না।

ভুধরবাবু সোফায় বসিলেন। বনমালী পাখা খুলিয়া দিল। নেপথ্যে মোটরের হর্ণ শোনা গেল। বনমালী দ্রুত বাহিরে গেল। রাজীব গাঙ্গুলী ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহার পরিধানে সাহেবী-পোষাক। বয়স ষাট হলেও বেশ স্মার্ট চেহারা।

রাজীব। আপনি...

ভূধর। ভূধর ভট্টাচার্য। সকালে আমিই ফোন করেছিলাম।

রাজীব। নমস্কার—

ভূধর। নমস্কার। আপনাকে দেখছি ছুটির দিনেও কাজে বেরোতে হয়।

রাজীব। সবই ছিল মশাই। ছুটিও ছিল, কাজের মর্যাদাও ছিল। সাদা চামড়ার আমলে ও দুটোর খুবই মূল্য ওরা দিত। এখন সব দিশী মালিক। যদ্দুর পারে খাটিয়ে নেয়।

ভূধর। তা যা বলেছেন। অযোগ্য সরকার হলে যা হয়।

রাজীব। সরকারকে দোষ দেওয়াই আমাদের কাজ। সরকার তো আমাকে আপনাকে নিয়েই। আসলে গলদ আমাদেরই। ন্যায়নিষ্ঠা, শৃঙ্খলতা, ভদ্রতা—এসব কি আর গভর্ণমেণ্ট গিলিয়ে দিতে পারে! নিজেদেরকে শিখতে হবে। তা যদ্দিন না হোচ্ছে, তদ্দিন আমাদের উন্নতির কোন আশাই নেই। যাক্ এসব। এখন বলুন, আমি আপনার জন্ত কি করতে পারি?

ভূধর। আপনি এইমাত্র অফিস থেকে ফিরলেন। একটু নয় ভেতরে গিয়ে বিশ্রাম করে আসুন। আমি অপেক্ষা করি।

রাজীব। না ভূধরবাবু, তার দরকার হবে না। আমি কাজ ভালোবাসি। জীবনে দুটো জিনিস আমার কাছে বড়। কাজ আর সময়। বিশ্রাম তো আছেই। চির বিশ্রাম...

ভূধর। এসব কি বলছেন। আপনি যে রকম সময় ধরে চলেন, তাতে আপনার জীবন খুব দীর্ঘ হবে—সন্দেহ নেই।

রাজীব। ও অভিশাপ আর দেবেন না মশাই। বেশীদিন বাঁচার মত পাপ আর নেই। এখন বাকি কর্ত্তব্য শেষ করতে পারলেই আমার ছুটি।

ভূধর। তার জন্ত এত ভাবছেন কেন গাঙ্গুলীমশাই?

রাজীব। আপনি তো আমার সব জানেননা ভূধর-বাবু। অত্যন্ত দরিদ্র ঘরের ছেলে আমি। কি প্রচণ্ড অধ্যবসায় আর পরিশ্রমের ফলে আজ যাহোক একটু দাঁড়াবার মত ঠাঁই করেছি। স্ত্রী গেছেন সে প্রায় দশ বছর হোল। এক মেয়ে আর এক ছেলে। মেয়ের বিয়ে গত বছর দিয়েছি। ছেলেকেও মানুষ করেছি।

এখন তার বিয়ে দিলেই সব কর্ত্তব্য শেষ হয়। চাকরীও আর বছরখানেক আছে। তারপর বিশ্রাম…হয়ত চির-বিশ্রাম নিতে হবে আমাকে।

ভূধর। সত্যি, আপনাকে দেখে অনেক শেখবার আছে। কাজ আর সময়ের দাম দিতে পারলে মানুষ যে উন্নত হোতে পারে, তার জলন্ত সাক্ষ্য আপনি।

রাজীব। তাহলে, আপনার সাথে আলোচনাটা শেষ করা যাক। ফোনে আপনি যে প্রস্তাব করেছিলেন, তা আমার মনে আছে। সঞ্জয় আমার একমাত্র ছেলে। কদিন হোল জার্মানী থেকে ফিরেছে ডক্টরেট নিয়ে। আপাততঃ কিছুদিন প্রফেসরি করবে ঠিক করেছে।

ভূধর। আমার মেয়েটিকে যদি দয়া করে নেন, তাহলে কৃতার্থ হব আমি। আমারও ওই একমাত্র মেয়ে।

রাজীব। মেয়ে আমি এতদিনে অনেক দেখলাম ভূধরবাবু। আরো অনেকে ধরাধরি করেছেন মেয়ে দেখবার জন্য। কিন্তু একজনকেও আমার মনে ধরছে না। বরং এখনকার মেয়েদের চেহারা দেখে আমার তো আশংকা হোচ্ছে, জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের এঁরাই যদি জননী হন, তাহলে জাতির স্বাস্থ্য বলতে বোধহয় কিছু থাকবে না।

ভূধর। আমার মেয়েকে যদি আপনি একটিবার দেখেন, আশা করি আপনার অপছন্দ হবে না। তবে ফটোও এনেছি। দেখবেন কি ?

ললিতের প্রবেশ। ছিপ্‌ছিপে চেহারার সৌখীন যুবক।

রাজীব। এসো ললিত।

ললিত। মামাবাবু, আমি এলাম আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। জানেন তো বাবাকে ? কি রকম ব্যস্ত-বাগীশ মানুষ ? কিন্তু একি ! আপনি তো এখনো অফিসের ড্রেসেই রয়েছেন। এদিকে সাতটা বাজে।

রাজীব। কার্ত্তন তো সেই আটটায়। তা এত আগে গিয়ে করব কি। (ভূধরবাবুকে) ললিত, আমার ভাগ্‌নে। আজ ওদের বাড়ীতে আসছেন এক নাম-করা কীর্ত্তনীয়া। মানভঞ্জন শোনাবেন। আমারও নিমন্ত্রণ।

ললিত। আরে স্যার যে ! এতক্ষণ লক্ষ্যই করিনি। মামাবাবুর সাথে আপনার পরিচয় আছে তাতো জানতাম না।

রাজীব। কি রকম ! এঁকে তুমি চেনো নাকি ললিত ?

ললিত। বাঃ ! স্কটিশে যে এঁর কাছে আমি পড়েছি।

ভূধর। তোমায় অনেকদিন পরে দেখে খুব আনন্দ হোল ললিত। জানেন গাঙ্গুলীমশাই, ললিত আমার অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র। এখন কি করছ বাবা তুমি ?

ললিত। আস্‌ছে বার আই, এ, এস পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছি।

ভূধর। বেশ ! বেশ ! আশীর্বাদ করি সফল হও। তাহলে আজ আর আপনার সময় নষ্ট করব না গাঙ্গুলী-মশাই। বরং কাল ছ'টার সময় একবার আস্‌বো। মনে রাখবেন একটু আমাকে। চলি বাবা ললিত। আসি গাঙ্গুলীমশাই।

নমস্কার বিনিময় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ভূধরবাবু। ললিত ভূধরবাবুর পায়ের ধুলা লইল।

ভূধর। তুমি তো আমার বাড়ীতে আসা একরকম ছেড়েই দিয়েছ ললিত। বাড়ীতে প্রায়ই বলে তোমার কথা। পারোতো কাল সকালে একবার বেড়িয়ে যেওনা।

ললিত। নিশ্চয়ই যাবো। চলুন স্যার, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

ভূধরবাবু ও ললিতের প্রস্থান

রাজীব গাঙ্গুলী চেয়ারে বসিয়া হাই তুলিতে লাগিলেন। টেলিফোন বাজিল। রাজীব গাঙ্গুলী রিসিভার তুলিয়া কথা বলিতে লাগিলেন—শুধু শেষ কথাটা শোনা গেল।

রাজীব। একটা জায়গায় কথাবার্তা চল্‌ছে। সেখানে একটা কিছু ফাইনাল্ না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে কোন হোপ্‌ আমি দিতে পারলাম না মিঃ মুখার্জী। আশা করি আপনি দুঃখিত হবেন না। ধন্যবাদ।

রিসিভার নামাইয়া রাখিলেন। ললিত আসিল।

রাজীব। শোন ললিত, তুমি এসে দেখছি ভালোই করেছ। ভূধরবাবু এসেছিলেন তাঁর মেয়ের সাথে সঞ্জয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। তুমি তো জানো, এতদিন মেয়ে দেখে দেখে আমি কিরকম টায়ার্ড হয়ে গেছি ?

তাই আগের থেকে ডেফিনিট্ না হোয়ে মেয়ে আর দেখব না ঠিক করেছি। কথায় বুঝলাম, তোমার ও বাড়ীতে যাতায়াত আছে। ভূধরবাবুর মেয়েটি কেমন?

ললিত। চমৎকার! আইডিয়াল! ওরকম মেয়ে লাখে একটা হয় কিনা সন্দেহ। তাছাড়া ভূধরবাবুর মত হ্যাপিফ্যামিলী কোল্‌কাতা শহরে খুব কমই দেখেছি।

রাজীব। তুমি যে দেখছি তোমার প্রফেসরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। যাই হোক, তোমার ওপিনিয়নের ওপর আমার ফেত আছে। তুমি যখন সার্টিফাই করছ তখন ভূধরবাবুর প্রোপোস্যাল্‌টা একসেপ্ট করব ভাবছি। ভদ্রলোককে আমার খুবই ভালো লেগেছে।

ললিত। আমি শুধু ওঁর ছাত্র নই। ছেলের মত।

রাজীব গাঙ্গুলী খস্ খস্ করিয়া একখানি চিঠি লিখিলেন তাহার পর খামে ভরিয়া ললিতের হাতে দিলেন।

রাজীব। তুমি এই চিঠিখানা ভূধরবাবুকে দেবে। আমার মন স্থির করে ফেলেছি। সঞ্জয়ের বিয়ে আমি এখানেই দোব। পরশু মঙ্গলবার পূর্ণিমা। ভূধরবাবুকে বলবে, তিনি যেন ওদিন ছেলে-আশীর্বাদের জন্য তৈরী হয়ে আসেন।

ললিত। কিন্তু মামাবাবু, ফাইনাল্‌ করার আগে মেয়েটিকে একবার নিজের চোখে দেখবেন না?

রাজীব। তার আর আবশ্যক নেই। তুমি সার্টিফাই করছ এতেই আমার দেখা হোয়ে গেছে।

ললিত। কিন্তু সঞ্জয়দা? তার একটা মতামত?

রাজীব। কি বললে ললিত? হোতে পারে এটা বিংশশতাব্দীর মাঝামাঝি। ছেলে কন্টিনেণ্ট্ ফেরত, উচ্চ শিক্ষিত, কিন্তু তার চরিত্র আমি তেমনভাবে গড়িনি যাতে করে আমার মতের ওপর তার কোন অমত থাকতে পারে।

ললিত। কিন্তু তাহলে সঞ্জয়দার যদি কোন···

রাজীব। আমাকে আবার এখুনি তোমাদের বাড়ীতে যাবার জন্যে তৈরী হোতে হবে। আমি যখন নিজের হাতে পাকা কথা লিখেছি, তখন জানবে সঞ্জয়ের বিয়ে এখানেই হবে। তার মতামতে আমার কিছ এসে যাবে না।

রাজীব গাঙ্গুলী বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন। ললিত চিঠিখানি হাতে লইয়া পায়চারী করিতে লাগিল। সঞ্জয়ের প্রবেশ। ধুতি, পাঞ্জাবী পরিহিত সুদর্শন যুবক। মুখে ক্লান্তির ছাপ।

সঞ্জয়। হ্যাল্লো! ললিত যে! কখন এলি?

ললিত। অনেকক্ষণ। তুমি কোথায় গিস্‌লে? খুব টায়ার্ড দেখাচ্ছে?

সঞ্জয়। ইউনিভার্সিটিতে একটু কাজ ছিল। বাবাকে নিতে এসেছিস্ বুঝি?

ললিত। হ্যাঁ। তুমিও চলো না?

সঞ্জয়। আজ নয় ভাই, আরেকদিন যাবো। তা-ছাড়া কেত্তন শোনার বয়স আমার এখনো হয়নি। তোর হাতে কার চিঠি রে ললিত?

ললিত। চিঠি নয়, ফাঁসির পরোয়ানা।

সঞ্জয়। কার?

ললিত। তোমার।

সঞ্জয়। কি রকম? অপরাধী জানিল না বিচার হইয়া গেল···

ললিত। সময়ে সবই জানতে পারবে। আমি কিছুই বলবনা।

সঞ্জয়। ললিত! কি জোক্ করছিস্? সত্যি বলনা, ব্যাপারখানা কি?

ললিত। বললাম তো। চোরের মন বোঁচকার দিকে। তুমি যা ভেবেছো তা তুমি করতে পাবে না। ব্যস্! আর কিছু জানতে চেওনা।

সঞ্জয়। ললিত! প্লীজ্! আমি টু টায়ার্ড! আমাকে আর সাস্‌পেন্সের মধ্যে রাখিস নে। বল আমাকে ভাই। আমার সম্বন্ধে কিছু ব্যাপার কি? আই মীন্ এনিথিং রিগার্ডিং মাই ম্যারেজ্?

ললিত। তুমিও কি আজকাল মামাবাবুর মত জ্যোতিষচর্চা করছ নাকি? মানুষের মনের কথা বেশ ধরতে শিখেছ দেখছি। বেশ, তবে শোন! তোমার বিয়ের কথা একেবারে পাকা হয়ে গেছে। সুতরাং [illegible]ড়ি।

সঞ্জয়। কি বলছিস্ যা তা! বিয়ে করব আমি, আর আমিই তার কিছু জানিনা। যদিও আমার এখনো

বিশ্বাস হচ্ছেনা। কিন্তু যদি তোর কথাই সত্যি হয়, তাহলে বলব এ অত্যন্ত অন্যায়। আমাকে যদি বাবা একটা পুতুল ভেবে থাকেন তাহলে তিনি ভুল করেছেন। আই স্যুড্ প্রোটেষ্ট্। আই মাষ্ট্…

রাজীব গাঙ্গুলী প্রবেশ করিলেন। পরিধানে ধুতি, পাঞ্জাবী কাঁধে পাট করা চাদর। পিছনে বনমালীর হাতে ছড়ি।

রাজীব। চল ললিত। আমি রেডি। ওরে বনমালী, দেখ বাবা গাড়ী বার করেছে কিনা।

বনমালী। আজ্ঞে বাবু, গাড়ী অনেক আগেই বেরিয়েছে।

রাজীব। সঞ্জয় কি এইমাত্র ফিরছ?

সঞ্জয়। (অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে) হ্যাঁ বাবা। কালই প্রেসিডেন্সীতে জয়েন্ করতে বল্‌ছে।

রাজীব। খুব আনন্দের কথা। আচ্ছা, ডিটেলস্ রাতে শুনবো। তোমাকে এখন টায়ার্ড দেখাচ্ছে। যাও রেষ্ট্ নাওগে। (সঞ্জয়ের কাঁধে হাত রাখিয়া) হ্যাঁ, একটা কথা তোমায় জানিয়ে রাখি। পরশু মঙ্গলবার তোমাকে আশীর্বাদ করতে আসবেন। বাড়ীতেই থেকো।

সঞ্জয়। (অসহায়ভাবে) বাবা! তুমি কি একেবারে ফাইনাল্ মানে সেট্‌ল্…

রাজীব। (দৃঢ়ভাবে) বার্লিন থেকে ডক্টরেট নিয়ে এসেছ বলে ভুলে যাচ্ছো কেন—তুমি রাজীব গাঙ্গুলীর ছেলে! ডোণ্ট্ বী সিলি মাই বয়। চল ললিত।

যাইবার মুখে ললিত সঞ্জয়ের প্রতি কটাক্ষ করিল। ইহা রাজীব গাঙ্গুলী দেখিতে পাইলেন না। রাজীব গাঙ্গুলীর সহিত ললিত ও বনমালী প্রস্থান করিল। মোটরের শব্দ শোনা গেল। সঞ্জয় সোফায় বসিল। বনমালী আসিয়া দরজা বন্ধ করিল ও ভিতরে চলিয়া গেল। সঞ্জয় ঘরের আলো নিভাইল।

মঞ্চ অন্ধকার। অল্প পরেই কলিং বেল বাজিল। বনমালী আসিয়া আলো জ্বালিল। দেখা গেল সঞ্জয় টেবিলে মাথা রাখিয়া বসিয়া আছে। বনমালী দরজা খুলিতে শুভ্রা প্রবেশ করিল। তাহার বয়স ২০। অত্যন্ত সুশ্রী আর স্মার্ট মেয়ে। এখন তাহাকে খুবই চঞ্চল দেখা গেল।

শুভ্রা। বনমালী, তোমার দাদাবাবু…

বনমালী ইসারায় দেখাইয়া দিল। শুভ্রা সঞ্জয়ের নিকট অগ্রসর হইল। বনমালী মুচ্‌কি হাসিল। দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

শুভ্রা। (সঞ্জয়ের মাথায় হাত দিল) সঞ্জয়! সঞ্জয়!

সঞ্জয় ধীরে ধীরে মাথা তুলিল। তাহাকে দেখিলেই মনে হয় তাহার উপর দিয়া ঝড় বহিতেছে। সে উদ্‌ভ্রান্তের মত শুভ্রাকে দেখিতে লাগিল।

শুভ্রা। আমাকে আসতে বলেছিলে, দেখ আমি এসেছি। কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারবো না জানো তো? কি হয়েছে সঞ্জয়? কথা বল্‌ছো না যে? শরীর খারাপ?

সঞ্জয় আগের মতই চাহিয়া রহিল। শুভ্রা তাহার মাথা বুকের কাছে টানিল।

শুভ্রা। ওগো! চুপ করে থেকো না! কথা বল?

সঞ্জয় আর নিজেকে স্থির রাখিতে পারিল না। সোজা দাঁড়াইয়া উঠিল

সঞ্জয়। বিদ্রোহ… বিদ্রোহ…

শুভ্রা। কিসের বিদ্রোহ? কার বিরুদ্ধে?

সঞ্জয়। প্রেমকে যারা স্বীকার করে না, মূল্য দেয় না, আমাদের বিদ্রোহ তাদের বিরুদ্ধে। সেই সব বিগত শতাব্দীর অভিভাবকসুলভ মনোবৃত্তিধারী গার্জেনদের বিরুদ্ধে।

শুভ্রা। তোমাকে কেমন এ্যাব্‌নর্মাল্ মনে হোচ্ছে। এমন অস্থির হোতে তোমায় তো কথনো দেখিনি। আমাকে সব খুলে বল সঞ্জয়। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

সঞ্জয়। প্রবল প্রতাপান্বিত পিতৃদেব একটু আগেই আমার ওপর হুকুম জারী করেছেন…পরশু আমার আশীর্বাদ। এ বিষয়ে আমার যে কিছু মতামত থাকতে পারে সেটা তিনি ধর্তব্যের মধ্যেও আনেন নি।

শুভ্রা। ও—এই ব্যাপার? এ তো সুসংবাদ। কোই, তোমার আশীর্বাদে আমাকে আসতে বললে না তুমি?

সঞ্জয়। এটা রসিকতার সময় নয় শুভ্রা। আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হলে আমাদের বেঁচে থাকা মিথ্যে…এটা তুমিও জানো, আমিও জানি।

শুভ্রা। কিন্তু, এর জন্যে এত বিচলিত কেন তুমি?

সঞ্জয়। হবো না? আমাদের জীবনে এর চেয়ে বড় বিপদ আর কি হোতে পারে?

শুভ্রা। স্বীকার করি। কিন্তু তোমার বাবাকে তুমি আগের থেকেই এত ইন্‌কন্সিডারেট ধরে নিচ্ছ কেন?

সঞ্জয়। আমার বাবাকে তুমি জানো না। পৃথিবীর সব কিছুর চেয়ে তাঁর কথার দাম অনেক বেশী।

শুভ্রা। তাঁকে বলেছিলে আমাদের কথা?

সঞ্জয়। তাঁর সামনে কিছু বলার মত স্পর্ধা আমার নেই। আমাকে তুমি সাহস দাও…শক্তি দাও শুভ্রা।

শুভ্রা। একটা কথা বলব?

সঞ্জয়। একটা কেন অনেক বল…

শুভ্রা। দুঃখ পাবে না?

সঞ্জয়। তেমন কিছু বলবে না, তা আমি জানি।

শুভ্রা। তাহলেও আমাকে বলতে হবে। মনে আছে তোমার? বার্লিন যাবার আগে আমায় তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে? ফিরে এসেই আমাকে বিয়ে করবে? আমার মনে হয় তুমি শুধু প্রতিশ্রুতি ভেঙে যাবার ভয়েই এতখানি বিচলিত হয়ে পড়েছ। বল? তাই নয় কি?

সঞ্জয়। আমি আর একজনকে বিয়ে করলে তুমি কি এতটুকু বিচলিত হবে না?

শুভ্রা তলাকার ঠোঁট দাঁতে চাপিয়া প্রচণ্ড আঘাত সামলাইল।
সঞ্জয় শুভ্রার দুই কাঁধে ঝাঁকানি দিল।

সঞ্জয়। তুমি কি আমায় সুবোধ বালকের মত আমার বাবার হুকুম মেনে নিতে বল? শুভ্রা…শু…

শুভ্রা সঞ্জয়ের বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদিল, তাহার পর নিজেকে
সংযত করিল।

শুভ্রা। তোমার বিপদটাই আজ বড় করে দেখছো। এদিকে আমারও যে বিপদ। আজই শুনলাম কোথায় নাকি আমার বিয়ের কথাবার্তা এক রকম ঠিক হোয়ে গেছে।

সঞ্জয়। অভিভাবকদের খেয়াল-খুসির হাত থেকে আমাদের বাঁচতেই হবে।

শুভ্রা। সব কিছুর জন্মেই আমি তৈরী করেছি নিজেকে।

সঞ্জয়। শোন শুভ্রা, পরশু আমার আশীর্বাদ। সে-দিনই আমরা আশীর্বাদ নেব বাবার কাছ থেকে। এসো আমার সঙ্গে। ভেতরে বসে একটা প্ল্যান্ ঠিক করে নি। বাবার ফিরতে এখন অনেক দেরী আছে।

সঞ্জয় ও শুভ্রার অন্দরে প্রস্থান

অল্পক্ষণ পরেই বাহিরে মোটরের শব্দ হইল। কলিংবেল
বাজিল। বনমালী হন্তদন্ত হইয়া প্রবেশ করিল।

বনমালী। সব্বনাশ! বাবু! হে মা কালী! এখন কি করি।

হঠাৎ তাহার মাথায় কি বুদ্ধি আসিল। দরজা খুলিয়া বাহিরে গেল। রাজীব গাঙ্গুলীর প্রবেশ। তিনি ঘরে ঢুকিয়া সোফায় বসিলেন ও পাইপে অগ্নি সংযোগ করিলেন। বনমালীর দ্রুত প্রবেশ।

বনমালী। বাবু! বাবু! গারেজ ঘর থেকে ভীষণ ধোঁয়া বেরোচ্ছে। বোধ হয় আগুন লেগেছে। শীগগির আসুন বাবু!

রাজীব। আগুন! গ্যারেজ ঘরে! তাইতো ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছি বটে! সঞ্জয়…সঞ্জয় কোথায়?

বনমালী। দাদাবাবু ঘুমোচ্ছেন। শরীর খারাপ, তাই আর ডাকিনি।

রাজীব। এতক্ষণ তবে কি করছিলি হতভাগা! ফায়ার ব্রিগেডে ফোন করতে পারিসনি! (টেলিফোনের নিকট যাইতেই)

বনমালী। বাবু, তেমন কিছু নয়। আমরাই নিভিয়ে দিতে পারবো। আপনি শুধু একবার দেখবেন আসুন বাবু।

রাজীব। চল্ হতভাগা…

(বনমালী ও রাজীব গাঙ্গুলী বাহির হইয়া গেলেন। ক্ষণপরেই বনমালী দৌড়িয়া বাহির হইয়া আসিল এবং ভিতরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বনমালীর পিছন পিছন শুভ্রা ও সঞ্জয় প্রবেশ করিল।)

বনমালী। শীগ্‌গির চলে আসুন দিদিমণি। বাবু দেখলে আর রক্ষে রাখবেন না। অনেক বুদ্ধি করে বাবুকে সরিয়েছি।

শুভ্রা। স্বয়ং বনমালী আমাদের সহায়। আর ভাবনা কিসের!

বনমালী। (চঞ্চল হইয়া) আর দাঁড়াবেন না দিদি-মণি। বাবু এখনি এসে যাবেন।

নেপথ্যে রাজীব গাঙ্গুলীর গলা শোনা গেল—"বনমালী ! বনমালী ! ওই বাবু এসে পড়লেন বলে। দোহাই দাদাবাবু। তোমার শরীর খারাপ বলেছি বাবুকে। তুমি ঘুমোও গে যাও। আসুন দিদিমণি……

সঞ্জয়। পরশু আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব। তুমি একটুও দেরী কোর না।

শুভ্রা সম্মতি জানাইল ও বনমালীর সহিত দ্রুত প্রস্থান করিল। রাজীব গাঙ্গুলী চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে প্রবেশ করিলেন। পিছনে বনমালী।

রাজীব। হতভাগা! গ্যারেজ ঘরে বিচুলি রাখতে কে বলেছিল শুনি। জানোয়ার কোথাকার! যা আরো দু' বাল্তি জল ঢেলে দিগে যা—আর শোন, ডাঃ সেনগুপ্তকে আমি ফোনে বলে দিচ্ছি। তুই এখুনি গিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আয়—

বনমালী। দাদাবাবুর অসুখ ভালো হয়ে গেছে বাবু। একটু আগেই দাদাবাবু বললেন—সব অসুখ সেরে গেছে—

রাজীব। এর মধ্যে আবার দাদাবাবুর অসুখও ভালো হোয়ে গেল? যা খেতে দিতে বল্। সঞ্জয়—সঞ্জয়—

রাজীব গাঙ্গুলী ও বনমালীর প্রস্থান

কিছুক্ষণ মঞ্চ অন্ধকার। তাহার পর আলো জ্বলিল। বনমালী প্রবেশ করিয়া আসবাবপত্রের ধুলা পরিষ্কার করিতে লাগিল। হঠাৎ ডেট্ ক্যালেণ্ডারের দিকে চাহিয়া।

বনমালী। আ আমার পোড়াকপাল। সন্ধ্যে হোতে চলল এখনো তারিখটা পালটাইনি?

ডেট ক্যালেণ্ডারের তারিখ পালটাইল। দেখা গেল "Tuesday 12 Sept." কলিং বেল বাজিল। বনমালী দরজা খুলিতেই ভূধরবাবু ও অবিনাশবাবু প্রবেশ করিলেন।

ভূধর। এই যে বনমালী মালাকর। গাঙ্গুলীমশাই কোই?

বনমালী। আজ্ঞে আপনারা বসুন। বাবু ভেতরে আছেন।

ভূধর। এসো অবিনাশদা—

ভূধরবাবু ও অবিনাশবাবু বসিতেই ললিত প্রবেশ করিল।

ললিত। স্যার, আপনারা কি এইমাত্র এলেন? মামাবাবুকে দেখছি না যে?

ভূধর। আমরা মিনিটখানেক হয় এসেছি। তোমার মামাবাবু ভেতরে। সময়ের মানুষ তো। ঠিক সময় অবশ্য এখনো হইনি। তাহলেও বাবা ললিত, তুমি একবার ভেতরে গিয়ে গাঙ্গুলীমশাইকে জানিয়ে এসো।

ললিত। এখুনি মামাবাবুকে খবর দিয়ে আস্ছি স্যার।

ললিত অন্দরে প্রস্থান করিল।

ক্ষণপরেই রাজীব গাঙ্গুলী ও ললিতের প্রবেশ। নমস্কার বিনিময়ের পর।

রাজীব। (অবিনাশবাবুর দিকে চাহিয়া) আপনার সঙ্গে তো পরিচয়…

ভূধর। শ্রীঅবিনাশ ঘোষাল। আমার বড় সম্বন্ধী। রিটায়ার্ড ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্। এখন মধুপুরের বাড়ীতে অবসর জীবন যাপন করছেন।

অবিনাশ। আপনার সাথে পরিচিত হোয়ে খুব আনন্দ পেলাম মিঃ গাঙ্গুলী। কাজকর্ম মিটে গেলে একবার আসুন না আমার মধুপুরের বাড়ীতে। দেখবেন কেমন গোলাপ ফুলের চাষ করেছি সেখানে।

ভূধর। হ্যাঁ, বলতেই ভুলে গেছি। অবিনাশদা এখন হাতে কলমে ফুল-চাষা হয়েছেন।

একথায় সকলে হাসিয়া উঠিলেন। বনমালী ভিতরে গিয়া ট্রেতে চার সরঞ্জাম লইয়া আসিল। ললিত চা ঢালিতে আরম্ভ করিল।

রাজীব। ও ললিত! এ কাজটা বনমালীই করে দিচ্ছে। তুমি বরং একবার ভেতরে গিয়ে সঞ্জয়কে ডেকে নিয়ে এসো। আর দশমিনিট পরেই আশীর্বাদ আরম্ভ করতে হবে।

ললিত ভিতরে গেল ও অল্পক্ষণ পরেই চিন্তিত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

ললিত। মামাবাবু! সঞ্জয়দা ভেতরে নেই। কোথাও নেই।

রাজীব। কি বলছ ললিত! সে জানে আজ তার আশীর্বাদ। না না—দেখো ভালো করে ভেতরেই আছে, সে—সঞ্জয়—সঞ্জয়—ওরে বনমালী তুই একবার দেখে আয়—

বনমালীর ততক্ষণে চা ঢালা হইয়া গিয়াছে। সে ভিতরে গেল। ললিত ঘরের এক কোণে নির্লিপ্তের মত বসিয়া ম্যাগাজিন দেখিতে লাগিল। বনমালী প্রবেশ করিল। সে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলিল—

বনমালী। দাদাবাবু নেই—

রাজীব। নেই কিরে! গেলো কোথায় সে। এখানে আর কোথায় সে যায় জানিস তুই?

ললিত। না মামাবাবু, সঞ্জয়দা বেড়াতে গেলে এক আমাদের বাড়ী ছাড়া আর কোথাও যায়না। আমি তো বাড়ী থেকে এই মাত্র আস্‌ছি। সঞ্জয়দা সেখানে যাইনি।

রাজীব। তাহলে গেলো কোথায় সে? ভদ্রলোকেরা এসেছেন—আজ তার আশীর্বাদ। সে কি আমাকে বেকুফ বানাতে চায়? পাঁচজনের কাছে অপদস্থ করতে চায়?

ভূধর। আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন গাঙ্গুলীমশাই? হয়তো আশেপাশে কোথাও গেছে। এখুনি এসে যাবে।

রাজীব। বার্লিন য়ুনিভার্সিটির ডক্টরেট। একটা রেস্‌পন্‌সিবিলিটি জ্ঞান থাকা উচিত। এদিকে সময় যে হয়ে এলো। ওরে বনমালী, ধানদুর্বার রেকাবীটা নিয়ে আয়।

বনমালীর প্রস্থান

ভূধর। হ্যাঁ, আমরা বরং ততক্ষণ আয়োজন সম্পূর্ণ করে রাখি। সঞ্জয় বাবাজী ফিরলেই কাজ সুরু করা যাবে।

ভূধরবাবু পকেট হইতে একটি সুদৃশ্য বাক্স বাহির করিলেন ও তাহা খুলিয়া রাজীব গাঙ্গুলীকে দেখাইলেন।

রাজীব। এ যে হীরের বোতাম। এসবের কি দরকার ছিল।

অবিনাশ। বাবাজী যে হীরের টুক্‌রো। তাকে হীরের বোতাম না দিলে বেমানান হবে যে মিঃ গাঙ্গুলী।

বনমালী ধান দুর্বার রেকাবী রাখিল। ঠিক সেই সময় শুভ্রা ও সঞ্জয় প্রবেশ করিল।

রাজীব। এসো সঞ্জয়। আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। যাষ্ট্‌ কোয়ার্টার টু সিক্স্‌। নিন আরম্ভ করুন ভূধরবাবু।

ভূধরবাবু স্থির হইয়া শুভ্রার দিকে চাহিয়া আছেন। শুভ্রাও তাই। ললিত ও বনমালী অতিকষ্টে হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছে। সঞ্জয়ের বেপরোয়া ভাব।

সঞ্জয়। হ্যাঁ, আশীর্বাদই আমরা নিতে এসেছি। একটু আগেই আমাদের বিবাহ রেজিষ্ট্রী হোয়ে গেছে। এসো শুভ্রা, আর আমাদের ভয়টা কিসের!

রাজীব। (ফাটিয়া পড়িলেন) ইডিয়ট্‌ রাস্‌কেল্‌··· এই শিক্ষা তুমি নিয়ে এসেছ বার্লিন থেকে? আমাকে তুমি অপদস্থ করতে চাও? কোথাকার কোন লোফারের মেয়েকে ধরে এনে আমার সামনে দাঁড়াতে তোমার লজ্জা করছে না? তোমার পছন্দটাই বড়···আমার প্রেষ্টিজটা কিছু নয়? গেট্‌ আউট্‌! বোথ্‌ অফ্‌ ইউ গেট্‌ আউট! আমার ছেলে নেই—আমার কেউ নেই—আমার কেউ নেই। তবে জেনে যাও আমার কথার দাম আমি ঠিকই দেবো। আজ তোমার বদলে আমি ললিতের আশীর্বাদ করব। এসো ললিত। নিন ভূধরবাবু, আশীর্বাদ করুন ললিতকে। বনমালী, ওদের ঘাড় ধরে বার করে দে—

ললিত। মামাবাবু! এই শুভ্রা, ভূধরবাবুর একমাত্র মেয়ে। আপনি যে মেয়ের সাথে সঞ্জয়দার বিয়ের ঠিক করেছেন এ সেই শুভ্রা।

ভূধর। (বিস্মিত ও আনন্দিত স্বরে) শুভ্রা···মা আমার···আমি যে তোর বিয়ে এখানেই ঠিক করেছিলাম···

শুভ্রার মাথা লজ্জায় হেঁট হইয়া গেল। ভূধরবাবু শুভ্রাকে বুকে টানিয়া লইলেন।

অবিনাশ। "এ যে ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা" বড় মজার ব্যাপার···

অবিনাশবাবু হাসিতে ফাটিয়া পড়িলেন। রাজীব গাঙ্গুলী কি করিবেন ঠিক পাইতেছিলেন না। সঞ্জয় মাথা হেঁট করিয়া চলিয়া যাইতেই

রাজীব। আর যেতে হবে না। লেখাপড়া শিখে একটা বাঁদর তৈরী হোয়েছেন। বলতে হয়তো আমাকে। এমন করে আমাকে বেকুফ না করলে হোত না?

সঞ্জয়। (কাঁদো কাঁদো স্বরে) আমি কি আগে জানতাম। (রাজীব গাঙ্গুলীর পায়ে ধরিয়া) আমি তোমার অবাধ্য হয়েছি। আমাকে তুমি ক্ষমা কর বাবা।

রাজীব গাঙ্গুলী সঞ্জয়কে উঠাইয়া জড়াইয়া ধরিলেন। তাহার পর একদিকে সঞ্জয় ও আর একদিকে শুভ্রাকে ধরিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—

রাজীব। ভিক্টরী! ভিক্টরী! মাই ভিক্টরী!! বিংশ শতাব্দীর অলোকপ্রাপ্ত জীব! ভেবেছ আমাদের ওপর টেক্কা দেবে? সাধ্য কি তোমাদের! (হাসিয়া) ভূধরবাবু, অবিনাশবাবু, আশীর্বাদ করুন শুভ্রা মা আর সঞ্জয়কে। প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করুন। এমন বৌমার জন্যেই আমি খুঁজে খুঁজে সারা হয়েছি। ওরে ললিত, ওরে বনমালী—শাঁখ বাজা, জোরে জোরে শাঁখ বাজা—

(আনন্দ কোলাহলের মধ্যে পর্দা নামিল।)

আমাদের যুগ ও আজকের যুগ

শ্রীঅবনীনাথ রায়

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করেছিলেন যে তিনি যদি কালিদাসের কালে জন্মগ্রহণ করতেন তবে কি ব্যাপার হত:—

> আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে
> দৈবে হতেম দশম রত্ন নবরত্নের মালে,
> একটি শ্লোকে স্তুতি গেয়ে রাজার কাছে নিতাম চেয়ে
> উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে কানন-ঘেরা বাড়ি।
> রেবার তটে চাঁপার তলে সভা বসত সন্ধ্যা হলে
> ক্রীড়াশৈলে আপন-মনে দিতাম কণ্ঠ ছাড়ি।
> জীবন-তরী বহে যেত মন্দাক্রান্তা তালে,
> আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে॥

কালিদাস কবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাই নিয়ে এখনো গবেষণা চলছে। সম্প্রতি কালিদাস-জয়ন্তী না হলে কালিদাসকে আমরা ভুলেই গেছি বলা যায়। আন্দাজ মত কালিদাস আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগেকার লোক। সুতরাং তখনকার জীবনযাত্রার সঙ্গে এখনকারের যে তফাৎ থাকবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু আমি বলতে চাইছি যে এখনকার কালে জন্মগ্রহণ করেও অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেও আমরা অপরাধের সঙ্গে একেবারে তফাৎ হয়ে গেছি। জীবন-যাত্রায় হয়ত হইনি, কেননা এখনো সেই দশটার সময় আপিস যাওয়া, মৎস্যের উপর আসক্তি, হাতে কাজ না থাকলে চায়ের দোকানে আড্ডা জমানো এবং মুখে রাজা উজীর মারা প্রভৃতি আগের মতই আছে যেমন আমাদের সময় ছিল। কিন্তু আইডিয়ার রাজ্যে আমরা একেবারে বদলে গেছি অর্থাৎ আমাদের চিন্তাধারা এবং এখনকার যুগের চিন্তাধারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একেবারে আলাদা। কেমন করে সেই কথাই বলছি। আর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কাঠামো ঠিক রেখে চিন্তাধারা বদলানো যে বেশি মারাত্মক সে কথা সকলেই স্বীকার করবেন।

আমাদের সময়ে জীবনের আদর্শ ছিল—অন্তত আমরা যা আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলাম সে হচ্ছে—মানুষকে ভালবাসা, পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করা, শিক্ষকদের ভক্তি করা (আমাদের সময় শিক্ষিকা ছিলেন না বললেই হয়), দেশকে ভালবাসা, ধর্মকে ভালবাসা। এই আদর্শে যে সকলে পৌঁছুতে পেরেছিলাম তা নয়, কিন্তু সেই পথে অগ্রসর হতে কোন বাধা ছিল না। এখন এগুলিকে আর আদর্শ বলে গ্রাহ্য করা হয় না। মুখে না বললেও ব্যবহারে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যারও অপ্রতুলতা—মানুষের মন নাকি সংস্কারমুক্ত হবে—মানুষের মন কাচের টেবিলের মত ঝকঝক করবে (tabula rase)—কারণ মনে সংস্কার থাকলে তার অগ্রগতির পথে বাধা হয়। ভূতের ভয় যেমন একটা সংস্কার, ছোট বেলা থেকে গল্প শুনে শুনে আমরা বিশ্বাস করতে শিখেছি; বাপ মাকে ভক্তি করা ও ত তাই। লোকের মুখে শুনে শুনে শিখেছি। শাস্ত্রে তার মহিমা কীর্ত্তন শুনে শুনে শিখেছি। বাবা এই কথা বলেছেন শুনে কোন কোন ছেলেকে এই যুক্তি প্রয়োগ করতে শুনেছি; কেন, বাবা কি ভুল করতে পারেন না। বাঢ়ং, নিশ্চয়ই পারেন—কোন মানুষই ত পারফেক্ট (perfect) নয়। কিন্তু আমাদের আদর্শে বলতো যে বাবার ভুল ধরার হক ছেলের নেই! আর কেউ নিশ্চয়ই ধরবে—তাঁর গুরুজনেরা হয়ত ধরবেন (যদি বেঁচে থাকেন) কিন্তু আমি নয়। বাবার বেলায় আমি বিচারকের আসন নেব না। তিনি আমার বাবা, তিনি এই নির্দেশ দিয়েছেন, এই পরিচয়ই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি সেটা মানবো এবং নির্বিবাদে হৃষ্ট মনে। তাঁর আদেশ মানলাম বলে, তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে পারলাম বলে নিজেকে ধন্য মনে করবো। এই মনোভাব ছিল বলেই আমাদের সময় বাবা, কাকা, জ্যাঠা, মা—যে কেউ পাত্রী নির্বাচন করে এলে আমাদের বিয়ে করতে বাধতো না। কখনো মনে হত না যে পাত্রী কেমন হওয়া চাই আমার সে মনের কথা ত বাবা জানেন না, বাবা ভুল করে বসবেন। ভুল হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা করেওছেন, কিন্তু আমার তাতে কিছু আসে যায় নি, আমার শান্তি ক্ষুণ্ণ হয় নি, কারণ আমি মনে করেছি যে ভুল ত আমারও হতে পারতো, আমিও ত যে যা নয় তাকে তাই বলে ভাবতে পারতাম।

আগে শাস্ত্রের উল্লেখ করেছি। বর্তমান যুগের যুবকদের মনের উপর আমাদের শাস্ত্র কোন প্রভাব বিস্তার করেছে বলে মনে হয় না। রামায়ণ আমাদের দেশের একখানি মহাকাব্য। এই মহাকাব্য বিদেশে বিদেশীদের কাছেও আদর পেয়েছে। বহু যুগের উপর দিয়ে এর প্রভাবকাল বিস্তৃত, কিন্তু বর্তমান যুগের মানুষের কাছে এর মধ্যে যে আদর্শ অনুসৃত হয়েছে তার মূল্য কমে গেছে। যে সীতাকে অত যুদ্ধ বিগ্রহের পর উদ্ধার করা হল, তাকে পুনরায় অগ্নিতে পরিশুদ্ধ করার কল্পনা বা আসন্নপ্রসবা সীতাকে ত্যাগ করা···এখনকার লোকের পক্ষে অবান্তর বলে গণ্য। রামচন্দ্র প্রজাদের এই অনুরোধে রাজী হওয়ায় কেউ কেউ বলেন যে, তিনি যথেষ্ট পরিমাণে পত্নী-বৎসল ছিলেন না, কেউ বলেন তিনি কাপুরুষ। দশরথ কৈকেয়ার নিকট নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে যে রামচন্দ্রকে বনবাস দিলেন, তার মধ্যে অনেকে তাঁর পত্নীপ্রেমের অযথা বাড়াবাড়ি দেখেন। মোটকথা রামায়ণের যুগে এই সব আদর্শের যে মূল্য ছিল এবং আদর্শকে সত্য হতে হলে যে মূল্য এখনো থাকার কথা, দেখা যাচ্ছে এখন তাদের সে মূল্য নেই। এর অর্থ হল এই যে, হয় রামায়ণের আদর্শ শাশ্বত নয়, তাই কালজয়ী হতে পারে নি, নয় ত আমরা পথ হারিয়েছি।

আদর্শ নিয়ে মূল্যের তারতম্য হওয়ার কারণ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি কাব্যে এবং হিন্দু শাস্ত্রে যে বস্তুকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সে হ'ল—সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা। সত্যই হল একমাত্র বস্তু যাকে সর্বক্ষেত্রে ধরে থাকতে হবে। সত্যই ভগবান। উপরে রামচন্দ্রের বা দশরথের যে উদাহরণ দেওয়া হল তার থেকে দেখা যাচ্ছে তাঁরা সত্যের হাতে বন্দী। সত্যকে প্রাধান্য দিতে হবে—তার কাছে নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, জীবন সব তুচ্ছ। এই আদর্শই সনাতন ভারতবর্ষ স্বীকার করে এসেছে—অপর কোন সট-কার্ট (short cut) নেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পাশ্চাত্য দেশে এবং সমাজে এই সত্য অস্বীকৃত হয়ে গেল। মানুষ যেন হঠাৎ পশুর স্তরে নেমে গেল। জীবনে কোন আদর্শের বালাই নেই, যেন তেন প্রকারেণ কার্য্যসিদ্ধি করাই মানুষের অভিপ্রায় হয়ে দাঁড়াল। End যদি সার্থক হয় তবে মানুষ বাহবা দিল কি means দিয়ে এই endএ উপনীত হওয়া গেছে—সেটা ধর্তব্য বিষয়ই নয়। বহু মানুষের হত্যার দ্বারা অর্জিত যে অর্থ তার মালিকের স্থান আজ সর্বোচ্চে। সমাজ-জীবনে অর্থ ই আজ সম্মানের মানদণ্ড, সত্যনিষ্ঠা নয়। এই পঙ্কিল নীতি বা দুর্নীতি আজ পাশ্চাত্যের ব্যক্তি-জীবন তথা রাষ্ট্রীয়-জীবনকে বিষাক্ত করে তুলেছে। এর প্রভাবের নাম cold-war—এরই প্রতিবেধকল্পে লম্বা লম্বা প্যাক্ট (pact) এবং nuclear weapons তৈরীর প্রতিযোগিতা। তারা শান্তি হারিয়েছে। তারা সত্যের বদলে সর্টকাটের সুগম পথ বেছে নিয়েছে।

সাহিত্যের মাধ্যমে পাশ্চাত্য দেশের ঐ দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের দেশেও এসে পৌছালো। আমাদের জীবন এবং চিন্তাধারাকে অনুরঞ্জিত এবং আবিষ্ট করলো। আপাতদৃষ্টিতে এর আবেদন আছে, যেমন সব সহজ জিনিষেরই থাকে। কঠিনকে পারলে সকলেই এড়াতে চায়। এখন এই যুগই চলেছে। এরি মধ্যে কিছু লোক পুরাতন সংস্কারকে অর্থাৎ সত্যকে আশ্রয় করে আছেন। তারা পুরাতনপন্থী বলে চিহ্নিত, হয়ত কুখ্যাত। কিন্তু একদিন স্রোত ফিরবে, সত্য জয়লাভ করবে—এই আশা তাঁরা পোষণ করেন।

একটা উদাহরণ দিই। আমাদের বাল্যকালে এবং ছাত্রজীবনে মেয়েদের এত প্রচার (publicity) ছিল না। 'নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে—নারীকে পূজা করতে হবে, নারী গৃহলক্ষ্মী, এ বিধান-শাস্ত্রে আছে; কিন্তু সেই গৃহলক্ষ্মী সর্বদা রাস্তায় ঘাটে, ট্রামে বাসে, পার্কে লেকে বেপরোয়া ঘুরে বেড়াবেন, এই রীতি ছিল না। আর্থিক অবস্থার অবনতির জন্য এই ব্যবস্থা অপরিহার্য হয়েছে এই যুক্তি স্বীকার করি। কিন্তু এই প্রবর্তনায় আমাদের পারিবারিক সুখ এবং শান্তি বেড়েছে কিংবা কমেছে, এটা গভীর চিন্তার বিষয়। আমাদের বাল্যকালে এবং ছাত্রজীবনে দেখেছি রঙ্গালয়ে এক শ্রেণীর মেয়েরা অভিনয় করতেন। তাঁদের অভিনয়কুশলতা দেখে দর্শকেরা প্রশংসা করতো, কিন্তু সমাজে তাঁদের কোন সম্মান ছিল না। রঙ্গালয়ের পর এল চলচ্চিত্রের যুগ। প্রথম প্রথম রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীবৃন্দই চলচ্চিত্রে যোগ দিয়েছিলেন—কিন্তু শেষ নাগাদ দেখা গেল গৃহস্থের কন্যাবধূও ঐ অভিনয়ে যোগ দিলেন। এর ফল ফলতে বিলম্ব হল না। চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী গৃহস্থের কন্যাবধূরা সমাজে সম্মান পেলেন। আগে আমাদের সময়ে ঘরের দেওয়ালে টাঙানো থাকতো দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতীর ছবি—সকালে উঠে সেই ছবির দিকে তাকিয়ে গৃহস্থ প্রণাম করতেন। তার পর তাঁদের জায়গায় দেখা গেল বুদ্ধ, মহাবীর, রামকৃষ্ণ পরমহংস, ভাস্করানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষদের ছবি এবং মূর্তি। এখন তাঁরা সরে গেছেন—সেই স্থান অধিকার করেছে সিনেমার অভিনেত্রী এবং তারকাদের দল। শুনতে পাই কলেজের হষ্টেলে এবং বোর্ডিং-এ ছাত্রদের শিয়রে টিপয়ের উপর রাখা থাকে সিনেমা ষ্টারদের ছবি—শয্যাত্যাগ করেই যাতে নজরে পড়ে তাদের মুখ, অবশ্য প্রণাম করেন কিনা জানি নে। সিনেমার চটুল গান সকলের মুখে মুখে—যেমন কোন্ খেলোয়াড় ভাল খেলেন তাই নিয়ে তাঁর ভক্তদের মধ্যে তর্কাতর্কি এবং শেষ নাগাদ হাতাহাতি হয়, তেমনি কোন্ অভিনেত্রী ভাল অভিনয় করেন বা করেছেন তাই নিয়েও বাদ বিসম্বাদ এবং মতান্তর মনান্তরের অন্ত নেই। চ্যারিটি শো তে সিনেমা ষ্টারদের হাতে হকি ষ্টিক দিয়ে মাঠে নামালে বেশি টিকিট বিক্রি হয়। কোথাও কোথাও সাহিত্য সভায় সিনেমা ষ্টারদের সভানেত্রী কিংবা প্রধান-অতিথিও করা হচ্ছে। এই সব উদাহরণ দেওয়ার অর্থ এই যে, আমাদের কালে যাদের সমাজজীবনে কোন সম্মান ছিল না, এখন তাঁরা শুধু সম্মান নয়, উচ্চ সম্মানের অধিকারিণী হচ্চেন। এর ফলে যদি আমাদের মেয়ে এবং বধূরা চলচ্চিত্রে অভিনেত্রীর পেশা গ্রহণ করার প্রস্তাব দেন, তবে যুক্তির দিক দিয়ে আপত্তি করার কিছু থাকে না। কিন্তু আপত্তির কারণ এই যে

শুধু অর্থের লোভ ও এই পেশা গ্রহণ করবার উত্তেজক কারণ নয়—তার চেয়েও বেশি কারণ হচ্ছে—ঐ ধরণের লালসাময় জীবন-যাত্রা গ্রহণ করবার অভিপ্রায়—সহরের প্রাচীর-গাত্রে এবং সিনেমা-কাগজের পাতায় পাতায় নিজেদের ছবি দেখবার এবং দর্শকবৃন্দ সেই ছবির দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাই কল্পনা করবার উদগ্র প্রলোভন। প্রমাণ দিয়ে এর সত্যতা দেখানো সম্ভব হবে না, কিন্তু ভুক্তভোগী মাত্রেই এর যথার্থ মনে মনে উপলব্ধি করতে পারবেন।

পাশ্চাত্য দেশের উদাহরণ আমাদের দেশে এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাদের দেশে দেহের পবিত্রতা অত্যন্ত গৌণ বস্তু। পাঁচবার সাতবার বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা, কুমারী মেয়েদের সন্তানসন্ততি—সে দেশের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। তা নিয়ে সে দেশে কারো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আমাদের দেশে দেহ অত্যন্ত পবিত্র সম্পদ। হাত ধরে ফেলেছিলেন বলে শান্তনুর মৎস্যগন্ধাকে বিয়ে করতে হয়েছিল, এ ঘটনা একমাত্র আমাদের দেশেই ঘটতে পারে।

আমরা এখন যথেষ্ট পরিমাণে মডার্ণ হতে চেষ্টা করছি, কিন্তু তাল রাখতে পারছি না। এখনো রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বোধ হয়—কিন্তু তাতে মডার্ণ হওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ এখন পিছিয়ে পড়েছেন—তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন নবীন কবিরা—নবতর কবিতা লিখছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা তাঁদের রবীন্দ্রনাথের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতে পারছি না। ফাউণ্টেনপেনের Quink কালি এখনো আমাদের শ্রেষ্ঠ মনে হয়, সুলেখা কালিকে শ্রেষ্ঠ মনে করতে পারি না—ওভ্যালটিন এখনো শ্রেষ্ঠ মনে হয়, 'পানীয়ন'কে শ্রেষ্ঠ বলতে পারি না—এ সবই আমাদের মনের স্থবিরত্বের পরিচয়, সন্দেহ নেই।

অন্যায় আব্দার করবো না—সেটা শোভনও নয়, সুন্দরও নয়। করলেও সেটা রক্ষিত হবে না। পাশ্চাত্য দেশের সবই খারাপ এ রকম অভিসন্ধি আমার মনে নেই। কেবল সেই দেশের দৃষ্টিভঙ্গীর পিছনকার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে দেখতে বলি। সে দৃষ্টিভঙ্গীর পিছনে আছে একটা প্রতিযোগিতার ভাব—তার থেকে আসতে পারে একটা জ্বালা এবং এগিয়ে যাওয়ার একটা নেশা। স্বস্তি এবং শান্তি কখনই আসবে না। বন্দুকের পর কামান, কামানের পর নৌবহর, সাবমেরিন, তারপর অ্যাটম বোমা, তারপর হাইড্রোজেন বোমা। এই ঘোড়দৌড়ের কি কোন শেষ আছে? মানুষ কি শুধুই ছুটবে?

আমাদের আদর্শে আছে এই স্থিতি—কারণ সত্য স্থির। আমাদের আদর্শে আছে এই সত্যের প্রতি আনুগত্য। মানুষ জন্মাবে মরবে, পৃথিবীতে এক রাজত্ব যাবে, আর এক রাজত্ব আসবে, পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী বদলাবে—কিন্তু তবু একটা সত্য স্থির থাকবে। চন্দ্র সূর্য উঠবে, ঋতুর পরিবর্তন হবে, বায়ুতে মানুষ নিঃশ্বাস নেবে, জল তৃষ্ণা নিবারণ করবে, মানুষ ভালবাসবে, বিয়োগে দুঃখ পাবে, মিলনে আনন্দ পাবে—এই নীতি চিরদিন অম্লান থাকবে। ভারতবর্ষের সাধনা এই চিরন্তন নীতিকে নিয়ে। Verity of verities, all is verity.

আকাশ পথে

অধ্যাপক শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য এম-এ (লণ্ডন)

রোম থেকে বিদায় নেবার পালা ঘনিয়ে এল। মনটা যেন ভারি ভারি লাগছিল। কোথায় যেন এক অস্পষ্ট বেদনা লুকিয়ে আছে। নীলোজ্জ্বল আকাশের কোলে তারা ফুটে উঠল। সেদিনের মেদুর সন্ধ্যা এক অনির্বচনীয় রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছিল আমার কাছে। পাশ্চাত্য আমাকে যে এত নিবিড় করে বেঁধেছিল তা আগে বুঝতে পারিনি।

রোম থেকে দিল্লীগামী প্লেন ছাড়বে নিশীথ রাত্রে। এক আনন্দ বেদনার সন্ধিক্ষণ—একদিকে কতদিন পরে আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে মিলবার আশা, অন্যদিকে কত দরদী মনের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হবার আশঙ্কা।

যন্ত্রচালিতের মত কখন আমার সিটটিতে এসে বসেছি। তখনও প্লেন ছাড়বার আধঘণ্টা দেরী। পাশের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল এক অপরূপ দৃশ্য। রোমের হৃৎস্পন্দন তখন থেমে গেছে। অজ্ঞাত সৈনিকের মত বিদায় নিতে হবে। চোখে ভেসে উঠল কত ছায়াছবি, কত নদী প্রান্তর, কত নীল শ্যামল।

আমার বন্ধুরা এসেছিল আমাকে বিদায় দেবার জন্যে। দেখি সবাই নির্বাক……ভাবলুম এত মায়ায় মানুষ কেন নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। এবার প্লেন সুরু করল তার গর্জন, তারপর একে একে ডানা মেলেছিল।

অনেকক্ষণ আকাশে উড়ে চলেছি খেয়াল নেই। কারণ তখন মনের আকাশে মেঘের ভিড়।

হঠাৎ চমক ভাঙ্গল নারী-কণ্ঠ শুনে। "আপনি কোথায় যাবেন।" আমি তখন নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছি। কি উত্তর দিয়েছিলাম মনে নেই। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত তখন চারটা। দূরান্তের তারাটি টিপ টিপ করে জ্বলছিল আশা দীপের মত। নীচে আঁধারের প্লাবন। রাত্রির অবগুণ্ঠনে বিশ্বের এত রূপ সব যেন রহস্যাবৃত। একে একে অবগুণ্ঠন সরিয়ে দিনের আলো উঁকি দিল। সোনার আলো লুটিয়ে পড়ল—পল্লী প্রান্তরে। মনে হ'ল কত সুন্দর এই পৃথিবী, মনে হল "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে," এই বাণী কত সত্য কত গভীর।

সকালের ব্রেকফাষ্ট এসে গেল ছোট্ট টেবিলটির ওপর। আমার পাশেই এক বৃদ্ধ সৌম্যকান্তি মুসলমান ভদ্রলোক। একটু হেঁসে বল্লেন —দিল্লী যাবেন বুঝি? একটু ঘাড় নেড়ে পালটা প্রশ্ন করলাম—। বল্লেন দামাস্কাস। কত দেশের কত যাত্রী—সবাই উড়ে চলেছি মহাশূন্যে —নীড়হারা পাখীর মত।

বাইরে আলো কখন চলে গেছে। মেঘের মধ্য দিয়ে পথ করে চলেছে আমাদের পুষ্পকরথ। পৃথিবীকে আর দেখা যায় না।

শুনলাম কিছুক্ষণ বাদেই আমাদের প্লেন বিমান ঘাঁটিতে নামবে।

সেই পাশের ভদ্রলোকটির বোধ হয় এবার নামবার পালা। প্লেন নামতে সুরু করেছে। ক্রমশঃ স্পষ্টরূপ নিয়ে জনপদ—পথ গিরি নদী।

মাটীর পরশ পেলাম—অনুভব করলাম ধরিত্রীর কঠিন আলিঙ্গন, বিমান ঘাঁটিতে দেখি মানুষের ভিড়। সবাই যেন আপন আপন প্রিয়জনকে খুঁজছে। সেই মুসলমান ভদ্রলোকটিকে মালা পরিয়ে অভিনন্দন জানাল বেশ কিছু লোক। বুঝলাম ভদ্রলোক নিশ্চয়ই কোন বিশিষ্ট নাগরিক হবেন। তাঁর পরিচয় জানা হয়নি, ভেবে মনে অনুতাপ হ'ল। এয়ারপোর্টে নেমে চারিদিকে তাকিয়ে দেখি—উষর প্রান্তর। চারিদিক ধু ধু করছে। মাঝে মাঝে জনালয়। সকাল থেকেই গরম হাওয়া বইতে সুরু করেছে। মনে হল, এস্থান থেকে যঃ পলায়তি স জীবতি। যাক সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে আবার প্লেনে। এবার নাকি অনেক দূরের পাল্লা—একেবারে বীরুট।

প্লেন উঠল হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে। যেন চারিদিকে দ্বিপ্রহরের ঝিমুনি। মাঝে মাঝে দু একটা পাখী উড়ে চলেছে। শ্যামল পৃথিবী ঝলমল করছে—প্রখর রৌদ্রে। হঠাৎ গোলমালে প্লেনের ভেতরে দৃষ্টি পড়ল। Get ready—Hurry up, The Engine fails.

আমি তখনও অন্য জগতে। ভাবলুম Ready হ'তে হলে মরণের জন্যেই হ'তে হয়। চারিদিকে হৈ হুল্লোড়—কেউ বা যীশুর নাম ক'রছে, কেউ বা দুর্গানাম জ'পছে। প্লেনটি হুহু শ্বাসে নামতে সুরু ক'রেছে। লক্ষ্য ক'রলাম প্রায় মাটির কাছাকাছি এসে পড়েছি। কিন্তু মাটী কোথায়? একটা ধোঁয়াটে রাজ্যে আমাদের প্লেন মিলিয়ে গেছে, কিছুই দেখা যায় না—শুনলাম সেটা নাকি Persian Gulf।

বীভৎস সুন্দর তার রূপ—জলের যেন কোন গতি নেই, চারিদিকে যেন একটা ধোঁয়াটে আবহাওয়া। আমাদের প্লেনখানি তখন যেন মাটির স্পর্শ পেতে চাইছিল। কিন্তু একটু নীচেই সেই গতিহীন জলধি। তার বুকে যদি প্লেনটি ধরা দেয়। সকলেই দেখি—অন্তিম মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় আছে। সব কোলাহল থেমে গেছে। আমিও ভাবছিলাম এতদিনের সংস্কার দিয়ে ঘেরা জীবনের বুদ্বুদ মুহূর্ত্তেই বিরাটের সঙ্গে মিলিয়ে যাবে। এর জন্যেই ক্ষুদ্র বুকে এত দুরু দুরু—এত দ্বিধা সংশয়। হঠাৎ দেখতে পেলাম খেজুর গাছের মত গাছের সারি। তবে কি সেই ভয়াল সমুদ্র পেরিয়ে মাটির বুকে এসেছি। বিরাট একটা ঝাঁকুনি দিয়ে প্লেন নামল কোথায় কে জানে? কোথায় কে ছিটকে গেল কে খবর রাখে। পরে যখন একটু সম্বিৎ ফিরল তখন দেখি আমি বীরুটের একটি হাসপাতালে। পাশে দেখি ছোট্ট একটি ফুটফুটে শিশু কাঁদছে। সবাই বলল—শিশুটির মাকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না।

অনেকদিন বাদে ভারতে ফিরছিল স্বামীর কাছে। স্বামী নাকি কোন বিরাট কোম্পানীর ম্যানেজার। ভাবলুম, ভদ্রলোকের কি অবস্থাই না হবে যখন এখবর গিয়ে পৌছবে তার কানে। কতদিনের আকুল প্রতীক্ষা। মানুষ সত্যই কত অসহায়। আমাদের যাদের সামান্য আঘাত লেগেছিল তাদের Special Planeএর ব্যবস্থা হল।

বীরুটের মরূদ্যানে সন্ধ্যা নামল। হঠাৎ খর তপ্ত…রৌদ্রঝলমল দিন আঁধার হ'য়ে এল। এখানে দিন ও রাত্রির মধ্যে সীমারেখা যেন খুবই অস্পষ্ট। দূরে খেজুর গাছের আগায় তখনও ক্ষীণ আশার মত একফালি রোদ্দুর লেগেছিল। পিঙ্গল আকাশে জ্বলজ্বলে তারা ফুটল। প্রশ্ন জাগল, ইউরোপের রাতের আকাশ কি এত উদার এত উজ্জ্বল। তারায় তারায় আকাশ যেন ভরে গেছে। আর সেই তারার আলোয় দূরান্তের মরুপথখানি যেন স্বপ্নময় হ'য়ে উঠেছিল। ভোরেই Special Plane ছাড়বার কথা। রাত্রির ছায়ায় প্রহর গুণছিলাম। আমার পাশের সিটের ছেলেটি হঠাৎ কেঁদে উঠল। বোধহয় কি স্বপ্ন দেখেছে। ভাবলাম হয়ত তার মাকেই স্বপ্নে দেখেছে। পরে জানলাম সে স্বপ্ন সত্যি হ'য়েছে। তার মাকে পাওয়া গেছে—কিছুদূরে। একটি ঝোপের আড়ালে। কিন্তু তখন তার প্রাণ নেই।

শেষ রাত্রেই উঠে প'ড়লাম। ভাবলাম কি অবস্থা দেখা যাক। দেখি সবাই প্লেনে ওঠে পড়েছে। আমিও বসে পড়লাম একপ্রান্তে। অনেক অচেনা মুখ। বোধহয় স্থানীয় লোক দিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করা হ'য়েছে। প্লেন ছাড়ল যখন তখনও রাত্রির অবগুণ্ঠনে পৃথিবী ঢাকা। উড়ে চলল নিঃসীম শূন্যে। আকাশের তারাগুলি তখনও সারি দিয়ে জ্বলছে আর নিবছে। আবার পৃথিবীর বুকে দুই একটি স্তিমিত আলোক ভ্রান্তি আনছে। মহাশূন্য থেকে রাত্রে বিভ্রম জাগে মাটি ও আকাশ সম্পর্কে।

শুনলাম এবার একেবারে করাচি।

মনে কি উন্মাদনা জাগল। কতদিন পরে ভারতের মাটি ছুঁতে পারব।

করাচীর কাছাকাছি গ্রামগুলি যেন আমায় হাতছানি দিচ্ছিল। যেন কত আত্মীয়তার বন্ধন। আমার পাশে যে ভদ্রলোক ব'সেছিলেন তাঁর নামবার পালা। সঙ্গে একটি বোরখা-পরা ভদ্রমহিলা। করাচীতেই কাজ নিয়েছেন। এককালে তিনি নাকি ক'লকাতায় ছিলেন। আমার সঙ্গে অল্প আলাপে বুঝেছিলাম যে ভদ্রলোক নিঃসন্তান। তাই শিশু দেখলেই তাঁর প্রাণ আনচান করে। তাই বোধহয় সেই রিক্ত শিশুটিকে দেখে ভদ্রলোকের কতই না আকুলি বিকুলি। তাঁর আয়ত দুটি চোখ ছলছল ক'রে উঠেছিল। সে চোখদুটি আজও ভুলতে পারিনি। আর ভুলতে পারিনি কতদেশের কত মানুষের কলরোল ও হৃদয় কল্লোল।

করাচীতে পৌঁছানমাত্রই মনটা কেঁপে উঠল। ভাবলুম এই ত ভারতের সীমান্ত। পরিচিত উর্দ্দুমিশ্রিত ভাষা কানে যাওয়া মাত্রই আত্মীয়তা-বোধ আরও নিবিড় হ'ল। তখন বেলা বেশ বেড়ে উঠেছে। চারিদিকে রৌদ্রের প্লাবনে যেন সারা ভুবন তার রূপ লাবণ্য মেলে ধরেছে। করাচীর পথঘাট বেশ পরিচ্ছন্ন, বিমান ঘাঁটি শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে। করাচী থেকে যখন বিমান ছাড়ল তখন বেলা দ্বিপ্রহর। মধ্যদিনের সূর্য্য। কত জনপদ পেরিয়ে এলাম। যমুনার নীলজল দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। তারই তীরে যে ছায়াঘন কুঞ্জ তা দেখলে কবির কথা মনে পড়ে যায়…"তমালতালী বনরাজি নীলা।" মনে হয় ভারতের মাটির কি মায়া। একটা মোহাবেশ যেন জড়িয়ে ধরে।

এবার যাত্রাশেষের পালা। যখন বিমান ঘাঁটিতে পৌঁছলাম তখন সূর্য্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছে। দেখলাম একপাশের আঙিনায় রক্তকরবীর লাজনম্ররূপ। আর তারই ছায়া দুলছে ধরণীর রূপমঞ্চে। অপূর্ব্ব এই দৃশ্য।

পালম বিমান ঘাঁটি থেকে শহরের পথে চোখ পড়ল আরও কত কি। পথের ধূলা ওড়াতে ওড়াতে চলেছে গোরুর পাল। ক্লান্ত বক ফিরেছে তার ক্ষুদ্রনীড়টিতে গোধূলির রক্তিম মুহূর্ত্তে।

আর আমিও চলেছি আমার নীড়টির দিকে কোন নিবিড় আকর্ষণে এতবড় বিশ্ব ছেড়ে। তাই কাণে বাজল কবির সেই স্ফুলিঙ্গ বাণী।

দেখা হয় নাই নয়ন মেলিয়া
ঘর হ'তে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপর
একটি শিশির বিন্দু।

পূজারিণী

শ্রীলাবণ্য পালিত

তোমারেই পূজা করিবার দাও অধিকার
তোমারি এ কাননের ছায়
প্রাণ চায়
তোমারি শেফালি ফুলে রচি উপহার
গাঁথি মালা আমি বার বার।
আজি এ কুঞ্জের দ্বারে দাঁড়ায়ে একা
দ্বিধা-ভরে রহি চাহি, ডাকিছে কেকা…।
কচি কিশলয়গুলি জাগিছে ধীরে ;
এ নত শিরে
ফিরাও না নিরাশার অকূল আঁধারে…।
ফিরাও না, ডালিখানি পাঁচ ফুলে ভরা—
বসন্তের সৌরভের স্পর্শটুকু ধরা ;
দিনে দিনে পলে পলে শূন্য মন আমার…
যতটুকু পূর্ণ করে, সেটুকু তাহার
আনিয়াছি, দাও অধিকার
তোমারেই পূজা করিবার
তিথি নাই, রীতি নাই…, জানি নাই কিছু…,
অন্তরের ভাষা আছে, মন তারি পিছু
ছুটে যায়, জানে তাই মরমের ভাষা,
প্রথম পূজার দীপ আমার এ আশা…।
তোমারেই পূজা করিবার দাও অধিকার,
নিভৃতে একেলা বসি এই গান
গাহি বার বার…।
সুরখানি রচিয়াছি কখনো উদাসী…,
কখনো করুণ রসে, বেদনার বাঁশী ;
মত্ত বসন্ত বায়ে চঞ্চল হিয়ায়…
চপলতা ছিল সুরে গোধূলি ছায়ায়…;
মাধবী রাতের কতো মিনতি জড়ানো…
সুরখানি আজো বাজে ;
খোঁপায় ছড়ানো
রাঙা ফুল মালা লয়ে রচিলাম গান……
তোমায় শোনাবো তাই ; হাসি অভিমান…
রাগ, অনুরাগ, আনি আমি পূজারিণী,
আমার যা কিছু আছে সব লয়ে দিই উপহার—,
শুধু তুমি আমারেই পূজা করিবার—
দেবে অধিকার…।

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

দেশের গ্রাম হ'তে বৌদির এক দুর সম্পর্কের বোন এসেছে। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স হবে মেয়েটির। রঙ. শ্যামবর্ণ হলেও অতিশয় সুশ্রী এবং স্বাস্থ্যবতী। মেয়েটি বিধবা। সমস্ত দেহ মন যখন তার রূপে রসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে ঠিক সেই সময়ই যেন জীবনে তার নেমে এসেছে ভাগ্যের চরম আঘাত। এই রূপ, এই যৌবন, এই স্বাস্থ্য সমস্তই ব্যর্থ হ'য়ে গেছে। এ'কথা ভাবতেও কেমন খারাপ লাগে।

শুধু তাই নয়। মেয়েটির একমাত্র ছেলের ডিপথিরিয়া হয়েছে। কী হয় বলা যায় না। অবস্থা জটিল। সেই জন্যই কলকাতায় আসা। রোগ প্রথমে ধরা পড়েনি। গ্রামের ডাক্তার রোগ ধরতে পারেনি। প্রথমে সাধারণ জ্বর মনে ক'রে চিকিৎসা করা হয়। তারপর মনে করা হয় টাইফয়েড। অবশেষে যখন কাশি দেখা দিলো, গলার স্বর ব'সে গেলো, তখন রোগ ধরা পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় আনা হয়। ছেলেটিকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে।

মেয়েটি প্রতিদিন বিকেলে, হাসপাতালে গিয়ে ছেলেকে দেখে আসে। এই সময়টুকুর জন্যই যেন সে সারাদিন উন্মুখ হ'য়ে থাকে। যতক্ষণ বাড়িতে থাকে—তা'র বড় বড় কালো চোখে কী বিষাদ, কী উদ্বেগ, কী ব্যাকুলতা! দেখলে কষ্ট হয়। বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। এই তো সবে চার বছর বয়েস। আহা, সেরে উঠুক, বাঁচুক, মানুষ হোক।

কয়েকদিন পরে জানা যায় ছেলেটির অবস্থা ভালোর দিকে। ডাক্তার বলেছে, আর ভয় নেই। মায়ের মুখে হাসি ফোটে। চোখের কোণে ক্ষণে ক্ষণে তরুণী-সুলভ রঙ্গ-রসিকতার আলো ঝিলিক দিয়ে ওঠে। রেডিও শোনায় আগ্রহ দেখা যায়। ছেলে সেরে গেলে কী কী সিনেমা দেখা হবে সে সম্বন্ধেও পরিকল্পনা চলতে থাকে। চিড়িয়াখানাটাও আর একবার দেখতে হবে। আর সেই সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী। সেই পঞ্চবটী। রামকৃষ্ণ ঠাকুরের সাধনপীঠ। আহা, কী শান্ত আর পবিত্র স্থান। গেলেই ভক্তিভাবে মনপ্রাণ ভ'রে যায়।

কিন্তু এ অবস্থা স্থায়ী হলো না। ছেলেটির অবস্থা আবার খারাপ হ'য়ে পড়ে। এবার খুব খারাপ। তবে ছেলের মাকে তা' জানানো হয় না। হাসপাতালে যাওয়াই তার বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। বলা হয় ছেলে এখন বেশ ভালো হয়ে উঠেছে। কিন্তু মাকে দেখলে সে যে নানা রকম বায়না ধরে—বাড়ি আসার জন্য কান্নাকাটি করতে থাকে, তার ফলে তার শরীর আবার খারাপ হ'য়ে পড়তে পারে। সে জন্য মায়ের এখন হাসপাতালে না যাওয়াই ভালো। ডাক্তারবাবু ব'লে দিয়েছেন এ'কথা।

এর পর হতে তাই ছেলের কাকা শুধু তার দেখা-শোনা করতে থাকে।

ফলে মেয়েটি আবার বিষণ্ণ হ'য়ে পড়ে। ছেলে ভালো আছে জানা সত্ত্বেও প্রতিদিন সন্ধ্যার পর দেওরের কাছ থেকে ছেলের সংবাদ পাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠ হয়ে থাকে। কুশল-সংবাদ পেয়ে তবে নিশ্চিন্ত হয়। আবার পরদিন উদ্বিগ্ন মনে সংবাদের প্রতীক্ষা করে। এমনি প্রতিদিন।

যদিও মেয়েটি আমার কেউ-ই নয়, তবুও আমার মনও এক প্রকার অস্বস্তিতে ভ'রে থাকে। সব সময় ভয় হয়, এই বুঝি একটা ভালো-মন্দের খবর আসে।

শেষ পর্যন্ত যা' আশঙ্কা করেছিলাম তাই হলো।

সেদিন রাত্রি তখন ন'টা হবে। সবে খেয়ে উঠেছি। এমন সময় খবর এলো ছেলেটি মারা গেছে। প্রথমে ফিস ফিস ক'রে একে-ওকে জানানো হয়। তারপর ছেলের

মায়ের কানে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আছড়ে পড়ে মেয়েটি। তারপর বুকফাটা চীৎকারে রাত্রির নৈস্তব্ধ্য বিদীর্ণ হয়।

শেষ বসন্তে সেদিন রাত্রিও বুঝি শোকাচ্ছন্ন। দক্ষিণ সমুদ্র হতে যে-বাতাস হু হু ক'রে আসে তাতেও যেন কার হাহাকার। অদূরে লেকের জলে চাঁদের আলো প'ড়ে চিকচিক্ করে। সে-ও কান্নার মত।

—'ওরে খোকা কোথায় গেলিরে—আমার যে আর কেউ নেইরে'—

করুণ বিলাপ কানে এসে বেঁধে। মনে হয় আমার গলার কাছেও একটা বাষ্পের ডেলা পাকিয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি ঘরে এসে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ি।

ক্রমে রাত্রি অনেক হয়। ঢং ঢং ক'রে বারোটা বাজে। লেক-অঞ্চলের এই দিকটা এ সময় একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে যায়। যানবাহন জনপ্রাণীর এতটুকু সাড়াশব্দ নেই। শুধু পাশের ঘর হ'তে মেয়েটির চিৎকার কানে আসে। গ্রামের মেয়ে সে। গ্রাম্য মেয়ের মতই বিলাপ ক'রে কাঁদে। শুয়ে শুয়ে ভাবি, বিধবার একমাত্র অবলম্বন —আহা, কাঁদবেই তো!

রাত্রি একটা বাজে। নিদ্রাহীন আমি উঠে মাথায় মুখে জল দিয়ে আবার শুয়ে পড়ি।

—এবার মেয়েটির বোধ হয় চুপ করা উচিত। এত কাঁদলে অসুখ করবে যে। ওকে কি কেউ থামাবার চেষ্টা করছে না? কেউ কি নেই ও'ঘরে? বৌদি গেলো কোথায়? বৌদির তো উচিত তার বোনকে প্রবোধ দেওয়া। নাঃ, কেউ নেই বোধ হয়। সবাই কি ঘুমিয়ে পড়লো?

ঢং ঢং ক'রে দুটোও বেজে যায়। তখনও সুর ক'রে কাঁদছে মেয়েটি। গলাটা একটু ধরে গেছে। তবু সমানে চিৎকার ক'রে চলেছে। মাঝে মাঝে বোধ হয় একটু ঢুলুনি আসে। স্বরগ্রাম নিচু হ'তে হ'তে ক্ষণেকের জন্য থেমে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই আবার দ্বিগুণ জোরে চেঁচিয়ে ওঠে। তার মধ্যে আর কান্না আছে ব'লে মনে হয় না। শুধু কথা। সুর ক'রে রামায়ণ পড়ার মত কথা আর কথা। এটা কি শোকের প্রকাশ—অথবা গ্রাম্য প্রথার শুধু অনুবর্তন? কী এটা? এই সুর ক'রে কাঁদারই বা মানে কী? কেমন বিশ্রী লাগে আমার।

কিছুতে ঘুমতে পাচ্ছি না। মাথা ধুয়ে হাতপায়ে জল দিয়ে আবার শুলাম। কানের মধ্যে তুলো গুঁজলাম। তবু চিৎকার কানে এসে বেঁধে। নাঃ, আর ঘুমনো যাবে না। অথচ একটু ঘুমনোও দরকার। না হ'লে শরীর খুব খারাপ হবে। আমার স্বাস্থ্য মোটেই ভালো নয়। রুগ্ন মানুষ। সারা রাত জেগে থাকলে বাওয়েলস্, ক্লীয়ার হবে না। হয়তো পাইলস্‌ও বাড়তে পারে। কী যে মুস্কিলে পড়েছি!

সকাল আটটায় আবার মিস্টার দেশাই-এর সঙ্গে এনগেজমেণ্ট। এই সাদার্ণ অ্যাভিনিউ থেকে সেই টালায় তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করতে হবে। অনেক গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার আছে। যদি শরীর খারাপ হ'য়ে পড়ে, যদি যেতে না পারি—খুব ক্ষতি হবে। না, যেতে হবেই যে-ক'রে হোক।

এদিকে ক্লান্ত অথচ দ্রুতগতিতে রাত্রি শেষ হ'তে থাকে। চারটেও বেজে যায়। এখনও মেয়েটা ইনিয়ে-বিনিয়ে সুর ক'রে চেঁচাচ্ছে। কবে ছেলে দেখে কে কা বলেছিল, কবে ছেলে কী কী খেতে চেয়েছিল, এই সেদিনো অসুখের মধ্যে ছেলে নাকি লুকিয়ে তেঁতুল মুখে দিয়েছিল, সে যদি চলেই যাবে তাহলে মুখ থেকে তেঁতুল কেড়ে নেওয়ার কী দরকার ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি—কত যে কথা তার আর শেষ নেই।

এটা কি কান্না? কলকাতায় কী কখনো লোক মরে না? তাই ব'লে কেউ কি সারারাত এ'ভাবে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে? সত্যিকার শোক নীরব অশ্রুতে অভিষিক্ত। মনের গভীরে তা' স্তব্ধ, শীতল ও অতলান্ত। অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়ে এরা—এদের সে-বোধ নেই।

ক্রমে শেষ হয়ে আসে রাত্রি। অনিদ্রায় আমার চোখ জ্বালা করতে থাকে। চোখ দিয়ে জল পড়া শুরু হয়। সমস্ত গা-হাত-পা-ও কেমন ব্যথা-ব্যথা মনে হয়। বিছানায় পড়ে শুধু এ'পাশ ও'পাশ করি।

এখানে-ওখানে দু-একটা মোরগের ডাকও শোনা যায়। আর ঘুমবার চেষ্টা করা বৃথা। রাত্রি আর নেই। তখনও মেয়েটা যথাপূর্বং ইনিয়ে-বিনিয়ে চেঁচিয়ে চলেছে। ব্যর্থ রাগে আমার সমস্ত মাথা আগুন হয়ে ওঠে: চেঁচাক, চেঁচাক, সারা জীবন চেঁচাক। অসভ্য পাড়াগেঁয়ে ভূত কোথাকার।

মানবতার সাগর-সঙ্গমে, সুইডেনে আর সোবিয়েতে

শচীন সেনগুপ্ত

(চার)

কাবুল থেকে সাড়ে চার ঘণ্টায় তাসকেণ্ট পৌঁছুলাম। তাসকেণ্ট সোবিয়েত রিপাবলিক অব উজবেকিস্তান। তৈমুরের সামারকন্দ আর বাবরের ফারগণা এখন এই রিপাবলিকের আওতায়। তাসকেণ্টে নামবার আগে পথে নেমেছিলাম তিরমিজ নামক একটি যায়গায়। সেখানে আমাদের লাঞ্চ খাবার ব্যবস্থা ছিল। নিরামিষ লাঞ্চ। এখানে যে খাবার পেলাম সমগ্র সোবিয়েতে নিত্যই তাই খেতে হয়, অতিরিক্ত থাকে আমিষ। শাদা ও কালো রুটি, মাখন, চীজ, শসা-টমেটোর স্যালাড্ টেবিলে থাকবেই থাকবে। তিরমিজে তাই ছিল। অমৃতসরে পেট ভরে খেয়েছিলাম বলেই ওখানকার নিরামিষ লাঞ্চ দেখে তেমন ক্ষুণ্ণ হলাম না। সাধারণত আমিষের ছোঁয়াটুক না থাকলে খেয়ে তৃপ্তি পাই না।

লাঞ্চ শেষ হবার পর ওই এয়ারষ্ট্রিপে যে রুশী ছেলে-মেয়েরা ছিল, তারা কিছু গান-বাজনার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করল। গীটার বাজিয়ে অজিত বসু আমাদের দলে ছিলেন। তাঁকে দেখিয়ে বল্লাম—এই যে, ইনি একজন ওস্তাদ বাজিয়ে। তোমাদের কিছুটা আনন্দ নিশ্চিতই ইনি দিতে পারবেন। অজিত বসু হাত ধুয়েই বসে ছিলেন। তবুও নারী-সুলভ কৃত্রিম লজ্জা কণ্ঠে আর অঙ্গ-সঞ্চালনে প্রকাশ করে তিনি বল্লেন—কী বিপদে ফেল্লেন, শচীনদা। ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন। সবাই ভাবলেন গীটার বুঝি আর শোনা হোল না। আমি বল্লাম—অজিত গীটার আনতে গেছেন, ততক্ষণ তোমরা একটা রুশী-গান শুনিয়ে দাও। আমার বলা উচিত ছিল একখানা উজবেকী গান শুনিয়ে দাও। কিন্তু আমি তা বল্লাম না। আমার অভিজ্ঞতা ছিল যে, উজবেক তরুণ-তরুণীরা নিজেদের রুশ থেকে স্বতন্ত্র কল্পনা করতে চায় না। দুটি ছেলে-মেয়ে একটি দ্বৈত-সঙ্গীত গেয়ে শোনালে। এর মাঝেই অজিত বসু তার গীটার নিয়ে শ্রোতৃদের ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছেন। গান শেষ করেই রুশীরা তাঁকে বল্লে—আমাদের গান তুমি শুনলে, এখন তোমার বাজনা আমাদের শোনাও। অজিত বসু আর একবার কণ্ঠে আর চোখে (অপাঙ্গে বল্লাম না) লজ্জা জমিয়ে বল্লেন—কী বিপদে ফেল্লেন বলুন ত, শচীনদা। আমি বল্লাম—এ রকম বিপদ বার বার তুমি বরণ করে নেবে, আমি জানি। এখন তবুও এঁরা অপেক্ষা করছেন। এরপর কারু অনুরোধেরও অপেক্ষায় তুমি থাকবে না। তখন তোমার মুখ-রক্ষার জন্য আমাকেই তোমায় গায়ে পড়ে বার বার এমনই বিপদের মাঝে ঠেলে দিতে হবে।

আমি যতক্ষণ কথা বলছিলাম, অজিত ততক্ষণ সুর বাঁধছিলেন। আমার কথা শেষ হতে না হতেই অজিত গীটারে তারে সুর ফোটালেন। তিনি ভালো বাজিয়ে। রুশী-শ্রোতাদের তিনি খুশী করলেন। তাঁরা পরপর ফরমাস করে চললেন। সমগ্র রুশে সঙ্গীতের প্রতি যে আকর্ষণ দেখিছি, তাতে বিস্মিত হয়েছি। যেখানেই যাবো—গান অথবা বাজনা শুনতে হবে, শোনাতে হবে ; বিশেষ করে ভোজের নিমন্ত্রণে। খাওয়া আর গান শোনা, আর মাঝে মাঝে রসাল ভাষণ ব্যতীত রুশী খাবার যেন হজম করা যায় না। চীন দেশেও তাই দেখে এসেছি। আমাদের এবারকার ডেলিগেশনে গায়েন বায়েন বেশি ছিলেন না। শোভা চক্রবর্ত্তীকে ভোজের টেবিলে অথবা কোন সভাতে কখনো গান গাওয়াতে পারতাম না। অজিত বসু একাই এবার আমাদের মান রক্ষা করে এসেছেন। অবশ্য এবারকার এই ডেলিগেশনটি সাংস্কৃতিক ডেলি-গেশন নয়। আগের বারেরটিও তা ছিল না। কিন্তু সে ডেলিগেশনে গায়েন-বায়েন অনেক ছিলেন। সেবার ভূপেন হাজারিকা একাই একশ গায়েনের কাজ করেছেন। তাঁকে রুশী তরুণ-তরুণীদের চক্রব্যূহ থেকে বার করে আনতে আমাকে কখনো-কখনো নির্ম্মম হতে হোত। সেবার ডেলিগেশনের নায়ক ছিলাম আমি।

আমাদের ক্ষিতীশ বসু ও সেবার বেশ জমিয়ে নিয়েছিলেন। হাজারি-কাকে এবং তাঁকে একবার প্রাহায় (চেকোশ্লোভাকিয়ায়) আর একবার টাসকেণ্টে টেলিভাজড্ করা হয়। ক্ষিতীশ সম্বন্ধে সেবারকার একটা গল্প বলি। যদিও তিন বছর আগেকার কথা, তবুও স্মৃতিতে গোলাপী রঙ ধরিয়ে রেখেছে। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের কথা।

হেলসিঙ্কি পৌঁছুবার পরের দিনই আমাদের কাউন্সিলের জেনারেল সেক্রেটারী রমেশচন্দ্র আমাকে জানালেন যে, লাঞ্চের পর আমাকে হেলসিঙ্কি থেকে আশী মাইল দূরে একটি শহরে যেতে হবে মোটরে। সেখানে একটি শান্তি একজিবিসনের উদ্বোধন হবে। ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে আমাকে আর বোম্বাইয়ের একজন মুসলমান চিত্রকরকে। শহরের নামটি তিনি বলতে পারলেন না। ফিনল্যাণ্ডের মতো সুন্দর দেশ, যার প্রতিটি দৃশ্যমান অংশই এক একখানি ছবি মনে হয়, স্বভাবতই ভ্রমণের স্পৃহা জাগিয়ে দেয়। সেই দেশের বুকের উপর দিয়ে আরাম-প্রদ মোটরে আশী মাইল যাবার এবং ফিরে আশী মাইল আসবার প্রস্তাব কি প্রত্যাখ্যান করা যায়। তখুনি রাজী হলাম। রমেশ বল্লেন, লাঞ্চের পরই ইণ্টারপ্রিটার গাড়ী নিয়ে আসবে।

লাঞ্চ খেয়ে বাইরে পা দিতেই একটি সুন্দরী ফিনিস তরুণী এগিয়ে এসে বল্লেন—আপনিই ত মিঃ সেনগুপ্ত ?

আমি জবাব দিলাম—হ্যাঁ। কে চিনিয়ে দিলে ?

—এই কাগজ। তিনি একখানি দৈনিক কাগজ আমার সামনে খুলে

বললেন। কী লেখা আছে কিছুই বুঝতে পারলাম না, দেখলাম আমার ছবি ছাপা রয়েছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—এরা কী লিখেছে।

—আপনি তুরকু যাচ্ছেন সেই খবর দিয়েছে, আর পরিচয় দিয়েছে আপনি কোলকাতার একজন খ্যাতনামা নাট্যকার এবং ন্যাশনাল ড্রামা একাডেমির কাউন্সিলার। চলুন গাড়ীতে বসে বসেই কথা হবে। আমাদের একটু দেরী হয়ে গেছে।

—কিন্তু আমার সঙ্গে আর কার যেন যাবার কথা ছিল!

—মিঃ হুসেনীর। কিন্তু তাঁকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি একাই চলুন। আশী মাইল পথ যেতে সময়ও ত কিছু লাগবে।

ঠিক সেই সময়ে ক্ষিতীশ পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখেই আমার মনে হোলো একটি গাইয়ে সঙ্গে নিলে ত বেশ হয়!

আমি বল্লাম—ক্ষিতীশ, বেড়াতে যাবে?

সুরূপা ইণ্টারপ্রিটারের দিকে চকিতে চেয়ে নিয়ে সে বল্লে—আপনি হুকুম করলেই যাই, দাদা।

—আমার আমন্ত্রণই আদেশ, গাড়ীতে উঠে পড়।

ক্ষিতীশ দাদার আদেশ পালন করে দাদাকে ধন্য করল।

গাড়ী ছুটে চল্ল—মনে হতে লাগল যেন স্বপ্নপুরীর মাঝ দিয়ে উড়ে চলেছে। ড্রাইভারকে একটু আস্তে চালাতে অনুরোধ করলাম। সে জানালে মোটে ত পঞ্চাশ মাইল স্পীড দিয়েছি। ইণ্টারপ্রিটার তার বক্তব্য তর্জ্জমা করে শুনিয়ে হেসে বল্লেন—ও খুব ভালো গাড়ী চালায়। আর পেশাদারী ড্রাইভার ও নয়। ইণ্টারপ্রিটারটির নাম কাইয়া বিয়ে-ভোলা; ইংরেজি ভাষায় বেশ দখল। জিজ্ঞাসা করে জানলাম—আমাদের গন্তব্য স্থল হচ্ছে তুরকু। ফিন্‌ল্যাণ্ড যখন সুইডেনের অধীন ছিল, তখন এই শহরটিই ছিল রাজধানী। এখনো সুইডেনের সঙ্গে এই শহরের যোগ রয়েছে। এর বন্দর থেকে রোজ একখানা খেয়া-জাহাজ যাওয়া-আসা করে।

তুরুক শহরে ঠিক সময়টিতেই পৌঁছুলাম। শান্তি একজিবিশনে ঢুকতেই একটি ভদ্রলোক এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। তার সঙ্গে কোথায় কবে আলাপ হয়েছে স্মরণ হোল না। তাঁর ইণ্টারপ্রিটার স্মরণ করিয়ে দিলেন ভদ্রলোকটি হাঙ্গেরীর সাংস্কৃতিক মন্ত্রী, পিকিংয়ে তিন বছর আগেকার সামান্য পরিচয়টুকু বড় কথা নয়, ব্যক্তিগত পরিচয়-টাও বড় কথা নয়, বড় কথা হোলো ভারত-হাঙ্গেরীর পরিচয়। ভারতের বাইরে প্রত্যেক ভারতীয়ই ভারত, আর প্রতি দেশের প্রতিটি অধিবাসীই তার দেশ। তাই এই রকম আকস্মিক পুনর্মিলনের আনন্দের কারণ ব্যক্তিগত মিলন নয়, জাতিগত মিলন। হাঙ্গেরীর সেই সাংস্কৃতিক মন্ত্রীটি অভিনন্দন জানাবার জন্ত সে-কথা বলেও ফেল্লেন। তিনি বল্লেন—বিশ্বশান্তির প্লাটফর্ম্মে ভারত আর হাঙ্গেরীর পৌত্র-পুত্রিক মিলন খুবই আশার কথা। আমাদের যেন কখনো বিচ্ছেদ না হয়।

আমি বল্লাম—এ বিষয়ে আমাদের মনান্তর কখনই ঘটবেনা।

শান্তি-একজিবিশনের উদ্বোধন শেষ হবার পর আমাদের শহর দেখাবার ব্যবস্থা হোলো। আমরা দর্শনীয় সব কিছু দেখে-দেখে ডকে গিয়ে উপস্থিত হলে বল্লেন, শহরের একটি অপেরা হাউসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একটি সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, আমাকে সেই সভায় কিছু বলতে হবে।

আমি সাফ অস্বীকার করলাম।

তারা কারণ জানতে চাইলে।

আমি বল্লাম—আমি বিদেশী। তোমাদের দেশের রাজনৈতিক সভায় উপস্থিত থাকবার অধিকারই আমার নেই; কিছু বলা ত একেবারে অসম্ভব।

তারা বল্লে—সভাটা রাজনীতি আলোচনা করবার উদ্দেশ্যে ডাকা হয়নি। ডাকা হয়েছে একই রাজনৈতিক মতবাদের চারটি দলের মিলন ঘটাবার উদ্দেশ্যে। তোমাকে কিছু বলতে অনুরোধ করছি এই কারণে যে, তোমরা ভারতবাসীরা মিলনের মন্ত্র জান।

আমি চমকে উঠ্‌লাম। আমার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল—তাই নাকি!

—আমরা ত তাই জানি।

তারা যা জেনেছে, তা যে ভুল, তাই বলতে ইচ্ছে করল। কিন্তু তা বলতে বাধল। যারা আমাকে তুরকুতে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা বল্লেন—আপনি যান, স্যর। নইলে ওরা ভাববে আমরাই যেতে দিলামনা।

আবার চমকে উঠলাম। ভারতে এই রকম কথা শুনতেই ত অভ্যস্ত। রাজনৈতিক মতবাদ ভয় করলে বোধ করি সব দেশের মানুষই একরকম হয়ে যায়। আমি ওদের সঙ্গে যেতে রাজী হলাম। আমাদের মূল হোষ্টরা আমাদের অপেরা হাউসের ফটক পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে নতুন হোষ্টদের বল্লেন—আপনাদের কাজ হয়ে গেলে আমাদের ফোন করবেন। আমরা এসে ওঁকে নিয়ে যাব। তাঁরা অপেরা-হাউসে ঢুকলেন না।

অপেরা হাউসে ঢুকতেই প্রেক্ষাগারের তিন-তলার সমস্ত দর্শক, প্রায় তিন-চার হাজার, উঠে দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে অভ্যর্থনা করল। অভিভূত হলেও এ-কথা ভুল্লাম না যে, এই অভ্যর্থনাও অভিনন্দন এই অজ্ঞাতনামা ভারত-সন্তানকে উপলক্ষ করে নতুন ভারতকেই জানানো হচ্ছে।

আমরা যখন ঢুকি তখন বক্তৃতা চলছিল। তাঁর বক্তৃতা শেষ হতেই আমাকে আহ্বান করা হলো, কিছু বলতে। আমি মিনিট দশেক বল্লাম, কাইয়া ফিনিশ ভাষায় তা তর্জ্জমা করে শোনাতে লাগলেন। আমার বক্তব্য শেষ করার মুখে আমি জানালাম যে আমার সঙ্গী দ্বিতীয় ভারতীয়টি বক্তৃতা করবেন না, গান শোনাবেন। ঘোষণা মাত্রই তুমুল হর্ষধ্বনি। নিজে নেমে এসে আমি ক্ষিতীশকে মঞ্চে তুলে দিলাম।

কাইয়া বল্লেন—ওঁর গানের মর্ম্মটা তাড়াতাড়ি আমাকে বলে দাও, শ্রোতৃদের বলে দি।

—কি গাইবে, তাত জানিনা আমি।

কাইয়া তাই জানতে ছুটে গিয়ে দাঁড়ালেন ক্ষিতীশের পাশে। ক্ষিতীশের পেটে কু-বুদ্ধি জমে উঠেছিল। হেলসিঙ্কি ছাড়বার পরই মোটরে বসেই সে একটি গান রচনা করে ফেলেছিল। আমাকে একবার দেখিয়েছিলও। পড়ে আমি বলেছিলাম—এটা ত গানও হয়নি, কবিতাও হয়নি। ক্ষিতীশ এতটুকু দমেনি তাতে, মনে-মনে গানটাকে সুরেও বেঁধে ফেলেছে। গানটা ফিনল্যাণ্ডের অধিবাসীদের প্রশস্তি। হারীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'হিন্দী-চীনী ভাই-ভাই' রচিত গানটি আমি চীনে নিয়ে গিয়েছিলাম। দেবব্রত বিশ্বাস সেটিকে এমনই জনপ্রিয় করে দিয়ে এসেছিলেন যে, আজও ভারতীয়দের সঙ্গে মিলিত হলেই চীন তরুণ-তরুণীরা 'হিন্দী-চীনী ভাই-ভাই' বলে সম্বর্দ্ধনা করে। ক্ষিতীশ বোধ করি তেমনই একটি উচ্ছাশা নিয়ে গানটি রচনা করে-ছিলেন এবং গেয়েছিলেনও আবেগ ঢেলে। গানটি শেষ হতেই করতালিধ্বনি হোলো। আমার মনে হোলো, তা যেন কেবল সৌজন্য-সূচক। তাই আমি ক্ষিতীশকে একটি ভাটিয়ালি ধরতে অনুরোধ করলাম। ক্ষুদ্র ফিনল্যাণ্ডে সাতশটি হ্রদ আছে, দেশটি সাগর-ঘেরা। ক্ষিতীশের ভাটীয়ালি মুহূর্ত্তেই শ্রোতাদের চিত্ত স্পর্শ করল। গান শেষ হতেই যে করতালিধ্বনি হোলো, তাতে মনে হোলো অপেরা-গৃহের ছাদ বুঝি বা ভেঙে পড়ে। এসব গান গাইবার খ্যাতি দেশে ক্ষিতীশের ছিলনা। গাওয়া যাই হোক, সুরের আবেদন যাবে কোথায়? ক্ষিতীশ ক্ষান্তি চান, কিন্তু শ্রোতৃদের দাবী আর একবার, আর একবার! সে এক অনুপম অভিজ্ঞতা। ক্ষিতীশকে চারবার ওই একটি গানই গাইতে হলো। কমিক-গান গাওয়া ক্ষিতীশ ফিন-ল্যাণ্ডের শীতেও ঘর্ম্মাক্ত হয়ে উঠল।

আমি তখন উঠে দাঁড়িয়ে বল্লাম—ভারতীয় লোক-সঙ্গীতের সুর আপনাদের রসানুভূতিকে তৃপ্তি দিতে পেরেছে বুঝে আপনাদের কাছ থেকে মানবের মহামিলনের প্রেরণা পেলাম। এই রাতের অভিজ্ঞতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ভারতে বহন করে নিয়ে যাব আমরা। কিন্তু রাত এখন এগারটা। আমাদের আশী মাইল পথ অতিক্রম করে ফিরে যেতে হবে হেলসিঙ্কি শহরে। তাই বেদনাভারাক্রান্ত চিত্তে আপনা-দের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছি। আপনাদের কল্যাণ হোক্, অটুট শান্তির অধিকারী হোন আপনারা।

প্রেক্ষাগৃহে যত বৃদ্ধা ছিলেন, নীচের তলায়, তাদের অধিকাংশ আসন ছেড়ে সারিবদ্ধ দাঁড়ালেন বেরিয়ে আসবার পথের দুই-দিকে, প্রত্যেকেই হাত বাড়িয়ে দিলেন করমর্দ্দনের জন্য। অনেকের চোখ, দেখলাম, অশ্রু-সজল।

বিশেষ করে এই বৃদ্ধারাই কেন এমন করে আমাদের বিদায় দিলেন, তার কারণ বুঝতে বেশি-কিছু ভাবতে হোলনা। এঁদের প্রত্যেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রিয়জনদের হারিয়েছেন। তাই বিশ্বশান্তির জন্য যাঁরা বিশ্বময় আন্দোলন করে ফিরছেন, তাঁদের সহজেই আপন-জন করে নিতে পেরেছেন। ভাটিয়ালি সুরও তাঁদের হৃদয়ের-দুয়ার খুলে দিয়ে অবরুদ্ধ আবেগকে টেনে বার করেছিল।

অনুরূপ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছিলাম ওরই কিছুদিন পরে উক্রে-নিয়ার রাজধানী, নীপার নদের তীরে অবস্থিত, কিয়েভ শহরে। কিয়েভের যে হোটেলে আমরা ছিলাম, সেই হোটেলেই আমাদের একটা ব্যাঙ্কোয়েট দেওয়া হয় বিদায় দেবার রাতে। সব শেষে আমি হোটেলের কর্ম্মীদের এক যায়গায় ডেকে নিয়ে আমাদের ডেলিগেশনের পক্ষ থেকে তাদের কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য বল্লাম —দেশ থেকে বহুদূরে এসে আমরা তোমাদের আতিথ্য গ্রহণ করিছি। আমরা তোমাদের ভাষা বুঝিনি, তোমরা বোঝনা আমাদের ভাষা। কিন্তু তোমরা স্নেহ দিয়ে সেবা দিয়ে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রীতি টেনে নিয়েছ, আর সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করে দিয়েছ আমাদের প্রতি তোমাদের চিত্তের শ্রদ্ধা ও প্রীতি দিয়ে। আমাদের গায়ের রঙ, মুখের ভাষা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা পৃথক হওয়া সত্বেও পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি আমাদের এক করে দিয়েছে। একদিন আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম আমরা পরবাসী, আমরা হোটেলে রয়েছি…

এই পর্য্যন্ত বলতেই চাপা-কান্নার শব্দ শুনে আমি থেমে গেলাম, চেয়ে দেখলাম তিন-চারটি নারী-কর্ম্মী এপরণে মুখ চাপা দিয়ে ফুঁসে ফুঁসে কাঁদছে।

রুশী ইণ্টারপ্রিটারকে বল্লাম—হোলো কি তামারা? অন্যায় কথা কিছু বল্লাম কি?

কি ঘটেছে জেনে নিয়ে তামারা বল্লে—ওরা কাঁদছে, যুদ্ধে নিহত ওদের স্বামী-পুত্রদের স্মরণ করে। অমনি স্নেহভরে তারাও কথা কইত। ওরা ভাবছে বিশ্বশান্তির বাণী নিয়ে সেই তোমরা দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ আজ। কয়েকটা বছর আগে কেন একথা ভাবলে না? তা যদি ভাবতে, তাহলে হয়ত ওদের স্বামী-পুত্রকে হারাতে হোতনা।

আমি আর বক্তৃতা ফিরে শুরু করতে পারলামনা। সজল চোখে নীরবে সকলের করমর্দ্দন করে অপেক্ষমান মোটরে গিয়ে উঠলাম— উক্রেনিয়ার কালচুর‍্যাল মিনিষ্টার এসে পাশে বোসলেন। তাঁর সঙ্গেও প্রাণ খুলে কথা বলতে পারলাম না, মন এমনই ভারি হয়েছিল।

তিরমিজ এয়ার ষ্ট্রীপের গানবাজনার কথা বলতে বলতে মন তিন-বছর আগেকার শান্তি-সফরের দিনগুলিতে চলে গিয়েছিল। তিন বছর পরেও দেখলাম মানুষের চিত্তের কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। সুরের মাঝে স্বরের মাঝে মানবপ্রীতির পরিচয়টুকু প্রকাশ পেলেই মানুষ সব অমিল সবলে সরিয়ে দিয়ে মিলনের জন্য হৃদয়ের দুয়ার খুলে দেয়। তিরমিজে গান-বাজনা উপলক্ষ করে পারস্পরিক প্রীতির যে সূচনা হোলো, অতীত দিনগুলি থেকে যে আদৌ বিচ্ছিন্ন হইনি তাই যেন আমাকে বুঝিয়ে দিল। দেড়ঘণ্টাকাল তিরমিজে কাটিয়ে আমরা আবার প্লেনে উঠলাম, আর দেড়ঘণ্টা উড়ে গিয়ে নামলাম টাসকেণ্টের সুবৃহৎ এয়ার-পোর্টে।

মাটিতে পা-দিয়েই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে কিছুকাল আমি দাঁড়িয়ে

এলাম? এই কি তাসকেন্টের সেই এয়ার-পোর্ট, যা তিন বছর আগে দেখে গিয়েছিলাম? একতলা সেই নাতিবৃহৎ বাড়িটি কোথায়? কোথায় সেই দ্রাক্ষাকুঞ্জ? কোথায় সেই বিচিত্রবর্ণসমন্বিত ফুলের কেয়ারী?

একটি ত্রিতল প্রাসাদতুল্য বাড়ীর সামনে আমাদের নামিয়ে দিল কেন? মস্কো এসে পড়লাম নাকি!

তিনবছরে তাসকেন্ট এয়ার পোর্টের পরিবর্ত্তন হয়েছে। এখন জেট-প্লেনের যুগ শুরু হয়েছে, বিমান-বহরের ফ্যাশান ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এই পরিবর্তন, মাত্র তিনটি বছরে। চারি দিকে চেয়ে দেখলাম। অপেক্ষমান প্লেনগুলি গণনা করে শেষ করতে পারলামনা। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে মার্ব্বেল-পাথরে তৈরি সুপ্রশস্ত সোপান বয়ে দ্বিতলের বিশ্রামগৃহে গিয়ে সকলে বোসলাম।

এবার আমরা উজবেক রিপাবলিকের অতিথি নই, মস্কো শান্তি-কমিটির অতিথি। তাই তাসকেন্টে অভ্যর্থনার তেমন আড়ম্বর ছিলনা, যেমনটি ছিল আগের বারে। সেবার ডেলিগেশন-নায়কের গাড়ীর সামনে চলত পাইলট কার, ডেলিগেশনের বাসস্থান করা হয়েছিল পুষ্প-কুঞ্জে ঘেরা একটি ভিলায়। এবার থাকতে হয়েছিল সুবৃহৎ এক হোটেলে।

তাসকেন্টে পৌঁছুলেই তৈমুর বাবরের কথা মনে পড়ে যায়। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তৈমুরের বার বার দিল্লী লুণ্ঠনের এবং অমানুষিক হত্যার বীভৎসতার ভিতর দিয়ে। কিন্তু পরবর্তীকালে বাবরের বংশধররা ভারতবর্ষকেই তাঁদের নিজেদের দেশ করে নিয়ে তাঁদের পিতৃ-পিতামহ-মাতামহদের দেশ থেকে নিজেদের একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ফেল্লেন। ভারতকে তাঁদের স্বদেশ করে নেবার প্রয়াসে তাঁরা যা করলেন, তা প্রাক-মুঘল আমলের ভারতীয়দের যেমন বেদনার কারণ হয়েছিল, তেমন নানা সাংস্কৃতিক অবদান দিয়ে সম্পন্নও করে তুলেছিল। আঘাত ও সান্ত্বনার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষ যে নতুন রূপ পরিগ্রহ করল, যে সাংস্কৃতিক চেতনা সে লাভ করল, তা প্রাক-মুঘল আমলের ভারতের রূপ থেকে অনেকাংশে পৃথক হয়েও ভারতীয় রূপ বলেই স্বীকৃতি পেল, যেমন ভারতীয়-দের কাছে, তেমন বিদেশীদেরও কাছে। আজকার দিনে, পাকিস্তান সৃষ্টির পরেও, সেই রূপ ভারতীয় নেশনের ও ন্যাশনালিজম-এর বাস্তব রূপ দিয়ে রয়েছে। আজ কিন্তু তৈমুরের বীভৎসতার স্মৃতি আমাদের চিত্তকে বেদনাক্লিষ্ট করে না। তৈমুরের রাজধানী সমরকন্দে গিয়েও মুহূর্তের জন্যও ক্ষুব্ধ হইনি। শুধু তৈমুরের সমাধির পাশে বহুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে এই কথাই ভেবেছি—অসাধারণ শক্তির অধিকারী হয়েও যে মানুষটির দেহাবশেষ এই সমাধিতে ধূলো হয়ে রয়েছে, সে-মানুষটির চিত্তে কোথাও কি মানবতার কিছুই ছিল না?

সমরকন্দের একটি বিখ্যাত মসজিদ দেখবার সময় সেখানকার গাইড একটি গল্প শুনিয়েছিলেন। গল্পটি এই:

তৈমুরের প্রিয়তমা মহিষী এবং পাটরাণী ছিলেন অসামান্যা সুন্দরী একটি তরুণী। সেই তরুণী রাণীর একবার খেয়াল হোলো তার স্বামী যখন দিগ্বিজয়ে আবার বার হবেন, তখন তাঁর অনুপস্থিতিকালে, তার অজেয়-শক্তির মূলে যা রয়েছে, তারই নিদর্শন রূপে এমন একটি মসজিদ তৈরি করবেন, যার সমতুল মসজিদ আর কোন দেশে নেই। রাণী কিন্তু সম্রাট-স্বামীর কাছে তাঁর এই সঙ্কল্পের কথা ব্যক্ত করলেন না। তৈমুর যখন দিগ্বিজয়ে বার হলেন রাণী তখন ঘোষণা করলেন যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মাঝে যে স্থপতি অনুপম একটি মসজিদ করে দিতে পারবেন, পারিশ্রমিক ছাড়াও তিনি প্রচুর পুরস্কার পাবেন। সর্ব্বাগ্রে শিল্পীদের মসজিদের নক্‌সা পাঠাতে হবে। দেশ-বিদেশ থেকে শিল্পীরা নক্‌সা পাঠালেন। মাত্র একটি নক্‌সা রাণীর পছন্দ হলো। রাণী সেই শিল্পীকে আহ্বান করলেন। শিল্পীটি তরুণ, কন্দর্পকান্তি। পর্দ্দার আড়াল থেকে রাণী তাঁকে দেখে বিস্মিত হয়ে ভাবলেন—এই তরুণ বয়সে এমন শিল্প-নৈপুণ্য কেমন করে অর্জ্জন করল অশ্রুতনামা এই স্থপতি! উজীরকে রাণীর নির্দ্দেশ দেওয়াই ছিল। রাণীর সামনেই উজীর শিল্পীকে প্রশ্ন করতে লাগলেন।

—আগে আর কোথায় তুমি মসজিদ তৈরি করেছ?

—কোথাও না।

—আর কোন নক্‌সা তোমার করা আছে?

—যে নক্‌সা আমি পেশ করেছি, তাই আমার প্রথম ও শেষ নক্‌সা।

—সম্রাট ফিরে আসবার পূর্ব্বে তুমি মসজিদ তৈরি সম্পূর্ণ করে দিতে পারবে?

—কাল ফিরে এলে পারব না, পরশুও না, এক বছরের মাঝে ফিরে এলেও পারব না। অন্তত দেড় বছর সময় আমার লাগবে।

—না পারলে তোমার গর্দ্দানা যাবে, তা জান ত?

—জানি।

—দেড় বছরের সময় তুমি পাবে।

তরুণ শিল্পী মসজিদ নির্ম্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁর প্রার্থনা অনুযায়ী রাণী ঘোষণা করলেন শিল্পীকে সাহায্য করবার জন্য দশ সহস্র শিল্পী ও ষ্টাফ নিয়োগ করা হোক, দেশে দেশে উটের, ঘোড়ার, গাধার গাড়ীর বহর পাঠিয়ে মাল-মশলা আনবার ব্যবস্থা করা হোক। শিল্পীর প্রয়োজন পূর্ণ করতে কোন ত্রুটি ঘটলে উজীরের গর্দ্দানা যাবে।

তাই কোন বিষয়ে কোন ত্রুটিই আর রইল না, দিনে দিনে দিবা-রাত্র কাজের ফলে মসজিদ রূপ পরিগ্রহ করতে লাগল। রোকারে যখন সূর্য্য পাটে বসতেন, তখন দাসী-পরিবৃতা হয়ে রাণী দেখতে যেতেন মসজিদের কাজ কতটা এগিয়েছে। রাণী চেয়ে থাকতেন মসজিদের নানা কাজের দিকে, আর শিল্পী চেয়ে থাকতেন অস্তগামী সূর্য্যের লালিমায় উদ্ভাসিত বুরখার অন্তরালবর্তী ইরাণী রাণীর নিখুঁত মুখখানির নিরুপম গড়নের দিকে।

সহসা একদিন দুজনারই অজ্ঞাতে পঞ্চশর তাঁর চিরন্তন চাতুরী প্রকাশ করলেন, সর্ব্বাঙ্গে অকারণ পুলক-শিহরণ অনুভব করে রাণী ও

শিল্পী একই মুহূর্ত্তে পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় করে প্রস্তর মূর্ত্তির মতো স্তব্ধ রইলেন। নিঃশব্দে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো, প্রধানা সহচরী রাণীর দেহ স্পর্শ করলে চমকে উঠে রাণী তার হাত ধরে প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চল্লেন তাতারী-দাসী পরিবৃতা হয়ে। শিল্পী সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

রাণী চলে যেতেই দিকে দিকে মশাল জ্বলে উঠল, সহস্র সহস্র মজুর কারিকর এগিয়ে এলো সারারাত কাজ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে, চারিদিকে চল্ল কর্ম্মচাঞ্চল্য, ত্রুটি যার ধরা পড়বে, তারই ত গর্দ্দানা যাবে! গর্দ্দানা গিয়েছে হাজার হাজার অলস-বিবেচিত মজুরের।

মূর্তির মতো স্তব্ধ শিল্পী সেই কর্ম্ম-চাঞ্চল্যের কোন অর্থই আর খুঁজে পাননা। কী হবে নির্দ্দিষ্ট কালের মাঝে মসজিদ্ সম্পূর্ণ করে? কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আর ত রাণী দিবস-যামিনীর সন্ধিক্ষণে তাঁর সামে এসে দাঁড়াবেন না, আর ত ভাববেন না তাঁকে আনন্দ দেবার জন্য এক তরুণ শিল্পী নিজেকে একেবারে নিঃস্ব করে ফেলেছে! শিল্পী স্থির করলেন মসজিদ নির্ম্মাণের কাজ তিনি বিলম্বিত করবেন; যত বেশি দিন লাগবে, তত বেশি দিনই রাণীকে দৈনিক একটিবার করে দেখবার আনন্দটুকুত পাবেন। সর্ত অপূর্ণ হলে গর্দানা যাবে? হোলই বা। রাণীর দর্শন না পেলে গর্দ্দানা বহাল রেখেই বা শিল্পী কতটুকু লাভবান হবেন। মসজিদ নির্ম্মাণের কাজ মন্থর হতে লাগল।

রাণী তা লক্ষ্য করে একদিন শিল্পীকে জানালেন যে এ-ভাবে কাজ ফেলে রাখলে তিনি গর্দ্দানা বাঁচাতে পারবেন না। শিল্পী নিবেদন করলেন—কাজ তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই শেষ করে দিতে পারেন রাণীর একটুমাত্র দাক্ষিণ্যের দয়া পেলে।

রাণী জানতে চাইলেন তাঁর প্রার্থনা কি!

শিল্পী অকুতোভয়ে বল্লেন—পলকের তরে অধরে অধরের পরশ।

শিল্পীর স্পর্দ্ধার পরিচয়ে রাণীর সর্ব্বশরীর কেঁপে উঠল, হতভাগ্য শিল্পী কেমন করে ভুলতে পারল তিনি ভূবিজয়ী তৈমুরের প্রিয়তমা, শ্রেষ্ঠতমা মহিষী! রাণী প্রহরীদের আহ্বান করলেন না, শিল্পীকে তিরস্কার করলেন না, তার সীমাহীন স্পর্দ্ধার কথা ভাবতে ভাবতে দাঁতে অধর চেপে তারই দিকে চেয়ে রইলেন, ধীরে ধীরে আঁধার নেমে এলো, দুটি প্রদীপ্ত চোখ আর দুটি প্রদীপ্ত চোখ দেখে স্তব্ধ হয়ে রইল।

প্রবীণা সহচরী মৃদু স্পর্শ দিয়ে রাণীকে সচেতন করতে চাইল। রাণী অস্ফুট স্বরে তাঁর অভিলাষ ব্যক্ত করলেন। সহচরী দাসীদের নিয়ে দূরে সরে গেল। রাণী চেয়ে চেয়ে দেখলেন তারা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। একবার দশদিক চেয়ে দেখলেন। তারপর স্থির পদক্ষেপে শিল্পীর কাছে এগিয়ে গিয়ে বল্লেন—তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করে তোমাকে আমি ধন্য করব, নিজেও হবো ধন্যা। শেষ কয়েকটি কথা আর তিনি শেষ করবার অবসর পেলেননা। মুহূর্ত্তের জন্য দুটি অধরে অধরে পরশ। তারপরই রাণী বুরখা টেনে দিয়ে বল্লেন—নির্দ্দিষ্ট সময়েই মসজিদ যেন সম্পূর্ণ হয়।

তাই হোলো। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে মসজিদের সকল কার্য্য সু-সম্পন্ন হয়ে গেল। রাণী শেষ পরিদর্শন করে শিল্পীকে সাধুবাদ জানাবার জন্য তার সন্ধান করলেন, সন্ধান কেউ দিতে পারল না। রাণী সাশ্রু নয়নে প্রাসাদে ফিরে গেলেন।

তৈমুর ফিরে এলেন। তাঁর প্রিয়তমা, শ্রেষ্ঠতমা মহিষী মসজিদটি সমারোহ সহকারে স্বামীকে নিবেদন করলেন—প্রণয়ের সর্ব্বোত্তম পরিচয়।

তৈমুর জানতে চাইলেন—এত অল্প সময়ে এমন বৃহৎ মসজিদ এমন মহিমামণ্ডিত হলো কেমন করে? তৈমুরের প্রশ্নের উত্তরে তৈমুরের সামে দাঁড়িয়ে তৈমুরের প্রিয়তমা শ্রেষ্ঠতমা মহিষী অকম্পিত কণ্ঠে বল্লেন—তার জন্য তাকে কী মূল্য দিয়ে একেবারে নিঃস্ব হতে হয়েছে।

তৈমুর সব শুনলেন, ঘাতককে ডাকলেন না, নিজের তলোয়ার কোষমুক্ত করলেন না, ইরাণী ছোরাও খাপ থেকে টেনে বার করলেন না, অস্ফুট শব্দে শুধু ব্যক্ত করলেন—সেই অকৃত্রিম অনুপম শিল্পীকে আমি একবার দেখতে চাই।

শিল্পীকে কোথাও পাওয়া গেলনা। তার শাকরেদ এক কিশোরকে বেঁধে আনা হলো।

শান্তস্বরে তৈমুর জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার গুরু কোথায় বালক?

ভয়ে আড়ষ্ট কিশোর।

—নির্ভয়ে বল, অভয় দিলেন তৈমুর।

কিশোর এইবার কথা কইল। সে বল্ল—রাণী যে-দিন সন্ধ্যায় আমার গুরুর কাজে সন্তোষ প্রকাশ করে যান, সে সন্ধ্যায় আমি মসজিদের সামে দাঁড়িয়ে ছিলাম। চাঁদের আলোয় দেখলাম, আমার গুরু ধীরে ধীরে সবচেয়ে উঁচু মিনারটির শিখরে দাঁড়িয়ে নীলিমায় বাহু মেলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলাম, গুরু আমার লহমায় নীলিমায় মিলিয়ে গেলেন।

শুনে তৈমুর স্তব্ধ, স্তব্ধ পাত্র-মিত্র সব। পর্দ্দার অন্তরালে প্রস্তর মূর্ত্তির মতো উপবিষ্টা রাণীর দুগাল বয়ে ঝরছে অশ্রুধারা। সে গালে আর লেশমাত্র লালিমা নেই।

ক্রমশঃ

ধর্ম্মে অভয়ত্ব ও ভয়বাদ

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা

নিখিল বিশ্বের মত বিশ্বমানবের ঈশ্বর ধারণাও বহু বিচিত্র। এই বিচিত্রতার একটা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য রহিয়াছে। সেইজন্যই ইহা একান্তই স্বাভাবিক। ধর্মে সমন্বয় প্রচেষ্টা বরং কতকটা অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক। স্রষ্টার কামনা হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও আবির্ভাব। ব্রহ্ম ঈক্ষণ করিলেন—এক আমি বহু হইব, একোহম্ বহু স্যাম প্রজায়েয়। সেই পরম ইচ্ছা হইতেই বিচিত্রতা বহুলতা।

মানব জাতির ঈশ্বর ধারণায় ও ধর্ম বিশ্বাসেও এই বিশেষত্ব সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। বহু ব্যক্তি মনে করে ভগবানের অস্তিত্ব নাই। প্রমাণ নাই বলিয়া অস্তিত্ব নাই। সৃষ্টি আপনা আপনি হইয়াছে। ইহার কোনও কর্ত্তা নাই। গীতার ভাষায়—অপরষ্টার সম্ভূত। কতক কতক লোক আবার সংশয়বাদী agnostic। অরণ্যবাসী বন্য মানব যাহাদিগকে অসভ্য বলিয়া অভিহিত করা হয়, তাহাদিগের স্রষ্টা ও পাতার ধারণা—সভ্য মানবের ঐশ্বরিক ধারণা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কোনও কোনও বন্যজাতি মনে করে—কোনও বিশেষ প্রকার জীবজন্তু, ভূত বা প্রেতই তাহাদের স্রষ্টা। পাশ্চাত্য অভিমতে ইহারা টটেম উপাসক। কোনও কোনও বন্য জাতির দেবতার নাম বোঙ্গাবুঙ্গি। বৃক্ষ উপাসনা করে এমন সম্প্রদায়েরও অভাব নাই। পৃথিবীতে লিঙ্গ-পূজক জাতিরও বিদ্যমানতা রহিয়াছে। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ ইহাদের নাম দিয়াছেন—ক্যালিক-ওয়ারশিপার। আবার বহু জাতি নর পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহারা কোনও বিশেষ মানুষকে ঈশ্বর বলিয়া, বিশ্বকর্ত্তা বলিয়া আরাধনা করেন। তাঁহাদিগের অভিমত—সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। এই মতবাদ অবতারবাদ হইতে পৃথক। জগতের বহু মনুষ্য নবীবাদী। নবীর ইংরেজী অভিধা প্রফেট। সারাসন জাতি, প্রাচীন হিব্রু সম্প্রদায় এবং খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে নবী পন্থারই সমধিক সমাদর। স্বর্গে বা বেহেস্তে একজন ঈশ্বর থাকিলেও প্রফেটই ভগবানের প্রকৃত প্রতিনিধি, উপনিষদিক ভাষায় স্বারপা। তাঁহার নবীত্ব বিশ্বাস করিলেই ঈশ্বরের কৃপালাভ সম্ভব হয়। প্রফেটে অবিশ্বাসীর অনন্ত নরক। খৃষ্টান জাতির অভিমত ইনি মনুষ্য পুত্র হইলেও Son of God, আবার ঈশ্বর পুত্র হইলেও ঈশ্বর হইতে অভিন্ন। ইনিই প্রকৃত ঈশ্বর True God এবং স্বয়ং ঈশ্বর—Only God,

আস্তিকের মধ্যে অনেকেই আবার সাকার বিশ্বাসী। অনেকে নিরাকার ভজনা করেন। এই নিরাকারত্বেও আবার অভিনবত্ব আছে। বৈদিক নিরাকারত্ব অবাঙমনসো গোচরম্। মন, বুদ্ধি, বাক্য দিয়া ইহার উপাসনা করা যায় না। অস্তি এই উপলব্ধি দ্বারা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করা যায় মাত্র। শ্রুতি বলেন—যাঁহাকে আকারহীন মনে করিতেছ, তিনিই সৎ তৎ সৎ। এই [illegible] স্থাপন করা উপনিষদের ভাষায় শ্রদ্ধৎস্ব। কিন্তু বৈদিক নিরাকারতত্ত্ব আকারহীনতাতেই পর্য্যবসিত নহে। শ্রুতি ব্রহ্মকে সীমাবদ্ধ করিয়া তাঁহার ভূমাত্বের অপহ্নব ঘটাইতে চাহেন নাই। তাই বেদ বিজ্ঞান বলিয়াছেন—তিনি সর্ব্বম্। তিনি মূর্ত্ত্য এবং অমূর্ত্ত্য। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—এই তত্ত্ব একমাত্র বেদশাস্ত্রেই উদ্‌গীত হইয়াছে। মহতোমহীয়ানের সহিত যুগপৎ অনোরনীয়াম্ এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া শ্রুতি ব্রহ্মের সাকার ও নিরাকারত্বের সমাহার ও সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। কেবল মাত্র নিরাকার বলিলে অনন্তকে সীমাবদ্ধ করা হয়। তাই ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয়ে শ্রুতি একান্ত সাবধান। তাই, তাঁহাকে একবার বলা হইয়াছে সৎ এবং তন্মুহূর্ত্তেই বলা হইয়াছে অসৎ। গীতা শাস্ত্রও এই সিদ্ধান্তের সমর্থক।

কেবলমাত্র আকার ও নিরাকার, সগুণ ও নির্গুণ, টটেম ও ভূত প্রেতের উপাসনা ইহাই নহে, যিনি বা যাঁহারা যে ভাবেই ঈশ্বর আরাধনা করুন, ঈশ্বর যে পাপীর দণ্ড বিধান করেন এবং পুণ্যবানকে স্বর্গ সুখ প্রদান করেন, অধিকাংশ আস্তিক্যবাদেই এইরূপ অভিমত পোষিত হইয়া থাকে। ভগবান পাপের শাস্তা, অতএব মহদ্ভয়—উদ্যত বজ্র মহদ্ভয়। এই মতই—অধিকাংশ আস্তিক্যবাদের দ্বারা স্বীকৃত। য়ুরোপীয় তত্ত্ববিৎগণের অভিমত ভয় হইতেই আস্তিক্যবোধেরও ধর্ম্মভাবের উন্মেষ। এই সিদ্ধান্তটি একান্তভাবে অবহেলার যোগ্য নহে। মানুষ তাহার সত্তাকে ক্ষুদ্র সামান্য অসহায় ভাবিয়া এক সর্ব্বশক্তিমান পরম অস্তিত্বের আশ্রয় চাহিয়াছিল। আর্ত্ত উপাসকও চতুর্ব্বিধ ভজনাকারীর অন্যতম।

কিন্তু মানুষের ঈশ্বর ধারণার অপূর্ণতা হইতে এই পরম আশ্রয়—সর্ব্বাশ্রয় হইয়াও হইলেন পরম নিরাশ্রয়। চরম দণ্ডদাতা, ভয়ের ও ভয়। পার্থিব আতঙ্ক হইতে উদ্ধারের কোনও পন্থা হইতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বরের কোপ হইতে নিষ্কৃতির উপায় মাত্র নাই। তিনি নাকি ন্যায়-দণ্ডে বিচার করিয়া পাপীকে অনন্ত নরকে নিক্ষেপ করেন। ইহা সারাসেনীয় হিব্রু ও খ্রীষ্টীয় ধর্মমত। এই জাতীয় ঈশ্বরের স্বর্গ ও নরক ইহার মধ্যবর্ত্তী কোনও পথ নাই। প্রায়শ্চিত্তও নাই। কর্মক্ষয় নাই। তিনি আদৌ সুহৃদং সর্ব্ব ভূতানাং নহেন। এই বিশ্বস্রষ্টাকে লক্ষ্য করিয়া বলা যায় না—এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেদালম্বনং পরম। (কঠ, শ্রুতি) ইনি কখনই আশুতোষ শিব নহেন।

অধিকাংশ আস্তিক্য মতের ভগবান কেবল ভয়ের পাত্র। মর্ত্ত্যের মানুষ তাঁহার ভয়ঙ্করতায় অনুক্ষণ সন্ত্রস্ত। কি জানি, কোন পাপে মানুষ কখন নরকস্থ হইবে। তাঁহাকে তুষ্ট করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রার্থনা পরায়ণ—অহরহ অর্ঘ হস্তে দণ্ডায়মান। পত্র, পুষ্প, ফল, তোয়—

যাহা কিছু উত্তম তাহাই উপহার দিয়া তাঁহার তুষ্টি বিধান তৎপর। এমন কি ইহার জন্য আপনার দেহ এবং আপনার হইতে প্রিয়তম পুত্র পরিজনকে বলি দিতেও কুণ্ঠিত নহে। ভগবানকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য মানুষকে কত কি যে কৃচ্ছ্র সাধন করিতে হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ভারতীয় বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সাধনায় পৌরাণিক ধর্ম খৃষ্ট ও মহম্মদীয় এই উগ্র তপশ্চর্য্যার ইতিবৃত্ত দেদীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে।

এই কঠোর তপস্যার উদ্দেশ্য ভগবানের কৃপা লাভ, পরমেশ্বরের সন্তুষ্টি বিধান। কারণ, তিনি কঠিন কঠোর—তিনি রুদ্র। দয়াময় নামে তাঁহাকে বিশেষিত করা হয়। তাহা তাঁহার অনুগ্রহ লাভের কৌশল মাত্র। ধ্বংস করিবার জন্যই, সৃষ্টি পিষ্ট করিবার জন্যই তিনি তাঁহার কালদণ্ড উদ্যত করিয়া রহিয়াছেন। ঐশ্বরিক বিধানের বিন্দু বিসর্গ পাত হইলেই তিনি দুর্ব্বাসার মত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। তাঁহার যজ্ঞভাগ না পাইলে দক্ষযজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলিবেন।

বিশ্বধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের পর বেদ-বিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত। শ্রুতি উদাত্ত প্রসন্নকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি—অখিল ভূত আনন্দ হইতে জাত হইয়াছে, তাহারা উৎপত্তির পর ঐ আনন্দের দ্বারাই জীবন ধারণ করে, প্রলয়কালে ঐ আনন্দেই বিলীন হয়। শুধু জন্ম ও জীবন নহে। মৃত্যু পর্য্যন্ত আনন্দের পরিসমাপ্তি। ছান্দোগ্য শ্রুতি মৃত্যুর নাম দিয়াছেন—জীবন-যজ্ঞের অবভৃথ স্নান। জীবিতাবস্থায় স্নান করিয়া মানুষ যেমন শ্রান্তি ক্লান্তি দূর করে, উৎক্রান্তির তদ্রূপ, উহা পরম পরিতৃপ্তির অবস্থা। এই কথাটাই তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।

এই প্রজ্ঞাবাণী জগতের আর কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রে, ধর্ম্মমতে ও তত্ত্বচিন্তায় উচ্চারিত হয় নাই। আনন্দ ব্রহ্ম এই ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম বিশ্বাস, ইহা একমাত্র শ্রুতিরই সিদ্ধান্ত। বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি এইরূপ—এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ। শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন—তিনি জনগণের মাস্তে:—মাস্তো জনানাং। ঋক্‌বেদের—বাক্‌সূক্তে ব্রহ্মস্বরূপা বাক্ আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে—বলিয়াছেন :—অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্ত বা উ—আমি রুদ্র ধনু ধারণ করিয়া ব্রহ্মদ্বেষীদের হনন করি।

পরম ভয়ই যে ব্রহ্মের একটা বিভাব (aspect) বেদ-বিজ্ঞান ইহা অকুণ্ঠ কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। গীতার একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ-দর্শনযোগে শ্রীভগবানের লোক-ভয়ঙ্কর রূপের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই লোকক্ষয়কৃৎকালরূপে দেখিয়া কঠ শ্রুতির সেই বজ্রমুদ্যতং মহদ্ভয়ং কথা মনে পড়ে। সেই :—

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যু র্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

জগতের অপরাপর ধর্ম্মমতে ঈশ্বরের দণ্ডদাতা রূপটি যেমন প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে বেদ-বিজ্ঞানে তেমন নহে। বেদ-বিদ্যায় ব্রহ্ম আনন্দ, অমৃত, রসস্বরূপ। অন্যান্য ধর্ম্মসিদ্ধান্তে তাঁহাকে পরম দয়ালু—এই পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে। বৈদিক ভারতেরই আধ্যাত্মিক সম্পদ—আনন্দ ব্রহ্ম। এই ভাগবত বিজ্ঞান জগতের আর কোনও ধর্ম্মমতে আছে বলিয়া জানা যায় না। ঈশ্বর উদ্ধারকর্ত্তা—সেভিয়ার। পুণ্য কার্য্যের প্রতিদান সুকৃতকারীকে তিনি স্বর্গ সম্পদের অধিকারী করেন। কিন্তু আনন্দ স্বরূপ নহেন। তাঁহার উপাসকগণ তাঁহাকে রসো বৈ সঃ বলিয়া বন্দনা পূজা করেন না। এই জীবনাকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করে না—আকাশে যদি আনন্দ না থাকিতেন, তবে কেই বা জীবন ধারণ করিতে চাহিত—রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কো হ্যেক স্যাৎ কঃ—প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি।

বেদ বিজ্ঞানে ব্রহ্মকে—প্রচলিত ভাষায় ঈশ্বরকে ভয়ও বলা হইয়াছে। ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুধাবতি পঞ্চমঃ। শ্রুতি কণ্ঠে এইরূপ প্রার্থনাও উচ্চারিত হইয়াছে—রুদ্র যত্তে দক্ষিণ মুখম্ তেন মাং পাহি নিত্যম্। ব্রহ্ম রুদ্র। তিনি ভয়েরও ভয়। ভীষণ অপেক্ষাও ভীষণতম। সেই রাজাধিরাজ উদ্যত বজ্র মহদ্ভয়। তাঁহারই প্রশাসনে সূর্য্য চন্দ্র বিধৃত রহিয়াছে। ব্রহ্মবাদিনী গার্গীকে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য যে ব্রহ্ম পরিচয় দিতেছেন তাহা প্রজ্ঞান ও কবিত্বের অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি। বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে, কিন্তু তিনি অভয় অমৃত। ভগবান উদ্ধারকর্ত্তা, সর্ব্বতোভাবে তাঁহার অনুগত হইতে মানুষকে মুক্ত করেন, কিন্তু ব্রহ্ম যে স্বরূপতঃ আনন্দ—আনন্দং ব্রহ্ম—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন—এই আনন্দ ব্রহ্মকে জানিলে কোনও কিছুতে ভয় থাকে না, এই তত্ত্বের উন্মেষ হয় নাই। কেবল শ্রুতিই এই কথা বলিয়াছেন—জীবন জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত—আনন্দেরই নিয়ন্ত্রণ। জীবমাত্রেরই প্রকৃত সত্তা হইতেছে অভয়—অমৃত। কৌষীতক প্রসন্ন গম্ভীরে বলিতেছেন—স এষ প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা আনন্দোঽজরোঽমৃত। পাপ নাই পরন্তু অনন্ত অমৃত হইতেই জীবজন্মের আবির্ভাব। জীবের আত্মা অন্তর্যামী পুরুষকে উপনিষৎ বলিতেছেন—ইনি অমৃত—এষ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃত :—এই তোমার আত্মা অমৃত।

উদ্যতবজ্র মহদ্ভয় বলিয়াই বেদ-বিজ্ঞান তাঁহার সিদ্ধান্তে ইতিশেষ করেন নাই, পরন্তু এই সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করিয়াছেন—ব্রহ্মই ভূমা—তিনিই পরম সুখ। সুখের পরাকাষ্ঠা তিনি। আর এই যে ভূমা, তাঁহা হইতে জীব অভিন্ন—তৎ ত্বমসি। উপনিষদে ইহাকে নানাভাবে আনন্দ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। বলিয়াছেন ইনি রাগ স্বরূপ। বলিয়াছেন—এতদ্ অভয়ম্। এতদ্ অমৃতম্।

বৈদেশিকী

অতুল দত্ত

মার্কিণ নির্ব্বাচন—

গত নভেম্বর মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন সাধারণ নির্ব্বাচন হয়। এই নির্ব্বাচনে শাসন বিভাগীয় দল অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের রিপাবলিক্যান্ দল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সেনেটে (উচ্চ পরিষদ) ও প্রতিনিধি-পরিষদে রিপাবলিক্যান্ দলের প্রতিদ্বন্দ্বী ডিমোক্রেটিক দলের সামান্য সংখ্যা-গরিষ্ঠতা ছিল। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরিমাণ ছিল ৯৬ জন সদস্য লইয়া গঠিত সেনেটে মাত্র দুই জন এবং ৪৩৫ জন সদস্যের প্রতিনিধি পরিষদে ৩৫ জন। এই নির্ব্বাচনের ফলে উভয় পরিষদেই ডিমোক্রেটিক দলের সদস্য-সংখ্যা রিপাবলিক্যান্দের অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। সাম্প্রতিক নির্ব্বাচনে ৩২টি রাষ্ট্রের গভর্ণরও নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে রিপাবলিক্যান্ গভর্ণর অপেক্ষা ডিমোক্রেটিক গভর্ণররা সংখ্যায় ১০ জন বেশী ছিলেন। এই নির্ব্বাচনে সে পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে চৌদ্দ জন। নিউ ইয়র্কের গভর্ণর পদে নেল্সন রক্‌ফেলারের নির্ব্বাচন রিপাবলিক্যান্ দলের একটি উল্লেখ-যোগ্য সাফল্য। এতদিন একরূপ স্থির ছিল—আগামী ১৯৬০ সালে প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনে রিপাবলিক্যান্ দলের প্রার্থী হইবেন বর্ত্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ নিক্সন। এখন প্রশ্ন দাঁড়াইবে—রিপাবলিক্যান্ দলের প্রার্থী হইবার অধিকতর যোগ্য কে—নিক্সন, না রক্‌ফেলার? মার্কিণ সংবিধানের সর্ব্বশেষ সংশোধন অনুসারে এক ব্যক্তি দুইবারের বেশী প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইতে পারেন না। কাজেই, প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের স্বাস্থ্যে কুলাইলেও তিনি আর তৃতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্ট প্রধান। চার বৎসর অন্তর সর্ব্বজনীন ভোটে পরোক্ষভাবে নির্ব্বাচিত প্রেসিডেন্ট সর্ব্বোচ্চ শাসন-কর্তৃপক্ষ। শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থাপক বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক্। শাসন বিভাগের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস্ প্রেসিডেন্টের (অন্য সকলেই প্রেসিডেন্টের নিযুক্ত কর্ম্মচারী মাত্র) এবং ব্যবস্থাপক বিভাগের দুইটি পরিষদের নির্ব্বাচন হয় স্বতন্ত্রভাবে; দুইটি বিভাগের কাজও চলে পৃথক এবং স্বাধীনভাবে। প্রেসিডেন্ট তাঁহার কাজের জন্য আইন সভা দুইটির নিকট দায়ী নহেন; সুতরাং, প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের রিপাব-লিক্যান্ পার্টি ব্যবস্থা পরিষদ দুইটিতে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা হারাইলে তাঁহার পদত্যাগের প্রশ্ন ওঠে না।

আমেরিকার রিপাবলিক্যান্ দল ও ডিমোক্রেটিক দলে মূলগত প্রভেদ নাই। ইহাদের মধ্যে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনও মতদ্বৈধ নাই। উভয়ে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিপোষক,—ধনী পুঁজিপতির আধিক্য দুই দলেই। তবে, ইহাদের মধ্যে ডিমোক্রেটিক দল প্রগতিশীল বলিয়া পরিচিত; প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও প্রেসিডেন্ট উইলসন্ এই দলের সভ্য ছিলেন। অবশ্য, চরম প্রতিক্রিয়াশীল প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানও এই দলের। নিগ্রো-পীড়ক গভর্ণর ফরাসও ডিমোক্রাট্। যাহা হউক, এই দলের সমর্থকদের মধ্যে বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকদের সংখ্যা বেশী; শ্রমশিল্প-প্রধান উত্তরাঞ্চলে ডিমোক্রাটদের সংখ্যাধিক্য। সম্প্রতি এই দলের মধ্যে একটি র‍্যাডিক্যাল শাখার উদ্ভব হইয়াছে। মার্কিণ নির্ব্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধে লণ্ডনের 'নিউ ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের' নিম্ন-লিখিত মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—"Now they (die-hard Republicans) have been defeated by Democrats who belong to the more liberal wing of the party...... these elections mean a genuine shift to the left. It is not simply a case, as it has so often been in American politics, Democrats beating Republicans with whom they agree on all essential issues.

সুদানে সামরিক একনায়কত্ব—

গত নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সুদানে সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রধান সেনাপতি জেনারেল আববুদ্ দেশের শাসন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কোন্ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই সামরিক "ক্যুপ" হইয়াছে, সামরিক একনায়কের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাহা এখনও অস্পষ্ট। সুদানের সর্ব্বশেষ প্রধানমন্ত্রী আবদুল্লা খলিল্ পাশ্চাত্যের অনুগত বলিয়া পরিচিত। তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলকে উচ্ছেদ করিয়া মিশরের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপনই সামরিক ক্যুপের উদ্দেশ্য বলিয়া প্রথমে মনে করা হয়। কিন্তু ক্ষমতা হস্তগত করিয়া জেনারেল অববুদ্ মিশরের সমর্থক সুদানী সংবাদপত্রগুলিকে এই অভিযোগে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন যে, তাহারা "বৈদেশিক দূতাবাসের সহিত সংযোগ" স্থাপন করিয়াছিল। জেনারেল আববুদ্ মার্কিণ সাহায্য লইতে সম্মত হইয়াছেন। এই সাহায্য দানের ব্যাপার সম্পর্কে গত ১৯শে নভেম্বর খার্টুমের এক সংবাদে বলা হয়—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সুদানকে অর্থনৈতিক সাহায্য দিতে চাহিয়াছিল এবং প্রধানমন্ত্রী আবদুল খলিল্ আগ্রহের সহিত সে সাহায্য গ্রহণে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু খার্টুমের সর্ব্বসম্মত অভিমত এই যে, মার্কিণ সাহায্যের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা উচিত; পার্লামেন্টে এই সাহায্যের অনুকূলে যাহাতে ভোট হয়, তদুদ্দেশ্যে মার্কিণ দূতাবাস এক দিনে দশ

হাজার পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছে। এই মার্কিণ সাহায্য আব্বুদ গ্রহণ করিয়াছেন। আবার বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তিনি লোকায়ত্ত চীনকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দান করিয়াছেন। সুদানের সামরিক অভ্যুত্থানকে মিশর অভিনন্দনই জানাইয়াছে। সম্প্রতি আসোয়ান্ বাঁধের প্রথমাংশের কাজ সম্পূর্ণ করিবার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট হইতে মিশরের ৪০ কোটী রুবল ঋণ পাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আসোয়ান বাঁধের সহিত মিশর ও সুদান—উভয়ের স্বার্থ বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং, সামরিক এক-নায়কের অধীনে সুদানের সহিত মিশরের সম্পর্ক কিরূপ আকার ধারণ করে, তাহা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সুদানের তুলা বিক্রয়ের জন্য বাজার একান্ত প্রয়োজন। সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন এবং তাহার নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য একটি সোভিয়েট মিশনের সুদানে আসিবার কথা ছিল। নিরপেক্ষ নীতিতে অবিচলিত থাকিয়া সুদান মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত সুসম্পর্ক রাখিতে পারে কিনা, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। সুদানের প্রকৃত সমস্যা সম্পর্কে লণ্ডন টাইম্স্ বলেন—They (the main difficulties facing the Sudan) are the failure to find a market for cotton and consequent foreign exchange crisis, the south's hankering after self-government, and, above all, relations with Egypt. (Times 18-11-58)

বার্লিন্ সম্পর্কে সোভিয়েট প্রস্তাব—

নভেম্বর মাসের প্রথমে মঃ ক্রুশ্চেভ্ মস্কোয় পোল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মঃ গোমুল্কার সম্বর্দ্ধনা-সভায় বলিয়াছিলেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন পূর্ব্ব বার্লিনের কর্ত্তৃত্ব পূর্ব্ব জার্ম্মানীর উপর ছাড়িয়া দিবে। বার্লিন্ সম্পর্কে এই নূতন নীতির ভিত্তিতে রচিত একটি প্রস্তাব বৃটেন্, আমেরিকা ও ফ্রান্সের নিকট নভেম্বর মাসের শেষভাগে আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে। প্রস্তাবের একটি অনুলিপি জাতি-সঙ্ঘেও প্রেরিত হইয়াছে। এই নূতন সোভিয়েট প্রস্তাবের প্রধান কথা—যে তিনটি পাশ্চাত্য শক্তি (বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্স) বর্ত্তমানে পশ্চিম বার্লিন্ অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহারা সেখান হইতে অপসরণ করুক, পশ্চিম বার্লিন নিরস্ত্রীকৃত স্বাধীন উন্মুক্ত নগরীতে পরিণত হউক, পশ্চিম বার্লিনের এই মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবার প্রতিশ্রুতি দিতে সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রস্তুত। এই মর্য্যাদা রক্ষায় জাতি-সঙ্ঘ অংশ গ্রহণ করাতেও সোভিয়েট ইউনিয়নের আপত্তি নাই। এই প্রস্তাব অনুসারে পশ্চিম বার্লিন হইতে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের অপসরণের জন্য সোভিয়েট প্রস্তাবে ছয় মাস সময়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ছয় মাস বর্ত্তমান ব্যবস্থাই প্রবর্ত্তিত থাকিবে; অর্থাৎ জার্ম্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের (পূর্ব্ব জার্ম্মানীর) মধ্য দিয়া পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ পশ্চিম জার্ম্মানীর সহিত সংযোগ রক্ষা করিতে পারিবে। এই সময়ের মধ্যে যদি প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদিত না হয়, তাহা হইলে তখন পূর্ব্ব-জার্ম্মানীর মধ্য দিয়া পশ্চিম বার্লিনের সহিত সংযোগসূত্রগুলি নিয়ন্ত্রণের ভার ঐ অঞ্চলের গভর্ণমেণ্টের উপর অর্পিত হইবে।

জার্ম্মানী ও বার্লিন্ বিভক্ত হইবার এবং উহাদের উপর বিজয়ী চতুঃশক্তির কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার সাম্প্রতিক ইতিহাস এইরূপ। সোভিয়েট সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণেই জার্ম্মানীর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। রাজধানী বার্লিন তাহারাই অধিকার করিয়াছিল। জার্ম্মানীকে পরাজিত করিবার প্রধান কৃতিত্ব সোভিয়েট সেনাবাহিনীর প্রাপ্য হইলেও ইহাকে মিত্রশক্তির সম্মিলিত বিজয় বলিয়া গণ্য করা হয় এবং পরাজিত জার্ম্মানীর উপর চারিটি বিজয়ী শক্তির কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন তাহার স্বাভাবিক অধিকারেই রাজধানী বার্লিন সহ পূর্ব্বাঞ্চল অধিকার করে। পশ্চিম অঞ্চলে অবশিষ্ট তিনটি শক্তির কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে সোভিয়েট কর্ত্তৃত্বাধীন পূর্ব্বাঞ্চল জার্ম্মাণ গণতান্ত্রিক রিপাবলিক্ নামে কমুনিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের স্বীকৃত স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। পশ্চিম জার্ম্মানী সোভিয়েট-বিরোধী সামরিক জোট্ "ন্যাটো" অন্তর্ভুক্ত হইবার পর পূর্ব্ব জার্ম্মানী পাল্টা সামরিক প্রতিষ্ঠান ওয়ারশ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন—জার্ম্মানীর ঐতিহাসিক রাজধানী পূর্ব্বাঞ্চলে অবস্থিত, পশ্চিমাঞ্চল হইতে যাইতে হইলে কম্যুনিষ্ট প্রভুত্বাধীন জার্ম্মান-গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। যুদ্ধের পর স্থির হইয়াছিল যে, সোভিয়েট প্রভাবাধীন পূর্ব্ব-জার্ম্মানীতে বার্লিনের অবস্থিতি হইলেও এখানে চারিটি বিজয়ী শক্তির কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। তদনুসারে পূর্ব্ব বার্লিনে সোভিয়েট ইউনিয়নের এবং বার্লিনের পশ্চিমাঞ্চলে অন্য তিনটি শক্তির কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত হয়। পূর্ব্ব জার্ম্মানীর মধ্য দিয়া পশ্চিম বার্লিনের সহিত সংযোগ রক্ষার অধিকার পাশ্চাত্য শক্তিবর্গকে দেওয়া হইয়াছিল।

সোভিয়েট ইউনিয়নের পশ্চিম বার্লিন সংক্রান্ত এই প্রস্তাবে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ সমস্যায় পড়িয়াছেন। পশ্চিম বার্লিন যদি তাঁহারা ত্যাগ না করেন, তাহা হইলে ছয় মাস পরে পূর্ব্ব জার্ম্মান্ গভর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতিরেকে পশ্চিম বার্লিনের সহিত তাহারা সংযোগ রক্ষা করিতে পারিবেন না। অথচ, পূর্ব্ব জার্ম্মান গভর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে তাঁহারা প্রস্তুত নন। এই অবস্থায় পূর্ব্ব জার্ম্মান গভর্ণমেণ্টের অনুমতির তোয়াক্কা না রাখিয়া জোর করিয়া পশ্চিম বার্লিনে যাওয়া ছাড়া তাহাদের আর গত্যন্তর থাকিবে না। এদিকে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট জানাইয়া দিয়াছেন যে, জোর করিয়া পূর্ব্ব জার্ম্মানীর মধ্য দিয়া পথ করিতে চেষ্টা করিলে উহাকে ঐ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলিয়াই ধরা হইবে; যেহেতু পূর্ব্ব জার্ম্মানী ওয়ারশ সামরিক চুক্তির অন্তর্ভুক্ত, সে জন্য তাহার বিরুদ্ধে আক্রমণকে সোভিয়েট ইউনিয়ন সহ ঐ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলিয়াই গণ্য করা হইবে। অতএব, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ যদি সোভিয়েট প্রস্তাবের ভিত্তিতে পশ্চিম বার্লিন সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে সম্মত না হন, তাহা হইলে ছয় মাস পরে যুদ্ধ বাধাইবার ঝুঁকি লইয়া উহার সহিত তাহাদিগকে সংযোগ রক্ষার চেষ্টা করিতে হইবে। অথবা কম্যুনিষ্ট কূটনীতির নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া পূর্ব্ব

জার্ম্মান গভর্ণমেন্টের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া তাহার নিকট হইতে সংযোগ রক্ষার অনুমতি লইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জার্ম্মানীর দুই অংশ এখন দুইটি বিরুদ্ধ সামরিক জোটের অন্তর্ভুক্ত। এখন কমুানিষ্ট এলেকার মধ্যে পশ্চিম বার্লিন কার্য্যতঃ পশ্চিমী শক্তিবর্গের অগ্রগামী পর্য্যবেক্ষণ ঘাঁটীরূপে কাজ করিতেছে। সুতরাং, বার্লিনের এই অংশকে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের কবলমুক্ত করিবার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রস্তাব লঘুচিত্তে উত্থাপিত হয় নাই এবং এই প্রস্তাব উড়াইয়া দেওয়া যাইবে না। আর তাহার প্রস্তাবে খুবই সংযমের এবং দূরদর্শিতার পরিচয় আছে। পশ্চিম বার্লিনকে বৈদেশিক কর্ত্তৃত্ব হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইতে দিবার কথা বিশেষতঃ কম্যুনিষ্ট রাজ্যের অভ্যন্তরে তাহার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য জাতি-সঙ্ঘের সহায়তা গ্রহণ করিতে দিবার সম্মতি সোভিয়েট প্রস্তাবের নৈতিক গুরুত্ব খুবই বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রস্তাবের এই নৈতিক গুরুত্বের প্রভাব রোধ করা সহজ হইবে না। বস্তুতঃ, পশ্চিমী শক্তিবর্গ সোভিয়েট প্রস্তাবের কোনও সঙ্গত উত্তর দিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা শুধু বলিতেছেন যে, বার্লিনের প্রশ্ন বিভক্ত-জার্ম্মানীর পুনর্মিলন সংক্রান্ত প্রশ্নের সহিত জড়িত; জার্ম্মানী ঐক্যবদ্ধ হইলে বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত বার্লিনের সর্ব্ব জার্ম্মানীর রাজধানী হইবে—তাহার পূর্ব্বে বার্লিন সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব নয়। কিন্তু ইহা কোনও যুক্তি নহে। জার্ম্মানীর দুই অংশ আপাততঃ মিলিত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। সেই কারণে বার্লিন সম্পর্কেও কোনওরূপ মীমাংসার চেষ্টায় সম্মত না হওয়াটা অন্যায় জিদ্ মাত্র। পশ্চিমী শক্তিবর্গ স্বাধীন নির্ব্বাচনের দ্বারা জার্ম্মানীর দুই অংশের মিলন চাহিতেছেন। সোভিয়েট ইউনিয়ন জানাইয়াছে যে, পশ্চিম জার্ম্মানী যদি কম্যুনিষ্ট-বিরোধী সামরিক জোট—ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহা হইলে ঐ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সমগ্র জার্ম্মানীকে ঐ জোটের মধ্য লইতে সে দিবে না। এখন সোভিয়েট রুশিয়ার নীতি —জার্ম্মানীর দুই অংশের গভর্ণমেণ্ট নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়া কনফেডারেশনের দ্বারা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করুক, বাহিরের কোনও শক্তিরই হাতে নাক গলাইবার প্রয়োজন নাই। অথচ, পশ্চিম-জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট ও তাহাদের পশ্চিমী মুরুব্বিরা পূর্ব্ব-জার্ম্মান গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিতেই প্রস্তুত নন। দুই পক্ষের এই নীতির মধ্যে কোনও আপোষের সূত্র নাই। সুতরাং, জার্ম্মানীর মিলন সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসাও সুদূরপরাহত।

ফরাসী নির্ব্বাচন—

গত সেপ্টেম্বর মাসে জেনারেল দ্য গলের রচিত সংবিধান ফ্রান্সে গণভোটে গৃহীত হইয়াছিল। এই সংবিধান অনুসারে গত নভেম্বর মাসে সাধারণ নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে। এই নির্ব্বাচনে দ্য গলের সমর্থক দক্ষিণ-পন্থীরা বিপুলভাবে জয়লাভ করিয়াছে। জাতীয় পরিষদে খাস ফ্রান্সের মোট ৪৬৫টি আসনের মধ্যে ১৮৭টি আসন অধিকার করিয়াছে দ্য গল্ পন্থী ইউ-এন্-আর দল, ১৩৩টি আসন রক্ষণশীল দলের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। ক্যাথলিক এম্-আর-পি অধিকার করিয়াছে ৫৭টি আসন। এই নির্ব্বাচনে বামপন্থী দলগুলির দারুণ শক্তি ক্ষয় হইয়াছে। সোস্যালিষ্ট, র‍্যাডিক্যাল ও কম্যুনিষ্টদের অধিকৃত মোট আসন সংখ্যা এক শতেরও কম। প্রদত্ত ভোট-পর্য্যালোচনায় দেখা যায়, ইউ-এন্ আর শতকরা ২৬ ভাগ ভোট পাইয়াছে, রক্ষণশীল দল পাইয়াছে ২৪ ভাগ, ক্যাথলিক দল শতকরা ৮ ভাগ, সোস্যালিষ্ট দল শতকরা ১৪ ভাগ এবং কম্যুনিষ্ট দল শতকরা ২১ ভাগ ভোট পাইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, দক্ষিণপন্থী তিনটি দলই তাহাদের অধিকৃত আসন সংখ্যার তুলনায় ভোট পাইয়াছে খুবই কম। ইহাদের মধ্যে ক্যাথলিক দল শতকরা মাত্র ৮ ভাগ ভোট পাইয়া ৫৭টি আসন অধিকার করিয়াছে, আর কম্যুনিষ্টরা শতকরা ২১ ভাগ ভোট পাইয়া আসন লাভ করিয়াছে মাত্র ১০টি। ইহার প্রথম ও প্রধান কারণ—নূতন সংবিধানে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব-ব্যবস্থার বিলুপ্তি দ্বিতীয় কারণ—নির্ব্বাচনকালে মলেপন্থী সোস্যালিষ্টগণ কর্ত্তৃক দক্ষিণপন্থী-দের সুকৌশলী পক্ষ সমর্থন।

গত মে মাসে ক্ষমতা লাভের সময় জেনারেল দ্য গল্ ঘোষণা করিয়া-ছিলেন যে, তিনি দলগত রাজনীতির উর্দ্ধে থাকিবেন। তাঁহার এই উক্তি আন্তরিক হউক, আর না-ই হউক, সাম্প্রতিক নির্ব্বাচনে তাঁহার জনপ্রিয়তাকে আশ্রয় করিয়া ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি ক্ষমতালাভ করিল। যে সামরিক ফ্যাসিস্ত দল ও প্রতিক্রিয়াপন্থী রাজনীতিকরা গত মে মাসে দেশের ন্যায়সঙ্গত গভর্ণমেণ্টকে অমান্য করিয়াছিল, প্যারিসে ছত্রীবাহিনী নামাইয়া দেশের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধনের হুমকী দিয়াছিল, তাহারা এবং তাহাদের সমর্থকরাই প্রবল হইয়া উঠিল। শোনা যায়, দ্য গলের ইচ্ছা ছিল—তিনি দক্ষিণপন্থী সোস্যালিষ্ট পি মালকে প্রধান মন্ত্রী করিবেন। কিন্তু মলের দল এই নির্ব্বাচনে নগণ্য প্রতিপন্ন হইয়াছেন। সুস্তেলের ইউ-এন্-আর আজ ফরাসী জাতীয় পরিষদে বৃহত্তম দল। প্রধান মন্ত্রিত্বে সঙ্গত দাবী তাঁহারই। গত মে মাসে আল্‌জেরিয়ায় বিদ্রোহের পশ্চাতে সেখানকার যে প্রতিক্রিয়াশীল ফরাসীরা ছিল, সুস্তেলকে তাহাদের মুখপাত্র বলা যাইতে পারে। আল্-জেরিয়ায় গভর্ণর থাকিবার সময় সুস্তেল সেখানকার ফরাসী অধিবাসী-দের বড় প্রিয় ছিলেন। সাম্প্রতিক নির্ব্বাচনে আল্‌জেরিয়ার জন্য নির্দ্ধারিত ৭১টি আসন মে মাসের সেই ফ্যাসিস্তপন্থীরাই অধিকার করিয়াছে। নির্ব্বাচিত আরবরা বাছা বাছা খয়ের খাঁ, ফরাসীরা ঝানু প্রতিক্রিয়াপন্থী। গত ২১শে ডিসেম্বর দ্য গল্ আনুষ্ঠানিকভাবে সাত বৎসরের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নূতন সংবিধানে রাষ্ট্রপতি প্রধান হইলেও জাতীয় পরিষদে প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রাধান্য স্বভাবতঃ তাহার নীতিকে প্রভাবিত চলিবে। সে প্রভাব কতদূর গড়ায় তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ক্রিস্টোফারসন

শ্রীতপনকুমার চট্টোপাধ্যায়

[জর্জ্জ রবার্ট গিসিং (George Robert Gissing) পাশ্চাত্যের শক্তিশালী লেখকদের অন্যতম। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েকফিল্ডে পৃথিবীর আলোক তিনি প্রথমপরিদর্শন করেন। ম্যানচেষ্টারের ওয়েনস্ কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন, কিন্তু ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে আকস্মিক বিবাহের ফলে তাঁর শিক্ষাজীবন এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির চরম অবসান ঘটে। এরপর প্রথমে তিনি লণ্ডন এবং পরে আমেরিকা যান। দারিদ্র্যও দুঃখকষ্টের যে বীভৎস ছবি তিনি আমেরিকায় প্রত্যক্ষ করেন, অধিকাংশ রচনাতেই তার ছাপ ফুটে উঠেছে। জেনাতে কিছুদিন তিনি দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করেন এবং পরে লণ্ডনে ফিরেন। এরপর সাহিত্যজগতের এক দুর্ব্বার আকর্ষণ তাঁকে টানতে থাকে এবং এই জগৎকেই তিনি বরণ করে নেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ "Workers in the Dawn" ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইটালীতেও জীবনের কিছুদিন তাঁর কাটে এবং এখানকার অভিজ্ঞতা ও জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর By the Ionian Sea গ্রন্থে। তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা "Unclassed" "The Nether world" "Demos" "New Grub Street" "Born in Exile" "The odd women" "The Emancipated" প্রভৃতি। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর একটী প্রসিদ্ধ গল্প "Christopherson"এর অনুবাদ এখানে দেওয়া হলো। যে বস্তুর প্রতি যে মানুষের থাকে আকর্ষণ—তাকে অন্তর দিয়ে সে ভালবাসে, সে ভালবাসা পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতিকে ভালবাসার চেয়ে কম নয় এবং সে জিনিষ হারাবার মুহূর্ত্তে থাকে তার অসীম অন্তর্বেদনা—এই ভাবকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে এই গল্প এবং শক্তিশালী লেখকের সুনিপুণ তুলিকায় অতি সুন্দর ও অনবদ্যভাবে গল্পটী ফুটে উঠেছে।]

বিশ বছর পূর্ব্বের এক কাহিনী। সময়টা ছিল মে মাসের এক সন্ধ্যা। সেদিন সমস্ত দিন ধরে সূর্য্যদেব তাঁর রশ্মি বিতরণ করেছিলেন। এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই যে, আমার এই নিম্নবর্ণিত গল্পটির জন্য অনেকদিন পূর্ব্বের সেই দিনটীর রশ্মি ও তাপের স্মৃতি আমি হারিয়ে ফেলি নাই। সেদিন আমার জানালার সম্মুখের আকাশে যে খণ্ড খণ্ড সাদা সাদা মেঘ আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তাদের আমি যেন এখনও তেমনই দেখতে পাচ্ছি—অথবা সেবার লণ্ডন নগরীর মধ্যে আমার নীরব কর্ম্মসাধনা বসন্তকালের লঘু কুঁড়েমির প্রভাবে যেরূপ বাধাগ্রস্ত হয়েছিল—তা যেন আমি এখনও অনুভব করছি সমস্ত অন্তর দিয়ে।

সূর্য্যদেবের পশ্চিম গগনে ঢলে পড়ার সময়েই কেবলমাত্র আমি ঘর হতে বেরোতাম। সেদিনকার বাতাসে ছিল এক অভূতপূর্ব্ব মাদকতা। সন্ধ্যার ঘনায়মান আঁধারে প্রশস্ত আকাশের নীচে সহরের অসংখ্য আলোকরাজি হতে পীতাভ দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। নিরুদ্বিগ্নভাবে একটু বিশ্রাম উপভোগ করা ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না বলে আধ ঘণ্টা ধরে এধার ওধার ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম এবং কিছুক্ষণ পর গ্রেস পোর্টল্যাণ্ড ষ্ট্রীটের নাম পরিবর্ত্তন হয়ে যেখানে মেলবোর্ণ রোড হয়েছে সেখানে এসে হাজির হলাম। সেখানে ট্রিনিটী চার্চ্চের কাছে আমার পরিচিত একটি পুরোনো বইয়ের দোকান ছিল। দোকানের গ্যাসের আলোতে উজ্জল বইয়ের তাকগুলির প্রতি আকৃষ্ট হলাম। আমি বইয়ের পাতা একের পর এক উলটিয়ে যেতে লাগলাম এবং প্রায়শঃ যা ঘটে থাকে তাই-ই ঘটল। অর্থাৎ পকেট হাতড়িয়ে দেখতে লাগলাম টাকাকড়ি কি রকম আছে। একটা বইয়ের প্রতি আমার আগ্রহ বেড়ে গেল এবং বইটীর দাম দিবার জন্য দোকানদারের দিকে অগ্রসর হলাম।

দোকানে দাঁড়িয়ে থাকবার সময় আমার এক আবছা ধারণা হয়েছিল যে—কোন লোক আমার পাশে দাঁড়িয়ে বই দেখছে। বইটি কিনে দোকান হতে বেরোবার সময়

দেখি, সেই লোকটি এক অদ্ভুত আগ্রহের সঙ্গে ও ঈষৎ হাসিমুখে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। আমার মনে হলো সে যেন কিছু বলতে চায়। আমি কিছু না বলে ধীরে ধীরে চলতে লাগলাম। লোকটীও সেদিকেই আসতে লাগল। গীর্জার ঠিক সামনে, সে তাড়াতাড়ি আমার পাশে এসে বলল, "দেখুন, আমায় অন্য কিছু মনে করবেন না। আমি শুধু আপনাকে এই কথাটা জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছিলাম যে, আপনি যে বইটা এখন কিনলেন ওটার প্রথম সাদা পাতায় কার নাম লেখা আছে—সেটা আপনি লক্ষ্য করেছেন কিনা।" তার এই ভীতি ও শ্রদ্ধাজড়িত কণ্ঠস্বরে আমার প্রথমে মনে হলো যে লোকটী বোধ হয় ভিক্ষা চাইবে। কিন্তু লোকটীকে সাধারণ ভিক্ষুকের মত মনে হোল না। বয়স তার আন্দাজ ষাট বছর। মাথায় তার লম্বা লম্বা চুল, আর আধপাকা ওবড়ো-থেবড়ো দাড়ি, আর রক্তহীন ফ্যাকাশে শুকনো মুখের মাঝ হতে চেয়ে আছে তাঁর অশ্রুপূর্ণ দুটী চোখ। লোকটীর অপরিষ্কার পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে অভাবে-পড়া কোনও ভদ্রলোক বলে মনে হয়। তাঁর কথার ভঙ্গীতেই বোঝা যায় পূর্ব্বে তিনি কোন উচ্চ শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাঁর দৃষ্টির মধ্যে এমন একটা বুদ্ধির দীপ্তি ছিল এবং কণ্ঠস্বরে মেশানো ছিল এমন এক হতাশা-পূর্ণ বেদনাজড়িত ভাব, যে তাঁর সঙ্গে বন্ধুভাবে পরিচয় না করে পারা গেল না। বইয়ের প্রথম সাদা পাতায় লেখা নামটা পূর্ব্বে লক্ষ্য করি নাই। সুতরাং গ্যাসের আলোতে পাতাটা খুলে ধরতেই দেখলাম অতি সুন্দর ও সুস্পষ্ট হাতের লেখায় লেখা রয়েছে এই ক'টি কথা—"ডব্লিউ, আর, ক্রিস্টোফারসন্, ১৮৪৯।"

ভদ্রলোক ইতস্তত করে ধীরে ধীরে বললেন—"ওটা আমারই নাম।"

—"তাই নাকি? বইটা তাহলে পূর্ব্বে আপনারই ছিল?"

—"হ্যাঁ। বইটা একসময় আমারই ছিল।" এই বলে ছোট ছেলের মত কাঁপানো গলায় হেসে উঠলেন এবং দাড়িতে হাত বুলিয়ে এরূপভাবে মাথা নাড়তে লাগলেন যে তাঁর কথায় কোন সংশয় জাগতে পারেনা।

—"আপনি কি কখনও ক্রিস্টোফারসন্ লাইব্রেরী বিক্রয় হওয়ার কথা শোনেন নাই? হয়ত তখন আপনি খুব ছোট ছিলেন। সেটা ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের কথা। আমি তো বইয়ের দোকানে আমার নাম লেখা বই প্রায়ই দেখেছি। আপনি আসবার ঠিক পূর্ব্বে এ বইটাতে আমার নামটা আমি লক্ষ্য করেছিলাম। তাই আপনি যখন বইটীর দিকে ঔৎসুক্যের সঙ্গে তাকিয়েছিলেন তখন বইটী আপনি কিনছেন কিনা লক্ষ্য করতে বড়ই আগ্রহ হলো। আমার এই অন্যায় আচরণের জন্য ক্ষমা করবেন। বইকে ভালবাসলে……তাই নয় কি?" তাঁর অসমাপ্ত প্রশ্ন তাঁর দৃষ্টি দ্বারা শেষ হলো। আমি যখন তাঁকে বললাম যে তাঁর সমস্ত কথাই আমি বুঝেছি এবং তাঁর সঙ্গে আমি একমত—তখন ছোট ছেলের মত তিনি হেসে উঠলেন।

কৌতূহলভরে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, "আপনার কি বড় লাইব্রেরী আছে?"

—"আজ্ঞে না। মাত্র কয়েক শ' বই আছে। আর যার বাড়ী ঘর নেই তার পক্ষে ঐ প্রচুর।"

সরলভাবে হেসে মৃদুস্বরে তিনি বললেন, "আমার লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যা ছিল ২৪,৭১৮ খানা।"

আমার ঔৎসুক্য ক্রমশঃ বেড়ে চলল। সোজাসুজি আর কোনকিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহসী না হয়ে আমি জানতে চাইলাম তিনি বর্ত্তমানে লণ্ডন সহরেই বাস করছেন কি না।

"—যদি দয়া করে আপনি পাঁচ মিনিট সময় ব্যয় করতে পারেন তাহলে আমার বাড়ীটা—মানে—," আবার সেই হাসি।

"মানে, যে বাড়ীটা আমার ছিল সেটা আপনাকে দেখাতে পারি।"

ইচ্ছাভরেই তাঁর সঙ্গে অগ্রসর হলাম। তিনি আমাকে সামান্য দূরে রিজেণ্ট পার্কের নিকটস্থ রাস্তায় নিয়ে গেলেন এবং অবশেষে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত উচ্চভূমির উপর অবস্থিত একটী বাড়ীর সামনে গিয়ে থামলেন।

তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "এই বাড়ীটাতেই আমি পূর্ব্বে বাস করতাম। দরজার পাশে ঐ ডানদিকে যে জানালাটা দেখা যাচ্ছে ওখানেই আমার লাইব্রেরী ছিল।"

কথাটা বলার সময় তাঁর মুখ হতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। আমি ধীরে ধীরে বললাম—

—"আপনার অদৃষ্ট।"

—"এ দুর্ভাগ্য নিজের দোষেই হয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় প্রচুর টাকাই আমার ছিল। কিন্তু ইচ্ছা হলো আরও টাকা উপার্জ্জন করবার। ব্যবসায়ী বুদ্ধি আমার কখনও ছিলনা। তাতেও আরম্ভ করলাম ব্যবসা। ফলে শীঘ্র এল দুঃসময়।"

উভয়ে মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে গীর্জ্জার কাছে ফিরে এলাম। বিদায়ের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে ক্রিস্টোফারসন স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি আমার আর কোন বই পূর্ব্বে কিনেছেন কিনা জানতে আগ্রহ হচ্ছে।"

উত্তরে বললাম, তাঁর নাম এর পূর্ব্বে কোথাও দেখেছি কিনা মনে পড়ছে না। তারপর হঠাৎ খেয়ালের বশে বলে ফেললাম, আমার এ বইটা নিতে তাঁর ইচ্ছা আছে কিনা—তা হলে আমি অত্যন্ত খুসীর সঙ্গেই এটা তাঁকে দিতে পারি। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর চোখে-মুখে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল, আমি লক্ষ্য করলাম। তিনি প্রথমে দ্বিধাভরে মৃদুভাবে আপত্তি করলেন, তারপর খুব আনন্দিত হয়ে আমার নিকট হতে বইখানি গ্রহণ করলেন। তারপর একটু লজ্জাভরে বললেন, "আমার এখনও গোটাকয়েক বই আছে। কিন্তু বাড়াবার ক্ষমতা আমার এখন আর নেই। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।"

পরস্পর করমর্দ্দন করে বিদায় নিলাম।

তখন লণ্ডন সহরের ক্যামডেন টাউনে আমি বাস করছিলাম। এই ঘটনার প্রায় দিন পনের পর একদিন বিকেলবেলায় ঘণ্টা দু'য়ের জন্য আমি ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। ফেরার পথে হাই ষ্ট্রীটের একটা বইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়ালাম। একজন লোক আমার পাশে এসে দাঁড়াল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি ক্রিস্টোফারসন্। পুরানো বন্ধুর মত পরস্পর নমস্কার বিনিময় হলো। দিনের স্বচ্ছ আলোয় তাঁকে আরও দীন, ক্লিষ্ট এবং অপরিষ্কার মনে হতে লাগল।

—"এর মধ্যে কয়েকবার আপনাকে আমি দেখেছি। কিন্তু আমি, বলি বলি করেও কথা বলতে পারিনি। আমি এখন খুব কাছেই থাকি।"

কিছু চিন্তা না করেই আমি বলে ফেললাম, "আমিও আপনাকে দেখেছি। তা, আপনি কি এখন একলাই আছেন?"

—একলা? না, না, আমার পত্নীও এখানে আছেন।

তাঁর কণ্ঠস্বরে কেমন একটা বেদনার ভাব অনুভব করলাম। মাটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তিনি কেমন অধীরভাবে মাথা নাড়ছিলেন।

উভয়েই বইয়ের দোকানের গল্প সুরু করলাম। দেখলাম ক্রিস্টোফারসন্ শুধু উচ্চবংশজাত নন, তিনি শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান।

তাঁর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে (তিনি এসব ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী) আমি জানতে চাইলাম যে লেখার কোন চর্চা তিনি করেন কি না? কিন্তু জানলাম যে লেখার চর্চা তিনি কোনদিনই করেননি এবং নিজেকে গ্রন্থ-কীট মাত্র মনে করেন। তারপর একটু ম্লান হাসি হেসে তিনি বিদায় গ্রহণ করলেন।

কয়েকদিন পরেই ঘটনাচক্রে আবার দেখা হয়ে গেল। আমার বাসার নিকটে রাস্তার মোড়ে একেবারে সামনা-সামনি দেখা। তাঁর চেহারার পরিবর্ত্তনে আশ্চর্য্যান্বিত হলাম! তিনি যেন আরও বৃদ্ধ হয়ে গেছেন এবং গভীর বিষণ্ণতার ছাপ তাঁর সারা মুখে ছড়ানো। করমর্দ্দনের জন্য হাত বাড়াতেই আমি তাঁর হাত স্পর্শ করেই বুঝলাম, যে তাঁর হাতের ক্ষমতা অনেক কমে গেছে। এমন কি দুজনের দেখা হওয়াতে আনন্দের একটী ক্ষীণরেখা তাঁর মুখে দেখা গেল। আমার কৌতূহলী দৃষ্টির উত্তরে তিনি বললেন, "আমি চলে যাচ্ছি, লণ্ডন ছেড়ে চলে যাচ্ছি।"

—"চিরকালের জন্য?"

—"তাই তো মনে হচ্ছে। তবে" খানিকটা দম নিয়ে তিনি বল্লেন, "এতে আমি খুবই আনন্দিত। আমার স্ত্রীর শরীর বর্ত্তমানে ভাল যাচ্ছে না। বাইরের মুক্ত হাওয়া তার এখন দরকার। চলে যেতে হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত—সত্যসত্যই খুব আনন্দিত হয়েছি।" তাঁর কথার ভঙ্গীতেই বোঝা গেল যে অত্যন্ত জোর করে তাঁকে কথাগুলো বলতে হচ্ছে। তাঁর দৃষ্টি ছিল উদাসীন এবং হাত কাঁপছিল থর থর করে। আমি প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম কোথায় তিনি যাবেন। কিন্তু অকস্মাৎ তিনি বলে

উঠলেন—"আমি এখন থাকি ঐ ওখানে। আপনি অনুগ্রহ করে বইগুলো একবার দেখবেন কি?"

বলাবাহুল্য তাঁর আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা পরিষ্কার রাস্তার ধারে একটা বাড়ীর সামনে হাজির হলাম। বাড়ীর একতলার অধিকাংশ জানালায় বাড়ীভাড়ার বিজ্ঞাপন টাঙ্গানো ছিল। দরজার সামনে হাজির হলে আমার বন্ধু আমাকে আহ্বান করে বড় মুস্কিলে পড়েছেন এরূপ ভাব দেখিয়ে ত্রস্তভাবে বলতে সুরু করলেন, "বাস্তবিকই আপনাকে দেখাবার বিন্দুমাত্র যোগ্য নয় এখানটা। আর বইগুলো যে পর পর সাজিয়ে রাখবো এরূপ স্থান পর্য্যন্ত এখানে একেবারে নেই।" আমি তাঁর অনুযোগ উড়িয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকলাম। অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে ক্রিস্টোফারসন্ দোতলার সিঁড়ির দরজার সামনে নিয়ে গেলেন আমাকে এবং দরজাটা দিলেন খুলে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। ঘরটা ছোট, সাংসারিক ব্যবহারের পক্ষে মোটামুটি চলনসই। দেখেই বোঝা গেল এটা শুধু দিনের বেলাতেই ব্যবহার করা হয়। ঘরটার তিনভাগের একভাগ শুধু বইয়ে ভর্ত্তি। সামনে সারি সারি বই রাখার ফলে ঘরের মেঝে থেকে ছাদ পর্য্যন্ত দুদিকের দেওয়াল সম্পূর্ণভাবে ঢেকে গেছে। জিনিষপত্রের মধ্যে রয়েছে শুধু একটী গোলাকার টেবিল, আর খানদুয়েক চেয়ার। এতেই ঘরের সমস্ত জায়গা ভর্ত্তি হয়ে আছে। বদ্ধ জানালার উপর বাইরের সূর্য্যরশ্মি এসে পড়াতে ঘরের ভিতরটা অসম্ভব রকমের উত্তপ্ত। বাঁধানো বই ও কাগজপত্রের গন্ধে জীবনে কখনও এরূপ অস্বস্তি বোধ করি নাই। আমি বলে উঠলাম, "আপনি বলেছিলেন আপনার কেবলমাত্র খানকয়েক বই আছে। কিন্তু আমার যত বই আছে আপনার অন্ততঃপক্ষে তার পাঁচগুণ আছে। ক্রিস্টোফারসন্ একটু আবেগের সঙ্গে চাপা গলায় বললেন, "কতগুলো বই ঠিক আছে—আমার মনে নেই। দেখতেই তো পাচ্ছেন, এগুলোকে ঠিকমত সাজাতে পর্য্যন্ত পারিনি। আমার আরও গোটাকয়েক বই ঐ ঘরে আছে।" সিঁড়ি দিয়ে আমাকে নীচে নিয়ে গেলেন এবং দরজা খুলে একটী শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। এ ঘরটা তত ভর্ত্তি নয় বটে। কিন্তু এ বাড়ীটারও একদিকের দেওয়াল বইয়ের আড়ালে সম্পূর্ণ ভাবে লুকিয়ে আছে। চারদিকে বইএর গন্ধ এমন ভাবে ছড়িয়ে আছে যে আমার চিন্তা করতেও অসহ্য বোধ হলো যে এই নোংরা ঘরটা প্রত্যহ দু'জন লোক শোবার ঘর হিসাবে ব্যবহার করে।

বসবার ঘরে পুনরায় ফিরে এলাম। ক্রিস্টোফারসন্ সেই বইয়ের বিরাট স্তূপ হতে দু' একখানি বই বের করে আমায় দেখাতে লাগলেন। কখনও ত্রস্তভাবে, কখনও দুঃখকষ্টে অভিভূত হয়ে, কখনও হেসে এবং কখনও ম্লানমুখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ক্রিস্টোফারসন্ তাঁর জীবনেতিহাস বর্ণনা করলেন। আমি বুঝতে পারলাম, তিনি এই ঘরটাতে দীর্ঘ আট বছর ধরে বসবাস করছেন! তাঁর বিবাহ হয় দুবার। তাঁর একমাত্র সন্তান, প্রথম পক্ষের পত্নীর গর্ভজাত কন্যা, ছোট বেলাতেই মারা যায়। তারপর (মধুর হাসির সঙ্গে যেন কোনও গোপন কথা বলছেন এরূপভাবে) যাকে বিবাহ করলেন তিনি ছিলেন তাঁর কন্যার গৃহ-শিক্ষয়িত্রী। আমি অত্যন্ত মন দিয়ে তাঁর কথাগুলো শুনছিলাম এবং আশা করছিলাম এই বিস্ময়কর সংসারের আরও বহু খবর জানতে পারব। আমি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললাম, "গ্রামে গিয়ে আপনি যে বাড়ীতে থাকবেন তাতে সম্ভবতঃ বই রাখবার জন্য অনেক তাক বসানো যাবে।"

তাঁর মুখের আকৃতির পরিবর্ত্তন হলো। অত্যন্ত ম্লান দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে। আমি আবার কথা বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সেইসময় ঘরের ভিতরে কোন শব্দে আমার মন আকৃষ্ট হলো। সিঁড়িতে শব্দ হলো ভারী পায়ের এবং মনে হোল শুনতে পেলাম কোন পরিচিত কণ্ঠ।

ক্রিস্টোফারসন্ মনোযোগী হয়ে বলে উঠলেন, "এই যে যিনি আসছেন তিনি বইগুলো সরিয়ে ফেলতে আমাকে সাহায্য করবেন। আসুন, মিষ্টার পমক্রেট, ভিতরে আসুন।" দরজাটা খুলে কঠিন-প্রকৃতির একটা লোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তাঁর তামাভ রংয়ের চুল, নীল চোখ, উঁচু চোয়াল দেখে মনে হয় লোকটার শিক্ষা বেশী না হলেও শক্তিশালী মানুষ বটে। তাঁর কণ্ঠস্বর যে পরিচিত মনে হয়েছিল তাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। অনেকদিন পরে পরে যদিও সাক্ষাৎ হয়

তবুও আমার ও পমক্রেটের মধ্যে আছে অনেকদিনের আলাপ।

পমক্রেট উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন—"এই যে, আপনিও ক্রিস্টোফারসনের পরিচিত, তা তো আমার জানা ছিল না।"

আমি উত্তর দিলাম, "আপনিও ক্রিস্টোফারসন্কে জানেন দেখে আমিও কম বিস্মিত হই নি।"

গ্রন্থ-ভক্ত বৃদ্ধ ভদ্রলোক আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে আমাদের দেখছিলেন। অবশেষে সদ্য-আগত ভদ্রলোকটীর সঙ্গে করমর্দ্দন করলেন এবং ভদ্রলোকটী একটু কঠিন কিন্তু ভদ্র-ভাবে প্রতি সম্ভাষণ জ্ঞাপন করলেন। পমক্রেটের কথা-বার্ত্তায় ইয়র্কশায়ারের টান ছিল এবং তাঁর হাবভাবেও স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি প্রকৃত ইয়র্কশায়ার অঞ্চলের লোক। তিনি বলতে এসেছিলেন যে ক্রিস্টোফারসনের লাইব্রেরীর সমস্ত বই বাক্সবন্দী করে বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন কবে পাঠানো হবে সেই দিনটা ঠিক করা প্রয়োজন।

ক্রিস্টোফারসন্ বললেন, "তাড়াহুড়ো করার কোন প্রয়োজন নেই। মিষ্টার পমক্রেট, আপনি আমার জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করছেন দেখে আমি আপনার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞ! শীঘ্র দিনটা স্থির করে নোব।"

মাথা নেড়ে পমক্রেট বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হলেন। আমাদের পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় হলো। দুজনেই এক সঙ্গে এখান হতে বেরিয়ে এলাম। বাড়ীর বদ্ধ হাওয়ায় এতক্ষণ থাকার পর রাস্তার মুক্ত বাতাস খোলা মাঠের সুমধুর বাতাসের মত মনে হলো। আমার সহ-গামীর অবস্থাও তেমনি। দেখলাম তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বুক চওড়া করে আনন্দে হাওয়া খেতে লাগলেন।

"এমন মধুর দিনে ইলকলি মুরে বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছা জাগে।"

কিন্তু ইলকলি মুর নিকটে না থাকায় দুজনে রিজেণ্ট পার্ক হতে বেড়িয়ে আসাই ঠিক করলাম। পমক্রেটকে কাজের জন্য এ পথ দিয়েই যেতে হবে, আর আমার পক্ষে ক্রিস্টোফারসন্ সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করার সুবিধা হবে। বুঝলাম এই গ্রন্থ-প্রিয় ভদ্রলোকের বাড়ীওয়ালী পমক্রেটের পিসিমা। ক্রিস্টোফারসনের জীবনের সুদিন ও দুর্দ্দিনের ঘটনা সব সত্য। দুর্দশার চরম সীমায় তিনি বর্ত্তমানে এসে পৌচেছেন। চল্লিশ বছর বয়সের সময় তাঁকে কেরাণীর কাজ বা ঐ জাতীয় কোন কিছু করে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে হয়েছে। তার পাঁচ বছর পরে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন।

পমক্রেট জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি মিসেস ক্রিসটো-ফারসনকে চেনেন?"

—"না। তবে জানতে বড়ই আগ্রহ। কেন?"

—"কারণ তিনি এমন একজন মহিলা যাঁর ঘটনা শুনতে আপনার ভালই লাগবে। আমার মতে তিনি আদর্শ মহিলা। আর ক্রিস্টোফারসনও যে প্রকৃত ভদ্রলোক সে বিষয়ে আমি নিঃসংশয়। তা না হলে ওর মাথাটা না ঠুকে আমি ছাড়তাম না। খুব ঘনিষ্ঠভাবেই ওদের সঙ্গে আমার মেলামেশা আছে। ওদের সঙ্গে এক বাড়ীতে আমি কাটিয়েছি গোটা কয়েক বছর। মিসেস্ ক্রিস্টো-ফারসনকে স্ত্রী-রত্ন বলা চলে। আর তাঁর এত দুঃখকষ্ট তাঁর স্বামী যে কিরূপে সহ্য করেন বুঝতে পারি না। এরূপ স্ত্রীকে একটু সুখের মধ্যে রাখতে যদি দস্যুবৃত্তিও করতে হতো তাতেও আমি কুণ্ঠিত হতাম না।"

—"মিসেস ক্রিস্টোফারসনকে তাহলে পরিশ্রম করে আহার্য্য সংস্থান করতে হয়?"

—"সে তো বটেই। শুধু নিজের জন্য নয়, স্বামীর জন্যও। কাজও আবার শিক্ষয়িত্রীর কাজ নয়। টটেনহাম কোর্ট রোডে একটা দোকানে কাজ করেন। সপ্তাহে ত্রিশ শিলিংয়ের চাকুরীকেই ওরা ভাল কাজ বলে মনে করেন। ঐ তো যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন, ও থেকেই আবার ক্রিস্টোফারসনের বই কেনা চাই-ই।"

—"বিবাহের পর ক্রিস্টোফারসন্ কোনও কাজ-কর্ম্ম করেন নি?"

—"প্রথম কয়েক বছর কিছু করেছিলেন শুনেছি। তারপর এক শক্ত অসুখে পড়ায় সে সব বন্ধ হয়ে গেল। সেই হতে বাড়ীতেই বসে আছেন। এখন কাজ শুধু বইয়ের দোকানগুলোতে ঘুরে বেড়িয়ে পুরাণো বইয়ের গন্ধ শোকা। মিসেস্ ক্রিস্টোফারসনও এতে বিন্দুমাত্র অভিযোগ করেন না। আপনি চোখে না দেখলে ধারণা করতে পারবেন না তিনি কি প্রকৃতির মহিলা।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি এমন ঘটনা ঘটলো যে তাঁদের লণ্ডন ত্যাগ করে যেতে হচ্ছে?"

—"সেই কথাই তো আরম্ভ করতে যাচ্ছিলাম। আমি যতদূর জানি, মিসেস্ ক্রিস্‌টোফারসনের বহু গোলগাল চেহারাওয়ালা স্বার্থসর্বস্ব ধনী আত্মীয়-স্বজন আছেন, কিন্তু তাদের কেউ-ই তাঁকে সাহায্য করতে অগ্রসর হন নি। এঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন—সহরের জনৈক টাকার কুমীরের বিধবা পত্নী মিসেস্ কিটিং। নরফোকে এই মহিলার বাড়ী আছে। তিনি নিজে কখনও যান নি সেখানে। তবে তাঁর এক ছেলে সেখানে প্রায় মাছ-টাছ ধরতে ও শিকার করতে যায়। মিসেস্ ক্রিস্‌টোফারসন্ আমার পিসিমাকে বলেছেন যে মিসেস্ কিটিং নাকি সেই বাড়ীটা বিনা ভাড়াতেই এঁদের বসবাস করতে দেবেন। এমন কি সেখানে খাওয়া-দাওয়ার সুব্যবস্থা যাতে হয় তার বন্দোবস্তও করে দেবেন। প্রকৃত পক্ষে মিসেস্ ক্রিস্‌টোফারসনকে বাড়ীটা তদারকের দায়িত্ব নিতে হবে—যাতে কেউ সেখানে বেড়াতে গেলে বেশ সাজানো গোছানো ও পরিষ্কারভাবে পায়।"

—"আমার তো মনে হয় ক্রিসটোফারসন্ এখান থেকে কোথাও যেতে চান না।"

—"তার কারণ কি জানেন? বইয়ের দোকান ছাড়া বেঁচে থাকার কল্পনাও তিনি করতে পারেন না। কিন্তু পত্নীর অবস্থা চিন্তা করে অবশেষে সম্মত হয়েছেন। এটাও খুব দ্রুতভাবে হয়নি। এ রকম ভাবে ও মহিলার আয়ু বেশীদিন টিকতো না। আমার পিসিমা বলেন যে উনি কখন পড়ে যাবেন তার কোনও স্থিরতা নেই।

প্রকৃতপক্ষে প্রায় ওকে দেখে আমার ভীতি জাগে। এ কথা উনি কোনদিনও মানবেন না—নিজের শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে কোনরূপ ত্রুটি দেখানো ওঁর অভ্যাস নয়। গ্রামের মহিলা বলে প্রায়শঃই গ্রামের কথা বলেন। তাঁর কথা শুনেই বুঝতে পারা যায়, এই কয়েক বছরে তাঁকে কত সহ্য করতে হয়েছে। মিসেস্ কিটিংএর আহ্বান পাবার ঠিক পরে—প্রায় সপ্তাহখানেক পূর্ব্বে আমি একবার তাঁকে দেখি। দেখে তো চেনাই যায় না। কারও চেহারার পরিবর্ত্তন জীবনে এতটা ঘটতে পারে, তা আপনি কখনও দেখেন নি। তাঁর মুখখানা যেন এক সপ্তদশী মেয়ের মত বোধ হলো। আর তাঁর হাসি—সে হাসি শোনামাত্রই বুঝতে পারতেন।"

প্রশ্ন করলাম, "তাঁর স্বামী অপেক্ষা তিনি কি অনেক কম বয়সের?"

—"অন্ততঃপক্ষে কুড়ি বছরের পার্থক্য। এখন ওঁর বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি।"

একটু ভেবে বললাম, "ওঁদের বিবাহিত জীবনে অশান্তি প্রবেশ করতে পারেনি। কি বলেন?"

—"অশান্তি? আমি হলফ করে বলতে পারি কোন রূঢ় বাক্য বিনিময় ওঁদের মধ্যে এখনও পর্য্যন্ত হয়নি। জলবায়ু পরিবর্ত্তনের ব্যাপারটা ক্রিস্‌টোফারসন একবার স্বীকার করলেই আর কোন কথা নেই। এ পৃথিবীতে ওদের চাওয়ার আর কিছু থাকবে না। বইয়ের ভিতর ডুবে যাবেন আবার।"

আমি মাঝ পথে প্রশ্ন করলাম, "আপনি কি বলতে চান যে ঐ সমস্ত বই-ই তাঁর পত্নীর সপ্তাহে ত্রিশ শিলিং উপার্জ্জনের অর্থ দিয়েই কেনা হয়েছে?"

—"না, তা নয়। ওঁর পুরাণো লাইব্রেরীর বহু বই উনি রেখে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া চাকুরী-কালীন অনেক বই কিনেছিলেন। একদিন বলেছিলেন আমাকে যে, টাকা বাঁচিয়ে বই কেনার জন্য অনেক সময় দৈনিক ছ' পেনিতে তাঁকে চালাতে হয়েছে। এ রকম হুজুকে-পাওয়া ভদ্রলোক কি দেখেছেন কখনও। এ সব পাগলামিগিরি বাদ দিলে ওঁকে ভদ্রলোকই বলা যেতে পারে। ওঁর স্বভাব এত মধুর যে না ভালবেসে পারবেন না। এখান হ'তে ওঁরা চলে গেলে আমারও খুব ক্লেশ বোধ হবে।"

ক্রিস্‌টোফারসনের বিদায়ের কাহিনী ছাড়া আমার আর অন্য কিছু শোনার ঔৎসুক্য ছিল না। কাহিনীটি শোনবার পর থেকে মন খুব খারাপ হয়ে গেল। দৈনন্দিন বৈচিত্র্যহীন জীবিকানির্ব্বাহের সংগ্রাম হতে ভদ্রমহিলা পাবেন চিরমুক্তি এবং এই প্রখর গ্রীষ্মে তাঁর প্রিয় গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মন-প্রাণ দিয়ে উপভোগ করবেন, এ কথা চিন্তা করতেও আমি আনন্দ বোধ করলাম। আর ক্রিস্‌টোফারসনের প্রতিও হলো একটু ঈর্ষা। কারণ এখন থেকে ভাবনা-চিন্তাহীন অবস্থায় তাঁর দিন অতিবাহিত হবে। নিরুপদ্রবে তিনি বইয়ের স্তূপের ভিতর নিজেকে

সমর্পণ করবেন। পুরানো বইয়ের দোকানগুলি হতে বিদায় নেওয়াতে তাঁর বিশেষ কোন অসুবিধা হবে না মনে হয়। তাঁর সঙ্গে দু' একদিনের মধ্যে সাক্ষাৎ করে আসব বলে আমি নিজে কথা দিলাম। রবিবারেই যাওয়া স্থির হলো, কেননা সেদিন তাঁর পত্নীর সঙ্গেও সাক্ষাৎকার ঘটতে পারে।

রবিবার বিকেলবেলায় তাঁর বাড়ীর দিকে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছি, এমন সময় পমফ্রেট এসে উপস্থিত। কেমন একটা উগ্র ভাব তাঁর চেহারায়। আর বিশ্রীভাবে পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে বাড়ীতে প্রবেশ করলেন। তাঁর উপস্থিতিটাও অত্যন্ত আকস্মিক। আমি আমার বাড়ীর ঠিকানাটা তাঁকে দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু ধারণাও করতে পারি নাই যে তিনি আমার বাড়ীতে পদার্পণ করবেন। তাঁর কটু প্রকৃতির সঙ্গে মিশ্রিত একটা অহঙ্কারের ভাব থাকায় কারও সঙ্গে এত মেলামেশা তিনি পছন্দ করতেন না। কতকটা ক্রুদ্ধভাবেই তিনি বলে উঠলেন, "এ রকম ঘটনা পূর্ব্বে শুনেছেন কখনও? সব ভুয়োবাজী। ওঁরা এখান হতে যাবেন—না, আর তার মূলে আছে ঐ বইগুলো।"

ক্রোধে থর থর করে তিনি তাঁর পিসিমার বাড়ীর সমস্ত সংবাদ জানালেন। পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে ক্রিস্টোফার্সনেরা তাঁদের নিকটতম আত্মীয়া এবং ভবিষ্যৎ রক্ষা-কর্ত্রী মিসেস্ কিটিংয়ের তাঁদের বাড়ীতে হঠাৎ উপস্থিতিতে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গেলেন। এই মহিলা তাঁদের বাড়ীতে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও পদার্পণ করেন নাই। সেইজন্য ধারণা করা হলো ক্রিস্টোফারসনদের সেখানে যাওয়া সম্পর্কে কিছু বলতে এসেছেন। মিসেস্ কিটিং যখন সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামছিলেন তখন তাঁর জোরালো কণ্ঠের কৃপায় কথোপকথনের শেষ অংশটা বাড়ীওয়ালী শুনতে পেয়েছিলেন।

—"অসম্ভব। এ কখনও হতে পারে না। এ আমি চিন্তা করতেই পারি না। তোমরা কি মনে করেছ যে আমার বাড়ীতে তোমরা ঐ সব অপরিষ্কার বই-টই ভর্ত্তি করে রাখবে? ঘোর স্বাস্থ্য-বিরোধী এ সব। এর চেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার আমি জীবনে কখনও শুনি নি।" এই কথা বলে মিসেস্ কিটিং গাড়ীতে ওঠে চলে গেলেন। তারপর কোন কারণবশতঃ বাড়ীওয়ালী উপরে উঠে দেখে, তাঁদের ঘরে বিরাজ করছে অখণ্ড নিঃস্তব্ধতা! দরজার কড়া নেড়ে কোন কাজের ছলে ঘরে ঢুকে দেখে অত্যন্ত ম্লান মুখে বসে আছে স্বামী আর স্ত্রী। তখনই তাঁরা সমস্ত কথা খুলে বললেন। মিসেস্ ক্রিস্টোফারসন্ একখানি পত্রে মিসেস্ কিটিংকে জানিয়েছিলেন যে তাঁর স্বামীর অনেকগুলি বই আছে, "সেগুলি নরফোকের বাড়ীতে নিয়ে যেতে তার কোন আপত্তি আছে কিনা। তাতেই মিসেস্ কিটিং লাইব্রেরীটি দেখতে দৌড়ে আসেন এবং চলে যাবার সময় ঐরূপ মন্তব্য করে যান। এখন হয় তাঁদের বইগুলি পরিত্যাগ করতে হবে, আর না হয় আত্মীয়ার সাহায্যের আশা ছাড়তে হবে। আমি বলে উঠলাম, "ক্রিস্টোফারসন্ কি তাহলে বইয়ের আশা ছাড়তে সম্মত হলেন না?"

—"আমার মনে হয় তাঁর স্বামীর পক্ষে এটা খুব কঠিন হবে। যাই হোক, তাঁরা বাড়ী না ছেড়ে বইগুলো নিয়ে থাকাই স্থির করেছেন। সমস্ত পরিকল্পনার এখানেই পরিসমাপ্তি। অনেকদিনের মধ্যে কোন ঘটনায় এতটা বিরক্ত হই নি।"

আমি তখন চিন্তার জাল বুনছিলাম। ক্রিসটোফারসনের মনের গতিবিধি হৃদয়ঙ্গম করতে আমার কষ্ট হলো না। মিসেস্ কিটিংকে না জানালেও আমার বুঝতে দেরী হলো না যে তাঁর সাহায্যের গুরুভার বোঝার মত ক্রিস্টোফারসনদের আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে। মিসেস্ ক্রিসটোফারসন্ কি প্রকৃতপক্ষে অসুখী? যে সমস্ত মহিলা নিজের সুখ-সাধ জলাঞ্জলি দিয়ে সন্তুষ্ট, তিনি কি তাঁদের মধ্যে একজন নন? বরঞ্চ অমার্জ্জিত জীবন তিনি অতিবাহিত করবেন, তবুও স্বামীর কোনও অসুবিধা তিনি হতে দিবেন না। আমার এই কথা শুনে পমফ্রেট ক্রুদ্ধ হলেন এবং মিসেস্ কিটিং ও ক্রিসটোফারসনের প্রতি যথেচ্ছ গালাগালি দিতে লাগলেন। তাঁর মতে এরূপ ব্যাপার ঘৃণ্য ও লজ্জাকর। অবশেষে আমাকেও তাঁর কথায় সম্মতি দিতে হলো।

দিন দুই তিন পরে অত্যন্ত ঔৎসুক্যবশত ক্রিস্টোফারসনদের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলাম। সেই বাড়ীটার উল্টোদিকের রাস্তায় দাঁড়িয়ে জানালার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ

করতেই সেই বৃদ্ধ বই-পাগলা ভদ্রলোককে দেখতে পেলাম। দেখে মনে হলো উদ্দেশ্যহীনভাবে কিম্বা মানসিক দুশ্চিন্তায় তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখেই ডাকলেন এবং বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়ার আগেই তিনি নীচে নেমে এলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার সঙ্গে আমি রাস্তায় একটু বেড়িয়ে আসতে পারি কি?"

মানসিক দুশ্চিন্তার সুস্পষ্ট ছাপ তাঁর সমস্ত চোখে মুখে ছড়ানো। বিনা বাক্যব্যয়ে, নিস্তব্ধ ভাবে খানিকটা পথ আমরা অতিক্রম করলাম।

আমি প্রশ্ন করলাম, "লণ্ডন ছেড়ে চলে যাওয়া বিষয়ে আপনি মত পরিবর্ত্তন করেছেন?"

—"সমস্তই আপনি পমফ্রেটের কাছ হতে শুনেছেন দেখছি। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমরা অন্ততপক্ষে এখনকার মত দিনকয়েক এখানেই যেমন আছি তেমনি থাকবো।"

এর পূর্ব্বে কোনও লোককে এরূপ অপদস্থ বোধ করতে দেখি নাই। তিনি মাথা নীচের দিকে করে কুঁজোভাবে এমন পথ চলছিলেন যে তাকে হাঁটা বলা যেতে পারে না। শরীরটাকে তিনি যেন কোনমতে টেনে নিয়ে চলেছেন। কোনও ঘৃণ্য কাজ করার পর দোষী ব্যক্তি যেমনভাবে হাঁটে, এও সেইরূপ।

তিনি আবার আরম্ভ করলেন তাঁর কথা, "সত্যি বলতে কি, বইগুলো নিয়েই বেশ গোলমাল বেঁধেছে," কথাটা বলে অত্যন্ত কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন। তাঁর সমস্ত শরীরটা থর থর করে কাঁপছে, আমি লক্ষ্য করলাম।

"আমার অবস্থা বেশ ভাল নয়, তা আপনি বুঝতেই পারছেন।"

—বলেই তিনি হেসে উঠলেন। "ব্যাপারটা প্রকৃতপক্ষেও এই। মিসেস্ ক্রিস্টোফারসনের একজন আত্মীয়া কতকগুলি সর্তে একখানা বাড়ী দিতে চেয়েছিলেন তাঁর গ্রামে। কিন্তু পরিশেষে দেখা গেল—লাইব্রেরীটাই বেশ মুস্কিলের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে—সাংঘাতিক রকমের বাধা। আমরা বর্ত্তমানে দুজনাতে এখানেই থাকবো, স্থির করে ফেলেছি।"

একটু কৌতূহলভরে আমি জানতে চাইলাম, মিসেস্ ক্রিস্টোফারসনের গ্রামে যেতে কোন আগ্রহ ছিল কি না।

—কিন্তু প্রশ্নটা করেই বুঝতে পারলাম আমি গুরুতর ভুল করে ফেলেছি। কারণ, কথাটা আমার বন্ধুর হৃদয়ের অত্যন্ত কোমল স্থানে ঘা দিয়েছে। তিনি যেন আমার ক্ষমা প্রার্থনা করছেন এরূপভাবে অত্যন্ত করুণ ও বিষণ্ণ-দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন—"গ্রামে বসবাস করতে পারলে তাঁর পক্ষে খুব সুখকর হতো।"

আমি বলে উঠলাম, "বইগুলোর কোন বন্দোবস্ত আপনি কি করতে পারেন না? বইগুলোর জন্য অন্য একটা বাড়ীর কয়েকখানা ঘর যদি ভাড়া নেন?"

এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেলাম তাঁর মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। বুঝলাম, তাঁর হাতে এক কানাকড়িও নেই।

—"এ নিয়ে আর চিন্তা করছি না। এ ব্যাপারের আমরা নিষ্পত্তি করে ফেলেছি।"

এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা আর উচিত নয়। সুতরাং সেদিন বিদায় নিলাম রাস্তার মোড়ে।

এর পর সপ্তাহখানেকের ভিতরেই পমফ্রেটের কাছ হতে একটা চিঠি পেলাম। চিঠিতে লেখা ছিল, "যেমন মনে করেছিলাম, তেমনই হয়েছে। মিসেস ক্রিস্টোফারসন্ গুরুতরভাবে পীড়িত।" চিঠিতে আর অন্য কথা ছিল না। আমি চিঠির ব্যাপার নিয়েই চিন্তা করতে লাগলাম। কথাগুলো আমার মন ও অনুভূতির উপর প্রভাব বিস্তার করলো। সেদিন অপরাহ্ণে পুনরায় চললাম সেই বাড়ীর দিকে।

সেই বাড়ীর সম্মুখের জানালায় কাউকেও দেখতে পেলাম না। কিছুক্ষণ ইতস্তত করার পর স্থির করলাম, বাড়ীতে গিয়ে পমফ্রেটের পিসীমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলবো। পমফ্রেটের পিসীমাই এসে দরজা খুলে দিলেন।

এর আগে কখনও এঁকে দেখি নাই। যখন আমার নাম তাঁকে বললাম এবং জানালাম—মিসেস্ ক্রিসটোফারসনের সংবাদ জানতে উৎসুক হয়ে এখানে এসেছি—তখন বসবার ঘরে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন এবং গোপনভাবে সমস্ত কথা বললেন। এই মহিলার স্বভাব ইয়র্কশায়ারের রমণীদের মত, লণ্ডনের নারীদের মত বিন্দু-মাত্রও নয়।

—"দিন দুই পূর্ব্বে মিসেস্ ক্রিস্টোফারসন্ অত্যন্ত

পীড়িত হয়ে পড়েন। প্রায়ই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তেন, আর রাত্রিতে অনিদ্রার রোগীর ন্যায় কাতরাতেন। অবশেষে ডাক্তার ডাকা হলো। ডাক্তার এসেই ওঁকে বইয়ে ভর্ত্তি নোংরা শোবার ঘর হতে সরিয়ে অন্য ঘরে রাখার ব্যবস্থা করলেন। সৌভাগ্যবশতঃ একটা ঘর তখন আসবাবহীন অবস্থায় ছিল। দিবারাত্রি তিনি সেইখানেই থাকেন, আর এখন এত রুগ্ন হয়ে পড়েছেন যে কথা বলতে পর্য্যন্ত কষ্ট হয়। স্বামীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে শুধু মাঝে মাঝে হাসেন। বিছানার ধারে তাঁর স্বামী সর্ব্বক্ষণ বসে থাকেন। তাঁকেও শীঘ্র শয্যা নিতে হবে। তাঁরও চেহারা হয়েছে ভূতের মত এবং ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয় এক বদ্ধ উন্মাদ।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "এ অসুস্থতার কারণ কি?"

বৃদ্ধা মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে জানালেন—কারণ অনুসন্ধান করা মোটেই কঠিন নয়।

প্রশ্ন করে ফেললাম, আপনার কি মনে হয় হতাশা ও অবসাদের ফলেই এরূপ হয়েছে?

—"মনে হয় তাই। বহুদিন হতেই অসুখে কষ্ট পাচ্ছিলেন, তার উপর এরকম একটা ঘা তাঁকে একেবারে শয্যাগত করে দিলে।"

বললাম, "আমি আর আপনার ভাই-পোর মধ্যে এ ব্যাপারে কিছু কথাবার্ত্তা হয়েছে। পম্‌ফ্রেটের মতে ক্রিস্‌টোফারসন বুঝতে পারেননি—তাঁর পত্নী তাঁর জন্য কতখানি আত্মত্যাগ করেছেন।"

বৃদ্ধা উত্তর দিলেন, আমারও তাই মনে হয়। তবে এখন ক্রিস্‌টোফারসন্ এ ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। কেননা এখন পত্নীর কথা ছাড়া—

এমন সময় দরজার কড়া নেড়ে উঠলো। কে যেন খুব কম্পিত স্বরে বাড়ীওয়ালীকে শীঘ্র করে উপরে যেতে বললো।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে?"

ক্রিস্‌টোফারসন্ আমাকে চিনতে পেরে অত্যন্ত বিষণ্ণমুখে আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, ওঁর অবস্থা খুব সঙ্কটাজনক মনে হচ্ছে। দয়া করে শীঘ্র একবার উপরে চলুন।

আমার সঙ্গে আর বাক্যবিনিময় না করে বাড়ীওয়ালীর সঙ্গে উপরে চলে গেলেন। আমি চলে আসতে পারলাম না। দশমিনিট ধরে সেই ঘরের মধ্যে আমি অধীরভাবে পায়চারি করতে লাগলাম, আর কান পেতে প্রতিটি শব্দ শোনবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে সিঁড়িতে পুনরায় পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম এবং বাড়ীওয়ালী আবার আমার নিকট ফিরে এলেন।

তিনি বলে উঠলেন, "ওটা কিছু নয়। নীরবভাবে একলা থাকলে উনি এরকম ঘুমিয়ে পড়েন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক বিছানার পাশে বসে ক্ষণে ক্ষণে জিজ্ঞাসা করবেন—কেমন লাগছে—আর ওঁকে বিরক্ত করবেন। আমি বুড়োটাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওঁর বসবার ঘরে পাঠিয়েছি। আপনি ওঁর ঘরে গিয়ে একটু কথাবার্ত্তা বলে এদিক থেকে উদাসীন করে রাখলে বড় ভাল হয়।"

সঙ্গে সঙ্গে আমিও উপরের বসবার ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। গিয়ে দেখি ক্রিস্‌টোফারসন্ একটা চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। দেখলেই মনে হয়—দুঃখকষ্ট ও হতাশার প্রতিচ্ছবি। আমি অগ্রসর হতেই টলতে টলতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। অতি-কুণ্ঠিত ও লজ্জাভরে তিনি আমার হাত ধরলেন। আমার দিকে চোখ তুলে তাকাতেই পারলেন না। তাঁর মধ্যে উদ্দীপনা জাগানোর জন্য আমি কয়েকটা কথা বলতে চেষ্টা করলাম। তাতে কিন্তু উল্টো ফলই হলো।

তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলেন, "এ সব কথা আমায় বলবেন না। যে যাই বলুন না কেন, আমি বুঝতে পারছি উনি কিছুতেই বাঁচবেন না—আর বাঁচবেন না।"

—"যে ডাক্তারকে আপনি দেখাচ্ছেন তিনি খুব নামকরা তো?"

—"ভাল বলেই তো শুনেছি। কিন্তু তাতে আর কি হবে? অনেক বিলম্বেই ডাকা হয়েছে—কিছুই করবার আর নেই এখন।"

তিনি পুনরায় চেয়ারে বসতেই আমিও তার পাশে বসে পড়লাম। দু'এক মিনিট নিস্তব্ধ থাকার পর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। ক্রিস্‌টোফারসন্ লাফিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর মাথা বিকৃত হয়েছে মনে করে আমি তার পিছনে পিছনে সিঁড়ি

পর্য্যন্ত দৌড়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি তিনি খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফিরে আসছেন। বিড় বিড় করে বলে উঠলেন, পোষ্টাপিস হতে পিয়ন এসেছিল। একখানা পত্রের আশায় আমি আছি।

আলাপ-আলোচনা আর বেশীক্ষণ চালানো যাবেনা ভেবে আমি বিদায় নিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। ক্রিস্টোফারসন্ আমাকে কিন্তু ছাড়লেন না।

দোষী কুকুর শাস্তি পাবার সময় যেরূপভাবে তাকায়, অনেকটা তেমনিভাবে আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন—আপনাকে আমি সত্যি কথা বলছি, আমার যা ক্ষমতা করেছি। যখন আমার পত্নী পীড়িত হয়ে পড়লেন—কিম্বা আমি যখন বুঝতে পারলাম– হতাশা আমার পত্নীর পক্ষে কি সাংঘাতিক ক্ষতিকরই না হয়েছে, তখনি আমি মিসেস্ কিটিংএর বাড়ীতে বলতে গেলাম যে সমস্ত বই-ই আমি বিক্রয় করে দেব। মিসেস্ কিটিং তখন সহরে ছিলেন না। আমার মূর্খতা জানিয়ে আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করতে বলে করুণা ভিক্ষা করে পত্র লিখলাম। সে পত্রের উত্তর আসার সময় অনেকদিন পার হয়ে গেছে, এখনও কোন জবাব আসেনি।

তাঁর হাতে ডাকপিয়নের কাছ হতে সদ্য-পাওয়া একটা বইয়ের দোকানের তালিকা রয়েছে দেখলাম। মেসিনের মত উপরের ঢাকনাটা ছিঁড়ে প্রথম পাতাটা দেখতে লাগলেন। পরমুহূর্ত্তেই কিন্তু বিবেকের দংশন-ব্যথায় অস্থির হয়ে হাত হতে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

ঘরের রাশীকৃত বইয়ের মধ্যে পা রাখবার যে সামান্য জায়গা ছিল তিনি সেখানেই অধীরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন এবং বললেন, অমন সুযোগ চলে গেল। উনি অবশ্য লণ্ডনেই না হয় থাকবেন বলেছিলেন। কিসে আমি পরিতৃপ্ত হবো সেটাও উনি জানতেন। কিন্তু আমি কি নির্ম্মম, কত হীন যে সামান্য সুখের জন্য ওঁকে বহু দুঃখ দিয়েছি। অস্থিরভাবে তিনি হাত পা ছুঁড়তে লাগলেন। কতটা আত্মত্যাগ তাঁকে করতে হয়েছে আমি বুঝতে পারিনি। গ্রামে বসবাস করবার কথায় তাঁর অন্তরের যে স্ফূর্ত্তি চোখে মুখে উদ্ভাসিত হতো তা আমি লক্ষ্য করিনি। অশেষ দুঃখযন্ত্রণা তিনি সহ্য করেছেন। তা বুঝেও আত্মসুখসর্ব্বস্ব কাপুরুষের মত আমি তার প্রতিবিধান করিনি—তিলে তিলে তাঁকে আমি মেরেছি। আমি বললাম, "শীঘ্র মিসেস্ কিটিংএর নিকট হতে পত্রের জবাব আপনি পেয়ে যাবেন। আর সে জবাবটা যে খুবই আনন্দদায়ক হবে তাতে আমার—" "বহু দেরী হয়ে গেছে। আমিই ওঁকে মেরে ফেললাম। সেই ভদ্রমহিলার কাছ হতে চিঠি পাবার আশা মিথ্যে। তিনি অকর্ম্মণ্য ধনীদের মধ্যে একজন ছাড়া আর কেউ-ই নন। তাঁর দাম্ভিকতায় আমরা যখন একবার আঘাত করেছি, তখন তাঁর কাছ হতে ক্ষমার প্রত্যাশা করা বৃথা।"

মুহূর্ত্তের জন্য বসে পড়ে আবার মানসিক বেদনায় অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

..."আমার পত্নী এখন মৃত্যুপথযাত্রী—আর ঐ বই-গুলিই তাঁর মৃত্যুর কারণ" এই কথা বলে হাত নেড়ে তিনি বইগুলির দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করলেন। "তাঁর প্রাণের পরিবর্ত্তে আমি এইগুলোকে রেখেছি। উঃ! উঃ!"

এই কথা বলার সময় তিনি খানকয়েক বই হাতে তুলে নিলেন, আর কি করতে যাচ্ছেন বুঝবার আগেই সেগুলি জানালা দিয়ে গলিয়ে রাস্তায় ফেলে দিলেন। আরও কতকগুলি বইয়ের ঐ একই অবস্থা হলো, আর সেগুলি রাস্তাতে পড়ার শব্দ আমি শুনতে পেলাম। তারপর আমি তাঁর হাত ধরে স্থির হতে অনুরোধ করলাম।

—"উচ্ছন্নে যাক ওসব। ওগুলোকে দেখলে আমার পিত্তি শুদ্ধ জ্বলে উঠে। ওইগুলোই আমার স্ত্রীকে মেরেছে!"

কথাগুলো বলবার সময় তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ-ছিলেন। অবশেষে অশ্রুধারা নেমে এল তাঁর দুচোখ হতে। এখন তাঁকে শান্ত করতে আমাকে বেশী বেগ পেতে হলো না। অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, আর কথা বলতে লাগলেন অবিরাম অশ্রু-বর্ষণ করতে করতে।

—"আপনি যদি বুঝতে পারতেন যে আমার পত্নী আমার জীবনে কতখানি স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর সঙ্গে যখন আমার বিয়ে হলো তখন আমি কপর্দ্দকশূন্য, আর আমার বয়স তাঁর থেকে বিশ বছর বেশী। ভাবনা

চিন্তা আর একটানা পরিশ্রম ছাড়া আর কিছুই তাঁকে দিতে পারিনি। সমস্তই আপনি জানতে পারবেন—তাঁরই উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করে আমি বেঁচে আছি। তা থেকে জঘন্য ও লজ্জাকর ব্যাপার এই যে—তাঁরই উপার্জ্জন, অথচ তাঁকে না খাইয়ে শুকিয়ে রেখে তিলে তিলে মেরে ফেলে সেই অর্থে কিনে গেছি বই। কি দুর্বুদ্ধি। কি ঘৃণ্য ও লজ্জাকর ব্যাপার। বই কিনে যাওয়ার নেশা আমাকে মদ খাওয়া কিম্বা জুয়াখেলার নেশার মত পেয়ে বসেছিল। আমি যদিও প্রত্যহ এর জন্য লজ্জিত হয়েছি ও পণ করেছি যে ও নেশা পরিত্যাগ করবো—কিন্তু সে আকর্ষণ কাটিয়ে উঠতে পারিনি। এজন্য উনি আমাকে কখনও দোষ দেননি—তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-পাত কিম্বা তিরস্কার পর্য্যন্ত করেননি। কুঁড়েমি করে আমি কেবল সময় অতিবাহিত করেছি। দোকানে কাজ করার খাটুনি থেকে ওঁকে উদ্ধার করার কোনও চেষ্টা পর্য্যন্ত করিনি। একটা দোকানে যে উনি কাজ করতেন, তা কি আপনি জানেন? এত জ্ঞান, এত প্রখরবুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও ওঁকে এইরূপ ঘৃণ্য জীবন যাপন করতে হতো। চিন্তা করে দেখুন, কত সহস্রবার আমি বই হাতে করে সেই দোকানের সামনে দিয়ে বেড়িয়ে এসেছি। উনি ঐ দোকানের মধ্যে পড়ে আছেন, আর আমি অনায়াসে নিরুদ্বিগ্নভাবে সেই দোকানের সামনে দিয়ে বেড়িয়ে আসতে পারতাম। উঃ! উঃ!"

দরজায় কেউ কড়া নাড়ছিল। দরজা খুলে দেখি, বাড়ীওয়ালী আশ্চর্য্যজনকভাবে তাকিয়ে আছেন কতকগুলি বই হাতে নিয়ে।

আমি ফিস্ ফিস্ করে বললাম, ঠিক আছে। মেঝের উপর ওগুলো নামিয়ে রাখুন। ভিতরে আনবেন না। একটা বিপর্য্যয় মাত্র।

আমার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন ক্রিস্টোফারসন্। যে কথা তিনি মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারছিলেন না, সেই প্রশ্নই তাঁর দৃষ্টির মধ্যে ছিল। বললাম, এমন কিছু হয় নাই, আর ধীরে ধীরে তাঁকে সংযত করলাম। সৌভাগ্যবশতঃ আমি চলে আসার আগে ডাক্তার এসেছিলেন এবং খানিকটা উন্নতির সংবাদ পেলাম। রোগীর অনেকটা ঘুম হয়েছিল এবং আবার ঘুম আসার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। ক্রিস্টোফারসন্ আমাকে আরেকবার খুব শীঘ্র খবর নিতে অনুরোধ করলেন। তাঁর জন্য মাথা ঘামায় এরূপ আমি ছাড়া আর কেউ-ই নাকি তাঁর ছিল না। পরের দিনই আবার আসব, প্রতিশ্রুতি দিলাম। পরের দিন অপরাহ্নে আমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলাম। ক্রিস্টোফারসন্ আমারই জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। দরজায় কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা গেল খুলে। তাঁকে প্রফুল্লমুখে সম্ভাষণ করতে এগিয়ে আসতে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমাকে তিনি দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন

—"সে পত্রের উত্তর এসেছে। আমরা বাড়ীটা পাচ্ছি।"

—"মিসেস্ ক্রিস্টোফারসনের অবস্থা এখন কেমন?"

—"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। অনেক সুস্থ বোধ করছেন। গতকাল আপনি যখন চলে গেলেন তখন থেকে সুরু করে আজ সকাল পর্য্যন্ত ঘুমিয়েছেন। প্রথম ডাকে পত্রটা পেয়ে গেছি।" তারপর এক নিঃশ্বাসে বলে চললেন, "ওঁকে বলেছি, তবে সমস্তটা খুলে বলিনি। উনি মনে করেছেন বইগুলোও সেখানে আমি নিয়ে যেতে পারব। ওঁর স্ফূর্ত্তির হাসিটা যদি দেখতেন। কিন্তু উনি বোঝবার পূর্ব্বেই সমস্ত বিক্রী হয়ে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে ফেলা হবে। উনি যখন জানবেন আমি বইগুলোকে একটুও মায়া করি না—"

ক্রিস্টোফারসন্ বসবার ঘরে প্রবেশ করলেন। তার চলাফেরার মধ্যে লক্ষ্য করলাম আত্মত্যাগের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আমোদ ও অহঙ্কার তিনি অনুভব করছেন। একজন পুস্তক-ব্যবসায়ীকে ইতিমধ্যেই চিঠি লেখা হয়ে গেছে। সমস্ত লাইব্রেরীটাই তাঁকে বিক্রী করা হবে।

"গোটাকতক বইও কি নিজের জন্য রাখবেন না?" আমি প্রশ্ন করলাম। অবশ্য গোটাকয়েক বই তাঁকে রাখতে হবে। তাতে কেউ-ই অনুযোগ করবেন না। এ ছাড়া তাঁর পক্ষে জীবনধারণ করাও কষ্টকর। প্রথমে খুব জোরেই বললেন, একখানা বইও তিনি রাখবেন না, জীবনে বইয়ের চেহারা তিনি আর দেখতে চান না। আমি তখন জানতে চাইলাম, মিসেস ক্রিস্টোফারসনের জন্য কি কোন বইয়ের

প্রয়োজন নেই? মাঝে মাঝে বইয়ের সঙ্গে থাকলে তিনি আনন্দিত হবেন না? কথাটা শুনে তিনি একটু গম্ভীর-ভাবে চিন্তা করলেন। অবশেষে আমরা ঠিক করলাম, অন্যান্য আসবাবপত্রের সঙ্গে নরফোকে এক বাক্স-বোঝাই বইও পাঠানো হবে। আর এতে মিসেস কিটিংএরও অভিযোগ করার কোন কারণ নেই। তাঁর অনুমতি পূর্ব্বেই নিয়ে রাখতে বললাম।

সেইরকমই হলো। সুষ্ঠুভাবে সমস্ত বই বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করা হলো। সারি সারি সাজানো বইগুলি বস্তায় ভর্ত্তি করে নীচে আনা হলো। তারপর সেগুলি গাড়ীতে করে এমন ভাবে পাঠিয়ে দেওয়া হলো যে পীড়িতা পত্নী এ বিষয়ে ঘুণাক্ষরে না জানতে পারে। এই সমস্ত কথা বলার সময় ক্রিস্টোফারসন এমন অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলেন যে সেরূপ হাসি ইতিপূর্ব্বে আর কখনও শুনি নাই। মনে হলো—ঘরের যে অংশটা এতদিন বইয়ে পূর্ণ ছিল তিনি আর সেদিকে তাকাতে পারছেন না। আর কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে মাথা আনত করে তিনি যেন কেমন আনমনা হয়ে পড়ছেন। তবে পত্নীর রোগ-মুক্তিলাভে তিনি খুব আহ্লাদিত হয়েছেন তাতে বিন্দু-মাত্র সংশয় নেই। এই দুর্ঘটনার ধাক্কায় তাঁকে আরও বেশী বৃদ্ধ মনে হলো। স্ফূর্ত্তির কথা বলার সময় তার চোখ হতে দরদর করে জল পড়তে লাগল, আর বয়স হওয়ার দুর্ব্বলতায় মাথাটা কাঁপতে লাগল ঈষৎ।

লণ্ডন হতে বিদায় নেওয়ার পূর্ব্বে আমি মিসেস্ ক্রিস্টোফারসনকে একবার দেখেছিলাম। অতিশয় রুগ্ন ও বিবর্ণ এবং সুন্দর চেহারা বলতে যা মনে হয় সেরূপ চেহারাও তাঁর কোনদিন ছিল না। তবে মানুষের হৃদয়ের রূপ যদি ফোটে ওঠে মুখমণ্ডলে, তাহলে মিসেস্ ক্রিস্টো-ফারসনের মুখশ্রীতে অন্তরের মাধুর্য্য ও স্নেহের ভাব প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল। খুব আমুদে স্বভাবের না হলেও তিনি বিষণ্ণ স্বভাবের ছিলেন না। আর পুনঃ পুনঃ লক্ষ্য করে তাঁর চোখের ভাষা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। সে ভাষা যেন তাঁর মনোবাঞ্ছা-পুরণকারী সর্ব্বশক্তিমান করুণাময় পর-মেশ্বরের প্রতি নিবেদন করছিল অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি।

অলৌকিক

শ্রীতারিণীপ্রসাদ রায়

বছর পনের আগেকার ঘটনা, মনে হয় যেন সে দিনের কথা।

মেজ মেয়ে অনিমার হল অসুখ, বয়স তখন তার বছর দুয়েক, সংসারে অভাব অনটন থাকলে সামান্য অসুখ বিসুখে যেমন হয়—খায় দায় বেড়িয়ে বেড়ায়, জ্বর এলে কাঁথা গায়ে দেয়, অবহেলা আর অমনোযোগিতার ফলে দেখা দিল সর্দ্দি, শ্লেষ্মা, হ'ল সে শয্যাশায়ী, বুকে একটু ব্যথার ভাব, শ্লেষ্মা ওঠে না, ডাকা হ'ল ডাক্তার।

মাজদিয়ার ডাক্তার আশুনাগ, গরীবের বন্ধু, দরদ দিয়ে আপন জনের মত করে দেখেন রোগীদের ; দাবী করে পয়সা কিছু চান না, যা' দেওয়া যায় তাই নেন, পাশ-করা ডাক্তার তিনি না হলেও রোগী তাঁর হাতে সারে। দরিদ্র পল্লীবাসীরা ভক্তি করে তাঁকে, পরম নির্ভরতার সঙ্গে তাঁর হাতে রোগীর সম্পূর্ণ ভার সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয় গ্রামের লোকেরা।

গাঁয়ে বা আশেপাশে নেই পাশ-করা ডাক্তার, প্রয়োজন হ'লে মাজদিয়া বা রাণাঘাট থেকে ডাকতে হয়—তাঁদের ডাকা মানে প্রাণান্তকর খরচার ঝুঁকি নেওয়া—কোথায় পাবে এত পয়সা গরীব পল্লীবাসীরা? সেই কারণেই বিশেষ সঙ্কটে না পড়লে ডাকে না তাঁদের।

প্রত্যহ সকালের ট্রেণে নিয়মিত ভাবে এসে নামেন আশুডাক্তার বানপুর ষ্টেশনে, পায়ে হেঁটে এগাঁ সেগাঁ ঘুরে বেড়ান ব্যাগ হাতে করে—শুধান সবার কুশল, সন্ধ্যায় ফিরে যান বাড়ী।

ডাকলাম পথ থেকে ডাক্তারবাবুকে। রোগী দেখে ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করে গেলেন তিনি চলে। যাবার সময় বলে গেলেন—ভয় নেই, সেরে যাবে।

ডাক্তারবাবু অভয় দেওয়া সত্ত্বেও রোগ কিন্তু সারবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, ক্রমেই যেন জটিলতর হ'তে লাগল অসুখের অবস্থা।

দিন সাতেক পরে আমার পিতা আমাকে ডেকে বললেন, অনির অসুখ বেড়ে চলেছে, ভাল ডাক্তার দেখানর ব্যবস্থা কর, এ চিকিৎসা আমার মনঃপুত হচ্চে না। ইনি হয়ত রোগ ধরতে পারেন নি।

ডাক্তারবাবু এলে তাঁকে বললাম সে কথা, রোগীকে পরীক্ষা করে বললেন, সে রকম বুঝলেত আমিই সেকথা বলতাম।

প্রবীণ ডাক্তার যখন নিজে ভরসা দিলেন তখন তাঁর অবাধ্য হয়ে বড় ডাক্তার কাকেও আনার মত পরিবর্ত্তন করলাম, বাবাকেও বললাম সে কথা, সন্তুষ্ট হলেন না তিনি।

আরও দিন তিনেক পরে দশদিনের দিন বাবা পুনরায় আমাকে বললেন, মেয়েটা অচিকিৎসায় মারা যাবে, আজ দেখলাম তার অবস্থা খুব খারাপ।

ছ্যাঁৎ করে উঠল আমার বুকের মধ্যে বাবার কথা শুনে, অনুতাপ হল, বাবা আগে থেকেই বলছেন একথা, ভাল মন্দ কিছু ঘটলে আমার দোষেই ঘটবে—দেখলাম বাড়ীর সবাই আমার উপর দোষারোপ করতে আরম্ভ করেছে। সকলের সকলরকম কথাই বিনা প্রতিবাদে সইতে হ'ল আমাকে।

মেয়েটী সেইদিনই মারা যাবে—সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল পাড়াময়, দলে দলে শুভাকাঙ্খিনী প্রতিবেশিনীরা মেয়ের বিছানার পাশে ভীড় জমিয়ে চোখের জল ফেলে সমবেদনা জানিয়ে গেলেন, নির্ব্বাক বিস্ময়ে রোগ-যন্ত্রণাকাতর শিশু কন্যা সকলের মুখের পানে চেয়ে দেখল, হয়ত বুঝতে পারল কারণটা।

কেহ কেহ কটাক্ষপূর্ণ মন্তব্য করতেও ছাড়লেন না, বললেন—মেয়ে কিনা!

সত্যিই কি খরচের সাশ্রয়ের জন্য আত্ম-প্রবঞ্চনা করলাম আমি? হাহাকার করে উঠল মন—এ আমি করলাম কি? তাকে এভাবে হত্যা করবার কি অধিকার আছে আমার? ভাল ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসিত হ'লে হয়ত সে নিরাময় হত। অন্ততঃ আফশোষ করবার কিছু থাকত না, কারও সামনে না—নির্জ্জনে বসে ফেললাম চোখের জল। আবেগ-আকুল চিত্তে প্রার্থনা জানালাম শ্রীভগবানের পাদপদ্মে—তার আরোগ্য কামনা করে।

প্রতীক্ষায় থাকলাম ডাক্তারবাবুর, বিকালে তিনি পুনরায় এলে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বসলাম রোগীর পাশে।

পরীক্ষান্তে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল দেখলাম ডাক্তারবাবুর মুখভাব, আশঙ্কার ছায়া যেন ফুটে উঠল তাঁর চোখে মুখে। বাইরে আমাকে একান্তে ডেকে তিনি বললেন, আমি ঠিক বুঝতে না পেরে মেয়েটাকে মেরে ফেললাম, রোগ নির্ব্বাচনে ত্রুটির কথা স্বীকার করলেন তিনি। বাবা যে তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন সে কথাও শেষ মুহূর্ত্তে বললেন অকপটে।

রাত্রি সাড়ে আটটায় তাঁর ফিরবার গাড়ী, ষ্টেশনের কাছে আমাদের বাড়ী। গাড়ী আসার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে তিনি উঠে গেলেন।

যাবার সময় আমাকে গোপনে বলে গেলেন, তাড়াতাড়ি খাওয়ার ব্যাপার চুকিয়ে নিতে। হয়ত আর বেশীক্ষণ টিকবে না রোগী।

তিনি চলে গেলে খেতে বসলাম—খেতে পারলাম না। বাড়ীর অন্যান্যেরা কেউ খেল—কেউ খেল না।

নটা নাগাদ প্রকাশ পেতে লাগল মৃত্যুর লক্ষণ, আরম্ভ হ'ল শ্বাস কষ্ট। আমার সেজ ভাই ভুপেন (বর্ত্তমানে বারাসত কোর্টের উকিল) কর্পূরের ধোঁয়া নাকের কাছে ধরে শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বাভাবিকতার জন্য চেষ্টা করতে লাগল।

সহ্য করতে পারলাম না সে দৃশ্য। সর্ব্বদা মনে হতে লাগল এ মৃত্যু না—হত্যা, এর জন্য দায়ী আমি, তাকে মৃত্যু শয্যায় ফেলে রেখে একপা একপা করে আমার দোকানের পথে পা বাড়ালাম, বাজারে দোকান—বসত বাড়ী থেকে অল্প দূরে। যাবার সময় মাকে বলে গেলাম, চোখের সামনে এ দৃশ্য সহ্য করতে পারছিনে। সে রকম কিছু হলে যেন আমাকে খবর দেওয়া হয়।

দোকানে এসে একটা বালিশ নিয়ে শুয়ে পড়লাম গদীর উপর। ফাগুন মাস—গায়ে দিলাম একখানা পাতলা চাদর, গরম লাগতে লাগল, সেখানা সরিয়ে রেখে চোখ বুজলাম, ঘুম এলনা; প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতীক্ষা করছি বাড়ীর কাহারও পদশব্দের। টং টং করে দেওয়াল ঘড়িটায় বাজল এগারটা। তবে কি বেঁচে গেল অনিমা! ডাকি ভগবানকে—বেঁচে উঠুক সে—কেউ যেন ডাকতে না আসে আমাকে, ক্রমে আধ ঘণ্টার আওয়াজ-সহ বেজে চলল বারটা, একটা, দুটো।

তন্দ্রায় জড়িয়ে এলো দু'চোখ—দুটো বাজার পর। স্বপ্নে দেখলাম, অস্পষ্ট নয়, এলোমেলো নয়—মনে হয় যেন এখনও চোখের সামনে জল্ জল্ করছে।

—অলৌকিক জ্যোতিসম্পন্ন গৌরবর্ণ সুন্দর সুঠাম ঋজু দেহ, খালি গা এক ব্রাহ্মণ, গলায় ঝুলছে পৈতার গোছা, পায়ে খড়ম, পরিধানে পট্টবস্ত্র—আমার শিয়রে এসে দাঁড়ালেন, তাড়াতাড়ি যেন উঠে নিতে গেলাম পায়ের ধুলো, বাধা দিয়ে আমার মাথায় হাত রেখে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন ব্রাহ্মণ—এত ভাবছিস কেন?

জড়িত স্বরে উত্তর দিলাম, মেয়েটা যে মারা গেল। স্বর্গীয় সুষমা-দীপ্ত বদন মণ্ডলে লক্ষ্য করলাম অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আতিশয্য, বললেন তিনি, মেয়ে তোর মরবে না।

অশেষ আগ্রহভরে ব্যাকুল দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চেয়ে থাকলাম তাঁর মুখের পানে, কথা বলতে পারলাম না।

হেসে বললেন তিনি, দরগায় ঢুকতে অশ্বথতলে ওষুধ নিয়ে বসে আছে ফকির। তোর মেজ ভাইকে খালি পায়ে—

কথা তাঁর শেষ না হতেই দরজায় ধাক্কা, ভেঙ্গে গেল ঘুম, ডাকলেন বাবা, তারিণী দরজা খোল।

দেওয়াল ঘড়িটায় বাজল তিনটে।

বাবা বললেন—বাড়ী চল, অনিমা মারা গিয়েছে।

জানা কথা সে মারা যাবে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটেছে আমার তন্দ্রাহীন অবস্থায় তার মৃত্যু সংবাদের প্রতীক্ষায়, তবু বিশ্বাস করতে পারি না। স্বপ্নে ব্রাহ্মণ যে বলে গেলেন, মেয়ে আমার মরবে না।

দোকানের দরজা বন্ধ করে বাবার পিছন পিছন পা বাড়ালাম বাড়ীর পথে। পথে ভাবতে ভাবতে এলাম—স্বপ্ন যদি সত্য হত!

বাড়ীতে পা দিতেই দেখি, সকলে করছে আছড়া পিছড়ি, কান্নাকাটি। ভূপেন সকলকে দিচ্ছে সান্ত্বনা, দেখলাম সে অপেক্ষা করছে আমার জন্য। আমাকে দেখেই বললে, আসুন দাদা, অনিকে তুলসী তলায় নিয়ে যেতে হবে।

ব্যথায় ভরা তার কথা। কর্ত্তব্য নিষ্ঠুর। নমনীয় নয় তার মনোভাব। আমার মেয়েদের সে ভালবাসে খুব।

হারিকেনের আলোটা মুখের উপর ধরে দেখলাম মৃত কন্যার মুখখানা, একটা টানা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল বুক চিরে, কুণ্ঠিতভাবে ডাকলাম মেজভাই যতীনকে, বললাম তাকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত, অনুরোধ করলাম দরগায় যাবার জন্য।

বিরক্তি ভরে সে আমাকে বললে, আপনার মাথা খারাপ হয়েছে।

বাবা আগ্রহ ভরে শুনতে চাইলেন আমার বক্তব্য। বললাম সব। তিনিও যতীনকে বললেন—দরগায় যাবার জন্য।

আধ ঘণ্টার মধ্যে সে ফিরে এলো হাঁপাতে হাঁপাতে, দেখে মা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—সে পথে ভয় পেয়েছে কিনা।

কোন ক্রমে "না" বলে হাতের মুঠো খুলে আমার স্ত্রীর হাতে একটু ধুলো দিয়ে সে বললে, খাইয়ে দাও।

অত্যন্ত পরিশ্রান্ত সে, তখন তাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা না করে বিশ্রামের অবকাশ দিয়ে কন্যাকে কি করে ধুলা খাওয়ান যায় সে চেষ্টাই করতে লাগল সকলে।

দেহে যার প্রাণ নেই সে খাবে কি করে!

কোন ক্রমে তার জিহ্বায় ঘসে দেওয়া হল মাটিটুকু। আশা-নিরাশায় উদ্বেলিত হ'তে লাগল সকলের মন।

এইভাবে অনর্থক সময় নষ্ট করে লাভ কি বিবেচনা করে ভূপেন ঘড়ি নিয়ে বসল তার শিয়রে।

কি আশ্চর্য্য! মিনিট পাঁচেকের মধ্যে নড়ে উঠল তার চোখের পাতা—গিললে একটা ঢোক।

আরও প্রায় মিনিট পাঁচেক গত হ'লে খেতে চাইল জল। জানাল ক্ষুধার কথা—দেওয়া হ'ল গরম দুধ। ঘুমিয়ে পড়ল সে খাবার পরে।

শ্রান্ত ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত বাড়ীর সকলে যে যেখানে পারল এলিয়ে দিল শরীর। আমি বৈঠকখানায় আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম।

গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন সকলে। কখন সকাল হয়েছে, রোদ উঠেছে, টের পাইনি কেউই।

সকাল সাড়ে ছটার গাড়ীতে এসে বাড়ীর চারিধারে ঘুরে বেড়িয়েছেন আশু ডাক্তার, কাউকেও ডাকাডাকি করতে সাহস পাননি। তাঁর ধারণা কন্যার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সেরে এসে আমরা হয়ত অধিক রাত্রে শুয়েছি।

আমাদের তখনকার বাড়ী মানে—ফাঁকা জায়গায় তিন কুঠরীযুক্ত একখানা কোঠাবাড়ী। চারিদিক ফাঁকা, কোন ঘেরাঘেরি আবরুর বালাই শূন্য। সেই বাড়ীর চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করছেন তিনি—আকুল আগ্রহ নিয়ে জানবার জন্য যে—মেয়েটি মারা গেল কখন।

অবশেষে বাইরের ঘরে আমার বিছানার পাশে বন্ধ জানালায় টোকা দিতেই খুলে গেল জানালা, দেখতে পেলেন তিনি আমাকে; মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন, তারিণী, ও তারিণী!

সাড়া দিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসলাম বিছানায়। চোখ মুছতে মুছতে খুললাম দরজা—জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, কখন মারা গেল মেয়েটি।

মারা ত যায়নি ডাক্তারবাবু—উত্তর দিলাম।

সেকি? যেন আকাশ থেকে পড়েন তিনি। কোথায় সে? দেখে আসি। আকুল উৎকণ্ঠা জড়ান ব্যগ্র প্রশ্ন।

উভয়ে রোগীর বিছানার পাশে গিয়ে দেখি, অনিমা বিছানায় উঠে বসে তার আশেপাশে খাবার-জাতীয় যাহা কিছু ছিল সব শেষ করে একটা গোটা বেদানা ভাঙবার চেষ্টা করছে।

ডাক্তারবাবুকে দেখে বললে, ভাত খাব।

হাত দেখলেন ডাক্তারবাবু, বুক পিঠ পরীক্ষা করলেন ভাল করে।

স্তম্ভিত তিনি। বললেন—একি! অসুখ হয়েছিল বলেও ত মনে হয়না। জানতে চাইলেন তিনি—কি করে কি হল।

সবিস্তারে বললাম তাঁকে অলৌকিক দৈববলের কাহিনী।

যতীন বললে—সত্যিই ফকির বসেছিল অশ্বত্থতলায়। বড় বড় রুক্ষ চুল দাড়ি, গায়ে তেলচিটে কাঁথার সঙ্গে ছেঁড়া চট জড়ান, জবাফুলের মত লাল চোখ দুটো যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলছে। যতীনকে দেখেই ফকির দাঁত কড়মড় করে বিরক্তিপূর্ণ ঝাঁঝালো সুরে বললে তাকে, চাকর রেখেছিস যে সারারাত বসে থাকব এখানে?

ভয় পেয়েছিল যতীন প্রথমে—কিন্তু পরে ফকির তাকে ডেকে সামনে থেকে একমুঠি ধুলা নিয়ে তার হাতে দিয়ে বলেছিল, যা, এখুনি গিয়ে খাইয়ে দিবি।

ধুলা মুঠোর মধ্যে নিয়ে ছুট ধরেছিল সে বাড়ীর দিকে, ফকিরের নিকট থেকে হাত কুড়ি আন্দাজ তফাতে এসে সে একবার মাত্র কৌতুহলবশে পিছন ফিরে চেয়েছিল কিন্তু ফকিরকে আর দেখতে পায়নি।

পাঠকবর্গের অবগতির জন্য যেটুকু জানি—সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম দরগার কাহিনী।

কৃষ্ণনগর রাজবংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার যখন মাটিয়ারী গ্রামে রাজধানী স্থাপন করিয়া বসবাস করিতেছিলেন সেই সময় পারস্য হইতে একজন পরিব্রাজক ফকির (অনেকে বলেন তিনি ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন, আমি স্বপ্নে যাঁকে দেখেছি তিনিও ব্রাহ্মণ) নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া এই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপে মুগ্ধ হইয়া ভবানন্দ মজুমদার পীর সাহেবকে এখানে থাকিবার জন্য অনুরোধ জানান। ফকিরসাহেব এই গ্রামে—যেখানে পীর সায়েবের দরগা সেইস্থানে—আস্তানা স্থাপন করিয়া থাকিয়া যান।

এই ফকিরের নাম পীর সালেক-উল-গউস। চলতি নাম পীর সাহেব। মৃত্যুর পর তাঁহার আস্তানা স্থলে তাঁহার নশ্বর দেহ সমাহিত করা হয়। সমাধি স্থলে রাজপ্রচেষ্টায় সমাধি মন্দির, চত্বর এবং গৃহাদি নির্মিত হয়। এই সমাধি বেদী পীর সায়েবের দরগা নামে খ্যাত।

দেশ বিভাগের পূর্ব্বে বংশানুক্রমে কাজিবংশীয় মুসলমানগণ সেবায়েত (খিদমতগার) নিযুক্ত থাকিয়া দরগার রক্ষণাবেক্ষণ এবং তত্ত্বাবধান করিয়া আসিতেছিলেন। অবিভক্ত বাংলা তথা ভারতের বহুস্থান হইতে মনস্কামনা পূরণ, দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, নিঃসন্তানের মানত শোধ জন্য এখানে প্রত্যহ দলে দলে লোক ভীড় জমাইতে লাগিল। কিছুদিন অন্তর অন্তর মেলার প্রচলন হইল।

পীর সাহেবের দরগায় মানত বা হাজত শোধ উপলক্ষে তন্মধ্যে আষাঢ় মাসে অম্বুবাচী মেলা প্রসিদ্ধ ও খ্যাত।

যতদিন দেশ বিভাগ হয়নি, আমাদের ইউনিয়ন মাটিয়ারী-বানপুরকে বেষ্টন করিয়া বিভক্তির ছাপ পড়েনি, হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় সম্প্রীতি-কলহ, আপোষ-বিরোধের মধ্যে বাস করিতেছিল ততদিন এই রীতি প্রচলিত ছিল।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে পীর সাহেবের দরগার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইল অন্যরূপে।

মুসলমান সেবাইতগণ মাটিয়ার গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন পাকিস্তানে। তাঁহাদের ত্যক্ত সম্পত্তি বিনিময় সূত্রে দখল করিলেন পূর্ব্ব-পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তু হিন্দুগণ।

বড়ই পরিতাপের বিষয় তৎসহ তাঁহারা পীর সাহেবের দরগা এবং পীরোত্তর সম্পত্তির আয়ও নিজেদের মধ্যে বণ্টন ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। অব্যাহত গতিতে এই প্রথা অদ্যাপি চলিতেছে।

এই দরগার উন্নতিকল্পে জনপ্রিয় সরকার অদ্যাপি দৃষ্টি দেন নাই। ফলে দিনের পর দিন জনগণমান্য জাগ্রত পীর সালেক-উল-গোউস-দরগা ক্রমাবনতির পথে ধ্বংস স্তূপে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তে অবস্থিত ঐতিহাসিক ঐতিহ্যসম্পন্ন হিন্দু-মুসলমানের মিলন-তীর্থ এই দরগা নদীয়া তথা বাংলার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গৌরব। ঐতিহাসিক কীর্ত্তি রক্ষণশীল সরকারের দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত পীর সাহেবের দরগা ধ্বংসের পথে, তাহাকে বিলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে সরকারী সাহায্য এবং রক্ষণাবেক্ষণ একান্ত প্রয়োজন।
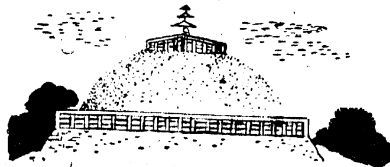
কি ভাবে স্মৃতিশক্তিলাভ করা যায়

উপানন্দ

স্মৃতিশক্তি মানসিক উৎকর্ষ সাধনের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক, এই শক্তির আনুকূল্যে সৌভাগ্যবান ও ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া যায়। স্মৃতি বিভ্রম যে সর্বনাশের মূল, তা দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পথে বহুবার প্রত্যক্ষ করা গেছে। রামচন্দ্রের স্মৃতি ভ্রংশ দোষ না ঘট্‌লে রামায়ণ মহাকাব্যের মধ্যে করুণ ঘটনার সমাবেশ হোতে পারতো না—এরূপ অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় ঘট্‌তে পারে—যার পশ্চাতে রয়েছে শোচনীয় বিস্মৃতি।

প্রত্যেকটী দিন জীবনের প্রারম্ভ থেকে মৃত্যুর সময় পর্যান্ত আমাদের মনে নানাঘটনার ভেতর দিয়ে কিছু কিছু রেখাপাত করে যায়, সেগুলি আমাদের মস্তিষ্কের ভেতর স্থান করে নেয়—সৎকাজ করা থাক্‌লে মধুর স্মৃতিগুলি মনে আনন্দ দান করে, স্মৃতি কথা বলেও আনন্দ পাওয়া যায়, কিন্তু যে সব অসৎ কাজ করা যায়, সেগুলি স্মরণ পথে উদিত হয়ে পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে—নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখ্‌তে হয়।

যে মানুষ নরহত্যা করে কোন রকমে আইনের ফাঁক পেয়ে আদালতের বিচারে মুক্ত হোলো, সে মানুষ সারাজীবন কষ্ট পেয়েই গেল—ভয় ও ভগবান ভেতরে—আর শেষের দিনে সে কাতর হয়ে উঠলো ভগবানের বিচারে দুঃসহ শাস্তি পাবার জন্যে। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ক্লাইব স্মৃতির দংশনে জর্জ্জরিত হয়ে শেষে আত্মহত্যা করেছিলেন। পূর্ব্বগোলার্দ্ধ আবিষ্কারক কলম্বসকে ব্যথাবেদনার ইতিহাস বুকে নিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছে অতীতের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি চিত্রণের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে। যে ব্যক্তিটি উচ্চপদস্থ হয়ে নির্য্যাতিত করছে নীচুতলার লোককে, সে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার সময়ে সে শিউরে উঠবে ভয়ে স্মৃতির সহস্র কশাঘাতে। জালিওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের নায়ক জেনারেল ডায়ার একদিনও মনে শান্তি পান নি—কত বিনিদ্র রজনী তাঁর কেটে গেছে স্মরণের পথে বিভীষিকা দেখে দেখে।

যার কোন কথা স্মরণ হয় না, পদে পদে সে ভুল করে, আর আবোল তাবোল বল্‌তে থাকে। ফলে সে নিজে কষ্টপায়, অপরকেও কষ্ট দেয়। স্মৃতিশক্তি অর্জ্জন করার দিকে তোমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। পরিশ্রম বলেই এই শক্তির প্রাখর্য্য ঘটে থাকে। ভবিষ্যতে জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি যাদের কাম্য, উত্তম বিদ্যালাভ করে যারা কীর্ত্তি, ধন, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ও সম্মানের অধিকারী হোতে ইচ্ছুক, তারা স্মৃতিশক্তি লাভ করবার জন্যে অদম্য চেষ্টা করে—তারাই ভবিষ্যতে হয় দেশ-বরেণ্য।

নিয়মিতভাবে মানসিক শ্রম, পুনরাবৃত্তি, গভীর মনন ও অনুশীলন ভিন্ন কোন কথা মনে রাখা সম্ভব নয়। যে মানুষ ছেলেবেলা থেকে মানসিক শ্রমে অভ্যস্ত, সে-ই সুদৃঢ়ভাবে স্মৃতিশক্তি অর্জ্জন কর্‌তে পারে। মানসিক পরিশ্রম আর অধ্যবসায় অবলম্বন করে তোমরা শস্য সমৃদ্ধ করে তোলো জীবনের ক্ষেত্রকে—যাতে করে ফসল তুলে এনে সঞ্চয় করে রাখ্‌তে পারো স্মৃতির ভাণ্ডারে। যারা স্মৃতির ভাণ্ডার গড়ে তুল্‌তে পারে না, কেমন করে তারা শ্রমের ফসল রাখ্‌বে তুলে, আর কেমন করেই বা প্রয়োজন মত বের করে এনে শস্য কণাগুলিকে কাজে লাগাবে! সময় মত কথা মনে না পড়্‌লে পুঁথিগত বিদ্যালাভ করেও বিরাট ব্যর্থতার মাঝে যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হয়।

জীবনে এমন একটি সময়ের স্রোত আসে যা অবলম্বন করে মানুষ সৌভাগ্যবান হোতে পারে—কিন্তু সে স্রোত উপেক্ষা কর্‌লে, তাকে আর ফিরে পাওয়া যায় না, ফলে জীবনের অবশিষ্টাংশ কর্দ্দমাক্ত চড়ায় তরণীর মত আবদ্ধ হয়ে থাকে—প্রত্যেক দিনটা চলে যায় কষ্টে, সুযোগ পেয়ে ও তার সদ্ব্যবহার হয় না। আজকে পাঠাভ্যাস করে যে ছেলে আগামী কাল ভুলে যায় তার পঠিত বস্তু, আজ যে অঙ্ক শিখে কাল পারে না কষ্‌তে—সে কেমন করে মানুষ হবে! পরীক্ষা দিতে গিয়ে কোন প্রশ্নের উত্তর লিখ্‌বার সময়ে যদি কোন কথা মনে না আসে, তাহোলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার আশা থাকে না। শিক্ষা লাভের সকল উদ্দেশ্য, সকল

প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়। যে সব ছেলে মেয়ে পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে, তারা যে খুব জ্ঞানী এরূপ ধারণা করো না, শুধু স্মৃতির প্রাপথাই তাদের সাফল্য গৌরবের প্রধান কারণ এই কথাটি জেনে রেখো।

কাজী নজরুল ইস্‌লাম একদা বাংলার কাব্য জগতে জ্যোতিষ্কের মত আবির্ভূত হয়েছিলেন, আজ তিনি এমন অবস্থায় এসেছেন যে নিজের নাম পর্য্যন্ত ভুলে গেছেন। স্মৃতি তাঁকে সকল রকমে ত্যাগ করেছে, তাই জীবদ্দশায় তাঁর আত্মবিলোপ ঘটেছে,—জ্ঞান বুদ্ধিও তাঁকে বর্জ্জন করে তাঁর শোচনীয় পরিণতি এনে দিয়েছে। তোমরা যদি সব কিছু ভুলে যাও তাহোলে তোমাদের জীবন-পথের পাথেয় অর্জ্জন করা হবে না—মূর্খতার আবেষ্টনে পাবে অজস্র কষ্ট, আর সে মূর্খতা থেকে পাবে না কোন দিন মুক্তি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিক পণ্ডিত স্যামুয়েল জনসন বলেছেন—'প্রাথমিক ও প্রধান মৌলিক শক্তি হচ্ছে স্মৃতি—এটা ভিন্ন কোন বুদ্ধি-বৃত্তির পরিচালনা অসম্ভব।' যেখানে স্মৃতির অভাব, সেখানে বিদ্যার স্থান নেই। জন্মগ্রহণের দিনে আমরা যেমন অসহায় ছিলাম তেমনি ভাবেই জীবনব্যাপী অসহায় অবস্থায় থাকতে হবে—যদি না বিদ্যালাভ হয় আর নেমে আস্‌তে হবে পশুর স্তরে।

স্মৃতিশক্তির সহায়তায় আমাদের কর্ম্মদক্ষতা বিস্তৃতি লাভ করে। বৈজ্ঞানিকরা এই সত্য প্রতিপাদন করেছেন, প্রত্যেক অভিজ্ঞতা যা আমরা লাভ করি, তা ক্ষোদিত থাকে আমাদের স্মরণের মণিকোঠায়। কেমন করে মনে রাখ্‌তে হয়, সেইটি প্রকৃত সমস্যা নয়—সমস্যা হচ্ছে আমরা কেন ভুলে যাই। ব্যাপকভাবে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বৈজ্ঞানিকরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, সম্মোহনের (Hypnosis) সাহায্যে সেই সব কথা মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলা যায়, যারা মনে থেকে হারিয়ে গেছে। সম্মোহন প্রয়োগ করে খুব ছোটবেলার কথাও মুখ থেকে বের করা যায়। এদের স্মৃতি প্রায়ই স্বপ্নের ভেতর ধরা পড়ে—চিহ্নিত হয়। পূর্ব্বজন্মের বহু স্মৃতিও আমাদের স্বপ্নে সময়ে সময়ে দেখা দেয়, অথচ আমরা বুঝে উঠ্‌তে পারিনে এই সব স্মৃতির গোড়ার কথা।

সকল যন্ত্রণাই কালহরণ করে, তাই যে যন্ত্রণা পূর্ব্বে পাওয়া গেছে তার কথা বল্‌তে পারা যায় না পরবর্ত্তীকালে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে যা শেখা যায়, তা আর পরবর্ত্তীকালে বর্তমান থাকে না। জীবন পাঠে জানা যায় যে, সীমাহীনভাবে জীবনটাকে মানিয়ে গুছিয়ে নেবার ক্ষমতা মানুষের প্রকৃতির মধ্যে আছে। কিন্তু জীবনে যে সব ঘটনা এনেছে সবচেয়ে শোকাবহ পরিণতি আর চরম দুর্গতি, সেগুলিকে অতিক্রম করা যায়না।

যে সব ঘটনা বা কাহিনী আমাদের স্পর্শ করেছে, সেগুলি থেকে আমরা অনেক কিছু ভালোমন্দ সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করেছি, হজম করেছি আর লাভবানও হয়েছি। ওরা আমাদের সঙ্গে সম্মিলিত হয় স্মরণের স্তরে স্তরে। পাপ বা মন্দ কাজ যা করে গেছি, তার জন্যে অনুতাপ, আত্মগ্লানি ও অনুশোচনা আসে! নীরবে নিভৃতে সকরুণ দীর্ঘশ্বাস পড়ে বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে। ঔরঙ্গজীব তাঁর পুত্র শাহআলমকে যে সব পত্র লিখেছিলেন, তোমরা যদি সেইসব ঐতিহাসিক পত্রপাঠ করো—তাহোলে বুঝ্‌তে পারবে কি করুণ অবস্থার ভেতরে তিনি জীবনের শেষ দিনগুলি স্মৃতি-ভারাক্রান্ত করে আতঙ্কের ভেতর নিজেকে বিপন্ন করে তুলেছিলেন—প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি দেখেছেন তাদের আক্রমণাত্মক রুদ্র রূপ—যাদের জীবনের অবসান ঘটিয়ে তিনি দিল্লীর সম্রাট হয়েছিলেন।

যখন বলা যায়…'ভুল্‌তে পারিনে, এম্নি যদি হতাম, তখন বুঝ্‌তে হবে স্মৃতির ওপর আমরা আপ্‌না থেকেই চাবুক হান্‌ছি। 'ভুল্‌তে পারিনে' কথার অর্থই হচ্ছে আত্মধিকার—নিজেকেই নিজে ক্ষমা করতে পারা যাচ্ছেনা। কৈশোরোত্তর দিনগুলির সঙ্গে একথার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নেই, আছে ছেলেবেলার হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ মাকে জীবনে বেশীদিন পাননি—যে কয় দিন পেয়েছিলেন তাঁর বউদিদি কাদম্বরী দেবীকে, তাও তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে অল্পদিনই বলা যায়। কবিগুরুর স্মৃতি গুহায় এঁদের কথাই বেদনার তুলির লিখন হয়ে রয়েছে। বাল্যস্মৃতি মধুর, আবার করুণও বটে। মুমূর্ষু মায়ের শয্যার কাছে ছেলের না পৌঁছুতে পারার বাধা বা ব্যর্থতার মাঝে অথবা বাবাকে সময় মত সেবা শুশ্রূষা করতে না পারার জন্যে মেয়ের মনোকষ্টের মধ্যে স্মৃতি কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে গভীরভাবে—এদের ভুল্‌তে পারা যায় না।

বহু বছর পরে হঠাৎ যখন স্মৃতির আঘাতে গভীর রাত্রে বিছানায় জেগে উঠি—আর মনে হয় নিজেকে গলা টিপে মেরে ফেলি, তখন বুঝ্‌তে হবে কোথায় যেন আমাদের গলদ রয়ে গেছে, কোথায় যেন আমাদের আত্মসম্মান আঘাত পেয়েছে। এই সব মানসিক আঘাত বা স্মৃতি-বিকারই তো 'করোনারি থ্রম্বসিসের' বীজাণু বাহক। যে ব্যক্তিটি উচ্চ মর্য্যাদা ও ক্ষমতা পেয়ে মানুষকে করেছে অবহেলা, ভুলে গেছে ভদ্রতা ও সৌজন্য—আর প্রাত্যহিক অজস্র লোকের স্তাবকতায় হয়ে উঠেছে অহংমন্য, সে ব্যক্তির অবস্থা লক্ষ্য করা গেছে তার মৃত্যুর প্রাক্‌কালে যখন সে বারে বারে শিউরে উঠেছে, চেঁচিয়ে উঠেছে, ভয়ে কেঁপে উঠেছে সারা জীবনের সকল কাজের সালতামামীর ক্ষণে সহস্র স্মৃতির নিদারুণ কশাঘাতে। মানুষ নিজের দোষ কোনদিনই দেখেনা, তাই স্বখাত সলিলে ডুবে মরে।

শিশু ভুল করলে, সে ধমকানি খেয়ে স্বীকার করে, ভুলের জন্যে শাস্তিও পায়—শেষে আবার তার মন পরিষ্কার হয়ে যায়, নতুনভাবে কাজ শুরু করে—তার মনে কোন রেখাপাত হয়না। সে দেবতার মত পবিত্র ও সুন্দর। কিন্তু যে বয়স্ক ব্যক্তি অতীতের মাঝে নিজেকে টেনে নিয়ে গিয়ে নিজেই নিজের শাস্তিদাতা হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে, তার মত হতভাগ্য পৃথিবীতে বিরল—সে অনুসন্ধান করছে ক্ষমা, সে প্রার্থনা করছে শান্তি।

স্মরণ করবার ক্ষমতা না থাকলে, স্মৃতি রোমন্থন করা যায়না। স্মরণ করার শক্তির সঙ্গে স্মৃতির পার্থক্য আছে। স্মৃতিশক্তি সুদৃঢ় করবার জন্যে মনস্তত্ত্ব অনেকেরই অবলম্বন হয়েছে। চিত্তের একাগ্রতা,

পুনরাবৃত্তি, ও সাহচর্য্য বা সংযোজনার ওপর স্মৃতির নির্ভরশীলতা রয়েছে। মন যার ঘুরে বেড়ায়, তার কিছুই মনে থাকেনা। যে অন্যমনস্ক, তার বিপদ পদে পদে। আমাদের শাস্ত্রে আছে—বারো বছর ফুলের মত মনটাকে নির্ম্মল করে ব্রহ্মচর্য্য পালন করলে, তোমরা অসাধারণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ও মেধাবী হোতে পারবে। যে কোন গ্রন্থের যে কোন পৃষ্ঠা ও বিষয় বস্তু তোমাদের মনে থাকবে। তাই বলি, এখন থেকে পবিত্র মন নিয়ে ব্রহ্মচর্য্য পালন করো। যে সব তত্ত্ব বা তথ্য তোমরা শিখতে চাও বা জানতে চাও, সেগুলি যদি মনের মধ্যে সংযোগ সূত্রে গেঁথে রাখো—শেখা বা জানার সঙ্গে সঙ্গে, তাহোলে সেগুলি তোমরা সহজে বিস্মৃত হবেনা। সুকৌশলে এগুলি আয়ত্ত করবে কেননা ঘটনাগুলি নিজেরাই নিস্তেজ ভাবাপন্ন।

নিজেদের কাছে ডায়েরি রাখবে আর ডায়েরির পাতায় কিছু কিছু লিখবে যাতে স্মৃতিশক্তি সুচারুরূপে বৃদ্ধি পায়। উদ্বিগ্নতা স্মৃতিশক্তি নষ্ট করে—পারিবারিক কলহ বা অশান্তিও এ সম্পর্কে ক্ষতিকর। আলোক ঘাঁটি গবাক্ষের সঙ্গে ভেজে থাবে তা'তে স্মরণ শক্তি লাভ হয়। সর্ব্বদা মস্তিষ্ককে উত্তেজিত অবস্থায় রেখোনা, তাহোলে স্মরণশক্তি লোপ পাবে।

স্মরণশক্তি হ্রাস পাওয়ার দরুণ নিরাশ হবার কোন কারণ দেখি না। কেন স্মৃতিশক্তি হ্রাস পাচ্ছে বা কোন কথা মনে পড়ছে না, সে সম্বন্ধে তোমরা অনুসন্ধান করবে। তারপর সচেষ্ট হবে দোষগুলি সংশোধন করে নিতে যাতে স্মরণশক্তি হ্রাস না পায়। স্মৃতিশক্তি লাভ করতে হোলে চিত্ত সংযম ও কল্পনার সাহায্যে ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করে, প্রয়োজন কথা বা পড়া বারে বারে পুনরাবৃত্তি করবে, তা'তে স্মৃতি সজাগ হয়ে উঠবে। তোমাদের মানসিকতাকে গতিময় না করে স্থিরভাবে রাখলে কোনদিনই স্মৃতিপথ প্রশস্ত হবে না। তোমরা দেহ ও মন পবিত্র করে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য পালনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবে, অন্তরে কোন প্রকার উদ্বেগ, নৈরাশ্য ও মলিনতা রাখবে না, তাহোলে স্মৃতিশক্তি নিশ্চয়ই উত্তমরূপে লাভ করতে পারবে। আশাকরি কিশোর বয়স থেকেই স্মরণশক্তি লাভ করবার জন্যে সচেষ্ট হবে— ফুলের মত নির্ম্মল হয়ে আর ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করে।

জেনে রেখো :

১৯০০ খৃষ্টাব্দে বিংশ শতাব্দীর আবির্ভাব হলেও আসলে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই এই আধুনিক শতাব্দী সুরু হয়েছে। তোমরা বোধ হয় জানো, ইতিহাসে সাধারণতঃ বিখ্যাত ঘটনার দ্বারা চিহ্নিত সময় থেকে এক একটি যুগের সূচনা হয়, আর সেই সব ঘটনা অবিস্মরণীয় ও বহুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে মানব সভ্যতার প্রগতিকে নবনব পথে পরিচালিত করে। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে আরূঢ়া হলেও ইংলণ্ডে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের সংস্কার আইন প্রবর্ত্তিত হবার সময় থেকেই ভিক্টোরিয় যুগ বলা হয়। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর থেকে ইতিহাসের পাতা বদলে গেল, পূর্ব্ব যুগের সঙ্গে রইলো না আর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ও সংযোগ, ফলে পৃথিবীতে আন্তর্জ্জাতিকতার ক্ষেত্রে এলো একটা পরিবর্ত্তন, আচার ও আচরণে লক্ষ্য করা গেল ভিন্নতা—সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথে প্রবাহিত হোলো নতুন দিনের ভাবস্রোত। তাই বিশ্বের ইতিহাসে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ থেকে বিংশ শতাব্দীর আবির্ভাব বলে চিহ্নিত হয়েছে।

* * *

অপরের দোষ ত্রুটি দেখবে ক্ষমার চক্ষে, কিন্তু নিজের সামান্যতম ত্রুটিকেও দেখবে বিচারকের চক্ষে।

* * *

ভালোবাসবার লোকের সংখ্যা কম, ভালোবাসা পাবার প্রত্যাশা করে এমন লোকের সংখ্যাই বেশী।

* * *

ভালো করার জন্যে আমরা মানুষকে ভালোবাসিনে, ভালোবাসি তাকে এই জন্যে যে তার ভালো করেছি।

* * *

একজন রাজনীতিজ্ঞ পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনের জন্যে. চিন্তিত, কিন্তু উচ্চস্তরের রাজনীতি-বিশারদ স্বদেশের পরবর্ত্তী কালের মানুষদের সম্বন্ধে চিন্তা করেন।

* * *

মহৎ হোলে কোন কাজই ক্ষুদ্র বলে মনে হয় না। জনসাধারণের কল্যাণ করবার দিকে লক্ষ্য রাখাই তোমাদের সর্ব্বোত্তম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

* * *

পঠনের দ্বারা পূর্ণ মানুষ হওয়া যায়, ধ্যানের দ্বারা গভীর তত্ত্বদর্শী হওয়া যায়, আর আলোচনার দ্বারা মানুষের ভেতর থেকে মলিনতা দূর করা যায়।

* * *

অষ্ট্রেলিয়ার নুলারবর মরুভূমি পেরিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে সুদীর্ঘ রেলপথ সোজাভাবে চলে গেছে। নদী এমন কি একটি গাছও পর্য্যন্ত একে চপকাতে হয়নি। সরল রেখার ওপর দিয়ে পথ ৩২৮ মাইল পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়েছে।

* * *

মিথ্যাবাদীর জীবন ক্ষণস্থায়ী। বদবন্ধু ছায়ার মত। তোমাদের সুদিনে তার কাছ থেকে কোনরকমেই বিচ্ছিন্ন হোতে পারবে না, কিন্তু তোমাদের দুর্দ্দিনে তাকে আর খুঁজে পাবে না।

গড়গড়া গাঙ্গুলীর গল্প

(জাম্পার পর্ব)

বীরু চট্টোপাধ্যায়

গড়ের মাঠে ধানের চাষ হচ্ছে দেখলেও এতটা বিস্মিত হতাম না, যা হলাম গাঙ্গুলী মশায়ের মুণ্ডিত মস্তক দর্শনে। তাঁর লীলায়িত গোঁফও সাবাড় হয়ে গেছে।

গজেন্দ্র গমনে তিনি হাতে একটা থলে নিয়ে বোধ করি দোকানে যাচ্ছিলেন—আমরা সবাই আঁত্‌কে উঠে কোরাসে জিগ্যেস করলাম—একি ব্যাপার গাঙ্গুলী মশাই?

হিটলারী গাম্ভীর্য্যে তিনি জানালেন, সে অনেক কাহিনী। পরে বলবো। এখন আর সময় নেই—তোদের দিদিমার উনুন বয়ে যাচ্ছে।

তিনি দোকানের পথে অদৃশ্য হলেন।

আমরা ভাবতে লাগলাম।

মাথা বা গোঁফ কামানো সংসারে এমন কিছু পরমাশ্চর্য্য ঘটনা নয়, কিন্তু গাঙ্গুলী-মশায় সম্বন্ধে প্রায় তাই-ই বলা চলে। কেননা তাঁর পক্ক-কুঞ্চিত কেশদাম, সযত্নে লালিত গুম্ফ যারা এতকাল দেখেছে এবং ঐ দুটি জিনিসের পরিচর্য্যা সম্বন্ধে যারা ওয়াকিবহাল তারা সূর্য্য পশ্চিম দিকে উদয় হবে ভাবতে পারে, কিন্তু তাঁর মুণ্ডিতরূপ যে সম্ভব একথা তাদের কাছে অকল্পনীয়।

গাঙ্গুলী-দিদিমার মুখে শুনেছি যে গাঙ্গুলী-মশাইর জীবনে আবাল্য একটিমাত্র সখের প্রবাহই বয়ে আসছে, সেটা হল চুলের বিলাসিতা। পরে যৌবনোদ্‌গমে গোঁফের। এককালে তিনি বাবরি রেখেছিলেন (তখনকার যুগের যাত্রা থিয়েটারী অভিনেতাদের ঢংএ), তারপর যুগ পালটে গেল। বাবরি ছেঁটে হল ব্যাকব্রাস।

চুল আগে ছিল সাদাসিদে। সখ হল কোঁকড়ানো করতে। হাত ও চিরুণীর সাহায্যে যখন পুরোপুরি কার্লিং করা গেল না তখন তিনি বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিখ্যাত চীনে সেলুন থেকে এককালে ছ'মাস অন্তর কার্লিং করিয়ে আনতেন।

কবিরাজী, হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথি, হেকিমী যত রকমের চুলের উন্নতির তৈল ও ওষুধ আছে যথারীতি তা-ই তিনি ব্যবহার করতেন।

এককালে স্নানের পর চুল আঁচড়াতে তাঁর পাক্কা বিয়াল্লিশ মিনিট সময় লাগতো। আজকাল সময় কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মিনিট পনের কুড়ি। একবার আঁচড়াচ্ছেন আবার এলোমেলো করছেন—এই ভাবে পৌনঃপুনিক বার দশেক করেও কিছুতেই তার পছন্দ হয় না। এই অতৃপ্তিই নাকি চুলোন্নতির সর্ব্বাপেক্ষা সদ্‌গুণ।

একদা সর্ব্ব সময়ের জন্য পকেটে চিরুণী ও ছোট একটি আরসী থাকতো। রাস্তায় ঘাটে, ভাড়ে ভাড়ে, বা দুরন্ত বাতাসে যদি এতটুকু চুল স্থানচ্যুত হত তক্ষুণি তিনি স্থান কাল পাত্র উপেক্ষা করে চিরুণী বের করতেন—আঁচড়াতেন, পরে আরসীতে মুখ দেখে তবেই নিশ্চিন্ত।

জামা কাপড় জুতো, খাওয়া দাওয়া, যাত্রা থিয়েটার কোন কিছুতেই তাঁর উৎসাহ ছিল না—একমাত্র চুল ছাড়া।

পড়তেন চুল সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ও বিজ্ঞাপন, কিনতেন চুলোপকারী শত প্রকার জিনিস, ভাবতেন চুলের কথা, স্বপ্ন দেখতেন, তাও চুল। মোটমাট এক কথায় চুল-অন্ত প্রাণ ছিলেন গড়গড়া গাঙ্গুলী মশায়।

গাঙ্গুলী-দিদিমা বলতে গিয়ে হেসে বাঁচেন না।

সেই চুল মাত্র একবার কামাতে হয়েছিল। পিতার মৃত্যুতে। মা শৈশবেই গেছলেন। শোকে গাঙ্গুলী মশায় পাগলের মত হয়ে গেলেন। তিন চারদিন পর্য্যন্ত অন্নজল মুখে দেওয়ানো গেল না তার। কেঁদে ককিয়ে পাড়া মাৎ করলেন, ওরে আমার কী সর্ব্বনাশ হলরে! ইত্যাদি।

পাড়ার লোক বিরক্ত হয়ে উঠলো। এতটা বাড়াবাড়ি ভালো নয়। পরিণত বয়সে বাবা দেহরক্ষা করেছেন—আর তুমিও কচি খোকা নও। বাড়ী-ঘর, জমি জমা, কোম্পানীর কাগজ হাজার ত্রিশ টাকার, ভাল ব্যাঙ্ক ব্যালান্স। বোনেদের সুপাত্রে বিবাহ, সবই তিনি দিয়ে গেছেন। এমন কিছু জ্ঞান হারাবার মত সর্ব্বনাশ হয়নি। অমর না হলে মানুষ এ বয়সে লোকান্তরিত হয়ই!

কিন্তু সমস্ত শোকটাই যে একমাত্র চুলের জন্যে হয়েছিল চুল কামাতে হবে বলে, সর্ব্বনাশ যে পিতার বিরহে নয়, চুলের বিরহে, সে কথা অবশ্য পরে প্রকাশ পেয়েছিল।

গাঙ্গুলী মশায় গোপনে দুশো টাকা ঘুষ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক পণ্ডিত বামুনকে 'মূল্য ধরে দিয়ে' মাথা না কামিয়েও-চলে-গোছের শাস্ত্রোক্ত (?) এক বিধি আবিষ্কার করে রাজী করিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কথাটা বেফাঁস হয়ে গিয়ে পিসিমার চ্যাঁচামেচিতে সে-ই সাধের চুলকে কামাতে হয়েছিল।

তারপর পাক্কা ছটি মাস তিনি বাড়ীর বার হননি। চুলহীন অবস্থায় রাস্তায় বেরনো নাকি শালীনতা-বিরোধী —এই ছিল তাঁর তখনকার মতবাদ।

চুল দাড়ি গোঁফ নিয়ে কত পরীক্ষা নিরীক্ষাই না তিনি চালিয়েছেন—আশু মুখুজ্জের মত গোঁফ রাখবার চেষ্টা করেছিলেন, সফল হন নি। মাইকেলী ধরণে জুলফী-কান-দাড়ি রাখতে গিয়ে মুখটাকে কিম্ভূতকিমাকার করে তুলেছেন। শেষটায় থুতনির কাছে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রাখতে গিয়ে—লোকের কাছে 'ছাগল দেড়ে' নাম নিতে হয়েছিল।

গোঁফটাকে শেষ পর্যান্ত বণিক সুলভ পাকানো টাইপের রেখেছিলেন—উভয় প্রান্ত সূচ্যগ্র। চুল আর গোঁফ, গোঁফ আর চুল এ নিয়েই এত ব্যস্ত ছিলেন যে যথা সময়ে বিবাহ পর্য্যন্ত করতে পারেন নি।

শেষে পিসিমার বিদ্রোহে একদিন আমাদের গাঙ্গুলী-দিদিমাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করে বাড়া ফিরলেন। দিদিমার বয়েস ছিল কম, মন ছিল সরল। প্রথমবার মুখের দিকে চেয়ে গোঁফ দেখে নাকি হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিলেন, ও মাগো আমায় কি কল্লে গো। শেষে দারোয়ানের সঙ্গে বিয়ে দিলে গো।

গাঙ্গুলী মশায়ের 'প্রাণ যায় শ্রেয়' তবু গোঁফ কামানো অসম্ভব গোছের অটল প্রতিজ্ঞা দিদিমার কান্নায় কিছু নমনীয় হল। সূচ্যগ্র মুখ কাটা হল—উপরিভাগ ছাঁটা হল। ঠোঁটের মাঝখানটিতে একটি প্রজাপতির মত শোভা পেতে লাগলো! বাটারফ্লাই বা হিটলারী ধরণে।

এ হেন বিখ্যাত ও মূল্যবান চুল এবং গোঁফ-সর্ব্বস্ব গাঙ্গুলী মশায়ের আজ এ সর্ব্বহারা অবস্থা দেখে আমাদের বিস্মিত হওয়া কিছু অন্যায় কি? কী এমন অবস্থা বিপর্য্যয় হতে পারে যার জন্যে…তবে কি সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন? উহুঁ দিদিমা তাহলে আস্ত রাখবেন না। নাঃ কোন কিছুই ভেবে কুল কিনারা করতে পারলাম না।

সমস্ত দিন আর গাঙ্গুলী মশায়ের পাত্তা পেলাম না। পড়া-শোনায় মন বসাতে পারছি না। রহস্য-গল্পের কৌতূহল নিয়ে অত্যন্ত অস্বস্তিতে কাল কাটাচ্ছিলাম। সন্ধ্যের মুখে গড়গড়া টানতে টানতে তিনি এসে উপস্থিত হলেন। আঃ বাঁচলাম।

তিনি বলে গেলেন কারণ কি। শুনে হাসবো কি কাঁদবো ভেবে পেলাম না। যথাযথ লিপিবদ্ধ করছি।

গাঙ্গুলী-দিদিমা ছিলেন চারুকলা পারদর্শিনী। মানে তাঁদের বিবাহের চল্লিশ বছর ধরে তিনি যুগে যুগে এক একটা শিল্প শিখেছেন ও তার অজস্র উদাহরণে বাড়ী-ঘর ছেয়ে ফেলেছেন। যেমন ঝিনুকের তাজমহল, মাছের আঁশ রাঙিয়ে ফুলের ঝুঁড়ি, কার্পেটে যুগ্ম বিলিতি ব্যাকুরের তলায় সালঙ্কারে লেখা 'ফুটন্ত ফুলের মাঝে দেখরে মায়ের হাসি।" বালিশের অড়ে রেশমী সুতোয় 'সুখে থাক' লেখা—ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর কিছুকাল চুপ চাপ ছিলেন সংসারের নানা ঝামেলায়, বাত-ব্যাধি ইত্যাদির তাড়নায়। ইদানিং দশ পনের বছর বাদে তাঁর খেয়াল হয়েছে উলের কাজ করবার। দিদিমার অধ্যবসায় প্রচণ্ড। গাঙ্গুলী মশায়কে দিয়ে 'উল-বোনা-শিক্ষা' সম্বন্ধীয় বই ও আধমনটাক উল কিনিয়ে কয়েকদিন ধরে কাঁটা নাড়াচাড়া করেই তা আয়ত্ত করে ফেললেন।

শিক্ষা সমাপ্ত হল।

দিদিমার বাসনা প্রথম কাজটি নিবেদন করবেন গাঙ্গুলীমশাইকে। শুভদিনে একটি জাম্পার তৈরী শুরু করলেন। অদ্ভুত ধৈর্য্য, দেড়মাস নাওয়া খাওয়া রান্না ও সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্ম বাদ দিয়ে বোনা শেষ করলেন। কিন্তু আফশোস্—কোথায় যেন ঘর গুণতে সামান্য ভুল হয়েছিল…'ভি' গলার শেষাংশ অর্থাৎ ত্রিকোণের নিম্নকোণ এতবড় হয়ে গেল যে গাঙ্গুলীমশায়ের মত বিরাট বপুরও, বুক ছাড়িয়ে, পেট ছাড়িয়ে, এমন কি নাভি প্রদেশকেও ছাড়িয়ে গেল। আর গায়ে যেন আলখাল্লা চাপানো হয়েছে, এমন ঢিলে হয়ে গেল! দোষ নেই দিদিমার…প্রথম প্রচেষ্টা…ডিজাইনটা বড় চমৎ-কার…'আরসোলা প্যাটার্ণ'। গাঙ্গুলীমশাই মুখে খুব পছন্দ হয়েছে দেখালেন। বললেন, থাকগে বড় গলাটাকে নয় একটু সেলাই করে নিলেই হবে।

—ক্ষেপেছ! গাঙ্গুলী দিদিমা নাকি মিষ্টি হেসে বলেছিলেন, একবার ভুল হয়েছে বলে ভেবেছ আর ভুল আমি হতে দিচ্ছি। তাছাড়া জাম্পার আরেকটুকু টাইট হওয়া দরকার।

গাঙ্গুলীমশায় হাঁ না কিছু বলবার সাহস পেলেন না।

আবার খুলে ফেলে বোনা শুরু হল। পুনরায় নাওয়া খাওয়া ও অন্যান্য কাজকর্ম্ম বাদ দিয়ে সারা শীতকালটি কাটিয়ে বসন্তের মাঝামাঝি শেষ করলেন বোনা।

জাম্পার সম্বন্ধে গাঙ্গুলীমশায় কোনকালেই তেমন উৎসাহ দেখাননি। কেন না ভয় ছিল, পরতে ও খুলতে তাঁর সাধের চুল এলোমেলো হয়ে যাবে।

দিদিমা অভয় দিলেন, সে ভয় করছ কেন? চুল আঁচড়াবে।

—তাতো বুঝলাম, নিমরাজী হলেন গাঙ্গুলীমশায়। দিদিমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার মত সাহস জীবনে কোন দিনই তিনি পাননি।

রোববার সকাল।

দিনও ভাল (দিদিমা পঞ্জিকা মতে চলেন), নব বস্ত্র পরিধানের উত্তম সময়। এবার সাইজটি বেশ ছোট হয়েছে, গলাও বেশ টাইট ফিটিং। দিদিমার সাহায্যে প্রায় ধস্তাধস্তি করে, সাধের চুলকে চরম বিপর্য্যস্ত করে গাঙ্গুলীমশাই যখন সেটি গায়ে ঢোকালেন তখনই নাকি তার নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হচ্ছে।

দিদিমা মিষ্টি হেসে জানালেন, নতুন নতুন উলের জিনিস, টাইট থাকা ভাল। একটুকু নড়াচড়া, দুদিনের ব্যবহার, তার পরেই ঠিক হয়ে যাবে।

বুকে প্রচণ্ড চাপ, পেটে ভীম বন্ধন ও বগলে একটা অকথ্য যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলেন গাঙ্গুলীমশাই।

—তুমি বোধকরি ভুল করে, কাতরস্বরে, প্রায় অস্ফুটে জানালেন গড়গড়া গাঙ্গুলীমশাই, কয়েক ঘর চওড়ায় কম নিয়েছ।

—না গো না, দিদিমা ফোগলা দাঁতে বিগলিত হাসি হাসলেন, দুদিন পরে ব'লো কি রকম ফাস্ট কেলাশ ফিট হয়েছে।

দুদিনের দরকার হলনা—দুঘণ্টার মধ্যে গাঙ্গুলীমশায়ের অবস্থা হল সঙ্গীণ।

সেই নিয়মটা জানিস তো তোরা, বিজ্ঞান বইয়ে পড়েছিস্ নিশ্চয়ই, গড়গড়া গাঙ্গুলী আমাদের বললেন, হিট্ এক্সপ্যাণ্ডস্ কোল্ড কণ্ট্র্যাক্টস্, উষ্ণতা প্রসারিত করে ও ঠাণ্ডা সঙ্কুচিত করে। রোদ্দুর যত চড়তে লাগলো জাম্পার তত টাইট। সকালবেলা দেহ ছিল শীতে শীর্ণ—বেলা বাড়তে রদ্দুরে দেহ ফুলে গেল। সাধারণভাবে মানুষ এ সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন বুঝতে পারে না কিন্তু জাম্পার আমায় তা ভালভাবেই বুঝিয়ে ছাড়লে। অসহ্য চাপ অনুভব করতে লাগলাম বুকে, পেটে, বগলে।

শেষ অবধি খোলবার জন্যে তৈরী হলাম। কিন্তু হায় তোদের দিদিমা ও আমার যুগ্ম চেষ্টা বিফল হল। হাত তুলতেই পারিনা। হাত উপর দিকে তুলতেই বুকে লাগে। ফাঁসীর আসামীর গলায় দড়ি দিয়ে ঝোল-বার পরে যে অবস্থা হয় ঠিক তাই হল আমার। ভয় খেয়ে গেলাম। শিকার-টিকারে আমার সাহস দেখেছিস তো! পরোয়াই করি না কিছুকে। সেই আমিও ভয়ানক ভড়কে গেলাম। বেশীক্ষণ এ অবস্থায় থাকলে হয়ত···তোদের দিদিমার বিজলী-খেলা আঁখিতেও দুশ্চিন্তার ছায়া পড়লো আমার এখন-তখন অবস্থা দেখে। দেখে। টানাটানি হ্যাঁচড়া-হেঁচড়ি সবই নিষ্ফল হল।

আর্ত্তচীৎকার করে উঠলাম—ডাকো শিগ্‌গির পাশের চৌধুরী বাড়ীর দরোয়ান জবরদস্ত সিংকে।

বিহ্বলভাবে তোদের দিদিমা ডেকে নিয়ে এলো, দরোয়ান, উড়ে ঠাকুর, আর ছাপরাজিলার চাকর দুটোকে।

তারপর যতক্ষণ জ্ঞান ছিল এইটুকুই মনে আছে যে, পাঠার দেহ থেকে যেভাবে ছাল ছাড়িয়ে নেয় অবিকল সেই পদ্ধতিতে তিন হিন্দুস্থানী পালোয়ান ও এক উড়ে ঠাকুরে মিলে জাম্পারকে আমার দেহচ্যুত করলো··· আর মনে নেই···জ্ঞান ফিরে না পাওয়াই আমার ভাল ছিল। সর্ব্বাঙ্গে লোমনাশকের কাজ করে গেছে ঐ জাম্পার! গোঁফের আর্দ্ধেক···দুই জুলফী, কানের পাশের এক থাবলা চুল উপড়ে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে জাম্পার···

গড়গড়া গাঙ্গুলী মশায় থেমে গিয়ে দ্রুত গড়গড়ায় ডজনখানেক টান দিলেন।

তারপর সত্তর পাউণ্ড হাওয়া দেহের ভেতর নিয়ে দীর্ঘ-প্রশ্বাসে বললেন, তার পরের অবস্থা তো তোরা স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছিস। দ্বিতীয়বার আমার পিতৃশোক হল।

—

মাঘ

শ্রীসুধীরকুমার রায়

পোষ আজ গিয়ে থাকে যাক্,
আশাভরা মনোহরা
খুশিয়ালি সোনাঝরা
গুটিসুটি ওই আসে মাঘ।

মাঘ যেন মধুভরা চাক,
নেই তাড়া লেখাপড়া
শুধু খেলা মাতোয়ারা
নেই কারও চোখ রাঙা রাগ।

বই-খাতা তোলা আজ থাক,
কাঁচা-পাকা টোপাকুল
দোলে গাছে ফুল ফুল
শিখী যেন নাচে মেলি পাখ।

বাণীমার পূজো আগে যাক্,
রাঙা পায়ে দিয়ে ফুল
হরদম পাড়ো কুল
চুপিসাড়ে বুঝে-সুঝে ভাগ।

কুয়াশায় মুখ ঢেকে মাঘ
কয় যেন কত কথা
শুঁটি ফুল নাড়ে মাথা
পোষ আজ গিয়ে থাকে যাক্।

অচেনা মুখ

প্রশান্ত মৈত্র

অনেক অনেক দূরের পাহাড় ঘেরা এক দেশের কোন এক গ্রামে এক কৃষক আর তার বৌ বেশ সুখে বাস করতো। সে গ্রামের লোকেরা জীবনে কোনদিন আয়না কি জিনিষ দেখে নি। তারা তাই জানত না তাদের নিজেদের মুখ কেমন দেখতে। সে দেশের রাণী গাড়ী করে সে গ্রামের মধ্যে দিয়ে একদিন যাচ্ছিল। সে তার আয়নাটা ভুল করে ঘাসের মধ্যে ফেলে রেখে চলে এল।

একদিন খুব সকালে সেই কৃষকটা মাঠে যেতে যেতে ঘাসের মধ্যে চক্‌চকে কী যেন একটা লক্ষ্য করলো। অমনি সে হাতে তুলে নিল রাণীর সেই আয়না। সে কোনদিনও এ রকম জিনিষ দেখে নি। আয়নার দিকে তাকিয়েই তার গোল চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল ভয়ে, বিস্ময়ে। "একি? এটা যে আমার মৃত বাবার ছবি! নিশ্চয়ই বাবার আত্মা আমার সাথে বাস করছে। তা' ছাড়া হতেই পারে না। শুধু তাকে এ ছবিতে একটু জোয়ান দেখাচ্ছে।"

কৃষক বাড়ীতে ফিরে চল্‌ল। রাস্তার মধ্যে ভাবতে লাগলো, "কিন্তু বৌ যদি এ আত্মা দেখতে পায় তা' হলে ভীষণ ভয় পাবে। অন্য কোথাও এটাকে লুকিয়ে রাখব—যা'তে সে দেখতে না পায়।"

একটা খড়ের-গাদার মধ্যে সেটাকে সে লুকিয়ে রাখল। প্রত্যেক দিন সকালে—বিকালে খড়ের গাদার কাছে এসে বাবার আত্মাকে একবার করে দেখে যেত। তার বৌ তাকে প্রতিদিন সেখানে যেতে লক্ষ্য করে। মনে মনে সে ভাবল, "প্রতিদিন কেন যায়? নিশ্চয়ই সেখানে কিছু লুকিয়ে রেখেছে।" তাই একদিন কৃষকের বৌ গিয়ে একটু খোঁজাখুঁজি করে আয়নাটা পেল।

আয়নার দিকে তাকিয়ে একটা অচেনা মেয়ের মুখ দেখতে পেল। বৌটা বলে উঠলো, "ও বুঝেছি, সে আবার একটা নূতন বিয়ে করেছে! থাকল সব। আমি রান্না-বান্না করতে পারব না, ঘর দোর পরিষ্কার করব না। ওর জন্যে কিছু করব না। নোতুন বৌ এসে যেন সব করে।" এ সব ভেবে ভেবে শেষ পর্য্যন্ত রাগে দুঃখে বিছানায় শুয়ে কান্না শুরু করলো।

বিকেল বেলা মাঠ থেকে ফিরে এসে কৃষক দেখে ঘর নোংরা। খাবার তৈরী নেই। তখন বৌকে জিজ্ঞাসা করলো, "রান্না হয়নি কেন! শরীর ভাল নেই?"

"আমি তোমার জন্য রান্না করিনি। কোন দিন করবও না। তোমার নোতুন বৌ এসে যেন সব করে।"

"তার মানে!"

"মানে আবার কি? যা বল্‌লাম তা' সব কিছুই জান। তোমার নোতুন বৌয়ের ছবি দেখেছি। খড়ের গাদার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলে।"

"আমি তো কিছুই বুঝলাম না।"

"বেশ ভাল। বুঝতে যখন পারলে না আমি বাপের বাড়ী চল্লাম। তোমার কুৎসিত নোতুন বৌ আসুক।"

"ও বুঝেছি! ওটা কোন বৌয়ের ছবি নয় গো, আমার বাবার আত্মা। রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। তুমি ভয় পাবে বলে খড়ের গাদায় লুকিয়ে রেখেছি।"

"বল্‌লেই হল। আমি বুঝি আর মেয়েমানুষের মুখ চিনি না? অত বোকা নই।"

এ ভাবে তাদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হল। ঠিক সেই সময়ে গ্রামের পুরোহিত রাস্তা দিয়ে যাবার সময় গোলমাল

শুনে ঘরে ঢুকল। "শোন বাছা, মিছামিছি কেন ঝগড়া কর ?" পুরোহিত বল্‌ল।

কৃষকের বৌ বলে, "সে আবার একটা নোতুন বিয়ে করেছে। আমি তার ছবি দেখেচি।"

কৃষকও বলে, "না, না আমার কাছে কোন বৌয়ের ছবি নাই। ওটা আমার বাবার আত্মা।"

সব বুঝে শুনে পুরোহিত বল্‌ল, "দেখি আমাকে ছবিটা দেখাও তো!" আয়নাটা হাতে নিয়ে ভালভাবে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। অবশেষে বল্‌ল, "তোমরা শান্তিতে থাক। আর ঝগড়ার মধ্যে যেয়োনা। এটা একটা পুরোহিতের ছবি। কি করে যে ভুল করতে পার জানি না বাপু।"

এই সব বলে-কয়ে তাদের আশীর্ব্বাদ করে পুরোহিত বিদায় নিল। যাবার সময় আয়নাটা নিয়ে গেল মন্দিরে রেখে দিতে।

(একটি বিদেশী গল্পের অনুকরণে—লেখক)

ভয় দেখানোর গল্প

অশোক মুখোপাধ্যায়

তখন আমি স্কুলে পড়ি। থাকি হোস্টেলে। সমবয়সী অনেক ছেলে একসঙ্গে ছিল সেখানে। তাই বেশ হৈচৈ করে কাটত দিনগুলো।

আমাদের সঙ্গে ভারি হার্ম্মাদ ছেলে ছিল কজন। সারা হোস্টেলটা তারা মাতিয়ে রাখত সব সময়। এক এক সময় বেরোত এক একটা মজা। যেমন কিছুদিন ভোরে উঠে দেখা যেত সকলের মশারির দড়ি কাটা। ক'দিন ঘুমের সময় যাকে তাকে ধরে চুল কেটে, গোঁফ লাগিয়ে সাজানো হত সঙ্‌। কিছুদিন আবার একজনের আয়না অন্যজনের টেবিলে, একজনের জুতো অন্যজনের খাটের নিচে—এমনি জিনিসপত্র অদলবদল করে এক হুলুস্থুল কাণ্ড বাঁধিয়ে দেওয়া হত।

একসময় হোস্টেলে আর এক হুল্লোড় দাঁড়িয়েছিল—রাত্রিতে ভয় দেখানো। যারা একটু ভীতু ধরণের, তাদের দুর্দ্দশার শেষ থাকত না। মুখোস প'রে অথবা মুখে রঙ্‌ মেখে ভূত সেজে, কিংবা স্প্রিং দিয়ে নকল সাপ তৈরী করে ভয়ের সৃষ্টি করা হত।

তাপস ছিল ভীতুর একশেষ। দেখতে খুব নাদুসনুদুস আর হাবা-গোবা। তাই সে হয়েছিল ভয়-দেখানো-ছেলেদের বাঁধা খদ্দের।

বেশ কয়েকবার ভয় পাবার পর তাপস মনে মনে ফন্দি আঁটল, সে এবার শোধ নেবে। ভয়-দেখানো-দলের পাণ্ডা ছিল শ্যামল। তাপস তাকেই শিকার ঠিক করে বসল।

তখন গ্রীষ্মকাল। দরজা জানালা খুলে সবাই ঘুমোয়। এক এক ঘরে চারজন ক'রে ছেলে। শ্যামল থাকে জানালার ধারের সিটটাতে। সাহসী হিসেবে নাম আছে বলেই সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ঐ সিটটা দিয়েছেন ওকে।

সেদিনটা অমাবস্যার রাত। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। তাপস চুপিচুপি শ্যামলের ঘরে ঢুকল। ভয় দেখাতে এসেছে, অথচ তারই বুক ভয়ে টিপটিপ করছে।

ঘরে চারজনের নাক ডাকার শব্দ। পা টিপে টিপে শ্যামলের কাছে এগিয়ে গেল তাপস। নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকল ওর খাটের তলায়। তারপর উবু হয়ে হাত আর পায়ের ওপর ভর রেখে পিঠ দিয়ে ওপর দিকে ঠেলতে লাগল খাটশুদ্ধ শ্যামলকে।

খাট বারকয়েক নড়ে উঠতেই ঘুম ভেঙে গেল শ্যামলের! সদ্যজাগা অবস্থায় চট করে কিছু ধরে উঠতে পারল না সে। ঘরে পিচ-কালো অন্ধকার। চারদিক নিঝ্‌ঝুম। এ অবস্থায় খাট মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠছে অকারণ—এতে আঁৎকে ওঠারই কথা। সাহসী হলেও আচম্‌কা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল সে। মুখ দিয়ে তার আঁ-আঁ ধরণের এক অদ্ভুত আওয়াজ বেরোতে লাগল।

এদিকে শ্যামলের গলার ঐ কিম্ভুত শব্দ শুনে তাপসের অবস্থা গেছে কাহিল হয়ে, তার দ্বারা যে সত্যি সত্যি ভয় পেতে পারে, কাউকে ভয় দেখানোর মুরোদ তারও আছে—এ বিশ্বাস তাপসের আদপেই ছিল না। তাই সে ভাবল, ভয় পাবার মত অন্য কিছু নিশ্চয় ঘরে আবির্ভূত হয়েছে, যার জন্যে শ্যামলের মত সাহসী ছেলেও এতটা ভয় পেয়ে গেছে। এতক্ষণ অবধি কোনমতে সাহসে বুক বেঁধে সে অন্ধকারে বসেছিল। কিন্তু এবারে অন্ধকার তার সমস্ত বিভীষিকা নিয়ে চেপে বসল তার ওপর। উপরন্তু শ্যামলের গলার ঐ আনুনাসিক আওয়াজ যেন অন্ধকারকে আরও ভয়াবহ করে তুলল।

পিঠের ওপর থেকে খাটটা ধপ করে ফেলে দিয়ে এক বিকট চিৎকার দিয়ে উঠল সে। তারপর ভয় পেলে সে যা করে, তার সব-গুলো সুরু করে দিল একসঙ্গে। চিৎ হয়ে মেজের ওপর পড়ে হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে এক অদ্ভুত কাণ্ড জুড়ে দিল সে। ঘরের আর তিনজন জেগে উঠেছে। অন্য ঘরের ছেলেরাও এসে হাজির হল ছুটো-ছুটি করে। তারপর আলো জ্বালতেই সকলে দেখতে পেল এক মজার দৃশ্য। খাটের ওপর শুয়ে একজন আঁ-আঁ করছে চোখ বুঁজে, আরেকজন খাটের তলায় শুয়ে হাত পা ছুঁড়ছে হিষ্টিরিয়া রোগীর মত।

জলটল দিয়ে সুস্থ করে তোলা হল দুজনকে। তারপর তাপসের কাছ থেকে সব ঘটনা শুনে আমরা তো আর হেসে বাঁচিনে। অনেক-রকম ভয় পাওয়ার কথা লোকে শুনেছে, কিন্তু ভয় দেখাতে গিয়ে নিজেই ভয় পেয়ে যাওয়া—এমনটি বোধহয় কেউ কোনদিন শোনেনি।

ঝরা পাতা

ফটো : রাখাল জানা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

সিক্ত কেশা

ফটো : হারানচন্দ্র ঘোষ
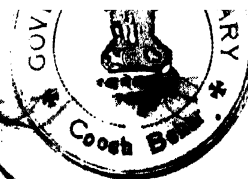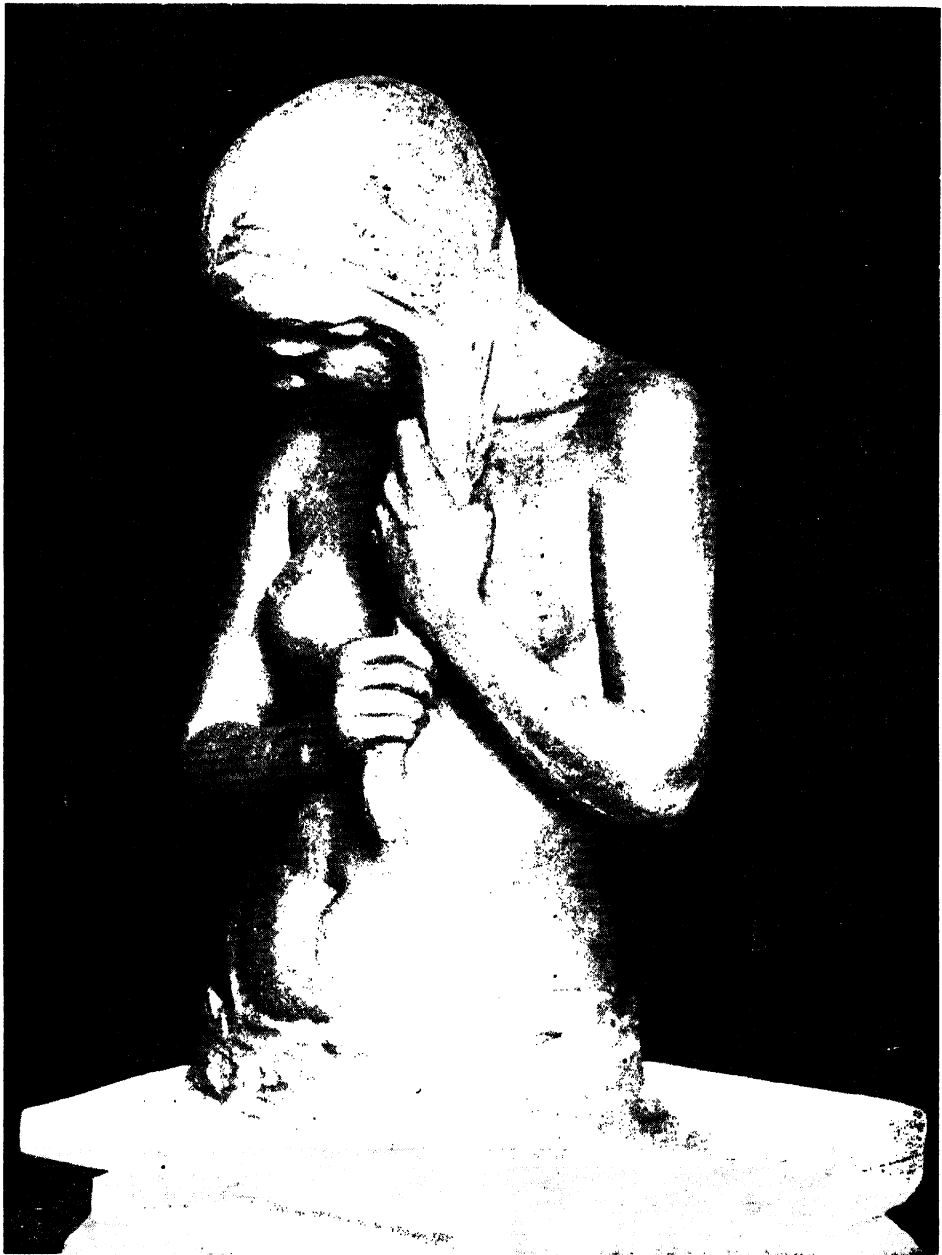
কথা-সঙ্গীত (তাল-দাদরা)

(১) সে দিন তুমি আসবে প্রিয়,
আসবে আমি জানি
সেই আশাতে থাকবে আমার
জীর্ণ হৃদয় খানি ॥

(২) আসবে তুমি সঙ্গোপনে,
আমার হৃদয় সিংহাসনে।
শুনাবে গো শঙ্কা-হরণ,
দুঃখ-হরণ বাণী

(৩) যারা তোমায় দিল অনেক,
তারাই তোমার বাঞ্ছিত !
যার কিছু নাই, তারেই শুধু—
কোরবে তুমি বঞ্চিত ?

(৪) কি দিয়ে হায় ! পূজবো তোমায়,
সেই ভেবে মোর দিন কেটে যায়।
হৃদয় খানি রইল শুধু—
নিও হে বুকে টানি ॥

কথা ও সুর—ডাঃ মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য

স্বরলিপি—কল্যাণী দেবী (বম্বে)

(১)

I	স	পধনো	নো	ধ	নো	নো	I	নোধ	নোর্স	নো	I	ধ	প	পা	I
	সে	দি	ন্	তু	মি	০		আ	স্	বে		প্রি	য়	০	

ম	প	ধ	নো	র্স	র্স	ধ	নো	নো	-	-	-
আ	স্	বে	আ	মি	০	জা	নি	০	০	০	০

ধ	নো	ধ	প	স	স	মগ	মপ	স	গ	র	র
সে	ই	আ	শা	তে	০	থা	ক্	বে	আ	মা	র

স র গ স প প গ স স - - -
জী ০ র্ণ হৃ দ য় থা নি ০ ০ ০ ০

(২)

I ম ম প I ধ ন ন I ধ নর্স র্স I ন ধ ধ I
আ স্ বে তু মি ০ স অং গো প নে ০
কি ০ দি য়ে হা য় পূ জ্ বো তো মা য়

প ধন র্স ন র্স র্স নর্স র র্স ন ধ ধ
আ মা র্ হৃ দ য় সি ইং হা স. সে ০
সে ই ভে বে মো র দি ন্ কে টে যা য়

I ধ র্সর্রজ্ঞ র্জ্ঞ | র্র র্স র্স I ন র্স ন | ধ প প I
শু না ০ বে গো ০ শ ং কা হ র ন
হৃ দ য় থা নি ০ র ই লো শু ধু ০

ম প ধ নো র্স র্স ধ নো নো - - -
দুঃ ০ খ হ র ন বা ণী ০ ০ ০ ০
নি ও হে বু কে ০ টা নি ০ ০ ০ ০

(৩)

I স স ম | গ ম ম I গম প স | গ র র I
সা রা ০ তো মা য় দি ০ ল অ নে ক

স স প প প ম মপ দানো নো দা প প
তা রা ই তো মা রি বা ০ ন্ ছি ত ০

গ প স গ র র স রস রজ্ঞ র স স
যা র কি ছু না ই তা রে ই শু ধু ০

স প প প প ম মপ দানো নো দা প প
কো র্ বে তু মি ই ব ০ ন্ চি ত ০

(৪)

দ্বিতীয় সুরে গেয়ে

কোমল গা = জ্ঞ। কোমল ধা = দা

কোমল নি = নো। উদারা—স্, মুদারা—স, তারা—র্স

বেদান্ত দর্শন—শঙ্কর ভাষ্য

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

মোক্ষ

মুক্তি বা মোক্ষই পরম পুরুষার্থ। জীবাত্মার স্বরূপ আনন্দ। অবিদ্যাজাত দেহাত্মবোধের ফল দুঃখ। তাহাই বন্ধ। মিথ্যাজ্ঞান বা অজ্ঞানের নিবৃত্তি ও স্বীয়স্বরূপ আনন্দের অভিব্যক্তিই বন্ধ হইতে মুক্তি বা মোক্ষ। আনন্দ জীবের স্বরূপগত হইলেও অজ্ঞান আবরণে আবৃত থাকার ফলে তাহা প্রকাশিত হইতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যখন অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, তখন আনন্দ প্রকাশিত হয় এবং দুঃখের বিনাশ হয়।

বৈশেষিক মতে মুক্তিতে আত্মার বিশেষ গুণের আত্যন্তিক বিনাশ হয় এবং অন্য কোনও বিশেষ গুণও তাহাতে আবির্ভূত হয় না। ন্যায়দর্শন মতে দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশই মুক্তি। মুক্তির অবস্থায় বৈশেষিক ও ন্যায় মতে আত্মার চৈতন্য থাকে না। তাহা শিলার মত জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। ন্যায় মতে আত্মা স্বভাবতঃ জড় পদার্থ, মনের সহিত সংযোগের ফলে আত্মায় চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। মুক্তিতে মনের সহিত সংযোগের নাশ হয়, চৈতন্যও তিরোহিত হয়। ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—অপবর্গে অনেক সুখ বিলুপ্ত হয়, চৈতন্য পর্য্যন্ত থাকে না। এই জন্য তাহা ভয়াবহ মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা ভয়াবহ নহে, বরং শান্তিনিকেতন। তখন যাবতীয় কার্য্যের উপরম এবং অনেক দুঃখ ও ভয়ঙ্কর পাপ লুপ্ত হয়। যাহাতে সর্ব্বদুঃখের উচ্ছেদ হয় এবং দুঃখের সংবিদ থাকে না, বুদ্ধিমান ব্যক্তির তাহা অরুচিকর হইতে পারে না। সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতেও মুক্তিতে সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি হয়, এবং আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে। এই অবস্থা শুদ্ধ চিত্তের অবস্থা, আনন্দময় অবস্থা নহে। বেদান্ত মতে মুক্তিতে জীব ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। তাহা পরম আনন্দের অবস্থা। ব্রহ্মভাব কিরূপ অবস্থা তাহা আমাদের ধারণার অতীত। জগতে সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মই যদি একমাত্র সত্য বস্তু হয়, এবং অবিদ্যার আবরণবশতঃ যদি তাহা হইতে অসংখ্য ভ্রান্ত জ্ঞান-বিশিষ্ট সসীম জীবের উদ্ভব হয়, তাহা হইলে অবিদ্যার অপসরণে জীবের সসীম ভ্রান্তিজ্ঞান বিনষ্ট হয়, এবং পূর্ণ জ্ঞানও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম—যিনি অবিদ্যার বিনাশের পূর্ব্বেও ভ্রান্ত জ্ঞানের সাক্ষীস্বরূপ জীবে বর্ত্তমান ছিলেন, তিনিই অবশিষ্ট থাকেন। সুতরাং যাহাকে আমরা জীবাত্মা বলি, মুক্তিতে তাহার বিনাশ হয় এই মীমাংসা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। ব্রহ্ম জীবের মুক্তির পূর্ব্বেও আনন্দস্বরূপ, পরেও আনন্দস্বরূপ। মুক্তিতে অবিদ্যা-নাশের ফলে নূতন আনন্দানুভূতি কিছু হইতে পারে না। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে।

শঙ্কর বলেন আত্মা অশরীর। তাহার জ্ঞানশক্তিমান্ সংকল্প-বিকল্পাত্মক মন নাই। আত্মা শুভ্র (শুদ্ধ) অসঙ্গ। সুতরাং মোক্ষ নামক অশরীরত্ব নিত্য, ইহা ধর্ম্ম-কর্ম্মের ফল নহে। শরীরাভিমানরহিত মোক্ষ পরিণামী নিত্য নহে। (যেমন সাংখ্যের তিন গুণ)। মোক্ষ পারমার্থিক কূটস্থ নিত্য, নিত্যতৃপ্ত, নিরবয়ব স্বয়ং জ্যোতিঃস্বভাব। (শ-ভা ১।১।৫)। তাহাতে কালভেদ নাই। মোক্ষ নামক অশরীরত্বই ব্রহ্ম। মোক্ষের প্রতিবন্ধক অজ্ঞান। অজ্ঞানের নিবৃত্তি তত্ত্ব-জ্ঞানের ফল। তত্ত্ব-জ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ। জীব ও ব্রহ্মের একত্ব-বিজ্ঞান সম্পদরূপও নহে, অধ্যাসস্বরূপও নহে। সম্পদ উপাসনার অর্থ কোনও অপকৃষ্ট বস্তুকে কোনও উৎকৃষ্ট বস্তুর সহিত অভিন্ন মনে করিয়া, এবং ধ্যানকালে অপকৃষ্ট বস্তুকে অবিদ্যমানপ্রায় করিয়া উৎকৃষ্ট বস্তুকে প্রধানভাবে চিন্তা করা। ইহাকে প্রতীকোপাসনাও বলে। অধ্যাস উপাসনাও প্রতীকোপা-সনা। কিন্তু তাহাতে অবলম্বন বস্তুটির প্রাধান্য থাকে। যেমন মনকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা। এতাদৃশ উপাসনা পুরুষ-ব্যাপার তন্ত্র অর্থাৎ পুরুষের ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু মোক্ষ-সাধক ব্রহ্ম-জ্ঞান তাহা নহে। ইহা বস্তুতন্ত্র—যে বস্তুর জ্ঞান, তাহার অধীন অর্থাৎ সেইরূপ। ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত ক্রিয়ার কোনও সম্বন্ধ নাই। মোক্ষও ক্রিয়াসাধ্য

নহে। মোক্ষ উৎপাদ্য বা প্রাপ্য নহে। আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী বলিয়া ব্রহ্ম সকলের দ্বারা নিত্যপ্রাপ্ত। মোক্ষ নিত্য শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ। মোক্ষ আত্মার ধর্ম্ম হইলেও অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে; উপাসনা দ্বারা আত্মা সংস্কৃত হইলে অভিব্যক্ত হয়, ইহা বলা যায় না। কেননা আত্মা ক্রিয়ার আশ্রয় হইতে পারে না। ব্রহ্ম জ্ঞান দ্বারা লভ্য। এই জ্ঞান পুরুষের মানসিক ব্যাপারের অধীন নহে। জ্ঞানকে "করিতে", "না করিতে", অথবা "অন্য প্রকার করিতে" পারা যায় না, কেমনা তাহা বস্তুতন্ত্র, বিধির অধীন অথবা পুরুষের অধীন নহে।

উপাধিমুক্ত আত্মা মোক্ষে শরীরের অভিমান ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। তাহাতে নূতন ধর্ম্মের আবির্ভাব হয় না। যাহা কেবল আত্মভাব, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া জ্ঞানী তাহাতে আবির্ভূত হন। (শ-ভা ৪।৪।১) পূর্ব্বে বদ্ধ ছিলেন, বিগলিত-বন্ধন হইয়া শরীর ও শরীর ধর্ম্ম হইতে মুক্ত হন মাত্র, নূতন কিছু হন না। স্বরূপ নিষ্পন্ন হইয়া (মুক্ত হইয়া) আত্মা কি পরমাত্মা হইতে পৃথক অবস্থান করেন, অথবা তাহার সহিত একীভূত হন? শঙ্কর বলেন মুক্ত পুরুষ পৃথক অবস্থান করেন না। (অবিভক্ত এব পরেণ আত্মনা মুক্তঃ অবতিষ্ঠতে—শ-ভা ৪।৪।৪)। "যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধং আসিক্তং, তাদৃক্ এব ভবতি"। যেমন নির্মল জলে নির্মল জল মিশাইলে এক হইয়া যায়, জ্ঞানীর আত্মাও তেমনি শুদ্ধ ব্রহ্মে অবিভক্ত হইয়া যায়। কোন কোনও শ্রুতিতে ভেদের কথা আছে বটে, কিন্তু তাহা ঔপচারিক। "ভেদ নির্দেশস্তু অভেদেঽপি উপচর্য্যতে। (শ-ভা ৪।৪।৪) মোক্ষে আত্মা মাত্র আত্মরূপে অভিনিষ্পন্ন হন। জৈমিনির মতে মুক্তের স্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাহা নিষ্পাপ, সত্য-সংকল্প প্রভৃতি বিশেষণান্বিত। তাহা সর্বেশ্বর ও সর্বজ্ঞ। "তিনি সেইকালে মুক্ত অবস্থায় পরিক্রমণ করেন, ক্রীড়া করেন, ভোগ করেন", ইত্যাদিও তাহার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। এ সকল মুক্তাত্মার ঐশ্বর্য্য। শঙ্কর বলেন—ঔড়ুলোমির মতে যদিও ব্রহ্মে এই সকল বিশেষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি ইহারা "শব্দ বিকল্পজ" অর্থাৎ শব্দ ব্যবহারমূলক মিথ্যা প্রত্যয় (যেমন রাহুর শির)। রাহুর মস্তক ভিন্ন অন্য অঙ্গ নাই, রাহুর মস্তকই রাহু। রাহুর মস্তক শুনিয়া মনে হয়, মস্তক বুঝি রাহু হইতে ভিন্ন। সেইরূপ ব্রহ্মে পাপাদি নাই, এই মাত্র উপরিউক্ত বিশেষণ সকলের অর্থ। চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ, মোক্ষকালে জীব চৈতন্য মাত্রে অভিনিষ্পন্ন হয়। কেননা এই আত্মা অন্তর্বাহ্য রহিত, একরস, পূর্ণ চৈতন্যঘন। সত্য কামত্বাদি ধর্ম্ম ব্রহ্মের স্বরূপ সন্নিবিষ্টের ন্যায় উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে সকল উপাধি-সম্পর্কের অধীন, স্বরূপের অন্তর্গত নহে। চৈতন্য মাত্রই স্বরূপ, আর সকল উপাধি সংসর্গে অধ্যস্ত। "তিনি ক্রীড়া করেন, রমমান থাকেন" প্রভৃতি দুঃখাভাব বুঝাইতে ও স্তুতি অর্থে উক্ত হইয়াছে। প্রকৃত ক্রীড়া অন্য পদার্থ সাপেক্ষ, আত্মার তাহা নাই। মোক্ষ "নিরস্তাশেষ প্রপঞ্চ, প্রসন্ন (অত্যন্ত নির্মল, উপাধি কালুষ্যহীন) ও অব্যপদেশ্য।" (অবর্ণনীয়)। ইহাই ঔড়ুলোমীর মত। কিন্তু বাদরায়ণ বলেন আত্মা পারমার্থিক রূপে নির্ধর্মক ও অখণ্ড চিৎ মাত্র হইলেও ব্যবহার দৃষ্টিতে তাহার ঐশ্বর্য্য বিলুপ্ত হয়না।

উপনিষদে আছে মুক্ত পুরুষের সংকল্প মাত্র তাহার পিতৃগণ তাহার সমীপে উপস্থিত হন। শঙ্কর বলেন—ইহার জন্য মুক্ত পুরুষের সংকল্পই যথেষ্ট, অন্য নিমিত্তের প্রয়োজন হয় না। মুক্ত পুরুষ কাহারও অধীন নহেন (অনন্যাধিপতি)। সংকল্প শব্দের প্রয়োগে জানা যায় মুক্ত পুরুষের মন থাকে, কেন না মনই সংকল্পের সাধন। বাদরি মুনির মতে মন থাকিলেও শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে না। (শ-ভা ৪।৪।১০) জৈমিনির মতে মনের সহিত শরীরও ইন্দ্রিয় থাকে। বাদরায়ণের মতে মুক্ত পুরুষের কখনও শরীর থাকে, কখনও বা থাকে না। মুক্ত পুরুষ ঐশ্বর্য্যবলে অনেক শরীর সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে আবিষ্ট হইতে পারেন। (এক প্রদীপ হইতে যেমন অনেক প্রদীপ হয়, সেইরূপ।) কিন্তু মুক্তি হইলে মুক্ত যখন চিৎমাত্র ও দ্বৈতরহিত হন, তখন ইহা কিরূপে সম্ভবপর হয়? শঙ্কর বলেন—উপনিষদে মুক্ত পুরুষের ঐশ্বর্য্যের কথা আছে বটে। কিন্তু তাহা সগুণ ব্রহ্মজ্ঞানের ফল, নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের ফল নহে। সগুণ ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা ঐশ্বর্য্যলাভ হয়। জগৎ সৃষ্টির ক্ষমতা ব্যতীত অন্যান্য ঐশ্বর্য্য ঈশ্বর সাযুজ্যপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষদিগের হইয়া থাকে। কিন্তু পরমেশ্বরের যে নির্গুণ নির্বিকার রূপ আছে, সগুণ উপাসক তাহা প্রাপ্ত হন না। যাহারা দেবযান পথে ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মার লোক) গমন

করেন, তাহাদের আর পুনরাবৃত্তি হয় না (পুনর্জন্ম হয়না), নির্গুণ ব্রহ্মবাদীদিগের তো কথাই নাই।

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে প্রতীত হয়, যে ঈশ্বরোপাসকগণ অবিদ্যা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হন না। তাহারা ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইলেও, তাহাদের ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয় না।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ী—যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন "ইদং মহাভূতং অনন্তমপারং বিজ্ঞান ঘেন এব। এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তানি এব অনবিনশ্যতি। ন প্রেত্য-সংজ্ঞা অস্তি"। এই মহাভূত (মহান্ আত্মা) অনন্ত অপার (অসীম) এবং বিজ্ঞানঘন। এই সকল হইতে (দেহ হইতে) উত্থিত হইয়া, (দেহ ও দেহ সম্বন্ধ বর্জন করিয়া) (এই মহাভূত) তাহাদের পরে (সহিত ?) বিনাশপ্রাপ্ত হয়। দেহ হইতে যাইবার পরে সংজ্ঞা থাকে না। দেহ-ত্যাগের পরে সংজ্ঞা থাকে না শুনিয়া মৈত্রেয়ী কহিলেন—ভগবান আমাকে মোহের মধ্যে ফেলিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন "আমি মোহজনক কিছু বলি নাই, আত্মা অবিনাশী ও উচ্ছেদহীন।" আত্মাকে বিজ্ঞানঘন, অবিনাশী ও অনুচ্ছিত্তি ধর্ম্মী বলিয়াও যাজ্ঞবল্ক্য তাহার বিনাশ হয় বলিয়াছেন এবং দেহ-ত্যাগের পরে তাহার সংজ্ঞা থাকে না বলিয়াছেন। ইহার অর্থ মুক্তিতে আত্মার বিশেষ জ্ঞান থাকে না। (শ-ভা ১।৪।২২) তাহার আমিত্বের লোপ হয় এবং তাহা ব্রহ্মের মধ্যে বিলীন হয়। ইহাই নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসকদিগের মুক্তি। সগুণ ব্রহ্মের উপাসকগণ ঈশ্বরে মিশিয়া যান না। তাহাদের ভেদ থাকে। বিশেষ জ্ঞানহীন আত্মার ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া যাওয়াকে যাজ্ঞবল্ক্য বিনাশই বলিয়াছেন। (বিনশ্যতি) যদিও ব্রহ্মের মধ্যে তাহা অভিন্নভাবে বর্ত্তমান থাকে। তরল মেঘাবৃত আকাশের নিম্নে সূর্য্য অস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়, কিন্তু মেঘের উপরে স্বীয় পূর্ণ মহিমায় বিরাজ করেন, মেঘাপসরণের ফলে তাহার কোনও পরিবর্ত্তনই হয় না। সেইরূপ অবিদ্যাবরণে আচ্ছাদিত ব্রহ্ম অবিদ্যার উপরি সদাই পূর্ণ গৌরবে বর্ত্তমান থাকেন। অবিদ্যাবরণ বিদূরিত হইবার পূর্ব্বেও তিনি যাহা ছিলেন পরেও তাহাই থাকেন, কেবল নিম্নভাগে অবিদ্যাজনিত বিশেষ জ্ঞান বিনষ্ট হয়। ব্রহ্মে নূতন কিছুই ঘটে না, কিছুই তাহাতে প্রবেশ করে না। অবিদ্যাবরণমুক্ত ব্রহ্মই মোক্ষ—তাহাকে প্রাপ্তব্য বলা যায় না, তিনি নিত্যপ্রাপ্ত। বিশেষ জ্ঞানের উপরে তাহার সাক্ষীরূপে তিনি নিত্য বর্ত্তমান, সুতরাং তিনি সর্বদাই "প্রাপ্ত"। কিন্তু জীবের বিশেষ জ্ঞানে সেই প্রাপ্তি-জ্ঞান নাই। বিশেষ জ্ঞানের যখন অভাব হয়, তখন তাহা জানিবার কেহই থাকে না।

ভ্রান্তি-অপগমে রজ্জুতে সর্প-জ্ঞানের ন্যায় মুক্তিতে সংসারের জ্ঞান তিরোহিত হয়, শঙ্কর বহু স্থানে একথা বলিয়াছেন। এই সকল উক্তি দ্বারা তিনি সংসারকে ঐকান্তিক মিথ্যা বলেন নাই। জগতের ব্যবহারিক অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তিনি তাহার এক প্রকার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। মাণ্ডুক্য উপনিষদে স্বপ্ন, জাগরিত ও সুষুপ্তি অবস্থাকে মিথ্যা বলা হয় নাই। জাগরিত অবস্থা "বহিঃপ্রজ্ঞ" অবস্থা, স্বপ্নাবস্থা অন্তঃপ্রজ্ঞ অবস্থা বলিয়া ঋষি সুষুপ্তিকে "একীভূত, প্রজ্ঞানঘন, আনন্দময়" অবস্থা বলিয়াছেন। "একীভূত" অর্থাৎ জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থার পৃথক পৃথক রূপে অনুভূত প্রপঞ্চ বিশ্ব প্রজ্ঞানঘন ও আনন্দময় অবস্থায় একীভূত। প্রজ্ঞানঘন অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন জ্ঞান ঘনীভূত হইয়া এই অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। এই অবস্থার আত্মা সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্য্যামী ও ভূতদিগের প্রভব ও প্রলয়ের কারণ। চতুর্থ অবস্থা "প্রপঞ্চোপশম" অবস্থা—যে অবস্থায় সকল প্রপঞ্চ উপশান্ত হয়। প্রপঞ্চোপশমে প্রপঞ্চের নাশ হয় না, প্রপঞ্চ ব্রহ্মে বিলীন হয়। তখন এক "আত্মমাত্র প্রত্যয়সার" রূপে আত্মা থাকেন। তুরীয় অচেতন অবস্থা নহে।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ বলেন—সত্যের বিভিন্ন রূপ দেখিবার জন্য আমাদের বিভিন্ন শক্তি (faculties) আছে। তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারের ফলে বিশ্বের রূপেরও ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্ত্তন হয়। তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আমরা দেখিতে পাই যে ব্রহ্মই জগতের পারমার্থিক সত্য, তখন মায়ার আবরণ উন্মোচিত হয় এবং ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। মুক্ত পুরুষের উপরে মায়ার আবরণ-শক্তির প্রভাব থাকে না। যখন ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্বের অনুভব হয়, তখন নামরূপের সহিত আমাদের বন্ধন ছিন্ন হয় এবং তাহাদের কোনও আকর্ষণ থাকে না। যতদিন ইন্দ্রিয়গণ

থাকে ও বুদ্ধির ক্রিয়া চলিতে থাকে, ততদিন তাহারা থাকে। মরীচিকার স্বরূপজ্ঞানের পরেও মরীচিকার প্রতীতি হয়, কিন্তু তাহা দ্বারা প্রতারিত হইবার ভয় থাকে না। সেইরূপ জগতের মায়িকরূপ যখন মায়িক বলিয়া প্রতীত হয়, তখন তাহা দ্বারা প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। জগতের প্রপঞ্চ রূপ ব্রহ্মে বিলীন হউক অথবা ব্রহ্মের ভাণ বলিয়া প্রতীত হউক। জগৎ আত্যন্তিক মিথ্যা নহে।*

শঙ্কর বলিয়াছেন "যৎ অবিদ্যা প্রত্যুপস্থাপিতং অ-পারমার্থিকং জৈবং রূপং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ব-রাগ-দ্বেষাদি-দোষ-কলুষিতম্ অনেকানর্থ যোগি, তৎবিলয়নেন তদ্বিপরীতম্ অপহতপাপ্‌মাত্মাদিগুণকং পারমেশ্বরং স্বরূপং বিদ্যয়া প্রতিপদ্যতে। সর্পাদিবিলয়নেন এব রজ্জ্বাদীন্।" তত্ত্ববিদ্যা অবিদ্যাজাত রূপের বিলয় করিয়া শুদ্ধরূপের প্রাপ্তি করায়, যেমন রজ্জু-তত্ত্বজ্ঞান-কল্পিত সর্পের বিলয় করিয়া অকল্পিত রজ্জুরূপ প্রতীতি করায় (শ-ভা ১।৩।১৯)। আরও বলিয়াছেন "এক এব পরমেশ্বরঃ কূটস্থো নিত্য বিজ্ঞানধাতুঃ অবিদ্যয়া মায়য়া মায়াবিবৎ অনেকধা বিভাব্যন্তে। নান্যো বিজ্ঞানধাতুঃ অস্তি ইতি" এক পরমেশ্বর কূটস্থ, নিত্য বিজ্ঞানধাতু (চিৎ-এক রস) তিনি মায়াবীর মত অবিদ্যা মায়া দ্বারা নানা আকারে প্রকাশিত হইতেছেন। তিনি ভিন্ন বিজ্ঞান ধাতু অন্য কিছু নাই।" "নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্য-স্বভাবে কূটস্থ নিত্যে একস্মিন্ অসঙ্গে অরূপে পরমাত্মান তৎ বিপরীতং জৈবং রূপং ব্যোম্নিইব তলমলাদি পরিকল্পিতং তদাত্মৈকত্ব-প্রতিপাদন-পর-বাক্যৈঃ ন্যায়োপেতৈঃ দ্বৈতবাদ-প্রতিষেধৈশ্চ অর্পণেষ্যামি ইতি পরমাত্মনো জীবাৎ অন্যত্বং দ্রঢ়য়তি, জীবস্য তু ন পরস্মাৎ অন্যত্বং প্রতিপিপাদয়িষ্যতি।" ভাষ্যকারের অভিপ্রায় এই যে পরমাত্মা এক। অনন্ত আকাশে যেমন মালিন্যাদি কল্পিত হয়, তেমনি পরমাত্মার আশ্রিত অজ্ঞান প্রভাবে তাহাতে জীবত্ব ও প্রপঞ্চ কল্পিত হইতেছে। দ্বৈতনিষেধক 'অদ্বৈত'-প্রতিপাদক যুক্তি সহভূত শ্রুতি বাক্যের দ্বারা তিনি ইহা প্রতিপন্ন করিবেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি পরমাত্মা হইতে জীবের প্রতীয়মান অন্যত্ব দৃঢ় করিয়া পরে পরমাত্মা হইতে জীবের যে প্রকৃত অন্যত্ব নাই তাহা প্রতিপাদন করিবেন। (শ-ভা ১।৩।১৯)।

শঙ্করের উপরোক্ত উক্তি এবং ঐ প্রকার অন্যান্য উক্তি হইতে মনে হয় যে চিদ্রূপ বিজ্ঞান-ধাতু একমাত্র। কিন্তু অবিদ্যাকর্ত্তৃক বিভিন্ন কেন্দ্রে পরস্পর সংবদ্ধ এক প্রকার বিজ্ঞান-প্রবাহের উদ্ভব হয়! কাহার বিজ্ঞান, জিজ্ঞাসা করিয়া লাভ নাই, কেননা পরমাত্মারূপ অনন্ত সমুদ্রের বক্ষে এই সকল বিজ্ঞান-বুদ্‌বুদ উঠিলেও এবং পরমাত্মা তাহাদের সাক্ষী হইলেও, তাহারা নির্লিপ্ত পরমাত্মার বিজ্ঞান নহে। প্রত্যেক কেন্দ্রের বিজ্ঞান-প্রবাহের সঙ্গে "আমি" জ্ঞান যুক্ত থাকে, কিন্তু এই "আমিত্বের" যেমন পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। বিজ্ঞান-বুদ্‌বুদদিগেরও তেমনি পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। তত্ত্বজ্ঞানের ফলে এই সকল বুদ্‌বুদের সঙ্গে "আমি"-জ্ঞানেরও বিনাশ হয়। ইহাই মোক্ষ। "আমি"-জ্ঞানযুক্ত বিজ্ঞান-বুদ্‌বুদপুঞ্জের সাক্ষী পরমাত্মা পূর্ব্বে যাহা ছিলেন 'আমি'র বিনাশের পরে তাহাই থাকেন। তাহাতে কোনও পরিণাম হয় না। আমিত্ব-যুক্ত বিজ্ঞান-প্রবাহ নানাজন্মে নানারূপে আবির্ভূত হয়, তিরোহিত হয়, দুঃখকষ্ট ভোগ করে। যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দুঃখকষ্টের নিবৃত্তি হয়, আমিত্বযুক্ত বিজ্ঞান-প্রবাহেরও নিবৃত্তি হয়। এই নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ কেহ প্রাপ্ত হয়না। তাহা ব্রহ্মে নিত্য বর্ত্তমান, তাহাই ব্রহ্ম। যখন মোক্ষ হয়, তখন তাহা ভোগ করিবার জন্য আমিত্বযুক্ত জীব থাকে না। কিন্তু এই জীব—এই আমিত্বযুক্ত বিজ্ঞান-শ্রেণী ঐকান্তিক মিথ্যা নহে। জড় জগতের অস্তিত্বের মত তাহার ব্যবহারিক (সুতরাং নশ্বর) অস্তিত্ব আছে। "জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ" ইহার অর্থ জীবের মধ্যে যিনি সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান, তিনিই ব্রহ্ম—জীব-সাক্ষী। তিনি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন। জীবের নশ্বর অংশ ব্রহ্ম নহে।

* ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ, Indian Philosophy vol II P. 639.

মা
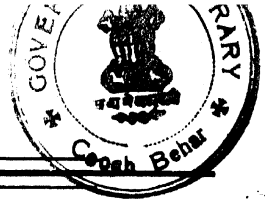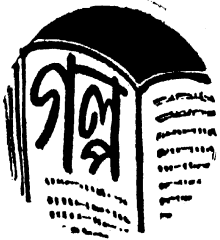
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কিছু দিন আগে বি-এ পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে ব্র্যাকেটে ফার্ষ্ট হয়েছিল একটী ছেলে ও একটী মেয়ে। দুজনেরই নাম, চেহারা ও জন্ম পরিচয় যুগান্তরে প্রথম পাতায় ছাপান ছিল। ছেলেটীর নাম বীরেন, পিতা গোপেন মুখার্জ্জী, বাড়ী উত্তর কলিকাতায় নিবেদিতা লেনে; আর মেয়েটীর নাম রমা, পিতা গোলক ব্যানার্জ্জী, বাড়ী দক্ষিণ কলিকাতার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে। সম্পাদক মন্তব্যে লিখেছিলেন যে ছেলেটি ও মেয়েটি প্রতিভায় একই, ব্র্যাকেটে সমান, শৈশবে দুর্দৈবের আঘাতও তারা পেয়েছিল ঠিক একই নির্ম্মমভাবে। এক বৎসর বয়স যখন, ছেলেটী তার মাকে, আর মেয়েটী তার বাপকে হারিয়েছিল। রমা ও বীরেনের মধ্যে পরিচয় পূর্ব্বে ছিল না কিন্তু—পরে জানা গেল যে যুগান্তরে ঐ সংবাদ প্রকাশিত হবায় পরই উভয়েই পরস্পরে আলাপের জন্য ব্যস্ত হয়েছিল; কিন্তু মেয়েটীর বাড়ীতে গিয়ে আলাপ করা বীরেনের পক্ষে সঙ্গত হবে না ভেবেই এম-এ ক্লাসে সাক্ষাৎ হবার পূর্ব্বে তাদের মধ্যে কোনও আলাপ পরিচয় হয়নি।

রমা যখন ব্র্যাবোর্ণ কলেজের থার্ড ইয়ারে পড়ে সে দেখলে যে একটী প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা রোজ বিকেল বেলায় গেটের পাশে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এই আশায় যে ছাত্রীরা তাকে একটি করে পয়সা দেবে। ১০।১৫ দিন সে টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে রোজ তাকে দুই আনা তিন আনা করে দিতো। এতেও রমার সন্তুষ্টি না হওয়ায় সে মাকে একদিন বল্লে—"মা যদি তুমি অনুমতি করো সংসারে গৃহস্থালি কাজে তোমাকে সাহায্য করার জন্য ঐ মহিলাটিকে বাড়ীতে নিয়ে আসি।" রমাই তাঁর একমাত্র সন্তান। সংসারে আর কেহ আপনার জন নাই, তাই রমাকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। স্বামী যে টাকাকড়ি রেখে গিয়েছিলেন, রমার শিক্ষা ও সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্যে তিনি তাহা ব্যয় করতে কোনও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। বাড়ীতে দ্বারবান, ঝি, রাঁধুনী-ব্রাহ্মণী সবই ছিল, আর কোনও লোকের প্রয়োজন ছিল না—তথাপি রমার আবদার রাখবার জন্যই মা রমাকে বল্লেন, "তুমি যদি সুখী হও, মহিলাটির খোঁজ খবর নিয়ে তাকে বাড়ীতে আনতে পারো।" তার পর দিনই বিকেলবেলায় রমার প্রস্তাবে মহিলাটি খুব খুসী হয়ে তাকে বুকে নিয়ে আশীর্ব্বাদ করলে এবং রমার সঙ্গে সেইদিনই তাদের বাড়ীতে এসে রমার মাকে বল্লে যে তার নাম সুবর্ণা, জাতিতে ব্রাহ্মণ, মুখুয্যে। তার স্বামী পাঞ্জাবে চাকরী করতেন। ১৯৪৭ সালে হিন্দু মুসলমান হাঙ্গামায় সে সব হারিয়ে ভাসতে ভাসতে কলিকাতায় ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ে জীবন কাটাচ্ছে। তার কথা শুনে রমার মাও বড়ই ব্যথিত হলেন এবং তাকে বল্লেন—"তুমি এ বাড়ীতে আমার ছোট বোনের মত থাকবে এবং দিদির সংসার তোমার নিজের মনে করে যা তুমি পার তা করবে, আর রমার সুখ-সুবিধার কোনও ত্রুটি না হয় তার উপর সর্ব্বদাই নজর রাখবে।" রমার মার কথায় সুবর্ণা অতিশয় সন্তুষ্ট হলো। সেদিন হতেই সুবর্ণা মনে প্রাণে চেষ্টা করতে লাগলো—কিসে রমার মাকে সে সুখী করতে পারে। রমার পড়ার ঘরটি গুছিয়ে রাখা, সকালে বিকেলে তার খাবার দেওয়া, মায়ের বিছানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, তাঁর খাবার সময়ে পাখা নিয়ে বাতাস দেওয়া—যাতে কোনও পোকা বা মাছি সেখানে না আসে। রমার মায়ের রুচি ও পছন্দ অনুসারে সুবর্ণা সকল কাজ করতো, ফলে ২।১ মাসের মধ্যেই রমার মা তাকে চোখের আড়াল করতে পারতেন না। সুবর্ণা মাঝে মাঝে কালীঘাটে আদিগঙ্গায় স্নান করতে ও মায়ের পূজা দিতে যেতো, একটু দেরী হলেই রমার মা রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতেন—কখন সুবর্ণা ফিরবে। এইভাবে প্রায় দু বৎসর সুবর্ণার সময় ভালভাবেই কেটেছিল। কিন্তু

যেদিন বীরেনের ও রমার পাশের খবর যুগান্তর কাগজে বাহির হলো যেদিন সুবর্ণার হৃদয়ে যেন কি এক বিপ্লব উপস্থিত হলো। সে সর্ব্বদাই যেন কি ভাবে এবং যখনই সুযোগ পায় সেই যুগান্তর কাগজখানি রমার টেবিল থেকে নিয়ে, সেই ফটোর দিকে তাকিয়ে থাকে, চোখের পলক পড়ে না। রমার মা একদিন দেখেছিলেন যে সুবর্ণা যুগান্তরের সেই ছবিকে চুম্বন দিচ্ছে। রমার মা ভাবলেন যে সুবর্ণা রমাকে কত না ভালবাসে।

কয়েক মাস পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তনের উৎসব হওয়ার কথা রমা তার মাকে জানালো। তিনি নিজের চোখে এই উৎসবে মেয়ের সম্মান পাওয়া দেখবেন বলে রেজিষ্ট্রারকে লিখে তাঁর নিজের জন্য একখানি প্রবেশপত্র আনিয়েছিলেন। রমাকে নিজ হাতে সাজিয়ে গাউন, হুড ও ক্যাপ সব পরিয়ে দিলেন। রমাদের বাড়ীর ৩।৪খানি বাড়ীর পরেই পালিত বিল্ডিংয়ের প্রাঙ্গণে এই উৎসবের এক বিরাট প্যাণ্ডাল তৈরী হয়েছে। রমা ও তার মা হেঁটেই যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ যখন বীরেন ও রমাকে ডিপ্লোমা দিয়ে দুইটি সোনার মেডেল দুজনকে পরিয়ে দিলেন, সভাস্থিত সকল নরনারী করতালি দিয়ে বীরেন ও রমাকে অভিনন্দিত করলেন। গৌরবে ও আনন্দে রমার মার হৃদয় আপ্লুত হলো, অশ্রুতে গণ্ডদেশ প্লাবিত হলো। তার দুঃখ বোধ-হয় এইজন্য যে আনন্দ ও গৌরবের তিনি তাঁর প্রধান অংশীদার তিনি ইহজগতে নেই। অধিবেশন হতেই বীরেনকে সঙ্গে নিয়ে রমা তার মায়ের কাছে এসে বীরেনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করে দিলে। রমার মার চোখ তখনও অশ্রুতে ভরা। রমার মা ক্ষণবিলম্ব না করেই বীরেনকে ডান হাতে আর রমাকে বাম হাত দিয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন এবং দুজনকেই চুম্বন করে অভিনন্দিত করলেন।

রমার মায়ের স্নেহপূর্ণ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা সঙ্গত হবে না ভেবেই বীরেন তাঁদের সঙ্গেই রমাদের বাড়ীতে এসেছিল। বোধহয় রমার মায়ের পূর্ব্ব থেকে বলা ছিল, তাই বীরেন পৌঁছিবামাত্রই উপরের বারান্দায় রমার ও বীরেনের জন্য সুবর্ণা দুই কাপ চা এবং নানাবিধ খাবার জিনিষ এনে দিলে। রমার মা বল্লেন—"অনেকদিন থেকে তোমাকে দেখব বলে রমাকে বলেছি; তুমি বোধহয় আসতে লজ্জাবোধ করেছ। যাহোক অনেকদিন পরে আজ আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হল। আমি শুনলাম, তুমি এম-এ পড়তে পড়তে আই-এ-এস পরীক্ষা দেবে, তুমি ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তোমার বাবার জীবন মহিমান্বিত কর।" রমার মা হঠাৎ লক্ষ্য করলেন যে সুবর্ণা এক দৃষ্টিতে বীরেনের দিকে তাকিয়ে আছে। তখনই তিনি ইসারা করে তাকে পাশের একটি ঘরে ডেকে নিয়ে বল্লেন যে খাবার সময় নবাগত অতিথির কাছে দাঁড়িয়ে থেকে এমন ভাবে তাকিয়ে থাকা আদৌ উচিত হয়নি। সুবর্ণা লজ্জিত হয়ে একটীমাত্র দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রমার মাকে বলেছিল, তিনি যেন তাকে মাপ করেন—ভবিষ্যতে তিনি এমন কাজ আর করবেন না। বীরেন রমার মাকে প্রণাম করে বাড়ী চলে গেল।

কিছুদিন পরে ক্লাস শেষ হলে পথে কথাপ্রসঙ্গে বীরেন রমাকে বল্লে—"তোমার মা বড়ই ভাল। আমার বাবাও আমাকে খুব স্নেহ করেন, মা চলে যাওয়া অবধি প্রায় কুড়ি বৎসর নিজে বসে থেকে আমাকে খাওয়ান, কলেজ থেকে ফিরে আসতে একটু দেরী হলে বাবা আমার জন্য পথে দাঁড়িয়ে থাকেন, রাত্রিতে এখনও পাশে শুইয়ে একখানি হাত আমার গায়ের উপর না রাখলে তাঁর ঘুমই আসে না। বাবা সর্ব্বদাই চেষ্টা করেন যে মায়ের অভাব যেন আমি বুঝতে না পারি। এত যত্ন সত্ত্বেও আমার মনে হয় যেন আমার জীবনটা ফাঁকা। রমা জান, আমি ভাবি যে 'মা' বলে ডাকতে না পায়, তার মত হতভাগ্য জগতে আর কেউ নেই। সূর্য্যের আলো অন্ধকে অথবা কোকিলের মিষ্ট কুহুস্বর বধিরকে যেমন কোন আনন্দ দিতে পারে না তেমনি বাবার আদর ও স্নেহ আমার কাছে যেন বিফল মনে হয়। রমা তোমার জীবন আমার জীবনের মতো শূন্য ও নীরস মনে হয়? রমা বীরেনের মর্ম্মস্পর্শী কথাগুলি শুনে কোন জবাব দেয় নাই, কিন্তু বাড়ী এসে বীরেনের ভাষায় তার ব্যথার কাহিনী মাকে জানিয়েছিল। রমার মা তখনই কেঁদে ফেললেন; রমা তাতে বিস্মিত হয়নি; কিন্তু সুবর্ণা যখন ঐ কথা শুনে তার ঘরে দরজা বন্ধ করে উপুড় হয়ে কান্না সুরু করলে—শুধু রমা নয়—রমার মা পর্য্যন্ত হতবুদ্ধি হয়ে ভাবতে লাগলেন—সুবর্ণার মাথার কি গোলমাল আছে? কিছুক্ষণ পরেই

সুবর্ণা সংযত হয়ে সংসারের করণীয় কাজ আরম্ভ করে দেওয়ায় রমার মা ভাবলেন যে নারীমাত্রই কম বেশী স্নেহ-প্রবণা হয়ে থাকে।

রমা ও বীরেনকে অবলম্বন করে তাদের পরিবার দুটি ক্রমশঃই ঘনিষ্ঠ হতে লাগল। রমার মা বীরেনকে বীরু বলে ডাকতেন, রমাও তাকে বীরুদা বলে ডাকত। পারস্পরিক সুখ সম্পদে কিম্বা আপদ বিপদে পরিবার দুটি কখনও নিশ্চিন্ত ও উদাসীন থাকত না। বীরেনের আই-এ-এস পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর থেকেই পাসের সংবাদের জন্য বীরেনের বাবা গোপেনবাবু যেমন ব্যস্ত ছিলেন, রমার মাও সেজন্যে কম উৎকণ্ঠিত ছিলেন না। যেদিন সংবাদ এল যে বীরেন আই-এ-এস পরীক্ষায় সেকেণ্ড এবং ছয়জন বাঙ্গালীর মধ্যে ফাষ্ট হয়েছে, দুই পরিবারেরই হর্ষের আর সীমা রহিল না। রমার মা মনে করলেন যেন তাঁর নিজের ছেলেই আই-এ-এস হয়েছে, তাই তিনি তার পরদিনই রমার ও বীরুর তিন চারজন বন্ধু, বীরুর বাবা গোপেনবাবু এবং বীরুকে সন্ধ্যাবেলায় নিমন্ত্রণ করলেন। গোপেনবাবু আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কারও বাড়ীতে কোন অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণে যেতেন না, কিন্তু রমার মায়ের অনুরোধ তিনি এড়াতে পারলেন না। সেদিন সকালে উঠে অবধি সুবর্ণা এমনভাবে কাজ করছে, বাড়ীঘর এমনভাবে সাজাচ্ছে যাতে সেদিনকার উৎসবে কোন খুঁত না থাকে। কিন্তু যত বেলা যাচ্ছে সুবর্ণা যেন বেশী চঞ্চল ও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে। সন্ধ্যার মধ্যে সে তার সব কাজই করেছে, কিন্তু বীরু ও গোপেনবাবু এসেছেন জেনেই সুবর্ণা রমাকে জানাল যে তার বুকে এমনি ব্যথা ধরেছে যে সে আর দাঁড়াতে পারছে না, কোন উত্তর পাবার আগেই সুবর্ণা তার ছোট ঘরটার দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। রমার মা একথা শুনে কোন হৈ চৈ করেন নি, তবে তিনি সুবর্ণার উপর একটু বিরক্ত হলেন। খাওয়ার পর যখন সকলেই চলে গেলেন, রমার মা সুবর্ণার ঘরের নিকট গিয়ে সুবর্ণাকে বল্লেন যে তিনি ডাক্তার আনতে লোক পাঠাচ্ছেন। সুবর্ণা ঘরের ভিতর হতেই উত্তর দিলেন যে ডাক্তারের কোন প্রয়োজন নেই, সে শীঘ্রই সুস্থ হবে। তার পরদিন সকালে উঠেই তার কর্ত্তব্য কাজগুলি যখন সুরু করে দিয়েছে—রমার মা দেখলেন যে সুবর্ণার মুখখানি শুকিয়ে গেছে এবং তখনও যেন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে তার কষ্ট হচ্ছে। রমার মা প্রশ্ন করামাত্রই সুবর্ণা বললে যে মাঝে মাঝে তার এরূপ হয়ে থাকে, দু'তিনদিনের মধ্যে সে সুস্থ হয়ে উঠবে।

একদিন সুবর্ণা রমার মায়ের কাছে কথাপ্রসঙ্গে শুনলে যে গোপেনবাবু রমার সঙ্গে বীরেনের বিবাহের প্রস্তাব করেছেন এবং তিনি সে প্রস্তাবে মত দিয়েছেন; বীরেন ইহাতে আপত্তি করিয়াছে। যদি বীরেনের মত হয় তাহলে এম-এ পরীক্ষার পর তাদের বিবাহ হবে। ইহার চার পাঁচদিন পরে রমার মা দেখলেন—সুবর্ণা বাড়ীতে নাই। রমার মা চিন্তিত হয়ে রমাকে বললেন, যে গঙ্গাস্নান হতে ফিরবার পথে সুবর্ণা বোধহয় মোটর চাপা পড়েছে এজন্য থানায় একটা খবর দেওয়া দরকার। রমা থানায় পাঠাবার জন্য চিঠি লিখতে গিয়ে দেখলে যে তার খাতার একটী পাতায় সুবর্ণার লেখা একটী পত্র। চিঠিখানি নিয়ে রমা তার মাকে শুনালে—

"মা রমা, আমার মত হতভাগিনী বোধহয় জগতে আর নাই, তুমি ও তোমার মা উভয়েই আমাকে ক্ষমা করো। আমি এমনই অধম যে তোমাদের আদর-যত্নের প্রতিদানে কিছুই করতে পারলাম না। তোমাদের কাছে আত্ম-পরিচয় দিবার সময়ে সত্যের গোপন করিয়াছিলাম এজন্যও আমি তোমাদের নিকট অপরাধী। তোমাদিগকে কোন কথা না বলিয়া জীবনের নূতন পথে যাত্রা করিতে বাধ্য হইলাম। তুমি যেমনি তরুণ ও কোমল তেমনি মধুর ও সুন্দর। আমার পূতিগন্ধময় জীবনের অতীত ইতিহাস তোমাকে জানাইব না—শুধু এইটুকুই বলিলাম যে বীরেন আমার গর্ভজাত পুত্র। মা বলে আমাকে ডাকিতে পারে নাই বলিয়া সে সমস্ত জগৎ ফাঁকা দেখে, একথা তোমার নিকট সে বলিয়াছিল। ভগবানের নিকট কিছুই চাহিবার আমার সাহস নাই। সে কারণ তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা যে যদি সুযোগ আসে তাহা হইলে আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে বীরেন যেন আমাকে একবার মা বলিয়া ডাকে।"

ইতি সুবর্ণা

রমার চিঠি পড়া শেষ হলে সে সব রহস্য বুঝতে না পারলেও তার মার বুঝতে কিছুই বাকী থাকল না। রমার

মা কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হয়ে থেকে চিঠিখানি রমার হাত থেকে নিজে নিয়ে তাহা সাবধানে নিজের বাক্সে রেখে দিলেন। রমাকে তিনি বললেন—"তুমি এ জন্য দুঃখিত হয়ো না। অসৎ সংসর্গ দূরে যাওয়াই গৃহের মঙ্গল।" রমা কিন্তু মার নির্ম্মম বিচারে সন্তুষ্ট হয়নি, কিন্তু সে প্রতিবাদ করতে সাহস করলো না। রমার মা আরও ভাবতে লাগলেন যে যার মা কুলটা ও পতিতা তার ছেলের যতই প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠা থাকুক না কেন, তার সঙ্গে রমার বিয়ে দেওয়া উচিত হবে না।

দুই এক সপ্তাহের মধ্যে সুবর্ণার ঐ চিঠির বিষয় কথা-প্রসঙ্গে বীরেনের কাণে উঠিল। লজ্জা ও ঘৃণায় অভিভূত হয়ে সে বুঝিতে পারিল কেন তার পিতা কোন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মিশিতেন না; কি গভীর গ্লানির মধ্যে কেবল তাকেই মানুষ করার জন্য তিনি সারাটি জীবন কাটিয়ে এসেছেন। সে তাহার বাবাকে তখন কিছুই বলিল না—পাছে তিনি পুত্রের নিকট তার মায়ের ঘৃণাময় জীবনের জন্য লজ্জা বোধ করেন। সে শুধু এই কথা তাঁহাকে বলিল—যেন তিনি তার বিয়ের জন্য আর অগ্রসর না হন; তাহার কারণ রমাই সমস্ত খুলিয়া বলিবে। সেই দিনই বীরেন রমাকে যে চিঠি পাঠিয়েছিল রমা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই চিঠির নকল দরোয়ান দিয়ে বীরুদার বাবার কাছে পৌছে দিয়েছিল;—

"প্রিয় রমা,

তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ যে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের জন্য তোমার মা ও আমার বাবা প্রস্তুত হচ্ছিলেন, কিন্তু আমি এ সম্বন্ধে মত দিই নাই। যাকে তুমি দাদা বলে ডেকেছ, যে তোমাকে ছোট বোনের মত স্নেহ করে এসেছে, তাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ হতেই পারে না। আইনের কোন বাধা না থাকলেও আমার তো বিবেক ও বিচারবুদ্ধি আছে। মানুষ যদি বিবেক অনুসারে কাজ না করে তবে বন জঙ্গলের পশু ও মানুষের মধ্যে প্রভেদ থাকবে কিসে? আমার ইচ্ছা যে তোমার মা তোমার বিয়ে আমার বন্ধু শচীনের সঙ্গে দেন। সেও আই-এ-এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে নিশ্চয়ই তুমি সুখী হবে।

আমি স্থির করেছি যে আমি এখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিব এবং স্বামী বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমাজ-সেবা করবো—যাতে বাংলা দেশে আদর্শ জননী ও আদর্শ পুত্রের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে ওঠে। মায়ের যে রক্তে আমার এই দেহের সৃষ্টি হয়েছে সমাজের কল্যাণের জন্য ও মাতৃত্বের গৌরব রক্ষার জন্য আমার সেই দেহ-মন ও প্রাণ উৎসর্গ করিলাম। ব্রহ্মচর্য্য সাধনই আমার মায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমি বরণ করিয়া লইলাম।

মায়ের ইচ্ছা ছিল যে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হওয়া এবং তাঁকে 'মা' বলিয়া একবার ডাকা। কিন্তু তাহা আর সম্ভব হল না। ইহাতে তাঁর বা আমার কোনও শান্তি হতো না। 'মা' বলে ডাকলে আকাশে তার প্রতিধ্বনি শোনা যেত, কিন্তু মা ডাকে যে অমৃতধারা মাতৃহৃদয় হইতে আপনা-আপনি বিচ্ছুরিত হয় সে ধারা মায়ের পাপের তাপে ও অনুশোচনার জ্বালায় নিশ্চয়ই শুকিয়ে গিয়েছে। যদি কখনও তাঁর দেখা পাও মাকে এই চিঠির মর্ম্ম জানিয়ে দিও। তুমি আমার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ নিও এবং তোমার মাকে আমার প্রণাম জানিও।"

ইতি বীরুদা

সেই দিন সন্ধ্যায় বাবাকে প্রণাম করে চিরদিনের জন্য বাড়ী ছেড়ে বীরেন আলমোড়ায় রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়েছিল। তার অনুরোধ অনুসারে গোপেনবাবু তাঁর বাড়ীখানি উইল করে রমাকে দিলেন এবং মিশনের হিন্দু ধর্ম্ম ও কৃষ্টি অনুসারে যে হিন্দু নারী শিক্ষা মন্দির হয়েছে তাঁর অন্যান্য বিষয়-সম্পত্তি সেই শিক্ষা মন্দিরে দান করিলেন। বীরেন সন্ন্যাস নেওয়ার এক মাসের মধ্যেই গোপেনবাবু দেহত্যাগ করলেন।

সুবর্ণা সংবাদপত্রে পড়েছিল যে বীরেন তাঁর মায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেছে। এ কথা জানবার পর সুবর্ণা মরে নাই, কিন্তু তার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

বিভূতিভূষণের কথাশিল্প

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম পর্ব : স্রষ্টা

অতি প্রাচীন সংস্কৃত নাটক শূদ্রক বিরচিত 'মৃচ্ছকটিকে'র নান্দীতে দেবাদিদেব মহাদেবের দুইখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রথমখানিতে মহাদেব একা, স্থিরশূন্যদৃষ্টি, সর্প-বিভূষিত ; অন্যটিতে হরগৌরীর যুগল মূর্তি, বিদ্যুল্লেখার ন্যায় গৌরীর গৌর ভুজলতা মহাদেবের শ্যামকণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আছে। নাট্যকার নাটকখানিতে বিগত-বৈভব নায়ক চারুদত্তের ভাগ্য-পরিবর্তন দেখাইতে চাহিয়াছেন। শেষ পর্য্যন্ত চারুদত্ত বিভব এবং প্রেয়সী বসন্তসেনা—দুই-ই লাভ করিয়াছে। রিক্ততা হইতে স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে, শূন্য-সংসার হইতে আনন্দময় পূর্ণ সংসারের দিকে নাটকখানির গতি, তাই নান্দীভাগে দেবাদিদেব মহাদেবের দুই বিপরীত রূপ-চিত্রণ।

ভারতবাসীর চিরন্তন জীবন-স্বপ্ন এই সু-প্রাচীন নাটকের নান্দীতে বিধৃত হইয়াছে। কোলাহলে নয়, সংঘর্ষে নয়, নিরুপদ্রব সহজ সুন্দর জীবনায়নের আকাঙ্ক্ষা তাহাদের চিরকালের। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য এইজন্যই অশুভান্তক হইত না। এই স্বপ্ন ভারতবাসীর এখনও আছে, তবে ইংরেজ আসিবার পর ইংরেজি সাহিত্যের ট্রাজেডির গৌরব নিঃসন্দেহে কিছুটা প্রভাবিত করিয়াছে ভারতীয় সাহিত্যিকদের। সাহিত্যে জীবন রূপায়িত হয়, জীবনের সমালোচনাই সাহিত্য। ইংরেজি সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতীয় সাহিত্যবোধে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয়। পৃথিবীতে সুখও আছে, দুঃখও আছে, জীবনের আনন্দ-বিলাস এবং কঠিন বাস্তবের আঘাত-সংঘাতে জীবনের ব্যথা-বিপর্যয়—দুই-ই সংসারে সত্য। আধুনিককালে মানুষের জীবনযাত্রা বিরল-অবসর এবং বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া এযুগের সাহিত্যিক ট্রাজেডিকে অস্বীকার করেন না। তবু আজও ভারতীয় সাহিত্যিকের মানসলোক যখন নির্বাধ অনুভূতিতে মুখর হইয়া উঠে, তখন ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা জন-মনের দর্পণস্বরূপ কবি-মানসে প্রতিফলিত হয়। এ অবস্থায় সংবেদনশীল হৃদয়বান লেখক শান্তভাবের শিল্পী না হইয়া পারেন না। এই লেখকদের মধ্যে আবার যাঁহারা আপন যুগের আপাত-কঠোর সমস্যা সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত উদাসীন (সম্পূর্ণ উদাসীন হওয়া অত্যন্ত বড় সাহিত্যিকের পক্ষে সম্ভব নয়) এবং যাঁহাদের মন বৃহৎ জীবন-দর্শনে আলোকিত, তাঁহাদের সৃষ্টি স্বভাবতই যুগের দাবী ছাড়াইয়া সিদ্ধরসের গৌরবে চিরকালের সম্পদ হইয়া উঠে। সমকালীন সাহিত্যিকদের সহিত হয়তো তাঁহাদের ততটা মিল থাকে না, যুগের তথাকথিত জ্বলন্ত প্রশ্নসমূহ তাঁহাদের লেখায় অগ্রাধিকার পায় না বলিয়া হয়তো যুগোন্মাদনায় উত্তেজিত একশ্রেণীর পাঠকের কাছে সে লেখা বিস্বাদ বোধ হইতে পারে ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রসিক-হৃদয়ে তাঁহাদের আবেদন অনস্বীকার্য। কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই শ্রেণীর লেখক। যে যুগে তিনি বাংলা-সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা সত্যই প্রশ্নের যুগ। তিনি কিন্তু স্থিরপ্রজ্ঞ ছিলেন। সাহিত্যিক-চিত্ত-বৈকল্যকারী সমসাময়িক ভাবসমূহের উত্তেজনা হইতে সাধকোচিত দৃঢ়তায় তিনি আপনাকে বহুলাংশে মুক্ত রাখিয়াছিলেন। পরে আলোচনা করিয়া দেখানো হইবে বুদ্ধদেব বসু তাঁহার বিপরীত-প্রান্তীয় লেখক, কিন্তু বিভূতিভূষণের মানস-স্থৈর্য অভিনন্দিত করিয়া বুদ্ধদেব বসুও বলিয়াছেন—"This extremely fortunate mental composition (we may call it composure) has enabled Bibhutibhusan to steer clear of the triple temptation of Bengali literature : Patriotism (in those debased forms where it becomes either jingoism or provincialism), reformist zeal (leading to journalistic tantrums) and pathology (Popularly known as psychology). [An Acre of Green Grass (1948), P. 89].

অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীভাবের সংযোগে শমভাব শান্তরসে পরিণত হয়। শমভাব একটি স্থায়ীভাব এবং ইহার অর্থ বিষয়ের প্রতি অনুরাগহীন মনের আত্মায় বিশ্রাম সুখ ভোগ। কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বলিয়াছেন :—"সকল রসের উপর শান্তরসের প্রতিষ্ঠাই ভারতীয় কবির কবিধর্ম। মানুষের বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ কঠোর নিয়তি, বাসনা-কামনার স্বর্গ-নরকব্যাপী আলোড়ন, সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ট্রাজেডির অনুভাবনা ভারতীয় কবিকল্পনাকে বিপথগামী করিতে পারে নাই" (আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ১ম সংস্করণ, পৃঃ—২২)। ঠিক আভিধানিকভাবে এই অর্থে না হইলেও মোটামুটি জটিল সমস্যাসঙ্কুল জীবনযাত্রা ভারতবাসীর কাম্য নয় বলিয়া এবং নিরুদ্বিগ্ন সরল-সুন্দর জীবনের জন্য ভারতবাসীর মন সাধারণভাবে উন্মুখ বলিয়া ভারতীয় জীবনে শান্তরসের একপ্রকার প্রাধান্য রহিয়াছে বলা চলে। ভারতের মধ্যে সবচেয়ে শ্যামল দেশ বাংলা এবং সবচেয়ে সরস মন বাঙ্গালীর,—একথা বহুপ্রচলিত। সেই অর্থে বাঙ্গালীর মনে শান্ত-ভাবের আবেদন স্বাভাবিক। যুগে যুগে বাঙ্গালী-মানসের রূপকার বাঙ্গালী লেখকের রচনায়ও তাই শান্তভাবের প্রাধান্য দেখা যায়। বিভূতি-ভূষণও এই পথের পথিক। প্রথম মহাযুদ্ধের আলোড়নে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মূল্যবোধের কিছুটা পরিবর্তন হইয়াছিল। তাঁহার সমসাময়িক কোন কোন সাহিত্যিক শান্তভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। বিভূতিভূষণ কিন্তু প্রশান্ত ধৈর্যে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার নিজস্ব মূল্যায়ন-রীতিতে যে পরিবর্তন তিনি কল্যাণকর মনে করিয়াছেন,

তাহা তিনি সানন্দে স্থান দিয়াছেন তাঁহার সাহিত্যে; কিন্তু 'যাহা প্রচলিত বা পুরাতন তাহাই অস্বীকার করিতে হইবে',—এইরূপ নৈরাজ্যবাদী মনোভাবে তাঁহার কোন আস্থা ছিল না। তিনি বাস্তবকে অস্বীকার করিয়া যেমন তুরীয়ভাবে ভাবিত হন নাই, তেমনি আবার কালের সংকীর্ণ গণ্ডীতে বাঁধা পড়েন নাই। মহান সাহিত্যিকের ইহাই লক্ষণ। বিভূতিভূষণের সৃজন-বৈশিষ্ট্য পরে আলোচিত হইবে, উপস্থিত একথা বলিলেই চলিবে যে, ভাববাদী শিল্পধর্ম তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয় হইলেও জীবনের ছবি তিনিও আঁকিয়াছেন, মানুষ লইয়া তাঁহারও কারবার। তবে তাঁহার জগৎ শুধুমাত্র রুক্ষ-ধূসর নয়, তাঁহার চরিত্র শুধুমাত্র জটিল মনস্তত্ত্বের রেখাচিত্র নয়। মানুষকে ফুটাইবার চেষ্টায় তাঁহার একান্ত দৃষ্টি ছিল মানবতার মর্মসন্ধানের দিকে, মানুষের আত্মার স্বরূপ-রূপায়নের দিকে, ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনের শাশ্বত সম্পর্ক নির্ধারণের দিকে।১ এ হিসাবে তাঁহাকে টলষ্টয়, রোমা রোলাঁ বা কবি রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য বলা যায়। অবশ্য এই প্রসঙ্গে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, বিভূতিভূষণের জীবন দর্শন বা ভাবদৃষ্টি সম্পর্কে যে সব আলোচনা করা হইতেছে তাহাতে প্রধানতঃ পথের-পাঁচালী—অপরাজিত—আরণ্যক শ্রেণীর উচ্চাঙ্গের রচনাই সম্মুখে রাখা হইতেছে। লেখককে তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির নিরিখেই বিচার করা উচিত। মানুষের মহত্ব যেমন তাহার শ্রেষ্ঠতম মুহূর্তের আত্মপ্রকাশেই স্ফুরিত হয়, দৈনন্দিন সাধারণ জীবনে নয়, লেখকেরও তেমনি সব লেখা সমান-মানের না হইলেও যেগুলি তাঁহার সত্যকার উচ্চশ্রেণীর রচনা, সেইগুলি দিয়াই তাঁহাকে বিচার করিতে হইবে। এ সম্পর্কে সমরসেট মমের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য :—প্রত্যেক লেখকের তাঁহার শ্রেষ্ঠ-সৃষ্টির দ্বারা বিবেচিত হইবার অধিকার আছে।২

বঙ্কিমচন্দ্র গদ্য লেখক ছিলেন, কিন্তু রচনা তাঁহার কাব্য-বিভূতি মণ্ডিত। কবিত্ব-সমৃদ্ধ গদ্য রচনা রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব বলা চলে। শুধু ভাষার দিক হইতে নয়, ভাবের দিক হইতেও বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথে এই কবি-ধর্ম বহুস্থলেই পরিলক্ষিত হয়। বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যেও এই কবি-চেতনার ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। গল্প-উপন্যাসে কাব্য-প্রবণতা সাধারণত বর্ণনার-অবকাশেই দেখা যায়, বিভূতিভূষণের কবি-রূপ কিন্তু তাঁহার প্রতিনিধিত্বমূলক রচনার সর্বত্র ছড়াইয়া আছে। কথাসাহিত্যের প্রচলিত রচনারীতির দিক হইতে বিভূতিভূষণের রচনা সর্বাঙ্গসুন্দর নয়। বিষয়বস্তুর বাস্তবতা, ঘটনার সন্নিবদ্ধতা, চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, বৈচিত্র্য এবং যুগ-সংঘাতে ইহার উপর প্রতিক্রিয়া, কাহিনীর অগ্রগতি ও নাটকীয়তা, —এই সবই কথাসাহিত্যের, বিশেষ করিয়া উপন্যাসের, প্রধান বিচার্য-বিষয়। পৃথকভাবে দেখিলে বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যে এই সকল দিক হইতে অনেক ত্রুটি আছে। কিন্তু তবু সমগ্রভাবে বিভূতিভূষণের সৃষ্টি যে রসোত্তীর্ণ হইয়াছে, তাঁহার কবিসুলভ ভাব-দৃষ্টি তজ্জন্য বহুলাংশে কৃতিত্ব দাবী করিতে পারে। কবি-চেতনা বিভূতিভূষণের শিল্পরীতি ক্ষতিগ্রস্ত করে নাই, বরং পূর্বোল্লিখিত ত্রুটিসমূহের জন্য যে ক্ষতি প্রায় অনিবার্য ছিল, তাহা পূর্ণাংশে না হইলেও আংশিকভাবে প্রতিরোধ করিয়াছে। বিভূতিভূষণের বিপুল জনপ্রিয়তার মূল হইল তাঁহার স্নিগ্ধ শিল্পকলা। এই শিল্পকলা বলিতে বিষয়-বস্তু, ভাব এবং আঙ্গিক,—সবই বুঝায়। বিভূতিভূষণের বৈশিষ্ট্য তাঁহার অসাধারণ মানবপ্রেম, নিষ্কলুষ সহজ জীবন ধর্মের প্রতি অনুরাগ, প্রকৃতির সহিত একাত্মতার মত সুগভীর প্রকৃতি প্রীতি, প্রকৃতিকে জীবস্বরূপে, বলিতে গেলে চরিত্ররূপে, রচনায় স্থান দান এবং সর্বোপরি জীবনের মূল সুরের বা আত্মার অনুসন্ধান। তাঁহার কথাসাহিত্যের এই উদার পটভূমিকায় কাব্যিক রচনাশৈলী চমৎকার মানাইয়া গিয়াছে। এ হিসাবে তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি পথের পাঁচালী আরণ্যকে পাশে—কবি-চেতনা অপেক্ষাকৃত সঙ্কুচিত করিয়া মোটামুটি উপন্যাসের বস্তুতান্ত্রিক আদর্শের উপর লেখা 'বিপিনের সংসার', 'অথৈজল' 'দুইবাড়ী' অনেক দুর্বল রচনা বলিয়াই মনে হয়। এমন কি 'অনুবর্তন' বা 'আদর্শ হিন্দু হোটেলে'র মত যে বস্তুধর্মী উপন্যাসে বিভূতিভূষণ যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, সেগুলিও পথের পাঁচালী বা আরণ্যকের পাশে দাঁড়াইতে পারে না।

অবশ্য কবিত্ব সব জায়গায় যে বিভূতিভূষণের সৃষ্টিকে মহিমান্বিত করিয়াছে এমনও নয়। কথাসাহিত্যে জীবন রূপায়িত হয় বলিয়া বাস্তবের সেখানে নিজস্ব ও অপরিহার্য্য মূল্য আছে। বিভূতিভূষণের, কবি-চেতনা কোন কোন স্থানে বাস্তবতা এমনভাবে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, যাহা সত্যই আধুনিক উপন্যাসে গৌরবসূচক বিবেচিত হইতে পারে না। কল্পনাপ্রবণ রোমান্স এবং ভাবধর্মী উপন্যাস এক জিনিস নয়। কিন্তু বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়া কল্পনার অশ্ব অবাধে ছুটাইয়া দিয়া বিভূতিভূষণ মাঝে মাঝে রচনাকে রোমান্সের পর্যায়ে তুলিয়াছেন। কোন কোন জায়গায় এমনও হইয়াছে যে, যাহা অনিবার্য, এমন কি যুগধর্মে যাহা অপরিহার্য, সেইরূপ পরিণতির প্রতি কটাক্ষ করিয়া তিনি আপন অনুভূতির গৌরব প্রতিষ্ঠিত

১ 'ভারতবর্ষ' গ্রন্থের 'চীনেম্যানের চিঠি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিম্নোদ্ধৃত যে কথা বলিয়াছেন তাহা এইপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :—"ভারতবর্ষ সমাজকে সংযত সরল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ হইবার জন্য নহে। নিজেকে শতধাবিভক্ত অন্ধ চেষ্টার মধ্যে বিক্ষিপ্ত না করিয়া, সে আপন সংহত শক্তিকে অনন্তের অভিমুখে একাগ্র করিবার জন্যই ইচ্ছাপূর্বক বাহ্যবিষয়ে সংকীর্ণতা আশ্রয় করিয়াছিল। নদীর তটবন্ধনের ন্যায় সমাজবন্ধন তাহাকে বেগদান করিবে, বন্দী করিবে না, এই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। এই জন্য ভারতবর্ষের সমস্ত ক্রিয়াকর্মের মধ্যে সুখশান্তি সন্তোষের মধ্যে মুক্তির আহ্বান আছে—আত্মাকে ভূমানন্দে ব্রহ্মের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্যই সে সমাজের মধ্যে আপন শিকড় বাঁধিয়াছিল।—রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ—৪১৪-৪১৫।

২ "Every author has right to be judged by his best."

—Somerset Maughm,—Ten Novels and their Authors (1954), P. 197.

করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কবিতায় এরূপ করিতে পারেন, কিন্তু কথা-সাহিত্যে করেন নাই। বিভূতিভূষণের 'আরণ্যকে' পার্বত্য অঞ্চলে জনবসতি স্থাপিত হওয়ার প্রসঙ্গটি দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক। পৃথিবীর ইতিহাসে আঞ্চলিক জনবাহুল্যের ও কর্মসংস্থান সমস্যার সমাধানকল্পে জনবিরল এলাকায় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা বারবার হইয়াছে। জন্মভূমির প্রতি মমতা মানুষের স্বাভাবিক, তবু স্বদেশে যাহাদের অন্ন জুটে না, দেশান্তরে ঘর বাঁধিয়া তাহারা চিরকালই অন্নসংস্থানের চেষ্টা করে। এই রীতি শুধু অর্থনীতির দিক হইতে নয়, পৃথিবীতে শান্তি-রক্ষার এবং মানব সভ্যতা বিকাশের দিক হইতেও গুরুত্বপূর্ণ। অতীত জীবন, শিক্ষাদীক্ষা বা মানসিক প্রস্তুতি অনুযায়ীই এই নবাগতদের রুচি বা জীবনযাত্রা গড়িয়া উঠে। তাহাদের দেশত্যাগ যদি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে মানিয়া লওয়া যায়, তাহাদের জীবনযাপন-প্রণালীর জন্য বিরক্ত বা ক্ষুন্ন হওয়া কাজের কথা নয়। কবি নিরঙ্কুশ, কিন্তু ঔপন্যাসিক প্রাণের আবেগে সুন্দরের জন্য সত্যের কণ্ঠরোধ করিতে পারেন না। বিভূতি-ভূষণ এইস্থলে কিন্তু তাহাই করিয়াছেন বলা চলে। অবাধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত পার্বত্য অরণ্যাঞ্চলে বস্তির পর বস্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। পতিত জনশূন্য ভূমিভাগে বহুসংখ্যক মানুষের আশ্রয় ও জীবিকার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাছাড়া যে উৎপাদিকা শক্তি এ অঞ্চলে অব্যবহৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার ব্যবহারে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রকৃতি-প্রেমিক বিভূতিভূষণ কিন্তু গাছ কাটিয়া মানুষের এ বসবাসে তীব্র বেদনাবোধ করিয়াছেন। বিরক্তি তাঁহার এরূপ পর্যায়ে উঠিয়াছে যে, শান্তভাবাশ্রয়ী বিভূতিভূষণ নায়ক সত্যচরণের জবানীতে এই অরণ্য-বিলোপের বহু-বিস্তৃতি কল্পনা করিয়া আতঙ্কে ব্যঙ্গাত্মক হইয়া উঠিয়াছেন। লবলুটিয়া অঞ্চলে বস্তি গড়িয়া উঠিয়াছে, লবলুটিয়া হইতে বহুদূরে ধন্ঝরি শৈলমালার অন্তর্গত চকমকিটোলা অঞ্চল তখনও শান্ত সৌন্দর্যময়ী। এখানেই থাকে সত্যচরণের মানসী পার্বত্য কন্যা ভানুমতী। সত্যচরণ ভাবিতেছে—এই এলাকায়ও যদি তামার খনি বাহির হইয়া পড়ে তাহা হইলে:—

"তামার কারখানার চিমনি, ট্রলি লাইন, সারি সারি কুলি বস্তি, ময়লা জলের ড্রেন, এঞ্জিন-ঝাড়া কয়লার ছাইয়ের স্তুপ···দোকান ঘর, চায়ের দোকান, সস্তা সিনেমায় 'জোয়ানী হাওয়া' 'শের শমসের' 'প্রণয়ের জের' (ম্যাটিনিতে তিন আনা, পূর্বাহ্নে আসন দখল করুন)—দেশী মদের দোকান, দরজীর দোকান।

হোমিও ফার্মেসি (সমাগত দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়)। আদি ও অকৃত্রিম আদর্শ হিন্দু হোটেল।

কলের বাঁশিতে তিনটার সিটি বাজিল।

ভানুমতি ঝুড়ি মাথায় করিয়া এঞ্জিনের ঝাড়া কয়লা বাজারে বিক্রী করিতে বাহির হইয়াছে—ক-ই-লা চা-ই-ই—চার পয়সা ঝুড়ি।***"

—এটি হইল কাব্যিক ভাবাধিক্যের উদাহরণ। কোন কোন সময় কাব্যিক ভাষার জন্যও বিভূতিভূষণের বিষয়বস্তু অস্পষ্ট হইয়া যায়। তাঁহার ডায়েরীগুলিতে এই অস্পষ্টতার অনেক নিদর্শন আছে। উপন্যাসেও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। 'পথের পাঁচালী" খুবই উচ্চাঙ্গের রচনা, ইহাতে বিষয়বস্তুর সহিত ভাষার চমৎকার সমন্বয় ঘটিয়াছে। তবু এখানেও লেখকের কাব্যপ্রবণ প্রকাশভঙ্গি কয়েকস্থানে বক্তব্যকে স্পষ্টতর করার পরিবর্তে অস্পষ্ট করিয়াছে। তাছাড়া অনেক জায়গায় চরিত্রকে থামাইয়া দিয়া তিনি বর্ণনা-বিশ্লেষণের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।[৩] এইরূপ আত্মপ্রকাশ ঘটিলে ভাষার কারুকার্য স্বাভাবিক এবং তাহার ফলেও বর্ণালী শব্দঝঙ্কারে চরিত্র বা ঘটনা পাঠকমনে ম্লান হইয়া যাইতে পারে। 'পথের পাঁচালী' হইতে উদ্ধৃত নিচের দৃষ্টান্ত দুইটিতে কথাটা পরিষ্কার হইবে:—

প্রথমটিতে গ্রামের পাঠশালায় শ্রুতিলিখনের পর বালক অপুর মনের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। অপু কল্পনাপ্রবণ, শ্রুতিলিখন শুনিতে শুনিতে সে তাহার মনকে ভাসাইয়া দেয় আপন গণ্ডী ছাড়াইয়া দূর হইতে আরও দূরে। ভাবাতুর তাহার শিশুমন কল্পনা করে বড় হইয়া সে শ্রুতিলিখনে শোনা অজানা দেশটিকে দেখিতে যাইবে। এ পর্যন্ত খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ইহার পরই লেখকের অলঙ্কৃত বর্ণনাভারে পাঠকের দৃষ্টি হইতে অপুর মনের লঘু পক্ষদুটি যেন কুয়াশায় হারাইয়া যায়:—"কিন্তু সে বেতসী কণ্টকিত তট, বিচিত্রপুলিনা গোদাবরী, সে শ্যামল জনস্থান, নীল মেঘমালায় ঘেরা সে অপূর্ব শৈলপ্রস্থ, রামায়ণে বর্ণিত কোনো দেশে ছিল না। বাল্মিকী বা ভবভূতিও তাহাদের স্রষ্টিকর্তা নহেন। কেবল অতীত দিনের কোনো পাখী-ডাকা গ্রাম্য সন্ধ্যায় এক মুগ্ধমতি গ্রাম্য বালকের অপরিণত শিশু কল্পনার দেশে তাহারা ছিল বাস্তব, একেবারে খাঁটি, অতি সুপরিচিত। পৃথিবী-পৃষ্ঠে যাহাদের ভৌগোলিক অস্তিত্ব কোনোকালে সম্ভব ছিল না, শুধু এক অনভিজ্ঞ শৈশব মনেই সে কল্পজগতের প্রস্রবণ-পর্বত তাহার সতত সঞ্চরমান মেঘজালে ঢাকা নীল শিখরমালার স্বপ্ন লইয়া অক্ষয় আসন পাতিয়া বসিল!"

কবিত্বের আধিক্যে এইরূপ রচনার সরল প্রসাদ গুণহানির আর একটি দৃষ্টান্ত গ্রামপথে কিশোরী দুর্গার সঙ্গে নীরেনের দেখা হওয়ার দৃশ্যটি। নীরেন জরীপের তাঁবু হইতে ফিরিতেছিল, আম-বাগানের পথে হঠাৎ তাহার সহিত দেখা হইয়া গেল দুর্গার। ইতিপূর্বে দুজনকে চমৎকার মানায় বলিয়া গোকুলের স্ত্রী ইহাদের বিবাহের কথা তুলিয়া-ছিলেন এবং তদবধি দুর্গা সেই স্বপ্নই দেখিতেছে। নীরেন কথাটার

---

৩ এই কবিত্ব-ভাবাপন্ন লেখক বক্তা হইয়া যখন কথাসাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন তাহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় নিম্নরূপ মন্তব্য করিয়াছেন:—"কাব্যে কবির নিজের যুক্তি সহজে প্রকাশ করিবার সুযোগ ঘটে, তাই কাব্যে কবির ভিতরকার তত্ত্ব প্রকাশের চেষ্টা প্রায়ই সৌন্দর্যের হানি করে না। কিন্তু নাটক অথবা উপন্যাসে যখন কবি বা লেখক অন্যের মুখে আপনার কথা বলেন, তখন ভিতরকার তত্ত্বপ্রকাশ করিতে গেলে মানুষগুলার তত্ত্বের চাপে ছোট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে, থিওরির আওতায় তাহাদের বিকাশের প্রতিরোধ হইতে পারে।—বর্তমান বাংলা সাহিত্য, পৃঃ—১৫৮

উপর তেমন গুরুত্ব হয়তো দেয় নাই, কিন্তু এখন এই স্নিগ্ধ বনপথে রূপবতী কিশোরীকে দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গেল। সরল বর্ণনালোকে এই অনুপম দৃশ্যটি যখন ঝলমল করিতেছিল, তখন লেখকের অলঙ্কৃত কাব্যিক বর্ণনা ইহার সৌষ্ঠব বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাসই করিয়াছে :—"দুর্গাকে ইহার আগে নীরেন কখনো ভাল করিয়া দেখে নাই, চোখ দুটির অমন সুন্দর ভাব কেবল দেখিয়াছে ইহারই ভাই অপুর মধ্যে। যেন পল্লীপ্রান্তের নিভৃত চূত-বকুল-বীথির প্রগাঢ় শ্যামস্নিগ্ধতা ডাগর চোখদুটির মধ্যে অর্ধলুপ্ত রহিয়াছে। প্রভাত এখনও হয় নাই, রাত্রি শেষের অলস অন্ধকার এখনও জড়াইয়া। তবে তাহা প্রভাতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় বটে,—কত সুপ্ত আঁখির জাগরণ, কত কুমারীর ঘাটে যাওয়া, ঘরে ঘরে কত নবীন জাগরণের অমৃত উৎসব—জানালায় জানালায় ধূপগন্ধ।"

যাহা হউক, এইরূপ বিক্ষিপ্ত দুর্বল অংশের উপস্থিতি সত্ত্বেও বিভূতিভূষণের শিল্পরীতিতে চিন্তার বাহন গদ্য এবং অনুভূতির বাহন পদ্যের সার্থক সমন্বয় দেখা যায়। এইরূপ সমন্বয় দেখা যাইত মহাকাব্যে। রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের সামগ্রী' প্রবন্ধে বলিয়াছেন জ্ঞানের কথা প্রমাণ করিতে হয়, আর ভাবের কথা সঞ্চার করিতে হয়। বিভূতিভূষণ মূলতঃ ভাবধর্মী সাহিত্যিক, তাঁহার লেখায় জ্ঞানের কথা যতই থাক, ভাবের কথা তাহার চেয়ে বেশি। জীবনবোধ তাঁহার প্রশস্ত, রচনা তাঁহার সঞ্চারধর্মী। প্রধানত সাধারণ মানুষের সরল জীবনের কাহিনী তিনি রূপায়িত করেন বলিয়া তাঁহার লেখার আবেদন সর্বশ্রেণীর পাঠকের অন্তর স্পর্শ করে।৪ সহজ কথা সহজ করিয়া বলাই কঠিন, কঠিন কথা বলা মোটেই কঠিন নয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'খাপছাড়া' কাব্যের ভূমিকাস্বরূপ কবিতাটিতে এরূপ সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করিয়াছেন। বিভূতিভূষণ যে লোককান্ত হইয়াছেন তাহার একটা বড় কারণ—পাঠক তাঁহার সৃষ্টির সহিত অপরিচয়ের দূরত্ব অনুভব করে না।

বিভূতিভূষণের সাহিত্য মূলত হৃদয়প্রধান, বুদ্ধি-প্রধান নয়। বাংলা সাহিত্যে আমরা যাহাদের কল্লোলপন্থী বলি, তাঁহাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য। হৃদয়ধর্মী ভাববাদী লেখক বিভূতিভূষণ ইহাদের প্রায় সমসাময়িক হইয়াও বিপরীতপ্রান্তে অবস্থান করিয়াছেন। দূরপ্রসারী রোম্যান্টিক দৃষ্টির দিক হইতে কবি জীবনানন্দ দাসের সহিত বিভূতিভূষণের সাদৃশ্য লক্ষণীয়, কিন্তু জীবনানন্দের বুদ্ধি-প্রাধান্য বিভূতিভূষণে নাই। বিভূতিভূষণ সহজধর্মী লেখক, তাঁহার অন্তরে যে ভাব জাগিয়াছে, স্বতস্ফূর্তভাবে তাহা তাঁহার লেখায় প্রকাশিত হইয়াছে। জগৎ সংসার হইতেই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার বিষয়বস্তু, কিন্তু তাঁহার অন্তরের মাধুর্য-সিঞ্চিত হইয়া সেই বিষয়বস্তু একটা বিশেষ কমনীয়তা পাইয়াছে। রুদ্ররসও রস, ভয়ঙ্করকে স্বরূপে ফুটাইবার মধ্যেও লেখকের মুন্সিয়ানা অনস্বীকার্য। বিভূতিভূষণে কিন্তু এই 'রুদ্র' স্বরূপে ফুটিয়া উঠে নাই। তাঁহার সাহিত্যে বস্তুগতভাবে ভয়ঙ্করত্ব আছে, কিন্তু তাহার উপরও যেন লেখকের শান্ত ভাবদৃষ্টির পেলব প্রলেপ পড়িয়াছে।৫ হিংস্র জটিলতা ফুটাইবার ক্ষেত্রেও তাই, শরৎচন্দ্রের গোলোক চাটুয্যে, বেণী ঘোষাল বিভূতিভূষণে অনুপস্থিত। তাঁহার আরণ্যকে প্রকৃতির ভয়াল কঠোর রূপ-চিত্রণের যথেষ্ট সুযোগ ছিল, কিন্তু বিভূতিভূষণ তাঁহার মনোধর্মের তাগিদেই যেন আরণ্যকের সুবিশাল শান্তশ্রী ফুটাইবার সাধনা করিয়াছেন। এইখানেই প্রকৃতি-শিল্পী টমাস হার্ডি বা আর্নেস্ট হেমিংওয়ের সহিত বিভূতিভূষণের পার্থক্য। হার্ডি 'রিটার্ণ অফ দি নেটিভ' গ্রন্থে 'এগডন হিথ' প্রান্তরটি যেভাবে আঁকিয়াছেন, বিভূতিভূষণের প্রান্তর-অরণ্য সেরূপ রুক্ষ বা মানুষের প্রতিকূল-শক্তির স্মারক নয়। আগেই বলা হইয়াছে, অন্তরধর্মের দিক হইতে বিভূতিভূষণ রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য। রবীন্দ্রনাথও ভয়াল ভয়ঙ্করকে কুণ্ঠাহীনভাবে ফুটাইতে পারেন নাই। শান্তভাবের দিকে তাঁহারও প্রবণতা লক্ষণীয়।৬

আবেগ-প্রবণ বা উচ্ছ্বাসবহুল যে সব সাহিত্যিকের রচনারীতি, তাঁহাদের নরনারীর প্রেমবর্ণনার আপেক্ষিক সুবিধা আছে। বাংলা কথাসাহিত্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল যে প্রেম চিত্রণে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, বর্ণাঢ্য ভাষা বা প্রকাশভঙ্গিই তাহার সবচেয়ে বড়দিক। বিভূতিভূষণের সাহিত্যে কাব্যগত আবেদন গভীর হইলেও নরনারীর প্রেমের বর্ণনায় তিনি কিন্তু আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার লেখায় প্রকৃতি অনুপমভাবে ফুটিয়াছে, বাৎসল্যরস ফুটিয়াছে চমৎকার, মানবতার আবেদনও ইহাতে অপরিমেয়, কিন্তু নরনারীর জৈবিক আকর্ষণগত প্রেমের রূপায়ণে

---

৪ ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক সহরে 'পথের পাঁচালী'র চিত্ররূপ প্রদর্শিত হইতেছিল। বিখ্যাত চিত্র সমালোচক আর্চার উইনস্টেন ছবি দেখিয়া কাহিনী-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন :—"The picture has a story so universal and simple that it is no story at all. This is what it is to live in an Indian village."

(Hindusthan Standard—3.11. 1958)

৫ তাই দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের গোরার সমস্ত উদ্দামতা শেষ পর্যন্ত আনন্দময়ীর পদতলে নিঃশেষিত হইয়াছে, সন্দীপ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে নিখিলেশের প্রশান্ত প্রতিরোধে, 'চার অধ্যায়ের' অগ্নিদাহ অতীনের কণ্ঠলগ্না এলার অশ্রুজলে নিভিয়া গিয়াছে।

৬ ম্যালেরিয়া আর দারিদ্র্যে মুমূর্ষু জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগর গ্রামের বর্ণনায় বিভূতিভূষণ নিচের লাইন দুটি যেভাবে লিখিয়াছেন, তাহাই তাঁহার ভয়াল ভয়ঙ্করকে বর্ণনার চরম রূপ মনে করা যাইতে পারে :—"সেই বনজঙ্গলে ভরা গ্রামখানির ওপর ধ্বংসের দেবতা যেন উপুড় হয়ে পড়ে আছেন, তাঁর করাল কালো ডানার ছায়ায় সারা গ্রাম অন্ধকার।"

—অভিযাত্রিক, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ—৭

তাঁহার সাফল্য খুবই সীমাবদ্ধ। স্নিগ্ধ রসের রসিক তিনি, জটিল জীবনায়নে অনুপ্রবেশের প্রয়োজন যেন তিনি অনুভব করেন নাই। সহজ জীবনধর্মের রূপশিল্পী বিভূতিভূষণের হাতে অপরাজিতে অপর্ণা-অপুর অথবা ইছামতীতে তিলু-ভবানীর দাম্পত্য প্রেমচিত্র হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, কিন্তু বিবাহ-নিরপেক্ষ নরনারীর দুর্বার ভালবাসা তাঁহার হাতে খোলে নাই। এই অসামাজিক প্রেমের যে রূপোজ্জ্বলতা, সর্বস্ব বাজি ধরিয়া ঈপ্সিত পথে অগ্রসর হইবার যে আকুতি, ইহার জ্বলিবার এবং জ্বালাইবার যে ক্ষমতা, বিভূতিভূষণের রচনায় তাহার পরিচয় কদাচিৎ মেলে। ঠিক পবিত্রতাবোধ বা সামাজিক নীতি-বোধের জন্য ইহা হয় নাই। সামাজিক বিধি-সম্মত নয়, এমন ভাল-বাসার ছবি বিভূতিভূষণ কয়েকটি আঁকিয়াছেন, তবে সবক্ষেত্রেই লেখকের বাস্তব দৃষ্টি বা আধুনিক মনোভাবের পরিচায়ক হইলেও ছবিগুলি কেমন যেন অত্যধিক পরিচ্ছন্ন শান্তরূপ পাইয়াছে। বিভূতিভূষণের সাধারণ রচনায় তাঁহার স্নিগ্ধ মানসলোকের যে বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়াছে, জটিল প্রেমের বর্ণনার উপরও তাহার প্রভাব পড়িয়া বর্ণনাংশগুলি একটু অবাস্তব বা ফিকে হইয়া গিয়াছে। 'বিপিনের সংসারে'র বীণা-পটলের নিষিদ্ধ প্রেম এই শ্রেণীর। এই প্রসঙ্গে অপু-লীলার ভালবাসার কথা ধরা যাক। এই প্রেম যে ঘনীভূত হইয়া স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল, তাহা গ্রন্থে দেখানো হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে অপু ও লীলার ভালবাসা পথের-পাঁচালী-অপরাজিতের সম্পদ। অপুর জীবনে অপর্ণার স্থান খুবই বড়, কারণ অপর্ণা অপুর সহমর্মিণী, শুধু সহধর্মিণী নয়। তাহাদের দুজনের মানস-গঠন একই ধরণের,—প্রশান্ত অথচ আবেগে লীলায়িত। কিন্তু অপু ও লীলা দীর্ঘকাল ধরিয়া পরস্পরকে গভীরভাবে ভাল-বাসিয়াছে। তবু বালক অপুর বালিকা লীলার জন্য আগ্রহের একটা আবেগ পাঠক উপলব্ধি করিতে পারে, এইরূপ ছবির চমৎকারিত্ব নীরেনের সহিত তাহার বিবাহের সম্ভাবনার কথা শুনিয়া বালিকা দুর্গার পুলক চঞ্চল মনোভাবের বর্ণনায়ও প্রকাশ পাইয়াছে। এই বাল্য বয়সের প্রেম-রঙীন মানস-চাঞ্চল্য বিভূতিভূষণের স্বাভাবিক আবেগ-বিহ্বল বর্ণনা-মাধুর্যে ভালই ফুটিয়াছে। কিন্তু ইহার বিপরীতে 'অপরাজিতে' অপু-লীলার কাহিনীর মধ্যে তরুণ তরুণীর সর্বগ্রাসী প্রেমের কোন রসোজ্জ্বল উগ্র রূপ ফুটিয়া উঠে নাই। এই গ্রন্থেই 'হেমলতা আপনাকে বিবাহ করিবে' জানালায় লিখিয়া অপুর প্রতি-বেশিনী যে মেয়েটি তাহার সঙ্গে প্রেমের নাটকের সম্ভাবনাময় যবনিকা উত্তোলন করিয়াছিল, সূচনাতেই সমস্ত ব্যাপারটা হাস্যকর ঘোষণা করিয়া লেখক সেই সম্ভাব্যতা অঙ্কুরে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে লীলার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত অপু ও লীলার ভালবাসার কোন বড় রকমের সংঘাত বা আলোড়ন সৃষ্টি হয় নাই। অথচ এই ভালবাসার আবেগমুখর ছবি ফুটাইবার প্রভূত সুযোগ ছিল। কার্যক্ষেত্রে লীলার প্রেম যেন গরীব অপুর প্রতি করুণা এবং অপুর ধনীকন্যা লীলাকে ভালবাসা যেন আপন মনের নিভৃতে সম্ভাবনাহীন একটুকরো ভীরু কামনাকে সস্নেহে লালন করা,—ব্যাপারটা এইরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। লীলার মৃত্যুর ঠিক আগে অপুর ও লীলার পরস্পরের প্রতি প্রেম-স্বীকৃতির মধ্যে লেখকের বাস্তব-সংঘর্ষ এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা আছে বলিয়া মনে হয়। ইহা যেন রবীন্দ্রনাথের "মাল্যদান" গল্পে অনাথা জাতিকুলহীনা দাসী কুড়ানীর মৃত্যুশয্যায় স্বপ্নের ধন দাদাবাবুর তাহার গলায় মাল্যদান। ডাক্তার যতীনের সামাজিক মর্যাদা সমস্যা-সঙ্কটহীন রাখিয়াই রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুপথযাত্রীর গলায় মাল্যদানের তথা মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটাইবার এই ব্যবস্থা করিয়াছেন।৭

বিভূতিভূষণের অসামাজিক প্রেমচিত্রগুলি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, সম্ভবতঃ ইহাদের সুষ্ঠু রূপায়ণে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে বিভূতিভূষণের তেমন ভরসা ছিল না। এইরূপ অসামাজিক প্রেমের যে সামান্য কয়খানি চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন, পূর্ণাঙ্গ বা ঘনিষ্ঠ না হইলেও সেগুলিতে একটু সুর সৃষ্টি করাই যেন তিনি বড় করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি জীবনকে বাস্তব দৃষ্টি-কোণ হইতে দেখিয়াছিলেন বলিয়া অসামাজিক প্রেমের স্বাভাবিকতাকে তিনি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন নাই। 'কেদার রাজা'র গিরিনের পরিণাম শোচনীয় হইয়াছে সত্য, কিন্তু এক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গিরিন লম্পট, প্রেমিক হইলে এই ভয়ঙ্কর মৃত্যুদণ্ড লেখক তাহাকে দিতেন না।

প্রকৃতপক্ষে সত্যকার ভালবাসার ক্ষেত্রে অসামাজিক প্রেমও লেখকের সহানুভূতি-ধন্য হইয়াছে, বিভূতিভূষণের সাহিত্যে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। 'অথৈ জলে' ভাবের কবি ঝড়ু মল্লিক সোনামুখী গ্রামের এক বিধবাকে লইয়া পালায়, প্রেমিক ঝড়ুকে লেখক ধিক্কৃত করেন নাই। বিপিনের সংসারে পটল-বীণার প্রেম পরিণতি লাভ করে নাই সত্য, তবে বালবিধবা দুঃখিনী বীণা যে লেখকের সহানুভূতি পাইয়াছে, তাহা গ্রন্থপাঠেই বুঝা যায়। 'ইছামতী'তে এই স্নিগ্ধ সহানুভূতির দৃশ্য খুবই উজ্জ্বল। তিলু নদীর ধারে পরপুরুষে আসক্তা গ্রামের বধূ নিস্তারিণী-কে হাতে নাতে ধরিয়া ধমক দিলে নিস্তারিণী সতীসাধ্বীর কাছে ধরা পড়িয়াও বলে,—"তুমি দিদি স্বামী পেয়েছ শিবির মত। অমন শিবির মত স্বামী আমরা পেলি আমরাও অমন কথা বলতাম। আহা—তিনি যে গুণবান!···ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে কোমরে বাত ধরবার মত হয়েছে। এত করেও মন পাবার যো নেই কারো। কেন আমি থাকবো অমন শ্বশুর বাড়ি? বলে দাও তো দিদি!"

—এবং ইহার পরই আছে:—"সুন্দরী বিদ্রোহিণীর মুখ রাঙা হয়ে

৭ বিভূতিভূষণ প্রকৃতপক্ষে এইভাবেই কয়েক স্থানে অসামাজিক প্রেমের এবং সমাজের দুই বিপরীত কোটির মিলনাকাঙ্ক্ষী নরনারীর কঠিন জীবন-প্রশ্নের লঘু-পরিণতি আঁকিয়াছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে তাঁহার 'কিন্নরদল' গ্রন্থের 'মণি-ডাক্তার' গল্পে গোয়ালাদের মেয়ে প্রেমলতার সহিত ডাক্তারের প্রেম-কাহিনী ধরা যাক। এই অসামাজিক প্রেম জমিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু পরিণতির পূর্বেই প্রেমলতাকে টাইফয়েডে মারিয়া ফেলিয়া লেখক সকল সমস্যার অবসান ঘটাইয়াছেন। এইরূপ প্রেমের স্বাভাবিক পরিণাম তীব্র বেদনাদায়ক, সেই দুঃখের মধ্যে তাঁহার সংবেদন-শীল মন বোধ হয় ঢুকিতে চায় নাই।
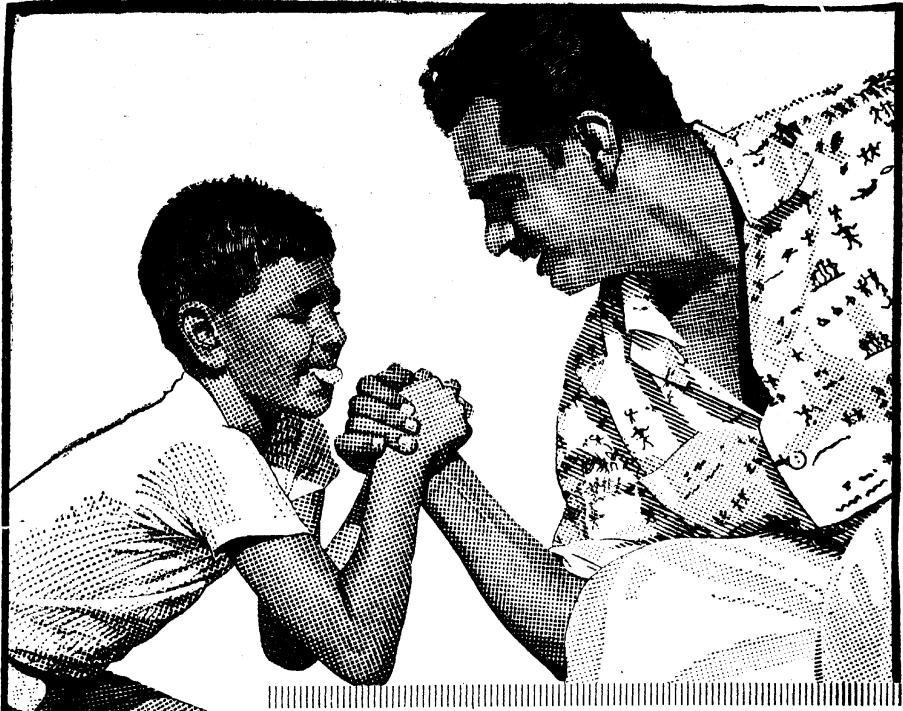
যাঁরা ভাল স্বাস্থ্য ভালবাসেন তাঁরা সবসময়
লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন
LIFEBUOY
FOR SAVING LIFE
FOR PRESERVATION OF HEALTH
SOAP
MADE IN INDIA FROM PURE VEGETABLE OILS ONLY
HINDUSTAN LEVER LIMITED
LIFEBUOY SOAP
খেলাধূলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন আমরা কখনই ধূলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজানু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। লাইফবয় সাবান এই বীজানুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।
প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন— এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।

উঠেছে। মুখে একটি অদ্ভুত গর্ব ও যৌবনের দীপ্তি, নিবিড় কেশপাশ পিঠের ওপর ছড়িয়ে আছে সারা পিঠ জুড়ে। বড় মানা হোল এই অসমসাহসী বধূটির ওপর তিলুর।"

বিভূতিভূষণের কবি-চেতনা ও শান্তভাবাশ্রয়ী মনোধর্মের নিরিখে এইরূপ প্রেমচিত্রের স্নিগ্ধতম দৃষ্টান্ত বোধ হয় 'জন্ম ও মৃত্যু' গল্পগ্রন্থের 'অরন্ধনের নিমন্ত্রণ' গল্পটি। এই গল্পে হীরেনের সঙ্গে ভালবাসা হইয়াছিল তাহার পিসিমার গ্রামের চঞ্চলা মেয়ে কুমুর। তাহাদের বিবাহ হইল না —কুলে মিলিল না বলিয়া। হীরেন মনের দুঃখে জামালপুর চলিয়া গেল। তারপর কাটিয়া গেল বহুবৎসর। ইহার মধ্যে হীরেন এবং কুমু দুজনেরই বিবাহ হইয়া গেল। জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের পর হীরেন একদিন পিসিমাকে মুঙ্গেরে নিজের কাছে লইয়া যাইতে আসিল পিসিমাদের গ্রামে। কুমুর বিবাহ হইয়াছিল গরীব ঘরে, স্বামী লইয়া যাইতে পারে না, কুমু তাহার ছোট্ট ছেলেটিকে লইয়া মার কাছে কায়ক্লেশে দিন কাটায়। হীরেনের সহিত দেখা হইল কুমুর। পরদিন অরন্ধনের নিমন্ত্রণ খাইতে হীরেন কুমুদের বাড়ী আসিল। কুমু যত্ন করিয়া হীরেনকে খাওয়ায়, কচুর শাক, নারকোল কুমড়ো—হীরেনের প্রিয় খাদ্যগুলি কুমু রান্না করিয়া রাখিয়াছে। খাওয়ার সময় তাহারা অসঙ্কোচে স্বীকার করিল পরস্পরকে তাহারা আগের মতই ভালবাসে। দরিদ্র গৃহলক্ষ্মীকে বড়লোকী উপহার দিয়া হীরেন তাহার অপমান করিল না। পিসিমাকে লইয়া শান্তভাবেই সে নৌকায় উঠিল, কুমু দাঁড়াইয়া রহিল ঘাটে। কুমু তাকাইয়া রহিল, নৌকা ভাসিয়া চলিল দূর হইতে দূরে। আশ্চর্য উজ্জল এই বিচ্ছেদ লগ্নের কবিসুলভ বর্ণনা :—"দু'পাড়ে নবীচর নির্জন! দুপুরের রৌদ্র আজ বড় প্রখর, আকাশ অদ্ভুত ধরণের নীল, মেঘলেশহীন। বন্যার জলে পাড়ের ছোট কালকাসুন্দি গাছের বন পর্যন্ত ডুবে গিয়েছে। কচুরিপানার বেগুনি ফুল চড়ার ধারে আটকে আছে। সেই সব বন-জঙ্গলময় ডাঙ্গার পাশ দিয়ে চলেছে ওদের নৌকো। ঝোপের তলার ছায়ায় ডাহুক চরছে। বন্যার জলে নিমগ্ন আখের ক্ষেতের আখগাছগুলো স্রোতের বেগে থরথর করে কাঁপছে।"

বলা বাহুল্য, অসামাজিক প্রেমের সম্পর্কেও বিভূতিভূষণের এই সহজ সুন্দর দৃষ্টি তাঁহার মানবতাবাদী মনোভাব হইতেই উদ্ভূত। মানুষকে স্বরূপে উপলব্ধির প্রয়াস এক মহৎ সাধনা, বিভূতিভূষণ সেই সাধনা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক প্রচলিত রীতিনীতির নিরিখে বহিরঙ্গ ঘটনা প্রবাহের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই মানুষের প্রতি সব সময় সুবিচার করা সম্ভব নয়। মানুষকে গভীরভাবে ভালবাসিতেন বলিয়াই বিভূতিভূষণ চেষ্টা করিতেন দুর্বল বা নীতিভ্রষ্ট মানুষকে তাহার দিক হইতে বুঝিতে এবং এইরূপ মানুষের মধ্যে মহৎ গুণ থাকিলে সে গুণ ফুটাইতে তাঁহার কোন সঙ্কোচ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে বিভূতিভূষণ মানসিক ক্ষুধা, অর্থ-নৈতিক সমস্যা এবং সামাজিক সংস্কারের চাপে ক্লিষ্ট মানুষকে সত্যধর্মের দিক হইতে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় পাপ পাপই থাকিয়া গিয়াছে, পুণ্যের মিথ্যা গৌরব পায় নাই; তবে পাপের মধ্যে যদি কোন সত্যকার মহৎ বৃত্তির সন্ধান মিলে, তাহার বিকাশে ও প্রকাশে তিনি সহায়তা করিয়াছেন। এইজন্যই তাঁহার কথাসাহিত্যে পয়া মেম (ইছামতী) কমলা (কেদার রাজা), পান্না (অথৈ জল), বিনোদিনী (মুখোশ ও মুখশ্রী গ্রন্থের 'অন্তর্জলি' গল্প), গোলাপী (নবাগত গ্রন্থের 'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল' গল্প), কুসুম ('জ্যোতিরিঙ্গণ' গ্রন্থে 'হিংয়ের কচুরি' গল্প) বা গিরিবালার ('আচার্য কৃপালনি কলোনী' গ্রন্থের গিরিবালা গল্প) মত দেহোপজীবিনী পতিতা স্ত্রীলোকেরাও সর্বাংশে ঘৃণিতা হইয়া ফুটে নাই, আপন বৈশিষ্ট্যের হিসাবে কোন না কোন দিক হইতে লেখকের অল্প-বিস্তর সহানুভূতি তাহারা লাভ করিয়াছে।

ক্রমশঃ

হোতোনা দিগ্‌ভ্রান্ত

সিদ্ধার্থ গংগোপাধ্যায়

পথ চলতে হঠাৎ তার স্থলপদ্ম মন,
হারিয়ে যাবে মেঘের ভিড়ে, হায়রে সে কি জানত?
বৃষ্টি-ভেজা ছায়ার নেশা—আনন্দ উন্মন
হৃদয় বেয়ে নামল এক নিবিড় অতলান্ত।

যখন সব শ্রান্ত চোখে ঘুমের ঝুরি যেন,
নামল এক মধুমাতাল মৌমাছির নেশা,
তখন সব ভুলেও ঘন কাজল-কালো কেশে,
জ্যোৎস্না এসে ভেড়াল তার আলোর শাম্পানও।

পথ চলতে হঠাৎ তার আনত আঁখি স্বপ্নে,
হারিয়ে যাবে হায়রে যদি অনেক আগে জানত,
তাহ'লে আর নামত না ক' অন্ধকারে-ঘেরা
তৃষ্ণা, আর মেঘের ভিড়ে হোতোনা দিগ্‌ভ্রান্ত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মিস অনুপমা বসুও নিজের কর্ত্তব্য সমাপনান্তে নদীর ধারে গিয়া একটি বিস্তৃত পাথরের উপর বসিয়া নদীর দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। তাহার দৈনন্দিন কর্ত্তব্য চম্পার মাকে চম্পার রিপোর্ট প্রত্যহ পাঠানো। ইউরিন কেমন, ব্লাড-প্রেসার কত, খাওয়ায় রুচি আছে কিনা, ভিটামিনগুলি প্রত্যহ খাইতেছে কিনা, এসব খবর প্রত্যহ না পাইলে চম্পার মা অনর্থ করিবেন, হয়তো চলিয়া আসিবেন। তাই এগুলি সে সযত্নে প্রত্যহ পাঠাইতেছে। গঙ্গার জল-স্রোতের দিকে চাহিয়া তাহার বাবুলের কথা মনে পড়িতে-ছিল। গঙ্গার তরঙ্গ-ভঙ্গ দেখিয়া বাবুলের চঞ্চল স্বভাবের কথাই মনে হইতেছিল তাহার। সে এখন কেমন আছে কে জানে। ভালই আছে সন্দেহ নাই, না থাকিলে খবর পাইত। তাহার বাবা নিশ্চয়ই খবর দিতেন।

তাহারই ছেলে বাবুল। কিন্তু যেহেতু বাবুলের বাবার সহিত তাহার সামাজিক আনুষ্ঠানিক বিবাহ হয় নাই তাই প্রকাশ্যভাবে সে নিজের মাতৃত্ব ঘোষণা করিতে পারে না। অনুপমার বাবা শঙ্করপ্রসাদ নিষ্ঠাবান নীতিবাগীশ অবসর-প্রাপ্ত অধ্যাপক। মেয়েকে উচ্চশিক্ষা দিবার জন্য কলেজে পাঠাইয়াছিলেন। বোর্ডিংয়ে থাকিত। সে লেখাপড়া ভালই শিখিয়াছিল, কিন্তু সে ডিগ্রীর সহিত একটি প্রণয়ীও জুটাইয়া আনিল। সুপর্ণ সিংহ নামটাই অনুপমার চিত্তকে প্রথমে আকর্ষণ করে। একটি নামের মধ্যে পক্ষীরাজ এবং পশুরাজের এমন সমন্বয় দুর্লভ বলিয়া মনে হইয়াছিল তাহার। লোকটির সম্বন্ধে তাহার কৌতূহল জাগিল। প্রথমে দেখা হইয়াছিল কলেজেরই কমন রুমে। তখন বয়সটাই এমন যে সব কিছুই ভালো লাগে। দোকানে-টাঙানো ছিট হইতে শুরু করিয়া বিশেষ ধরণের পশু-পাখী ফড়িং ফুল লতা-পাতা সব কিছুই মনকে মুগ্ধ করে। এক বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের জন্য কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিতে কলেজে আসিয়াছিলেন সিংহ মহাশয়। আলাপ করিয়া অনুপমা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি কথাবার্ত্তা, সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিলাতী ডিগ্রী আছে। সমাজেরই সেবা করেন। নামটিও চমৎকার। যথাসময়ে আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইয়াছিল। পিতা শঙ্করপ্রসাদ এসব কিছুই জানিতেন না। বাবুল যখন পেটে আসিল তখন অনু তাঁহাকে সব কথা জানাইতে বাধ্য হইল, কারণ নামের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সুপর্ণ উড়িয়া গিয়া-ছিলেন। পরে খবর পাওয়া গিয়াছিল তিনি নাকি একটি ধনী-কন্যার পাণি-পীড়ন করিতে উৎসুক হইয়া তাহারই পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ধনী-কন্যাটি পিতার বিশাল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। তাহাকে গাঁথিতে পারিলে তাঁহার জীবন-স্বপ্ন (অর্থাৎ সমাজ-সেবা) সফল হইবে। কারণ সমাজ-সেবা করিতে হইলে প্রচুর টাকা চাই। অনুপমা তাহাকে চিঠির পর চিঠি লিখিয়াও জবাব পায় নাই, কয়েকবার দেখা করিবার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হইয়াছে। কারণ সুপর্ণ সেই মেয়েটির পিছু পিছু কখনও বম্বাই, কখনও মসৌরি, কখনও রামগড়, কখনও বা কালিম্পঙে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা অসম্ভব। ইদানীং ঠিকানাও পায় নাই।

শঙ্করপ্রসাদ অনুকে ভর্ৎসনা করেন নাই, বাড়ি হইতে দূর করিয়া দিয়া কোনও নাটকীয় কাণ্ডও করেন নাই।

তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন—"তুমি লেখাপড়া শিখেছ। সব জেনে শুনে যে দায়িত্ব তুমি গ্রহণ করেছ, তার ভার তোমাকে বইতে হবে। সামাজিক লাঞ্ছনা আজকাল আর হয় না, তবে লোক-লজ্জা বলে' একটা জিনিস আছে এখনও। আমি যতদূর সাধ্য তোমাকে তার থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করব।" অনুপমার মাথায় সিঁদুর পরাইয়া তিনি তাহাকে ব্যাঙ্গালোরে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানকার হাঁসপাতালেই বাবুলের জন্ম হয়। বাবুল একটু বড় হইবার পর সে তাহাকে বাবার কাছে রাখিয়া ব্যাঙ্গালোর হাঁসপাতালেই নার্সের কাজ শেখে। তাহার পর সেখান হইতে মাদ্রাজে যায়। মাদ্রাজের এক মিশনরি সাহেবের সাহায্যে সে বিলাত পর্য্যন্ত যাইতে সমর্থ হইয়াছিল। নার্সিং এবং ছেলে-প্রসব-করানো বেশ ভালভাবেই শিক্ষা করিয়াছে। ভালই রোজকার হয়। বাবাকে কোন কোন মাসে দুইশত টাকা পর্য্যন্ত পাঠাইতে পারে। শঙ্কর-প্রসাদ সমস্ত টাকা বাবুলের নামে ব্যাঙ্কে জমা করেন।… নদীর স্রোতের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনুর মনে হইল, এখনও সে সুপর্ণ সিংহকে ভালবাসে। আগেও একথা মনে হইয়াছে। আবার হইল।

সূর্য্যসুন্দর নিমীলিত-নয়নে শুইয়া আবার সেই দিবা-স্বপ্নটি দেখিতেছিলেন। নির্জ্জন প্রান্তরের ভিতর দিয়া দিগন্ত-বিস্তারী পথ চলিয়া গিয়াছে। সেই পথে তিনি একা যাত্রী। তিনি যেন পশ্চিম দিগন্তের দিকে চলিয়াছেন। কেন চলিয়াছেন তাহা তিনি জানেন না। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। পশ্চিম আকাশ বর্ণ-বিচিত্র। সেই বর্ণ-বিচিত্র ভেদ করিয়া কে যেন তাঁহার দিকে আসিতেছে। অনিবার্য্য অক্লান্ত গতিতে আসিতেছে। কিন্তু কে, ওকে—

"কে, ওকে—"

তন্দ্রার ঘোরে সূর্য্যসুন্দর কথা কহিয়া উঠিলেন।

"বাবা কিছু বলছেন ?"

উর্ম্মিলা মাথার শিয়রে বসিয়াছিল, ঝুঁকিয়া প্রশ্ন করিল।

সূর্য্যসুন্দরের ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি চোখ খুলিয়া প্রথমে নেটের মশারাটা দেখিতে পাইলেন, তাহার পর উর্ম্মিলার মুখটা। বুঝিতে পারিলেন, তিনি পথ চলিতেছেন না, বিছানাতেই শুইয়া আছেন। তাঁহার পুরাতন খাটের উপরই শুইয়া আছেন, তাঁহার পুরাতন শয়ন-গৃহে। মনে পড়িল এ রকম স্বপ্ন আর একবার দেখিয়াছিলেন।

"বাবা, কিছু বলছেন ?"

"না। কুমার কোথা"

"তিনি বাগানে গেছেন, পাখীর মাংস রান্না করছেন সেখানে"

"ও"

সূর্য্যসুন্দর আবার চোখ বুজিলেন।

একটু পরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রবেশ করিলেন চন্দ্রসুন্দর। উর্ম্মিলাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "সন্ধের পর এইখানে বসে' গীতা পড়ব। তুমি মা মেজেটা গঙ্গাজল দিয়ে একটু নিকিয়ে দিও, কেমন ? মাছ মাংস পেঁয়াজ রসুনের রান্না এইখানটায় বসে' খেয়েছ তো তোমরা, তার উপর বসে গীতা পড়াটা কি ঠিক হবে—"

ঠিক হইবে কি না এ প্রশ্নের উত্তর উর্ম্মিলা দিল না। কেবল বলিল, "আমি গঙ্গাজল দিয়ে এখুনি ধুয়ে দিচ্ছি মেজেটা"

১৩

কুমারের বাগানের ঘরটিতে মাংস চড়াইয়াছিল।

ঘরের বাহিরে ঘোর অন্ধকার। ঘোর শীতও। নানা সুরে নানারকম নৈশ কীট পতঙ্গ চীৎকার করিতেছে, একটা পেচকের কর্কশ কণ্ঠও শুনা যাইতেছে মাঝে মাঝে। ঘরের ভিতরে কয়লার উনুনের উপর প্রকাণ্ড মাংসের ডেক্‌চিতে মাংস ফুটিতেছে, মশলাভাজার গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত। ল্যাংড়া চাকরটা ঘরের এককোণে আপাদমস্তক ঢাকা দিয়া বসিয়া আছে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় একটা বস্তা বুঝি কোণে ঠেসানো আছে। ইহারা মশারীতে অভ্যস্ত নহে, আপাদমস্তক চাদর ঢাকা দিয়া মশা হইতে আত্মরক্ষা করে, দম বন্ধ হয় না। মশা বেশি নাইও, কারণ কুমার চতুর্দ্দিকে ফ্লিট্ ছিটাইয়াছিল। কুমারের পায়ের কাছে ছুঁচকি সামনের থাবার উপর মুখটি রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল, মাঝে মাঝে কুমারের মুখের দিকে চাহিতেছিল, মাঝে মাঝে কান খাড়া করিতেছিল, কিন্তু কোন শব্দ করিতেছিল না। ল্যাং-ল্যাং ঘুমাইতেছিল।

ঘরের একধারে পেট্রোম্যাক্স জ্বলিতেছে। কুমার তাহার কাছেই একটি ক্যাম্প-চেয়ারে বসিয়া বাবার স্মৃতিকথা'য় মন দিয়াছে। তাহার পাশেই রহিয়াছে একটি গুলি-ভরা বন্দুক। গোটাদুই বড় বড় ব্যাঙ্ আসিয়া জুটিয়াছে, লাফাইয়া লাফাইয়া পোকা ধরিয়া খাইতেছে। অনেক দূরে কোথায় যেন মাঝে মাঝে বন্দুকের আওয়াজ শুনা যাইতেছে। থানার বর্ত্তমান দারোগা সাহেব মাঝে-মাঝে কারণে-অকারণে বন্দুক-আওয়াজ করেন। তিনি বলেন—ঘরে আলো জ্বালিয়া রাখিবে এবং মাঝে মাঝে বন্দুক আওয়াজ করিবে। যাহার বন্দুক নাই সে শাঁখ বাজাইতে পারে, যাহার শাঁখ নাই সে গলা-খাঁকারি দিক। তাই কুমারের মনে হইল দারোগা সাহেবই বোধহয় বন্দুক আওয়াজ করিতেছেন। কুমারের এসব দিকে কিন্তু ততটা মন ছিল না, সে নিবিষ্ট চিত্তে বাবার বাল্যজীবন কাহিনী পড়িতেছিল।

"যথা সময়ে আমি দীনু পণ্ডিতের পাঠশালায় ভরতি হইয়া গেলাম। ভরতির দিন দিদিমার আদেশে বাড়ির ক্ষ্যান্ত ঝি চাল ডাল তরিতরকারি ফল-মূল দিয়া সাজাইয়া একটি সিধা দীনু পণ্ডিতকে দিয়া আসিয়াছিল। সিধার সহিত একখানি নরুন-পাড় ধুতি এবং একটি লাল গামছাও ছিল। বলা বাহুল্য, ইহাতে দীনু পণ্ডিত খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। দিদিমা মাঝে মাঝে দীনু পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ খাওয়াইতেন। এই সব কারণেই সম্ভবত দীনু পণ্ডিত আমার উপর একটু প্রসন্ন ছিলেন। পাঠ-শালায় প্রথম দিন গিয়াই অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলাম। গিয়া দেখি নবীন চৌদ্দ-পোয়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুই বিস্তৃত হাতের উপর দুইখানি ইঁট। চৌদ্দ-পোয়া শাস্তিতে পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইতে হইত, দুই পায়ের মাঝখানে চৌদ্দ-পোয়া অর্থাৎ সাড়ে তিন হাত ব্যবধান থাকিত। নবীনের অবস্থা দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু দিদিমার কৌশলে আমি দীনু পণ্ডিতের কোপ-কবল হইতে কিছুটা রক্ষা পাইয়াছিলাম। আমি অবশ্য খুব নিরীহ ছেলে ছিলাম, পণ্ডিত মহাশয়ের ক্রোধাগ্নি জ্বালাইবার মতো ইন্ধন আমার ছিল না। সে ইন্ধন ছিল মন্মথর। বদমায়েসিতে তাহার জোড়া আমি হইতে পারি নাই, যদিও তাহার সহিত আমার বন্ধুত্ব খুব হইয়াছিল। মন্মথ পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হইতে প্রায়ই শাস্তি পাইত। প্রায়ই তাহাকে 'ঘুঘু-ঘোড়া' হইয়া বসিতে হইত। মন্মথও প্রতিশোধ লইতে ছাড়িত না। সুযোগ পাইলেই অন্ধকারে পণ্ডিত মহাশয়ের বাসায় ঢিল ফেলিত। গোলক পণ্ডিতের নিকট আমি কিছু শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলাম। শিশুবোধক, ধারাপাত শেষ হইয়াছিল। হাতের লেখাও অনেকটা মকসো করিয়াছিলাম। কিন্তু দীনু পণ্ডিত গোড়া হইতে আবার সব শুরু করিলেন। দিদিমাকে গিয়া বলিলেন—'মা, ভাগ্যে আপনার নাতিটিকে এখানে এনেছিলেন। ওই অজ পাড়াগাঁয়ে গোলক পণ্ডিতের কাছে থাকলে হয়েছিল আর কি। ও তো একটি গবাকান্ত হয়েছে।' দিদিমা বুদ্ধিমতী ছিলেন, গোলক পণ্ডিতের কাছে আমি কতটা বিদ্যার্জ্জন করিয়াছি তাহাও তাঁহার অবিদিত ছিল না। কিন্তু তিনি দীনু পণ্ডিতের কথার প্রতিবাদ করিলেন না। বলিলেন, "এখন তোমার কাছে এনে দিয়েছি বাবা—তুমিই ওর ভার নাও, ওকে মানুষ করে তোল।" দীনু পণ্ডিত সাহ্লাদে বলিলেন "নিশ্চয়, নিশ্চয়, করব বই কি। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করাই তো আমার কাজ। ওই যে রামবাবুর ছেলে ঘেঁাতা, যেমন বোকা তেমনি পাজি ছিল। কারো গাছে ফল থাকবার যো ছিল না ওর জ্বালায়। আম জাম পেয়ারা কুল প্রত্যেকটি গাছ মুড়িয়ে খেত ছোকরা, আর বাকী সময়টা ছিপ নিয়ে বসে থাকত গঙ্গার ধারে। রামবাবু ওরে একদিন ধরে' এনে আমার হাতে সমর্পণ করে' দিলেন। ওকে নিয়ে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল আমাকে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত টিট্ করেছিলাম। এখন রেলের টালি ক্লার্ক হয়েছে জানেন বোধ হয়।" দিদিমা বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমার নাম ডাক তো খুব। সুধীর ভারটিও তুমি নাও বাবা। ওর মায়ের ওই একমাত্র ভরসা। বাপ তো থেকেও নেই—"

দিদিমার কণ্ঠস্বর সজল হইয়া আসিয়াছিল। দীনু পণ্ডিত প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে আমার ভার তিনি বহন করিবেন। সে প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষাও করিয়াছিলেন। প্রবল প্রতাপে তিনি তো আমাকে শাসন করিতেনই—অবশ্য খুব একটা মারধোর করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে

না—আমার হাতের লেখা অঙ্ক এবং ভাষা জ্ঞানও যাহাতে অনিন্দনীয় হয় সে বিষয়েও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। পাঠশালাতেই আমি ধারাপাত, শুভঙ্করী এবং লোহারামের ব্যাকরণ পাঠ শেষ করিয়াছিলাম।

এতদিন পরে আমার সেই পাঠশালার জীবনের কথা ভাবিতে গিয়া দুই তিনটি বন্ধুর কথাই কেবল মনে পড়িতেছে। মন্মথ, খোঁড়া অশ্বিনী এবং দিবাকরের কথা। ইহাদের প্রত্যেকেরই কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল এবং প্রত্যেকেই আমার পরবর্ত্তী জীবনকেও কম প্রভাবিত করে নাই। মন্মথ ছিল বেশ মিশুক এবং সরল। চমৎকার গান গাহিতে পারিত। অভিনয়েও দক্ষতা ছিল। তখনকার দিনে যে সব যাত্রা হইত মন্মথ ছিল সে সবের উৎসাহী দর্শক। মামার এবং দিদিমার কড়া শাসনে আমার ভাগ্যে প্রায়ই যাত্রা দেখা ঘটিয়া উঠিত না। আমি যাত্রা-দেখার আনন্দটা উপভোগ করিতাম মন্মথর সহায়তায়। সে গঙ্গার ঘাটে বসিয়া যাত্রার গান বক্তৃতা আমাদের শুনাইত। তাহার গানের গলা অসাধারণ ছিল, যেমন চড়া, তেমনি মিষ্ট। বক্তৃতাও খুব ভালো করিত। তাহার সঙ্গে প্রায় প্রত্যহই তাহাদের বাড়ি যাইতাম। মন্মথর মা শুভঙ্করী দেবী সত্যই একজন মহীয়সী মহিলা ছিলেন। তিনি আমাকে নিজের ছেলের মতোই স্নেহ করিতেন। বৈকালে যেদিন তাঁহার বাড়িতে না যাইতাম তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িতেন, চাকর পাঠাইতেন আমার খবর লইবার জন্য। চাকরের সঙ্গে আবার আমাকে যাইতে হইত। গিয়া দেখিতাম আমার জন্য খাবার ঢাকা-দেওয়া রহিয়াছে। সেটি সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইয়া, তাহার পর চাকর সঙ্গে দিয়া আমাকে বাড়ি পাঠাইয়া দিতেন। দিদিমার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়া পড়িয়াছিলেন তিনি। ইহার সূত্রপাত হয় আমরা সাহেবগঞ্জে আসিবার কিছুদিন পরেই। কথায় কথায় একদিন বাহির হইয়া পড়ে তাঁহার বাপের বাড়ি একই গ্রামে। আমার মা যে স্বামী-পরিত্যক্তা ভাগ্যহীনা এবং আমি যে পিতৃহীন অনাথেরই মতো—একথা প্রায়ই আলোচনা করিতেন তাঁহারা। সম্ভবত এই সব কারণে এবং দিদিমার ইঙ্গিতে তিনি আমার বৈকালিক আহারের ব্যবস্থাটা করিয়াছিলেন। মামার বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া খুবই সাধারণ-রকমের ছিল। সকালে ব্যবস্থা ছিল মুড়ি কিম্বা বাসী রুটি এবং পাতলা গুড়। পাঠশালায় যাইবার সময় ভাত, কলাইয়ের ডাল এবং বাসী অম্বল ছাড়া আর কিছু থাকিত না। মাঝে মাঝে আলু ভাতে থাকিত। পাঠশালা যাইবার সময় তরকারি বা মাছ খাইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। পাঠশালা হইতে ফিরিয়া ঠাণ্ডা তরকারি, (কচিৎ কোনদিন মাছ) দিয়া ঠাণ্ডা ডাল-ভাতই ছিল বরাদ্দ। আমি মন্মথর বাড়ি হইতে প্রত্যহই কিছু ভালোমন্দ খাবার খাইয়া আসিতাম; কোনদিন মোহনভোগ, কোনদিন সন্দেশ, কোনদিন দুধের সর বা চাঁচি, যেদিন লুচি পরোটা থাকিত সেদিন তো হাতে স্বর্গ পাইতাম। মন্মথর বাড়ি হইতে ফিরিয়া মামার বাড়ির বরাদ্দ ডাল-ভাত-তরকারি এবং দিদিমার প্রসাদ খাইতাম। খাইবার খুব যে একটা ইচ্ছা থাকিত তাহা নয়, কিন্তু দিদিমার জেদে খাইতে হইত, মামীমা পাছে কিছু মনে করেন এ ভয়ও ছিল। সংসারে মামীমার আধিপত্য ক্রমশঃ বাড়িতেছিল, মা ক্রমশ যেন নিজেকে সংসার হইতে সরাইয়া লইতেছিলেন। তিনি যে বাড়িতে আছেন তাহা বোঝাই যাইত না। কখন খাইতেন, কখন শুইতেন, কিছুই টের পাইতাম না। কখনও তাঁহাকে বসিয়া গল্প করিতে দেখি নাই। সর্ব্বদাই নীরবে কাজ করিতেন। কাজই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। কুটনো-কোটা, বাটনা-বাটা রান্না-করা সবই তিনি একা করিতেন। ক্ষ্যান্ত ঝি কেবল মাছ কুটিয়া দিত। রান্না আবার দুইরকম ছিল। দিদিমার জন্য শুদ্ধাচারে আলোচালের ভাত রান্না করিতে হইত। আলাদা একটা রান্নাঘরই ছিল তাঁহার জন্য। দিদিমা তাঁহার পাত হইতে আমার জন্য প্রত্যহ কিছু আলো-চালের ভাত, মুগের ডাল এবং দুধ রাখিয়া দিতেন। মা সংসারে সব কাজই, এত নীরবে এমন প্রচ্ছন্নভাবে করিতেন যে, তাঁহার অস্তিত্বই বুঝা যাইত না। তাঁহাকে কখনও ফরসা কাপড় পরিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। সর্ব্বদা একটি লাল পেড়ে আধময়লা শাড়ি পরিয়া থাকিতেন, মাথায় সিঁদুর পরিতেন বটে, কিন্তু কেশের প্রসাধন করিতে কখনও দেখি নাই। অনেক চুল ছিল তাঁহার, সেগুলি তাঁহার মাথার উপর স্তূপ হইয়া থাকিত। দিদিমা মাঝে মাঝে তাঁহার মাথায় হাত দিয়া দেখিতেন এবং চুলে জট পড়িয়া যাইতেছে বলিয়া ভর্ৎসনা করিতেন শুনিতে

পাইতাম।…এই সময় আর একটা ঘটনা ঘটাতে মা যেন আরও লজ্জিত, আরও ম্রিয়মান হইয়া গেলেন। একদিন সকালে উঠিয়া শুনিলাম—আমার একটি ভাই হইয়াছে। অবাক হইয়া গেলাম। হঠাৎ ভাই আসিল কোথা হইতে? গোয়ালের পাশে যে ঘরটিতে গরুর খড় রাখা হইত সেখান হইতে খড় বাহির করিয়া কখন যে সেটা আঁতুড়-ঘরে পরিণত হইয়াছিল তাহাও বুঝিতে পারি নাই।

উঁকি দিয়া দেখিলাম সেই ঘরে মা একখানি ছেঁড়া কাপড় পরিয়া ছেঁড়া কম্বল ঢাকা দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছেন। পাশেই ছেঁড়া-নেকড়ায়-ঢাকা একটি ফুটফুটে শিশু। সে-ও ঘুমাইতেছে। ক্ষ্যান্ত ঝির ধমক খাইয়া দ্বারপ্রান্ত হইতে সরিয়া আসিলাম। একটি মোটা কালো মেয়ে একটি ভাঙা লোহার কড়াই করিয়া কিছু গনগনে কয়লার আগুন লইয়া প্রবেশ করিল। শুনিলাম সেই ধাত্রী, জাতে ডোম। সেই ছেলে প্রসব করাইয়াছে, সেই এখন মায়ের সহিত এই ঘরে থাকিবে, আমরা কেহ এ ঘরে ঢুকিতে পাইব না।

দিদিমার কাছে গেলাম। তিনিও সেই কথাই বলিলেন। চুপি চুপি প্রশ্ন করিলেন, "ভাইকে দেখেছিস?"

"হ্যাঁ, দূর থেকে দেখেছি। খুব সুন্দর। ধপধপ করছে রং, এক মাথা কালো কোঁকড়ানো চুল—"

"হবেই তো। ও যে চাঁদ"—দিদিমা বলিলেন।

"চাঁদ?"

"তুই সূয্যি, তোর ভাই চাঁদ হবে না? খুব সুন্দর হয়েছে?"

"খুব। চাঁদের চেয়েও ভালো"

"পোড়াকপাল আমার, এই সময়ই চোখের দৃষ্টিটা গেল। ওর মুখ আর দেখতে পাব না"

ইহার পর দিদিমা চুপ করিয়া গেলেন। হঠাৎ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম তিনি নীরবে রোদন করিতেছেন। তাঁহার দুই গাল বাহিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। দিদিমা সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। ইহার কয়েকদিন পরে দিদিমা আর এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। মা-ই প্রত্যহ দিদিমার চুল আঁচড়াইয়া পিছনে ছোট্ট একটি খোঁপা বাঁধিয়া দিতেন। মা আঁতুড়ে ঢোকার পর মামীমা একদিন চিরুণী লইয়া দিদিমার চুল আঁচড়াইতে বসিলেন। দুই একবার চিরুণী চালাইবার পরই দিদিমা থামাইয়া দিলেন তাঁহাকে।

"সর, তোকে আর চুল আঁচড়াতে হবে না। তুই ঠিক পারচিস না। আমি আর চুল রাখবই না। বিশুকে খবর পাঠা, আমার চুলগুলো ছোট ছোট করে' ছেঁটে দিক। এ আপদ আর রাখা কেন—"

পরদিন বিশু নাপিত আসিয়া দিদিমার মাথাটি ঠিক কদম ফুলের মতো করিয়া দিয়া গেল। দেখিতে অদ্ভুত হইল দিদিমাকে। ইহার দিন কয়েক পরে ঠাণ্ডা লাগিয়া দিদিমার একটু জ্বরভাব হইল। প্রবীণ ডাক্তার সুরথবাবু দেখিতে আসিলেন। তিনি বলিলেন—মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া দেওয়ার জন্যই ঠাণ্ডা লাগিয়াছে। তিনি মাথায় গরম টুপি, গায়ে গরম জামা এবং পায়ে মোজা পরিবার ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। ইহার পর দিদিমার চেহারা একেবারে বদলাইয়া গেল। গফুর দরজি তাঁহার জন্য যে জামা করিয়া আনিল তাহা মেয়েদের জামা নয়, ঢিলা-হাতা কোটের মতো পাঞ্জাবী, চায়না কোট তাহার নাম। দিদিমার রং খুব ধপধপে ফরসা ছিল, নাকটি ছিল টিয়া পাখীর ঠোঁটের মতো। তিনি যখন টোপরের মতো কালো মখমলের টুপি ও গরম পাঞ্জাবী পরিয়া বিছানায় বসিয়া থাকিতেন মনে হইত কোনও বৃদ্ধ ইহুদী বুঝি বসিয়া আছে। দিদিমা বলিয়া তাঁহাকে চেনাই যাইত না। মামা খুব মাতৃভক্ত ছিলেন। তিনি দুইবেলা, সকালে-সন্ধ্যায়, দিদিমাকে আসিয়া প্রণাম তো করিতেনই, দূরে কোন 'কলে' যাইবার আগেও প্রণাম করিয়া যাইতেন। মায়ের এই নূতন বেশ তাঁহার খুব ভালো লাগিয়াছিল। তিনি মায়ের জন্য মুর্শিদাবাদ হইতে সবুজ-পাড়-দেওয়া বেগুনী-রঙের একটি চমৎকার বালাপোষও আনাইয়া দিয়াছিলেন। বালাপোষটি গায়ে দিলে দিদিমাকে আরও সুন্দর দেখাইত। তাঁহার মুখভাব ক্রমশ শিশুর মুখের মতো হইয়া আসিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া মাঝে মাঝে ইহাও মনে হইত যেন একটি শিশু কোনও মন্ত্রবলে হঠাৎ বড় হইয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে…"

কুমার তন্ময় হইয়া পড়িতেছিল এবং কল্পনা করিবার চেষ্টা করিতেছিল বাবার দিদিমা সত্যই কেমন দেখিতেছিলেন।

ক্রমশঃ

'সোনার তরী'র আধ্যাত্মিকতা

শ্রীরঘুনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থ

বর্ত্তমান যুগে একটা বিশেষ ভাবপ্রবণতা দেখা দিয়াছে। এই ভাব-প্রবণতা—সব কিছুকেই মাটির বা রূঢ় বাস্তবের গান রূপে ব্যাখ্যা। রবীন্দ্র-কাব্য এই ব্যাখ্যার হাত থেকে নিস্তার পায় নাই। মনে হয় 'কমুউনিজম্'ই ইহার মূল। বিশেষ শ্রেণীর লেখক ও অধ্যাপক শিক্ষা দিতেছেন—"রবীন্দ্রনাথ মাটির গান গাহিয়াছেন। কোথাও আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক নাই। আধ্যাত্মিকতা একটা ধোঁয়াটে কথা।"

ইহা স্বীকার করা অসম্ভব। 'অধ্যাত্ম' শব্দের যথার্থ অর্থবোধের অভাবই তাঁহাদের প্রকৃত অর্থ হইতে দূরে স্থাপন করিয়াছে। কোন আদর্শ দেহে বা স্থূলে সীমাবদ্ধ নহে। আদর্শ দেহাতীত। যাহা দেহাতীত তাহাই মাটির বা রূঢ় বাস্তবের অতীত। বাস্তবাতীত হইলেও আত্মাতীত নহে। এই আত্মাকে আধার করিয়া যাহা ঘটে তাহাই আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিকতা কাল্পনিকতার লীলা বিলাস নহে। কল্পনা ও কাল্পনিকতার যে পার্থক্য তাহা সুবিদিত। রবীন্দ্র-প্রতিভায় কল্পনা আছে, কাল্পনিকতা নাই। কল্পনা ও রূঢ় বাস্তব এক নহে।

'সোনার তরী'তে কল্পনার প্রমাণ পাই—

> আজ কোন কাজ নয়—সব ফেলে দিয়ে
> ছন্দোবন্ধ গ্রন্থগীত, এসো তুমি প্রিয়ে,
> আজন্ম-সাধন-ধন সুন্দরী আমার
> কবিতা কল্পনালতা।
>
> —মানস সুন্দরী।

কল্পনা ভিন্ন কাব্য সম্ভব নহে। শুধু বাস্তব দিয়ে কবিতা হয় না। রূঢ় বাস্তবে গান গাহিতে ও বাস্তবকে ত্যাগ করিয়া কল্পনার সাহায্য লইতে হয়। তাহা হইলে রূঢ় বাস্তবে গান ও কল্পনার অবকাশ আছে।

কল্পনার বর্ত্তমানতা প্রমাণে আধ্যাত্মিকতার অস্তিত্ব প্রমাণ করা বিশেষ অসুবিধা হইবে না। তাঁহার কাব্য সমুদ্রের অমূল্যরতন যে আধ্যাত্মিকতা—তাহা "গীতাঞ্জলি"র নোবেল-পুরস্কার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। এখানে 'সোনার তরী'র আধ্যাত্মিকতা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

বেদান্তে সাধনার পথকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—

"সর্ব্বথা তক্তব্যঃ মমকারঃ, ত্যক্তুমশক্যশ্চেৎ সর্ব্বথা কর্ত্তব্যঃ মমকারঃ।"

'আমি' 'আমার' এই দেহ-কেন্দ্রিক বুদ্ধি সর্ব্বপ্রকারে ত্যাগ করা উচিত। যদি তাহা সম্ভব না হয় তাহা হইলে "সব আমি ও সব আমার চিন্তা করা কর্ত্তব্য।" ইহার অপর নাম বড়-আমির সহিত ছোট-আমির যোগ। এই আন্তর যোগ না হইলে কোন সৃষ্টিই সম্ভব নয়।

'সোনার তরী'র 'রবীন্দ্রনাথ' সব আমির সাধক'। সোনার তরীতে নিজের আত্মকেন্দ্রিকতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যথিত হইয়াছেন সেখানে তিনি বিষাদযোগী। সোনার তরীর 'ছোট আমি' অহং দিয়ে ঘেরা—বড়-আমির জন্য ব্যাকুল। জনৈক লেখক লিখেছেন—"মহাকাল দেহী আমিটিকে নেন না, কিন্তু আমার কর্ম্ম কৃতিত্বের মধ্যে প্রচ্ছন্ন যে ভাবময়-আমি, আমার কর্ম্মকে মর্যাদা দিয়ে প্রকারান্তরে সেই ভাবময় আমি সত্তাটিকে, কবির ভাষায়, বড় আমিটিকে, তরীতে নেন বসিয়ে।"

কেবলমাত্র বিষাদই নামে নাই—কারণও আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। "শৈশব সন্ধ্যায়" রাখালের গানের মধ্যে পেয়েছেন অনন্তের সন্ধান—বড় আমির সন্ধান।

> "কত অসম্ভব কথা, অপূর্ব্ব কল্পনা
> কত অমূলক আশা, অশেষ কামনা,
> অনন্ত বিশ্বাস! দাঁড়াইয়া অন্ধকারে
> দেখিনু নক্ষত্রালোকে, অসীম সংসারে।"

বর্ষা যাপনের অনুভূতির ধারা-স্নাত হইয়া চলিয়াছেন ধারার উৎপত্তির সন্ধানে অর্থাৎ পরশমণির সন্ধানে। পরশমণি কখন তাঁহার ছোট-আমিকে সোনায় রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছে তাহা তিনি স্বয়ংই জানিতে পারেন নাই। ছোট-আমি ব্যবহারিক মূল্য ও সৌন্দর্য্যকে অধিকতর বর্দ্ধিত করেছে। তথাপি তাঁহার শান্তি নাই। তখন তিনি অনুভব করেছেন প্রেমই সকলের মূল। প্রেমই বিশ্বের প্রথম কথা এবং প্রেমই বিশ্বের শেষ কথা। এইখানেই কাব্যের, বিজ্ঞানের, সাধনার আরম্ভ। কাব্যের কথা—"শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ।" প্রথমেই হয়েছে প্রেমের উৎপত্তি, নতুবা সহানুভূতি প্রভৃতির অস্তিত্ব কোথায়! যদি নিজের বলিয়া মনে হয় তাহা হইলে বেদনার উৎপত্তিই হইতে পারে না। পরিণামে কাব্য বা রসের উৎপত্তি অসম্ভব।

প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ এখন জ্ঞানী না হইয়া ভক্তে রূপান্তরিত হইলেন। বৈষ্ণব কবিতায় তাহারই পরিচয় মিলে। এখানে সব 'তুমি'র খেলা। তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—

> হেরি কার নয়নে,
> রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে?

ভক্ত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ভানুসিংহের পদাবলি, গীতাঞ্জলি প্রভৃতিতে যথেষ্ট আছে। তাঁহার অন্তরের অনাহত—ধ্বনি তাঁহার 'পুরস্কার' কবিতায় শুনিতে পাই—

যে জন শুনেছে সে অনাদি ধ্বনি,
ভাসায়ে দিয়েছে হৃদয় তরণী
জানেনা আপনা, জানেনা ধরণী,
সংসার কোলাহল।

এই ধ্বনি যুগ যুগ ধরে মানুষকে আকর্ষণ করিতেছে। কেহ ত্যজিয়াছে সংসার, কেহ প্রাণ, কেহ বা কুলমান। রবীন্দ্রনাথ আজ বিমোহিত সেই অরবের রবে।

আলোচনায় কোথাও আধ্যাত্মিকতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে কিনা তাহা সুধী-সমাজের বিচার্য্য। বর্ত্তমান যুগ উন্নাসিকতার যুগে রূপান্তরিত হইতে বসিয়াছে। সেই উন্নাসিকতাই প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে দেয় না। রবীন্দ্র প্রতিভায় দুইয়ের সমন্বয়ে বাস্তবতা ও আধ্যাত্মিকতা ঘটিয়াছে, রবীন্দ্র প্রতিভা হইতে আধ্যাত্মিকতা বর্জ্জন করিলে প্রতিভাকে পঙ্গু করা হইবে। অপর পক্ষে যদি কেহ মনে করেন যে, বাস্তবতাকে ত্যাগ করিলেন তাহা হইলে তিনিও একদেশদর্শী পদবাচ্য হইবেন। রবীন্দ্র-নাথের সোনার তরীর মূল কথা 'ছোট আমি'র সহিত 'বড় আমি'র, দেহের সহিত দেহাতীতের, মনের সহিত প্রাণের, সীমার সহিত অসীমের, নিকটের সহিত দূরের সংযোগ স্থাপন।

জেবউন্নিসার আত্মকাহিনী

ডক্টর শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অদ্ভুত এই মুঘলবংশ। এই বংশের রক্তধারায় চাঘতাই তুর্ক, স্বর্ণাভ মোঙ্গল, কমনীয় পারসিক, নমনীয় ভারতীয় রক্তের সংমিশ্রণ হয়েছে। এদের জন্মের ভাষা তুর্কী, ধর্ম্মের ভাষা আরবী, রাজভাষা ফারসী, মাতৃদুগ্ধের ভাষা হিন্দুস্থানী। ভারতের মুঘলদের মাতৃকুলে বিখ্যাত বীর যোদ্ধা কারাকোরামের চেঙ্গিজের রক্ত, পিতৃকুলে সমরখন্দের চাঘতাই বীর তাইমুরের রক্ত। তৈমুর গর্ব অনুভব করতেন, তিনি মোঙ্গলকুলের জামাতৃবংশ। সেইজন্যই তিনি নিজেকে আমীর তৈমুর গুরগণ (জামাতা) বলে পরিচয় দিয়ে গর্ব অনুভব করতেন। চেঙ্গিজের তরবারির ছিল আকণ্ঠ রক্ত পিপাসা—ষাট লক্ষ শত্রুর রক্তে তিনি তাঁহার তরবারির পিপাসা নিবারণ করেছিলেন—অথচ এই চেঙ্গিজ খান বিভিন্ন ধর্ম্মের সত্য ও তথ্য অনুসন্ধান করবার জন্য একদিন পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মগুরুদের এক বিরাট সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। একমাস ব্যাপী সম্মেলনের আলোচনা অনুধাবন করে চেঙ্গিজ বলেছিলেন—সমস্ত ধর্ম্মেরই অন্তরালে ন্যূনাধিক সত্য নিহিত আছে। যে কোন ধর্ম্মের মধ্যদিয়েই ইষ্ট লাভ করা যায়। প্রতিদিন গভীর রাত্রে সপরিবারে তিনি মুক্ত আকাশতলে নতজানু হয়ে নক্ষত্ররাজিকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অর্ঘ্য নিবেদন করতেন।

এই মুঘলবংশের পূর্ব্বপুরুষ সমরখন্দের বিতাড়িত ও পলাতক অধিপতি চাঘতাই বীর তারাঘাই সমরখন্দের বনভূমিতে সামান্যমাত্র অনুচর সঙ্গে নিয়ে আশ্রয় লাভের জন্য অনির্দ্দিষ্ট ভ্রমণ করছিলেন। তখন দিকচক্রবাল-রেখান্তে অস্তায়মান সূর্য্যের শেষ রশ্মি আপন মহিমা বিস্তার করছিল। তারাঘাই জন-মনুষ্যবিরল বনাঞ্চলে বহু দূরাগত একটি শব্দ শুনে চকিত হয়ে উঠলেন। এমন শব্দ এই নির্জ্জনে অশ্রুতপূর্ব্ব। সে বনে ছিল একজন মোল্লা। [illegible] পবিত্র আজান—আল্লা-হু আকবর। তারাঘাইয়ের কর্ণে এই শব্দ ও সুর অত্যন্ত নূতন, অথচ অতি মধুর বলে মনে হয়। তারাঘাই এই শব্দ অনুসরণ করে উন্মুক্ত তরবারী হস্তে শব্দের উৎস সন্ধানের চেষ্টা করলেন। একই শব্দ—একবার, দুইবার, তিনবার। দূর থেকে তারাঘাই দেখলেন, দীর্ঘদেহ আজানুলম্বিত পরিচ্ছদ শোভিত, শিরে হরিৎবর্ণ শিরস্ত্রাণ, অথচ সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। এই বনভূমিতে অস্ত্রহীন অশ্বহীন পদচারী মানবের দর্শন অভূতপূর্ব্ব। সেই দীর্ঘদেহ পুরুষ অস্তায়মান সূর্য্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁহার দুই হস্ত একবার দুই কর্ণে, অন্যবার দুই জানুতে রেখে শেষবার নতজানু হয়ে আভূমি প্রণত হল। আবার—একবার, দুইবার, তিনবার। সেই সঙ্গে সঙ্গে অতি সুললিত কণ্ঠে সেই মহান বাণী আল্লা-হু আকবর। ততক্ষণে বিস্মিত, চকিত, মুগ্ধ তারাঘাই সেই দীর্ঘদেহ মানুষটির পশ্চাতে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁহার ছায়া আগন্তুকের দেহ অতিক্রম করে গেল—কিন্তু আগন্তুকের ভ্রূক্ষেপ নাই—সম্মুখে হস্ত প্রসারিত করে কৃতাঞ্জলিপুটে পশ্চিম আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অত্যন্ত শান্তস্বরে আল্লার দোয়া প্রার্থনা করছিলেন। তারাঘাই আগন্তুকের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কে? কার সঙ্গে কথা বলছিলে?" আগন্তুক নির্ভয়ে উত্তর দিল—"আমি মুসলিম। আমি আল্লার নিকট প্রার্থনা করছিলাম।"

"আল্লা কি তোমার প্রার্থনা শোনেন?"—প্রশ্নের সুরে তারাঘাই জিজ্ঞাসা করলেন।

"নিশ্চয়ই শোনেন।"

"আমার হয়ে প্রার্থনা কর—আমি আমার পিতৃরাজ্য হতে বিতাড়িত, পলায়িত, নিরাশ্রয়। আমি এই গভীর ঘনবনে আশ্রয় লাভের জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করছি। আমার হৃতরাজ্য আমি উদ্ধার করব। তুমি আমার

জন্য প্রার্থনা কর। তোমার আল্লা যদি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করেন, তবে আমি তোমার আল্লাকে স্বীকার করব—তোমার ধর্ম্ম গ্রহণ করব।"

সত্যই সেদিন আগন্তুক আল্লার কাছে প্রার্থনা করেছিল—তারপরের যুদ্ধে তারাঘাই জয়লাভ করলেন। তিনিই প্রথম চাঘতাই তুর্ক—যিনি 'ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ' করেছিলেন। মোল্লার আশীর্ব্বাদ এবং আল্লার দোয়ায় সমরখন্দে চাঘতাই বংশ প্রতিষ্ঠিত হল। এই তারাঘাইয়েরই পুত্র বিখ্যাত খঞ্জবীর তৈমুর।

একদা আর্য্য-আসিয়ানি বাদশাহ আকবর শিকার অন্বেষণে অশ্বারোহণে যাইবার পথে দেখেন, অতি দ্রুত পথ অতিক্রম করছেন সবৎসা হরিণী। শিকারের উন্মাদনায় বাদশাহ আকবর তীর নিক্ষেপ করতে উদ্যত হয়েছেন—অকস্মাৎ পশ্চাৎ দিক থেকে একটি আহ্বান শুনলেন—আকবর! আকবর স্তম্ভিত হলেন—এই গভীর অরণ্যে তীর নিক্ষেপের অতি সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে কে তাঁকে বাধা দিল? পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আকবর দেখলেন—চতুর্দ্দিকে বিরাট শূন্যতা, জনমানবের কোন চিহ্ন নাই। এই অবসরে হরিণী বহুদূর পথ অতিক্রম করে গেল। আবার আকবর দ্রুততর বেগে হরিণীর নিকটে উপস্থিত হলেন। আবার ধনুকের জ্যা সংযোজন করলেন—তীর নিক্ষেপের মুহূর্ত্তে আবার সেই অশরীরী আহ্বান অতি তীক্ষ্ণ কণ্ঠ। আকবর অশ্বল্গা সংযত করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, সেই বিরাট মহাশূন্যতা—কার এই আহ্বান? হরিণী ইচ্ছা করলেই শিকারীর দৃষ্টিপথ হতে বহুদূর অতিক্রম করতে পারত—কিন্তু হরিণ শিশুর মায়াতে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই সন্তানের জন্য অপেক্ষা করছিল। ইতোমধ্যে আবার আকবর হরিণীর নিকটে উপস্থিত হলেন—যৌবনকাল, অসংযত উদ্যম—শিকারের উন্মাদনা, অব্যর্থ লক্ষ্য, হরিণীকে বধ করতেই হবে। আবার শর নিক্ষেপের জন্য উদ্যত হলেন—পশ্চাদ্দেশ থেকে আবার সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর—"আকবর, তুমি কি এইজন্য জন্মগ্রহণ করেছ?" ইতোমধ্যে আকবরের নিক্ষিপ্ত শর হরিণী-মাতাকে আবক্ষ বিদ্ধ করল। হরিণী মাতার করুণ দৃষ্টি আকবরের দিকে নিবদ্ধ ছিল। হরিণ শিশু ভূপতিতা মাতার গাত্র স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে রইল। আকবর অশ্বপৃষ্ঠ হতে অবতরণ করে হরিণীর দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু তাঁহার কর্ণে অনবরত ধ্বনিত হচ্ছিল সেই ধ্বনি—"আকবর! তুমি কি এইজন্যই জন্মগ্রহণ করেছ?"

সেই মুহূর্ত্ত হতে সম্রাট আকবরের মনে এক বিরাট পরিবর্ত্তন সূচিত হল। দুই সহস্র বৎসরের ব্যবধানে হিন্দুস্থানে এক নূতন তথাগত বুদ্ধের আবির্ভাব হল, শাহানশাহ আকবর রাজকীয় শিকার নিষিদ্ধ করে দিলেন। রাজকীয় রন্ধনশালার জন্য পশুবধও প্রায় নিষিদ্ধ হয়েছিল। সমস্ত রাজ্যে পবিত্র নামাজের দিন পশু হত্যা নিষিদ্ধ হল। তিনি একদিন দুঃখ করেছিলেন—"কেন মানুষ আহারের জন্য জীব হত্যা করে? আমার যদি এত বিরাট দেহ হত যে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ আমার মাংসে তৃপ্ত হত আমি আল্লাকে ধন্যবাদ দিতাম।" এই মহাপুরুষ সমস্ত ভারতবর্ষকে এক মহান আদর্শে উদ্বোধিত করে, এক বিরাট সাম্রাজ্য সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছিলেন—সে স্বপ্ন শাহজাদা দারা শিকো সফল করতে পারতেন—কিন্তু দুর্ভাগ্য হিন্দুস্থান—তোমার রাজ্যে সে বিরাট পুরুষের স্বপ্ন সফল হল না।

সম্রাট জাহাঙ্গীর ছিলেন ফতেপুর সিক্রির পুণ্যশ্লোক মহাত্মা সেলিম চিসতীর আশীর্ব্বাদপূত সন্তান—যোধপুর রাজকন্যা ধর্ম্মপ্রাণা যোধবাইয়ের পুত্র। সেলিম চিসতীর পবিত্র খানকার পবিত্র ধূলিতে শাহজাদা সেলিম প্রথম ধরণীর ধূলি স্পর্শ করেছিলেন। আকবর সেলিম চিসতীর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে তাঁহার সন্তানের নামকরণ করেছিলেন "সেলিম।" এই সেলিম সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ী ইবাৎখানার পুণ্য আবেষ্টনীর মধ্যেই শৈশবের শিক্ষালাভ করেছিলেন। ধর্ম্মপ্রাণ আবদুর রহিম খানখানান ছিলেন তাঁহার বাল্যের শিক্ষাগুরু। খানখানান ছিলেন জন্মে তুর্কী, সংস্কারে সম্পূর্ণ ভারতীয়, তিনি ভগবানের অবতার শ্রীরামচন্দ্রের নিকট আত্ম-সমর্পণ করে বলেছিলেন—আমি তোমার শরণাগত। এই জগৎ উদ্ধারের জন্য তোমার শরণ ভিন্ন আর কোন উপায় নাই।*

বাদশাহ জাহাঙ্গীরের ন্যায়নিষ্ঠা, সুবিচার, জীব জন্তুর প্রতি দয়া—সমগ্র হিন্দুস্থানে প্রবাদরূপে প্রচলিত ছিল। রাজ্যের দীনতম প্রজা ও বিচার প্রার্থনা করে যেন প্রত্যাখ্যাত না হয় এজন্য পিতামহ জিন্নত-মকানী তাহার রাজপ্রাসাদে এক বৃহৎ ঘণ্টা সংযোজিত করেছিলেন। মুঘল পরিবারের বৈশিষ্ট্য ছিল তাদের ন্যায়নিষ্ঠা। যে কোন প্রজা দিন রাত্রি যে কোন মুহূর্ত্তে ঘণ্টাধ্বনি করে বাদশাহের নিকট বিচার প্রার্থনা করতে পারত। আমি শুনেছিলাম একদিন বাদশাহ জাহাঙ্গীর মৃগয়ায় নির্গত হয়েছিলেন—একটি ঝিলের ধারে একটি হরিণী জলপান করতে এসেছিল—নির্ভয়, নিঃশঙ্ক; পার্শ্বে ছিল এক রজক।—ঝিলের জলে বস্ত্র ধুচ্ছিল। হরিণীর প্রতি নিক্ষিপ্ত শর দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যর্থ হল। সেই রাজমোহরাঙ্কিত শর নিরপরাধ রজকের বক্ষ বিদ্ধ করল। সম্রাট জাহাঙ্গীর এই দুঃসংবাদ জানতেন না। পরদিন প্রভাতে রজকিনী শরবিদ্ধ রজককে রাজপুরীর সম্মুখে নিয়ে এসেছিল—ঘণ্টাধ্বনি করে, বাদশাহের নিকট বিচার প্রার্থনা করল। অভিযোগ এক নিষ্ঠুর ব্যাধ শরের আঘাতে তার স্বামী হত্যা করেছে। সে বাদশাহের নিকট বিচার প্রার্থনা করল। সম্রাট আদেশ করলেন মৃত রজকের দেহ থেকে শর বিচ্যুত করা হউক। শর পরীক্ষা করে বাদশাহ নিঃসন্দেহ হলেন বিগতদিনের হরিণীর প্রতি নিক্ষিপ্ত শর এই রজককে নিহত করেছে। বাদশাহ গম্ভীর হয়ে উঠলেন। তারপর বিচার করলেন—"রজকিনী, আমি বিচার করছি যে অপরাধী তোমাকে স্বামীহীনা করেছে, তার শাস্তি স্বরূপ তুমি তার পত্নীকে স্বামীহীনা করে সে দুঃখের ক্ষতিপূরণ করবে। সম্রাজ্ঞী নুরজাহান রজকিনীকে লক্ষ মুদ্রা দান করে স্বামীর প্রাণরক্ষা করেছিলেন। এই ন্যায় বিচারের ফলে মুঘল রাজবংশের উপর আল্লাহর আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয়েছিল।

একদিন একজন সর্ব্বত্যাগী ফকীর সম্রাট শাহজাহানকে আশীর্ব্বাদ

---

* গহি শরণাগত রামচন্দ্র কী ভবসাগর গ নাকী।
ও রহিমন জগৎ উদ্ধারকারী আর না কছু উপায়।

করে একটি আপেল প্রসাদ দান করেছিলেন—সেই আপেলের অনুরূপ বর্ণ গন্ধ রূপ কোন আপেলের মধ্যে কেউ কখনও দেখে নাই। ফকির বলেছিলেন—"বাদশাহ, তুমি প্রতিদিন নামাজের পূর্ব্বে এই আপেল স্পর্শ করবে—এই স্পর্শে তোমার অঙ্গুলি অপূর্ব্ব গন্ধ পূর্ণ হয়ে যাবে। এ আপেল বিধাতার আশীর্ব্বাদ। এ আপেল যেদিন তুমি হারিয়ে ফেলবে, সেদিন হবে তোমার জীবনের চরম দুঃখের দিন।" বাস্তবিকই বাদশাহ শাহজাহান ভ্রাতৃবিরোধের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বহু অনুসন্ধান করেও আপেলের সন্ধান পান নাই।

অদ্ভুত ধর্ম্মবিশ্বাসী এই পাদশাহ আলমগীরের তিনি বল্কের যুদ্ধের দিনে সূর্য্যোদয় থেকে অবিশ্রাম সৈন্য চালনা করে চলেছেন। মুহূর্ত্ত-মাত্র বিশ্রাম নাই—অগণিত শত্রু সৈন্য মুঘল সৈন্যকে বেষ্টন করে অগ্রসর হয়েছে। ঔরঙ্গজেবের জীবন শঙ্কটাপন্ন। হঠাৎ আওরঙ্গজেব পশ্চিম আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেন সূর্য্য অস্তায়মান। সন্ধ্যার নমাজের সময় উপস্থিত। তৎক্ষণাৎ তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হতে অবতরণ করে নতজানু হয়ে নমাজ সম্পন্ন করলেন। তাঁহার এই নিষ্ঠা ও অচল ধর্ম্মবিশ্বাস দেখে শত্রু সৈন্য অভিভূত ও বিমূঢ় হয়ে গেল। বল্কের সুলতান নাজীর খান শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে অশ্বের মুখ পরিবর্ত্তন করে—যুদ্ধের পরিসমাপ্তি করলেন।

সেদিনের আওরঙ্গজেব আর আজকের বাদশাহ আলমগীর। পার্থক্য আকাশ পাতাল।

ক্রমশঃ

রজনীর তীরে মম তরীর বেদনা

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নাহি আর এক-হয়ে-থাকা অবকাশ, ফুল-ফোটাবার আশা
মুছে গেছে অশ্রুজলে—তবু কেন সম্ভোগের অতৃপ্ত তিয়াষা
সাগর সঙ্গম তরে তটিনীর মত!
সুবর্ণ সৈকতে তব উপনিবেশের আয়োজন করে বৃথা
তরঙ্গ যাত্রীর দল। মৃত হয়ে গেছে কত জীবন-সবিতা
কত প্রাণ হোলো শেষে উপল-আহত!

মায়া-মুকুরের বুকে আজো তব প্রতিচ্ছায়া যেন মরীচিকা,
তৃষাতুর প্রেমিকেরে দেয় ব্যথা, মত্ত করে তব রূপশিখা—
অনঙ্গেরে—জাগে চিত্তে উদগ্রচেতনা।
তুমি যেন চোরাবালি, তবু তব পানে ছুটে যায় মনপ্রাণ!
মর্ম্মের মর্ম্মর বাণী রহিল গোপনে তব, গাহিবে কি গান?
রজনীর তীরে মম তরীর বেদনা।

বিদায়ের দিনে কবে করেছিলে নিরালায় মিলনের দিন
প্রথম প্রেমের লাগি! সিঁদুরের ছোঁয়া লেগে কল্পনা-রঙীণ
হোলো ছিন্নমেঘ, চাঁদ উঠিবার আগে!
প্রণয়-সংযোগ স্নায়ু তোমার আমার ছিল যেথানে একদা,
সেথা আজ দিক্‌ভ্রান্ত কামনার বলাকারা কহে কত কথা,
মোর সাধ হয় রাণু! শোনাতে তোমাকে।
তোমার মনের সেই হারানো সুরের সনে মোর পরিচয়
পুরানো স্মৃতির পথে, সেথা এসে বিপর্য্যয় এনেছে বিস্ময়
মধ্য এশিয়ার মরু-বালু গর্ভসম।
নীড় হোতে নীড়ে চকিত নিবিড়ে যারা মৃদুমধু আলাপন
করে পায় মুহূর্ত্ত-মন্থন সুধা প্রখর তাদের প্রলোভন
কেন মনোহরণের ক্ষণে তিক্ততম!

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নিমির ঘুম আসে না।

হ্যারিকেনের আলো যতই আড়াল করুক অভয়, যতই অন্ধকার ক'রে দিক নিমির দিকে, তার ঘুম আসে না। যতক্ষণ পর্যন্ত বই বন্ধ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত জেগে থাকে সে। নিঃশব্দে নয়, সশব্দেই জেগে থাকে। কথা নয়, কথার চেয়েও তীব্র কতগুলি শব্দ আছে। চরিত্র ও পরিবেশ অনুযায়ী সেই শব্দগুলি আশ্চর্যরকম কার্যকরী।

থেকে থেকে নিমি হঠাৎ এক একটা দীর্ঘ হুঁ দিয়ে ওঠে। যার মধ্যে অনেক না-বলা বিদ্রূপ ও বিরক্তি ওঠে ফুটে। কখনো কখনো তার সহসা ককানি শুনে মনে হয়, কি কষ্ট যেন হচ্ছে নিমির। সে যেন কাঁদছে, ছটফট করছে।

আবার কখনো কখনো নিঃশব্দে অভয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে। ভেবে ভেবে যেন কুল-কিনারা পায় না।

কুল-কিনারা পায় না ব'লেই, তার নিজের দিকে নৈতিক সমর্থনের অভাব হ'য়ে পড়ে। চোখের সামনে দেখা দেয় অভয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবেরা। যারা প্রায়ই এ বাড়িতে যাতায়াত করে। অনাথ মিস্ত্রি তাদের মধ্যে একজন। যাকে সকলে ভালবাসে, ভক্তিও করে।

সেই অনাথ অভয়ের নামে অজ্ঞান। অভয়ের ভাল বাখানে পঞ্চমুখ। মন্দ বাখানে রা' নেই।

কিন্তু অনাথদের সঙ্গে নিমিদের মিল কোথায়। অনাথের নামের সঙ্গে ভয় মিশিয়ে আছে। জেল খাটতে, গুলী খেতে যার ভয় নেই, সে অনাথ। যার চার পাশে, অদৃশ্য, ওৎপাতা বাঘের মত পুলিশী ত্রাস বিরাজ করছে, সে হল অভয়ের গুরু। যে অনাথ ওই এক কাজে বউ ছেলে মেয়ে সব হারিয়েছে। যে-মানুষ আগে কোন বাধা রাখে নি, পিছনে রাখেনি কোন টান।

সুবালার কল্পিত কুহকী মায়ায় যত সর্বনাশের ভয় নিমির, অনাথের সঙ্গে ঘোরাফেরা তার চেয়ে কোন অংশে কম ভয় নয় তার।

ভালবাসার কী বিড়ম্বনা নিমির। ভয় তাকে কখনো ছেড়ে যায় না। অকূল ভাবনায় তার ছোট মনটিতে যে কত উদ্বেগ ভ'রে ওঠে, সংসারে সে কথাটা কেউ জানে না। জানতে চায় না। নিমিরও যে বড় দিশেহারা লাগে নিজেকে, চোখ মেলে সেটুকু দেখবার সময় নেই কারুর। চোখও নেই।

এসব কথা ভেবে, নিমিরও যে কান্না উথ্‌লে ওঠে, তা কেউ শুনতে পায় না।

অভয়ও টের পায়, নিমি ঘুমোয়নি। মিথ্যে নয়, নিমির নানান রকম শব্দগুলি তার মনোযোগের ব্যাঘাত করে। মিথ্যে নয়, বইগুলির সঙ্গে অনাথ খুড়োর চাক্ষুষ যোগাযোগ আছে।

কিন্তু প্রথমে প্রথমে নিমি যেমন ক'রে অভয়ের মনকে কুলুপকাটি এঁটে, যখন খুশি খোলা-বন্ধ করতে পারত, আজ আর তা পারে না। নতুন নতুন বিস্ময়ের দরজা তার চোখের সামনে খুলে দেবার যাদুটা শিখিয়ে দিয়েছে অনাথ। সেই বিচিত্রের মাঝে, নিমির ঢোকবার কোন দরজা নেই।

অভয়ের চেয়ে অনাথ কিছু বেশী পণ্ডিত নয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা আছে। রামায়ণ, মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ,

'কারিগরী শিক্ষা' ছাড়াও, 'মজুরি ও পুঁজি' নামে বইয়ের কপালে মাথা কোটে অভয়। বইটি তাকে অনাথই দিয়েছে। বানান ক'রে ক'রে, অভয় যেটুকু উদ্ধার করে, 'বাক্য' হিসেবে সেটুকু পড়ার মত হয়। কিন্তু মানে বুঝতে গিয়ে গুরু শিষ্যের প্রায় একই দশা। সহজ হিসেবের এত যে গরমিল, কে জানত। টিপসই দিয়ে 'হপ্তা' নেবার বেলায়, কোনদিন মনে হয় না। এই মুজুরির সঙ্গে, সমুদ্রের মত অতল রহস্যময় পুঁজির কোন যোগসাজস আছে, তার সঙ্গে আছে আরো ভারী ভারী কথা। 'উৎপাদন' 'পণ্য' 'ক্রয় ও বিক্রয়' 'সমাজ ব্যবস্থা' 'ধন বণ্টন' ইত্যাদি। কথাগুলি বানান ক'রে প'ড়ে, অভয়ের নিজেরই মনে হয়, বাঁদরের মুঠিতে যেন কেউ মুক্তো ভ'রে দিয়েছে। আড়ষ্ট জিহ্বার কোলে, কতগুলি অর্থহীন শব্দ। প্রলাপের মত।

তবু, কুয়াশা ঢাকা দিগন্তের মত কী একটি অস্পষ্ট আলোকের রেখা যেন চিক্‌চিক্ ক'রে ওঠে অভয়ের চোখের সামনে। তার কোন স্পষ্ট মূর্তি নেই। তার দীপ্ত হাসি ও প্রখর তাপ ফুটে ওঠে না মেঘ-চাপা দিকচক্রবালে। রক্তাভ সুগোল অবয়ব নিয়ে তার রথ হয় তো দেখা যায় না।

কিন্তু সে আছে। অনেক কুয়াশা ও মেঘের আড়ালে সে যেমন আছেই আছে, তেমনি অর্থহীন অস্পষ্ট কঠিন কথাগুলির মধ্যেও অনাবিষ্কৃত মানে যেন ঠাহর করা যায়। শুধু বোঝা যায় না।

অভয়ের তাই সব কিছুতেই বড় বিস্ময়। গান গেয়ে সে যেমন বলে, এক থেকে ডাইনে গেলে, শত সহস্র অযুতে কোটিতে তুমি যেতে পার। কিন্তু বাঁয়ে? এককে কোটিতে নিয়ে যাওয়া যায়। বাঁয়ে যে অসীম ও অনন্ত বিন্দু, তার হদিস কোথায়?

তখন মনে হয়, সবই ওর জটিল ও কঠিন।

অনাথ বলে, অত কথার খোলস না হয় না ভাঙতে পারলুম। জীবনটার দিকে তাকিয়ে দেখ না কেন? ওই প্যাঁচানো পাকানো কুচুটে কথাগুলোনের মানে জলের মতন সহজ হয়ে রয়েছে সবখানে।

কেমন?

জীবনটা। অবিচার আর অনাচারের ছড়াছড়ি। ঘরে যাও, ঘরে, পথে যাও, পথে; সবখানে। খাওয়া পরা বাস, যেদিকে চোখ দেবে, বড় বড় সব কথার মানে একেবারে সাফ।

অভয়ের তখন মনে হয়, তাও তো বটে!

তবে? এই অবিচার আর অনাচারটাকে জগত ভরে চালাবার জন্যে অনেক বড় বড় মাথা খাটানো হয়েছে। সেই মাথা খাটানো— চালাকীটা, আর একজন মাথা খাটিয়ে বইয়ে লিখেছে। বুদ্ধি দিয়ে না বুঝলেও, মন দিয়ে বোঝা যায়। চোখ মেলে দেখা যায়।

তবু বইয়ের বুকে মাথা কুটে মরে অভয়। যদিও বই তার কাছে পাথরের সামিল। কী যেন আছে, কী যেন নিঃশব্দে বলছে সেই পাথর। সেইটুকু সেই কথাগুলি শুনতে চায় সে। কিন্তু সেখানে সমাজের কথা আছে। সমাজের কথা জানতে গেলে, ইতিহাস আসে। ইতিহাস জানতে গিয়ে। একটা কঠিন দুর্বোধ্য মস্ত গল্পের মত মনে হয়। আশ্চর্য অদ্ভুত গল্প। অভয়ের সামনে নানান পোষাক-পরিচ্ছদ পরা, নানান ধরণের মানুষের মূর্তি ভেসে ওঠে। বিচিত্র সব কল্পনায় পেয়ে বসে তাকে। সে যেন ইতিহাসকে দেখতে পায়। কিন্তু তাকে বুঝতে পারে না।

তবু মনের একটি জায়গা কখনো ভরতে চায় না। হেসে গেয়ে হেঁকে ডেকে যে জীবনটা তার টলমল করত, বেগে বইত, তেমন আর হয় না। কোন্ একটা ঘূর্ণী ধাঁধাঁয় যেন সে আটকে গেছে। সেখানে শুধু নিমির কঠিন মুখ ও বিদ্রূপ চাইনি।

মানুষের অনেক সাধ। নিজেকে ছাড়িয়ে যাবারও তার বড় সাধ। বুঝি সাধনাও। কিন্তু যাওয়া যায় না যেন।

মাঝে মাঝে ছোটোখাটো কারণে, এই আড়ষ্ট জটিলতা কেটে যায়।

ইতিমধ্যে পাড়ার যাত্রার দল যাত্রা করেছে। অভয় বিবেক সেজে গান করেছে। বিশু ছাড়া সুখ্যাতি করেছে সবাই। রতন ঠাকুর, যাত্রা গানের 'কেলাবের' মাস্টার। সে বলেছে, 'এতদিনে একটা খাঁটি বিবেক পাওয়া গেছে দলে। একা এই বিবেক দিয়ে, এখন কলকাতা ঘুরে আসা যায়।'

যাত্রার আসর শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু গানের পালা

শেষ হয় নি। এ বাড়ি ও বাড়ি, পাড়ায়, চায়ের দোকানে কারখানায় আরো অনেকবার গাইতে হয়েছে। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে বিবেকের গান।

বাজারের মাছের কারবারী গান শুনে মেডেল দিয়েছে। রূপোর জল লাগানো লোহা নয়, এক ভরি ওজনের খাঁটি রূপোর মেডেল। লাল সিল্কের ফিতেয় বাঁধা, নিজে ঝুলিয়ে দিয়েছে বুকে।

মালীপাড়ারই বারোয়ারী তলায় যাত্রা হয়েছে। নিমি গিয়েছিল। পাড়ার মেয়েরা কেউ বাকী ছিল না। নিমি দেখেছিল, সুবালাও এসেছে।

মাছের কারবারী শরতদাস যখন মেডেল দেয়, তখন নিমির দিকে কেউ তাকিয়ে দেখে নি। তার দুই চোখে যেন খুশির বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছিল কেউ। আশে পাশের মেয়েদের চাউনির জ্বালায়, মুখখানিকে গম্ভীর করে, মাথা নীচু করে রেখেছিল।

কিন্তু মেয়েদের আসরের মধ্যে, খিলখিল হাসি ও নির্লজ্জ হাততালি শুনে, চমকে দেখেছিল নিমি, সুবালা। সুবালার পাশে বসে, গিরিবালা সিগারেট টানছিল। সে বলেছিল, এই ছুঁড়ি, হাত তালি দিচ্ছিস কেন লো মুখ-পুড়ি? মুখপোড়া মিনসেরা যে সব এদিকে তাক্‌কে রয়েছে।

সুবালা বলেছিল, থাক্‌গে। লোকটা মাইরি জবর গায় গিরিদিদি।

এই পর্য্যন্তই এসেছিল নিমির কানে। তারপরেই চোখাচোখি হয়েছিল গিরিবালার সঙ্গে। চোখাচোখি না হ'লে, গিরিবালা যে-কথাটি বলত, সেটা তার মুখেই ছায়া পড়ে গিয়েছিল। গিরিবালা বলতে চেয়েছিল সুবালাকে, জবর গানের গাইয়ে তো তোর ঘরের গাইয়ে।

তাতেও বোধহয় আপত্তি ছিল না নিমির। সে দেখ-ছিল, সুবালার অপলক চোখের আর পলক পড়ছে না অভয়ের ওপর থেকে। যতই দেখছিল, ততই নিমির মুখের সব আলোটুকু আসরের বিজলী আলোও ধরে রাখতে পারেনি। খুশীর দীপ্তি নিভে গিয়েছিল একটু একটু করে। একটু একটু করে, স্বামীর জন্যে সব অহঙ্কার উবে গিয়েছিল।

দলের মধ্যে বিশু ডেকে কথা বলেনি। ঘরে নিমি মুখ ফুটে বলেনি কিছু আগে। অভয়ই জিজ্ঞেস করেছে। হেসে, অনেক আশা নিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, বিবেকের গান কেমন লাগল?

নিমি জবাব দিয়েছে, 'যার ভাল লেগেছে, সে তো আসরে দাঁড়িয়েই হাততালি মেরেছে। শুনতে পাওনি?'

—না তো।

—তবে তোমার কপাল মন্দ। রাত পোহালে যেও তার কাছে। বুকের কাছে দাঁড়িয়ে, শুনিয়ে দেবেখনি।

এর বেশী আর বলতে হয়নি। বুঝতে বাকীও থাকে নি অভয়ের।

তবু, কয়েকটা দিন যেন তার জীবনের বন্ধ দরজা খুলে গিয়েছিল। সেই ঝোঁকের মাথাতেই অনাথ খুড়ো ধরে বসল তাকে। ধরল এমন বে-কায়দায়, একেবারে সভায় মধ্যখানে। কারখানার মজুরদের সভা। হাজার হাজার লোক। তার ওপরে লোক এসেছেন কলকাতা থেকে বক্তৃতা দেবার জন্যে। সকলে উঠে দাঁড়িয়ে, হাততালি দিয়ে তাঁদের সম্মান জানায়।

অনাথ খুড়োরও সেখানে খুব মান। যন্ত্রের চোঙাটার কাছে দাঁড়িয়ে, অনাথ খুড়ো বেমালুম চেঁচিয়ে বলে দিল, আমাদের রিপেয়ারিং ডিপার্টের কবিয়াল অভয়চরণ আজ গান গাইবেন। নিজের তৈরী গান।

অভয় থ। রিপেয়ারিং-এর মিস্ত্রিরা হাত তালি দিয়ে চীৎকার ক'রে উঠল। জনাকয়েক, প্রায় পাঁজাকোলা ক'রে তুলে দিয়ে গেল তাকে যন্ত্রটার সামনে।

অতবড় ষণ্ডার মত মানুষটা অভয়। যন্ত্রটার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল, সে বুঝি চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠবে। এ কি করলে খুড়ো?

অনাথ বলল, ঠিক করেছি। প্যাঁচার মত দিন রাত্তির থম্ ধরে বসে থাকলেই হবে? লোকে তোমাকে আমার সাকরেদ বলে। ওসবে আমার লোভ নেই। তোমাকে বক্তিমে দিতে হবে না, কিন্তু তোমার মধ্যে মাল যা আছে, তা' ছাড়তে হবে। নে, আরম্ভ কর।

অভয় আবার বলল অসহায় ভাবে, কি আরম্ভ করব অনাথখুড়ো, ব'লে দাও।

অনাথ বলল, তা' আমি কি জানি।

কলকাতা থেকে যারা এসেছেন, তাদের একজন বললেন, আপনি যা পারেন, তাই গেয়ে দিন একখানা।

কিন্তু সভার চীৎকার থামছে না।

অভয় গিয়ে দাঁড়াল সকলের সামনে। মাইকের স্পীকার প'ড়ে আছে তার বুকের কাছে। সে আসর বোঝে, বাসর বোঝে, কিন্তু এ রকম সভায় সে কোন দিন দাঁড়ায়নি। এ রকম সভায় যে-সব গান হ'য়ে থাকে, তাও সে জানে না।

অভয় যেন পাথর হ'য়ে রইল। চীৎকার বাড়তে লাগল। ইতিমধ্যে একজন এসে, মাইকের স্পীকারটা তুলে দিয়ে গেল তার মুখের সামনে।

অনাথ বলল, ধর, ধরে ফ্যাল্ খুড়ো।

অভয় শব্দ তুলে অবাক হ'য়ে গেল। মাঠের চারদিকে তার গলা। সহসা তার নজরে প'ড়ে গেল হরি মিস্ত্রিকে। তার হাতের কাজের গুরু। চেঁচিয়ে বলল, ক গাইব ?

শুনে সবাই হেসে মরে গেল।

হরি চেঁচিয়ে বলল, সেই সেইটা, 'যত ময়লা গাদা···

অভয় চোখ বুজে চীৎকার ক'রে উঠল, আমি গান গাইতে পারি না। আমাকে মাফ করেন সকলে।

কয়েক মুহূর্ত্ত সকলেই নীরব। পর মুহূর্ত্তেই হাসি ও চীৎকারের একটা ধুম প'ড়ে গেল।

অনাথের চোখে কোনদিন তার প্রতি রাগ বা বিরক্তি দেখে নি অভয়। আজ চোখাচোখি করবার সাহস পর্যন্ত হ'ল না তার। সে শুধু দেখল, তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে, অনাথ চীৎকার ক'রে বলছে, বন্ধুগণ, আমরা আমাদের সভা শুরু করছি। জলালউদ্দীন তার আগে আপনাদের একখানি গান গেয়ে শোনাবে।

অভয় লজ্জায় ও অপমানে তাড়াতাড়ি নেমে এল মঞ্চ থেকে। তারপরে, ভিড়ের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল, কেউ ফিরেও দেখল না।

ক্রমশঃ

ছেলেরা চুরি করে কেন ?

সুপ্রিয়া ঠাকুর

মিথ্যা বলা এবং চুরি করা—ছেলেদের এ দুটি বদ-অভ্যাসের সম্বন্ধ, অত্যন্ত নিকট। অর্থাৎ একটা থেকে অন্যটার উৎপত্তি খুব স্বাভাবিকভাবেই ঘটে থাকে, যে ছেলে চুরি করায় পটু হতে চলেছে তাকে নিতান্ত প্রয়োজন বোধেই মিথ্যার সাহায্য নিতে হয়েছে। আবার যে মিথ্যায় পটু, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই চুরির প্রতি একটা আকর্ষণ তার আসবেই। কারণ, অপরাধ করে রেহাই পাবার উপায় তার হাতের মুঠোয়। তাই একটার প্রতিরোধ করতে হলে অন্যটার কথা ভুললে চলবে না।

১। ছেলেদের হাত থেকে কোন জিনিষ জোর করে কেড়ে নেবেন না।

ধরুন, আপনি সেলাই করতে বসেছেন, সামনে আপনার বছর দেড়েকের ছেলে খেলা করছিল। হঠাৎ তার কি খেয়াল হল আপনার কাঁচিটা টেনে নিলে। অথবা তার বাবার ঘড়িটা হাতের কাছে পেয়ে নিয়ে নিলে, সঙ্গে সঙ্গে হাঁ হাঁ করে যেন কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন না, বরং তার বদলে অন্য কিছু দিয়ে ভুলিয়ে দেবেন, যাতে করে বুঝতে সে না পারে যে কাঁচিটা নেবার জন্যেই আপনি এই কৌশল বিস্তার করেছেন। কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে, সে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে, কারণ আপনার গায়ের জোর বেশী। কিন্তু অন্য সময় যখন আপনি ঘরে না থাকবেন তখন ঐ জিনিষটিই কিংবা অন্য কোন জিনিষ আপনাকে লুকিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে, অর্থাৎ তার ধারণাই হয়ে যাবে যে আপনাকে জানিয়ে বা দেখিয়ে কোন কিছু নেওয়া সম্ভব নয়।

২। তাদের নিজস্ব বস্তুতে আপনার অধিকার নাই, মনে রাখবেন।

অনেক সময় ছেলে-মেয়েদের শাস্তি দেওয়ার জন্যে আমরা তাদের খেলনা বা সখের জিনিষগুলি নিয়ে নিই। এতে তারা শাস্তি পায় বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আপনার উপর প্রতিশোধ নেওয়ার উপায়ও শিখে যায়, অর্থাৎ কোন কারণে কখনও যদি সে আপনার ওপর অসন্তুষ্ট হয় তখন এমনি করেই আপনার প্রয়োজনীয় কোন জিনিষ লুকিয়ে রাখবে বা নষ্ট করে ফেলবে। আজ আপনাকে জব্দ করার জন্যে যে কৌশল সে অবলম্বন করলে, দুদিন পরে অন্যের কোন একটি জিনিষ তার পছন্দমত হলে সে সেটিকে ওই একই কৌশলে নিয়ে নেবে।

আপনার আত্মীয়ের কোন ছেলে হয়ত আপনার বাড়ীতে এসেছে। তাকে ভুলিয়ে রাখার জন্যে আপনার ছেলের কিছু খেলনা তার অনুপস্থিতিতে বা তার কাছ থেকে জোর করে নিয়ে ছেলেটিকে দিলেন। এমনও কিন্তু করবেন না কখনও! তাকে দিয়েই দেওয়াবার চেষ্টা করবেন। কারণ, এতেও ছেলেদের মনে খারাপ প্রতিক্রিয়া হয়।

৩। নিজের জিনিসের যত্ন করতে শিক্ষা দিন।

ছেলেদের নিজের জিনিষের প্রতি যত্ন নেওয়ার শিক্ষা দিতে হলে নিচের নিয়মগুলি পালন করুন :

(ক) যতদিন ছেলেরা সাবধানতা অবলম্বন করতে না পারবে ততদিন কোন বই বা খেলনা তার হাতে দিয়ে সেখান থেকে চলে আসবেন না।

(খ) ভাঙ্গা খেলনা বা ছেঁড়া বই তাদের হাতে দেবেন না। অর্থাৎ ভেঙ্গে গেলে বা ছিঁড়ে গেলে হয় সেগুলি মেরামত করে দিতে হবে, না হয় ফেলে দিতে হবে।

(গ) খেলা হয়ে গেলে খেলনাগুলি বা বইটি যথা-স্থানে গুছিয়ে রাখতে শেখাবেন।

নিজের জিনিষের প্রতি যত্নবান হলে অন্যের জিনিষের পরেও শ্রদ্ধাশীল হবে এবং অন্যের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হবে।

৪। কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস ব্যবহার করতে দেবেন না।

অধিকাংশ মা বাবাই ছেলেদের কুড়িয়ে পাওয়া জিনিষ সম্বন্ধে মাথা ঘামান না। কারণ, তাঁরা অত তলিয়ে দেখেন না যে এতে তাঁর ছেলের মনে অন্যের জিনিষের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যেতে পারে। তাই ছোটবেলা থেকেই তাদের শিক্ষা দেবেন যে কুড়িয়ে পাওয়া পয়সা ভিখিরিকে দিয়ে দিতে হয়, অন্য জিনিস পেলে তার মালিকের সন্ধান করে তাকে ফেরৎ দিতে হয়। মালিকের সন্ধান না পেলে জিনিসটি অন্য জায়গায় তুলে রাখতে বলবেন। তারপর বুঝিয়ে বলবেন যে সে যদি আজ ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা না করে, অন্য দিন তার কোন জিনিস কেউ কুড়িয়ে পেলে সেও তাকে ফেরৎ দেবে না।

৫। ছেলেদের জিনিস-পত্র মাঝে মাঝে পরীক্ষা করবেন।

আপনার ছেলে-মেয়েদের খাতা, পেন্সিল, খেলনা ইত্যাদি যা আছে আপনি তা মোটামুটি সবই প্রায় চেনেন। তার মধ্যে এমন কোন জিনিস যদি দেখেন যা আপনার ছেলের নয় বলে মনে হচ্ছে, তবে সেটির সম্বন্ধে ছেলেকেই জিজ্ঞাসা করবেন, কিন্তু ছেলের সামনেই তার জিনিস-পত্র যেন পরীক্ষা করতে লেগে যাবেন না বা তাকে বুঝতে পর্যন্ত দেবেন না যে তার অনুপস্থিতিতে তার জিনিস-পত্র আপনি উট্‌কে পাট্‌কে দেখেছেন।

৬। ন্যায়সঙ্গত চাহিদাগুলি সাধ্যমত পূরণ করবেন।

বিশেষ করে উৎসবে বা কোন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে যা যা দরকার সেগুলির দিকে লক্ষ্য রাখবেন। যেমন ধরুন, কালীপূজোর বাজী, বিশ্বকর্মার দিনে ঘুড়ি সুতো বা বন্ধুদের নিয়ে কোন পিক্‌নিক্ পার্টির চাঁদা ইত্যাদির জন্যে কৃপণতা করবেন না। কোন সৎকাজ বা স্কুলে পরীক্ষার ভাল ফল করার জন্যে পুরস্কার দেবেন, তা যত সামান্যই হোক। এই সবের মধ্যে দিয়ে ছেলেদের সৎকাজের অনুপ্রেরণা বাড়ে। স্বাভাবিকভাবেই অসৎ-কাজের দিকে লক্ষ্য থাকে না।

৭। টাকা পয়সার ব্যাপারে বিশেষ করে সাবধান থাকবেন।

টাকা পয়সার ওপর মানুষের যত আকর্ষণ, এত বোধ হয় আর কোন কিছুর ওপরেই নাই। কারণ, এই ছোট ছোট বস্তুগুলির বিনিময়ে মানুষ তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অনেকখানিই লাভ করতে পারে। এমন কি অবোধ শিশুরা পর্যন্ত এই মোহিনী শক্তির প্রভাব থেকেই রেহাই পায় না। তাই ছেলে-মেয়েদের মনে টাকা-পয়সার ওপর আসক্তি অত্যধিকভাবে না জন্মাতে পারে তার জন্যে আপনার নিজের কতকগুলি দিক বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(ক) টাকা পয়সা তাদের চোখের সামনে ছড়িয়ে রাখবেন না।

সাধারণত আমরা যা করে থাকি; বাজার বা দোকান থেকে ফেরৎ খুচরো টাকা বা আনি, দুয়ানিগুলো বিছানার কোণে বা টেবিলের ওপর রেখে দিই। সকালে তাড়া-তাড়ির সময় কে এখন তুলতে যায়! ঘরে তো অন্য কেউ নাই। আপনারই ছোট ছেলে মেয়েরা খেলা করছে। আজ তারা চুরি করবে না সত্যি কথা। হয়ত হাতে করে নিয়ে খেলা করবে একটু। কিন্তু এই খেলার মধ্যে দিয়েই তার মনে কিছু কেনার সখ আসবে। যেমন তার বাবা, মা বা অন্যেরা কিনে থাকেন। সবটাই খেলার ছেলে কিন্তু। তারপর যখনই সে বুঝতে পারবে যে এর বিনিময়ে তার প্রার্থিত বস্তু প্রায় সবই পাওয়া যায়, তখনই সে যখন তখন আপনার কাছে পয়সা চাইবে। সব সময় আপনি দেবেন না নিশ্চয়ই। আর দেওয়া উচিত নয়! অতএব তখন তার অন্য পথ বেছে নেওয়ার কথা খুব স্বাভাবিক-ভাবেই মনে পড়বে।

(খ) ভোলাবার জন্যে ছেলেদের হাতে পয়সা দেবেন না।

আপনি হয়ত বাইরে কোথাও যাচ্ছেন। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন না। ছেলেও বায়না ধরেছে আপনার

সঙ্গে যাবে। তখন অন্য উপায় আর না দেখে তার হাতে কিছু পয়সা দিয়ে ভুলিয়ে যান। এমনটা করবেন না। এতেও ছেলেদের পয়সার ওপর লোভ বেড়ে যায়। তখন আপনার কাছ থেকে সব সময়েই এমনিভাবে পয়সা পাবার আশা করে।

(গ) ছেলেদের দিয়ে কোন জিনিস কেনাবেন না।

ফিরিওয়ালা ডেকেছেন ওপর থেকে। দর-দস্তরি ওপর থেকেই করলেন, তারপর ছেলের হাতে পয়সা দিয়ে জিনিসটা আনতে পাঠালেন। কে আর নীচে যায়। নীচে নিজেই যাবেন। ছেলেকে নীচে পাঠিয়ে তার আরও নীচে নামার পথ তৈরী করে দেবেন না।

(ঘ) তাদের সামনে কারও পকেট থেকে কিছু নেবেন না।

অনেক সময় দরকার হলে, টাকা পয়সা বা দরকারী কোন কাগজ তাদের বাবার পকেট থেকে আমরা নিয়ে থাকি। আপনার দেখাদেখি তারাও নিতে শিখবে। প্রথম প্রথম তারা হয়ত বুঝতেই পারবে না যে এটা তাদের পক্ষে অন্যায়। আর বুঝলেই বা কি এসে যায়। তার থেকে বরং ছোটবেলা থেকে শিক্ষা দেবেন যে কারও পকেট থেকে কিছু নিতে নাই।

(ঙ) তাদের কাছ থেকে পাই পয়সার হিসাব নেবেন।

ছেলে একটু বড় হয়ে গেলে তাকে দোকানে বা বাজারে পাঠাতেই হবে। কারণ, আমাদের মত মধ্যবিত্ত ঘরে এ ছাড়া উপায় থাকে না। হিসাব নেবেন বটে, কিন্তু সে যেন এমন কথা মনে না করতে পারে যে আপনি তাকে সন্দেহ করেছেন। তা হলে তার ফল হবে বিপরীত। তাকে যখন টাকা পয়সা দেবেন গুণে নিতে বলবেন।

(চ) অহেতুক সন্দেহ করবেন না।

অধিকাংশ মায়েরই কম বেশী এ দোষ আছে দেখতে পাওয়া যায়। হ্যাঁরে, অমুক বাড়ীর চাকর বা অমুক বাবু দু টাকা সের চিংড়ি মাছ নিয়ে এল, আর তোর বেলাতেই আড়াই টাকা?

এই ধরণের কথা ছেলেদের কখনও বলবেন না। এতে আপনার ছেলের মনে বিরক্তি আনবে এবং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যেও অন্ততঃ তার পরের দিন কিছু না কিছু পয়সা আপনার বাজারের টাকা থেকে সে চুরি করবে।

(ছ) ছেলেদের হাতখরচা সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন।

(জ) বিলাসিতার প্রশ্রয় একেবারে দেবেন না।

শেষে এ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলব। ‘ধরুন, জানতে পারলেন যে আপনার ছেলের চুরি করার অভ্যাস হয়ে গেছে। এতদিন বুঝতে পারেন নি। এখন জানতে পেরে কি করবেন? আঁৎকে উঠে তাকে রাগের মাথায় মারধর বা বকা-ঝকা যেন কখনও করবেন না। তার ফল আরও খারাপ দাঁড়াবে। তার চেয়ে তাকে প্রথমেই এর পরিণতিটা দেখবার চেষ্টা করবেন। তার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন তার এই বদ্ অভ্যাসের কথা জানতে পারবে তখন তার নিজের অবস্থাই বা কি হবে—আপনাদেরও লজ্জার সীমা থাকবে না ইত্যাদি। তারপর তার প্রকৃতি এবং স্বভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে তার সখের ব্যাপারে খুব বেশী করে উৎসাহিত করবেন। যেমন, আপনার ছেলে হয়ত ছবি আঁকতে ভালবাসে। তখন তাকে ভাল কাগজ পেন্সিল, রং তুলি ইত্যাদি কিনে দেবেন এবং তার আঁকার ব্যাপারে আপনিও যে খুব উৎসাহী এমন ভাব দেখাবেন। অর্থাৎ তার মন যে দিকে যেতে চায় সেই দিকেই বেশী করে নিয়ে যেতে পারলে কিছুদিন পর তার এই বদ্ অভ্যাস আর থাকবে না। কারণ, ছেলেরা চুরি করার জন্যে চুরি করে না—এই কথাটা সব সময় মনে রাখবেন। অন্যান্য খেলার মত—প্রথম প্রথম এটাও তাদের একটা খেলার মতই থাকে।

সামি কাবাব

উপকরণ—আধসের কিমা, এক ছটাক ছোলার ডাল, আদা, পেঁয়াজ, লঙ্কা, কিছু ধনেপাতা, পুদিনা পাতা, দুই তিনটি বড়এলাচ, দালচিনি ও একটি ডিম।

এই সামি কাবাব তৈরী করতে হলে আগে কিমা আর ছোলার ডাল সিদ্ধ করতে হবে। বেশী জল দেবেন না। ডাল যেন বেশী না গলে যায়। সেদ্ধর সময়ে পিঁয়াজ আদা একটু বড় কোরে কেটে, বড়এলাচ ছড়িয়ে, দালচিনি, পরিমাণ মত নুন সব ওতে দিয়ে দিন। হ্যাঁ শুক্‌নো লঙ্কাও চার পাঁচটা আস্ত ঐ সঙ্গে দিন। সেদ্ধ হয়ে গেলে সব একসঙ্গে মিহিন কোরে বেটে নিন। এবার ঐ পুদিনা-পাতা ধনেপাতা আর কিছু পিঁয়াজ আদা কুচি কুচি করে কাটুন যত সরু কাটতে পারেন, এর মধ্যে একটু টক দিন। আমচুর বা লেবুর রস যা হয়। ঐ ডিমটি এবার ভেঙ্গে ঐ পেস জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে চপের মত কোরে গড়ুন। গোল কোরে গড়বেন। ভেতরে ঐ কুঁচনো জিনিষ পুরের মত কোরে দেবেন। ঐ কুঁচনো জিনিষের মধ্যে কিছু কাঁচা লঙ্কাও কুঁচিয়ে নেবেন। এবার তাওয়ায় অল্প ঘি দিয়ে ঐগুলি লাল কোরে ভেজে নিন। চপের চেয়ে কম খরচে চপের চেয়ে সুস্বাদু জিনিষ হবে। যাঁরা রসুন খান তাঁরা সেদ্ধর সময়ে রসুন দিতে পারেন।

—আভারাণী দেবী

শ্রাদ্ধ বাড়ী

শ্রীকালিদাস রায়

প্রকাণ্ড ম্যারাপ-তলে শ্রাদ্ধ-বাড়ী সুসজ্জিত সভা,
পর্দায় ঝালরে ফুলে কিবা শোভা বাহবা বাহবা।
রাস্তায় দাঁড়ায়ে গেছে শত শত গাড়ী
আসিয়াছে শত শত পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদধারী।
সিগারেট চুরুটের ধূমে আমোদিত সভাস্থান
চলিতেছে তার মাঝে কীর্তনের গান।
কেহ তা শোনে না কান দিয়া।
আড়চোখে দেখে কীর্তনিয়া
জমা হলো কত টাকা থালার উপর।
চলিছে ভোটের গল্প সভাস্থলে কোর্টের খবর।
ছাউনীর অন্য পাশে জনদশ উড়িয়া ব্রাহ্মণ
পান মুখে, ঘামে ভিজে হাতা নাড়ি করিছে রন্ধন।

সভাটির এক পাশে সাজানো ষোড়শ,
খাট-শয্যা বস্ত্র-ফল সন্দেশ তৈজস।
আসিছে মিষ্টান্ন দধি কত ভারে ভারে।
পুরুত তাগিদ দেয় হোথা বারে বারে।
চলিতেছে সমারোহে মহা মহোৎসব,
বাজে খোল, হট্টগোল, অট্টহাস্য,
চলে কলরব।
সর্ব আভরণমুক্ত থানপরা গৃহিণী কেবল
এক কোণে ফেলে আঁখিজল,
উচ্চ কণ্ঠে ডাকে ছেলে। মা কোথায়
হুঁশ নেই তার
কে করিবে শ্রাদ্ধের যোগাড়?

আমাদের রানীমা

আমাদের বাড়ীর কাছেই ছোট একটা বাড়ী আছে। সে বাড়ীতে থাকেন রানীমা। আমরা যখনই ছাদে উঠি দেখি রানীমা বাড়ীর উঠোনে বসে হয় চরকা কাটছেন নয় সোয়েটার বুনছেন। একদিন ছাদে রোদ্দুরে চুল শুকোতে উঠে আমি দেখি রানীমা চরকার সামনে চুপ করে বসে আছেন। আমি ভাবলাম ওঁর সঙ্গে গিয়ে একটু গপ্পসপ্প করা যাক। আমি যেতে আমাকে বসার একটা আসন দিয়ে রানীমা বললেন

"দ্যাখ্, আমি না হয় মুখ্যসুখ্য মানুষ তাই বলে আমি কি এতই বোকা যে আজে বাজে কিছু বুঝিয়ে দিলেই বুঝব? রাশিয়া নাকি আকাশে একটা নতুন নক্ষত্র ছেড়েছে আর তার মধ্যে নাকি একটা কুকুর পোরা! হ্যাঁ ঃ যত সব—"।

আমি যখন রানীমাকে স্পুটনিক আর লাইকা সম্বন্ধে সব কিছু বুঝিয়ে বললাম রানীমা একেবারে হতবাক বললেন-"আমায় আর একটু খুলে বলতো, আমার মাথায় অত চট্ করে কিছু ঢোকে না।"

রানীমা কিন্তু সেটা বললেন নেহাৎই বিনয় করে। বুদ্ধিসুদ্ধি ওঁর বেশ ভালই আছে। ছেলে মেয়েরা যখন চেঁচিয়ে ওদের পড়া মুখস্ত করে উনি তখন ওদের নানারকম প্রশ্ন করে নানা বিষয়ে জেনেছেন। অন্যান্য মহিলাদের মত বাঁধাধরা গতে চলতে উনি মোটেই রাজী নন। সেদিন আমি যাচ্ছিলাম কেনাকাটা করতে। রানীমা আমায় বললেন "আমায় একটু কাপড় কাচা সাবান এনে দিবি ভাই?"

S. 261A-X52 BG

বিদ্যালয়-পাঠাগার ও পুস্তক

শ্রীনমিতা সেনগুপ্তা

ডাক্তার রঙ্গনাথন বলেন, শিক্ষা কেবলমাত্র স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির জন্য নহে, বহির্জগতের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যই শিক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন এবং এই শিক্ষাকে আয়ত্ত করিবার জন্য একান্ত প্রয়োজন বিদ্যালয়-পাঠাগারের বহুল প্রতিষ্ঠা।

বিদ্যালয়-পাঠাগারের কাজ যেমন বহুমুখী ইহার প্রয়োজনও তেমনি বহুল। পাঠাগারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সম্বন্ধে বলিতে গিয়া Gretchen Knief schsenk বলিয়াছেন "Three B's in library service—books, brains and building." সুতরাং পুস্তকের প্রয়োজনীয়তাই যে সর্ব্বাধিক একথা নির্বিচারে স্বীকার্য্য। একটা উত্তম পাঠাগার পুস্তক, পাঠক এবং কর্ম্মী এই তিনটির ঘনিষ্ঠ এবং অখণ্ড সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার মধ্যে পুস্তকই যে প্রধান এবং মূলবস্তু, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বহুমূল্য আসবাবপত্রের দ্বারা পাঠাগারকে যতই সুসজ্জিত করা হোক না কেন, তাহার কোন মূল্যই থাকে না যদি সেই পাঠাগারে উপযুক্ত পুস্তক না থাকে এবং সেই পুস্তকের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার না হয়।

পুস্তকের সংখ্যা নিরূপণ এবং গুণাগুণ বিচার করিয়া পুস্তক নির্ব্বাচন করাও বিদ্যালয়-পাঠাগারের আর একটী প্রধান লক্ষ্য বস্তু। একমাত্র ইহার উপরই নির্ভর করে পাঠাগারের সার্থকতা, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর পক্ষে নানাবিধ পুস্তকের মাধ্যমেই বহির্বিশ্বের সহিত মানসিক সংযোগ স্থাপন করা অত্যন্ত সহজ ও সম্ভব। কিন্তু ইহা একটী লক্ষণীয় বিষয় যে, আমাদের বালক-বালিকাদের মধ্যে ১.৫ অংশ বালক বালিকাই তাহাদের পাঠ্য-পুস্তক ভিন্ন অন্য কোনরূপ পুস্তক পাঠ করে না। বিদ্যালয়ে পাঠাগারের পর্য্যাপ্ত সুযোগের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। জ্ঞান-পিপাসু বালকবালিকাগণ বিদ্যালয়-পাঠাগারের উপযুক্ত সুযোগের অভাবে মুষ্টিমেয় জনসাধারণ ও ব্যক্তিগত পাঠাগারগুলির অল্পসংখ্যক পুস্তকের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের সেই তৃষ্ণা মিটাইতে বাধ্য হয়।

যদিও ক্ষেত্রবিশেষে নিয়মিত পাঠক এবং সাময়িক পাঠকের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা কঠিন, তথাপি মোটামুটিভাবে ইহা বলা চলে যে, অধিক-সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে বিদ্যালয় পাঠাগার হইতে পুস্তক সংগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হয়। অথচ এইরূপ ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে লক্ষিত হয় যে বিদ্যালয়-পাঠাগারগুলি তাহাদের চাহিদা মিটাইতে সক্ষম হয় না এবং একমাত্র এই কারণেই ছাত্রছাত্রীগণ তাহাদের প্রয়োজনীয় পুস্তক সংগ্রহের নিমিত্ত বিদ্যালয় পাঠাগারের বহির্ভূত জনসাধারণ কিংবা ব্যক্তিগত পাঠাগারগুলির স্মরণ লইতে ও নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে বাধ্য হয়। এই সকল ছাত্রছাত্রীদিগের পুস্তক সংগ্রহের নিমিত্ত ইতস্ততঃ ছুটাছুটির হাত হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়—প্রয়োজনীয় বিষয় বস্তুর উপর লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে উহাদের চাহিদা মিটাইতে পারা যায় এইরূপ পুস্তক বিদ্যালয়-পাঠাগার সমূহে সঞ্চিত রাখা। এই সঙ্গে সহজপ্রাপ্য ও প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তকের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করাও বিশেষ প্রয়োজন।

পুস্তকের সংখ্যা ও গুণাগুণ নিরূপণ করা বিদ্যালয় পাঠাগারের একটী অপরিহার্য্য বিষয়। সাধারণতঃ দেখা যায় বিদ্যালয় পাঠাগারসমূহে অতি আবশ্যক বিষয়, যেমন—বাংলা, ইংরাজি, ইতিহাস, ভুগোল প্রভৃতির সংখ্যাই বিশেষ করিয়া নির্দ্ধারিত করা হয়, কিন্তু সেই তুলনায় মনোবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, কৃষিশাস্ত্র, সঙ্গীত শাস্ত্র বিষয়ক পুস্তকসমূহ সংরক্ষিত রাখা হয় না। অথচ এই সকল পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা যে কিছুমাত্র কম নহে ইহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এই সকল পুস্তক ক্রয়ের দিকে দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। একটী বিদ্যালয় পাঠাগারে বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকের কি পরিমাণ সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে তাহা ঠিক করা খুবই কঠিন, তথাপি প্রত্যেক বিদ্যালয় পাঠাগারের কর্ত্তব্য মোটামুটি তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার মাথা পিছু অন্ততঃপক্ষে ৫টী করিয়া পুস্তক রাখা। এই বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থাগারিক বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন। L. R. Mccolvin বলেন, একটি সাধারণ পাঠাগারের প্রথম অবস্থায় পুস্তকের তাকগুলি পরিপূর্ণ রাখিতে হইবে, তদুপরি পাঠাগারের আশে পাশের লোক সংখ্যা অনুসারে মাথা পিছু ১·৬ খণ্ড করিয়া পুস্তক রাখা সমীচীন। ইহার পরে নিয়মিত পাঠকের হার অনুসারে পুস্তকের সংখ্যা ক্রমঃবর্দ্ধিত হওয়া প্রয়োজন। ডাঃ রঙ্গনাথনের মতে মাথা পিছু ২৪ খানা পুস্তক রাখা সমীচীন। যে কোন বিদ্যালয় পাঠাগারে প্রায় ২০০ শত ছাত্রছাত্রীর অনুরূপ অন্ততঃ পক্ষে ১০০০ হইতে ১৭০০ পর্য্যন্ত পুস্তক তালিকাভুক্ত রাখা কর্ত্তব্য এবং প্রতি বৎসর কমপক্ষে আরো ১০০ নূতন পুস্তক এই তালিকাভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। Irene Wells এর মতে একটী বিদ্যালয় পাঠাগারে নিম্নলিখিত রূপ পুস্তকে রাখা প্রয়োজন।

তালিকাভুক্ত ২০০ জনের জন্য ১৭০০ পুস্তক হইতে ২০০০ খণ্ড।
" ৫০০ " " ৩৫০০ " " ৫০০০ "
" ১,০০০ " " ৫০০০ " " ৭০০০ "

কিন্তু ভারতের নানাবিধ বাধাবিঘ্নের বিশেষতঃ আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া আমরা এই বিষয়ে অতিরিক্ত বড় ধারণার বশবর্ত্তী হইতে পারি না। কাজেই এখানে একটী বিদ্যালয় পাঠাগারকে সুপরিচালিত করিতে হইলে এবং দ্রুতগতিতে উন্নত করিতে হইলে আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্বর্ত্তীকালীন সময়ে প্রতি ছাত্রছাত্রী পিছু পাঁচ হইতে সাতটি পুস্তক বিদ্যালয় পাঠাগারে রাখা সমীচীন মনে

করি অথবা যে পরিমাণ পুস্তক বর্ত্তমানে আছে তাহার দেড় গুণ বৃদ্ধি করিলেও বর্ত্তমান অবস্থায় চলিতে পারে। অবশ্য শুধু বিদ্যালয়ের পক্ষে এত পুস্তক সংগ্রহ করা আর্থিক অসুবিধার জন্য সম্ভব নহে। কাজেই সরকার ও স্থানীয় জনগণের এই বিষয়ে সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

অনেক প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় ছাত্রছাত্রীর বিবিধ বিষয়ের প্রতি অনুরাগ হিসাবে পুস্তক নির্ব্বাচন করিবার কোন ধারাবাহিক নিয়ম নাই। সেই সকল বিদ্যালয় পাঠাগারগুলির পুস্তক ক্রয় করিবার সময় ছাত্রছাত্রীদিগের একজন প্রতিনিধি অথবা স্বতন্ত্রভাবে ছাত্রছাত্রীর মতামত নিয়া পুস্তক নির্ব্বাচন করা উচিত। এই সকল ছাত্রছাত্রীগণের পুস্তক মনোনীত করিবার সুবিধার নিমিত্ত বিদ্যালয়-পাঠাগারে এক-একটী করিয়া "পুস্তক নির্দেশিকা" রাখা যাইতে পারে। অথবা একটী বাক্স রাখা চলিতে পারে যেখানে তাহারা তাহাদের নির্ব্বাচিত পুস্তকের নাম লিখিয়া তাহা সেই বাক্সে ফেলিয়া দিতে পারে। কিন্তু এই স্থলে একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে বিদ্যালয় পাঠাগারগুলি যদি সর্ব্বতোভাবে ছাত্রছাত্রীর দাবী কিংবা নির্ব্বাচিত পুস্তকের উপর পাঠাগারের চাহিদা ঠিক করে তাহা হইলে নিতান্তই ভুল করা হইবে। তাহাদের অহেতুক দাবীকে সংযত করিয়া অপর বিষয়সমূহের এমন সকল পুস্তক ক্রয় করিতে হইবে যাহা বিদ্যালয়ের তরফ হইতে ছাত্রছাত্রীর পাঠ করা অতি অবশ্যই কর্ত্তব্য। কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করাই বিদ্যালয়-পাঠাগারের উদ্দেশ্য নহে। গ্রন্থাগারের এমন সমস্ত পুস্তক নির্ব্বাচন এবং ক্রয় করা উচিত যে সমস্ত পুস্তক পাঠে ছাত্রছাত্রীগণ অধিকতর আগ্রহান্বিত হইবে এবং অধিকতর উৎসাহের সহিত অধিকতর পুস্তক সংগ্রহের জন্য সচেষ্ট থাকিবে। পুস্তকের সংখ্যা অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি করা এমন কিছুই নহে, যদি তাহার গুরুত্ব এবং কার্য্যকারিতা থাকে।

বিদ্যালয় পাঠাগারের প্রত্যেকটি পুস্তক এরূপভাবে সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য যাহা বালক-বালিকাদের উৎসাহ, উদ্দীপনা, উপকারিতা এবং জ্ঞান অর্জ্জনের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করে। এই সর্ত্তগুলি বিশেষভাবে অধিক প্রয়োজন সেইখানেই যেখানে বিদ্যালয় পাঠাগার কেবলমাত্র তাক-সজ্জিত করিবার নিমিত্ত পুস্তক ক্রয় করে না। অতএব একটী বিদ্যালয়-পাঠাগারের প্রকৃত পুস্তক নির্ব্বাচন গ্রন্থাগারিকের সুবিবেচনার পরিচায়ক।

অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় বিদ্যালয়-পাঠাগারগুলি ভারতীয় কৃষি, কলা, অতীত ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়গুলির পুস্তক রাখা সম্বন্ধে গুরুত্ব আরোপ করে না। ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের দেশের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া অতীত এবং বর্ত্তমান সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে সুযোগ দেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সুতরাং এই সকল বিষয়ক উত্তম পুস্তক সংগ্রহ করা প্রত্যেক বিদ্যালয়-পাঠাগারের মুখ্য উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। পাঠাগারে Reference পুস্তকও বহুল পরিমাণে রাখা কর্ত্তব্য। ঐ সকল পুস্তক এরূপভাবে ক্রয় করা উচিত যাহাতে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ পরবর্ত্তীকালে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তাহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারে।

সময় মত পুস্তক পাল্টানোর বিষয়ে দৃষ্টি রাখা গ্রন্থাগারিকের অন্যতম কর্ত্তব্য। পুস্তক সময়োপযোগী না হইলে ছাত্রছাত্রীর পক্ষে ভাল অপেক্ষা মন্দ ফলই প্রদান করে বেশী. ছাত্রছাত্রীর প্রয়োজনীয়তা ও আগ্রহের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া পাঠাগারে দরকারী পুস্তকসমূহ সংগ্রহ করা বিদ্যালয়-পাঠাগারের একটী মুখ্য কর্ত্তব্য। মোটের উপর যে সকল পুস্তক পাঠে ছাত্রছাত্রীর প্রয়োজনীয় আগ্রহ মিটিতে পারে এবং তাহাদের পাঠাগার সম্বন্ধে আকর্ষণ আনিতে পারে সেইরূপ উপযুক্ত পুস্তকই বিদ্যালয়-পাঠাগারে রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

অনেক স্থলে দেখা যায় বিদ্যালয়-পাঠাগারগুলিতে অব্যবহার্য্য এবং অপ্রয়োজনীয় বহুসংখ্যক পুস্তক কেবলমাত্র পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য রাখা হয়। আবার অনেক সময় দেখা যায় কোনও আইনজীবী ব্যক্তি হয়তো আইন সংক্রান্ত তাঁহার যাবতীয় পুস্তক সমূহ তিনি দান পত্র করিয়া কোন বিদ্যালয় পাঠাগারকে দিয়া গিয়াছেন। আবার কখনো দেখা যায় হয়তো কোন পাঠ্য পুস্তকের একটা মোটা সংখ্যা পাঠাগারের কোন একটী বিশিষ্ট স্থান জুড়িয়া রাখিয়াছে, যাহা প্রকৃতপক্ষে বহু পুরাতন এবং মোটেই সময়োপযোগী নহে। উপরন্তু এই গুলি ছাত্রছাত্রীগণেরও কোন কাজেই আসে না। আবার কোথাও দেখা যায় অনাবশ্যক ও অব্যবহৃত পুস্তকসমূহ ছিন্নভিন্ন অবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। এই সকল ধূলি-ধূসরিত পুস্তকগুলি দেখিলেই বুঝা যায় যে কখনও ইহাদের স্পর্শও করা হয় নাই। এইরূপ অবস্থায় এই সকল পুস্তক তালিকাভুক্ত করিবার পূর্ব্বেই সতর্ক বিবেচনার প্রয়োজন। এই ব্যাপারে কেবলমাত্র সেই সকল পুস্তকই গ্রহণযোগ্য, যে সকল পুস্তক হইতে প্রকৃত উপকার পাওয়া যাইবে। যে সকল বিদ্যালয়ে এই ধরণের অব্যবহৃত পুস্তক কার্য্যকরী হইবে বলিয়া মনে হয় অতি সত্বর সেই বিদ্যালয় পাঠাগারে উহাদের স্থানান্তরিত করা আবশ্যক। অবাঞ্ছিত এবং অপ্রয়োজনীয় পুস্তকসমূহ বিদ্যালয়-পাঠাগারে অতি অবশ্যই বর্জ্জনীয়। ইহা যদি কেহ দানও করে তথাপি গ্রহণ করা উচিত নহে। বরং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠাগারগুলিতে এই পুস্তকগুলি দান করিবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া উচিত। কারণ যে কোন বিদ্যালয়-পাঠাগারে এই প্রয়োজনীয় এবং অবাঞ্ছিত পুস্তক মৃতদেহেরই মত ভার স্বরূপ। একজন সুদক্ষ গ্রন্থাগারিকের পুস্তক-বিক্রেতার লাভের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কোন প্রকার দুর্ব্বলতার বশবর্ত্তী না হইয়া, সত্যিকারের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই সকল সমস্যার সমাধান করা উচিত। এখানে একটী মাত্র প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে সকল অবাঞ্ছিত পুস্তকসমূহ পাঠাগারে বিদ্যমান আছে তাহাদের সম্বন্ধে কি করা যাইতে পারে? এই সকল পুস্তক মধ্যে মধ্যে বাতিল করিয়া দেওয়া উচিত। ৫০ জনের মধ্যে ১৬ জন গ্রন্থাগারিকের মতে এই সকল পুস্তক সরবরাহ করা মোটেই উচিত নহে। ২৯ জনের মতে ভবিষ্যতের প্রয়োজনের নিমিত্ত উহা রাখা আবশ্যক।

মোটামুটি একথা বলা যায়, পুরাতন পাঠ্যপুস্তক, বয়স্কদের উপন্যাস এবং অপরাপর অনাবশ্যক জিনিষপত্র বিদ্যালয় পাঠাগারের মঙ্গলের নিমিত্ত ত্যাগ করা প্রয়োজন।

উপসংহারে ইহা বলা চলে, একটী বিদ্যালয়-পাঠাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিবার নিমিত্ত জনসাধারণ এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন করা উচিত এবং পুস্তক আদান প্রদানের ব্যবস্থা করিলে তাহাতে সুফল লাভ হইবে। একটী সহরে যতগুলি পাঠাগার আছে প্রত্যেক পাঠাগারের সহিত সম্পর্ক রাখিতে পারে এমন একটি বৃহৎ বিদ্যালয়-পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। কারণ ইহার মাধ্যমে প্রত্যেক পাঠাগার নিজেদের প্রয়োজন মত পুস্তকসংগ্রহ ও বিনিময় করিতে সক্ষম হইবে। পাশ্চাত্য দেশে বিদ্যালয়-পাঠাগারগুলির সহর কেন্দ্র আফিস হইতে গ্রামের পাঠাগারগুলিতে নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তর মটরগাড়ি দ্বারা প্রয়োজনীয় পুস্তক সরবরাহ ও সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। ভারতেও এই দিকে লক্ষ্য দিলে শিক্ষার বিপুল প্রসার ঘটিবে তাহা নিঃসন্দেহে আশা করা যায়।

আজ আমি চিনেছি আমায়

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

আজ আমি চিনেছি আমায়
লভেছি আশীষ তব
কণায় কণায়—
আজ আমি চিনেছি আমায়।

রবি শশী তারকার রূপ
নাহি আজ করে বিমোহিত
রূপের ছটায়—
আমি আজ চিনেছি আমায়।

অনন্ত আকাশ আজ
শান্ত হ'য়ে আছে
আমা—মাঝে।
অনন্তের পেয়েছি সন্ধান।
আমা হ'তে অনন্তের
হয়েছে উদ্ভব,
আমার মাঝারে পুনঃ
লয় হ'য়ে যায়।
আমা ছাড়া নাহি আর কিছু
এই জগত সত্তায়।
আমি আজ চিনেছি আমায়।

যাহারে চিনেছি, আজ
ছিল মোর হৃদয় গুহায়।
আমি আজ চিনেছি আমায়।

যাহারে চিনেছি আজ
রহিয়াছে সবে মিশে
নিজ মহিমায়।
আমি আজ চিনেছি আমায়।

॥ বাণী-বন্দনা ॥

সেকালে

একালে

শিল্পী :—শ্রীপৃথ্বী দেবশর্ম্মা

হীরেন্দ্র নারায়ন মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)
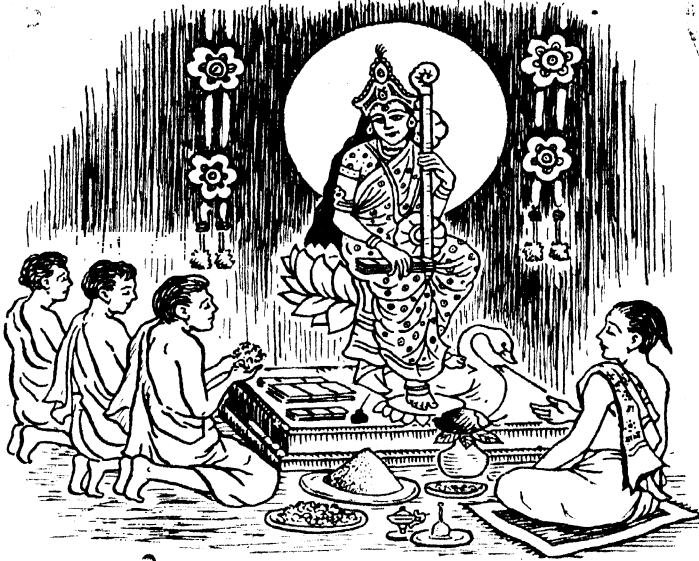
পয়সা নিবারণ পেয়েছে কিছু। ধূলিমুঠি বিলিয়ে কড়ি-মুঠি কুড়িয়েছে ধর্মাতুর নরনারীর হাটে। কিন্তু তার খেসারতও কম দিতে হয়নি। পাহাড়-ভাঙা শ্রান্তি নিয়ে সারাটা রাত, সারা সকাল পথে পথে ঘুরে বেরিয়েছে অতসীর সন্ধানে। মনটা অনুশোচনায় ভরে উঠেছে। ওর বউনি কারবারে গুন্নারি নৌকার গুণ টানতে অতসী কোথায় তলিয়ে গেল ভাটার টানে! অতসী তো নিজে থেকে এগিয়ে আসেনি। নিবারণই জোর করে তাকে টেনে এনেছিল নিজের স্বার্থে।···পয়সা!···পয়সা নিবারণ চেয়েছিল সত্যি। পয়সা না হলে আর একটি দিনও বাঁচবার সংস্থান ছিল না তার। কিন্তু তাই বলে তো অতসীর বিনিময়ে সে-পয়সা চায়নি নিবারণ।

নন্দাকে নিয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল নিবারণ, মনের মতন করে নতুন ঘর বাঁধবে বলে। নন্দা-পালিয়েছে তার স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে। কিন্তু নিবারণ আজও পারেনি বস্তির এই অন্ধকার এঁদো ঘরখানা ছেড়ে পালাতে। কেন পারেনি, সে কথা অন্যে না জানলেও নিবারণ জানে। অতসীর হয়তো এতটুকুও অসুবিধা হয়নি পাশ কাটিয়ে চলতে। কিন্তু নিবারণ একমুহূর্তের জন্যেও পারেনি মনটাকে আড়ালে সরিয়ে নিতে। পলাতক মন অজানা আকর্ষণে বাঁধা পড়েছে ওই অসহায় মেয়েটার মুখপানে চেয়ে।

অদ্ভুত! ওর ওই নিঃসম্বল নিঃসঙ্গ জীবনের কথা ভেবে নিবারণের মন বারবার ভিজে উঠেছে। কিন্তু অতসী নিজে একটি মুহূর্তের জন্যেও ভাবে না সে কথা। হয় ভাবে না, কিংবা ভাববার মত বুদ্ধি তার নেই।··· বুদ্ধিই নেই। উঠতি বয়েসে ভাগ্যের বিপাকে প'ড়ে হয়তো হতভম্ব হয়েছে। না হয়, কষ্ট ওর হাড়ে-হাড়ে দাঁত বসিয়ে মনটাকে ভোঁতা ক'রে দিয়েছে। বুদ্ধি আছে, কিন্তু অনুভূতি নেই।

তাই কি?

না-না।—নিবারণের সে ভুল বারবার ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে এসেছে। অতসীর মনের নাগাল সে পায়নি। যতদিন বিছানায় পড়ে ছিল, নিবারণের দেওয়া ওষুধ-পথ্য খেতে কোন আপত্তি সে করেনি। মনে আপত্তি থাকলেও মুখ ফুটে বলেনি কোন কথা। কিন্তু ধীরে ধীরে শরীর যত সুস্থ হয়ে উঠেছে, মিনতি তত বেড়েছে। হাত জোড় ক'রে অনুনয় করেছে নিবারণের কাছে: ওসব কি হবে নিবারণবাবু?···ভিকিরীর আবার ওষুধ!

নিবারণ ইতস্তত করেছে। ক্ষণকাল নীরব থেকে, একদাগ ওষুধ ঢেলে অতসীর মুখের সামনে তুলে ধরে বলেছে: আর আনবো না। এবারের মত খেয়ে নাও।··· ভুগে কি লাভ বলো?

লাভ!···বাসি ফুলের মত মরা একটুকরো হাসি ফুটে উঠেছে অতসীর পাণ্ডুর ঠোঁটের কোণে। উদাস দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ নিবারণের মুখপানে চেয়ে থেকে বলেছে: গরীবকে বাঁচানো পাপ।

পাপ!

তাছাড়া আর কি নিবারণবাবু? খুন জখম করলে যে পাপ হয়, তার চেয়ে ঢের বেশী পাপ হয় গরীবদুঃখীকে বাঁচিয়ে তুললে। মরে' তারা খালাস পায়।

নিবারণ আর কোন কথা বলেনি। ইচ্ছা থাকলেও জবাব আসেনি মুখে। ওষুধ খাইয়ে শিশিটা কুলঙ্গীতে তুলে রেখে, নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে দরজাটা টেনে দিয়ে।

মনটা নৈরাশ্যে ভরে উঠেছে। নিবারণ বুঝেছে যে অতসী নন্দা নয়। ঘরে বাইরে নিয়ত যাদের সঙ্গে হয়েছে ওর পরিচয়, তারা যেন আলাদা রক্তমাংসে তৈরী। অতসীর সঙ্গে তাদের কোথাও এতটুকু মিল নেই। তবুও মাঝে মাঝে মনের কোণে স্বপ্নের জলতরঙ্গ বেজে ওঠে। পদ্ম যখন চটুল পরিহাসে অতসীকে বিব্রত ক'রে তোলে, নিবারণের চোখ দুটো হালকা নেশার আমেজে বন্ধ হয়ে আসে।

অতসী যে কেমন করে এতখানি পথ পায়ে হেঁটে ফিরলো তা নিজেও বুঝতে পারেনি। একটা ঘূর্ণা বাতাসের ঝাপটায় ওর অসাড় হাত-পাগুলো যেন ছেঁড়া পাতার মত কুণ্ডলী পাকিয়ে আবার উড়ে এসে পড়লো বস্তির সরু গলিটার মুখে।

লোকগুলো দিক্‌দিগন্তে বেরিয়েছে পেটের দায়ে। কোন সাড়াশব্দ নাই। পুঁটি তলগড়ে ব'সে কাঠের আরসিখানা বাঁ-হাতে ধ'রে ডান হাতে রসকলি আঁকছে থাঁদা নাকটার ডগায়। ওপাশে দরজার সামনে তোলা উনুনটায় ভাত চড়িয়ে পদ্ম রৌদ্রে দাঁড়িয়ে চুল শুকোচ্ছিল।

হঠাৎ অতসীকে দেখে বীভৎস উল্লাসে পদ্ম চেঁচিয়ে উঠলো: কি লো, শেষমেষ তা হলে ফিরলি?...রাত কাটালি কোন চুলোয়?

অতসী কোন উত্তর দিলে না। শ্রান্ত পা' দুটোকে সামলে নিয়ে এগিয়ে চললো নিজের ঘরের দিকে।

নিবারণের ঘরখানা তালাবন্ধ। নিঃশব্দে চোখ দুটো নামিয়ে নিয়ে অতসী তার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াতেই তড়বড় করে পদ্ম এসে দাঁড়ালো ওর পাশে। ততক্ষণে পুঁটি গয়লানিও উঠে এসেছে ওর পিছু পিছু।

ওমা, এযে নতুন কাপড়-চোপড় লো! রথ দেখতে গিয়ে কলা বেচে এলি বুঝি?

অতসী কোন উত্তর দিলেনা। তালুতে জিব ঠেকিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ ক'রে পদ্ম বললে; তা ভালো। চোকস কপাল করে এসেছিলি। কিন্তু ইদিকে মিনসে যে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে কাল রাত থেকে। সহরময় খুঁজে মরছে।

অতসী জানে। এই ক'মাসে নিবারণকে চিনতে তার বাকী নাই। বস্তির আর পাঁচজনের মত সে নয়।...খুঁজে বেড়াবে। সত্যি খুঁজে বেড়াবে সহরময়। নিবারণের অতগুলো পয়সার জিনিস অতসী ভিড়ের ভিতর কোথায় হারিয়ে এসেছে, তা নিজেও জানে না। নিবারণের উপকার করতে পারেনি কোনদিন। কিন্তু আজ লোকসান করে এসেছে তার অনেক টাকার মাল।

কিলো, কি ভাবছিস অমন ক'রে?...ছেকলটা খোল। ঘরে ঢুকতে মন সরছে না বুঝি?

নাঃ উত্তর দেবে না ভেবেও না দিয়ে পারে না অতসী। পদ্মর কথায় ওর আপাদমস্তক যেন ঘেন্নায় রী রী করে ওঠে।

অতসী ঘরে ঢুকলো।

পুঁটির গায়ে আঙুলের একটা খোঁচা দিয়ে পদ্ম শানকি-ভাঙা অওয়াজে এক ঝলক হাসি ছুঁড়ে দিয়ে বললে: বয়েস থাকতে অমন ভুথ-ধান্ধা করার কোন মানে হয়?... ভালো শিকার জুটিয়েছিল; রাতারাতি ভোল পাল্‌টে দিয়েছে।...অমন দামী কাপড়-চোপড়! মন লাগিয়ে থাকলে, সোনাদানাও উঠতো গায়ে।

পুঁটি হাসে। কিন্তু পদ্মর কথায় ফোড়ন কাটতে পারে না। একটু থেমে, নরম সুরে দরদ মিশিয়ে বলে: একদিনে চেহারাটা যে কালি-ঝুল হয়েছে লো! পথ হারিয়েছিলি বুঝি?

হাঁ।...ছেঁড়া মাদুরখানা টেনে নিয়ে অতসী মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে। ওদের কথায় কান দেবার মত মনের অবস্থা তার ছিল না। বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে চাপা কান্নায়। কিন্তু কাঁদতে অতসী পারে না। ওই গন্নাকাটা পদ্ম আর রসকলি-কাটা পুঁটি গয়লানির সামনে চোখের জল ফেলতে তার মন আজ বিদ্রোহ করে ওঠে।

পদ্ম হঠাৎ থেমে যায়। অতসীর রকম-সকম দেখে কথা বাড়াতে যেন সাহস হয় না আর। অতসী যতক্ষণ ফেরেনি, নিবারণ যতবার ঘুরে এসেছে তার ঘরে, পদ্ম তত-বার চাপা গলায় টিটকারি দিয়ে উঁকি মেরেছে দরজায়। অথচ অতসী ফেরেনি দেখে সে নিজেও হাঁপিয়ে উঠেছিল। মনে মনে হাজার বার মুণ্ডপাত করেছে নিবারণের। কাটা কাটা কথার বিঁধুনিতে তাকে কম বিব্রত করেনি।...আর অতসী যখন সত্যি ফিরে এলো, পদ্মার মনটা যেন বিষিয়ে উঠলো চোখের নিমেষে।

অতসী!

কি ভেবে পদ্ম বসে পড়লো অতসীর পাশে। অতসী বাধা দিলে না। যেমনকার তেমনি নির্জীব হয়ে পড়ে রইল মুখ গুঁজে।

এমন নির্বাক পদ্ম হয়না সহসা। ওর উত্তাল নগ্ন প্রকৃতি যেন হঠাৎ বিষহরির ছোঁয়ায় মাথা নীচু করে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। পুঁটি চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে ছিল দরজার সামনে।

অনেকক্ষণের নীরবতা কাটিয়ে পদ্ম ঠাণ্ডা গলায় বলে উঠলো: ভারি সুন্দর মানিয়েছে অতসীকে। নারে পুঁটি?

তা মানাবে না? গেরোর ফেরে না-হয় খাপরা-খোলার বস্তিতে এসে ঠাঁই নিয়েছে। জাতের ঘরের মেয়ে তো বটে।

তাই। সত্যি তাই। এমন মিষ্টি চেহারা! যোগ থাকতে ভালো মানুষের হাতে পড়লে, রূপ ওর ঝলমলিয়ে উঠতো।

আবার পদ্ম নীরব হয়ে গেল। অতসী কোন কথা বলে না। এমন কি, তার শরীরের স্পন্দনটা পর্যন্ত যেন অনুভব করা যায় না বাইরে থেকে। বুকের ভিতর যে ঝড় উঠেছিল, সে ঝড় থেমে গিয়ে ওর সারা সত্তা যেন নিথর হয়ে এসেছিল নিদারুণ অবসাদে। তিতীক্ষায় স্থির হয়ে এসেছিল ওর নারীসুলভ প্রতিঘাতস্পৃহা। ওদের হাত থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নেবার মত সক্রিয়তাও যেন ছিল না মনের।

পদ্ম উসখুস করছিল। এপাশ ওপাশ তাকিয়ে নিয়ে বললে: পুঁটি, যা না। উনুনে ভাত ফুটছে। হেঁসেলে কুকুর না ঢোকে!

একটু ইতস্তত ক'রে পুঁটি সরে গেল দরজা থেকে।

পদ্ম তাড়াতাড়ি উঠে দরজাটায় খিল লাগিয়ে দিলে। এসে আবার বসলো অতসীর মাদুরখানায়—একেবারে গা-ঘেঁসে। অতসীর পিঠের ওপর হাতখানা ছড়িয়ে দিয়ে বললে: কি লো, কথা কইছিস না যে! গোসা হলো নাকি?··· না, মন ঘুরছে কারো লেগে?

অতসী কোন উত্তর দিলে না। শরীরটা ওর শিরশির করে উঠলো দারুণ বিতৃষ্ণায়।···এই গন্নাকাটি ছাড়বে না ওর হাড়মাস না চিবিয়ে। কপালে কাল-নাগিনীর মতন এসে জুটেছে হতচ্ছাড়ি ঠোঁটকাটি।

আস্তে আস্তে পদ্ম ঝুঁকে পড়লো অতসীর ঘাড়ের ওপর। কাণের কাছে মুখখানা নিয়ে চুমকাড়ি কেটে বললে: নিবারণের কারবারের পয়সা ভাঙিস নি তো?

অতসী চমকে উঠলো। হঠাৎ যেন ওর বিচার বুদ্ধি ফিরে এলো পদ্মর কথা শুনে।···নিবারণবাবুর পয়সা! সত্যি তো নিবারণবাবু অনেক টাকার জিনিস দিয়েছিল ওকে গঙ্গার ঘাটে বিক্রি করতে! যাত্রীর ভিড়ে সেই থলে-ভরা জিনিস-পত্র ও হারিয়ে এসেছে।···কি ভাববে নিবারণবাবু? ওর পরণে এই দামী নতুন শাড়ি আর সায়া-ব্লাউজ দেখে হয়তো নিবারণবাবুও ভাববে এই কথা। যা পদ্ম ভেবেছে, পুঁটিও ভাবছে মনে মনে।···ছি-ছি!

অতসী ধড়ফড় করে উঠে বসলো। পদ্মর হাত দুখানা দু'হাতে চেপে ধরে বললে: না পদ্মদিদি, নিবারণবাবুর পয়সা আমি ভাঙিনি। না ব'লে কেন নেবো পরের জিনিস!···হারিয়েছি। পথেই হারিয়ে এসেছি জিনিস-পত্তর সব। বিক্রি করতে পারিনি। লোকের চাপে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলাম।

তারপর?

তারপর কি ঘটেছে, কিছুই জানি না। যারা দয়া করে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, তারাই দিয়েছে সব। পরণের কাপড়খানাও ছিল না।

মিন্‌সেরা ভালো বলতে হবে।

পুরুষ নয়। মেয়েছেলে।···বড় লোকের বাড়ীর গিন্নী।

ওঃ!···এক টুকরো অবিশ্বাসের হাসি ঝিলিক দিয়ে গেল পদ্মর চোখে মুখে।

অতসী হকচকিয়ে গেল। কি বলবে, ভেবে পায় না। পদ্মর হাত দুখানায় আকুতির সঙ্গে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললে: বিশ্বাস করো, পদ্মদিদি। তারা বড়লোক—মস্ত বড়লোক!

তাই বুঝি গেরণ-দান দিয়েছে?

হাঁ।···না-না, গেরণ-দান নয়। ভেবেছিল, ভদ্দর ঘরের মেয়ে আমি। যোগে চান্‌ করতে এসে সব হারিয়েছি। ভিকিরী, তা জানতো না। জানলে, এমন

দামী জামা-কাপড় দেয় কথনো ?···রাখতে চেয়েছিল বাড়ীতে।

রয়ে গেলি না কেন ?···পেটের দায়ে সাত দুয়োরে হাত পেতে বেড়াতে বুঝি ভালো লাগে তোর ?

ভালো লাগে না, তা জানি···তবু অমন করে বাঁদি হয়ে থাকতে পারবোনা কারো বাড়ীতে।···অত বড় লোক। দয়া-মায়া সবই আছে। কিন্তু থাকা চলে না তার কাছে। তুমি জানো না, পদ্মদিদি।

জানবার আর কি আছে ?···ভিকিরীর আবার বাছ-বিচার !

পদ্ম ঝাঁজিয়ে ওঠে।

অতসী ক্ষণকাল নীরব থেকে, ইতস্তত ক'রে বলে : জানো না, তাই রাগ করছো। মেয়েমানুষ হলে কি হয়। যতক্ষণ একলা ঘরে ছিলাম, আস্ত রাখে নি। বেটা-ছেলেকেও হার মানায়।

ওমা ! সে কি লো ?···সে কি !

তাই। লজ্জায় অতসী মুখখানা নীচু করে।

পদ্ম যেন হঠাৎ কেমন অস্থির হয়ে উঠলো। অতসীর হাত দুখানা ধ'রে জোরে ঝাঁকানি দিয়ে বললে : নেকি, জানো না তুমি কিছু ! বেশ করেছে, বেশ করেছে তোকে নাকাল ক'রে। বাগে পেলে কে-ই বা ছাড়ে বল ?

অতসী হকচকিয়ে গেল পদ্মর কথা শুনে। নিমেষে ওর চোখ দুটো যেন ঝক ঝক ক'রে উঠলো। সেই চাউনি অতসী আগেও অনেকবার দেখেছে পদ্মর চোখে। কিন্তু এমন ক'রে সে মাতাল হয়ে ওঠেনি কোন দিন।

অতসী উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই পদ্ম নেকড়ে বাঘের মত থাবা মেরে আঁকড়ে ধরে। গন্নাকাটির গায়ে যেন অসুরের মতন জোর। প্রাণপণ চেষ্টাতেও অতসী পারে না নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে।

ছাড়ো, ছাড়ো পদ্ম দিদি।

পদ্ম বাধা মানে না। খিল খিল করে হেসে ওঠে বীভৎস উল্লাসে।

অতসীর হাত-পা অসাড় হয়ে আসে। বুকের ভিতরটা টিপ টিপ করে অজ্ঞাত আশঙ্কায়।

হঠাৎ দরজায় শিকল নাড়ার শব্দ হলো। নিবারণবাবু ধাক্কা দিচ্ছে দরজায়।

পদ্ম উঠে দাঁড়ালো শিকার ছাড়া হিংস্র জানোয়ারের মত !

অতসী তখন প্রায় বিবস্ত্র। উঠে দরজার খিলটা খুলে দেবার শক্তিটুকুও যেন লোপ পেয়েছে তার। রাগে দুঃখে ক্ষোভে বুকের ভিতরটা থর-থর ক'রে কাঁপে। সর্বাঙ্গ ভিজে উঠেছে ঘামে।···গন্নাকাটি !···গন্নাকাটি নতুন শাড়ির আঁচলটাকে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছে ! পাগলা কুকুরের মত চিবিয়ে কেটেছে গোটা আঁচলটা। অতসী উঠে বসবার আগেই খিল খুলে পদ্ম ছল্‌কে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ক্রমশঃ

অগ্নি

শ্রীমুক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আপন বলি' জানি তোমায়, অগ্নি, তুমি মোদের পিতা ;
অগ্নি, তুমি ভ্রাতা মোদের, তুমিই চিরকালের মিতা।
শুভ্রবরণ সূর্য্যে যেমন আরাধনা সবাই করে ;
তেমনি তব মূর্ত্তি বিশাল অর্চ্চি আমি শ্রদ্ধাভরে।

(ঋগ্বেদ ১০।৭।৩)

সংগ্রামেতে হয় যেন মোর তেজের নব অভ্যুদয় ;
তোমায় করি' প্রজ্জ্বলিত দেহ মোদের পুষ্ট হয়।
চারিটি দিক নত হ'য়ে আমার যেন বশ্য হয় ;
তোমায় পেয়ে অগ্নি, যেন করতে পারি শত্রু জয়।

(ঋগ্বেদ ১০।১২৮।১)

বিধান সভায় সাহস প্রদর্শন—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বা মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত পরামর্শ না করিয়া নেহরু-নুন চুক্তির সময় প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু জলপাইগুড়ি জেলার বেরুবাড়ী ইউ-নিয়নের একটি অংশ পাকিস্তানকে দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ছিট মহল বদল উপলক্ষে উহা করা হইয়াছিল। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় ও বিধান পরিষদে সর্ব-সম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ঐ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। ঐ অংশে পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত বহু উদ্বাস্তু বাস করে ও তাহাদের বসবাসের জন্য সরকার তথায় বহু অর্থব্যয় করিয়াছেন। এখন উহা পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্যে যাইলে শুধু ঐ স্থানের অধিবাসীরা দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না—সরকারের বহু অর্থ ক্ষতি হইবে। কাজেই শ্রীনেহরুর এই অন্যায় ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া বিধান সভা ও বিধান পরিষদের সদস্যগণ যে সাহস দেখাইয়াছেন সে জন্য সকলেই তাঁহাদের অভিনন্দিত করিবেন।

কলেজ-শিক্ষকগণের বেতন বৃদ্ধি—

পশ্চিমবঙ্গের কলেজ-শিক্ষকগণের বেতন বর্দ্ধিত হারে দিবার জন্য ইতিপূর্বে ৭৭টি কলেজের অধ্যাপকগণকে বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাণ্ট-কমিশন ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদের দেয় টাকা দিয়াছে! সম্প্রতি কলিকাতার বাকী ৭টি কলেজ ও মফঃস্বলের বাকী ২টি কলেজের জন্য ১৯৫৭-৫৮ সালের দেয় ২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট দিয়াছেন—কমিশনও ঐ পরিমাণ টাকা সত্বর দান করিবেন। বর্দ্ধিত বেতনের অর্দ্ধেক পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও অর্দ্ধেক কমিশন দিতেছেন। কলিকাতার কলেজগুলির ছাত্র সংখ্যা আগামী ৫ বৎসরে কমাইয়া প্রতি কলেজে ১৫ শতের অনধিক ছাত্র রাখার নির্দ্দেশ এই সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। কলেজ-শিক্ষা ব্যাপারে ব্যবসাদারী বন্ধ করিয়া ছাত্রদের প্রকৃত ও উপযুক্ত শিক্ষাদান ব্যবস্থার জন্যই সর্ব-ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাণ্ট-কমিশন গঠিত হইয়াছে ও কেন্দ্রীয় সরকার ঐ কমিশন মারফত প্রভুত অর্থ ব্যয় করিতেছেন। আশা হয়, ইহার ফলে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা অধিকতর ফলদায়ক হইবে।

দুর্গাপুর অঞ্চলের উন্নতি—

পশ্চিমবঙ্গে বর্দ্ধমান জেলার দুর্গাপুরে বহু কলকারখানা স্থাপিত হইতেছে! তথায় দামোদরের বাঁধ হওয়ার পর প্রচুর ইলেকট্রীক শক্তি উৎপন্ন হওয়ায় কলকারখানা স্থাপনের সুযোগ হইয়াছে। সে জন্য ঐ অঞ্চলে বহু ফাটকাদার ব্যবসায়ী যাইয়া জমী ক্রয় বিক্রয় ও গৃহনির্মাণ দ্বারা সাধারণকে ও সরকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছিল। সে কারণে গত ৩০শে ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় "দুর্গাপুর উন্নতি আইন" পাশ হইয়াছে। অতঃপর তথায় জমীর মূল্য ও গৃহ নির্মাণ ব্যবস্থা এই আইনে নিয়ন্ত্রিত হইবে। সে ব্যবস্থার জন্য সরকার একটি কমিটী গঠন করিয়া কমিটীর উপর সকল কার্য্যের ভার প্রদান করিবেন। নূতন সহর সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে গঠিত হইলে তাহা যেমন দেখিতে সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর হইবে, তেমনই জমী ও বাড়ী বিক্রেতারা ফাটকাবাজ ব্যবসায়ীদের হাত হইতে রক্ষা পাইবে।

লেডী ওয়াডিয়ার দান—

পরলোকগত খ্যাতনামা ধনী ব্যবসায়ী সার কুসরো ওয়াডিয়ার শ্বেতাঙ্গিনী পত্নী ম্যাডালিন গত আগষ্ট মাসে বিলাতে মারা গিয়াছেন। তিনি তাঁহার উইলে ভারতস্থ ও বিলাতস্থ সকল সম্পত্তি পুনা (ভারত) ওয়াডিয়া কলেজের ইলেকট্রীকাল টেকনোলজিকাল ইনিষ্টিটিউটে দান করিয়া গিয়াছেন। লেডী ওয়াডিয়ার বিলাতস্থ সম্পত্তির মূল্য ১১৭৩২৯ পাউণ্ড। ভারতে ও আমেরিকায় তাঁহার যে সম্পত্তি আছে তাহার মূল্য এখনও জানা যা নাই। লেডী ওয়াডিয়া কিছু অর্থ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়া গিয়াছেন।

ভারতকে ফোর্ড ফাউণ্ডেসনের দান—

গত ৩০শে ডিসেম্বর আমেরিকার ফোর্ড ফাউণ্ডেসন ভারতকে ৪ দফায় নিম্ন লিখিত অর্থদান করিয়াছেন। (১) আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য ৪ লক্ষ ৬৫ হাজার ডলার। (২) বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৪ লক্ষ ৩০ হাজার ডলার (৩) ভারতের ৬টি এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ৯৪ হাজার ৫ শত ডলার (৪) ভারতে শাসন-ব্যবস্থা শিক্ষার সরকারী কলেজে ৬০ হাজার ডলার। এই সকল দানে ভারতের অবস্থা অবশ্যই উন্নত হইবে।

আমতায় জল নিকাশ পরিকল্পনা—

পশ্চিমবঙ্গের সেচ মন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় গত ২৮শে ডিসেম্বর হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ায় নিজ হাতে মাটি কাটিয়া আমতা জল নিকাশ পরিকল্পনার কাজ আনুষ্ঠানিক ভাবে আরম্ভ করিয়াছেন। ২৩ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা ব্যয়ে কেতুয়া বিল প্রভৃতি নীচু স্থানের জল নিকাশের ব্যবস্থা হইলে ২১ হাজার একর চাষের জমী উন্নত হইবে ও ফলে ১ লক্ষ ৯৩ হাজার মণ অতিরিক্ত ধান ফলিবে। গঙ্গা হইতে কেতুয়া বিল পর্য্যন্ত সাড়ে ১০ মাইল পুরাতন খাল চওড়া ও গভীর করা হইবে। নবীনবাবুর খাল, কমলাচক খাল ও কুমারচক খালও চওড়া এবং গভীর হইবে। ৮টি পায়ে চলার পুল, ৪টি গাড়ী চলাচলের পুল ও ৪৯টি স্লুইস গেট নির্মিত হইয়া ৪৮ বর্গ মাইল এলাকার উন্নতি করা হইবে। সত্বর কাজ শেষ হইলে ঐ অঞ্চলের লোক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে।

কলিকাতা যাদুঘরের বিস্তার—

গত ২৮শে ডিসেম্বর ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাক্তার রাধাকৃষ্ণন কলিকাতায় যাদুঘরের বিস্তারের জন্য যাদুঘরের নিকট এক নূতন গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন। তথায় ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ৬ তালা বাড়ী নির্মিত হইলে বহু নূতন ও পুরাতন জিনিষ বৈজ্ঞানিক ভাবে রক্ষার ব্যবস্থা হইবে। নূতন বাড়ীতে কখনও আগুন লাগিবে না—তাহার একতলায় ৫ শত শ্রোতা বসিবার উপযুক্ত সভা-গৃহ থাকিবে। তাহা ছাড়া গবেষণাগার ও গবেষক ছাত্রদের জন্য উপযুক্ত স্থানের তথায় ব্যবস্থা করা হইবে। কলিকাতায় ঐ নূতন গৃহ নির্মাণের ফলে কলিকাতাবাসী ছাত্র-ছাত্রীগণ অধিক উপকৃত হইবেন।

কুমারী নবনীতা দেব—

কবিদম্পতি শ্রীনরেন্দ্র দেব ও শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর একমাত্র সন্তান কুমারী নবনীতা দেব ১৯৫৮ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'তুলনামূলক বিশ্বসাহিত্যে' স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় এম-এ উপাধি লাভ করিয়াছেন ও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশে 'তুলনামূলক বিশ্ব-সাহিত্যে'র পঠন থাকিলেও এসিয়ায় জাপানে ছাড়া আর কোথাও এ বিষয়ের আলোচনা ছিল না। নূতন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উহার অধ্যয়ন প্রবর্তিত হইলে ১৯৫৬ সালে মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে নবনীতা কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ইংরাজি অনার্স লইয়া বি-এ পাশ করিয়া

কুমারী নবনীতা দেব

যাদবপুরে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি ঐ বিষয়ে স্বর্ণপদক ছাড়াও ১৯৫৮ সালের এম-এ পরীক্ষায় সকল বিষয়ের ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম হইয়া একটী অতিরিক্ত স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন। নবনীতা বহুবার বিতর্ক সভা, সন্তরণ প্রতিযোগিতা ও চিত্রাঙ্কন প্রদর্শনীতে সম্মান ও স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন। তিনি ১৯৫৯ সালের মধ্য-ভাগে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য আমেরিকা যাইবেন। আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন ও উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

কলিকাতায় চৈতন্য গবেষণা ভবন—

গত ২৮শে ডিসেম্বর দক্ষিণ কলিকাতায় রাসবিহারী এভেনিউতে উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে অনুশীলনের জন্য শ্রীচৈতন্য গবেষণা ভবন ও গৌড়ীয় মঠের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত ভবন বিভিন্ন ধর্মীয় মত বিনিময়ের কেন্দ্রস্থল হইবে। ডাঃ রাধাকৃষ্ণন তথায় বলিয়াছেন—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রচারিত প্রেম ও সত্যের বাণীকে অবলম্বন করিয়া এক নূতন বিশ্ব গড়িয়া উঠিবে। মানুষের বাঁচিয়া থাকিতে হইলে ইহা অনিবার্য্য। যিনি প্রকৃত ভক্ত তাঁহার নিকট ধর্মীয় ভেদাভেদ নিরর্থক। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীকে-সি দাশগুপ্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এবং স্বামী ভক্তি বিলাস তীর্থ মহারাজ ও শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কলিকাতায় বৈষ্ণব দর্শন গবেষণার কেন্দ্র বর্তমান যুগের মানুষকে অবশ্যই শান্তির পথ দেখাইবে।

নবদ্বীপে শ্রীঅরবিন্দ মন্দির—

নবদ্বীপ (নদীয়া) বঙ্গবাণীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগোবিন্দলাল গোস্বামী ১২ই ফেব্রুয়ারী পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে শ্রীমা'র নিকট হইতে শ্রীঅরবিন্দের ভস্ম লইয়া ১৫ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় আসিবেন। হাওড়া ষ্টেশন হইতে ৫৯ ঘোড়ায় চালিত স্বর্ণ রথে তাহা মহাত্মা গান্ধী রোড, কলেজ ষ্ট্রীট ও ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট হইয়া ৫২বি ইণ্ডিয়ান মীরার ষ্ট্রীটে রাখা হইবে। তাহা স্পেশাল ট্রেণে শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর হইয়া নবদ্বীপে ২১শে ফেব্রুয়ারী পৌছিবে ও ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নবদ্বীপ বঙ্গবাণীতে নির্মিত মন্দিরে স্বর্ণাধারে রক্ষা করা হইবে। কলিকাতায় ২ দিন ঐ ভস্মাধার সকলের দেখার জন্য রাখা হইবে। বঙ্গবাণীর সভাপতি মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মন্দির নির্মাণ ও উৎসবাদির ব্যয়ের জন্য সর্বসাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

শ্রীভূপতি মজুমদার সম্বর্দ্ধনা—

গত ৬ই জানুয়ারী মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কলিকাতা ভারত সভা হলে খ্যাতনামা বিপ্লবী কর্মী ও বর্তমানে মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয়ের ৬৯তম জন্ম দিবস উপলক্ষে তাঁহাকে দেশবাসীর পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। সভায় প্রথমে মেয়র ডাঃ ত্রিগুণা সেন এবং পরে খ্যাতনামা বিপ্লবী শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। ঐ উপলক্ষে প্রকাশিত 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' পুস্তকে ভূপতিবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবন কথা সভায় পঠিত হয়, এবং কবি শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সমবেত দেশবাসীর পক্ষ হইতে ভূপতিবাবুর সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। বহু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাঁহাকে মাল্য, অভিনন্দন পত্র, উপহারাদি প্রদান করা হয়। তাঁহাকে একটি রৌপ্যনির্মিত রিভলভার উপহার দিয়া বাঙ্গালী তরুণগণের সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রশস্ততর করার জন্য তাঁহার নিকট আবেদন জ্ঞাপন করা হয়। গত ৫০ বৎসর কালের অধিক দিন ধরিয়া ভূপতিবাবু যেভাবে দুঃখবরণ করিয়া নানাক্ষেত্রে দেশের সেবা করিয়া আসিতেছেন, তাহা স্মরণ করা ও সেজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা প্রত্যেক দেশবাসীর কর্তব্য—সেজন্য এই উৎসব-অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদিগকে আমরা অভিনন্দিত করি।

সমরেশ বসু সম্বর্দ্ধনা—

গত ৪ঠা জানুয়ারী রবিবার বিকালে ২৪ পরগণা জেলার নৈহাটির নিকটস্থ মাদরাল গ্রামে স্থানীয় সারস্বত পাঠাগারের কর্মিদের উদ্যোগে মাদরালস্থ শান্তিধাম নামক মনোরম গৃহে খ্যাতনামা তরুণ কথাশিল্পী নৈহাটিবাসী শ্রীমান সমরেশ বসুকে কথাসাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁহার সাফল্যলাভের জন্য সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং মাদরালবাসীদের পক্ষ হইতে শ্রীকালিদাস ঘোষাল ও শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় সমরেশবাবুকে এক সুলিখিত অভিনন্দন পত্র, একটি সুন্দর কৃত্রিম ফুলের তোড়া উপহার দেন। ফুলের তোড়াটি স্থানীয় এক মালাকর শোলা দ্বারা সুনিপুণভাবে তৈয়ার করিয়া দেন ও তাহার সৌন্দর্য্যে সকলে মুগ্ধ হন। অনুষ্ঠানে ২৪ পরগণা জেলা ইতিহাস সংকলন সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীগোপী ভট্টাচার্য্য ও জেলা সাংবাদিক সংঘের পক্ষ হইতে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সমরেশবাবুকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। সমরেশবাবু তাঁহার সাহিত্য সাধনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভাষণ দান করার পর সভাপতি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় বর্তমান সাহিত্যের ধারা এবং বিশেষ করিয়া সমরেশের লিখিত 'গঙ্গা' প্রভৃতি পুস্তকের বিবরণ দান

করিয়া তাঁহার রচনা-শৈলি ও অন্যান্য গুণের বর্ণনা করেন। কলিকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার মাদরাল নিবাসী শ্রীপঞ্চানন ঘোষালের উদ্যোগে ঐ সুরম্য শান্তিধাম ও বিরাট বিলের ধারে বুদ্ধমন্দির ও শিবমন্দির নির্মিত হইয়াছে। ভাটপাড়া-নৈহাটি অঞ্চলের বহুসংখ্যক ও জেলার নানাস্থান হইতে সমাগত সুধীবৃন্দ ঐ মনোরম গৃহাদি দর্শন করিয়া আনন্দিত হন। সকলে তরুণ সাহিত্যিক সমরেশের সম্বর্দ্ধনার জন্য স্থানীয় কর্মীদের প্রশংসা করেন।

বিভূতি-তীর্থ—

গত ২৮ শে ডিসেম্বর রবিবার ২৪পরগণা জেলা ইতিহাস সংকলন সমিতির ও জেলা সাংবাদিক সংঘের সদস্যগণ বনগ্রামে যাইয়া স্বর্গত কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃভূমি বারাকপুর গ্রামে তাঁহার বাসগৃহ এবং গোপালনগরে তাঁহার স্মৃতিরক্ষায় নির্মিত পাঠাগারভবন দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। বারাকপুর ও গোপালনগর উভয় স্থানেই স্থানীয় কর্মীরা সমাগত সুধীবৃন্দের সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করিয়াছিলেন। শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ইতিহাস সমিতির শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, সাংবাদিক সংঘের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভাট্টাচার্য্য, কবি শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,রাণাঘাটের শ্রীসনৎ চৌধুরী প্রমুখ একদল উভয় স্থানে গমন করেন এবং উভয় স্থানের সভাতেই উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বারাকপুরের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া বিভূতি-তীর্থ নামকরণের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। পথের পাঁচালী, দৃষ্টিপ্রদীপ, আরণ্যক, আদর্শ হিন্দু হোটেল প্রভৃতিতে অঙ্কিত চরিত্র ও চিত্রগুলি ঐ সকল স্থানে আজিও বর্ত্তমান। বিভূতিভূষণের খ্যাতি আজ ভারতের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে—কাজেই বারাকপুরস্থ তাঁহার বাসগৃহ জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া তথায় বিভূতিবাবুর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা স্বাধীন সরকার ও দেশবাসীর কর্ত্তব্য। বনগ্রামবাসী শ্রীসুবোধকুমার সাহার ঐকান্তিকতা ও চেষ্টার ফলে সে দিন সকলের ঐ সকল স্থান দর্শনের সকল ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হইয়াছিল।
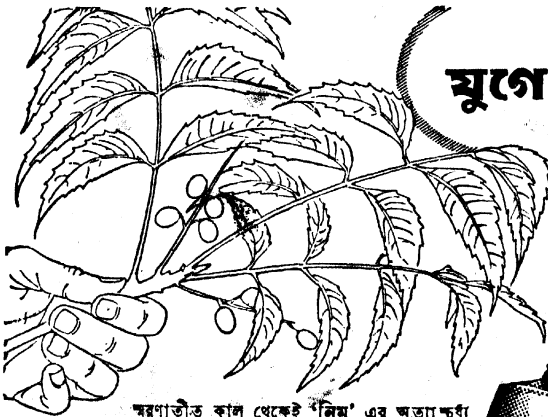
পাট ও পীঠ

শ্রী'শ'—

॥ জন্মান্তর ॥

জন্ম ও মৃত্যু আর আত্মার অবিনশ্বরত্ব—এই নিয়ে আছে গবেষণা, আছে মতভেদ, আছে প্রমাণ ও অপ্রমাণের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত; কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মমতে জন্মান্তর সম্ভবই শুধু নয়, নিশ্চিতও বটে। তবে মৃত্যুহীন অবিনশ্বর আত্মা জন্মে জন্মে দেহধারণ করলেও দেহধারীর কিন্তু মনে থাকে না পূর্ব্বজন্মের কথা, অবশ্য যদি সে জাতিস্মর না হয়।

'নর্ম্মদা চিত্র' পরিবেশিত বরুণ পিকচার্সের "জন্মান্তর" চিত্রটি এই জন্মান্তরকে উপজীব্য করেই রচিত হয়েছে। এক প্রেমে আশাহত তরুণীর বিয়ের রাতে আত্মাহুতি দান ও কুড়ি বৎসর পরে প্রৌঢ়ত্বের সীমায় উপনীত সেই প্রেমিকের সম্মুখে সেই মৃত তরুণীর হুবহু একই চেহারায় উপস্থিত হওয়া এই জন্মান্তরবাদকেই সমর্থন করে, তবে সে জাতিস্মর না হওয়ায় তার পূর্ব্বজন্মের কথা মনে পড়ে না। কুড়ি বছর আগের এক ঘটনা,—উদীয়মান চিত্র-শিল্পী আশীষ তরুণী কবরীর সঙ্গে পরিচিত হয় একটি চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে, আর এই পরিচিতিই পরিণত হয় সুগভীর প্রণয়ে। কিন্তু সে প্রণয়ের পরিণতি সুখের না হয়ে, হয় অতীব দুঃখের। বিবাহে সামাজিক ও পারিবারিক বাধার জন্য কবির (কবরীর ডাক নাম) বিবাহ আশীষের সঙ্গে দিতে তার অভিভাবকেরা রাজী হয় না। উপরন্তু অন্যের সঙ্গে কবির বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু আশাভঙ্গের নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে কবি বিয়ের রাতে আত্ম-হত্যা করে তার তরুণ জীবনের ওপর যবনিকা টেনে দেয়। আবার কুড়ি বছর পরে এই যবনিকা উত্তোলিত হয়—প্রৌঢ় আশীষের ঘরে আশীষেরই আঁকা কবির চিত্রাবলীর সঙ্গে তরুণী মিনতির হুবহু সাদৃশ্য শুধু মিনতিকেই বিস্মিত করে না আশীষ ও তার বৃদ্ধ ভৃত্য নিধুকেও অবাক করে দেয়। নিধু আশীষকে বলে কবিদিদিই আবার ফিরে এসেছে। আশীষ ভাবে। মিনতিকে জানায় কবির সব কথা। মিনতি অস্থির হয়ে ওঠে, কিন্তু পূর্ব্বজন্মের কথা কিছুই মনে পড়ে না। তারপর আশীষের হয় মৃত্যু, আর গল্পেরও শেষ। এই হল সংক্ষেপে "জন্মান্তর"-এর কাহিনী।

কাহিনীর দিক থেকে নতুনত্ব আছে। অভিনয়ে কবি ও মিনতির ভূমিকায় অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় তাঁর অভিনয় দক্ষতার অপূর্ব্ব পরিচয় দিয়েছেন, আর নিধু চাকরের ভূমিকায় কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনবদ্য অভিনয় মনে রাখবার মতন হয়েছে। এঁরা ছাড়া পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী, তপতী ঘোষ, রেণুকা রায় প্রভৃতির অভিনয়ও চরিত্রানুযায়ী হয়েছে। আশীষের ভূমিকায় নির্ম্মলকুমারের অভিনয় কিছুটা দুর্ব্বল হলেও তাঁর প্রৌঢ় বেলাকার অভিনয় ভাল হয়েছে। পরিচালনা উচ্চস্তরের না হলেও মোটামুটি ভাল হয়েছে—বিশেষ করে ছ্যাবলামি বা হাল্কা রসিকতা প্রভৃতি বর্জ্জন করে নবাগত পরিচালক তাঁর সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন।

তবে গুণানুসারে চিত্রটিকে বিচার করলে এর কতক-গুলি বিশেষ ত্রুটি চোখে পড়ে। প্রথমতঃ চিত্রটির গতি বড়ই শ্লথ। তার ওপর গান আছে তিনটি—মিনতির একটি আর কবরীর দুটি। এর মধ্যে আবার কবরীর একটি গানকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কয়েকবার শোনান হয়েছে। ঐ একটি গানকে রেখে অন্য দু'টি গান বাদ দিলেইভাল হত। তাহলে ছবিটির গতিও এত ঝিমিয়ে পড়ত না। তাছাড়া আশীষের ঘরে কবির পেন্টিংগুলা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বহুবার দেখান হয়েছে। যে কোনও জিনিষই অনেকবার করে দেখালে তা বিরক্তিকর হয়ে পড়ে। এর ওপর কবির গান ও কয়েকটি দৃশ্য পুনঃ পুনঃ ফ্ল্যাশ ব্যাক্ করে দেখানোও একঘেয়ে হয়ে পড়েছে। আর সর্ব্বোপরি ছবির যেটি প্রধান অঙ্গ সেই রহস্যময় পরিবেশটিই ফুটে ওঠেনি। এই মিষ্টিক্ ভাবটিই হওয়া উচিত ছিল ছবির প্রধান অবলম্বন—এই ভাবটির ওপরই গল্পের কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে বলে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই প্রধান ভাবটিই পরিচালক সুষ্ঠুভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি; আর সেটা হয় নি আশীষ ও কবির পুরান কথাকে—তাদের ভাব, ভালবাসা, বিচ্ছেদকে একটানা দেখাতে গিয়ে তাতে সেটাই হয়ে পড়েছে ছবির প্রধান বিষয়। তাই, একটি ছেলে ও মেয়ের প্রেম ও তার বিষাদময় পরিণতি—সেই একঘেয়ে সাধারণ গল্পেরই এটি একটি নতুন সংস্করণ ছাড়া আর কিছু হয় নি। সর্ব্বোপরি ছবির শেষটিই ঠিকমত হয়নি। যখন ট্র্যাজেডির মধ্যেই ছবিটির শেষ করা হল তখন আশীষের মৃত্যুর পর মিনতিকে জীবিত রেখে কি উদ্দেশ্য সাধিত হল? আশীষের সঙ্গে মিনতির মৃত্যু ঘটালে তবু একটা উদ্দেশ্য আছে বোঝা যেত যে পরপারে বা পরজন্মে হয়ত তারা মিলিত হবে। কিন্তু মৃত্যুর পর কবির চেহারা নিয়ে মিনতি কি করবে? কবিই যদি মিনতিরূপে আবার জন্ম নিয়ে থাকে তাহলে তার এ জন্মের কলটা কি

লে ? সে কি অপেক্ষা করে থাকবে কুড়ি পঁচিশ বৎসর পরে যুবক দেহে আশীষ আবার জন্মে তার সামনে এসে দাঁড়াবে বলে ?

এই সূত্রে এভা গার্ডনার ও জেম্‌স মেসন্ অভিনীত "প্যাণ্ডোরা এণ্ড দি ফ্লাইং ডাচ্‌ম্যান্" নামক একটি নামকরা বিদেশী চিত্রের কথা মনে পড়ে যায়। এই চিত্রে বহু যুগ আগে নায়ক কর্তৃক বিনাদোষে হত নায়িকা প্যাণ্ডোরা ভগবান কর্তৃক শাস্তিভোগরত মৃত্যুহীন নায়কের সামনে, সেই বহুকাল আগে মৃত নায়িকার হুবহু চেহারা নিয়ে বহুযুগের ওপার হতে এসে দাঁড়িয়েছিল, আর নায়ক কর্তৃক অঙ্কিত সেই মধ্যযুগীয় নায়িকার প্রতিকৃতি তারই চেহারার হুবহু নকল দেখে আধুনিকা প্যাণ্ডোরাও বিস্মিত হয়েছিল—কারণ সেও জাতিস্মর ছিল না। পরে সে যখন সব বুঝতে পারল তখন নায়কের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে নায়ক ডাচ্‌ম্যান্‌কে ভগবানের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিল। গল্পের এই যে শেষ—এর মধ্যে একটা যুক্তি আছে, একটা উদ্দেশ্য আছে, একটা সঙ্গতি আছে, আর এই রকমই হওয়া উচিত। একটা খাপছাড়া সঙ্গতিবিহীন শেষের কোনও অর্থ হয় না। গল্পের শেষটুকুর দিকে লেখক ও পরিচালকরা বিশেষ নজর দেন না দেখা যাচ্ছে; কিন্তু তাঁদের মনে রাখা উচিত ছবির শেষ দৃশ্যটিই দর্শকমনে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তার করে, শেষের সুরটুকুই অনুরণিত হতে থাকে দর্শক মনে প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করবার সময়।

যাই হোক, অভিনয়ের দিক দিয়ে ও কিছুটা নতুনত্বের জন্য "জন্মান্তর" চিত্রটি যে দর্শনীয় হয়েছে তা অবশ্য স্বীকার্য্য।

খবরাখবর ঃ

পরিচালনায় দেবকী বসু, প্রযোজনায় অমর মল্লিক ও সঙ্গীত পরিচালনায় রায়চাঁদ বড়াল—এই তিন গুণীর সমন্বয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের "সাগর সঙ্গমে" গল্পটি চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছেন ভারতী দেবী।

পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায় "মৃতের মর্ত্যে আগমন" চিত্রটি প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছেন। প্রধান ভূমিকায় আছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাসবী নন্দী।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের লেখা ভক্তিমূলক চিত্র "নদের নিমাই"-এর কাজ এগিয়ে চলেছে। চিত্রটিতে প্রায় তিরিশটির ওপর গান গীত হয়েছে।

"অদৃশ্য ইঙ্গিত" চিত্রের পরিচালক সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় আঞ্চলিক সুটিংএর জন্য জামসেদপুর অঞ্চল ঘুরে এসেছেন। ছবিটিতে অভিনয় করেছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী, অসীমকুমার, ছবি বিশ্বাস প্রভৃতি।

বিদেশী খবর ঃ

ব্রিটিশ অভিনেতা Alec Guinnessকে ও মার্কিণ অভিনেত্রী Elizabeth Taylorকে যথাক্রমে "The Bridge on the River Kwai" ও "Cat on a Hot Tin Roof" চিত্রে অপূর্ব অভিনয় করার জন্য নিউ ইয়র্ক-এর রেডিও, টেলিভিসন্ ও সংবাদপত্রের ফিল্ম সমালোচকগণ গত বৎসরের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীরূপে ভোট দিয়েছেন।

গেভাকলারে রঞ্জিত "নৌকাবিলাস" চিত্রের একটি দৃশ্যে সুবল ও বৃন্দার ভূমিকায় অনুপকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

Elizabeth Taylor অভিনেতা Glenn Ford-এর সঙ্গেও সিনেমা মালিক ও ম্যানেজারদের ভোটে বক্স অফিসের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণরূপে প্রথম স্থান পেয়েছেন। তাঁদের পরে আছেন—(৩) Jerry Lewis, (৪) Marlon Brando, (৫) Rock Hudson, (৬) William Holden, (৭) Brigitte Bardot, (৮) Yul Brynner, (৯) James Stewert এবং (১০) Frank Sinatra.

Alec Guinnessও চার হাজার সিনেমার ভোটে ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ বক্স অফিস্ আকর্ষণ বলে অভিহিত হয়েছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে Sir Alec Guinnessকে এই নতুন বছরে নাইটহুড্ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

শিল্পীর কথা

'তাঁরি নূপুর শুনি সখি মন্দিরে'

কুমারেশ ভট্টাচার্য

বিশ বছর আগের কথা। বালীগঞ্জ রেল ষ্টেশনের অনতি-দূরে কসবা নিবাসী সংগীতজ্ঞ শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় সকাল সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে বসে গানের আসর। সে আসরে সমবেত হয় তাঁর বহু ছাত্র-ছাত্রী। তারা আন্তরিকভাবে শিক্ষা করে উচ্চাংগ সংগীত। শৈলেন-বাবু বিখ্যাত সংগীতশিল্পী শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের অতি প্রিয় ও সুযোগ্য ছাত্র। তিনি যখন ছাত্র-ছাত্রীদের তালিম দেন তখন তাঁর কোলে এসে চুপচাপ বসে থাকে ফুটফুটে

শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়

সুন্দর তাঁর আদুরে ছোট্ট মেয়েটী। পাঁচ-ছ' বছরের এই অতি শান্ত মেয়েটি ডান হাতের একটি আঙুল মুখে দিয়ে কখনও বা দাঁতে চেপে একমনে শোনে গান। সংগীতের বিভিন্ন রাগ-রাগিনী তার পূর্বজন্মার্জিত সাধনাকে কি সঞ্জীবিত ক'রে তুলতে চায়? সুরের অপূর্ব ঝংকার ও মূর্চ্ছনা এই ছোট্ট বালিকাটীর হৃদয়তন্ত্রীতে বেজে উঠে জাগাতে চেষ্টা করে কি তার সুপ্ত প্রতিভাকে?

ইং ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডবনৃত্যে আর হের হিটলারের দাপটে সমগ্র বিশ্ব যেন প্রকম্পিত—সন্ত্রস্ত। এ মহাযুদ্ধের প্রবল ঢেউ থেকে বাঙলাদেশও বাদ প'ড়ল না। এই বিরাট কোলকাতা শহরের অধিকাংশ অধিবাসীই বোমার ভয়ে আতংকিত হ'য়ে দলে দলে কোলকাতা ত্যাগ ক'রলেন—প্রাণের মায়ায়। শৈলেনবাবু কিন্তু এখানেই থেকে গেলেন। সকাল-সন্ধ্যায় গান-বাজনায় মুখরিত তাঁর বৈঠকখানাটি কিন্তু নীরব—নিথর। বাদ্যযন্ত্রগুলোও যেন মনের দুঃখে নেহাৎ মুহ্যমান হ'য়ে পড়ে আছে ঘরের কোণে।

কারণ, সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীই তাদের অভিভাবকদের সংগে কোলকাতা ছেড়ে পালিয়েছে। শৈলেনবাবুর মন তখন খুবই খারাপ। একা একা ব'সে গান গাইতে তাঁর আর ভাল লাগে না। এমনি সময় একদিন তাঁর স্ত্রী ব'ললেন—'অফিস থেকে ফিরে এসে চুপ ক'রে ব'সে না থেকে নিজের মেয়েটাকে তো একটু গান শেখাতে পারো।' কথাটা ঠিক বটে! তারপর থেকেই সেই আট বছরের মেয়েটির সংগীত শিক্ষা শুরু হোল তার পিতার কাছে। কিন্তু সেদিন কি তার পিতা-মাতা কল্পনা ক'রতে পেরে-ছিলেন যে তাঁদের এই ছোট্ট মেয়েটিই একদিন সারা ভারতের মধ্যে হ'য়ে উঠবে একজন শ্রেষ্ঠ সংগীত-শিল্পী? তাঁরা কি সেদিন স্বপ্নেও ভেবেছিলেন যে এই মেয়েটিই ভবিষ্যতে একদিন ভারত পেরিয়ে সুদূর রাশিয়া, পোলাণ্ড, চেকোশ্লোভিকিয়ায় গিয়ে সংগীত-শিল্পী হিসেবে লাভ ক'রবে নাম, যশ ও সম্মান; আর সংগে সংগে বৃদ্ধি ক'রবে বাঙলার তথা ভারতের মর্যাদা ও গৌরব? কিন্তু পূর্ব-জন্মার্জিত সাধনা ও সুকৃতির ফলে আর ইহজন্মে সংগীতের প্রতি অনুরাগ ও ঐকান্তিক চেষ্টায় আজ তা বাস্তবে রূপায়িত হ'য়েছে। সেদিনকার সেই বালিকাটি আর কেউ নয়, ইনি হ'চ্ছেন ভারতের একজন শ্রেষ্ঠা সংগীত-শিল্পী বাঙলা ও বাঙালীর মুখোজ্জ্বলকারিণী শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় (চট্টোপাধ্যায়)।

মীরার জ্যেঠামশাই শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় একজন সুলেখক ও নামকরা চিত্র-শিল্পী। পিতার নিকট সংগীত শিক্ষা শুরু হবার পর থেকেই মীরার সংগীত-প্রতিভা শতদলের মত হয় বিকসিত। ন' বছর বয়সেই তিনি বিলম্বিত একতালে বা ঝুমরায় খেয়াল গান অতি সহজে ও অল্প সময়ে আয়ত্ত করেন। তাঁর পিতার এবং তাঁর অন্যান্য ছাত্রীর পক্ষে যে গান সম্পূর্ণ আয়ত্ত ক'রতে প্রায় একমাস সময় লেগে যেত, মীরা কিন্তু সে গানটি একদিনেই শিখে নিতেন। প্রতিভা যা কিছু স্পর্শ করে তাই-ই সোনা হয়ে যায়। ১৯৪৩ সালে মাত্র ১১ বছর বয়সে মীরা কোলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে খেয়াল গান গেয়ে শ্রোতৃবৃন্দকে করেন বিস্মিত ও চমৎকৃত, নিজে লাভ করেন বিপুল উৎসাহ ও

আনন্দ। ঐ সালেই তিনি নিখিলবংগ সংগীত প্রতিযোগিতায় যোগদান ক'রে খেয়াল, ঠুংরী ও তারণা নোটেশনে ১ম স্থান অধিকার ক'রে পুরস্কার লাভ করেন পাঁচটী রৌপ্যপদক।

ইং ১৯৪৩ সাল বাংলা ১৩৫০ সন—বাঙলার ইতিহাসে এক স্মরণীয় বৎসর। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর আবার বুঝি দেখা দিল সারা বাঙলায়। সুদূর পল্লী থেকে দলে দলে বুভুক্ষু নর-নারী-শিশু এসে হাজির হ'ল এই কোলকাতা শহরে—এক মুষ্টি খাদ্যের আশায়। সেই দুর্দিনে বালিকা মীরার হৃদয়ও কেঁদে উঠল—চঞ্চল হোল বুভুক্ষু নরনারীর আর্ত চীৎকারে। কোলকাতা বেতার কেন্দ্রে গান গেয়ে যে অর্থ তিনি পেতেন সেই অর্থ এবং নিজেদের পল্লী থেকে অর্থ সংগ্রহ ক'রে তিনি সাধ্যমত সাহায্য ক'রেছেন বহু নরনারী ও শিশুকে। এগার বছরের একটি মেয়ের পক্ষে এটা কম গৌরবের কথা নয়। ১৯৪৪ সালে ১২ বছর বয়সে তিনি সম্মানের সংগে লাভ করেন 'গীতশ্রী' উপাধি।

১৯৪৫ সাল- জানুয়ারী মাস। কোলকাতায় পূরবী সিনেমা হলে শুরু হ'য়েছে নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনের অধিবেশন। ভারত-বিখ্যাত প্রায় সমস্ত ওস্তাদই এসেছেন সম্মেলনে অংশ গ্রহণ ক'রতে। তেরো বৎসরের বালিকা মীরা সেই অনুষ্ঠানে খেয়াল ও ঠুংরী গান গেয়ে সবাইকে বিস্মিত করেন। ভারত-বিখ্যাত ওস্তাদরা মুক্তকণ্ঠে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এবং অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের মহামান্য প্রধান বিচারপতি শ্রীফণীভূষণ চক্রবর্তী মহাশয় মুক্তকণ্ঠে সেদিন বলেছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে এই বালিকা সমগ্র ভারতে একজন প্রথম শ্রেণীর সগীংতশিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তাঁদের সেদিনকার সেই বাণী বাস্তবে পরিণত হয়েছে। ঐ বৎসরেই আগষ্ট মাসে কোলকাতার রঙমহল থিয়েটার হলে অনুষ্ঠিত নিখিলবংগ সংগীত সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন। উক্ত সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা সংগীত-প্রেমিক স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের অমর আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন ক'রতে। ঐ অনুষ্ঠানে তিনি ভূপেন্দ্র-বাবুর অমর আত্মার উদ্দেশ্যে তাঁর পিতার রচিত নিম্নোক্ত গানটী গেয়ে সবাইকে আনন্দ দান করেন।

'বাঙলার তুমি, বাঙালীর তুমি, তুমি যে মোদের প্রাণ।
তোমারে স্মরিতে আজি এ তিথিতে গাহি তব জয়গান॥'

ঐ একই বৎসরে নভেম্বর মাসে এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি মিউজিক কনফারেন্সে এবং ডিসেম্বর মাসে গয়ায় অনুষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কংগ্রেসে যোগদান ক'রে মীরা পরিচয় দেন অসামান্য সংগীত-প্রতিভার—লাভ করেন বিপুল সম্মান ও গৌরব। সারাভারতের কাছে তিনি প্রমাণ করেন যে বাঙালী মেয়েরাও সংগীতে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখেন। এই সম্মেলনে ভারত-বিখ্যাত সংগীত-শিল্পী গোলাম আলি খাঁ সাহেব, কেশরীবাঈ প্রভৃতি এই বালিকাকে জানান তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

১৯৪৭ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী কোলকাতার শ্রী সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনে যোগদান ক'রে মীরা মালকোশ রাগে খেয়াল গান করেন। তাঁর সুমিষ্ট-কণ্ঠে রাগের বিস্তার ও উন্নত তান শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করে।

১৯৪৮ সালের মার্চমাসের প্রথম সপ্তাহে পরাধীন ভারতের শেষ বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ও তদীয় পত্নী লেডী মাউণ্টব্যাটেন আসেন কোলকাতায়। কোলকাতার তদানীন্তন শেরিফ মিঃ ডি, এন সেন মহামান্য অতিথিযুগলকে কোলকাতার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে ৯ই মার্চ তারিখে ক্যালকাটা ক্লাবে অভিনন্দন জানান। এ উপলক্ষ্যে সভায় সংগীত পরিবেশন করেন মীরা চট্টোপাধ্যায়। এই অপূর্ব সুললিত ভজন গানখানি মহাত্মা গান্ধীর রচিত, শ্রীশৈলেন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সুর সংযোজিত এবং মীরার মধুরকণ্ঠে পরিবেশিত হ'য়ে সবাইকে, বিশেষ ক'রে লর্ড ও লেডী মাউণ্টব্যাটেনকে আকৃষ্ট করে ও আনন্দ দান করে। তাঁরা উভয়েই মীরার ও তাঁর পিতার সহিত করমর্দন ক'রে গানখানার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। গানখানা নিম্নে উদ্ধৃত করছি—

উঠ জাগো মুসাফির ভোর ভৈঁ
আব্ রহেনা কাহা শোবত হ্যয়,
যো জাগতো হ্যয় সো পাও ত হ্যয়
যো শোয়ত হ্যয় সো খোয়ত হ্যয়।
যো কাল করনা হ্যয় ওব আজ কর্‌লে
যো আজ করনা হ্যয় ওব অব কর্‌লে
টুট্ নিদ্‌সে আঁখিয়া খোল য্যরা—
ঔর অপ্‌নে প্রভু পর্ ধ্যান লাগালে॥

এভাবে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই মীরার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র ভারতে। ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তিনি তাঁর পিতার কাছেই শিক্ষা করেন খেয়াল-ঠুংরী ও অন্যান্য গান। ১৯৫১ সালের প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত মীরা ভারত ও পাকিস্থানের সর্বশ্রেষ্ঠ ওস্তাদ গোলাম আলি খাঁ সাহেবের কাছে শিক্ষা ক'রছেন খেয়াল ও ঠুংরীর জটিল ও সূক্ষ্ম কলাকৌশল। ভারতীয় সংগীত সুরের বহিঃপ্রকাশ নয়—এ ধ্যানের বস্তু। এর যেন শেষ নেই—সমুদ্রের মতই এ যেন অসীম।

'কেরে বাদল মেঘে গগন ছাইল', 'আঁধার ছাইল নীলাকাশ', 'গগনে গরজে মেঘ নিবীড় তিমিরে ঘেরা', 'তাঁরি নূপুর শুনি সখি মন্দিরে', প্রভৃতি বহু বাঙলা খেয়াল ও রাগ প্রধান গান মীরার সুমিষ্ট-কণ্ঠে বেতার ও

রেকর্ডের মাধ্যমে পরিবেশিত হ'য়ে জনসাধারণকে দিয়েছে গভীর আনন্দ ও পরম তৃপ্তি।

১৯৫৩ সালের নভেম্বরে রাষ্ট্রীয় বেতার অনুষ্ঠানে মহিলা শিল্পী হিসেবে বাঙলা থেকে সর্বপ্রথম দিল্লীতে আমন্ত্রিত হন মীরা। এর পরও আজ পর্যন্ত তিনি আরও তিনবার আমন্ত্রিত হয়েছেন দিল্লী থেকে।

১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বম্বে শহরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হ'য়ে যোগদান করেন মীরা। সেখানে খেয়াল ও ঠুংরী গানে অপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়ে তিনি লাভ করেন স্বর্ণপদক। ১৯৫৬ সালে পুনরায় এই বম্বে শহরে কয়েকজন নির্বাচিত বিশিষ্ট শিল্পীর মধ্যে তিনি বম্বে গভর্ণমেণ্টের প্রদত্ত সুবর্ণপদক 'ষ্টেট এ্যাওয়ার্ড' হিসেবে লাভ করেন। তারপর এল ১৯৫৪ সালের আগষ্ট মাস। মীরার জীবনেতিহাসের এক স্মরণীয়, বরণীয় ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ভারত রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলে নির্বাচিত হ'য়ে তিনি রওনা হ'লেন রাশিয়ায়—পরিচালিকা মিসেস্ চন্দ্রশেখরের নেতৃত্বে।

মীরার সারা অংগে খেলে গেল পুলক শিহরণ, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের মনে লাগলো আনন্দের দোলা, বাঙালী অনুভব ক'রল পরম গৌরব।

মস্কো শহরে এসে পৌঁছেলেন ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল। সেখানে পৌঁছাবার সাথে সাথেই তাঁরা লাভ ক'রলেন বিরাট জনতার বিপুল অভিনন্দন। তাঁরা মর্মে মর্মে অনুভব ক'রলেন তাঁদের প্রতি মস্কোবাসীর আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি ও স্নেহের পরশ। ৩০শে আগষ্ট বলসোই থিয়েটার হলে শুরু হ'ল ভারতীয় সংগীত পরিবেশন ও নৃত্য প্রদর্শন। হাজার হাজার উৎসুক শ্রোতা ও দর্শকের স্থান তো একটা থিয়েটার হলে হ'তে পারে না। তাই টেলিভিশনের সাহায্যে সবাই সুযোগ পেল ভারতীয় শিল্পীদের দেখবার এবং তাঁদের গান শুনবার। মীরা সেখানে প্রথমে গাইলেন রবীন্দ্র সংগীত—'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে', ও 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে।' পরে রাধাকৃষ্ণের বর্ণনাসহ একটা ঠুংরী গান। এ ভিন্ন আরও অন্যান্য গান গেয়ে তিনি শ্রোতাদের দেন গভীর আনন্দ আর তাঁদের কাছ থেকে লাভ করেন বিপুল অভিনন্দন ও সম্মান। সমস্ত গানগুলো সংগে সংগে রাশিয়ান-ভাষায় অনূদিত হবার ফলে শ্রোতাদের বুঝতে কোন কষ্ট হয়নি। প্রথমদিনের অনুষ্ঠান শেষ হবার পর মীরা যখন 'হল' থেকে বাইরে এলেন তখন নীনা নামে সুন্দরী একটি রাশিয়ান মেয়ে ভীড় ঠেলে মীরাকে এসে জড়িয়ে ধ'রে জানালে সাদর চুম্বন। সে টেলিভিশনে মীরাকে দেখে ও তাঁর গান শুনে এতদূর আকৃষ্ট হ'য়েছে যে মীরাকে সে বন্ধুত্বে বরণ ক'রে নিতে চায়। তার অমায়িক ব্যবহারে ও কথাবার্তায় মীরার মনে হ'ল, এই নীনা যেন তাঁর কতদিনের চেনা—যেন কত ঘনিষ্ঠতা, কত আলাপ-পরিচয় এর সংগে পূর্ব থেকে। আজ পর্যন্তও নীনা প্রতিমাসে মীরাকে চিঠি লিখে বন্ধুত্বের বন্ধন অটুট রেখেছে। মস্কো রেডিও থেকেও মীরার গান পরিবেশিত হয়েছে, রেকর্ড করাও হ'য়েছে তাঁর গানের। এক অভূতপূর্ব আনন্দের মাঝে রাশিয়ায় মীরার দিনগুলো কেটে গেল। বহু উপঢৌকন লাভ ক'রে, যশের মুকুট প'রে মীরা যখন মস্কো ত্যাগ ক'রলেন তখন তাঁর স্বল্পদিনের পরিচিতা বান্ধবীরা বিশেষ

মীরা ও তাঁর রাশিয়ার বন্ধু নীনা

ক'রে নীনা কাঁদতে লাগল। চোখের জলের ভেতর দিয়ে ভারতীয় দল বিদায় নিলেন। তাঁরা মস্কো থেকে এলেন পোলাণ্ড। সেখানে মীরা পোলিস গান শিখে নিয়ে সেই গানও তাঁদের শোনালেন। তারপর তাঁরা আসেন চেকোশ্লোভিয়ায়। এখানেও ভারতীয় সাংস্কৃতিক দল লাভ করেন বিপুল সম্মান। এখানে মীরা পরিবেশন করেন একটি ভক্তিমূলক সংগীত—'সকলি তোমারি ইচ্ছা, মা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি'।...এখানকার একজন চেক অধিবাসী সুন্দর বাঙলা জানেন। তিনি মীরার সংগে বাঙলা ভাষায় আলাপ করেন। মীরা আরও বিস্মিত হ'লেন তখনই যখন সেই ভদ্রলোক শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট রাজলক্ষ্মীর চরিত্র সম্বন্ধে

আলোচনা ক'রতে চাইলেন। শরৎ-সাহিত্য সে ভদ্রলোক কি ভাবে প'ড়েছেন, ভাবতেও আনন্দ লাগে না কি? এ ভাবে বিদেশে সর্বত্র সম্মান ও সুনাম লাভ ক'রে ভারতীয় দল ফিরে এলেন দিল্লী—ভারতের বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য বিদেশে প্রচার ক'রে।

১৯৫৭ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে বাঙলার সর্বজনপ্রিয় সংগীত-শিল্পী শ্রীপ্রসূনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সংগে মীরা পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হন।

মীরার ছাত্রীদের মধ্যে কুমারী লক্ষ্মী বসু বেতার সংগীত প্রতিযোগিতায় যোগদান ক'রে সমগ্র ভারতের মধ্যে ১ম স্থান অধিকার করে এবং রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট থেকে সুবর্ণ পদক ও টাকার তোড়া পুরস্কারস্বরূপ লাভ ক'রে বাঙলার গৌরব বৃদ্ধি করে।

মীরার মায়ের ইচ্ছা আজ পূর্ণ, বাবার আন্তরিক চেষ্টার সংগে সংগীত-শিক্ষাদান আজ সার্থক। কিন্তু মীরার সংগীত-সাধনা আজও চলেছে অব্যাহতভাবে। কেননা, এ সাধনার বুঝি শেষ নেই!

মীরার বয়স এখন ২৬ বৎসর। আমরা আন্তরিক-ভাবে ভগবানের কাছে কামনা করি তাঁর শারীরিক সুস্থতা, সুদীর্ঘ ও শান্তিময় জীবন।

কোন নায়িকাকে

দিব্যেন্দু পালিত

আরো একবার তুমি এসো—
অম্বরীর আঁচল উড়িয়ে,
উজ্জ্বলার দহন জুড়িয়ে,
গভীর হৃদয়ে ভালবেসো।

ললাটের প্রিয়তম টিপ,
গুঁড়ো গুঁড়ো সিঁদুর ছড়ানো,
যে-কথাটি মনে মনে জানো,
তার মুখে জেলে দিও দীপ।

বাতাসে এখনো কতো ভাষা,
আকাশের বুকে কতো রঙ,
তার কিছু নিয়েই বরং—
স্বভাবের সম্মিলিত আশা।

সকালের শিশু-রোদ বলে,
বুদ্ধের মতন এক নারী—
তুমি সেই পুণ্যতোয়া বারি
ঢেলে দিও সময়ের পলে।

ধ্যান-মগ্ন শান্তি কতো আছে
অধরের রক্তিম আভায়—
অপূর্ণ পিপাসা কিছু চায়
সুমদির ভঙ্গিমার কাছে।

অপলক প্রতীক্ষার স্নায়ু
তোমাতেই হয়েছে বিলীন;
কামনার রৌদ্র-রাঙা দিন—
আর তুমি তার পরমায়ু।

শ্যাম-স্নিগ্ধ চোখের ছায়ায়
বনানীর অপার নীলিমা;
সাগর খুঁজেছে তার সীমা
হৃদয়ের গহন মায়ায়।

শঙ্খিনীর মতো ভালবেসো—
যেন প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়;
ছবি তার আঁকুক সময়—
আরো একবার তুমি এসো।

বিদ্যাভাব

উপাধ্যায়

লগ্ন থেকে চতুর্থ স্থান, এর অধিপতি এবং বিদ্যাকারক গ্রহ বৃহস্পতির বলাবল ও অবস্থিতি অনুসারে জাতক বা জাতিকার বিদ্যাভাব নির্ণয় করতে হয়। পঞ্চম স্থান থেকে বিচার হয় মানুষের বুদ্ধি সম্পর্কে। কেউ কেউ তৃতীয় স্থানকে বিদ্যা বিচার সময়ে লক্ষ্য করে থাকেন। এঁরা বলেন, পার্থিব জগতে মনের অবস্থা বা গতি ও প্রকৃতি কিম্বা মানসিক প্রবণতার কারকতা তৃতীয় স্থানেই নিহিত রয়েছে। মানুষের উচ্চ চিন্তাধারা সম্পর্কে জানা যায় নবম স্থান থেকে। কিন্তু হিন্দু-জ্যোতিষীরা চতুর্থ স্থানকেই বিদ্যার প্রকৃত স্থান বলেছেন। অবশ্য মানুষের মানসিক-শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্য কতটুকু, তা তৃতীয় স্থান বিচার করে যেমন ধরতে পারা যায়, অনুরূপ ভাবে বুঝতে পারা যায় চতুর্থ স্থান থেকে জাতক বা জাতিকা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হবে কিনা বা ডিগ্রি-উপাধি পেয়ে শিক্ষিত বলে জন সমাজে সমাদৃত হবে কিনা—চতুর্থ স্থান থেকে বিদ্যা, পঞ্চম স্থান থেকে বুদ্ধি, আর দশম স্থান থেকে বিদ্যাজনিত যশ চিন্তা করতে হয়। বিদ্যাবিষয়ক ফল ভালো হোলেই যে জাতক বা জাতিকা বুদ্ধিমান বা বুদ্ধিমতী হবে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোতে পারবে এরূপ কথা বলা যায় না। আমরা পাশ ফেল প্রভৃতি দশম স্থান থেকে বিচার করে সাফল্য লাভ করেছি। খুব বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিমতী মেধাবী ছেলেমেয়ে যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞান-বুদ্ধি ও মানসিক উৎকর্ষ লাভ করেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোতে পারেনা—অনুকূল আবেষ্টনী, অধ্যবসায়, মনঃসংযোগ ও প্রশ্নোত্তর করবার কৌশল জানার অভাবে, আর একথাও সত্য যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডিগ্রিধারী হোলেই যে সে জ্ঞান ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে উন্নত হবে, এরূপ নিশ্চয়তা দেখা যায় না। চাকরীর ক্ষেত্রে অবশ্য ডিগ্রিটা পাসপোর্ট বলা যায়। বহু স্নাতকোত্তর ছেলেমেয়েকে দেখা গেছে বিদ্যাবুদ্ধিতে নিকৃষ্ট এবং উচ্চপদে অধিষ্ঠিত।

চতুর্থ স্থানে পাপগ্রহ থাকলে বিদ্যায় বাধা প্রদান করে—আর আশানুরূপ বিদ্যার্জ্জন হয় না, বিদ্যাভঙ্গযোগ ঘটে। এই স্থানে বৃহস্পতি ও শুক্র থাকলে উত্তম বিদ্যা ও কর্ম্মলাভ অবশ্যই হয়ে থাকে। দশম স্থানে পাপগ্রহ, নীচস্থ, দুর্ব্বল বা পরাজিত গ্রহ থাকলে আর দশমাধিপতি দুঃস্থানগত ও পাপদৃষ্ট হোলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। দশম স্থানে কোন গ্রহ না থাকলে দশমাধিপতি কার নবাংশে আছে, সেই নবাংশপতির অবস্থান ভেদে পাশ-ফেলের বিচার করতে হয়। যার বুধ ও বৃহস্পতি উত্তম, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সে উন্নতি লাভ করবে। চতুর্থ বা দশম স্থানে বৃহস্পতি থাকলে আইন-বিদ্যায় উন্নত ও পারদর্শী হওয়া যায়। দ্বিতীয়াধিপতি শুভভাবে থাকলে বাকশক্তি লাভ হয়—উৎকৃষ্ট বক্তা ও অধ্যাপক হওয়া যায়। বুধ কেন্দ্রে কোণে অথবা দ্বিতীয়ে শুক্র থাকলে জ্যোতির্ব্বিদ হওয়া যায়। অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি বা ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় পারদর্শী হোতে হোলে দ্বিতীয় স্থানে মঙ্গল আর কেন্দ্রে বা কোণে বুধ থাকা দরকার। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বাগ্মিতা, কবিত্ব শক্তি প্রভৃতি কারক বুধ গ্রহ। বুধ শুভ হোলে উৎকৃষ্ট চিকিৎসক হওয়া যায়। অস্ত্রাদি চিকিৎসা বিষয়ের জ্ঞান মঙ্গলের অবস্থান দ্বারা নির্ণয় করতে হয়, শনি দ্বারা তান্ত্রিক ব্যাপারের জ্ঞান নির্ণয়।

রবি বা মঙ্গল দ্বিতীয়াধিপতি হয়ে শুক্র বা বৃহস্পতির সঙ্গে একত্র থাকলে ন্যায়দর্শন বা মনোবিজ্ঞানে উৎকর্ষ

লাভ হয়। বৃহস্পতি ও শুক্র বুধের দ্বারা পূর্ণ দৃষ্ট হয়ে কেন্দ্রে কোণে অবস্থান কর্‌লে দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ ও মানসিকক্ষেত্রে সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি অর্জ্জন করা যায়। শুক্র ও বৃহস্পতি বলবান হয়ে কেন্দ্র কোণে থাকলে বিশেষ বিদগ্ধতা লাভ হয়। উৎকৃষ্ট বিদ্যার্জ্জন করে পণ্ডিতসমাজে ব্যাসতুল্য হোতে গেলে তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একাদশাধিপতির প্রভাবমুক্ত হয়ে চতুর্থাধিপতি ও বৃহস্পতির শুভভাবে থাকা দরকার।

তৃতীয় ও নবমস্থান আর এদের অধিপতির বলাবল ও অবস্থান ভেদে বিচার কর্‌তে হয়, জাতক বা জাতিকা সাহিত্যকলা, শিল্প বা বিজ্ঞান প্রভৃতির মধ্যে কোনটির দিকে তার ঝোঁক—আর কোন্ বিদ্যায় শিক্ষালাভ কর্‌লে জীবনে কৃতিত্ব দেখাতে পার্‌বে। চতুর্থ স্থানে বৃহস্পতি বা রাহু বলী হোলে ডিগ্রী লাভে কোন বাধা বিপত্তি ঘটে না। বৃহস্পতি বা বুধ বিদ্যাধিপতি হয়ে শত্রু গৃহে থাকলে কুবিদ্যা হবে—আর কেন্দ্রে ত্রিকোণে বা উচ্চগৃহে থাক্‌লে উত্তম বিদ্যালাভ ঘটে।

ন্যায়, দর্শন, অলঙ্কার, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রপরতা বৃহস্পতির আনুকুল্যে সম্ভব হয়।

ভিষক, জ্যোতিষ, কাব্যশিল্প, লেখ্যবৃত্তির কারক বুধ। শুক্রের আনুকূল্যে কাব্যকর্ত্তা ও প্রাকৃত গ্রন্থতৎপর হওয়া যায়—প্রাকৃত গ্রন্থ বলতে নাটক, উপন্যাস, ইতিহাস, ভূতত্ত্ব, পদার্থতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব প্রভৃতি বুঝা যায়। চতুর্থপতি ও পঞ্চমপতি একত্র কেন্দ্র বা কোণে সহাবস্থান কর্‌লে জাতক বিদ্বান হয়। শঙ্করাচার্য্যের লগ্নে বিদ্যাকারক গ্রহ বৃহস্পতি তুঙ্গস্থ ছিল—এজন্যে তিনি বেদান্তজ্ঞ হয়েছিলেন। দ্বিতীয়স্থানে মঙ্গলগ্রহ থাকায় তিনি গণিতজ্ঞ হয়েছিলেন। বুধ ও শুক্র আইনবিদ্যার কারক। উদিত বুধ একাদশ স্থানে এবং শুক্র দশম স্থানে থাক্‌লে আইনশাস্ত্রজ্ঞ হওয়া যায়, উৎকৃষ্ট প্রাবন্ধিক হোতে গেলে চন্দ্র বলবান হওয়া আবশ্যক। বুদ্ধিকারকগ্রহ বলবান অথবা বুদ্ধিভাবাধিপতি অর্থাৎ পঞ্চম ভাবাধিপতি শুভগ্রহ দৃষ্ট হয়ে কিম্বা বুদ্ধি স্থানে বুধ থাক্‌লে জাতক বা জাতিকা অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হয়। বিদ্যা বিষয়ে বিচার কর্‌তে হোলে চতুর্থ ও পঞ্চমাধিপতির বলাবল, অবস্থান ও শুভাশুভ গ্রহের দৃষ্টি দ্বারা শুভাশুভ নির্ণয় বিধেয়; তা ছাড়া ভাবাধিপতি শুভগ্রহ শুভবর্গগত, শুভদৃষ্ট, স্বোচ্চাদি বর্গ ও স্বগৃহাদি বর্গগত কিনা তাও লক্ষ্য করা উচিত। চন্দ্র মনের কারক, আর চতুর্থস্থান থেকে মানসিক গুণাগুণ বিচার করা হয়। যদি চতুর্থাধিপতি বলবান হয় তবেই জাতক বিশুদ্ধ ও প্রশান্ত হৃদয় হোতে পারে, চন্দ্র দুর্ব্বল হোলে মনঃসংযোগের অভাব ঘটে। হীনবল ও নীচস্থ চন্দ্র যার রাশিচক্রে দেখা যায়, সে ব্যক্তি প্রায়ই অব্যবস্থিতচিত্ত হয়, তার পক্ষে লেখাপড়া ভালো হয়না, তবে গ্রহযোগও দৃষ্টি দ্বারা ফলাফলের তারতম্য হোতে পারে।

বুধ বুদ্ধির কারক, এজন্যে বুধ চন্দ্রের সঙ্গে থাক্‌লে বা চন্দ্র বুধ দ্বারা পূর্ণ দৃষ্ট হোলে জাতক বুদ্ধিমান্‌ও বালকের ন্যায় সরলচিত্ত হয়ে থাকে। চন্দ্র মনের কারক হওয়ায় স্মৃতিশক্তিরও কারক। এজন্যে চন্দ্র বলশালী হয়ে ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ ভিন্ন অন্যভাবগত হোলে জাতক বা জাতিকা স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন হয়। চন্দ্র ও বুধ একত্র যুক্ত থাক্‌লে জাতক অসাধারণ মেধাবী ও বুদ্ধিমান হয়ে থাকে। চন্দ্র থেকে কেন্দ্র কোণগত বুধও শুভফলপ্রদ। বৃহস্পতি প্রজ্ঞাকারক এজন্য চন্দ্রের সঙ্গে বৃহস্পতি থাক্‌লে প্রজ্ঞাবান হওয়া যায়।

বিদ্যাভাব নিজের অধিপতি, শুক্র, বুধ, বৃহস্পতির দ্বারা যুক্ত বা দৃষ্ট হোলে অতীব শুভজনক হয়। কিন্তু ভাবাধিপতি দুঃস্থানে অর্থাৎ ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশভাবে থাক্‌লে, শত্রুগ্রহগত বা দুর্ব্বল হোলে শুভফলের আশা নেই, কিন্তু স্বক্ষেত্রে মূল ত্রিকোণে বা তুঙ্গে থাক্‌লে শুভফলদাতা হয়। ভাবাধিপতি তুঙ্গী, মূল ত্রিকোণস্থ, বা স্বগৃহী হয়ে শুভগ্রহযুক্ত বা দৃষ্ট হয়ে কেন্দ্রে বা কোণে থাক্‌লে বিদ্যাভাবের অতীব শুভফল হয়ে থাকে।

চতুর্থ স্থানে তুঙ্গস্থ চন্দ্রের সঙ্গে শনি থাক্‌লে আর এদের ওপর বৃহস্পতি পূর্ণদৃষ্টি কর্‌লে অল্পবয়সেই জাতক পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত হয়ে গ্রন্থকার হয়। জাতকের লগ্ন ধনু হোলে আর লগ্নাধিপতি শনির সঙ্গে লগ্নে অবস্থান কর্‌লে, সে প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী অর্থাৎ উকিল, ব্যারিষ্টার, শেষ পর্য্যন্ত আইনের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হয়ে ওঠে—সর্ব্বোচ্চ আদালতের বিচারক পর্য্যন্ত হয়।

চতুর্থ স্থানে চতুর্থাধিপতি ও তুঙ্গস্থ বৃহস্পতি একত্র থাক্‌লে উচ্চ আইন শিক্ষালাভ হয়ে থাকে। লগ্নাধি-

পতি ও চতুর্থাধিপতি একাদশে আর রবির সঙ্গে দ্বিতীয়াধিপতি দ্বাদশে থাক্‌লে বিদ্যাশিক্ষা সঙ্কীর্ণভাবে ঘটে থাকে। চতুর্থাধিপতি ও শুক্র কেন্দ্রগত হোলে আর বুধ বলবান হোলে জাতক বিদ্যাবিনয়াদি গুণসম্পন্ন হয়। চতুর্থাধিপতি বৃহস্পতি ও বুধ তৃতীয় স্থানে বা দুঃস্থানে থাক্‌লে অথবা নীচ শক্র গৃহগত হোলে বিদ্যাদি বিষয়ে নিকৃষ্ট ফল প্রদান করে।

***

মাঘ মাসের ব্যক্তিগত লগ্ন ও রাশির ফলাফল

মেষ লগ্ন—কর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে ভ্রমণ—পুত্র-সন্তান লাভ—নানা পরিকল্পনায় সাফল্য লাভ—দুর্ঘটনার সম্ভাবনা—সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ—অসন্তোষ ও বিপন্নতার আশঙ্কা—অর্থক্ষতি, সাময়িক শারীরিক কষ্ট—স্ত্রীর আর্থিক বিষয়ে কিছু বিশৃঙ্খলতা—চৌর্য্যভয়—স্বজন বিরোধ বা উপরওয়ালার সঙ্গে মনোমালিন্য—ব্যয় বৃদ্ধি—স্ত্রী বা মাতার পীড়া। নানাভাবে অর্থ অপব্যয়। বিদ্যার্থীর পক্ষে আশানুরূপ ফল দেখা যায় না। পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ ফল লাভ।

বৃষ লগ্ন—অর্থ ও বন্ধু লাভ—পীড়া—উচ্চ স্থান হোতে পতনের আশঙ্কা—কর্ম্মে সাফল্য লাভ—অপবাদ ভয়—দুশ্চিন্তা—আংশিক ভাবে কিঞ্চিৎ ক্ষতির সম্ভাবনা। পরীক্ষায় সাফল্য। বিদ্যার্জ্জন মন্দ নয়। প্রণয়ে সাফল্য লাভ। পারিবারিক কলহ—পিতামাতার সহিত মনোমালিন্য, তজ্জন্য বিচ্ছেদ।

মিথুন লগ্ন—শারীরিক ও মানসিক কষ্ট ও অস্বচ্ছন্দতা—আশাভঙ্গ—মনস্তাপ—উদ্বেগ—চৌর্য্যভয়—স্বজন বিরোধ। অতিরিক্ত ব্যয়, স্ত্রী বা মাতার অসুখজনিত দুশ্চিন্তা। স্ত্রীলোকের কাছ থেকে মানসিক আঘাতপ্রাপ্তি, প্রণয় ভঙ্গ। বিপন্নতার আশঙ্কা। শক্র বৃদ্ধি। পরীক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য হবে না, অকৃতকার্য্য হবার আশঙ্কা।

কর্কট লগ্ন—অপ্রত্যাশিতভাবে ভয়, মানসিক আঘাত। স্বাস্থ্যহানি। ভ্রমণ। গবেষণা বা আবিষ্কার কার্য্যে সাফল্য। পিতৃপীড়া। সন্তান লাভ। কর্ম্ম স্থানে পরিবর্ত্তন সম্ভাবনা। কলহ-বিবাদ। বিদ্যার্জ্জন, পরীক্ষায় শুভফল। প্রণয় বৃদ্ধি—স্ত্রী বা পুরুষের ভালোবাসা প্রাপ্তির সম্ভাবনা—অবৈধ প্রণয়ের যোগাযোগ ঘটতে পারে।

সিংহ লগ্ন—শত্রুহানি। আকস্মিক ভয়। বিপন্নতার সম্ভাবনা। কলহ ও মনোমালিন্য। সঞ্চিত অর্থ থেকে ক্ষতি। ব্যয়বৃদ্ধি। সন্তানের পীড়া, অর্থকৃচ্ছ্রতা—ঋণ। স্ত্রীলোকের সহিত অসদ্‌ভাব, শ্লেষ্মাপ্রকোপ, চিত্তের বিক্ষিপ্ততা বা চাঞ্চল্য, কতকগুলি অপ্রত্যাশিত অপ্রীতিকর ঘটনা। বিদ্যার্জ্জন। পরীক্ষায় সাফল্য। গৃহসুখের অভাব।

কন্যা লগ্ন—শারীরিক অসুস্থতা ও ভয়। ব্যয় বৃদ্ধি। শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্র থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে বিপদের ভয়। প্রাণায়ামাদি প্রক্রিয়ার দ্বারা সাধনার ইচ্ছা। সাহিত্য-চর্চ্চা, গ্রন্থ রচনা ও অধ্যাত্ম সাধনার দিকে আগ্রহ। উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা। কর্ম্মে বাধাপ্রাপ্তি। পুত্র লাভ। পরীক্ষার ফল আশাপ্রদ বলা যায় না। স্মৃতিশক্তির হ্রাস হেতু বিদ্যার্জ্জনে কিঞ্চিৎ কষ্টভোগ। স্ত্রীর সহিত অসদ্ভাব। প্রণয়ভঙ্গ যোগ। ভালবাসার ক্ষেত্রে স্ত্রীলোক বা পুরুষের নিকট লাঞ্ছনা ভোগ। শরীরে আঘাত প্রাপ্তি।

তুলা লগ্ন—স্ত্রীর বিপন্নতা। ক্লান্তি ও বিবাদ। পুরস্কার লাভ। অর্থ লাভের যোগ। ব্যবসায়ে লাভ। সৌভাগ্য সুখ। শুভ কর্ম্মানুষ্ঠান। বিদ্যাভাব মধ্যম। পরীক্ষার ফল আশানুরূপ বলা যায় না। ব্যয়বৃদ্ধি। উদ্বেগ ও আতঙ্ক। প্রণয় বৃদ্ধি। নারী বা পুরুষের সাহচর্য্যসুখ।

বৃশ্চিক লগ্ন—ভ্রমণ। আমোদ-প্রমোদে অপব্যয়। দুঃখভোগ ও দুর্ঘটনা। অর্থলাভ। স্ত্রীলোকের সহিত কলহ। সন্তানের পীড়া। পরীক্ষায় উন্নতি। বিদ্যালাভ। অবৈধ প্রণয়ের যোগাযোগ। দাম্পত্য কলহ। পারিবারিক অস্বচ্ছন্দতা।

ধনু লগ্ন—আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ। দুশ্চিন্তা। অর্থলাভ। শারীরিক অসুস্থতা—দুর্ঘটনার ভয়। উদ্বেগ। সন্তানাদির পীড়া। গৃহ বিবাদ। আয় বৃদ্ধি। শত্রু ভয়। ব্যবসায়ে লাভ ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন। নূতন কর্ম্ম যোগাযোগ।

বিবাহাদির যোগাযোগ বা প্রণয় লাভ। পরীক্ষায় নৈরাশ্য-জনক পরিস্থিতি, লেখাপড়ায় মনঃসংযোগের অভাব। স্ত্রী-লোক কর্ত্তৃক প্রতারণা।

মকর লগ্ন—স্থান পরিবর্ত্তন। বিবাহের সম্ভাবনা, বিবাহিত ব্যক্তির সন্তান-সম্ভাবনা—ভূম্যাদি ক্রয় বা গৃহ-নির্ম্মাণ যোগ। বাহন যোগ। অর্থপ্রাপ্তি—প্রণয় লাভ। সন্তানের পীড়া। পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ। বিদ্যাভাব মধ্যম।

কুম্ভ লগ্ন—ব্যয় বৃদ্ধি। অপবাদ। অর্থক্ষতি। মাসের মধ্যভাগে লাভ। স্ত্রীর পীড়া বা বিপন্নতা। হঠাৎ বিবাহের যোগাযোগ। প্রতিদ্বন্দ্বীর কুচক্রান্ত। বিষয়-সম্পত্তির গোলযোগ। প্রণয়ের প্রবণতা। স্বজন বিয়োগ। মাতার অনিষ্ট সম্ভাবনা। পরীক্ষার ফল ভালো নয়।

মীন লগ্ন—স্বাস্থ্য ও ভ্রমণ সম্পর্কে কিছু কষ্ট ভোগ। চিত্তচঞ্চলতা ও মতভেদের দরুণ অশান্তি। আকস্মিক ভয় ও উদ্বেগ। দূর দেশ থেকে দুঃসংবাদপ্রাপ্তি। ধনভাব শুভ। সহোদরগণের সহিত কলহ বিবাদ। মাতৃপীড়া। বিদ্যার্জ্জন কিন্তু পরীক্ষার ফল মধ্যম। স্ত্রীর সহিত মনো-মালিন্য। আয় বৃদ্ধি। অর্থলাভ। সম্মান বৃদ্ধি। পদোন্নতি। পিতার বিশেষ পীড়াদি কষ্ট।

***

মেষ রাশি—আশা আকাঙ্ক্ষা ও পরিকল্পনায় সিদ্ধিলাভ। পতন বা আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা। অপব্যয়। কিঞ্চিৎ কষ্ট। কর্ম্মে কিঞ্চিৎ বাধা। ভ্রমণে ক্লান্তি। রোগ বা গুরুতর পীড়া। কলহ বিবাদ ও তজ্জনিত লাঞ্ছনা-ভোগ। স্ত্রী পুত্রের সহিত বিচ্ছেদ। ব্যয়াধিক্য এমন কি ঋণ সম্ভাবনা।

বৃষ—নৈরাশ্য। বিচ্ছেদ। বিপদের আশঙ্কা। নূতন বন্ধু লাভ। ধন লাভ। সন্তানের পীড়া। পিত্ত-প্রকোপ। চক্ষুপীড়াদি। স্ত্রীর সহিত কলহ। পুত্র-লাভ। পরাক্রম বৃদ্ধি। স্ত্রী বা পুরুষের সঙ্গলাভজনিত আনন্দ। বুদ্ধির প্রাখর্য্য। যানবাহন বা সম্পত্তিলাভের সুযোগ। বিলাস ব্যসন বৃদ্ধি। আয় বৃদ্ধি।

মিথুন—মর্ম্মান্তিক মানসিক কষ্ট। অর্থ লাভ। সাময়িক পীড়া বা স্বাস্থ্যহানি। দুঃখ ভোগ। কলহ। স্ত্রীর স্বাস্থ্যহানি ও স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য হেতু স্থানা-ন্তরে গমনেরও সম্ভাবনা। স্ত্রী বা পুরুষের সহিত প্রণয়। উদ্বেগ।

কর্কট—ভ্রমণ ও স্বাস্থ্যহানি। স্ত্রীর সহিত কলহ। মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য। কর্ম্মে যোগাযোগ। সৌভাগ্য লাভ। জনপ্রিয়তা, যশোলাভ। শত্রু হানি। স্ত্রীলোকের সাহচর্য বা সংসর্গ লাভ। প্রণয়াসক্তি।

সিংহ—স্বজন বিরোধ। কলহ। সঞ্চিত অর্থহ্রাস। ব্যয়বৃদ্ধি। জ্ঞাতিবর্গের দ্বারা প্রপীড়িত হওয়ার যোগ। বিমর্ষভাব। আশাভঙ্গ। শত্রুদের পরাজয়। বিপদের আশঙ্কা। সম্মানহানি। রক্তপাত।

কন্যা—আকস্মিক ভীতি। সন্তানাদির সুখ-স্বচ্ছন্দতা স্থান পরিবর্ত্তন। কর্ম্মে বাধা। পরিবার বৃদ্ধি। স্বজনবর্গের স্বাচ্ছন্দ্য লাভ। মাতৃ পীড়া। বন্ধুবিচ্ছেদ। দুশ্চিন্তা। প্রত্যেক কার্য্যে সন্দিগ্ধতা প্রকাশ। স্ত্রীর সহিত অসদ্ভাব।

তুলা—অর্থলাভ। পৌনঃপুনিকভাবে শত্রুদের দ্বারা আক্রমণ। পাওনাদারদের তাগাদার জন্য মানসিক বিশৃঙ্খলতা। ঋণ-সম্ভাবনা। উদ্বেগ ও ভয়।

বৃশ্চিক—ভ্রমণ ও ভয়। অপমান কিন্তু কর্ম্মে সাফল্য ও ধনপ্রাপ্তি। শারীরিক সৌন্দর্য্যহানি। স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব। দুর্ব্বলতা। পরানুগ্রহে অর্থলাভ। ব্যয়ের জন্যে সঞ্চয়ের অভাব। পরাক্রমবৃদ্ধি। গুরুজনবর্গের আনুকূল্য লাভ। উপরওয়ালার প্রীতি। স্বাধীনভাবে জীবন যাত্রা। শত্রু হানি। উচ্চস্থান হতে পতনের আশঙ্কা।

ধনু—শরীরে বিষাক্ত পদার্থ প্রবেশের আশঙ্কা। অগ্নিভয়। ভ্রমণ। শারীরিক ক্লান্তি, অনিদ্রা ও অকারণ ভয় ও দুশ্চিন্তা। দুষ্টলোকের চক্রান্তে বা প্ররোচনায় অসৎ পরামর্শপ্রাপ্তি হেতু অর্থক্ষতি ও বুদ্ধি ভ্রংশ। মাতৃপীড়া বা মাতার স্বাস্থ্যহানি। দুঃখভোগ।

মকর—সম্মান হানি। অকারণ লক্ষ্যভ্রষ্ট অবস্থায় ভ্রমণ। নানা বাধা ও কর্ম্মে গোলযোগ। শারীরিকও মানসিক কষ্ট। অর্থ লাভ। অজীর্ণ, শরীরে রক্তপাত। শত্রুবৃদ্ধি। নৈতিক আদর্শের বিচ্যুতি ঘটবার আশঙ্কা—নানাভাবে প্রলুব্ধ হওয়ার দরুণ। কলহ বিবাদ। আয়বৃদ্ধি। দাম্পত্য কলহ। দুঃখভোগ।

কুম্ভ—সাফল্য লাভে বিঘ্ন, ধনলাভ ও সম্মানহানি, কলহ-বিবাদ, স্বাস্থ্যোন্নতি, বস্ত্রলাভ। স্ত্রীর বিপন্নতা। স্থান ত্যাগ। শত্রুহানি।

মীন—উত্তম ভোগ বিলাস, রোগ ও ভয়, অর্থ ক্ষতি,

পদমর্য্যাদাহানির আশঙ্কা, স্ত্রীর সাহচর্য্য লাভ ও প্রণয়, বন্ধুপ্রীতি ও সাহায্য প্রাপ্তি।

* * * *

পৌষমাসের প্রারম্ভ থেকে মাঘের প্রথম সপ্তাহ মধ্যে যে সব ব্যক্তির জন্ম, তাদের মধ্যে অনেকেরই পক্ষে ইংরাজী ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দটী আশাপ্রদ। সাংসারিক ক্ষেত্রে যে সব সমস্যা উদ্ভব হয়েছিল বা নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির জন্য মানসিক অস্বচ্ছন্দতা প্রকাশ পেয়েছিল, সেগুলি আর থাকবে না—ক্রমশঃ উন্নতির সূচনা ঘটবে। সূর্য্যোদয়ের সময় যাদের জন্ম, তারা স্বজন-বিয়োগের জন্যে শোকাচ্ছন্ন হোলেও তাদের সম্পত্তিলাভ ঘটবে চরমপত্রের বলে বা মৃত্যুকালে নির্দ্দেশের আনুকূল্যে। নূতন বন্ধুত্বসূত্রে আনন্দলাভ, অবিবাহিত বা অবিবাহিতাদের বিবাহ সম্ভাবনা ও রোমাণ্টিক পরিবেশের সৃষ্টি হবে। বৎসরের মধ্যভাগে সৌভাগ্য বৃদ্ধি, ভ্রমণ যোগ, শেষভাগে কর্ম্মোন্নতি ও নানা কর্ম্মে, ব্যবসায়ে বা প্রোফেসনে সাফল্য।

মাঘের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহ মধ্যে জাত ব্যক্তির পক্ষে ১৯৫৮সালের অনিশ্চিত পর্য্যায়ভুক্ত অবস্থা বা ঘটনাগুলির জের চল্‌তে থাকবে গোটা ১৯৫৯ সাল ধরে। চৈত্র মাস থেকে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে এঁদের অনেককে মামলা মোকর্দ্দমায় জড়িত হোতে হবে আর শত্রু বৃদ্ধিও ঘটবে দারুণভাবে। সূর্য্যোদয়কালে যাদের জন্ম তারা বিগত ইংরাজী বর্ষাপেক্ষা এই বর্ষে ব্যবসায়ে অধিকতর সাফল্য ও অর্থ লাভ করবে। মধ্যাহ্নকালে জাতকদের পক্ষে ব্যবসায়ের ওপর বিশেষ নজর নেওয়া দরকার হবে, রুটীন মাফিক কাজ ছাড়া কোনপ্রকার স্পেকুলেশন করলেই গণ্ডগোলের সৃষ্টি হবে বর্ষের প্রথমে ও মধ্যভাগে। সূর্য্যাস্তের সময় জাতকেরা সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে সৌভাগ্যবান হবে, কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রম করে কার্য্যাদি সম্পাদন করবার চেষ্টা করলে রোগশয্যায় শায়িত হবার আশঙ্কা আছে। মধ্য রাত্রে জন্ম যাদের, তারা যদি পর্য্যবেক্ষণ শক্তি হারিয়ে ফেলে তাদের চাকুরির স্থানে, আর অপরের সহিত ব্যবহারে কৌশল প্রয়োগ ও কর্ম্মে মনোনিবেশ না করে, খুঁটিনাটি কাজটা পর্য্যন্ত না দেখে, তা হোলে তাদের ভাগ্যে উপরওয়ালার সঙ্গে কলহ বিবাদের দরুণ যথেষ্ট অশান্তি ভোগ হবে, পদোন্নতির পক্ষেও বাধা সৃষ্টি হবে—কোন কোন ক্ষেত্রে বেকার অবস্থায় থাকতেও দেখা যাবে।

***

ভবিষ্যদ্বাণী

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভের বিরুদ্ধে গুপ্ত ষড়যন্ত্র চল্‌বে, তাঁকে পদিচ্যুত করার চেষ্টা হবে এমন কি আততায়ীর হস্তে জীবন বিপন্নও হোতে পারে। ফ্রান্সের জাতীয়তার' অভ্যুদয় হবে, যাতে করে সে তার হৃতগৌরব ফিরিয়ে পেতে পারে জেনারেল দ্য গলের অধিনায়কতায়। ফ্রান্সে কমিউনিষ্ট প্রতিপত্তি হ্রাস পাবে, ফ্যাসিষ্ট শাসনই প্রত্যক্ষভাব পরিলক্ষিত হবে। কৃষি বাণিজ্য ব্যবসায় ও শ্রমশিল্পোন্নতি ঘটবে ফ্রান্সে। আন্তর্জ্জাতিকতার ক্ষেত্রে মার্কিণের সম্মান ও প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হবে, বেকার সমস্যার উদ্ভব হবে আর নানাভাবে তাকে গোলযোগের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনাও আছে। মার্কিণ জনসাধারণ রাজনীতির ক্ষেত্রে উদারনৈতিকতার আশ্রয় গ্রহণ করতে সচেষ্ট হবে—ব্যয় সঙ্কোচের জন্যে আমেরিকার বর্ত্তমান নীতির পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা আছে। আইসেনহাওয়ারের পক্ষে এ বৎসরটি শুভ নয়। ডিফেন বেকারের সংরক্ষণশীল দলের প্রভাব ক্যানাডায় অক্ষুণ্ণ থাকবে, আমেরিকার সঙ্গে কানাডার সম্প্রীতি থাকবে না। ক্যানাডার আভ্যন্তরিক উন্নয়ন, বৈদেশিক বাণিজ্যপ্রসার ও আন্তর্জ্জাতিক সৌহার্দ্দ্য বৃদ্ধি প্রভৃতি পরিলক্ষিত হবে। ইংলণ্ডে আকস্মিক রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটবে এবং ষ্টক এক্‌চেঞ্জ ও টাকার বাজারে বেশ ওঠানামা চলবে, রাজনৈতিক জুয়াড়ীদের সুচতুর কৌশল প্রয়োগের ফলে ইংলণ্ডের বিশেষ অর্থক্ষতির সম্ভাবনা আছে। চীন ও জাপানের শিল্প বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সূচিত হয়। আমেরিকার নিকট এই বৎসর কমিউনিষ্ট চীন সমাদৃত হবে। ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত জনবরেণ্য ব্যক্তির পরলোকগমন ঘটবে। আরবের উপর মিসরের প্রভাব বিস্তৃত হবে। সৌদি-আরবে প্রায়ই সংঘর্ষ ও গণ্ডগোলের সৃষ্টি হওয়ায় ইঙ্গ-মার্কিণ স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হোতে পারে। আয়ার-আলস্টার সীমান্তে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। বৃটেন ও হল্যাণ্ডের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্য চুক্তিভঙ্গ হওয়ায় সমস্যার সৃষ্টি হোতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষ চরমে উঠবে—গ্রেট ব্রিটেন ও চীনের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের যোগাযোগ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাবে। কাশ্মীর সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন প্রকার মীমাংসা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির আশা নেই। জাপানের জনৈক বয়োবৃদ্ধ নেতার আকস্মিক মৃত্যু ঘটবে। চীনকে বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করবার জন্যে বিশেষভাবে চাপ দেওয়া হবে। ভারতবর্ষের শাসন সংস্কারও আভ্যন্তরীণ সংগঠন হবে। সন ১৩৬৫ সালের মাঘ ও ফাল্গুন মাস ভারত ও পাকিস্তানের পক্ষে অবসাদ ও বিরক্তিকর, বিশেষতঃ পাকিস্তানে এই দুইমাসে শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেক কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যাবে। ইংরাজী ১৯৫৯ সালের শেষের দিকে নাগাদের বিদ্রোহও উপদ্রব হেতু ভারতবর্ষে বিশেষতঃ কলিকাতায় চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সম্ভাবনা আছে।
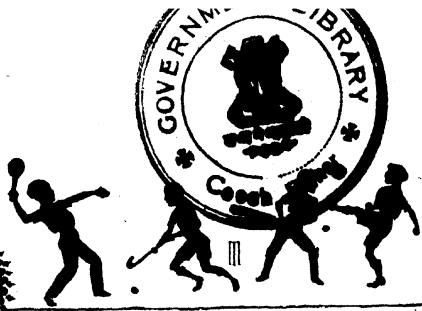
সুধাংশুকুমার চট্টোপাধ্যায়

রঞ্জি ট্রফি ঃ

বাংলা রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চলের খেলায় আসামকে ১৮৭ রানে পরাজিত ক'রে ৮ পয়েন্ট লাভ করেছে।

বাংলা ঃ ১৬৪ ও ১৫১ (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)

আসাম ঃ ৬৮ ও ৬০

বাংলার বোলার পি চ্যাটার্জি আসাম দলের ২য় ইনিংসে ৩টি উইকেট নিয়ে রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতায় ১০০তম উইকেট লাভের গৌরব লাভ করেন।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস ঃ

পুরুষ বিভাগে পাঞ্জাব ৬৯ পয়েন্ট এবং মহিলা বিভাগে মহীশূর ৪০ পয়েন্ট পেয়ে দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করে। ফলাফল:

পুরুষ বিভাগ : ১ম পাঞ্জাব ৬৯ পয়েন্ট ; ২য় মাদ্রাজ ১৪, ৩য় রাজস্থান ১৩, ৪র্থ দিল্লী ১২, ৫ম মহীশূর ১১, ৬ষ্ঠ পুণা ১০, বিক্রম ১০, ৭ম জব্বলপুর ৮, ৮ম বোম্বাই ৭, ৯ম কর্ণাটক ৫, ১০ম এলাহাবাদ ৩, গুজরাট ৩ পয়েন্ট।

মহিলা বিভাগ : ১ম মহীশূর ৪০, ২য় পুণা ১৭, ৩য় জব্বলপুর ১৬, ৪র্থ পাঞ্জাব ১১, বোম্বাই ১১, ৫ম বিক্রম ২, ৬ষ্ঠ নাগপুর ১, মাদ্রাজ ১, কর্ণাটক ১ পয়েন্ট।

ডেভিস কাপ ঃ

১৯৫৮ সালের ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে আমেরিকা ৩-২ খেলায় অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত ক'রে ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে। চারটি সিঙ্গলস এবং একটি ডাবলস মোট এই পাঁচটি খেলার মধ্যে আমেরিকা দুটি সিঙ্গলস এবং ডাবলস খেলায় জয়ী হয় এবং বাকি দুটি সিঙ্গলসে অষ্ট্রেলিয়ার জয় হয়। গত ১৫ বছর ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অষ্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে আসছে ; এই পনের বছরে অষ্ট্রেলিয়া ৮ বার এবং আমেরিকা ৭বার ডেভিস কাপ জয়লাভ করেছে। আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়ার কাছে শেষ হেরেছিল ১৯৫৫ সালে। ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৫৭ পর্য্যন্ত একাদিক্রমে তিন বছর অষ্ট্রেলিয়া ডেভিস কাপ পেয়েছে।

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ

টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ৬১৪ (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ; আর কানহাই ২৫৬, বি বুচার ১০৩, জি সোবার্স ১০৬ নট আউট)।

ভারতবর্ষ ঃ ১২৪ (উমরীগড় ৪৪ নট আউট। গিলক্রিস্ট ১৮ রানে ৩, হল ৩১ রানে ৩ এবং রামাধীন ২৭ রানে ২ উইকেট।) ও ১৫৪ (মঞ্জরেকার ৫৪ নট আউট। গিলক্রিস্ট ৫৫ রানে ৬, হল ৫১ রানে ৩ উইকেট)

ক'লকাতার রঞ্জি ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের তৃতীয় টেষ্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ৩৩৬ রানে ভারতবর্ষকে পরাজিত করেছে। ফলে বর্ত্তমান টেষ্ট সিরিজে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ২-০ খেলায় অগ্রগামী হয়েছে। অনুষ্ঠিত তিনটি টেষ্ট খেলার মধ্যে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১ম ও ৩য় টেষ্ট খেলায় জয়ী হয়েছে এবং ২য় টেষ্ট খেলা ড্র গেছে। পাঁচ দিনের টেষ্ট খেলা চতুর্থ দিনে ১২টা বাজতে ২০ মিনিটে সমাপ্ত হয়। ভারতবর্ষ বনাম

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের তৃতীয় টেষ্ট খেলা নানা দিক থেকে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের রোহান কানহাই ১ম ইনিংসে ২৫৬ রান করেন। তাঁর ড্রাইভ, কাট এবং লেগ ষ্ট্রোক দেখে দর্শক সাধারণ পরম তৃপ্তি পায়।

এই ২৫৬ রান ক'রতে তাঁর ৪০০ মিনিট সময় লাগে। বাউণ্ডারী করেন ৪২টি। ইডেন উদ্যানের উইকেটে কোন দলেরই খেলোয়াড় ইতিপূর্ব্বে টেষ্ট খেলায় দ্বিশত রান করতে পারেন নি।

ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেষ্ট খেলায় এ পর্য্যন্ত ৭টি ডবল সেঞ্চুরী হয়েছে এবং কানহাইয়ের ২৫৬ রানই সর্ব্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান হিসাবে গণ্য হয়েছে। এই ৭টি ডবল সেঞ্চুরীর মধ্যে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলেরই করেছেন তিনজন খেলোয়াড়—কানহাই (২৫৬), ওরেল (২৩৭) এবং উইকস (২০৭); এবং বাকি ৪টি করেছেন—ব্র্যাডম্যান (২০১), হার্ডষ্টাফ (২০৫ নট আউট), হ্যামণ্ড (২১৭) এবং সাটক্লিফ (২৩০ নট আউট)।

টেষ্ট খেলায় ভারতবর্ষের বিপক্ষে এক ইনিংসে ৬০০ রান হয়েছে চারবার। এই ৪ বারের মধ্যে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজই করেছে তিনবার।

আলোচ্য তৃতীয় টেষ্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ে সমান নৈপুণ্য দেখিয়েছে; অপর দিকে ভারতীয় দল ক্রিকেট খেলার এই তিনটি বিভাগে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টসে জয়ী হয়ে ব্যাটিং আরম্ভ করে এবং ৩ উইকেট হারিয়ে ৩৫৯ রান করে। কানহাই ২০৩ এবং বুচার ৮৭ রান ক'রে নট আউট থাকেন। ২য় দিনে চা-পানের সময় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৬১৪ (৫ উইকেটে) রানের মাথায় ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের তিনজন খেলোয়াড়—কানহাই (২৫৬), বুচার (১০৩) এবং সোবার্স (১০৬ নট আউট) সেঞ্চুরী করেন। ৯০ মিনিটের খেলায় ভারতবর্ষের ২টো উইকেট পড়ে ২৯ রান ওঠে।

৩য় দিনে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস ১২৪ রানে শেষ হয়। ৪৯০ রান পেছনে পড়ে ভারতবর্ষ 'ফলো-অন' করে। নির্দ্ধারিত সময় দেখা গেল ৫টা উইকেট পড়ে ভারতবর্ষের ২য় ইনিংসে ৬৯ রান উঠেছে। ৪র্থ দিন ১২টা বাজতে ২০ মিনিটে ভারতবর্ষের ২য় ইনিংস ১৫৪ রানে শেষ হয়ে যায়। গিলক্রিস্টের বোলিং ভারতবর্ষের পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর বলে ২য় ইনিংসে ভারতবর্ষের ৬টা উইকেট পড়ে। সুভাষ গুপ্তই তাঁর 'hat-trick' ঠেকিয়ে দেন।

ইংলণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়া ঃ

ইংলণ্ড ঃ ২৫৯ (মে ১১৩; ডেভিডসন ৬৪ রানে ৬ উইকেট, মেকিফ ৬৯ রানে ৩ উইঃ) ও ৮৭ (মেকিফ ৩৮ রানে ৬, ডেভিডসন ৪১ রানে ৩ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ৩০৮ (হার্ভে ১৬৭; ষ্টেথাম ৫৭ রানে ৭ এবং লোডার ৯৭ রানে ৩ উইকেট) ও ৪২ (২ উইকেট)

মেলবোর্ণে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে ইংলণ্ডকে পরাজিত ক'রে আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে ২—০ খেলায় অগ্রগামী হয়েছে।

ইংলণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়া ঃ

ইংলণ্ড ঃ ২১৯ (মে ৪২; বেনড ৮৩ রানে ৫ উইকেট। ও ২৮৭ (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। কাউড্রি ১০০ নট আউট, মে ৯২। বেনড ৯৪ রানে ৪ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ৩৫৭ (ও' নীল ৭৭, ডেভিডসন ৭১ ম্যাকে ৫৭, ফ্যাভেল ৫৪। লেকার ১০৭ রানে ৫ এবং লক ১৩০ রানে ৩ উইকেট) ও ৫৪ (২ উইকেটে)

সিডনিতে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়ার ৩য় টেষ্ট ক্রিকেট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

ক্রিকেট খেলায় বিশ্বরেকর্ড ঃ

পাকিস্তানের টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় হানিফ মহম্মদ করাচী বনাম ভাওয়ালপুরের খেলায় করাচীর পক্ষে ৪৯৯ রান ক'রে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছেন। পূর্ব্ব রেকর্ড ছিল ডন্ ব্র্যাডম্যানের—৪৫২ নট আউট রান। এই ৪৯৯ রান তুলতে হানিফ মহম্মদের ১০ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট সময় লেগেছিল।

জাতীয় বাস্কেটবল ঃ

পুরুষ বিভাগে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান সার্ভিসেস দল ফাইনালে মহীশূরকে ৬৪—৫৯ পয়েণ্টে পরাজিত করে।

মহিলা বিভাগে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান বাংলা ফাইনালে মহীশূরকে ৩৫—২৯ পয়েণ্টে পরাজিত করে।

বালকদের বিভাগে বোম্বাই ফাইনালে পাঞ্জাবকে ৭৫—৫৮ পয়েণ্টে পরাজিত করে।

অরুন্ধতী (কবিতা-পুস্তক) : অংশুপতি দাশগুপ্ত

২০টি কবিতা এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। নাম হইতে কবিতার বিষয় বস্তু বুঝা যাইবে—যথা (১) বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, রাত্রে (২) শিবানীপুর গ্রাম (৩) সেক্‌সপীয়ার (৪) ৩০শে জানুয়ারী (৫) আমাদের এই সহর ইত্যাদি। ৩০শে জানুয়ারী সনেট—কবি লিখিয়াছেন—

সে যজ্ঞের পূর্বাভাস নিয়ে আসে প্রলয়াগ্নিশিখা,
দিগন্তে আসন্ন হল যুগান্তের কৃষ্ণ যবনিকা।

শিবানীপুর গ্রামে—

আকাশেতে সন্ধ্যা নামে, রাত্রি নামে আলোর ভিখারী,
নক্ষত্রেরা উঠে আসে বুকে নিয়ে অনন্ত জিজ্ঞাসা
অলক্ষ্যের পানে তীর হানে কালপুরুষ শিকারী
সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলে বধূটির ভীরু ভালোবাসা।

এই ভাবের বর্ণনা সকল কবিতায় বর্তমান। কবির কাব্য-সৃষ্টির প্রয়াস ব্যর্থ হয় নাই।

[প্রকাশক—তুলি-কলম, ৫৭এ কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২ দাম—দেড় টাকা।]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীর সেরা রূপকথা : বীরু চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থকার সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত ন'ন—ছেলেমেয়েদের উপযোগী বহু রচনায় এঁর কৃতিত্ব দেখা গিয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে জাপানী, জার্ম্মানী, ফরাসী, আমেরিকা, ইংরেজী, গ্রীক তুরস্ক, মঙ্গোলিয়া, ভারত, গ্রীক ও সুইডেনের বারোটী বিভিন্ন ধরণের রূপকথা সন্নিবেশিত হয়েছে। গল্পগুলি খুব উপভোগ্য, বলবার ভঙ্গীও শিল্পসম্মত, তাছাড়া প্রত্যেক গল্পে দেশের পরিবেশ লক্ষ্য করা গেল। ছেলেমেয়েদের কাছে রূপ কথাই সব চেয়ে ভালো লাগে, তারা এই বইগুলি পড়ে খুব খুশী হবে। প্রচ্ছদপট প্রশংসনীয়। আমরা পড়ে আনন্দ পেয়েছি। গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

[প্রকাশক—পারিজাত ব্রাদার্স, ৮১নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা; দাম—একটাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।]

নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ : স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

আলোচ্য গ্রন্থখানি তিনভাগে বিভক্ত—শ্রীগুরু, ইষ্ট ও সাধন। রামকৃষ্ণ শরণম্ স্তোত্রের দ্বারা গ্রন্থের সমাপ্তি রেখা টানা হয়েছে। শ্লোকগুলি সংস্কৃত ভাষায় নানাছন্দে রচিত হয়েছে, আর সেগুলি বাংলা কবিতায় অনুবাদ করে দেওয়া আছে। বাংলা কবিতাগুলিও মনোরম। যাঁরা অধ্যাত্ম পথের যাত্রী তাঁদের মানসিক পুষ্টির পক্ষে গ্রন্থের অন্তর্নিহিত ভাবধারা উপযোগী হোতে পারে। আমরা পড়ে আনন্দ পেয়েছি।

[প্রকাশক—রাইটার্স সিণ্ডিকেট, ৮৭ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা মূল্য—আড়াই টাকা।]

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে (একাঙ্কিকা) :
নির্বোধ (নাটক) : অজিত গঙ্গোপাধ্যায়

দুইখানা নাটক একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমখানা নাকি ডসটয়ে ভস্কির কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে, আর দ্বিতীয়খানা নাকি আন্তন চেখভ অনুসরণে রচিত হয়েছে। অনুসরণের চেয়ে বোধহয় অনুবাদ আরো ভালো হ'ত। যাই হোক লেখকের উদ্যম প্রশংসনীয়।

[প্রকাশক—শঙ্কর পুস্তকালয়, ৭২ ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, কলিকাতা—৪। মূল্য—মাত্র তিন টাকা]

ভারতীয় বৈজ্ঞানিক : নৃপেন্দ্রনাথ সিংহ

ভারতে প্রাচীনকাল থেকে বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি হয়েছে তা বিস্ময়কর না হলেও একেবারে সামান্য নয়। এ অগ্রগতির পূর্ণ অথচ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এ গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের জীবন-কাহিনীও এতে রয়েছে। দেশের ছেলে-মেয়েদের পক্ষে এ পুস্তক অত্যন্ত উপযোগী। পড়লে বড়রাও অনেক তথ্য জানতে পারবেন।

[প্রকাশক—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী। কলিকাতা—১২। মূল্য—দুই টাকা আট আনা।]

ঠাকুর হরিদাসের জীবন কথা : শ্রীবিপিনবিহারী দাশগুপ্ত

ভক্ত হরিদাসের অমর জীবন বৈষ্ণব সাহিত্যে ও শাস্ত্রে বিশারদ শ্রীবিপিনবিহারী দাশগুপ্তের রচনায় অতি মনোহর রূপ লাভ করেছে। বাঙলার ভক্তমাত্রেই এর রস আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হবেন, উদ্বুদ্ধ হবেন, উপকৃত হবেন।

[প্রকাশ—সমীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। ১০০ নং রসা রোড, কলিকাতা—১৩। মূল্য—তিন টাকা]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "স্বয়ংসিদ্ধা" (৭ম সং)—৩৲

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "কর্ণার্জ্জুন" (২৫শ সং)—২'৫০

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত নাটক "চন্দ্রগুপ্ত" (২৯শ সং)—২'৫০

ডাঃ শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী প্রণীত "জাহানারার আত্মকাহিনী" (৪র্থ সং)—৩'৫০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "অরক্ষণীয়া" (২৪শ সং)—১'২৫, "বিরাজ-বৌ" (২৮শ সং)—২৲, "শ্রীকান্ত" (৪র্থ পর্ব—১৪শ সং)—৩৲, "বামুনের মেয়ে" (১১শ সং)—২৲

স্বপ্না প্রেস লিঃ প্রকাশিত রণজিৎকুমার সেনের "শ্রেষ্ঠ গল্প"—৫৲

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "ফুটলো কমল"—২৲, "শেষ পর্য্যন্ত"—৩৲ এবং পরলোক-তত্ত্ব "পরলোকের বিচিত্র কাহিনী"—২'২৫

শ্রীনরেন্দ্র দেব প্রণীত শিশুপাঠ্য "জন্ম-জন্মান্তরের কাহিনী"—২'৫০, "বকমারি গল্প"—২'৫০

শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্মা প্রণীত "উপনিষদ্‌রহস্য" ১ম খণ্ড (৩য় সং)—৯৲, ২য় খণ্ড (৩য় সং)—৯৲

দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "অদৃশ্য-সংগ্রাম" (নূতন সং)—২'২৫

মিলোভান জিলাস্ প্রণীত পুস্তকের বঙ্গানুবাদ "নতুন শ্রেণী"—১-৫০

নতুন রেকর্ড

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস্ ও কলম্বিয়া রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—

"হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস"

N 76074—"তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি" দুখানা আধুনিক গান যুগ্মকণ্ঠে গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী রুমা দেবী। লুকোচুরি কথাচিত্রের গান—'মায়াবন বিহারিণী হরিণী' গানখানা গেয়েছেন কিশোরকুমার ও রুমা দেবী।

N 76075—'ইন্দ্রাণী' কথাচিত্রের দুখানা গান 'দূরের তুমি আজ' ও 'ওগো সুন্দর জানো নাকি' গেয়েছেন গীতা দত্ত।

N 76076—'ইন্দ্রাণী' কথাচিত্রের আর দুখানা গান 'ভাঙরে ভাঙরে ভাঙ' ও 'সবহি কুছ লুটাকর' গেয়েছেন যথাক্রমে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও মহম্মদ রফি।

N 76077—'ইন্দ্রাণী' কথাচিত্রের আর দুখানা মনোরম গান 'দূরের তুমি আজ' ও 'ঝণক ঝণক কণক কাকণ বাজে' সুমিষ্ট কণ্ঠে গেয়েছেন শ্রীমতী গীতা দত্ত !

N 76078—'পুরীর মন্দির' বাণীচিত্রের দুখানা গান গেয়েছেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

কলম্বিয়া

GE 30406—মুক্তি প্রতীক্ষিত বাণীচিত্র 'মরুতীর্থ হিংলাজ' ছবির দুখানা গান 'তোমার ভুবনে জাগে' ও 'পথের ক্লান্তি ভুলে' সুমিষ্ট কণ্ঠে গেয়েছেন দরদী শিল্পী হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়।

GE 30407—'মরুতীর্থ হিংলাজ' কথাচিত্রের আর দুখানা গানও গেয়েছেন হেমন্তকুমার। গান দুটি হোল—'হে চন্দ্রচূড়' ও 'সর্বস্ব বুদ্ধিরূপেন'।

GE 30409—'যৌতুক' কথাচিত্রের দুখানা আধুনিক গান—'মনের কথাটি ওগো' ও 'এই যে পথের এই দেখা' সুমিষ্ট কণ্ঠে পরিবেশন করেছেন হেমন্তকুমার।

GE 30410—'যৌতুক' কথাচিত্রের দুখানা গান 'আহা রঙ ধরেছে ফুলে ফুলে' ও 'এই বন বিহঙ্গ'—দরদ ঢালা কণ্ঠে গেয়েছেন যথাক্রমে গীতা দত্ত ও লতা মুংগেশকর।

GE 30411—'ইন্দ্রাণী' কথাচিত্রের আরও দুখানা গান—'নীড় ছোট ক্ষতি নেই' ও 'সূর্য ডোবার পালা'—গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও গীতা দত্ত।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
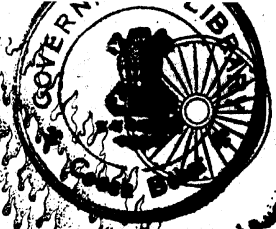
ফাল্গুন—১৩৬৫

দ্বিতীয় খণ্ড | ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

কবি চিত্তরঞ্জন দাশ

তপোবিজয় ঘোষ

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।

ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ যাঁর সম্পর্কে এই উক্তি করেছিলেন বাঙ্গালী-মানসের পুনর্জাগরণের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর নেতৃত্বের কথাও আজ এক শ্রদ্ধেয় ঐতিহ্যের বিষয়। সর্বস্বত্যাগী এই মুক্ত পুরুষের মহান্ আত্মা সূর্য-শক্তির মত চিরভাস্বর। প্রত্যহের চিরস্মরণীয়, চিরবরণীয়।

কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনৈতিক জীবন ছাড়াও আরও একটি মনোরম পরিচয় আছে। কালের ব্যবধানে তাঁর সেই সৃজনধর্মী শিল্পী-সত্তা আজ বিস্মৃত প্রায়। অথচ চিত্তরঞ্জনের সেই কবি-ব্যক্তিত্ব নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বাংলা কাব্যসাহিত্যের আসরে একটি উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারী।

রাজনৈতিক জীবন সুরু করবার আগে তিনি ছিলেন মূলতঃ কবি। এই কাব্য সাধনা তাঁর আবাল্যের সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। বাইরের কোন প্রভাব বা পরিণত বয়সের কোন বিশেষ মুহূর্তের হঠাৎ আলোর ঝলকানি নয়। জন্ম মাত্রে নব শিশু যেমন সুতীব্র চীৎকারে আপন

প্রাণ স্পন্দনকে ঘোষণা করে, জ্ঞান হওয়ার পর থেকে চিত্ত-মানসও তেমনি ছন্দোবন্ধে মুক্তি দিয়েছে আপন অনুভূতিকে। উত্তর জীবনে এই কাব্যই তাঁকে অদৃশ্যে অলক্ষ্যে পথ দেখিয়েছে। আলো হয়ে ফুল হয়ে অসীম মমতায় তাঁর হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মানুষের কথা ভাবিয়েছে এবং মানুষকে ভালবাসিয়েছে।

১৮৯৬ সাল থেকে ১৯১৫ এই সুদীর্ঘ কুড়ি বৎসর কালের নিরবচ্ছিন্ন কাব্য সাধনায় চিত্ত-কবি-মানসের ফসল ভরা হয়েছে। কিন্তু এরও আগে অপরিণত কিশোর বয়স থেকেই নিয়মিত কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনা সুরু করেছিলেন তিনি। লণ্ডনে ছাত্রাবস্থায় থাকাকালীনও এই সাধনার বিরাম ছিল না। কবি-কন্যা লিখেছেন, "বাবার অন্তরের ভাবতরঙ্গ কবিতাতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রকাশ প্রথমে মূর্ত হয়েছিল তাঁর অপরিণত বয়সে রচিত পদ সমূহে।" (১) কিশোর-কবির এই প্রথম আবেগকে স্পর্শ করার জন্য কবির একটি পদ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

ভক্তি পুষ্প দিয়ে মাগো! গাঁথিয়াছি হৃদিহার
বড় সাধ দিব তুলে—ওই চরণে তোমার
ব্যথা মোর স্মরি যত দহে হৃদি দহে তত
আশা কত হয় হত, বহে হৃদে নীর ধার।

* * * *

তুমি যদি আলো করে থাক মা হৃদয় 'পর
দুঃখ মোর সুখ হবে দূরে যাবে অন্ধকার।

ভক্তি-বিনম্র প্রসন্ন-নির্ভরতায় কবির এই প্রাথমিক মাতৃ-বন্দনা লক্ষ্য করবার মত। কিশোর-কবির স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ-প্রবণতা তাঁর ভবিষ্যৎ কবি-শক্তি সম্পর্কেও স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। দেশমাতৃকা সম্পর্কে কবির অনুভূতি এখানে স্পষ্ট গাঢ় নয়। অস্পষ্ট এবং ঈশ্বরানুরক্তির প্রচ্ছায়ায় কুহেলিকাচ্ছন্ন। এ যেন ভোর হবার ঠিক আগের মুহূর্ত! প্রদোষকালের আলো অন্ধকারের লীলা-ময়তায় কবি-চিত্তের ভাবাবেগ আন্দোলিত। প্রেম অথবা সৌন্দর্যানুভূতির রহস্যময় ব্যাকুলতা এখনও স্পর্শ করেনি অন্তর। ধ্যান দেয়নি, গান জাগায়নি, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের নিত্য আবর্তে সুরভিত হয়ে উঠেনি হৃদয়ের কামনা-বাসনা। দুর্বল ছন্দে, সাধারণ প্রকাশ ভঙ্গির সাহায্যে কবি কেবল-মাত্র আত্মপ্রকাশ করছেন কাব্যালোকে।

তবু এই অস্ফুট মানবিকতার মধ্যেও কবি যেন অনুভব করছেন আগামী জীবনকে। মহত্তর বৃহত্তর সেই জীবন সম্পর্কে কবি-চিত্তে দেখা দিয়েছে ব্যাকুলতা, তাকে বরণ করে নেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন কিশোর কবি। জীবন-সংগ্রামের দুঃখ দৈন্যে নির্ভয়ে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য অসঙ্কোচ সাহস সঞ্চয় করেছেন :

সাহসে করিয়া ভর
আনিয়া হৃদয়ে বল
দাও তরী ভাসাইয়া।
যদি বা গরজে ঘন
উঠে ঝড় করে রণ
দেয় তরী ডুবাইয়া—
কি ভয় কি ভয় তোর
ওরে হৃদয় আমার
উঠিবি রে সাঁতারিয়া!

উপরোক্ত দুটি পদই কবির কিশোর বয়সের রচনা। কিন্তু চিত্ত-কবি-মানসের স্বরূপ এখানে আশ্চর্যজনকভাবে উদ্‌ঘাটিত। কোমলতা এবং কাঠিন্য, মাতৃ-বন্দনায় অটল নির্ভরতা, বিশ্বস্ত আত্ম-সমর্পণ এবং সংগ্রাম-মুখর জীবন-সমুদ্রে স্পর্ধিত ব্যক্তিসত্তার বীর্য-নির্ঘোষ—এই পদ দুটিতে যেন তারই অস্ফুট পদধ্বনি।

কবি চিত্তরঞ্জনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ সালে। কিশোর বয়সের রচনাগুলি তখন অপ্রকাশিত ছিল, সম্প্রতি কবি-কন্যা শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী সেগুলোকে 'কবি-চিত্ত' গ্রন্থে মুদ্রিত করেছেন। 'মালঞ্চই' কবির প্রথম গ্রন্থ। চিত্তরঞ্জনের যৌবনকালের ফসল। কবি-জীবনে যৌবন-ঋতু ফুল ফুটায়, ফল দেয় না। পত্রপুষ্পের ঘন-নিবদ্ধ সবুজতায়, আকাশ-মাটির বহিরঙ্গ সৌন্দর্য তন্ময়তায় এবং প্রেম ও প্রিয়ার অবগুণ্ঠিত লীলাময়তায় কবি-চিত্তের উচ্ছ্বসিত আবেগের তরল আতিশয্য থরো থরো রোমাঞ্চে নিয়ত কম্পমান। প্রকাশের ব্যগ্রতা সামুদ্রিক তরঙ্গ-বিক্ষোভের মত এখানে কেবল ফুলে ফুলে উঠে।

স্থির অচঞ্চল হতে জানে না। কৈশোরের অপরিণত প্রদোষচ্ছায়ার প্রেক্ষাপটে এমনি বর্ণালী রূপ নিয়েই শক্তিধর যৌবনের আবির্ভাব ঘটে। সৌন্দর্য ও মাধুর্যের জগতে কবির অস্থির পাদচারণা সুরু হয়। গীতি-কবিতার ছন্দোস্পন্দে মুক্ত ঝরণার মত কবি নিঃশেষে প্রকাশ করতে চান নিজের আকুলতাকে। আর কবির এই গীতি-ধর্মী ভাবাবেগকে সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে যিনি নিয়ন্ত্রিত প্রেরণান্বিত করেন তিনি নিত্যকালের চিরপ্রেমময়ী সৌন্দর্য-লক্ষ্মী। মালঞ্চে এই প্রেম এবং সৌন্দর্যের প্রকাশ। চিত্ত-কবি মানস এখানে তাই সহজ ভাবে প্রেমময়ীকে আহ্বান জানিয়েছে। 'নির্বাপিত জীবনের জ্বলন্ত যাতনার মধ্যেও লাভ করেছে তার মায়াময় শুভ স্পর্শ :

> তোমার ও শুভদৃষ্টি থাকুক জীবনে,
> ভাগ্যহীন জনমের তুমি হও রাণী !
> প্রথম প্রভাতে আজি নব বরষের,
> উঠুক ফুটিয়া তব প্রেম পুষ্প হাসি
> সুন্দর মঙ্গল রূপে ! (উপহার)

যৌবনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশতঃ সৌন্দর্যময়ী এই প্রেমকে কখনও তিনি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি-ভঙ্গিতে বিচার করতে বসেছেন (দ্রঃ 'তোমার প্রেম'), কখনও বা নব জাগৃতির উদার স্পর্শে তাকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন বহির্বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্যলোকে :

> আমার এ প্রেম তুমি রেখ না বাঁধিয়া
> হৃদয়-মন্দিরে গন্ধ বদ্ধ কুসুমের ;
> সমস্ত গগন-ভরা পবন লাগিয়া
> সমস্ত ধরণী পাক প্রেম মরমের।
> * * * *
> আজি এ হৃদয় মোর ছিঁড়েছে বন্ধন,
> পড়েছে বিশ্বের আলো পুষ্প-কারাগারে ;
> আবর লাবণ্য তব, নিবার চুম্বন,
> ভেসেছে তরণী আজি মুক্ত পারাবারে।
> (জাগরণ)

যৌবনের প্রেম ও সৌন্দর্য তন্ময়তার মধ্যে একটা বিরহাতুর বেদনার সুর থাকে। এ বেদনা যেন সর্বগ্রাসী। মনে হয়, কোথায় যেন ছন্দপতন ঘটেছে, অভাববোধের কাঁটা তীক্ষ্ণ হয়ে মনকে পীড়িত করে তুলছে : যা পাওয়ার ছিল তার অনেকখানিই বুঝি থেকে গেছে না-পাওয়ার রহস্যা-বরণে। অথচ যৌবন জীবনের সবটুকু সুধাকেই নিঃশেষে চায় পান করতে। যৌবনের ধর্মই তাই। তরুণ গড়ুরের মত কি এক মহৎ ক্ষুধার আবেশে দিগন্ত সীমায় তার পক্ষ সঞ্চালন। আকাশের সবটুকু নীলিমাকে পক্ষপুটে ধারণ করার এক উদগ্র পিপাসা। এ-পিপাসার নিবৃত্তি নেই। যৌবনে কবি-চিত্তের বেদনাও তাই অন্তহীন।

চিত্ত-কবি-মানসের এই বেদনার সুরটুকু তাঁর কাব্য-গ্রন্থগুলিকে এক সজল মধুর আস্বাদ্যমানতায় মনোরম করে তুলেছে। মালঞ্চের তৃষ্ণাতুর কবি-মানস কখনও আকুল-ভাবে এই অপ্রাপ্তির দহন-জ্বালাকে উপভোগ করেছে :

> আমার এ প্রেম বুঝি তৃপ্তিহীন তৃষা
> সমস্ত জীবন এক নিদ্রাহীন নিশা।
> (—'তৃষা', মালঞ্চ)

কখনও মোনালিসার চিত্র-দর্শনে কবি-চিত্তে জেগেছে জিজ্ঞাসা :

> দিবা-দগ্ধ রাত্রিহীন জীবনে এ বার
> প্রেম মায়া উপবন নহে সৃজিবার।
> কি ভুল আনিবে তবে কি নব ছলনা ?
> আজ মোনা ! ('মোনা' মালঞ্চ)

প্রেম ও সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে কবি-মানসের স্বতস্ফূর্ত বিহার সব সময় সংযত থাকে নি, এ কথা অনস্বীকার্য। ছন্দ ও ভাষার লালিত্য কবি-হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে সুষ্ঠু রূপ দিতে পারে নি। কবি-চিত্তের আবেগ-তরলতা মালঞ্চের ও পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতাকে ত্রুটিপূর্ণ করে তুলেছে। কিন্তু তা সত্বেও কবি যে সংহত-চিত্তে সংযত বাক্য বিন্যাসে কাব্য রচনায় একেবারে অপারদর্শী ছিলেন না, তার প্রমাণ কবির সনেট রচনা। প্রেম ও সৌন্দর্যের উচ্ছ্বাস উদ্বেলতার সফেন সমুদ্রে এখানেই কবি-শক্তি আবিষ্কার করেছে তটভূমির কাঠিন্য।

দেবেন্দ্রনাথ সেনের উদ্দেশে লিখিত চিত্ত-কবির সনেটটি পাঠ করলে একটি আশ্চর্য সংযত কবি-মানসের

পরিচয় পাওয়া যায়। ভাবের গাঢ় বন্ধনে, শব্দ প্রয়োগের একনিষ্ঠ কবি-কুশলতায়, অষ্টক এবং ষটক বন্ধের লীলা-মাধুর্যে সনেটটি প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাওয়ার যোগ্য। এর প্রথম আট চরণে দেবেন্দ্রনাথের 'সুখ-ভরা শান্তি-ভরা স্বপ্ন-ভরা' কাব্য-সৃষ্টির প্রতি চিত্ত-কবির বিমুগ্ধ অনুরাগের প্রকাশ। ষটকে সেই চিরন্তন কবি-প্রিয়ার উদ্দেশে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি :

আরো ভালবাসি আমি প্রিয়ারে তোমার
কত না কবিতা তার অধরে লাগিয়া,
অঙ্ক পানে রাঙ্গা মুখ হইতে যাহার
তোমার অধর কবি লইতে রাঙ্গিয়া।
তব যোগ্য নহে তবু পাঠাইনু ভেট
আমার আগ্রহভরা ভিখারী সনেট।

('কবি ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রতি' মালঞ্চ)

মালঞ্চের পর কবির আরো চারখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়: মালা (১৯০২) সাগর সঙ্গীত (১৯১৩) অন্তর্যামী (১৯১৪) এবং কিশোর কিশোরী। কিশোর কিশোরীর কবিতাগুলি চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রথম ছাপা হয় ও পরে গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে। মালঞ্চ থেকে কিশোর কিশোরী—কবির কাব্য সাধনার এই নিরবচ্ছিন্ন ধারাকে বিশ্লেষণ করলে কবি-চিত্তের একটি সুস্পষ্ট ক্রম-পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। ক্রমবিকাশমান কবি প্রতিভা প্রেম ও সৌন্দর্যের বহিরঙ্গ লীলা বিলাসের স্তরগুলো অতিক্রম করে কেমন সহজ ভাবে আধ্যাত্মিকতার নিবিড় উপলব্ধিতে সমাহিত হয়েছে তার স্পষ্ট স্বাক্ষর আছে এই পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থে। বস্তুত কবি-মানসের এই বিবর্তন কবি ধর্মেরই অনুকূল। শক্তিমান কবি মাত্রই চলার পথে বারংবার তাঁর রূপ ও রঙের পরিবর্তন করেন। মনের স্বাভাবিক অগ্রগামিতাকে রুদ্ধ করে রাখলে চলমান কবি-প্রাণের অপমৃত্যু অনিবার্য। ঋতু বদলের মত রীতি বদল করাও তাই কবি-ধর্ম। চিত্তরঞ্জনের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়নি। মনের স্বাভাবিক পরিবর্তনকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন এবং সেই ভাবেই প্রকাশ করেছেন নিজের অনুভূতিকে। মালঞ্চের কবি এবং কিশোর কিশোরীর কবির মধ্যে তাই একটা সূক্ষ্ম ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। তবে এ প্রসঙ্গে এ-কথাও স্মরণীয় যে কবি-চিত্তের এই ক্রম-পরিণতির ইতিহাস কোথাও তাঁর স্বধর্ম-চ্যুতির কারণ ঘটায় নি। এ পরিণাম একান্তই স্বাভাবিক, কবি-হৃদয়ের অভিজ্ঞতালব্ধ এবং ঈশ্বর ও লৌকিক জগৎ সম্পর্কে তাঁর ক্রমবর্ধমান স্বচ্ছ মোহমুক্ত উপলব্ধির অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি। তাই মালঞ্চ-রচয়িতার সঙ্গে অন্তর্যামী বা কিশোর-কিশোরী স্রষ্টার মনোভঙ্গির যে পার্থক্য, তা যতখানি প্রকাশগত, অন্তরঙ্গ বিচারে ঠিক ততখানি চরিত্রগত নয় বলে আমাদের ধারণা। জটিলতার পরিবর্তে সহজ সরলভাবে কবি-মানসের এই রূপান্তরটুকু সাধিত হয়েছে। বক্রগতি বা বিচিত্রগতি নয়, একটি সরল রেখার অনায়াস ঊর্ধ্বগতিই কবি-চিত্তের এই ক্রম-বিকশিত ভাবধারার প্রকৃত অভিধা।

চিত্তরঞ্জনের প্রথম কাব্যগ্রন্থে ইতস্তত: শিথিলতা লক্ষিত হয়েছে। রূপ-কর্মের ক্ষেত্রে কবি-মানস তখন পর্যন্ত ছিল দুর্বল এবং আবেগ তরল। রোমান্টিক কবি-চেতনা এখানে কোন শাশ্বত রস-বস্তুর সন্ধান লাভ করেনি। তাই প্রেম ও সৌন্দর্যের বহিরঙ্গ লীলা বিলাসে কবি-চিত্ত নিয়ত অস্থির, অতি-কল্পনার ভাবাবেগে স্পন্দিত। মালঞ্চ পরবর্তী কাব্যে কবির এই লঘু-পক্ষতা নিয়ন্ত্রিত হয়ে একনিষ্ঠ ভাবুকতার স্তরে ক্রমশ: উন্নীত হয়েছে। কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'মালা' থেকেই এর সূচনা লক্ষ্য করা যায়। মালঞ্চের উচ্ছল জীবনাবেগ এখানে এক অখণ্ড নীরবতার মধ্যে ধ্যানস্থ হওয়ার জন্য ব্যাকুল। যৌবনের সর্বগ্রাসী অস্থিরতা যৌবন-মধ্যাহ্নে প্রেমের শীতল স্পর্শে 'আপনার গান' রচনা করতে চায়। ডুব দিতে চায় অন্তর-রহস্যের চির-মৌন রসসমুদ্রে। কবি-চিত্তের বহিরঙ্গ সৌন্দর্য-পিপাসা অন্তলীন লীলাময়তার শান্ত নিবিড় সাযুজ্য চায়। কবির তাই নূতন উপলব্ধি :

আমার হৃদয় ছিল সর্ব গীতহারা
তব প্রেমে বাজে প্রিয়ে সকল রাগিণী
সুখ পূর্ণ শান্তিপূর্ণ অমৃতের ধারা
করিছে জীবন মোর সঙ্গীত বাহিনী।

('প্রেম' মালা)

কিন্তু এই প্রেম আজ আর আত্মকেন্দ্রিক নয়, বিশ্বমুখীন।

বিশ্বমাঝে তার বেজে উঠে গান। স্বার্থপরের মত সম্পূর্ণ একার করে তাকে আর পাওয়ার উপায় নেই; তাই এই প্রেমোপলব্ধির সকল সুকৃতি একনিষ্ঠ ভক্তের মত দেবতার চরণে সমর্পণ করার অভীপ্সা জানাতে হয়:

তবে এস নামি মোরা দেবতা চরণে
সেইখানে বাঁধা রব জীবনে মরণে। (ঐ)

মানুষী প্রেমাকাঙ্ক্ষা এখানে আত্ম-নিবেদনের ভঙ্গীতে দেবতার চরণে সমর্পিত: প্রেম এবং ভক্তির প্রগাঢ় সমন্বয়। চিত্ত-কবি-মানসের ক্রম-পরিণতির সূত্র সন্ধানের পক্ষে কবিতাটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মালঞ্চের ভোগ-তৃষ্ণা তার সকল চঞ্চলতা অস্থিরতাকে পরিহার করে কেমন অনায়াস গতিতে শুদ্ধ সত্য উপলব্ধির গভীরতায় ভাবনিষ্ঠ হয়ে উঠছে এ কবিতাটির ছন্দোস্পন্দে তার প্রমাণ বিধৃত। এই অনির্বচনীয় প্রেম-সঙ্গীতকে সুরে ছন্দে ভরে তুলবার জন্য কবি-চিত্তে প্রয়োজন ধ্যান-মৌন প্রশান্তির। পূর্ণতার উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন অখণ্ড নীরবতার। কবির কণ্ঠে তাই প্রার্থনার সুর:

পূর্ণ করে দাও আজি শান্ত এ হৃদয়
হে অনন্ত। হে সম্পূর্ণ। নীরবে নিভৃতে
নিঃশব্দে ভরিয়া দাও অন্তর নিলয়,
ওই তব শব্দহীন মহান সঙ্গীতে।
('নীরবতা,' মালা)

কিন্তু এমন পরিপূর্ণ প্রশান্তি, আত্ম-নিবেদনের জন্য এমন শব্দহীন মহান সঙ্গীতের পটভূমিকা, সে কোথায়? অনন্তের পুণ্যস্পর্শ যেখানে চিরপ্রবহমান, সফেন তরঙ্গের মন্ত্রোচ্চারণে সীমাহীন সমুদ্র যেখানে ধ্যান-গম্ভীর বিমুগ্ধ ভক্তের মত আপন অন্তরের সৌন্দর্য প্রতিনিয়ত উদ্ভাসিত করে—সেই সাগর-তীরে কি? 'মালা'র পর তাই বোধ হয় চিত্ত-কবি 'সাগর সঙ্গীত' রচনা করলেন!

সাগর-সঙ্গীত দিগন্তবিসারী সাগরের উদ্দেশে কবির ভাবুক-চিত্তের মুগ্ধ বিস্ময়াঞ্জলি। এই কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্র-নাথের সোনার তরীর (২) অন্তর্গত 'সমুদ্রের প্রতি' 'বসুন্ধরা' প্রভৃতি কবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও, চিত্তরঞ্জনের কবি-প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে এখানেই। কবি কন্যা লিখেছেন: "সীমাহীন সমুদ্রের রূপের প্রতি বাবার আন্তরিক আকর্ষণ ছিল। তাই বার বার তিনি ছুটে গিয়েছেন সাগরের আহ্বানে—আদিঅন্তহীন বিশাল জলধির সঙ্গে অনন্ত নীলাকাশের যে মিলন, সে মিলনে সাগরের উচ্ছল নৃত্য তাঁর অন্তর স্পর্শ করেছিল—তাই আদি-অন্তহীন বিশাল নীলাম্বুর বিভিন্নরূপের তরঙ্গ ভঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে সেই অসীম রূপকেই তিনি সাগর সঙ্গীতের ছন্দে বেঁধে রাখলেন।"

কিন্তু ছন্দের এই বন্ধন চিত্ত-কবির হৃদয়ের সকল বন্ধনকে নিঃশেষে মুক্তি দিল অরূপ সুন্দর বিশ্ব জগতে। স্থিতপ্রজ্ঞ কবি-সত্তা অসীম ঔদার্যের সঙ্গে এই প্রথম অনুভব করল বিশ্ব-জীবনের চলমান ধারার সঙ্গে তার নিজস্ব প্রাণ-শক্তির সুনিবিড় একাত্মতা। সাগরের সাথে কবি-হৃদয় বাঁধা পড়ল জন্মান্তরের আত্মীয়তায়:

কবে দেখেছিনু তোমা, হাত ধরেছিনু—
চেয়েছিনু চোখে? কোন কালে কোন দেশে
সেদিন কি তব সাথে কথা কয়েছিনু—
তুমি গেয়েছিলে গান? চেয়েছিলে হেসে?
সেদিন কি ছিল প্রাণ এত ভরপুর—
গভীর আবেগ ভরা এত অশ্রু জলে?

গভীর আত্মীয়তার মন্ত্রে সাগর সাধনা সমাপ্ত করে কবি এবার 'অন্তর্যামী'র সাধনা সুরু করলেন। কবির অস্থির আত্ম-বিশ্লেষণ প্রশান্ত আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে এবার পরিপূর্ণভাবে রূপান্তরিত হল ভক্তের আত্ম নিবেদনে। বৈষ্ণব-আরাধ্য লীলাময় বিশ্বদেবতার চরণতলে সমস্ত বাণী সাধনার সুকৃতিকে উৎসর্গ করলেন কবি। বৈষ্ণব-ভাবুকতার চির রহস্যময় প্রেম-জীবনে কবি-চিত্তের নবতম জন্মলাভ ঘটল। অঙ্গধারী মানুষী প্রেম এবার অনঙ্গরূপে কাম-গন্ধহীন দেব-মহিমায় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল কবির লেখনীতে! মালঞ্চের কবি 'কিশোর-কিশোরী'তে পদার্পণ করে এই দেহাতীত প্রেম ও সৌন্দর্যকেই করে নিলেন:

জীবন সাধন ধন তুমি যে আমার
কত জন্ম পরে তাই হেরিনু আবার,

এমন মধুর করে
এমন পরাণ ভরে। * * *
তুমি যে মধুর মধু মাধুরী আমার।
এমন হারাণ ধন পেয়েছি আবার।

(কিশোর-কিশোরী)

এ যেন সেই বৃন্দাবনের চির-কিশোর-কিশোরীর হৃদয়-মন্থন-জাত দিব্যভাবপূর্ণ প্রেমগীতি! যেন রাধাভাবে ভাবিত বৈষ্ণব মহাজনদের অন্তরের অকৃত্রিম উল্লাস। প্রেম ও ঈশ্বরানুভূতির এক আশ্চর্য রস-সম্মিলন। চিত্ত-কবির বাণী আরাধনার সর্বশেষ সিদ্ধি লাভ!

কিন্তু কবির এই জন্মান্তর পারম্পর্যবিহীন কোন একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। যে সহজ সরল গতিতে কবি-মানসের রূপান্তর ঘটেছে এই দৃষ্টিভঙ্গি তারই অনিবার্য ফল। কবির পূর্ব জীবনেই এর বীজ নিহিত আছে। পরিণত কাব্য সাধনায় তাই অঙ্কুরিত পল্লবিত হয়ে আকাঙ্ক্ষিত ফল দান করেছে মাত্র। কবির কিশোর বয়সে রচিত পদগুলির বিশ্লেষণ করলে এর যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যাবে। কবির আত্ম-নিবেদনের ভঙ্গিটি সেখানে অনুপস্থিত নয়। 'মালঞ্চে' প্রেম ও সৌন্দর্যের পাশাপাশি কয়েকটি ঈশ্বর সম্পর্কিত কবিতা আছে। কৈশোরের অপরিণত রচনায় বিশ্ব-নিয়ন্তার প্রতি কবির একটা সহজ বিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হয়েছিল, কিন্তু যৌবনের অস্থিরতা সে বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে অবিশ্বাসের প্রশ্ন তুলেছে—

তবে সেই ভাল, জীবনের
ভেঙেছে আবাস, যদি ভেসেছে বিশ্বাস
তুমি থাকিও না আর জীবন জুড়িয়া
অতীতের ভীতি-ভরা প্রেতের মতন।

('আমার ঈশ্বর,' মালঞ্চ)

কিন্তু এখানেও, একটু লক্ষ্য করলেই বেশ বোঝা যায়, কবির অভিমানী রূপ যত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ততখানি মোটেই প্রবল নয় কবির 'ঈশ্বর-বিদ্রোহী' চেতনা। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি তাঁর আপাতঃ অবিশ্বাস মূলতঃ তার ঈশ্বরানুরাগেরই পরিচয়বাহী। যৌবনে সমস্ত কিছুকেই ছুঁয়ে দেখবার, অদৃশ্যকে দৃশ্য এবং অলক্ষ্যকে লক্ষ্যগোচর করবার একটা প্রবল স্পৃহা দেখা যায়। মানুষের সামর্থ্য যেখানে সহজে পৌঁছায় না—যৌবনে তার প্রতিই জাগে বিরূপতা, তাকে আক্রমণ করে ধূলিসাৎ করবার প্রবল বাসনা। অথচ এ সমস্ত কিছুরই মূলে নিঃশব্দে সংগোপনে কাজ করে যায় একটা সুতীব্র আকর্ষণ। এই আকর্ষণই পরিণত বয়সে রূপান্তরিত হয় মুগ্ধ বিস্মিতের আত্ম-নিবেদনে। মালঞ্চের পর 'মালা'য় এসে যখন কবি একই ঈশ্বর সম্পর্কে বলেন :

নিখিলের প্রাণ তুমি। তুমি হে আমার
দিবসের দিনমণি নিশার আঁধার
জাগরণে কর্মভূমি
শয়নের স্বপ্ন তুমি
ওগো সর্বপ্রাণময়। তুমি যে আমার
দিবসের দিনমণি নিশার আঁধার।

('প্রার্থনা' মালা)

তখন সন্দেহ থাকে না মালঞ্চের অভিমানী কবি-হৃদয় মালায় এসে মুগ্ধ আত্মনিবেদনের প্রশান্তিতে শান্ত সমাহিত হওয়ার সাধনা সুরু করেছে এবং এই প্রস্তুতি অজ্ঞাত আকর্ষণের তাড়নায় মালঞ্চের আপাতঃ সন্দেহ অবিশ্বাসের মধ্য দিয়েই নিজস্ব পথ তৈরী করে নিয়েছে। তা না হলে মালঞ্চ-পরবর্তী কাব্যগ্রন্থেই কবি-হৃদয়ের এই পরিবর্তনকে স্বীকার করে নেবার পক্ষে যথেষ্ট কালোচিত বাধা দেখা দেয়।

'মালা' কাব্যগ্রন্থে কবি-মানসের দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে 'সাগর-সঙ্গীত' শেষ করে 'অন্তর্যামী'র সাধক কবি তাকেই পুনরায় নবরূপে আবাহন করেছেন 'কিশোর কিশোরী'র মায়াময় জগতে। পার্থক্য এই কিশোর-কিশোরীতে দেহাতীত প্রেমের বন্দনা গান লৌকিক জগৎকে প্রায় অস্বীকার করেছে। প্রেমিকা এবং ঈশ্বর এক দেহে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে গেছে। তার পৃথকীকরণ আর সম্ভব নয়। মালঞ্চ-মালার না পাওয়ার বেদনা এখানে সকল মিলনের উল্লাসে স্পন্দিত। 'অন্তর্যামী'র ধূসর বৈরাগ্য প্রেমের স্পর্শে আবার রঙীন, মধুরতম হয়ে উঠেছে। মালঞ্চে যদি অভিমান, মালায় আত্ম-বিশ্লেষণ, আর সাগর-সঙ্গীতে নির্জন-সাধনা এবং অন্তর্যামীতে সাধন-

শেষের বৈরাগ্য প্রশান্তি, তবেই কিশোর-কিশোরীতে আত্মনিবেদন ও সর্বশেষ উপলব্ধি—প্রেমোপলব্ধি।

তোমার আমার মাঝে
অপর কেহ কি আছে ?
কে বলে রে ধন্য ধন্য
এ কার নূপুর বাজে ?
কার পদরজঃ
পরাণ পঙ্কজ
শোভা করে ? হে মিলিত ! হে মধু মিলন !
হে পূর্ণ অপূর্ণ তুমি ! ধন্য এ জীবন।

(কিশোর-কিশোরী)

কিশোর-কিশোরী কবির সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ। এরপর চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনৈতিক জীবনের সুরু। কবি চিত্তরঞ্জনের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনরূপে আবির্ভাব। কবি-জীবন থেকে রাজনৈতিক জীবনে চিত্তরঞ্জনের এই ভিন্নতর পদচারণার সূত্র সন্ধান করতে গেলে তাঁর কাব্যের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের প্রয়োজন। মনে হয়, কাব্যলক্ষ্মীর সাধনায় তাঁর অন্তরের অতৃপ্ত বেদনার কোন দিনই অবসান হয়নি। পরম ও চরম লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য কবি-চিত্তের ব্যাকুলতা শেষ পর্যন্ত অসফলই থেকে গেছে। দেশ ও দেশমাতৃকার আরাধনার মধ্য দিয়ে তিনি তাই নূতন করে তাঁর জীবন দেবতাকে খুঁজে নিতে প্রয়াসী হয়েছেন।

পরবর্তীকালে চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক কর্মদক্ষতা তাঁর কবি-প্রতিভাকে ম্লান করে দিয়েছে। আধুনিক পাঠক-সাধারণও তার কথা বড় একটা মনে রাখেনি। এর একমাত্র কারণ বোধ হয় এই যে চিত্তরঞ্জনের কাব্য কোন নূতনত্বের দাবী নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়নি। এক হিসেবে তা গতানুগতিকতারই অনুবর্তন। চিত্তরঞ্জনের কাব্যের ভাষা সরল আবেগধর্মী। তাতে উচ্ছ্বাস আছে, সংযত উত্তাপ নেই। কোমলতার পাশাপাশি নেই দৃঢ়-সংবদ্ধ ভাষা ও ছন্দের কাঠিন্য। কঠোর কোমলের উত্থান পতনে ছন্দের যে লীলামাধুর্য—চিত্ত-কাব্যে সে সৌন্দর্য অনুপস্থিত। চিত্র সৃষ্টিতে অথবা উপমা অলঙ্কারাদি ব্যবহারেও তিনি কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর না হয়ে প্রাচীন সংস্কারকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর কাব্যে যুগোপযোগী জীবন-জিজ্ঞাসা নেই, মননধর্মী তীক্ষ্ণতা নেই, হেমচন্দ্র-রঙ্গলালের জ্বলন্ত দেশপ্রেমও অস্বীকৃত। ছন্দরীতি বিষয়ে তিনি সাধারণতঃ অন্ত্যানুপ্রাস-যুক্ত প্রবহমান পয়ারেরই অনুসরণ করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ, সমকালীন খ্যাতিমান লেখকদের প্রভাব থেকে তাঁর কবি-চেতনা মুক্ত নয়। রবীন্দ্রনাথের কথা ছেড়ে দিলেও দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বহু কবির কাব্য দ্বারা তিনি প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্র-গুরু বিহারীলালের নিরঙ্গ সৌন্দর্য-লোকের ভাবালু রোমান্টিকতা চিত্তকাব্যে যেন অঙ্গাঙ্গী-ভাবে মিশে আছে। এদিক দিয়ে তিনিও বিহারীলালের ধারার একজন শক্তিমান অনুকারী মাত্র। ঘরের প্রেমকে বিশ্বাভিসারী করার যে কৃতিত্ব চিত্তরঞ্জন দেখিয়েছেন—অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যাবলীতে তার স্পর্শ আমরা আগেই পেয়েছি। বাংলা গীতি-কবিতার প্রবহমানতায় চিত্তরঞ্জন কিছুটা দার্শনিকতার রং ছড়িয়েছেন, এটুকুই তাঁর কৃতিত্ব। মৌলিক না হলেও এই কবি-ক্ষমতাটুকুকে স্বীকার করে নেওয়া যায়। তবে কোনো কবির কাব্য কালজয়ী হওয়ার পক্ষে কোনো একটা বিশেষ গুণ নিশ্চয়ই যথেষ্ট নয়।

(১) শ্রীঅপর্ণা দেবী সম্পাদিত 'কবি চিত্ত' দ্রঃ

(২) সোনার তরীর প্রকাশ কাল ১২৯৮ ফাল্গুন—১৩০০ অগ্রহায়ণ।

ধ্বংস

অমিয় চৌধুরী

মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেল কালীপদর।

কয়েকদিন থেকেই এক ফোঁটা ঘুম আসেনি তার চোখে। কিংবা এলেও তা টিকে থাকতে পারেনি। টিমটিমে হ্যারিকেনের আলো জ্বেলে খট্‌খট্ খটাখট্ খটাখট করে মাকু টেনে টেনে এপাশ ওপাশ করেছে। চারখানা গামছা আর দুখানা ধুতি তৈরী করে ফেলেছে এই ক'দিনে। ব্রহ্মদৈত্যের মেলায় ওগুলো বিক্রি করবে। এক দিনের মেলা। কিন্তু ঐ একদিনেই যা বিক্রি হয় তাতে দরিদ্র চাষীগুলোর অনেক দিনের আহার জোটে। তাছাড়া তেমন নামকরা না হলেও মেলাটা খুব জাঁকজমকের। ও তল্লাটে এই একটি মাত্রই মেলা বসে। বছরে একবার। বছরে একবার করে আশে পাশের গ্রাম থেকে ছেলে বুড়ো সবাই এসে মেলে এই মাঠটায়। সহর থেকে দোকান পাটও আসে। চানাচুর, তেলেভাজার দোকান। দু একটী মিষ্টির দোকান। তা ছাড়াও সহরের ফুটপাতে জিনিষ ছড়িয়ে যে সব সাড়ে-ছ-আনা-ওয়ালারা বসে থাকে তারাও এই একটা দিনের জন্যে মেলায় না এসে পারে না। আর হতভাগা-হতভাগীর দল। ওরা আসে বাবা ব্রহ্মদৈত্যের কাছে নিজেদের মনস্কামনা জানাতে। কারো ছেলে চাই, কারো ছেলের অসুখ সেরে যাক্, কারুর স্বামীর শরীর এবং মন সুস্থ হয়ে উঠুক। কালীপদর জীবনেও এমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল। বিয়ের এক বছর পরে একটা বাচ্চা হয়েছিল। কিন্তু গত বছরে মায়ের দয়ায় অর্থাৎ বসন্তের হুলিয়াতে কালীপদর বাচ্চাটা রেহাই পায় নি। বাবা ব্রহ্মদৈত্যের থানে বটগাছটার কোটরে মানত করে একটা ইঁটও তুলে রেখেছিল কালীপদ। কিন্তু কে জানে বাবার কি ইচ্ছে, বাচ্চাটা বাঁচলো না। অকালে গলে গলে পচে পচে মরলো। বাচ্চাটার সেই বীভৎস চেহারা খানা মনে করলে এখনো দুহাতে মুখ ঢাকে কালীপদ। তবু তাকে বুক বাঁধতে হয়। দুদিনের জন্যে অচল হয়ে পড়া সংসারটাকে আবার মজবুত করে তুলতে হয়েছে। মজবুত করে তুলে আবার তাঁতের মাকু ধরতে হয়েছে।

কিন্তু এবারকার মেলাটা ভালভাবে জমবে কি না, কে জানে। ছেঁড়া কাঁথা মুড়ি দিয়ে উঠে বসলো কালীপদ। সন্ধ্যের অন্ধকার আর আকাশের বুকে কালো মেঘ একসঙ্গেই জমতে শুরু করে দিয়েছিল। আর তার সঙ্গে হিংস্র বাতাসের দাপাদাপি। সেই মেঘগুলো এখন গলতে আরম্ভ করে দিয়েছে। বাতাসের দাপাদাপিটা আরও মাত্রা ছাড়িয়ে উঠেছে। এপাশ ওপাশ ভীত চোখে চাইলো কালীপদ। ওরই পাশে অকাতরে ঘুমোচ্ছে আকালী। মাঝ রাতের এত প্রচণ্ড শব্দেও ওর ঘুম ভাঙ্গেনি। একবার মাত্র সামান্য একটু নড়ে উঠেছিল। তার পর আবার ঘুম। ও বেচারাকে দেখলে সত্যিই আজকাল বড্ড মায়া লাগে কালীপদর। ছেলেটা মারা যাবার পর থেকেই ও কেমন ক্ষয়ে ক্ষয়ে আসছে দিন দিন। আগেকার সেই নিটোল শরীরটা ভাঙ্গছে আস্তে আস্তে। আগে গাল দুটো একটু পুরন্ত, নাকটা একটু থ্যাঁদা-থ্যাঁদা দেখাতো। আর আজকাল সারা মুখের মধ্যে নাকটাই সার হয়ে উঠেছে। একটু ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে। ক'দিন থেকে ও বেচারারও একটু স্বস্তি নেই। তাছাড়া কাল সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে কেমন একটা গুমোট ভাব অস্থির করে তুলেছিল সবাইকে। সম্ভবতঃ এই বৃষ্টিটারই পূর্বাভাষ। ঐ ভ্যাপসা গরমেও খানিকটা ঘুমের ব্যাঘাত ঘটেছিল। আজ তাই সন্ধ্যে হতে না হতে দুটো পান্তা ভাত গিলে বিছানা নিয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছে। খেয়ে উঠে অন্যদিন দুচারটে গল্প করে কালীপদর সঙ্গে। আজ তাও করেনি।

বিছানা ছেড়ে একবার উঠে দাঁড়ালো কালীপদ।

কালীপদর মনে হল সে মরে গেছে একেবারে। ভয়ের এতগুলো সমষর এর আগে কোনও দিন ঘটেছে কিনা তা জানা নেই ওর। ঘরের চৌকীটা দুলছে বেতালে। চালার বাতাগুলো মচ্‌মচ্‌ করছে দুরন্ত বাতাসের চোটে। দেয়ালের মধ্যে ফোঁকাটা দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। কালী-পদর মনে হচ্ছে, এইবার এই মুহূর্তে বুঝি সমস্ত ঘরটাই ওদের ওপর ধ্বসে পড়বে। মা বলে আর ডাকবার সময় পাবে না। আবার ভয়ে কুঁকড়ে গেল কালীপদর মনটা। কেমন একটা নিরুপায় আতঙ্ক নিয়ে বাইরের অবস্থাটা আন্দাজ করতে চেষ্টা করলো।

পুকুর পারের দিকে চেয়ে বুক কেঁপে উঠলো ওর। ঈশান কোণের জমাট বাঁধা কালো ছায়াটা দ্রুতবেগে ছুটে এসে সমস্ত আকাশটা ঢেকে ফেলেছে। অসম্ভব কালো আর ভয়ানক রাত্রি। অজস্র রাক্ষসের মাতলামিতে যেন ভোজবাজি শুরু হয়ে গেছে। এতদিন পর্য্যন্ত রোদে জলে যে গাছগুলো মাথা খাড়া করে ছিল, ওগুলোও যেন শুয়ে শুয়ে পড়বার জন্যে ছটফট্ করছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। যেন একটা ব্রহ্মদৈত্যের রক্তাক্ত রোষবহ্নির শিখা। লাখ লাখ দামামা বেজে উঠেছে আকাশে। ওরা সমস্ত পৃথিবীটাকে ভেঙ্গে চুরে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। ঝড়ের শব্দ আর তারই সঙ্গে বিদ্যুতের জ্বালা-ধরানো চমক। কালীপদর সারা ইন্দ্রিয় জুড়ে যেন বিরাট একটা ভীতির শিহর ছড়িয়ে পড়লো। এখানে ওখানে বড় বড় গাছ উপড়ে পড়ার শব্দ আসছে। এ গাছে ওগাছে ডাল ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে হাওয়ার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে। কাছেই কোথায় দুপ্‌দুপ্‌ করে শব্দ হল একবার। কালিপদর মনে হল, পিছনদিককার পাঁচীলটা বুঝি ভেঙ্গে পড়লো হঠাৎ। এইবার বোধ হয় এ ঘরটাও যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে বিছানার কাছে সরে এলো। ঘুমন্ত আকালীর গায়ে ঠেলা দিয়ে ডেকে বললো, আকালি। এই আকালি!

শঙ্কিত ডাকে হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসলো আকালী। ব্যস্তসমস্তভাবে বলে উঠলো, কি হল গো? কি হলো?

কালীপদ বলে, উঠে বস্! স্থাখ্ ক্যামে কি কাণ্ড আরম্ভ হইছে বাইরে!

চোখ মুছে এদিক ওদিক ভাল করে চাইলো কালীপদ। যেন চোখ থেকে ঘুটঘুটি অন্ধকারটাকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করলো। আকালীও। বাইরের ঝরঝরে হাওয়ায় কাঁপছে ঘরটা। চালের এক কোণের ফুটো দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে মেঝেতে। মেঝের খানিকটা ভিজে গিয়ে কাদা হয়ে গেছে। আকালী শিউরে উঠলো, হেই মা গো! ই কি কাণ্ড! এই জাড়ের (শীতের) দিনে এত বিষ্টি কুথা থিকে এলো!

[illegible] বাইরের অবস্থাটা আন্দাজ করে বললো, এই স্থাখ্ ক্যানে [illegible] কাণ্ডকার-খানাটো। টুকচি বিবেচনা থাউক উঁয়োর! কাল বাবার থানে পূজো হবে, বলি দান হবে, তা পরে যেঞে মেলা বসবে, আর এই অসুমুয়ে কি আরম্ভ করলে স্থাখ্ দিখিনি!

ইসব বাবা বম্মদত্যির খেলা বুঝলে গো! আকালী কপালে জোড় হাত ঠেকিয়ে দক্ষিণ দিক করে প্রণাম করে। বলে, হেই বাবা বম্মদত্যি, তুমি রক্ষে করো বাবা! ই গেরামের তুমিই তো বাবা রাজা। তুমার দয়া না হলে যে কিছুই হবে না। হেই বাবা, তুমাকে ব্যাগাতা করছি বাবা, আমরা গরীব লুক, আমাদের দিকে একবার ভেলে দেখো। আমাদের ঘর ভেঙ্গে গেলে কুথাকে যাবো বাবা! টুকচি রসো বাবা! লইলে যে কাল তুমার পুজো হবে না গো! সব মাটি হইন্ যাবে!

আকালীর সঙ্গে কালিপদও প্রণাম করে। মনে মনে তারই ভয় বেশী। কারণ আগেকার মত আর রোজগার পাতি নেই। সহর বাজারে কল বসে আর বিভুঁই থেকে কাপড় আমদানী হওয়ায় ওদের বাজার মন্দা পড়ে গেছে একেবারে। হাতের তৈরী জিনিষ চড়া দাম দিয়ে কিনতে নারাজ বাবুরা। আর কালিপদ বা এ পাড়ার অন্যান্য সব তাঁতিরাও তো ঐ কলের কাপড়ের সমান সস্তা দামে জিনিষ দিতে পারবে না। মহাজনেরাও আজকাল আর দাদন দিতে চায় না। যদি বা দিতে চায় তাতে ঢাকের দামে মনসা বিকিয়ে যাবার মত অবস্থা। কালে ভদ্রে মাঝে মাঝে সহরের ব্যাঙ্ক থেকে সূতি নিয়ে আসে কালিপদ। গামছা তৈরী করে বিক্রী করে দিয়ে আসে ছ'মাইল দূরের সহরে। তাও নিতান্ত সস্তায়। ঠিক পোষায় না তার। চারটে গামছা বিক্রী করে খুব জোর দুটাকা কি তারও কম কিছু লাভ থাকে। তবু তাঁতের

কাপড় তৈরীতে কালীপদর বিলক্ষণ একটা সুনাম আছে। সেই সুনামের জোরেই বনেদী বড়লোক-গুলো মাঝে মাঝে সহর থেকে তলব দিয়ে পাঠায় কালীপদকে। সৌখীন কাপড় তৈরী করে দেবার জন্যে। ঐ সময়েই যা দু একটা দাঁও মারতে সুবিধে হয় তার। ও দাঁও সে ছাড়ে না। তবু সে আর ক'টাকা। ওতে তো আকালীর দু জোড়া রূপোর চুড়িও হয় না। সুতরাং এ অবস্থায় যদি শেষ সম্বল ঘরটাও ধ্বসে যায়, তবে সে ঘর আর জন্মেও তুলতে পারবে না কালিপদ। সেইজন্যে ও-ও আকালীর কথায় সায় দেয়। বলে, হেই বাবা, তুমিই তো আমাদের মা-বাপ! তুমার এই রাগ কেনে! তুমি তুমার রাগটো সামলিন্ লাও বাবা! তুমি রক্ষে করো!

বাবা ব্রহ্মদৈত্যের হয়ত ওদেরকে রক্ষে করবার ইচ্ছে নেই মোটেই। বৃষ্টিটা আরও চেপে আসে। মাঝরাতের চাপ জোবা অন্ধকারটা আরও বিব্রত হয়ে পড়ে। রাতের কালো বিপর্য্যস্ত গ্রামখানা আরও কাঁপতে থাকে। ও পাশের আম বাগানের শন্‌শনে শব্দে আর দুটী আত্মার কম্পমান অস্তিত্বে বুঝি ভয়ঙ্কর একটা শিহরিত স্বপ্ন মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। ওরা দুজনে দুজনের কাছে সরে আসে আতঙ্কিত চোখে।

চালাটার একটা কোণে খড় উড়ে গেছে। খড় উড়ে গিয়ে ফাঁক হয়ে যাওয়ার দরুণ বৃষ্টির ধারাপাত আরও বেশী করে আরম্ভ হয়ে গেছে। কাঁথা বিছানা সব তাড়াতাড়ি গুটিয়ে বাঁ দিককার বাক্সটার ওপর তুলে রাখে কালীপদ। সারা ঘর কাদা হয়ে গেছে। ক্যাঁচ-ক্যাঁচে চৌকিটাকে সরিয়ে নিয়ে আসে বৃষ্টির ছাট বাঁচিয়ে। যেদিকে একটু ছাউনী আছে।

এই ঘর থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারছে কালীপদ—পাশের পায়রাখুপরিটা জলে ভেসে যাওয়ার মত অবস্থা। তাঁতের কাঠ আর দড়িগুলো ভিজে গেছে। পা-রাখা গর্ত্তটা জলে ডুবে গেছে। অথচ কোনও উপায়ও নেই ওগুলো বাঁচাবার। এ ঘরে যেটুকু জায়গা তাতে ওদের দুজনেরই একটু মাথা বাঁচাবার জায়গা হচ্ছে না। কালীপদর মনে হল, ওর সংসারটা বুঝি এই বেহিসেবী জলের তোড়ে ভেসে যাবে এই মুহূর্তে। তাই যাক্। সেই সঙ্গে ওরা দুজনেও ভেসে যাক্।

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে আকালীর মেজাজ বিগড়ে গেছিল। এবার ও গজর গজর করে ওঠে, লাও, এবারে সামলাও! তখন ভুয়ে ভুয়ে কান কামুড়ে বলে দিলম, ওগো আর কিছু না হোক্ যেঞে, ঘরের চালাটো ছয়য়ে লাও। না তখুন আমার কথাটো তেত লাগলো, তখন বলা হল, যে আমি মেয়ে মানুষ, আমি কি বুঝি! লাও বুঝলে তো কে বেশী বোঝে, হুঁঃ! তুমাকে কি আর বোলবো!

বিছানাগুলো আরও ওপাশে ঠেলে দিয়ে বলে কালী-পদ, তা আমি কি তখুন জানি যি এই জাড়ের দিনে অমন বে-আক্কেলে বিষ্টি লামবে!

: ক্যানে ই কি লতুন দেখছো লাকি? গেল বারের আগে বারে দেখো লাই থো, এমনি পারা জাড়ের দিনে বিষ্টি নেমে গোটা গাঁপটোকে ভাসিন্ দিলে। ই বারে বুধায় উয়োর চেঞেও বেশী বান লামবে লদীতে!

হঠাৎ একটা ভিজে ঝাপটায় দুজনে পিছিয়ে যায়। উঃ! বৃষ্টি কি আজ থামবে না নাকি! সারা ঘরে এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে গেছে। শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে ওরা। ভাগ্যে এই চৌকিটা ছিল, নইলে ঠায় এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে থাকতে হত ওদের। কালীপদ বলে, বক্‌র বকর্ করে বকিস্ না তো বাপু! এ্যাকে তো এই শালা বিষ্টির জ্বালায় মরছি, তার উপরে তু যদি কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করিস্ তো লদীতে ডুবে মরবো গা যেঞে। যা হবার তা হইন্ গেইছে! ঘর ছ'ন হয় লাই, যখুন তখুন তো আর কুনু উপায় লাই থো! আখুন টুকচি লেগে দে তো, ঘরের জলগুলান লালা কেটে বার করে দি। জলটো টুকচি থেমেছে লাগছে!

দেয়ালের মাটী নরমই হয়ে গেছে। কালীপদ জলের ওপর পা ফেলে ফেলে এগিয়ে এল একটু। ঘরের একটা কোণে একটু মাটী খুঁড়ে জল যাওয়ার পথ করে দিল। আকালীকে বললো, তু জল গুলান্ ছেঁচালে বেঁচালে দে তো, আমি ইদিকে খাবুলে খাবুলে পার [illegible]। লইলে বেশীক্ষণ জল দাঁড়িন্ থাকলে ঘরটা [illegible]ড়ে যাবে একেবারে।

[illegible] তখনও আকালীর গজর গজর থামেনি। মনে মনে সে একেবারে অজগরের মত ফুঁসছিল। তবু মুখে কিছু

বললো না। ছেঁড়া কাঁথাখানা গা থেকে নামিয়ে রাখলো কোণ-ঘেঁসা রং-চটা টিনের বাক্সটার ওপর। বলা যায় না—কাজ করতে করতে ওটা জলে পড়ে যেতে পারে। জলে পড়ে কাদামাখা হয়ে গেলে ওটার আর কোনও জাত থাকবে না। সুতরাং ওটা গায়ে নিয়ে কাজ করা ঠিক হবে না। আঁচলটাকে জড়িয়ে আঁট সাঁট করে বেঁধে নেয় আকালী। তার পরে হাতে করে সরু ফোঁকড়টা দিয়ে জল পার করতে থাকে।

কিছুক্ষণ পর জলটা একটু কমের দিকে আসে। হাওয়াটাও যেন একটু দম নেয়। দেয়ালের গা গড়িয়ে আর ফাঁকা চালা দিয়ে জল পড়া কমে খানিকটা। কিন্তু তখনো ওরা সমানে জল বের করতে থাকে। দু-এক সময় আর একটা ভাবনা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে ওদের। জল হিঁচতে হিচতে আকালী বলে, হা গো, বাইরের গ'ল (গোয়াল) ঘরটো ঠিক আছে তো?

কালীপদ উত্তর দিল, হ, হ, উ ঘরটো তো ভালই আছে। উটোর জন্যে ভয় নাই, টিনের চালা আছে। ত্যাবে একবার যেএে দেখে এলে হত গরুগুলান্ ভিজে গেইছে নাকি!

আকালী শশব্যস্তে বলে, লা, লা, তুমার আধুন যেএে কাজ লাই। আগে ঝোড়-জলটা থামুক, তা' পরে লা হয় যেয়ো।

আকালীর ভয় দেখে হাসে কালীপদ। ফোঁকর দিয়ে জল ঠেলতে ঠেলতে অন্ধকারেই আকালীর মুখটা দেখতে চেষ্টা করে। ঠিক দেখা যায় না। তবু আন্দাজ করে বুঝতে পারে অদ্ভুত মমতায় চিক্‌চিক্ করছে দুটো চোখ। ভারি ভাল লাগে কালীপদর। বলে, না রে, এই দুর্যোগে কি মানুষ ঘর থেকে বেরোয়। আমাকে কি উদোম পাগল পেইছিস্?

আবার চুপ করে যায় ওরা দুজনে। সারা রাত বিশ্রাম নেই ওদের। অমনি করে জল পরিষ্কার করে ঘরের মেঝে থেকে। কালীপদ মনে মনে বড্ড অনুতপ্ত হয়ে ওঠে। বড্ড ভুল করে ফেলেছে ও। মাসখানেক আগে লাঙুলের গোয়ালারা খড় বিক্রী করতে এসেছিল। কুড়ি টাকা কাহন। কালীপদ অবশ্য তিন তাড়া কিনে রেখেছিল। কিন্তু আরও কিছু কিনে রাখলে ভাল করত ও। অন্ততঃ এক কাহন যদি কিনে রাখত, তাহলে অযথা এমনি নষ্টও হয়ে যেত না ঘরটা। আর তাঁতটাও তো কাজের বাইরে চলে গেছে বলে মনে হয়। ছি, ছি, কালীপদটা নেহাতই বেয়াকুব। তখন আকালীর কথা না শুনে বেবাক্ ভুল করে ফেলেছে। শুধু ভুল নয়, অন্যায়ও। হঁ্যা অন্যায় বৈকী! নইলে মাঝরাত্রে আকালীকে আবার এমনি করে বেগার খাটতে হয়! না তাকেই এমনি করে খালি গায়ে শীতের জ্বালায় কাঁপতে হয়!

ততক্ষণে জলটা একেবারে থেমে গেছে। খাঁ[illegible]-গাছ ও-গাছের পাতা থেকে তখনও জল গড়িয়ে পড়ছিল টুপ-টাপ। কালীপদ একবার জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো বাইরের অবস্থাটা। আলকাতরার মত অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করা যায় না। শুধু এইটুকুই বুঝতে পারলো, এখনো গ্রাম্য পথের জল নিষ্কাশিত হয়ে যায়নি। আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে ছোট ছোট গাছগুলো সর্বনাশা ঝড়ের দাপট সহ্য করতে না পেরে একেবারে ধরাশায়ী হয়ে গেছে। দূরে কোত্থেকে একটা শব্দ আসছিল। খুব সম্ভব ক্ষেতের জলরাশি আল-কাটা পথ দিয়ে গিয়ে বাঁধা পুকুরে পড়ছিল।

কালীপদর মনে হল, আর বেশী রাত নেই। আর একটু পরেই আলো ফুটে উঠবে। নিকষ-কালো অন্ধকারটা একটু একটু করে তরল হয়ে আসছে। আকাশের পুবদিকের খানিকটা অংশ মেঘমুক্ত হয়ে উঠেছে। দু একটা তারাও জ্বলে উঠবার জন্যে কাঁপছে অল্প অল্প। ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাড়ে কাঁপুনি ধরে যাচ্ছে কালীপদর। কালীপদ আকালীর দিকে তাকালো একবার। একটানা এতক্ষণ কাজ করার পর হাঁপাচ্ছে বেচারী। মাথাটা ঢুলে ঢুলে পড়ছে বুকের ওপর। আর তার নিজের শরীরটাই কি কিছু কম ক্লান্ত। গোটা শরীরটায় যেন কে আলপিন ফুটাচ্ছে অবিরাম। তারই যন্ত্রণায় গিঁটে গিঁটে নিঃসাড় হিম-শীতলতা।

নিঃসাড় হিম-শীতলতা নিয়েই রাত্রিটাও কাটলো ওদের। ভোরের পাখী দুটো একটা করে ডাকতে সুরু করলো। কালীপদ ঠায় দাঁড়িয়েছিল বাখারির জানালাটার কাছে। সেখান থেকেই শুনতে পেল ব্রহ্মদৈত্যের থানে

ঢাক বেজে উঠেছে। সকালবেলায় আগে পূজো হবে তারপর মেলা বসবে।

আকালীর দিকে চাইলো মুখ ফিরিয়ে। ছেঁড়া কাঁথাটা মুড়ে ঐ অল্প পরিসর চৌকিটুকুর ওপর বুক হাঁটু এক করে শুয়ে পড়েছে বেচারা, সারা রাত্রি ধরে বেফালতু খাটনির ধাক্কায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অল্প অল্প কাতরাচ্ছে আকালী। কালীপদ ডাকলো, অকালী!

ঘুমের ঘোরে কুঁচকে উঠলো আকালীর মুখটা। সাড়া দিল, উঁ।

বাবার থানে যাবি না?

সাড়া পাওয়া গেল না আকালীর। কাছে সরে এসে ওর গায়ে ধাক্কা দিয়ে জাগাতে গিয়েই হঠাৎ চিক্‌চিক করে উঠলো কালীপদর চোখ দুটো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো আকালীর মুখ। একটি আশা। কেমন একটা আনন্দের শিহর ছড়িয়ে গেল কালীপদর সর্বাঙ্গে। আশ্চর্য! কথাটা একেবারে ভুলে বসেছিল সে। তাহলে কি অমন সারা-রাত খাটায় আকালিকে! ছিঃ ভারি চুক গেছে। নাঃ থাক্, আকালীকে জাগিয়ে লাভ নেই। একটি নতুন জীবন যে আকালীর অভ্যন্তরে জন্মলাভ করে আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠেছে পৃথিবীর আলো দেখবার জন্যে, সে কথা মাত্র কদিন আগেই জেনেছে কালীপদ। ভারি ভাল লাগলো। ঠিক এই জন্যেই বুঝি অত তাড়াতাড়ি হাঁপিয়ে উঠেছিল আকালী। এই জন্যে এখনও ঘুমের মধ্যেও হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠছে। ভাল করে লেপটা টেনে দিল কালীপদ আকালীর গায়ে।

তারপর বেরিয়ে এলো। আজ উপোস করবে কালীপদ। বাবা ব্রহ্মদৈত্যের থানে পুষ্পাঞ্জলি না দিয়ে খাবে না। শুনতে পাচ্ছে কালীপদ, একদল লোক হৈহুল্লোড় করছে বুড়ো বটতলাটার কাছে। গত রাত্রের আচমকা বৃষ্টির জন্য লোক অবশ্য কিছু কম হয়েছে। কিন্তু পূজো আটকায়নি। ভাবনা হয়েছিল কালীপদর, এই অকাল বৃষ্টির ক্ষয়ক্ষতিতে বুঝি বা পুজোটাই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তা হল না দেখে মনে মনে আশ্বস্ত হল। যাহোক, ওর কাপড় ক'টা তা হলে বিক্রি করা যাবে। এদিক ওদিক চেয়ে দেখলো একবার। মেলা বসবে সেই বিকেলের দিকে। লোকজন এখন যা এসেছে তা কেবল পূজো দেখবার জন্যে। আর মানত শুধবার জন্যে।

গোয়াল ঘর থেকে গরুগুলো বের করে ডাঙ্গালে বেঁধে দিয়ে এবং ঘরের আরও কাজকর্ম শেষ করার পর স্নান করে কাচা কাপড় পরে ব্রহ্মদৈত্যের থানে এসে যখন পৌঁছুলো বেলা তখন অনেকটা হয়েছে। তবে রোদের তেমন তেজ নেই। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ এখনো খানিকটা গোমড়া করে রেখেছে আকাশের মুখটাকে। পথে-ঘাটে প্যাচপ্যাচে কাদা।

ব্রহ্মদৈত্যের থানে তখন যজ্ঞের আগুন জ্বলে উঠেছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় সারা জায়গাটা ছেয়ে গেছে। যেন এক-টুকরো মেঘ সব কিছুকে আড়াল করে দেবার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বড্ড বেশী। গাঁয়ের মাতব্বররা বসে বসে হুঁকো টানছে। আর গল্প করছে। ব্রহ্মদৈত্যের থানে প্রণাম করে এসে ওদের মধ্যেই বসে পড়লো কালীপদও। ওদের কথাবার্তা যে গতরাত্রের সর্বনাশা বৃষ্টিকে কেন্দ্র করে তা বুঝতে কষ্ট হল না কালীপদর।

বলাই ভট্‌চাজ্ কাঁদো কাঁদো হয়ে বলছে, তোমাকে কি বলবো ভায়া, বৃষ্টি নয় এটা নিতান্তই পিতৃদেব ব্রহ্মদৈত্যের অভিশাপ। নইলে অত মজবুত করে ঘর তৈরী করলাম, আর এক বৃষ্টিতেই সমস্ত ঘরটা পড়ে যায় অমন করে! গরীব বামুন, চাল-কলা ছাড়া তো আর কিছু রোজগার নেই। কি করে যে ঘরটা তুলবো তার ঠিক নেই। তবু ভালো, সে ঘর চাপা পড়ে আমার ছেলে দুটো মরেনি।

নিতাই মোড়ল বলছে, আমারও সেই অবস্থা ভাই! টিনের চালাটা উড়ে গিয়ে পড়বি তো পড় একেবারে পুকুরের জলে! গরুগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজেছে সারা রাত। আর যে ঘরটা আধখানা তোলা হয়েছিল, সেটাও ভেঙে গেছে! কি যে করি ভেবে পাচ্ছিনা!

: তোমাদের তো ঐ গেল! আর আমার যে সর্বস্ব গেল! একটি মাত্র গাই—ওর দুধ বিক্রী করে কোনও রকমে পেটের ভাত জোগাড় করছিলাম, বিধাতা তাতেও বাদ সাধলেন! 'থ্যান' করে কালই গরুটাকে ঘরে বেঁধে রেখেছিলাম, আর কালই ঐ কাণ্ড ঘটলো—দেয়াল চাপা পড়ে মারা গেল! কচি বাচ্চা—ওটাও বাঁচবে না

আর—বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো মোহন গোয়ালা। অসহায়ভাবে মাথা নাড়তে লাগলো।

ঠ্যাং-খোড়া নটু বললো, কেঁদো না ভায়া হে, কাঁদবার কিছু নেই। বাবা বহ্মদত্যির ইচ্ছে ছিল এমনি, তা আর খণ্ডাবে কে বলো! দেশে অনাচার এসেছে, নৈলে এমনি অসময়ে এমন ধারা জল নামে! তুমি দুঃখ করছো এইটুকুর জন্যে, আর ভেবে দেখ তো এই বৃষ্টিতে আরও কত লোকের কত সর্বনাশ হয়েছে! কত সংসারকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে! এ তো আর শুধু তোমার আমার পাপ নয়, সারা দেশের পাপ!

ওদের সবারই দিকে তাকিয়ে মুষড়ে পড়লো কালীপদর মন। সবারই মুখে ঐ মেঘের কিছু কিছু টুকরো ছড়িয়ে পড়ে ম্লান করে দিয়েছে মুখগুলোকে। অন্য বছর ব্রহ্মদৈত্যের পূজোর দিনে যে শরীরগুলো উচ্ছল উৎসাহে ব্যস্ত হয়ে উঠতো, এ বছরও সেই শরীরগুলোই এসেছে। কিন্তু সে উৎসাহ নেই। তেমন প্রাণোচ্ছলতা নেই। কেমন যেন মনমরা। নেহাৎই পূজো না করলে নয়, তাই করা। এ একরকম দায়-সারা গোছের ব্যাপার। সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে ভাঙ্গা-জীবনের আর্ত্তনাদ। এখানে ও গাছটা পড়ে গেছে। ওখানে ঐ পুকুরের ধ্বস নেমেছে। এই মাঠের আল ভেঙ্গে গেছে। ঐ মাঠটার ফসলগুলো জলে ডুবে গেছে। আর তারই সঙ্গে এতগুলো মুখও ভারী হয়ে এসেছে চিন্তায়। এত ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করবার মত সংগতি এদের নেই—কালীপদ তা জানে।

আর জানে বলেই নিজের দিক থেকেও একবার হিসেব করে দেখলো কালীপদ। যাক্ এত সব ভাবনার হাত থেকে রেহাই পেয়েছে কালীপদ। ওর ঘরটাই কি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো যদি না সে সমস্ত রাত্রি জেগে জল বের করে দিত! ভাগ্যে তখন বুদ্ধিটা মাথায় এসেছিল! সকাল বেলায় উঠে তাঁত ঘরটাও একবার দেখে এসেছে কালীপদ। বিশেষ কিছু নষ্ট হয়নি। তাঁতটা জলের ছাঁটে একটু ভিজে গেছে। আর পা-রাখা জায়গাটাতে খানিকটা জল দাঁড়িয়ে গেছিল। ও জল কালীপদ তোবড়ানো বালতিটায় করে আস্তে আস্তে বের করে ফেলে দিয়েছে বাইরে। গরুগুলোও অক্ষত শরীরেই আছে। তবু ওদের কথা শুনে মনটা দমে গেল কালীপদর। আজ বাবা ব্রহ্মদৈত্যের পূজোর দিনে এমনি একটা অমঙ্গল যেন সমস্ত আনন্দকে মুহূর্ত্তে বিষিয়ে দিল। নিজের দিক থেকে নয়। ওদের দিক থেকে ভেবে মনে হল, বাবার পূজোটা এবার ভাল করেই করা উচিত। নইলে ঐ জাগ্রত দেবতার কোপ দৃষ্টি সমস্ত গ্রামকে ছারখার করে দেবে।

অথচ ভয়ে কিছু বলতেও পারলো না কালীপদ। ও কথা বলতে গেলেই হয়ত খিঁচিয়ে উঠবে ওরা, তুমি তো বলেই খালাস হে! তোমার যদি আমাদের মত এই হাল হত, তাহলে বুঝতে কত ধানে কত চাল হয়! আমাদের শালা ঘর-দুয়োর ভেসে গিয়ে কোথায় দাঁড়াই তার ঠিক নেই, আবার পূজোর ধুমধাম! রাখো, রাখো, ও সব ভণ্ডামি! ও সব ভণ্ডামি আমাদের দেখা আছে বহুত। শালার দুনিয়ায় আগে নিজের প্রাণ, তারপর অন্য কিছু।

আস্তে আস্তে মেঘের থমথমে ভাবটা কেটে গেল কিছুক্ষণ পর। চড়া রোদ উঠলো আকাশ তাতিয়ে। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে লোকজনের ভিড়ও বাড়তে লাগলো। গত রাত্রের রাক্ষুসে বৃষ্টির দাপটে এলো-মেলো হয়ে যাওয়া ঘরদোর সামলে নিয়ে গাঁয়ের ঝি-বহুড়িরা এসে জুটেছে। কালীপদ হুঁকোয় টান দিয়ে মোড়লদের সঙ্গে সুখদুঃখের গল্প করতে করতে এদিক ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। এতক্ষণ পর যেন পূজো-পূজো মনে হচ্ছে। জমে উঠেছে জায়গাটা বেশ।

কেষ্ট মোড়ল বললো, বুঝলি কেলে, বাবা বহ্মদত্যির এমনি মহিমে যে আপনা আপনি লোক ছুটে আসে—

আরও গোটা দুই টান দিয়ে হুঁকোটা মোড়লের দিকে এগিয়ে দিল কালীপদ। মোজ করে ধোঁয়া ছেড়ে বললো, হুঁ—তা তো ব্যাটেই।

জায়গাটা যখন হট্টগোলে গমগম করছে, ঠিক তখনি হঠাৎ ওদিক থেকে হেঁকে উঠলো বেরেজো অর্থাৎ ব্রজঠাকুর —এই যে পেসাদ লাও—এদিকে এসো—এদিকে এসো সবাই—

পেসাদ!—উঠে দাঁড়ালো কালীপদ। বাবা ব্রহ্ম-দৈত্যের প্রসাদ খেলে সব পাপ কেটে যায়। ঐ এক

কণা প্রসাদ পাবার জন্যে বসে আছে কালীপদ সেই সকাল থেকে। ঐ এক কণা প্রসাদ মুখে দেবে! তার পর জলগ্রহণ করবে। তাছাড়া মনে মনে দেবতার কাছে একটা মানতও করে রেখেছে কালীপদ। একটি ঢিল নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে ব্রহ্মদৈত্য তলার বুড়ো নামাল-নামা বটগাছটার কোটরে তুলে রেখেছে। হেই বাবা! আকালী আমার বড়া দুখা! একটো ছেলের জন্যে মাথামোড় খুঁড়ছে! উকে একটো ছেলে দাও বাবা! যি পেরানীটো উর প্যাটে জন্ম লিইছে, উ যেন বেঁচে থাকে বাবা!

অন্যান্য বছর কালাপদ আকালীকে সঙ্গে নিয়েই পূজো দেখতে আসতো। এ বছর তা পারেনি। কাল সারা রাত ধরে অবিরাম খাটনির পর আর 'উয়ো'র 'দেহি'টোর সাড় নেই। একেবারে 'লতার পারা' নেতিয়ে প'ড়েছে। চোখের কোলগুলো তলিয়ে গেছে। মুখ চোখেও নিঃসীম কাতরতা। বটতলার ওপাশে ভিড় কাটিয়ে এগিয়ে গেল কালীপদ। হাত পেতে প্রসাদ নিল। তারপর আবার ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এলো। মনে মনে আবার প্রণাম করলো কালীপদ। প্রসাদটুকু মাথায় ঠেকালো।

পথে যেতে যেতে অনেক কথা মনে হল কালীপদর। কবে কোন্‌কালের এক ব্রহ্মচারীর স্মৃতি নিয়ে বসে আসছে এই মেলা। বড় জাগ্রত এই ব্রহ্মচারীর অদৃশ্য আত্মা। সমস্ত গ্রামটাকে বিপদে রক্ষা করেছে। দুর্ভিক্ষ মহামারীর হাত থেকে রক্ষে করে আসছে। এ গাঁয়ে কেউ কোনওদিন ডাকাত কি চোর আসতে দেখেনি! কোনও অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যে কেউ এই গ্রামে আসতে গেছে, সে ঐ ব্রহ্মদৈত্যের বটগাছটার নীচে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। হাতের অস্ত্র খসে গেছে। ভয়ানক আতঙ্কে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। অথচ সংশয় এই যে, গত কাল এমন বৃষ্টি নামলো যেন এতগুলো লোকের জীবনের ভিতটাকে একেবারে ভেস্তিয়ে দিয়ে চলে গেছে। কেন এমন হল? মনে মনে প্রশ্ন করলো কালীপদ নিজেকেই। এমন তো কোনও বার হয় না! তবে গতবার পূজোর ঘট উল্টে গেছিল। ঠিক তারই প্রতিফল কি এ বৎসর পর্য্যন্ত গড়িয়ে এসেছে! মোড়লদের আড্ডায় বসে বসে অনেক ক্ষতির খবর শুনতে পেল কালীপদ। নিজের মনে ব্যথাও পেল কম না। সব থেকে ব্যথা পেল—নোটন বুড়ীর মৃত্যুর খবর পেয়ে। বয়েস অবশ্য নোটন বুড়ীর কম হয়নি। প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। তবু গত বৎসর পর্য্যন্তও এই পূজোয় এসেছে। মোড়লদের সঙ্গে ঠাকুমার মত রসিকতা করেছে। সত্যিই বুড়ীটা ভালবাসতো সবাইকে খুবই। নিজের ছেলেমেয়ে ছিল না। সেই মাতৃত্বের সবটুকু তাই ঢেলে দিতে পেরেছিল গাঁয়ের ছেলে বুড়ো সবাইকে। আর কালীপদকেই কি কম ভালবাসতো বুড়ী! গতবার ব্রহ্মদৈত্যের মেলায় এক ঠোঙা বাতাসা নিয়ে পূজো দিয়ে সেই 'পেসাদ' নিয়ে গিয়ে দিয়ে এসেছিল আকালীকে। বলেছিল, এই প্রেসাদটো মুখে দে তো! দেখবি ঠিক তুর বেটা হবে একটো।—ঠিক হবে! সেই নোটন বুড়ী গত সন্ধ্যে পর্য্যন্ত মস্করা করেছে পাড়া মাতিয়ে। মাঝ রাতে জল নামলো। আর সেই জলে গোটাগুটি ঘরটাই ওর ওপর ধ্বসে পড়লো।

কালীপদর মনে হল, এ সব গাঁয়ের লোকদের অবিশ্বাসের ফল। বিশেষ করে চ্যাংড়া ক'টা ছোঁড়া জুটেছে। দূরের সহর গাঁয়ে কলেজে না কোথা পড়ে! ওরাই সব দুটো 'ইঞ্জিরি' শিখে একবারে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। ওরা নাকি বিশ্বাস করে না ঠাকুর-দেবতার কথা। আরে বাবা, তোরা তো কালকের ছেলে। তোরা ও সবের কি জানবি। এইবারে দেখলি তো অবিশ্বাসের ফল। হাতে নাতে প্রমাণ পেয়ে গেলি! নইলে সেবার এত বড় একটা বানে গোটা দেশটা ভেসে গেল, তাতেও এই গাঁয়ের কোনও ক্ষতি হল না, আর কালকের এক বৃষ্টিতেই এত বিপর্য্যয়! তবু ভালো, কালীপদর এখনো বিশ্বাস যায়নি। ও জানে, ওকে রক্ষে করেছে ঐ দেবতাই। ঐ ব্রহ্মদৈত্যকে সে জলের মধ্যেও সারা রাত ডেকেছে। তাই না ওর কোনও ক্ষতি হয়নি। এত লোকের এত ক্ষতি হল, অথচ ওর কোনও ক্ষতিই হয়নি। এটা কি কম সৌভাগ্যের কথা? আর এ সৌভাগ্য তার কিছুতেই হত না—যদি না তার বাবা ব্রহ্মদৈত্যের ওপর অটল বিশ্বাস থাকতো! মনে মনে আবার প্রণাম করলো কালীপদ।

ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো কালীপদ। সমস্ত পাড়াটা নির্জ্জন বলে মনে হচ্ছে। পাড়ার সবাই বাবার থানে পুজো দেখতে গেছে—ঘরে ঘরে দরজায় শিকল তোলা।

উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকলো কালীপদ, আকালী—আকালী—

কোনও সাড়া পেল না কালীপদ। আচ্ছা যাহোক্ ঘুমোতে পারে আকালীটা। এতখানি বেলা হল এখনো বিছানায় শুয়ে থাকতে ভালও লাগে! আবার হাঁকলো কালীপদ—আকালী—আকালী রইছিস্ ঘরে ?

তবু কোনও সাড়া মিললো না। বিরক্ত হয়ে উঠলো কালীপদ। চীৎকার করে ডেকে উঠলো, বলি কানের মাথা কি খেইছিস্ নাকি হারামজাদি! এত্তু করে ডাকছি, রা দিছিস্ না ক্যানে ?

এর পরেও যখন কোনও উত্তর এলো না, তখন বিস্মিত হয়ে গেল কালীপদ। তবে কি আকালী অসুখ শরীরেই পুজো দেখতে চলে গেছে পাড়ার বৌগুলোর সঙ্গে ? আচ্ছা মেয়ে তো! পোয়াতি শরীর নিয়ে ভিড়ে কোথায় ঠেলা লেগে পড়ে যাবে, সে আক্কেলটুকুও জন্মেনি নাকি এই বয়েসেও ? ক্ষোভে বিরক্তিতে ভরে উঠলো কালীপদর মন। আবার ওকে যেতে হবে বাবার থানে। অকালীকে নিয়ে আসতে হবে। এত ঝামেলা লাগিয়ে দিতে পারে বউটা!

হাতের প্রসাদটুকুর দিকে তাকালো কালীপদ। এগুলো কি খেয়ে ফেলবে নাকি ? নাঃ থাক্। বলা যায় না ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে হাত পেতে প্রসাদ নেবার মত সুযোগ নাও আসতে পারে আকালীর! হাজার হলেও মেয়ে মানুষ তো! তাতে আবার গাঁয়ের বৌ! তার থেকে বরং প্রসাদগুলো ঘরের ভেতরে লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে তুলে রেখে দেওয়া যাক আপাততঃ। আকালী ফিরে এলে আকালী আর ও এক সঙ্গে খাবে।

কিন্তু ঘরে ঢুকেই হঠাৎ চমকে গেল কালীপদ।

চমকে দু পা পিছিয়ে গেল। ওকি! ঘরের ভেতরে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে আকালী। নিরাবরণ দেহ। সারা মেঝেটা চাপ চাপ খয়েরি রক্তে ভেসে গেছে!

মুহূর্ত্তে আঁৎকে উঠলো কালীপদ। চেতনার বুকে অজস্র সাপের ছোবলে ছটফট করে উঠলো। নিঃসাড় বেদনায় চোখ ফেটে জল আসতে চাইলো কালীপদর আকালীর দিকে চেয়ে। অচেতন আকালীর পায়ের দিক ঘেঁসে একটা আকারহীন রক্তের ঢেলা একটা বীভৎস আতঙ্ক ছড়িয়ে রেখেছে যেন সমস্ত জায়গাটায়!

কেঁপে উঠলো কালীপদ। প্রসাদগুলো হাত থেকে খসে পড়লো। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে আকাশে বিদ্যুৎ চমকিয়ে উঠলো আর একবার। আর একবার বৃষ্টি নামবে। মেঘ জমছে আকাশের ঈশান কোণে।

পাখী

রত্নেশ্বর হাজরা

উদার আকাশ ছেড়ে কুটিল মাটির কাছাকাছি
ভালো আছি।
ভালো থাকি—
এখানের ডাকাডাকি
হাজার প্রাণের কানে যায়,
আকাশ উদার শুধু ফাঁকা-ফাঁকা একা নির্জন
গম্ভীর বিস্ময়!
এখানে সকাল হয় বুঝি :
মাঠে আর ঘাসে ঘাসে খুঁজি

ফড়িঙের নীল ডানা, প্রজাপতি, দানা-ভরা ধান,
সেখানে আহার নেই নীল প্রান্তর
পাখার ঝাপট-লাগা শস্যহীন ইথারে তুফান।

এ-মাটির অভিশাপ ভালো
আকাশের আশিসের চেয়ে
পৃথিবীর শ্বাপদেরা ভালো
লাখো লাখো দেবতার চেয়ে।
এ-মাটির বুকে ভরা হৃদয়ের অজস্র সঞ্চয়।

শক্তিসাধন-বিজ্ঞান

শ্রীনৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষীয় পঞ্চ-উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে শক্তি, শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই প্রধান। ইঁহাদের উপাসনাপদ্ধতি তন্ত্রশাস্ত্রের অন্তর্গত। সাধনার অঙ্গগুলি যথা—অন্তপূর্জা, বহির্পূজা, প্রতিমা, প্রতীক, শালগ্রামশিলা, লিঙ্গ ইত্যাদির পূজা, উপচারমণ্ডল, মন্ত্র, যন্ত্র, জপ, ধ্যান, ভুতশুদ্ধি, মুদ্রা, ন্যাস, ধ্যান প্রভৃতিও সাধারণতঃ একই প্রকারের। উপাসনার মূল-নীতি এক হইলেও উপাস্য দেবতা এবং বাহ্য উপাসনা প্রণালীর মধ্যে, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত মতভেদে কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। পঞ্চরাত্র আগমে বৈষ্ণবগণের ব্যূহ, শিবশক্তি আগমে তাহাই তত্ত্বাভাস।

আদ্যাশক্তি এবং শক্তির বিভিন্ন রূপই শক্তি-সাধকের ইষ্টদেবতা। আদ্যাশক্তি—একানন্দ চিদাকৃতিঃ, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মরূপা। শক্তি-সাধনা অদ্বৈতেরই সাধনা। তন্ত্রশাস্ত্রও অদ্বৈতেরই সাধন-শাস্ত্র। কৈবল্য বা নির্বাণমুক্তি লাভের প্রথম ধাপ। নিরুত্তরতন্ত্র—শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি নির্বাণং নৈব জায়তে—অর্থাৎ শক্তিজ্ঞান বিনা নির্বাণ মুক্তি লাভ হয় না।

কালিকাই আদি মহাবিদ্যা এবং ইঁহার উপাসক অগ্রণী বলিয়া কথিত। অন্য সব মূর্ত্তি ব্রহ্মরূপিণী কালিকা দেবীর মূর্ত্তিভেদ। অসুর শুম্ভকে দেবী বলিয়াছিলেন...জগতে এক আমি ব্যতীত দ্বিতীয় আর কে আছে। রে দুষ্ট অষ্টমাতৃকা আমারই অভিন্না বিভূতি, আমারই শরীরে বিলীন হইতেছে। ডামর তন্ত্রে বলা হয়—

> ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব কৌমারী বৈষ্ণবী তথা।
> বারাহী নারসিংহৈন্দ্রি চামুণ্ডা মাতরঃ স্মৃতাঃ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী, ও চামুণ্ডা—ইঁহারাই অষ্ট-মাতৃকা।

দিব্য এবং বীর ভাবের জ্ঞানী সাধক কালীকুলের এবং কর্মী-সাধক শ্রীকুলের অনুগামী। কালী, তারা, রক্তকালী, ভুবনী, মেদিনী, ত্রিপুটা, ত্বরিতা, প্রত্যঙ্গী বা বিদ্যা ও দুর্গা—কালীকুলের অন্তর্ভুক্ত। সুন্দরী, ভৈরবী, বালা, বগলা, কমলা, ধুমাবতী, মাতঙ্গী, সপ্তরতি-বিদ্যা, মধুমতী মহাবিদ্যা শ্রীকুলের অন্তর্ভুক্ত। আদ্যামূর্ত্তি কালিকা শুদ্ধ-সত্ত্বগুণ প্রধানা, নির্বিকারা—নির্গুণ-ব্রহ্ম-স্বরূপ-প্রকাশিকা এবং সাক্ষাৎ কৈবল্যদায়িনী। তারা সত্ত্বগুণাত্মিকা, তত্ত্ববিদ্যাপ্রদায়িনী, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা—রজোগুণপ্রধানা সত্ত্বগুণাত্মিকা—স্বর্গ এবং গৌণ মুক্তি প্রদান করেন। ধূমাবতী, কমলা, বগলা ও মাতঙ্গী—তমঃপ্রধানা—ষটকর্ম সাধনের জন্য ইঁহাদের আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। শারদা-তিলক গ্রন্থে ষটকর্মের লক্ষণ—

> শান্তিবশ্যস্তম্ভনানি বিদ্বেষোচ্চাটনে ততঃ।
> মারণান্তাণি শংসন্তি ষটকর্মাণি মনীষিনঃ॥

অর্থাৎ শান্তিকরণ, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন ও মারণ—এইগুলি পণ্ডিতগণ ষটকর্ম নামে অভিহিত করেন। যে কর্ম দ্বারা রোগ, শত্রুকৃতি মারণাদি কার্য ও গ্রহাদি দোষ নিবারিত হয় তাহা শান্তিকর্ম। সকল লোককে বশীভূত করার নাম বশীকরণ। যে কর্মের দ্বারা প্রবৃত্তি রোধ বা কার্য-কারিকা শক্তি নষ্ট করা যায় তাহার নাম স্তম্ভন। স্নেহসূত্রে আবদ্ধ প্রণয়ীগণের স্নেহবিচ্ছেদ ঘটান রূপ কর্মের নাম বিদ্বেষণ। যে কার্যের দ্বারা স্বদেশ হইতে লোককে বিতাড়িত করা হয় তাহারা নাম উচ্চাটন এবং যে কার্য দ্বারা প্রাণীগণের প্রাণ-হরণ করা হয় তাহার নাম মারণ।

শক্তিধর্ম অর্থে যে বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদই বুঝায় তাহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। গন্ধর্ব তন্ত্রের উক্তি—

> গুরুন্ নত্বা বিধানেন সোঽহম্ ইতি পুরোধসঃ।
> ঐক্যং সম্ভাবয়েৎ ধীমান জীবস্য ব্রহ্মণোঽপি চ॥

অর্থাৎ যথাবিধি গুরুপ্রণাম ও সোঽহম্ চিন্তা করণান্তর ধীমান সাধক জীব ও ব্রহ্মের একত্ব ধ্যান করিবেন। আত্মার সহিত দেবতার ঐক্য ভাবনার নির্দেশ তন্ত্রশাস্ত্রে সর্বত্রই দেখা যায়। দেহ দেবালয় এবং জীব সদাশিব। অজ্ঞানরূপ নির্মাল্য ত্যাগ করিয়া সাধক সোঽহম্ ভাবনায় পূজা করিবেন।

> দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ জীবো দেবঃ সদাশিবঃ।
> ত্যজেৎ অজ্ঞান নির্মাল্যং সোঽহম্ ভাবেন পূজয়েৎ॥

কুলার্ণব তন্ত্র।

জ্ঞান এবং কর্মকাণ্ড শক্তি-উপাসনায় মিশ্রিত। কর্ম বা ধর্মানুষ্ঠান রীতিই জ্ঞানকাণ্ডের প্রকাশ, ইহার পরিসমাপ্তিও জ্ঞানে। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী নহে। এইরূপ ধর্মানুষ্ঠান রীতি পশুভাবের মধ্যেও জ্ঞান সঞ্চার করে, সেজন্য কুলজ্ঞানী চণ্ডাল ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হয়। সামাজিক জীবন বা সংস্কারের সহিত তান্ত্রিক সাধকের সম্বন্ধ নাই। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে জাতি বিভাগ স্বীকৃত, কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক গুণেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়।

সিদ্ধির উপায়ের নাম সাধনা, যাহার ধাতুগত অর্থ চেষ্টা। কিন্তু কিসের জন্য সাধনা তাহা নির্ভর করে সাধ্য বিষয়ের উপর। সাধনা কেবলমাত্র উপাসনা বা ধর্মানুষ্ঠান নহে। হঠযোগী স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য লাভের জন্য সাধনা করেন। বশীকরণ, উচাটন, স্তম্ভন প্রভৃতি শক্তি-লাভের জন্য কেহ কেহ সাধনা করেন। কেহ বা জাতিস্মর হইবার

জন্য সাধনা করেন। বেতাল অগ্নি-সাধনায় যে সিদ্ধিলাভ হয় তাহার নাম সিদ্ধি। কিন্তু সাধনা অর্থে প্রধানতঃ বুঝায় উপাসনা ও ধর্মানুষ্ঠান, তদ্দ্বারা স্বর্গ, গৌণ-মুক্তি বা নির্বাণ-মুক্তি লাভ হয়। নির্বাণ-মুক্তি সাধনার চরম লক্ষ্য এবং শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি। ধর্মানুষ্ঠান, উপাসনা, প্রার্থনা, সংস্কার, তপঃ,স্বাধ্যায়, ধ্যান প্রভৃতি এইরূপ সাধনার অন্তর্গত। সমাধিরূপ সিদ্ধিলাভের জন্য যোগাভ্যাস ও সাধনার অঙ্গ। সাধারণতঃ উপাস্য-উপাসক জ্ঞানে যে উপাসনা করা হয় তাহাই সাধনা। ইহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও ভাব-শুদ্ধি হয় এবং সাধক জ্ঞানযোগ বা লয়যোগ বা পরাভক্তি লাভে সমর্থ হইয়া থাকে।

নির্বাণমুক্তি বা মোক্ষই মুক্ত আত্মার স্বরূপ—পরমাত্মা। সাধক অবিদ্যাসংযুক্ত জীবাত্মা। আত্মার সূক্ষ্ম এবং স্থূল বাহন রূপে অবিদ্যার প্রকাশ হয়। মানুষ বলিলে বুঝায়—মন ও দেহ বা অন্তঃকরণ ও স্থূল শরীরসংযুক্ত আত্মা। আত্মা, বুদ্ধি ও মনস্—এই ত্রিরূপে আত্মা মানুষের শাশ্বত অবিনশ্বর রূপ এবং কাম-মনস্, কামদেহ, পিণ্ডদেহ ও ভাণ্ডদেহ—এ চারিটী মানুষের নশ্বর ধ্বংসশীল রূপ। কাম-মনস্ সহ তিনটী দেহ চিৎ-শক্তির মায়ারূপী প্রকাশ বা উদ্গত অংশ। চিৎ-শক্তির প্রকাশ বা চৈতন্যের প্রসার প্রকৃতপক্ষে মায়া-শক্তির মাতৃ, মান ও মেয় রূপ সঙ্কোচ। চৈতন্য এইরূপে সঙ্কুচিত হইয়া সসীম আত্মা রূপে নিজেকে অন্য সসীম আত্মা হইতে পৃথক জ্ঞান করে। বিশুদ্ধ চৈতন্যের বহুরূপে আত্ম-প্রকাশের নামই মায়া। জগতের প্রত্যেক পদার্থই চিৎ-শক্তি বা মহামায়ার অঙ্কে অবস্থিত। জগৎ বলিলে বুঝায় শক্তিযুক্ত সত্তা। 'জগৎ আছে'—রূপ প্রতীতে অথবা জগৎবিশিষ্ট সত্তাজ্ঞান হইতে জগৎরূপ বিশেষণ দূর করিলে থাকে মাত্র সত্তা, যাহার প্রতীতি হয় না। আবার জগৎ-সত্তার প্রতীতি না হইলে আত্ম-সত্তা বা 'আমি আছি' এরূপ জ্ঞানও থাকে না। সত্তা সর্বদাই শক্তির-অঙ্কে অবস্থিত। শক্তি অংশটী স্থূলভাবে প্রকাশ পায় বলিয়া ইহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ইহার সাধারণ সংজ্ঞা—নাম ও রূপ। শ্রুতি বলেন—

অস্তিভাতি প্রিয়ম্ রূপম্ নাম চেত্যংশ পঞ্চকম্।
আদ্যাত্রয়ম ব্রহ্মরূপম্ জগৎ রূপং ততোদ্বয়ম্॥

অর্থাৎ অস্তিভাতি প্রিয়ম্ বা সচ্চিদানন্দ রূপই ব্রহ্মরূপ এবং নাম ও রূপই ইঁহার জগৎ-রূপ। প্রথম তিনটী সত্তা, অপর দুইটী সংজ্ঞা। সত্তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও অপ্রত্যক্ষ বলা যায় না।

শক্তি ও সত্তা অভিন্ন। শক্তিও শক্তিমান অভেদ। কিন্তু এই শক্তিটী জড় নহে—ইনি চিন্ময়ী-মহামায়া, যাঁহার অঙ্কস্থিত সন্তান জীব ও জগৎ। এই শক্তি বা মায়া মিথ্যা বা ভ্রান্তি নহে। ইহা সত্য। ব্রহ্মের আবরক নহে, প্রকাশক। স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের প্রকাশই শক্তি বা মায়া। মহামায়া মা যখন বহুত্বের স্পন্দন উপসংহৃত করিয়া স্থির হন তখন তিনি নিরঞ্জন, নির্গুণ, নির্বিকল্প ব্রহ্ম সংজ্ঞায় অভিহিত হন, কিন্তু তখন তিনি বাক্য-মনের অতীত। মহামায়ার স্বেচ্ছাকল্পিত শিশু চৈতন্যই জীব। মহামায়াই জীব-জগৎ রূপে নিত্য প্রকাশিত।

সাধনা অর্থে বুঝায় শক্তিপতি অর্থাৎ দেবীর কৃপালাভ। দেবীর কৃপালাভ হইলে সাধক স্বার্থভোগ ত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অর্জনে কৃতসঙ্কল্প হয়। এইরূপ পরিবর্ত্তনই সাধনার লক্ষ্য। চণ্ডী-তত্ত্বে শক্তিপাত অর্থে বুঝায় মহামায়ার অনুভাব। মহামায়ার অনুকূল ইচ্ছা বা কৃপা উপলব্ধি হইলে জীব মন্বন্তরের আধিপত্য লাভ করিতে পারে। রবিতনয় মহাভাগ সাবর্ণি মহামায়ার অনুকূল ইচ্ছায় মন্বন্তরের অধিপতি হইয়াছিলেন। অনুভাব অর্থে পশ্চাৎ ভবতীতি—যাহা পরে ভাবাকারে ফুটিয়া উঠে। চৈতন্যরূপিণী শক্তিস্বরূপা মহামায়া দুর্বিজ্ঞেয়। কিন্তু তিনি ভাবাকারে প্রতিনিয়ত প্রকটিতা। অন্তরে প্রতিক্ষণে যে ভাবরাজি উঠিতেছে ও মিলাইয়া যাইতেছে, উহা মহামায়ার অনুভাব। তাঁহার অঙ্কেই সঞ্জাত এবং তাঁহাতেই বিলীন হইতেছে। অব্যক্তাবস্থা হইতে যখন ব্যক্তাবস্থায় আবির্ভূতা হন তখন ভাবাকারে প্রকটিতা হইয়া থাকেন। ভাবের ঘনীভূত অবস্থাই স্থূল। ভাবমানস গ্রাহ্য, ঘন হইলে তাহা স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া থাকে। অনুভাবরূপিণী মহামায়া প্রতি জীবে ভাবরূপে নিত্য বিরাজিতা হইলেও আমরা তাহা বুঝিতে পারিনা। ইহা যিনি বুঝিতে পারিয়াছেন তিনি তাঁহার অনুকূল ইচ্ছা বা কৃপাও উপলব্ধি করিয়াছেন। যাহা ভাব বা কল্পনা বলিয়া আমরা সাধারণতঃ উপেক্ষা করি তাহা যে মহামায়ার অনুভাব, শক্তির ব্যক্তাবস্থা—তাহা বুঝিতে পারিলে সাধনার পথও সুগম হয়।

কামক্রোধাদি বৃত্তি, রূপরসাদি বিষয়, দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণ—এ সবই মহামায়ার অনুভব। যে সব ইন্দ্রিয়বৃত্তি একত্বের অভিমুখী করে সেগুলি দেবতা এবং যেগুলি বিষয়ে আসক্ত করিয়া ভেদ সৃষ্টি করে সেগুলি অসুর বলা হয়। গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া দৈবাসুরসম্পদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়, দেবাসুর সংগ্রাম জীবমাত্রেরই দেহে চিরকাল চলিতেছে। উভয় পক্ষই পরস্পরের বিষয় অপহরণে উদ্যত হইয়া সংগ্রাম করিতেছে। এই দ্বেষ্য-দ্বেষক ভাব সর্বজনবিদিত। পুরাণে পাওয়া যায় যখন মহিষ নামক অসুর, অসুরগণের রাজা এবং পুরন্দর দেবতাগণের রাজা ছিলেন তখন দেবাসুর সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল। রজোগুণের প্রতীক মহিষাসুর। কাম এবং ক্রোধ রজোগুণ হইতে উদ্ভূত সেজন্য বলা হয়— ক্রোধঞ্চ মহিষং দদ্যাৎ অর্থাৎ ক্রোধকে মহিষরূপে কল্পনা করিয়া দেবীর উদ্দেশ্যে বলিদান দিবে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর উপাখ্যানে যে তিনটী চরিত্রের কথা পাওয়া যায় তাহা এই ত্রিগুণেরই বিশ্লেষণ। প্রথম চরিত্রে মধু ও কৈটভ দুইটী অসুর—মধু অর্থে আনন্দ ও কৈটভ অর্থে বহুত্ব অর্থাৎ বহুত্বের আনন্দরূপ অসুরদ্বয় সত্ত্বগুণের বহির্বিকাশরূপী সংস্কারদ্বয়। দ্বিতীয়চরিতে মহিষাসুর। দম্ভ, দর্প, অভিমান, কামনা প্রভৃতি আসুরিক সম্পদের অধিপতি মহিষ রজোগুণের বহির্বিকাশরূপী সংস্কার। তৃতীয় চরিতে শুম্ভ ও নিশুম্ভ অসুর। ইহারাই তমোগুণের বহির্বিকাশরূপী আমিত্ব ও মমত্বরূপ সংস্কারদ্বয়। রজোগুণের অন্তর্মুখী বিকাশসমূহের অধিপতি পুরন্দর।

ইনি দেহরূপ পুরকে বিদারণ করিয়া দেহাত্মবোধের বিলয় সাধন করিয়া, পরমাত্ম সত্তায় মিলিত করিবার জন্য সর্বদা প্রয়াস করেন। অভয়, সত্ত্বশুদ্ধি, যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি দৈবসম্পদের অধিপতিই পুরন্দর।

সত্ত্বগুণ প্রকাশশীল, রজোগুণ ক্রিয়াশীল এবং তমোগুণ স্থিতিশীল। গীতায় বলা হয়—প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ। আমি আমাকে জানি না, কিন্তু জানিবার জন্য যে চেষ্টা তাহাই প্রবৃত্তি, চেষ্টার ফলে একটু একটু আমাকে জানা তাহাই প্রকাশ এবং আমি বলিয়া ঐ ক্ষুদ্র জানাটিকে ধরিয়া রাখার নামই মোহ। গুণত্রয় নিয়ত পরিবর্তনশীল ও পরিণামী। ব্রহ্ম হইতে স্তম্ভ পর্যন্ত সমস্তই এই ত্রিগুণের সংযোগ, বিয়োগ ও মিশ্রণ ব্যতীত আর কিছু নহে।

গুণত্রয়ের দুইটী দিক আছে। একদিকে সৃষ্টি স্থিতি লয়, জীব জগৎ, জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি ভোগ করবে, অপরদিকে অখণ্ড প্রকাশ, বৈরাগ্য ও নিরোধ বা অপবর্গ—মুক্তি।

> সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
> গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

অর্থাৎ তুমি সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের শক্তিস্বরূপিণী। সনাতনী ত্রিগুণের আশ্রয়স্বরূপা ও গুণময়ী। তুমি নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার। শক্তি যে তোমার স্বরূপ তাহা এই জগতের প্রত্যেক পদার্থে প্রতিক্ষণে তোমার সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় মূর্তি দেখলেই বুঝিতে পারা যায়। এই ত্রিশক্তি একই শক্তির ত্রিবিধ স্পন্দন মাত্র। শক্তির স্বরূপটী অব্যক্ত হইলেও এই ত্রিবিধ স্পন্দন দ্বারা তাঁহার সত্তা উপলব্ধিযোগ্য হয়। অব্যক্ত শক্তি যেরূপে ব্যক্তভাবাপন্ন হয় তাহা লক্ষ্য করিয়া দেবতাগণ স্তুতি বাক্যে বলিলেন—তুমি গুণাশ্রয়া আবার গুণময়ী। গুণত্রয় যখন তোমার আশ্রয়ে প্রকাশিত হয় তখন তুমিই গুণময়ী হইয়া নারায়ণী মূর্তিতে আবির্ভূত হও।

জীবন গতিশক্তি বিশিষ্ট, ইহার লক্ষ্য অগ্রসর হওয়া। দেবাসুর-সংগ্রাম নিজের মধ্যে অনুভব করিয়া অসুরনিধনকারিণী মহামায়া মাকে দর্শন করা ও তাঁহার পূজা করাই উদ্দেশ্য।

গীতায় ভগবান বললেন—পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। ফল জল পুষ্প ধূপাদির দ্বারা ভক্তি সহকারে আরাধনা করাই পূজার অঙ্গ। কিন্তু কেহ কেহ বাহ্যপূজাধমাধমা—এই উক্তির বশবর্তী হইয়া কর্মকাণ্ড একেবারে ত্যাগ করিয়া মাত্র ধ্যানের দ্বারা পরমাত্ম সাক্ষাৎকার করিতে চেষ্টা করেন। দেহাত্মবোধ, আহার নিদ্রা প্রভৃতি যতদিন থাকবে, বাহ্য পূজাও থাকবেই। বাহ্য উপকরণ পুষ্প ধূপাদি ত্যাগ করিলেই বাহ্য পূজা ত্যাগ হয় না। শ্রুতি বলেন—উপাস্য একজন আর উপাসক একজন—এইরূপ ভেদজ্ঞানে যাঁহারা পূজা করেন তাহারা দেবতাদের নিকট পশু। ভেদজ্ঞানের সহিত যে পূজা তাহাই বাহ্যপূজা। বাহ্য বলিয়া কিছু নাই, সবই অন্তর—এইরূপ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলে তখন আর বাহ্য পূজা থাকে না। অন্তর বাহিরূপ ভেদজ্ঞান দূর করার জন্যই সাধনা। যতদিন এই ভেদজ্ঞান তিরোহিত না হয় ততদিন দেবতার সহিত পরিচয় হয় না—সুতরাং পূজা কাহার হইবে—দেবে পরিচয়ো নাস্তি বদ পূজা কথং ভবেৎ। আবার দেবতার সহিত পরিচয় হইলে তখন পূজার আকাঙ্ক্ষা থাকে না—জাতে পরিচয়ে দেবে পূজামপি ন কাঙ্ক্ষতি। পূজ্যপূজক ভেদজ্ঞানে যে পূজা হয় তাহা অজ্ঞানের অধম পূজা। কিন্তু আমার হৃদয়ে যিনি প্রাণ, যিনি আমি তাঁহাকে পূজা করিতেছি—এইরূপ বোধে যে পূজা করা হয় তাহা কখন ব্যর্থ হয় না। অভেদে ভেদজ্ঞান লইয়া পূজা আরম্ভ করিলে ভেদজ্ঞান ক্রমশঃ শিথিল হয়। গীতায় উক্ত হয়—

> তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
> নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥

যতদিন মূর্তি আত্মভাবস্থ না হয় অর্থাৎ মা অনুকম্পাপূর্বক সাধকের আত্মারূপে প্রকাশিত না হন, ততদিন অজ্ঞানরূপ অন্ধকার কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। সকল মূর্তিতেই, প্রতিমা এবং প্রতীকে, আত্মভাবস্থ করিয়া দর্শন করিতে হয়। ইষ্ট মূর্তিতে আত্মভাবস্থ হইলে অন্য মূর্তিতে ইহা সহজে সাধ্য হয়। মূর্তি বা প্রতীক সৃষ্টি স্থিতি ও লয় শক্তির ঘনীভূত বিকাশ ও চৈতন্য সত্তার কেন্দ্র এবং আত্মপ্রতিবিম্ব স্বরূপ—এইরূপ কল্পনা করিয়া পূজায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। কল্পনা সত্য এবং প্রাণময় হইলে পূজা সিদ্ধ এবং অভিষ্ট ফলপ্রদ হয় না।

রাজা সুরথ রাজ্যাপহরণ জন্য এবং সমাধি বৈশ্য বিষয়াশক্তিবশতঃ অত্যন্ত ব্যথিতচিত্তে মেধস ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হন এবং তাঁহার উপদেশ অনুসারে জগন্মাতার মৃণ্ময়মূর্তি নির্মাণ করিয়া আরাধনা করেন। এইরূপে তিন বৎসর জগন্মাতার পূজা করিয়া তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন ও বরলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা শ্রীশ্রীচণ্ডীর তৃতীয় মাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

> সন্দর্শনার্থমম্বায়া নদীপুলিনসংস্থিতঃ।
> স চ বৈশ্যস্তপস্তেপে দেবীসূক্তং পরং জপন্॥
> তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্তিং মহীময়ীম্।
> অর্হণাঞ্চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ॥
> নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ।
> দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রা সৃগুক্ষিতম্॥
> এবং সমারাধয়তো স্ত্রিভির্বর্ষৈর্যতাত্মনোঃ।

জগন্মাতার দর্শন লাভের জন্য রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি উভয়েই লোকালয় ত্যাগ করিয়া নদীপুলিনে অবস্থানপূর্বক নিয়মিতভাবে দেবীসূক্ত জপ, মৃণ্ময়ী মূর্তি গঠনপূর্বক পুষ্পধূপাদির দ্বারা পূজা, হোম, অনাহারে কিম্বা সংযতাহারে সমাহিতভাবে অবস্থান এবং স্বগাত্ররুধির সিক্ত উপহার প্রদান ইত্যাদি নানারূপ অনুষ্ঠান করিয়া তিন বৎসরকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। স্বগাত্ররুধির শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থ প্রাণ। উপনিষদে প্রাণকে আঙ্গিরস বা অঙ্গের রস বলা

হয়। ত্বগস্থিরুধির দ্বারা সঞ্জীবিত না হইলে কোন উপহারই মাতৃচরণে অর্পিত হয় না। পূজার পদ্ধতি সম্বন্ধে এই চারিটী শ্লোকে যাহা বলা হইল তাহা পূজানুষ্ঠানকালে সর্বদা স্মরণ রাখা প্রত্যেক ভক্ত এবং পূজকেরই কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষে বহুভাবে এবং বাংলাদেশে বিশেষভাবে শরৎকালে জগন্মাতার পূজা বহু আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবতী-বাক্যে তাহার ফলশ্রুতি এইরূপ—

শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ॥
সর্ববাধা বিনির্মুক্তো ধনধান্যসুতান্বিতঃ।
মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥

শরৎকালে আমার যে বার্ষিকী মহাপূজার অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাতে ভক্তির সহিত আমার এই মাহাত্ম্য শ্রবণ বা পাঠ করিয়া, মনুষ্য আমার প্রসাদে সকল বাধা হইতে মুক্ত এবং ধনধান্যসুতান্বিত হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

কিন্তু উক্ত মন্ত্রকথিত ফললাভ ক্বচিৎ কখন দেখা যায়। ইহার প্রধান কারণ ভক্তির সহিত যথাযথভাবে পূজার অনুষ্ঠান হয়না এবং দেবীবাক্যে সংশয় থাকে। সংশয় এবং অবিশ্বাস থাকিলে কোন পূজাই আশানুরূপ ফলদায়ক হয় না।

দ্বিপদী

বেতাল ভট্ট

(১)
দশ-চক্রে ভগবান ভূত হয়, প্রবাদই প্রমাণ,
দশ-চক্র মাঝে পড়ি হয়ে উঠে ভূতও ভগবান।

(২)
বংশীধরের সন্তানেরা কেবল ধনের অংশহর,
গানগুলি তার জেনো আসল বংশধর।

(৩)
রমণীর 'বাহুপাশে' বন্দী হওয়া আনন্দময় বটে
'হাতে' তার বন্দী হলে বিড়ম্বনা ঘটে।

(৪)
ধমকাতে বা গালি দিতে যে ভাষাটি মুখে যোগায়,
সেই ভাষারই রাষ্ট্রভাষা হওয়াই উচিত —
দ্বিধা কি তায়?

(৫)
এ যুগের বহু পিতা সন্তান না চায়,
ইলিশের ডিম হ'লে স্বাদ কমে যায়।

(৬)
দিদিমা খোকারে কোলে আদরে নাচায়
মা তারে না চায় না চায়, ধোয়া
শাড়ীটা বাঁচায়।

(৭)
ধনঞ্জয় হয় বটে কোন কোন বই,
তাই ব'লে মৃত্যুঞ্জয় হয় তারা কই?

(৮)
দুঃখ নাই অগ্নিদাহে, লৌহের পীড়নে
তোলন কুঁচের সঙ্গে সহিব কেমনে? (অনুবাদ)
(স্বর্ণের আক্ষেপ)

(৯)
টেবিলের খানা আর হেঁসেলে পায়স,
দুই-ই লুটিতেছে নয়া শিক্ষিত বায়স।

(১০)
গোষ্ঠী ক্রমে যাচ্ছে বেড়ে কোষ্ঠীতে নেই অন্ন।
লক্ষ্মী মায়ের মাঠ হল বন, ষষ্ঠী মায়ের জন্য।

(১১)
উচ্চৈঃশ্রবা পৃষ্ঠে হেরি বনের বানরে,
পায় না বানর ছাড়া ব্যথা কে অন্তরে?

(১২)
লাখপতি হয় যদি, যে মাগিত ভিখ,
কেমনে সে রাখে বল মাথা তার ঠিক।

(১৩)
ভেবেছিনু বুঝি তুমি মধুকর, তা নয় দেখি যে ভীমরুল
হুল ফুটাতেই পার ফুলেফুলে, ফুটাতেও নারো শিস-ফুল।

(১৪)
বুড়োরা তল্পী তোল,
তরুণ তন্ত্রশাসনে তোদের ঠাঁই যে পিঁজরা-পোল।

(১৫)
আগে বেঁজি পোষো, নহিলে করিতে হইবেই অনুতাপ,
ভরা ভাণ্ডারে ইঁদুর আসিবে, ইঁদুর ধরিতে সাপ।

(১৬)
পান্তা ভাতে পেঁয়াজই চাই কি হবে ছাই ঘৃতে,
পেস্তা বাঁটা চলবে নাক সস্তা ফুলুরিতে।

(১৭)
দুশমনেরও দুর্দশাতে পারি না ভাই হাসতে,
ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে, কে যেন কয় আস্তে।

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯১৪ সালের পরবর্তী কথ্যভাষার গদ্য রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর প্রবর্তনা অনুযায়ী এগিয়ে চলেছে তার শ্রেষ্ঠ সামঞ্জস্যময় পরিণতির দিকে। প্রমথবাবুর ভাষায় যে কোন জটিল বিষয় নিয়ে গ্রন্থ রচনা করা সম্ভবপর, তা বেশ ভালো করে দেখিয়েছেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর বিখ্যাত কাব্যজিজ্ঞাসা গ্রন্থে। জটিল অলঙ্কারশাস্ত্র অতি-উপভোগ্য ভঙ্গিতে উপাদেয় ভাষায় ব্যাখ্যাত হয়েছে এই বইএ। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপরিচয় আর একটি দৃষ্টান্ত—যাতে বৈজ্ঞানিক আলোচনার ডাঁটা-চচ্চড়িও কথ্যভাষার সরস মশলা সহযোগে সুস্বাদু মানসভোজে পরিণত হয়েছে।

সাহিত্যে প্রথম স্থান লাভের পর মাত্র একশো বছরের মধ্যেই চলতি ভাষার গদ্য সামঞ্জস্যের মূল সূত্রগুলি আয়ত্ত করতে পেরেছে। কোন জটিল বিষয় বোঝাতে হলে তৎসম শব্দের সাহচর্য নেবার সামর্থ্য তার এমন ভাবে হয়েছে যে, ভাষায় বিদ্যালঙ্কারি আড়ম্বর সৃষ্টি না করে মূল কাঠামো বজায় রেখেই তা করা যাচ্ছে; অন্যদিকে, ক্ষিপ্রতা বজায় থাকলেও হুতোমি ইতরতা এসে পড়ার ভয় আর নেই। সরসতার জন্যে দরকারি প্রবাদবাক্য, মা-মাসির মুখের ভাষা আর যত বাগধারা, সবই এই ভাষায় পংক্তিভোজে আসন পেতে বসে যাচ্ছে। জাত-বেজাতের কোন ঝগড়া উঠছে না। চলতি ভাষায় তাই সারল্যও আছে তারল্যও আছে; গাম্ভীর্যও আছে, মাধুর্যও আছে; বিষাদের ঘনঘটা ও দমকা হাসির তুফান এখানে অনায়াসে পাশাপাশি বিরাজিত।

বাংলা গদ্য ১৯১৪ সালের পরেই যেন তার প্রকৃত পথ খুঁজে পেয়েছে। একদিকে অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠার উপন্যাস আগাগোড়া এই কথ্যভাষায় লেখা চলছে, আবার জটিলতম দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনাও এর দ্বারা সম্পন্ন হচ্ছে। আগে উৎকৃষ্টতম সাধুভাষার প্রাধান্যের দিনেও বহু চপল, চটুল ও চঞ্চল ভাব কি করে বিকশিত করা যায়, তা লেখকদের এক মহা ভাবনার বিষয় ছিল। কিন্তু গত একশো বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এখন আর সে-ভাবনা নেই। যে কোন বিষয়ের উপযোগী শব্দের উপাদানের যথেচ্ছ মিশেল্ দিয়ে খাঁটি চল্‌তি ভাষার কাঠামোয় ফেলে এখন যে কোন রচনা সম্পন্ন করা যায়, মাঝে মাঝে ভিন্ন জাতের উপাদানের আবির্ভাবেও ভাষা ধ্বসে পড়ার সম্ভাবনা নেই। বিদ্যাসাগরের ভাষায় হঠাৎ "মেহেরবান্ কদরদান্ আশমান জমিন্ ফারাক" ধরণের শব্দ এসে পড়লে ভাষার জাতিনাশ বা রসভঙ্গের ভয় ছিল। কিন্তু এখন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, হিরণ্ময় ঘোষাল, অন্নদাশঙ্কর রায় বা মৌলানা খাফি খানের গদ্য রচনায় বাংলা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডারের সব কটা জাতের উপাদান পরম উদারতায় পাশাপাশি বাস করতে পারে রমণীয় সুষমার সহযাত্রী হয়ে। এই কথ্যভাষার অপরিসীম সম্ভাবনা এখন যাযাবর, রঞ্জন, রূপদর্শী, কালপেঁচা প্রভৃতি লেখকদের হাতে টুকরো টুকরো ভাবে রূপ নিচ্ছে। একজন শক্তিশালী গদ্যলেখক প্রয়োজন যিনি একটি অখণ্ড সৃষ্টিতে কথ্যভাষার সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনাকে একযোগে ফলিয়ে তুলতে পারবেন। তার জন্যে এমন এক সাহিত্যপ্রতিভার আবির্ভাব দরকার, যিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মতো নিজের রচনাবলীর সাহায্যে নব-গঠিত কথ্যভাষায় গদ্যের অন্তর্নিহিত সমস্ত ঐশ্বর্য স্তবকে স্তবকে সুসজ্জিত করে ফুটিয়ে তুলবেন, স্তরে স্তরে সাজিয়ে দেবেন এর অন্তর্লীন মাধুর্যসম্ভার নিজ রচনার নৈবেদ্যপাত্রে, এর সুগন্ধিতরঙ্গ ছড়িয়ে দেবেন দিগদিগন্তে আপন রচনার পুষ্পপাত্রের পরিবেশনায়, যাতে দূর বিদেশের সাহিত্যরসিকও উন্মনা হয়ে উঠবেন বাংলা গদ্যে ফরাসি গদ্যভাষার উৎকর্ষের আঘ্রাণ পেয়ে।

প্রমথ চৌধুরী এই মহান্ পরিণতির পথ সুগম করে গেছেন ফরাসি বাগভঙ্গি জলের মতো সহজ করে বাংলা গদ্যে ছড়িয়ে দিয়ে:—

"রাজাজ্ঞা সর্বথা শিরোধার্য হলেও সর্বদা পালন করা সম্ভব নয়। রাজার আদেশে মুখ বন্ধ করা সহজ, খোলা কঠিন।"

কিম্বা,

"কিন্তু সমালোচকেরা চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়ে দিলেও বঙ্গসরস্বতী আর গোবিন্দ অধিকারীর অধিকারভুক্ত হবেন না এবং দাশরথিকেও সারথি করবেন না।"

এই ধরণের বুদ্ধি-প্রধান বাগভঙ্গির সঙ্গে তুলনীয় সেই প্রসিদ্ধ Montaigne (মঁতেঞ্—১৫৩৩-১৫৯২)-এর রচনা। যাঁর প্রভাব প্রমথ বাবুর উপর খুব বেশি। মঁতেঞ্ তাঁর নিজের লেখা সম্বন্ধে যে মন্তব্য

করেছেন তা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং তা বীরবল মহাশয়ের রীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্যও বটে। সেইজন্যে সংক্ষেপে তা একটু তুলে দেওয়া হচ্ছে। মঁতেঞ্ ও প্রমথ চৌধুরী দুজনেই রীতিসর্বস্ব লেখক। ঐ রীতি তাঁদের নিজের নিজের ব্যক্তিত্বও নির্দেশ করে। চলতি ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখক যিনি হতে চান, তাঁর কেবল রীতিসর্বস্ব হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এই কারণেই প্রমথ চৌধুরী বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের মতো শক্তিশালী স্রষ্টা হতে পারেন নি। তাঁর লেখা দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল, কিন্তু গভীরতাবিহীন; রসিয়ে রসিয়ে উপভোগের বস্তু তাঁর রচনা, কিন্তু উপভোগের পর ঠিক পূর্ণ তৃপ্তি পাওয়া যায় না। তার কারণ, প্রমথবাবু নিজেকে নানাভাবে ভোগ করেছেন নিজের রচনারীতির সহায়তায়; নিজেকে উপভোগ করে কখনও পূর্ণ তৃপ্তি পাওয়া সম্ভব নয়; চৌধুরী মহাশয় কখনও পূর্ণ সার্থকতা লাভ করেন নি; তাঁর সেই অতৃপ্তপ্রাণ রচনারীতি পাঠকের মনেও একটা অভাববোধ জাগিয়ে তোলে। মঁতেঞ্ বেশ মন খুলে বলেছেন :—

"C'est moi que je peins···Je suis moi-meme la matiere de mon livre.···C'est ici purement l'essai de mes facultes naturelles et nullement des acquises···Ce sont ici mes fantaisies par lesquelles je ne tache point a donner a connaitre les choses, mais moi···Le monde regarde toujours vis-a-vis; moi, je renverse ma vue an dedans. je la plante, je l'amuse la, Chacun regarde devant soi; moi, je regarde dedans moi. Je n'ai affaire qu'a moi. Je me considere sans cesse, je me controle, je me goute···Moi, je me roule en moi-meme."

অর্থাৎ, "আমি নিজেকেই রূপায়িত করি···আমি নিজেই আমার রচনার বিষয়বস্তু···এ হল পরিপূর্ণভাবে আমার স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহের উপস্থাপনা, আমার পাণ্ডিত্যের নয়···এইসব কল্পনাচারণের দ্বারা আমি কেবল নিজেকে দিতে চাই, কিছু শেখাতে চাই না...দুনিয়া সর্বদা সম্মুখে চায়; আমি আমার দৃষ্টি ভিতরের দিকে ঘুরিয়ে দিই: আমি তাকে লালন করি, আমি তাকে ভোগ করি সেখানেই। প্রত্যেকে চায় বাইরের দিকে; আর আমি চাই আত্মাভিমুখ হতে! আমি কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে চাই। বিরামহীনভাবে আমি নিজেকে যাচাই করি, নিয়ন্ত্রণ করি, আস্বাদন করি···আমি নিজের মধ্যে গড়াগড়ি খাই।"

প্রমথ চৌধুরীও তাঁর মতোই রীতির মাধ্যমে শুধু নিজেকে, নিজের মানস সত্তাটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রকাশ করেছেন। সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থগর্ভ বাক্যবয়নে উভয়েই বিশেষ পটু। কথা শানিয়ে বলতে, ভঙ্গির বৈচিত্র্যে এক বস্তুকেই বারবার অভিনব করে তুলতে দুজনেই সিদ্ধহস্ত। মঁতেঞ্ যেমন বলছেন যে, তিনি তাঁর রচনার মধ্যে কেবল নিজেকে রূপায়িত করেন, নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন, অবিরাম আপনাকে পরখ করেন, সামলান, চাখেন, বীরবলও তেমনি তাঁর রচনায় বুদ্ধির লকড়ি খেলা দেখিয়ে দেখিয়ে নিজের বিশিষ্ট মানসটি নানাভাবে প্রদর্শন করেছেন। তাঁর অনুগামী আধুনিক বাঙালি গদ্যলেখকেরাও মোটামুটি এই আত্মানুভূতি ও আত্মবিলসনের পন্থা অনুসরণ করেছেন। কমিউনিষ্ট লেখকবৃন্দ ছাড়া প্রায় সব বুদ্ধিজীবী কথ্যভাষার গদ্যলেখকেরা তথাকথিত রম্য-রচনা বা Belles Lettres শ্রেণীর রচনায় মনোময় পুরুষের বিদ্যুচ্চমকসম্পন্ন বিভূতিবিলাস বা মানসিক তরবারিচালনার চাতুর্য দেখিয়ে থাকেন। এর রস কেবল বুদ্ধির দ্বারা উপলভ্য। এই শ্রেণীর রচনার বৃদ্ধির ফলে বাংলা গদ্য রচনাবলী বুদ্ধির জড়তা থেকে মুক্তিলাভ করেছে।

প্রমথ চৌধুরি আমাদের যে পরিণতির সম্মুখীন করে গেছেন, এখন প্রয়োজন তাকেই পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে বাংলা গদ্যে ফরাসী গদ্যের যে উৎকর্ষ সবে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে, তাকে পুরোপুরি আত্মসাৎ করা, যাতে বাংলা গদ্য ফরাসি গদ্যের মতোই ব্যঞ্জনা ও বুদ্ধি-প্রধান হয়ে উঠে আধুনিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্তাগুলিকে সুস্ফুটভাবে রূপায়নে সমর্থ হয়। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮৯১—১৯৫১) সার্থকভাবে এবং শিবরাম চক্রবর্তী নিতান্ত লঘুভাবে প্রমথবাবুর বিচিত্র বাগ্‌ভঙ্গি অনেকটা আয়ত্ত করেছেন দেখা যায়। কথার লকড়ি খেলায় তাঁরা বেশ খানিকটা সাফল্য লাভ করেছিলেন যথাক্রমে হসন্তের পত্র ও মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি রচনায়। অন্নদাশঙ্কর অপেক্ষাকৃত ধীর ভঙ্গিটি আয়ত্ত করে খুব জটিল চিন্তাও সহজ মৌখিক ভাষায় ফোটাতে পেরেছেন। আরও তরুণদের রম্যরচনা যে প্রমথবাবুর অনুসরণে তাঁর প্রবর্তনায় উৎসাহিত হয়ে আত্ম-আস্বাদনের প্রয়াস, তা সকলেরই চোখে পড়ে।

এই প্রয়াস পূর্ণ সার্থকতা লাভ করলে মানসভূমিতে বুদ্ধির ফসল আরো বেশি করে ফলবে এবং বাংলা গদ্যসাহিত্য সমৃদ্ধতর হবে। ফরাসি ও অন্যান্য বৈদেশিক গদ্যভাষার প্রভাব যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হলে বাংলাগদ্যকে কথ্যভাষার প্রণালীতে প্রবাহিত হতেই হবে। অনাবশ্যক জটিলতা বর্জন করে বাংলা গদ্যভাষাও তাহলে আধুনিক প্রগতিশীল গদ্যভাষাগুলির মতো স্বচ্ছন্দ ও ভারমুক্ত হতে পারবে।

ভাষাকে ইচ্ছামতো ঘোরাতে ফেরাতে হলে কেবল মৌখিক ভাষার ক্রিয়াপদই যথেষ্ট নয়। কথ্যভাষার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিকেও নজর রাখতে হবে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, শুধু চলতি ভাষার ক্রিয়াপদই যথেষ্ট নয় বটে, কিন্তু সেটাও অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন। মৌখিক ভাষার ক্রিয়াপদ একমাত্র লক্ষণ নয় বটে, কিন্তু অন্যতম এবং একটি প্রধান লক্ষণ, সে কথা চলতি ভাষার ক্ষেত্রে সর্বদা স্মরণীয়। যে ভাষা মুখের ভাষা, একমাত্র তাই চলতি ভাষা। কারণ, একমাত্র মৌখিক ভাষাই লোকের মুখে মুখে চলে নিয়ত পরিবর্তনশীল, সজীব ভাষা। অন্যান্য অবস্থা সমান সমান হলে এরই সৃষ্টিসামর্থ্য সবচেয়ে বেশি, একথা আগে প্রমাণিত হয়েছে। অপর পক্ষে, সাধু

ভাষা একটি কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা, ব্রজবুলির মতো তার প্রয়োগ সীমাবদ্ধ, মৃত্যুও অনিবার্য। পাণিনি-সংস্কৃত প্রাচীন ভারতীয় আর্য-ভাষা সংস্কৃতের মতোই প্রথমে তার আবির্ভাব সাহিত্যে, প্রাধান্যের দিনে মুখের কথায় না হলেও সবরকম লেখার কাজে তার আধিপত্য বিস্তৃত, পরে মাত্র সাহিত্যে ব্যবহার সীমাবদ্ধ হয়ে ক্রমশ তার লুপ্তি অনিবার্য। কোন প্রভাবশালী কথাসাহিত্যিকও এই পরিণতি ঠেকাতে পারেন না। সেইজন্যে পরশুরামের মতো অসামান্য প্রতিভাধর রস-স্রষ্টাও কজ্জলী ও গড্ডলিকার ভাষার রূপান্তর সাধন করে পরবর্তী কালে সাধু ক্রিয়াপদযুক্ত তথাকথিত "চলতি ভাষা," যা আসলে মিশ্র-ভাষা তা, পরিত্যাগ করে মৌখিক ভাষার ক্রিয়াপদযুক্ত খাঁটি কথ্য-ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি যদি আবার "এই বজ্রমুষ্টি দেখিয়া রাখ, ইহা হঠাৎ ধাবিত হয়" গোছের ভাষা প্রয়োগ করেন, তাহলে বিশেষ বিবেচনার কাজ হবে না।

বঙ্কিমের সঙ্গে সঙ্গে রীতিপ্রধান যে যুগের সুরু হয়েছিল, প্রমথ চৌধুরীর শিল্পী-সত্তার পূর্ণ বিকাশের সঙ্গে তার অন্তর্নিহিত সত্যও বহুদল পদ্মের মতো পূর্ণ প্রকটিত হল। রীতির চরম বিকাশ দেখা গেল বীরবলের গদ্যভাষায়। শাব্দ উপাদানের হিসাবনিকাশ গৌণ হতে হতে তুচ্ছতায় পর্যবসিত হল। আজ সাধুভাষা বনাম চলতি ভাষার তর্কযুদ্ধ অবান্তর এই জন্যেই যে, কথ্যভাষা কেবল যে সাধু-ভাষার সমান মর্যাদায় অন্যতর Standard Writing Language বা আদর্শ লেখ্য ভাষা হয়ে উঠেছে তা নয়, শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল বাঙালি লেখকের কাছে এটিই একমাত্র আদর্শ লেখ্য ভাষাও হয়ে উঠেছে। এখন কেবল চলতি ভাষার ক্ষেত্রেই রীতি বা style-এর পার্থক্য বিচার করে চলতি ভাষার বিভিন্ন লেখকদের গুণগত তারতম্য নির্ণয় করা যাবে। লেখকের ব্যক্তিত্বনির্দেশক যে রীতি, তা লেখক সাধু-ভাষায় লিখলেও আত্মপ্রকাশ করে, কথ্যভাষায় লিখলেও গোপন থাকে না এমন-কি রূপান্তরিত হয়না। তবে, কোন্ ভাষায় কোন্ লেখক স্বস্তির সঙ্গে তার রীতি বিকশিত করতে পারবে, তা একান্ত ব্যক্তিগত বিবেচনার বিষয়। দুটি ভাষাতেই তার ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠ্‌বে বটে, কিন্তু সমান স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে কিনা, তা লেখকবিশেষের উপর নির্ভর করে। তবে, ব্যক্তিত্বজ্ঞাপক রীতি যে উভয়ত্র থাকবে, তা নির্ভয়ে বলা যায়। উদাহরণত, প্রমথনাথ বিশির কথা ধরা যাক। ভাষার পার্থক্যেও যে রীতি বজায় থাকতে পারে, তাঁর রচনাবলী তার প্রমাণ। তাঁর গোড়ার দিকের উপন্যাসে ও অন্যান্য রচনায় সাধুভাষার আধিপত্য দেখা যায়। কিন্তু প্র-না-বি-র বিশিষ্ট স্বরূপ তাদের মধ্যে যেভাবে পাঠকবর্গের কাছে প্রকটিত, ঠিক সেইভাবেই তাঁর স্বকীয়তা আবার আত্মপ্রকাশ করেছে সাম্প্রতিক কালের কথ্য-ভাষায় রচিত "কেরি সাহেবের মুন্সি" উপন্যাসে। পরশুরামের ক্ষেত্রেও ভাষার বদলে রীতির পরিবর্তন ঘটেনি। এমন দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। প্র-না-বি ও পরশুরাম বা রাজশেখর বসু মহাশয়দের ক্ষেত্রে সাধুভাষায় রীতির যে বিকাশ দেখা গেছে, চলতি ভাষায় সে-বিকাশ কিছুমাত্র কম মহিমায় পরিস্ফুট হয়নি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ক্ষেত্রে সাহস করেই বলা যায় যে, তাঁর সাধুভাষার রচনা-বলীর চেয়ে চলতি ভাষার রচনাবলীতে সাম্প্রতিক কালে রীতির উন্নততর বিকাশ দেখা গেছে।

বিষয় অনুসারে সাধু বা চলতি ভাষায় লেখা উচিত, এ ধারণা হয়ত ১৯১৪ সালে সমর্থন করা যেত, যখন কথ্যভাষার প্রকাশসামর্থ্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাসুলভ সন্দেহের অবকাশ ছিল। কিন্তু আজ নির্ভয়ে বলা যায় যে, যে কোন বিষয় কথ্যভাষায় সাধুভাষার চেয়ে ভালো-ভাবে প্রকাশ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ আনন্দবাজার পত্রিকার কমলাকান্তের আসর-এর কথা ধরা যাক। প্রমথনাথ বিশি এতে সাধারণত সাধুভাষায়, কদাচিৎ চলতি-ভাষায় যে সব মন্তব্য প্রকাশ করেন, সেগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সব রচনাগুলিই চলতি ভাষায় লিখিত হলে বক্তব্যের কোন হানি হত না। সাধু ও কথ্য-ভাষার প্রকাশভঙ্গি রূপরসসমেত পৃথক্ বটে, কিন্তু প্র-না-বি-র রীতিস্বাতন্ত্র্য উভয় ক্ষেত্রেই অক্ষুণ্ণ রেখে প্রস্ফুটিত করা যায়। তার কারণ, লেখকের ব্যক্তিত্ব দুই ক্ষেত্রেই অপরিবর্তিত থাকে। সাধু বা চলতি যে ভাষাই হোক না কেন, বিকাশ-বাহনের তারতম্যে রীতির তুরঙ্গমীর রূপান্তর অসম্ভব। তাহলে কথ্যভাষায় লেখার সার্থকতা কোথায়? সার্থকতা ঐ বাহনের ক্ষিপ্রগতির জন্যে। বিবেকানন্দ-বর্ণিত সাধুভাষার গদাইলস্করি চাল আমাদের ছাড়তেই হবে।

দৈবজ্ঞ না হয়েও একথা নিশ্চিন্ত মনে বলা যায় যে, বাংলা সাহিত্যে শেষ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব জয়যুক্ত হবেই; বাংলা গদ্যে রামকৃষ্ণ-কথামৃত গ্রন্থাবলী আর স্বামীজির বাংলা রচনার কথ্যভাষাই অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করবে। সাহিত্যে অধ্যাত্মভাব ব্যক্ত করাই সবচেয়ে কঠিন কাজ, দুরূহতম রূপবন্ধের সাধনা। সেই সাধনায় মহেন্দ্রনাথের বিস্ময়কর সিদ্ধিলাভের পর কথ্যভাষার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আর কোন তর্ক উঠতে পারে না। কথামৃতের ভাষাই সর্বজন-বোধগম্য ভাষা; কারণ, সব বাঙালিই সে-ভাষা বোঝে। সুতরাং অন্য সাহিত্যগুণের কথা বাদ দিলেও কথামৃতের রামকৃষ্ণ-কথিত অংশের ভাষা যে সুবোধ্যতার দিক থেকে আদর্শস্থানীয়, তাতে কোন সংশয় নেই। ঐ সহজবোধ্যতার সঙ্গে অন্যান্য গুণ সংযুক্ত হলে কথ্যভাষার শ্রেষ্ঠ বিকাশ দেখা যাবে। বলা বাহুল্য, অন্যান্য গুণ আয়ত্ত করা কথ্যভাষার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

বাংলা গদ্যভাষার বিবর্তনের ধারায় এখন থেকে বিচার্য বিষয় হবে, গদ্যভাষার সম্ভাব্য পরিণতি কোন্ দিকে। সমাজে অর্থ-নৈতিক কারণে শ্রেণী সংগ্রামের ফলে নতুন শ্রেণীর আধিপত্য বিস্তৃত হবে। তখন প্রাধান্যশালী নতুন শ্রেণীসমাজ-শাসনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও নিয়ন্ত্রণ করবে। সেই শ্রেণীর মুখের ভাষার উপর কথ্যভাষার গদ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। আধুনিক কালে পৃথিবীর সব সভ্য দেশেই গদ্য ভাষা জাতির প্রাধান্যশালী শ্রেণীর মুখের ভাষা অনুসারে পরিচালিত হয়। বাংলা গদ্যভাষার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হবে না।

বাংলা গদ্য-ভাষার বরণীয় পথ সম্বন্ধে পরিশিষ্ট অংশে আলোচনা করা যাবে।

ইতিমধ্যে আমরা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছি যে, চাপিয়ে-দেওয়া ফার্সি আর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজীয় সংস্কৃত প্রভাব সম্পূর্ণ লুপ্ত করে বর্তমানে চলতি ভাষার প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে। চলতি ভাষার প্রতিষ্ঠা একটা স্বতস্ফূর্ত আন্দোলনের দ্বারা সম্ভব হয়েছে; এর মধ্যে মুসলিম বা ইংরেজ রাজশক্তির কোন প্রভাব নেই, কিম্বা এটা একটা বাইরে থেকে চাপিয়ে-দেওয়া ব্যাপারও নয়। বাংলা গদ্যের ভিত্তি স্বাভাবিক ভাবেই কথ্যভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, এই কারণে লেখকবর্গ পথ খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত মৌখিক ভাষার শরণাপন্ন হয়েছেন। এটাও কথ্যভাষার শ্রেষ্ঠত্বের একটা প্রমাণ। রাধাকান্ত দেব, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে আরম্ভ করে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-বীরবলের মধ্যে দিয়ে এসে আমরা বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কেও চলতি ভাষার জয়গান করতে দেখি। বাংলা ভাষার ভিত্তিও বঙ্গভূমির অধিবাসীদের মৌখিক ভাষার আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব, বাংলা গদ্যের মূল ধারাটি কথ্যভাষার প্রাধান্য স্থাপনের দিকে অগ্রসর।

পরিশিষ্ট

বাংলা গদ্যের বর্তমান প্রবণতা কোন্ দিকে, তা বুঝবার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে—বাংলা গদ্যসাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষার রীতি-নীতি আলোচনা করা। কোন্ সাহিত্যিকের রচনায় কোন্ সাহিত্যধর্ম অভিব্যক্ত, কোন্ গুণ সেখানে প্রকাশ লাভ করেছে, তার গবেষণা বিশুদ্ধ সাহিত্য-সমালোচনার অঙ্গীভূত। আমাদের আলোচনার বিষয় অন্য; আমরা গদ্যসাহিত্যের ভাষায় তথাকথিত সাধু ও কথ্যভাষার রীতিগুলির তারতম্য ও প্রভাবের পার্থক্য আর পরিমাণ নিরূপণ করে বাংলা গদ্য বিবর্তিত হয়ে কোন্ প্রবণতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং কোন্ পথে এগিয়ে যাচ্ছে, সেটা নির্ণয় করব।

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে পক্ষপাতপূর্ণ মন্তব্যের মূল্য যৎকিঞ্চিৎ; বাস্তবে যা ঘটছে, কেবল তারই গুরুত্ব স্বীকার্য। আমাদের ভালো-লাগা না-লাগার কথাও অবান্তর। আমরা চাই বা না চাই, যা ঘটছে তাকে মেনে না নিয়ে উপায় নেই। সুতরাং বাংলা গদ্যের প্রবণতা ভাষার দিক থেকে সাধু বা কথ্য, যেদিকে দেখা যাবে, সেদিক, বিশেষ কারো পছন্দ হোক বা না হোক, সত্যিই যে বাংলা গদ্যের গতিপথের নির্দেশক, তা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। যথাসাধ্য রাগদ্বেষবিবর্জিত হয়ে বাস্তব তথ্যসমূহ সংগ্রহের পর আমাদের সিদ্ধান্ত গঠনীয়।

প্রথম থেকেই বাংলা গদ্যের মূল ধারাই হচ্ছে চলতি ভাষার দিকে প্রবণতা। কোন আধুনিক ভাষাই মুখের ভাষার উপর নির্ভর না করে থাকতে পারে না। আমরা গদ্যেই আধুনিকতম চিন্তাগুলি প্রকাশ করতে পারি। চিন্তার ভাষা যা, লেখার ভাষাও তাই হওয়া উচিত। এই জন্যেই আধুনিক ইউরোপীয় মনের জটিল ভাবুকতার প্রকাশ হয়েছে তথাকথিত দুর্বোধ্য আধুনিক কবিতায়; এলিয়ট, পাউণ্ড, এলুআর, রিল্‌কে প্রভৃতির রচনায়। আধুনিক যুগের চিন্তাধারা প্রকাশের প্রকৃষ্ট বাহন যে গদ্য, তাকেও হতে হবে অনাড়ম্বর, লঘু ও সরলশ্রী। বর্তমান সময়-সংক্ষেপ ও গতি-প্রিয়তার যুগে ইনিয়ে বিনিয়ে নিজের চিন্তাকে একটা কৃত্রিম বক্রভঙ্গিময় ক্রিয়াপদ, সর্বনাম ও অব্যয়কণ্টকিত ভাষায় প্রকাশ করা কর্মব্যস্ত লেখকের পক্ষে সুখের ব্যাপার নয়। বিশেষ করে যখন চলতি ভাষায় লিখলে মনের চিন্তা সহজেই কলমের ডগায় আসে, তখন খামকা একটা সাধু ভাষার আশ্রয় নেবার কোন দরকার নেই। সারগর্ভ, সংক্ষিপ্ত বাক্যময়, সুদূরপ্রসারী ব্যঞ্জনার জন্যেও চলতি ভাষাই প্রশস্ত; কারণ, যথেচ্ছ তৎসম শব্দ এতে দিব্যি মানিয়ে নেওয়া যায়, আর তৎসম শব্দে অল্পের মধ্যে অনেকখানি ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা সকলের জানা আছে। অবশ্যই চলতি ভাষায় লিখতে-পারা শিক্ষা ও সাধনা সাপেক্ষ। বিভিন্ন শাব্দ উপাদানের সুষ্ঠু মিশ্রণের সমস্যাও আছে। তাহলেও এই ভাষা আমাদের চিন্তার সঙ্গে এক ভাব-প্রণালীর দ্বারা সংযুক্ত। এই ভাষায় মনোভাব লিপিবদ্ধ করা সহজতম।

সাধুভাষার গোঁড়া সমর্থকদের জন্যে চলতি ভাষার উপযোগিতা এখনও ব্যাখ্যা করার দরকার আছে। মোহিতলাল লিখেছেন, "লিখিব সাধুভাষায়, ভঙ্গিমা করিব বাংলা বুলির এবং তাহারই খাতিরে উচ্চারণ বাঁকাইয়া ক্রিয়াপদের স্থানে টক্ টক্ শব্দ করিব, এ-অনাচারে ভাষা পীড়িত হয়, তাহার ধ্বনি-ধর্ম নষ্ট হয়।" ধ্বনি-ধর্ম সম্বন্ধে মোহিতলালের অনুভূতি দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। কারণ, ভাষা প্রথমত মুখে জন্মগ্রহণ করে; তার সব ধ্বনিই প্রথমে মুখে উচ্চারিত হয়ে রূপ লাভ করে; অতএব, ধ্বনির বিশুদ্ধ রূপের নিরিখ তার কোন লেখ্য রূপ নয়, ভাষায় তার উচ্চারিত ও শ্রুত রূপ; ভাষা চোখে দেখার জিনিস নয়, মুখে-বলা ও কানে-শোনার জিনিস; ভাষার লিখিত রূপ পরের কথা। কাজেই যদি ভাষায় কোন ধ্বনি সুপ্রচলিত থাকে এবং সেটাই তার আদি ও অকৃত্রিম রূপ হয়, তাহলে তার কৃত্রিম রূপ ব্যবহারেই ধ্বনি-ধর্ম নষ্ট হয়, ভাষার প্রকৃত উৎস থেকে আসা রূপটি লেখায় ব্যবহার করলে তার ধ্বনি-ধর্ম নষ্ট হবে কেন? এর চেয়ে অযৌক্তিক মনোভাব আর কিছু হতে পারে না।

মূল সংস্কৃতে ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের ব্যবহার মধ্যভারতীয় আর্যভাষার যুগেই আমরা ত্যাগ করেছি। মুখের কথায় এখন "করোমি," "করোতি" না বলে "করি," "করে" বলা হয়, "তে" না বলে "তারা" বলা হয়; সুতরাং লেখার সময় অকারণে অপিনিহিতির প্রভাবযুক্ত বাংলা ভাষার মধ্যযুগীয় "করিয়া," "খাইয়া," "যাইতেছি," "পড়িতেছি," ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার না করে সংক্ষিপ্ত চলতি শব্দগুলো ব্যবহার করা এবং "তারা" শব্দের মাঝখানে অনর্থক একটা-"হা-" ধ্বনি ব্যবহার না-করা বেশি যুক্তিসম্মত।

মোহিতলাল প্রভৃতি প্রাচীনপন্থীরা অভ্যাসের দাসত্ববশে ভুলে যান যে, যে কোন ভাষাই সেই ভাষাভাষী লোকের মুখের কথার উপর নির্ভরশীল। কে না জানে যে, ভাষা প্রথমত মুখের, তার পরে লেখার?

অথচ মোহিতলাল তা মানতে চান নি। মুখের ভাষাই পরে নানা দরকারে লেখার কাজে ব্যবহৃত হয়ে লেখ্য-ভাষা গড়ে তোলে। ভাষা গড়তে হবে মুখের কথার উপর ভিত্তি করে; জন্মগতভাবে কোন লিপিবদ্ধ ভাষা মনুষ্য গোষ্ঠীকে প্রকৃতি তুলে দেয় নি। ভাষা পোষাক পরিচ্ছদের মতো কৃত্রিম বহিরাবরণমাত্র নয়। তা ইচ্ছামতো খোলা-পরা যায় না। নিজ ভাষা পরিত্যাগ করে অন্য ভাষাকে মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করা যেমন কষ্টসাধ্য, মাতৃভাষার কৃত্রিম কোন রূপে লেখা ততটা না হলেও বেশ একটু পীড়াদায়ক। সুতরাং লিখবার সময় ভাষাকে যথাসম্ভব তার মৌখিক রূপের উপর স্থাপিত না করে একটা অনাবশ্যক বক্রতা দেবার দরকার কিছু নেই। যে বক্রিমা চারু এবং সাহিত্য সৌন্দর্যের আকর, তাকে অবশ্য গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু চলতি ভাষার ক্রিয়া, সর্বনাম ও অব্যয় পদগুলিকে সংস্কৃত ভাষার হাস্যকর অনুকরণে বাঁকিয়ে চুরিয়ে না লিখলে ভাষার ধ্বনি-ধর্ম নষ্ট হবে, এ কথা অর্থহীন। ভাষার ধ্বনি-ধর্ম তো সেই ভাষার লৈখিক রূপে আবদ্ধ নয়, বরং সেই ভাষায় যারা কথা বলে তাদের বাচনভঙ্গি ও ভাষার বাচনিক রূপের উপর ধ্বনিধর্মটি একান্তভাবে নির্ভরশীল। অতএব, ভাষার ধ্বনিধর্ম মুখের ভাষার স্বরূপের দ্বারা নিরূপিত আর তার পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হবে। ধ্বনি স্থিরীকৃত হয় রসনায়, লেখনীর দ্বারা নয়। রসনা ধ্বনিরূপ গঠন করলে অনেক পরে লেখনী তার চিত্র অঙ্কন করে দেয়, এই মাত্র। সেই চিত্ররূপ চিরদিন আঁকড়ে ধরে রাখার বস্তু নয়; সময় হলেই তাকে যাদুঘরে পাঠাতে হয়। অন্যথা ভাষার যাদু নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে।

বাঙালি যদি তার মুখের কথায় ক্রিয়াপদের উচ্চারণকালে করছি, বলছি ইত্যাদি শব্দের দ্বারা টকটক্ শব্দ করেও, তবে সেটা তার ভাষার স্বাভাবিক ধ্বনি-ধর্মবশত; "-ইতে-" প্রত্যয়যোগে যদি সে করিতেছি, বলিতেছি বলে, তাহলে টক্‌টক্ শব্দ না হলেও এক অস্বাভাবিক কৃত্রিমতা তথা আড়ষ্টতা দেখা দেয়। সেই অসঙ্গত বক্রতা যখন মুখের কথায় চির-অনাদৃত থেকেছে তখন লেখায় তার সমাদর করা কি জন্যে? মোহিতলালের গদ্য রচনাবলীর ভাষার আড়ষ্টতা ঐ দোষ থেকেই উদ্ভূত। তাঁর প্রচণ্ড, উগ্র চিন্তারাশির উপযুক্ত ভাষা তিনি কখনও খুঁজে পান নি। সেই জন্যে তাঁর রচনার ভাষা চিন্তার অগ্রগমনের তুলনায় অনেক পিছনে পড়ে থেকে বিরুদ্ধ সমালোচকের ব্যঙ্গদীপ্ত মুখে নিষ্করুণ হাসি ফুটিয়েছে। বাহিরে আমাদিগকে, তোমাদিগের—ইত্যাদি পদ যে খুব শ্রুতিমধুর আর বাইরে, আমাদের, তোমাদের—ইত্যাদির ধ্বনি শ্রুতিকটু, একথা বলার মতো ধ্বনিমাধুর্য বিচারের মাপ-কাঠি কারো কাছে নেই।

যে সুললিত ধ্বনিমাধুর্য এক শ্রেণীর সংস্কৃত শব্দের বিশেষ গুণ, তাকে সাদরে আহ্বান করতে চল্‌তি ভাষায় কোন বাধা নেই। এমন অবস্থায় কতকগুলি প্রাচীন পদগঠনরীতি সমাদৃত হওয়া বিরক্তিকর। তথাকথিত সাধুভাষার সর্বনাম, ক্রিয়া প্রভৃতি পদগুলি আসলে মৌখিক রূপের ভিত্তিতে অবস্থিত, অথচ বিকৃতভাবে গঠিত রূপ মাত্র। শব্দের মূল সংগৃহীত হবে মৌখিক ভাষা থেকেই, অথচ লেখার সময় সেই শব্দে সংস্কৃতের ভঙ্গি আনতে কতকগুলো অদ্ভুত বিকৃতি সংযুক্ত করে কল্পনা করা হবে যে, শব্দটি এর পর সংস্কৃতের মর্যাদায় উত্তীর্ণ হল—এই মনোভাব কঠোরভাবে নিন্দনীয়। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ আচার্য সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং কথ্যভাষায় প্রবন্ধ লিখে দেখিয়েছেন, মনস্বী সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞের এ ব্যাপারে কোন অন্ধতা নেই। নকল সংস্কৃতনবিশদের কাছে আসল রত্নের মূল্য-বোধ আশা করা যায় না।

ইংরেজি, ফরাসি, জর্মন প্রভৃতি প্রত্যেক সাহিত্য গৌরববিভূষিত আধুনিক ভাষায় ক্রিয়াপদ প্রভৃতির মৌখিক ও লৈখিক রূপ এক রকম—অবশ্য ভদ্র সমাজে। ঐ সব ভাষার লেখকেরা তাঁদের রচনায় সর্বনাম, ক্রিয়া ইত্যাদি পদ গঠনের সময় স্বভাষার আশ্রয় ছেড়ে যে সব ভাষা থেকে তাঁদের ভাষার জন্ম, সেই সব ভাষার অনুকরণে কিম্ভূতকিমাকার কিছু গড়্‌বার চেষ্টা করেন না। যুগধর্মেই বাংলা গদ্যভাষাও ঐ সব আধুনিক ভাষার অনুরূপ হয়ে উঠ্‌ছে; শেষ পর্যন্ত আমাদের গদ্যভাষা সেই পরিণতিতে উপস্থিত হয়েছে, যে পরিণতি তার মূল ধারাটি অভ্রান্তভাবে নির্দেশ করছে।

১৫৫৫ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত চারশো বছর সময়ের বাংলা গদ্যের ক্রমপরিণতি নিয়ে আলোচনায় আমরা দেখতে পাই, গদ্যভাষা মূলত সহজ কথ্যভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল; যুগে যুগে ফার্সি, সংস্কৃত ও অন্য ধরণের প্রভাব এর উপর প্রসারিত হলেও এবং তার জন্যে মাঝে মাঝে একে বিড়ম্বিত হতে হলেও শেষ পর্যন্ত এই ভাষা সব আবর্জনা ঝেড়ে ফেলে আত্মস্থ হয়ে ডাক দিয়েছে প্রত্যেক আগন্তুক প্রভাবকে যথাযথ আসন নিতে; কিন্তু সে কারো কাছে স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হতে দেবে না। তাই ১৯১৪ সালের পরে দেখতে দেখতে এই ভাষায় গড়ে উঠ্‌ল এমন বিস্ময়জনক গ্রহিষ্ণুতা ও কমনীয়তার লাবণ্যদীপ্তি যে, দরকার মতো সব জাতের শব্দকে এতে মানিয়ে নেওয়া যায়, অথচ অতি সুকুমার ভাব বিকাশেও কোন অসুবিধা হয় না। নিঃসংশয়ে মৌখিক ভাষাভিত্তিক গদ্যভাষাই বাংলা গদ্যের মূলধারা নির্দেশ করছে।

এই ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দগুলোর সংখ্যা খুব কম নয়। তারা যে চলতি ভাষার ক্রিয়াপদগুলোর সঙ্গে মিশ খায়নি, এমন কথা বলা যায় না। এই ভাষা যে মুখের ভাষা এবং রুচিমান্ বিদগ্ধ ভদ্রলোক যে এই ভাষায় বিবৃতি দিয়ে থাকেন আর অন্তরঙ্গ মহলে গল্পগুজব করে থাকেন, সে-সত্য অস্বীকার করা যায় না। চল্‌তি ভাষায় ক্রিয়াপদের উচ্চারণই স্বাভাবিক উচ্চারণ; শত শত বছর ধরে বিবর্তিত হয়ে মুখের ভাষায় ক্রিয়াপদের ঐ রূপ দাঁড়িয়ে গেছে। সাধুভাষায় তাকে বাঁকিয়ে এক অদ্ভুত রূপ দেওয়া হয়। অথচ ক্রোধান্ধ মোহিতলাল বলেছেন, "উচ্চারণ বাঁকাইয়া ক্রিয়াপদের স্থানে টক্‌টক্ শব্দ করিব" ইত্যাদি, যেন মূলত উচ্চারণটা বাংলা ভাষায় প্রথমে সাধুভাষার মতো ছিল—আর এখন তাকে বদলে কথ্যভাষার উচ্চারণে পরিণত করা হয়েছে। উচ্চারণের প্রামাণিকতা প্রাচীন বা মধ্যযুগের

ভাষায় যা ছিল, তার নয় কিম্বা লেখ্য ভাষারও নয়; তা কেবল বর্তমান কালের মুখের ভাষার—অবশ্য শিষ্ট সমাজের। অতএব, উচ্চারণ যা, তাকে বাঁকিয়েছেন সাধুভাষাপন্থীরা, যাঁরা শিক্ষিত সমাজের উচ্চারণ অনুযায়ী কথ্যভাষায় গদ্য রচনা করছেন, তাঁরা নন। "করছেন"—এই শব্দটিই লোকের মুখে উচ্চারিত হয়, "করিতেছেন" তার বিকৃত লেখ্যরূপ মাত্র।

সুতরাং আধুনিক বাংলা গদ্যের দুর্গতি সাধিত হয়েছে, এই অভিযোগ আমরা মানতে পারি না। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো কোন প্রতিভাবান্ লেখক যদি কথ্যভাষায় লেখনী চালনা করেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই এই ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত ভাষার চেয়ে বেশি ভালো ভাষা নির্মাণ করতে পারবেন। এখনও পর্যন্ত যদি কথ্যভাষায় লেখা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের তৈরি রচনার চেয়ে ভালো কিছু গড়ে উঠে না থাকে, তার কারণ যোগ্য প্রতিভার অভাব, কথ্যভাষার কোন ত্রুটি নয়। মনে রাখা দরকার যে, বঙ্কিমোত্তর সাধু গদ্যভাষাতেও তাঁর চেয়ে ভালো লেখক আজও জন্মায়নি। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র কথ্য ভাষার সম্বন্ধে যে মত পোষণ করতেন, মোহিতলালের মতো বিরুদ্ধবাদী সমালোচকেরা তা জানেন না, কিম্বা খেয়াল রাখেন না। বিবেকানন্দের বক্তব্য পড়ার পর তাঁদের চৈতন্য সঞ্চারিত হওয়া উচিত ছিল। মোটকথা বিরুদ্ধবাদীদের অভিমত বিদ্বেষপ্রসূত ও উপযুক্ত অধ্যয়নের অভাবনির্দেশক। জনসাধারণ যে এই সব নির্বোধ ও একদেশদর্শী মন্তব্যে বিভ্রান্ত হয়নি, তা আনন্দের বিষয়।

১৯১৪ সালের পরবর্তী যুগে পণ্ডিতি রীতি একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। সাধুভাষার যে শব্দসম্পদ্ নষ্ট হয়ে যাবার ভয়ে পণ্ডিতেরা একদা হাহাকার করেছিলেন, দেখা যাচ্ছে যে, সে-শব্দসম্পদ্ অবিকৃতভাবে অধিকতর মাধুর্যের সঙ্গে বজায় আছে। কথ্যভাষাকে সাহিত্যে স্থান দেওয়ায় সাহিত্যের ভাষা গ্রাম্য তো হলই না, বরং শিক্ষিত লোকের মুখের ভাষা আগের চেয়ে বেশি সাহিত্যঘেঁষা হয়ে উঠেছে কথ্যভাষায় লিখিত সাহিত্যের প্রসাদে। মধুসূদন-প্যারীচাঁদ বিতর্কে মধুসূদন যে বলেছিলেন, একদিন শিক্ষিত লোকে তাঁর নাটকের সংলাপের ভাষার অনুরূপ ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথোপকথন করবে, তাঁর সেই ধারণাই যথার্থ বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

রবীন্দ্রকাব্যের যৌবনধর্মিতা

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

রবীন্দ্রকাব্যকে কাহার সহিত তুলনা করিব? বোধ হয় একমাত্র কল্পতরুর সহিত মানবীয় শিল্পসৃষ্টির পরাকাষ্ঠা এই অপূর্ব কাব্যকলা তুলনীয়! ইহা সকল রুচির পাঠকেরই রস-পিপাসা তৃপ্ত করিতে পারে। এই বিশাল কল্পবৃক্ষের নিকট যে যাহা ইচ্ছা করে তাহাই পাইতে পারে —"Here is God's plenty" তথাপি এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত যৌবনের কবি; চিরতারুণ্য তাঁহার স্বভাবধর্ম। এই যৌবনধর্মিতা তাঁহার মানস-ভঙ্গিকেই শুধু অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত করিয়া তোলে নাই, কাব্যকলাসৃষ্টিকেও একপ্রকার মসৃণতা ও পেলবতায় প্রসাধিত করিয়া তুলিয়াছে। মনে হয়, এ যেন অতি-মাধুর্যের দৃষ্টান্তস্থল এবং অতি-লালিত্যের আধার। সঙ্গীত-স্বপ্ন, আবেশ-বিভ্রম, চারুতা-কোমলতার অভিনব সমাবেশে দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় সিসৃক্ষু কবি একা।এক কাব্যলোক সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা গন্ধর্বলোকের মতই চিরানন্দময়, নয়নাভিরাম। কূজনগুঞ্জনমুখরিত, সুশ্যামল এই শাশ্বত যৌবনের রাজ্যে মরজগতের ত্রিতাপজ্বালার কোনো প্রতাপ নাই। এখানে পদার্পণ করিবামাত্র কবির সুরে সুর মিলাইয়া আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা হয়,—

"আমার যৌবনস্বপ্নে ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ।"

স্বাধিকারপ্রমত্ত জরা এই সুষমাময় বিচিত্র অপ্সরালোক হইতে চিরনির্বাসিত। সৌন্দর্যের অতন্দ্র প্রহরী তর্জনীসঙ্কেতে তাহাকে শাসন করিয়া বলিতেছে—"হে জরা, হে ভয়ঙ্কর, তিষ্ঠ। মানুষের নশ্বর শরীরেই তোমার আধিপত্য,—তাহার মর্মলোকে তোমার প্রবেশ নিষেধ।"

কেশে আমার পাক ধরেছে বটে,
তাহার পানে নজর এত কেন?
পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়োর
সবার আমি এক-বয়সী জেনো।

আমাদের এই অকালবার্দ্ধক্যজীর্ণ হতভাগ্য দেশে রবীন্দ্রনাথের মত এক চিরতরুণের আবির্ভাব ও তাঁহার "যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল" কাব্যপ্রবাহের প্লাবন "মহেন্দ্রের তপোভঙ্গদূতের" আগমনের মতই একটি আকস্মিক ও বিস্ময়জনক ব্যাপার তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার যৌবনবিলসিত কাব্যসৃষ্টি আমাদের শুষ্ক, আনন্দহীন জীবনকে সরস করিয়া তুলিয়াছে। দুঃখ-বেদনা, জরামৃত্যু সত্ত্বেও সংসারের সুধাপাত্র যে নিঃশেষিত হইবার নয় এ কথা যৌবনধর্মী রবীন্দ্রকাব্যই আমাদিগকে শিখাইয়াছে। ইহার প্রতিটি ছত্রে দৃপ্ত তারুণ্যের জ্বলন্ত, অগ্নিময় স্বাক্ষর।

চিরযুবা তুই যে চিরজীবি,
জীর্ণজরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরাণ ছড়িয়ে দেদার দিবি।—

রবীন্দ্রকাব্যের এই অমৃত-শ্লোক আমাদের এই গ্লানিময় দৈনন্দিন জীবনের পঙ্কল-পঙ্ক হইতে কোন্ এক সুদূর স্নিগ্ধ, আলোকোজ্জ্বল জগতে লইয়া যায়। এক হিসাবে বলিতে গেলে সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যই যেন এক উচ্ছ্বসিত ছন্দায়িত যৌবনবন্দনাগীতি।

যৌবন সুঠাম সুন্দর সুচারু। তাই রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের কবি। চিরসুন্দরের সঙ্গলাভে ধন্য, কৃতার্থ কবি জীবনের সর্ববিধ কুশ্রীতা ও কদর্যতাকে সযত্নে পরিহার করিয়াছেন,—"All things uncomely, all things worn-out and old." তাঁহার জীবনের চতুর্দিকেই সৌন্দর্যের এক অলৌকিক দ্যুতিময় পরিমণ্ডল; তাঁহার ইন্দ্রনিন্দিত কান্তি—সুন্দর সুকোমল; তাঁহার অনুপম কবিকর্ম শুধু "বিলাসকলাকুতুহলম্" নয়—চিরসুন্দরের বেদীমূলে ছন্দোবদ্ধ মানবীয় ভক্তি-অর্ঘ্য। রবীন্দ্রকাব্য কেবলমাত্র অসার শব্দকাকলি নয়, কেবল মাত্র মনোহর কবিকল্পনার ক্ষণলীয়মান ইন্দ্রধনুচ্ছটা নয়,—পূজা। সে পূজা সেই চিরসুন্দরের—যাহাকে কবি "ওগো সুন্দর, মরি মরি" বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন, যাহাকে কবির ধ্যানমুগ্ধ তৃতীয় নেত্র জলে স্থলে, অনলে অনিলে প্রত্যক্ষ করিয়াছে; যাহার ললিত করস্পর্শে—

মানস-তরঙ্গ-তলে বাণীর সঙ্গীতশতদল
নেচে ওঠে জেগে।

এই চিরসুন্দরকে কবি তাঁহার পার্থিব জীবনে নব নব রূপে,—গন্ধে বর্ণে গানে উপলব্ধি করিয়াছেন। এই সেই Spirit of Beauty যাহাকে শেলী "That Light whose smile kindles the universe" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সুন্দরের শ্রেষ্ঠ পূজারী বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগতে বাস্তব জগতের কদর্যতা, অসম্পূর্ণতা, কাড়াকাড়ি, হানাহানি নাই, আছে শুধু বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপ—"বকুল নিকুঞ্জের মধুকরগুঞ্জন"। সৌন্দর্যের এই আতিশয্য এই অতি-মাধুর্যই অধুনা অনেকের নিকট "গুণ হয়ে দোষ হ'ল বিদ্যার বিদ্যায়" বলিয়া মনে হইতেছে; উপবন অপেক্ষা গো-ভাগাড়ই যাহাদের নিকট অধিকতর স্পৃহনীয়, তাহাদের রুচির বাগাই লইয়া মরিতে হয়!

রবীন্দ্রকাব্যের যৌবনধর্মিতার একটি সুস্পষ্ট লক্ষণ ইহার গীতি-প্রবণতা ও গতিচঞ্চলতা। মনে হয়, সঙ্গীতপ্রবণ কবিমানস সুরের পাখা মেলিয়া অব্যক্তের, অনির্বচনীয়ের উদ্দেশে উধাও হইয়া চলিয়াছে,—"হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনোখানে।" যৌবনের চোখে মায়া-কাজল—"যে-মায়া ফাল্গুন মাসের দক্ষিণ হাওয়ায়, যে-মায়া শরৎ ঋতুতে সূর্যাস্তকালের মেঘপুঞ্জে।" এই যৌবন-মায়াকে প্রমূর্ত করিয়া তুলিতে পারে—একমাত্র সঙ্গীত; ভাষার সাধ্য নাই তাহাকে রূপায়িত করিয়া তোলে। যৌবনের অশরীরী স্বপ্ন-কামনা, অস্ফুট হৃদয়াবেগের উপযুক্ত বাহন—সুর।

লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কবে,
সুরের ভিতরে লুকাইয়া কহি তাহারে।

তাই যৌবনধর্মী রবীন্দ্রকাব্য সঙ্গীতের সগোত্র; কথা ও সুর এখানে 'বাগর্থাবিব' বিরাজ করিতেছে।

স্থাণুর ন্যায় শুব্ধ অচপল হইয়া থাকা যৌবনের স্বভাববিরুদ্ধ। তাই রবীন্দ্রকাব্যলোকে স্থিতি বলিয়া কোনো কিছুই নাই—আছে উদ্দাম উধাও গতি, বাধাহীন বন্ধনহীন উদার মুক্তি। পর্বত এখানে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ হইতে চায় এবং তরুশ্রেণী পক্ষীর মত পাখা মেলিয়া উড়িবার জন্য ব্যাকুল। যৌবনের পক্ষে অচলায়তনের অন্ধকারায় বদ্ধ হইয়া থাকাটাই মৃত্যুর নামান্তর মাত্র। মৃত্যু চিরস্থির, তুহিনশীতল; তাহাতে নাই জীবনের স্পন্দন, যৌবনের বহ্নিতাপ। তাই জীবন-প্রেমিক যৌবনধর্মী কবির কল্পলোকের একমাত্র মূলমন্ত্র—চরৈবেতি চরৈবেতি। জগতের মর্মমূলেও আছে এই প্রচণ্ড উন্মত্ত অধীর গতিবেগ; 'গম্' ধাতু হইতেই 'জগৎ' শব্দটির উদ্ভব। রবীন্দ্রকাব্যসৃষ্টির অন্তর্লীন সুন্দর সুস্পষ্ট ক্রমাভিব্যক্তির ধারাটি অনুসরণ করিলে দেখা যায় তাহারও মূলে এই গতি। এই গতিশীলতাই শিল্পীর স্বভাবধর্ম। শিল্পীর নিরাসক্ত নবকৌতূহলদীপ্ত চিত্ত এ সংসারে কোনো কিছুকেই "যেতে নাহি দিব" বলিয়া অনন্তকাল আঁকড়াইয়া রাখিতে পারে না—পারিলে তাহার স্বধর্মচ্যুতি ঘটিতে বাধ্য। এক হাটে বোঝা লইয়া অন্য হাটে শূন্য করিয়া দেওয়াই শিল্পীর জীবনের মূলমন্ত্র। শিল্পীশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের চিরপ্রগতি-শীল হৃদয় কোনো পথের বাঁকে আসিয়া পাদমেকং ন গচ্ছামি বলিয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে নাই। সর্বপ্রকার বন্ধনমোচনের ঐকান্তিক আকুলতা, সংস্কার ও জড়ত্বের প্রতি আন্তরিক বিতৃষ্ণা এবং সর্বোপরি এক অনন্য-সাধারণ প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি রবীন্দ্রনাথকে চিরতারুণ্যের অক্লান্ত পতাকাবাহী করিয়া তুলিয়াছে।

যাহারা রবীন্দ্রকাব্যের মর্মমূলে প্রবেশ করিতে পারে নাই তাহাদের নিকট ইহার যৌবনধর্মিতা একটা মেরুদণ্ডহীন কোমল ভাববিলাস-মাত্র। তাহাদের বিশ্বাস লতাসুলভ পেলবতাই যৌবনধর্ম। এরূপ বিশ্বাস যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক তাহা বলাই বাহুল্য। কোমলের সহিত কঠোরের সংমিশ্রণ যে আদৌ অসম্ভব নয় তাহা সর্বজনবিদিত। যৌবন শুধু কুসুমকোমল নয়—বজ্রাদপি কঠোরও বটে। রবীন্দ্রকাব্যে যৌবনের রসাবেশ একটা নারীসুলভ নমনীয়তা অথবা রুগ্ন ভাবপ্রবণতা হইতে সঞ্চিত নয়, ইহার উৎস আরো গভীরে। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—উপনিষদের এই মৃত্যুহীন বাণী কবির জীবনকে নিবিড়ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। তাঁহার কল্পনা উর্বশীর মত আনন্দের সুধাপাত্র লইয়া হৃদয়ের অতলসিন্ধু হইতে জরামৃত্যুময় সংসারে আবির্ভূত হইয়াছে।

স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, আরাম ও বিলাসের সুনিশ্চিত কুসুমাস্তৃত পথেই যৌবনের সঞ্চরণ নয়—দুঃখদুর্দৈব তাহার নিত্যসহচর; ধ্বংস ও বিপদের শিয়রে বসিয়াও সে অকুতোভয়। "এক হাতে তার কৃপাণ আছে, আরেক হাতে হার"—ইহাই তাহার স্বরূপ। দুর্জয়ের জয়মালা তাহার কণ্ঠতটে, উল্লোল উদ্দামের উতরোল নৃত্যে তাহার বক্ষ স্পন্দিত।

ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী,
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহল-কোলাহল আনি
মোর গান হানি।

যৌবনের বুকে অনন্ত অনির্বাণ আশা। তাই যৌবনমদদৃপ্ত দুর্মর আশাবাদী কবি মৃত্যুকবলিত নশ্বর সংসারে থাকিয়াও মানবজীবনের সেই অব্যর্থ ভয়ঙ্কর পরিণতিকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন—

তোর নাহি করি ভয়,
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে
করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে সত্য আমি—এ বিশ্বাস প্রাণে দিব, দেখ্,
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।

হৃদয়-কুহর হইতে উদ্গারিত এই জ্বলন্ত অগ্নিগর্ভ বাণী কি শুধু একটা Pose? ইহার উদ্ভব—জগতের অন্তর্নিহিত অথচ জগদাতীত এক সর্বব্যাপী আনন্দময় সত্তার অস্তিত্বে ধ্রুব অচপল বিশ্বাস। এই আনন্দময় সত্তার উপলব্ধি কবির হৃদয়-বীণার তন্ত্রীতে সঙ্গীতের ঝঙ্কার তুলিয়াছে। তাই তাঁহার কাব্য সঙ্গীতলক্ষণাক্রান্ত এবং যেখানে গীতি সেইখানেই গতি।

যৌবনধর্মী বলিয়াই রবীন্দ্রকাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ইহার রোমান্টিক ভাববিহ্বলতা ও স্বপ্নালুতা। রঙীণ রোমান্টিক কাঁচের ভিতর দিয়া এই স্থূল প্রাত্যহিক জীবনকে দেখাই যৌবনধর্ম এবং এইরূপে দেখিলে বস্তুজগতে কুশ্রীতা, কদর্যতা কিছুই নাই; সবই সুন্দর, সুঠাম, সুবলয়িত—মধুরং মধুরং মধুরং। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে—জগৎ ও জীবন কি সত্যই এত সুন্দর, এত লোভনীয়? —"The world is more full of weepjng than you can understand!" জগৎ ও জীবন যতই কুশ্রী, কদর্য হোক্, যৌবন তাহাকে "আপন মনের মাধুরী" মাখাইয়া সুন্দর করিয়া তোলে। রবীন্দ্রকাব্যজগৎ এই আপন হৃদয়ের মাধুর্যে অভিসিঞ্চিত এক অপূর্ব আনন্দলোক।

রবীন্দ্রকাব্যের সুদৃঢ় সুবিশাল আশাবাদও তাহার যৌবনমুখিতা হইতে উদ্ভূত। যৌবনের নেত্রে মনোহর স্বপ্নাঞ্জন এবং স্বপ্ন দেখিতে পারে বলিয়াই মানুষ এখনও জীবনকে নিতান্ত দুর্বিষহ মনে করে না। যৌবনের নিকট "Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter." যাহা কিছু দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য তৎপ্রতি তাহার অনুরাগ। এ যেন

• The devotion to something afar
From the sphere of our sorrow.

কবিগুরুর অমুসৃত আশাবাদ বলিষ্ঠ, পুরুষোচিত। দুঃখ-দুর্দৈব, বাধা-বিঘ্নের সম্মুখে ইহা মাথা নত করে না, এমন কি মৃত্যুর মধ্যেও অমৃত, অধ্রুবের অন্তরালে ধ্রুবের অস্তিত্বকে অহরহ উপলব্ধি করে। কবির কণ্ঠে অনন্ত আশার বাণী। তাই তিনি আপাতদৃষ্টিতে যাহা ব্যর্থ তাহারো মধ্যে সার্থকতা খুঁজিয়া পাইয়াছেন···

যে ফুল না ফুটিতে ঝরিল ধরণীতে,
যে-নদী মরুপথে হারালো ধারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।

কবির বিশ্বাস যৌবনের মধ্যেই জীবনের সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা।

এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, যৌবনের মধুর স্বপ্নজড়িমা ও রসাবেশ কবিকে চিরকালের জন্য "ভাবের ললিত ক্রোড়ে" নিলীন করিয়া রাখিতে পারে নাই—দুঃখদৈন্যজর্জ্জরিত সংসারের বিশাল কর্ম-ক্ষেত্রের আহ্বানেও তাঁহাকে সাড়া দিতে হইয়াছে। দুর্বল অসতর্ক-মুহূর্তে তরল ভাববিহ্বলতার নিকট আত্মসমর্পণ করিবামাত্র কবিচিত্ত ব্যথিত ও অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়াছে; "অশ্রুজলে চিরশ্যাম" এই জগতের করুণ ক্রন্দনকে কবি কোনোমতেই উপেক্ষা করিতে পারেন নাই।

রবীন্দ্রকাব্যলোক চিরযৌবনের লীলাভূমি, কিন্তু তাই বলিয়া সেই আনন্দময় জগতে কেবলমাত্র লতাপুষ্প, চন্দ্র-চকোর ও মাধবী-যামিনীর ব্যাকুল বিরহ নাই। সেখানে কর্তব্যের কঠোর আহ্বান যৌবনের রঙীণ মোহঘোরকে লূতাতন্তুর ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়; দুঃখদেবতার রথচক্রধ্বনি ও মৃত্যুর কলগর্জ্জনও সেখানে ধ্বনিত হয়!
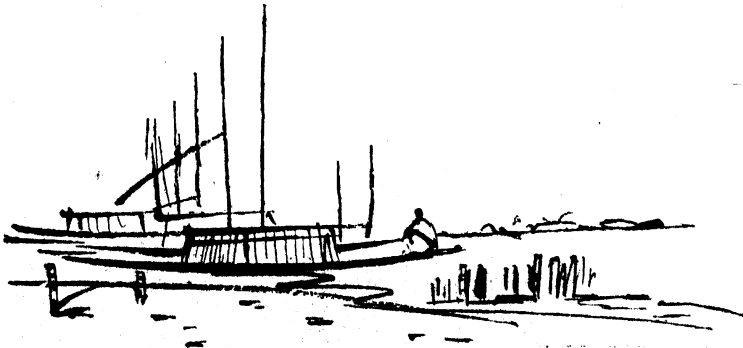
স্বরাজের পথে অছি দেশ

অধ্যাপক শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

পৃথিবীর নানাদিকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের কলোনীগুলি ছড়াইয়া আছে। এই সকল দেশের শাসন ও শোষণ ব্যাপারে শাসকগোষ্ঠি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে এবং এজন্য অপর কোন শক্তির নিকট উহাকে জবাবদিহি করিতে হয় না। তবে শাসককে নিজ স্বার্থেই শাসিতের প্রতি কিছুটা ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিতে হয়। তাহাদের আর্থিক স্বার্থের প্রতি কিছুটা নজর দিতে হয়। শাসকজাতির নিজ স্বার্থই সেখানে বড় এবং প্রত্যক্ষ, শাসিতের স্বার্থ গৌণ। শাসকেরা মুখে যাহাই বলুক না কেন, তাহাদের নিজ স্বার্থেই পরাধীন উপনিবেশগুলি শাসিত হয়। এজন্যই আজও শাসক ও শাসিতের সংগ্রাম পৃথিবীর নানাদেশের ইতিহাসকে রক্তরঞ্জিত করিতেছে, সেই সকল অঞ্চলে চলিতেছে শাসক-নীতির নির্লজ্জ অত্যাচার এবং দেশভক্তগণের স্বাধীনতালাভের জন্য আমরণ সংগ্রাম।

কিন্তু এই সকল পরাধীন দেশের বাহিরে আরও কতগুলি অধীন দেশ আছে যেখানে শাসক জাতি অছিরূপে দেশ শাসন করে—পরাধীন দেশের নিজের স্বার্থেই এই সকল দেশ শাসিত হয়। এই সকল অছি-দেশকে স্বরাজের পথে লইয়া যাওয়াই শাসকের উদ্দেশ্য এবং প্রতিবৎসর শাসককে উহার শাসিত দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্পর্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট বিবরণী দাখিল করিতে হয়। রাষ্ট্রসংঘের অছি-পরিষদের একটী ক্ষুদ্র তদন্তকমিটি প্রতি বৎসর এই সকল দেশের লোকদের অবস্থার বিষয়ে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান করে এবং অধিবাসিগণের নিজেদের মুখ হইতে তাহাদের অভাব অভিযোগ, আশা ও আকাঙ্খার কথা শুনিয়া রিপোর্ট দেয়। এই সকল দেশের যে কোন অধিবাসী লিখিতভাবে নিজের, দেশের বা দেশবাসীর কোন অভাব অভিযোগের বিষয় রাষ্ট্রসংঘের গোচরে আনিতে পারে। এরূপ ব্যক্তিগত অধিকার অনেক স্বাধীনদেশের নাগরিকদেরও নাই। প্রত্যেকটী অভাব-অভিযোগের পত্র রাষ্ট্রসংঘ আলোচনা করে ও মতামত দেয়। আবেদনকারী নিজে রাষ্ট্রসংঘের সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার বক্তব্য বলিতে পারে, রাষ্ট্রসংঘ আগ্রহের সহিত বক্তব্য শুনিয়া থাকে এবং যথাকর্তব্য করিয়া থাকে।

প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) পরে যুদ্ধে-পরাজিত জাতিসমূহের শাসিত কতকগুলি উপনিবেশ যুদ্ধে জয়কারী জাতিসমূহের হস্তগত হয়—ঐ সকল দেশ পরে লীগ-অব-নেশনের ম্যাণ্ডেট (অনুমতি) বলে ঐ সকল জাতি শাসন করিতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে (১৯৩৯-১৯৪৫) পৃথিবীর ইতিহাস আরও ওলট-পালট হইয়া যায়। ১৯৪৫ সনে যুদ্ধজয়ী জাতিগণ বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রসংঘ গঠন করিয়া এই সকল ম্যাণ্ডেট-ভুক্ত দেশসমূহের দায়িত্ব গ্রহণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করে। অবশ্য লীগ অব নেশনের পরিসমাপ্তির পর রাষ্ট্রসংঘ [illegible] প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকারী হিসাবেই এই নুতন দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু প্রায় সকল জাতি রাষ্ট্রসংঘের এই দায়িত্বগ্রহণের ক্ষমতা স্বীকার করিয়া লইলেও দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার রাষ্ট্রসংঘের এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লয় নাই। এজন্য দক্ষিণ-পশ্চিম-আফ্রিকা (প্রাক্তন জার্ম্মাণ উপনিবেশ) আজও অছি এলাকাভুক্ত হয় নাই। অবশ্য রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ বা জেনারেল এসেম্ব্লির অধিকাংশ সদস্যই দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের এই মত স্বীকার করে নাই।

পৃথিবীতে উপনিবেশ'-রক্ষণাধীন (Protectorate) বা অপর যে যে কোন নামেই হউক বহু পরাধীন দেশ আছে। শাসক দেশগুলি এই সকল পরাধীন দেশের পঞ্চান্নটী দেশকে রাষ্ট্রসংঘের সনদের ঘোষণার অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করে। ইহার বাহিরের পরাধীন দেশগুলি রাষ্ট্র-সংঘের ঘোষণার আওতায় পড়িবে কিনা বিতর্কের বিষয়। রাষ্ট্রসংঘের ঘোষণার আওতায় পড়িলেই যে রাষ্ট্রসংঘের এই সকল দেশ সম্পর্কে দায়িত্ব খুব বেশী তাহা নহে—তবে লীগ-অব-নেশনের আমলে এই সকল দেশের সহিত বিশ্ব প্রতিষ্ঠানের যে সম্পর্ক ছিল, আজ রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে পরাধীন দেশসমূহের সম্পর্ক বিশ্ব প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে। কিন্তু দশটী অছিদেশ এবং উহার দুই কোটী অধি-বাসী সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের দায়িত্ব খুবই পরিষ্কার ও প্রত্যক্ষ। রাষ্ট্রসংঘের সনদের আদর্শ অনুযায়ী এই সকল অছিদেশের পরিচালন ও শাসন ব্যাপারে রীতিমত পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শনের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে একটী পরাধীন উপনিবেশ বা রক্ষণাধীন দেশের সঙ্গে একটী পরাধীন অছিদেশের কি তফাৎ। বাহির হইতে খুব বড় রকমের পার্থক্য দেখা যায় না ইহা খুবই সত্য। ইটালীর অধীন সোমালীল্যাণ্ড এবং ট্যাঙ্গানিকা এই দুইটী অছিদেশ পূর্ব্ব-আফ্রিকার বৃটিশ কলোনী কেনিয়ার খুব সন্নিকট, আফ্রিকার মধ্যবর্ত্তী বেলজিয়ান কঙ্গোর পাশেই অছিদেশ রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডী; আরও তিনটী অছিদেশ—দুইটি কেমারুন, ফরাসী শাসিত টোগোল্যাণ্ডের পাশেই ফরাসী এবং বৃটিশ রক্ষণাধীন (Protectorate) দেশসমূহ। একই শাসন-অধীন একটী অছিদেশ, অপরটী কলোনীমাত্র—কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট এবং মৌলিক। শাসকদেশ নিছক নিজ অধিকার বলে উপনিবেশ বা কলোনী শাসন করে, কিন্তু উহা যখন একটী অছিদেশ শাসন করে—এই শাসনের অধিকার সে পায় রাষ্ট্রসংঘের চুক্তি হইতে। চুক্তির সর্ত এই যে শাসিত অধিবাসীগণকে শাসক একটি উন্নত আদর্শে পৌছাইয়া দিবে। এই সকল অনুন্নত জনসমষ্টিকে তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী ক্রমে ক্রমে স্বায়ত্ত-শাসনে স্বাধীনতায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অবস্থানুযায়ী এই আদর্শে পৌছিতে অল্প বা বেশী সময় লাগিতে পারে।

অছিদেশসমূহের সংখ্যা দশটী মাত্র। গত দুইটী বিশ্বযুদ্ধে যে সকল অঞ্চল একেবারে নিরাশ্রয় বা 'পিতৃমাতৃহীন' হইয়াছে তাহারাই অছি-দেশে পরিণত হইয়াছে। প্রত্যেক অছিদেশ সম্বন্ধেই পৃথক পৃথক চুক্তি হয় এবং শাসকদেশ চুক্তি সর্ত্তে রাষ্ট্রসংঘের সনদ অনুযায়ী সমস্ত অধিকার পায় এবং দায়িত্ব গ্রহণ করে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা (প্রাক্তন জার্ম্মান উপনিবেশ) লীগ-অব-নেশনের ম্যাণ্ডেট-ভুক্ত দেশ হইলেও দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার রাষ্ট্রসংঘের অধিকাংশ সদস্যের মতের বিরুদ্ধে ইহাকে অছিদেশ বলিয়া স্বীকার করে নাই।

রাষ্ট্রসংঘের অধীন অছি এলাকাগুলি :—

অছি দেশে	শাসক দেশ	জনসংখ্যা	দেশের পরিমাণ (বর্গ মাইল)
(১) ক্যামারুন্স	যুক্তরাজ্য	১৫,০০,০০০	৩৪,০৮১
(২) ট্যাঙ্গানিকা	যুক্তরাজ্য	৮২,০৫,৪০০	৩,৬২,৬৮৮
(৩) ক্যামারুন্স	ফ্রান্স	৩১,০০,০০০	১,৬৬,৭৯৭
(৪) টোগোল্যাণ্ড	ফ্রান্স	১০,৭০,০০০	২১,২৩৬
(৫) রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি	বেলজিয়ম	৪২,৭০,৯০৫	২০,৯১৬
(৬) সোমালীল্যাণ্ড	ইটালী	১২,৬৩,৫৪৮	১,৯৪,০০০
(৭) পশ্চিম স্যামোয়া	নিউজিল্যাণ্ড	৯৬-০০০	১,১৩৩
(৮) নাউরু	অষ্ট্রেলিয়া	৩,২৪৪	৮২
(৯) নিউগিনি	অষ্ট্রেলিয়া	১১,০০,২৫০	৯৩,০০০
(১০) প্যাসিফিক দ্বীপসমূহ	যুক্তরাষ্ট্র	৬৪,২৯০	৬৮৭

রাষ্ট্রসংঘের তিনটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান—অছিদেশগুলি রীতিমত পরিচালিত হইতেছে কিনা এই বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখে। অছি দেশ-সমূহের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সাধারণ পরিষদ বা জেনারল অ্যাসেম্বলি—এই প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রসংঘের প্রত্যেক সদস্য দেশের প্রতিনিধি রহিয়াছে। কিন্তু অছিএলাকার প্যাসিফিকদ্বীপসমূহ (যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালনাধীন) সামরিক গুরুত্বের জন্য সাধারণ পরিষদের অধীন নহে, রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ও সিকিউরিটী কাউন্সিল ইহার তত্ত্বাবধায়ক। রাষ্ট্র-সংঘের সনদের বিধান অনুযায়ী অছি-পরিষদ বা ট্রাষ্টিসিপ কাউন্সিল সাধারণ এবং নিরাপত্তা পরিষদকে এই সকল দেশের প্রতি অছির কর্ত্তব্যপালনে সহায়তা করে।

অছি-দেশসমূহ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে সাধারণ পরিষদে উহা দুই-তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্যে পাস হওয়া দরকার। যে সকল রাষ্ট্র অছি-দেশ পরিচালন করে তাহারা অছি-পরিষদের সভ্য। চীন ও সোভিয়েট রাশিয়ার অধীনে কোন অছি-দেশ নাই, কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসাবে ইহারা অছি-পরিষদের স্থায়ী সভ্য। ইহা ব্যতীত সাধারণ পরিষদ প্রতি তিন বৎসরের জন্য অছি-পরিষদে অপর পাঁচজন সভ্য নির্ব্বাচিত করিয়া থাকে। ১৯৫৫ সালের পূর্ব্বে ইটালী রাষ্ট্রসংঘের সদস্য না হইয়াও অছি-পরিষদের সভ্য ছিল। কিন্তু ইহার কোন ভোট দিবার অধিকার ছিল না। ১৯৫৫ সালে ইটালী রাষ্ট্রসংঘের সদস্য নির্ব্বাচিত হওয়ায় ইহা প্রথম অছি-পরিষদের 'পূর্ণ' সদস্য হইয়াছে। ইটালী একটা পরামর্শ সভার সাহায্যে সোমালীল্যাণ্ড শাসন করে—এই সভার সভ্য ইজিপ্ট, কলম্বিয়া এবং ফিলিপিন দেশের প্রতিটি।

১৯৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে অছি-পরিষদ নিম্নলিখিত ১৫ জন সভ্য লইয়া গঠিত ছিল :

শাসক সভ্য :—অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইটালী, নিউজিল্যাণ্ড, যুক্তরাজ্য এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র।

অ-শাসক সভ্য : চীন, সোভিয়েট রাশিয়া, (এবং নির্ব্বাচিত) বারমা, গায়েটামালা, হাইটি, ভারত ও সিরিয়া।

প্রতি বৎসর অছি-দেশের শাসককে সাধারণ পরিষদে (সামরিক গুরুত্ব অঞ্চলের জন্য নিরাপত্তা পরিষদে) রাষ্ট্রসংঘের অছিগিরির মূল-নীতি ও আদর্শের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বার্ষিক বিবরণী পেশ করিতে হয়। কোন্ কোন বিষয়ে বিবরণী দিতে হইবে অছি-পরিষদই তাহা নির্দ্ধারণ করে। অছি-পরিষদে সমালোচনা এবং প্রশ্নের আর শেষ নাই—এই সকলের জবাবে শাসিত জাতির গৃহকোণের অনেক সন্ধান দেশের রাজনৈতিক দল, হাঁড়িকুড়ির আমদানী রপ্তানী, দেশের বহুবিবাহের কারণ, জলের সরবরাহের নলের দৈর্ঘ্য প্রভৃতি বহু খবর পাওয়া যায়।

শাসক অবশ্য বিবরণীতে নিজেদের মতামত এবং সমস্যাগুলি সম্বন্ধে সমাধানের উপায় নির্দ্দেশ করে। এই মতের সহিত শাসিতের মতের মিল হইবে এরূপ সম্ভাবনা নাই। তাহারাও নিজেদের মত যাহাতে প্রকাশ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থাও আছে।

এজন্যই সেই সকল দেশ পরিদর্শনের প্রশ্ন আসে। তাহাদের নিকট হইতে যে সকল আবেদন পাওয়া যায় তাহারও পরীক্ষা বা অনুসন্ধানের দরকার হয়; অছি-দেশের যে কোন পুরুষ, নারী বা শিশু তাহাদের আশা, আকাঙ্খা, অভিযোগ এবং দাবীর বিষয় সরাসরি রাষ্ট্রসংঘকে জানাইতে পারে—কাহারও মারফৎ আবেদন পাঠাইতে হয় না। প্রতিবৎসর অছি-দেশের ভিতরের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বাহিরের হাজার হাজার লোক, ব্যক্তিগতভাবে দল বাঁধিয়া বা ছোট বড় সমিতির মাধ্যমে এই অধিকারের সুবিধা গ্রহণ করিতেছে।

অদ্ভুত রকমের চিঠিপত্র পাওয়া যায়—হয়ত টোগোল্যাণ্ডের একটা ছেলে লিখিল—কবে তাহার গ্রামে রেল লাইন যাইবে। প্রাপ্তবয়স্ক কেহ জানিতে চাহিল—কবে তাহার দেশ স্বাধীনতা পাইবে। একজন ক্যামারুণ-জমী খঞ্জ একখানি কাঠের পায়ের জন্য আবেদন করিল। পশ্চিম স্যামোয়াজয়ী স্বায়ত্বশাসনের জন্য দরখাস্ত করিল। এক প্রশান্ত-সাগরীয় দ্বীপের নারীরা জানাইল—তাহাদের পুরুষগণ যাহাতে কড়া মদ অল্প পরিমাণে খায় তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মেগোডিসিও হইতে পাধার গাড়ীর চালকেরা বেশী টেক্স দিতে হয় বলিয়া প্রতিবাদ জানাইল। এই সকল আবেদন কেবল চিঠি লেখা, আর ডাকে পাঠান নহে—ইহা অপেক্ষা অনেক কিছু বেশী। আবেদনকারী নিজে রাষ্ট্র-

সংঘের নিকট উপস্থিত হইয়া বক্তব্য নিবেদন করিয়াছে ইহাও বহুবার দেখা গিয়াছে। আবেদনের বক্তব্য সহানুভূতির সহিত বিবেচিত হয় এবং তাহাতে কিছু করিবার থাকিলে নিশ্চয়ই করা হয়। ১৯৫৬ সনের শেষের দিকে আফ্রিকার ছয়টা অছি-দেশের প্রায় কুড়িজন প্রতিনিধি অছি-পরিষদ এবং সাধারণ-পরিষদে কয়েকবার উপস্থিত হইয়াছিল। কয়েকজন রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে এবং কেহ কেহ দেশের জমিতে জাতীয় অধিকারের কথা বলিতে আসিয়াছিল।

অবশ্য দরখাস্ত করিলেই সবকিছু পাওয়া যায় ইহা না হইলেও দরখাস্ত করা এবং উহার বিবেচনার মধ্যে যে অধিকার সূচিত হয় তাহার গুরুত্ব খুবই। আন্তর্জাতিক তদারকিতে ইহা সম্ভব হইতেছে—তাহাও কম কথা নহে। এই কারণেই প্রতি বৎসর পৃথিবীর সুদূর প্রান্ত হইতে হাজার হাজার আবেদন নিবেদন রাষ্ট্রসংঘের দরবারে প্রেরিত হয়।

আর এক উপায়ে অছি-পরিষদ আন্তর্জাতিক কর্ত্তব্য সম্পাদনা করে। এই সকল অছি দেশে পর্য্যবেক্ষক বা পরিদর্শক দল পাঠান হয়—যাহাদের বলা হয় অছি-পরিষদের "চক্ষু এবং কর্ণ।" ইহারা অছি-দেশে যাইয়া নানা বিষয়ের তদন্ত করে। শাসকরাষ্ট্রও এই তদন্তে আপত্তি করে না। লীগ-অব-নেশনের সহিত এইখানে রাষ্ট্রসংঘের ম্যাণ্ডেটের দেশ ও অছিদেশের পার্থক্য।

১৯৪৭ সন হইতে এরূপ তদন্তের কাজ চলিতেছে। অছিপরিষদের মিশন এক এক এলাকায় ৩।৪টী অছিদেশ একবৎসরে পরিদর্শন করে। প্রতি তিন বৎসরে এইভাবে প্রত্যেক অছিদেশ একবার পরিদর্শন হয়। সাধারণতঃ পরিদর্শক মিশনে চারিজন সদস্য থাকে—দুইজন শাসক দেশের এবং দুইজন অ-শাসক দেশের প্রতিনিধি। ১৯৫৬ সনে, গায়েটামালা, বেলজিয়ম, ভারত এবং ইংলণ্ডের প্রতিনিধি উড়োজাহাজে নিউইয়র্ক হইতে পশ্চিমে রওনা হইয়া মহাসাগর অতিক্রম করিয়া প্রশান্ত-সাগরীয় দ্বীপসমূহে অবতরণ করে এবং স্কুল ও হাসপাতাল পরিদর্শন করে, আর স্থানীয় লোকদের সহিত মেলামেশা করে। সেখান হইতে পরে তাহাদিগকে দেখা যায় নিউগিনির রাস্তায় জীপ-গাড়ীতে—স্থানীয় শাসনকর্ত্তা, ডাক্তার এবং মিশনারীর সহিত তাহাদের আলাপ-আলোচনা হয়; গ্রামোয়ার সর্দ্দার ও নেতারা তাহাদের অভ্যর্থনা জানায়। অতঃপর তাহাদের চোখে পড়ে নাউরু দ্বীপের মূল্যবান ফস্‌ফেট কোরাল টিবির বিরাট অরণ্য। বহু বৈচিত্র্যময় এই অভিজ্ঞতার বিষয় আলোচনা করতে করতে মিশনের সভ্যেরা ফিরিয়া যায় নিউইয়র্কের হেডকোয়ার্টারে।

ইহার পূর্ব্ব বৎসর মিশন গিয়াছিল পশ্চিম আফ্রিকায়। কাজ প্রায় একরকম। কিন্তু সেখানকার লোকেরা বেশী সজাগ, লেখাপড়ায় একটু অগ্রসর এবং রাজনৈতিক চেতনাও বেশী। মিশনের পদে পদে তাহাদের সহিত কথা বলিতে হইয়াছে, তাহাদের বহু বক্তৃতা যুক্তিতর্ক এবং দাবী শুনিতে হইয়াছে। আর গ্রহণ করিতে হইয়াছে বহু আবেদন-নিবেদন পত্র।

অছি দেশের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হইতেছে টেঙ্গানিকা—লোকসংখ্যা আশী লক্ষের উপর—সর্ব্বাপেক্ষা ছোট নাউরু—লোকসংখ্যা তিন হাজারের কিছু বেশী। রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডিতে চল্লিশ লক্ষের বেশী লোক হ্রদ ও বন্ধুর পার্ব্বত্য দেশে ঠাসাঠাসি করিয়া বাস করে। ইটালীর সোমালী-ল্যাণ্ডে পনরলাখ যাযাবর বা অর্দ্ধ-যাযাবর অধিবাসী সমগ্র তীরবর্ত্তী উষর দেশে স্ত্রীপুত্র লইয়া অবিরাম ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নিউগিনির লক্ষ লক্ষ লোক মাত্র কিছু দিন পূর্ব্বে সভ্য-সরকারের আওতায় আসিয়াছে।

প্রতিদিনই এই সকল দেশের চেহারা বদলাইতেছে। বিভিন্ন অছি-দেশের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। ফরাসী ক্যামারুনে আধুনিক কারখানা ও সহর গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আরও ভিতরে কয়েক শত মাইল গেলে, সাহারা মরুভূমির গায়ে, দেখা যায় স্যাঁৎসেঁতে গ্রীষ্মমণ্ডলের গভীর অরণ্য! সেখানে দেখা যায় রৌদ্রে শুকান ইঁটের বাড়ীর সহর, পাগড়ী-পরা সর্দ্দার, রঙীণ পোষাকের অশ্বারোহী, সিঙ্গা ও দামামার বাদ্য—স্বতঃই মনে হয় যেন ইহা এক মধ্যযুগীয় মুসলীম রাজ্য। রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডিতে পাহাড়ে থাক্ কাটিয়া কত যত্নের ফসল চাষ, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপের কেরোল তট—আর মনোরম নারিকেল গাছের শ্রেণী এবং নিউজিল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে পার্ব্বত্য ঘনবনানীর মাথায় তুষার লাঞ্ছন—এই পরস্পর বহু ব্যবধানে অবস্থিত অছিদেশগুলির বিভিন্ন রূপ কতই না আগ্রহের সঞ্চার করে।

দেশে দেশে বিভিন্নরূপ ত বটেই, দেশের মধ্যেও মানুষের চেহারা বিভিন্ন। টেঙ্গানিকায় দেখা যায় মাসাই জাতির লোক পশু চরাইতেছে, ভারতীয় ছেলে স্কুলে যাইতেছে, আর দেখা যায় ইউরোপীয় সিসল তন্তুর কুঠীয়াল বা প্লাণ্টার। ক্যামারুণে দেখা যায় একদিকে ফরাসী মাইনিং বা খনির ইঞ্জিনিয়ার, অপর দিকে উচ্চ ভূমিতে পশু পালন করিতেছে ফুলানী জাতের লোক। নিউগিনির পর্ব্বতে পাথরের কুঠার লইয়া আজও ভুনা শিকারী ঘুরিয়া বেড়ায় পশুর সন্ধানে। ক্ষুদ্র নাউরু দ্বীপে দেখা যায় চীনা শ্রমিক ফস্‌ফেট খুঁড়িতেছে, আর প্রশান্তসাগরীয় দ্বীপে চোখে পড়ে সাইপেনা চর্ম্মকার বা নৌকা নির্ম্মাতা। মাঝে মাঝে দেখা যায় শাসক দেশের—এমনকী রাষ্ট্রসংঘের বিশেষজ্ঞগণ ছোট ছোট দলে কর্ম্মব্যস্ত। ইউরোপীয় কার্ম্মার বা চাষী, কুঠীয়াল, খনির মালিক এবং ব্যবসায়ীও দেখা যায়—খুব অল্প সংখ্যায়—টেঙ্গানিকা, ফ্রেঞ্চকামারুণ বা নিউগিনি অঞ্চলে। বড় বড় সহরে বহু জাতের মানুষের মধ্যে দেখা যায়—ব্যবহারজীবী, করণিক, ব্যবসাদার, ফিরিওয়ালা এবং আরও কতকি।

যখন আমরা সংখ্যাধিক্যের কথা বলি, আমরা গ্রামাঞ্চলের লোকের কথাই মনে রাখি। পল্লী-অঞ্চলের লোকেরা সংখ্যায় লক্ষ লক্ষ। অপরের সহিত তুলনা করিলে ইহাদের জীবনধারণের মান খুবই ছোট এবং তাহাদের জীবনের পরিবেশ সমস্তই নিম্নস্তরের। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অছিদেশের লোকেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষী, বাস করে সে নিজের এক বা একাধিক স্ত্রী এবং পুত্রকন্যা লইয়া পরিষ্কার জঙ্গল কিম্বা তৃণাচ্ছাদিত সমতল ভূমিতে। সে পালন করে কয়েকটা ছাগল বা

অনেকগুলি গরু মহিষ। ঝড়ে জলে ভিজিয়া বা রৌদ্রে পুড়িয়া যে যাহা উৎপাদন করে তাহা খাইয়া-পরিয়া জীবন যাপন করে। সে আর তাহার পরিবারের লোকেরা সাধারণতঃ খাদ্য উৎপাদন করে নিজেদের ভরণ-পোষণের জন্য—অতিরিক্ত উৎপাদন করিলে ন্যায্যমূল্যে তাহা বিক্রয় করিয়া আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কেনে।

তাহার জগত ক্ষুদ্র জগত। তাহার জগতের সীমা অনেক সময় গ্রামের সীমায় শেষ বা কাছাকাছি সহরের সীমা পর্য্যন্ত, বড় জোর তাহার জাতের লোকেরা যতদূর পর্য্যন্ত বাস করে সেই পর্য্যন্ত প্রসারিত। কিন্তু সে মাঝে মাঝে বহির্জগতের খবর পায়, বিশেষতঃ যখন শাসক-জাতির কর্ম্মচারীকে দেখে। লেখাপড়া প্রায় কেহই জানে না, যাহারা মিশনারী স্কুলে পড়িয়াছে হয়ত কিছু কিছু সামান্য জানে। ছেলেমেয়েরা সম্ভবতঃ কিছু লেখা-পড়া শিখিতেছে।

অনেক ক্ষেত্রে তাহার প্রথম আনুগত্য জাতির সর্দ্দার বা চীফের প্রতি। এই সকল সর্দ্দারের উপরে অবশ্য জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্দ্দার বা চীফ আছে। ইহার উপরেও এক ইউরোপীয় শক্তি আছে ইহাও হয়ত তাহার জানা। তাহার জাতের কিংবদন্তী, বিশ্বাস, আচার ব্যবহার, সু বা কুসংস্কার, পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্ম যদিও কিছুটা কিম্বা অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কিন্তু লোপ পায় নাই এবং এই সকলই তাহার প্রতিদিনের জীবনযাত্রা ও চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত করে।

কিন্তু আদিম লোক যে একেবারে আদিম আছে তাহা নহে। আজ শাসকের ক্ষমতার অপব্যবহার, অনশন মৃত্যু এবং মহামারীর ভয় কমিয়াছে। পুরাতন সংস্কার আর পূর্ব্বের মত নাই। বাহিরের জগত আজ আনিয়াছে নূতন জ্ঞানের আলো। নূতনের শক্তি তরুণদলে প্রাণ লইয়া উঠিতেছে। আজ সে বেশী খাদ্য, ভাল খাদ্য ফলাইতে শিখিয়াছে। এরূপ সব ফসল সে ফলায়, যাহা দেশের বাহিরের বাজারে বেশী মূল্যে বিক্রয় হয়। আজ তাহার দেশে রাস্তা-ঘাট তৈরী হইতেছে, সে পথে পণ্যের দ্রব্য আমদানি রপ্তানী হয়। স্কুল, ডাক্তারখানা, আদর্শ কৃষিক্ষেত্র—তাহার দেশের ভিতরে নানা স্থানে স্থাপিত হইয়াছে।

অবশ্য এই সকল উন্নতি খুব সহজে হয় নাই। পূর্ব্ব-আফ্রিকায় লোকের অকর্ম্মণ্য গরুর সংখ্যা কমাইতে খুবই বেগ পাইতে হইয়াছিল, কারণ বহু গরুর মালিকানা ছিল সেদেশে বহু সম্মানের। পশ্চিম আফ্রিকার লোকেরা ছেলেদের স্কুলে পাঠাইতে চাহে নাই—কারণ মাঠে কাজ-করা ছেলে অপেক্ষা স্কুলে-পড়া ছেলের মূল্য যে বেশী একথা তাহাকে বুঝান খুবই শক্ত।

সকল আধুনিক উন্নতিতেই যে তাহাদের মঙ্গল হইয়াছে তাহা নহে। ইউরোপীয় খনির কাজে মজুরীর লোভে লম্বা ঘণ্টায় অল্প মজুরী তাহাদের ক্ষতি করিয়াছে। স্বাস্থ্যপূর্ণ গ্রাম ছাড়িয়া তাহাকে অস্বাস্থ্যকর বস্তীতে বাস করিতে হইতেছে। স্কুল, ডাক্তারখানা খুব বেশী হইয়াছে কি? যাহারা অল্প লেখাপড়া শেখে অল্প দিনেই তাহা ভুলিয়া যায়। আবার তা নিরক্ষর।

রাষ্ট্রসংঘ তথা উহার সাধারণ পরিষদ এবং অছি-পরিষদ সকল সময়ই অছি দেশসমূহের সর্ব্ববিধ উন্নতির চেষ্টা করিতেছে। অছি-দেশের অধিবাসিগণের ব্যবসা বাণিজ্য বাড়ে, কৃষি উন্নত হয়, উৎপাদন এবং খাদ্য সমবায় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়, করভার যাহাতে সমভাবে প্রচারিত হয়, রাস্তা, স্কুল এবং আরোগ্যশালা যাহাতে নির্ম্মিত হয়, শিক্ষক-শিক্ষণ ও ডাক্তারের সংখ্যাবৃদ্ধি—প্রভৃতি বিষয়ে সকল সময়ই রাষ্ট্রসংঘ সজাগ। শাসকদেশসমূহকে এই সকল বিষয়ে উপদেশ ও নির্দ্দেশ দেওয়া রাষ্ট্রসংঘের প্রধান কার্য্য। বহির্জ্জগতের সহিত সম্পর্শে আসিয়া এই সকল দেশের লোকের রাষ্ট্রীয় চেতনা হইয়াছে—শিক্ষা ইহাদিগকে আধুনিক গণতন্ত্রের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছে। শিক্ষাই গণতন্ত্রের বাহক, ধারক এবং পরিপোষক। কিন্তু শিক্ষা সকলে এক সঙ্গে পায় না। সহরে বাণিজ্যকেন্দ্রে এবং যেসকল স্থানে গবর্ণমেন্টের আপিস সেই সকল স্থানের লোকেরা বহির্জগতের সহিত বেশী সম্পর্কে আসে এবং প্রথমে শিক্ষিত হয়। একটা ছোট শিক্ষিতের দল এইরূপে গড়িয়া উঠে এবং ইহারাই নিজেদের প্রতিপত্তি ও প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তার করে। শিক্ষিতের মধ্যেই কেহ কেহ বিদেশে যাইয়া উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে। এই উচ্চশিক্ষিতেরাই হয় দেশের নেতা। পুরাতন আচার ব্যবহার, জাতির বংশগত প্রভুত্বের এবং 'বিদেশী' শাসকের অধিকার হয় বিরুদ্ধ-যুক্তির সম্মুখীন। ক্রমেই নূতন চিন্তাধারা দেশের লোকের মগজে প্রবেশ করে। শাসক দলে প্রতিনিধির স্থান, ভোটাধিকার, রাজনৈতিক দল গঠন, দেশের শাসননীতি এবং আইন প্রণয়নে কর্ত্তৃত্ব, স্বায়ত্বশাসন কিম্বা পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার—প্রভৃতি নানা প্রশ্ন জীবন্ত হইয়া দেখা দেয়। কোন কোন অছি দেশ এই সকল বিষয়ে বেশ কিছু অগ্রসর হইয়াছে, আবার কোথাও সবেমাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। ইহাই ক্রমবিকাশমান মনের সভ্যতা। শাসকগণকে এই আশাআকাঙ্ক্ষার সহিত পরিচিত থাকিয়া দেশকে অগ্রগতিতে সহায়তা করিতে হয়। প্রতিনিধিগণকে সকল কাজে সহযোগিতার জন্য আহ্বান করিতে হয়। কি শাসন কার্য্যে, বিধান কার্য্যে—জেলা পর্ষদ, গ্রামপঞ্চায়েৎ গঠনে নির্ব্বাচনের প্রবর্ত্তন করিতে হয়। কারণ এই সকল অছি-দেশের আদর্শ পূর্ণস্বরাজ লাভ এবং জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন। শাসক জাতি-সমূহের তথা রাষ্ট্রসংঘের কর্ত্তব্য এই আদর্শে যথাসম্ভব অল্প সময়ে পৌঁছিতে সহায়তা করা।

গত ৬ই মার্চ্চ ১৯৫৭ ব্রিটিশ টোগোল্যাণ্ড (পশ্চিম আফ্রিকা ট্রাষ্ট টেরিটরি) গোল্ডকোষ্টের সহিত মিলিত হইয়া স্বাধীন 'ঘানা' রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। মাত্র দশ বৎসর পূর্ব্বে টোগোল্যাণ্ড অছি-দেশ ভুক্ত হয় এবং এই স্বল্পকালের মধ্যেই ইহার স্বাধীনতা লাভ অছি-দেশসমূহের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সূচনা করে। আর একটা দেশ সোমালীল্যাণ্ড—১৯৬০ সনে স্বরাজ লাভ করিবে স্থির হইয়া আছে। যাহাতে এই দেশ আর্থিক ও অন্যান্য দিক হইতে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে তাহার আয়োজন চলিয়াছে।

গোল্ডকোষ্ট স্বাধীনতা পাইবে স্থির হইয়া গেল, কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী অছি

টোগোল্যাণ্ড যাহার বিস্তার ১৩,০০০ বর্গমাইল পর্যান্ত, তাহার কি গতি হইবে, রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের ইহাই একটা সমস্যা। ১৯৫৫ সালের কথা। একটী মিশনকে সেদেশে সমস্যার বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞার জন্য পাঠান হইল। মিশন তন্ন তন্ন করিয়া সমস্যাটী বিচার করিল এবং ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে নিজেদের প্রস্তাব পেশ করিল। সাধারণ পরিষদ স্থির করিল যে বৃটিশ টোগোল্যাণ্ডের লোকেরা নিজেরাই গণ ভোট দ্বারা স্থির করিবে যে তাহারা গোল্ডকোষ্টের সহিত মিলিত হইয়া স্বাধীনতা চায় কিনা—কিম্বা তাহারা আরও কিছুদিন অছি-দেশ রূপেই থাকিবে। রাষ্ট্রসংঘের পরিচালনায় ১৮৫৬ সালের ৯ই মে সেদেশে গণভোট লওয়া হইল—দেখা গেল ৯৩,৩৬৫ এই মিলন ও স্বাধীনতা লাভের স্বপক্ষে এবং ৬৭,৪২২ এই মিলনের বিপক্ষে। সাধারণ পরিষদ উহার একাদশ অধিবেশনে স্থির করিল যে—যেদিন গোল্ড:কাষ্ট স্বাধীনতা পাইবে সেই দিনই ব্রিটিশ টোগোল্যাণ্ড ঐদেশের সহিত মিলিত হইয়া স্বাধীনতা অর্জন করিবে এবং ঐ দেশের আদর্শ এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায় উহা আর অছি-দেশ থাকিবে না।

পৃথিবীর জনমত চায় শান্তি—বিশ্বশান্তি। এই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিদেশের স্বাধীনতা লাভ প্রয়োজন। ইহা রাষ্ট্রসংঘ স্বীকার পাইয়াছে। কিন্তু সকলেই সমান অগ্রসর নহে। খাদ্য, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার অভাব বহুদেশে আজও পূর্ণ মাত্রায়। এই সকলের সমাধান না করিলে জাতীর স্বাধীনতা অর্থহীন, বিশ্বশান্তি ত দূরের কথা। তাই রাষ্ট্রসংঘ ও ইহার সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ অবিরাম গতিতে যাহাতে খাদ্য সমস্যার সমাধান, ব্যাধির জয়, শিক্ষার এবং শিল্প ও কৃষির প্রসার, বিশ্বমানবের মিলন ও সহযোগিতা যাহাতে বৃদ্ধি পায় তজ্জন্য কাজ করিয়া যাইতেছে।

কবি শশাঙ্কমোহন সেন

হরিরঞ্জন দাশগুপ্ত

বঙ্গভারতীর মন্দির প্রাঙ্গণে বসে এই বিংশ শতকেই 'বঙ্গসাহিত্যের একজন দুরাকাঙ্ক্ষ অথচ অকৃতী সেবক' শান্ত সমাহিতচিত্তে নানা ছন্দে গান গেয়েছিলেন। তাঁর গানের সুরে ও ভাব-মহিমায় মুগ্ধ বঙ্গবাসী সেই অখ্যাত অথচ অকৃত্রিম সাহিত্য সাধককে অভিনন্দিত করেছিলেন, বিদগ্ধ সমাজ একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন তাঁর অসামান্য কবি-প্রতিভা, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'আপনার ভাষা ও কাব্যকলা সম্বন্ধে কিছু বলাই বাহুল্য'। কিন্তু বঙ্গবাণীর এই শক্তিমান কবি শশাঙ্কমোহনের কাব্যকুঞ্জে সাহিত্যরস-পিপাসু মধুকরের গুঞ্জন অতর্কিতে রুদ্ধ হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সাহিত্যে মানুষ নিজেরই পরিচয় দেয় নিজের অগোচরে—যেমন পরিচয় দেয় ফুল তার গন্ধে, তারা তার আলোকে। এই পরিচয় সমস্ত জাতির জীবনে জ্বালিয়ে তোলা অগ্নিশিখার মতো; তারই থেকে জ্বলে ভাবীকালের পথের মশাল, আর ভাবীকালের গৃহের প্রদীপ।' সমালোচক শশাঙ্কমোহন কবি-মাহাত্ম্য নির্দেশ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, 'প্রত্যেক প্রকৃত কবি নিজের কোন বিশেষ মাহাত্ম্য ও অননুকরণীয় বিশেষত্ব গুণেই—কবি-সাধকের ব্যক্তিত্বটুকুই সর্বদা এবং সর্বত্র, সর্বপ্রধান কথা। উহাই যাবতীয় সামর্থ্যের, মৌলিকতার কিংবা মাহাত্ম্যের নিদান।' শশাঙ্কমোহনের রচনায় তাঁর নিজের পরিচয়, অননুকরণীয় বিশেষত্ব ও ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর থাকা সত্ত্বেও তিনি আজ বিস্মৃতপ্রায়। গভীর সৌন্দর্যানুভূতি, মৌলিকতা, উচ্চ ভাবাদর্শ, ভাষার সৌষ্ঠব, কল্পনাশক্তির উদ্দামতা ও অসাধারণ কবিত্ব-শক্তি শশাঙ্কমোহনের রচনায় সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তবু তিনি আজো যথার্থ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেননি, অনিশ্চিত ভাবী-কালের সুবিচার তিনি পাবেন কিনা, কে জানে? শশাঙ্কমোহন নিজেই বলে গেছেন, 'সাহিত্যের চরম বিচার প্রণালী নির্মম ও নিরপেক্ষ পদার্থ। অনন্ত কালপ্রবাহের স্রোতোমধ্যে সর্বপ্রথমে আত্মতত্ত্বের উপর নির্ভয়ে দাঁড়াইতে না পারিলে এইরূপ বিচার লাভের যোগ্যতা অর্জন করা যায়না।' কিন্তু শশাঙ্কমোহন নিজে সেই যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিলেন।

শশাঙ্কমোহন স্বভাব-কবি ও ভাবুক। সিন্ধু জননীও শৈলশিখরই তাঁকে কাব্যমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিল। তিনি রচনা করেছিলেন—"সিন্ধু-তত্ত্বের কর্ম প্রণোদনা ও জ্ঞান প্রেম সৌন্দর্যের আদর্শে সমুজ্জ্বল কাব্য 'সিন্ধুসঙ্গীত', শৈলতত্ত্বের প্রেম স্বাধীনতা ও ধ্যানগত নাট্যকাব্য 'সাবিত্রী', অতুলনীয় ভাবসম্পদ-সমৃদ্ধ প্রেমগাথা 'স্বর্গে ও মর্ত্যে', সত্য শিবসুন্দরের অনুভূতিমূলক নানা ভাবছন্দোময় গীতিকাব্য 'ব্যোম সঙ্গীত', ভারতের অধ্যাত্মালোকে বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের বিভিন্ন আদর্শমূলক সাধনার দ্বন্দ্ব ও জয় পরাজয়ের কাহিনী 'বিশ্বামিত্র', 'নচিকেতা', 'তপতী' ও বহু অপ্রকাশিত খণ্ড কাব্য। তাঁর অভিনব প্রেমগাথা 'স্বর্গে ও মর্ত্যে' সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনার সাহায্যে আমরা এই 'অকৃতী সেবকে'র কাব্য কৃতিত্বের পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো।

আর্য ঋষিশিষ্য শশাঙ্কমোহনের সর্বোত্তম সৃষ্টি "স্বর্গে ও মর্ত্যে"। জনৈক সমালোচকের মতে এটি হলো "finest lovestory ever written"। এই কাব্যের অনবদ্য শিল্প মাধুর্য, সসীমের সঙ্গে অসীমের সমন্বয়-সাধন নৈপুণ্য ও প্রেমাশ্রুধারাপূত বিরহমিলন বিস্ময়-

হয়! এই একটিমাত্র কাব্যে কবির সমগ্র কবিপ্রতিভার পরিপূর্ণ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কাব্যরসপিপাসু পাঠক-পাঠিকা 'স্বর্গে ও মর্ত্যে' বর্ণিত প্রেমসুধা পান করে তৃপ্তি লাভ করবেন। ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির মর্মমূলনিহিত অবতারবাদ এই কাব্যে প্রেমিক-প্রেমিকার হাসিকান্নার উচ্ছল সমারোহে মূর্ত হয়ে উঠেছে। গীতার আদর্শ ও অধ্যাত্মবাদ তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। একদিকে যৌবনের প্রাণপ্রবাহ, অপরদিকে দেবাদিদেব মহাদেবের ধ্যানগম্ভীর ভাবমূর্তি—মহামানবতার প্রতীক। দার্শনিক কবি মঙ্গলের পথনির্দেশ করেছেন এই কাব্যে। পৌরাণিক আত্মাকে আধুনিক ভারতীয় দৃষ্টি-ভঙ্গীতে রূপায়িত করেছেন তিনি। এ যেন রবীন্দ্রনাথের দেবতাকে প্রিয় করি, 'প্রিয়কে দেবতা' করবার গৌরবোজ্জ্বল স্বপ্ন।

এই ধরণীতে বসে স্বর্গসুধা লাভ করা কি সম্ভব? প্রিয় বিরহ বিধুর মর্ত্যের আকুল আহ্বানে স্বর্গ কি সুলভ ও সহজগম্য হয়না?

এই আধ্যাত্মিক জবাব মেলে কবির এই কাব্যে।

কাব্যের নায়িকা সুকুমার বয়স থেকেই অন্তরে অন্তরে অনন্তের পথের সন্ধানী। সে—

'স্তব্ধতার সিন্ধুনীরে আকাশের সুগভীরে
রেখাভূতা একাকিনী, স্থির বিহঙ্গিনী যথা।
বালার নাহিক তপন, করিয়াছে অন্তর্ধান
সে রূপের অভিসারে বিশ্ব বিমোহন।'

মহাসমুদ্র সঙ্গমাভিলাষিণী চঞ্চলগামিনী প্রবাহিনী দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছে, তার এই আত্মবিস্মৃতির উদাস উল্লাসের তরঙ্গ প্রবাহ কি রোধ করা যায়?

'স্বর্গে ও মর্ত্যে'র প্রথম সর্গে প্রেমের বেদনবিধুরতা, দ্বিতীয় সর্গে সন্ধানী চিত্তের আকুল জিজ্ঞাসা:

'কে আছে এ বিশ্ব আড়ে
হৃদয় খুঁজিছে যারে, ডাকিতেছে উত্তরায়!'

তৃতীয় সর্গে নায়কার মনভুলানো সম্মোহন মূর্তি ও সুন্দরের ছায়া বর্ণনা। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে নায়িকা বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গীভূতা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার অন্তরে অসীমের ক্রন্দন, আনন্দের আকুতি। এটি হলো 'Dark night of the Soul', দুঃখের এই অমানিশা শেষে অমৃতের সন্ধান পেয়ে ভক্ত ধন্য হয়। সুন্দরের সুমধুর বাঁশরির ডাকে এগিয়ে চলেছে বালা। তার—

'আলুলে উড়িছে বেশ, মুখে নাহি বাক্য লেশ
আকুল পিপাসা ক্ষুধা দু'নয়নে ভাসে।'

দূর বনপথে সে দেখল এক ভয়ংকর অনন্ত রূপ:

'বালার অনন্ত মুখ, চৌদিকে অনন্ত জল
কোথায় লুকায় মরি, যায় কার কাছে?
বালার একটি মালা, চৌদিকে অনন্ত গালা
চৌদিকে সহস্র বাহু পশরিয়া আছে।
অনন্তের মাঝে পড়ে, নারী ছটফট করে
রেণু রেণু করি যদি দেয় দেহ খান!'

চতুর্থ সর্গে সত্য ও ছায়া রূপ, পঞ্চম সর্গে সংশয় ও প্রত্যয়ের ঘূর্ণাবর্ত।

ছায়া ও কায়ার মিলন ক্ষণে—
"ঊর্ধ্ব হতে অতীন্দ্রিয় বাঁশরীর সাড়া
অনন্ত অদ্বৈত শান্ত আসে অনুক্ষণ।"

সপ্তম সর্গে মধুমোহন প্রেমডোরে বাঁধা পড়লেন, নায়িকার তপস্যা সিদ্ধির গৌরবে ধন্য হলো।

শৈশব ও কৈশোরের সন্ধিক্ষণে বৃন্দাবনবাসিনী বালা নবযৌবনোদ্গতা তো শ্রীরাধিকার রূপ পরিগ্রহ করেছিল। তারই সঙ্গে সঙ্গে গোপ-বালকেরও আত্মদর্শন সৌভাগ্য ঘটেছিল। পরম ভক্ত বৈষ্ণবের মতো কবি সেই মিলনদৃশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে মধুমোহনের স্তুতিগান করেছিলেন:

'হে অনঙ্গ হে অচ্যুত, হে শিব সুন্দর
হে নিত্য হৃদয়রাজা প্রভু লোকোত্তম
পড়িয়াছে ধরা।'

সপ্তম সর্গে কবির কবিত্বশক্তির চরমোৎকর্ষ। এখানে বৈষ্ণব কবি-জনোচিত সহজিয়া সুর নেই, আছে নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটনজনিত অফুরন্ত শাশ্বত পুলকাবেগ। বৈষ্ণব কবিতায় পূর্বরাগ অভিসার বিরহ মিলন মানুষের সঙ্গে দেবতার নিবিড় পরিচয় করিয়ে দেয়। শশাঙ্কমোহনের এই 'প্রিয়াৎ প্রিয়তর' মধুমোহন পুরুষোত্তম মূর্তি, জ্ঞান ও ধ্যানলোকে সমাসীন। তিনি মোক্ষদায়ী। যুগে কবি ও ভাবুকেরা এই জীবন-দেবতারই আরাধনা করে গেছেন।

"ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরমং নিধানম্,
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে।"

শশাঙ্কমোহনের কথায়:

অনাবৃত সত্য সন্নিধানে
অগ্নির বিধানে, সেই জ্যোতির বিধানে
সীমা অসীমায় লীন, বারিবিন্দু বিলীন সাগরে।
অনন্ত পরমা শান্তি বিশ্ব সিন্ধুময়
শান্ত শিব অদ্বৈতের স্বরাজ অক্ষয়।

শান্ত শিব অদ্বৈতের বৈজয়ন্তী সুরই এই কাব্যের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য।

বিরহের অমানিশায় বিরহিণীর অনন্ত বেদনা-বিহ্বল, বসন্তরাজ মৃত। যমুনা উজান বহে না, বিহগকুল স্তব্ধ, সমগ্র প্রকৃতি নীরব ব্যথাতুর।

এই বিরহের চিত্র বৈষ্ণব-কবির বর্ণনার সমকক্ষ না হলেও তা'তে যে কবিপ্রতিভার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে, কাব্য-রসিকের কাছে তা' সহজেই ধরা পড়ে।

প্রেমিকের মিলন-দিনে প্রেমিকা সম্বলহীনা, একাকিনী, প্রেমিকের পদপ্রান্তে সে যে তার সর্বস্ব নিবেদন করে যোগিনী সেজেছে :

'আজি নিঃসম্বল
আজি আমি নহি আর সবার সম্বল
আজি আমি একা—আজি আমি অকূল অতল।'

এ যেন সাধকের চরম আত্মোপলব্ধি, আত্মা ও পরমাত্মার মিলনের ব্রাহ্ম-মুহূর্তের সংকেত-স্তোত্র। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ও নিঃসম্বল না হলে কি মিলনের পরমানন্দ উপভোগ করা যায়?

নবম সর্গে কবির জিজ্ঞাসা :

কি গাহিনু এতক্ষণ
পাইলে কি প্রিয় নব প্রাণের প্রবাহে
এ রহস্য গাথা সুপ্ত সান্ত্বনা আভাষ?

রহস্যসুন্দরী কবিচিত্তে 'অনন্ত মনদগোচর সেই সোহং মূর্তি চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

শশাঙ্কমোহন ছিলেন সর্বতোভাবে মানুষের কবি। মানবকল্যাণের ব্রতেই তিনি সাধনা করেছিলেন বঙ্গবাণীর মন্দিরে। মানবের জয়-গান করে গেছেন তিনি। আত্মবলে বলীয়ান মানুষ সর্বজয়ী—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। সার্থক কবিরা মানুষেরই বন্দনা গান করে যান। "তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দে গানে"—বলেছিলেন রবীন্দ্র-নাথ। মানুষকে দেবতা করবার স্বপ্নবিভোর ব্যাসবাল্মীকির মতো শশাঙ্কমোহনও ভারতের প্রাচীন আদর্শের ধারক ও বাহকরূপে বঙ্গসাহিত্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

কাব্য সাহিত্যে তাঁর অবদান 'অকৃতী সেবকের নিষ্ফল প্রয়াস নয়, সার্থক শিল্পীর রসোত্তীর্ণ সৃষ্টি। তাঁর কাব্যে যে Currency ও supremacy' রয়েছে ভাবীকাল তা' আবিষ্কার করবেই।

প্রেমাত্মা হিমালয়

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

অত্যাচার, অবিচার, দৈন্য কিংবা বঞ্চনার,
অনন্ত বৈচিত্র্যময় গুরুতম বিরহের
ব্যথার গুঞ্জন যত,
বেদনার আর্ত কলরব
মানুষের মনে ছিল যুগে যুগে
সুষুপ্তিতে, স্বপ্নে জাগরণে
অবচেতনার তলে, প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্যের রূপে
এক সঙ্গে এল কি সকলে তারা
মহাসিন্ধু-তরঙ্গ-নির্ঘোষে—নীলাচলে
গম্ভীরার জনহীন গোপন মন্দিরে
উচ্ছ্বলিত লবণাক্ত অশ্রুর প্লাবনে?
এক সঙ্গে দিল দেখা বিরহিণী শ্রীরাধিকা
চিরন্তন দুঃখদগ্ধ লাঞ্ছিত জনতা—
আকাশের শুকতারা আর
স্রোতোজলে ভেসে যাওয়া ধরণীর ফুলদল।
মানুষে মানুষে প্রীতি, প্রভুভৃত্যে হৃদয় বন্ধন,
সখার পরম সখ্য, জননীর বাৎসল্য নির্ঝর
যৌবন প্রমোদবনে প্রেমিক ও প্রেমিকার ·
মনোমহোৎসব—
সব ভালোবাসা বাঁধে বাসা
এক অতি অপরূপ মানুষের চোখের বন্যায়
বাঁধ ভাঙা সে জলপ্লাবন
দেখা দেয় তরঙ্গিত গঙ্গাকূলে নিরালা
কুটীর প্রান্তে
সৃষ্টি করে সুকঠিন হিমস্তূপ
বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণের স্পন্দনে প্রেম-আত্মা হিমালয়।

সঙ্কর্ষণ রায়

নানা রঙে রঙিণ দিন ও রাত। কঠিন মাটি যেন পায়েই ঠেকে না—একটানা পুষ্পাস্তীর্ণ অস্তিত্ব। বীথিকার সাম্নে উদ্‌ঘাটিত হ'তে থাকে রূপককে কেন্দ্র ক'রে বিচিত্র জীবনের পরম বিস্ময়। তাতে রঙ ও রসের অভূতপূর্ব আয়োজন—যা সে কল্পনাও করেনি কখনো।

একক আত্মকেন্দ্রিক অস্তিত্ব যাপনের সুকঠিন সঙ্কল্প থেকে নেমে এসেছে সে কোন মোহিনী মায়ার কুহকে। না উঠে এসেছে জীবন যৌবনের চরম সার্থকতায়।

শুকনো মরা নদীতে যেন বান ডাকে—সুপ্ত নারীত্বের উদ্বোধনে আবিষ্কার করে সে অনাস্বাদিত রূপের উৎস।

কিন্তু রূপক তার নতুন জীবনের সঙ্গে নিজেকে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছিল না। সে বুঝতে পারছিল, কুণ্ঠা ও সংশয় অতিক্রম করা তার পক্ষে সহজ নয়। এ যেন তার চরম পরাজয়। মিলনের মাধুর্যবোধের পরিবর্তে বিপুল গ্লানি। রাতের পর রাত তার পুনরাবৃত্তি।

বিয়ের পর মাসখানেকও কাটে না—রূপক যেন ক্লান্ত হ'য়ে ওঠে। তার মনে হয় যেন সে তার আত্মবিকাশের ক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত হয়েছে। সংখ্যাতত্ত্বের অমীমাংসিত পথের পাঠোদ্ধারে যাকে সঙ্গিনী হিসেবে পেতে চেয়েছিল, সে তাকে ভুলিয়েছে রঙিণ কুহকের মায়ায়—লোপ করেছে বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোয় প্রাণের প্রদীপ জ্বালাবার সাধনাকে। এ কুয়াশার চেয়ে যে আঁধার ভাল।

বীথিকা একদিন বললে, কী হয়েছে তোমার বল তো? হঠাৎ ও রকম মনমরা হ'য়ে গেলে কেন?

ক্লিষ্ট হাসি হেসে রূপক বললে, ভাবছিলাম কোথা থেকে কোথায় নেমে এসেছি।

বীথিকা বললে, নেমে এসেছি মানে! উঠে এসেছি বলো।

কোথায় উঠেছি। এতগুলো বছরের প্রত্যয় থেকে বিচ্যুত হওয়াকে কী উঠে আসা বল?

হ্যাঁ বলি। বাঁধাধরা প্রত্যয়ের ছক থেকে মুক্ত হ'য়ে বৃহত্তর জীবনে উঠেই এসেছ—নেমে আসনি।

রূপক কিছু বলল না। চুপ ক'রে থেকে ভাবে তার সঙ্কুচিত কুণ্ঠিত সত্তার মধ্যে কোথায় পূর্ণতর জীবনের বিকাশের প্রতিশ্রুতি?

বীথিকা বললে, চুপ ক'রে রইলে যে!

রূপক বললে, মনে পড়ে বীথি, দুয়ের মধ্যে এককে খুঁজতে চেয়েছিলাম আমরা?

দু'হাত দিয়ে রূপকের গলা জড়িয়ে ধ'রে বীথিকা বললে, খুঁজে কী পাই নি? পারি নি কী দু'জনে এক হ'তে—খণ্ড খণ্ড জীবনবোধের সমন্বয় করতে!

রূপক বললে, বুদ্ধি দিয়ে পারছি কই!

রূপকের বুকে মাথা রেখে বীথিকা বললে, হৃদয়ের কাছে বুদ্ধির পরাজয়কে স্বীকার ক'রে নিতেই হ'বে।

রূপক কাতরকণ্ঠে বললে, পারছি নে বীথি।

বীথিকা চমকে উঠে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকায় রূপকের মুখের পানে। বলে, পারছ না! এরি মধ্যে অসহ্য লাগছে আমাকে।

রূপক ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে বলে, তোমাকে নয় বীথি, নিজেকে। তোমার ভালবাসায় যার সৃষ্টি—তাকে স্বীকার ক'রে নিতে পারছি নে সহজ মনে।

আমার ভালবাসাকে স্বীকার করতেও তোমার কুণ্ঠা?

চিরকাল এ্যাবস্ট্রাক্‌শনের মধ্যে বিচরণ ক'রে এসেছি। বাস্তব জীবনের স্বাদ তো কখনো পাইনি। তোমার ভালবাসা আমাকে মাটিতে নামিয়ে এনে উদ্‌ঘাটিত করেছে আমার তুচ্ছতা—ধূলিসাৎ করেছে আমার এত বছরের অভ্রভেদী অহঙ্কার!

রূপকের ব্যথিত অসহায় মুখখানার দিকে অনেকক্ষণ ধ'রে চেয়ে থাকে বীথিকা। হঠাৎ এক ঝলক হাসি তার পাতলা রক্তাভ ঠোঁট দুটিতে ঝিকমিকিয়ে ওঠে। রূপকের মুখখানা নিবিড়ভাবে বুকের মধ্যে চেপে ধ'রে সে বললে, কিন্তু আমার ভালবাসা থেকে তোমাকে মুক্তি দিতে তো আমি পারব না। মাটিতে যদি নেমেই থাক—সেই ভাল। মাটিতেই ঘর বাঁধবার সাধ আমার—আকাশে নয়।

রূপক বললে, কিন্তু কথা ছিল আমাদের দু'জনের অস্তিত্বকে এ্যাবস্ট্রাক্‌শনের মধ্যে তুলে ধরব—যেখানে আকাশ মাটির তফাৎ নেই, যেখানে অস্তিত্ব এসে মিশেছে শূন্যতার মধ্যে।

বীথিকা হেসে বললে, ম্যাথমেটিক্যাল এ্যাবস্ট্রাক্‌শনের মধ্যে পুরোপুরি আত্মসমর্পণের কল্পনা করতুম—যখন হয়তো জীবনের উর্ধ্বে জীবনায়নের স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি প্রতিদিনের অস্তিত্ব থেকে পালিয়ে বেড়াবার উপায় নেই—লজিক বা সংখ্যাতত্ত্বের খেলায় দৈনন্দিন জীবনের চাহিদাকে বিসর্জন দেওয়া যায় না।

কিন্তু—

আর তর্ক নয়। এখন শোবে চল। রাত অনেক হয়েছে।

রিসার্চে আর তেমন মন দিতে পারে না রূপক। বস্তু-জগৎ এতদিন তার কাছে ছিল বাস্তবতাবর্জিত। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পৃথিবী ছিল কতগুলো প্রতীকের সমষ্টি। চোখ মেলে চেয়ে কখনো দেখে নি—শুধু অঙ্ক কষে গেছে। সংখ্যাতত্ত্বের পথেই ছড়ান ছিল তার প্রতিদিনের ভাবনা।

আজ কী এতদিনের স্বীকৃতি না পাওয়া বস্তুজগৎ তার ওপর শোধ নিচ্ছে? বীথিকা বুঝি নিমিত্তমাত্র।

দশ বছরের গবেষণার সূত্রগুলি সবই যেন ছিঁড়ে গেছে—গাণিতিক বুদ্ধিও যেন ভোঁতা হ'য়ে যায়। বস্তুর অতীত যে প্রতীকগুলোর মধ্যে সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বিচরণ করেছে তাদের যেন অর্থহীন প্রহেলিকার মত মনে হয়।

টেবিলের ওপর ছড়ান কাগজপত্রের ওপর চেপে ব'সে আছে বোবা শূন্যতা। সংখ্যাতত্ত্বের পরিচিত ফর্মুলাগুলোও যেন অসহযোগ করছে।

সেদিন সিক্‌সথ ইয়ারের ক্লাস নিয়ে নিজের ঘরে এসে ব'সে "নাম্বারের" সদ্য প্রকাশিত সংখ্যাটি নাড়াচাড়া করছিল রূপক। হঠাৎ তাপস বসুর লেখা একটি প্রবন্ধ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রবন্ধটি সংখ্যার সংজ্ঞা নিয়ে লেখা।

রূপকের এত বছরের গবেষণার সূত্র ধ'রে ফেলেছে তাপস। স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌স্টিট্যুটের তাপস বসু। সাক্ষাতে চিনবার অবকাশ হয়নি তার—কিন্তু বীথিকা তাকে চেনে। মনের মধ্যে আচমকা ধাক্কা খেল রূপক। প্রবন্ধটি পড়তে পড়তে সে উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে। ধাপে ধাপে তারই পথে এগিয়ে চলেছে তাপস—হয়তো শিগ্‌গিরই তাকে ছাড়িয়ে যাবে।

প্রবন্ধটি বার বার পড়ে রূপক। তার নীল চোখ দুটিতে ঈর্ষার জ্বালা—দুঃসহ দাহ মনের মধ্যেও। মনের শিথিল প্রতিশ্রুতিগুলি জড়ো করে সে।

বাড়িতে এসে দেখল—গা ধুয়ে বীথিকা ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে ব'সে সাজগোজ করছে। রূপককে দেখে সে বললে, এত দেরি হ'ল যে! ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে যাবার কথা ছিল না।

রূপক বীথিকার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, আর বেড়ানো নয়। বীথি—আমাদের কাজ আবার শুরু করতে হ'বে।

মুখে পাউডারের পাফ বোলাতে বোলাতে বীথিকা বললে, কী আবার কাজ!

আমাদের রিসার্চের কথা বলছিলাম।

রিসার্চ! তোমাকে সামলানোর রিসার্চে আমার হাড় ভাজা ভাজা হ'য়ে গেল—এর ওপর আবার কী রিসার্চ করব গো!

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে রূপক বললে, সংখ্যাতত্ত্বের গবেষণায় সমস্ত জীবনটাকে উৎসর্গ করবে বলেছিলে একদিন—সেটা যে উঁচু স্তরের মনোবিলাস ছিল তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাকেও তুমি নামিয়ে এনেছ—সেদিক থেকে অসাধারণ ক্ষমতা তোমার তা' অবশ্য স্বীকার করতে হ'বে।

আর্ত কণ্ঠে বীথিকা বললে, ও কী বলছ তুমি!

সোফার ওপর ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিয়ে গুম হ'য়ে বসে থাকে রূপক। দু'জনের মাঝখানে অস্বস্তিকর নীরবতা থম থম করে।

দিন কয়েক বাদে রূপক বীথিকাকে বললে, ডক্টর নিয়োগী জিজ্ঞেস করছিলেন রিসার্চ স্কলারশিপটা তুমি ছেড়ে দেবে কিনা!

বীথিকা গম্ভীর মুখে বললে, তুমি কী জবাব দিলে?

আমি আবার কী জবাব দেব। জবাব তো তুমি দেবে!

আমি কী জবাব দেব তা তো তুমি জানোই।

জানি হয়তো। কিন্তু লিখিতভাবে তোমাকে জানিয়ে দিতে হ'বে যে তুমি স্কলারশিপ ছেড়ে দিচ্ছ।

চিঠি লেখার প্যাডটি টেনে নিয়ে বীথিকা বললে, এক্ষুণি লিখে দিচ্ছি।

বীথিকার লেখা শেষ হ'লে রূপক বললে, তাপস বসু তোমার ঐ স্কলারশিপটা নিতে চায়। আমার সঙ্গে দেখা করেছিল আজ।

বীথিকা চমকে উঠে বলে, তাপস!

বীথিকার মুখের ওপর বক্র দৃষ্টিপাত ক'রে রূপক বললে, হ্যাঁ, তাপস। তার কাছে শুনলুম ওর সঙ্গে একদা তুমি নিয়মিত ক্যালকুলাস কষতে। তোমার বুদ্ধির ওপর অসাধারণ শ্রদ্ধা ওর। সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে মৌলিক গবেষণা করবার ক্ষমতা যে তোমার আছে তা'ও সে আমাকে বলেছে। তোমাকে ও যতটা চিনেছিল তার শতকরা এক ভাগও আমি চিনতে পারি নি ব'লে মনে হ'ল—যদিও প্রায় ছ'মাস তুমি আমার সঙ্গে কাজ করেছ।

চোখ নামিয়ে চুপ ক'রে বসে রইল বীথিকা—কিছু বলতে পারল না। তার মনের গভীরে আলোড়িত আবেগগুলি মুখের ওপর গাম্ভীর্যের আবরণ টেনে চাপা দেবার চেষ্টা ক'রে সে।

বীথিকার পদত্যাগ পত্রটি ভাঁজ ক'রে পোর্টফোলিও ব্যাগে রেখে দিয়ে রূপক বললে, তাপসকে আমি কথা দিয়েছি যে ওকে আমার রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্ট ক'রে নেব। ডক্টর নিয়োগীরও তাতে আপত্তি নেই।

বীথিকা হঠাৎ ব'লে ফেলে, স্কলারশিপ আমি ছাড়ব না—চিঠিটা ছিঁড়ে ফেল।

রূপকের দু'চোখে কৌতুক উপচে ওঠে—সে বললে, কিন্তু তাপস কাল থেকে তার কাজ সুরু করবে। দরখাস্ত সে আমাকে দিয়ে দিয়েছে—তোমার রেজিগ্‌নেশন লেটারের সঙ্গে জুড়ে তা' আজই আমি ডক্টর নিয়োগীর কাছে পেশ করব।

দু'চোখে দুঃসহ জ্বালা ছিটিয়ে বীথিকা বললে, আমার স্কলারশিপ আমি ছাড়ব না—ফিরিয়ে দাও আমার চিঠিটা।

বীথিকার কথায় কর্ণপাত না ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রূপক। মনে জমাট কান্নার গুরুভার নিয়ে ব'সে রইল বীথিকা।

যে রঙিণ স্বপ্নে এতদিন মগ্ন ছিল বীথিকা, তার মোহ মিলিয়ে গিয়ে অন্তবিহীন অন্ধকার শুধু অবশিষ্ট রইল তার চোখের সামনে। বিপুল শূন্যতাবোধের কেন্দ্রে অসহায়ের মত ব'সে রইল সে।

ওদিকে রূপক নির্বিকার। তাপসের সাহায্যে পুরোপুরি কাজে মন দিয়েছে সে। বীথিকার দিকে নজর দেবার সময় নেই তার। প্রতি দিনের অস্তিত্বের মধ্যে নগণ্য একটি অভ্যাসের মত তাকে স্বীকার ক'রে নেয় মাত্র।

বীথিকাও চুপচাপ। তার অভিমানাহত অবমানিত হৃদয়ের ভার কোথায় নামাবে সে ভেবে পায় না।

একদিন তাপসকে নিয়ে বাড়িতে এল রূপক। তার সেই পূর্বপরিচিত তাপস নয়—অনেক বেশি ব্যক্তিত্ব, অনেক বেশি প্রত্যয় জমাটবাঁধা আত্মভোলা মুখখানি। দেখে বুকের ভেতরটাতে মোচড় দিয়ে ওঠে।

মামুলি কুশল বিনিময় ছাড়া আর কোন কথাবার্তা হয়না তার তাপসের সঙ্গে। তাপস যে দূরত্ব বজায় রেখে চলতে চায় তা' সে বুঝতে পারে।

বসবার ঘরে রূপক ও তাপসের জোর বিতর্ক চলে। রূপকের generalisation গুলোকে স্বীকৃতি দিতে পারছিল না তাপস। তাপস বলছিল, যথেষ্ট উপকরণ নেই যাদের সমন্বয়ে সাধারণ মীমাংসায় উপনীত হওয়া চলে। খণ্ডখণ্ডভাবে বিশ্লেষণ না ক'রে অখণ্ড সত্যে উত্তীর্ণ হওয়া চলবে না।

পাশের ঘরে ব'সে তাদের তর্ক শুনছিল বীথিকা। যে পথে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছে একদিন সে পথ থেকে যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তা' সে বুঝতে পারছিল। সংখ্যাতত্ত্বের যে সব সমস্যার সমাধানে সে একদা সক্রিয় অংশ নিয়েছে তাদের স্বরূপ নির্ণয়ের অধিকার সে আজ

হারিয়েছে। রূপক বা তাপস তাদের আলোচনায় অংশ নিতে, তাকে আর ডাকে না।

বীথিকা মনে মনে জ্বলতে থাকে নিজের ওপরই মর্মান্তিক আক্রোশে।

দিন কয়েক বাদে সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ তাপস রূপকের বাড়িতে এসে রূপকের খোঁজ করে– রূপক তখন বাড়িতে ছিল না।

চোখ নামিয়ে বীথিকা বললে, তিনি তো একটা মিটিংএ গেছেন বরানগরে।

তাপস বললে,মিটিং ! কই আমাকে তো কিছু বলেননি !

মুচকি হেসে বীথিকা বললে, হয়তো ভুলে গেছেন। যা ভুলো মন ! বাড়িতে এসে হঠাৎ ওঁর মনে পড়ে গেল মিটিংএর কথা। পড়ি কি মরি ক'রে ছুটলেন।

ও। তা হ'লে আমি যাই।

একটু বসবে না। উনি না থাকলেও আমি তো রয়েছি। আমার সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথাবার্তা বললে তোমাদের সংখ্যাতত্ত্ব অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে না।

তাপসের মুখে চাপা হাসি ঝিলিক দিয়ে ওঠে—সে বললে ; অশুচি সংখ্যাতত্ত্বের স্পর্শ বাঁচিয়ে তোমার শুচিতা বজায় রাখছো, তা' তো আমার অজানা নয় বীথি—অমন কথা কেন আর বলছ ?

আরক্ত মুখে বীথিকা বললে, সংখ্যাতত্ত্বের বাইরেও একটা জগৎ আছে—যেখানে মানুষ তার ছোটখাট সুখ-দুঃখ নিয়ে বাস করে।

ম্লান হেসে তাপস বললে, একথা তোমাকে একদিন ব'লেছিলুম বীথি—তুমি তা' কানেও তোলোনি।

তাপসের বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

বীথিকা চমকে উঠে তাপসের মুখের দিকে তাকায়। অনিমেষ চোখে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে সে বলে, ভেতরে বসবে এস।

বীথিকা চা ঢালতে ঢালতে তাপসকে বলছিল, অমন খণ্ড খণ্ড ক'রে চুলচেরা বিচার করবার দরকার কী তাপস ? বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আর সব কিছু রিলেটিভ হ'লেও সংখ্যা যে এ্যাব্‌সোলিউট তা' মানো নিশ্চয়ই ?

তাপস অবাক হ'য়ে বললে, এ সব নিয়ে এখনো ভাবো নাকি তুমি !

সলজ্জ হেসে বীথিকা বললে, পুরোনো অভ্যেস—ছাড়তে পারিনে।

বীথিকা যা' বলেছে তা' নিয়ে মনে মনে খানিকক্ষণ চিন্তা ক'রে তাপস বললে, সোজাসুজি জেনারেলাইজেশন করতে গেলে তা' ফিলজফি হ'য়ে পড়ে—ম্যাথ্‌মেটিক্স নয়।

বীথিকা বললে, কিন্তু ম্যাথ্‌মেটিক্সও তো জেনারেলাই-জেশন। এ্যাবস্ট্রাক্‌শনও বলতে পার। এ্যাবস্ট্রাক্‌শনের মধ্য দিয়ে বিচার করলে শূন্য আর একের মধ্যে কোন তফাৎই নেই। অঙ্ক কষে সহজেই প্রমাণ করা যায়। অথচ সত্যিই তো শূন্য একের সমান নয়।

তাপস চুপ ক'রে থাকে। তার চোখ দুটি অকস্মাৎ প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠে বীথিকার মুখে কী যেন ব্যগ্রভাবে অন্বেষণ করে।

বীথিকা চোখ নামিয়ে বললে, অবশ্য এসব নিয়ে কিছু বলা আমার সাজে না। ও সবের চর্চা তো অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি।

তাপস ব্যগ্র স্বরে বললে, ছাড়ো নি বীথি—ছাড়তে পার না। কেনই বা ছাড়বে ? কিন্তু নিজেকে ওরকম লুকিয়ে রাখার দরকার কী। এস না য়ুনিভার্সিটিতে।

শাড়ির আঁচলের কোনটি ধ'রে পাকাতে পাকাতে বীথিকা বললে, আমার য়ুনিভার্সিটি আমার ঘরের চারটি দেয়ালের মাঝখানে। তোমাদের য়ুনিভার্সিটিতে যেতে আমি চাইনে।

কিছুক্ষণ বাদে তাপস উঠে দাঁড়িয়ে বললে, চলি।

বীথিকা বললে, আবার আসবে তো ?

তাপস মাঝে মাঝে আসে—প্রায়ই রূপকের অনুপস্থিতিতে। রূপক বাড়িতে থাকলে বীথিকার নাগাল পায় না। বীথিকা তখন তাকে এড়িয়ে চলে সযত্নে। গৃহকর্মে অতিমাত্রায় ব্যস্ততা প্রকাশ করে। রূপক তাদের কথাবার্তায় যোগ দিতে ডাকলে কাজের অজুহাত দেখায়। অথচ রূপক না থাকলে তাপসের সঙ্গে উৎসাহের সঙ্গে সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে—তাপসের রিসার্চের সমস্যাগুলির সম্বন্ধে জানতে চায়।

রূপক য়ুনিভার্সিটি থেকে ফিরে একদিন দেখল, ড্রইংরুমে তাপস ও বীথিকা পাশাপাশি ব'সে তন্ময় হ'য়ে অঙ্ক কষছে। রূপক স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়াল। রিসার্চে চাপা

পড়া তার হৃদয়টি হঠাৎ যেন সক্রিয় হ'য়ে ওঠে—প্রতিদিনের অভ্যস্ত অস্তিত্বের বাইরে নতুন ক'রে দেখল সে বীথিকাকে তাপসের মুগ্ধ দৃষ্টির আলোয়। তার নীল চোখ দুটি জ্বলতে থাকে।

রূপককে দেখে তাপস উঠে দাঁড়িয়ে বললে, নমস্কার স্যার। মিসেস মিত্রের কাছ থেকে কতগুলো প্রবলেম বুঝে নিচ্ছিলুম।

কাষ্ঠ হাসি হেসে রূপক বললে, তা' বেশ। কিন্তু প্রবলেমগুলো সম্বন্ধে আমাকে তো কিছু বলো নি।

বলব ভেবেছিলাম। কিন্তু মিসেস মিত্রের কাছে সহজ সমাধানের আভাস পেয়েছি। অঙ্কের মাথা ওঁর খুব পরিষ্কার।

রূপক কিছু বলল না।

মাসখানেক বাদে রূপক বীথিকাকে বললে, তাপস জার্মানি যাচ্ছে। বন্ য়ুনিভার্সিটিতে পোস্ট-ডক্টরেট ফেলোশিপ পেয়েছে।

বীথিকা টেবিল ক্লথে ফুল তুলছিল—তার ছুঁচধরা হাতটি কেঁপে ওঠে। সে বললে, এখানকার রিসার্চ ওর শেষ হ'য়ে গেল?

না, হয়নি। ওখানে গিয়ে না হয় করবে। স্কলারশিপটা জোগাড় ক'রে দিয়ে আমিই ওকে পাঠাচ্ছি।

বীথিকার সেলাই করা বন্ধ হ'য়ে যায়। সেলাইয়ের সরঞ্জাম টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে চুপ ক'রে মাথা নীচু ক'রে বসে থাকে সে।

রূপক তার পাশে এসে তার কাঁধে হাত রেখে বলে, নিজেকে ক্রমশঃ আমার কাছ থেকে গুটিয়ে নিচ্ছ কেন বীথি? কী অপরাধ করেছি আমি তোমার কাছে?

মুখ তুলে তাকায় বীথিকা—উদ্গত অশ্রু দমন ক'রে বললে, গুটিয়ে তো আমি নিই নি।

বীথিকাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে কম্পিত স্বরে রূপক বললে, কিন্তু আমাদের দু'জনের মাঝখানে তৃতীয় কেউ এসে কেন দাঁড়াবে? কেন?

রূপকের বুকে মাথা রাখল বীথিকা—কিছু বলল না।

মরমীয়া সাধনা

ডক্টর শ্রীগুরুদাস ভট্টাচার্য

ধর্ম ও নীতির বিশ্বকোষে মরমীয়া সাধনার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে:—relationship and potential union of the human soul with Ultimate Reality, and to use the term 'mystical experience' for direct intercourse with God। জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিবিড় সম্বন্ধ ও অন্তরঙ্গ মিলন মরমীয়াবাদের মূলকথা—কোথাও প্রেমের পথে, কোথাও তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদির সহায়। উভয় ক্ষেত্রেই এই সাধনা কুয়াসাধুসর রহস্যময়তায় মণ্ডিত।

মরমীয়া-সাধনার উৎস-সন্ধানে ঐতিহাসিকগণ পেঁছিয়ে গেছেন আদিম যুগে। সেকালের মানুষ জীবন সংগ্রামে জয়ী হবার জন্যে নানা যাদুবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করত। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান, মাঠের শস্যে, বৃক্ষে প্রাণ কল্পনা করে তাদের দৈবীকরণ হত। এদের জয় ও লাভ করার জন্যে প্রাণময়ী প্রকৃতি-শস্যাদির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেত-মানুষ। তার দেহে 'ভর' হত, দৈব নির্দেশ প্রচারিত হত, দেবতার সঙ্গে অভেদ হয়ে ইচ্ছাপূরণের চেষ্টা চলত। শস্য অথবা তার প্রতীকের সঙ্গে একাত্ম হবার বাসনায় তারা নতুন শস্য ও তার প্রতীকের (পশু বা মানব) মাংস আহার করত, রক্তে স্নান করত, সদ্যবিচ্ছিন্ন চর্ম পরিধান করত। দেবতা ও মানবে অভেদ-মিলনে মানুষ হত দৈবীচিত্তসম্পন্ন। এই সব অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল শস্য-শিশু-পশুর সমৃদ্ধি। সেই সঙ্গে উৎসব হত, আসর বসত নাচ গান কথার। চাষের মাঠে, নারীরাই-প্রধানতঃ এই উৎসবে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করত; পরে পুরুষেরা সে ভার নিল। অনেক ক্ষেত্রে, প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার ও সংস্কারের 'প্রতি বিশ্বাসে পুরুষ নারীর রূপসহায় অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করত—যেমন, দক্ষিণ ভারতের 'কুরুনইকুট্ট' নৃত্যাভিনয়। এইভাবে ইষ্টসহ অভেদের সাধনা ও নারীরূপে ভজনার রীতি—বহু প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত ছিল। কালক্রমে তাদ্রই ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হল আধ্যাত্মিক মিষ্টিকতায়—কোথাও হৃদয়ভাব তার সহায়, কোথাও দেহ সাধনা তার মাধ্যম।

মধ্যযুগের ইউরোপে প্লেটোর মতবাদ, এপিকিউরিয়ান ও স্টোইক্ দর্শনের পাশে দেখা দিল প্লতিনাসের (২০৪-২৭০ খ্রীঃ) নিও-প্লেটোনিক

দার্শনিকতা। প্লেটোর all knowledge re collection—সূত্রকে ভিত্তি করে বিস্তৃত হল জন্মান্তরবাদ ও আত্মার অবিনশ্বরতার ভাবনা। এর সাহায্যে নব্য প্লেটোনিকরা গড়ে তুললেন মরমীয়া সাধনার প্রাথমিক রূপটি—'flight of the alone to the alone'—'একার সাথে মিলুক একা।' পোরফিরি ও আয়াম্‌-ব্লিকাস একে আরও মিষ্টিক করে তুললেন। দেবতা দেবদূত শয়তান, যাদুবিদ্যা সন্ন্যাস দিব্যভাব, রূপক মন্ত্রতন্ত্র অদৃষ্টবাদ ইত্যাদির অনুপ্রবেশে সাধনা জটিলতর হয়ে উঠল। সেণ্ট্ অগস্টাইন এই মিষ্টিক আরাধনাকে নিয়ে এলেন খৃষ্টধর্মে: তার নতুন ব্যাখ্যা প্রচারিত হল। ব্যাপকতা দান করলেন সেণ্ট পল। অতিপ্রাকৃত আনন্দলোকের স্বপ্ন-দর্শন ও রসাস্বাদন এবং পরম সত্যের নিবিড়তম উপলব্ধির এক রাহস্যিক ধারা গড়ে উঠল মরমীয়া সাধনা নামে ও রূপে।

কিন্তু মরমীয়া তত্ত্ব ও সাধনা কোন এক বিশেষ দেশকালের ধর্মমত নয়; তা সর্বজনীন, সকল দেশের সকল মানুষের। পারস্পরিক বৈষম্য আপাত—মূলে সমতা। ইহুদী ধর্মে, 'জোহার' বইতে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের প্রেমের সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়েছে। ওল্ড্ টেস্টামেণ্টের সঙ্ অফ্ সঙ্স্‌এ এই ভাবনার ভাষারূপ প্রতিফলিত হয়েছে—Let Him kiss me with the kisses of His mouth ; for Thy love is Better than wine :…By right on my bed I sought Him whom my soul loveth :…I sought Him but found Him not।

মধ্যপ্রাচ্যে মরমীয়া সাধনার আত্মপ্রকাশ সুফী ধর্মে। কোরাণে এর ইঙ্গিত এবং হজরৎ মহম্মদের ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের সঙ্গে এর যোগ আছে বলে অনেকে মনে করেন। গ্রীক্ দর্শনের অনুশীলনের ফলে নিও-প্লেটোনিক মতবাদ থেকে ইসলামী মিষ্টিকতা শক্তি সংগ্রহ করে। সিরীয়, খৃষ্টান, ইন্দো-ইরাণীয় বিশেষত বৌদ্ধ প্রভাবও এতে লক্ষণীয়। আবু সুলেমান, অল্ হল্লান, ইবন্ আরাবি, অল্ ইনায়ো, রাবেয়া প্রভৃতি সাধক সাধিকার মাধ্যমে সুফী ধর্ম ক্রমে বিস্তৃতি ও গভীরতা লাভ করে। তত্ত্বের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান অল্ বহালির। সুফী মতবাদ সন্ন্যাস থেকে মরমীয়া, তা থেকে তত্ত্ব, শেষে বিশ্বদেবতাবাদে উপনীত হয়। এতে বিধান-বিরোধিতা প্রেমসাধনা, অন্তরঙ্গতা, নির্বাণলাভ, ঈশ্বরের নারীত্ব, জীবের পুরুষত্ব ইত্যাদি ভাব মুখ্য স্থান লাভ করে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে, ইবন্ অল্ ফারীদ, সাদী, হাফিজ, রুমী প্রভৃতি সাধকের মরমীয়াবাদী রচনা মধুরসায়িত হয়ে ওঠে। ক্রমে, দার্শনিকতা ও দল-উপদলের ভীড়ে সুফী ধর্ম বিচিত্র জটিল হয়ে ওঠে।

ইষ্ট দেবতার সঙ্গে অভেদ সম্বন্ধ মরমীয়া সাধনার মূল কথা। তার জন্যে প্রয়োজন আত্মার বিশুদ্ধিকরণ ও ভাগবতস-যুক্ত-লাভের ব্যাকুলতা। এই দৃষ্টিতে, উপনিষদের 'সোহম্'-বাদ এর সঙ্গে অভিন্ন ব্যাপকতর অর্থে: সকল মতপথেরই শেষকথা ঈশ্বরে-জীবে ভেদহীন একাত্মতা। শেষ সাধনায় জ্ঞানপথে সাধক পশুত্ব-ত্যাগে পশুপতিত্ব লাভ করেন; দেহ সাধনার মাধ্যমে তান্ত্রিক সাধকের শক্তি-সাযুজ্য ঘটে (বৌদ্ধ ও হীনাচারী তন্ত্র-সাধনায়ও এই ভেদরাহিত্য); বৈষ্ণব ভক্ত প্রেমসাধনার সহায়ে মিলিত হন নিখিলরসামৃতসিন্ধু কৃষ্ণের সঙ্গে। পথ হয়ত আলাদা, পথিক হয়ত বিভিন্ন, কিন্তু পথের শেষের মিলন—বিন্দুটি সেই এক।

ভারতে ইসলাম অনুপ্রবেশের পর থেকে সুফী ধর্ম এ দেশীয় ধর্ম-সাধনার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে মরমীয় সাধনাকে পরিস্ফুট ও পরিপুষ্ট করে তোলে। কবীর-তুকারাম চৈতন্যদেবের সাধনায় তার অভিপ্রকাশ, সমকালীন ও পরকালীন ধর্মে ও সাহিত্যে তার ব্যঞ্জনা। কালক্রমে, ভারতীয় মরমীয়াবাদ বিস্তৃততর রূপান্তরিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন মত—পথের ধর্মে-কাব্যে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে।

স্পারজিঅন বলেছেন: Mysticism is, in truth, a temper rather than a doctrine, an atmosphere rather than a system of Philosophy : এবং আণ্ডারহিল বলেছেন: Mysticism is a vision, an individual quest, a psychological experience : উক্তি দুটির মধ্যে মিষ্টিক সাধনার মর্মকথা ও মৌল স্বরূপ পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়েছে। দেশ ও কালের ব্যবধান সত্ত্বেও মরমীয়া সাধকদের উপলব্ধি ও চলার পথ প্রায়—অভিন্ন। আঞ্চলিক সীমান্ত সত্ত্বেও তা বিশ্বজনীন এবং সকল ক্ষেত্রেই এই উপাসনা কোন বিহিত শাস্ত্র বা সুশৃংখল দার্শনিকতার মুখাপেক্ষী নয়। কোন বিশিষ্ট মত পথ বা বাদ নয়। সর্বত্রসঞ্চারী মরমীয়া সাধনা একান্তই মরমী—ব্যক্তিগত এষণা, তত্ত্বাতীত বোধিদৃষ্টি, আত্মার আত্মসাক্ষাৎকার সাধকের হৃদয়ভাব নির্ভর: 'যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে'। তার কাছে, Ideal is the only Real: এবং এই আইডিয়াল ভগবান। ইনিই আত্মার উৎস ও স্থয়স্থান, এঁর জন্যেই আত্মার অশুদ্ধি—মোক্ষণ ও লীলাভিসার, তদ্‌ভাবভাবিত হয়ে তাঁরই উপলব্ধি—God only। তত্ত্বরসিক সাধক সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে দেখেন একটি চিত্র, সব অনৈক্যের মধ্যে পরম ঐক্যকে, প্রিয়তম সেই ঐককে।

মরমীয়া সাধনার একদিকে তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানের জটিলতা ও বিচিত্রতা; অন্যদিকে প্রেমারতির মধুরতা ও সুন্দরতা। ভক্তি মরমীয়া সাধকের কাছে প্রেম জীবনের মূল ও ইষ্টের সঙ্গে মিলনের একমাত্র সেতু। পরমাণুর জন্যে জীবাণুর ব্যাকুল কামনা অভিসারের পথে এগিয়ে দেয় আত্মাকে, অসীমের হয় সহৃদয় হৃদয়-সংবাদ, ভাগবত প্রেমের আলোয় পথ চিনে চিনে ভক্ত যেখানে উপনীত হয়, সেখানে—God and I are one। এই উপাসনা মরমীয়া বলে এর প্রকাশ মরমী, হৃদয়বেদ্য; এর ভাষা ধূসর সান্ধ্য: রূপকে প্রতীকে alchemic language। এখানে, দৈবীপ্রেম বোঝাতে মানবিক প্রেমের চিত্র অংকিত হয়; ঈশ্বর ও ভক্তের সম্বন্ধ স্বামী স্ত্রীর—উভয় বরবধূ, বিবাহ এখানে মিলনের দ্যোতক। এ ছাড়াও সোনা রূপা লোহা পাখী নৌ-কাজল আলো আগুন অন্ধকার ইত্যাদি শব্দকে নিগূঢ় অর্থবোধক প্রতীক রূপে ব্যবহার করা হয়। বস্তুর রাসায়নিক রূপান্তরের ইঙ্গিত দ্বারা

মনের বৃত্তিসমূহের ভাবান্তরকে বোঝান হয়। বিশ্বজগতের যা কিছু সবই মরমীয়া সাধকের কাছে অসীমের প্রতীক। ব্লেকের ভাষায়ঃ

To see a world in a grain of sand,
And a heaven in a wild flower,
Hold Infinity in the palm of your hand,
And eternity in an hour.

মরমীয়া সাধনা ব্যবহারিক বিজ্ঞান-সদৃশ। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে মানবাত্মা কেবলই বদলায়। চলে, লড়াই করে; বিবর্তনের মধ্য দিয়ে কেবলই 'হয়ে—ওঠে'। তাই এর চলার পথ বাঁধানো রাজপথ নয়। ব্যক্তিগত আকুতিতে মাঠঘাট উজিয়ে-যাওয়া সকলেরই সেই এক কথা: কেবলই চলা, কেবলই সরা। সমগ্র মরমীয়া সাধনাই যেন বর্ষণমুখর অভিসারের পদাবলী—পঞ্চপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত!

প্রথম প্রদীপঃ 'আত্মার জাগরণ'। সংসারসুখে আবদ্ধ মন হঠাৎ শুনতে পায় অজানার ডাক, নতুন এক অনুভবের স্ফূর্তি, নবতর এক চেতনার পদসঞ্চরণ। অহংবোধ গৃহসুখ ছাড়তে চায়না, জ্বলেওঠা আগুন মনকে বার করে আনতে চায় দৈব-চেতনার অভিমুখে। ভাগবত-প্রীতির এই স্থিরা-রতিই 'পূর্বরাগ'। দ্বিতীয় দীপঃ 'চিত্তের শুদ্ধি'। পূর্বরাগান্বিত চিত্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বের মাঝে পথ করে এগিয়ে চলে অজ্ঞাত সম্মুখে। হৃদয়ই দৈবী-প্রেমের আগুনে পুড়িয়ে দিতে থাকে যাবতীয় হীনতা-দীনতা-কলুষ-গ্লানিকে। অহং দুর্বলতর, আত্মা শুদ্ধতর, সংসার-চেতনা শিথিলতর হতে থাকে। ভক্ত তখন সেন্ট্ থেরেসার মত বলে: Let me Suffer or die। এরই নাম 'অভিসার'। মরমীয়া সাধকচিত্তের উদ্বর্তনের তৃতীয় সোপানঃ 'চিত্তের উজ্জীবন'। অভিসার-অন্তে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার। অহংবোধ ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হয়, আত্মবোধও বিশ্ববোধ এনে দেয় ভেদজ্ঞানরাহিত্য। ভাগবত প্রেমের দীপ্ত আলোকে হৃদয় তখন পারিপ্লাবিত। একদিকে আত্মার স্থিতি-ধ্যান-তন্ময়তা-সাত্ত্বিকভাব, অন্যদিকে সমস্ত দেহমনকে একাগ্র করে তুলে পরম আনন্দ-প্রেমামৃতের কাছে আত্মসমর্পণ। সেখানে, সেন্ট্ জনের ভাষায়ঃ all ceased and I was not। ভক্ত-ভগবানের এই সান্নিধ্যকে বলা হয়েছে 'মিলন'। চতুর্থ পর্যায়ে: 'আত্মার মৃত্যু'। মিলন স্থায়ী হয়না; ভগবান দেখা দেননা। কারণ ভক্ত হৃদয়ের অহংকার, চিত্তের আবিলতা এখনও নিঃশেষিত নয়। তাই আঘাত দানের উদ্দেশ্যে ঈশ্বর সরে যান নিকট-দূরে। একাকিত্বের অসহায়তা, শূন্যতার অন্ধকার ও বেদনার আগুনে ক্রম-রূপান্তর হতে থাকে আত্মার। তার শেষতম কালিমাটুকু নিশ্চিহ্ন, সামান্যতম আসক্তিও বিলুপ্ত হয়ে যেতে থাকে। মুক্ত আত্মা নিজেকে পরিপূর্ণরূপে চিনতে পারে, উপলব্ধি করে নিজের ক্ষুদ্রতা ও ঈশ্বরের বিরাটত্ব। সেন্ট্ ক্যাথারিনের মতো সে অনুভব করে, by me is god। ঈশ্বর বিচ্ছেদে তাঁর হৃদয় আরও নিবিড় ও আপন করে পেতে চায় তাঁকে। সংসার প্রীতির অপসরণে চিত্তে যে শূন্যতা জাগে, তা পরিপূর্ণভাবে অধিকার করে ভাগবত-প্রীতি। অহরহ সখার অভাববোধজনিত এই যে আকুল আর্তি, এই-ই 'বিরহ'। পঞ্চম বা শেষ বিন্দুতেঃ 'আত্মার অভেদ-মিলন'। পার্থিব চেতনাবিলুপ্ত ভক্ত হৃদয়ে এখন কেবল দৈবীচেতনার নিঃসীম আলো। আত্মা তখন পরম বিশুদ্ধ, সর্বকলুষমুক্ত, সুরভিত পদ্ম। পরম প্রিয়তম এসে ধীরে ধীরে বসেন সেই শুভ্র শতদলে আসন করে। জীবাত্মা-পরমাত্মার হয় বিবাহ, অর্থাৎ পুনর্মিলন ও পূর্ণমিলন; সানন্দ চিত্ত উপলব্ধি করে: god in me–ঈশ্বরই প্রেম, প্রেমই ঈশ্বর—'সোহম্' বা 'সাহম্'। মরমীয়া ভাষায়, সংসারপ্রীত আত্মা থাকে লোহার মত কঠিন—কালো; ঈশ্বর রতির আগুনে পুড়ে তার সব কালো উধাও হয়; সে হয় সাদা অর্থাৎ শুদ্ধ; তারপর লাল হয়ে ওঠে ভাগবত-প্রেমে দীপ্ত হয়ে; শেষে মহাভাবের আবেগে গলে গিয়ে মিলিত হয় ইষ্টের সঙ্গে। আত্মার সঙ্গে আত্মার সাক্ষাৎকার হয়, সাযুজ্য হয়, এক আর একে মিলে হয় এক—সমুদ্রের লবণে তৈরী পুতুল সমুদ্রেই মিশে যায়, আবার ঘটে 'ভাবসম্মিলন'।

মিস্টিকের এই অভিসারও মিলনানন্দের অভিজ্ঞতা তত্ত্বাতীত বোধাতীত প্রকাশাতীত, অনুভববেদ্য হৃদয়গম্য হ্লাদৈকময়। সাধকের এই তুরীয় আস্বাদ ব্রহ্মস্বাদসহং। বৈষ্ণব সাধকের অন্তিম প্রেমানুভূতিও বেদান্তের প্রকাশ-অগম্য, যদিও তাঁর সাধনা মূলত মরমীয়া নয়। তার ভিত্তি মূলে আছে একটি বিশিষ্ট ধর্মমত, প্রকাশভংগিমায় রহস্যের অভাব, লীলা রাধাকৃষ্ণের: (শাস্ত্রমতে) জীব-ঈশ্বরের নয়। ভক্ত লীলাশুক সখী, গোপিপ্রেম তাঁর সর্বসাধ্য সার। তথাপি বৈষ্ণবী রতি মরমীয়া অনুরাগানুগা। রাধার কৃষ্ণপ্রীতি মরমীয়ার ঈশ্বরপ্রেমের সমান্তরাল মিস্টিক উপাসনার পঞ্চাঙ্গ (পূর্বরাগ থেকে ভাবসম্মিলন) বৈষ্ণব লীলাতত্ত্বেরও স্তম্ভস্বরূপ। যাঁরা রাধাকে জীবাত্মার প্রতীক মনে করেন, যাঁদের আরাধনা রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত—তাঁদের ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ মরমীয়ার মতই অতি-প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত। ভক্তের কাছে ইষ্ট প্রেমময়, ভক্তরাধা, মুখ্যসাধ্য কৃষ্ণরতি, সাধন প্রেম—'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে', পথশেষের অনুভূতিঃ 'কি কহব রে সখি আনন্দ পর! চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর'॥ মিস্টিকের কণ্ঠে: He is not only with us, but also within us। ভাষা তখন সাংকেতিকতার হাত ধরে চলে। মিস্টিসিজম্ বৈষ্ণব ধর্মে আরোপিত নয়, অন্তর্নিহিতঃ বৈষ্ণব সাধনা মরমীয়া না হয়েও মরমী।

মেটাফিজিক্স্ আধ্যাত্মমুখী ভাবনা হলেও মিস্টিসিজম্ তার মৌল কেন্দ্র নয়। মেটাফিজিক্স্ জানতে চায় কার্যকারণের আদিকে: absolule Knowledge তার সাধ্য; মিস্টিসিজম্ পেতে চায় কার্যকারণের অন্তকে: Union with Union তার সাধন। প্রথমটির লক্ষ্য জ্ঞানের উপলব্ধি, দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য পরমের অনুভূতি। তাই কাব্যকলার ক্ষেত্রে জন ডান ও ফ্রান্সিস টমসন সগোত্র কবি নন। একজন জিজ্ঞাসু, অপরজন মুমুক্ষু। কিন্তু অনুভবের অতলান্ত গভীরে মেটাফিজিক্যাল কবিও মিস্টিক হয়ে ওঠেন। প্রকৃতি-দেহ-নারী-প্রেম সম্পর্কে তত্ত্বজিজ্ঞাসা উপনীত হয় তত্ত্বরসে—যেখানে আত্মার অন্তরঙ্গতম আত্মীয়তা। ডান্, ট্রাহের্ণে, ব্রন্টি, টেনিসন, শেলী,

কীটস, ব্লেক, ডন,-এর বহু কবিতা এই পর্যায়ে উত্তীর্ণ। বিহারীলালের কবিতাও। এই দৃষ্টি-আলোকে ওয়র্ডস্‌ ও অর্থ- উপলব্ধি করেন :

> Gently did my Soul
> Put off her veil, and Self transmuted, Stood
> Naked, as in the presence of her god.
>
> Prelude

মিস্টিকতার রহস্যময় পরিবেশ ও আবেশ তান্ত্রিক সাধনায় অন্তর্নিহিত প্রেমারতির স্থানে সেখানে দেহ-আরতির আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ। বিচিত্র মন্ত্র ও কৃত্যের (ritual) মাধ্যমে তন্ত্রসাধক আবাহন করেন আরাধ্য দেবতার ; মন্ত্র ও তন্ত্রবলে দেবতা আবির্ভূত হন, আশ্রয় করেন আরাধকের দেহ ও মনকে। উভয়ের একাত্মার মাধ্যমে সাধক অলৌকিক শক্তি ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতি লাভ করেন। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন ধ্যান ও আবাহন মন্ত্র। মন্ত্রঃপূত শুদ্ধি ন্যাস ইত্যাদি করণীয় আঙ্গিক। শুধু প্রাচ্য নয়, পাশ্চাত্য দেশেও তান্ত্রিক মিষ্টিক সাধনা প্রসার লাভ করে। 'সাধনমালায়' এই কৃত্যমূলক মরমীয়া সাধনার সরলতর রীতিপদ্ধতি বিধিবদ্ধ ; ক্রমেই তা জটিলতর হয়ে ওঠে পুরাণ ঘেঁষা তন্ত্রগ্রন্থগুলিতে। রহস্যময় ভীতিকর হয় শাস্ত্রীয়—অশাস্ত্রীয় নানা অনুষ্ঠানে-ক্রিয়াকলাপে।

কিন্তু প্রেমের অভিসিঞ্চনেই মিষ্টিকতার যথার্থ বিকাশ। প্রেম-ভক্তির আকুলতা তান্ত্রিক চিত্তকেও দ্রবীভূত আবেগময় করে তোলে। ভীতিতে—প্রীতিতে ভয়ানক সুন্দরতায় তান্ত্রিকের উপলব্ধি হয় ভক্তি—শক্তি মিশ্রিত। তখনই শক্তি পদাবলীর শক্তিমৎ প্রেমের সাঙ্গীতিক প্রকাশ ; শ্যাম ও শ্যামার অভেদ, সখী ও সন্তানে ভেদহীনতা। বৈষ্ণব ভক্তের মত শক্তি তান্ত্রিকও হন কবি। প্রেমিক কবির আত্মোপলব্ধির প্রকাশ ধ্যানশীলতার নৈঃশব্দ্যে : যেখানে দুয়ে মিলে এক হওয়া—হৃদি দিয়ে হৃদি অনুভব। সেখানে, ফ্রান্সিস টমসনের মত : Naked I wait Thy lore's uplifted stoke।

সাহিত্যশিল্পের বিচারে, রোমান্টিকতা নিবিড়তম হয়ে অধ্যাত্মরাজ্যে পদার্পণ করলে মিষ্টিকতার আবির্ভাব হয়। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক মনন আধ্যাত্মিকতার স্পর্শে আর্টের সীমান্ত অতিক্রম করে মিষ্টিক অসীমতায় বিহার করেছে। পঙ্কদীপান্বিতা পথ বেয়ে তিনি উপনীত হয়েছেন সব-পেয়েছির দেশে, অবগাহন করেছেন দিঘির অতলে, অনুভব করেছেন চিত্তের নবীন পূর্ণতা :

> এক রজনীর বরষণে শুধু কেমন করে,
> আমার মনের সরোবর আজি উঠেছে ভরে।

সেই হৃদয়-সরোবরে :

> একটি মাত্র শ্বেত শতদল
> আলোক-পুলকে করে ঝলমল ;

তখন কবির অন্তরতম প্রদেশে সমাহিত সৌন্দর্য-উপলব্ধি :

> স্থির আছে শুধু একটি বিন্দু
> ঘূর্ণীর মাঝখানে :
> সেইখান হতে স্বর্ণকমল
> উঠেছে শূন্যপানে।

আর সেই স্বর্ণকমলের ওপরে সোনালী-পাখা এক নাম-নাজানা সোনার পাখার মধুর বিহার।

মিষ্টিক সাধনকলায় রোমান্টিক শিল্পকলা : যেন ইন্‌প্রেসনিস্টিক ছবির চারপাশে কাজকরা সোনা-ফ্রেম ॥

বাঙ্গলা সাহিত্যে স্বদেশ-প্রীতি

শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত

বাঙ্গালীর স্বদেশ প্রীতির পরিচয় বাঙ্গলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অংশ অধিকার করিয়া আছে। বাল্মীকির রামায়ণ হইতে স্বদেশ-প্রীতির মন্ত্র আহরণ করিয়া ভূদেব প্রথম বাঙ্গালীকে শোনাইলেন,—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" এত অল্প কথার মধ্যে এমন প্রগাঢ় স্বদেশ প্রেমের অভিব্যক্তি আর কোথাও আছে কিনা জানি না।

ইহার সহিত তিনি আরও বলিয়াছেন,—"ভারতবাসী 'জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়' বলিতেছেন। এ মহাকাব্য তাঁহারা কখনই ভুলিবেন না, পরজাতি-বিদ্বেষ ও পরজাতি-পীড়ন তাহার স্বজাতি-বাৎসল্যের অঙ্গীভূত হইবেনা। প্রত্যুত পৃথিবীর অপর সকল জাতি তাঁহার নিকটে জ্ঞান এবং প্রীতির ঐ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবে।"

এই সাত্ত্বিক উদারভাবে পরিপূর্ণ স্বদেশপ্রীতির কথা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ই সর্বপ্রথম প্রচারিত করিলেন। এই স্বদেশ-প্রেম বিশুদ্ধ স্বদেশ-প্রেম, ইহাতে জাতি-বৈরতার চিহ্নমাত্র নাই।

কিন্তু স্বদেশপ্রীতির প্রথম উন্মেষ দেখিতে পাই কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়। দেশ জননীর দুর্দশায় তিনি কাতর হইয়া ১২৫৫ সালের ১লা বৈশাখের 'সংবাদ প্রভাকরে'র একটি কবিতায় লিখিলেন,—

> —"জননী ভারত ভূমি আর কেন থাক তুমি
> ধর্ম্মরূপ ভুষাহীন হয়ে ?
> তোমার কুমার যত সকলেই জ্ঞান হত
> মিছে কেন মর ভার বয়ে ?
> পূর্ব্বকার দেশাচার কিছুমাত্র নাহি আর

অনাচারে অবিরত রত।
কোথা পূর্ব্ব রীতি নীতি
অধর্ম্মের প্রতি প্রীতি
শ্রুতি হয় শ্রুতিপথ হত।

তাহাই বাঙ্গলা সাহিত্যে দেশপ্রীতির আদি বাঙ্গলা গান। দেশপ্রীতি দেশবাসীর প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করে। ইহাও গুপ্ত কবি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই তিনি দেশবাসীকে শোনাইলেন,—

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসীগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কত রূপে স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥"

ইহাতেও বিদেশী বিদ্বেষ নাই। এই কয় ছত্রে গুপ্তকবি তাঁহার গভীর দেশাত্মবোধের প্রেরণায় বাঙ্গালীকে তাহার স্বাতন্ত্র্যরক্ষা ও বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেতন করিয়া তুলিয়াছেন। দেশের লোক যখন মমতাহীন হইয়া দেশীয় রীতিনীতি ও আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছিল তখন তিনি এই অনুকরণপ্রিয় জাতিকে আঘাত করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন।

মায়ের উপর সন্তানের যে ভালবাসা গুপ্তকবি দেশের প্রতি দেশবাসীর সেই ভালবাসার অভাব দেখিয়া লিখিয়াছেন,—

"জাননা কি জীব তুমি জননী জন্মভূমি
যে তোমারে হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে সন্তানে জননী ভোলে
কে কোথায় এমন দেখেছে?"

ইহা তাঁহার মর্মবেদনার এক চরম অভিব্যক্তি। "থাকিয়া মায়ের কোলে সন্তানে জননী ভোলে" বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে এই মর্ম্মান্তিক কথাকে আরও মর্ম্মান্তিক করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, রবীন্দ্র, রজনীকান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পর্য্যন্ত অনেকেই শুনাইয়াছেন। কিন্তু আজ হইতে একশত বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বর গুপ্তের যুগে গুপ্তকবি ভিন্ন আর কাহারও নিকট হইতে বাঙ্গালী একথা শোনে নাই। স্বদেশবাসীর শোচনীয় অধঃপতনে কবিবর এতদূর ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন যে তাহাকে তিনি 'মানুষ' না বলিয়া 'জীব' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই 'জীব' কিরূপে মানুষ হইতে পারে তাহার নির্দ্দেশও তিনি দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"মনুষ্য তাঁহাকেই বলি, যিনি স্বদেশীয় লোকের কল্যাণার্থ অত্যন্ত অনুরাগী। মনুষ্য তাঁহাকেই বলি, যিনি স্বজাতীয় ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের উন্নতির জন্য প্রযত্ন করেন এবং স্বদেশের স্বাধীনতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।"

গুপ্তকবির ভাবধারা যে এখনও পর্যন্ত পারম্পর্যের পথ অনুসরণ করিয়া চলিয়া আসিতেছে একথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না; বরং আরও স্পষ্ট ভাবে বলা যায় এই ভাবধারায় তিনিই প্রথম প্রবর্ত্তক ও প্রচারক।

ঈশ্বরগুপ্তের পর মাইকেল মধুসূদনের রচনায় স্বদেশপ্রীতির পরিচয় ফুটিয়া উঠে। ইয়োরোপ যাত্রাকালে তিনি জন্মভূমির উদ্দেশে লিখিয়াছেন,—

"রেখ মা দাসেরে মনে,
এ মিনতি করি পদে
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ
মধুহীন করোনাগো তব মনঃ কোকনদে!
প্রবাসে দৈবের বশে জীবতারা যদি খসে
এ দেহ আকাশ হ'তে নাহি খেদ তাহে
জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে
চিরস্থির কবে নীর, হায়রে জীবন নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি মা ডরি সমনে
মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃতহ্রদে।

ইহা ছাড়া মাইকেলের মেঘনাথবধ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গের বিভিন্ন স্থানে স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা কৃত্তিবাসের রামায়ণে নাই। তাঁহার রচিত মেঘনাদ বিভীষণকে বলিতেছে—

"—শাস্ত্রে বলে গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়; পর, পর সদা।"

ইহার পর দীনবন্ধু মিত্র রচিত নীলদর্পণ নাটক বাঙ্গালীর প্রাণে জাতিপ্রেমের বন্যা জাগাইয়া তুলিল। নীলকরপীড়িত কৃষকদের হাহাকার সমস্ত বাঙ্গালীর হৃদয়ে সহানুভূতির একাত্মতা আনিল। এই প্রসঙ্গে অমৃতলাল বসু লিখিয়াছেন,—

"নীলদর্পণ কি করিয়াছে?...
বাঙ্গালীর মূর্চ্ছাগত মনকে মনুষ্যত্বের তেজে উদ্দীপ্ত করিয়া জাগরিত করিয়া তুলিয়াছিল। আজ যে বাঙ্গালী দেশের জন্য কাঁদিতেছে, 'ভারত', ভারত বলিয়া একটু হাত পা নাড়িতেছে। নীলদর্পণ অভিনয়ের পূর্বে এ অবস্থার কতটুকু অস্তিত্ব ছিল?"

মধুসূদন ও দীনবন্ধুর সমসাময়িক কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বীরবাহুকাব্যে স্বদেশ বন্দনা করিলেন। বীরবাহুকাব্যে দেশভক্তির উজ্জ্বল প্রকাশনা বাঙ্গালী পাঠককে বহু বৎসর যাবৎ মাতাইয়া রাখিয়াছিল। ইহা ভিন্ন হেমচন্দ্র দেশবাসীকে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করিতে আরও বহু কবিতা রচনা করিলেন। কংগ্রেস সৃষ্টির প্রায় ষোলো বৎসর পূর্বে তিনি 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়' বলিয়া বিলাপ করিয়াছিলেন। 'ভারত বিলাপ' কবিতার এই সুর বাঙ্গালীর মনে প্রাণে দেশপ্রেমের এক নতুন সুর ঝঙ্কৃত করিয়া তোলে। ইহার পর কংগ্রেস অনুষ্ঠানে কবিবর হেমচন্দ্র আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার 'রাখিবন্ধন' কবিতায় এই উপলক্ষে লিখিলেন,—

—"কি আনন্দ আজ ভারত ভুবনে
ভারত জননী জাগিল!

*　　*　　*

যোগনিদ্রা শেষে দেখে জননীর
কেন হেরে আজ রোমাঞ্চ শরীর,
কার না নয়ন তিতি রে ?
সহস্র বৎসর গোলামের হাল,
ভারতের পথে এত যে জঞ্জাল,
আজি তার ফল ফলেছে।
জীবন সার্থক আজিরে আমার
এ রাখি বন্ধন ভারত মাঝার
দেখিনু নয়নে দেখিনুরে আজ
অভেদ ভারত চির মনোরথ
পুরাবার তরে চলিল।"

কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশন উপলক্ষে কবি উদাত্ত ভাবে ভারতবাসীকে আহ্বান জানাইয়া লিখিলেন,—

এখনো কে আছ অবসন্ন প্রাণ
উঠ, জাগ—শোন ভারত সন্তান,
মর্ত্যভূমে আজি কি অমর গান,
অনন্ত উচ্ছ্বাসে বহিয়া যায়।
অষ্টাবিংশ কোটি কণ্ঠে তুলি লয়
এস সবে গাহি জননীর জয়
জীবনে না রবে মরণের ভয়,
অসার সংসার ভাবনা ছার—
মহাযজ্ঞ মাতৃক্লেশ বিমোচন
মাতৃপূজা কোটি কোটি দেবার্চন
ইহ-পর লোকে কি আছে তেমন
বাঞ্ছিত নরের বল না আর।

কংগ্রেস অধিবেশন সূচনার পূর্বে রাজনারায়ণ বসু "শিক্ষিত বঙ্গবাসিগণের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপনের" উদ্দেশ্য লইয়া একটি পুস্তিকা রচনা করেন। ইহার ফলে সর্বপ্রথম জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে ৺নবগোপাল মিত্রের প্রচেষ্টায় হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভা স্থাপিত হয়। ইহার প্রথম অধিবেশনে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত এই গানটি গীত হয়,—

"মলিন মুখ চন্দ্রমা ভারত ! তোমারি
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন বারি॥
চন্দ্রজিনি কান্তি নিরখিয়ে
ভাসিতাম আনন্দে।
আজি এ মলিন মুখ কেমন নেহারি।
এ দুঃখ তোমার হায়রে, সহিতে না পারি।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ পরে এই গান তাঁহার রচিত "ভারত-মাতা" নামে ক্ষুদ্রনাটকে সন্নিবেশিত করেন।

এই স্বদেশী মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত এই সঙ্গীত গীত হয়—

"মিলে সবে ভারত সন্তান
এক তান মন-প্রাণ,
গাও ভারতের যশো-গান।
হোক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।" ইত্যাদি

এই সঙ্গীত সমগ্র দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণে দেশোন্মাদনার এক অপূর্ব সাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছিল। বাঙ্গলার প্রতি গ্রামের মাঠে ঘাটে সর্বত্র এই সঙ্গীত গীত হইত। ইহার প্রভাব সমগ্র দেশকে যেন এক নবচেতনায় উদ্বোধিত করিল।

বাঙ্গলা ভাষায় রচিত এই প্রথম জাতীয় সঙ্গীতকে অভিনন্দিত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে লিখিলেন,—"এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয় কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, নর্মদা, গোদাবরী তট বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক। এই গীত বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়-যন্ত্রে বাজিতে থাকুক।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই আশা সার্থক হইয়াছিল। জাতীয় মহাসমিতিতেও (কংগ্রেস) এই সঙ্গীত গীত হয়। এমন আশা-উদ্দীপনাপূর্ণ ভারতের জয়গান বাঙ্গালী ইহার পূর্বে আর শোনে নাই।

এই জাতীয়তার প্রচণ্ড বেগ বঙ্কিমচন্দ্রকে অত্যন্ত গভীর ভাবেই আঘাত করিয়াছিল। তাই তাঁহার সাহিত্যক্ষেত্র জাতীয়তার মন্ত্র গানে ঝঙ্কৃত হইয়াছে।

ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শন" প্রকাশ করিলেন। এই বঙ্গদর্শন বাঙ্গালীর জাতীয়তার এক নবযুগের উদ্বোধন করিল। এই বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালী বন্দেমাতরম সঙ্গীতের মধ্য দিয়া মাতৃমন্ত্রে দীক্ষালাভ করিল।

বাঙ্গলাদেশের প্রতি প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁহার সঙ্গীত রচনা করিলেন, সাহিত্যরচনা করিলেন। বাঙ্গলাদেশে জাতীয় সাহিত্যের মাধ্যমে এই ভাবে দেশপ্রীতির বীজ রোপণ করিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি লিখিলেন,—

—"গুণবতী মাতার প্রতি পুত্রের যে স্নেহ, সে স্নেহ কোথায় ? যে মনুষ্য জননীকে "স্বর্গাদপি গরীয়সী" মনে করিতে না পারে সে মনুষ্য মধ্যে হতভাগ্য। যে জাতি জন্মভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী মনে করিতে না পারে সে জাতি জাতি মধ্যে হতভাগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রচনার নানাস্থলে এই দুঃখ আজীবন প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী যাহাতে দেশের দুঃখ মোচন করিতে পারে ইহাই ছিল তাঁহার প্রধান আকাঙ্ক্ষা। সেকালে বাঙ্গালী জাতিকে মিথ্যাবাদী, ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়াছিলেন,—

সেদিন সেকালের মিথ্যা উক্তির প্রতিবাদ করিলেন শুধু বঙ্কিমচন্দ্র। অগ্নিদীপ্ত ভাষায় তিনি বলিলেন—"যে বলে—বাঙ্গালী চিরকাল দুর্বল,

চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক। তাহার কথা মিথ্যা।"

শুধু এই কথা লিখিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন না। সেকালের সেই মিথ্যা ভাষণকে বাঙ্গালীর স্মৃতি হইতে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য তিনি তাঁহার রচিত সীতারাম, আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণীতে বাঙ্গালীর বীরত্বের ছবি অত্যন্ত নিপুণ হস্তে অঙ্কিত করিলেন।

কমলাকান্তরূপে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার হৃদয়ের অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়া লিখিলেন,—

—"আমি এই কালসমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা। কই আমার মা। কোথায় কমলাকান্তপ্রসূতি বঙ্গভূমি। সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা। জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা! হাঁ এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃণ্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী অনন্ত রত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশদিক্—দশদিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানাশক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু-বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত।…

কমলাকান্তের এই উক্তির মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গ জননীর রূপ দুর্দ্দশায় গভীর মর্ম্মবেদনা ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার বন্দেমাতরম সঙ্গীত বাঙ্গালীকে স্বদেশ সেবায় অনুপ্রাণিত করিল।

ইহার পর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, অমৃতলাল, অতুল সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ বাঙ্গলার জনপ্রিয় কবিরা যে সব গান ও কবিতা রচনা করিলেন তাহাতে শুধু যে আমাদের স্বাজাত্য ও স্বদেশপ্রীতিকে বর্দ্ধিত করিল তাহা নয়, সেই সঙ্গে বাঙ্গলা সাহিত্য ভাণ্ডারে অতুল সম্পদ সঞ্চিত হইল।

এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যে সাহিত্য রচিত হইল তাহাতে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিবার প্রেরণা জোগাইল। বাঙ্গালী দেশকে বিদেশী শাসনের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করিল। রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন,—

"ওই অমর মরণ রক্তচরণ
নাচিছে সগৌরবে
সময় এসেছে নিকটে, এবার
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।"

কান্তকবি রজনীকান্ত বাঙ্গালীকে বিদেশী বর্জ্জন করিয়া দেশী বস্ত্র গ্রহণ করিবার জন্য লিখিলেন,—

—"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই,
দীন দুঃখিনী মা যে মোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।"

রবীন্দ্রনাথের সুরে সুর মিলাইয়া বাঙ্গলার যুবক বাঙ্গলার পথে ঘাটে গাহিতে লাগিল,—

"নব বৎসরে করিলাম পণ—
লব স্বদেশের দীক্ষা
তব আশ্রমে তোমার চরণে
হে ভারত, লব শিক্ষা
পরের ভূষণ পরের বসন
তেয়াগিব আজ পরের অশন
যদি হই দীন, না হইব হীন
ছাড়িব পরের ভিক্ষা।"

এই ভাবে বাঙ্গলার ঘরে ঘরে স্বদেশী মন্ত্রের মত স্বদেশী সাহিত্য বাঙ্গালীকে অনুপ্রাণিত করিতে লাগিল। বাঙ্গলা থেকে এই ভাবধারা সমগ্র ভারত পরিব্যাপ্ত হইল। জাতি যেন শতাব্দীর নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল।

সাহিত্যদর্পণকার বলেছেন, সাহিত্য মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছায়া। স্বদেশী সাহিত্যের এই মহাজীবনের প্রতিচ্ছায়া আমাদের বাস্তব জীবনে জ্বলন্ত অক্ষরে প্রতিভাত হইল। সাহিত্যই জাতির প্রাণ, আর এই সাহিত্যই জাতীয় যুদ্ধে আমাদের জয়মাল্যে ভূষিত করিল।

আজ স্বাধীন দেশের নাগরিক আমরা, যেন কখনও ভুলিয়া না যাই আমাদের সাহিত্যই আমাদের মুক্তি সাধন করিয়াছে। বাঙ্গলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রীতি সাহিত্যের ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হঠাৎ ল্যাং-ল্যাং ভেউ-ভেউ করিয়া বাহিরে ছুটিয়া গেল। ছুঁচকিও তাহার অনুসরণ করিল। কুমার খাতা বন্ধ করিয়া দ্বারের দিকে চাহিল একবার, তাহার পর উঠিয়া পড়িল। ডেকচির ঢাকনাটা খুলিয়া একবার দেখিল মাংসের ঝোল কতটা আছে। ঝোল তখনও ছিল। হাতার সাহায্যে একটুকরা মাংস বাহির করিয়া সে তখন একটা বাটিতে রাখিল, তাহাতে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিয়া সেটাকে ঠাণ্ডা করিল, তাহার পর আঙুল দিয়া টানিয়া টানিয়া দেখিতে লাগিল মাংস সিদ্ধ হইয়াছে কি না। একটু বাকী আছে,মনে হইল জলটা মরিতে মরিতে হইয়া যাইবে।

"কুমারবাবু না কি। এখানে কি হচ্ছে—"

কৃষ্ণকান্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন, তাঁহার পিছু পিছু ল্যাংল্যাং এবং ছুঁচকি। দুইজনেরই মুখে অপ্রস্তুত ভাব। জামাইবাবুকে তাহারা চিনিতে পারে নাই—তাড়া করিয়া গিয়াছিল এজন্য দুইজনেই যেন খুব লজ্জিত। সেই ভাবটা কাটাইয়া উঠিবার জন্যই হোক বা একজন আর একজনকে দোষী প্রতিপন্ন করিবার জন্যই হোক তাহারা পরস্পর পরস্পরের ঘাড় পা কান কামড়া কামড়ি করিয়া বপ্রক্রীড়ায় মাতিয়া উঠিল। কৃষ্ণকান্তের পোষাক অদ্ভুত। ব্রিচেস্-পরা সাহেবী পোষাক, হাতে বন্দুক মাথায় টর্চ-বাঁধা। চক্ষু কর্ণ রোগের বিশেষজ্ঞেরা মাথায় যেমন টর্চ বাঁধেন অনেকটা তেমনি।

"কোথায় গিয়েছিলেন, দিদি খুঁজছিলেন আপনাকে"

"তোমার দিদি সারাজীবনই খুঁজছেন আমাকে। কখনও পাচ্ছেন, কখনও হারাচ্ছেন"

"এ বেশে কোথা গিয়েছিলেন!"

"—প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছিলাম—"

"প্রতিশোধ? কিসের প্রতিশোধ"

"আজ সকালে হাঁসপাতালে দেখলাম একটি মানব-শিশুকে শেয়ালে খেয়েছে। শৃগালের স্পর্দ্ধা বরদাস্ত করা যায় না। গোটা কুড়ি শৃগাল সংহার করেছি"

"কোথায়—"

"পাশের বাগানটায়! ওই বেতের জঙ্গলটার পাশে—"

"অতগুলো শেয়াল একসঙ্গে পেলেন কি করে—"

টোপ ফেলেছিলাম। একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে' মাথায় এই আলোটা জ্বেলে দিলুম। শেয়ালরা কৌতূহলী জীব, অস্থানে এমন জোর আলো দেখে দেখতে এল ব্যাপারটা কি। গুটিগুটি রেন্‌জের মধ্যেই এসে পড়ল, তারপর আর ফিরে গেল না"

"কুড়িটা মেরেছেন?"

কুড়িটা। তোমার কোনও জমিতে যদি সারের দরকার থাকে, ওগুলো পুঁতে দিতে পার সেখানে। শেয়ালের মাংস খাওয়া যায় না, বিশ্রী গন্ধ ওদের মাংসে, কুকুর-কুকুর গন্ধ। নিগ্রোরা বোধহয় খায়—

একটা কেরোসিন বাক্সের উপর পেট্রোম্যাক্সটা জ্বলিতেছিল, সেটা মাটিতে নামাইয়া দিয়া কৃষ্ণকান্ত তাহার উপর উপবেশন করিলেন।

"আপনি এই ক্যাম্পচেয়ারটায় আরাম করে' বসুন না"

"না, রাজাকে অকারণে সিংহাসনচ্যুত করা আমার স্বভাব নয়। ভগবানের আদেশে আমি কেবল দুষ্কৃতদের [illegible] করি—"

কুমার পুনরায় মাংসের দিকে মন দিয়াছিল। ঢাকনাটা তুলিয়া দেখিতেছিল। কৃষ্ণকান্তের দিকে ফিরিয়া বলিল, "গন্ধটা তেমন ভালো ছাড়ছে না"

"বুনো হাঁস ?"

"হ্যাঁ"

"কি কি হাঁস"

"টিল,নোচার্ড,লালসর,স্পুনবিল,সীজও আছে একটা—"

"কতটা মাংস আছে—"

"তা সের পাঁচ ছয় হবে"

"ভাল সরষের তেল আছে এখানে ?"

"আছে—"

"তাহলে এক কাজ কর। পোয়া দেড়েক সরষের তেল চড়িয়ে দাও একটা কড়াতে। কড়া এনেছ ?"

"হ্যাঁ, ওই যে—"

"পেঁয়াজ রসুন আদা ?"

"তা-ও আছে—"

"তাহলে গোটা তিনেক রসুন, পাঁচ-ছটা পেঁয়াজ আর ছটাক খানেক আদা কুঁচিয়ে তেলে ভেজে সবসুদ্ধ ঢেলে দাও ওটার ভিতরে। খানিকটা কাঁচা তেলও দাও তার উপর। পাখীর মাংস সরষের তেলেই জব্দ। তোমার দিদির কাছে শিখেছি এটা"

"জলটা মরুক আগে। ওরে ল্যাংড়া—"

"জি"

কোণের বস্তাটা নড়িয়া চড়িয়া উঠিল।

কড়াটা পরিস্কার কর। আর তিনটে রসুন, ছ'টা পেঁয়াজ, আর খানিকটা আদা কোট্"

কৃষ্ণকান্ত মুগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বাঃ বেশ চমৎকার কামুফ্লেজ করে' ছিল তো ল্যাংড়া"

ল্যাংড়া উঠিয়া আসিয়া আদেশ প্রতিপালনে মন দিল। ল্যাং ল্যাং এবং কুঁচকি তাহার আশেপাশে ঘুরঘুর করিতে লাগিল। ল্যাংড়া তাহাদের পরম বন্ধু, একটু আগেই পাখীর মাংস খাওয়াইয়াছে"

কুমার বলিল, "আপনার শিকারের গল্প অনেকদিন শুনিনি জামাইবাবু—"

"আজ দুপুরে তো বলছিলাম রামপ্রসাদ, যোগেন আর প্রিয়গোপালদের—"

"এখন বলুন না একটা, শুনি। মাংসের জলটা মরুক ততক্ষণ—"

কৃষ্ণকান্ত উৰ্দ্ধমুখ হইয়া খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "না, তেমন কিছু মনে পড়ছে না এখন"

"আচ্ছা আপনার ভাইঝির শ্বশুর কালীবাবুকে নিয়ে কি কাণ্ড হয়েছিল বলুন তো। আবছা আবছা শুনেছিলাম"

"প্রতিশোধ নিয়েছিলাম"

"কি রকম—"

"মালতী আমার এক দূরসম্পর্কের দাদার মেয়ে। দুমকায় যখন ছিলাম তখন মেয়েটা খুব ন্যাওটো ছিল আমার। বীরেন-দা দুমকায় থাকতেন তখন। কিছুদিন পরে আমি বদলি হয়ে গেলাম সেখান থেকে। কাউকে কিছু জিগ্যেস না করে' বীরেনদা দুম্ করে' মালতীর বিয়ে দিয়ে বসলেন ওই কালীবাবুর ইম্‌বেসিল (inbicile) ছেলেটার সঙ্গে। মূর্খ, থস্‌থসে মোটা, দুটি গাল যেন দু'টি বান্ রুটি। সম্বলের মধ্যে আছে শহরে গলির শেষ প্রান্তে এক জরাজীর্ণ একতলা বাড়ি। বিয়ের সময় আমি যেতে পারিনি। ভেবেছিলাম বিয়ে সম্ভবত ভালই হয়েছে। ভুলটি ভাঙল বছরখানেক পরে। মালতীর চিঠি পেলাম। লিখেছে তার উপর যে ধরণের অত্যাচার চলছে তা সহ্য করবার ক্ষমতা তার নেই। সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে সে। নিজের বাবাকে চিঠি লিখে সে কোনও প্রতিকার পায় নি, তাই আমাকে লিখেছে। আমিও যদি এর কোনও প্রতিকার না করি তাহলে সে আত্মহত্যা করবে। টেলিগ্রাম করে' ছুটি নিলুম, তারপর গেলুম তার কাছে। কালীবাবু লোকটিকে সেই প্রথম দেখলাম। ভালুক আর বাঁদরের কম্‌বিনেশন। বেঁটে, রোগা, মুখময় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া গোঁফদাড়ি, কুৎসিৎ দর্শন লোকটা। চোখে নীল চশমা। বাঁ হাতের শীর্ণ আঙুলগুলি সর্ব্বদা চলাচল করছে গোঁফ-দাড়ির মধ্যে কাঁকড়ার মতো। আমি গিয়ে মালতীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। চুপ করে' রইল, তারপর দাড়ির জঙ্গলে খানিকক্ষণ আঙুল চালিয়ে বললে, আপনাকে তো চিনি না। বীরেনবাবুর কোনও চিঠিও পাইনি। এ অবস্থায় ঘরের বউকে আপনার সামনে

বার করি কি করে'। বললাম, আপনি মালতীকে গিয়ে বলুন যে তোমার কেষ্টকাকা এসেছে। অনেক কচলাকচলি করে' তবে মালতীর সঙ্গে দেখা হ'ল। শুনলাম বুড়োর স্ত্রী নেই। একটি মাত্র শোবার ঘর। সেই ঘরে বুড়ো ছেলের সঙ্গে এক খাটে শোয়, মালতীকে শুতে হয় ঘরের বারান্দায়। সমস্ত রাত শীতে ঠকঠক করে' কাঁপে। সমস্ত দিন হাড়ভাঙা খাটুনি, বাড়িতে ঝি নেই, চাকর নেই, তার উপর রাত্রে ঘুমও নেই—বোঝ অবস্থাটা। কালীবাবুকে বললাম, আপনি এই বৈঠকখানার একধারে শুলেই তো পারেন। মেয়েটার শীতে ভারী কষ্ট হচ্ছে যে। দাড়িতে খানিকক্ষণ আঙুল চালিয়ে কালাবাবু বললেন, "আমার গৃহস্থালীর ব্যাপারে আপনি ওপর-পড়া হ'য়ে মাথা ঘামাচ্ছেন? হুঁ"—আবার খানিকক্ষণ থেমে—"আপনি দূরসম্পর্কের কাকা, জোয়ান বয়স। আমার বউমাটিও সুন্দরী, যুবতী। আপনার সহানুভূতি হবারই কথা। হুঁ"—এই বলে' আবার দাড়িতে আঙুল চালাতে লাগল। আমি দেখলাম এক্ষেত্রে সোজা আঙুলে ঘি বেরুবে না, আঙুল বাঁকাতে হবে। মালতীকে আড়ালে ডেকে চুপি চুপি বললাম—"তোর জিনিসপত্তর গুছিয়ে রাখ, রাত্তির আড়াইটের ট্রেণে তোকে নিয়ে যাব। সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে দেখলাম জায়গাটা। দেখলাম ওদের বাড়ির ঠিক পাশেই একটা সেকেলে শুক্‌নো ইঁদারা আছে। বেশ প্রকাণ্ড ইঁদারা। তারপর থানায় গেলাম। সেখানে ভাগ্যক্রমে দেখা হ'য়ে গেল পুরাতন বন্ধু সুরপৎ সিংয়ের সঙ্গে। একসঙ্গে পড়েছিলাম, একসঙ্গে শিকারও করেছি অনেকবার। সে তখন ওখানকার দারোগা। খুব সুবিধে হয়ে গেল। তারপর বাজারে গেলাম। বেশ মজবুত দেখে কিছু দড়ি আর একটা মুখোস কিনে নিয়ে এলাম, লুকিয়ে রেখে দিলুম সেগুলো ব্যাগের মধ্যে। সব ঠিক করে' আবার থানায় গেলাম। সুরপৎ সিংকে আমার প্ল্যানটি খুলে বললাম অকপটে। সে হাসল একটু। তারপর বলল, "ঠিক আছে। তবে দেখো, মরে' যায় না যেন!" [illegible]াম, "না, মরবে না"। রাত বারোটা নাগাদ মুখো[illegible] পরে' ওদের শোয়ার ঘরের বন্ধ দরজায় মারলাম লাথি, তারপর দিলুম একটা ধাক্কা। কপাট মজবুত ছিল না তেমন, ভেঙে গেল। ঘরে ঢুকে বাপ ব্যাটা দু'জনেরই মুখ কস্‌কসিয়ে বেঁধে ফেললাম তাদেরই কাপড় দিয়ে, তারপর পায়ে দড়ি বেঁধে দুজনকেই টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে সেই শুক্‌নো ইঁদারাটার ভিতর নামিয়ে দিলুম!"

কুমার স্মিতমুখে বলিয়া উঠিল, "বলেন কি! চীৎকার করলে না তারা"

"তারস্বরে। তাদের সঙ্গে আমিও চেঁচাতে লাগলুম। কিন্তু লোকজন উঠতে উঠতে আমি তাদের ইঁদারায় নাবিয়ে মুখোসটা ফেলে দিয়েছি ইঁদারার মধ্যেই। পাশেই ছিল তো ইঁদারাটা—"

"ইঁদারায় নাবাতে গেলেন কেন"

"বাইরে শীতে কি রকম কষ্ট হয় তা বুঝিয়ে দেবার জন্যে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে' নিয়ে গিয়েছিলাম বাপ ব্যাটাকে—"

"তারপর?"

"আমার হাল্লা শুনে বেরিয়ে এল দু'একজন। তাদের বললাম, বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল, ডাকাতগুলো হয়তো আছে এখনও আশে পাশে। এই শুনে ঘরে ঢুকে পড়ল সবাই। তারপর মালতীকে নিয়ে আমি নিজেই থানায় গেলাম। সেখানে অফিসিয়ালি রিপোর্ট করলাম—আমি আমার ভাইঝির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। কিন্তু রাত্রে বাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেছে। ভাইঝির স্বামী আর শ্বশুরকে একটা ডাকাত টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। কোথা নিয়ে গেছে জানি না, আপনারা সেটা খোঁজ করুন। আমাকে কালই কাজে জয়েন করতে হবে, তাই এই ট্রেণেই আমি আমার ভাইঝিকে নিয়ে চলে যাচ্ছি। যখন কেস হবে, তখন এসে সাক্ষী দেব। ঠিকানা দিয়ে কেটে পড়লাম আড়াইটের ট্রেণে"

"কি হ'ল শেষ পর্য্যন্ত?"

"কেস হ'ল। গিয়ে সাক্ষীও দিলাম। ডাকাত ধরা না পড়াতে কেস ধামা চাপা পড়ে গেল"

"আর মালতী?"

"মালতী আর ফিরে যায় নি। তাকে স্কুলে ভরতি ক'রে দিয়েছিলাম। এখন সে এম-এ, পাস করে প্রফেসারি করছে"

"কালীবাবু কিছু করেন নি?"

"যথেষ্ট করেছিলেন। মকোর্দ্দমা পর্য্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু নিয়ে যেতে পারেন নি আর মালতীকে। আমারও কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেন নি, সুরপৎ আমার স্বপক্ষে ছিল তো। তুমি মাংসটা দেখ এইবার, জলটা মরে গেছে মনে হচ্ছে—"

কুমার উঠিয়া গেল এবং মাংসটা নাড়িয়া দেখিল।

"ভাগ্যে আপনি বললেন, জল একদম শুকিয়ে গেছে, আর একটু হ'লে ধরে যেত—"

"এইবার তৈলাক্ত কর। বেশ খানিকটা তেলে পেঁয়াজ রসুন আর আদাটা ভাজ"

পেঁয়াজ রসুন আর আদা কোটা হইয়া গিয়াছিল, কুমার সেগুলি ভাজিয়া মাংসে ঢালিয়া দিল। ল্যাং ল্যাং এবং ছুঁচকি এতক্ষণ কানখাড়া করিয়া বসিয়াছিল, হঠাৎ তাহারা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। পর মুহূর্ত্তেই বাহিরে কুকুরে কুকুরে ঝগড়া বাধিয়া তুমুল কোলাহল উঠিল একটা। একাধিক রুষ্ট কুকুরের চীৎকারে অন্ধকার আলোড়িত হইয়া উঠিল।

কুমার বলিল, "তাকিয়াটা এসেছে বোধহয়"

"তাকিয়া? সে আবার কে?"

"বোসবাবুর কুকুর। বোসবাবু পুষেছিলেন ওটাকে। কিন্তু তিনি বদলি হয়ে গেছেন, ওটাকে আর নিয়ে যান নি। ও আমাদের বাড়িতে ঢোকবার চেষ্টায় আছে, কিন্তু ল্যাংল্যাং ছুঁচকি কিছুতে আমোল দিচ্ছে না ওকে—"

সহসা একটা কুকুর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। কুমার দ্বারপ্রান্তে উঠিয়া গিয়া ডাকিতে লাগিল—"ল্যাংল্যাং ছুঁচকি ভেতরে আয়, ভেতরে আয়—"

দেশী কুকুরেরা সহজে কথা শোনে না। অনেক ডাকাডাকির পর তবে ল্যাংল্যাং ছুঁচকি ভিতরে আসিল। যখন আসিল তখনও তাহারা রাগে গরগর করিতেছে। ঘাড়ের লোম খাড়া, ল্যাজও খাড়া। বিজয়ীর মতো তাহারা আসিয়া প্রবেশ করিল।

"ঝগড়াটে হিংসুকে কোথাকার। ব'স এখানে—"

কুমার তাহাদের হাত দিয়া ঘরের কোণের দিকে ঠেলিয়া দিল।

"বসে' থাক চুপ করে"

তাহারা বসিবার পর কুমার ডাকিল—'তাকিয়া, তাকিয়া আয়, তাকিয়া—"

কুণ্ঠিত মুখে সসঙ্কোচে পাঁশুটে রঙের একটি বেঁটে মোটা কুকুর আনত নয়নে, আনত পুচ্ছে দ্বারপ্রান্তে আসিল।

"আয়, আয়, ভেতরে আয়—"

তাকিয়া ভিতরে আসিতে সাহস করিল না, সসঙ্কোচে দ্বারপ্রান্তেই দাঁড়াইয়া রহিল।

"ওর নামটি বেশ লাগসই হয়েছে। কে রেখেছে"

"আমি। আমিই ওকে প্রথমে পুষেছিলাম, কিন্তু বোসবাবু চাইলেন বলে' তাঁকে দিয়ে দিয়েছিলাম। এখন ওকে ফেলে তিনি চলে গেলেন। তাকিয়া, তাকিয়া আ, আ"

তাকিয়া সভয়ে ল্যাজ নাড়িয়া ভিতরে আসিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু ঘরের কোণ হইতে ল্যাংল্যাং এবং ছুঁচকি দুইজনেই আবার গরগর করিয়া উঠিল।

"চোপ্। চুপ করে বসে' থাক তোরা। হিংসুকে কোথাকার"

কুমারের ধমক খাইয়া আবার নীরব হইল তাহারা।

এমন সময় বাহির হইতে স্বাতীর গলা শোনা গেল।

"ছোটকাকা, ছোটকাকা—আলো দেখাও"

ল্যাংড়া পেট্রোম্যাকস্ লইয়া বাহির হইল। ক্ষণপরেই হাঁপাইতে হাঁপাইতে স্বাতী আসিয়া হাজির, তাহার পিছনে স্মিতমুখী সন্ধ্যা।

"মাঝ রাস্তায় ছোট পিসির টর্চের ব্যাটারি ফুরিয়ে গেল। শিগ্‌গির চল, চিত্রা এসে গেছে—"

তাহার পর কৃষ্ণকান্তের দিকে ফিরিয়া বলিল, "আমি বড় পিসিকে যত বলছি আপনি এখানেই আছেন, তা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। কেবল ভাবছে, ভেবেই যাচ্ছে, চলুন"

কৃষ্ণকান্ত সন্ধ্যার দিকে ফিরিয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "সাহেব কোথা"

"আপনাকে খুঁজছেন"

"আমাকে! কেন"

"গাছের সম্বন্ধে কি যেন জিগ্যেস করবেন। বাগান করবার শখ হয়েছে—"

"কিন্তু আমি তো জঙ্গলের খবর রাখি"

"হয়তো জঙ্গলের গাছই বাগানে লাগাবেন। চলুন"

কুমার জিজ্ঞাসা করিল, "কাকাবাবুর খাওয়া হয়ে গেছে?"

"এখনও হয় নি। তবে দিদিমা তাঁর জন্যে অন্যঘরে তরকারি-টরকারি আলাদা করে রেঁধেছেন। ছানার পায়েস হয়েছে তাঁর জন্যে। চমৎকার হয়েছে পায়েসটা—"

"তুই পায়েসও খেয়েছিস না কি"

স্বাতী নিজেই পায়েস চাহিয়া খাইয়াছিল, কিন্তু বলিল, "দিদি জোর করে' খাওয়ালে—কি করব বল। বললে—চেখে দেখ্ কিন্তু দিলে একটি বাটি। হ্যাঁ, দিদি বললে কলাপাতা কাটানো হয়েছে? যদি না হ'য়ে থাকে শালপাতা নিয়ে যেতে। জামাইরা শুধু থালায় খাবে, আমরা পাতায়—"

"ল্যাংড়া কলাপাতা কেটেছিস তো"

"জি হাঁ—"

"সব নিয়ে চল তাহলে। আগে মাংসের হাঁড়িটা নিয়ে চল"

সকলে বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

স্বাতী কুমারকে চুপি চুপি বলিল, "জানো ছোটকাকা, বাবা বড় disappointed হয়েছেন। তিনি ভেবেছিলেন—চিত্রা আসবার আগে টেলিগ্রাম করবে আর তিনি ঘটা করে' স্টেশনে আনতে যাবেন। কিন্তু ওরা খবর না দিয়ে হুট্ করে' এসে পড়েছে। কি করবে, টেলিগ্রাম করবার সময়ই পায়নি, সুব্রত লাস্ট মোমেণ্টে ছুটির খবর পেলে—"

"ও, তাই বুঝি—"

হঠাৎ স্বাতী চীৎকার করিয়া উঠিল—"ছোটকাকা, ও-দুটো কি, শেয়াল নাকি!"

সত্যই দুইটি শৃগাল একটু দূরে দাঁড়াইয়া ইহাদের দেখিতেছিল।

"এ দুটোর ভবলীলাও শেষ করে' দেব না কি"—কৃষ্ণকান্ত প্রশ্ন করিলেন।

"অনেক তো মেরেছেন আজ। ছেড়ে দিন এ দুটোকে"

শৃগাল দুটিও সরিয়া পড়িল।

"অনেক শেয়াল মেরেছেন বুঝি? কোথা?"—স্বাতী জিজ্ঞাসা করিল।

"পাশের বাগানটায় স্তূপ করা আছে"

"চলুন না দেখি—"

"না, এখন নয়। কাল সকালে দেখো"

সন্ধ্যার মৃদুকণ্ঠের গম্ভীর আদেশকে কেহ অমান্য করিতে পারিল না। বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ

বিরহে

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

তোমারে ছাড়িয়া যেন তোমারে আবার
পেয়েছি নূতন করে। সে রূপ তোমার
মনে হয় কোন দিন দেখি নাই আগে,
তাই ত নূতন করি মনে দোলা লাগে।
আগে তব দেখেছিনু নীরব আকুতি
বুক ভরা শান্ত প্রেম, তীব্র অনুভূতি,
সলাজ সোহাগ ভরা অমথিত বাণী,
মুকুলিত ভীরু প্রেমে মুগ্ধ হিয়াখানি।
পত্রে তুমি আজিকে মুখর; প্রবাসেতে আজ
লিপি তব কহে কত কথা; নাহি করে লাজ
দূরতার আড়ালেতে রহি; খুলিয়া হৃদয়
মোর কাছে আজি ধরা দেছ অসংশয়।
তোমারে ছাড়িয়া আজি—আজি বহু দূরে
পেতেছি তোমার বাণী অপরূপ সুরে।

জেবউন্নিসার আত্মকাহিনী

ডক্টর শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পাদশাহ বেগম, আজকে মুঘল পরিবারে তোমার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। সুখে দুঃখে, আমোদে উৎসবে, ঐশ্বর্যে, বিপর্য্যয়ে—তুমি স্বর্গীয় দেবদূতের মতন মুঘল রাজ-পরিবারকে রক্ষা করবার জন্য চেষ্টা করেছ। ভ্রাতৃবিরোধের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আগ্রার সন্নিকটে মুরাদ এবং আওরঙ্গজেবের শিবিরে উপস্থিত হয়ে আত্মঘাতী সংগ্রাম নিবারণের চেষ্টা করেছ। যে কোন মুহূর্ত্তে অসন্তোষের স্ফুলিঙ্গ বিরাট অগ্নিদাহে পরিণত হতে পারত, অথচ তুমি ছিলে নির্ভীক। শিবির থেকে শিবিরান্তরে গিয়ে, শান্তির চেষ্টা করেছ। যুযুধমান ভ্রাতাদের তিরস্কার করে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ করেছ। সম্রাট শাহজাহান যেদিন আগ্রার দুর্গে বন্দী হলেন, তুমি সেদিন বাদশাহ আলমগীরের সমস্ত অর্থ, সম্মান এবং বিলাসের প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করে, কারাজীবন বরণ করেছিলে। শাহজাহানের সুদীর্ঘ আট বৎসর ব্যাপী কারাজীবনের দুঃখ, অপমান, যন্ত্রণা লাঘবের জন্য তোমার সেই অনলস প্রয়াস তোমাকে গৌরবান্বিত করেছে, মুঘল রাজ পরিবারকে এক অপূর্ব্ব মহিমান্বিত করে তুলেছে। একদিন ছিল, যখন সম্রাটের মোহরাঙ্কিত পাঞ্জা তোমার বাহু শোভিত করত। তোমার ইঙ্গিতই ছিল মুঘল সম্রাটের সর্ব্বশেষ আদেশ। তোমার অঙ্গুলি সঞ্চালনেই সুবিশাল সাম্রাজ্য পরিচালিত হত। তুর্কীস্থান, বোখারা, ইরাণ, রুমের রাজপ্রতিনিধিগণ তোমার অনুগ্রহ লাভের জন্য দিনের পর দিন, মাসের পর মাস রাজপুরীর অদূরে অপেক্ষা করত, অথচ শাহজাহানের রাজ্যচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে তোমার জীবনের এবং ক্ষমতার কি আশ্চর্য পরিবর্ত্তন! তুমি আজ সন্ন্যাসিনী, কিন্তু তবু তুমি শাহজাদী, মুঘল রাজরক্ত তোমার জীবনকে মাঝে মাঝে চঞ্চল করে তুলত, তার সাক্ষী আমি।

বন্দী শাহজাহানের পার্শ্বচারিণীরূপে তুমি দেখেছ—এক পক্ষকাল মধ্যে আওরঙ্গজেব বিশ্বাসঘাতকতা করে কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদকে সুরাপানে অচেতন করেছিলেন; অথচ এই আওরঙ্গজেব ভ্রাতৃবিরোধের প্রাক্কালে মুরাদকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—মুরাদ! দিল্লীর সিংহাসন তোমার। তুমিই দিল্লীর সিংহাসনের একমাত্র যোগ্য অধিকারী, মুঘল বংশের একমাত্র যোগ্যতম সন্তান। দারা বিধর্ম্মী হিন্দুপদলেহী; শুজা বিলাসী, ইসলামে নিষিদ্ধ সঙ্গীতসেবী। আমি আল্লার ফকীর, তুমি আমার স্ত্রীপুত্র কন্যাদের নিরাপত্তার ভার নেবে। আমি আল্লার নামে কোরাণ স্পর্শ করে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—তোমাকে আমি বাবরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আমার সমস্ত শক্তি, বুদ্ধি এবং অর্থ নিয়োজিত করব। আমার শুভেচ্ছার চিহ্নস্বরূপ তোমাকে এই পত্রের সঙ্গে লক্ষ মুদ্রা প্রেরণ করছি। তোমাকে দিল্লীর সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখে আমি মক্কা যাত্রা করব।

সরল বিশ্বাসী মুরাদ সেই প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করেছিল। যুদ্ধ জয়ের পক্ষকাল মধ্যে আওরঙ্গজেব মুরাদকে তাঁহার শিবিরে আমন্ত্রণ করলেন। মুরাদের বিজয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাবার জন্য বিরাট ভোজের আয়োজন হল। সঙ্গীত, সুরা এবং নর্ত্তকীরও ব্যবস্থা হল। অথচ এই তিন বস্তুই ইসলামে নিষিদ্ধ। এই উৎসবই মুরাদের জীবনের শেষ উৎসব। পরদিন সমস্ত আগ্রাবাসী চকিত, ভীত, স্তম্ভিত হল—আওরঙ্গজেবের শিবিরে মুরাদ বন্দী। মুরাদবক্স এই সলিমগড় দুর্গের অতিথি হলেন, তার পর গোয়ালিয়রের দুর্গে তিন পক্ষকাল পরে আওরঙ্গজেব বাদশাহ আলমগীর উপাধি ধারণ করে বাবরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। পিতা শাহজাহন আগ্রার প্রাসাদে তখনও জীবিত। শাহজাদা মুহম্মদ সুলতান পিতার আদেশে পিতার পিতাকে বন্দী করে সসৈন্যে পরিবেষ্টনী রচনা করে বাদশাহ আলমগীরের আদেশের অপেক্ষা করছিল। পরবৎসর আওরঙ্গজেব পরম সমারোহে দিল্লীর দুর্গে প্রবেশ করলেন। দিল্লীতে দ্বিতীয়বার তাঁহার সিংহাসনারোহণ উৎসব অনুষ্ঠান হবে। পাঁচ পক্ষকাল ব্যাপী উৎসব—সে যে কি বিরাট উৎসব, তাহা কল্পনা করা যায় না। মানুষ কি অকৃতজ্ঞ! কি স্বার্থপর! উৎসবের উল্লাসে নৃত্যগীতের বিলাস ভোজনের আনন্দ সমস্ত দিল্লীবাসী বিভ্রান্ত হল। বাদশাহ আলমগীর তখনও জানতেন যে আগ্রার হিন্দু মুসলমান প্রজাবর্গ শাহজাহানের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন—শাহজাহান যদি একবার দুর্গদ্বারে এসে প্রজাদের নিকট সাহায্য কামনা করতেন, সমস্ত প্রজা বাদশাহ আলমগীরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে উঠত। সে অসন্তোষের পরিণতি বাদশাহ আলমগীরের পক্ষে শুভ হবে না; সুতরাং উৎসবের স্থান আগ্রা থেকে দিল্লীতেই স্থানান্তরিত করা হল। শাহজাহানের দীর্ঘশ্বাস, ক্ষীণ প্রতিবাদ আগ্রা দুর্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল।

শাহজাহান দুঃখ করে মমতাজকে বলেছিলেন—"মমতাজ! তুমি কি আমার জন্য পৃথিবীর সমস্ত অভিশাপ কুড়িয়ে এনেছিলে?" আগ্রার প্রাসাদের পূর্ব্ব অলিন্দে বসে সূর্য্যাস্তের ম্লান রশ্মি তাজমহলের গম্বুজকে প্রতিমুহূর্ত্তে নব নব রূপ দান ক'রত। শাহজাহান করুণ নেত্রে সেই রূপ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করতেন। তাজমহলের রূপ পরিবর্ত্তন শাহজাহানের জীবনের ঘটনা পরিবর্ত্তনেরই প্রতিচ্ছবি।

এই উৎসবের মধ্যেই শাহজাদা মুহম্মদ সুলতান আওরঙ্গজেবের শিবির পরিত্যাগ করে শুজার পক্ষ অবলম্বন করলেন। তার পরদিন দারাশিকো ও তাঁহার পুত্র সিপার শিকোই বিশ্বাসঘাতক জিওন খাঁ

বাদশাহ আলমগীরের হস্তে সমর্পণ করল। উঃ! কি বিশ্বাসঘাতক এই জিওন খান! একদিন না দারা শিকো এই জিওন খানের প্রাণদণ্ড মার্জ্জনা করেছিলেন—তার জীবন রক্ষা করেছিলেন? এই উৎসবের মধ্যেই দারা শিকোর বিচার আরম্ভ হয়েছিল—অপরাধ ধর্ম্মদ্রোহ—অপরাধ দারার অঙ্গুলিতে "প্রভু" শব্দ ক্ষোদিত অঙ্গুরী শোভা পেত—সুতরাং দারা কাফের। মোল্লার বিচারে দারা শিকোর প্রাণদণ্ড হল। তাঁহার ছিন্নমুণ্ড পিতা শাহজাহানের নিকট প্রেরিত হয়েছিল। শাহজাহানের পক্ষে ভবিষ্যতে দারার পক্ষ সমর্থন করে রাজ্যের প্রজাবর্গকে উত্তেজিত করার সুযোগ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বাদশাহ আলমগীর মহম্মদ সুলতানকে ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দুর্গে প্রবেশ করবার অনুমতি দিলেন। রাজ্যের প্রয়োজনে বাদশাহ আলমগীরের পক্ষে মুহম্মদ সুলতানকে সলিমগড় দুর্গে অবরুদ্ধ করা হল।

ময়ূর সিংহাসন! অপূর্ব্ব তোমার মহিমা! কি মোহময়ী তোমার মায়া! তোমার উজ্জ্বল আলোকে সমস্ত মুঘল পরিবার আত্মবিস্মৃত হয়ে গেল। বাদশাহ আলমগীর তোমারই প্রলোভনে পিতাকে কারারুদ্ধ করিলেন—জ্যেষ্ঠপুত্র মুহম্মদ সুলতানকেও অবরুদ্ধ করলেন।

সুলেমান শিকো। তুমি তো ছিলে ময়ূর সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী, দারার জ্যেষ্ঠপুত্র। তোমাকেও রাজরক্তের অভিশাপে ময়ূর সিংহাসনের সম্মুখে আত্মাহুতি দিতে হয়েছিল। মুরাদ বক্স! তুমি আর কেন অবশিষ্ট থাকবে? বাদশাহ আলমগীর অনুগ্রহ করে তোমার ছিন্নমুণ্ড পিতাকে উপহার দেন নি। সে কি পিতার প্রতি করুণা? তোমার ছিন্নমুণ্ড আলী নকীকে তোমার ছিন্নমুণ্ড বর্ষাফলকে বিদ্ধ করে এক পক্ষ কাল জনতার কৌতূহল বর্দ্ধন করেছিল।

নিদাঘের উদ্যানে পুষ্পদলের মতন শাহজাহানের বংশধর একটির পর একটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল। বাদশাহ শাহজাহান নিষ্ফল আক্রোশে কখনও গর্জ্জন, কখনও অশ্রুবর্ষণ, কখনও অভিশাপ দিয়ে এবং কখনও আল্লার নিকট প্রার্থনা করে তাঁহার দুর্ব্বহ দিনগুলি অতিবাহিত করছিলেন। বাদশাহ আলমগীর আগ্রার দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে এক নূতন সুদৃঢ় প্রাচীর নির্ম্মাণ করিলেন। দুর্গদ্বারে ভীষণ-দর্শন সশস্ত্র হাবসী প্রহরী। নগরের সর্ব্বত্র গুপ্তচর। শাহজাহানের পুরাতন ভৃত্য ও কর্ম্মচারী সকলকেই দুর্গ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে। একমাত্র অবশিষ্ট রাজপরিবারের পুরনারী এবং খোজা ভৃত্য তাঁহার সহচর ও আজ্ঞাবাহী। সম্রাট পক্ষাঘাতে পঙ্গু। যষ্টির উপর নির্ভর করে কায়ক্লেশে স্বয়ং প্রকোষ্ঠ থেকে অলিন্দ পর্য্যন্ত পদচারণ করেন। অলিন্দে বসে কখনও তাজমহলের দিকে করুণ নেত্রে দৃষ্টিপাত করেন; কখনও অশ্রু বিসর্জ্জন করেন, কখনও অদৃষ্টকে ধিক্কার দেন। কখনো বা তাঁহার প্রিয় বীণা বাজিয়ে সঙ্গীতের মধ্যে অতীতের স্মৃতি বিলুপ্ত করেন। সপ্তাহে একটিদিন মাত্র বাদশাহ আলমগীরের আদেশে রাজনর্ত্তকীদের সঙ্গলাভ করে চিত্তবিনোদন করেন।

আগ্রার দুর্গে মুহম্মদ সুলতান দিনে দুইবার শাহজাহানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। বাদশাহ আলমগীরের লিখিত অনুমতি ব্যতীত শাহজাহানের সঙ্গে অন্য কোন মানুষের সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ ছিল। অনুমতিসাপেক্ষ সাক্ষাৎ ও আলাপের প্রতিটি শব্দ বাদশাহ আলমগীরের নিকট বর্ণিত হত। শাহজাহানের কক্ষের মসীপাত্র ও লেখনী আলমগীরের আদেশে স্থানান্তরিত হয়েছিল। একজন বিশ্বস্ত খোজা ভৃত্যকে শাহজাহানের লেখক নিযুক্ত করা হল। সেই খোজাভৃত্যই ছিল শাহজাহানের একমাত্র লিপিকার। স্বহস্তলিখিত কোন লিপি প্রেরণ শাহজাহানের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

শাহজাদা দারা আগ্রা দুর্গ পরিত্যাগের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাদের ব্যবহৃত সাতাশ লক্ষ মুদ্রা মূল্যের হীরা জহরৎ মণিমুক্তা শাহজাহানের অন্তঃপুরে এক সুরক্ষিত গোপন কক্ষে আবদ্ধ রেখেছিলেন। শাহজাহানের নিকট বাদশাহ আলমগীর পরাজিত দারার উত্তরাধিকারের দাবীতে সেই হীরা জহরৎ দাবী করলেন। শাহজাহান সেই নিষ্করুণ দাবী রূঢ়ভাবে প্রত্যাখান করেছিলেন। শাহজাহানের পক্ষে মৃত দারার স্ত্রী কন্যাদের এই শেষ সম্পদ—হত্যাকারীর হস্তে সমর্পণ করা যে কি মর্ম্মান্তিক তা একমাত্র আল্লাই জানেন। শেষ পর্য্যন্ত শাহজাহান অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে সেই হীরা জহরৎ বাদশাহ আলমগীরের হস্তে সমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেদিনের কর্ম্মকাহিনী তুমি ভোলনি।

পাদসাহ বেগম! বাদশাহ আলমগীরের লোভ ছিল সীমাহীন। দারার পত্নীকন্যার হীরা জহরৎ লাভেও বাদশাহ আলমগীরের লোভ তৃপ্ত হয়নি। তাঁহার সর্ব্বাধিক লোভাতুর দৃষ্টি ছিল পিতার শতমুক্তাখচিত জপমালার প্রতি—সেই মালার প্রত্যেকটি মুক্তা ছিল একই বর্ণ, একই আকার এবং একই পরিমাপ মূল্য চারিলক্ষ আশরফি। আরও ছিল শাহজাহানের অনামিকায় পরিহিত একটি বৃহৎ হীরক খণ্ড। সেই হীরকখণ্ডের শাহজাহান প্রতিদিন মুকুরের মত তাঁহার প্রতিফলিত মুখমণ্ডল অবলোকন করতেন। বাদশাহ আলমগীর শাহজাহানের নিকট লিখলেন, এই মুক্তার মালা এবং হীরকখণ্ড সংসার-ত্যাগী অপেক্ষা সম্রাটের অঙ্গেই অধিকতর শোভা পায়। এই উক্তির ইঙ্গিত অত্যন্ত সরল, সহজ এবং স্পষ্ট। শাহজাহান নির্বোধ ছিলেন না; অত্যন্ত দুঃখ এবং ক্ষোভের সঙ্গে তাঁহার অঙ্গুরী বাদশাহ আলমগীরের নিকট প্রেরণ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই লিখলেন—আমি আমার এই জপমালা নিয়েই নমাজের সময় আল্লার নাম উচ্চারণ করি। আমি এই জপমালা বাদশাহকে দেব, কিন্তু তার পূর্ব্বে আমি মুক্তাগুলিকে চূর্ণবিচূর্ণ করব। তারপর আর বাদশাহ আলমগীর মুক্তামালার প্রতি কোন লোভ প্রদর্শন করেন নাই। কোন উচ্চবাচ্য করেন নি।

সিংহাসনচ্যুত শাহজাহানের অপমান এইখানেই শেষ হয়নি। সম্রাট শাহজাহানের ব্যবহৃত রাজ পরিচ্ছদ, শয্যা সামগ্রী, ভোজন পাত্র মণিমুক্তা অন্তঃপুরিকাদের অলঙ্কার—দেওয়ানী আম এবং দেওয়ানী খাসের সঙ্গে [illegible] যা কিছু দ্রব্য—সমস্তই অতি সাবধানে এবং যত্নের সঙ্গে [illegible] করে রাখা হয়েছিল। মণিমুক্তা এবং মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণ[illegible] আওরঙ্গজেবের খাস গোদামখানাতে তাঁহার বিশ্বস্ত খোজা ভৃত্য [illegible] তত্ত্বাবধানে অর্গলাবদ্ধ এবং মোহরাঙ্কিত করে রাখা হয়ে-

ছিল। তারপর প্রয়োজন অনুসারে তিনজন কর্ম্মচারীর সম্মুখে সেই অর্গল উন্মুক্ত করে প্রত্যেকটি জিনিষ পরীক্ষা করা হত এবং প্রত্যেক কর্ম্মচারীর বিভিন্ন মোহরাঙ্কিত করে অর্গলবদ্ধ করা হত। প্রথমেই বৃদ্ধ সম্রাটের মনোরঞ্জনের জন্য তাঁহাকে তাঁহার প্রিয় মণিমুক্তা অবলোকন করবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরে সেই অনুমতি প্রত্যাহৃত হয়েছিল। আমার মনে পড়েছে একদিনের ঘটনা—বৃদ্ধ সম্রাট তাঁহার খোজা ভৃত্যের নিকট এক জোড়া পাদুকা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন—সেই খোজা ভৃত্য আগ্রার বাজার থেকে অতি সাধারণ চর্ম্ম-পাদুকা শাহজাহানের নিকট প্রেরণ করেছিল। সে পাদুকার মূল্য আট টাকা নয়, চার টাকা নয়, দু'টাকা মাত্র। খোজা ভৃত্য শাহজাহানের পদপ্রান্তে পাদুকা ন্যস্ত করে অনুগ্রহ দৃষ্টিপাত করল। শাহজাহান ভৃত্যের স্পর্দ্ধায় বিস্মিত হলেন। যে শাহজাহান প্রতি সপ্তাহে তিনবার মণিমুক্তাখচিত মকমলের অথবা শশক চর্ম্মের কিংবা পশমীনার পাদুকা পরিবর্ত্তন করতেন তাঁহার পদদ্বয়ে কি না অতি সামান্য কঠিন চর্ম্মপাদুকা! শাহজাহানের সেই গ্লানি ভৃত্য তার বন্ধুদের নিকট পত্রপুষ্প পল্লবিত করে ব্যাখ্যান করেছিল। যেন সেই ভৃত্যই শাহজাহানকে পরাজিত করেছে। এ কাহিনী আগ্রার প্রাসাদে প্রবাদ হয়ে পড়েছিল।

অন্য আর একদিনের ঘটনা তোমার মনে আছে পাদসাহ বেগম! শাহজাহানের নিঃসঙ্গ কারাজীবনের সঙ্গী ছিল তাঁর বীণা। একদিন বীণার তার ছিঁড়ে গিয়েছিল—শাহজাহান খোজা ভৃত্যকে বীণা সংস্কারের আদেশ দিয়েছিলেন, অবিলম্বে যেন বীণা সংস্কার করা হয়। একদিন, দুইদিন, তিনদিন সেই বীণা শাহজাহানের নিকট ফিরে আসে নাই। প্রতিদিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে শাহজাহান দুর্গের উন্মুক্ত অলিন্দে তাজমহলের দিকে দৃষ্টিপাত করে বীণা বাজিয়ে তাঁহার অন্তরের বার্ত্তা তাজবিবিকে শোনাতেন। চতুর্থ দিনে তিনি উত্যক্ত হয়ে খোজা ভৃত্যকে অবিলম্বে বীণার আনয়নের জন্য আদেশ করলেন। বাদশাহ বেগম! মনে পড়ে—খোজা ভৃত্য কি উত্তর দিয়েছিল? পাদশাহ বেগম! অনেক দুঃখে তোমার নিকট পুঞ্জীভূত বেদনার ভার লাঘব করছি, তুমি ভিন্ন আর কে বেদনার অংশ নেবে?

পাদশাহ বেগম, এই দুঃখের জন্য দুঃখ করে লাভ কি? তুমি তো জান আওরঙ্গজেব আগ্রা দুর্গ অবরোধ করে প্রথমেই দুর্গে জল চলাচলের পথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। শাহজাহান ছিলেন পান-বিলাসী, প্রতিদিন ঝিলাম নদীর পথে নৌকাযোগে কাশ্মীর থেকে ফুল, ফল, বরফ শাহজাহানের জন্য দিল্লীতে আসত। জলের অভাবে শাহজাহানের জীবন অতীষ্ট হয়ে উঠল। এদিকে শাহজাহানের ব্যবহৃত সমস্ত পানপাত্র অর্গলাবদ্ধ। সম্রাট শাহজাহান পৌত্র মহম্মদ সুলতানের নিকট পানীয় জল এবং পানপাত্রের অনুরোধ জানালেন। পিতার অনুমতি ভিন্ন কোন দ্রব্যই শাহজাহানের নিকট প্রেরণ করা নিষিদ্ধ—আওরঙ্গজেব আদেশ এই ছিল। মহম্মদ সুলতান পিতার নিকট শাহজাহানের জন্য পানপাত্র এবং পানীয় প্রেরণের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। অনুগ্রহ করে আওরঙ্গজেব জলদানের আদেশ করলেন। কিন্তু সে পানপাত্র মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণপাত্র নয়, মণিমুক্তাখচিত পাদুকা। তুমি তো জান, পাদশাহ বেগম! শাহজাহান বলেছিলেন—বিধর্ম্মী কাফের হিন্দু মৃত পিতার আত্মাকে জলদান করে, শ্রাদ্ধ করে আত্মাকে তৃপ্ত করে। কিন্তু আমার ধার্ম্মিক পুত্র আওরঙ্গজেব তাঁর জীবিত পিতাকে অশ্রদ্ধা করে জলপূর্ণ পাদুকা দান করেছে।

জীবনের শেষদিনে এত দুঃখের মধ্যেও শাহজাহান তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুত হননি। আল্লার প্রতি বিশ্বাস হারান নি। সম্পূর্ণভাবে তিনি ভাগ্যের হস্তে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। কনৌজের মোল্লা সৈয়দ মহম্মদ কনৌজী শেষ জীবনে শাহজাহানের সঙ্গে পবিত্র কোরাণ আলোচনা করে তাঁকে তৃপ্তি দিয়েছেন। রসুল আল্লার জীবন আলোচনা করেছেন—মোল্লাদের সঙ্গে একত্র নামাজ পড়েছেন। ঈদ, মহরুরম প্রভৃতি ইসলামের পুণ্য দিবসে শাহজাহান ভিক্ষুক, উলেমা, ফকীরদের দান করতেন। বাদশাহ আলমগীর শাহজাহানের নিজ হস্তে দান করবার অধিকার বন্ধ করে দিলেন, কারণ দানের সুযোগে শাহজাহান হয়ত তাঁর স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টি কত্তে পারেন। সুতরাং আওরঙ্গজেব তাঁর দান নিষেধ করে দিলেন।

তুমিই ছিলে পাদশাহ বেগম, সম্রাট শাহজাহানের সেই দুর্বিসহ জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী—একাধারে মাতা ও কন্যা। তোমার মধ্যে রয়েছে আমাদের মাতামহী জগৎ গোঁসাইনির ধর্ম্মপ্রাণতা, মাতা মমতাজ বেগমের কোমলতা। কারাগারে শাহজাহান দেখেছেন দারার ছিন্ন মুণ্ড—শুনেছেন শুজার পলায়ন, নির্ব্বাসন—শুজার পত্নী কন্যার তিরোধান, মুরাদের ছিন্ন মুণ্ড সর্ব্বজন সমক্ষে প্রতিবাদীর হস্তে সমর্পণ করা হয়েছিল, আবার শুনেছেন গোয়ালিয়র দুর্গে সুলেমান শিকোর তিলে তিলে মৃত্যু। তুমিই তো পাদশাহ বেগম, একহাতে সম্রাটের অশ্রু মুছিয়ে দিয়েছ, আর এক হাতে নিজের অশ্রুমোচন করেছ। তোমার অশ্রুজল মুঘল রাজপরিবারের বহু পাপ প্রক্ষালন করে দিয়েছে। আমি আমার পিতার শেষ জীবনের সেবা করব বলে কত কল্পনা করেছিলাম, কত আশা করেছিলাম, তোমার আদর্শে জীবন অনুপ্রাণিত করেছিলাম। আমার দুর্ভাগ্য, আমি সেই সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হয়েছি। আমার পিতা আমাকে বুঝতে পারলেন না; তোমার পিতার অভিশাপের দিনে আমার পিতার আমাকে অত্যন্ত প্রয়োজন, তাঁর সেই দূরদৃষ্টি নেই। আত্মরক্ষার জন্যও তাঁর আত্মদর্শন নেই।

তোমার পিতা তোমার সেবায়, তোমার সান্নিধ্যে মৃত্যুর মুহূর্তে অপূর্ব্ব আত্মনিবেদন করার মতন শক্তি লাভ করেছিলেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব পর্য্যন্ত তিনি সজ্ঞানে পবিত্র কোরাণ পাঠ শুনেছিলেন, তাঁর পার্শ্বে তাজবিবির সপত্নী অশ্রুপ্লুতা আকবরাবাদী মহল, ফতেপুরী মহল, কন্যা নুররহনার বানু, পৌত্রী জাহানজেবকে সান্ত্বনা বাণী দিয়ে আশ্বস্ত করেছিলেন। জীবনে তার যে আল্লায় বিশ্বাস ও নির্ভরতা ছিলনা, মরণের পূর্ব্বে তিনি তাঁর সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি দরিদ্র ও ফকীরদের মধ্যে বিতরণ করবার আদেশ দিয়েছিলেন, এবং তোমার উপরই সেই ভার অর্পণ করা হয়েছিল।

ক্রমশঃ

সাধন সঙ্গীত

রাগপ্রধান—ত্রিতাল

শিব সুন্দর পরম-পান্থ,
নিলে তব পন্থাতে ;
এই অভিযান রাখি' তব পানে
সাথী হ'লে মোর সাথে।
নিলে তব পন্থাতে ॥

সকল আঘাত, সব প্রলোভনে
দলিয়া চলেছি আমার চরণে,
শত্রু বিফল, প্রিয় পরিজনে
বৃথাই আমারে সাধে !
নিলে তব পন্থাতে ॥

দেব-দানবেরা প্রলয় ঘনায়ে
রুধিতে পারে না মোরে,
বিশ্ব-বিপদ-বারণ বন্ধু,
তুমি আছ অন্তরে।

তোমারে স্মরণ করিয়া সদাই
আমার সাধন সরণীতে যাই,
তোমার পাবক-পরশন পাই
আমার দিবস-রাতে
নিলে তব পন্থাতে ॥

কথা : নিশিকান্ত (পণ্ডিচেরী) সুর ও স্বরলিপি : তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

০ ১ + ৩

পা মা II { পা- র্সা না র্সা | -া পা মা রা | সণা -রা সা -া | -া -া -া -া I
শি ব সু ন্ দ র ০ প র ম পা ন্ থ ০ ০ ০ ০ ০

I না -সা রা মা | রা -মা পা -ণা | পা -না না -র্সা | -া -া পা মা } I
নি ০ লে ত ব ০ প ন্ থা ০ তে ০ ০ ০ "শি ব"

I ণা -া ধা ণা | ণা -পা পা পা | পা ধা ধা -মা | পা -া -া -া I
এ ই অ ভি যা ন্ রা খি ত ব পা ০ নে ০ ০ ০

I পা র্রা -া র্সা | -র্রা র্রা র্সর্গা র্গর্র | র্সনা ধনা র্সা -া | -া -া -া -া I
সা থী ০ হ ০ লে মো০ র্ সা০ ০ থে ০ ০ ০ ০ ০

I ন্া -সা রা মা | রা -মা পা -ণা | পা -না না -র্সা | -া -া পা মা II
নি ০ লে ত ব ০ প ন্ থা ০ তে ০ ০ ০ "শি ব"

II মা পা -র্সা র্সা | র্সা -া র্সা র্সা | র্সা র্রা র্সনা ধনা | র্সা -া -া -া I
স ক ল্ আ ঘা ত্ স ব প্র লো ভ০ ০ নে ০ ০ ০

I মা পা ণা পা | না র্সা র্রা র্সা | র্রা র্মা র্রর্মা -র্রা | র্সা -া -া -া I
দ লি য়া চ লে ছি আ মা র চ র০ ০ ণে ০ ০ ০

I র্রা -র্পা র্পর্মা র্মা | র্রা র্রা র্সা র্রা | র্সনা র্সা ণা -পা | পা -া -া -া I
শ ০ ত্রু বি ষ০ ল প্রি য় প০ রি জ ০ নে ০ ০ ০

I রা মা পা মা | পা -র্সা র্সণা ণা | -পা পা -া -া | -া -া -া -া I
বৃ থা ই আ মা ০ রে সা ০ ধে ০ ০ ০ ০ ০ ০

I ন্া -সা রা মা | রা -মা পা -ণা | পা -না না -র্সা | -া -া পা মা II
নি ০ লে ত ব ০ প ন্ থা ০ তে ০ ০ ০ "শি ব"

১ + ৩
II রা পা -া মা | মধা ধপা মা রা | রা মা রা সা | রা সা ন্া সা I
দে ব ০ দা ন০ ০ বে রা প্র ল য় ঘ না য়ে রু ধি

I প্া -া -া প্া | ন্া -া ন্া ন্া | সা -া -া -া | -া -া -া -া I
তে ০ ০ পা বে ০ না মো রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I প্া -না সা ন্া | সা রা মা -রা | মা -পা ণা -ধা | ণা -া পা -া I
বি ০ শ্ব বি প দ বা ০ র ০ ণ ০ ব ন্ ধু ০

I -া পা র্রা র্সা | র্রা -া -া -া | -া র্সা -না ধনা | র্সা -া -া -া I
০ তু মি আ ছ ০ ০ ০ ০ অ ন্ ত রে ০ ০ ০

I	মা পা র্সা র্সা	র্সা -া র্সা র্সা	র্সা -র্রা র্সনা ধনা	র্সা -া -া -া	I
	তো মা রে স্ম	র ণ্ ক রি	য়া ০ স০ ০	দা ০ ০ ই	
I	মা পা ণা পা	না র্সা র্রা র্সা	র্রা -র্মা র্রর্মা -র্রা	র্সা -া -া -া	I
	আ মা র সা	ধ ন স র	ণী ০ তে০ ০	যা ০ ০ ই	
I	র্রা র্পা র্পা র্পর্মা	র্রা র্রা র্সা র্রা	না -র্সা ণা -পা	পা -া -া -া	I
	তো মা র পা	ব ক প র	শ ০ ন ০	পা ০ ০ ই	
I	রা মা পা মা	পা র্সা র্সণা -পা	পা া -া -া	-া -া -া -া	I
	আ মা র দি	ব স রা ০	তে ০ ০ ০	০ ০ ০ ০	
I	ন্া -সা রা মা	রা -মা পা -ণা	পা -না না -র্সা	-া -া পা মা	II II
	নি ০ সে ত	ব ০ প ন্	থা ০ তে ০	০ ০ "শি ব"	

ভরত

শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

কহিলেন শ্রীভরত : হে রামজননি !
আর্য্যবনবাস-কথা আমি নাহি জানি।
রাজ্যতৃষা নাহি মাতঃ ! নাহি অন্য আশ—
শুধু জানি তিনি প্রভু আমি তাঁর দাস।
মোর অভিলাষে এই নির্বাসন
পিতৃহত্যা পাপ তবে করুক স্পর্শন।
তার লাগি' অভিশাপ : যার প্রেরণায়
অগ্রজের ভাগ্যলক্ষ্মী ম্লান বেদনায়
হউক উন্মাদ সেবা—ছিন্ন বস্ত্রধারী।
বৃত্তি তার হ'ক ভিক্ষা ! নারীবধকারী
যে পাপে নিমগ্ন হয় হ'ক সেই পাপ।
যার লাগি' অযোধ্যার এই দুঃখ তাপ—
রবির উদয় আর গমন সময়
শয্যাশ্রিত মানবের যত পাপ হয়
হ'ক সেই অপরাধ ! লভি' উপকার
যে জন তাহার ঋণ না করে স্বীকার ;
অপরের দেবতায় রহে যার দ্বেষ
নাহি করে দূর যেবা অপরের ক্লেশ
বারি দান নাহি করে যে তৃষ্ণার্ত্ত-নরে
পিতা ও মাতার সেবা যেবা নাহি করে—
এই সব পাপ মোরে করে যেন গ্রাস
আমার লাগিয়া যদি এই বনবাস।
রামের অযোধ্যা আর অযোধ্যার রাম—
সেই রাম পদে আমি জানাই প্রণাম।

ন্যূনতম বেতন সম্বন্ধীয় আইন

শ্রীনির্মলচন্দ্র কুণ্ডু এম-এ, ডি-এস্-ই

শ্রমিকের কল্যাণে—

শ্রমিকদের বাদ দিয়ে সমাজের টিকে থাকা আজকাল সম্ভবপর নয়। তাই দুনিয়ার খোরাক যোগানোর মূলে যে মজুর রয়েছে—সে কথা সমাজ স্বীকার করেছে। সমাজের কাঠামো জোরালো করতে হোলে—মজুরদের আগে একটা সুরাহা করার দরকার। এই জন্যই তাদের ভাত-কাপড়ের দিকে, তাদের কল্যাণের দিকে পড়েছে আমাদের নজর। দেহে ও মনে সবল ও কর্ম্মঠ মজুর তৈরী করার ভার সারা-সমাজের। এ দায়িত্ব শুধু—যাঁরা মজুর খাটান তাঁদেরই নয়; রাষ্ট্রও এব্যাপারে এসেছেন এগিয়ে। ইতিমধ্যে সরকার শ্রমিকদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য ও তাদের কল্যাণের জন্য কতকগুলো আইনগত ব্যবস্থা করেছেন। নজীর হিসাবে আমরা দেখাতে পারি—১৯৪৮ সালের কারখানা (ফ্যাক্টরী) আইন, ১৯৪৭ সালের খনি মজুরদের ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড আইন, ১৯৪৭ সালের বিরোধ মীমাংসার আইন প্রভৃতি। এ ছাড়াও, আমাদের প্রাদেশিক সরকার ট্রাইবুনাল বসিয়ে কারখানার মালিক ও শ্রমিক এই উভয়পক্ষের চাঁদায় প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, উপযুক্ত গ্রাচুইটি প্রবর্ত্তনের নির্দ্দেশ দিয়েছেন। কারখানা আইনে-প্রাপ্য বেতনসহ ন্যূনতম ছুটী ছাড়াও—অসুস্থকালীন ছুটী ও নানা পূজা-পার্ব্বণের ছুটীর ব্যবস্থা হয়েছে।

ন্যূনতম বেতন আইন—শ্রমিকদের কল্যাণমূলক আইনের একটি। আজ আমরা এই আইনের বিষয় আলোচনা করবো। এসংসারে যাদের দুপয়সা আছে—তাদের আবহমান-কাল হ'তে এই চেষ্টা যে—কি ক'রে সবচেয়ে কম পয়সায় মজুর খাটিয়ে কাজ হাসিল করবে। আর মজুরেরা তাদের আর্থিক টানাটানির দরুণ—অনেক সময় যে কোন মজুরী—তা যত কমই হোক না কেন—নিতে বাধ্য হয়। একজন মজুর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে কাজ উদ্ধার করলে—সে তার উপযুক্ত পয়সা পেলো কিনা মালিকের সে দিকে দৃক্‌পাত নাই। মালিকদের এই চিরন্তন শোষণ-প্রবৃত্তির হাত হ'তে, শ্রমিকদের বাঁচাবার জন্য জগতের অধিকাংশ দেশই মজুরদের নিম্নতম বেতনের হার বেঁধে দিয়েছেন। যে সমস্ত শিল্পে মজুরদের গায়ের রক্ত জল ক'রে হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটতে হয়, আর যে সব জায়গায় শ্রমিকেরা সঙ্ঘবদ্ধ নয়—সেইসব ক্ষেত্রে বিশেষ ক'রে ন্যূনতম মজুরীর আইন দরকার। ইংলণ্ড সকলদেশের আগে ১৯০৯ সালে নিম্নতম বেতনের আইন পাশ করে। আমেরিকায় ১৯১২ সালে এই আইন কার্য্যকরী হয়। ১৯১৫ সালে ফ্রান্সে এই রকমের আইন তৈরী হয়। জগতের অন্যদেশের অনুপাতে ন্যূনতম বেতন আইন ভারতবর্ষের মতো গরীব দেশে অনেক আগেই পাশ হওয়া উচিত ছিল। ১৯৪৮ সালে ভারত সরকার ন্যূনতম মজুরীর একটা আইন (Minimum wages Act, 1948) পাশ করেছেন। কতকগুলি শিল্পে নির্দ্দিষ্ট হারের নীচে বেতন দিয়ে মজুর খাটানো বন্ধ করাই এই আইনের উদ্দেশ্য। যদি কোন মালিক সরকারের বেঁধে দেওয়া গণ্ডী ছাড়িয়ে—কম বেতনে মজুর খাটান, তাহ'লে তাঁর কাজ বে-আইনী বলে গণ্য হবে; আর আইন-অমান্যকারী আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হবে। দণ্ড—৬ মাস জেল বা ৫ শত টাকা জরিমানা হতে পারে। এই আইন—যাতে মজুর দুবেলা খেয়ে পরে, স্বাচ্ছন্দ্যে কালকাটানোর জন্য উপযুক্ত বেতন পায়—তার ব্যবস্থা করেছে।

ন্যূনতম বেতন আইনের জোরে আমাদের সরকার মালিক ও শ্রমিকের সমানসংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে, কমিটি তৈরী ক'রে, আইনে উল্লিখিত ১২টী শিল্পে ও কৃষিমজুরদের ন্যূনতম বেতন বেঁধে দিবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর মধ্যেই তেল কলের শ্রমিকদের ও চামড়ার কাজের মজুরদের ন্যূনতম বেতন উপদেষ্টা কমিটি বসিয়ে বেঁধে দিয়েছিলেন। এইসব শিল্পের জন্য কমিটি একজন জজের সভাপতিত্বে মালিক ও মজুরদের সমানসংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে তৈরী হয়েছিল। হাওড়া ও কলিকাতার তেলকলের নিপুণ মজুরদের মাসিক ন্যূনতম মজুরী ঠিক হয়েছে—৭৬৲ টাকা। একজন অনিপুণ মজুরের জন্য ৫০৲ টাকা। এইভাবে ময়দার কলের, চাল-কলের মজুরদের ন্যূনতম বেতন ধার্য্য হচ্ছে। গত ১৯৫০ সালে সরকার বাহাদুর চা বাগানের শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন বেঁধে দেবার জন্য শ্রমিক ও মালিকদের নিয়ে যে কমিটি বসিয়েছিলেন, সে কমিটি এ সম্বন্ধে রিপোর্ট দাখিল করেছেন। রিপোর্টটী এখন সরকার চূড়ান্তভাবে মেনে নেবার আগে বিবেচনা করছেন।

এ ছাড়া, ন্যূনতম বেতন আইন মাফিক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দ্দেশমতো শ্রম-মহাধ্যক্ষ মহাশয় (লেবার কমিশনার সাহেব) সরাসরিভাবে চারটী শিল্পের শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম বেতন ধার্য্য ক'রে দিয়েছেন। এই সমস্ত ব্যবসায়ে মজুরদের আয়ব্যয়, চলতি বেতন ইত্যাদির খুঁটিনাটী ভাবে অনুসন্ধান করার পর ন্যূনতম মজুরী স্থির করা হচ্ছে। মোটরবাস ও ট্যাক্সীর কর্ম্মচারীদের মধ্যে নানা গ্রেডের ড্রাইভারদের জন্য ৯০৲ টাকা হ'তে ১১০৲ টাকা ন্যূনতম বেতন স্থির হয়েছে। অভিজ্ঞতার তারতম্য অনুসারে কন্‌ডাকটরদের মাহিনা ৭০৲ টাকা হ'তে ৭৮৲ টাকা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বিড়ি শিল্পের কারিগরদের ন্যূনতম দিনমজুরী ও হাজার বিড়িপিছু মজুরীর হার স্থির হয়েছে। এ ছাড়া মিউনিসিপ্যালিটির কর্ম্মচারী, জেলাবোর্ডের কর্ম্মচারী, রাস্তাঘাট তৈরীর কাজে কুলীমজুরদের ও রাজমিস্ত্রী এবং তাদের যোগাড়েদের ন্যূনতম মজুরী ধার্য্য হবে। শীঘ্রই এ সম্বন্ধে সরকারের বিজ্ঞপ্তি বার হবে।

ন্যূনতম বেতন আইনের বলে—পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৩ সালের কৃষি মজুরদের নিম্নতম মজুরী বেঁধে দেন। এই উদ্দেশ্যে পাড়াগাঁয়ের মজুরদের আয়ব্যয়ের হিসাব, তাদের সাংসারিক অবস্থা, দিনমজুরী, দিনের খাবার খরচ, অভাব অনটন সম্বন্ধে অনুসন্ধান শেষ হয়েছে। এই আইন কার্যকরী হ'লে পাড়াগাঁয়ের মজুরদের দুর্দশা কিছুটা কমবে ও তাদের জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যথেষ্ট বাড়বে। পাড়াগাঁয়ের অনেক জায়গায় যে সামান্য মজুরীতে বা কোনও মজুরী না দিয়ে যে বেগার খাটানোর রেওয়াজ আছে—সেটাও চিরকালের মতো যাবে বন্ধ হয়ে।

পরিশেষে আর একটী কথা না বললে ন্যূনতম মজুরীর সব কথা বলা হবে না। যে সমস্ত শিল্প ন্যূনতম মজুরীর আইনের আওতায় আসে না—সেই সমস্ত শিল্পের মজুরদের ন্যূনতম বেতনের ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকার ট্রাইবুনাল বসিয়ে করেছেন। লোহার কারখানাদারেরা আগে ২৫৲ টাকা হতে ৪০৲ টাকা মজুরী দিতেন। মাগগীভাতা সমেত গড়ে মোট ৫০৲ টাকা পেত একজন মজুর। লোহার কারখানার ট্রাইবুনালের রায়ে সবচেয়ে কম বেতনভোগী অনিপুণ মজুরের মাসিক বেতন মাগগীভাতা সমেত ৫৫৲ টাকা ও আধা-নিপুণ মজুরের বেতন ৬০৲ টাকা স্থির হয়েছে। কাপড়ের কলে ন্যূনতম বেতন শতকরা ২৫৲ টাকা বাড়িয়ে ৫০৲ টাকা ও চটকলে সবচেয়ে কমবেতনের পরিমাণ ৪৬৶০ আনা হতে ৫৮৷০ টাকা ধার্য্য হয়েছে।

ন্যূনতম বেতন আইন ঠিকমতো চালু হচ্ছে কিনা তা তদারক করার জন্য সরকার ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করেছেন। ইন্সপেক্টররা এই আইনের আওতার কারখানা মালিকদের বেতনসম্বন্ধীয় খাতাপত্র তলব করতে পারবেন ও আইন-মতো মজুরী যদি না দেওয়া হয় দেখেন—তা হলে মালিকদের দোষী সাব্যস্ত করে অভিযুক্ত করতে পারবেন।

আইনের দ্বারা শ্রমিকের ন্যূনতম বেতন বেঁধে দেবার যে শুভ হিড়িকটা দেখা দিয়েছে—তার ফলে শ্রমিকদের জীবনের লক্ষ্য ও জীবনযাত্রার ধারা উন্নত হবে—এই আমরা আশা করি। তাদের উপরই আমাদের ভালমন্দ করছে নির্ভর; তাই আজ রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের পর—তাদের কথাটাই আমাদের বড় ক'রে মনে পড়ে।

চৌপদী

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

(১)

কতজনই লিখিতেছে গল্প গান কবিতা নাটক।
লেখক দুর্লভ নয় এই দেশে দুর্লভ পাঠক।
ছাপিবার যন্ত্র আছে বহু বই ছাপা হয় তাই
পড়া তো সহজ নয়, পড়িবার কোন যন্ত্র নাই।

(২)

বসন্ত শেষ গ্রীষ্মও শেষ চলছে এখন বর্ষা,
ঝাপ্‌সা সবি আবছায়াতে, আকাশও নয় ফর্‌সা।
ডাকলে কোকিল মারো তারে পাও যদি তার দেখা
রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন মিষ্টি এখন কেকা।

(৩)

শোনো ভগবান এইবার তোমা আসন হইবে ত্যজিতে,
আইন করিয়া আর কাহারেও দেবনা তোমারে ভজিতে।
গণতন্ত্রের দেশকাল এটা, চলিবে না আর চালাকি,
আমাদেরি ভোটে বাঁচন মরণ, শুনিছ? হইলে কালা কি?

(৪)

এ জীবনে ভোগসুখ যত,
উটের খেজুর পাতা চিবানোর মত।
তালু তাতে ছিঁড়ে যায় ঠোঁট তাতে চিরে যায়
বালুরাশি পায় পায় পুড়ায় সতত॥

(৫)

মসলা এমন কি আছে আর প্রেমের সম,
যাতে দেবে তাই হবে যে মিষ্টতম।
নিম ছেঁচকি হয় যে মিঠে প্রিয়ার হাতে,
আনন্দে খাই বিনা নুনে ঢেঁড়স ভাতে।

(৬)

বন্দী ছিলি এত কাল মুক্তি পেলি
পেয়ে খোলা সম্মুখে শড়ক।
না চেয়ে ডাইনে বাঁয়ে চলে গেলি
ওপথের শেষ যে নরক।

(৭)

যোগীদের সাধনার ধ্যানলব্ধ স্বাধীন এ দেশ,
হবে কি উন্মাদগ্রস্ত রোগীদের আশ্রম বিশেষ?
ত্যাগীদের বক্ষোরক্তে লব্ধমুক্তি আমার বাঙ্গালা
হায় রে হবে কি লুব্ধ ভোগীদের রঙ্গনাট্যশালা?

(৮)

লেখাটি তোমার ফাঁপা ফুটবলসম
অন্তরে তাত প্রবেশ করে না মোটে,
ধাক্কা মারিয়া মাথার খুলিতে মম
ফিরিয়া আবার তোমার পানেই ছোটে।

(৯)

'প্রডিগ্যাল সন' কোথা ছিল এতকাল
ফিরে এসে হ'ল, বাবা, আদুরে দুলাল।
একেবারে ভুলে গেলে তারে হায়, যেবা
চিরদিন পদতলে করিতেছে সেবা!

(১০)

বোকায় এবং খোকায় ভরা দেশটা
নয়ক তাদের ভুলানো খুব শক্ত।
লেখায় আঁকায় তারই কর চেষ্টা,
মিলবে বহু টাকা এবং ভক্ত।

পহাল গামের পথে

(২৮)

দত্তদের সঙ্গে সেই কবে পথে দেখা হয়েছিল। আজ তারা নিমন্ত্রণ করে গেছে হাউস-বোটে। মাছ খেতে পাবো।

বাঙালী মাছপ্রিয় সন্দেহ নেই। অসিতও নিমন্ত্রণ পেয়েছে তার এক প্রফেসরের হোটেলে। সকালবেলা হাজির পাণ্ডা কোটেশ্বর। "অমরনাথের ইচ্ছা থাকলে আপনারা অমরনাথ যেতে পারেন। কাল তো পাহালগাম যাচ্ছেন আপনারা। আমার বাড়ী মার্ত্তণ্ড। সেখানে বাস দাঁড়াবে। খেয়ে যেতে হবে কিন্তু। ভাত, দাল, সব্জী, আর কিছু নয়। না-না—আপত্তি নয়। আমরা এ খাওয়াই। আমাদের নিয়ম। আমার অনুরোধ, আপনি না বলতে পারবেন না।" অসিত নিমন্ত্রণ নিয়ে নিলো। কোটেশ্বরজী চলে গেলেন।

সেই কথাই হচ্ছিল দত্তদের হাউসবোটে। ঝিলমের বাঁধের গায়ে হাউসবোটে। ও'রা ক্ষিধেয় ছটফট্ করছিলেন। আমরা আসতেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। দত্ত-গৃহিণীর হু'চোখ-ভরা তিরস্কার—"এতো দেরী ; খিদে পায় না ?"

"পায় বৈকি ! ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করায় দায় আছে।"

"দায় না ছাই। আর দশ মিনিট পরে এলে দেখতেন কেমন তাড়িয়ে দিতাম।"

"সেও তো খাওয়া হোতো ! গলা ধাক্কা খাওয়া।"

খাওয়ালেন চমৎকার। বিরিয়ানী পোলাও, মাংস আর মাছের ফ্রাই।

ঠেসে খেয়ে গল্পগুজব করতে লাগলাম। গুণেনবাবু তাঁর ছবির গল্প করতে লাগলেন। বেণু আর দত্ত-গৃহিণী গল্প জুড়েছে একান্তে। হঠাৎ দত্ত-গৃহিণী বলে উঠলেন—"সত্যি নাকি ? আপনারা অমরনাথ যাচ্ছেন ?"

"সত্যি কিনা জানি না ; ব্যবস্থা করছি। যাবার চেষ্টা খুব করবো।"

"তবে তুমি একা দিল্লী ফিরে যাও। আমি এ'দের সঙ্গে চল্লাম অমরনাথ।"

"তুমি যাবে, অমরনাথ কেন, গোল্লায় গেলেও আমার হক্ কি তোমায় নিষেধ করি। আমার রং নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক কৃষ্ণচন্দ্রের মতো ; তোমার রং 'তড়িত লতা তনু' ; তোমায় নিষেধে নিরস্ত রাখার সাহস কই আমার। বুকে রাখতে পারি, রুখে তো রাখতে পারিনা।"

"কেবল ফাজলামীই জানো। সোজা কথা বলোনা বাপু—যেতে দেবেনা।"

নীচের ঠোঁটটা একটু বেরিয়ে এলো। গাল দুটো একটু ভারী হয়ে এলো, ডবল চিনটা স্পষ্ট হোলো। অভিমানের সুসম্পূর্ণ ছবি।

হেসে বললেন দত্ত,—"একা দিল্লী ফিরলেই দিদি আবার বিয়ে দিয়ে দেবেন। জানো তো দিদি বললেই আমি বিয়ে করি। ও আমার অভ্যেস !"

গুণেন বলে,—"সেরেছে !"

"কোরো, কোরো, বিয়ে করো। তার মধ্যে অমরনাথ আমি ঘুরে আসবো।" আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, "কি আমায় নিয়ে যাবেন না ?"

"দ্বাভ্যাং তৃতীয় :—শাস্ত্রে নিষেধ। 'নিদ্রাভঙ্গ কথাচ্ছেদো দম্পত্যোং প্রীতি ভেদনম্'—এসব ব্রহ্মহত্যার মতো পাপ। তবে যদি দত্ত মশায়ও যান্—"

"অসম্ভব। স্ত্রীতে আমার অনুরাগ ; কিন্তু চাকরিতে আমার টান্। অনুরাগ পোষার আসল টান্। স্ত্রীর মুখখানা সময় মতো দেখার জন্ত আমার যতো টান, তার চেয়েও বেশীটা আমার জয়েন্ট সেক্রেটারির বেলা দশটায় আমার মুখখানা দেখার। তাঁর মন ভাঙলে জোড়া লাগবে না, কিঞ্চিৎ অর্থে স্ত্রীর মন জোড়া লাগে।"

"দেখো অপমান কোরোনা বল্ছি ! তোমার টাকা আমি চাইনা !" লাল হয়ে বৌঠান বল্লেন।

"কবে চেয়েছো ? বিল আসে। পাওনাদার চায় দিয়ে দিই। খালের দেশে এসে বিলের বহর বেড়ে বেড়ে মণিব্যাগটা ভাসিয়ে নিয়ে ছেড়েছে।"

"কেবল টাকার খোঁটা আমার সয়না। কি এমন খরচ করেছি শুনি ?"

গুণেন বলে "এমন কি। নিয়ে বেরিয়েছিলাম সাতশো। এখান থেকে টেলিগ্রাম করিয়ে এনেছি তিনশো। এখন দেখছি আবার অন্ততঃ শ'দুয়েক নৈলে বাড়ী ফেরা যাবেনা।"

"বোলোনা, বোলোনা গুণেন ; বছর খানেকের সঞ্চয় নিমেষে ধুলায় হোলো লয়। শুনছি আর জিভ যেন টাগ্‌রায় আটকে যাচ্ছে।"

হাসতে হাসতে দত্ত-গৃহিণী আমায় শুনিয়ে বললেন—"দেখছেন তো বেরসিক বিয়ে করে আমার সব গেল।"

"যা বলেছো !" বলে দত্ত মশাই হাঁপ ছাড়লেন।

কিন্তু পরদিন যখন পাহাল গামের বাস ছাড়লো তখনও আমরা এই মধুর দম্পতীর গল্প করেছি। আমরা যাচ্ছি শুনে ওদের উৎসাহের কথা বার বার মনে হচ্ছে।

রমন্না নিজেই সব গুছিয়ে গাছিয়ে দিলো। আমরা এখন আটদিনের জন্য পাহাল-গাম যাচ্ছি। রমন্নার চিন্তা আমরা অমরনাথ যাওয়া মনস্থ করেছি। ওর মতে ও বিপদে এখন মাথা না গলানোই শ্রেয়। আমাদের কদিনের শ্রীনগরবাস শেষ হোলো, বাক্স বিছানা বেঁধে আটটার সময় বাসে চড়লাম। কিছু জিনিষ রমন্নার কাছে রেখে গেলাম। বোধহয় আরো কিছু রেখে গেলাম এই সদাহাস্য বিদেশী বন্ধুটীর কাছে।

পহাল-গামের পথে আমরা কয়েকটা জায়গা দেখতে দেখতে যাবো। অনন্তনাগ, কুয়ারনাগ, অচ্ছাবল, মার্ত্তণ্ড।

অনন্তনাগ কাশ্মীরের একটা প্রধান জিলা। এখানে বেশীর ভাগ লোকই নানারকম শিল্পদ্রব্য তৈরী করে। গাব্বার কাজ আর কাঠের কাজই প্রধান। অনন্তনাগে এখনও বিষ্ণুমন্দির আছে। তার পাশে প্রস্রবণ। এ প্রস্রবণের জল সমস্ত রোগ দূর করে বলে খ্যাতি। তখন সকাল দশটা হবে। মোড়ের মাথায় বাস থামলো। শ্রীনগর থেকে এসেছি ৪২ মাইল। খানিকটা বাজার পেরিয়ে অনন্তনাগ মন্দিরে

অনন্তনাগে কপটেশ্বরের ঝরণা

গেলাম। এখন বলে কোঠের। প্রাচীন কপটেশ্বর মন্দির এইখানে ছিল। প্রস্রবণের জল একটা বাঁধানো পুকুরে পড়ছে। পুকুর ভর্ত্তি মাছের দল। একেবারে তলায় মাছগুলি পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে। পাপ-সূদন কপটেশ্বরের মহিমা ভারতবিশ্রুত ছিল। কাশ্মীরের রাজা পদ্মরাজ। মালবের ভোজরাজের সমসাময়িক। বন্ধুতা হয় উভয় রাজায়। ফলে পদ্মরাজ কপটেশ্বরের ঝরণার জল কাঁচের বোতলে ভরে ভোজরাজকে পাঠাতেন মুখ ধোবেন বলে। ভোজরাজ জলের মহিমা অনুধাবন করে কাশ্মীর রাজকে পাঠালেন সোনার পিণ্ড। এই সুবর্ণের বিনিময়ে পদ্ম-রাজ একটী গোলকুণ্ড নির্মাণ করেন। সেই কুণ্ডটী মন্দিরের বাম দিকে। আমরা গিয়ে সেখান থেকে জল খেলাম। অচ্ছাবল—কিস্তওয়র পথ। সেই পথের ওপর কপটেশ্বর, কোঠের।

কোঠেরের ঝর্ণা সম্বন্ধে নানা কাহিনী আছে। একটী কাহিনী আছে যে, ঝর্ণার জলের তলায় একখণ্ড পাথর আছে। তাতে উৎকীর্ণ আছে লিপি। এ লিপিতে সন্ধান লেখা আছে ভূগর্ভস্থিত বিরাট রত্ন-ভাণ্ডারের। জলের ধারা দেখিয়ে যদিচ লোকে এখনও সেই কাহিনী বলে থাকে, এটা সত্য যে সে পাথর আজও কেউ সাহস করে বার করতে পারেনি। যদি পারতো অনন্তনাগের অনন্ত দারিদ্র্য থাকতো না।

দোকানে দোকানে ভরা বাজার। সেখানে গেলে এ দারিদ্র্য বোঝা যায় না। বুঝতে গেলে শহরের আরও ভিতরে গলির মধ্যে যেতে হয়। যেতে হয় যেখানে দড়ি দিয়ে চাকা টেনে চলেছে মুসল-মান বালক। সেই চাকার গায়ে শুকনো পপলার বা দেবদারুর ডাল গেঁথে নানা রকম যন্ত্র দিয়ে কাটা চলেছে। গোল গোল ফুলদানী, বাতিদান, খাটের পায়া, লম্বা ইলেকট্রিক ষ্ট্যাণ্ড তৈরী হচ্ছে। শ্রীনগরে যে ফুলদানীর জোড়া তিনটাকা, বাজারে যা দু'টাকা, এইসব গলিতে তা একটাকা দামে বিক্রী হয়। ওদের দারিদ্র্যের মূলধনে স্ফীত হয় বণিক। ভাবি যদি এদের একটা কো-অপারেটিভ্ গিল্ড থাকতো, যদি এরা একজোট হয়ে কাজ করে নিজেরাই বাজারে চালু করতে পারতো, যুগ যুগ ব্যাপী এই দুঃসহ দারিদ্র্য এদের সইতে হোতনা।

অনন্তনাগের বাজার

অনন্তনাগের বাজারে চা খেতে খেতে মনে পড়ে—কাশ্মীরের এই সব শিল্পের ঐতিহাসিক আর অর্থনৈতিক পরিচয়। অনন্তনাগের

কাঠের কাজ, ইসলামাবাদের শাল। কাশ্মীর বলতেই তো কাশ্মীরী শালের কথা মনে পড়ে। কাশ্মীর "ল্যাকারওয়র্কে" অর্থাৎ কাঠের ওপর রঙীণ গালার রং-বাহারী কাজেও ওস্তাদ। শ্রীনগরের বাজারে এই কাজের নমুনা পকেট-অনুযায়ী নানা রকমের পাওয়া যায়। সৌখীন ভ্রমণবিলাসীরা কাশ্মীরের স্মৃতি হিসেবে ছোটো বড়ো নানা উপঢৌকন কিনে আনেন। তেমনি আনেন কাঠের, বিশেষ করে আখ-রোট কাঠের, নানা নক্সা-বাহারী জিনিষ, বেতের ঝুড়ি ইত্যাদি। কিন্তু কাশ্মীর বলতে আসলে কাশ্মীরী শাল। ইসলামাবাদে এর প্রধান কেন্দ্র। এখন কারিগররা সকলেই কাশ্মীরী। চিরকাল তা ছিল না। কাশ্মীরের শাল এলো বাবর বাদশার সময়ে। বাবর তো শিল্পকর্মের মহা সমঝদার ছিলেন। ইরাণের কারিগরদের কাশ্মীরে এনে তিনিই এ কাজের প্রবর্ত্তন করেন। নক্সার ভিতগড়নটা তাই আজও পারসিক পদ্ধতি মেনে চলেছে। যাকে আমরা বলি কল্কা—এই কল্কার বাহারেরও একটা আকস্মিক অভ্যুদয় যোগ আছে। তখনকার দিনে বাদশারা উষ্ণীষের ওপর একটি মধ্যমণি ব্যবহার করতেন, নাম জিঘা। জিঘার চারপাশে মণিমুক্তার কারসাজি; আর তারই মাথায় একগুচ্ছ দামী পালক ঝলমল করতো। আন্দি-জানী এক কারিগর একবার একটা জিঘার কল্কা করলো নানা রঙে রেশমী আর পশমী সুতোয় শালের ওপর। দেখতে অবিকল রত্নময় জিঘা। বাবর দেখে মহাখুসী। সেই শালের জিঘাই তিনি উষ্ণীষে বাঁধলেন। ব্যস; সেইটাই চলন হয়ে গেল, আর সেই থেকে আলোয়ানে, রুমালে, শাড়ীতে, আঙ্গরাখায়, চোগায় ঐ জিঘার প্রচলন। রণবীর সিংয়ের এক সেনাপতি জেনারেল ভেন্তুরা দশ এগারো ফুটের একটা জিঘায় একটা স্কার্ফ ভরে, তার নাম 'পাম্ ডিজাইন' দিয়ে ফ্রান্সের অভিজাত মহলে প্রচার করলেন। এই সঙ্গে য়ুরোপে শালের প্রচলনের কথাও মনে পড়ে যায়। এখানেও নেপোলিয়ন একদিকে, অন্যদিকে রাজা রামমোহন রায়। মিশর জয় করার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ নেপোলিয়নই প্রথম কাশ্মীরী একখানা শাল সম্রাজ্ঞী জোসেফিনের জন্য নিয়ে যান। এই য়ুরোপে প্রথম শালের ঐতিহাসিক প্রামাণ্য আবির্ভাব। কিন্তু য়ুরোপীয় শালীন সমাজে এর প্রচলন করেন রাজা রামমোহন রায়; তাঁর চোগার ওপর শাল জড়িয়ে রসিকজনের চোখে শালের নেশা লাগিয়ে দিয়ে। আমি এক বিশিষ্ট শালব্যবসায়ীর কাছে শুনেছি যে আজও কাশ্মীর বাঙ্গালীর কাছে কৃতজ্ঞ। "শালের নিয়মিত খরিদদার বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর গুণেই কাশ্মীরী শাল পৌঁছালো য়ুরোপের দরবারে, সেখানকার অভিজাত মহলে। বাঙ্গালীর তত্ত্বে শাল একটা অবশ্য দেয় সামগ্রী। শালের সমঝদার বাঙ্গালী। আর য়ুরোপে ফ্রান্স। ফ্রান্সে জার্মানীতে যুদ্ধ বাধলেই কাশ্মীরীরা চায় ফ্রান্সের জিত। নৈলে ফ্রান্সে শাল কেনার তাগিদ যাবে কমে।"

শালের পশম জোগাড় করতে হয় তিব্বত থেকে, তিব্বান-শাল এবং উরুতরফান্ অঞ্চল থেকে। এই উৎ, পশমের শালই প্রসিদ্ধ তুষ।

অচ্ছাবল উদ্যান

কারিগরদের অত্যন্ত দুরবস্থা। তারা কিছুদিন আগেও দৈনিক ছ'পয়সা থেকে দু'আনা মজুরী পেতো। এখন অনেক ভালো। সরকার খুব সাহায্য করছেন। ওদের একখানা ভাল শাল করতে একবছরের বেশী খাটতে হয়।

মীর্জা গুলাম বেগ কাশ্মীরের জনপ্রিয় নেতা। 'অরীফ্' ছদ্মনামে তিনি কাব্য লেখেন। বর্ত্তমান কাশ্মীর সরকার তাঁতীদের আর কারি-গরদের উন্নতির প্রতি কতো সজাগ—অরিফের এই কাব্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়:—

অঙ্গে তোমার আঙরাখা বোনা দোয়াখা কাশ্মীরীনা!

খোঁজ করেছো কি, দেখেছো কি চেয়ে, কোনো ক্ষত আছে কিনা?

দোরোখা নক্সী-ফুলের পাপড়ি ঘিরে
জখম আছে কি ? রক্ত আছে কি লেগে ?
আছে কি স্বপ্ন জেগে ?
আধপেটা খেয়ে ছোটো ছেলে তার ঘুমিয়ে পড়েছে রাতে ;
বুড়ী ধুয়ে চলে পশমের ধুলো হিমে বিরক্ত হাতে।
আশা তার পাবে কিনা
দুমুঠো অন্ন বেচে আঙ্গরাখা দোরখা কাশ্মীরীনা।
প্রদীপে তো তার তেল নয় ওটা, রক্ত দিয়ে তা ভরা,
পলতে উস্কে, তারি আলো দিয়ে শালেতে নক্সী করা
দোরোখা নক্সী ফুলের পাপড়ি ঘিরে
কত হৃদয়ের রক্তালু-ক্ষত রক্ত দিয়েছে চিরে
স্বপ্ন তাহার জীবনে আসবে কিনা
বেচে আঙ্গরাখা দোরোখা কাশ্মীরীনা।
কুমারী চোখের বিদ্যুৎ কতো এই নক্সীর গায়
অন্ধ হয়েছে শুধু কাজ করে ; অন্ন কি পাওয়া যায় !
কতো ডালিমের লাল হোলো পীত, বসন্ত গেলো ফিরে
কতো হৃদয়ের রক্তালু ক্ষত রক্ত দিয়েছে চিরে।
তুমি দেবে দক্ষিণা !
কতো যৌবন মূল্যে পরেছো দোরোখা কাশ্মীরীনা।

আর ওরা করে কার্পেট। কার্পেটের ডিজাইন আগে কাগজে এঁকে নিয়ে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় তার একটা ছন্দ আঙ্কিক নিয়মে লেখা থাকে। একজনার লেখা অন্যে সহজে বোঝেনা। ইচ্ছা করেই এমনি সাঙ্কেতিক বর্ণ ব্যবহার করা হয়। একদল বুনে চলে। অন্যদল, যারা ডিজাইন-কার তারা বসে বসে চেঁচায়,—'এইবার পাঁচঘর নীল ; দু'ঘর সবুজ এবার' ; 'ছাড়ো ; দশঘর ফাঁকা কালো।' কার্পেটখানা শেষ অবধি বোনা না হওয়া পর্য্যন্ত কেউ জান্তে পারেনা ডিজাইনটা হবে কি।

একথা যখন এসেই পড়লো এই সঙ্গে কাশ্মীর-শিল্পের আরও দু'চারটে কথা ধরে নেওয়া যাক্। শাল, কার্পেট, গালার কাজ ছাড়া কাশ্মীরে গাব্বার কাজ। এও জমাট কম্বলে নক্সী কাজ। কিন্তু ভ্রমণবিলাসীদের কাছে প্রিয় কাজ 'পেইপার মেশী'—অর্থাৎ কাগজের মণ্ডের কাজ। এই মণ্ডকে নানান আকারে জমাট করে তার ওপর রং দিয়ে অভিনব নক্সীর কাজ করে এরা। হাল্কা অথচ মজবুত জিনিষ। সুদৃশ্য ও আপেক্ষিকভাবে কম মূল্যের। এরা বলে 'কলমদানী'র কাজ। কারণ পেইপার মেশী কাজে কলমদানীই প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া দামী রঙ্গীণ পাথর কাটাই, রূপা-তামার কাজ, সামোভার গড়ন, নৌকার কাজ থেকে কাঠের আসবাবের কাজ পর্য্যন্ত এবং বর্ত্তমানে উৎসাহিত কাশ্মীরজাত সিল্কের কাজ কাশ্মীরী জীবনের মজ্জায় মিশে গিয়ে জীবিকার একটা মস্ত কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নব পর্য্যায়ে পাঁচশালা বন্দোবস্তে সরকার এই সব কুটীর শিল্পের ওপর খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। ইসলামাবাদ, পাম্পরসরায়, অনন্তনাগ, শ্রীনগর—এইসব জায়গাতেই কুটীর শিল্পের প্রকৃত পীঠস্থান। কাশ্মীর জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় পেতে গেলে এসব জায়গায় যাওয়া অনিবার্য্য।

অদ্ভুত এক কাহিনী শুনলাম কোঠেরের জল সম্বন্ধে। কাহিনীটা সারা অনন্তনাগে প্রচলিত একটা ছড়াকে আশ্রয় করে। ছড়াটা এই—

মুৎসকুণ্ড রাজস মইসিহন্দি কাণ।
তিম কতি শালনস্? কুঠোরওয়ান্॥

কে এক রাজা ছিল মুৎসকুন্দ—মুচকুন্দ হবে হয়তো। তার সমস্ত রাজকীয় চিহ্নের ও রূপের অন্তরায় ছিল দুটী কাণ। কাণ দুটী মোষের কাণের মতো। রাজার মাথায় মোষের কাণ নিশ্চয় রাজার ব্যক্তিত্বকে বিশেষ মর্য্যাদা দিতনা। বুঝতে বেগ পেতে হয়না যে রাজার হোতো পরম অস্বস্তি। অরাজকীয় কাণ দুটী সরাবার প্রকৃষ্ট উপায় কেটে ছোটো করানো। আয়ুর্বেদোক্ত মতে কাটলেও সুশ্রুত তো আর রাজার কাণ কাটতে পারেননা ; পারলেও রাজার কাণ-কর্ত্তনকারীর প্রাণধারণ বিশেষ বিপজ্জনক ব্যাপার হোতো। তখন রাজা এক উপায় বার করার আদেশ দিলেন। রাজার জানা ছিল কুঠেরের জলের মাহাত্ম্য—চুপিসাড়ে একদিন এসে মুচকন্দ ঝর্ণার জলে মারলেন এক ডুব। ডুব দিয়ে উঠেই দেখেন কাণ থেকে গাধামীর বোঝা নেমে গেছে। কাজেই মুচকুন্দের কর্ণবৃদ্ধি রোগের আশু উপশমের কাহিনী অনন্তনাগের ছেলে বুড়ো জানে।

ক্রমশঃ

বিশল্যকরণী

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শিং ভেঙে বাছুরের দলে অনেকেই ঢুকে থাকেন, শ্রান্তপক্ষ বিহঙ্গের মত চিঁহি চিঁহি ও করেন, কিন্তু মহিম মামার যৌবন অক্ষয় অব্যয় অনির্বাণ। বাবার সঙ্গে সমানে আড্ডা দিয়েছেন—জগৎদা বলতে অজ্ঞান, এখন আমাদের সঙ্গেই ওঠেন বসেন। মাথার চুলে আর এক যৌবনলক্ষ্মী শুভ্র মল্লিকার মালা পরিয়ে দিলে কি হয়, মনের সবুজপত্র আজও পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। মোটকথা মামা আজও কচি ও কাঁচা, শুধুকড়ি নয় কোমল।

সেদিন লেকের মিক্সড্‌ আড্ডায় পা দিয়েছি কি না দিয়েছি, গেটের কাছ থেকেই শুনতে পেলুম মামার দিল-খোলা-প্রাণ উচ্ছল বাক্যস্রোত যেন সাগর গর্জ্জন করছে—গল্প আর কি বলবো রে ভাই—নবনীটা ফাঁসিয়েছে বুঝি—পুষ্পমালা নাহি মোর, রিক্ত বক্ষতল, নাহি বর্ম অঙ্গদকুণ্ডল—তোদের সঙ্গে কি আর পাল্লা দিতে পারি, না জেল্লা আছে কথায়—আমাদের দৌড় ঐ পর্য্যন্ত।

নবনী আমাদের বন্ধু আর ওঁর দূরসম্পর্কের ভাগনে। সেই সূত্রেই উনি আমাদের 'কমন' মামা। আর বয়সের কমবেশ থাকলে কি হয়—সম্বন্ধটা হয়ে গেছে সচিব সখা প্রিয় বান্ধবের। নবনী বিলাতফেরত ব্যারিষ্টার—বাপ যা রেখে গেছে তা অধস্তন তিনপুরুষকে গোল্লায় দেবার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু ফুসফুসের দোষে ওর স্বাস্থ্যটা গেছে ভেঙে, তাই বিয়েও করেনি, কোন মাথাব্যথাও নেই। দীঘার প্রায় কাছাকাছি সমুদ্রের ধারে একটা চমৎকার বাংলো বানিয়ে রেখেছে, সুবিধে পেলেই যায় আসে। বছরের বেশীভাগই সেখানে কাটায়—সে আবার ওখানকার এক থোকা হাকিমও বটে অর্থাৎ অনাহারী।

মামা বললেন—এর আগে নবনী কতোবার বলেছে, যাইনি, এখন আপশোষ হচ্ছে—কী চমৎকার জায়গা—এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা পেরিয়ে হরজটাভ্রষ্ট দেবী যেখানে আর থাকতে না পেরে রাই-উন্মাদিনীর মত সাগর জলে ঝাঁপ দিয়েছেন তারও আরও দক্ষিণে—সেখানে ওপরে নীল, নীচে নীল, সামনে নীল—দেখে দেখে আশ মেটেনা, নয়ন ন তিরপিত ভেল—

নবনী কবি মানুষ—ফোড়ন কাটলে—

আবেশ লাগে মনে, নীলে নীলে নীলাঞ্জনার অকাল জাগরণে, আকাশপ্রদীপ জ্বেলে দেখে অরুন্ধতীর দল—

মামা বললেন—থাক—আর কবিতায় কাজ নেই—তবে পাদপূরণটা করে দিই—মত্ত মাতাল সাগরতল হতেছে উতল—কিন্তু জীবনে সমুদ্রমন্থন ত রোজই হয়, বাসুকির লেজ ধরে কতো টানাটানি—উঠছে সেই একই গরল—নীলকণ্ঠের আজ আর শক্তি নেই তাকে কণ্ঠে ধরবার—

কিন্তু গজমোতি হার গলায় নহ-কন্যা নহ-মাতার একটি আধুনিকা সংস্করণ উঠবেন ত—তিনিই মোহিনী হয়ে অমৃত বণ্টন করে দেবেন—

তা যা বলেছিস—কথাটা কি জানিস্‌—সব তীরথ্‌ মে তীরথ সাঁচা হ্যায়—মানুষই সেই সত্য তীর্থ—শুধু ইয়া ঘটকা পরদা খোল দেখা—অন্তরের পরদাটা সরিয়ে দিয়ে দেখতে হয়—তাই দেখে এলুম রে ভাই—

সে কী মামা—

আমরা ত শুনলুম যে নবনী তোমাকে ভজিয়েছিল যে ওখানে যা মুর্গী পাওয়া যায় আর ওর বাবুর্চি তোফা কাটলেট বানায় আর ওষুধ হিসেবে শরীর তাজা রাখার জন্য দু'এক ভোজ তেজালো জলীয়েরও বন্দোবস্ত আছে—নেপোলিয়নের দিনের খাঁটি আঙুর—পুঞ্জপুঞ্জ দ্রাক্ষা-গুচ্ছ—আর তুমি নাকি মামীর ভয়ে বলিদানের পাঁটার মত কাঁপতে কাঁপতে কালীঘাটের কালী, চিৎপুরের চিত্রেশ্বরী, দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীকে ডেকে মানত করে-

ছিলে নির্বিঘ্নে একা যেন সমুদ্রতীরে একমাস কাটিয়ে আসতে পারো—

তোদের নিয়ে আর পারিনা—ওহে ভ্রমর ভাই, কোন্ কাজের তাগিদ নাই, গল্প যদি শুনবে বল তার খবর কইয়্যা যাই, সাঁঝের বেলা ফুটলো ফুল তার খবর কইয়্যা যাই।

পৌছলুম ত সমুদ্রের ধারে—খাই দাই বেড়াই—একদিন হলো কি কথায় কথায় এগিয়ে চলে গেছি অনেকদূর, ক্যাকটাস ক্যাস্যুরীনার ছায়া বেয়ে বালীয়াড়ীর পাহাড়ের উপর দিয়ে—দেখছি ধীরে ধীরে আলো নিভে আসছে, অন্ধকারের কালোয় নিজেকে নিবিড় করে নিকষকৃষ্ণার সায়রে নিজেকে ডুবিয়ে দিচ্ছেন জ্যোতিষাং জ্যোতি। জলে এসেছে জোয়ার, বাতাসে দিয়েছে দোলা, আকাশের তারারা মিটমিট করে হাসছে। উদাসীন সমুদ্রও নিভৃত নৃত্যের রসাভাসে জাগছে—তারই একটা মর্মান্তিক আকুতি ছড়িয়ে পড়ছে বালির বেলাভূমিতে। দেখি দূরে বসে আছে একটি ছেলে আর মেয়ে—তাদের কণ্ঠে এসেছে গান, সুরের লহরীতে ছেয়ে গেছে আকাশ-বাতাস—ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হতে। হঠাৎ দেখি ছেঁড়া প্যান্টালুন-পরা উস্কোখুস্কো-চুল বিস্ফারিত চোখ নিয়ে এক প্রৌঢ় কোথা থেকে এসে দাঁড়ালেন, বললেন—লজ্জা করেনা stop that song you idiots, গান থামাও মূর্খরা, সবচেয়ে বড়ো গান গাওয়া হচ্চে, শুনতে পাও না। বজ্রকঠিন আদেশের মত শোনালো সেই বাণী। থতোমতো থেয়ে গেলো তারা—আর বাপের বয়সী আমিও। নবনী আমার গা টিপে সাবধান করে দিলে, কথা না বলে এগুলো, দেখি সমুদ্রের সেই বালিয়াড়ীর ধারে ফণিমনসার পাশে দাঁড়িয়ে আক্রোশে গজরাচ্চে যেন একটি শঙ্খচূড় মহাসর্প।

নিভৃতে নিরালায় বসে আলাপ করছেন ওঁরা—ইডিয়টরা জানে না যে নূতন শূল তৈরী হচ্চে আমার বিজ্ঞানশালায় যা বিঁধবে ওদের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে। ডাক্তার সমাদ্দারের একটি ডোজে প্রেমচন্দ্র উধাও হবেন জগত থেকে—এমন ট্রানকুইলাইজার বের করেছি যে সব উত্তেজনা প্রশান্ত হয়ে যাবে চিরকালের মত, সব উন্মত্ততা শান্ত হবে একটি ইনজেকসনে—রক্তে বইবে না জোয়ার, ধমনীতে আসবে না উচ্ছ্বাস, মনে জাগবেনা আবেগ—কিগো কবির দল, ওগো স্বপনচারিণীরা, তোমাদের দিন উঠলো, নতুন করে গড়বো আমি মানুষকে, সৃষ্টির জৈবিক নিয়ম পর্য্যন্ত দেবো পাল্টিয়ে, হাক্সলি যা কল্পনা করেনি, আইনস্টাইন যা ভাবেনি।

হো হো করে একটা উন্মত্ত হাসির ঝড় বয়ে গেলো সমুদ্র সৈকতে। লেখকের দল—কি হবে তোমাদের কল্পনা করতে পারো—প্রেম নেই, ভালবাসা নেই, কামনা নেই, উত্তেজনা নেই—কি নিয়ে কাব্য লিখবে, গল্প ফোটাবে, উপন্যাস রচনা করবে—আর ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে হবে না—পদ্মদিঘীর ঘাটে গো, বসে সিঁড়ির পাটে গো, সুন্দরী এক কন্যে ভাবছেন কার জন্যে।

নবনী কিছু বললে না—শুধু ইঙ্গিত করলে এগিয়ে যেতে—আরো কিছু দূর গিয়ে বললে—মস্ত বড় পণ্ডিত লোক—মিঃ সমাদ্দার—তবে মাথার দোষ আছে—ওঁর কথা পরে বলবো—ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে, মরণং কোথায় জানি না—ঐ যে গাঁ দেখছো, ওরই পিছনে আছে এক মন্দির, সেইখানেই আস্তানা।

আমরা এগিয়ে চললুম—সামনেই সেই মন্দির, এমন কিছু নয়—শুধু একটা ঘর—তারি চাতালে সমুদ্রের দিকে মুখ করে আধোজাগ্রত চন্দ্রের মত বসেছিল একটি পরিপূর্ণা কালো মেয়ে—ছেঁড়া কাপড়, দেহ মলিন, কিন্তু মালিন্য ভেদ করে চোখের কী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, মুখে কী বিদ্যুৎময় আবেশ। নবনী বললে—আমি যখন প্রথম এখানে আসি—তার কিছুদিন পরে একদিন পুলিশ এক আসামীকে ধরে নিয়ে এলো আমার কাছে, স্টেটমেণ্ট লেখাবার জন্য—রক্তাক্ত উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। ভদ্রলোক বেড়াতে এসেছিলেন এই নিরালা সাগর তীরে—ক্যাফেটোরিয়ায় থাকতেন—আর সমুদ্রের ধারে মাইলের পর মাইল ঘুরতেন—কী যেন খুঁজতেন, বলতেন বিশল্যকরণী খুঁজছি, এমন ওষুধ যে মেয়ে-মানুষ পুরুষ দেখলে চঞ্চল হবে না, আর পুরুষ মেয়ে দেখলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবে। শান্ত করে দিতে হবে এ বৃত্তিটাকে। বৈজ্ঞানিক লোক, নাম ডাক, বিত্তাবত্তার পরিচয় আছে—জন্ম থেকেই মিশনরীদের দাক্ষিণ্যে মানুষ, বিলাতে গিছলেন তাদেরই সাহায্যে। প্রণয়রসসিক্ত হয়ে ঐ দেশেই একটি আতাম্রকুন্তলার পাণিপীড়ন করেন—তার পরের ইতিহাস অলিখিত—হয়তো একটি নিরুক্ত পরিচ্ছেদ

আছে। হঠাৎ একদিন দেখা গেলো বিজ্ঞান ছেড়ে প্রজ্ঞানে নিয়ে মেতেছেন, মন্দির ও মূর্ত্তি নিয়ে গবেষণা করছেন, বিশেষ করে তন্ত্রোক্ত স্ত্রী মূর্ত্তি নিয়ে আর গাছ-লতাপাতার মাঝে ওষুধ খুঁজচেন—প্রেম নামক শল্যকে উৎপাটিত করবেন, পঞ্চশরের শর যাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো যে এখানকার মন্দিরের বিগ্রহকে কলুষিত করেছেন তিনি—কালীর পায়ের নীচের শিবকে ভেঙে ফেলে দিয়ে নিজে সেইখানে শুয়েছিলেন—সকালে লোকে দেখতে পেয়ে উন্মাদ ভেবে প্রহার দিয়েছে। নবনী আরো বললে যে, আমি পরিচয় পেয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ছাড়িয়ে দিলাম, নিজের বাড়ীতে এনে চা জলযোগ করিয়ে সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—ব্যাপার কী বলুন ত ? উদ্ধত জবাব দিলেন তিনি—অনু কে বোঝো—হাইফেন-বার্গব্রডিঞ্জারের নাম ত করো—এম্-এস্-সি না—বললাম হ্যাঁ—তবে ঐ অনুগুলোর ভেতর যে শক্তি আছে সেগুলো পাষাণ হয়ে জমে যাচ্চে ঐ কালো পাষাণীর মধ্যে, তার খবর রাখো—ফিসন্ আর ফিউসন্ মুখে বললে হয় না। ভেঙে চুরমার করে ছড়িয়ে দিতে হবে ঐ চূর্ণ অনুকে—তবেই ত শক্তির খেলা দেখতে পাবে, সবাই হবে শক্তিধর, বীর্য্যবান্। শিবটা পারলেনা, নামেই শুধু মহাকাল—মহাদেবচন্দ্র যে মরে ভূত হয়ে গেছেন সে খেয়াল কারো নেই—গাঁজায় দম দিয়ে ভোঁ হয়ে পায়ের তলায় ঘুমুচ্চেন ভূতনাথ—নন্ কণ্ডাকটার বনে গেছেন—তাই এ ব্যাটাকে সরিয়ে নিজের বুকের উপর ঐ নাচের তালের ধুকধুকি শুনছিলাম, কী অন্যায় করেছি বাবা—

মুখে তখনও তীব্র সুরার গন্ধ—মনে হলো নির্জলা নির্ভেজাল খাঁটি তালরস মহিমাই এই প্রেমরস সীমার একটি সসীম দিক্। বুঝলাম পাণ্ডিত্যের চাপে আর নানা রকমের কারণে অকারণে মাথার স্ক্রু গোলমাল হয়েছে। আমার এক মনবীক্ষণী বন্ধু ছিলেন, সাইকোএনালিষ্ট—তাঁকে চিঠি লিখলাম—তিনি এলেন, দেখলেন, বললেন—ফ্যামিলির ইতিহাস নাও, আর মনের গোপন সুড়ঙ্গের, কোন বিপ্তার আর সুন্দরের যাতায়াত ছিল—বিলেতে কিছু ঘটেছিল নিশ্চয়ই—কিছুদিন দেখে-শুনে দাওয়াই বাৎলালেন—ভদ্রলোকের বিয়ে দিয়ে দাও একটি কালো মেয়ের সঙ্গে—খবরদার সমস্কাজী গৌরী হলে চলবে না, চিকণদেহা শ্যামাঙ্গিনীও নয়—একটি মেবাদী আলুলায়িত-কুন্তলা কপালকুণ্ডলাকে ধরো এই নবকুমারের জন্য—আচ্ছা, মামা আমার কি ঘটকালীর ব্যবসায়—অনেক কষ্টে ব্যবস্থা করে পাঠিয়ে দিলাম রাঁচিতে। এক সপ্তাহের মধ্যে খবর এলো—একী কাকে পাঠিয়েছো—এ রকম একটা সুস্থ, মনীষাসম্পন্ন, কূটবিচারে অভ্যস্ত, বিদ্বান বুদ্ধিমান বিনয়ী নম্র ভদ্রব্যক্তি সচরাচর দেখাই যায় না। আরো পনেরো-দিন পরে ছেড়ে দিলে তারা। কলকাতায় গিয়ে পুনরায় অধ্যয়নব্রতী হলেন তিনি। ভুলেই গেছি কথাগুলো, মাস আষ্টেক বাদে আবার এক গোলযোগ—হাঙ্গামাহুজ্জুত—এবারে ব্যাপার আরো সঙ্গীণ—মন্দিরে ঢুকেছেন উনি, সঙ্গে একটি মেয়ে—ঐ যে চত্বরে বসে যেটি। মহিম মামা বললেন—আমি চমকে উঠলাম নবনীর কথায়—বলিস কিরে, অতো বড় বিদ্বান জ্ঞানী লোক।

নবনী বলে চললো—জানো মামা—মেয়েটা কিছু কুলবতী নয়, তবে যৌবনবতী চটকবতী বটে, বাগদীদের না দুলেদের, না চাঁড়ালের ঘরের তা জানিনা, তবে শুনলুম যা, তাতে প্রকৃতিতে উচ্ছৃঙ্খল, বন্ধনবাঁধন মানে না, একেবারে হাটবাজারের, সম্ভ্রমসৌরভ কিছু নেই, লাজ ভয় ঘৃণাও নয়, কিন্তু যেন একটি চঞ্চল বিদ্যুৎশিখা। শুনে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেলো। তার সাথে কি রকম করে যে জুটেছেন তা জানিনা, সারারাত হৈহৈ করেছেন, কখনো ফক্সট্রট নেচেছেন, বোতল গড়াগড়ি গিয়েছে, বলেছেন—পাষাণীকে পিশে চুরমার করে দেবো, চেঁচিয়েছেন—তুমি দেবদাসী, আমি দেবীদাস, দুজনে মিলে শিব ব্যাটাকে তাড়িয়ে দেবো—ডিস্‌মিস্—তারপর, কাণ্ড কি, নিজের বুকের উপর দাঁড় করিয়েছেন ঐ কালো-বরণী নগ্না নগণ্যাকে, দিয়েছেন তার হাতে দেবীর খগড়, বার করিয়েছেন জিভ্, নিজের বুকে খোঁচা দিয়ে রক্ত বের করে লাগিয়েছেন তার জিভে। সকালবেলা গাঁয়ের লোক, পুরুত নাপিত জেলেমালা এসে দেখে—একী কাণ্ড—সবাই অবাক্, দুজনেই বাহ্যজ্ঞানহীন, লোকজন এসেছে, ভোরের আলো ঢুকেছে, হুঁসই নেই। হৈহল্লা করতে মেয়েটাত আলুথালু বেশে দৌড়ে পালালো। উনি মার খেয়ে ঢুলঢুলু চোখে বললেন—কি বাবা, ভোলা মহেশ্বরের পার্ট প্লে করছিলাম—সহ্য হোলনা—দিলে ত

সোনার চাঁদ মৌতাতটিকে ভেঙে—জানো ধরেছি বেটির কায়দা, অণু আর পরমাণুর ঘড়িটাকে নিয়েছি কেড়ে—অষ্টভৈরবীরা খুঁজে পাবেনা—পৃথিবীর দম বন্ধ করে দেবো—সময়ের চলা স্তব্ধ—কী মজা তারপরে চোবাবো ঐ ঠাকরুণকে সমুদ্রের জলে।

আবার পাঠানো হলো রাঁচিতে, আবার তারা ফেরত পাঠালে—শুধু ফেরত পাঠালে নয়—যতদিন সেখানে ছিলেন ততদিন তিনি দর্শনবিজ্ঞান, মহাজাগতিক বিকীরণ, শক্তির লীলা নিয়ে এমনি এক দিগগজী প্রবন্ধ ফাঁদলেন, যার নাম দিলেন—কাল আর কালী—যে তার কপিশুদ্ধ পাঠিয়ে দিয়ে তাঁরা লিখলেন—যিনি এই উঁচুদরের প্রবন্ধ লিখতে পারেন, তাঁকে সাধারণভাবে পাগল বলবো কি করে। ছেড়ে দিলেন ওঁরা—তারপরে কোন পাত্তাই নেই প্রায় বছর দুই। মেয়েটা কিন্তু—নাম তার মাতঙ্গী সেইদিন থেকেই কেমন যেন বদলাতে সুরু করলো—এতদিনের প্রগলভতা যেন আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে—সে যেন ক্ষণিকের এক নতুন স্পর্শে জেগে উঠছে। রঙ্গ-রস, জাতি ব্যবসা, ঘরের কাজ সব ছেড়ে দিলে—কাজ নিলে ঐ মন্দিরে—সকাল সন্ধ্যে ঐ মন্দিরের চত্বর নিজের মাথার চুল দিয়ে পরিপাটী করে মুছে দেয়, বলে—কত-কালের কতলোকের পায়ের ধূলোর স্পর্শ লেগে এখানে—আমরা পাপিষ্ঠে যদি কিছু পুণ্য হয়—ওর মা কাঁদে—মাতু আমার রোজগেরে মেয়ে, তাকে কিনা কোথাকার কে এক বুড়ো গুণ্ডা গুণ করে দিয়ে গেলো গা। আরো শুনলুম তার মাকে বহু অর্থ দিয়ে রাজী করিয়েছিলেন ভদ্রলোক ওর সঙ্গে মন্দিরে যেতে ঐ একটি দিনই। আগে কোন ঘনিষ্ঠতা ছিলনা, পরেও নয়।

আজ কিছুদিন হলো আবার এসেছেন ভদ্রলোক—এবারে আর এক রূপ, অবস্থা আরো খারাপ, পেণ্টুলান্ আরো ছেঁড়া—কোথায় থাকেন, কি করেন, কিছুরই ঠিক নেই, মাতুর কাছে ঘেঁসেননা, ওকে দেখলে—দূর দূর করেন, বলেন—তুই ভণ্ড, তুই মেকী, দোয়াতের কালি গায়ে ঢেলে কালী সেজেছিস, তোর আসল রং কালো নয়, হাড়ে হাড়ে কালি যখন নেই তখন হাড়কালি মাস-কালি করবি কি করে, বেরো। লাঠি নিয়ে তাড়া করেন, মাতু কাঁদে। বললাম নবনীকে—দেখ্ দেখি, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়—কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ড ঘুরে আসা ভদ্র-লোকের অবস্থা দেখ—

মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেলো—তারপর যে কটা দিন ওখানে ছিলাম দেখেছি ওঁকে—সমুদ্রের ধারে বসে আছেন—স্তব্ধ সমাহিত মানুষ, অন্য জগতের লোক—সিন্ধুর মতই গভীর আর বন্দনায়—মনে হলো বলি—

উগ্র তুমি বাহির হতে, ব্যগ্র তুমি অহর্নিশি
অন্তরেতে শান্ত তুমি, আত্মরতি মৌনী ঋষি

কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলেন—গান শুনছি। কেউ কথা কইলে চটে যান, গান গাইলে আরো, চেঁচিয়ে বলেন—যেখানে সবচেয়ে বড় গান গাওয়া হচ্ছে, তোমরা সেখানে কষ্টিনষ্টি করছো। আর দেখছি ঐ কালো, নিকষ কালো, কষ্টিপাতারে কোঁদা মাতুকে—খাচ্ছে দাচ্ছে, কাজ করছে, কিন্তু দৃষ্টি রয়েছে ঐ পাগলের দিকে, ঐ অসহায় মানুষটার দিকে—কতো মার খেয়েছে ওঁর হাতে, কতো তাড়া, কতো গালাগাল, তবু নড়েনি—ধরে বেঁধে খাইয়েছে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে শুইয়েছে, সেবা করেছে, যত্ন করেছে, পাড়ার লোকের টিটকারী শুনেছে, মা মাসীর হাহুতাশ। ভদ্রলোকের এমন অবস্থা যে খিধে পেলে বা কিছু দরকার হলে বলতে পারেননা, কখনো বলেন—দে, দে ভিক্ষে দে, যেদিন জনম সেদিন আমি দীক্ষা পেয়েছি, এক অক্ষর মন্ত্র মায়ের ভিক্ষা পেয়েছি। আবার কখনো বলেন আমার দেবতা ক্ষুধিত পাষাণ, আমার রাধাবল্লভকে রাধাবল্লভী দিয়ে সাধতে হয়না, তিনি সর্বভূক—সকলের কাছে হাত পাতেন, চেটে-পুটে খান—নিত্যেও আছেন, লীলাতেও আছেন—তাঁর দাঁড়িপাল্লায় কিছু কম পড়লে চলেনা। তাঁর কাছে কোন চাওয়াই মন্দ নয়, তাঁর কাছে কোন পাওয়াই খারাপ নয়—শুধু দিতে আর নিতে জানতে হয়—সেই টেকনিক্-টাই হলো সাধনা।

মাতুকে ডেকে ধমকে বলতেন—জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যে অপরূপ বসে আছেন তিনিই বসে আছেন তোর ঐ দেহের প্রতিটি কোষে, তোর মনের প্রতিটি ভঙ্গীতে ইঙ্গিতে, কামনায়, মিলিয়ে দেনা দুটোকে তাহলে তুইও ত রাধা হয়ে যাবি, যাকে চাইবি তাকে পাবি, বুঝলি, মিটে

যাবে, শুধু জ্বালা নয়, সব খেলা—পাগলী কিছু বুঝতে পারলি না—যা, যা, বেরো—

আমি থাকতেই এর প্রধান অঙ্কের সমাপ্তি দেখে এলাম, হয়তো নাট্যের অবসান নয়, বললেন মামা—পাড়াগাঁয়ের নিশুতি রাত—প্রায় এগারোটা—তারা-জ্বালা আকাশে আলোর হাট বসেছে, সমুদ্রের হাওয়া আসছে হুহু করে—খাওয়া-দাওয়ার পর নবনী আর আমি তর্ক করছি জোর। নবনী বলছিল, আচ্ছা, মামা, তোমার কি মনে হয়, প্রথম যৌবনে মিঃ সমাদ্দার এগনষ্টিক বা এথিষ্ট ছিলেন—এ সব তারই প্রতিক্রিয়া, তিনি ত কিছুই মানেন না। আমি জবাব দিয়েছিলাম—নবনী, শঙ্খচক্রধারী কোন বরাভয় মূর্ত্তি, অসিখর্পরধারিণী কোন চামুণ্ডা, বাঁশী হাতে কোন মনোমোহন প্যারে তাঁর চেতনাকে রাঙিয়ে পান্না হয়তো করেনি কিন্তু তাঁর অবচেতনে বিরাটের যে একটা বিশাল রূপ ফুটেছে সে বিষয়ে কোন ভুল নেই—তার সঙ্গে হয়তো কড়ায়ক্রান্তিতে মিলিয়ে নিতে পারা যাবে না শিশুকোলে কোনো ম্যাডোনাকে, ক্রুশবিদ্ধ কোন মহাপুরুষকে, নৃত্যরত কোন নটরাজকে বা ধ্যান নিমগ্ন কোন তথাগতকে, কিন্তু নিজের মতো করে সত্যকে তিনি পেয়েছেন। নবনী উত্তর দিলে—সত্য কি মিথ্যা বুঝবো কি করে—তুমি যাকে বলছো লালা, আমি বলবো শক্তির অন্ধ আলোড়ন—বড় জোর তার মধ্যে একটা ছন্দ, একটা সুষমা, একটা হার্মনি আছে—ব্যস্ এ পর্য্যন্ত।

তর্কটা আরো জোরে করবো বলে জবাব দিতে যাচ্ছি, নবনী বললে—মামা, মুলতুবী রইলো—দেখছো না কারা আসছে—

দেখি হারিকেন হাতে এক বুড়ী (পরে শুনলাম মাতুর মা) আর একটি লোক এসে দাঁড়ালো—প্রণাম করে খবর দিলে সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক অত্যন্ত অসুস্থ। নবনী ওঁর খোঁজ-খবর করতো, অলক্ষ্যে টাকাকড়ি যোগাতো—হাজার হোক অতবড় একটা পণ্ডিত মানুষ—তাই মাতু বলেছে খবর দিতে। সমাদ্দার সাহেব পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন, অবস্থা ভাল নয়। ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে আমি আর নবনী বেড়িয়ে পড়লাম। নিশীথ রাত্রের অন্ধকারে মহাপ্রকৃতি আমাদের যেন হাত ধরে নিয়ে চলেছেন—দূরে মহাসিন্ধুর গর্জন—আকাশে নক্ষত্রের অভিসার—অরুন্ধতীরা বাসর সাজাচ্ছে—বর এলো বলে—

মন্দিরের চত্বরে উঠে দেখি মাতু যেন গণেশ জননী। ভদ্রলোকের মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিয়ে জল দিচ্ছে। শ্বাস জোরে জোরে পড়ছে, বুঝলাম বাঁধন ছেঁড়ার সাধন আরম্ভ হয়েছে—গলায় তারই ঘড়ঘড়।

মাতুর চোখে অবিশ্রান্ত ধারা।

খানিক পরে আশ্চর্য্য—রোগীর জ্ঞান যেন কিছুটা ফিরলো, নেভবার আগে প্রদীপের মত—কী যেন দেখছেন—হাঁ করে চেয়ে রইলেন মাতুর দিকে—সে চোখের দৃষ্টিতে অভ্যস্ত রুক্ষতা নেই, চাঞ্চল্য নেই—শ্যামসমারোহে এক অপরূপ কোমলতা নেমেছে—এক পেলব মৃদুলতা—এক সব পাওয়ার তৃপ্তি। সে চোখের দৃষ্টি আর উপোষী চোখের দৃষ্টি নয়—সে দেখছে প্রিয়াকে, জায়াকে, মেয়েকে, মাকে, এক অক্ষরে।

হঠাৎ মাথাটা ঢলে পড়লো।

চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো মাতু।

মামী কখন এসে আসরে বসেছেন দেখিনি, দেখি তিনিও চোখ মুছচেন।

মানবতার সাগর-সঙ্গমে, সুইডেনে আর সোবিয়েতে

শচীন সেনগুপ্ত

—পাঁচ—

তৈমুরের কাহিনী বলতে বলতে সামারকন্দের কথায় এসে পড়েছি। এবার সামারকন্দ যাইনি, গিয়েছিলাম তিন বছর আগে। সেবার মস্কো থেকে তাসকেণ্টে গিয়েছিলাম রুশী ছোট প্লেনে উড়ে। দূরত্ব দুহাজার মাইল, সময় লেগেছিল সারাটা দিন। এখন মস্কো-টাসকেণ্ট জেট প্লেনে সাড়ে তিন ঘণ্টার পথ হয়েছে। ওই সময়টা, শুনলাম, আরো কমানো যায়।

সেবার তাসকেণ্টে পৌঁছে স্নান প্রভৃতি শেষ করে ধুতি-চাদর পরে গেষ্ট-হাউসের বহুবর্ণাভ ফুল-বাগানটিতে বসে বিশ্রাম করছিলাম যখন, তখন আমাদের সোবিয়েৎ-শফরের অভিভাবিকা মাদাম কুভাপোলোভা উজবেক্ শান্তি কমিটির সভাপতিকে নিয়ে কাছে এসে বোসলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—উজবেকিস্তানের কী কী দেখতে চাও ?

দেখবার মতো কী কী আছে জানিনা। তবুও বল্লাম—সামারকন্দ আর বুখারা। ওই দুটি নাম মনে রঙ ধরিয়ে রেখেছিল অনেকদিন ধরে। তখন তাসকেণ্টের নামও জানতাম না।

শান্তি কমিটির সভাপতি বল্লেন—বুখারা দেখানো এখন সম্ভবপর নয়। কিন্তু সামারকন্দ যাওয়া সম্ভব। তবে তার জন্য এরোপ্লেনের ব্যবস্থা করতে হবে। তিনখানা এরোপ্লেনের ব্যবস্থা এয়ার সার্ভিস এমন হঠাৎ করে দিতে পারবেন কিনা, তাও ভাববার কথা।

আমি বল্লাম—আমরা ট্রেনে যাব।

—না, না, যাঁরা আমাদের অতিথি হবার কষ্ট স্বীকার করেন, তাঁদের আমরা রেল-ভ্রমণের কষ্ট দিতে চাইনা।

আলাপ-আলোচনার পর ঠিক হোলো, তাসকেণ্টে আমরা চারদিন থাকব। ওই সময়ের মাঝে, এরোপ্লেন পেলে, একদিন সামারকন্দ ঘুরে আসব।

এরোপ্লেনের ব্যবস্থা হোলো। চৌষট্টি জন ভারতীয় ডেলিগেটের যাওয়া-আসার জন্য তিনখানা এরোপ্লেনের ব্যবস্থা হলো। একদিন খুব ভোরে ডেলিগেশনকে তিনটি দলে ভাগ করে আমরা তিনখানা প্লেনে সামারকন্দ যাত্রা করলাম। দু'ঘণ্টায় আমাদের প্লেনখানা সামারকন্দে আমাদের নামিয়ে দিলে। আমরা এয়ার-পোর্টের দ্রাক্ষাকুঞ্জে অপেক্ষা করতে লাগলাম, আর দুখানা প্লেনের জন্য। সামারকন্দের সুন্দরীরা বড় বড় ফুলের বাঙ্ক দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। সেই গোলাপী রঙ, সেই কালো কালো চোখ, টানা টানা ভুরু। কিন্তু ঘাগরা কোথায়, ওড়না কোথায়, কোথায় কুণ্ঠার অবগুণ্ঠন। সকলেরই শর্ট স্কার্ট, সিল্কের ব্লাউজ, হিলতোলা জুতো চুলও অনেকের বাড অথবা শিঙ্গলড। শুনলাম সবাই রুশী ভাষায় কথা বলতে পারেন ; উজবেকীর সঙ্গে সঙ্গেই সকলকেই রুশী শিখতে হয়।

মাদাম একটি মহিলাকে আমার সামনে এনে বল্লেন—আজ সারাদিন তুমি এঁরই অতিথি। ইনি ডাক্তার।

—ধরে ফেলেছ আমি একজন রুগী ?

—রোগ যদি কিছু থাকে ডাক্তারের কাছে তা গোপন রেখনা। সামারকন্দে আসবার আকাঙ্ক্ষা আর সবার চেয়ে তোমারই ছিল বেশি। একটু হেসে মাদাম অন্যত্র চলে গেলেন।

যে ডাক্তারের হাতে তিনি আমাকে দিয়ে গেলেন, তিনি ইংরিজি জানেন না। রোগ ব্যক্ত করি কোন ভাষায় ? দো-ভাষিণী লিডা পাশেই ছিলেন, মস্কো থেকে সঙ্গে এসেছিলেন, ইংরেজী ভাষার শিক্ষিকা তিনি ; তরুণী।

তিনি বল্লেন—বল লীডার, রোগের কথা খুলে বল। আমি তর্জ্জমা করে ডাক্তারকে বুঝিয়ে দোব। ডাক্তার রুশী জানেন, আমিও উজবেকী ভাষায় কথা বলতে পারি।

আমি বল্লাম—নারীর মাধ্যমে নারীর কাছে যে-পুরুষ রোগ ব্যক্ত করতে চায়, দু'নৌকোর মাঝে পড়ে তাকে হাবু-ডুবু খেতে হয়। বুড়ো হবার পর থেকে তত বোকা আমি আর নেই। আমি দেশে গিয়েই চিকিৎসা করাবো। আমার রোগের কথা থাক। সামারকন্দের রুগী-দের কথাই শুনি।

ডাক্তার শোনাতে লাগলেন রোগ, অপমৃত্যু, খুবই ছিল ; দারিদ্র্যও ছিল দুরপনেয়। আজ যে সবই অতীতের বিষয় হয়েছে, তা নয়। তবে ওগুলির মুলোৎপাটনের প্রচণ্ড প্রয়াস চলছে। তারপর ডাক্তার সংখ্যা আবৃত্তি করে তাঁর অতিথিকে জানাতে লাগলেন—কটা হাসপাতাল, কতগুলি ক্লিনিক, ক্রেশ, প্রসূতি-সদন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ; সংক্রামক ব্যাধির সঙ্গে কেমন করে সংগ্রাম করা হচ্ছে, কেমন করে দিনে দিনে সুস্থ সবল শিক্ষার্থীর দল সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংখ্যা স্মরণ রাখবার বিস্ময়কর শক্তির পরিচয় বার বার পেয়েছি ইষ্টার্ণ ডেমোক্রেসীগুলিতে। এত মুখস্থও রাখতে পারে ওরা।

মাদাম আবার এগিয়ে এলেন একটি যুবককে সঙ্গে নিয়ে। তিনি বল্লেন—এই ছেলেটি জার্ণালিষ্ট হবার চেষ্টা করছে। তোমার কাছে কিছু জানতে চায়। উঠে দাঁড়িয়ে তার হাত ধরে আমার পাশে বসালাম। যুবকটি বড় লাজুক। যা জানতে এসেছিল, তা যেন সে ভুলেই গেল। আমার বাঁ হাতের পাতাটা তার হাতের মুঠোর ভিতর চেপে ধরে সে চুপ করে বসে রইল। অগত্যা আমিই প্রশ্ন করতে লাগলাম। জানলাম কোন স্কুল কলেজে সে জার্ণালিজম শিখছেনা, নিজে-নিজেই চেষ্টা করছে জার্ণালিষ্ট হবার।

আমি বল্লাম—তবে ত আমার সঙ্গে তোমার মিল রয়েছে, বন্ধু। আমিও ও-বিদ্যে কোন স্কুল কলেজে পড়ে আয়ত্ত করিনি। তবুও এক

কালে আমার দেশে একজন নামজাদা সাংবাদিক হয়েছিলাম। রোজ দু'বেলা খেতে পাও ত?

যুবকটি মাথা নেড়ে জানালো, তা পায়।

—আমি তাও পেতাম না।

মাদাম বল্লেন—কী যে বল তুমি।

—বড়াই করবার জন্য বলছি না, মাদাম। তোমাদের বিপ্লবের আগে তোমাদের দেশেও অনেক জার্ণালিষ্টকে, ইন্টেলেকচুয়ালকে, না খেয়ে দিন কাটাতে হোতো। সে-কথা তুমি জান।

—সে দুর্দ্দিন কেটে গেছে, মাদাম দৃঢ়কণ্ঠে বল্লেন।

—হয়ত গেছে। আমাদেরও যাবে আশা করছি। কিন্তু মাদাম যে-দিন কাটে, সে-দিন যে আবার ঘুরেও আসে, ইতিহাসে তারও প্রচুর নজীর রয়েছে।

মাদাম বল্লেন—তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—কোন সিষ্টেম চালু হবার ফলে যে-সুরাহা হয়, সেই সিষ্টেম প্রাচীন হতে হতে নতুন নতুন সমস্যা এসে রাজ্যময় আবার জঞ্জাল সৃষ্টি করে। আবার আসে দুর্দ্দিন।

শেষ প্লেনখানা এসে ল্যাণ্ড করল। মাদাম বল্লেন—ওরা এসে পড়েছে। আমি ওদের নিয়ে আসি। সমরকন্দের তরুণীরা ফুলের তোড়া নিয়ে মাদামের অনুসরণ করলেন। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। ডেলিগেশনের প্রতিটি ডেলিগেট তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন লীডার তাঁদের উপেক্ষা করেন কিনা। সামারকন্দের তরুণ জার্ণালিষ্টটি আমার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বিদায় নিলেন।

মহিলা ডাক্তারটির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্লাম—তারপর ডাক্তার, রুগীর রোগ ধরতে পারলে?

পেছন থেকে লিডা বল্লেন—ইট ইজ টু লেট, লীডার। তুমি সুযোগ হারালে। এখুনি ভিড় জমে উঠবে।

সত্যই ভিড় জমে উঠল। মাদাম বল্লেন—আর সময় নষ্ট কোরনা, বাসে গিয়ে ওঠ।

সারি বেঁধে চারখানা বাস দাঁড়িয়েছিল। ডাক্তার আমাকে নিয়ে তার প্রথম খানিতে উঠলেন, মাদামও সব ব্যবস্থা করে এসে আমাদের বাসেই উঠলেন এবং হেসে বল্লেন—এখন আমার মাধ্যমেই তোমাকে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

—আমাদের চোখ কথা কইবে মাদাম, কণ্ঠে ভাষা থাকবে না।

মাদাম তর্জ্জমা করে আমার উক্তিটি ডাক্তারকে শুনিয়ে দিলেন। ডাক্তার বল্লেন—আমাকে দেখতে ত আসেননি, এসেছেন সামারকন্দ দেখতে।

সামারকন্দ দুটো অংশে বিভক্ত। প্রাচীন সামারকন্দের কোনই পরিবর্ত্তন করা হয়নি। তাকে পিছনে রেখে সামনের দিকে নতুন সামারকন্দ গড়ে তোলা হচ্ছে আধুনিক শহরের অনুকরণে। আমার কৌতুহল প্রাচীন সামারকন্দ সম্বন্ধে। নতুন শহর ত অনেক দেখলাম।

প্রাচীন সামারকন্দের বাড়ীগুলি মাটি দিয়ে গড়া—প্রায় উত্তরপ্রদেশে এলাহাবাদ ছাড়াবার পর পশ্চিম দিকে যাবার সময় রেল-পথের দুধারে যেমন বাড়ী দেখা যায় তেমন। পথগুলোও কাঁচা।

আমাদের প্রথমেই নিয়ে যাওয়া হোলো ওখানকার একটি মান-মন্দিরে। মাটির তলায় সেটি ঢাকা পড়েছিল, খুঁড়ে বার করা হচ্ছে। গাইড বল্লেন—আবু বেকির সেটি তৈরি করেছিলেন ভারতবর্ষের জয়পুর মান-মন্দিরের ধাঁচে। উক্তিটি শুনেই গর্ব্ব হোলো। ওকে স্বদেশপ্রীতি বলব, না আত্মাভিমান বলব, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে তাই জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বল্লেন—ও গর্ব্বের মূলে রয়েছে ইনফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স। একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলাম না। তৈমুর বার বার যা মার দিয়েছিলেন, তার শোধ দিতে পারিনি। তাই জয়পুরের মডেলে মন্দিরটি তৈরি হয়েছে শুনে মন বোধ করি উৎফুল্ল হলো এই ভেবে যে, বিজিতও বিজয়ী হতে পারে।

মান-মন্দিরটি দেখবার পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হোলো তৈমুরের আত্মীয়-পরিজন যেখানে বাস করতেন, সেই অঞ্চলে। সব বাড়ীগুলিই খালি পড়ে আছে, খুবই জীর্ণ। কিন্তু সমগ্র পরিবেশের এমন একটি রূপ আছে, যা দেখে আরব্যরজনী আর পারস্য রজনীর গল্পগুলি থেকে থেকে মনজুড়ে বসছিল, আর দৃষ্টি মাঝে মাঝে প্রত্যাশা করছিল ওই সব গল্পের নায়ক-নায়িকাদের আকস্মিক আবির্ভাব। কিন্তু তা ঘটল না। সঙ্কীর্ণ পথের দুপাশে দাঁড়িয়েছিল মলিন-বাস-পরিহিত শত শত নর-নারী, আর নগ্ন-প্রায় শিশুকুল। আমরা সেলাম আলেকুম বল্লেই হেসে হেসে তাঁরা আলেকুম সেলাম বলে আমাদের প্রত্যাভিবাদন জানাতে লাগলেন। আমি মাঝে মাঝে এক-একজনকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম—আপনি কি মুসলমান? কেউ হাঁ বা না বল্লেন না। কিন্তু আমরা এসেছি বলে সকলেই বেশ খুশী হয়েছেন। আমরা যেন তাঁদের পূর্ব্ব-পরিচিত আপন জন।

সামারকন্দে আজও উল্লেখযোগ্য কোন ইনডাষ্ট্রি গড়ে ওঠেনি, কেবল কলেক্টিভ ফার্ম্ম কতগুলি গড়ে উঠেছে। তাসকেন্টের মতো সামারকন্দ এখনো সমৃদ্ধ হয়নি। মসজিদ আর সমাধি অনেক দেখলাম, তৈমুরের আর তাঁর পৌত্রের সমাধিও দেখলাম। কিন্তু প্রাসাদ বলে তৈমুরের কিছু ছিল কিনা তার কোন নিদর্শন পেলামনা।

একটি মক্তব দেখাতে নিয়ে যাওয়া হোলো। সেখানেও সুনির্ম্মিত কারুকার্য্যখচিত একটি সুন্দর মসজিদ। তাই ঘিরে চারদিকে ছাত্রাবাস। ফটকের দু'পাশে দুটি উচ্চ স্তম্ভ হেলে পড়েছে। সে দুটিকে ভেঙ্গে না ফেলে কেমন করে আবার সোজা করা যায়, রুশী এঞ্জিনিয়াররা সেই চেষ্টা করছেন। আমরা দেখতে পেলাম মোটা-মোটা তার দিয়ে সে গুলো টানা দেওয়া রয়েছে। আমাদের বলা হোলো স্তম্ভগুলো আগেকার চেয়ে অনেক বেশী সোজা হয়েছে।

ঘুরতে ঘুরতে লাঞ্চের সময় হয়ে গেল, শ্রমও বড় কম হয়নি। ডাক্তার বল্লেন—আর ঘোরাবো না। এইবার লাঞ্চে চল।

—কোথায়? তৈমুরের প্রাসাদ?

—না, কলেকটিভ ফার্ম্মে। তার কর্ম্মিরা তাদের ভারতীয় বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে রেখেছে।

প্রায় বিশ মিনিট বাসে চলে কলেকটিভ ফার্ম্মে ঢুকে পড়লাম।

বাস থেকে নেমেই দেখলাম দ্রাক্ষাকুঞ্জের মাঝে কার্পেট বিছানো রয়েছে। তার ওপর মোটা-মোটা তাকিয়া, চারিদিকে ফুলের রঙ-বাহার। পা বাড়ালাম কার্পেটের দিকে। ফার্মের নায়ক বল্লেন—একেবারে খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম নেবেন। চলুন, হাত-মুখ ধুয়ে নেবেন।

সাবান তোয়ালে নিয়ে ফার্মের কয়েকজন সেবক-সেবিকা জলের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেখানে যেতেই তাঁরা সাবান হাতে তুলে দিলেন, জল ঢেলে দিলেন; বর্ষিয়সী একটি মহিলা কর্ম্মী তোয়ালে দিয়ে আমার মুখও মুছিয়ে দিলেন।

সকলের হাত-মুখ ধোয়া হলে সকলকে টেবিলে নিয়ে যাওয়া হোলো। খাবার আয়োজন দেখে চমকে উঠলাম। স্তূপাকার আঙুর, আপেল, কলা, কেক, মাখন, পাঁউরুটি, রকমারি মাংসের তৈরি খাবার, আর নানা রংয়ের মদ। আসনে বসতেই ফার্মের নায়ক একখানা সামারকন্দের রুটি হাতে তুলে দিলেন, আটার রুটি গড়বার চাকির মতো গোল আর নিরেট। ছুরি বসাবার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। ফার্মের নায়ক হাতের চাপ দিয়ে ভেঙে দিলেন। খেয়ে দেখলাম বেশ স্বাদ। কিন্তু বেশি খেতে ভরসা হোল না, পেটে গিয়ে যদি পাথর হয়ে ওঠে।

খাওয়া, বার-বার স্বাস্থ্যপান, গান, আলাপন, এক সঙ্গেই চলতে লাগল। ওরই মাঝে জেনে নেওয়া হোলো ফার্মের খুঁটিনাটি নানা খবর। বছরের পর বছর সকল রকম শস্যের উৎপাদনবৃদ্ধি পাচ্ছে। ফার্মের নায়ক বল্লেন—এবার আশা করছি উৎপাদনে আগেকার সকল রেকর্ড অতিক্রম করব।

দেড় ঘণ্টা ধরে খাওয়া চল্ল।

টেবিল ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে সোজা গিয়ে ফরাসের কার্পেটের উপর গা এলিয়ে দিলাম একটা বড় তাকিয়া টেনে নিয়ে। একটু কালের জন্য ঘুমিয়েও পড়েছিলাম। ঘন-ঘন ঘণ্টার আওয়াজ শুনে লাফিয়ে উঠে বোসলাম। ফার্মের কোথাও আগুন লেগেছে নাকি? রুশী-দোভাষী মিশা বললে—চল, টেবিলে চল।

—আবারো টেবিলে! তাসকেণ্টে ফিরে আজ রাতেও কিছু খাব না। বলে আবার শুয়ে পড়লাম।

মিশা বল্লে—বিরিয়ানি পোলাউ তৈরি হয়েছে।

—হোক্‌গে! চোখ না খুলেই বল্‌লাম।

মিশার কোন জবাব পেলাম না। একটু পরেই কপালে কোমল হাতের পরশ। চেয়ে দেখি ডাক্তার। আমি বললাম—খেয়ে আমার অসুখ করেনি ডাক্তার, শুধু পেটটা এত বোঝাই হয়েছে যে, উঠতে পারছি না। ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে লিডাও এসেছিল। সে বল্লে—উঠতে তোমাকে হবেই, লীডার। টেবিলে বিরিয়ানি পোলাউ, আর শিক-কাবাব সার্ভ করা হচ্ছে।

তারপর গলা নীচু করে বল্ল—বিরিয়ানি প্রত্যাখ্যান করলে এখানকার হোষ্টরা নিজেদের অপমানিত মনে করেন।

নিরুপায়। আবার টেবিলের কাছে গেলাম। ফার্মের নায়ক আমার অপেক্ষায় রয়েছেন। তিনি হাত ধরে আমাকে তাঁর পাশে বসালেন। সামনের ডিসে বিরিয়ানি ধোঁয়া ছড়াচ্ছে, গরম গরম শিক-কাবাব পরিবেশন করা হচ্ছে। কিছুকাল ডিসের দিকে চেয়ে রইলাম, তারপর টেবিলের আর সবাইকার দিকে চেয়ে দেখলাম। সকলেই হাত আর মুখ সমানে চালিয়ে যাচ্ছেন। হোষ্টদের প্রতি সম্মান জানাবার জন্য এক চামচ বিরিয়ানি আমিও মুখে তুলে নিলাম। ফার্মের নায়ক এক খণ্ড শিক-কাবাব মুখের সামনে তুলে ধরলেন। তাও মুখে পুরে নিয়ে চিবোতে লাগলাম। পিছন থেকে লিডা আমার কানের কাছে মুখ এনে বল্লে—এইবার তোমার কিছু বলা উচিত।

এক চামচ বিরিয়ানি তুলে নিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে তারস্বরে আমি বল্লাম—কেতাবে পড়েছি আর্য্যরা মাঝে মাঝে গো-বৎস খেতেন। কিন্তু বিরিয়ানি পোলাউ আর শিক-কাবাব খেতেন কিনা, সে বিবরণ আমি কোন কেতাবে পড়িনি। আমরা এখন গো-বৎস খাইনা, কিন্তু সুযোগ পেলেই শিক-কাবাব আর বিরিয়ানি পোলাউ খাই, আর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি এই দেশের সেই ইতিহাস-বিশ্রুত মহান পুরুষদেরকে—যাঁরা এই পরম লোভনীয় খাদ্য দুটি এই দেশ থেকে আমাদের দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন (করতালি)। আজ যাঁরা পরম প্রীতিভরে তাঁদের জাতীয় ওই সম্পদ দুটি অকৃপণ হাতে আমাদের পরিবেশন করে আমাদের রসনাকে পরিতৃপ্ত করলেন, তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। আর প্রার্থনা করি পৃথিবীতে এমন দিন অগোণে আসুক, যখন পৃথিবীর সকল দেশের মানুষ নিত্য দু'বেলা এই সুস্বাদু খাদ্য খেয়ে হৃষ্ট এবং পুষ্ট হতে পারে।

তুমুল করতালি ধ্বনি। ফার্মের নায়ক দুই হাতে আমার ডান হাতের পাতা ধরে ঝাঁকানি লাগালেন। আমি বল্লাম—চল ত তোমাদের ফার্মের ওই ঘন সবুজ যায়গাটা দেখে আসি।

—ও আর কি দেখবে! ওটা ত টমেটো ক্ষেত।

—টমেটো আমি বড্ড ভালবাসি।

টেবিলে থেকে দূরে সরে যেতে তবে আমার শ্বাস স্বাভাবিক হোলো।

মাদাম তাড়া দিলেন, এখানে আর দেরী করলে টাসকেণ্ট পৌঁছুতে অনেক রাত হয়ে যাবে। একে একে বাসে গিয়ে উঠলাম। রাস্তায় এখন খুব ভাড় জমেছে। তাদের বেশির ভাগ নর-নারী এই প্রথম ভারতবাসী দেখছে। তাদরে মুখে-চোখে কেবলই কৌতূহলের পরিচয় পেলাম না, আত্মীয়তার প্রসন্নতাও দেখলাম। আর তাই আমার চিত্ত স্পর্শ করল।

একটা জায়গায় ভীড় এত ঘন হয়েছিল যে, ড্রাইভার বাস থামিয়ে দিল। ঠিক সেই সময়টিতে রাস্তা থেকে কে যেন আমার হাতে একখানা বই গুঁজে দিল। আমি ভাবলাম অটোগ্রাফ চায় বুঝি। কলম বার করে লিখতে উদ্যত হলাম।

মাদাম বল্লেন—বইখানা উপহার পেলে।

—কে দিলে?

—সকাল বেলায় এয়ার-পোর্টে যে জার্নালিষ্ট ছেলেটির সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম, সে।

—কোথায় সে?

—ভিড়ের মাঝে মিশে গেল দেখলাম।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। মাদাম আমার হাত চেপে ধরে বল্লেন—কোথায় যাও?

—দেখি ছেলেটিকে খুঁজে বার করতে পারি কি না। ধন্যবাদ জানাবার সুযোগ পেলাম না যে!

—সে ধন্যবাদ চায়না, চায় চিরদিন তুমি তাকে মনে রাখ।

বাস চলতে শুরু করল। আমি ছেলেটির কথা ভাবতে লাগলাম। তার বেশভূষা দেখে বুঝেছিলাম তার আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। তবুও আমি তার সঙ্গে আলাপ করেছিলাম বলেই সে মনে করল—আমাকে একটা কিছু উপহার দেওয়া দরকার। বইখানা কেনবার জন্য তাকে রুবল যোগাড় করতে হয়েছে হয়ত বেশ কষ্ট করে, হয়ত ধার করেই কিনেছে। বই কিনে সারাদিন আমাদের পিছু-পিছু ঘুরেছে, হয়ত কিছু না খেয়েই। আমার কাছে পৌঁছুবার সুযোগ হয়ত এর আগে সে পায়নি। বাস অকস্মাৎ থেমে যেতে সেই সুযোগ যে-মুহূর্তেই পেল, সে মুহূর্তটুকুর সদ্ব্যবহার সে করল, বইখানা আমার হাতে গুঁজে দিয়েই উধাও হয়ে গেল। একে কী বলা যায় ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। বইখানা লেনিনের জীবনী, রুশীতে লেখা। তা আমি পড়তে পারবনা কোনদিনই। কিন্তু বইখানা আমার লেখার ডেস্কের ওপর রেখে দিয়েছি। তার ওপর দৃষ্টি পড়লেই সামারকন্দের তরুণ জার্ণালিষ্টের মুখখানি আমার চিত্তপটে ফুটে ওঠে।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেখি তিনখানা প্লেনই ওড়বার অপেক্ষায় আছে। মাদাম তাড়া দিলেন—আর দেরী নয়। ডাক্তারের দিকে ফিরে বল্লাম—সারাটা দিন কী কষ্টই না তোমাকে দিলাম।

—কিন্তু যে আনন্দ দিয়ে গেলে, আমার মনেই তা জমা রইল। কাউকে তার ভাগ দিতে হবেনা।

রাতের অন্ধকার নেমে আসবার পর আমরা তাসকেন্টে ফিরে এলাম। সমগ্র শহরটিই যেন একটি প্রমোদ-উদ্যান। সুপ্রশস্ত পথের দুই পাশে গাছের সারি, তার পরেই ফুটপাথ, ফুটপাথের পর ফুলের বাগিচা, তারপর বাড়ী ঘর, কোনটা ছোট, কোনটা বড়; কোনটায় টালির ছাদ কোনটা ছয়-তলা উঁচু, সর্ব্ব রকমে আধুনিক। অতীতে শুনেছি এই তাসকেন্টের ওপর দিয়ে একটা পায়ে-হাঁটা বাণিজ্য-পথ চীন-ইউরোপকে সংযুক্ত করেছিল। চীনারা তাকে সিল্ক-রুট বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের রেশম ব্যবসায়ের পথ ছিল ওটা। ভারত এবং পশ্চিম এসিয়ার নানা দেশের সঙ্গে এই তাসকেন্টের যে সংযোগ ছিল, তার বিবরণ এবং প্রমাণ ত রয়েইছে। আজও আকাশ-পথে পুব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণের সংযোগস্থল হয়েছে তাসকেন্টের বিরাট এয়ার-পোর্ট।

আজকার তাসকেন্ট, অর্থাৎ উজবেকিস্তান, সোভিয়েৎ ইউনিয়ানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তুলা উৎপাদন করে; হাইড্রো-ইলেক্ট্রিকে সোভিয়েৎ ইউনিয়ানে এর স্থান দ্বিতীয়। প্রকাণ্ড টেক্সটাইল মিল রয়েছে এই তাসকেন্টে। শিক্ষার প্রসারে, সাংস্কৃতিক চেতনায়, তাসকেন্টে সোভিয়েৎ রিপাবলিকগুলির মাঝে আগেকার সারিতে স্থান করে নিয়েছে। এখানকার ছেলে-মেয়েরা তুলনায় অন্যান্য রিপাবলিকগুলির ছেলে-মেয়েদের চেয়ে বেশি সংখ্যায় হিন্দী আর উর্দ্দু পড়ে, বলেও অনেক ভালো।

প্রথম দিন সকালে আমাদের টিচার্স ট্রেইনিং কলেজে নিয়ে যাওয়া হোলো। প্রায় দু'হাজার ছাত্র-ছাত্রী সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানালো। আমাদের নিয়ে বসানো হোলো একটি প্রকাণ্ড হল-ঘরে। টেবিল ভরতি খাদ্য ও পানীয়; বিরিয়ানি পোলাও যা মন্দ নয়, রকমারি ফল, আর কোল্ড-ড্রিঙ্ক। শিক্ষক-শিক্ষিকাও অনেক ছিলেন। আমাদের দলেও আট-দশজন অধ্যাপক আর শিক্ষক ছিলেন। আমি একে-একে তাঁদের সকলের পরিচয় দিলাম। শুরু হোলো শিক্ষা-সংক্রান্ত সংবাদের আদান-প্রদান, উভয় দেশের শিক্ষা বিষয়ক নানা আলোচনা।

আমি নীরবে বসে সামনের প্লেট থেকে এক-এক ফালি খরমুজা তুলে নিয়ে মুখে ফেলে দিতে লাগলাম। সেগুলো চিবোতে হয়না, মুখের তাপেই গলে যায়। ওঁদের পক্ষ থেকে বলা হোলো শহরের শিক্ষার সকল সমস্যা ওঁরা যেমন সমাধান করতে পারছেন, গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা-সমস্যা তেমন সমাধান করতে পারছেন না। তবে এই স্কুল অব পেডাগগির ছাত্র সংখ্যা যে-হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে আশা করা যায় যে, সুশিক্ষিত শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাব অগৌণেই দূর হবে। সব চেয়ে আশার কথা, তাঁরা বল্লেন, মেয়েরা দলে দলে এগিয়ে আসছেন শিক্ষা-প্রসারের দায়িত্ব বহন করবার আগ্রহ নিয়ে। তারপর শুরু হোলো সংখ্যা শোনাবার পালা। সব শেষে তাঁরা বল্লেন যে, উজবেকিস্তানে এখন আর নিরক্ষরতা নেই।

আমাদের পক্ষ অনুরূপ মন্তব্য করতে না পেরে কুণ্ঠিত যদিও হলেন, তবুও জোর-গলায় বুঝিয়ে দিলেন শিক্ষা-ব্যাপারে আমাদের অগ্রগতিও বিস্ময়কর হয়েছে স্বাধীনতার পরে। এই আলোচনায় আমি আদৌ যোগ দিইনি। তার কারণ শুধুমাত্র লিটারেসি যে একটা জাতিকে এগিয়ে নেয়, আমি তা বিশ্বাস করিনা। নিরক্ষররা যে মূর্খ হতে বাধ্য, এ-কথাও আমি মানিনা। শিক্ষিত মূর্খের সংখ্যা কোন দেশেই নগণ্য নয়। তবুও আমি বেশ মনোযোগ দিয়েই চলতি-আলোচনা শুনছিলাম এই আশা নিয়ে যে, শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নতুন কিছু হয়ত শুনব, যা পুরোণো পৃথিবীর মানুষদের বলতে শুনিনা। ঘণ্টা দেড়েক আলোচনা চল্ল। তারপর স্কুলের অধ্যক্ষ আমাকে বল্লেন—তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা, অর্থাৎ শিক্ষক-শিক্ষিকারা, অডিটোরিয়ামে অপেক্ষা করছেন আমার ভাষণ শোনবার আগ্রহ নিয়ে।

আমি বল্লাম—একজন অধ্যাপককে পাঠাচ্ছি। আমি সামান্য একজন নাট্যকার মাত্র।

তিনি বল্লেন—তাঁরা ডেলিগেশন-নায়কেরই ভাষণ শুনতে চান।

মস্কো থেকে আগত তরুণ দোভাষী মিশাকে বক্তৃতা তর্জ্জমা করে শোনাবার জন্য সঙ্গে নিয়ে মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালাম। মিনিট খানেক করতালি। অধ্যক্ষ আমাকে শ্রোতৃদের কাছে ইনট্রোডিউস করে দিলেন। মিশাকে পাশে টেনে নিয়ে বক্তৃতা শুরু করলাম। যা বল্লাম, তার মোদ্দা কথা এই যে, আমি শিক্ষিত নই, তাই শিক্ষকও নই। আর শিক্ষিকাও যে নই, তা আমাকে দেখেইবুঝতে পারছেন। আমি নাট্যকার। আমার কাজ হচ্ছে অভিনয়োপযোগী এমন সব বাক্যরচনা করা, যা অভিনেতৃদের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হয়ে শ্রোতৃদের মনের দুয়ার খুলে দিয়ে তাদের অবরুদ্ধ আবেগকে মুক্তধারার মতো বাইরে বার করে এনে তাদের প্রত্যেককে, প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রীকে, এবং নাট্যকারকেও, অবাস্তব একটা আনন্দলোকে নিয়ে যেতে পারে মুহূর্তের জন্য। সেই স্বল্পকালের অনুভূতিই নাটক। নাটক বইয়ের পাতায় থাকে না। তেমনই জ্ঞানও থাকেনা বইয়ের পাতায়—থাকে মানুষের মনে-মনে। মনের দ্বারে আঘাত হেনে সেই জ্ঞানকে বাইরে এনে সর্ব্বজনীন করাই হচ্ছে শিক্ষা। প্যাটার্ণ সৃষ্টি এডুকেশন নয়, ট্রেনিং। জ্ঞানকে সর্ব্বজনীন করবার সহায়তা বই-ও করতে পারে, গানও পারে, নাচও পারে, নাটকও পারে, কাব্যাবৃত্তিও পারে। স্কুল আর স্কুল-মাষ্টারি, লিটারেসি আর কারিকুলামই শিক্ষার শেষ কথা নয়। শেষ কথা হচ্ছে মানুষকে, সকল মানুষকে, সমাজের একটিমাত্র শ্রেণীকে নয়, সমগ্র মানুষকে, শতদলের মতো ফুটিয়ে তোলা। একে যদি আপনারা আদর্শ করে নিয়ে থাকেন, তা'হলে শুধু আপনাদেরই

জাতির হিতসাধন করবেন না, সমগ্র জগতের হিত করবেন। আপনাদের ব্রত সার্থক হোক।

প্রচুর করতালি ধ্বনি। তারই মাঝে মিশা বল্লে—তোমার বক্তৃতা তর্জমা করতেও inspired হয়ে উঠি, লীডার।

—তুমিও ধরে ফেলেছ মিশা, নারীর মতো আমিও ফ্লাটারি চাই।

—না, লীডার না, আমি যা অনুভব করি, তাই বল্লাম।

—থ্যাঙ্ক ইউ মিশা, বলে আমি অধ্যক্ষের সঙ্গে মিলিত হলাম। তিনিও খুব খুশী।

আমাদের দলের তুইজন অধ্যাপক মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। অধ্যক্ষ তাঁদেরও বক্তৃতা করতে আহ্বান জানালেন। বেশ বল্লেন তাঁরা।

শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিদায় নিয়ে সকলে আবার বাসে উঠলাম। শুনলাম পরবর্তী গন্তব্য-স্থল মিনিষ্ট্রি অব কালচার। সুন্দর একটি নতুন বাড়ী। মিনিষ্টার স্বয়ং এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালেন। অত্যন্ত সুপুরুষ তিনি, যৌবন অতিক্রম করেননি ; ইংরিজি বলেন।

তিনি নিয়ে গেলেন একটি বড় ঘরে। সেখানে একটা বড় টেবিলের এক পাশে বহু লোক বসে আছেন। আমরা ঢুকতেই তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন। মিনিষ্টার বল্লেন—আমরা এখন বন্ধুর মতো ফরমালিটি বর্জ্জন করে আলাপ-আলোচনা করব। সকলে বসবার পর উজবেকি পক্ষই জানালেন তাঁরা কতগুলি বিষয় জানতে চান।

আমি বল্লাম—জানাতে পারলে খুবই খুশী হব আমরা।

তাঁরা জানতে চাইলেন ভারতে কত তুলা উৎপন্ন হয়, তুলোর আঁশ-গুলো কেমন, বছরের কোন সময়ে ফসল লাগানো হয়, কখন ফসল তোলা হয়, কতগুলো টেক্সটাইল মিল ভারতে আছে।

আমাদের মাঝে কয়েকজন বোম্বাই আর মধ্যপ্রদেশের ডেলিগেট ছিলেন। ক্ষেত-খামারের সঙ্গে তাঁদের কিছুটা যোগ ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের খবরও কিছু-কিছু তাঁরা রাখতেন। জবাব তারাই দিলেন। কিন্তু সংখ্যা আউড়ে প্রশ্নকারীদের তুষ্ট রাখতে পারলেন না। আমি বল্লাম—এটি ফার্ম্মার্স ডেলিগেশন নয়। কাজেই কৃষি-বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল প্রশ্নের জবাব দিয়ে আপনাদের কৌতূহল নিবৃত্তি আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আমাদের কাছে দু'তিন কপি ইণ্ডিয়া ইয়ার-বুক আছে। আপনারা যদি উপহার স্বরূপ এক কপি গ্রহণ করেন, তাই থেকে ও বিষয়ক তত্ত্ব ও সংখ্যা আপনারা জানতে পারবেন। কালচুর্যাল মিনিষ্টার বল্লেন—এই মিনিষ্ট্রিতে এসে এই সব আলোচনা করতে হবে আপনারা হয়ত আশা করেন নি। কিন্তু ও-সব আমাদের কালচারের অঙ্গ।

আলাপ-আলোচনার শেষে মিনিষ্টার আমাদের বাসে তুলে দিয়ে বল্লেন—কাল আপনাদের নতুন একটা তাজমহল দেখাবো।

—দেখলে বিস্মিত হব না, আমি বল্লাম।

—কেন?

—আমাদের দেশের তাজমহলের পরিকল্পনা যিনি করেছিলেন, তাঁর ধমনীতে এই দেশেরই বাবরের রক্ত ছিল। সামারকন্দের মসজিদও দেখে এলাম, আর গল্পটাও শুনে এলাম ত।

লাঞ্চের টেবিলে মাদাম বল্লেন—খাবার পর দু'ঘণ্টা ছুটী। তারপর আমরা শহর দেখতে বেরুবো, তারপর দেখব ওপন্-এয়ারে উজবেকি ভাষায় শেক্সপীয়রের ওথেলো নাটকের অভিনয়।

সন্ধ্যা হতে না হতেই একটা বড় পার্কে গিয়ে ঢুকলাম। তারই এক অংশে ওপন্-এয়ার থিয়েটার। মঞ্চ আর-সাজঘর প্রভৃতির ওপর আচ্ছাদন আছে, কিন্তু দর্শকদের বসবার যায়গা অনাবৃত। দেখে মনে হোলো সাত-আটশ আসন আছে।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে অভিনয় শুরু হোলো। খানিকটা দেখেই বল্লাম—চমৎকার

মাদাম আমারই পাশে বসে অভিনয় দেখছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কী চমৎকার!

—ওথেলোর অভিনয়।

—ষ্টালিন প্রাইজ উইনার যে।

—আমাদের দেশে বিলেত থেকে মাঝে-মাঝে ছোট বড় দল শেক্স্-পীয়র অভিনয় করতে যান। তেমন দু'চারটি দলের অভিনীত ওথেলো নাটক আমি দেখেছি। কিন্তু কোন দলে এমন অভিনয়-কুশলী ওথেলো দেখিনি।

—ব্রিটেন থেকে আমাদের দেশে এসে যাঁরা ওঁর অভিনয় দেখেছেন, তাঁরাও খুব সুখ্যাতি করে গেছেন।

—করবারই কথা, আমি বল্লাম।

—দেসদিমোনা, ইয়াগো? মাদাম জিজ্ঞাসা করলেন।

—ভালো, বেশ ভালো।

আমার তখন কথা কইতে ইচ্ছে করছে না। দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনীত হয়ে যাচ্ছে, আমি মুগ্ধ হয়ে অভিনয় দেখছি। একটা অঙ্ক শেষ হবার মুখে দেসদিমোনা যখন এক্‌জিট নিতে যাবেন, তখন হঠাৎ বসে পড়লেন। আমি আর্ত্তের মতো হায়, হায়, করে উঠ্‌লাম।

মাদাম বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হোলো?

—ফ্র্যাক্‌চার না হোলেও গুরুতর স্প্রেইন।

—কার?

—দেসদিমোনার পায়ের।

—তুমি কি করে জানলে?

—জানিনি, বুঝিছি। নইলে ওরকম কোরে ও বসে পড়তো না। আমি যে অনেক দেখেছি।

অঙ্ক শেষে সেই যে পর্দ্দা পড়েছিল, তা আর ওঠে না। দশ মিনিট বিশ মিনিট, পর্দ্দা তবুও পড়ে রইলো। দর্শকরা আমাদের দেশের দর্শকদের মতোই হাত-তালি দিতে লাগলো, সিটি মারতে লাগলো। অবশেষে এক ব্যক্তি পর্দ্দার সামনে এসে বল্লেন—দেসদিমোনার পায়ে গুরুতর চোট লেগেছে। তিনি দাঁড়াতে পারছেন না। অন্যদিন হলে অভিনয় বন্ধ করে দেওয়া হোতো। কিন্তু আজ ভারতীয় অতিথিরা রয়েছেন। তাই আজ আমাদের পরিচালক স্বয়ং, বহুদিন পরে, সামনের অঙ্ক থেকে দেসদিমোনার ভূমিকায় অবতীর্ণা হবেন। হাত-তালির সঙ্গে সঙ্গে হৈ-হৈ রব উঠল, উল্লাসের।

মাদাম বল্লেন—তোমাদের ভাগ্য ভালো খুব বড় একজন অভিনেত্রীর অভিনয় দেখবার সুযোগ পেলে। পরিচালিকাই আগে দেসদিমোনার ভূমিকা অভিনয় করতেন। তখন বাস্তব জীবনে ওই ওথেলো চরিত্রাভি-নেতার স্ত্রী ছিলেন তিনি। তারপর মিউচুয়াল কনসেন্টে ওঁদের সেপারেশন হয়। সেই থেকে স্ত্রী আর অভিনয় করেননা, পরি-চালনার কাজ করেন। আজ তোমরাই আবার ওঁদের একসঙ্গে অভিনয় করতে বাধ্য করালে। তুমি নাট্যকার, তুমি হয়ত দু'খানি নাটক দেখতে পাবে একটি অভিনয়ে।

—কিন্তু ওথেলো যদি সত্যি-সত্যিই দেসদিমোনার গলা টিপে ধরে?

—ওঁদের পরস্পরের ব্যক্তিগত প্রীতির বন্ধন ছিঁড়ে গেছে, কিন্তু শিল্পগত শ্রদ্ধা দিন দিন প্রগাঢ় হচ্ছে।

—আশ্চর্য্য!

—আশ্চর্য্যই বটে।

আশ্চর্য্য অভিনয়ও দেখলাম। পরিচালিকার বয়েস একটু বেশি, দেসদিমোনার তুলনায়, কিন্তু অভিনয়ের কী অসাধারণ শক্তি, আর শিল্প-শৈলীতে দুজনার কী প্রগাঢ় understanding! যেন একটা লোকাতীত অভিনয় দেখলাম সেই রাতে, তাসকেন্টের সেই পার্কে, নৈশ আকাশের নিবিড়-নীল চন্দ্রাতপ তলে। ক্রমশঃ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

দেখছ কি ?

ফটো : সুধাংশু চক্রবর্ত্তী
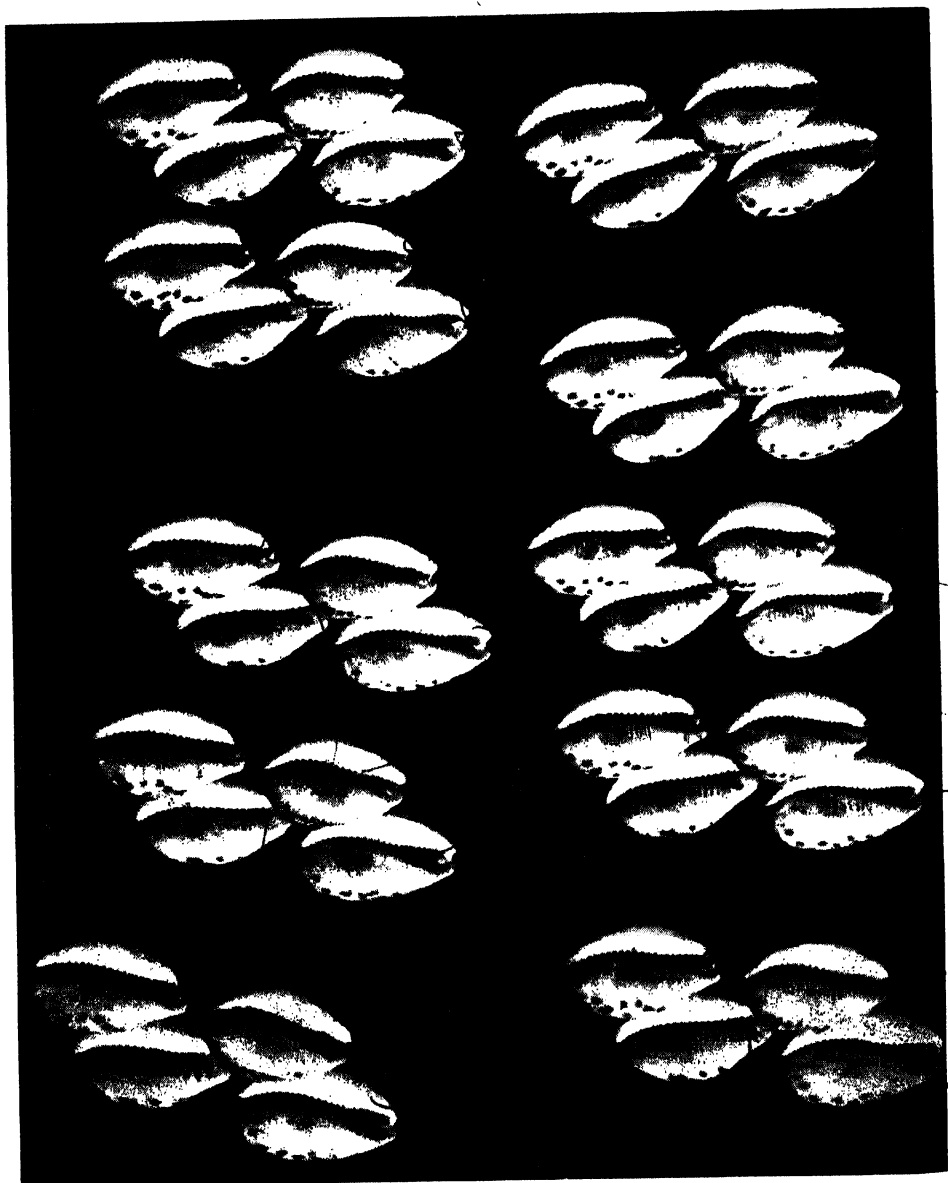
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ বিগত বৈভব ফটো : অমল সেনগুপ্ত

অভিজ্ঞতার কথা

উপানন্দ

অভিজ্ঞতাই জ্ঞান। এজন্যে তোমাদের কাছে এবার অভিজ্ঞতার কথা বলছি।...

একটি ঘোড়াকে জোর করে মেরে মেরে টেনে হিঁচড়ে জলে নামাতে পারা যায় বটে, কিন্তু জল খাওয়াতে পারা যায় না। সে তার আপনার গোঁ ধরে থাকবে। কেউ জোর করে কি কাউকে কিছু করাতে পারে? ভালোবাসা নম্র ব্যবহার ও মিষ্ট কথার দ্বারা অনেক কাজ করানো যেতে পারে যে কোন মানুষকে দিয়ে, আর সে হাসি মুখেই তা করবে, বিরক্ত হবে না। অলস লোকেই হতভাগ্য হয়ে থাকে—ছেলেবেলা থেকে তোমরা যদি অলস হও, তাহোলে পরিণামে বহু কষ্ট ভোগ করতে হবে। যেসব লোক সর্ব্বদাই বলে যে, এ জগতে আপনার বলতে তার কেউ নেই, তারা নিজেই নিজেকে বন্ধুহীন করে থাকে, এতে অপরের দোষ নেই। নিজের ব্যবহারে আপনার পর, পর আপনার হয়। অবাধ্যতার প্রতিফল হচ্ছে শাস্তি, সংসারে তারও আবশ্যক আছে। যে প্রকৃত মানুষ, সে নতশিরে হৃষ্টচিত্তেই শাস্তি গ্রহণ করে থাকে। যতজ্ঞানই তোমরা অর্জ্জন করো না কেন, যতক্ষণ সে জ্ঞান তোমাদের পারিপার্শ্বিক জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত না হয়, ততক্ষণ সে জ্ঞানের কোন মূল্যই নেই। মনুষ্যত্বের উদ্বোধন আর জীবনের উৎকর্ষ সাধন করাই সমস্ত জ্ঞানার্জ্জনের মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু জ্ঞানার্জ্জন সত্ত্বেও যদি মনুষ্যত্বের প্রকাশ না হয়, তা হোলে বরং মূর্খ হয়ে থাকা ভালো। নিজের বিদ্যাবুদ্ধিকে যে অভ্রান্ত মনে করে, তার অধঃপতন নিশ্চয়ই ঘটে। ভুল বুঝেও জেদ বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে তা প্রয়োগ করা চরিত্রের পক্ষে কলঙ্কের বিষয়। শারীরিক বা মানসিক দিক, আহারের পর ভরা পেটে কোন রকম পরিশ্রম করা উচিত নয়। অধ্যাপক পার্কার একজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক। তিনি বলেছেন, ডাক্তারের ওষুধ অপেক্ষা প্রকৃতির ওপর বেশী নির্ভর করলে, মৃত্যু-সংখ্যা অনেকখানি হ্রাস পেতে পারে। অধ্যাপক ব্লাকি বলেন, যে সব কাজ দাঁড়িয়ে কিম্বা চলাফেরা করে সম্পন্ন করা যেতে পারে, তা কখনও বসে করা উচিত নয়। শরীরকে বহুক্ষণ চালনার ওপর সচল রাখাই স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে একটি প্রধান উপায়। তোমরা কখন কাউকে প্রতারিত করো না—এর পরিণতি হচ্ছে অধঃপতন। যদি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে প্রয়াসী হও, তাহোলে কখন সুযোগের অপেক্ষা করে বসে থাকবে না—সুযোগও করে নিতে হয়—আর এইরকমেই সুযোগ ও সিদ্ধিলাভ করায়ত্ত হয়। প্রকৃত বন্ধু দিতে চায়, কখন নিতে চায় না। খোস মেজাজ সুখের প্রধান উপকরণ। টাকা আর সময় এই দুইটাই মানুষের সমান মূল্যবান। যে লোক সময়ের অপব্যয়ী, সে টাকারও অপব্যয়ী। অভাব ঘুচাতে হোলে, আকাঙ্ক্ষা কমাতে হবে, মিতব্যয়ী হোতে হবে। পাখী ধরা পড়ে ফাঁদে পা দিয়ে, আর মানুষ ধরা পড়ে কথা কয়ে। তোমরা সব বিশ্বাস করতে পারো কিন্তু তোষামোদপ্রিয় হামবড়া লোককে কখন সন্তুষ্ট করতে পারবে, এটা যেন কখন মনের কোণে ঠাঁই দিয়ে বিশ্বাস করো না। এইসব দাম্ভিক লোকের কাছ থেকে সমস্ত নিরীহ ভদ্রলোক দূরে থাকতে চায়—কেন জানো? অপমানিত হোতে পারে এই ভয়ে।

প্রতিদিন রাত্রি দশটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্য্যন্ত যদি সুনিদ্রা হয়, তা হোলে শরীর মন দুয়ের পক্ষেই মঙ্গল। সেকালে ধর্ম্মে ও পাপ-পুণ্যে যে একটা শ্রদ্ধা আর আস্থা ছিল, সেইটেই ক্রমে এদেশ থেকে অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে, আর লোকে যথেচ্ছাচারী হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাই আজ দেশের দুর্গতি বেড়ে চলেছে। হার্ব্বার্ট স্পেনসার বলেছেন—জীবনে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হোলে ভালো জীব অর্থাৎ স্বাস্থ্যবান শরীরের আবশ্যক। যেখানে উচ্চ আকাঙ্ক্ষার অভাব, সেখানে আলস্য ও অকর্ম্মণ্যতাদোষ পরিলক্ষিত হয়। যে কাজ স্বীকার করবে, তা সুসম্পন্ন করবে। ক্ষণভঙ্গুর জীবন কেবল কর্ম্মের দ্বারাই অমরত্ব লাভ করে। প্রকৃত বীর সর্ব্বদাই ক্ষমাশীল।

সম্রাট নেপোলিয়ন যে কেবলমাত্র বীরই ছিলেন, তা নয়, সময়ে সময়ে তাঁর রসালাপেরও পরিচয় পাওয়া যায়। নেপোলিয়ন যখন অল্পবয়সেই একজন গোলন্দাজ সৈন্যের অফিসাররূপে কাজ করছিলেন, তখন জনৈক প্রসিয়ার সেনানায়ক অহংকারে বুক ফুলিয়ে কথাপ্রসঙ্গে একদিন তাঁকে বলেছিলেন—আমার দেশবাসী কেবল গৌরবের জন্যেই যুদ্ধ করে—কিন্তু ফরাসীরা টাকার জন্যে যুদ্ধ করে মাত্র—এই কথায় নেপোলিয়নের চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরিয়ে এলো। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—'ঠিক, ঠিক, যাদের যা অভাব, তার জন্যে তারা যুদ্ধ করবে বৈকি, ফ্রান্সের তো আর গৌরবের অভাব নেই—' এই কথা শুনে প্রসিয়ান সেনানায়ক নির্বাক হয়ে রইলেন।

নাম কিনবার জন্যে কাজ করার চেয়ে লোকের বিশ্বাসী হয়ে থাকাই ভালো। মনের অন্ধকারের চেয়ে গাঢ় অন্ধকার আর কোথাও নেই। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—"জীবে দয়া নয়, জীব সেবাই পরম ধর্ম" মদগর্ব্বে গর্বিত মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, কেননা দম্ভে তখন তার কেশাকর্ষণ করে টানে। যখন সে ধ্বংসমুখে পতিত হয়, তখন ক্ষণেকের জন্য চৈতন্য হোলেও আর ফিরবার আশা থাকে না। অত্যাচারের প্রকৃত প্রতিশোধ হচ্ছে ভালোবাসা। শত্রুকে ভালোবাসা দিয়ে যে মিত্র করে নিতে পারে, সেই হচ্ছে প্রকৃত মানুষ, প্রকৃত বীর। নিজের সুখের জন্যে অপরকে প্রতারণা করা মহাপাপ।

স্যার ওয়াটার সিল্টী মস্তবড় লোক হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, —'ছেলেবেলায় শুনেছিলাম কাজের সময় কাজই করবে, খেলার সময় কেবল খেলবে, এই উপদেশই ঠিক। ছেলেবেলা থেকে এই উপদেশ অনুসরণ করে জীবনে কৃতিত্বলাভ করতে পেরেছি—' দেশের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও ব্যাধি দূর করাই প্রত্যেক স্বদেশ-হিতৈষী ব্যক্তির লক্ষ্য।

অধ্যবসায়ের সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম না করলে জীবনে উন্নতি ও প্রতিষ্ঠালাভ হয় না। স্বাস্থ্য, চরিত্র ও আত্মসংযম ভিন্ন পৃথিবীতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করা যায় না। সঙ্গী নির্ব্বাচনে গুরুজনদের পরামর্শ নেওয়াই সবচেয়ে ভালো। মানুষ যাতে ভগবানের দিকে উঠে আসতে পারে, সেইজন্যে ভগবান মানুষের রূপ ধারণ করে আমাদের মধ্যে আসেন। লক্ষ্যহীন জীবন স্রোতে চালিত তৃণের মত। আদর্শ ভিন্ন জীবনে সুখ ও উন্নতি অসম্ভব। কর্ত্তব্য-জ্ঞানের সঙ্গে সৎসাহস বা চরিত্রবল থাকা একান্ত আবশ্যক। যে বিষয়ের চিন্তা করা যায়, সেই বিষয়েরই স্বরূপত্ব প্রাপ্তি ঘটে। যার যা প্রাপ্য, তাকে তা-ই দেওয়াই হচ্ছে ন্যায়পরতা। ন্যায়পরতাই সমাজ রক্ষার মূল। কোন ব্যক্তির অসাক্ষাতে তার গ্লানি করা বা তার কলঙ্ক রটনা করাকে পরনিন্দা বলে। পরনিন্দা মহাপাপ। পরনিন্দাপরায়ণ ব্যক্তি স্বার্থপর, নীচাশয় ও কাপুরুষ। বিজ্ঞান দিন দিন অনেক অভিনব তত্ত্ব আমাদের জ্ঞানগোচর করছে—সেই সব তত্ত্ব না জানলে অনেক সময়ে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হোতে হয়।

একটিমাত্র দীপ থেকে যেমন হাজার দীপ জ্বেলে অসংখ্য স্থানের অন্ধকার দূর করা যায়, তেমনি একটিমাত্র সাধু ব্যক্তির সংস্রবে এসে তাঁর সুবিমল চরিত্রের স্পর্শ দ্বারা হাজার ব্যক্তির চরিত্র নির্ম্মল হোতে পারে। যেমন মৃগ নিজে থেকেই গিয়ে নিদ্রিত সিংহের মুখে প্রাণ বিসর্জ্জন করে না, তেমনি নিরুদ্যম পুরুষ সংসারে কোন কাজই করে উঠতে পারে না। মনের বিশ্বাসমত কার্য্য করাকে সরলতা বলে। যার ভেতরে সরলতা আছে, তার পক্ষে ভগবানের কৃপালাভ খুব সহজ। গুহক চণ্ডালের সরলতা গুণের জন্য শ্রীরামচন্দ্র তার ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়েছিলেন। সত্যপরায়ণ ব্যক্তিরা কখন প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেন না। প্রতিজ্ঞানুসারে কাজ করাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক; মহাপ্রাণ শিবিরাজ একটি সামান্য কপোতের প্রাণরক্ষার প্রতিজ্ঞাপালনের জন্যে হাসিমুখে নিজের দেহ-মাংস দান করেছিলেন।

অতীতই বর্ত্তমানকে গড়ে তোলে। জীবনের প্রত্যেক স্তরে রয়েছে অতীতের গোপন ক্রিয়ার পরিচয়—আর অনুভব করা যায় তার মৌন শাসন ও নিবিড় স্নেহ। যাদের অতীত অন্ধকারে ঘুমিয়ে আছে তাদের বর্ত্তমানের উন্নতির দ্বারও রুদ্ধ। জনসমাজের শ্রদ্ধা প্রীতিলাভ করতে হোলে, মহৎকর্ম্ম করা আবশ্যক। সংসার-সাগরে চলেছে দুঃখ তরঙ্গ খেলা, তার মাঝে ভেসে চলেছে মানুষের আশার ভেলা। সহনশীলতা ব্যতীত জীবনের সংগ্রাম ক্ষেত্রে বিজয়ী হওয়া যায় না।

লেখাপড়া শিখে মানুষ হবার জন্যে যার মন নেই, আছে কেবল মতলব, তার দুঃখের দিনগুলি নিশ্চয়ই আসবে—সেদিন অনুতাপ করেও কোন ফল হবে না। ব্যক্তিগত চিন্তা-স্রোতের স্বাধীনপ্রবাহ অব্যাহত ভাবে যেখানে চলতে থাকে, সেখানেই সামাজিক ঐক্য পারিবারিক বন্ধন শ্লথ ও শিথিল হয়ে দুর্ভাবনা আনতে পারে। যে কাজ করে, ভুল করবার সম্ভাবনা তার চিরদিনই থাকে, তা বলে কাজ না করে বসে থাকা বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নয়। মানুষের মনে যা মজে থাকে, কাজে তাই ফুটে হয়ে নেমে আসে। জগতে কিছুই চিরকালের মত হয়ে যায় না; অর্থাৎ কোন কিছুরই সমাপ্তি রেখা দেখা যায় না। সোজা কথাকে সোজা করে বলতে চেষ্টা করা উচিত, কেননা বাক্যের ব্যূহভেদ করে যেটুকু পাওয়া যায়, তা আর সব সময়ে সারগর্ভ হয়ে ওঠে না, ভাব-দৈন্য লক্ষ্য করে ভ্রূকুঞ্চিত করতে হয়। কথায় শুধু কথা বাড়ে তাই নয়, সেই সঙ্গে তার সুরও চড়ে যায়, ফলে দু'পক্ষে চড়া সুরে কড়া কথা বলতে সুরু করলে কলহ বিবাদ, শেষ পর্য্যন্ত বিপদ ঘটে। এক্ষেত্রে নম্রভাবে কথা বলাই শোভন, তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি হয় না। তোমরা এইসব অভিজ্ঞতার কথা ভেবে দেখে অনুসরণ করবার চেষ্টা করো, তাতে ফল ভালোই হবে।

ছবির ঘোড়া

(জাপানী উপকথা)

গোপাল দাস

অনেকদিন আগেকার কথা। জাপানে বাস করতেন এক বিখ্যাত চিত্রকর। লতা-পাতা-ফুল আর পশু-পাখী-মানুষের ছবি আঁকতেন তিনি। যা কিছুর ছবি আঁকতেন তাই হয়ে উঠত একেবারে জীবন্ত সত্যিকারের জিনিস। তিনি ছিলেন জাপানের সেরা আঁকিয়ে। তাঁর তুলির রঙে ছিল যাদু।

তাঁর ঘরের দরজা ছিল কাগজ দিয়ে তৈরী। সেই কাগজের ওপর চিত্রকর আঁকলেন একটা ঘোড়ার ছবি। ঘরের ভেতর দিয়ে দরজার গায়ে রইল ছবিটা।

ঘোড়ার ছবিটা হয়েছিল একেবারে নিখুঁত। যে দেখত সেই প্রশংসা করত। হঠাৎ দেখলে মনে হ'ত দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি সত্যিকারের ঘোড়া। বহু লোক আসত এই অদ্ভুত ঘোড়াটাকে দেখতে। তারা বলাবলি করত, আঁকা হলেও এটি একটি সত্যিকারের ঘোড়া। আসল ঘোড়া থেকে তফাৎ নেই কিছু।

একদিন পাশের গাঁ থেকে ঘোড়াটাকে দেখতে এল এক বুড়ী। বেশ একটা জোয়ান ঘোড়ার ছবি দেখে ভারী খুশী হল সে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বুড়ী দেখল এক অবাক কাণ্ড। বার বার একটা মাছি উড়ে এসে বসছিল ঘোড়াটার পিঠের ওপর। বুড়ীর চোখের সামনেই ঘোড়াটা লেজ নেড়ে তাড়াল মাছিটাকে।

—এ যে দেখছি একেবারে জল-জ্যান্ত ঘোড়া, মনে মনে বললে বুড়ী। এক ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে ছবির মতো। যেন কেউ সহজে বুঝতে না পারে।

একদিন ঘোড়াটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে চেঁচিয়ে উঠল একটি ছোট ছেলে—গ্যাখো, গ্যাখো ঘোড়াটা কি রকম পিটপিট করে তাকাচ্ছে আমার দিকে!

ঘোড়াটাকে পিটপিট করে তাকাতে দেখেছে আরও অনেকে। কান নাড়াতেও দেখেছে কেউ কেউ।

ঘোড়াটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে শোনে সকলের কথা। বলে না কিছুই। অনেক দিন ধরেই এক ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। তার ইচ্ছে হচ্ছিল টগবগ্ করে ছুটে যায় রাস্তা দিয়ে।

একদিন নিশ্চয়ই বাইরে বেরুবে সে। তবে হ্যাঁ, ক'টা দিন অপেক্ষা করতে হবে তাকে। মাত্র দুটোদিন। তারপরই আসবে পূর্ণিমার রাত্রি। ধবধবে জোছনায় ডুবে যাবে পথঘাট। তখন পথ দিয়ে চলতে কিছুই অসুবিধে হবে না তার।

দুই

আকাশে ভাসছে পূর্ণিমার চাঁদ। যেন ঝক্ঝক্ করছে একখানা রূপোর থালা। জোছনার ঠাণ্ডা আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। লোকজনের সাড়া মিলছে না কোথাও। বেশ রাত হয়েছে তখন। চিত্রকরও পড়েছে ঘুমিয়ে। ঘোড়াটি দেখলে এই তার সুযোগ।

দরজার গা থেকে আস্তে আস্তে উঠে এল ছবির ঘোড়া। তার শরীরটা তো পুরু নয় মোটেই। কাগজের মতোই পাতলা তার দেহ। জানলার সরু ফাঁক দিয়ে কাত হয়ে সে অনায়াসে চলে এল বাইরে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল একবার। নাঃ কেউই দেখছে না তাকে। উঠোন পার হয়ে সে বেরিয়ে পড়ল বড় রাস্তায়। মাথাটা উঁচু করে লেজ তুলে কদম্ কদম্ শুরু করল চলতে।

চওড়া রাস্তাটা বরাবর চলে গেছে অনেক দূর। কিছু দূর গিয়েই সে ছুটতে আরম্ভ করলে টগবগ টগবগ। ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে থেমে পড়ল এক জায়গায়। সামনেই সে দেখতে পেল একটা গাজরের ক্ষেত।

ক্ষেতে নেমে পড়ে শুরু করলে গাজর খেতে। অনেক দিন হল তার কোন খাওয়া জোটেনি। তার ওপর এমন তাজা পুষ্ট গাজর। মনের আনন্দেই খেয়ে চলেছে সে। হঠাৎ কে যেন উঠল চেঁচিয়ে। মাথা তুলে দেখে লাঠি হাতে এক বুড়ী আসছে তাড়া করে। বেগতিক বুঝে সেও দিলে ভোঁ দৌড়।

দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে পৌঁছুল চিত্রকরের বাড়ী। গাজর খেয়ে একটু ফুলে উঠেছে তার পেটটা। কোন

রকমে জানলার ফাঁক দিয়ে ঢুকে গেল ঘরের ভেতর। তারপর ঠিক আগের মতোই দরজার কাগজের সঙ্গে রইল লেপ্টে।

গাজর-চোরকে ঠিক চিনতে পারলো বুড়ী। এ হচ্ছে সেই চিত্রকরের বাড়ীর ঘোড়া। একেই সে দেখেছিল লেজ নেড়ে মাছি তাড়াতে।

সকাল হতেই বুড়ী দৌড়ে এল চিত্রকরের কাছে। তার ঘোড়ার নামে করল নালিশ, কাল রাতে আমার গাজর খেয়ে নষ্ট করেছে আপনার ঘোড়া!

—আপনি নিশ্চয়ই ভুল দেখেছেন, বললেন চিত্রকর। অন্য কারুর ঘোড়া হবে সেটা। দেখুন না দরজার গায়ে কি রকম সেঁটে রয়েছে আমার ঘোড়া। বাইরে যাওয়া দূরে থাক, ও নড়া-চড়া পর্য্যন্ত করতে পারে না একটু।

—বাজে কথা কেন বলছেন মিছিমিছি? ঝাঁজের সঙ্গে বললে বুড়ী। আপনার ঘোড়াকে লেজ নেড়ে মাছি তাড়াতে তো সেদিন দেখে গেলুম নিজের চোখে! আচ্ছা, ঠিক আছে। আবার কখনও গাজর খেতে গেলে একেবারে বেঁধে আটকে রাখব আপনার ঘোড়া। বলেই বুড়ী হন্ হন্ করে চলে গেল সেখান থেকে।

তিন

পরের দিন রাতেও তেমনি আকাশ ভর্তি জোছনা। ছবির ঘোড়ার ইচ্ছে হল আজও বেরিয়ে পড়ে বাইরে। বুড়ীর শাসানি মনে পড়তেই চুপ হয়ে যায়। কিন্তু গাজরের কথাও ভুলতে পারে না সে। গাজর খেয়ে খুবই লোভ হয়েছে তার। ভাবলে খুব চুপি চুপি গিয়ে খেয়ে আসবে কয়েকটা গাজর। বুড়ী টের পাবে না মোটেই।

সেদিনকার মতোই জানলা দিয়ে গ'লে বেরিয়ে এল ছবির ঘোড়া। তারপর চেনাপথ ধ'রে হাজির হল এসে গাজরের ক্ষেতে। যেমনি সে একটা গাজরে মুখ দিয়েছে অমনি 'ধর ধর' করতে করতে ছুটে এল বুড়ী আর তার এক ছোকরা চাকর। দুজনেরই হাতে বাঁশের লম্বা লাঠি।

চিত্রকরের ঘোড়াও ভয় পেয়ে লাগাল চোঁ চোঁ দৌড়। বুড়ী আর চাকর নাগাল পেল না তার। হাঁপাতে হাঁপাতে সে এসে পৌঁছুল চিত্রকরের বাড়ী। তাড়াতাড়ি জানলার ফাঁক দিয়ে ঢুকল ঘরের ভেতর। মুখে ছিল তার একটা গাজর। তাড়াহুড়োতে সেটাকে ফেলে দিতে ও গেল ভুলে। গাজরটা কিন্তু আটকে গেল জানলার ফাঁকে—সেটা ছিঁড়ে পড়ে রইল বাইরে।

চটপট সে গিয়ে ঢুকল ছবির ভেতর। মুখে যে গাজরের এক টুকরো সবুজ পাতা আটকে রইল সেদিকেও খেয়াল নেই তার।

চার

পরদিন খুব ভোরেই বুড়ী এল চিত্রকরের বাড়ী। সঙ্গে তার অনেক লোক। চিত্রকরের ঘরের সামনেই একটা গাজর পড়ে থাকতে দেখল বুড়ী।

বাড়ীতে লোকজনের হৈ চৈ। চিত্রকরের গেল ঘুম ভেঙে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

—কোথায় আপনার ঘোড়া। চেঁচিয়ে বললে বুড়ী। আমরা দেখব তাকে। কাল রাতেও সে আমার গাজর খেয়ে এসেছে পালিয়ে। আপনার ঘরের দোর গোড়ায় পাওয়া গেছে এটা। গাজরটা তুলে দেখাল বুড়ী।

হুড়মুড় করে সবাই গিয়ে ঢুকল চিত্রকরের ঘরের ভেতর। নেহাত ভাল মানুষের মতোই চুপটি করেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই ছবির ঘোড়া।

—দেখুন, দেখুন এখনও ও'র মুখে লেগে রয়েছে এক টুকরো গাজরের পাতা। বুড়ীর চোখেই সেটা ধরা পড়ল সকলের আগে।

সবাই অবাক হয়ে দেখল—সত্যিই ছবির গায়ে লেগে রয়েছে গাজরের এক টুকরো সবুজ পাতা।

সেই ছোট ছেলেটিও ছিল ভীড়ের মধ্যে। হাত নেড়ে বললে চিত্রকরকে—সত্যিই ভয়ানক দুষ্টু আপনার এই ঘোড়াটা। সেদিন কি রকম পিটপিট করে তাকাচ্ছিল আমার দিকে।

সকলেই কিছু না কিছু বললে ঘোড়াটার নামে। গোলমালে সব শোনা গেল না।

চিত্রকর বুঝলেন নিশ্চয়ই কোন দোষ করেছে তার ঘোড়া। তা নইলে এত লোক কেন নালিশ করবে ও'র নামে। বুড়ীকেই বললেন তিনি, আচ্ছা, আপনিই বলুন ওকে নিয়ে এখন কি করতে প্যারি আমি।

—কেন ওকে ছেড়ে রেখেছেন আপনি? উত্তর

করলে বুড়ী! একটা খোঁটার সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রাখুন না কেন ওকে!

—ঠিক বলেছেন আপনি, বলেই চিত্রকর নিয়ে এলেন রঙ আর তুলি। ছবিটির এক জায়গায় প্রথমে একটা খোঁটা আঁকলেন। তারপর দড়ি এঁকে তার সঙ্গে বেঁধে দিলেন ঘোড়াটাকে।

এরপর আর কোনও দিন চিত্রকরের ঘোড়াটাকে বাইরে বেরুতে দেখেনি কেউ।

আজকে প্রাতে

রমেশ মজুমদার

পুব্ গগনে নীল ছড়ালো দিল্ ভরালো,
হিম বাতাসে কাঁপন আসে নিদ্ হারালো,
ঐ কুয়াশা বাঁধ্ছে বাসা,
খিল্খিলিয়ে তাদের হাসা;
ঐ ডালিয়া লক্ষ গাছে,
হাস্ছে আরো ডাক্ছে কাছে,
মনের বনে আজকে প্রাতে রঙ্ ধরালো,
দেখ্ রে তোরা কুঞ্জে কেগো রূপ ছড়ালো।

পুরাণো দিনের স্মৃতি

শ্রীহরিপদ গুহ

আজ তোমাদের কাছে অনেকদিনের একটা স্মৃতি বলছি। আমার বয়স তখন প্রায় তোমাদেরই মতো। আমি তখন বিক্রমপুরে থাকি।

ভাদ্রমাস, ভরা বর্ষা। চারদিক জলে থই থই করছে। এমন কি এ'বাড়ী থেকে ও' বাড়ীতে যেতে হলেও নৌকো ছাড়া গতি নেই। তোমরা, যারা সহরে থাকো, পূর্ব্ববঙ্গের বর্ষাকাল সম্বন্ধে হয়তো কল্পনাই করতে পারবে না। প্রত্যেক গৃহস্থেরই একখানা করে নৌকো থাকে। নৌকো না থাক্লে তাদের চলে না। হাট, বাজার, স্কুল, পোষ্টঅফিসে যেতে নৌকো ছাড়া গতি নেই।

তখন বেলা পড়ে এসেছে। আমি আমার ছোট্ট ঘরখানিতে ব'সে রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী আবৃত্তি কর্ছিলুম—

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা.
কূলে একা ব'সে আছি নাহি ভরসা।

*　　*　　*

একখানি ছোট ক্ষেত—আমি একেলা,
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।

ঠিক এমনি সময় কানাই, যতীশ, ভবতোষ, অমিয় ও শিবু ঘরে ঢুকে সমস্বরে চীৎকার করে বলল—একা কেন হে? এই তো আমরা রয়েছি! সকলে খুব হেসে উঠ্ল। হাসি থাম্লে কানাই বলল—অনেক কথা আছে, নৌকোয় আয়। সার্টটা গায়ে দিয়ে তাদের সঙ্গে নৌকোয় গিয়ে বস্লুম। তারা নৌকো ভাসিয়ে দিলে। পাঁচখানা বৈঠার টানে নৌকাখানি তীরবেগে ছুটে চল্ল।

গ্রামের প্রান্তভাগে শ্মশান। চারদিক জলে ডুবে গেছে, শুধু খানিকটা স্থান দ্বীপের মত মাথা উঁচু করে আছে। এখান থেকে লোকালয় অনেক দূরে। তারা নৌকোখানি এখানে এনে একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধল। বর্ষাকালে এখানটাই ছিল আমাদের আড্ডা। এমন নির্জ্জন স্থানে সকলেই প্রাণ খুলে গল্প করতে পারতুম। গুপ্ত পরামর্শ ও গুপ্ত আলোচনা এখানে বসেই করা হতো। কাজেই আমার বুঝতে দেরী হলো না যে, আজ কোন গোপন পরামর্শ হবে।

কানাই আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে—আজ যে 'নষ্টচন্দ্র' সে হুঁস আছে?

আমি বল্লুম—মোটেই না, কে আর পাঁজি দেখ্তে গেছে বল। তবে ভরসা আছে, খবর তোমরা দেবেই।

কানাই বল্ল—তা' হ'লে শোনো, আজ প্রস্তুত থেকো, রাত্রে তোমায় নিয়ে আস্ব। এদিককার যোগাড় আমরা সব করে রেখেছি। তারপর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেখানে নানাপ্রকার পরামর্শ চল্তে লাগল।

অমিয় বল্ল—চণ্ডীবোসের গাছে অনেক শশা ফলেছে, তারক সাহার বাড়ীতে নারকেল গাছে বড় বড় ডাব হয়েছে।

ভবতোষ বল্ল—হারাণ মণ্ডলের বাড়ী মোটা মোটা আক্ আছে। যতীশ বল্ল—বিষ্ণু সমদ্দারের বাড়ীর চাটিম কলায় পাক ধরেছে। আর কোথায় কি উপাদেয় দ্রব্য আছে তার খবর নিয়ে কানাই একটা 'চার্ট' প্রস্তুত করে ফেল্ল। কোন্ বাড়ীতে কে কখন সজাগ থাকে, কোথা দিয়ে নৌকো ভিড়াতে হবে, কে কে কোন্ গাছে উঠ্বে, তাও তখনই স্থির হয়ে গেল।

তখন দিনমণি পাটে বসেছে। সমস্ত আকাশে ও গাছের মাথায় তার স্বর্ণছটা ছড়িয়ে পড়েছে। কানাই ধীরে ধীরে নৌকো ভাসিয়ে দিল। ভবতোষ স্ফূর্ত্তিভরে গেয়ে উঠ্ল—

'সম্মুখে রাঙ্গা মেঘ করে খেলা,
ওগো, তরণী বেয়ে চলো, নাহি বেলা।'

আর সকলে বৈঠা বাজিয়ে তাল দিতে দিতে নৌকা ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে বেয়ে চল্‌ল।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আমি তাড়াতাড়ি রাত্রের খাবার খেয়ে তৈরী হয়ে রইলুম। বাড়ীতে যেন কেউ কোন সন্দেহ করতে না পারে তাই জোরে জোরে পড়া আরম্ভ করে দিলুম। পাড়াগাঁয় এমনিতেই সকলে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে সকাল সকাল শুয়ে পড়ে। রাত আটটার সময়ই কোন কোন বাড়ীতে গভীর রাত্রি বলে মনে হয়। অবশ্য কোন কোন বাড়ীতে যখন হরি সংকীর্ত্তন হয়, তখন এর ব্যতিক্রমও হয়।

সহসা আমার ঘরের দরজায় গোটা দুই টোকা পড়ল। আমি অতি সন্তর্পণে নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে দরজায় তালা দিয়ে নৌকোয় গিয়ে উঠলুম। কানাই নৌকো ভাসিয়ে দিল।

নৌকায় সরঞ্জাম দেখে আতঙ্কে আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। খানচারেক কাটারি, দু'খানা রামদা, ক'গাছা মোটা মোটা বাঁশের লাঠি ও কিছু শক্ত দড়ি। চুরি বিদ্যায় এই প্রথম হাতে-খড়ি। কানাইরা এ' বিষয়ে খুবই দক্ষ। প্রতি বছরই নষ্টচন্দ্রের সময় তারা নৈশ-অভিযানে বেরিয়ে থাকে। তাদের সাহসও খুব বেশী। তাদের সঙ্গে যোগ দিলেও আমার বুকের ভেতরটায় কিন্তু দুরু দুরু করে কাঁপছিল। আমরা সকলেই হাফপেণ্ট পরে এসেছিলুম। ভাল কথা, বল্‌তে ভুলে গেছি, বিকাল বেলা কানাই অনেকগুলো বুনো-ফল সংগ্রহ করে রেখেছিল। সেগুলো দেখ্‌তে অনেকটা কৎবেলের মতো কিন্তু নীরেট। মনে হয় যেন কাঠের বল। আমরা সকলে সেগুলি ছুঁড়ে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীর চালে ফেল্‌তে লাগলুম। বাড়ীগুলির অধিকাংশরই টিনের চাল, কাজেই দুমদাম করে শব্দ হতে লাগল। অনেকে নানাপ্রকার গ্রাম্যভাষায় চোখা চোখা বাণ নিক্ষেপ করতে লাগল। কিন্তু ভয়ে কেউ ঘরের বার হলো না।

আমরা বেগে নৌকো ভাসিয়ে চল্‌লুম। সুমধুর গালি-গালাজ শ্রবণেও আমাদের প্রাণে কত আনন্দ! দ্বিগুণ উৎসাহে আবার অন্য বাড়ীতে গোটা ছুঁড়্‌তে লাগলুম। প্রাচীনদের মুখে শুনেছি যে, সেদিন নাকি পরের দ্রব্য না বলে নিলে চুরির অপরাধে পাপ তো হয়ই না, অধিকন্তু পুণ্যের বোঝা নাকি বেড়ে যায়। বিনা খরচায় পুণ্য-সঞ্চয়ের এতবড় সুযোগ কিছুতেই ছাড়া যায় না—তাই এই নৈশ-অভিযান। আর লোকের গালাগালিতে নাকি পরমায়ু বাড়ে। সেদিক দিয়েও মনে বেশ একটু সান্ত্বনা পেয়েছিলুম।

কানাই বল্‌ল—আর একটু গভীর রাত না হলে কোন সুবিধা হবে না. এখনও অনেকে সজাগ রয়েছে, চল্‌, শ্মশানে গিয়ে বসা যাক্।

ভবতোষ আপত্তি করে বলল—না, আমি চুপ করে বসে থাক্‌তে রাজী নই। চল্‌, খানকতক আক্ নিয়ে আসি, তারপর যতক্ষণ খুসী বসে থাকো, আমার কোন আপত্তি থাক্‌বে না।

এ' প্রস্তাব কেউ অবহেলা করতে পার্‌ল না। তীর বেগে নৌকা হারাণ মণ্ডলের বাড়ীর ঘাটে এসে নৌকা ভিড়্‌ল। ভবতোষ আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল, কাটারি হাতে নিয়ে টপ করে নেমে পড়ল; অমিয় তাকে অনুসরণ করল। এক হাতে আকের পাতাগুলি ধরে অপর হাতে কেমন ক্ষিপ্রগতিতে ভবতোষ ইক্ষু বংশ ধ্বংস করল তা দেখলে সত্যি আশ্চর্য্য হতে হয়। অমিয় তাড়াতাড়ি আকের খণ্ডগুলি নৌকায় এনে তুলল, আমরা নৌকো ভাসিয়ে দিলুম। শ্মশানে ফিরে এসে সকলে ভবতোষকে খুব বাহবা দিলুম। তারপর প্রত্যেকে এক এক খণ্ড ইক্ষু দণ্ড নিয়ে তার সদ্ব্যবহারে লেগে গেলুম। পূর্ব্বে আমরা পয়সা খরচ করে অনেক আক্ খেয়েছি, কিন্তু সত্যি তার রস এত মধুর লাগেনি। 'না জানি কতেক মধু এই আকে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে।'

ঘণ্টাখানেক পর আবার প্রস্তুত হওয়া গেল। এবার কানাইয়ের পালা। আমাদের যত কিছু আশা ভরসা সবই তার উপর। কারণ, সে সকল বিষয়েই অগ্রণী এবং সুদক্ষ। আমাদের দলে তার মত ডাংপিটে আর দ্বিতীয় কেউ ছিল না।

আমাদের নৌকাখানি ধীরে ধীরে তারক সা'র বাগানের পেছনে লাগানো হোল। কানাই, শিবু আর আমি দড়ি ও কাটারি নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চল্‌লুম। চারিদিক নিস্তব্ধ, শুধু মাঝে মাঝে কয়েকটা ঝিঁ ঝিঁ অনবরত একঘেয়ে ডেকে চলেছে। একটা আম গাছের কাছে এসে কানাই হঠাৎ চমকে দাঁড়াল, আমরা একটা খস্ খস শব্দ শুনতে পেলুম। কানাই চাপা কণ্ঠে বল্‌ল—একটু দাঁড়া, আগে ওটা চলে যাক্!

আমি বল্‌লুম—কি?

সে অকম্পিত কণ্ঠে বলল—জাত সাপ।

আতঙ্কে আমার বুকের ভেতর ভূমিকম্প আরম্ভ হলো। একটু পরে কানাই বল্‌ল—আয়, আর ভয় নেই, বেটা চলে গেছে। তারপর সে নারকেল গাছের দিকে অগ্রসর হল। আমি ও শিবু তাকে অনুসরণ করলুম। তখনও আমার বুকের কাঁপুনিটা কমেনি।

দড়ি ও কাটারিখানা নিয়ে কানাই সড় সড় করে গাছে উঠে পড়ল। একটু পরেই ঠক্ ঠক্ করে কয়েকটা শব্দ হলো, তার পরেই নারকেলের একটা কাঁদি নীচে নেমে এলো। শিবু তাড়াতাড়ি দড়ির বাঁধন খুলে কাঁদিটা তুলে নিলে, কানাই দড়িটা টেনে নিল। একটু পরেই আবার আর এক কাঁদি নেমে এলো, আমি সেটা খুলে নিলুম। এ'ভাবে সে গাছের সবগুলি নারিকেল শেষ করে কানাই নেমে এসে আর একটা গাছে উঠল।

সেই সময় চৌকিদার পাহারায় বেরিয়েছিল। পুকুরের মাঝখানে এসে সে জাগো, জাগো, বলে কয়েকবার চীৎকার করল। তার সেই রাসভনিন্দিত কণ্ঠস্বরে অনেক গৃহস্থেরই নিদ্রাভঙ্গ হলো। কাজেই আমরা বেশ একটু অসুবিধায় পড়লুম।

কানাই নাছোড়বান্দা; বল্‌ল—এই গাছটা শেষ না করে নাম্‌ব না।

কাটারি দিয়ে কয়েকটা ঘা দিতেই কে একজন বলে উঠ্‌ল—বাবা, বাবা চোর এসেছে। পর মুহূর্ত্তেই কর্কশ কণ্ঠে কে চীৎকার করে উঠ্‌ল—কে রে ওখানে ?

শিবু ছুটে গিয়ে চুপি চুপি তাদের ঘরের শিক্‌লটা তুলে দিয়ে মোটা গলায় বল্‌ল—তোমার যম।

কানাই এবার একটা বড় কাঁদি কেটেছিল ; ঝুলিয়ে দেবার সময় মাঝ-পথে হঠাৎ—দড়িটা ছিঁড়ে যাওয়ায় নারকেলগুলো সব পড়ে গেল একটা ভয়ানক শব্দ হলো। ঘরের মধ্যে বন্ধ লোকটি তখন 'চোর, চোর' বলে চেঁচাতে লাগ্‌ল এবং আলো নিয়ে বাইরে আসবার জন্য বৃথা চেষ্টা করতে লাগল।

ততক্ষণে আমরা নারকেলগুলো সব নৌকায় তুলে ফেলেছি। কানাই নৌকোয় উঠে কয়েকটা গোটা সজোরে তার ঘরের চালে নিক্ষেপ করল। লোকটা অশ্লীল ভাষায় আমাদের উদ্দেশে গালি দিতে লাগল।

আমরা বেগে নৌকো চালিয়ে দিলুম এবং শ্মশানে পৌঁছে মনের সঙ্গে ডাব খেতে সুরু করে দিলুম।

কানাই বল্‌ল—ওহে, ছোবড়াগুলো ফেলো না, বেটার ঘরের সামনে সব রেখে দিতে হবে। ভবতোষ বল্‌লে—নিশ্চয়। বেটা শয়তান, চাইলে একটা ডাব দেয়নি, এবার বুঝুক ঠেলা। দেখতে দেখতে অত-গুলো ডাব যে কেমন করে শেষ হয়ে গেল, ভাব্‌লে সত্যি আশ্চর্য্য লাগে।

যতীশকে বলা হলো—ওহে, তুমি এবার চাটিম কলার চড়াটা নিয়ে এসো। গাছ পাকা কলা খাওয়ার লোভ সাম্‌লানো যায় না। শিবু বল্‌ল—অমিয়কে নিয়ে শশাগুলোও আন্‌তে হবে, কিছু বাদ দিলে চল্‌বে না।

আবার বেরিয়ে পড়লুম। যাবার সময় তারক সা'র বাড়ীতে ছোবড়া গুলো ফেলে দিয়ে গেলুম।

বিষ্ণু সমাদ্দার লোকটা কৃপণ। তার কাছে কেউ কিছু চেয়ে কোন দিনও পায়নি। বেটাকে এবার খুব জব্দ করা যাবে।

যতীশ ধীরে ধীরে নেমে কলার কাঁদিটা কেটে নিয়ে এলো। কাট্‌বার সময় যে সামান্য একটু শব্দ হলো, তা শুনেই বিষ্ণু সমাদ্দার ঘর থেকে চীৎকার করে উঠল—কে রে ? সঙ্গে সঙ্গে কপাট খোলার শব্দ হলো।

আমরা তাড়াতাড়ি নৌকো ভাসিয়ে দিলুম। ভবতোষ তার ঘরের চালে কয়েকটা গোটা নিক্ষেপ করল।

আমরা চক্রবোসের ঘাটে এসে নৌকো লাগালুম। অমিয় গিয়ে এক কুড়ি শশা নিয়ে এলো। আমরা আবার সেই শ্মশানে ফিরে এলুম।

সকলে এক একটা কলা নিয়ে কামড় দিতে লাগলুম। তারপরই মুখ বিকৃত করে সেগুলো জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। কলা মোটেই পাক ধরেনি, তখনো কস রয়েছে। যতীশ সকলের কাছ থেকেই মুখ খিচুনী খেয়ে আম্‌তা আম্‌তা করতে লাগল। বেচারার আর দোষ কি ?

যাহা হোক্, শশা খেয়ে মুখটা আবার বদ্‌লে নেওয়ার জন্য সকলে এক একটা শশা তুলে নিলুম।

সহসা কানাই বলে উঠল—শীগগির বৈঠা ধর, ওই দেখ সমদ্দার এইদিকে আসছে।

চেয়ে দেখলুম—তিন চারজন লোক নিয়ে সমদ্দার এদিকেই বেগে নৌকো চালিয়ে আস্‌ছে। হাতের শশা ফেলে বেগে আমরা প্রাণপণে বৈঠা বাইতে লাগলুম। কানাই মাঝে মাঝে বল্‌তে লাগল—ভয় নেই, জোরসে টান ?

সহসা কানে এলো—মর বেটারা ! আর ফির্‌তে হবে না। সঙ্গে সঙ্গে বিকট হাসি !

এতক্ষণ আমরা শুধু নৌকোই বেয়েছি, কোথায়, কোনদিকে যে চলেছি, কিছুই ভাবিনি, এবার ভাববার অবসর পেলুম। কোথা জলের সীমা ? চারদিক ধূ ধূ করছিল। জল, শুধু জল। উন্মাদিনী পদ্মা তাণ্ডব নৃত্যে নেচে চলেছে। ভীম জল-কল্লোলের একটানা শোঁ শোঁ শব্দ কানে তালা লাগাচ্ছিল।

কানাই বলে উঠল—আর ভয় নেই, বেটারা ফিরে যাচ্ছে।

ভয়নাই বা কি যে আছে, আমরা কিন্তু তা বুঝে উঠতে পারলুম না। বড় নৌকা নিয়েও লোকে এ সময়ে পদ্মায় আসতে সাহস করে না, আর আমাদের তো একখানা ছোট ডিঙ্গি ! বড় বড় ঢেউ এসে সজোরে নৌকোয় আছড়ে পড়তে লাগলো। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হচ্ছিল —বুঝি আর রক্ষা নেই !

কানাই অকম্পিত কণ্ঠে বল্‌ল—তোরা বেশী নড়াচড়া করিস্ নি, স্থির হয়ে বসে থাক। আমি একাই চালাচ্ছি। তারপর ভবতোষকে লক্ষ্য করে বল্‌লে—তুই বাটি করে আস্তে আস্তে নৌকোর জল ফেলে দে। ভয়ে সকলের মুখই একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল ; আমার তো মনে হয়েছিল—ভবখেলা বুঝি আজই শেষ হয়ে যায় ; চুরির শাস্তি বুঝি হাতে হাতেই ফলে !

কানাই বল্‌ল—হয়েছে কি ? অত ভয় কিসের ? এ'রকম করলে, নৌকো এখনই ডুবিয়ে দেব। তার কথার উত্তর দিতে কারো সাহস হলো না, মনে মনে ইষ্টনাম জপ করতে লাগলুম।

স্রোতের টানে আমাদের নৌকোখানি তীরবেগে ছুটে চলেছিল। কানাই হাল ধরেছিল, নৌকো সোজা ওপারের দিকে চালাতে লাগল। আমি একটু আপত্তি করে বল্‌লুম—ওপারে যাচ্ছ কেন ?

সে গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল—দর্‌কার আছে।

আবার সব চুপচাপ।

জলতরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। আমরা কয়টি প্রাণী নীরবে বসেছিলুম। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে নৌকো এসে চড়ায় পৌঁছল। একটা গাছের গুঁড়িতে নৌকো বেঁধে সে ধীরে ধীরে উপরে উঠল। তারপর "তোরা একটু বোস ভাই, আমি এখনই আসছি।" বলে ধীরে ধীরে চলে গেল। সে অদৃশ্য হলে, অমিয় বল্‌লে—কি ভয়ানক লোক ! ওর জন্য আমাদের প্রাণ যেতে বসেছিল ! আগে জানলে কে ওর সঙ্গে আসত ? নমস্কার, জীবনে আর কখনো নয় !

তখন বুকের কাঁপুনিটা অনেক কমে গিয়েছিল। ভবতোষ আবার তা' বাড়িয়ে দিলে, বল্‌লে—কী অসীম সাহস এই কানাইএর। এই

চরটা ভূতের আস্তানা, ও কি না সটান একা চলে গেল। আমাদের কাউকে সঙ্গে যেতেও বল্‌লে না!

* * *

প্রায় মিমিট পনের পরে কানাই ফিরে এসে শুষ্ক মুখে বল্‌লে—তোরা একবারটি আয় ভাই, বড় বিপদ। তার স্বর বড়ই করুণ!

কোনপ্রকার প্রশ্ন না করে আমরা ধীরে ধীরে নৌকো থেকে নেমে তাকে অনুসরণ করলুম। কিছুদূর যাবার পর দু'খানি ছোট খড়ের ঘর দেখা গেল। কানাই আস্তে আস্তে একখানি ঘরে প্রবেশ করল। এক পাশে মিটমিট করে একটা মাটির প্রদীপ জ্বলছিল। সেই ক্ষীণালোকে দেখলুম—একজন যুবতী চুপ করে মাটিতে বসে আছে; তার মুখখানি একেবারে পাংশু হয়ে গেছে। বেদনাতুর চক্ষু দুটি জল ভরে ছল্ ছল্ করছে! সামনে একজন লোক লম্বা হয়ে শুয়ে আছে, তার আপদমস্তক একটা ছিন্ন বসন দ্বারা আবৃত।

কানাই বল্‌ল—আর দেরি করিস্ নি, ধর ভাই, এর সদ্গতি করে দি! তারপর নিজেই সেই বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তির মাথার দিকটা দু' হাতে উঁচু করে তুলে ধরল। আমরা সকলে তাকে সাহায্য করলুম, ধরাধরি করে তাকে বাইরে নিয়ে এলুম। সেই রমণীও আমাদের সঙ্গে বাইরে এলো। নৌকোর কাছে এসে কানাই বল্‌ল—নামা, ঠিক করেনি। তারপর সেই শব দেহের বস্ত্র উন্মোচন করে; সমস্ত কাপড় জড়িয়ে ভাল করে বাঁধল। আস্‌বার সময় দুটো বড় মাটির কলসী এনেছিল, অমিয় সেই দুটিতে বালি ভরতে লাগল।

কঙ্কালসার দেহটি দেখে আমার মনে হলো—একে যেন আগে কোথা দেখেছি! আমি এক-দৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলুম। কানাই তা' লক্ষ্য করে বল্‌ল—কি দেখছিস অত করে? চিন্‌তে পারছিস্ না? আমাদের পান্নু ঠাকুর।

তখন অতীতের অনেক কথাই মানস-পটে ভেসে উঠল। পান্নু ঠাকুরের সংসারে আপন বল্‌তে কেউ ছিল না। পরকেই সে আপন বলে মনে করত। কি পরোপকারীই না ছিল সে! লোকের উপকার করতে গিয়ে তাকে কত লাঞ্ছনা গঞ্জনাই না সইতে হয়েছে! তার আজ এই পরিণতি! হা ঈশ্বর!

পান্নু ঠাকুরের দেহ নৌকোয় তুলে, নৌকো ভাসিয়ে দেওয়া হলো। রমণী আর্ত্তনাদ করে একটা বুক ফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

এতক্ষণ এই রমণীকে ভাল করে দেখবার অবসর পাই নি। এবার কিন্তু তাকে চিন্‌তে পারলুম। সে শ্যামা দিদি!

অদূরে 'ঝুপ' করে একটা শব্দ হলো। একটু পরেই নৌকো নিয়ে সকলে তীরে ফিরে এলো।

আমরা ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলুম। শ্যামাদিদি সহসা আর্ত্তনাদ করে বল্‌তে লাগল—আমার কি উপায় হবে? আমি কোথা যাবো!

কানাই তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লে—তোমার কোন ভাবনা নেই দিদি! আমি তোমার ভার নেব। আজকের রাতটা কষ্ট করে কাটিয়ে দাও; কাল এসে তোমার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব।

শ্যামাদিদি আর কিছু বল্‌তে পারল না। কাতর ভাবে দীন-নেত্রে আমাদের দিকে চেয়ে রইল। তার সেই ব্যথা ভরা করুণ দৃষ্টি আজো চোখের সামনে ভেসে উঠে মনটাকে বেদনাতুর করে তোলে।

আমরা যখন বাড়ী ফিরলুম তখন ভোর হয়ে গেছে। সমস্ত রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, তাড়াতাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়লুম।

কানাই তার কথা রেখে ছিল। ভাল ব্যবস্থাই করে দিয়েছিল।...

তারপর কত বছর কেটে গেছে। আজও শ্যামাদিদির সেই ব্যথা-ভরা দৃষ্টি ভুলতে পারি নি। প্রতি বছর 'নষ্টচন্দ্র' তিথিতে তার স্মৃতি বুকের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠে মনটাকে ব্যথাতুর করে তোলে।

মলয়কুমার

শান্তশীল দাশ

এ পাড়ার সেরা ছেলে মলয়কুমার—
বলি শোন একে একে কতগুণ তার!
ভোরবেলা মুখ ধুয়ে সবাই যখন
পড়ার ঘরেতে যায়, মলয় তখন
ছিপ হাতে ছুটে যায় পুকুর পাড়ে;
সব কিছু ভুলে গিয়ে একেবারে
চুপ করে বসে থাকে ছিপটি ধরে;
সকাল বেলাটা যায় এমনি করে।

দশটা যখন বাজে, ছেলের দলে
ইস্কুলে যায় চলে বই বগলে;
ছিপখানি রেখে দিয়ে পুকুর ঘাটে
মলয় তখন জলে সাঁতার কাটে।
বার দুই তিন করে এপার ওপার;
বাড়ী গিয়ে কিল খায় গোটা দুচ্চার
মার কাছে: তবু হুঁস হয় না মোটে,
পরদিন ঠিক মত আবার ছোটে।

ডাংগুলি, ফুটবল, লাটাই-ঘুঁড়ি—
ওস্তাদ সব তাতে, নেইকো জুড়ি
তার মত এ পাড়ায়, মিলবে না আর,
সকলেই তার কাছে মেনে নেয় হার।

সন্ধ্যাবেলায় তার বদলায় রূপ,
হৈ চৈ গোলমাল একেবারে চুপ;
লক্ষ্মী ছেলের মত বই সাজিয়ে,
বসে থাকে বই পাশে মুখ নামিয়ে।
মা এসে অবাক হয়ে গালে দিয়ে হাত
দেখেন, শ্রীমান ঘুমে একেবারে কাত।

বিভূতিভূষণের কথাশিল্প

অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম পর্ব : স্রষ্টা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আগেই বলা হইয়াছে, বিভূতিভূষণ রোমাণ্টিক চেতনাসম্পন্ন লেখক ; তীব্র সৌন্দর্যবোধ ও দূরপ্রসারী কল্পনা-প্রবণতার জন্য তাঁহাকে এক হিসাবে রোমান্সধর্মী লেখকও বলা যাইতে পারে। তাঁহার চিন্তার ও রচনারীতিতে ক্লাসিক দৃঢ়তার বা নিয়মতান্ত্রিক নীতিনিষ্ঠার অভাব ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া এই শ্রেণীর লেখক বলিতে বাস্তব-সমস্যার অব্যাহতি-লুব্ধ পলায়নপর যে মনোবৃত্তির কথা সাধারণত আমাদের কল্পনায় জাগে, বিভূতিভূষণের মনোভাব সেরূপ ছিল না। তাঁহার দৃষ্টি কবিসুলভ এবং মেজাজ রোমাণ্টিক হইলেও আসলে তিনি জগৎ ও জীবনের ঘনিষ্ঠ শিল্পী ছিলেন। বিষয়বস্তুর সহিত কতখানি গভীর পরিচয় লইয়া তিনি লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্মৃতির রেখা, উর্মিমুখর বা উৎকর্ণের মত ডায়েরীর নিরিখে গল্প-উপন্যাসগুলি পড়িলেই বুঝা যাইবে।*৮ একথা সত্য যে সমকালীন বহু জটিল সমস্যাই তিনি স্পর্শ করেন নাই, কিন্তু এ হিসাবে তাঁহার কোনরূপ সংস্কারও ছিল না। যুগ-সমস্যা সম্পর্কে বিভূতিভূষণ শরৎচন্দ্র বা তারাশঙ্করের মত সচেতন শিল্পী নন। তবে তাঁহার আবেগ-প্রবণ মানসলোকে এইরূপ কোন সমস্যা প্রতিফলিত হইলে তাহার রূপায়ণে তিনি দ্বিধা করেন নাই। অবশ্য এ কথা সত্য যে, বিভূতি-ভূষণের লেখায় যে সব যুগ-সমস্যা স্থান পাইয়াছে, তাঁহার বিশিষ্ট মনো-ধর্মের উজ্জ্বলতার ঊর্ধ্বে সেগুলি কখনোই উঠিতে পারে নাই, সমগ্রভাবে সেগুলি কেমন যেন নিষ্প্রভ হইয়াই ফুটিয়াছে। বিভূতিভূষণের সাহিত্যে জীবনের সহজ গতি এবং প্রকৃতির রূপোজ্জ্বলতাই বড় কথা, যুগসমস্যার সুস্পষ্ট বলিষ্ঠ প্রকাশ তাঁহার সাহিত্যে খুবই কম। কবি-ভাবাপন্ন কথা-সাহিত্যিকের এই দুর্বলতা অস্বাভাবিক নয়। বিভূতিভূষণের ভাবগুরু রবীন্দ্রনাথেও এইরূপ ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' উপন্যাস-খানি দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরিলে দেখা যায়, রাজনৈতিক পটভূমিকায় লেখা এই উপন্যাসে কাহিনীর গৌরব আছে, রচনা-শৈলীর বৈশিষ্ট্য আছে, নাটকীয়তাও কিছুটা আছে, কিন্তু তথাপি রসিক পাঠকের কাছে 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের রূপকল্প বা আঙ্গিকের মূল্য অবশ্যই ততটা নয়, ইহার কাব্যিক সুরমূর্ছনার অথবা হৃদয়গত ভাবাবেগের আবেদন তাঁহার কাছে যতখানি।*৯

এই কবিসুলভ ভাবপ্রবণতা ছিল বলিয়াই বিভূতিভূষণের মন বস্তু-তান্ত্রিক জীবনের নিছক প্রয়োজনের গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে রূপময়ী প্রকৃতির স্পর্শ-রঙীণ এবং বাস্তব ও কল্পনার অপরূপ সমন্বয়ে সার্থক বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্য নূতন ধরণের সৃষ্টি হিসাবে বিবেচিত হইবার স্পর্ধা রাখে। বিশেষ করিয়া প্রকৃতিকে তিনি যেভাবে মানুষের জীবনে আনিয়াছেন বা সমগ্রভাবে রচনার স্থান দিয়াছেন তাহা সত্যই অভূতপূর্ব। বিভূতিভূষণের রচনায় প্রকৃতির রূপ জীবন্ত, এই জীবন্ত সত্তা আবার কষ্টকল্পিত নয়, স্বতঃস্ফূর্ত।*১০ বিভূতিভূষণের সাহিত্যে প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী অতি মনোজ্ঞভাবে বলিয়াছেন :—"রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বে যে সমস্ত গার্হস্থ্য উপন্যাস বাংলাদেশে লিখিত হইয়াছে, বিভূতিবাবুর রচনা ঠিক সে পর্যায়ভুক্ত নহে। কারণ এমন একটি নূতন উপাদান তাঁহার রচনায় আছে, যাহা রবীন্দ্র-পূর্ব যুগের গার্হস্থ্য উপন্যাসে ছিল না। সেটি প্রকৃতি। এটি রবীন্দ্রপূর্ব যুগে অভাবিত ছিল। এটি জীবনের একটি নূতন সূত্র, আমাদের দেশে তো বটেই, পাশ্চাত্য দেশেও। প্রকৃতিকে জীবনের

---

*৮ কথা-সাহিত্যিকের প্রকৃতি সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচক জন ক্যারুথারসের নিম্নোধৃত মন্তব্যটি এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় :—'He is first an observer, then a recorder. He must be not only in the world, but of it ; for how else should he gain the sympathy and understanding without which all his art is vain.

John Carruthers—Schherazade—P. 32

*৯ প্রকৃতপক্ষে বাংলা কথা-সাহিত্যে কাব্যভাবের অত্যুজ্জ্বলতায় দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মনে হয় বাঙালী মনের আবেগ-প্রবণতা ইহার অন্যতম প্রধান কারণ। আধুনিককালেও রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা', শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত (১ম পর্ব), বুদ্ধদেব বসুর 'যেদিন ফুটলো কমল', প্রবোধকুমার সান্যালের 'আঁকা-বাঁকা', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ' (১ম পর্ব), অদ্বৈত মল্ল বর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' প্রভৃতি প্রখ্যাত বাংলা উপন্যাসে অন্যভাব যাই থাক, কাব্যভাব একটি বড় দিক।

*১০ প্রকৃতি বিভূতিভূষণের সাহিত্যে কিরূপ জীবন্ত এবং মানুষের সহিত কিভাবে সংশ্লিষ্ট, তাহা নিম্নের উদ্ধৃত অংশ হইতেই অনেকটা বুঝা যাইবে :—

'পথের পাঁচালী'তে মায়ের মৃত্যুর-পরদিন অপু পৌছাইল গ্রামে। গ্রামের প্রবেশ পথে কোদলা নদীর তীরে দাহ হইয়াছে। গ্রন্থে এইখানে আছে—"মা নাই! মা নাই!...বৈকালের কি রূপটা! নির্জন, নিরালা কোনও দিকে কেহ নাই। উদাস পৃথিবী, নিস্তব্ধ বিবাগী রাঙা রোদ-ভরা আকাশটা। অপু অর্থহীন দৃষ্টিতে পোড়া খড়গুলোর দিকে চাহিয়া রহিল।

উপাদানরূপে গ্রহণ ও স্বীকার নূতন যুগের লক্ষণ, সে নূতন যুগ এখনও পুরাতন হয় নাই। পশ্চিমের হাত হইতে রবীন্দ্রনাথ ইহা গ্রহণ করিয়াছেন, রবীন্দ্রোত্তর কথাশিল্পীগণের মধ্যে বিভূতিভূষণ সবচেয়ে অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছেন। এখানেই বিভূতিবাবুর রচনায় নূতনত্ব, দেশ ও কালের চিহ্ন। এই উপাদানটি সবচেয়ে আধুনিক, শ্রমিক-ধনিক সংঘর্ষ বা সার্বজনীন অসন্তোষের চেয়েও অনেক বেশি আধুনিক। প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে নূতন সাহিত্যের এইখানেই প্রভেদ।*১১

বিভূতিভূষণ প্রকৃতিপ্রেমিক শিল্পী, তাঁহার পল্লীপ্রীতি আন্তরিক, তাহাতে হুজুগ বা ফ্যাশনের স্পর্শ ছিল না। পড়িলেই বুঝা যায় তাঁহার গল্প উপন্যাস হৃদয়ানুভূতি নিঙড়াইয়া লেখা। তিনি গ্রামকে এবং গ্রাম্য-প্রকৃতিকে কতখানি ভালবাসিতেন, তাঁহার ডায়েরীগুলিই তাহার সাক্ষ্য দিবে। 'উৎকর্ণ'তে তিনি বলিয়াছেন:—"বাংলাদেশের মর্মকাহিনী লুকানো আছে এই সব নিভৃত দ্বীপপ্রান্তের আম-বকুল-বাঁশ বনের আড়ালে। যিনি লেখক হবেন, যিনি লেখনী ধারণ করবেন, বাংলার কথা শোনবার জন্য তাঁকে আসতে হবে এখানে, মিশতে হবে এদের সঙ্গে, যোগ দিতে হবে এদের এই শান্ত উত্তেজনাহীন, তুচ্ছ অনাড়ম্বর, অখ্যাত গ্রাম-জীবনের উৎসবে, এদের বুঝতে হবে, ভালবাসতে হবে।*১২ তাঁহার অপর ডায়েরী 'স্মৃতির-রেখা'য় আছে:—"গভীর রাত্রি পর্যন্ত বড়বাসার ছাদে বসে মেঘলা রাতে কত কথা মনে আসে—আবার যদি জন্মাই হয় তবে যেন ঐ রকম দীনহীনের পর্ণকুটিরে অভাব অনাটনের মধ্যে, পল্লীর স্বচ্ছতায় গ্রামা নদী গাছপালা নিবিড় মাটির গন্ধ, অপূর্ব সন্ধ্যা, মোহভরা দুপুরের মধ্যেই হয়—" *

শরৎচন্দ্র এবং বিভূতিভূষণের সাহিত্যে পল্লীচিত্র এবং পল্লীচরিত্র যেভাবে ফুটিয়াছে, তাহার তুলনামূলক বিচার করিলেই পল্লীপ্রকৃতি সম্পর্কে বিভূতিভূষণের মনোভাবের সম্যক পরিচয় মিলিবে। প্রকৃতপক্ষে এ হিসাবে দুজনের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য বর্তমান। শরৎ সাহিত্যে পল্লীগ্রামের সামাজিক সমস্যা বড় হইয়া উঠিয়াছে, পল্লী-প্রকৃতির জীবন্ত রূপ খুবই কম চোখে পড়ে। বিপরীতভাবে বিভূতি-ভূষণের সাহিত্যে পল্লীপ্রকৃতি শুধু বর্ণনায় উজ্জ্বল নয়, তাহার সক্রিয় সত্তা আছে। কিন্তু পল্লীগ্রামের সমস্যার যে আলোচনা তাঁহার রচনায় স্থান পাইয়াছে, তাহা মূল রসের হিসাবে অনেকক্ষেত্রেই গৌণ এবং স্বল্প-আবেদনশীল। পল্লীর মানুষ তাঁহার সাহিত্যে প্রশান্ত প্রকৃতির আত্মজ স্বরূপ, তেমনি সহজ, সরল, শান্ত। তাহাদের মধ্যে আর্থিক স্বচ্ছলতা নাই, শিক্ষার দীপ্তি নাই, কিন্তু সেই জন্য শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের মত অধঃপতনের বেদনায় তাহাদের চিত্র করুণ হইয়া উঠিয়াছে কদাচিৎ। আসল কথা, প্রাণময়ী ও লাবণ্যময়ী প্রকৃতির কাছে যে মানুষ আশ্রয় পাইয়াছে, তাহাদের হৃদয়ের ঐশ্বর্যকে বিভূতিভূষণ বড় করিয়া দেখাইয়াছেন, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক যুগ-সমস্যার নিরিখে দেশের বৃহত্তর জনসংখ্যার হীনতা ফুটাইয়া তাহাদের তথা দেশের পুনর্গঠনের আবেদন সৃষ্টির প্রয়াস পান নাই। এইজন্যই বলা হয়, বিভূতিভূষণের পল্লীসাহিত্য "নদী-তটের সাহিত্য" কিন্তু শরৎচন্দ্রের পল্লীসাহিত্য "চণ্ডীমণ্ডপের সাহিত্য"। বিভূতিভূষণের লেখায় পল্লীর বা গ্রামবাসীর কোন নিন্দা পড়িলে পাঠকের মনে হইবে ইহা যেন প্রিয়জনের অপ্রত্যাশিত দৈন্যে বেদনা বা অভিমানের প্রকাশ, হীনতার জন্য বিদ্রূপ সমালোচনা নয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিভূতিভূষণের সাহিত্য ও জীবনের অভি-জ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়াছে, কল্পনার উপর নহে। মানুষকে তিনি স্বরূপে বিচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার কবি-সুলভ ভাবদৃষ্টি এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করিয়াছে। প্রকৃতি অবাস্তব নয়, পল্লীপ্রকৃতির সান্নিধ্যে যে মানুষ বাঁচিবার সুযোগ পায়, নাগরিক-জটিলতা-বক্র চেতনা হইতে বা দেশাত্মবোধের আবেগে তাহাদের আপাত-বাস্তবশ্রয়ী বিচার না করিয়া পল্লীপ্রকৃতিতে লালিত তাহাদের আপন মনোধর্মের নিরিখে তিনি তাহাদিগকে সহজভাবে ফুটাইতে চাহিয়াছেন। আধুনিক লেখকেরা সাঁওতালদের ছবি আঁকিবার সময় এই দৃষ্টিকোণ হইতেই, লেখনী চালনা করেন, কিন্তু পল্লীর মানুষের ক্ষেত্রে প্রকৃতি সান্নিধ্যের মহিমা তাঁহারা প্রায়ই ভুলিয়া বসেন।

আসলে বিভূতিভূষণ অস্তিবাদী লেখক। বিশ্বাসপ্রবণতা তাঁহার অন্তরধর্ম। বক্তব্যের গভীরে তিনি যখন প্রবেশ করেন, তখনও তাঁহার প্রকাশভঙ্গী ইতিবাচক বা সদর্থক, নেতিবাচক বা নঞর্থক নয়। মানুষের আয়ত্ত-ক্ষমতার অতিরিক্ত এবং কেবলমাত্র অনুভূতি-বেদ্য এক পরমাশক্তির বিশ্বপ্রকৃতির অভ্যন্তরে নিত্যানিয়ত লীলা চলিতেছে। ইহা প্রাচীন সাহিত্যের নিষ্ঠুর নিয়তি নয়, মানুষের প্রতি-কূলস্পর্শী অপ্রতিরোধ্য শক্তি নয়, অনুকূল প্রকৃতির মধ্যেই তাহার স্বরূপ লক্ষণীয়;—বিভূতিভূষণ ইহা দ্বিধাহীনভাবে বিশ্বাস করিতেন। এই সরমী কবিচেতনায় তিনি রবীন্দ্রনাথের কৃতী উত্তরাধিকারী।

বিভূতিভূষণের মানসগঠনই তাঁহার রচনার মূলপ্রেরণা সন্দেহ নাই। প্রকৃতির কোলে তাঁহার প্রথম জীবন অতিবাহিত হইবার ফলে তাঁহার মন প্রশান্ত উদারতায় ভরিয়া গিয়াছিল। কলস্বনা ইছামতী শুধু তাঁহার হৃদয় বীণায় সুরসংযোগ করে নাই, গতির আবেগও জোগাইয়াছে। কথক পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতীতচারী কাব্যমুখী ভাবলোকের প্রভাব পড়িয়াছিল তাঁহার উপর; এই সময় পিতার সহিত নূতন নূতন স্থানে যাইবার সুযোগ হওয়ায় তাঁহার দৃষ্টি দূরপ্রসারী হয়। বিভূতিভূষণ অধ্যয়নপ্রিয় ছিলেন, দেশী-বিদেশী বহু লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখকের সৃষ্টির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও উইলিয়ম এইচ হাডসনের তিনি অনুরাগী ছিলেন, টমাস হার্ডি নিঃসন্দেহে তাঁহার প্রকৃতি-মুখী মনোভাবকে সম্প্রসারিত করেন। বিভূতিভূষণ টলস্টয়ের ভক্ত ছিলেন, ভাবিত হইয়াছিলেন তাঁহার ভাবে।*১৪ রোমাঁ রলাঁর অমর সৃষ্টি 'জাঁ ক্রিস্তফা'র দ্বারা

---

*১১ বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্প, (১ম সংস্করণ), ভূমিকা, পৃঃ-৶০-৷০

*১২ উৎকর্ণ (১ম সংস্করণ), পৃঃ-৬৩-৬৪

*১৩ স্মৃতির রেখা (১৩৬২), পৃঃ-৩২-৩৩

তাঁহার পথের পাঁচালী কিছুটা প্রভাবিত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। বিভূতিভূষণ রবীন্দ্রনাথকে গুরুর মত শ্রদ্ধা করিতেন।*১৫ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দৃষ্টিকে প্রাত্যহিক তুচ্ছতা ও দীনতা হইতে উত্তরিত করিয়া সচ্চিদানন্দের দিকে প্রসারিত হইবার প্রেরণা দিয়াছিলেন; ইহাদের অন্তরালে নিত্য প্রবহমান শান্ত-সৌন্দর্যের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন।*১৬

মহৎ উপন্যাসের প্রচলিত যে সংজ্ঞা আছে, তাহাতে বহুচরিত্র, বিরাট পটভূমিকা, প্রচুর বাগাড়ম্বর, লেখকের ভূয়োদর্শনের পরিচয়, ইত্যাদি অপরিহার্য দিক। আলঙ্কারিকেরা সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছিলেন সুদূর অতীতে, পরিবর্তিত কালের নিরিখে—এখন সেইসব সংজ্ঞার কিছু কিছু পরিবর্তন, পরিবর্জন বা পরিবর্ধনের প্রয়োজন স্বাভাবিক। আগে ছোট গল্পকেই নভেল বলা হইত, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রোমান্স আর নভেল এক ছিল। বর্তমানে জেমস্ জয়েসের কাল পর্যন্ত এই সংজ্ঞা কত বদলাইয়াছে! এখন আর তাই এপিকের বা মহাকাব্যের ছকে ফেলিয়া মহৎ উপন্যাস খোঁজা চলেনা। অবশ্য এখনও কোন মহৎ উপন্যাসে উপরোক্ত গুণাবলী থাকিলে ভাল হয়, না থাকিলে পুনঃনির্ধারিত মূল্যবোধের হিসাবে উপন্যাসটিকে নিজস্ব গৌরবে বিচার করিতে হইবে। এক্ষেত্রে মহৎ উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ ধরিতে হইবে ইহার পিছনে লেখকের ভাবদৃষ্টি এবং উপন্যাসটিতে জগৎ ও জীবনের নিরিখে সেই ভাবদৃষ্টির রূপায়ণ। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান, লেখকের সংবেদনশীল বা সহানুভূতিশীল মনোভাব, বিশেষকে নির্বিশেষ করিয়া তোলা, বাস্তব পটভূমিকা হইলেও মহান আদর্শবোধ এবং ব্যক্তিগতকে বিশ্বজনীন করা ইহার মূল কথা। সংক্ষেপে বলা যায়, যে উপন্যাসের বক্তব্য বর্তমান-কেন্দ্রিক হইয়া ব্যক্তির সীমার মধ্যেই থাকিয়া যায়, তাহা ভাল উপন্যাস হইতে পারে, কিন্তু মহৎ উপন্যাস নয়। মহৎ উপন্যাসের লেখক অন্ধের মত পথসন্ধানে হাতড়াইয়া মরিবেন না, স্থির-প্রজ্ঞার আলোকে আলোকিত তাঁহার মন বহুবিচিত্র সমস্যার চাপে ক্লিষ্ট হইয়াও হতাশ হইবেনা, তাঁহার মধ্যে থাকিবে একটা সুদৃঢ় বিশ্বাসবোধ। আঘাত সংঘাতের আবর্ত-আলোড়নের ভিতর দিয়া শেষ পর্যন্ত সেই জাগ্রত আস্থাবাদের গৌরবে পরম মূল্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এই নব মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে তাই ছোট গল্পের চেয়ে সামান্য বড় আর্নেষ্ট হেমিংওয়ের উপন্যাস 'ওল্ড ম্যান এণ্ড দি সি' অথবা রোমা রলাঁর বৃহৎ উপান্যস 'জাঁ ক্রিস্তফ'-দুখানিই মহৎ উপন্যাস। রুশ-লেখক টলষ্টয় ডষ্টয়ভস্কি এই শ্রেণীর উপন্যাসের স্রষ্টা। তাঁহারা উভয়েই বহু অভিজ্ঞতা, চঞ্চল ব্যক্তিজীবনের ব্যথাবহুল নানা বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া বৃহৎকে খুঁজিবার সাধনা করিয়াছেন।*১৭ ডষ্টয়ভস্কির শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'দি ব্রাদার্স ক্যারামাজোভ'কে দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরিলে দেখা যায় এই মহৎ উপন্যাসখানি আপাতদৃষ্টিতে বৃদ্ধ ক্যারামাজোভ ও তাঁহার পুত্রগণের অথবা পতিতা নারী গ্রুশেনকার কাহিনী হইলেও আসলে এই দ্রুত-আবর্তিত, ঘনীভূত কাহিনীটি ভগবান বলিয়া যদি কেহ থাকেন, তাঁহাকেই খোঁজার কাহিনী।*১৮

বিভূতিভূষণ সম্পর্কে এতবড় কথা বলা না গেলেও একথা ঠিক যে তাঁহার প্রধান উপন্যাস পথের পাঁচালী-অপরাজিতে খণ্ডিত ব্যক্তিজীবন

---

*১৪ The Concise Oxford Dictionary of English Literature (1939) —এ অভিধানে মানবপ্রেমিক টলস্টয়ের সম্পর্কে বলা হইয়াছে:—The union of a great moral conviction and realistic details, and an immense imaginative vision, combine to make him one of the great European writers.

*১৫ "জীবনের বেগ যেন মন্দীভূত না হয়। আমাদের দেশে আমাদের জাতীয় জীবনে তার আশঙ্কা খুব বেশী। পেট্রার্ক সম্বন্ধে যেমন উক্ত হয়েছে—'It is a noble florentine profile, the whole aspect suggesting abundance of thought and life......' আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কার সম্বন্ধে সে কথা বলা যায়?"—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ঊর্মিমুখর পৃঃ ৭৪

*১৬ "কিন্তু বিরোধ বিপ্লবের ভিতর দিয়ে যে ঐক্যটি খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই ঐক্যটি কী? সেই হচ্ছে শিবম্। এই-যে মঙ্গল এর মধ্যে একটা মস্ত দ্বন্দ্ব। অঙ্কুর এখানে দুই ভাগে ভাগ হয়ে বাড়তে চলেছে, সুখ দুঃখ, ভালোমন্দ। মাটির মধ্যে যেটি ছিল এক, সেই শান্তম্, সেখানে আলো আঁধারের লড়াই ছিল না। লড়াই যেখানে বাধল সেখানে শিবকে যদি না জানি তবে সেখানকার সত্যকে জানা হবে না। এই শিবকে জানার বেদনা বড় তীব্র। এইখানে 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্'। কিন্তু এই বড়ো বেদনার মধ্যেই আমাদের ধর্মবোধের যথার্থ জন্ম। বিশ্বপ্রকৃতির বৃহৎ শান্তির মধ্যে তার গর্ভবাস।

—রবীন্দ্রনাথ—আত্মপরিচয় (১৯৫৭), পৃঃ—৪৮

*১৭ টলস্টয়ের বৈশিষ্ট্য আগে উল্লিখিত হইয়াছে, ডষ্টয়ভস্কি সম্পর্কে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় সংক্ষেপে চমৎকারভাবে বলিয়াছেন —"Dostoevsky খ্রীষ্টকে রুশ কৃষকের অন্তঃপুর হইতে বাহির করিয়া পাশ্চাত্য জগতের হৃদয় সিংহাসনে বসাইয়াছেন।"—বর্তমান বাংলা-সাহিত্য, পৃঃ—১৩৫

*১৮ "The Brothers Karamazov remains a stupendous book. It has a theme of profound significance. Many critics have said that this was the quest of God; I, for my part, should have said that it was the problem of evil.

Somerset Maughm—Ten Novels and their Authors (1951), P. 260

অবলম্বনে পাঠক-মনকে বৃহৎ বিশ্ব জীবনবোধের মুখোমুখী লইয়া যাইবার আবেগ আছে, ঘরের সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া নক্ষত্রলোকের আনন্দ-সভায় যোগ দিবার আমন্ত্রণ আছে। সেই অর্থেই ইহাতে আছে মহৎ উপন্যাসের বীজ। তাঁহার আরণ্যক এবং ইছামতীতেও এই সম্ভাবনার ইঙ্গিত আছে। এযুগে এইরূপ ভাবলোকের প্রতিষ্ঠা বিস্ময়কর ব্যাপার। এই সৃষ্টি-কৃতিত্বে বিভূতিভূষণ স্মরণীয় হইয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে এই বৈশিষ্ট্য খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়। একমাত্র 'আনন্দমঠে'ই ইহা কিছুটা আছে, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য কোন উপন্যাস এ কৃতিত্ব দাবী করিতে পারে না। শরৎচন্দ্রের কোন উপন্যাসেই এ বৈশিষ্ট্য নাই। বিস্ময়ের কথা, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেও এই সম্ভাবনা কম, শুধু 'গোরা'য় ইহার কিছুটা স্পর্শ পাওয়া যায়। আধুনিক বাংলা উপন্যাসিকদের মধ্যে 'আরোগ্য নিকেতন', 'বিচারক'এর-রচয়িতা তারাশঙ্করই কতকটা এই গৌরবের অধিকারী।

* * * * *

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রুশো, দিদারো, ভলটেয়ার প্রমুখ মনীষীরা উদাত্তকণ্ঠে মানবতার মহিমা ঘোষণা করেন এবং ইহার অব্যবহিত পরে ফরাসী বিপ্লবের ধাক্কায় ইউরোপের প্রচলিত প্রাচীনপন্থী সমাজ জীবনে সুস্পষ্ট ভাঙন দেখা দেয়। বিপ্লবের মূলমন্ত্র 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার স্বপ্ন এই কালে বপন করিল নূতন জীবনানুভূতির বীজ। ফরাসী বিপ্লবের সুগভীর স্পন্দন বহিয়া ইংলণ্ডে আবির্ভূত হইলেন লেক-কবিকুল এবং এই কবিগণ, বিশেষ করিয়া ইঁহাদের মধ্যমণি ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ লীলাময়ী প্রকৃতিকে জীবন্ত সত্তা হিসাবে সাহিত্যে স্থান দিলেন। এইভাবে মানবতাবোধ এবং প্রকৃতি-ধর্মিতা-সমুজ্জ্বল এই সময়কার সাহিত্য নবযুগের সৃষ্টি করিল। এই সাহিত্যের প্রভাব পর্বত-সমুদ্র পার হইয়া দেশে দেশে সঞ্চারিত হইয়াছে এবং আমাদের বাংলাসাহিত্যের কুঞ্জেও ধ্বনিত হইয়াছে ইহার সুর। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের ভিতর দিয়া সেই সুরের যে প্রভাব আধুনিক কালে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা অধিকাংশ লেখকই অল্প বিস্তর প্রভাবিত হইয়াছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র এক হিসাবে কল্লোলপন্থী হইলেও এই ভাবধর্মের প্রভাবে অনেকখানি প্রভাবিত হইয়াছিলেন।*১৯ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় এই সাহিত্য-চিন্তার ছাপ যথেষ্ট। রূঢ় কঠিন বাস্তবকে স্বীকার করিয়া তাহারই পটভূমিকায় বিশাল উদার মানবতাবাদী দৃষ্টি-ভঙ্গী লইয়া বিভূতিভূষণ সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন, আদর্শবোধের ভাবপ্রবণতা দূরচারী স্বপ্নালুতার সহিত মিশ্রিত হইয়া তাঁহার রচনায় একটি রোম্যান্টিক আমেজের স্পর্শ আনিয়াছে। সমাজ-নিরপেক্ষ নন্দনধর্মী অস্কার ওয়াইল্ডের মত কলাকৈবল্যবাদী তিনি নন, ডি এইচ লরেন্সের মত সমাজ বা নন্দনতত্ত্ব উভয় নিরপেক্ষ আত্মরতিমুগ্ধ স্রষ্টাও নন, রুশো হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত স্বভাব-সারল্যপন্থীদের যে ধারাটি বহু সমস্যাবিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে সাহিত্যিক রূপকলার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্ত্বেও আপন গৌরবে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, বিভূতিভূষণ তাহারই অন্যতম ধারক। হৃদয়বত্তার দিক হইতে চার্লস ডিকেন্সের সহিত বিভূতিভূষণের তুলনা করা যায়। কিন্তু এই মানস-সংগঠনে ডিকেন্স সমকালের যে আনুকূল্য পাইয়াছিলেন, বিভূতিভূষণ তাহা পান নাই।

ডিকেন্সের মন গড়িয়া উঠিয়াছিল ইংলণ্ডের উদারনৈতিক পরিবেশ-প্রসারের যুগে (Age of growing liberalism); বিভূতিভূষণের অবস্থা কিন্তু ছিল বিপরীত। বিভূতিভূষণের মন প্রথম মহাযুদ্ধের বিভীষিকা, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের মত শাসন কর্তৃপক্ষের পৈশাচিক পীড়ন, জাতীয় আন্দোলনের ব্যর্থতাজনিত হতাশা, যুদ্ধোত্তর সামাজিক বিশৃঙ্খলা, প্রচণ্ড অর্থ নৈতিক মন্দা এবং অসহ্য নিরাশ্বাস পরি-স্থিতি হইতে মুক্তিকামী আঁধারচারী বিদ্রোহী তারুণ্যের মর্মজ্বালার মধ্যে সংগঠিত হইয়াছিল। এই পরিবেশে তাঁহার পক্ষে বেপরোয়া ভোগবাদী অথবা হতাশ অদৃষ্টবাদী—দুইটি হওয়া সম্ভব ছিল। বিভূতিভূষণ কিন্তু এই প্রতিকূল পরিবেশে বিস্ময়কর মনোবল দেখাইয়াছেন। তিনি নিজে যাহা বিশ্বাস করিয়াছেন এবং যে কথা বা যে সত্য প্রকাশের জন্য তাঁহার অন্তর উদ্বেল হইয়াছে, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে তিনি দ্বিধা করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে প্রায় একই সঙ্গে যোগাযোগ এবং শেষের কবিতা রচনার ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও আপন কবি-ভাবনা এবং যুগপ্রভাবের যে সংঘর্ষের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, বিভূতিভূষণের রচনাশক্তি যেরূপই হউক, তাঁহার চিন্তার রাজ্যে এইরূপ কোন দ্বিধার অবতারণা হয় নাই। চার্লস ডিকেন্স সম্বন্ধে মনীষী জি কে চেষ্টারটন বলিয়াছেন, ডিকেন্স তাঁহার নিজস্ব পন্থায় কুসংস্কার বিরোধী, উদার মানবতাবাদী এবং ধর্ম-বিশ্বাসী ছিলেন; *২০ বর্তমান গ্রন্থের আলোচনা পাঠে বুঝা যাইবে এই

---

*১৯ প্রেমেন্দ্র মিত্র মানুষের কবি, তাঁহার নিজের ভাষাতেই বলিতে গেলে 'কর্মের আর ধর্মের কবি'। তবু বন্ধু অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লেখা নিম্নের পত্রাংশ হইতে তাঁহার প্রকৃতি-ধর্মিতার স্বাক্ষর মিলিবে:—"...একদিন বোধহয় পৃথিবীর আনন্দসভায় আমার আসর ছিল—অন্ধকার রাত্রে হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে আকাশের পানে চাইলে মনে হত, সমস্ত দেহমন যেন নক্ষত্রলোকের অভিনন্দন পান করছে—অপরূপ তার ভাষা। বুঝতে পারতুম আমার দেহের মধ্যে অমনি অপূর্ব রহস্য অনাদি অনন্ত আকাশের ভাষায় সাড়া দিচ্ছে।"

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—কল্লোলযুগ (১ম সংস্করণ), পৃঃ—২১

*২০ "And it is right to say that when more sophisticated Victorians set up fads like fences, and established new forms of narrowness, that flow of popular feeling that was a single man, burst through them and swept on. He was a radical, but he would not be a Manchester Radical, to please

বৈশিষ্ট্যগুলি বিভূতিভূষণের মধ্যেও ছিল। সমসাময়িক পাঠকের ক্লান্ত মন তাঁহাকে পাইয়া মুক্তির নিংশ্বাস ফেলিয়াছিল। বিভূতিভূষণের অনন্য সৃষ্টি পথের পাঁচালী পাঠে মুগ্ধ হইয়া মোহিতলাল মজুমদার ইহাকে 'দেবতার দীপারতি' বলিয়াছেন *২১ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কল্লোলযুগের অন্যতম প্রধান হোতা; বিভূতিভূষণের অকৃত্রিম প্রশস্তি করিয়া অচিন্ত্যকুমার বলিয়াছেন :—"বিচিত্রায় এসে বিভূতিভূষণের সন্নিহিত হই। তখন তাঁহার পথের পাঁচালী ছাপা হচ্ছে—মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে আসতেন "বিচিত্রায়।" যখনই আসতেন মনে হত যেন অন্য জগতের সংবাদ নিয়ে এসেছেন। সে জগতে প্রকৃতির একচ্ছত্র রাজত্ব—যেন অনেক শান্তি অনেক ধ্যানশীলতার স্বপ্ন সেখানে। ছায়া-মায়াঘেরা বিশাল নির্জন অরণ্যে যে তাপস বাস করছে, তাকেই যেন আসন দিয়েছেন হৃদয়ে—এক আত্মভোলা সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে তিনিও যেন সমাহিত, প্রসন্ন গম্ভীর। প্রকৃতির সঙ্গে নিত্য আত্মসংযোগ রেখেছেন বলে তাঁর ব্যক্তি ও মৌনে সর্বত্রই সমান স্বচ্ছতা, সমান প্রশান্তি। তাঁর মন যেন অনন্তভাবে স্থির ও আবিষ্ট। মনের এই গুরুধর্ম বা নৈর্মল্যশক্তি অন্যমনকে স্পর্শ করবেই। যে মানবপ্রীতির উৎস থেকে এই প্রজ্ঞা, এই আনন্দ, তাইতো পরম পুরুষার্থ। এই প্রীতিরূপে অবস্থিতিই তো সাহিত্য। এই সাহিত্য বা সহিত-স্বেই বিভূতিভূষণের প্রতিষ্ঠা। স্বভাবস্বচ্ছধবল নিশ্চিন্ত নিস্পৃহ বিভূতিভূষণ।

এই বিভূতিভূষণের আওতায় এসে "শনিবারের চিঠি" তার সুর বদল করলে। অর্থাৎ সে স্তুতি ধরলে। এর আগে পর্যন্ত সে একটানা ঘৃণা নিন্দাই করে এসেছে,...' *২২.

নির্মল প্রশান্ত উদার প্রকৃতির ভাবে ভাবুক বিভূতিভূষণ সত্য ও সুন্দরের পূজারী ছিলেন। নন্দনবাদ এবং উদ্দেশ্যবাদ, সাহিত্য লক্ষ্যের এই দুই চরমপন্থা পরিত্যাগ করিয়া বলিতে গেলে তিনি মধ্য পথে চলিয়াছেন। ঈশ্বরে বা বিশ্বনিয়ন্ত্রী পরমাত্মিক শক্তিতে তিনি আস্থা রাখিয়াছেন, অথচ মানুষকে তিনি গভীরভাবে ভালবাসিয়াছেন এবং সুন্দরকে তিনি বরণ করিয়াছেন। পরমমূল্যবোধ সম্মুখে রাখিয়া কল্যাণধর্মী-প্রাণাবেগে উচ্ছল বিভূতিভূষণ সত্যনিষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ভূয়োদর্শন-সমৃদ্ধ তাঁহার দৃষ্টি। রূপবতী যে প্রকৃতির অবাধ উদারতা ঘরের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া মনকে বিশাল বিশ্বে ছড়াইয়া দেয়, তাহাই বিভূতিভূষণের একান্ত আশ্রয়। প্রকৃতি জটিল নয়, সরল; জটিল জীবনায়ন বিভূতিভূষণের পথ নয়, তিনি সহজ-পথের পথিক। তাঁহার সমকালীন শক্তিমান কথাসাহিত্যিক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তুলনা করিলেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হইবে। মাণিকবাবুর মত জীবনের জটিলতার মূল অনুসন্ধানে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া চরিত্র বিশ্লেষণের চেষ্টা তিনি করেন নাই, বিচিত্র অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র বিভূতিভূষণের সাহিত্যে অপেক্ষাকৃত অল্প। জীবনের একটা চলমানতা তিনিও ফুটাইয়াছেন সত্য, কিন্তু মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত সাহিত্যিকদের সংঘাত-আলোড়িত চিত্তের দ্রুত-গতির সহিত তাহা তুলনীয় নয়। বিভূতিভূষণের গতি ধীর, চিত্ত রসসিক্ত, আপন সৃষ্টির বিশ্লেষণ অপেক্ষা আস্বাদনেই যেন তাঁহার অনুরাগ বেশি। ভালবাসিয়া যাহা তাঁহার সাহিত্যের সামগ্রী করিয়াছেন, তাহা সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়া পাঠককে ধীরে সুস্থে উপভোগ করিবার সুযোগ দেওয়াই তাঁহার শিল্পরীতি। এইজন্য তাঁহার সাহিত্যে অন্তর্লীন মহৎভাব যাহাই থাকুক, বহিরঙ্গ জীবনালেখ্যের বা প্রকৃতি-রূপের খুঁটিনাটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

'ফুলজানি' উপন্যাস উপলক্ষ করিয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একবার গ্রন্থলেখক শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিয়াছিলেন :—"আপনার লেখা আমার ভারি ভাল লাগে। ওর মধ্যে কোন নভেলি মিথ্যার ছায়া নেই।...আপনি কোনরকম ঐতিহাসিক বা ঔপদেশিক বিড়ম্বনায় যাবেন না—সরল মানব হৃদয়ের মধ্যে যে গভীরতা আছে—এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখপূর্ণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের যে চিরানন্দময় ইতিহাস তাই আপনি দেখবেন।" প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এই পত্র যখন লেখা হয় রবীন্দ্রনাথ সেই সময় গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি রচনা করিতেছেন। ছোট ছোট চাওয়া-পাওয়ার কাহিনী, সাধারণ মানব-মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-বেদনার ছবি, প্রকৃতির প্রশান্ত ব্যাপ্তি এবং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির ঐক্যবোধ—এ সবই ছিল গল্পকার রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন অবলম্বন। রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে এরূপ প্রশংসা লাভ 'ফুলজানি'র মত গ্রন্থের গ্রন্থকার শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সৌভাগ্য, মনে হয় কবিগুরু 'ফুলজানি'তে আপন হৃদয়ের সুর প্রতিধ্বনিত দেখিয়াছিলেন বলিয়াই আবেগ-বিহ্বল হইয়া শ্রীশচন্দ্রকে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। প্রশস্তিসূত্রে রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রকে যে সব নির্দেশ দিয়াছেন বা শ্রীশচন্দ্রের যে গুণের উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলি বিভূতিভূষণের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য শ্রীশচন্দ্রের ও বিভূতিভূষণের প্রতিবেশ এক নয় এবং যুগের পরিবর্তনে রুচিও শিল্পকলার কিছুটা পরিবর্তন অনিবার্য বলিয়া একই দৃষ্টিকোণ হইতে দুইজনকে দেখাও
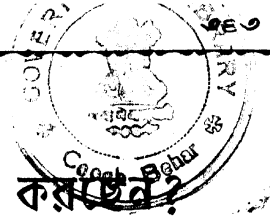
Mr. Gradgrind, He was a humanitarian, but he would not be a platform pacifist to please Mr. Honeythunder. He was vaguely averse to ritual religion, but he would not abolish christmas to please Mr. Scoorge. He was ignorant of religious history, and yet his religion was historic. For he was the people, that is heard so rarely in England; and if it had been heard there often, it would not have suffered its feasts to be destroyed.

G. K. Chesterton—Charles Dickens—The Great Victorians (Pelican Ed. 1937) Vol.-I.-P. 176.

*২১ সাহিত্যবিতান, পৃঃ—২৪১

*২২ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—কল্লোলযুগ (১ম সংস্করণ), পৃঃ—৩২৪-২৫

ঠিক হইবে না। তবে সংক্ষেপে একটা বলা যায় যে, বিভূতিভূষণের রচনার যে স্নিগ্ধতা অভিনন্দনীয়, তাহার আবেদন নিঃসন্দেহে সমকালীন বিপরীতধর্মী সাহিত্যের পাঠকের ক্লান্তির উপরও অবশ্যই কিছুটা নির্ভরশীল। বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে বিভূতিভূষণের স্থান কোথায় তাহা পরবর্তী অধ্যায়ে নির্ধারণের চেষ্টা হইবে, তখন বাংলা কথাসাহিত্যের প্রাক-বিভূতিভূষণ পর্ব এবং বিভূতিভূষণের সমকালীন রূপ বিচার করিয়া পাঠকের বিভূতিভূষণ-প্রীতির কারণ বা ইহার স্বরূপ নির্ধারণ করা যাইবে। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত উপরোক্ত পত্রে "ঐতিহাসিক বা ঔপদেশিক বিড়ম্বনা" কথাটি ব্যবহার করিয়া রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন বাংলাসাহিত্যের কোন কোন সৃষ্টি-প্রয়াসকে কটাক্ষ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। বিভূতিভূষণের যুগে এইরূপ কটাক্ষযোগ্য কোন সাহিত্য-প্রয়াস হইয়াছিল কি না; তাহাও আমরা পরে আলোচনা করিয়া দেখিব।

আধুনিককালে কথাসাহিত্যে চরিত্র-সৃষ্টি বা চরিত্র-বিশ্লেষণের উপর যে জোর পড়িয়াছে, তাহার মূলে আছে বাহিরের সংঘর্ষে চঞ্চল ব্যক্তিমনের দ্রুত পরিবর্তনশীলতার স্বীকৃতি। যুগে যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের জন্য মানুষ নূতন নূতন ভাব-ভাবনা স্বীকার করিয়া লয়। এই স্বীকৃতির প্রকাশ অবশ্য উপন্যাস সৃষ্টি হইবার আগে সাহিত্যে তেমন দেখা যায় নাই। উপন্যাসের প্রশস্ত পটভূমিতে এই স্বীকৃতি সার্থক আশ্রয় লাভ করিয়াছে। কথাসাহিত্য সর্বজনপ্রিয় ও সকলের অধিগম্য সাহিত্যবিভাগ, চিন্তারাজ্যে পরিবর্তনের জন্য জগৎ ও জীবন সম্পর্কে লেখকের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ ইহাতে পড়া স্বাভাবিক। সামন্ততান্ত্রিক যুগের অবসানের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের গৌরব বাড়িয়াছে এবং যে যাহা চিন্তা করে, এখন তাহা প্রকাশে আগের মত বাধা নাই। তাই কথা-সাহিত্যিক বর্তমানে মানুষের জীবনের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠা গল্প-উপন্যাসে আপন অন্তরের চাহিদা অনুযায়ী নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাইতেছেন। গল্পের আয়তন সীমাবদ্ধ, এই পরীক্ষার চাপ উপন্যাসের ক্ষেত্রেই পড়িতেছে অধিক পরিমাণে। উপন্যাসে জীবনের মূল্যায়নে তাই ঘটিতেছে রূপান্তর, শিল্পকলায় লক্ষণীয় পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। একালে কবিতা বা নাটকের তুলনায় উপন্যাস-গল্পের শিল্পকলায় এ রূপান্তর যে কত বেশী, তাহা সামান্য অনুধাবনেই বুঝা যায়। কবিতা এখন ক্রমেই গোষ্ঠীগত হইয়া পড়িতেছে, তাই তাহাতে বৈচিত্র্য কম।*২৩ নাটকে বিষয়বস্তুকে বৈচিত্র্য থাকিলেও চরিত্রের বহিরঙ্গ প্রকাশ-সুযোগের সীমাবদ্ধতা নাটককে ততটা বৈচিত্র্যধর্মী হইতে দেয় না। জীবনের মূল্যবোধ সম্প্রসারিত বা পরিবর্তিত হইবার ফলে উপন্যাসে এখন বৈচিত্র্য আনিবার সুযোগ আসিয়াছে। বিশেষ করিয়া বাঙালী সাহিত্যিকের এ সুযোগ প্রচুর, কারণ যুদ্ধে, দুর্ভিক্ষে, দেশবিভাগে, জাতীয় পুনর্গঠনের বিপুল আয়োজনে বাঙালীর জীবনে এখন আলোড়ন আসিয়াছে। এই আলোড়নের সুযোগ বিভূতিভূষণ ততটা পান নাই, অন্ততঃ তিনি যখন লিখিতে আরম্ভ করেন তখন পান নাই। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি রোমান্টিক-ভাবাপন্ন লেখক ছিলেন বলিয়া কবি-চেতনার জন্য আপন ভাব-ভাবনার বর্ণাঢ্য বহিঃপ্রকাশের একটা তাগিদ তিনি সর্বদা অনুভব করিতেন।*২৪ বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তিনি যখন সাহিত্যক্ষেত্রে আসিলেন, তখন কেমন একটা অস্থির আবহাওয়া বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছিল এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাগরোপম প্রতিভা লইয়াও সেই হতাশার কুহেলী দূর করিতে পারেন নাই। যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক মন্দা, ভয়াবহ বেকার সমস্যা ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সমকালীন ব্যর্থতাই এই হতাশা-বোধের কারণ। এই সময় বিভূতিভূষণ উজ্জ্বল অস্তিবাদী ভাব-দৃষ্টির বিপুল আশ্বাস লইয়া আবির্ভূত হইলেন। জীবনের উদার প্রশস্তি এবং আশাবাদের আলোকে নিরাশ্বাস পাঠকহৃদয় আলোকিত ও আশ্বস্ত করিবার সাধনায় তিনি অভাবিতভাবে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার রচনার আঙ্গিক ত্রুটিশূন্য নয়, তাঁহার দৈবে বা অলৌকিকে বিশ্বাস এযুগে বিচারসহ কিনা সন্দেহ; তথাপি তাঁহার সাহিত্যের মূলরস পাঠকমন এমনভাবে জয় করিল যে, এই লোককান্ত লেখকের ত্রুটি-দুর্বলতা পাঠকের যেন নজরেই পড়িল না।

ক্রমশঃ

---

*২৩ আধুনিক কালের কাব্য-ব্যক্তিত্বের চাইতে উপন্যাস-ব্যক্তিত্বকে চিনে নেওয়া সহজ। কারণ এ যুগের 'ইমেজিসম্' এবং প্রতীকতার অঙ্গরাগে সাম্প্রতিক কবিতার অন্তত বহিরাংশে এমন একটা সাধারণ ধর্মিতা এসেছে যে তা থেকে স্বভাবতই কোন কবির একান্ততা বেছে নেওয়া কঠিন হয়—যদি না সেই কবি কোন বিশিষ্ট দার্শনিকতায় উদ্ভাসিত থাকেন।

—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—সাহিত্য ও সাহিত্যিক (১ম সংস্করণ), পৃঃ—১

*২৪ তত্ত্ব চিন্তা ও যুক্তি প্রণালীর মধ্য দিয়া যেমন একটি দুর্জ্ঞেয় গভীর ধ্যানশক্তি আপনাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে, কবির কাব্যের মধ্য দিয়াও তেমনি একটি গভীর উপলব্ধি, চিত্তের একটি অনির্বাচ্য রসনির্ঝরিণী, তাহার সেই অলৌকিক রূপকে মূর্ত কল্পনার সাহায্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে।

ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—সাহিত্য পরিচয় (১ম সংস্করণ), পৃঃ ১২১

নৃত্যময় জগৎ

দেশ-বিদেশে ভারতীয় নৃত্য

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

১৯০৬ সাল। অ্যামেরিকা তখনও রাশিয়ান ব্যালে নৃত্যের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেনি। রুথ্ ডেনিস্ নামে এক তরুণী অ্যামেরিকান দর্শকদের অবাক করেছিলেন তাঁর রাধা-নৃত্যের মোহন ভঙ্গিতে। তাঁর এ-নাচের জন্যে খ্যাত হলেন। এরপরে তিনি শুধু 'রাধা' নয়, 'কাল-নগিনী' 'ধূপশিখা' এই কয়টি ভারতীয় নৃত্য দেখিয়ে চমৎকৃত করলেন সারা মহাদেশটাকে। তারপর বেরুলেন ইউরোপ বিজয়ে। লণ্ডন, প্যারিস ও সারা জার্মানি তাঁর

রাধা নৃত্যে—রুথ্ সেণ্ট ডেনিস

সেখানকার দর্শকেরা মোটেই প্রস্তুত ছিলনা। একদল লোক নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, কিন্তু বেশীর ভাগ দর্শক তাঁর নৃত্যমহিমায় মুগ্ধ হলেন। ডেভিড্ বেলাস্কো তাঁকে সেণ্ট বলে অভিনন্দিত করলেন। সেই থেকে রুথ্ ডেনিস্ সারা অ্যামেরিকায় রুথ্ সেণ্ট ডেনিস নামে বন্দনা-গানে মুখরিত হয়ে উঠল। দেবী 'রাধা' রূপে তিনি পূজা পেলেন। সার্থক হল তাঁর ইউরোপ অভিযান।

কিন্তু এ-নাচ তিনি শিখলেন কোথায়? অ্যামেরিকার প্রচলিত নৃত্য-ছাড়া তো কিছুই তিনি শেখেননি! ভারতে আসেননি হিন্দু-নৃত্য দেখতে কিংবা শিখতে।

একবার শুধু কোনয়-দ্বীপে একটা সাধারণ হিন্দু-নৃত্য দেখেছিলেন। তখন থেকেই হিন্দু-নৃত্যের মহিমা তাঁর অন্তরকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। তিনি প্রাচ্য নৃত্য সম্বন্ধে পড়াশোনা করলেন। তাঁর অন্তরের গভীরে শিল্পী নব অনুপ্রেরণায় জেগে উঠল। অ্যামেরিকাবাসী দেখতে পেল শ্রীরাধার ভুবন-ভোলানো রূপ। এ নৃত্য

রাই-উন্মাদিনী নৃত্যে—রুথ, সেণ্ট ডেনিস্

প্রেরণার উৎসও সেণ্ট ডেনিস্ নিজেই আবিষ্কার করেছেন। যে আনন্দে মাতৃক্রোড়ে শিশু নাচে, মেষশাবক লাফায় তা আনন্দময় ব্রহ্মের আনন্দলোকেরই পরিচয়। সে আনন্দ-ব্রহ্মের সংগে যোগ যাঁর যত নিবিড় নৃত্যের প্রেরণাও তাঁর অন্তরে তত গভীর।১

১৯১৪ সালে তাঁর নৃত্যে মুগ্ধ এক তরুণ তাঁর দলে যোগ দিলেন। তাঁর নাম টেড্‌শন্। তরুণটিকে তাঁর

প্রাচ্য ব্যালের অনুসরণে—রুথ সেণ্ট ডেনিস্ ও টেড্‌শন

এত ভাল লাগলো যে তিনি তাকে বিয়ে করে ফেললেন। দুজনে মিলে একটা নাচের স্কুল স্থাপন করলেন—'ডেনিশন বিদ্যালয়' নামে। অ্যামেরিকার নৃত্যে ডেনিশন যুগের সূচনা হল। রুথ সেইণ্ট ডেনিস ও টেড্‌শন্ সতের বৎসর

১। "Obviusly I did not have any idea. I only had the deep cosmic impulse to move freely and rhythmically, which I believe is an inborn impulse carried over on the physical plane from the mere joy of youthful exuberence, as animals gambol in the spring. And from lambs gamboling in the spring, let us move to Himalayan heights where according to my understanding of Hindu Philosophy, the Gods dance, because Brahma Himself is sheer bliss and so all young things coming straight from God are happy, they cry because they can't yet reveal their joy but they begin bouncing on mother's knee, and from there they indicate all their life that they came from a realm of light and joy and-rhythm. : Ruth St. Denis.

একত্রে নৃত্য করেছেন। হিন্দুনৃত্যের ভঙ্গিতে তাঁরা আরও কত নাচের সৃষ্টি করেছেন। মার্থা গ্রেহাম, ডোরিস হাম্ফ্রে

আদিবাসী নৃত্যে—টেড্ শন্

প্রভৃতি বিশ্ব-বিখ্যাত নর্ত্তকা ডেনিশান বিদ্যালয়েরই ছাত্রী।

আর একজন নর্ত্তকী ভারতীয় নৃত্যকে বিশ্বের দরবারে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি হচ্ছেন রাশিয়ান শিল্পী ইউরোপের সর্বজনপ্রিয়া নর্ত্তকী এনা পাভলোভা। তিনি যখন ভারতে আসেন তখন ইলোরার গুহামূর্তি ও অজন্তার চিত্রাবলী তাঁকে আকৃষ্ট করে নূতন শিল্প-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে। তিনি তাঁর সে-শিল্প প্রেরণাকে মূর্ত করে তুলেন ভারতীয় নৃত্যে যুগস্রষ্টা শিল্পী উদয়শংকরের সাহায্যে। ভারতের নৃত্যে নবযুগের সূচনা করেন উদয়শংকর। তাঁদের দুজনের কাছে সমগ্র পৃথিবী পেল হিন্দু ব্যালের অনাস্বাদিত অপূর্বরসের আস্বাদন। ১৯২৩ সালে তাঁরা সারা অ্যামেরিকাকে মাতিয়ে তুলেন হিন্দু নৃত্যে।

উদয়শংকর

তার দেড়বছর পরে উদয়শংকর এনা পাভলোভার দল ছেড়ে দিয়ে নিজের দল গঠন করেন। বস্তুতঃ পক্ষে উদয়শংকরই দিলেন সারা জগতকে প্রকৃত হিন্দুনৃত্যের প্রথম আস্বাদন ১৯৩১ সালে যখন তাঁর নৃত্য-সঙ্গিনী ফরাসী নর্তকী সিম্‌কীকে নিয়ে বিশ্বজয়ে বাহির হলেন।

অ্যামেরিকান তরুণী লা-মেরি (রাসেল মেরিওয়েদার হিউজেস্) নৃত্য শিক্ষা করতে এলেন ভারতে। সাত বৎসর ধরে এদেশের নৃত্য তিনি শিক্ষা করলেন। লাহোরে ও দিল্লীতে তিনি কথক-নৃত্য শিক্ষা করলেন, আর দাক্ষিণাত্যে ভরতনাট্যম্। বর্মী, জাপানী, আরবীয় ও স্পেনীয় নৃত্যে তিনি দক্ষতা লাভ করেন। কিন্তু হিন্দু-নৃত্যের প্রতিই তাঁর আকর্ষণ ছিল সবচেয়ে বেশী। ১৯৪০ সালে অ্যামেরিকায় ফিরে গিয়ে হিন্দুনৃত্য শিক্ষা-দানের জন্য নিউইয়র্কে নাচের স্কুল খোলেন। হিন্দু-নৃত্য

সম্বন্ধে রচনা করেছেন মূল্যবান গ্রন্থ—The Gesture Language of Hindu Dance". হিন্দু-নৃত্যে দীক্ষা দিচ্ছেন শতশত অ্যামেরিকান তরুণ তরুণীকে। শুধু তাই নয়, হিন্দুনৃত্যের মুদ্রা ও অঙ্গিকের সাহায্যে তিনি অনেক অভারতীয় নৃত্যেরও রচনা করেছেন। নৃত্যরূপ দিয়েছেন কোন কোন খৃষ্টীয় ও ইহুদি সঙ্গীতের। ১৯৪৫ সালে তিনি তাঁর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন নিউইয়র্কে। তাঁর নৃত্য দেখে অ্যামেরিকান দর্শকেরা হিন্দু-নৃত্যের সৌন্দর্য নূতন করে অনুভব করতে শিখল।২

প্রাচ্য নর্ত্তকীরূপে—লা-মেরী

ভারতীয় নর্তক রামগোপাল, মৃণালিনী, শিবরাম, প্রিয়গোপাল, রাগিণী প্রভৃতি ইউরোপ ও অ্যামেরিকায় হিন্দু নৃত্যকে জনপ্রিয় করে তোলেন। বিখ্যাত নর্ত্তকী রাগিণীর কৃষ্ণ-নৃত্য, অপ্সরী-নৃত্য ও বীর-নৃত্যে সমগ্র অ্যামেরিকা মুগ্ধ হয়েছিল।

২। "To see the Hindu dance is to experience an awakening to the existing beauty which has been hidden from us by our haste."

এই প্রবন্ধের চিত্রাবলী Mr. Walter Terey রচিত ও Harper & Brothers, Publishers, New York কর্তৃক প্রকাশিত The Dance in America নামক গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

এখানে রাত্রি আসে

শৈলজানন্দ রায়

এখানে রাত্রি আসে জিওলের ডালের ফাঁকে
স্যাওড়ার ঝোঁপে ঝোঁপে ঝিঁঝিঁর ডাকে
এখানে রাত্রি আসে ঝিলিমিলি নদীর মতন
আঁধারের রূপ দেখে অভিসারী বাউলের মন।
এখানে রাত্রি আসে নীড় ফেরা পাখাদের গানে
হাসি মুখ তারা বৌ বসে আকাশ সোপানে,
এখানে রাত্রি আসে ঘাস বনে আলপথ ধরে
সুস্থ নিদ্রায় রত কিষাণের স্বপ্ন বাসরে।

এখানে রাত্রি আসে রাখালিয়া বাঁশীর সুরে
গোধূলি ছায়া ম্লান সোনালী ধান ক্ষেত জুড়ে
এখানে রাত্রি আসে ধান শীষে মধুপের নাচে
ফড়িং নৃত্য তালে তমসার পরশ যাচে।
এখানে রাত্রি আসে বেবাজিয়া মেয়েটির চোখে
আঁধার ঘর কোণে দীপজ্বলা সন্ধ্যা আলোকে,
এখানে রাত্রি আসে অভিসারে লাল মাটি পথে
যখন চলেছে মেয়ে প্রিয় মুখ দরশন পেতে।

সপ্তম স্বর

শ্রীকানু রায়

[খ্যাতনামা ইংরেজী লেখক Robert Barr-এর লেখা An Alpine Divorce অবলম্বনে। যদিও তিনি স্কটল্যাণ্ডবাসী তাহলেও তাঁর জীবনের একটা বড় অংশ কেটেছে স্কটল্যাণ্ডের বাইরে। কানাডায় লেখাপড়া শিখেছেন, কিছুদিন শিক্ষকতাও করেছেন। Detroit free Press পত্রিকায় তিনি Luke sharp ছদ্মনাম নিয়ে লিখতেন। এই নামেই তিনি সারা পৃথিবীতে সুপরিচিত। ১৮৮১ সালে তিনি ইংলণ্ডে চলে আসেন। এখানে এসে জেরোম কে জেরোম প্রভৃতি খ্যাতনামাদের সাথে মিলিত হয়ে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইংলণ্ডের সাংবাদিকতার ইতিহাসে এই পত্রিকার বিশেষ ভূমিকা আছে। বেশীর ভাগ উপন্যাসই তিনি ঐ সময়ে রচনা করেছেন। তাঁর জন্ম ও মৃত্যু সাল যথাক্রমে ১৮৫০ ও ১৯১২ খৃঃ]

এক একটা লোক থাকে যাদের জীবনে মধ্যপন্থা বলে কিছু নেই। তাদের সব কিছুই চরম, সব কিছুই চূড়ান্ত। জীবনের পথে চলতে গেলে প্রত্যেকটা মানুষকেই কোন না কোন অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়, যার সংগে হয়তো তার মতের কোন সংগতি নেই—মিল নেই। সে সব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক একটা আপোষ রফা, অন্ততঃপক্ষে মধ্যবর্তী মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য পথে চলাই বিধেয়। কিন্তু এই শ্রেণীর লোকদের সুর সব সময়েই সপ্তমে বাঁধা থাকে। যেমন মিষ্টার জন বডম্যান। অবশ্য তাঁর এই মেজাজও খুব বেশী অসুবিধার সৃষ্টি করতনা—যদি না তিনি এমন এক মেয়েকে বিয়ে করতেন—যার মেজাজ, দুঃখের বিষয় ঠিক তাঁরই মতন।

সত্যি সত্যি বিয়ের ব্যাপারে দৈবই প্রবল। এই পৃথিবীর অসংখ্য নরনারী—তার মধ্যে কজনেরই বা সুযোগ ঘটে খুব বেশী লোকের সাথে পরিচিত হবার? আর যদিই বা কোন পুরুষ তার পছন্দ মত মেয়ে খুঁজে পেল, স্ত্রী হিসাবে তারা সব সময়ে মনের মত হয় না। মেয়েদের বেলাও অবশ্য এই কথা প্রযোজ্য। প্রথমে মতান্তর তারপরে মনান্তর। শেষটায় সমস্ত দাম্পত্য-জীবনটাই বড় বিরক্তিকর, বড় যান্ত্রিক হয়ে দাঁড়ায়।

বডম্যান দম্পতিরও ঠিক তাই ঘটেছিল। আর তার ফলে বিবাহিত জীবনের রঙীণ স্বপ্নাবেশটা আস্তে আস্তে কেটে যাবার পর তাঁরা একে অন্যের প্রতি ক্রমশঃ বিরক্ত হতে লাগলেন। সেই বিরক্তিটাই ধীরে ধীরে রূপ পেল ঘৃণায়, তীব্র তীক্ষ্ণ নির্মম ঘৃণায়। স্নেহ নেই, মমতা নেই, ভালবাসা নেই। মনের সুর গেছে কেটে, একত্র থাকার প্রয়োজনটা মিথ্যে হয়ে এসেছে তাই তাঁরা একটি কামনাই করলেন। বিচ্ছেদ। হ্যাঁ, বিচ্ছেদ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে ইংলণ্ডের আইনগুলি বড় অসুবিধাজনক। শুধু মতের বা মনের অমিল হলেই চলবে না। স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে যে কোন একজনকে হতে হবে নিষ্ঠুর, নির্মম অপরাধী, আর অত্যাচারী। একমাত্র তখনই আইন বিচ্ছেদকে সমর্থন জানাবে। দুঃখের বিষয়, অতি বড় ধূর্ত চোখেও কেউ কোনদিন মিসেস বডম্যানের নিষ্পাপ জীবনে এতটুকু কলংকের ছাপ দেখতে পায়নি। আর মিষ্টার বডম্যানও সামাজিক ভাবে বড় ভাল মানুষ। যে কোন সৎ নাগরিকের চেয়েও সৎ এবং সভ্য। যদি মিষ্টার বডম্যান দরিদ্র হতেন তাহলে হয়ত অর্থের অভাবের জন্য স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারতেন। কিন্তু তা'ও হবার নয়। কোন দিকেই কোন পথ খুঁজে পেলেন না তিনি। অথচ প্রতিনিয়ত এই অস্বস্তি এটাও অসহনীয়। এই ভাবে ভাবতে ভাবতে কখন যে খুন করবার কথা মনে

এল তা' বডম্যান নিজেও জানে না। খুনই বোধহয় একমাত্র পথ। বোকা নন তিনি। সাধারণভাবে খুন করলে চলবে না। এমন একটা কিছু করতে হবে যাতে মনে হবে···অন্ততঃ লোকে যাতে ভাবতে পারে সেটা দুর্ঘটনা। এমন কি হয়না? দৈবাৎ দুর্ঘটনায় পড়ে কত লোকের স্ত্রী মারা গেছে। খবরের কাগজে এই জাতীয় কত ঘটনাই তো পড়েছেন তিনি। তাঁর স্ত্রীও যদি ঐ রকম কোন একটা দুর্ঘটনায় মারা যান তবে লোকের সন্দেহ করবার কী আছে।

হঠাৎ একদিন তিনি স্থির করলেন সুইজারল্যাণ্ডে বেড়াতে যাবেন। মিসেস বডম্যানও নির্বিবাদে বাক্স গুছোলেন, প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনে আনালেন, বিছানা বাঁধলেন। তিনি জানতেন যে তাঁর উপস্থিতি বডম্যানকে বড় বিরক্ত করে তোলে। কিন্তু স্বামীর প্রতি তিনি নিজেও কম বিরক্ত নয়। স্বামীর প্রতি অবিমিশ্র ঘৃণা ছাড়া তাঁর আর কিছু নেই। বড় তীব্র, বড় তীক্ষ্ণ আর নির্মম এই ঘৃণা। তাঁর মেজাজের সুরও কোনদিন সপ্তম থেকে পঞ্চমে নামলো না। অথচ স্বামীর সাথে তিনি অনায়াসে সুইজারল্যাণ্ড ভ্রমণের সংগী হলেন।

জন বডম্যান তাঁর পরিচিত একটা হোটেলে এসে উঠলেন। এই হোটেল থেকে মাইল দুয়েক দূরে একটা নির্জন স্থানের কথা তাঁর মনে পড়ল। একদিন খুব ভোরবেলা একা একা বেড়াতে বেড়াতে আবার সেই স্থানটাতে চলে গেলেন। বড় নির্জন এই অঞ্চলটা। আশেপাশে কয়েক মাইলের মধ্যে কোন লোকালয় নেই। চারপাশে প্রচুর গাছপালা, একটা পাহাড়ের আড়ালে দূরের হোটেলটা ঢাকা পড়ে গিয়েছে। উপত্যকার উপর দিয়ে আঁকাবাঁকা সরু পথটা এগোতে এগোতে এখানে এসে একটা বড় পাথরখণ্ডের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। তারপর—তারপরই অন্ধকার অতলস্পর্শী একটা খাদ। খাড়া পাহাড়ের তলদেশটার দিকে তাকালে শিউরে উঠতে হয়। মাইল খানেক কি তার চেয়েও বেশী গভীরে নেমে গিয়েছে। শুধু ক্ষণিকের দৃষ্টিতেই যেন বুকের রক্ত জমে বরফ হয়ে যায়। এটাই উপযুক্ত স্থান, মনে মনে বললেন জন বডম্যান। কালকে ভোরবেলাতেই কাজটা সেরে ফেলতে হবে।

পরদিন ভোরবেলা ব্রেকফাস্টের পর বডম্যান তাঁর স্ত্রীকে বললেন, আমি একটু বেড়াতে বেরুব। তুমি যাবে?

যাব, ঘাড় নাড়লেন মিসেস বডম্যান।

বেশ। তাহলে ন'টার মধ্যে তৈরী হয়ে নাও।

তাই হবে। ন'টার আগেই আমি তৈরী হতে পারব।

পথে তাঁরা একটা কথাও বললেন না। সারাটা পথ বডম্যান শুধু পরিকল্পনাটার কথা ভাবতে ভাবতে চললেন। সেই বড় পাথরখণ্ডটার উপরে দু'জনে বসবেন, গল্প করবেন। তারপর গল্প করতে করতে হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ধাক্কা। কিন্তু পড়বার সময় সে যদি জড়িয়ে ধরে, কিংবা শার্টের কলারটাও চেপে ধরতে পারে তাহলে তো তাঁকেও—ভাবতেও কেমন ভয় লাগে। মাইলখানেক খাড়া খাদ। তলায় চাপ চাপ অন্ধকার। কাজটা যদি নির্বিবাদে সারতে পারেন তাহলে বেশ হয়। যদি চিৎকার করে ওঠে কোন লাভ হবে না। কিছু অক্ষম আর্তনাদের শব্দ বারবার পাহাড়ের গায়ে নিষ্ফল আক্রোশে মাথা কুটে মরবে। সাহায্য করবার জন্য কেউ ছুটে আসবে না। হায়রে মূর্খ নারী, কিছু জানে না, কিছু বুঝতেও পারেনি!

পাথরটার খুব কাছাকাছি এসে হঠাৎ মিসেস বডম্যান থমকে দাঁড়ালেন। একটু যেন কেঁপেও উঠলেন।

কি হয়েছে? বডম্যান জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ?

জন! কাঁপা কাঁপা গলায় বলেন মিসেস বডম্যান। আজ অনেকদিন পরে তিনি স্বামীর ক্রিশ্চিয়ান নাম ধরে ডাকলেন, আচ্ছা জন—তোমার কি মনে হয়না তুমি যদি গোড়া থেকেই আমার প্রতি একটু সহৃদয় হতে তাহলে হয়ত ব্যাপারটা এমন দাঁড়াত না?

বডম্যান স্ত্রীর দিকে না তাকিয়েই জবাব দেন, এখন আর এসব কথার কোন মানে হয়না।

একদিন হয়ত আমি এর জন্য দুঃখিত হব। আর তুমি?

মনে হয়না।

ও, তাই নাকি? আস্তে আস্তে মিসেস বডম্যান তাঁর আসল মেজাজ ফিরে পেলেন, আমি তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছিলাম। মনে রেখো।

জন বডম্যান একটু সন্দেহের দৃষ্টিতেই স্ত্রীর দিকে তাকান। তারপর শুষ্কভাবেই বলেন, তার মানে? তুমি আমাকে সুযোগ দিচ্ছিলে? আমি তোমার কাছ থেকে কিছুই প্রত্যাশা করি না। মানুষ যাকে ঘৃণা করে তার কাছ থেকে কিছু নেয় না। আমার মনের কথা সবই তোমাকে খুলে বলছি। একদিন আমরা এক পবিত্র আনন্দময় বন্ধনের মধ্য দিয়ে একত্রিত হয়েছিলাম। কিন্তু তুমি—তুমিই তাকে স্থায়ী হতে দিলে না।

ঠিকই বলেছ তুমি, পাথুরে জমির উপরে চোখ রেখে মিসেস বডম্যান উচ্চারণ করলেন···হ্যাঁ এমন একদিন ছিল যখন আমাদের মনের সুর আলাদা হয়নি।

পাথরটার একেবারে ধারে এসে অস্থির পদবিক্ষেপে হাঁটতে লাগলেন তিনি, আর বারবার—যেন নিজের মনেই কথা বলছেন এমনি ভাবে ঐ শব্দগুলি উচ্চারণ করেন। তাঁকে যেন কেমন খাপছাড়া কেমন অস্বাভাবিক লাগে। হাত দুটো বারবার মুঠো করছেন আবার খুলছেন, কী এক অস্থির উদ্দামতা তাঁকে বুঝি পেয়ে বসেছে। জন বডম্যানের কেমন যেন ভয় লেগে গেল। তিনি বলেন,অমন করে পায়চারী করছ কেন? এস, আমার পাশে এসে স্থির হয়ে বস। তোমাকে বুনো জানোয়ারের মত মনে হচ্ছে।

কি বললে, জানোয়ার? মিসেস বডম্যান অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন, হ্যাঁ! আমি জানোয়ার। আমি বুনো। একটু আগে তুমি বলেছ তুমি আমাকে ঘৃণা কর। তাতে আমার কিছু আসে যায় না। কেননা আমি জানি তুমি মূর্খ, বর্বর। তুমি জানো না আমি তোমাকে তার চেয়ে বেশী ঘৃণা করি। তুমি হয়ত শুধু বিবাহ-বিচ্ছেদের কথাই ভাবছ, আমি নিশ্চিত জানি—এর চেয়ে কোন মারাত্মক চিন্তা তোমার মনে স্থান পাবে না। কিন্তু আমি ভাবছি! খুন—হ্যাঁ খুনের কথাই আমি ভাবছি।

জন বডম্যান ভয় পেয়ে পাথরটাকে আঁকড়ে ধরলেন। তাঁর মনের গোপন অপরাধের ছবিটা বড় করুণ হয়ে ভাসছে।

আমি সবাইকে বলেছি—মিসেস বডম্যান আবার সুরু করেন, তুমি আমাকে খুন করবার মতলবেই স্যুইজার-ল্যাণ্ডে নিয়ে এসেছ।

আশ্চর্য। জন বডম্যান প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলেন, এমন একটা মিথ্যে কথা কী করে তুমি বলতে পারলে?

কেন বলেছি জান? তোমাকে ঘৃণা করি বলে। তোমার উপর প্রতিশোধ নেব বলে। হোটেল থেকে বেরিয়ে আসবার সময়েও আমি ম্যানেজারকে সব কথা বলে এসেছি! তিনি আমাকে তোমার সাথে আসতে নিষেধও করেছিলেন। কিন্তু আর কয়েক মুহূর্ত পরেই হোটেল থেকে দু'জন লোক এখানে উপস্থিত হবে। তাদের বোলো, মিসেস বডম্যান হাঁপাতে থাকেন, তাদের বোলো যে দুর্ঘটনায় তোমার স্ত্রী মারা গেছে।

এই কথা বলে তিনি স্কার্ফটা গায়ে ভালো করে জড়িয়ে নেন। তারপর—

ও কি করছ? চিৎকার করে ওঠেন বডম্যান।

কিন্তু তার আগে—অনেক আগেই মিসেস বডম্যান সেই খাদের অতলস্পর্শী অন্ধকারে ঝাঁপ দিলেন। ক্ষণিকের মধ্যে তলিয়ে গেলেন, হারিয়ে গেলেন তাঁর স্বামীর চোখ থেকে।

ভয়ে, বিস্ময়ে, বেদনায় বোবা হয়ে গিয়েছেন জন বডম্যান। সেই অতলান্ত অন্ধকার থেকে চোখের দৃষ্টিটা ফিরিয়ে এনে পেছনের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলেন দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারলেন সত্য মিথ্যা সবই এখন নিরর্থক।
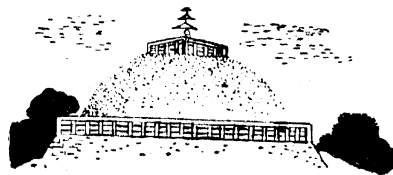
কোলকাতা বণাম মধুপুর

চায়ের দোকানে বেজায় তর্ক চলছিল। ভুতোদা থাকেন মধুপুরে। কোলকাতায় বেড়াতে এসেছেন কয়েকদিনের জন্যে। ওঁকে ক্ষেপাবার চেষ্টা করছিল ছেলেছোকরার দল।

বিমলঃ কি ভুতোদা, সহর দেখতে এসেছেন? সামলে চলবেন। রাস্তায় ট্রাম চাপা পড়বেননা।

ভুতোদাঃ (অপ্রসন্ন মুখে) হ্যাঃ যা তোদের সহরের ছিরি।

বিনয়ঃ সেকি ভুতোদা, কোলকাতার মত এত পেল্লায় সহর আর পাবেন কোথায়?

ভুতোদাঃ সহর না ছাই। রাস্তায় বেরোনোর জো নেই। একটু ধীরে সুস্থে চলেছো কি কুড়িজন ঘাড়ের ওপর হামলে পড়বে। সেদিন কি বিপদেই পড়েছিলাম। বিমলা তুই বলনা—তুই তো ছিলি আমার সঙ্গে।

বিমলঃ ভুতোদা চৌরঙ্গীতে মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে একটু আয়েস করে পানজর্দ্দা খাচ্ছিলেন। আর যাবে কোথায়। খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে প্রায় পঞ্চাশটা গাড়ী ওঁর ইঞ্চি কয়েক দূরে আটকে গেল। উনি পানজর্দ্দা মুখে দিয়ে, চারিদিকে তাকিয়ে 'ভাল জ্বালা' বলে বিরক্তমুখে রাস্তা পেরিয়ে এলেন। ট্রাফিক পুলিসেরা জীবনেও এরকম ঘটনা দেখেনি। তাই বেটন ফেটন নিয়ে হাঁ করে সবাই ভুতোদাকে দেখতে লাগল।

ভুতোদাঃ আচ্ছা তোরাই বল। বিকেলে বেড়াতে গিয়ে একটু আরাম করে পানজর্দ্দাও খেতে পারবনা? একি সহরের ছিরি! আমার সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

বিমলঃ মধুপুর আর কোলকাতা! জানেন কোলকাতায় পয়সা দিলে বাঘের দুধ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। আপনার অজপাড়াগাঁয়ে—

ভুতোদাঃ যাঃ যাঃ তোদের কোলকাতায় পয়সা দিলেও সব পাওয়া যায়না।

বিমল বিনয় (একসঙ্গে): কি! কি!!

বিনয়ঃ বলুন কি চাই আপনার—এরোপ্লেন? রাজহাঁসের ডিম? এনসাইক্লোপিডিয়া?

ভুতোদাঃ (হাসিমুখে) তাজা ফুরফুরে হাওয়া। বিমল আর
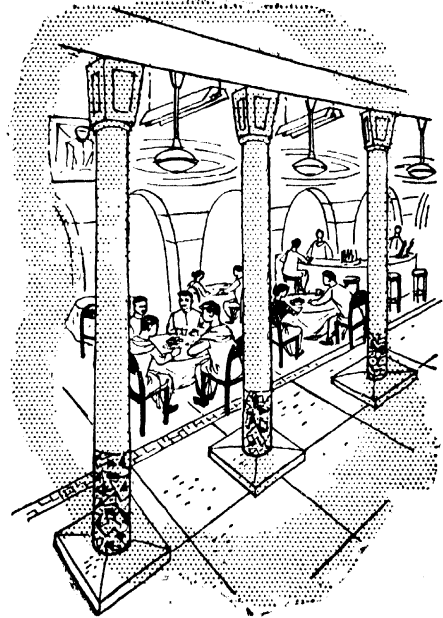
বিনয় একেবারে চুপসে গেল।

ভুতোদাঃ সকালবেলা যখন পাহাড় জঙ্গল নদীর ওপার থেকে মাটীর গন্ধ মেখে সে হাওয়া সর্বাঙ্গে আদর করে যায় তখন মনে হয় স্বর্গে আছি।

DL 466A-X52 BG

ঐ ধোঁয়া কালি সিমেন্টের গরাদখানায় সে হাওয়ার মর্ম তোরা বুঝবিনারে। কিন্তু শুধু খোলা হাওয়াই না। আরও অনেক কিছু পাওয়া যায়না তোদের এ সহরে।

ভুতোদা: কাল বাজারে গিয়েছিলাম। সখ হোল একটু মাছটা ফলটা কেনার। কিন্তু মুদীর দোকানে যা ব্যাপার দেখলাম। বিমল আর বিনয় ঘাবড়ে এ ওর মুখের দিকে তাকাল। বেজায় জব্দ করছেন ভুতোদা ওদের। আবার কি যে ছাড়েন।

বিনয়: কি ব্যাপার ?

ভুতোদা: এক খদ্দের মুদীকে কি নাজেহালটাই করলে! হোত আমাদের মধুপুর মুদী চেলাকাঠ নিয়ে পেটাতো।
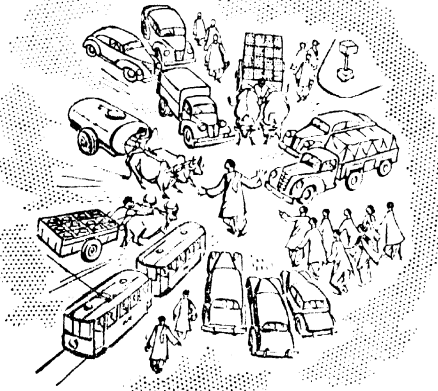
বিমল: বলুনই না কি করলে ?

ভুতোদা: খদ্দের চেয়েছে 'ডালডা'। মুদী সেই 'ডালডার' টিনে হাতাটা ঢুকিয়েছে খদ্দের রেগে খুন। বলে "তুমি লোক ঠকাবার জায়গা পাওনি ? 'ডালডা' তো পাওয়া যায় শীলকরা টিনে। খোলা আজেবাজে কি গছাচ্ছ আমায় ?" তারপর আমার দিকে ফিরে বলে "দেখুন তো মশাই 'ডালডার' এত কাটতি বলে এরা সব আজেবাজে জিনিষ 'ডালডার' নামে বিক্রী করছে। 'ডালডা' কখনও খোলা অবস্থায় পাওয়া যায়না।"

বিনয়: আপনি কি বললেন ভুতোদা ?

ভুতোদা: আমি তো হেসেই অস্থির। ভদ্রলোককে বললাম—মশাই আপনার এ সহরের হালচালই আলাদা। মধুপুরে বিপিন মুদীর কাছ থেকে খোলা 'ডালডাই' তো আমরা কিনে থাকি।" ভদ্রলোক গেলেন বেজায় চটে। বললেন—"আপনি 'ডালডা' কেনেন না আরো কিছু। কেনেন যত খোলা জিনিষ যাতে ধুলোময়লা আর মাছি বসে" বলে গটগট করে চলে গেলেন। (ভুতোদার অট্টহাসি) বিমল আর বিনয় আরো জোরে হেসে উঠল। ভুতোদার হাসি গেল মিলিয়ে। উনি ভেবেছেন বেজায় জব্দ করছেন ওদের কিন্তু ওদের হাবভাব দেখে তো তা মনে হচ্ছেনা।

বিমল: খোলা হাওয়া আর খোলা 'ডালডা'—আহাহা কি ডায়েট—হাঃ হাঃ

ভুতোদা: হাসির কি হোল ?

বিনয়: ভদ্রলোক আপনাকে ঠিকই বলেছেন। 'ডালডা' কখনও খোলা অবস্থায় বিক্রী হয়না। ভুতোদা (চটে): তবে মধুপুরে আমরা কি খাই ? বিনয়: ভদ্রলোক যা বলেছেন তাই। কারণ 'ডালডা' কোন জায়গাতেই খোলা অবস্থায় পাওয়া যায়না।

ভুতোদা: দ্যাখ! বাঙ্গালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছিস ? বিমল: আপনি এই রেষ্টুরেন্টের মালিক হরেনদাকে জিজ্ঞাস করুন। বাড়ীতে মিনুদিকেও জিজ্ঞাসা করবেন।

হরেনদা: হাঁা, ওরা ঠিকই বলছে। আমার 'ডালডা' নিয়েই তো কারবার 'ডালডা' পাওয়া যায় একমাত্র শীলকরা বায়ুরোধক টিনে—হলদে খেজুর গাছ মার্কা টিনে।

বিনয়: শীলকরা টিনে 'ডালডা' তাজা ফুরফুরে হাওয়ার মতই ভাল অবস্থায় পাওয়া যায়।

ভুতোদা চুপসে গেলেন। মিনমিন করে একবার বললেন "খোলা হাওয়া তো নেই এখানে।"

বিমল: একটা লেগেছে ভুতোদা। সেকেণ্ডটা মিস্‌ফায়ার হয়ে গেল।

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই

DL. 466B-X52 BG
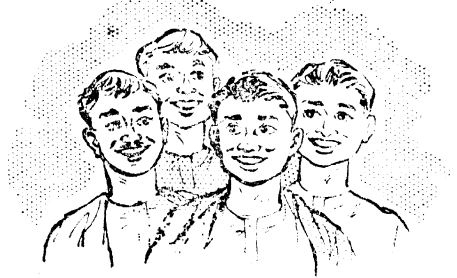
পুস্তক ব্যবসায় ও বিক্রয় কর—

ত ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় যখন সরক। অর্থাভাবে বিপন্ন হয়, সে সময়ে অন্যান্য বহু জিনিষের হিত পুস্তকের উপর বিক্রয় কর ধার্য্য করা হয়। সে সময়ে দেশের অবস্থা সাধারণ ছিল না ; যুদ্ধ পরিচালনা কার্য্যে সরকারের অর্থের প্রয়োজন ছিল—কাজেই সে সময় ঐ বিক্রয় করের ব্যবস্থার প্রতিবাদ করা হইলেও সে প্রতিবাদ সফল হয় নাই। তাহার পর পুস্তকের উপর হইতে বিক্রয় কর তুলিয়া দিবার জন্য ১৯৫২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার এক আইন করেন। সে আইনে একটা ত্রুটি থাকিয়া যায়—যে সকল রাজ্যে তখন বিক্রয় কর প্রচলিত ছিল, সে সকল রাজ্যে পুস্তকের উপর হইতে বিক্রয় কর তুলিয়া দেওয়ার স্বাধীনতা রাজ্য-সরকারগুলিকেই দেওয়া হইয়াছিল। উড়িষ্যা, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লী, উত্তর প্রদেশ, বিহার, বোম্বাই, মধ্যভারত, মাদ্রাজ, হিমাচল প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে পুস্তক বা পত্রিকার উপর বিক্রয়কর নাই। পশ্চিমবঙ্গে বহু আন্দোলন সত্ত্বেও পুস্তকের উপর হইতে বিক্রয় কর তুলিয়া দেওয়া হয় নাই। শুধু ধর্ম পুস্তক ও প্রাথমিক শিক্ষার পুস্তকের উপর আংশিক-ভাবে বিক্রয়-কর রহিত করা হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় কর্তৃপক্ষ ধর্ম-পুস্তক বলিতে শুধু রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতি ধরিয়াছেন। তাহা ছাড়া যে সকল পুস্তকে ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা থাকে, সেগুলির উপর বিক্রয় কর দিতে হয়। প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক বলিতেও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পুস্তকগুলিই শুধু ধরা হয়। বহু নূতন ধরণের প্রাথমিক শিক্ষাপুস্তক প্রকাশিত হইলেও আমরা এখনও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ পড়াইয়া শিশুদের শিক্ষারম্ভ করিয়া থাকি। দুঃখের কথা, ঐ সকল পুস্তক বর্তমানে সরকারী অনুমোদন লাভ না করায় বইগুলি ক্রয়ের সময় তাহার উপর বিক্রয় কর দিতে হয়। সাময়িকপত্রগুলি দেশের জনগণের মধ্যে জ্ঞান-বিস্তারে যে বিরাট কাজ করে, সে কথা সকলে মুখে স্বীকার করিলেও আমাদের পশ্চিমবঙ্গের অর্থ-সচিব সেগুলির উপর হইতে বিক্রয় কর তুলিয়া দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। তাঁহারা বলেন, পুস্তকের উপর হইতে বিক্রয় কর তুলিয়া দিলে তাঁহাদের আয় প্রায় ১০ লক্ষ টাকা কমিয়া যাইবে। এ বিষয়ে এক বৎসর পূর্বে ১৯৫৮ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছিল। ঐ বৎসর ২১শে জুন পশ্চিমবঙ্গের পুস্তক-প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা সমিতিও ঐ বিষয়ে পশ্চিম-বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট এক নিবেদন প্রেরণ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় গত ১৩ই জানুয়ারী পুস্তক-প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা সমিতির এক উপ-সমিতি আবার এ বিষয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তাহা সকলের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। সমিতি এ বিষয়ে সরকারকে যে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করিলে সরকারের আয় না কমিয়া বরং বাড়িয়া যাইবে। প্রকাশকদিগকে কাগজ কিনিবার সময় কোন বিক্রয় কর দিতে হয় না। সরকার যদি কাগজের কল-গুলি হইতে কাগজ বিক্রয়ের সময় বিক্রয়কর গ্রহণের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে পুস্তকের উপর বিক্রয় করের বাবদ ১০ লক্ষ টাকার স্থলে তাঁহারা ২২ লক্ষ টাকা পাইতে পারেন। এ ব্যবস্থা হইলে কাগজের বাজারে বর্তমানে যে ফাটকাবাজি ও দুর্নীতি চলিতেছে, তাহাও আংশিকভাবে কমিয়া যাইবে। বর্তমানে মুদ্রিত পুস্তক ও সাময়িক-পত্রাদির উপর বিক্রয় কর লওয়া হয়। কিন্তু সরকারের এ কথা অজ্ঞাত নয় যে, যে পরিমাণ পুস্তক ও সাময়িকপত্র ছাপা হয়, তাহার শতকরা ৪০ ভাগ অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া থাকে—সেগুলি সম্বন্ধে সরকার কোন কর পান না। এ অবস্থায় কাগজের কলে উৎপন্ন কাগজের উপর

বিক্রয় কর ধার্য্য করা হইলে কেহই কর হইতে বাদ যাইবেন না।

এ বিষয়ে আরও একটি বিবেচনার যোগ্য বিষয় আছে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য কোন রাজ্যে পুস্তকাদির উপর বিক্রয় কর না থাকায় সে সকল রাজ্যে পুস্তকের ব্যবসা যে পরিমাণে সমৃদ্ধতর হইতেছে এবং পশ্চিমবঙ্গে পুস্তকাদির ব্যবসা সেই পরিমাণে কমিয়া যাইতেছে। যে কোন ক্রেতা কলিকাতার দোকানে বই না কিনিয়া পশ্চিমবঙ্গের বাহিরের যে কোন দোকান হইতে বই কিনিলে বিক্রয়কর বাবদ শতকরা ৫ টাকা প্রদান হইতে রেহাই পাইয়া থাকেন।

আমরা এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা, বিধান সভা ও বিধান পরিষদের সকল সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বিক্রয় করের জন্য কলিকাতার বাজারে পুস্তক ও সাময়িকপত্র ব্যবসায়ীদের যে ক্ষতি হইতেছে, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া অনেক ব্যবসায়ী কারবার বন্ধ করিয়া দিতেছেন—ফলে বহু লোক বেকার হইয়া যাইবে। যখন মিলজাত কাগজের উপর বিক্রয় কর দিতে পুস্তক-ব্যবসায়ীদের আপত্তি নাই—তখন পশ্চিমবঙ্গের কর্তৃপক্ষ কেন যে ঐ বিক্রয় কর না ধরিয়া পুস্তাদির উপর বিক্রয় কর গ্রহণের ব্যবস্থা করেন, তাহা বুঝা যায় না। উহা করিলে সরকারের আয় কমিয়া না গিয়া বরং দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইবে। পশ্চিমবঙ্গের মত দরিদ্র দেশে জ্ঞান-বিস্তারের উপর এই প্রত্যক্ষ কর শুধু অন্যায় নহে, দৃষ্টিকটুও বটে। ভারতের প্রায় সকল রাজ্যে পুস্তকাদির উপর বিক্রয় কর যখন তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে তখন আমাদের বিশ্বাস, বিষয়টি সম্যকভাবে অনুধাবন করিয়া পশ্চিমবঙ্গের কর্তৃপক্ষও ঐ কর সত্বর তুলিয়া দিবার ব্যবস্থায় মনোযোগী হইবেন।

চাউলের সঙ্কট—

যদিও বার বার কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন ও পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ঘোষণা করিতেছেন যে এবার ভারতবর্ষে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে ফলে ১৯৫৯ সালে ভারতের কোথাও খাদ্যাভাব হইবে না, কিন্তু আমরা প্রত্যহ সকালে লোক মুখে জানিতে পারি যে কোথাও ন্যায্য মূল্যে চাল সরবরাহের ব্যবস্থা পর্য্যাপ্ত নহে—ফলে অধিকাংশ লোক হয় ন্যায্য মূল্যে অখাদ্য চাউল কিনিতে বাধ্য হয়, না হয় কালোবাজারে ২০ টাকার চাউল ২৮ টাকা মণ দিয়া কিনিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। ধনী ব্যবসায়ীরা চাউল কিনিয়া জমাইয়া রাখিতে পারে, কিন্তু খুচরা দোকানে পর্য্যাপ্ত চাল দিলে সে চাল কালোবাজারে যাওয়ার সম্ভাবনা অধিক নহে। বর্তমান অর্থনীতিক অবস্থায় সাধারণ লোকের প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাউল কিনিবার অর্থ নাই। নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য্য জিনিষই মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকেরা ঠিক সময় মত ক্রয় করিতে পারে না—এ অবস্থায় চাউলের পরিমাণ কিছু বাড়াইয়া দিলে লোককে আর চালের জন্য চোরাবাজারে ছুটাছুটি করিতে হয় না। ন্যায্যমূল্যে চাউল বিক্রয়ের দোকানের সংখ্যাও প্রয়োজনানুসারে অধিক নহে—তাহার ফলে সাধারণ মানুষকে চাউল কিনিতে অনেক সময় দূরে যাইতে হয়। সপ্তাহের মধ্যে যে দিন সে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে, সে দিন সে দোকানে যাইয়া দেখে—দোকানে চাউল নাই। এ অবস্থার জন্য দায়ী কে, আমরা জানি না। অনেক সময় ২ দিন ঘুরিয়া ক্রেতা শেষ পর্যান্ত অখাদ্য চাউল কিনিতে বাধ্য হয়। প্রতিদিনের সকালে সংবাদপত্র খুলিলেই আমরা দেখিতে পাই, কোন না কোন অঞ্চলে চাউলের অভাবে লোক কষ্ট পাইতেছে। ফলে কালোবাজারে ২৮।৩০ টাকা মণ দরে চাউল কিনিতে বাধ্য হইয়া থাকে। চাউল ও আটা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ —তাহার ব্যবস্থা না করিলে গৃহস্থ গৃহে বাস করিতে পারে না—কিন্তু বর্তমান সময়ে সেই চাউল ও আটার সংস্থান করাই মানুষের পক্ষে কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়াছে। মাথা পিছু সপ্তাহে দেড় সের চাল ও এক সের আটাতে কোন সাধারণ বাঙ্গালীর কুলায় না—সে অবস্থাপন্ন হইলে কালো-বাজারে যায়, নচেৎ অন্যরূপ সুলভ অখাদ্য খাইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করে। আমরা জানি, শীতকালে তরিতরকারী সুলভ বলিয়া বহু দরিদ্র পরিবার ভাত কম খাইয়া অধিক তরকারী খাইয়া দিন যাপন করে। ২।১ মাসের মধ্যে যখন তর-কারীর দাম বাড়িবে, তখন তাহাদের না খাইয়া থাকিতে হইবে। সে জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে চাউলের উপযুক্ত ব্যবস্থায় মনোযোগী হইতে অনুরোধ করি। একদিকে ফাটকাবাজী ব্যবসায়ী, অন্য দিকে দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারী—এই উভয় পক্ষের

অত্যাচার দেশবাসী আর কতদিন সহ্য করিবে? সহ্যের সীমা প্রায় অতিক্রান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে।

বেরুবাড়ী সমস্যা—

পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার ১২নং বেরুবাড়ী ইউনিয়নের একাংশ নেহরু-নুন চুক্তিতে ছিটমহল বদলের সময় অন্যায় ভাবে ভারতরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানকে প্রদানের সিদ্ধান্ত করা হয়। ঐ স্থানে পাকিস্তান হইতে আগত বহু সহস্র উদ্বাস্তু পুনর্বসতি লাভ করিয়াছিল। সে জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা ও বিধান পরিষদের সকল দলের সদস্যগণ একযোগে নেহরু-নুন চুক্তির ঐ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া ঐ অঞ্চলের হস্তান্তর বন্ধ করিতে শ্রীজহরলাল নেহরুকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। ঐ অঞ্চল হস্তান্তরের সময় শ্রীনেহরু পশ্চিমবঙ্গের কাহারও সহিত পরামর্শ করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন কলিকাতায় আসিয়া এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য-মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত কথা বলিয়া গিয়াছেন—তিনি নাকি বলিয়াছেন যে এখন ঐ অঞ্চল হস্তান্তর বন্ধ করা শ্রীনেহরুর পক্ষে অসম্ভব—তাহা করিতে গেলে তাঁহার আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগিবে। ঐ সংবাদ পাইয়া ঐ অঞ্চলের হিন্দু অধিবাসীরা আতঙ্কিত হইয়াছেন ও দলে দলে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানের সন্ধান করিতেছেন—যাহাদের অন্য স্থানে যাইয়া বসবাসের সুবিধা আছে, তাহারা অন্য স্থানে চলিয়া যাইতেছেন। দেশ বিভাগের ১১ বৎসর পরে এই ভাবে ছিটমহল বদলের ব্যবস্থা হওয়া ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের পক্ষে কিরূপ কষ্টকর, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। যে ব্যবস্থার প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য-মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের সকল নেতা একমত, সে ব্যবস্থায় শ্রীজহরলাল নেহরুর আপত্তি হইবে কেন, তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। শুনা যায় এ বিষয় লইয়া শ্রীনেহরুর সহিত ডাক্তার রায়ের মতভেদের জন্যই ডাক্তার রায় নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করিতে যান নাই। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটী কংগ্রেসের-সভাপতি-প্রস্তাব বিষয়েও কেন নীরব, তাহার কারণ সম্বন্ধে লোক বেরুবাড়ী সমস্যার কথাই আলোচনা করিতেছে। ডাক্তার রায় এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব—তবে আমাদের বিশ্বাস, ডাক্তার রায় যদি এ বিষয়ে একটু কঠোর মনোভাব লইয়া সমস্যার সমাধানে শ্রীনেহরুর সহিত আলোচনা করেন, তাহা হইলে কখনই পশ্চিমবঙ্গের সম্মিলিত মনোভাব উপেক্ষা করা শ্রীনেহেরু পক্ষে সম্ভব হইবে না।

দণ্ডকারণ্য—

পূর্ববঙ্গ হইতে আগত বাস্তহারাদের জন্য পশ্চিমবঙ্গে স্থান সংকুলান না হওয়ায় কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও অন্ধ্র রাজ্যের সংযোগ স্থলে এক প্রকাণ্ড জমীতে খুব কম লোক বাস করে। সে স্থানের স্বাস্থ্য ভাল, স্থানটি নদীবহুল ও উর্বর, তথায় যেমন বহু অরণ্যজাত সম্পদ আছে, তেমনই বহু মূল্যবান ধাতব পদার্থ আছে। পশ্চিমবঙ্গ হইতে একটু দূরবর্তী হইলেও তথায় সহজে ২০ লক্ষ বাঙ্গালী যাইয়া বাস ও জীবিকার উপায় লাভ করিবে। পশ্চিমবঙ্গের একদল বামপন্থী নেতা বাঙ্গালী বাস্তহারাকে নানাপ্রকার মিথ্যা কথা বলিয়া তথায় যাইতে নিষেধ করিতেছে। যদি বাঙ্গালী তথায় না যায়, তবে পাঞ্জাব ও মাদ্রাজ হইতে বহু লোক আসিয়া ঐ স্থানে বাস করিবে—তাহার ফলে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদিগকে পশ্চিম বাংলায় থাকিয়া বাসের জমী, চাষের জমী ও জীবিকার উপায়ের অভাবে দুঃখ দুর্দশা ভোগ করিয়া মৃত্যুপথের যাত্রী হইতে হইবে। এ কথা সর্বত্র প্রচারের ফলেও বাঙ্গালী উদ্বাস্তুরা কেন দণ্ডকারণ্যে যাইতে ভয় পাইতেছেন তাহা বুঝা যায় না। সুখের কথা গত ৩রা ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে ৯২টী পরিবারের ২১০ জন উদ্বাস্তু রায়পুর (মধ্যপ্রদেশ) যাত্রা করিয়াছেন—সেখান হইতে মোটরে ১৩০ মাইল যাইয়া তাহারা দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার প্রথম ঘাটি ফরাসগাঁও সহরে পৌছিবেন। সম্প্রতি ভারত সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় হইতে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা এবং পূর্ব-পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন নামে একখানি পুস্তক প্রচার করা হইয়াছে। পুস্তকখানিতে কয়েকটি মানচিত্র দিয়া ঐ অঞ্চলের সকল তথ্য ও সংবাদ বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে যে স্থানে পুনর্বাসন পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহার আয়তন ৩০০৫২ বর্গ মাইল—উহা মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলা ও উড়িষ্যার কোরাপুট ও কালাহাণ্ডি জেলায়

অবস্থিত। আসল দণ্ডকারণ্যের আয়তন ৮০ হাজার বর্গ মাইল, উহার কিছু অংশ উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ ছাড়াও অন্ধ্র ও বোম্বাই রাজ্যে পড়িয়াছে। যাঁহারা ঐ অঞ্চল দেখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাই বলিয়াছেন, ঐ অঞ্চলের জলবায়ু বাঙ্গলা দেশের মত। তথায় অতি সহজে জল পাওয়া যায়, ফলে চাষের জন্য সেচ এবং শিল্পের জন্য বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা খুব সহজ হইবে। সেখানকার খনিজ সম্পদ আহরণ করিয়া তথায় কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা করা যাইবে। কাজেই খনিজ পদার্থ ব্যবহারের ফলে শত শত বৎসর লোক জীবিকার উপায় পাইবে। সে জন্য আমরা প্রথমাবধি বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদিগকে—শুধু উদ্বাস্তু কেন, অপেক্ষাকৃত ধনী, শিক্ষিত, তরুণ বাঙ্গালীদিগকে তথায় যাইতে অনুরোধ করিয়াছি। তথায় যাইলে লোক সহজে অর্থার্জনের উপায় পাইবে। বাঙ্গালী না যাইলে অন্য রাষ্ট্রের উৎসাহী কর্মীরা যাইয়া সে স্থান দখল করিবে—ফলে বাঙ্গালী জাতিকে এই সংকীর্ণ জনবহুল পশ্চিমবঙ্গে থাকিয়া দুঃখ দুর্দশা ভোগ করিয়া ক্রমে মৃত্যুপথ যাত্রী হইতে হইবে। সে জন্য এখনও আমরা বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদিগকে দলে দলে যাইয়া দণ্ডকারণ্যে আশ্রয় ও পুনর্বাসন লাভ করিতে আহ্বান জানাইতেছি।

দিল্লীতে কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়—

দিল্লীতে অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র উদ্যোগে বার্ষিক কবি-সম্মিলন উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া এ বৎসর কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় গত ২৭শে জানুয়ারী তথায় যান ও ২৮শে তারিখে কবি-সম্মিলনে যোগদান করিয়া স্বরচিত 'স্বপ্ন্ত' কবিতা পাঠ করেন। ১৩টি ভাষার ১৪ জন কবি (হিন্দীর ২ জন) ঐ সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ঐ দিন রাত্রিতে হিন্দী অনুবাদসহ কবিতাটি কলিকাতা বেতার কেন্দ্র হইতেও প্রচারিত হইয়াছিল। ২৪শে সন্ধ্যায় দিল্লীর বাঙ্গালী সাহিত্যানুরাগী অধিবাসীরা কবি শ্রীবিভূতি-ভূষণ বাগচীর বাসগৃহে কবিশেখরকে এক প্রীতি সম্মিলনে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। গত বৎসর বাংলা দেশ হইতে কবিবর শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক নিমন্ত্রিত হইয়া ঐ সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। খ্যাতিমান ও প্রবীণ বাঙ্গালী কবিগণের এই ভাবে সম্মানদানে বাঙ্গালী মাত্রই গৌরব বোধ করেন।

আনন্দবাজার পত্রিকার নূতন সম্পাদক—

গত ১লা ফেব্রুয়ারী আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন—আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীচপলা-কান্ত ভট্টাচার্য্য কার্য্যকাল পূর্ণ হওয়ার পর অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার স্থলে শ্রীঅশোককুমার সরকার কার্য্য-ভারগ্রহণ করিয়াছেন। অশোককুমার সাপ্তাহিক দেশ-পত্রেরও সম্পাদক।

গান্ধীজীর অর্থনীতিক ব্যবস্থা—

গত ৩১শে জানুয়ারী মাদুরাই সহরে কেরল, মাদ্রাজ, মহীশূর ও অন্ধ্রের কলেজ অধ্যাপকগণের এক আলোচনা চক্রে গান্ধী স্মারকনিধির সেক্রেটারী শ্রীজি-রামচন্দ্রম বলিয়াছেন—গান্ধীজি যে অর্থনীতিক ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা শুধু আদর্শবাদী ব্যবস্থা নহে, খুব বাস্তব ব্যবস্থা। তিনি বলেন—গান্ধীজি কখনও যন্ত্রের বিরোধী ছিলেন না—তিনি শুধু এই সর্ত নির্দেশ করিয়াছিলেন যে, যন্ত্র যেন মানুষকে শোষণের উপায় না হয়। অর্থনীতিক উন্নয়ন যেন নৈতিক উন্নয়ন হইতে বিচ্ছিন্ন না হয়। গান্ধীজি যে অর্থনীতির নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহার ব্যাপক প্রচার হওয়া প্রয়োজন। গান্ধীজির শিক্ষানীতি যেমন দেশ ক্রমে গ্রহণ করিতেছে, অর্থনীতিও সেইভাবে ভারত-বাসী যাহাতে বুঝে ও গ্রহণ করে, ভারত সরকারকে সে বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। নতুবা দেশের বর্তমান অবস্থা পরিবর্তনের অন্য উপায় নাই।

কংগ্রেসের নূতন সভাপতি—

শ্রীজহরলাল নেহরুর একমাত্র সন্তান শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গত ২রা ফেব্রুয়ারী দিল্লীর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যালয় কর্ত্তৃক কংগ্রেসের নূতন সভাপতি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন। তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঐ পদে নির্বাচিত হইলেন, ৮ই ফেব্রুয়ারী বর্তমান সভাপতি শ্রীইউ-এন-ডেবরের নিকট হইতে কর্মভার গ্রহণ করিবেন ও কংগ্রেসের গঠন তন্ত্রের নির্দেশ মত নিজে ওয়ার্কিং কমিটী গঠন করিবেন। তাঁহার পূর্বে শ্রীমতী এনি বেসান্ট, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা—৩ জন মহিলা কংগ্রেস সভাপতি হইয়াছিলেন—ইন্দিরা গান্ধী চতুর্থ মহিলা সভাপতি। তাঁহার বয়স ৪২ বৎসর।

ডাক্তার তারকনাথ দাস—

খ্যাতনামা রাজনীতিক ও আমেরিকায় ভারতীয় আদর্শের প্রচারক ডাক্তার তারকনাথ দাস সম্প্রতি নিউ-ইয়র্কে ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ২৪পরগণা জেলার কাঁচরাপাড়ার নিকট মাঝিপাড়া গ্রামে ১৮৮৪ সালে তাঁহার জন্ম হয় ও কলিকাতা আর্য্য মিশন ইনিষ্টিটিউসন, স্কটীশচার্চ কলেজ ও টাঙ্গাইল কলেজে পড়ার পর তিনি সন্ন্যাসী হইয়া কিছুকাল ভারত ভ্রমণ করেন। রামদয়াল মজুমদার, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র বসু প্রভৃতির সহিত পরিচয়ের ফলে তাঁহাদের প্রভাবে তারকনাথ প্রভাবিত হইয়া ১৯০৫ সালে তিনি জাপানে যান ও একবৎসর পরে ১৯০৬ সালে আমেরিকায় যাইয়া সানফ্রান্সিসকোতে বাস আরম্ভ করেন। সাংবাদিকের কাজ গ্রহণ করিয়া তিনি তথায় ১৯১০ সালে বি-এ ও ১৯১১ সালে এম-এ পাশ করেন। ১৯১৪ সালে আমেরিকার নাগরিক হইয়া ১৯২৪ সালে এক মার্কিণ মহিলাকে বিবাহ করেন। ১৯২৪—৩১ সালে উভয়ে ইউরোপে বাস করিয়াছিলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি আমেরিকায় ফিরিয়া যান ও ১৯৪৮ সালে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। ভারতীয় ছাত্রদের সাহায্য দানের জন্য ১৯৫১ সালে ১৫ লক্ষ ডলার দান করিয়া এক 'দাস ফাউণ্ডেসান' প্রতিষ্ঠা করেন। ৪৭ বৎসর পরে ১৯৫২ সালে তিনি কয়েক মাসের জন্য ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত ও সুবক্তা ছিলেন ও বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির কথা বিদেশে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অসাধারণ কর্মী ও সাহসী মানুষ তারকনাথ দাস বিদেশে বাঙ্গালীর সম্মান ও প্রতিষ্ঠা অর্জনে আজীবন যাহা করিয়া গিয়াছেন, ইতিহাসে তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অভয় মনে করেছিল, তার অসহায় দুরবস্থা বুঝে, অনাথ খুড়ো আবার তার সঙ্গে হেসে কথা বলবে। ডেকে নেবে কাছে। পিঠে চাপড় মেরে হাসবে হা হা ক'রে।

কিন্তু তা হ'ল না। কারখানায় গিয়ে অভয় যখন দাঁড়াল অনাথের কাছে, সে প্রথমে ফিরে তাকায় নি। তারপরে বলেছে, যা, নিজের কাজ দেখগে যা।

অভয় বলেছে, অন্যায় হ'য়ে গেছে খুড়ো।

অনাথ ধমক দিয়েছে, থাক্, আর খুড়ো খুড়ো করতে হবে না। খুড়ো ডাকলে তার মান রাখতে হয়।

অভয় বলেছে বোকা বোকা করুণ মুখে, তা' আমি কি তোমার মান রাখি না ?

অনাথ মুখ ভেংচে বলেছে, রাখ বৈ কি। একশ গণ্ডা লোকের সামনে খুড়োকে মিথ্যুক ক'রে দিয়েছিস্, বলেছিস্, গান গাইতে পারি না। মান রেখেছিস্ বৈ কি। ওসব বর্দ্ধমানি ন্যাকামো করিস্ না, যা কাজে যা।

অভয় বর্দ্ধমানের ছেলে। অনাথের ভাষায় সেই জন্য অভয়ের ন্যাকামো বর্দ্ধমানি ন্যাকামো হয়েছে।

অভয় বলেছে মুখ চুণ ক'রে, তা কি করব বল। লাজ-লজ্জা ভয় ব'লে জিনিষ তো থাকে। আমি বে-ওপায় হ'য়ে বলে ফেলে দিয়েছি।

অনাথ খিচিয়ে উঠেছে, তবে আর কি, আমার মাথা কিনেছিস্। কেন, এত লাজ লজ্জা ভয় কিসের ? শরীলটা তো এ্যাত্তখানি। কাছা নেই পাছায়।

অনাথ খুড়োর খোঁচা বড় তীক্ষ্ণ। জ্বালাটা লেগেছে অভয়ের। বলেছে, এ্যাট্টা জানান টানান দেয়া নেই। বেমক্কা খাড়া ক'রে দিলে অতগুলান লোকের সামনে। তা' কি করব আমি ?

এর পরে অনাথের আক্রমণ আর একটু কড়া হ'য়ে উঠেছে। বলেছে, হ্যাঁ, মস্ত গাইয়ে তুমি। দশ দিন আগে তোমাকে পত্তর দিয়ে নেমন্তন্ন করতে লাগবে, আপনি আঁজ্ঞে ক'রে নিয়ে আসতে হবে, তবে না! যা ভাগ এখন।

আর কথা বলতে পারেনি অভয়। গানের খোঁটা বড় খোঁটা। অভয়ের মানে লেগে গিয়েছে। কষ্টও হয়েছে প্রাণে। তা' ব'লে এত কথা, এমন কথা বলবে খুড়ো ? বড় বড় ঠ্যাং ফেলে সে নিজের ডিপার্টে চলে এসেছে। কারুর সঙ্গে ভাল ক'রে কথাও বলেনি।

দু'একজন ঠাট্টা ইয়ারকি করতে গিয়ে, অভয়ের গরম মেজাজ দেখে, আর মুখ খারাপ শুনে অবাক হ'য়ে গিয়েছে। মেজাজ গরমটা যদিও বা মানতে পেরেছিল সবাই, অভয়ের মুখ খারাপ করা শুনে সবাই থ। আর মজাও পেয়েছে, তার মুখ খারাপ শোনার জন্যেও উস্কে দিয়েছে অনেকে।

শেষে মনের কথাটা বলেছে অভয় হরি মিস্ত্রিরির কাছে।

হরি মিস্তিরি ফোগলা দাঁতে, গোঁফ ফুলিয়ে হেসেই বাঁচে না। বলেছে, অনাথ রাগ করেছে তোমার 'পরে, তাতে আবার তুমি মন খারাপ করেছ ?

অভয়—বড় যে কিটিয়ে কিটিয়ে বলেছে সে।

অনাথের নাম নেয়নি অভয়।

হরি মিস্তিরি যেন ভারী মজা পেয়েছে। বলেছে, আরে ধু-র! অনাথের রাগ, তাও আবার তোমার 'পরে। ওটা রাগ নয়-রে খুড়ো, রাগ নয়। তোর ওপরে অভিমান হয়েছে।

—অভিমান ক'রে, অমন অপমান করলে ?

—হ্যাঁরে। তোকে যে বড় ভালবাসে গো। অনাথের সত্যিকারের রাগ কি ওরকম নাকি ? আরে বাবা !

ও সত্যি সত্যি রাগ করলে, মিলের ম্যানেজার ওপর-শিয়ের সায়েব পর্যন্ত পেরমাদ গোণে না ? সে তো আর যেমন তেমন রাগ নয়। মহাদেবের মতন ?

—মহাদেবের মতন ?

—হাঁ। গেল ছেচল্লিশ সালে সেই রাগ দেখেছিলুম আমরা। অনাথের এক সাকরেদ, ব্যাচাকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল মিলের দারোয়ানেরা। তখন কলকাতাও খুব গুলীগোলা চলছিল। অনাথ কারখানার বাইরে খাড়া হ'য়ে আমাদের ডাক দিলে। বললে, সব বেইরে এস। আমরা সব বেইরে এলুম। এসে দেখলুম, অনাথ নয়, আগুনের শিস্। সেই আগুন আমাদের গায়েও লাগল। অনাথ বললে, 'দারোয়ানেরা লেবার অফিসারের চর। শলা-পরামর্শ ওখেনেই হয়েছে। লেবার অফিসারটাকে আমরা ছারখার ক'রে ফেলব। মেরে ফেলব অফিসারটাকে। আর দারোয়ানদের কেটে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলে দেব গঙ্গায়।'

—তাই হ'ল ?

—তক্ষুনি। আমরাও রেগে গেছলুম। অনাথের কথা শোনামাত্র লেবার অফিসটাকে একেবারে ভেঙ্গে ফেললুম আমরা। কিন্তু লেবার অফিসার পালিয়ে গেছল আগেই। মার খেয়ে মরেছিল শুধু শুধু বাবুরা। দরোয়ানরা সারা তল্লাটে ছিল না। অনাথ আমাদের বললে,'সায়েবদের কুটি ঘিরে ফেল !' ঘিরে ফেললুম। মেমসায়েবরা চেঁচা-মেচি চীৎকার জুড়ে দিলে। অনাথ বললে, 'কুটি তল্লাসী ক'রে ত্যাখ, দরোয়ানরা কোথায় আছে।' আমরা তল্লাসী করলুম। পেলুম না কাউকে। ম্যানেজার সায়েব থরথর্ ক'রে কাঁপছিল। শালার পাত্‌লুন খারাপ হ'য়ে যাবার দাখিল। অনাথ বললে ম্যানেজারকে, 'দরোয়ানদের বার ক'রে দাও, নইলে তোমার কারখানা তুলে ফেলে দেব গঙ্গার জলে।' ম্যানেজারের মুখ চুণ। তবু অনাথের কাছে এসে বললে, 'অনাথ আমি ইংরাজের বাচ্চা, ঝুট কথা কভি বোলে না। দরোয়ানের খবর আমার জানা নেই।' তা' অনাথ কুটির ওই চকচকে মেঝেয় থু থু ক'রে থু থু ফেলে বললে, 'থুক্ দিই তোমার মত ইংরাজের বাচ্চাকে।' অনাথের মত আমরাও রেগে গেছলুম। আমরাও থু থু ফেলেছিলুম। অনাথ বললে, 'ঝুটার কারবারী আবার বড়াই দেখাচ্ছিস। কোন কথা শুনব না। ব্যাচার খুনীদের চাই।' তখন একে একে সব সায়েবরা এল। এসে বললে, ইমান সে বলছি, আমরা জানি না। দরোয়ানরা ভাগ্‌ গয়া। কথা দিচ্ছি, সমস্ত দরোয়ানের নোকরি খতম। তাদের আমরা আর ত্রিসীমানায় আসতে দেব না।' আমরা ব্যাচার মড়া নিয়ে মিছিল বার করলুম। ও জায়গার সমস্ত কারখানায় হরতাল হ'য়ে গেল। আর যত কারখানা ছিল, সব কারখানার দরোয়ানেরা একেবারে মুল্লুক। কিছুদিন দরোয়ান ব'লে কেউ ছিল না। কিন্তু মাসখানেক বাদেই, সেই পেরথম পুলিশ চুরি ক'রে নে' গেল অনাথকে।

—চুরি ক'রে ?

—হাঁ, চুরি ক'রে রাত দুটোয় চুপি চুপি এসে নে গেছল। নইলে যে হল্লা হ'য়ে যেত, ধরে নিয়ে যেতে পারত না। তা' অনাথকে ধরে নে' গেল ; আমরা ভয় পেয়ে গেলুম। আমরা চুপসে গেলুম, ঠিক শেয়ালের মতন। পুলিশ যেন আমাদের সাহসটাও চুরি ক'রে নে গেল। বাংলা দেশের তাবৎ চটকল আমাদের মিলকে বলে, 'লড়িয়ে মিল।' কেন ? না লড়াই আমরা শুরু করি আগে। এই তোমার শস্তা র‍্যাশান বল, মাগ্‌গিভাতা বল, আর ছুটি বল, আমরা আগে রব তুলেছি। আমরা রব তুলেছি কার কথায় ? অনাথ। অনাথের কথায়। অবিশ্যি অনাথেরও গুরু আছে। সে সব গুরুরা সব লেখাপড়া জানা মস্ত দিগ্‌গজ। তারাও খুব জেল খাটে। কিন্তু সত্যিকারের দুঃখী হল অনাথ। নিজের জন্যে সে কিছুটি রাখে নি। আমরাও বেইমান। অনাথ দু' তুবার জেল খেটেছে। আমরা তার বউ বাচ্চাকে খাওয়াতে পারি নি। রোগে ডাক্তার দেখাতে পারি নি। সব ম'রে গেছে। শুধু তাই ? তার গুরু যাঁনারা, সেই সব দিগগজ-দের সঙ্গে মতান্তর হ'য়ে গেল অনাথের। তাঁনারা বললেন, 'সাতচল্লিশ সালে আমরা স্বাধীনতা পাইনিকো।' অনাথ বললে, 'হ্যাঁ পেয়েছি। গরমেণ্টটা আমাদেরই গরমেণ্ট।' হুঁ, কথার ওপরে কথা ? অনাথকে দিলে দল থেকে

তাড়িয়ে। আর ব'লে দিলে, অনাথ লোক খারাপ, দালাল। সেই যে শক্ খেল, আজো তার ঘা শুকোল না। বউ ছেলে-মেয়ে ঘর, সব গেছে। এখন একেবারে ন্যাংটা। তবে, দলের লোকেরা আবার ডেকে নে গেছে অনাথকে। বলেছে, 'তোমার কথাও সত্যি অনাথ। গরমেণ্টটা এ দেশের স্বাধীন গরমেণ্ট।' তখন অনাথ বললে, 'হাঁ, স্বাধীন গরমেণ্ট, কিন্তন বড়লোকের গরমেণ্ট।' কেন বললে? না, 'দেশের দিকে তাকিয়ে ছাখ।' অনাথের ওই এক কথা। যা বলবে, দেশের দিকে তাকিয়ে বল।

বলতে বলতে হরি মিস্তিরির বুড়ো চোখ দুটি আচ্ছন্ন হ'য়ে গিয়েছে। আপন মনে বলেছে, 'কিন্তু আর তেমন ক'রে কথা বলে না অনাথ। জানিনেকো, আবার কবে ও রেগে উঠবে। ও তো পাগল।

ব'লে ফোঁস ক'রে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে।

অভয়ের অর্থহীন অথচ বিস্মিত চোখের সামনে ভেসেছে অনাথের মুখখানি। বলেছে, আবার কোনোদিন রাগবে?

হরি বলেছে, তা জানিনেকো। দু'বার তিনবার রেগেছে অনাথ। তা' সব জিনিষের তো এ্যাট্টা সময় আছে। আবার যখন সময় আসবে, তখন রাগবে। কিন্তু তখন হয়তো আমি আর সম্লায়ে থাকব নাকো।

অভয়ের মনটা ছ্যাং ছ্যাং ক'রে উঠেছে। বলেছে, কেন? থাকবে না কেন?

হরি ফোগলা দাঁতে হেসে বলেছে, জন্মালে মরতে হবে না? কিন্তু অনাথের কাছে যে কথাগুলোন শুনেছি, মরবার কালে সেই কথা মনে হবে। আর ওর মুখখানিও মনে পড়বে।

—কোন্ কথা খুড়ো?

হরি মিস্তিরির বুড়ো মুখের লোলরেখা টান টান হ'য়ে উঠেছে। চোখ দুটি উঠেছে চিকচিকিয়ে। বলেছে ফিস্-ফিস্ ক'রে, ওই যে, সেই কথা গো। সব সময় যা বলে পাগলাটা, আমরা একদিন ভালভাবে মানুষের মত বাঁচব। সকলে সমান হ'য়ে যাবে সম্সারে।

বহুবার শোনা কথাটা হরি মিস্তিরির চোখে ও কপালের প্রায় শতাব্দীর সর্পিল রেখায় এখনো বিস্ময় জাগায়। বলে, কি আশ্চর্য্য কথা অনাথ বললে যে অবিশ্বেস করতে পারিনেকো। আর কদ্দিন বা বাঁচব। ছেলে নাতীরা রইল, তারা দেখবে। মাথার ওপরে ভগমান তো রয়েছেন। একদিন নিশ্চয় অনাথের কথাটা ফলবে।

এক কথায় কত কথা উঠে গিয়েছে। রাগারাগির কথা ভুলেই গিয়েছে অভয়। অনাথেরই গুরুগিরিতে শেখা জীবনতত্ত্বের কথাগুলি যেন নতুন গুরুত্ব নিয়ে দেখা দিল তার সামনে। নতুন ক'রে যেন পরিচয় পাওয়া গেল অনাথ খুড়োর।

কিন্তু তবু অভয় থেকে যেতে পারল না অনাথের কাছে। রাগ ক'রে বা মান ক'রে নয়। অনাথ যদি নিজের থেকে ডেকে না নেয় কাছে—তবে অভয় যায় কেমন ক'রে?

তিন দিন পরে, বাজারের মহাজন শরৎদাস এসে ধরল অভয়কে। সঙ্গে সুরীনের ওকালতি। অভয়কে বাজারে গাইতে হবে।

যে কোন বৃহস্পতিবারে পূর্ণিমা পড়লে, বাজারে বারোয়ারী গান বাজনা কিছু না কিছু হয়ই। কোজাগরী লক্ষ্মী পূজোয় সবচেয়ে বেশী গানবাজনার আসর বসে। কয়েকদিন ধরে যাত্রা, কবিগান, কীর্তন চলে। কয়েক বছর ধ'রে, অনেক টাকা খরচ ক'রে, কলকাতার রেকর্ড-রেডিওর গাইয়েদেরও আনা হ'চ্ছে। সেইটাই রেওয়াজ দাঁড়িয়েছে আজকাল।

অভয় রাজী হল না প্রথমে। মন ভাল নেই। কে শুনবে তার গান? অনাথ খুড়ো তো আসবে না। মুখ ফুটে সেকথা বলল না অভয়!

সুরীন কাকুতি মিনতি করল। শৈলবালাও পীড়াপীড়ি করল জামাইকে। একলা শরৎদাস নয়। বাজারের আরো আরো মহাজনরা এসে ধরল। তারা কোনো কথা শুনবে না। জামাই কবিয়ালের কেরামতিটা তারা একবার দেখতে চায়।

ভামিনী খুড়িও পুকুরঘাট থেকে চেঁচিয়ে দিব্যি দিলে অভয়কে। না গাইলে খুড়ি বড় দুঃখ পাবে। শৈলবালার বাড়িতে সে আসবে না, তাই ঘাট থেকেই বলতে হ'ল তাকে।

নিমি তো মুখ ফুটে কখনো কিছু বলবে না। তার ইচ্ছা অনিচ্ছা বোঝবার উপায় নেই।

কিন্তু শুধু যে অভয়ের মনটাই খারাপ তা নয়। ভয়ও তো আছে। কতটুকু সে জানে। কোন্ সাহসে দাঁড়াতে আসবে? প্রথমবারের অভিজ্ঞতা বড় তিক্ত। এই দূর দেশে সে রকম দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কম।

কিন্তু প্রতিপক্ষ বয়স্ক, অভিজ্ঞ ঘাগী লোচন ঘোষ। নামে ডাকে যার গগন ফাটে। কলকাতার রেডিওতে লোচন কবি গান করে। আলাপ পরিচয় আছে অভয়ের সঙ্গে। প্রথম পরিচয় পেয়ে, অভয় পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল লোচন ঘোষকে! শুনে নয়, চেহারায়ও পায়ে হাত দেবার মত মানুষ। ছোটখাটো মানুষটি, মুখখানি এই বুড়ো বয়সেও ছেলেমানুষের মত। আর সাজতে পারে ভাল। লুটনো কোঁচা, শাদা ধবধবে আদ্দির পাঞ্জাবী, ঘাড় অবধি বড় বড় চুল। যদিও মাঝখানে এখন টাক প'ড়ে গিয়েছে। আর চোখ দুটিতে সবসময়েই হাসি। একটু অস্বস্তি হয় হাসি দেখে। যেন সবটাই ঠাট্টা, সবটাই শ্লেষ। দুটি দুটি মুদীখানা আছে নিজের। বসতবাটি আছে ভাল। আর কায়স্থ সমাজে সম্মানও আছে। কবিগান ছাড়াও, আর একটি গুণ, ভাল পাখোয়াজ বাজাতে পারে।

এ অঞ্চলে লোচন ঘোষের জমাটি-প্রতিপক্ষ সুবালাদের বাড়িওয়ালী রাজুবালা দাসী। আগে আগে রাজু লোচনের লড়াই যেমন উপভোগ করেছে লোকে, তেমনি আবার দুজনের পীরিত নিয়েও কম কথা হয়নি। আসরে দুজনে ঘোর শত্রু। অন্দরে গালাগালি। সেইটিই লোকের ভাল লাগত।

রাজু-লোচন আলাদা আলাদা কবিয়ালের সঙ্গে গাইলে, সে আসর জমত না। এ অঞ্চলের লোকেরা উঠে চলে যেত। বলত, এ আসর মরা। প্রাণ নেই।

জোয়ার আসে। ভাঁটা যায়। একদিন জোয়ার এসেছিল। এখন ভাঁটা যাচ্ছে। সেদিনকার যৌবন আর নেই। কালের পা' দাগ ফেলেছে তাতে। শুধু গায়ক গায়িকার নয়। সেই সব শ্রোতাদের যৌবন গতায়ু। রাজু এখন গান ছেড়ে দিয়েছে। লোচনও সচরাচর গায়না। মাসে দু'মাসে রেডিওতে কবি গায়। পাখোয়াজ বাজাবার আমন্ত্রণ পায় কখনো কখনো।

সেই লোচন ঘোষের সঙ্গে গান করা কি চাট্টিখানি কথা?

কিন্তু বাতাসের আগে খবর গেল কারখানায়। হরি মিস্তিরিরা সবাই উৎসাহ দিলে। শুধু অনাথ কিছু বললে না। কিন্তু এতগুলি লোকের কথা ঠেলাই বা যায় কেমন ক'রে?

সুরীনকে বলল অভয়, ঘোষ মশায়ের সঙ্গে গাইতে আমার সাহসে কুলোয় না খুড়ো।

সুরীন গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, মন্দ হলেও তোমার মান যাবে না বাবা। ঘোষ অনেক বড়। এখানে হারলে তোমার লজ্জার কিছু নেই। কেউ তোমাকে দুয়ো দেবে না।

আসর বসল।

পাড়াগাঁ নয়। মফস্বল শহরের বাজার। বিজলী-বাতিতে ঝলমলিয়ে উঠল আসর। বাজারের আসরে ভদ্রলোকদের আগমন কমই হয়। দোকানী ফড়ে পাইকের মহাজনদের ভিড়। আর মালীপাড়ার গেরস্থ, আধাগেরস্থ, দেহপোজীবিনীরা দল বেঁধে আসবেই। বারোবাসর-পাড়ার মেয়েমানুষদের শহরের অন্য আসরে যাবার সুযোগ নেই, যেতেও চায় না কেউ। বাজারের আসরটা তাদের নিজেদের হ'য়ে গিয়েছে। বরং তারা না থাকলে বাজারের আসর জমে না।

তবে ভদ্রপাড়ার মেয়েমানুষেরাই শুধু আসে না। পুরুষেরা কামাই দেয় না।

লোচনের হাসি হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে অভয়ের বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। কোনরকমে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল সে লোচনকে।

লোচন চুপি চুপি বলল অভয়কে, মনে জোর আছে তা হ'লে বল?

অভয় চমকে উঠে বলল, এঁজ্ঞে কেন?

লোচন বলল, মনে বল না থাকে তো চুপচাপ বসে থাকতে গো। নমস্কার করতে আসতে কি?

অভয় বলল, এঁকে আপনি গুরুজন, গুণী।

লোচন তেমনি নিঃশব্দে হাসল মিটিমিটি। মনটা দমে যেতে লাগল অভয়ের।

অভয় মার্কিণ কাপড়ের পাঞ্জাবী পরেছে। মিলের ধোয়া ধুতি পরেছে কোঁচা দিয়ে। কিন্তু মিলের ধুতি কখনো তার পায়ের পাতা ছাড়িয়ে নীচে নামে না। কারণ কুলোয় না। গলায় একখানি চাদর জড়িয়েছে। একটু বেশী নীল হ'য়ে গেছে চাদরখানি। বাড়িতে কাচা নীল দেওয়া হয়েছে, তাই।

লোচনের লুটনো কোঁচা আর আদ্দির গিলে করা পাঞ্জাবীর কাছে ওসব চোখেই পড়ে না। তার ওপরে সোনার বোতামের চকচকানি।

মেয়েদের বসবার জায়গায়, রাজুবালা সকলের আগে বসেছে। চির-সধবার বেশ রাজুদের। বৈধব্য তাদের কপালে লেখা নেই। শালপাড় শাড়ির ওপরে, মুগার পাতলা চাদর জড়িয়ে, কপালে সিঁদুর প'রে বেশ ঘরোয়ানা হ'য়ে এসেছে।

লোচন ঘোষ গিয়ে যখন তার কাছে দাঁড়াল, বয়স্কদের সকলের চোখ গিয়ে পড়ল সেদিকে। স্বপ্ন নেমে এল সকলের চোখে। আর একবার তারা তাদের হারানো যৌবনকে প্রত্যক্ষ করছে।

লোচন বলল, ছ্যাখো দিখিনি কি কাণ্ড। এই বুড়ো বয়সেও রেহাই পেলুম না।

রাজু তার চির-প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি, বয়সের গাঢ় ছায়া-ভরা চোখ দুটি দিয়ে তাকিয়ে হাসল। বলল, ভালই তো। তোমার যে বড় সৌভাগ্য ঘোষ মশায়।

লোচন বলল, আর কি সেদিন আছে রাজু? ছোকরার কাছে হেরে গিয়ে আমার মাথা হেঁট হবে।

রাজু অবিশ্বাসের হাসি হাসল দাঁতহীন ঠোঁটে। অপাঙ্গে তাকিয়ে, চিরকালের সেই স্নেহ মুখ ঝামটা না দিয়ে পারল না, নাও, আর আদিখ্যেতা ক'রোনা বাপু।

অর্থাৎ লোচনের পরাজয় যে কোনোকালেই সম্ভব নয়, তা' জানে রাজু। কারণ, ঘোষের কপালে সে দুর্ভোগ কোনোদিন ঘটেনি।

রাজু আবার বলল, ছোঁড়াটার গলা ভাল। এদিকে লড়বে কেমন, বলতে পারি নে।

কোনদিন তো আসরে নামে নি।

কথাটা যেন কেমন? সান্ত্বনা দিচ্ছে লোচন ঘোষকে, লোচন তাকাল রাজুর বুড়ি চোখের দিকে।

লোচনের চাউনির অর্থ বুঝে রাজু বলল, আহা! অমন তাকিয়ে আছ কেন!

অভয়ও এল রাজুর সামনে। অভয়কে দেখে, রাজুবালার দু' চোখে ঈর্ষা ফুটে উঠল। ভাঁজ-পড়া ঠোঁটে দেখা দিল বিদ্রূপ।

অভয় বলল, আশীর্ব্বাদ কর গো মাসী।

রাজু বলল, তাই করছি। ঘোষের কাছে হারলেও তোমার সেটা জয় হবে, মনে রেখ।

যেন অভয়ের পরাজয় চায় রাজু। লোচনের সঙ্গে লড়াই যে আজ তার সঙ্গে লড়াইয়েরই সামিল।

অভয় বলল, সেই মানটাই যেন থাকে।

মেয়েদের আসরে সুবালা ছিল একদিকে। তাদের বারোবাসরপাড়ার দলের সঙ্গে। মালীপাড়ার গেরস্থ দলের সঙ্গে, নিমি আর একদিকে।

সুবালা ডেকে বলল অভয়কে, এই, এই যে গো?

সুবালার দিকে চোখ তুলতে গিয়ে, অভয় অনুভব করল তার সর্বাঙ্গে নিমির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিঁধেছে।

সুবালা বলল, লড়াই যা হবে তা তো বুঝতেই পারছি। সেই সাতকেলে রামায়ণ আর মহাভারত শোনাবে দুজনে। ঘেন্না ধ'রে গেছে শুনে শুনে। একটু ভাল পদ বানিও। শুনে যেন ভাল লাগে।

কথাটা লোচনের কানে যেতে সে একটু অবাক হ'য়ে তাকাল সুবালার দিকে। অভয় জবাব দিল, সাতকাল গেলে আর এককাল থাকবে। তরপরেই বল হরি হরি।

সবাই হেসে উঠল।

অভয় ঘুরে গিয়ে দাঁড়াল নিমিদের সামনে। না, নিমির মুখে রাগের ছাপ পড়েনি।

তবে খুব খুশি-খুশিও নয়। বিশুর বউ বলল, হারলে পাড়ায় ঢুকতে দেব না কিন্তু।

তারপরেই ঢাকে কাঠি পড়ল। কাঁসি তাল দিল, কাঁই নাঁই কাঁই নাঁই।

শরৎদাস এসে ফুলের মালা পরিয়ে দিল আগে লোচনকে। পরে অভয়কে।

আসর বেশ জমে উঠেছে।

লোচন দেবদেবীর, পরে গুরুর বন্দনা করল। তারপর হাত জোড় ক'রে, সকলের দিকে তাকিয়ে গাইল লোচন,

অনেক দিন পরে
বাজারের চত্বরে
গাইতে এলুম কবি গান ॥
(বন্ধুরা মাপ করিবেন)

হেসে উঠে গাইল

সঙ্গে গাইবে অভয়
তিনি দিয়েছেন অভয়
রাখিবে লোচনেরো মান ॥
(বন্ধুরা মাপ করিবেন)

ঠাট্টাচ্ছলে আরও খানিকটা ভনিতা করে, আসর জমিয়ে নিল লোচন। অভয় মাথা নীচু করে, ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ খুঁটছে।

লোচন হঠাৎ একবার কোমর নাড়াল, আর শব্দ করল একটা জোরে। ঢুলীও ওস্তাদ। হাত দিয়ে ঢোলকের বাঁ দিকে এমন ডলা দিয়েছে, প্রায় লোচনেরই গলার স্বরের মত একটা আওয়াজ করে উঠল।

লোচন গাইল।

ভাই সাতকেলে নয় চিরকেলে
রামায়ণ আর মহাভারত পেলে
এখনো বুকে ধরে রাখি।
(বন্ধুরা মাপ করিবেন)

সুবালার ভ্রূ কুঁচকে উঠল। তাকে চিমটি কাটল গিরিবালা।
—মর মুখপুড়ি, আর বলতে যাবি ?

নিমিও হাসল ঠোঁট উল্টে। অভয়ও হাসল ঘাড় দুলিয়ে।

লোচন গেয়ে চলেছে,

আমাদের বাপ ঠাকুরের পরিচয়
রামায়ণ মহাভারতে ক্ষয়
আদি ইতিহাসের কোথাও নাই বাড়ী।
(বন্ধুরা মাপ করবেন)

পুরাণ ছাড়া নতুন নাই
জবাব দিও হে অভয় ভাই
কোন্ ভগবতী স্বামী থাকতে চির বিধবা।
(ধুয়া)

দিতি ও অদিতি কথা
বিনতার কহ বার্তা
কি যাতনায় চিতা জেলে মরেন দেবী অম্বা।
(ধুয়া)

লোচনের প্রশ্নাবলীতে সবাই বিস্ময়ে ও কৌতূহলে চোখ বড় বড় ক'রে উঠল। সকলেরই চোখ গিয়ে পড়ছে বারে বারে অভয়ের ওপর !

অভয় নত মস্তক। পাথরের মত স্তব্ধ।

লোচন একে একে পনরটি প্রশ্নের পর, শেষ প্রশ্ন করল,

অসুরো ঠাকুরো শুক্র
কার কাছে হলেন টুক্‌রো
কাহার যৌবন বীজ ধারণ করিলেন।
(ক্রমশঃ)
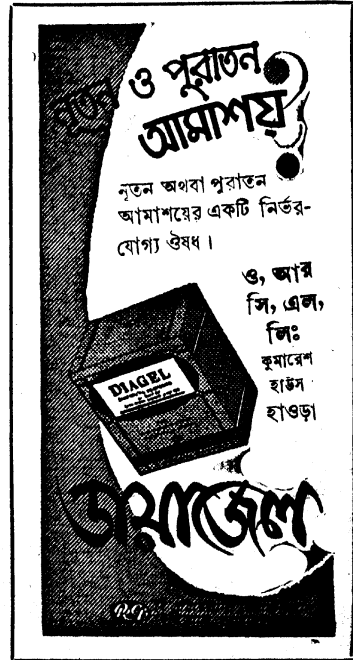
পি. ঈ. এন. ক্লাবের রজতজয়ন্তী উৎসব ও লেখক সম্মেলন

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

পি, ঈ, এন ক্লাব বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রখ্যাত কবি, সম্পাদক, ঔপ-ন্যাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক ও কথাশিল্পীদের নিয়ে সংগঠিত। পৃথিবীর বহু স্বনামধন্য লেখকলেখিকা এই সংস্থার সভ্যভুক্ত। পি, ঈ, এন সংক্ষেপিত শব্দত্রয়ী—এর নামকরণের ভেতর দু'ভাবে এরূপ সুন্দর শব্দ যোজনা হয়েছে যার ফলে সর্ব্বশ্রেণীর সাহিত্য-গোষ্ঠী প্রবেশাধিকার পেয়েছেন—যেমন Poets (কবি) Editors (সম্পাদক) Novelists (ঔপন্যাসিক)। কবি, সম্পাদক ও ঔপন্যাসিককে নিয়ে সংক্ষেপিত শব্দে গড়ে উঠ্‌লো পি, ঈ, এন। আবার Playwrights (নাট্যকার) Essayist (প্রাবন্ধিক) আর Novelists (ঔপন্যাসিক) নিয়েও পি, ঈ, এন এর ঐ একই রূপ।

এই আন্তর্জ্জাতিক সাহিত্য সংস্থা ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মিসেস ডসন স্কট গঠিত করেন। এর নিখিলভারতকেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে। মাদাম সোফিয়া ওয়াদিয়া এই কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাত্রী ও সংগঠয়িত্রী। এর পঁচিশ বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষে ভুবনেশ্বরে এবার রজতজয়ন্তী উৎসব সমারোহে হোলো। এর প্রথম সভাপতি ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, পরবর্ত্তী সভানেত্রী হয়েছিলেন সরোজিনী নাইডু। বর্ত্তমানে সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত আছেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এবং অন্যতম সহ সভাপতিপদ অলঙ্কৃত করে আছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু।

আন্তর্জ্জাতিক সাহিত্য মহামণ্ডলরূপে পি, ঈ, এন ক্লাব পৃথিবীর সর্ব্বদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে—আর ভাব-জগতের ভিতর চরম দুঃসাহসিক বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে, একথা অস্বীকার করা যায় না; এদের সঙ্গে আঁতাত অর্থাৎ মৈত্রীবদ্ধ হয়েছেন ইউনেস্কো, বিশ্বের সর্ব্বদেশের সাহিত্য একাদেমি এবং রাষ্ট্রকর্ণধারগণ। এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্রিক সঙ্কীর্ণ নীতি, ভেদাভেদ, প্রাদেশিকতা, জাতি বর্ণ ধর্ম্ম ও ভাষাগত বৈষম্য দূর করে সর্ব্বত্র প্রখ্যাত লেখক-লেখিকাদের মধ্যে আত্মীয়তা, সৌহার্দ্দ্য, সম্প্রীতি ও আন্তরিকতার মাধ্যমে বিরাট কৃষ্টিগত পারিবারিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়া—আর বিশ্বশান্তি প্রেম মৈত্রী মানবতা ও সর্ব্বপ্রকার মানব কল্যাণের আদর্শকে সুদৃঢ় করে সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নয়নের পথ রচনা করা, যাতে করে হিংসা-কণ্টকিত পৃথিবী শান্তি সমাচ্ছন্ন হয়ে তার মহামঙ্গলের হারানো সুর আবার ফিরে পেতে পারে।

পৃথিবীর যে কোন পি, ঈ, এন শাখাকেন্দ্রের সভ্য শুধু দেশ বিদেশে সমাদৃত হবার সুযোগ পান না, সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ও পেয়ে থাকেন অন্য দেশে অবস্থানকালে, ভ্রমণ, পরিদর্শন, গবেষণা ও আলাপআলোচনা সম্পর্কে স্থানীয় পি, ঈ, এন ক্লাবের চর্চ্চাকেন্দ্রের সহৃদয় দাক্ষিণ্যে—তত্রত্য পি, ঈ, এন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ নানাভাবে সাহায্যে করে থাকেন তাঁদের গোষ্ঠীভুক্ত বিদেশী বন্ধুকে—আর একান্ত আপন জনরূপে নিজেদের কাছে টেনে নিয়ে এই বন্ধুকে আতিথেয়তা দেখাতেও কার্পণ্য করেন না, ফলে, যে কোন দেশের কবি, কথাশিল্পী, সম্পাদক, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিকের পক্ষে অন্যদেশের স্বগোত্রীয়দের সংস্পর্শে এসে চিন্তা মনন ও জ্ঞান রাজ্যের নব নব উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে মনের ভূগোলের অনাবিষ্কৃত প্রদেশ-গুলির সন্ধান করা সম্ভব হয়ে ওঠে। এইটাই হোলো পি, ঈ, এন ক্লাবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

নিখিল ভারত পি. ঈ, এন ক্লাব কেন্দ্রের উদ্যোগে ইতিপূর্ব্বে নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনের অধিবেশন হ'য়েছিল জয়পুর (১৯৪৫) বারাণসী (১৯৪৭) আন্নামালাইনার (১৯৫৪) এবং বরোদায় (১৯৫৭)—এবার পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হোলো ভুবনেশ্বর। এখানে ভারতবর্ষীয় পনরোটী ভাষার পি, ঈ, এন সভ্য-ভুক্ত প্রতিনিধিবর্গ এবং সুইট্‌জারল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থান থেকে এর সভ্যও প্রতিনিধিগণ সাগর পেরিয়ে এসেছিলেন, আর এসেছিলেন তাঁদের বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারবর্গ প্রতিনিধির অধিকার গ্রহণ করে—প্রতিনিধি শিবিরে সকলেই ছিলেন রাজ-অতিথির সমাদর ও মর্য্যাদা নিয়ে। উড়িষ্যার রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় পি, ঈ, এন ক্লাবের অভ্যর্থনা সমাদর, আপ্যায়ন ও আতিথেয়তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক প্রতিনিধির ব্যাজ রৌপ্য নির্ম্মিত, আর উড়িষ্যা শিল্প শ্রীমণ্ডিত তারের কারুকার্য্যে সুন্দর ও সুশোভন হয়ে বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেছিল।

উড়িষ্যার নব রাজধানী ভুবনেশ্বর ভারতের অন্যতম পুণ্যতীর্থ ও ঐতিহাসিকক্ষেত্র। আজ এসেছে উড়িষ্যার নব জাগরণ। এই রাজ্যের তরুণ প্রাণে জেগে উঠেছে অনেক কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, অনেক কিছু হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। এখানকার মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-সম্প্রদায় স্বেচ্ছাসেবকের ভার গ্রহণ করে অক্লান্তভাবে যেরূপ কর্ম্মনিষ্ঠা, কর্ম্মতৎপরতা, কর্ত্তব্যবোধ ও দায়িত্ব জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে, তাতে তাদের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—একদা ইতিহাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্তে আসবে তাদের পরম মাহেন্দ্র লগ্ন। ভুবনেশ্বরে আজ গড়ে উঠ্‌ছে নব নব সৌধশ্রেণী বিশাল বিস্তৃতক্ষেত্রের ওপর—আর গড়ে উঠ্‌ছে মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্পকলায় তার বিশিষ্ট স্বাক্ষর রাখ্‌বার জন্যে—কিন্তু দুঃখের বিষয় যে মাটিতে বাংলার তরুণের মন তৈরী হয়ে এসেছে সুদীর্ঘকাল ধরে, সে মাটি আজ যেন বদলে গেছে—বাঙালী ছাত্র-সম্প্রদায় যারা সকলক্ষেত্রে ছিল পুরোভাগে—আজ যেন হটে আসছে, এইটী হয়ে উঠ্‌ছে আমাদের কাছে মর্ম্মান্তিক বেদনা।

উড়িষ্যার পশ্চাতে আছে বিরাট ঐতিহ্য, আছে তার গৌরবময়

পটভূমিকা। প্রাচীন কলিঙ্গের বেশীর ভাগ অংশ আর প্রাচীন উৎকলের কিছু অংশ একত্রিত হয়ে গড়ে উঠেছে সাম্প্রতিক উড়িষ্যা। ভাগীরথী থেকে সুরু করে গোদাবরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ হচ্ছে কলিঙ্গ আর পূর্ব্বদিকে বাংলার সমীপবর্ত্তী গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্য্যন্ত বাহু বিস্তার করে, ও কোশলের পশ্চিম সীমা এবং কলিঙ্গের উত্তর পশ্চিম অংশ পর্য্যন্ত সীমা রেখা টেনে উৎকল আপনাকে প্রকাশ করেছে। উৎকল আর কলিঙ্গ সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমগোষ্ঠীভুক্ত—কেননা উভয় দেশের রাজন্যবর্গ ইতা-সুদ্যুম্ন বংশোদ্ভুত।

মহাভারতে কলিঙ্গ দেশকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন বলা হয়েছে। মহাভারতের যুদ্ধ সমাপ্তির পর থেকে মহাপদ্ম নন্দের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত বত্রিশজন ক্ষত্রিয় রাজা প্রায় এক হাজার বৎসরের ওপর এখানে রাজ্যশাসন করেছিলেন। শুধু কলিঙ্গ নয়, ভারতের সর্ব্বত্র সমস্ত ক্ষত্রিয় শাখা-প্রশাখা নির্ম্মূল করে গেছেন মহাপদ্ম নন্দ। পরবর্ত্তী সময়ে কলিঙ্গ পরাক্রমশালী হয়ে ওঠে। চন্দ্রগুপ্ত এবং তাঁর পুত্র বিন্দুসার কলিঙ্গ জয় করতে সাহসী হননি, অশোকই কলিঙ্গ জয় করেন। উড়িষ্যার ধৌলি ও জৌগড় গিরি প্রদেশে অশোকের লিপি খোদিত আছে। সার্ব্বভৌম সম্রাট খারাভেলার অধীনে কলিঙ্গ আবার স্বাধীন হ'য়ে ওঠে—খণ্ডগিরিতে তাঁর লিপি খোদিত। ব্রাহ্মণ্য, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের সমন্বয়-সংযোগস্থল এখানেই লক্ষ্য করা যায় ত্রিবেণী সঙ্গমের মত।

খারা ভেলার সময় থেকে সপ্তম অথবা অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত উড়িয়া ভাষার কোন নিদর্শন নেই। প্রায় অষ্টম শতাব্দীতে সিদ্ধগণ তাঁদের গান রচনা করতে আরম্ভ করেন। সহজিয়া বৌদ্ধ সিদ্ধগণের মধ্যে লুই পাদ, কানু পাদ, শবরপাদ শান্তিপাদ উল্লেখযোগ্য। উড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় লুই, কানু, শবরপাদ প্রভৃতি সিদ্ধগণের সঙ্গীতে। ঐ সব গান ও আধুনিক উড়িয়া রচনা পাশাপাশি রেখে পড়লে দেখা যাবে এদের মধ্যে আছে অনেকখানি মিল। নরসিংহ দেবের (১২৫৯ খৃঃ) প্রস্তর খোদিত লিপির দিকে দৃষ্টিপাত করলে বুঝা যায় কি ভাবে উড়িয়া ভাষা আধুনিক রূপ নেবার দিকে দ্রুততর এগিয়ে চলেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সরল মহাভারত, চণ্ডীপুরাণ ও বিলাঙ্ক রামায়ণ লিখেছেন সরল দাস। এঁর আবির্ভাবের একশো বছর আগে এসেছিলেন বিখ্যাত লেখক বৎস দাস। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গদ্য ও পদ্য মিশ্রিত অদ্ভুত গদ্য সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় রুদ্র সুধানিধির মধ্যে।

বলরাম, জগন্নাথ, যশোবন্ত, অনন্ত ও অচ্যুত এই কয়জন ঈশ্বরের কৃপাসিদ্ধ মহাসাধকের প্রত্যেকেই এক লক্ষ কবিতা রচনা করেছিলেন। তুলসী দাসের রামায়ণ রচনার নব্বই বৎসর পূর্ব্বে বলরাম দাস রামায়ণ রচনা করেছিলেন। এটা বাল্মিকী রামায়ণের মূল অনুবাদ নয়—অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রভাব এর মধ্যে আছে। ঐ পাঁচজন মহাসাধক ও শ্রীচৈতন্যদেব উড়িষ্যারাজ প্রতাপ রুদ্রদেবের গুরু হোলেও পরম গুরুরূপে স্থান পেয়েছিলেন বলরাম দাস। উড়িষ্যার ধর্ম্ম ও সাহিত্য জগতে জগন্নাথদাস (১৪৯০ খৃষ্টাব্দ) বিরাট জ্যোতিষ্ক ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় বহু ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ তিনি লিখেছিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁকে 'অতিবাদী' (সর্ব্বোত্তম পুরুষ) বলে অভিহিত করেছেন। জগন্নাথ দাসই বৈষ্ণব অতিবাদী সম্প্রদায় গঠন করেন। তাঁর ভাগবত সংস্কৃত ভাগবতের অনুবাদ নয়। উড়িয়া ভাগবত সংস্কৃত ভাগবত অপেক্ষা উত্তম। আজও উড়িষ্যার ঘরে ঘরে এই ভাগবত পাঠ হয়ে থাকে।

যোগ, তন্ত্র ও বৈদান্তিক তত্ত্ব আর তথ্যগুলিকে অবলম্বন করে যশোবন্ত দাস শিব স্বরোদয়, প্রেমভক্তি, ব্রহ্মগীতা, মালিকা প্রভৃতি রচনা করে সুপ্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। হেতুদয় ভাগবত, মালিকা (ভবিষ্যদ্বাণী) বাখর (ধর্ম্মোপদেশ,) সম্বাদ (গল্প) এবং কতকগুলি অতীন্দ্রিয়মূলক কবিতা রচনা করে গেছেন অনন্তদাস।

অচ্যুতানন্দ দাস মহাযোগী ছিলেন। তাঁকে অনেকে বৌদ্ধ বৈষ্ণব বলেছেন। তিনি যে সব গ্রন্থ লিখে গেছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শূন্য সংহিতা, অনাকার সংহিতা, গুরুভক্তি গীতা আর পদ্মকল্প টীকা। উপরোক্ত ঈশ্বরের কৃপাসিদ্ধ পাঁচজন সাধকের রচনাবলী উড়িষ্যার ধর্ম্ম সাহিত্য, ভাষা এবং রাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়রূপে পরিগণিত হয়েছে। বিপ্র নারায়ণ দাসের হরিবংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উড়িষ্যার বহু প্রাচীন কবি সহজ সুন্দর ভাষায় মহাকাব্য রচনা করে গেছেন। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এবং তৎপরবর্ত্তীকালে কবিরা আলঙ্কারিক ও অপ্রাকৃতিক ভাব প্রয়োগপদ্ধতিতে কবিতা রচনা করতে সুরু করলেন। অর্জ্জুন দাসের রামবিভা, দামোদর দাসের রসকুল্যা চৌতিসা, শিশু শঙ্করের উষাবিলাস, লক্ষ্মণ মহান্তির উর্ম্মিলা ছন্দা, কপিলেশ্বর দাসের কপটকেলি, হরিহর দাসের চন্দ্রাবতী বিলাস, বৃন্দাবন দাসের রসবারিধি, রামচন্দ্র পট্টনায়কের হারাবতী প্রভৃতি পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর উড়িয়া সাহিত্যে অমূল্যরত্নরূপে সমাদৃত হয়েছে। দেশের সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে নায়ক-নায়িকা সৃষ্টি করে রামচন্দ্র পট্টনায়ক হারাবতী রচনা করেছেন, এজন্যে এর বৈশিষ্ট্য আছে।

যে সব কবির কবিতায় আলঙ্কারিকতা ও অপ্রাকৃতিকতার লিখনশৈলী ফুটে উঠেছে, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ধনঞ্জয় ভঞ্জ, দীনকৃষ্ণদাস, লোকনাথ বিদ্যাধর, ত্রিবিক্রম ভঞ্জ প্রভৃতি। এঁরা পুরুষও প্রকৃতির ভালোবাসা সংক্রান্ত বিষয়ে কবিতা লিখেছেন উচ্চাঙ্গের রসসৌন্দর্য্য ফুটিয়ে। উড়িয়া সাহিত্যে কবিসম্রাট রূপে স্থান পেয়েছেন উপেন্দ্র ভঞ্জ। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে এঁর জন্ম আর তিরোভাব ১৭২০ খৃষ্টাব্দে। এঁর মধ্যে অপূর্ব্ব কবিপ্রতিভা অভিব্যক্ত হয়েছে। এঁর পরবর্ত্তীকালে বহু খ্যাতনামা কবি জন্মগ্রহণ করেছেন যেমন ঘনভঞ্জ, দাশরথি দাস, কৃপাসিন্ধু পট্টনায়ক, রঘুনাথ ভঞ্জ, সদানন্দ কবিসূর্য্য, চক্রপাণি পট্টনায়ক, বিশ্বনাথ খুন্তিয়া, বিশ্বম্ভর দাস, যদুমণি মহাপাত্র, কবিসূর্য্য বলদেব রথ প্রভৃতি। উড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় গানে আর গীতিকবিতায়। উড়িয়া কবিদের চৌতিসা অনবদ্য, এই সব চৌতিসা পদ সমগ্র উড়িষ্যায় আজও গাওয়া হয়ে থাকে। চৌপদী সঙ্গীতের প্রাচুর্য্যও লক্ষ্য করা যায়। গীতিকার হিসাবে কপিলেন্দ্র দেব, ধনঞ্জয়, উপেন্দ্র ভঞ্জ, সালবেগ, বনমালি পট্টনায়ক, বিশ্বনাথ খুন্তিয়া, কবিসূর্য্য বলদেব রথ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ব্রজবুলি ভাষায় যে সব উড়িয়া বৈষ্ণব কবি পদ রচনা করে গেছেন তন্মধ্যে দামোদর দাস, চণ্ডকবি, মাধবী দাসী, রায় রামানন্দ এবং যদুপতি প্রধান।

উড়িষ্যার বিদগ্ধ সমাজ গদ্যেও সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্পকলা বিষয়ক বস্তুর ওপর নানা সূত্রে রচনা করে গেছেন। বর্ত্তমান উড়িয়া সাহিত্যের অভ্যুদয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে জাতীয় জাগরণের সময় থেকে। উড়িষ্যার সাহিত্যাকাশে তিনটী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে এসেছিলেন রাধানাথ রায়, ফকিরমোহন সেনাপতি, এবং মধুসূদন রাও। গদ্যসাহিত্যে আর কথাশিল্পে ফকিরমোহন বিশেষ স্থান অধিকার করে

আছেন। গল্পসাহিত্য প্রবর্তকরূপে তিনি সর্ব্বজনসমাদৃত। উড়িয়া সাহিত্যের অভ্যুদয় যুগের সর্ব্বোত্তম কবি হিসাবে রাধানাথ স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। অতীন্দ্রিয় লোকের বার্ত্তা বহন করে এনে মধুসূদন ভক্তিমূলক কবিতা ও গান রচনা করে গেছেন। গোপবন্ধু দাস, নীলকণ্ঠ দাস, গোদাবরী মিশ্র, পদ্মচরণ পট্টনায়ক প্রভৃতির দান উড়িয়া সাহিত্যে অবিস্মরণীয়। এই সাহিত্যের নবযুগের স্রষ্টা হচ্ছেন সবুজ সাহিত্য সমিতি। দুইটি মহাযুদ্ধের মধ্যবর্ত্তী সময়ে এঁরা করেছেন উদগ্র সাধনা। কুন্তলকুমারী, মায়াধর মানসিংহ, শচীরাউত রায়, অনন্ত পটনায়ক, কামুচরণ মহান্তি, ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব, বৈকুণ্ঠ পট্টনায়ক, রাধামোহন গদনায়ক, নিত্যানন্দ মহাপাত্র, কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী প্রভৃতি বর্ত্তমান উড়িয়া কাব্য সাহিত্যের নক্ষত্রমণ্ডলী। এঁদের কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, ছোট গল্প, নাটক, প্রবন্ধ ও সমালোচনা বরেণ্য স্থান অধিকার করেছে। রামশঙ্কর রায়, ভিখারীচরণ পট্টনায়ক, অশ্বিনীকুমার ঘোষ, ভঞ্জকিশোর পট্টনায়ক, অদ্বৈতচরণ মহান্তি, মনোরঞ্জন দাস প্রভৃতি উড়িষ্যার নাট্য সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। এই সাহিত্যাকাশের অন্যতম উজ্জ্বলজ্যোতিষ্ক অন্নদাশঙ্কর রায়।

এলো ইংরাজী নববর্ষ ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে। একে স্বাগত বন্দনা জ্ঞাপন করে মহাসমারোহে সুরু হোলো পি, ঈ, এন ক্লাবের ভারতবর্ষ কেন্দ্রের রজত জয়ন্তী উৎসব ও পঞ্চমবার্ষিক নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনের অধিবেশন উড়িষ্যার নবরাজধানী পুণ্যতীর্থ ভুবনেশ্বরের পাদপীঠে। উড়িষ্যার প্রধানমন্ত্রী সুসাহিত্যিক ও কবি ডক্টর হরেকৃষ্ণ মহতাবের অধিনায়কত্বায় উড়িষ্যা পি, ঈ, এন ক্লাবের শাখা-সঙ্ঘ ও রাজ্যসরকারের উদ্যোগে অধিবেশন ও উৎসব সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হয়েছে ১লা জানুয়ারী থেকে ৩রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত। এর সঙ্গে প্রদর্শনীও খোলা হয়েছিল—শুধু যে মানুষের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যও শিল্পকলার নিদর্শনীগুলি বিভিন্ন বিপণিতে সুসজ্জিত হয়েছিল তা নয়, বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথিপত্র সম্বলিত চিত্রপ্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যার ভেতর থেকে উড়িষ্যার সভ্যতাও সংস্কৃতির অগ্রগমনের পথের সন্ধান পাওয়া আমাদের পক্ষে সহজ হয়েছে। যদিও ইতিহাসের বহু জীর্ণ পুঁথির পাতা উড়ে গেছে বারম্বার বৈদেশিক আক্রমণের দুরন্ত ঝটিকায় চতুর্দ্দশ শতাব্দী থেকে।

ভারতবর্ষের পনরোটী ভাষার প্রতিনিধিবর্গ যোগদান করেছিলেন 'বর্ত্তমান ভারতের উপন্যাস' এবং 'বর্ত্তমান ভারতের সাহিত্য আর তার দাবী' শীর্ষক আলোচনা সভায়। 'লেখকরূপে আমার অভিজ্ঞতা' শীর্ষক বক্তৃতায় অনেকেই মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়েছিলেন। বক্তৃতাগুলি ইংরাজীতে প্রদত্ত হয়েছিল। তাছাড়া ভুবনেশ্বরে রাজ অতিথিশালায় কবি সম্মেলনে পনরোটী ভাষার কবিরা নিজ নিজ ভাষায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছিলেন; উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী নিজেও কবি, তাঁর স্বরচিত কবিতা-আবৃত্তি চিত্তগ্রাহী হয়েছিল। সুইট্‌জারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিদের সমাবেশ হয়েছিল ভুবনেশ্বর অধিবেশনে। এঁরাও বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাছাড়া সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার বাণী বাহক বিশ্বসাহিত্য-সংস্থার প্রতিনিধিকেও দেখা গিয়েছিল। এঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন পনেরোটী দেশের সাহিত্যিকদের নিয়ে গড়ে তুলেছেন কংগ্রেস বা সংস্থা। এঁদের প্রধান কার্য্যালয় প্যারিসে। পি, ঈ, এনের নিখিল ভারত কেন্দ্রের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি ডাঃ এস্ রাধাকৃষ্ণণ এবং অন্যতম সহসভাপতি শ্রীজহরলাল নেহেরু। ভুবনেশ্বরের প্রদর্শনী ও সম্মেলনের উদ্বোধক হয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী, আর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি। তিন দিন ধরেই দুবেলা অধিবেশন হয়েছে, তারপর ছিল ভুবনেশ্বরের রাজঅতিথিশালায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশভোজ, কটকে রাজভবনে নাট্যাভিনয়ও নৈশভোজ। উড়িষ্যা সরকারের আনুকূল্যে কোনারক, ভুবনেশ্বর, পুরী, কটক ও চিল্কাহ্রদ ভ্রমণ ও পরিদর্শন করে প্রতিনিধিরা আনন্দলাভ করেছিলেন। রাজ্যসরকার প্রতিনিধিদের সর্ব্বপ্রকার সুবিধার সুন্দর সুব্যবস্থা করেছিলেন। এঁদের রাষ্ট্রপরিবহন, ও মোটরকারগুলির আনুকূল্যে নানাদিক দেখবার সুযোগ পাওয়া গিয়াছিল। উড়িষ্যার গঙ্গাবংশের অপূর্ব্ব স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন হচ্ছে কোনারকের সূর্য্যমন্দির। ভুবনেশ্বর থেকে চল্লিশ মাইল দূরে এই মন্দির অবস্থিত রাজধানীর দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে। তৃতীয় নরসিংহদেবের বারো বৎসরের রাজস্ব ব্যয় করা হয়েছিল এই মন্দির নির্ম্মাণ করতে, বারো বছর ধরে দুইশত স্থাপত্য শিল্পী এই মন্দির নির্ম্মাণ করেছিলেন। সাত হাজার মন্দিরের বর্ত্তমানে পাঁচশত মন্দির রয়েছে উড়িষ্যায়, ভুবনেশ্বরের কাছে শিশুপাল গড়ের ধ্বংসাবশেষ ভূগর্ভ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এর ভেতর থেকে অতীতের অজ্ঞাত ইতিহাসও বেরিয়েছে। উড়িষ্যার মন্দিরগুলিতে আছে অপূর্ব্ব সজীব স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন—এই নিদর্শনগুলিকে চারভাগে ভাগকরা যেতে পারে (১) সামাজিক (২) ধর্ম্মসংক্রান্ত [৩] আলঙ্কারিক আর [৪] প্রচলিত (Conventional)—উড়িষ্যা আর্টের সর্ব্বোত্তম পরিণতি লাভ হয়েছে কোনারক মন্দিরে। চতুর্দ্দশ শতাব্দী থেকে বারম্বার মুসলমান আক্রমণের ফলে উড়িষ্যা থেকে গৌরবময় স্থাপত্য শিল্পের তিরোধান ঘটে। তারপর উড়িষ্যার নিজস্ব সত্তাও হারিয়ে যায় পরভৃতিকার মত।

পুরীর সমুদ্র উপকূলে উর্ম্মিমালার অবিশ্রান্ত নৃত্য ও কল্লোলধ্বনি, নানাদিকে বিস্তৃত বালুকাকীর্ণ প্রান্তর, নদীসমূহের মোহানায় বদ্বীপ আর পশ্চিমে উপরিভাগের অধিক্যতায় শৈলমালা, চল্লিশ মাইল লম্বা চিল্কা হ্রদ আর হিংস্র শ্বাপদ সঙ্কুল ঘন অরণ্যরাজি উড়িষ্যার জীবনীশক্তিকে সুদৃঢ় করেছে—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যধারায় নিত্য অবগাহন করে ধর্ম্মপ্রাণ হয়ে উঠেছে উড়িয়া জীবনে। তাই প্রতি পদক্ষেপে দেখতে পাওয়া যায় দেবতার মন্দির—আর শোনা যায় শঙ্খঘণ্টাধ্বনি ও স্তব গুঞ্জন। পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালা এখানে অত্যুচ্চ নয়—এই পর্ব্বতমালায় পানে চেয়ে চেয়ে মানুষ আত্মহারা হয়ে ওঠে, সমুদ্র আর তার তরঙ্গহিল্লোল ও অবিশ্রান্ত গর্জ্জন মানুষের অন্তরে কত ভাব অনুভাবই না জাগিয়ে তোলে! পুরী দর্শনের সময়ে রেলওয়ে হোটেলে আমাদের বৈকালিক জলযোগের ব্যবস্থা হয়েছিল, চিল্কাহ্রদের ধারে ডাক বাংলোয় করেছি মধ্যাহ্ন ভোজন আর প্রত্যাবর্ত্তনের পথে খুর্দ্দাক্লাব আমাদের সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে অপরাহ্ণিক চা-পানের ব্যবস্থা করেছিলেন। ভুবনেশ্বর গেষ্ট হাউসে উড়িষ্যার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব এবং কটক রাজভবনে রাজ্যপাল ডিনারে আমাদের আপ্যায়ন করেছিলেন। ভুবনেশ্বরে নৈশভোজে আমাদের সঙ্গে ছিলেন পণ্ডিত জহরলাল ও রাধাকৃষ্ণণ। কোণারক পরিভ্রমণেও এঁরা ছিলেন আমাদের সাথী। আমরা পেয়েছিলাম আমাদের পথ নির্দ্দেশক হিসাবে উড়িষ্যা সরকারের টুরিষ্ট অফিসার শ্রীযুক্ত বনবিহারী রথকে। এঁকে মনে হোলো ইতিহাসের বিশ্বকোষ। এঁর বন্ধুত্ব, সাহচর্য্য, ভালোবাসা, নম্র ব্যবহার আমাদের অবিস্মরণীয়।

সাহিত্য সাধনার ভেতর দিয়ে আজ আমাদের উদ্বোধন করতে হবে মহা দৈবীশক্তিকে—যে শক্তি নিহিত আছে শব্দের ভেতর, ভাষার ভেতর, ভাবের আদান প্রদানের ভিতর—সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত করতে হবে মানুষের মন আর রাজনৈতিক জুয়াড়ীদের হাত থেকে কেড়ে নিতে হবে মানুষের মনের শাসন ভার! তবেই সার্থক হবে বর্ষে বর্ষে আন্তর্জ্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন, তবেই অনাগত পৃথিবীর নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারবে সাহিত্যসাধকেরা। আর আসবে পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্ধি।

ছোট্ট মুন্নি কেন কেঁদেছিল

X52 BG

মুন্নি ফোঁপাতে আরম্ভ করল তারপর আকাশফাটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। মুন্নির বন্ধু ছোট্ট নিন্টু ওকে শান্ত করার আপ্রান চেষ্টা করছিল, ওকে নিজের আধ আধ ভাষায় বোঝাচ্ছিল—"কাঁদিসনা মুন্নি—বাবা আপিস থেকে বাড়ী ফিরলেই আমি বলব—" কিন্তু মুন্নির ভ্রুক্ষেপ নেই, মুন্নির নতুন ডল পুতুলটির দুধে আলতায় মেশানো গালে ময়লার দাগ লেগেছে, পুতুলের নতুন ফ্রকের ওপর পড়েছে ময়লা আঙ্গুলের ছাপ—আমি আমার জানলায় দাঁড়িয়ে এই মজার দৃশ্যটি দেখছিলাম। আমি যখন দেখলাম যে মুন্নি কোন কথাই শুনছেনা তখন আমি নিজে এলাম। আমাকে দেখেই মুন্নির কান্নার জোর বেড়ে গেল—ঠিক যেমন 'এঙ্কোর, এঙ্কোর' শুনে ওস্তাদদের গিটকিরির বহর বেড়ে যায়। আমাদের প্রতিবেশির মেয়ে নিন্টু—আহা বেচারা—ভয়ে জবুথবু হয়ে একটা কোনায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঠিক কি করব বুঝতে পারছিলামনা। এমন সময় দৌড়ে এলো নিন্টুর মা সুশীলা। এসেই মুন্নিকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—"আমার লক্ষী মেয়েকে কে মেরেছে?"

কান্না জড়ানো গলায় মুন্নি বলল—"মাসী, মাসী, নিন্টু আমার পুতুলের ফ্রক ময়লা করে দিয়েছে।"

অতুল দত্ত

গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও কমুনিজম্—এই দুইয়ের বিরোধে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে যে সঙ্কট, তাহার তীব্রতা বর্ত্তমানে কতকটা হ্রাস পাইয়াছে। তবে, এই অবস্থাটা সাময়িক, না ইহার কোনও স্থায়ী মূল্য আছে, তাহা প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হইবে। আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির এই পরিবর্ত্তন সাধনে সোভিয়েট ইউনিয়নের সহকারী প্রধানমন্ত্রী মিঃ মিকোয়ানের আমেরিকা সফর অনেকখানি সহায়তা করিয়াছে।

মিঃ মিকোয়ানের মার্কিণ সফর—

জানুয়ারী মাসের প্রথমে সোভিয়েট রুশিয়ার সহকারী প্রধানমন্ত্রী মিঃ মিকোয়ান আমেরিকায় গমন করেন এবং এক পক্ষ কাল সমগ্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ করেন। ইহা তাঁহার বেসরকারী সফর; সোজাসুজি মার্কিণ সরকারের সহিত ও মার্কিণ জনসাধরণের সহিত আলাপ-আলোচনা করাই তাঁহার এই সফরের উদ্দেশ্য। মিঃ মিকোয়ান্ সরকারী স্তর অপেক্ষা বেসরকারী স্তরে আলোচনার উপরই বেশী গুরুত্ব দিয়াছিলেন। আমেরিকায় তাঁহার আলোচনাকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। রাজনৈতিক আলোচনার সময় তিনি প্রধানতঃ বার্লিন সম্পর্কে সোভিয়েট প্রস্তাব এবং জার্ম্মানী সম্পর্কে শান্তি-চুক্তির প্রস্তাব লইয়াই আলোচনা করিয়াছিলেন। অর্থনৈতিক স্তরে আলোচনাকালে সোভিয়েট-মার্কিণ বাণিজ্যের প্রস্তাব শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। বেসরকারী স্তরে মেলা-মেশা ও আলাপ-আলোচনার দ্বারা তিনি সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে মার্কিণ জনসাধারণের ভুল ধারণা অনেকখানি দূর করিতে সমর্থ হন; শীতল-সংগ্রামী প্রচারের প্রভাব অনেকটা নষ্ট হয়। অর্থনীতিক্ষেত্রে সোভিয়েট-মার্কিণ বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারেও মিঃ মিকোয়ান্ বেসরকারী মহলে সোভিয়েট ইউনিয়নের ঐকান্তিক আগ্রহ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 'নিউইয়র্ক' টাইমসের' যে প্রতিনিধিটি মিঃ মিকোয়ানের মার্কিণ সফরের সময় তাঁহার সঙ্গে ঘুরিয়াছিলেন, তিনি বলেন, "সহকারী সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী সর্ব্বত্র গভীর রেখাপাত করিয়াছেন; শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী-শ্রেণী তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন—সরকারী মহলের নীতিতে এবং বেসরকারী ব্যবসায়ী মহলের মনোভাবে পার্থক্য রহিয়াছে, এই কথাই তাঁহাকে বোঝান হইয়াছে।"

জার্ম্মানীর সহিত সন্ধি-চুক্তির প্রস্তাব—

মিঃ মিকোয়ান্ আমেরিকায় সফর করিবার সময়ই সোভিয়েট ইউ-নিয়নের পক্ষ হইতে জার্ম্মানী সম্পর্কে সন্ধি-চুক্তির খসড়া প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এই প্রস্তাবে দুই মাসের মধ্যে প্রাগে অথবা ওয়ারসতে শান্তি-চুক্তির জন্য বৈঠক আহ্বান করিতে বলা হইয়াছে এবং উল্লেখ করা হইয়াছে যে, জার্ম্মানীর "সমরবাদ" ও "প্রতিশোধ বৃত্তির" অবসান ঘটানই এই চুক্তির উদ্দেশ্য। প্রস্তাবের প্রধান কথা হইল দুই জার্ম্মানীর (পশ্চিম জার্ম্মান্ গভর্ণমেণ্ট ও পূর্ব্ব জার্ম্মান্ গভর্ণমেণ্ট) স্বীকৃতি; এক পক্ষে সহযোগী শক্তিবৃন্দ এবং অন্য পক্ষে দুইটি জার্ম্মান্ গভর্মেণ্টের মধ্যে এই চুক্তি হইবে। চুক্তির সর্ত্ত—চুক্তিবদ্ধ কোনও শক্তির বিরুদ্ধে জার্ম্মানী সামরিক জোট গঠন করিতে পারিবে না; পূর্ব্ব ও পশ্চিম জার্ম্মানী যথাক্রমে ওয়ারশ চুক্তি ও অতলান্তিক চুক্তি হইতে মুক্তি পাইবে; ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে জার্ম্মানীর যে সীমান্ত ছিল, উহাই তাহার সীমান্ত হইবে। এই প্রস্তাব সম্পর্কে মিঃ মিকোয়ান্ বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন; স্বাধীন নির্ব্বাচনের দ্বারা জার্ম্মানীকে ঐক্যবদ্ধ হইতে না দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন যে, পূর্ব্ব-জার্ম্মানীর জনসাধারণ তাহাদের গভর্ণমেণ্টকে সমর্থন করে। তিনি জানাইয়াছিলেন যে, জার্ম্মানী সম্পর্কে শান্ত আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য সোভিয়েট রুশিয়া এল্‌ব নদীর দুই পাশে পাঁচ শত মাইল পর্য্যন্ত দুই পক্ষের সৈন্য অপসারণের ব্যবস্থা সমর্থন করে।

বাগদাদ্ চুক্তি কাউন্সিলের বৈঠক—

গত জানুয়ারী মাসে করাচীতে বাগদাদ্ চুক্তি কাউন্সিলের বৈঠক একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জ্জাতিক ঘটনা। গত বৎসর ইরাকে সামরিক বিপ্লব বাগদাদ্ চুক্তি সংস্থাকে দারুণ আঘাত করিয়াছিল; এই বিপ্লবের ফলে বাগদাদ্ চুক্তির একমাত্র আরব স্তম্ভ ধ্বসিয়া পড়ে। বাগদাদ্ চুক্তির এই ভাঙ্গা ঘর মেরামত করাই ছিল করাচীতে অনুষ্ঠিত চুক্তি-কাউন্সিলের সাম্প্রতিক বৈঠকের উদ্দেশ্য। এই অধিবেশনের পূর্ব্বে ইরাণের কতকগুলি সংবাদপত্রে ইরাকের বর্ত্তমান শাসক-শক্তির বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হয়। কোনও কোনও সংবাদপত্র ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক তৎপরতার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন এবং ইরাকের তৈলপ্রধান মসুল ও কার্কুক অধিকার করিয়া লইতে বলেন। ইরাণী মজলিসেও (আইন সভা) ইরাকের বিরুদ্ধে গরম গরম বক্তৃতা হইতে থাকে। সীমান্ত অঞ্চলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং ছোটখাটো হাঙ্গামা ঘটে। পাকিস্থানে ভারত-বিরোধী প্রচারের মাত্রা এই সময় খুবই চড়ে; আফগানিস্তানের বিরুদ্ধেও প্রবল প্রচার আরম্ভ হয়। সিরিয়ার বিরুদ্ধে তুরস্ক বহুকাল হইতে নানাবিধ অলীক অভিযোগ করিয়া আসিতেছিল, এই সময় ঐ অভিযোগগুলির পুনরাবৃত্তি আরম্ভ হয়। বাগদাদ্ চুক্তির মুসলমান রাষ্ট্রগুলি হঠাৎ প্রতিবেশীদের সম্পর্কে এত খাপা-

দাবি করিবার বিশেষ কারণ ছিল। আমেরিকা ইহাদের প্রত্যেকের সহিত স্বতন্ত্রভাবে সামরিক চুক্তি করিতে চাহিতেছে। করাচীতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার কথা ছিল। পাকিস্থান, ইরাণ ও তুরস্ক তাহাদের সমগ্র প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহে। শুধু কমুনিষ্টদের আক্রমণই নহে—যে কোন রকম আক্রমণ হইতে বাঁচাইবার দায়িত্ব তাহারা আমেরিকার ঘাড়ে চাপাইতে চাহিতেছে। এই দাবীর সমর্থন যোগাইবার জন্যই প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে এই বর্দ্ধিত চীৎকার। তাহাদের আশা—এই দাবী গ্রহণে আমেরিকাকে সম্মত করাইতে পারিলে প্রতিবেশীরা ভয়ে তটস্থ হইবে। কিন্তু আমেরিকা ততদূর অগ্রসর হইতে চাহে নাই। করাচী সম্মেলনে মার্কিণ প্রতিনিধি লয় হেণ্ডার্সন শোনান যে, মার্কিণ কংগ্রেসের নির্দ্দেশ—শুধু কম্যুনিজম্ প্রতিরোধের জন্যই সামরিক সাহায্য দেওয়া হইবে। মার্কিণ শাসন বিভাগ সে নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করিতে পারেন না। এই মতবিরোধের জন্য আপাততঃ করাচীতে দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তিগুলি স্বাক্ষরিত হইতে পারে নাই।

বাগদাদ্ চুক্তি সংস্থাকে সুসংহত কম্যুনিষ্ট-বিরোধী সামরিক ঘাঁটীতে পরিণত করিবার যে আশা আমেরিকা পোষণ করিয়াছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ইরাক্ এই সংস্থার বাহিরে যাওয়ায় সে আশা শীঘ্র পূর্ণ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। তাহার পর ১৯৫৬ সাল হইতে মধ্যপ্রাচ্যে যে আইসেনহাওয়ার নীতি প্রবর্তনের চেষ্টা হয়, তাহাও ব্যর্থ হইয়াছে। কোনও আরব রাষ্ট্রকেই এই নীতির আওতায় রাখা সম্ভব হয় নাই। প্রথমে রাজনৈতিক সাহায্য, তাহার পর সামরিক সাহায্য এবং শেষ পর্য্যায়ে সামরিক চুক্তি সম্পাদন ছিল আইসেনহাওয়ার নীতির লক্ষ্য। সেই নীতি ব্যর্থ হওয়ায় এবং বাগদাদ্ চুক্তির ভিত্তি শিথিল হইয়া যাওয়াতেই তুরস্ক, ইরাণ ও পাকিস্থানের সহিত আমেরিকা সামরিক চুক্তি করিতে আগ্রহী হইয়াছে। এই সব চুক্তির দ্বারা ঐ দেশগুলিকে পাকা সোভিয়েট-বিরোধী ঘাঁটীতে পরিণত করা তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু আরব রাষ্ট্রগুলির সহিত প্রত্যক্ষভাবে সে শত্রুতা করিতে চাহিতেছে না; ভারত ও আফগানিস্থানকেও সে চটাইতে চাহে না। সেই জন্যই কম্যুনিষ্ট আক্রমণ ব্যতীত অন্য কোনও ব্যাপারে আশ্বাস দিতে সে প্রস্তুত নয়।

আমেরিকার মধ্যপ্রাচ্যনীতি ও নাসের—

আরব রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে এতকাল আমেরিকা যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে, এখন তাহার কতকটা সংশোধনে সে প্রয়াসী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রও (মিশর ও সিরিয়া) যেন আমেরিকার এই সংশোধিত নীতিতে প্রকারান্তরে সাড়া দিতেছে। ইতিপূর্ব্বে আমেরিকা নানাভাবে মিশর ও সিরিয়াকে চাপ দিতে চেষ্টা করিয়াছিল। এই নীতির ফলে মিশর ও সিরিয়া কম্যুনিষ্ট শিবিরের নিকটবর্ত্তী হয়। সম্প্রতি সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট আসোয়ান্ বাঁধ নির্ম্মাণে ৪০ কোটী রুব্‌ল্ সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতিতে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রে রুশিয়ার জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় এখন আমেরিকা মিশরকে চাপ দিবার নীতি ত্যাগ করিয়া তাহার সহিত সদ্ভাব স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। সম্প্রতি বৃটেনের সহিত মিশরের আর্থিক লেন-দেন সম্পর্কিত মীমাংসার মধ্যস্থতা করিয়াছেন বিশ্ব-ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান্ ইউজেন্ ব্ল্যাক্। ইহা আমেরিকার ইঙ্গিতেই সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে করা যুক্তিসঙ্গত। আর প্রেসিডেণ্ট নাসের গত ডিসেম্বর মাসে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রে কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করেন। তাহার পরেই জানুয়ারী মাসে মিশর ও সিরিয়ায় কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে ধর-পাকড় চলে। মিশরে চারশত পরিচিত কম্যুনিষ্টদের মধ্যে একশত কারারুদ্ধ হয়, সিরিয়ায় গ্রেপ্তারের সংখ্যা আরও বেশী। আরব সাধারণতন্ত্রে এই কম্যুনিষ্ট-বিরোধী তৎপরতা নিছক আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হয়ত নহে। প্রেসিডেণ্ট নাসের হয়ত আমেরিকাকে বুঝাইতে চাহিতেছেন যে, কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের সহিত তাহার সম্পর্ক যাহাই হউক না কেন, কম্যুনিজমের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নাই; অতএব, আমেরিকা যেন সংযুক্ত-আরব সাধারণতন্ত্রকে সন্দেহের দৃষ্টিতে না দেখে।

বেল্‌জিয়ান্ কঙ্গোয় হাঙ্গামা—

গত জানুয়ারী মাসে বেল্‌জিয়ান্ কঙ্গোয় আফ্রিকানদের বিদ্রোহ এবং কিউবায় ডিক্টেটারী শাসনের অবসান দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিছুদিন পূর্ব্বে ঘানার রাজধানী আক্রায় আফ্রিকাবাসী জনগণের এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনের কঙ্গোয়ান প্রতিনিধিগণ বেল্‌জিয়ান্ কঙ্গোর রাজধানী লিওপোল্ডভিলেতে আহূত এক সভায় বক্তৃতা দিবেন, স্থির ছিল।

কর্ত্তৃপক্ষ এই সভার প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রবর্ত্তন করা সত্ত্বেও গত ৪ঠা জানুয়ারী এই সভার আয়োজন হয়। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী জোর করিয়া এই সভা ভাঙ্গিতে সচেষ্ট হইলে হাঙ্গামা সৃষ্টি হয় এবং চার দিন ধরিয়া শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে কৃষ্ণকায়দের আক্রমণ এবং পাল্টা আক্রমণ চলে। এই হাঙ্গামায় সরকারী হিসাবে নিহতের সংখ্যা ৭১ জন; কিন্তু বেসরকারী হিসাবে অনেক বেশী। এই হাঙ্গামা সম্পর্কে হজকিন্ মন্তব্য করিয়াছেন…the explosion was an historical accident in the sense nobody planned it. এই হাঙ্গামার পর বেল্‌জিয়ান্ গভর্ণমেণ্ট কঙ্গোর শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই নূতন প্রস্তাব অনুসারে গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন "অর্গান" সম্পর্কে নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইয়াছে, বর্ণ-বৈষম্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইবে, নূতন শ্রমিক আইন প্রবর্তিত হইবে, শিক্ষা-ব্যবস্থারও কিছু প্রসার ঘটিবে।

কিউবায় ডিক্টেটারীর অবসান—

গত জানুয়ারী মাসে কিউবার সামরিক ডিক্টেটার জেনারেল ফুলগেন্‌সিও বাতিস্তা বিতাড়িত হইয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে তিন বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ কাস্ত্রোর নেতৃত্বে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। এতদিনে সে বিদ্রোহ সাফল্য লাভ করিল। কিউবায় এই বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য এই যে, গ্রামাঞ্চলে ইহার উদ্ভব; সেখান হইতে ইহা রাজধানী হাভানা পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। লাটিন আমেরিকায় সাধারণতঃ গভর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তন হয় সহরাঞ্চলের সামরিক অভ্যুত্থানে। এই দিক হইতে কিউবায় বিদ্রোহের সহিত ল্যাটিন্ আমেরিকার অন্যান্য দেশের বিদ্রোহের মূলগত পার্থক্য। যুদ্ধোত্তরকালে লাটিন্ আমেরিকায় ডিক্টেটারীর অবসান এক বিশেষ আন্তর্জ্জাতিক ঘটনা। গত ১৯৫৫ সালে আর্জ্জেন্টিনায় পেরণের পতন হইতে এই প্রগতিশীল ধারার আরম্ভ। কিউবার পর এখন শুধু পারাগুয়ে, নিকারগুয়া ও ডোমিনিকায় ডিক্টেটার অবশিষ্ট রহিল। ১০।২।৫৯

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—চব্বিশ—

সেদিন মেরিলিন মুনরোর ছবি দেখল সত্যজিৎ, রেস্তোরাঁয় খেলো পরিতোষের সঙ্গে, বাড়ী ফিরল রাত প্রায় এগারোটায়। খুব সহজ ভাবে নেওয়া যাক জীবনটাকে। আবার ফিরে যাওয়া যাক সেই দিনগুলোর ভেতর—যখন কোনো ভার ছিল না মনের মধ্যে—নিজেকে নিয়ে বিশেষ কোনো দায় ছিল না। সেদিন সকলের সঙ্গে স্রোতের মধ্য দিয়ে চলা: ক্রিকেটের মাঠে, সিনেমায়, ইউনিভার্সিটিতে, পলিটিক্যাল তর্কে, ছাত্র শোভাযাত্রায়। আরো অসংখ্য মানুষের পাশাপাশি পা ফেলে আমিও চলেছি—এইটুকু যথেষ্ট, এর বেশি কিছু ভাববার দরকার ছিল না।

সাড়ে দশটার ট্রামে বাড়ী ফিরতে ফিরতে সত্যজিৎ ভাবছিল, মানুষের বয়স বাড়ে কখন? যখন সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যখন নিজেকে সরিয়ে নেয় এক পাশে। আমি—আমি। তখন পৃথিবীর স্রোতে ভেঙ্গে চলা নয়, তখন ভাবা: এই স্রোত কতখানি বয়ে আছে আমার দিকে, আমার প্রয়োজনে। তখন সেই দার্শনিকের ভাবায়: 'আমি আছি, তাই পৃথিবীর অস্তিত্ব আছে।' সভ্যতারও বয়স বাড়ে এম্‌নি করে। যত বাড়ে—মানুষ তত আত্মকেন্দ্রিক হয়।

সেই নিজের প্রয়োজনেই সত্যজিৎ মনে করেছিল, পূরবী তারই একটি কথার ওপর বিশ্বাস করে শবরীর মতো প্রতীক্ষা করে থাকবে; বনশ্রী এতদিন পরেও সেই গঙ্গার ধারের সন্ধ্যাগুলিকে ভুলতে পারেনি। কিন্তু পূরবী তার ঘোর ভাঙিয়ে দিয়েছে। 'আমিত্বের' উপর মস্ত একটা ঘা খেয়েছে সত্যজিৎ। তাকে বাদ দিয়েও মানুষের আলাদা আলাদা মন আছে—জীবনের আলাদা স্রোত আছে।

আবার ফিরে যাওয়া যায় সকলের ভিতর? সেই সুমিত্র—আবার সেই আস্তিন গুটিয়ে রাজনীতির আলোচনা? আবার সেই খেলার মাঠ—মোহনবাগান স্কোর করলে গ্যালারীর ওপরে সেই লাফানো, আনন্দে পায়ের চটি ছুড়ে ফেলে দেওয়া? পার্কের রেলিঙে হেলান দিয়ে ঘুগ্‌নি আর তেলে ভাজা খাওয়া? বন্ধুর করুণ প্রেমের কাহিনী শুনতে শুনতে তার পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দেওয়া: আরে ঘাবড়াচ্ছিস কেন অত? লেগে থাক্—পেশেন্স্ পে-জ।

ফিরে যেতে পারে কি সত্যজিৎ? বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে যে আমিটা একটু একটু করে নিজের চারদিকে একটা শক্ত খোলা তৈরি করে দিয়েছে—সেটাকে ভেঙে ফেলা কি এতই সহজ আজকে?

কিন্তু সেই চেষ্টাই করতে হবে—নইলে তার মুক্তি নেই। মুখার্জি ভিলার বিষ তার রক্তে তিলে তিলে জমে উঠছে, তার নিজের ব্যক্তিত্বটা গুটিয়ে আসছে নৈরাজ্যের ভেতর—কিছুদিনের মধ্যেই সে সিনিক হয়ে উঠবে। অথচ এই ত্রিশঙ্কু পরিণতিটাকেই ঘৃণা করে সত্যজিৎ—ঘৃণা করে সব চাইতে বেশি।

বাড়ীতে যখন পৌছুল, তখন নীচেটা অন্ধকার। আস্তাবলে পা ঠুকছে ঘোড়াটা: বুড়ো হয়ে যাওয়ার আগে শিবশঙ্করকে নিয়ে অনেক রাতে সে কলকাতার ঘুমন্ত পথ দিয়ে কেশর ফুলিয়ে ছুটে আসত, হয়তো এম্‌নি রাত্রে সেই

স্মৃতি আজো ওর পা-কে চঞ্চল করে তোলে। একবার উপরের দিকে চোখ তুলে তাকালো। হিংস্র উগ্র খানিকটা আলোয় অস্বাভাবিক ভাবে ঝকঝক করে জ্বলছে শিবশঙ্করের কাচের জানলা। কী করছেন এত রাত্রে? অনুমান করতে পারে সত্যজিৎ। এক দৃষ্টিতে হয়তো তাকিয়ে আছেন ভেনাস্ আর অ্যাডোনিসের সেই কুৎসিত ছবিটার দিকে, ডাক্তারের বারণ সত্ত্বেও বসেছেন এক গ্লাস হুইস্কি নিয়ে—আস্তাবলের ঘোড়াটার মতো তাঁরও উদ্দাম দিনগুলিকে মনে পড়ছে।

মার্কারি ক্লকটায় এগারোটা বাজতে আরম্ভ হল। মুখার্জি ভিলায় কালপুরুষের কণ্ঠস্বর। কোনোদিন একটা ভূমিকম্পের ধাক্কায় এই বাড়ীটা যখন বালির স্তূপের মতো এলিয়ে পড়বে (সেই দিনটার কথা প্রায়ই ভাবতে চেষ্টা করে সত্যজিৎ), তখনো সেই ধ্বংস স্তূপের মধ্যে ঘড়িটা সমানে প্রহর গুণতে থাকবে। ওর আর মুক্তি নেই।

বারান্দায় উঠে এল সত্যজিৎ। ম্লান আলোয় দেওয়ালে অর্কিডের ছায়া—কতগুলো ভূতুড়ে আঙুলের মতো কাঁপছে। গ্রাক-পিলারের ওপর ঘুমন্ত পায়রার পাখা ঝাপটানি। প্রীতি বীথির ঘরে একটা ফিকে নীল বাতি জ্বলছে, শোয়ার আগে বোধ হয় রাত্রির প্রসাধন করছে প্রীতি, দরজার খড়খড়ির ফাঁকে মৃদু গানের গুঞ্জন: "তোমারি বিরহে রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাস"—

মুহূর্তের জন্য থেমে দাঁড়াল সত্যজিৎ।

"দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী
দীর্ঘ বরষ মাস"—

এ গান কা'র উদ্দেশ্যে? রীতেন দি গ্রেটার?

ভাবতে ভালো লাগল না। রবীন্দ্রনাথের ওপর মমতা হয়। এইগান লিখবার সময় কা'র কথা ভেবেছিলেন তিনি? রীতেন?

ইন্দ্রজিতের ঘর অন্ধকার। বারান্দার সামনে বসে বসে ঘুমুচ্ছে রঘু—হয়তো সত্যজিতের জন্যই অপেক্ষা করছে। মনে হল এ বাড়ীর যত শ্রান্তি—যত অবসাদ সব যেন রঘুরই মধ্যে ভেঙে পড়েছে।

পা টিপে টিপে সে আবার সিঁড়ি বাইতে লাগল। তেতলায়, নিজের ঘরে।

অন্ধকার। টেবিল, খাট, আয়না, আলনা, বইয়ের আল্‌মারি। অচেনা। স্তব্ধ। মৃত।

সত্যজিৎ দাঁড়ালো। এর মধ্যেই আবছা চোখে পড়ছে বড় আয়নাটা। তার মধ্যে আরো আবছা তার ছায়া। ধূমল, দুর্নিরীক্ষ্য। ব্যক্তি সত্যজিৎ নয়—তার আত্মার প্রতিবিম্ব।

"And after my death
I enter my dark airless tomb
From where"—

From where?

কবি উত্তর দিতে পারেন নি। হয়তো ইন্দ্রজিৎ জানে। আরো অন্ধকারে, আরো নীরন্ধ্র বিষাক্ততার অতলে। কিন্তু সত্যজিৎ কি সে-কথা বিশ্বাস করে? জীবনকে কি সে ও-ভাবে দেখতে চেয়েছে কোনোদিন?

সুইচে আঙুল রেখে। সেটাকে টেনে দেবার আগে আর একবার তমসাচ্ছন্ন আয়নাটায় নিজের আরো তামসী আত্মিক প্রতিবিম্ব দেখল সত্যজিৎ। আর মনে হল, পূরবী অনেক দূরে চলে যাবে—হয়তো কালকেই।

পৃথিবীকে নিজের প্রয়োজনে চাওয়া নয়—নিজেকে পৃথিবীর প্রয়োজনে ছড়িয়ে দিলে তবেই মুক্তি। কিন্তু তাই কি পারে ইন্দ্রজিৎ? এই মুখার্জি-ভিলার সমাধিকক্ষে একবার পা দিলে সে বিশ্বাস টলে যেতে চায়।

খুট ক'রে আলো জ্বলে উঠল। টেবিলে ঢাকা দেওয়া খাবার। "Toothbrush hanging on the wall"—এলিয়টের কবিতা।

জীবন। রাত্রির পর দিন, দিনের পর রাত্রি। মুখার্জি-ভিলার এই গণ্ডীর মাঝখানে থাকা—নিজের চারদিকে শামুকের মতো একটা শক্ত খোলা তৈরি করে যাওয়া। আর মধ্যে মধ্যে মনে হওয়া—পূরবী অনেক দূরে চলে যাবে। হয়তো কালকেই।

তাই তিন দিন পরে একটুও চমকালো না সত্যজিৎ।

একটা বিশেষ রোল নাম্বারের ঘরে লাল কালির লম্বা টান। পরুষ নিরুত্তাপ অক্ষরে লেখা: টেক্‌ন ট্রান্‌স্ফার।

ক্লাসে মুখ তুলে কা'রো দিকে তাকালোনা সত্যজিৎ। এমন কি বীথির রোল-নাম্বারে যখন একটা প্রক্সি পড়ল, তখনও না। তারপর বই খুলে তাকালো সোজা সামনের

দেওয়ালের দিকে, পরিষ্কার গলায় পড়াতে আরম্ভ করল: "In shakespearian tragedies, we always find a strange note of"—

না—ক্লাসের দিকে চোখ সে নামাবে না। পূরবী চলে গেছে। তার ছাত্রীদের দৃষ্টির চাপা সমবেদনার চাইতে অপমান আর কিছুই নেই।

বাড়ী ফিরল তিনটের কাছাকাছি। বারান্দায় একটা ছোট হোল্ড-অল আর স্যুটকেস্। বীথি দাঁড়িয়ে।

—কিরে, কী ব্যাপার?

—বাঃ, আমাদের সেই কন্‌ফারেন্স সাউথ-ইণ্ডিয়ায়? টাকা নিলাম না তোমার কাছ থেকে? দিন ছয়েক লাগবে ফিরে আসতে।

—বাবাকে বলেছিস?

—বললে যেতে দেবেন নাকি?—বীথি হাসল।

—জানতে তো পারবেন। তখন?

—আমার সম্বন্ধে কোনো ইন্টারেস্ট নেই ছোড়দা। তাঁর কালো মেয়েকে তিনি কোনোদিন দেখতে পারেন না। মধ্যে মধ্যে গান শোনবার জন্যে দিদির ডাক পড়বে—আমার নয়। অতএব নিশ্চিন্ত থাকো।

—কিন্তু কাজটা বোধ হয়—

—ভালো হচ্ছে না—না?—সেই আশ্চর্য উজ্জল হাসিটা বীথির: যেন এ-বাড়ীর সবই ভালো চলছে। সবই ভেঙে যাচ্ছে ছোড়দা, এটা তুমি আমার চাইতে বেশি জানো। এখন আর আড়াল রেখে কী হবে? অতএব লক্ষ্মী ছেলের মতো আমার সঙ্গে চলো হাওড়া স্টেশনে। তুলে দিতে হবে মাদ্রাজ মেলে।

সব সমস্যার সমাধান এক মুহূর্তে করে দিলে বীথি।

মুহূর্তের জন্য সত্যজিতের দৃষ্টি ঘুরে গেল বীথির মুখের উপর দিয়ে। মুখার্জি-ভিলার ফাটলে সূর্যের আলোর একটা ঝলক। এই মেয়েটা এখানে প্রক্ষিপ্ত। এ বাড়ির আলো-বাতাস-বিহীন উজ্জ্বল গৌরবর্ণতার ভিতর কোথা থেকে এনেছে রৌদ্রের রঙ—অরণ্যের শ্যামশ্রী। শিবশঙ্কর সহজাত সংস্কারেই চিনে নিয়েছেন—ও এখানকার কেউ নয়, এখানে ওকে মানায় না।

বীথি আবার বললে, ভাবছ কি? চলো। বড্ড ভীড় হবে গাড়িতে।

—দাঁড়া, চা খাই এক পেয়ালা।

—চা খাবে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে।

সত্যজিৎ হাসল: এদিকে তো এত বড় বড় কথা—একা স্টেশনে যাওয়ার সাহস নেই?

—আছে। কিন্তু তোমাদের ভ্যানিটিকে একটু খুশি করতে চাই। অবলাত্বের সুবিধেটুকু ছাড়ব কেন? দেখো গাড়িতে জায়গা না থাকলেও কোনো সহৃদয় পুরুষ আমাকে বসবার জায়গা করে দেবেন।

—তুই ডেঞ্জারাস মেয়ে। আচ্ছা—চল—

—বাবাকে ম্যানেজ করবার ভার কিন্তু তোমার।

—সে দেখা যাবে, চল্।

ট্রেনে বীথিকে তুলে দিতে অসুবিধে হল না। একটা দল ওদের ছিলই—একখানা থার্ডক্লাশ আগে থেকেই দখল করা ছিল ওদের।

আবার সন্ধ্যা। আবার নিজের ঘর।

টেবিলের উপরে একরাশ প্রুফ। বনশ্রী পাঠিয়েছে।

বিরক্তিকর। আজ সারাদিন মনের কাছে একা থাকতে চেয়েছিল সত্যজিৎ। নিজের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে ভাবতে চেয়েছিল পূরবীর কথা। কিন্তু উপায় নেই। কেউ সময় দেবেনা তাকে—এক মুহূর্তেও না।

এমন সময় প্রীতি।

—কী চাই?

—একটা খুব দরকারি কথা।

—বলো।—হতাশায় চেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিলে সত্যজিৎ: বলে যাও।

প্রীতির মুখ লাল টকটকে। উত্তেজনার শ্বাস পড়ছে ঘন ঘন।

—ছোড়দা—আমি—আমি—রীতেনকে বিয়ে করতে চাই।

দারুণভাবে চমকে উঠল সত্যজিৎ—চমকে উঠল প্রীতিও। ঝন্ ঝন্ করে একটা অস্বাভাবিক শব্দ বেজে উঠল সারা বাড়ীতে। আছড়ে আছড়ে পেয়ালা-পিরিচ ভাঙছে ইন্দ্রজিৎ।

আর আর্ত চিৎকার।

ইন্দ্রজিৎ তারস্বরে ভিলোঁর কবিতার আবৃত্তি করছে।

ক্রমশঃ

গ্রহ জগৎ

ভাগ্যভাব

উপাধ্যায়

জাতকাভরণে উল্লিখিত আছে—'ভাগ্যস্থানং পরং জ্ঞেয়ং বিহায় ভবনান্তরম্। আয়ুর্বিদ্যা যশোবিত্তং সর্ব্বভাগ্যে প্রতিষ্ঠিতম্॥ বিহায় সর্ব্বং গণকৈর্বিচিন্ত্যং ভাগ্যালয়ং কেবলমত্রযত্নাৎ। আয়ুশ্চ মাতা চ পিতা চ বংশো ভাগ্যান্বিতে নৈব ভবন্তিধন্যাঃ।' রাশিচক্র বিচারে দ্বাদশ ভাবের মধ্যে নবম বা ভাগ্যভাব সর্ব্বপ্রধান। একে ধর্ম্মভাবও বলা হয়। প্রথমে এই ভাব বিচার করে শেষে অন্যান্য ভাব বিচার করা বিধেয়। আয়ুঃ বিদ্যা যশ এবং ধন সমস্তই ভাগ্যে প্রতিষ্ঠিত। এজন্যে জ্যোতির্বিদ্গণ অন্যান্য ভবন ত্যাগ করে যত্নের সঙ্গে ভাগ্যস্থানের বিচার করবেন, কেননা জীবন, মাতা, পিতা আর বংশ ভাগ্যবান ব্যক্তির দ্বারাই ধন্য হয়।

নবম ভাবকে ভাগ্যভাব বলে। নবম ভাব ও বৃহস্পতি থেকে ভাগ্য প্রভাব, গুরুর অনুগ্রহ, ধর্ম্মানুষ্ঠান, উরুপ্রদেশ, বামপদ প্রভৃতি বিষয়ে লক্ষ্য করা হয়। লগ্ন থেকে নবমস্থান ও চন্দ্র থেকে নবমস্থান এই দুইটীর ভেতর যেটী বলবান রাশি, সেটী থেকে ভাগ্যভাবের ফলফেল বিচার করতে হয়। ভাগ্যভাবে গুরু, তৃতীয় সন্তান, চতুর্থ ভ্রাতা বা ভগ্নী, নবম সন্তান, পৌত্র পৌত্রী, পুত্রের প্রথম পুত্র ও দৌহিত্র-পত্নী, শ্যালক বা শ্যালিকা, বিশেষতঃ স্ত্রীর কনিষ্ঠ ও কনিষ্ঠা প্রভৃতি আত্মীয়গণের শুভাশুভ বিচার হয়ে থাকে। বিচারের সময়ে এই নবমস্থানটীকে লগ্ন মনে করে রাশিচক্রস্থ গ্রহসংস্থান দেখে উপরোক্ত আত্মীয়দের সম্পর্কে ফলাফল বলা হয়ে থাকে।

ভাগ্যভাব বলবান হোলে প্রাক্তন সুকৃতি বলে অন্যান্য ভাবেরও ফলাফল শুভ হয়। ভাগ্যস্থান দুর্ব্বল হোলে নানারকম যোগ থাক্‌লেও জীবনে বাঞ্ছিত ফল লাভ ও সুখৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তি ঘটে না। নবমস্থানে বহু পাপগ্রহ থাকলে আর ভাগ্যাধিপতি বা লগ্নাধিপতি হীনবল হোলে ভাগ্যহানি ঘটে। ভাগ্যস্থানের অধিপতি ভাগ্যস্থানে থাক্‌লে বা সেখানে তার দৃষ্টি থাক্‌লে স্বদেশেই ভাগ্যলাভ হয়, আর যদি ভাগ্যস্থান নবমাধিপতি ভিন্ন অন্য স্বীয় উচ্চগ্রহস্থ শুভ গ্রহের দ্বারা যুক্ত বা দৃষ্ট হয়, তা হোলে বিদেশে ভাগ্যলাভ হয়। পাপ ও ক্রুর গ্রহযুক্ত বা দৃষ্ট হোলে ভাগ্যোন্নতি বিশেষ হয় না, বহু দুঃখ কষ্ট জীবনে ভোগ করতে হয়।

নবম স্থানে সমস্ত গ্রহের যোগ বা সমস্ত গ্রহের দৃষ্টি থাকলে জাতক বিশেষ ধনী, সৌভাগ্যবান ও রাজতুল্য হয়। নবমে শুভগ্রহ দৃষ্টি বর্জ্জিত গ্রহ নীচস্থ, অস্তগত বা শত্রুগৃহগতরূপে অবস্থান করলে দুর্ভাগ্য হয়। ভাগ্যাধিপতি ও বৃহস্পতি শুভাধিক বর্গগত আর ভাগ্যস্থান শুভগ্রহ যুক্ত হোলে জাতক ভাগ্যবান হয়। ভাগ্যস্থ অশুভগ্রহ তুঙ্গী স্বগৃহী বা মিত্রগৃহী হোলে ভাগ্য যশ, ধন ও ধর্ম্মের উন্নতি ঘটে। ভাগ্যাধিপতি যে রাশিতে থাকেন, সেই রাশির অধিপতিই ভাগ্যকর্ত্তা। এই ভাগ্যকর্ত্তা তুঙ্গী, স্বগৃহী, মিত্রগৃহী, বর্গবলে বলী হোলে ভাগ্যবৃদ্ধি হয়, কিন্তু নীচস্থ দুঃস্থানগত, শত্রুগৃহী, পাপগ্রহযুক্ত, পাপাধিক বর্গগত হোলে ভাগ্যহানি হয়।

কেন্দ্রস্থান গ্রহশূন্য হোলে ভাগ্যভাব শুভ হয় না। ভাগ্যস্থ গ্রহ স্বতুঙ্গস্থ হোলে জাতক অতিশয় ভাগ্যবান ও ধনৈশ্বর্য্যশালী হয়। সর্ব্বগ্রহ দৃষ্ট বৃহস্পতি ভাগ্য স্থানে থাক্‌লে জাতক মহাভাগ্যশালী ও রাজমন্ত্রী হয়। ভাগ্যে অবস্থিত শুভগ্রহ, দুর্ব্বল হোলেও জাতক ধার্ম্মিক হয়। বৃহস্পতি যদি ভাগ্যে থাকে, আর ভাগ্যের অধিপতি থাকে কেন্দ্রে—আর লগ্নপতি বলশালী হয়, তা হোলে জাতক বিশিষ্ট সৌভাগ্যবান হয়। লগ্নাধিপতি ভাগ্যে, ভাগ্যাধিপতি লগ্নে আর সপ্তম স্থানে বৃহস্পতি থাক্‌লে জাতক অতিশয় ভাগ্যশালী হয়। ভাগ্যাধিপতির সঙ্গে মীনরাশির ২৭ অংশে শুক্র আর লগ্ন থেকে তৃতীয় স্থানে শনি থাক্‌লে জাতক বহু ভাগ্যশালী হয়। বৃহস্পতি ও শুক্র শুভ রাশিতে থেকে ভাগ্যভাব বা সুখভাব গত হয় অথবা ভাগ্যাধিপতি কেন্দ্রে বলবান হোলে জাতক বহু গ্রামের অধিপতিও যানবাহন সম্পন্ন হয়। যাদের ভাগ্যাধিপতি কেন্দ্রে থাক্‌লে বাল্যে আর উচ্চস্থ বা ত্রিকোণস্থ হোলে যৌবনে সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করে। বৃহস্পতি, চন্দ্র যে রাশিতে অবস্থিত তার অধিপতি বা লগ্নাধিপতি কেন্দ্রে অবস্থান করলে যৌবনে সুখী হয়। কেন্দ্র ত্রিকোণ ভিন্ন অন্য স্থানে ভাগ্যাধিপতি স্বক্ষেত্রগত বা মিত্র গৃহগত হোলে জাতক শেষ বয়সে ভাগ্যবান হয়। চন্দ্র ও রবি সুনীচস্থ বা নীচ রাশিগত হয়ে নীচাভিমুখী হোলে সমস্ত ভাগ্যযোগ নষ্ট হয়। যার কোষ্ঠীতে রবি ও চন্দ্র দুর্ব্বল, তার ভাগ্যোদয়ে নানা বাধা বিপত্তি ঘটে। নবমাধিপতি শত্রুমধ্যগত হোলে আর নবম স্থানে পাপ ও শত্রু গ্রহের দৃষ্টি থাকে তা হোলে জাতক পরধর্ম্মরত হয়। বৃহস্পতি ভাগ্যগত হোলে আর ভাগ্যাধিপতি কেন্দ্রে অবস্থান করলে বিশ বছর বয়সের পর ভাগ্যোদয় ঘটে। ভাগ্যাধিপতি ধনভাবগত হোলে আর ধনাধিপতি ভাগ্য স্থানে অবস্থান করলে বত্রিশ বর্ষের পর

জাতক যানবাহন সম্পন্ন ও কীর্ত্তিমান হয়। বুধ কন্যা রাশির ১৫ অংশে আর ভাগ্যাধিপতি ভাগ্যস্থানে অবস্থান কর্‌লে চল্লিশ বৎসরের পর ভাগ্যোদয়। বিচার দ্বারা যে যে গ্রহ উন্নতি কারক বলে ঠিক করা হয়, সেই সেই গ্রহ নির্দ্দিষ্ট বয়সের পর ফল দিয়ে থাকে। রবি উন্নতিকারক হোলে বাইশ বছরের আগে উন্নতি হয় না। চন্দ্র চব্বিশ, মঙ্গল আটাশ, বুধ বত্রিশ, বৃহস্পতি ষোলো, শুক্র পঁচিশ ও শনি ছত্রিশ বর্ষ পরে স্ব স্ব ফল প্রদান করে। রাহু ৭১ বর্ষ থেকে নিজের ফল পূর্ণভাবে দিতে পারে। শনি ও মঙ্গল অশুভ হয়ে পরস্পর কেন্দ্রবর্ত্তী হোলে অত্যন্ত কষ্ট, নানাবিধ ঝঞ্ঝাট ও অশান্তি প্রদান করে। ৩৯ থেকে ৪০ বর্ষ পর্যান্ত কষ্ট পেতে হয়। কৃত্তিকা, রেবতী, স্বাতী ও পুষ্যানক্ষত্রস্থ শুক্র ভাগ্যগত হোলে বিশেষ ভাগ্যপ্রদ। নবম ভাবাধিপতি ও নবমভাবকারক পাপদৃষ্ট, পাপযুক্ত অথবা পাপ মধ্যগত হোলে পিতার দুঃখ হয়। নবমে শনি থাক্‌লে যদি লগ্নাধিপতি ও চন্দ্র নীচ রাশিগত হয় তা হোলে জাতক ভিক্ষাজীবী হয়। অষ্টমে মঙ্গল, নবম বা পঞ্চমে রবি ও দশমে চন্দ্র থাক্‌লে মানুষ ভিক্ষুক হয়। কর্কট লগ্ন জাতকের রাশিচক্রে তুলায় শনি, বৃষে চন্দ্রতুঙ্গী এবং বৃহস্পতি মকরে থাক্‌লে তার মন্ত্র সাধনায় সিদ্ধি ও অন্তে মুক্তিলাভ হয়। কেন্দ্রস্থ চন্দ্র বা শুক্র বৃহস্পতির দ্বারা দৃষ্ট হোলে দারিদ্র্য যোগ নষ্ট হয়। চন্দ্রের দ্বিতীয়ে ও দ্বাদশে কোন গ্রহ না থাক্‌লে কেমদ্রুম যোগ হয়। এই যোগে জন্ম হোলে অঙ্গরোগ, দারিদ্র্য, কুপুত্র, অসতী স্ত্রী, পাপাশয় ও নানা দুঃখভোগী হয়ে মানুষ জীবনে কষ্ট পায়। ভাগ্যাধিপতি কর্ম্মস্থানে, কর্ম্মাধিপতি ভাগ্যে থাকলে উৎকৃষ্ট রাজযোগ হয়। এই যোগে জাত ব্যক্তি সৌভাগ্যবান হয়। নবমে কেতু ও মঙ্গল, দ্বিতীয়ে বৃহস্পতি, পঞ্চমে বুধ, ষষ্ঠে রবি ও সপ্তমে শুক্র থাক্‌লে জাতক অতীব ধনশালী হয়। লগ্নাধিপতি ভাগ্যাধিপতির সহিত একত্র হয়ে পঞ্চমাধি-যুক্ত হোলে সন্তানগণের দ্বারা ধন ও ভাগ্যলাভ। দ্বিতীয়াধিপতি নবম স্থানে থাক্‌লে উত্তরাধিকারসূত্রে ভাগ্যলাভ। নবমভাবপতি, ভাগ্যভাব কারক বৃহস্পতি ও শুক্র তৃতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশে থাক্‌লে জাতক ভাগ্যহীন হয় আর কেন্দ্র, ত্রিকোণ বা আয় স্থানে থাক্‌লে ভাগ্যবান হয়। নবম স্থান দুর্ব্বল হোলে মানুষ ধার্ম্মিক হয় না। নবম পতি শুভগ্রহ ও শুভস্থান অর্থাৎ কেন্দ্রকোণগত হোলে ভাগ্যাদির উন্নতি আর ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ স্থান গত হোলে ভাগ্যাদির হানি ঘটে থাকে। ভাগ্য স্থানে পাপগ্রহ, ভাগ্যাধিপতি পাপসংযুক্ত অথবা ক্রুর গ্রহের নবাংশে বা ষষ্ঠাংশে কিম্বা পাপগ্রহের মধ্যবর্ত্তী হোলে জাতক পাপকার্য্যে রত হয়। যদি বৃহস্পতি কিম্বা শুক্র উচ্চাংশে অথবা মিত্র বা শুভগ্রহের নবাংশে অবস্থান করে এবং ভাগ্যাধিপতি গ্রহ বলবান হয় তা হোলে জাতক ধর্ম্মাধ্যক্ষ হয়। যাদের ভাগ্যাধিপতি ও লগ্নাধিপতি তৃতীয় স্থানে বা ভাগ্য স্থানে কিম্বা বলবান হ'য়ে উচ্চ রাশিতে অবস্থান করে তারা শ্রেষ্ঠ মানব হয়ে থাকে। দ্বিতীয়াধিপতি নবমে ও নবমাধিপতি জ্ঞাতি কারক গ্রহের সঙ্গে দ্বিতীয় স্থানে থাক্‌লে জাতক জ্ঞাতি ভাগ্যলাভ করে। জন্ম সময়ে লগ্ন, তৃতীয় ও পঞ্চম স্থানগত বলবান গ্রহের নবম স্থানে দৃষ্টি থাক্‌লে জাতক রূপবান, ভোগবান ও অর্থবান হয় এবং যানবাহন সম্পত্তি ভোগ করে। রবি ও চন্দ্র রাজার কারক। রামচন্দ্রের কুণ্ডলীতে রবি ও চন্দ্র কেন্দ্রগত হয়ে বিশেষ বলশালী হয়েছে, এইজন্যে ইনি প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন।

***

ফাল্গুন মাসের ব্যক্তিগত লগ্ন ও রাশির ফলাফল

মেষ

মোটামুটি ভাবে মাসটা ভালো যাবে। উচ্চপদস্থ বন্ধু প্রাপ্তি। লাভ। বিলাসব্যসনের উপকরণ প্রাপ্তি। শত্রুনাশ। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। শেষভাগে ভ্রমণে কষ্টলাভ, সাময়িক স্বাস্থ্যহানি। কলহ বিবাদ। পতনের সম্ভাবনা বা আঘাত প্রাপ্তি। অকারণ মানসিক উদ্বেগ। বায়ু ও পিত্তপ্রকোপ। ভূম্যাধিকারীর পক্ষে মূলতঃ কোন অবস্থার উন্নতি না হোলেও বাড়ী বা ভূমির ক্রয় বিক্রয়ে আর্থিক উন্নতি। মামলামোকর্দ্দমা সংক্রান্ত ব্যাপারে অশুভ সময়, এজন্যে আপোষনিষ্পত্তি করে নেওয়াই ভালো। চাকুরীজীবীর পক্ষে মাসটী ভালো নয়। ব্যবসায়ে ও প্রোফেসানে খুব ভালো ফল দেখা যাবে। ভরণী নক্ষত্রা-শ্রিত ব্যক্তির পক্ষে শুভ ফলগুলি সম্পূর্ণভাবে পাওয়ার অন্তরায় ঘটবে। প্রণয়ের ক্ষেত্রে মেয়েদের পক্ষে অপ্রত্যাশিত নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি বা অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ। অধ্যাত্মপথে যে সব ধর্ম্মপ্রাণা নারী সাধনা করছেন, তাঁরা ভগবৎ কৃপালাভ কর্‌বেন ও নানারকম ভাব ও দর্শনের মাধ্যমে সাধনায় অগ্রসর হবেন।

বৃষ

ফাল্গুন মাসের শেষের দিক থেকে চৈত্রের গোড়া পর্য্যন্ত সময়টী ভালো, প্রথম দিকটা নানাপ্রকার অশান্তি, উপদ্রব, শত্রু বৃদ্ধি ক্লান্তি-জনক ভ্রমণ ও আশাভঙ্গ, অর্থব্যয় প্রভৃতির জন্যে কিছু কষ্টভোগ আছে। এমন কি মামলামোকর্দ্দমায় পরাজয় পর্য্যন্ত ঘটতে পারে। শারীরিক দুর্ব্বলতা। শ্লেষ্মাপ্রকোপ। পারিবারিক শান্তি, মধ্যে স্বজন-বিরোধ। সন্তানের পীড়া। অর্থপ্রাপ্তি। সকল কাজে বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে কিছু কিছু সাফল্য। ফাটকায় ক্ষতি। প্রথমদিকে চাকুরি-জীবীর পক্ষে শুভ নয়, শেষের দিকে কিছু ভালো। ভূম্যাধিকারী বা বাড়ীওয়ালার পক্ষে নানা অশান্তির কারণ ঘটবে। ব্যবসায়ী ও পেশা-জীবীর অবস্থার উন্নতি। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে, মেয়েদের পক্ষে ভালো বলা যায় না। রোহিণীনক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির ভাগ্যে বেশী কষ্টভোগ।

মিথুন

মাসের শেষের দিকটা আদৌ ভালো যাবে না। স্ত্রীলোকের সহিত কলহ, মিথ্যা অপবাদ, সকল কাজে বাধা, অসৎসর্গ, চিত্তচাঞ্চল্য ও ও বিক্ষোভ, বদ্‌মেজাজ, আর্থিক অস্বচ্ছন্দতা, ব্যয়াধিক্য, ভয় প্রভৃতি দেখা যায়। মাসের প্রথম দিকটায় অশুভ ফল কমই হবে। রক্তের চাপাধিক্য, চক্ষুপীড়া, যকৃৎঘটিত দোষ, পিত্তপ্রকোপ। পারিবারিক অশান্তি। আত্মীয় স্বজনের সহিত মনোমালিন্য। প্রথম দিকে আর্থিক অবস্থা উদ্বেগ জনক হবে না। মাসের শেষের দিকে বিশেষ আর্থিক ক্ষতি যোগ আছে। সম্পত্তিসংক্রান্ত গোলযোগ। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ। ব্যবসায়ী ও পেশা জীবীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নয়। মাসের প্রথম দিকটা মেয়েদের পক্ষে বেশ ভালো বলা যায়। সকল দিকেই

এ মাসে মেয়েরা ভালো ফলই পাবে, তবে কোনপ্রকার উচ্চ আশার বশবর্ত্তী হয়ে নব প্রচেষ্টায় নিজেকে নিযুক্ত করা চলবে না।

কর্কট

এ মাসটী ভালোই যাবে। মোটামুটি সব কাজেই সাফল্য। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। স্বাস্থ্যলাভ। বন্ধুমিলন। খ্যাতি প্রতিপত্তি। বিলাস-ব্যসনের দ্রব্যাদি লাভ। গুরুজনবর্গের সহৃদয় ব্যবহার। সৌভাগ্য-সূচনা। পুনর্ব্বসু ও অশ্লেষা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে শুভফলগুলি পূর্ণ-ভাবে আয়ত্ত হবে। স্ত্রী-পুত্রের সামান্য পীড়াদি। মাসের প্রথম দিকে বন্ধুবান্ধব ও সন্তানাদির সঙ্গে সামান্য ঝগড়া হোতে পারে। নানাভাবে অর্থাগম। বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যাধিকারীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নয়। চাকুরিজীবীর উন্নতি ও উপরওয়ালার অনুগ্রহ লাভ। বেকার ব্যক্তির কর্ম্মপ্রাপ্তি। মেয়েদের পক্ষে এ মাসটী নানা দিক দিয়েই শুভ হবে।

সিংহ

মোটামুটি শরীর ভালোই যাবে। কিছুটা সাফল্যলাভ। ক্লান্তিজনক ভ্রমণ। উদ্বেগ, অশান্তি, বন্ধু বিয়োগ, অবমাননা প্রভৃতি—শেষের দিকে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন। স্ত্রী ও সন্তানাদির স্বাস্থ্যহানি। প্রস্রাবের পীড়া। পারিবারিক কলহ। হিসাবের ভুলে আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা। কোন প্রকার পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ বর্জ্জনীয়। কৃষি-জীবীর পক্ষে শস্য সঞ্চয়ের পথে বাধা। ভূম্যাধিকারী বা বাড়ীওয়ালারা নানা গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলতার সম্মুখীন হবে, মামলা-মোকর্দ্দমার সম্ভাবনা আছে, তজ্জন্য অর্থব্যয় ও উদ্বেগ। মাসের প্রথম দিকে চাকুরিজীবীর পক্ষে সুবিধাজনক পরিস্থিতি হোলেও শেষের দিকটা আদৌ ভালো নয়। ব্যবসায়ী ও পেশা-জীবীরা এ মাসে বেশ আয় করবে। এ মাসে মেয়েদের পক্ষে ভাগ্য পরিবর্ত্তন বা নানা উত্থান পতনের সম্ভাবনা। মাসের শেষ দিকটাই বেশ ভালো, প্রথম দিকটা তত ভালো হবে না। উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে সুসময়। মঘা ও পূর্ব্বফাল্গুনী নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে আশানুরূপ শুভ ফল হবে না।

কন্যা

মাসটী মোটেই ভালো নয়। নানা প্রকার দুঃখ কষ্ট ভোগ। শ্লেষ্মা প্রকোপ ও কণ্ঠনালী প্রদাহ, ব্রণ, শোক ও বন্ধু বিচ্ছেদ। উদ্বেগ ও অশান্তি। আশাভঙ্গ মনস্তাপ, শত্রু বৃদ্ধি ধনক্ষয়, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট। সর্ব্ব কার্য্যেই বাধা। অসম্মান ও অপবাদ প্রাপ্তি। কুসংসর্গ-জনিত পীড়াভোগ। বিক্ষোভ, দ্বন্দ্ব কলহ। মাসের প্রথমে দুর্ঘটনা ও ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত। পরিবারের মধ্যে স্ত্রীলোকের দ্বারা মানসিক আঘাতপ্রাপ্তি, কলহাদি সম্ভাবনা। আর্থিক অবস্থা ভালো যাবে না। ফাটকা, জুয়াখেলা প্রভৃতি বর্জ্জনীয়। ভূম্যাধিকারীরা বা বাড়ী-ওয়ালারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রতিবাদী হয়ে আদালতে লাঞ্ছনাভোগ, মামলা মোকর্দ্দমায় পরাজয়। চাকুরির ক্ষেত্রে মাসে প্রথম দিকটা খারাপ যাবে, শেষের দিকটা কিছু ভালো। উপরওয়ালার সঙ্গে বিরোধ, তজ্জন্য বিরাগ ভাজন হওয়ার ফলে উন্নতির পথে বাধাপ্রাপ্তি। ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীর পক্ষে মোটামুটি যাবে। মাসের প্রথম দিকটা মেয়েদের পক্ষে ভালো, শেষের দিকটা ভালো যাবে না। হস্তানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে দুর্ভোগ কম হবে, উত্তর ফল্গুনী ও চিত্রানক্ষাশ্রিত ব্যক্তির বহু দুর্ভোগ আছে।

তুলা

মাসটী মিশ্রফলদাতা—ভালোমন্দ দুই ঘটবে। শত্রু বৃদ্ধি, বন্ধু বিচ্ছেদ, কর্ম্মে বিপত্তি ও বাধা, মানসিক চাঞ্চল্য, অসম্মান ও আশাভঙ্গ-যোগ আছে। আর আছে বাধা-বিপত্তির ভেতর দিয়ে কার্য্যে সাফল্য, পদোন্নতি বা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, শত্রুদমন আর বিলাস ব্যসনে কালাতিপাত। যে ভাবেই হোক্ রক্তপাতজনিত শারীরিক দুর্ব্বলতা ও শরীরের অভ্যন্তরে পচনক্রিয়ার সম্ভাবনা। গৃহে কলহ-বিবাদ হালেও শেষ পর্য্যন্ত পারিবারিক শান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ। নানা ভাবে অর্থাগম। হঠাৎ কোন পরিকল্পনায় আত্মনিয়োগ করে শেষ পর্য্যন্ত আর্থিক চাপের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা। ভূম্যাধিকারী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে শুভ। চাকুরীজীবীর পক্ষে সুসময়। ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীর সময় মন্দ যাবে না। ঘরে বাহিরে মেয়েরা সুস্থতা ও ঐক্য সংযোগ রাখতে পারবে না, প্রণয়ে আসক্ত হোলেও বিচ্ছেদ ঘটবে। স্বাতী ও বিশাখা-নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিদের পক্ষে অশুভ ফলগুলি পূর্ণভাবে ফলবে কিন্তু চিত্রানক্ষত্রাশ্রিতগণ শুভ ফলগুলিই সম্পূর্ণভাবে লাভ করবে, অশুভ ফল পাবে না বললেই হয়।

বৃশ্চিক

মোটেই ভালো যাবে না। মাসের প্রথম দিকটা কোন মতে অতি-বাহিত হোলেও শেষের দিকটা একেবারেই ভালো নয়। দুঃখ কষ্ট, স্বজনবর্গের শত্রুতা, ভ্রমণে দারুণ অবসাদ স্বাস্থ্যহানি, অসম্ভব ব্যয়, নানা কাজে বাধা বিপত্তি প্রভৃতির আশঙ্কা আছে। গোড়ার দিকে ভ্রমণে কিছু সুখলাভ, সুসংবাদ লাভ, শুভ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। বন্ধুদের সঙ্গে কলহ। আর্থিক ক্ষেত্রে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি, অকারণ অর্থব্যয়, চিকিৎসায় বিভ্রাট ও ব্যয়। ব্যাঙ্কে সঞ্চিত অর্থ অনেকখানি বেরিয়ে আসবে। রেস, ফাটকা, জুয়াখেলা চলবে না। বাড়ী ক্রয়ে লাভ কিন্তু জমি-জমা সংক্রান্ত ব্যাপারে গোলযোগ। ভূম্যাধিকারী ও বাড়ীওয়ালাদের পক্ষে দুর্ভোগ। চাকুরিজীবীর কোন লাভ হবে না। ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীর পক্ষে মাঝামাঝি সময়। মেয়েদের পক্ষে মোটেই ভালো নয়—নানা বাধা বিপত্তি, কর্ম্মে বিশৃঙ্খলতা, পারিবারিক গোলযোগ প্রভৃতি দেখা যাবে। অনুরাধা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে কিছুটা ভালো গেলেও বিশাখা ও জ্যেষ্ঠানক্ষত্রাশ্রিতগণ খুব কষ্ট পাবে এই মাসে।

ধনু

মিশ্রফল। মাসের প্রথম ভাগটী শুভপ্রদ নয়, শেষ ভাগ অপেক্ষাকৃত শুভ। শেষার্দ্ধে কিছু সাফল্য লাভ, পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আমোদ প্রমোদ, ভ্রমণ, সুসংবাদ প্রভৃতি আশা করা যায়। বন্ধু বিচ্ছেদ, নানা কাজে বাধা, স্বাস্থ্যহানি, স্বজন বিরোধ, ক্ষতি মাসের প্রথমার্দ্ধে আশঙ্কা আছে। স্ত্রীর পীড়া ও তজ্জনিত উদ্বেগ। অর্থকৃচ্ছ্রতাযোগ মধ্যে মধ্যে ব্যয় বাহুল্যহেতু দেখা যাবে। এ জন্য ব্যয়সঙ্কোচের দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। কোন প্রকার নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ বা পরিকল্পনা করা অনুচিত। ভূম্যাধিকারী, বাড়ীওয়ালা প্রভৃতি ব্যক্তির পক্ষে এমাসটী ভালো যাবে না। চাকুরি জীবীদের পক্ষে মাসের শেষার্দ্ধটী শুভ—কর্ম্মোন্নতি, পদোন্নতি প্রভৃতি ঘটতে পারে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটা অশুভ। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে অনেকটা ভালো, মূলা ও পূর্ব্বাষাঢ়া জাত ব্যক্তির পক্ষে ফল অশুভ।

মকর

মাসটী বিশেষ শুভ। সর্ব্বপ্রকারে উন্নতির আশা করা যায়। সৌভাগ্য বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যোন্নতি, নানাপ্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, সম্মান, পসার প্রতিপত্তি, শত্রুনাশ প্রভৃতি যোগ আছে। সুযোগসুবিধা ও অর্থলাভ। ভূম্যাধিকারী, বাড়ীওয়ালা শ্রেণীর ব্যক্তির পক্ষে মাসটী মোটামুটি যাবে। কর্ম্মক্ষেত্রে নানা প্রকার বাধার সৃষ্টি হোলেও চাকুরি জীবীর পদোন্নতি, কর্ম্মোন্নতি প্রভৃতি আশা করা যায়, উপর ওয়ালার কোন বাধাই উন্নতির পক্ষে অন্তরায় হবে না। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী বিশেষ শুভ।

কুম্ভ

শুভপ্রদ নয়। সর্ব্ব কার্য্যেই বাধা ও বিপর্য্যয়, ক্লান্তিকর, ভ্রমণ, মর্য্যাদা হানি, দুঃখ, স্বজন বিরোধ, বন্ধু বিচ্ছেদ, সম্পত্তি সংক্রান্ত গোলযোগ, স্থানান্তরে গমন, অপবাদ প্রভৃতি দেখা যায় কিন্তু বিলাস-ব্যসন, পরীক্ষায় সাফল্য বিদ্যার্জ্জন, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি ঘটবে। অম্ল অজীর্ণ, পাকাশয় প্রদাহ, ঘরে বাহিরে বিবাদ ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। আর্থিক অবস্থা বা আয় সম্পর্কে মোটামুটি ভালো, মাসের শেষার্দ্ধেই বেশী ভালো হবে। প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। ভূম্যাধিকারী, বাড়ীওয়ালা প্রভৃতির পক্ষে মাসটী শুভ নয়, বাড়ীভাড়া ও কর আদায়ে গোলযোগ ঘটতে পারে। বেকার ব্যক্তির চাকুরী হোতে পারে বা কর্ম্মের যোগাযোগ হবে। চাকুরিজীবীর পদোন্নতি সম্পর্কে বাধা হওয়ার আশঙ্কা আছে। ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীদের হ্রাস বৃদ্ধি সম্পন্ন উপার্জ্জন। মেয়েদের পক্ষে মাসের প্রথমার্দ্ধ শুভ, শেষার্দ্ধ অশুভ। ধনিষ্ঠাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষেই বেশী শুভ, শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রা-শ্রিত ব্যক্তির পক্ষে অশুভ ফলগুলি বেশী ফল্‌বে।

মীন

মাসটী শুভ যাবে। কর্ম্মে সাফল্য; সৌভাগ্যবৃদ্ধি; লাভ, সন্তান সুখ, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, পরীক্ষায় কৃতকার্য্য, বিদ্যায় উন্নতি প্রভৃতি মাসের প্রথমার্দ্ধে প্রবল, শেষার্দ্ধে কিছু পারিবারিক অশান্তি ও শত্রুবৃদ্ধি। স্বাস্থ্যোন্নতি পারিবারিক শান্তি, নানাভাবে অর্থাগম, বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যাধিকারীর পক্ষে মোটামুটি ভালো। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ মাস। ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীর পক্ষে মাসটী মন্দ যাবে না। স্ত্রী-লোকের পক্ষে শুভ। উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে কিছু বাধাবিপত্তি, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও রেবতী নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ শুভ বলা যায়।

***

মেষলগ্ন—

কর্ম্মে সাফল্য। অর্থব্যয়। লাভ। আয়বৃদ্ধি। ব্যবসায়ে উন্নতি। শত্রু বৃদ্ধি। অকারণ উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা। বিলাসব্যসন ও আমোদপ্রমোদ। পতনের আশঙ্কা। বিদ্যার্জ্জন। পরীক্ষায় সাফল্য। শ্লেষ্মা প্রকোপ।

বৃষলগ্ন—

মানসিক অস্বচ্ছন্দতা। মনস্তাপ। দুর্ঘটনার ভয়। আর্থিক ক্ষতি আংশিকভাবে। স্বাস্থ্য লাভ। মাসের শেষার্দ্ধে সৌভাগ্য লাভ। বিদ্যায় বাধা। পরীক্ষায় মধ্যম ফল। আয়ভাব শুভ। সন্তানাদির পীড়া। অপবাদ। ভয়। পিত্তাধিক্য।

মিথুনলগ্ন—

পীড়া, মানসিক কষ্ট, মাতার অসুখ, বিপন্নতা, শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা, নানাপ্রকার অশান্তি ও দুঃখ, অর্থাগম, স্বজন বিরোধ ও বিচ্ছেদ। বিদ্যা-ভাব মধ্যম। পরীক্ষায় সাফল্য।

কর্কটলগ্ন—

বিবাদ ও নানাপ্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা। লাভ। ভূম্যাদিক্রয়। গৃহনির্ম্মাণযোগ। কর্ম্মখ্যাতি। পুত্রসন্তান লাভ। পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা। সম্পত্তি লাভ। মানসিক উদ্বেগ। স্ত্রীর পীড়া। বিদ্যায় বাধা। পরীক্ষায় ফল মধ্যম। উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে গমন। প্রণয়ে বিপত্তি।

সিংহলগ্ন—

ভ্রমণ, শারীরিক কষ্ট, বায়ু প্রকোপ, অর্থ ক্ষতি, পারিবারিক কলহ, অহেতুক ব্যয় বৃদ্ধি, সন্তানের পীড়া এজন্য দুশ্চিন্তা, স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য, স্ত্রীর বিপত্তি। পরীক্ষায় ফল শুভ, বিদ্যার্জ্জন আশানুরূপ। প্রণয়ানুরাগ।

কন্যালগ্ন—

উদ্বেগ ও ভয়, শারীরিক অসুস্থতা, বায়ু প্রকোপ, কর্ম্মে বাধা, ব্যয়, শত্রু ভয়, মাসের শেষার্দ্ধে কর্ম্মে সাফল্য, মামলা মোকর্দ্দমা, সাংসারিক ক্ষতি ও পারিবারিক অবনতি। বিদ্যার্জ্জনে বাধা, পরীক্ষায় অসাফল্য, স্ত্রীর সহিত মতবিরোধ, স্ত্রীর চিত্ত চাঞ্চল্য, সন্তানাদির শুভ সময়, প্রতি-বেশীদের দুর্ব্ব্যবহার জনিত কষ্ট।

তুলা লগ্ন—

পারিবারিক অমঙ্গল, ব্যয়, মনস্তাপ, অর্থাগম, পুরস্কারপ্রাপ্তি সৌভাগ্য-বৃদ্ধি, পুত্রলাভ, অপরের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা অনাদায়ের হেতু চিত্ত-বিক্ষোভ, দুর্ঘটনার ভয় বা পতনাশঙ্কা, স্বরভঙ্গ বা কণ্ঠনালীতে প্রদাহ, আয় বৃদ্ধি। পরীক্ষার ফল মোটামুটি মন্দ নয়, পড়াশুনায় অনবাধনতা, সন্তানাদির কষ্ট, স্ত্রীর সহিত প্রীতি, সুখ, ও বাহন ক্রয়।

বৃশ্চিকলগ্ন—

ভ্রমণ, শ্লেষ্মা প্রকোপ, স্বরভঙ্গ দোষ, দুর্ঘটনার ভয়, চিত্তের উদ্বেগ, সম্মানহানি ও সহকর্ম্মীদের সহিত মতবিরোধ, মাসের শেষার্দ্ধে অর্থাগম বা আয় বৃদ্ধি, সৌভাগ্যোদয়, সন্তানের পীড়া। মাঙ্গলিক কর্ম্মে স্পৃহা, স্ত্রীর পক্ষে অশুভ মাস, শারীরিক ক্লান্তি ও অবসাদ, ক্ষুধামান্দ্য, প্রণয়াসক্তি বিদ্যা ও পরীক্ষায় শুভফল।

ধনু লগ্ন—

ধনাগম, শারীরিক ও মানসিক অস্বচ্ছন্দতা, আয়বৃদ্ধি, শত্রুর গুপ্ত-চক্রান্ত, সম্মান বৃদ্ধি, ব্যবসায়ে অর্থাগম, মাসের প্রথমার্দ্ধে পারিবারিক বিশৃঙ্খলতা, প্রণয়ে সাফল্য, অধীনস্থ ব্যক্তিদের অপপ্রচেষ্টার জন্য উদ্বেগ, মোকর্দ্দমায় জয়লাভ। বিদ্যাভাব অশুভ। পরীক্ষায় মধ্যম ফল।

মকরলগ্ন—

পীড়া, বুকের যন্ত্রণা, বাত প্রকোপ, শারীরিক শীর্ণতা, চিকিৎসা বিভ্রাট হেতু জীবনের ভয়, অর্থ লাভ, পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা, সন্তানাদির দ্বারা মানসিক আঘাত, স্বজন বিরোধ, বিজ্ঞান শাস্ত্রার্জ্জনে সাফল্য। পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল লাভ। মধ্যে মধ্যে ব্যয়বৃদ্ধি।

কুম্ভলগ্ন—

স্ত্রীর জন্য দুশ্চিন্তা, সৌভাগ্যোদয়, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, অর্থাগম, ব্যয়বৃদ্ধি, শত্রুবৃদ্ধি, সম্মান সুখ, ব্যবসা-বাণিজ্যে সাফল্যলাভ, ভূমিজাত দ্রব্য বিক্রয়াদিতে লাভ—শেষার্দ্ধে মনস্তাপ ও হঠাৎ দুঃসংবাদপ্রাপ্তি। বিদ্যার্জ্জনে নিকৃষ্ট ফল, পরীক্ষায় অসাফল্য, কামপ্রবণতা।

মীন লগ্ন—

পীড়া ও ভয়, হ্রাসবৃদ্ধি সম্পন্ন অর্থাগম, পারিবারিক কষ্ট, স্ত্রীর সহিত কলহ বিবাদ, এমন কি বিচ্ছেদ, কর্ম্মে বিপত্তি, মাসের শেষার্দ্ধে চিত্তসুখ, জমিজমার ব্যাপারে কিছু গণ্ডগোল, মামলা মোকর্দ্দমায় জয়লাভ, পরীক্ষার ফল নিকৃষ্ট, বিদ্যার্জ্জনে মধ্যম। পুত্র কন্যাদির বিবাহ, স্থানান্তরে গমন। নিম্নশ্রেণীর লোকের সহিত কলহ বিবাদ।

শ্রী'শ'—

॥ নীল আকাশের নীচে ॥

১৯৩০-এর কলিকাতা। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে। চতুর্দ্দিকে চাপা বিদ্রোহের অগ্নি ধূমায়িত। পার্কে, পার্কে বিদেশী আইন অমান্য করে সভা আহ্বান ও বক্তৃতা, পুলিশের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ও গ্রেপ্তার। ১৯৩০-এর কলিকাতার এই পটভূমিকার মধ্যে এক নিরীহ চীনা ফেরিওয়ালার সশঙ্ক পদক্ষেপ, আর এক স্বদেশী আন্দোলনকারী ব্যারিষ্টার পত্নীর জীবনের সঙ্গে ভ্রাতা-ভগ্নীর সুমিষ্ট সম্পর্কে জড়িত হয়ে পড়ার ঘটনা প্রভৃতি নিয়েগড়ে উঠেছে হেমন্ত-বেলা প্রডাক্‌সন্সের "নীল আকাশের নীচে" চিত্রের কাহিনী। মহাদেবী বর্মা লিখিত এই কাহিনীতে যথেষ্ট নতুনত্ব আছে। সুদূর চীন দেশের এক চাষীর জমিদারের অত্যাচারে তার বোন নিখোঁজ হয়ে যাবার পর ভারতবর্ষের কলিকাতা শহরে এসে ফেরিওয়ালার বৃত্তি গ্রহণ করা এবং কয়েক বৎসর এই শহরের রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করে বেড়ানর মধ্যে কংগ্রেস কর্ম্মী ব্যারিষ্টার পত্নীর সঙ্গে পরিচয় এবং শেষে তাঁরই স্বদেশ প্রেমের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে চীন-জাপান যুদ্ধের সময় দেশের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করবার জন্যে স্বদেশ গমন। চীন ও ভারত, এই দুই মহাদেশের মধ্যে স্মরণাতীত কাল থেকে যে মৈত্রীর সম্পর্ক বিদ্যমান 'নীল আকাশের নীচে'র এই ক্ষুদ্র কাহিনীর মধ্যে তা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। চীন দেশীয় ব্যবসায়ীরা পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র ছড়িয়ে আছেন এবং প্রায় প্রতিটি দেশেই 'চায়না টাউন' বা চীনা পাড়া নামে তাঁদের নিজস্ব এলাকা গড়ে তুলেছেন। কলিকাতাতেও বহু চীনা বংশ পরম্পরায় বাস করে আসছেন,—আর ভারতীয় জীবনের সঙ্গে, বাংলার ভাব ধারার সঙ্গে প্রায় একাত্মীভূত হয়ে মিশে গেছেন। এঁদেরই একটি চরিত্র নিয়ে, তাকে স্বাধীনতা আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ পটভূমিকায় বাঙ্গালী জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে এবং চীন দেশের গ্রামে তার পূর্ব্ব ইতিহাস, যা বাংলার গ্রামেও কিছু নতুন নয়, এই নিয়ে যে সুন্দর গল্প গড়ে উঠেছে তা সু-পরিচালনা ও অনবদ্য অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে একটি সুষ্ঠু চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে।

অভিনয়ের দিক দিয়েও চিত্রটি যে সার্থক হয়ে উঠেছে তা বলা চলে। বিশেষ করে শ্রীকালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের চীনা ফেরিওয়ালার ভূমিকায় অভিনয় সত্যই অপূর্ব্ব হয়েছে। তাঁর রূপসজ্জা, ভাবভঙ্গী, কথাবার্ত্তা সব কিছুই চীনাম্যানের হুবহু অনুকরণ হয়েছে। ব্যারিষ্টার পত্নী বাসন্তীর ভূমিকায় শ্রীমতী মঞ্জু দের সাবলীল অভিনয়ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও সু-অভিনীত হয়েছে। শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান দু'টিও শ্রুতিমধুর ও সুগীত হয়ে চিত্রের সৌষ্ঠব বাড়িয়েছে।

বহির্দৃশ্যের দিক দিয়েও চিত্রটির ফটোগ্রাফী উল্লেখযোগ্য হয়েছে। চীন দেশের একটি গ্রামের চিত্র, নদীর চিত্র প্রভৃতি সম্পূর্ণ বাস্তবরূপী না হলেও, খারাপ হয়নি। চীনা পাড়ায় চীনাম্যান্‌দের নববর্ষ উৎসবের দৃশ্যটিও সুন্দরভাবে গৃহীত হয়েছে। বিশেষ করে কলিকাতার রাস্তা ও পার্ক, রাতের গঙ্গা ও রাত্রের রাজপথ প্রভৃতির চিত্রগ্রহণ প্রশংসার যোগ্য হয়েছে।

তবে 'নীল আকাশের নীচে'র মধ্যে 'কাবুলিওয়ালার' ছায়া যেন দেখতে পাওয়া যায়। 'কাবুলিওয়ালা'-র কাবুলিওয়ালা কলিকাতায় এসেছিল কাবুল থেকে, আর এতে চীনা ফেরিওয়ালা এসেছে সুদূর চীন থেকে। কাবুলিওয়ালা রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করতে করতে বাড়ীর দরজায় ভাব করল ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে, আর চীনা ফেয়িওয়ালাও ফেরি করতে করতে বাড়ীতে এসে পরিচিত হল স্বদেশী আন্দোলনকারিণী বাসন্তী রায়ের সঙ্গে। কাবুলিওয়ালার জেল হয়েছিল, এখানে বাসন্তীর জেল হল। জেল থেকে বেরিয়ে কাবুলিওয়ালা তার মেয়ের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় শেষে দেশের দিকে রওনা হল, আর এখানে ব্যারিষ্টার পত্নী বাসন্তী জেল থেকে ফিরে আসার পর চীনা ফেরিওয়ালাও দেশের কথা ভেবে শেষে দেশের দিকে যাত্রা করল। অন্য ঘটনাগুলি অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর একটি বিষয় উল্লেখ না করলে আলোচনা

'নর্ম্মদা চিত্র' পরিবেশিত ও কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত মুক্তি-প্রতীক্ষিত "জল জঙ্গল" চিত্রের একটি দৃশ্যে মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অসীমকুমারকে দেখা যাচ্ছে।

অপূর্ণ থেকে যায়। ১৯৩০সালের কলিকাতা দেখাতে গিয়ে প্রথমেই আধুনিক কালের সুউচ্চ স্কাই স্ক্র্যাপার অট্টালিকা দেখিতে দেখা গেছে। তাছাড়া যুদ্ধোত্তর কালের আধুনিক পুলিশ ভ্যান্, রাস্তায় পথিকদের রাস্তা পার হবার প্যাডেস্-ট্রিয়ান্ ক্রসিং-এর শাদা দাগ, নিউমার্কেটের একটি কাপড়ের দোকানের নিওন্ লাইট্ প্রভৃতি ১৯৩০ সালের কলি-কাতায় ছিল না। এই ত্রুটিগুলি এদেশীয় চলচ্চিত্রের পক্ষে সামান্য হলেও, উপেক্ষণীয় নয়। একটু চোখ খুলে এডিট্ করলেই এই সব ছোটখাট কিন্তু মারাত্মক দোষগুলি চোখে পড়বে। আমাদের দেশের পরিচালকরা এই সব খুঁটিনাটির প্রতি বিশেষ নজর দেন না। কিন্তু ওদেশীয় পরিচালকরা যে সালের ঘটনা সেই সালটিকে সর্ব্ব বিষয়ে নিখুঁত করে দেখান, আর তার জন্য অবশ্যই বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করে থাকেন। আমাদের দেশের চলচ্চিত্র এখন উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে, এ সময় এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটতে দেওয়া উচিত নয়। ৩০ সালকে ৩০ই দেখাতে হবে সর্ব্ব বিষয়ে, ৫৯-এর ছায়া যেন তাতে কোথাও না থাকে। তাছাড়া ছবির গতিও মাঝে মাঝে বড়ই মন্থর হয়ে পড়েছে। গল্পটি ছোট, আর ছবিটিকে ১১০০০ ফিটের ওপর নিয়ে যাওয়া হয়েছে—তাই গতিও দ্রুত হবার সুযোগ পাই নি। ছোট গল্পকে ছোট করে দেখানই ভাল, অহেতুক টেনে বড় করতে গেলে তার বাঁধন শিথিল হয়ে পড়বেই। অনেকক্ষণ ধরে ছবি দেখাবার ইচ্ছা থাকলে বড় দেখে গল্প বেছে নেওয়াই উচিত। প্রযোজক-পরি-চালকেরা এ বিষয়ে একটু অবহিত হবেন আশা করি।

তবে, এই কয়েকটি ত্রুটি ছাড়া চিত্রটি যে অভিনয়ের সৌন্দর্য্যে, বিষয়-বস্তুর নতুনত্বে, বহির্দৃশ্যের চমৎকারিত্বে ও পরিচালনার পারিপাট্যে একটি দ্রষ্টব্য চলচ্চিত্র হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

* * *

॥ হলিডে অন্ আইস্ ॥

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারীর সন্ধ্যায় ময়দানে নবনির্ম্মিত আইস্ ষ্টেডিয়ামে দশসহস্রের উপর দর্শকের উপস্থিতিতে আমেরিকার বিখ্যাত বরফের ওপর নৃত্যদলের নয়নাভিরাম তিন সপ্তাহ-ব্যাপী স্কেটিং নৃত্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছে। কয়েক বৎসর আগে এলিট্ সিনেমা হলে প্রদর্শিত স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান্ আইস রিভিউ ছাড়া এরূপ বরফের ওপর স্কেটিং পায়ে নৃত্যের প্রদর্শনী কলিকাতায় বা ভারতে পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হয়নি। চৌরঙ্গী রোডের ধারে তৃণাচ্ছাদিত ময়দানের একাংশ জুড়ে ৫০০০ বর্গফিটের যে কৃত্রিম জমান বরফ হ্রদের সৃষ্টি করা হয়েছে ও তৎসংলগ্ন যে অস্থায়ী ষ্টেডিয়াম্ নির্ম্মিত হয়েছে তাও কলিকাতায় অভূতপূর্ব্ব বলা চলে। শুভ্র বরফের ওপর নানা বর্ণের আলোকসম্পাতে, সাজ পোষাকের চোখ ঝলসান বর্ণছটায়, সুমধুর সঙ্গীত ও যন্ত্রবাদ্যের সুরঝংকারে এই স্কেটিং নৃত্য চমৎকারই শুধু হয়নি—পরম উপভোগ্যও হয়েছে। আড়াই ঘণ্টাকাল ধরে বরফ হ্রদের ওপর স্কেটিং পায়ে নৃত্যপরা তরুণীদের ও সুদক্ষ স্কেটারদের সাবলীল ও দুরূহ নৃত্য ও কৌতুক অভিনেতাদের হাস্য-কৌতুক এবং সর্ব্বোপরি সমগ্র অনুষ্ঠানের বিরাটত্ব ও জৌলুস প্রভৃতির জন্য এই মার্কিণ প্রদর্শনীটিকে কলিকাতায় ও ভারতে এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ প্রমোদ অনুষ্ঠানরূপে অভিহিত করা চলে।

নৃত্যগুলির মধ্যে "পিটার প্যান্ ইন্ ষ্টোরি বুক ভিলেজ" নৃত্যের জন্য জানোয়ার ও রূপকথার কয়েকটি চরিত্র ছেলে বুড়ো সবাইকে আনন্দ দেবে, আর "ইষ্ট অফ্ সুয়েজ" নৃত্যটিতে নর্ত্তক-নর্ত্তকীদের পীতবর্ণের প্রাচ্যদেশীয় পোষাকের চোখ ঝলসান বাহার ও কৃত্রিম ধূম্রজাল সৃষ্টি প্রভৃতি সত্যই নয়নমুগ্ধকর হয়েছে।

অন্যান্য নৃত্যগুলিও দুরূহ ফিগার-স্কেটিং-এর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যতায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, আর বিশেষ করে কৌতুক অভিনেতাদের হাস্যকৌতুকগুলি সুন্দর অভিনয় ও অপূর্ব্ব স্কেটিংয়ের জন্য পরম উপভোগ্য হয়েছে। তার ওপর সু-পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা এই নৃত্য উৎসবকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে তুলেছে। তবে একটি বিষয়ের উল্লেখ এখানে না করে থাকা যায় না। প্রথমদিনের অনুষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার ত্রুটিতে বহু নিমন্ত্রিত অতিথিকে, বিশেষ করে মহিলাদের, প্রবেশদ্বারে ভিড়ের চাপ ও অন্যান্য অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল। একটি বিরাট সু-পরিচালিত অনুষ্ঠানে এরকম ত্রুটি হওয়া অবাঞ্ছনীয়ই শুধু নয়, অশোভনও। আশা করি এখানকার কর্ম্মকর্ত্তারা এ বিষয়ে অবহিত হয়ে, এরকম ত্রুটি যাতে ভবিষ্যতে আর না ঘটে সে সম্বন্ধে সজাগ থাকবেন।

যাই হোক, "হলিডে অন্ আইস্" অনুষ্ঠানটি যে এ বৎসরের কলিকাতার শ্রেষ্ঠ ও অবশ্য দ্রষ্টব্য প্রমোদ অনুষ্ঠান তা নিসন্দেহে বলা চলে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজঃ ৫০০ (হোল্ট ৬৩, কানহাই ৯৯, বুচার ১৪২ ; মানকড় ৯৫ রানে ৪ উইকেট) ও ১৬৮ (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। হোল্ট ৮১ নট আউট ; গুপ্তে ৭৮ রানে ৪ উইকেট)

ভারতবর্ষঃ ২২২ (রায় ৪৯, কৃপাল সিং ৫৩। সোবার্স ২৬ রানে ৪ উইকেট) ও ১৫১ (বোরদে ৫৬ ; গিলক্রায়েষ্ট ৩৬ রানে ৩, হল ৪৯ রানে ৩)

মাদ্রাজের কর্পোরেশন ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ৪র্থ টেষ্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ২৯৫ রানে ভারতবর্ষকে পরাজিত ক'রে আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে 'রাবার' সম্মান লাভ করে। চারটি টেষ্ট খেলার ফলাফল দাঁড়ায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জয় ৩ এবং খেলা ড্র ১।

১ম দিন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ২৮৩ রান ওঠে ৫ উইকেটে। কানহাই ৯৯ রান ক'রে রান আউট হ'ন। লাঞ্চের পর মানকড় সোবার্স এবং স্মিথের উইকেট পান। এ দু'জনের একজন উইকেটে থাকলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের আরও রান উঠতো। ২য় দিনে ৫০০ রানে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংস শেষ হয়। বুচার সেঞ্চুরী করেন। ১ উইকেট পড়ে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংসে ২৭ রান ওঠে। ভারতবর্ষ ৪৭৩ রান পিছিয়ে থাকে ; হাতে উইকেট থাকে ৯টা। ৩য় দিনে ২২২ রানে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস শেষ হয়। কৃপাল সিং ৫৩ রান ক'রে ভারতবর্ষের মুখ কিছুটা রক্ষা করেন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ভারতবর্ষকে 'ফলো-অন' করতে বাধ্য না ক'রে ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং কোন উইকেট না হারিয়ে ৮ রান করে। ৪র্থদিনের ২-৪৫ মিনিটে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ক্যাপটেন দলের ১৬৮ (৫ উইকেটে) রানের মাথায় ২য় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ভারতবর্ষ ২য় ইনিংসে ৩টে উইকেট হারিয়ে ৪৮ রান করে।

৫ম দিনের ২-৩০ মিনিটে ভারতবর্ষের ২য় ইনিংস ১৫১ রানে শেষ হয়। ফলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ২৯৫ রানে জয়ী হয়।

ভারতবর্ষঃ ৪১৫ (বোরদে ১০৯, কনট্রাক্টর ৯১, উমরীগড় ৭৬, অধিকারী ৬৩) ও ২৭৫ (রায় ৫৮, গাইকোয়াদ ৫২, বোরদে ৯৬, অধিকারী ৪০)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজঃ ৬৪৪ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। সোলোমন ১০০ নট আউট, স্মিথ ১০০, হোল্ট ১২৩, হাণ্ট ৯২)

নিউ দিল্লীর ফিরোজশাহ কোটলা মাঠে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ৫ম বা শেষ টেষ্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই ৫ম টেষ্ট খেলায় নায়ক হলেন ভারতবর্ষের সি জি বোরদে। তাঁর ক্রীড়া চাতুর্য্যের জন্যই ভারতবর্ষ পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়। বোরদে প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরী করেন ; ২য় ইনিংসে ৯৬ রান ক'রে দুর্ভাগ্যক্রমে নিজের উইকেট ভেঙ্গে ফেলেন, মাত্র ৪ রানের জন্যে তিনি সেঞ্চুরী করা থেকে বঞ্চিত হ'ন। নতুবা টেষ্ট খেলায় উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব লাভ করতেন। ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে একমাত্র বিজয় হাজারে এই কৃতিত্ব অর্জন

করেছেন। (অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, ১৯৪৭-৪৮ সালের টেষ্ট সিরিজে)

১ম দিন ৪ উইকেট পড়ে ভারতবর্ষের ২৩৬ রান ওঠে। ৮ রানের জন্যে কনট্রাক্টার সেঞ্চুরী করা থেকে বঞ্চিত হ'ন।

২য় দিন ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস ৪১৫ রানে শেষ হয়। বোরদে ১০৯ রান করেন—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে ভারতীয় খেলোয়াড়ের মধ্যে প্রথম সেঞ্চুরী। কোন উইকেট না পড়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ৬৪ রান ওঠে।

৩য় দিনে ৪ উইকেট হারিয়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৪০৮ রান তুলে। ভারতবর্ষ ১ম ইনিংসের খেলায় ৪১৫ রান তুলে যে সুবিধা ক'রে নিয়েছিল তা ৩য় দিনের খেলায় দূর হয়ে যায়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের হোল্ট এবং কানহাই এই দিন তাঁদের টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় ১,০০০ রান পূর্ণ করেন।

৪র্থ দিনে চা-পানের কিছু পর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৮ উইকেটে ৬৪৪ রান তুলে ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ভারতবর্ষে ক্রিকেট সফরে এসে এ পর্য্যন্ত কোন বৈদেশিক দলই এত রান তুলতে পারেনি। ভারতবর্ষের ২য় ইনিংসে ১ উইকেট পড়ে ৩১ রান ওঠে। ৫ম বা খেলার শেষ দিনে ভারতবর্ষের ২য় ইনিংস ২৭৫ রানে শেষ হলে খেলাটি অমীমাংসিত থেকে যায়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ৪র্থ টেষ্টে জয়ী হয়ে 'রাবার' লাভ করায় তাদের কাছে ৫ম টেষ্ট খেলার ফলাফলের কোন গুরুত্বই ছিল না।

ভারতবর্ষের ২য় ইনিংসে উমরীগড় আহত থাকায় ব্যাট করতে পারেন নি। তাছাড়া ভারতবর্ষের কয়েকজন নামকরা খেলোয়াড় আহত হওয়ায় তাঁদের স্বাভাবিক খেলা দেখাতে পারেননি।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ভারত সফর ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল ভারত সফরে ১৭টি ক্রিকেট খেলায় যোগদান ক'রে অপরাজেয় থাকে। খেলার ফলাফল : ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের জয় ৯, খেলা ড্র ৮।

আই এফ এ শীল্ড ঃ

১৯৫৮ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলা ১৯৫৯ সালের ২৯শে জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৯৫৮ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর এই শীল্ড ফাইনাল খেলাটি উভয় পক্ষে একটি ক'রে গোল হওয়ায় ড্র যায়। পুনরানুষ্ঠিত খেলায় ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ১-০ গোলে মোহনবাগানকে হারিয়ে ১৯৫৮ সালের আই এফ এ শীল্ড জয়ী হয়। এই নিয়ে ইষ্টবেঙ্গল ৬বার আই এফ এ শীল্ড জয়ী হল।

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ৪৭৬ (ম্যাকডোনাণ্ড ১৭০, বার্ক ৬৬, ও' নীল ৫৬ ; ট্রুম্যান ৯০ রানে ৪ উইকেট) ও ৩৬ (কোন উইকেট না পড়ে)

ইংলণ্ড ঃ ২৪০ (কাউড্রে ৮৪, বেনড ৯১ রানে ৫ উইকেট, রোর্কি ২৩ রানে ৩ উইকেট) ও ২৭০ (মে ৫৯, গ্রেভনি ৫৩ নট আউট। বেনড ৮২ রানে ৪ উইকেট)

এডলেডে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়ার ৪র্থ টেষ্ট খেলায় ১০ উইকেটে ইংলণ্ডকে পরাজিত ক'রে কাল্পনিক 'এ্যাসেজ' জয়ী হয়। আনুমানিক ৬ বছর পর অষ্ট্রেলিয়ার ঘরে 'এ্যাসেজ' ফিরে গেল। এই জয়লাভের ফলে চারটি টেষ্ট খেলার ফলাফল দাঁড়ায় অষ্ট্রেলিয়ার জয় ৩ (১ম, ২য় ও ৪র্থ টেষ্ট) এবং ড্র ১ (৩য় টেষ্ট)।

টসে জয়ী হয়ে অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ব্যাট করে। প্রথম দিনে অষ্ট্রেলিয়ার ২০০ রান ওঠে ১ উইকেটে। ম্যাকডোনাণ্ড ১১২ এবং হার্ভে ১১ রান ক'রে নটআউট থাকেন। ২য় দিনে পূর্ব্ব দিনের ২০০ রানের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার ২০৩ রান যোগ হয়—রান দাঁড়ায় ৪০৩, ৬ উইকেটে। ম্যাকডোনাণ্ড ১৪৯ রান ক'রে আহত অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন। ৩য়দিন অষ্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ৪৭৬ রানে শেষ হয়। ম্যাকডোনাণ্ড ১৭০ রান করেন। ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে ৩ উইকেট হারিয়ে ১১৫ রান করে। কাউড্রে এবং গ্রেভনী যথাক্রমে ৫৩ ও ১৬ রান ক'রে নটআউট থাকেন। ইংলণ্ডের প্রথম দুটো উইকেট মাত্র ১১ রানের মধ্যে পড়ে যায়। কাউড্রে এবং গ্রেভনী জুটি বেঁধে দলের পতন রোধ করেন।

৪র্থ দিনে চা পানের বিরতির কিছু পর ইংলণ্ডের ১ম ইনিংস ২৪০ রানে শেষ হ'লে ইংলণ্ড 'ফলো-অন' করতে বাধ্য হয়। কোন উইকেট না পড়ে ইংলণ্ডের ৪৩ রান ওঠে।

৫ম দিনে ইংলণ্ডের ৫ উইকেট পড়ে ১৯৮ রান ওঠে, ফলে অষ্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের রানের থেকেও ৩৮ রান পিছিয়ে থাকে।

৬ষ্ঠ দিনে ইংলণ্ডের ২য় ইনিংস ২৭০ রানে শেষ হয়। জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৩৫ রান তুলতে অষ্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং কোন উইকেট না পড়ে প্রয়োজনীয় রান উঠে যায়।

আগাখাঁন কাপ ঃ

১৯৫৯ সালের আগাখাঁন কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে নদার্ণ রেলওয়ে ১—০ গোলে সেণ্ট্রাল রেলওয়ে দলকে পরাজিত ক'রে আগাখাঁন গোল্ড কাপ জয়ী হয়েছে। নদার্ণ রেলওয়ে সম্প্রতি ইণ্টার রেলওয়ে হকি প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেছে।

হাসির টেক্কা ঃ শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্র মজুমদার প্রণীত

গ্রন্থকার ভারতবর্ষের কিশোর জগতের অন্যতম লেখক, এঁর লেখার সঙ্গে আমাদের কিশোর বন্ধুদের পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই হয়েছে। এঁর প্রথম গ্রন্থ হাসির তুবড়ি শিশু সাহিত্য সমাজে সমাদৃত। আলোচ্য গ্রন্থে ষোলটী চিত্রিত হাসির ছড়া আছে,—সবগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত। হাস্য রসের অবতারণায় লেখকের বেশ মুন্সিয়ানা লক্ষ্য করা গেল। ছেলেমেয়েরা এ গ্রন্থে প্রচুর হাসির খোরাক পাবে। তাদেরই মনের নানারকমের খেলাঘর সাজিয়ে শ্রীমান্ মিত্র মজুমদার সুন্দর সুন্দর চিত্রে, সরল ভাষায়, সাবলীল ছন্দে ও মধুর ব্যঞ্জনায়, যে 'হাসির টেক্কা' তাদের কাছে তুলে ধরেছেন, তা অনবদ্য ও উপভোগ্য হয়েছে। ছেলেমেয়েদের হাতে এই বই উপহার দেবার যোগ্য। বই-খানি পড়ে খুব আনন্দ পেয়েছি। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

[প্রকাশক—দ্বারকানাথ সাহিত্য সংসদ, ২৮।৪এ, বিডন রো, কলিকাতা—৬। দাম দেড় টাকা]

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

(১) ছোটদের রামকৃষ্ণ (২) পরমারাধ্য শ্রীমা ঃ

শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্ত লিখিত

রামতনু অধ্যাপক ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত দ্বিতীয় পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। লেখক মৃণালকান্তি শিশু সাহিত্য রচনা করিয়া সুনাম অর্জন করিয়াছেন—বই ২খানি ছোটদের উপযোগী করিয়াই লিখিত। যুগ মানব শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীসারদা দেবীর জীবনী ছেলেমেয়েরা অল্প বয়সে পাঠ করিলে তাঁহাদের মন নূতন-ভাবে গঠিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি, বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ধর্ম বা নীতি শিক্ষার স্থান নাই—কাজেই অভিভাবকগণকে পুত্র-কন্যাদির জন্য এইরূপ পুস্তক ক্রয় করিয়া তাহাদের সে অভাব মিটাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। লেখক গল্পচ্ছলে বহু শিক্ষা দিয়াছেন, ভাষাও স্বচ্ছ এবং সরল।

[মূল্য—(১) ১·২৫ নয়া পয়সা (২) ২·২৫ নয়া পয়সা। প্রাপ্তি স্থান—শ্রীমা প্রকাশনী—১নং রমেশ মিত্র রোড কলিকাতা—২৫]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নতুন রেকর্ড

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস্ ও কলম্বিয়া রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ—

"হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস"

N 82807—"আঁধার নেমেছে দূরে" ও "মল্লিকা চেয়েছে যে"—দুখানা আধুনিক মনভোলান গান পরিবেশিত হয়েছে শিল্পী উৎপলা সেনের মধুরকণ্ঠে।

N 82808—"দোল দোল দোল না" ও "আগডুম্ বাগডুম্ ঘোড়াডুম্ সাজে" দুখানা মনোরম ছড়া সুরের অপূর্বপরশে যেন সজীব হয়ে উঠেছে আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতি সুমিষ্টকণ্ঠে।

N 82809—মোহাম্মদ রফির কণ্ঠের দুখানা গান—"ঐ দূর দিগন্ত পার" ও "এ জীবনে যদি।"

N 82810—"আকাশের তারা আর মাটীর ফুলেরা" ও "একটি তারা ডাকে আমায়" গান দুইটী সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়েছে শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্তের কণ্ঠে।

কলম্বিয়া

GE 30412—পুরীর মন্দির কথাচিত্রের গান "আমার গোপন কথাটি" ও "মোর অন্তর আজ কেঁদে বলে"—গেয়েছেন জনপ্রিয় শিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

GE 30413—সূর্যতোরণ বাণীচিত্রের দুখানা গান "ওরা তোদের গায়ে" "হোকনা আকাশ মেঘলা" গেয়েছেন হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়।

GE 30414—"তুমি তো জাননা" ও "ওগো অকরুণ" সূর্যতোরণ বাণীচিত্রের এই গান দুখানা গেয়েছেন যথাক্রমে দুইজন জনপ্রিয় শিল্পী হেমন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

GE 30415—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের দরদী কণ্ঠে আর দুখানা গান—"আমার জীবনে নেই আলো" ও "ওগো অকরুণ।"

GE 30416—শিকার বাণীচিত্রের "না জানি কোন ছন্দে" ও "সরমে জড়ানো আঁখি" এই দুখানা আধুনিক গান আমাদের খুব ভাল লেগেছে।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী : শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা　　　বসন্ত বাহার　　　ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

চৈত্র—১৩৬৫

দ্বিতীয় খণ্ড | ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

মানবতার পূজারী লক্ষ্মণ

শ্রীমঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়

'রামায়ণে'র প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটি বলিষ্ঠ, ঋজু, কর্ত্তব্যপরায়ণ, পরম-অনুগত, উচ্ছ্বাসবিহীন, দৃঢ়চেতা ও অসাধারণ সংযমী মহাবীরের যে স্থির চিত্র আমাদের মনকে বিশেষভাবে অভিভূত করিয়া রাখে, সেই চিত্র শ্রীরামচন্দ্র, ভরত অথবা শত্রুঘ্নের নহে, তাহা সুবর্ণছবি লক্ষ্মণের।

এই নীরব, সংযত পুরুষটি মহাকাব্যে একরূপ উপেক্ষিত বলিলেই হয়। একমাত্র রামচন্দ্র ছাড়া তাঁর চরিত্র-মাহাত্ম্য ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের সামগ্রিক রূপটি সকলের নিকট অজানা ছিল। সূর্য্যের প্রভায় যেমন নক্ষত্র দীপ্তিহীন হইয়া থাকে, তেমনি শ্রীরামের দিব্যছটায় লক্ষ্মণ-চরিত্রের মহিমা সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া গিয়াছিল। এবং লক্ষ্মণ ও রামচন্দ্রের সেবার মধ্য দিয়া নিজেকে এমনভাবে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন যে 'রামায়ণে' তাঁহার নিজস্ব সত্তা বলিয়া যে কিছু আছে তাহা জানা যায়না। কিন্তু সূর্য্য-প্রভায় নক্ষত্র যতই ঢাকিয়া থাকুক না কেন, অচঞ্চল স্থির ধ্রুব নক্ষত্রটি স্বতেজে ও স্ব-মহিমায় আপন কেন্দ্রে দীপ্তিমান থাকে। লক্ষ্মণ সেই অচঞ্চল ধ্রুবরূপী নক্ষত্র, যাহা কালের বক্ষে স্থির থাকিয়া পবিত্র আলোকছটায় এই ধরণীকে যুগে যুগে অভিষিক্ত করিতেছেন।

শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাস হইতে অযোধ্যায় ফিরাইয়া

লইয়া ফিরিবার জন্য চিত্রকূট পর্বতে জটাচীরধারী ভরতের বিলাপ, কাতরোক্তি ও রোদনে আমাদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে। রামের পাদুকা গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর জন্য তাঁহার নগরের বহির্দ্দেশে বাসের প্রতিজ্ঞা এবং ঐ পাদুকাকে সমস্ত রাজ্য-ব্যাপার নিবেদনপূর্ব্বক জটাচীরধারণ করিবার ও ফলমূল খাইয়া জীবনধারণের শপথের ছবি ভরতকে এক মহত্তম মর্য্যাদা দান করিয়াছে ইহা সত্য। তাঁহার নির্লোভতা, ত্যাগ, ভ্রাতৃপ্রেম ও বিনম্রতার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে নাই। 'রামায়ণে' তিনি এই একটিমাত্র কার্য্যের জন্য চিরকালের মত আদর্শ-স্থানীয় হইয়া রহিলেন। এই চিত্রই যুগেযুগে কারুণ্যরসে সঞ্জীবিত হইয়া তাঁহাকে অপরূপ সুষমা দান করিতেছে। কিন্তু লক্ষ্মণের বীরত্ব, ধৈর্য্য, ত্যাগ, আনুগত্য, বুদ্ধিমত্তা, সেবা, প্রেম, ক্ষমা, নির্লোভতা ও কর্ত্তব্যনিরত অবস্থার যে শত শত চিত্র আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের আদর্শস্থল হইয়া রহিয়াছে, তাহার তুলনাও পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

বালকাণ্ডে দেখি, বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের নিকট আসিয়াছেন—রাক্ষস বধ করিবার জন্য রামচন্দ্রকে লইয়া যাইতে। রাজা এই কথা শুনিয়া শোকে হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। রাম যে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতির পাত্র, নয়নের মণি। রাম যে অল্পবয়স্ক কিশোর, যুদ্ধবিদ্যা এখনও সম্যকরূপে তাঁহার আয়ত্ত হয় নাই—একথা জানাইয়া বার বার রামের মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র অটল।

উপরন্তু বিশ্বামিত্র মুণির উদ্বেলিত ক্রোধের প্রাবল্য দেখিয়া বশিষ্ঠ মুণি তাড়াতাড়ি রামকে তাঁহার সঙ্গে বনে পাঠাইবার জন্য রাজাকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। তখন রাজা লক্ষ্মণকেও ডাকাইয়া পাঠাইলেন। লক্ষ্মণ আসিলেন। রাজা দশরথ ও জননী কৌশল্যা রামের মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। পুরোহিত বশিষ্ঠও মঙ্গলাচরণ করিলেন। তাহার পর দশরথ রামের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া প্রীতমনে তাঁহাকে বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বিশ্বামিত্রের পিছনে রাম, রামের পিছনে লক্ষ্মণ চলিতে লাগিলেন।

দেখা যাইতেছে, সেই সময় সুমিত্রা অনুপস্থিত ছিলেন। আর তিনি উপস্থিত থাকিলেও কিশোর-পুত্রকে তুমি বনমধ্যে রাক্ষস নিধন করিতে যাইতে দেখিয়া যাত্রাকালীন মঙ্গলাচরণ বা তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ ইত্যাদি ব্যাপারে নিবৃত্ত ছিলেন। মঙ্গলাচরণ যাহা কিছু রামকে কেন্দ্র করিয়া হইয়াছিল—লক্ষ্মণকে কেন্দ্র করিয়া নহে।

লক্ষ্মণ রামের চেয়েও ছোট। ভরতকে না ডাকাইয়া দশরথ রামচন্দ্রের সঙ্গে লক্ষ্মণকে দিলেন কেন—ইহা আমাদের নিকট আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। রাম সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ। কিন্তু সেই রামকে দিতে তিনি অল্পবয়স্ক ও যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত হয় নাই বলিয়া বিশ্বামিত্র মুণির নিকট আপত্তি তুলিয়াছিলেন—অথচ রামের বনগমনে তিনি লক্ষ্মণকেও সেই সঙ্গে পাঠাইলেন কেন?

দশরথ নীতিনিপুণ ছিলেন এবং লোকচরিত্র সম্বন্ধেও তিনি বিলক্ষণ অভিজ্ঞ ছিলেন। কাজেই তিনি অল্পবয়স্ক রামের সহিত তাঁহার অপেক্ষা কনিষ্ঠ লক্ষ্মণকে সঙ্গে দিয়া যে বুদ্ধিহীনের ন্যায় কার্য্য করিবেন ইহাও বোধ হয় না। মনে হয়, আবেগপ্রবণ রামের সঙ্গে আবেগবিহীন লক্ষ্মণকে পাঠাইয়া তিনি বুদ্ধিমত্তার কাজই করিয়াছেন। লক্ষণের দৃঢ়চিত্ত ও সুখেদুঃখে অচঞ্চল ভাবটি তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই বোধহয়।

ইহার পর অযোধ্যা-কাণ্ড।

শ্রীরামের যৌবরাজ্যে অভিষেক-বার্ত্তায় সমগ্র অযোধ্যানগরী অপূর্ব্ব শোভাময় রূপ ধারণ করিল। রাজধানীতে তুমুল হর্ষের স্রোত বহিতে লাগিল। রামচন্দ্র সেই সুখসংবাদ জননীকে জানাইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু কৌশল্যা সেই সময় রামের মঙ্গল কামনায় দেবগৃহে ছিলেন। সেখানে কৌশল্যা প্রাণায়াম দ্বারা ধ্যান করিতেছিলেন এবং সীতা, সুমিত্রা ও লক্ষ্মণ তাঁহার সেবা করিতেছিলেন। রাম সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া জননীকে শুভসংবাদ জানাইয়া হাস্যমুখে লক্ষ্মণকে কহিলেন—"লক্ষ্মণ, এক্ষণে তোমাকেও আমার সহিত রাজ্যভার বহন করিতে হইবে। তুমি আমার দ্বিতীয় অন্তরাত্মা। সুতরাং রাজশ্রী আমার ন্যায় তোমাকেও আশ্রয় করিয়া আছেন। ...বৎস তুমি ইচ্ছামত ভোগসুখ উপভোগ কর।"

রাজ্যলাভজনিত আনন্দে লক্ষ্মণের প্রতি রামচন্দ্রের

প্রগাঢ় প্রীতিসূচক এই ক'টি কথাই যেন সংযতবাক্ লক্ষ্মণের সম্যক উপযুক্ত। আমরা কল্পনা নেত্রে দেখিতে পাই—দেবগৃহের সেই শান্ত, গাম্ভীর্য্যময় পরিবেশে রামের এই অনাবিল প্রীতিপ্রদর্শন ও উচ্ছ্বাসে লক্ষ্মণ লজ্জায় আরক্তিম হইয়া নতমস্তকে নীরবে সেই প্রীতি ধারায় অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন। রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকজনিত আনন্দে অযোধ্যাবাসী অপেক্ষা লক্ষ্মণেরই অধিক আনন্দিত হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু কোন আনন্দেরই বহিঃপ্রকাশ আমরা লক্ষ্মণ চরিত্রের কোথাও দেখিতে পাইনা। তাহার পরিবর্ত্তে দেখি লক্ষ্মণ দেবগৃহে জননী কৌশল্যার শুশ্রূষায় রত।

অযোধ্যা নগরীর আনন্দ কোলাহল, রাজসভার উত্তেজনা, রাজপ্রাসাদের বিলাস ও উচ্ছ্বলতার ঢেউ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। বিশাল অযোধ্যা নগরীর উৎসব-মুখরতার মাঝে লক্ষ্মণের এই যে শান্ত, মৌন, স্থির, কর্ত্তব্যনিরত, সেবাপরায়ণ চিত্রটি—ইহা অপূর্ব্ব।

শান্ত গাম্ভীর্য্যের মধ্যে অটল থাকিয়া নিরাসক্তভাবে কর্ম্ম করিয়া যাওয়া—ইহাই লক্ষ্মণের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

ইহার পর রামের প্রতি কৈকেয়ীর নির্ব্বাসনের আদেশে রাম জননীর নিকটে আসিয়া এই সংবাদ জানাইলেন। কৌশল্যা এই সংবাদে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ও চেতনা পাইয়া নানারূপ বিলাপ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাম জননীকে প্রবোধ দিয়া বনগমনে প্রস্তুত হইলেন। তখন লক্ষ্মণ আগাইয়া আসিয়া কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন—"আর্য্যে, রঘু-প্রবীর রাম রাজ্যশ্রী ত্যাগ করিয়া বনে প্রস্থান করিবেন ইহা সুসঙ্গত হইতেছে না। মহারাজ বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার প্রকৃতির বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। তিনি বিষয়াসক্ত, স্ত্রৈণ, সুতরাং স্ত্রীলোকের মন্ত্রণায় তিনি কিনা বলিবেন?" বলিয়া তিনি রামকে বলিলেন—"আর্য্য, এক্ষণে আপনার এই নির্ব্বাসন সংবাদ প্রচার না হইতেই আপনি আমার সাহায্যে সমস্ত রাজ্য হস্তগত করুন। আমি সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় শরাসন ধারণ করিয়া আপনার পার্শ্বরক্ষা করিব—তখন কাহারও সাধ্য নাই যে অভিষেকে বিঘ্ন সম্পাদন করিবে।"

"দেখুন, জ্যেষ্ঠত্ব নিবন্ধন রাজ্য আপনারই প্রাপ্য—সুতরাং মহারাজ কোন বলে কোন যুক্তিতে তাহা কৈকেয়ীকে দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন? * * * এক্ষণে আপনি ও আপনারা উভয়েই আমার পরাক্রম প্রত্যক্ষ করুন। বৃদ্ধ হইয়াও বালক, কৈকেয়ীর প্রতি অনুরক্ত পিতাকে আমি এখনই বিনাশ করিব।"

লক্ষ্মণের এই উক্তি সাময়িক উত্তেজনাপ্রসূত নহে। অকারণে রামচন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন ধার্ম্মিক পুত্রকে বনবাস দেওয়ার কল্পনা বালকের খেয়াল-খুসীর মতই হাস্যকর ও অগ্রাহ্য। কাজেকাজেই বৃদ্ধ পিতার বালকোচিত উক্তি যে সম্পূর্ণরূপে রাজধর্ম্মের প্রতিকূল, তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়াই লক্ষ্মণ বৃদ্ধ পিতাকে বিনাশ করিয়া রাজধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা চাহিয়াছিলেন। ইহার মানে এমন নহে যে তিনি পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিলেন না, অথবা পিতাকে তিনি ভালবাসিতেন না।

'রামায়ণে' মহর্ষি বাল্মীকি "কর্ত্তব্য"কেই সবার উপরে স্থান দিয়াছেন দেখিতে পাই।

সে কর্ত্তব্য লৌকিক কর্ত্তব্য নহে, শাস্ত্রোক্ত অথবা বেদোক্ত কর্ত্তব্য নহে, সে কর্ত্তব্য মানবিক। যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সত্যে সে কর্ত্তব্য প্রতিষ্ঠিত। মানুষ বুদ্ধি, যুক্তি, হৃদয়, প্রেম ও জীবন দিয়া যে কর্ত্তব্য সংসারে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে তাহা লৌকিক বা শাস্ত্রোক্ত কর্ত্তব্য নহে—তাহা অপেক্ষা অনেক বড়, অনেক মহৎ—এই শিক্ষাটাই বোধ হয় রামায়ণের সবচেয়ে বড় শিক্ষা। তাই লক্ষ্মণ যখন কহিলেন—'পিতাকে বিনাশ করিব' তখন আমরা তাঁহাকে এই উক্তির জন্য দোষারোপ করিতে পারিনা। কেন না—মানবত্ব যেখানে লাঞ্ছিত ও পদদলিত, সেইখানেই প্রয়োজন হয় বীর্য্যের ও পৌরুষের। মানবতা যে দেবত্ব হইতেও শ্রেষ্ঠ—তাহা প্রমাণ করিলেন লক্ষ্মণ। কিন্তু রামচন্দ্র লক্ষ্মণের এই কথায় কর্ণপাত করিলেন না। উপরন্তু তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বও দৈবের যুক্তিপূর্ণ সুমধুর ব্যাখ্যায় লক্ষ্মণ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তিনি রামচন্দ্রকে কহিলেন—"আপনার যদি আবেগ উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে ভবাদৃশ ব্যক্তির মুখ হইতে কি এইরূপ বাক্য নির্গত হওয়া সম্ভব? আপনি দৈবকে অনায়াসেই প্রত্যাখ্যান করিতে

পারেন, তবে কি নিমিত্ত একান্ত শোচনীয় অকিঞ্চিৎকর দৈবের প্রশংসা করিতে চান? আপনি যে ধর্ম্মের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া মুগ্ধ হইতেছেন যাহার প্রভাবে আপনার মত-দ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে আমি সেই ধর্ম্মকেই দ্বেষ করি।" "* * * যে ব্যক্তি নিস্তেজ, নির্বীর্য্য সেই দৈবের অনুসরণ করে, কিন্তু যাহারা বীর, লোকে যাঁহাদিগের বল-বিক্রমের প্রশংসা করিয়া থাকে, তাঁহারা কদাচ দৈবের মুখাপেক্ষা করেননা। যাহারা আপনার রাজ্যাভিষেক দৈব-প্রভাবে প্রতিহত দেখিয়াছে আজ তাহারাই আমার পৌরুষের হস্তে তাহাকে পরাস্ত দেখিবে। আমি আপনার চিরকিঙ্কর, আদেশ করুন, যেরূপে এই বসুমতী আপনার হস্তগত হয়, আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব।" এই ধরণের কঠোর উক্তির সময় লক্ষ্মণের চক্ষুদ্বয় বারবার অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিতেছিল। কোমলও কঠোরের সন্নিবেশে ইহা এক বিচিত্র চিত্র। রামের রাজ্যলাভজনিত আনন্দে যিনি ধীর স্থির, বনবাসজনিত দুঃখে তাঁহার এরূপ উক্তি, হৃদয়ের অর্গল খুলিয়া অকস্মাৎ যেন বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

রামচন্দ্র সীতার সহিত বনবাসে যাওয়া স্থির করিলেন। তখন লক্ষ্মণ রামের চরণে পড়িয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন—"আর্য্য, মৃগমাতঙ্গসঙ্কুল অরণ্যে যদি আপনার একান্তই যাইবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক আমিও আপনার অগ্রে অগ্রে গমন করিব। আপনাকে ছাড়িয়া আমি উৎকৃষ্ট লোক, কি অমরত্ব—কিছুই চাহিনা, ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যও প্রার্থনা করিনা।"

তাঁহার এই সকাতর প্রার্থনায় প্রথমে রাম রাজী হন নাই, কিন্তু অবশেষে রাজী হইলেন।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বনবাসে চলিলেন। রাজা দশরথ ও তাঁহার মহিষীদের রোদন ও বিলাপ-ধ্বনিতে রাজপ্রাসাদ মুখরিত হইয়া উঠিল। সমগ্র অযোধ্যা নগরী শোকে আকুল হইয়া পড়িল। রাজা হইতে অযোধ্যাবাসী সকলেরই মুখে কেবল রামের কথা।

রাজকুমার লক্ষ্মণও যে রামচন্দ্রের মত চীরধারণ করিয়া রাজ্যের চিরাভ্যস্ত ভোগ সুখ ত্যাগ করিয়া বনবাসে চলিলেন—সেদিকে কাহারও দৃষ্টি পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

বিদায়ের সময় জননী সুমিত্রা লক্ষ্মণকে কহিলেন—"বৎস, যদিও সকলের প্রতি তোমার অনুরাগ আছে, তথাচ আমি তোমাকে বনবাসের আজ্ঞা দিতেছি। তোমার ভ্রাতা অরণ্যে চলিলেন, দেখিও তুমি সতত ইহাঁর সকল বিষয়ে সতর্ক হইবে। বৎস, জ্যেষ্ঠের বশবর্ত্তী হওয়াই ইহলোকের সদাচার জানিবে। এক্ষণে রামকে পিতা, সীতাকে জননী এবং গহনবনকে অযোধ্যা জ্ঞান করিও।"

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের অগ্রে থাকিয়া পথ পরিষ্কার করেন। শিকার করিয়া আনেন, ফলমূল পাড়িয়া আনেন, নদী হইতে পানীয় জল তুলিয়া আনেন, অরণ্য মধ্যে সুন্দর পুষ্প দেখিলে জানকীর প্রীতি উৎপাদনায় তাহা তুলিয়া আনেন। রাম অযোধ্যা ছাড়িয়া আসিয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন—লক্ষ্মণ তাঁহাকে নানা যুক্তিপূর্ণ বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া তাঁহার চিত্তকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন। ভরতের আগমনে হস্তী, অশ্ব ইত্যাদির জন্য ঐ স্থান অপরিষ্কার হওয়ায় তাঁহারা চিত্রকূট ত্যাগ করিয়া পঞ্চবটীতে আসিলেন। পুষ্পিতকানন পঞ্চবটীর অতুলনীয় শোভা দর্শনে ঐ স্থানে বাস করিতে রামচন্দ্রের অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিল। রামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ উৎকৃষ্ট স্তম্ভশোভিত সমতল ও সুরম্য এক পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন ও যথাবিধি বাস্তু-শান্তি করিয়া তিনি রামচন্দ্রকে কুটীর দেখাইতে আনিলেন। কুটীর দেখিয়া রাম ও জানকীর অত্যন্ত সন্তোষ জন্মিল। রাম লক্ষ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া স্নেহবাক্যে কহিলেন—"বৎস, প্রীত হইলাম। তুমি অতি মহৎ কর্ম সম্পন্ন করিয়াছ। এক্ষণে আমি পারিতোষিক স্বরূপ কেবল তোমায় আলিঙ্গন করিলাম, চিত্ত-পরিজ্ঞানে তোমার বিলক্ষণ নিপুণতা আছে।"

রামচন্দ্রের নিকট হইতে এই ধরণের কয়েকটি উক্তিই তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। সমগ্র রামায়ণ মধ্যে লক্ষ্মণ এবং হনুমানই শুধু রামচন্দ্রের এই ধরণের প্রগাঢ় প্রেম ও প্রীতিপূর্ণবাক্য দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছেন। বাস্তবিক লক্ষ্মণ ও হনুমানই রামায়ণ মধ্যে এক রামের কৃপা ও প্রীতি ছাড়া আর কিছুই পান নাই।

বনবাসের চতুর্দ্দশবর্ষ পরে রামচন্দ্র অযোধ্যার রাজা

হইয়া লক্ষ্মণকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় লক্ষ্মণ তাহা প্রত্যাখ্যান করেন, রাম ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন। শত্রুঘ্ন মধুর পুত্র লবণকে বধ করিয়া রামের নির্দ্দেশে মধুপুরীর রাজা হইলেন, বিভীষণ লঙ্কার অধিপতি হইলেন, সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যার রাজপদ অলঙ্কৃত করিয়া অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন—শুধু হনুমান ও লক্ষ্মণ বাকী রহিলেন। শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাদের উভয়কেই আপনার হৃদয় মধ্যে ঠাঁই দিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী করিয়া রাখিলেন।

বনবাসের ত্রয়োদশ বৎসর লক্ষ্মণ রামের সেবা করিয়া কাটাইয়াছিলেন। এই ত্রয়োদশ বৎসর তিনি নিদ্রা যান নাই। রাম ও জানকীর দ্বারে রাত্রে তিনি ধনুর্ব্বাণ হস্তে পাহারা দিতেন।

সীতাহরণের ব্যাপারে লক্ষ্মণ যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। সীতা যখন রামের অনুরূপ আর্ত্তরব শুনিয়া লক্ষ্মণকে বারবার রামের নিকট যাইতে বলিলেন, তখন লক্ষ্মণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন জনস্থানে যে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস নিহত হইয়াছে—তাহারাই উহাদের প্রতিশোধ লইবার জন্য মায়াবী মারীচকে পাঠাইয়াছে। কাজেই উহা রাক্ষসী মায়া, এই বুঝিয়া লক্ষ্মণ কিছুতেই সীতাকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় রাখিয়া যাইতে চাহিলেন না—কিন্তু লক্ষ্মণের এই নীরবতাকে ভুল বুঝিয়া সীতা নানা অপমানজনক বাক্যে তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিলেন। সীতার সেই হৃদয়-বিদারকউক্তি "তুই প্রচ্ছন্নরূপী ভরতের চর, জ্ঞাতি শত্রু, কপট, ক্রুর, মিত্ররূপী শত্রু—আমার নিমিত্তই তুই একাকী রামের অনুসরণ করিতেছিস" ইত্যাদি অসম্মানকর বাক্যে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। যাইবার পূর্ব্বে তিনি বলিয়া গেলেন—"তুমি আমার পরম দেবতা, তোমার বাক্যে প্রত্যুত্তর করি আমার এরূপ ক্ষমতা নাই। বনদেবতারা সাক্ষী, তুমি আমার প্রতি যারপর নাই কটূক্তি করিলে—মৃত্যু তোমার একান্তই সন্নিহিত হইয়াছে।"

সীতাহরণ হইল। রাম অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পড়িলেন। তখন লক্ষ্মণ তাঁহাকে নানা যুক্তিতর্কে অতি বিচক্ষণতার সহিত শোক, মোহ ও অবসাদ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার পর পম্পাতীরে সুগ্রীবের সহিত ইহাঁদের মিত্রতা হইল। রামের সাহায্যে সুগ্রীব রাজ্য পাইয়া ভোগসুখে মাতিয়া গেলেন।

সীতাকে অন্বেষণ করিবার যে প্রতিজ্ঞা সুগ্রীব করিয়াছিলেন তাহা বিস্মৃত হওয়ায় কিষ্কিন্ধ্যায় যাইয়া সুগ্রীবকে ক্ষত্রজনোচিত ভাষণ ইত্যাদিতে লক্ষ্মণের যথেষ্ট ন্যায়-নীতি ও যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মদবিহ্বল তারা যখন স্খলিত গমনে তাঁহার নিকটে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন "রাজকুমার, তোমার ক্রোধের কারণ কি? কে তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল" তখন স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যে তিনি ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া তটস্থ হইয়া অবনতমুখে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। এখানে তাঁহার লজ্জাশীলতা লক্ষণীয়। যে সুগ্রীবকে পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা ভুলিয়া ভোগসুখে মত্ত থাকার জন্য তিনি—"বানর, তুমি স্বকার্য্য সাধনপূর্ব্বক রামের কার্য্যে উপেক্ষা করিতেছ, সুতরাং তুমি অনার্য্য, মিথ্যাবাদী ও কৃতঘ্ন। * * সুগ্রীব, অঙ্গীকার পালন করিয়া তুমি বালীর অনুসরণ করিও না" ইত্যাদি বাক্যে জর্জ্জরিত করিয়াছিলেন—তিনিই আবার তারার নিকট হইতে—"না জানিয়া ইতর লোকের ন্যায় সহসা ক্রোধের বশীভূত হওয়া তোমার উচিত নহে, * * সুগ্রীব রামের প্রয়োজনে রাজ্য, ধন, ধান্য, পশু, রুমা ও আমাকেও ত্যাগ করিতে পারেন—" ইত্যাদি শুনিয়া বীত-ক্রোধ হইয়া প্রসন্ন হইলেন।

লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়াছিলেন রামের বার্ত্তা লইয়া, কিন্তু তাঁহার প্রচণ্ড ক্রোধ দেখিয়া সুগ্রীব লক্ষ্মণের সম্মুখেই স্বর্ণ সিংহাসন হইতে উঠিয়া কণ্ঠের বিচিত্র মাল্য ছিন্ন করিয়া কহিলেন—"রামের জন্যই আমি হৃতরাজ্যশ্রী ও কীর্ত্তি পুনরায় অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছি। সেই দেব আমার যে উপকার করিয়াছেন উহার আংশিক প্রতি-শোধ করাও আমার পক্ষে সুকঠিন। * * বীর, আমি তোমার কিঙ্কর, যদি আমার কোন অপরাধ থাকে তাহা হইলে প্রণয় ও বিশ্বাস এই দুই কারণে ক্ষমা কর।" ইত্যাদি বিনয়সূচক বাক্যে লক্ষ্মণের প্রসন্নতা দেখা দিল এবং তিনিও যে হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া সুগ্রীবের প্রতি অত্যন্ত কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন এজন্য যথেষ্ট অনুতপ্ত হইয়া কহিলেন—"রামচন্দ্র প্রিয়বিরহে শোকাকুল হইয়া নানাপ্রকারে বিলাপ করিতেছিলেন, সেই দেখিয়াই

আমি তোমাকে এইরূপ কহিলাম—এজন্য আমাকে ক্ষমা কর।"

ক্ষত্রিয়োচিত তেজের সহিত বৈষ্ণবোচিত বিনয় ও নম্রতায় লক্ষ্মণ-চরিত্র সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

এইবার আসিল যুদ্ধকাণ্ড।

সমগ্র রাক্ষসকুলের মধ্যে ইন্দ্রজিত ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর। লক্ষ্মণের সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রামের পর অবশেষে ইন্দ্রজিত বধ হইল। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, ঋষিকুল সকলেই তাঁহার জয়গান করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিতকে বধ করিয়া লক্ষ্মণ স্বয়ং অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। রক্তাক্ত-দেহে তিনি ক্ষতজনিত ব্যাথার জন্য বিভীষণ ও হনুমানের স্কন্ধে ভর করিয়া রামের নিকট যাইয়া প্রণাম করিলেন। রামচন্দ্র এই সংবাদে যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া রণক্লান্ত রক্তাক্ত-দেহ লক্ষ্মণকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন—"ভাই লক্ষ্মণ, আজ বড় পরিতুষ্ট হইলাম। তুমি অতি দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়াছ। যখন ইন্দ্রজিত বিনষ্ট হইল, তখন জানিও আমরা জয়ী হইলাম।" এই বলিয়া তিনি লক্ষ্মণকে ক্রোড়ে তুলিয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন।

বীরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের এই স্তুতিবাদে অতিশয় লজ্জা পাইলেন। তাঁর এই বীরোচিত কার্য্যে রামচন্দ্র যৎপরনাস্তি খুসী হইয়াছিলেন, তাই তাঁহার উচ্ছ্বাস আর বাধা মানিতেছিল না। কিন্তু স্বল্পভাষী লক্ষ্মণ তাঁহার এই উচ্ছ্বাসকে এড়াইয়া আসিষাছেন সেই সর্ব্বসমক্ষে রামচন্দ্রের এই স্নেহালিঙ্গন ও বীর-কার্য্যের জন্য অকুণ্ঠ প্রশংসাবাদে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া গেলেন। এই বীরোচিত কার্য্যের উপযুক্ত নায়ক হইতেছেন লক্ষ্মণ। রণক্ষেত্রের বীভৎস পরিবেশে রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেহ লক্ষ্মণের নিকট হইতে এই লজ্জা ও কুণ্ঠা আমরা আশা করিতে পারি না। বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিতবধের গৌরব ও আনন্দের বহিঃপ্রকাশ তাঁহাতে নাই, নাই রণজয়ের উল্লাস, নাই শান্তি ক্লান্তি অবসাদের কোন ছায়া। শত্রুজয় করিয়া তিনি যে নম্রতা ও বিনয়ের পরিচয় দিয়াছেন—তাহাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ। জয়ের গৌরবরূপ স্বর্ণকিরীট অপেক্ষা বহুমূল্য রত্নকিরীট তাঁহার শিরোভূষণ হইয়া দীপ্তিমান হইতে লাগিল। এই বিনম্রতার বিপরীত রূপ পরমুহূর্ত্তে দেখিতে পাই। অপর এক দৃশ্যে—

রাবণের শক্তিশেলে বিদ্ধ হইয়া হতজ্ঞান লক্ষ্মণ রক্তাক্ত-দেহে রণভূমিতে পড়িয়া গেলেন। বানরেরা ঐ শক্তিশেল উহার বক্ষ হইতে টানিয়া বাহির করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়া অবশেষে ব্যর্থ হইল। ঐ শক্তিশেল লক্ষ্মণের বক্ষ ভেদ করিয়া মাটিতে গাঁথিয়া গিয়াছিল। তখন রামচন্দ্র ঐ শক্তি-শেল লক্ষ্মণের বক্ষ হইতে তুলিয়া তাহা ভাঙিয়া হনুমানকে লক্ষ্মণের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়া রাবণ বধ করিবার উদ্দেশ্যে চলিয়া গেলেন। তাঁহার তীব্র শরাঘাতে রাবণ রণক্ষেত্র ছাড়িয়া পলাইয়া গেলেন। তখন লক্ষ্মণকে মৃতপ্রায় দেখিয়া রামচন্দ্র নানাবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। সুষেণের আদেশে হনুমান গন্ধমাদনের শৃঙ্গ তুলিয়া আনিলেন। বিশল্যকরণী, সাবণ্যকরণী, সঞ্জীবনী ও সন্ধানী এই চারি প্রকারের ঔষধে লক্ষ্মণ বিশল্য ও নীরোগ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। রামচন্দ্র তখনও শোকোচ্ছ্বাস কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। লক্ষ্মণকে বসিতে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুরুদ্ধস্বরে কহিতে লাগিলেন—"বৎস, আমি ভাগ্যবলেই তোমাকে পুনর্জীবিত দেখিলাম। তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে আমার জানকী লাভ, জয় ও জীবনেই বা কি প্রয়োজন?"

রামের এইরূপ বাক্যেও কার্য্য শৈথিল্যের আভাসে লক্ষ্মণ সেই অবস্থাতেই অতিশয় দুঃখপূর্ণ স্বরে কহিলেন—"আর্য্য, ক্ষুদ্র লোকের ন্যায় আপনার এইরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করা কি উচিত? প্রতিজ্ঞা পালন মহতেরই লক্ষণ, বীর আপনি কেন আমার জন্য নিরাশ হন? আমার ইচ্ছা যে আজ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই রাবণকে বধ করুন। যদি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা ধর্ম্ম হয়, যদি জানকী উদ্ধারে আপনার যত্ন থাকে, তবে শীঘ্রই আমার কথা রক্ষা করুন।"

লক্ষ্মণের এই উক্তিটি বিশেষ লক্ষ্যণীয়—"বীর, আপনি কেন আমার জন্য নিরাশ হন?"

রামচন্দ্র যে আবেগজনিত আনন্দের অবস্থায় লক্ষ্মণকে স্নেহে, আদরে বিপর্য্যস্ত করিয়া তাঁহার বিপদে বালকের ন্যায় কাতর হইয়া পড়েন, রামচন্দ্রের এই একান্ত স্বাভাবিক হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের প্রাবল্যে তিনি রামচন্দ্রকে কখনও বা

তীব্র ভৎর্সনা করিয়াছেন—কখনও বা নীরব থাকিয়া তাহা উপভোগ করিয়াছেন।

আরণ্যকাণ্ডে লক্ষ্মণের আরও একটি উক্তি লক্ষ্যণীয়।

কবন্ধদস্যুর হস্তে রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই অবাক। লক্ষ্মণ সেই সময় রামকে কহিলেন—"বীর, দেখুন আমি রাক্ষসের হস্তে অতিশয় বিবশ হইয়া পড়িতেছি, এক্ষণে আপনি আমাকে উপহারস্বরূপ অর্পণ করিয়া সুখে পলায়ন করুন। বোধহয় আপনি অচিরাৎ জানকীকে পাইবেন। পরে পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ এবং রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া একবার আমাকে স্মরণ করিবেন।"

লক্ষ্মণের এই দীন-হীন কাতরোক্তিতে সেদিন রামচন্দ্র তাঁহাকে বীরের প্রতি বীরের যথাযোগ্য উত্তর দিয়াছিলেন! তিনি বলিয়াছিলেন—"বীর, অকারণে ভীত হইও না, তোমার সদৃশ লোক বিপদে কদাচ ভীত হন না।"

সেদিন লক্ষ্মণ স্বেচ্ছায় আপনার জীবন দিয়া রামচন্দ্রকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার এই অর্ব্বাচীনতায় রামচন্দ্র শুধু মৃদু ভর্ৎসনা দ্বারা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। পরে তাঁহারা উভয়েই কবন্ধকে বধ করেন।

রাবণ-বধের পর বিজয়োল্লাস কিছু স্তিমিত হইলে সীতাকে রামচন্দ্রের নিকট লইয়া আসা হইল। কিন্তু রাবণের গৃহে বন্দিনী থাকায় রাম তাঁহাকে সর্ব্বসমক্ষে প্রত্যাখ্যান করিলেন। সীতা লক্ষ্মণকে চিতা প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। রামচন্দ্রের এই প্রত্যাখ্যানও সীতার প্রতি নানা অশোভন উক্তির প্রতিবাদ তাঁহার অনুরাগী ও সুহৃদগণের মধ্যে কেহই করিতে সাহসী হইলেন না। একমাত্র লক্ষ্মণই রোষবশে রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

সীতার এই অপমান তিনি অনুমোদন করেন নাই। কিন্তু রামচন্দ্র যে কথা সীতাকে তখন বলিলেন—তাহা রাজধর্ম্ম ও গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুকূল বলিয়াই তিনি সহসা প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলেন না। তাঁহাদের সময়কার সামাজিক অবস্থা স্মরণ করিয়া রামচন্দ্রের উক্তিগুলি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলিয়া বোধ হয়।

রাম সীতাকে কহিলেন—"তুমি নিশ্চয় জানিও, আমি যে সুহৃদগণের বাহুবলে এই যুদ্ধশ্রম উত্তীর্ণ হইলাম—ইহা তোমার জন্য নহে। * * * যে স্ত্রী পরগৃহবাসিনী কোন সৎকুলজাত তেজস্বী পুরুষ তাহাকে পুনর্গ্রহণ করিতে পারে? রাবণ তোমাকে দুষ্ট চক্ষে দেখিয়াছে, এক্ষণে আমি নিজের সৎকুলের পরিচয় দিয়া কিরূপে তোমাকে পুনরায় গ্রহণ করিব।"

লক্ষ্মণ স্বয়ং রাজপুত্র হইয়া রাজধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন না···সে শুধু নিজেদের বংশমর্য্যাদার জন্য। তাহার পর রাম অগ্নি পরীক্ষান্তে সীতাকে পুনরায় গ্রহণ করায় তাঁহার আনন্দের সীমা ছিল না।

পিতা দশরথ এই স্থানে কেবল লক্ষ্মণের সহিত কথা বলিয়াছিলেন। লক্ষ্মণকে তিনি কহিলেন—"রামকে তুমি নিত্যব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। বৎস, জানকীর সহিত ইহার সেবা করিয়া তোমার ধর্ম্ম ও যশোলাভ হইয়াছে।"

সীতা, লক্ষ্মণ ও অগণিত লোক সমভিব্যাহারে রাম অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে অযোধ্যা আবার রমণীয় শ্রীধারণ করিল। রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া রাম লক্ষ্মণকে ডাকিয়া কহিলেন—"বৎস, মনু প্রভৃতি পূর্ব্বরাজগণ চতুরঙ্গ সৈন্যের সহিত যে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন—এবং পূর্ব্বে তাঁহারা যৌবরাজ্যের যে ভার বহন করিয়াছেন, তুমিও সেই ভার গ্রহণ কর।"

রামচন্দ্রের বিনীত অনুরোধ ও নিয়োগ বাক্যে লক্ষ্মণ কিছুতেই রাজী হইলেন না। লক্ষ্মণ চরিত্রের এই নির্লোভতা ও ত্যাগে আমরা মুগ্ধ না হইয়া পারি না। রামচন্দ্রের অনুরোধ সত্ত্বেও কেন যে তিনি যৌবরাজ্য গ্রহণে অসম্মত হইলেন, ইহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

লক্ষ্মণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখি কতকগুলি বিশেষ গুণ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে—সেই বিশেষ গুণগুলির জন্য তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় এক মহান পুরুষরূপে—যিনি সেবাধর্ম্মকেই একমাত্র আদর্শ ও মহান জানিয়া সকল প্রলোভন হেলায় জয় করিয়া আপন কর্ত্তব্যে দৃঢ়ভাবে অটল রহিলেন। অথচ কোথাও কোন আতিশয্য নাই, সেবা ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে গিয়া কোথাও তিনি শাস্ত্রের বাণী উদ্ধৃত করেন নাই। লোকচক্ষুর অন্তরালে তাঁহার যে সেবাপরায়ণ চিত্রটিই আমাদের চোখে পড়িয়াছে তাহা মানবতার ইতিহাসে অম্লান হইয়া রহিয়াছে।

এইবার আসিল উত্তরকাণ্ড।

নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে জানকীকে বনবাসে পাঠাইবার ভার লক্ষ্মণের উপরেই পড়িল। লক্ষ্মণের মুখ শুষ্ক, চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত। রামচন্দ্রের নিদারুণ বাক্য তাঁহার কর্ণে গলিত সীসার ন্যায় তপ্ত বলিয়া বোধ হইতেছে।

রাম তাঁহাকে ডাকাইয়া কহিলেন—"তুমি জানকীর জন্য আমায় কোন অনুরোধ করিও না।······তুমি এই বিষয়ে নিবারণ করিলে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইব। আমার চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ কর, আমার প্রাণের দিব্য আমায় কিছু বলিও না।" "তুমি কল্য প্রভাতে সুমন্ত্র-চালিত রথে করিয়া সীতাকে লইয়া পরিত্যাগ করিয়া আইস। যদি তোমরা আমার মতস্থ হও, তবে আমার সম্মান রাখ এবং সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া আইস।" এই বলিয়া রাম বাষ্পাকুল-লোচনে অন্য কক্ষে চলিয়া গেলেন। রামচন্দ্র বিশেষভাবেই জানিতেন যে লঙ্কায় সীতা পরিত্যাগের সময় লক্ষ্মণ বাধা না দিলেও বর্ত্তমানে তিনি বাধা দিতেন। সেইজন্য তিনি বাধা দিবার পূর্ব্বেই রামচন্দ্র তাঁহাকে নিদারুণ শপথ জালে জড়িত করিলেন। লক্ষ্মণ সীতাকে লইয়া রথে করিয়া যাইতেছেন। তাঁহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ দেখিয়া জানকী তাঁহাকে কহিলেন—"তুমি নিয়তই রামের নিকট থাক, আজ দুই রাত্রি তাঁহাকে দেখিতে পাও নাই বলিয়া এইরূপ শোকাকুল হইয়াছ? সীতা তাঁহার নিদারুণ বিপদ জানিতেন না বলিয়াই লক্ষ্মণের চক্ষে অশ্রু দেখিয়া তাঁহাকে পরিহাস করিয়া ঐ কথা বলিলেন। লক্ষ্মণ অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন। ঐ অশ্রু সীতার বনবাস-দুঃখে তো বটেই, পরন্তু সীতার প্রতি রামচন্দ্রের প্রেম স্মরণ করিয়া, এই অশ্রু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সীতার বিসর্জন-জনিত হৃদয়বিদীর্ণকারী দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইতে দেখিয়া, এই অশ্রু রামচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্মণের নিদারুণ অভিমান-সঞ্জাতও বটে। সীতা-বিসর্জ্জনের মত এত বড় একটা ব্যাপারে রাম কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করেন নি—ভ্রাতাদের পূর্ব্বাহ্ণে এ বিষয়েও কণামাত্র আভাস দেননি—লক্ষ্মণের অভিমান সেই কারণ ছাড়া আর কি হইতে পারে?

তপোবনে আমরা জটাচীরধারী ভরতের আকুল ক্রন্দন দেখিয়াছি, সীতা-বিরহে রামের সেই শোকোচ্ছাস বিরহের এক অমর চিত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছে, কিন্তু নিস্তব্ধ তমসাতীরে অশ্রু-আকুল লক্ষ্মণের যে চিত্র আমরা দেখিতে পাই, তাহার সহিত কাহারও তুলনা চলে না।

লক্ষ্মণ সজলনয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে সীতাকে কহিলেন—"দেবী, আমার হৃদয়ে বড় কষ্ট। আর্য্য রাম ধীমান হইলেও যখন এই কার্য্যে আমায় নিয়োগ করিয়াছেন তখন আমি লোকের নিকট অবশ্যই নিন্দনীয় হইব। আমার আজ মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। এই লোক-গর্হিত কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া আমার সমুচিত নহে, তুমি প্রসন্ন হও, আমার অপরাধ লইও না।"

লক্ষ্মণের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার অশ্রুসিক্ত নয়ন ও দীনহীন ভাব দেখিয়া জানকী বিস্মিত হইয়া গেলেন। তিনি কহিলেন—"আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, তুমি সব কথা আমাকে বল।"

তখন লক্ষ্মণ জলধারাকুল লোচনে আনুপূর্ব্বিক বিবরণ জানাইয়া অবশেষে কহিলেন—"তুমি আমার সমক্ষে নির্দোষ প্রমাণিত হইয়াছিলে, তথাপি মহারাজ কলঙ্ক ভয়ে তোমাকে ত্যাগ করিলেন। তিনি তোমার বাস্তব যে কোনও দোষ আশঙ্কা করিয়াছেন তাহা নহে, তুমি এরূপ বুঝিও না, এক্ষণে রাজার আদেশ এবং তোমার আশ্রম দর্শনে মনোরথ—এই দুই কারণে আমি তোমাকে আশ্রমের প্রান্তভাগে পরিত্যাগ করিয়া যাইব। তুমি পাতিব্রত্য অবলম্বন এবং রামকে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক একাগ্রমনে অনশনে কালযাপন কর। ইহাতেই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে।" এই বলিয়া তিনি সীতাকে প্রণাম করিয়া নৌকায় উঠিলেন।

তমসার তীরে এক রোরুদ্যমানা অসহায়া অন্তঃসত্ত্বা নারী, আর গঙ্গাবক্ষে অশ্রুসিক্ত শোকাকুল এক বীরশ্রেষ্ঠ পুরুষ—উভয়েই রাজধর্ম্মের নির্দ্দেশ নতশিরে গ্রহণ করিলেন।

একজন গভীর অরণ্যে রহিয়া গেলেন—আর একজন তমসার জলে সমস্ত দুর্ব্বলতা বিসর্জ্জন দিয়া ভাবলেশহীন-মুখে অচঞ্চল-হৃদয়ে রামচন্দ্রের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। একদা বহুবর্ষ পূর্ব্বে রামচন্দ্রের বনগমন যাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া যে লক্ষ্মণ রামকে 'দৈবের বশবর্ত্তী' হইয়াছেন বলিয়া নানা যুক্তিতর্কে দৈবকে অসার প্রতিপন্ন করিয়া আপন পৌরুষকেই প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন সেই লক্ষ্মণ সুমন্ত্রের সহিত রথে ফিরিয়া আসিবার সময় ক্লান্তস্বরে

কহিলেন—"আমার বোধহয় এই দুর্ঘটনা, ইহা দৈব-নিবন্ধন। দৈবকে অতিক্রম করে কাহার সাধ্য। যিনি ক্রুদ্ধ হইলে দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর এবং রাক্ষসদিগকে নষ্ট করিতে পারেন তিনিও দৈবের অনুবৃত্তি করিতেছেন। হায়, অন্যায়বাদী পৌরদিগের জন্য এই অযশস্কর কার্য্য করিয়া তাঁহার কোন ধর্ম্ম সাধিত হইবে জানিনা।"

অযোধ্যায় ফিরিয়া লক্ষ্মণ দেখিলেন, সীতা বিরহে রাম অনবরত রোদন করিতেছেন। লক্ষ্মণ নিজেকে সংযত করিয়া কহিলেন—"আমি আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া জাহ্নবী তীরে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে শুদ্ধচারিণী জানকীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার পাদমূলে আশ্রয় লইবার জন্য পুনরায় আসিলাম।"

এখানে লক্ষ্মণের "শুদ্ধচারিণী" কথাটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তিনি আরও কহিলেন—"আর্য্য, আপনি শোকাকুল হইবেন না, কালের গতিই এইরূপ। আপনার মত ধীমান মনস্বীরা কিছুতেই শোক করেন না। দেখুন, সমস্ত সঞ্চয় নাশে, উন্নতি পতনে, সংযোগ বিয়োগে ও জীবন মরণে পর্য্যাবসান হয়। অতএব স্ত্রী পুত্র, বন্ধুবান্ধব ও ধন-সম্পদ ইহার মধ্যে কিছুতেই অতিমাত্রায় আসক্ত হওয়া উচিত নহে। কারণ ইহাদের সহিত বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী।"

লক্ষ্মণ সুমন্ত্রের নিকট শুনিয়াছিলেন—রাম চিরদুঃখী হইবেন। তিনি প্রিয়-বিচ্ছেদ কষ্ট সহ্য করিবেন এবং বহুকালের জন্য জানকী, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে ত্যাগ করিবেন। কাজেই সীতা-বিরহে তাঁহাকে একান্ত শোকাকুল দেখিয়া লক্ষ্মণ রামকে অতি প্রচ্ছন্নভাবে জানাইলেন যে—"সংসারে সবই অনিত্য, অতএব শোক করা উচিত নহে। আপনি যে অপবাদ ভয়ে ভীত হইয়া জানকীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন তজ্জন্য শোকাকুল হইলে সেই অপবাদ আবার থাকিবে। অতএব আপনি ধৈর্য্যবলে এই দুর্ব্বল বুদ্ধি ত্যাগ করুন।"

এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র প্রীতিভরে লক্ষ্মণকে কহিলেন—"বৎস, তোমার বাক্যে আমার দুঃখ, নিবৃত্তিও সন্তাপ দূর হইল। তুমি বুদ্ধিমান। তুমি আমার অনুকূল বন্ধু, বিশেষতঃ এই সময়ে এমন বন্ধু দুর্লভ।" রামচন্দ্র তাঁর জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসময়ে তাঁহাকে বন্ধুত্বের শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা দিয়া ধন্য করিলেন।

এ যাবৎ লক্ষ্মণ সেবকরূপেই রামচন্দ্রের স্নেহছায়াতলে নতশিরে সব আদেশ পালন করিয়া আসিলেও যেখানে অন্যায়, অধর্ম্ম ও অযৌক্তিকতা সেইখানেই তিনি অকুণ্ঠিত-চিত্তে স্বীয় মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত বিরুদ্ধ মত অবশেষে রামচন্দ্রের মতের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তা সত্ত্বেও দেখি, রামায়ণ মধ্যে একমাত্র তিনিই বাস্তব। হৃদয় দৌর্ব্বল্যে, দুঃখে বেদনায়, ক্ষাত্র তেজে, ন্যায়, দৈব, ধর্ম্ম ও নীতির অকুণ্ঠ সমালোচনায়, রাজধর্ম্ম বিশ্লেষণে, আত্মবিশ্বাসে, স্নেহে, প্রেমে, ক্ষমা ও উদারতায়, অন্যায়ের প্রতিবাদে, পরিশ্রমের কঠোরতায় তিনিই একমাত্র মানবোচিত গুণে ভূষিত।

'রামায়ণে' রামচন্দ্রকে কেহই বুঝিতে চেষ্টা করে নাই। তিনি সকলের নিকট হইতে অযাচিতভাবে স্নেহ ভালবাসা, প্রেম-প্রীতি, শ্রদ্ধা-সম্মান ও পূজা পাইয়া আসিয়াছেন। একমাত্র লক্ষ্মণই তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই রামচন্দ্র তাঁহাকে "বন্ধু" বলিয়া অভিহিত করিলেন।

রামচরিত্রের উজ্জ্বলতম অংশ লক্ষ্মণ। তাঁহাকে বাদ দিয়া রামচরিত্র অঙ্কন করা বৃথা। কিন্তু লক্ষ্মণ-চরিত্র স্বয়ং-সম্পূর্ণ। যদিও তাঁর গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের ছবি আমাদের নিকট অগোচরই রহিয়া গেল, কিন্তু তবুও বলিতে পারা যায়—সেখানেও তিনি আদর্শস্বামীরূপেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

রাম-সীতার সহিত আজ লক্ষ্মণের মূর্ত্তিরও পূজা হইয়া থাকে এবং রামচন্দ্রের সঙ্গে একাসনেই তাঁর স্থান হইয়াছে। জানি না কোন প্রাচীন যুগে কাহারা তাঁহাদের পূত-চরিত কথা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধাভরে তাঁদের প্রিয়চরিত্রগুলির মূর্ত্তি করাইয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, জানি না কোন বিস্মৃত যুগ হইতে তাঁহাদের চরিত্র-কথা নিয়মিত পাঠের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছিল, যাঁহারা এ কাজ করিয়া থাকুন—রামচন্দ্র ব্যতীত লক্ষ্মণকে যে তাঁহারা মানবতা'র শ্রেষ্ঠ পূজারী বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন এ বিষয়ে লক্ষ্মণের মূর্ত্তিপূজাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ।*

* মহর্ষি বাল্মীকি রচিত "রামায়ণ" অবলম্বনে।

গোধূলির রঙ

সন্তোষকুমার অধিকারী

বেলা রায়ের বাবা অসীমকৃষ্ণ রায়—একটা নামকরা—ফার্মের মালিক। কলকাতায় ও আশে-পাশে তাঁর খান তিনেক প্রাসাদতুল্য বাড়ী আছে। আর আছে গোটা চারেক মোটর। কিন্তু ঐশ্বর্য্যই বেলা রায়ের একমাত্র অহংকার নয়। বেলা রায় অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে পাস করেছে এবং বিলেত যাবো যাবো করেও যেতে পারছেনা, কারণ বেলার বাবা-মার ইচ্ছে বিয়ের পর সে স্বামীর সঙ্গে বিলেত যায়। মেয়ে-জামাইকে বিলেত পাঠাবার মত যথেষ্ট অর্থও তাঁরা আলাদা ক'রে রেখেছেন। কিন্তু শুধু এই জন্যেই যে বেলা মৃত্তিকাকে পায়ের তলার রাখতে শিখেছে তা নয়। এমন কি তার অনিন্দ্য রূপের জন্যেও নয়। বেলার গর্ব্ব তার বনেদী আভিজাত্য, তার রুচি, তার আচরণ, তার কৃষ্টি, তার দীপ্তি।

বাঙ্গালী ঘরে এ'র যে কোন একটি গুণ থাক্‌লেই মেয়েরা মাটিতে পা না দিয়েই হাঁটতে চায়। আর বেলার বয়েস সবেমাত্র একুশ ছুঁয়েছে। তার মনে এখন প্রথম আশা আর স্বপ্ন। জীবনকে এখন সে শুধু মধুর বলেই জেনেছে। কাজেই বেলা রায়ের পক্ষে অহংকার কিছুটা না থাকাই বরং আশ্চর্য। যদি সে পাঁচতলা বাড়ীর পাঁচতলার ছাদ থেকে মাটির দিকে চেয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে, তাতেই বা আশ্চর্য হবার কি আছে।

বেলা রায়ের একুশ বছরের যৌবন ফুটবো-ফুটবো ক'রে উন্মুখ হ'য়ে আছে। তার পাপড়ি শতদলের মধু গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে মধুলোভী বহুজন ছুটে এসেছে। কিন্তু আবার ফিরে গিয়েছে তারা। ছুটে এসেছিলো কলেজের সতীর্থ সত্যেন সেন, যে আজ ব্যারিষ্টারি পড়তে লণ্ডন চলে গিয়েছে। এসেছিলো চৌষট্টি টাকা ভিজিটের ডাক্তার গুপ্তর একমাত্র পুত্র অনিমেষ। সে এখনও নিরাশ হয়নি একেবারে। আরও অনেক এসেছিলো। কিন্তু মনের দরজা খোলেনি বেলা রায়। এ দরজা শুধু একজনই খুলতে পারে। সে মনসিজ।

মনসিজের বাবা নাম-করা মিলোনার নন। কিম্বা তাঁর লাখ টাকার ফিক্স্‌ড ডিপোজিটও নেই। মনসিজের বাবা কলেজের শুধু অধ্যক্ষ। শুধু সেই কলেজে পড়ার দিনে যে কি ভাবে বেলা রায় মনসিজ নামক ছেলেটির কাছে মনটাকে হারিয়ে এলো সে কথা ভাবতে গেলেও আশ্চর্য্য লাগে।

এ কথা সকলেই জানে। শুধু এ বাড়ীর নয়—ও বাড়ীর লোকেও। বেলার বাবা আপত্তি করেন নি। কারণ টাকার অভাব তাঁর নেই। জামাইকে অর্থাভাব পেতে হবে না—বেলাই তাঁর একমাত্র মেয়ে। আর মনসিজ?

সেই অনিন্দ্যসুন্দর তরুণটির মুখ ভর্ত্তি সারল্য। চোখে বুদ্ধির দৃঢ়তা। বেলা তাকে হৃদয় দিয়েছে। হ্যাঁ দিয়েছে বই কি। ডায়মণ্ডহারবার রোডের দিকহারা পথে ড্রাইভ করতে করতে পার্শ্ববর্তিনী তরুণীর চোখের দিকে চেয়ে একাধিকবার বলেছে মনসিজ—তোমাকে আমার ভালো লাগে…ভালো লাগে। তুমি কেমন করে এলে আমার কাছে?

দোতলার ঘরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ড্রেস্ করতে করতে ভাবছিলো বেলা। হালকা পাউডারের পাফ্ সযত্নে বোলাচ্ছিলো সে তার গালে আর গলায়। আয়নার উজ্জ্বল কাচে কানের গোল রিং দুটি চিক্‌চিক করছিলো। কোঁকড়া ফাঁপানো চুলগুলো বাতাসে একটু একটু উড়ছিলো। নিজের মুখের দিকে চেয়ে একটুখানি শুধু হাসলো বেলা রায়। এখন সবে মাত্র সকাল আটটা। দীর্ঘ তিন বছর ফ্রান্স আর লণ্ডনে কাটিয়ে কন্টিনেন্ট ঘুরে

অবশেষে ফিরে এলো মনসিজ। আজ এগারোটায় তার ট্রেন এসে লাগছে হাওড়া ষ্টেশনে। ফিরে আসছে, এসে পৌঁচচ্ছে মনসিজ।

লম্বা করিডোর বেয়ে একেবারে পশ্চিমের ছাদে পৌঁছলো বেলা। খোলা ছাদে সারি সারি টব ভর্তি গোলাপ। রজনীগন্ধা আর চন্দ্রমল্লিকা বেছে বেছে লম্বা ডাঁটার কটা গোলাপ কাঁচি দিয়ে সযত্নে কেটে নিলো সে। মনসিজ বড় ভালোবাসে গোলাপ। তাদের সহপাঠী সেই শ্যামলা মেয়ে নীলা দত্ত একবার কতকগুলো গোলাপ দিয়েছিল মনসিজকে। উঃ কী খুসীই না হয়েছিল মনসিজ। বাপ যার কাগজের আপিসের সাব-এডিটর—সেই মেয়ে কিনা তার গান শুনিয়ে আর ফুল দিয়ে ভুলিয়ে দেবে মনসিজের মনকে।

নিজের দিকে চেয়ে একটু দর্পিত হ'য়ে ওঠে বেলা রায়। সে যদি একটু কম রূপ পেতো—যদি তার মুখের রঙ আর একটু কম ফরসা হ'তো—কিম্বা আর একটু মোটা হ'য়ে যেত তার দেহ···কিম্বা যদি সে হালকা হ'য়ে যেত—বাচাল হ'ত ওই নীলা দত্তর মত ?

মৃদু হাসিতে ভ'রে উঠলো বেলার মুখ। ফুলগুলোকে দু'হাতে ধরে সে দক্ষিণের বারান্দায় এগিয়ে এলো—বাপি, আর একটু পরে আমি গাড়ীটা নিয়ে বেরোবো। আজ মনসিজ ফিরে আসছে।

—সত্যি ?

ইজি-চেয়ার থেকে ঘাড় কাত করে তাকালেন অসীমকৃষ্ণ রায়। তারপর আবার ডুবে গেলেন রাশিকৃত ফাইলের স্তূপে। বেলা হাল্কা একটু সুরের ঢেউ তুলে এগিয়ে গেল উত্তরের বারান্দায়—ছোড়দা, ষ্টেশন যাবি ? আজ মনসিজ আসছে।

—মনসিজ ? তা আজ তুই একাই যা। আমি বিকেলে ওকে কনগ্রাচুলেট করবো।

বেলা লঘুপদে ফিরে এলো তার নিজের ঘরে। এখন সবে সাড়ে আটটা। বোম্বে মেল এসে পৌঁছবে এগারোটায়।

নীলা দত্ত হয়ত জানেনা যে মনসিজ আজ এসে পৌঁচচ্ছে। মনসিজ কি তাকেও চিঠি লেখে ? না, এত হালকা সে নয়। কিন্তু তবু কি অহংকার ওই কালো মেয়ে নীলা দত্তর। সে যেন তার দৈন্য তার অভাবকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবে। সে যেন আপন গণ্ডির বাইরের পৃথিবীকে অবহেলায় তলিয়ে দেবে। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে সে বড় করুণাবোধ করছে নীলা দত্তর জন্যে।

সত্যি কথা বলতে কি, নীলাই ত আলাপ করিয়ে দিল মনসিজের সঙ্গে। তখন নীলা তার ঘনিষ্ঠ সখী ছিল। এক জন্ম-দিনের উৎসবে নীলা তার হ'য়ে নেমন্তন্ন ক'রে আনলো মনসিজকে। মনসিজ সেতার বাজায়। চমৎকার তার হাত। তার বাজনা শুনতে শুনতে কতদিন দুঃখে গুমরে উঠেছে বেলা। হায়! কেন সে শেখেনি বাজাতে ?

নীলা তার কানে কানে বললো—এই মনসিজ। তোকে এতদিন নাম শুনিয়েছি। এবার চেহারা দেখালাম। দেখত—আমার 'মন্‌আমি' হবার যোগ্য কিনা ?

প্রথম দিনেই মুগ্ধ হলো বেলা। তারপর তার সন্ধ্যের ব্যাডমিণ্টন ক্লাবের পার্টনার হলো মনসিজ। তার ছুটির দিনের আউটিংএরও সঙ্গী হ'লো সে! তার মুগ্ধ মধুর চোখে চোখ রেখে অবশেষে একদিন বললো সে—তোমায় বড় ভালো লাগছে···বেলা।

আশ্চর্য্য! নীলা ঝগড়া করেনি। তার লাভারকে মুগ্ধ করেছে বেলা, কিন্তু নীলা কোন চাঞ্চল্য দেখায় নি মুখে। আশ্চর্য্য ঔদাসীন্য দিয়ে সে অবজ্ঞা করেছে মনসিজ-বেলার গড়ে-ওঠা ঘনিষ্ঠতাকে। কিন্তু সত্যিই কি সে মনে মনে দুঃখ পায়নি কিছু ?

নীলার জন্যে—মনে ব্যথাবোধ করলো বেলা।

মনসিজ লিখছে—সোমবার সকাল এগারোটায়—বোম্বে মেলে হাওড়া পৌঁচচ্ছি। আশা করি ভালো আছ। আশা করি যেদিন তোমায় ছেড়ে এসেছিলাম ঠিক সেদিনের মত করেই পাবো।

তোমার মনসিজ

মনসিজ বড় চাপা। মনের ভাবকে সে প্রকাশ করে না কথায়। কিন্তু কথায় তার ব্যঞ্জনা আছে। আর বেলা অনুভব করতে পারে তার ভাবের ব্যঞ্জনাকে।

মনসিজ গ্লাসগো থেকে ডিগ্রী নিয়ে আসছে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে। ইতিমধ্যে কলকাতার সমাজে হৈ চৈ পড়েছে

তাকে নিয়ে। বেলা জানে ঘরে ঘরে মেয়েদের আর মায়েদের চোখে ঘুম নেই। কিন্তু বেলা নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমিয়েছে। সে জানে মনসিজ পাঁকাল মাছ নয়। তাকে হারাবার ভয় নেই। তাকে সে স্থির জেনে পেয়েছে। মনসিজ শুধু তার।

দশটা নাগাদ ষ্টেশনে এসে পৌছলো বেলা। গাড়ীটাকে ষ্ট্যাণ্ডে রাখতে ব'লে দুহাত ভর্তি ফুল নিয়ে হাওয়ায় যেন উড়তে উড়তে গাড়ী থেকে নামলো সে। সঙ্গে আর কেউ আসেনি। ভালোই হয়েছে। এত-দিনের পর দেখার মধ্যে তৃতীয় কেউ না থাকাই ভালো। আকাশ রঙের ফিজি সিল্কের শাড়ীতে তাকে অপূর্ব্ব মানিয়েছে। মাথার চুলের গুচ্ছ বেণী বেঁধে ঘাড়ের দু'পাশ দিয়ে ঝুলিয়েছে। চোখে সোনার চশমা। হাতের কড়ে আঙুলে ঝুলছে টকটকে লাল রঙের একটা ভানিটি ব্যাগ।

হাঁটতে হাঁটতে চশমার কাচের আড়াল থেকেই দেখলো বেলা—কাউণ্টার থেকে দু'জন ভদ্রলোক হাঁ করে চেয়ে আছে তার মুখের দিকে। বেলা কুণ্ঠিত হয়না। মুগ্ধ অথবা ঈর্ষান্বিত চোখের দৃষ্টি সইতে সে অভ্যস্ত। দৃঢ় পদক্ষেপে এন্‌কোয়্যারির সামনে এসে সে প্রথমেই শুধোলো—বোম্বে মেল ?

—রাইট টাইম্‌।

একটা প্ল্যাটফরম্‌ টিকিট কিনে নিলো সে। তারপর অবশিষ্ট সময়টুকু কাটাতে হুইলারের বইয়ের ষ্টলের দিকে এগোলো।

সবেমাত্র একটা সিনেমা পত্রিকা নিয়ে তার প্রথম দুটি পাতা উলটিয়েছে সে এমন সময় ঘাড়ের কাছে কার যেন নিঃশ্বাস পড়লো—আরে বেলা নাকি ?

মুখ ফিরিয়ে ছোট্ট একটা শব্দ ক'রে প্রায় অসাড় হ'য়ে গেল বেলা। তার ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে তারই পুরোনো বন্ধু নীলা দত্ত। একটা সাধারণ তাঁতের শাড়ী প'রে, সবুজ পপলিনের ব্লাউজ গায়ে, খোলা চুলে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে নীলা। কিন্তু সে এখানে কি করতে এলো ?

নীলা সহাস্যে বললো—মনসিজ আসছে এই ট্রেনে। তুই নিশ্চয়ই খবর পেয়েই এসেছিস ?

শুকিয়ে ওঠা ঠোঁট দুটোকে আল্‌গা করে ওল্‌টালো বেলা রায়।

—মনসিজ ? হ্যাঁ আসছে বটে আজই। আমার এক আত্মীয়ও আসছে। এলাহাবাদ থেকে।

—এক ঢিলে দুই পাখী মারা হবে। মনসিজ খুসীই হ'বে তোকে দেখলে। অনেক সময় আছে এখনও। ভাবছিলুম একা একা কি করি ? ভালোই হ'লো তোকে পেয়ে। নীলা তার হাত ধ'রে টেনে আন্‌লো একটু ফাঁকা জায়গায়।

—তুই ত আজকাল আর খবরই রাখিস্‌ না আমাদের। ডুমুরের ফুল হ'য়ে গেছিস নিজে। ভাগ্যিস্‌ আজই তোর আত্মীয় আসছেন এলাহাবাদ থেকে।

নীলা শব্দ ক'রে হেসে উঠলো। আর বেলার হাতের ফুল দেখিয়ে বললো—ভারী সুন্দর গোলাপগুলো। মনসিজ পেলে খুসী হতো। ও আবার ছবি আঁকা ধ'রেছে। পাঠিয়েছে তোকে কিছু।

অপমানে লাল হ'য়ে গেল বেলার সুন্দর মুখটা। সে শুধু নিঃশব্দে বললো—ছবি আঁকে ? তাহলে হাতে আর কোন কাজ নেই বল ?

নীলা বললো—এক সপ্তাহের জন্যে ফ্রান্স গিয়েছিলো। তার কতকগুলো ফোটো পাঠিয়েছে। কী সুন্দর ফ্রান্সের নদী, বন, আর আকাশ ! তুই দেখেছিস ? সুইজার-ল্যাণ্ডে এক হোটেলে খেতে গিয়ে জল চেয়ে ও বিপদে ফেলে দিয়েছিলো সকলকে। ওয়েটার কিনা এক গ্লাস গরম জল এনে হাজির। কোল্ড ওয়াটার বলাতে ছোট্ট মেজার গ্লাসে ক'রে এক আউন্স জল। তাও অনেক দেরী ক'রে আন্‌তে পারলো।

নীলা হেসে গড়িয়ে পড়লো, আর সে হাসিতে রাশিকৃত ব্যাঙ্গ আগুন হ'য়ে ছড়ালো বেলা রায়ের বুকে।

হঠাৎ একটা ঘণ্টার শব্দে সচকিত হয়ে উঠলো বেলা। নীলার কথায় বাধা দিয়ে বললো—আমি দেখি একটু, ছোড়দা আসবে বলেছিলো।

নীলার উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই হ'ন হ'ন ক'রে একদিকে এগিয়ে গেল বেলা। সে এখন পরিত্রাণ চায় নীলার হাত থেকে—তার কথা আর দৃষ্টি থেকে।

নীলার দৃষ্টি সত্যিই ঝাপ্‌সা হ'য়ে এসেছিলো। ভীড়ের মধ্যে অসংযত হয়ে পড়েছিলো তার পদক্ষেপ। বোম্বে মেলের ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাটফরমে একটা চাঞ্চল্য

জাগলো। ভীড়ের ধাক্কায় দ্রুত এগোচ্ছিল বেলা! হঠাৎ কে এসে হাত ধরলো।

—কোথায় চলেছো? নীচে পড়বে যে?

হাত ধ'রে প্ল্যাটফরমের প্রায় কিনারা থেকে টেনে সরিয়ে নিয়ে এলো যে, তার দিকে চেয়ে ভীতু কণ্ঠে বললো বেলা—আঃ অনিমেষদা, বড্ড ভীড়। যা ধাক্কা দিচ্ছে লোকগুলো।

অনিমেষ ও'র দিকে চেয়ে বললো—তোমায় দেখে ত' আমি ছুটে এলাম। একা—কে আসছে?

—আসছে আমাদের এলাহাবাদের এক পিসী। ট্রেন এসে গেলো। তুমি এসো আমার সঙ্গে।

হু হু করে কাঁপতে কাঁপতে প্রকাণ্ড ট্রেনখানা এসে দাঁড়ালো যেন একটা ক্লান্ত দৈত্যের মত। আর তার জঠর থেকে ছিটকে পড়তে লাগলো লগেজ সমেত মানুষগুলো। শুধু একটি ফার্ষ্ট ক্লাস কামরা থেকে একটি মাত্র যুবক স্থির দৃষ্টিতে যেন খুঁজতে লাগলো কাউকে—খুব পরিচিত কোন লোককে!

—এই যে মনসিজ, তুমি নামোনি এখনও?

নীলা দত্তর ব্যস্ত ব্যাকুল মুখের দিকে চেয়ে—উদাসীন-ভাবে উত্তর দিলো মনসিজ—কে নীলা? তুমি কি ক'রে জানলে যে আমি আসছি?

—বাঃ রে! তুমি চিঠি লেখোনা তোমার বোন বিনতাকে? বিনতাই ত বললো—তুমি ত আর আমাকে মনে ক'রে লিখবে না?

নীলার অভিমানভরা চোখের দিকে চেয়ে মনসিজ বললো—কিন্তু বিনতা ত…

—ওর যে অসুখ। না না, বেশী কিছু না। চলো যেতে যেতে বলবো।

কুলীর মাথায় স্যুটকেশ আর বেডিংটা তুলে দিয়ে মনসিজের পাশে এসে দাঁড়ালো নীলা। বললো—চলো।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে আবার থমকে দাঁড়ালো মনসিজ। হঠাৎ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো তার মুখ। উল্টো দিক থেকে হেঁটে আসছে বেলা! হেঁটে আসছে সে। হাত ধ'রে আছে অনিমেষের।

থমকে দাঁড়ালো বেলাও। হ্যাঁ মনসিজ নীলার হাত ধ'রেই চলেছে। কোন রকমে কাঁপা গলায় সে বললো—ভালো আছো?

—হ্যাঁ, তুমি ভালো আছো বেলা?

—ভালো আছি।

—কী অপূর্ব্বই তোমাকে দেখাচ্ছে। আঃ কী সুন্দর ফুলগুলো। তুমি কি—দেরী করেছো আসতে? এত দেরী…

মনসিজের চোখ সত্যিই মুগ্ধ হ'য়ে গেছে। কিন্তু না, আর ভুলবে না বেলা রায়। যে বিশ্বাস রাখতে জানে না, যে মিথ্যা বলতে পারে, যে প্রবঞ্চক…বেলা অনিমেষের হাত টেনে ধরে এগিয়ে গেল।

—আমি যাচ্ছি।

—যাচ্ছো? কে আসবে আর? তোমার সঙ্গে যে আমার কথা আছে বেলা। বেলা…

মনসিজ প্রায় চিৎকার ক'রে উঠলো। কিন্তু ভীড়ের হট্টগোলে আর ইঞ্জিনের গর্জনে বেলার কানে মনসিজের ডাক পৌঁছলো না। সে ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গেছে অনিমেষের হাতটাকে আঁকড়ে ধ'রে।

গেটের দিকে এগোতে এগোতে বললো নীলা দত্ত—কত ঢংই যে জানে বেলা রায়? কত ছেলেকে ঘোল খাওয়াচ্ছে তারও ঠিক নেই। আজ অনিমেষ, কাল ছিলো পীযূষ, আবার কাল হবেন হয়ত…স্যাণ্ডাল্যাস।

মনসিজ মনের গোপন একটা জায়গায় যেন তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাত অনুভব করলো। নীলাকে লুকিয়ে সে রোধ করলো একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস। তারপর মনে মনে আর্তনাদ করে উঠলো—এর জন্যেই কি এই তিন বছর ধ'রে শুধু তোমার কথাই শুধু ভেবে এলাম বেলা?

আচমকা অনিমেষকে থামিয়ে বললো বেলা—আমি যাচ্ছি। কাজ আছে খুব। বাবাকে এক্ষুণি গাড়ী দিতে হ'বে।

প্রায় ছুটতে ছুটতে গাড়ীতে ফিরে এলো সে। দরজা খুলে ভেতরে বসে পড়লো। ফুলগুলোকে জানলা গলিয়ে ছিটিয়ে দিলো রাস্তায়। তারপর চলন্ত গাড়ীর নরম কুশনে মুখ লুকিয়ে—হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠলো একুশ বছরের মেয়ে বেলা রায়।

—হায় মনসিজ! এর জন্যেই কি এতকাল ধ'রে অপেক্ষা করলাম? তুমি রূপটাই দেখলে আমার। দেখলে না এই রক্তে মাংসে গড়া মনটাকে?

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রধান সাময়িক পত্রগুলিতে কেবল সাধুভাষা ব্যবহৃত হত। সবুজপত্র ব্যতিক্রম মাত্র। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে এসে দেখা যায় যে, এমন কোন সাময়িকপত্র পাওয়া দুষ্কর যাতে অল্পবিস্তর কথ্যভাষা ব্যবহার করা হয় না। "ভারতবর্ষ," "প্রবাসী," "গল্পভারতী," "মাসিক বসুমতী," "দেশ," "আনন্দবাজার," "যুগান্তর" প্রভৃতি সব কটি নাম-করা কাগজেই এখন চলতি ভাষায় লেখা গদ্য রচনাবলী অবাধ প্রবেশাধিকার লাভ করেছে। পত্রিকাগুলিতে স্বাভাবিক ভাবেই চলতি ভাষার আধিপত্যও ক্রমশ বাড়ছে। প্রধান সম্পাদকীয়গুলি এখনো সাধুভাষায় লেখা হয়। দৈনিক সংবাদপত্রের প্রধান সংবাদগুলিও সাধু-ভাষায় পরিবেশিত হয়। কিন্তু নানা চিঠিপত্র, প্রবন্ধ, সরস রচনা, ছোটখাট সংবাদ, সংবাদ-সাহিত্য—এ সবই খাঁটি চলতি ভাষায় লেখা হচ্ছে।

১৯২৫ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সংখ্যার দিক থেকে দেখলে খুব কম লেখকই চলতি ভাষায় গদ্যরচনা নিষ্পন্ন করতেন। কিন্তু ১৯৫০ সালের পর থেকে দেখা যাচ্ছে যে, চলতি ভাষা তথাকথিত সাধুভাষার সঙ্গে অন্তত সমান দরের লেখ্যভাষার মর্যাদা পেয়েছে। আধুনিক ও প্রগতি-শীল লেখকমহলে সব ধরণের গদ্য রচনাই এখন কথ্যভাষায় সুসম্পন্ন হচ্ছে।

কোন কোন মহলে এখনো সাধুভাষায় লেখার বিচিত্র প্রবণতা থাকলেও আর সাধুভাষার রচনাবলী আজও বেশ প্রবলভাবে বর্তমান হলেও চলতি ভাষা যে আধুনিক প্রভাবশালী মন সম্পূর্ণরূপে অধিকার করেছে, সমস্ত ব্যাপার আলোচনা করলে তা বোঝা কঠিন নয়। কথ্য-ভাষা দিন দিন প্রবলতর হয়ে ক্রমশ সার্বভৌম আধিপত্য লাভ করবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আরো কতদিন সাধুভাষার অস্তিত্ব থাকবে, তা বলা সম্ভব নয়। মফঃস্বলে আর অল্পশিক্ষিত মহলে পুরাতন যুগের প্রভাব বেশি হওয়ায় আরো অনেকদিন সাধুভাষার অস্তিত্ব দেখা যেতে পারে। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, অচিরে বাংলা গদ্যের মূল ধারারূপে একমাত্র চলতি ভাষার গদ্যই জন-স্বীকৃতি লাভ করবে। তার মানে এই নয় যে, সাধুভাষায় লেখা বিরাট ও উৎকৃষ্ট সাহিত্য মূল্যহীন হয়ে পড়বে। সেই সাহিত্য আগের মতোই নিজের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে। কিন্তু আধুনিক বাংলা গদ্যের প্রধান প্রবণতা হবে কথ্যভাষার দিকে। নতুন যুগের সাহিত্য গড়ে উঠবে এই ভাষাতেই। এই চলতি বাংলা-বুলির স্বরূপ ও গতিবিধি নিরূপণ করতে পারলেই বাংলা গদ্যের পরবর্তী ক্রমবিকাশ অনুধাবন করা যাবে।

চলতি ভাষার প্রসারে বেতার-কেন্দ্রের দান অসামান্য। ১৯২৭ সাল থেকে বেতার-কেন্দ্রের মারফতে যতগুলি ঘোষণা, সংবাদ, সমালোচনা, সংবাদ-সমালোচনা, বক্তৃতা, সাহিত্যনিবন্ধ, গল্প, ধারাবাহিক উপন্যাস পঠিত হয়ে প্রচারিত হয়েছে, তার প্রায় সমস্তই কথ্যভাষায় লিখিত; সুতরাং এর জন্যেও কথ্যভাষার প্রসার যেমন বাড়ছে, তার সাহিত্যিক মর্যাদাও তেমনি স্বীকৃত হচ্ছে। নিখিল ভারত বেতার প্রতিষ্ঠান বা "আকাশবাণী"-র যে কয়েকটি কেন্দ্র থেকে বাংলা ভাষার কিছু অনুষ্ঠানও প্রচারিত হয়, সে-সব জায়গায় এবং পাকিস্থানের বেতার-কেন্দ্রগুলিতেও খাঁটি কথ্যভাষায় সব কাজ চালানো হয়। পাকিস্থানে কেবল দু-একটি আরবি-ফার্সি শব্দ বেশি ব্যবহার করা হয়। বেতার-প্রচারের সাহায্যে চলতি ভাষায় লেখার প্রবণতা আরো বাড়বে।

চলতি ভাষার প্রবণতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই ভাষা ক্রমশ খাঁটি মুখের ভাষা হয়ে উঠবার দিকে প্রধাবিত। তথাকথিত সাহিত্যিক কথ্যভাষার ভিত্তি লোকের মুখের ভাষায় স্থাপিত হলেও রবীন্দ্রনাথ—বীরবল—বিভূতিভূষণ—দিলীপকুমার—অন্নদাশংকর প্রভৃতির ব্যবহৃত ভাষা পুরোপুরি মুখের ভাষা নয়। তাঁদের ভাষায় এমন সব তৎসম শব্দের ব্যবহার আছে—যা কেবল অসাধারণ শিক্ষিত জনের মুখের ভাষা বলে গণ্য হতে পারে। ভাবাভিব্যক্তির প্রয়োজনেই ঐ শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে, একদিকে শিক্ষিত ভদ্র বাঙালি ঐসব শক্তিশালী লেখকের অনুকরণে নিজেদের মুখের ভাষায় তৎসম শব্দের ব্যবহার বাড়াচ্ছেন, আর অন্যদিকে লেখকেরাও লেখার ভাষায় তৎসম শব্দের ব্যবহার কমিয়ে তদ্ভব আর দেশি-বিদেশি শব্দের ব্যবহার বৃদ্ধি করে ভাষাকে একটু একটু করে ঘরোয়া রূপের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। এই ভাবে সাহিত্যিক কথ্যভাষা মুখের ভাষা, আর মুখের ভাষা গদ্যভাষা হয়ে

উঠবে পরস্পরের দিকে ধাবিত প্রয়াসে। অন্যদিকে দেখা যায়, সরকারি ও বেসরকারি মিলিত চেষ্টায় কলকেতিয়া শিষ্ট কথ্যভাষাই সমগ্র বাংলা-ভাষী এলাকার একমাত্র আদর্শ কথ্যভাষা হয়ে উঠবে। সুতরাং ভবিষ্যতে লেখার কাজে যে কথ্যভাষা ব্যবহার করা হবে, সেই ভাষাই ভারত ও পাকিস্তানের বাংলাভাষী বিস্তীর্ণ এলাকায় শিক্ষিত জনের মুখের এক-মাত্র ভাষারূপেও প্রযুক্ত হবে। অতীতে এক এক জেলা বা পরগণাকে কেন্দ্র করে যে প্রাদেশিকতা গড়ে উঠেছিল, আজ ভৌগোলিক ব্যবধান সংকুচিত হওয়ায় সাহিত্য ও বেতার-যন্ত্রের প্রসারণে তা সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যাবে। তার মানে এই যে, লেখ্য ও কথ্য, উভয় ভাষার ক্ষেত্রেই বঙ্গদেশের অখণ্ডতা নিয়তিনির্দিষ্ট।

যখন যে সমাজ প্রভাবশালী, তখন সেই সমাজের লোকের মুখের ভাষাই দেশের সর্বত্র আদর্শ কথ্যভাষা বলে গৃহীত হবে, এটা স্বাভাবিক। ফ্রান্সে পারি-ভ্যাস'াই অঞ্চলের কথ্যভাষাই কি ভাষাগত সৌন্দর্য, কি উচ্চারণ, দুদিক থেকেই ফ্রান্সের আদর্শ চলিত ভাষা বলে ধরা হয়। তার কারণ, সপ্তদশ শতকেই ঐ অঞ্চলের বাসিন্দা জনসংঘ শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি-মান্ ফরাসি সম্প্রদায়রূপে গণ্য হয়েছিল। ফরাসি রাজদরবারও ঐ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাংলাদেশেও একই কারণে প্রথমে নদীয়া পরে কলকাতা অঞ্চলের ভাষা আদর্শ কথ্য ও লেখ্যভাষার মর্যাদা লাভ করেছে। ভবিষ্যতে লোকের মুখের ভাষা যেমন সাহিত্যিক হয়ে উঠবে, সাহিত্যের ভাষাও তেমনি পুরোপুরি বিদগ্ধ জনের মৌখিক ভাষার উপর স্থাপিত হবে। তার ফলে বাংলা গদ্যভাষা অনেকটা ফরাসি গদ্যভাষার মতো প্রাণবন্ত, বুদ্ধিদীপ্ত, সারগর্ভ, গাঢ়বন্ধ ও অব্যর্থ হয়ে উঠবে। বাঙালি শিক্ষিত জনও কতক অংশে বিদগ্ধ ফরাসি সামীপ্য লাভ করবেন। চলতি ভাষায় লেখা সাহিত্য সহজেই লোকের মুখে মুখে ফিরবে এবং মুখের ভাষায় সাহিত্যগুণ অর্পণ করে ভাষায় ধার বাড়িয়ে দেবে। ফরাসি বিদগ্ধ যেমন শানিয়ে-বলা বানানো কথার জন্যে বিখ্যাত, ফরাসি গদ্য যেমন বানিয়ে-বলা শানানো কথার জন্যে প্রসিদ্ধ, বাঙালি মার্জিতরুচি তেমনি সরস বাক্‌চাতুর্যের জন্যে, বাংলা গদ্য তেমনি সুভাষিত ও বাগ্-ধারাগত উৎকর্ষের জন্যে খ্যাতিমান্ হতে পারবে। অদূর ভবিষ্যতে এই সাহিত্যদীপ্তি ও বাক্‌সিদ্ধিলাভ অনিবার্য।

উনিশ শতকের আগে বাংলা ভাষা ও গদ্য রচনার উপর রাষ্ট্রিক কারণে ফার্সি ভাষার প্রবল প্রভাব বিদ্যমান ছিল। রাজনৈতিক বিবর্তনে সে-প্রভাব অপসারিত হয়ে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব প্রবল হয়ে উঠল। আজকের দিনে বাংলা ভাষায় ইংরেজি শব্দের সংখ্যা যাই হোক, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব তার চেয়ে অনেক বেশি। ফার্সি ভাষা ও সাহিত্য ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ—ছয় শতাব্দীর মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে যতটা প্রভাব স্থাপন করেছিল, মাত্র দুই শতকেই পাশ্চাত্য ভাষা ও সাহিত্যসমূহ তার চেয়ে ঢের বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। আধুনিক কথ্যভাষার গদ্যে ইংরেজি বাক্যরচনা পদ্ধতি, উদ্ধৃত-চিহ্ন সহযোগে বাক্য সুরু করে মাঝপথে কর্তৃপদের স্থান নির্দেশ করে তারপর বাক্য ও উদ্ধৃতিচিহ্ন শেষ করার পাশ্চাত্য প্রভাবজাত-প্রবণতা বেশ দেখা যায়। অন্য ধরণের বাগ্‌ভঙ্গিও অনেক দেখা যায়। ইংরেজি কথাসাহিত্যের প্রভাবেই এমন হয়েছে। বাংলা বাক্যের গড়ন কোথাও কোথাও ইংরেজি ঢঙে বিন্যস্ত দেখা যায়। কথার মধ্যে স্বতন্ত্র পদাংশ বা Parenthesis-এর প্রয়োগ, ছেদ-চিহ্নের ব্যবহার, বাগ্‌ভঙ্গির বৈদেশিক বিন্যাস, বিদেশি ভাবকল্পনার আক্ষরিক অনুবাদের প্রয়োগ—সবই অভ্রান্তভাবে এই পাশ্চাত্য প্রভাবের সাক্ষ্য দিচ্ছে। উল্লিখিত বিশেষত্বগুলি বুদ্ধদেব বসু মহাশয়ের রচনায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। দু একটা দৃষ্টান্ত দেখা যাক :—

"এও যদি বুঝতাম," লেখক আবার বলতে লাগলেন, "যে, আমার ছবি যোগ্য লোকের হাতেই পড়েছে, তবু না-হয় কিছু সান্ত্বনা ছিল। যাদের বড় বড় বাড়ি, টাকার ছড়াছড়ি, এমন লোকের মধ্যে দু চারজন আর্ট পেট্রন তুমি পাবে—হ্যাঁ, পেট্রন পাবে, কিন্তু প্রেমিক পাবে না।"

মাত্র এইটুকুর মধ্যেই "আর্ট পেট্রন......পাবে না" অংশে লেখকের উপর ইংরেজি ভাষা ও রচনাপদ্ধতির প্রভাব লক্ষণীয়। "হ্যাঁ, পেট্রন পাবে"—ধরণের পদাংশ সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করে। অন্যত্র তিনি লিখেছেন :—

"কেন, ভাগ্যিস্ কেন?" চিত্রকর দ্রুত দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তাকালেন।

"দ্রুত দৃষ্টি", "সুবর্ণ সুযোগ," "আলোকসম্পাত," "এই উক্তির আলোকে"—এই সব প্রয়োগ ইংরেজির প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট প্রভাব—আক্ষরিক অনুবাদ বললেও চলে। আরো কয়েক বছর পরে স্পষ্ট বোঝা যাবে, বাংলা ভাষা ও গদ্যে ঠিক কি পরিমাণ পাশ্চাত্য প্রভাব স্থায়ী হবে। স্বাধীনতা লাভের পরও ভাষা ও সাহিত্যে ইউরোপীয় ও মার্কিন প্রভাব আগমনের পথ রুদ্ধ হয়নি।

আমাদের নিত্যব্যবহার্য জিনিসগুলির মধ্যে যেমন—টুথ ব্রাশ, টুথ পেস্ট, চেয়ার, টেবিল, ফাউন্টেন পেন, ট্রাম, বাস, গ্রামোফোন প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তেমনি আমাদের ভাষাতেও সেগুলি প্রবেশ লাভ করেছে। প্রধানত গদ্য ভাষায় কথাসাহিত্য রচনায় এই সব শব্দের ব্যবহার দরকার হয়। পরিভাষা রচনা করে এগুলির বিদেশি নাম তাড়াবার চেষ্টা করা বৃথা। চলতি ভাষায় লিখিত গদ্যে যে কোন ভাষা থেকে আগত নতুন উদ্ভাবিত জিনিসের নাম দিব্যি খাপ্ খেয়ে যাবে। ইংরেজি ভাষার রাজনৈতিক কারণগত প্রভাব আজ চলে যেতে বসেছে। কিন্তু তার সাংস্কৃতিক প্রভাব কতদিন থাকবে বা কতদিনে লুপ্ত হবে, তা বলা সহজ নয়। রাজনৈতিক প্রভাব লুপ্ত হলেও জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শনের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে পাশ্চাত্য প্রভাবের দ্বারস্থ থাকতে হবে। আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের প্রভাবও বাংলা সাহিত্যে থাকবেই। ঐ বৈদেশিক প্রভাব আপাতত কেবল ইংরেজি ভাষার মারফৎ আমাদের ভাষা ও সাহিত্যে সঞ্চারিত হবে। কাজেই শুধু সাংস্কৃতিক কারণেই বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে আরো বিদেশি শব্দ ঢুকবে, বাংলা সাহিত্যে অগণিত বিদেশি ভাব ও চিন্তাধারা প্রবিষ্ট হবে এবং স্বভাবতই গদ্যভাষাও খানিকটা পাশ্চাত্য ভঙ্গিতে ঢালাই হবে।

কথ্যভাষা বৈদেশিক প্রভাব আত্মসাৎ করার ব্যাপারে সাধুভাষার চেয়ে বেশী উপযোগী। কাজেই সেদিক থেকেও কথ্যভাষার আদর বাড়বে।

রাজনৈতিক কারণে ও রাষ্ট্রিক প্রভাবে এর পর হয়ত হিন্দি ভাষার প্রভাব বাংলা ভাষা তথা গদ্যভাষার উপর দেখা যেতে পারে। তার পরিমাণ আন্দাজ করা যায় না। দীর্ঘকাল বাঙালি ও হিন্দুস্থানি অখণ্ড ভারতে এক সরকারের অধীনে পাশাপাশি বাস করে আসছে! সাংস্কৃতিক দৈন্যের জন্যে হিন্দি ভাষা ও সাহিত্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে ততটা প্রভাবিত করতে পারেনি। এক সময়ে মালাধর বসু, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতির মতো শক্তিশালী কবির রচনায় হিন্দি ভাষার সামান্য প্রভাব দেখা গেছে। কিন্তু প্রতিবেশী কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষার চেয়ে ইংরেজি ভাষার প্রভাব বিস্তৃত হবে, সেই সম্ভাবনা অনেক বেশি।

সমাজে সাম্যবাদের প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার জন্যে যদি কোন দিন কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি তথাকথিত বঞ্চিত ও সর্বহারা শ্রেণীর লোক রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করে নেয়, সমাজের সব ক্ষেত্রেই তাদের সর্বময় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলেও কথ্যভাষার খুব খারাপ কোন পরিবর্তন হবার ভয় নেই। অবশ্য পরিবর্তন একটা হবেই, কিন্তু সেটা ভালোর দিকে। আদর্শ কথ্যভাষা কেবল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুখেই আবদ্ধ না থেকে ক্রমশ সর্বশ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে যাবে। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেও এই ধরণের একটা পরিবর্তন ঘটবে, দেশে সাম্যবাদপ্রচারের পরিণতি যাই হোক না কেন। আর তখন তাতে কথ্যভাষায় প্রয়োগবৈচিত্র্য ও ভঙ্গিমাধুর্য দেখা যাবে। এ কথা মনে করা ভুল যে, তথাকথিত অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ইতরজনসুলভ কটূক্তি-কণ্টকিত ভাষা মার্জিত চলতি ভাষাকে পংকিল করে তুলবে। সামগ্রিকভাবে যাই ঘটুক না কেন, হৃদয়ের সূক্ষ্ম কোমল ভাবনারাশি ফোটাতে গিয়ে সে-সবের উপযোগী ভাষা খোঁজার সময় সব শ্রেণীর লোককেই মার্জিতরুচির চলতি ভাষার আশ্রয় নিতেই হবে। তাতে অনেক তৎসম শব্দের স্থানলাভ অনিবার্য। ব্যাপক জনশিক্ষা আর বয়স্ক সদ্যশিক্ষিতের জন্যে সুবোধ্য গ্রন্থ রচনার বহুল প্রয়াসের দ্বারাও কৃষক ও শ্রমিকদের মুখের ভাষার উন্নতি ও সংস্কার অনিবার্য। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে প্রোলেটারিএটদের মুখের ভাষাও আর এখনকার মতো চোয়াড়ে থাকবে না, বরং রাশিয়ায় যেমন দেখা গেছে, বেশ মিহি আর মোলায়েম হয়ে আসবে। চিরন্তন মানবিক অনুভূতিগুলি সর্বজনের হৃদয়ে যদি নাও হয়, সর্বশ্রেণীর মানুষের অন্তরে সাড়া তুলবেই। তখন নিজেদের গরজেই সেগুলিকে রূপ দিতে সমর্থ যে ভাষা, তার সন্ধান করতে হবে। সুতরাং আদর্শ কথ্যভাষার বিজয়ে সন্দিহান হওয়ার কারণ নেই।

আচার্য বিনয়কুমার সরকারের মতে, বাংলা গদ্যে ফরাসি প্রাঞ্জলতা দেখা গেছে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর, অক্ষয়চন্দ্র সরকার আর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনায়। কিন্তু ঐ প্রাঞ্জলতা আরো ভালো করে কথ্য ভাষায় নিতান্ত দুরূহ বিষয়ের আলোচনাতেও ফুটিয়েছেন বিনয়কুমার নিজে, সুনীতিকুমার আর দিলীপকুমার। তাঁদের রচনাশৈলীর মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ; অথচ নিজ নিজ রীতি ও ভঙ্গির মহিমায় প্রত্যেকেই চলতি ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি ও যাদু যেভাবে পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন, তা অতুলনীয়। প্রথমে বিনয়কুমারের ভাষার নজির দেখা যাক:—

"একালের ফরাসি পণ্ডিত বের্গস অরবিন্দর মাথায় ঢেলেছেন "জীবনের ধাক্কা" (এলাঁ দে লা ভি)—এই ধাক্কাটা দুনিয়াকে হিড় হিড় করে ঠেলে নিয়ে চলে। তাতেই হয় সৃষ্টি। প্রাণ, মানুষ, জগৎ, চিত্ত সবই এই ধাক্কার ঠেলায় নয়া নয়া মূর্তিতে বিকাশলাভ করতে থাকে। এই গেল বিবর্তন বা অভিব্যক্তির এক পশ্চিমা ফোয়ারা। অরবিন্দর দ্বিতীয় পশ্চিমা গুরু জার্মান পণ্ডিত হেগেল। এই ফোয়ারায় নাইতে গেলে সহজেই দখল করা যায় দুনিয়ার দ্বন্দ্ব—টক্কর, প্রতিযোগিতা, সংগ্রাম। এই দ্বন্দ্বমূলক দুনিয়ার বিভিন্ন গতিভঙ্গি অর্থাৎ ভাঙাগড়া, জীবন বিকাশের বা সংস্কৃতি বিকাশের বা চিত্তোন্নতির নানা স্তর, গড়ন বা রূপ মাত্র। অরবিন্দর "ভাগবত জীবন" দ্বন্দ্বনিষ্ঠ, টক্করনিষ্ঠ, লড়াইনিষ্ঠ। অরবিন্দ দর্শন শান্তি জানে না। এর ভেতরকার মন্তর হচ্ছে ওঁ অশান্তিঃ ওঁ অশান্তিঃ অশান্তিঃ! মানুষের ভাগবত জীবনকে অরবিন্দ খাড়া করেছেন অশান্তির উপর—লড়াইএর উপর—বিপ্লবের উপর। ভাগবত জীবনকে পাকড়াও করতে হলে মানুষের চলতে হয় অশান্তি চাখতে চাখতে—টক্করের পর টক্কর চালিয়ে—দুনিয়াখানাকে জুতোতে জুতোতে। যে লোকটা বিপ্লবকে চিরসাথী করে না, সে লোকটা দেখে না কখনও ভাগবত জীবনের মুখ। নমো বিপ্লবায়—অথাতো বিপ্লব জিজ্ঞাসা—এই হল অরবিন্দ দর্শনের গৌরচন্দ্রিকা।"

এর চেয়ে সহজ সরল অথচ লাগসৈ ভাষায় আর কেউ শ্রীঅরবিন্দের দর্শন নিয়ে আলোচনা করেন নি। বিনয়কুমারের ভাষা দেখে বোঝা যায়, তথাকথিত চোয়াড়ে ভাষাতেও জটিল দার্শনিক ও ধনবিজ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনা অতি সুন্দরভাবে করা যায়। সুতরাং কথ্যভাষার পরিণতি সম্বন্ধে আশঙ্কা পোষণ করা নিরর্থক। অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন, "বিনয় সরকারের লেখার ভিতরে যেটা আপাতত গুরুচণ্ডালি দোষ বলে মনে হয়, সেটা তাঁর অক্ষমতার পরিচায়ক নয়, বরঞ্চ সেটা তাঁর প্রগতিশীল মনেরই পরিচায়ক।" বিনয়কুমার দেখিয়ে দিয়েছেন, চলতি ভাষার প্রায় গ্রাম্য ও রূঢ় আটপৌরে রূপের দ্বারাও ফরাসি প্রাঞ্জলতা সৃষ্টি করা সম্ভবপর।

সুনীতিকুমারের ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক নিবন্ধগুলি সবই কথ্যভাষায় লেখা; তিনি জলের মতো সহজে ভাষাসম্পর্কিত আলোচনায় বক্তব্য বুঝিয়ে দেন। ইউরোপের এক অঞ্চলের ভাষাসমস্যা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন:—

"ফ্লেমিংরা ডচ্ বা ওলন্দাজদেরই শাখা—এদের ভাষা ডচ্ ভাষারই এক প্রাদেশিক রূপ; সমস্ত ফ্লেমিং লোকে ডচ্ পড়ে বা শুনে বুঝতে পারে, আর ডচেরাও ফ্লেমিংশ বোঝে। ডচ আর ফ্লেমিংদের মধ্যে কেবল ধর্মের পার্থক্য মাত্র দেখা যায়—ডচেরা প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান, আর

ফ্লেমিংরা হচ্ছে রোমান কাথলিক। ধর্ম আলাদা বলে, ফ্লেমিংরা তাদের সহোদরস্থানীয় ডচেদের সঙ্গে মিলে এক জাতি না হয়ে, রোমান কাথলিক কিন্তু ফরাসিভাষী ভালোন্‌দের সঙ্গে মিলে বেলজিঅম রাষ্ট্র গঠন করেছে। বেলজিঅমের রাষ্ট্রিয় জীবনে আগে ফরাসি ভাষারই প্রভাব বেশি ছিল; কিন্তু ফ্লেমিংরা ক্রমে ক্রমে তাদের বিশিষ্ট ভাষা আর জাতীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে পড়ছে, তাই এখন দুটো ভাষাকে সব বিষয়ে সমান স্থান দিতে হচ্ছে। সরকারি ইস্তাহার দুই ভাষায় হয়, রাস্তার নাম দুই ভাষায় লেখা থাকে, রেলের টিকিটে ডাকটিকিটে টাকাপয়সায় নোটে সর্বত্র দুই ভাষার মর্যাদা রাখতে হয়। ফ্লেমিং আর ফরাসিভাষী ভালোন্—এদের অনুপাত ছিল ১৯১০ সালের লোকগণনায় ৭৪ লাখ বেলজিআন্‌দের মধ্যে ২৯ লাখ ফরাসি-বলিয়ে, ৪১ লাখ ফ্লেমিশ-বলিয়ে, আর প্রায় ৯ লাখ ফ্লেমিশ আর ফরাসি দুই-ই যারা বলে, এমন লোক; বাকি জর্মান বলে। এই অনুপাতটা এখন কি রকম দাঁড়িয়েছে তা জানি না, তবে অনুমান হয়, বিশেষ পার্থক্য হবে না, দুটো জাতই এখন নিজের নিজের ভাষা আর সংস্কৃতি রক্ষা করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে। আমরা সভাসমিতিতে দুটো ভাষার ব্যবহার প্রায় সর্বত্র সমান সমান দেখেছি। মধ্য যুগের ইংরিজি আর এংলো-স্যাক্সন বা প্রাচীন ইংরিজি জানা থাকলে, একটু জর্মান জানা থাকলে, ডচ্ বা ফ্লেমিশের অনেকটা পড়ে বোঝা যায়, কিন্তু শুনে বোঝা যায় না। বেলজিঅমে অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত ভালোনরা ঘরে যে ফরাসি বলে, সেটা পারিসের শুদ্ধ ফরাসি নয়—সেটা হচ্ছে ফরাসির এক প্রাদেশিক উপভাষা। শিক্ষিত লোকেরা অবশ্য সর্বত্রই শুদ্ধ ফরাসি বলে।

সঙ্গীতশাস্ত্রের জটিল রূপবন্ধের আলোচনায় কত রস ও চমক সৃষ্টি করা যায়, তা দিলীপকুমারের রচনায় বারবার দেখা গেছে। যাঁরা "সাঙ্গীতিকী" পড়েছেন, তাঁরাই কথ্যভাষার অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হয়েছেন। ঐ গ্রন্থে এক জায়গায় একটি বৈদেশিক সুরের পটভূমিকার বর্ণনায় তিনি ভাষার যে নৈপুণ্য ও শিহরণবিলাস রচনা করেছেন, তার তুলনা বাংলা ভাষায় বিরল। সাধুভাষায় সুরপুরীর ঐ স্বপ্নসুষমার বর্ণনা অসম্ভব। সামান্য একটু আভাস দেওয়া গেল :—

"পুরবীর সঙ্গে মেশানো একটা হাওআইই গিটারের কান্নাছোঁওয়া মিড়ে কি যে একটা পথহারা আবেশের ঘনিমা জেগে ওঠে মনের ছায়াকুঞ্জে···কত কি ভাব যে ভিড় করে আসে···কত আধহারানো ফিরে পাওয়া আবার তখনি মিলিয়ে-যাওয়া স্মৃতির সুরভি···কিন্তু সব জড়িয়ে হৃদয়ের কোথায় একটা গাঢ় অথচ স্বচ্ছ বেদনা। ঐ—সেই গিটারের মিড়—কবে শুনেছিলাম একটি ভুলে-যাওয়া গানের সঙ্গে··· বুকের মধ্যে সেই বেদনাটা যেন ফের উদ্বেল হয়ে ওঠে—দমকা হাওয়ায় শিউরে-ওঠা সান্ধ্য কুহকের মতন। বেদনাটা যেন মোড় ফিরল তাপ থেকে শান্তির পথে···বেজে ওঠে একটা মৃদু গুঞ্জনধ্বনি—কথায় সুরে মিশেল। উথলে ওঠে একটি গান এক শান্তির নির্ঝরের মতনই—উর্ধ্ব-উৎসারে। সুরও গুনগুনিয়ে আসে···মনে হয় যেন সাগরপারের সেই অর্ধবিস্মৃতা সুরে ভাবে প্রেমে আমার ভোলা মনেও নিরন্তর জাগরূকই ছিল, আছে···উপরে আকাশের কৃষ্ণাম্বরীতে নানারঙা তারার চুমকি ঝলমলিয়ে উঠেছে···নিচে একটি হৃদয় নয়নের অধরে সেই উজাড়-করা সুষমা পান করতে চাইছে—অথচ সে উর্ধ্বাকাশের স্বচ্ছ ভৃঙ্গারটি ছুঁতে গেলেই যাচ্ছে মিলিয়ে···জাগছে অচিন্ প্রার্থনা আশাপুর্ণার কাছে ···এ-সুরকে এ-দেশি বলা যায় না পুরোপুরি, অথচ কত রাগের ছায়া-পরিমল যে এর পাপড়িতে পাপড়িতে ছড়ানো, মাখানো, জড়ানো, শুধু কথায় নয়—ভাবে রসে, ব্যঞ্জনায়। একে গানের কোন্ শ্রেণীতে ফেলব বলো?"

বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়গৌরব ও প্রাঞ্জলতার সার্থক সমন্বয় চেয়েছিলেন। আজকের কথ্যভাষার বিভিন্ন নিদর্শন প্রমাণ করে যে, আধুনিক বাংলা গদ্যে ঐ দুটি জিনিসের সুসমঞ্জস মিলন ঘটেছে। দীর্ঘ চারশো বছরের অক্লান্ত সাধনায় বাংলাগদ্য এখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গদ্যভাষাগুলির সমপর্যায়ে উঠে আসতে পেরেছে। বাংলা কথাসাহিত্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যের স্তরে আরোহণ করুক বা না করুক, প্রকাশ-সামর্থ্যের দিক থেকে বাংলা গদ্যভাষা এখন নিঃসংশয়ে জগতের সেরা গদ্যভাষাগুলির অন্যতম। এত শীঘ্র এই মর্যাদালাভের জন্যে প্রধানত রবীন্দ্রনাথ যে বিস্ময়কর চলিত ভাষা রচনা করে গেছেন, তাকেই অভিনন্দন জানাতে হয়। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ অনুগামী বীরবলের সংগঠনশক্তিও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। আর যে সব উত্তরসাধক বাংলা গদ্যকে তার পরম বাঞ্ছিত পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তাঁদের অতন্দ্র প্রয়াসে, তাঁদের অভিবাদন জানিয়ে এই সামান্য নিবন্ধের পরিসমাপ্তি আনা যেতে পারে।

আমাদের কাব্যজগতে যাই হোক, গদ্যভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে শক্তিশালী লেখনীর অভাব নেই। প্রবীণ লেখকদের কথা বাদ দিলেও তরুণদের মধ্যেই যাঁরা যশস্বী ও জনপ্রিয়, তাঁদের সম্ভাবনা অপরিসীম। সাহিত্যের নব রস তাঁদের রচনায় নব নব রীতি ও ভঙ্গিতে নিয়ত আত্ম-প্রকাশ করছে। কথ্যভাষার সার্থকতম বিকাশ অনতিবিলম্বে তাঁদের রচনায় জ্যোতির্ময় হয়ে দেখা দেবে, নির্ভয়ে সেই আশা করা যায়। তখনই সংস্কৃত ভাষার সুন্দরীতমা দুহিতার প্রকৃত মহিমা বোঝা যাবে। সংস্কৃত গদ্যভাষার সঙ্গে বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের পরিণতির তুলনা করলে তা বাংলা গদ্যের পক্ষে গৌরবের বিষয় হবে, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সমাপ্ত

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জীবনের এক অধ্যায়

শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত

১৯৪৮ সালের ১০ই নবেম্বর ভারতের জাতীয়তার ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। আমাদের জাতীয়তার জনক সুরেন্দ্রনাথ ঐ তারিখে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁর চিন্ময় জীবনের প্রাণময় আবেগে আমরা উদ্দীপ্ত হই। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক কুলীন ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতামহ ছিলেন রক্ষণশীল গোঁড়া মনোভাবাপন্ন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। আর পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত উদারমনোভাবাপন্ন। কিন্তু লক্ষ্যণীয়, এই পরস্পর-বিরোধী ভাবধারার সংঘাতে কখনও তাঁদের পরিবারে এমন কোন আলোড়ন বা আবর্ত্তের সৃষ্টি হয়নি যাতে পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে। অবশ্য এর জন্য অনেকখানি দায়ী হিন্দুধর্ম্মের পরমত-সহিষ্ণুতা। প্রাচীনপন্থী ভাবধারার সঙ্গে উদারপন্থী নব্যধারার এক অপূর্ব্ব সমাবেশের সমন্বয় হয়েছিল সেই পরিবারে—যে সমন্বয়ী মনোভাব উত্তরকালে সুরেন্দ্রনাথকে অনেক প্রতিকূল আবহাওয়ার সঙ্গে আপোষ করে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। ভারতের জাতীয়তার জনক ও রাজনীতিক দীক্ষাগুরু সুরেন্দ্রনাথের উপরে তাঁর পারিবারিক প্রভাব যথেষ্ট পড়েছিল।

সাধারণ বাঙ্গালী পরিবারের শিশুদের মতই সুরেন্দ্রনাথের শিক্ষাজীবন সুরু হয় পাঠশালায় প্রধানতঃ বাংলাপঠনপাঠন শিখবার জন্যই। তখন তাঁর বয়স পাঁচ বৎসর। সেদিনের পাঁচবছরের শিশুর জীবনের একটি ছোট ঘটনা: পাঠশালার গুরুমশাই তাকে নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে একদিন 'মেড়ামানুষ' বলে ভৎর্সনা করেন। বর্ণবিদ্বেষপ্রসূত এই জাতীয় ভৎর্সনায় শিশু সুরেন্দ্রনাথ এতই রুষ্ট ও দুঃখিত হলেন যে তিনি আর ঐ পাঠশালায় যেতে রাজী হলেন না। অভিভাবকদের অনেক সাধ্যসাধনা এবং পরিশেষে ভীতিপ্রদর্শন কোন কিছুতেই সুরেন্দ্রনাথকে তাঁর অটল সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারল না। সুরেন্দ্রনাথ কিছুতেই আর ঐ পাঠশালায় গেলেন না। ভোরবেলা যেমন ভবিষ্যৎ দিনের সংকেত বহন করে, তেমনি সেই দিনের সেই শিশু সুরেন্দ্রনাথও ভবিষ্যতের দৃঢ়চেতা, সংকল্পে অটুট, ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রগুরুর সম্ভাবনার ইঙ্গিতই বহন করেছিল। যাই হোক অবশেষে সংকল্পে অটল সুরেন্দ্রনাথের ইচ্ছার কাছেই হার মানতে হয়েছিল তার অভিভাবকদের এবং বাংলা ভাষা শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার জন্য তাঁকে একটি বাঙ্গালী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়। সেখানে দু'বছর অধ্যয়নের পর সুরেন্দ্রনাথকে ইংরাজী শিখবার জন্য পেরেণ্টাল একাডেমিক ইনষ্টিটিউশান (Parental Academic Institution) নামক এক ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়। সুরেন্দ্রনাথের সত্যকারের ছাত্রজীবন এখান থেকেই সুরু হয়। সুরেন্দ্রনাথকে যখন এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করে দেওয়া হয় তখন তার কেবলমাত্র ইংরেজী অক্ষর জ্ঞান হয়েছে। অথচ এই বিদ্যালয়ে প্রধানতঃ এংলো-ইণ্ডিয়ান (Anglo-Indian) ছেলেরাই পড়াশুনা করত এবং তারা ইংরাজীতেই কথাবার্ত্তা বলত। এই পরিবেশে সুরেন্দ্রনাথের অবস্থা সহজেই অনুমেয়—যদিও তাঁকে এই পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে বেশ একটু বেগ পেতে হয়েছিল। তিনি যথেষ্ট তাড়াতাড়িই ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা বলে তাদের সমকক্ষ হতে পেরেছিলেন। অবশ্য একথা ঠিক এবং তিনি নিজেও স্বীকার করে গেছেন যে—এই ইংরাজী কথাবার্ত্তার ভিতরে তার ব্যাকরণ শুদ্ধি যথেষ্ট থাকত না, কারণ তাঁর ইংরেজী জ্ঞান, ইংরেজী শুনে—ব্যাকরণকে আয়ত্ত না করেই। তিনি যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন তখনও তাঁর ব্যাকরণ জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল লেনীর (Lennie's) ছোট্ট ইংরেজী ব্যাকরণ কেতাবে। উত্তরকালে ইংরেজীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগ্মী—যিনি শুধু ভারতীয়দের মধ্যেই বা প্রাচ্যেই শুধু নয়—বিলাতে বা পাশ্চাত্য দেশেও তাঁর বাগ্মিতার জন্য যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন—তাঁর ইংরেজী বিদ্যার্জ্জন শুরু করেছিলেন এমনিভাবে।

সুরেন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তিনি কখনও গৃহশিক্ষকের কাছে পাঠাভ্যাস করেন নি—যদিও তিনি বেশ আর্থিক স্বচ্ছল পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নিজের উপর নির্ভরশীল হয়েই সুরেন্দ্রনাথকে তার পাঠ্যজীবনে অগ্রসর হতে হয়েছিল। ইংরেজী এবং ল্যাটিন প্রভৃতি কঠিন পাশ্চাত্য ভাষাসমূহ শিক্ষা করবার জন্য অবশ্য যদি কখনও তিনি খুব অসুবিধা বোধ করতেন তখন তিনি তাঁর পিতার সাহায্য গ্রহণ করতেন এবং তাঁর পিতাও তখন সানন্দ চিত্তে তাঁর শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করে তাঁকে পাঠ বুঝিয়ে দিতে সাহায্য করতেন। এমনি করে ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর ভিতরে গড়ে উঠেছিল আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বাবলম্বন শিক্ষা—তাহা সুরেন্দ্রনাথের উত্তরকালের রাজনীতিক জীবনে সাফল্য অর্জ্জনে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। শৈশবের এই আত্মনির্ভরশীলতা ভবিষ্যৎ কর্ম্মময় জীবনে নূতন কর্ম্মপথে বা কর্ম্মসূচী গ্রহণে তাঁকে শুধু সহায়তাই করেনি, তিনি এই স্বাবলম্বনশিক্ষা থেকে সমস্ত বাধা বিপদকে অতিক্রম করে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণাও লাভ করেছিলেন। "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে" কবির এই বাণী তাঁর কাছে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তাঁর বাল্যের এই স্বাবলম্বন শিক্ষা থেকেই। পরমুখাপেক্ষী না হয়ে আত্মসাহায্যে এগিয়ে যাওয়ার শিক্ষায় তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তাঁর পিতা ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—যিনি চিকিৎসাবিদ্যায় যথেষ্ট সুনাম, প্রতিপত্তি ও অর্থ অর্জ্জন করেছিলেন এবং তৎকালীন কলিকাতার একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলে বিবেচিত হতেন, তিনি তাঁর কর্ম্মজীবন শুরু করে-

ছিলেন শিক্ষকতা দিয়ে। তিনি প্রথম জীবনে ডেভিড্ হেয়ারের একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকুরী গ্রহণ করেন, যদিও মনে মনে তাঁর চিকিৎসক হওয়ার খুবই বাসনা ছিল। কিন্তু অন্তরের ইচ্ছা অন্তরে রেখেই তাঁকে জীবন সুরু কর্ত্তে হয়েছিল শিক্ষকতা দিয়ে, চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষায় তাঁর অভিভাবকদের অসম্মতির জন্য। সৌভাগ্যক্রমে শিক্ষক-জীবনে এসেই তিনি সান্নিধ্য লাভ করলেন, উদারপুরুষ হেয়ার সাহেবের। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোবাসনা জানতে পেরে হেয়ার সাহেব তাঁকে তার অভিরুচিমত চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের সমস্ত সুযোগ ও সুবিধা করে দিলেন শিক্ষকতা চাকুরী বজায় রেখেই। মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নের জন্য প্রত্যহই তাঁকে বিদ্যালয় হতে হেয়ার কয়েক ঘণ্টা ছুটি মঞ্জুর করে দিলেন। এই সুযোগ ও সুবিধারও তিনি সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি চিকিৎসা জগতে কলিকাতার অন্যতম প্রধান ডাক্তার বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হেয়ার সাহেবের সহায়তা ও দাক্ষিণ্যেই তাঁর অবদমিত মনোবাঞ্ছা সফল বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করতে পেরেছিল। নিজের ইচ্ছামত শিক্ষা-লাভের পথে অভিভাবকদের অসম্মতি প্রভৃতি নানা প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল বলেই দুর্গাচরণবাবু তাঁর ছেলে সুরেন্দ্রনাথের বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর অর্থাৎ ১৮৫৩ খ্রীঃ একটি উইল করে রেখে-ছিলেন; তাহাতে তিনি সুরেন্দ্রনাথকে বিলাত পাঠিয়ে তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে এই উইল সুরেন্দ্রনাথের হাতে পড়লে তবে তিনি এই উইলের সারমর্ম্ম জানতে পারেন। ছেলের শিক্ষাব্যবস্থায় যাতে কোনপ্রকার অসুবিধা না হয় বা আর্থিক কোন কারণ যাতে ছেলের উচ্চশিক্ষার পথে কোন সময় কোন অন্তরায় সৃষ্টি না করে—তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে বিচার করেই তিনি এই ব্যবস্থা করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষা কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চশিক্ষার্থ কলেজে ভর্ত্তি হন। কলেজেও তিনি ভাল ফলই দেখান এবং যথারীতি বি-এ পাশ করেন। স্কুল কলেজে তিনি বরাবরই ভাল ফল করতেন। তিনি পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার না করলেও বরাবরই তার কাছা-কাছি থাকতেন এবং পুরস্কার-বিজয়ীদের অন্যতম থাকতেন। অধ্যবসায় ও উদ্দেশ্যসাধনের নিষ্ঠার পুরস্কার মানুষের অবশ্যপ্রাপ্য। এই অধ্যবসায় ও উদ্দেশ্য সাধনের নিষ্ঠাই সুরেন্দ্রনাথকে তাঁর জীবনে জয়যুক্ত করেছিল। তাই দেখা যায় তাঁর শৈশবাবস্থায় যে সকল সহপাঠী বন্ধু-গণের কাছে সুরেন্দ্রনাথ জয়ী হতে পারেন নি, ভবিষ্যতে তিনি তাদের পশ্চাতে ফেলে অগ্রগামী হতে পেরেছিলেন! বি-এ পরীক্ষা পাশ করে তিনি যখন কলেজ ত্যাগ করে যাবার উপক্রম করেছিলেন তখন তাঁদের কলেজের অধ্যক্ষ সেণ্ট এণ্ড্রুস বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ জন্ সাইম (Mr. John Sime of the university of St. Andrew's) ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করেন সুরেন্দ্রনাথকে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করিবার জন্য বিলাত পাঠিয়ে দেবার নিমিত্ত। বিদ্যোৎসাহ দুর্গাচরণবাবু পুত্রের শুভাকাঙ্ক্ষী অধ্যক্ষ সাইমের এই অনুরোধকে শিরোধার্য্য করে তখনই রাজী হলেন এই প্রস্তাবে এবং সুরেন্দ্রনাথকে বিলাত পাঠাবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে তাঁর ১৮৫৩ সালের উইলের স্বপ্নকে অর্থাৎ পুত্রকে বিলাত পাঠিয়ে তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ করার স্বপ্নকে বাস্তব রূপদান করতে উদ্যোগী হলেন। এমনি করে দুর্গাচরণবাবু সুরেন্দ্রনাথের মনে উৎসাহ ও প্রেরণার সঞ্চার করেছিলেন। ১৮৬৮ সালের ৩রা মার্চ্চ তারিখে সুরেন্দ্রনাথ তার অপর দুই বন্ধু রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্তের সঙ্গে বিলাত যাত্রা করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে বিদ্যার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ শরীর-পালন ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য রীতিমত ব্যায়ামানুশীলনও করতেন। সুস্থ ও সবল দেহের অধিকারী না হতে পারলে জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়া খুব কষ্টকর হয়ে পড়ে। স্বাস্থ্যই সকল সুখের এবং জীবনে সাফল্য লাভের মূল—এই অনস্বীকার্য্য সত্যকে উপলব্ধি করেই সুরেন্দ্রনাথ ছাত্রাবস্থা থেকেই ব্যায়ামানুশীলনে মনোযোগী হয়েছিলেন এবং সারাজীবনভরই তিনি এই অভ্যাস বজায় রেখে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত সুন্দর ও আনন্দোজ্জ্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েছিলেন। অবশ্য এই বিষয়েও অনেকগুলি কৃতিত্বের দাবী রাখেন সুরেন্দ্রনাথের পিতা ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাঁর সন্তানদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য একজন নিয়মিত ব্যায়াম-শিক্ষক নিযুক্ত করে নিজের বাড়িতেই একটি আখড়া তৈয়ার করে দিয়েছিলেন। এমনি করে সন্তানদের মানসিক উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক উন্নয়নেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তাঁর পিতৃদেব। উত্তরকালে স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ বলেছেন, "প্রত্যেক দেশ-প্রেমিকেরই স্বাস্থ্যের প্রতি যথোচিত যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। কারণ দেশপ্রেমিকের জীবন জাতির কাছে এক বহু-মূল্য সম্পদবিশেষ। তাঁদের দীর্ঘজীবনের সাথে সাথে তাঁদের বিচারবুদ্ধি ও পরিপক্কতা লাভ করে এবং তাদের বক্তব্যও যথেষ্ট মূল্যবান হয়,… ……অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশের নেতৃবর্গ তাঁদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন বলেই তাঁদের অনেকে অকালে মৃত্যুবরণ করেছেন—যার জন্য জাতিকে অনুশোচনা এবং শোক প্রকাশ কর্ত্তে হয়েছে।" সুরেন্দ্রনাথ এই উক্তিগুলি করেছিলেন ভগ্নস্বাস্থ্য আনন্দমোহন বসু সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে। সুরেন্দ্রনাথের এই মূল্যবান উক্তি আধুনিক যুগের আবালবৃদ্ধ-বণিতা সকলেরই—বিশেষ করে দেশ-প্রেমিকদের প্রণিধানযোগ্য। কারণ, বর্ত্তমানে এরকম একটা ভ্রান্ত ধারণা কোন কোন মহলে রয়েছে যে সমাজ-সেবা ও দেশ-সেবা কর্ত্তে গেলে বোধ হয় স্বাস্থ্যের প্রতি সম্যক্ দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব নয়—অথবা স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে গেলে যথোচিত দেশ-সেবা বা সমাজ-সেবা করা সম্ভব নয়। উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার জন্য বা ভাল স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বাল্যবিবাহ রোধ করবার প্রয়োজনীয়তা ও সুরেন্দ্রনাথ অনুভব কর্ত্তেন। যখনই সুরেন্দ্রনাথ সুযোগ বা সুবিধা পেতেন তখনি তিনি জনসমক্ষে বাল্যবিবাহবিরোধী মনোভাব ব্যক্ত কর্ত্তেন। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ একদা সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের সময় তাঁর স্বাস্থ্য এবং কর্ম্মক্ষমতা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন যে সুরেন্দ্রনাথের বয়সী ভারতবাসীর মধ্যে সচরাচর এই রকম স্বাস্থ্যের অধিকারী ও কর্ম্মক্ষম লোক খুব কমই দেখা যায়। তখন

এই স্বাস্থ্য রক্ষার কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর নিকট তাঁদের পরিবারে কয়েক পুরুষ ধরে বাল্যবিবাহ বন্ধ থাকাই এর অন্যতম প্রধান কারণ বলে বর্ণনা করেছিলেন। শুনতে আশ্চর্য্য শোনালেও এ কথা সত্যি যে সুরেন্দ্রনাথের পরিবারের সংরক্ষণশীল গোঁড়া মনোভাবের দরুণই তাঁদের পরিবারে বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠান সম্ভব হয় নি। তাঁরা খুব বড় কুলীনবংশ ছিলেন। তাই স্বভাবতঃই বিবাহাদির জন্য সমমর্য্যাদাসম্পন্ন অনুরূপ কুলীনবংশ (যাদের সংখ্যা খুবই কম ছিল) খুঁজে বার করতে শুধু বেগ পেতেই হত না, অনেক দেরীও হত। যার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ পরিণত যৌবনেই তাঁদের পরিবারের ছেলে-মেয়েদের বিবাহ হত। অবশ্য কোন উদ্দেশ্যমূলক বা সমাজ সংস্কারের মনোভাব থেকে যে এটা হয়নি তা সুরেন্দ্রনাথ অকপটভাবে নিজেই স্বীকার করে গেছেন তার আত্মচরিতে। বাল্যবিবাহের পরিবর্ত্তে পরিণত-যৌবনে বিবাহের দরুণই তাঁদের পরিবারের প্রায় সকলেই সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন বলেই সুরেন্দ্রনাথের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল এবং এমনি করে তাঁর মধ্যে একটা বাল্যবিবাহ-বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠেছিল।

সুরেন্দ্রনাথের বাল্যজীবন তথা ছাত্রজীবনের সমসাময়িক গণআন্দোলন বা সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ধারা আদৌ বেগবতী ছিল না বল্লেই চলে। রামগোপাল ঘোষের মত বিশিষ্ট বক্তার বক্তৃতা শুনতে পর্য্যন্ত জনসভাগুলিতে বিশেষ জনসমাগম হতনা এবং জনগণের চিত্তে সেই বক্তৃতার দরুণ বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়াও দেখা দিত না। সুরেন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী জীবনে অবশ্য সেই আন্দোলনের ধারায় শুধু বেগই সঞ্চারিত হয়নি, আসমুদ্রহিমাচলের সমগ্রভারতবাসীকে সেই আন্দোলনের পূত স্রোতস্বিনী ধারায় অবগাহন করিয়ে সুরেন্দ্রনাথ এক সূত্রে গ্রথিত করেছিলেন তাদের সকলকে—এক জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তাঁর ওজস্বিনী ভাষার বক্তৃতায়। সুরেন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনের ব্রাহ্মসমাজ তথা সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম নেতা কেশবচন্দ্র সেনই বোধ হয় বাংলা তথা ভারতের সফল বক্তা ছিলেন—যিনি তাঁর বাগ্মিতার সম্মোহনী শক্তিতে জনসাধারণকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন। তিনিই ভারতের সার্থক বক্তা যাঁর বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে সাধারণ মানুষ দলে দলে জনসভায় যোগদান করতে আরম্ভ করে। তাঁর সময় হতেই প্রকাশ্য জনসভায় লোক সমাগম বৃদ্ধি পেতে সুরু করে—তিনিই এই গৌরবের প্রথম দাবী করতে পারেন —কেশবচন্দ্র তাঁর বক্তৃতার অপূর্ব্ব শক্তিতে অতি সহজেই যুবকচিত্ত জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতায় গুরুগম্ভীর স্বরের সঙ্গে মিশ্রিত থাকত এক অপূর্ব্ব ভাবাবেগ ও দৃঢ় আত্মবিশ্বাস। অসামান্য ছিল তাঁর বক্তৃতার উচ্চারণ ভঙ্গী। স্বভাবতঃই ছাত্র সুরেন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতার আকর্ষণে আকৃষ্ট হলেন। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনবার সুযোগ ও সুবিধা পেলেই তিনি সেখানে উপস্থিত থাকতেন এবং রুদ্ধ নিশ্বাসে ব্রাহ্ম-নেতার বক্তৃতার প্রতিটি অক্ষর অভিনিবেশ সহকারে শুনতেন, সুপ্রশংসচিত্তে লক্ষ্য করতেন তাঁর বক্তৃতার দৃপ্ত বাচনভঙ্গী, গম্ভীরভাবে অনুধাবন কর্ত্তে চেষ্টা করতেন তাঁর বক্তব্য বিষয় এবং ভাব। একথা বল্লে বোধ হয় একটুও অত্যুক্তি হবে না যে বাগ্মী হিসাবে সুরেন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জ্জনের জন্য অনেকখানি দায়ী কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতার প্রভাব।

সুরেন্দ্রনাথের ছাত্রাবস্থায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব বিশেষ করে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের প্রভাব তাঁকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছিল। বিদ্যাসাগরের বিরাট ব্যক্তিত্ব, সংকল্পের দৃঢ়তা, উদার মহানুভবতা এবং সর্ব্বোপরি অসহায় দীন-দরিদ্র দেশবাসীর প্রতি তাঁর অকৃত্রিম সহানুভূতি সুরেন্দ্রনাথের অন্তরে যথেষ্ট শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে বলে গেছেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের গোড়ায় রয়েছে আর্ত্ত দুঃখীর প্রতি তাঁর সহানুভূতিপ্রবণ প্রাণ।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ আন্দোলন আশানুরূপ সাফল্য লাভ না করায় সুরেন্দ্রনাথ তাঁর তরুণ বয়সেই খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁর জীবন স্মৃতিতে তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন—"আমার তরুণ বয়সে আমি আক্ষেপ করে যে কথা বলেছিলাম—আজ জীবনের সায়াহ্নেও সেই কথাই পুনরাবৃত্তি করে বলছি—কালে তাঁর বিধবা বিবাহ আন্দোলন সাফল্য অর্জ্জন করবে।" এই ক্ষোদোক্তি থেকেই সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারের প্রচেষ্টা সুরেন্দ্রনাথের তরুণ মনে কি গভীর রেখাপাত করেছিল।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর তরুণ বয়সে তৎকালীন আর একটী আন্দোলনের প্রতিও যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ভাবীকালের খ্যাতিমান ও শক্তিমান বক্তা সাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা করবার প্রথম পাঠও বোধহয় সেই আন্দোলনের মাধ্যমে গ্রহণ করেন। এই আন্দোলনটী ছিল মাদকতা নিবারণী। অমায়িক ও বিনয়ী প্যারীচরণ সরকার তখন কলুটোলার একটী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। যেকোন আন্দোলনে নেতৃত্বদানের প্রত্যেকটী গুণের তিনি অধিকারী ছিলেন। তিনি এগিয়ে এলেন মাদকতা নিবারণী আন্দোলনের নেতৃত্ব দানের জন্য। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তৎকালীন যুবক সমাজের ভিতরে অমিতাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। প্রতিভাবান অনেক যুবকও ঐ ভ্রান্ত পথে পা বাড়িয়েছিলেন। মদ্যপানকে তাঁরা পাশ্চাত্যশিক্ষা বা ইংরেজী শিক্ষার অচ্ছেদ্য অংশরূপেই মনে করতেন। মাদকতা নিবারণী আন্দোলন এই জাতীয় অনেক বিপথগামী ধ্বংসোন্মুখ প্রতিভাবান যুবককে নিশ্চিত পতনের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে। এই আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সমাজসেবী কেশবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মণিষীবর্গ ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ইউনিটারিয়ান গির্জ্জার (Unitarian Church) আমেরিকা প্রবাসী পাদ্রী রেভারেণ্ড সি, এইচ, এ, ডল ও (Rev. C. H. A Dall) এই আন্দোলনের একজন সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের উদার তরুণমন স্বভাবতঃই সমাজহিতৈষণায় এই আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং আস্তে আস্তে তিনি এই আন্দোলনের সমর্থনে জনসভায় বক্তৃতা করতেও সুরু করেন। এমনি করেই সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মীজীবনের প্রথম পাঠ সুরু হয়েছিল এই মাদকতা নিবারণী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

কী মেলে গীতা পাঠে

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

কঠোপনিষদ বল্লেন—আত্মাকে জানবে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে জানবে সারথি আর মনকে লাগাম। জ্ঞানী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গুলিকে অশ্ব, রূপাদি বিষয়কে বিচরণ পথ এবং ইন্দ্রিয় ও মনযুক্ত আত্মাকে ভোক্তা বলে জানেন।*

কুরুক্ষেত্রে রথের রথী অবশ্য অর্জ্জুন আত্মা নন, যদিও তাঁর অন্তরে অধিষ্ঠিত আত্মা যা' সবার মাঝে বিরাজিত। কিন্তু দেহ রথে মনের লাগাম ধরে বিরাজিত সকল বুদ্ধির কেন্দ্র জ্যোতির জ্যোতি নররূপী নারায়ণ। ইন্দ্রিয় অশ্বেরা দেখেছে অস্ত্রের ঝলক, আত্মীয় স্বজন, শুনেছে শঙ্খধ্বনি, স্পর্শ করেছে ধনুর্ব্বাণ, ঘ্রাণের আভাস পেয়েছে রণস্থলের শোণিতধারার। বুদ্ধি সারথি চান আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে আত্মার মোহ-জাল উদ্ঘাটন করতে। অর্জ্জুনের আত্মাই যে প্রকৃত রথী—তার দেহটাও রথ। টানো টানো মনের লাগাম—বুদ্ধি সারথী শ্রীকৃষ্ণ কষলেন লাগাম। বল্লেন—ইন্দ্রিয় ঘোঁড়াগুলাকে টানো টানো মনরূপ লাগাম টেনে। দৃষ্টি দাও অন্তরে, শোনো জ্ঞানের বাণী, ঘ্রাণ কর মুক্ত স্বর্গের মন্দার পারিজাত। তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন—প্রকৃত জ্ঞান। কি সে রূপ দেখালেন সারথি আপনার—বিশ্বরূপ যা সঙ্কীর্ণ বিষয় পথ হ'তে কোটি কোটি গুণ বিশাল, অনন্ত বিস্তৃত।

সে জ্ঞান অন্তর প্রবিষ্ট হলে আরতো বাকী থাকে না জানবার বোঝবার ভোগ করবার কোনো বিষয়। কিন্তু সবার পক্ষে কী সে বোঝা সম্ভব? এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে কোথা সে জ্ঞানের স্থান? এ তুচ্ছ নয়নের সাধ্য কী সে জ্যোতির তেজ উপলব্ধি করবার? অর্জুন স্বয়ং ভীত হয়ে চতুর্ভুজরূপ দেখতে চেয়েছিলেন—ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য পথে বিচরণ করবার আনন্দ উপভোগ করবার প্রয়াসে।

মানুষের উন্নতির ক্রম আছে। মোহের পরদা ধীরে ধীরে ওঠে—আবার পড়ে আবার ওঠে। প্রদীপের আলো ধীরে ধীরে জ্বলে। কিন্তু প্রদীপকে একেবারে নিভিয়ে রাখলে, মায়ার আবরণ চাপা দিলে, সে তো আত্ম-প্রকাশ করে না। অবতার, মেশায়া, পয়গম্বর, মহাপুরুষ, ঋষি, মুনি সবাই বিতরণ করেন জ্ঞান। নিজ নিজ বুদ্ধির সাধ্য অনুসারে জীব আহরণ করে সমাচার। একই উপদেশ ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মনে বিভিন্নরূপে ফোটে তার বোঝবার ক্ষমতা অনুসারে। কিন্তু শোনা চাই। কান বন্ধ ক'রে লাভ তো নাই। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল—গাহিতে গাহিতে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রাণে নামীর ঐশ্বর্য, মাধুর্য্য এবং প্রাচুর্য্য।

শ্রীমদ্ভগবগীতা জ্ঞানের প্রদীপ। সে প্রদীপ রাঙিয়ে তোলে হৃদয়ের আঁধার ঘর। প্রকাশ করে তাঁর মুরতি যিনি অণু হতে অণু, মহান হ'তে মহত্তর। প্রাণ পূর্ণ হয় উচ্ছ্বসিত প্রেমে। তখন প্রেমানন্দময়ী ভক্তি দর্শন পায় সচ্চিদানন্দের। কিন্তু সে প্রদীপ জ্বলে নেবে, আবার জ্বলে—ধীরে ধীরে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সে দীপশিখাকে উজ্জ্বল রাখবার জন্য ঢালতে হয় ভক্তি তেল জ্ঞানের প্রদীপে। একদিনে—হয়তো এক জন্মে সম্ভব নয় গীতার তত্ত্ব-কানন হতে পারিজাত সংগ্রহ ক'রে ডালি পূর্ণ করা। তাই অভ্যাস চাই। বারম্বার পাঠ চাই। শোনা চাই সে গুরু শিষ্যের অপূর্ব্ব মনোহর আলোচনা দিনের পর দিন।

তাতে মেলে কী? ঋষি কি বলেছেন সে কথা গীতা মাহাত্ম্যে বুঝি। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কী বলেছেন—গীতার সঙ্গীতের মন-মজানো ছন্দের বিষয়? কী মেলে কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ শুনলে?

তিনি প্রথমেই সাবধান করেছেন অর্জ্জুনকে গীতার কথা বলতে অনধিকারীকে। কারণ মানব-মনের অভিব্যক্তির ক্রম আছে। সত্য অনন্ত। কিন্তু মায়ার খেলা সৃষ্টি করেছে স্তর—বিভিন্নতা বুদ্ধির, রস-গ্রহণের। বুদ্ধি সারথী সকল রথের লাগাম টানতে পারে না। তাই ইন্দ্রিয় ঘোঁড়ারা সংকীর্ণ যশ, মান, রূপ ও রসের অলিতে গলিতে ছোটে। ভাবে জগতটা ছোট। অভিজ্ঞতা এবং নৈরাশ্য ধীরে ফোটায় জ্ঞানের চক্ষু। সারথির চোখ ফোটে। কিন্তু যে সারথি আত্মভোলা মায়ার খেলায় তার পক্ষে তো সার সত্যের পথ বোধ হবে কুপথ।

তাই ভগবান বল্লেন—তপস্যাহীন ব্যক্তির নিকট বলা উচিত নয় গীতায় বর্ণিত পরম কথা। যে ভক্তিহীন তার তো প্রাণ বদ্ধ—সে অধিকারী নয় গীতার তত্ত্ব কথা শোনবার। যার শোনবার ইচ্ছা নাই কী ফল তার কাছে গীতা পাঠের? আবার এমন মানুষ আছে যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়াসম্পন্ন। কী উদ্দেশ্য সাধিত হবে তেমন লোকের নিকট পরিবেশন করলে গীতার সত্য—যা জীবনের সার সত্য—অবিসম্বাদী সনাতন পরম তত্ত্ব।*

কিন্তু যার সাধনা আছে, যে ভক্ত, যার নিজের আগ্রহ আছে শ্রীহরির মুখনিসৃত অমৃত পানের সে তো সুধা-পানের সুখ একলা ভোগ করতে পারে না। কারণ জীবনের শ্রেষ্ঠ আচরণ সাম্য; পরকে আপন জ্ঞান বিদ্বেষ-বিহীন প্রাণে। যখন সুধারস উচ্ছ্বসিত হয় প্রাণে কার সাধ্য

---

* আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃপ্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥

* ইদং তেহনতপস্কায় নভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাক্যং ন চ মাং যোহভ্যসূয়তি।১৮।৬৭

রোধে তার বেগ? তাই শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—এই পরম গুহ্যবাণী আমার ভক্তদের মাঝে যে ব্যাখ্যা করে, সে তার পরম ভক্তির ফলে নিঃসন্দেহ আমাকেই পায়।*

ভক্ত চেনে ভক্তকে। পরিপ্রশ্ন, কার্য্যালোচনা, গদগদ কণ্ঠে জ্ঞানের কথা কহা—ভক্তির এক পথ। আমি জানি তাই জ্ঞানী, বাকী মূর্খ, এ হলো মূর্খতার পরম রূপ। সঞ্জয় যে শুনেছিলেন সেও তো লীলার এক রূপ। বেদব্যাস শুনে বিতরণ করেছিলেন সে জ্ঞান—তাই মানব সমাজ সমৃদ্ধ আজ সে জ্ঞানে। তবে একেবারে বেনা বনে মুক্ত ছড়ানো বৃথা। তাই ভগবান নির্দেশ দিলেন—ভক্তের সাথে আলোচনার তার কাছে প্রকাশের। ব্যাখ্যা করতে হবে ভক্তের নিকট—অসূয়ার যে ভ্রান্ত তাকে প্রতীক্ষা করতে হবে। গীতা ব্যাখ্যা করতে হবে তাঁকে যিনি হৃদয়ঙ্গম করেছেন রহস্য। তাই মণীষীরা আমাদের জন্য ব্যাখ্যা করেছেন গীতা—নানা ভঙ্গীতে, নানা ভাবে।

শ্রীকৃষ্ণ পরম গুরুর ইচ্ছা যে গীতা প্রতিপাদিত সত্য মানব সমাজের হিতের জন্য হ'ক প্রচারিত জগতে। প্রচারকে তিনি পুরস্কৃত করবার বিধান করেছেন। প্রচারে বা পাঠে কী মেলে সে কথা তিনি বলেছেন সুস্পষ্টভাবে। বোঝা যায় তাঁর অভিলাষ—জগতের হিতের জন্য আবশ্যক গীতার বাণী শ্রবণ। তিনি বল্লেন—মানুষের মধ্যে, গীতা প্রচার-কারীর মতো আমার অত্যন্ত প্রিয় কর্ম্মকারী লোক পৃথিবীতে কেহ নাই। আর তেমন ব্যাখ্যাতা হ'তে আমার অধিক প্রিয়ও কেহ থাকবে না।‡

তার পর তিনি বল্লেন—যে ব্যক্তি আমাদের এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলো-চিত সংবাদ অধ্যয়ন করবে—তার দ্বারা আমি জ্ঞানযজ্ঞে পূজিত হব—এই আমার মত।§

অধ্যয়ন অবশ্য মাত্র পাঠ নয়—মর্ম্ম সংগ্রহ করা নিজের বুদ্ধির সামর্থ্য অনুসারে। বলা বাহুল্য জ্ঞানদীপকে প্রকৃষ্টরূপে জ্বালিয়ে না রাখলে অধ্যয়ন সফল হয় না। গীতা-প্রতিপাদিত পরম সত্য বোঝবার এবং ধারণা করবার সাধ্য-মত প্রয়াসই যজ্ঞ। সে প্রয়াস ঐকান্তিক হলে জেগে ওঠে প্রাণ ফুটে ওঠে জগদীশ্বরের বিভূতি। সে অধ্যয়নে হতে হবে—মন্মনা—এ নির্দেশ তাঁর নিজের। সেই নির্দ্দেশের পটভূমিতে ফলশ্রুতি বুঝলে গর্ব্বের ভ্রান্ত-পথে বিচরণ করবার আশঙ্কা থাকবে না। বলা বাহুল্য মাত্র জ্ঞান আহরণের জন্য গীতা অধ্যয়ন করলে শুভফল-লাভ হয় না। যে কেহ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে, অসূয়াশূন্য হয়ে, গীতাশাস্ত্র মাত্র শ্রবণ করে, সে হয় পাপমুক্ত। পুণ্যাত্মা শুভলোক প্রাপ্ত হয়।*

শ্রদ্ধাবান কে? শ্রদ্ধাবান হয়ে শুনলে শুভলোক প্রাপ্তি। শ্রদ্ধা—ভগবানে একনিষ্ঠ ভক্তি। সেই অবস্থায় মানুষকে তোলবার আয়োজনই গীতার উপদেশ। শ্রদ্ধা থাকলে গীতা পথ দেখিয়ে দেবে জ্ঞানের এবং কর্ম্মের। ভক্তি ছড়িয়ে পড়বে সারা জীবনের সকল কর্ম্মে। আর তো কিছু বাকী থাকবেনা! একনিষ্ঠ ভক্তিই তো যোগ। কিছু না ভেবে সকল ভাবনা এককেন্দ্র করলে নির্বাত স্থলের দীপ শিখার মত আলোর আলো, জগতের আলো সমৃদ্ধ করবে মনকে। অসূয়া থাকলে তো শ্রদ্ধা স্থান পায় না মনে। বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর।

কৃষ্ণ বলেছেন অর্জ্জুন শুনেছেন। যিনি বলেছেন তিনি শ্রীকৃষ্ণ, যিনি শুনেছেন প্রথম তিনি অর্জ্জুন। কবে জন্মেছিলেন কৃষ্ণ, ছিলেন কিনা, কোন্ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত, কোন বাণী ধার করা—এ সব তর্কে কৃষ্ণ মিলে না। আর এমন ক্ষিপ্ত মন নিয়ে সহস্রবার গীতা পাঠ করলে কোনো জ্ঞান লাভ হয় না। গীতা বা কোনো মহাজন-বাক্য শুনতে গেলে প্রথম চাই শ্রদ্ধা? তাই ভগবান সবাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন প্রথমেই। যার তপস্যা নাই, ভক্তি নাই, শোনবার ইচ্ছা নাই, তার কাছে গীতা পাঠের প্রয়োজন নাই।

গীতা পাঠের ফল স্বয়ং বিবৃত করেছেন ভগবান। তাঁর আলোচনার শেষে। শ্রদ্ধাবান হয়ে শুনেছিলেন অর্জ্জুন, অসূয়া ছিল না তাঁর মনে। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন—

নষ্ট মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়চ্যুত
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।

হে অচ্যুত তোমার প্রসাদে অজ্ঞান নষ্ট হয়েছে। আমি স্মৃতিলাভ করে নিঃসংশয় এবং স্বস্থ হয়েছি। তোমার কথামত কাজ করব।

কী মেলে গীতার বচন শুনলে স্পষ্ট বল্লেন অর্জ্জুন। নষ্ট হয় মোহ, ফুটে ওঠে জ্ঞান। সন্দেহ লোপ পায়, শ্রোতা হয় স্বস্থ।

আর বল্লেন তোমার বচনের নির্দ্দেশে কাজ করব।

গীতার শিক্ষা প্রথমতঃ কাদের শিক্ষা—কর্ম্ম পথের নির্দ্দেশ। তাই গৃহস্থের কল্যাণকর শ্রীমুখের শুভবাণী।

গীতার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের নিজের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করলে বোঝা যায় গীতার মর্ম্ম।

---

* য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ। ১৮।৬৮

‡ ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি। ৬৯

§ অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ
জ্ঞান যজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ।

* শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্য কর্ম্মণাম।

পারমাণবিক শক্তি ও মানব জাতির ভবিষ্যৎ

সমর দত্ত
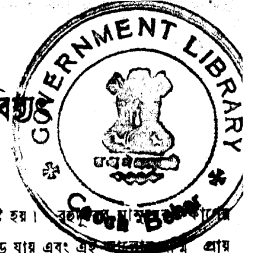
সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের নানান্তর পেরিয়ে আজ আমরা এসে পৌঁচেছি বিজ্ঞানের যুগে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি পরম বিস্ময়কর। পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে মানুষ আজ বিস্মিত। কিন্তু পর পর দুইটি মহাযুদ্ধের বীভৎস পরিণতি দেখে বিংশ শতাব্দীর মানুষের মনে প্রশ্ন জেগে উঠেছে—বিজ্ঞানী কি তার নব নব আবিষ্কারগুলি ধ্বংসের কাজে প্রয়োগ করবে—না সৃষ্টি ও মানবকল্যাণে প্রয়োগ করে অতিমানব সভ্যতার এক নূতন অধ্যায় রচনা করবে! আজ পারমাণবিক শক্তি এরূপ সক্রিয় হয়ে উঠেছে যে এর আনুকূল্যে পৃথিবী এক নিমেষে ব্রহ্মাণ্ড থেকে অবলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। মাত্র দুইটি পরমাণু বোমার আঘাতে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি অঞ্চল সম্পূর্ণ-ভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল। আজও আমরা প্রত্যক্ষ করছি—বিজ্ঞানের দাক্ষিণ্যে ক্ষমতালিপ্সু বিভিন্ন শক্তির দানবীয় আচরণ। হিংসাপ্রমত্ত পৃথিবী অদূর ভবিষ্যতে মহাপ্রলয়ের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপে পরিণত হবে, না মানুষের সন্ধানী-মন প্রকৃতির অন্তহীন রহস্যের অতল সাগর মন্থন করে নব নব তথ্য ও সত্যের মণিমুক্তা তুলে এনে মানব-মঙ্গলের গগনস্পর্শী সৌধ রচনা করবে—এই কথাটাই আজ আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

১৯৪৫ সালের আগষ্টমাসে উপরোক্ত দুইটি অঞ্চলের উপর পারমাণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। তারপর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া উভয়েই পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কার করে পারস্পরিক হুমকী দিতে আরম্ভ করে। তৃতীয় রাষ্ট্র বৃটেন ও পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার আবিষ্কারক ব'লে নিজেকে বিশ্ববাসীর নিকট পরিচয় দিয়েছে। ফ্রান্স ও কয়েকটি পশ্চিমী রাষ্ট্র এই মারণাস্ত্র নির্মাণের কাজে ব্যাপৃত এবং এ সম্বন্ধে তারা অদূর ভবিষ্যতে সাফল্য লাভে আশান্বিত। উন্নততর অস্ত্র নির্মাণের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে, সোভিয়েট রাশিয়াতে এবং বৃটেনে নানারূপ গবেষণামূলক কাজ চলেছে। আমেরিকা তার আপন রাজ্যের অন্তর্গত নাভাদা মরু অঞ্চলে হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা চালাচ্ছে এবং কয়েকবার প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে খৃষ্টমাস ও বিকিনি দ্বীপপুঞ্জে ও পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ সংক্রান্ত কাজ ও হয়েছে। সম্প্রতি মার্কিণ পরমাণু শক্তি কমিশন ঘোষণা করেছে যে গত ২৯শে জুন ১৯৫৮ রাত্রি ১টায় (ভারতীয় সময়) প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় যে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে তা বর্তমান পর্য্যায়ের দশম বিস্ফোরণ। বৃটেনও খৃষ্টমাস দ্বীপপুঞ্জে এই মারণাস্ত্রের পরীক্ষা চালাচ্ছে। সাইবেরিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সোভিয়েট ইউনিয়নের তত্ত্বাবধানে এই ভয়াল অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটেছে।

মহাশূন্যে বিমান অথবা বেলুন থেকে নিক্ষেপ ক'রে এই বোমা পরীক্ষা করা হয়। কোন একটি বোমার বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর শব্দ ও চোখ ঝলসানো আলোর সৃষ্টি হয়। ... কানের পর্দা এই শব্দ তরঙ্গের আঘাতে ছিঁড়ে যায় এবং ... প্রায় ১০০ মাইল বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী বিকীরিত হয়। পারমাণবিক অস্ত্র বিস্ফোরণান্তে যে উত্তাপের সৃষ্টি হয় তার তাপমাত্রা (Temperature) প্রায় ৬ মিলিয়ন ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড অর্থাৎ সূর্য্যের বহিরাংশের সমান। যে স্থানে বিস্ফোরণ ক্রিয়া সম্পাদিত হয় সেই স্থানের চতুর্দ্দিকের মাটি কাঁপতে থাকে। ছাতার মত আকৃতিবিশিষ্ট তেজস্ক্রিয় পদার্থের ধূমায়িত মেঘ সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করে।

এই মারণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ক্রমশঃ বিষাক্ত হয়ে উঠছে। বিস্ফোরণের ফলে নির্গত তেজস্ক্রিয় পদার্থ মুহূর্ত্তের মধ্যে উপর দিকে ওঠে এবং বাতাসের সঙ্গে বহুদূরবর্ত্তী অঞ্চলেও ভেসে যায়। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পদার্থগুলি পৃথিবীর বুকে নেমে এসে নিদারুণ সর্ব্বনাশের সৃষ্টি করে। বিস্ফোরণের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের অধিবাসিদের মর্ম্মন্তুদ অবস্থা কল্পনাতীত। ১৯৫৪ সালের মার্চ্চ মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বিকিনি দ্বীপপুঞ্জে পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের জন্য কয়েকজন মৎস্যজীবীর মর্ম্মান্তিক জীবননাশের কথা জানা যায়। বিস্ফোরণ অঞ্চল থেকে বহুদূরে সমুদ্র মধ্যে অবস্থিত ধীবরগণ তেজস্ক্রিয় বিস্ফোরক পদার্থের (Radio active Chemicals) সর্ব্বগ্রাসী শক্তির কবল থেকে রেহাই পায় নি, বিস্ফোরণের অনতিবিলম্বে তাদের সর্ব্বশরীর শক্তিহীন হ'য়ে পড়ে, মুহু র্মুহু বমি হতে থাকে এবং কয়েক দিনের মধ্যে তাদের মাথার সব চুল উঠে যায়। ২৩ জনের মধ্যে ৭ জনের মৃত্যু হয়। ১৯৫৭ সালে ভারতবর্ষে ফ্লু ('Flu) নামে পরিচিত যে এক অদ্ভুত ইনফ্লুয়েঞ্জার আবির্ভাব হয় তার কারণ এই পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ। ভারত মহাসাগর ও কাশ্মীরের উলার ও ডাল হ্রদে যে লক্ষ লক্ষ টন মাছ নষ্ট হয়েছিল, বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে এই অপচয়ের জন্য দায়ী পারমাণবিক শক্তির পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ। মানবদেহে বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া নিম্নোক্ত ব্যাধির আকারে প্রতিফলিত হয় বলে বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন:—

(১) Lukemia (দেহ মধ্যস্থিত রক্তকণিকাবিনাশক ব্যাধি)
(২) Epilation (মাথার চুল চিরতরে নষ্ট হওয়া)
(৩) Mutation (বাক্‌শক্তি হীনতা)
(৪) Sterility (বন্ধ্যাত্ব)
(৫) Cancer (কর্কট রোগ)
(৬) Bone necrotis (দেহের অস্থির বিনাশ)
(৭) Cataracts (চক্ষুর হানি)

ফরাসী পদার্থবিদ Frederick Juli Curie পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে বলেছেন :—

Radioactive elements in the atmosphere would cause outbreak of Cancer unless H-Bomb tests are halted.

উইসকনসীন বিশ্ববিদ্যালয়ের Dr James F Crow বলেছেন :—

People now exposed to fall out may be expected to produce two thousand million children and 80,000 of them, by crude estimate, will be born with some gross mental or physical defect of genetic origin.

নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত আমেরিকার প্রখ্যাত রসায়নবেত্তা Dr. Linns Poling এর মতে :—

The average age of one million people will be reduced to 5 to 10 years, two lacs of children of 20 generations will suffer from mental and health deformation, one ray of radiation in the human body will shorten their life about two weeks. Dr. Poling আরও বলেছেন—The British H-Bomb tests will cause the break of Lukemia and one thousand people will die and by comparatively small radiation. Cancer and Lukemia cases will notably increase.

যে তেজস্ক্রিয় শক্তি মারণাস্ত্ররূপে বিশ্বব্যাপী মানুষের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছে, পরমাণুর বুকের মধ্যে লুকানো সেই অপরিমিত শক্তিকে গঠনমূলক কর্মে অর্থাৎ শিল্পক্ষেত্রে চিকিৎসাশাস্ত্রে, কৃষিকার্য্যে এবং উচ্চতর মৌলিক গবেষণায় প্রয়োগ ক'রে বিশ্বজনীন কল্যাণ সাধন করা সম্ভব। যে বিভিন্ন উপায়ে এই অমিত পরমাণু শক্তিকে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা যেতে পারে এমন সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

(১) মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে প্রচুর শক্তির প্রয়োজন। সাধারণতঃ কয়লা থেকে মানুষ এই শক্তি সংগ্রহ ক'রে থাকে। যদি পারমাণবিক শক্তি থেকে এই চাহিদা মেটানো যায় তাহলে কয়লার খরচ অনেক বেঁচে যাবে। অবশ্য একথা সত্য যে আজ কয়লা বা জলবিদ্যুৎ ব্যবহারে যা খরচ পড়ে, পরমাণু শক্তি ব্যবহারে খরচ তার চেয়ে অনেক বেশী পড়বে। কিন্তু এমনদিন চিরকাল থাকবে না। ভবিষ্যতে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের খরচ যখন অনেক কমে যাবে তখন কয়লার খরচ বেড়ে যাবে অনেক। কয়লার সঞ্চয় নিঃশেষিত হবার আগেই পারমাণবিক শক্তির ব্যাপক ব্যবহার খুব সহজেই আশা করা যায়।

(২) পারমাণবিক চুল্লী (Atomic Reactor) থেকে প্রভূত পরিমাণ তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক (Radioactive Isotopes) পাওয়া যায় এবং শিল্পক্ষেত্রে এগুলিকে প্রয়োগ করার প্রকৃত সম্ভাবনা দেখা গেছে। রেডিও থোরিয়াম (থোরিয়ামের তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক) ও জিঙ্ক সালফাইড মিশ্রণের ফলে একটি উজ্জ্বল পেন্ট তৈরী হয় এবং এটা ঘড়ির কাঁটায় সংলগ্ন থাকাকালীন অন্ধকারে আলোকিত অবস্থায় দেখা যায়। এই পদার্থগুলি হ'তে বিকীরিত রশ্মিকে বিভিন্ন ধাতব বস্তুর খুঁত ধরবার জন্য অথবা ধাতবপাত কতটা পুরু হ'বে তা স্থির করবার জন্য, কিংবা ধাতব পদার্থের ঘর্ষণ শক্তির পরিমাপ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রয়োজনীয়। নানাপ্রকারের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু যথা—কাগজ, প্লাসটিক, রবার, তাঁত ইত্যাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাৎসরিক প্রায় ১০০ মিলিয়ন ডলার পরিমাণ অপচয় তেজস্ক্রিয় সমস্থানিকের সাহায্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এখন বাঁচাতে পারছে। খাদ্যদ্রব্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক অতিশয় কার্য্যকরী। সমস্থানিক থেকে নির্গত রশ্মি মাংস, শাক-সব্জী ও অন্যান্য খাদ্যে নিহিত নানা প্রকার জীবাণু নাশে সমর্থ। নানাপ্রকার ঔষধ ও ভৈষজ পদার্থ রক্ষণাবেক্ষণেও এই রশ্মি বিশেষ উপকারক।

(৩) পারমাণবিক চুল্লী হ'তে সংগৃহীত তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক বিংশশতাব্দীর চিকিৎসা জগতে এক অভিনব ইতিহাস রচনা করেছে। চিকিৎসকগণ তেজস্ক্রিয় সমস্থানিকের সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন অংশের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ এবং খাদ্য, ঔষধ ও পথ্যের বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া অনুধাবনে সক্ষম হয়েছেন। মানব দেহের অন্তর্গত থাইরয়েড গ্লাণ্ডের রোগ নির্ণয়ে এবং ওই রোগের চিকিৎসায় এই বস্তু বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে। মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে টিউমার-অস্ত্রোপচারে এর দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চর্ম্মরোগ, ক্যানসার, সিফিলিস ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ে এটা মানুষকে বিস্মিত করেছে।

(৪) উদ্ভিদ জগৎ সম্বন্ধে এই পদার্থ বৈজ্ঞানিকগণকে এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভে সাহায্য করেছে। গাছপালা সূর্য্যরশ্মি থেকে নিজ দেহে শক্তি সংগ্রহ করে, কার্বোহাইড্রেটস্, প্রোটিন ও চর্বি সংগ্রহ করে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল থেকে। রেডিওকার্বন ব্যবস্থার সহায়তায় বৈজ্ঞানিকগণ উদ্ভিদ জগতের এই বৈচিত্র্যময় প্রক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণে সমর্থ হয়েছেন।

(৫) কৃষিক্ষেত্রেও রেডিও ফসফরাস প্রয়োগ করে সারের কার্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করা এবং কৃষিকর্ম্মের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা সম্ভব হয়েছে। তেজস্ক্রিয় পরমাণু শক্তির সাহায্যে মশা-মাকড়, পঙ্গপাল প্রভৃতির উপদ্রব থেকে শস্যক্ষেত্র নিরাপদ করাও সম্ভব।

সংখ্যাতীত দিনের মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতি আধুনিক পারমাণবিক যুগে উত্থান-পতনের সন্ধিক্ষণে সমুপস্থিত। পরমাণুর অভ্যন্তরে সুপ্ত অপরিমিত শক্তিকে স্বীয় রাষ্ট্রিক কল্যাণে প্রয়োগ করে আমেরিকা, ইংলণ্ড, কানাডা, রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে। ভারতবর্ষও এ বিষয়ে একেবারে পিছিয়ে নেই। কিন্তু ভারত ব্যতীত অধিকাংশ রাষ্ট্রই এই শক্তির সহায়তায় মারণাস্ত্র তৈরী করে সমগ্র বিশ্বমানব জীবনে এক অশুভ অধ্যায়ের সূচনা করেছে। একটি মহত্তর সভ্যতা ও উন্নততর মানব সংস্কৃতির ভিত্তি রচনার প্রয়াস যুগপৎ মানবজাতির সর্ব্বাত্মক ধ্বংসের বিরাট আয়োজন—এই দুইটি বিপরীত প্রবাহ দিনে দিনে দ্রুততর হচ্ছে। সাম্রাজ্যগঠন, উপনিবেশ স্থাপন, শিল্পে অনগ্রসর দেশে লাভজনক অর্থ বিনিয়োগের সঙ্কীর্ণ পথ পরিহার করে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ আন্তর্জ্জাতিক মানব কল্যাণে পরমাণু শক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ব্যবস্থা করে বিশ্বব্যাপী জনসাধারণের ভবিষ্যৎ জীবন সুখী ও শান্তিময় করে' তুলুক—জগতের যে কোন দেশের শান্তিকামী মানব-প্রেমিকের এই অন্তরতম কামনা।

সায়াহ্ন
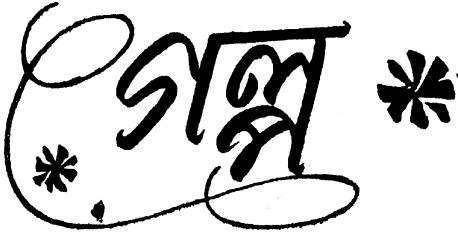
হরেন ঘোষ

দেয়ালঘড়িতে ঢং করে আওয়াজ হল একটা। সাড়ে পাঁচটা বাজলো। ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসলেন সদানন্দবাবু। সোজা তাকালেন ঘড়ির দিকে। তারপর পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে বাইরে। এখনো হালকা একটা আবরণ, রোদের রাঙা আলো পড়েনি আকাশে-মাটিতে। বিছানা ছেড়ে নামতে যাবেন, সদ্য-ঘুম-ভাঙা সুজাতা দেবী কাপড়ে টান দিলেন।

—উঠছো যে! এত সকালে উঠে কি করবে? আর একটু শুয়ে থাকো।

—ও হ্যাঁ, একঝিলিক বিষণ্ণ হাসি হাসলেন সদানন্দবাবু। তাইতো, এত সকালে উঠে কি করবো? আবার শুয়ে পড়লেন তিনি। কিন্তু নতুন করে ঘুম এলোনা। এতদিনের অভ্যেস। ভারী বিশ্রী লাগে চুপচাপ করে শুয়ে থাকতে। তবু চোখ বুজে, একবার খুলে, এপাশ ওপাশ করে ঘড়িতে ছটা বাজতেই উঠে পড়লেন। সুজাতা দেবীও উঠলেন। দুজনে দুজনার দিকে তাকালেন। কেউ কোন কথা বললেন না। সদানন্দবাবু কলঘরে চলে গেলেন। সুজাতা দেবী গেলেন বাইরের দিকে। ঝি আসবে। দরজা খুলে দিতে হবে। আজ থেকে ওকে একটু দেরীতে আসতেই বলে দিয়েছেন। কি করবে এত সকালে এসে?

কল খুলে অনেকক্ষণ ধরে মুখ হাত ধুলেন সদানন্দবাবু। ইচ্ছে করে এত দেরী করছেন, তবু কেন যেন তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে। ব্যস্ততার ভাব কাটিয়ে উঠতে চাইছেন আপ্রাণ। তবু পারছেন না। ব্যস্ততা যেন রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। ইচ্ছে করলেই তাড়ানো যায় না। তবু যথাসম্ভব দেরী করে মুখ মুছতে মুছতে ঘরে এলেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ালেন, তারপর অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন প্রতিবিম্বের দিকে। সত্যি এমনভাবে কতদিন দেখেননি নিজেকে। চুল সব সাদা হয়ে গেছে, ভাঁজ পড়েছে মুখে। শিথিল হয়ে এসেছে চামড়া।

বাইরে এলেন সদানন্দবাবু। খবরের কাগজ রেখে গেছে হকার। তুলে নিলেন তিনি। আজ পড়তে হবে। সবটা পড়ে ফেলবেন তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বিজ্ঞাপন, কর্ম্মখালি, নিরুদ্দেশ, সিনেমার পাতা, খেলাধূলো, যা আছে সব পড়বেন তিনি। কাগজ তুলে নিলেন। চশমা বার করে চোখে দিলেন। অক্ষরে অক্ষরে পড়তে হবে আজ। অন্যদিন তো তাড়াহুড়োর মধ্যে হেডিং দেখারই সময় পান না। আজ কতদিন পর ছুটি পেলেন।

প্রচণ্ড অবকাশ, প্রচুর অবসর, সীমাহীন ছুটি। কোন কাজ নেই। সমস্ত দিন আর রাত, সব কটি মুহূর্ত্ত হাতের মুঠোয়—তিনি যেমনভাবে ইচ্ছে খরচ করবেন। কোন বিধিনিষেধ, নিয়ম, শাসন বন্ধন নেই। তিনি আজ মুক্ত স্বাধীন, কারো অধীন নন। খবরের কাগজ সামনে খুলে রেখেই তিনি উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবনার সমুদ্রে সাঁতার কাটছিলেন। অকস্মাৎ বুক তোলপাড় করে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো একটি। অপ্রতিভ হলেন সদানন্দবাবু। এদিক ওদিক চাইলেন। এবার কাগজটা মেলে ধরলেন চোখের ওপর।

একি, এত খবর থাকে কাগজে। কৈ তিনি তো খোঁজ রাখেন নি কিছু। সোনার দর কি রকম ওঠানামা করছে, সরকারী পরিকল্পনা কতদূর কাজে এগিয়েছে, কোথায় যুদ্ধ চলছে, কেমন ভাবে মন্ত্রীদের মধ্যে বিশ্ব-পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা চলছে—সব খবর পড়লেন। তিনি এ যুগেরই মানুষ, অথচ তাঁর অজ্ঞাতে এতকাণ্ড হচ্ছে, আর তিনি খবরই রাখেন না কোন কিছুর। মনে মনে লজ্জিত হলেন সদানন্দবাবু। বহুদিনের অন্ধকার

যবনিকার অন্তরাল থেকে একটি স্মৃতি-রশ্মি ভেসে এলো মনশ্চক্ষে। এককালে খবরের কাগজের খবর নিয়ে সেকি উত্তেজনা আর মাতামাতি। কাগজ না পড়লে ঘুম আসতো না চোখে। তারপর যেন সত্যি যন্ত্রে পরিণত হয়ে গেলেন সদানন্দবাবু। মনে মনে ধিক্কার দিলেন নিজেকে। জগৎ ভুলে ছিলেন। নিজের একটা সীমাবদ্ধ জগৎ গড়ে তুলে নিজেকে তার মধ্যে আটকে রেখেছিলেন এতদিন। আজ আবার সীমা ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে সবার মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে মানিয়ে নিতে পারবেন কি?

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস তাঁর অজ্ঞাতে বেরিয়ে এলো।

চা খাবার নিয়ে সুজাতা দেবী এলেন। মুখখানা যথাসম্ভব প্রসন্ন করতে চাইলেও, এক ঝলক দেখেই সদানন্দবাবু বুঝে নিলেন যে তারই মত না-নিদ রাত কেটেছে সুজাতা দেবীর। অথচ কেউ কোন কথা বলেন নি। চুপচাপ শুয়ে ছিলেন, কখনো সন্তর্পণে পাশ ফিরছিলেন, দীর্ঘশ্বাস চাপছিলেন। অবশেষে ভোর রাতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। অথচ ঘুম ভেঙ্গেছে ঠিক সেই সাড়ে পাঁচটায়। এতদিনকার অভ্যেস।

আবার চোখাচোখি হ'ল, কথা হ'ল না। খাবার, চা নামিয়ে রেখে মুখ ঘুরিয়ে ভেতরে চলে গেলেন সুজাতা দেবী। আজ তাঁরও যেন ছুটি। ব্যস্ততা নেই অন্য দিনের মত। ঝি মসলা বেটে দিত, তিনি দু'এক ভাগে ঝোল, তরকারী রেঁধে একবাটি দুধের সঙ্গে পৌনে নটার সময় ভাত বেড়ে দিতেন। তারপর পাখা নিয়ে বাতাস করতে বসতেন।

আজ তিনি একের পর এক, চার পাঁচ ভাগে তরকারি কুটলেন ধীরে সুস্থে। তাড়াতাড়ি খাবার ব্যস্ততা নেই, এগারোটার পর একসঙ্গে খেলেই চলবে। মনে পড়লো তাঁর, প্রথম জীবনে একসঙ্গে খাবার জন্যে যেমন আকুল হয়ে উঠতেন সদানন্দবাবু। মাঝে মাঝে দেরী করে অফিস যেতেন, কখনো বা জোর করে সুজাতা দেবীর মুখে ভাত গুঁজে দিতেন।

আবার উদাস হয়ে পড়লেন সদানন্দবাবু। কাগজের একটা বর্ণও মাথায় ঢুকছে না। মনে হচ্ছে একপাল পোকা কিলবিল করছে যেন। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো তাঁর, শিথিল হাতে পড়ে রইল ভাঁজ করা কাগজ। উদাস চোখে তাকিয়ে রইলেন। কি ভাবে দিন কাটাবেন, কি নিয়ে থাকবেন আজ থেকে? ঘাড় নীচু করে কাজ করতে করতে কুঁজো হয়ে গেছেন, শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে, লেজার বুকের হিসেব ঠিক রাখতে চশমা নিতে হয়েছে। তিলতিল করে দেহকে খরচ করেছেন তিনি, মনকে পরিণত করেছেন যন্ত্রে। সুদীর্ঘ আটত্রিশ বছরের অভ্যেস তাঁর ছাড়তে হবে একদিনে। এমনি সময় তাঁকে তাড়াহুড়ো করে নাকেমুখে গুঁজে ছুটতে হ'ত অফিসে। রবিবারেও ছুটি ছিল না তাঁর। অফিসের তাড়াতাড়া ফাইল বাড়ী নিয়ে আসতো চাপরাসী। সারাদিন কেটে যেত সেই কাজ শেষ করতে। ছুটি নিতে ইচ্ছে হয়নি কোনদিন। মনে হত সময় কাটবে না তাহলে। আর কি হবে ছুটি নিয়ে, প্রয়োজন নেই যখন। খুব বেশী দিন কখনো ছুটি নিয়েছেন বলে মনে হ'ল না তাঁর। আর অদ্ভুত ঘটনা, জীবনে অসুখবিসুখও হয়নি তেমন বড় রকমের। একেবারে নিয়মবাঁধা ছকে ফেলা জীবন কেটে গেছে।

সেই সতের বছর বয়সে চাকরীতে ঢুকেছিলেন সদানন্দবাবু। কলেজে ঢুকেই কলেজ ছাড়তে হ'ল। বাবার আকস্মিক মৃত্যুতে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। সংসারের ভার পড়লো তার ওপর। মা, তিনটি অবিবাহিত বোন, দুই ভাই স্কুলে পড়ে। দেশ ছেড়ে চলে এলেন শহরে, চাকরী করতে। তারপর গেছে সেই কষ্টের দিনগুলো। আধপেটা খাওয়া, তাও জোটেনা ভালো করে। থাকতেন এক জায়গায়—খেতে যেতে হ'ত মাইলখানেক দূরের মেশে। কেমন করে নিজের খরচ কমিয়ে বাড়ীতে মাঝে মাঝে দু'টো টাকা বেশী দেওয়া যায়, এই চিন্তায় ভালো করে ঘুমুতে পারেননি কতোরাত্রি। টিউশনি নিলেন। তবু প্রতি চিঠিতে মার চাওয়ার শেষ নেই। ঘর সারাতে হবে, বর্ষায় জল পড়ে, বোনের শাড়ী নেই, ভাইদের স্কুলের মাইনে বাকি, বই কিনতে হবে। তবু মুষড়ে পড়েননি তিনি। পেছু হটেননি। দুঃখকষ্ট সয়ে ওদের সকলের চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করেছেন। ভীরু তিনি কোনকালে নন, ভেঙ্গে পড়েন না দুঃখকষ্টে। সামর্থ্য না থাক, মনোবলের অভাব নেই কোনকালে।

ভাই দুটো ম্যাট্রিক পাশ করলো। হাঁফ ছাড়লেন

সদানন্দবাবু। তবু এতদূর করতে পেরেছেন। এখনো কাঁধের বোঝা নামেনি। তিনটি বোন। ঘুম হ'ত না কতোরাত্রে। ভেবে ভেবে আকুল হলেন। তবু দাঁড়াতেই হবে। আত্মীয়-স্বজনরা সবাই দূরে গেছেন বাবার মৃত্যুর পর, জ্ঞাতি সরিকরা মামলা সুরু করেছেন সম্পত্তি ভাগা-ভাগি নিয়ে। কিছুদিনের ছুটি নিয়ে তিনি বাড়ী গেলেন। পরম ভাগ্য বলতে হবে। যোগাযোগ ঘটে গেল। এক বোনের বিয়ে দিলেন ছোটবেলার বন্ধুর সঙ্গে। একটা বোঝা কমলো।

ইতিমধ্যে উঠতে বসতে মা ঘ্যানর ঘ্যানর সুরু করেছেন, এবার ঘরে বৌ আনতে হয়। কত করে বোঝালেন তিনি, এখন উপায় নেই কোন, যা আয়, এতেই চলে না, আবার পরের মেয়ে এনে কষ্ট দেব কেন? সময় তো আছেই। আগেই শ্যামানন্দ, প্রাণানন্দ মানুষ হোক। চোখের জল ফেলে মা বাধ্য হয়ে রাজী হলেন কিছুদিন অপেক্ষা করতে।

ভাইদের পড়াবার ইচ্ছে থাকলেও পেরে উঠলেন না সদানন্দবাবু। সামর্থ্যে কুলোলো না। ধরে করে দুজনেরই কাজ জুটিয়ে দিলেন। অল্পবয়সে তাদের কাঁধেও সংসারের জোয়াল পড়লো।

এবার কাঁধের বোঝা হালকা হ'ল কিছুটা। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এখন তিনজনের উপার্জ্জন। সংসারের শ্রী ফিরলো ক্রমশঃ, স্বচ্ছলতা এলো। অল্পদিনের মধ্যেই তিন ভাই ও বড় ভগ্নিপতি মিলে দু'বোনের বিয়ে দিলেন। হাসি ফুটলো মায়ের মুখে। ভগবান আবার মুখ তুলে চেয়েছেন!

মা এবার নাছোড়বান্দা। আর কোন ওজর আপত্তি টিকলো না সদানন্দবাবুর। সেবারই পূজোর ছুটিতে বাড়ী গিয়ে ছুটি বাড়াতে হ'ল। মা দেখেশুনে প্রায় ঠিক করে রেখেছিলেন, শুধু ওঁর মতের অপেক্ষা করছিলেন। সুজাতা দেবী বধূ রূপে এলেন তাদের সংসারে। সে আজ কতদিনের কথা!

দুফোঁটা চোখের জল এসে কখন তার গালের ওপর স্থির হয়েছিল বুঝতে পারেননি সদানন্দবাবু। ছায়াছবির মত অতীতের ছবি আসছে, যাচ্ছে। একের পর এক।

সুজাতা দেবীর পায়ের শব্দ পেয়ে চোখের জল মুছে ফেললেন দ্রুত হাতে। মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললেন—কি গো রান্না হ'ল? চিরদিনকার অভ্যেস, নটার আগেই পেটে টান ধ'রে। এত তাড়াতাড়ি ক্ষিদে পাবার কথা নয়।

—ওমা সেকি কথা। অবাক হলেন সুজাতা দেবী।—কখন হয়ে গেছে রান্না। আমি বসে আছি তোমার চান করবার অপেক্ষায়। কাগজ পড়া আর শেষই হয়না। সব মুখস্থ করে ফেলবে নাকি? ওঠো, এগারোটা বেজে গেছে যে।

রীতিমত চমকে উঠলেন সদানন্দবাবু। সে কি গো! এগারোটা এরি মধ্যে বেজে গেল? এত বেলা হয়েচে তা তুমি যে বড় ডাকোনি। দেখো দেখি, তোমার নিশ্চয় ক্ষিদে পেয়ে গেছে। অভ্যেস তো! ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সদানন্দবাবু।

—যাও, আমার ক্ষিদে পাবে কেন? চান করে নাও তাড়াতাড়ি। বেশী বেলায় খেলে পিত্তি পড়বে। সলজ্জ হাসি ফুটিয়ে ভেতরে চলে গেলেন তিনি।

আবার আনমনা হয়ে পড়লেন সদানন্দবাবু। অন্যদিন এই সময় ঘাড় গুঁজে থাকেন কাগজের স্তূপে। মনে থাকে না ঘর বাড়ী, কোন কিছুর কথা, এমনকি সুজাতা দেবীর কথাও ভুলে যান। আজকের দিনটির সঙ্গে কত তফাৎ। নতুন, একেবারে অনভ্যস্ত জীবন। তবু আজ থেকে এই নতুন জীবনকে মেনে নিতে হবে, খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এই পঞ্চান্ন বছর বয়সে নতুন করে নতুন অভ্যেস সুরু করতে হবে। চুপচাপ, কর্ম্মহীন বসে থাকতে হবে। বাত ধরে না যায়! এভাবে কেমন করে দিন কাটাবেন? এভাবে থাকলে তো তিনি আরো বেশী বুড়ো হয়ে যাবেন অল্পদিনেই। এবার জোর করে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন তিনি। ভেতরে গেলেন।

—দাও তেল দাও—চান করে নিই। বড় দেরী হয়ে গেল।

—যাও, সব গুছিয়ে রেখেছি। দেরী কোরো না যেন।

দেখলেন সদানন্দবাবু, ইতিমধ্যেই স্নান করে নিয়েছেন সুজাতা দেবী। লালপেড়ে শাড়ী পরেছেন, চওড়া করে সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছেন।

—আর ভাখো, দুজনেরই ভাত বেড়ো। একসঙ্গে খেয়ে নিই।

একেই দেরী করে ফেলিছি। ব্যস্তভাবে কলঘরে চলে গেলেন তিনি।

দুপুর আর কাটতে চায় না। এত লম্বা দুপুর। এটা কাটানোই সবচেয়ে কষ্টকর। আর এই মস্ত দুপুরটা হুহু করে কেটে যেত। দ্রুত হাত চলতো তার। পাঁচটা বেজে গেলেও কাজ শেষ হ'তে চাইত না। দেরী হয়ে যেত বাড়ী ফিরতে। আগে তবু তাস খেলার সখ ছিল, তাড়াতাড়ি ফেরবার তাড়া ছিল। বহুদিন ছেড়ে দিয়েছেন তাস খেলা। বাড়ী ফিরতে দেরী হ'ত, একা একা না খেয়ে বসে থাকতেন সুজাতা দেবী। মুখে বলতেন না কিছু, তবু বুঝতেন সদানন্দবাবু, ওর কষ্ট হয়। তাস খেলা ছাড়লেন। আর ছিল থিয়েটারের নেশা। অনেকদিন পর্য্যন্ত করেছেন। তারপর তাও ছেড়ে দিয়েছেন। মনে হয়েছে তিনি আনন্দ করছেন, স্ফূর্ত্তি করছেন, ওদিকে সুজাতা দেবী একা একা তার পথ চেয়ে বসে আছেন। সেই থেকে সন্ধ্যের পর আর তিনি বাইরে থাকেন না।

কখনো বলতেন সুজাতা দেবী—তুমি পড় বইটা, আমি শুনি। কিন্তু দুপাতার বেশী পড়া হ'ত না। বই বন্ধ করে গল্প সুরু করতেন সদানন্দবাবু। তারপর খাওয়া দাওয়া সারতে দশটা। এবার ঘুমোবার পালা।

সামান্য কেরাণীর চাকরীতে ঢুকেছিলেন তিনি এই অফিসে, সেই কতদিন আগে। অফিস বদল করেননি জীবনে। প্রয়োজন হয়নি। ধীরে ধীরে চাকরীতে উন্নতি করেছেন। কোম্পানীর অফিস। বড়সাহেব, ছোট-সাহেব তাঁর কাজে খুসী। নিজেরাই তাকে ধাপে ধাপে উঠিয়ে দিয়েছেন। আজ তিনি অবসর গ্রহণ করলেন একেবারে চীফ-ক্লার্কের কাজ থেকে। কত বড় দায়িত্ব ছিল তার কাঁধে। আজ থেকে তিনি ভারমুক্ত। সব বোঝা নামিয়ে দিয়ে এসেছেন। ফাঁকা, সব ফাঁকা, চারিদিকে কেমন শূন্য মনে হচ্ছে।

তাঁর আমলেই অফিস সুরু। সেই প্রথম থেকে তিনি আছেন। কত সাহেব এসেছেন, গিয়েছেন—কিন্তু তিনি সেই এক এবং অদ্বিতীয়। কোম্পানীর বড়কর্ত্তারা তার ওপর বরাবরই প্রসন্ন ছিলেন। শেষদিন পর্য্যন্ত। তার সঙ্গে অফিসের, অফিসারদের, একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছলো।

ছোট অফিস থেকে আজ এত বড় অফিস হয়ে উঠেছে। দু তিনটি জেলায় শাখা গড়ে উঠেছে। তিনি দেখলেন সব তার চোখের সামনে। শুধু একবার বললেই হয়ত আরো কিছুদিন কাজে থাকতে পারতেন তিনি। কিন্তু তা তিনি বলবেন কেন? কোনদিন অন্যায় অনুরোধ তিনি করেননি কাউকে।

দিবানিদ্রার অভ্যেস নেই কোনদিন। চোখ বুজে শুয়ে থাকতে পারলেন না বেশীক্ষণ। অসহ্য লাগে। উঠে পড়লেন তিনি। সুজাতা দেবী ঘুমিয়ে পড়েছেন। বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন তিনি। বারবার দীর্ঘশ্বাস পড়ছে তাঁর। আবার ছবি ভেসে উঠছে চোখের সামনে। দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে হয়েছিলো তাদের। হেসে উঠেছিল সংসার। কিন্তু সইল না কপালে। অল্পদিনের ব্যবধানে মারা গেল ছেলেদুটি কলেরায়। শোকের ছাড়া পড়লো সংসারে। কেমন হয়ে গেলেন সুজাতা দেবী। কাজ নিয়ে আরো ডুবে গেলেন সদানন্দবাবু।

অন্ধের নুড়ি মিনতি রইল শুধু। তার দিকেও তাকাতে পারেন না আর। হয়ত, কোন ফাঁকে ফাঁকি দিয়ে সরে পড়বে ওদের মত। বিশ্বাস নেই। কাঁদাতে আসে এরা। ওকে এড়িয়ে চলতে চান সদানন্দবাবু। কদিনের জন্যে মায়া বাড়িয়ে লাভ কি? তাকে নিয়ে নিষ্ঠুর বিধাতা পরীক্ষা করছেন। কী নির্ম্মম রসিকতা। হৃৎপিণ্ড ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তবু জোর করে মনকে সবল করতে চেষ্টা করেন তিনি। আর সুজাতা দেবী নীরবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন।

না, মিনতি ফাঁকি দিলো না। কোলেপিঠে করে মানুষ করলেন সুজাতা দেবী। বড় হ'ল মিনতি। সামান্য লেখাপড়া শেখালেন। তারপর দেখেশুনে বিয়ে দিলেন তার। কেউ আর কাছে রইল না। সুজাতা দেবী আবার একা। বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন, যাক পরের ঘরে, তবু বেঁচে থাক, সুখে থাক। এ বাড়ীতে রাখতে ভয় হয় বেশীদিন। হঠাৎ যদি ফাঁকি দিয়ে চলে যায়? তাই অল্প বয়সে বিয়ে দিলেন ওর। মাঝে মাঝে আসে মিনতি। ফুটফুটে দুটি ছেলে। অস্থির করে তোলে

রবাড়ী। বেশ লাগে যে কদিন থাকে ওরা। মনে মনে হাসলেন সদানন্দবাবু, মা আমার একেবারে গিন্নি হয়ে উঠেছে। কেমন সংসার করছে দু'টি ছেলেমেয়ে নিয়ে। আর বুদ্ধিও হয়েছে বেশ। একটা রামায়ণ, মহাভারত আর গীতা কিনে পাঠিয়েছে আমার পড়বার জন্যে। অবসর কাটাবার জন্যে।

কখন যে সুজাতা দেবী পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন বুঝতে পারেননি সদানন্দবাবু। তাঁর কথায় চমকে উঠলেন। কান্নাভেজা গলা সুজাতা দেবীর।

—ওগো কখন তুমি উঠে এসেছ? তুমি এরকম করে মন খারাপ করে থাকলে আমি কিভাবে থাকবো?

জোর করে হাসলেন সদানন্দবাবু। অপ্রস্তুত ভাব কাটাতে চাইলেন।

—না, না—মন খারাপ করবো কেন? ঘুম এলো না কিনা। অভ্যেস নেই তো। চলো, চা করো খাই। একটু বেশী উৎফুল্ল হবার চেষ্টা করলেন তিনি!

তবু তো কাটলো আজকের দিনটা। ভাবলেন সদানন্দবাবু, এমনি করেই কেটে যাবে। সব অভ্যেস হয়ে যাবে। তাছাড়া বিশ্রামের তো প্রয়োজন আছে জীবনে। এ দেহ তো যন্ত্রবিশেষ। আজ প্রথম, তাই হয়ত অসুবিধে হচ্ছে একটু বেশী।

আবার এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়। ভাগ্যিস বাড়াটা তৈরী করেছিলেন আগে। নইলে আরো বিশ্রী লাগতো, সব পোটলাপুটলি দিয়ে কোম্পানীর বাড়ী ছেড়ে আসতে। তারচেয়ে চাকরী থাকতে থাকতে নিজের এই ছোট্ট-বাড়ীতে উঠে আসতে ভালোই লেগেছিল। হাজার হোক নিজের বাড়ীতে। এই বেশ, মনকে প্রবোধ দিলেন সদানন্দবাবু। ঠিক কেটে যাবে সময়। এতদিন কাজ করেছি, এবার বিশ্রাম প্রয়োজন। তাছাড়া নতুনকে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে তো! তাদের দিন ফুরিয়ে আসছে, আর নতুনদের জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আর গ্রাচুয়িটির টাকা পেয়ে যাবেন কিছুদিনের মধ্যেই। তাদের দু'টি পেট চলে যাবে ঠিক। ছেলে না, মেয়ের বিয়েও বাকি নেই। তবে আর ভাবনা কিসের। বছরখানেকের পরে দুটি ঘর ভাড়া দেবেন। সেভাবেই তৈরী করিয়েছেন। তবে এখন নয়। কিছুদিন নিরিবিলিতে বিশ্রাম করা যাক। উদাস চোখে চেয়ে রইলেন সদানন্দবাবু সামনের দিকে। সূর্য্য অস্ত গেছে, এখন গোধূলির ধূসর ছায়া পড়েছে আকাশে-মাটিতে। সারাদিন বাইরে কাটিয়ে পাখীরা দলবেঁধে কিচির-মিচির শব্দে বাতাস মাতিয়ে নীড়ে ফিরছে। সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসছে পৃথিবীর বুকে, তার মায়াবী আঁচল বিছিয়ে দিতে।

অতিথি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শাস্ত্র বলে—ভালই বলে—
সর্ব্বদেবময় অতিথি,
অতিথ—রাঁথা পূর্ণিমা মোর—
বাসন্তী পঞ্চমী তিথি।
ভরে ভবন উৎসবে হে।
অবিশ্রান্ত আনন্দ যে।
তাদের হাসি ফোঁটায় গোলাপ,
প্রতি কথায় নূতন গীতি।

২

রঙিয়ে যায় ভুবন, ভবন—
যায় চলে যায় উল্লাসেতে—
আল্‌তা দুধের ঢেউ খেলে যায়
সাগর হাওয়ার পরশ এতে।
সকল দেশ ও সকল জাতি—
আত্মীয় ও তাদের জ্ঞাতি,
সারা পথই ফুলের বাগান—
বসন্ত যায় সঙ্গে নিতি।

৩

জানেনাক—ক্লান্তি, জরা—
হেমন্ত নাই তাদের ক্ষেতে।
অকুন্ঠিত জীবন ধারা
তাদের প্রাণের সে উৎসেতে।
নয় অচেনা দেবতাদের,
দর্শনে হয় পুণ্য যে ঢের,
ধরার ধুলা হয় মধুময়—
সরস যে হয় উষর ক্ষিতি।

পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সম্প্রতি শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত সম্পাদিত পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল নামক গ্রন্থখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার মূল্য বার টাকা।

প্রথমে সম্পাদক ১৪ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা লিখিয়াছেন। তাহার পর এক পৃষ্ঠা গ্রন্থপঞ্জী, দুই পৃষ্ঠা কথাবস্তু ও আলোচনার সূচিপত্র এবং তাহার পর ১৬৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী কথাবস্তু ও আলোচনা। ৩ পৃষ্ঠা কৃষ্ণমঙ্গলের সূচীপত্রের পর ৫৩২ পৃষ্ঠা ব্যাপী মূল ও টীকা সহ কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য—।

সম্পাদক মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

মধ্যযুগে বাংলাদেশে কৃষ্ণ, শিব, চণ্ডী, মনসা ও ধর্ম ঠাকুর—প্রধানতঃ এই কয়জন দেবদেবীকে কেন্দ্র করিয়া অনেকগুলি মঙ্গলকাব্য লেখা হইয়াছিল। এই সকল কাব্য লোকে ভক্তি করিয়া পাঠ করিত এবং গায়কেরা বিভিন্ন রাগ-রাগিণীতে গান করিয়া এই দেব-দেবীর মাহাত্ম্য লোক সমাজে প্রচার করিত। এইরূপে কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করিয়া যতগুলি কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছিল, কবি পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল তাহাদের অন্যতম। আরও বিভিন্ন কবির প্রায় ২৫ খানি কৃষ্ণমঙ্গলের পরিচয় অদ্যাবধি জানা গিয়াছে—তাহার মধ্যে অন্ততঃ ৭।৮ খানি ইতি-পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য কৃষ্ণমঙ্গলের তুলনায় পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল নিকৃষ্ট নয়—বরং অধিকাংশগুলির চেয়ে ইহার কবিত্ব অনেক বেশী সরস ও প্রাণবন্ত।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়ের প্রথম ভাগে (১৯১৪-৮৯৭-৯০৭ পৃষ্ঠা) এই রচনার খানিকটা অংশ ছাপিয়া-ছেন। দীনেশবাবুর অনুমানে পরশুরাম সপ্তদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন—কিন্তু এই অনুমানের কারণ তিনি ব্যক্ত করেন নাই।

আমার দুই পুঁথি। একখানি আমার বহরমপুরের বাড়ীতে ছিল—এখানি সম্পূর্ণ। তাহার নকলের তারিখ ১২১৫ সাল। অপর পুঁথি-খানি আমার সংগৃহীত—ইহা শেষের দিকে ১৭৩ পৃষ্ঠায় আসিয়া খণ্ডিত। দুই পুঁথিতেই লিপিকরেরা বানানের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়াছেন।

পরশুরাম সমগ্র ভাগবত পুরাণের, অথবা উহার কেবলমাত্র দশম স্কন্দের ও অনুবাদ করেন নাই। গ্রন্থারম্ভে বন্দনার পর ভাগবতের প্রথম স্কন্দের শেষ দুই (১৭-১৯) অধ্যায় অবলম্বনে পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ ও শুকদেবের ভাগবত কীর্তনের কথা বিবৃত করিয়া তিনি চতুর্থ স্কন্দ (৮-১২ অধ্যায়) অনুসারে ধ্রুব চরিত্র, ষষ্ঠ স্কন্দ (১।২ অধ্যায়) হইতে কান্তকুব্জের অজামিল নামক উচ্ছৃঙ্খল ব্রাহ্মণের বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তির প্রসঙ্গ, সপ্তম স্কন্ধ (১০) অনুসারে প্রহ্লাদ চরিত্র, অষ্টম স্কন্ধ (২।৪) হইতে গজেন্দ্রের মুক্তি কাহিনী এবং নবম স্কন্ধ হইতে পাঁচটি বিবিধ উপাখ্যান প্রসঙ্গ—এই পাঁচটি স্কন্ধ হইতে পাঁচটি বিভিন্ন উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া দশম স্কন্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। দশম স্কন্ধে ও কবি ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই। মোটামুটিভাবে ভাগবতকে উপজীব্য করিয়া কৃষ্ণচরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন।

দাশগুপ্ত মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন—"দুঃখের বিষয় পরশুরামের ব্যক্তিগত বিশেষ কোন পরিচয়ই সংগ্রহ করিতে পারি নাই।" তাঁহার লেখা বিচার করিয়া বলা হইয়াছে—পরশুরাম ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে বা সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কবির উপাধি ছিল চক্রবর্তী। তাঁহার বাড়ী কোথায় ছিল, তাহা সঠিক জানা যায় না।

কৃষ্ণচরিত্রের প্রাথমিক রূপ দেখা যায় মহাভারতে ; কিন্তু মহাভারতে যে কৃষ্ণচরিত আছে তাহা ক্ষত্রিয় বাসুদেব—কৃষ্ণের ইতিহাস ও সেই ইতিহাস প্রধানতঃ কুরু পাণ্ডবদের ইতিহাসের সহিত ও বিশেষতঃ কুরুক্ষেত্র ভারত-যুদ্ধের সহিত সংশ্লিষ্ট। কৃষ্ণের বাল্যচরিত সম্বন্ধে বিবরণ প্রথম রচিত হয় হরিবংশে ; হরিবংশ ছাড়া ব্রহ্ম, মৎস্য, অগ্নি, বায়ু, বিষ্ণু, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত ও পদ্মপুরাণে কৃষ্ণের বাল্যলীলার উল্লেখ আছে। পুরাণগুলির রচনা কাল খৃষ্টপূর্ব কয়েক শতাব্দী আগে হইতে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে। প্রায় আট শতাব্দী ধরিয়া কৃষ্ণচরিত লেখা হইয়াছে। খৃষ্টজন্মের ২।৩ শতাব্দী পূর্বে মহাকবি ভাস কৃষ্ণের বাল্যজীবন লইয়া 'বালচরিত' নাটক লিখিয়াছিলেন। খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে লিখিত ভাগবত পুরাণই কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে অতি উল্লেখযোগ্য রচনা। ভাগবত দক্ষিণ-ভারতে লিখিত এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে বোধ হয় তাহা উত্তর-ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বিষ্ণুপুরাণ অনুসরণ করিয়া লিখিত—তিনি ভাগবত দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মালাধর বসু ভাগবত পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

পরশুরামের এই কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া পুতনা বধ, তৃণাবর্ত বধ, যমলার্জ্জুনভঙ্গ, বৃন্দাবন যাত্রা, বৎস, বক ও অঘাসুর বধ, ধেনুক বধ, কালীয় দমন, গোপীগণের বস্ত্রহরণ, রাসলীলা, দোললীলা, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, কংসবধ, কৃষ্ণ ও বলরামের শিক্ষা, রুক্মিণীহরণ, স্যমন্তক মণিহরণ, শ্রীকৃষ্ণের মহিষী হরণ, নরকাসুর বধ, পারিজাত হরণ, উষাহরণ প্রভৃতির পর—মৃগরাজার উপাখ্যান, শিশুপাল বধ, শ্রীদাম উপাখ্যান, বৃকাসুর বধ, কৃষ্ণের লীলাবসান প্রভৃতি বর্ণিত আছে। নলিনীবাবু 'কথাবস্তু ও আলোচনা'র মধ্যে সকল ঘটনার বিবরণ প্রদান করিয়াছেন—

দোললীলা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—ভাগবতে দোললীলা, দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড নাই। পদকর্তাগণ এই সকল বিষয়ে পালা গান রচনা করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেন। পরশুরাম ব্যতীত ভাগবতের অন্য কোন অনুবাদক এ সকল বিষয় লেখেন নাই। পরশুরাম দোললীলা সম্বন্ধে ৩০ পৃষ্ঠাব্যাপী পালা গান লিখিয়া গিয়াছেন। পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ ও গরুড় পুরাণে কৃষ্ণের দোলায় আরোহণের কথা আছে—তাহা লইয়াই পদকর্তারা পদ রচনা করিয়াছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলাদেশে দোল উৎসব ছিল না। ক্রমে ইহার প্রবর্তন হয় ও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা বর্তমানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড ভাগবতে নাই—বড়ু চণ্ডীদাসই ঐ দুই পালার লেখক। ষোড়শ শতাব্দীতে সনাতন গোস্বামীর ভ্রাতা রূপ গোস্বামী দানকেলি-কৌমুদী নামক গ্রন্থে কৃষ্ণের দানলীলার রূপ দিয়াছেন। চণ্ডীদাসের দানখণ্ড দেশের উপর এতই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে একদা নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার শিষ্য গদাধরের বাড়ীতে দানলীলার অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে অদ্বৈত প্রভু কৃষ্ণ, চৈতন্যদেব রাধিকা ও নিত্যানন্দ বড়াইবুড়ী সাজিয়াছিলেন।

বিরাট কাব্যখানির সকল ঘটনা লেখার স্থানও নাই, তাহা সম্ভব ও নহে। পরশুরাম তাঁহার কৃষ্ণমঙ্গলের বহু উপাখ্যান বর্ণনায় মুখ্যতঃ ভাগবতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। নৃগোপাখ্যান, বলদেবের যমুনা-কর্ষণ, জরাসন্ধবধ, শিশুপালবধ, শাল্ববধ, শ্রীদাম উপাখ্যান, বৃকাসুর বধ ও ভৃগুমুণি কর্তৃক তিন দেবতার মধ্যে কৃষ্ণের প্রাধান্য পরীক্ষা দিয়া কৃষ্ণমঙ্গল শেষ করা হইয়াছে। ভাগবতের দশমস্কন্ধের বহু উপাখ্যান বর্ণনা না করিয়া পরশুরাম মাত্র কেন ঐ কয়টি উপাখ্যান কৃষ্ণমঙ্গলে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কারণ বুঝা যায় না।

২।৪টি উপাখ্যান নিম্নে দেওয়া হইল।

নৃগরাজার উপাখ্যানের কথাবস্তু এই—একদা কোন এক ব্রাহ্মণের গাভী নৃগনামে ইক্ষ্বাকুবংশস্থ রাজার গোধনের মধ্যে মিশিয়া যায়। নৃগ না জানিয়া তাহা আর এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়া দেন। তারপর গাভীর প্রকৃত অধিকারীর সহিত ঐ ব্রাহ্মণের বিবাদ লাগিয়া যায়। নৃগরাজা তাঁদের উভয়ের যে কোন একজনকেই ঐ গাভীটির পরিবর্তে অপর একলক্ষ উৎকৃষ্ট গাভী গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কেহই রাজী হইলেন না। গাভীটি রাজারই রহিয়া গেল। ফলে, ধার্মিক ও দানশীল হইলেও ব্রহ্মস্ব-অপহরণের অপরাধে যমের বিচারে নৃগরাজা একজন্মের জন্য একটি কৃকলাস হইয়া এক কূপের মধ্যে পড়িয়া রহিলেন। পরে দৈবক্রমে কৃষ্ণ ঐ কৃকলাসকে কূপ হইতে উদ্ধার করিলেন এবং কৃষ্ণের নিকটে নিজের পরিচয় দিয়া ও কৃষ্ণের স্তব করিয়া পাপক্ষয়ান্তে নৃগরাজা সকলের সমক্ষে বিমানে চড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণ তখন যদুকুমারগণকে, জানিয়া হোক, না জানিয়া হোক, ব্রহ্মস্ব অপহরণের বিষম ফল সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া উপদেশ দান করিলেন।

বলরামের যমুনাকর্ষণ উপাখ্যানটি ও কল্পনায় এক আঢ্য বিলাস। অনেকদিন পরে বলদেব গেলেন নন্দের গোকুলে। একদিন গোপীগণে পরিবৃত হইয়া তিনি গেলেন যমুনার এক উপবনে বিহার করিতে। সেখানে প্রচুর বারুণি মদ পান করিয়া মত্ত হইলেন ও গোপীদের সহিত জলক্রীড়া করিবার বাসনায় যমুনা নদীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, যমুনা তুমি ফির, স্রোত পরিবর্তন করিয়া উজান বহিয়া যাও, আমি জলক্রীড়া করিব। যমুনা শুনিল না, দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলরাম লাঙ্গলাগ্র দিয়া শতখণ্ড করিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে যমুনাকে টান দিলেন। ভীতা যমুনা মূর্তি গ্রহণ করিয়া আসিয়া বলদেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, বলদেব তখন স্ত্রীগণকে লইয়া যমুনার জল বিহার করিলেন।

এই সকল উপাখ্যান ভাগবত-পাঠ, কথকতা, যাত্রা প্রভৃতির মাধ্যমে সে যুগে সর্বজনবিদিত ছিল। পরশুরাম সেগুলি তাঁহার কাব্যে বর্ণনা করিয়া কৃষ্ণমঙ্গল রচনা করিয়া গিয়াছেন। মঙ্গলকাব্যের পাঠ ও আলোচনার ফলে ভাগবত-কথা ও প্রচারিত হইয়াছিল।

শিশুপালবধ কাহিনী সর্বজনপরিচিত। কৃষ্ণমঙ্গলে তাহাও স্থান পাইয়াছে। কাহিনী এইরূপ—

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে সমবেত সকল রাজারও অন্যান্য ব্যক্তিগণের মতে ও অনুমোদনে যুধিষ্ঠির সর্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের এই সম্মান চেদিরাজ শিশুপালের সহ্য হইল না—তিনি আসন হইতে উঠিয়া সক্রোধে কৃষ্ণকে কটু কথা বলিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর কৃষ্ণ চক্র দিয়া তাঁহার মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন।

শ্রীদাম উপাখ্যানে কি করিয়া শ্রীদাম নামে এক বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ও শ্রীকৃষ্ণের সতীর্থ চিরদারিদ্র্যে প্রপীড়িত হইয়া তাঁহার সাধ্বী পত্নীর অনুরোধে দ্বারকায় কৃষ্ণের কাছে ধন প্রার্থনা করিতে গেলেন এবং কৃষ্ণ তাঁহাকে প্রচুরভাবে অভ্যর্থনা করিলেও তিনি লজ্জায় কিছুই না চাহিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গিয়া আশ্চর্যরূপে অপরিমিত সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। ঐ যাবতীয় ধনরত্ন, প্রাসাদ, উদ্যান, দাস, দাসী সমস্তই যে কৃষ্ণের করুণার দান, তাহা বুঝিতে ব্রাহ্মণের বিলম্ব হইল না।

একটি উপাখ্যানে ভৃগুমুণি কর্তৃক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবের মধ্যে প্রাধান্য পরীক্ষায় বিষ্ণুরই জয় ঘোষিত হইয়াছে। একদা সরস্বতীর তীরে যজ্ঞ করিতে করিতে ঋষিদের মনে এই বিতর্ক উপস্থিত হইল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে কোন্ দেব মহান্। ইহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া ব্রহ্মার পুত্র ভৃগুমুণি প্রথমে ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ব্রহ্মাকে প্রণাম বা স্তব কিছুই করিলেন না। তাহাতে ব্রহ্মা বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু পুত্রকে কোন শাস্তি দিলেন না। তারপর ভৃগু গেলেন কৈলাসে শিবের নিকটে এবং শিবকে উন্মার্গগামী বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন। কুপিত শিব আরক্ত নয়নে শূল উদ্যত করিয়া ভৃগুকে বধ করিতে গেলেন, পার্বতী ব্রহ্মহত্যার পাতকের ভয় দেখাইয়া স্বামীকে নিবৃত্ত করিলেন। তারপর

ভৃগু গেলেন বৈকুণ্ঠে। কৃষ্ণ সেখানে সুখে শয়ন করিয়াছিলেন, ভৃগু গিয়া তাঁহার বুকে পদাঘাত করিলেন। ইহাতে কৃষ্ণ শয্যা হইতে উঠিয়া মস্তক দিয়া মুনিকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মণ, আপনি আসিয়াছেন আমি তাহা আগে জানিতে পারি নাই, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। ক্ষণকাল এই আসনে বসুন। তীর্থ সমূহের রজে আপনার পদ পবিত্র, আপনি পাদোদক দিয়া আমাকে ও আমার অনুগত সকলকে ধন্য করুন। আপনার পাদপ্রহার চিহ্ন আমার বুকে বিভূতিরূপে বিরাজ করিবে। কৃষ্ণের কথা শুনিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ ভৃগু সরস্বতীর তীরে ফিরিয়া গিয়া ঋষিদের সকল সমাচার কহিলেন। শুনিয়া তাঁহারা সকলকে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইলেন।

ইহার পর পরশুরাম বলেন, এইভাবে নানা ঘটনা উপলক্ষ করিয়া বলরামের সহিত কৃষ্ণ পৃথিবীর ভার ক্ষয় করিলেন। তখন নিজের যাদবকুল অসহনীয় বোধ হইলে, কৃষ্ণ শাপ-ছলে উদ্ধত ও দুর্বিনীত যাদবদের নিজেদের মধ্যে কলহ উৎপাদন করাইয়া তাহাদের ধ্বংস করিলেন। তারপর লীলাবসানে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ধামে চলিয়া গেলেন।

অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই কৃষ্ণমঙ্গল পাঠ করিলে সে সময়ের সমাজ ব্যবস্থা ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বহু তথ্য জানিতে পারিবেন। এই ভাবে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মধ্যে আমাদের দেশের ইতিহাস রক্ষিত আছে। ১২১৫ সনে অর্থাৎ আজ হইতে দেড়শত বৎসর পূর্বে ইহা লিখিত—লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—তাঁহার লেখার মধ্যে বহু ভুল ভ্রান্তি আছে—তবে তিনি 'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম' লিখিয়া নিজেকে ছোট করেন নাই। তখন ও ছাপাখানা হয় নাই—কাজেই হাতে লিখিয়া নকল করার প্রথা ছিল—পরশুরাম যে সুবৃহৎ কাব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা এইভাবেই রক্ষা পাইয়াছে।

বহ্নি-যৌবন

শ্রীতারকপ্রসাদ ঘোষ

হে চির অতৃপ্ত দাহ, দহনের হোম-হুতাশন,
আমার এ মনঃকুণ্ডে পেয়েছ কী হব্য-পরশন,
দুর্ব্বার হে জলন্ত পাবক ?
ক্ষমাহীন শাসনের অনুপম দণ্ড তাই তব
কী অমোঘ মর্ম্মবাণী বহিয়াছে নিত্য নব নব,
বুভুক্ষুর ক্ষুধা ধক্-ধক্—
আমি জ্বলি—বিশ্ব জ্বলে—দুর্নিবার বেদনার-তলে
বুকে নিয়ে' বহ্নির-পাহাড়
যুগ হ'তে যুগান্তর—অবিচ্ছেদ—পল হ'তে পলে
চৌদিকে ছড়ায়ে সেই দগ্ধতার দীর্ণ হাহাকার !
হে বহ্নি, বাসর তব কবে যেন রচিলে উল্লাসে
দিগন্তের কোল হ'তে বিদ্যুৎচ্ছুরিত নীলাকাশে
আলোড়িয়া সে পরিমণ্ডল—
সে-দিনেও পাও নাই তব প্রিয়া স্বপনের রাণী,
বিদ্রোহ-বাসনা তাই হৃদিমূলে করে কানাকানি
বজ্রের-উত্তাপে অনর্গল—
অযুত অসংখ্য তাপ অনুতাপে মিশে অনুখন্
কী আশ্চর্য্য জ্বালায় জ্বালায়,
নিষিক্ত নির্য্যাস যার আমাতেও জাগায় কম্পন,
রুদ্ররোষে শুষি যবে সেই রস মরুর-তৃষায় !

হে অনল, চিরোন্মাদ, নশ্বরের লীলাভূমি 'পরে
নির্ম্মম পদাঙ্ক তব রেখাঙ্কিত যবে থরে থরে
ভস্মের বিদ্রূপ তুলিকায়,
সর্ব্ব-শেষ অবসান, সুনিশ্চিত মুস্কিল-আশান,
এ-মর্ত্ত্যের যত জাল-জঞ্জালের উড্ডীন নিশান
মুহূর্ত্তের ইঙ্গিত-লীলায়,
তবুও সে-জিহ্বা তব গ্রাসিতে পারেনি কোনোদিন
কামনার কণ্টকের-দাগ,
যে-কাঁটা আগুনে পুড়ে' চিরন্তন হয় মৃত্যুহীন—
কার্ম্মুকে কুসুম-শর—দেহ-পর্ণে পীরিতির-ফাগ্ !
আমার সর্ব্বাঙ্গে সেই সঘন নিঃশ্বাস তব নাচে,
নাচে কী শাণিত মসৃণ শিখা ; প্রাণের-কানাচে
বাজায় কী গুরু তূর্য্যনাদ—
আতপ উদ্গার ওঠে বক্ষ ঠেলি' উলঙ্গ আক্রোশে,
দিশাহারা চিত্ত মোর উল্কা ছুটে আবেগের-বশে,
খুঁজে কোন্ অনন্ত আহ্লাদ
যা' হ'তে বঞ্চিত তুমি ক্ষিপ্ত হে, আরক্ত অনল,
অভিগ্রস্ত তিক্ত রিক্ততায়,
আমি চাই সেই তাপ-সন্তারের তীব্র হলাহল
উচ্ছৃঙ্খল ধমনীতে আয়ুষ্মতী সৃষ্টির আশায় !

(পূর্বানুবৃত্তি)

অনন্তনাগে অতিকষ্টে একটা হোটেল পেঁয়ে দিব্যি চা, ডিম, রুটী খেয়ে নেওয়া 'গেল। অসিত দয়া করে ব্যবস্থা করলে তাই। তারপরেই অসিতের দেওয়া পান। সুতরাং গাড়ী ছাড়লো যখন, তখন যেন নতুন হয়ে গেছি। এবার ৪ মাইল পরে গাড়ী এসে থামলো অচ্ছাবল। চমৎকার জায়গা। লোকে লোকারণ্য; বিরাট ভীড়। অচ্ছাবলে মেলা বসেছে। বাৎসরিক মেলা। মনে মনে ইচ্ছা ছিল এখানকার একটা মেলা দেখি। অন্য কোথাও কি হয় জানা নেই, ভারতবর্ষে মেলা একটা প্রাতিষ্ঠানিক জনারণ্য। বিরাট জনসমাজের একটা আড়াআড়ি টুকরো, যার ভেতর থেকে ভাল করে চাইলে জীবন-নাট্যের অনেকখানি দেখা যায়।

এখানে দেখলাম বোরখা-পরা মেয়ের দল কাতারে কাতারে, সঙ্গে পাহাড়ীয়া, গ্রাম্য, অন্ত্যোবাসী মুসলমান শ্রমিক, চাষী, জোলার দল। মস্ত বড় বড় মাটীর জালায় ভাত। সামনে মাটীর সানকী কুড়ি বাইশ খানা করে রাখা! এক একজন যাচ্ছে এক আনা থেকে দু'আনা দিচ্ছে। একটা সানকীতে কিছু ভাত তুলে দিল, অন্য জালা থেকে মাখন তুলে নেওয়া দইয়ের চাঁছ দুহাতা দিয়ে এক খাবলা নুন মিশিয়ে দিল, আর দিল সানকী ভরে জল। উবু হয়ে বসে শেষ দানা অবধি ভাত কটি খেয়ে ঝরণার জলে সানকী ধুয়ে সানকীটা রেখে দিল। এমনি শত শত নরনারী যুবা বৃদ্ধ বালক শিশু ঐ ভাত খাচ্ছে। ঐ ওদের মেলার খাদ্য। একটু বর্দ্ধিষ্ণু যারা তারা সঙ্গে করে খাবার এনেছে। গোল হয়ে বসে চিনারের ছায়ায় খাবার ভাগাভাগি করছে। মস্ত বড় বড় চর্বিতে সেঁকা রুটী, কয়েকটা পোড়া কাবাবের টুকরো, কিছু মুলো গাজর পেঁয়াজ, একটা আলুর ঘ্যাঁট মতো—এই নিয়ে বসে বসে খাচ্ছে বোরখার সামনের ঢাকা তুলে। মিটমিটে চোখে চাইছে। চোখে সুর্মা, ঠোঁট দুটো জর্দায় পানে কালচে লাল। মাথায় তৈলাক্ত সীঁথির মাঝে কাশ্মীরী পাথর বা পলা বসানো রূপার ঝুমকো, কাণ দুটো চেন্-যুক্ত ফুলের ভারে ছিঁড়ে পড়ছে যেন। স্তনের ওপরটায় ঢাকা কাপড়ে তো বটেই—তার ওপর রাশি রাশি পাথর, পলা, কাঁচ আর রূপোর

মেলায় মেয়েরা ভাত খাচ্ছে

ভীড়। ওরা আজ সেজে এসেছে। পুরুষরা বেশীর ভাগই লম্বা আলখাল্লা ঢাকা, মাথায় খুলি ঢাকা টুপী, পরণে পাজামা। বেশীর ভাগই কম্বল বেচতে এনেছে। সেই নতুন ভেড়িয়া-কম্বলের এক ধরণের গন্ধের সঙ্গে মিশেছে তেলে ভাজা তিলের বড়া, গুড় আর বেসনের বড়া, পোড়া মাংস, আর পকোড়া ভাজার গন্ধ। আর গন্ধ নোংরা কাপড়ের, ঘামের, আর মাথার তেলচিটে টুপীর। নানা গন্ধে মেশা যে গন্ধ—তাকে বলি

ভীড়ের গন্ধ, মেলার গন্ধ। কাপড়ের কানাত ঢাকা দোকানের সার; তাতে পুঁতি, মালা, আয়না, টিনের বাঁশী, চানামাটী আর কাঁচের মারবেল, তুলোভরা পুতুল, গিল্টির গহনা, গালার চুড়ি, রঙীণ ফিতে—এই সব! ধামা ধামা কাশ্মীরী বিস্কুট; অর্থাৎ আটার তালের সঙ্গে গুড় আর তিল মেশানো, পরে সেঁকা। কাঠের মতো শক্ত। কাশ্মীরী চায়ের সঙ্গে খায়। সবুজ শুকনো পাতা-চা ডালায় করে রাখা। তাই জলে সিদ্ধ করে দিয়ে দেয় এক খাবলা নুন। নাম—শী। সেই নুন-চায়ে ডুবিয়ে দেয় ঐ বিস্কুট। নরম করে খায়।

কাশ্মীরে নুন খাবার প্রচলন অত্যন্ত বেশী। কাশ্মীরী রান্না বলতে সমতলে আমরা যা বুঝি তা মোগলাই রীতির একটা সংস্করণ। আসল কাশ্মীরের যা রান্না, অর্থাৎ যে রান্নার খোলতাই পাবে ডুঙ্গার মধ্যে,

অচ্ছাবলের পথের ধারে

নদীর ধারে, জেলে পল্লীতে, কাঠুরেদের কুটীরে, চাষার গ্রামে—তার খোলতাই পাওয়া যাবে নুনে আর লঙ্কায়। একগাদা নুন আর লঙ্কা দিলে তবে রান্না হবে রসোত্তীর্ণ। কাশ্মীরে নুনের খাঁই অত্যন্ত বেশী। চিনি বড়লোকের খাদ্য। ওদের নুন। তিব্বতের পথেও দেখেছি নুনের খুব কদর। নুনের কদর কোথায় বা নেই, তা নয়। আপেক্ষিক ভাবে নুনের ব্যবহার কাশ্মীরে অত্যধিক। পরে কাশ্মীরীদের রান্না, বাজারের ব্যবসায়ী হোটেলে নয়, বাড়ীতে স্নেহের রান্না, বড়লোক-দের বাড়ী নয়, দরিদ্রের বাড়ী, খেয়ে এর পরিচয় পেয়েছি। আর কাশ্মীরী-খানা আসল যা, সেটা পুরোদস্তুর মোগলাই রীতির সুসংস্কৃত সংস্করণ। তা অতুলনীয়।

ভীড় ঠেলে চলেছি আচ্ছাবলের বাগানে। বসুনন্দের পুত্র নয়, নরের পুত্র অক্ষ এই অক্ষিবল নগর স্থাপন করেন। অচ্ছাবল কাশ্মীরের সর্ববৃহৎ প্রস্রবণ। এই প্রস্রবণের জল দিকে দিকে বইয়ে দেওয়া হয়েছে। অনন্ত নাগে এবং অচ্ছাবলে বাড়ীর মধ্য দিয়ে প্রস্রবণের জল বইছে। সেই জলই বাড়ীর সব নোংরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাইরে দিয়ে যে জল বইছে সেই জল সকলে পানীয় ভাবে ব্যবহার করে। অচ্ছাবলের প্রসিদ্ধ বাগিচা নুরজাহানের তৈরী। কয়েকতলা বাগান। শেষ তলাটা নেই। চমৎকার কাঠের কালো গেট। এটা বেশী দিনের নয়। রাজা রণবীর সিংজী করিয়েছেন। ভিতরে প্রকাণ্ড হামাম—নাইবার ঘর, বারাদরী। এসব হামামে বাদশা জাহাঙ্গীর নুরজাহানকে নিয়ে রম্য বিলাসে মগ্ন ছিলেন। রাজার ঐশ্বর্য্যময় সভা বসেছে চাঁদনী-রাতে। বাইরে সেদিনও এই দরিদ্র জনতার ভাড় লাগতো, বলতো "বাদশা জাহাঙ্গীরের জয় হোক।" জনতার এই জয়ধ্বনি উদর থেকে বেরোয়, আশার লোভে, প্রাণ থেকে বেরোয় না, প্রাপ্তির আনন্দে। সেদিনকার মহাবদান্য রাজাও বুঝতে দেননি যে রাজত্ব না থাকলেই প্রজাদের কল্যাণ: রাজতন্ত্র থাকাই প্রজাদের অকল্যাণ।

হঠাৎ দেখি সামনে দিয়ে ওরা বোধহয় তিনটী বোন যাচ্ছে। বড়টি আঠারো, ছোটোটি বছর ছয়। অপরূপ সুন্দরী মেয়ে। কাপড় চোপড় নোংরা হলেও তুলে রাখা সজ্জা; আজ পরে এসেছে। রংয়ের খুশী লেগেছে মনে। গলা আর গা ভরতি পুঁথি-পাথর-আঁটা গহনার স্তুপ। আমার ইচ্ছা হোলো এই হাসিভরা মুখখানার ছবি নিই। একজন বৃদ্ধকে বোঝালাম। সে তো কোনও মতে দাঁড় করালো মেয়েটাকে। ছবি তুলবো। অত ভীড়ের মধ্যেও ভয় পেয়ে গেলো মেয়েটা। হঠাৎ কেঁদে ফেললো। ছবি নেওয়া হোলোনা। অবশেষে বৃদ্ধকে বলি ওরা তিনবোনে দাঁড়াক। বৃদ্ধ বল্লেন,—"না, তা হতে পারে না। ঐ বড় মেয়ের ছবি ও তোমায় তুলতে দিয়েছে জানতে পেলে ওর অভিভাবকরা তো ওকে মারবেই, তোমার যন্ত্রটিও (ক্যামেরা) আস্ত থাকবে না।"

আমি আর বৃদ্ধ চলতে লাগলাম। অসিত আর বেণু হারিয়ে গেছে। দল তো ভীড়ে কে কোথায় মিশেছে তার আর পাত্তা নেই। বাগানের ওপরতলা থেকে ভীড়টা এখন স্পষ্ট। ফোটো অসিত নেবেই। কে এক তরুণী গাছের তলায় শাশুড়ী ননদী ব্যূহ পরিবৃত হয়ে সন্তানকে স্তন্য দিচ্ছে। অসিত নেবে শটটা; হঠাৎ মেয়েটী হেসে পিছন ফিরে বসলো। অসিত বল্লে,—"খেলে যা। এদিক নেই ওদিক আছে। নেবোই এসব অসূর্য্যম্পশ্যাদের ছবি।" সেই ও চলে গেল। আমি তো গা-ঢাকা দিয়ে থাকার জন্য ব্যস্ত। বৃদ্ধকে পেয়ে খুশী। "বলছো তুমি ছবি নিলে ওরা রাগ করবে অথচ শুনতে পাই কাশ্মীরে মেয়ে খুব সস্তা।"

"সে তো কাবুলের পথে শুনবে কলকাতার মেয়ের ছড়াছড়ি। কোন্ সহরে নেই। এরা হোলো কাশ্মীরের জান্, ইজ্জৎ। কাশ্মীরের গাঁয়ের মেয়ে এরা। এদের সোহবত্ আলাদা।"

হঠাৎ আমি বলে উঠলাম। "দেখো দেখো ইজ্জৎএর দশা দেখো।" একটি বোরখাবৃতা ললনা স্বামীর সঙ্গে চলেছেন। বিদেশী পর্য্যটক।

ভদ্রলোক উত্তম সজ্জায় সজ্জিত। ভদ্রমহিলার সাজ তো দেখবার উপায় নেই। তবে বোরখার দাম দেখলে মনে হয় খোলষ যখন এত পরিপাটী, ভেতরের ব্যাপার কোন না সমান তালের হবে। ঠাওর করতে না পেরে একেবারে বাগানের কেয়ারী-বাঁধা ফোয়ারার চৌবাচ্চায় ঝপাং। দামী নাগরা বোরখা সমেত ভেজা মালটী যখন উঠলেন তখন প্রশ্ন সিক্তবসনাসুন্দরীকে কি করে শুষ্কবসনাসুন্দরী করা যায়। গেলও। ভদ্রলোক অভিনব উপায় আবিষ্কার করলেন। নিজের পাজামাটা খুলে —ইত্যাদি। ওদিকে আর চোখ রাখিনি। খানিকক্ষণ পরে দেখি ভদ্রলোক আণ্ডারওয়ার আর সার্ট পরে চলেছেন। হাতে একটা ভিজে পুঁটুলী। বোরখার তলায় আচকান পরে শ্রীমতীকে কেমন দেখাচ্ছে জানিনা, বাইরে সেই ভিজে বোরখা কায়েম হয়ে আছে। সুবিধামতো ভদ্রলোককে দাওয়াই বাৎলালাম,—"কোনও নির্জনে গিয়ে শুকিয়ে নিন, যা রোদ বাতাস শুকিয়ে যাবে।"

আমাদের বাস যে ছেড়ে দেবে। কাতরভাবে বললেন ভদ্রলোক।

আমি বলি,—"আজ মেলার দিন ছাড়বে না।"

বোরখার ভেতর থেকে কলকণ্ঠে জবাব এলো—"বুদ্ধি দিলেও নিতে নেই বুঝি?"

বোরখার দিকে চেয়ে ভীতচক্ষে ভদ্রলোক বলেন—"আদাব আরজ।"

কণ্ঠস্বর শুনে সন্দেহ হোলো—বোরখার ভেতর সত্যিই কোনও পুরুষ নেই তো?

সুন্দরী কাশ্মীরের মেয়েরা। কিন্তু কাশ্মীরী মেয়ে এক ধরণের নয়। ডোগরা মেয়েরা আকারে খর্ব এবং স্থূল। মধ্যদেশ রমণীয় নয়। চোখের দৃষ্টিতে অতটা উজ্জ্বলতা নেই। সেই উজ্জ্বলতা আর রমণীর তীক্ষ্ণতা আছে ডুঙ্গার হাঁজিদের মধ্যে, চাষা মেয়েদের মধ্যে, গ্রামের মুসলমান মেয়েদের মধ্যে। শ্রীনগরের মেয়েদের মধ্যে পর্য্যটকদের নয়ন-মন বিনোদিনীরা এই জাতীয় মেয়ে। কিন্তু সত্যকার সুন্দরী মেয়ে যাদের চোখ টানা টানা, ভাসা ভাসা, আঁখি পল্লব স্নিগ্ধ ও দীর্ঘ, কেশ সুকৃষ্ণ ও কুঞ্চিত, নাকের গঠন তীক্ষ্ণ ও সুডৌল, ঠোঁট পাতলা, চিবুকে খাঁজ, গালে রক্তিমাভা লেগেই আছে, পাৎলা সুগঠিত মধ্যদেশ—সেই কান্তরুচি মেয়েদের পাওয়া যায় গুজরদের মধ্যে, পার্বত্য বনেচর গুজর। কিন্তু কি ডোগরা কি মুসলমান, কি গুজর মেয়েদের হাত পা সুগঠিত নয়। করপল্লব ও চরণকমল দুটোই যেন বৃক্ষের পুষ্প পল্লবহীন কাণ্ড। রুক্ষ, কর্কশ, পুরুষাবলী। এরা ছাড়া কাশ্মীরে অন্য এক জাত মেয়ে আছে; তারা লম্বাকী। তাদের টানটা তিব্বত চীনের নির্নাক বদনের প্রতি। খস্ প্রভৃতি উপজাতিদের কথা এখানে বললাম না।

খিদেয় পেট চুঁই চুঁই করছে। খুঁজে পেলাম বেণুকে, কিন্তু অসিত উধাও। পথে এক বৈষ্ণব ভোজনালয়ে মশিক্ত ভগবানদাসজী দাল-রোটি খাচ্ছেন ও সাদা-খাবার গুণগান করছেন। "আপনার জিভের মতো সচল খাদ্য এখানে অচল। সুতরাং আনবেন কি?"

আমি বললাম "অচল চালাবার রুচি আমার সত্যিই নেই।"

একটা ঝর্ণার ধারে এসে বসে রইলাম। বাস থেকে বেণু খাদ্য এনে সাজিয়ে নিয়ে বসলো। কিন্তু এলো না অসিত শেষ অবধি। সাজানো খাবার গুটিয়ে নিয়ে আবার বাসে চড়া গেল। এবার কুকরনাগ। কুকরনাগ এমন কিছু নয়। পার্বত্য নির্ঝরিণী। এখানে বাগান বাগিচার বালাই নেই। ডাক-বাংলো আছে। শিকার করা, মাছ ধরা, পিকনিক করার জায়গা। তাঁবু নিয়ে এসে দুচার দিন কাটাতে ভালই লাগে। চারিধারে ছোটো ছোটো পাহাড়ের মধ্যে নানা ফুলের গাছ হয়ে আছে। বড় বড় পাথরের ঢিবির চারিধার দিয়ে উচ্ছল কলরবে জল পড়ছে। তার শব্দ বনভূমিকে প্রাণবন্ত চটুল করে রেখেছে। এখানে দ্বিতীয়বার বেণু তার পোঁটলা খুলেছে।

"গেলাম এই অসিতকে নিয়ে।"

"কেন বেণুদি?"

"কেন? কেন আবার কি? খাওয়া দাওয়া নেই নাকি আজ?"

কুকরনাগ

গলার স্বর ভেজা ভেজা পকেট থেকে কাগজের প্যাকেট বার করে অসিত বলে "পান এনেছি, পান।"

"রাখো তোমার পান। ধন্যি ছেলে সব। না খেয়ে খেয়ে ভালোও লাগে।"

কিন্তু যখন অসিত পকেট থেকে আর একটা মোড়ক বার করলো তখন বেণু চুপ।

সে মোড়কে ছিল বেণুর প্রিয় খাদ্য—শিক কাবাক!

"এবার? সাপ তো!"

"সাপ! ফাজিল, দুষ্টু ছেলে; কেবল জোগাবে।"

এতটাই যে বেণু কি করে বলেছিল আজ ভাবি। খিদেয় কিনা করে। বেণুকে নবাক করে আমাদের অবাক করে দেয়।

বাস এবার যাচ্ছে মার্তণ্ড। বর্তমান নাম মাটন্। মার্তণ্ডেশ্বর স্বামীর মন্দির। কত আনন্দ;—এখানে কোটেশ্বরীজী থাকবেন আমাদের আবাহন করতে। মার্তণ্ডেশ্বর মন্দির, বরাহস্বামী মন্দির আর পরিহাস-

কেশবছিল—কাশ্মীর রাজ্যের তিনটি পরম বিখ্যাত হিন্দু মন্দির। অমরনাথ নরন্নাগ, শূলঘাট, ক্ষীরভবানী এসব তীর্থ। কিন্তু মন্দির ভাস্কর্য্য, মানুষের শিল্পকলা—রুচির বিকাশের দিক থেকে এই সব মন্দিরের তুলনা ছিল না।

কাশ্মীরের ভাস্কর্য্য একটা নূতন ধারায় উদ্ভাত হয়েছিল। এ ধারাটাকে সাধারণভাবে হিন্দু ধারা বলা হয়েছে সত্য, কারণ হিন্দু প্রেরণা সম্ভূত এর বিকাশ। কেউ কেউ এ ধারাকে হিন্দু কুশান ধারার স্বগোত্রীয় বলেছেন। কেউ বা বলেছেন গ্রীক। মানি এসব। কিন্তু বর্ত্তমানে একটা দল ইস্‌লামিক ধারা বলতে আরম্ভ করেছে। আমি ভাস্কর্য্য বা প্রত্নতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ নই। তবে এই সব আলোচনার মধ্যে আমি রাজনৈতিক গন্ধ

কুফরনাগের আর একটি দৃশ্য

পাই। স্বস্তিক-চিহ্ন নিয়ে নাৎসীরা 'আর্য্য' 'আর্য্য' করে উন্মত্ত হয়েছিল। অথচ হিব্রু সংস্কৃতির মধ্যে স্বস্তিকের চিহ্ন পাওয়া একেবারেই যায়না একথা সত্য নয়। সত্য কোনটাই নয়। সত্য এর প্রচ্ছন্ন রাজনীতি। মানুষের মধ্যনিহিত ঘৃণাকে জাগরিত করবার, মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করবার, বেড়ালের ঝগড়া বাঁধিয়ে কিছু লাভ করবার বাঁদুরে বুদ্ধি।

আমি দেখেছি কাশ্মীরের প্রাক্-কুশান আর কুশানোত্তর ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য রীতিতে পার্থক্য। কুশান যুগের স্থপতিরা মধ্য এশিয়ার সংস্কৃতি থেকে যে ছাঁচ নিয়ে এসেছিল তার খানিক বিকাশ বাইজান্টাইন স্থাপত্যে আছে। এ দুটোর যোগাযোগও হয়তো ছিল। এদের খিলান দেবার রীতি, ত্রিকোণ সিংহদ্বার করার রীতি, থামের ওপরে নীচে কারুকার্য্য করার রীতি, দুসারি থামের মাঝে লম্বা প্রদক্ষিণ পথ করার কৌশল, সকলের ওপরে এদের কারুকার্য্যের খুঁটিনাটির মধ্যে প্রবেশ করলে বিষয় বস্তুর নির্বাচন ও উৎকীর্ণ করার প্রথা স্বতন্ত্র সন্দেহ নেই। তবু সন্দেহ উৎপাদন করার লোকের অভাব নেই। কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ মন্দিরের বেশীর ভাগই তো ধ্বংস হয়ে গেছে। তবু মার্ত্তণ্ড মন্দির থেকেই এই স্বাতন্ত্র্যের সমর্থন পাওয়া যায়। এ মন্দিরের গঠন রীতির সঙ্গে, এর থামের সারি থেকে, এর খিলানের ধরণধারণ থেকে আন্দাজ করা আশ্চর্য্য নয় যে গ্রীসীয় পদ্ধতির অনুসরণেই কাশ্মীরী রীতি চলেছিলো এবং কাশ্মীরের পক্ষে সে রীতির সংবাদ পাওয়া বড় একটা কঠিন সমস্যার ব্যাপার ছিল না। মার্ত্তণ্ড স্বামীর মন্দির বা অবন্তীপুরের মন্দির গড়বার সময়ে কাবুলে গ্রীক-স্থাপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। কাবুল থেকে ধারাটা কাশ্মীরে আসবে আশ্চর্য্য কি? আরও একটা কারণ গ্রীক-বাদীরা দেখিয়ে থাকেন। ভারী কৌতুকপ্রদ কারণ। তাঁরা বলেন "হিন্দু আর জৈন মন্দির ঢের দেখা আছে! এতো সুন্দর, সরল, অনাড়ম্বর পদ্ধতি তারা পাবে কোথা থেকে?" অর্থাৎ যেহেতু সুন্দর এবং সরল—সেই হেতু তা ভারতীয় নয়। যেহেতু ভারতীয় নয়, সেই হেতু গ্রাক্; কারণ সুন্দর এবং সরলের ধারক ও বাহক তো গ্রীসই, আর কেউ নয়! কী দম্ভ! একবারও ভাবতে পারেন না যে কাশ্মীরেই স্বতন্ত্র একটা প্রথা জন্ম নিয়েছিলো। মধ্য-এশিয়ায় যে মহিমময় আর্য্য সংস্কৃতি পরিপুষ্ট হয়েছিল, যার ফলে মন্দির স্থাপত্যের ওপর প্রামাণ্য ও সুবিস্তৃত গ্রন্থও রচিত হোলো। সেই সংস্কৃতি কাশ্মীরীর মতো শিল্পপ্রাণ জাতির প্রাণে একটা নবভাব-ধারা, নব উন্মেষ জাগ্রত করলো। অন্ধ আত্মম্ভরিতায় এঁরা এই সরল পথ বেছে নিলেন না। ক্যানিংহামের মতো প্রসিদ্ধ ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক খা মেরেছেন একটা কথা নিয়ে। কথাটা গ্রীসের এক ধরণের স্থাপত্যের নাম। নামটি 'আরিওষ্টাইল্‌।' একটা বিশিষ্ট ধরণের নামের সঙ্গে যখন 'আরিও' বা আর্য্য কথাটা সংযুক্ত এবং সে পদ্ধতির সঙ্গে যখন কাশ্মীরী পদ্ধতির মিল আছে তখন এ কথা বলতে বাধা কি যে আসলে থাম ও খিলানের এই বিচিত্র সমাবেশের মূল আবিষ্কার কাশ্মীরেই;

তা থেকে কাবুলের গ্রীকেরা নিয়ে গ্রীসে পাচার করলো এবং নাম দিলো আরিওষ্টাইল ! এতে বাধা কি ? বাধা এই যে গ্রীসকে ভারতের কাছে ছোটো করতে হয়। তার চেয়ে অনেক সোজা ভারতকে ছোটো করা। কিন্তু ইতিহাস নির্মম। উইলডুরাণ্ট গ্রীক স্থাপত্য-পদ্ধতির সমালোচনায় বলেছেন গ্রীকেরা স্থাপত্যের জন্য যে মাইলেশিয় সভ্যতার কাছে ঋণী সেই মাইলেশীয় সভ্যতা 'অরিয়েণ্টাল্' পদ্ধতির কাছে ঋণী। এখন এই 'অরিয়েণ্টাল' বলতে গিয়েই বেশীর ভাগ য়ুরোপীয় ঐতিহাসিক 'ইতিগজ' সূত্র অবলম্বন করেছেন ! প্লেটো হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেলেন ; ফিরে এসে দর্শনশাস্ত্রে পরমজ্ঞান ছড়ালেন। ঐতিহাসিক শুধু বাণী দিলেন 'অরিয়েণ্টাল' প্রভাব। যীশু গায়েব হয়ে গেলেন, কিছুকাল ঐতিহাসিক নীরবতা রক্ষা করা দুরূহ বুঝে কেবল বল্লেন—'অরিয়েণ্টাল'। বাস্—আর ব্যাখ্যা নেই। ফলিত বিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, চিকিৎসা সবই প্রথম গ্রীকদের (!) ; তবে নেহাৎ ফেরে পড়ে শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করেছেন 'ওরিয়েণ্টাল' প্রভাব। গ্রীক স্থাপত্য পদ্ধতির তাই। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে গ্রীসে স্থাপত্য পরম উৎকর্ষ লাভ করেছিলো ; তা বলে মার্ত্তণ্ড মন্দিরের স্থাপত্যও গ্রীসের কাছে ঋণী এ কথা কেন ? যা সত্য তা স্বীকার করতে বাধা কি ? মার্ত্তণ্ড মন্দিরের স্থাপত্য যে পদ্ধতির শিশুকাল,গ্রীসে সেই পদ্ধতিরই যৌবন। তাই নাম Ariostyle এবং মার্ত্তণ্ড মন্দিরের অনেক আগে এ পদ্ধতি উদ্ভাবিত ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে, নিশ্চিহ্ন হতে হতে শেষ নিদর্শন মার্ত্তণ্ড মন্দির রয়েগেছে। সেই প্রাচীন হতে প্রাচীনতর যুগে মাইলেশিয়া থেকে গ্রীসে এ পদ্ধতি গিয়ে যখন ক্রমশ উন্নত হতে থাকে, তখন এদেশে শাসন শৃঙ্খলার অভাবে এই শিল্প ক্রমশঃ ক্ষয়িষ্ণু। কেন এ ক্ষয় ? ইতিহাসের দাবী। এ দাবী পূরণ গ্রীসকেও করতে হয়েছিল। পদ্ধতি যাই হোক, আশ্চর্য্য লাগে ভাবতে এ কারা করেছিল ; কেন করেছিল। রাজার তাড়ায়, না মনের সাড়ায় ? কেননা প্রশ্ন এই-যে শিল্পটা সৃজন করে কে ? বাটালি না মন ? সেই মনটা কোন রসে স্নিগ্ধ হয়ে কাজ করেছে। ঘোড়াকে জল অবধি নিতে পারো, জল খাওয়াতে পারো ? শ্রমিককে পেঁয়াজে পয়জারে শ্রম করতে বাধ্য করতে পারো, কিন্তু আনন্দবোধ ব্যতিরেকে চিরকালের শিল্পরচনা করাতে পারো ?

দেবীপ্রসাদকে টাকা দিলেই যে রচনা করবেন, তা তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হবে, যদি তাঁকে শ্রেষ্ঠ টাকা দেওয়া যায় ? প্রশ্নটা দেবীপ্রসাদকে করলে তাড়া খেতে হবে। তাই মনে হয় যাঁরা এসব মন্দিরের ভাস্কর তাঁরা শুধু একটা ধারার বাহক ছিলেন না ; প্রাণেরও অধিকারী ছিলেন। সে প্রাণে মাধুরী ছিল, আর ছিল স্বপ্ন—ছিল ভক্তি আর শ্রদ্ধা। এ শিল্প প্রপাগাণ্ডার গণ্ডায় আণ্ডা মেলানো নয়। এ প্রাণের নিবেদন। এঁরা অবন্তীস্বামী, রামস্বামী, বরাহস্বামীর কথা মনে মনে সঙ্গীতের রসে গেয়েছেন তবে সেই ছন্দকে রূপায়িত করতে পেরেছেন এই পাষাণে।

সোইখণ্ডিতাশ্ম প্রাকারং প্রাসাদান্তর্বাধন্তচ
মার্ত্তণ্ডস্যাদ্ভুতং দাতা দ্রাক্ষাস্ফীতঞ্চ পত্তনম্—

মাটনের সূর্য মন্দির

সেই দ্রাক্ষাস্ফীত পত্তন দেখতে যাবো। মার্ত্তণ্ড মন্দির। কিন্তু হায় মার্ত্তণ্ড মাটন্ হয়ে গেছে। নাম সার্থক। কল্পনায় যা ছিল জীবন্ত, প্রত্যক্ষে দেখি তা 'কোল্ডব্লডেড্ মার্ডার'—নির্বিবাদ চিত্তে হত্যা—।
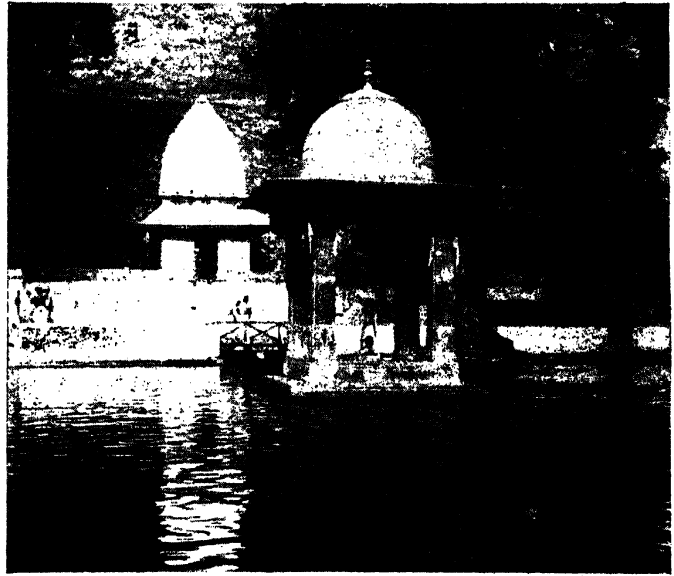
মাটন্ একটা খুব ছোটো সহর বলা যাক বা খুব বড় গ্রাম। এখানে কাঁসার বাসন আর গাব্বার কাজ প্রচুর। অনেক দোতালা তেতালা কাঠের কাজ করা বাড়ী। সবই পাণ্ডাদের। মেলার সময়ে যাত্রীদের থাকার জন্য এসব বাড়ী। বছরের বেশীর ভাগই খালি থাকে। কাজেই বড় বড় বাড়ী থাকতেও জায়গাটা ভুতে পাওয়া।

ভুত নেই এক জায়গায়। সেটা মন্দিরের সামনে চিনার তলায়। তা একশো বছর বয়স হবে চিনার গাছটার। বেড় হবে প্রায় বাইশ

ফুট। তার তলায় নরক। প্রেতলোকের বাসিন্দা এরা, চিত্রগুপ্তের সহচর। বলে ব্রাহ্মণ। বিরাট বিরাট লালবনাত-মারা খাতার পাহাড়। নিজে ঘাড়ে করেছে, তল্পিদারের ঘাড়ে চাপিয়েছে। আর বাসের দোরে এসে ভীড় করে ক্রমাগতঃ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে অস্থির করে তুলছে। "কোন জিলা?" "ক্যানাম্?" "নহিঁ—নহিঁ বোলিয়ে না।" "কুছ নেহি দেনা পড়ে গা—পিতাজীকা নাম ক্যা?" "কলরব, কলরব, কলরব। এর মধ্যে ছোট্টমানুষ কোটেশ্বর হাত তুলে চেঁচায়, "দাদা ম্যয় ইধর হুঁ।"

বিদেশে চেনা মুখ। কোটেশ্বরই আমার কতো চেনা।

গেট পার করে নিয়ে গেল মন্দিরের চাতালে। চাতালের চারধারে খুপরি খুপরি ঘর। যাত্রীরা থাকে। মাঝখানে জলাশয়ে মাছ খেলা করছে। কয়েক ধাপ সিঁড়ির পরে ছোটো মন্দির চুনকাম করা, এই সেদিনের বলে মনে হয়। মন্দিরের ভেতর শ্বেতপাথরে তৈরী সপ্তাশ্বরথ-বাহন মার্ত্তণ্ড। দেখে আশ্চর্য্য লাগলো!! মন্দির দেখে রসঘন তৃপ্তি হয়, রসিক চিত্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে; বিগ্রহ দেখলে একটা শান্ত সমাবেশের আভায় পাওয়া যায়। এর ব্যতিক্রম নেই। মসজিদে গেছি, আজমীর শরিফ, দিল্লী নিজামুদ্দীন আওলিয়ার দরগা—এসব জায়গায় গেছি, চার্চ্চ অব রিডেম্পশানে গেছি—সর্বত্রই ভক্ত-ভগবানের ঐক্যের মাধ্যমে এক শান্ত-শিব পরিবেশ পেয়েছি। কিন্তু এ যেন উগ্র ব্যবসাবুদ্ধির নিদর্শন, এ যেনো নবদ্বীপের পথে সাজানো মহাপ্রভুর জীবনের নানা লীলার মাধ্যমে উপার্জ্জনের তৃষ্ণা। এতোদিন ধরে ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের বিরাট কীর্ত্তি, রণাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত যে মন্দির দেখবো বলে ভেবে এসেছি, সে মন্দির কোথায়?

কোটেশ্বরজী আমার দৃষ্টিতে কি পেয়েছিলেন জানিনা। আমায় প্রশ্ন করলেন,—কি হয়েছে? প্রণাম করুন।

মাথা হেঁট করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম "মার্ত্তণ্ড মন্দির কোথায় ঠাকুর? মার্ত্তণ্ডস্বামীর মন্দির?"

কোটেশ্বরজী দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "এই তো।"

"এই নয়। এতো মার্টিনের সূর্য্য মন্দির। আমার সেই মার্ত্তণ্ড-স্বামীর মন্দির; সে কোথায়? সে তো সূর্য্যমূর্ত্তি নয়; সপ্তাশ্বরথবাহিত এ মূর্ত্তি মার্ত্তণ্ডমূর্ত্তি নয়।"

কোটেশ্বরজী বললেন "কালীমূর্ত্তি চান?"

"কালীমূর্ত্তি? হ্যাঁ এক কালী মন্দিরও ছিল, ললিতাদিত্য সেখানে পুজা পাঠাতেন। অবন্তীবর্মন সে মন্দিরে দুবার স্বয়ং গেছেন। কিন্তু সে তো মার্ত্তণ্ড-মন্দির থেকে দূরে। মার্ত্তণ্ড মন্দির কোথায়?

বেনু ডাকছে। "চলে এসোনা। মন্দির পেলেই তর্ক আর প্রশ্ন। আমরা তো ঢিব ঢিব করে পেন্নাম করলাম, পয়সা দিলাম, চলে এলাম। তোমার যতো বাই, কেবল কুলুজী ঘাঁটা। বৌদিকে বলো শুচিবাই, খুঁৎখুতে; তোমার মতো শুচিবাই দেখিনি আমি।

কোটেশ্বরের ছোটভাই, বুড়ো বাপ আর ছোট্ট ছেলে, কোটেশ্বরেরই হবে। ওরা রাশি রাশি খাদ্য এনেছে। ডাল, ভাত, ওদের দেশের এক রকম শাকের ঝোল, ছানার দালনা আর ক্ষীর। খাবার দেখে তো প্রমাদ গণলাম। খাবো কি করে? এই তো কুকরনাগে খেয়ে এলাম।

ওস্তাদ মেয়ে এই বেনু। খাবার ব্যাপারে দিব্যি মাথা খেলে। বলে,—"পাণ্ডাজী, এগুলো বেঁধে বুধে নিয়ে যাই। রাতে খাওয়াটা জমবে। আপনি তো যাবেনই কাল। বাসন নিয়ে আসবেন।"

পাণ্ডাজী খুশী মনে রাজী হলেন।

বাসে চড়ার আগে কোটেশ্বরজী বললেন—"সময় আছে ঘণ্টা দুই? পাহাড়ের মাথায় একটা পুরানো ভাঙ্গা মন্দির আছে। যেতে পারতেন; সেই হয়তো আপনার চেনা মন্দির।"

"চেনা মন্দির? চিনা নয়, জানা। কিন্তু বাস তো থামবে না। আমি আবার আসবো। পাহাড়ের মাথায় মন্দির বলছেন? একটা ঝর্ণা আছে বড়? কালো পাথরের মন্দির?"

"হ্যাঁ ঝর্ণা আছে। বড়ো বড়ো পাথরের স্তূপ পড়ে আছে। পুরাণো কালের দেববর্জিত মন্দির। মার্ত্তণ্ডের মন্দির ঐটাই।"

"কি হবে বলে? কবে ভেঙ্গে গেছে। সে কি আজ? এখন আর হিন্দু কেউ যায় না। সায়েবরা আর হালফ্যাসানের বাবুরা যায়। হিন্দুরা এই মন্দিরেই পূজা করে।"

কাশী বিশ্বনাথ, বৃন্দাবনের গোবিন্দজী, গোপীনাথজী, মদনমোহনজী, চিতোরের মীরার মন্দির—সবেরই আজ এই দশা। পুরাতন পরিত্যক্ত; নূতন সৌধে দেবতা প্রতিষ্ঠা। নূতন দেবতা কি হয়? দেবতা তো চিরকালের। পাথর ভেঙ্গেছে আলাউদ্দিন, সিকন্দর বুতশিকন, আউরঙ্গজেব; দেবতা কি ভাঙ্গতে পেরেছে?

এবারে হোলোনা। বাস ছেড়ে দিলো। এবার পহালগাম।

এবার উঠছি পাহাড়ের বলয়ে বলয়ে ঘুরপাক খেয়ে। শ্রীনগর-পাহালগাম মোটর পথ খুব প্রচলিত পথ। অনবরত নানা মডেলের গাড়ী উঠছে নামছে। খানিক ওঠার পরই সাক্ষাৎ পেলাম লীদারের। পাহালগাম থেকে শেষনাগ পর্য্যন্ত ভূমি ভাগের জীবনগান গাইছে এই কলনাদিনী নদী। লীদারের সৌন্দর্য্যের কথা আগে শুনেছিলাম। মোটর পথের পাশে পাশে লীদারের নালার জল বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একধারে পাহাড় উঠে গেছে। দেওদার আর চীড়ে ঢাকা। মাঝে মাঝে ছোটছেলের সন্ধ্যার ঘুমের মতো নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন গ্রাম। মনে হয় সমস্ত শান্তির আকর এই গ্রামগুলো।

মোটর আর থামছে না। চলছে। কনভয়টার বড় অংশ চলে গেছে। আমাদের অংশটায় চারখানা গাড়ী উঠছে। বিকেল হয়ে এসেছে। লীদারের আসল অববাহিকা নীচে সমতলে দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে কাঠের সাঁকোর ওপর দিয়ে পথ গেছে। কাশ্মীরী কুলীরা কাজ করছে কাঠের পুলে। মেরামতের কাজ। বাস চলেছে ধুলোর বন্যা আকাশে উড়িয়ে। এবার লীদারের বন্যরূপ চোখে পড়লো। গর্জনে, আক্রোশে, আস্ফালনে লীদার যেন নিজের লেজ পাকিয়ে নিজে আছাড় খাচ্ছে। ফুঁসিয়ে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা মৃত্তিকার শিশুদের ল্যালায়িত মুখ। লীদার গিয়ে মিশছে ঝিলমে—সাদিপুরে। লীদার আর সিন্দ্ এই দুটোই ঝিলম-গঙ্গার যমুনা আর শোন। কয়েকটা যুবা এবং একটি মেয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলেছে। ছোটো ছোটো ঘোড়ায় চকচকে জীন। অপর দিক থেকে ওরা আসছে। পহলগামে ঘোড়ায় চড়ার প্রচলন খুব। ঘণ্টায় চার পাঁচ আনায় ঘোড়া পাওয়া যায়। খুব বেশী চড়া দামের সময়ে আট নয় আনা ওঠে। এদের ঘোড়ায় চড়া দেখে বুঝলাম শহরের কাছে এসে গেছি।

সমস্ত গা চুল মাথা ধুলায় ভরে গেছে। স্নানের জন্য ব্যস্ত হয়েছি। খুব বেশী ঠাণ্ডা নয়। এমন কি সিমলার মতোও নয়। বাজারের মধ্যে এসে বাসষ্টাণ্ডে বাস দাঁড়াতেই প্রথম জিজ্ঞাসা—কোথায় থাকবো। জগজীবন ভগ্নদূত। খবর আনলো সমস্ত আয়োজন বিচূর্ণ করে স্থানাভাব ঘটেছে। আমায় অবিলম্বে যেতে হবে অফিসে। কাউন্সিল বসেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জ্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং চতুর্ব্বিধ শিক্ষা

শ্রীচারুপদ ভট্টাচার্য্য

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে প্রচলিত শারীরিক প্রাণিক আন্তরিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুলির মধ্যে আমরা শারীরিক শিক্ষার বিষয় আলোচনা করিয়াছি এবং বর্ত্তমানে অন্য তিনটি শিক্ষার বিষয় আলোচনা করিব।

আমাদের দেশে সকল রকম শিক্ষার মধ্যে মানসিক শিক্ষাই সর্ব্বজন, পরিচিত, যদিও দুই একটি বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত এই শিক্ষা অসম্পূর্ণ এবং নানাবিধ দোষে পূর্ণ। শিক্ষা বলিতে আমরা সাধারণতঃ মানসিক শিক্ষার কথাই বুঝিয়া থাকি।

মনের প্রকৃত শিক্ষা যাহা মানবকে উর্দ্ধতর জীবনের জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিবে তাহার প্রধান পাঁচটি ধারা লইয়া। সাধারণতঃ ইহারা ক্রম-পরম্পরায় আসিলেও, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ইহারা পূর্ব্বে কিম্বা পরে অথবা একত্রেও আসিতে পারে।

ঐ পাঁচটি ধারার বিষয়ে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে :—

১। একাগ্রতার শক্তি ও মন সংযোগের সামর্থ্য বৃদ্ধি।

২। প্রসার, ব্যাপৃতি, বৈচিত্র্য এবং ঐশ্বর্য্যদায়ক বৃত্তিসমূহের অনুশীলন

৩। একটি মূলভাব বা উর্দ্ধতর আদর্শ কিম্বা একটা পরম জ্যোতির্ম্ময় লক্ষ্য যাহা আমাদের জীবনের দিশারী হইবার উপযুক্ত, এবং এই গুলিকে ঘেরিয়াই আমাদের সমস্ত চিন্তা সুসংবদ্ধ করা।

৪। চিন্তা নিয়ন্ত্রণ, অবাঞ্ছিত চিন্তাবলী বর্জ্জন, যাহাতে আমরা যাহা চাই তাহা সঠিকভাবে চাহিতে পারি।

৫। মানসিক নিস্তব্ধতা, পূর্ণ প্রশান্তি, সত্তার উর্দ্ধলোক হইতে আগত প্রেরণা ধারণের ক্রমবর্দ্ধমান ধারণ সামর্থ্য।

মনের ধর্ম্ম জ্ঞান-অর্জ্জন, কিন্তু জানা হইল মানসিক ক্রিয়ার একটি দিক মাত্র এবং ইহার আর একটি দিক হইল মনের নির্ম্মাণ বৃত্তি, অধিক না হইলেও মনের এই দুইটি দিকই সমান প্রয়োজনীয়। বৃত্তি অর্থাৎ যে বৃত্তি রূপ দেয় এবং পরিমাণে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়। বিশেষ মূল্যবান হইলেও মানসিক ক্রিয়ার এই দিকটি আমরা কদাচিৎ সযত্নে অধ্যয়ন এবং অনুশীলন করিয়াছি। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া যাহারা তাহাদের মনের বৃত্তির উপর সম্যক কর্ত্তৃত্ব চায়, কেবলমাত্র তাহারাই রূপণ বৃত্তিতে পর্য্যবেক্ষণ এবং সু-নিয়মিত করিবার কথা ভাবিয়া থাকে। কিন্তু এই প্রচেষ্টার চেষ্টা করিলেই তাহারা দেখিতে পাইবে যে অলঙ্ঘ্য বিপুল বাধা তাহাদের প্রচেষ্টার অন্তরায়। এইরূপ হইলেও এইরূপ কারী বৃত্তির সংযমন এবং আত্মানুশীলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে এবং এইগুলি ব্যতীত মনের উপর কর্ত্তৃত্ব অসম্ভব। জ্ঞান অর্জ্জনের দিক হইতে দেখিলে সকল রকম চিন্তাই গ্রহণযোগ্য এবং এইগুলিকে সমন্বয়ের অন্তর্ভুক্ত করা কর্ত্তব্য; কারণ সমৃদ্ধতর এবং জটিলতর হওয়াই সমন্বয়ের ধর্ম্ম।

কর্ম্মের জন্য প্রয়োজন ইহার বিপরীত দিক—কিরূপভাবে কর্ম্মের রূপ দিতে হইবে তাহার উপর রাখিতে হইবে সজাগ দৃষ্টি। মানস সমন্বয়ের ভিত্তির মূল ধারাটির সঙ্গে মিলমিশ রাখিয়া চলিতে পারিবে যে সমস্তভাব, কেবলমাত্র সেইগুলিকেই গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার অর্থ এই যে, যে কোন ভাব মানস চেতনায় প্রবেশ করিবে তাহাকে তখনই কেন্দ্রীয় ভাবটির সামনে আনিয়া ধরিতে হইবে: এবং যে সকল ভাব ইতিমধ্যে সংজ্ঞবদ্ধ করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যদি তাহার প্রয়োজন হয় তবেই

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
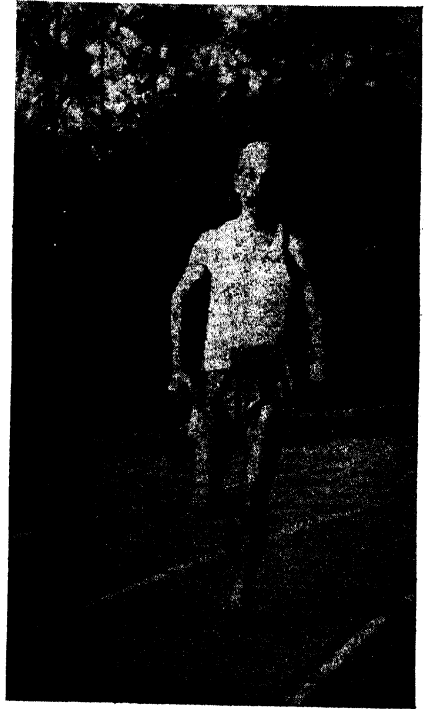
এই মানস সমন্বয়ের মধ্যে সে স্থান পাইবে এবং এইরূপ না হইলে তাহাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে, যাহাতে কর্ম্মের উপর সে প্রভাব বিস্তার না করিতে পারে। কর্ম্মের উপর পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব চাহিলে মনঃশুদ্ধির এই প্রক্রিয়া নিয়মিত ভাবে অনুশীলন করিতে হইবে। এই অভ্যাসটি আয়ত্ত হইয়া গেলে কাজ কর্ম্মের মধ্যেও আমরা আমাদের চিন্তাবলীর উপর

কর্তৃত্ব রাখিতে পারিব এবং আমাদের কাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয় এমন চিন্তা স্থান পাইতে পারিবে না।

একাগ্রতা এবং মনঃসংযোগের সামর্থ্য নিরন্তর অভ্যাস করিলে, বাহ্য-চেতনায় কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় চিন্তাবলী এবং পরিণামে প্রয়োজনীয় চিন্তাবলী অধিক সক্রিয় এবং ফলপ্রদ হইয়া উঠিবে। একাগ্রতাকে তীব্রতম করিতে পারিলে, কোন চিন্তাই থাকিবে না, এবং মনের উন্মাদন বন্ধ হইয়া যাইবে, এবং এইরূপে পৌঁছান যায় একটি অখণ্ড নিস্তব্ধতায়। এই নিস্তব্ধতায় নিজকে উর্দ্ধতর মানস লোক সকলের দিকে খুলিয়া ধরিতে পারা যায় এবং ঐখান হইতে যে সব অনুপ্রেরণা আসে, সেখান হইতে ঐগুলিকে লিপিবদ্ধ করা যায়।

এতদূর না হইলেও নীরবতা এমনিতেই পরম উপকারী; যাহাদের মন কিছু পরিণত এবং সক্রিয় তাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ ব্যক্তিই মনকে বিশ্রাম দিতে জানে না। দিনের বেলায় মনের ক্রিয়া আমরা অনেকটা শাসনে রাখিতে পারি; কিন্তু রাত্রে শরীর নিদ্রিত হইয়া পড়িলে, জাগ্রত অবস্থার শাসনটির লেশমাত্রও থাকে না এবং মন তখন অত্যধিক অসংলগ্ন ক্রিয়ায় মাতিয়া উঠে। ইহার পরিণামে হয় উত্তেজনা, ক্লান্তি এবং মানসিক ক্রিয়ার হ্রাস।

মনের আধারের অন্যান্য অংশগুলির মত মনেরও বিশ্রাম চাই এবং মনকে বিশ্রাম দিবার উপায় অজানা থাকিলে, মন কোন সময়েই বিশ্রাম পাইবে না। মনকে কি ভাবে বিশ্রাম দিতে হইবে তাহা শিক্ষা করা প্রয়োজন এবং মনের সব চেয়ে ভাল বিশ্রাম হয় নীরবতায়। অনেক ঘণ্টা-ব্যাপী নিদ্রা অপেক্ষা কয়েক মিনিট নিস্তব্ধ নীরবতায় কাটাইলে, মন অনেক বেশী বিশ্রাম লইতে পারে।

উত্তেজনার মধ্যে চিন্তা বিশৃঙ্খল এবং অক্ষম হইয়া পড়ে, কিন্তু সজাগ নিস্তব্ধতার মধ্যে আলো প্রকাশ হয় এবং মানবের নূতন নূতন সামর্থ্যের সম্ভাবনা খুলিয়া দেয়;

প্রাণের শিক্ষা—

সকল রকম শিক্ষার মধ্যে প্রাণ সত্তার শিক্ষাই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য্য। একটি সুস্পষ্ট জ্ঞান ও পদ্ধতি ধরিয়া এই জিনিষটিকে খুব কমই অনুসরণ করা হইয়াছে। অবশ্য ইহার কতকগুলি কারণ আছে। প্রথমত এই বিষয়টির সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অত্যন্ত মিশ্র এবং দ্বিতীয়ত কাজটি অতীব দুরূহ। ইহার সাফল্যের জন্য প্রয়োজন, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তি।

প্রাণ আমাদের স্বভাবের স্বৈরাচারী প্রভুত্বকামী অত্যাচারী রাজা। প্রাণের মধ্যে আছে সামর্থ্য শক্তি উৎসাহ, কার্য্যকরী সক্রিয়তা এবং এই কারণে অনেকেই তাহাকে সমীহ করিয়া চলে এবং সর্ব্বদা তাহাকে খুশী রাখিতে চেষ্টা করে। প্রাণ কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করে না এবং প্রাণের দাবি দাওয়ারও কোন সীমা থাকে না। প্রাণের আধিপত্যের পশ্চাতে দুইটি সু-প্রচলিত ধারণা দুর্দমনীয় করিয়া তুলিয়াছে তাহার মধ্যে একটি হইল মানব জীবনের লক্ষ্য সুখী হওয়া এবং অন্যটি এই যে মানুষ জন্মগ্রহণ করে একটি নির্দ্দিষ্ট স্বভাব লইয়া। এই স্বভাবের পরিবর্ত্তন অসম্ভব।

প্রথমটি একটি গভীর সত্যের কদর্য্য বিকৃতি। কারণ সত্যটি হইল এই যে, সমস্তই রহিয়াছে আনন্দের উপর এবং সেই আনন্দ ব্যতীত জীবনের কোন অস্তিত্বই নাই।

সুখী হওয়া আমার জন্মগত অধিকার—এই দৃঢ় প্রত্যয় হইতে কার্য্যকারণ সূত্রে এই ধারণা জন্মিয়া থাকে যে, যে কোন উপায়ে বাঁচিতে হইবে। অজ্ঞান আচ্ছন্ন এবং আত্মপ্রসারী অহমিকার এই মনোভাব হইতে যত দুঃখ ও সংঘর্ষ, নিরাশ ও হতাশা এবং পরিণামে একটি মহতী বিনষ্টির কারণ হইয়া থাকে। পৃথিবী আজ যে অবস্থায় পতিত তাহাতে ব্যক্তিগত জীবনের লক্ষ্য সুখ এবং সুবিধা নহে। ইহা হইল প্রত্যেকের মধ্যে ক্রমে ক্রমে সত্যময় চেতনায় ঋত-চিতের সম্বিৎ জাগিয়ে তোলা।

ধারণাটির মূলে এই সত্য যে স্বভাবের আমূল রূপান্তর করিতে হইলে প্রয়োজন অবচেতনার উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং যাহা কিছু অবচেতনা হইতে আসিয়া থাকে তাহাদের নিয়ন্ত্রণ।

প্রাণিক শিক্ষার প্রধান দুইটি দিক:—দুইটীর প্রকৃতি এবং লক্ষ্য অনেক তফাৎ হইলেও, দুইটিই সমান মূল্যবান। প্রথম ধাপ হইল ইন্দ্রিয়গুলির পুষ্টি সাধন এবং ব্যবহার। দ্বিতীয় নিজের প্রকৃতি জানা এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদের উপর কর্তৃত্ব অর্জ্জন করা ও তাহাদের রূপান্তর সাধন। ইহার পরের বিষয় হইল প্রাণের শিক্ষার দ্বিতীয় দিকটি অর্থাৎ স্বভাব ও তাহার রূপান্তরের বিষয়।

সাধারণতঃ প্রাণের শিক্ষা তাহার শুদ্ধি এবং তাহার উপর কর্তৃত্ব সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রণালী প্রচলিত আছে তাহাদের মূল হইল নিগ্রহ, দমন, কৃচ্ছ্রতা এবং তপস্যা। এই পথগুলি সহজ এবং আশু ফলদায়ী কিন্তু গভীর ভাবে দেখিতে গেলে এইগুলি নিয়মানুগত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ শিক্ষার অপেক্ষা কম স্থায়ী ও কম ফলদায়ক। অধিকন্তু এই উপায়ে প্রাণের সম্মতি, সাহায্য এবং সহযোগের সকল সম্ভাবনা দূরে চলিয়া যায়—অথচ সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টির জন্য এই সহযোগের একান্ত প্রয়োজন। নিজের ভিতরে গতিধারা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া এবং দেখিয়া চলা যে আমরা কি করিতেছি—ইহাই হইল অপরিহার্য্য আরম্ভ।

সঙ্কল্প স্থির হইলে পরাজয়কে কখনও চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া না লইয়া ক্রমাগত লাগিয়া থাকাই এই বিষয়ে একমাত্র করণীয়। এইরূপ ক্রমোন্নত অনুশীলন দ্বারা মাংস পেশীর মতই ইচ্ছাশক্তির পুষ্টি এবং বৃদ্ধি সাধন করিতে হয়। চেষ্টার দ্বারাই সামর্থ্য বৃদ্ধি পায় এবং ধীরে ধীরে কঠিনতর ক্ষেত্রে আমরা নিজেকে নিযুক্ত করিতে শিখি।

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে প্রথমেই প্রয়োজন নিজের স্বভাব সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান এবং ইহার পর নিজের সকল বৃত্তির উপর কর্তৃত্ব। তাহাতে যে সমস্ত জিনিষগুলির রূপান্তর সাধন করিতে হইবে, সেই গুলির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব আনিয়া ঐগুলির রূপান্তর সাধন করিতে হইবে।

আমাদের ভিতরে প্রাণ হইল বাসনা কামনার, উৎসাহ ও উগ্রতার

সক্রিয় শক্তি ও নিদারুণ নৈরাশ্যের মত্তাবেগ ও বিদ্রোহ কেন্দ্র। প্রাণ সমস্ত কিছুই সফল করিতে এবং সৃষ্টি করিতে পারে। সকল কিছুই সিদ্ধ করিতে পারে এবং সকল কিছুই ধ্বংস এবং নষ্ট করিতে পারে। মানব সত্তার এই অংশটিকে সুশিক্ষিত করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কার্য্য।

শরীর ও প্রাণ :—প্রকৃতপক্ষে শরীরের কাজ আদেশ করা নয়। আদেশ মানিয়া চলাই শরীরের ধর্ম্ম। শরীর স্বভাবতই নিরীহ বিশ্বস্ত সেবক। দুখের বিষয় এই যে শরীর মন এবং প্রাণের বিষয়ে সর্ব্বসময় বাচবিচার করিতে পারে না। শরীর নিজের স্বাস্থ্যহানি করিয়াও মন এবং প্রাণের সেবা করিয়া যায়। প্রাণ তাহার আবেগ আতিশয্য এবং অপচয় দিয়া শরীরের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও সুসাম্য অচিরে নষ্ট করিয়া অবসাদ ক্লান্তি এবং ব্যাধি আনিয়া দেয়। শরীরকে এই অত্যাচারের কবল হইতে মুক্ত করিতে গেলে একমাত্র চৈত্ত পুরুষের সহিত নিত্য সংযোগ দ্বারা ইহা করা সম্ভব হয়। শরীরের সকল অবস্থার সহিত মানাইয়া চলিবার আশ্চর্য্য শক্তি এবং সহ্য করিবার একটি আশ্চর্য্য শক্তি আছে। শরীরের এমন কাজ করিবার যোগ্যতা আছে যাহা আমাদের কল্পনাতীত। এই সমস্ত অজ্ঞানা স্বৈরাচারী প্রভুদের পরিবর্ত্তে আমাদের সত্তায় কেন্দ্রীয় সত্তা যদি তাহাকে পরিচালনা করে তাহা হইলে শরীরের কাজ করিবার আশ্চর্য্যজনক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

আমাদের পূর্ণতার লক্ষ্যস্থানে উঠিলে আমরা দেখিব যে আমরা চলিতেছি যে সত্যের সন্ধানে তাহার প্রধান চারিটি দিক :—যথা প্রেম, জ্ঞান, শক্তি ও সৌন্দর্য্য। সত্যের এই চারিটি গুণই আমাদের জীবনে এক সঙ্গে প্রকাশ পাইবে। চৈত্ত পুরুষ হইবে যথার্থ বিশুদ্ধ প্রেমের বাহন, মন অক্লান্ত জ্ঞানের, প্রাণ প্রকাশ করিবে অজেয় শক্তি এবং তেজ, শরীর প্রকাশ করিবে এক আনন্দ সৌন্দর্য্য এবং সুসঙ্গতি।

অন্তরাত্মিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা :—যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে জন্ম লাভ হয় এবং যে রকম শিক্ষা পাওয়া যায়, সেই অনুসারেই মানুষ তাহার আরাধ্য আদর্শ বা পরম তত্ত্বকে নানা নামের বসন পরায়। অভিজ্ঞতা সর্ব্বত্রই এক—অবশ্য তাহা যদি হয় আন্তরিক। পার্থক্য আসে শুধু ব্যাখ্যা স্থান, নিজস্ব প্রত্যয় এবং মানসিক শিক্ষা অনুযায়ী ব্যবহৃত প্রত্যেক ভাষার শব্দে এবং বাক্যে।

ব্যক্তির জন্ম রহস্য এই যে সকল সৃষ্টির আদি উৎস অসংখ্য সম্ভাবনার মধ্যে একটি সুপ্ত ধারা সে ; এক অদ্বিতীয় এবং বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের সাহায্যে আপনাকে দেশ কাল ইত্যাদি সকলের মধ্যে নিক্ষেপ করিল, ব্যষ্টি নিয়ম বা ব্যষ্টি সত্যের মধ্যে নিজকে স্থূলে ঘনীভূত করিয়া ধরিল এবং এই রকম একটা ক্রম স্ফূর্ত্তির ধারায় হইয়া উঠিল তাহার অন্তর, আত্মা বা চৈত্ত পুরুষ।

প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার মধ্যে লইয়া চলিয়াছে সঙ্গোপনে একটি ঊর্দ্ধতর চেতনার সম্ভাবনা—যে চেতনা বর্ত্তমান সমস্ত সীমা রেখা অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে লইয়া যায় একটী উচ্চতর ও বিশালতর জীবনে, এবং এই চেতনাই চালনা করে সমস্ত বিশিষ্ট মানবের জীবন। ইহাই সজ্জিত করে মানব জীবনের পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী এবং এই সবের প্রতি তাহার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াবলী। মানবের মানব চেতনা যাহা জানেনা বা করিতে পারে না, এই চেতনা তাহা জানে এবং করিয়া থাকে।

এই চৈত্তপুরুষের ভিতর দিয়াই মানুষ মানুষের সত্য-মানুষকে, মানুষের বাহ্য অবস্থাবলীকে স্পর্শ করে। এই চৈত্ত পুরুষ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কাজ করিয়া চলে অজানা অচেনা হইয়া পর্দ্দার অন্তরাল হইতে। কেহ কেহ এই চৈত্ত পুরুষের অস্তিত্ব বুঝিতে পারে এবং তাহার ক্রিয়াও ধরিতে পারে এবং ইহাদের মধ্য হইতে মাত্র কয়েকজন তাহাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করে এবং এই সমস্ত ব্যক্তির নিকটেই চৈত্ত পুরুষ পূর্ণফল দান করে। এই কর্তৃত্ব লাভের জন্য চৈত্ত সত্তার চেতনায় সচেতন হইয়া উঠিবার জন্য আন্তরিক শিক্ষার অনুশীলন প্রয়োজন। ইহার জন্য বিশেষ ভাবে প্রয়োজন ব্যক্তিগত সংকল্প। অটল সংকল্প, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, অক্লান্ত অধ্যবসায় লইয়া এই পথে অগ্রসর হইতে হয়।

এই পথে অগ্রসর হইতে হইলে এমন একজনকে প্রয়োজন হয় যিনি অনুরূপ প্রয়াসের পূর্ব্বেই সফলতা লাভ করিয়াছেন, যিনি এই পথ-গামী পাথককে সাহায্য করিতে পারেন, এবং পথের সন্ধান দিতে পারেন। ইহা হইলেও এমন সাধকও আছেন যাঁহারা একলা চলিতে চান। এইরূপ ব্যক্তিগণের জন্য দুই একটি সূত্র কার্য্যকরী হইতে পারে। প্রথমে নিজের ভিতরে অন্বেষণ করে সেই বস্তুর—যাহা দেহের জীবনের বাহ্য অবস্থার অধীন নয়, যে মন আমরা পাইয়াছি, যে ভাষায় আমরা কথা বলি যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে (অর্থাৎ আচার ব্যবহার ইত্যাদি) চলে আমাদের জীবন এবং যে দেশ এবং যুগের সঙ্গে সংযুক্ত তাহা হইতে যাহার জন্ম নয়। নিজের সত্তার মধ্যে গভীর ভাবে অন্বেষণ করিতে হইবে তাহাকে, যে দিতে পারে আমাদিগকে একটা বিশ্বব্যাপ্তি, একটা সীমাহীন প্রসারের অনুভূতি, একটা অন্তহীন স্থায়িত্বের উপলব্ধি। এইখানে আরম্ভ হয় সকল জীবের মধ্যে, সকল জিনিষের মধ্যে জীবন ধারণ, যে সমস্ত বাধার প্রচার মানুষকে পরস্পরের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকে এইখানে তাহারা ধ্বসিয়া পড়ে। এই সময় অন্যের চিন্তা হয় আমার চিন্তা, অন্যের অনুভবে আমার অনুভূতি, অন্যের হৃদয় বৃত্তি আমার হৃদয় স্পন্দিত, সব কিছুর জীবনেই আমি জীবন্ত। যাহা কিছু ছিল অসার তাহাই হইয়া উঠে প্রাণবন্ত, পাষাণে জাগে স্পন্দন, গাছ পালা অনুভব করে, ইচ্ছা করে এবং দুঃখ পায়, পশুরা কথা বলে অল্প বিস্তর যদিও অপরিণত অথচ স্পষ্ট এবং পরিষ্কার ভাষায় কালহীন সীমাহীন এক অপরূপ চেতনা সমস্ত কিছুকেই প্রাণবন্ত করিয়া রাখে। অন্তরাত্মিক সিদ্ধির এইগুলি হইল একটি দিক মাত্র। ইহা ব্যতীত ইহার আরও অনেক দিক আছে। মন দিয়া আধ্যাত্মিক জিনিষের বিচার করা সম্ভব নয়। যোগ সাধনা সম্বন্ধে যাহারা উপলব্ধি করিয়াছেন তাহারা সকলেই এই কথা বলিয়াছেন। এই পথে অগ্রসর হইতে হইলে সকল রকম মতামত সকল রকম মানসিক ক্রিয়া বর্জ্জন

করা একেবারে অপরিহার্য্য। এই পথে কখনও বিচলিত, উত্তেজিত বা সন্ত্রস্ত হইতে নাই।

এই অক্লান্ত নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের ফলে ভিতরের একটা দুয়ার হঠাৎ খুলিয়া যাইবে এবং দেখিতে পাওয়া যাইবে নিজকে প্রদীপ্ত জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে, যাহা আনিয়া দিবে অমৃতের নিশ্চয়তা এবং এই উপলব্ধি—যে অনাদিকাল হইতে ছিলাম আরও থাকিব অনন্তকাল। বাহিরের স্থূল আকারেরই বিনাশ হয়। বাহিরের স্থূল বস্তুগুলি জীর্ণবাস, তাহাদের ফেলিয়া দিতে হয়। তথাপি এই স্থূল দেহের সকল রকম দাসত্ব হইতে মুক্তি, সকল রকম ব্যক্তিগত আসক্তি হইতে মুক্তিই পরম সিদ্ধিময়। লক্ষ্যস্থল হইতে আরও অনেকখানি পথ অতিক্রম করিতে হইবে। সোপানের পর সোপানগুলি অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতের উন্মুক্ত দুয়ারে পৌঁছিতে হইবে এবং এই শেষের সোপানগুলির নামই আধ্যাত্মিক শিক্ষা।

অন্তরাত্মিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষার মধ্যে তফাৎ করা প্রয়োজন এই জন্য যে সদর অন্দর এই দুইটি একটি সাধারণ যোগ সাধনার নামে মিশাইয়া ফেলা হয়, যদিও দুইটির লক্ষ্য ভিন্ন। একটি পৃথিবীর উপর মহত্তর সিদ্ধি, এবং অপরটি পলাইয়া যাইতে চায়, সকল পার্থিব সৃষ্টি হইতে, এমন কি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ছাড়াইয়া পলাইয়া যাইতে চাহে অব্যক্তের মধ্যে।

অন্তরাত্মিক জীবন, অমর জীবন, অন্তহীন কাল, সীমাহীন দেশ, চির-উন্নতিশীল পরিবর্ত্তন, এই রূপময় বিশ্বের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন গতিপ্রবাহ। আধ্যাত্মিক চেতনা হইল অনন্ত এবং শাশ্বতের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করা। অন্তর আত্মাকে জানিবার জন্য, অন্তর আত্মার জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজন নিজের মধ্যে সকল অহমিকার বিলোপ। আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য হইতে হইবে অহং-শূন্য।

যে মুক্তি পৃথিবীর কোন পরিবর্ত্তন আনে না, যে সমস্ত কারণে অপরে কষ্ট পায় তাহার কিছুমাত্র অপনোদন করে না, তাহা এমন ব্যক্তিদের তৃপ্তি দিবে কি করিয়া যাহারা অপরকে না দিয়া কেবলমাত্র নিজেরই কাছে গচ্ছিত যে ধন তাহা বসিয়া ভোগ করিতে চায় না, যাহারা স্বপ্ন দেখে যে আপাত দৃষ্টিতে পৃথিবী যত বিশৃঙ্খল যত দুঃখ-দৈন্য-ক্লিষ্ট হোক না কেন তাহা হইয়া উঠিবে পৃথিবীর অন্তরালস্থিত মহিমার যোগ্য ভূমি। তাহারা চাহে তাহাদের এই অন্তর্জগতের আবিষ্কার থেকে অপরেও যেন লাভবান হইতে পারে।

এই রূপময় জগতের ওপার হইতে আহ্বান করা যাইতে পারে এক নূতন শক্তিকে,এক অভূতপূর্ব্ব চেতনা শক্তিকে—যাহা আসিয়া ঘটনায় ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারিবে এবং এক নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করিবে।

দুঃখ কষ্ট সমস্যার ; অজ্ঞতা ও মৃত্যু সমস্যার যথার্থ সমাধান পার্থিব দুঃখ যন্ত্রণাবলীর বাহিরে। এক অব্যক্তের মধ্যে বিলীন হইয়া যাওয়াতে নয়, দুঃখ থেকে সমষ্টিগতভাবে পলায়নে নয়—ইহা কতদূর সম্ভব তাহা সন্দেহ জনক। এই পলায়ন সমগ্রভাবে, সৃষ্টির একেবারে ফিরিয়া যাওয়া তাহার স্রষ্টার কাছে। ইহা হইল সৃষ্টিকে বিলোপ করিয়া দিয়াই তাহার সংস্কার।

প্রয়োজন একটা রূপান্তর—অর্থাৎ জড়ের পুনরূপান্তর। তাহা আসিবে প্রকৃতির প্রগতির মধ্যে যে একটা উর্দ্ধগতি পূর্ণতার দিকে তাহারই যুক্তিযুক্ত পরিণতি হিসাবে। তাহা আসিবে এক নূতন ধরণের জীব সৃষ্টির দ্বারা—যাহার সহিত মানুষের পার্থক্য হইবে, মানুষের এবং পশুর মধ্যে যতখানি, যাহা এই পৃথিবীর উপর প্রকাশ করিবে এক নূতন শক্তি, নূতন চেতনা এবং নূতন সামর্থ্য।

এইরূপে আরম্ভ হইবে একটি নূতন শিক্ষা, যাহার নাম হইবে অতি-মানস শিক্ষা। ইহার সর্ব্বজয়া প্রভাব কেবলমাত্র যে ব্যক্তি চেতনার উপর ক্রিয়া করিবে তাহা নহে, যে পদার্থ দিয়া সে তৈয়ারী—যে পারি-পার্শ্বিকীর মধ্যে তাহার জীবন তাহার উপরও ইহার ক্রিয়া হইবে।

অতিমানস শিক্ষা হইবে না শুধু মানুষী প্রবৃত্তির একটা ক্রমগতি। তাহার সুপ্ত বৃত্তিসমূহের বর্দ্ধিষ্ণু উন্নতি ; হইবে সমস্ত প্রকৃতিরই একটা রূপান্তর ; সত্তার আমূল পরিবর্ত্তন। এই উত্তরণ—অতিমানসের দিকে যাহার শেষ পরিণাম পৃথিবীর উপর দেব জাতির আবির্ভাব।

(On education হইতে অনুবাদ)
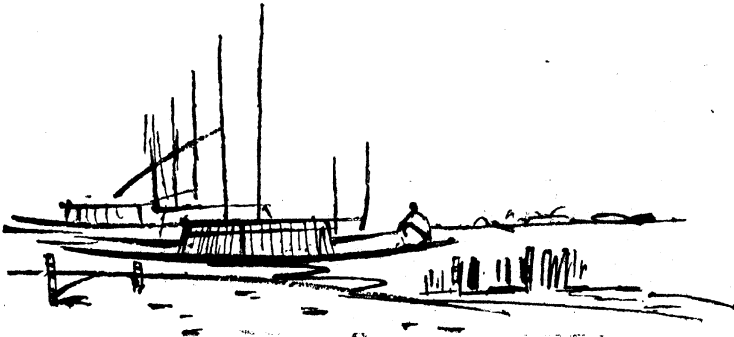
বাড়ীর কর্ত্তা

[Tchehovএর "The Head of the family" গল্পের অনুবাদ]

শ্রীকল্যাণকুমার ভট্টাচার্য্য

সাধারণতঃ তাসখেলায় খুব বেশী রকমের হেরে যাওয়ার পর অথবা খুব মদ খেয়ে যখন ডিস্‌পেপ্‌সিয়া আরম্ভ হ'ত, তখন স্টিপানিচ্‌ ঝিলিন অস্বাভাবিক রকম বিষণ্ন মনে ঘুম থেকে উঠত। এলোমেলো চুলে তাকে তখন অত্যন্ত বিরক্ত মনে হ'ত। তা'র পাংশুমুখে এমন অসন্তোষের ছাপ লেগে থাকত যেন কোন কিছুতে সে খুব মনঃক্ষুণ্ণ অথবা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে জামা-কাপড় পরে সে ইচ্ছে করে ভিসির জলে * চুমুক দিয়ে ঘরের চারদিকে পায়চারী করতে আরম্ভ ক'রত।

আলখাল্লাটা নিজের চারপাশে জড়াতে জড়াতে এবং সশব্দে থুথু ফেলতে ফেলতে সে বিড়বিড় করে ব'কত —"আমি জানতে চাই কোন্ জানোয়ার এখানে এসে দরজা খুলে রেখে চলে যায়।"

—"নিয়ে যাও ঐ কাগজটা। ওটা এখানে পড়ে আছে কেন? কুড়িজন চাকর পুষছি, অথচ জায়গাটা ভাঁটিখানার চেয়েও বেশী নোংরা হয়ে রয়েছে। আঃ! কোন্ হতভাগা আবার ওখানে ঘণ্টা বাজাচ্ছে?"

—"ওখানে এ্যান্‌ফিসা, যে ধাই-মা আমাদের ফেডিয়াকে জগতে এনেছিল।"—ওর বৌ উত্তর দেয়।

—"এই সব হতভাগা আদর দেওয়ার লোকগুলো কি সারাদিন ঘুরে বেড়াবে?"

—"স্টিপানিচ্‌, ওকে এখন বার করে দেওয়া যায় না। তুমি নিজে ওকে চেয়েছিলে, এখন তুমিই ওকে বকছ।"

—"না, না আমি মোটেই বকছি না, আমি শুধু বলছি। তুমিও ত কোলের ওপর হাত রেখে ঝগড়া করার ছুতো না খুঁজে কিছু কাজ করতে পার। আমার কথা হচ্ছে, মেয়েরা আমার বুদ্ধির বাইরে; সত্যি তাদের কিছুতেই বোঝা যায় না। কি ভাবে যে তারা সারাটা-দিন কিছু না করে নষ্ট করে? পুরুষ মানুষকে ত ষাঁড়ের মত, জানোয়ারের মত কাজ করতে হয়—অথচ তার বৌ, যে তার জীবনের সহধর্ম্মিণী সে সুন্দর পুতুলের মত বসে থাকে এবং কিছু না করে শুধু সুযোগ খোঁজে সময় কাটানোর জন্য, স্বামীর সঙ্গে কি করে ঝগড়া করা যায়। ওগো, ইস্কুলের মেয়েদের মত চলা এখন ছাড়তে হবে। তুমি আর এখন ইস্কুলের মেয়ে নও—তুমি এখন তরুণী নারী। তুমি বৌ হয়েছ। ছেলের মা এখন। তুমি আর আগের মত নও। আহা! এই রূঢ় সত্যটা শুনতে মোটেই ভাল লাগছে না, না?"

—"মজার ব্যাপার এই যে তোমার লিভারে যখনই গোলমাল দেখা দেয় তখনই কেবল তোমার মুখ দিয়ে রূঢ় সত্য বেরোয়।"

—"তা ঠিক।"

"তুমি বাইরে কি অনেকক্ষণ ছিলে, না তাস খেলছিলে?"

—"যদি আমি করি তা'তে কার কি? এটা কি অন্য কারোর ব্যাপার?"

—"আমি কি কাউকে আমার কাজের হিসেব দিতে বাধ্য? আমি মনে করি, এতে যে টাকা আমি নষ্ট করি

* ফ্রান্সের অন্তর্গত ভিসির প্রস্রবণের জল অনেক রোগ সারাতে পারে বলে প্রসিদ্ধি আছে।

তা আমার নিজের। যা' আমি খরচ করি এবং যা এই বাড়ীতে খরচ হয় সব আমার—আমার। কানে যাচ্ছে কি আমার কথা?"

এই এক ভাবে সব কিছু চ'লল।

কিন্তু খাওয়ার টেবিলে সব লোকের মাঝখানে স্টিপানিচ্‌কে যে রকম কঠোর, যুক্তিবাদী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ বলে মনে হ'ল—সে রকম আর অন্য কোন সময়ে নয়। সেটা আরম্ভ হ'ল ঝোল পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে। এক চামচে ঝোল খেয়েই সে হঠাৎ ভুরু কুঁচকে চামচে রেখে দিয়ে বলে উঠল—

—"দুত্তোর ছাই! আমাকে রেষ্টুরেন্টেই খেতে হ'বে।"

তা'র বৌ চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কি হ'ল, ঝোল কি ভাল হয়নি?"

—"এই রকম রান্না-ঘর ধোওয়া জল কি গেলা যায়? বড্ড নুন এতে। ছেঁড়া ন্যাকড়ার গন্ধ বেরোচ্ছে এর থেকে—পেঁয়াজের গন্ধ না হয়ে ছারপোকার গন্ধ হয়েছে।"

ধাই-মাকে বলল, এ্যান্‌ফিসা, এ খেতে গেলে সত্যি রাগ হয়ে যায়। সংসারের জন্য প্রত্যেক দিন আমার টাকা দেওয়ার শেষ নেই। নিজের সব কিছু ছেড়েছি—আর আমার খাওয়ার জন্য এদের কাছ থেকে এই পাচ্ছি।"

শিক্ষয়িত্রীটি আস্তে আস্তে সাহস করে ব'লল, "আজ ঝোলটা ত ভালই খেতে হয়েছে।" কটমট করে তাকিয়ে ঝিলিন্ চেঁচিয়ে উঠল, "ও, তুমি তাই মনে কর নাকি? অবশ্য সকলেরই নিজের নিজের রুচি আছে। এটা স্বীকার করতেই হবে ভ্যাসিলিভনা, যে আমাদের রুচি সম্পুর্ণ আলাদা—যেমন তুমি এই ছেলেটির ব্যবহারে খুব খুশী। (ঝিলিন্ একটা বিশ্রী ভঙ্গী করে তার ছেলে ফেডিয়াকে দেখাল)। তুমি একে নিয়ে খুব আনন্দে আছ, অথচ আমি—আমি একেবারে বিরক্ত—হ্যাঁ।"

সাত বছরের ছেলে ফেডিয়া কাঁচুমাচু মুখে খাওয়া বন্ধ করে নিচের দিকে তাকাল। তা'র মুখটা আরও করুণ হয়ে উঠল।

"হ্যাঁ, তুমি সন্তুষ্ট আর আমি একেবারে বিরক্ত। আমাদের মধ্যে কে ঠিক তা আমি ব'লতে পারি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস ওর বাবা হিসাবে ওকে আমি তোমার থেকে ভাল রকম জানি। দেখ, কি রকম ভাবে ও বসে আছে। এই ভাবে কি কোন ভদ্র ছেলে-মেয়ে বসে? ঠিক করে বস।"

ফেডিয়া মুখ তুলে গলাটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল। তার মনে হচ্ছিল যে সে নিজে এবার আরও ভাল ভাবে বসেছে। চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ছিল।

"ঠিক করে চামচে ধরে খাও। দাঁড়াও পাজী ছেলে, তোমাকে দেখাচ্ছি। কাঁদতে পাবে না। সোজা তাকাও আমার দিকে। আহা! কান্না হচ্ছে আবার, তবে রে বদমাইস, কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক।"

তা'র বৌ বাধা দিয়ে বলে উঠল, "আচ্ছা, ও আগে খেয়ে নিক।"

"না, কিচ্ছু খাবে না। এই রকম শয়তান ছেলের কোন কিছু খাওয়া উচিত নয়।"

ফেডিয়া ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চেয়ার থেকে নেমে ঘরের কোণে গেল। সে তখনও বলে চলছিল, "ওতে কিছু হ'বে না। যদি তোমাকে কেউ মানুষ না করে, তাহ'লে আমি আরম্ভ ক'রব। তোমাকে দুষ্টু হ'তে দেব না। আর খাওয়ার সময় তুমি কাঁদতে পাবে না। বুঝেছ বুদ্ধু, তোমার কাজ তোমাকে করতে হবে। তোমার বাবাকে কাজ করতে হয় এবং তুমিও তা করবে। কুঁড়েমি করে কেউ খেতে পাবে না। তোমাকে মানুষ হতে হবে। হ্যাঁ—পূরো মানুষ।"

তা'র বৌ ফরাসী ভাষায় বলে উঠল, "ভগবানের দোহাই তুমি থামো। অন্ততঃ বাইরের লোকের সামনে আমাদের খুঁত ধরে বেড়িও না। ঐ বুড়ী সব কিছু শুনছে, আর ওর জন্য সারা সহরের লোক এখন তা শুনবে।"

ঝিলিন্ রাশিয়ান ভাষায় ব'লল, "বাইরের লোককে আমি ভয় পাই না। আমি সত্যি কথাই বলছি। তুমি কেন মনে করছ যে আমি ঐ ছেলেটির ওপর সন্তুষ্ট হ'ব। তুমি কি জান—ও তোমার জন্য কত খরচ করাচ্ছে আমাকে। ওহে নোংরা ছেলে, তোমার জ্ঞান আছে কি তোমার জন্য কত খরচ করতে হচ্ছে। তোমার ধারণা কি—যে আমি টাকা তৈরী করি? না কিছু না করেই টাকা পাই? চেঁচিও না, মুখ সামলাও বলছি। যা বলাই, তা কি কানে যাচ্ছে? ক্ষুদে শয়তান, তুমি কি চাও চাবুক খেতে?"

ফেডিয়া আরও জোরে কাঁদতে আরম্ভ করল। তার মা টেবিল থেকে উঠে তোয়ালেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল —"ও: অসহ্য! তুমি কখনও আমাদের শান্তিতে থেতে দেবে না। তোমার রুটি আমার গলায় আটকাচ্ছে।" চোখে রুমাল চেপে সে খাওয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জোর কোরে হাসি ফুটিয়ে ঝিলিন্ বিড় বিড় ক'রে বলল, "এখন ইনি রাগ করেছেন। এঁর দ্বারা কিচ্ছু হবে না। এই হয়ে থাকে এ্যান্‌ফিসা, আজকাল আর কেউ সত্যি কথা শুনতে চায় না।

ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে সবই যেন আমার দোষ।

কয়েক মিনিট চুপচাপ কাটল।

ঝিলিন্ চারিদিকে খাওয়ার থালাগুলোতে দেখল—কেউ কোন কিছু ছোঁয়নি। একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে শিক্ষয়িত্রীর লজ্জিত ও অপ্রতিভ মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। "ভ্যাসিলেভ্‌না, তুমি যাচ্ছ না কেন? মনে হয় তুমি দুঃখ পেয়েছ। দেখছি সত্যি কথা বলা তুমি পছন্দ কর না। আমি মাপ চাইছি। এটা আমার স্বভাব। ভণ্ড হ'তে আমি কোনদিনই পারি না; সব সময় সোজা-সুজি সত্যি কথাই বলে থাকি। (দীর্ঘনিঃশ্বাস) দেখছি, আমার থাকাটাই কেউ পছন্দ করছে না। আমি থাকলে কেউ খেতে কিংবা কথা বলতে পারে না। বেশ, তোমার বললেই পারতে। আমি চলে যেতাম।"

ঝিলেন্ উঠে পড়ে গম্ভীর হয়ে দরজা পর্য্যন্ত গেল। ফেডিয়ার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে ভয়ে কান্না থামিয়ে ফেলল। গম্ভীর মেজাজে ঘাড়টা পেছন দিকে হেলিয়ে ফেডিয়াকে বলল—"যাক তোমার ছুটি। তোমাকে মানুষ করার জন্য কখনও আর কিছু বলতে আসব না। সব কিছু মুছে ফেলছি। বাবা হয়ে তোমার কাছে বিনীত ভাবে ক্ষমা চাইছি—সত্যি তোমার ভালর জন্যই তোমার অভিভাবকদের বিরক্ত করতে গিয়েছিলাম। এই সঙ্গে শেষবারের মত তোমার ভবিষ্যতের সব কিছু দায়িত্ব আমি অস্বীকার করছি।

ফেডিয়া আরও জোরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ঝিলিন্ দরজা খুলে নিজের শোবার ঘরে চলে গেল। ঘুম থেকে ওঠার পর তার মনটা খচ্‌খচ্ করছিল। বৌ, ছেলে, এ্যান্‌ফিসা সকলের সামনে আসতেই তার লজ্জা করছিল। বিশেষ করে যখন খাওয়ার সময়কার ঘটনার কথা মনে পড়ল—তখন আরও খারাপ লাগছিল। কিন্তু তার আত্ম-মর্য্যাদাবোধ ছিল খুব বেশী। সব কথা খোলাখুলি বলার মত সাহস ছিল না বলে সে গোঁজ গোঁজ করতে লাগল।

পরের দিন সকালে উঠে তা'র মেজাজটা খুব শরীফ ছিল। মুখ ধোয়ার সময় সে আনন্দে শিস দিচ্ছিল। প্রাতঃরাশের জন্য খাওয়ার ঘরে গিয়ে সে ফেডিয়াকে দেখতে পেল। বাবাকে দেখেই সে উঠে পড়ে অসহায়ের মত তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

টেবিলে বসে ঝিলিন্ খুশী মনে বলে উঠল, বাঃ খোকা। কিছু বলবে আমাকে। শরীর ভাল আছে ত। আচ্ছা এদিকে এস ত সোনা, বাবাকে একটা চুমু খাও দিকি।

ভয়ে শুকনো মুখে ফেডিয়া বাবার কাছে গিয়ে কম্পিত ঠোঁটে তার চিবুক স্পর্শ করল, তারপর নিজের জায়গাটিতে গিয়ে কোন কথা না বলে বসে পড়ল।

প্রেম

[William Shakespeareএর XVIII সনেটের অনুবাদ]

শ্রীঅমিয় চট্টোপাধ্যায়

তব সাথে বসন্তের তুলনা কি করি?
আরও মনোরম তুমি, আরও অনুপম;
অশান্ত সমীরে কাঁপে (প্রিয়) মে-মাসের কুঁড়ি;
(আর) বসন্তের সাথে বাঁধা কালের নিয়ম।
কভু আতপের তেজ-হানে স্বর্গের নয়ন,
কভু তার কনককান্তি নিষ্প্রভ স্তিমিত।
বসন্তের নির্ম্মল স্বচ্ছতা কভু করেনা বরণ,
প্রকৃতির অবিচ্ছিন্ন গতি যবে হয় অস্তমিত;
কিন্তু তব অক্ষয় বসন্ত রহে চির অম্লান।
হারায়ে ফেলনা কভু তোমার মাধুর্য্য
তোমার গতিতে ফেলিতে পারেনা ছায়া মৃত্যু-সুমহান
স্বর্গীয় আনন্দধারা ব'য়ে আনে জীবনে ঐশ্বর্য্য;
যতদিন মানবের ব'হে শ্বাস জ্যোতি নয়নে,
তোমার অদম্যগতি জীবন স্পন্দন॥

জেবউন্নিসার আত্মকাহিনী

ডক্টর শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পাদসাহ বেগম ! মৃত্যুর পুর্বে শাহজাহান প্রায়ই যমুনার অপর তীরে তাজমহলের প্রতি অপলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কার প্রতীক্ষায় যেন আকুল হয়ে উঠতেন ? অশ্রুধারা তাঁর দুই চোখ বেয়ে পড়ত। অন্তিমদিনে একবার বক্ষে করপল্লব স্থাপন করে, আর একবার শীর্ণ হস্ত প্রসারিত করে তাজমহলের দিকে তিনি অঙ্গুলি সঙ্কেত করলেন। পাদশাহ বেগম ! তিনি তো বুঝেছিলেন, শাহজাহান চেয়েছিলেন তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর সমাধি পার্শ্বে তাঁহাকে সমাহিত করা হউক।

শাহজাহান কল্পনা করেছিলেন, তাজবিবির সমাধির অপর পার্শ্বে যমুনার তীরে গড়ে উঠবে তাঁর সমাধি ; সে সমাধি হবে রক্তপ্রস্তর দিয়ে তৈরী। সেই রক্তপ্রস্তর হবে শক্তি শৌর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের প্রতীক। অন্যদিকে তাজবিবির স্মৃতিসৌধ ছিল শ্বেত প্রস্তরনির্ম্মিত—শুচি, সৌন্দর্য্য এবং শান্তির প্রতীক। এই দুই সমাধি মন্দিরের মিলন-সেতু হবে কৃষ্ণপ্রস্তর দিয়ে তৈরী। এই কৃষ্ণ প্রস্তর হবে মৃত্যুর প্রতীক। বাদশাহ আলমগীর সিংহাসনারোহণ করে রক্তমর্ম্মর দিয়ে সমাধিসৌধ নির্ম্মাণ নিষেধ করে দিলেন। কারণ রাজবন্দীর মৃত্যুতে বিলাস শোভা পায় না।

তবু, বাদশাহ বেগম ! তুমি আকাঙ্ক্ষা করেছিলে—শাহজাহান জীবনে যে আড়ম্বর ও বিলাস উপভোগ করেছেন, অন্ততঃ মৃত্যুর দিনে যেন সেই আড়ম্বর ও বিলাস থেকে যেন তাঁকে বঞ্চিত না করা হয়। তাই তুমি শাহজাহানের শবযাত্রা আড়ম্বরের সঙ্গে সুসম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন। মনে পড়ে, তোমার ইচ্ছা ছিল সাম্রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারিগণ, আগ্রার অভিজাত সম্প্রদায়, জ্ঞানী, গুণী, উলেমা এবং আপামর প্রজাবর্গ শব শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবে ; নগ্নপদে, নগ্নশিরে তারা শবদেহের শোভাযাত্রায় অনুগমন করবে—পথের দুই পার্শ্বে স্বর্ণরৌপ্য দরিদ্র এবং ফকীরদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। কিন্তু তোমার সেই ইচ্ছা বাদশাহ আলমগীর পূর্ণ করতে দেন নি—রাত্রির অন্ধকারে দুর্গের পশ্চাদ্দেশে প্রাচীরের অতি সামান্য অংশ ভগ্ন করে বিনা আড়ম্বরে শব দেহ দুর্গের বহির্দ্দেশে আনীত হল। শববাহক ছিল মাত্র কয়েকজন খোজা ভৃত্য। অতি সন্তর্পণে রাত্রির অন্ধকারে শবাধার তাজ মহলের বহির্ভাগে এসে প্রবেশ করল। পূর্ব্বেই কাজী সমাধির আয়োজন সম্পন্ন করে রেখেছিলেন। দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই তাজবিবির সমাধির অপর পার্শ্বে শাহজাহানকে সমাধিস্থ করা হল। শাহজাদা মুয়াজ্জম বাদশাহ আলমগীরের প্রতিনিধিরূপে শবদেহের পার্শ্বে উপস্থিত হলেন ; তখন শব সমাধি প্রায় শেষ হয়ে গেছে।

বুদ্ধিমান বাদশাহ আলমগীর আগ্রাবাসীর ধূমায়িত অসন্তোষকে বিরাট ভোজের মধ্য দিয়ে শান্ত করেছিলেন। দরিদ্র প্রজা ভেবেছিল—বাদশাহ আলমগীর পিতার আত্মার কল্যাণে খাদ্য অর্থ বিতরণ করেছেন।

চতুর্থ স্তবক

আমি চিন্তাই করে যাচ্ছিলাম—সমুদ্রের মত সীমাহীন আমার চিন্তার পরিধি—উর্ম্মিমালার আবর্ত্তের মত আমার চিন্তার স্রোত। তবে কি সত্যই শাহজাদা আকবর পলায়িত, নিরাশ্রয় নিরুপায় ? মাত্র তেইশ বৎসরের যুবক—তাঁর পত্নী, কন্যা, পুত্র—তারা কি দারা-শিকোর পত্নীর মত শাহজাদা আকবরের শৃঙ্খল হয়ে উঠবে ?

আমি প্রতিদিনই বাদশা বেগমের পত্রের অপেক্ষা করছিলাম। তিনি তৈমুর বংশের দুদ্দিনে একমাত্র আশা ? তবে কি তিনিও শাহজাদা আকবরকে পরিত্যাগ করেছেন ? একদিন সলিমা বেগম শাহজাদা সলিম এবং বাদশাহ আকবরের মিলন সম্ভব করে মুঘল বংশকে রক্ষা করেছিলেন। বাদশাহ বেগম কি আর্ত আলমগীরের সঙ্গে শাহজাদা ও আকবরের মিলনের চেষ্টা করবেন না ? আমি নিরাশ হয়ে পড়লাম। পক্ষকাল পরে একজন ঘোড়-সওয়ার সলিমগড় দুর্গদ্বারে এসে শিলমোহরাঙ্কিত চর্ম্মপেটিকা রেখে গেল। দেখেই বুঝলাম সেই চর্ম্মপেটিকা দুর্গের দারোগার নিকট প্রেরণ করা হয়নি ; —নচেৎ রাজবন্দিনীর কাছে বাদশাহের অনুমতি ভিন্ন পত্র কিংবা দ্রব্য আদান প্রদান নিষিদ্ধ। আমার কিঙ্করী গুলসন অতি সাধারণ একটি রৌপ্যাধারে আমার সম্মুখে সেই পেটিকা রেখে দিল। এই আমার জীবনে প্রথম রৌপ্যপাত্র ব্যবহারের প্রথম অভিজ্ঞতা। আমি চিরকালই স্বর্ণপাত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত। আজ যে আমি বন্দিনী ; বাদশাহ আলমগীরের আদেশে বন্দিনীর পক্ষে মণিমুক্তা, স্বর্ণপাত্র ব্যবহার বিলাসমাত্র।

আমি কম্পিত হস্তে চর্ম্মপেটিকা পরীক্ষা করে দেখলাম। পাদশাহ বেগমের মোহর পরীক্ষা করার ধৃষ্টতা কোন কর্ম্মচারীরই ছিল না। আমার আদেশে গুলসন মোহর-মুক্ত করে কয়েকখানি পত্র আমার হাতে তুলে দিল। প্রথম পত্রখানি ছিল পাদশাহ বেগমের স্বহস্ত-লিখিত।

জাহানারার পত্র :

"শাহজাদী জেব, তোমার আশঙ্কা উদ্বেগ নিরসন করবার মত আমি কোন সংবাদ পরিবেশন করতে পারছি না। পিতার অসুস্থতার সময়ে সিংহাসনের দ্বন্দ্বের সময়কার বহু ঘটনা আমাকে নূতন করে আঘাত করছে। বহু ঘটনাই আমি বিস্মৃত হয়েছিলাম। আমার অনুরোধেই পিতা শাহজাহান পুত্র আওরঙ্গজেবকে ক্ষমা করেছিলেন, আশীর্ব্বাদ করেছিলেন। কিন্তু শাহজাহানের অভিশাপ আজও আগ্রার প্রাসাদকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে।

বাদশাহ আলমগীর গুপ্তচরের নিকট থেকে সংবাদ পেয়েছিলেন,

মাড়োয়ারের মুঘল সেনাপতি তাহওয়ার খানের রাজপুত রাণা রাজসিংহের সঙ্গে গোপনে সংবাদ আদান প্রদান করছেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে বাদশাহ আলমগীর হিন্দুর উপর জিজিয়া-কর পুনঃস্থাপন করেছিলেন। যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নীর প্রতি আচরণে সমগ্র রাজপুত জাতি বিক্ষুব্ধ, ক্ষিপ্ত। উন্মাদের মতন তাহারা রাজপুত-জাতির সম্মানে মৃত্যুপণ করেছে মুঘলের বিরুদ্ধে মেবারের রাণা রাজসিংহ নেতা মাড়োয়ারের রাঠোর-বীর দুর্গাদাস সহায়ক। প্রতিদিন বাদশাহের নিকট সংবাদ আসছিল—কোনদিন রসদ কোনদিন শিবির অগ্নিদগ্ধ করছে; কোনদিন সম্মুখ যুদ্ধে মুঘল সৈন্য পরাজিত। রাজপুত বীর যুদ্ধ করেছে স্বদেশে, শাহজাদা আকবর প্রতিবারেই পরাজিত হয়েছিল। মুঘল সৈন্য যুদ্ধ করেছে বিদেশে অর্থের জন্য—ধর্ম্ম, জাতি ও দেশের জন্য। যে রাজপুত যুদ্ধক্ষেত্রে মুঘল সৈন্যের কাছে প্রাণ দিয়েছিল; সেই রাজপুতের বিরোধিতা করা মুঘলের পক্ষে অসম্ভব হয়েছিল। এই পরাজয়ের অপমানে বাদশাহ আলমগীর শাহজাদা আকবরকে রূঢ় ভৎসর্না করেছিলেন। শাহজাদা আকবর অত্যন্ত বিনীতভাবে নিজের অযোগ্যতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বাদশাহের নিকট পত্র প্রেরণ করেছিলেন। বাদশাহ আলমগীর কিন্তু শান্ত হন নি। দুদিন পরে বাদশাহ আলমগীর শাহজাদা আকবরকে পদচ্যুত করে শাহজাদা আজমকে চিতোরে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেছিলেন এবং আকবরকে মাড়ওয়ারে স্থানান্তরিত করলেন। ক্ষোভে, অপমানে শাহজাদা আকবর বাদশাহের সঙ্গে পত্রালাপ বন্ধ করে দিলেন—ফলে পিতাপুত্রের মধ্যে তিক্ততা বেড়েই চলেছিল। এ সংবাদ রাজপুতদের অগোচর ছিল না। সিংহাসনের জন্য পিতা-পুত্রের মধ্যে কলহ, সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্দ্বন্দ্ব—প্রতি মুঘল শিবিরই একটা আশঙ্কা আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল। বাদশাহ আলমগীর ও শাহজাদা আকবরের মধ্যে মনোমালিন্য শত্রু শিবিরেও অজ্ঞাত ছিল না। রাণা রাজসিংহ মুঘল সেনাপতি তাহওয়ার খানের মধ্যে গোপন পত্রালাপ প্রকাশ্য আলোচনা হয়ে উঠল; রাঠোর বীর দুর্গাদাস প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যদি শাহজাদা আকবর তাঁহার পিতার রাজপুতধ্বংসী নীতি পরিত্যাগ করেন এবং মহানুভব সম্রাট আকবরের নীতি অনুসরণ করেন, তবে রাঠোর এবং শিশোদীয় বংশ সম্মিলিতভাবে তাঁকে সাহায্য করবে। শাহজাদা আকবর ছিলেন অনভিজ্ঞ, অর্ব্বাচীন এবং স্বপ্নবিলাসী। দিল্লীর ময়ূর সিংহাসন শাহজাদা আকবরকে প্রলুব্ধ করেছিল। সেনাপতি তাহাওয়ার খান স্বপ্ন দেখলেন দিল্লীর উজীর-ই আজমের পদ।

বাদশাহ আলমগীর তখন আজমীরে শিবির স্থাপন করেছেন—চলন্ত রাজধানী এবং মুঘল রাজদরবার তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে চলেছে। রাণা রাজসিংহ স্থির করলেন—শাহজাদা আকবরকে কেন্দ্র করে আজমীরে বাদশাহ আলমগীরের শিবির আক্রমণ করবেন। এই সংকটময় মুহূর্তে অকস্মাৎ মহারাণা রাজসিংহ ইহলোক ত্যাগ করলেন। সমস্ত রাজপুতানা শোক-ভারাক্রান্ত। মেবারের নূতন রাণা জয়সিংহের দূত রাও কেশরী সিং মুঘল সেনাপতি তাহওয়ার খানের শক্ত—গোপন সন্ধি-পত্র স্বাক্ষর করলেন। একপক্ষ কালের মধ্যে আজমীরে বাদশাহ আলমগীর শিবির আক্রান্ত হল।

শাহজাদী জেব, তুমি শুনেছ নিশ্চয়, চার জন মোল্লা প্রকাশ্যে তাঁদের মোহরাঙ্কিত একখানি ফতোয়া জারি করেছিলেন যে বাদশাহ আলমগীর ইসলাম ধর্ম্মের নির্দেশ করেছেন, সুতরাং তিনি দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করবার অযোগ্য। শাহজাদা আকবর স্বয়ং জনসাধারণের সম্মুখে সিংহাসনারোহণ উৎসব সমাপ্ত করলেন। ইতিপূর্ব্বেই শাহজাদা মুয়াজ্জম বাদশাহকে এই ষড়যন্ত্র বিষয়ে অবহিত করেছিলেন। কিন্তু বাদশাহ সেই সতর্কবাণী বিশ্বাস করেন নাই। বরং শাহজাদা মুয়াজ্জমকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ প্রচারের জন্য তিরস্কার করেছিলেন। তিনি শাহজাদা আকবরকে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হবার জন্য অনুরোধের সুরে আদেশ করেছিলেন। শাহজাদা আকবর সে পত্রের উত্তর দিয়েছিলেন। আমি তোমার নিকট পিতা-পুত্রের পত্র—পত্রের উত্তর এবং প্রত্যুত্তরের অনুলিপি তোমার নিকট প্রেরণ করছি। তোমার অন্তরের ক্লেদ, গ্লানি হয়ত অনেকটা দূর হবে, আমি বড় ক্লান্ত।

বাদশাহ আলমগীরের ধৈর্য্য অপরিসীম, অভিজ্ঞতা প্রচুর—বিপদকালে বুদ্ধি অতি স্থির। তিনি শাহজাদাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে শিবিরে আমন্ত্রণ করেছিলেন। তাহাওয়ার খানের পত্নী কন্যা তখন মুঘল শিবিরের পিতা ইনায়েৎ খানের আশ্রয়ে ছিল। বাদশাহ আলমগীর জানিয়ে দিলেন—তাহাওয়ার খান যদি আকবরের পক্ষ ত্যাগ না করে, তবে তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদের প্রকাশ্যে রাজপথে অপমান করা হবে। ভীত শঙ্কিত তাহওয়ার খান বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য শিবিরে উপস্থিত হলেন। শেষ পর্য্যন্ত বাদশাহ তাহওয়ার খানকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু তবু বাদশাহ নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। তিনি রাজপুতদের সঙ্গে আকবরের বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্য এক সাংঘাতিক কৌশলের আবিষ্কার করলেন। শাহজাদা আকবরের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহ উৎপাদনের জন্য—তিনি অতি চতুর একখানি পত্র রচনা করলেন। সেই পত্রখানি শাহজাদা আকবরের উদ্দেশ্য লিখিত হয়েছিল। তিনি আকবরকে লিখেছিলেন—

আমার প্রাণাধিক পুত্র! তোমার বুদ্ধিকে আমি প্রশংসা করি। তুমি মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করে রাজপুতদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করেছ। মূর্খ রাজপুত—বিশ্বাস করেছে যে তুমি তোমার পিতার বিরুদ্ধে সিংহাসনের জন্য যুদ্ধযাত্রা করেছ। আমি অত্যন্ত উল্লসিত যে রাজপুত যোদ্ধাগণ তোমার পশ্চাতে অগ্রসর হচ্ছে, তারা আমার শিবিরের অনতিদূরে উপস্থিত হলে সম্রাটের সৈন্য পশ্চাৎ দিক থেকে আক্রমণ করবে। শাহজাদার সৈন্য সম্মুখ দিক হতে আক্রমণ করবে। আমাদের মিলিত সৈন্য রাজপুত সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করেন।

পূর্ব্বের ব্যবস্থানুযায়ী বাদশাহ আলমগীরের পত্র নিয়ে গুপ্তচর রাজপুত শিবিরের সম্মুখে অতিক্রম করে চলল। রাঠোর বীর দুর্গাদাসের শিবির রক্ষী সেই গুপ্তচরকে বন্দী করল। পুনঃ পুনঃ ভীতি প্রদর্শন এবং প্রশ্নের উত্তরে গুপ্তচর স্বীকার করেছিল যে, শাহজাদা আকবরের শিবিরে বাদশাহের গোপন পত্র নিয়ে এসেছিল। গুপ্তচর পত্রখানি রাঠোর

বীর দুর্গাদাসের হস্তে অর্পণ করল। রাঠোর দুর্গাদাস পত্র পড়ে স্তম্ভিত। সহজেই তিনি বিশ্বাস করলেন যে, ষড়যন্ত্র-কুশল বাদশাহ আলমগীরের পুত্রের পক্ষে এই ষড়যন্ত্র সম্ভব।

গভীর রাত্রি; সমগ্র শিবির নিদ্রামগ্ন। সন্দেহ বিজড়িত মনে স্রস্ত-চরণে, উন্মুক্ত তরবারি হস্তে নির্ভীক রাঠোর বীর দুর্গাদাস শাহজাদা পত্রের সরল অর্থ এবং গুপ্ত অভিসন্ধি জানবার জন্য আকবরের শিবিরে স্বয়ং উপস্থিত হলেন। কিন্তু শিবির রক্ষী দুর্গাদাসের নিকট নিবেদন করল—বাদশাহজাদা নিদ্রামগ্ন; রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বে তার শিবিরে অন্য মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। দুর্গাদাসের সন্দেহ ঘনীভূত হল। শাহজাদার এই নিদ্রা কপট নিদ্রা নয় ত? শাহজাদা আকবরের সাক্ষাৎলাভে নিরাশ হয়ে দুর্গাদাস—মুঘল সেনাপতি তাহওয়ার খানের শিবিরে উপস্থিত হলেন। তাহওয়ার খানও অনুপস্থিত। বাদশাহ আলমগীরের আমন্ত্রণে রাত্রির প্রথম প্রহরে মুঘল শিবির অভিমুখে গমন করেছেন।

আকবর নিদ্রামগ্ন;—তাঁহার শিবিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। সেনাপতি তাহওয়ার খান অনুপস্থিত—সুতরাং রাজপুতের সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হল। সরল বিশ্বাসী—বীর দুর্গাদাসের পক্ষে বাদশাহ আলমগীরের পত্রের সত্যাসত্য সম্বন্ধে অবিশ্বাসের কোন অবকাশ ছিল না। রাজপুত শিবির সন্দেহ ও ষড়যন্ত্রের মাঝে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই রাজপুত অশ্বারোহী এবং পদাতিক আকবরের শিবির ত্যাগ করে গেল। পথে তারা আকবরের শিবিরের রসদ লুণ্ঠন করল এবং মাড়োয়ারের পথে অশ্বমুখ ফিরিয়ে দিল।

পরদিন প্রভাতে নিদ্রা শেষে আকবর চকিত হয়ে দেখলেন—শিবির অভ্যন্তরে সে একা। প্রথমে আকবর বিশ্বাস করত পারে নি, শেষ পর্য্যন্ত সত্য রূঢ়ভাবেই তাহার সম্মুখে প্রকাশিত হল। দিল্লীর সিংহাসনের স্বপ্ন প্রভাতের আলোকে বিলীন হয়ে গেল। মাত্র তিনশত পঞ্চাশজন দেহরক্ষী এবং অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে নিয়ে আকবর রাজপুতানার পথে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

শাহজাদী জেব, তুমি নিরর্থক রাজপুতজাতির উপর অভিমান করেছ, তিরস্কার করেছ। বুদ্ধির খেলায় বাদশাহ আলমগীরের জয় হয়েছে। আমি শুনেছি, পলায়নের পরে সমস্ত দিবস রাত্রি এবং তার পর-দিনও শাহজাদা আকবর আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে রাজপুতদেরই দ্বারে উপস্থিত হয়েছিলেন—কারণ আকবর তখনও বাদশাহ আলমগীরের কৌশলের সংবাদ জানতেন না। রাজপুতদের সম্মুখে প্রায় একাকী, সহায়সম্বলহীন, রুক্ষ কেশ, অবিন্যস্ত বেশ, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত বাদশাজাদার উপস্থিতিতে রাঠোর বীর দুর্গাদাস সহজেই পরিস্থিতি অনুমান করে নিলেন; এবার সত্যই দুর্গাদাস বাদশাহ আলমগীরের নিকট পরাজিত হয়েছেন। কিন্তু আশ্রয়প্রার্থী শাহজাদা আকবরকে মারয়াড়ে তিনি আশ্রয় প্রদান করতে পারলেন না—প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু আজ ত শাহজাদা আকবর মেবারের অতিথি। তোমার মনে পড়ে জেব, বীর ছত্রশাল বুন্দেলা শাহজাদা দারা শিকোহর জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করেছিলেন।

ক্রমশঃ

আশা

শ্রীঅমরনাথ গুপ্ত

আমার এ কবিতা নয় ছন্দে-ভরা গান
নয় এ যে ভাবে ভরা ভাষার ঝংকার
সাধারণ মানুষের এ সরল কথা
এতে নাই কোনখানে গর্বের হুংকার।
আমি কবি তাই চাই এই পৃথিবীর
ছোটবড় সবাকার কান্না-হাসি সম
ধূসর ধূলির পরে যুগ যুগ ধরে
রেখে যেতে এইখানে স্মৃতিটুকু মম।
তুচ্ছ আমি—আর তুচ্ছ আমার লিখনী
নেই তাতে এতোটুকু রূপরস গন্ধ—
প্রেমের সে উচ্ছ্বাস কিংবা কামের লালসা
মনের জঘন্যতম লজ্জাকর দ্বন্দ্ব।
আমি আঁকিতে যাই বাস্তব পৃথ্বীর
দুঃখ ব্যথায় ভরা নিত্যকার রূপ
কাঁদে যে হৃদয় মোর তাদের লাগি
যাদের সমাধিস্থলে নাহি জ্বলে ধূপ।
হয়তো অজানা রব, কোন ক্ষতি নাই,
যদি আমি নাহি পাই যশ-অর্থ-মান
তবুও জানিব মনে—মানুষের লাগি
মানুষ "আমি"রে হেথা ক'রে গেছি দান।

হীরেন্দ্র নারায়ন মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

সুবিমল নিষ্কৃতি পেয়েছে। শুধু নিষ্কৃতি নয়, দেহ আর মনের কঠোর সংগ্রামে মন তার হয়েছে বিজয়ী। জীবনের খরস্রোতে যে চোরাবালির চরে সে পা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার সমাপ্তি ঘটেছে আচমকা একটা ভাঁটার টানে। রীণাকে সে দিয়েছে মুক্তি। নিজে ফেলেছে স্বস্তির নিঃশ্বাস। কিন্তু পিছুটানের বোঝা চাপিয়ে গিয়েছে জয়ন্তর ঘাড়ে। জয়ন্ত অস্বীকার করতে পারেনি। সে সুযোগও তাকে দেয় নি সুবিমল। মরবার আগে তার পৈতৃক সম্পত্তি আর সঞ্চিত অর্থের বিলি-ব্যবস্থা করে সুবিমল খোকার ভার দিয়ে গিয়েছে জয়ন্তর হাতে। জয়ন্ত জানে খোকাকে সে কেমন ক'রে মানুষ করতে চেয়েছিল। বড় হয়ে খোকা বিলেতের কোন কন্‌ভেণ্টে থেকে লেখাপড়া শিখবে। দেশে আর ফিরবে না কখনো। ওর মায়ের জীবন পথে চেনা মানুষের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে খোকার চোখ যেন নিষ্প্রভ না হয়ে আসে কোনদিন। যৌবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে রীণা যেন হঠাৎ কারো মুখপানে তাকিয়ে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে চেয়ে না থাকে। ভুল করেও যেন একফোঁটা চোখের জল ফেলে খোকার পথ সে ভিজিয়ে না দেয়। পিচ্ছিল হয়ে উঠবে খোকার পায়ের তলা।

জোয়ারদার-ভিলার নিঃসঙ্গ দিনগুলো মন্থর হয়ে আসে। জনাকীর্ণ সহরের কোলাহল থেকে জয়ন্ত দূরে সরে আসতে চেয়েছিল। চেয়েছিল নির্জন পরিবেশে জীবনটাকে মনের ছাঁচে ঢালাই করে নিতে। সুযোগও সে পেয়েছিল। কিন্তু সে সুযোগের সবটুকু পরিধি যেন নাগ-পাশের মত তাকে জড়িয়ে ধরেছে সুবিমলের মৃত্যুর পর। প্রতিটি মুহূর্ত অসহ হয়ে ওঠে। অথচ সে বন্ধন থেকে জয়ন্ত আজ জোর ক'রে নিজেকে ছিনিয়ে নিতে পারে না।

ওপরে থাকে জয়ন্ত একা। নীচে সেই পুরানো দারোয়ান, মালী আর চাকরটা। জয়ন্ত হাঁপিয়ে ওঠে।... দায়িত্ব শেষ হয়েছে। যে কাজ নিয়ে সে এসেছিল, সে কাজ ফুরিয়েছে। তবে আর কেন এ বন্ধন!...অনুগ্রহ তো সে চায়নি।...মাথাটা হেঁট হয়ে আসে।

জোয়ারদার সাহেব দুদিন এসেছিলেন ওর খবর নিতে। সরকার মশায় নিয়মিত এসে পোঁছে দিয়ে গিয়েছেন হাত খরচের টাকা। ওর খাওয়া-থাকার স্বাচ্ছন্দ্য তেমনি বজায় আছে। নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয়নি কোনদিকে। ঠিক আগের মতই মালী প্রতিদিন বদলে দিয়ে যায় ফুলদানির ফুলের গোছা। ঘড়ির কাঁটা ধরে চাকরটি যথারীতি এনে হাজির করে ওর চা-জলখাবার, দুবেলার ভাত-ডাল-রুটি।

তবুও জয়ন্তর ভালো লাগে না। একতিলও সইতে পারে না এই গুরুভার দিনগুলো। সুবিমলের মনের পর্দার সঙ্গে ওর জীবনের স্বরগ্রাম হয়তো মেলেনি কোনদিন, মিলতোও না। তবু সুবিমলকে ওর ভালো লেগেছিল। সুবিমলের রিক্ততা ওকে আকর্ষণ করেছিল। সেই মমতা রূপান্তরিত হয়েছিল বন্ধুত্বে। নিবিড় অনুভূতিতে জয়ন্তর মন ভরে উঠেছিল।...সুবিমল!...পর্যাপ্ত সমৃদ্ধির ভিতরেও যেন সুবিমল ছিল নিঃস্ব। মনটা ছিল তার উদার। কিন্তু যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াতো ঐশ্বর্যপুরীর নির্জন প্রান্তরে। বেঁচে থাকবার মোহ ওর ফুরিয়ে গিয়েছিল। তাই, বাঁচাবার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। যে কয়েকমাস বেঁচে ছিল, জীবনের সুতোটা ধরে যেন শরীরটাকে নিয়ে সুবিমল ইয়ো-ইয়ো খেলতো: নিরালম্ব হাতলাটুর চাকাটা দূরে ছুঁড়ে দিয়ে কখনো সুতোর টানে বুকের কাছে গুটিয়ে

আনতো, কখনো বা ঝাঁকানি দিয়ে সরিয়ে দিত নাগালের বাইরে।

জয়ন্ত অনেকদিন বলেছে: কেন মিছেমিছি নিজেকে এমন অবহেলা করেন সুবিমলবাবু?

সুবিমল হয় উত্তর দেয়নি; চুপ করে চেয়ে থেকেছে জয়ন্তর মুখপানে। না-হয় মিষ্টি একটু হেসে বলেছে: যা সত্যি—তাকে এড়িয়ে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে লাভ কি জয়ন্তবাবু? মরা আর বাঁচা একই পোস্ট কার্ডের দুটো পিঠ। ভিতরের দিকটা সামনে ধরলে হাতখানা এগিয়ে আসে বুকের কাছে: আর বাইরের দিকটা উল্টে ধরলে ডাক বাক্সের দিকে এগিয়ে যায়।

ইচ্ছা থাকলেও দ্বিতীয় কথা বলেনি জয়ন্ত। ক্ষণকাল নীরব থেকে, একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে অস্পষ্ট স্বরে হয়তো নিজেকেই শুনিয়েছে—তাই। জীবনের খতিয়ানে জমার দিকটা হাওলাতে ভরে উঠেছে।

কি, চুপ করে গেলেন যে?···ভাবছেন বুঝি, রীণার কাছে আঘাত পেয়ে জীবনের স্পৃহা আমার কমে গিয়েছে! ···তা নয়। মোটেই তা নয়, জয়ন্তবাবু। রীণা ছিল আমার জীবনে একটা লটারীর টিকিট।···নন্‌স্টার্টার হয়ে যেটুকু ফিরিয়ে দিয়ে গেছে, সে ওই খোকা। না এলে যে লোকসান হতো, এসে লোকসান হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী। মাঝখান থেকে খোকার ভবিষ্যতের পরিচিতিটা ঘোলা হয়ে রইল।

অনেকক্ষণ ধরে কেমন একটা অস্বস্তিকর নীরবতা দুজনের মাঝখানে এসে ডানা মেলে দাঁড়িয়েছিল। বার-বার জয়ন্তর মনে হয়েছে প্রসঙ্গটা না তুললেই ভালো হতো।

নিস্তব্ধ দুপুর।

নীচে সিঁড়ির পাশের চাতালটায় মালী আর চাকরটা হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। গেটের পাশে ঘুমটি ঘরের দরজায় দারোয়ানটা টুলে বসে ঢুলছে। শিমুল গাছটার পরডালে বসে একটা কাক কলকল শব্দে আর একটা কাকের মুখে খাবার গুঁজে দিচ্ছে। এখন আর কাকের কণ্ঠস্বরে সেই কর্কশতা নাই। মমতায় ভিজে উঠেছে।···হয় প্রিয়া, না হয় জননী।

দিনে জয়ন্তর চোখে ঘুম আসে না। আলমারির বই-গুলো পাতি পাতি করে খুঁজে একখানা জীর্ণ বই টেনে নিয়ে এসে বসলো ডেক চেয়ারটায় গা ঢেলে।

অ্যান্ ইংলিশ ম্যান ইন্ সার্চ অব ইংল্যাণ্ড।

বইখানার নাম অনেকদিন আগে শুনিয়েছিল জয়ন্ত। কিন্তু হাতে পড়েনি কোনদিন।···মানুষের সভ্যতা কেমন করে বদলে যায়, কেমন করে ধাপে ধাপে ওঠে আর নামে বিরাট একটা জাতির জীবনধারা, তারই নিখুঁত চিত্র। বিশ বছরের ভিতর ইংরেজের সংস্কৃতি, সমাজ জীবনের আদর্শ, জাতীয় ভাবধারা নিঃশেষে প্লাবিত হয়ে গেল ফরাসী সভ্যতার স্রোতে।···ঠিক এমনি ক'রে—এমনি ক'রে অতল সাগরে তলিয়ে গেল এ দেশের ঐতিহ্য। শুধু বাঙলার নয়, সারা ভারতের। বিশ বছরও লাগলো না। দশ বছরের ভিতর এত বড় একটা বিরাট জাতির আত্মচেতনা নিঃশেষে লোপ পেয়ে গেল। না ফিরিঙ্গী, না বাঙালী, না ইংরেজ, না হিন্দুস্থানী! তালগোল পাকিয়ে গেল সব। যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড ভোগ ক'রে আজ যদি এ দেশের কোন মানুষ আবার ফিরে আসে তার জন্মভূমিতে, পথে ঘাটে দরবারে কোথাও সে খুঁজে পাবে না তার চেনা একটী মানুষকে। স্মৃতির সঙ্গে বাস্তবের ছবি মিলিয়ে নিতে গিয়ে মাথা তার গুলিয়ে যাবে।

ভাবতে ভাবতে চোখদুটো বন্ধ হয়ে আসে। কেমন একটা অস্বস্তিতে তোলপাড় করে ওর স্নায়ুকেন্দ্র। মনটা বিদ্রোহ করে উঠতে চায়।···কন্‌জারভেটিভ ও নয়। নতুনকে মেনে নেবার শক্তি ওর আছে। ও চায় জীর্ণ সংস্কৃতিকে ভেঙে নতুন করে গড়ে নিতে। কিন্তু সে নতুন মানে তো জীবনের সমাধি নয়। আত্মচেতনার অবলুপ্তিও নয়।···ওরা প্রোগ্রেসিভ। দেহ ও মনের নীতির শৃঙ্খল ভেঙে ছুটে যাওয়াকেই ওরা বলে প্রোগ্রেস।···সততা দুর্বলতা। চেস্টিটি ততোধিক।

হঠাৎ মনে পড়ে যায় অনেকদিন আগেকার একটা কথা। মিসেস সুরেখা খাণ্ডেলওয়াল বলেছিলেন: স্পীড না থাকলে কি জীবন! লাইফ মানেই স্পীড। বদ্ধ জীবের স্পীড থাকে না। বাঁধন ছিঁড়ে যারা ছুটে চলে, তারাই জীবন্ত। বাকী সব জড়-পদার্থ। স্পীড থাকলেও, সে স্পীড চালু মেসিনের।

তার মানে ?

মানে সহজ। জীবনের স্পীড একই এক্সেলে ঘোরে না। দরকার হলে গতি বদলায়। হাতও বদলায়।

ঠিক।

হাঁ, তাই। স্টিয়ারিং হাত-ফের করে যখন গতিবেগ বাড়ে, তখন ক্লান্ত হাত থেকে নতুন হাতে স্টিয়ারিং তুলে দেওয়াই ভালো। তাতে যে শুধু স্পীড বাড়ে তাই নয়। এক্সিডেন্টের ভয়ও কমে।

কিন্তু জীবনের তো একটা ভার্চু থাকবে! ছুটে চলার স্পীডের চেয়ে পা-পিছয়ে পড়ার স্পীড অনেক বেশী।··· হয়তো সহজও অনেক।

কি বলতে চান, জয়ন্তবাবু?···জিজ্ঞাসু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুরেখা চেয়েছিল জয়ন্তর মুখপানে।

উত্তরে জয়ন্ত বলেনি কিছু। শুধু একটুখানি হেসেছিল। সে হাসিতে হয়তো শ্লেষও ছিল না, সমর্থনও ছিল না।

তবুও বেশ একটু খটকা লেগেছিল সুরেখার মনে। ক্ষণকাল নীরব থেকে জোরের সঙ্গে বলেছিল: ভার্চু একটা কাল্পনিক দুর্বলতা। মনকে মেনে নেবার সাহস যাদের নেই, তারাই কাঁটালাগাম লাগিয়ে জীবনের রাশ টেনে রাখবার চেষ্টা করে। মনকে অস্বীকার করবার একটা কৌশল।···আত্মবঞ্চনার সান্ত্বনা!

আত্মবঞ্চনা!

তা ছাড়া আর কি! মনের লাগাম টেনে দেহকে নিপীড়িত করায় বাহাদুরি থাকতে পারে, পৌরুষ নেই।··· আগুনের ধর্ম পোড়ানো। জল পেলে নিবে যাওয়াও তার প্রকৃতি। কিন্তু জলের মাহাত্ম্য বাড়িয়ে আগুনের শক্তিকে চাপা দিয়ে রাখবার চেষ্টা ক'রে লাভ কি? আপনাদের ভার্চু মানে তো তাই।

হবে: জয়ন্ত হাসবার চেষ্টা করে। কিন্তু হাসি ফোটে না।

সুরেখা একটু থেমে বলে: ভার্চু তো পান্না নয়, যে মনের অগোচরে দেহের খনিতে লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়বে।···মনকে বাদ দিলে দেহ তো একটা শব।

কথাটা ব'লে সুরেখা আর বসে নি। জয়ন্তর মুখপানে ভালো ক'রে চাইতেও হয়তো পারেনি আর।

এলোমেলো বাতাসে পাল-তোলা পান্‌সির মত দুপুরের নিঃসঙ্গ প্রহর যেন টলমল করে।

মিস্টার জায়ান্ট!

হঠাৎ জয়ন্তর চমক ভেঙেছিল শিপ্রার কণ্ঠস্বরে।··· কখন শিপ্রা ঝড়ো-পাতার মত উড়ে এসে পড়েছিল জয়ন্তর সামনে, জয়ন্ত তা বুঝতেও পারেনি।

আজও শ্মশান আগলে বসে আছেন, দেখছি!

শ্মশান?

তা ছাড়া আর কি!

সত্যিই তাই। সত্যি জয়ন্ত শ্মশান জাগিয়ে বসে আছে এই জোয়ারদার-ভিলায়। সুবিমলের শুশ্রূষার জন্যে সে এসেছিল। সুবিমল বিদায় নিয়েছে কিন্তু সে আজও পারেনি সরে যেতে। সে কথা যে জয়ন্ত অনুভব করেনি, তা নয়। তবু পারেনি রাতারাতি সব স্মৃতি মুছে ফেলে দায়িত্ব কাটিয়ে উঠতে।

প্রসঙ্গটা না বাড়িয়ে জয়ন্ত বলে: হঠাৎ আবার কি মনে ক'রে শুনি?

আত্ম-রক্ষার জন্যে: শিপ্রা হাসে।

আত্মরক্ষা?

হাঁ, তাই। পরিশ্রান্ত হয়ে উঠেছি নিজেকে নিয়ে বারবার ছিনিমিনি খেলে। পারেন না, পারেন না আমার হাত ধ'রে টেনে তুলতে?

শিপ্রার কণ্ঠে এমন আর্তনাদের সুর জয়ন্ত শোনেনি কোনদিন। বিস্ময়ে ভরে ওঠে। চোখ দুটো মেলে ধরে শিপ্রার মুখপানে: ব'সো।

গোল টিপয়টা টেনে নিয়ে শিপ্রা সামনা-সামনি বসে।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবে কেটে গেল। জয়ন্ত অনুধাবন করবার চেষ্টা করে। শিপ্রা প্রাণপণ যুদ্ধ করে নিজের সঙ্গে।

জানেন? লীনা বিভোর সেনের ছোট ভাই সঞ্জয়ের সঙ্গে মস্কো চলে গেছে।

জানি।

আর?

জানবার মত নেই কিছু।

ওর মা মিসেস্ মোতাহার চৌধুরী অলৌকিক খেলা খেলেছেন। খেলেছেন কেন, খেলছেন আজও।

পরেও খেলবেন। কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কি আছে ?

মাথা ঘামাবার নেই ?

না। তবে নিজের সম্পর্কে ওই ধরণের আশঙ্কা হয়ে থাকলে অবশ্য স্বতন্ত্র।

না—না—না। সে কথা বলছি না।

তবে ?

বলছি মিসেস চৌধুরীর কথা।

মিসেস চৌধুরী নয়। মাদাম ককটেল।

মাদাম ককটেল!···অদ্ভুত নাম। সত্যি আপনার অরিজিনালিটী আছে জয়ন্তবাবু।···সব আছে। সব আছে আপনার। শুধু নেই অনুভূতি।···পুরুষ নন আপনি!

শিপ্রার চোখে-মুখে যেন দপদপ ক'রে জ্বলে ওঠে লিক্‌লিকে আগুনের শিখা: পারেন না ওই বলিষ্ঠ দুখানা হাতে ডুবন্ত মানুষকে টেনে তুলতে ?

না।···জয়ন্ত কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। শিপ্রার মত মেয়ে যে কেমন করে হঠাৎ এমন দুর্বল হয়ে পড়তে পারে, সেকথা ও ভাবতে পারে না।

দু-হাতে চায়ের দুটো পেয়ালা নিয়ে চাকরটা ঘরে ঢুকলো।

তাড়াতাড়ি শিপ্রা বুকের কাপড়টা গুছিয়ে নিয়ে সিধে হয়ে বসে। একটু থেমে, নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলে: এখানকার কাজ তো শেষ হয়েছে। এখন একটা চাকরি-বাকরি নিয়ে ফিরে চলুন না অযোধ্যায়।

চাকরি!···জয়ন্ত হাসে।

মুহূর্তে শিপ্রার সর্বাঙ্গে একটা শিহরণের স্রোত বয়ে যায়। ওই এক চিল্‌কে হাসির ছোঁয়াচে ঝকঝক করে ওঠে জয়ন্তর চোখদুটো। এত কাছাকাছি মুখোমুখি বসে জয়ন্তকে শিপ্রা দেখেনি কোনদিন।···ওর মনে পড়ে যায় সুরেখার কথা। সুরেখাদি একদিন জয়ন্তর কথায় বলে—ছিল—কাঁচ-কাটা হীরে কিনতে মেলে বাজারে। কিন্তু মন-কাটা হীরে মেলে না।

ক্রমশঃ

অভিজ্ঞান

মাণ পাল

সপ্তর্ষি গিয়েছে সরি' জানি তব
আকাশের সীমারেখা হ'তে
জানি তার হয়েছে সময়, নিয়েছে বিদায়
সাগরের নীলিমার স্রোতে।
ছায়াপথে ছায়াপাত কি এমন দোষ—
আলো যদি নেভে, মুছে যায় পথ;
হাসি-ভরা পৃথিবীতে কারে দেব দোষ
থেমে যদি যায় মোর জীবনের রথ ?
বিষাদের মেঘ-মাখা চাঁদ দেয় উঁকি,
ম্লান জ্যোছনায় ভাসে ধরণীর তট,
আমি হেথা বসে আঁকি যত আল্‌পনা
কালি দিয়ে কালো করি জীবনের পট!
সবই যার ক্ষতি তার হিসাব কি নেব
হেরে গেছি এই বাজী পাশাখেলাতে,
জোর ক'রে বাঁকা দিন ফুরাবে যে কবে
সকলের হাসি দেখে চাই হাসি লুকাতে।
তবু আজ আশা রাখি পরে কোনো দিন
হয়তো বা ভুল ক'রে ক্ষণিকের বিলাসে,
আন্‌মনা ভেসে যাবে পুরাতন দিনে
আঁখিকোণ ছলছলি' স্মৃতিরাঙা সুবাসে।

শ্রীঅরবিন্দ ও প্রেমধর্ম

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন যখন শ্রীঅরবিন্দের পূত দেহাবশেষ বাংলার লীলা-ভূমি, মহাপ্রভুর সাধনক্ষেত্র নবদ্বীপে যাবার পথে কলকাতায় এসে পৌছলো, তখন আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু প্রশ্ন করে-ছিলেন—ওহে শ্রীঅরবিন্দও কি প্রেমপথ-পথিক নাকি? এই প্রচণ্ড প্রাণবন্ত বীর্য্যবান মহাপুরুষকেও তোমরা বৈষ্ণব করে খোল করতালে ঢুকিয়ে দিলে—হায়রে বাংলার মাটি, বাংলার জল। আমি তাকে পাল্টা প্রশ্ন করেছিলাম—প্রেমপথ বলতে কি বোঝাতে চান তিনি—অনেক সময়েই আমরা কথার মারপ্যাচ নিয়ে ভাবের ও ভাষার দরকষাকষি করি। আসলে সব সাধনার লক্ষ্যই এক। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম—যে যে পথ দিয়েই আসুক—কবির ভাষায় সব পথ এসে মিশে গেছে শেষে তোমার দুখানি নয়নে। সে পথ কুসুমাস্তীর্ণ ভাব-বিহ্বল গদগদ মসৃণ পথ নয়—সে পথ অশঙ্কিনী প্রত্যতির, অমেয় বীর্যের পথ। অব্যভিচারিণী-ভক্তি আর বিপুল বা বিরাট জ্ঞান একই সুরের কথা—যা কিছু দুই, যা কিছু বিভক্ত, যা কিছু খণ্ড সে সবকেই একে মিলতে হবে। এই মিলন রহস্যই প্রেম ধর্ম—রাধার মহিমা প্রেম রসসীমা—রাধার অর্থ হচ্চে—সম্পূর্ণ হওয়া, সিদ্ধ হওয়া, আরাধনা করা, আরাধিত হওয়া—অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বর। কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী মহিমাই এই প্রেম রসসীমা। সেখানে স্বসুখ বাসনার লেশ নেই।

> সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়
> রতি গাঢ় হইলে তারে প্রেম নাম কয়
> প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম—স্নেহ মান প্রণয়
> রাগ অনুরাগ, ভাব মহাভাবময়

কিন্তু মহাভাব হলেই হলোনা—অধিরূঢ় মহাভাবকে বৈষ্ণব সিদ্ধান্তীরা বললেন—মাদন—মহাভাব স্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরিয়সী—অর্থাৎ স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম যাহার—

> একই চিচ্ছক্তি ধরে তিন রূপ,
> সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।

হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সংবিৎ মিলিয়ে যে মহাভাব তিনিই 'সর্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি'।

সাধারণ মানুষ কিন্তু জ্ঞানী নয়, বিজ্ঞানী নয়, ভক্ত নয়, ভাবুক নয়, দরদী নয়, মরমী নয়—সে কাতর, সে ক্লিষ্ট, সে পিষ্ট। দুঃখে বেদনায়, অজ্ঞানতায় কামনায় সে জর্জর। কিন্তু এই যে তার কান্না সেটি হচ্চে আসলে পূর্ণতমের জন্য কান্না। তার মনের গভীরে এই আকুতি—আমায় বলে দাও, আমায় জানিয়ে দাও, আমায় বুঝিয়ে দাও—কে তুমি, জগন্নাথ-স্বামী নয়ন-পথগামী ভবতুমে—কাকে আমি পূজো করবো, কোন শক্তির সঙ্গে আমি মিলবো, কোন ছন্দকে, কোন সৌষম্যকে আমি ধরবো, কোন পথ বাহ্য, কোন পথ গ্রাহ্য—

> কোথায় আলো, কোথায় আলো
> ভিতর বাহির কালোয় কালো

দিনের তপ্ত আলোয়, রাত্রির সূচীভেদ্য অন্ধকারে, ঘর ছাড়ার শ্মশানে, সংসারের মোহমাদকতার মধ্যেও মানুষের এই প্রশ্ন। বৃহদারণ্যকের ঋষি ইদং ব্রহ্ম, ইদং সর্ব এই অমৃতের কথা বলেছেন। এই সর্বের গানই রাধাতত্ত্ব, রাসতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব। বিষ্ণু তিনিই যিনি (বিশ্) প্রবিষ্ট হয়ে আছেন, যিনি (বিষ) বিস্তৃত হয়ে আছেন।

> অদ্বয় জগততত্ত্ব কৃষ্ণের স্বরূপ
> ব্রহ্ম আত্মা ভগবান তিন তার রূপ
> জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনার বশে
> ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে

এর রূপ অনন্ত, ভাব অনন্ত, গুণ অনন্ত—এখানে এক ও অখণ্ড রস। কিন্তু সান্তের সীমায় খণ্ডবোধে, স্তর ও অধিকার ভেদে এই একই প্রকাশিত হন বহুরূপে—মল্লদের কাছে যিনি অশনি, স্ত্রীদের কাছে তিনিই ললনানিষ্ঠ, নাগর নারায়ণ মূর্তিমান স্মর, ভোজপতির কাছে তিনিই সাক্ষাৎ মৃত্যু, জ্ঞানীর কাছে তিনিই বিরাট, যোগীর কাছে

পরম তত্ব। শ্রীল রূপ গোস্বামীর ভাষায় এই যে উদয়—এ হচ্ছে মনোময় রাজ্যে চৈতন্য স্বরূপে—মনোময় রাজ্যে স্তরের পর স্তর আছে—চেতনার পর্দায় একটির পর একটি যবনিকা সরে যাচ্ছে—উর্দ্ধতর মানস, ভাস্বর মানস, অধিমানস, অতি মানস (Higher mind, Illumined mind, Over mind, Supermind.)। গুণমায়ার বন্ধন যখন খসে যায়, প্রকৃতির সর্ববাধা যখন বিনির্মুক্ত হয়, ভাগবত সেবায় তৎপরত্ব আসে, তখনই যোগমায়ার আশ্রয়ে আমরা লীলারস-রসিক হই। প্রাকৃতিক জীবনের লীলায় প্রথম ছন্দই হচ্ছে মিলন অভীপ্সা। সেই অনাগুন্তবান একই নিজের ইচ্ছায় দুই হলেন, কারণ তিনিই বহু হবেন। মহাপ্রকৃতি এই আকর্ষণের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি লীলার ধারাবাহিকতাকে স্থূল থেকে সূক্ষ্মে নিয়ে যান্। এই শক্তি বিশ্বজন্মা, এই শক্তি যোগমায়া। যোগমায়ার অর্থ হচ্ছে যিনি শুধু যুক্তই করছেন না, রূপনাম উপাধির মধ্যে মিত হয়েও প্রকাশিত করছেন নিজেকে। তাই রাসলীলায় চাই যোগমায়ার আশ্রয়। কারণ তখনও আবেগ রয়েছে, স্পন্দন রয়েছে, রাগ অনুরাগ, সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ, পূর্বরাগ, মান অভিমান নিয়ে প্রেম-বৈচিত্র্য চলেছে। বাঁশীর ডাক শুনে ছুটে আসছেন গোপীরা—কেউ রাঁধছিলেন, কেউ শিশুকে স্তন্যপান করাচ্ছিলেন—জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরং।

বিসরি গেহ নিজহু দেহ এক নয়নে কাজররেহ
শিথিল নীবির বন্ধ···বেগে ধাওত যুবতিবৃন্দ

এই প্রেম বৈচিত্র্য অপরূপ, কিন্তু এখানেই শেষ কথা নয়—কারণ প্রেমসঙ্গতা থেকেই আসে অনন্ত মমতা। অনন্তমমতা থেকে আসে সর্বত্র সমতা—যথা যথা নেত্র পড়ে তথা তথা কৃষ্ণ স্ফুরে। ক্রমশ বর্হিমুখী রূপ অন্তর্মুখী অপরূপের সঙ্গে মিশে যায়—ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে মাধুর্য মেশে—বহিরঙ্গ আর অন্তরঙ্গ এক হয়—এই তো প্রেম সাধনার পরম ইঙ্গিত—এই তো আকর্ষণের প্রধান রীতি, একেই আচার্য্যরা বলেন কৃষ্ণতত্ত্ব।

শ্রীঅরবিন্দও এই কথাই বললেন তাঁর পূর্ণযোগে। এই যে বিশ্বব্যাপী শক্তি রন্ধ্রে রন্ধ্রে অবতরণ করছেন তিনিই উদ্দীপিত অধিরোহণও করছেন—আর দুইএর এই যে মিলন—এই যে Double ladder of consciousness—সে সবের পরিণতি হবে এইখানে—শুধু এই লভিষ্যু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর নয়—আমিই সুন্দরে রূপান্তরিত—আমার অঙ্গ ত ধন্য হবেই, পরশ রাগে চিত্ত ত রঞ্জিত হবেই, মিলন সুধা প্রাণে সঞ্চিত ত হবেই—কিন্তু তার পরেও আছে আমার জন্ম-জন্মান্তর ঘটে গেছে—আমিই বদলেছি—কিংকরত্ব আর নেই, শংকরত্ব ঘটেছে—আমিই পরম শিব, সোঽহং, তত্ত্বমসি। এই যে তিলে তিলে নূতন হোয়—এ শুধু ভাবরাজ্যে নয়, দেহে মনে প্রাণে—সর্ব স্তরের রূপান্তরে। এই ত অচিন্ত্যভেদাভেদ। শ্রীঅরবিন্দ বললেন বৈদিক ঋষিরা, উপনিষদের যাজ্ঞিকরা এই সত্যের আভাস পেয়েছিলেন—তাঁরা অগ্নিতে আহুতি দিতেন—ত্রিষু সনুষু—Body, life and mind—জড় প্রাণ মনের স্তরে—তাই অপহৃত গোধন দেবতার বরে নতুন হয়ে ফিরে আসতো—Young and radiant.

জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি এই তিনের সামঞ্জস্যের মধ্যেই যোগের পূর্ণ বিকাশ। তাই শ্রীঅরবিন্দ ভক্তি বা প্রেমকে কোনদিন নিষিদ্ধ করেন নি, শুধু সাবধান করে দিয়েছেন—অবিশুদ্ধ ভাব-তরঙ্গে গা ভাসিয়োনা—যাতে সাধনার মধ্যপথে মোহ না আসে, মাদকতা না নামে। আর ভাগবতী শক্তির ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য একেরই দুই পিঠ—যে সত্ত্বা নিজেকে এই বিশ্বের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছে ব্যষ্টির মধ্যে প্রতিটি অণুতে রেণুতে, তিনিই নিজেকে আস্বাদন করে গুটিয়ে নিচ্ছেন নিজেকে কোটীতে—Return of the spirit to itself. এই ত মহারাম—আত্মস্থ পরম শিব সক্রিয় পুরুষোত্তম। সমাধিমগ্নও বটে—সমাধি ভঙ্গে লীলারতও বটে। তাই শ্রীঅরবিন্দের প্রেমরস সীমা হচ্ছে সমস্ত সত্তার Integration. প্রতি মুহূর্ত্তে নবজন্মলাভ, নূতন হওয়া। ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি—ব্রহ্ম হয়েই ব্রহ্মলাভ—আচার্য্য শঙ্করের এই উক্তি এখানে প্রযুজ্য। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বললেন—শুধু তাই নয়, যদিও বিদুষঃ সর্বকর্মদাহ অর্থাৎ জ্ঞানীর সর্ব কর্মই দগ্ধ হয়, মিথ্যা জ্ঞানপ্রসূত অশরীরত্ব সশরীরত্ব ভাব থাকে না—তবু এই দিব্যলীলার বিলাস বা বিক্রীড়া মায়া নয়, মোহ নয়, মতিভ্রম নয়। এই বিশুদ্ধীকৃত প্রেমের চরম সাধনা আমরা দেখি শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী'তে—একে বলা যেতে পারে—

অন্যের হৃদয় মন, আমার মন বৃন্দাবন
মনে বনে এক করে মানি।

এ প্রেমের ইতিহাস শুধু বৈধী নয়, রাগানুরাগা নয়—সচেতসাম্ রসতাম্ নয়—এ রস শৃঙ্গার থেকে শান্তমে চলে গেছে। শেষ অবস্থায় সাধক প্রাণারাম, আপ্তকাম, সর্বকাম, সেখানে মনবাক চিত্ত নির্বাপিত, স্থির অচঞ্চল, ব্রাহ্মী স্থিতিতে মগ্ন।

শ্রীঅরবিন্দের সাধনলব্ধ উপলব্ধির শেষ কথা অপূর্বভাবে রূপান্তরিত হয়েছে 'সাবিত্রীতে।' রূপে রসে ঝঙ্কারে, ভাবে ভাষায়, শব্দ বিন্যাসে, আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধিতে 'সাবিত্রী' এক অপরূপ কাব্য। ইংরাজীতে লেখা বলে এর রহস্য অনেকের কাছেই সম্পূর্ণ অনাবৃত নয়—তা ছাড়া গুরু-গম্ভীর ভাব ও ভাষা আমাদের অনেকের কাছেই দুরূহ। তবু প্রেমতত্ত্বের যে এক অপূর্ব দিক্ কবি শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে ফুটেছে তাতে তাঁকে পরম-ভাগবত পরম-বৈষ্ণব বলতে কারুর বাধবে না। সাবিত্রী সত্যবানের প্রতীকে কবি শ্রীঅরবিন্দের কল্পনায় প্রেমের এক সর্বগ্রাসী সর্বময় রূপই ভেসে উঠেছে—সেখানে দেহ বা দেহাতীত এ প্রশ্ন অবান্তর। এক অনাদি আনন্দের অনন্ত হিল্লোলে জেগে উঠেছে দুই। একদিকে এই মাটির পৃথিবী—God hidden in the clay, আর এক দিকে অনন্ত যৌবন আকাশ—তার Everlasting yes—চির-প্রেমিকের হাঁ, আমি আছি অয়মহং ভোঃ এই বাণী। এই দুই মিলিয়েই আবিষ্ট হয়ে আছেন সেই পরম এক, যিনি দ্বৈতাদ্বৈত অর্দ্ধ-নারীশ্বর, মন্দারমালা পরিশোভিত, কপালমালা পরি-শোভিত। স্বর্গ ফিরে ফিরে চায় ধরণীর দিকে—যে ধরণী ক্লান্ত নয়, তপ্ত নয়, পূর্ণের পূর্ণাভিসিঞ্চনে মধুময়—আর পৃথিবী চেয়ে থাকে স্বর্গের দিকে, জরা-মৃত্যু বিনষ্টির অতীত যে লোক। প্রেমের পট্টবাস পরে তপস্বী মানুষ চলবে স্বর্গের দিকে দীপশিখা হাতে—আরে সেই আলো দেখে নামবেন মাটির পথে স্বর্গের দেবতা। কোন পাহাড়ের পারে কোন সাগরের ধারে কোন মানুষের বুকে দুয়ের হবে মিলন তারই অধীর প্রতীক্ষায়. পৃথিবীর সব মানব-মানবী দাঁড়িয়ে। তারই বারতা দিলেন শ্রীঅরবিন্দ—

Inscribe the long romance of Thee and Me

অরবিন্দ প্রেমতত্ত্বের মূল কথাই হোল—All that thou art, shall to my hands belong—তুমি যাহা সবই আমি, আমার—

I will pour delight from thee as from a jar
I will whirl thee as my chariot through the ways
I will use thee as my sword, as my lyre,

তুমি আমার অমিয় সুধার পাত্র, আমার তরবার, আমার বীণা—তুমি হবে a channel for my timeless force—কালসীমা পেরিয়ে অচিহ্নিত যে শক্তি তারই ধারক ও বাহক সাবিত্রী আর সত্যবান a dual power of God in an ignorant world সেই "দ্বেধা অপাতয়ৎ"—এই যুক্ত প্রেমময় জীবনে—

You shall reveal to them the hidden eternities
The truth of infinitides not yet revealed

তোমাদের সম্মিলিত জীবনে জানাবে সেই পরম সত্য, সেই চরম ঋত, সেই অপূর্ব গান, সেই অচিন্ত্যনীয়ের সুর—কারণ স্বর্গকে জন্ম নিতে হবে বারে বারে মাটির মায়ের কোলে। প্রেম হচ্চে তারই দুয়ার।

My Earth is now play-field and thy Seat

আমার ভুবন হবে তোমার ভবন, তোমার লীলাক্ষেত্র, তোমার আসন্।

Her face She lifts to Him who is herself
Until the Spirit leaps into the Spirit's embrace

এই যে সত্তার সঙ্গে সত্তার মিলন—এ মিলন পরম রমণের, পরমা রমার, পুরুষ প্রকৃতির, শিব ও শিবানীর, সংসার ও ও প্রজ্ঞার, অর্দ্ধনারীশ্বরের। এখানে ছোট্ট আমি বিরাট আমিতে মিলিয়ে গেছে, ক্ষুদ্র অহং বৃহতের মহাসাগরে বিলীন।

I have escaped and the small self is dead,
I am immortal, alone, ineffable
I have gone out from the Universe I made
And have grown nameless and immeasurable.

এ আমি ছোট্ট গণ্ডী থেকে পালিয়ে আসা আমি, যে ক্ষুদ্র আমি মরে গেছে, যে আমি অমর, একক্, পরিবর্তনহীন, যে আমি নিজের তৈয়ারী জগত থেকে বেরিয়ে এসেছে, যে আমি নামহীন, সংখ্যা গণনার অতীত। কিন্তু তখনও তিনি তাঁকেই দেখছেন, তাঁর বাণী শুনছেন।

I have seen the beauty of immortal eyes
And heard the passion of the Lover's flute
And known a deathless ecstasy's Surprise
And sorrow in my heart for ever mute.
Nearer, nearer, now the music draws
Life shudders with a strange felicity,
All nature is a wide enamoured pause
Hoping her Lord to touch, to clasp, to be.

কবি বলছেন—

আমি যে দেখেছি সেই অমর আঁখির সুষমাকে
আমি যে শুনেছি সেই চির প্রেমিকের বাঁশরী
আমি যে জেনেছি মৃত্যুহীন উল্লাসের বিস্ময়।

কবির কাছে সেই অমৃত সঙ্গীত এগিয়ে যাচ্চে। তার 'More Poems'ও ঠিক এই কথাই পড়ি।

কোন ছায়াঘন প্রত্যুষের আলোতে
বিস্মৃত সায়াহ্নের বাণীহীন প্রতীক্ষাতে
নির্জন প্রাঙ্গণে, মোর পরাণে
মৌনী বীণার ধেয়ানে
তব পদধ্বনি শুনি আমি
দয়িততম, আসো তুমি
দীপশিখা সম
অনিন্দ স্বপন মম
তুমি আসো, তুমি আসো,
আরো আরো নিকটে আরো

জীবন কাঁপচে থর থর অপূর্ব রসাভাসে, সমস্ত প্রকৃতি স্তব্ধ আবেগে ভাষাহীন মূক—পরমপতির স্পর্শে সে চাইছে, শুধু স্পর্শ নয়, গভীর আলিঙ্গন, শুধু আলিঙ্গন নয়, সে হতে চাইচে একাত্মীভূত, তাও নয়, শেষ পর্য্যন্ত "To be" অর্থাৎ রূপান্তরিত হতে—তিলে তিলে নূতন হোয়।

For this one moment lived the ages past
The world now throbs fulfilled in me at last

সেই এক চরমক্ষণের গানই গাইলেন পরম বৈষ্ণব পরমশাক্ত মহারসিক কবি শ্রীঅরবিন্দ। তিনি মহাজনদের মতই গাইলেন—

To live, to love are signs of infinite things
Love is a divine power by which all can
change.

বেঁচে থাকা মানেই ভালবাসা—ভালবাসা অনন্তের সন্ধান দেয়, যে দিব্যশক্তি রূপান্তর করতে পারে, সত্তাকে বদলে দিতে পারে।

An hour began, the matrix of new time, a new age, a new creation—সত্যিকার ভালবাসলেই জীবনের ধারা বদলে যায়, জীবনে নূতন সূর্য্যের উদয় হয়, নূতন যুগ আসে, নূতন সৃষ্টি, নূতন দৃষ্টি।

তাই সাবিত্রী হচ্চেন—"A priestess of immaculate ecstasies—জীবন যজ্ঞে প্রতিটি আনন্দোচ্ছল ছন্দে যিনি আহুতি দেন। সাবিত্রীর জীবনই সত্যবানের পৃথিবী—তারই উপর তার ত্রিধা পদ রেখে তিনি বিচক্রমণ করবেন। সাবিত্রীর তনু তারই আনন্দের অনুভূতির কেন্দ্র। কবি বলছেন—মহাকালের যাত্রাপথে একাকী সত্যবান দাঁড়িয়ে—মৃত্যুর বিধানের জোয়াল ঘাড়ে করেও তিনি অমরতার যাত্রী—তিনি যে সত্যবান অর্থাৎ সত্যে বিধৃত। সত্যবান gathered all Savitri into his clasp." লক্ষ্য করবার বিষয় যে কবি "all Savitri" বলছেন অর্থাৎ যে সাবিত্রী অখণ্ড—তার প্রতিটি অনুভূতি, প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি কার্য্য, প্রতিটি সংস্কার, তার দেহ-মন চিত্ত বাক্ সবই নিয়ে যে তিনি, যেখানে দ্বৈত নেই, অজ্ঞান নেই,সবই সীমাহীনের মহানে বিলীন "A soul merging into God. Her separate life was lost in his.

ভালবাসার শেষ কথা এই প্রেম-মগ্নতায়—তুমি নেই, আমি নেই, আবার তুমিও আছ, আমিও আছি—দুই মিলিয়ে এক অখণ্ড অনুভূতি। সাধনার প্রথম স্তর—মর্ত্য সীমাকে ছাড়িয়ে অসীমের দিকে যাত্রা (transcending the human formula)। দ্বিতীয় স্তর—উর্দ্ধারোহণ, মানস যাত্রা। তৃতীয় স্তর—মহাশক্তির অবতরণ, চতুর্থ স্তর—সেই শক্তিকে প্রেমে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে সমস্ত সত্তাকে রূপান্তরিত করা।

সাবিত্রী হচ্চেন সেই প্রেমরস সীমা, আর অবতরণের প্রতীক্।

One shall descend and break the iron law

নিয়মের অর্থাৎ (যমের) নিগড় যিনি ভাঙবেন। তাই নারদের মুখ দিয়ে তিনি গান শোনালেন।

He Sang to them of the lotus heart of love
With all its thousand luminous buds of truth

বিকশিত বিশ্ব-বাসনার মূলে যে শতদল পদ্ম সেই শোধিত প্রেমের মধ্য দিয়ে রূপ নেয় পরম সত্য। তারই সহস্র বিকাশের গান গাইলেন দেবর্ষি।

Which quivering sleeps veiled by apparent things যা আপাতদৃষ্ট সত্তার মধ্যে 'এজতি' কম্পমান হয়ে ঘুমিয়ে থাকে It trembles at each touch, it strives to wake প্রতি স্পর্শে সেই সত্তা চঞ্চল হয়ে ওঠে, জেগে উঠতে চায় এবং একদিন—

It shall hear a blissful voice
And in the garden of the spouse shall bloom
When she is seized by her discovered lord.

একদিন সে শুনবে সেই বাণী, সেই বাঁশী—যা কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশবে। সেই চিররমণের উদ্যানেই তার হৃদয়ের ফুল ফুটবে এবং সেদিন সে শুধু পতিকে আবিষ্কার করবে না, পরমপতিও তাকে গ্রহণ করবেন। কবির উপমা হলো—

Seized by her discovered Lord

একজন করবে আবিষ্কার, আর একজন করবে সজোরে গ্রহণ; মনে রাখতে হবে কবির অবচেতনায় এই মিলন, এই গ্রহণ, এই গ্রসন্ at one and every point of time—অর্থাৎ নিত্যরাস। এই অদ্বয় জ্ঞান যেখানে সম্ভব সেখানে মৃত্যুর সঙ্গে বোঝাপড়া করতেই হয়—মৃত্যু মানেই খণ্ডতা, মৃত্যু মানেই দ্বৈতকে স্বীকার। তাই সত্যবানের মৃত্যুর পর সাবিত্রী যমকে বললেন—I bow not to thee, O huge mask of Death মৃত্যুদেব আমি তোমাকে স্বীকার করি না। Mask কথা ব্যবহার করে কবি বলতে চাইলেন যে মৃত্যু একটা মুখোস—অনন্ত জীবনেরই আবরণ। সেই পরম কল্যাণতম রূপকে দেখতে গেলে বলতে হয়—খোলো খোলো দ্বার, তোলো তোমার যবনিকা—স্বর্গতোরণ সামনে।

মৃত্যু হাসে—বলে, কিসের শক্তিতে তুমি বিশ্ববিধাতার চিরন্তন বিধানকে উল্টে দিতে চাও নারী—

সাবিত্রী বলে—My God is Love—আমার দেবতা প্রেম, I shall remake the Universe O ! Death—নতুন করে এই বিশ্বকে আমি গড়ে তুলবো।

যমরাজ হেসে বলেন—বাতুল—সেই পরম নেতিময় একের মধ্যে প্রেম নেই, ভালবাসা নেই, অমৃতত্ব নেই—তিনি চরম একাকী, আমি তারই প্রতীক্।

সাবিত্রী জবাব দিলেন—প্রভু, তুমি ভুল করছো, সেই নেতির মধ্যেই আছে ইতি—Everlasting yes—জল স্থির থাকলেও জল, হেলে দুলে ও জল।

I am, I love, I See, I act, I will

আমি আছি অয়মহং ভো, আমি ভালবাসি, মহাভাবে প্রাণারাম হই, আমিই দ্রষ্টা পুরুষ, আমি কাজ করি, যন্ত্র শুধু নই, যন্ত্রীও, আমি ইচ্ছা করি—অহং মন্যুতে।

যমরাজ তখনও তর্ক করেন—You should know—বিজানীয়াৎ, বিজ্ঞানী হতে হবে—বিরাট, বিপুল, বিশালের সম্যগের যে জ্ঞান—

সাবিত্রীর উত্তর অত্যন্ত স্পষ্ট—when I have loved for ever, I shall know—আমার জানা তখনি সম্পূর্ণ হবে যখন আমি ভালবাসবো চিরকালের জন্য। প্রেমই আমাকে জ্ঞানী করবে। আমার প্রেমের ঠাকুর এইখানেই, ইহৈব, কাদামাটির মাঝেই তিনি আছেন—আমার প্রিয়, প্রিয়তর, প্রিয়তম—আমার সব—আমার পূর্ণ, আমার জীর্ণ, তাঁরই চরণ চিহ্ন সব জায়গায়—ঈশাবাস্যমিদং সর্বং, সর্বং খল্বিদং। তিনি আছেন এই মর্ত্যের ও মৃত্যুর আবরণের মধ্যেও—কামকামনা লোভ-লালসার মধ্যেও—ভাগবত-বীজ সর্বত্র সুপ্ত।

Our Earth starts from mud and ends in sky

মাটিতে আরম্ভ সেই জীবনের, আকাশের পরমে তার শেষ—দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ—when unity is one, strife is lost.

হেরে গেলে তুমি প্রভু—

And all is known and all is clasped by Love
My Love eternal sits enthroned in God's
calm
For Love must soar beyond the very heaven
It must change its human ways to ways
divine.

প্রেমের শক্তিতে সবই জানা যায়, সবকেই ধরা যায়—প্রেম অনন্ত, শান্তমের মন্দিরে তার অধিষ্ঠান—কিন্তু এই প্রেম

মানুষী প্রেম নয়, একে দিব্য প্রেমে রূপান্তরিত করে নিতে হবে।

—একে শুধু বদলে দিতে হবে—কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছার স্বরূপ করে নিতে হবে—কেন।

Not for my heart's sweet poignancy
Not for my happy body's bliss alone
I have claimed from thee, the living Satyaban
But for his work and mine, our sacred charge

আমার নিজের সুখের জন্য নয়, দেহের ভোগের জন্য নয়—জগদ্ধিতায় আমাদের এই যুক্ত জীবন—

Our Love is the heavenly seal of the Supreme
For Love is the bright link twixt Earth and heaven
Love is the far Transcendent's angel here
Love is the man's lien on the Absolute.

প্রেমই হচ্চে স্বর্গ ও মর্ত্যের সেতু, দিব্যের বাহন, সেই এক ও অনাদির কাছে মানুষের ছাড়পত্র।

সাবিত্রী প্রেমের ঊর্দ্ধতম রাজ্যে উঠে যমরাজকে বললেন—

I am a deputy of the aspiring world.
... ...
Release the Soul of the world called Satyvan

ফিরিয়ে দাও সত্যবানকে—আমার প্রেম নিত্য, সত্য, অখণ্ড এ বাণী, অমোঘ বাণী। কালপুরুষকে হঠতেই হলো—

শ্রীঅরবিন্দ-প্রেমতত্ত্বের এই হলো মূল কথা। তার প্রজ্ঞা-মানসে প্রেমের যে প্রত্যয় উদ্ভাসিত সে প্রত্যয় স্থির—তিনি অসংশয়িত চিত্তে বলেছেন—তুমি আছ, আমি আছি।

ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ লীলারস—

রবীন্দ্রনাথের মহুয়ায় দেখেছি কবি-প্রেমের একান্ত তপস্বিনী একাকিনীকে নিয়ে গেছেন এক অনন্তমেয় ঊর্দ্ধের রাজ্যে

যে মুক্তি রয়েছে লীন বন্ধহীন শান্ত অন্ধকারে
অরণ্যে অরণ্যে আজি সাগরে সাগরে
জনশূন্য তুষার শিখরে
কোন মহাশ্বেতা কোন তপস্বিনী বিছালো অঞ্চল
শুভ্র অচঞ্চল
অনন্তেরে সম্বোধিয়া কহিল সে উর্দ্ধে তুলি আঁখি
তুমিও একাকী

এও অপূর্ব উপলব্ধির রাজ্য—শ্রীঅরবিন্দ আর এক ধাপ এগিয়ে বললেন—তুমিও একাকী নও, আমিও একাকী নয়, আমরা সব সময়েই মিলিত—সে মিলন অনন্ত, অসীম, রসলীন—তার মধ্যে মৃত্যুর অধিকার নেই, খণ্ডের বোধ নেই, নিয়তির নির্দেশ নেই। এই পূর্ণ পরিণামের কথাই সাবিত্রীর শেষকথা

আছো জাগি পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন।
সেই প্রেমের ওঠানামায় মানুষ দেবতা, দেবতা মানুষ।

আসন

শ্রীচিত্র শর্ম্মা

মোর দীর্ঘ জীবনের ক্ষুদ্র তাঁত-শালে
চালায়েছি প্রতিপল মাকু তালে-তালে,

সুরে সুরে কান্না-হাসি,
পান্নার মিনার রাশি
বসায়ে গিয়াছি মোর বাসনার ভালে।

বুটী-তোলা সুখ-দুখে,
চুম্‌কির চিকন্ মুখে
স্নায়ু-সূতা কারুতার মানেনি শাসন,
একা-একা অন্তরালে,
জীবনের তাঁত-শালে
আমার দেবতা লাগি বুনেছি আসন।

কবীর-তীর্থ—মগহর

শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

নর্থইষ্টার্ণ রেলওয়ে লক্ষ্ণৌ-গোরক্ষপুর সেকশনের মধ্যে ছোট্ট একটি ষ্টেশন—নাম মগহর। গোরক্ষপুর হইতে মগহরের দূরত্ব মাত্র ষোল মাইল। উত্তর প্রদেশের বস্তী জেলার অন্তর্ভুক্ত এই মগহর গ্রাম ভক্ত-কবি কবীরের দেহাবসান স্থান ও সমাধিভূমি। বস্তি শহর হইতে মগহরের দূরত্ব ২৭ মাইল। গোরক্ষপুর হইতে ফয়জাবাদগামী পাকা সড়কের পার্শ্বে এই গ্রাম অবস্থিত।

মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক কবীরের জন্ম হইতে মৃত্যু-ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। কেহ বলেন—কবীর কোন ব্রাহ্মণ বিধবার পুত্র, মুসলমানের গৃহে পালিত; কেহ বলেন—তিনি মুসলমান জোলার ঘরেই জন্মগ্রহণ করেন। কবীর স্বয়ং নিজেকে কাশীর জোলা ও গুরু রামানন্দের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

আচার্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের মতে নাথপন্থী সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা মুসলমান ধর্মগ্রহণ করেন তাঁহারাই জোলা বলিয়া পরিচিত হন। বাঙ্গলাদেশের যুগী বা যোগীরা নাথপন্থী, তাঁত-বোনা এই সম্প্রদায়ের জীবিকা। সমগ্র উত্তর ভারতে একসময়ে গুরু গোরক্ষনাথের নাথধর্মের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। গোরক্ষপুর নাথধর্মের অন্যতম কেন্দ্র, গোরক্ষপুর হইতে কাশী বহুদূরে নহে, সুতরাং জোলাদের পূর্বপুরুষেরা নাথপন্থী ছিলেন এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক কাশীর পণ্ডিত বা মোল্লা-প্রভাবিত হিন্দু বা ইসলাম ধর্মের পরিবেশের মধ্যে কোনধর্মের অন্ধসংস্কার কবীরের ধর্মমতকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। এই হিসাবে কবীরকে একজন বিদ্রোহী সাধক বলা যাইতে পারে। কবীরের উদার ও সার্বজনীন মতবাদ ভারতের নানাস্থানে যেমন হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বহু ভক্তশিষ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল তেমনি আজীবন বহু নির্যাতন ও প্রতিকূলতা তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল।

আপন সাধনালব্ধ মতবাদ অত্যন্ত সহজবোধ্য লোকভাষায় প্রকাশ কবীরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কবীরের ধর্মমতাবলম্বীরা কবীরপন্থী নামে পরিচিত—উত্তর ভারতে কবীরপন্থীর সংখ্যা নগণ্য নহে। অবশ্য সহজবোধ্য, তেজোদ্দীপ্ত-ভগবদ্ভক্তি-স্নিগ্ধ দোঁহাবলীর রচয়িতা হিসাবেই কবীর অধিকতর জনপ্রিয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কবীর-সাহিত্যের একজন পরম ভক্ত ছিলেন। গীতাঞ্জলির কবিতাগুলির সহিত কবীরের ভাবধারার আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। এই প্রভাব কবীর সাহিত্যের মর্মমূলে অনুপ্রবেশের পরিণাম। গীতাঞ্জলি প্রকাশের পর খৃষ্টীয় মিশনরীগণ খৃষ্টীয় ধর্মমতের নিকট রবীন্দ্রনাথকে ঋণী প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। মধ্যযুগের ভারতীয় সাধনার সহিত তাঁহার মানসিক যোগাযোগ প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় পাঠকদের জন্য কবিগুরু কবীরের একশতটি কবিতা নিজে ইংরাজীতে অনূদিত করিয়া প্রকাশ করেন। এই পুস্তক One hundred poems of Kabir নামে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকা প্রকাশের পর ইউরোপে কবীরের নাম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশেও শিক্ষিত সমাজে কবীরের সমাদর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিছুদিন পূর্বে স্বাধীন ভারত-সরকার কবীরের প্রতিকৃতি সমন্বিত ডাকটিকিটের প্রবর্তন করিয়া লোকমানসে কবীরের স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ সরকারী সংগ্রহশালায় রক্ষিত পঞ্চদশ শতকে অঙ্কিত প্রাচীন চিত্র হইতে এই প্রতিকৃতি গৃহীত হইয়াছিল।

কথিত আছে যে কবীরকে কেহ উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন—তুমি কাশীতে বাস কর, তোমার আর মুক্তির ভাবনা কি? এই কথা শুনিয়া কবীর কাশী হইতে মগহরে চলিয়া আসেন এবং এইখানেই তাঁহার নরলীলার অবসান ঘটে। কবীর তাঁহার বিদ্রোহী মতবাদের জন্য কাশী হইতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন ইহাও শুনা যায়।

কবীরের মৃত্যু সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী প্রচলিত আছে। কবীরের দেহান্তের পর তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার দেহের সদ্গতি লইয়া কলহ আরম্ভ করিল, শিষ্যেরা কেহ হিন্দু কেহ মুসলমান। হিন্দু-শিষ্যেরা দেহ দাহ করিতে চাহিলেন, বলিলেন কবীর হিন্দু। মুসলমান শিষ্যেরা বলিলেন, গোর দিতে হইবে কবীর জোলা মুসলমান। শবের আচ্ছাদন উঠাইয়া দেখা গেল—দেহ নাই, কতকগুলি ফুল পড়িয়া আছে। মুসলমানেরা কতকগুলি ফুল লইয়া সমাধি দিলেন, হিন্দুরা কতকগুলি ফুল লইয়া দাহ করিলেন। জীবিতকালে যাঁহার জীবন কুসুমের মতই নির্মল ও সুরভিত ছিল, মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ পুষ্পরাশিতে পরিণত হওয়ার কাহিনী সত্যই উপভোগ্য।

কবীরের দেহান্তকালের এই ঘটনা সর্বাংশে সত্য না হইতে পারে—তবে উহা যে নিছক কল্পিত কাহিনী নহে মগহরে আসিলে তাহার প্রমাণ মিলিবে। মগহর ষ্টেশন হইতে এবং মগহর গ্রামের জনবসতি হইতে প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরে আমি নাম্নী একটি স্রোতস্বিনীর তীরে পাশাপাশি দুইটি সৌধে কবীরের দেহাবশেষ রক্ষিত রহিয়াছে। কবীরের সমাধির উপর মুসলমান শিষ্যরা একটি মকবরা বা সমাধি-সৌধ নির্মাণ করেন, ইহার স্থাপত্য মসজিদের অনুরূপ। ইহার পাশেই হিন্দু শিষ্যদের দ্বারা স্থাপিত সমাধি মন্দির। কবীরজীর দেহাবশেষ কাশীতে লইয়া গিয়া দাহ করা হয় ও ভস্মাবশেষ এখানে প্রোথিত করা হয় বলিয়া কথিত আছে। হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীর দেহ দাহ করার প্রথা নাই, কবরস্থ করার বিপরীত প্রথা হিসাবে দাহপ্রসঙ্গ-কাহিনীতে স্থান পাইয়াছে বলিয়াই পণ্ডিতদের অনুমান। যাহা হউক কবীরের দেহাবশেষের অর্দ্ধাংশ ভস্ম-

হিসাবেই হউক বা পুষ্পরাশি হিসাবেই হউক এই স্থানে সমাহিত হয় ও তাহার উপর স্মৃতিমন্দির নির্মিত হয়। এই মন্দিরে নিত্য আরতি পূজা প্রভৃতি নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন হয়। মন্দিরটি প্রশস্ত বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত ও সুরক্ষিত। কাশীর কবীর-চৌরায় কবীরপন্থীদের প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত; এই কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানেই এই মন্দিরের সমস্ত কার্য পরিচালিত হয়। মুসলমানদের নির্মিত সৌধটি অধুনা শ্রীহীন ও উপেক্ষিত মনে হয়। এই সৌধটির চারিদিকে ও বেষ্টনী আছে। বেষ্টনীর মধ্যে বহু ফকিরের সমাধি রহিয়াছে। এক কোণে কবীর-পুত্র কামালের সমাধি আছে। মুসলমানদের জন্য সমাধি সৌধটি দিল্লীর বাদশাহের অন্যতম সেনাপতি নবাব ফিদাই খান কর্তৃক ষোড়শ শতাব্দীতে পুনর্নির্ম্মিত বা সংস্কৃত করা হয়। মগহর পরগণার একটি গ্রামের রাজস্ব হইতে এই সমাধির ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। একটি জোলা পরিবারের উপর সমাধির রক্ষণাবেক্ষণ ভার ন্যস্ত আছে।

প্রতি বৎসর পৌষ মাসে মগহরে একটি বিরাট মেলা বসে। নানা-স্থানের হিন্দু মুসলমান ভক্ত-যাত্রীর সমাবেশে স্মৃতি সৌধ দুটির চারিপাশ মুখরিত হইয়া উঠে। পরবর্ত্তীকালে মেলা উপলক্ষে সমবেত যাত্রীদের সুবিধার্থে এই স্থানে 'আমি' নদীর তীরে একটি মসজিদ ও একটি শিব-মন্দির নির্মিত হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ-গোরখপুর রেলপথের ট্রেণ-যাত্রীরা ট্রেণ হইতেই পাশাপাশি অবস্থিত মন্দির ও মসজিদ দুটি স্মরণ করেন।

যাত্রি-সাধারণের সুবিধার্থে মগহর ষ্টেশনটি পূর্বোত্তর রেলওয়ে কর্তৃক কিঞ্চিদূর্দ্ধ দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে সম্প্রতি পুনর্নির্মিত হইয়াছে। ভারতীয় স্থাপত্য কলাসম্মতভাবে নির্মিত ষ্টেশন ভবনটির উপর কবীর সমাধির উপর নির্মিত মন্দির ও মসজিদের অনুকরণে দুইটি গম্বুজ নির্ম্মিত হইয়াছে। ষ্টেশন ভবনের চতুষ্পার্শ্বে প্রস্তর ফলকের উপর কবীরের কয়েকটি সুনির্বাচিত দোঁহাবলীও খোদিত রাখা হইয়াছে। নবনির্মিত ষ্টেশন সকল শ্রেণীর যাত্রিদের বিশ্রাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আরামপ্রদ বিশ্রামালয়ের ব্যবস্থা সমন্বিত রাখা হইয়াছে। কবীরের সর্ব-ভারতীয় বিপুল জনপ্রিয়তার তুলনায় কবীরের অন্তিম আশ্রয় ভূমি মগহর এখনও সর্বভারতের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে মগহর এরূপ অনাদৃত থাকিবে না। অচিরেই ইহা একটি দর্শনীয় স্থানে পরিণত হইবে।

॥ বিদ্যুৎ ॥

কৃতী সোম

ওই বুঝি ভেংগে গেল কালির দোয়াত :
মেঘলা আকাশে
কালো রঙ্ মেলে দিলো মিশ্ কালো হাত।

কালি নয়, রঙ নয়, চিন্তার পাহাড়
মনের আকাশে জমে, শুষ্ক জীর্ণ ঝাড়
অকস্মাৎ ভরে ওঠে,
কামনা-পাখিরা ছুটে
অন্তহীন আবেগ ডানায়,
তারপর আকাশের ছবি বদলায়।
বিদ্যুৎ-আগুন
কখন ঝলকে উঠে, আমি বুঝি খুন!

আমার আকাশ চম্‌কায়,
আবার দু'চোখ ঝল্‌সায়,
আমাকে আহত করে যায়;
রাক্ষুসে পাখির মত খুঁটে খুঁটে খায়
আমার সবুজ কত সুখ
প্রজ্বলন্ত বিদ্যুতের মুখ।
সেতো নয় তিলোত্তমা—নিটোল নিখুঁত,
পৃথিবীর মেয়ে এক—মালবী বিদ্যুৎ।

চম্‌কায়—ঝল্‌সায়—কাঁপে থরথর,
দেহের মেঘেরা ঝরঝর
পড়বে কি গলে গলে এ-স্নেহের তীরে?
বিহ্বল সীমানা ঘিরে ঘিরে?
বর্ষণের আগে কই হাতছানি নীল?
শিরায় শিরায় শুধু টগ্‌বগ্
রক্তের মিছিল।

ভল্লুকের কবলে

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

আমি যে যুগের কথা বল্‌ছি, তখন Coxwell Harrison Certus-Cordite 450400 Repeating Rifle খুব জনপ্রিয় ছিল এবং ব্যবহাররীতি Rossএর মত সোজাসুজি টানতে হয়। এতে ৬০ গ্রেণ Cordite আর চারশ' গ্রেণের সওয়া তিন ইঞ্চি কার্ট্রিজ ব্যবহার হত—দেখতে যেন ছোটখাটো বোতলের মত। সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না—এই রাইফেল আমিও কিছুদিন ব্যবহার করেছিলাম।

প্রায় সাঁইত্রিশ বছর আগের কথা। মাঝে মাঝে ছিটকে এধার ওধার শিকারে বেরিয়ে যাই। এবার রঙ্গমঞ্চ কর্ণগড়—পটভূমিকা মেদিনীপুর, অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক, দৃশ্যাবলী উজ্জ্বল মোটেই নয়, বরং কিছুটা ঘোলাটে বলা যেতে পারে।

জুন মাস—কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। এদিককার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, ধারাবর্ষণ হলেই শালগাছের জঙ্গলে তিনটি করে পাতা গজিয়ে ওঠে। সেটা ক্রমেই এত ঘন হয় যে দূরে দৃষ্টি চলেনা—আর সেইজন্তেই জঙ্গলে ভালুকের সন্ধান পাওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে।

আমরা চারজন ভবঘুরে। সঙ্গী আরও আছে—দুজন সাঁওতাল আর দুটি কুকুর। জঙ্গল বিট্ করা হয়নি—আমরা পায়ে হেঁটেই এধার ওধার ঘোরাফেরা করি।

প্রায় ঘণ্টা দুই খোঁজাখুঁজির পর ভালুকের পায়ের চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল। ঐ জঙ্গলে মাঝেমাঝেই উইয়ের ঢিবি আছে। ভালুক এসে প্রায়ই নখ দিয়ে ওই বল্মীকের গা চিরে ফুটোর মধ্যে নাক লাগিয়ে দেয়—আর নিঃশ্বাসের এক একটা লম্বা টানে পোকা বের করে এনে খায়।

খানিকটা অনুসন্ধানের পরেই ভালুকের অবস্থিতি টের পেয়ে গেলাম। কারণ তাদের কোনও একটা শব্দ শুনে বা গন্ধ পেয়ে সাঁওতালদের কুকুর দুটো উর্দ্ধশ্বাসে কোথায় যে পালিয়ে গেল—তার আর পাত্তা নেই। শিকারে এসে কুকুরের এই বিপরীত আচরণ দেখে স্তম্ভিত হ'লাম। এতদিন দেখেছি যে, তারাই জঙ্গলে ঢুকে শিকার তাড়িয়ে বের করে আনে। সেই আদিযুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত এরা সমান তালে প্রয়োজনের রসদ যুগিয়ে এসেছে। মহাভারতের যুগে কুকুররূপী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল—একথা বাদ দিলেও, ঘরে ঘরে কুকুরের কী যত্ন, কী সেবা—দেখে মনে হয়, মানুষের চেয়ে তাদের চাহিদা এতটুকুও কম নয়—রাত্রে তারা পাহারা দেয়, বাজারের থলি বয়ে আনে; আমি আবার এমন একটা সাধারণ দেশী কুকুরের কথা জানি, যে থলির মধ্যে পয়সা আর জিনিষের ফর্দ্দ নিয়ে দোকান থেকে রীতিমত সওদা করে আনে—কোনও জিনিষ বাদ পড়লেই কেঁউ কেঁউ করে আর সেখান থেকে নড়তে চায়না। আজকাল তো কথাই নেই। মানুষের তৈরী নকল চাঁদে উঠে অনন্ত মহাশূন্যে পৃথিবী বেষ্টন করে পরিক্রমণ করেছে সর্ব্বপ্রথম সেই কুকুরই।

কুকুর-মাহাত্ম্য বাদ দিয়ে এবার শিকার-মাহাত্ম্যে আসা যাক।

আমরা দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেলাম। ওদিকে চারজন—আর এদিকে আমি আর আমার পাশেই শাণিত-তীরভল্ল নিয়ে একজন সাঁওতাল। ওরা গেল বাঁদিকে, আর আমরা গেলাম ডাইনে। ভাল্লুকপ্রবর ঠিক কোথায় এবং কী ভাবে আছেন—সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা দুজন এগিয়ে যাই।

ওদিকে ভাল্লুকও জঙ্গলে মানুষের আগমন টের পেয়েছে, কারণ সব জন্তু-জানোয়ারই জঙ্গলে নূতন কিছুর আমদানী হলেই বুঝতে পারে। বনের জীব-জন্তুর সহজাত অনুভূতি এতই তীক্ষ্ণ যে জঙ্গলে কেউ ঢুকলেই তারা টের পেয়ে যায়। অরণ্যচারী যে কোনও পশু-পক্ষীরই এটা স্বভাবজাত ধর্ম্ম।

অদূরে উপর্য্যুপরি কয়েকটি গুলীর আওয়াজ হতেই বোঝা গেল, একটি জানোয়ার যেন আমাদের দিকেই ছুটে আসছে। চীৎকারেই বুঝলাম, ইনিও ভাল্লুক না হয়ে

যান না। লক্ষ্য করে দেখি, আমার কাছ থেকে প্রায় ২০ গজ দূর দিয়ে জানোয়ারটা ছুটে যায়—আমিও দৌড়ে কিছুটা এগিয়ে গেলাম, যাতে ভাল করে দেখতে পাই। যেমন দেখা অমনি আওয়াজ।

আশ্চর্য্য, সে পড়ল না—ফিরেও চাইল না, গতি-বেগেরও কোনও হ্রাস নেই—ছুটেই চলেছে! বেশ লক্ষ্য করে দেখলাম—সে যেন ডান দিকে ঘুরতে চায়। আমিও তখুনি ছুটে গিয়ে ডান দিকে দাঁড়ালাম এবং তার দেহের উপযুক্ত স্থান নজরে আসতেই আবার গুলী করি। ততক্ষণে ভাল্লুকটা ঘুরে আমার সামনা-সামনি এসে পড়েছে। আমার আর ভাল্লুকের ব্যবধান অত্যন্ত অল্প—প্রায় বিশ পঁচিশ ফুট হবে।

খুব তাড়াতাড়ি রাইফেলে আবার গুলী ভরতে যাই—কী সর্ব্বনাশ। ব্যবহৃত গুলীর খোলটা একেবারে নলের মধ্যে আটকে গিয়েছে—নড়াচড়ার নাম গন্ধ নেই। প্রাণ সংশয়াপন্ন—এই মুহূর্ত্তেই ভালুকের স্নেহ-আলিঙ্গনে লৌহ-ভীম চূর্ণ হয়ে যাবে। কী বীভৎস রূপ। তার লেলিহান জিহ্বায় যেন মৃত্যুর আহ্বান! সুতীক্ষ্ণ দাঁতগুলো সূর্য্য-কিরণে ঝিক্‌মিক্ করে উঠল।

আমার স্থির লক্ষ্য ভালুকের চোখের ওপর—সে যদি আর দু'পা এগিয়ে এসে আক্রমণ করে, তবে আমার হাতের রাইফেলটি ওর মুখে ঢুকিয়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ বন্দুকটি তখন আমার উরুদেশে—স্কন্ধে নয়—আর বেল্ট নিয়ে টানাটানি করবারও সময় নেই। ইতিমধ্যে আমার কানে আরও দুটি গুলীর আওয়াজ এসে পৌছুলো—তার সঙ্গে দূরে আহত ভালুকের চীৎকারও শুনতে পেলাম। কিন্তু তখন নিজেই মারা যাই—কাজেই সেদিকে লক্ষ্য করবার ফুরসৎ কোথায়?

এত কাছে এসেও ভালুকটি আমার দিকে তাকিয়ে হ্যাঃ হ্যাঃ করতে থাকে। ভাবলাম, এই মুহূর্ত্তে দু-পায়ে ভর দিয়ে, দু-হাত উর্দ্ধে তুলে আমার উপর ঝাঁপ দেয় আর কি। আর মাত্র চার পাঁচ ফুটের ব্যবধান! আমার দৃষ্টি বিস্ফারিত, নিঃশ্বাস রুদ্ধ, বুকের স্পন্দন দ্রুততর, বুঝি আর রক্ষে নেই।

ভগবান্ যাকে বাঁচান, তাকে মারে কে?

হঠাৎ ভাল্লুকটা টাল খেয়ে বাঁদিকের খাদে গড়িয়ে পড়ল। গড়াতে গড়াতে নীচে কিছুদূর গিয়েই ভল্লুকটির ভবলীলা সাঙ্গ।

ওদিকে আমার দলীয় লোকের কলরব শুনতে পেলাম। কী সংবাদ? জানতে কৌতূহল হওয়াটা বিচিত্র নয়। প্রাণে রক্ষা পেলাম তাই, নইলে বিপরীত কিছু ঘটলেই সংবাদ নেওয়াটা এ জন্মের মত ফুরিয়ে যেত। সঙ্গীদের কাছে শুনলাম, দুটো ভালুক ছিল—একটা শুয়ে আর একটা বসে। বসা ভালুকটাকে গুলী করতেই অপরটি কোথায় ছুটে পালিয়ে গেল।

বাধা দিয়ে বলি—

—সেটি আমার গুলীতে জখম হয়ে একটা খাদে টাল খেয়ে পড়েই অক্কা।

আমার বন্দুক বিভ্রাট ও প্রাণ বিপন্ন হওয়ার কথা তাদের সবাইকে খুলে বল্‌তেই তারা সচীৎকারে আমাকে অভিনন্দন জানালে—

…Long live our Hero—কিন্তু—

—আবার কিন্তু কী?

—তুমি তো ভাই নিপাতনে সিদ্ধ—এদিকে কিন্তু চার-পাঁচটা গুলী খেয়েও আমাদের ভল্লুকটি যে 'ভাগল্‌বা'!

—এত গুলীবৃষ্টি সত্ত্বেও? তাহলে নিশ্চয় ঠিক জায়গা মত লাগেনি।

জনৈক বন্ধু মুরুব্বীয়ানা চালে উপদেশ দেন।

—আরে, ওসব কথা এখন যেতে দাও—এই নাও আমার winchester Rifle—তুমি নিজেই একবার চেষ্টা করে দেখনা, কী হয়! আমার জন্যে পরোয়া কোরোনা—রিভলবার হ্যাজ্!

তিনি কটিবন্ধে রক্ষিত রিভলবার একহাতে দেখিয়ে অপর হাতে তাঁর রাইফেল আমার হাতে তুলে দিতেই পূর্ব্বতন সাঁওতাল সঙ্গীটিকে নিয়ে আমি আবার ছুটে চলি। তাঁরাও আমার পশ্চাদ্ধাবন করেন। কিছুদূর হৈ-চৈ করে এগিয়ে যেতেই অদূরে দেখলাম, সেই গুলী-খোর ভাল্লুকটি যেন মরণোন্মুখ অবস্থায় দুহাত বাড়িয়ে টলতে টলতে ধেয়ে আসে—তবুও দুইঞ্চি, আড়াই ইঞ্চি মোটা শালগাছগুলো মট্‌মট্ করে ভাঙবার শক্তি তখনও সে রাখে। ধার-করা রাইফেলটাই তখন কাজে লাগিয়ে দিলাম। বুকের সাদা জায়গায় আমার গুলী লাগতেই

সেই বিশালকায় ভালুকটি এবারকার মত ভবযন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে গেল !

অগ্রগামী বন্ধুদের বলি—

—এ শিকার আমার নয়—সর্ব্বপ্রথম যার গুলী ওর দেহ স্পর্শ করেছে—আইন অনুযায়ী এটি তারই প্রাপ্য।

আইন দেখালাম বটে, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদও শুনলাম—

—সে আর কেমন করে হয় ? আমরা সবাই চাঁদা করে চালিয়েছি—কার গুলী যে কালা-মাণিকের অঙ্গ স্পর্শ করেছে, কে জানে ! অতএব লটারী করেই ওর মালীকানা সাব্যস্ত করা হউক।

মুরুব্বী বন্ধুটির উত্তরে যে মুনশিয়ানা ছিল, তার উপযুক্ত জবাব খুঁজে পেলামনা।

এদিকে সাঁওতালের হাতে আমার নিজের বন্দুকটি চোখে পড়তেই, সেটি নিয়ে, একটা মসৃণ সরু শালের ডাল দিয়ে উল্টো দিক থেকে নলের মধ্যে খোঁচা দিতেই সেই আটকে-যাওয়া গুলীর খোলটা বেরিয়ে এলো।

শিশুকালে পড়েছি—একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। হাড় বের হতেই বাঘ যেমন তার নিজস্ব রূপ ধারণ করেছিল, খালি কার্ট্রিজ বেরিয়ে আসতেই, আমার বন্দুকও তেমনি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেল।

উৎসাহী সাঁওতালেরা তখন ভালুকটিকে লোকজনের সাহায্যে বয়ে নিয়ে যায়—আমরাও পশ্চাতে শবানুগমন করি। প্রকাশ্য রাজপথের ধারে, অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার একটা জায়গায় সেটাকে এনে ফেলতেই, আঙুল দেখিয়ে জনৈক মোড়লের গদ্‌গদ্‌ ভাব—

—চাইন্দা রে চাইন্দা—বাঁচাইলেন, সায়েবরা বাঁচাইলেন।

ভালুকটার কপালে অর্দ্ধচন্দ্রের মত বেশ পরিষ্কার একটা দাগ—মস্তকের অগ্রভাগ একেবারেই লোমশূন্য। জবা-কুসুম মাখলে টাকে চুল গজায় কিনা, সেটা সৌন্দর্য্য-উপাসকরাই বলতে পারেন—কিন্তু আমাদের এই ভালুকটি রোজই যে কাদাকুসুম মাথায় মাখতেন, তার সাক্ষাৎ বিবরণ দিলে গাঁয়ের সেই মোড়ল—রীতিমতো লোমহর্ষণ ব্যাপার হলেও লোক ধর্ষণের জ্যান্ত সাক্ষী সে নিজেই। রোজ বিকেলে সেই ভালুকটি নাকি পুকুর পাড়ে এসে মানুষের মতই তার অঙ্গসজ্জা সুসম্পন্ন করতো—আর মাঝে মাঝেই সেই 'পাড়-বাঁধানো' পুকুরের আরশিতে নিজের অপরূপ মূর্ত্তি দেখে, বিরক্তি ও ঘেন্নায় যেন দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠতো—তার ফলে মেয়েরা কেউ 'গাগরী-ভরণে' ওপথে হাঁটতো না—এমন একটা জলজ্যান্ত যম-দূতের সামনে কেই বা যেতে চায় !

এই কথা শুনেই একজন শিকারী বলে উঠল—

—ভালুকের হাবভাবও অনেকটা মানুষের মতই। দু পায়ে হাঁটে—বাচ্চা কোলে নিয়ে আদর করে—আবার গারো পাহাড়ে একজাতের ভালুক আছে তাদের বৌ-মারা ভালুক বলে—বৌকে যেমন আদর করে, তেমনি কথায় কথায় 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' দিতেও ছাড়েনা। মানুষ অবশ্য এখন সেই আদিমযুগ কাটিয়ে এসেছে।

অতঃপর পরীক্ষা কার্য্য। কয়েকটি গুলী লেগেছে—কোমরে পিঠে, তলপেটে, আর একটি সামনের হাতে—আর ভালুকের বক্ষে আমার বুলেট ! মেপে দেখা গেল পাকা ৭ ফুট ৪ ইঞ্চি।

আজকাল সমবায় পদ্ধতিতেই কাজ করার রীতি; কিন্তু সে যুগেও শিকারে সমবায় শক্তি নিয়ে আমরা যে এক বিশাল ঋক্ষরাজকে ভূপতিত করেছিলাম—তার আনন্দও কোনো অংশে কম নয়।

এবার আমাদের সেই টেকো ভালুকটির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। যিনি একদিন কাদায় মাথা খুঁড়ে অঙ্গপ্রসাধন করতেন, এবার তিনি 'ট্যান' হয়ে এসে তোরণদ্বারের অঙ্গশোভা বৃদ্ধি করবেন। জনৈক প্রবীণ মোড়লের হাতে দু'খানা দশটাকার নোট গুঁজে দিয়ে ভালুকটির চামড়া ছাড়িয়ে আমাদের ক্যাম্পে পাঠাবার নির্দ্দেশ দিলাম। সেই সঙ্গে এটাও বিশেষ করে তাদের মগজে ঢুকিয়ে দিই, আমার স্বহস্ত-নিহত যে ভালুকটি খাদের গহ্বরে নিজের সমাধি রচনা করেছে, তারও ছাল ছাড়িয়ে যেন ঐ সঙ্গেই পাঠিয়ে দিতে ভুল না হয়।

শেষের পরও অবশেষ থাকে ?

এবার সংক্ষিপ্ত সমাচার। আমরা চাঁদা করে যে ভালুকটি মেরেছিলাম, সেই চাইন্দার চামড়াটি পরদিন আমাদের আস্তানায় এসে পৌঁছুল। আমি স্বয়ং যে ভালুকটিকে নিধন করেছিলাম, সেটি এলো না। তার কারণ জানতে চেয়ে শুনলাম—সেই সাঁওতাল কোন এক সৌখীন বাবুর কাছে সেটা বিক্রী করে দিয়েছে—হেতু নাকি তাড়ি খাবার পয়সার অভাব। তাছাড়াও কর্জ্জ নিয়েছিল—সুদে আসলে পরিমাণটি বৃদ্ধি হওয়ায়, আমার মাথায় হাত বুলিয়ে সে নাকি ধার পরিশোধ করে তবে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

এই শুভসংবাদটি অবগত হয়ে আমিও নিশ্চিন্ত হ'লাম।

চিত্রোপম ভারত

উপানন্দ

ভারতবর্ষ আমাদের জন্মভূমি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই ভারতবর্ষকে বন্দনা করে গেয়েছেন—'প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে—' কবি দ্বিজেন্দ্রলাল এই জন্মভূমির প্রশস্তি বন্দনা করে তাঁর অমর সঙ্গীত রেখে গেছেন—'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি, সকল দেশের রাণী সেযে আমার জন্মভূমি'—ভারতের রাজধানী দিল্লী। এই দিল্লী অঞ্চল বহুলক্ষ বৎসর আগে কেমন করে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল এ সম্পর্কে ডক্টর ডি, এন ওয়াডিয়া গবেষণার সাহায্যে অন্তর্দৃষ্টি বলে ব্যক্ত করেছেন নয়া দিল্লীতে ভারতীয় ভৌগোলিকদের সাধারণ বার্ষিক সম্মেলনে। এই সম্মেলনে তিনি ছিলেন সভাপতি।

সভাপতির ভাষণ থেকে আমরা জানতে পারি যে আরাবল্লী পর্ব্বতমালার উত্তর শৈল-শিরায় যেখানে দিল্লী অবস্থিত, তার জন্ম হয়েছে এক শত কোটি বছর পূর্ব্বে। সেই সময়ে এইসব গিরিশ্রেণী জন্মলাভ করে। তারপর এলো মৃত্তিকার তীব্র সাময়িক আক্ষেপ ও আলোড়ন। ফলে উত্তর ভারতে অধিকাংশ ভূখণ্ড এমন কি দিল্লীও, সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়ে গেল আর বিশ হাজার ফুটের ওপর সামুদ্রিক পলি পুঞ্জীভূত হয়ে রইলো। ষাটকোটি বছর পূর্ব্বে সমুদ্র থেকে উত্থিত হোলো উত্তর ভারত ভূমি, আর সেই সময় থেকে দিল্লী ও কন্যাকুমারিকার মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ড সুদৃঢ় স্তরভুক্ত হয়ে রয়েছে। যে উত্তর-ভারতীয় সমুদ্র একদা দিল্লী অঞ্চল ও তার সন্নিহিত শৈলশিরা গ্রাস করেছিল, সেই সমুদ্র প্রায় দশকোটি বছর পূর্ব্বে হিমালয়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল। সিন্ধু গাঙ্গেয় উপত্যকার সৃষ্টি হয়েছে পরবর্ত্তীকালে। দিল্লী অঞ্চলের ভৌগোলিক ইতিহাসের সময়কাল যদি চব্বিশ ঘণ্টা ধরে নেওয়া যায় তা হোলে হস্তিনাপুরের প্রতিষ্ঠা সময় থেকে ধরে দিল্লীতে মানুষের বসতির সময় নির্ণীত হবে এক সেকেণ্ডের ষাটভাগের চার ভাগ—ডাঃ ওয়াডিয়া তাঁর ভাষণে এই কথাই বলেছেন, তাহোলে বুঝে দেখ এই ভারতবর্ষ কত প্রাচীন, এখানে মানুষের বসতি ও সুরু হয়েছে সংখ্যাতীত বর্ষে আর এর সভ্যতা ও সংস্কৃতিও সবচেয়ে পুরাতন। বৈদিক সভ্যতার আবির্ভাবকাল এর তুষার-প্রবাহ যুগেরও পূর্ব্বে। এই 'ভারতের মহামানবের সাগর তীরে' জন্মলাভ করে তোমাদের গর্ব্ব অনুভব করা উচিত।

পৃথিবীতে কোথাও ভারতবর্ষের মত বিচিত্র সৌন্দর্যাপূর্ণ দৃশ্যময় দেশ নেই, এখানে ষড়ঋতু নিত্য খেলা করে। অতীতের ভগবৎপ্রেরিত শ্রমশিল্পীরা এর প্রাচীন স্মৃতিসৌধ আর প্রাসাদশ্রেণী এমনভাবে গঠন করে গেছেন যে, আমরা আজও তার নিদর্শনগুলি দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাই। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ভারতবাসীদের সামাজিক আচার-পদ্ধতি, পালপার্ব্বণ অনুষ্ঠান, পর্ব্বসমারোহ, ধর্ম্ম, আধ্যাত্মিকতা, যোগ, দর্শন ও শিল্পকলার অত্যাশ্চর্য্য বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর ভিতরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে সমাদৃত—প্রাচীন ভারত গৌরবের উচ্চশিখরে উঠেছিল। বর্ত্তমানে যন্ত্রবিজ্ঞানের যেসব নব নব আবিষ্কার দেখে আমরা বিস্মিত হয়ে যাচ্ছি, এসব আবিষ্কৃত হয়েছিল রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে, যন্ত্রসভ্যতা উঠেছিল চরমোন্নতির গৌরীশৃঙ্গে—যন্ত্রযুগের আধিপত্য আজকের দিনের মত সেযুগেও হয়েছিল, তাই এর ধ্বংসের জন্যে ভগবান বারে বারে মানুষের রূপ ধরেছিলেন। পাশ্চাত্য জাতিরা সংস্কৃত শিক্ষালাভ করে আর এদেশের পুঁথিপত্র নিজেদের দেশে নিয়ে গিয়ে তন্নতন্ন করে পড়েছে আর বিশ্লেষণ করেছে। আজ যে জড়-বিজ্ঞানকে উপাসনা করা হচ্ছে, সেই বিজ্ঞানই অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর ধ্বংসের কারণ হবে।

প্রাচীন ভারত বারে বারে এই বিজ্ঞানের দানবীয় লীলার সঙ্গে পরিচিত হয়ে শেষে এর উচ্ছেদসাধন করেছে, আর প্রকৃতির স্তন্যপান করে পুষ্ট হয়ে প্রাকৃতিক নিয়ম-বহির্ভূত সর্ব্বপ্রকার কাজ বর্জ্জন করে গেছে, এই ভারত জড়বিজ্ঞানকে প্রশ্রয় না দিয়ে ভগবানের লীলা-বৈচিত্র্যের রসাস্বাদন করে অমৃতের সন্তান হয়েছিল। পৃথিবীর ধ্বংস আগতপ্রায়, এর জন্য দায়ী জড়ধর্ম্মী পাশ্চাত্য জগৎ। আজ আমরা পাশ্চাত্যজাতির পদলেহী, এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হোতে পারে!

যাহোক যারা প্রকৃতির পূজারী, উদ্ভিদতত্ত্ববিদ আর নিসর্গবাদী—তাদের কাছে ভারতের মহারণ্য, পর্ব্বতমালা, উপত্যকা ও অধিত্যকা, কৃষিক্ষেত্র, মরুভূমি, নদনদী ও প্রস্রবণধারা অপূর্ব্ব বলেই মনে হবে। শিকারীদের কাছে ভারতের জীবজন্তু পশুপক্ষী বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এখানে আছে ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, শূকর, হস্তী, মহিষ, বাইসন প্রভৃতি নানা জঙ্গলে, নদনদীতে আছে—বিভিন্ন প্রকারের মৎস্য, কুম্ভীর, হাঙ্গর প্রভৃতি —আর আছে স্নাইপ, পাতিহাঁস প্রভৃতি ঝিলের ধারে ধারে। পৃথিবীর সর্ব্বোত্তম পর্ব্বত হিমালয়। এই দেবতাত্মা হিমালয়-শৈলারোহণে আনন্দ পায় পর্ব্বতের অভিযাত্রীগণ। পশ্চিমভারতের গুহাময় মন্দির নানাভাবে অদ্বিতীয়। কেননা এখানে সুদক্ষ শ্রমশিল্পীরা পাহাড়পর্ব্বত খোদিত করে নব নব শিল্পসৌন্দর্য্য প্রকাশ করেছেন, পাহাড় কেটে কেটে করেছেন কত না চিত্রবিন্যাস!

বোম্বাই বন্দরের পারে এলিফেন্টার গুহাতে যে ভাস্কর্য্য শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়, তার ভেতর শুধু শিল্পীর অসাধারণ কৃতিত্বের অভিব্যক্তিই প্রকাশ পায় না, পশ্চিম ভারতের হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের পরিচিতিও প্রত্যক্ষীভূত হয়। কার্লা ও ভজার ভিতর যেসব গুহা আছে, সেগুলি বৌদ্ধশিল্পের নিদর্শন। এধরণের স্থপতিশিল্প প্রাচীনতম, এখানে তার কিছু কিছু প্রকাশ পেয়েছে। কার্লাতে দারুশিল্পের যে নিদর্শন রয়েছে, তা দুহাজার বছরের কালস্রোতে ভেসে যায় নি—সুদূর অতীতের শিল্পমহিমাকে বুকে নিয়ে আজও সে দাঁড়িয়ে আছে। শিল্প-প্রেমিক তীর্থযাত্রীদের কাছে অজন্তা, এলোরা আর ঔরঙ্গাবাদের গুহা-গুলি পরমবিস্ময়রূপে অবস্থিত। অতীতের এই মহান শিল্পসৌন্দর্য্য আজও যা কালজয়ী হয়ে রয়েছে, পৃথিবীতে একান্ত দুর্লভ বলেই আমরা জেনেছি। ভারতের মহত্তম অমূল্য সম্পদের কিছু কিছু পাওয়া গেছে এলোরায়—অজন্তা ও কৈলাসমন্দিরের প্রাচীরগাত্রের চিত্রলেখায়। গুহামন্দিরগুলির পাশে ঔরঙ্গাবাদের সন্নিহিত স্থানে ঐতিহাসিক স্মৃতি-স্তম্ভগুলি আমাদের চিত্ত অভিভূত করে তোলে—বিবি-কা-মোকবারা ও দৌলতাবাদের দুর্গ অতুলনীয়।

হায়দ্রাবাদের ঐতিহাসিক স্মৃতিজড়িত চারমিনার, গোলকুণ্ডা দুর্গ, সালারজঙ্গ যাদুঘর প্রভৃতি ভ্রাম্যমান মানুষের কাছে সমাদৃত হয়ে থাকে। বিজাপুরের গোলগম্বুজ এবং ইব্রাহিম রাওজায় আছে অপূর্ব্ব শিল্পনিদর্শন। তা ছাড়া এতদঞ্চলে এসে বাদামি, আইহোলি আর পদাৎকল প্রভৃতি দর্শন করে যাওয়া উচিত কেননা মধ্যযুগের প্রারম্ভিক সময়ের ইতিহাসের পাতা এখানে ছড়ানো রয়েছে—চৌলকাদের মন্দিরগুলি ও স্মরণস্তম্ভের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হচ্ছে তাদের স্থাপত্যশিল্পের চরমোৎকর্ষ। বোম্বাইয়ের উত্তরে আমেদাবাদ, আধুনিক বাণিজ্যপ্রধান সহররূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এর আভরণ হয়ে রয়েছে মধ্যযুগীয় সুন্দর মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের অলঙ্করণ। মাউন্ট-আবুতে জৈনদের দিলওয়ারা মন্দির। অকৃত্রিম মার্ব্বেল পাথরে গড়ে উঠেছে এর ভাস্কর্য্য শিল্পের মোহিনী-মূর্ত্তি। বিচিত্র-বর্ণের মানুষ দেখা যায় সৌরাষ্ট্রে। এখানে অনেক কিছু দেখবার আছে —জৈনমন্দির গঠিত পালিতানা সহর, দুর্গ এবং মন্দির-বেষ্টিত জুনাগড়, গান্ধীজীর জন্মভূমি পোরবন্দর সৌরাষ্ট্রকে মহিমান্বিত করেছে। এশিয়ার একমাত্র সিংহের বাসভূমি গির-অরণ্যে ভ্রমণ ভ্রাম্যমানের পক্ষে আনন্দ-প্রদ। প্রায় দুহাজার বছরের কীর্ত্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মধ্যভারত—যার স্তরে স্তরে রয়েছে প্রাচীন দিনের স্মৃতিসৌধ। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ছয়শত বছরের পশ্চাতে যে ইতিহাস গড়ে উঠেছে, তার উজ্জ্বল পৃষ্ঠাগুলি পড়ে আছে প্রাচীন অবন্তী উজ্জয়িনীতে—এই উজ্জয়িনী কালিদাসের কাব্য-নির্ঝরিণী, এইস্থানই ছিল বিক্রমাদিত্যের রাজধানী। এখানেই ছিল বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভা।

ভিলসা বা বিদিশায় উদয়গিরিগুহাগুলি অতীত ভারতের হিন্দু ভাস্কর্য্যের মহিমা বক্ষে করে নিয়ে আজও বর্ত্তমান। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর স্মৃতিজড়িত সাঁচী, এর বিরাট স্তূপ আর অদ্বিতীয় খোদিত দ্বারপথ নিয়ে অবস্থিত, বৌদ্ধদের প্রচুর ভগ্নাবশেষ রয়েছে এখানে। ওয়ার্দ্ধার কাছে গান্ধীজীর সেবাগ্রাম শিক্ষাকেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ। রাজপুত-দের প্রাচীন বাসভূমি রাজস্থান বিশেষভাবে দর্শনীয়। রাঙারঙে রাঙিয়ে আছে সৌধমালা-শোভিত জয়পুর, এর কাছেই প্রাচীন রাজধানী অম্বর। উদয়পুরে আছে অসংখ্য মনোরম হ্রদ, প্রাসাদ, আর উপত্যকা। বালু-প্রস্তরের শৈলসমাচ্ছন্ন প্রান্তে মরুবক্ষে দাঁড়িয়ে রয়েছে অপূর্ব্ব সহর যোধপুর। গজনর হ্রদে হাঁস শিকারের জন্যে পৃথিবীর নানাদেশের লোক আসে বিকানীরে। চিত্রশালা ও যাদুঘরের জন্য প্রসিদ্ধ আলো-ওয়ার। এখানেও শিকারের প্রাণী বহু প্রকারের থাকায় শিকারীরা ছুটে আসে। তারাগড় পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত আজমীর। ইতিহাসের ঘটনাসম্বলিত আজমীর হারানো-দিনের অনেক কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সহরের সাত মাইল পশ্চিমে পবিত্র তীর্থ-হ্রদ পুষ্কর। অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যমণি দিল্লী কত যুগ ধরেই না সঞ্চিত করেছে মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য—কত সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এর স্নায়ু—কত সাম্রাজ্যেরই না রাজধানী ছিল দিল্লী। দিল্লী থেকে দক্ষিণে দুই মাইল দূরে যমুনা তীরে যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের বাসভবনের ভগ্নাবশেষ আজও দেখতে পাওয়া যায়।

মোগল শাসনকর্ত্তারাই আগ্রার শীর্ষে মহিমামুকুট পরিয়ে গেছেন, সাজিয়ে গেছেন নবনব সৌধ স্থাপত্যশিল্পের অলঙ্কারে। আকবর আগ্রাকে গঠিত করে গেছেন, তারপর সাজাহান এসে পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য্য তাজ-মহলের সৃষ্টি করে গেছেন, এখানে—এই তাজমহল প্রেমের সমাধি তীর্থে পাষাণের মহাকাব্য। আগ্রা দুর্গ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। আগ্রার বাইশ মাইল দূরে আকবরের রাজধানী ফতেপুর সিক্রী পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। এখানে সম্রাটের প্রাসাদ এখনও দর্শকগণের অন্তরে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

শিল্পকলা ও সংস্কৃতির স্মৃতি বহন করছে লক্ষ্ণৌ। আধুনিক স্থাপত্য-শিল্পের প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাঞ্জাবের রাজধানী চণ্ডীগড়, এটি ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা নূতন সহর। শিখদের পবিত্র সহর অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরের জন্য বিখ্যাত। এই মন্দিরের অভ্যন্তরে স্বর্ণ রৌপ্যের তারের মীনার কারুকার্য্যগুলি মানুষের মনে বিস্ময়োৎপাদন করে। হিমালয়ের উত্তর

ও মধ্য ভাগে শৈল শিখরে গ্রীষ্মাবাসের উপযোগী বহু সুন্দর স্থান আছে। এইসব পার্ব্বত্য অঞ্চলে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য লোক সমাগম হয়, তাছাড়া হিমালয়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য অপূর্ব্ব—হিমালয়ের ভিতর এমন সব স্বর্গীয় অলৌকিক ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে যা বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা করা যায় না। হিমালয়ের পশ্চিম দিকে ডালহৌসী—এর শান্ত সৌম্য দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। কুলু ও কাংরা উপত্যকা ছোটখাটো শিকারের উপযোগী; এখানে আছে বহু আপেলের বাগান। সিমলায় তিতিরপাখী শিকার ও শীতের স্কেটিং, নারকান্দা থেকে কুলুর দৃশ্য, তিব্বতের পথে রামপুর ও চিনি চিত্রোপম হয়ে রয়েছে। প্রাচ্য ভূখণ্ডের ভেনিস কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর—কাশ্মীর এশিয়ার স্বর্গভূমি। এখানে আছে সুন্দর নদী ও হ্রদ, কাশ্মীরের কাননগুলি বিচিত্র বর্ণের সমারোহ সৃষ্টি করেছে। কাশ্মীরের গুলমার্গ, সোনামার্গ, পহলগাম, অমরনাথ তীর্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আলমোরা ও রাণীখেত হিমালয় শৈলশৃঙ্গের অপূর্ব্ব রূপ প্রকাশ করছে, আর আলমোরার কাছে পিণ্ডারী তুষার-প্রবাহ আলোকচিত্রের পক্ষে অতীব সুন্দর। ইন্দো-নেপাল সীমান্তে লুম্বিনী। এখানে গৌতম বুদ্ধ বাস করেছিলেন ও ধর্ম্মপ্রচার করেছিলেন। গয়ার দক্ষিণে ছয় মাইল দূরে বুদ্ধগয়া। এখানে শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। কাশীর সন্নিকটে সারনাথ। এখানেই বৌদ্ধধর্ম্মের জন্মস্থান। বারাণসী ভারতের প্রাচীনতম পুণ্যতীর্থ ভূমি। এখানে আর্য্যসভ্যতা, সংস্কৃতি জ্ঞান বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম সাধনার চরমোৎকর্ষ সাধন হয়েছিল। উত্তর প্রদেশে কুশীনগর। এখানে বুদ্ধ নির্ব্বাণলাভ করেন।

হিমালয়ের পূর্ব্বাঞ্চলে দার্জ্জিলিং। এখান থেকে দেখা যায় এভারেষ্ট। কালিম্পং কার্সিয়াং শিলং প্রভৃতি স্থানে পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্য অপূর্ব্ব। আসামের শিবসাগর ও গৌহাটীতে রয়েছে আহম রাজাদের ধ্বংসাবশেষ। আসাম চা বাগানের জন্য বিখ্যাত, এখানে গহন অরণ্যে বন্যহস্তী ও একটি শৃঙ্গবিশিষ্ট গণ্ডার পাওয়া যায়। কামাখ্যা পাহাড় হিন্দুর পবিত্র তীর্থস্থান। হরিদ্বারের একক্রোশ পূর্ব্বে চণ্ডীর পাহাড়ে যেতে গঙ্গার নীলধারা দেখতে পাওয়া যায়। কনখল, হরিদ্বার, গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী, কেদারনাথ, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি হিমালয়ের মধ্যে পুণ্যতীর্থরূপে অবস্থিত। হরিদ্বারের তিনশত তেরো মাইল ঈশানকোণে মানস-সরোবর। এখানে অনেক সিদ্ধ মহাপুরুষ অবস্থান করেন।

কলিকাতা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর। এখান থেকে প্রায় একশত মাইলদূরে শান্তিনিকেতন। এখানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সাধনা করে গেছেন আর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে গেছেন। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর, পুরী, কোনারক প্রভৃতি স্থানে ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন রয়েছে মন্দিরগুলিতে। বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের সময় অষ্টম শতাব্দী হোতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, এই সময়ের মধ্যে গড়ে উঠেছে শতাধিক মধ্যযুগীয় মন্দির একমাত্র ভুবনেশ্বরেই। মুক্তেশ্বরের মন্দির স্থাপত্য শিল্পের অমূল্য রত্ন। পুরীর সমুদ্র, চিল্কাহ্রদ বিশেষ দ্রষ্টব্য।

দক্ষিণভারত দেবদেউলের দেশ। দক্ষিণভারত ভ্রমণকালে বহু সুন্দর সুন্দর সহর, অরণ্য, হ্রদ, প্রস্রবণ, সমুদ্র উপকূল, তাম্রীবন প্রভৃতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্দিরের বুকেই না লুকিয়ে রয়েছে রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্ত! মহীশূরের চতুঃপার্শ্বে উত্তম-পরিকল্পিত অলঙ্কারমণ্ডিত তীর্থভূমি, বৃহৎ প্রাচীন অরণ্যশ্রেণী, জলপ্রপাত ও স্বর্ণখনি নয়নানন্দকর। একটি প্রস্তরখণ্ড কেটে নন্দী ষাঁড় তৈয়ারী হয়েছে পর্ব্বতের ওপর, একে দেখতে পাওয়া যায় মহীশূর থেকে। সহরের ওপর দাঁড়িয়ে আশ্চর্য্যরকম পরিদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। নির্ঝরের সুন্দর লীলা প্রকাশ পাচ্ছে মহীশূরের বৃন্দাবন বাগানে, এই বাগানটী মনে হয় যেন আধুনিক পরীর রাজ্য। বাঙ্গালোরের লালবাগে কয়েক একর ভূখণ্ডের ওপর বহু দুষ্প্রাপ্য ও বিদেশাগত লতাগুল্ম আর উদ্ভিদ শ্রেণী। সারানা বেলগোলায় গোমতেশ্বর মূর্ত্তিটি একটী বিপুল প্রস্তর খণ্ডে গড়ে উঠেছে সাতান্ন ফুট উঁচু হয়ে। বিলুরের চেন্না কেশবের মন্দির, ওহেলবিদে হয়শালেশ্বর মন্দির মধ্যযুগের হয়শালাদের অপূর্ব্ব স্থাপত্য নিদর্শন। মহাবলীপুরমের গুহামন্দির, প্রস্তরখোদিত মহাভারতের চিত্রাবলী, প্রাচীন বাতিঘর প্রভৃতি সপ্তম ও অ ম শতাব্দীর পল্লব-স্থাপত্য শিল্প ও ভাস্কর্য্যের গৌরবময় কীর্ত্তিকাব্যরূপে সমুদ্র উপকূলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পল্লব, চোল ও বিজয়নগরের মহিমা বিকীর্ণ হচ্ছে বহু মন্দিরবেষ্টিত সহর কাঞ্চীপুরমে। এটী দাক্ষিণাত্যের কাশীধাম।

দক্ষিণভারতের অনেকখানি দক্ষিণে তিরুচি। এখানে উচ্চশৈলশৃঙ্গে মন্দির অবস্থিত, সমতলক্ষেত্র থেকে উঠেছে অসংলগ্নভাবে। এখান থেকে তিনমাইল দূরে শ্রীরঙ্গম। এখানে অন্যতম সর্ব্বোত্তম বিষ্ণুমন্দির অবস্থিত। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ তাঞ্জোরে চুয়াত্তরটী মন্দির আছে। চোলযুগের বৃহদীশ্বর মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর মন্দির রূপে এটি অভিহিত। তামিল সভ্যতাও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল মাদুরাই। এখানে মীনাক্ষীমন্দিরে যন্ত্রসঙ্গীতের ধ্বনি শোনা যায় সে ধ্বনি অপূর্ব্ব।

নীলগিরিতে কোদাই ক্যানাল পার্ব্বত্য ষ্টেশন, রামেশ্বরমতীর্থ, উটাকামণ্ড, কুনুর আর কোটাগিরির পার্ব্বত্য বায়ুপরিবর্ত্তন আবাস উল্লেখযোগ্য। মালাবার উপকূলে গভীর অরণ্য, এই অরণ্যে অজস্র বন্যজন্তু আছে—পেরিয়ার হ্রদের চতুর্দ্দিকে অরণ্যভূমি চিত্তাকর্ষক। ত্রিবান্দ্রমে চিড়িয়াখানা ও যাদুঘর, কোবালামের সমুদ্র উপকূল ও সুচিন্দ্রম বিশেষভাবে দর্শনীয়। তোমরা সুযোগ ও সুবিধামত সারাভারত পরিভ্রমণ করে দেখবে ঐতিহাসিক কীর্ত্তি, নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল আর তীর্থক্ষেত্র। ভারতবর্ষের মত সুন্দর দেশ পৃথিবীর কোথাও পাবে না।
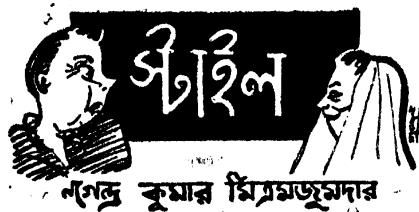
শীতকাল।

বেশ জোরে বৃষ্টি নেমেছে।

হ্যারিসন রোড ও কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে ক্যাবলার সঙ্গে তার মামাবাবু—হাবলার দেখা।

ক্যাবলাকে জলে ভিজে আসতে দেখে হাবলা প্রশ্ন করলে—কিরে ক্যাবলা এই শীতের দিনে জলে ভিজছিস্! চুড়িদার পাঞ্জাবী তো জলে ভিজে সারা গায়ে লেপ্টে বসেছে। তবু ছাতা মাথায় দিবিনে—ছাতা মাথায় দিলেই স্টাইল করে চলা হ'লনা—এই না?

অপ্রত্যাশিত ভাবে পথেই যে তার হাবলামামার সঙ্গে দেখা হবে—এ কথা সে একবারও ভাবতে পারেনি। অপ্রতিভ হয়ে বললে—বৃষ্টি নামবে এমন জোরে সেকি আর ঘর থেকে বেরুবার পূর্ব্বে জানতে পেরেছিলাম। জানলে ছাতা নিয়েই বেরুতাম।

উত্তর শুনে হাবলা জানালে—কৈফিয়ৎ তোদের তৈরী হয়েই থাকেই—তোরা কি বর্ত্তমান যুগে ছাতা নিয়েবেরুবার ছেলেরে? ঝড়ো কাকের মত জলে ভিজবি, রোদে পুড়বি তবু ছাতা নিবিনে! আর আমি ছাতা তো ছাতা—প্ল্যাষ্টিকের ওয়াটারপ্রুফ চাদরটাও ঘাড়ে ফেলে বেরিয়েছি। দরকার হয় সারা দেহটাকেও বৃষ্টির ছাঁট হ'তে ঢেকে ফেলতে পারব চাদরটা দিয়ে! নে—এই ছাতা নে। জলে না ভিজে সটান বাড়ী চলে যা। আমি একটু ঘুরে ফিরে যাবো।

কথাটা শুনেও ক্যাবলা কোন জবাবদিহি না করেই—পাঞ্জাবীর বোতামগুলো নিয়েই নাড়াচাড়া করতে থাকে।

এমন নিরুত্তরও হুনোমুনো ভাব দেখে বিরক্তির সুরে হাবলা জানায়—যা, আর ছাতা নিতে হবে না। প্ল্যাষ্টিকের এই চাদরটাই নে—হাল্কা হবে—বেশ স্টাইল করে যাওয়া হবে—গা-মাথা ঢেকে।' ট্রাম রাস্তা পার হয়ে বাড়ী পৌঁছুতে অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। একে ত তাল পাতার সেপাই! তার উপর অতক্ষণ জলে ভিজলে নির্ঘাৎ ব্রনকাইটিস্ নিউমোনিয়া ধরে যাবে।

অনিচ্ছা থাকলেও ক্যাবলা আর আপত্তি জানাতে পারল না। কারণ হাবলা বড় রগচটা লোক। অগত্যাই সে মামার কাছ হতে প্ল্যাষ্টিকের চাদরটাই টেনে নিলে এবং মামার সম্মুখেই মাথা থেকে ঘোমটা দেওয়ার মত কোমরের নীচ পর্য্যন্ত জড়িয়ে নিয়ে শ্যামবাজারের ট্রাম ধরতে পাশে দাঁড়ালো।

ট্রাম যা একটা এলো—ভীষণ ভিড়! তিল ধারণের জায়গা নেই!

ক্যাবলার চেহারাটা ঠিক মহিলাদের মত ক্ষীণ ও ছিপ-ছিপে। মুখে দাড়ির বালাই নেই, গোঁফটাও ক্ষুর দিয়ে কামানো। উপরন্তু প্ল্যাষ্টিকের চাদরে ঘোমটা দিয়ে কোমর পর্য্যন্ত ঢেকে ফেলেছে। এমন 'মেকআপ' নিয়েছে গড়নে পিটনে তাকে কেউ মহিলা ছাড়া ভাবতেই পারবেনা!

ফুটবোর্ডে সলজ্জ ভাবে উঠতে দেখে পাশের এক ভদ্র-লোক বলে উঠল—সরুন মশায়—একটু পাশ দিন—মহিলার সিট্‌টা ছাড়ুন।

একে মহিলা তার উপরে বাহিরে সমানে বৃষ্টি চলেছে—কার মনে না দয়া হয়। সসঙ্কোচে হুড়োহুড়ি করে সবাই ভিতরে যাবার পথ পরিষ্কার করে দিলে। মহিলাদের মাত্র একটি সিট বাকী পড়েছিল যা এতক্ষণ এক ভদ্র-মহিলার আত্মীয় পুরুষ অধিকার করে বসেছিলেন। মহিলার সম্মানার্থে তিনি সিট্‌টি ছেড়ে দিয়ে পাশে উঠে দাঁড়ালেন।

ক্যাবলাই বা ছাড়বে কেন সম্মানে আগিয়ে দেওয়া সিটটি। সে আরও লজ্জাবতী নারীর মত ঘোমটাটি একটু টেনে বেশ আরাম করে বসে পড়ল।

ভিড়ের ভিতর কারুর সেদিকে নজর নেই। ট্রামটিও এদিকে হঠাৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ও পরক্ষণই বিদ্যুৎ সরবরাহের সাথে সাথে চালু হয়।

বৃষ্টিটা তখন এদিকে আরও বেশ জোরসে চলেছে।

হাবলা একটু পথ এগিয়েই বিরক্তি ভরে গন্তব্য স্থলে না গিয়ে ভিজে ছাতা হাতে সেই ট্রামটিরই হাতল ধরে ফুট-বোর্ডে উঠে দাঁড়ালো।

হাবলের ভিজে ছাতাটি হতে সমানে জল গড়িয়ে পড়ছে। শীতের ঠাণ্ডা জল দু'এক ফোঁটা গায়ে পড়তেই পাশের এক ভদ্রলোক ঝাঁঝালো গলায় বললেন—বেশ তো হুঁস! এই বৃষ্টির দিনে ট্রামে-বাসে উঠেছেন। রিক্সা করে গেলেই ত পারতেন। ছাতা না নিয়ে কি কলকাতা সহরে পথ হাঁটা যায় না। ঝড়-বৃষ্টির দিনে আক্কেলটাও বলিহারি!

ফুটবোর্ডে অধিকক্ষণ এমন ভাবে দাঁড়ানো সমীচীন হবে না ভেবেই কটূক্তি কথাগুলো শুনেও পরক্ষণেই পাশ কাটিয়ে হাবলা ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা করলো।

ভিজে ছাতাটা আবার আর একজনের গায়ে ঠেকতেই তিনি ত তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন একি! একি মশাই! গট-গটিয়ে ভিজে ছাতা নিয়ে ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকছেন! ট্রামে না এসে—বাসে আসতে পারতেন না?

এ কথায় ফোড়ং দিয়ে আর একজন যাত্রী বলে উঠলেন—বাসেও তাই! ভিজে ছাতা নিয়ে কলকাতা সহরে পথ চলতে চান ত মোটর, ট্যাক্সি করে যাওয়া আসা করবেন। নেমে যান। আর ভিতরে নাক গলাতে চেষ্টা করবেন না। ভাল উপদেশই দিচ্ছি।

হাবলার বড় রাগ হলো উত্তরের ঢং শুনে। সে নাকি সুরেই মন্তব্য করলে—আমার নয় মশাই! আমার নয়! যারা ট্রামে-বাসের ভিড় সহ্য করতে কাতর—তাদেরই ট্যাক্সি মোটরে যাতায়াত করতে অনুরোধ করি! বৃষ্টির দিনে ছাতা নিয়ে পথ চলবোনা ত ঝড়ো কাকের মত আপনাদের দেখা-দেখি আধুনিক স্টাইল করে জলে ভিজে কাঁপতে কাঁপতে যাতায়াত করতে হবে।

বটে! বটে! বাবাজীর দম্ভ ত কম নয়। উনি ভিজে ছাতা গায়ের উপর চালাবেন আর যাত্রীরা চুপ করে সইবে! দেখি ছাতা! আমি টান মেরে ফেলে না দিই তো কি বলছি? বলেই লোকটি তার দিকে তেড়ে আসে আর কি?

তাদের ক্যাবলা এতক্ষণ মহিলার সিটে মহিলা সেজেই আরাম করে বসে মামাবাবুর ও যাত্রীদের কথা কাটা-কাটিই শুনছিল। বাড়ীর নিকটবর্ত্তী স্টপেজে আসতেই ক্যাবলা মহিলার মত মিহি গলায় উঠে দাঁড়িয়ে বললে—একটু গাড়ীটা থামাবেন।···একটু সরে দাঁড়ান না?

মহিলার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কানে যেতেই অনেকেই সমস্বরে দরদ দেখিয়ে বলে উঠলেন—আরে মশাই! গাড়ীটা থামান! ভদ্রমহিলাকে নামতে দিন।

ঝগড়া যিনি করছিলেন হাবলের সঙ্গে—তিনিও এই কণ্ঠস্বর শুনে সন্ত্রস্ত হয়ে জানালেন—ভদ্রমহিলা নামুক তার পর দেখছি! কি হয়! বলেই পথ ছেড়ে দিলেন ভদ্র-মহিলাকে।

বাড়ীর সন্নিকট স্টপেজ এসে গেছে দেখেই হাবলাও চটপট এই সুযোগে নেমে পালাবার জন্য ক্রমশঃ দরজার মুখ ঘেঁসে সরে আসছিলো।

দেখতে দেখতে স্টপেজে এসে ট্রাম দাঁড়ালো। ফুট-বোর্ডের মুখে এসে ক্যাবলা মামাকে টেনে নিয়ে ঘোমটা খুলে পুরুষের স্বরে বললে—মামাবাবু, ভাল চান তো নেমে পড়ুন! বলেই তারা ঝড়ের মত দুজনে নীচে নেমে পড়ল।

কন্‌ডাকটার ক্যাবলাকে হঠাৎ মহিলা হতে পুরুষের বেশে দেখে বিস্ময়ে বলে উঠল—মেয়েত নয়—পুরুষ! আচ্ছা ঠকিয়ে গেল আমাদের! চোখে ধূলি দিয়ে নেমে

গেল! মামা ভাগ্নে তুজনেই সমান চীজ! জোড়-মাণিক হয়েই বুঝি গাড়ীতে উঠেছিল।

কনডাকটারের মুখে কথাগুলো শুনে গাড়ীশুদ্ধ লোক বিস্ময়ের সুরে প্রকাশ করল—এ্যাঁ-এ্যাঁ! বটে! মেয়ে নয়—পুরুষ! বলেই চলন্ত ট্রাম থেকে সব মামা-ভাগ্নে তুজনকে দেখতে লাগল।

ট্রাম চলে গেল। ক্যাবলা বলল—দেখলে ত মামা, স্টাইল! স্টাইল কর! ছাতা না নিয়ে সাধে কি কলকাতা সহরে চলাফেরা করি! আর এই ফাঁকা স্টাইল করেই গাড়ী ভর্ত্তি ভিড়ের ভিতরেই আমি আরাম করে বাড়ী ফিরে এলাম। তোমার তো ভিজে ছাতা নিয়েই প্রাণ যাবার যোগাড় হয়েছিল। আমি না থাকলে অদৃষ্টে তোমার কি যে ঘটতো তাই ভাবি! বুঝনা বলেই রাতদিন আমাদের বল—স্টাইল! স্টাইল! স্টাইল কেন যে করি—বুঝলে তো এবার!

হাবলা অনিচ্ছা সত্বেও চাপা গলায় উত্তর দিল—হুঁ!

চৈত্র আমন্ত্রণে

শ্রীসুধীরকুমার রায়

রৌদ্রঝরা
পত্রঝরা
চৈত্র এলো আজ,
কাননরাজির
বক্ষ জুড়ি
ঘনায় নব সাজ।

বিহঙ্গেরা
আজকে যেন
বেজায় রকম সুখী,
তরুরাজির
শাখায়
কিশলয়ের উঁকি।

কুন্দ গাঁদা
উঠলো ফুটি
টগর খালি হাসে,
মধুর আশে
মধুপ ঘোরে
তাহার পাশে পাশে।

নতুন ভোরের
স্বপ্ন জাগে
সবার মনের কোণে,
নতুন বছর
আসছে যে আজ
চৈত্র আমন্ত্রণে।

তোমরা কি জানো

সিদ্ধার্থ গংগোপাধ্যায়

বৃক্ষারোহী মাছের কথা—

মাছেরা সাধারণতঃ জল ছাড়া বাঁচতে পারে না, এ তোমরা নিশ্চয়ই জানো। যে জন্যে আমরা সংগীণ অবস্থা বোঝাতে 'জলের মাছ ডাঙায়' একথাটা খুব বেশীরকম ব্যবহার করি। মাছের কানকোর নীচে যে ঝিল্লীর মতো প্রত্যংগ গুলো রয়েছে, সেগুলোই তাদের শ্বাসযন্ত্রের কাজ করে। ঐ ঝিল্লীগুলো যতোক্ষণ ভিজে থাকে, ততোক্ষণ সে স্বচ্ছন্দে শ্বাস নিতে পারে! জলের মাছকে ডাঙায় এনে তুললে খানিকক্ষণের মধ্যে ঐ ঝিল্লীর মধ্যে সঞ্চিত জল বাইরের হাওয়া আর উত্তাপের চোটে শুকিয়ে যায়, আর এমনি তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট সুরু হয়।

কিন্তু তোমরা হয়তো অনেকে জানোনা যে, এমন মাছও আছে যে অনায়াসে জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে আসতে পারে হেঁটে-চলে বেড়াতে পারে স্বচ্ছন্দে এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, সত্যি সত্যি সে গাছের গুঁড়ি বেয়ে দিব্যি ওপরে উঠে যেতে পারে। এরকম মাছ পাওয়া যায় ব্রহ্ম-দেশে, সিংহলে আর আমাদের দেশে। এ মাছের ইংরিজী নাম হোলো ক্লাইম্বিং পার্চ (Climbing Perch) অর্থাৎ বাংলায় 'বৃক্ষারোহী পার্চ মাছ' বলা যেতে পারে।

এরা কেন এমন হঠাৎ জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে আসে শুনবে? মাঝে মাঝে এদের ভয় হয় যে, তারা যে পুকুরে বা নদীতে বাস করে, দারুণ অনাবৃষ্টির ফলে তার জল বুঝিবা একেবারে শুকিয়ে যাবে, তলাকার মাটি বেরিয়ে শুকনো খটখট করবে। তখন তারা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা ক'রে আরো গভীর কোনো পুকুর বা নদীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। এদের গায়ে সরু সরু কাঠি দেওয়া পাখনা আছে, তারই সাহায্যে এরা ডাঙায় উঠে নতুন বাড়ির খোঁজে ঘুরে ফিরে বেড়ায়।

তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করবে, আচ্ছা, এদের শরীরের মধ্যে এমন কি আশ্চর্য জিনিস আছে, যার সাহায্যে এরা জলের বাইরে এসেও মরে না? তার উত্তর হবে, এদের মাথার প্রত্যেক দিকে একটা করে বিশেষ ঘর আছে, যার মধ্যে এরা দীর্ঘদিন ধরে খানিকটা জল সঞ্চিত রাখতে পারে। চলতি কথায় 'জলের ভাঁড়ার' বলতে পার তোমরা। এই সঞ্চিত জলই এদের কানকোর নীচের ঝিল্লীগুলোকে ভিজিয়ে রাখে, আর যতোক্ষণ না তারা অন্য কোন পুকুরে পৌঁচচ্ছে, ততোক্ষণ তাদের বাঁচতে সাহায্য করে।

তোমাদের মধ্যে কেউ হয়তো বলবে, এমনও তো হতে পারে যে, পার্চ মাছ খুঁজে খুঁজে মনের মতো কোন পুকুর বা নদী পাচ্ছে না, অথচ তাদের মাথার তুদিকে-আঁটা জলের থলিতে জল ফুরিয়ে এসেছে, তখন

তারা কি করবে? এই মাছেরা অত বোকা নয় যে, জলের সঞ্চয় ফুরিয়ে আসতে দেখলেই তারা পুকুর বা নদী খোঁজা বন্ধ ক'রে মৃত্যুর হাতে নিজেদের তুলে দেবে। যখন তাদের মাথার দুদিকে আঁটা জলের থলিতে জলের সঞ্চয় ফুরিয়ে আসে, তখন তারা গাছের যে-সব গর্তে অনেকসময় বৃষ্টির জল জমে থাকে, সেরকম গর্তে ঢুকে পড়ে—আর যদি সে-জলও কালক্রমে ফুরিয়ে যায় তাহ'লে গাছের গুঁড়ি বেয়ে তরতর করে ওপরে উঠতে থাকে।

গাছের ছালের সংগে এরা কানকো দিয়ে নিজেদের আটকে রাখে, আর কাঁটা-ওয়ালা পাখনায় ভর করে গুঁড়ি বেয়ে উপরে চড়তে থাকে। তারা চলে খুব ধীরে ধীরে, কিন্তু অবশেষে যখন তারা গন্তব্য স্থানে পৌঁছোয়, তখন অমূল্য জলের সন্ধান পেয়ে যেন শরীরে নতুন প্রাণ ফিরে পায়।

তোমার মাথায় কত চুল?—

তোমার মাথায় কত চুল আছে, বলতে পারো? বলা খুব শক্ত। কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা, একটা আনুমানিক হিসাব করে জেনেছেন যে এক-একজনের মাথায় ১০৯,০০০ থেকে ১৪০,০০০ পর্যন্ত চুল আছে। প্রতিটি চুল কতখানি মোটা জানো?—এক ইঞ্চির আড়াইশো ভাগ থেকে ছশো ভাগের মধ্যে। একটি মাত্র সরু চুল চার আউন্সের মতো ভার সইতে পারে, বিশেষজ্ঞেরা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন।

হাজার হাজার বছর আগে চীনেরা আর জাপানীরা চুল দিয়ে লম্বা দড়ি বানাত। এরকম একটা চুল থেকে তৈয়ারী-করা দড়ি বিলেতের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সাজানো আছে। এই দড়িটা দৈর্ঘ্যে কয়েক হাজার ফুট, আর এর ওজন হবে প্রায় দু'টন।

কাঁচের বাটিতে গরম জল—

তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ, কাচের বাটিতে বা গ্লাসে গরম জল ঢাললে সাধারণতঃ সেটা ফেটে যায়। বাড়ীর নতুন চাকরটা কাচের গ্লাসে ফুটন্ত দুধ ঢেলে তোমার কাছে নিয়ে আসতে গিয়ে গ্লাসটা তো ফাটিয়ে ফেললই, উপরন্তু দুধটাও নষ্ট হল—তা' দেখে তোমরা কতো বিজ্ঞের মতো বলেছ—কি হে, কাচের গ্লাসে গরম জল বা দুধ ঢাললে, ফেটে যায় জানো না? তারপর এই নিয়ে অনেক বকাবকি করেছ। কিন্তু জানো কি কেন এরকম হয়।

প্রকৃতির একটা মস্ত বড় নিয়ম এর পিছনে কাজ করছে। তোমরা যখন দাদাদের মতো বড় হয়ে ফিজিক্স পড়বে, তখন দেখবে কোনো জিনিসকে গরম করলে সেটা বৃদ্ধি পায় বা সহজ বাংলায় বেড়ে যায়, ইংরিজীতে যাকে বলে expansion। অবশ্য এই বৃদ্ধির মাত্রাটা সব জিনিসের বেলায় সমান নয়; কোন কোন জিনিসের বেলায় খুব বেশী কোন কোনটার বেলায় মাঝামাঝি, আবার কোনটার ক্ষেত্রে খুব কম।

যদি তুমি কাচের বাটি বা গ্লাসের মধ্যে খুব গরম (ফুটন্ত) দুধ বা জল ঢালো তাহ'লে সেই বাটিটার অথবা গ্লাসটার ভিতরের অংশটা উত্তাপের স্পর্শে বেড়ে যেতে চায়। এই ব্যাপারটা এতো তাড়াতাড়ি হয়ে যায় যে, উত্তাপ সেই বাটি অথবা গ্লাসটায় সম্পূর্ণভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। এইজন্য ভিতরের অংশ যখন বাড়বার চেষ্টা করে, তখন বাইরের অংশ মোটেই বাড়বার চেষ্টা করেনা (কারণ সেটা এখনো ঠাণ্ডা র'য়েছে—উত্তাপ এখনও বাইরের অংশে এসে পৌঁছুতে পারেনি)। এর ফলে বাটি বা গ্লাসটা সহজেই ফেটে যায়।

আমরা কি সব শব্দ শুনতে পাই—

যে সব শব্দ আমরা শুনতে পাইনা, তার মধ্যে এক ধরণের শব্দ হচ্ছে খুব আস্তে, যা আমাদের কান পর্যন্ত এসে পৌঁছুতে পারেনা, আর এক ধরণের শব্দ হচ্ছে অস্বাভাবিক রকমের জোরে, যা আমাদের কানের পর্দায় এতো জোরে আঘাত করে যে অনুভূত হলেও তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না (মনে হয়, কিছুই যেন শুনতে পেলুম না)।

ছোট্ট ছোট্ট পোকামাকড়েরা আর সবরকমের জীবজন্তুরা সমস্ত শব্দই শুনতে পায়। ধর, একটা ছোট্ট ইঁদুরছানা তার গর্তে বসে কিচমিচ করে ডাকছে,—এ ডাক আমরা শুনতে পাইনা কিন্তু বড় ইঁদুরেরা অনেকদূর থেকেও সে-শব্দ শুনতে পায়। বাদুড়ের চীৎকার এতো উঁচু পর্দায় যে আমাদের পক্ষে তা শুনে বুঝতে পারা বড় কষ্টকর। ছোট্ট ছোট্ট পোকামাকড়দের শোনবার জন্যে এমন সব যন্ত্র আছে যার দ্বারা তারা খুব মিহি আওয়াজও অনায়াসে শুনতে পায় আমরা যে-সব আওয়াজ শুনতে পাইনা।

জীবজন্তুদের শ্রবণশক্তি অত্যন্ত প্রখর। বিড়াল, কুকুর—এরা দেখবে সর্বদা কান খাড়া করে রাখে যাতে যে-কোন শব্দ আস্তে, অথবা জোরে, তাদের কানে অতি সহজেই পৌঁছয়। কানে শুনেই তারা বুঝতে পারে বিপদ আসছে কিনা অথবা শিকার হাতে পাবার সম্ভাবনা আছে কিনা।

আগুন নেবানোর যন্ত্র

শ্রীসত্যগোপাল পাল

এই কলকাতা শহরের নানা জায়গায়ই চোখে পড়ে আগুন নেবানোর যন্ত্র। বড় বড় দোকানে, বিভিন্ন অফিসে অফিসে, বিশেষ করে সকল সিনেমা হলেরই কোণে কোণে দেয়ালে ঝুলানো লাল রঙের মোচার মত আকৃতি বিশিষ্ট যে একটি বড় চোঙ চোখে পড়ে ওটাই হচ্ছে আগুন নেবানোর যন্ত্র। ইংরেজীতে ওকে বলা হয় 'ফায়ার এক্সটিংগুয়িশার'।
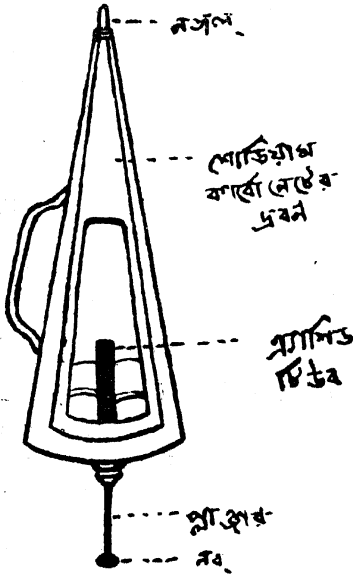
আগুন নেবানোর যন্ত্র

যন্ত্রটি মানুষের পরম বন্ধু। হঠাৎ আগুন লেগে গেলে মানুষের ধন-প্রাণ রক্ষায় ওটাই হবে প্রধান অবলম্বন।

এই যন্ত্রটি ইস্পাত প্রভৃতি কঠিন ধাতুনির্মিত একটি চোঙ মাত্র। অনেকের নিশ্চয়ই মনে হবে যে, ওটা আগুন নেবায় ব'লে ভেতরটা জলে ভরতি থাকে। তা কিন্তু মোটেই নয়। রাসায়নিক সংমিশ্রণের দ্বারা কার্বণ-ডাই-অকসাইড গ্যাস বা অংগার অম্লজান উৎপাদনই যন্ত্রটির একমাত্র কল-কৌশল। এই অংগার অম্লজান আগুন নেবানোর ব্যাপারে বিশেষ সক্রিয়! এর সংস্পর্শে আসা মাত্রই আগুন নিবে যায়।

চোঙটির ভেতর সম্পূর্ণ ভরতি থাকে সোডিয়াম কার্বনেটের দ্রবণে। আর ওর মোটা অংশে অর্থাৎ তলার দিকটায় চোঙটির সংগে সংলগ্ন থাকে সালফিউরিক এ্যাসিড ভরতি একটি কাচের ছোট্ট চোঙ্। সেটির নাম এ্যাসিড টিউব। এ ছাড়া যন্ত্রটির ভেতরে কলকব্জার অন্য কোনো কারসাজি নেই। এর বাইরের অংশে এ্যাসিড টিউবের ঠিক নীচে থাকে ধাতুনির্মিত একটি কঠিন দণ্ড এর নাম প্লানজার। প্লাঞ্জারটির ডগায় আছে বলের মত গোল ধাতু দিয়ে তৈরি একটি বর্তুল। তার নাম নব (Knob)।

যন্ত্রটি ব্যবহার করবার সময় নবটিকে বাঁধানো মেঝেয় অথবা দেয়ালের গায়ে খুব জোরে আঘাত করতে হয়। প্লাঞ্জারটা সংগে সংগে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে যন্ত্রটির ভেতরে। ফলে প্লাঞ্জারের ভীষণ আঘাতে সালফিউরিক এ্যাসিড ভরতি কাচের চোঙটি তক্ষুণি যায় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে। সংগে সংগে সোডিয়াম কার্বনেটের দ্রবণের সংগে সালফিউরিক এ্যাসিডের সংমিশ্রণের ফলে মুহূর্তের মধ্যে উৎপন্ন হোয়ে যায় কার্বন-ডাই-অকসাইড গ্যাস বা অংগার অম্লজান।

যন্ত্রের ওপরের দিকে সরু অংশে একটি মুখ আছে। এইটির নাম নজ্‌ল। ঘা-খেয়ে প্লাঞ্জারটা ভেতরে ঢুকে যাবার সংগে সংগে নজ্‌লটি খুলে যায়। আর সেই পথে বেরিয়ে আসতে থাকে কার্বণ-ডাই-অক্‌সাইড গ্যাসের প্রবল প্রবাহ। যন্ত্রটির বাইরের অংশে তার গাত্র সংলগ্ন যে হাতলটি আছে সেটা ধ'রে নজ্‌লটিকে ইচ্ছে মতো অগ্নিশিখার মুখোমুখি ক'রে দিলেই কার্বণ-ডাই-অক্‌সাইড গ্যাসের প্রবাহে আগুন নিবে যেতে থাকে।

যন্ত্রটি দিয়ে আগুন নেবানো গেলেও এর সামান্য শক্তি বড় বড় অগ্নিকাণ্ডের পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়। সাধারণতঃ আগুন নেবানোর পক্ষে প্রাথমিক অবলম্বন হিসেবেই এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মনে করো, সবাই সিনেমা দেখছ এক মনে। হঠাৎ কোন কারণে হয়তো দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠ্‌লো হলের ভেতরে। আগুন নেবানোর জন্যে অনেকেই চটপট ক'রে ফোন করে দেবেন দমকলের অফিসে। কিন্তু দমকল বাহিনীর ঘটনাস্থলে পৌঁছুতে তো বেশ খানিকটা সময়ের প্রয়োজন। তা ব'লে আগুন নিয়ে তো আর বসে থাকা চল্‌বে না। কাজেই যতক্ষণ না দমকল বাহিনী এসে পৌঁছোয় ততক্ষণ এই যন্ত্রটি আগুন নেবানোর একমাত্র উপায়। বড় বড় অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে নাগরিকদের ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য কোলকাতার রাজপথে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজিয়ে ভীষণ বেগে দমকল বাহিনীর ছুটোছুটি তো সকলেই দেখেছো আশা করি।

বেদান্ত দর্শন—শঙ্কর ভাষ্য

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

শব্দ প্রমাণ

অদ্বৈতবাদে শব্দ একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত। বস্তুতঃ ব্রহ্মসূত্র শাব্দ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্য প্রমাণের কথা তাহাতে বিশেষ ভাবে নাই। "ঋগ্বেদাদি এই মহৎ ভূতের নিঃশ্বসিত।" বেদ শব্দসমষ্টি। ব্রহ্ম হইতে স্বতঃ-নির্গত বলিয়া বেদ-প্রমাণ বাদরায়ণ যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণের সহিত পরিচিত ছিলেন না, তাহা নহে। তিনি শ্রুতিকেই প্রত্যক্ষ এবং স্মৃতিকে অনুমান নাম দিয়াছেন (১৩।২৮)। বেদ স্বপ্রকাশ। স্মৃতি যতক্ষণ বেদের অবিরোধী, ততক্ষণ প্রমাণ। শঙ্কর বলিয়াছেন (২।১।১১) "যেসকল বিষয়ের জ্ঞান শ্রুতি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহাতে যুক্তি ও তর্কের উপর নির্ভর করা যায় না। মানুষের চিন্তা কোনও বন্ধন মানে না। যে যুক্তি শ্রুতিকে গ্রাহ্য করে না, ব্যক্তিগত মতের উপর যাহা প্রতিষ্ঠিত, তাহার দৃঢ় ভিত্তি নাই। বহুকষ্টে এক পণ্ডিত কর্তৃক যে সকল যুক্তি উদ্ভাবিত হয়, তাহা অপেক্ষা বিজ্ঞতর ব্যক্তি কর্তৃক তাহা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই শেষোক্ত ব্যক্তির যুক্তিও অন্য লোককর্তৃক খণ্ডিত হয়। বিভিন্ন মতের অস্তিত্ববশতঃ কেবল যুক্তিকে নিশ্চিত ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। আবার কপিল, কনাদ বা অন্য কোনও সর্বজনমান্য পণ্ডিতের মতকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, কেননা তাহাদের মত পরস্পরের বিরোধী।" এইভাবে যুক্তিকে অগ্রাহ্য করার জন্য শঙ্করের বিরুদ্ধবাদিগণ বলিয়াছেন—"কোনও যুক্তিরই দৃঢ়ভিত্তি নাই, একথা তুমি বলিতে পার না। কেননা যুক্তির কোন ভিত্তি নাই, ইহাও তো তুমি যুক্তিদ্বারাই প্রমাণ করিতে চাও। বিশেষতঃ কোনও যুক্তিরই যদি কোনও ভিত্তি না থাকে, তাহা হইবে জীবনযাপন যে অসম্ভব হয়"। ইহার উত্তরে শঙ্কর বলিয়াছেন "কোন কোনও বিষয়ে যুক্তির ভিত্তি আছে, ইহা সত্য। কিন্তু উপস্থিত বিষয়ে যুক্তির যে দৃঢ় ভিত্তি নাই, ইহা অস্বীকার করা যায় না। যুক্তি নির্ভর করে বিশ্বের যাহা কারণ, তাহার জ্ঞানের উপর। কিন্তু তাহা এতই দুর্গম, যে শ্রুতির সাহায্য ব্যতীত, তাহার চিন্তা করাও অসম্ভব। কেননা তাহার রূপ এবং প্রত্যক্ষ-যোগ্য কোনও গুণ নাই বলিয়া তাহা প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, এবং তাহার বিশেষ লিঙ্গ অথবা গুণ নাই বলিয়া তাহার সম্বন্ধে অনুমান অথবা অন্য কোনও প্রমাণের ব্যবহারও সম্ভবপর নহে।" শঙ্করের মতে সূর্য্যালোক যেমন নিজেই আলোকের প্রমাণ, স্বপ্রকাশ বেদও তেমনি নিজেই তাহার সত্যতার প্রমাণ, তাহার প্রামাণ্য-নিরপেক্ষ অর্থাৎ তাহার অন্য প্রমাণের অপেক্ষা নাই। কিন্তু এই উপমাদ্বারা যাহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে না, তাহাদিগকে নিরস্ত করা অসম্ভব।

বেদ শব্দসমষ্টি। বেদান্তীর মতে বেদের অর্থ-ই নিত্য। কিন্তু যেসকল বাক্যে ও শব্দে বেদের অর্থ প্রকাশিত, তাহারা নিত্য নহে। কেননা তাহারা প্রতিকল্পে ঋষিদিগের রচিত। যেসকল বাক্য, শব্দ ও অক্ষর যোগে বেদ রচিত, তাহারা প্রতিকল্পে সৃষ্টিকালে আবির্ভূত হয় এবং প্রলয়ে বিনষ্ট হয়। "সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি এবং প্রতিকল্পের শেষে সৃষ্টির ধ্বংস হইলেও পর পর সৃষ্টির মধ্যে সম্বন্ধ আছে, তাহাদের মধ্যে নিয়তত্ব আছে।" (ডয়সেন), "বেদের মধ্যে বিশ্বের আদর্শ রূপ রক্ষিত আছে। এইরূপ অবিনাশী বলিয়া বেদকে নিত্য বলা হয়। পর পর সৃষ্ট জগতের আকৃতি নিয়ত বলিয়া কোনও কল্পে বেদের প্রামাণ্যের হ্রাস হয় না। অবশ্য যেসকল আকৃতির আদর্শে জগৎ এবং জাগতিক বস্তু গঠিত হয় (archetypal form) তাহারা মায়া-জাত, সুতরাং তাহারা পরমসত্তার ন্যায় নিত্য নহে। বোধাকৃষ্ণণ্ শব্দ হইতে জগতের উৎপত্তি। কিন্তু শব্দ জগতের উপাদান-কারণ নহে। ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ। শঙ্করের মতে শব্দের অর্থ নিত্য। এই নিত্য অর্থ বহন করিবার শক্তিই শব্দের স্বরূপ। এই অর্থ যে সকল বস্তুতে প্রকাশিত হয়, তাহাদের সৃষ্টিকেই এই সকল শব্দ হইতে উৎপন্ন বলা হয়। ঈশ্বরের বুদ্ধি ও ইচ্ছা স্বাধীন। প্রতিকল্পে ঈশ্বর এইসকল শব্দ স্মরণ করিয়া তদনুসারে নূতন সৃষ্টি করেন। যুগেযুগে এই সকল শব্দের অর্থকে বাস্তবরূপ দানই সৃষ্টি। বেদে ঈশ্বরের জ্ঞান এবং স্বরূপ প্রকাশিত। এই অর্থেই বেদ নিত্য। তাঁহার প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ।

কিন্তু শ্রুতি কেবল ব্রহ্মবিষয়েই প্রমাণ। ভৌতিক বস্তু এবং তাহাদিগের গুণ আদি সম্বন্ধে (যাহারা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য) বিজ্ঞানের (Science) প্রামাণ্য শঙ্কর অস্বীকার করেন নাই। ব্রহ্ম সম্বন্ধেও শ্রুতিবাক্যের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য অনুমান ও প্রত্যক্ষ এবং প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। (১।১।২)।

বেদ শব্দের মৌলিক অর্থ জ্ঞান (বিদ্ জ্ঞানে)। অধ্যাপক মোক্ষমুলার বলেন সম্ভবতঃ আদিতে 'জ্ঞান' অর্থেই (Sophoa) বেদ শব্দ ব্যবহৃত হইত। জ্ঞানের (অর্থের)

সহিত শব্দের সম্বন্ধ নিত্য, অর্থপ্রকাশক শব্দ ব্যতীত কোনও জ্ঞানের অস্তিত্ব অসম্ভব। বেদ বুঝাইতে ব্রহ্ম শব্দ বহুস্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই সকল স্থানে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ অর্থেই ব্রহ্ম ও বেদ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহা অসম্ভব নহে যে আদিতে "বেদ" শব্দের অর্থ ছিল "জ্ঞান," —ব্রাহ্মণ ও সংহিতা অর্থে পরে ঐ শব্দের ব্যবহার আরব্ধ হইয়াছিল। শব্দেই ঐশ্বরিক জ্ঞান প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক শব্দ এক একটি প্রত্যয়ের (Idea) বাঙ্ময়রূপ। সৃষ্টিকালে ঈশ্বর এক একটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া তাঁহার এক একটি প্রত্যয়কে রূপ দিয়া তাহাকে বাহিরে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং সেই শব্দসকলই প্রাকৃতিক বস্তুরূপে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং প্রত্যেক শব্দই জ্ঞানময় ঈশ্বরের সৃষ্টি। জীব জগতে প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতিতে (Species) যেমন ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশ, তেমনি প্রত্যেক শব্দে তাহার জ্ঞানের প্রকাশ। শঙ্কর বেদকে "দেব-তির্য্যক্ মনুষ্য-বর্ণা-শ্রমাদি প্রবিভাগ-হেতু" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (১।১।৩)। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন "কোনও কিছু করিতে ইচ্ছা করিয়া যখন কেহ কার্য্যারম্ভ করে, তখন ঈপ্সিত বস্তু প্রকাশক শব্দটি প্রথমে স্মরণ করে (১।৩।২৮)।" কিন্তু যখন কোনও শব্দেরই সৃষ্টি হয় নাই—তখন সে কি করিবে? সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বে বৈদিক শব্দগণ প্রথমে স্রষ্টার মনে উদিত হইয়াছিল এবং এই শব্দগণের আবির্ভাবের পরে স্রষ্টা তদনুরূপ বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইহা অনুমান করিতে হয়। এই অনুমানের সমর্থক প্রমাণ শ্রুতিতে আছে। শ্রুতিতে আছে "ভূঃ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া প্রজাপতি পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। "ভুবঃ ও "স্বঃ" উচ্চারণ করিয়া ভুব ও স্ব-লোকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহা হইতে মনে হয় প্রজাপতির চিন্তা বুঝাইতেই "বেদ শব্দ" ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই অর্থে বেদ নিত্য—কেননা বেদ শব্দসমষ্টি এবং এই সকল শব্দ ঈশ্বরের চিন্তার বাঙ্ময় রূপ। বেদ (ব্রহ্ম, বাক্, শব্দ) নিত্য ও নিরপেক্ষ। যে সত্য প্রকাশের জন্য বেদান্তের এত প্রচেষ্টা তাহা "ব্রহ্ম" (=বাক্=শব্দ) ও আত্মা—এই দুই শব্দ বহন করিতেছে। প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা তাহা প্রমাণ করিবার উপায় নাই। শব্দসমষ্টি বেদই তাহার প্রমাণ।

বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন

শংকরের মতে বাহ্য জগতের পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই; তাহার অস্তিত্ব ব্যবহারিক। কিন্তু তিনি বিজ্ঞানবাদী নহেন। যাহা বাহ্য বস্তু বলিয়া প্রতীত হয়, মনের বাহিরে তাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা বিজ্ঞানমাত্র, ইহা তাঁহার মত নহে। এই মতে বাহ্য জগৎ বস্তুহীন স্বপ্ন মাত্র। তাঁহার পরমগুরু গৌড়পাদের এই মত শঙ্কর গ্রহণ করেন নাই। আমাদের উপলব্ধির বাহিরে অবস্থিত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য হই। কোনও স্তম্ভ অথবা প্রাচীরকে কেহই জ্ঞানের এক রূপ বলিয়া অনুভব করে না—পরন্তু জ্ঞান হইতে ভিন্ন জ্ঞানের বিষয়রূপেই অনুভব করে। যাহারা বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, তাঁহারাও বলেন যে যাহা মনের মধ্যে অনুভূত হয়, তাহারা যেন বাহিরে অবস্থিত বলিয়া প্রতীত হয়। সুতরাং বাহ্যবস্তু যে মনোবাহ্য বলিয়া অনুভূত হয়, তাহা তাহারাও স্বীকার করেন। জ্ঞানের বিষয় জ্ঞান হইতে ভিন্ন। বিষয়ের ভিন্নতা বশতঃই জ্ঞানের ভিন্নতা হয়। আমরা বিষয়দিগকে প্রত্যক্ষ করি, কেবল যে তাহাদের চিন্তা করি, তাহা নহে। প্রতীতি বা প্রত্যক্ষজ্ঞানরূপ মানসিক ক্রিয়া হইতে সেই প্রতীতির বিষয়ের উদ্ভব হয় না। পরন্তু জ্ঞানের যাহা বিষয়, তাহার প্রকৃতিই ঐ মানসিক ক্রিয়ার কারণ। কোনও ব্যক্তি সংবিদের সমীপে উপস্থিতি হইলে কোনও বস্তুর উৎপত্তি হয় না। যখন কোন কষ্টের অনুভব হয়, তখন সেই কষ্ট কেবল মনের একটা বিকার মাত্র নহে। অন্য বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বের ন্যায় সেই কষ্টের অস্তিত্ব আছে। বস্তু স্বরূপে যাহা, সেই রূপেই তাহা অনুভূত হয়। যেরূপে তাহার অনুভূতি হয়, তাহাই তাহার স্বরূপ। শঙ্করের মতে সংবিদের মধ্যে কোনও আধেয় নাই, ইহা কেবল জ্ঞান মাত্র (awareness)। ইহার ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম নাই। ইহা বিশুদ্ধ রূপহীন স্বচ্ছতা মাত্র। জ্ঞানে যে বর্ণ, সৌন্দর্য্য, গতি ও উদ্বেগ দৃষ্ট হয়, তাহা সকলই বিষয়ের, সংবিদের নহে। সংবিদের বিষয়সকল বিভিন্ন বলিয়া ইন্দ্রিয়ানুভূতি, প্রত্যক্ষ জ্ঞান, স্মৃতি, কল্পনা, পরিচিন্তন, বিচার, তর্ক, বিশ্বাস প্রভৃতির মধ্যে আমরা ভেদ দেখিতে পাই। কিন্তু বিশুদ্ধ সংবিদ্ কিছু দানও করে না, কিছু গ্রহণও করে না। ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরও বিষয় থাকে। সেই জন্য ব্রাডলের মতো শঙ্করও নিরপেক্ষ সত্য অথবা ভ্রান্তি স্বীকার করেন না। সত্য প্রত্যয়গণ আমাদের প্রয়োজন-সাধনে সাহায্য করে এবং আমাদের সত্যের ধারণার সহিত তাহাদের সামঞ্জস্য থাকে, কিন্তু ভ্রান্ত প্রত্যয় দ্বারা আমাদের প্রয়োজনও সিদ্ধ হয় না, আমাদের সত্যের ধারণার সহিত তাহাদের সামঞ্জস্যও থাকে না। যে দেখে, শোনে, স্পর্শ করে ও আঘ্রাণ করে, সেও যেমন সত্য, তেমনি যাহাকে দেখে, শোনে, স্পর্শ করে, আঘ্রাণ করে, তাহাও তেমনি সত্য। প্রশ্নোপনিষদের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন—"বিষয় আছে, অথচ তাহা জানিবার উপায় নাই, বলা, আর দৃশ্যবস্তু দৃষ্ট হইতেছে, অথচ চক্ষু নাই বলা, সমান।" যেখানে কোনও জ্ঞান নাই, সেখানে জ্ঞানের বিষয়ও নাই। এক দিকে মন ও তাহার প্রকারগণ (Categories), অন্যদিকে প্রকারদিগের দ্বারা গঠিত জগৎ এক সঙ্গে বর্ত্তমান। বিষয়ী ও বিষয় পরস্পর-সাপেক্ষ। একটি ছাড়িয়া অন্যের

যাঁরা ভাল স্বাস্থ্য
ভালবাসেন তাঁরা সবসময়
লাইফবয় দিয়ে
স্নান করেন
খেলাধূলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন আমরা কখনই ধূলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজানু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। লাইফবয় সাবান এই বীজানুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।
LIFEBUOY
SOAP
প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন-এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।
L. 283-X52 BG

অস্তিত্ব নাই। শঙ্কর বিজ্ঞানবাদ ও বস্তুবাদ (mentalism and realism) উভয়ই অস্বীকার করিয়াছেন। উভয় মতই অভিজ্ঞতার বিরোধী। তিনি স্বপ্ন ও জাগরিত অবস্থার পার্থক্য নির্দেশও করিয়াছেন। স্বপ্নাবস্থায় উপলব্ধ বস্তু জাগরিত অবস্থায় বাধিত হয়, কিন্তু জাগরিত অবস্থার উপলব্ধ স্তম্ভাদি কোনও অবস্থাতেই বাধিত হয় না। (১।২।২৯)

অধ্যাত্মবাদ

শংকর বিজ্ঞানবাদী নহেন, কিন্তু তিনি আত্মা ভিন্ন অন্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। বাহ্ জগৎ অচেতন জড়রূপে প্রতীত হয়। কিন্তু তাহা চৈতন্যেরই প্রকাশ। যাহাই জ্ঞানের বিষয়, তাহাতে বিষয়-চৈতন্যই প্রকাশিত। জ্ঞানের বিষয় জড় নহে, গতি নহে, শক্তিও নহে, তাহা মনের সজাতীয় পদার্থও (mind self) নহে। গতি, শক্তি এবং মন—সকলই প্রত্যয় মাত্র (concept)। সংবিদ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে বিষয়ের অস্তিত্ব নাই। কোনও ব্যক্তির সংবিদে যে বিষয় নাই, ঐশ্বরিক সংবিদে তাহা বর্ত্তমান। ঈশ্বরের সংবিদে যাবতীয় বিশ্ব বর্ত্তমান। বিশ্বের জ্ঞান-সমন্বিত জীবগণও ঈশ্বরের সংবিদে বর্ত্তমান। জগৎ যে স্থায়ী, তাহার কারণ ঈশ্বরের সংবিদে তাহা সর্ব্বদা অনুভূত হইতেছে। সমগ্র জগৎ সেই অসীম আত্মা দ্বারা পূর্ণ। বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই স্বরূপে আত্মিক—আত্মার ধর্ম্ম। আত্মা বিষয়-ও-বিষয় সম্বন্ধের অতীত, আত্মাই সৎ বস্তু। আত্মার বাহিরে কিছুই নাই। ঈশ্বরের জ্ঞানে বর্ত্তমান আছে বলিয়াই যাবতীয় বস্তুর অস্তিত্ব। ঈশ্বরের জ্ঞানে যাহা নাই, তাহার অস্তিত্বই নাই।

সত্য ও মিথ্যা

মীমাংসকদিগের মতে বেদের সকল অংশই (উপনিষদ-ও) কর্ম্মাঙ্গভূত, কর্ম্মের উপদেশ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু ব্রহ্মসূত্র (১।১।৪) বলেন—ব্রহ্মই সমগ্র বেদের প্রতিপাদ্য। বেদান্ত-বাক্যসকলের তাৎপর্য্য-নির্ণয়-দ্বারা ইহা অবগত হওয়া যায়। মীমাংসক বলেন ব্রহ্ম সিদ্ধবস্তু, তাঁহাকে ত্যাগ করা যায় না, গ্রহণও করা যায় না। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে উপদেশ অনর্থক। বেদান্ত বলেন ব্রহ্ম ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য না হইলেও তাহাকে আত্মরূপে অবগত হইলে সর্ব্বদুঃখের আত্যন্তিক নাশ হয়, এবং পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। অজ্ঞান দূরীভূত হইলে মোক্ষরূপ ব্রহ্ম অধিগত হয়। কোন ক্রিয়ার দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা এবং তাহার ফল মোক্ষ অধিগত হয় না। আত্মজ্ঞানের ফল মোক্ষের প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তি। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় যে বস্তুজ্ঞান, তাহার ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানও বস্তুতন্ত্র। ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত কোনও কার্য্যের সম্বন্ধ কল্পনা করা যায় না। শাস্ত্র ব্রহ্মকে ইদম্ বলিয়া প্রতিপাদন করেন না। ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মা; তিনি জ্ঞানের বিষয় নহেন, ইহা প্রতিপাদন করিয়া শাস্ত্র অবিদ্যাকল্পিত জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞান প্রভৃতি ভেদ অপসরণ করেন। শ্রুতি বলেন—"যস্য অমতং, তস্য মতং। মতং যস্য, ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং, বিজ্ঞাতং অবিজানতাম্" ব্রহ্ম যাহার নিকট অবিদিত তাহার নিকট বিদিত, আর যাহার নিকট বিদিত বলিয়া বিবেচিত, তিনি ব্রহ্মকে জানেন না। কারণ সমস্ত জ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত (ফলাব্যাপ্য রূপে তাহাদের জ্ঞানের বিষয় হন না)। আর অজ্ঞানীর নিকট জ্ঞানের বিষয়রূপে ব্রহ্ম হন বিজ্ঞাত। শ্রুতিতে ইহাও আছে—দৃষ্টির দ্রষ্টাকে এবং বিজ্ঞাতার (বুদ্ধিবৃত্তির) বিজ্ঞাতাকে সাক্ষীকে জানিতে পারিবে না। ব্রহ্মকে বিধিমুখে প্রতিপাদন করা যায় না বলিয়া তিনি শব্দ জ্ঞানের অবিষয়। আবার নিষেধ মুখে তিনি নেতি, নেতি রূপে বিজ্ঞানত হন বলিয়া তিনি শাস্ত্র-প্রমাণ-গম্য তিনি তৎ-ত্বম্ অসি অহং ব্রহ্মস্মি, এই প্রকার বৃত্তির বিষয় হন—সুতরাং তিনি শব্দ জ্ঞানের অবিষয় নহেন।

যখন আমাদের ঘটজ্ঞান হয়, তখন আমাদের অন্তঃকরণ ঘটের আকার ধারণ করে। এই ঘটাকার বৃত্তিতে চিতের আভাস থাকে। অন্তঃকরণের এই বৃত্তি ঘটের অধিষ্ঠান। যে চৈতন্য তাহাতে বর্ত্তমান তাহা অজ্ঞানরূপ আবরণকে নাশ করে। ঘটাকা অন্তঃকরণ বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত যে চিদাভাস, তাহাকে প্রমাণ-চৈতন্য বা "ফল" বলে। এই প্রমাণ-চৈতন্যই ঘটকে প্রকাশিত করে (অজ্ঞানাবরণ নাশের পরে)। প্রমাতৃ চৈতন্য ও ঘটাধিষ্ঠান-ভূত বিষয় চৈতন্যের অভেদাভিব্যক্তিবশতঃ প্রমাণ চৈতন্য ঘটকে প্রকাশিত করে। ইহাই ঘটের ফলব্যাপ্যতা। প্রমাতৃ চৈতন্যও বিষয় চৈতন্যের অভেদাভিব্যক্তিবশতঃ বিষয়-চৈতন্যে অধ্যস্ত ঘট প্রমাতৃ-চৈতন্যে অধ্যস্ত হয়। ইহার ফলে প্রমাতা ঘটকে জানিতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞানের সময় "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য শুনিয়া মনের ব্রহ্মাকারা অখণ্ড বৃত্তি হয়। ব্রহ্ম এই বৃত্তির ব্যাপ্য। এই বৃত্তি দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক ও ব্রহ্মনিষ্ঠ অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। কিন্তু অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চিদাভাস ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, পরন্তু স্বয়ং অভিভূত হইয়া পড়ে ও ব্রহ্মমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। ইহার কারণ এই অন্তঃকরণের ব্রহ্মাকার বৃত্তি কর্ত্তৃক ব্রহ্মনিষ্ঠ অবিদ্যার নাশ হইলে, সেই অবিদ্যার কার্য্যভূত সমস্ত প্রপঞ্চ ও তাহার অন্তর্গত উপরি-উক্ত ব্রহ্মাকারা বৃত্তি বিনষ্ট হয়। দর্পণ অপসারিত হইলে তাহাতে প্রতিবিম্বিত মুখ যেমন সত্য মুখে পর্য্যবসিত হয়, সেইরূপ উক্ত ফলরূপ চিদাভাসও ব্রহ্ম চৈতন্যমাত্রে পর্য্যবসিত হয়, লবণের পুতুল লবণ সমুদ্রে মিলাইয়া যায়। অন্তঃকরণ বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাস রূপ "ফল চৈতন্য" ঘটাদির ন্যায় ব্রহ্ম বস্তুকে প্রকাশ করিতে পারে না। ইহাই ব্রহ্মের ফলাব্যাপ্যতা।

এইভাবে ফলব্যাপ্য নহেন বলিয়া ব্রহ্মকে শব্দ জ্ঞানের অবিষয় বলা হইয়াছে।*

ব্রহ্ম জ্ঞানই একমাত্র সত্যজ্ঞান। তাহা প্রকাশিত হইলে অন্য সমস্ত জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানের তুলনায় অন্য জ্ঞান মিথ্যা। কিন্তু এই মিথ্যা জ্ঞানেরও এক প্রকার সত্যতা আছে। ইহা ব্যবহারিক জ্ঞান। লোক ব্যবহারে ইহা সত্য। লোক ব্যবহারের যতটুকু সত্যতা, এই জ্ঞানের সত্যতা তাহার অধিক নহে। ব্রহ্মজ্ঞান পারমার্থিক। তাহার সত্যতা অনপেক্ষ, কিন্তু ব্যবহারিক জ্ঞান যতক্ষণ অবিদ্যা থাকে, ততক্ষণই সত্য। অবিদ্যার নাশ হইলে এই জ্ঞানের বিষয়ীভূত প্রপঞ্চের সহিত এই জ্ঞানও বিনষ্ট হয়। রজ্জুতে সর্প জ্ঞান দূরীভূত হইলে যেমন বুঝিতে পারা যায় রজ্জুই সত্য, সর্প মিথ্যা, সর্প সেখানে কখনও ছিল না, তাহার যে জ্ঞান হইয়াছিল, তাহা মিথ্যা, তেমনি ব্রহ্ম জ্ঞান হইলে যখন অবিদ্যা ও প্রপঞ্চের নাশ হয়, তখন চিদাভাসযুক্ত অন্তঃকরণের অস্তিত্ব থাকিলে বুঝিতে পারা যাইত, যে প্রপঞ্চ ও তাহার জ্ঞান কখনই ছিল না। কিন্তু তখন অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চিদাভাস ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত হয়।

ব্যবহারিক জ্ঞানের আপেক্ষিক সত্যতার প্রমাণ বস্তুর সহিত তাহার সাদৃশ্য, ব্যবহারে তাহার কার্য্যকারিতা এবং অন্যান্য ব্যবহারিক জ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্য। কোনও বস্তু সত্য কিনা তাহা নির্ভর করে সেই বস্তুর উপর, আমাদের ধারণার উপর নহে। কোনও স্তম্ভকে স্তম্ভ, অথবা মানুষ অথবা অন্য কিছু এইভাবে বর্ণনা করিলে তাহা সত্য হয় না। তাহা স্তম্ভ ইহাই সত্য। কেননা এই বর্ণনাই সেই বস্তুর স্বরূপের সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত। সত্য ও মিথ্যা উভয়ই সংশ্লিষ্ট বস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্য বস্তু ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় নাই এবং ব্রহ্মকে বর্ণনা করিতে সমর্থ কোনও শব্দই নাই। সুতরাং আমাদের কোনও বর্ণনাই সম্পূর্ণ সত্য নহে।

যে জ্ঞান অন্য জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয় না, অন্য জ্ঞানের সহিত যাহার সামঞ্জস্য আছে, তাহা সত্য (ব্যবহারিক)। কিন্তু বিশ্বের অতি সামান্য অংশই আমাদের পরিজ্ঞাত বলিয়া কোনও জ্ঞানকেই অবাধ বলিতে পারা যায় না, অন্য জ্ঞানলাভের ফলে যে জ্ঞান সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, সে জ্ঞান সত্য নহে। স্বপ্নে যাহা দেখা যায়, জাগরিত হইলে তাহার বাধা হয়, সুতরাং স্বপ্ন সত্য নহে। আবার ব্রহ্ম জ্ঞান দ্বারা জাগরিত ব্যবহারিক জ্ঞান বাধিত হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের বাধক কোনও জ্ঞান নাই। এই পরম জ্ঞান স্বতঃপ্রমাণ। এই জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে ভেদ থাকে না। ব্যবহারিক জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের একত্ব অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। মনের গঠনের মধ্যে অবিদ্যার বীজ নিহিত।

জ্ঞান স্ব-প্রকাশ। অবিদ্যাকর্তৃক তাহার পূর্ণ প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। জ্ঞানকালে চিদাভাসযুক্ত অন্তঃকরণ জ্ঞেয় বস্তুর রূপধারণ করে। ইহাই অন্তঃকরণের বৃত্তি। ইহার ফলে জ্ঞেয় বস্তু যখন প্রমাতৃ চৈতন্যে অধ্যস্ত হয়, তখন সেই বস্তুর জ্ঞান হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্ঞানেরও জ্ঞান হয়। বস্তুর জ্ঞান বস্তুর সহিত আপনাকে (জ্ঞানকে) প্রকাশিত করে। ইহা ব্যতীত স্বতন্ত্র কোনওরূপ জ্ঞানের জ্ঞান হয় না। তখন জ্ঞান জ্ঞানরূপে পরিজ্ঞাত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানে অন্তঃকরণে-প্রতিবিম্বিত চিদাভাস ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না, ব্রহ্মনিষ্ঠ অবিদ্যার নাশের ফলে তখন ব্রহ্মাকার অন্তঃকরণ বৃত্তির সহিত অবিদ্যাকৃত যাবতীয় প্রপঞ্চ বিনষ্ট হয়। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের জ্ঞান অন্তঃকরণে হওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া অনুমান করা যায়।

জ্ঞানের প্রামাণ্য সম্বন্ধে অদ্বৈতসিদ্ধিতে আছে "কোনও বস্তু প্রকৃতপক্ষে যাহা, তাহা প্রকাশ করে বলিয়াই তাহার জ্ঞান প্রামাণিক হয় না। অথবা তাহার বিপরীত রূপে প্রকাশ করিলে অপ্রামাণিক হয় না। কিন্তু যে জ্ঞান পরবর্ত্তীকালে অসত্য বলিয়া পরিত্যক্ত হয় না, তাহা প্রামাণিক এবং যাহা পরিত্যক্ত হয় তাহা অপ্রামাণিক। এই প্রামাণ্য কেবল শাস্ত্র হইতে প্রাপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানেরই থাকিতে পারে। অন্য কোন জ্ঞানের এই প্রামাণ্য নাই।"

ব্যবহারিক জ্ঞান

শঙ্কর বলেন—আত্মায় অনাত্মার অধ্যাস এবং অনাত্মায় আত্মার অধ্যাস অবিদ্যা। এই আত্মা ও অনাত্মার ইতরেতর অধ্যাসকে হেতু করিয়া যাবতীয় লৌকিক ও বৈদিক প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহার প্রবৃত্ত হইয়াছে। বিধিনিষেধ ও মোক্ষপর সকল শাস্ত্রও এইরূপে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমিও আমার এইরূপ অভিমান যাহার নাই, সে জ্ঞাতা হইতে পারে না। সুতরাং তাহার পক্ষে প্রমাণসকলের প্রযোজ্যতা নাই। দেহের সহিত প্রত্যক্ আত্মার ইতরেতর অধ্যাস ও ধর্ম্মের অধ্যাস না হইলে অসঙ্গ আত্মার জ্ঞাতৃত্ব সঙ্গত হয় না। অবিদ্যাযুক্ত পুরুষকে আশ্রয় করিয়াই প্রমাণ ও শাস্ত্র সকল প্রবৃত্ত হয়। ব্যবহার কালে পশু প্রভৃতির সহিত বিদ্বান ব্যক্তির আবার কোনও প্রভেদ নাই। উদ্যতদণ্ড-হস্ত পুরুষকে নিজের অভিমুখে আসিতে দেখিয়া পশুগণ পলায়ন করে এবং হরিত-তৃণ-হস্ত পুরুষকে দেখিয়া তাহার দিকে গমন করে। মানুষও উদ্যতখড়্গ পুরুষ দেখিয়া দূরে যায়, বিপরীতহস্ত মানুষের নিকট আগমন করে। বিবেকীই হউক অবিবেকীই হউক প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহার পশুগণের

* বেদান্তদর্শনম্। (উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত) (১৬৮—৯ পৃষ্ঠা)

সমানই হয়। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আমাদের মানসিক ক্রিয়া আমাদের স্বার্থ (interests) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং অন্তঃকরণ-কর্তৃক আমাদের চেতনা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকে। আমাদের প্রয়োজনের সহিত দ্রব্যের যেসকল গুণের সম্বন্ধ তাহারাই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। আমাদের স্বার্থ ও প্রয়োজনের সহিত যাহার সম্বন্ধ নাই, তাহা আমাদের জ্ঞানের বাহিরে পড়িয়া থাকে। ফলে সংবিদের ক্ষেত্র নিতান্তই সংকীর্ণ। দ্রব্যের অসংখ্য সম্বন্ধের অল্পই আমাদের সংবিদে প্রতিফলিত হয়। সকল সম্বন্ধযুক্ত হইয়া কোনও বস্তুই সংবিদে প্রতিফলিত হয় না। পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও সসীম বুদ্ধি দ্বারা আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ বলিয়া বিশ্বের অধিকাংশই আমাদের জ্ঞানের বাহিরে অবস্থিত। সুতরাং আমাদের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির মাধ্যমে বিশ্বের যেরূপ আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়, তাহা যে বিশ্বের প্রকৃত রূপ তাহা বলিতে পারা যায় না। বিশ্বের যতটুকু আমরা জানিতে পারি, ততটুকু সহিতই আমাদের জীবনের কারবার। সুতরাং পার্থিব জীবনের পক্ষে আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের প্রয়োজন আছে এবং তাহার মূল্যও আছে। এই জ্ঞানই ব্যবহারিক জ্ঞান। অধ্যাস বা অবিদ্যা এই জ্ঞানের ভিত্তি হইলেও এবং তাহা ত্রুটীপূর্ণ হইলেও, তাহা নিরর্থক ও মূল্যহীন নহে।

আমাদের সংবিদ (বিষয়ী) ও তাহার বিষয়ের সাহত এক প্রকার সম্বন্ধই জ্ঞান। কিন্তু এই সম্বন্ধ অনন্যসাধারণ। অন্য কোনও সম্বন্ধের সহিত ইহার সাদৃশ্য নাই। এই সম্বন্ধ সংযোগও নহে, সমবায় সম্বন্ধও নহে। সংবিদ ও তাহার বিষয় একত্র বর্ত্তমান, এই পর্য্যন্ত বলা যায়, কিন্তু উভয়ের সম্বন্ধের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা যায় না।

চিন্তা বা মনন দ্বারা বস্তুর স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না, যদিও চিন্তা এই স্বরূপ জানিবার জন্য সদা-চেষ্টিত। চৈতন্যই পরম সত্তা, তাহাকে প্রকাশিত করিবার জন্যই যাবতীয় জ্ঞানের চেষ্টা। আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানে সত্যেরই প্রকাশ। কিন্তু সৎ কালাতীত। প্রত্যক্ষ জ্ঞান কালিক বলিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়না। জ্ঞানের কোনও সাধনই সৎকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে পারে না। সৎকে প্রকাশ করিবার জন্য আমরা তাগাতে বিশেষণের আরোপ করি। যাহার আরোপ করি তাহা সত্য নহে, তাহা সৎ হইতে ভিন্ন। যাহা সত্য নহে, তাহা সতে আরোপ করি বলিয়াই তাহা অধ্যাস—সৎ যাহা নহে, সত্যে তাহার আরোপ। আত্মা সৎ, তাহাতে আমরা ক্রিয়া, কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের আরোপ করি। 'অতস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধিঃ—যাহা তাহা নহে, তাহাকে তাহা বলিয়া জানাই অধ্যাস। আমাদের যাবতীয় ব্যবহারিক জ্ঞান অধ্যস্তর জ্ঞান। সকলই আত্মায় অধ্যস্ত। আত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই কিন্তু আত্মায় যাহা অধ্যস্ত বা আরোপিত হয়, তাহা অল্প, অল্প, ভূমা। এই জগৎ প্রপঞ্চ, আত্মাতেই অধ্যস্ত। ইহার পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। রজ্জুতে সর্পের মত শুক্তিতে রজতের মত, জগৎ-প্রপঞ্চ ব্রহ্মে অধ্যস্ত। ব্রহ্ম জ্ঞানের আবির্ভাবের সঙ্গে ইহার বিলোপ হয়। সুতরাং পারমার্থিক দৃষ্টিতে ইহার জ্ঞান মিথ্যা। ব্রহ্মজ্ঞানে বিষয়-বিষয়ী ভেদ নাই। কিন্তু ব্যবহারিক জ্ঞান বিষয়-বিষয়ীর ভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

মানব মনের গঠনই এইরূপ যে তাহা এক অখণ্ড বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড বিভক্ত করে, এবং অসঙ্গ আত্মাকে বিষয়ী-বিষয়-সম্বন্ধ যুক্তরূপে প্রকাশিত করে। এই মানব-মন ও তাহাতে প্রকাশিত যাবতীয় বিষয় সেই অখণ্ড অসঙ্গ আত্মাতে অধ্যস্ত। তাহাদের পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই, তাহারা প্রপঞ্চের অন্তর্গত, ব্রহ্মজ্ঞানে প্রপঞ্চ-বিলয়ের সময় তাহারা বিলুপ্ত হয়। ব্রহ্মজ্ঞান বা মোক্ষ অবিনাশী।

ব্যবহারিক জ্ঞানে যে জগৎ প্রকাশিত, তাহা প্রজ্ঞার নিয়ম-শৃঙ্খলে বদ্ধ; তাহা কার্য্যকরণ-নিয়মের অধীন, দেশ ও কালে ব্যবস্থিত। কিন্তু এই জগতের তলদেশে যে অখণ্ড আত্মা বর্ত্তমান, তাহা অবিকারী, তাহাতে কার্য্য-কারণ ভেদ নাই, তাহা দেশ ও কালের অতীত। ব্যাবহারিক প্রমাণ তাহাতে প্রযোজ্য নহে, ব্যাবহারিক প্রমাণ দ্বারা তাহাকে জানা যায় না। কিন্তু আমরা তাঁহার চিন্তা করি, চিন্তার অভ্যস্ত উপায়ে। সেই পরম সত্তাকে—যাহাতে আমাদের জ্ঞানের যাবতীয় বিষয় অধ্যস্ত, তাঁহাকে পুরুষরূপে এবং সমগ্র বিশ্ব সেই পুরুষের জ্ঞানের বিষয়রূপে চিন্তা করি। এই পুরুষই ঈশ্বর। ঈশ্বর জ্ঞাতা ও জগৎ জ্ঞেয়। তাঁহার ও জগতের মধ্যে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-সম্বন্ধ বর্ত্তমান। কিন্তু তাঁহার জ্ঞানও মানবীয় জ্ঞানের মতো আপেক্ষিক, জ্ঞাতা-ও-জ্ঞেয়-সম্বন্ধের অস্তিত্বের জন্য আপেক্ষিক। পূর্ণজ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক।

(পূর্বানুবৃত্তি)

তাহারা বাড়ি পৌঁছিয়া দেখিল চন্দ্রসুন্দর ঘরের মেঝেতে বসিয়া গীতাপাঠ করিতেছেন। ঘরের মধ্যে অনেকগুলি ধূপকাটি জ্বলিতেছে। চন্দ্রসুন্দর পরিবেশটিকে যথাসম্ভব শুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। মেঝের একধারে রাধানাথ গোপও বসিয়া আছেন এবং মুগ্ধচিত্তে গীতার ব্যাখ্যা শুনিতেছেন। তিনি নিজের বাগান হইতে কয়েকটি বড় বড় গাঁদাফুলের মালা আনিয়াছিলেন, সেগুলি চন্দ্রসুন্দরের দুই পার্শ্বে স্তূপীকৃত করা রহিয়াছে। প্রিয়গোপাল এবং সুবাতালী তহশিলদারের ছোট ছেলে সফুদ্দিনও একধারে বসিয়া আছে। ইহারা সকলেই চন্দ্রসুন্দরের ছাত্র। ঘরের আর একধারে একটু তফাতে বসিয়া আছে কিরণ, নিখিল-বাবুর স্ত্রী কাঞ্চনমালা, স্টেশন মাস্টারের স্ত্রী যোগমায়া এবং মিস বোস। কিরণ এবং যোগমায়ার গলায় আঁচল, হাত দুইটি জোড়-করা। উষাও এখানে ছিল, কিন্তু চিত্রা আর সুব্রত আসাতে উঠিয়া গিয়াছে। উর্মিলা সূর্য্যসুন্দরের মাথার শিয়রে চিত্রার্পিতবৎ বসিয়া আছে। গগন পিছনের দরজাটা দিয়া একবার উঁকি দিয়া দেখিল। আন্দাজ করিবার চেষ্টা করিল গীতাপাঠ আর কতক্ষণ চলিবে। কথা ছিল সন্ধ্যায় দাদুর ঘরে মজলিস বসিবে, চম্পা গান গাহিবে। কিন্তু ছোট-দাদুর গীতা-পাঠ সে সম্ভাবনা রহিত করিয়া দিয়াছে। সে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল। সূর্য্যসুন্দর চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া শুইয়া ছিলেন। গীতার ব্যাখ্যা মাঝে মাঝে তাঁহার কানে যাইতেছিল, তিনি তাহার কিছু অর্থও হৃদয়ঙ্গম করিতে-ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মুদিত নয়নের সম্মুখে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল সেই পথটা, সেই আদি-অন্ত-হীন নির্জ্জন পথ, যে পথে তিনি একক যাত্রী, যে পথের অপর প্রান্ত হইতে কে যেন আগাইয়া আসিতেছে। তিনি তাহাকে ঠিক চিনিতে পারিতেছেন না, মনে হইতেছে ওই কি মৃত্যু? মৃত্যু কি এভাবে আসে?

হঠাৎ বাহিরে খোল করতাল মৃদঙ্গ বাজিয়া উঠিল।

"ও কি?"

সূর্য্যসুন্দর চোখ খুলিয়া প্রশ্ন করিলেন।

রাধানাথ গোপ সসম্ভ্রমে উত্তর দিলেন—কিষুণগঞ্জের রামবিলাস বাবাজীর কীর্ত্তনীয়ার দল। তাদের খুব ইচ্ছে তারা আপনার হাতার একধারে বসে' নামকীর্ত্তন করবে রোজ। রামবিলাস বলছিল আমি তো ডাক্তারবাবুর ঋণ এ জীবনে শোধ করতে পারব না, তিনি যদি অনুমতি দেন তাহলে তাঁকে নামগান শোনাই—

সূর্য্যসুন্দর কোন উত্তর দিলেন না।

কাঞ্চনমালা, নিখিলবাবুর স্ত্রী, কিরণের কানে কানে কি যেন বলিলেন।

কিরণ বলিল, "কাকীমা বলছেন, একটু দূরে বসে' ওরা বাজাক তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু দাদুর কানের কাছে যেন গোলমাল না হয়"

"না, না, ওরা দূরে বসেই বাজাবে। ওই হাস্নুহানার ঝাড়ের ওপারে ওদের জায়গা করে' দিয়েছি। মাস্টার মশাইকে জিগ্যেস করে' তবে ওদের খবর দিয়ে-ছিলাম—"

চন্দ্রসুন্দর বলিলেন, "বাজাক না। ভগবানের নাম হবে, ভালই তো"

রাধানাথ গোপ তাহাদের বসাইবার জন্য বাহিরে চলিয়া গেলেন।

চন্দ্রসুন্দর পুনরায় গীতাপাঠ আরম্ভ করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পুরসুন্দরী প্রবেশ করাতে তাহা আর হইল না।

পুরসুন্দরী সূর্য্যসুন্দরের কাছে গিয়া নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "আপনার জন্যে গরম লুচি ভেজে আনি দু'খানা ?

"না। আমি আর রাত্রে কিছু খাব না। দিনে অনেক খাওয়া হয়েছে। রাত্রে না খাওয়াই ভালো"

গগন মাথার দিকের দরজার কাছে পুনরায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, "ভোরের দিকে আমি না হয় হর্লিক্‌স্ করে' দেব এক কাপ্।"

"তুমি করে' দেবে ?"

সূর্য্যসুন্দর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন।

"আমি খুব ভোরে উঠি যে। আপনার ঠিক পাশের ঘরেই তো আমি আছি। সমস্ত ব্যবস্থা করে' নিয়েছি ওখানে। স্টোভ, জলের কুঁজো, চায়ের সমস্ত সরঞ্জাম, ওভালটিন্, হরলিক্‌স—"

গীতাপাঠে বাধা পড়ায় চন্দ্রসুন্দর মনে মনে চটিতেছিলেন, কিন্তু উপায় কি! পুরসুন্দরী তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "রাত তো অনেক হ'ল। আপনার খাবার জায়গা করে' দি ?"

"আমারও তেমন খিদে হয় নি মা"

"তবু যা পারেন খেয়ে নিন। গরম গরম ফুলকো লুচি আপনি বসলে ভেজে ভেজে দেব। আপনার খাওয়া হলে তবে এরা খেতে বসবে। কুমার মাংসের হাঁড়ি খোলবার আগেই আপনাকে খাইয়ে দিতে চাই"

কিরণ মন্তব্য করিল—"সে-ই ভালো। একে পাখীর মাংস তার কুমার রেঁধেছে, ঢাকা খুললে ও তো মাৎ করে' দেবে চারদিক। কাকাবাবু, আপনি খেয়েই নিন"

"আচ্ছা এই শ্লোকটা শেষ করে' উঠছি"

শ্লোকটা পড়িতেছিলেন কিন্তু তাহাতেও আবার বাধা উপস্থিত হইল। হাই-হিল-জুতা খটখট করিয়া চিত্রা প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া চন্দ্রসুন্দর অবাক হইয়া গেলেন। শুধু জুতা নয়, ওভার কোটও পরিয়াছে, হাতে দস্তানা, চোখে চশমা। সে সোজা গিয়া সূর্য্যসুন্দরের বিছানায় বসিল এবং দুই হাতে সূর্য্যসুন্দরের গাল দুটি ধরিয়া তাঁহার কপালে চুম্বন করিল। প্রণাম করিল না। চন্দ্রসুন্দর অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, কি আশ্চর্য্য!

পুরসুন্দরী চন্দ্রসুন্দরের দিকে আড় চোখে চাহিয়া চিত্রাকে বলিলেন, "জুতোটা খুলে আয় বাইরে, এখানে গীতা পড়া হচ্ছে যে। আগে প্রণাম কর, দাদুকে, ছোটদাদুকে—"

"ও"

অপ্রতিভমুখে চিত্রা বাহির হইয়া গেল এবং জুতা খুলিয়া আসিয়া গুরুজনদের প্রণাম করিতে লাগিল। চিত্রার স্বামী সুব্রতও দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, তাহার পরিধানে ছিল খাকি সুট। সে-ও পুরসুন্দরীর কথাগুলি শুনিয়া হেঁট হইয়া জুতার ফিতা খুলিতে লাগিল। চন্দ্রসুন্দর সুব্রতকে দেখেন নাই, কিন্তু সে যে পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্ তাহা শুনিয়াছিলেন।

বলিলেন, "তুমি দাদু কষ্ট করে' জুতো খুলছ কেন। এখানে আর কেউ কিছু মানছে না, সব জগন্নাথ ক্ষেত্র হ'য়ে গেছে। তাছাড়া গীতা পড়াও হয়ে গেছে। তুমি জুতো পরেই ভিতরে এস"

সুব্রত কিছু বলিল না, মৃদু হাসিল মাত্র, তাহার পর ঘরে প্রবেশ করিয়া গুরুজনদের প্রণাম করিতে লাগিল। তাহার পর সূর্য্যসুন্দরের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দাদু, আপনি কেমন আছেন এখন"

"খুব ভালো আছি। তবে সময় হ'য়ে এল, তোমাদের সকলের কাছে বিদায় নিয়ে এবার পারের খেয়ায় উঠিতে হবে"

পার্ব্বতী হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে আসিয়া ধমকের সুরে পুরসুন্দরীকে বলিল, "মা, তুমিও এসে গল্পে মেতে গেছ! চিত্রা আয়, সুব্রত তুমিও এস, বাথরুমে গরম জল দিয়েছি। মা, তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকো না এস, আঁচ ব'য়ে যাচ্ছে, বেগুন ব্যাসন সব ঠিক করে' দিয়েছি"

গগনকে আবার দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল।

"ওরে পার্ব্বতী, চিত্রা আর সুব্রতর জিনিস-পত্র ওই

চলদে তাঁবুটায় নিয়ে যেতে বললে ছোটকাকা। ওরা ওখানেই থাকবে, তুই গুছিয়ে দে সব—"

"বাবা বাবা, এক হাতে আমি আর ক'দিক সামলাই বল—"

বলিয়াই পার্ব্বতী অন্তর্দ্ধান করিল।

ইহার পরেই অপ্রত্যাশিতভাবে 'দ্বারপ্রান্তে দেখা দিলেন কবিরাজ মশায়। তিনি হঠাৎ মিলিটারি কায়দায় সুব্রতকে স্যালুট করিয়া বলিলেন—"জয় হিন্দ"। তাহার পর আকর্ণ বিশ্রান্ত হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমিও কিছুদিন ফৌজে চাকরি করেছিলাম। ফৌজী আদব-কায়দা কিছু কিছু মনে আছে এখনও। তারপর সুপারিনটেণ্ড সাহেব কেমন আছ"

"ভাল। আপনি?"

"আমি নেই, যা দেখছ তা অতীতের কঙ্কাল"

চিত্রার বিবাহের সময় কবিরাজ মশায় ছিলেন, তখন সুব্রতর সহিত তাঁহার বেশ আলাপ হইয়াছিল।

পার্ব্বতীর উচ্চকণ্ঠস্বর পুনরায় শোনা গেল।

"চিত্রা, সুব্রত এস, তোমাদের জল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

"যাও, যাও তোমরা যাও। ছোট বামুনদিদিকে আর চটিও না। সেই বুড়ীই বোধ হয় পুনর্জন্ম গ্রহণ করে' এসেছে আবার—"

"কার কথা বলছেন—"

"সেকালে আর এক বামুনদিদি ছিলেন এ বাড়ীতে, তার কথা তোমরা বোধহয় শোন নি। বিরুবাবুর মনে আছে হয় তো।"

"সুব্রত, চিত্রা আ—"

আবার পার্ব্বতীর গলা শোনা গেল।

"যাও, যাও তোমরা যাও"

চিত্রা সুব্রত উঠিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

"আপনি এতক্ষণ ছিলেন কোথায় কবরেজ মশাই"—কিরণ প্রশ্ন করিল।

"ভুস্‌কারে শুয়ে ঘুমুচ্ছিলাম। ওইখানেই আমি আমার আস্তানা করে' নিয়েছি"

এ অদ্ভুত খবরে সকলে হাসিয়া উঠিল। ভুস্‌কার মানে যে ঘরে গমের ভুসি জমা করা থাকে। প্রকাণ্ড উঁচু ঘর। জানালা দরজা কিছু নাই। একটি দেওয়ালের উপরে শুধু একটি ছোট জানলার মতো ফাঁক থাকে, তাহার ভিতর দিয়াই ঘরে ভুসি ঢালা হয়। ভুসি বাহির করিবার সময়ে সিঁড়ির সাহায্যে সেই পথেই চাকরেরা ঢোকে। ঘরের ছাত হইতে মেজে পর্য্যন্ত ভুসি ঠাসা থাকে সেখানে। কেবল ওই জানালার ঠিক নীচেই খানিকটা জায়গা খালি থাকে ভিতরে। সেখানে কবিরাজ মহাশয় শুইয়াছিলেন এ সংবাদ সত্যই অদ্ভুত।

কিরণ প্রশ্ন করিল, 'ওখানে আপনি উঠিলেন কি করে?"

"মই দিয়ে। কুমারবাবুর লম্বা মই আছে যে একটা"

"আপনার গায়ে তো ভুসি-টুসি কিচ্ছু লাগে নি দেখছি"

"আপাদমস্তক কম্বল ঢাকা দিয়ে শুয়েছিলাম। কম্বলটায় লেগেছে খুব। সেটা খুলে এসেছি"

সূর্য্যসুন্দর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ভুস্‌কারে শোওয়া ওঁর অনেক দিনের পুরোনো অভ্যেস"

কবিরাজ অকৃত্রিম আনন্দে খিক খিক করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

"সেই কলাচুরির কথা মনে আছে আপনার ডাক্তারবাবু?"

"আছে বই কি—"

উষা আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। সে সবটা শোনে নাই। কিন্তু গল্পের গন্ধ পাইয়াছিল।

বলিল, "কোথায় কলা চুরি হ'ল—"

"এখন হয় নি। হয়েছিল অনেক দিন আগে। তোমাদের জন্মাবার আগে। সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। সে বড় মজার গল্প"

"বলুন না"

ছোট-খুকীর মতো আবদার করিয়া উষা বাবার বিছানার একধারে জাঁকিয়া বসিল।

কুমার পিছনের দ্বার দিয়া ঢুকিয়া কাঞ্চনমালাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি এখন যাবেন? আমি মথুরার হাতে কাকাবাবুর জন্য খানিকটা রান্না-করা মাংস পাঠাচ্ছি। আপনি যদি যেতে চান মথুরার সঙ্গে যেতে পারেন"

"তাই যাই তাহলে। লণ্ঠন দিও একটা"

"হ্যাঁ লণ্ঠন দেব বই কি"

কাঞ্চনমালা বাহির হইয়া গেলেন।

চন্দ্রসুন্দরও গীতা ফুলের মালাগুলি গুছাইয়া লইয়া উঠিয়া পড়িলেন। এসব আলোচনা তাঁহার তত ভালো লাগিতেছিল না।

কবিরাজ মহাশয় একটি মোড়া টানিয়া বসিলেন এবং শুরু করিলেন তাঁহার গল্প।

"এটা গল্প নয়। আমি যা বলি তা একটাও গল্প নয়, সত্য। আই অ্যাম এ হিস্‌টোরিয়ান্। ডাক্তারবাবুর বাড়ির চারিপাশে তখন বাগান ছিল। ফুল ফল শাক-সবজি কপি-আলু সব রকম হ'ত। ডাক্তারবাবু বিতরণ করতে কসুর করতেন না, তবু চুরি হ'ত। কাক-বাদুড়-গরু-ছাগলরা তো করতই, মানুষরাও করত। যখনকার কথা বলছি তখন ডাক্তারবাবুর কলা-চাষ করবার শখ খুব প্রবল। জিতুবাবু বলে' এক ব্রাহ্ম ভদ্রলোক তখন ডাক্তার-বাবুর বাড়িতে থাকতেন এবং চাষ সম্বন্ধে নানা রকম পরামর্শ দিয়ে ডাক্তারবাবুকে উৎসাহিত করতেন। আর আমরা বিনা পয়সায় নানা রকম তরিতরকারি ফলমূল খেয়ে বাহবা বাহবা করতুম। কলা চাষের খুব ধুম চলেছে তখন, বাড়ির চারদিকে নানা রকম কলা-গাছ লাগানো হয়েছে। সে যে কত রকমের কলা, তা আর কি বলব তোমাদের। সব আমার মনেও নেই। চীনে কলা, বর্ম্মী কলা, সিংগাপুরী কলা, কাবুলী কলা, মাদ্রাজী কলা, মর্ত্তমান কলা, অগ্নীশ্বর কলা—এই ক'টা নাম মনে পড়ছে। জিতুবাবু ঢাকা থেকে এক রকম কলা গাছ আনালেন তার নাম 'শফ্‌রি' কলা। তিনি এক ডজন শফরি কলার গাছ লাগালেন, নানা রকম সার-টার দিয়ে। ডাক্তারবাবু রোজ সকালে উঠে রোগী দেখবার আগে কলা গাছগুলিকে একবার দেখে আসেন। জিতুবাবু তো দু'ঘণ্টা অন্তর দেখছেন। ক্রমে ক্রমে গাছগুলি বাড়ল, তারপর দেখা গেল একটি গাছে কলার ফুল হয়েছে। সেদিন কি আনন্দ সকলের। বাড়িতে নূতন ছেলে হয়েছে যেন। তারপর সেই মোচা কলা ছাড়তে লাগল ক্রমশ। ক্রমশ কাঁদি হ'ল একটা। সবাই এসে বড় বড় করে' দেখে যেতে লাগল সেটাকে। তারপর যেদিন কলার রং ধরল সেদিন তো হৈ চৈ পড়ে' গেল বাড়িতে। দুটো দল হ'য়ে গেল। বিরুবাবুর মা বললেন—এখুনি ওটাকে গাছ থেকে কেটে ভাঁড়ার ঘরে টাঙিয়ে দেওয়া হোক, দু' একদিনেই পেকে যাবে। এ শুনে জিতুবাবু হাঁ হাঁ করে উঠিলেন। তিনি বললেন—গাছে আরও দু' একদিন থাক, মাটির রসটা পুরো টেনে নিক, তারপর কাটা হবে। জিতুবাবু এসব বিষয়ে অভিজ্ঞ লোক, তাঁর কথা অমান্য করা গেল না। কাঁদি গাছেই রইল। তারপর দিন ডাক্তারবাবু কলে বেরুবার আগে সকাল সাতটার সময়ে দেখেছেন কাঁদি গাছে ঝুলছে, আরও দু'চারটে কলা পেকেছে। ন'টার সময় জিতুবাবু গিয়ে দেখলেন—সব সাফ, গাছে কাঁদি নেই, কে কেটে নিয়ে গেছে। হুলুস্থুল পড়ে' গেল। থানায় পর্য্যন্ত খবর দেওয়া হ'ল। দুপুর বেলা আমদাবাদ থেকে আমি এসে পৌছলাম এক বেতো ঘোড়ায় চড়ে'। তখন আমার ঘোড়া ছিল, তার ল্যাজে চুল ছিল না, বাঁ চোখে ছানি, কিন্তু চলত ভালো। বিরুবাবুর মায়ের কাছে খবর পাঠালাম আমি এসেছি। তিনি তো অন্নপূর্ণা ছিলেন, খবর পাঠালেই অন্ন জুটে যেত। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম চারিদিকে কেমন একটা থমথমে ভাব। জিতুবাবু ভুরু কুঁচকে বসে' আছেন, চাকর-বাকরগুলো সবাই সন্ত্রস্ত, উদিৎ সিং তম্বী করে' বেড়াচ্ছে চারিদিকে। তারপর শুনলাম ব্যাপারটা। আমারও রাগ হ'ল খুব। এ শালা চণ্ডালের দেশ, ডাক্তারবাবু এদের এত দেন, এদের জন্যে এত করেন তবু ব্যাটারা চুরি করতে ছাড়ে না। ডাক্তার-বাবু তখনও কল থেকে ফেরেন নি, বিরুবাবুর মা আমাকে আগেই খাইয়ে দিলেন। আমি খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমুব বলে' মই আনিয়ে ভুসকারে গিয়ে ঢুকলাম। ওখানে নিরিবিলিতে বেশ চমৎকার ঘুম হয়। বিশেষত শীত-কালে। বরাবরই আমি ওখানে শুতাম। সেদিন ভুসকারে ঢুকে ভুসোগুলো সরিয়ে একটু জায়গা করতে গিয়ে দেখি ভুসোর মধ্যে কলার কাঁদিটা ঢোকানো রয়েছে। বুঝলাম চুরি করে' কেউ সরিয়ে রেখেছে এখানে। নিয়ে যেতে পারে নি। অন্ধকার হ'লে নিয়ে যাবে। ওখানে শোয়া আর নিরাপদ বলে' মনে হ'ল না। নেবে গিয়ে খবরটি চুপি চুপি উদিৎ সিংয়ের কানে তুলে দিলাম। সাপের ল্যাজে পা পড়লে যা হয় অনেকটা তেমনি হ'ল। উদিৎ সিং তড়াক করে' লাফিয়ে উঠে দুলতে লাগল, যেন

আমাকেই ছোবলাবে। নাকের ছ্যাঁদা ফাঁক হয়ে গেল, ছোট ছোট নীল চোখ দুটো থেকে ছুটতে লাগল আগুন। দাঁতে দাঁত পিষে নীচু গলায় তর্জন করে' আমাকে বললে —কোই কোই বাত্ নেহি বোলিয়ে। ম্যয় শালেকো পাকড়েঙ্গে। তারপর কি করলে জান? সেই কলার কাঁদির পাশেই ভুসোর মধ্যে ডুবে বসে রইল। নাকের ছ্যাঁদা দুটি আর চোখ দুটি বেরিয়ে রইল শুধু। ঠিক সন্ধের পরই ধরা পড়ল চোরটা। ডাক্তারবাবু তাকে কলেরা থেকে বাঁচিয়েছিলেন, খেতে পাচ্ছিল না—তাই বাগানের মালী করে' বাহাল করেছিলেন। সেই শালার এই ব্যবহার।

উদিৎ সিংহ তো তাকে জুতিয়ে রক্তারক্তি করে' দিলে, তারপর থানা পুলিশ। নির্ঘাত জেল হ'য়ে যেত, ডাক্তারবাবুই আবার বাঁচালেন তাকে। চাকরিও দিলেন আবার। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বাঁচাতে পারেন নি। মাস ছয়েক পরে আর এক জায়গায় চুরি করে' ধরা পড়ল সে। তখন জেল হ'য়ে গেল···"

গগন বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল, সে অনুভব করিল কবিরাজ মহাশয় যদি আর এক প্রস্থ গল্প আরম্ভ করেন তাহা হইলে বড়ই দেরি হইয়া যাইবে। সে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "চলুন আমরা সব বাইরে গিয়ে বসি। দাদুর সমস্ত দিন বড্ড strain গেছে, উনি এবার একটু ঘুমুন"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ—সেই ভালো। চল বাইরেই যাই আমরা। আমি তো পুরোনো গুদাম ঘরের মতো। আমার মনের দরজা জানলা খুলে দিলে কত যে গল্পের আরশোলা, ইঁদুর, টিকটিকে বেরিয়ে পড়বে তার ঠিক আছে। রাত ভোর হয়ে যাবে।"

হাসিতে হাসিতে কবিরাজ মহাশয় বাহিয়ে চলিয়া গেলেন।

ক্রমশ

বিভূতিভূষণের কথাশিল্প

অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রথম পর্ব : স্রষ্টা

প্রকৃতি প্রীতির সহিত মানবপ্রেমের ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে।*২৫ প্রকৃতিকে যিনি সত্য সত্যই ভালবাসেন, অবাধ-প্রসারিত প্রকৃতির সান্নিধ্যে তাঁহার মন হয় মুক্ত, সংকীর্ণ পরিবেশের সীমা ছাড়াইয়া তাঁহার দৃষ্টি সম্প্রসারিত হয়। এইভাবে মন যাঁহার বাড়িয়া যায়, স্বভাবতই আত্মকেন্দ্রিকতার দৈন্য তাঁহাকে আর গ্রাস করতে পারে না। নিজেকে লইয়া ব্যস্ততার আকাঙ্ক্ষা যাঁহার নাই, তিনিই অপরের জন্য নিঃস্বার্থভাবে ভাবিতে বা কাজ করিতে পারেন। প্রকৃতি-প্রেমিক সাহিত্যিক এইজন্যই মানব-প্রেমিক হন। রুশো, ভিক্টর হুগো, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, টমাস হার্ডি, রবীন্দ্রনাথ,—ইঁহারা প্রকৃতি ও মানুষকে একই সঙ্গে গভীরভাবে ভালবাসিয়াছেন, তাঁহাদের রচনায় দুইই উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়াছে। বিভূতিভূষণও এই পথেই চলিয়াছেন। প্রকৃতি-প্রেম এবং মানবতাবোধ অঙ্গাঙ্গী হইয়া তাঁহার রচনায় স্থান পাইয়াছে।

প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার জন্য যাহারা যোগ্যতা থাকিলেও সম্মুখে আসিতে পারে না, বলিষ্ঠকণ্ঠে আপন ন্যায্য দাবী উপস্থাপিত করিতে পারে না, যাহারা বঞ্চিত, শোষিত অথবা অবহেলিত, সাধারণতঃ সাহিত্যিকের মানবত্ববোধ তাহাদের রূপায়ণেই প্রতিফলিত হয়। ন্যুট হামসুন, ম্যাক্সিম গোর্কি, প্রেমচন্দ, শরৎচন্দ্রের মত লেখকের ইহাই সর্বোজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। কিন্তু প্রকৃতিপ্রেমিক মানবতাবোধী সাহিত্যিকদের শুধু ইহারাই নয়, মানুষ মাত্রেই ভালবাসার পাত্র। মানুষের নিজস্ব সত্তাকে স্পর্শ করাতেই তাঁহাদের আনন্দ। সে মানুষ শ্রেণী-নিরপেক্ষভাবে যে কেহই হইতে পারে। যেজন পিছনে পড়িয়া গিয়াছে তাহাকে সম্মুখে আনিতে তাঁহারা যেমন ব্যগ্র, যে মানুষ আপন মহৎ সম্ভাবনা প্রতিরুদ্ধ করিয়া আপাত-সুখ-তৃপ্তির মোহে শক্তির অপব্যবহার করে, তাহার সম্পর্কে যেমন তাঁহাদের বেদনাবোধ, সেইরূপ যে মানুষ এমনিই উচ্চকোটির, তাহার ছবি আঁকিতেও তাঁহাদের কোনরূপ সঙ্কোচ নাই। এইরূপ সাহিত্যিক বিশ্বাস করেন যে, প্রকৃতি এবং মানুষ উভয়ই বিশ্বজগতের অন্তর্ভূত সত্তা, একই পরমাশক্তি ইহাদের মূলে কাজ করিতেছে। সে অর্থে তাঁহাদের প্রকৃতিপ্রীতি মানব-প্রেমেরই দ্যোতক।

*২৫ অবশ্য একথা বিশদভাবে না বলিলেও চলিবে যে, মানবপ্রেম প্রকৃতিপ্রেমের উপর নির্ভরশীল নয় এবং মানবপ্রেমিক হইতে হইলেই যে প্রকৃতিপ্রেমিক হইতে হইবে এমন নয়। পক্ষান্তরে প্রকৃতিপ্রেমিক স্বভাবতই মানবপ্রেমিক হইয়া থাকেন।

মানুষমাত্রেই মহৎ, তাহার আবিলতা পারিপার্শ্বিক বা সাংগঠনিক ত্রুটিজাত,—এই সহজ বিশ্বাসে আলোচ্য সাহিত্যিকেরা উদ্বুদ্ধ।*২৬

বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যে এইরূপ মানবপ্রীতির প্রাচুর্য লক্ষ্যণীয়। ভালবাসার স্বচ্ছমুকুরে মানুষকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই বিভূতিভূষণের রচনায় মানুষ স্বরূপে ফুটিয়াছে। তিনি কবি-স্বভাবের ব্যক্তি ছিলেন, ভাবাবেগের সুযোগে তাঁহার মানবতাবোধের স্বতঃস্ফূর্তি দেখা যায়। অবশ্য বিভূতিভূষণের প্রকৃতিপ্রেম এত গভীর ও বিশাল যে, তাঁহার পক্ষে এজন্য আকাশচারী কল্পনাবিলাসী হওয়া, প্রকৃতির অন্তহীন রহস্যে ডুবিয়া গিয়া দার্শনিক হওয়া, অথবা প্রকৃতির উদার ব্যাপ্তি-সংশ্লেষে বস্তুতান্ত্রিক জগৎ অস্বীকার করিয়া ক্রমে অধ্যাত্মবাদী হইয়া উঠা বিচিত্র ছিল না, কিন্তু এই ত্রিবিধ প্রবাহের স্পর্শ তাহার গায়ে লাগিলেও তিনি মূলতঃ জগৎ ও জীবনের শিল্পী ছিলেন। প্রকৃতি তাঁহার মহৎ সৃষ্টির প্রেরণা-উৎস এবং প্রাণস্বরূপ সন্দেহ নাই, তথাপি তাঁহার কথাসাহিত্যের পটভূমি মানুষের জীবন। তিনি যে মানুষকে আপন রচনায় স্থান দিয়াছেন, তাহাকে মৌল মূল্যেই রূপায়িত করিবার সাধনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :— 'নিজের সুখদুঃখের দ্বারাই হ'ক, আর অন্যের সুখ-দুঃখের দ্বারাই হ'ক, প্রকৃতির বর্ণনা করেই হ'ক, আর মনুষ্যচরিত্র গঠন ক'রে হ'ক, মানুষকে প্রকাশ করতে হবে। সাহিত্যে আর সমস্তই উপলক্ষ।'—এই হিসাবে, কিছুটা ভাববাদী হইলেও বিভূতিভূষণের সাহিত্য প্রকৃত সাহিত্য।

বিভূতিভূষণ তাঁহার রচনায় যেসব মানুষকে স্থান দিয়াছেন, তাহারা শুধুমাত্র আমাদের পরিচিত মানুষের গতানুগতিক রূপ নয়, আপন ভাবদৃষ্টির অনুকূলে তিনি তাহাদের আসল সত্তাকে জাগতিক জী[illegible]র পটভূমিকায় ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন।*২৭ এইরূপ মৌল-[illegible] ফুটাই-

*২৬ তুলনীয় :—

'His life was gentle, and the elements
So mix'd in him that Nature might stand up,
And say to all the world "This was a man !"
—Shakespeare, Julius Ceasar, V. 5.

*২৭ সাধারণ মানুষেরা বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যে ভিড় করিয়াছে, কিন্তু লেখকের দরদী স্পর্শে তাহাদের অন্তর্লোক উদ্ভাসিত হওয়ায় তাহারা এক ধরণের অসাধারণত্ব লাভ করিয়াছে। হোটেলের পাচক হাজারি (আদর্শ হিন্দু হোটেল), হাতুড়ে ডাক্তার বিপিন (বিপিনের সংসার), বিগত-বৈভব সরল গ্রাম্য কেদার (কেদাররাজা), যাত্রাদলের নট বঙ্কু (বঙ্কু হাজারা ও শিখিধ্বজ পত্র), সতীসাধ্বী হাড়ির

বার প্রয়াসে মনস্তত্ত্বের গহন অরণ্যে তাঁহার পথ হারাইবার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু সেই জটিলতা এড়াইয়া গিয়া আপন বিশ্বাসের আলোতে তিনি মানুষকে আবিষ্কার করিয়াছেন। বিভূতিভূষণের সাধনা বৈষ্ণবের সাধনা, অন্তরের প্রেম-মন্দাকিনীর স্পর্শে পতিত শিলাখণ্ডে প্রাণসঞ্চার করিয়া তিনি পাঠকের হৃদয় তরঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, বিভূতিভূষণের সৃষ্ট চরিত্র তাঁহার ভাবদৃষ্টির অনুকূল হইলেও তিনি শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই, মোটামুটি আদর্শপ্রবণ, নীতিবাদী এবং ধার্মিক মানুষ হইলেও লেখার মধ্যে তিনি এই দিকগুলি হইতে খুবই কম আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। এ হিসাবেও তিনি রবীন্দ্রনাথের যোগ্য শিষ্য। সমকালীন শরৎচন্দ্র, অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ, তারাশঙ্কর বা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলনায় বিভূতিভূষণ অপেক্ষাকৃত স্থিতিবান। বিশৃঙ্খল যুগে লিখিতে বসিয়া বন্ধুর-পথ-পরিক্রমায় তিনি আশ্চর্য সংযম দেখাইয়াছেন বলা চলে। সহজ প্রকাশের ভিতর দিয়া বিভূতিভূষণ যে রূপসৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই হইয়া উঠিয়াছে আবেদনশীল। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ সম্পর্কে বলা হয়, তাঁহার কবিপ্রতিভা চরমে উঠিত যখন তিনি প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষক অথবা উপদেষ্টার ভূমিকা গ্রহণ না করিয়া প্রকৃতি হইতে বিপুল অভিভাব (suggestion) সংগ্রহ করিতেন।*২৮ কথাটি বিভূতিভূষণ সম্পর্কেও খাটে। সুচিন্তিত বক্তব্য প্রকাশ নয়, অন্তরের ভাবধারার স্বতস্ফূর্ত অভিব্যক্তিই তাঁহার মহিমাব্যঞ্জক। মনীষী অস্কার-ওয়াইল্ড সাহিত্যের সংজ্ঞা হিসাবে বলিয়াছেন সাহিত্য জীবন ভিত্তিক, কিন্তু ইহা জীবনের অনুলিপি নয়, সাহিত্যে উদ্দেশ্যের অনুকূলেই জীবন রূপ পায়।'*২৯ বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিতে দেখা যায়, তিনি আপন ভাবদৃষ্টির ছাঁচে জীবনকে ঢালিয়া লইয়াছেন, কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তিনি সেই সংগঠনে নির্দেশাত্মক আত্মপ্রকাশ করেন নাই।

কাহিনী, কাঠামো (Pattern), চরিত্র, সংঘাত, নাটকীয়তা, সংলাপ, আকৃতি (Form), রচনাশৈলী এবং লেখকের ভাবদৃষ্টি এইগুলিই মোটামুটি উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ।*৩০ কেহ কেহ কাহিনীকেই উপন্যাসের মূলভিত্তি বলেন, *৩১ আবার কাহারও কাহারও মতে চরিত্র-সৃষ্টিই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ দিক।*৩২ মানুষের হৃদয়ের ছবি, তথা মানুষের স্বরূপপ্রকাশই উপন্যাসের প্রধান কাজ, একথাও কোন কোন মনীষী বলিয়া থাকেন।*৩৩

বিভূতিভূষণের উপন্যাস বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই, তাহার রচনা উপরোক্ত সকল লক্ষণের দিক হইতে সন্তোষজনক নয়। বিশেষ করিয়া কাঠামো, সংঘাত, নাটকীয়তা—এই দিকগুলি হইতে তাহার লেখায় বহু ত্রুটি বিদ্যমান। কিন্তু ইহা সত্বেও বিভূতিভূষণের উপন্যাস যে উচ্চ শ্রেণীর সৃষ্টিরূপে অভিনন্দিত হয়, তাহার কারণ তাঁহার সরস গল্প, সরল চরিত্র, অনুপম সংলাপ এবং অপূর্ব ভাবদৃষ্টি। মানুষের হৃদয়ের সহজ সুন্দর ছবি ফুটানোর ব্যাপারে বাংলা সাহিত্যে তাঁহার কৃতিত্বের তুলনা কদাচিৎ মিলে। বিভূতিভূষণের আর এক বৈশিষ্ট্য হইল মানুষের দোষ গুণকে পৃথক খণ্ডে ভাগ করিয়া তিনি খণ্ডিত (compartmental) চরিত্র সৃষ্টি করেন নাই, মানুষের ব্যক্তিত্ব বা স্বরূপ ফুটাইবার চেষ্টা করিতেন বলিয়া জীবনের প্রকৃত রূপের পূর্ণাঙ্গ চিত্র মেয়েটি (অসাধারণ গল্প), গাছপাগল যুগলপ্রসাদ (আরণ্যক), পতিতা গোলাপী (ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল গল্প), ভক্তিমতী চারিত্রিক-সুনামহীনা নারী গিরিবালা (গিরিবালা গল্প), সহস্র অসুবিধা সত্বেও নিজের গ্রামের কুটিরে বাসে অভিলাষিণী কাশীত্যাগিনী বৃদ্ধা বিধবা দ্রবময়ী (দ্রবময়ীর কাশীবাস গল্প), নিজস্ব একটি বাড়ীর স্বপ্নে মশগুল দরিদ্র ভণ্ডুল মামা (ভণ্ডুলমামার বাড়ী গল্প), রহস্যময় অরণ্যে প্রশান্ত সাধু (কুশল পাহাড়ী গল্প), গদির গরীব কর্মচারী কবি কুণ্ডুমশায় (কবি কুণ্ডু মশায় গল্প),— ইহারা সবাই এই ধরণের চরিত্র। বিভূতিভূষণের সাহিত্যে এইরূপ চরিত্রই বেশি।

*২৮ উইলফ্রেড হুইটেন সম্পাদিত 'The world's Library of Best Books' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ওয়ার্ডসওয়ার্থ শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

*২৯ 'Literature always anticipates life. It does not copy it; but moulds it to its purpose.'

—Oscar wilde—the Decay of Lying.

*৩০ ছোট গল্পের ক্ষেত্রেও এই লক্ষণগুলির অধিকাংশ প্রযোজ্য, যদিও ছোট গল্প জীবনের খণ্ডাংশ লইয়া লেখা হয় এবং তাহাতে একটি ঘটনা বা একটী ভাব রূপায়িত হইয়া থাকে। তবে ছোট গল্পের গভীরতায় একটা অঙ্গুলি নির্দেশের তীক্ষ্ণতা থাকে, যাহা উপন্যাসের ব্যাপকতর পরিধিতে দেখা যায় না।

*৩১ 'We shall all agree the fundamental aspect of the novel is its story-telling aspect'—E. M. Forster—Aspects of the Novel (1928) P. 40

*৩২ 'The greatest novels are essentially character studies.'—Alfred H Upham—The Typical forms of English Literature (1927) P. 183.

*৩৩ এই সকল তর্ক ও আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া একটি সহজ কথা স্মরণ করিলেই উপন্যাসের স্বরূপ ধরা পড়িবে। উপন্যাস মানুষের হৃদয়ের ছবি; মানুষের ধর্ম আছে, সমাজ আছে, রাষ্ট্রনীতি আছে, সচেতন ও অবচেতন আত্মা আছে। গ্রন্থকার যে কোন একটি বিশেষ লক্ষণের উপর দৃষ্টি রাখিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে মানুষের স্বরূপের অভিব্যক্তিই তাঁহার আদর্শ; কোন একটি বিশেষ লক্ষণকে সমগ্র ব্যক্তিত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে সেই চিত্র জীবন্ত হইবে না।

ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত—শরৎচন্দ্র (৭ম সংস্করণ), পৃঃ—১-২

আঁকিবার দিকেই তাঁহার প্রবণতা ছিল।*৩৪ মানুষের প্রতি প্রবল ভালবাসায় তাঁহার মন উদ্বেল বলিয়াই তিনি মানুষের প্রকৃত সত্তার এই পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণে সমর্থ হইয়াছিলেন। আঙ্গিকের দিক হইতে ত্রুটিশূন্য না হইলেও বিভূতিভূষণের সৃষ্টির শিল্পকলা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। তাহা প্রচলিত সংস্কার-অপেক্ষা রাখে না, বরং সাফল্যের নিরিখে নূতন সংজ্ঞা নির্দেশের-দাবী রাখে।

কাজেই দেখা যাইতেছে, আঙ্গিকের ত্রুটি থাকিলেওমহান মানবতাবোধ বা হৃদয়বোধের আবেদনের দিক হইতে বিভূতি-ভূষণের বৈশিষ্ট্য সন্দেহাতীত। 'পথের পাঁচালী' বিভূতিভূষণের প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা, এই প্রশ্নবিচারেই কথাটার গুরুত্ব বুঝা যাইবে। পথের পাঁচালীর গল্প শ্লথগতি, ইহা লেখকের আস্বাদনপন্থী মনের সৃষ্টি। ইহাতে নাটকীয়তা খুবই কম। তবু পথের পাঁচালী অসাধারণ জনপ্রিয় হইয়াছে এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ইহাকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাইয়াছেন।*৩৫ নদীস্রোতে ভাসমান নৌকা হইতে তীর-ভূমির বিচিত্র সৌন্দর্য দর্শন যেমন নৌকারোহীর পক্ষে প্রীতিপ্রদ, বিভূতি-ভূষণের গল্প উপন্যাস পাঠে সেইরূপ তৃপ্তি জন্মিয়া থাকে। এককথায় বলিতে গেলে বুদ্ধির উজ্জ্বলতাদীপ্ত 'দীপ্তিকাব্যে'র নয়, ভাবরসে চিত্ত বিগলনকারী 'দ্রুতিকাব্যে'র স্পন্দন বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। যে মানুষকে তিনি তাঁহার রচনায় স্থান দিয়াছেন, তাহার ও সমাজের মাঝখানে কোন ফাঁক নাই; সে সমাজেরই অংশ এবং সমাজের দ্বারাই প্রভাবিত। আবার তাহার সহিত প্রকৃতির (যে প্রকৃতি বিভূতিভূষণের সাহিত্যে জীবন্ত, গল্প-উপন্যাসে উপস্থাপিত চরিত্রের মনোভাব গঠনের উপাদানমাত্র নয়) কোন বিরোধই নাই, সে প্রকৃতির সহিত গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট এবং প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত। এই অ-সমমুখী দুই পথের মধ্যে সেতুবন্ধন করিয়া বিভূতিভূষণের সৃষ্ট চরিত্র অগ্রসর হইয়াছে। বাস্তবিক সমাজ ও প্রকৃতি এই দুই আপাতবিরোধী শক্তির মাঝে পড়িয়াও বিভূতিভূষণের চরিত্র যে ভারসাম্য রক্ষা করিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে লেখকের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বলেন—চমৎকারিত্ব রসের সারবস্তু। বিভূতিভূষণের সাহিত্যে সাধারণ কথা ও সাধারণ চরিত্র সহজ বর্ণনা বা রূপায়ণের ভিতর দিয়া এমন চমৎকারিত্ব লাভ করিয়াছে যাহার আবেদন সর্বজনীন। শিল্পের সাধারণীকৃতি (universalisation) শিল্পের গৌরব এবং উন্নত শিল্পের লক্ষণ। বিভূতিভূষণের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রগুলিও আপন আপন ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনা, এগুলি পাঠকের রসিক চিত্তের আশ্রয় পাইয়া সাধারণীকৃত হইয়া থাকে। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একবার বলিয়াছিলেন:—"আমি চিরদিন কলকাতার মানুষ। বাঙলার পল্লীপ্রকৃতি এবং পল্লীজীবনের সঙ্গে এমন আজন্ম পরিচয়ের দাবী করতে পারিনা। কিন্তু বেশ একটা মমতাবোধ করি তার জন্য—তাতে ভুল নেই। আর 'পথের পাঁচালী'র অপুর সঙ্গে অনুভব করি বাঙালী শিশুর অভিজ্ঞতা।*৩৬

বৃহৎ অর্থে না ধরিলে সাধারণ অর্থে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জীবনের ভাষ্যকার বলা চলেনা। বিশ্লেষণ কখনই তাঁহার বিশিষ্টতা নয়। তিনি প্রকৃতপক্ষে জীবনের চিত্রকর, ছবি আঁকাই তাঁহার কাজ। এই চিত্রাঙ্কনে অবশ্য খুঁটিনাটির বর্ণনা তিনি করিয়াছেন। এইরূপ বিস্তারিত রূপায়ণের উদ্দেশ্যে হইল—আপন বক্তব্য বা কল্পনার যথাসম্ভব পরিস্ফুটন। বিভূতিভূষণ প্রকৃতিকে মানুষের সহায়কা শক্তিরূপে প্রাণময়ী করিয়াছেন। এই জীবন্ত প্রকৃতির স্পর্শ বা অনুকূল প্রভাব এমন এক সরল পরিমণ্ডল রচনা করিয়াছে, যাহার আশ্রয় লাভ করিয়া পৃথিবীর জটিলতা-ক্লান্ত পাঠক শান্তি লাভ করে।*৩৭ মানুষকে তিনি

*৩৪ 'The novel is not merely fictional prose, it is the prose of mans life, the first art to take the whole man and give him expression.

—Ralph Fox—Tho Novel and the People.

*৩৫ রবীন্দ্রনাথ 'পথের পাঁচালী'কে স্বাগত জানাইয়া বলিয়াছেন:—"পথের পাঁচালির আখ্যানভাগটা অত্যন্ত দেশি। কিন্তু কাছের জিনিষেরও অনেক পরিচয় বাকী থাকে। যেখানে আজন্মকাল আছি সেখানেও সব মানুষের সব জায়গায় প্রবেশ ঘটে না। 'পথের পাঁচালি' যে বাংলার পাড়াগাঁয়ের কথা, সেও অজানা রাস্তায় নতুন করে দেখতে হয়। লেখার গুণ এই যে নতুন জিনিষ ঝাপসা হয়নি, মনে হয় খাঁটি, উচুদরের কথায় মন ভোলাবার জন্যে সস্তাদরের রাঙতার সাজ পরাবার চেষ্টা নেই। বইখানা দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে। এই বইখানিতে পেয়েছি যথার্থ গল্পের স্বাদ। এর থেকে শিক্ষা হয়নি কিছুই, দেখা হয়েছে অনেক যা পূর্বে এমন করে দেখিনি। এই গল্পে গাছপালা, পথঘাট, মেয়েপুরুষ, সুখদুঃখ সমস্তকে আমাদের আধুনিক অভিজ্ঞতার প্রাত্যহিক পরিবেষ্টন থেকে দূরে প্রক্ষিপ্ত করে দেখানো হয়েচে। সাহিত্যে একটা নতুন জিনিষ পাওয়া গেল অথচ পুরাতন পরিচিত জিনিষের মতো সে সুস্পষ্ট।"

* ৩৬ দ্রষ্টব্য:—গোপাল হালদার 'বাঙলা সাহিত্য ও মানব-স্বীকৃতি' (১ম সংস্করণ), পৃঃ—১৬৩-১৬৪

*৩৭ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বস্তুতান্ত্রিক অগ্রগতি এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা সর্বজনবিদিত। এই প্রাচুর্যভোগেও এখন সেখানে একধরণের ক্লান্তি দেখা যাইতেছে বলিয়া মণীষীরা মনে করিতেছেন। গান্ধী-দর্শন সম্পর্কে বক্তৃতার জন্য আহূত হইয়া অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গিয়াছিলেন। তিনি সেখানকার জনসাধারণের মনোভাব সম্পর্কে লিখিয়াছেন:—"যাদের মন চকচকে গাড়ি ও বাড়ির ভারে ক্লান্ত, তারা অন্য একটি রাস্তা ধরেছেন। কুটির-নির্মাণ করবার জন্য জঙ্গলের কাঠ ব্যবহার করে তাতে রঙ বজায় রেখেছেন। রেড উড [illegible] একটি কাঠের ব্যবহার অনেক জায়গায় দেখলাম। আবার অনেকে মানুষের হাতে গড়া জিনিসের বিরুদ্ধে মনে মনে বিদ্রোহ ক'রে গাছপালা, মাটি, পাখী, ফুলফল প্রভৃতির প্রতি যেন একটি পূজার

আগার স্বরূপের হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন, সত্য, সৌন্দর্য ও সহজ আনন্দের রসে অভিসিঞ্চিত তাঁহার সৃষ্টিতে জীবনের জটিলতার স্থান নাই বলিলেই চলে। যে জটিলতা সামাজিক বিধিনিষেধের প্রশ্নে মানুষের গহন মনের দ্বন্দ্বজাত—তাহাতো পরিহার তিনি করিয়াছেনই, সমকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার জটিলতাও তিনি পারত-পক্ষে এড়াইয়া গিয়াছেন। যে ক্ষেত্রে এরূপ সমস্যা একেবারে এড়ানো সম্ভব হয় নাই, সেক্ষেত্রেও আপন ভাবদৃষ্টির প্রলেপে তিনি তাহা মোলায়েম করিয়া উপস্থাপিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে এইরূপ সমস্যার ছবি এমন মানবিক আবেদনপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে যে সমস্যার উগ্ররূপ সেখানে সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায়না।

মানবিকতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত মূল্যবোধের পুনঃ নির্ধারণের হিসাবে অথবা কথাসাহিত্যে মানুষের হৃদয়ের বার্তা-পরিস্ফুটনের অগ্রাধিকার স্বীকৃতিতে শান্তভাবাশ্রয়ী বিভূতিভূষণের হাতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা কিভাবে রূপায়িত হইয়াছে তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উপস্থাপিত হইল। প্রথম দৃষ্টান্তটি অর্থনৈতিক পটভূমিকায় লেখা একটি গল্প এবং দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক পটভূমিকায় লেখা একটি গল্প। উভয় গল্পেই সহজভাবের শিল্পী বিভূতিভূষণের মনোধর্মের সন্ধান মিলিবে।*৩৮

প্রথম দৃষ্টান্তটি হইল বিভূতিভূষণের অসাধারণ গ্রন্থের বিপদ নামক গল্প। গল্পটি অর্থনৈতিক পটভূমিকায় লেখা। ইহার প্রধান চরিত্র হাজু নামে একটি তরুণী। হাজু রামচরণ বোষ্টুমের মেয়ে। স্বামী-পরিত্যক্তা এই গ্রাম্য মেয়েটি গরীব বাপের ঘরে খাইতে পায় না এবং এর ওর দুয়ারে গিয়া লাঞ্ছনা সহ্য করে, পেটের জ্বালায় চুরি পর্যন্ত করে কখনও কখনও। অবশেষে হাজু একদিন বনগাঁ শহরে গিয়া পতিতাবৃত্তি সুরু করে। এই বৃত্তি অসহায় দরিদ্র মেয়েটিকে স্বাবলম্বী করিয়া তোলে। হাজুর নিজের ঘর হয়, সে ঘরে ওর জিনিষপত্র, সে চায়ের কাপ কিনিয়াছে, খাট কিনিয়াছে, চৌকী কিনিয়াছে। বক্তাকে গ্রাম সম্পর্কে হাজু আগে জ্যাঠামশায় বলিত, এই জ্যাঠামশায়ের নিকট হইতেই তবু কিছু সহানুভূতি মিলিত। হাজু তাঁহাকে ভক্তি করিত খুব। হঠাৎ সে একদিন জ্যাঠামশায়কে পথে দেখিতে পাইল, আবদার করিয়া জোর করিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিল নিজের ঘরে। নিজের জিনিষপত্র সরলভাবে দেখাইতে দেখাইতে হাজুর মুখ আনন্দে গৌরবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এই সময় বক্তা যে সব কথা বলেন, তাহাতে অর্থনৈতিক সমস্যা ও সামাজিক নীতিবোধের প্রচলিত মূল্যের উপর এক সূক্ষ্ম প্রশ্নচিহ্ন ফুটিয়া উঠে। অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায় ইহা বিভূতিভূষণের সহানুভূতিস্নিগ্ধ মনেরই প্রশ্নচিহ্ন। তিনি বলেন :—"কাল ও ছিল ভিখারিণী, আজ এ পথে আসিয়া ওর অন্নবস্ত্রের সমস্যা ঘুচিয়াছে, কাল যে পরের বাড়ি চাহিতে গিয়া প্রহার খাইয়াছিল, আজ সে নিজের ঘরে বসিয়া গ্রামের লোককে চা খাওয়াইতেছে নিজের পয়সায় কেনা পেয়ালা পিরিচে—যার বাবাও কোনদিন শহরে বাস করে নাই বা পেয়ালায় চা পান করে নাই। ওর জীবনের এই পরম সাফল্য ওর চোখে। তাহাকে তুচ্ছ করিয়া ছোট করিয়া নিন্দা করিবার ভাষা আমার যোগাইল না।*৩৯

বলা বাহুল্য, অর্থনৈতিক সমস্যাভিত্তিক এই গল্পটিতে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের পরিপ্রেক্ষিতে নূতন মূল্যায়নে প্রচলিত নীতিবোধের গোঁড়ামি পরিবর্তনের যে আবেদন আছে সে হিসাবে বিভূতিভূষণের আধুনিকত্বও ফুটিয়াছে। কিন্তু তবু এ গল্পে হৃদয়াবেগ বা মানবতা-বোধই বড় কথা, অর্থনৈতিক সমস্যা অথবা সামাজিক প্রশ্নে আধুনিকতা-বোধ গৌণ দিক।

অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে বিভূতিভূষণের এই যে প্রচলিত নীতি-নিরপেক্ষ সহানুভূতিশীল মানবিক মনোভাব, ইহা তাহার রাজনৈতিক পটভূমিকার রচনাতেও দেখা যায়। অবশ্য, আগেই বলা হইয়াছে বিভূতিভূষণ অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সমস্যা, বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক সমস্যা প্রায়ই এড়াইয়া গিয়াছেন এবং রাজনৈতিক পটভূমিকায় তাঁহার লেখার সংখ্যা নগণ্য। এই সামান্য দু একটি রচনায়ও মানবতাবোধের রসসিঞ্চনে বা হৃদয়াবেগের স্পর্শে রাজনীতি আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। এদিক হইতে 'মুখোশ ও মুখশ্রী' গ্রন্থের 'বোতাম' নামক গল্পটিকে দৃষ্টান্তস্বরূপ লক্ষ্য করিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে। আলোচ্য 'বোতাম' গল্পে আছে :—

'প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনে সারা ভারতে যে গণ-জাগরণ হইয়াছিল, আদিবাসী মহিলা এলিশাবা কুই

ভাব (cult) গড়ে তুলেছেন। আবার অন্যান্য মরমী লোকেরা আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি দেশের সভ্যতার মধ্যে আরও অনা-বিল প্রকৃতির সন্ধান করেছেন—যেখানে তাঁদের ধারণা মানুষ নিজের গড়া ঐশ্বর্যের ভারে চাপা পড়েনি।

(শ্রীনির্মলকুমার বসু—আমেরিকার চিঠি—বসুধারা, আশ্বিন, ১৩৬৫)

*৩৮ দুইটি গল্পেই বিভূতিভূষণের প্রিয় রচনারীতি অনুযায়ী 'আমি' চরিত্রটি বক্তারূপে বর্তমান। এই 'আমি' চরিত্রটি গল্প-সংশ্লিষ্ট, কিন্তু গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নয়। বলা বাহুল্য এইভাবে নিজের জবানী'তে গল্পটাকে রাখার একটা সার্থকতা আছে, ইহাতে লেখকের ভাবদৃষ্টি সহজে ফুটিবার সুযোগ পায়।

* ৩৯ তবে এই প্রসঙ্গে একথা অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আধুনিকতার মোহে দুশ্চরিত্রতা সমর্থনের লোক বিভূতিভূষণ নন। মানুষের নৈতিক চরিত্রের মর্যাদা তিনি কিরূপ বুঝিতেন তাহা 'কেদার রাজা' উপন্যাসে বিপন্ন বালবিধবা শরৎকুমারীকে রক্ষায় অথবা 'অসাধারণ' গ্রন্থের 'অসাধারণ' গল্পে নিম্নশ্রেণীর সতীসাধ্বী বধূটির সংগ্রাম-চিত্রণে সম্যক ফুটিয়াছে। 'বিধুমাষ্টার' গ্রন্থের 'অভিশাপ' গল্পে দুশ্চরিত্র প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর অপমৃত্যুতেও তাঁহার এই নীতি-বোধই প্রকাশ পাইয়াছে।

রাঁচী অঞ্চলের সে আন্দোলনের নেতৃত্ব করে। মিশনে শিক্ষালাভের পূর্বে এলিশাবা ছিল এক গ্রাম্য হো কন্যা 'চম্পু' এবং সেই সোনালী কৈশোরের দিনে চম্পু ভালবাসিয়াছিল গল্পের বক্তা বাঙালী এক সারভেয়ারবাবুকে। সারভেয়ারবাবুটি চম্পুদের কুটিরে অসুস্থ হইয়া কয়েকদিনের জন্য আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং চম্পু সে সময় সেবাযত্ন করিয়া তাহাকে সারাইয়া তুলিয়াছিল। বিদায় লইবার সময় বাবুটি উপহারস্বরূপ তাহাকে আপন হাতঘড়িটি দিতে চায়, সরলা চম্পু কিন্তু ঘড়ির পরিবর্তে চাহিয়া লয় তাহার গিল্টিকরা ছ'আনা দামের বোতামটি। তারপর বহুদিন কাটিয়া যায়। এখন সারভেয়ারবাবু জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। সেই চম্পু এখন মহীয়সী দেশনেত্রী এলিশাবা কুই। মিশনারীদের যত্নে তাহার শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটিয়াছিল। বিরাট সম্বর্ধনার আয়োজন হয় এলিশাবা কুইয়ের এবং সেই সূত্রে পুনরায় দেখা হয় বাঙ্গালীবাবুটির সহিত এলিশাবার। অতীতের পুষ্পিত লাবণ্যে বর্তমান তুচ্ছ হইয়া যায়, আগুন-ঝরানো আগষ্ট বিপ্লবের নেত্রী স্মৃতির যাদুদণ্ড স্পর্শে ফিরিয়া পায় বহুপিছনে ফেলিয়া-আসা আরণ্যক লালফুলের আলক্ত-মাখানো শান্ত দিনগুলি। সে স্বীকার করে:—"সত্যি বলচি, এখন এসব ফেলে চলে যেতে ইচ্ছে করে বলিবা গাঁয়ে। আগষ্ট আন্দোলনের পরে জেলে বসে শুধু বলিবার কথাই ভাবতাম।" যাবার সময় পুরানো দিনের চম্পু খিল খিল করে হেসে বলে,—"কাল আসবো।" তারপর একটু থেমে আবার বলে,—"বোতাম নিয়ে আসবো। হারাইনি।"

প্রকৃতি-প্রেমিক ও মানবতাবাদী বিভূতিভূষণের মনোধর্মের আর একটী মহান দিক হইল তাঁহার বলিষ্ঠ আশাবাদ। ব্যক্তিগত জীবনে অনেক কঠিন পথই তাঁহাকে ভাঙ্গিতে হইয়াছে, কিন্তু সেই ব্যথায় মন তাঁহার বসিয়া যায় নাই। তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টিতে এই অপরাজিত মনের ছাপ সুস্পষ্ট। বিভূতিভূষণ যে যুগের লেখক, সে যুগে চতুর্দিকে বিরাজ করিতেছিল ব্যর্থতা আর দৈন্ত। ব্যক্তি ও সমাজ—উভয় জীবনেই পঙ্গুতা দেখা দিয়েছিল। এই সময় বাঙালী লেখকদের মধ্যে, বিশেষ করিয়া তরুণ একদল লেখকের মধ্যে হয় হতাশার দীর্ঘশ্বাস, আর না হয় নিরুদ্ধ জীবনের প্রতিক্রিয়ায় ক্ষণ-সুখবাদের দিকে একটা বিপজ্জনক ঝোঁক দেখা যায়। আগেই উল্লিখিত হইয়াছে, কবি-সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই দুর্দিনে বেসামাল সাহিত্যতরীর হাল দৃঢ়হস্তে ধরিতে পারেন নাই।*৪০ সে সময়কার কয়েকজন তরুণ বাঙালী লেখক প্রচলিত নীতি বা রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়াইয়া প্রকাশ্যেই এক ধরণের গৌরববোধ করিতে থাকেন। সত্যসুন্দরের প্রতীকস্বরূপ রবীন্দ্র সাহিত্য-রীতিও ইহাদের আক্রমণের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়।*৪১

এই সময় বিভূতিভূষণের আবির্ভাব হইল। তাঁহার শুচি-স্নিগ্ধ সাহিত্যকৃতি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তপ্ত নিদাঘদিনে বারিসিঞ্চনের কাজ করিল। সমকালীন অস্বস্তিকর পরিবেশে অসাধারণ ধৈর্য ও আশাবাদী মনোভাব লইয়া তিনি বাণী-সাধনা সুরু করিলেন।*৪২ জীবন যে অপরাজিত, দৈন্তের চাপে ধ্বংস হইতে পারে না, সত্য, শিব ও সুন্দর পার্থিব কলুষের পেষণে নিঃশেষিত হইবার নয়, একথা তিনি উদাত্তকণ্ঠে প্রচার করিলেন। তাঁহার অপু অপরাজিত জীবনের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিল। পথের পাঁচালী প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে হতাশ্বাস সাহিত্য রসিকদের আশ্বস্ত করিয়া তুলিল। বাংলার সবুজ প্রকৃতি আর সরস মনের যে সরল রূপায়ণ তিনি করিলেন, তাহার মাধুর্যরসে অনবধানী পাঠক হৃদয়ও আপ্লুত হইল।

বিভূতিভূষণ কিরূপ আশাবাদী ছিলেন, তাহার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত তাঁহার 'জন্ম ও মৃত্যু' গ্রন্থের 'ডাকগাড়ি' গল্পটি। গল্পটি এক হতাশ আশঙ্কাতুর অসহায় মনের পরম আশ্বাসলাভের কাহিনী, কিন্তু এই আশ্বাস আসিয়াছে বিচিত্র সূত্র হইতে। সাধারণ বিষয়বস্তুর অসাধারণ গৌরবে 'ডাকগাড়ি' গল্পটি বিভূতিভূষণের প্রতিনিধিস্বরূপ রচনা। গল্পটিতে আছে:—

'তরুণী রাধা বিধবা হইয়া শাশুড়ীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় বাপের বাড়ি চলিয়া আসে। দিন কাটিয়া যায়, ইতিমধ্যে রাধার বাপের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ে। রাধা তাহার তোরঙ্গ ও শাশুড়ীর নিকট গচ্ছিত সোনার হারটি লইতে ছোট ভাইটিকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুরবাড়ি আসিল। রাধার এত কষ্ট করিয়া আসা কিন্তু বিফল হইল, শাশুড়ী ননদ ঝগড়া করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। তিক্ত ও হতাশ মন লইয়া রাধা ফিরিয়া যাইবার পথে রাণাঘাট ষ্টেশনে আসিল। তাহার কাছে মোট পয়সা ছিল বারোটি, ক্ষুধার্ত ভাইটিকে সে তাহা হইতে তিন পয়সা দিয়া একখানি পাউরুটি কিনিয়া দিল। চা খাইতে তাহার ইচ্ছা করিতেছিল, কিন্তু চার পয়সা খরচের ভয়ে সে চা খাইতে পারিল না। ঠিক এই সময় রাণাঘাট ষ্টেশনে ঢুকিল দার্জিলিং মেল। ঝকঝকে গাড়ী, সাহেব, মেম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যাত্রীদল। হঠাৎ রাধার বিষণ্ণ মন উদ্বেলিত হইয়া রূপান্তরিত হইয়া গেল। গল্পে এইখানে আছে:—"রাধা কি দেখিল, কি পাইল জানিনা কিন্তু ডাকগাড়ীখানা সুশ্রী সুবেশ আরোহী দল ও সুসজ্জিত ঝকঝকে তকতকে প্রথম ও দ্বিতীয়

---

*৪০ অবশ্য বাংলা সাহিত্যের যাহাতে মর্যাদা রক্ষা হয়, তজ্জন্য রবীন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। নব্যপন্থীদের অত্যুগ্রতা সীমিত করিবার আশায় ১৩৩৪ সালের ৪ঠা ও ৭ই চৈত্র তিনি বিচিত্রা-ভবনে তাহাদের সহিত মিলিত হন। কিন্তু কবিগুরুর এই চেষ্টায় সুফল বিশেষ ফলে নাই।

*৪১ দ্রষ্টব্য—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—কল্লোলযুগ (১৩৫৭), পৃঃ—১৪৭

*৪২ 'বিভূতিভূষণ'—আশাবাদী ছিলেন,...সুচিরকাল অপেক্ষা করার ধৈর্য তাঁহার ছিল।

—সজনীকান্ত দাস—আত্মস্মৃতি (১৩৬১), পৃঃ—২৪০

শ্রেণীর কামরাগুলি লইয়া তাহার মনে একটি অভূতপূর্ব আনন্দ, উৎসাহ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করিল। সমস্ত দার্জিলিং মেলখানা যেন একটি উদ্দীপনাময়ী কবিতা—কিংবা কোন প্রতিভাবান গায়কের মুখে শোনা সঙ্গীত। রাধার মনে হইল এই ভালো কাপড়-চোপড়-পরা সুন্দর চেহারার মেয়েপুরুষ বালক-বালিকাদের সে দেখিতে পাইতে পারে—যদি মাত্র ছ'আনা পয়সা খরচ করিয়া রাণাঘাট ষ্টেশনে আসে। যে পৃথিবীতে এরা আছে, সেখানে তার বাবার বাতের বেদনা, সুচির (গাঁয়ের এক চালবাজ সমবয়সী মেয়ে) হৃদয়হীনতা, মায়ের খিটখিটে মেজাজ, বাবা মায়ের ঝগড়া, শাশুড়ীর নিষ্ঠুর ব্যবহার সব ভুলিয়া যাইতে হয়, এমন কি তার ছ'ভরির হারছড়ার লোকসানের ব্যথাও যেন মন হইতে মুছিয়া যায়। কি চমৎকার! দেখিলে জীবন সার্থক হয় বটে, মন ভরিয়া ওঠে বটে! সংসারে এত সুখ, এত রূপ, এত আনন্দ আছে!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাধা কি বুঝিল, কি পাইল জানি না—কিন্তু একথা খুবই সত্য যে, মেল গাড়িখানা ছাড়িয়া গেলে রাধা দেখিল যে সে যেন নতুন মানুষ হইয়া গিয়াছে। মনে নতুন উৎসাহ, হাতে পায়ে নতুন বল, চোখে নতুন ধরণের দৃষ্টি। সে যেন রাধা নয়,—যে সংসারে অসহায়, অনাহৃত, উপেক্ষিত, অবলম্বনহীন এবং যার শেষ সম্বল ছ'ভরির হার ছড়াটা পর্যন্ত শাশুড়ী ঘুচাইয়া দিয়াছে।'

—অতঃপর নতুন মানুষ রাধা ভাইকে দিয়া এক পেয়ালা চা আনাইল নিজের জন্য।

ক্রমশঃ

মধুমাসে তুমি এসেছ মাধবী ঘুম-কুঙ্কুম মেখে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

প্রাণসঙ্গমে প্রেমের কথাটী ভুলেছ কি এই রাতে ?
স্বপ্ন-সবুজ যৌবন জাগে আবেগের সংজ্ঞায় ;
নীল দিগন্তে উঠেছে কি চাঁদ নগ্ন রজনী সাথে ?
ছায়া বুঝি তার দুলে ওঠে গঙ্গায়।
কৃষ্ণচুড়ার মঞ্জরী ঝরে পুষ্পিত অঙ্গনে
তোমার আমার নৈশ-মিলন বাচনিক বন্ধনে।

মধুমাসে তুমি এসেছ মাধবী ঘুম-কুঙ্কুম মেখে
মুখোমুখি বসে কহিবে কি কথা হৃদয়ের বিনিময়ে ?
আলাপনে তব আলিপনা দেব রঙের পাত্র রেখে
পরাজয়ে নয়—শুধু ক্ষণ পরিচয়ে।
মুকুল ফোটানো জোছনার হাসি পড়েছে বিজন ঘরে,
ওষ্ঠ তোমার কেঁপে ওঠে কেন আমারে পরশ তরে ?

যত রাত হোক্, ক্লেশ-মন্থর মনের কথাটী বলো,
বাতায়ন হোতে এলো সমীরণ তোমারে শোনাতে গীতি।
ঘর যদি আজ, ভালো নাহি লাগে, বাহিরে এখন চলো,
হারানো দিনের রয়েছে লুকায়ে স্মৃতি।
আলোর পাপ্‌ড়ি বুকেতে তোমার হেরিতেছি অভিসারে,
নব বিদ্যাধরী দিওনা পোহাতে ধরে রেখে দাও তারে।

ঘুম নেই

বীরভদ্র

রাত্রি নিঝুম, ঘুম নেই চোখে
দূরে কুৎসিত গাঢ়তর অন্ধকারে
পেচকের একটানা কর্কশ চীৎকার।
আকাশে ওঠেনি চাঁদ—আলো নেই,
শুধু কালো মেঘ—আরও ভয়ার্ত রাত্রি।
এমনি কত বিনিদ্র রজনী অনায়াসে
কেটে যায়—
মেলে না অজস্র জিজ্ঞাসার কোন সুষ্ঠু উত্তর।
অসহ্য চিন্তার নিবিড় আবেশে
আচ্ছন্ন সমস্ত মন, ক্লান্ত শরীর।
বাঁচবার অবলম্বন নেই কোন,
মুক্তিরও পথ রুদ্ধ—শুধু পলে পলে দাহ।
সারাদিন কর্ম্মের সাথে কঠোর সংগ্রাম,
রাত্রে নিদ্রাবিহীন জীবন,
তবুও তীব্র জ্বালায় জ্বলে যায় শুষ্ক জঠোর—
জোটে না সামান্য বস্ত্র—অনাবৃত দেহ।—
ক্রমে রাত্রি শেষ হ'য়ে আসে,
চিন্তার জাল বোনা আরও একটি
কালরাত্রি
নিঃশব্দে অলক্ষিতে পার হ'য়ে যায়!

লক্ষ্মী কমলা!
আমার ভাইঝি কমলা স্কুলের ছুটিতে আমার এখানে আসার পর থেকেই বাড়ীর চেহারা যেন বদলে গেছে। আগে আমি সব সময়েই ব্যস্ত থাকতাম, কিছুই যেন হয়ে উঠতো না কিন্তু কমলার হাতের ছোঁয়ায় সমস্ত কাজ যেন মূহুর্ত্তের মধ্যে হয়ে যায়!
এই কাপড় ধোওয়ার ব্যাপারেই দেখুন না। কাপড় কাচার মধ্যে যে কোন বিশেষত্ব থাকতে পারে আমি তা জানতাম না তাই কমলা যখন আমায় বলল যে কাপড়কাচা সাবান হওয়া দরকার খাঁটী আমি বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ও বলল, "খাঁটী সাবান হলে জামাকাপড় কাচা ভাল হয় কারণ খাঁটী সাবানে প্রচুর ফেণা হয়। সে ফেণায়
S. 254 A-X52 BG
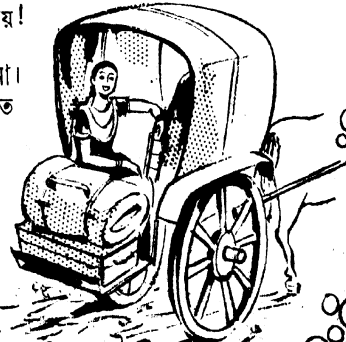
জামাকাপড়েরও ক্ষতি হয়না এবং হাতেরও কোন অনিষ্ট
হয়না।" সে সানলাইট সাবান এনে আমায় দেখাল যে
সানলাইটে কাচা জামাকাপড় কত পরিষ্কার হয়।
সত্যি, একটু ঘষলেই ফেণা হয় কত। আমি যখন
ওকে কাপড়কাচার জিনিষটা দিলাম, কমলা বলল—
"না, পিসীমা, সানলাইট দিয়ে কাচার সময় জামাকাপড়
আছড়াতে হয়না। শুধু একটু সাবান ঘষে দাও প্রচুর
ফেণা হবে এবং জামাকাপড় বিনা আছাড়েই পরিষ্কার হবে।"
সত্যিই কাচার পরে কাপড়জামা এত সাদা আর উজ্জ্বল
হয়ে উঠল যে আমার যেন আর শুকোবার জন্যে তর
সইছিল না; তখনই পরতে ইচ্ছে করছিল। কমলা
সত্যিই চালাক মেয়ে! সে বলে যে সানলাইট দিয়ে কাচলে
জামাকাপড় এত সাদা আর উজ্জ্বল হয় তার কারণ সানলাইটের
প্রচুর ফেণা জামাকাপড়ের সুতোর ফাঁক থেকে সব ময়লা দূর করে দেয়।"
সবই তো বুঝলাম। কিন্তু বাড়ীটা চালাতে হয়তো আমাকেই। সেইজন্যে ওকে আমি
আমার মনের কথাটা বলেই ফেললাম—"কিন্তু সানলাইটের দাম যে বড্ড বেশি।"
কমলা একগাল হেসে বলল—"পিসী, ওটা তোমার মিথ্যে ভয়!" আমি অবাক হয়ে
গেলাম। তখন কমলা বলল: "একটা সানলাইট সাবানে একগাদা
কাপড় কাচা যায়। সানলাইট দিয়ে জামাকাপড় কাচলে সত্যিই
খরচ বাঁচে!" সানলাইট সাবান সম্বন্ধে আর একটি জিনিষ আমার খুব
ভাল লাগে। সানলাইট দিয়ে কাচার পরে জামাকাপড়ের গন্ধটাই কেমন
পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে আর এর ফেণা হাতকে রাখে কোমল ও মসৃণ।
কমলা বাড়ীতে আসার পরেই আমি প্রথম
জানলাম যে পরিবারের সমস্ত জামাকাপড়
যেমন আমার স্বামীর সার্ট, পায়জামা,
তোয়ালে, ন্যাপকিন, বিছানার চাদর,
পর্দা, ছেলেমেয়েদের জামাকাপড়—এক
কথায় আমার ছোটবড় সব জামাকাপড়
কাচার জন্যে সানলাইটের থেকে ভাল
সাবান আর কিছুই নেই। এটি যে
শুধু জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে কাচে তাই নয়;
সানলাইটের একটি সাবানেই এক গাদা জামাকাপড়
কাচা যায়। এতে পয়সাও বাঁচে আর
পরিষ্কার জামাকাপড়ও পরা হয়।
SUNLIGHT SOAP
S 254 B-X52 BG
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই
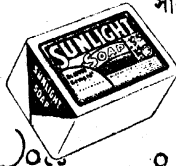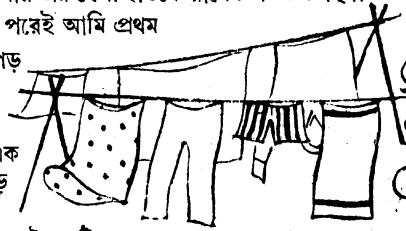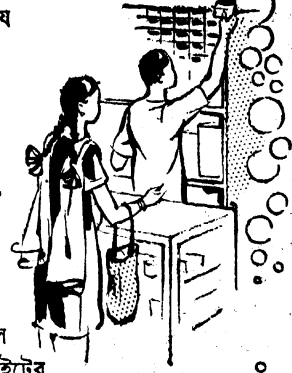
প্রবাসী বাঙালী ভূপেন্দ্রনাথ

কুমারভট্ট

দেবতায় আশীর্বাদধন্য এই বাঙলাদেশ। বাঙালী জাতির একটা বৈশিষ্ট্য আছে—আছে স্বাতন্ত্র্য। ধর্মে-কর্মে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিল্পে-সাহিত্যে, বুদ্ধি ও প্রতিভায় বাঙালী পরিচয় দিয়েছে অসামান্য দক্ষতার—বিরাট প্রতিভার। তাই তার ইতিহাস গৌরবোজ্জ্বল, মহিমান্বিত। শুধু বাঙলাদেশেই নয়, বাঙলার বাইরে অন্যান্যদেশে গিয়েও প্রবাসী বাঙালী বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে লাভ ক'রেছে প্রতিষ্ঠা, সম্মান ও বিপুল গৌরব। যে সমস্ত বাঙালী বিদেশে গিয়ে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছেন, বৃদ্ধি ক'রেছেন বাঙালীর সুনাম, তাঁদের মধ্যে স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় অন্যতম।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত শুভড্যা ছিল একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর উক্ত গ্রামের এক সম্রান্ত ও মধ্যবিত্ত কায়স্থ পরিবারে এক শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করেন ভূপেন্দ্রনাথ। তাঁর পিতৃদেব

ভূপেন্দ্রনাথ দাস

৺পার্বতীনাথ দাস নামা সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন। তাঁর ছয়টি পুত্রের মধ্যে ভূপেন্দ্রনাথ ছিলেন দ্বিতীয়। ছাত্রজীবন থেকেই দারিদ্র্যের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ ক'রে তাঁকে অগ্রসর হ'তে হয়েছিল স্বীয় লক্ষ্যপথে। মেধাবী ও প্রতিভাবান্ ছাত্র ভূপেন্দ্রনাথ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জুবিলী হাইস্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাস করেন মাসিক ১৫৲ টাকা জলপানি লাভ ক'রে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে তিনি এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে লাভ করেন ২০৲ টাকা বৃত্তি। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে তিনি সসম্মানে বি-এ পাস করেন। তারপর তিনি কিছুদিন শিক্ষকতা করেন ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ হাইস্কুলে। অল্পদিনের মধ্যেই আদর্শ শিক্ষাব্রতী হিসাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর সুখ্যাতি। ইতিমধ্যে তিনি বি-এল পরীক্ষা পাস করেন।

তারপর ভাগ্যান্বেষণে ভূপেন্দ্রনাথ বাঙলাদেশ ছেড়ে চলে গেলেন সুদূর ব্রহ্মদেশে। প্রথমে রেঙ্গুনে এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল অফিসে নিযুক্ত হন কেরাণীর কাজে। নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ। অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন আজীবন, তীব্র প্রতিবাদ ক'রেছেন স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে। উক্ত অফিসের মাদ্রাজী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কোন অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক'রে তিনি ইস্তাফা দেন কেরাণীর কাজে। এর পর তিনি বেসিন শহরে মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে নিযুক্ত হ'লেন দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে। ওকালতি পাস ক'রে তিনি তখনও পর্যন্তও সে বৃত্তি গ্রহণ করেন নি। শিক্ষাব্রতীর কার্যেই ছিল তাঁর প্রবল আকর্ষণ, আন্তরিক অনুরাগ। অধ্যাপনার মধ্যেই তিনি লাভ করিতেন বিমল আনন্দ। এখানে প্রায় সাত বছর ধরে শিক্ষকতা ক'রে তিনি লাভ করেন বিপুল যশ ও অসাধারণ জনপ্রিয়তা। তাঁর বর্মী ছাত্রদের মধ্যে উত্তরকালে যাঁরা প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রেছেন তাঁদের মধ্যে স্বাধীনব্রহ্মের প্রেসিডেণ্ট উ, বা, উ এবং সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি মিঃ উ, এ মং প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বেসিন মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলটি পরিণত হয় গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলে। ভূপেনবাবুরই ন্যায্যদাবী ছিল প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হবার। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বিলাত থেকে ম্যাট্রিক পাস করা মিঃ ই, সি ডাউন নামে এক সাহেবকে এনে দিলেন সেই পদ। তেজস্বী ভূপেন্দ্রনাথ সে অন্যায় মাথা পেতে মেনে নিলেন না, প্রতিবাদ ক'রলেন বিদেশী সরকারের অন্যায় কার্যের। তারপর এক কড়া চিঠি লিখে শিক্ষকের পদে দিলেন ইস্তাফা।

তারপর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ভূপেন্দ্রনাথ বেসিনে শুরু করেন ওকালতি। অল্পদিনের মধ্যে এ্যাডভোকেট শ্রেণীভুক্ত হ'য়ে তিনি আশীর্বাদ লাভ করেন ভাগ্যলক্ষ্মীর। আশাতীত আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ সৎ-কার্যে, দুঃস্থ আত্মীয় ও অনাত্মীয়ের সাহায্যকল্পে ব্যয়বৃদ্ধিও হ'ল তাঁর যথেষ্ট। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বেসিন বার এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি ও স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। তিনি স্থানীয় কালীবাড়ী, জগন্নাথবাড়ী, গৌরাংগ আশ্রম প্রভৃতির সংগে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রেঙ্গুনে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন হস-পিটালের উন্নতিকল্পে বর্মী সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বেংগল সোসাল ক্লাবের তিনি শুধু অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না তিনি ছিলেন প্রাণস্বরূপ। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ভূপেন্দ্রনাথ রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যা-লয়ের 'ফেলো' নির্বাচিত হন। তিনি ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন বিনা প্রতিযোগিতায়। তারপর আরও দুবার তিনি উক্তসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ব্যবস্থাপকসভায় তিনি

ছিলেন ভারতীয় দলের লীডার বা নায়ক এবং স্পষ্টবাদী পার্লামেন্টারিয়ান হিসাবে তিনি লাভ করেন বিশেষ সুনাম। ব্রহ্মে অন্তরীণ ও কারারুদ্ধ ভারতীয় রাজবন্দীদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারকল্পে তাঁর চেষ্টা ও কার্য বিশেষভাবে স্মরণীয়।

নানাদিকে কর্মব্যস্ততার মধ্যেও কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথ ছিলেন সাহিত্যের পূজারী। তাঁর রচিত গল্প, প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হ'য়ে পাঠকসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করে। তাঁর রচিত উপন্যাস 'সাগর-বক্ষে' ও গল্পগ্রন্থ 'বহ্নিপ্রেম' পাঠক-পাঠিকাকে দেয় বিমল আনন্দ। বেসিন থেকে প্রকাশিত 'ফেয়ার প্লে' নামক কারেনদের একটি ধর্মি-সাপ্তাহিক পত্রিকার ইংরাজী বিভাগের সম্পাদনা ক'রতেন তিনি। বংগীয় সাহিত্য পরিষদের ব্রহ্মদেশীয় শাখার সভাপতি ছিলেন তিনি প্রায় তিন বৎসর যাবৎ। একজন ভাল অভিনেতা হিসাবেও খ্যাতি ছিল তাঁর অসামান্য। বিরাট প্রতিভা ও কর্মদক্ষতার বলে ব্রহ্মবাসীর অন্তরের মণিকোঠায় তিনি নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এটা সমগ্র বাঙালী সমাজের পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের বিষয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্মা যখন বোমার আঘাতে আঘাতে বিধ্বস্ত হ'তে চলেছিল সেই মুহূর্তে অনন্যোপায় হ'য়ে ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর পরিবার-বর্গ সহ অতিকষ্টে তাঁর প্রিয় কর্মস্থল ছেড়ে আসতে বাধ্য হন। তিনি ক'লকাতায় এসে বালীগঞ্জে বাস করতে থাকেন। কয়েক বছর পরে ভূপেনবাবু ব্লাডপ্রেসার ষ্ট্রোকে শয্যাশায়ী হন—চিকিৎসা ক'রতে থাকেন ডাঃ অমল রায়চৌধুরী। দীর্ঘকাল রোগভোগের পর গত ৮ই জানুয়ারী কর্মময় ও আদর্শ জীবনের অবসান হয়। তাঁর মৃত্যুসংবাদে বেসিন বার এসোসিয়েশনের একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাঁর অমর আত্মার সম্মানার্থে কোর্ট বন্ধ থাকে অর্ধদিবস। আজ স্বাধীন দুটি দেশ—ভারত ও ব্রহ্ম। কিন্তু তবুও ব্রহ্মবাসী ভুলতে পারেনি তাঁদের অতিপ্রিয় ভূপেন্দ্রনাথকে। তাইতো তাঁদের অন্তরে ভূপেনবাবুর মৃত্যুতে আঘাত লেগেছে এত বেশী।

মৃত্যুকালে ভূপেনবাবুর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

আমরা কামনা করি তাঁর অমর আত্মার চিরশান্তি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তাঁর জীবন-আদর্শ বাঙালীকে যেন অনুপ্রাণিত করে।

মেয়েদের কথা

আধুনিক নারী জীবন ও তার সমস্যা

শ্রীমতী অম্বুজবালা দেবী

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে মধ্যমণি নারী। গৃহে তার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তার জীবনের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যও আছে। সেই সব কর্ত্তব্যপালনের দায়িত্ব একমাত্র তারই ওপর ন্যস্ত। গার্হস্থ্যক্ষেত্রে পরিবারের মধ্য-বিন্দুটির স্থিতি-সাম্য সংরক্ষণের ভার সে-ই গ্রহণ করেছে! পুরুষের কার্য্যের পূর্ণতার সহায়ক হয়ে তার পৃথক সত্তা সুদীর্ঘকাল ধরে সমাজ-সংসারকে সর্ব্বতোভাবে শ্রীমণ্ডিত করে এসেছে। আজ সমাজের দ্রুত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই বাংলার নারীর শ্রী, হ্রী আর মাধুর্য্য ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ, আনন্দ ও পরিপুষ্টির জন্যে যে নারী একদা আদর্শ গৃহিণীরূপে আত্মদান করেছে, সে নারীর সাম্প্রতিক বৃত্তি নীতিধর্ম্মবিরুদ্ধ পথে সঞ্চালিত হচ্ছে, তাই পারিবারিক জীবনে দ্রুতভাবে ঘনিয়ে আসছে অকল্যাণ ও অশান্তি; এর মারাত্মক প্রভাব সমস্ত সমাজ-জীবনকে আত্মহত্যার পথে পরিচালনা করবে কিনা, তা কে বলতে পারে? মেয়েদের মধ্যে আজ অধিকমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থগৃধ্নতা দেখা দিয়েছে—আর এসেছে কুচিন্তা ও কুসংসর্গ।

আমরা যে সময়ে মানুষ হয়েছি আর সংসার পাতিয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালন করতে সুরু করেছি, সে সময়ের সমাজ-পদ্ধতি, জীবন-যাত্রা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভিন্নরূপ ছিল। আমরা যারা সাধারণ গৃহস্থের ঘরে জন্মেছি, স্বামীর সংসারটীকেই মনপ্রাণ দিয়ে অলঙ্করণের চেষ্টা করেছি, গৃহক্ষেত্রকে ব্রতপার্ব্বণ পূজা সমারোহের ভেতর নানাবিধ মাঙ্গলিকী ব্যবস্থা করে—সেদিনও যে সব মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সোপানগুলি পেরিয়ে স্নাতকোত্তর হয়েছে তাদের ভেতর ঘর সংসার করবার মনোবৃত্তিটাই বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। তাদের মধ্যে চাকরি করবার স্পৃহা ছিল খুব কম মেয়েরই—আদর্শ গৃহিণী ও জননী হবার জন্যে সকলেই ছিল সচেষ্ট; আর তাদের জন্যে চাকুরীর ক্ষেত্রও অবশ্য প্রশস্ত হয়নি। কাজেই সহস্র নির্য্যাতন ভোগ করেও সেদিনের মেয়েরা ত্যাগ স্বীকার করে ঘর সংসার করেছে—স্বামীর লাঞ্ছনা, শাশুড়ী ননদের গঞ্জনা ও সপত্নীর দুর্ব্ব্যবহার তাদের পক্ষে নীরবে সহ্য করতে হয়েছে। আইন ও সমাজের নাগপাশে আবদ্ধ নারী শুধু প্রতিকারহীন প্রতিবাদই করেছে, উৎক্ষিপ্ত চিত্ত বিদ্রোহের রূপ ধরেছে—সর্পের মত ফোঁস করে উঠেছে, কিন্তু দংশন করেনি। শরৎচন্দ্রের লেখনী সেদিনের মেয়েদের ব্যথা-বেদনার ইতিহাসের দিকেই এগিয়ে চলেছিল।

আজ আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় ও জীবন-দর্শনে নানা-রূপান্তর এসেছে, তারই সঙ্গে সঙ্গে এসেছে বহু পরিবর্ত্তন নারীর সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যেও। নারীর ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আন্দোলন সার্থক হয়ে ওঠায় সমাজ জীবনে সমান অধিকার পেয়ে নারীর গতি-বিধির সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অপসারিত হয়ে গেছে, যুগের প্রবাহকে গতিরুদ্ধ করে সুদৃঢ় রূপে বাঁধ দেবার চেষ্টা করেছেন প্রাচীন পন্থী সমাজ নায়কেরা—কিন্তু তাঁদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। আজ নারীর ঘরসংসারের রুদ্ধ বাতায়ন-পথগুলি উন্মুক্ত হয়েছে,—গৃহস্থালী শিক্ষা, পারিবারিক বৃত্তি শিক্ষা আর বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা সমাজের উপরতলার মেয়ে থেকে সুরু করে নীচের তলার মেয়ে পর্য্যন্ত পাচ্ছে। কিন্তু নারী প্রগতির প্রবহমান স্রোতোধারা কোন কোন দিকে বিস্তীর্ণ হয়ে উঠেছে—আর কোন কোন দিকে হয়ে উঠেছে শীর্ণ। স্বামীর গৃহে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করার শিক্ষা যে নারীর মাতা, মাতামহী আর পিতামহী লাভ করে অন্তঃপুরচারিণী ছিলেন, সেই নারী আজ রাষ্ট্রশাসন থেকে সুরু করে আইন প্রণয়ন পর্য্যন্ত করছে, ওকালতি ব্যারিষ্টারী করছে—বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে দূত হয়ে চলেছে, ইচ্ছামত বিবাহ ও

স্বামী ত্যাগ করছে,আর প্রজনন শক্তির বিলোপ সাধন করে দিয়ে সন্তান পালনের দায়িত্ব গ্রহণে পরাঙ্মুখ হয়েছে, তা'তে তার মধ্যে পুরুষত্বই প্রকাশ পেতে বসেছে, নারীত্বের রূপ ফুটে উঠ্‌ছে না। নারীর সেই অঙ্গলাবণ্য, কমনীয়তা ও রূপের ঔজ্জ্বল্য আজ রূপান্তরিত হয়ে উঠ্‌ছে, চোখ মুখের চেহারা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন-সৌষ্ঠব প্রায় পুরুষের মতই হ'তে আরম্ভ হয়েছে। এদেশের মেয়েরা টমিগান নিয়ে মোটরবাইকে চড়ে রণক্ষেত্রে ছুটবার মত মেজাজও তৈয়ারী করেছে, এরোপ্লেন পরিচালনাও করবে তারা। কোন কোন মেয়ে ট্রামে বাসে পকেট মারের বৃত্তিও গ্রহণ করেছে—অদৃষ্টের কি পরিহাস! মেয়ে-ডাকাতেরও অভাব হয় না! এই তো অতি-আধুনিক নারী জীবন!

ভারতীয় নারীর আদর্শ সেবায় ও তিতিক্ষায় অরুন্ধতী, অনুগমনে দময়ন্তী ও সাবিত্রী, কর্ম্মনৈপুণ্যে দ্রৌপদী এবং দুঃখদলনে সীতা। তার সিঁদুর কৌটায় পূর্ণ থাকে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, পদ্মিনী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া দেবীর সতীত্বের আদর্শ। ভারতের নারীত্ব ও সতীত্বের পাদপীঠে প্রতিযুগই প্রণাম করে এসেছে। ত্যাগে, প্রেমে, স্নেহমমতায় আর বাৎসল্যে অভিসিঞ্চিত করে ভারতীয় নারীরা চিরকালই নিজেদের জীবনকাব্যকে ভাগবতের ন্যায়ই পবিত্র করে রেখেছে। কিন্তু এসব আদর্শ, আচার ও আচরণের রূপান্তর হ'তে সুরু হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দিনে স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে। আজ সিঁদুর কৌটার মর্য্যাদা নেই, সুতরাং প্রাচীনদিনের সতীত্বের আদর্শ সে কৌটায় কেমন করে স্থান পাবে? একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, নারী পুরুষের দাম্পত্য জীবন যে কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে অতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার সংঘাতেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে, আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চিরজন্মের মত বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বসময়ে এ বিচ্ছেদ হিন্দু পরিবারে হবার সম্ভাবনা ছিল না; তাই দায়ে ঠেকেই হোক,আর মানিয়ে গুছিয়ে হোক্—দাম্পত্যজীবন রক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করা হোতো। যে সব মেয়ে ঘর ছেড়ে চলে যেতো,তারা যে ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার জন্যে বেরিয়ে কুপথগামী হোতো একথা স্বীকার করা যায়না—সহ্য করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেই নির্য্যাতিতা নারী পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করতো। আজ সমাজের অনুশাসন উদার হওয়ায় মেয়েরা নিজের ইচ্ছা মত পথ ধরে চল্‌বার সুযোগ পেয়েছে। 'ভ্রষ্টা' শব্দ অভিধান থেকে উঠে যাচ্ছে, আজ আর কেউ পতিতা নয়, তবে অধঃপতিতা হোতে পারে।

নারীর মন সুখ সম্ভোগ, আর কাম ও কামনার পথে পুরুষের মতই বৈচিত্র্যকামী, তা মনস্তত্ত্ববিদের নজরে অবশ্যই সহজে ধরা পড়ে। ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিরা এসব লক্ষ্য করেই নারীকে সংসারে মন দিতে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন, ধর্ম্মপালনের দ্বারা চিত্তের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্যে নানা রকম পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন, আর নারীও সেই নির্দ্দেশ পালন করে এসেছে। তা না হোলে পদ্মিনীর জহর ব্রতানুষ্ঠানই বা কেমন করে সম্ভব হোতো, আর শত শত রাজপুত রমণীর পক্ষে আগুনে ঝাঁপিয়ে-পড়া সহজ হোতো?

আজকের দিনে মানুষের মন বিশ্লেষণাত্মক হয়ে উঠেছে—বিজ্ঞান ও বাস্তববাদ মানুষকে ঈশ্বরভীতির পথ থেকে টেনে এনে স্বেচ্ছাচারিতার দিকে উত্তেজিত করছে, পক্ষী-মিথুনের নীড়ের মত আজ ওর সংসার রচিত হচ্ছে, কোন্ সময়ে ভেঙে পড়বে তার ঠিক নেই। ঘর যারা বেঁধে দেবে তারাই ঘর বাঁধার বিরোধী, এই পরিপ্রেক্ষিতে আজকের দিনের মেয়ে-পুরুষের অবাধ মেলামেশা নৈতিক স্বাস্থ্যহানি ঘটালেও আত্মতৃপ্ত ও পরিপূর্ণ সুখ সম্ভোগের সহায়ক হয়ে উঠেছে। পাশ্চাত্য দেশে যে সমস্যা তীব্র হোতে তীব্রতর হয়ে উঠেছে, সেই সমস্যা গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে এই দেশে। রোমান্টিকতার আতিশয্যের ফলে ক্রমেই আস্‌ছে অবসাদ, আর মানুষের যৌবন শক্তিও অকালে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। নারী পুরুষের পরস্পর লোলুপ দৃষ্টি সংক্রামক ব্যাধির মত আজ মারাত্মক হোতে বসেছে, এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা।

আজ স্ত্রী-পুরুষ জীবিকা উপার্জ্জনের জন্যে সমানভাবে অধিকার পাওয়ায় কর্ম্মক্ষেত্রে দুই শ্রেণীর মানুষই জলস্রোতের মত বেগে ধাবিত হচ্ছে। অধিকাংশ তরুণ-তরুণী বিবাহের পক্ষপাতী নয়, কেন না গার্হস্থ্য জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে এরা বিশেষ ইচ্ছুক নয়। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের নানাপ্রকার রীতিপদ্ধতি এদের কাছে অজানা না থাকায়, কোনপ্রকার নিন্দা অপবাদের আঘাত পাবার অবকাশ এদের পক্ষে নেই। সহশিক্ষা ও সহকর্ম্ম লাভের

ফলে জীবনের ক্ষেত্র পূর্ব্বের মত নেই। এখানে মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়ে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ আচরণের দ্বারা প্রকৃতিকেই দলিত মথিত করে চলেছে। তাই যখন মেয়ে-পুরুষ অফিসের ছুটির পর রেস্তোঁরায়, কাফেতে বা সিনেমায় গিয়ে অশোভন আবহাওয়ার সৃষ্টি করে তখন সৃষ্টিকর্ত্তাকেই দোষারোপ করে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয়। চাকুরীর ক্ষেত্রে মেয়েরাই বেশী স্থান পাচ্ছে, প্রতিযোগিতায় পুরুষ হটে আসছে।

অবশ্য অন্তঃপুরচারিণীর মধ্যে যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে পদস্খলন হয়নি, একথা বলি না—কিন্তু এরূপ পদস্খলন খুব সীমাবদ্ধ নারীর মধ্যে দেখা যেতো। বর্ত্তমানে সকল সীমা লঙ্ঘন করার অধিকারপ্রাপ্তির ফলে মানুষ যেন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। শহরে নাইটক্লাবের অভাব নেই, এখানে অভিজাত সম্প্রদায়ের নারী পুরুষের ভিড় হয়ে থাকে। সেখানে পানাসক্তি শুধু তীব্রভাবে প্রকাশ পায়না, প্রচণ্ড পরকীয়-প্রবৃত্তি ও ব্যভিচারের চরম স্তর পর্য্যায়ভুক্ত হয়ে ওঠে—কিন্তু এসব কথা অনেকেই জানে। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, এইসব দুর্নিবার উচ্ছৃঙ্খলতা মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে আনছে—পরিণতিই যে সমাজ-বিধ্বংসী তা সহজে অনুমেয়। যাদের অর্থ আছে, তারা কি ভাবে যে নারীকে প্রলুব্ধ করে, তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। আর কার্য্যোদ্ধারের জন্যে বিশিষ্ট ব্যক্তির সর্ব্বপ্রকার মনোরঞ্জনের বাহন হয়ে বহু আধুনিকা নিন্দা গ্লানিকে তুচ্ছ মনে করে।

ধর্ম্মচর্চ্চার অজুহাতে নারীর ক্যামোফ্লেজিং-প্রবৃত্তি আজও সমাজের রন্ধ্রপথে ব্যভিচারের বিষবাষ্প সৃষ্টি করছে, কতনা তীর্থক্ষেত্রে, আশ্রমে, সঙ্ঘে বামা নিয়ে তথাকথিত বাবাদের চলেছে বামাচার, যার সম্বন্ধে জানবার পক্ষে কোন সুযোগই ঘটে না, কোন কথাই বাহির হবার পথ পায় না—কত নারীই না নিজের ঘরসংসার জলাঞ্জলি দিয়ে এই সব স্থানে মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে! নারী-পুরুষের বিভিন্ন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বর্ত্তমান যুগের মধ্যে বহু জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে—যার সমাধান হওয়া কোনদিনই সহজসাধ্য হবে না। প্রত্যেক নারীপুরুষের ভেতর আছে যে চাপা প্রবৃত্তি, সেইটাই যখন উদগ্র হয়ে ওঠে তখন সে নারী বা পুরুষ কোন বাধা নিষেধকে গ্রাহ্য করে না, আর তার একাজের জন্যে উৎসাহ দেবার লোকেরও অভাব হয় না। মানুষকেও পথভ্রষ্ট করবার লোকের অভাব হয় না, কিন্তু পথ থেকে মোড় ফিরিয়ে এনে সুপথে চালনা করার লোকের অভাব হয়। আজ নারীপুরুষের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নূতন সমাজের জন্মদান করছে চারিত্রিক অধঃপতনের মাধ্যমে। মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, শিশু-মনস্তত্ত্ব, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, সেবাশুশ্রূষা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, সঙ্গীত, নৃত্য, রন্ধন প্রভৃতি—এতদ্‌সত্ত্বেও আদর্শস্থানীয়া নারী ক্রমেই দুর্ল্লভ হয়ে উঠছে। আধুনিক অর্থকরী বিদ্যা আমাদের দেশে যেভাবে প্রসারিত হয়েছে, তা'তে শিক্ষিত মেয়ে-পুরুষের মধ্যে রুটির জন্যে কিছুকাল ধরে কামড়াকামড়ি সুরু হয়ে গেছে। ঘরে ঘরে আদর্শস্থানীয়া জননী না হোলে জাতি কোন দিন বড় হোতে পারে না। জাতির কল্যাণের জন্যে এদেশের কয়জন প্রগতিবাদিনী মেয়ে চিন্তা করে থাকে? ভালোবাসার বিবাহ (অর্থাৎ যে বিবাহ মাতাপিতার অনুমোদনের অপেক্ষা রাখে না, শুধু সিভিল ম্যারেজে রেজিষ্ট্রারের স্বাক্ষরের অপেক্ষা রাখে) কোনদিন দাম্পত্যজীবনকে সুখী করে না, কেননা পরস্পরের মধ্যে চারিত্রিক অবিশ্বাস গভীরভাবে শিকড়-বদ্ধ হয়—তার মূলোৎপাটন করা একপ্রকার অসম্ভব হয়েওঠে। বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে জীবনের করুণ সমাপ্তি ঘটে। যেসব ক্ষেত্রে ভালোবাসার বিবাহ স্থিতিস্থাপক হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর মধ্যে একজন উদারচেতা সহস্র কটূক্তি নারবে সহ্য করেছে দাম্পত্য জীবনকে স্থায়ী ও সুন্দর করতে।

অনেক সময়ে দায়িত্বজ্ঞানবিবর্জ্জিত তরুণ তার সহ-কর্ম্মিণীর প্রণয়ে আসক্ত হয়ে তার তরুণী সহধর্ম্মিণীর জীবনও বিড়ম্বিত করে তোলে, ইদানীং এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটতে দেখা যায়। স্বামীর সাক্ষাতে পরপুরুষের প্রতি আসক্তি প্রকাশও আজ যেন সভ্যতার রুচিকে বিকৃত করছে না। এইসব দেখে মনে হয়, জাতিকে যদি বীরপুরুষ, চিন্তাশীল নায়ক, বিশিষ্ট মনীষী, বরেণ্য বৈজ্ঞানিক, কবি ও সাহিত্যিক সৃষ্টি করতে হয়, তা হোলে তার পক্ষে হয়তো তা আর সম্ভব হবে না—যদি আজকের দিনের মত স্বেচ্ছাচার ও ব্যভিচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। যেসব ক্ষেত্রে পিতা বা স্বামী যোগাযোগ করেছেন অর্থলাভের জন্যে

ব্যভিচারের পথে, সেসব ক্ষেত্রে পরিণতিতে ভয়াবহরূপ ধারণ করে।

আজ স্ত্রী পুরুষ চলেছে জীবিকা উপার্জ্জনের জন্যে কর্ম্মক্ষেত্রে সকাল ন'টা না বাজতেই, ফলে ঘরসংসার দেখবার মত তাদের অবকাশ আর থাকে না। মেয়েরা চলেছে অফিসে কাজ কর্‌তে, স্কুলকলেজে পড়াতে, কারখানায় কাজ কর্‌তে বা পার্টির কাজ কর্‌তে, কোন কোন মেয়ে হয়তো চলেছে ট্রামে বাসে পকেট মার্‌তে—তাদের যাবার পথে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কাঁদতে থাকে, ভুলিয়ে রেখে যাবার সময় কোথায়? ঠিক সময়ে হাজিরা দিতে হবে। তারা মেঝেতে ধুলোয় গড়াগড়ি দেয়, মা চলে যায় গটগট করে, 'ফুটানি কা ডিব্বা' (ভ্যানিটিব্যাগ) হাতে নিয়ে। তাদের ছোট ছোট সন্তানেরা কিভাবে ঘরে থাকতে পারে, এটাও একটা প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পূর্ব্বের মত একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা প্রচলিত না থাকায় সকলেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা অর্জ্জন করেছে, ক্রেচে মেয়েরা তাদের শিশুসন্তানদের রেখে কাজ কর্‌তে চলে যায়, ফেরার পথে তাদের নিয়ে বাড়ীতে বা বাসায় আসে। ওদেশে আমাদের ধর্ম্মপ্রাণ দেশের মত এত চোরের উপদ্রব নেই, আড়কাঠিও নেই। ছেলেমেয়ে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে বেচে দেওয়ার জন্যে শিশু অপহরণ এদেশে যেমন চল্‌ছে, এরূপ পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে নেই। ওদেশের পুলিস এদেশের পুলিসের মত নয়, তাই তারা জেগে ঘুমোয় না, তারা জাতির কল্যাণের জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এদেশে আজ পর্য্যন্ত এমন কোন প্রতিষ্ঠান বা ঘাঁটি গড়ে ওঠেনি, যেখানে ছেলেমেয়েকে জমা দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে কাজে যাওয়া যাবে। মধ্যবিত্ত সমাজের সকলেই যে ঝি চাকর রাখ্‌তে পারে এরূপ অবস্থা এদেশে নেই, আর ঝি চাকর থাক্‌লেও তাদের ওপর নির্ভরশীল হওয়া যায় না। আগেকার দিনে যে সব ঝি চাকর দেখা গেছে, তারা বিশ্বাসী, প্রভুভক্ত আর সৎ ছিল। তাদের মধ্যে ছিল সততা, ভদ্রতা আর মায়ামমতা। আধুনিক ঝি চাকররা সদাচার ভুলে গেছেন—সাম্যের গান শুনে লাল ঝাণ্ডা দেখে। তারা চেষ্টা করে মনিবের কাছ থেকে কতটা আদায় করে নেবে, আর সুযোগ সুবিধা মত মনিবের জিনিষপত্র, টাকাকড়ি বা সিন্দুকের চাবি আত্মসাৎ কর্‌বারও চেষ্টা করে।

দিনদুপুরে ঝি-চাকরের হাতে মনিবের পরিবারবর্গ খুন হ'য়েছে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়, তাই আধুনিক ঝি-চাকরের ওপর সর্ব্ববিষয়ে নির্ভরতা অত্যন্ত বিপজ্জনক। গৃহিণী হয়তো অফিসের ছুটির পর বাড়ী এসে দেখলেন ছেলেমেয়েদের ভালো করে খাওয়া হয় নি, হয় তো বা কারো গায়ের অলঙ্কার চুরি গেছে, অথবা হয়তো কোন ছেলেমেয়ে নিখোঁজ হয়েছে, কিম্বা ঘরের জিনিষপত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া স্বামী-স্ত্রী ফ্ল্যাটের বর্হিদ্বারের তালাচাবি দিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে চলে গেলেন, এসে দেখলেন তালা ভেঙে জিনিষপত্র কে বা কারা চুরি করে নিয়ে চলে গেছে। তখন তাঁরা বিশ্রামের অবকাশ পান না, থানায় চলে যান ডায়েরী করতে—এই তো সমস্যা। তাছাড়া স্ত্রী হয়তো তাঁর অফিসের কোন বন্ধু সহকর্ম্মী বা উপর-ওয়ালার সঙ্গে ছুটির পর বেড়িয়ে বা সিনেমা দেখে আর কাফেতে নৈশ ভোজন ও স্বাস্থ্যপান করে ঘরে ফিরলেন রাত্রি এগারোটায়, তাঁর স্বামীকে সেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বায়না, কান্নাকাটি ও জ্বালাতন অবলীলাক্রমে সহ্য করে রান্নার ব্যবস্থা কর্‌তে হয়, আর ঘরদোর পরিষ্কার কর্‌তে হয়। এদিকে নৈশবিহারিণী এসে ছেলেমেয়েদের প্রহার ও স্বামীর সঙ্গে কলহ করে আধুনিকত্ব প্রকাশ করলেন। সকলের পক্ষে হোটেল-জীবন যাপন সম্ভব নয়, আর হোটেলে থাক্‌তে হোলেও সেইরকম বিশ্বস্ত উন্নত হোটেলে থাকতে হয়, সেরূপ বিত্তশালী না হোলে তা সম্ভব নয়। মেয়েদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অধিকার পাওয়ার ফলে আর তারা পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে কর্ম্মক্ষেত্রে জীবিকা উপার্জ্জনের অধিকার লাভ করার পর থেকে পারিবারিক জীবন অধিকতর বিড়ম্বিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে কিনা ভেবে দেখবার সময় এসেছে! সবাই চাকুরি কর্‌তে গেলে ঘরই বা দেখ্‌বে কে? আর সন্তানপালনের দায়িত্বই বা নেবে কে? সন্তান পালনের নানা পদ্ধতি শেখানো হচ্ছে বটে, কিন্তু শেষে এ শিক্ষা মূল্যহীন হয়েই থাকবে। এদিকে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও গর্ভ নষ্ট করাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার উচ্ছিষ্টভোজী মেয়েরা যেভাবে এক একটি

পরিবারে আগুন জালিয়ে দিতে বসেছে তাতে তারা ক্ষমারও অযোগ্য। অর্দ্ধশিক্ষিত মেয়েরাও সাংঘাতিক।

বাহিরবিশ্বে পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্রে নারীর সমান দাবী, এর ওপর তার অধিক মাত্রায় আত্মকেন্দ্রিকতা আর দুর্দ্দশার চাপে সঙ্কীর্ণ-চিত্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিজের উপার্জ্জনের অংশ স্বামীর সংসারে দেওয়া বা পরার্থে নিয়োগ করার যে মনোবৃত্তি তা আর মেয়েদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না, এটী অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আদালতে প্রায় দেড় হাজার বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা বিচারের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, তাই মনে হয় দেশের আজ বড় দুর্দ্দিন। সবচেয়ে করুণ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে—যাদের মা বাপের বিবাহ-বিচ্ছেদের সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নেই। তারা যখন দুজনকে একত্র না দেখতে পায় ডুকরে কেঁদে ওঠে, শেষে ভেবে ভেবে অর্দ্ধমৃতপ্রায় হয়ে যায়। অনেককে অকালে জীবন হারাতেও দেখা গেছে। দাম্পত্যজীবনকে বিষাক্ত করে দিয়ে যারা মানুষের ঘর-সংসার ভেঙে দেবার চেষ্টা করে, তারা সেই বাল্মিকী-কথিত ব্যাধের মত, তাদের প্রতিষ্ঠা কোনদিন শাশ্বতী হয় না। ভগবানও কোনদিন সংসার-ভাঙার দলকে ক্ষমা করেন না। আজ্‌কের দিনে আমাদের সংসার ভাঙার দলই সবচেয়ে বেশী।

আজ আমরা এমন একটা সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি যখন দাম্পত্যজীবনের সুখ শান্তি নষ্ট করে আদালতের আশ্রয়ে স্বামীপুত্রপরিবারের সঙ্গে পৃথক হবার উদ্দেশ্যে ছেলেমানুষী করা শোভা পায় না। ভারতের নারীর আদর্শ ত্যাগে ও তিতীক্ষায়, সহিষ্ণুতা ও শান্তিস্থাপনায়—আজকের দিনে ক'জন বিবাহিতা তরুণী সে কথা ভাবে! বাঙালী মেয়ের সবচেয়ে বড় গর্ব্বের জিনিষ তার আদর্শ মাতৃত্ব, সতীত্ব ও পতিভক্তি! অন্যান্য দেশের মেয়েরা আমাদের বাঙালী পরিবারের আদর্শনিষ্ঠা দেখে প্রশংসা করেছে, আর নিজেরা অনুতপ্ত হয়েছে নিজেদের ভুলের জন্যে।

চারদিকের নারীপ্রগতি ও স্বৈরাচারের মধ্যে বাঙালী সমাজের পারিবারিক জীবনের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করা কত বড় সমস্যা হয়ে উঠেছে, তা বোধ হয় আজ এখনও অনেকে উপলব্ধি করতে পারছেন না। পণপ্রথার কালো-বাজারীরূপও ধরা পড়ছে, এ প্রথা উচ্ছেদের জন্যে জাতি দৃঢ়সঙ্কল্প নয়। জাতির সুদীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে বোধ হয় এত বড় সঙ্কটকাল আর আসে নি। যাঁরা ঘরে থাকেন, অথচ কোন কাজ করেন না—তাঁদের অনেকেই সারাদিন সংসারধর্ম্ম ফেলে রেখে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সিনেমায় যাচ্ছেন, আর ট্রামে বাসে ভিড় ঠেলে গিয়ে নিজেদের নির্দিষ্ট সিটে বসে আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন। নারীর স্মৃতিই সৌভাগ্য এনে দেয়। গৃহলক্ষ্মী যদি চঞ্চলা হয়ে কেবল ঘরের বাইরেই ছুটে ছুটে যায়, তাহোলে সে পরিবারে কোনদিন লক্ষ্মীর কৃপা হবে না—লক্ষ্মীছাড়া হবে সমস্ত পরিবারবর্গ। ছেলেমেয়েরাও কোনদিন মানুষ হবে না, মায়ের অসৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অধঃপতিত হবে একথা কয়জন নারী ভাবে?

বাঙলার শিক্ষিত মেয়েরা নিজেদের আদর্শ চরিত্র গঠন করে নিদারুণ সামাজিক ও পারিবারিক অস্তিত্বের সঙ্কট থেকে জাতিকে ত্রাণ করতে পারে, এজন্যে দুর্ব্বার সঙ্কল্পে সহযোগিতা করুক প্রত্যেকটি বাঙালী মেয়ে—যাতে করে সর্ব্বপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা, অসংযম, অশিষ্টতা ও অশান্তি প্রত্যেক পরিবারের মধ্য থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ভারতীয় সভ্যতার মূল সূত্রটীকে অবলম্বন করে প্রত্যেক বাঙালী নারী মহৎ আদর্শের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক, এইটাই অন্তরের কামনা। চিত্রতারকার জীবন মেয়েদের কাছে যেভাবে প্রভাব বিস্তার করছে—তা লক্ষ্য করে ঘৃণায় ও লজ্জায় অধোবদন হয়ে থাকতে হয়। তারকা-জাতীয় পুরুষ বা নারীর ইচ্ছা, অনিচ্ছা, বিকৃতইচ্ছার সাইকোলজিক্যাল আলোচনা ছেলে-মেয়েদের সম্মুখে মেয়েরা যত করবে ততই তারা প্রভাবান্বিত হয়ে নিজেদের ভবিষ্যতের পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলতে পারে। সিনেমা-বাতিকগ্রস্ত মেয়েরাও পারিবারিক জীবনকে বিধ্বস্ত করে তুলছে। এদিকে তাদের সতর্ক হয়ে ওঠা উচিত, আর তাদের পক্ষে সত্য শিবসুন্দরের সাধনায় আত্মনিয়োগ করা খুবই দরকার। বাংলার আয়তন কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি হয়েছে, নারীসমাজও বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করছে—কিন্তু বিবর্দ্ধিত মহিলা সংখ্যার মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় আদর্শ গৃহিণী, বধূ বা কন্যার সংখ্যা খুবই কমে যাচ্ছে, এজন্যেই দুঃখের সঙ্গে এত কথা বলতে হোলো।

টমাটোর আচার

উপকরণ—টমাটো /১ সের, গুড় /।৵ পোয়া, আদা ।।০ ছটাক, ভাল কিস্‌মিস্ ।।০ ছটাক, পাঁচফোড়ন, লঙ্কা, এবং সামান্য তেল।

প্রথমে, গোটা টমাটোগুলি ধুয়ে নিয়ে চাকা চাকা করে কাটতে হবে। কাটবার সময় লক্ষ্য রাখবেন টমাটোর রস যেন মাটিতে না পড়ে। একটা থালা, কিম্বা অন্য কিছুর উপর রেখে কাটবেন। তারপর আদাগুলি খুব সরু সরু করে কুচিয়ে নিন। কিস্‌মিস্‌গুলি বোঁটা ছাড়িয়ে ধুয়ে রাখুন। টমাটোগুলি কাটার পর আর যেন জল লাগাবেন না। এইবার উনুনে সিল্‌ভারের হাঁড়ি বা ডেক্‌চি চড়িয়ে দু'-চামচ তেল দিয়ে বোঁটা ছাড়িয়ে লঙ্কাগুলি দু'খানি করে তেলে ছেড়ে দিন। আর পাঁচফোড়নগুলি দিয়ে দিন। ফোড়নগুলি ভাজা ভাজা হয়ে এলে টমাটোগুলি ছেড়ে দিয়ে চামচ বা হাতা দিয়ে নাড়তে থাকুন। টমাটোগুলি কুট্‌বার সময় যে রস বেরিয়েছিল তাও এইসময় দিয়ে দিন। তারপর আদা-কুচি ও কিস্‌মিস্‌গুলি দিয়ে দিন। পাঁচ মিনিট পরে গুড় দেবেন। একটুও জল দেবেন না যেন। তারপর অল্প মাখা মাখা রস থাকতে থাকতে নামাবেন। ঠাণ্ডা হলে কাঁচের জারে ভরে রাখুন। এই চাটনি অনেকদিন থাকে। তবে মাঝে মাঝে রোদে দেবেন। রোদে দেবার সময় জারের ঢাক্‌নি খুলে রেখে জারের মুখে একখানি কাঁচা পাঁপড় দিয়ে বেঁধে দেবেন। তা না হলে ঢাক্‌নির ঘাম আচারে পড়লে আচার নষ্ট হয়ে যায়।

শ্রীমতী রাণী চক্রবর্তী
(চন্দননগর)

বিচিত্র লীলা

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

অন্ধকার বলে দেয় আলোকের পথ,
অশান্তির দেশে চলে শান্তির সে রথ।
কঠিন প্রস্তর ভেদি ছুটে আসে নদী,
অসহ্য উত্তাপ হতে জন্মিল জলধি।
দুঃখ মাঝে নিরন্তর সুখ করে বাস,
প্রসব বেদনা পরে মাতৃ-মুখে হাস।
আকাশের বুক চিরে বিদ্যুতের আলো,
কুসুমের বক্ষ বিঁধে মালা গাঁথে ভালো।
আঁধার সমুদ্র গর্ভে মুকুতা-রতন,
কঠিন তপস্যা শেষে ঈশ্বর দর্শন।
এমন বিচিত্র লীলা নাহি যায় বোঝা,
সুকঠিন সমস্যার সমাধান সোজা।
রত্নাকর বাল্মীকির হয় অগ্রদূত,
রচনা তোমার, হরি, সকলি অদ্ভুত!

ও মনুয়া সোনা

সতীন্দ্রনাথ লাহা

ও মনুয়া সোনা
কলার কাঁদি মাথায় দিলাম
ফসল আমার গোনা।
যা' দিয়েছি হাতে,
কুলিয়ে যাবে তাতে।
লাভের কড়ি সামলে রেখো
কাউকে বোলো না॥

ওগো মাথার মানিক!
ক্লান্ত হ'লে বট তলাতে
না হয় বোসো খানিক।
পাশে টিউব কল,
আঁজলে খেয়ো জল
একটা না হয় কদমা কিনো
নেয় পয়সা নিক॥

থাক গামছা গায়
সময় মত মুখটি মুছো
এগিয়ে বটের ছায়।
বিছিয়ে চটের থলি।
বসতে তোমায় বলি।
জিরিয়ে খানিক চিঁড়ে খেয়ো
খিদে যদি পায়॥

তুমি গেলেই হাটে
চরণ টিপে ভাবনাগুলো
আমার বুকে হাঁটে।
বলবে আমায় ভীতু
জানেন ঠাকুর ইতু।
তুমি ত আর বুঝবে না'ক
কি করে দিন কাটে॥

সদাই লাগে ত্রাস
কাজ ফেলে কি কোথাও গেলে
খেলতে পাশা তাস?
যখনই যাও দূরে,
মন কাঁদে বেসুরে।
সব কাজেতে যোগান দিতে
আমার অভিলাষ॥

দিলাম মাথার কিরে।
থাকতে আলো ফিরতে হবে
আসবে আঁধার ঘিরে।
কাল বোশেখী দিন
ভাবনা অন্ত হীন।
ঝড় বাহনে চিকুর হানে
বৈকালী মেঘ চিরে॥

পড়বে মনে ভুলে
দুপুর রোদে বট তলাতে
হয়ত যদি শুলে।
তোমার কোদাল আমার ঝারি,
ফসল ফলায় কি বাহারি।
যাও গো সোনা তাড়াতাড়ি
দিচ্ছি ফসল তুলে॥

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

লোচনের শেষ প্রশ্নে হরিধ্বনি দিয়ে উঠল সকলে। হরিধ্বনির সঙ্গে একটা খুশির আমেজও ছিল। ভাষায় না হ'লেও লোচনের ভঙ্গির মধ্যে ছিল একটি রহস্যময় মাদকতা। একটি বিশেষ ভঙ্গি। যা দেখে মনে হয়, এখনো আসল তূণে টান পড়ে নি। আসল তীর ছোঁড়া হয় নি। যে-তীর আসল রসের পাত্রকে বিদ্ধ করবে। যে-রস ছড়িয়ে পড়বে, আর রস জরজর হ'য়ে সবাই হল্লা ক'রে উঠবে। পুরাণের জটিল কাহিনী পেড়ে আগে ধর্মের কথা হোক। লোচন ঘোষের আসল মূর্তি তারপরে দেখা যাবে।

বিদায় নেবার আগে, গানে গানে বলল লোচন, অভয় যেন সবিস্তারে সব কথার জবাব দেয়। সভার লোকজন যেন সব পরিষ্কার বুঝতে পারে।

ঢোলক বাজল ডুডুম ডুম্। আসর দেখলে বোঝা যায়, লোচনের পক্ষে লোক বেশী। আসর ভরে তারই মহিমা।

সুরীন বিড়ি খেতেও ভুলে গিয়েছে। লোচনের কাছে হারলেও হার নয় বটে অভয়ের। তবু সে হাঁ ক'রে চেয়ে আছে নত-মাথা অভয়ের দিকে। ভামিনীর মন আরো খারাপ। অভয়ের ভাব-সাব দেখে, আসর ছেড়ে পালাতে ইচ্ছে করছে তার।

সবচেয়ে বিচিত্র নিমির মনের অবস্থা। অভয় জিতুক, এই আশায় তার বুক ভরে উঠতে চায়। কিন্তু আর একটা মন বলছে, অভয় পরাজিত হোক, অহঙ্কার মরুক একটু। যেন সেই পরাজয় অভয়কে তার কাছেও নত ক'রে দেবে।

সুবালার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, তাদের বাড়িরই একটি মেয়ে। তোর গাইয়ে যে মুখ তোলে না লো সুবলি।

সুবালা ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, আমার সাতকেলে ঘরের গাইয়ে। কিন্তু ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সুবালার মন বিমর্ষ হ'য়ে উঠছিল। ভামিনীর মত তারও মনে হচ্ছিল, চলে যাওয়াই ভাল। কারণ, অভয়ের ভাবভঙ্গি দেখে তার রাগ হচ্ছিল।

আরো একজন অভয়ের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে বসেছিল। সে অনাথ। কারখানার সকলের সঙ্গেই বসেছে সে। কিন্তু কথা বলছে না একটিও।

অভয় দাঁড়াল। প্রকাণ্ড চেহারা। দেখলে মনে হয়, পাড়াগাঁয়ের চাষীমানুষ, ভদ্রলোক হবার আপ্রাণ চেষ্টায় সেজে এসে দাঁড়িয়েছে। গলার মালাখানিও মানুষ অনুপাতে ছোট হ'য়ে গিয়েছে। গলা খুলল অভয়। সুর ভাঁজল খানিকক্ষণ কানে হাত দিয়ে। তারপর, জনে জনের নাম না ক'রে, এক কথায় বন্দনা সারল অভয়। গাইল—

গুরু আমার সবাই
সকলের পায়ে পরণাম জানাই।
গুরু মানেই গুরুজন
ব'লে গেছেন মহাজন।
গুরুই হলেন ভগমান
গুরু হলেন আপন প্রাণ
গুরু আমার আপনারা সবাই
আপনাদের পায়ে পরণাম জানাই॥

ব'লে, চারদিকে ঘুরে ফিরে নমস্কার করল অভয়।

লোচন ঘোষ বলল, বাঃ বেশ বাবা, বেশ !

চেঁচিয়ে বলল, কিন্তু বৌ-মা রয়েছেন যে আসরে, তোমার পরিবার ?

আসরে হাসির ধুম প'ড়ে গেল। কিন্তু অভয়ও হাসছে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে। চীৎকার ক'রে বলল, আজ্ঞে ঠিকই বলেছেন। এবার দয়া ক'রে শোনেন।

তারপর হাত জোড় ক'রে, সুর দিয়ে বলল,

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের গুরু শ্রীরাধিকা
কে না জানে ভাই।
শিবের আরাধ্যা দেবী মা চণ্ডিকা
কেন—জানেন না ঘোষ মশাই ॥

আসরের এক কোন্ থেকে হরি মিস্তিরি লাফিয়ে উঠল, বাঃ, বেঁচে থাক ভাই।

লোচন ঘোষও চীৎকার ক'রে উঠল, সুন্দর, সুন্দর।

গুল্‌তানি চলল খানিকক্ষণ। মহাজন দাশ মশায় হাত তুলে ধমক দিল, আঃ, চুপ কর, গাইতে দাও।

রাজুবালা ভুরু কুঁচকে, বিমর্ষ হেসে বলল, ছোঁড়ার থলেয় মাল আছে দেখছি।

নিমি তার বান্ধবীদের চিমটি খেয়ে বলল, কথা জানে কাঁড়ি কাঁড়ি।

সুবালা বলল তার সঙ্গিনীদের, লোচন ঘোষের জবাব করুক আগে। নিজে কথা বলুক, তারপরে বোঝা যাবে কেরামতি।

সেই কথাই ভেবেছে এতক্ষণ অভয়। বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ ক'রেছে। চুপ ক'রে বসেছিল মাথাটি গুঁজে। এ যে গুরুমশায়ের কথা শোনা। একটি কথা ভুললে চলবে না। কান পেতে শুনতে হবে। মনে রাখতে হবে। জবাব দিতে হবে একটি একটি ক'রে।

অভয় প্রথমে ধুয়া তৈরী ক'রে নিল। বলল, তার বুদ্ধি অল্প। জ্ঞানের বড় অভাব। পুরাণ চিরকালের। সে কথা বলবার হক থাক্ লোচন ঘোষ মশাইয়ের। সে হালের কথা বলবে। নতুনই কালে কালে পুরানো হয়। ছোঁড়ার কথায় যদি বিশ্বাস না হয়, তবে—

একবার চেয়ে দেখ নিজের দিকে।
আপনার অঙ্গ
মহাকালের কত রঙ্গ
কান পেতে কালের কথা শোন আপন বুকে ॥ (ধুয়া)
ও ভাই, হায় দিন চলে যায়
কান পেতে কালের কথা শোন আপন বুকে (ধুয়া)

ব'লে, সরাসরি লোচনের জবাবে চলে এল অভয়। গান গেয়ে গেয়েই বলল, শিব থাকতে গৌরী দেবী হ'লেন বিধবা। কেন ? না, মা আমার ক্ষিদের জ্বালা সইতে না পেরে, স্বামীকেই খেয়ে বসলেন। মহাদেব বললেন, পার্বতী ঠাকরুণ, আমায় খেয়ে যে তুমি বিধবা হ'য়ে গেলে ? তখন দেবীর শোক আর ধরে না। দেবীর দুঃখ দেখে মহাদেব বললেন, বিধবার বেশেও তুমি দেবী থাকবে। নাম হ'ল তোমার ধুমাবতী। ওই নামেই তুমি পুজো পাবে জগতে।

জবাব দিয়ে অভয় মন্তব্য করল, পুরাণ বলেই রক্ষে। বিধবা হ'য়েও তিনি পুজো পান, মানুষ হলেই মাগী ডাইনী। শুধু কি তাই ?

মাগো, তোমার খুদার জ্বালায় স্বামী খেলে
পুলিশ আসিবে পলে
পুজোর বদলে ফাঁসীর দড়ি, ঝুলিয়ে গলে ॥

হাসির রোল পড়ল চারদিকে। বাহবা বাহবা উঠল আসরে। অভয় কোমর দুলিয়ে নাচতে নাচতে নমস্কার করল নত হ'য়ে।

লোচন ঘোষও বাহ্‌বা দিল। কিন্তু তার চোখে যেন কিসের ছায়া। বিস্ময়ের ঘোরও আছে।

পুরাণের কাহিনী আষ্টেপৃষ্ঠে মুখস্থ করেছে অভয় গাঁয়ের গুরু নিতাই ভট্‌চাযের কাছে। কবিগানের ওইটি বোধহয় প্রাথমিক। রামায়ণ মহাভারত ছাড়াও, যেখানে যে-কথা শুনবে, মনে ক'রে রাখবে। হিন্দু ধর্ম বল, মুসলমান ধর্ম বল, আর খ্রীষ্টানদের ঢঙ বল, সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে রাখতে হবে। যত শোনা যায়, তত শেখা যায়। সংসারের কাউকে ছোট জ্ঞান ক'রো না। নিতাই ভট্‌চাযের সঙ্গে গাঁয়ে একবার লড়াই হয়েছিল মামুদের। মামুদ নাম-করা গাইয়ে। ভট্‌চায তাকে আসরে জিজ্ঞেস করেছিল, হিঁদু মেয়েরা সিঁদুর কেন পরে। সিঁদুরের উৎপত্তি কেন ?

মামুদ জবাব দিয়েছিল অব্যর্থ। দিয়ে, ভট্‌চাযকে জিজ্ঞেস করেছিল, মুসলমানদের নামাজের পাঁচ ওক্ত কি ?

সবাই ঘাবড়ে গিয়েছিল ভট্‌চাযের জন্য। কিন্তু ভট্‌চায আরো গভীরের মানুষ। মামুদের সঙ্গে গাইবার আগে তৈরী হ'য়ে এসেছিল সে। অভয়ের গুরু ফ্যাল্‌না নয়।

একে একে লোচন ঘোষের সব কথার জবাব দিল অভয়। দেবমাতা অদিতি, অসুরমাতা দিতি, আর উচ্চৈঃশ্রবা ও গরুড়ের মাতা বিনতার জীবন ব্যাখ্যা করল। কাশীরাজের কন্যা অম্বাকে হরণ করেছিল ভীষ্ম, কিন্তু বিয়ে করেনি। তাই নিজে চিতা জ্বেলে মরেছিল সে। পরজন্মে ভীষ্মের শমন শিখণ্ডী হ'য়ে জন্ম নিয়েছিল। তারপরে বলল, মহাদেবের যৌবন-বীজ শুক্র। ব'লে, সকলের দিকে হাত জোড় ক'রে, হেসে হেসে দুলে দুলে বলল, কিন্তু মানুষ মহাদেবেরা একটু সাবধান থাকবেন। কারণ,

শুক্র এক চোখো, কা—না।
তানার পাপ পুণ্যে নাই মানা।
সংসারে করেন ছিষ্টি অনাছিষ্টি
এক চোখে এক বগ্‌গা দিষ্টি
এক ছাড়া তার দোস্‌রা নাই জানা।

আবার কলরোল উঠল হাসির। বাহ্‌বা দিল তারা, যারা কথার অন্তর্নিহিত মানে বুঝতে পেরেছে। মেয়েদের আসরে কথাবার্তা একটু কম শোনা গেল। অনেকে বুঝতে পারে নি।

অনাথ দেখল, হরি মিস্তিরির মুখে কথা পর্যন্ত নেই। অনাথ বলল, খুড়ো ?

হরি যেন চমকে উঠল, অ্যাঁ ?

অনাথ বলল, ব্যাপার কি ?

হরি চোখ গোল ক'রে বলল, আমিও তো সেই কথাই বলছি। অভয়ের কথা বলছিস্‌ তো ?

অনাথ বলল, হ্যাঁ। দেখে মনে হয়। ভাজার মাছটি উল্টে খেতে জানে না। কিন্তু কি গাইছে একবার শুনেছ ?

হরি বলল, শুনিনি ? শুনেছি বলেই তো থ' মেরে গেছি। অব্যিশি আমি জানতুম।

—জানতে ?

—জানতুম না ? সেই একদিন যখন আমাকে শোনালে, একের ডাইনে কোটি কোটি, বাঁয়ের বিন্দু তা হ'লে কত ? বাঁয়ের বিন্দু থেকেই তো তুমি সব তুলে নিয়ে এয়েছ—যাকে শূন্য বলা হয়। তখুনি বুয়েছি, ভেতরে মাল আছে।

অভয় ততক্ষণে লোচনের প্রতি তার প্রশ্ন তুলে ধরেছে।

ক্রমশঃ

সংস্কৃত-জননী-স্তুতিঃ *

ডক্টর-শ্রীযতীন্দ্রবিমল-চতুর্ধুরীণ-বিরচিতা

সংস্কৃতজননী সৃষ্টি-কুশলিনী বিশ্বভাষাপ্রসবিনী।
বেদবেদান্ত—বিবিধ—সিদ্ধান্ত—সর্বযুগপ্রচারিণী ॥১

জগজ্জনধর্ম—সমন্বয়মর্ম—সমস্নেহসংরক্ষিণী।
তিব্বতচীন—শ্যামজাপান—মহাযানসুখসরণী ॥২

এসিয়ামেরিকা—ইয়োরোপাফ্রিকা—শিক্ষানিকেতনমণিঃ।
নিঃস্ব-ভারতবাসি—প্রজ্ঞা-প্রকাশি—তমোনাশি—
রত্নখনিঃ ॥৩

মহারাষ্ট্র—গুর্জর—মগধজ্যোতিষপুর—
কাশ্মীর-চোলভরণী।
ভারতখণ্ডাঞ্চল—বিভূষণ-রত্নদল—
সুসমঞ্জস-নিবেশনী ॥৪

যতীন্দ্রো বিমলো দীনো
যাচতে সংস্কৃতাম্বিকে।
আশিষস্তে দিবারাত্রং সদাবিশ্ব-হিতাত্মিকে ॥

---

* উজ্জয়িন্যাং কালিদাস সমারোহে গীতা। (২৩, ১১, ৫৮ খৃষ্টাব্দ)

বৈদেশিকী

অতুল দত্ত

জার্ম্মান সমস্যা গত কিছুকাল আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে; অন্য কোনও প্রশ্নই সাম্প্রতিক কালে বিশ্ববাসীকে এত বেশী বিচলিত করে নাই। জার্ম্মানী আন্তর্জ্জাতিক সমর-সজ্জার একটি প্রধান কেন্দ্র। এই জার্ম্মানী সংক্রান্ত প্রশ্ন কৃত্রিম উপায়ে চাপা রাখিয়া পশ্চিম জার্ম্মানীর সমর-সজ্জা চলিতেছে; উহাকে পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত করিবার ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ হইয়াছিল। গত নভেম্বর মাসে সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রথমে বার্লিন সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া এবং পরে জার্ম্মানীর সহিত সন্ধি-চুক্তির খসড়া প্রস্তাব আনিয়া জার্ম্মান সমস্যার কৃত্রিম আবরণ ছিন্ন করিয়াছে; এই প্রশ্ন আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

জার্ম্মান সমস্যা—

আগামী মে মাসে পশ্চিম-বার্লিন সম্পর্কে সোভিয়েট প্রস্তাবের ছয় মাস মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবে। তৎপূর্ব্বে পশ্চিমী শক্তিবর্গ কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিলে সোভিয়েট রুশিয়া ঐ সময় তাহার প্রভুত্বাধীন বার্লিনের অংশ পূর্ব্ব-জার্ম্মানীর উপর অর্পণ করিয়া সৈন্য সরাইয়া লইবে। তখন পশ্চিম-বার্লিনের সহিত পাশ্চাত্য শক্তির যোগাযোগ রক্ষার জন্য হয় পূর্ব্ব জার্ম্মান গভর্ণমেন্টকে স্বীকার করিতে হইবে; অথবা তাহাকে উপেক্ষা করিয়া গায়ের জোরে সংযোগ রক্ষা করিতে হইবে। যেহেতু সোভিয়েট প্রস্তাবে কোনও উগ্রতা নাই, সে জন্য পাশ্চাত্যের জনমত পশ্চিম বার্লিন লইয়া সঙ্কট সৃষ্টি করিবার বিরোধী। এই অবস্থায় গায়ের জোরে পশ্চিম বার্লিনের সহিত যোগাযোগ রক্ষার কথা আপাততঃ বৃটেন ও আমেরিকা ভাবিতে পারিতেছে না। আবার পশ্চিম জার্ম্মানীর চ্যান্সেলার ডাঃ আডেনয়ার পূর্ব্ব জার্ম্মান্ গভর্ণমেন্টকে কোন-রূপ স্বীকৃতি দেওয়ার সম্পূর্ণ বিরোধী। এই সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়া ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমে মিঃ ডালেস ইউরোপে সফর করেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর মস্কো পরিদর্শনের এক পুরাতন নিমন্ত্রণ ছিল। মিঃ ম্যাকমিল্যান্ এই নূতন পরিস্থিতিতে সে নিমন্ত্রণ রক্ষার সিদ্ধান্ত স্থির করেন। মস্কোয় রওনা হওয়ার পূর্ব্বে মিঃ ডালেসের সহিত তাঁহার আলোচনা হয়। জার্ম্মান প্রশ্ন সম্পর্কে অনমনীয়তায় ডাঃ আডেনয়ারের নূতন মিত্র জুটিয়াছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট দ্য গল। পশ্চিম জার্ম্মানীর সমর-শক্তি বৃদ্ধিতে বরাবরই প্রধান আপত্তি ছিল ফ্রান্সের। তাহার আপত্তিতেই পশ্চিম জার্ম্মানীকে "ন্যাটোর" অন্তর্ভুক্ত করিতে বিলম্ব হয়। এই দিক হইতে দেখিলে জঙ্গী-নীতির পরিপোষক আডেনয়ারের সহিত দ্য গলের মিলন সত্যই বিচিত্র। কিন্তু সম্প্রতি এই দুই ঝাঁনু রাষ্ট্র-নায়কের মধ্যে "সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি" হইয়া গিয়াছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে দ্য গল্ যখন পশ্চিম ইউরোপ সম্পর্কে "সাধারণ বাজার" (কমন্ মার্কেট) নীতি ঘোষণা করেন, তখন আডেনয়ারের সমক্ষে সমস্যা উপস্থিত হয়—তিনি কী করিবেন। জার্ম্মান শিল্পপতিরা ফরাসী প্রভুত্বাধীন এই অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থায় যোগ দিবার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু আডেনয়ার সেই বিরোধিতা উপেক্ষা করিয়া রাজনৈতিক প্রয়োজনে এই ব্যবস্থার সহিত পশ্চিম জার্ম্মানীকে যুক্ত করেন। ইহার বিনিময়ে পূর্ব্ব জার্ম্মানী সম্পর্কে তাঁহার নীতির প্রতি ফ্রান্সের সর্ব্বাঙ্গীণ সমর্থনের আশ্বাস তিনি লাভ করেন। জেনারেল দ্য গল্ দেখিলেন—আপাততঃ বৃটেনের সহিত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পশ্চিম জার্ম্মানীর সমর্থনে ফ্রান্সের শক্তি বাড়িবে। তাহার পর জার্ম্মানী যদি স্থায়ীভাবে বিভক্ত থাকে, তাহা হইলেই ফ্রান্সের সুবিধা। আন্তর্জ্জাতিক দরবারে ফ্রান্সকে ইউরোপের একমাত্র মুখপাত্র করিয়া তুলিবার যে আকাঙ্ক্ষা তিনি পোষণ করেন, তাহা সফল হইবার প্রকৃত উপায় জার্ম্মানীর স্থায়ী বিভাগ। তিনি আরও বিবেচনা করিলেন—জার্ম্মান সমস্যা জীয়াইয়া রাখিয়া জার্ম্মানীতে ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্য মজুত রাখার প্রয়োজনীয়তা তাহারই বেশী; কারণ উত্তর-আফ্রিকায় ফরাসী সৈন্য নিযুক্ত রাখার আবশ্যকতা শীঘ্র শেষ হইবার সম্ভাবনা নাই। অন্য দিকে ফ্রান্সের সহিত অর্থ-নৈতিক সহযোগিতায় সম্মত হইয়া ডাঃ আডেনয়ারের রাজনৈতিক সুবিধাই শুধু হয় নাই; অন্য দিক হইতেও পশ্চিম জার্ম্মানীর উপকৃত হইবার সম্ভাবনা সৃষ্ট হইয়াছে। সম্প্রতি আল্‌সেসে ব্যালিষ্টিক অস্ত্র গবেষণার জন্য জার্ম্মানী ও ফ্রান্সের একটি যুক্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। এই ধরণের প্রতিষ্ঠানে পারমাণবিক অস্ত্র তৈয়ারী সম্ভব হইতে পারে। জার্ম্মান ভূমিতে পারমাণবিক অস্ত্র নির্ম্মাণ না করিবার জন্য পশ্চিম জার্ম্মানী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু জার্ম্মান ভূমির বাহিরে উহার তৈয়ারীতে কোনও আইনগত বাধা নাই।

মস্কোয় ম্যাক্‌মিল্যান—

এই পরিস্থিতিতে গত ২১শে ফেব্রুয়ারী বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌মিল্যান্ ও তাঁহার পররাষ্ট্র সচিব মিঃ সেল্‌উইন লয়েড মস্কো যান। সেখানে দশ দিন অবস্থানের পর তাঁহারা দেশে ফেরেন। তাহার পর, মিঃ ম্যাক্‌মিল্যান্ এখন বন্ ও প্যারিস্ সফর করিতেছেন। মস্কোয় বৃটিশ রাষ্ট্রনায়করা বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। জার্ম্মান সমস্যা সম্পর্কে স্বভাবতঃ তাঁহাদের মধ্যে আলোচনা হইয়াছে। এই বিষয়ে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের মনোভাব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা

তাহারা অর্জ্জন করিয়াছেন। পশ্চিমী শক্তিবর্গ এখন পর্য্যন্ত বার্লিন ও জার্ম্মানী সম্পর্কে সোভিয়েট প্রস্তাবের কোনও উত্তর দেন নাই; অবশ্য নানা ভাবে এই প্রস্তাবের সমালোচনা হইয়াছে—বার্লিনের প্রতি পশ্চিমী শক্তিবর্গের অধিকারের কথাটা প্রয়োজনাতিরিক্ত গুরুত্বের সহিত বার বার বলা হইয়াছে। সাধারণভাবে জার্ম্মান প্রসঙ্গ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গের আলোচনার জন্য পশ্চিমী শক্তিবর্গ চতুঃশক্তির পররাষ্ট্রীয় সচিবদের সম্মেলনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মিঃ ম্যাক্‌মিল্যান এই প্রস্তাবে সোভিয়েট ইউনিয়নকে সম্মত করাইয়াছেন। গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী মিঃ ক্রুশ্চেভ মস্কোয় এক নির্ব্বাচনী সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা পররাষ্ট্র-সচিব-বৈঠকে আলোচনার "গোলকধাঁধাঁ"য় আর পড়িতে চাহেন না। এই গোলকধাঁধাঁ এড়াইবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা পররাষ্ট্র-সচিব-সম্মেলন সম্পর্কে সর্ত্ত দিয়াছেন যে, সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসাবে পররাষ্ট্র সচিবের বৈঠক বসিবে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বৈঠক শেষ করিতে হইবে; পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার পররাষ্ট্র সচিবকে এই বৈঠকের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দুই পক্ষের প্রতিনিধি-সংখ্যা সমান করিতে হইবে এবং বার্লিন ও জার্ম্মানী সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রস্তাব এই বৈঠকের আলোচ্য হইবে। পররাষ্ট্র সচিব বৈঠক সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়নের এই সর্ত্তাধীন সম্মতিকেই মিঃ ম্যাক্‌মিল্যানের মস্কো সফরের সাফল্য মনে করা হইতেছে।

বার্লিন ও পশ্চিম জার্ম্মানী—

বার্লিন ও জার্ম্মানী সম্পর্কে সোভিয়েট প্রস্তাব পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় করিবার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন দাবী জানাইয়াছে। বার্লিন সম্পর্কে সোভিয়েট প্রস্তাব সংক্ষেপে এইরূপ—বার্লিনে বৈদেশিক প্রভুত্বের অবসান হউক; উহাকে স্বাধীন মুক্ত নগরীতে পরিণত করা হউক; বৃহৎ চতুঃশক্তি উহার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ থাকিবে; প্রয়োজন হইলে জাতি-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে পর্য্যবেক্ষণের ব্যবস্থা হইবে। সোভিয়েট ইউনিয়ন জানাইয়াছে যে, এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সহিত কোনও মীমাংসা না হইলে ছয় মাস পরে সে তাহার প্রভুত্বাধীন বার্লিনের অংশ পূর্ব্ব-জার্ম্মানীর উপর অর্পণ করিয়া সৈন্য সরাইয়া আনিবে। অর্থাৎ, তখন পশ্চিমী শক্তিবর্গকে হয় পূর্ব্ব-জার্ম্মান গভর্ণমেণ্টের কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া তাহাদের অনুমতিক্রমে পশ্চিম বার্লিনের সহিত সংযোগ রক্ষা করিতে হইবে, অথবা গায়ের জোরে পূর্ব্ব জার্ম্মানীর মধ্য দিয়া পথ করিতে হইবে। পূর্ব্ব জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে গায়ের জোর প্রয়োগ করা হইলে সোভিয়েট ইউনিয়ন যে নিষ্ক্রিয় থাকিবে না, ইহা সে জানাইয়া দিয়াছে। জার্ম্মানী সম্পর্কে সোভিয়েট প্রস্তাব—জার্ম্মানীর দুই অংশের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতে হইবে; জার্ম্মান সমরবাদের অবসান ঘটাইয়া জার্ম্মানীকে শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইবে; পোট্‌স্‌ডাম্‌ চুক্তিতে নির্দ্ধারিত জার্ম্মানীর সীমান্ত স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। বার্লিন সংক্রান্ত প্রস্তাব ও জার্ম্মানী সংক্রান্ত প্রস্তাব স্বতন্ত্রভাবে উত্থাপিত হইলেও ইহারা পরস্পরের সহিত বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। পূর্ব্ব ও পশ্চিম জার্ম্মানীর স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হইলে ভৌগোলিক দিক হইতে বার্লিন পূর্ব্ব-জার্ম্মানীর প্রাপ্য হয়। অ-কমুনিষ্ট পশ্চিম বার্লিনের ইহাতে আপত্তি স্বাভাবিক। এই জন্যই সোভিয়েট প্রস্তাবে বার্লিনকে স্বাধীন মুক্ত নগরীতে পরিণত করিয়া উহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। জার্ম্মানীর সমরবাদের উচ্ছেদ সাধনের এবং উহার সীমান্ত নূতনভাবে নির্দ্ধারণের সিদ্ধান্ত ইতিপূর্ব্বে পোট্‌স্‌ডাম্‌ চুক্তিতেই স্থির হইয়াছিল; ইহা সোভিয়েট প্রস্তাবে উত্থাপিত নূতন প্রসঙ্গ নহে। জার্ম্মানীর দুই অংশের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া তাহাদের সহিত স্বতন্ত্রভাবে সন্ধি করিবার কথাটা অবশ্য নূতন। কিন্তু উহা গত চৌদ্দ বৎসরের ইতিহাসের সৃষ্ট বাস্তব অবস্থার স্বীকৃতি ব্যতীত আর কিছুই নয়। জার্ম্মানী যে দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, ইহা বাস্তব সত্য। ইহাকে অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। বিশেষতঃ, যে পশ্চিমী শক্তিবর্গ প্রথমে পশ্চিম বার্লিনকে স্বতন্ত্রভাবে রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে এই বাস্তব ব্যবস্থাকে স্বীকার না করা নিতান্তই অশোভন। জার্ম্মান সমস্যাকে জীয়াইয়া রাখিয়া পশ্চিম জার্ম্মানীকে অগ্রবর্তী আক্রমণ-ঘাঁটীরূপে ব্যবহারের দুরভিসন্ধি ত্যাগ করিবার ইচ্ছা যদি না থাকে, তাহা হইলে সকল যুক্তিই অবশ্য নিষ্ফল। প্রত্যেক নিরপেক্ষ ব্যক্তিই স্বীকার করিতেছেন যে, জার্ম্মানীর দুই অংশের স্বাতন্ত্র্য এখন সুস্পষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত। মার্কিন সেনেটার ম্যান্‌স্‌ফিল্ড সম্প্রতি বলিয়াছেন—পূর্ব্ব জার্ম্মানীর অস্তিত্ব "বাস্তব সত্য" এবং উহা ক্রমেই সংহত হইতেছে। বৃটিশ শ্রমিক-নেতা মিঃ ক্রসম্যান্‌ গত বৎসর জার্ম্মানী পরিদর্শনের পর বলিয়াছিলেন "Whether we like it or not, Germany is now firmly partitioned.…To suggest that these two states could now be demolished and one central state constructed in their place by a freely elected constituent assembly seems to me quite absurd."

অর্থাৎ, আমরা পছন্দ করি, আর না-ই করি, জার্ম্মানী এখন আয়র্লণ্ড ও কোরিয়ার মত বিভক্ত। এই দুইটি রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া স্বাধীন নির্ব্বাচনের দ্বারা গঠিত গণপরিষদের মাধ্যমে একটি এক-কেন্দ্রিক রাষ্ট্র গঠনের কথা কিছুতেই বলা চলে না বলিয়া আমি মনে করি। এই বাস্তব অবস্থা স্বীকার করিয়া জার্ম্মানী ও বার্লিনের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। সমাজতান্ত্রিক পূর্ব্ব-জার্ম্মানীর অভ্যন্তরে বার্লিনের নিজস্ব বিশিষ্ট সমাজ-ব্যবস্থা টিকাইয়া রাখিতে হইলে ইহাকে স্বাধীন মুক্ত নগরীতে পরিণত করাই আবশ্যক।

পাক্‌-মার্কিণ সামরিক চুক্তি—

মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে আমেরিকার সহিত তুরস্ক, ইরাণ ও পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই তিনটি রাষ্ট্রই চাহিয়াছিল যে, শুধু কম্যুনিষ্ট আক্রমণই নয়—সর্ব্বপ্রকার বহিরাক্রমণই দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তির আওতায়

আসিবে। তাহাদের এই আকাঙ্ক্ষা মিটিয়াছে। দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভাষায় "কমুনিষ্ট আক্রমণ" প্রতিরোধের কথা নাই—আছে বহিরাক্রমণ প্রতিরোধের প্রতিশ্রুতি, স্বাধীনতা ও রাজ্যগত অখণ্ডতারক্ষার আশ্বাস। প্রয়োজন হইলে সশস্ত্র মার্কিণ সৈন্য প্রেরণ করা হইবে বলিয়াও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। এই দ্বিপাক্ষিক চুক্তিগুলির মধ্যে পাক্-মার্কিণ দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তির সহিতই আমাদের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। পাক্ কর্তৃপক্ষের আবদার বজায় থাকায় তাঁহারা সম্ভবতঃ অত্যন্ত উল্লসিত হইয়াছেন। পাক্ পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী ভারতের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া জোর গলায় শুনাইয়াছেন যে, সব রকম আক্রমণের বিরুদ্ধেই পাকিস্থান এখন আমেরিকার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতিলব্ধ। "স্বাধীনতা ও রাজ্যগত অখণ্ডতা" রক্ষার জন্য মার্কিণ আশ্বাসেই পাকিস্থানের উল্লাস বেশী। ইহার কারণ "রাজ্যগত অখণ্ডতার" প্রশ্নের সহিত কাশ্মীর প্রসঙ্গ সম্পর্কিত রহিয়াছে। আমেরিকার পক্ষ হইতে দিল্লীস্থিত মার্কিণ দূত মিঃ বাঙ্কার শুনাইয়াছেন যে, কম্যুনিষ্ট আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্যে এই চুক্তির নাই; কারণ যে আইসেনহাওয়ার নীতি অনুযায়ী এই চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য কম্যুনিষ্ট আক্রমণ প্রতিরোধ। মার্কিণ পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র লিঙ্কন্ হোয়াইট্ বলেন যে, এই দ্বিপাক্ষিক চুক্তিগুলি অবশ্য কম্যুনিষ্ট আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত; তবে বাগদাদ্ চুক্তি, সিয়াটো প্রভৃতি অনুসারে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে পরিচালিত অন্যান্য আক্রমণ প্রতিরোধেও আমেরিকা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মার্কিণ মহলের বক্তব্য প্রচারিত হইবার পর পাক্-পররাষ্ট্র বিভাগ বলিয়াছেন যে, দ্বিপাক্ষিক চুক্তির যে ব্যাখ্যাই করা হউক না কেন,তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের ব্যাখ্যা ব্যতীত অন্য কোনও ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নন। একটু লক্ষ্য করিলেই বোঝা যায়,চুক্তির ভাষায় ইচ্ছা করিয়াই "কম্যুনিষ্ট আক্রমণের" কথাটা স্পষ্ট করিয়া না বলিয়া পাকিস্থানকে খুশী করা হইয়াছে। আবার চুক্তির মৌখিক ব্যাখ্যার দ্বারা ভারতকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা হইতেছে। মিঃ হোয়াইট দ্বিপাক্ষিক চুক্তির প্রতিরোধমূলক বৈশিষ্ট্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা কোনও কৈফিয়ৎ নয়। প্রকাশ্য সামরিক চুক্তির উদ্দেশ্য সব সময়েই প্রতিরোধমূলক বলিয়া উল্লেখ করা হয়—পররাজ্য আক্রমণ করা হইবে বলিয়া ঢাক-ঢোল সহকারে প্রচারের দ্বারা কোনও আধুনিক রাষ্ট্র সামরিক চুক্তি করে না। মিঃ হোয়াইটের দ্বিধাজড়িত ও দ্ব্যর্থবোধক উক্তি শুনিয়া স্বভাবতঃ মনে হয়, পাক্-মার্কিণ সামরিক চুক্তির প্রকাশিত বিবরণই হয়ত সব নয়—ইহার অন্তরালে গোপন আশ্বাস আছে। ইহা ছাড়া, পাক্-মার্কিণ সামরিক চুক্তি প্রতিরোধমূলক হউক, আর আক্রমণমূলকই হউক, ইহা পাকিস্থানের ঔদ্ধত্যকে যে কি দারুণ প্রশ্রয় দিয়াছে, তাহা ভারতীয় সীমান্তের অধিবাসীরা বুঝিতেছে ধন-প্রাণ দিয়া, তাহাদের মা-বোনের ইজ্জত দিয়া। সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে, পাকিস্থান ভারতীয় সীমান্তে মার্কিণ অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছে। ইহার পর, পাক্-মার্কিণ সামরিক চুক্তির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পাক্ ঔদ্ধত্য বৃদ্ধির আর কোনও প্রমাণের প্রয়োজন নাই।

সাইপ্রাস সমস্যার সমাধান—

সাইপ্রাসবাসীর চার বৎসরব্যাপী দুঃস্বপ্নের অবসান হইয়াছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে সাইপ্রাস্ সমস্যার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। আর্ক বিশপ্ ম্যাকারিও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। বিদ্রোহী নেতা জিভাস অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন।

সাইপ্রাস্ সমস্যা মূলতঃ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে সাইপ্রাসবাসীর মুক্তির সমস্যা। কিন্তু পরবর্তীকালে এই সমস্যা আন্তর্জাতিক প্রশ্নে পরিণত হইয়াছিল। গ্রীস স্বভাবতঃ সাইপ্রয়েট্ গ্রীকদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আগ্রহী। বিশেষতঃ, প্রথম দিকে মুক্তিকামী সাইপ্রেটরা গ্রীসের সহিত তাহাদের দ্বৈপায়ন মাতৃভূমির সংযুক্তি দাবী করিয়াছিল। পরবর্তীকালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সুকৌশলে গ্রীসের বিরুদ্ধে তুরস্ককে দাঁড় করায়। গত ৫ই ফেব্রুয়ারী গ্রীসের প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্যারামানলিস্ এবং তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী মেণ্ডেরিস্ জুরিখে মিলিত হন। তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন গ্রাক্ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ য়্যাবেরফ্ এবং তুর্কি পররাষ্ট্র সচিব মিঃ জেরেলু। ছয়দিন আলোচনার পর তাঁহারা সাইপ্রাস্ সম্পর্কে মীমাংসায় উপনীত হন। এই মীমাংসা-পরিকল্পনায় সাইপ্রাসে একটি কাউন্সিল অব ষ্টেট গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হইবেন। গ্রীক ও তুর্কি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত ব্যবস্থা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনে কোনও সাইপ্রয়েটের আপত্তি থাকিলে সে ঐ কাউন্সিল অব ষ্টেটের নিকট আপীল করিতে পারিবে। একটি যুক্ত কম্যাণ্ডের দ্বারা সাইপ্রাস্ রাজ্য গ্রীস ও তুরস্কের সহিত সংযুক্ত থাকিবে। গ্রীস, সাইপ্রাস ও তুরস্ক পালাক্রমে এই কম্যাণ্ডের নেতৃত্ব করিবে। পরে, লণ্ডনে ব্যাপকতর আলোচনায় এই জুরিখ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে মুক্তিকামী সাইপ্রয়েটদের সহিত বৃটিশ গভর্ণমেন্টের মীমাংসা হইয়াছে। ১০।৩।৫৯

শ্রী'শ'—

॥ চলচ্চিত্র ও ভারত ॥

ভারতীয় পরিবেশে ও পটভূমিকায় চলচ্চিত্র নির্ম্মাণের ঝোঁক অধুনা বিদেশী চিত্র নির্ম্মাতাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। ভারতের বৈচিত্র্যময় পরিবেশ, বর্ণাঢ্য দৃশ্যাবলী ও অপূর্ব্ব

এই যুগ-সন্ধিক্ষণে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলনের ক্ষেত্ররূপেও সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এবং ভবিষ্যতে যে আরও করবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রদীপের তলায় যেমন অন্ধকার, তেমনি ওদেশীয় চিত্র-নির্ম্মাতাদের কাছে এদেশের আকর্ষণ যতই প্রবল হোক, আমাদের দেশীয় চিত্র-নির্ম্মাতারা কিন্তু এই বিশাল ও বিচিত্র দেশের বুকে নিহিত চিত্র নির্ম্মাণের অপূর্ব্ব উপাদানগুলির দিকে বদ্ধচক্ষু হয়ে রয়েছেন। এই ঐতিহ্যময় ও ঐশ্বর্য্যময় ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে, ধর্ম্ম ও অনুশাসনকে, পুরাণ ও ইতিহাসকে, গল্প ও রূপকথাকে, সাহিত্য ও শিল্পকে, চিত্রের মাধ্যমে প্রাণময় ও বাঙ্ময়

মুক্তি প্রতীক্ষিত "অগ্নিসম্ভবা" চিত্রের একটি দৃশ্যে মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কমলা মুখোপাধ্যায়কে এক বিশেষ ভঙ্গীতে দেখা যাচ্ছে।

সৌধশ্রেণী প্রভৃতিই প্রলুব্ধ করছে বিদেশীদের এই স্বপ্নময় ভারতের রহস্যময় পটভূমিকায় চিত্র নির্ম্মাণে। তা ছাড়া পুরাতন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, নবীন জাতীয়তাবাদের একনিষ্ঠ সাধক,যুদ্ধোত্তর এই স্বাধীন ভারত,শান্তি ও অশান্তির

করে তুলে, বিশ্বের সম্মুখে প্রকাশ করে, আবার এই পুরাতন ভারতকে নতুন করে আবিষ্কার করবার সুযোগ বিশ্ববাসীকে দেবার চেষ্টা, আমাদের দেশের চিত্র নির্ম্মাতারা করছেন বলে মনে হয়না। এখনও ভারতীয় চিত্র, বিশেষ

করে হিন্দী চিত্র, হলিউডের হাল্কা ও অপরাধমূলক ছবির অন্ধ অনুকরণে এগিয়ে চলেছে; আর বাংলা ছবির দৌড় সেই অনাদি-অনন্ত প্রেম ও বিরহ, হাসি আর কান্না, সেই চাওয়া আর পাওয়া—বড় জোর মনস্তত্ত্বের কিছু কচকচি বা ধনী-নির্ধনের চিরন্তন দ্বন্দ্ব। তবে আশার কথা অধুনা ভারতীয় চিত্রে বিশেষ করে বাংলা চিত্রে একটা পরিবর্তনের সুর যেন শোনা যাচ্ছে, নতুনের আগমন যেন সূচিত হচ্ছে। কয়েকটি ছবির মধ্যে দিয়ে পরিচালক-প্রযোজকদের এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়ও পাওয়া গেছে। এখন এই প্রচেষ্টাকে ফলবতী করতে হলে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে নতুন পথে এগিয়ে চলতে হবে পুরাতনকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে, তবেই হয়ত অদূর ভবিষ্যতে বাংলা তথা ভারতীয় চিত্র বিষয়বস্তুর নতুনত্বে ও পারিপাট্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র প্রস্তুতকারী দেশরূপে বিশ্বের দরবারে স্থায়ী আসন লাভ করবে।

* * *

অধুনাতন যে সব বিদেশী চিত্র ভারতে নির্মিত হয়েছে তার মধ্যে Stewart Granger ও Anthony Steel অভিনীত মার্কিন চিত্র "Harry Black and the Tiger" চিত্রটি বছরখানেক আগে দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি অঞ্চলে গৃহীত হয়েছিল। এর পর বৃটেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা Dirk Bogarde ও জাপানী অভিনেত্রী Yoko Tani অভিনীত "The Wind Cannot Read" নামক বৃটিশ ছবিটিও ভারতে তোলা হয় এবং এই চিত্রটিতে দিল্লী, আগ্রা ও জয়পুরের অনেক প্রসিদ্ধ স্থানের চিত্র গ্রহণ করা হয়েছে। চিত্রটি শীঘ্রই কলিকাতায় মুক্তি পাবে।

এ ছাড়া সোভিয়েট সরকারও ভারতীয় চিত্র নির্মাতাদের সহিত একযোগে কয়েকটি চিত্র নির্মাণের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই সম্পর্কে সোভিয়েট পরিচালক Kamil Yarmatov শীঘ্রই ভারতে আসবেন। ইতিমধ্যে Soviet Taskent Film Studio বোম্বের একটি ষ্টুডিওর সঙ্গে সপ্তদশ শতাব্দীর একটি ভারতীয় কবির কাব্যকে চিত্রে রূপায়িত করবার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন।

ভারত ও পূর্ব্ব জার্ম্মানীর মধ্যেও চিত্র নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হয়েছে। "গৌতম, দি বুদ্ধ" খ্যাত ভারতীয় প্রযোজক শ্রীরাজবংশ খান্না পূর্ব্ব জার্ম্মানীর ডেকা ষ্টুডিওর সহযোগিতায় "মহাভারত", "রামায়ণ", "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" ও অযোধ্যার শেষ নবাব "ওয়াজেদ আলী শা"-র জীবনী—এই চারটি চিত্র নির্ম্মাণ করবেন বলে জানা গেছে। প্রথম চিত্রটি ওয়াজেদ আলী শার জীবনী অবলম্বনে রচিত হবে।

পশ্চিম জার্ম্মানীও ভারতীয় বিষয় নিয়ে চিত্র নির্ম্মাণে পেছিয়ে নেই। জার্ম্মাণ ডকুমেণ্টারী ফিল্ম প্রযোজক Poul Zils ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে কয়েকটি চিত্র নির্ম্মাণ করবেন বলে জানিয়েছেন। চিত্রগুলি জার্ম্মান ভাষায় রচিত হবে এবং ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার চলচ্চিত্র বাজারে প্রদর্শিত হবে। তাঁর প্রথম চিত্র,—"5000 years of Indian Art"—প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার একটি প্রদর্শনীর জন্য তোলা হবে। এর পর তিনি "Mother Ganga" ও "The Chosen One" নামে ভারতীয় জীবন ও সভ্যতাকে ভিত্তি করে দুটি চিত্র নির্ম্মাণ করবেন।

* * *

॥ ধীরাজ ভট্টাচার্য্য ॥

বাংলার চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তারকা ধীরাজ ভট্টাচার্য্য ৫৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ৫৪ বৎসর বয়সকে পরিণত বয়স বলা চলে না—বিশেষ করে ধীরাজের মতন শিল্পীর ক্ষেত্রে, যাঁর কাছ থেকে চলচ্চিত্র-শিল্প ও বাংলার নাট্যামোদী, চলচ্চিত্র-অনুরাগী দর্শক সমাজ আরও অনেক কিছু আশা করছিল। তাই এই পরিণত প্রতিভার এই অপরিণত বয়সে প্রয়াণে বাংলার চলচ্চিত্র জগৎ আজ বিশেষ ব্যথিত। অদূর ভবিষ্যতে ধীরাজের শূন্য স্থান পূর্ণ হবার সম্ভাবনাও সন্দেহের অবকাশ রাখে।

১৯০৫ সালে যশোর জেলায় ধীরাজ ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ছেলে বেলায় লেখাপড়ায় তিনি ভাল ছেলেই ছিলেন, কিন্তু তাঁর জন্মগত অভিনয় প্রতিভা তাঁকে আকর্ষণ করল অভিনয়ের প্রতি,—আর ১৯২৫ সালে ম্যাডান্ থিয়েটার্স-এর নির্ব্বাক চিত্র "সতী লক্ষ্মী"তে তিনি যখন সর্ব্বপ্রথম দর্শক সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন বোধ হয় কেউই ভাবে নি যে উত্তরকালে এই সুদর্শন তরুণ অভিনেতা

বাংলা তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র-অভিনেতারূপে খ্যাতিলাভ করবে।

সেই নির্ব্বাক যুগের "সতী লক্ষ্মী"র পর আর যে সব চিত্রে তিনি অভিনয় করে সুনাম অর্জ্জন করেন তার মধ্যে 'কাল পরিণয়', 'নৌকাডুবি', 'গিরিবালা' ও 'মৃণালিনী' উল্লেখযোগ্য। তারপর এল সবাক চিত্রের যুগ, আর সে যুগের প্রথম পর্ব্বেই ধীরাজ 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'দক্ষযজ্ঞ', 'অন্নপূর্ণা', 'যমুনা পুলিনে', 'সমাধান', প্রভৃতি চিত্রে অনবদ্য অভিনয় করে সবাক চিত্র-জগতেও তাঁর স্থান পাকা করে নিলেন। প্রথম থেকেই ধীরাজ নায়কের চরিত্র অভিনয়ে পারদর্শিতা দেখান; কিন্তু পরে মধ্যজীবনে এসে তিনি তাঁর অভিনয় কুশলতার আর একটি বিশেষ দিকের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেন,—এই সময় থেকেই তিনি চৌকস চরিত্র-অভিনেতা রূপে, বিশেষ করে 'ভিলেন' চরিত্রে তাঁর অপূর্ব্ব অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিয়ে, অকুণ্ঠ প্রশংসালাভ করেন। এই সময়ের চিত্রগুলির মধ্যে 'কঙ্কাল', 'কুয়াশা', 'কালোছায়া', 'চীনের পুতুল', 'হানা-বাড়ী', 'নিয়তি', 'মরণের পরে', 'ডাকিনীর চর', প্রভৃতি চিত্র তাঁকে বাংলা চিত্রের শ্রেষ্ঠ 'ভিলেন' চরিত্রাভিনেতা রূপে পরিচিত করে। সাম্প্রতিক কালের দুটি চিত্র "ধূমকেতু" ও "নীলাকন্ক"-তে দর্শকরা আবার তাঁকে দেখতে পান। এর পর তিনি বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়লেও "অপরাধ" নামক একটী অপরাধমূলক চিত্রে অভিনয় আরম্ভ করেন, কিন্তু মৃত্যু এসে তাঁর এই শেষ চরিত্র-চিত্রণে বাধা দিল,—নিজ গৃহেই রোগশয্যা থেকে উঠে তিনি ক্যামেরার সম্মুখে শেষ বারের মতন অভিনয় করেন, আর এর কয়েকদিন পরেই এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়ে পরপারে যাত্রা করেন।

অভিনয় ছাড়া লেখক রূপেও ধীরাজ ভট্টাচার্য্য সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুনাম অর্জ্জন করে গেছেন—তাঁর "সাজান বাগান" উপন্যাস ও আত্মজীবনী মূলক লেখা "যখন পুলিশ ছিলাম" ও "যখন নায়ক ছিলাম" পুস্তকের মধ্য দিয়ে। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চেও ধীরাজ তাঁর অবদান রেখে গেছেন সার্থক অভিনয়ের মাধ্যমে; আর তরুণ বয়স থেকে আরম্ভ করে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ৩৪ বৎসর ধরে অসংখ্য চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করে অভিনয় জগতে রেখে গেছেন তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর—যা কোনও দিনই মুছে যাবে না।

আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

* * *

দেশে-বিদেশে ঃ

ভারতীয় চলচ্চিত্র অভিনেতা I. S. Johar বিদেশী চিত্র "Harry Black and the Tiger"-এ সাফল্যময় অভিনয়ের পর বৃটেনের The Rank Organisation কর্ত্তৃক তাঁদের আগামী চিত্র "North West Frontier"-এ অভিনয় করবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। চিত্রটির প্রধান ভূমিকাদ্বয়ে অভিনয় করবেন Lauren Bacall ও Kenneth More, আর এক পার্ব্বত্য রেলপথের মালিকের ভূমিকায় অভিনয় করবেন আই, এস, জোহর। ছবিটির চিত্র গ্রহণ করা হবে ভারতের জয়পুরে। স্পেন ও বৃটেনেও কিছু কিছু চিত্র গ্রহণ করা হবে। তবে চিত্রটির গল্পাংশ "The Pride of India" নামক একটি ট্রেণে ভ্রমণের ঘটনার থেকে রচিত বলে হয়ত ছবিটির নাম "North-West Frontier" না রেখে "The Pride of India" রাখা হতে পারে।

* * *

খ্যাতনামা ইতালীয়ান্ চিত্র-পরিচালক Roberto Rosselini ও ভারতীয় ডকুমেণ্টারী চিত্র-প্রযোজক হরি দাশগুপ্তর ৩২ বৎসর বয়স্কা স্ত্রী সোনালী দাশগুপ্তকে ঘিরে যে রহস্য-রোমান্স গড়ে উঠেছে ও যা ভারত তথা বিশ্বের—বিশেষ করে ইউরোপের চিত্র জগতে বিপুল আলোড়ন ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে, তার ওপর নতুন করে কিছুটা আলোকপাত হয়েছে। দু'বৎসর আগে রোসেলিনি যখন ভারত সরকারের পক্ষে চিত্র-পরিচালনার ব্যাপারে এদেশে নিযুক্ত ছিলেন তখনই তাঁর সঙ্গে সোনালীর সাক্ষাৎ হয়। তারপর হঠাৎ রোসেলিনি তাঁর কাজের মাঝখানেই এদেশ ছেড়ে চলে যান, আর সোনালীও গোপনে তাঁকে অনু-সরণ করে প্যারিসে চলে যান এবং সেখানে লোক চক্ষুর অন্তরালে এক বছরেরও ওপর বাস করছেন—তাঁর শিশু পুত্র হরি ও চোদ্দ মাস বয়স্কা কন্যা রাফায়েলাকে নিয়ে।

প্যারিসবাসীরা যদিও জানত সোনালী ওখানেই বাস করছে কিন্তু তার ঠিকানা কেউই বার করতে পারে নি। সম্প্রতি রোসেলিনি ও সোনালী সর্ব্বপ্রথম একত্রে জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না বিখ্যাতা ইতালীয়ান্ অভিনেত্রী আনা ম্যাগ্‌নানীর পূর্ব্বতন স্বামী ও হলিউডের স্বনাম খ্যাতা অভিনেত্রী ইন্‌গ্রীড্ বার্গম্যানের বর্ত্তমান স্বামী রোসেলিনি বলেছেন যে তিনি ও সোনালী তাঁদের বর্ত্তমান বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হবার অপেক্ষায় রয়েছেন। ইতালীয়ান্ ও ভারতীয় আদালত কর্ত্তৃক তাদের বর্ত্তমান স্ত্রী ও স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ মঞ্জুর হলেই তাঁরা দুজনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন বলে মনে হয়।

* * *

খবরাখবর ঃ

'আর্ট এণ্ড কাল্‌চার পিক্‌চাস' পরিবেশিত ও সুশীল মজুমদার পরিচালিত "অগ্নিসম্ভবা"-র চিত্রগ্রহণ শেষ হয়ে গিয়ে ছবিটি মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। শান্তি দাশগুপ্ত লিখিত একটি বলিষ্ঠ কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন মনোজ ভট্টাচার্য্য। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন কালোবরণ এবং গান রচনা করেছেন রমেন চৌধুরী ও অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিকায় আছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলা মুখোপাধ্যায়, আশা দেবী প্রভৃতি।

* * *

পরিচালক তপন সিংহ তাঁর নতুন চিত্র "ক্ষণিকের অতিথি"র বাহ্যদৃশ্যের চিত্র-গ্রহণের জন্য দলবলসহ সুরী অভিমুখে যাত্রা করেছেন। চিত্রটির প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন নির্মল কুমার ও রুমা দেবী, আর সঙ্গীত রচনা করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

* * *

নবগঠিত চিত্র প্রতিষ্ঠান 'সি, আর, এস্' তাঁদের প্রথম ছবি "তৃষ্ণা এলো চোখে"-র কাজ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে সুরু করে দিয়েছেন। এক অভিনব রহস্য কাহিনীকে কেন্দ্র করে ছবিটির চিত্র-নাট্য রচনা করেছেন রমাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী। অভিনয়াংশে আছেন কমল মিত্র, ভারত দেব শোভা সেন, কমলা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। পরিচালনা করছেন "সপ্তরথী" নামে একটি কলাকুশলী দল।

* * *

'চিত্রসাথী' নামে আর একটি নবগঠিত চিত্র-প্রতিষ্ঠান তাঁদের প্রথম ছবি "স্বর্ণ চাঁপার" কাজ প্রাথমিক ভাবে আরম্ভ করেছেন। এক অনাদৃতা নারীর জীবনকে কেন্দ্র করে চিত্রটির কাহিনী লিখেছেন সুজিত নাগ। পরিচালনা করছেন অনিল মিত্র।

* * *
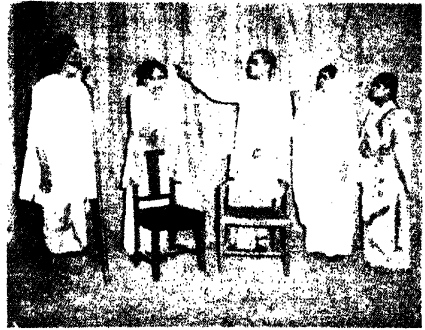
জি, ই, সি, রিক্রিয়েশন্ ক্লাবের পরিবেশনায় রঙমহল মঞ্চে "দুই পুরুষ" নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। তপন গুহ, গৌর গোস্বামী, অরুণ মজুমদার, গীতা দে, ইরা চক্রবর্ত্তী ও কমলা ঝরিয়ার অভিনয় উপস্থিত দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দান করে। উপরে অভিনয়ের একটি দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

* * *

পরিচালক কনক মুখোপাধ্যায়ের নতুন চিত্র "এ জহর সে জহর নয়"-এর কাজ ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে এগিয়ে চলেছে। ভূমিকায় আছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী, চন্দ্রাবতী, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র ও চৌকস অভিনেতা জহর রায় প্রভৃতি।

* * *

বিদেশী খবর ঃ

Marylen Monrce, Diana Dores ও Brigitte Bardot-এর সমগোত্রীয়া আর একটি লাস্যময়ী চিত্র-তারকার সন্ধান পাওয়া গেছে। এই তারকাটি হচ্ছে ফরাসী অভিনেত্রী Mylene Demongeot. ফরাসী

চিত্র "The Witches of Salem"-এ Mylene তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়ে প্রভূত প্রশংসা অর্জ্জন করেছেন, আর "Upstairs and Downstairs" নামের একটি ব্রিটিশ কমেডি-চিত্রে শীঘ্রই অবতীর্ণা হয়ে দর্শকমনোরঞ্জন করবেন।

* * *

বিশ বছরেরও আগে হলিউডে নির্ম্মিত ও বোরিস্ কার্লফ্ অভিনীত "The Mummy" চিত্রটিকে ব্রিটেনে আবার নবরূপে চিত্রায়িত করা হচ্ছে। Mummy-র ভূমিকাটিতে রূপদান করবেন Christopher Lee, যিনি ব্রিটিশ চিত্র "Dracula" ও "The Hound of the Baskervilles"-এ অভিনয় করে সুনাম অর্জ্জন করেছেন।

* * *

স্বনামখ্যাত অভিনেতা Orson Welles, Herman Melville-এর উপন্যাস "Moby Dick"কে অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাট্যরূপ দান করেছেন। নাটকটি শীঘ্রই ব্রড্‌ওয়েতে প্রদর্শিত হবে।

* * *

নিউ ইয়র্কের The Little Orchestra Society প্রায় দু'মাসের জন্য পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলি ভ্রমণ করবেন।

The Chicago Symphony Orchestra মস্কো থেকে আরম্ভ করে তিন মাস ধরে পূর্ব্ব ও পশ্চিম ইউ-রোপের দেশগুলি ভ্রমণ করবেন।

ওয়াশিংটনের National Symphony Orchestra মধ্যে ও দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণে দু'মাসের জন্য বহির্গত হবেন।

* * *

Los Angeles-এর The United Nations Association রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশ্ব-শান্তির আন্দোলনে সাহায্য করতে পারে এই রকম বিষয়বস্তু বিশিষ্ট এক অঙ্ক নাটকের একটি প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছেন। পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ নাটকটি যাতে এই বৎসরের অক্টোবর মাসের রাষ্ট্রপুঞ্জ সপ্তাহের (United Nations Week) একটি বিশেষ অনুষ্ঠানরূপে প্রদর্শিত হতে পারে তার জন্য লস্ এঞ্জেলিসের American National Theatre and Academy এখন থেকেই প্রস্তুত হচ্ছে।

শিল্পীর কথা

'বিফল জনম, বিফল জীবন'

কুমারেশ ভট্টাচার্য

বাঁকুড়াজেলার বিষ্ণুপুর শুধু স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে-শিল্পেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নয়, সারা ভারতের মধ্যে সংগীত চর্চার এ একটা অন্যতম পীঠস্থান। এখানকার মল্লরাজগণের সময় থেকে আজ পর্যন্ত বহু বছর ধরে সমভাবে চ'লছে সংগীতানুশীলন। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে সংগীত চর্চার নেই কোন
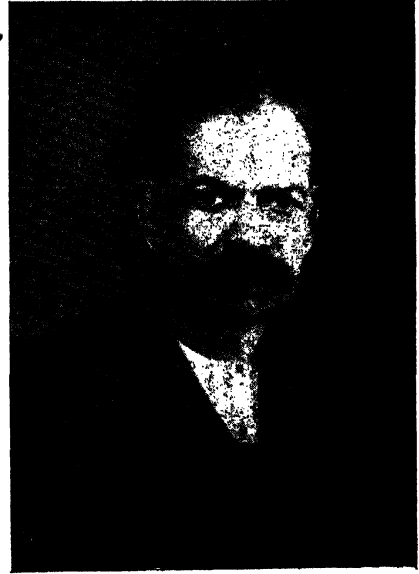
শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরাম—নেই বিচ্ছেদ। এখানকার সংগীতগুরু গদাধর চক্রবর্তী, অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, যদু ভট্ট, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অসংখ্য সংগীতসাধক ছিলেন সংগীত-জগতের দিকপাল, শুধু বাঙলার নয়—এঁরা সমগ্র ভারতের গৌরব। এখানকার বন-মর্মরে, পাখীর গানে, নদীর কলতানেও যেন ঝংকৃত হয় সংগীতের এক অপূর্ব মধুর সুর।

আজ থেকে প্রায় পঁচাত্তর বছর আগের কথা। সংগীত-কেশরী অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ণুপুরের মহারাজ রামকৃষ্ণ সিংহকে সংগীত শিক্ষা দেবার জন্যে যখন রাজদরবারে যেতেন, তখন প্রায়ই সংগে যেত তাঁর পাঁচ বৎসরের শিশু পুত্রটী। এই বালকের মধুর কণ্ঠের অপূর্ব সুর-তাল-সমন্বিত গান শুনতেন মহারাজ অত্যন্ত আগ্রহভরে, মুগ্ধ হ'তেন এর সংগীত-প্রতিভায়। চিত্রাঙ্কন বিদ্যাতেও এই বালকের অপূর্ব প্রতিভা লক্ষ্য ক'রে মহারাজ তাঁকে কোলকাতায় পাঠাতে অভিলাষ করেন—চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্যে। কিন্তু তৎপূর্বে ইংরাজীভাষায় কিছু জ্ঞানলাভ করা অত্যাবশ্যক বিবেচনা ক'রে তিনি অনন্তলালকে অনুরোধ করেন ছেলেটীকে তাঁর বিষ্ণুপুর ইংরাজী স্কুলে ভর্তি ক'রবার জন্যে। বালকটি যথারীতি স্কুলে যেতে আরম্ভ ক'রল, সংগে সংগে নিয়মিতভাবে সংগীতও শিক্ষা ক'রতে লাগল পিতৃদেবের কাছে। কিন্তু নাদ-ব্রহ্মের সাধনার দ্বারা যে বালক ভবিষ্যতে যশলাভ করবে তার মন কি আর ইংরাজী ভাষা শিক্ষায় আকৃষ্ট থাকতে পারে? সেদিনকার সেই বালক আর কেউ নয়, ইনি হ'চ্ছেন ভারতের একনিষ্ঠ সংগীত-সাধক, সুর-ব্রহ্মের নিষ্ঠাবান পূজারী, বাঙলা তথা ভারতের গৌরব সর্বজনপ্রিয় সংগীত-নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইনি বিষ্ণুপুরে ১২৮৪ সালের ২৫শে পৌষ বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করেন। আশৈশব সংগীতে ছিল তাঁর সহজাত অধিকার ও অনুরাগ। তদুপরি বিখ্যাত সংগীত-সাধক পিতৃদেবের নিকট সংগীত শিক্ষা ক'রে অল্প বয়সেই সংগীতে তিনি লাভ করেন বিশেষ পারদর্শিতা। দশ বছর বয়সে গোপেশ্বর প্রথম এলেন কোলকাতায়। সংগীত-প্রিয় এক সাহেব তাঁর গান শুনে এত মুগ্ধ হন যে মিনার্ভা থিয়েটারের বাড়ী ভাড়া নিয়ে শুধু গোপেশ্বরের গান হবে এই মর্মে বিজ্ঞাপন প্রচার করতে থাকেন। একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় সারা শহরে। দশ বছরের এক বালক সংগীতে অদ্ভুত পারদর্শিতা দেখাবে এ সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়। বহু লোকের সমাগম হ'ল। বালকের গান শুনে মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা তাকে কোলে ক'রে অত্যন্ত প্রশংসা করেন তার গানের। মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বালকের গানের সমালোচনা ক'রে ব'লেছিলেন, 'চক্ষু মুদ্রিত ক'রে শুনলে মনে হয় খুব বড় গায়কের গান হ'চ্ছে।' কোলকাতার জনসাধারণকে গানে সন্তুষ্ট ক'রে গোপেশ্বর ফিরে গেলেন বিষ্ণুপুরে। সেখানে গিয়ে পুনরায় একাদিক্রমে ১৩ বৎসর ধ'রে তিনি পিতার কাছে সঙ্গীত-শিক্ষা লাভ করেন। তারপর আবার তিনি আসেন কোলকাতায়। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ গুরুপ্রসাদ মিশ্র, মুলো গোপাল, শিবনারায়ণ মিত্র প্রভৃতির নিকট থেকে বহু খেয়াল, টপ্পা ও ধ্রুপদ সংগীত সংগ্রহ করেন। স্বীয় অগ্রজ সংগীতবিশারদ রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট থেকে ইনি শিক্ষা করেন শোরী-কৃত টপ্পা ও ঠুংরী। শুনলে অবাক হতে হয় যে ধ্রুপদ খেয়াল প্রভৃতি প্রায় পাঁচহাজার গান ইনি বিশেষ করে আয়ত্ত করেন। ইনি হিন্দী ও বাঙলা ভাষায় বহু ধ্রুপদ, খেয়াল ও বাংলা গান রচনা করেছেন। বর্ধমান-মহারাজার রাজসভায় গোপেশ্বর সংগীতাচার্যের পদ অলঙ্কৃত করেন প্রায় ২৯ বৎসর ধ'রে এবং কোলকাতার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সংগীত প্রতিষ্ঠান 'সংগীত সঙ্ঘের' অধ্যক্ষ ছিলেন বহুদিন যাবৎ। নিষ্ঠাবান সংগীত-সাধক গোপেশ্বর প্রকৃত সংগীতের প্রচার ও প্রসারকল্পে যেভাবে চেষ্টা ক'রেছেন এবং আজও এই বৃদ্ধ বয়সে যতটুকু ক'রছেন তার জন্য বাঙালী তথা ভারতবাসী মাত্রেই তাঁর কাছে ঋণী। ১৩১৬ সালে তাঁর রচিত "সংগীত চন্দ্রিকা" ১ম ভাগ ও ১৩২১ সালে উক্ত গ্রন্থের ২য় ভাগ প্রকাশিত হয়। সংগীতের এই দুই বৃহৎ পুস্তকে প্রমাণিত হয় সংগীত শাস্ত্রে গোপেশ্বরের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের এবং তিনি লাভ করেন 'সংগীত-নায়ক' উপাধি। বিশ্বভারতী থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গোপেশ্বরকে "স্বর-সরস্বতী' উপাধিতে ভূষিত করেন। গোপেশ্বর 'আনন্দ সংগীত পত্রিকা', 'সংগীত প্রকাশিকা', 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় বহু গানের স্বরলিপি ও প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থ তানমালা, গীতমালা, সংগীত লহরী, গীত প্রবেশিকা প্রভৃতি সমগ্র ভারতে বিশেষভাবে আদৃত হ'য়েছে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনে গোপেশ্বরবাবু গিয়েছিলেন বাংলার প্রতিনিধি হিসাবে। প্রথমদিন মণ্ডপের প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হবার সময় বিখ্যাত ওস্তাদ পরম উদারচিত্ত আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব গোপেশ্বরবাবুকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে ছুটে

এসে সশ্রদ্ধ নমস্কার ক'রে বল্লেন, আপনি আমার গ্রন্থ-গুরু। আপনার 'সংগীতচন্দ্রিকা' গ্রন্থ আমার ধ্রুপদশিক্ষায় পরম উপকার সাধন করেছে।

বিশ-পঁচিশ বছর পূর্বেও আমাদের দেশের মেয়েদের উচ্চাঙ্গ সংগীত কেউ শেখাতেন না। কিন্তু গোপেশ্বর-বাবু কোলকাতায় এসে সে আবহাওয়ার পরিবর্তন ক'রেছেন। আজ বাঙলার ঘরে ঘরে বহু মেয়ে উচ্চাঙ্গ সংগীত সাধনায় মগ্ন।

বিষ্ণুপুরের অধিপতি দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ মহাশয়ের আন্তরিক সাহায্যে ও তানসেন-বংশীয় সংগীতজ্ঞ বাহাদুর সেনের আপ্রাণ চেষ্টায় খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুরে উচ্চাংগ সংগীতের প্রসার বিশেষভাবে বিস্তৃতি লাভ করে। সেই ভারতীয় বিশুদ্ধ উচ্চাংগ সংগীতের প্রভাব আজও সমগ্র ভারতে বাঙলার গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ভারতীয় বিশুদ্ধ সংগীতের ধারক ও বাহক বিষ্ণুপুর তাই আজও ভারতের অন্যতম সংগীত-তীর্থক্ষেত্র—সংগীত-শিক্ষা-মন্দির। বর্তমানযুগে সেই মন্দিরের একনিষ্ঠ সংগীত সাধক, প্রধান পুরোহিত সংগীতাচার্য শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

গোপেশ্বরবাবুর এমন একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এমন একটা সারল্য আছে যা শুনলে সত্যিই অবাক হ'তে হয়—শ্রদ্ধায় মাথা নত হ'য়ে আসে অজ্ঞাতসারে। তাঁরই কথা প্রসংগে সেদিন তাঁর উপযুক্ত সংগীতজ্ঞ ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রদ্ধেয় সত্যকিঙ্করবাবু ব'লছিলেন—যখন ক'লকাতায় বাস করেছিলেন গোপেশ্বরবাবু—সুকিয়া ষ্ট্রীট অঞ্চলে, তখন একদিন ভবানীপুর থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক এসে তাঁকে বিশেষ অনুরোধ করলেন তার পরদিন তাঁদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত গানের আসরে গান গাইবার জন্য। সম্মত হ'লেন গোপেশ্বরবাবু। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ের একঘণ্টা পূর্ব থেকেই সংগীতাচার্য প্রস্তুত হয়ে আছেন যাবার জন্ত। সত্যবাবুও নিমন্ত্রিত হয়ে তাঁর সংগে যাবেন। কিন্তু আশ্চর্য, সংগীত আসরের উদ্যোক্তাদের কথামত তো নির্দিষ্ট সময়ে মোটর এসে উপস্থিত হ'লনা নিয়ে যাবার জন্ত। অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে গোপেশ্বর-বাবু তাঁর ভাইপোকে ব'ললেন—আর মাত্র আধঘণ্টা বাকী আছে গান আরম্ভ হবার। কর্তৃপক্ষ বোধহয় বিশেষ কোন কারণে ব্যস্ত থাকায় গাড়ী পাঠাতে পার-ছেন না। চল আমরাই একটা ট্যাক্সী ডেকে চ'লে যাই। উপস্থিত শ্রোতারা সব অপেক্ষা ক'রে থাকবেন; এটা কি ভাল?' এই ব'লেই তিনি নিজে ট্যাক্সী ক'রে ভাইপোকে সাথে নিয়ে ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হলেন ভবানীপুরে—গানের আসরে। বলা বাহুল্য কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময়ে গাড়ী পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু পথে যান্ত্রিক গণ্ডগোলের জন্যে গাড়ী পৌছাতে দেরী হ'য়েছিল।

এই সামান্য একটা ঘটনার ভেতর দিয়ে জনসাধারণ বুঝতে পারেন যে সংগীতাচার্য গোপেশ্বরবাবু কতখানি সরল, কত নিরহঙ্কার এবং কি পরিমাণে কর্তব্য ও সময়ানু-বর্তিতা মেনে চলেন।

আর একদিনের একটা ঘটনা। কোলকাতায় কোন বাড়ীতে 'বৌভাত' উপলক্ষে বাড়ীর ছেলেরা ঐ রাত্রে একটু গান-বাজনার ব্যবস্থা ক'রেছে। নিমন্ত্রিত বহুলোক উপস্থিত হবেন। তাঁরা নিশ্চয়ই তৃপ্তি লাভ ক'রবেন কিছু-ক্ষণ গোপেশ্বরবাবুর গান শুনে। নির্দিষ্ট সময়ে গোপেশ্বর-বাবু সত্যকিঙ্করবাবুকে নিয়ে উপস্থিত হ'লেন। গান আরম্ভ করলেন তিনি। কিন্তু এ কী? শ্রোতা যে বাড়ীর দু একজন মাত্র লোক। প্রায় সমস্ত লোকজন খাবার জন্যেই ব্যস্ত। গান শুনবার চেয়ে নিমন্ত্রণ খাবার দিকেই লক্ষ্য তাঁদের বেশী। সংগীতের তান থেকে আহারের বিবিধ উপাদানের আকর্ষণ যে তাঁদের কাছে বড় হয়ে উঠেছে। সাধক গোপেশ্বর কিন্তু গান গেয়ে চলেছেন একমনে। সত্যকিঙ্করবাবু বাধা দিয়ে ব'ললেন—কি হবে এখানে গান গেয়ে! সবাই নিমন্ত্রণ খাবার জন্যে ব্যস্ত।

মৃদু হেসে সাধক উত্তর দিলেন—কেউ নাইবা শুনুক, আমার তো সাধা হ'চ্ছে। বাসায় থাকলেও সাধতাম, এখানেও সাধছি।

সংগীতের প্রতি কি গভীর অনুরাগ! সুরব্রহ্মের এক-নিষ্ঠ পূজারী গোপেশ্বর সংগীতকে যে কিভাবে ভালবেসে-ছেন তা ভাবলেও বিস্মিত হ'তে হয়।

ইং ১৯৪৩ সালে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে সাধক আত্মনিয়োগ করেন তাঁর জন্মস্থান বিষ্ণুপুরের গৌরবময় সংগীত ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারকল্পে। বিষ্ণুপুর 'রামশরণ সংগীত মহাবিদ্যালয়' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। অবসর গ্রহণের পর তিনি প্রণয়ন করেন ভারতীয়

সংগীতের ইতিহাস। তিনি নিখিল ভারত বেতার কেন্দ্রের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী। ১৯৫৪ সালে তিনি দিল্লী বেতার রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে যে গান করেন সে অপূর্ব গান আজও দেশবাসীর কানে যেন অনুরণিত হচ্ছে। গোপেশ্বরবাবু দিল্লী সংগীত-নাটক আকাদমীর একজন সম্মানিত সভ্য। ১৯৫৫ সালে বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেস কর্তৃক তিনি সম্মানিত হন এবং ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবংগ প্রাদেশিক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা সপ্তাহ উপলক্ষে এই সংগীত-সাধককে জানানো হয় সম্বর্ধনা। ১৯৫৬ সালে গোপেশ্বরবাবু শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চাংগ সংগীতের সম্মানিত অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

বাঙলা ১৩৫৩ সালের ৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে কোলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে দেশ-পূজ্য এই সিদ্ধ সুর-সাধকের জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয় বিরাট সমারোহে। অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট সংগীত-শিল্পী, রাজা-মহারাজা, চিত্রশিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক প্রভৃতি দেশবরেণ্য ব্যক্তি উপস্থিত থেকে গোপেশ্বরবাবুকে জ্ঞাপন করেন তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি, প্রদান করেন মানপত্র।

১৯৫৫ সালে বেতার প্রতিষ্ঠান বাঙলার বিষ্ণুপুরের মহৎ কীর্তি স্মরণ করার উদ্দেশ্যে সেখানে অনুষ্ঠান করেন বেতার সংগীত সম্মেলন এবং সংগীত-নায়ক গোপেশ্বরের সংগীত দ্বারা উদ্বোধিত হয় উক্ত সম্মেলন। আজ পর্যন্ত ভারতের কোন প্রদেশ এরূপ সম্মানে সম্মানিত হয়নি।

গোপেশ্বরবাবুর বর্তমান বয়স ৮১ বৎসর। এই বৃদ্ধ বয়সেও অন্ত নেই তাঁর উৎসাহের, বিচ্ছেদ নেই তাঁর সংগীত-সাধনার। এখনও তিনি মগ্ন সংগীত-গবেষণায়। এখনও তাঁর বিষ্ণুপুর-ভবনে দেশ-বিদেশ থেকে আসেন অগণিত সংগীতানুরাগী ও সংগীত-শিল্পী এই সাধকের দর্শন ও উপদেশ লাভের জন্য।

বহু রাগের মধ্যে ভৈরব, ছায়ানট, দরবারী-কানাড়া, আড়ানা, আশাবরী প্রভৃতি রাগগুলি গোপেশ্বরবাবুর অতি প্রিয় এবং বহু বাঙলা গানের মধ্যে 'বিফল জনম; বিফল জীবন', 'হৃদয় রাসমন্দিরে', প্রভৃতি গানগুলি তিনি প্রায়ই গেয়ে থাকেন।

সাধক গোপেশ্বর মনেপ্রাণে বুঝেছেন সুরব্রহ্ম ও পরমব্রহ্ম একই বস্তু। তাই বৃদ্ধবয়সেও এই আত্মভোলা সাধক সুর-ব্রহ্মের সাধনায় একান্ত মগ্ন। আজ এই বয়সেও সংগীতকে যে তিনি কি পরিমাণে ভালবাসেন তার একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। দুপুরবেলা। আসন পেতে ভাত বেড়ে দেওয়া হয়েছে বৃদ্ধ সাধককে। তিনি খেতে যাবেন ঠিক এমনি সময়ে কয়েকজন ভদ্রলোক এলেন তাঁর বাড়ীতে দূর থেকে। সাধক ভুলে গেলেন নিজের আহারের কথা। সম্মানিত আগন্তুকদের যথোচিত অভ্যর্থনা ক'রতে, তাঁদের খাবারের ব্যবস্থা ক'রতে তিনি ব্যস্ত। তাঁরা তখন কিছু খেয়ে-দেয়ে অনুরোধ ক'রলেন সাধককে—তাঁর গান শোনাতে। নিজের খাবারের কথা ভুলে গিয়ে বিপুল আগ্রহে তানপুরাটি নিয়ে তিনি আরম্ভ ক'রলেন গান গাইতে। শুধু সংগীত সাধক হিসাবে নয়, প্রকৃত মানুষ হিসাবেও গোপেশ্বরবাবুর স্থান অতি উচ্চে।

বর্তমান ভারতে গোপেশ্বরবাবু যে একজন শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী, একথা বলাই বাহুল্য। তদুপরি তিনি সংগীতভাণ্ডারের কুবের-সদৃশ।

আমরা কামনা করি, বাঙলা তথা সমগ্র ভারতের গৌরব, সর্বজনবরেণ্য, সুরব্রহ্মের নিষ্ঠাবান পূজারী, সংগীত-নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় আরও সুদীর্ঘ ও শান্তিময় জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে তাঁর অপূর্ব সংগীত-সাধনার অভিজ্ঞতালব্ধ অমূল্য সংগীতের বস্তুসমূহ দেশবাসীকে বিতরণ ক'রতে থাকুন।

মুর্শিদাবাদ সীমান্ত সমস্যা—

মুর্শিদাবাদ জেলায় লালগোলার নিকটস্থ চর ও পদ্মা মধ্যস্থ জলাজমির একটা বড় অংশ গত নেহরু-নুন চুক্তি অনুসারে ভারতরাষ্ট্র হইতে পূর্বপাকিস্তানকে দান করার ফলে ঐ অঞ্চলের ১৬ হাজার অধিবাসী আবার উদ্বাস্তু অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। নানাস্থানের মৎস্যজীবী ও কৃষিজীবীর দল ঐ স্থানগুলিতে নূতন বাসস্থান নির্মাণ করিয়া গত ১০।১২ বৎসর বাস করিতেছিল। তাহাদের পক্ষে এখন পাকিস্তানে বাস করা অসম্ভব হইবে বলিয়া তাহারা ক্রমে ক্রমে ঘরবাড়ী ও জমীজমা ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হইতেছে। পাকিস্তানে তাহাদের উৎপন্ন মৎস্য বা শাকশব্জী কিনিবার লোক নাই। ভুল মানচিত্র দেখাইয়া নাকি শ্রীনেহেরুকে ঐ অঞ্চল পাকিস্তানকে দিতে বাধ্য করা হইয়াছে। প্রকাশ কোন সরকারী কর্মচারী ভারতরাষ্ট্রে থাকিয়াও পাকিস্তানকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতেছে। এ বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে ভারতরাষ্ট্রকে রক্ষা করা কিভাবে সম্ভব হইবে, সাধারণ লোকে তাহা বুঝিতে পারে না।

সীমান্ত আক্রমণ সমস্যা—

পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম সীমান্তে পূর্বপাকিস্তানের সৈন্যগণ ও সাধারণ মানুষগণ সর্বদা ভারতরাষ্ট্রের অধিবাসীদের উপর গুলীবর্ষণ করিতেছে, প্রায়ই ভারত রাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়া জিনিষপত্র চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে, অনেক সময় ভারতরাষ্ট্রের জমী জবর দখল করিয়া বসিয়া থাকিতেছে—প্রতি-আক্রমণ করিলে তাহারা পলাইয়া যায়। এ বিষয়ে গত ২৩ ফেব্রুয়ারী নয়াদিল্লীতে লোকসভায় আলোচনা হইয়াছিল—তথায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু জানাইয়াছেন যে এ সকল বিষয়ে তিনি আপোষ রক্ষার ব্যবস্থায় মনোযোগী আছেন। কিন্তু তাহার পরও বহু স্থানে পাকিস্তানী সৈন্যগণ কর্তৃক গুলীবর্ষণ ও লুটতরাজের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কতদিন এই অবস্থা থাকিবে বলা যায় না। গত ১০ বৎসর ধরিয়া এইরূপ অত্যাচার চলা সত্ত্বেও ভারতরাষ্ট্রের কর্তারা ইহা বন্ধ করিতে সমর্থ হন নাই। পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে এইরূপ গোলমাল লাগিয়াই আছে।

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল—

এ বৎসর 'ভারতীয় অপরাধ বিজ্ঞানের মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক দিক' সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার জন্য শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ক্রিমিনোলজিতে ডক্টর উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে কোনো ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ক্রিমিনোলজিতে অন্য কেহ ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন নাই। ডক্টর ঘোষালের গবেষণার

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল

বিষয় বস্তুটি সম্পূর্ণ নূতন এবং এই দিকটি পূর্বে কেহ আলোকপাত করেন নাই। এই গবেষণার জন্য তিনি বিদেশী যন্ত্রপাতির সহিত স্বনির্মিত কয়েকটি যন্ত্রপাতিরও সাহায্য গ্রহণ করেন।

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল একজন বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক রূপে ইতিমধ্যেই খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার রচিত হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞান ও অন্যান্য পুস্তক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। কয়েকটি গোয়েন্দা কাহিনী রচনা করিয়াও পঞ্চাননবাবু বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। ইনি পোলাণ্ডের ওয়ারসা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের অধ্যাপক ডক্টর হিরণ্ময় ঘোষালের ভ্রাতা। পঞ্চাননবাবু বর্তমান কলিকাতা পুলিসের একজন ডেপুটী

কমিশনার। সর্বসাধারণের নিকট ইনি একজন সৎ ও দক্ষ রাজপুরুষরূপে পরিচিত। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে ঘোষাল বংশের দৌহিত্র সেই প্রাচীন ঘোষাল বংশেরই সুসন্তান ইনি। ইঁহার পিতামহ রায় কমলাপতি ঘোষাল বাহাদুর ছিলেন বঙ্কিমবাবুর মাসতুতো ভাই এবং ইংরাজী শিক্ষায় তাঁহার প্রথম শিক্ষক। ইহা বঙ্কিমবাবুর জীবনী হইতেই জানা যায়। ডক্টর ঘোষাল মাদ্রাজের পুরাতন জমিদার বংশের সন্তান। ওখানকার বহু জনহিতকর কার্যের সহিত অতীত হইতে অদ্যাবধি ইঁহারা জড়িত। এদানীং ডাঃ ঘোষাল তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির বহু মূল্যবান অংশ প্রজাদের ও গ্রামবাসীদের সুখ সুবিধার জন্য দান করিয়াছেন। 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক স্বয়ং এইরূপ কয়েকটি স্থান দর্শন করিয়া অন্যান্য দর্শকদের ন্যায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। এইরূপ স্বার্থত্যাগী বিদ্যানুরাগী, জ্ঞানী পুলিসের সংখ্যা যতো অধিক হয় ততই মঙ্গল। আমরা ডক্টর ঘোষালের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

আজাদ স্মৃতি বক্তৃতা—

গত ২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী নয়াদিল্লীতে বিজ্ঞান ভবনে আজাদ স্মৃতি বক্তৃতামালার ২টি বক্তৃতা হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু 'বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত ভারত' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বলেন—প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থনীতিক ও সামাজিক আদর্শবাদীগণকে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হইতে হইবে। পুঁজিবাদী বা সাম্যবাদী দুনিয়ার সমালোচনা করা সহজ—উভয় ক্ষেত্রেই যেমন ত্রুটি রহিয়াছে, সেরূপ গুণাবলীও রহিয়াছে। অন্তর্দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও উভয়ের লক্ষ্য এক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা ব্যতীত ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতির কোন পথ নাই—কিন্তু অতীতকে যদি আমরা উপেক্ষা করি কিম্বা ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে এই ভবিষ্যৎ উন্নতির কোন মূল্য থাকিবে না। শ্রীনেহরুর এই দুইদিনের বক্তৃতা মৌখিক ছিল না—তিনি লিখিত ভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। মৌলনা আবুল কালাম আজাদের মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে এই বক্তৃতা প্রদত্ত হয় ও ইহা শীঘ্রই পুস্তকাগারে প্রকাশিত হইবে। শ্রীনেহরু ইহাতে ভবিষ্যৎ ভারতের রূপ সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

অধ্যাপক ডক্টর মাখনলাল রায়চৌধুরী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐশ্লামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর মাখনলাল রায়চৌধুরী সম্প্রতি কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বক্তৃতা দানের জন্য আমন্ত্রিত হইয়া কাবুল রওনা হইয়া গিয়াছেন। তিনি তেহরাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি হিসাবে ইরাণে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা করিবেন। অতঃপর তিনি ইস্পাহান, সিরাজ, গজনী, ঘোর, কান্দাহার প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিবেন। ডাঃ রায়চৌধুরী কিছুকাল মিশরের রয়াল ইউনিভারসিটিতে প্রাচ্য সংস্কৃতির অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আরবী ভাষায় গীতার অনুবাদ করিয়া

ডক্টর মাখনলাল রায়চৌধুরী

বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। আমরা ডক্টর রায়চৌধুরীর দীর্ঘজীবন ও আরো উন্নতি কামনা করি।

পঁচিশ

প্রায় দু মিনিট একটানা চিৎকার করল ইন্দ্রজিৎ। তারপর হঠাৎ থেমে গেল। উত্তেজনার একটা অন্ধ উন্মত্ত উচ্ছ্বাসকে মুক্তি দিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করল সে। আর চিৎকারটা থামবার পর সমস্ত বাড়ীটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল অদ্ভুতভাবে। একটা পিন পড়ে গেলেও তার আওয়াজ পাওয়া যাবে এমনি স্তব্ধতা।

প্রীতির লাল টকটকে মুখখানা ছাইয়ের মতো বিবর্ণ। সত্যজিতের সামনে ফেলে রাখা প্রুফটার ওপর লম্বালম্বি একটা মোটা আঁচড় পড়েছে—হাতের কলমটা চমকে চলে গেছে তার ওপর দিয়ে। সমস্ত বাড়ীতে এখনো চিৎকারটার নিঃশব্দ অনুরণন চলছে—মুখার্জি ভিলার ফাটলধরা মৃত্যু রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিউরে শিউরে উঠছে অভিশাপের মতো।

সত্যজিৎ-ই সহজ হল আগে।

—রীতেনকে বিয়ে করতে চাস?

প্রীতি বসে পড়েছিল সামনের চেয়ারটায়। দু হাতে মুখ ঢেকে। লজ্জায় নয়—ভয়ে। ঘরের আলোটা কোণায় কোণায় একরাশ অর্থহীন বিকৃত ছায়া রচনা করেছে—হঠাৎ সত্যজিতের মনে হল একদল অশরীরী যেন এখানে ওখানে গুঁড়ি মেরে বসে আছে—কী যেন একটা ভয়ঙ্কর সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছে তারা।

প্রীতি চোখ তুলল। রক্তাভ উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।

—তা ছাড়া আমার উপায় নেই ছোড়দা।

একটু সময় নিল সত্যজিৎ। সিগার কেস্ খুলে একটা চুরুট বের করল, ধরিয়ে নিল ধীরে সুস্থে।

—রীতেনকে তুই সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছিস?

শাড়ীর আঁচল দিয়ে প্রীতি মুখটা মুছে নিল একবার।

—আমার মনে হয়, ভুল বুঝিনি।

—কিন্তু বাইরে থেকে যতটুকু ওকে দেখা যায়—

—সেটুকু ওর খেয়ালীপনা ছোড়দা। কিন্তু মনের দিক থেকে ও যে কী ছেলেমানুষ, কত অসহায় সে অন্তত আমি জানি।

সত্যজিৎ চুপ করে রইল। মুহূর্তের জন্য একটা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ভেসে গেল ভাবনার ওপর দিয়ে। পুরুষের ভালবাসা শুরু হয় নেশা দিয়ে—মেয়েদের ক্ষেত্রেও কি তাই? বাৎসল্য যেখানে স্বাচ্ছন্দ্য পায়—মেয়েদের ভালোবাসা সেখানে উৎসারিত হয় তত সহজে। তাই রীতেনের সমস্ত পাগলামোর ওপরে বনশ্রীর এমন অবাধ প্রশ্রয়; তাই যেগুলো রীতেন সম্পর্কে মানুষকে বিরূপ করে তোলে—সেইগুলোই প্রীতিকে বেশী করে আকর্ষণ করেছে। রীতেনের চরিত্রের উদ্দামতাই প্রীতির মনে মোহটাকে তীব্র করে তুলেছে—এই খামখেয়ালী অসংলগ্ন দায়িত্বহীন লোকটাকে নিয়ন্ত্রণ করবার একটা স্বাভাবিক প্রেরণা পেয়ে বসেছে তাকে।

—কী ভাবছ ছোড়দা?

—ভাবছি তুই নিজের মতো করে ওকে দেখছিস—ঠিক ওকে দেখতে পাচ্ছিস না।

—সকলেই নিজের মতো করেই অন্যকে দেখে ছোড়দা। ঠিক অন্যকে কেউ কি কোনদিন দেখতে পায়?

সত্যজিৎ চকিত হল। এ-কথা বীথির মুখে মানাত—কিন্তু প্রীতির কাছ থেকে সে আশা করেনি। নিজের চোখ দিয়েই তো সবাই দেখে। সে-ও পূরবীকে অমনি করেই দেখতে চেয়েছিল। পূরবীর আলাদা মনটার কথা ভাবেও নি কোনদিন। তার দাম তাকে দিতে হয়েছে। আজ যদি প্রীতি ভুল করে—যদি দুঃখও পায়, তা হলেই বা সে বাধা দেবার কে? সে-ও তো রীতেনকে সত্যি করে দেখতে পাচ্ছেনা—তার মন, তার চিন্তা দিয়েই বিচার করছে।

আর কে বলতে পারে, আমি আর একজনকে সম্পূর্ণ করে চিনতে পেরেছি? সংসারে যারা সব চাইতে নিকট, সেই স্বামী-স্ত্রীই কি দশ বছর ঘর করবার পরে এমন দাবী করতে পারে যে তাদের পরস্পরের পরিচয় একেবারে সম্পূর্ণ করে জানা হয়ে গেছে, সেখানে কোনো

আড়াল আর নেই, কোনো বিস্ময় আর লুকিয়ে নেই কোথাও ?

দার্শনিক বলে, দর্শন হল এমন একখানা গ্রন্থ—যার প্রথম পাতা ছিঁড়ে হারিয়ে গেছে—শেষ পাতা এখনো লেখাই হয়নি। মানুষও তো ঠিক তাই। ছেলেবেলায় কবে কোনখানে তার জীবনের পাণ্ডুলিপি লেখা শুরু হয়েছিল সে জানে না ; তার চেতনার দিকটাতে পিঠ ফিরিয়ে বসে তারই আর এক সত্তা লিখে চলেছে এক গোপন উপন্যাস—মধ্যে মধ্যে ঝোড়ো হাওয়ায় এক-আধটা পাতা উড়ে এলে সেইটুকুর মধ্যেই সে পায় তার নিভৃত আত্মকাহিনীর সংবাদ ; আর তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে—"The sealed envelope goes to the fireplace !"

সেই নিভৃত নির্জন গ্রন্থটি পড়বার ক্ষীণ চেষ্টার নাম মনোবিজ্ঞান। একটা পেন্সিল টর্চ ধরে অন্ধকারে এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার পাঠোদ্ধারের মতো। কেউ কাউকে জানেনা। জানবার জন্যে মিথ্যা চেষ্টা করেই বা কী লাভ ?

—কী করব ছোড়দা ?

—যা ভালো বোঝো তাই করো।—সত্যজিৎ মৃদু নিঃশ্বাস ফেলল।

—কিন্তু বাবা।

সত্যজিৎ হাসল।

—এ কথা কেন জিজ্ঞেসা করছিস ? বামুনের মেয়ে হয়ে কায়েতের ছেলেকে বিয়ে করবি—আর ভেবেছিস বাবা দু-হাত তুলে তোকে আশীর্বাদ করবেন ? তার ওপর—সত্যজিৎ একটু হাসল : কিছু মনে করিসনি, বাবা নিশ্চয় দু-চারবার রীতেনকে দেখে থাকবেন। আর সে ক্ষেত্রেও—

বিমর্ষমুখে প্রীতি বললে, ও বলেছে দাড়িটা ও কামিয়েই ফেলবে।

এবার সশব্দে হেসে উঠল সত্যজিৎ। এক ঝলক বসন্তের হাওয়ায় যেন অনেকক্ষণের একটা গুমোট কেটে গেল।

—এটা বুঝি তোর ফার্স্ট সাক্‌সেস্ ? তা আরম্ভ হিসেবে নেহাৎ মন্দ নয়। এরপর যদি ওর গায়ের বিশ্রী শার্টটা আর ইয়াংকি ইংরেজি ছাড়াতে পারিস, তা হ'লে ভদ্র সমাজে একেবারে অচল হবে না।

প্রীতির পীড়িত মুখেও একটুকরো হাসি দেখা দিল।

—বলেছে, একটা মোটরকার কোম্পানিতে চাকরী পাওয়ার কথাও হচ্ছে।

—গুড্—ভেরি গুড্।—সত্যজিৎ সশব্দে প্রীতির পিঠ চাপড়ে দিলে : তুই তো দেখছি এর মধ্যে রীতেনকে একেবারে মানুষ করে ফেলেছিস। নাঃ—এরপর বিয়েটা তোদের আর ঠেকানো গেল না।

—কিন্তু—

চুরুটটা নিবে গিয়েছিল। আর একবার সেটায় আগুন ধরিয়ে নিয়ে সত্যজিৎ বললে, ও 'কিন্তুর' উত্তর দিতে পারব না। বিয়েটা এ বাড়ীতে হওয়ার আশা ছেড়ে দাও—ওটা সেরে এসো রেজিস্ট্রী অফিসে। এবং আর যাই করো, বিয়ের পরে জোড় বেঁধে বাবার কাছে অন্তত আশীর্বাদ চাইতে যেয়ো না। তার ফল কী হবে তুমি জানো।

প্রীতি হঠাৎ কেঁদে ফেলল।

—বাবা আমার গান শুনতে বড় ভালোবাসেন ছোড়দা।

—সেই গান শোনাবার জন্যে নিজেকে তুমি বলি দিতে পারো না।

প্রীতি কেঁদে চলল। সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল না সত্যজিৎ। এ সমস্যার কোনো সমাধান তার জানা নেই।

—বাবা কি কিছুতেই একে মেনে নিতে পারেন না ছোড়দা ?

—না। শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়কে অন্তত সে ভুল করবার কারণ নেই।

—কিন্তু বাবা খুব কষ্ট পাবেন ছোড়দা। হয়তো—

হয়তো। তার অর্থ সত্যজিৎও ভালোই বোঝে। বীথি হলে শিবশঙ্কর বলতেন—'বেরিয়ে যাক বাড়ী থেকে, ও আমার কেউ নয়। আমি ওর আর মুখদর্শনও করব না কোনোদিন।' কিন্তু প্রীতির সম্বন্ধে ও-কথা বলতে পারবেন তিনি ? হুইস্কির গ্লাস যখন বিস্বাদ হয়ে যাবে, নিজের শূন্যরিক্ত অবসাদের ভেতর ভেনাস আর অ্যাডো-নিসের কুৎসিত ছবিটা নিজের কাছেই যখন আরো কুৎসিত হয়ে উঠবে, তখন প্রীতির কীর্তন তাঁর একমাত্র অবলম্বন, ক্ষত-বিক্ষত ক্লান্ত চেতনার একটুখানি ছায়াছত্র। সে আশ্রয় সরে গেলে কোথায় দাঁড়াবেন তিনি—কী নিয়ে বেঁচে থাকবেন ?

—কেঁদে লাভ নেই প্রীতি। যা ঘটবে তাকে ঘটতে দেওয়াই ভালো। তুই তৈরি হয়ে নে। যদি দরকার পড়ে আমাকে জানাস—আমি সাধ্যমতো সাহায্য করব।

প্রীতি উঠে দাঁড়ালো। কান্নায় কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মুখার্জি ভিলায় এই-ই শেষ কান্না—সত্যজিৎ ভাবল। এই-ই মমতার শেষ উচ্ছ্বাস—হৃদয়ের শেষ ব্যাকুলতা। এ-সব দুর্বলতার সীমা পার হয়ে গেছে বীথি—নতুন সূর্যের আলো পড়েছে তার চোখে। ইন্দ্রজিৎ প্রতি মুহূর্তে এখানে ছড়িয়ে দিচ্ছে অভিশাপ—কোনদিন নিজের গলায় ছুরি বসিয়ে কিংবা যাকে হোক খুন করে সে সব কিছুর ওপর

যবনিকা টেনে দেবে। শিবশঙ্কর তাঁর ফাইন্যাল ষ্ট্রোকের জন্য অপেক্ষা করে আছেন। আর ত্রিশঙ্কু সত্যজিতের পক্ষে ঘরে বাইরে সবই সমান। কেবল এ-বাড়ীর অন্তিম লগ্নে তিনটি জিনিসের পরিণামই সত্যজিৎ ভাবতে পারে না—এক রঘু, দুই আস্তাবলের বুড়ো ওয়েলার ঘোড়া আর তিন নম্বর কালপুরুষের মতো ওই মার্কারি ক্রকটা।

প্রীতির কান্না এখনো দুকান ভরে বাজছে তার। মুখার্জি ভিলায় মমতার শেষ উচ্ছ্বাস।

স্কুল থেকে প্রায় ছ'টার সময় ফিরল বনশ্রী। চারটে পর্যন্ত স্কুলের খাটুনি—তারপর এক ঘণ্টা কাটল সেক্রেটারির সঙ্গে বকবক করে। এতক্ষণ ধরে প্রাণপণে বোঝাতে হল আর একজন টীচার নইলে স্কুল কিছুতেই চালানো যাচ্ছে না। তিন মাসের জন্যে একস্ট্রা টেম্পোরারি একজন লোকও দরকার—মিনতি তার মেটার্নিটি লিভ এক্সটেণ্ড করতে চেয়েছে।

মিনতি সম্বন্ধে একটা কী মন্তব্য করতে গিয়েও সেক্রেটারি সামলে নিলেন। চকিতের জন্যে রাঙা হয়ে উঠেছিল বনশ্রীর মুখ। মিনতি অসহায় নিরুপায় জেনেও তার মনের ভিতরটা জ্বালা করছিল। এত দারিদ্র্য—এই স্বাস্থ্য! আর বছর বছর মা হওয়ার ব্যাপারে তার বিরাম নেই। কী খাওয়াবে তার ছেলেমেয়েদের—কেমন করে মানুষ করবে?

ক্রিমিন্যালিটি! শিওর ক্রিমিন্যালিটি!

বিতৃষ্ণ, বিরক্ত মন নিয়ে ক্লান্ত বনশ্রী এসে নিজের ঘরের ইজিচেয়ারে বসে পড়ল। বাবা বেড়াতে বেরিয়ে গেছেন যথানিয়মে। রীতেন এখনো বাড়ী থেকে বেরুতে পারে না—ঘরে বসে রেডিয়ো খুলে বিলিতী গান শুনছে। রক্-এন্-রোলের মতো খানিক দুঃশ্রাব্য গান ছড়িয়ে পড়েছে সারা বাড়ীতে। বনশ্রী ভ্রূকুটি করল।

পাশের ছোট টেবিলের উপর চোখ পড়ল। একখানা চিঠি রয়েছে তার নামে। অচেনা হাতের লেখা এনভেলপ।

চিঠিটা ছিঁড়ে কয়েক লাইন পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বনশ্রী সোজা হয়ে উঠে বসল। প্রকাণ্ড হাতুড়ি দিয়ে কে যেন একটা ঘা বসিয়ে দিয়েছে তার হৃৎপিণ্ডের ওপর।

মিনতি মারা গেছে। একটি মৃত সন্তানকে জন্ম দিয়ে পরশু হাসপাতালে তার জীবনের দায় মিটিয়ে দিয়েছে। তাকে নিয়ে স্কুলের কোনো অসুবিধাই আর রইল না।

পাথর হয়ে রইল বনশ্রী—ধীরে ধীরে চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলল। মনে পড়ল সেদিনের কথা—যেদিন লজ্জা আর অপরাধের ভারে ম্লান হয়ে তার কাছে ছুটি চাইতে এসেছিল মিনতি। শীর্ণ রক্তহীন শরীর—বকের মতো শুকনো পা, অন্ধকার দুটো চোখের কোনে তার জল ছলছল করছিল। আর বনশ্রী রুক্ষ গলায় বলেছিল—

দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট চেপে ধরল বনশ্রী। সেদিনের সেই নিষ্ঠুরতার স্মৃতি তার বুকটাকে পিষে দিতে লাগল। সে মা হয়নি—মা-র দুঃখ, মা-র বেদনা বোঝবার শক্তিও তার নেই। তবু আরো একটু সহানুভূতি নিয়ে সে মিনতিকে বোঝবার চেষ্টা করতে পারত—অত অফিসিয়্যাল, অতখানি কর্কশ না হলেও তার কোনো ক্ষতি ছিল না।

আর ছুটি চাইতে আসবে না মিনতি। তার মেটার্নিটি লিভ্ নিয়ে আর কোনো সমস্যা দেখা দেবে না স্কুলে।

চিটি লিখে জানিয়েছে মিনতির স্বামী। বলতে গেলে স্ত্রীকে হত্যাই করেছে লোকটা। কিন্তু আইন তাকে ছুঁতে পারবে না—কোনো বিচারও হবেনা তার। বনশ্রী জানে, সাতদিন পরেই মিনতির যৎসামান্য প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকার তাগিদ দিয়ে এই লোকটাই আবার আফিসিয়্যাল চিঠি লিখবে। তারপর বছর ঘুরতে না ঘুরতে আবার বিয়ে করবে স্বচ্ছন্দে, নির্বিকার চিত্তে। কলকাতার হোটেলে কোনোদিন হয়তো ফাউল কারীর মুর্গীতে টান পড়তে পারে—কিন্তু স্ত্রীর অভাব বাংলা দেশে অন্তত কখনো ঘটবে না।

বনশ্রী নিথর হয়ে বসে রইল। গলে পড়তে লাগল চোখের জল।

কতক্ষণ সে জানেনা। টেবিলের ওপর চা আর খাবার যে কখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে—তাও তার খেয়াল ছিল না। হঠাৎ হীরুর গলার আওয়াজে সে জেগে উঠল।

হীরু বললে, দিদিমণি, সত্যজিৎ বাবু দেখা করতে এসেছেন।

—ক্রমশঃ

গ্রহ জগৎ

কর্ম্মভাব

উপাধ্যায়

কর্ম্মভাব দ্বাদশভাবের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ভাবে যে সব গ্রহ থাকে তারা বিশিষ্ট ফল দিয়ে থাকে। অন্যান্য ফল অপেক্ষা মানুষকে কর্ম্মফলই আগে ভোগ করতে হয়—'তথাপি সংসার সমুদ্র মধ্যে ভুঙক্তে নরঃ কর্ম্মফলানি চৈব। 'কর্ম্মস্থানে কোন গ্রহ না থাকলে বা তার দৃষ্টি না থাকলে মানুষ দারিদ্র্য-কষ্ট ভোগ করে। এই কর্ম্মভাব বা দশমভাব দুর্ব্বল হোলে সহস্র চেষ্টা করলেও মানুষের প্রভুত্ব, সম্মান, প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি হয় না। কেন্দ্রাধিপতি ত্রিকোণাধিপতির সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট হোলে তবেই বিশেষ উন্নতি হয়ে থাকে। দশমাধিপতি অর্থাৎ কর্ম্মাধিপতির সঙ্গে নবমাধিপতি অর্থাৎ ভাগ্যাধিপতি মুখ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হোলে জাতক বিখ্যাত ও বিজয়ী হয়ে থাকে—আর হয়ে থাকে দেশের মধ্যে দশজনের একজন। লগ্নাধিপতি ও দশমাধিপতি পরস্পর এরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট হোলেও অনুরূপ উত্তম ফলভোগ হবে। গ্রহগণের ক্ষেত্র-বিনিময়ই মুখ্য সম্বন্ধ। নবম (ভাগ্য) স্থানের অধিপতি আর দশম (কর্ম্ম) স্থানের অধিপতি শুধু মুখ্যসম্বন্ধবিশিষ্ট হোলেই যে জাতক কীর্ত্তিশালী ও স্বনামধন্য হবে তা নয়, এই অধিপতিরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে থাকলেও প্রবল রাজযোগহেতু অনুরূপ কীর্ত্তিশালী ও বিখ্যাত হবে। ত্রিকোণপতির মধ্যে নবমাধিপতি সবচেয়ে বেশী পরিমাণে স্বাভাবিক বলে বলী। একজন্যে যদি নবমাধিপতি ও দশমাধিপতি বলবান হয়ে পরস্পর সম্বন্ধ করে, তা হোলে উৎকৃষ্ট রাজযোগ হয়ে থাকে। যদি একই গ্রহ কেন্দ্র ও ত্রিকোণাধিপতি হয়, তা হোলে সেই গ্রহই বিশেষ উন্নতিকারক হয়ে জাতককে সাধারণের ভেতর অসাধারণ ব্যক্তি করে তোলে কিন্তু যদি একই গ্রহ দশম ও একাদশাধিপতি হয়, তাহোলে জাতকের ভাগ্যে রাজযোগের ফল লাভ হয়না। গ্রহগণ ষষ্ঠ অষ্টম ও দ্বাদশ স্থানে থেকে রাজযোগকারক হোলে, সে যোগ নিষ্ফল হয়ে যায়। গ্রহরা রাজযোগকারক হয়েও একাদশে থাকলে রাজযোগের অনেকটা ফল নষ্ট হয়ে থাকে। যদি রাহু ও কেতুর কোন গ্রহের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকে ও শুভভাবস্থ অর্থাৎ কেন্দ্র ত্রিকোণ গত হয়, তা-হোলে এরা এদের দশা অন্তর্দ্দশায় রাজযোগের ফল প্রদান করে। কর্ম্মস্থানস্থ গ্রহমাত্রই শুভ ফল দিয়ে থাকে। লগ্ন ও চন্দ্র এই দুইটির মধ্যে যে বলবান হবে তা থেকে দশম ভাব নিয়ে বিচার করতে হয় জাতকের কর্ম্ম ও বৃত্তি। রবি, চন্দ্র ও লগ্ন এদের দশমাধিপতি যে গ্রহের নবাংশে থাকেন, সেই সেই নবাংশাধিপতি গ্রহের যে বৃত্তি, জাতক সেই বৃত্তি দ্বারা ধনোপার্জ্জন ও জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বহু গ্রহ বৃত্তিকারক হোলে সকলেই নিজ নিজ দশান্তর্দ্দশায় নিজ নিজ বৃত্তি দ্বারা অর্থ দিয়ে থাকে। মেষ, সিংহ ও ধনু অগ্নিরাশি। বৃষ, কন্যা ও মকর পৃথ্বীরাশি। মিথুন, তুলা ও কুম্ভ বায়ুরাশি। কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন জলরাশি। অগ্নিরাশির যে কেউ জাতকের দশমভাব হোলে জাতকের কর্ম্মস্থান হবে কারখানা, আগুনের স্থান, সৈন্য, লৌহ, যন্ত্রপাতি ও ইস্পাতের কারখানা, ছাপাখানা প্রভৃতি। ভূসংক্রান্ত স্থান, কৃষি, বস্ত্র-ব্যবসা, বাণিজ্য, উদ্যান রচনার ক্ষেত্র প্রভৃতি কর্ম্মকেন্দ্র যাদের দশমভাব হয়েছে পৃথ্বীরাশি। বাগ্মিতা, সাংবাদিকতা, লেখন, বিমান, জ্যোতির্ব্বিদ্যা আর যেসব কাজে যন্ত্রশিল্পাদির জ্ঞান দরকার সেইসব কাজই হবে তাদের, যাদের কর্ম্মভাব হয়েছে বায়ুরাশিতে। জলরাশি যাদের দশমভাব, তারা জাহাজে কাজ পাবে, হোটেল রেস্তোঁরা, মদ, মৎস্য প্রভৃতিও তাদের কর্ম্মসংশ্লিষ্ট হোতে পারে। বেশীরভাগ গ্রহ দ্ব্যাত্মক বা দ্বিস্বভাববিশিষ্ট রাশিতে থাকলে অথবা পৃথ্বীক্ষেত্রের নীচে থাকলে বা দুর্ব্বল হলে, পরের অধীনে চাকুরীর সূচনা করে। পৃথ্বীক্ষেত্রের উপরে, সবল ও শুভদৃষ্টি গত হয়ে বেশীর ভাগ গ্রহ থাকলে, জাতক অপরকে কর্ম্মে নিযুক্ত করবে বা করবার অধিকার পাবে। বায়ুরাশিতে বেশীর ভাগ গ্রহ থাকলে, বৃত্তিজীবী হওয়াই ভালো। যাদের দশম বা কর্ম্মভাব পৃথ্বীক্ষেত্রে অবস্থিত, তাদের পক্ষে ব্যবসা করাই উত্তম। বলবান রবি বৃত্তিকারক হোলে ঔষধ, কাষ্ঠ, স্বর্ণ, পারদ, ঘাস খড় বা তৃণজাত দ্রব্য, বরাহ মতে মেষাদি পশু লোমজাত দ্রব্য, প্রভৃতি বস্তুর বাণিজ্যে জাতকের বৃত্তি নির্দ্দেশ করতে হবে। চন্দ্র বৃত্তিকারক হোলে স্ত্রীজনের আশ্রয়, ভূমি, জল ও জলোৎপন্ন দ্রব্য, কুসীদ জীবিকা ইত্যাদি—জনসাধারণ সংশ্লিষ্ট স্থানে কর্ম্ম, যেমন জাহাজে কাজ নৌবাহিনী, পুলিশ প্রভৃতি বিভাগে কাজ, ফেরিওয়ালা, বাহন-পরিচালকের কাজ, দোকানদার ও গৃহস্থালীর দ্রব্যের কাজও হোতে পারে। রবি বৃত্তি নির্দ্দেশক হোলে, রাজকর্ম্মচারী, রাজনৈতিক বিভাগের কর্ম্মী, রাজা, মন্ত্রী বা রাজপরিষদ বা মন্ত্রী বিভাগে পদলাভ, বিচারক, আইনব্যবসায়ী ও সরকারী কর্ম্মচারী হবার সম্ভাবনা। চন্দ্র বৃত্তিকারক হোলে উপসেবিকা (নার্স) ধাত্রী (মিড-ওয়াইফ) অলঙ্কার প্রস্তুত-কারক, জহুরী, ধাতুদ্রব্যাদি বিক্রেতা ও রাজকীয় কর্ম্মাদি সূচিত হয়। মঙ্গল বৃত্তিকারক হোলে অস্ত্রশস্ত্রাদির নির্ম্মাণ বা ক্রয় বিক্রয়, মৃত্তিকা খনন ও গঠন, স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র প্রভৃতি ধাতুদ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়, অগ্নি ক্রিয়াসাধ্য কার্য্য ইত্যাদি কর্ম্মসম্ভাবনা। তাছাড়া সৈন্য বা সৈন্য বিভাগে কর্ম্ম, ছুতোরের কাজ, মেকানিকের কাজ, জরিপের কাজ, রাসায়নিক, আইন ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কের কাজ, ইনসিওরের দালালী ও কসাইয়ের কাজও হোতে পারে। এরূপ গ্রহ সংস্থানে সার্জ্জেন ও দন্ত চিকিৎসক হওয়ার যোগ দেখা যায়। বুধ বৃত্তিদায়ক হোলে কবিতা ও উপন্যাস লেখা, গ্রন্থরচনা, সাহিত্যিকতা, শিল্পবৃত্তি, হিসাব নিকাশ বা গণিতের কাজ, টীকা, ব্যাখ্যা, শাস্ত্রচর্চ্চা ও লেখার কাজ, কেরাণীবৃত্তি প্রভৃতি হওয়ার সম্ভাবনা। বৃহস্পতি বৃত্তিকারক হোলে পূজার্চ্চনা, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, ধর্ম্মপ্রচারক প্রভৃতি হোতে পারে। এ যোগে বড় ব্যবসায়ী, ব্যবহারজীবী, চিকিৎসক এবং পদস্থ কেরাণী হবারও সম্ভাবনা আছে। শুক্র বৃত্তিকারক হোলে সিনেমা, থিয়েটার

ও সর্ব্বপ্রকার আমোদ প্রমোদ ও ক্রীড়া কৌতুক ও যাদু প্রভৃতি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন। গান বাজনা, অভিনয়, নাট্য রচনা প্রভৃতি বৃত্তি দ্বারাও জীবিকা উপার্জ্জন, তাছাড়া রৌপ্য ও লোহাদির বাণিজ্য আর স্ত্রীলোক থেকে ধনপ্রাপ্তি সূচিত করে শুক্রের দশমভাবে অবস্থিতির দরুণ। শনি বৃত্তিকারক হোলে বিভিন্ন ধরণের বৃত্তিলাভ হোতে পারে—দায়িত্বপূর্ণ কাজ, অপরের অধীনে কাজ, মিলে কাজ, কম্পোজিটার, কারখানার কুলি আর ঝাড়ুদার ও ফেরিওয়ালার কাজের সম্ভাবনা দেখা যায়। তা ছাড়া যে সব কাজে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হয় সেগুলিও লাভ হয়ে থাকে। চাষবাসেও সাফল্য লাভ। রসায়ন দ্রব্যাদি নিয়ে কর্ম্ম হবার সম্ভাবনা। হার্সেল দশমভাবে থাকলে জ্যোতিষী, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ আর সাধারণ ধরণের কাজে নিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা। নেপচুন বৃত্তিকারক হোলে সমুদ্রে কাজ, নৌবাহিনীতে কাজ প্রভৃতি সূচিত হয়. হার্সেলের প্রভাবে অধ্যাত্ম সাধনায় সাফল্য লাভ করে আশ্রম বা সঙ্ঘ পরিচালক, ধর্ম্মগুরু প্রভৃতি হবারও সম্ভাবনা থাকে। দশমস্থানে কোন গ্রহ না থাকলে দশমাধিপতি যে নবাংশে আছে তার অধিপতিকে নির্দ্দেশক মনে করতে হবে। রবি নির্দ্দেশক হোলে ঔষধ ব্যবসায়ী, রাসায়নিক দ্রব্য বিক্রেতা ও স্বর্ণকার হবার সম্ভাবনা। চন্দ্র ঐরূপ হোলে কৃষিকর্ম্ম, জহুরী আর স্ত্রীলোকের অধীনে চাকুরি। মঙ্গল নির্দ্দেশক হোলে সৈন্য বিভাগে কাজ, মেকানিক. যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা। বুধ ঐরূপ হোলে লেখক, গ্রন্থকার, গণিতজ্ঞ ও ভাস্কর হওয়া যায়। বৃহস্পতি ঐরূপ নির্দ্দেশক হোলে, এটর্ণী, উকিল, ব্যারিষ্টার, অধ্যাপক, বিচারক প্রভৃতি হওয়া যায়। শুক্র নির্দ্দেশক হোলে আর্টিষ্ট, নৃত্যকুশলী, পোষাক প্রস্তুতকারক হওয়া যায়। শনি নির্দ্দেশক হোলে অতি নিম্ন পদ লাভ। বুধ, শুক্র, বৃহস্পতি বা শনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাহু কেন্দ্রের ভিতর থাকলে জাতক পুত্র, সম্মান, লক্ষ্মী ও আরোগ্য লাভ করে। দশমভাব থেকে বৃত্তি, আশা আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ, সম্মান প্রতিষ্ঠা, পার্থিব উন্নতি ও সাফল্য, বিদেশ ভ্রমণ, জীবিকা উপার্জ্জনের উপায়, আত্মসম্মান, ধর্ম্মজ্ঞান এবং পদমর্য্যাদা বিচার হয়। মীনরাশি দশমস্থানে হোলে আর সেখানে বুধ বা মঙ্গল থাকলে জাতকের তীর্থস্নান ও মোক্ষলাভ হয়। এইভাবে বুধ বা মঙ্গলের সঙ্গে বৃহস্পতি থাকলে জাতক দাতব্য প্রতিষ্ঠান তৈরী করে,আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে জনকল্যাণকর কাজ করে। চন্দ্র এখানে থেকে বৃহস্পতির দ্বারা দৃষ্ট হোলে সদাচার ও সত্যবাদিতার জন্যে যশ হয়ে থাকে। দশমে রবি পৈতৃক ধন সম্পত্তিদাতা, আর চন্দ্র হচ্ছে মাতার ধনসম্পত্তি দাতা। এখানে অবস্থিত মঙ্গল শত্রুর, বুধ বন্ধুর, বৃহস্পতি ভ্রাতৃবর্গের, শুক্র স্ত্রীলোকের আর শনি ভৃত্যের যোগাযোগে ধনসম্পত্তি দান করে। মোটামুটিভাবে বিচার করে দেখা গেছে রবি বা মঙ্গল দশমে থাকলে জাতকের পৈতৃক সম্পত্তি, উত্তম বৃত্তি ও পুরুষকার প্রয়োগের ফলে যথেষ্ট ধনোপার্জ্জন হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা আর বিজ্ঞান সংক্রান্ত তত্ত্ব ও তথ্য প্রকাশের দ্বারা জাতক জীবনে কৃতিত্ব অর্জ্জন করতে পারবে যদি তার দশমভাবে থাকে বুধ ও বৃহস্পতি। শুক্র ও চন্দ্র যোগে আইনজ্ঞ, মন্ত্রী, দেওয়ান, কাউন্সিলার, মেয়র, প্রেসিডেণ্ট প্রভৃতি হওয়া যায়। চন্দ্র উত্তম কর্ম্মদাতা। কণ্ট্রাক্টর, বড় বড় শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক বা ডিরেক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, মেকানিক, কুলীদের পরিচালক প্রভৃতি হওয়া যায় দশমে শনি থাকলে। অবশ্য এসব বিচার করতে গেলে দেখতে হবে গ্রহদের বলাবল আর দেখতে হবে বিদ্যাবুদ্ধির অধিপতিগণের অবস্থা। যদি বিদ্যাবুদ্ধির অধিপতিরা দুর্ব্বল হয় ও লেখাপড়া না হয় তাহোলে সেব্যক্তি গ্রামের মোড়ল, কুলির সর্দ্দার, চাপরাশিদের প্রধান, বা অফিসের দারোয়ানদের দলপতি হোতে পারে। এজন্যে কোষ্ঠী বিচার করে ছেলেবেলা থেকে রাশিচক্রের বলাবল অনুসারে কর্ম্মভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো ও বৃত্তি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করানো দরকার। ঠিকমত পথ না ধরিয়ে দিলে বা বৃত্তি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে অভিভাবকগণ অবিবেচকের মত কাজ করলে, ছেলেমেয়েদের জীবনে সাফল্য না হওয়ার দরুণ তারা দুঃখ পাবেই। বহু বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েরা নষ্ট হয়ে যায় তাদের পিতামাতার দোষে। এই সব ক্ষতি অপনোদন হোতে পারে যদি তাঁরা বালক বালিকাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দেবার জন্যে বিদ্যালয়ে পাঠাবার পূর্ব্বে তাদের কোষ্ঠীবিচার করে দেখে নেন কিভাবে তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে। যদি তাঁরা কোষ্ঠীতে দেখেন যে তাঁদের ছেলেমেয়েদের কর্ম্মক্ষেত্রে সাংঘাতিক পরিমাণে অশুভ সম্ভাবনা রয়েছে ভবিষ্যতের গর্ভে, তাহোলে তাঁদের কোষ্ঠীর দোষগুলি খণ্ডন করবার জন্যে সচেষ্ট হবেন, শাস্ত্রে এই সব দোষের প্রতিকারের ব্যবস্থাও করে দেওয়া আছে। নতুবা পরবর্ত্তীকালে শত শত টাকা খরচ করেও ছেলেমেয়েদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে দেওয়া কোনমতেই সম্ভব হবেনা। চতুর্থাধিপতি ও পঞ্চমাধিপতি, নবমাধিপতি ও দশমাধিপতি কিম্বা লগ্নাধিপতি ও দশমাধিপতির অবস্থাও সমাবেশ ভালো না হোলে জীবনে উত্তম সাফল্য হয় না। বুধ ও বৃহস্পতি দ্বিতীয় ও একাদশ গৃহে অবস্থান করলে বহুটাকা রোজগার করা যায়। চতুর্থ বা একাদশ স্থানে মঙ্গলও বৃহস্পতির সহাবস্থানে বহু জমিজমা হয়। শত বাধা বিঘ্ন এলেও জাতক উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠবে যদি রবি ও চন্দ্র কোষ্ঠীতে তুঙ্গস্থ থাকে। চতুর্থস্থানে শুক্র ও বৃহস্পতির সহাবস্থানে উত্তম বিদ্যা ও উপার্জ্জন ঘটে। যাহোক আগামী সংখ্যায় ভৃগুসংহিতায় উক্ত বিভিন্ন লগ্নানুসারে কর্ম্মভাবে বিভিন্ন গ্রহের সমাবেশে যেরূপ বিভিন্ন ফল পাওয়া গেছে তা প্রকাশ করবো। আশা করি তার দ্বারা কর্ম্ম ও বৃত্তি সম্পর্কে অনেকে উপকৃত হবেন।

* * *

চৈত্রমাসের ব্যক্তিগত রাশিফল

মেষ

স্বাস্থ্য খারাপ যাবে না। মধ্যে মধ্যে পিত্তপ্রকোপ ও বায়ুবৃদ্ধি। পারিবারিক অশান্তি। স্বজন বা বন্ধু বিয়োগ। ভ্রমণে বিপত্তি বা দুর্ঘটনা। অর্থ-নৈতিক অবস্থা শুভ বলা যায় না। ভূম্যাধিকারীর পক্ষে কিছু অসুবিধা ভোগ বিশেষতঃ মাসের প্রথমে ভূমি বা বাড়ীভাড়া আদায় সম্পর্কে ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হোতে পারে। ভাড়াটিয়ার সঙ্গে মামলামোকর্দ্দমা, আয়বৃদ্ধি. চাকুরিজীবীদের পক্ষে অফিস সংক্রান্ত ব্যাপারে বা কাজে উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবার সম্ভাবনা। শত্রুবৃদ্ধি, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে সামাজিক ক্ষেত্রে বা গৃহস্থালী ব্যাপারে কিছু অসুবিধা ভোগ। প্রণয়ভঙ্গ যোগ। অশ্বিনীনক্ষত্রজাত ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ ভালো যাবে না। ভরণী নক্ষত্র জাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। কৃত্তিকাজাত ব্যক্তির পক্ষে মোটামুটি ভালো। বিদ্যায়কিঞ্চিৎ বাধা।

বৃষ

বিশেষ ভালো সময়। কর্ম্মে সাফল্য। সৌভাগ্যযোগ। বিদ্যায় উন্নতি লাভ। পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। পারিবারিক স্বচ্ছলতা। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে, তবে রোহিনী নক্ষত্রজাত ব্যক্তির পক্ষে উচ্চস্থান থেকে পতন, দুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্যভঙ্গ যোগ। আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে না, বরং আয় হ্রাস ও ব্যয় বৃদ্ধি। মাসের প্রথম দিকে অর্থের টানাটানির আশঙ্কা। রাজনৈতিক কারণে বা গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মপদ্ধতির পরিবেশে ভূম্যধিকারীদের পক্ষে কিছু ক্ষতি ঘটবে।

চাকুরিজীবীদের পক্ষে অত্যন্ত শুভ, কর্ম্মোন্নতি বা পদোন্নতি আশা করা যায়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে এমাসটী শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। প্রণয়ে সাফল্য, প্রণয় সংক্রান্ত ব্যাপারেও সিদ্ধিলাভ। অবাঞ্ছিত লোকের সংস্পর্শে আসা বৃষরাশির স্ত্রীলোকের পক্ষে অনুচিত, অবৈধ সান্নিধ্যের যোগাযোগজনিত অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা আছে।

মিথুন

শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভালো বলা যায় না। স্ত্রী ও সন্তানের পীড়াযোগ। পিত্তপ্রকোপহেতু ব্যাধির আশঙ্কা। আত্মীয়স্বজনের সহিত মনোমালিন্য ও তজ্জনিত পারিবারিক অশান্তি। আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক নয় কিন্তু অর্থকৃচ্ছ্রতা ঘটবে না। অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু লাভ হোলেও ব্যয়বৃদ্ধির জন্য মানসিক উদ্বেগ। আশাভঙ্গযোগ। ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মাসটি শুভ বলা যায় না। শস্য ক্ষতি। জমিজমা নিয়ে গণ্ডগোলের সৃষ্টি। চাকুরিজীবীদের পক্ষে উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবার যোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটী শুভ। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীগণ আশানুরূপ শুভ ফল লাভ করবে না। প্রণয়ে সাফল্যলাভ। মৃগশিরানক্ষত্র জাত ব্যক্তির পক্ষেই বেশী অশুভ, আর্দ্রা ও পুনর্ব্বসুর পক্ষে তদনুপাতে কম।

কর্কট

শরীর ভালো যাবে না। ব্লাডপ্রেসার রোগীর পক্ষে সতর্ক হওয়া উচিত। পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠান। ভ্রমণে অবসাদ ও ক্লান্তি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত্রুতায় মানসিক উৎপীড়ন ভোগ, অপরের প্রতি ঈর্ষা-পরায়ণতা। অর্থোপার্জ্জনের দিকে ব্যাঘাত। নানদিক দিয়ে কিছু অর্থলাভ মাসের মধ্যভাগে হোলেও ব্যয়াধিক্যহেতু মাসের শেষে অর্থ-কৃচ্ছ্রতা ভোগ। ভোগবিলাসিতার জন্য ব্যয় ও ঋণ হোতে পারে।

সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে কিছু গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলতা। টাকাকড়ি লেনদেন ব্যাপারেও লোকসান। চাকুরিজীবীদের পক্ষে শুভ, উপরওয়ালার সুনজরে পড়বার সম্ভাবনা। বেকার ব্যক্তির পক্ষে এইমাসে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে সাক্ষাৎ করা, পরীক্ষা দেওয়া প্রভৃতি কর্ত্তব্য। চাকুরিলাভের সুযোগ সম্ভাবনা আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে শুভ মাস, এদের আয় বৃদ্ধি ও লাভ হবে। কর্কট রাশির স্ত্রীলোক সংসারের সকল দিকে সুবিধাসুযোগ পাবে, গার্হ্যস্থালী ও প্রণয় সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে, যথেষ্ট আনন্দলাভ করবে। রোমান্টিক আবেষ্টনীও মধুর হয়ে উঠবে। পরীক্ষায় সাফল্য। পুষ্যানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির অপেক্ষা পুনর্ব্বসু ও অশ্লেষা-জাত ব্যক্তিরই বেশী শুভ ফল দেখা যায়।

সিংহ

এমাসটী উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রজাত ব্যক্তির পক্ষে শুভ। পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র-জাত ব্যক্তির শুভফল মধ্যম। মঘাজাত ব্যক্তির পক্ষে কিঞ্চিৎ অশুভ।

উদর ও গুহ্যপ্রদেশে পীড়া, জ্বর, আমাশয় ইত্যাদি সূচিত হয়। ব্লাডপ্রেসারের রোগীর সতর্ক হওয়া আবশ্যক। স্ত্রী পুত্রাদির পীড়া। পারিবারিক অস্বচ্ছন্দতা মাসের মধ্যে বেশীর ভাগ সময়েই নানা ধরণের ব্যক্তির সহিত কলহ, এজন্য অশান্তিভোগ ও চিত্তবিক্ষোভ। আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ বৃদ্ধি। অর্থের দিক দিয়ে শুভই হবে। অনাদায়ী টাকা পাবার যোগ। অপ্রত্যাশিতভাবে অর্থলাভ। কোন প্রকার স্পেকুলেশন করলে ক্ষতি হবে। ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালাদের পক্ষে মাসটী ভালো নয়। ভ্রমণকারীদের পক্ষে কোন অসুবিধা ভোগ হবেনা। চাকুরি-জীবীদের পক্ষে মাসটি শুভ হোলেও মাসের শেষের দিক শুভ নয়। যে সব স্ত্রীলোকের কোনপ্রকার প্রণয় সূত্রে আসবার সম্ভাবনা হয়েছে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি লাভ হবে ও প্রণয় মিলন ঘটবে। অবৈধ প্রণয়ের যোগাযোগ ঘটতে পারে। অবিবাহিতা মেয়ের বিবাহের সুযোগ আসবে এমন কি পাকাপাকি হয়ে যাবে। গার্হ্যস্থালী ব্যাপারে শুভ। স্বামী বিদেশে থাকলে এমাসে দাম্পত্য মিলন ঘটবে। মাসের শেষে ঝি চাকরের জন্যে অসুবিধা ভোগ, পরীক্ষার্থীগণের পক্ষে শুভ ফল।

কন্যা

এ রাশির পুরুষেরা নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করবে, স্ত্রীলোকের সুবিধা সুযোগও স্বাচ্ছন্দ্যভোগ করবে। উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে শুভাধিক্য। হস্তাজাতগণ বিশেষ কষ্ট পাবে আর চিত্রানক্ষত্রজাত ব্যক্তিরা উত্তর ফল্গুনীর মতই শুভ ফল লাভ করবে। এমাসে প্রস্রাবের দোষ বা পীড়া, ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত, উদর ঘটিত পীড়াদি যোগ আছে। শিকারিগণের পক্ষে খুব সাবধান হওয়া দরকার। পরিবারবর্গের সঙ্গে অসদ্ভাবজনিত অশান্তি ভোগ। অর্থ-নৈতিক অবস্থা ভালো, আয় হবে। আবিষ্কার ও গবেষণায় কৃতিত্ব অর্জ্জন মাসের শেষের দিকে বেশ ব্যয় হবে। ভূম্যাধিকারী ওবাড়ীওয়ালাদের পক্ষে মাসটী অশুভ, মামলা মোকর্দ্দমায় ব্যয় ও পরাজয়। চাকুরিজীবীরা অফিসে লাঞ্ছনা ভোগ করতে পারে। এজন্য উপরওয়ালার সঙ্গে বেশী কথা কাটাকাটি করা উচিত নয়, কাজের কৈফিয়ৎ দেবার সময়ে খুব সতর্কতা প্রয়োজন, এবং উপরওয়ালার কাছে যতটা কম যাওয়া যায় ততটাই ভালো। স্ত্রীলোকেরা নানাপ্রকার সুবিধা ভোগ করবে। জনপ্রিয়তা অর্জ্জন, সামাজিক মর্য্যাদা লাভ, প্রণয়ীর অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য আনন্দ ও উপঢৌকনলাভ, সমাজ সেবায় সুনাম অর্জ্জন ও দাম্পত্যসুখ। অবৈধ প্রণয়ে স্বার্থসিদ্ধিলাভ। পরীক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য হবে না।

তুলা

দুর্ঘটনায় রক্তপাতাদি ও অস্ত্রোপচার। শারীরিক শীর্ণতা। বহু দিন ধরে যারা রোগে ভুগছে, তাদের পক্ষে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। পারিবারিক অশান্তি। সামাজিক মর্য্যাদালাভ। আর্থিক সুযোগ নানা ভাবে আসবে। সাহিত্যসেবীর শুভ সুযোগ। গ্রন্থপ্রকাশকগণের পক্ষে শুভ। স্পেকুলেসনেও লাভ। ভূম্যাধিকারী ও বাড়ীওয়ালারা অনেক সুখ সুবিধা পাবে, তবে সময়ে সময়ে ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে মনোমালিন্য হবে এমন কি দাঙ্গা হাঙ্গামাও হোতে পারে। চাকুরিজীবীদের পক্ষে উন্নতিযোগ, পদমর্য্যাদাবৃদ্ধি, উপরওয়ালার সুনজর প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের আয় ও লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। সামাজিক সুখভোগ, যশ, সম্মান ও প্রতিষ্ঠা। পরীক্ষার্থীগণের সাফল্য।

বৃশ্চিক

বিশাখা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিদের পক্ষে অনেকটা শুভ। অনুরাধা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে কিঞ্চিৎ অশুভ। স্বাস্থ্য ভালো যাবে না, চক্ষুপীড়া, উদর পীড়া, ব্লাডপ্রেসার, পারিবারিক অশান্তি ভোগ। ব্যয়বৃদ্ধি, পাওনাদারের তাগাদা, মামলামোকর্দ্দমা, বন্ধুবিচ্ছেদ। গৃহ ভূমিসংক্রান্ত ব্যাপারে গোলযোগ। বাড়ীওয়ালা ভূম্যাধিকারীদের পক্ষে মাসটি অশুভ। চাকুরিজীবীরা এমাসে নানা অসুবিধা ভোগ করতে পারে। গভর্ণমেন্ট চাকুরিতে যাঁরা আছেন, তাঁদের সতর্কতা আবশ্যক। স্ত্রীলোকগণ নানা অসুবিধা ভোগ করবে। পরীক্ষায় আশাভঙ্গ যোগ।

ধনু

মাসটি বিশেষ শুভ। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিরই সব চেয়ে ভালো সময়। পূর্ব্বাষাঢ়া ও মঘানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে কিঞ্চিৎ অশুভ হোতে পারে। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে,—সর্দ্দি ও অজীর্ণ রোগ অল্প পরিমাণে দেখা দেবে। পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলতা। বিলাস-ব্যসন দ্রব্য ক্রয়। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, সামাজিক প্রতিষ্ঠা। সামান্য পরিমাণে অনুচর পরিচরবর্গের সহিত কলহ হোতে পারে, সহিষ্ণুতা অবলম্বন করলে কোনপ্রকার গোলমালের সৃষ্টি হবে না। অর্থ লাভ, ব্যয়বাহুল্য। ভৃত্য বা কর্ম্মচারীদের চেষ্টায় দ্রব্যাদি চুরি যাবার সম্ভাবনা ও তজ্জনিত ক্ষতি, সতর্ক দৃষ্টি রাখলে এরূপ ঘটনা না ঘটবারই সম্ভাবনা।

বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মাসটী ভালোই যাবে। চাকুরিজীবীরা উন্নতির আশা করতে পারেন। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ হওয়ায় পদোন্নতির যোগ আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীর পক্ষে মাসের প্রথমে কিছু বাধা আসতে পারে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী শুভ। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবগণের সহিত সম্প্রীতি এবং স্নেহ ভালোবাসা প্রাপ্তি। অবিবাহিতা মেয়েদের পক্ষে বিবাহের কথাবার্ত্তা চল্তে থাকবে, বিবাহ হবার সুযোগও আস্‌বে। পরীক্ষার শুভফল।

মকর

মাসটী মিশ্রফল দাতা, মাসের শেষের দিকে কিছু কিছু অশুভ ঘটনা ঘটতে পারে। উত্তরাষাঢ়া ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিদের পক্ষেই শুভফলগুলি বিশেষ ভাবে ফল্‌বে শ্রবণানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে কিছু কিছু অশুভ সম্ভাবনা। শরীর মধ্যে মধ্যে খারাপ যাবে। জ্বর, শারীরিক দুর্ব্বলতা ও রক্তশূন্যতা। সন্তানাদির সঙ্গে কলহ বিবাদ, তজ্জনিত মানসিক অশান্তি, চিত্তচাঞ্চল্য, সন্তানের পীড়াদি কষ্ট। আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক। চুরির জন্য ক্ষতি। ঝি চাকরের দ্বারা প্রতারণা।

ভূম্যাধিকারী ও বাড়ীওয়ালাদের পক্ষে শুভ সুযোগ। চাকুরিজীবীদের পক্ষে মধ্যম। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের অবস্থা মোটামুটি ভালো যাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে অলঙ্কার লাভ, বিলাস ব্যসনের দ্রব্যাদি ক্রয়, বনভোজন, আমোদপ্রমোদ, গানবাজনা ও সভাসমিতিতে যোগদান ও আনন্দ উপভোগ। স্নেহপ্রীতি ভালোবাসা লাভ। প্রণয়ের ক্ষেত্রে ও সাফল্যলাভ। পরীক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য ঘটবে না।

কুম্ভ

ধনিষ্ঠানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে মাসটী উত্তম, পূর্ব্বভাদ্রপদজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম এবং শতভিষানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে অধম। স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। বুকে ব্যথা, অজীর্ণ, চক্ষুরোগ, হৃদ্‌রোগের প্রবণতা। এজন্য সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। পারিবারিক অশান্তি। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সহিত বিচ্ছেদ? আর্থিক স্বচ্ছন্দতা ও লাভ। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। গভর্ণমেন্টের অনুসৃত নীতির চাপে পড়ে ভূম্যাধিকারী ও বাড়ীওয়ালাদের পক্ষে দুর্ভোগ। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ মাস। কিছু কিছু মানসিক কষ্ট ও উদ্বেগ মাসের প্রথমে ঘটলেও শেষের দিকে বিশেষ ভালো হবে,—যারা অস্থায়ী পদে আছে, তাদের পদ পাকা হবে—চাকুরির ক্ষেত্রে পসার প্রতিপত্তি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর আয়বৃদ্ধি হবে না, একভাবেই চল্‌বে। লাভও বিশেষ হবে না। স্ত্রীলোকের পক্ষে এ মাসটি শুভ, মাসের শেষে প্রণয়ের ব্যাপারে একটু সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য, অন্যথা বিশৃঙ্খলতা ও অপবাদ জনিত মানসিক কষ্টভোগ। সংসার ও সামাজিকক্ষেত্রে এরাশিক্ স্ত্রীলোকেরা সুখ লাভ করবে। পরীক্ষায় স্বাচ্ছন্দ্য কৃতিত্ব অর্জ্জন।

মীন

পূর্ব্বভাদ্র ও রেবতী নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিদের পক্ষে মাসটি খারাপ যাবে না কিন্তু উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিরা নানাপ্রকারে কষ্ট পাবে। জ্বরভাব, অজীর্ণ ও বায়ুপ্রকোপ। পারিবারিকক্ষেত্রে নানাপ্রকার সমস্যার সৃষ্টি হবে। অতিরিক্ত ব্যয় হবে। উদ্বেগ ও চিত্তবিক্ষোভ। অর্থ-নৈতিক অবস্থা মোটামুটি ভালো বলা যায়। নূতন পরিকল্পনা, গবেষণা ও আবিষ্কারের দিকে অগ্রসর হোলে সাফল্যলাভ। ভূম্যাধিকারী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে সময়টি ভালো নয়। নানাপ্রকার অসুবিধা ও মামলামোকর্দ্দমা। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ।

ব্যক্তিগত লগ্নফল

মেষলগ্ন—

কলহ বিবাদ। কিছু অর্থক্ষতি ও ব্যয়। মানসিক অস্বচ্ছন্দতা। অসন্তোষ ও বিপন্নতা। স্বাস্থ্যলাভ। আমোদপ্রমোদ। প্রণয়বৃদ্ধি। শত্রুবৃদ্ধি। কর্ম্মে বাধা ও আশাভঙ্গ। মধ্যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য। আয় বৃদ্ধি যোগ। বিদ্যায় বাধা স্মৃতিশক্তির হ্রাসহেতু।

বৃষলগ্ন—

সম্মান, সাফল্য, স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি। শত্রুর উপদ্রব। পুত্রসন্তান লাভ। বুদ্ধি প্রাখর্য্য ও উত্তম বিদ্যার্জ্জন। উত্তম প্রণয় লাভ। উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা। আয় সুখ।

মিথুনলগ্ন—

পীড়া। মানসিক অশান্তি। শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা। দুঃখভোগ। বন্ধু বিচ্ছেদ। আয়বৃদ্ধি ও লাভ। পদোন্নতির পথে বাধা। প্রণয়ভঙ্গ। বিদ্যায় কিছু উন্নতি।

কর্কটলগ্ন—

মানসিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য। বিদ্যাভাব উত্তম। সন্তানলাভ। শত্রুহানি। সম্পত্তিপ্রাপ্তিযোগ বা হৃত সম্পত্তির পুনরুদ্ধার। লোকাপবাদ হেতু মধ্যে চিত্তচাঞ্চল্য।

সিংহলগ্ন—

কর্ম্মে খ্যাতিলাভ। কর্ম্মোন্নতি। আয়বৃদ্ধি। স্বজনবিরোধ ও বন্ধু বিচ্ছেদ। অপবাদ। অবৈধ প্রণয়ের সংস্পর্শে আসার আশঙ্কা। ব্যয়াধিক্য। মনস্তাপ। আকস্মিক ভয়। স্ত্রীর পীড়া বা জীবন সংশয়।

কন্যালগ্ন—

পীড়া ও ভয়। অর্থক্ষতি। নানা কর্ম্মে বাধা। মাতৃবিয়োগ। শোক প্রাপ্তি। ভ্রমণ। উত্তম আয়। অকারণ উদ্বেগ ও চিত্তচাঞ্চল্য। বিদ্যার্জ্জনে ক্ষতি। কর্ম্মপরিবর্ত্তন বা কর্ম্মস্থানে বদ্‌লি।

তুলা লগ্ন—

স্ত্রীর সহিত কলহ। সম্মান বা পুরস্কার লাভ। ধনযোগ। সৌভাগ্য লাভ। দুর্ঘটনার ভয়। সামান্য পীড়া। বিদ্যায় আশানুরূপ উন্নতি। কিঞ্চিৎ ব্যয়।

বৃশ্চিকলগ্ন—

ভ্রমণ। দুঃখকষ্ট। দুর্ঘটনার ভয়। শত্রু বৃদ্ধি। অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু ব্যয়। কার্য্যে বাধাপ্রাপ্তির পর কিছু সাফল্য। স্ত্রীর দুর্ঘটনা বা পতনাশঙ্কা। সন্তানাদির পীড়া। বিদ্যা মধ্যম।

ধনু লগ্ন—

অর্থ ব্যয়। উত্তম আয়। পুত্র লাভ। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য। সম্মান হানি। সৌভাগ্যোদয়। মাতার পীড়া। শত্রু বৃদ্ধি। অধীনস্থ লোকের বিশ্বাসঘাতকতা। প্রণয়ের যোগাযোগ। বিদ্যায় উন্নতি বিশেষতঃ সাহিত্যকলাও শিল্পবিদ্যায় সাফল্য।

মকরলগ্ন—

আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ। অর্থকৃচ্ছ্রতার দরুণ সাময়িকভাবে ঋণ। অর্থক্ষতিও চৌর্য্য ভয়। প্রাপ্য টাকা আদায়ে গোলযোগ। মানসিক অশান্তি। স্বজন বিয়োগ। বিদ্যা শুভ।

কুম্ভলগ্ন—

আয় বৃদ্ধি। কর্ম্ম সাফল্য। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। বিজ্ঞান শাস্ত্রবিদ্যায় উন্নতি। মামলা মোকর্দ্দমায় জয় লাভ। সন্তান পীড়া। অবৈধ প্রণয়ে বিপত্তি। স্থান পরিবর্ত্তন। কর্ম্মক্ষেত্রে সুনাম।

মীন লগ্ন—

স্থান পরিবর্ত্তন। দুর্ঘটনার ভয়। অর্থলাভ ও আমোদপ্রমোদ। সৌভাগ্য! শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা। প্রণয় বৃদ্ধি। কর্ম্মের প্রসারতা। বিদ্যায় বাধা। গুরুজন বিয়োগ।

সুধাংশুকুমার চট্টোপাধ্যায়

ইংলণ্ড—অষ্ট্রেলিয়া টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

ইংলণ্ড ঃ ২০৫ (রিচার্ডসন ৬৮, মর্টিমোর ৪৪ নট আউট। বেনড ৪৩ রানে ৪ উইকেট) ও **২১৪** (গ্রেভনী ৫৪, কাউড্রে ৪৬। লিণ্ডওয়াল ৩৭ রানে ৩ উইকেট, রোকি ৪১ রানে ৩ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়া : ৩৫১ (ম্যাকৃডোনাল্ড ১৩৩, গ্রাউট ৭৪, বেনড ৬৪) ও ৭০ (১ উইকেটে। ম্যাকডোনাল্ড ৫২ নট আউট)

মেলবোর্ণে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়ার ৫ম টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ৯ উইকেটে ইংলণ্ডকে পরাজিত করে। ফলে ১৯৫৮-৫৯ সালের ৫টি টেষ্ট খেলার ফলাফল দাঁড়ায় অষ্ট্রেলিয়ার জয় ৪ এবং খেলা ড্র ১। আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে অষ্ট্রেলিয়ার এই 'এ্যাসেজ' লাভের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনডের কৃতিত্ব এবং অবদান সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বলতে কি ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার এই টেষ্ট সিরিজটাই রিচি বেনডের টেষ্ট সিরিজ হিসাবে টেষ্ট খেলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রথম টেষ্ট খেলার এক সপ্তাহ আগে অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক হিসাবে রিচি বেনডের নাম প্রকাশিত হয়। সারা ক্রিকেট মহলে এই ঘোষণা কম বিস্ময় সৃষ্টি করে না। ৫ম টেষ্ট খেলায় বেনড টসে জয়ী হয়ে ইংলণ্ডকে প্রথম ব্যাট করতে ছেড়ে দেন। টসে জিতে ভাল উইকেটে বিপক্ষ দলকে প্রথম ব্যাট করতে ছেড়ে দিয়ে সেই বিপক্ষ দলকে শেষ পর্য্যন্ত হারাতে পারা গেছে এমন দৃষ্টান্ত ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট সিরিজে খুব কমই আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে অধিনায়ক জনি ডগলাস টেষ্ট খেলায় এইভাবের সিদ্ধান্ত নিয়ে জয়ী হয়েছিলেন; তাঁর পর বহু অধিনায়কই চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে এ চেষ্টা একেবারে জুয়া খেলার সামিল বলে মেনে নিতে হয়েছিল। অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনড আলোচ্য ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট সিরিজের ৫ম বা শেষ টেষ্ট খেলায় সেই অসম্ভব কাজে সিদ্ধিলাভ ক'রে ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচনা করলেন।

অষ্ট্রেলিয়া ক্রিকেট খেলার সর্ব্ব বিভাগে ইংলণ্ডের থেকে উন্নত খেলার পরিচয় দিয়েছে। ইংলণ্ডের টেষ্ট সিরিজে পরাজয়ের প্রধান কারণ ব্যাটিংয়ে অসাফল্য, বিশেষ ক'রে ইংলণ্ডের ওপনিং ব্যাটসম্যানরা ইনিংসের গোড়াপত্তন মোটেই সুদৃঢ় করতে পারেন নি।

৫ম টেষ্ট খেলা অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে আর একদিক থেকে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অষ্ট্রেলিয়ার বিশ্বখ্যাত ফাস্ট বোলার আর লিণ্ডওয়াল তাঁর টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনের ২১৯টি উইকেট লাভ ক'রে টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে সর্ব্বাধিক উইকেট পাওয়ার রেকর্ড স্থাপন করেন। পূর্ব্ব রেকর্ড ছিল ক্ল্যারী গ্রিমেটের—২১৬টি। টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় সর্ব্বাধিক উইকেট পাওয়ার বিশ্ব রেকর্ড—ইংলণ্ডের এ্যালেক্স বেডসারের—২৩৬টি।

ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট ক্রিকেট খেলা ৮৩ বছরের ঐতিহ্যে বিশ্বখ্যাত। এ পর্যন্ত ১৭৮টি টেষ্ট ম্যাচ খেলা হয়েছে। অষ্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডের থেকে ১২টি টেষ্ট খেলা বেশী জয়ী হয়েছে। দু'দেশের ক্রিকেট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল—

	অষ্ট্রেলিয়ার জয়	ইংলণ্ডের জয়	ড্র	মোট খেলা
অষ্ট্রেলিয়াতে	৫৩	৩৮	৬	৯৭
ইংলণ্ডে	২১	২৪	৩৬	৮১
	৭৪	৬২	৪২	১৭৮

রঞ্জি ট্রফি :

বোম্বাই ২৯৪ (আমরোলীওয়ালা ১৩৯, দালভী ৫৮ ; পি চ্যাটার্জী ৭৬ রানে ৬ উইকেট) ও **৫৩৬** (আপ্তে ১৫৭, কেনী ১১১, ওয়াদেকার ৮৫)

বাংলা : **১৭৬** (পি রায় ৫৩ ; হারদীকার ২৪ রানে ৪, দেশাই ৫৮ রানে ৩ উইকেট) ও **২৩৪** (পি রায় ৯৫ সিলেটি ৫৮ ; দেশাই ৩৭ রানে ৪ উইকেট)

জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা—রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে বোম্বাই ৪২০ রাণে বাংলাকে পরাজিত করে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বনাম পাকিস্তান ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : **১৪৬** (ফজল মামুদ ৩৫ রানে ৪, নাশিমুল ঘানি ৩৫ রানে ৪ উইকেট) ও **২৪৫** (বুচার ৬১, সোলোমন ৬৬। ফজল মামুদ ৮৯ রানে ৩, সুজাউদ্দিন ১৮ রানে ৩ উইকেট)

পাকিস্তান : ৩০৪ (হানিফ মহম্মদ ১০৩, সৈয়দ আমেদ ৭৮। হল ৫৭ রানে ৩, গিবস ৯২ রানে ৩) ও **৮৮** (কোন উইকেট না পড়ে)

করাচিতে অনুষ্ঠিত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বনাম পাকিস্তানের প্রথম টেষ্ট খেলায় পাকিস্তান ১০ উইকেটে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলকে পরাজিত করে। খেলার ৫ম বা শেষ দিনে পাকিস্তান জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৮৮ রানের জন্য ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং ১ ঘণ্টা '৫ মিনিট খেলে কোন উইকেট না হারিয়ে প্রয়োজনীয় রান তুলে দেয়। ফজল মামুদ তাঁর টেষ্ট ক্রিকেট জীবনের শততম উইকেট লাভ করেন। পাকিস্তানের পক্ষে তিনিই প্রথম এই সম্মান লাভ করলেন।

বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে সরকারী টেষ্ট খেলায় পাকিস্তানের পক্ষে ফলাফল : পাকিস্তানের জয় ৭, হার ৬, ড্র ১১।

পাকিস্তান : ১৪৫ (হল ২৮ রানে ৪, রামাধীন ৪৫ রানে ৩ উইকেট) ও **১৪৩** (হল ৪৯ রানে ৪, এ্যাটকিনসন ৪৯ রানে ৪ উইকেট)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ৭৬ (ফজল মামুদ ৩৪ রানে ৬ উইকেট) ও **১৭২** (ফজল মামুদ ৬৬ রানে ৬ এবং হোসেন ৪৮ রানে উইকেট)

ঢাকায় অনুষ্ঠিত ২য় টেষ্ট খেলায় পাকিস্তান ৪১ রানে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলকে পরাজিত করে। খেলা শেষ হ'তে ২ দিন বাকি থাকতেই জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়। ফজল মামুদ ১২টা উইকেট পান ১০০ রান দিয়ে। এই জয়লাভের ফলে পাকিস্তান 'রাবার' লাভ করে। টেষ্ট সিরিজের তিনটি টেষ্ট খেলার মধ্যে পাকিস্তান ২টিতে জয়ী হয়।

জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান :

ত্রিবান্দ্রমে অনুষ্ঠিত ২৪তম জাতীয় এ্যাথলেটিক্ চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় সার্ভিসেস দল পুরুষ বিভাগে শীর্ষস্থান লাভ করেছে। পুরুষ বিভাগে প্রথম তিনটি দলের পয়েণ্ট—১ম সার্ভিসেস ১২০ পয়েণ্ট, ২য় পাঞ্জাব ৪৪ পয়েণ্ট এবং ৩য় মাদ্রাজ ১৮ পয়েণ্ট।

মহিলা বিভাগের ফলাফল : ১ম বোম্বাই ৩০ পয়েণ্ট। বালকদের বিভাগে ১ম পশ্চিম বাংলা ১৯ পয়েণ্ট এবং বালিকাদের বিভাগে ১ম মহীশূর ৩২ পয়েণ্ট। চার দিনের অনুষ্ঠানে মোট ২৪টি সর্ব্বভারতীয় রেকর্ড স্থাপিত হয়।

সন্তোষ ট্রফি :

১৯৫৮ সালের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাংলা ১—০ গোলে সার্ভিসেস দলকে পরাজিত ক'রে সন্তোষ ট্রফি জয়ী হয়েছে। ১৫ বার সন্তোষ ট্রফির খেলার মধ্যে বাংলা ১২ বার ফাইনালে খেলে ৯ বার ট্রফি পায়। সূচনা থেকে (১৯৪১) বাংলা পর্য্যায়ক্রমে ১০ বার ফাইনালে উঠে ৭ বার সন্তোষ ট্রফি পায়। বাংলা মাত্র ৩ বার ফাইনালে উঠতে পারেনি।

আলোচ্য বছরের খেলায় সার্ভিসেস দল সেমি-ফাইনালে গত দু' বছরের সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী হায়দ্রাবাদ দলকে ৫-২ গোলে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠে। সার্ভিসেস দলের পক্ষে লাহিড়ী 'hat-trick' করেন।

বাংলা বনাম বোম্বাইয়ের সেমি-ফাইনাল খেলাটি প্রথম দিন ১—১ গোলে ড্র যায়। ২য় দিনও খেলাটি ড্র যায়। উভয় দলই ২টি ক'রে গোল করে। বাংলা দল দু'বার অগ্রগামী থেকেও শেষ পর্য্যন্ত তা রক্ষা করতে পারেনি। বোম্বাই শেষ মিনিটে গোল দিয়ে খেলাটি ড্র করে। ৩য় দিন বাংলা ২—১ গোলে বোম্বাই দলকে পরাজিত করে।

একটি প্রসন্ন সুর ঃ শান্তশীল দাস—কবিতা পুস্তক

কবি শান্তশীল কবিতা রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। এই পুস্তকে ২৫টি ছোট কবিতা—সনেট আছে। প্রার্থনা কবিতায় কবি লিখিয়াছেন—

ব্যথা দাও, দুঃখ দাও, কোন ক্ষতি নাই,
তার সাথে যদি দীপ্ত প্রসন্নতা পাই।

অপাবৃণু কবিতায়—

ভেঙে দাও রুদ্ধ দ্বার, হে চির সুন্দর,
নির্মল আলোকে দীপ্ত হ'ক এ অন্তর।

ধ্যানে কবি বলিতেছেন—

আবার প্রতীক্ষা করি, কবে পাব ফিরে
সে সুন্দরে; কবে ধরা দেবে সে-সুন্দর
মুছে যাবে চিরতরে মোর অশ্রুজল।

সবই কবির অন্তরের প্রার্থনা। দরদী কবি নিজ সাধনার দ্বারা উপলব্ধ অভিজ্ঞতা কবিতার আকারে প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল চিরন্তন প্রার্থনা সকলের মনে লাগিবে।

[প্রকাশক : তুলি কলম, ৫৭-এ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—১৲]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নিঃসঙ্গবিহঙ্গ : বাণী রায় প্রণীত

কবি জীবনানন্দ দাশই গ্রন্থকর্ত্রীর নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ। এঁর সঙ্গে জীবনানন্দের পরিচয়ের দিনগুলি সংখ্যায় অধিক ছিল না, কিন্তু গভীরতায় গাঢ় ও স্থায়িত্বে দীর্ঘ ছিল। ব্যক্তিগত জীবনের আলোচনাও কাব্যের কিছু কিছু সমালোচনা উক্ত প্রবন্ধে আছে। এমনিভাবে গ্রন্থকর্ত্রী আলোচনা করেছেন আরও অনেক বিশিষ্ট প্রতিভাধর সাহিত্যিক ও শিল্পীকে নিয়ে তাঁর 'অভিশপ্ত গন্ধর্ব্ব' 'কীর্ত্তিনাশা কূলে' প্রভৃতি প্রবন্ধে। স্বর্গত নাট্যশিল্পী দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি মোহিতলাল মজুমদার, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল ও রবীন্দ্রজীবনের প্রেরণার উৎস কাদম্বরী দেবী নিঃসঙ্গ বিহঙ্গের মধ্যে স্থান পেয়েছেন। সাগরপারের কয়েকজন মনীষীর চরিত-কথা ও আলোচনা এই গ্রন্থে আছে।

গ্রন্থখানি প্রবন্ধ-সঙ্কলন। প্রাবন্ধিকতায় গ্রন্থকর্ত্রীর বিদগ্ধতার পরিচয় প্রত্যক্ষ করা গেছে। যে ধরণে 'নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ' লেখা হয়েছে, এ ধরণে লেখা আমাদের সাহিত্যে এখনও তেমন প্রচলন হয়নি, সাগর পারের সাম্প্রতিক সাহিত্যে প্রচুরভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন ভাল ও মন্দ উপাদান থেকে প্রকৃত ব্যক্তিসত্তার পরিচয় দেবার প্রচেষ্টায় এই গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করেছে। গ্রন্থকর্ত্রী বলেছেন—'সাহিত্য বিচারে' আমি সাহিত্যিককে জড়িত করে প্রোফাইলের প্রথায় নূতন আঙ্গিক বাংলায় আনবার চেষ্টা করেছি।' এঁর সে চেষ্টা সার্থক হয়েছে। গ্রন্থখানির মধ্যে কৌতূহলপ্রদ ঘটনার অবতারণা আছে, কাব্য ও সাহিত্যের আলোচনা আছে; আর আছে ব্যক্তিসত্তার রূপরেখা। এই চিত্তাকর্ষক গ্রন্থখানি পড়ে খুব তৃপ্তি পেয়েছি, আমাদের বিশ্বাস পাঠকপাঠিকারাও পড়ে খুব তৃপ্তিলাভ করবেন। সুন্দর প্রচ্ছদপট, ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উত্তম।

[প্রকাশক—মুখার্জ্জী বুক হাউস, ৫৭নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬, মূল্য—তিন টাকা আট আনা]।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নতুন রেকর্ড

কয়েকখানা কলম্বিয়া রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ—

GE 24917—মাথুর বাণীচিত্রের দুখানা গান পঙ্কজ মল্লিকের সুরসৃষ্টিতে শোভারায় চৌধুরীর সুস্পষ্ট কণ্ঠে পরিবেশিত হয়েছে। গান দুখানা—'মালঞ্চে ফুটাইছে ফুল মালতী বকুল' ও 'বন্ধু এলনা, কারকুঞ্জে রইল শ্যাম।'

GE 24918—'গুণগুণাইয়া গান গাও' ও 'আগে জানলে আমি যাইতাম না'—গান দুখানা গেয়েছেন যথাক্রমে সুমিত্রা সেন ও বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়।

GE 24919—কুমারী সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুললিতকণ্ঠে দুখানা মনোরম আধুনিক গান—'আঁধারে লেখে গান' ও 'ডাগর ডাগর নয়ন মেলে'।

GE 24920—'গোলাপের পাপড়ি ঝরা' ও ঝিনুক ঝিনুক 'ঝিনুক তুলে'—শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের দরদীকণ্ঠে দুখানা আধুনিকগান সুশ্রাব্য হয়েছে সুরলালিত্যে।

GE 24921—জনপ্রিয় শিল্পী পান্নালাল ভট্টাচার্যের কণ্ঠে দুখানা রামপ্রসাদী গান—'মন তোমার এই ভ্রম গেল না' ও 'চাইনা মাগো রাজা হতে' সত্যিই মনে ভাবের উদ্রেক করে!

GE 24922—সর্বজনপ্রিয় শিল্পী গায়ত্রী বসুর কণ্ঠে 'ঐ পাখী জানে' ও 'প্রথম মুকুল তুমি ঝরোনা' দুখানা আধুনিক গান ভাবব্যঞ্জনায় ও সুরমাধুর্যে শ্রোতার মনকে দোলা দেয়॥

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী : শ্রীশিবশঙ্কর কুণ্ডু — দিনের শেষে — ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ভারতবর্ষ

বৈশাখ—১৩৬৬

দ্বিতীয় খণ্ড | ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

মাঘ কবির কাব্যকলা

অধ্যাপক শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য

সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথ মাঘ-কবির শিশুপালবধের ব্যাখ্যার প্রারম্ভে বলেছিলেন—

যাঁরা শব্দ ও অর্থের প্রয়োগসৌষ্ঠব উপভোগ করতে চান, যাঁরা গুণ ও অলঙ্কারের মর্মগ্রহণে আগ্রহশীল, যাঁরা সৎকাব্যের ধ্বনিপথে বিচরণ করতে অভিলাষী, যাঁরা উত্তাল ভাবতরঙ্গময় রসামৃতপ্রবাহে অবগাহনেচ্ছু, তাঁদের জন্যই আমি মাঘের 'সর্বংকষা' টীকা লিখছি।

যে শব্দার্থপরীক্ষণপ্রণয়িনো যে বা গুণালঙ্ক্রিয়া-
শিক্ষাকৌতুকিনো বিহর্তুমনসো যে চ ধ্বনেরধ্বনি।
ক্ষুভ্যদ্ভাবতরঙ্গিতে রসসুধাপূরে নিমজ্জন্তি যে
তেষামেব কৃতে করোমি বিবৃতিং মাঘস্য সর্বঙ্কষাম্‌॥

এই কাব্যের নায়ক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। বীররস এর প্রধান অবলম্বন। কিন্তু কবি তাঁর অপূর্ব বর্ণনায় শৃঙ্গারাদি সমস্ত রসেরই সহায়তা নিয়েছেন। ইন্দ্রপ্রস্থযাত্রা এর বর্ণনীয় বিষয়। শিশুপালনিধনে এর সমাপ্তি। ধন্য মাঘকবি! আর ধন্য আমরা যারা তাঁর সূক্তিরসের আস্বাদ গ্রহণ করছি।

নেতাস্মিন্ [illegible]ন্দনঃ স ভগবান্ বীরঃ প্রধানো রসঃ
শৃঙ্গারাদিভি[illegible]বান্ বিজয়তে পূর্ণা পুনর্বর্ণনা।
ইন্দ্রপ্রস্থগ[illegible]পায়বিষ[illegible]শ্চভাবসাদঃ ফলং
[illegible]মাঘকবির[illegible] কৃতিনস্তৎসূক্তিসংসেবনাৎ॥

সংস্কৃত ভাষায় পাঁচখানি মহাকাব্য বিখ্যাত। শিশুপালবধ এই পঞ্চকাব্যের অন্যতম। বৃহত্রয়ীর মধ্যেও এই গ্রন্থের নাম গণ্য করা হয়। চেদি দেশের দুর্বুদ্ধি রাজা শিশুপাল হঠকারিতার ফলে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হয়েছিলেন—মহাভারতের সেই পরিচিত কাহিনী অবলম্বনে মাঘ সুদীর্ঘ বিংশতি সর্গে কাব্য প্রণয়ন করেছেন।

আখ্যানের কোন কোন অংশ তিনি বিষ্ণুপুরাণ বা ভাগবত থেকে গ্রহণ করেছেন। ঘটনার অঙ্গবিন্যাসে ভারবির কিরাতার্জুনীয় ছিল তাঁর আদর্শ।

এদেশের অপর অনেক কবির মত মাঘও আত্মপরিচয় সামান্যই দিয়েছেন। তাঁর পিতামহ সুপ্রভদেব ছিলেন বর্মল বা বর্মলাত নামে এক রাজার মন্ত্রী, আর পিতা ছিলেন দত্তক সর্বাশ্রয়। নানা কারণে অনুমান করা হয়—মাঘ খ্রীষ্টীয় ৭ম বা ৮ম শতকে বর্তমান ছিলেন।

শিশুপালবধের প্রসাধনে কবি অনেকস্থলে বাহ্যভূষার প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি ত্র্যক্ষরে, দ্ব্যক্ষরে, এমন কি, একটিমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণের সাহায্যে কবিতা রচনা করেছেন; নানা ছন্দে, নানা ভঙ্গীতে যমক-অনুপ্রাস প্রয়োগ করেছেন; চক্রবন্ধ, মুরজবন্ধ প্রভৃতি পদ্মবন্ধে শ্লোক সাজিয়েছেন। এতে তাঁর অদ্ভুত নির্মাণ-কৌশল প্রকাশ পেয়েছে, শব্দ-ভাণ্ডারের উপর অবাধ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরূপ বিস্ময়কর শিল্প-নৈপুণ্য পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক হলেও সর্বত্র কাব্যরসের পরিপোষক হয় নি। ভাষার আড়ম্বরে, ছন্দের গহনতায়, বর্ণনার আতিশয্যে অনেক স্থলে ভাবের প্রসার ব্যাহত হয়েছে। শব্দ আর অর্থ এই উভয়ের সামঞ্জস্যে, উভয়ের সহকারিতায় উত্তম সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। মাঘের দৃষ্টি ছিল শব্দের দিকে অধিক।

কিন্তু একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, এই মাঘই ঘোষণা করেছেন—উত্তম কবি শব্দ ও অর্থ উভয়েরই অপেক্ষা রাখেন।

'শব্দার্থৌ সৎকবিরিব দ্বয়ং বিদ্বানপেক্ষতে।'

মাঘের কাব্যে এমন স্থল মোটেই বিরল নয়, যেখানে কবি সব্যসাচীর মত শব্দের প্রযোজনায় আর অর্থের সংযোজনায় সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন; কারুশিল্পের মহাপ্রবাহের সঙ্গে চারুশিল্পের রসনিস্যন্দের মিলন ঘটিয়েছেন, বাগ্বিন্যাসের ঘনঘটার অন্তরালে ভাবনির্ঝরের অমৃতধারা সঞ্চার করেছেন।

শিশুপালবধ সংস্কৃত বিদ্যার্থীর প্রিয় কাব্য। এমনও অনেকে বলেন—বিচিত্র পদবৈভবে সমৃদ্ধ মাঘের নয়টি মাত্র সর্গের সঙ্গে যার পরিচয় ঘটে, তার কোন শব্দ অজ্ঞাত থাকে না।

নবসর্গগতে মাঘে নবশব্দো ন বিদ্যতে।

কথা মিথ্যা নয়। মাঘের শব্দ-সম্ভার অফুরন্ত, প্রয়োগ-পটুত্ব অসাধারণ।

শব্দের পারিপাট্যে, ছন্দের বৈচিত্র্যে, অলঙ্কারের সৌষ্ঠবে বিমুগ্ধ হয়ে সেকালের সমালোচকরা মাঘের উপর পক্ষপাত দেখিয়েছেন, কাব্যের প্রশংসায় অত্যুক্তি করেছেন। কেউ বলেছেন—কাব্যের পরা কাষ্ঠা মাঘ—'কাব্যেষু মাঘঃ'। কেউ বা বলেছেন—বিভিন্ন কবির যত বৈশিষ্ট্য সমস্তই এক মাঘে পাওয়া যায়। কালিদাসের উপমা, ভারবির অর্থগৌরব, দণ্ডীর পদলালিত্য—তিন গুণই মাঘে আছে।

উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
দণ্ডিনঃ পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ॥

অজ্ঞাতনামা গুণগ্রাহীদের এসকল উক্তিতে অতিরঞ্জন আছে, সে কথা সত্য। তা হলেও মাঘের কাব্যে উপমার মাধুর্য, অর্থের গাম্ভীর্য, লালিত্যের প্রাচুর্য অসাধারণ। রুচিভেদের বৈষম্য সত্ত্বেও মাঘের শিশুপালবধ ভাবের গভীরতায়, কল্পনার বিচিত্রতায়, ভাষার বহুরূপতায় প্রাচীন সাহিত্যক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

কাব্যের প্রারম্ভে মহামুনি নারদ দ্বারকায় কৃষ্ণের কাছে বার্তা বহন করে আনলেন—উচ্ছৃঙ্খল শিশুপালের অত্যাচারে জনগণ উৎপীড়িত। ইন্দ্রের অনুরোধে তুমি এই দুর্বৃত্তকে বধ কর। দুষ্কৃতির ফলে স্বভাবতই দুর্জনদের বিপদ ঘনিয়ে আসে, তখন শিষ্টজনেরা তাদের দমন করেন।

তদেনমুল্লঙ্ঘিতশাসনং বিধের্বিধেহি কীনাশনিকেতনাতিথিম্।
শুভেতরাচারবিপক্তিমাপদো বিপাদনীয়া হি সতামসাধবঃ॥

নারদের এই নির্বন্ধবাক্যে গগনাঙ্গনে ধূমকেতুর মত ক্রুদ্ধ কৃষ্ণের মুখমণ্ডলে প্রলয়-ভ্রুকুটি ফুটে উঠল। তিনি চির-বিদ্বেষী শিশুপালের উৎসাদনে স্বীকৃতি জানালেন।

ওমিত্যুক্তবতোঽথ শার্ঙ্গিণ ইতি ব্যাহৃত্য বাচং নভ-
স্তস্মিন্নুৎপতিতে পুরঃ সুরমুনাবিন্দোঃ শ্রিয়ং বিভ্রতি।
শত্রূণামনিশং বিনাশপিশুনঃ ক্রুদ্ধস্য চৈদ্যং প্রতি
ব্যোম্নীব ভ্রুকুটিচ্ছলেন বদনে কেতুশ্চকারাস্পদম্॥

কিন্তু পূর্বে ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে পাণ্ডবযজ্ঞে আমন্ত্রণ এসেছে। চেদিরাজ্যে অভিযান করলে সে আমন্ত্রণ রক্ষিত হয় না। দ্বিধাকুল মুরারি গুরুজনদের মন্ত্রণা চাইলেন। মন্ত্রী উদ্ধব এবং অগ্রজ বলদেবকে ডেকে পাঠালেন।

যিযক্ষমাণেনাহূতঃ পার্থেনাথ দ্বিষন্মুরম্।
অভিচৈদ্যং প্রতিষ্ঠাসুরাসীৎ কার্যদ্বয়াকুলঃ॥
গুরুদ্বয়ায় গুরুণোরুভয়োরথ কার্যয়োঃ।
হরির্বিপ্রতিষেধং তমাচচক্ষে বিচক্ষণঃ॥

কৃষ্ণাগ্রজ বলদেব উগ্রস্বভাব, তাঁর নীতিও অনুরূপ। স্বপক্ষের বৃদ্ধি আর বিপক্ষের বিনাশ ছাড়া তাঁর কিছুই কাম্য নেই।

আত্মোদয়ঃ পরজ্যানির্দ্বয়ং নীতিরিতীয়তী।

তিনি বললেন, শত্রুর উৎপাটন ব্যতীত প্রতিষ্ঠালাভ অসম্ভব, ধূলিজালকে কর্দমে পরিণত না করলে জল দাঁড়াতে পারে না।

বিপক্ষমখিলীকৃত্য প্রতিষ্ঠা খলু দুর্লভা।
অনীত্বা পঙ্কতাং ধূলিমুদকং নাবতিষ্ঠতে॥

বলদেব আরও বললেন—ওজস্বিতা সম্ভ্রম বৃদ্ধি করে, মৃদুতা হীনত্বের হেতু হয়। সূর্য ও চন্দ্র উভয়ের অপরাধ সমান। অথচ রাহু সূর্যকে বহুদিনের ব্যবধানে আক্রমণ করে; কিন্তু চন্দ্রকে ঘন ঘন গ্রাস করে। চন্দ্রের মৃদুত্বই এর যথার্থ কারণ।

তুল্যেঽপরাধে স্বর্ভানুর্ভানুমন্তং চিরেণ যৎ।
হিমাংশুমাশু গ্রসতে তন্ম্রদিম্নঃ স্ফুটং ফলম্॥

লোকে পরাক্রমকেই সম্মান দেয়। যে সিংহ নিষ্ঠুরভাবে মৃগদল ধ্বংস করে, সকলে তাকেই বলে মৃগাধিপ, কিন্তু যে চন্দ্র মৃগকে অঙ্কে ধারণ করে, তার নাম দেয় মৃগলাঞ্ছন।

অঙ্কাধিরোপিতমৃগশ্চন্দ্রমা মৃগলাঞ্ছনঃ।
কেসরী নিষ্ঠুরক্ষিপ্তমৃগযূথো মৃগাধিপঃ॥

যাঁর শক্তি আছে, তিনি বিধিনিষেধ গ্রাহ্য করেন না। উদ্দাম প্রতাপের কাছে শাস্ত্রনিয়ম কিছুই নয়। তেজ কখনও তিমিরের বশীভূত হয়ে একত্র অবস্থান করে না।

অনৃতুচ্ছৃঙ্খলং সত্ত্বমন্যচ্ছাস্ত্রনিয়ন্ত্রিতম্।
সামানাধিকরণ্যং হি তেজস্তিমিরয়োঃ কুতঃ॥

বলরামের মতে আমন্ত্রণ রক্ষা অপেক্ষা শত্রুবধ অধিক লাভজনক। পাণ্ডবেরা যজ্ঞ করুন, ইন্দ্র স্বর্গে আধিপত্য করুন, সূর্য তাপ বিকীরণ করুন, আমরাও আমাদের শত্রু নিপাত করি। সকলেই স্বার্থ চায়।

যজতাং পাণ্ডবঃ স্বর্গমবত্বিন্দ্রস্তপত্বিনঃ।
বয়ং হনাম দ্বিষতঃ সর্বঃ স্বার্থং সমীহতে॥

প্রবীণ মন্ত্রী উদ্ধব সব শুনলেন। তিনি কটাক্ষ করে বললেন, অজ্ঞেরা কর্ম করে অল্প, ব্যস্ত হয় অধিক। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মহা ব্যাপারেও অচঞ্চল থাকেন।

আরভন্তেঽল্পমেবাজ্ঞাঃ কামং ব্যগ্রা ভবন্তি চ।
মহারম্ভাঃ কৃতধিয়স্তিষ্ঠন্তি চ নিরাকুলাঃ॥

উদ্ধবের মতে রাজনীতিক কার্যে মৃদুতা উগ্রতা উভয়েরই স্থান আছে; প্রতীক্ষা প্রযত্ন উভয়ই আবশ্যক।

তেজঃ ক্ষমা বা নৈকান্তং কালজ্ঞস্য মহীপতেঃ।
নৈকমোজঃ প্রসাদো বা রসভাববিদঃ কবেঃ॥
নালম্বতে দৈষ্টিকতাং ন নিষীদতি পৌরুষে।
শব্দার্থৌ সৎকবিরিব দ্বয়ং বিদ্বানপেক্ষতে॥

সুতরাং অনুকূল মুহূর্তের প্রতীক্ষা কর্তব্য। উপযুক্ত কাল ভিন্ন শিশুপালের বিনাশ অসাধ্য।

সময়াবধিমপ্রাপ্য নান্তায়ালং ভবানপি।

স্থিরবুদ্ধি উদ্ধবের যুক্তির ফলে যুদ্ধাভিযান স্থগিত রইল। শ্রীহরি সসৈন্যে ইন্দ্রপ্রস্থে যাত্রা করলেন।

অপেতযুদ্ধাভিনিবেশসৌম্যো হরির্হরিপ্রস্থমথ প্রতস্থে।

ব্রহ্মার অঙ্গ থেকে প্রজাসঙ্ঘের মত, শম্ভুর জটাজুট থেকে বারিপ্রবাহের মত, স্বয়ম্ভুর মুখ থেকে শ্রুতিসন্ততির মত মধুজয়ীর বিপুল বাহিনা পুরী থেকে নির্গত হল।

প্রজা ইবাঙ্গাদরবিন্দনাভেঃ শম্ভোর্জটাজূটতটাদিবাপঃ।
মুখাদিবাথ শ্রুতয়ো বিধাতুঃ পুরান্নিরীয়ুর্মধুজিদ্ধ্বজিন্যঃ॥

পথে অত্যুচ্চ রৈবতক মহাকালের মত দণ্ডায়মান। গিরিগাত্রে জলহীন পাণ্ডুর মেঘমালা শিবদেহে শুভ্র উত্তরীয়ের শোভা ধারণ করেছে।

কচিজ্জলাপায়বিপাণ্ডুরাণি ধৌতোত্তরীয় প্রতিমচ্ছবীনি।
অভ্রাণি বিভ্রাণমুমাঙ্গসঙ্গবিভক্তভস্মানমিব স্মরারিম্॥

সেখানে কমলদলে মধুকর বিচরণ করে, তরুবীথিকা তাপ হরণ করে, সুন্দরী সুরললনা নির্ভয়ে বিহার করেন।

রাজীবরাজীবশলোলভৃঙ্গং মুষ্ণন্তমুষ্ণং ততিভিস্তরূণাম্।
কান্তাংলকান্তা ললনাঃ সুরাণাং
রক্ষোভিরক্ষোভিতমুদ্বহন্তম্॥

পর্বতপৃষ্ঠে এক পার্শ্বে উদয়োন্মুখ সূর্য, অপর পার্শ্বে অস্তগামী চন্দ্র, যেন হস্তিগণ্ডলম্বিত ঘণ্টাদ্বয়, উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত রশ্মিচ্ছটা যেন তার বন্ধনরজ্জু।

উদয়তি বিততোর্ধ্বরশ্মিরজ্জাবহিমরুচৌ
হিমধাম্নি যাতি চাস্তম্॥
বহতি গিরিরয়ং বিলম্বিঘণ্টাদ্বয়পরিবারিত-
বারণেন্দ্রলীলাম্॥

নির্ঝরিণীরা শৈলশিখর ত্যাগ করে সাগর উদ্দেশে যাত্রা করেছে, ইতস্ততঃ বিহগকূজন ধ্বনিত হচ্ছে; যেন অপত্যবৎসল রৈবতক পতিগৃহগামিনী আত্মজাদের বিচ্ছেদে বিলাপ করছেন।

অপশঙ্কমপরিবর্তনোচিতাশ্চলিতাঃ পুরঃ পতিমুপেতুমাত্মজাঃ।
অনুরোদিতীব করুণেন পত্রিণাং বিরুতেন
বৎসলতয়ৈষ নিম্নগাঃ॥

সুদূর যাত্রাপথে পর্যায়ক্রমে নানা ঋতু অতিক্রান্ত হতে লাগল। কত অস্তোদয়, কত সন্ধ্যাপ্রভাত আবর্তিত হল।

সেখানে বিকচ কমলের গন্ধ ভৃঙ্গদের মাতিয়ে তোলে, মকরন্দের সুবাস ছড়িয়ে স্নিগ্ধ সমীর ক্লান্তি দূর করে।

বিকচকমলগন্ধৈরন্ধয়ন্ ভৃঙ্গমালাঃ সুরভিতমকরন্দং মন্দমা-
বাতি বাতঃ।
প্রমদমদনমাদ্যদ্যৌবনোদ্দামরামা রমণরভসখেদস্বেদ-
বিচ্ছেদদক্ষঃ॥

দিনারম্ভে নিশানাথ শ্রীহীন হয়েছেন, রজনী বিদায় নিয়েছে, কুমুদিনী নিমীলিত হয়ে আছে, তারকারাও অস্তমিত। সঙ্গিনীদের হারিয়েই যেন চন্দ্র ম্লান হয়েছেন।

সপদি কুমুদিনীভির্মীলিতং হা! ক্ষপাপি
ক্ষয়মগমদপেতাস্তারকাস্তাঃ সমস্তাঃ!
ইতি দয়িতকলত্রশ্চিন্তয়ন্নঙ্গমিন্দু-
র্বহতি কৃশমশেষং ভ্রষ্টশোভং শুচেব॥

উষা রজনীর অচিরোৎপন্না আত্মজা। শিশু কন্যা যেমন ক্রন্দনের ধ্বনি তুলে জননীর পশ্চাৎ গমন করে, তেমনই উষা কাকলির রব তুলে রজনীর সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল।

অরুণজলরাজীমুগ্ধহস্তাগ্রপাদা
বহুল মধুপমালাকজ্জলেন্দীবরাক্ষী।
অনুপততি বিরাবৈঃ পত্রিণাং ব্যাহরন্তী
রজনিমচিরজাতা পূর্বসন্ধ্যা সুতেব॥

উদয়গিরি থেকে মৃদু কর বিস্তার করে তরুণ সূর্য গগনে উঠলেন। যেন প্রাঙ্গণ থেকে ক্রীড়ারত শিশু কোমল করাগ্র প্রসারিত করে মাতৃক্রোড়ে আরোহণ করল।

উদয়শিখরিশৃঙ্গপ্রাঙ্গণেষ্বেষ রিঙ্গন্
সকমলমুখহাসং বীক্ষিতঃ পদ্মিনীভিঃ।
বিততমৃদুকরাগ্রঃ শব্দয়ন্ত্যা বয়োভিঃ
পরিপততি দিবোংঙ্কে হেলয়া বালসূর্যঃ॥

স্বল্প সুপ্তির ক্ষণিক বিশ্রামের পর প্রত্যূষে বিগতক্লম রাষ্ট্রনায়ক প্রসন্ন মনে দুরবগাহ রাষ্ট্রচিন্তায় নিরত হন, কবি কাব্যানুশীলন করেন।

ক্ষণশয়িতবিবুদ্ধাঃ কল্পয়ন্তঃ প্রয়োগানুদধিমহতি রাজ্যে
কাব্যবদ্দুর্বিগাহে।
গহনমপররাত্রপ্রাপ্তবুদ্ধিপ্রসাদাঃ কবয় ইব মহীপা-
শ্চিন্তয়ন্ত্যর্থজাতম্॥

দিবসের আগমনে বিক্ষিপ্ত তিমিরপুঞ্জ টেনে নিয়ে

যামিনী প্রস্থান করে, কমলাক্ষী বিলাসিনীরাও স্রস্ত কেশ-পাশ নিয়ে পথ অতিক্রম করে।

লুলিতনয়নতারাঃ ক্ষামবক্ত্রেন্দুবিম্বা রজনয় ইব নিদ্রাক্লান্ত-
নীলোৎপলাক্ষ্যঃ।
তিমিরমিব দধানাঃ স্রংসিনঃ কেশপাশানবনিপতিগৃহেভ্যো
যান্ত্যমূর্বারবধ্বঃ॥

নানাপ্রকার অভিজ্ঞতা নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ যথাকালে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে উপস্থিত হলেন। যজ্ঞসভায় সমাগত সভ্যদের মধ্যে তিনিই লাভ করলেন শ্রেষ্ঠার্ঘ্য। সভাসীন শিশুপাল প্রতি-পক্ষের এ সম্মান সহ্য করতে পারলেন না; যুদ্ধোদ্যোগ ঘোষণা করলেন। বলোদ্ধত সৈন্যগণের সমরকোলাহল বেগবিক্ষুব্ধ নদীসমূহের গর্জনধ্বনির মত শোনাতে লাগল। অস্ত্রের ঝন-ঝনার মধ্যে মহারণ আরম্ভ হল।

আয়াস্তীনামবিরতরয়ং রাজকানীকিনীনা-
মিত্থং সৈন্যৈঃ সমমলঘুভিঃ শ্রীপতেরূর্মিমদ্ভিঃ।
আসীদোঘৈর্মহদিব মহদ্বারিধেরাপগানাং
দোলাযুদ্ধং কৃতগুরুতরধ্বানমৌদ্ধত্যভাজাম্॥

এই সংশয়িত সংগ্রামে শ্রীকৃষ্ণ অনলবর্ষী চক্রধারে অরিদেহ নির্মস্তক করলেন।—

তেনাক্রোশত এব তস্য মুরজিত্তৎকাললোলানল-
জ্বালাপল্লবিতেন মূর্ধ বিকলং চক্রেণ চক্রে বপুঃ॥১

১ আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্র হইতে প্রচারিত।

চৌপদী

বেতাল ভট্ট

(১)

আমরা ঘুঁটে পুড়ছি বটে, সে ব্যথাটা সইবে।
তুমি গোবর হাস্‌ছ বটে ক'দিন হাসি রইবে?
গোরুর পেটে আছে গোবর তাও তো ধরায় আসবে।
ঘুঁটে হয়ে পুড়বে তুমি, তখন তা যে হাসবে।

(২)

আশ্রিতে করিবে বড়, ভালো কথা, তাই করো,
দেখো যেন তোমারেও না যায় ছাড়িয়ে।
দেখো সে হইয়া উচ্চ তোমারে না গণে তুচ্ছ
যারে তুমি ফুঁয়ে ফুঁয়ে তুলেছ বাড়িয়ে।

(৩)

বাবুর পাদুকা জোড়া দামী ভেলভেট মোড়া
পায়ে থাকে প্রণতের তরে,
কড়া জুতা এক পাটি তোলা থাকে, সে জুতাটি
দুর্বলের ঘাড়ে পিঠে পড়ে।

(৪)

ভারতের মানচিত্র? তোমার নিজের দেশ
দেখছ কি ওখানে?
ঝুলে যেন ঠ্যাঙবাঁধা ছালতোলা ছাগশিশু
কশাইএর দোকানে।

(৫)

ভাত ছড়ালে হয় না কাকের অভাব
গর্বভরে বলত যত ছোট বড় নবাব।
আজকে তারা খাচ্ছে গড়াগড়ি
হাজার কাকে নৃত্য করে' তাদের 'পরে চড়ি।

(৬)

দুর্বোধ কবিতায় অনেক ঘামায়ে মাথা
পাঠক কষ্টেই পায় রস।
শতকরা নব্বই কৃতিত্ব পাঠকের
কবির পাওনা শুধু দশ।

(৭)

গ্রন্থের প্রচার,
সিংহ আর শৃগালের মিলিত শিকার।
তারপর ভাগ বাঁটোয়ারা?
তাদের অজ্ঞাত নয়, ঈশপ কি কথামালা
একদিন পড়িয়াছে যারা।

(৮)

শত শত যুগ হতে মিলি কবিবর্গ
কামেরে প্রেমের নামে বানায়েছে স্বর্গ।
তাই নিয়ে বাড়াবাড়ি দেখি সব বইতে
সে প্রেমের নামে হয় সাতখুন সইতে।

(৯)

বাণীর মন্দিরে উঠে সঘনে বৃংহণ
হইল ডি-ফিলখানা তাঁহার প্রাঙ্গণ।
গণেশেরে কয় বাণী তুমি লও ভার,
সামলাতে পদ্মবন চলিনু এবার।

(১০)

এরণ্ড হয়েছ তুমি দ্রুম,
শিয়ালকাঁটার বন করে তোমা স্তব,
তৃণগণ তব মূলে ঢালিছে কুসুম,
দূরে রয়ে হাসিতেছে বনস্পতি সব।

নতুন বাসর

রবীন্দ্রকমল কর

গ্রামের কোল ঘেঁষে খালটি এঁকেবেঁকে চলে গেছে গ্রামান্তরে। পারের বুনো ঘাস নুয়ে এসে পড়েছে জলে —যেন কত পিপাসার্ত। এদিক সেদিক ভেসে যাচ্ছে দু'চারটে নৌকো। দাঁড়ের সপ্‌সপ্‌ শব্দ আর গাঙ্‌-শালিকের কিচিরমিচির। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের শূন্যতাকে ভ'রে তুলছে ক্ষণে ক্ষণে।

যদিও সারা বছরই এই খাল নৌকো চলাচলের উপ-যোগী থাকে, কিন্তু আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে যখন তার দুই পার জলে ভেসে যায় তখনই নৌকো চলাচলের হয় সুবিধে। আত্মীয়-পরিজনদের বাড়ীতে বেড়াবার ধুম পড়ে যায় গাঁয়ে। দিনের সারাক্ষণই খালের বুক বেয়ে চলে নৌকোর অন্তহীন শোভাযাত্রা। আচম্‌কা মাঝি-মাল্লাদের গানে গাঁয়ের বৌ-ঝিরা থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে। সুনীল দুটি চোখ দিগন্তের সুনীল আকাশে মেলে ধরে।

"উঃ, কতকাল বাপের বাড়ী যাইনি।" একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন দত্তগিন্নী।

ফোড়ন কাটে সুরজা। "দত্ত মশাইকে ছেড়ে থাকতে পারবেন তো?" এ গাঁয়েই ওর বাপের বাড়ী! তাই ওর মুখের বাঁধন একটু আলগা।

হেসে ওঠে সবাই। দত্তগিন্নী যেন একটু লজ্জা পান। তারপরই সামলে নিয়ে বলেন, "পরিমলকে ছেড়ে তোরই বুঝি থাকতে কষ্ট হচ্ছে?"

আবার হাসে সবাই। পরিমল সুরজার স্বামী। মাস কয়েক হল বিয়ে হয়েছে তাদের। কলকাতার কি একটা সওদাগরী অফিসে কাজ করে পরিমল।

বেগতিক দেখে পালিয়ে যায় সুরজা। দত্তগিন্নীর কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়। সত্যিই তো পরিমলের জন্য মনটা কেমন করে। সেই যে বিয়ের পর গেল তারপর কৈ একবারও তো এল না। কী এমন কাজ পরিমলের! কাজ ফেলে কি একদিনের জন্যেও আসা যায় না!

একটু অবসর পেলেই সুরজা তার ঘরের জানালার সামনে এসে দাঁড়াবে। সেখান থেকে খালের জল স্পষ্ট দেখা যায়। জলে কাঁপতে কাঁপতে নৌকোগুলো যখন ভেসে যায় বেশ লাগে ওর দেখতে। এই জানলা দিয়েই ও প্রথম দেখেছিল পরিমলকে। বর আসছে—বর আসছে। একটা হুলস্থুল পড়ে যায় চারদিকে। কি এক অদম্য কৌতূহল হয় সুরজার। সবার অলক্ষ্যে চুপিসাড়ে এসে তার ঘরের জানলার সামনে দাঁড়ায়। বর দেখার জন্যে খালের পারে ভিড় জমে উঠেছে। এত ভিড়ে পরিমলকে কি করে দেখা যাবে। সুরজা ভাবে লোক-গুলো কি বেহায়া, যেন বর দেখেনি কখনো! বর তো আমার, তোদের কি। তোরা কেন ভিড় করছিস। যা-না বাপু সরে। আমার চিরজীবনের সঙ্গীকে একবার দু'চোখ ভরে দেখি। নয়ন সার্থক করি।

এরই এক ফাঁকে সুরজা পরিমলকে দেখে নেয়। খুশীতে ভরে ওঠে তার মন। এই হবে তার স্বামী। তার চিরজীবনের সাথী। ইহকাল পরকালের দেবতা। এত সুখও লিখা ছিল তার কপালে! এইতো সেদিনের কথা। তবু মনে হয় কতকাল, কতযুগ, আগের।

কত নৌকোই না ভেসে চলেছে খালের জলে। কত নতুন মানুষই না এসেছে গাঁয়ে।

সুরজা প্রতিটি লোকের দিকে নজর রাখে। চেনা শোনা কাউকে দেখলেই ছুটে যায়। অনুযোগের সুরে বলে, "এতদিনে তা হলে মনে পড়ল বড়দি।"

নীলিমা তার স্বামীকে নিয়ে বাপের বাড়ী বেড়াতে আসে। বিয়ের পর গাঁয়ে তার এই প্রথম পদার্পণ।

সুরজা দেখতে পেয়েই ছুটে আসে। বলে, "বেশ মেয়ে যা হোক'তুই নীলি'। গাঁয়ের কথা বুঝি একবারও মনে পড়ে না ?"

"পড়বে না কেন ভাই। একা তো আর আসতে পারি না।"

"একা আসতে পারিস না—না দাসমশাইকে ছেড়ে আসতে কষ্ট হয় ?" ঠোঁটে ছোট্ট একটু হাসির ঢেউ তুলে সুরজা সকৌতুকে প্রশ্ন করে।

"আমার মোটেই হয় না," নীলিমা তার স্বামীর দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করে, "তবে ওর হয়। আমাকে ছেড়ে ও একদণ্ড থাকতে পারে না।"

নীলিমা হাসে। সুরজাও হাসে।

রুমাল দিয়ে বিজন তখন মুখ মুছচে। সুরজা জিজ্ঞেস করে, "আমায় চিনতে পারছেন ?"

"তা আর পারছি না—বিয়ের রাতে আপনি আমায় যা জব্দ করেছিলেন—"।

বিজন চটপট জবাব দেয়।

নীলিমা বলে, "তোর কথা প্রায়ই বলে ও। তুই নাকি দেখতে খু-উব-সুন্দর···ভালো গান জানিস···তোর কাছে আমি কিছুই না—"

শশব্যস্ত হয়ে ওঠে বিজন। বলে, "দেখুন ও-সব একেবারে মিথ্যে কথা। একটুও বিশ্বাস করবেন না।"

সুরজা আর নীলিমা দু'জনেই সশব্দে হেসে ওঠে।

সেদিন সারারাত ঘুম হয় না সুরজার। কি এক অসহ্য যন্ত্রণায় বিছানার এপাশ ওপাশ করে ও। নীলিমা কত সুখী। স্বামী তার কত আপনার। একদণ্ডও নাকি তাকে ছেড়ে থাকতে পারে না। আর পরিমল ? সে তো তাকে ছেড়ে দিব্যি আছে। বিয়ের পরে তো ক'মাস কেটে গেল। ক'টা চিঠি দিয়েছে পরিমল তাকে। তবে কি পরিমল তাকে ভুলে গেল ? যেমন করে দুষ্মন্ত ভুলে গিয়েছিলেন শকুন্তলার কথা ? না—না, তা কেমন করে সম্ভব !

বিয়ের রাতে দেখা পরিমলের চেহারাটা সুরজার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কি সুন্দরই না দেখতে পরিমল। যেন ঠিক রাজপুত্তুর। কে জানে হয়তো বা তাকে রাজকন্যা ভেবে ভুল করে গলায় মালা দিয়ে গেছে। পরিমল, কি সুন্দর নাম। নীলিমা পরিমলকে দেখেনি। দেখলে বুঝতে পারত সে তার চেয়ে কত বেশী সৌভাগ্যবতী।

বাসর ঘর থেকে একে একে সবাই যখন বেরিয়ে গেল পরিমল তখন সুরজার একটা হাত চেপে ধরেছে। ভীষণ লজ্জা করছিল সুরজার। কে কোথা দিয়ে আবার দেখে ফেলে। পরিমলের ওসব বালাই নেই। সুরজার কানের কাছে মুখটা এনে বলেছিল, "আজ কী সুন্দর রাত, তাই না সুর।"

পরিমলের মুষ্টি বন্ধন থেকে নিজের হাতটা মুক্ত করার একটা নিষ্ফল প্রচেষ্টা করেছিল সুরজা, যদিও বেশ লাগছিল ওর বলিষ্ঠ স্পর্শটুকু।

"রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী করে—যতক্ষণ চিনি নাই তোরে," বলেই ছেড়ে দিয়েছিল পরিমল।

সুরজা শাড়ীর আঁচল দিয়ে নিজেকে আরও বেশী করে জড়িয়ে খাটের একপাশে মুখ ফিরিয়ে বসেছিল। কিন্তু তা হলেও কি পরিমলের হাত থেকে রেহাই আছে। সে ঠিক সুরজার পাশটিতে এসে বসেছে। কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলেছে, "দুষ্টু মেয়ে।" আর তারপরই আলোটা দিয়েছে নিভিয়ে।

পরিমল না জানি এখন কি করছে। সে কি বিনিদ্র শয্যায় সুরজার মতই ভাবছে ! সুরজার কথাই ভাবছে।

আচ্ছা, মানুষের যদি পাখীর মত ডানা থাকত ? তা হলে কিন্তু বেশ হত। তা হলে কাউকে না জানিয়ে অন্ধকার আকাশের বুকে সুরজা তার ছোট্ট ডানা দুটি মেলে টুকটুক করে উড়ে যেত কলকাতায়। পরিমলের মেসের ঘরখানাতে। কিন্তু পরক্ষণেই সুরজা তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ফেলল। না সে যাবে না। কেনই বা যাবে। তারই বা এমন কি গরজ শুনি। আসতে পারে না পরিমল ?

পরদিন নীলিমা সুরজাদের বাড়ী বেড়াতে আসে। বলে, "তোর বরের খবর কি বল। কবে আসছেন শুনি ?"

"কি জানি ভাই।" সুরজা নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দেয়।

"অত আর ন্যাকা সাজতে হবে না। বলবি না এই তো ?"

. কি বলতে পারে সুরজা। সে যে সত্যিই কিছু জানে না। সেই যে বিয়ের পর গিয়ে একবার একটা চিঠি দিয়েছে তারপর কি আর চিঠি দেবার কথা মনে হয়েছে পরিমলের।

দুপুরে রোজই একবার করে আসে নীলিমা। কত কথা বলে, সবই শ্বশুরবাড়ীর কথা। শাশুড়ী, দেবর, ননদের কথা। সবার চেয়ে বেশী বলে বিজনের কথা। বিজন কি খেতে ভালবাসে, নীলিমা কোন রঙের শাড়ী পরলে বিজন খুশী হয়। কেমন সুন্দর নাম দিয়েছে তার —বৌরাণী। কথা বলতে বলতে নীলিমা হাসে। হাসতে হাসতে কথা বলে। সুরজাও সঙ্গে সঙ্গে হাসে। আর নীলিমা চলে গেলেই তার হাসি মিলিয়ে যায়। দুই চোখ বেয়ে নামে শ্রাবণের ধারা। নীলিমার প্রতি একটা রুদ্ধ আক্রোশে তার অন্তর বিষিয়ে ওঠে। নীলিমা যেন ইচ্ছে করেই তার সুখের কথা বড় গলায় জাহির করে—শুধু সুরজার দুই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্যে যে নীলিমা তার চেয়ে কত সুখী।

অপরাহ্নের পশ্চিমাকাশ রাঙিয়ে সূর্য যখন অস্ত যায় তখন করুণ দু'টি চোখ মেলে খালের দিকে চেয়ে থাকে সুরজা। বাইরের উদাস বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে নিজের অন্তরের প্রতিচ্ছবি যেন দেখতে পায় সে। একসময় কখন তার চোখ দু'টি কানায় কানায় ভরে ওঠে জলে। সামনের দৃশ্যটা অস্পষ্ট হয়ে আসে। শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে গিয়ে নজরে পড়ে একটা নৌকো এসে ভিড়েছে পারে। কে আবার এল? সুরজা কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

একটা রুগ্ন লোককে দু' তিনজন ধরাধরি করে নৌকো থেকে নামায়। ওদের কাঁধে ভর দিয়ে লোকটা সুরজাদের বাড়ীর দিকেই এগোতে থাকে। পিছনে মোট নিয়ে আসে মাঝি।

এ আবার কে? সুরজা ভাবতে বসে। কৈ এমন কারও কথা মনে তো পড়ছে না!

হঠাৎ চমকে ওঠে সুরজা। লোকটাকে চিনতে পেরেছে সে। খুব কাছাকাছি থেকে একদিন দেখেছিল তাকে। আজ চেনাই যায় না। এ কেমন করে সম্ভব। একদিন রাজপুত্রের মত ছিল যার চেহারা, আজ একি তার পরিণতি। কেন নিষ্ঠুর বিধাতা এমন করে তার স্বপ্ন গুঁড়ো গুঁড়ো করে ভেঙে দিয়ে গেল। সে তো কারও কোন অনিষ্ট করে নি। তবে তার কপালে কেন এত লাঞ্ছনা। ওগো পাষাণ দেবতা, এ তোমার কেমন ধারা বিচার। সুরজা আর ভাবতে পারে না। তার মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। পড়তে পড়তে জানলার গরাদটা ধরে নিজেকে সামলে নেয় সে।

রাত অন্ধকার। আলোর ছিটেফোঁটাও নেই কোথাও। সুরজা ধীর পদক্ষেপে পরিমলের বিছানায় এসে বসে। এ ঘরই তার বাসর রাত্রির সাক্ষ্য বহন করে আছে। এ ঘরেই একদিন পরিমল দৃঢ় মুষ্টিতে তার আঙুলগুলো নিষ্পেষিত করে দিতে চেয়েছিল। আর আজ ও কত অসহায়। উঠে বসবারও ক্ষমতা নেই।

সুরজা আলতোভাবে পরিমলের কপালে একটা হাত রাখে। চোখ মেলে পরিমল শুধু একবার চায়। তারপর আবার চোখ নামিয়ে আনে। কোন কথা বলার শক্তিও আজ তার নেই।

পরদিন নালিমা ও বিজন কলকাতায় রওয়ানা হয়ে যায়। যাবার আগে ওরা সুরজার সঙ্গে দেখা করে। ওর দুঃখে সহানুভূতি জানায়। ওর স্বামীর রোগমুক্তি কামনা করে।

জানলা দিয়ে উদাস দুটো চোখ মেলে চেয়ে থাকে সুরজা। খালের ধারে নৌকো বাঁধা। মালপত্র বোঝাই করা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। নীলিমা কাদা থেকে শাড়ী বাঁচিয়ে সাবধানে পা ফেলে চলেছে। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় খালের পার পিছল। নীলিমা পড়তে পড়তে বিজনকে ধরে সামলে নেয়। দু'জনে খিলখিল করে হেসে ওঠে। আর সেই হাসি যেন একটা চাবুকের মত সুরজার মুখের ওপর সপাৎ করে এসে পড়ে। সশব্দে জানালাটা বন্ধ করে কান্নায় ভেঙে পড়ে ও পরিমলের বুকে।

পরিমল প্রথমটায় হতভম্ব হয়ে যায়। তারপর সুরজার অশ্রুসজল মুখখানা দুর্বল দুটি হাতে তুলে ধরে কম্পমান অধরে এঁকে দেয় নিঃশব্দ একটি চুম্বন। আর সুরজার মনে হয় যেন আজই তার বিয়ে হল পরিমলের সঙ্গে। যেন একটু আগেই পড়শীরা হৈ হল্লা করে বর-কনেকে বাসরে একলা রেখে পালিয়েছে।

আজ আর এতটুকুও লজ্জা করেনা সুরজার। পরিমলের বুকে মাথা গুঁজে নিঃশব্দে শুয়ে থাকে সে। নিজেই বুঝতে পারেনা ব্যথার অশ্রু কখন এক সময় আনন্দাশ্রুতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রকাব্যে সসীম ও অসীম

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

রবীন্দ্রকাব্যের মর্মমূলে উপনীত হইতে গেলে সাধারণ পাঠক অনেক সময় রীতিমত বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহার অন্যতম কারণ এই যে, 'সসীম', 'অসীম,' 'সান্ত,' 'অনন্ত' প্রভৃতি কবির অতিপ্রিয় ও বহু-ব্যবহৃত শব্দ তাহার মনে একটা কুহেলিকার সৃষ্টি করিয়া তোলে। অথচ এই শব্দগুলির অন্তরালে যে-তত্ত্বটুকু প্রচ্ছন্নরূপে নিহিত, রবীন্দ্র-কাব্যে লব্ধপ্রবেশ হইতে গেলে তাহাকে সর্বপ্রথম উপলব্ধি করিতেই হইবে। জানি, কাব্যরস আস্বাদনের জন্য তত্ত্বান্বেষণ করিয়া মরা একটা বিড়ম্বনামাত্র; কাব্যের পক্ষে তত্ত্ব একটা By-Product তাহাও সর্বজনবিদিত। কিন্তু নারিকেলের শুষ্ক কঠিন বহিরাবরণ ভেদ না করিলে যেমন সুস্বাদু সুকোমল শাঁসটুকু পাইবার উপায় নাই; ঠিক্ সেই-রূপ নীরস তত্ত্বের কঙ্করময় পথের মধ্য দিয়াই অনেক ক্ষেত্রে কবির দুর্গম মর্মলোকে উপনীত হইতে হয়। ইহার দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত—ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থ। সসীম ও অসীমের তত্ত্বটুকু একটি অদৃশ্য স্বর্ণসূত্রের ন্যায় সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যকৃতিকে নিরন্তর বিধৃত করিয়া অসামান্যরূপে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং ইহাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করিলে ভুল হইবে।

বলাবাহুল্য, যাহা সীমিত ও সুনির্দিষ্ট তাহাই সসীম এবং সুনিশ্চিত সীমারেখার বাহিরে এমন কোনো কিছু যাহাকে সীমার দ্বারা চিহ্নিত করা অসম্ভব তাহাই অসীম, অনন্ত। সসীমের, সান্তের উপমাস্থল—আমাদের ক্ষুদ্রগৃহ-প্রাঙ্গণ; চতুর্দিকের সঙ্কীর্ণ পাষাণ-প্রাচীর তাহার সুনির্ধারিত গণ্ডী। সীমাবদ্ধ অপরিসর কুটীরাঙ্গনের বাহিরে যে-উদার মুক্তি, যে-অবাধ উধাও সীমাহীন অনির্দেশ্যতা তাহাই অসীমের স্বরূপ। অসীমের কোনো ভৌগোলিক অবস্থিতি নাই—নিঃসীমতাই তাহার স্বভাবধর্ম। দেশকালপাত্রের দ্বারা সে অসহায়ভাবে রুদ্ধ, শৃঙ্খলিত নয়। গোষ্পদের সহিত অকুল মহোদধির যে-পার্থক্য, সসীম ও অসীমের মধ্যে ব্যবধানটুকুও ঠিক্ সেইরূপ।

ভূমাকে বলা হইয়াছে "বহোর্ভাবঃ" অর্থাৎ বহুর ভাব। যাহা অসীম তাহার মধ্যে এই ভূমার, এই বহুর ভাবের অভিব্যক্তি। এবং প্রকৃত সুখ ভূমার মধ্যেই নিহিত—যৎ বৈ ভূমা তৎ সুখম্। অসীমের মধ্যেই আত্মার প্রসারণ, সীমার মধ্যে তাহার সঙ্কোচন। অবশ্য অসীমের সীমারেখাশূন্য অন্তহীন অকূল বিস্তার সীমার মধ্যেও সঙ্কুচিতরূপে আত্ম-গোপন করিয়া থাকে। সান্ত ও অনন্ত পরস্পর বিচ্ছিন্ন বিযুক্ত হইয়াও অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত। তাইতো ধূপ আপনাকে গন্ধের মধ্যে এবং গন্ধ আপনাকে ধূপের মধ্যে বিলীন করিবার জন্য ব্যাকুল। সীমাও সেইরূপ অসীমের এবং অসীম সীমার সঙ্গলাভের জন্য উন্মুখ, লালায়িত। মানুষ ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জীব। এই বিশ্বব্যাপারের তরঙ্গাবহ বিশালত্বের মধ্যে তাহার মত নশ্বর নগণ্য অসহায়ের স্থান কতটুকু। সৃষ্টির মধ্যে সে তো অণু হইতে অনীয়ান্ ব্যতীত আর কিছুই নয়। তথাপি সেই "অণোরণীয়ানের" মধ্যেই "মহতো মহীয়ানে"র জ্যোতির্ময় প্রকাশ—"তিমির বিদার তোমার অভ্যুদয়!" তাইতো কবি ভগবানকে সীমার মধ্যে অসীম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

এই সঙ্কীর্ণ সীমিত মানব-জীবনের বাহিরে যে-অবাধ স্বাধীনতা, স্বাচ্ছন্দ্য ও উদার মুক্তি হিল্লোলিত হইতেছে মানুষ তাহার আস্বাদ জানে না। সে জানে না বলিয়াই তাহার পুঞ্জীভূত দুঃখ ও নৈরাশ্য। ইহার কারণ, অসীমের মধ্যেই প্রকৃত আনন্দের উৎস,—সীমার মধ্যে নিরন্তর দুঃখ, নিরবচ্ছিন্ন গ্লানি। আমাদের এই জীবন যেন একখানি বেসুর বীণাযন্ত্র; তাহাকে অনন্তের সুরে—In tune with the infinite—বাঁধিয়া লওয়া চাই। সম্ভবত ইহাকেই মনীষী এমার্সন বলিয়াছেন—"Hitch your wagon to a star." অসীম হইতে আমরা বিযুক্ত বিচ্ছিন্ন বলিয়াই দুঃখকে এত দুঃসময় বলিয়া বোধ হয়, এবং মৃত্যু তাহার ভয়ঙ্কর মূর্তি পরিগ্রহ করে:—

> দুঃখ সে ধরে দুঃখের রূপ,
> মৃত্যু সে হয় মৃত্যুর কূপ…

জীবন সীমিত বলিয়াই সে নশ্বর, চঞ্চল, জরামৃত্যুকবলিত। অসীমের মধ্যে দুঃখমৃত্যুবিচ্ছেদ বলিয়া কিছুই নাই। অনন্তের মধ্যে বিধৃত প্রসারিত করিয়া দেখিলে এগুলি আমাদের চিত্তের শান্তিকে বিঘ্নিত করিতে পারে না। ঋষির সেই আকুল প্রার্থনা—"মৃত্যোর্মামৃতং গময়" সান্ত হইতে অনন্তে, সসীম হইতে অসীমে প্রয়াণের আকাঙ্ক্ষাকেই অভিব্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে। সান্ত ও অনন্ত যেন বন্ধন ও মুক্তি, মৃত্যু ও অমৃতের নামান্তর মাত্র। খাঁচার পাখী এবং বনের পাখীর রূপকের মধ্য দিয়া কবি সীমা ও অসীমের মধ্যে সুদুস্তর ব্যবধান পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। অনন্তের অবাধ নিরবচ্ছিন্ন বিস্তৃতির মধ্যেই "অসীমনিলীমাভিলাষী" বিহঙ্গের কলোল্লাস। সেখানে কুণ্ঠিত কুঠার স্থান নাই—আছে অপরিমেয় পুলক, স্বাধীনতার অমৃত-আস্বাদ। দিগন্তলীন মরুভূমির বুকে অশ্বপৃষ্ঠবিহারী আরব-বেদুইনের উদ্দাম জীবনের প্রতি কবিচিত্তের দুর্নিবার আকর্ষণ অনন্তের প্রতি সান্তের আকর্ষণ বলিয়া মনে করিতে ক্ষতি কি! শেলীর "The desire of the moth for the star" কি অসীমের জন্য সসীমের বুক-ভাঙা ক্রন্দন নয়?

সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে জীবনকে খণ্ডিত, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তির প্রতি একটি প্রবল ধিক্কার পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

লাভক্ষতি—টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ-ভাগ,
কলহ-সংশয়—
সহে না সহে না আর—জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি'
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।

চিরসুন্দরের পূজারী, কল্পনার সুদূরঅভ্রচারী কবির নিকট জীবনের এই বিকৃত কবন্ধমূর্ত্তি নিতান্তই অসহনীয়। তাঁহার মানস-বিহঙ্গের বিহার এই জড়জগতের বহুঊর্ধ্বে যেথানে

আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ-অঙ্গন
উষা-দিশাহারা নিবিড় তিমির-আঁকা।

ব্রাউনিঙের মতো রবীন্দ্রনাথও যেন বলিতে চাহেন—

What's time! leave Now for dogs and apes!
Man has for Ever.

অতিমাত্রায় "লাভক্ষতি-টানাটানি"র ফলে এই সংসার ঘৃণ্য পঙ্ক-কুণ্ডের ন্যায় ক্লেদাক্ত, আবিল হইয়া উঠিয়াছে। সীমিত জীবনের দুঃসহ সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে চিরবিদ্রোহী, কবিচিত্তের ক্ষোভের অন্ত নাই। তাই কবির আকুল প্রার্থনা—

শ্যেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন করে উর্ধ্বেলয়ে যাও
পঙ্ককুণ্ড হতে।

বস্তুত যাহা সীমায়িত তাহাই স্বভাবত পরিমিত এবং যাহা অপরিমেয় তাহাই অনন্ত, অসীম। কূপের জলের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব,—মহাসমুদ্রের জল অগাধ, অপরিমেয়। সীমার মধ্যে চিরবন্দী বলিয়াই মানুষের মূলধন এত অল্প। সেই স্বল্প পরিমাণ মূলধন হইতে কিছুটা অংশ স্খলিত হইলেই সে হাহাকার করিয়া উঠে,—"অল্প লইয়া থাকি তাই যাহা যায় তাহা যায়।" মানুষের দুঃখ বেদনা, অতৃপ্তি-অশান্তির কারণ ইহাই। সীমার মধ্যে সুখ কোথায়!—নাল্পে সুখমস্তি। অসীমের নির্বিকার উদাসীন্য ও অপরিমেয় উদারতার মধ্যে লাভক্ষতির হিসাব নাই। নদী পুলিনে লক্ষ কোটি প্রবাহ অবিশ্রাম স্পর্শ করিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু সেই চলোর্মিরাশিকে নদী কি মুহূর্ত্তের জন্য বাঁধিয়া রাখিতে পারে? জীবনকে যদি নদীতটরূপে কল্পনা করা যায়, তবে চিরচঞ্চল ধনজনযৌবন ধাবমান নদীপ্রবাহের সহিত তুলনীয়। ইহারা গতিশীল,—স্থিতিশীলতা ইহাদের স্বভাবধর্ম্ম নয়।—"কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন-যৌবন ধন মান।" সীমার পটভূমিকা হইতে দেখিলে ইহাদের এই চলিষ্ণুতা, এই নশ্বরতা একটি মহতী বিনষ্টি বলিয়াই আমাদের প্রতীতি হইতে পারে,—কিন্তু সত্যই কি তাই? অনন্তের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে বিশ্বব্যাপী ধ্বংস ও মৃত্যুকে পর্য্যন্ত নগণ্য বলিয়া মনে হয়। যে "রূপহীন জ্ঞানাতীত ভীষণ শকতি" বিশ্বসংসারকে নিরন্তর দুঃখবেদনা, জরামৃত্যুর দ্বারা ক্লিষ্ট, জর্জর করিয়া তুলিতেছে, কবির নিকট তাহাই মাতার মতো স্নেহময়ী,—"ধরেছে আমার কাছে জননীমূরতি।" প্রজ্ঞা-দৃষ্টিসম্পন্ন, অকুতোভয় কবি এই অদৃশ্য অন্ধশক্তির খেয়ালখুশী ও অত্যাচারকে অনন্তের পরিপ্রেক্ষিতে দেখিয়াছেন। তাই ইহার নৃশংসতাকেও তাঁহার নিকট এক বিচিত্র লীলা বলিয়াই মনে হইয়াছে।

কে চাহে সঙ্কীর্ণ অন্ধ অমরতাকূপে
এক ধরাতল মাঝে শুধু এক রূপে
বাঁচিয়া থাকিতে!

পার্থিব জীবনের বহুকাঙ্ক্ষিত অমরতার প্রতি এই নিদারুণ উপেক্ষা অসীমের লীলা-বৈচিত্র্যের সহচর কবির পক্ষেই সম্ভব। নব নব ভুবনের নব নব জীবন যে-কবি চিত্তকে অহরহ আকর্ষণ করিতেছে তাহার নিকট সসীম জাগতিক জীবনের অমরতা অন্ধকূপ ছাড়া আর কি! একটি সুস্পষ্ট সুনিশ্চিত সীমার মধ্যে আমাদের ক্ষুদ্র জীবনচক্র অবিশ্রাম আবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়াই আমাদের এতো ভয়, এতো সংশয়। কবি সীমার মধ্যেও অসীমকে উপলব্ধি করিয়াছেন। যদি আমরা তাঁহার সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে পারিতাম—"একাধারে তুমিই আকাশ তুমি নীড়" তবে দুঃখ বেদনা আমাদের নিকটও সহনীয় হইয়া উঠিত।

রবীন্দ্রকাব্যের মূলে যে-দুর্মর আশাবাদ—তাহার মূলে দেখিতে পাই বিশ্বজীবনের সহিত কবির নিবিড় একাত্মতা। যাহা কিছু ব্যক্তিগত তাহাই সীমিত, সঙ্কীর্ণ; যাহা বিশ্বের তাহাই অসীম, অপরিমেয়। এক-হিসাবে বলিতে গেলে সসীম নাস্ত্যর্থবাচক এবং অসীম অস্ত্যর্থবাচক। একটি নাস্তি, অপরটি অস্তি। ব্যক্তির দিক্ হইতে দেখিতে যাহার অস্তিত্ব নাই, বিশ্বের বিশাল দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে তাহার অস্তিত্ব অবলুপ্ত হয় নাই,—রূপান্তর হইয়াছে। মৃত্যুর অন্ধকারে যাহাকে হারাইয়া ফেলিলাম, আমার নিকট তাহার অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া গেছে; কিন্তু সে তো বিশ্বজীবনে বিলীন হইয়া তাহার অংশীভূত হইয়া আছে। নয়নের সম্মুখে যাহাকে দেখি না, সেতো নয়নের 'মাঝখানেই' 'ঠাঁই' লইয়াছে। দৃষ্টির সম্মুখে যতক্ষণ সে ছিল, ততক্ষণ সে ছিল নিতান্ত সসীম, ব্যক্তিগত; দৃষ্টির বাহিরে রহিয়া সে হইয়াছে অনন্তের ধন। জীবনে সে ছিল অপূর্ণ,—মৃত্যু তাহাকে দিয়াছে পূর্ণতা। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, রবীন্দ্রকাব্যে মৃত্যুশোকের মতো এতো বড়ো একটা হৃদয়বিদারক ব্যাপারও ব্যক্তিগত অনুভূতির তীব্রতা হারাইয়া সহনীয় ও মহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বপ্রবাহে ব্যক্তি কোথায় তলাইয়া গিয়াছে। অনন্তের সহিত কবির নিবিড় একাত্মতার ফলেই তাঁহার শোক শ্লোকরূপে বিগলিত হইয়া পড়িলেও তাহার চতুর্দিকে একটি শান্তি ও স্নিগ্ধতার পরিমণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়। কবির সুদৃঢ় প্রতীতি, এই মহাবিশ্বে কিছুই হারায় না; অনন্তের ভাণ্ডারে কোনো ক্ষয় ক্ষতি নাই। মরুপথে যে-নদীর ধারা হারাইয়া গেছে বলিয়া আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, কবির অনন্ত বিশ্বাস—তাহার বিলুপ্তি ঘটে নাই। এই বলিষ্ঠ দুর্মর আশাবাদ কোনো ক্ষণস্থায়ী Moodএর ব্যাপার নয়; অনন্তজীবন-বিশ্বাসী কবির পক্ষে সর্বতোভাবে ইহাই স্বাভাবিক।

টেরাকোটা শিল্প ও বাঙালী

শ্রীদুর্গাচরণ সরকার

শিল্পের দেশ বাংলা দেশ। এর প্রতি মন্দিরে দালানে দেউলে ফুটে উঠেছে বাঙ্গালীর শিল্প-প্রীতি। আল্পনা, নক্সা, পটচিত্র আর মৃৎশিল্পে বাঙালী পটুয়ার কোমল হাতের স্পর্শ লেগে আছে। বিরাট পূজার দালানের দেওয়াল-চিত্র থেকে, মাটির ছোট্ট হাঁড়িটির গায়ে পর্য্যন্ত, মন্দিরের সুবিশাল বিস্ময়কর ভাস্কর্য থেকে খেলার পুতুলটীরও অঙ্গে বাঙালীর সুনিপুণ রূপরেখা। ফ্লোরেন্স মিউজিয়মে দুহাজার বৎসর পূর্বের গাঙ্গরিড়িদের বিবাহাদি সামাজিক চিত্র মৃৎপাত্রে অঙ্কিত দেখা যায়। কুটীরের আল্পনাতে যেমন, নাটমন্দিরের স্থাপত্যতেও তেমনি বাঙালীর সৌন্দর্য্য সাধনা। শিল্প এখানে বাঙালীর জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বাংলার সামাজিক অনুষ্ঠানেও শিল্পের বিশিষ্ট স্থান। পিঁড়ে, আসন, কুলো, কাঁথা ও কলসী-ঘটে যে আল্পনা ও মাঙ্গলিক নক্সা আঁকা হয় তা সত্যিই খুব উঁচু স্তরের।

এইসব লোক-শিল্প বাদ দিয়েও ভারতীয় শিল্পে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে—বাঙালীর স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য। বাঙালী স্থপতির সৃজনী প্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠেছে বিভিন্ন মন্দির গাত্রে। বাংলার মন্দির সাধারণতঃ মৃৎনির্মিত। সেইজন্য জয়পুর, রাজপুতানা বা দাক্ষিণাত্যে যখন পাথরের উপর অপূর্ব ভাস্কর্য্য খোদিত হয় সেইসময় বাংলার স্থাপত্য শিল্প এক বিশেষ ধারায় অগ্রসর হ'ল। পাথর কুঁদে কুঁদে যে মূর্তি রচিত হচ্ছিল, তা আরও কমনীয় ও লীলায়িত হ'য়ে উঠলো বাঙালী শিল্পীর কোমল হাতের স্পর্শ পেয়ে—মাটির পেলব অঙ্গে। নরম কাদাকে শিল্পী রূপ দিল। শুরু হ'ল এক বিশেষ ঢংএ (Style) মূর্তি নির্মাণ। প্রাচীনকালের বাঙালী শিল্পীর গড়া মৃৎ-মন্দিরের কারুকার্য্য এখন আর দেখা যায় না। পুরোন যুগের প্রায় সব দেবালয়ই ধ্বংস হয়েছে—কালের গতি পরিবর্তনের সাথে সাথে। তাদের নিশ্চিহ্ন হওয়ার কারণ পাথরের অভাবে এগুলি মাটির দ্বারা নির্মিত হয়েছিল ফলে বাংলার জলীয় আবহাওয়া, লবণাক্ত জল, নদী-প্লাবন ও পরবর্তীকালে যবন-আক্রমণে এগুলি দ্রুত ধ্বংস হয়। তবুও যখন এখানে-ওখানে মাটির তলা থেকে খোদিত ফলক বা ইঁট বা'র হয়, তখন বোঝা যায় প্রাচীন বাংলার কারুশিল্প কতদুর উৎকর্ষ লাভ করেছিল।

ছোট ছোট ইঁট বা মাটির ফলকে নানারকম দেবদেবীর মূর্তি আঁকা হয়; তারপর সেগুলি পুড়িয়ে নিয়ে তা দিয়ে তৈরী হয় মঠ-মন্দির। ইঁটের ওপর এই যে মাটির কাজ—একেই বলে টেরাকোটা (Terracotta) শিল্প। টেরাকোটা-শিল্প বাঙালীর সম্পূর্ণ নিজস্ব। শিল্পজগতের বৈশিষ্ট্য বাঙালীর টেরাকোটা। প্রাচীন মন্দির গাত্রে এখনও দেখা যায় লুপ্তপ্রায় এই বিচিত্র শিল্পকলা। শিল্পীর আন্তরিকতা, সৌন্দর্য্যবোধ ও কলানৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে এই সব ইস্টক-শিল্পে। দেব-দেবীর মূর্তি রচনায় যেমন তার হৃদয়ের নীরব ভক্তির সংযোগ ঘটেছে, তেমনি কারুকার্য্য বৃক্ষলতাতে তার অপূর্ব ও বিচিত্র শিল্পী-হৃদয়ের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে।

রাজসাহীজেলার পাহাড়পুরের বিরাট ঐতিহাসিক মন্দিরটী রচিত হয়েছিল শুধু মাত্র ইঁট ও কাদায়। তবুও কালের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে পাথরের মন্দিরের মতই তা দাঁড়িয়েছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী। এখনও এর গায়ে মাঝে মাঝে দেখা যায় অনন্যসাধারণ কারুকার্য্য। অপূর্ব টেরাকোটা মূর্তি। এর ভগ্নাবশিষ্ট মূর্তিগুলি আজও অনুপম সৌন্দর্য্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিংশশতাব্দীর মুগ্ধবিস্মিত চিত্র ছাড়াও বহু সামাজিক চিত্র খোদিত আছে। লাঙ্গল কাঁধে কৃষক, শিশু কোলে করে জল-আহরণ-রতা মাতা, ক্রীড়ারত বাজিকর প্রভৃতি বাঙালীর ঘরোয়া ব্যাপারও স্থান পেয়েছে এতে। সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে ইঁটের কঠিন গায়ে। কুমীর, সাপ, কচ্ছপ প্রভৃতি বাঙালীর অতি পরিচিত জীবজন্তু এবং কিন্নর-কিন্নরী, গন্ধর্ব, দৈত্য, অসুর ও বহু কাল্পনিক জীব শিল্পী উৎকীর্ণ করেছেন। কাল্পনিক জীবগুলি যদিও অদ্ভুত, তবু তাদের নিজস্ব মূল্য আছে। শিল্পে কল্পনার এক বিশিষ্ট স্থান। শিল্প সব সময়ে বাস্তবের মুখাপেক্ষী নয়। শ্রান্তশিল্পী মাঝে মাঝে এই কঠোর বাস্তব রাজ্য থেকে বিদায় নিয়ে মনোহর স্বর্গীয় কল্পলোকে বিচরণ করেন। বাঙালী স্থপতির কল্প-কথার অভিব্যক্তি এই মূর্তিগুলি।

পাহাড়পুর বিহারে শিল্পশৈলীর মাঝে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করার বিষয়। প্রাচীন বহু মন্দির, বিহার ও স্তূপগাত্রে হিন্দু দেব-দেবীর পাশেই স্থান পেয়েছে জাতকের গল্প, বৌদ্ধশিল্প ও বৌদ্ধ দেবদেবীগণ। সেখানে উদারহৃদয় শিল্পী ধর্মের নামে কোন ভেদ সৃষ্টি করেননি। হিন্দুব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধশ্রমণ পাশাপাশি থেকেও কোন দ্বেষ, হিংসা বা সংঘর্ষের সৃষ্টি করেননি। এ থেকে সে যুগের বাঙালী কতদূর উন্নতমনা, ধর্মবিদ্বেষহীন এবং সাম্প্রদায়িকতা থেকে কতখানি মুক্ত ছিলেন—তা বোঝা যায়। জানা যায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী প্রকৃতিপুঞ্জের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পালযুগের সমৃদ্ধিময় বাংলার অবস্থা।

আর একটা কথা, ছোট ছোট ইঁটের উপর নির্মিত হলেও টেরাকোটা মূর্তিগুলির কিছুমাত্র সৌন্দর্য্যহানি হয়নি। বরং মাটির কোমল অঙ্গ খুঁদে খুঁদে তৈরী বলে এগুলি আরও লাবণ্যময়। পাথরের মূর্তির থেকে এই পোড়ামাটির পুতুলগুলি কোন অংশেই হেয় নয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইঁট বা ফলকের ওপর এগুলি উৎকীর্ণ। কিন্তু সেই ক্ষুদ্রাবয়বের মাঝেই প্রকাশ পেয়েছে অপূর্ব অঙ্গ-সৌষ্ঠব—পুরুষের

পৌরুষ, সৈনিকের দৃঢ়তা, নারীর কমনীয়তা, শিশুর তারল্য, নক্সার বৈচিত্র্য।

পাহাড়পুরের ধনুকাসুর-বধ প্রভৃতি চিত্রগুলির শিল্পসৌন্দর্য্য ও লালিত্য দেখলে অজন্তার শিল্পশৈলীর কথাই মনে পড়ে। সুতরাং

'আমাদেরি কোন সুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়
আমাদের পট অক্ষয় ক'রে রেখেছে অজন্তায়।'—

মনে করলে কোন অন্যায় হয় না ; বরং সেইটাই হয়ত ঠিক।

টেরাকোটা শিল্পে দেবদেবীর মূর্ত্তিতে অপূর্ব এক দেবভাব ফুটে উঠেছে। শিল্পী-হৃদয়ের সকল ভক্তি যেন ইঁটের ওপর মূর্ত হয়ে সৃষ্টি করেছে ভাব-গম্ভীর দেবমূর্তি। আবার কিন্নর ও গন্ধর্ব মূর্তিতে সে বিচিত্র কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। মানসলোক থেকে শিল্পী তার শিল্পের বিষয়বস্তু খুঁজে নিয়েছেন।......

কিন্তু বাঙালী ভাস্কর রাজপুতানা বা দ্রাবিড় শিল্পীর মত নিজের শিল্পপ্রতিভা দেব-রচনাতেই সীমাবদ্ধ করেনি। নিজের জীবনকে শিল্পের মধ্যে বিলীন করে দিয়েছে। বাঙালী সমাজের সঙ্গে বাংলার শিল্পের তাই ঘনিষ্ট যোগ। টেরাকোটা শিল্পে তাই দেখা যায় কোথাও মেয়েরা মাছ কাটছে, কোথাও লাঙ্গল নিয়ে কৃষক চলেছে ক্ষেতে, কোথাও গীতবাদ্যরত পুরুষ, কোথাও নৃত্যরতা নারী, কোথাও বা ব্যাঘ্রশিকারী। ময়নামতীর মন্দির গাত্রে এইরূপ বহু সামাজিক চিত্র দেখতে পাওয়া যায়।

বোলপুরের অনতিদূরে ইলামবাজারে কয়েকটী প্রাচীন দেবালয় আছে। এগুলি আগাগোড়া টেরাকোটা কারুকার্য্য মণ্ডিত সুন্দর সুন্দর ইঁটের দ্বারা রচিত। ইঁটের ফলকের ওপর যে সকল নক্সা অঙ্কিত আছে সেগুলি যেমন সূক্ষ্ম, তেমনি অপূর্ব কারুকার্য্যখচিত। মন্দির গাত্রে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কিত আছে। ছোট ছোট ইঁটের ওপরেই কালী, শত্রুনিপীড়নরতা দুর্গা, ধ্যানমগ্ন শিব, নারায়ণ ও আরও বহু মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরের প্রতি কোণে হস্তী, ব্যাঘ্র, সিংহ, অশ্ব ও অশ্বারোহী উৎকীর্ণ করা বিরাট স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে। সুসজ্জিত সিপাহী সৈন্য, অশ্বারোহী ও যুদ্ধের ছবি বাঙালীর অতীত-শৌর্য্য স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রাচীন যুগের এই সকল ছবি দেখলে তখন মনে পড়ে বাঙালী এককালে স্বাধীন সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন এদিকে সেদিকে ; পালযুগে, সেন রাজত্বকালে, শশাঙ্কের সময়ে বাঙালীর গৌরব ব্যাপ্ত হয়েছিল সারা ভারতে আর ভারতের বাহিরে—শ্যাম, কাম্বোজ, চম্পা ও সুবর্ণ দ্বীপে। বাঙালী তখন ভীরু ছিল না।

পূজার দালানের বহু জায়গায় কয়েকটি সামাজিক ও লৌকিক চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। একজায়গায় বিরাট ফলকে আছে : পাল্কী করে বিয়ের বর যাচ্ছে। বেহারার সঙ্গে যাচ্ছে একদল পাইক—আর তাদের সঙ্গে চলেছে একটা কুকুর—পাহারা দিতে দিতে। বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বহু ঘটনাই মৃৎশিল্পী রূপ দিয়েছে ইটের গায়।

বংশবাটীতে অনন্তদেবের মন্দির ও হংসেশ্বরী মন্দির গাত্রে ইস্টক শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন দেখতে পাই। বিরাট গাত্রে অসংখ্য নক্সাগুলিতে কোনখানে কুম্ভহস্তে সারি সারি রমণী, মাদল বাদনরতা নারী, নৃত্যপর পুরুষ ও নারীমূর্তি, শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা, নারায়ণের অনন্তশয্যা, নৌকাবিহার প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়। 'নৌকাবিহার' চিত্রটীতে প্রাচীনবাংলার সমুদ্র-জাহাজের অনেকটা নিদর্শন পাওয়া যায়। সিংহ-মুখাঙ্কিত বিরাট নৌকা বাঙালীর অতীতদিনের যুদ্ধজাহাজ ছিল। বিজয় সেনের বাংলা, 'সমুদ্রাশ্রয়ান্' 'নৌসাধনোদ্যতান্' বঙ্গদেশের সমুদ্র-বিজয়ের বিরাট ইতিহাসের ক্ষণিক প্রকাশ এই টেরাকোটা মূর্তিগুলি। বাঙালীর গৌরবময় অতীত ইতিহাসের নীরব সাক্ষ্য বহন করছে এই মূক মাটীর ক্ষুদ্র পুতুলগুলি।

বৃটিশ চন্দননগরে বুড়ো শিবতলার ভগ্ন দেবালয় গাত্রে বন্দুকধারী সিপাহী সৈন্য দেখে হঠাৎ আশ্চর্য্য হতে হয়। সেগুলি হয়তো ইংরেজ সিপাহীর অনুকরণে রচিত হয়েছে। বাংলায় প্রথম ইংরেজ পদার্পণের চিত্রটী কোন এক বাঙালী শিল্পী ইঁটের ওপর চিত্রিত করে রেখেছিল বোধহয়।

সুতরাং টেরাকোটা কারুকার্য্যখচিত এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইঁটগুলির ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়। বাঙালী-জীবনের বহুচিত্র খোদিত হয়েছে ইঁটের কঠিন গাত্রে। বাঙালীর বিশিষ্ট শিল্পশৈলী নিয়ে ইঁটের পর ইঁট সাজান হয়েছে জীর্ণ দেবালয়ের গায়ে। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী চিত্রিত ইতিহাস টেরাকোটা শিল্প।

কিন্তু বাঙালীর নিজস্ব এই শিল্প সৃষ্টি, অনাদৃত, টেরাকোটা-শিল্পীরও আর সাক্ষাৎ মেলেনা। দিন দিন বর্ষায় বৃষ্টিতে ক্রমাগত ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে বাঙালী শিল্পীর শিল্পসাধনা। মাটীর কারুকার্য্য ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ভেঙ্গে চলেছে—যা আর কিছুদিন পর সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তার সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হয়ে যাবে বাঙালীর অতীত শিল্পের পরিচয়।
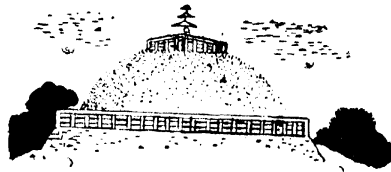
জাতীয় স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পনা

আশা গংগোপাধ্যায়

কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা যখন ভিটেমাটি বন্ধক দিয়েও কন্যার বিবাহের যৌতুক বা খরচের অর্থ সংগ্রহ করতে পারছেন না. যত্র-আয়-তত্র-ব্যয় যে সংসারে সেখানে আকস্মিক বিপদের সম্মুখীন হওয়াতে পরিবারের কর্তা—যিনি একমাত্র কর্ণধার—চতুর্দিকে রাশি রাশি হলুদবর্ণের সরষে ফুল দেখছেন, —মরুভূমির অগ্নিবর্ষী বুকে হঠাৎ-আসা স্নিগ্ধ জলধারার মত গৃহিণী এলেন তাঁর অনেক দিনের ধীরে ধীরে সঞ্চয় করা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে এগিয়ে :—

এই নাও, হাজার টাকা, পঁচিশ টাকা ; এই নাও আমার অলংকার, আমার যা কিছু সোনাদানা আছে। নিজের স্বামী সন্তানকে, নিজের আত্মীয় স্বজনকে যদি আপদ-বিপদে স্ত্রী ধন দিয়েই সাহায্য করতে না পারব—তাহলে বৃথাই সিঁথিতে এঁকেছি সিঁদুর—মণিবন্ধে বেঁধেছি লৌহবলয়। তোমাদের দায়িত্ব আছে পরিবার পোষণের, আর আমাদের নেই ? আমরা কি পারি না সংসারের প্রতিদিনের খরচ বাঁচিয়ে কণিকা-মাত্র সঞ্চয় কোরে আমাদের সিঁদুর কৌটো ভরে রাখতে, পূর্ণ কোরে রাখতে আমাদের লক্ষ্মীর ঝাঁপি ?

এই নারী ! সহস্ররূপিণী—গৃহিণী-সচিব-সখী-প্রিয়-শিষ্যা। মহিলাদের এই মনোবৃত্তিকে বেশী কোরে জাগিয়ে তুলতে—আর শুধু মহিলাদের জন্যই বা কেন—সমস্ত জাতির এই সঞ্চয় প্রবৃত্তিকে কার্যকরী কোরে তোলবার জন্য দিকে দিকে আজ চলেছে সঞ্চয় অভিযান।

বহুদিনের পরাধীনতামুক্ত স্বাধীন দেশের সংগঠন কাজে—জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন কল্পে সাহায্য করতে হবে দেশের প্রতিটি অধিবাসীকে—কি মহিলা—কি পুরুষ, কি ধনী—কি দরিদ্র।

এই বিষয়ে মহিলাদের সঞ্চয়-সংস্থা গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২রা মার্চ পর্যন্ত একপক্ষকাল ধরে এক বিপুল অভিযানের আয়োজন কোরেছিলেন। সমস্ত সহরের পল্লীতে পল্লীতে সভার আয়োজন কোরে, সহরতলীর বিভিন্ন কেন্দ্রে বক্তৃতা দিয়ে, চলচ্চিত্র ও বেতারের মাধ্যমে, দৈনিক ও মাসিক সংবাদপত্র, সব রকমেই এর বহুপ্রচারের এক সুষ্ঠু প্রচেষ্টা করেছেন।

দেশ যতদিন পরাধীন ছিল, দেশের গঠনমূলক কাজের দায়িত্ব ছিল শাসকের। ভারতের জনসাধারণের সুখ-সুবিধা কিভাবে হতে পারে সে বিষয়ে চিন্তা করবার ভার নিয়েছিলেন—স্বয়ং বৃটিশ সম্রাট। দেশের লোকের সে বিষয়ে কিছু বলবার অধিকার ত ছিলই না, উপরন্তু যে-কোনরূপ স্বাধীন মতবাদকে গলাটিপে হত্যা করা হত এবং স্বাধীনতা প্রয়াসীকে ঝুলিয়ে দেওয়া হত ফাঁসির মঞ্চে রাজদ্রোহের অপরাধে।

সেদিন গত হয়েছে—আজ আমাদের সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার রথ সূর্য্যকরোজ্জ্বল সড়ক দিয়ে ধীরে ধীরে উন্নতির শিখরাভিমুখে এগিয়ে চলেছে।

সরকার নিয়েছেন দেশকে উন্নত করবার মহান্ দায়িত্ব—আর সেই সরকার হচ্ছে আমাদেরই জনগণের প্রতিনিধি দ্বারা সংগঠিত। সুতরাং এক কথায় বলা যায় দেশের জনসাধারণই হাতে তুলে নিয়েছে দেশ-গঠনের পুরোপুরি দায়িত্ব।

তাই আজ জনগণকে দিতে হবে অর্থ—প্রচুর অর্থ—যা নাকি লাগবে আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিকে রূপায়িত কোরে তুলতে। দেশের অর্থ আসবে তিনটি বিভিন্ন উপায়ে।

এক—বিদেশ হতে ঋণ গ্রহণ। দুই—জনসাধারণকে করভারে প্রপীড়িত কোরে, আর সর্বশেষ অথচ সর্বোৎকৃষ্ট উপায়—জনগণের নিজস্ব সঞ্চিত অর্থ লগ্নী কোরে।

ঋণভারে জর্জরিত হয়ে কত ধনী, কত জমীদার, কত সাম্রাজ্য, কত দেশ একেবারে শেষ হয়ে গেছে। যে ঋণ শোধ দেওয়া যাবে না—সে ঋণ গ্রহণের দায়িত্ব বড় কম নয়।

দেশের উৎপাদন বাড়িয়ে এবং তার দ্বারা দেশবাসীর অভাব মিটিয়ে উদ্বৃত্ত দিয়ে বিদেশের ঋণ পরিশোধ করা সহজ ব্যাপার নয়। তাছাড়া বিদেশের অর্থে শিল্পোৎপাদন হলে একটি বড় রকমের লভ্যাংশ চলে যাবে বিদেশের কোষাগারে—সুতরাং ঋণ গ্রহণ করা এরূপ পরিস্থিতিতে কোনক্রমেই উচিত নয়। এই প্রথম উপায়টি সব দিক দিয়েই নিতান্ত ধ্বংসমূলক। দ্বিতীয়—করধার্য করা। করভারে জর্জরিত দেশের উপর আর অধিক কর ধার্য করাও বিশেষ সুবিধাজনক নয়। এতে একদিক দিয়ে দেশের ধনী সম্প্রদায়ের সহযোগিতা একেবারেই হারাতে হবে।

সুতরাং দেশবাসীর সঞ্চিত অর্থ ই বিনিয়োগ করতে হবে এই সংগঠনের কল্যাণ কার্যে।

জনসাধারণ এর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ উপকৃত হয়েছেন। ১২ বছর, ১০ বছর, ৫ বছর পরে সুদসমেত সেই সঞ্চিত অর্থ বর্ধিত হয়ে এককালীন বেশ একটি স্ফীত অংকের রূপে নিজেরই কাছে ফিরে আসবে।

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থায় গচ্ছিত অর্থ দিয়েই আবার জাতীয় সরকার বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন। যেমন।—

হাসপাতাল, মাতৃমংগল, শিশুসদন, বিদ্যালয়, জলসেচন ব্যবস্থা, শিল্প-মন্দির, কারখানা, কৃষিকল্যাণ সংস্থা প্রভৃতি গঠন কোরে দেশকে উন্নততর ও সুন্দরতর কোরে তুলবেন। এতে দেশের লোকের পরোক্ষ সহযোগিতা পাওয়া যাবে।

একটি প্রশ্ন স্বভাবতই উঠতে পারে যে—দরিদ্র দেশবাসীর সঞ্চয় করবার মত অর্থ কোথায় ?

কিন্তু চিরন্তন মুষ্টিভিক্ষার চাল সঞ্চিত কোরে আবহমান কাল ধরে প্রতিপালিত হয়ে এসেছে কত দরিদ্র নারায়ণ, কত অনাথ-আতুর।

লক্ষ্মীর কৌটায় সযত্ন সঞ্চিত অর্থ, মাটীর বুকে নিহিত গুপ্ত রত্নকলস, সিন্ধুক ভরা হীরা জহরতের অলংকার—ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই কিছু না কিছু এক সময়ে সঞ্চয় করেছে। সে টাকা সুদে বাড়ত না—বছরের পর বছর জমা থেকে যেত—কখনও অধিকারীর কাজে লাগত, কখনও লাগত না। আর দেশের কাজে ত আসতই না। এর দ্বারা শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থই সিদ্ধ হত।

আজ একটি কোরে পয়সাও যদি স্বাধীন ভারতের কোটি কোটি লোকের অর্ধেক সংখ্যাও প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে সঞ্চয় করে, তাহলে কত কোটি টাকা বছরে সরকার পেতে পারেন তা সহজেই অনুমেয়। আর সেই পয়সা জাতির সঞ্চয় ভাণ্ডারে গচ্ছিত রাখলে আমারই দুর্দিনে আমারই কাছে অনেক বেশী হয়ে ফিরে আসবে—সেটা কি আমাদের এক পরম লাভ নয়?

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গান

শ্রীজয়দেব রায়

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের বঙ্গদেশ। ইংরেজ রাজত্ব তখন চলছে পুরোদমে। রাজসেবাই সেদিন ছিল বাঙালীর ধর্ম ও শ্রেষ্ঠ ব্রত, যাতে ইংরেজ প্রভুর অসন্তোষ বা রোষ উৎপাদন হয় এমন কিছু করা ছিল সেকালের রাজকর্মচারীদের পক্ষে অচিন্তনীয়।

সেকালে পরাধীন হতভাগ্য দেশবাসীর পক্ষ থেকে অভাব-অভিযোগের একটি কথা বলবারও অধিকার ছিল না, এমন দিনে নিজে একজন হাকিম হয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করেছিলেন দেশবাসীর আশা ও আকাঙ্ক্ষার মর্মবাণী, এনে দিয়েছিলেন জাতীয়ভাবের নবজোয়ার জাতির জীবন প্রবাহে।

দেশবাসীর প্রতি ছিল দেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালের গভীর সমবেদনা। তাঁর দেশপ্রেমের গানগুলি থেকেই সেদিন দেশবাসী নবচৈতন্য লাভ করেছিল, এগুলির কাজ আজও ফুরায় নি; চিরদিনই এগুলি দিতে থাকবে জাতীয় জীবনে নব উদ্দীপনা, নতুন প্রেরণা।

ইউরোপে কিছুকাল বাস ক'রে কবি তাঁর স্বদেশবাসীর সর্ববিষয়ে দৈন্য ও স্বদেশে তাঁর সহকর্মিগণের বিজাতীয় আচার আচরণ লক্ষ্য ক'রে ব্যথিত ও বিচলিত হয়েছিলেন। পরদেশীদের অনুকরণে যারা জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বর্জন করেছিল, কবি তাদের বিদ্রূপের কশায় ও ব্যঙ্গবাণে ক্ষত বিক্ষত করেছিলেন। পক্ষান্তরে দেশবাসীর কুসংস্কার ও ভণ্ডামিকেও তিনি নিষ্ঠুর আঘাত হেনেছিলেন।

তাঁর এই ব্যঙ্গসঙ্গীতগুলিও তাই আর এক ধরণের দেশপ্রেমের গান। ভণ্ডামি, নকল সাহেবিয়ানা, রাজভক্তির আতিশয্যের আবহাওয়ায় তাঁর কর্মজীবন অতিবাহিত হয়। কিন্তু তাঁর কবিজীবন ছিল সেই পাঁকের মধ্যে পাঁকাল মাছের মতো নিষ্পঙ্ক। তাই প্রত্যেকটি অনাচার, অপচার, কপটতা, হীনতার গ্লানি তাঁর লেখনীতে সরস সাহিত্যের রূপ লাভ করেছে।

যে যুগে বিলাতী আচারই ছিল সামাজিক জীবনের কৌলীন্যের আদর্শ, সেযুগে নিজে বিলাতফেরতা হয়ে বিলাতী কদাচারকে ব্যঙ্গ করা যথেষ্ট সৎসাহসের পরিচায়ক। এগুলি তাই তাঁর মূল স্বদেশীগানগুলির চেয়েও অধিকতর জাতীয়তার উদ্দীপক। যেমন,

আমরা বিলেত ফেরতা ক-ভাই,
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই,
তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই।
আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলি'
আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি
আমরা চাকরকে ডাকি 'বেয়ারা' আর
মুটেদের ডাকি 'কুলি'।
আমরা সাহেব সঙ্গে পটি,
আমরা মিষ্টার নামে রটি,
যদি সাহেব না বোলে বাবু কেহ বলে
মনে মনে ভারি চটি॥

শুধু তাই নয়, বিলাত থেকে ফিরে এসে 'হরিদাসরায়ের' যে দুর্দ্দশা হয়েছিল, তা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবাণ হেনেছেন। এ সকল গান শুদ্ধ মাত্র হাসির গান নয়, এগুলির মধ্যে স্বদেশ ও স্বধর্মের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। কেবলমাত্র বক্তৃতা ক'রে আর তর্ক ক'রে জাতির মঙ্গল বা দেশোদ্ধার করা সম্ভব নয়, কবি তাই দেশবাসীকে আসল পথ দেখাতে চেয়েছেন—

তোমরা দেশোদ্ধারটা করতে চাও কি
ক'রে মুখে বড়াই?
তা' সে হবে কেন!
তোমরা বাক্যবাণে শুধু ফতে করতে চাও কি লড়াই?
তা সে হবে কেন!
তোমরা ইংরাজ গৌরব ক্ষুব্ধ বলে চাও কি যে, সে
তোমাদের ও করপদ্মে দেশটা স'পে, শেষে
তল্পিতল্পা বেঁধে নিজেই চলে যাবে দেশে?
তা'-সে হবে কেন?
তোমরা হিন্দুধর্ম প্রচার ক'রেই, হতে চাও যে ধন্য।
তা সে হবে কেন?

এখন অবশ্য যুগের পরিবর্তন হয়েছে, ইংরেজ এদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে, বিলেত থেকে ফিরে এসে আর কেউ বড় একটা সাহেবও বনে যায় না। কিন্তু সেকালের সাহেবীভাবাপন্ন বিলাত-ফেরতাদের সঙ্গে নিজের সমাজ ও পরিবারের বিচ্ছেদ ঘটত। এতে জাতির বলক্ষয় হ'ত বলেই দ্বিজেন্দ্রলাল তাদের আক্রমণ করেছেন।

কেবল জাতীয়তামূলক স্বদেশী গানেই নয়, কবির রচনার সর্বত্রই স্বদেশপ্রীতি সুস্পষ্ট। তাঁর নাটকের প্রায় সবগুলিতে দেশপ্রেম প্রচার এবং স্বাধীনতা সংগ্রামই প্রধান অবলম্বন। রাজকর্মচারী দ্বিজেন্দ্রলালকে স্বদেশপ্রেম প্রচারের জন্য বাধ্য হয়েই সেদিন প্রাচীন ঐতিহাসিক কাহিনীর পটভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল।

মেবার পাহাড়কে উদ্দেশ করে তিনি যে গান রচনা করেছেন, তাতে সমগ্র ভারতবাসীর সংঘবদ্ধ শক্তিরই প্রশস্তি—

মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড়
যুঝেছিল যেথা প্রতাপ বীর
বিরাট দৈন্য দুঃখে তাহার শৃঙ্গের সম অটল স্থির।
জ্বলিল যেথানে সেই দাবাগ্নি, সে রূপবহ্নি পদ্মিনীর,
ঝাঁপিয়া পড়িল, সে মহাআহবে যবনসৈন্য, ক্ষত্রবীর॥
মেবার পাহাড়, উড়িছে যাহার
রক্তপতাকা উচ্চ শির—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর॥

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রীতি অবশ্য বাংলাদেশকে কেন্দ্র ক'রেই প্রধানত উচ্ছসিত হয়েছিল। তিনি 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' মাতৃভূমিরই মহিমার গান গেয়েছেন—কখনও বঙ্গভূমিকে উদ্দেশ করে, কখনও-বা ভারতভূমিকে উদ্দেশ করে। তাঁর মহিমা-কীর্তন বঙ্গভূমির উদ্দেশে—

বঙ্গ আমার! জননি আমার! ধাত্রি আমার! আমার দেশ
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ!
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন, কেন গো মা তোর মলিন বেশ।
সপ্ত কোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে আমার দেশ।
(কোরাস)—কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন আমার দেশ॥

জাতির জাগরণের জন্য তার ধর্মপ্রাণতার অপেক্ষা তার অতীত শৌর্যবীর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াই তিনি অধিকতর প্রয়োজন মনে করতেন। তাই ছন্দে ও সুরে সেই শৌর্যাবদানের কথাই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। তার ফল, তাঁর অধিকাংশ গান স্তুতিমূলক প্রশস্তি-বাচন না হয়ে, হয়ে উঠেছে উদ্দীপনাময় পৌরুষব্যঞ্জক ও জলদ গম্ভীর—

শীর্ষে শুভ্র তুষারকিরীট সাগর ঊর্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা,
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা।
কখনো মা তুমি ভীষণ দীপ্ত, তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে,
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে॥

ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণকমল করিয়া স্পর্শ,
গাইল "জয় মা জগন্মোহিনি। জগজ্জননি! ভারতবর্ষ।"

দেশমাতার সৌন্দর্য ও মাধুর্যের আবেদন যে কোন গানে নেই, তা নয়। তবে এ শ্রেণীর গান উদ্দীপনাময় নয়, এর অনুদ্ধত সুর আমাদের অন্তরকে বিগলিত ক'রে মাতৃমমতায় দ্রবীভূতা বঙ্গমাতার শ্যামল অঞ্চল ছায়ায় নিয়ে যায়। যেমন,

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা;
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা,
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা;
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে নাক তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি॥

কেবল মাতৃভূমিই নয়, মাতৃভাষার প্রতিও গভীর মমতা কবির গানে প্রকাশিত। এজীবনে তিনি অর্থ, মান কিছুই চান না, তিনি চান কেবল দীনা মাতৃভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের সেবায় জীবনোৎসর্গ করতে। মাতৃ-ভাষার উদ্দেশে তিনি গেয়েছেন—

আজি গো তোমার চরণে জননি!
আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান;
ভক্তি-অশ্রু-সলিল-সিক্ত শতেক ভক্ত দীনের গান!
মন্দির রচি মা তোমার লাগি' পয়সা কুড়ায়ে পথে পথে মাগি।
তোমারে পূজিতে মিলেছি জননি, স্নেহের সরিতে করিয়া স্নান।
(কোরাস)—
জননি বঙ্গভাষা এজীবনে চাহিনা অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি অমল-কমল-চরণে স্থান।

তবে প্রধানত তাঁর গান সম্মুখ-সমরে-অগ্রগামী সাহসী সৈনিকের লুপ্ত শৌর্যের উদ্বোধনের জন্য চারণ কবির তম্বুরার সঙ্গে ধ্বনিত হয়েছে।

ভারতের যে সকল বীর নিজেদের রক্ত দিয়ে শত্রুর আক্রমণ একদা প্রতিরোধ করেছিলেন, দেশবিদেশে ভারতের গৌরব পতাকা বহন ক'রে ফিরেছিলেন, তাঁদের বীর অবদান তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—

একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারতসাগরময়;
সন্তান যার তিব্বত-চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তার কি-না এই ধূলায় আসন, তার কিনা এই ছিন্ন বেশ?

প্রাচীনকালের চারণরা গ্রামে গ্রামে জাতির গৌরব ও মহিমার গুণগান ক'রে বেড়াত, এই চারণব্রত তাঁর গানে বাণী রূপ আরোপ করেছিল। তা ছাড়া, তাঁর গানের উদ্দীপনাময় সুর কবি বিদেশের সামরিক সঙ্গীত থেকেও সংগ্রহ করেছিলেন, এই সকল গানের উচ্চকণ্ঠে সমবেত কোরাসও ইংরেজি গান থেকে গৃহীত—

ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে গাও উচ্চে রণজয় গাথা।
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে শুন ঐ ডাকে ভারত মাতা।

কে বলো করিবে প্রাণে মায়া, যখন বিপন্ন জননী জায়া ?
সাজ সাজ সকলে রণসাজে শুন ঘনঘন রণভেরী বাজে
চল সমরে দিব জীবন ঢালি—জয় মা ভারত, জয় মা কালী।

অতীতের গৌরবগান, বর্তমানের দুঃখ গ্লানির গান গেয়েই দ্বিজেন্দ্রলালের কবিব্রতের শেষ হয় নি, তিনি জাতির ভবিষ্যতের দিকেও আশা-নেত্রে চেয়েছেন।

দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন কবি, অতীতের জন্য শোক না ক'রে দেশের লোককে আবার মানুষ হবার জন্য আবেদন জানিয়েছেন করুণ কণ্ঠে—

কিসের শোক করিস ভাই—আবার তোরা মানুষ হ।
গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই—আবার তোরা মানুষ হ' ॥
পরের 'পরে কেন এ রোষ, নিজেরই যদি শত্রু হোস ?
তোদের এ যে নিজেরই দোষ—আবার তোরা মানুষ হ' ॥
বিশ্বময় জাগায়ে তোল ভায়ের প্রতি ভায়ের টান ;
ভুলিয়ে যারে আত্মপর, পরকে নিয়ে আপন কর ;
বিশ্ব তোর নিজের ঘর—আবার তোরা মানুষ হ' ॥*

* কলিকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত।

অনুন্নত অর্থ নৈতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য

প্রিয়তোষ মৈত্রেয়

আজকের গোটা দুনিয়ার অর্থ নৈতিক চিন্তা ও ক্রিয়াকর্ম্মকে মোটামুটি-ভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটি উন্নত অর্থনীতির দেশের—তাহ'ল, পূর্ণ কর্ম্ম সংস্থান অবস্থার সৃষ্টি ও রক্ষার সাহায্যে সাময়িক অর্থ নৈতিক সংকট থেকে দেশের অর্থনীতিকে রক্ষা করার চিন্তা ও ক্রিয়াকর্ম্ম। অপরটি, অনুন্নত অর্থনীতির দেশগুলির—আর তা'হল, শিল্পায়নের মাধ্যমে ব্যাপক কর্ম্ম-সংস্থানের ব্যবস্থার সাহায্যে দেশের জীবনমান ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা এবং পূর্ণ কর্ম্ম-সংস্থানের অবস্থা সৃষ্টি করার চিন্তা ও ক্রিয়া-কর্ম্ম। আমরা শেষোক্ত দেশের অধিবাসী—তাই সেই দেশের অর্থ নৈতিক ক্রিয়া-কর্ম্মের বৈশিষ্ট্য আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

অনুন্নত-অর্থনীতির অনেকগুলি দেশেই পরিকল্পনার সাহায্যে অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা চলছে। সেইজন্যও বিশেষ ক'রে এই সব অর্থ-নীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা থাকা প্রয়োজন। এই বৈশিষ্ট্য গুলি মোটামুটিভাবে নিম্নরূপ :

এই সব অর্থনীতির দেশের জন-সংখ্যার এক বিরাট অংশ শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ কৃষি নির্ভরশীল। ফলে জীবন-মান অতি নিম্ন,আর তাই অন্য কোন প্রকার পণ্যের ব্যাপক বাজার গ'ড়ে ওঠে না—আর সেজন্য অন্য শিল্পও গ'ড়ে ওঠার পরিবেশ পায় না,—ফলে সাধারণভাবে মানুষের মাথা পিছু আয় খুবই অল্প এবং তাও ব্যাপকক্ষেত্রে পণ্যভিত্তিক,—মুদ্রাগত নয় (non-monetised)। মাথা পিছু স্বল্প-আয় হেতু সঞ্চয় নেই। বাজার নেই ব'লেও শিল্প-বিকাশের ক্ষেত্র সংকীর্ণ। এমন ক'রেই "দেশটা দরিদ্র" এ কারণেই দরিদ্রই থেকে যায়।

এই সব অর্থনীতিতে কৃষিই প্রধান উপজীবিকা—আর তাই বিপুল জনসংখ্যা জমিতেই ভীড় জমায়। ফলে এই অর্থ-নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছদ্ম ও অর্দ্ধ বেকার (disguised ও under-employed) সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ যদি এই সংখ্যা থেকে কিছুসংখ্যক লোককে সরিয়ে অন্য কোন বৃত্তিতে নিয়োগ করা যায়, তাতেও মোট উৎপাদনের পরিমাণ সমানই থাকে। ঐ লোকগুলির প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য। যদি অর্থ নৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাহায্যে কৃষি ভিন্ন অন্য কোন জীবিকার ব্যাপক ব্যবসা করা যায় তবে এই ছদ্মবেকার জন-সংখ্যা নূতন সঞ্চয়ের ও মূলধন গড়ে তোলার পক্ষে একটী বিরাট সূত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। অর্থাৎ যদি এই ছদ্ম-বেকার জন-সংখ্যাকে কলকারখানার এবং ভারী ও মূল শিল্পে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করা যায়, তবে পূর্ব্বে কৃষি এলাকায় অপরের যে বাড়তি শ্রম-ফলভোগ করত, তা সঞ্চয়ের মাধ্যমে বা ভারী ও মূলশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য ঐ বাড়তি উৎপাদন ব্যবহার করার মধ্যে দিয়ে মূলধন গড়ে ওঠে। মুদ্রাস্ফীতির শঙ্কাও অনেক হ্রাস পায়। কৃষি অর্থনীতির এই দিকটা অনেকদিন অবজ্ঞাতই ছিল।

আগেই বলেছি, এই সব দেশের মানুষের মাথা পিছু আয় অতি সামান্য এবং উৎপাদনও কোন রকমে জীবন-ধারণের পর্য্যায়ে সীমিত। এর ফলে, সঞ্চয় গড়ে ওঠে না ব'লে, ব্যাপক শিল্পায়নের সম্ভাবনা দেখা যায় না। আর ব্যাপক শিল্পায়নের অস্তিত্ব নেই বলে উপযুক্ত কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই এবং সেইজন্য উপার্জ্জনও কম। এমন করেই 'দেশটা দরিদ্র, কারণ তা দরিদ্র' এই Vicious circleটা সক্রিয় থাকে। আবার, কোনরকমে জীবন-রক্ষার পর্য্যায়ের বাড়তি উৎপাদন নেই বলে এবং তাই শিল্পায়ন সম্ভাবনা ঘটনা বলে এ সব দেশে মুদ্রাগত বাজার এবং Exchange Economicsর অবস্থা গ'ড়ে ওঠে না। অথচ শিল্প-সম্ভাবনাকে সার্থক ক'রে তোলার পক্ষে এই অবস্থা সৃষ্টি অপরিহার্য্য।

এই আলোচনা থেকে এই ধারণা আমরা সহজেই করতে পারি, এই সব দেশে যেহেতু মাথা পিছু স্বল্প আয়, সেই হেতু সঞ্চয় যা' ঘটে তা নগণ্য। শুধু তাই নয়, যে সামান্য সঞ্চয়ও ঘটে, তাও জমিতেই নিয়োজিত হয়। ফলে শিল্প-বাণিজ্যে মূলধনের সরবরাহ ঘটে না।

উৎপাদন প্রধানতঃ কৃষি এলাকায় খাদ্য শস্য এবং প্রাথমিক কাঁচা-মালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। প্রোটিন খাদ্যের উৎপাদন তুলনায় অল্প।

এ সব দেশে মোট আয়ের প্রায় সবটাই খাদ্য শস্য এবং বাকী সামান্য অংশ নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যেই ব্যয় হয়। ফলে শিল্প পণ্যের চাহিদা থাকে না বললেই চলে।

এই সব দেশের অর্থনীতি ও বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য—খাদ্য-শস্য ও কাঁচামাল রপ্তানি। অবশ্য অর্থনীতির অবস্থা খুব শোচনীয় হ'য়ে পড়লে খাদ্যশস্য আমদানী করতে হয় এমন দৃষ্টান্তও আছে।

এই সব কারণে মাথাপিছু বাণিজ্যের পরিমাণ সামান্য।

আরও একটা লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল, ঋণ সরবরাহ এবং বাজারের অবস্থা অতীব শোচনীয়। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা যেমন দুর্ব্বল, তেমনি অসংগঠিত। সোনারূপো, হীরে, জহরত প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু বিপুল পরিমাণে অলঙ্কারের আকারে এবং ধন্মায় স্থানে অকেজো অবস্থায় প'ড়ে থাকে—অথচ অর্থনৈতিক উৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহৃত হয় না।

দেশের মানুষের এবং অর্থ-নৈতিক ক্রিয়া-কর্ম্মের অবস্থা এমন শোচনীয় বলে তাদের বসবাসের অবস্থাও তদ্রূপ।

ভারতের যেকোনও জায়গায় গিয়ে ঘুরে আসুন, উপরে বর্ণিত সব লক্ষণই চোখে পড়বে।

পূর্ব্বের আলোচনায় বলেছি, এই সব অর্থনীতিতে কৃষি-কর্ম্মই প্রধান অর্থ-নৈতিক কর্ম্ম। আর কৃষিকর্ম্মে খুব সামান্যই মূলধন ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। শুধু তাই নয়, ক্ষুদ্রায়তন ভিত্তিতে এবং বিক্ষিপ্ত ভাবে কৃষি উৎপাদন-সংগঠন পরিচালিত বলে ঐ সামান্য মূলধন ও সুবিধাজনক ভাবে ব্যবহৃত হয় না এবং সুফলপ্রসূ হয় না। উৎপাদন-পদ্ধতির মান অত্যন্ত নিম্ন এবং ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলি যেমন মান্ধাতার আমলের তেমনি বহুব্যবহারজনিত দুর্ব্বল।

অনুন্নত কৃষিপ্রধান অর্থনীতির দেশগুলিতে আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণ করার পক্ষে প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করেছে স্থানীয় বাজারের অভাব এবং অনুন্নত পথঘাট ও যানবাহন ব্যবস্থা। তবে এটা দেখা যায়, কোন কোন অনুন্নত দেশে শুধুমাত্র বিদেশের বাজারের জন্য কৃষি উৎপাদনের কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নত ধরণের কৃষিউৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

আবার এই সব দেশে কৃষকদের দীর্ঘমেয়াদী সংকটও দূরের স্বল্প-মেয়াদী সংকটের সম্মুখীন হবার ক্ষমতাই থাকে না—আর তাই তারা তাদের সেই পুরানো পদ্ধতি জমি থেকে সর্ব্বাধিক ফসল ফলাতে চেষ্টা করে—তার ফলেও জমির শক্তির অবনতি ঘটতে থাকে।

আবার উপার্জ্জন ও সম্পদের তুলনায় কৃষকদের ঋণের পরিমাণ বিপুল—তারপর রয়েছে স্বল্পপ্রসূ উৎপাদন ব্যবস্থা—ফলে বাজারের জন্য উদ্বৃত্ত পণ্য আসে না। তাই উৎপাদনটা নিতান্তই subsistence levelএ থেকে যায়।

অনুন্নত অর্থনীতির জনতত্ত্ব

(ক) এইসব অনুন্নত অর্থনীতির দেশগুলিতে যেমন জন্মহার অত্যন্ত বেশী, তেমনি মৃত্যুহারও বেশী। জন্মহার হাজার প্রতি প্রায় ৪০। এই অবস্থার ফলে সাধারণতঃ শিশু মৃত্যুর দরুণ দেশের মূলধন সঞ্চয় বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

(খ) পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং sanitation এর ব্যবস্থা খুবই শোচনীয়।

পল্লী এলাকায় জনসংখ্যার ভীড় অত্যধিক।

শিক্ষা, কৃষি ও সংস্কৃতি

(ক) শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারেই প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে এবং শিক্ষিতের শত করা হার খুবই কম।

(খ) শিশু-শ্রমিকের ব্যাপক-ব্যবহার

(গ) অসংগঠিত এবং দুর্ব্বল মধ্যবিত্ত শ্রেণী

(ঘ) সামাজিক জীবনে স্ত্রীলোকদের মর্য্যাদার অভাব।

(ঙ) গতানুগতিক ও শ্লথ জীবনচর্চ্চা।

এছাড়া রয়েছে অসংগঠিত এবং প্রয়োজনের তুলনায় অত্যল্প যানবাহন ব্যবস্থা। এর গুরুত্ব অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম্মের দিক দিয়ে অত্যধিক।

উপরে যে সব বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে তাদের অধিকাংশকে অর্থনৈতিক ক্রিয়া কর্ম্মের দুটি সম্পর্কের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা চলে। তা হ'ল, (ক) আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে ভোগ পরিমাণও বাড়ে। (খ) আর, যত আয় বাড়ে তত বিনিয়োগ বাড়ে।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা আমাদের স্মরণ রাখতেই হবে—আয় যত অল্প, ততই প্রাথমিকভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্য অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় বাবদ খরচ অনুপাতে বাড়বে। আমরা বলেছি মাথা পিছু স্বল্প আয় অনুন্নত অর্থনীতির একটি অন্যতম লক্ষণ। আর এটা বোঝা যায়, এই স্বল্প আয় উল্লিখিত অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য প্রসূত। আবার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এই স্বল্প আয় উদ্ভূত। কয়েকটী ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করা যাক্—

এই সব এলাকার কৃষি অর্থনীতির প্রাধান্যের মূলে চাহিদা ও ভোগ ক্রিয়ার প্রভাব অন্যতম। যেহেতু এই সবদেশের লোকেদের আয় স্বল্প, সেইহেতু আয়ের বিরাট অংশ খাদ্যের খাতে ব্যয় হয়। আর সেইজন্য এই সব দেশে কৃষিপণ্যের চাহিদা অন্যতম চাহিদা। আবার এই সব দেশে মাথা পিছু মূলধন অত্যন্ত কম বলে মোট শ্রমের প্রায় সবটাই কৃষিতে খাটে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাহায্যে এই অবস্থার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে—কিন্তু তার জন্যেও দেশের অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রয়োজন।

এ থেকে ধারণা করা যায়, যে সব দেশে শিল্পার্জ্জনের এক বিরাট অংশ খাদ্য ও কোনরকমে বসবাসের বাবদেই ব্যয় হয় সে সব দেশে মাথা পিছু বৈদেশিক বাণিজ্যের হার অত্যন্ত কম। মাথা পিছু স্বল্প-আয়

—নির্দ্দিষ্ট-কাঠামোতে বিদেশ থেকে আমদানী করা অকৃষিগত পণ্যের সক্রিয় চাহিদা স্বভাবতঃই সামান্য হয়ে থাকে। বরং অনেকক্ষেত্রে কৃষিজাত ভোগ্যপণ্যের আমদানীর প্রয়োজনই বোধ হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থা চাহিদার দিক থেকে। যোগানের দিক যদি বিচার করা যায় তবে দেখা যাবে, প্রাথমিক পণ্যে (কৃষিগত) দেশের প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত সামান্যই থাকে এবং যন্ত্র-শিল্পের প্রসার এমন থাকে না যাতে উদ্বৃত্ত শিল্প-পণ্য বিদেশে রপ্তানী করা যেতে পারে। এসব দেশে যখন রপ্তানীর প্রাধান্য ঘটে তখন সাধারণতঃ রবার, কোকো, এবং ইক্ষু প্রভৃতি ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য—রপ্তানী বাণিজ্যের এই সব পণ্যের প্রাধান্য থাকে বলেই বৈদেশিক মূলধনের বিরাট অংশ এই সব অনুন্নতদেশে এই সব single crop, plantationএর ক্ষেত্রে বেশী হয়ে থাকে। যদিও এই সব পণ্যের রপ্তানী গুরুত্বপূর্ণ, তথাপি মাথা পিছু মোট রপ্তানীর হিসাব কষলে ফল খুব লক্ষণীয় হবে না।

এ সব দেশে শিশু শ্রমিক নিয়োগের ব্যাপকতা ভোগের দিক দিয়ে স্বল্প আয়ের প্রভাব-প্রসূত। প্রথমতঃ পরিবারের আয় এত অল্প থাকে যে সেই আয়ে সংসারের খরচ মেটানই যায় না—কাজেই শিশুকেও জীবিকা উপায়ের কাজে নিযুক্ত হতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষা প্রভৃতির ব্যাপারে যে খরচের প্রয়োজন তা' এই সবদেশের অধিকাংশ পরিবারের আর্থিক সংগতিতে সংকুলান হয় না।

বিষয়টিকে অন্যভাবেও বিচার করা চলে, যে সব দেশে মৃত্যুহার বেশী সে সবদেশে শিশুদের স্বাবলম্বী হওয়ার বয়স পর্যান্ত লালন-পালনের খরচা স্বল্প—মৃত্যুহারের দেশের চেয়ে বেশী। কাজেই অনুন্নত অর্থনীতির দেশে—যেখানে পরনির্ভরশীলদের সংখ্যা বেশী সেখানের অল্পবয়স্ক ছেলেদের উপার্জ্জনের কাজে লাগিয়ে এই ভার লাঘব করার চেষ্টা চলে।

আবার এই সব দেশে আয় অল্প ব'লে সঞ্চয় অল্প। আর তাই বিনি-য়োগের পরিমাণ সামান্য। মূলধন স্বল্প বলেই শোচনীয়, এবং প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষি ও শিল্পে মান্ধাতার আমলের অনুন্নত ধরণের মূলধন সামগ্রী ব্যবহৃত হয়। কারিগরি, ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষণের ব্যবস্থাও অত্যন্ত প্রাচীন এবং তাও যথেষ্ট নয়। একথাও সত্যি এই সামান্য মূলধন যদি বিক্ষিপ্তভাবে নিযুক্ত থাকে তবে সেই মূলধন উন্নত ধরণের বা সুফল-প্রসূ হবে না। তবে অবশ্য অনেক অনুন্নত অর্থনীতির দেশে দেখা যায়, কোন কোন বিশেষ বিশেষ শিল্পেরক্ষেত্রে যথেষ্ট এবং খুব উন্নত ধরণের মূলধন ব্যবহৃত হয়ে থাকে—আবার কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদনক্ষেত্রে স্বল্প এবং সুপ্রাচীন মান্ধাতার আমলের মূলধন নিয়োগ করা হয়। উন্নত ধরণের মূলধন—বিশেষ করে রপ্তানী দ্রব্যের শিল্পে—যে সব ক্ষেত্রে বিদেশী মূলধন খাটে, সে সব ক্ষেত্রেই বেশী ব্যবহার দেখা যায়।

সাবিত্রী

বনবেনু

বনের মাঝারে, দারুণ আঁধারে
স্বামীরে লইয়া কাছে,
সজল নয়নে, করুণ বয়ানে
কে ওই বসিয়া আছে!
শ্রাবণের ধারা ঝরিছে সেথায়
নাহি তবু দৃক্‌পাত,
চোখে ঝরে জল, ভাবিয়া বিকল
কপালে রাখিয়া হাত।
ভাবে শুধু এই জীবনের খেলা,
শেষ হ'ল বুঝি ধীরে,
বুঝিয়াছে আজ মৃত্যু তাহারে
রয়েছে আঁধার ঘিরে।
রাজার কন্যা, কত আছে ধন
তবু যেন নিরানন্দ,
মৃত্যু দুয়ারে হানে করাঘাত
বলে কোর নাক বন্ধ।

যমরাজ আসি, কহিল তথায়
যাও ফিরে যাও ঘরে,
জীবন যে তার হ'য়ে গেছে শেষ
দীর্ঘ দিনের পরে।

লয়ে যাব সেথা, মৃত্যু দুয়ারে
অন্ধকারের মাঝে,
বন উল্লুক মৃত্যু হানিছে
যেথা প্রভাতে ও সাঁঝে।

কহে সাবিত্রী সাশ্রু নয়নে
এই ছিল মোর ভালো,
মৃত্যুর পরে দেখিব স্বামীরে
পাইবো নয়নে আলো।
সাধ নাই আর, বাঁচিতে আমার
জীবন করিব শেষ,
রহিবে না সুখ, রবে না শান্তি
রবে না দুঃখ লেশ।
যমরাজ কহে, বুঝেছি তোমার
স্বামী প্রতি অনুরাগ
সকল আশা ও সুখ সম্পদ,
তারি তরে কর ত্যাগ।

যাও ফিরে যাও, মুখ পানে চাও,
দিয়াছি ফিরায়ে তারে
সারা বিশ্বের স্নেহের পাত্র
জাগুক তোমার পরে।

নবীন আবেগে সজল নয়ন
তুলিয়া চাহিল ধীরে
ফোঁটা কয় জল পড়িল ধুলায়
নমিতে বিনত শিরে।

পুরুষস্য চরিতম্
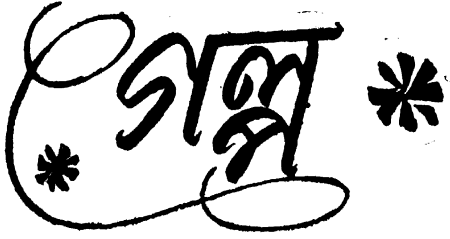
দেবাচার্য

—মন্দির দেখতে যাবেন না ?

সুলতা কর, সলিলার সমবয়সী, সিঁথিতে সিঁদুর, প্রশ্ন করে।

—যান আপনারা, আমি আর যাব না—বালিশ কোলে টুর্গেনিভের 'অন দি ইভ্' উপন্যাস পড়ছিল সলিলা সান্যাল, মুখ তুলে উত্তর দেয়।

—এইখানে বসেই স্বামীর আরাধনা করতে চান ? —সলিলার মুখে রক্তিমাভা দেখা দেয়, বলে—স্বামীর আরাধনা !

—মানে, জগন্নাথ স্বামীর আরাধনার কথা বলছি।

—ওঃ। সলিলা হাঁফ্ ছাড়ে।

—যাক, ভালই হল, ঘরটা পাহারা দেবেন। আমি আবার ভাবছিলাম, এতগুলো টাকা ঘরে রেখে যাবো—তালাচাবীর উপরেই কি নির্ভর করা যায় ? চোরের কাছে ডুপ্লিকেট চাবী থাকাতো বিচিত্র নয়।

—যান আপনি, আমি আছি। সলিলা বইএর পাতার দিকে চোখ ফেরায়।···

···স্কুলের ২২টি মেয়ে নিয়ে সলিলা সান্যাল আর সুলতা কর এসেছে পুরীতে। হোটেলের নীচের তলায় মেয়েরা, আর উপরের একটি কোণের ঘরে স্থান পেয়েছে শিক্ষয়িত্রী দুইজন। বৃষ্টির দিনে জন্ম, তাই ঠাকুরদা নাম দিয়েছিলেন, 'সলিলা'। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, নাক মুখ সুন্দর। রংও ফর্সা বলা যায়, বাঙ্গালী মেয়েরা যেমন দেখতে, তার চেয়ে খারাপ নয়। তবু দেবতা-প্রজাপতি কেন যে সলিলার উপর এত উদাসীন, তার কারণ সলিলা নিজেও সঠিকভাবে জানে না। এইটুকুই শুধু জানা আছে তার, শেয়ার মার্কেটে সর্বস্বান্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত বাবার নিকট কোন পাত্রই পছন্দ হ'ত না। সর্বস্বান্ত হবার পর, পাত্রদের সাক্ষাৎ পেলেও, পাত্র-পিতাদের দাবী মেটানো সম্ভব ছিল না।···

তারপর, দেখতে দেখতে আট বছর কেটে গেল।

···পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হোটেলটি, এখনও পুরীর সীজ্ন ঠিক শুরু হয়নি বলে ভিড় কম। স্কুলের খরচে এবং ছাত্রীদের পয়সায় প্রায় বিনা ব্যয়েই কোনারক, ভুবনেশ্বর, পুরী দেখে ফেরা যাবে যখন, তখন সলিলা ছাত্রীদের এক্সকারসান পার্টির ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা সুলতা করের সহকারিণী হিসাবে আসতে আপত্তি করেনি।

বাইরে বারান্দায় জুতোর মচ্মচানি শুনতে শুনতে সলিলার কান অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। কে যেন আগন্তুক যাত্রী এল। পাশের ঘরে তালাচাবী খোলেন ম্যানেজার।

ম্যানেজার চক্রবর্তীর কণ্ঠস্বর—পছন্দ হয়েছে ?

হয়েছে, উত্তর শোনা যায়।

পছন্দ হবেই। সব ঘরই ভাল। চেয়ারে, বিছানায় যেখানেই বসুন না কেন, সমুদ্র দেখতে পাবেন। ব্রেকফাস্ট এখুনি পাঠিয়ে দেব ?

হ্যাঁ, দিন।···

প্রহরে প্রহরে কত লোকই তো আসে, আবার চলে যায়। সলিলার ভ্রূক্ষেপ নেই। কী আশ্চর্য ! পুরুষ মানুষ সম্বন্ধে আজ আর কৌতূহল অনুভব করে না সলিলা। তার নামের সঙ্গে মানসিক প্রকৃতির যোগ নেই কি ? সে যে সলিলা, অর্থাৎ জোলো, ঢিল ছুড়লে কয়েক নিমেষের জন্য বুদ্বুদ সৃষ্টি হয়, আবার মিলিয়ে যায়। জলের চিহ্ন আঁকা যায় কি ?

সমুদ্রে স্নান ক'রতেও সলিলার উৎসাহ দেখা যায় নি। প্রথমদিনেই লবণ জলের যে আস্বাদ নাকে মুখে অনুভব করেছে সে !···

আর, তাছাড়া,

কলেজের ছেলেগুলো কি অসভ্য!

পথে দাঁড়িয়ে থাকে, সরবে না কিছুতেই। ভিজে কাপড়ে অতগুলি পুরুষের চোখের সামনে উঠে আসাও এক ফ্যাসাদ। তাছাড়া, গরম বালির উপর হেঁটে আসতে পায়ে যেন ফোস্কা পড়ে।...

বিকেল গড়িয়ে গেল।

হোটেল নির্জন। প্রায় সবাই বেরিয়েছে শহর দেখতে, মন্দিরের প্রসাদ কিনতে, অথবা অন্য কোন প্রয়োজনে। সাবান তোয়ালে গুছিয়ে দরজা বন্ধ করে সলিলা। বাথ-রুমটা বেশ বড়, শাওয়ার-বাথের বন্দোবস্ত আছে, সকল পোশাক আশাকের ভার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্নান করায় যে এত আনন্দ, তা যেন আজই সলিলা প্রথম টের পেল। প্রকাণ্ড দেওয়াল আয়নায় দেহের প্রতিবিম্ব পড়ে... তাকে কি দেখতে খারাপ?...সলিলা লজ্জা পায়।...

...ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, উদয়গিরি, গৌরীকুণ্ড, তারপর কোনারক ঘুরে ছাত্রীদের নিয়ে রিসার্ভ বাসে এসেছে পুরীতে, কালই ফিরে যাবে সন্ধ্যার ট্রেনে।...একটা রাত্রি আর দিন শুধু বাকী।

...নীল রঙের শাড়ী পরে তাকে তো বেশ মানায়। ইশ, লোকগুলো কী! সেকালের রাজাদেরই বা কি রুচি! ছিঃ ছিঃ, ঐ সব মূর্তি গড়িয়ে রেখেছে মন্দিরের গায়ে। ভাবতেও সলিলার গা শিরশির করে ওঠে।

এই কি বিবাহিত জীবন?

সাধারণ সংসার? ভগবান—দেবতা—মানুষ...প্রভেদ কোথায়?

আমেরিকান মেমসাহেব গাইড্ নিয়ে কোণারকে এসেছিল—সলিলার সঙ্গে কোণারক-মিউজিয়ামে আলাপ Why this obscenity? কী উত্তর দেবে সলিলা? কয়েকটি কলেজের ছাত্র দূরে দাঁড়িয়ে উড়িয়া দরোয়ানের সঙ্গে হাসিঠাট্টা ক'রছে।

সলিলার মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে। কোনমতে বুদ্ধি করে বলে—Cross the hurdle, you get into the sanctuary of god...

কিন্তু, মনে মনে সলিলার প্রশ্ন জাগে—সাধারণ লোকের সম্মুখে স্বামীস্ত্রীর রতিজীবন এমন নগ্নভাবে তুলে ধরার কি সার্থকতা?

সলিলা ভ্রূ কোঁচকায়। নির্জন বারান্দায় সোফাটা টেনে বসে। তখনও টুর্গেনিভের উপন্যাসটি শেষ ক'রতে পারেনি। ইলীনার মতো মেয়ে কি বাংলাদেশে নেই? কিন্তু, ইন্‌সারোভের মতো পুরুষ কোথায়?

বাঙ্গালী পুরুষ—পুরুষই নয়। ছিল, এককালে হয়তো ছিল। সে বিবেকানন্দও নেই, সে অরবিন্দও নেই। নেতাজী...নেতাজী কি এখনও বেঁচে আছেন?...

ব্রেকার্সের শব্দ যেন আরও জোরে শোনা যায়। ঢেউ যেন আরও উঁচুতে উঠতে না পেরে ভেঙে পড়ে, ক্ষুব্ধ আক্রোশে।...বাতাস, বাতাস নেই। এমন গুমোট—না, না, এইবার বাতাস বইতে শুরু ক'রেছে।

খুট্ করে শব্দ, পাশের ঘরের দরজা খুলে যায়, কিন্তু সলিলার ধ্যানভঙ্গ হবার মতো শব্দ সরব নয়।

...অনিমেষ অবাক হয়ে দেখে, একটি যুবতী। এলো-চুল পিঠে ছড়িয়ে, সমুদ্রের দিকে মুখ।

দর্শনের প্রফেসর, একলা একলা দেশভ্রমণ ও দর্শন করাই তার নেশা। বাড়ীতে বাবা মা ভাই, দাদা, বোন, বৌদি—সবাই আছেন, তাছাড়া পিসীমা মাসীমার ভিড়ও সর্বদাই লেগে আছে। তাই, বেশী লোকের ভিড় এড়িয়ে নির্জনে, নিজেকে খুঁজে পাবার চেষ্টাতেই তার তৃপ্তি। মানসিক বিলাসও বলা যায়।

অপরিচিতা তরুণী। সেও বয়সে প্রবীণ নয়। তাছাড়া অবিবাহিত। আর, সর্বদাই স্ত্রীলোককে এড়িয়ে চলাই তার বহুদিনের অভ্যাস। অনিমেষের ইচ্ছে ছিল খোলা বারান্দায় একটি চেয়ার টেনে বসে। কিন্তু, বসতে গেলে পাশেই বস্‌তে হয়। স্ত্রীলোকের পাশে বসবে? সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়ে? তার শালীনতাবোধে আটকায়।

মহিলাটির বয়স কত?

উনি কি বিবাহিতা?

কি জানি। ওঁর স্বামী বোধহয় শহরে গিয়েছেন, এখুনি ফিরবেন। সলিলা মুখ ফিরিয়ে আছে, তাই সিঁথির উপর নজর যায়না।

অনিমেষ নিমেষের জন্য ইতস্ততঃ করে, কি যেন জানতে পারলে ঔৎসুক্য মিটতো—কিন্তু, যাক্—থাক্ ওসব কথা... অল্ লেডীজ্ আর উইমেন—টমাস এ কেম্‌পিস্ কি বলেছেন?—কমেণ্ড্ দেম্ টু গড্, বাট্ ডোণ্ট বি ইণ্টিমেট্

উইথ্ এনি। সকল স্ত্রীলোকদের জন্য ভগবানের আশীর্বাদ প্রার্থনা কর, কিন্তু, দেখো, যেন কোন একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হ'য়ো না।···

সমুদ্রের তীরে অগণিত নরনারীর ভিড়। নুলিয়ারা লম্বা দড়ি টেনে জাল গোটাচ্ছে। অনেকগুলো নৌকো কালো বিন্দুর মত দেখা যাচ্ছে, অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে জেলেরা, ব্রেকার্সে'র ওপারে। অনিমেষ অন্যমনস্কভাবে চারদিকে চোখ ঘোরায়। একটা সাইকেল-রিকশ আসছে। উঠবে কি? ঐ যাঃ, পার্স নিতে ভুলে গিয়েছে। ফিরে আসে অনিমেষ। সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠে। করিডর পার হয়ে দুটো ঘরের মাঝ দিয়ে বারান্দা। বারান্দা না ঘুরে তার ঘরে ফিরবার উপায় নেই। তাই, অনিবার্যভাবে আবার···সেই মহিলাটির—কবির ভাষায়, চাঁচর চিকুর··· ঘনকুন্তল···মেঘের মতো কালো চুলের ছবি চোখে পড়ে।

আচমকা জুতোর শব্দে সলিলা চোখ ফেরায়।

চার চোখ এক হয়।

উভয়পক্ষের দৃষ্টির মধ্যে বিস্ময় ও কৌতূহল। অনিমেষ মুখ ফেরাবার আগে মেয়েটির দৃষ্টি নত হয়ে আসে। কেউ কথা বলে না। কিন্তু, দু'জনের মনেই এক প্রশ্ন: কে ইনি, কোথায় যেন দেখেছি।

—শুনুন। কম্পিতকণ্ঠে সলিলা বলে।

—আমাকে কিছু ব'লছেন? অনিমেষ দরজায় চাবী ঘোরানো বন্ধ রেখে, প্রশ্নের উত্তর দেয়।

—অনিমেষদা! সলিলার কণ্ঠস্বরে এইবার দৃঢ় প্রত্যয়।

—সলিলা, তুমি !! এখানে ??

ততক্ষণে সলিলা উঠে দাঁড়িয়েছে। চুলগুলোকে মাথার পিছনে কোন রকমে জড়িয়ে, সলিলা পূর্ণদৃষ্টিতে অনিমেষের দিকে তাকায়। অনিমেষও বিস্মিত দৃষ্টিতে সলিলার দিকে চেয়ে থাকে।

সলিলার পিছনে, অনিমেষের সুমুখে—অনন্ত নীল সমুদ্রের ফেনিল বিস্তার। তখনও সূর্যের আলো ছড়িয়ে ছিল আকাশে।···

—তারপর?

—তারপর, আর কিছুই নেই। মেয়েদের অন্যতমা অভিভাবিকা হয়ে এসেছি পুরীতে।

—ক'লকাতা মুখো ফিরবে কবে?

—কাল।

—আচ্ছা, তুমি তাহলে ব'সো এখানে। আমি একটু ঘুরে আসি। অনিমেষ ঘর খুলে পার্স নেয়, বেরিয়ে যাবার সময় আবার সলিলার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। সলিলার চোখের দৃষ্টিতে যে আহত অভিমান ছিল, তা অনিমেষ দেখতে পায়নি।

জুতোর শব্দ মিলিয়ে যায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সলিলা সমুদ্রের দিকে মুখ ঘোরায়। একটু পরে, ক্লান্তি অনুভব করে, ঘরে গিয়ে খিল এঁটে শুয়ে পড়ে।

এমন দুর্বোধ্য পুরুষও আর সে দেখে নি।

এতদিন, এক যুগ পরে দেখা হ'ল, শুধু একতরফা প্রশ্নই করেই গেল। তার সম্বন্ধে জানবার কৌতূহলও তো সলিলার মনে জাগতে পারে। কিন্তু, সে কৌতূহল নিবৃত্তির কোন সুযোগই দিল না অনিমেষদা। অনিমেষদা ঠিক সেই রকমই আছে। কেমন যেন অদ্ভুত। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে দুর্বলতা নেই, এমন পুরুষ অবশ্যই শ্রদ্ধার পাত্র, তাই বলে এত উদাসীন হলেই বা স্ত্রীলোকের চলে কি করে?···

মায়ের মামাবাড়ীর দেশের ছেলে অনিমেষদা। বেশ মনে আছে সেদিনকার ঘটনা। সলিলার তখন মাত্র পাঁচ বছর বয়েস। নদীর ঘাটে গিয়েছে শিশুর কৌতূহলে, মাকে—কাউকে না জানিয়ে। বর্ষায় নদীর জল ঠিক গেরুয়া রঙে রাঙা—স্রোতও প্রখর, অন্যান্য ছেলে-মেয়েরা কেমন জলে ঝাঁপ দেয়, আমিও দি না কেন, এই রকম মনোভাব থেকেই বিপত্তির উৎপত্তি। ঘন লম্বা চুল জলে তখনও ভাসছিল, তাই সে যাত্রা বেঁচে গিয়েছিল সলিলা। ক্লাশ টেনের ছাত্র অনিমেষ আসছিল বই বগলে, নদীর ধার বেয়ে।

উঃ, সে কি বকুনী!

মা, মাসী, দাদু, দিদিমার, আর পাড়ার লোকের। কিন্তু, অনিমেষদা কিছু বলেনি। দেখা হলেই বলতো, তোমার মধ্যে প্রাণ আছে, তোমাকে একদিন সাঁতার শিখিয়ে দেব।···

আরও, কত টুকরো স্মৃতি-চিত্র ভেসে ওঠে মনের পর্দায়, একের পর এক ছবি। ছবির যেন শেষ নেই।···

না, না, কারুর কাছেই সলিলার মনের গোপন কথা প্রকাশ হয়নি। নিজের কাছেও কি সব নিজের কথা প্রকাশ হয় ?···

যা হ'তে পারতো, তা কেন হয় না ? বাবা এত পাত্রের সন্ধান নিলেন, কিন্তু এমন সুপাত্র থাকতেও কেন সেদিকে বাবার নজর গেল না ?···

তখন, কিই বা বয়েস তার, মুখ ফুটে কি করেই বা ব'লতো সলিলা ?

তা ছাড়া সে যে সলিলা। বাঙ্গালী মেয়ে কি রাসিয়ার ইলীনার মতো হ'তে পারতো ? কি জানি, হয়তো পারতো। হলে ক্ষতি হ'তো না। বাঙ্গালী ঘরের প্রত্যেক মেয়েই কি সলিলার মতো নয় ? টিপ্ টিপ্ করে ঝরেই চলেছে জল, ছিন্ন-ওয়াশার পুরনো কলের ফাঁক বেয়ে। কঠিন সিমেণ্ট, ক্ষয় নেই। আগেকার দিনের বেলেপাথর-গুলো কিন্তু ক'লতলায় ক্ষয়ে যেতো।

—দরজা খুলুন।···কি হ'ল আপনার !

আলো জ্বালে সলিলা।

—মা, মিষ্টি নেবেন ? ভাল লেডিগেনি, সন্দেশ।

—আঃ জ্বালাতন, রাখো তোমার লেডিগেনি। না না, নেব না, যাও। ঘরে প্রবেশ করে সুলতা কর। হাতে জগন্নাথের প্রসাদ, কাঠের জগন্নাথ, মোষের শিঙের ধূপদানি ইত্যাদি।

একগাল হাসি হেসে বলে—ধন্য আপনি, কবি হওয়া উচিত ছিল। সেই শুয়ে আছেন বিছানায়, ওঠেন নি একবারও।···

—আমি আর রাত্রে খাব না। আপনি খেয়ে নিন।

—শরীর খারাপ হয়েছে ?

—হ্যাঁ।

সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে সলিলা মুখের উপর চাদর টেনে ঘুমের ভান করে।···সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, একে একে সব ঘরে আলো নিভে যায়, তখন সে উঠে আসে সন্তর্পণে। বাইরে শিকল টেনে বারান্দার সেই চেয়ারটা টেনে নেয়।

ঘর অন্ধকার, নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে অনিমেষদা।

··উঃ, কি গুমোট ! সমুদ্রের তীরে দোতালার উপরেও বাতাস নেই। পুরীতে এত মশা কেন ? চারদিকেই তো বালি, পচা জল কোথায় ? কে যেন নির্জন বীচের উপর দিয়ে তখনও পায়চারী করছে।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে সলিলা, মাথা হেলে পড়ে কাঁধের উপর—টেরও পায়নি সে।···

পরদিন।

সকালে মেয়েরা সমুদ্রে স্নান করতে নামে। অবাক হয়ে দেখে, সলিলাদিও তাদের পিছন পিছন জলে নেমেছেন।

—কি, আজকে যে বড় এলেন ? একটি মেয়ে প্রশ্ন করে।

স্রোতের উপর লক্ষ্য রেখে মাথা নীচু করে সলিলা। আঃ, লোনা জলেও স্নান মন্দ নয়, দেখছি। চোখ ভাল হয়।···

সেদিন অনেকক্ষণ সমুদ্রে স্নান করেছিল সলিলা। কিন্তু সব সময়ে তার লক্ষ্য ছিল একটি বিন্দুর উপর।··· ঢেউএর দোলায় দোলায় নুলিয়ারা কেমন অভ্যস্ত কৌশলে আনাড়ীদের স্নান করাচ্ছে।···কিন্তু, অনিমেষদার কি এখনও আশ মেটে নি ? কি দরকার, ব্রেকার্স ডিঙ্গিয়ে যাবার ? হাঙ্গর—হাঙ্গর যদি—সন্তঃস্নাতার বুকের রক্ত ছলাৎ করে ওঠে।···ফিরে এসেছে···ওই, ওধারে, কোমর জলে দাঁড়িয়ে।··উঠে আসছে—যাক্, এইবার আমি যাই।

—সলিলা, তুমি আবার জলে নেমেছ ? মনে পড়ে ছেলেবেলাকার ঘটনা ?···কৈ, কেউ তো ব'ললো না সে কথা ? সলিলা আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ততক্ষণে গরম বালির মধ্যে তার নরম পা দুটো গরম হয়ে ওঠে। ভিজে আঁচল নিংড়িয়ে, পথের উষ্ণতা কমিয়ে, এগিয়ে চলে সলিলা।

··· ··· ···

তারপর ?

—তারপর, তুমি এখন ?···তাহ'লে, চল্লে ?

পরম বিস্ময়ে ট্রেণের কামরা থেকে মুখ বের করে সলিলা। অনিমেষদা দাঁড়িয়ে আছেন প্ল্যাটফরমে, তার জানালার পাশে—গম্ভীর মুখে।

কি বলবে সলিলা ?

সেই দেখা হবার পর থেকে আর একবারও যিনি তার

খোঁজ নেওয়া আবশ্যক মনে করেন নি, তিনি যে স্টেশন পর্যন্ত আসবেন, সলিলা ভাবতেও পারেনি।

—তোমার ঠিকানাটা দিয়ে যাও।

—আমার আবার ঠিকানা কি, স্কুলই আমার ঠিকানা।

—না না, সেখানে থাকো?

—স্কুলেই তো থাকি। স্কুলের সঙ্গে হোস্টেল।

—ওঃ, অনিমেষ বলে—আচ্ছা, চলি। অনিমেষ হনহন্ করে হেঁটে চলে প্ল্যাটফর্মের উপর। শেষবারের মতো সলিলা জানালার বাইরে দূরে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করে। ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে যায় মূর্তি। অবাক হবারই কথা।···

ট্রেণ চলতে শুরু করেছে। মেয়েরা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সলিলাদির দিকে তাকিয়ে থাকে। সুলতা কর প্রশ্ন করে—ভদ্রলোকটি কে? ভারী অদ্ভুত তো! একী! আপনি হাসছেন, না কাঁদছেন?

সুলতা করের কাছে সব চেয়ে অদ্ভুত মনে হ'ল, যখন মাত্র তিন দিন যেতে না যেতেই, সলিলাকে ও প্ল্যাটফর্মের সেই ভদ্রলোককে পাশাপাশি হেঁটে, স্কুলের গেট পার হয়ে, এক ট্যাক্সীতে উঠতে দেখলো। তখনও কিন্তু মুখ টিপে হাসবার চেষ্টাও করে নি সুলতা। কিন্তু, পরদিন যখন অনিমেষের মা ও বৌদি দুজনেই এলেন স্কুলে এবং এলেন স্কুলের হেড মিস্ট্রেস্ এবং তার সাহায্য প্রার্থনা ক'রলেন, তখন সুলতা শত চেষ্টা করেও নিজেকে গম্ভীর রাখতে পারেনি।

লক্ষ কথা না বলেই বিয়েটা হয়ে গেল। বাসর ঘরে পর পর অনেকগুলো গান গেয়েছিল সুলতা ও আর এক-জন শিক্ষয়িত্রী, মাধবী বোস। বরপক্ষের প্রতিনিধি ও বাসর ইত্যাদি ব্যবস্থার অন্যতমা প্রধান কর্মকর্ত্রী, অনিমেষের ছোট বোন, সংস্কৃত অনার্সের ছাত্রী অরুন্ধতী—একগাল হাসি হেসে সমবেত কজ্জলিতাক্ষীদের সামনে অনেক সংস্কৃত বচন আউড়িয়ে শেষ পর্যন্ত বলে বসে—শাস্ত্রকারেরা চিরকাল উল্টো কথা লিখে আসছেন।

সুলতা কর স্কুলে ছাত্রীদের সংস্কৃত পড়ায়, প্রশ্ন করে—কি ব্যাপার?

দাদার দিকে তাকিয়ে ভয়ের ভাব দেখিয়ে অরুন্ধতী বলে—দাদা, যদি অভয় দেয়, তো বলতে পারি।

অনিমেষ স্মিতহাস্যে অর্ধাবগুণ্ঠিতা সলিলার বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—অভয় দিলাম।

ঠোঁট উল্‌টে অরুন্ধতী বলে:

পুরুষস্য চরিত্রম্ স্ত্রীয়াঃ ভাগ্যং দেবাঃ ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ?

ফুলশয্যার রাত্রে যখন ফুলের গন্ধে ছাদের ঘর এবং নন্দনকাননের মধ্যে প্রভেদ খুঁজে পায় না অনিমেষ, সালঙ্কারা সলিলার হাতের আঙুল নিজের আঙুলের মধ্যে নিয়ে অনিমেষ প্রশ্ন করে—কাঁপছো কেন, ভয় কি?

—ভয়ের জন্য কাঁপছি না কি। তুমি যেন কেমন।

—কিসের জন্য কাঁপছো?

—যাও, তোমার সঙ্গে কথা ব'লবো না।

—কেন, আমি কি দোষ ক'রলাম?

সলিলা প্রশ্নের উত্তর দেয় না, কি যেন ভাবে, হঠাৎ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় খোলা ছাদে। অনিমেষও বেরিয়ে আসে। স্বল্পান্ধকারে পরিণীতার মুখ দুই হাতের মধ্যে নিয়ে সবিস্ময়ে প্রায় চীৎকার করে বলে—একী! তুমি কাঁদছো? তবে কি ভুল ক'রলাম?

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে সলিলা বলে—এ দয়ার প্রয়োজন ছিল না। চব্বিশ বছর যখন কেটে গিয়েছে, তখন বাকী জীবনটাও কাটতো।

—কি ব'লছো তুমি! আমি কিছুই তো বুঝতে পারছি না। দয়া ক'রলাম কোথায়? এ প্রশ্নই বা আসে কি করে?

—কেন তবে তুমি বাবার প্রস্তাবে রাজী হওনি?

—কে বলেছে? নিশ্চয় অরুন্ধতীর কাজ। দেখতো কি ছেলেমানুষী! আমি বারণ করে দিলাম, তাও শুনলো না।

—আচ্ছা, সত্যি বাবা তোমাকে ডেকে প্রস্তাব ক'রেছিলেন?

—আমাকে ডেকে নয়, আমার বাবার কাছে প্রস্তাব ক'রেছিলেন? সে প্রস্তাবে বাবার সম্মতিও ছিল, সকলেরই ছিল। কিন্তু, আশ্চর্য, তুমি কি কিছুই জানতে না?

—না, কোনদিনই বাবা এ কথা আমায় জানতে দেন নি।

—তা হবে, তোমার উপর তোমার বাবার টানের কথা শুনেছি। তোমার বিয়েতে কিছুই যৌতুক দিতে পারবেন না ভেবেই, তাঁর আয়ুঃ ফুরিয়ে এসেছিল, ভাবলেও ভুল হবে না।

—কিন্তু, তুমি কেন তখন বিয়েতে মত দিলে না? তখন তো বাবার হাতে টাকা ছিল।

—ছিল বৈ কি, তিনি আমাকে ঘরজামাই ক'রতে চেয়েছিলেন। বাবা মাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ, সমস্ত সম্পত্তি আমার ও তোমার নামে অর্ধেক অংশ লিখে দিতে রাজী ছিলেন। তখনও তোমার মা বেঁচে। তোমার ভাই বা বোনও হতে পারতো। কিন্তু—

—কিন্তু?

—আমি রাজী হই নি।

—কেন?

—তা আমি তোমাকে ব'লবো না।

—ব'লতেই হবে। স্ত্রীলোকের কৌতূহলে এইবার সলিলা স্বামীর হাত ধরে। অবশেষে পীড়াপীড়িতে বিব্রত হয়ে অনিমেষ উত্তর দেয়—

কারণ, তখন তোমাকে আমি ভালবাসতাম না। হ'লো? এইবার আর কোন ব্যাখ্যা নয়।

—কিন্তু, কখন তুমি আমাকে ভালবাসতে শুরু ক'রলে, তা তো জানতে পারলাম না।

—জেনে দরকার নেই। অনিমেষ মিটিমিটি হাসে।

সলিলা তখন কাঁদছিল, না হাসছিল, তা বুঝবার উপায় ছিল না। আপন মনে, যেন আকাশকে সম্বোধন করে সে কথা ব'লছে, অনিমেষ আবার বলে—ভালবাসারও লগ্ন আছে।

খোলা আকাশে তারার ভিড়। অনিমেষের মনে হয়, মাত্র তিনফুট দূরে যে জোনাকীর আলো নিভছে, আবার জ্বলছে, তার তুলনা নেই।

অবশেষে সলিলা বলে—সবই ধরো মেনে নিলাম, কিন্তু—

—আবার কিন্তু।

—অতদিন পরে দেখা হ'ল, দু'চার কথা জিগ্যেস করেই তুমি কেন ওরকমভাবে পালিয়ে গেলে? তারপর, আর একটি কথাও নেই।

—অরুন্ধতী নেহাত মিথ্যে বলেনি। পুরুষের চরিত্রই হল, কাজ করা।

—আর মেয়েদের চরিত্র কি?

—কেঁদে ভাসানো। আর, দিনরাত—নাঃ, আর বলা ঠিক হবে না।

—কি এমন মহান কাজ ক'রছিলেন মহান পুরুষ, যে সামান্য একটি মেয়েকে কাঁদিয়ে যেতেও তার বিবেকে বাধলো না?

—পুরুষ মাত্রেই সমুদ্রের মতো মহান না হলেও, অন্তরের গর্জন কিন্তু ঐ সমুদ্রের গর্জনের মতোই জান্তব, ধরে নিতে পারো। আমি সারারাত্রি সমুদ্রের তীরে পায়চারী করেছি।

—পায়চারী করেছ! সারারাত্রি। হেটেঁলে ফেরো নি?

—না।

—বল কি!

—বেশী তো বলি নি। আরও যদি জানতে চাও, তা'হলে তোমার চোখের অশ্রুকণিকা, আই মিন, হাইড্রোজেন পরমাণু পর্যন্ত শুকিয়ে যাবে।

—কিন্তু, কেন তুমি এরকম অদ্ভুতভাবে পায়চারী করে রাত কাটালে?

—পুরুষ মাত্রেই মাঝে মাঝে রাত্রে পায়চারী করে, ক'রতে বাধ্য হয়।

—বুঝলাম না।

—কিছুই বুঝতে পারলে না?

—না।

—নিজের কাছে প্রশ্ন ক'রেছিলাম। উত্তর পাইনি।

—কি প্রশ্ন করেছিলে?

—'তুমি' ছাড়া 'আমি' নামক পদার্থের কোন অস্তিত্ব আছে কিনা।

—আবার হেঁয়ালী। সহজ করে, ব'লো।

—আর, কত সহজ করে ব'লবো। তুমি যে আমার জীবনের কত বড় বাধা, তা কি তুমি টের পাওনি, যেদিন তোমার চুল ধরে টেনে তুলেছিলাম—মনে নেই?···

এ উত্তরের পর আর কি কোন প্রশ্ন করা চলে? সেই কথাই ভাবছিল সলিলা। তারপর রাত্রি শেষ হয়ে গেল এবং সেই রাত্রির পরে আরও অনেক অনেক রাত্রি কেটে গিয়েছে, কিন্তু সলিলার ভাবনা শেষ হয়নি। কারণ এখনও মাঝে মাঝে মাঝ-রাত্রে অনিমেষ ছাদের উপর পায়চারী করে'।

কবি মুক্তরামের শ্রীশ্রীদুর্গাপুরাণ

অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী

ধর্ম্মাদর্শে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য যে সে কখনও তাহার দেবতাকে সুদূর স্বর্গের কল্পসিংহাসনে বসাইয়া শান্তি পায় নাই। তাহাকে সে আপনার সুখ-দুঃখের ব্যাথা বেদনার মাঝে আনিয়া আনন্দ পাইয়াছে। পূর্ণব্রহ্মসনাতন, নন্দনন্দনের মাঝে মূর্ত্ত হইয়াছেন; পূর্ণব্রহ্মময়ী জগজ্জননী, মেনকা-কন্যা উমাতে পরিণত হইয়াছেন। বাঙালীর কল্পনায় বেদ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত গীতা চণ্ডী শ্রুতি স্মৃতি সব একাকার হইয়া তাহার মানস-লোককে অশ্রু-শ্যামল ঐশ্বর্য্য-উজ্জ্বল করিয়াছে। তাই শাস্ত্রে পুরাণে সে যে দেবতাকে পাইয়াছে তাহার পরিচিত বিশ্বাসের নিবিড় বাঁধনে বাঁধিয়া বিশ্বের অণু হইতে পরামাণু মহৎ হইতে মহীয়ান সকল ঐশ্বর্য্যকে মাধুর্য্যে পরিণত করিয়াছে।

বাংলার শাক্তধর্ম্মের সুপ্রাচীনত্ব অবিসম্বাদিত সত্য—'তন্ত্রা গৌড়ে প্রকীর্ত্তিতা' কিন্তু তন্ত্রের দূরবগাহ্য আচার আচরণ তান্ত্রিকের তন্ত্রপীঠে যতখানি মহিমময় ছিল তাহা গৃহীর গৃহাঙ্গণে ঐশ্বরিক মহিমার সৃষ্টি না করিয়া ততখানি বিভীষিকার সৃষ্টি করিত। তাই গৃহীভক্ত তান্ত্রিকের আচার অনুষ্ঠানকে বিসর্জ্জন দিয়া তাহার মানস-গঙ্গার অশ্রুজলে নবভাবে নিসিক্ত করিয়া লইয়াছিল আর এক নূতন ভাবকে। ইহা হইতেই জন্ম-লাভ করিয়াছিল লৌকিক শাক্ত সাহিত্যের। লৌকিক সাহিত্যের-ই পূর্ণ বিকাশ আগমনী ও বিজয়া গান। বৃক্ষের পূর্ণতম পরিণতি হয় ফুলে ও ফলে। বৃক্ষস্বরূপ সুবিশাল লৌকিক শাক্ত সাহিত্যের-বৃক্ষ চণ্ডী-মঙ্গল, মনসা-মঙ্গল প্রভৃতি কাব্যগুলি। সেই বৃক্ষেরই ফুল আগমনী, বিজয়া সঙ্গীত এবং তাহার ফল মাতৃরূপে কন্যারূপে জগজ্জননীর প্রতি বাঙালীর সুস্নিগ্ধ আকুতি। তাই বাংলার বহু প্রতিভাধর কবি, মনীষী অনেকক্ষেত্রে উভয়ের সংমিশ্রণে শাক্ত কাব্যের এক নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তকবি মুক্তারাম নাগের শ্রীশ্রীদুর্গা-পুরাণ ও এমনি-ই একটী শাক্ত কাব্য। ইহাতে রামায়ণ মহাভারত চণ্ডী, পুরাণ, ভাগবত এবং আগমনী-বিজয়া সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্নধারা একই স্রোতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। কবি যেখানে যাহা সুন্দর পাইয়াছেন তাহাই তিল তিল করিয়া আহরণ করিয়া নিজেকে এবং তাঁহার কাব্যের শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিবার জন্য এই মালিকা গ্রন্থন করিয়াছিলেন।

কবি মুক্তারামের উর্দ্ধতন নবম পুরুষ বিষ্ণানন্দ নাগ মহাশয়,পুরোহিত নাপিত, ধোপা, মালী প্রভৃতি সহ রাঢ় দেশ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্ব তীরে মুমুরদিয়া নামক এক জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে বসতি স্থাপন করেন। ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার কঠিয়াদি থানার নিকটে মুমুরদিয়া গ্রাম অবস্থিত। কবি মুক্তারামের পিতৃপুরুষগণের সহিত মুমুরদিয়ার প্রতিপত্তিশালী দত্ত বংশের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিবার ফলে নাগ বংশীয়েরা একটী নূতন স্থানে বসতি স্থাপন করেন আজও সেই স্থানটি নাগের গ্রাম নামে পরিচিত। কবি মুক্তারাম ভাগলপুরের দেওয়ান সরকারের অধীনে সুমার-নবিশের কার্য্য করিতেন। দেওয়ান সাহেবগণ "একদিন মুক্তারামকে স্ত্রীজনোচিত অলঙ্কার পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া তাঁহার রূপ লাবণ্য অনুভব করিতে ইচ্ছা করেন। ইহাতে তিনি ক্ষোভেও দুঃখে দেওয়ান বাড়ীর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন এবং যাগইর গ্রামে তাঁহার কুল পুরোহিতের বাড়ীতে উপস্থিত হন।" তিনি এইখানে থাকিয়া কাব্য পুরাণাদি পাঠ আরম্ভ করেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার মন ধর্ম্মপথে ধাবিত হয়। এই সময় তিনি অনেক শাক্ত-সঙ্গীত রচনা করেন এবং পরে তিনি দুর্গাপুরাণ এবং পদ্মাপুরাণ রচনা করেন। ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয়ের অভিমতে তিনি একটী কালিকাপুরাণও রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তিনি আট মাস পরিশ্রমে এই দুর্গাপুরাণ রচনা করিয়াছিলেন'—কিন্তু কোন সময়ে রচনা করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় নাই।

"শিবের আজ্ঞায় কৈলা অষ্টমাস শ্রম,
জীবন জঞ্জালে কত হৈল মন ভ্রম॥"

তবে তাঁহার অধস্তন চতুর্থ এবং শেষ পুরুষ দ্বারকানাথ নাগ মহাশয় ১২৯৬ সালের ভূমিকম্পে মৃত্যুমুখে পতিত হন, কাজেই তিনি যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মধ্যভাগে এই গ্রন্থ রচনা করিয়া-ছিলেন তাহা অনুমান করা যায়। তাঁহার দুর্গাপুরাণের মধ্যে তাঁহার রচিত দেবী বিষয়ক অধিকাংশ সঙ্গীত অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে খাঁটী পূর্ব্ববঙ্গীয়, আরাকানী এবং সাধুভাষার সংমিশ্রণ অদ্ভুত-ভাবে হইয়াছে।

কবি মুক্তারাম গ্রন্থ সূচনায় 'নমো গণেশায়' শ্রীশ্রীদুর্গাচরণের জয়। অথ শ্রীশ্রীদুর্গাপুরাণ পাঁচালী লিখিতে শ্রীশ্রীগুরবেনমঃ' বলিয়া আরম্ভ করিয়া শ্রীশ্রীদুর্গার এবং রাগরাগিণীর বন্দনা সূচক দশটি পংক্তি; শুদ্ধ বাংলায়ও নহে শুদ্ধ সংস্কৃত নহে, অথচ দুইয়ের মিলনে রচনা করিয়াছেন। তিনি দুর্গাপুরাণ রচনা করিয়া তাই আগে দুর্গার বন্দনা এবং এই পুরাণ পাঁচালী যে বিভিন্ন রাগরাগিণীতে গীত হইবে সেই সকল রাগরাগিণীর বন্দনা করিয়াছেন:—

সৃষ্টি স্থিতি জগন্মাতা চন্দ্রকান্তকান্তি তথা।
পূজিতা শ্রীরাম রাজা বন্দে দেবী দশভুজা॥
আগ্রে আগ্রে সনাতনী চণ্ডমুণ্ড পাসণ্ড মহিষাসুরমর্দ্দিনী।
শঙ্খচক্র শূল হস্তে জয়ে দেবী নমস্তুতে॥
মল্লার মালবশ্চৈব শ্রীরাগ বসন্তস্তথা,
হিন্দুল কর্ণাটশ্চৈব বন্দে ষড় রাগাস্থিতা।

কেদার সারঙ্গশ্চৈব পিঞ্জুরী পটমঞ্জুরী,
মালসী ধানসী বন্দোসিন্ধুরী তুরী-বড়ারী।
নিদাঘ মূলতাঙ্কৈব ভূপাল গান্ধার তথা।
গয়রা বেগরা আদি বন্দো সে রাগিণী যথা॥

তাহার পর সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ গুণাশ্রিত পূর্ণব্রহ্ম পরে আত্মাশক্তি, মুরলীধর, তাঁর 'দুই পত্নী বন্দো বাণী আর কমলা', হরগৌরী, 'অবিঘ্নে নির্ম্মাণ হউক পর বন্ধ-পুত্তা' অর্থাৎ নির্ব্বিঘ্নে পদ রচনার জন্য সিদ্ধি বরদাতা গণপতি পরে পুনরায়

পুণ বন্দো সরস্বতী কণ্ঠে কর ভর,
শরৎ মালসী গাই গৌরীর নাইওর
রচিব কবিতা হেন না পাই ভরসা,
বামনে ধরিতে চন্দ্র যেন করে আশা।
শব্দ হনে সিদ্ধি হয় নিঃশব্দে নীরূপ,
বারে বারে ডাকি দেবি ! না করিও কোপ।
রাগপদ মিত্রাক্ষর শীঘ্র যাউক হইয়া,
সুস্বর যোগাও দেবি ! মোর হৃদে রইয়া।
কেবল অজ্ঞান আমি তোমা বরে গাই,
মূর্খ জানি হাসলে লোকে আমার দোষ নাই।
যার পুনি জ্ঞান থাকে সেই ধরে মূল :
শিশু হস্তে সোনা দিলে রাঙ সমতুল।
পুনঃ পুনঃ প্রণমহ চণ্ডিকার পায়,
না ভজি মায়ের পদ হেলায় জন্ম যায়।
জননি করুণাময়ি ! মুই হীন দাস,
গাইতে তোমার নাম চিত্তে অভিলাষ।
তুমি বিনে অধমের ভরসা আর কি,
না ভজি তোমার পদ জীবার সাধ্য কি।
কি করিবে ধনে জনে, কি করিবে রাজ্যে॥
স্মরিতে সকল কর চিত্তের স্বকার্যে

*   *   *

এতেকে যে হয় তোমার নাম আলাপিতে।
নাগ মুক্তারামে ভণে এ ভব তরিতে॥

অন্যান্য কবিগণ বিস্তৃতভাবে অন্যান্য দেবদেবীর বন্দনা যে ভাবে করেন, কবি তাহা অনুসরণ না করিয়া অতি সংক্ষিপ্ত দেবদেবী বন্দনার পরই তাঁহার আপন-কথা 'শরত মালসী গাই গৌরীর নাইওর' এ লিয়া আসিয়াছেন। মালব-শ্রী মালসী রাগিণী ভৈরব রাগের স্ত্রী, অপরাহ্ন কালের গীতে তিনি মূর্ত্ত হইয়া উঠেন। হাফ-আখড়াইয়ের প্রধান সুরকর্ত্তা মোহনচাঁদ বসু প্রধানতঃ শরৎমালসী এবং বসন্ত মালসীতে গান গাহিতেন। কবিগানের প্রায় সকল প্রকার গীত মাত্রেই মালসী রাগিণীতে গীত হইত। দেবীর নাইওর অর্থাৎ স্বামী-গৃহ হইতে পিতৃগৃহে আগমনের কাহিনী এই রাগিণীতে গীত হয়। সাধারণভাবে দেবী বিষয়ক গীত এই রাগিণীতে গীত হইয়া থাকে। সঙ্গীত-দামোদর গ্রন্থে উক্ত আছে।

শক্রোত্থানং সমারভ্য যাবর্গা মহোৎসবম্॥
গীয়তে তদ্‌বুধৈ নিত্যং মালসী সা মনোহরা" ॥

শক্রোত্থান অর্থাৎ জীমূতবাহন পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া দুর্গা মহোৎসব পর্য্যন্ত মনোহারিণী মালসী রাগিণীতেই সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতগণ গান করিয়া থাকেন। কিন্তু ভাটিয়ালি, সারি ও জারি গানের মত বাংলার প্রসাদী সঙ্গীত এবং মালসী গানও বাংলার লোক সঙ্গীতের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানের গ্রাম্য গায়কগণ শরৎকালে যে আগমনী ও বিজয়া গান গৃহে গৃহে করিয়া থাকেন তাহা মালসী রাগিণীতেই গীত হইয়া থাকে। কবি মুক্তারামের গ্রন্থে কবির স্বরচিত এবং দ্বিজরাজ, গোসাঞি রামানন্দ, জগন্নাথ, শঙ্কর, তারিণী, কালিদাস, কানাই-বলাই-নাথ, শরৎ, কৃষ্ণকান্ত, দ্বিজরাজকিশোর, দ্বিজ রামপ্রসাদ, রামলোচন, কানাই প্রভৃতি পল্লীকবি রচিত গান সংগৃহীত আছে। এই গান-গুলিতে শুধুমাত্র আগমনী বিজয়া সম্পর্কিত পদ নাই, ইহার মধ্যে সাধারণ দেবী বিষয়ক অর্থাৎ শুধুমাত্র চণ্ডী নহে গঙ্গাও সঙ্গীত যথেষ্ট আছে। কাজেই দেখা যায় প্রচলিত সংস্কারে মালসী গান সর্ব্ব সময়েই গীত হইয়া থাকে তবে প্রকৃষ্ট সময় শরৎকাল। কবি মুক্তারাম আলোচ্য গ্রন্থে অষ্টমী রাত্রিতে হিমালয় গৃহে দেবসভায় অপসরাগণের নৃত্যগীত উৎসবে উল্লেখ করিয়াছেন

"এইকালে গায় গীত মালবমালসী।
হংসগতি নৃত্যে তবে চলিলা রূপসী॥"

বন্দনার পরেই কবি মহাভারতের অনুক্রমে 'ব্যাসের নিকট জন্মেজয়ের গৌরীর নাইওর শ্রবণ' প্রসঙ্গ আনয়ন করিয়া কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন

এক চিত্তে সভাখণ্ড শুন মন করি,
যেন মতে শরৎকালে নাইওর এলেন গৌরী।
সুর নরে পুজে তাঁরে এই ত সময়,
ব্যাসস্থানে জিজ্ঞাসেন, রাজা জন্মেজয়।
এক নিবেদন মুনি, করি তোমার পদে,
শুনিলাম পূর্ব্বকথা তোমার প্রসাদে।
অষ্টাদশ পুরাণ আর নব ব্যাকরণ,
গীতা-ভাগবত আদি স্বগোত্র কথন।
এ সকল শুনি মুক্ত হইল কিঙ্কর,
শুনিবারে শ্রদ্ধা মনে, গৌরীর নাইওর।
পুরাণে শুনেছি মাত্র হরগৌরীর বিয়া,
সুর নর রক্ষা কৈলা, কৈলাসেতে গিয়া।
পুনঃ তাঁরে কি মতে বা আনিল নাইওর,
কতদিন ছিলেন আসি, মা বাপের ঘর

কিবা আড়ম্বরে এলেন কারে সঙ্গে করি
কি কি দ্রব্যে মেনকায়, তুষিলেন গৌরী।
দেখিয়া দুহিতা, মায়ের খণ্ডিলেক তাপ,
মায়ে ঝিয়ে কি বিষয় হইল আলাপ।
পাষাণের মেয়ে তিনি শুনতে অসম্ভব,
হিমালয় কি মতে কল্লেন দুর্গার উৎসব।
সেই কালে সুরপুরে, পুজে কুতূহলে,
কেহবা বসন্তে পুজে, কেহ শরৎকালে।
এ সকল শুনিবারে চিত্তে হ'ব রঙ্গ,
শুনিলে দুর্গতি খণ্ডে ভবানী প্রসঙ্গ
ব্যাস বলে কহি আমি……

ব্যাসদেব তখন জনমেজয়কে প্রসঙ্গ কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন কবির কাব্যও আরম্ভ হইল। অতি সুকৌশলে কবি প্রচলিত লৌকিক ধারণাকে পুরাণের সহিত একই সূত্রে গাঁথিয়া দিলেন। পুরাণসমূহের মধ্যে দেবভাববিমণ্ডিত দেবকথাই কেবল আছে। মানুষের অন্তরের কথা, গৃহের কথা তাহার মধ্যে নাই, তাই সাধারণ মানুষ দেবতার মহতী কল্পনায় কেবল তৃপ্ত হইতে না পারিয়া দেবতার দেবত্ব রক্ষা করিয়া নিজের মনের কথা দিয়া তাহাকে আপন করিয়া লইয়াছে। এইজন্য লোকবিশ্বাস এবং পুরাণ কথা লৌকিক কাব্যে একই স্রোতে মিলিত হইয়াছে। হিমালয়ে জগৎ পিতা হর ও জগতমাতা গৌরীর বিবাহ প্রসঙ্গ, কৈলাস গমন, কার্ত্তিক গণপতির জন্ম, দেবলোকে অসুরের উৎপীড়ন, ইন্দ্রাদি দেবতা কর্ত্তৃক দেবীর স্তব, দেবস্তবে প্রসন্না দেবীর মহিষাসুরের সহিত সংগ্রাম, মহিষাসুরবধ প্রভৃতি কাহিনী প্রখ্যাত মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবং অন্যান্য পুরাণ মধ্যে বর্ণিত আছে, কিন্তু ঘরের কথা পুরাণকার বলেন নাই বাঙালী কবি তাহাই বলিয়াছে। উচ্চাদর্শের জন্য পুরাণকার যাহা ফাঁক রাখিয়াছিলেন বাঙালী কবি তাহাকেই হৃদয়রসে পূর্ণ করিয়াছেন তাই এইরূপ কাব্যগুলি রচিত হইয়াছিল।

ভারতীয় সমাজে বিবাহের পরে স্বামীগৃহ ভিন্ন বাহিরে যাওয়া নারীকুলের অশোভন আচরণ বলিয়া কথিত হয় তাই কবিদেবীর মহিষাসুরের সহিত রণের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন 'বিয়া হইয়া অসুরের সঙ্গে মহারণ' অসুরের সহিত রণ করিয়া দেবতাদিগের স্তবে দেবীর শ্রম অপনোদিত হইল; তারপর তিনি একদিন 'পুষ্প শয্যায়' শয়ান ছিলেন সারি সারি ডাকিনী যোগিনী শীতল জল, কর্পূর-তাম্বুল, চুয়াচন্দন যোগাইতেছিল সখীগণ নানা রঙ্গে নাটগীত গাহিতেছিলেন এমন সময় দেবর্ষি নারদ উপস্থিত হইলেন। দেবী নারদকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন, তখন দেবর্ষি বলিলেন—'দেবী তুমি পরমাপ্রকৃতি, হরিহরব্রহ্মা বিনা আর কেহই তোমার মহিমা বুঝিতে পারে না। মায়াবদ্ধ জীবকে তুমিই সেই মায়া সূত্রে বাঁধিতেছ, তাহা হইলে তোমার পিতা 'হিমাল রাজেশ', মাতা মেনকা তোমাকে পাইবার জন্য কত যজ্ঞ হোম ক্লেশ করিয়াছিলেন; আজ তাঁহারা তোমাকে দেখিতে চান। বিবাহের পর তুমি কৈলাস আলো করিয়া আর কি হিমালয়ে যাইবে না; এই কি দেবতার দেবভাব—

দেবের সম্বন্ধ নাই মায়া কি মমতা,
বিয়া হলে জনকপুরে নাহি গেল সীতা।

তুমি এমনই নির্ম্মম হইয়াছ যে পিতা পাষাণকেও অতিক্রম করিয়াছ। মাতা মেনকা তোমাকে স্বপ্নে দেখিয়া আকুল, তুমি একবার তাহাকে দেখা দাও। তখন—

নারদের বচনে পাষাণ বিন্ধে ঘুণে—
দৈবকী নন্দনের যেন, গোকুল হইল মনে।
শিশুকালের কথা শুনি পুলকিত তনু,
তিমিরে ঢাকিছে যেন. শিশিরের ভানু।

দেবী আনন্দে উন্মত্ত হইয়া শিবের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতে শিব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন

অচল পর্ব্বত সে যে ধরণীতে ধরে,
হস্ত নাই পদ নাই, বাপ বল কারে?
* * *
হীন অকুলীন জানি, নিন্দে সব দেবে,
তার ঘরে যেতে চাও, পূজা খাবার লোভে।
কিবা সুখ ভোগ তথা? কর যে বড়াই,
ভাঙ্গ ধুতুরা তার পাপিষ্ঠ দেশে নাই।

শিবের উপযুক্ত কথাই বটে। তবুও পার্ব্বতী আপন উদ্দেশ্যে অটল; তখন ভাঙ্গড় শিব সাংসারিক বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের মত বলিলেন

কহিব উচিত কথা না করিও রোষ।
যাচিয়া নাইওর গেলে পরিণামে দোষ।
সতী নামে দক্ষ কন্যা পূর্ব্বে কইনু বিয়া,
আচম্বিতে প্রমাদ ফলিল তারে দিয়া।
নিষেধ না মানি গেল মা বাপের তথা,
কহিতে অনেক আছে পূর্ব্বাপর কথা,
পুনঃ আর তাঁর সনে নৈল দরশন,
পিতা সনে দ্বন্দ্ব করি ত্যজিল জীবন।
তাঁর শোকানলে মোর অন্তর হল কালা
অদ্যাবধি বয়ে ফিরি সেই হাড়ের মালা
এথেকে নিষেধ আমি করি যে তোমাকে
হারাধন পেলে কেনা গেঁটে বেন্ধে রাখে
আর না কহিও তুমি নাইওরের কথা,
কহিলে উচিত ফল দিব সে সর্ব্বথা।

ভোলানাথ কুপিত হইলেন, পতি আজ্ঞা বিনা পিতৃগৃহ গমনে বাধাপ্রাপ্ত সাধারণ বাঙালী গৃহিণীর মত দেবী চক্ষে জল ফেলিলেন কিন্তু

পুরাণের দশমহাবিদ্যা রূপের পরিবর্ত্তে সাধারণ দাম্পত্য কলহের ন্যায় পরিণামে শান্তি আসিল। দেবী পিতৃগৃহে যাইবেন বলিয়া নারদকে তাঁহার গমন সংবাদ দিতে পাঠাইলেন এবং তাহাকে বলিলেন 'বসন্তের শুক্লপক্ষে সুরথ আমার পূজা করিয়াছিল, আশ্বিনের শুক্লপক্ষে সাগরের পারে রামচন্দ্র আমার পূজা করিয়াছিলেন, আবার সেই শরৎ কাল আসিয়াছে আপনি গিয়া আমার পিতা মাতাকে বলিবেন যে আমি শারদ সপ্তমীতে পিতৃগৃহে যাইব, তিন রাত্রি তিন দিন থাকিয়া দশমী তিথিতে কৈলাসে ফিরিয়া আসিব। নারদ সেই বার্ত্তা লইয়া হিমালয়ে চলিলেন।

এদিকে হিমালয়ে মাতা মেনকা ও পিতা নিদ্রা মধ্যে স্বপ্নে দেখিলেন—

গীত মালসী

কান্দিয়া বলে ভবানী, মা জননী ! একবার নাইওর আন মোরে।
পিতা হিমালয়, পাষাণ হৃদয়, মায় কি পাসরে ঝিয়েরে (গো মা)
মা তোমার জঠরে, জন্মেছি সংসারে গো,
যোগ সাধি নিরাহারে, (পাইলাম) পতি মহেশ্বরে,
পাগল দিগম্বর, থাকে সে কৈলাসপুরে (গো মা) ॥
পাগল শঙ্করে, কুচনী নগরে গো, ভিক্ষা করে ঘরে ঘরে,
ভাঙ্গ ধুতুরা খায়, শ্মশানে বেড়ায়, আমি থাকি অন্নশূন্য ঘরে,
বৎসরান্ত পরে, মা জিজ্ঞাস মোরে গো, কেমনে বিস্মরিছ মোরে,
দ্বিজরাজের বাণী, শুন গিরিরাণী, রইয়াছ কঠিন অন্তরে ॥

দেবী যেন কাঁদিয়া মাতাকে বলিতেছেন—'মাগো তুমি বড় নিদারুণ হইয়াছ, তুমি সারা বৎসরেও একবার আমার খোঁজ লও নাই, তবু তুমি ও আছ বাবাও আছেন পিতা না থাকিলে বাঙালী ঘরের কন্যারা ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূর গৃহে তেমন আদর পান না, মাতা অসহায়—সেখানে মাতার অসহায়তা কন্যা অনুভব করে, কিন্তু যেখানে পিতা পূর্ণ-গৌরবে দেদীপ্যমান সেখানে মাতা কেন এমন, কন্যা যেন নিরুদ্ধ অভিমানে ফুলিয়া উঠিতেছেন। ইহা ত কৈলাস নহে বাঙালী মধ্যবিত্ত গৃহের নিত্যদিনের ঘটনাকেই কবি উমা মেনকার জবানীতে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। মাতা স্বপ্নে ইহা দেখিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া ভূমিতে গড়াগড়ি করিতে লাগিলেন, জ্ঞাতি বন্ধু সকলে তাঁহাকে শান্ত করিলে তিনি বলিলেন

দেখলেন মাকে, এই সে দুঃখে মরিগো
সুরঙ্গ বেশে, চাঁচর কেশে, চন্দ্রচ্ছটা তাহে হেরি,
... ...
আমি মনের খেদে (হে) বইয়াছি সাধি নাইওর আসিবেন গৌরী
ছিল কাল নিদ্রা, ভেঙ্গ হে ঐ কইয়া গেল চঞ্চলা শঙ্করী ॥

মাতা সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—

সুহৃদ যে হও মোর প্রাণ রক্ষা চাও,
ত্বরিতে আনিয়া মোর গৌরীরে দেখাও।
যাবৎ মায়েরে আমি না দেখিব ঘরে।
তাবদন্নজল আমি না দিব উদরে ॥

হিমালয় ব্যস্ত হইয়া কৈলাসে যাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন এমন সময় দেবর্ষি নারদ সেখানে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া 'হিমাল মেনকার' হৃদয় শান্ত হইল। কারণ তিনিই শিব বিবাহের ঘটক। তাঁহাকে পাদ্য অর্ঘ দিয়া বলিলেন—

কোথায় ছিলে হে নারদমুনি। আমায় দুর্গাহারা ক'রে
রাখলে হে, যেমন মণিহারাফণী।
বিয়ার কালে বলেছিলে হে, মায়েরে দেয়াবে আনি,
কোলে ক'রে মাকে নিলে হে, আমায় করে অনাথিনী ॥
দেবের দেব মহাদেব হে, তাহে জামাই হেন গণি,
ভূত সঙ্গে মনরঙ্গে হে, ভুলায় কুচনী ॥

গোসাঞি রামানন্দ তাঁহার রচিত মালসী গীতে মেনকার কথা বলিয়াছেন, কবি মুক্তারাম হিমালয়ের কথা বলিতেছেন—

দেবেরদেব মহাদেবে বরিয়া জামাই,
চণ্ডীকে বিবাহ দিয়া দেখার আশা নাই।
জাতিতে পর্ব্বত আমি তিনি যে দেবতা,
বিনা আজ্ঞায় আনিতারে কি মোর যোগ্যতা।
ভাগ্যে ছিল পুত্রীভাবে পাইনু শিশুকালে
এখন না দেখি তাঁরে মনে অগ্নিজ্বলে।

হিমালয়ের কাতরতা দেখিয়া যেন মনে হয় তিনি নিজে কিরাত বা শবর জাতি—তিনি উচ্চতর আর্য্য সমাজে কন্যার বিবাহ দিয়াছেন, সেইজন্য সর্ব্বদাই তিনি আপন গণ্ডীতে আপনি সঙ্কুচিত। দুর্গার যে রূপ দেখিতে পাই তাহা অধিকাংশ সময়ে কি কিরাত কন্যার মত নয়? হিমালয় যেন কিরাতরাজা !

দেবর্ষি মেনকাকে বলিলেন—'রাণী তোমার ভাগ্যের অবধি নাই। তুমি জগৎ ঈশ্বরীকে গর্ভে ধারণ করিয়াছ, হাতে কোলে করিয়া তাহার মুখে স্তন দিয়াছ। যাহার অন্ত ব্রহ্মা পায় নাই, তাহাকে তুমি ভুলিয়া আছ কেমন করিয়া? মহিষাসুর বধ করিয়া তিনি শ্রমযুতা হইয়া তোমাকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। মহিষাসুর বধের পর ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাহাকে স্তবে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে শান্ত করিয়াছেন। যেমনভাবে স্বর্গে তিনি ইন্দ্রকে পুন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তেমনি ভাবে সুরথের বসন্ত সপ্তমীতে পূজায় রাজ্যপ্রাপ্তি এবং শারদ সপ্তমীর পূজায় রামচন্দ্রের সীতা-প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। রাণী তুমি ও তাঁহাদের-ই মত ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি দেবগণসহ এই শারদ সপ্তমীতে তাঁহার পূজা কর, দূতমুখে শিবকে নিমন্ত্রণ করিতে পাঠাও। তাহা হইলেই দেবী আসিবেন শঙ্কর ইহা জানেন—কারণ এই লইয়াই ত তাঁহাদের নিত্যদিন বিবাদ ঘটিতেছে। দোলা ঘোড়া কিছুই পাঠাইতে হইবে না কেবল—

যে বেদ বিহিতে পূজা করিলা শ্রীরামে,
তুমিও করিবা সেবা সেই অনুক্রমে।
কেবল ভবানী হেন না করিয়া জ্ঞান
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদির পূজা হইবে স্বস্থান।
এতেকে পাঠালেন আমা জানাইতে বার্ত্তা,
দূত ডাকি আনি দেও শীঘ্র যাউক তথা।
নারদের মুখে শুনি এ সব কাহিনী;
হিমালয় মেনকা নাচে জয় জয় ধ্বনি।

কবি অতি সহজেই লোক প্রচলিত ধারণা এবং পুরাণ কাহিনীকে এক সঙ্গে মিলাইয়া তাঁহার কাব্যকে ভক্তিরসধারা ও মমতার স্নিগ্ধরসে উজ্জীবিত করিয়া গ্রামীণ বাংলা সমাজের অন্তর-তৃষ্ণা নিবারণের উপায় স্বরূপে কাব্যের কাঠামো গঠন করিলেন।

শিখাকণ্ঠ শ্রুতিকণ্ঠ নামে দুইজন গন্ধর্ব্ব অনুচর যাঁহারা দেবীকে 'কোলে কাঁখে' করিয়া বড় করিয়াছিল, হিমালয় তাহাদিগকেই স্বর্গের দেবতাগণকে নিমন্ত্রণের জন্য 'পানকর্পূর সহিতে' পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা নারদকে সঙ্গে করিয়া প্রথমে কৈলাসে গিয়া দেবীর সহিত সাক্ষাত করিলেন। চণ্ডীর আজ্ঞায়, শিবের নিকটে গিয়া দেখিলেন' —বিষ খেয়ে মহাদেব হালি ঢলি পড়ে।' কতক্ষণ পরে শিব ত্রিনয়নে তাহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন 'চণ্ডীর চক্রের অন্ত নাই। দূত সাবধানে হিমালয়ের অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। তিনি হিমালয়ের নিমন্ত্রণে সন্তুষ্ট হইয়া নন্দীকে বৈকুণ্ঠে গিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুকে নিমন্ত্রণের জন্য পাঠাইলেন—

আদ্যন্ত কহিবা তুমি সকল সংবাদ,
হিমালয়ের নিবেদন গৃহ বিসম্বাদ।
একে একে দেবগণ জানাও যথোচিত,
বিলম্ব না কর নন্দি, চলহ ত্বরিত।

এই ত বাঙালীর শিব, বাঙালীর আশুতোষ 'ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট, ভাঙ্গ খাইয়া হালিয়া ঢলিয়া পড়েন, সেই ভাঙ্গ শ্বশুরের দেশে নাই—তাই তিনি বুঝিয়া পান না কেমন করিয়া সেই দেশে মানুষ থাকিতে পারে। তাই ত তিনি দেবীকে পাঠাইতে চাহেন না—উপরন্তু তাঁহারা নিমন্ত্রণ করেন না,পূর্ব্বে সতী কাহিনীতে তিনি উন্মত্ত হইয়াছিলেন। তাহার স্মৃতি আজও ভুলিতে পারেন না তাই গলায় তাঁহার হাড়ের মালা এখনও ঝুলিতেছে, 'হারাধন গেঁটে বান্ধিয়া' রাখিয়াছেন। পত্নীগতপ্রাণ বাঙালীর একান্ত সত্যচিত্র। রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য শিবায়ণে যেখানে 'পাথারে ফেলিয়া গেল পর্ব্বতের ঝি' বলিয়া পত্নীহীন গৃহে বাঙালীর সংসারের অসহায় রূপ প্রকাশ করিয়াছেন সেখানে মুক্তারাম আরও সুন্দর করিয়া বাঙালীর মনের নিগূঢ় চিন্তাটিকে সুপ্রকাশ করিয়াছেন। আহ্বান না পাইয়া যেখানে দুর্জ্জয় অভিমান; আহ্বান পাইয়া সেখানে একেবারে এমন উল্লসিত যে বৈকুণ্ঠের দেব সভাতেও দেবীর সহিত ঝগড়ার কথা সবই বলিয়া পাঠাইলেন। মনের ভাবটা যেন এরূপ—আমি কেউ কেটা নই—আহ্বান পাইয়া তবে রাজী হইয়াছি। এই না হইলে দেবাদিদেব আত্মভোলা মহেশ্বর হইতেন কেমন করিয়া? দেবগণ হর পার্ব্বতীর কোন্দল শুনিয়া ছুটিয়া আসিলেন, গ্রাম বৃদ্ধের ন্যায় পিতামহ ব্রহ্মা বলিলেন—

শ্রদ্ধা করি বাপ মায়নাই ওর নিবে ঝি,
কেন বা জঞ্জাল বাড়াও তাতে দোষ কি?

দেবগণের প্রবোধ বাক্যে শিব অনুমতি দিলেন কিন্তু নিজে চণ্ডীর সহিত যাইবেন না তিনি দেবগণের সঙ্গেই যাইবেন। দেবী ইহা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া শিবের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়া বলিলেন। তখনও শিব তাঁহাকে ছাড়িতে রাজী নহেন তিনি বলেন—

গমন বিরোধি আমার
না হইও সর্ব্বথা।
তোমার ঘরের যতধন
রাখ লেখা করি,
শুধু হাতে আমি যাব
দুই পুত্রে সঙ্গে করি॥

নাইওর যাইবা বাপের ঘরে গো ভবানী।
ভাঙ্গ ধুতুরা ইন্দ্রাসন, কে করিবে যতন
ডাকিলে নিকটে পাব কারে॥
কার্ত্তিক গণেশ যাবে, আমার হেথা কে রহিবে,
জয়া বিজয়া যাবে সঙ্গে, অন্ন নাই শূন্য ঘরে,
রাখি যাইবা একেশ্বরে, কুল মজাইবা উৎসবের রঙ্গে॥

দেবী বলিলেন হর আজ্ঞা কর বাপের বাড়ী হইতে দূত আসিয়াছে আমি সেখানে যাইব। তোমার ঘরের সব কিছু রহিল—শুধু হাতে যাইব সঙ্গে থাকিবে দুই পুত্র কার্ত্তিক গণাই। বিশ্বাস না হয় তোমার ধন কড়ির হিসাব লিখিয়া রাখ। শঙ্কর সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন সবই বুঝিলাম—কিন্তু কে আমাকে দেখিবে 'ডাকিলে নিকটে পাব কারে।' তুমিত আবার কার্ত্তিক গণেশ জয়া বিজয়া সকলকে লইয়া যাইবে আমি কেমন করিয়া থাকিব? কে অন্ন দিবে? তুমি যাবে যাও কিন্তু 'উৎসবের রঙ্গে কুল মজাইও না'। আর এক কথা আমি ত যাহা পাই সবই বিলাইয়া দি, ঘরে ত কিছুই নাই শূন্য হাতে কি যাওয়া তোমার শোভা পায়? স্থিরচিত্ত বৈষয়িক বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের রূপ কবির লেখানীতে ধরা পড়িয়াছে। মানুষটি শঙ্কায় সংকোচে দ্বিধায় দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ। দেবী উত্তর দিলেন—ভয় নাই সপ্তমীতে যাইব দশমী প্রত্যুষে ফিরিয়া আসিব কোনও মেয়ে কোথাও কি বাপের বাড়ী যায় নাই যে 'রাত্রদিন খোঁটায় দহিবে মোর হিয়া।'

যত মন্দ কহিলা মোরে তুমি বাপ মাও,
কহিতে ক্রন্দন আসে না করিলাম রাও।
বুঝিয়াছি যারে খেয়ে কর চপলতা,
আপনার বস নহ কিসের দেবতা,

ভাঙ্গ ধুতুরা খেলে লজ্জা নাহি থাকে,
বস্ত্র শূন্য হয়ে থাক হাসে দেবলোকে।
যদি কিঞ্চিৎ জ্ঞান হয় ব্যাঘ্র চর্ম্ম টান,
পিন্ধিবারে চাও তারে লজ্জা নাহি মান।
এ সকল দেখিয়া আমার লজ্জা করে,
তোমার সাক্ষাতে কেবা কথা কৈতা সারে।

দেবদেবীর কোন্দল দেখিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু হাসিয়া বলিলেন—কন্যার পিতৃগৃহ গমন কাল আনন্দের সময় এখন কোন্দল করা উচিৎ নয়, বিশেষ করিয়া কথায় কথা বাড়ে কি জানি এখন কথা কহিতে কহিতে শেষে পূর্ব্ব ঘটনার (সতী কাহিনীর) কথা মনে পড়িলে কি অনর্থপাত করিবেন কে জানে? দেবগণের এই কথায় দেবী শিবকে প্রণাম করিয়া সভা ছাড়িয়া প্রান্তরের শীতল ছায়াযুক্ত বিল্ববৃক্ষতলে দুই দূত সঙ্গে করিয়া বসিলেন। দেবী তাহাদের হাতে সেই বিল্ববৃক্ষের 'যুগল শ্রীফল' দিয়া মাতা মেনকাকে দিয়া তাঁহার আগমন সংবাদ দিতে বলিয়া পাঠাইলেন। তিনি যে আসিবেন তাহার প্রতীক এই যুগল শ্রীফল। যেদিন তিনি 'যুগল শ্রীফল' পাঠাইলেন সেদিন শারদীয়া ষষ্ঠী।

এদিকে হিমালয় মেনকা আনন্দে উল্লসিত হইয়াছেন দীর্ঘদিনের পর কন্যা গৃহে আসিবেন—নানাদেশ হইতে নানা দ্রব্যজাত করিতেছেন। কর্পূর, তাম্বুল, আতপ তণ্ডুল, নারিকেল, চিনি, ননী, ক্ষীর, গুড়, কলা, মধু, দধি, তিল যব, মুহুরী, মাস, মুগ, 'মেষ, মৈষ ছাগ কোটী কোটি' আনিয়া ভাণ্ডার পূর্ণ করিলেন। পান পাইয়া ঋষি, মুনি, দেবতা গন্ধর্ব্ব রাজকন্যা, মণিকন্যা, পার্ব্বতীয়া নারী, জ্ঞাতিকুটুম্ব, অপ্সরী, ভাট নর্ত্তকী, বাজুনিয়া বাজিকর যন্ত্রি, রাজা প্রজাগণ প্রভৃতি আসিবার ফলে 'একান্ত লোকের ঘটা রাজ্যে নাই পায় ঠাঁই'। বিবাহের সময় যেখানে গৌরীর বাসর ঘর হইয়াছিল সেখানে রত্নমন্দিরের দেওয়াল 'তরুণ কনকে বান্ধা চারিটি দেওয়ালী' নির্ম্মাণ করিলেন, উপরে চন্দ্রাতপ টাঙাইয়া দিয়া চতুর্দ্দিক শুদ্ধ গঙ্গাজলে পরিষ্কার করিয়া 'হিঙ্গুল হরিতালে' আলিপনা দেওয়াইলেন। ষষ্ঠী সন্ধ্যা ধীরে ধীরে আসিল। দীপ ধূপের গন্ধে, শঙ্খঘন্টার বাদ্যে বিদ্যাধরীর নাচে শরৎসন্ধ্যা আনন্দমুখর হইয়া উঠিল। মেনকা, দেবী প্রেরিত 'যুগলবেল' পুরোহিতের হাতে দিয়া বলিলেন—

এই সে ভবানী মোর আত্মজার প্রতি
ইহাকে স্থাপিয়া কার্য্য কর যত ইতি।

... ...

চণ্ডীর যুগল বেলে রম্ভা কচু মিশালে
সঙ্গে দিল অশোক জয়ন্তী
হরিদ্রা দাড়িম্ব মান, ধান্য আদি সমাধান
নবদ্রব্য বুঝি লয় লেখা
সারি সারি বসাইয়া, গন্ধপুষ্প জল দিয়া,
পূজিলেক নব-পত্রিকা॥

দেবীপ্রেরিত শ্রীফল দেবীর প্রতীক, তাই বিল্বষষ্ঠী বা বিল্ব অধিবাসে দেবীর আগমন সূচিত হয়।

সপ্তমী প্রভাতে হিমালয়পুরে ব্যস্ততার অবধি নাই 'হিমেলরাজ' যাহাকে যে কার্য্য দিয়াছেন সকলেই তাহা করিতেছেন। সকলে পথ চাহিয়া বসিয়া আছে কখন দেবী আসিবেন।

এদিকে দেবী 'সুন্দামেথী, হরিদ্রা, পিঠালী, আমলকী, বিষ্ণুতৈল' প্রভৃতি সর্ব্বগাত্রে মাখিয়া নানা তীর্থের জলে স্নান করিয়া অতি দীপ্তিময় রতন শাড়ী পরিধান করিলেন। 'অতসী কুসুমবর্ণ অরুণ নিন্দিত' আসনে বসিয়া কবরী বাঁধিলেন—

মণিমুক্তা তাহাতে লাগিছে দোলানি,
ঊর্দ্ধে কামটঙ্গি ঘর হেঁটে দোলে বেণী।

... ...

দুই পাশে কেশেতে কেঁচুয়া (১) সারি সারি ১। ফিঙাপাখী
রঙ্গিয়া পাথরের কলি (২) মাণিক্যের ঝুরি॥ ২। ফলক

সীমন্তে কাম সিন্দুরের ফোঁটা, সীমন্তের আগে তরুণ চন্দ্র তার আগে লবঙ্গ, ভুরূতে অঞ্জন আর চোখে কাজলের কনা, নাসায় বেশর প্রভৃতি নানা অলঙ্কারে দেহ সজ্জিত হইলেন—

সেইরূপে দশদিক আলোকিত হৈল,
তুলনা দিবার নারি এই দুঃখ রইল।
শশধর যোগ্য নহে অন্তরে কলঙ্ক,
যেইরূপ দেখিয়া হরের যোগ ভঙ্গ।

সঙ্গে সঙ্গে কার্ত্তিক গণেশকে বিচিত্র বসনে ভূষণে এবং দেবীর বাহন পশুরাজ সিংহও বিচিত্র ভাবে সজ্জিত হইলেন। লক্ষ্মী সরস্বতী কিন্তু এই প্রসঙ্গে নাই। তারপর—

শিবেরে প্রণাম করি তাঁরা তিনজনে।
অবিলম্বে আরোহণ করিলা বিমানে॥

দেবী ক্ষেত্রপগণকে বলিলেন—পশ্চিমে রথ সঞ্চালিত কর কারণ বৈকুণ্ঠে পূর্ণব্রহ্ম নিরঞ্জনকে দেখিয়া পিত্রালয়ে যাইব। চন্দ্রমণ্ডল ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ দক্ষিণে রাখিয়া একস্থানে আসিয়া দেবী বলিলেন—

এখানে বিলম্ব কর কিঞ্চিৎ পলিকা।
নিরঞ্জন নির্ব্বাণে করিয়া আসি দেখা॥
রথ রাখি তথায় রহিলা সর্ব্বজন।
পদগতি হাঁটি দেবী করিলা গমন॥
সেইস্থান দেখি তবে করিলা ভকতি।
তার ভেদ কই শুন হইয়া স্থির মতি॥
প্রকৃতির সেবায় পুরুষ হলেন বশ।
তার অর্থ লিখিলা এবে ভুবন চতুর্দ্দশ॥

সপ্ত পাতাল সপ্ত দ্বীপ স্বর্গ সাথে।
এ তিন ভুবন হৈল এক ডিম্ব হ'তে ॥

... ...

রূপ ভেদ নাই তাঁর লক্ষণ না পায়।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে যাহাকে ধিয়ায় ॥
পরমপুরুষ সে যে আত্মা অবিনাশী।
অনন্তবাহন তার ক্ষীরোদ নিবাসী ॥
যত দেব পুজা কর তাতে আসি মিশে।
প্রলয় পৃথিবী হৈলে নৈরাকারে ভাসে ॥
ধর্ম্ম অধর্ম্ম কিবা জ্ঞান আর অজ্ঞান।
পাপ পুণ্য তাঁর কাছে সকলি সমান ॥
ধরিলে ধরণ না যায় আছয়ে গহিনে।
আচম্বিতে নাদ হল শক্তি দরশনে ॥
তাঁর ইচ্ছা নাই সৃষ্টি রইতে এই মতে।
সকল ভাঙ্গিয়া চান এই রন্ধ্রে নিতে ॥
জপা অজপা ভাঙ্গি একই কাহিনী।
একাক্ষরে এক নাম ব্রহ্মে উঠে ধ্বনি ॥
একেতে অনন্ত হয় অনন্তে হলো এক।
সেনামের তুলনা নাই ভজন করি দেখ ॥
অনাহতে সেই ধ্বনি উঠে সেই রন্ধ্রে
যাকে জপি মায়া ত্যাগ করিছে যোগীন্দ্রে
কঠোর তপস্যা কইলে দেখি তাঁর আভা
উদ্দেশে তপস্যা করে যত দেবী দেবা
শব্দেতে আলস্য তার নিঃশব্দেতে সার।
কেবল শক্তির কাছে রাখিছেন সংসার ॥

কবি মুক্তারাম তাঁহার কাব্যটিকে কেবল মাত্র মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। কালানুগ লোকচেতনা অনুসারে যেখানে যাহা পাইয়াছেন সব কিছু দিয়াই তাঁহার কাব্যকে মর্ম্মগৌরবে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে সৃষ্টিপ্রকরণ লিখিবার কোন প্রয়োজন ছিল না বা আদিদেব নিরঞ্জন সম্পর্কে আলোচনার কোন প্রয়োজন ছিল না কিন্তু শূন্যপুরাণ হইতে যে ধারা চলিয়া আসিতেছে লৌকিক চণ্ডীমঙ্গলে এবং ধর্ম্মমঙ্গলে ও শিব-সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতিকে অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণনার স্থান করিলেন দেবীর পিতৃগৃহে যাত্রা পথে। ব্রহ্মস্থানে আসিয়া দেবী পদপঙ্‌ক্তিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

প্রণয়ী

শ্রীবিমল রায়

একটি অরুণ ভোরে এসেছ বাহিরে
ঘুম ভেঙে, পদতলে লুণ্ঠিত অঞ্চল,
স্বেদাক্ত কুঞ্চিত বক্ষে অলস কুন্তল
মাখিয়া রাত্রির গ্লানি রহিয়াছে ঘিরে।
বিনিদ্র অঞ্জন মাখা আঁখির পালকে
অস্পষ্ট স্বপ্নের মায়া, চোখের সাগরে
ফেলিয়া ক্ষণিক ছায়া দূরে যায় সরে'
অজানার কোন পাখি আঁধার-আলোকে।
গোপনে দেখেছি তাহা, তুমি তো জাননা
তোমার বুকের ব্যথা আছে কোন খানে ?
যখন চেয়েছ ফিরে, সচকিতা, পাছে
আমি কিছু বুঝি তব ব্যথার ব্যঞ্জনা
সলজ্জ ভ্রুকুটি হেনে গেলে দূরে, মানে
মদনের চোখ নাই—প্রণয়ীর আছে।

পিতম্

বন্দেআলী মিয়া

জীবনের মধুবৃন্তে ঘুম ভেঙে জাগে প্রজাপতি
গ্রহে গ্রহে জ্বলে দীপ—কলকণ্ঠে কাকলি কূজন,
তোমার উদয় তারা দেখেছো কি কংকাবতী
সেদিন প্রসন্ন বেলা—দুই চোখে অচেনা স্বপন।

সেদিন বাতাসে ছিল অচেনা মদির দাহ
আছিল অশেষ ব্যথা ক্ষুধাতুর জলধির বুকে,
সেদিন ভুবনে ছিল জীবনের অযুত প্রবাহ
আছিল স্বপন সাধ—অজানার আরণ্যক দুখে।

আজিগো পুষ্পশাখে মেলিয়াছে ময়ূরী পেখম
মেলেছে কমলদল জীবনের দক্ষিণ সায়রে,
তোমার সুরের ধ্বনি লোকে লোকে
জাগে গো পিতম।
আজিও অশ্রু তব দিকে দিকে নিরবধি ঝরে।

দেবভূমি—বদরীনাথ

শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্তী

দেবভূমি কেদারনাথে আমরা একরাত্রি বাস করে পরদিন প্রাতে বাবা কেদারনাথকে দর্শন ও পূজা সমাপন করলাম। ২৭শে মে (১৯৫৭) বেলা অনুমান ১১টা'র সময় আমরা যাত্রা করলাম গৌরীকুণ্ড অভিমুখে। মনে হ'ল যেন কি অপার্থিব—স্বর্গীয় আনন্দলোক ছেড়ে চলেছি। হৃদয়াকাশে উদিত হ'ল আর একটি দেবভূমির কথা,—বাবা বদরী বিশাল বা বদ্রীনারায়ণ ধাম। মনের ক্ষণিক বিষাদ হ'ল তিরোহিত, আবার এক নূতন দেবলোকের কল্পনা জাগল মনোমধ্যে। নবীন উৎসাহ ও উদ্যম নিয়ে যাত্রা সুরু হ'ল।

দেড়-মাইল বরফের রাস্তা অতিক্রম করে এবার চললাম বিশাল পর্বত শ্রেণীর উৎরাই পথে। কিছুক্ষণ পায়ে হেঁটে ঘোড়ায় চাপলাম। সন্ধ্যায় আমরা পৌছলাম গৌরীকুণ্ড চটিতে। তখন টিপ টিপ বৃষ্টি হচ্ছিল—খুব শীত। কেদারনাথ ধামে স্নান করা সম্ভব হয়নি, তাই গৌরীকুণ্ডের তপ্তকুণ্ডে স্নান করলাম। সেখানে এক চটীতে রাত্রিবাস করে পরদিন প্রত্যুষে যাত্রা সুরু হ'ল বদরীনাথের পথে। মধ্যাহ্নে "ফাটা" চটীতে আহার ও বিশ্রাম করে সন্ধ্যার প্রাক্কালে এসে পৌছলাম "নালা" চটীতে।

আমাদের প্ল্যান ছিল যে নালার পথে উখীমঠ হ'য়ে আমরা চামেলি যাব, সেখান থেকে 'বাসে' যাব পিপলকোটি; কিন্তু নালায় পৌছে সেই পথ দুর্গম ও নির্জন এবং ভাল চটী নাই জেনে আমরা স্থির করলাম আবার রুদ্রপ্রয়াগ ফিরব। সেখান থেকে যাব মটর বাসে পিপলকোটি। নালা থেকে গুপ্তকাশী ১ মাইল পথ। আমরা ঠিক করলাম গুপ্তকাশীতে রাত্রিযাপন করব কিন্তু গুপ্তকাশীতে সন্ধ্যার সময় পৌছে দেখলাম সেখানে নঃ স্থানং তিল ধারণম্। কি করা যায়—এই শীতপ্রধান স্থানে রাস্তায় তো আর থাকা যায় না। এখানে এসে আমরা ঘোড়া ছেড়ে দিয়েছিলাম। স্থির করলাম ২ মাইল হেটে কুণ্ড চটীতে গিয়ে রাত্রি যাপন ও আহার করব। দুর্ভাগ্য এমনি সেই দমফাটা বন্ধুর উৎরাই পথ অতিক্রম করে রাত্রি ৮টার সময় কুণ্ড চটীতে এসে দেখলাম সেখানে লোকে লোকারণ্য। বহু কষ্টে সামান্য একটু স্থান পেলাম—তার মধ্যে আবার ঢুকে আছে উত্তর প্রদেশের কৃষক শ্রেণী। তাদের জামা কাপড়ের দুর্গন্ধে গা বমি বমি করতে লাগল। কিন্তু উপায় কি? সকলেই শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত। কোথাও পাকের স্থান মিলল না—খাবারও মিলল না। ঘটিতে করে খাবার জল এনে পিপাসা নিবৃত্ত করা হল।

প্রত্যুষে উঠে যাত্রা করলাম—৯ মাইল অতিক্রম করে পৌছলাম চন্দ্রাপুরী চটিতে বেলা প্রায় ৯॥টায়। সেখানে একটি ভাল চটীতে স্থান করে স্নানাহার সমাপন করলাম। এই চটী চন্দ্রা-মন্দাকিনীর সংগম স্থানে সমতল ভূমিতে—স্বচ্ছ স্নিগ্ধ মন্দাকিনীর পূত জলে স্নান করে গত রজনীর গ্লানি দূর হ'ল। অপরাহ্নে আবার যাত্রা করলাম অগস্ত্য-মুনি চটী অভিমুখে। পৌণে পাঁচ মাইল রাস্তা—সমতল ভুমি। আশা ছিল অগস্ত্যমুনিতে পৌছে মটর "বাস" পাব—১১ মাইল মটর বাসে পৌছব রুদ্রপ্রয়াগে সেইদিন বৈকালে; কিন্তু হায় সেখানে বেলা তিনটার সময় পৌছে দেখলাম অসংখ্য যাত্রীর দল বসে আছে ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য গ্রামের চারিদিকে। কি ব্যাপার? তিনদিন ধরে এক-খানি মাত্র গাড়ী চলছে—আর সেইদিন সেখানিও হয়েছে বিকল! অসংখ্য জনতা ঘিরে আছে মটর বাস ষ্টেশন অফিস। আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথায় পেলাম না আশ্রয়। ভগবানের সৃষ্ট অসংখ্য তারকা খচিত বিশাল গগন তলে করলাম সেই রাত্রির শয্যা রচনা—উন্মুক্ত দুর্ব্বাক্ষেত্র হ'ল আহার স্থান। কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুম জমল কিন্তু বেশ!

পর দিন প্রত্যুষে স্থান মিলল 'কালীকম্লীর' ধর্মশালায়। স্নান আহার শেষ করে প্রতীক্ষা করছিলাম মটর-বাসের। ইতিমধ্যে এক কোলাহল উঠল, 'বাস এসেছে—বাস এসেছে'। পড়ল ছুটোছুটি হুড়ো-হুড়ি। এক ঘণ্টা পরে উঠলাম বাসে—বেলা ৪টায় পৌছলাম আবার রুদ্রপ্রয়াগে—সেই মন্দাকিনী ও অলকানন্দার উদ্দাম তরঙ্গধ্বনি। মনে প্রাণে স্বর্গীয় আনন্দধারার শিহরণ।

রুদ্রপ্রয়াগে পৌছে রুদ্রনাথকে প্রণাম করে চললাম অলকা-নন্দার অপর তীরে বাস ষ্ট্যাণ্ডে। আশা, যদি 'বাস' পাই যাত্রা করব পিপলকোটি অভিমুখে। অলকানন্দার পুল পেরিয়ে বাসের অফিসের সম্মুখে অসংখ্য জনতা দেখে চমকে গেলাম। খবর নিয়ে জানলাম 'বাসের' অভাবে প্রায় দুই হাজার যাত্রী তিনচার দিন অবস্থান করছে এই ক্ষুদ্র স্থানে। বুকিং অফিসে মিলল না কোন কর্মচারী—দরজা বন্ধ। অনেক অনুসন্ধান করে একজন কর্মচারীকে পাকড়াও কর-লাম। তিনি যা বললেন তা'তে ৭ দিনের পূর্ব্বে আমাদের পিপল-কোটি যাবার 'বাস' পাওয়া দুষ্কর মনে হ'ল। যা'হোক আমাদের আটজনের নাম রেজেষ্টারী করলাম ২৲ টাকা ফিস জমা দিয়ে মটর বাস' অফিসের খাতায়। তৃতীয়দিনে পৈরী (গাড়োয়াল জিলার হেডকোয়ার্টস) থেকে পাঠাল অনেক মটর-বাস। আমরা প্রথম ট্রিপের বাসেই স্থান পেলাম। বাবা বদরীবিশালের নাম নিয়ে বাসে চাপলাম। রুদ্রপ্রয়াগ হ'তে পিপলকোটি ৪৯ মাইল। ভাড়া প্রথমশ্রেণীতে ৩।৵০। আমি আসন নিলাম ড্রাইভারের পাশে।

বাস চলল এবার অলকানন্দার দক্ষিণ কূল ধ'রে—একই রকম রাস্তা, পাহাড়-শ্রেণী ডানদিকে, বামে পুণ্যতোয়া, অলকানন্দা। চালক

একটু অসতর্ক হলে সলিল সমাধি সুনিশ্চিত। রুদ্রপ্রয়াগ হ'তে কর্ণ-প্রয়াগ ২০ মাইল। এই কর্ণপ্রয়াগে পর্ব্বতশ্রেণীর নীচে সূর্য্যের তপস্যা করেছিলেন মহাবীর কর্ণ—তপস্যায় সিদ্ধ কর্ণ লাভ করলেন অভেদ্য কবচকুণ্ডল সূর্য্যদেবের কৃপায়। এখানে স্নান, তর্পণ ও উমাদেবীর মন্দির দর্শন করা বিধেয়। কর্ণপ্রয়াগ হতে চামেলী ২০ মাইল—নন্দপ্রয়াগ ১১ মাইল। নন্দপ্রয়াগ—নন্দা ও অলকার সঙ্গম স্থান, এখানে রাজা নন্দ ও রমাপতি মন্দির দর্শনীয়। নন্দপ্রয়াগ হতে পিপলকোটি ১৮ মাইল।

আমরা অপরাহ্ণে পৌছলাম পিপলকোটি। আমরা এখানে কোন চটিতে স্থান পেলাম না। ঘর ভাড়া করতে হল আহার বিশ্রামের জন্য। ইহা একটি ছোট গঞ্জ—এখানে আছে হাটবাজার, দোকানপাট—ডাকঘর ও তারঘর। ডাকবাংলো ও ধর্ম্মশালা যাত্রীর ভীড়ে ভর্ত্তি। এই হলো বাস-রুটের শেষ ষ্টেশন। এখানে পাওয়া যায় অসংখ্য হরিণ, ব্যাঘ্র ও অন্যান্য পশু-চর্ম্মাসন, চামর কম্বল ইত্যাদি। কিন্তু রাস্তায় কোথাও এসব জন্তু জানোয়ারের দেখা মেলে না।

এখান থেকে বদ্রীনাথ ৩৯ মাইল। পিপলকোটিতে পাওয়া যায় কাণ্ডী, ডাণ্ডী ও ঘোড়া। আমরা চললাম এখান থেকে পায়ে হেঁটে। সেইদিন (১লা জুন, ১৯৫৭) বৈকাল ৪ টার সময় আমরা যাত্রা করলাম বদরীনাথের পথে। ৪ মাইল চড়াই রাস্তা হেঁটে আমরা পৌছলাম সন্ধ্যায় গরুড়গঙ্গা চটিতে। একটি ভাল চটিতে স্থান পেলাম। এখানকার দৃশ্যটি মনোরম—দুই পাহাড়ের মধ্যস্থলে প্রবাহিত হচ্ছে গঙ্গা। এখানে গরুড় গঙ্গায় স্নান ও মন্দির দর্শন করতে হয়; কিন্তু রাত্রিকালে বরফ জলে স্নান করতে সাহস হল না—স্পর্শ করে সন্ধ্যাবন্দনা করলাম। ফিরবার পথে স্নান করেছিলাম। গরুড়গঙ্গায় এক ডুবে একমুড়ী পাথর তুলে ঘরে রাখলে নাকি নাশ হয় সর্পভয়। বিছায় কামড়ালে ইহা জলে ঘষে লাগালে আরাম হয় জ্বালা।

প্রত্যুষে ওঠে আমরা চললাম জোশী মঠ (জ্যোতির্ম্মঠ) অভিমুখে। বেলা ১১॥০ টায় আমরা পৌছলাম ঝড়কুলা চটিতে। এখানে এসে জানলাম অত্যধিক বরফ পড়ায় চলতি রাস্তা হয়েছে বন্ধ। চার দিনের মধ্যেও পরিষ্কার করতে পারে নি সেই রাস্তা—সেই কারণে বহু যাত্রী ফিরে গেছে ঝড়কুলী থেকে তিন দিন অপেক্ষা করে। আমার বড় ছেলে আমাদের এক সপ্তাহ পূর্বে এসে এইস্থান থেকে ফিরে গেছিল। আমরা সংবাদ পেয়ে চিন্তিত হ'লাম। গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা জানাল যাত্রীরা যেতে পারে উচ্চ পাহাড়ের রাস্তায়—কিন্তু ৩ মাইল ঘুরে যেতে হ'বে আর রাস্তা খুব বন্ধুর—আর একটি রাস্তা আছে পাহাড়ের গায়ে—যেটি তৈরী হচ্ছে মটর চলাচলের জন্য। কিন্তু সেই অসম্পূর্ণ রাস্তায় ভয় আছে পাহাড় ধ্বসে পড়ার এবং পুল হ'বার স্থানগুলিতে পারাপার হ'তে নামতে উঠতে অসীম কষ্ট। আমরা দুর্গা বলে সেই রাস্তায় যাত্রা করলাম। সেই অরণ্যসংকুল রাস্তায় এসে কি যে দুঃখকষ্ট ভোগ করলাম তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। ৩ মাইল পথ অতিক্রম করতে প্রায় ৫ ঘণ্টা সময় লাগল। রাস্তা দুর্গম অথচ মনোহর। জ্যোতির্ম্মঠ ভগবান শঙ্করের স্থাপিত—চারি মঠের মধ্যে একটি। দেবভূমি হিমাচলে ভগবান শঙ্করের দান অপরিসীম। জোশীমঠে দাঁড়িয়ে একবার চারিদিকে তাকালে যে অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যায় তা অতীব নয়নাভিরাম। অদূরে দেখা যায় হাতীপর্বত ঘোড়াপর্বতের শীর্ষ—প্রায় হাজার ফিট নিম্নে বিষ্ণুপ্রয়াগের সেতু। জোশীমঠে নৃসিংহ ভগবানের মন্দির, জ্যোতির্লিঙ্গ মহাদেব, দেবীমন্দির ও দুটি জলের ধারা দর্শনীয়। শীতের কয়েক মাস বদ্রীনাথের পূজা হয় এখানকার মন্দিরে—এখানে শীত বারমাস।—৬১০৭ ফুট উচ্চ। বাজার হাসপাতাল ডাক ও তার অফিস ব্যতীত এখানে আছে সৈন্যের ছাউনি। এখান থেকে নূতন সড়ক তৈরী হয়েছে লাসা অবধি—মটর রাস্তা। পিপলকোটি হতে জোশীমঠ পর্য্যন্ত মটর রাস্তা সমাপ্ত প্রায়। এই পর্য্যন্ত

মন্দির দ্বারে

বাস আসলে তীর্থযাত্রীদের অশেষ কল্যাণ হবে। এখান থেকে বদরিকাশ্রম ২১ মাইল—ভয়ানক চড়াই উৎরাই রাস্তা, কিন্তু মনোরম দৃশ্য। কোথাও শ্লেটের পাহাড়—কোথাও শ্বেতপাথরের পাহাড়—মনে হয় যেন কোন নিপুণ শিল্পী তৈরী করেছে প্রাসাদ গাত্র হরেক রকম পাথরে। আমরা আহারান্তে যাত্রা করলাম এবং সন্ধ্যার বৃষ্টিতে ভিজে পৌছলাম বলদোড়া বলদেও চটিতে। যে ঘরে আশ্রয় পেলাম তার ছাদ ফুটো—ছাতা মাথায় দেবার উপায় ছিল না যাত্রীর ভীড়ে—সারারাত্রি বসে কাটালাম সামান্য খাবার খেয়ে।

পরদিন—প্রত্যুষে অলকানন্দার উপরে পুল পার হয়ে আমরা উঠলাম পশ্চিম পাড়ে, এবার সুরু হল চড়াই পথ। পাঁচ মাইল অতিক্রম করে ডানদিকে একটি পুলের গায়ে লেখা দেখলাম "Way to vally of gardens" অর্থাৎ নন্দন-কানন যাবার রাস্তা। আরো একমাইল হেঁটে আমরা পৌছলাম পাণ্ডুকেশ্বর। ইহা একটি বড়গ্রাম—আছে দোকানপাট, অনেক বাড়ীঘর—এখানে বাড়ী ভাড়া করতে হ'ল—একটি বড় ঘর, ভাড়া ১০৲। সম্মুখে পর্ব্বত-শিখরে বাস করতেন পাণ্ডুরাজা—প্রবাদ শাপগ্রস্ত মৃগবেশধারী রাজা

পাণ্ডু এখানে তপস্যা করেছিলেন বলে এইস্থানের নাম পাণ্ডবেশ্বর। আমরা এখানে রাত্রিবাপন করলাম। সন্ধ্যায় যোগবদরী মন্দিরে আরতি দর্শন করলাম। এখানে বেশ শীত।

প্রত্যুষে যাত্রা করলাম বদরীনাথপুরীধাম পথে—১১॥ মাইল পথ। বড়ই দুর্গম চড়াই রাস্তা—মাঝে মাঝে বরফে রাস্তা গেছে ধ্বসে, তা'তে রাস্তা হয়েছে আরো ক্ষীণকায়া—কোন প্রকারে একটি প্রাণী যেতে পারে। মালবাহী খচ্চর বা ছাগল—ভেড়ার পাল প্রভৃতিকে আসলে আত্মগোপন করতে হয় পাহাড় গাত্রে। হনুমান চটী ছেড়ে কিছুদূর এগিয়ে রাস্তা বরফাচ্ছন্ন হওয়াতে নূতন রাস্তা তৈরী হয়েছিল পাহাড়ের গায়ে—সরু পিচ্ছিল। পা একটু বেসামাল হ'লে পড়তে হবে ৫০০০ ফুট নীচে বরফের স্তূপে। কতকটা পথ চলতে হল বরফের উপর দিয়ে। একস্থানে আমার পিছনে মালবাহী খচ্চর এসে পড়ায় আমি পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়ালাম, কিন্তু দু'দিকের মোট ভারী থাকায় আমি পাহাড়ের গায়ে আরো উঁচুতে উঠতে গিয়া প্রায় যাচ্ছিলাম বরফ-শয্যায় পড়ে, কিন্তু পিছন থেকে এক বাঙ্গালী বৃদ্ধা মহিলা আমার একখানি হাত ধরে ফেলাতে গেলাম বেঁচে।

সেই দুর্গম রাস্তা অতিক্রম করে যখন চড়াই ভেঙ্গে উঠলাম এক উচ্চ পর্ব্বতশিখরে—পশ্চিম উত্তর কোণে দেখতে পেলাম বাবা বদ্রীনাথের মন্দিরের ধ্বজা—এই উঁচু স্থানের নাম "দেবজননী"। এবার উৎরাই পথে নামলাম এক সমতলভূমিতে। সামনে দেখলাম একটি সেতু—তার অপর পারে বদরীনাথ ধাম। সামনে উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলাম অপূর্ব দৃশ্য—নারায়ণ পর্বত চূড়া, বরফাচ্ছন্ন মিনারের কত রমনীয় দৃশ্য! মুখ হ'তে অজানিতভাবে উচ্চারিত হ'ল—এই তো স্বর্গরাজ্য! ঋষি-গঙ্গার উপরিস্থিত সেতু পেরিয়ে প্রবেশ করলাম বদরিকাশ্রম—নরনারায়ণ আশ্রম। উচ্চতা ১০,৪০০ ফিট। অস্তগামী সূর্য্যদেবের রক্তিম আভা পর্ব্বতের বরফাচ্ছন্ন চূড়ায় প্রতিভাত হয়ে তখন সৃষ্ট হয়েছিল এক রমণীয় দৃশ্য! মুহূর্তে তিরোহিত হ'ল দুর্গম পার্বত্য পথের ক্লান্তি, দুঃখ কষ্ট, ক্ষুধা পিপাসা। সেই দৃশ্য অদৃশ্য হ'লে দৃষ্টি পড়ল বাবা বদরীনাথ মন্দির চূড়ায় ও জন কোলাহল মুখরিত সহরের দিকে।

আমরা শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্ট পাণ্ডার যাত্রীবাসে উঠে হাতমুখ ধুয়ে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে গেলাম পোষ্টাফিসে আত্মীয়-স্বজনের চিঠির খোঁজে। তারপর চললাম মন্দির অভিমুখে।

বদ্রীনাথধাম অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গের এক সমতলক্ষেত্রে অবস্থিত—একটি ছোট খাট মুখর সহর। অসংখ্য যাত্রী ও পাণ্ডার কোলাহল মুখরিত। এখানে পাবেন সব কিছু। শাকসব্জী ও আম। হিমালয়-তীর্থে এখানে পৌঁছে ওসব বস্তু দেখতে পেলাম। বাঁধান রাস্ত, ডাকঘর, তারঘর, দোকান, বাসভবন, ধর্মশালা, ছত্র ও বিজলী আলো সব কিছু আছে এখানে।

একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত বদরী পঞ্চায়তন বা মন্দির [illegible] থেকে চলেছে বিরাট সোপান শ্রেণী সিংহদ্বার অবধি—তারপর মন্দিরের চারদিকে বাঁধান চত্বর—তার চারদিকে ভজনালয়—মন্দিরের আফিস—প্রসাদ বিক্রীর স্থান। লাইন বেঁধে চলেছে যাত্রীর দল মন্দির মধ্যে বাবা বদরীনাথ বা বদরীনাথ পঞ্চায়তন দর্শনে। সেখানে দেখতে পাবেন চতুর্ভুজ নারায়ণ—সিংহাসনে উপবিষ্ট—পার্শ্বে লক্ষ্মী, উদ্ধব, নারদ, কুবের, গণেশ, গরুড়, নর ও নারায়ণ মূর্ত্তি। এই মন্দির পরিচালিত হয় গভর্ণমেণ্ট কমিটি কর্তৃক। মন্দিরের আয় নেহাৎ কম নয়—যাত্রীদের প্রদত্ত প্রণামী অর্থ ও অলঙ্কার ব্যতীত মন্দিরে বদরীনাথের সামনে ক্ষুদ্র চত্বরে বসতে হ'লে প্রণামী দিতে হ'বে ৫০৲ টাকা। বদ্রীনাথের একখানি মুকুট দেখালেন পুরোহিত—অসংখ্য মূল্যবান মণিমুক্তাজহরৎখচিত সোনার মুকুট—মূল্য প্রায় লক্ষ টাকা।

এই মন্দির বা ঠাকুর কে তৈরী করেছে বা প্রতিষ্ঠা করেছে সঠিক কেহ বলতে পারলে না। তবে অতীব প্রাচীন। বৌদ্ধযুগে এই মন্দিরের মূর্ত্তি সকল নিক্ষিপ্ত হয়েছিল অলকানন্দার গর্ভে। ভগবান শঙ্কর হিমালয়ে তপস্যা শেষ করে শ্রীভগবানের আদেশে আসেন এই ভীষণ দুর্গম হিমালয় তীর্থে—তিনি অলকার গর্ভ থেকে উদ্ধার করেন এই সব মূর্ত্তি ও স্থাপন করেন তাঁদের আবার এই মন্দিরে। এখানকার পুরোহিত মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ। বয়সে নবীন কিন্তু পাণ্ডিত্যে প্রবীণ। আমি তাঁর সংগে আলাপ করে ও তাঁর মন্ত্র পাঠ শুনে মুগ্ধ হয়েছি।

মন্দিরে পূজা দিবার পূর্বে তীর্থযাত্রীরা স্নান তর্পণ করেন মন্দিরের নীচে অলকার তীরে তপ্তকুণ্ডে। ভগবানের কি অপূর্ব সৃষ্টি এই গরমকুণ্ড! অলকার জল বরফ-সদৃশ—হাত দিলে যেন কেটে যায়—সেখানে স্নান করে কার সাধ্য! তাই শ্রীভগবান সৃষ্টি করেছেন পাহাড়ের গাত্রে বেশ প্রশস্ত তপ্তকুণ্ড—মনের আনন্দে গরম জলে স্নান সেরে পূজা পার্বণ শেষ করলাম।

বাবাকে দর্শন করে গেলাম ব্রহ্মকপাল—পিণ্ডদান ক্ষেত্রে। অলকার ওপরে বেশ প্রশস্ত একখানি পাথরের চত্বর। মন্দির পার্শ্বে পাবেন পিণ্ডদানের অন্ন, কুশ যব ইত্যাদি। গঙ্গা থেকে ঘটিতে করে জল নিতে হবে—তারপর বসুন সেই ব্রহ্মকপালে। সারি সারি বসেছে তীর্থযাত্রী—এক এক লাইনে আছেন একজন পুরোহিত—তাঁর উচ্চারিত মন্ত্র পাঠ করে চলেছে পিতৃ-মাতৃ পুরুষের পিণ্ডদানকারীরা।

প্রবাদ যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব স্বর্গারোহণ কালে হিমালয়ে অবস্থিত নদীগুলি পার হবার জন্য ভীম আপন শক্তি বলে পাঁচটি শীলাখণ্ড নদী গর্ভে স্থাপন করে অপর চার ভাইদের নদী পারাপার করেন—এই পাঁচটি শীলার নাম, কুবের শীলা, বারাইশীলা, মার্কেণ্ডেয় শীলা ও গরুড়-শীলা মধ্যেই বদরী আসন অবস্থিত।

বাবা বদরীনাথের কথামৃত আমার পাণ্ডার মুখে যা শুনেছিলাম তার চুম্বক বলে আমি এই তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গ শেষ করব। পুরাকালে স্বর্গের দেবতা ও মর্তের মানব অতিষ্ঠ হয়ে উঠেন এক শক্তিশালী দুর্দ্ধর্ষ দৈত্যের দাপটে। এই দৈত্য পেয়েছিলেন সহস্র কবচ কুণ্ডল বাবা কেদারনাথকে আরাধনা করে—বর পেয়েছিলেন এই মর্ম্মে—যে যতদিন থাকবে এই সহস্র কুণ্ডল দৈত্যের অংগে, কাহারো সাধ্য হবে না এই দৈত্যকে কাবু করতে। এহেন দৈত্য জয় করল স্বর্গ, মর্ত্ত ও

পাতাল। দেবতাগণ এলেন বিষ্ণুর নিকট—প্রার্থনা জানালেন দৈত্য বিনাশের। বিষ্ণু আশ্বাস দিলেন, মাভৈঃ! হঠাৎ একদিন লক্ষ্মী দেবী দেখলেন বৈকুণ্ঠ ধামে বিষ্ণু নাই—লক্ষ্মী হলেন চিন্তিত। তিনি স্বয়ং বেরুলেন বিষ্ণুর খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে হিমালয় চূড়ায় এসে দেখলেন স্বয়ং বিষ্ণু সমাধিস্থ—উন্মুক্ত স্থানে। তিনি তখন বদরী বৃক্ষ হয়ে আচ্ছাদন দিলেন বিষ্ণুকে। কিছুদিন পরে এসে হাজির হল এক বিশালকায় ভীষণ মূর্ত্তি দৈত্য—মুখে রব 'রণং দেহি।' বিষ্ণুর সমাধি ভঙ্গ হল—তিনি বললেন—তিষ্ঠ ক্ষণকাল। তারপর বিষ্ণু সৃজন করলেন খর্বকায় নর নারায়ণ। ভীষণ যুদ্ধ হল দৈত্যের সংগে নর নারায়ণের—একে একে নয় শত নিরানব্বইটি কবচ কুণ্ডল ছিন্ন হ'ল দৈত্য গাত্র হ'তে। তখন দৈত্য ভীত হয়ে ছুটল সূর্য্যদেবের নিকট—করল তাঁর সাহায্য ভিক্ষা। সূর্য্যদেব জানালেন স্বয়ং বিষ্ণু যুদ্ধ করছেন তার সংগে, কোন দেবতার সাধ্য নাই তাকে বাঁচাবার, একমাত্র পন্থা প্রাণ বাঁচাবার জন্য পাতালে পলায়ন। দৈত্য অনন্যোপায় হয়ে সূর্য্যদেবকে অবশিষ্ট কুণ্ডলটি দিয়ে পাতালে পলায়ন করে প্রাণ বাঁচাল। দেবতারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবার যার যার স্থানে অধিষ্ঠিত হলেন।

এই অবশিষ্ট কবচকুণ্ডলটি সূর্য্যদেব পরে দান করেছিলেন ভক্ত পুত্র কর্ণকে।

চেলিনীর জীবন কথা

সুনীলকুমার নাগ

ইতালীর শিল্পী চেলিনীর (Benvenuto Cellini, 1500-1571.) আত্মজীবনী একখানা অসাধারণ বই। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি লেখা এই বইখানা যে শুধু পৃথিবীর প্রাচীনতম আত্মজীবনীর অন্যতম তা'ই নয়। সে সময়ের ইতালীর পোপ ও রাজপুরুষগণের সঙ্গে কাজের খাতিরে চেলিনীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকবার জন্য আত্মজীবনীতে সে সময়কার ইতালীর একটা নির্ভুল ইতিহাসও পাওয়া যায়। পৃথিবীর অনেক ভাষাতেই এ বই অনূদিত হ'য়েছে। জর্মন ভাষায় চেলিনীর আত্মজীবনী অনুবাদ করেন গ্যয়টে স্বয়ং।

চেলিনী ছিলেন একাধারে স্বর্ণশিল্পী, মনিকার ও ভাস্কর। শিল্পী হিসেবে চেলিনী সম্বন্ধে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হয় যে ইতালীর রেনেসাঁর মধ্যমণি মহান শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলো অবধি তাঁর তৈরী একাধিক মূর্ত্তি দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে গেছেন। ১৫৬৮ খৃঃ অব্দে মাইকেল এঞ্জেলোর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে ফ্লোরেন্সের ভাস্করগণের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য চেলিনীই নির্বাচিত হ'য়েছিলেন।

চেলিনী মনে করতেন কোন না কোন দিকে জীবনে যাঁরা সাফল্য লাভ করেছেন, তাঁদের সকলেরই উচিত আত্মজীবনী রচনা করে যাওয়া। চেলিনী তাঁর আত্মজীবনী রচনার কাজে হাত দেন আটান্ন বছর বয়সে।

ভূমিষ্ঠ হবার পর সবাই ওঁর বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন—শিশুর নাম কি রাখা হবে।

চেলিনীর বাবার আশা ছিল একটি মেয়ে হবে, কিন্তু ছেলে হওয়াতেও দেখা গেল তিনি কম খুশী হলেন না। প্রথমে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন, তারপর হেসে বললেন—ভালইত ছেলে হ'য়েছে, আমি ওকে স্বাগত জানাই (He is welcome)। আনুষ্ঠানিক ভাবে নাম রাখবার সময়ও তাই নাম হ'লো Benvenuto অর্থাৎ welcome.

পনেরো বছর বয়সে ফ্লোরেন্সের এক স্বর্ণকারের কাছে চেলিনী কাজ শিখতে আরম্ভ করেন। তিন বছরের মধ্যে চেলিনীর নৈপুণ্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলো এবং ফ্লোরেন্সের স্বর্ণকারেরা প্রকাশ্যেই স্বীকার করলো যে নৈপুণ্যের দিক দিয়ে বিচার করলে চেলিনীর সমকক্ষ কোন যুবক নেই। সেই অতি-নৈপুণ্যের কথা ছড়িয়ে পড়বার পর দেখা গেল, যে স্বর্ণকারদের কাছে চেলিনী এক সময় শিক্ষানবিশী করতেন তারাই এবার ঈর্ষায় জ্বলতে আরম্ভ করেছে। শেষ পর্য্যন্ত চেলিনীকে পালিয়ে যেতে হয় রোমে। রোমে প্রথমে এক স্বর্ণকারের কাছে চাকরী করতেন চেলিনী, তারপর গণ্যমান্য কয়েকজনের সহায়তায় নিজেই একটা দোকান খুললেন। রোমে এসে চেলিনী শীলমোহর, মেডেল, এনগ্রেভিং এবং এনামেল করার কাজ শেখবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই এতটা সুদক্ষ হ'য়ে উঠলেন যে সে সময়ে রোমের সর্বাপেক্ষা নিপুণ-শিল্পী লাউৎসিওর সঙ্গে রীতিমত পাল্লা দিতে লাগলেন, শিল্পকর্ম আয়ত্ত করার জন্য নিজের এই অসাধারণ শক্তি দেখে চেলিনী নিজেই বলছেন: "The Author of Nature, had gifted me with a genius so happy that I could with the utmost ease learn anything to which I gave my mind."

রোমের ভীষণ প্লেগে চেলিনীও আক্রান্ত হয়েছিলেন। ওঁর ছোট ভাই এবং বোন যদিও প্লেগে মারা যায় কিন্তু চেলিনী সেরে ওঠেন। উঠবার পর ওর চিকিৎসককে কয়েকটি রূপোর বাসন তৈরী করে উপহার দেন। ঐ চিকিৎসক ফেরারার ডিউক এবং আরো অনেককে ঐ বাসনগুলি দেখান। সবাই বললেন: এগুলি নিশ্চয়ই বহু প্রাচীন, গত দু'তিন হাজার বছরের মধ্যে এমন শিল্প-নৈপুণ্য কেউ দেখাতে পারে নি। তারপর যখন চেলিনী সত্য কথা প্রকাশ করলেন, সকলেত শুনে অবাক।

কয়েকবছর পরের ঘটনা। ১৫২৭ সালে ইয়োরোপে তখন জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। অন্যান্য রাজ্যও জড়িয়ে পড়তে লাগলো এ যুদ্ধে। জর্মনরা রোমের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। রোমের কাছেই একটি বড় বাড়ীর জন্য লড়াইয়ের সময় চেলিনী জন পঞ্চাশেক লোক সংগ্রহ করে জর্মনদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে ওদের হাত থেকে বাড়ীটা রক্ষা করলেন। এখানে খণ্ডযুদ্ধের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে পাঠকের মনে হয় যে চেলিনী নিশ্চয়ই একজন বড় যোদ্ধাও ছিলেন। কিন্তু এটা সত্যি কথা নয়। কারণ বহু ঐতিহাসিক একথা স্বীকার করেন নি। চেলিনী যে কিছুটা নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন সে কথা অনেকেই বলে গেছেন। উনি নিজেও আত্মজীবনীতে এরকম তিনটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একদিন পোপের (Pope Clement) চোখের সামনেই একজন স্প্যানীশ সামরিক অফিসারকে হত্যা করেন। এরপর কার্ডিনাল মালডিয়াতির এক চাকরের নিকটআত্মীয় মিলানের এক মণিকার পম্পেওর চক্রান্তের ফলে রোমের টাঁকশাল থেকে চেলিনী পদচ্যুত হন। এই লোকটি চেলিনীর নামে অনেক সময় তাহা মিথ্যেও প্রচার করতে লাগলো। যেমন একবার পোপের কাছে গিয়ে নালিশ করলো যে এক স্বর্ণকার চেলিনী খুন করেছে। পোপ রাগে জ্বলে উঠে রোমের ম্যাজিস্ট্রেটকে হুকুম করলেন যে অবিলম্বে যেন চেলিনীকে ধরে ফাঁসিতে লটকানো হয়। চেলিনী রোম ছেড়ে নেপল্‌স্‌এ পালিয়ে যাবার আয়োজন করলেন। তারপর পোপ তাঁর দু'জন বিশ্বস্ত অনুচরকে বাড়ী পাঠিয়ে জানলেন যে সেই স্বর্ণকার সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। এই পম্পেওকে একদিন চেলিনী ছোরার আঘাতে খুন করেন। আর একবার এক সৈনিক বন্ধুকে বিনা অপরাধে মারবার জন্য চেলিনী নিষ্ঠুর ভাবে প্রতিশোধ নেন। একদিন রাতে হঠাৎ চোখে পড়ল যে লোকটি তাঁর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। চেলিনী ছুটে গিয়ে নিজের ছোরাখানা এমন ভাবে ওর কাঁধের ওপর বসিয়ে দেন যে আর টেনে তুলতে পারলেন না। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। চেলিনীর প্রকৃতিটাই ছিল অত্যন্ত উগ্র। এক এক সময় সামান্য কারণে উত্তেজিত হ'য়ে উঠতেন। আর কোন কথাই খুব ভেবে চিন্তে বলবার অভ্যাস ওঁর ছিল না। যে পোপের কাছে চেলিনী অশেষ ঋণী ছিলেন একবার তাঁর শিল্পবোধের সমালোচনা করে নিজেকে বিপন্ন করে তোলেন। কখনো কখনো হয়তো সাধারণ লোকজনের সঙ্গে সাধারণ রসালাপের মধ্যে কাটালেও নিজের শিল্প সাধনায় উত্তরোত্তর উচ্চতর সাফল্য অর্জনের লক্ষ থেকে কখনো মুহূর্তের জন্যও ভ্রষ্ট হ'ননি। পোপ এবং অন্যান্য যাজকশ্রেণীর ব্যক্তিদের জন্য চেলিনী নিত্য নতুন জিনিষ তৈরী করে প্রচুর অর্থ এবং প্রভাব প্রতিপত্তি করলেন অল্পদিনের মধ্যে। চেলিনীর তৈরী অনেক মুদ্রার শিল্পসৌষ্ঠব প্রাচীন রোমের অনেক সম্রাটের মুদ্রার চাইতেও সুদৃশ্য বলে অনেকেই বলে গেছেন।

সে সময়ের ইতালীতে গির্জ্জা ও রাজপুরুষগণের মধ্যে প্রায় সব বিষয়েই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতো, চেলিনীর শিল্পনৈপুণ্যের জন্য প্রত্যেকেই চাইতেন চেলিনী তাঁর অধীনে কাজ করুক। চেলিনী অবশ্য বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে কাটিয়েছেন। ভেতরের পাশবিক প্রবৃত্তিটা মাঝে মাঝে মাথা নাড়া দিয়ে উঠলেও নিজের প্রকৃত যে কাজ অর্থাৎ "শিল্পকর্ম্ম"—সে কাজে চেলিনী কখনো অবহেলা করেন নি। শুধু তাই নয়, তিনি যখন যা তৈরী করেছেন তার প্রায় প্রত্যেকটিই সে সময়কার ইতালীর শিল্পবোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণের প্রশংসা পেয়েছে। প্রায় সারা-জীবন ধরেই উচ্চতর প্রতিভার অধিকারী হবার জন্য চেলিনীকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হ'য়েছে। একবার পোপের এক জারজ ছেলে পিয়ের লুইগী চেলিনীর ভাগ্য দেখে ঈর্ষায় জ্বলে উঠে অভিযোগ করলো যে গির্জা থেকে প্রচুর মণিমুক্তা চেলিনী অপহরণ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে চেলিনীকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হ'লো যে অভিযোগটি একেবারে মিথ্যে, অকারণে এরকম নাজেহাল হবার জন্য চেলিনী আত্মহত্যার কথা ভাবছিলেন, এই সময় একদিন তিনি দিব্যচোখে দেখলেন সন্ত পিটার স্বয়ং কুমারী মেরীর কাছে তাঁর জন্য করুণা ভিক্ষা চাইছেন। কথাটা পোপের কাণে গেল, এ পোপটি ছিলেন একজন ঘোর নাস্তিক। পোপ চেলিনীকে পাগল ঠাওরালেন।

এই সময়ই ফেরারার কার্ডিনালের তদ্বিরের ফলে চেলিনী মুক্তি পেলেন এবং ফ্রান্সে চলে গেলেন। ফ্রান্সের রাজার হ'য়ে চেলিনী কতকগুলি মূর্ত্তি তৈরী করেন তার প্রাসাদ সাজাবার জন্য। যার প্রত্যেকটি সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দু'টি মূর্ত্তিবিশিষ্ট একটি চমৎকার নিমকদানীও বানিয়েছিলেন চেলিনী ফ্রান্সের রাজার জন্য। শোনা যায় এ নিমকদানিটি এখনো ভিয়েনায় আছে।

ফ্রান্সের রাজার এক প্রিয় পাত্রী ছিল, ওঁর আশা ছিলো চেলিনী তাঁর কোন না কোন মূর্ত্তি ওঁর মুখশ্রী অনুসারে করবেন। কিন্তু তিনি তা করছেন না দেখে ক্রমশঃ ক্রুদ্ধ হ'তে থাকেন। রাজার প্রিয়ভাজন হ'য়েও এই মহিলার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য শেষ পর্যন্ত চেলিনীকে ফ্রান্স ত্যাগ করতে হয়। ফ্রান্সের রাজার জন্য চেলিনী অনেক অবিস্মরণীয় শিল্প সৃষ্টি করেন, তার মধ্যে জুপিটার এবং মঙ্গল গ্রহাধিপতি অতিকায় মূর্ত্তিটা বিশেষভাবে উল্লেখনীয়।

ফ্লোরেন্স এসে চেলিনী ডিউক ক্যাশিমোর জন্য পারসেউসের একটা মূর্ত্তি তৈরী করেন ব্রোঞ্জ দিয়ে। তা ছাড়া কিছু কিছু মার্ব্বেলের কাজও করেন।

ফ্লোরেন্স নগরবাসীরা চেলিনীর শিল্প সৃষ্টি দেখে এমন মুগ্ধ হ'য়েছিলেন যে অনেক গুণগ্রাহী চেলিনীর নামে কবিতা পর্যন্ত রচনা করেছিল। চেলিনীর তৈরী নেপচুনের মার্বেল মূর্ত্তি দেখে সস্ত্রীক ডিউক ক্যাসিমো বিস্মিত হ'য়ে যান, ক্যাসিমোর ডাচেস বলে ওঠেন :

"By my life, I never could have conceived the tenth part of beauty as this !" ফ্লোরেন্সের প্রখ্যাত ভাস্কর ব্যাণ্ডিনেলোর সঙ্গে এই মার্বেল মূর্ত্তিটির মডেল নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, তাতে ব্যাণ্ডিনেলো হেরে যান,চেলিনী বলেন যে হেরে যাবার জন্য তাঁর যে মনোকষ্ট হয় তার ফলে অল্পদিন পরেই ব্যাণ্ডিনেলো মারা যান। ফ্রান্সের রাণী তাঁর স্বামী রাজা হেনরীর সমাধি মন্দির বানাবার জন্য চেলিনীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু ডিউক ক্যাসিমো ছাড়লেন না চেলিনীকে।

নেপচুনের মার্বেল-মূর্ত্তি বানাবার সময় একটি লোক খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিয়ে চেলিনীর প্রাণনাশের চেষ্টা করেন। অল্পের জন্য চেলিনী বেঁচে যান। এই সময় পিয়েরা নাম্নী একটি মহিলা চেলিনীর সেবা শুশ্রূষা করেন। ১৫৬৫ খৃঃঅব্দে এঁকে চেলিনী বিয়ে করেন।

চেলিনী তাঁর আত্মজীবনীতে ১৫৫২ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত নিজের জীবনের ঘটনাবলী লিখে যান, এর পরেও কয়েক বছর বেঁচে ছিলেন তিনি, তবে তখন তাঁর শরীরটা ভেঙ্গে পড়েছে। প্রায় বালক বয়স থেকে চেলিনীর যে দুরন্ত এবং কর্মময় জীবনের সুরু হয় তার শেষ হয় ১৫৭১ খৃঃ অব্দে চেলিনী প্লুরিসিতে ভুগে মারা যান।

আমি যেন সেই গান ভুলে যাওয়া পাখি,
যে একা নীরব নীড়ে
হিম রজনীর অবসান গোণে মেলি অতন্দ্র আঁখি।
ছিল কত সুর, উচ্ছল কলতান,
ভালবাসা অভিমান,
ডানা মেলে দূর-নীলিমার নীলে পাড়ি দেওয়া থাকি-থাকি।

বুঝি নিয়ে এলে দক্ষিণ হাওয়া ডাকি,
শুনি বন মরমরে,
ফুলগুলি ফুটে চায় কার মুখে সূর্য-সোহাগ মাখি!
দয়া করো মোরে হানো পঞ্চম বান,
প্রেমে জ্বেলে দাও প্রাণ,
সুধা সুরে ঢেলে কণ্ঠের মিলে হৃদয়ের গাওয়া বাকি।

কথা : শ্রীগোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

সুর ও স্বরলিপি : পঙ্কজকুমার মল্লিক

- - স র জ্ঞ প | জ্ঞ প - - - - ‖ ধ র্স ধ প জ্ঞ স | জ্ঞ র - - - - | জ্ঞ - রজ্ঞ ম জ্ঞম রজ্ঞ |
০ ০ আ মি যে ন সে ই ০ ০ ০ ০ গা ন ভু লে যা ও য়া পা খী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০০ ০র

স - - - - - | স স স সর রস ণ্ | স র - - স র | ম জ্ঞ - - জ্ঞম জ্ঞম | ম প প প পম প . |
০ ০ ০ ০ ০ ০ যে এ কা না০ র ব নী ড়ে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ হি ম র জ নী০ ০

ণ ণ ণধ ণ ধ প | ম প প পধ পধ পম | মপ ম - জ্ঞ - - | ম - - - র সর | স - স র জ্ঞ প |
অ ব সা০ ন্ গো নে মে লি অ ত ন্ দ্র০ আঁ০ খি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ আ মি যে ন

জ্ঞ প - - - - ‖
সে ই ০ ০ ০ ০

র্স র্স র্রর্স ন র্স র্র | র্স র্র র্জ্ঞ - - - | প র্স ন র্স র্র র্স | র্র - - - - - | র্স র র্স ণ - প |
ছিল ০০০ কত সু ০ ০ ০ ০ ০ উচ্ছলকল তা০ ০ ০ ০ ন ভাল বা সা ০ ০

ণ - ধ ন র্স ন | র্স - - - - - | র্স ণ ধ পম - - | প ধ পধ ণ - - | ণ র্স র্স ণর্স ণর্সণ ধ |
০ ০ ০ ০ অভি মা ০ ০ ০ ০ ন ডা না মে লে ০ ০ দূ ০ ০০ ০০ র নীলিমা র০ ০ নী

প - - - - - | ম প প প পধ পধ | মপ ম - জ্ঞ - - | ম - - - র সর | স - স র জ্ঞ প |
লে ০ ০ ০ ০ ০ পা ড়ি দেওয়া থা০ কি০ থা০ কি০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ আমি যেন

জ্ঞ প - - - - II
সে ই ০ ০ ০ ০

ন র্স ধন প পধ পধ | ম প প প পধ পধ | মপ ম - জ্ঞ - ম | ম প প প দ ণ |
বু ঝি নি০ যে এ লে দ০ ক্ষি ণ হাও য়া০ ডা০ কি০ ০ ০ ০ শু নি ব ন ম র

দ প - - - - | জ্ঞ জ্ঞ র জ্ঞ রস জ্ঞ | র স - - - - | স গ গ গ গ গ | গ ম ম - ম ম |
ম রে ০ ০ ০ ০ শু নি ব ন ম০ র্ ম রে ০ ০ ০ ০ ফু ল গু লি ফু টে চায় কার মুখে

ম প প পদ প ণ | দ প - - - - I
সু ধু য সো হাগ মা খি ০ ০ ০ ০

র্স র্স র্স র্রর্স ন র্স | র্র - র্সর্র র্জ্ঞ - - | র্র র্স প - র্সন র্স | র্র - - - - - | র্স র্র র্স ণ র্স প |
দ য়া ক র০ ০ মো রে ০ ০০ ০ ০০ হা নো প ণ্ চ০ ম বা ০ ০ ০ ০ ন প্রে০ মে ০ ০ ০

ণ - ধ ন র্স ন | র্স - - - - - I
০ ০ জ্বে লে দা ও প্রা ০ ০ ০ ০ ণ্

স র্সন - ধ প - | গ - ম প ধ ণ | ণ র্স র্স ণর্স ণ ধ | প - - - - - | ম প প প পধ পধ |
সু ধা ০ সু রে০ ঢে০ লে ০ ০ ০ ক ণ্ ঠে র০ ০ মি লে ০ ০ ০ ০ ০ হৃ দ য়ে র গাও য়া০

মপ ম - জ্ঞ - - | ম - - - র সর | স - স র জ্ঞ প | জ্ঞ প - - - - II II
বা০ কি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ আ মি যে ন সে ই ০ ০ ০ ০

আদি-কবি কৃত্তিবাস

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

হেথাকার মৃত্তিকায় স্বাদে গন্ধে রয়েছে ছড়ানো
মৃত্যুহীন জীবনের অমৃত-প্রবাহ অভিনব,
হে কবি, তোমার স্পর্শ হেথাকার বাতাসে জড়ানো,
আজি এ পবিত্র দিনে সেই স্পর্শ দেহে মনে লব।

সেই স্বাদে পরিতৃপ্ত, সেই গন্ধে পুলকিত প্রাণ
হে অতীত কথা কও, স্মৃতির দুয়ার দাও খুলি,
দোয়েল শ্যামার কণ্ঠে মুখরিত তব নাম গান
তব পাদস্পর্শে কবি, ধন্য এ পল্লীর পথধুলি।

সেই ধূলি শিরে রাখি,' কবি-জন্ম সার্থক আমার
বাঙলার আদি-কবি কৃত্তিবাস তোমারে প্রণাম,
আদি মহাকাব্যকার, ভক্তি-অর্ঘ আমা সবাকার
নিবেদি' চরণে তব—সফল পূজার মনস্কাম।

স্মৃতিপথে যাত্রা করি' চলে যাই দূরে বহুদূরে
পল্লীতে পল্লীতে আর অবলুপ্ত সহরে বন্দরে,
চণ্ডীমণ্ডপের তলে, অঙ্গনে অঙ্গনে অন্তঃপুরে
শুনি রামায়ণ পাঠ সন্ধ্যায় অথবা দ্বিপ্রহরে!

মাঠের কাজের শেষে ছুটে আসে কৃষক কৃষাণী—
শূদ্র আসে ভদ্র আসে, আসে মাঝি মাল্লা ও মজুর,
তন্ময় হইয়া শোনে অমৃত সমান সেই বাণী
বিচিত্র কাহিনী তব রামায়ণ অতি সুমধুর।

বাংলার ঘরে ঘরে উচ্চারিত যেই রাম নাম
আপদ-হরণকারী, সর্বসম্পদের দাতা তিনি,
নয়নাভিরাম রাম, ভূয়ো ভূয়ো তাঁহারে প্রণাম
প্রচারি' মহিমা তাঁরই কবি-কীর্তি লইয়াছ জিনি।

অর্থী প্রার্থী চলে গেল সেদিন সে রাজসভা হ'তে
একান্তে ডাকিয়া রাজা কহিলেন—"কি প্রার্থনা তব,
ভূমি? অর্থ? স্বর্ণ কিছু? আমার এ মুক্ত সদাব্রতে
তোমার ঈপ্সিত বস্তু দান করি' আমি ধন্য হব।"

"আমি কবি, হে রাজন্, সম্পদের নাহি প্রলোভন,
তব কণ্ঠে পুষ্পমাল্য মোর কাছে সেই মূল্যবান,
রত্নহার চমৎকার রাজদেহে সুন্দর শোভন,
দেহ মোরে অনুমতি প্রভাতে করিয়া গঙ্গাস্নান

শুদ্ধাসনে বসে আমি রামায়ণ করিব রচনা,
তুমি শুধু তব রাজ্যে প্রচারিতে রামের মহিমা
আমার সহায় হও; আজীবন বাণীর অর্চনা
সফল করিতে দাও। ইতিহাসে তোমার গরিমা

যুগে যুগে লোকে লোকে আরতির দীপশিখা সম
উজলিবে মানবের অজ্ঞাত প্রচ্ছন্ন ইতিহাস
সুখে দুঃখে বেদনায় আশা নিরাশায় অনুপম
জীবযাত্রা অবশেষে সান্ত্বনার স্বস্তির নিঃশ্বাস।"

সিংহাসন হতে রাজা নেমে এল মৃত্তিকার 'পরে
দুবাহু বাড়ায়ে দিল শ্রদ্ধাভরে গাঢ় আলিঙ্গন,
কণ্ঠ হ'তে পুষ্পমালা খুলিয়া সেদিন তোমা তরে
পরাইল কণ্ঠে তব, কবি বলে' করি সম্ভাষণ।

রাজ-পুরস্কার নহে, লভেছিলে রাজ-উপহার,
চন্দন-তিলক ভালে, কবি, তব সেই জয়টিকা,
দেশে দেশে যত কবি তাদের সৃষ্টির অহঙ্কার
তব মহিমায় দীপ্ত, যেন অনির্বাণ হোমশিখা

সেই হতে জ্বলিতেছে এই মৃত্তিকার অন্তস্তলে
হেথা হতে নিয়ে যাই সে শিখার পবিত্র উত্তাপ,
রেখে যাই সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি এ পুণ্য বেদীতলে
নিয়ে যাই এই আত্মবিস্মৃত জাতির মনস্তাপ।

কালজয়ী-স্মৃতি তব, তবু আজ বহুবর্ষ পরে
মনে পড়ে, যে অমৃত বিলাইলে তৃষিত জনায়,
এ অন্ধতামস যুগে যদি পারিতাম দিতে ধরে'
সবার সম্মুখে তাহা দুর্লভ মানব-সাধনায়;

পুনর্জন্ম হত তব লোকচিত্তে এই ফুলিয়াতে
বাঙালীরও নব জন্ম দেখিতাম বিস্মিত নয়নে,
নর দেহে দেবতার আবির্ভাব নূতন প্রভাতে
জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পেতাম রামায়ণে।

তবু মনে হয় যেন লোকলোচনের অন্তরালে
প্রসন্ন প্রচ্ছায়ে কোনো নব জাতকের কণ্ঠস্বর
শুনিতেছি মাঝে মাঝে; দেহজ্যোতি দিকচক্রবালে
চমকি উঠিয়া যেন উত্তরিছে দুস্তর সাগর।

ফুলিয়া কৃত্তিবাস স্মরণোৎসবে পঠিত—৩রা ফাল্গুন রবিবার ১৩৬৫।

বেদান্ত দর্শন—শঙ্কর-ভাষ্য

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

দর্শনে শঙ্করের স্থান

শঙ্কর অতুলনীয় প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। মাত্র ৩২ বৎসরে তিনি যে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে অন্য কেহ সেরূপ মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হন নাই। উপনিষদের অদ্বৈত দর্শন তাঁহার ভাষ্যে পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি ভারতবর্ষকে তাহার প্রাচীন ব্রহ্মবাদে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা বহুল পরিমাণে সফল হইয়াছিল। তিনি যে দর্শন ও ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও বৈদিক যাগ-যজ্ঞ অপেক্ষা তাহাদ্বারা লোকের ধর্ম্ম-পিপাসা অধিকতর পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। মুক্তির জন্য তিনি কোনও বিশেষ দেবতার উপাসনার বিধি দান করেন নাই—বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য, শক্তি, সকলেরই স্তব তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তৎকালপ্রচলিত অনেক দূষিত প্রথার তিনি সংস্কার করিয়াছিলেন! তিনি একাধারে দার্শনিক ও কবি এবং সাধক ও ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন। বিশুদ্ধ ধর্ম্মের রক্ষণ ও প্রচারের জন্য তিনি ভারতবর্ষের চারি প্রান্তে চারিটি মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন—দ্বারকায় সারদা মঠ, পুরীতে গোবর্দ্ধন মঠ, বদরিকাশ্রমে জ্যোতির্মঠ এবং দক্ষিণ ভারতে শৃঙ্গেরী মঠ। এই সকল মঠ এখনও বর্ত্তমান আছে।

শঙ্করের দর্শন সম্বন্ধে অধ্যাপক থিব বলেন যে "দর্শনের দিক হইতে শঙ্করের সমর্থিত মতই ভারতীয় সকল দার্শনিক মতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সাহসে, গভীরতায় এবং যুক্তির সূক্ষ্মতায় ভারতীয় অন্য কোনও দর্শনই শঙ্করের দর্শনের সহিত তুলনীয় নহে।" জগতের দর্শনেও শঙ্করের স্থান অতি উচ্চে।

শঙ্কর তাহার দর্শনে বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিয়াছেন। তবু তাঁহার দর্শনকে কেহ কেহ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-মত বলিয়াছেন। শঙ্করের পরমগুরু গৌড়পাদের মায়াবাদ সম্বন্ধে যাহাই বলা হউক না কেন, তাঁহার মায়াবাদ বৌদ্ধ শূন্যবাদ হইতে একান্ত ভিন্ন। শঙ্কর জগৎকে 'মায়া' বলিলেও তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই, পরন্তু তাহার ব্যবহারিক অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। শঙ্করের মতে জগৎ মিথ্যা—ইহা সত্য। কিন্তু এখানে 'মিথ্যা' অর্থ অস্তিত্ব-হীন নহে, শশশৃঙ্গ অথবা বন্ধ্যাপুত্রের মতো অলীক নহে। জগৎ-ভ্রম—শুক্তিতে রজত-ভ্রম এবং রজ্জুতে সর্পভ্রমের মতোও নহে। শুক্তিতে রজত-জ্ঞান এবং রজ্জুতে সর্প-জ্ঞান ক্ষণকাল-পরেই বাধিত হয়, কিন্তু জাগতিক বস্তুর জ্ঞান আমুক্তি বাধিত হয় না। জগতের অনুভূতি আমাদের হয়, সে অনুভূতির এক ভিত্তিও আছে। সুতরাং জগৎ ঐকান্তিক মিথ্যা নহে। কিন্তু জগৎ নশ্বর, নিত্য-পরিণামী ও চঞ্চল, জগৎ সৎ নহে। জাগতিক বস্তু যাহাতে অধ্যস্ত হয়, সেই ব্রহ্মই সৎ, অধ্যস্ত জগৎ অসৎ। ব্রহ্ম noumenon, জাগতিক বস্তু তাহার phenomena। Noumenonএর উপরে pheuomena দিগের আবির্ভাব হয় কেন, এবং উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কি, তাহা আমরা জানি না। এই অজ্ঞাত শক্তিই 'মায়া'। এই শক্তিবশতঃই সমুদ্রে তরঙ্গের মত ব্রহ্ম noumenon—সমুদ্রে অনবরত জাগতিক বস্তুরূপ phenomena তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে ও বিলীন হইতেছে। ইহাই মায়া। এই মায়াবশে যে জগতের উদ্ভব ও বিলয় অনাদিকাল হইতে হইয়া আসিতেছে, তাহার মধ্যে শৃঙ্খলা আছে, তাহার অন্তর্গত জীব মায়ার বশ হইয়াও মায়ার স্বরূপের আলোচনা করিতেছে। মায়া মিথ্যা নহে, মায়ার সৃষ্টিও অস্তিত্বহীন নহে।

ব্রহ্ম নির্গুণ। নির্গুণ কোনও বস্তুর অভিজ্ঞতা আমাদের নাই এবং এরূপ কোনও বস্তুর ধারণা ও বর্ণনা করাও অসম্ভব। তাই ব্রহ্মকে মনের অতীত বলা হইয়াছে। কিন্তু "গুণ" শব্দ দ্বারা এখানে আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য 'গুণ'ই সূচিত হইয়াছে। এই জগৎ সত্বঃ রজঃ ও তমঃ গুণের বিকার। আমাদের পরিচিত যাবতীয় গুণই সত্বঃ, রজঃ ও তমোগুণের বিকার। ব্রহ্ম সত্ব, রজঃ ওতমোগুণের অতীত। জাগতিক কোনও গুণ ব্রহ্মে নাই। ব্রহ্মকে আমাদের [illegible]াত যাবতীয় গুণের অতীত বলিলেও শঙ্কর তাহাকে [illegible] চিৎ ও আনন্দস্বরূপ বলিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্ম

একেবারে যে বাক্যও মনের অতীত, তাহা নহে। "সৎ" এবং চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ। সৎ-ত্ব (অস্তিত্ব) কোনও গুণের বোধক না হইলেও চিৎ ও আনন্দকে গুণ না বলিবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু এই চিৎ ও আনন্দ আমাদের পরিজ্ঞাত চিৎ ও আনন্দ নহে। ব্রহ্ম চিৎ-ত্ব-ও-আনন্দত্ব-গুণান্বিত নহেন—তিনি চিৎ ও আনন্দ। সৎ এবং চিৎ ও আনন্দ অভিন্ন। এই ব্যাখ্যা সংজ্ঞাজনক বলিয়া গণ্য না হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম অনন্ত, সুতরাং তাহার চিৎ-ত্ব ও আনন্দ-ত্ব আমাদের পরিজ্ঞাত চিৎ-ত্ব ও আনন্দ-ত্ব হইতে ভিন্ন। সুতরাং আমাদের পরিজ্ঞাত কোনও গুণ ব্রহ্মে নাই ইহা স্বীকার করিলেও, কোনও গুণই তাহাতে নাই ইহা বলা যায় না। তাহা বলিলে ব্রহ্মকে "বস্তু-শূন্য বিকল্প" (বস্তুহীন কল্পনা মাত্র) বলিতে হয়। ব্রহ্মে মানবীয় গুণের আরোপ নিষিদ্ধ—কেননা তিনি আমাদের পরিজ্ঞাত যাবতীয় গুণের অতীত। কিন্তু তিনি আমাদের জ্ঞানের বহির্ভূত গুণেরও অতীত, ইহা নিতান্তই দুঃসাহসিক উক্তি। গুণের আরোপ করিলে ব্রহ্মের অসীমত্ব সংকুচিত হয়, ইহাও বলা যায়না, কেননা অসীম গুণের আরোপে অসীমত্ব সংকুচিত হইবার কারণ নাই। স্পিনোজ্যা বলিয়াছিলেন—কার্য্য তাহার কারণের নিকট যাহা প্রাপ্ত হয়, কারণে তাহার অস্তিত্ব নাই। ইহা বলিয়াও তিনি ব্যাপ্তি (Extension) ও চিন্তা (thought) এই দুই গুণ ঈশ্বরে আরোপ করিয়াছিলেন। ইহারা অসীম বলিয়া এই দুই গুণের দ্বারা ঈশ্বরের অসীমত্বের সংকোচের আশঙ্কা তিনি করেন নাই। যখন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়, তখন ব্রহ্মের যে স্বরূপ তাহা অনুভূত হয়। ভাষায় তাহার বর্ণনা অসম্ভব হইলেও সেই অনুভূত স্বরূপই ব্রহ্মের গুণ। সেই স্বরূপের মধ্যে যদি অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান ও আনন্দ থাকে, তাহা হইলে তাহাদের সহিত অনন্ত প্রেম ও অনন্ত ক্ষমা যে থাকিতে পারে না, তাহা বলা যায় না।

বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদে কোনও স্থায়ী বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকৃত নহে। শঙ্কর দর্শনে ব্রহ্মই আদি, অন্ত ও মধ্য—ব্রহ্মই "সর্ব্বত্র গীয়তে।" শঙ্করের দর্শনে জগতের অস্তিত্ব যদি বাস্তবিক অস্বীকৃতও হইত, তাহা হইলেও নিত্য ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার হেতু তাহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলা যাইত না। কিন্তু শঙ্কর জগতের ব্যবহারিক (phenomenal) অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই। শঙ্করের দর্শন অজ্ঞেয়বাদ নহে। তিনি ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মানুষের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের নিকট ব্রহ্ম অজ্ঞেয়। কিন্তু মানবীয় বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর। মানুষ তাহার ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও বুদ্ধি অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে। ইহাই মুক্তি—ইহাই বেদান্তের লক্ষ্য। এই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার যখন লব্ধ হয়, তখন যে বাধা দ্বারা মানবের জ্ঞান সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে বদ্ধ, তাহা বিদূরিত হয়। তখন মানবজ্ঞান অসীমত্বপ্রাপ্ত হয়। ফলে তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। ভক্তিবাদীর নিকট এই পরিণাম বাঞ্ছনীয় নহে। তিনি চিনি খাইতে চাহেন, চিনি হইতে চাহেন না। কিন্তু প্রেম চাহে প্রেমাস্পদের সহিত এক হইতে, ব্যবধান প্রেম সহ্য করিতে পারে না। শঙ্করের মুক্তিতে এই ব্যবধানের বিলোপ হয়, তাহার ফলে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ বিলুপ্ত হইতে বাধ্য। যতদিন ভেদ থাকে, ততদিন তাহার সংকোচ-সাধনেই ভক্তের সমস্ত চেষ্টা ব্যয়িত হয়। চেষ্টার সম্পূর্ণ সফলতাই অভেদ। তাহাকে ভয় করিবার কারণ নাই। শঙ্কর বলিয়াছেন—

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ, তবাহং ন মামকীয়স্তং।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ, কচন তারঙ্গঃ সমুদ্রঃ ॥

হে নাথ, ভেদ অপগত হইলেও আমি তোমারই থাকিব, তুমি আমার হইবে না। তরঙ্গ সমুদ্রেরই, সমুদ্র কখনও তরঙ্গের হয় না।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গগন পাশের ঘরের দিকে চাহিয়া বলিল, "ওরে নিয়ে আয় এইবার—"

দিগন্ত অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া পাশের ঘর হইতে একটি নীল-শেড-দেওয়া সুদৃশ্য বাতি লইয়া প্রবেশ করিল।

"কোথা রাখব এটা"

"মাথার শিয়রের দিকে এই তেপায়াটার উপর। দাদুর ঘরে রাত্রে এই বাতিটাই জ্বলবে। শেডটা ভালো, স্নিগ্ধ আলো হবে। এই লণ্ঠনগুলো সরিয়ে নিয়ে যা—"

উষা জিজ্ঞাসা করিল, "এটা আবার কোথা থেকে পেলি"

"কাটিহার থেকে আনালাম"

"তাই বুঝি সঙ্গে থেকে দু'ভায়ে মিলে ওইটে নিয়ে ঘুজ্ ঘুজ্ করছিস"

দিগন্ত দাদার আদেশ অনুসারে আলোটি যথাস্থানে রাখিয়া লণ্ঠনগুলি লইয়া চলিয়া গেল। সমস্ত ঘরটা একটা নীলাভ স্নিগ্ধ আলোয় ভরিয়া উঠিল।

উষার দিকে চাহিয়া গগন প্রশ্ন করিল—"বেশ সুন্দর হয় নি ?"

"চমৎকার"

"দাদুকে এবার ঘুমুতে দাও একটু। তুমি আবার যেন গল্প ফেঁদো না"

"গল্প তো তোমরাই করছ। আমি তো এতক্ষণে এলাম ছেলে তিনটেকে খাইয়ে। ছেলে তো নয়, এক একটা ডাকাত"

"ঘুমিয়েছে ওরা ?" সূর্য্যসুন্দর প্রশ্ন করিলেন !

"না। চক্ষে ঘুম নেই কারো। অথচ সমস্ত দিন হৈ হৈ করে' বেড়িয়েছে ! কতক্ষণ আর চাপড়াব। বুড়ো হাতীদের কি আর চাপড়ে ঘুম-পাড়ানো যায়! ওদের বাপের কাছে দিয়ে চলে' এলুম তাই। ওঁরও ইচ্ছে ছিল সন্ধের সময় বাবার কাছে এসে একটু বসেন, কিন্তু যা হৈ হৈ হচ্ছে বসবেন কখন। আমারও ক্লান্ত লাগছে। মোটা মানুষ ঘুরে ঘুরে হাঁপিয়ে পড়েছি। আমি বাবার পায়ের কাছে এইখানটায় একটু গড়িয়ে নি। ওই ছোট বালিশটা আমাকে দে তো উর্ম্মিলা—"

উর্ম্মিলা সূর্য্যসুন্দরের মাথার শিয়রে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। কোথাও উঠিয়া যায় নাই, কোন কথা বলে নাই। কেবল তাহার অঙ্গুলিগুলি সূর্য্যসুন্দরের কেশ-বিরল মস্তকে ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল।

উষা মাথায় বালিশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাইয়া পড়িল। একটু পরে তাহার নাকও ডাকিতে লাগিল। সূর্য্যসুন্দর তাহার দিকে সস্নেহে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিলেন।

গগন তখন চুপি চুপি দাদুর কানের কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, "দাদু, আলোটা ভালো লাগছে তো"

"ওয়াণ্ডারফুল"

"চম্পাকে ডাকব ? সে এইখানে তোমার মাথার কাছে বসে আস্তে আস্তে গান শোনাক না একটা। গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়—"

"বেশ, সে তো ভালই হবে। কিন্তু ওর কষ্ট হবে না তো, পোয়াতি মানুষ—"

"[illegible]পর বাড়িতে পার্টিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এই অবস্থায়। ডেকে আনি ?"

"আন তাহলে"

দিগন্ত পাশের ঘরে অপেক্ষা করিতেছিল। গগন সেদিকে চাহিয়া বলিল, "দিগন্ত তোর বৌদিকে নিয়ে আয়। তার আগে ক্যাম্প-চেয়ারটা দাদুর মাথার দিকে পেতে দে। চম্পা ওইটেতে বসে' গান শোনাক দাদুকে—"

বাধ্য বালকের মতো দিগন্ত আসিয়া ক্যাম্প-চেয়ার পাতিয়া দিল এবং তাহার পর চম্পাকে ডাকিয়া আনিল। চম্পা যেন গ্রীণ-রুমে অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার পরিধানে জরির পাড়-বসানো নীল শাড়ি, খোঁপায় কুন্দ-ফুলের মালা। সে সলজ্জ মৃদু হাসিয়া গগনের দিকে চাহিল, তাহার পর মৃদুকণ্ঠে দিগন্তকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন গানটা গাইব"

দিগন্ত বলিল, "দিন শেষে বসন্ত যা—"

গগন ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া দিগন্তর দিকে চাহিল। সে আশা করিয়াছিল দুপুরের কথা-মতো 'মম যৌবন নিকুঞ্জে' গানটাই গাওয়া হইবে। কিন্তু দিগন্ত একি ফরমাস করিল। কিন্তু সে জানে এ সব ব্যাপারে দিগন্তই বেশী সমঝদার, তাই সে আর প্রতিবাদ করিল না।

চম্পা ধীরে ধীরে গাহিতে লাগিল—

"দিন শেষে বসন্ত যা প্রাণে গেল ব'লে
তাই নিয়ে বসে আছি, বীণাখানি কোলে।
তারি সুর নেব ধরে'
আমারি গানেতে ভরে
ঝরা মাধবীর সাথে যায় সে যে চলে'।

গগন দিগন্ত দুই জনেই নিঃশব্দ চরণে বাহির হইয়া গেল। সূর্য্যসুন্দর গান শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুমের মধ্যে তিনি নিজের মাকে দেখিতে পাইলেন। মায়ের কোলে একটি শিশু, তিনিই যেন শিশু হইয়া মায়ের কোলে শুইয়া আছেন, মা যেন মৃদু কণ্ঠে গান গাহিয়া তাঁহাকে ঘুম পাড়াইতেছেন। মায়ের ছবি ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। বাবা আসিলেন, তাঁহার হাতে এক-গোছা সবুজ দুর্ব্বা। বাবার হরিণটা আসিয়া দুর্ব্বাগুলি খাইতে লাগিল। বাবা চলিয়া গেলে আসিলেন মামা। তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোমার উপর সত্যই অন্যায় করেছিলাম আমি, আমায় মাপ কোরো। মামাও চলিয়া গেলেন, তাহার পর আসিল মন্মথ। হাসিয়া বলিল, কি রে তুইও টিকিট কেটেছিস দেখছি। কোন ভয় নেই। বেশ আছি আমরা এখানে। এখানেও গান গাই। শুনবি? তোর সেই হার্মোনিয়মটা আছে তো। হার্মো-নিয়মটা বাহির করিয়া আনিয়া, তেমনি করিয়া বসিয়া চোখ বুজিয়া সেই পুরাতন গানটা ধরিল—

উরমির পরে উরমি উঠিয়া
সবলে এ তনু দেয় ডুবাইয়া
ডুবে গিয়ে পুন কেন উঠি ভেসে
কেন নাহি যাই তলায়ে

তাহার পর হঠাৎ থামিয়া বলিল, "হার্মোনিয়মের বেলোটা খারাপ হয়ে গেছে, সারিয়ে নিস।" এই বলিয়া একটু হাসিয়া সে-ও চলিয়া গেল। তাহার পর আসিল নবুদা, তাহার পর রায় মশায়।···সর্ব্বশেষে আসিল 'বউ'—বিরুর মা। মুখে প্রসন্ন হাসি।—মৃদুকণ্ঠে বলিলেন ছেলে, মেয়ে বউ, নাতি, নাতবৌ নিয়ে বেশ আরামে আছ দেখছি। যে জগত অতীতে মিলাইয়া গিয়াছে, যে জগতের অধিবাসীরা আর ইহলোকে নাই সেই জগত তাঁহার ঘুমের মধ্যে মূর্ত্ত হইল। প্রায়ই হয়।

···তাহার পর হঠাৎ সব লুপ্ত হইয়া গেল আবার। ঘুম ভাঙিয়া গেল। চোখ খুলিয়া দেখিলেন—ঘরে নীল আলো জ্বলিতেছে, চম্পা উঠিয়া গিয়াছে। উর্ম্মিলা শুধু বসিয়া আছে মাথার শিয়রে। দূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে কীর্ত্তনের গান—

হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

"কারা হরি নাম করছে?"

"রামনিবাস বাবাজীর দল কীর্ত্তন করছে, সেই যে সন্ধের সময় এসেছিল"

"ও"

সূর্যসুন্দর আবার চোখ বুজিলেন। উর্ম্মিলা আনত-মুখে সূর্য্যসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল, তাহার পর যখন অনুভব করিল সূর্য্যসুন্দর সত্যই

ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন ; তখন সে-ও মামার শিয়রের স্থানটিতে গুটিসুটি হইয়া শুইয়া পড়িল।

সূর্য্যসুন্দর কিন্তু ঘুমান নাই। তিনি রামনিবাসের বাবা শ্রীনিবাসের কথা ভাবিতেছিলেন। লোকটা মদ খাইত, মাংসও খুব প্রিয় ছিল তাহার। প্রায়ই তাঁহার বন্দুক লইয়া শিকারে বাহির হইত। হাতের লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ। কখনও শুধু হাতে ফেরে নাই। ঘুঘু হরিয়াল শরাল প্রভৃতি প্রায়ই মারিয়া আনিত। শুধু মারিয়া আনিত নয়, তাঁহার আস্তাবলটায় বসিয়া রাঁধিত। একা হাতেই সে পাখীর পালক ছাড়াইত, কুটিত, মশলা বাটিত। বামুনদিদি তাহাকে বাড়িতে আমোল দিতেন না। রান্না করিতে করিতে তাঁহার জন্য খানিকটা আলাদা করিয়া তুলিয়া রাখিয়া সে বাকিটাতে খুব ঝাল দিত। তাহার পর সেই ঝাল মাংসের চাট দিয়া মদ খাইত। রোজ মদ খাইত সে। বস্তুত ইহাই তাহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। সকালে উঠিয়া পাখীর খোঁজে বাহির হওয়া, পাখী খুঁজিয়া শিকার করা এবং সন্ধ্যায় সেই পাখীর মাংস সহযোগে মদ খাওয়া। যেদিন সে অন্য পাখা পাইত না, সেদিন চড়াই শালিক পর্য্যন্ত মারিত। ঢিল ছুঁড়িয়া মারিত। এ বিষয়ে অদ্ভুত দক্ষতা ছিল তাহার, মাংস সে কোন রকমে রোজ জোগাড় করিবেই। মাংস তাহার প্রত্যহ চাই-ই, অথচ বাজারে প্রত্যহ মাংস পাওয়া যাইত না, এখনকার মতো তখন গ্রামে গ্রামে কশাইয়ের দোকান ছিল না, পূজার সময় ছাড়া পাঁটা কাটা হইত না। আদিম বন্য মানবদের মতো তাই শ্রীনিবাসকে নিজের দক্ষতার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। মদ খাইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল শ্রীনিবাস। যাহা কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল, সবই সে মদে নষ্ট করিয়াছিল। অবশেষে গ্রামের প্রান্তে দশ বিঘার যে আমবাগানটি আছে সেইটি বাঁধা দিয়া তাঁহার নিকট হইতে আড়াইশত টাকা ধার করিয়াছিল সে। হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিয়া রীতিমত দলিল-পত্র করিয়া ধার করিয়াছিল। কিন্তু শোধ করিতে পারে নাই। কাহারও ধার সে শোধ করে নাই। অবশেষে একটা নষ্ট স্ত্রীলোকের আশ্রয় লইয়াছিল। সে নষ্ট ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু শ্রীনিবাসের খুব হিতৈষিণী ছিল। সেই তাহাকে খাইতে পরিতে দিত এবং পাওনাদারদের তম্বি হইতে তাহাকে লুকাইয়া রাখিত। কোনও পাওনাদার শ্রীনিবাসের নাগাল পাইত না। সে নাকি শাখাপত্রবহুল বড় বড় গাছে উঠিয়া লুকাইয়া বসিয়া থাকিত। স্ত্রীলোকটি একটি বালতির ভিতর এক বোতল মদ, কিছু মাংস এবং খানকয়েক রুটি লইয়া গিয়া গাছতলায় দাঁড়াইয়া সঙ্কেত করিলে শ্রীনিবাস গাছের উপর হইতে একটা দড়ি নামাইয়া দিত। স্ত্রীলোকটি বালতিতে দড়ি বাঁধিয়া পুনরায় সঙ্কেত করিলে শ্রীনিবাস বালতি উপরে টানিয়া লইত। স্ত্রীলোকটিও তাহার পর গাছে উঠিয়া যাইত। সূর্য্যসুন্দর একবার স্বচক্ষে তাহাদের একটি গাছের উপরে দেখিয়াছিলেন। পাওনাদারদের ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু যমকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। শ্রীনিবাসের অবশেষে কঠিন পীড়া হইল। সিরোসিস্ অব লিভার এবং তদুপরি নিউমোনিয়া। ছিন্নবসনা রুক্ষকেশা শ্রীনিবাসের স্ত্রী আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সূর্য্যসুন্দরের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল। সূর্য্যসুন্দর শ্রীনিবাসের চিকিৎসা করিবার জন্য তাহার বাড়ি গেলেন। গিয়া দেখিলেন চিকিৎসা করিবার আর কিছু নাই, শেষ চিকিৎসক যম আসিয়া শিয়রে দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীনিবাস অসহায় দৃষ্টি তুলিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল, দুই গাল বাহিয়া ধারা নামিল। শ্রীনিবাসের পুত্র রামনিবাস তখন চার বছরের শিশু। সে বিছানার পাশে দাঁড়াইয়াছিল, শ্রীনিবাস তাহার হাতটি টানিয়া সূর্য্যসুন্দরের হাতে দিয়া নির্ণিমেষ উৎসুক দৃষ্টিতে সূর্য্যসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সেই সময় সূর্য্যসুন্দর একটা নাটকীয় কাণ্ড করিয়াছিলেন। যে হ্যাণ্ডনোট ও দলিল লিখিয়া দিয়া শ্রীনিবাস একদা তাঁহার নিকট বাগান বাঁধা রাখিয়া আড়াইশত টাকা ধার করিয়াছিল, সেই হ্যাণ্ডনোট ও দলিলটি তিনি বাড়ি হইতে আনাইয়া তাহার সম্মুখেই ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন, মৃত্যুপথযাত্রী হয়তো কিছু সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিল। রামনিবাস তাঁহার সে টাকা শোধ করে নাই। সেই বাগানটি [illegible] লোককে বিক্রয় করিয়া সেই টাকায় একটি আখড়া স্থাপন করিয়াছে। আখড়ায় রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি আছে। অনেক ভক্ত জুটিয়াছে। রামনিবাস এখন

বাবাজী, কেহ কেহ গুরুজিও বলে। ভক্তদের কৃপায় তাহার আর অন্নকষ্ট নাই।

কীর্ত্তন আবার প্রবল হইয়া উঠিল—হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

শুনিতে শুনিতে সূর্য্যসুন্দর আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ঘুমাইয়া আবার তিনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। আবার যেন 'বউ' আসিয়াছে। বলিতেছে, "তুমি দিন-কতক পরে এসো। সবার সঙ্গে দেখা না করে' যেন এসো না। গগনের বউ ভারী সুন্দর হয়েছে, না?" মুচকি হাসিয়া বউ চলিয়া গেল। স্বপ্নের মধ্যেই তিনি ভাবিতে লাগিলেন, সকলের সঙ্গে তো দেখা হয় নাই, সকলে তো এখনও পর্য্যন্ত আসিয়াও পৌছায় নাই। সকলে কি আসিবে? কতদিন পরে আসিবে? ততদিন তিনি বাঁচিয়া থাকিবার মতো শক্তি সংগ্রহ করিতে পারিবেন কি? দ্বারপ্রান্তে শব্দ হইল। তিনি চোখ খুলিয়া দেখিলেন। ঘরে সেই নীল শেড দেওয়া আলোটা জ্বলিতেছে। তাঁহার বিছানার কাছে ও কে দাঁড়াইয়া আছে? বউ নাকি!

"কে—"

মৃদু কণ্ঠে উত্তর আসিল, "আমি চম্পা, আপনার জন্যে ওভাল্‌টিন এনেছি"

সূর্য্যসুন্দর কোন উত্তর দিলেন না, দিতে পারিলেন না। একটা অপূর্ব্ব মাধুর্য্যরসে তাঁহার সমস্ত চিত্ত ভরিয়া গেল, তিনি কথা বলিতে পারিলেন না।

প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত

ব্যাকুল *

শ্রীদিলীপকুমার রায়

আসে কোন্ উদাস স্মৃতি যায় না সখা ভোলা যারে:
জাগে এক অনিদ ব্যথা ঘুম পাড়ানো যায় না তারে।

কবে সেই শ্যামলকে লো দেখেছিলাম নয়ন ভ'রে,
তনু মন প্রাণ সঁপি' তায় নিয়েছিলাম আপন ক'রে
সে-প্রণয় রঙিন কল্প কথার মতন তায় স্বপনে,
যেন সেই সব কাহিনী মন ভুলানো—ছায় স্মরণে!
যদি হায় ভাগ্য ঘুমায় জাগাতে তায় কেবা পারে!

আজো সই যমুনা মাঠ নিকুঞ্জ বাট তেমনি তো ভায়!
তেম্‌নিই জলকে চলে সখীরা সব কলসী মাথায়!
শুধু আজ বল কোথা সেই নূপুর রণন মনোহরা?
কোথা হায় কথায় কথায় গোপালের সেই বায়না ধরা?
বাজে না কেন উছল বাঁশি লো বল্ সে—ঝংকারে?

আজো ভায় তেমনি আকাশ, তেম্‌নি তো চাঁদ তারা,
আজো গায় তেম্‌নি কোকিল, নাচে ময়ুর আপন হারা,
আছে সব সেই-শুধু নেই সে ব'লে জীবন হ'ল ছাই,
বিরহের তাপে মীরা পাগলিনী আজ হ'ল তাই:
এ কেমন আগুন সখী জ্বললে যে আর নেভে নারে।

ডেকে আন ডাক দিয়ে তায়: "এসো বঁধু,
এসো গো আজ।
তোমার ঐ মোহন বাঁশি বাজাও আবার, হে হৃদয়রাজ!
তুমি না ঠাঁই দিলে পায় কোথায় পাব
ঠাঁই বলো আর?
তুমি নাথ মীরার যে সর্বস্ব, নেই আর
কেউ কোথা তার।
কেন বা বাসলে ভালো—করবে না সফল যাহারে?"

* ইন্দিরা দেবীর সমাধিশ্রুত হিন্দি ভজনের অনুবাদ।

'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'তে মধুসূদনের রস-চিত্র কল্পনা

শ্রীকিশোরীরঞ্জন দাস

প্রাচীন সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে কাব্যরস সম্বন্ধে বহু আলোচনা আছে। এ-বিষয়ে ইংরেজী-সাহিত্যও অগ্রণী। বাংলা-সাহিত্যে সংস্কৃত-ইংরেজীর রস-বিচার-ব্যাখ্যার অনুসরণ চলছে। অবশ্য কোন কোন স্থলে এর কিঞ্চিৎ পরিবর্জন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হচ্ছে—বাংলা সাহিত্যিক ও কবিবৃন্দের হাতে।

অভিনব গুপ্ত কাব্যরসের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন :—

শব্দসমর্প্যমানহৃদয় সংবাদ সুন্দর বিভাবানুভাব সমুদিত-প্রাঙ্ নিবিষ্ট—
রত্যাদি বাসনানুরাগসুকুমার—স্বসংবিদানন্দ চর্বণ্য ব্যাপার-রমণীয়
রূপো রসঃ।

'প্রাঙ-নিবিষ্ট রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব-বিভাব-অনুভাবাদি দ্বারা অভিব্যক্ত হয়ে সহৃদয়ের হৃদয়ে যে আনন্দময় আস্বাদ্যমানতা প্রাপ্ত হয়—তা-ই রস। কবির শব্দ-সংযোজনার দ্বারা লৌকিক ভাবগুলি সকল সহৃদয়-সংবাদী সুন্দর ও অনুপম বিভাব-অনুভাবে রূপান্তরিত হ'য়ে পাঠকচিত্তের স্থায়ি-ভাবগুলিকে উদ্বুদ্ধ করে।'

'সাহিত্যদর্পণের কবিরাজ বিশ্বনাথ এক-ই কথাই বলেছেন :

বিভাবেনানুভাবেন
ব্যক্তঃ সঞ্চারিনা তথা।
রসতামেতি রত্যাদিঃ
স্থায়াভাবং সচেতসাম্॥

'চিত্তের রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাব বিভাব-অনুভাব ও সঞ্চারীর সংযোগে রূপান্তরিত হ'য়ে রসে পরিণত হয়।' এই বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী হচ্ছে কাব্যরচনা বা সৃষ্টি কৌশলের তিনটি ভাগ। এ-বিষয়ের আলোচনা আমাদের প্রসঙ্গ বহির্ভূত। সংস্কৃত আলংকারিকরা মানুষের মনের অন্তর্নিবিষ্ট এরূপ নয়টি স্থায়িভাব নির্ধারণ করেছেন—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় ও শম।

রতিহসিশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেথমষ্টৌ প্রোক্তাঃ শমোহপি চ॥

এই নয়টি স্থায়িভাব বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারীর সংস্পর্শে যথাক্রমে নয়টি রসে পরিণত হয়—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত।

শৃঙ্গারহাস্যকরুণ রৌদ্রবীর ভয়ানকাঃ।
বীভৎসোঽদ্ভুত ইত্যষ্টৌ রসাঃ শান্তস্তথা মতঃ॥

মধুসূদনও অলংকারশাস্ত্রোক্ত নয়টি রসের শ্রেণীভাগ স্বীকার করেছেন, কিন্তু অলংকার শাস্ত্রে এই নয়টি রসের যে ভাবকল্পনা ও রূপবর্ণনা আছে তা তিনি গ্রহণ করেননি। তিনি কয়েকটি রসের যে চিত্রাঙ্কন করেছেন তার মূলে তাঁর নিজস্ব কল্পনা ক্রিয়াশীল। বিভিন্ন রসের সনেট-গুলির আলোচনায় এরকম চিত্রকল্পনার হৃদয়গ্রাহিতা এবং সার্থকতা উপলব্ধি করা যাবে। তিনি কোন রসসংজ্ঞা বা রসব্যাখ্যা এ কাব্যের কোথাও পরিবেশন করেননি, রসের মূল প্রকৃতিটি অবলম্বন ক'রে সেই রসের চিত্ররূপ এঁকেছেন তাঁর বিচিত্র কল্পনা ও অপূর্ব ভাষার রেখায়। এর উপাদানগুলির কয়েকটা তিনি পুরাণবর্ণিত আখ্যানভাগ থেকে বা রামায়ণ-মহাভারত থেকে সংগ্রহ ক'রে তার-ই সাহায্যে ভাবময় তত্ত্বকে রূপায়িত করেছেন শব্দের ব্যঞ্জনা-শক্তির দ্বারা, কবি করুণরস, বীররস, শৃঙ্গাররস ও রৌদ্ররস—এই প্রধান চারটি রসের বিচিত্র চিত্ররূপ এঁকে-ছেন এবং ঐ রসের ভাবাশ্রয়ে বিভিন্ন চিত্রকল্পনা করেছেন। এরকম কল্পনা তাঁর নিজস্ব এবং বাংলা কাব্যে প্রথম।

মধুসূদনের এই রস-সম্বন্ধীয় সনেটগুলির মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ তা নিয়ে নানাজনের নানামত। কেউ বলেন, কবি নিজেই 'মেঘনাদবধকাব্য' রচনা করতে গিয়ে বলেছেন—'গাইব মা, বীররসে ভাসি, মহাগীত।' 'বীররস' সনেটের বর্ণনায় দেখি যে, 'গিরি-শিরে' ভীষণ-মূর্তি যোদ্ধা সমুচিত বীরমদমত্ত এক বীরপুরুষ বামহস্তে ধৃত 'ভীমশরাসনে' শর সংযোজিত করে প্রচণ্ড সিংহনাদ করতে করতে এবং টংকারধ্বনি করে শরক্ষেপে করছে। তার—

"বোমকেশ-সম কায়; ধরাতল পদে,
রতন-মণ্ডিত শির ঠেকিছে গগনে,
বিজলী ঝলসা-রূপে উজলি জলদে।
চাঁদের পরিধি, যেন রাহুর গরাসে,
ঢালখান; উরুদেশে অসি তীক্ষ্ণ অতি,
চৌদিকে বিবিধ অস্ত্র।"

কবি এই ভীষণাকৃতি ও বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত বীরপুরুষকে বীররসের দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করে বলেছেন—'বীররস এ বীরেন্দ্র রসকুলপাত।' বীররসের মূলভাব উৎসাহকে তিনি বিশেষভাবে যুদ্ধোত্তমরূপে গ্রহণ করেছেন। এই উৎসাহ সকল শ্রেণীর মানুষের অন্তরে বিমলগভীর আনন্দানুভূতির সঞ্চার করতে নাও পারে। আর বিবিধ-অস্ত্রে সজ্জিত 'ভৈরব আকৃতি শূরে' দেখে কবি নিজেই যেন কিঞ্চিৎ ভয় পেয়েছেন—'সুধিনু তরাসে, কে এ মহাজন, কহ, গিরিমহামতি? তাছাড়া, বীররসে মহাকাব্য রচনা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বীররসে কাব্যকে উত্তীর্ণ করতে পারেননি। সেখানে বীররসের বহুসার্থক নিদর্শন থাকলেও মূলসুর শেষ পর্যন্ত করুণ—রসাশ্রিত হ'য়ে উঠেছে।

'শৃঙ্গাররস,' 'সুভদ্রা' এবং 'উর্ব্বশী' প্রভৃতি শৃঙ্গাররসাত্মক সনেট-গুলির মধ্যে কবি সুভদ্রা-অর্জ্জুন প্রভৃতি নরনারীর যে কামনামদির রূপ অঙ্কন করেছেন তাতে প্রমাণিত হয় রতিভাবাবলম্বিত কামকলার উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় যে-সকল শৃঙ্গাররসাত্মক কাব্যরচিত হ'ত তার ধারানুসরণ করেছেন। 'শৃঙ্গাররস' নামক সনেট দুটির প্রথমটিতে দেখা যায় এক মনোরম কুঞ্জবনে রূপবান এক পুরুষ সৌন্দর্যবর্ধক পুষ্প-মালা ধারণ করে মস্তকে পুষ্পমুকুট পরিধান করে কুসুমাসনে উপবিষ্ট আছে। তার চারিপাশে সুন্দরী রমণীরা নয়নে কামনার দ্যুতি নিয়ে সকৌতুকে পরস্পর হাত ধরাধরি করে নৃত্য করছে। এই যুবাপুরুষের সংস্পর্শোদ্ভূত কামনার অগ্নিস্ফুলিঙ্গে তরুণী হৃদয় দগ্ধীভূত। এই অভিনব কাম-সম্ভোগচিত্র কল্পনা কবিকে ব্রজধামের গোপিনীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব রাসলীলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দ্বিতীয়-টিতে নারী 'মদনের বরে' মেঘনাদসম সমরকুশলী বীরযোদ্ধা, সে চন্দ্রচূড়রথী। অলক্ষিতে থেকে প্রেম-বাণবর্ষণে পুরুষঅরিকে আহত করে—কটাক্ষবাণে পুরুষ হৃদয় বিদ্ধ ক'রে এবং অতি সহজেই পুরুষকে পরাজিত করে। এতে জৈব প্রবৃত্তির অনিবার্য্য আবেগ সপ্রমাণিত। আবেগের আতিশয্য কবির কল্পনাকে অতিশায়িত ক'রে তুলেছে। তিনি শৃঙ্গাররসকে কামের অবতাররূপে কল্পনা করেছেন—

> "কামদেব অবতার রসকুলে আসি
> শৃঙ্গার রসের নাম।"

প্রেম-কবিতা হিসাবে এগুলি রোমান্স সৃষ্টি করতে পারে—দোলাচঞ্চল চিত্তবৃত্তিকে কামনার বিচিত্র রঙে রঞ্জিত করতে পারে, কিন্তু সম্ভোগ শৃঙ্গারের এই কল্পনা-বিলাস চিত্তভূমিকে আবিল ক'রে তোলে, সকলকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। পাঠক হৃদয়-খাতে এই আদিরসের প্রবাহ সর্বাত্মক নয় বরং কামপঙ্কিলতায় গতি শ্লথ হয়ে আসে। এরসের প্রাধান্য এক 'বীরাঙ্গনা' কাব্য ছাড়া তাঁর অন্য কোন কাব্যে তেমন পরিদৃষ্ট হয় না।

'রৌদ্ররসে'র বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি কতকগুলি উপমার আশ্রয় নিয়েছেন। রৌদ্ররসের প্রকৃতি গিরিগুহাবদ্ধ প্রলয়কারী মেঘের মত, ভীষণ গর্জ্জনকারী ক্ষুধার্ত সিংহের ন্যায়। সেই ভীষণ গর্জ্জনে বিরাট অটল-অচল পাহাড় ভূকম্পনে বনভূমি কম্পনের ন্যায়—বাত্যা-বিক্ষুব্ধ উদ্দাম-উত্তাল অতল সমুদ্রের ক্রোধোন্মত্ত ঢেউএর তীব্র আন্দোলনের ন্যায় থরথর কম্পিত হচ্ছে। ভারতী দেবী কৃপা-পরবশ হ'য়ে এই ক্রোধবেণী নিষ্ঠুর কর্কশভাষী রৌদ্ররসকে সাগরের অতল-তলে বেঁধে রেখেছেন। এই রৌদ্ররসের ব্যবহারও সাহিত্যে খুব অল্প। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ-কাব্যের কোন কোন স্থলে এবং 'বিরাঙ্গনা কাব্যের' কেকয়ী পত্রিকায় রৌদ্ররসের কিঞ্চিৎ ব্যবহার দেখা যায়; তাছাড়া আধুনিক কাব্যে এই রসের ব্যবহার নগণ্য। সে সম্বন্ধে কবি স্বয়ং তাঁর সনেটে বলেছেন—রৌদ্ররস—'বড়ই কর্কশভাষী, নিষ্ঠুর, দুর্মতি, সতত বিবাদে মত্ত, পুড়ি রোষানলে।' এই রসকে ভারতীদেবী সাগরের তলে বেঁধে রেখেছেন—অর্থাৎ এ-রসের ব্যবহার বিরল।

রৌদ্ররসের মূলভাব ক্রোধ। ৬৫নং (হিড়িম্বা) সনেটে রৌদ্ররসের সার্থক নিদর্শন পাওয়া যায়:

> "ক্রোধান্ধ মেঘের চক্ষে জ্বলে যথা থরে
> ক্রোধাগ্নি তড়িত-রূপে; রক্ত-নয়নে
> ক্রোধাগ্নি! মেঘের মুখে যেমতি নিঃসরে
> ক্রোধনাদ বজ্রনাদে, ঘোর ঘোষণে
> ভয়ার্ত্ত ভূধর ভূমি, খেচর অম্বরে
> ঘন হুহুঙ্কার-ধ্বনি বিকট বদনে;—"

'দুঃশাসন' সনেটটিতে প্রতিহিংসালোলুপ ভীমের চরিত্রের রূপায়ন দেখা যায়। করুণ-রস, বীর-রস প্রভৃতি রসের প্রকাশভঙ্গী শৃঙ্খলাবদ্ধ, কিন্তু রৌদ্ররসের প্রকাশভঙ্গী বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। রৌদ্ররসের নিকৃষ্টতা প্রকাশিত হয়েছে ভাবের দৈন্য ও কর্কশতা এবং বর্ণনার বিশৃঙ্খলার দ্বারা।

সর্ব্বশেষে করুণ রস সম্বন্ধীয় সনেটগুলির আলোচনায় দেখা যায় যে, এই স্তরের কবিতাগুলিতে একটি স্থায়ী আবেদন আছে। ইংরেজীতে একটি কথা আছে—'our sweetest songs are those that tell of our saddest thought," এই হচ্ছে করুণ-রস। অনেকের মতে করুণ-রসই মূল রস। করুণ-রসের যে শতদল বিকশিত হয় তা অন্যকে আমন্ত্রিত করে আনে, তা সহৃদয়ে হৃদয়সংবাদী। "প্রাচীন অলংকার শাস্ত্রে রসের যে নয়টি বিভাগ আছে সেগুলির মধ্যে একমাত্র করুণ-রসই সর্ব্বত্র, সহজে মর্ম্মস্পর্শী অথচ দীর্ঘকালস্থায়ী। করুণ-রসই আমাদের হৃদয় একেবারে পরিপ্লাবিত করে দিতে পারে। কবি মধুসূদনের অন্তরেও করুণ-রসের প্রতি পক্ষপাত ছিল; করুণ-রস-সৃষ্টিতেই তাঁর অধিকতর সাফল্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এমন কি, 'মেঘনাদবধ' কাব্যেও তিনি যেখানে বীররস, শৃঙ্গাররস বা বীভৎসরস সৃষ্টি করেছেন, সেখানে উৎকর্ষের বা অভিনবত্বের পরিচয় দিলেও যেখানে তিনি করুণ-রসাত্মক ভাবপ্রকাশ করেছেন, সেখানে তাঁর রচনা অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী ও কবিত্বের দিক দিয়েও সার্থক হয়েছে। তিনি করুণ-রসকেই শ্রেষ্ঠত্বের মর্য্যাদা দিয়েছেন।"

'করুণ-রস' সনেটের বর্ণনায় দেখি, অপূর্বসুন্দরী এক যুবতী নির্জন নদীতীরে নিঃশব্দে ক্রন্দনরতা। তার গণ্ডবাহিত এক এক বিন্দু অশ্রু এক একটি মুক্তাফলের ন্যায় প্রতিভাত। আর কমনীয় সুন্দর মার্জ্জিত বদনমণ্ডল বিপদাশঙ্কায় রাহুগ্রস্ত শরতের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় পাংশু ও ম্লান। তার অশ্রুস্পর্শে নদস্রোত কেবল যে পদ্মবর্ণকান্তি রূপধারণ করেছে তা নয়, তা থেকে মধু ও সুরভি ক্ষরিত হওয়ায় অলিকুল তদুপরি গুঞ্জরণ করছে। সব মিলিয়ে এক মায়াঘন পরিবেশ—

> "সুন্দর নদের তীরে হেরিনু সুন্দরী
> বামারে, মলিনমুখী, শরদের শশী,
> রাহুর গরাসে যেন? সে বিরলে বসি,

মৃদে কাঁদে সুবদনা ; ঝরঝর ঝরি,
গলে অশ্রুবিন্দু, যেন মুক্তাফল খসি !
সে নদের স্রোতঃ পরশন করি,
ভাসে, ফুল্ল কমলের স্বর্ণকান্তি ধরি,
মধুলোভী মধুকরে মধুরসে রসি,
গন্ধামোদী গন্ধবহ সুগন্ধ প্রদানি।"

কবি তাকেই—'করুণা বামার নাম—রসকুলে রাণী' বলেছেন। করুণ-রসের এরূপ চিত্রাঙ্কনে, বিশেষ করে, নারীকে করুণার সঙ্গে অভিন্নরূপে কল্পনা ক'রে নিজস্ব কল্পনাশক্তির ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। রূপচিত্র-শিল্পীর অসাধারণ প্রতিভাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর এই অভিনব পরিকল্পনায়।

'করুণ-রস' সনেটে যে সুন্দরী করুণা বামাকে নদীতীরে ক্রন্দনরতা অবস্থায় দেখা যায় সে-তো 'নদীপারে একাকিনী সে বিজনবনে' বসি বনবাসিনী শোকবিহ্বলা সতীজানকী। 'করুণ-রসে'র চিত্র পরিকল্পনায় রামায়ণের 'অভাগিনী সীতা'—চরিত্রের প্রতি কবি হৃদয়ের সুগভীর সহানুভূতি প্রকাশিত। তাই করুণ-রসের পরিকল্পনা 'সীতা-বনবাসে' সনেট দুটিতে জীবন্তভাবে রূপায়িত। একটি কল্পনা, অপরটি বাস্তব রূপায়ণ। কারো মতে: 'দুঃখবেদনা—বিচ্ছেদ এই চরিত্রের মধ্যে কারুণ্যের যে নির্ঝর প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে তাহার তুলনা বিশ্ব-সাহিত্যে নাই।' এই উক্তি অনেকাংশেই সত্য ও যথার্থ। কবি এই সকরুণ চরিত্রটিকে কেন্দ্র ক'রে 'সীতাদেবী নামে একটি সনেট রচনা করেন। সেখানে অশোক-কাননে চেড়ীবেষ্টিতা সীতাদেবীর করুণাঘন মূর্তি অপূর্ব রস-ব্যঞ্জনায় সমুদ্ভাসিত। কবি দেখেছেন—

"মুদিত নয়নে
একাকিনী তুমি সতি, অশোক কাননে,
চারিদিকে চেড়ীবৃন্দ, চন্দ্রকলা যথা
আচ্ছন্ন মেঘের মাঝে ! হায় বহে বৃথা
পদ্মাক্ষি, ও চক্ষু হ'তে অশ্রুধারা ঘনে।"

এই বর্ণনা পাঠান্তে কবির কথায় বল্‌তে হয়—"অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা, বৈদেহী।"

বীর-করুণ-শৃঙ্গার-রৌদ্র—এই চারটি রসের যে চিত্র-বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে করুণ-রসের বর্ণনা-ই শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয় এবং কবিমুখে বীররসের জয়গান করতে চাইলেও অন্তরে করুণ-রসের সমর্থক ছিলেন তা বোঝা যায়। আর কবির ব্যক্তি জীবনের ট্র্যাজেডীর সিঞ্চনে করুণ-রসাত্মক কবিতাগুলি তাই রসোত্তীর্ণ ও সার্থক। কবির কাব্যের Saddest thought-ই তো পাঠকের অন্তরে Sweetest song-এর সৃষ্টি করে। মধুসূদনের এই সনেটগুলি পাঠকচিত্তে সত্যই সঙ্গীত সৃষ্টি করিতে সক্ষম।

প্রতীক্ষা

পুষ্প সান্যাল

সারা সকাল বসে আছি
তোমার তরে,
কখন তুমি আসবে প্রিয়
আমার ঘরে।
কখন তোমার আলোর আলো
ঘুচাবে মোর মনের কালো
কখন তোমার বাজ্‌বে বাঁশী
এ অন্তরে।

মেঘ জমেছে মনে মনে
উদাস হল দিন,
গভীর অবহেলায় প্রিয়
নীরব হল বীণ।
পুষ্পে আজি নেই সুরভি
প্রভাত যেন গায় পূরবী,
ধূসর ছায়া ছড়িয়ে আছে
আকাশ পরে॥
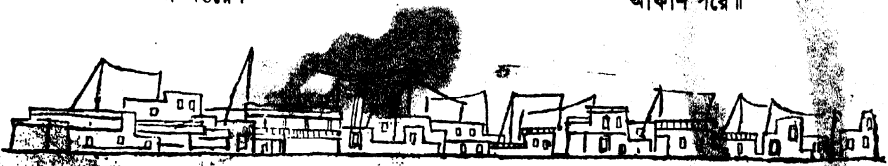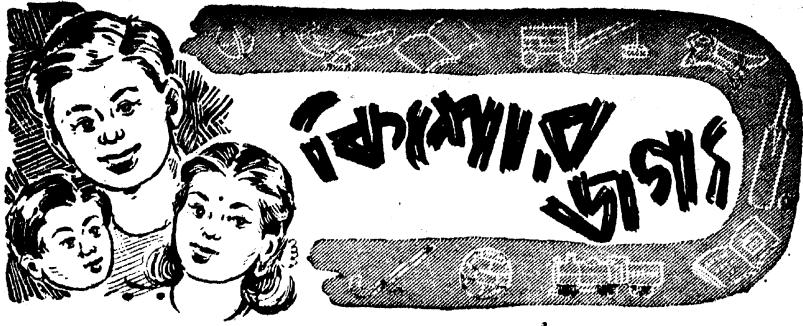
ভাবপ্রবাহ

উপানন্দ

যে কাজ করতে অপরে শক্ত বোধ করে, তা যদি সম্পন্ন করতে সহজ হয়, তা হোলে সেটাকে ধীশক্তি বলে। ধীশক্তির দ্বারাও যে কাজ সম্পন্ন করা যায় না, তা সুসম্পন্ন করাকে প্রতিভা বলে। যে ব্যক্তি সর্ব্বদাই নিজেকে ভদ্রলোক বলে জাহির করে, প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে ভদ্রলোকের গুণগুলি খুঁজে পাওয়া যায় না। একই ভুল বারে বারে করা উচিত নয়, —ভুলের রকম ফের ভালো। লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় সুখ্যাতি অর্জ্জন করতে হোলে আত্মসংযম ও ধৈর্য্য ভিন্ন সম্ভবপর হয় না। চিত্তকে স্থির করলে ভগবানের কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায়। ভগবানকে ভক্তি করলে ভগবানের রূপ নিজের মধ্যে ফুটে ওঠে। তোমাদের জীবন প্রভাতের অভ্যুদয় হয়েছে, এখন থেকে চেষ্টা করো প্রতিভাধর মানুষ হোতে।

ব্যক্তি ও বস্তুর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ভিন্ন কৃষ্টি অর্জ্জন হয়না। কৃষ্টি ও সভ্যতা ব্যক্তি বা জাতি-বিশেষের সম্পত্তি নয়, তা মানব জাতির সাধারণ সম্পত্তি। মানুষ নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি ও সৌন্দর্য্য অনুশীলনের জন্যে জীবনযাত্রার জটিল পথে যখন অগ্রসর হয়, তখনই প্রয়োজন হয় কৃষ্টি বা সংস্কৃতির। জগতে শিল্প বাণিজ্য যাদের মুঠোর মধ্যে, আজ তারাই সংস্কৃতিকে পরিচালনা করছে, সেইজন্যে আমরা সর্ব্বত্র সংস্কৃতির বিকৃতরূপ দেখতে পাই। সংস্কৃতিতে আজ সঙ্কটময় অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। তোমরা ভারতের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রথম সন্ধান পাবে বেদে। আজকের দিনে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা জাতির জীবনে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার জন্যে তোমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত। বর্ত্তমানে জগৎ এক বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে এসেছে, এর কারণ হচ্ছে বিভিন্ন সমাজশক্তির গুরুতর অসামঞ্জস্য।

যে জাতি যে পরিমাণে আপনার অভাব আপনি পূরণ করতে সমর্থ, যে জাতি সেই পরিমাণে সভ্য। যে বিদ্যা অপমান ও দুর্গতি থেকে মানুষকে রক্ষা করে, সেই বিদ্যা অর্জ্জনই দরকার। সেই শিক্ষারই প্রয়োজন যা চরিত্রগঠনে সাহায্য করে, মানসিকশক্তিবিকাশের পথ প্রশস্ত করে, বুদ্ধির উৎকর্ষ আনে—আর স্বাবলম্বনের পথ দেখায়। অশিক্ষায় নিমগ্ন থাকলে ছোট বড়ো সকলপ্রকার দুর্গ্রহের কাছে নিঃসহায় অবস্থায় লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে। এজন্যে তোমরা প্রকৃত শিক্ষার আদর্শ গ্রহণ করো। স্বাধীনদেশের ছেলেমেয়েরা প্রকৃত শিক্ষালাভ না করলে স্বাধীনতা মৃতই হবে।

বিদ্যা কেবলমাত্র অর্থকরী হোলে ব্যক্তিগত মঙ্গল হোতে পারে বটে, কিন্তু তার দ্বারা সমাজের মঙ্গল হয় না। ব্যক্তিগত মঙ্গল অবলম্বন করে জগতে কোন জাতি বড় হয়নি। সমষ্টিভাবে কর্ম্ম না করলে কোন কর্ম্মই সংসাধিত হয় না। তোমরা বস্তুতন্ত্রবাদী জগতের প্রতি সচেতন হয়ে নিজেদের কর্ম্ম করে যাবে। যার ভেতর যত বেশী কর্ম্মশক্তি আছে, তার ভেতর ততখানি অংশ জুড়ে আছেন ভগবান। সর্ব্বদা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করবে, মিথ্যা আচরণ করবে না, মিথ্যা-কথনও ত্যাগ করবে, তাতে আত্মার বিশুদ্ধি রক্ষা হবে। আত্মার বিশুদ্ধি রক্ষা করতে পারলে, তোমাদের মধ্যে ভগবৎশক্তি দেখা দেবে, আর সেই শক্তি প্রয়োগ করে তোমরা বিশ্বের বিস্ময় হয়ে উঠবে—যেমন করে হয়েছিলেন তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা। তোমরা ভুলো না ভারতের প্রধান সম্পদ—আধ্যাত্মিকতা।

জীবনে দুঃখ, বিপদ ও বাধাকে কেউ এড়াতে পারে না। এদের প্রয়োজনীয়তা ও আছে। দুঃখ বিপদ ও বাধা না এলে আমাদের চেতনা অধিকতর উদ্দীপ্ত হয় না, পরিমার্জ্জিত হয় না—এরাই আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের শ্রেষ্ঠ সহায়ক। জীবমাত্রেই জীবনসম্পন্ন। যতদিন জীবন নিত্য, ততদিন সমাজ ও নিত্য। জীবন দান করাই প্রতি সমাজের প্রাথমিক কর্ত্তব্য। জীবন ধারণের প্রাথমিক উপকরণগুলি যে সমাজ দিতে পারে না, সে সমাজ আত্মঘাতী—সে সমাজে পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি সম্ভব নয়। মানুষ-সত্যের আদর্শকে গণ-চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করাই হোলো আজকের দিনে সব চেয়ে বড় কাজ। এই কাজের ভার তোমাদেরই গ্রহণ করতে হবে। মানুষের চিন্তার মধ্যে যে আবিলতা প্রবেশ করেছে, তাকে

বিদূরিত করবার জন্যেই তোমাদের এগিয়ে আসতে হবে প্রকৃত শিক্ষালাভ করে।

বীণা যখন বেজে ওঠে পূর্ণ রাগিণীতে, তখন তার প্রত্যেকটী তারের ঝঙ্কারের মিলনে গড়ে ওঠে একটি সঙ্গীত, তবু তার মধ্যে স্বতন্ত্র থাকে প্রত্যেকটী আলাদা তার। এমনি স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলবে তোমরা অথচ সুরের ঐক্য যেন ছিন্ন হয়ে না যায়, একটি ঝঙ্কারই যেন ওঠে। কর্ম্মীর শ্রেষ্ঠত্ব তার কর্ম্মের দ্বারা নির্ণীত হয় না, হয় তার কর্ম্ম-নৈপুণ্যের দ্বারা। সুখ ও দুঃখকে অভিন্নভাবে আলিঙ্গন করবার মত স্বভাব যেন তোমাদের হয়, তা হোলে জীবনে বহু উন্নতি করতে পারবে।

ভগবান গীতায় অর্জ্জুনকে বলেছেন—কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফল পাওয়া বা না পাওয়া কখনই তোমার আয়ত্তাধীন নয়, অতএব তুমি ফল কামনা করে কর্ম্ম করো না—আর কখনও কর্ম্মবিহীনও হয়ো না। কর্ম্ম বলে যে সমত্ব বোধ হয়, তাকে যোগ বলে। কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে তোমরা কর্ম্ম করবে। উপনিষদের ঋষি বলেছেন—'সত্যংবদ। ধর্ম্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ' সত্য বলবে, ধর্ম্ম আচরণ করবে, অধ্যয়নে ভুল করবে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—'মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা স্বতই বর্ত্তমান, তাহারই বিকাশের নাম শিক্ষা···উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য জীবনের সমস্যাগুলি সমাধান করিবার সামর্থ্যলাভ···'আমাদের মধ্যে রয়েছে বহু সমস্যা, এর সমাধানের জন্যেই তোমাদের উচ্চশিক্ষা লাভের প্রয়োজন।

সৎকর্ম্ম ও সৎশিক্ষা দ্বারা মানুষ এজন্যেই দেবত্বলাভ করতে পারে। তোমরা দেবত্বলাভ করবার জন্যে ছেলেবেলা থেকেই সচেষ্ট হও। এই বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরালে যে সত্য রয়েছে, তাকে মানুষ কাঙাল হয়ে চিরকালই খুঁজেছে, সেই সত্যকে যে খুঁজে পেয়ে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, সে-ই হয়েছে আমাদের চিরবরণীয় আর চিরস্মরণীয়। আত্মকেন্দ্রিকতা আমাদের যত কিছু অনিষ্টের মূল,—আত্মকেন্দ্রিকতাকে যাঁরা তুচ্ছ করে পরার্থপরতার দিকে ছুটে বিশ্বকল্যাণ বোধকে জাগ্রত করেছেন তাঁরাই ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মহামানব হয়েছেন। আমরা তাঁদেরই বন্দনা করে থাকি। তোমরা যদি তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সত্যকে খুঁজে বের করে সত্যাশ্রয়ী হও, আর আত্মকেন্দ্রিকতাকে বিসর্জ্জন দিয়ে পরহিত ব্রতে আত্মনিয়োগ কর, তাহোলে তোমরাও ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক একটি মহামানব হয়ে উঠবে—আর সারা বিশ্ব তোমাদের বন্দনা গান করবে।

বৈচিত্র্যই সৃষ্টির নিয়ম। মত-বৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তাও তাই অস্বীকার করা যায় না। তোমরা ভেবে দেখবে, সৌন্দর্য্য বোধই মানুষকে আনন্দ দিয়েছে, না আনন্দলাভই তার চেতনায় সৌন্দর্য্যবোধ এনেছে। অবস্থা বাদ দিয়ে পদার্থের গুণ বিচার করা চলে না। ভালোবাসাকে করোনা শৃঙ্খল। ভালোবাসা হোক সাগরের ঢেউয়ের মত—আর সেই ঢেউই যে প্রবহমান সাগরের দুই পারের দুই তটের সংযোগ। যা চিরদিনের সত্য, তাকে কখন সাময়িক স্বার্থের প্রভাবে ভুলে যেও না। আমাদের মধ্যে এসেছে মারাত্মক মানসিক আলস্য, এই আলস্য যেন তোমাদের মনকে স্পর্শ না করে। মানব সভ্যতার প্রজ্ঞার আলোকে তোমরা উদ্ভাসিত হও। আজ আমাদের অন্তর লোকের সৃজনক্ষেত্রে নেমে এসেছে হিম-নীরবতা, তা থেকে আমাদের উদ্ধার পেতে হবে। আজকের রাত্রিই আমাদের একমাত্র সত্য নয়, কালকের প্রভাতের কথাও ভাবতে হবে বৈকি!

মানব সভ্যতার মহানায়কদের জীবন আর বাণী তোমাদের হোক আলোচনার বস্তু—তোমরা তাঁদের কথা ভাবতে ভাবতে তাঁদের মতই হয়ে ওঠ। মানব সভ্যতার দুটি চির জ্বলন্ত মশাল আর্ট ও বিজ্ঞান—এই মশাল দুটি ধরে তোমরা নিখিলের অতলান্ত রহস্যের সন্ধান করো—কণ্টকহীন উপলহীন মহাবিস্তৃতির মসৃণ পথ করে তোলো তাদের জন্যে, যারা আজো জন্মগ্রহণ করেনি তোমাদের দেশে—সাময়িক রাজনৈতিক প্রয়োজনের যূপকাষ্ঠে কোনদিন তোমরা অন্তরের চিরসত্যকে বলি দিও না—বলি দিও তাদের কৃত্রিম অন্তরের পশ্চাচারকে, যারা তোমাদের দেশের আকাশবাতাসকে বিষিয়ে তুলছে, যারা মানব সভ্যতার চরম কলঙ্কস্বরূপ হয়ে দেশের অন্নবস্ত্র সমস্যাকে গভীরতম করে তুলতেও কুণ্ঠাবোধ করছে না।

এজন্যে তোমরা উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে শক্তি সঞ্চয় করো—আর সৎসাহসী হও। রাজনৈতিক কৌলিন্য মর্য্যাদা নিয়ে আজ যাঁরা নানা দেশের সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন তালিকায় নিজেদের নাম বহু বিঘোষিত করছেন, তাঁদের বহু কথার সঙ্গে বহু কাজেরই মিল পাবে না, তাঁদের কথায় ভুলো না—নিজেরা খুঁজে দেখবে কোথায় সত্য আত্মগোপন করে রয়েছে—কোথায় ইতিহাসের উপেক্ষিত মানুষেরা নীরবে অশ্রুপাত করছে। তারা অনেক কিছু বলতে চেয়েছে তাদের অনেক কিছু বলার অধিকার ফেলেছে তারা হারিয়ে। তাদের নিয়ে এসো তোমাদের পুরোভাগে—শোনো তাদের কাছ থেকে বিস্মৃত কোন্ ঋতুর রৌদ্র আলো বৃষ্টিতে তারা বপন করেছিল বীজ—যার ফসলে ভরে গেছে দেশ কিন্তু আজ শস্য সঞ্চয়ের দিনে তাদের কথা কেউ বলে না, কেননা সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন তালিকা থেকে তাদের নাম মুছে গেছে। তোমরা তাদের খুঁজে বের করে এনে আবার আমাদের বিদায়-গোধূলিতে জন্ম দাও আমাদেরই নবীন উষা—এইটুকুই হোক আমার বক্তব্য তোমাদের কাছে।

উপনিষদের ভূমিকা

চিত্রিতা দেবী

তোমাদের কাছে উপনিষদের কথা বলতে এসে আমার নিজেরি একটু দ্বিধা হচ্ছে। 'উপনিষদ' নামটা যে একটু ভয় দেখানো সন্দেহ নেই তাতে—কিন্তু ওর মধ্যে প্রবেশ করিলেই বুঝতে পারবে সকল ভয় দূর করার মূল মন্ত্র লেখা আছে এতে। কিন্তু আমি কেবল ভাবছি, কেমন করে বললে, সে বাণী তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হবে। এতো ইতিহাস, ভূগোল অথবা অঙ্কের মত সাধারণ লৌকিক বিজ্ঞানের বিষয় নয়।

প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা নিহিত আছে এই গ্রন্থগুলির মধ্যে। এ কাহিনী যে বলে, আর যে শোনে, উভয়কেই পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে কাজ করতে হয়। যেমন তেমন করে নিতান্ত সাধারণভাবে কেউ বলে গেল, আর তেমনি সাধারণ অর্দ্ধমনস্কভাবে কেউ শুনে গেল, সে যুগে একথা কেউ ভাবতে পারত না।

কিন্তু আমাদের হাতে এ ছাড়া আর উপায় কী আছে? সেই শান্ত স্নিগ্ধ তপোবনের ধীর মন্থর যুগ তো অনেকদিন চলে গেছে। আজকের যুগের লক্ষ্য হচ্ছে, অনেক লোকের জন্যে অনেক কথা কে কত তাড়াতাড়ি বলে ফেলতে পারে। কিন্তু তাই বলে দুঃখ করবার কিছু নেই। মানুষের ইতিহাসে সে যুগের মতই এ যুগেরও প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। যুগের দাবী বর্তমানের দাবী, মেটাতেই হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রাচীন যুগকেও যেন একেবারে ভুলে না যাই। তাহলে তার এতদিনের অভিজ্ঞতার ফল ব্যর্থ হবে। সেই জন্যেই আজকের দিনে, ভারতবর্ষের প্রায় সকল মনীষীদেরই এই আকাঙ্ক্ষা, যে, এ যুগের শিক্ষার পারে জ্বলে উঠুক সে যুগের জ্ঞানের আলো?

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন 'উপ' এই কথাটাই 'উপনিষদ' এই শব্দের মধ্যে প্রধান। 'উপ' অর্থাৎ নিকটে। হাটের মাঝে গলাবাজি করে বলার বিষয় এ নয়। গুরুর নিকটে নিভৃতে বসে এই বিদ্যাকে গ্রহণ করতে হয় সমস্ত মানসশক্তি দিয়ে।

কেবল লেক্‌চার দিয়েই সে যুগের গুরু দায় খালাস হতেন না, অথবা ছাত্র কেবল হাজিরা দিয়ে, কর্ত্তব্য শেষ করতেন না। ছাত্রের দেহ-মনের সকল শিক্ষার ভার ছিল গুরুর উপরে। মনুষ্যত্বের সমস্ত শিক্ষা যাতে ছাত্রের মধ্যে সার্থক হয়, সে যাতে পূর্ণ মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে, সেদিকে গুরুর দৃষ্টি ছিল সর্বদা সজাগ। সেই জন্যেই সদ্‌গুরুর সন্ধানে মানুষ আজো এত ব্যাকুল হয়ে ওঠে। নিজের জীবনকে আদর্শরূপে শিষ্যের সামনে তুলে ধরে, আপন সাধনলব্ধ জ্ঞান, সে যুগের গুরু সঞ্চারিত করতেন শিষ্যের মধ্যে।

এখনকার দিনে গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক যে রকম হয়ে উঠেছে, তাতে এ ধরণের কথা হয়ত ভাবাও যায় না—কিন্তু সে যুগে, গুরু-শিষ্যের সম্পর্কটা সত্য না হয়ে ওঠা পর্য্যন্ত শিক্ষা পূর্ণ হোত না। তাই উপনিষদ পাঠের পূর্বে শান্তি-পাঠের মন্ত্রে গুরু-শিষ্যের সম্মিলিত প্রার্থনা দেখতে পাই ধ্বনিত হচ্ছে—ওঁ সহনাববতু সহ নৌ ভুনক্তু।

সহ বীর্য্যং করবাবহৈ,
তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥

মন্ত্রটির বাংলারূপ এই রকম দাঁড়ায়—

"গুরু ও শিষ্য আমাদের দোঁহে এক সাথে রাখো প্রভু।
বিদ্যার ফল যেন ভোগ করি দুজনে।
অধীত বিদ্যা হোক তেজস্বী, আনুক চিত্তে বল।
বিদ্বেষভরে দুজনে দোঁহারে কখনো না যেন দেখি।"

গুরু ও শিষ্য পরস্পরের প্রতি বিদ্বিষ্ট হলে শিক্ষার সব আয়োজনই ব্যর্থ। শুধু কয়েকটা বিষয় জেনে নেওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। তার যথার্থ উদ্দেশ্য শিক্ষিত হয়ে ওঠা, জ্ঞানকে জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। তার জন্যে গুরু ও শিষ্য উভয়কেই সমান নিষ্ঠাসম্পন্ন হতে হবে। হতে হবে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবান।

'উপনিষদ' এই নামের ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্য আর একটু অন্য রকম করে করেছেন। শঙ্করাচার্য্যের নাম নিশ্চয় তোমাদের অজানা নয়। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে তাঁর অভ্যুদয় হয়, দক্ষিণ ভারতের প্রান্তে। সমগ্র বেদান্ত সাহিত্যের ব্যাখ্যা ও সেই ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে ভারতীয় বিখ্যাত দার্শনিক মত অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি।

তিনি বলেন 'উপনিষদ' এই নামের অর্থ 'সদ' কথাটার মধ্যেই নিহিত আছে। 'সদ' ধাতুর মানে খুলে

দেওয়া, আলগা করে দেওয়া। অজ্ঞানের আবরণ নিশ্চিত-রূপে খুলে দেয় বলে, এই গ্রন্থের নাম উপনিষদ্।

অজ্ঞানের আবরণ কথাটা একটু অস্পষ্ট ঠেকছে বোধ হয়। অজ্ঞান অর্থাৎ অজানা আমাদের ঢেকে রাখে। কি থেকে ঢেকে রাখে, জানা থেকে। অন্ধকার যেমন আমাদের ঢেকে রাখে আলো থেকে।

তাই পণ্ডিতেরা অজ্ঞানকে বার বার অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বলেছেন, এ শুধু তমসা নয়, মিথ্যা মায়া। কারণ এ যে শুধু আমাদের দেখতেই বাধা দেয় তা নয়, অনেক সময় ভুল করে দেখায়—যেটা যা নয়, সেটাকে তাই বলে ধারণা করিয়ে দেয়।

যেমন ধর, একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। গরমের ছুটীতে হয়ত তুমি দার্জিলিঙে বেড়াতে গেলে। সেখানে কাজ তো খালি খাওয়া আর ঘুরে বেড়ানো। এমনি একদিন বিকেল বেলা খুব খানিকটা ঘুরে-টুরে, বাড়ীর কথা যখন মনে হোল, হয়ত তাকিয়ে দেখলে। পশ্চিম দিকের ঐ মস্ত পাহাড়টার আড়ালে, সূর্য্য কখন টুপ করে নেমে গেছে। দেখতে দেখতে অন্ধকার কালো হয়ে তোমার চারিদিক ঘিরে সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। দুধারে পাইন গাছের সারি ভূতের মতন দাঁড়িয়ে আছে। হয়ত তোমার একটু গা ছম্ ছম্ করছে। তাকে আমল না দিয়ে তুমি হয়ত হন্ হন্ করে বাড়ির দিকে চলেছো। মেঘের কোণা থেকে তৃতীয়ার চাঁদ পাইন পাতা আর ঘাসের ডগার উপরে চিক্‌চিক্ করছে। এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেলে পথের পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওটা কী শুয়ে রয়েছে। ওমা ও যে মস্ত কেউটে সাপ, ওকে ডিঙিয়ে যাবে কী করে। চমকে তুমি থমকে দাঁড়ালে। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি এল, পকেট থেকে টর্চ বার করে বোতাম টিপলে তুমি। আলো জ্বলল, তুমি আপন মনেই হেসে উঠলে, মিথ্যে ভয় পেয়েছিলে। সাপ নয়, ওটা তো একটা দড়ি। অন্ধকারের এমনি ক্ষমতা, দড়িকে সাপ বলে ভুল করায়। কখনো যদি উল্টো হয়,—দড়ি মনে করে সাপটাকেই মাড়িয়ে দাও। তাই তুমি হয়ত মনে মনে ঠিক করলে—রাতের বেলা সর্বদা সঙ্গে টর্চ নিয়ে বেরোবে। তাহলে আর এমন ভ্রমে পড়তে হবে না।

আচার্য্য শঙ্কর বলেন, উপনিষদের বাণী অন্তরে উপলব্ধি করতে পারলেই মনের মধ্যে সেই টর্চটী জ্বলে ওঠে। তার আলোয় মানুষ নির্ভয়ে সংসারে বিচরণ করতে পারে। দুঃখ বিপদ যতই আসুক, পাপের পথ যতই লোভ দেখাক, ঠিক রাস্তা চিনে নিতে আর ভুল হয় না।

আগামী বারে তোমাদের উপনিষদ্ সম্বন্ধে আরও কিছু বলব। (ক্রমশঃ)

বৈশাখী

শ্রীকৃষ্ণদাস চক্রবর্তী

বিগত-বিভব আজ ঋতুরাজ
খুলি রাঙাচেলী বসন্ত-সাজ
বিবর্ণ অশোক-পলাশে ;
পুরাণো বছর নিলো বিদায়
ক্লান্ত চরণে বিবসন প্রায়
চুপিসাড়ে মধু মাসে।
পিকের কাকলি গেছে থামি
ধীরে যবনিকা আসে নামি
চৈত্র-রাত্রি শেষে ;
দু'টি দিগন্তে দু'টি বিভা
নিশি অবসানে আসে দিবা
নবীন সূর্য হেসে।
নব বরষের নব রাগে
চির নূতনের শোভা জাগে
দিকে দিকে রাশি রাশি ;
মৃদু গম্ভীর ধ্বনি তুলে
বৈশাখী উষা এলোচুলে
দুয়ারে দাঁড়ালো আসি।
বিগত দিনের ব্যথা ভুলি
বরণ করিয়া লহ তুলি
হৃদয় অর্ঘ্য দানে ;
নব বরষের নব প্রাতে
এসো আজি মিলি একসাথে
চির নূতনের জয়গানে।
গোধূলীতে মেলি রাঙা-আঁখি
রুদ্রাণীরূপে এ বৈশাখী
বাজাবে বিজয় ডমরু ;
সংহারী যত জীর্ণ-জরা
নূতন ছন্দে গড়িতে এ-ধরা
লীলা প্রমত্ত হবে সুরু।

কাজল-প্রদীপ

শ্রীআশাবরী দেবী বি-এ

দুই তরুণ সখা যাবেন মৃগয়া করতে—কাঞ্চন-পুরীর যুবরাজ কাজলকুমার আর তাঁরই অন্তরঙ্গ প্রাণের দোসর সহচর যুব-সেনাপতি প্রদীপকুমার। একদিকে কাঞ্চনপুরীর রাজ-দম্পতির হৃদয়ের মণি, আর একদিকে কাঞ্চনপুরীর রাজ-সেনাপতি ও তাঁর পত্নীর নয়নের তারা! রাজ-প্রাসাদে আর সৈন্যাধ্যক্ষ-গৃহে তাই সুখশান্তি নেই। তরুণ দুইটির দুঃসাহসিক মনের দুর্জয় পণ কি কিছুতে ভাঙবে না?

মহারাজা সমরেন্দ্রনাথ ও মহারাণী পদ্মাবতী দুজনেই সেদিন সন্ধ্যায় ম্লানমুখে বসেছিলেন রাজোদ্যানের শেফালী-তলের মর্মর-বেদীতে। অবিশ্রাম শিউলী ঝরছিলো মৃদু হাওয়ায়—আকাশ ভরে গিয়েছিল পুলকিত শারদ-জ্যোৎস্নার প্লাবনে।

"এ কী সমস্যার ওপর সমস্যায় পড়লেম পদ্মা—!" মহারাণীর সমব্যথিত দৃষ্টি এসে মিশলো রাজার চোখে। অনতিদূরে পদ্মভরা পুষ্করিণীর শুভ্র মর্মর-সোপানে জলপ্রান্তে বসে আছেন রাজকন্যা চিত্রা তন্ময় হয়ে একা—মুক্তামালা-জড়ানো নিবিড়-কৃষ্ণ দীর্ঘ বেণী মর্মরের শুভ্রতার ওপর এঁকে-বেঁকে চলে পড়েছে। সখীরা কেহ সঙ্গে নেই। চিত্রা পিতামাতার আগমনও জানতে পারেন নি—কি এতো ভাবনায় কন্যা নিমগ্ন?

"প্রদীপের সঙ্গে চিত্রার বিবাহ সত্যই কি একেবারে অসম্ভব রাজা?" রাণীর কণ্ঠে ব্যাকুলতা ধ্বনিত হয়। "আমার 'পিতৃমন তো অসম্ভব বলে না পদ্মা—রূপে বিদ্যায়, শৌর্যে বীর্যে এমন স্বামী পাওয়া তো চিত্রার ভাগ্য—কিন্তু মহারাণী…কুল-পুরোহিতের বিধান—"

"কি বিধান মহারাজ যে চিত্রার প্রাণ-রক্ষাকারীও তার পাণি-গ্রহণের অযোগ্য ঘোষিত হয়েছে?"—এই সময়ে ফুল-ছাওয়া উদ্যানপথ দিয়ে ধীর পদে যুবরাজ এসে দাঁড়ালেন মহারাজা ও মহিষীকে প্রণাম করে।

"পিতা-মাতা! আমি আপনাদের অনুমতি-প্রার্থনায় এসেছি—!" সংশয়শূন্য কণ্ঠে কাজল বললে। রাজা-রাণী ব্যগ্র হ'য়ে উঠলেন—কিসের অনুমতি-প্রার্থী হয়ে এমন সময়ে এলো কাজল? কি তাকে অদেয় আছে তাঁদের? পরম স্নেহে রাজপুত্রের চিবুক চুম্বন করে কাছে বসালেন পিতামাতা।" "চিত্রা-মা!" বলে কন্যাকে ডাকতে—দেখেন পুষ্করিণী প্রান্ত শূন্য—কখন রাজকুমারী চকিত হয়ে চলে গেছেন!

মহারাজা সমরেন্দ্রনাথ মহারাণী পদ্মাবতী নীরবে পুত্রের মুখপানে ব্যাকুল দৃষ্টি ফেলে চেয়ে রইলেন নীরবে—পলকে ভেসে উঠলো বাইশ বৎসর আগের ছবিগুলি মানস-পটে * * * কাজল চিত্রা আর প্রদীপ যখন এলো তাদের বাপ মায়ের কোলে—রাজা রাণী আর সেনাপতি জয়কেতু আর তাঁর পত্নী সত্যবতীর মন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কাঞ্চনপুরী-বাসীর মন ভরে গিয়েছিলো মরুভূমির মতো উষ্ণ দহন শিখায়—লেশমাত্র সুখ শান্তির স্পর্শ সেখানে ছিলো না। এ সোনার রাজ্যে কিছুরই অভাব ছিলো না—কিন্তু অপুত্রক রাজা রাণী এবং অপুত্রক প্রধান সেনাপতির মনের অবসাদই ছড়িয়ে পড়েছিলো সারা কাঞ্চনপুরীতে।

সমরেন্দ্রনাথ ও জয়কেতু, পদ্মাবতী ও সত্যবতী পরস্পরে নিবিড় প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন—প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধের দৈন্য লেশমাত্রও ছিলো না তাতে। রাজ্য ও পরিজনের সুখ-সমৃদ্ধি সাধনে উভয়ে প্রকৃতই ছিলেন সহকর্মী। রাজ-দণ্ড ও শাসন-তরবারির উপরে ছিলেন মন্ত্রণা-গুরু কুল-পুরোহিত। চির-সাধক এই সত্যদ্রষ্টা মহর্ষির করুণা-লাভ করেন মহারাজা সমরেন্দ্রনাথ অতি তরুণ বয়সে—পিতৃমাতৃহীন, রাজ্যভ্রষ্ট বিতাড়িত সমরেন্দ্রনাথ সেদিন উন্মাদের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন হিমালয়ের সানুবনে—একমাত্র সহচর ছিলেন জয়কেতু। কিন্তু গুরুর কৃপায় সমরেন্দ্র-নাথের আজকের এই জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সৌন্দর্য, দান-পুণ্যে ও ঐশ্বর্যে সমা-রোহে ভরা আদর্শ সাম্রাজ্যের রচনা—সে হলো আর এক সুদীর্ঘ কাহিনী!

মহর্ষি বারোটি মন্ত্র সাধনা করেন এই অপুত্রকদের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য। সব জপতপ ব্যর্থ হয় হয়—এমন সময়ে কাজল ও প্রদীপ এলো মায়ের কোলে—একদিনে একই শুভলগ্নে মহারাজা ও সেনাপতির ঘরে, শুভশঙ্খ আনন্দ-রোলে বেজে উঠলো। রৌদ্রতপ্ত পৃথিবীর বুকে যেন অজস্র জলধারা আনন্দ-প্রলেপের মতো ঝরে পড়লো। খুশীর প্লাবনে টলমল করতে লাগলো সারা কাঞ্চনপুরী।

পাঁচ বৎসর পরে আনন্দের পূর্ণপাত্র উপছে দিয়ে মহারাণীর কোলে এলেন রাজকন্যা। কাজল চিত্রার খেলার সাথী প্রদীপও রাজপ্রাসাদেই বাড়তে লাগলেন।

জীবন আনন্দের লহরে-লহরে ক্রমেই প্রভীণ হয়ে উঠছিলো এমন সময় আবার কাঞ্চনপুরীতে ছেয়ে এলো বিষাদের মেঘ। চিত্রার চৌদ্দ বৎসরের জন্মদিনের উৎসব শেষে হঠাৎ রাজকুমারী দারুণ হৃদয়-যন্ত্রণায় জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন। তারপর বহু যত্নে জীবনের স্পন্দন ফিরে এলেও রাজকুমারীর সম্পূর্ণ চেতনা ফিরতে বহুদিন লেগেছিলো। চিত্রার কঠিন রোগে রাজা রাণী, কাজল, পুর-পরিজন ও প্রধান চিকিৎসক—নাগরি-কেরা সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কেবল ক্লান্ত হয়নি যুব-সেনাপতি প্রদীপকুমার। চিত্রার খেলার সাথী সেদিন সখীর জীবন আগলে দাঁড়িয়েছিলো। মহাসাধক কুল-পুরোহিত এই দারুণ দুঃসময়ে কাঞ্চন-পুরীতে ছিলেন অনুপস্থিত—ভারতের সকল তীর্থ পরিক্রমায় বেরিয়ে-ছিলেন মহর্ষি।

চিত্রার জীবন-দীপ নিবু-নিবু হয়ে এসেছে—এমন সময় তার শিয়রে এসে দাঁড়ালেন সৌম্য গম্ভীর মুখে। তাঁর ললাটে সঙ্কল্পের রেখা। তার-পর দীর্ঘ এক বৎসর ধরে প্রদীপ ব্রতধারী হয়ে রাত্রি দ্বিপ্রহরে নাগ-পুষ্করিণীতে ডুব দিয়ে একটি ফোটাপদ্ম শিকড়শুদ্ধ তুলে দেবী-মন্দিরে দীপ

জ্বালিয়ে পার্বতী-মূর্তির পাদপদ্মে অর্পণ করে জলগ্রহণ করতেন মহর্ষির নির্দেশে।

রাজকুমারী সুস্থ হয়ে উঠলেন—তাঁর বরণ-মালা মনে মনে প্রদীপের জন্যই রচিত হ'তে লাগলো। রাজা রাণী আভাসে জানতে পেরে মহানন্দে আয়োজন শুরু করার প্রারম্ভে মহর্ষির অনুমতি-প্রার্থী হতেই—"মুকুটহীন কোনও কুমারের কণ্ঠে রাজকন্যা মালা দিতে পারেন না—অসম্ভব!" বজ্রনির্ঘোষে জানালেন কুল-পুরোহিত।

তারপর আরও দুই বৎসর কেটে গেছে—দুঃখের আঁধারও যেন এই পরিবারে আর পুর-পরিজনের মনে গাঢ়তর হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণদ্বীপের সম্রাট তাঁর পুত্রের সঙ্গে চিত্রার বিবাহ-প্রস্তাব করে দূত পাঠান কাঞ্চনপুরীতে—এমন সময় কাজল ও প্রদীপ দুই বন্ধুর অটল পণের কথা শোনা গেলো মৃগয়া যাবার—স্বয়ং মহর্ষিই নাকি তাদের উৎসাহ-দাতা। দুই তরুণ মেতে উঠেছে অজানার নেশায়—ওরা যে সেই বয়সেই এসে পৌঁছেচে—যে বয়সে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে সব জানার নেশা জাগে—মন ঠেলা দেয় রহস্যের সন্ধানে।* * * রাজা রাণী পুত্রের মুখপানে শঙ্কা-মায়া দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। তরুণ যুবরাজ কাজলকুমার—শালপ্রাংশু উন্নত দেহ—রূপ-প্রদীপ্ত শ্রী—সারা রাজ্যের আনন্দের উৎস।

"কিসের অনুমতি বৎস?" কম্পিত-কণ্ঠে রাণী শুধান।

"আমি আর প্রদীপ নীল পাহাড়ের বনে যাবো শিকার করতে—মাগো! আপনি ও পিতা অনুমতি দিন।"

"তুমি—?" রাজা যেন স্তব্ধ হয়ে গেলেন—অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে তাঁর মন।

"কাজল!" রাণী-মা কোনোক্রমে উচ্চারণ করলেন—

"তুমি জানো না কি অসম্ভব কথা বলচো তুমি আজ বৎস—" "হ্যাঁ কাজল, তার চেয়ে তুমি বরং যাও দক্ষিণের শ্যাম-উপত্যকায়—বিচিত্র সুন্দর সে বনভূমি নন্দনকাননের মতো—।" মহারাজা বলে ওঠেন। রাজা রাণী যে স্বপ্নের মধ্যেও কাজলকে চোখে রাখেন—কি কোরে, কোন প্রাণে তাকে যাবার অনুমতি দেবেন অতি দুর্গম প্রচণ্ড বিভীষিকা-ভরা ঐ বনে? নীল পাহাড়ের বনে নাকি সত্যই এক মহা ভয়ঙ্কর অজানা দানব বাস করে। মহাবীরের বুকও কেঁপে ওঠে ঐ বনের নামে। ছেলেমানুষ কাজল কি জানবে যে পৃথিবীতে আছে কতো ভয়-দুঃস্বপ্ন, আর নখর সঙ্কুল হিংস্রতা! কাজল কিন্তু শোনে না—নীরবে দৃঢ় সংকল্প-ভরা মুখে মৃদু হাসে কথা-না-শোনা দুষ্টু ছেলের মতো! ও জানে সন্তান-স্নেহের দুর্বলতায় ভরা রাজা রাণীর হৃদয়—তেমনই সারা কাঞ্চনপুরী। কিন্তু কাজলকে যে যেতেই হবে নীল পাহাড়ের অজানা বনে। ঐ রহস্যময় বন যে তাকে শৈশব হতে আহ্বান জানাচ্ছে প্রতিদিন। সে আর প্রদীপ ঐ বনকে জয় করার স্বপ্নে শৈশব-কৈশোরের কতো দিন বিভোর হয়ে থেকেছে।

কতো মিনতি, অনুনয় বিনয়—কিন্তু কারও কথা কাজল প্রদীপ শুনবে না। পুত্রের বিচ্ছেদ-আশঙ্কায় পদ্মাবতী ও সত্যবতীর চোখে জলের ধারা শুকায় না। পরিজনরা কতো বোঝায়—নীল পাহাড়ের বনের মহা-ভয়ঙ্কর দানবের কতো প্রবাদ উপকথা লোকে এসে বলে—কিন্তু কুমার অটল। অবশেষে মহারাজা বলেন—"তাহলে কাঞ্চন পুরীবাসীকে এ কথা জানাতে হয়—কেন না কাজল তাদের মাথার মণি।"

......পরদিন দলে দলে নগরবাসী ছুটে এলো দূর দূরান্তর হ'তে রাজার ডাকে। সভায় ধীরে ধীরে বললেন সমরেন্দ্রনাথ কথাটা—আবেগে স্বর যেন রুদ্ধ হয়ে যেতে চায়।—নিমেষে সভাস্থল যেন স্তব্ধ হয়ে গেলো। প্রজা-প্রধানরা সানুনয় প্রতিবাদ জানালেন যুবরাজকে একবাক্যে—কিন্তু সবই নিষ্ফল হলো। অবশেষে বিষণ্ণ মনে অনুমতি দিয়েই ত্বরিতে সভাস্থল পরিত্যাগ করলেন মহারাজা। বৃদ্ধ সৈন্যাধ্যক্ষ রাজপুত্রকে ডেকে বললেন, "যুবরাজ, আমাদের স্বামী-স্ত্রীর অন্ধের নড়ি পুত্র প্রদীপ রইলো তোমার সহচর—প্রাণ দিয়েও সে রক্ষা করবে তোমায়।" তারপর প্রদীপকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "বৎস! ক্ষত্রিয়ের জীবনে কর্তব্য ও ধর্মই সবচেয়ে বড়ো—আত্ম বিসর্জন দিয়েও তা পালন কোরো—" আবার গড়িয়ে-আসা অশ্রু মুছে বৃদ্ধ জয়কেতু আপন বর্শা ও তরোয়াল খুলে প্রদীপের হাতে দিলেন—"কতো অজেয় রাজা জয় কোরে মহারাজ সমরেন্দ্রনাথকে দিয়েছি এই বর্শা ও তরোয়াল—বিজয়-লক্ষ্মীর আশীর্বাদ আছে এতে—আজ তুমি এদের নাও প্রদীপ।"

রাজকুমার যাবেন মৃগয়ায়—সারা রাজ্যে মাঙ্গলিক-অনুষ্ঠান সুরু হয়ে গেলো। কুলপুরোহিত বিজয়-ব্রত শেষে কাজল প্রদীপের ললাটে জয়-তিলক এঁকে দিলেন—"কাজল-যুবরাজ! বিজয়-লক্ষ্মীলাভ কোরে এসো বৎস—বৎস প্রদীপ! বীর তুমি, রাজ-তিলক পরে এসো মনোভিলাষ পূর্ণ হোক।" হাসি ফুটে ওঠে মহাসাধকের মুখে।

কাজল হাতী রথ ও লোকজন সব ফিরিয়ে দিলো। কাজল ও প্রদীপ দুই ঘোড়া রৈবতক ও গতিরাজে বসে হাওয়ার বেগে নিমেষে রাজা রাণী ও পুরবাসীর দৃষ্টি পথ মিলিয়ে গেলো বনপ্রান্তে। রাজকুমারের মন অনির্বচনীয় আনন্দে ঝলমল করছে। বনের কাঠুরেদের পায়ে-চলা পথ শেষ হয়ে এবার শুরু হলো গহন অরণ্যানী। প্রদীপ একটু অন্যমনা। কাজল উৎসাহে চঞ্চল। দুজনে ঘোড়া হ'তে নেমে রাশ হাতে ধীরে এগিয়ে চলেছেন—পেছনে পেছনে রৈবতক ও গতিরাজ ক্ষুরের মৃদু শব্দ তুলে আসছে—তাদের পিঠে রয়েছে কুমারদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সম্ভার।

"দেখ প্রদীপ দেখ—কি সুন্দর পাখী!" কাজল আনন্দে চিৎকার করে উঠলো। প্রদীপও বিস্মিত হলো এমন মুক্ত পাখীই নাচতে পারে এত অপরূপ ভঙ্গীতে! নিস্তব্ধ গহন বন—এখানে কথা কইলে প্রতিধ্বনি ওঠে। কাজল গান গেয়ে ওঠে আর প্রতিধ্বনিতে সুর ছড়ায় বনে। হঠাৎ কাজল থেমে বলে "প্রদীপ আমরা নীল পাহাড়ের কাছে পড়েছি।" সাবধানে দুই বন্ধু এগোতে থাকেন ঘন লতা-পাতা ভেদ করে। "কাজল—যুবরাজ!" প্রদীপ বললো, "আমরা ঘন বনে অনেকক্ষণ পৌঁছে গেছি—কোনও জন্তু কেন দেখলাম—না এখনও, বড়ো আশ্চর্য লাগছে।" পাখী, হরিণ, প্রজাপতির পাল কাটিয়ে

কাটিয়ে ওরা যেন পরীর রাজ্যের বনে ঘুরতে লাগলো। সন্ধ্যা ঘনাতে দুজনে একটা বিরাট অজগরের ভয়ঙ্কর হাঁর মতো একটা অন্ধকার পাথুরে গহ্বর পথ জুড়ে রয়েছে দেখে ওরা স্থির করলে আর এগোবে না। সুমুখে এক স্রোতস্বিনীর চওড়া ধারা বয়ে যাচ্ছিলো—সেইখানেই ঘোড়া দুটিকে বেঁধে ওরা ঘন গুল্মে জড়ানো এক মস্ত গাছের ডালের ওপর আশ্রয় নিলো—আজকের রাত্রিটা এইখানেই কাটাবে ওরা।

সন্ধ্যা হতেই নিশাচর পাখী আর নানারকম প্রাণীর ডাক সুরু হলো। অজস্র জোনাকে ঝিকমিক করতে লাগলো বনস্থলী। কতো সুখে লালিত রাজার দুলাল আর কতো আদরের বাপ মায়ের ছেলে প্রদীপ এই অদ্ভুত উত্তেজনা ভয়-মেশানো নতুন পরিবেশে বিচিত্র সব ভাবনা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না। হঠাৎ দুজনারই ঘুম ভেঙে গেলো একটা কাতর মরণ-আর্তনাদে·········নীচে ঝুঁকে চেয়ে দেখতেই ওদের সারা শরীর যেন একটা অব্যক্ত আতঙ্কে অবশ হয়ে এলো—এক মহাভয়ঙ্কর অমানুষিক বিরাট দানব বজ্রপেষণে চেপে ধরেছে প্রদীপের ঘোড়া গতিরাজকে। ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় আলো-আঁধার বনের মাঝে সেই পাহাড়ের মতো অবয়ব ভালো বোঝা যায় না—কেবল রাক্ষুসে দুই শাণিত সাদা দাঁতের সারি আর দুটো সবুজ হিংস্রতা-ময় বন্য চোখ ঝকঝক করছে। নিমেষে দানব এক ক্ষুব্ধ হুঙ্কার তুলে গতিরাজকে মুষ্টিতে চেপে গহ্বরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো।

ভোর হলে দুজনে গাছ হতে নেমে এলো। রৈবতকের খুঁটি শুদ্ধ নেই—ক্ষুরের চিহ্ন দক্ষিণের নিবিড় বনের ভিতরে মিলিয়ে গেছে। প্রদীপের বিষণ্ণ মুখ রাজপুত্রেরও মন দুঃখে ভরে তোলে। দুইজনে ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেন। রৈবতক বেঁচে আছে নিশ্চয়—নিঃশ্বাস ফেলে প্রদীপ বলে—"চলো, প্রথমে তারই সন্ধান করি।" নদীর ধার দিয়ে ওরা চললো—ক্ষুরের চিহ্ন এইদিক হতেই ছুটেছে।

ভোরের দিকে আকাশ ছিলো স্বচ্ছ। দিনের আলো ঝর্ণার মতো ছড়িয়ে পড়েছিলো পৃথিবীতে—নদীর বুকে তারই খেলা চলছিলো—বনের গভীরে আলো কতোটুকুই বা দেখা যায়। মিষ্টি রোদ কড়া হয়ে ওঠবার আগেই ঈশান-কোণে দেখা দিলো একটুকরো কালো মেঘ। দেখতে-দেখতে ছেয়ে গেলো সারা আকাশ······তার রং হলো কালির মতো ঘন কালো, আর তারই মধ্য দিয়ে সুরু হলো বিদ্যুতের চোখ-ঝলসানো তরোয়াল খেলা। মেঘে মেঘে প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্য সুরু হয়ে গেলো। অমাবস্যার দুপুর-রাতের মতো অন্ধকারে ভরে গেলো সব। দুজনে যেন দিশাহারা হয়ে গেলো—কথা কইলে শোনা যায় না এতো তুফান। এক বিরাট অশথ গাছে ডালের সঙ্গে নিজেদের বেঁধে রাখলে তারা। প্রতি মুহূর্তেই মনে হলো এবারে নিশ্চয়ই মাটিতে ছিটকে পড়বে দুজনেই।

······আচ্ছন্ন চৈতন্যের মধ্যে সারা রাত কেটে গেলো—ভোরের দিকে আবার পূর্বদিকে আলোর নিশানা দিয়ে তপনদেব উঁকি দিলেন। পাখীদের আনন্দ-ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো বন। নদীর বাঁকে বাঁকে পাশে-পাশে রোদ যখন ছড়িয়ে গেলো, কাজল বললো—"প্রদীপ—আরও নিবিড় বনে যাই,—চলো তার আগে রৈবতককে খুঁজে বার কোরতে হবে। এই বর্শা দুটি আর তরোয়াল দুটি ছাড়া তো আমাদের প্রয়োজনীয় সব কিছুই গেছে ঘোড়া দুটির সঙ্গে।"···নদীর পাড় ধরে কাজল প্রদীপ এগিয়ে চলে। সারাদিন সারারাত বৃষ্টির ফলে ক্ষুরের চিহ্ন সব ধুয়ে মুছে গেছে। হতাশায় দুই বন্ধু স্তব্ধ।

(ক্রমশঃ)

তোমরা কি জানো

সিদ্ধার্থ গংগোপাধ্যায়

(দ্বিতীয় পর্যায়)

দিনের বেলায় আমরা আকাশের তারাগুলোকে দেখতে পাই না কেন—

অনেক দিন আগে, মানুষ যখন আকাশের ব্যাপার কিছুই জানতো না, তখন তাদের মধ্যে অনেকে মনে করত, দিনের বেলায় তারা বুঝি সত্যি সত্যি নিবে যায়। মিশর দেশে তখন যারা থাকত, তাদের ধারণা ছিল যে, তারাগুলো বুঝি ভগবানের লণ্ঠন। সন্ধ্যাবেলায় চারদিক যখন অন্ধকার হয়ে আসে, তখন তিনি ঐ লণ্ঠনগুলো একে একে জ্বেলে দেন।

তারারা কিন্তু সত্যি সত্যি নিবেও যায় না, আর ভগবানের লণ্ঠনও নয় সেগুলো। তারা সারাদিন, সারারাত, সমস্তক্ষণ একভাবে জ্বলছে। তবে আমরা দিনের বেলায় তাদের দেখতে পাই না কেন? তার কারণ হচ্ছে, পৃথিবীর চারপাশে বাতাসের যে পুরু স্তর ভেসে বেড়াচ্ছে, দিনের বেলায় সূর্যের আলোকে তারা টুকরো টুকরো করে চারদিকে এমনভাবে ছড়িয়ে দেয়, যাতে কোথাও এতোটুকু অন্ধকার না থাকে। এইসময় আমাদের চোখ সূর্যের আলোর চোখ-ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্য নিয়ে এমন ব্যস্ত থাকে যে, সেই স্তর ভেদ করে আমরা আর কিছু দেখতে পাই না। রাত্রিবেলায় সূর্যের এই আলো না থাকার দরুণ বাতাসের সেই স্তরের মধ্যে দিয়ে তারারা স্পষ্ট আমাদের চোখে পড়ে। যদি পৃথিবীর চারপাশে বাতাসের এই পুরুস্তরটা না থাকত, তাহ'লে শুধু রাত্রিবেলাতে কেন দিনের বেলাতেও, তারাদের আমরা স্পষ্ট দেখতে পেতুম। সূর্য তখন কেবলমাত্র আলোর রেখায়-আঁকা বেশ বড় একটা কামানের গোলার মতো হাজার হাজার তারায়-ভরা কালো আকাশের গায়ে বিরাজ করত।

সূর্যগ্রহণের সময়ে দিনের বেলাতেও আমরা তারাদের মধ্যে যেগুলো

সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং যে গ্রহ সেইসময় আকাশে অবস্থান করছে তাদের সাক্ষাৎ পাই। গ্রহদের মধ্যে শুক্র সবচেয়ে উজ্জ্বল, মাঝে মাঝে দিনের বেলাতেও আকাশের দিকে তাকালে তাকে দেখতে পাবে। আর একথা ঠিক যে, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ আকাশের অনেক উঁচুতে বাতাসের সমস্ত স্তর ভেদ করে এরোপ্লেনে করে উড়ে যেতে পারো, তাহ'লে তারাদের যে-কোন সময়েই দেখতে পাবে।

এমন কোন উদ্ভিদ আছে, যার ফল নেই, বীজ নেই, শিকড়ও নেই—

উদ্ভিদরাজ্য চারটি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত। এই চারটি ছোট ছোট রাজ্যের মধ্যে একটি রাজ্যের অধিপতি থ্যালোফাইট (thallophyte) নামের শেওলা-জাতীয় খুব সাধারণ একরকমের উদ্ভিদ। এরা দেখতে একেবারেই বড় গাছের মতন নয়। এদের শরীর মাত্র কয়েকটি কোষ দিয়ে গড়া। এই থ্যালোফাইটের ফল নেই, ফুল নেই, বীজ নেই, শিকড়ও নেই।

গাছের গুঁড়িতে, পুরনো কাঠের বেড়ায়, আর বর্ষার স্যাঁতস্যাঁতে দেওয়ালে এরা ঘন হয়ে গজিয়ে থাকে। এদের রং এমনিতে সবুজ, কিন্তু এক পশলা বৃষ্টির পর এরা আরো সবুজ আর টাটকা হয়ে ওঠে—দূর থেকে দেখলে মনে হয় কে যেন সবুজ রং করে দিয়েছে। ব্যাঙের ছাতা (mushrooms) আর নিম্নশ্রেণীর 'মস্' (moss) এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত।

—মাথায় টাক পড়ে কেন—

মাথায় টাক পড়ার অনেকরকমের কারণ আছে। কারুর কারুর মাথায় অসুখ আছে বলে সমস্ত চুল তাড়াতাড়ি ঝরে যায়, কেউ কেউ আবার মাথায় শক্ত টুপি ব্যবহার করেন বলে তাড়াতাড়ি তাঁদের চুল উঠে যায়। শক্ত টুপি মাথায় এমন এঁটে বসে থাকে যে, স্বচ্ছন্দভাবে রক্ত চলাচল করতে পারে না, আর তাই চুল-রাও উপযুক্ত খাদ্য না পেয়ে ঝরে পড়ে।

টাক পড়ার প্রধান কারণ হল উত্তরাধিকার। অর্থাৎ বাবার মাথাতে টাক থাকলে ছেলের মাথাতেও টাক পড়বে। কোন পরিবারে যদি বংশানুক্রমিক ভাবে এই টাক পড়াটা চালু হয়ে গিয়ে থাকে, তাহ'লে এর হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া কষ্টকর। মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের মাথায় টাক বেশী দেখা যায়।

অন্য সব জীবজন্তুরা কি আমাদের মতন কথা বলতে পারে

আমরা যেরকম আমাদের মনের সমস্ত ভাব কথার মধ্যে দিয়ে পাঁচজনের কাছে বলি, অন্যান্য জীবজন্তুরা তার হাজার ভাগের এক ভাগও কথা বলতে পারে না। কিন্তু এটা সত্যি যে—কোন কোন জন্তু তাদের একেবারে নিজস্ব ধরণের ভাষায় নিজেদের মধ্যে কোন কোন কথা বলে। কুকুররা যখন আমাদের কোন আসন্ন বিপদের কথা জানাতে চায়, আমাদের সংগে খেলতে চায়, অথবা আমাদের উপর বিরক্ত হয়, তখনই তারা ডাকে। তোমরা শুনেছ, চড়ুই পাখীর বাচ্চারা খেতে না চাইলে তাদেরা মা কিরকম 'কিচমিচ' করে বকুনি দেয়, আর ছোট্ট বাছুর তার খিদে পেলে 'হাম্বা' 'হাম্বা' করে ডেকে মাকে জানায় যে তার খিদে পেয়েছে। বাঁদরেরা নানারকমের শব্দ করে—যাদের প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা মানে।

অনেক পোকামাকড়েরা আশ্চর্য এবং সুন্দরভাবে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে। যেমন পিঁপড়ে আর মৌমাছিরা। এদের আমরা 'সামাজিক পোকা' বলে থাকি, তার কারণ এরা মিলে মিশে বাস করে। এটা তাদের পক্ষে সম্ভব হত না, যদি তাদের নিজেদের মধ্যে ভাব আদান-প্রদানের স্বতন্ত্র কোন উপায় না থাকত। লম্বা লম্বা শুঁড় দিয়ে এরা পরস্পরকে স্পর্শ করে মনের বিচিত্র ভাব জানায়।

শীতকালে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়লে সেটা ধোঁয়ার মতো দেখায় কেন—

আমাদের শরীর আগুনের গনগনে একটা উনুনের মতো সর্বদাই উত্তাপের জন্ম দিচ্ছে, আবার শরীরের মধ্যে এমন সব আশ্চর্য ব্যবস্থা রয়েছে, যার দ্বারা শরীর নিজে হোতে ঠাণ্ডা হয়ে যেতে পারে। একজন স্বাস্থ্যবান পুরুষের শরীরে এই উত্তাপের জন্ম, আর শরীরের ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার মধ্যে তাপমাত্রার প্রভেদ ৯৮'৬ ডিগ্রী ফারেন হাইট।

ফুসফুসের ভেতরে জমানো জল বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যায়—এবং তাতে ঠাণ্ডা হাওয়ার কাজ খানিকটা হয়। বাইরে থেকে যে বাতাসটা ফুসফুসে এসে ঢুকছে তাতে ফুসফুসে যতোখানি জল ধরে, তার একশো ভাগের প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ভাগ জল থাকে। যখন এই বাতাসটাই আবার নিঃশ্বাস হয়ে বেরিয়ে যায়, তখন তা জলে একেবারে ভর্তি হয়ে থাকে। এইরকমভাবে শরীর থেকে প্রতিমুহূর্তে আমরা খানিকটা করে জল নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্য দিয়ে হারাচ্ছি। শীতকালে নিঃশ্বাস ছাড়লে তা ধোঁয়ার মতো দেখায় তার কারণ হচ্ছে, তুমি নিঃশ্বাসের মধ্যে দিয়ে যে-গরম হাওয়া বাইরে ছেড়ে দিচ্ছ, তার ভেতরকার জল, বাইরের বাতাসের ঠাণ্ডার সংগে মিশে, ছোট ছোট জলকণা-দিয়ে-গড়া ছোটখাট একটা মেঘ হয়ে জমে ওঠে, আর সেইটেই তুমি ধোঁয়ার মতো দেখতে পাও।

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
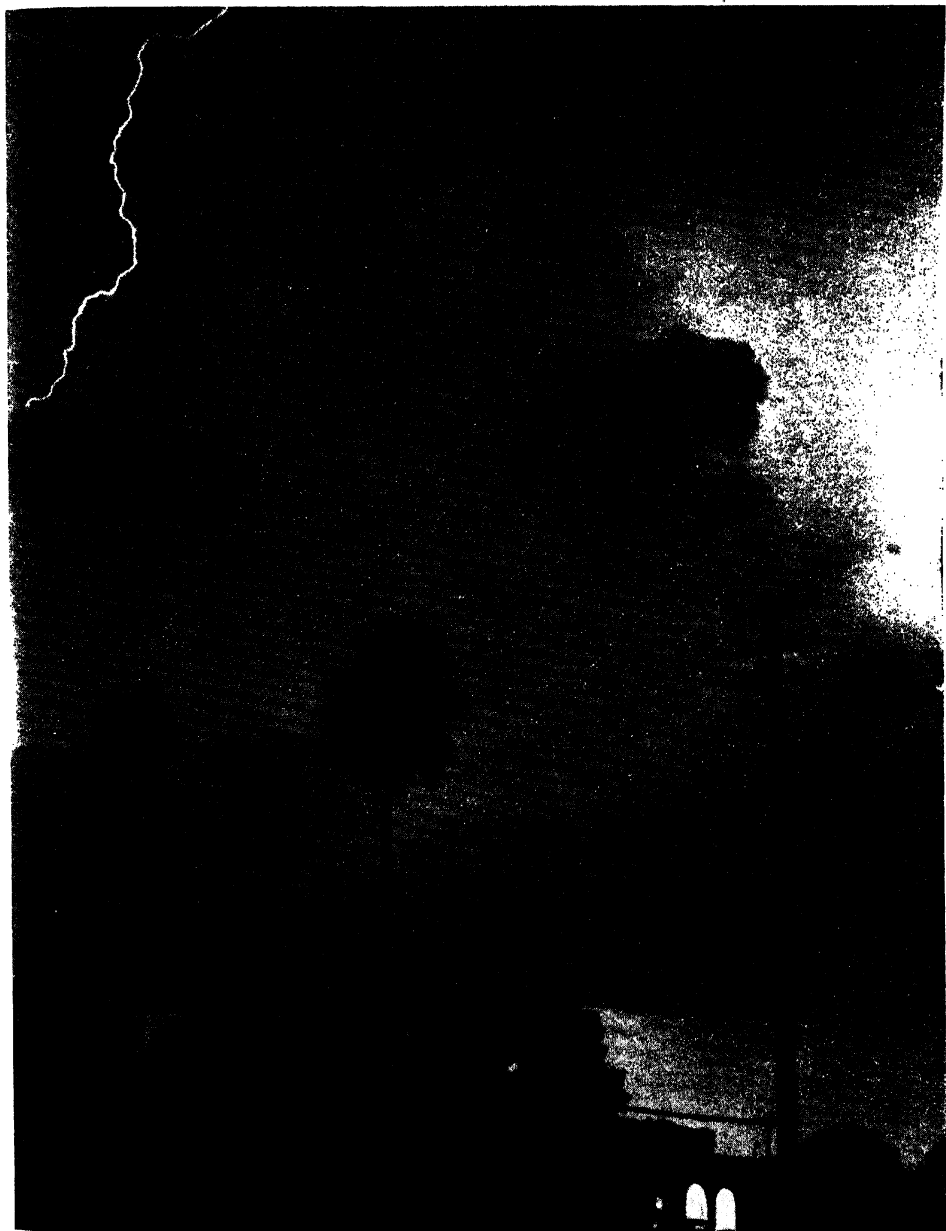
ঝড়ের সংকেত

ফটো : জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ঝড়ো হাওয়া

ফটো : গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

পহলগামের প্রথম কটাক্ষ

পহলগাম বাজারের মধ্যে লীদারের ওপরে প্রকাণ্ড হোটেল-ওয়জীর হোটেল। হোটেল বড়। কিন্তু কাশ্মীরের সব বড়োর মাপ আমাদের দলের পাল্লায় পড়ে ছোটো হয়ে গিয়েছিল। দেখা গেল শেষ অবধি ওয়জীর হোটেলে কেবল আমাদের দলের মেয়েদেরই স্থান হতে পারলো; বাকী সব তাঁবুতে।

লীদারের তীরে শত শত তাঁবু। যেন তাঁবুরই শহর। পহালগামে এসে এই তাঁবুতে থাকাই এক বিলাসিতা, শ্রীনগরে যেমন হাউস-বোটে থাকা। শ্রীনগরে নৌকা-বাড়ী, পাহালগামে তাঁবু-বাড়ী। কিন্তু তাঁবুই বা কতো তাঁবু। পহালগামে ততো তাঁবু নেই আমাদের যতো তাঁবু দরকার। কনট্রাক্টর দুরা হিমসিম খেয়ে গেছে, তাঁবু যোগাড় করতে পারেনি। এখন তাই কাউন্সিল মিটিং।

কাউন্সিলে বাইরের লোক আছে দুরা আর হোটেলের মালিক রঞ্জন। দুরা বলছে, তাঁবু এনে দেবে শ্রীনগর থেকে; আজ আর কাল দুদিনের ব্যবস্থা নিয়ে গোলমাল। ভগবানদাসজীর মত যে দুদিনের জন্য আমরা কোনও রকমে গাদা-গাদি করে কাটিয়ে দিই।

পতিরাম এতে নারাজ। পয়সা দেওয়া হচ্ছে ও হবে। কনট্রাক্ট নিয়েছে যখন—এক নয় কনট্রাক্ট পরিপাক করুক,নয়তো খেসারৎ দিক!

লালসিং বললে—"এখন তো ঠিকাদারকে ধরে ঠেঙ্গালেও তাঁবু আসবে না; অথচ রাত আসবে। বক্তৃতা না করে কাজ করা হোক।"

পতিরামের অনির্ব্বচনীয় বচন। সে টেবিল চাপড়ে বলে ওঠে—"পশুরা নিজে ভাবুক,জারগা দিক, নৈলে 'ঠেকা' থেকে জরিমানা দিক।"

লালসিং বলে—"বুদ্ধিই যদি থাকবে তো গাঁয়ের পণ্ডিত কেন্ হবে ও!"

পতিরাম আরও চটে বললো,—"তুই য়ুপীর ডমিসাইল্‌ড্ নোস্, বাংলার রেফুইজীও নোস—বাংলার রেফিউজ তুই। তোকে বাঙ্গালীরা তোর বুদ্ধি দেখে তাড়িয়ে দিয়েছে বাংলা থেকে। জরিমানা মানে টাকা। আর টাকা থাকলে সব হয়।"

ভগবানদাসজী বল্লেন—"কি বলতে চান আপনি, টাকা আছে। কি করবেন?"

লালসিং রঞ্জনের দিকে চেয়ে বললে, "কি মিষ্টার রঞ্জন, কিছু হতে পারে?"

ওয়জীর হোটেলে ছাত্রছাত্রী দল খাচ্ছে

মিঃ রঞ্জন বললেন—"টাকা খরচ করলে সবই হতে পারে। হোটেল তো আমার একটা নয়।"

পতিরাম আমায় একটা বড় চিমটী কেটে বল্লে—"শোন শোন্ চুকন্দর শোন্। বাঙ্গলাদেশের কলঙ্ক তুই।"

ভগবানদাসজী বল্লেন—"কি বলেন সোহনলালজী—হোটেলে দুদিনের ব্যবস্থা করা যাক।"

"করলে আর আমার কি বলার আছে। তবে উনি বলছেন প্লাজা হোটেলের কথা। পহালগামের সেরা হোটেল। দৈনিক সীট ভাড়া আট টাকা। একশো ষাটজনের দৈনিক লাগবে ১২৮০৲। আটদিনে আমার দশ হাজারের ওপর লেগে যাবে। এটা কি সম্ভব?"

পতিরাম চিৎকার করে বলে উঠলো—"সম্ভব নয়? আর আমাদের বাচ্চারা রাতে হিমে মাঠে পড়ে থাক্ তা সম্ভব?"

ভগবানদাসজী বল্লেন—"প্লাজা এখান থেকে কমপক্ষে দেড়মাইল। রাতে দিনে তিনচারবার খাবার জন্য যাতায়াত কষ্ট হবে না?"

লালসিং বল্লে—"যা প্রস্তাব করা হয়েছে তার বিরুদ্ধ চিন্তা করার চেয়ে অন্য প্রস্তাব আনা হোক।"

মিঃ রঞ্জন বললেন—"উনি না থাকলে প্লাজার ডিসিপ্লিন ভঙ্গ হবে। এখানে আমার অনেক গেষ্ট আছেন।"

পতিরামকে বল্লাম—"ওখানে বেশীক্ষণ থাকবো না ভাই। তোর গালাগাল না শুনে বেশীক্ষণ কাটানোয় আমার কোনও স্বস্তি নেই।"

যখন প্লাজায় সব নিয়ে পৌঁছেচি তখন বিকেল পাঁচটা বেজে গেছে।

তেতলাটা পুরো আমাদের। বড় ঘরটায় একুশজন ছেলে। ছোট ঘরটায় আমরা ছয়জন। বেণু, অসিত, জগজ্জীবন, গুপ্তা, বিহারীলাল আর আমি। ছেলেরা সব গোছগাছ আরম্ভ করে দিলো।

এদের ক্ষিপ্রতা দেখবার জিনিষ। বাড়ীতে সকলে বাপ-মা-ঠাকুমা-দিদিমার নয়নের মণি। কথনও জল গড়িয়ে খায়না। এখানে নিজের নিজের কাজ করার জন্যই ব্যস্ত নয় শুধু, কাজ দেখিয়ে কৃতিত্ব নেবার চেষ্টা। ওরই মধ্যে কারু কারু ছোটো ছোটো ওস্তাদী; নিজে না করে অপরকে খাটিয়ে নেবার ফিকির। সেটা ধরা পড়ে যেতেই লেগে যায় হুটোপাটী হাসাহাসি। কেউ কুঁড়ে, কেউ চট্‌পটে, কেউ আদুরে, কেউ নকুলে; ছেলেদের এই অপরূপ রূপ প্রত্যক্ষ করা যায় না বাইরে না এলে।

পহলগাম মনকে ডুবিয়ে দেয়

দশের কাজ এমনি করেই হয়। কে যে করে ঠিক নেই, কিন্তু দশজন একত্র হলেই করবার লোক একজন জুটেই যায়। ভগবান আছেনই বোঝা বইতে। অ-কেজো-রা দু দলের। একদল নিরীহ, সোজাসুজি অ-কেজো; জানে অ-কেজো, মানে অ-কেজো। যে কাজ করে তাকে মেনে চলে। অন্যদল অ-কেজো; কিন্তু মানেনা। কেবল যে কাজ করে তার খুঁত ধরে বেড়াবে, তার একটী বিচ্যুতি, তার স্বার্থ অভিসন্ধির চুলচেরা হিসাব করবে; এটার ওটায় ফোড়ন্ দেবে, টিপ্পনী ঝাড়বে, প্যাঁচ কষবে। মাতব্বরী করবে কিন্তু কাজ করবেনা। এঁরা ভাবেন এঁরা চালাক, কেজো লোকটা বোকা। সমাজে এই বোকাদের কিন্তু সর্বদা দলে পাওয়া যায় এবং এই বোকারা নৈলে আমাদের জীবন অচল।

আমি মিঃ রঞ্জনকে হাত ধরে টেনে বাইরে আনলাম। খানিক পরে যখন ফিরে গেলাম তখন সমস্ত ব্যাপারটা আড়াই হাজার টাকায় রফা হয়েছে।

কনট্রাকটার বলে—"তাঁবু হোলে আমার খরচ হোতো পাঁচশো।"

পতিরাম বল্লে—"লীদারে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবো আর যদি কথা বলেছো। কিন্তু বাঙ্গালী ভূতটা কোথায় থাকবে। ও যদি দেড়মাইল দূরে থাকে তো আমি এখানে থাকবোনা।"

লালসিং বললো—"একজন কেউ তো থাকবে প্লাজায়।"

ভগবানদাসজী বললেন—"আমাদের বড় দলটাই এখানে রইলো। আমরা যেমন আছি থাকি। উনি প্লাজায় যান্।"

এমনি বোকা আমাদের হুকুমচাঁদ। অবিশ্রাম সকলের ফাইফরমাস খাটছে, নিজেদের দলটাকে আগলে রেখেছে। স্থূলবপু ধনকুমার তো ওর জ্বালায় অস্থির। লক্ষপতির ছেলে; বালতি ভরে জল দিয়ে

আসছে, ঘাড়ে করে বেডিং খুলছে। ধনেশ হাসে। ধনকুমার বেডিং আনছিল। ধনেশ পা-পিছলে পড়ে গেল। ধনকুমার বেডিংসহ ধরাশায়ী। বেডিংয়ের বেল্টটা পটাস্ করে ছিঁড়ে গেল।

বেণু ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে হেসে গড়িয়ে পড়লো। "দেখো দেখো জগজীবন দাদা—ছেলেগুলোর কাণ্ড দেখ।"

সব ছেলে লজ্জায় এককোণে গিয়ে জড় হয়েছে।

বেণু নিজে দাঁড়িয়ে ছেলেদের জিনিষপত্র রাখিয়ে বিছানাপত্র করিয়ে দিয়ে শেষে বল্লে—"দুটোকে আমাদের ঘরে জায়গা দিতেই হবে।"

ছোটো ছোটো দুভাই সুরেশ আর গিরিশ। এক বিছানায় এক লেপে শোয়। বেণু নিজের কাছে ওদের বিছানা করে নিলো।

কিন্তু জানলা থেকে আমি নড়িনা।

প্রায়ান্ধকার প্রত্যুষে দেখেছি পহালগামকে নানা ভাবে, নানা ভঙ্গীতে, নানা বেশে, নানা রূপে। পহালগাম শ্রীনগর নয়, পহালগাম কাশ্মীর নয়। কাশ্মীর—যে কাশ্মীর বানিহালের টানেল পার হয়ে চোখে পড়ে—তার মধ্যে মন যেন হারিয়ে যায়। বিস্তীর্ণ আদিঅন্তহীন সুষমার পারাবার সে যেন, সে যেন এক রাজ্য যার মধ্যে বড় বড় নগর নগরী, নদী নালা লুকিয়ে তো আছেই, আছে শতশতাব্দী ব্যাপ্ত এক মানবায়নের ইতিহাস। এখানে বিস্ময় জাগে, জাগে জিজ্ঞাসা। একে মন দিয়ে পাবার প্রশ্ন জাগেনা; চিত্ত দিয়ে জানার তৃষ্ণা জাগ্রত হয়। কিন্তু সে জগত থেকে বহু-বহুদূরে এই পহালগাম। একবারেই একই দৃষ্টিতে যেন এর সবখানি দেখা যায়, পাওয়া যায়, বোঝা যায়। যেন প্রথম প্রেম—যে পেলো সে সবখানি পেলো; যে পেলোনা সে হতভাগ্য।

প্লাজা হোটেলটা পহালগামের পশ্চিম সীমার শেষে। এখনকার লীদার, সেকালের লম্বোদরী, বয়ে যাচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিম থেকে উত্তর পূর্বে। লীদার দুভাগ হয়ে যাচ্ছে প্লাজার নীচে, আবার গিয়ে মিশছে একটু পুবে গিয়ে। উত্তর পশ্চিম থেকে আর একটা পাহাড়ী নালা এসে মিশছে লীদারে। কাজেই প্লাজার এই জানালাটায় দাঁড়ালে সমস্ত পহলেগাম, পূর্বের পাহাড়টা পর্য্যন্ত পশ্চিম থেকে পুবে বয়ে যাওয়া লীদারের সমস্ত অববাহিকাটা চোখে পড়ে একখানা ডিম ধরণের রেকাবের মতো পাহলগাম। রেকাবের কানাগুলো সার সার পাহাড়, ঘন পাইন বনে ঢাকা। গাঢ় সবুজে যেন নিবিড় হয়ে আছে। আর সেই বনের মাথার ওপর দিয়ে চাইলে বরফ ঢাকা পাহাড়। ভৈরব-গর্জন লীদার চলেছে পহালগাম চিরে। তার বুকের ওপর দিয়ে ক্যান্টিলীভার কাঠের সাঁকো সারি সারি একটা, দুটো, তিনটে পড়ে আছে। নদীর পাড়ের সবুজ ঘাসের বিস্তীর্ণ পুলিনে সারি সারি শত শত তাঁবু। তার শাদা শাদা পিঠ দূরে দূরে নেমে গেছে। ঘোড়ায় চড়ে ছেলে, মেয়ে, তরুণ, তরুণী, যুবক যুবতী নানা সাজে নানা পোষাকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই জানালা দিয়ে পহালগামের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। আর সেই পরিচয়ে পহালগামকে আমি ভালবেসে ফেললাম।

প্লাজা হোটেল

দিনের পর দিন আমি পহালগামকে দেখেছি। প্রভাতে দেখেছি, মধ্যাহ্নে দেখেছি, স্তিমিত অপরাহ্নে, ঘনায়মান সন্ধ্যায়, নিবিড় নিশীথে, এখানে ইতিহাস মহাকালের শ্যামল আসনের তলায় চাপা পড়ে আছে, নশ্বর বিবর্ত্তনের চিহ্নটুকুও ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে লীদারের উন্মত্ত স্রোত। এখানে সময় বাঁধা পর্বতের বলয়ে, সীমা উন্মুক্ত আকাশের বাতায়ন পথে। এখানকার পাইনের গান দিনে শোনা যায়না, রাতের বুকে কাঁদে। পহালগাম যেন মনকে ডুবিয়ে দেয়। "মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরী, নয়ন আমার কাঙ্গাল হয়ে মরেনা ঘুরি।"

পহালগামের সমতল আগাগোড়া কেবল ঘাসে ঢাকা। ঘন সন্নিকট মাটী ঘেঁষা ঘাস। চলতে আরাম পাই। পথটা এঁটেল মাটিতে ঢাকা। চলে আরাম নেই। ঘোড়ায় করে চলা যায়। বাজারের মাঝ দিয়ে পথ। দুধারে দুসার দোকান। এক ফার্লং লম্বা হবে বাজার। তার মধ্যে পহালগাম শেষ। পাহাড়ী ধরণের নোংরা বাড়ীর সার।
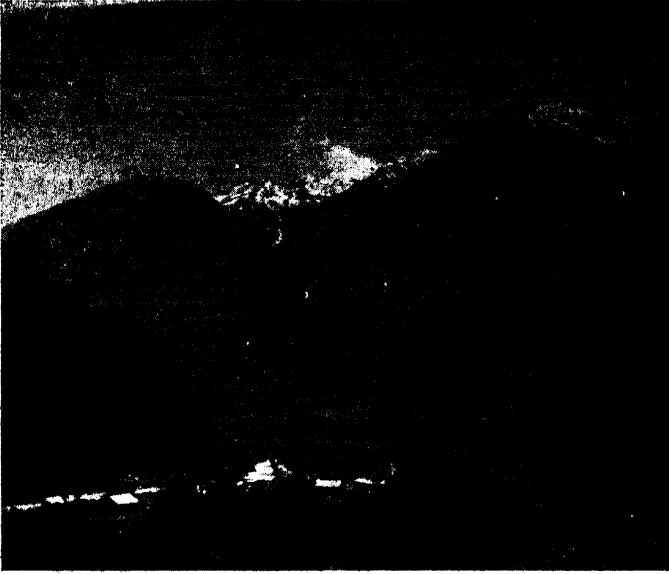
পহলগামের পাইন। পাহাড় তুষার

পহলগামের সাঁকো

কিন্তু এইসব নয়। দূরে দূরে পাইনের নিবিড়তার মধ্যে চেয়ে দেখলে খানিক উঁচুতে আলো জ্বলছে দেখতে পাওয়া যায়। শ্রীনগরের মতো মোমবাতি জ্বেলে বিজলিবাতি দেখতে হয়না। বাড়ী-গুলো সব সায়েবসুবোদের বা দিশী রুই কাৎলাদের। আমাদের কেউ নয়। আমরা কায়ক্লেশে এই বাজারের ঘর ভাড়া করেই থাকতে পারি। মাসখানেকের জন্য দিন হিসেবে ভাড়া পাওয়া যায়। হোটেল রেস্তর াঁ অনেকগুলি। বাইরে থেকে তবু যা, ভেতরে খাওয়া দেখলে খাওয়া মাথায় উঠবে। 'থাকুক অন্তের কাজ'—জলেই যা নোংরা, দেখলে শিউরে উঠতে হয়। কাশ্মীরে, সারা কাশ্মীরে এই এক বৈচিত্র্য দেখেছি, নোংরাকে এরা নোংরা মনে করেনা।

চা খাওয়া পর্ব সাঙ্গ হতে না হতে দেখি তুঙ্গভদ্রা আর গুটি-তিনেক মেয়ে মিলে একটা দল, অন্য দলে আছে বৈজন্তী আর চারটী শিক্ষয়িত্রী। কান্তার দল নেই, ও একা। তুঙ্গভদ্রার দলে সকলেই ট্রাউজার আর কোট পরেছে। সিগারেট ধরিয়েছে। বৈজন্তীরা চুল ফাঁপিয়ে গোড়ায় একটা করে রুমাল বা টাই বেঁধেছে। পরণে শাড়ির ওপর দিয়ে লম্বা কোট চাপানো। ওরা গল্প করতে করতে এগিয়ে গেল ক্লাবের দিকে।

পহালগ্রাম ক্লাব বিরাট ক্লাব। এককালে সায়েবদের একচেটিয়া ছিল। এখন সুইমিং পুল হচ্ছে। এখনও নাচ, গান, হৈ-হল্লোড়, পান-আহার চলে।

ফিরে আসছি। আর্টিষ্ট শর্মা আর রুক্মিনীর সঙ্গে দেখা। ওরা

চুলের কতখানি যত্ন আপনি করছেন?

আপোষে আলোচনা করছে পহালগামে আঁকার বিষয়বস্তুর কেবল অঢেল ব্যবস্থা নিয়ে।

"এ সব থাকতে অন্যদেশে ভালো দৃশ্যের জন্য যাওয়া মাথা খারাপের লক্ষণ" রুক্মিণী বল্লে।

আপনি একা? জিজ্ঞাসা করে ভর্মা।

আমি বলি "একাই হয়ে যাও তোমরাও। বেশী করে জানবে। It takes two to love; three is crowd! একা আমি আর দোকা পহালগামকে নিয়ে। ব্যস্—life is paradise now!"

"Exactly—ঠিক বলেছেন। আমার অন্তরের কথা বলেছেন" রুক্মিণী বলে। "কিন্তু আমার ভাল লাগে খুব খানিক আড্ডা দিয়ে ক্লান্ত হয়ে তারপর ডুবে যাই এই আনন্দে। কেবল একা ভাল লাগলো। লেডী অব্ শ্যালটের ছায়া দেখে দেখে ছবি আঁকার খেয়াল আমারও আছে।"

ওরা আমায় ধরে ফেলেছে। বাজার সরগরম। চাটের দোকানে চাট থাকতে পারছে না, চেরীর দোকানে চেরী। রেস্তরাঁয় নেই ডিম, মাংস রুটী।

ফলে বৈকালীন ভোজ বহুলোক খায়নি। তার লোকসান।

আমরা খেতে বসলাম কোটেশ্বরের দেওয়া সেই খাস্তা!! অত সাধের খাওয়া—কিন্তু কী কাণ্ড!! সমস্ত ভাত ছানার দালনা দিয়ে মেখেছি। যেই মুখে দেওয়া—থূঃ থূঃ থূঃ, বিষ, বিষ! চরম নুন দেওয়া। মনে থাকবে কাশ্মীরীদের নুন খাবার সীমা।

ঘন ঘটা করে বৃষ্টি নামলো। সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে বাতাস। বরফ পড়তে লাগলো চড়বড় করে। ভিতরে শীতে আমরা কাঁপছি। টিনের ছাতের ওপর বৃষ্টি আর বরফের শব্দ, বাতাসের দীর্ঘ বিলাপ, লীদারের ভৈরব গর্জন। শব্দমুখর পৃথিবীর উপর তখন তাণ্ডবের নৃত্য, ডম্বরুর সাথে শিঙা, জটাজালের মধ্য হতে আগুনের ঝলক।

আমি বসে বসে ডায়েরী লিখছি। সবাই ঘুমুচ্ছে। বেণু কেবল লেপ টেনে টেনে গায়ে দিচ্ছে আর কুঁকড়ে যাচ্ছে। বিহারীলালজী উঠে একটা সিগারেট ধরালেন।

আমি বাইরের দিকে গিয়ে জানলা খুলে লীদারের দিকে চেয়ে রইলাম।

> "স্মৃতি বেদনার মালা একেলা বসে গাঁথি
> বরিষণ মুখরিত শ্রাবণ রাতি।"

(ক্রমশঃ)

ভালোবাসা

দিব্যেন্দু পালিত

ভালোবাসা, তুমি দিলে শুধু যন্ত্রণা—
নিষ্পাপ বুকে তীব্র জ্বালার বিষ;
জ্ব'লে ম'রে যাই, এইটুকু সান্ত্বনা।
ভালোবাসা, তুমি দীপ্ত অহর্নিশ।

মনে পড়ে, কবে চেয়েছি তোমায় কাছে:
খুব কাছে, যেন হ'তে পারে শ্বাসরুদ্ধ;
নিঃশ্বাসে, নীল ওষ্ঠে গরল আছে—
তোমার স্মরণে হয়েছি মন্ত্রশুদ্ধ!

তুমি এলে, এই বাহুপাশ হলো সন্ধি—
আঁধারে ফুটেছে আঁধার-আলোর অঙ্ক;
গুঁড়ো হয়ে যাই, সঙ্কোচে মনোবন্দী
কেঁপেছে গলুই, পাটাতন নিঃশঙ্ক!

তোমারই আঘাতে শিউরে হয়েছি বন্য—
প্রাপ্ত শিখায় ধিকিধিকি জ্বলে চিত্ত;
কখনো তৃপ্ত, কখনো বা হীনমন্য;
হঠাৎ প্লাবনে ভেসে গেছে বুক নিত্য!

তুমি কতো দিলে, ভালোবাসা, আমি পূর্ণ—
ছুটেছি আঁধারে দিক্‌হীন উদ্‌ভ্রান্ত;
ওষ্ঠ ক্ষয়েছে, বক্ষ হয়েছে চূর্ণ;
হাঁপিয়ে বলেছি; নই এতটুকু শ্রান্ত!

দাবানলে জ্বলে সারা-মন-বনভূমি—
অঙ্গ জুড়িয়ে অগ্নিবলয় হাসে;
হঠাৎ কখন নেমে এলো মৌসুমী—
মুখ লুকিয়েছি অন্তিম উল্লাসে!

একটি প্রেমের ব্যাপার

[বেন্ হেকট]

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ

অনেকদিন পূর্ব্বের এক রোদ ঝলমল প্রভাত।

সিকাগো ডেলিনিউজের নগর-সম্পাদক মিষ্টার গিলরুথ তাঁর অফিস কক্ষে আমাকে ডেকে পাঠালেন। সংবাদ-পত্রের প্রভাতি সংস্করণ থেকে কাটা একটুকরো কাগজ আমার হাতে দিয়ে বল্লেন—হ্যাগেনব্যাক ওয়াগেল সার্কাস' পার্টি উইস্কন্সিনে এক দুর্দ্দৈবের মধ্যে পড়েছে। সার্কাস পার্টির ট্রেনখানিতে রাত্রে আগুন লাগে। সেই আগুনে সার্কাসের অনেক লোক পুড়ে মরেছে আর জখম হয়েছে।

তিনি হেসে বল্লেন—আজ 'বিলিয়টে' আবার সার্কাস খুলছে। তুমি সেইখানে যাও। নিশ্চয়ই সেখানে গল্প লেখবার উপাদান তোমার চোখে পড়বে।

আমি ঠিক সময়েই 'বিলিয়টে' পৌছালাম। বিড়ম্বিত সার্কাস পার্টির শ্রেণীবদ্ধভাবে গমনের দৃশ্যটি আমার কাছে এক অতিসাহসিক অথচ মর্ম্মন্তুদ ব্যাপার বলে মনে হচ্ছিল।

লাল আর সোনালি রং করা গাড়ীগুলিতে অনেক আসন শূন্য পড়ে আছে। ঘোড়া আছে—চালক নেই। কৌতুক চিত্র দেখানোর সরঞ্জাম আছে—কিন্তু ক্লাউনের অভাব। তা সত্ত্বেও শোকদুঃখের যেন বাহ্যপ্রকাশ নাই। অনেকদিন আগের এক সূর্য্যকরোদ্ভাসিত দিবসে এই ছোট্ট সহরে দলটি এমনভাবে অগ্রসর হচ্ছিল—যা দেখে মনে হয় তাদের সবই ঠিক আছে। কোনও বিপর্যয় তাদের ঘটেনি।

সার্কাস্ ব্যাণ্ডের বাজনা শুনে, দলটির জমকালো চলনভঙ্গি দেখে বিলিয়টের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ভুলে গেল যে এই সার্কাসের অর্দ্ধেক খেলা দেখাবার লোক আর ইহজগতে নাই বা মুমূর্ষ অবস্থায় হাসপাতালে পড়ে আছে।

আমি সার্কাসে প্রেস-এজেন্ট টমসন্‌কে খুঁজে বের করলাম। তার হাত কাঁপছিল, তার চোখ অনিদ্রায় লাল হয়ে উঠেছিল। আমরা যখন সার্কাস দলের প্যারেড্ দেখছিলাম—হঠাৎ বিস্ময়ে তার মুখ ফাঁক হয়ে গেল। তার ভাব দেখে মনে হলো সে যেন ভূত দেখেছে।

—এ যে, গাস্! সে বিবর্ণমুখে বললো—'কি আশ্চর্য্য!'

সিংহের খাঁচা নিয়ে যে গাড়া যাচ্ছিল তার সামনের আসনে লালরংয়ের বেমানানো জ্যাকেট গায়ে, সবুজ রংয়ের ট্রাউজার পরা, পেটেণ্ট লেদারের জুতা পায়ে হাতে চাবুক নিয়ে যে লোকটি বসে ছিল তার দিকে সে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। সোনালি রংয়ের গাড়িটি ধীরে ধীরে চল্‌ছে—আর সেই লোকটি মাথা সোজা করে, সম্মুখের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে বসে আছে। তার ভাব দেখে আমার মনে হলো যে তার চোখ খোলা থাকলেও সে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে।—

'আমি বুঝতে পারছিনা ওখানে ও কেন বসে আছে'—মিষ্টার টমসন বল্লেন—'সিংহের খেলা তো ও দেখায় না। হতভাগা লোকটা নিশ্চয়ই কাল রাত্তির থেকে পাগল হয়ে গিয়েছে।'

সার্কাস ময়দানে যাবার পথে মিষ্টার টমসন্ আমাকে ব্যাপারটি বল্লেন। সুইজারল্যাণ্ডবাসী গাস্ শ্রীমতী লোলার তরুণ স্বামী। লোলা বাঘ, সিংহ পোষ মানাতো, খেলা দেখাতো বাঘ সিংহ নিয়ে। গাস্ তার স্ত্রীকে পৃথিবীর

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নারী বলে মনে করতো। প্রতিদিন খেলা দেখাবার সময় সে বড় খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতো। খেলা দেখানোর সময় সে লোলার হাতে চাবুক, চেয়ার, পশুর খেলা দেখানোর সব সরঞ্জাম একে একে তুলে দিত। তখন তার কোমরের বেল্টে টোটা ভরা বন্দুক ঝুলতো।

লোলা তার স্বামীকে বলেছিল, যদি খেলা দেখানোর সময় পিঞ্জরের ভিতর কোনও গুরুতর রকমের ব্যাপার ঘটে তখনই যেন বন্দুক ব্যবহার করা হয়। প্রয়োজনের সময়ই ওটা করতে হবে—অন্য সময়ে নয়।

লোলা ও গাস্ ট্রেনের একখানি কামরায় ঘুমিয়ে ছিল—যখন ট্রেনখানিতে আগুন লাগে। ধাক্কা খেয়ে গাস্ অজ্ঞান হয়ে যায়। জ্ঞান হলে সে দেখতে পায়, সে জ্বলন্ত ট্রেনের একধারে পড়ে আছে।

জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে গাস্ উঠে দাঁড়িয়ে অগ্নি উদ্ভাসিত পরিবেশের মধ্যে উদ্ধার কার্যেরত লোকদের ভিড়ের দিকে ছুটে গেল। লোলাকে সে দেখতে পেল—চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। যখন সে অর্দ্ধদগ্ধ গাড়ীর তল থেকে বেরিয়ে আসছিল—তখন একটি লৌহ-দণ্ড তার শরীরে বিদ্ধ হয়ে তাকে মাটির সঙ্গে গেঁথে ফেলেছে। তার বুকের উপর একটা ভারী কাঠ পড়ে আছে। কিন্তু তখনও সে বেঁচে ছিল। সে মর্ম্মন্তুদ চীৎকার করছিল যখন গাড়ীর ভগ্ন অংশগুলি সরাবার চেষ্টা করছিল উদ্ধার কার্যেরত লোকেরা। তাকে রক্ষা করার আর কোনও উপায়ই ছিলনা।

সহসা তার আর্ত্তনাদ বন্ধ হলো। লোলা গাস্‌কে দেখতে পেয়েছে। গাস্ লোলার দেহের উপরের ধ্বংস স্তূপ সরানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যাকুলভাবে লোলার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গেল।

লোলা ফিস্ ফিস্ করে বল্লো—গাস্, এখন যে দরকার হয়েছে।

তার যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখের দিকে গাস্ চেয়ে রইলো। একজন ডাক্তারের কথা কানে এল গাসের। না কোনও আশা নেই। এই ধ্বংসস্তূপ সরানোর আগেই ওর প্রাণ যাবে।

লোলা আবার ফিস্ ফিস্ করে বললো—এখন সত্যিই দরকার হয়েছে। কথা শোনো, গাস!

গাস বন্দুক বের করলো—যে বন্দুকের প্রয়োজন আর কোনওদিনই হয়নি। এক মুহূর্ত্ত সে তার নির্ভীক লোলার মর্ম্ম-বিদারক আর্ত্তস্বর শুনলো। তারপর বন্দুক ছুড়লো। লোলা চিরকালের মত নিস্তব্ধ হলো।

সার্কাসে ময়দানের দিকে আমরা যখন এগুচ্ছিলাম মিষ্টার টমসন এই গল্প আমাকে শোনালেন।

সাজঘরে গাস্‌কে দেখতে পেলাম। দুইজন লোক তাকে বোঝাবার জন্য চেষ্টা করছে। একজন বল্‌ছিল, খাঁচার মধ্যে লোলার জায়গা তুমি কিছুতেই নিতে পারবে না। বাঘ সিংহের খেলা দেখানোর অভ্যাস তোমার কোনও দিনই নাই গাস্। তোমাকে ওরা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খাবে।

—আমাকেই তার কাজ করতে হবে। অবিচলিত গাসের কণ্ঠস্বর। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছিল যেন সে ঘুমিয়ে আছে—যদিও চোখ তার খোলা ছিল।

—'এতে কি ভাল হবে গাস্?' অন্য লোকটি প্রতি-বাদ করলো—'ওখানে গিয়ে শুধু জখম হয়ে লাভ কি?'

—তার কাজ আমাকেই করতে হবে'—গাস্ পুন-রুক্তি করলো।

অন্য কোনও ক্ষেত্রে গাস্‌কে দূরে সরিয়ে ফেলা হোতো। তার ভালোর জন্যই আটকিয়ে রাখ্‌তো। কিন্তু সার্কাস ব্যাপারটি আলাদা জগতের। তাছাড়া লাল জ্যাকেট পরা গাসের ফ্যাকাসে মুখ এবং স্থির চাহনিরও হয়তো একটা তীব্র এবং সঙ্গত যুক্তি ছিল।

অপরাহ্নে খেলার সময় আমি বাঘ সিংহের পিঞ্জরের কাছে বসে দেখছিলাম তার মধ্যে কিভাবে ধীরে ধীরে তারা প্রবেশ করলো। ব্যাণ্ডের বাজনা উদ্দামভাবে চলতে লাগলো। দর্শকরা অধীরভাবে অপেক্ষা করছিল। রিং-মাষ্টার আলোর সামনে এসে দাঁড়ালো। সার্কাসক্ষেত্রের গুণ গুণ আওয়াজের মধ্যে তার চড়া স্বর শোনা গেল। সে ঘোষণা করলো—হিংস্র জানোয়ারদের যে বেড়াল কুকুরদের মত পোষ মানিয়ে শিক্ষা দিত সেই পশুর খেলায় পারদর্শিনী, অপ্রতিদ্বন্দ্বী জগদ্‌বিখ্যাত লোলা দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে। কিন্তু তার স্বামী আজ সেই স্থান পূরণ করবে। সে সঙ্কল্প করেছে অরণ্যের হিংস্র পশুদের রাণী-

রূপে রোমাঞ্চকর তুলনাহীন যে অদ্ভুত খেলা তার স্ত্রী দেখাতো—আজ সেই খেলা সে দেখাবে।

লাল জ্যাকেট পরা, পেটেন্ট লেদারের জুতা পায়ে চাবুক হাতে গাস্ পিঞ্জরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো। রোমাঞ্চিত দর্শকগণ এই খেলা যেমন করে হোক চলবেই এই ভেবে আনন্দধ্বনি করতে লাগ্‌লো। কিন্তু সার্কাস পাটির লোক যারা এই ব্যাপার দেখছিল তাদের মুখ দিয়ে কোনও আনন্দ কোলাহল বের হলো না। তারা জানতো যে গাস্ মৃত্যুর মুখে প্রবেশ করছে।

গাস্ যখন পিঞ্জরের ক্ষুদ্র দরজার বাইরে ক্ষণকাল দাঁড়িয়েছিল তখন তার মুখ দেখলাম। মুখখানি অপূর্ব্ব দীপ্তিমণ্ডিত। মনে হ'লো গাস্ যেন তার স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করছে—যার মস্তকে অনুকম্পার গুলি বিদ্ধ করেছিল সে। মনে হলো—আমিও যেন লোলার ছায়ামূর্ত্তি গর্জ্জনকারী হিংস্রপশুদের পিঞ্জরের মধ্যে দেখ্‌তে পাচ্ছি। আমার মনের মধ্যে সহসা এই ভাব জেগে উঠ্‌লো—যেন গাস্ আমাকে বলছে যে, সে দেখতে পাবে লোলাকে ঐ হিংস্রপশুদের মধ্যে—যাদের সে ভালবাসতো এবং এইখানেই লোলার সঙ্গে মিলিত হতে পারবে।

দরজা খুলে গেল! গাস্ পিঞ্জরের মধ্যে প্রবেশ করলো। নিঃশ্বাস রোধ করে আমি দেখতে লাগলাম। গাস্ চাবুক আস্ফালন করলো। লোলা বাঘ সিংহদের যে নামে ডাকতো সেই নাম ধরে ডাকতে লাগ্‌লো। তারা এই ভণ্ডর দিকে চেয়ে দাঁত খিঁচিয়ে গোঁ গোঁ করে উঠলো এবং গর্জ্জন করতে করতে পিছু হটে গেল।

প্রথমটা মনে হলো যেন লোলার সেই প্রসিদ্ধ খেলাটি আগের মতই চলবে। পিপার চার ধারে ক্রুদ্ধপদক্ষেপে সিংহরা প্রদক্ষিণ করলো। বাঘরা খাঁচার একপাশে তাদের পা রাখবার জায়গার দিকে সরে গেল।

সহসা লোলার অভিনয়ের ছন্দচ্যুতি হ'লো। তড়িৎ-বেগে একটি সিংহ গাসের ওপর লাফিয়ে পড়লো—তার-পর ঝাঁপিয়ে পড়লো দুইটি বাঘ। গাস্ মাটিতে পড়ে গেল। হিংস্র পশুর নখর দন্তে তার দেহকে ছিন্নভিন্ন করতে লাগ্‌লো। লৌহদণ্ড নিয়ে সার্কাসের লোকেরা খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করলো। বন্দুক থেকে গুলি বর্ষিত হলো।

তাড়াতাড়ি গাস্‌কে হাসপাতালে পাঠানো হলো। ডাক্তারের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম—গাস্ প্রাণে বাঁচবে, কিন্তু তার একটি পা ও একটি হাত কেটে ফেলতে হবে।

এই কাহিনীটি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দিলাম এবং পরদিনই অফিসে ফিরে এলাম।

সম্পাদক মিষ্টার গিলরুথ আমাকে সহাস্যে বল্লেন—গল্পটা নেহাৎ মন্দ হয়নি—কিন্তু বেচারা এই ব্যাপারটা কেন করলো বলতো? নিশ্চয় ওর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

আজকের এই গল্পের পাঠকগণ যা জানতে পারলেন মিষ্টার গিলরুথ্ তার সবটাই জানতেন না। ডেলি নিউজে যে গল্পটা ছাপা হয় তাতে গাস্ জলন্ত ট্রেনের নীচে আগের রাতে যা করেছিল তার বিবরণটা বাদ দিতে হয়েছিল আমাকে! গাস্ তার মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্রীর যন্ত্রণা লাঘবের জন্য গুলি করতে বাধ্য হয়েছিল—সে বিবরণ ইচ্ছে করেই আমি দিইনি—কারণ পুলিশের লোক এ সব ব্যাপারে সাংবাদিকদের মত ভাবপ্রবণতার ধার ধারেনা!

তীক্ষ্ণবুদ্ধি মিষ্টার গিল্‌রুথ বলেছিলেন—'গল্পটা ভালই—তবে একটা জায়গায় কেমন খট্‌কা লাগ্‌ছে! গল্পের কোনও একটা সূত্র বোধহয় তোমার দৃষ্টিতে পড়েনি। গল্পটা পড়তে পড়তেই আমি সেটা বুঝতে পেরেছি।

—হ্যাঁ, এই বিরাট প্রেমের সমস্ত ঘটনাই উনত্রিশ বছর পরে প্রকাশ করলাম, মিষ্টার গিলরুথ। মহান প্রেমের এমন দৃষ্টান্ত আর আমার চোখে পড়েনি!

লেখক পরিচিতি:—নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক বেন্ হেক্‌ট ১৯১৪ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত সিকাগো ডেলি-নিউজের নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁর লেখা বইগুলির মধ্যে Count Braga, I Lite actress প্রভৃতি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে। তিনি চলচ্চিত্রের জন্যও অনেক বই লিখেছেন।

বৈদেশিকী

অতুল দত্ত

ইরাকের বিদ্রোহ ও জাতীয়তাবাদী আরবদের মধ্যে বিভেদ, এবং তিব্বতে রাজনৈতিক গোলযোগ ও দালাই লামার ভারত আগমন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। ভারতের প্রতিবেশী তিব্বতের হাঙ্গামা ভারতে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছে; দালাই লামার ভারতে আশ্রয় গ্রহণে ভারত এই ব্যাপারের সহিত কতকটা জড়াইয়াও পড়িয়াছে।

তিব্বতে অশান্তি—

গত মার্চ্চ মাসের প্রথম হইতে তিব্বত সম্পর্কে নানাবিধ সংবাদ রটিতে আরম্ভ করে। উদ্দেশ্য-প্রণোদিত মহল হইতে নানাপ্রকার প্রচার চলিতে থাকে। তাহার পর, মার্চ্চ মাসের শেষভাগে পিকিং হইতে জানান হয় যে, পূর্ব্ব চীনের খাম্পা-বিদ্রোহ তিব্বতের রাজধানী লাসা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল; তিব্বতের সেনাবাহিনী বিদ্রোহী বাহিনার সহিত যোগ দেয়। কিন্তু তিন দিনের মধ্যে এই বিদ্রোহ দমন করা হইয়াছিল, চার হাজার বিদ্রোহী সৈন্য ধৃত হয়, নানা ধরণের চারি হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্ত্র, মেসিন্ গান, কামান ও মর্টার চীনা বাহিনীর হস্তগত হয়। চীনা কর্তৃপক্ষ তিব্বতের স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, তাঁহারা সাম্রাজ্যবাদীর শক্তির প্ররোচনায় বিদ্রোহীদিগের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিলেন এবং দালাই লামাকে আটক করেন। পিকিং কর্তৃপক্ষ তিব্বতের এই গভর্ণমেণ্টকে বাতিল করেন এবং পঞ্চেন লামার নেতৃত্বে গঠিত নুতন প্রস্তুতি কমিটীর হাতে শাসনভার অর্পণ করেন। তিব্বত বহির্বিশ্বের সহিত সংযোগ-বিহীন রাজ্য। এই রাজ্যের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সংবাদের একান্ত অভাব। সুতরাং, চীনা কর্তৃপক্ষের কোন্ নীতির বিরুদ্ধে তিব্বতে এই বিদ্রোহ এবং এই বিদ্রোহের পশ্চাতে তিব্বতী জনমতের সমর্থন কতখানি তাহা এখনও বোঝা যাইতেছে না। পিকিং কর্তৃপক্ষ বলেন—দালাই লামা বিদ্রোহের সুরুতেই একাধিকবার চীনা কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের পাল্লায় পড়িয়াছেন এবং বে-আইনী ক্রিয়া-কলাপ বন্ধ করিতে প্রয়াসী। পরবর্ত্তী সংবাদে জানা গিয়াছে যে, দালাই লামা তাহার কয়েকজন সহযোগীর সহিত একত্রে ১৭ই মার্চ্চ লাসা ত্যাগ করেন। সুদীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া ৩১শে মার্চ্চ দালাই লামা, তাহার জননী, ভ্রাতা ও ভগিনী এবং আশী জন সঙ্গী ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে প্রবেশ করিয়াছেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট দালাই লামা রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছিলেন; ভারত গভর্ণমেণ্ট তাহার সে অনুরোধ পূর্ণ করিয়াছেন। শ্রীনেহেরু ঘোষণা করিয়াছেন যে, দালাই লামা ভারতে সম্মানিত অতিথিরূপে অবস্থান করিবেন।

তিব্বতের ব্যাপারে ভারতবাসীর আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল। ইহার প্রথম ও প্রধান কারণ—তিব্বত ভারতের প্রতিবেশী এবং সুপ্রাচীন কাল হইতে এই রাজ্যের সহিত ভারতের ধর্ম্মীয় ও সাংস্কৃতিক যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ইহা ছাড়া, ইংরাজের আমলে আমরা তিব্বতকে ভারতের প্রভাবাধীন এলাকা বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছি। চীনের সহিত তিব্বতের সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেকেরই সম্যক জ্ঞান নাই। এই জন্য চীনের কম্যুনিষ্টরা অন্যায়ভাবে তিব্বত অধিকার করিয়াছে বলিয়া স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহলের প্রচারে তাহারা প্রভাবিত হয়। অতীতে তিব্বত ও চীনের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের জয়-পরাজয়ে শেষ পর্য্যন্ত তিব্বত চীনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে চীন তিব্বতকে তাহার অচ্ছেদ্য রাজ্যাংশ বলিয়া এবং তিব্বতীদিগের চীনের পাঁচটি খণ্ড জাতির (nationality) একটি জাতি বলিয়া মনে করে। কম্যুনিষ্ট চীন হঠাৎ তিব্বতের উপর চীনের প্রভুত্ব দাবী করে নাই। অবশ্য, গত ১৯৪৯ সালে চীনে যেমন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তেমন পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। এই জন্য তিব্বতের সহিত চীনের সম্পর্ক পূর্ব্বে শিথিল ছিল। কিন্তু চীন কখনও তিব্বতের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে নাই। তিব্বতের সহিত চীনের সম্পর্কের শিথিলতার সুযোগেই এই রাজ্যে বৃটিশ ভারতের তৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯০৪ সালে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তিব্বতে তাঁহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সেনাপতি ইয়ংহাজব্যাণ্ডের নেতৃত্বে এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। ইহার পর চীনের সহিত এক চুক্তি অনুসারে বৃটিশ ভারতের গভর্ণমেণ্ট গীয়াংসী, ইয়াটুং ও গার্টকে সৈন্য ও ট্রেড্ এজেণ্ট রাখিবার অধিকার লাভ করেন এবং লাসায় এক জন বৃটিশ ভারতের প্রতিনিধি রাখিবার ব্যবস্থা হয়। ইহার পর ১৯১১ সালে চীনে যখন ডাঃ সান্ ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে জাতীয় বিপ্লব সংগঠিত হয়, তখন তিব্বত স্বাধীনতা ঘোষণা করে। চীনের তৎকালীন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট এক সামরিক বাহিনী প্রেরণ করিয়া তিব্বতে তাঁহাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন। চীনের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া ১৯১৪ সালে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এক কন্ভেনশন্ প্রবর্ত্তন করেন। এই কন্ভেনশন্ অনুসারে তিব্বতের উপর চীনের আধিপত্য (Suzerainty) স্বীকৃত হয়—সার্ব্বভৌমত্ব (Sovereignty) স্বীকৃত হয় না। ইহা ছাড়া, তিব্বত সামরিক ও বেসামরিক ব্যাপারে চীনা গভর্ণমেণ্টের কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত হইল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট অবশ্য তিব্বতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন, চীন কখনও এই কন্ভেনশন অনুমোদন করে নাই।

আধিপত্য বা স্মজারেনটি বৃটিশের কূটনৈতিক ধূর্ত্ততাপ্রসূত এক আজব চিজ, যাহা চীন কখনও মানিয়া লয় নাই। "Britain was the first country to define China's position in Tibet as being that of Suzerain Power." (Oppenheim). "The recognition of Chinese suzerainty over Tibet ......principally served as a convenient device for establishing a buffer area between British and Russian spheres of interest." (Feer). আন্তর্জ্জাতিক-ক্ষেত্রে তিব্বতকে চীনের আইনগত প্রভুত্ব হইতে মুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই "সুজারেনটীর" সৃষ্টি হয়। ইহার দ্বারা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট লাঠি না ভাঙ্গিয়া সাপ মারিতে চাহিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিব্বতের ব্যাপারে চীনকে সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ করিয়া আন্তর্জ্জাতিক জটিলতা সৃষ্টি করা হইল না, দ্বিতীয়তঃ আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তিব্বতীদিগকে দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও কুসংস্কার "উপভোগ" করিতে দিয়া তাহাদের মাথার উপর বৃটিশের চাবুক উদ্যত রাখা হইল। রাজনীতির ভাষায় সভেরেনটি ও সুজারেনটি শব্দ দুইটিতে যথেষ্ট পার্থক্য। Suzerainty is by no means sovereignty. It is a kind of international guardianship, since the vassal state is either absolutely or mainly represented internationally by the Suzerain state. (Oppenheim). তিব্বতের উপর চীন চিরদিন সভেরেনটি দাবী করিয়াছে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কৌশলে চীনকে এই অধিকারে বঞ্চিত করিয়া তাহার সুজারেনটি মাত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রণী হইয়াছিল। যাহা হউক, প্রথম মহাযুদ্ধের আরম্ভ হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান পর্য্যন্ত এই অবস্থাই চলে। ১৯৪৯ সালে চীনে যখন চিয়াং কাইশেকের শাসন শেষ হইয়া আসে, তখন তিব্বত পাশ্চাত্য শক্তির সহায়তায় চীনের সহিত তাহার সম্পর্ক ছিন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল। এই সময় কুয়োমিণ্টাং প্রতিনিধি লাসা হইতে বিতাড়িত হন। অন্য দিকে এক মার্কিণ সাংবাদিক (মিঃ লাওয়েল্ টমাস্) প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের এক পত্র লইয়া দালাই লামার নিকট উপস্থিত হন। ১৯৪৯ সালে অক্টোবর মাসে চীনে কম্যুনিষ্ট গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে তিব্বতকে পাশ্চাত্য শক্তির প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য সামরিক অভিযান আরম্ভ করিবার আয়োজন হয়।

ভারত তাহার পূর্ব্বেই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত নীতি অনুসারেই ভারত গভর্ণমেণ্ট তিব্বতের উপর চীনের শুধু সুজারেনটি স্বীকার করেন। তাঁহারা তিব্বতের স্বায়ত্ত শাসনাধিকার সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া চীনের নিকট তিব্বতীয় সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার অনুরোধ জানান। ইহার পর চীন গভর্ণমেণ্ট তিব্বতকে আলোচনা চালাইবার উদ্দেশ্যে পিকিংএ একটি প্রতিনিধিমণ্ডল পাঠাইবার আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। ১৯৫০ সালে লাসা হইতে এই প্রতিনিধিমণ্ডল প্রেরিত হন। কিন্তু তাঁহারা নানা অজুহাতে নয় মাস দিল্লীতে অতিবাহিত করেন। ফেব্রুয়ারী হইতে অক্টো'বর পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিবার পর বিরক্ত হইয়া চীন গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব তিব্বতে সৈন্য পাঠাইবার আদেশ দেন। তিব্বত গভর্ণমেণ্ট তখন সরাসরি জাতি-সঙ্ঘের নিকট আবেদন জানান। এই সময় ভারত গভর্ণমেণ্ট চীনের আচরণে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া তিব্বতের সহিত শান্তিপূর্ণ আলোচনার জন্য চীন গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। পিকিং গভর্ণমেণ্ট এই অনুরোধের অসৌজন্যসূচক উত্তর দেন। ঐ লিপিতে চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতকে হস্তক্ষেপে বিরত থাকিতে বলা হয় এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট সাম্রাজ্যবাদ শক্তি কর্ত্তৃক প্রভাবিত বলিয়া অভিযোগ করা হয়। চীনের ধারণা হইয়াছিল যে, ভারত গভর্ণমেণ্ট তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের আচরণের অনুকরণে তিব্বতের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে চাহিতেছেন—তাঁহাদের প্ররোচনাতেই তিব্বতী প্রতিনিধিমণ্ডল ভারতে নয় মাস বসিয়াছিলেন ; আপোষ আলোচনার নামে সময় লইয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহিত ষড়যন্ত্র করা হইতেছিল। যাহা হউক, গত দশ বৎসরে এই একবার মাত্র চীন ও ভারত গভর্ণমেণ্টর পারস্পরিক সম্বন্ধে তিক্ততা দেখা দিয়াছিল। তিব্বতের ব্যাপার লইয়া ভারত-চীন সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই তিক্ততা শেষ পর্য্যন্ত সুফলপ্রসূই হয়। এই চিঠির উত্তরে ভারত ভভর্ণমেণ্ট কড়া ভাষা ব্যবহার করিলেও পিকিং গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছিলেন যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নীতি অনুসরণের ইচ্ছা তাঁহাদের আদৌ নাই—তাহারা তিব্বতে কোনও extra territorial rights চাহেন না। "Our rejoinder though couched in legally strong language, recognised Chinese sovereignty on Tibet.—(Panikkar) বৃটিশ আমলের নীতি বর্জ্জিত হওয়াতেই পরবর্ত্তীকালে চীন-ভারত সম্পর্ক মধুর হয় এবং ১৯৪৪ সালে তিব্বত সম্পর্কে চীন-ভারত চুক্তিতে "পঞ্চশীলনীতির" উদ্ভব হয়। এই চুক্তিতে তিব্বতের আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার স্বীকৃত হয় ; অবশ্য ভারত তিব্বতের উপর চীনের নিরঙ্কুশ সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিল।

ইরাকে বিদ্রোহ—

গত ৫ই মার্চ্চ আঙ্কারায় আমেরিকার সহিত তুরস্ক, ইরাণ ও পাকিস্থানের দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইহার পর ১৩ই মার্চ্চ কায়রো ও দামাস্কাস হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ প্রচারিত হয় যে, উত্তর ইরাকে কাশেম্ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে। তাহার পর নানাবিধ পরস্পর-বিরোধী সংবাদের মধ্য দিয়া প্রতিপন্ন হয় যে, বিদ্রোহ দমন হইয়াছে, বিদ্রোহী নেতা কর্ণেল ওয়াহেব শওয়াফ নিহত হইয়াছেন। পরে বাগদাদ হইতে সরকারী সূত্রে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, ৬ই মার্চ্চ শান্তিবাদীরা দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ইহার পরদিন নাসেরপন্থী বা-দিষ্টল এক শোভাযাত্রা বাহির করিয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধায়। সামরিক শাসক কর্ণেল ওয়াহেব সাড়ে তিনশত

শান্তিবাদীকে গ্রেপ্তারের আদেশ দেন। একজন বিশিষ্ট কম্যুনিষ্ট উকিলকে হাজতে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়। এইদিনই তথাকথিত "মস্থল রেডিও" হইতে কাশেম্ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের এবং বিদ্রোহী গভর্ণমেন্ট স্থাপনের সংবাদ প্রচারিত হইতে থাকে। সরকারী মুখপাত্র বলেন যে, এই "মস্থল রেডিও" প্রকৃতপক্ষে সিরিয়ায় অবস্থিত—অত শক্তিশালী প্রচারযন্ত্র ইরাকে নাই। যাহা হউক, ৯ই মার্চ্চ সরকারী বিমান বিদ্রোহীদের প্রধান কেন্দ্রে বোমা বর্ষণ করে এবং ওয়াহেবের নিজের সৈন্য তাঁহাকে হত্যা করে। এই ঘটনার পরই ইরাকের গভর্ণমেণ্ট সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের বাগদাদস্থিত দূতাবাসের নয়জন কর্ম্মচারীকে নির্ব্বাসিত করেন এবং এদিকে প্রেসিডেন্ট নাসের অত্যন্ত তীব্রভাবে ইরাকের কাশেম্ গভর্ণমেন্টকে আক্রমণ করিয়া বক্তৃতা করিতে থাকেন। নাসেরের অভিযোগ—ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মেজর জেনারেল কাশেম্ কম্যুনিষ্টদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিতেছেন; তিনি আরব জাতীয়তাবাদে বিভেদ ঘটাইতেছেন। কম্যুনিষ্টদিগকে আক্রমণ করিয়া নাসের বলেন যে, তাহারা দেশদ্রোহী, তাহারা বাগদাদকে ঘাঁটী করিয়া অন্যান্য আরব দেশে অভিযান চালাইতে চাহিতেছে। সম্প্রতি নাসের সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিও তীব্র আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন। ধর্ম্মের নামে কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইবার জন্য তিনি আরবদিগকে আহ্বান জানাইয়াছেন। মোট কথা, নাসের ইরাককে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি একেবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া, ইরাকের সহিত সোভিয়েট ইউনিয়নের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নকেও আঘাত করিতেছেন। ইহা ছাড়া, এখন তিনি আমেরিকার কৃপাপ্রার্থী। সুতরাং কম্যুনিজম্ ও সোভিয়েট ইউনিয়নকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার কম্যুনিষ্ট-বিরোধী সতীত্ব প্রমাণ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। ইহা প্রমাণের চেষ্টা তিনি গত কিছু কাল ধরিয়াই করিতেছেন। গত ডিসেম্বর মাসে ইরাকে কম্যুনিষ্ঠ প্রভাব লইয়া সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রে যখন খুব উত্তেজনা এবং সীরিয়া ও মিশরে কম্যুনিষ্ট-বিরোধী অভিযান, তখন লণ্ডনের "নিউ-ষ্টেটস্‌ম্যান্" লিখিয়াছেন, "Most of the scare stories have been put by the Ba'athists in Lebanon and Syria, who are anxious to discredit Kassem regime, and they have been skilfully exploited by President Nasser, who is currently flying a Pro-American Kite.

৮।৪।৫৯

মানবতার সাগর-সঙ্গমে, সুইডেনে আর সোবিয়েতে

শচীন সেনগুপ্ত

ওথেলোর অভিনয় মনকে এমন ভারি করে দিয়েছিল যে, রাতে ভালো করে ঘুমুতে পারলাম না। বিছানায় আশ্রয় না নিয়ে ফুল-বনে বসে রইলাম প্রায় তিন প্রহর রাত পর্য্যন্ত। অন্ধকার ফিকে হয়ে আসায় ঘরে গিয়ে শয্যাশ্রয় নিলাম। দরজায় ঘন-ঘন করাঘাত ঘুম ভাঙিয়ে দিলে। দরজা খুলতেই মিশা জিজ্ঞাসা করলে—অসুখ করেছে নাকি?

—না ত। আমি বল্লাম।

—ব্রেকফাষ্ট যে শেষ হতে চল্ল। গাড়ী তৈরি। টেকসটাইল মিলে এখুনি যেতে হবে।

—দশ মিনিটের মাঝেই দাড়ি কামিয়ে আর স্নানটা সেরে নিয়ে আমি গাড়ীতে গিয়ে বোসছি।

—ব্রেকফাষ্ট খাবে কখন?

—মিলে গিয়েই খাব'খন।

—সেখানে যদি খাবার ব্যবস্থা না থাকে?

—নিশ্চিতই থাকবে।

মিলের রেসেপশন রুমে ঢুকতেই দেখলাম টেবিল ভরতি প্রচুর খাবার। যেমন হয়ে থাকে, তেমনই খাওয়া আর কাজের বিবরণ শোনা এক সঙ্গেই চলতে লাগল। সোবিয়েৎ রিপাবলিকগুলির মাঝে সবচেয়ে বেশি তুলো উৎপন্ন হয় এই উজবেকীস্তানে। তাই এখানকার এই মিলটি খুব বড় এবং রকমারি কাপড়ও (ধুতী-শাড়ী নয় থান) উৎপাদন করে। শার্ট, কোট, ট্রাউজার, ব্লাউজ তৈরির নানা রকম কাপড় ও নানা ডিজাইনের ছাপা কাপড় এখানে তৈরি হয়। আমাদের সেই কথা জানিয়ে দিয়ে ডিরেক্টর সংখ্যা বর্ণনা করতে লাগলেন। উৎপাদন বৃদ্ধির পার্সেণ্টেজ, মাথা-পিছু কাপড়ের পরিমাণ, শ্রমিকের সংখ্যা, শ্রমিক নর-নারীর অনুপাত, খালি সংখ্যা আর সংখ্যা। আমাদের ডেলিগেশনের অনেকে নোট-বুকে তা টুকে নিতে লাগলেন। সংখ্যাবৃত্তি শুরু হলেই আমি আনমনা হয়ে যাই। ও-সব আমার মাথায় ঢোকে না। আমি মিলও চালাবো না, কাপড়ের ব্যবসাও করব না, শুধু জানতে চাই ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালাইজড হবার পর উজবেক জন-গণের আয়-বৃদ্ধি হয়েছে কিনা, আর বেকার সমস্যারই বা কতটা সমাধান হয়েছে। এই কথা জানতে চেয়ে আবার সংখ্যাবৃত্তিকে উস্কে দিলাম। তা থেকে জানতে পারলাম বেকারের সংখ্যা ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে, শ্রমিক-পরিবারের জীবনের মানদণ্ড উন্নত হয়েছে, শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, শ্রমিকরা তাদের এবং পৃথিবীর মানুষের সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছে। আমাদের এই সব জানিয়ে দিয়ে মিল দেখাতে নিয়ে যাওয়া হোলো। সমগ্র মিলটা যেন একটা গার্ডেন-সিটি। যেখানে খালি যায়গা, সেইখানেই ফুলের কুঞ্জ, কেয়ারি। টাসকেণ্টের মতো এমন ফুলের সমারোহ খুব বেশি যায়গায় দেখিনি। একদিন জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম, শুধু পথের পাশে-পাশেই বছরে বিশলক্ষ ফুলগাছের চারা আবাদ করা হয়। অতবড় মিলটার কোথাও কোন আবর্জ্জনা দেখলাম না। কয়লার কারবার নেই বলে ধোঁয়াও কোথাও নেই. আর শ্রমিকদের হাতে-মুখে-পোষাকে কালিঝুলিও নেই। মিল-শেডগুলির মেজে শুকনো, পরিচ্ছন্ন, আলো-বাতাসেরও অভাব নেই শেডের অভ্যন্তরে। শেডের পর শেড অতিক্রম করে তুলো-পেঁজা থেকে শুরু করে সুতো-তৈরি, কাপড়-বোনা, কোরা-কাপড় ধোয়া-শুকোনো-রঙধরানো, ছাপানো, সব কিছুই দেখে নিলাম। মেয়ে-পুরুষ সকলেই কাজ করছেন পরম উৎসাহভরে। সেদিন অবশ্য তাঁরা একটু অতিরিক্ত খুশী ছিলেন, কেন না তাঁরা একসঙ্গে ভারতের সকল রাজ্যের অনেক নর-নারী দেখতে পাবেন তাঁদের সুদীর্ঘ সারিগুলির ভিতর দিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, আর কর্ম্মব্যস্ত নর-নারী মুহূর্ত্তের তরে মুখ তুলে আমাদের দিকে একটিবার চেয়ে দেখছেন। তাঁদের অধরে হাসি, চোখে যেমন কৌতুহল, তেমনই প্রসন্নতা।

কাপড় ছাপাবার শেডে যখন ঢুকলাম, তখন ডিরেক্টর জানালেন সেই বিভাগের মেয়ে কর্ম্মিরা আমাদেরকে অভিনন্দন জানাবেন। মাদাম আমাদেরকে একজায়গায় জড়ো করলেন। মেয়ে কর্ম্মিরা ফুলের গুচ্ছ নিয়ে এগিয়ে এলেন। তাঁদের বেশির ভাগই তরুণী, বয়স্কা কম। তাঁদের নেত্রীর বয়েস বিশ-বাইশের বেশি হবে না। তিনি সর্ব্বাগ্রে এগিয়ে এসে যে ফুলের তোড়াটি আমার হাতে তুলে দিলেন, তার ওজন প্রায় দশ সের হবে বলে মনে হোলো। বেশিক্ষণ সেটি বইতে পারলাম না, লিডার হাতে তা সমর্পণ করে বল্লাম—ভারত-উজবেকের প্রীতির নিমিত্ত হয়েছে তোমরা, রুণীরা। তাই প্রীতিটুকু অন্তরে ভরে নিয়ে বোঝাটা চাপালাম তোমার ওপর।

—বোঝা বলে যা বুঝি, তা আমরা ফেলে দিতে শিখেছি, বলে তোড়াটি সে নিল। তারপর অনেকক্ষণ সেটা তাকে বয়ে নিয়ে বেড়াতে দেখিছি। কখন কোথায় সেটা একসময়ে সে হস্তান্তরিত করেছে, তা চোখে পড়েনি। জিজ্ঞাসাও কিছু করিনি তাকে।

নারী-শ্রমিকদের নেত্রীটি ফুলের তোড়াটি হাতে দেবার পর তাঁদের পক্ষ থেকে প্রস্তুত অভিনন্দন পত্রটি পড়তে লাগলেন। সেটি উজবেকী ভাষায় রচিত। তিনি জানালেন আমরা তাঁদের মিল দেখতে এসেছি বলে তাঁরা খুব খুশী হয়েছেন। এই মিলটি তাঁদের গর্ব্ব। কেননা এটি তাঁদের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করে যেমন দারিদ্র্যের পেষণ থেকে তাঁদেরকে অব্যাহতি দিয়েছে, তেমন শিক্ষালাভেরও সুযোগ করে দিয়েছে; সর্ব্বোপরি নারী-কর্ম্মিদের এই আত্ম-প্রত্যয়ের অধিকারী করেছে যে, কর্ম্ম-শক্তিতে

তাঁরা পুরুষের চেয়ে হীনবল নন। তারপর তাঁরা জানান যে, তাঁরা আশা করেন ভারতের যে নারীরা তাঁদের মতো কল-কারখানায় কাজ করেন, তাঁরাও নব-শক্তির সন্ধান পেয়েছেন। অবশেষে তাঁরা অনুরোধ জানান আমরা দেশে ফিরে যেন আমাদের নারী-শ্রমিকদেরকে তাঁদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

তাঁদের অভিনন্দনের জবাব আমাকেই দিতে হোলো। খুশী হয়েছি, তাঁদের কর্ম্ম নৈপুণ্যের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়েছি, হৃদয়বত্তায় মাধুর্য্যে মুগ্ধ হয়েছি, এইসব বলেই বক্তব্য শেষ করলাম। আমাদের দেশের নারী শ্রমিকদের কথা বল্লাম না। ভালো করে কিছু জানি না বলেই যে বল্লাম না, তা নয়। যতটুকু জানি, তাও বল্লাম না। তুলনাই হয় না যে! উজবেকী ওই শ্রমিক-নারীদেরই দেখলাম না কেবল—উজবেকী মহিলা কবি, উজবেকী শিক্ষিকা, উজবেকী অভিনেত্রী প্রভৃতির সঙ্গে একাধিক স্থানে একাধিকবার মেলা-মেশা করবার যে সুযোগ পেয়েছি, তাতে করে জেনেছি যে, জীবনকে ফলিয়ে তোলবার যে সাধনায় তাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন, তা আমাদের শিক্ষিতা নেতৃস্থানীয়াদের অনেকে অনাবশ্যক মনে করে এড়িয়ে চলেছেন, শ্রমিক-নারীরা ত আজও শ্রমিক সমাজের নিম্নতম স্তরে পড়ে রয়েছেন। অথচ আমাদের মিথ্যাভিমান রয়েছে, আমরা এশিয়ার জাতিসমূহের মাঝে অগ্রগামী। আমরা মনেই রাখি না মাথা-পিছু আয়ের দিক দিয়ে আমরা এশিয়ার জাতিসমূহের অনেকের চেয়ে আজও নিম্নতর স্তরে পড়ে রয়েছি।

মিল থেকে বেরিয়ে একটি বিশেষ ধরণের চিকিৎসা-কেন্দ্রে গেলাম। মিলেরই একটা অঙ্গ সেটি। ক্লিনিকও নয়, হাসপাতালও নয়। ওর নাম যা বলা হয়েছিল, তা আমার মনে নেই। শ্রমিকদের মাঝে এমন নর-নারী দেখা যায়, যাদের দেহে ব্যাধিজনিত কোন দুর্ব্বলতা এবং শ্রম করবার অনিচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও কাজে উৎসাহের অভাব দেখা যায়। এই চিকিৎসা-কেন্দ্রটি তাদেরই জন্য। তাদের ইনভ্যালিড হিসেবে ছুটি দেওয়া হয় না। সকলের মতো তাদেরও আটঘণ্টা মিলে কাজ করতে হয়। কিন্তু কাজ শেষ করবার পর তাদের বাড়ী যেতে দেওয়া হয় না, এইখানে এনে রাখা হয়। এখানে তাদের ক্যালরি হিসেব করে খেতে দেওয়া হয়, মনের স্বাভাবিক আনন্দ দেবার ব্যবস্থা করা হয়, সুনিদ্রার সহায়ক সকল বিষয়ের দিকেই দৃষ্টি রাখা হয়। দৈনিক আট ঘণ্টা তারা মিলে কাজ করে, আর ষোলঘণ্টা এখানকার নিয়ম-কানুন মেনে তাদেরকে এইখানেই থাকতে হয় যতদিন না তাদের কর্ম্মশৈথিল্য ঘুচে যায়, অথবা শৈথিল্যের প্রকৃত কারণটি ধরা পড়ে। যে ডাক্তারটি আমাদের এ-সব কথা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, তিনি বল্লেন অধিকাংশ শিথিলকর্ম্ম শ্রমিকই এখানকার বিধি-ব্যবস্থায় দু-তিন সপ্তাহ থেকেই কর্ম্মক্ষম হয়ে ওঠে, আর ধরাও পড়ে শৈথিল্যের প্রকৃত কারণটি কি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনারা ধরে নিয়েছেন মানবমাত্রেই এই টেক্‌সটাইল মিলে শ্রমিকের কাজ করতে উদ্দীপনা পাবেই।

—না, না, ধরে কিছুই নিইনি বলেই ত দেখতে চাই অসুখ-বিসুখ না থাকা সত্ত্বেও কাজে উৎসাহ নেই কেন? ওরা ত বলে না যে, এই বিশেষ কাজ ওদের ভালো লাগে না। সে-কথা বল্লে ত যে-কাজ করতে ওরা উৎসাহ অনুভব করে, সেই কাজেই নিয়োগ করা যায়। কোন কাজেই উৎসাহ পাবে না, সেটা ত স্বাভাবিক নয়। তেমন লোকের সংখ্যা-বৃদ্ধি ভয়ের কথা।

এই চিকিৎসা কেন্দ্রটি দেখবার পর একটি হাসপাতাল দেখতে গেলাম। ও-সব দেশে হাসপাতালে ঢুকতে হলে বাইরের কাপড়-চোপড় এপরণ দিয়ে ঢাকা দিতে হয়। আমাদের সবাইকেই তাই পরিয়ে দেওয়া হোলো। বেশ পরিচ্ছন্ন আর পরিপাটি এই হাসপাতালটি। রুগীদের শয্যাগুলি ঘেঁসা-ঘেসি স্থাপিত, কিন্তু মেজেতে বিছানো কোন বিছানা কোথাও দেখলাম না। আউট-ডোরেও শৃঙ্খলা দেখলাম অনেক বেশি। আমাদের ডেলিগেশনে ডাক্তার ছিলেন চারজন। তাঁদের মাঝে একজন মহিলা, গুজরাতী, ডক্টর মিসেস বিগনে। তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ওখানকার ডাক্তারদেরকে শ্বাস নেবার আর অবসর দিলেন না। তাঁরা কিন্তু এতটুকু বিরক্ত হলেন না। ম্যালেরিয়া, কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় একরকম নেই। যৌনব্যাধিও প্রায় দেশ-ছাড়া। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিপ্লোবোত্তর সোবিয়েৎ রাষ্ট্র যে বিস্ময়কর উন্নতি করেছে, তা ত কেবল মস্কো আর লেনিনগ্রাদাই আত্মসাৎ করে বসে নেই। তার সুফল পনেরোটি রিপাবলিকই সমানে ভোগ করছে। তাই উজবেকিস্তানেও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, আধুনিক ওষুধ-পত্তর, যন্ত্রপাতি, কিছুরই অভাব নেই।

হাসপাতাল থেকে গেষ্ট-হাউসে ফেরবার পথে ছোট্ট একটি মিউজিয়মও দেখে নিলাম। লাঞ্চের পর অল্প একটু বিশ্রাম করেই শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। একটি বড় ঝিলকে কেন্দ্র করে একটি পার্ক গড়ে তোলা হয়েছে। সেখানে ছেলেদের রেলগাড়ী রয়েছে। ছোট্ট-ছোট্ট রেলগাড়ী, ছোট্ট ষ্টীম এঞ্জিন, ছোট্ট ষ্টেশন। ছোটরাই ষ্টেশন মাষ্টার, টিকেট কলেক্‌টার, টিকেট চেকার, গার্ড, ড্রাইভার। যাত্রীরাও ছোট। বড়দের এই রেলওয়ের কোথাও ঠাঁই নেই। আমরা গেষ্ট বলে গাড়ীতে গিয়ে বসবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম এবং তা রক্ষাও করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—এই রেল-পথে কিছুটা ভ্রমণ করা যায় না? শুনলাম ট্রেণ সেদিনকার মতো যাত্রা শেষ করে ফিরেছে, ক্ষুদে-ক্ষুদে রেল-কর্ম্মিরা কাজ শেষ করে বাড়ী চলে গেছে। দেখতেও পেলাম ষ্টেশন-বাড়ীর একটি ঘরও খোলা নেই।

মাদাম বল্লেন—ক্ষুদে-ট্রেণে বেড়াতে পারলে না বলে ক্ষুণ্ণ যদিও হয়েছ, ক্ষুব্ধ হয়োনা। কিন্তু নৌ-বিহারের আয়োজন করা হয়েছে। ঝিলের বুকে খুব খানিকটা বেড়ানো যাবে।

বেলা তখন পড়ে এসেছে। উজবেকী তরুণ-তরুণীরা জোড়ে-জোড়ে ডিঙ্গি ভাসিয়েছে ঝিলের বুকে, সাঁতারও কাটছে দলে দলে। আমরা বড়-বড় দুখানা মোটর-বোটে গিয়ে উঠলাম। বোট চলেতেই ডিঙ্গিগুলো আমাদের বোট দুখানির দুপাশ ঘেঁসে চলতে লাগল। তাদের আরোহী-আরোহিণীরা ভেসে-যাবার গান ধরল। যারা সাঁতার কাটছিল, তারাও সেই গান কণ্ঠে তুলে নিল; কণ্ঠে তুলে নিল তারা, যারা

LUX
TOILET SOAP

যুগলে-যুগলে ঝিলের পাড়ে-পাড়ে সান্ধ্য ভ্রমণ করছিল। ফুলের কুঞ্জে আর আঙুর-ঝোপের আড়ালে বসে আত্মগোপন করে যারা কানে-কানে এতক্ষণ প্রাণের কথা কইছিল তারাও ওই গান কণ্ঠে নিয়ে জানিয়ে দিলে কে কোথায় কি ভাবে বসে রয়েছে। যারা গানে যোগ না দিয়ে সাঁতারই কাটছিল, তারা থেকে থেকে চেঁচিয়ে কী যেন বলছিল। জিজ্ঞাসা করে জানলাম তারা বলছে ঝাঁপিয়ে পড়, ঝাঁপিয়ে পড়, আমাদের সাথে গা ভাসিয়ে দাও।

ঘণ্টাখানেক পরে মাদাম বল্লেন—আর নয়। এবার তাজমহলে যাবার সময় হয়েছে।

আমাদের বোটখানি তীরে ভিড়ল। ঝিল থেকে উঠে জনসমুদ্রে পড়লাম। মাদাম আর রুশী-উজবেকী সাথীরা অতি কষ্টে পথ কেটে কেটে আমাদের এগিয়ে নিয়ে চল্লেন। পার্কের ফটকের সামনেই আমাদের বাসগুলো দাঁড়িয়ে ছিল। বাসে উঠে জানালা দিয়ে আমরাও যত হাত নাড়ি, পার্কের রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সিক্ত নীল সুইমিং কষ্টিউম পরিহিত তরুণ-তরুণীরাও ততই হাত নাড়ে। দু-পক্ষই চায় চিত্তরাগকে হাওয়ার তরঙ্গে ভাসিয়ে দুই পক্ষের কাছে পৌঁছে দিতে। মোটার বাস ব্যবধান বাড়িয়ে দেয়, মোড় ঘুরে পার্কটিকে অদৃশ্য করে দেয়।

মিনিট কুড়ি পরে রামধনুর সাত-রঙ-ঝরানো দুটি ফোয়ারা আর তার পেছনে একটি মার্কেল প্রাসাদ নানা বর্ণের বিজলীর আলোয় উদ্ভাসিত হোলো। আর সেই উজ্জ্বল আলো ব্রোঞ্জের তৈরি দীর্ঘাবয়ব একটি কৃষ্ণাভ মূর্ত্তিকে পারিপার্শ্বিক আড়ম্বরের এমনই উর্দ্ধে তুলে ধরেছে যে, পুলকে দেখে মনে হয় মূর্ত্তিটি যেন আকাশ স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে আছে।

মূর্ত্তিটি উজবেকিস্তানের জাতীয় কবি আলিশির নাভোইয়ের প্রতি-মূর্ত্তি। প্রসাদোপম ওই মার্কেল-প্রাসাদটি একটি অপেরা-ভবন, কবির স্মৃতি চিরন্তন রাখবার জন্য তৈরী করা হয়েছে। ওইটিকেই আমাদের কাছে দ্বিতীয় তাজমহল বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। আমাদের বাসগুলো গিয়ে প্রাসাদের প্রশস্ত সোপানের সামনে দাঁড়ালো। সাদর অভ্যর্থনা সহকারে দোতলায় আমাদের তুলে নেওয়া হোলো। সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই স্তব্ধ হয়ে গেলাম। শ্বেত প্রস্তরের প্রকাণ্ড একটি হল-ঘর, উজবেকী চিত্রের গ্যালারি। খুব উচ্চাঙ্গের চিত্র না দেখলেও বেশ ভাল ভালো অনেক ছবি দেখলাম। সেই হলের পর আর একটি হল উজবেকী স্থাপত্য বুকে করে রয়েছে। সব দেখা হলে তিন-তলায় যাওয়া হোলো। মধ্য-এশিয়ার শিল্প-নিদর্শন দেয়ালের মার্কেলে ফলিয়ে তোলা হয়েছে। একটি হল-ঘরে ঢুকেই আমি বল্লাম—এ যে ভারতবর্ষে ফিরে এলাম।

কিউরেটার বল্লেন—পদ্মবনে ঢুকলে বল।

—ওই লতা আর পাতা অমন করে আমাদের দেশেও আঁকা হয়।

—আমরা পাথরে খোদাই করিছি।

—আমরা কাঠে-পাথরে ইটে ওগুলি ত রূপায়িত করিছি, আবার পাল-পার্ব্বণে যখন তখন মেজেতে আঙিনায় চালের গুঁড়ো জলে গুলে ওরূ আল্পনাও দিয়ে থাকি। সারাটা পূব-এশিয়াই যেন পদ্মবনের মধুকর ছিল।

কিউরেটার বল্লেন এই হলগুলিতে যে-সব শিল্প-নিদর্শন ধরে রাখা হয়েছে, তার উদ্ভব এবং বিকাশ কোথায় কেমন করে হয়েছে; একদল শিক্ষিত তরুণ-তরুণীকে তা শিখিয়ে নিয়েছি। প্রত্যহ অপেরা-অভিনয় দেখতে যত দর্শক আসেন, তাঁদেরকে প্রথমে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এই হলগুলি দেখানো আর বোঝানো হয়। বিশেষ একটি শ্রেণীকেই অপেরার দর্শক করে আমরা রাখিনি ত। সকলকেই পালা করে আমরা অপেরা দেখাই। তাই সমাজের সকলেই অপেরা দেখতে এসে মধ্য-এশিয়ার কারু ও চারু শিল্পেরও পরিচয় পেয়ে যান। সেই পরিচয় দর্শকদের মনে নানা প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে। আর সেইটেই জাতির লাভ। জানবার আগ্রহ হবে, মানুষ জবাব দাবী করবে হয় সমাজের কাছে, নয় নিজের কাছে।

অপেরা শুরু হবার সময় হতেই আমাদের প্রেক্ষাগারে নিয়ে যাওয়া হোলো। প্রকাণ্ড প্রেক্ষাগারটি দর্শকে পরিপূর্ণ। আমরা প্রবেশ করতেই সকলে উঠে দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। আমরাও করতালি দিয়ে তাঁদের অভিনন্দন জানালাম। আমরা আসন গ্রহণ করতে না করতেই যবনিকা উঠল, অভিনয় শুরু হোলো। অপেরাটির বিষয়-বস্তু আমাদের জানা—অর্থাৎ, লয়লা-মজনু। ওটি বাংলা মঞ্চেও এককালে খুব বেশি অভিনীত হোতো। তাকেও আমরা অপেরা বলতাম। কিন্তু ইউরোপীয় অপেরার সঙ্গে তার কোন মিল ছিল না। তা ছিল তখনকার বাংলা নাটকেরই অনুরূপ, খালি নাচ আর গান থাকত বেশি। ওদের অপেরায় সংলাপ থাকে না। নাচ, গান, অর্কেষ্ট্রা, আর দৃশ্যপট হচ্ছে ওদের অপেরার প্রাণ। সব মিলে একটি অবিচ্ছিন্ন কাব্য সৃষ্টি করে। বেশ ভালোই লাগল অভিনয়।

বিরতির সময় অভিনেতৃদেরকে অভিনন্দন জানাবার জন্য রুমের দিকে অগ্রসর হলাম। নায়িকার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াতেই তিনি হেসে বল্লেন—আসুন, আসুন, ভিতরে আসুন।

—আপনি বাংলা জানেন!

—কিছু কিছু। বলে তিনি মুচকে হাসলেন এবং হাত ধরে তাঁর নিজের বসবার আরামপ্রদ আসনখানিতে বসিয়ে দিলেন। আলাপ জমে উঠতে সময় লাগল না। অবশ্য আলাপন দোভাষী মিশার মাধ্যমেই চালাতে হোলো। জানলাম তিনিও ষ্ট্যালিন-প্রাইজ উইনার। তাঁকে, আর যিনি ওথেলো অভিনয় করেছিলেন তাঁকেও, এই টাসকেণ্টে রাখা হয়েছে টাসকেণ্টের অভিনয়ের মানোন্নয়ন করবার জন্য। এটা একটা খুব বড় কথা। দেশের সব গুণীদেরকে মস্কৌতে সমবেত করে সকল অঞ্চলগুলিকে দীন করে রাখতে সোবিয়েৎ রাষ্ট্র-পরিচালকরা রাজী নন। তাঁরা স্থির করেন কে কোন বায়গাকে কর্ম্মক্ষেত্র করে নেবেন। থিয়েটারকে ন্যাশনাইলজড্ করাও হয়েছে সংস্কৃতিকে দেশ-ব্যাপী করে তোলবার জন্য। আর এই বিষয়ে অপেরাই হয়েছে খুব বড় একটা মাধ্যম। বহু-ভাষা-ভাষিক দেশে অপেরাই হচ্ছে গণ-সংযোগের শ্রেষ্ঠতম বাহন। কেননা অপেরায় সংলাপ থাকে না, নাটককে প্রকাশ করা হয় নৃত্য-গীতের সহায়তায়। ভারতবর্ষেও এককালে তাই করা হোতো। প্রয়োজনের

জাতিরেই তা করা হয়েছিল, এক অঞ্চলের ভাষা অন্য অঞ্চলের বোধগম্য নয় বলে। রাশিয়াতেও তাই। অবশ্য সোবিয়েতের পনেরোটি রিপাবলিকে আজ সকলকেই রুশী শিখতে হয়। কিন্তু সকলেই কিছু রুশীতে কাব্য নাটক লিখতে পারেন না। পারা সম্ভব নয় বলেই তাকে বাধ্যতামূলক করা হয়নি; আঞ্চলিক ভাষাতেই তা লিখতে বলা হয়। শুধু বলাই হয় না, উৎসাহও দেওয়া হয়। আর সর্ব্বজনীন ভাবকে অপেরার সহায়তায় ব্যাপ্ত করা হয়।

ও-দেশে যাবার আগে শুনেছিলাম, অপেরা নাটকের সাহায্যে ওরা কমিউনিজম প্রচার করে। কিন্তু কথাটা আদৌ সত্য নয়। লয়লা-মজনুতে কমিউনিজম-এর কিছু নেই। প্রথমবার ও-দেশে গিয়ে প্রায় ডজনখানেক অপেরা দেখেছি। ভিক্তর হুগোর নোতরদাম উপন্যাসও রুশী অপেরায় রূপান্তরিত দেখিছি। খাঁটি রুশী বিষয় অবলম্বনে রচিত অপেরাও কম দেখিনি। একখানাতেও কমিউনিজম প্রচারণার গন্ধটুকুও পাইনি। মানুষের জীবন সুন্দর, নর-নারীর প্রেম বিশুদ্ধ হলে তা যে নরনারীকে মানুষ হিসেবে উন্নত করে, সুন্দর জীবন যাপন করবার এবং সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হবার কল্পনার অধিকার ধনী-দরিদ্র সকলেরই আছে, এমন সব প্রচারণা অবশ্যই থাকে, বক্তৃতার মাধ্যমে নয়, শিল্প সৃষ্টির মাধ্যমে।

বিরতির সময় উত্তীর্ণ হবার মুখে আমরা প্রেক্ষাগৃহে ফিরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। অভিনেত্রীটি আমার হাতের প্রগ্রামখানা টেনে নিয়ে তাঁর নাম স্বাক্ষর করে দিলেন, এবং যুক্তকরে আবেদন জানিয়ে রাখলেন, আবার যেন টাসকেন্টে আসি। রাত দশটার পর অভিনয় শেষ হোলো। লয়লা-মজনু অভিনয় যে অনবদ্য হয়েছে, এমন কথা আমার [illegible]য়নি। অপেরার পুরো রস গ্রহণ করায় আমার বাধা ওদের সঙ্গ[illegible]র সঙ্গে আমার পরিচয়ের অভাব।

সেবার টাসকেন্টে থাকবার শেষ দিনটি বড়ই কর্ম্মব্যস্ত ছিলাম। সকালে কলেকটিভ ফার্ম দর্শন, দুপুরে ওখানকার দু'জন শ্রেষ্ঠ কবির গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা, অপরাহ্নে পাবলিক রিসেপশন, তারপর জলসা, তারপর ব্যাঙ্কয়েট, তারপর ডেলিগেশনের অর্দ্ধাংশের মস্কো যাত্রা।

সেদিন ব্রেকফাষ্ট খাবার পরই আমরা চলে গেলাম কলেকটিভ ফার্মে, টাসকেন্ট শহরের বাইরে। মোটারে যেতেই লাগল ঘণ্টা দুয়েক সময়। কলেকটিভ ফার্মের কর্ম্মীরা অভ্যর্থনা করে নিয়ে রিসেপশন হলে বসালেন। ডিরেকটার কলেকটিভ ফার্মের বিবরণ শোনাতে শুরু করলেন। ফার্মের আয়তন, আয়-ব্যয়, উৎপন্ন শস্য প্রভৃতির পরিমাণ, কর্ম্মীর সংখ্যা তিনি জানালেন। প্রায় চারশত পরিবার এই ফর্মটিতে কাজ করেন। তাঁদের উৎপন্ন সব জিনিষই ফার্মের সম্পত্তি। কেবল তরি-তরকারি, শাক-সব্জী, উৎপাদনের জন্য প্রতি পরিবারকে কিছু-কিছু জমি পরিবারগতভাবে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। ফার্ম্মের উৎপন্ন সকল জিনিষই কিছুটা মুনাফা দিয়ে গবর্ণমেন্ট কিনে নেয়। সেই দাম থেকে কিছুটা রিজার্ভ ফণ্ডে জমা রেখে বাকিটা কাজ হিসেবে কর্ম্মিদের মাঝে বণ্টন করা হয়। ফার্ম্মের আওতায় এবং পরিচালনায় হাসপাতাল আছে, ক্রেশ আছে, প্রাইমারী বিদ্যালয় আছে, নাচ গান অভিনয়ের আসরও আছে। কৃষকদের ঘর-বাড়ী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আধুনিক আসবাবে সজ্জিত। রেডিও দেখতে পেলাম অনেক বাড়ীতে।

এই ফার্ম্মটির প্রধান ফসল হচ্ছে কাপাস। মাইলের পর মাইল কাপাসের ক্ষেত। গাছগুলি তখন কোমর অবধি বড় হয়েছে। অনেকগুলো উইডিং মেশিন তখন ক্ষেতের আগাছা নিংড়াবার কাজ করছে। তাদের চাকাগুলো দুই সারি কাপাস গাছের মাঝখানকার জমির ওপর দিয়ে যেমন গড়িয়ে চলেছে, তেমন আগাছাগুলোও নির্ম্মূল করে তুলে নিচ্ছে, অথচ কাপাস গাছের কোন ক্ষতি করছেনা। ডেলিগেশনের অনেকেই এক-একটা মেশিনে চেপে বসলেন ড্রাইভারের পাশে।

কাপাস ক্ষেত দেখবার পর গেলাম ফার্ম্মের ডেয়ারীতে। সেখানে যাবার পথের দুধারে আঙুরের কেয়ারী। লতাগুলোয় থোকা-থোকা আঙুর ফলে রয়েছে; শাদা, লাল, বেগুনে এবং কালো, ডিম্বাকৃতি এবং গোল। ডেয়ারীর গরুগুলো হৃষ্ট-পুষ্ট আর পরিচ্ছন্ন এবং আকারে আমাদের দেশের বড় বড় মোষগুলোর চেয়েও বড়। অবশ্য ফিনল্যাণ্ডে আর সুইডেনে ওর চেয়েও বড় গরু দেখেছি। আমরা যেতেই গরুর পরিচর্য্যা যাঁরা করছিলেন, তাঁরা পরমোৎসাহে দুধ দোয়া শুরু করে দিলেন, হাত দিয়েই। সাধারণত তা করা হয়না, যন্ত্র লাগিয়েই তা করা হয়। কিন্তু গরুগুলো এখন খোলাযায়গায় ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছিল বলে তা করবার সুবিধে হোলনা। এখন দোয়া হচ্ছে শুধু আমাদের বোঝাতে ওঁদের ফার্ম্মের গাইয়ের দুধ কত মিঠে। ডেলিগেটরা দুধ গিলে খুব তারিফ করলেন।

ডেয়ারীর পরই ক্রেশ দেখতে গেলাম। মায়েরা যখন কাজ করেন, শিশুরা তখন এইখানে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করে। শিশুদের মাঝে যারা বড়, তারা খেলা করে, ছবির বই দেখে; যারা ছোট, তারা কটে-দোলনায় হাত-পা নেড়ে খেলা করে অথবা ঘুমিয়ে থাকে। এখানে ডাক্তার আছে, নার্স আছে, শিক্ষক-শিক্ষিকাও আছে। দিনান্তে কাজের শেষে ঘরে ফেরবার সময় মায়েরা শিশুদেরকে বুকে করে নিয়ে যান।

ক্রেশ থেকে বেরুতেই মাদাম আমাকে বল্লেন—ফার্ম্মের আর কিছু তোমাকে দেখতে হবেনা। তোমাদের লেখকদের সংগ্রহ করে কবিদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাও। তোমাদের জন্যে দুইখানা গাড়ী অপেক্ষা করছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—দোভাষী সঙ্গে যাবে কে?

—লিডা গেষ্ট-হাউসে তোমাদের বক্তৃতাগুলি অনুবাদ করছে। তাকে তুলে নিয়ে যেয়ো। সকালবেলায় আসবার সময় আমরা পাবলিক রিসেপসনে যে ভাষণ দেব, তাই লিখি দিয়ে এসেছিলাম রুশীতে অনুবাদ করবার জন্য।

আমরা আটজনায় গেষ্ট হাউসে ফিরে এসে লিডাকে তুলে নিয়ে শহরের নানা পথ বয়ে নির্জ্জন এক অঞ্চলে পৌঁছুলাম। এখানকার রাস্তাগুলি কাঁচা এবং অপ্রশস্ত, দু-পাশের বাড়ীগুলোও পুরানো, জীর্ণ। অনেক ঘুরে-ঘুরে একটি বাড়ীর সামনে আমাদের গাড়ী দুখানা থামল।

আমরা নামতেই একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। তিনিই আমাদের হোষ্ট, কবি নন, গণিতের অধ্যাপক এবং আকাদেমিশিয়ান। আমরা তাঁর অনুসরণ করেই দেখতে পেলাম একটুকু খোলা যায়গায় ছোট্ট একটি সামিয়ানার নীচে লাল কার্পেট বিছানো রয়েছে। তার উপর ভেলভেটের খোলে-ভরা কয়েকটা তাকিয়া। আমাদের কিন্তু সেখানে বসানো হোল না। ও আসরটি সাজানো হয়েছে প্রতিবেশীদের বোঝাবার জন্য যে বাড়ীতে আজ বরেণ্য অতিথির আবির্ভাব হয়েছে।

আমাদের যে ঘরে বসানো হোলো, তাতে চেয়ার-টেবিল সোফা-কোচ রয়েছে। প্রাথমিক পরিচয় শেষ হতেই গৃহকর্ত্তা বল্লেন—একটু চা খেয়ে নিলে কেমন হয়?

—তা মন্দ হয় না, আমি বল্লাম। কিন্তু প্রস্তাবটা শুনে পিত্তি আমার জ্বলে গেল। বেলা তখন দেড়টা; পেট চোঁ চোঁ করছে। শুনেছিলাম লাঞ্চ এখানেই খাওয়া হবে। আর গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক মশাই জানতে চাইছেন—একটু চা পান করলে কেমন হয়!

প্রস্তাবটি করে তিনি আর আমাদের বসতে দিলেন না, একরকম গরু-তাড়া করেই পাশের ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন। ঘরে ঢুকেই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। চায়ের সরঞ্জাম চোখেই পড়ল না, প্রকাণ্ড টেবিল ভরতি খাবার আর খাবার, আঙুর, আপেল, কলা, সারি-সারি সুরার বোতল। গৃহ-কর্ত্রী স্বয়ং খাওয়াবার ভার নিলেন, খাবার তুলে দিয়ে দিয়ে ডিসগুলি ভরতি করে দিলেন।

গৃহকর্ত্তাকে আমরা বল্লাম—আমাদের মাঝে গণিতজ্ঞ কেউ নেই।

—না-ই বা থাকল, শিল্পী ত আছেন। আমি মধ্য-এশিয়ার স্থাপত্য এবং শিল্প-সাধনা অতীতে কেমন ছিল, তাই নিয়ে একখানা বই লিখেছি। উঠে গিয়ে সেল্‌ফ্‌ থেকে সেই বই একখানা টেনে নিয়ে এলেন।

চেয়ারে পুনরায় বসতে বসতে বল্লেন—আমার মেয়ে যদি এখানে এখন থাকত, আপনাদের ভালো করে সব বুঝিয়ে দিতে পারত। সে ইংরিজি বেশ ভালো বলতে পারে, আর এই বিষয়ে আমার কাছ থেকে সবই জেনে নিয়েছে। এখন সে জার্মেনীতে পড়চে। তিনি বইখানার পাতা ওন্টাতে লাগলেন। লিডার দিকে চেয়ে দেখি তার মুখ শুকিয়ে গেছে। অধ্যাপক যা যা বলবেন, বেচারাকে একা সব তর্জ্জমা করে আমাদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

লিডা চুপি-চুপি আমাকে বল্লে—আমি নিজেই ও-সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ।

অধ্যাপক তাঁর কেতাব থেকে এক-একটা অংশ পড়েন আর কনুই দিয়ে লিডাকে এক-একটা গুঁতো দেন, লিডা কলের মতো অনুবাদ করে শুনিয়ে দেয়—অধ্যাপক ছবি দেখাবার জন্য বইখানা দুই হাতে উঁচু করে ধরে সকলের দৃষ্টি ছবির দিকে আকর্ষণ করেন।

গৃহ-কর্ত্রী ধমক দিয়ে বলেন—তুমি নিজেও খাবে না, আমার অতিথিদেরও খেতে দেবে না।

অধ্যাপক লজ্জিত হয়ে বইখানা রেখে কাঁটা দিয়ে একটা কিছু মুখে তুলে দিয়ে চিবুতে থাকেন, আবার কাঁটা রেখে দিয়ে বই তুলে নিয়ে বলেন—অনেকের ধারণা মধ্য এশিয়ার শিল্প সাধনা কিছুই নেই। এ অঞ্চলের লোকরা হয় চিরকাল গরু-ভেড়া তাড়িয়ে বেরিয়েছে, আর না হয় দেশের পর দেশ লুণ্ঠনই করেছে। মানি তাও করেছে, আবার নানা সভ্যতার গতির সঙ্গে তাল রেখেও চলেছে। গ্রীক, হিব্রু, বৌদ্ধ, কেরেস্তানি এবং ইসলামিক সভ্যতার সঙ্গে যুগে-যুগে মধ্য-এশিয়া যে নিবিড় পরিচয় স্থাপন করেছিল, তার পরিচয় হয়ে রয়েছে এই সব শিল্প ও স্থাপত্যের নিদর্শন। আবার তিনি ছবি দেখাবার জন্য বইখানা উঁচু করে ধরলেন। গৃহ-কর্ত্রী এবার আর ধমক দিলেন না। স্বামীর কথা টেনে বল্লেন—পরিচয় আরো রয়েছে সেই সব দেশে, যে-সব দেশে মধ্য-এশিয়ার বিজয়ীরা বস-বাস করেছে। কথাটা শেষ করেই তিনি আবার বললেন—ভাববেন না, আমি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার গরব করছি। আমি সভ্যতার বিস্তার কি ভাবে হয়েছিল, তাই শুধু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

খাওয়া আর আলোচনা ঘণ্টা দেড়েক কাল চলবার পর আমি নিবেদন করলাম আমাদের আর একটি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হবে। অধ্যাপক ব্যস্ত হয়ে তাঁর গৃহিণীকে বল্লেন—তবে ত ওঁদেরকে আর বসিয়ে রাখা উচিত নয়। বিরিয়ানি পোলাউ আনতে বল।

আপত্তি অশোভন, সামারকন্দে তা শিখে এসেছিলাম। তাই চুপ করেই রইলাম। এলো বিরিয়ানি আর শিক-কাবাব। কারু-কারু উদরে তারও স্থান হোলো। গৃহ-কর্ত্রীর পাশে যে ডেলিগেটটি বসে ছিলেন, তিনি তা খাচ্ছিলেন না দেখে গৃহ-কর্ত্রী তাঁর বাম বাহু দিয়ে ডেলিগেটটির গলা জড়িয়ে নিয়ে চামচে করে তাঁর মুখে বিরিয়ানি ঢুকিয়ে দিতে লাগলেন।

আমি বল্লাম—মাদাম, ছেলেটি বড়ই অবাধ্য।

—অবাধ্যকে বাধ্য করবার কায়দা আমার জানা আছে। দেখুন না, কেমন সুবোধের মতো খেয়ে যাচ্ছেন, এখন।

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বল্লে—খাচ্ছে না, গো-গ্রাসে গিলছে।

পুরো দুই-ঘণ্টা পরে মুক্তি পেলাম। তাঁরা আমাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে বল্লেন—আবার যেন দর্শন পাই।

কুড়ি মিনিট পরেই কবির বাড়ীর সামনে গিয়ে আমাদের গাড়ী থামল। কবির প্রতিনিধি আমাদের দ্বিতলে নিয়ে গেলেন। যে-ঘরে আমাদের বসানো হবে, কবি তার দুয়ারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঘরে ঢুকে হতবাক্ দাঁড়িয়ে রইলাম। আরো বড় টেবিল, আরো বেশি খাদ্য ও পানীয়! কবি সবাইকে বসালেন। চেয়ে দেখলাম ডেলিগেশনের সকলেরই চোখ অপলক। কবি তাড়া দিলেন—হাত চালাও। আমি পাশেই বসেছিলাম। ধোঁয়া-ওড়া কাটলেটের একটা ডিস আমার হাতে দিয়ে বল্লেন—ঠাণ্ডা হয়ে যাবার আগেই খেয়ে নাও।

লিডাকে বল্লাম—বাঁচাও লিডা।

সে বল্লে—আমি কি করব। এক বেলায় দু' জায়গায় খাবার নিমন্ত্রণ নাও কেন?

—আমি জানতাম নাকি! হাতের ডিশ টেবিলে রেখে কাটলেট থেকে যে ধোঁয়া উড়ছে তাই দেখতে লাগলাম।

কবি কনুয়ের গুঁতো দিলেন। আমি ক্ষিপ্রহাতে একটা রোষ্ট থেকে খানিকটা কেটে নিয়ে ডিসে রেখে কবির হাতে তুলে দিলাম। কবি সেটা টেবিলে রেখে ইসারায় বুঝিয়ে দিলেন আমি কিছু মুখে না-দেওয়া পর্য্যন্ত তিনিও দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকবেন। অগত্যা এক টুকরো কেটে নিয়ে মুখে ফেলে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। এমন ভালো খাবারেও যে এত অরুচি হতে পারে, আগে কখনো তা বুঝিনি। বন্ধুদের দিকে চেয়ে দেখলাম—কেউ মাঝে মাঝে একটা করে আঙুর মুখে ফেলে দিচ্ছেন, কেউবা একটা কলা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছেন যেন পূর্ব্বে কখনো কলা তাঁরা দেখেন নি। কবি তাড়ার পর তাড়া দিচ্ছেন, আর অন্দর থেকে ডিসের পর ডিস নতুন-নতুন খাবার আসছে। এক বর্ণ বাড়িয়ে বলছি না।

আর্ত্তস্বরে লিডাকে বল্লাম—উপায় একটা কিছু ঠাওরাও, লিডা। তোমাদের এতদিন অতিরিক্ত খাটিয়েছি বলে এমন করেই কি প্রতিশোধ নেবে?

—নইলে দেশে গিয়ে আমাদের কথা একেবারে ভুলে যাবে যে!

—করুণার দানকে আমরা সব চেয়ে বেশি মর্য্যাদা দিই।

লিডা তখন বল্লে—শোন, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। চট করে গোটা দুই-তিন গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢেলে নাও। আর একটা গ্লাস কবির হাতে তুলে দিয়ে বল, তার স্ব-রচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে।

তাই করলাম। আমরা দুজনাও দুটি গ্লাস মুখে লাগালাম কবিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে। কবি পর পর দুই চুমুক শ্যাম্পেন পান করে তাঁর কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। মাঝে-মাঝে ভুলে যান, আর তার ছেলেকে ডেকে বলেন ওই কবিতাটি যে বইয়ে আছে, তাড়াতাড়ি সেই বইখানা নিয়ে আসতে। ছেলে বই আনতে যান, আর কবি গ্লাস মুখে তুলে নেন। ছেলে বই এনে প্রম্পট করেন, আর কবি গ্লাসটা রেখে আবৃত্তি করেন, আর আমি শূন্য গ্লাসটা ভরতি করে দিই।

সহসা এক সময় কবি বল্লেন—আমি ত অনেক শোনালাম, এবার তোমাদের পালা।

আমি বল্লাম, অবশ্য। আমাদের দলে হায়দারাবাদের একটি অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর হাফিজ মুখস্থ ছিল। তাঁকে কিছু আবৃত্তি করতে বললাম। তাঁর মুখে হাফিজ শুনে কবি উল্লসিত হয়ে উঠলেন। তিনিও হাফিজ আবৃত্তি করতে লাগলেন।

লিডা বল্লে—কেমন দাওয়াই বাতলে দিয়েছিলাম?

আমি জবাব দিলাম—শ্যাম্পেনের ওপর তোমার নিজেরও হয়ত লোভ ছিল।

হাত থেকে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে সে বল্লে—অকৃতজ্ঞ।

কবি বল্লেন—কাব্যালোচনা আর খাওয়া ত একসঙ্গেই চলতে পারে।

আমি বল্লাম—অবশ্যই পারত, হাতে যদি সময় থাকত। পাঁচটায় পাবলিক রিসেপশন। এখন চারটে দশ।

—তাই ত! রিসেপশনে গণ্যমান্য অনেকেই যে আসবেন।

—বিদায় নিতে ব্যথা পাচ্ছি, কিন্তু তবুও যে তাই নিতে হয়, কবি।

—কিন্তু তোমরা কেউ কিছু খেলেনা যে! আচ্ছা, রিসেপশন হবার পর আবার আসতে পার ত!

—পারতাম, যদি রিসেপশনের পর জলসা, আর জলসার পর ব্যাঙ্কোয়েট না থাকত।

—তাইত!

—ব্যাঙ্কোয়েটের পরই দলের অর্দ্ধাংশ মস্কো রওনা হবেন, বাকি অর্দ্ধেক কাল ভোরে।

কবি নীরব। আমি বল্লাম—তোমাদের একটি উজবেকী কবিতার বাংলা অনুবাদ শুনিয়ে আমরা তোমাকে বুঝিয়ে দিতে চাই যে, দূরদেশের লোক হয়েও তোমাদের কবিতা আমরা কণ্ঠে তুলে নি।

কবিতাটি আমাদের চিন্ময় শেহনবীশের মুখস্থ ছিল। তাঁকে অনুরোধ করতেই তিনি আবৃত্তি করে শোনালেন। কবি খুব খুশী হলেন। নিজে নেমে এসে আমাদের গাড়ীতে তুলে দিলেন। গেষ্ট-হাউসে ফিরতেই মাদাম বল্লেন—তাসকেণ্টের সবগুলো বাড়ীতেই খেয়ে এলে নাকি?

—না, সব বাড়ীর সব খাবার ওই দুই বাড়ী বসেই দেখে এলাম।

—তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও রিসেপশনের জন্য।

সেবার রিপাবলিক অব উজবেকিস্তানের অতিথি হয়ে গিয়েছিলাম। তাই অত সমারোহ। এবার মস্কোর পথে দেড়-বেলা বিশ্রামের ব্যবস্থা, অতিথি মস্কো শান্তি-কমিটির। অবশ্য আগেকার দেখা জায়গাগুলো আর একবার দেখা গেল; কিন্তু আন-অফিসিয়ালি। আগেকার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হোল না। তাঁরা হয়ত জানলেনও না আমরা আবার তাঁদেরই দুয়ার পার হয়ে চলে গেলাম। এই তিন বছরে অন্তত দেড়শত ডেলিগেশন তাসকেণ্ট ঘুরে গেছেন। তাঁদের সকল সদস্যকে মনে রাখা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। ব্যক্তি নয়, দেশই শুধু থাকে সবার স্মৃতিতে।

তাসকেণ্টে নতুন ভারতীয় যাঁদের সঙ্গে মিলিত হলাম, তাঁদের মাঝে ছিলেন ডক্টর অনুপ সিং এম-পি। তিনি কোরিয়া যুদ্ধ-বিরতির সময়ে ভারত-সরকারের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের অন্যতম ছিলেন। আফ্রো-এশিয়ান সলিডারিটি কমিটির তিনি একজন প্রধান কর্মী। বেশ বিজ্ঞ লোক, সদালাপী এবং সুবক্তা। কংগ্রেসের সদস্য তিনি।

আর মিলিত হলাম আর্য্যনায়ক-দম্পতির সঙ্গে। তাঁদের খ্যাতি অনেক দিন থেকেই শুনে আসছিলাম। আর্য্যনায়ক সিংহলী, ভারতবর্ষকে নিজের দেশ করে নিয়েছেন, সারা বিশ্বকেও বলা চলে। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চীন আর ইউরোপ পরিক্রমা করেন। আশা দেবী তারই সহধর্ম্মিণী, বাঙালী মেয়ে। এই দম্পতির ধর্ম্ম হচ্ছে জন-সেবার মাধ্যমে সমাজোন্নয়ন। সবরমতী আশ্রমে ওঁরা কাজ শুরু করেন। এখন বিনোবাজীর সঙ্গে কাজ করছেন। এমন বিস্ময়কর নর-নারী জীবনে খুব কমই দেখেছি। মানবতার প্রতিষ্ঠার কথা ছাড়া সংসারের কোন কথাই তাঁরা ভাবেন না। ছ'ফুটেরও উঁচু ঋজুদেহ আর্য্যনায়কমের সুগঠিত দেহ দেখলেই শিল্পীর গড়া একটি ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি বলে মনে হয়।

আপাদেবীর বড় বড় চোখ দুটি দিয়ে সর্ব্বদাই তাঁর মনের উদারতা প্রকাশ পায়।

যেদিন সন্ধ্যায় তাসকেণ্টে পৌঁছুলাম, তার পরের দিন শেষ রাতে হোটেল ছেড়ে আবার এয়ারপোর্টে ফিরে গেলাম। জেট প্লেন সাড়ে তিন ঘন্টায় আমাদের মস্কো নামিয়ে দিলে। আকাশ পথে প্লেনে বসে সকালবেলাকার মস্কোর রূপ দেখলাম। ঋষি টলষ্টয় রচিত 'ওয়ার এণ্ড পীস' উপন্যাসে পড়েছিলাম ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ান পক্‌লনি পাহাড়ে দাঁড়িয়ে মস্কোর অসংখ্য গীর্জ্জার চূড়াকে চীন-প্যাগোডা মনে করে মস্কোকে মহাপ্রাচ্যের মধ্যমণি বলেছিলেন। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আমরা দেখলাম সেই অগণ্য অসংখ্য চার্চ্চের চূড়া ছাপিয়েও উঁচু হয়ে উঠেছে অসংখ্য অতিকায় ক্রেণ। মনে হোলো যোজনব্যাপী ফার-পাইনের ঘন-বনের অনেক উর্দ্ধ দিয়ে উড়ে এসে আমাদের জেট-প্লেন ক্রেণের অরণ্যে প্রবেশ করছে কি কেবল যন্ত্রের প্রতি যন্ত্রের আকর্ষণে? মস্কো কি বিবিধ যন্ত্রের সমষ্টি মাত্র?

ক্রমশঃ

যুগপ্রয়োজনে শ্রীমন্ মহাপ্রভু

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

আজি যুগ প্রয়োজনে তোমার শরণ মাগি অর্ঘ্য লয়ে তপ্ত অশ্রুজলে,
রক্তপঙ্ক স্রোত মাঝে ভেসে আছে অনবদ্য নাম তব শুভ্র শতদলে।
রসরাজ মহাভাব! পৃথিবীর পড়ে আসে বেলা। অস্তনীলিমার দিকে
চেয়ে চেয়ে খুঁজিতেছি আকাশ রেখায় করুণার সন্ধ্যা তারাটীকে।
তুমি তো করেছ কৃপা জনে জনে রাধা ঋণ শোধ করি পরম হরষে,
আসিয়াছ যুগে যুগে নব নব রূপে রসে ধরণীর সঙ্কট দিবসে।
হরি-লীলা-রস নিকেতন মর্ত্ত্যকায়া লয়ে তুমি দেখায়েছ আপনাতে
জীবে প্রেম দিয়ে গেলে ভক্তি সিন্ধু শ্রীচৈতন্য এ ভারতে নিত্যানন্দ সাথে।
চিরদিন সৃষ্টি স্থিতি লয়, কালের অদৃশ্য চক্রে, ঘুরিছে ইঙ্গিতে তব,
মুছে গেছে ইতিহাস হোতে কত যুগ যুগান্তর—ভৌগোলিক সীমা নব
দেখালে অসীমে অবলুপ্ত করি কত গ্রহতারা কত মহাজনপদ
সে কথা ভুলিয়া যারা তোমার শক্তিরে করে উপহাস, তারা যে বিপথ
রচিছে বিপদ সনে, তারা তো জানে না সহস্র কামনা শেষে যাবে পুড়ে,
পুঞ্জীভূত ধূম-মেঘে যাবে উড়ে দুরন্ত দুরাশা যত দূরে বহুদূরে।
দশানন সম যারা স্রষ্টারে করিয়া হেলা স্বর্ণলঙ্কা রচিল সহসা
বিজ্ঞানের দাক্ষিণ্য লভিয়া আজি; তারা তো জানে না কবে দুঃখের বরষা
নামিবে তাদের মাঝে দানব দলন দিনে, সেইদিন আসিছে আবার,
করুণার অবতংশ তোমারে হেরিব আমি সেইদিনে নব অবতার।

নাহি বল, নাহিক সম্বল, অন্তরে আনন্দ নাহি', চারিদিকে নিরুৎসাহ,
অনন্ত আকাশে চলে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা প্রজ্ঞানের করি অন্তর্দাহ
আসন্ন প্রলয়ে—মরণের মহারাত্রি ঘনায়ে আসিছে, তবু ভ্রান্ত নর
সৃষ্টি ছাড়া মতবাদ করিছে প্রচার সৃষ্টি মাঝে, অহংমত্ত নিরন্তর
তোমার শক্তিরে করি নিয়ত বিদ্রূপ—তারা আছে, তুমি নাই কহে সদা
এই মতবাদ লয়ে যন্ত্র সভ্যতার যুগে মনীষার হেরি পুলকতা।
স্বরূপ লুকায়ে তুমি কাঙালের বেশ ধরি হেরি তব বিশ্ব পরিক্রমা
হৃদয়-গোমুখী হোতে করুণা গাঙ্গের ধারা বহে তব করি সবে ক্ষমা।

রূপের ঘরেতে এসে রূপাতীত করিতেছ লীলা, সে লীলার প্রতিচ্ছবি
আমারে দেখালে কতবার! অনাহত সুরে সুরে অজপার সম জপি
তব নাম, কালের বৈরাগী আসে দোতারা বাজায়ে নিত্য মর্ম্মনদীতীরে
পাবনী ধারায় তব সিনান করায়ে মোরে সুরে সুরে চলে যায় ধীরে।
সরযূ যমুনা গঙ্গা ত্রিবেণী সঙ্গম হয়ে মিশে গেছে স্বাধিষ্ঠানে মোর,
অপূর্ব্ব বিভূতি তব হে অসীম! সীমা মাঝে দেখায়েছ—ঝরে আঁখিলোর।
দুর্দ্দিনের রাত্রি ছায়ে অনাথিনী কাঁদিছে যেথায় বিচারের প্রহসনে,
নিঃসহায় বালকের উঠিছে রোদন ধ্বনি হননের নিষ্ঠুর গর্জ্জনে
বুভুক্ষু মানব যেথা পাষাণে কুটিছে মাথা, বস্ত্রহীন বসি রুদ্ধদ্বারে
ভাগ্যেরে ধিক্কৃত করে, ভূমিহীন গৃহহীন অর্থহীন মরে হাহাকারে
বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড সাথে হেথা করিতেছে নিত্য কোলাকুলি
কৃত্রিম পণ্যেরে দিতে গৃহস্থের ঘরে, দয়াহীন স্বার্থগৃধ্নু ধর্ম্ম ভুলি
অর্থ শোষণের তরে বর্ব্বর রীতিতে চলে, সেথা তুমি যুগ প্রয়োজনে
মর্ত্ত্যকায়া ধরি এসো ত্রাণকর্ত্তা রূপে আজি ধরিত্রীর দুর্য্যোগের ক্ষণে।

শতাব্দীর রাজপথে দলকেন্দ্রী শঠতার শোভাযাত্রা আর পশ্বাচার
ভয়ার্ত্তের মর্ম্মপুটে আনিতেছে সঙ্কোচন। চিতাসম সমাজ সংসার
ওঠে জ্বলে দিকে দিকে কুবেরের ধনলিপ্সা পশুশক্তি করেছে প্রধান,
আদর্শের শবযাত্রা সভ্যতা শ্মশান পানে চলিতেছে, কেঁদে ওঠে প্রাণ
দেশে আর দেশান্তরে অবসন্ন গণশক্তি প্রাণ ধারণের গ্লানি লয়ে,
ঔদ্ধত্যের স্বেচ্ছাচারে মৃতপ্রায় মানবতা—রাজনীতি অক্ষক্রীড়া হয়ে
রণাঙ্গণ করিছে রচনা। মুষ্টিমেয় মানবের ঐশ্বর্য্যের ক্রীড়া-পুত্তলিক
লক্ষ লক্ষ নরনারী। মৃগতৃষ্ণা দিগন্তের ডাকে আর বিভ্রান্ত পথিক!
ভারত আত্মারে তুমি আবার জাগ্রত করো অকল্যাণ করি অপগত,
প্রেমধর্ম্ম প্রচারিয়া এ ভারত একদিন বিশ্বেরে করেছে অবনত।

স্মরণের ভূর্জ্জপত্রে প্রেমের স্বাক্ষর তব হৃদয়ের রাজে গম্ভীরায়
তুমি কি দিবে না সাড়া! আজি যুগ বিপর্য্যয়ে প্রাণধর্ম্ম লয়েছে বিদায়।
নদীয়ার পথে পথে অশ্রুঝরা রাত্রিদিন মোর সাথে করে মাধুকরী
তুমি কি দিবে না সাড়া! জীবনের অধীশ্বর! ভুবন ভুলানো রূপ ধরি।
আকাশ-পিঙ্গল হোলো,আশাহত ক্ষুদ্ধলোক, সভ্যতার অগ্নিকণাক্ষরে,
বহ্নি তেজে পৃথ্বী কাঁপে হিংসাচ্ছন্ন ধরিত্রীর দীর্ঘশ্বাসে আয়ু পত্র ঝরে;
শুষ্ক হয়ে যায় শত জীবন কুসুম। তব করুণার তরে তৃষ্ণা ভরে—
চেয়ে আছি প্রেমের ঠাকুর! কথা কও, কথা কও, দুঃখের বারিধি মাঝে
ঝঞ্ঝাহত জীর্ণ তরী করে আর্ত্তনাদ, হে কাণ্ডারী! কোথা তুমি!
এস কাছে।

ভয়াবহ সঙ্কটের সম্ভাবনা সম্মুখে সবার। কল্লোলিত সিন্ধুসম
বিপুল বিক্ষোভ বেগ বিশ্ব মাঝে আলোড়িত, দিনগুলি যেন তিক্ততম।
এ দুর্দ্দিনে হে মহাজীবন! ধরণীর পূর্ব্বদ্বারে এস প্রেম বন্যা লয়ে
নবদ্বীপ ধামে, প্রতীক্ষায় অবধূত রহিয়াছে, বিরহের অশ্রু বয়ে—
যায় প্রভু! হৃদয়ের মৃদঙ্গের গুরু গুরু তালে তালে বাজায়ে খঞ্জনী
আবাহন করি তব আবির্ভাব লগ্ন তরে কীর্ত্তনের সুরে কাল গণি।

ফুলের মত…
আপনার লাবণ্য রেক্সোনা
ব্যবহারে ফুটে উঠবে
Rexona
BLENDED WITH CADYL
রেক্সোনা সাবানে থাকে ক্যাডিল অর্থাৎ ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষাকারী কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তোলে!
একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত টয়লেট সাবান
রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারী লিমিটেড এর পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্ত্তৃক ভারতে প্রস্তুত।
RP. 152-X52 BG

তিব্বত ও দালাই লামা—

গত ৩১শে মার্চ তিব্বতের ধর্ম-গুরু তথা শাসনকর্তা মহামান্য দালাই লামা ১৫ দিন পদব্রজে পাহাড় পর্বত বন-জঙ্গল ও তুষারময় পথ অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছেন—ইহাই বর্তমান যুগের একটি বড় ঘটনা। বহু দিন হইতে তিব্বতের এক দল লোক অন্যতম ধর্ম-নেতা পাঞ্চেন লামার নেতৃত্বে তিব্বতের বর্তমান শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অন্দোলন করিতেছিল। তিব্বত দেশের চারিদিক প্রায় পাহাড়ে ঘেরা—বাহিরের জগতের সহিত সেজন্য তিব্বত-বাসীর সম্পর্ক কম। এ অবস্থায় বর্তমান সভ্যতা তথায় প্রবেশ করিতে পারে নাই। তিব্বতের ঠিক উত্তরেই চীন-দেশ। চীনদেশে কম্যুনিষ্ট শাসনের বিরাট ব্যবস্থা প্রচলিত। কম্যুনিষ্ট চীনও সেজন্য তিব্বতকে নিজ প্রভাবে প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। গত এক মাস যাবৎ কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত তিব্বতীয়গণ তাঁহাদের দেশে দালাই লামার শাসনের উচ্ছেদ করিয়া কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত পাঞ্চেন লামার অধীনে নূতন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করিতেছিল। সেজন্য উভয় দলে যুদ্ধ বিগ্রহ হইতেছিল এবং কম্যুনিষ্ট চীনের অস্ত্র-শস্ত্র ও সৈন্যবাহিনী তিব্বতে পাঞ্চেন লামার দলকে সাহায্য করিতেছিল। চীনের সাহায্যে ক্রমে পাঞ্চেন লামার দল প্রবল হইয়া উঠে ও তাহারা দালাই লামাকে হত্যা করিয়া তিব্বতে দালাই লামার শাসনের অবসানের জন্য নানা রূপ ষড়যন্ত্র করে। দালাই লামার গ্রীষ্মাবাসের উপর বোমা ও গুলী বর্ষণ করিয়া পাঞ্চেন লামার দল ঐ প্রাসাদ ধ্বংস করিয়াছে ও প্রাসাদস্থ বহু মূল্যবান প্রাচীন পুঁথি ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং বহু প্রাচীন আসবাবপত্র নষ্ট করিয়াছে। এ অবস্থায় গত ১৭ই মার্চ দালাই লামা প্রায় ৯০ জন সঙ্গী লইয়া প্রাসাদ হইতে পলায়ন করেন।

চীনা সংবাদদাতারা প্রকাশ করে যে গুলী বর্ষণের ফলে দালাই লামা নিহত হইয়াছেন। সেজন্য পৃথিবীর সর্বত্র বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীরা দালাই লামার নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা আরম্ভ করে। যাহা হউক, দালাই লামা পদব্রজে ভারতাভিমুখে রওনা হন এবং তাঁহার ভারত প্রবেশের ৩।৪ দিন পূর্বে তাঁহার এক প্রতিনিধি ভারতে আসিয়া ভারতের প্রধান-মন্ত্রীকে খবর দেন যে দালাই লামা ভারত সরকারের নিকট আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছেন।

শ্রীজহরলাল নেহরু দালাই লামার প্রতিনিধিকে জানাইয়াদেন—ভারতের বৌদ্ধগণ দালাই লামাকে ধর্ম-গুরু বলিয়া স্বীকার করেন, কাজেই তিনি ভারতে আসিলে তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করা হইবে ও আশ্রয় দান করা হইবে। ভারতের উত্তর পূর্ব সীমান্ত এজেন্সি প্রদেশ (নেফা) পাহাড় ও জঙ্গলে পূর্ণ—গত ৩১শে মার্চ দালাই লামা ৮ জন সঙ্গীসহ তিব্বত সীমা অতিক্রম করিয়া ভারতের নেফা প্রদেশে প্রবেশ করেন এবং আরও ৪ দিন পদব্রজে চলিয়া তোয়াং নামক এক মহকুমা সহরে আসিয়া পৌছেন। ভারতীয় সৈন্যদল ঐ কয়দিন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন এবং ৪ঠা এপ্রিল তাঁহারা তোয়াং সহরে পৌছিলে তাঁহাদের স্থানীয় শাসনকর্তা উপযুক্ত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করেন ও তোয়াংএর একটি বৌদ্ধ বিহারে তাঁহাদের আশ্রয় দান করা হয়। ক্রমে লামার সঙ্গী বাকী ৮০ জনও আসিয়া তোয়াং বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে ২।১ দিন বিশ্রাম করিয়া তাঁহাদের পদব্রজে আরও ৩।৪ দিন আসিতে হয়—তাহার পর জিপ গাড়ীতে করিয়া ৩।৪ ঘণ্টার পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের নিকটস্থ রেল ষ্টেশনে আনয়ন করিতে হয়। শ্রীনেহরু এই সকল সংবাদ গত ৪ঠা এপ্রিল দিল্লীর লোক সভায় প্রকাশ করিয়াছেন। দালাই লামা ভবিষ্যতে কোথায় থাকিবেন তাহা এখন ও জানা যায় নাই বা স্থির হয় নাই। বর্তমানে পাঞ্চেন লামার নেতৃত্বে তিব্বতে চীন-প্রভাবিত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। দালাই লামার দলের বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু ভারতে চলিয়া আসিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন। তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কি হইবে তাহা এখনও জানা যায় নাই।

তবে তিব্বতে কয়েক-দিন উভয় দলে যুদ্ধের ফলে বহু লোক নিহত হইয়াছে ও বহু সম্পত্তি ধ্বংস হইয়াছে।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুকে এখন ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। চীনের সহিত ভারতের মৈত্রী-ভাব আছে—তাহা বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের সময় হইতে প্রায় ২ হাজার বৎসরের প্রাচীন। শ্রীনেহরু চীনের সহিত সে বন্ধন ছিন্ন না করিয়া দালাই লামাকে আশ্রয় দান করিয়াছেন। যে কোন আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দান মানব-ধর্ম—এখানে আশ্রয় প্রার্থী একজন মহা-সম্মানিত রাজকীয় ব্যক্তি এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বহু লোকের ধর্ম-গুরু। কাজেই তিনি যখন আশ্রয় প্রার্থী—তখন তাঁহাকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় দান করিয়া শ্রীনেহরু মানব-ধর্মই পালন করিয়াছেন। গত ১২ই এপ্রিল দালাই লামা সদলে ভারতের মধ্যে নিরাপদ স্থানে পৌছিয়াছেন। আমরা ভারতবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করি। দালাই লামার ভারত-আগমন শুধু ঐতিহাসিক ঘটনা নহে,ভারতের পক্ষে সৌভাগ্যের সুচনা করিবে বলিয়া আমরা মনে করি। একজন বিশিষ্ট ধর্ম-গুরুর ভারতবাসের ফলে ভারতের জনগণের মধ্যে ধর্ম-ভাব বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদের সুপথে পরিচালিত করুক—আমরা সর্বান্তকরণে ইহাই প্রার্থনা করি।

কলিকাতায় নূতন মেয়র—

গত ৮ই এপ্রিল কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় কংগ্রেস দলের প্রার্থী শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীকিশোরীলাল ঢনঢনিয়া যথাক্রমে ১ বৎসরের জন্য কলিকাতার মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্বাচিত হইয়াছেন। বিদায়ী মেয়র ডাক্তার ত্রিগুণা সেন সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং কর্পোরেশনের মোট ৮৬ জন সদস্যের মধ্যে ৪৯ জন মেয়রের পক্ষে ও ৪৭ জন ডেপুটী মেয়রের পক্ষে ভোট দান করেন। নূতন মেয়র বিজয়বাবুর বয়স ৫৫ বৎসর, তিনি গত ১৯ বৎসর কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য আছেন, তাঁহার পিতামহ স্বর্গত রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৪২ বৎসর কর্পোরেশনের সদস্য ছিলেন। বিজয়বাবু বি-এল পাশ করিয়া গত ৩০ বৎসর আলিপুরে ওকালতি করিতেছেন। ডেপুটি মেয়র কিশোরীলাল বাবুর বয়স ৪৬ বৎসর; তিনি খ্যাতনামা অর্থ-নীতিবিদ্ ও ব্যবসায়ী। তিনি এক সময়ে ভারত চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি ছিলেন। তিনি বহু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। আমরা উভয়কে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করি এবং আশা করি, তাঁহাদের সুপরিচালনায় কলিকাতা সহর উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

কলিকাতায় নেতাজীর মূর্ত্তি—

সম্প্রতি স্থির হইয়াছে কলিকাতা সহরের দুইটি প্রকাশ্য স্থানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর দুইটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপন করা হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার চৌরঙ্গী রোড ও সুরেন্দ্র ব্যানার্জী রোডের সংযোগ স্থলে মেট্রপলিটান হাউসের বিপরীত দিকে একটি ও কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে আর একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সামরিক পোষাক পরিহিত নেতাজীর মূর্তি প্রস্তুত করিবেন এবং কর্পোরেশন নিজ ব্যয়ে একটি স্বতন্ত্র মূর্তি শ্যামবাজারে স্থাপন করিবেন। কলিকাতা সহরে নেতাজীর মূর্তি না থাকা কলিকাতাবাসীদের পক্ষে কলঙ্কের কথা। তাঁহার জীবন ও অবদানের কথা সর্বদা বাঙ্গালীজাতির মনে জাগ্রত রাখার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

এম-পি'কে বলপূর্বক বিতাড়ন—

গত ৯ই এপ্রিল দিল্লীতে লোক সভার সদস্য শ্রীঅর্জুন সিং ভাদোরিয়াকে তাঁহার ঔদ্ধত্যর জন্য ডেপুটী সভাপতি সর্দার হুকুম সিং বলপুর্বক সভা হইতে বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি সোসালিষ্ট দলের সদস্য ও শাস্তি স্বরূপ তাঁকে একসপ্তাহের জন্য সভায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। লোকসভার ইতিহাসে এরূপ ঘটনা এই প্রথম। তিনি ডেপুটী স্পীকারের কোন কথা না শুনিয়া শুধু সভায় গণ্ডগোল করিতেছিলেন। বলপ্রয়োগ দ্বারা তাঁহাকে সভা হইতে বাহিরে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। এ ঘটনা সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এরূপ ঘটনা দেশের পক্ষে সত্যই লজ্জার বিষয়।

মন্মথনাথ ঘোষ—

খ্যাতনামা সাহিত্যিক, বহু মনীষীর জীবনী লেখক মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় গত ৭ই এপ্রিল মঙ্গলবার মধ্যরাত্রিতে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১৮৮৪ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর কর্মবীর ৺কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাগান বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ

ছিলেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক, বেঙ্গলী ও হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রের প্রবর্তক ও প্রথম সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ। মন্মথবাবু গণিতে এম-এ পাশ করিয়া সরকারী হিসাব বিভাগে উচ্চপদে কাজ করিতেন। জীবনের প্রথম ভাগে হইতেই বাংলা সাহিত্য রচনায় তিনি ব্রতী হন এবং হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, কালীপ্রসন্ন, উমেশচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতির জীবনী রচনা করেন। তিনি ভারতবর্ষ পত্রের প্রথমাবধি লেখক ছিলেন এবং তাঁহার কয়েকশত লেখা ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার পুস্তক সংগ্রহ ছিল বিরাট এবং জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি লেখা পড়াতেই অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। উনবিংশ-শতাব্দীর শেষভাগ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের বহু লেখকের লেখার সম্বন্ধে তিনি প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার মৃত্যুতে বেদনা অনুভব করি ও তাঁহার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী—

বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সেবক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী গত ৪ঠা এপ্রিল শনিবার রাত্রিতে ৮২ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা গড়িয়াহাটাস্থ 'ব্রহ্মবিহার' বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান। কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছিল। ১২৮৪ সালের ২৫শে আশ্বিন তাঁহার জন্ম হয়। বাড়ী ছিল মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুরে। ১৭ বৎসর বয়সে কাব্যতীর্থ পাশ করিয়া তিনি কাশীতে যাইয়া সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ১৩৪১ সালে সংস্কৃতের অধ্যাপক হইয়া তিনি শান্তিনিকেতনে যোগদান করেন। সারা জীবন তিনি পাঠাগারে অধিক সময় ব্যয় করিতেন। রবীন্দ্র নাথের আগ্রহে তিনি পালি ভাষা শিক্ষা করিয়া সে বিষয়ে গবেষণা করেন। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসিয়া যে কয়-জন পরবর্তী জীবনে প্রসিদ্ধিলাভ করেন, শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম; তপস্বীর মত তিনি সারা জীবন বিদ্যার্জন ও জ্ঞানচর্চা করিয়া গিয়াছেন।

মতিলাল রায়—

চন্দননগরের প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতা মতিলাল রায় গত ১০ই এপ্রিল সকালে ৭৭ বৎসর বয়সে প্রবর্তক আশ্রমে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি গত কয়েক বৎসর রোগভোগ করিতে-ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন এবং তাঁহার সহধর্মিণী কয়েক বৎসর পূর্বেই পরলোকগমন করিয়াছেন। ১২৮৯ সালের ২২শে পৌষ তিনি জন্মগ্রহণ করেন—৬ বৎসর বয়স হইতে তিনি এক শিবমূর্তি সর্বদা কণ্ঠে ধারণ করিতেন—১৫ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়, কিন্তু রামানন্দ ব্রহ্ম-চারীর নির্দেশে তিনি আজীবন ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করেন। ১৯১০ সালে শ্রীঅরবিন্দ কলিকাতা হইতে পলাইয়া চন্দননগর যাইয়া তাঁহার গৃহে এক মাস অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। মতিবাবু প্রথম যৌবনে বিপ্লববাদের মধ্যে আত্মনিয়োগ করেন ও পরে শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশ মত প্রবর্তক সংঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া গঠনমূলক দেশসেবায় মন দেন। তিনি বহু শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া তাহার মধ্যে দেশ-কর্মীদের কাজ দিতেন ও বহুলোককে পালন করিতেন। একদল ত্যাগী কর্মী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সারাজীবন তাঁহার আদর্শে কাজ করিতেছেন। তিনি প্রবর্তক মাসিক-পত্রের সম্পাদক ও সুলেখক ছিলেন। তাঁহার ভাগবত-জীবন ও আদর্শ নিষ্ঠা সকলকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিত।

ডাক্তার অমলকুমার রায়চৌধুরী—

কলিকাতা আর-জি-কর মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল ও সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক অমলকুমার রায়চৌধুরী গত ৩০শে মার্চ সোমবার রাত্রিতে ৬৮ বৎসর বয়সে তাঁহার গিরিডির বাস ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। টাকীর সুপ্রসিদ্ধ বংশে ১৮৯২ সালে কলিকাতায় তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। ১৯১৪ সালে এম-বি পাশ করিয়া তিনি ১৯১৬ সালে হইতে আর-জি-কর মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছেন এবং ১৯১৫ হইতে ২ বৎসর প্রিন্সিপালের কাজ করিয়াছেন। তাঁহার ৪ পুত্র ও ৩ কন্যা বর্তমান—তাঁহার পত্নী ১৯৩৪ সালে পরলোক গমন করেন। কলিকাতার প্রাক্তন মেয়র শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। চিকিৎসক হিসাবে তিনি সুনাম ও বহু অর্থ উপার্জন করেন এবং পরে বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে কলিকাতার একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের অভাব হইল।

নেতাজী রাশিয়ায় জীবিত—

গত ৪ঠা এপ্রিল বর্দ্ধমানে যাইয়া এক সভায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অগ্রজ শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু বলিয়াছেন যে নেতাজী জীবিত আছেন ও রাশিয়ায় আছেন। তিনি শীঘ্র দেশে ফিরিয়া আসিবেন। সুরেশবাবু নেতাজী তদন্ত কমিটীর সদস্য ছিলেন এবং কমিটীর অপর ২জন সদস্যের সহিত একমত হইতে না পারিয়া পৃথক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। অগ্রজের মুখে ঘোষিত অনুজের সম্বন্ধে সংবাদ 'অসত্য' বলিয়া মনে করার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

সুন্দরবনে নূতন ৮টি থানা—

সুন্দরবন অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের জন্য ২৪ পরগণা জেলার মধ্যে সুন্দরবন অঞ্চলে নূতন ৮টি থানা প্রতিষ্ঠা করা হইবে। তন্মধ্যে গত ৩০শে মার্চ নিম্নলিখিত ৫টি স্থানে নূতন থানা (পুলিশ ষ্টেশন) খোলা হইয়াছে—হিঙ্গলগঞ্জ, পাথর প্রতিমা, গোসাবা, নামখানা ও বাসন্তী। পুলিশ-মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় ঐ সকল স্থানে যাইয়া থানা-গুলির কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়া আসিয়াছেন।

হুগলী নদীর ক্রমাবনতি—

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা রয়াল একস্‌চেঞ্জে বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজের বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতির ভাষণে শ্রীজে-ডি-কে ব্রাউন হুগলী নদীর ক্রমশঃ অবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং ফরক্কা বাঁধ নির্মাণ পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার দিবার জন্য আবেদন জানান। তিনি বলেন—এই বিষয়ে অতি দ্রুত কোন ব্যবস্থা করা না হইলে উত্তর-পূর্ব ভারত তথা সমগ্র ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের উপর উহার প্রতিক্রিয়া মারাত্মক হইতে পারে।—বিষয়টির গুরুত্ব কেন্দ্রীয় সরকার কেন উপলব্ধি করেন না, বুঝা যায় না। এ বিষয়ে সত্বর কাজ আরম্ভ করা না হইলে পশ্চিমবঙ্গের বিরাট দক্ষিণাংশ আবার অরণ্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। কলিকাতা সহর বা সুন্দরবন এলাকার উন্নতি-পরিকল্পনায় অর্থ ব্যয় করা সম্পূর্ণ নিরর্থক হইবে।

ভারতকে সাহায্য দান—

ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আমেরিকা, বৃটেন, কানাডা, পশ্চিম জার্মানী ও জাপান—৫টি দেশ সমবেত হইয়া অর্থ সাহায্য দান করিতে ব্যবস্থা করিয়াছেন। দ্বিতীয় পাঁচশালা ব্যবস্থার শেষ বৎসরে ৩০ কোটি ডলার ও তৎপূর্বে ৪০।৪৫ কোটি ডলার সাহায্য ভারত পাইবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় ভারতে যদি শতকরা ৩০ ভাগ মূলধন সংগৃহীত হয়, তাহা হইলে আমেরিকা বাকী অর্থ দিয়া ভারতে একটি নূতন ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবে। ভারত দ্রুত শিল্প ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইতেছে। এই কার্য্যে বিদেশী অর্থসাহায্য গ্রহণ করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। শিল্পসমৃদ্ধ ভারতের পক্ষে এই ঋণ শোধ করা অসম্ভব হইবে না।

নেতাজী জন্মদিবসে ছুটি—

গত ২৬শে জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে স্থির হইয়াছে যে প্রতিবৎসর নেতাজী শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন উপলক্ষে ২৩শে জানুয়ারী ছুটি ঘোষণা করা হইবে। এতদিন যে কেন এই ছুটী ঘোষণা করা হয় নাই, তাহা জানি না। আমরা বিশ্বাস করি, নেতাজী জীবিত আছেন ও যথাসময়ে তিনি আবার ভারতে আগমন করিবেন।

শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপির জন্য পুরস্কার—

গত ১লা মার্চ নয়াদিল্লীস্থ ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে, 'ভারতের ইতিহাস' সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপির জন্য বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীহরিরঞ্জন ঘোষাল ডি-লিট ৫ হাজার টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। জনপ্রিয় সাহিত্য প্রচারে উৎসাহ দানের পরিকল্পনা অনুসারে গত ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে ঐ পুরস্কার দানের কথা ঘোষণা করা হইয়াছিল। একজন বাঙ্গালী ঐ পুরস্কার লাভ করায় বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দিত হইবেন।

পশ্চিমবঙ্গে গৃহ নির্ম্মাণ—

দ্বিতীয় পাঁচশালা বন্দোবস্তের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে কারখানার শ্রমিকদের জন্য ৫০ লক্ষ ৯৫ হাজার ৪ শত টাকা ব্যয়ে ১০৩৮টী এক কক্ষ বিশিষ্ট ও ১৮৮টি দুই কক্ষ বিশিষ্ট বাসগৃহ নির্ম্মাণ করা হইবে। ইহার অর্দ্ধেক ব্যয় ভারত সরকার দান করিবেন ও বাকী অর্দ্ধেক ঋণ স্বরূপ ভারত সরকার হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ

করিবেন। দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে ১৩৩৬টী গৃহ নির্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছে ও ২৩৯০টী গৃহ নির্মিত হইতেছে। তাহা ছাড়া ১৬২২টী গৃহ নির্মাণের অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে। চন্দননগর গোরহাটীতে ও টিটাগড়ের পাতুলিয়ায় নূতন গৃহগুলি নির্মিত হইবে। শিল্পাঞ্চলে বাসগৃহ সমস্যা কতদিনে সমাধান হইবে বলা যায় না। নূতন বাড়ীগুলি হইলে দরিদ্র শ্রমিক পরিবার-গুলি যে উপকৃত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মেজর পি-বর্দ্ধন—

খ্যাতনামা সমাজ-সেবক নেতা মেজর পি-বর্দ্ধন গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১৮৯০ সালে কলিকাতা বৌবাজারে প্রসিদ্ধ বর্দ্ধন বংশে জন্মগ্রহণ করেন—তাঁহার পিতা কবি ও শিক্ষা-ব্রতী ছিলেন। ১৯১৪ সালে এম-বি পাশ করিয়া তিনি পারশ্য, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশে ৮ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম জীবন হইতে নিজেকে গঠনমূলক কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। ধর্মপ্রাণ ও পরহিতব্রতী বলিয়া তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

ইংরাজি ভাষা শিক্ষা—

একদল উগ্র জাতীয়তাবাদী লোক স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থার বিলোপ সাধনের কথা বলিয়া থাকেন। অবশ্য ভারতবর্ষে ভারতীয় ভাষাগুলির উন্নতিতে সাহায্য করা প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য; কিন্তু তাই বলিয়া এখনই ইংরাজি ভাষা শিক্ষা বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য হইবে না। গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ কে-এল-শ্রীমালিও ঐ কথাই বলিয়াছেন। সরকার সকল ক্ষেত্রেই আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদানের নীতি কমাইতে চাহেন না। যতদিন না আঞ্চলিক ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহ রচিত ও প্রকাশিত হয়, ততদিন উচ্চ বিভাগে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ইংরাজি ভাষা শিক্ষা অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলেও কর্মক্ষেত্রে ইংরাজীকে আরও কয়েক বৎসর আমরা বাদ দিয়া চলিতে পারি না। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যায় শিক্ষিতের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইলে ক্রমে তাঁহারা নিজেরাই ইংরাজি ভাষাকে বাদ দিয়া চলিবার ব্যবস্থা করিবেন।

বিদেশে 'পথের পাঁচালীর' সম্মান—

স্বর্গত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'পথের পাঁচালী' পুস্তকের চলচ্চিত্র সম্প্রতি আমেরিকা নিউ-ইয়র্কের একটি চিত্রগৃহে ৪ মাস কাল ধরিয়া দেখান হইয়াছে। সত্যজিৎ রায় উহার পরিচালক। বাঙ্গালীর এই গৌরব সকলকে আনন্দ দান করে। উহা ফিলাডেলফিয়া সহরে বহু সপ্তাহ দেখান হইয়াছে। ক্রমে উহা ভার্জিনিয়ার আটলান্টা, সেণ্ট লুইস, উইল কনসিন, সিন্সিনাটি, ওহায়ো, ওয়াসিংটন প্রভৃতি সহরে দেখানো হইয়াছে। মার্কিণ দর্শকগণ উহার শিল্পসমৃদ্ধি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। বাঙ্গালী লেখক ও বাঙ্গালী পরিচালকের এই অপূর্ব সৃষ্টি জগতের মানুষকে নূতন চিন্তার পথ দেখাইয়া নবজীবন দান করিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

শ্রীফটিক চট্টোপাধ্যায়—

কৃষ্ণনগর গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক শ্রীফটিক চট্টোপাধ্যায় বিশুদ্ধ গণিতে গবেষণা করিয়া এ বৎসর
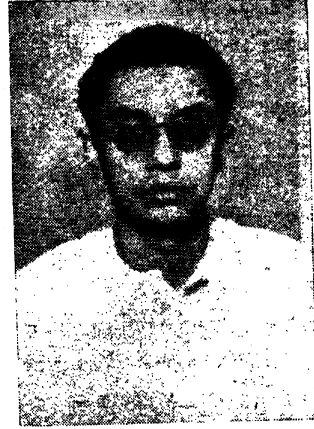
শ্রীফটিক চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-ফিল উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি একজন বিশিষ্ট সেতার-বাদক। তাঁহার গবেষণার বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত সুখ্যাতি করিয়াছেন।

মহাত্মাজীর পাদপীঠে—

কলিকাতা চৌরঙ্গী রোডে মহাত্মা গান্ধীর ব্রোঞ্জ মূর্তির আবরণ উন্মোচন সংবাদে গত পৌষমাসের ভারতবর্ষের সাময়িকীতে আমরা মূর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ ৪ লাইন লেখা উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। উহা পাঠ করিয়া আমাদের শ্রদ্ধেয় কবি-বন্ধু ডাক্তার কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত মহাশয় উহার নিম্নলিখিত যে কাব্যানুবাদ প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণকে উপহার দিতেছি—

"মৃত্যুর মর্মের মাঝে অধিষ্ঠিত অক্ষয় জীবন,
অসত্যের অন্তরালে ধ্রুব সত্য রয় সুগোপন।
তমসার গর্ভ-গৃহে রহে গূঢ় ভর্গ জ্যোতিষ্মান,
প্রাণে সত্যে আলোকে ও প্রেমে আবির্ভূত ভগবান॥"

বেলগড়িয়া গ্রামে উৎসব—

বেলগড়িয়া ২৪পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার একটি গ্রাম—তাহা ইছামতী নদীর অপর পারে অবস্থিত।
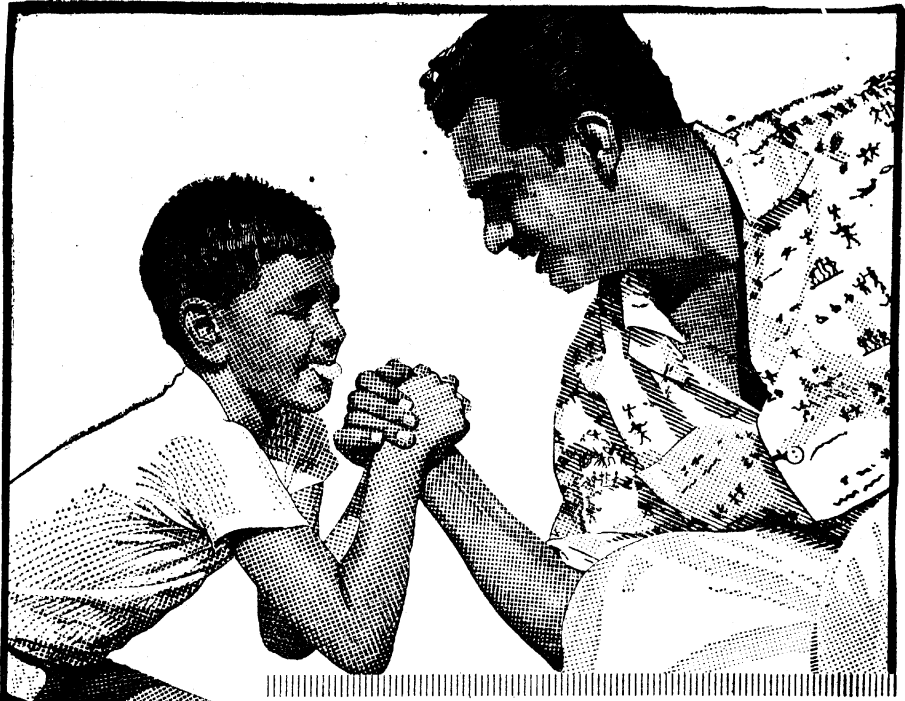
যাঁরা ভাল স্বাস্থ্য ভালবাসেন তাঁরা সবসময়
লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন
খেলাধূলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন আমরা কখনই ধূলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজানু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। লাইফবয় সাবান এই বীজানুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।
প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন— এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।
LIFEBUOY
FOR SAVING LIFE
FOR PRESERVATION OF HEALTH
SOAP
MADE IN INDIA FROM PURE VEGETABLE OILS ONLY
HINDUSTAN LEVER LIMITED
LIFEBUOY SOAP
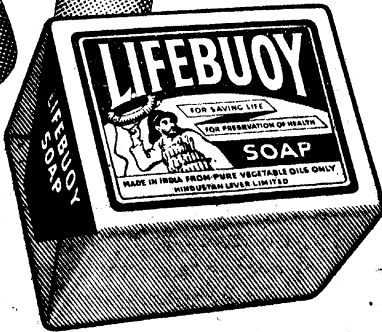
সম্প্রতি সেখানে স্থানীয় বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। তাহাতে শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতি ও অধ্যাপক শ্রীগুরুদাস ভট্টাচার্য্য ডি-ফিল প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন। গ্রামে সম্ভ্রান্ত অধিবাসী স্বর্গত হরিচরণ বসু গ্রামের বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য বহু জমী ও অর্থদান করিয়া গিয়াছেন—উৎসব উপলক্ষে গ্রামবাসীরা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে হরিচরণবাবুর এক চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া দাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। গ্রামের উৎসাহী কর্মীদিগের আগ্রহে ও চেষ্টায় গ্রামটিকে ক্রমশঃ শ্রীমণ্ডিত করার যে বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে, সমাগত অতিথিরা তাহাতে সন্তোষ ও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

বেলগড়িয়া গ্রামোৎসবে সম্মিলিত ব্যক্তিগণ

কাঁথি অঞ্চলে সংস্কৃত প্রচার—

খ্যাতনামা কোবিদ ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ও তাঁহার বিদুষী সহধর্মিণী ডক্টর রমা চৌধুরী মেদিনীপুর জেলায় সম্প্রতি ঘুরিয়া বহু চতুষ্পাঠী পরিদর্শন ও বহু পণ্ডিত সভায় যোগদান করিয়া আসিয়াছেন। ঐ অঞ্চলে তদুপলক্ষে যতীন্দ্রবিমল রচিত সংস্কৃত নাটক "মহাপ্রভু হরিদাসম্" অভিনীত হইয়াছিল। বহু পণ্ডিত সম্মিলনে ও ভক্ত সম্মিলনে শ্রীচৌধুরী ঘোষণা করিয়াছেন—সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পূর্বগৌরবের প্রতিষ্ঠার জন্য যতটুকু যত্ন ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, দেশবাসী তাহা করেন না। সংস্কৃত ভাষা যে চিরকাল সমগ্র ভারতের অধিবাসীদের ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা রূপে যোগসূত্রে একতাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, একথা আজ দেশবাসী ভুলিয়া গিয়াছে। সে কথা সর্বদা সকলকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া পণ্ডিত মণ্ডলীর একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীচৌধুরী ও তাঁহার সহধর্মিণী এ বিষয়ে একান্তভাবে চেষ্টা করিতেছেন, সে জন্য তাঁহারা শুধু সংস্কৃতানুরাগীদিগের নহে, দেশের সকলের কৃতজ্ঞতার পাত্র। প্রার্থনা করি, তাঁহাদের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য প্রচারের এ চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক।

লাস্যময়ী

হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

ক্লিটন একটা টেরি স্কালার উপহার দিয়েছে সুরেখা থাণ্ডেলওয়ালকে। লীলায়িত নৃত্যছন্দে ওর চরণের গতি যেন শিথিল না হয়। থাণ্ডেলওয়াল না বুঝলেও, সুরেখা বোঝে—কি চায় ক্লিটন। একদিন কথায় কথায় ক্লিটন বলেছিল, এল্‌কোহলে শরীরের ইলাস্টিসিটি কমিয়ে দেয়। মাস্‌ল্‌ যত হেল্‌থি হয়, স্কিন তত মসৃণ থাকে। গঠনের চার্ম তোমার কমবে না কোনদিন, যদি রোজ সকালে পনোরো থেকে বিশ মিনিট স্কালারে গা ঢেলে হাত-পা গুলো স্ট্রেচ করে নাও। কিন্নরী তুমি। অনবদ্য তোমার দেহসৌষ্ঠব।...আই মিন্‌, থাইজ এণ্ড বাটক্‌স্‌।...ক্লিটন ইতস্তত করেছিল।

থাণ্ডেলওয়াল হয়তো সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার চেয়েছিল সুরেখার মুখপানে। কিন্তু সুরেখা দৃকপাত করেনি। বিস্ফারিত চোখ দুটো তুলে ধরেছিল ক্লিটনের মুখের ওপর! মুহূর্তে স্নায়ুগুলো চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। একটা অনাস্বাদিত শিহরণের স্রোত বয়ে গিয়েছিল ওর সারা দেহে।

উন্মত্ত জলস্রোতের ধারালো আঘাতে তটভূমিতে যখন ভাঙন ধরে, বাঁশের পিন দিয়ে আটকানো যায় না এলা মাটির পতনোন্মুখ ভিত্তি। স্রোতের আঘাতে নিঃশব্দে ছিন্ন হয়ে যায় বসুন্ধরার দৃঢ় বন্ধন। অতলের আকর্ষণে নুয়ে পড়ে তৃণশ্যামল তটভূমি। অলক্ষ্যে শিথিল হয়ে আসে রম্য-বীথিকার সুপ্ত পরিবেশ। ভেঙে পড়ে। গ্লেসিয়ারের টানে বরফের সাতরঙা পাহাড় আলোর বাঁধন ছিঁড়ে উল্কার মত ছুটে যায় অন্ধকার গহ্বরের অজানা পথে।

রেখা!

থাণ্ডেলওয়াল।

তুমি—

কি বলতে গিয়ে থাণ্ডেলওয়াল থেমে যায়—ইতস্তত করে সুরেখার মুখ পানে এক নজর চেয়ে।

কি?

কিছু না।

কিছু না, নয়। কিছু—অনেক কিছু। বলো, থামলে কেন?

থামেনি। থাণ্ডেলওয়াল চেষ্টা করছিল কথাটাকে আভাসে-ইঙ্গিতে রূপ দিতে। সামনা-সামনি সহজ করে বলবার সাহস তার ছিল না।

সুরেখা জানে থাণ্ডেলওয়াল কি বলতে চায়। লিমন কুলপির স্লাইসের মত এক চিলকে ঠাণ্ডা হাসি ঠোঁটের আগায় তুলে ধরে বলে: ক্লিটনের আসা-যাওয়া তোমার ভালো লাগে না। এই তো?

না—না, আমি তা বলিনি।

তবে?...সুরেখা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চায় থাণ্ডেলওয়ালের চোখে চোখ রেখে। চোখের দৃষ্টিটা ধীরে ধীরে বদলে যায়, সূর্যের আলোর দিকে আস্তে-আস্তে ঘুরিয়ে ধরলে যেমন করে তেপল আতশী কাচের রঙ বদলায়—বিচিত্র হয়ে ওঠে বর্ণাঢ্য আকর্ষণ, তেমনি করে বদলে যায় সুরেখার চোখের দৃষ্টি। এ দৃষ্টিতে থাণ্ডেলওয়ালের মনের পাখায় জিয়ালার আঠা জড়িয়ে যায়। মন ওর উড়তে গিয়ে হঠাৎ বন্দী বিহঙ্গের মত ছটফট করে। নিষ্ক্রিয় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। কি বলবে ভেবে পায় না।

সুরেখা মুখ টিপে হাসে।...টুইটেল ডি!...শবদেহকে যে মন আঁকড়ে ধরে থাকে, সে মন মায়ের। প্রিয়ার নয়।

ওর কথার তাৎপর্যটুকু থাণ্ডেলওয়াল ঠিক বোঝে না। না বুঝলেও অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, সুরেখা জংলা পাখীকে শিস দেওয়ার মত ওর আদিম অনুভূতিকে

চিয়ান দিয়ে দাঁড়ে বসাতে চাইছে। মনটা ঘুরঘুর করে, কিন্তু মুখে ফুটে বলতে পারে না কিছু।

খাণ্ডেলওয়াল!

বলো।

ক্লিটন যেদিন ওই স্কালারটা এনে দিয়েছে, সেই দিন থেকে তুমি হয়েছ কেমন উন্মনা। ওদের দেশে যারা বরফের পিছল পথে ঘোষনৃত্য করে তনু আর অতনুর ছিনিমিনি খেলে, স্কালার তাদেরই জন্যে।···টাকা খরচ করেছে ক্লিটন, ফলভোগ করবে খাণ্ডেলওয়াল।

মনের আতঙ্ক কাটে না। সুরেখার কথায় কোন হেঁয়ালি নাই। তবুও খাণ্ডেলওয়াল কেমন বিমূঢ় হয়ে যায়। ক্ষণকাল মৌন দৃষ্টিতে সুরেখার মুখপানে চেয়ে থেকে বলে: রেখা। টাকা আমার ফুরিয়েছে। আজ আর খোয়াব নাই।

জানি।···মৌ ফুরিয়ে গেলে ফুলের পাপড়ি আপনি ঝরে পড়ে। বোঁটার বাঁধন আল্‌গা হয়ে আসে। জোর করে এলনো পাপড়িকে আটকে রাখা যায় না।

ওদের কথা শেষ হওয়ার আগেই হঠাৎ ক্লিটন এসে উপস্থিত হলো সিঁড়িতে দ্রুতপায়ের প্রতিধ্বনি তুলে।

সুরেখা এগিয়ে যায়। হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে ক্লিটনকে: গুড ডে, মিস্টার ক্লিটন!

গুড ডে: ক্লিটন হাতখানা বাড়িয়ে দেয়।

খাণ্ডেলওয়াল ওঠে না। স্থানুর মত বসে থাকে ওদের দিকে চেয়ে। মরা একটুকরো হাসি ফুটে ওঠে মুখে। নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে সোফাটার দিকে হাত চিতিয়ে বলে: আইয়ে সাব।···গুড মর্নিং!

মর্নিং!···ক্লিটন হাত-পা ছড়িয়ে বসে।

চলো। জামা-কাপড় বদলে নাও। ডায়মণ্ডহারবার থেকে ঘুরে আসি। মিস্টার ক্লিটন নতুন গাড়ী কিনেছেন। আমাদের কম্পানি চান।

সুরেখা ফিরে দাঁড়ায় খাণ্ডেলওয়ালের দিকে। কণ্ঠস্বরে পর্য্যাপ্ত মমতা মাখিয়ে বলে: ওঠ, লক্ষ্মীটি, দেরী ক'রো না।···হি ইজ নাইস্! রিয়ালি নাইস্!

তোমরা যাও: খাণ্ডেলওয়াল ইতস্তত করে।···অনেক কাজ আমার।

আই'ম সরি: ক্লিটন ঘাড় নাড়ে।

অপেক্ষা না ক'রে খাণ্ডেলওয়াল উঠে যায় পাশের ঘরে।

সুরেখা আর দ্বিতীয় কথা বলে না। একবার তির্যক দৃষ্টিতে খাণ্ডেলওয়ালের মুখপানে চেয়ে পোষাকের ঘরে গিয়ে ঢোকে স্যুট বদলাতে।

একা বসে ক্লিটন চাবির চেনটা ঘুরিয়ে আঙুলে জড়ায় আর খোলে। কেমন একটা থমথমে নীরবতা যেন মুহূর্তে ওদের মাঝখানে ব্যবধানের কালো যবনিকা টেনে দিয়েছে।

ক্লিটনের কানে রিমরিম করে সুরেখার মিষ্টি কথার তরঙ্গগুলো: হি ইজ নাইস্!···রিয়ালি নাইস্।···বটে, শি ইজ মোর নাইস্!···এ চার্মিং লেডি।

দীর্ঘক্ষণের জমাট-বাঁধা নীরবতা দু'পায়ে ঝন ঝন ক'রে ভেঙে দিয়ে সুরেখা চঞ্চলপদে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মালাবারি সিল্কের ফিকে জাফরাণি শাড়ির আঁচলটা পিঠের ওপর উড়িয়ে: এক্সকিউজ মি, মিস্টার ক্লিটন। অনেক-ক্ষণ বসিয়ে রেখেছি; না?

নো—নো: ক্লিটন চোখ ভরে চেয়ে থাকে সুরেখার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে।

হাল্‌কা সাফ্রণ রঙের আওতায় সুরেখার নিটোল দেহটা যেন প্রদীপের শিখার মত দপদপ ক'রে জ্বলে। সুরেখা জানে কেমন করে দূরে দাঁড়িয়ে পুরুষের মনে নেশা ধরাতে হয়। জানে, কেমন ক'রে হাতের কাছে থেকেও নাগালের বাইরে নিজেকে ধরে রাখতে হয়। তাই পুরুষের চোখে সুরেখা পুরানো হয় না।

স্পীড! ম্যাক্সিমাম স্পীড দেবে আজ মিস্টার ক্লিটন। বেঁচে থাকা মানেই স্পীড। তার চেয়েও বেশী স্পীডের ভিতর দিয়ে মরণকে আমি চাই। যে স্পীডে নিজেকে ধরে রাখা যাবে না। উল্কার বেগে ছুটে গিয়ে ছিটকে পড়বো এক পৃথিবী থেকে অন্য পৃথিবীতে। একদল মানুষ হাহাকার করবে, আর একদল কাড়াকাড়ি করবে বিবস্ত্র দেহটা নিয়ে।

ক্লিটন হাসে। বাঙলা বলতে না পারলেও, সুরেখার কথার তাৎপর্য বুঝতে ওর অসুবিধা হয় না।···হাসির রাশ টেনে প্রশংসা মিশিয়ে বলে: এ ডিনামিক ফোর্স! এ্যান্ এমবডিমেন্ট অব প্লেজার!

কথাগুলো খাণ্ডেলওয়ালের কানে যায়। কিন্তু কোন উত্তর সে দেয় না। নিজেকে যেন জোর করে বেঁধে রাখে হিসাবের খাতায়।

খাণ্ডেলওয়াল!

খাণ্ডেলওয়ালের ঘরে একবার উঁকি দিয়ে সুরেখা বেরিয়ে যায় ক্লিটনের সঙ্গে। সিঁড়ির কাছে গিয়ে বয়কে ডেকে বলে: বাবুকে সময়মত খাইয়ে দিও। ফিরতে আমার দেরী হবে।…হয়তো আজ না ফিরতেও পারি।

কথাগুলো কেটে কেটে বললেও সুরেখা যেন ইচ্ছা ক'রেই ছুঁড়ে দেয় খাণ্ডেলওয়ালের ঘরের দিকে।

তবুও নিস্তব্ধ। কোন শব্দ নাই, কোন প্রত্যুত্তর নাই।

ওরা বেরিয়ে গেল।

ক্লিটনের পেশিতে পেশিতে কেমন একটা উন্মাদনা। সুরেখার শিরা-উপশিরায় চঞ্চলতা। চঞ্চলতা ওর সহজাত স্ফুরণ। নিষ্ক্রিয় হয়ে বাঁচতে ও জানে না। পারে না একটী মুহূর্তও গতিহীন হয়ে থাকতে।

ঝড় বয়ে যায় খাণ্ডেলওয়ালের জীবনে। ব্যবসায় মন্দা পড়েছে। চারিদিকে দেনা, পাওনাদারের ভিড়। ফাটকার খেসারৎ মিটাতে অনেক টাকার হুণ্ডি কেটেছে চোপরার কাছে।

সুরেখা সেই যে বেরিয়েছে ক্লিটনের সঙ্গে ডায়মণ্ড-হারবার ভ্রমণে, তারপর আর বাড়ী ফেরেনি।…তিন-চার-পাচ-ছয়…একে একে সাতটি দিন কেটে গেল। চোপরা মাঝে মাঝে ওদের খবর নিতে আসে। ওর প্লাস্টিক কারখানার নতুন পরিকল্পনা মাঝপথে বাধা পেয়েছে ক্লিটনের আকস্মিক অনুপস্থিতিতে।

শঙ্কিত দৃষ্টিতে খাণ্ডেলওয়ালের মুখপানে চেয়ে চোপরা জিজ্ঞেস করে: পেয়েছ কিছু খবর?

না। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে খাণ্ডেলওয়াল প্রসঙ্গটার মোড় ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করে: লোহার বাজার বহুৎ মন্দা। কালসে—

খাণ্ডেলওয়ালের মনের অবস্থা যে চোপরা বোঝে না, তা নয়। তবুও কথাটাকে ফিরিয়ে এনে বলে: থানে দেও।…এক্সিডেণ্ট হয়নি তো?

নেহি: দ্বিধাহীন কণ্ঠে খাণ্ডেলওয়াল জবাব দেয়।

চোপরা অপেক্ষা করে না। বিদায় নিয়ে চিন্তিত মনে বেরিয়ে যায়।

বুধবার সকালে ব্যস্তসমস্তভাবে চোপরা এসে উপস্থিত হলো একখানা টেলিগ্রাম হাতে। কাশ্মীর থেকে ক্লিটন তার করেছে পনের দিনের ছুটি চেয়ে।

দেখিয়ে: চোপরা টেলিগ্রামখানা এগিয়ে ধরলো খাণ্ডেলওয়ালের দিকে। কিন্তু খাণ্ডেলওয়াল হাত বাড়ালে না। চোপরার মুখপানে চেয়ে অস্ফুট স্বরে বললে: প্লেজারট্রিপ।

তাই। তবে প্লেজারটা শেষ পর্যন্ত বজায় থাকলে হয়।

চোপরা হাসে, কিন্তু খাণ্ডেলওয়ালের হাসি কেমন যেন শুকিয়ে ওঠে তালুর কাছাকাছি এসে। ভালো লাগে না। একতিলও আর ভালো লাগে না ওর। সুরেখা আজ চিতি সাপের মত লেজ জড়িয়েছে ওর গলায়। শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। ওর সারা অন্তর ছটফট করে সুরেখার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। কিন্তু সে মুক্তির পাশ সুরেখার হাতে। খাণ্ডেলওয়ালের হাতে নয়। সে নাগপাশ থেকে মুক্তি দিতে পারে সুরেখা নিজে। খাণ্ডেলওয়াল ইচ্ছা করলেও ছিঁড়ে ফেলতে পারে না তার বন্ধন। বোম্বা কনস্ট্রীক্টার!

খাণ্ডেলওয়াল চেয়েছিল বিয়ের একটা দলিল রেজে-ষ্টারি করতে। কিন্তু সুরেখা রাজী হয়নি। একই সোফায় পাশাপাশি ব'সে মাথাটা খাণ্ডেলওয়ালের ঘাড়ে হেলিয়ে দিয়ে বলেছিল: যাকে ভালবাসি তার সঙ্গে ঠিকেদারি করতে আমি রাজী নই।

ঠিকেদারি! তার মানে?

টম্! এই সামান্য কথাটুকুও বোঝ না?

খাণ্ডেলওয়াল সত্যি বোঝেনি। বুঝবার মত তীক্ষ্ণতা তার ছিল না। হয়তো ভাবতেও জানতো না সবকিছু, সুরেখার মত ধারালো বুদ্ধি নিয়ে।

আধফোটা পদ্মের মত ঠোঁটের পাপড়িদুটো মেলে ধরে সুরেখা বলেছিল: তিন আইনের বিয়ে মানে তো কন্‌ট্রাক্ট। আইনের ফাঁসে দেহকে হয়তো বেঁধে রাখা যায়। কিন্তু মনকে বাঁধা যায় না।

খাণ্ডেলওয়ালের মন তৃপ্তিতে ভরে উঠেছিল। ওর

সবটুকু অস্তিত্ব যেন মুহূর্তে বিলীন হয়ে গিয়েছিল সুরেখার ব্যাপ্তিতে।···রেক্-থা!

খাণ্ডেলওয়ালের আঙুলগুলো হাতের মুঠোয় চেপে ধ'রে সুরেখা নিদ্রাতুর চোখে চেয়েছিল খাণ্ডেলওয়ালের মুখপানে।

ওদের বিয়ে হয়েছিল হিন্দুমতে। খাণ্ডেলওয়াল না জানলেও, সুরেখা ভালো করেই জানতো যে, বাঁধন ছিঁড়বার সুযোগ খাণ্ডেলওয়ালের কমে গেল অনেকখানি। কিন্তু সুরেখার কোনদিনই অসুবিধা হবে না ওকে দূরে সরিয়ে দিতে।

পুরানো কথাগুলো তোলপাড় করছিল খাণ্ডেলওয়ালের মনে।

অনেকক্ষণের নীরবতা কাটিয়ে চোপরা বললে: পনের-দিনের ছুটি। দোসরা টেলিগ্রাম আসবে বোম্বাই থেকে। তারপর?

চোপরার কথায় উত্তাপ ছিল না। তবুও যেন মুহূর্তে চনচন করে উঠলো খাণ্ডেলওয়ালের মগজটা। ক্ষণকাল নীরব থেকে নিজেকে সংযত করে নিয়ে বললে: শেষ টেলিগ্রাম আসবে লণ্ডন না-হয় অষ্ট্রেলিয়া থেকে। নয় একটা ফিরিঙ্গী বংশ জন্মাবে আবার।

সমবেদনার এক টুকরো পাণ্ডুর হাসি খেলে গেল চোপরার মুখে। খাণ্ডেলওয়ালের পিঠে হাত রেখে ঘাড় নেড়ে বললে: কুছ হরজা নেই ভাইসাব।

চোপরা বসলো না। টেলিগ্রামখানা পকেটে ভরে নমস্কার জানালো খাণ্ডেলওয়ালকে।

হাত দুটো তুলে খাণ্ডেলওয়াল অভিবাদন করে উঠে দাঁড়ালো। অজস্র কথা এসে ভিড় করেছিল ওর মনে। কিন্তু বলা হলো না। কেমন একটা গুরুভার জড়তায় কণ্ঠস্বরটা যেন রুদ্ধ হয়ে গেল।

শনিবার বিকেলের ডাকে খাণ্ডেলওয়ালের হাতে এসে পৌছলো সুরেখার একখানা চিঠি। চিঠি সে আশা করেনি তা নয়। তবুও যেন আজ সে সইতে পারছিল না সুরেখার এই চিঠি। চিঠি নয়, এ হয়তো ডিনারের শেষে বাসি পাউরুটির একটা টুকরোর মত এক কণা করুণার দান সুরেখা ছুঁড়ে দিয়েছে পিছনের জানালা দিয়ে। খাণ্ডেল-ওয়ালকে সে করেছিল অনুগ্রহ। সেই অনুগ্রহের বোঝা আজ দুঃসহ হয়ে উঠেছে খাণ্ডেলওয়ালের কাছে।

অনেকবার নাড়াচাড়া ক'রে চিঠিখানা হাতে নিয়ে খাণ্ডেলওয়াল এসে দাঁড়ালো বাইরের বারান্দায়।

সূর্য তখন মহানগরীর সৌধকিরীট অতিক্রম ক'রে সীমান্ত রেখায় নেমেছে। প্রাসাদের গা ছাড়িয়ে দীর্ঘায়তন ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে পথে ও ফুটপাতে। কর্মশ্রান্ত মানুষগুলা পিঁপড়ের মত পিলপিল ক'রে বেরিয়ে আসে বিবর ছেড়ে।

খাণ্ডেলওয়াল চিঠিখানা খুলে ধরলো চোখের সামনে। ···হাঁ। চিঠি সুরেখাই লিখেছে। হাতের লেখার ছাঁদ কোথাও এতটুকু বদলায়নি। ঠিক তেমনি আছে আগা-গোড়া। বদলে গিয়েছে শুধু সুরেখা নিজে। তিল তিল করে সরে গিয়েছে তার নাগালের বাইরে।···নাগাল! নাগাল কি সে পেয়েছিল কোনদিন! সুরেখা হয়তো দুদিনের জন্যে করেছিল অনুগ্রহ। সে অনুগ্রহ পেয়ে খাণ্ডেলওয়াল হয়েছিল ধন্য। কৃতার্থ হয়েছিল ওর সারা অন্তর। কিন্তু আজ?

না-না-না।···বদলায়নি রেখা। বদলাতে সে পারে না। খাণ্ডেলওয়ালের জন্যেই তো সে ছেড়েছিল তার আত্মীয়-স্বজন সমাজ।···ক্লিটনকে হয়তো তার ভালো লাগে। ভালো লাগে চঞ্চলতা। তাই মাঝে মাঝে ছিটকে যায় দমকা বাতাসে হেলোনিয়াসের ফুলছড়ির মত। নিজেকে বেঁধে রাখতে পারে না।

ক্লিটন! সেন্‌সিবল্ লোক হলে করতো না এই হঠকারিতা। কিংবা সুরেখার ঝোঁককে সে এড়িয়ে যেতে পারেনি। সুরেখা ঝড়ের ঝাপটায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে ক্লিটনকে গন্ধমাতাল পতঙ্গের মত। অপরাধ সুরেখার নয়। ক্লিটনেরও হয়তো ছিলনা কোনও দোষ।

রেখা লিখেছে। লিখেছে আনন্দের উচ্ছ্বাসে মনের কপাট খুলে। অস্বীকার তো সে করেনি খাণ্ডেলওয়ালকে!

লিখেছে: আমি জানি, জানি তুমি কষ্ট পেয়েছ অনেক। মনে তোমার ঝড় বয়ে গেছে আমায় নিয়ে। তবু এ-কথাও জানি যে, আমার ওপর রাগ করে থাকতে তুমি পারো না। আমি দূরে সরে এলে তোমার প্রতিটী মুহূর্ত শূন্যতায় ভরে ওঠে। বাইরের জগতে তোমার অটল

প্রতিষ্ঠা থাকলেও গৃহে তুমি একাকী অচল ; শিশুর মত অসহায়।

তুমি তো জানো। পথের নেশা যখন পেয়ে বসে, নিজেকে ধরে রাখতে আমি পারি না। দূর আমাকে হাতছানি দেয়। পিছনের টান শিথিল হয়ে আসে। মনে হয়, বাতাসে ছড়িয়ে দিই নিজের সবটুকু অস্তিত্বকে। ভেসে যেতে ইচ্ছা করে পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে—যেখানে মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি কোনদিন।

ডায়মণ্ডহারবারের পথ আমার চেনা। হাজার বারের আসা-যাওয়ায় পুরাণো হয়েছে তার প্রতিটি বাঁক, গাছ-পালা, মানুষ-জন, পশু-পাখী। তাই বাড়ী থেকে বেরিয়েই ক্লিটনকে বলেছিলাম গাড়ী ঘুরিয়ে নিতে। আমারই ইচ্ছায় গাড়ী ডায়মণ্ডহারবার রোড না ধরে ধরেছিল এসে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড।...তারপর! তারপর সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসে হাজির হয়েছি ভূস্বর্গ কাশ্মীরে।

মিস্টার ক্লিটন বিদেশী লোক। অদ্ভুত ভদ্রতাবোধ! এতখানি পথ পাশাপাশি বসে এসেছি। কিন্তু একটী মুহূর্তের জন্যেও বিব্রত বোধ করিনি। নিতান্ত সহজভাবে সঙ্গ দিয়েছেন বন্ধুর মত। ঢালু পথে নামবার সময় স্পীডের ওপর যে কয়েকবার গাড়ী ব্রেক করতে হয়েছে, মিস্টার ক্লিটনই বিব্রত হয়েছেন আমার অসাবধানতায়। মিষ্টি হেসে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন সতর্কতার সঙ্গে।

অভিমান করে যেন নিজেকে অবহেলা ক'রো না। সুখদেওকে অনেকদিন বলেছি—শিখিয়েছি তুমি কি ভালোবাসো আর বাসো না।

এখানে এসে উঠেছি একটা হোটেলে। একই ঘরের দুপাশে দু-খানা স্প্রাং কট। সারাদিন ঘুরে বেড়াই হিমালয়ের অপূর্ব রূপ আর প্রকৃতির অফুরন্ত সম্পদ দেখে। ভুলে যাই বাইরের পৃথিবীটাকে। রাত্রের নিস্তব্ধ প্রহর কাটে নানা কথায়। ক্লিটন বলে তার ছেলেবেলার কথা —ইংলণ্ডের পল্লীজীবনের ইতিহাস। আর আমি বলি আমার স্কুলের কথা, কলেজ জীবনের কাহিনী। বিচিত্র অনুভূতির ভিতর দিয়ে কাটে সারাটি রাত।...গিয়ে শোনাবো তোমায় রাত্রি-দিনের গল্প।

চিঠিটা শেষ করা হলো না। চোখের সামনে অক্ষর-গুলো যেন কেমন কুণ্ডলী পাকিয়ে গায়ে গায়ে জড়িয়ে যায়। অসমাপ্ত চিঠিখানা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে থাণ্ডেলওয়াল শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে বাইরের দিকে।

রাস্তার ওপারে বাদাম গাছটার ডাল-পালায় নেমেছে সন্ধ্যার ছায়া। পথের আলো তখনো জ্বলেনি।

চায়ের পেয়ালা হাতে বয় এসে দাঁড়ালো থাণ্ডেল-ওয়ালের পাশে। সঙ্কোচের সঙ্গে ক্ষণকাল মুখপানে চেয়ে থেকে বললে : বাবুজি, চায় পানি।

নেহি : ক্ষিপ্রপদে থাণ্ডেলওয়াল সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

ফটকটা পার হয়ে নীচে এসে দাঁড়িয়েছে শিপ্রা—মিস্ শিপারিণ...পিছনে বালকৃষ্ণণ। ক্রমশঃ
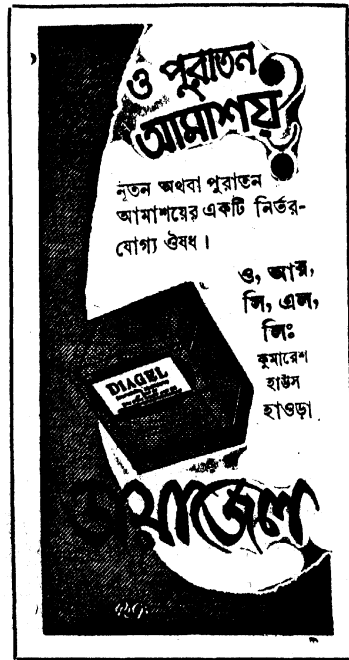
মাতৃ-বাৎসল্যের রূপায়ণে কবিশেখর

অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রোত্তর প্রধান কবিবৃন্দের মধ্যে যিনি আজও বাংলার কাব্য-কাননে বনস্পতির ন্যায় বিস্তৃত [illegible] আপনার স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করিতেছেন, রবীন্দ্র প্রভাবিত হইয়াও যিনি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত, যাঁহার কবিতার ক্ল্যাসিক্যাল গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে শরতের শেফালির শুচিশুভ্র মাধুরী ও কমনীয়তা প্রকাশিত—তিনি হইতেছেন অসামান্য হৃদয়-মাধুর্য্যের অধিকারী কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়। কবিশেখর একান্তভাবেই মাতৃ-বাৎসল্যের কবি।

বাংলাদেশ মাতৃ বাৎসল্যের দেশ। এদেশের সাহিত্যের একটি ধার যশোদা, মেনকা ও শচীমাতার অশ্রু জলে পুষ্ট হইয়া ত্রিধারা গঙ্গার ন্যায় উৎসারিত হইয়াছে। এই ধারাই মাতৃ-বাৎসল্যের ধারা। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যকে এই প্রবাহই স্তন্যরস দান করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে কবিবর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার 'মহিলা' কাব্যগ্রন্থে মাতৃস্তব রচনা করিয়াছিলেন। তারপর দেশমাতৃকার আবির্ভাবের পর রক্ত-মাংসের গর্ভধারিণী মানবী মাতার কথা কবিতায় আর বড় দেখা যায় না। দেশ-জননীর মহিমা কাব্য-সাহিত্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের রচনায় ভারতীয় সাহিত্যের কোন ধারাই বাদ পড়ে নাই—কাজেই অনেক রচনায় মাতৃ-মমতার কথা আছে—তবে প্রাধান্যলাভ করিবার অবসর পায় নাই।

রবীন্দ্রোত্তর কাব্য-ধারায় শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিকের রচনায় মাতৃ-বাৎসল্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। পরে আর কোন কবি কবিতায় জননীকে তাঁহার প্রাপ্য-আসন দেন নাই। অবশ্য কবিশেখরকে বাদ দিয়েই এ কথা বলিতেছি। এ যুগের কবিগণ নিশ্চয়ই ম্যাকডাফ বনিয়া যান নাই—নিশ্চয়ই মাতৃস্তন্যে লালিত। কিন্তু কই, বাৎসল্য-রসের কবিতা তো তাঁহাদের লেখনীতে প্রসব করে না!

এ যুগে একা কবিশেখর কালিদাস রায় জননীর মহিমা ও মাধুর্য্যকে কবিতার একটি প্রধান উপজীব্য করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে আমি সে বিষয়ে আলোচনা করিব—আর কাহারও জন্য না হউক বাংলার মায়েদের জন্য।

কবিশেখর মাতৃ-জীবনের ভক্তিস্নাত শুচিতার কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

> সন্তান বিধির দান, কামনার কালীদহে
> পঙ্কজ ফুটায়;
> শূন্য তাহা রয় নাক, কমলা দয়িত নিজে
> বিরাজেন তায়।

'মাতৃহৃদয়' নামক কবিতায় বলিয়াছেন—

> সত্য তোমা চেনে যদি কেহ
> তবে সে জননী ছাড়া কেহ নয়। মা'র পুণ্য স্নেহ
> নিশিদিন পরিষিক্ত করিতেছে তোমার চরণ
> সন্তানে সোহাগ তার সে ত প্রভু তোমার স্মরণ।
> একই নিয়ম, বিধি প্রকৃতির এ বিশ্বভুবনে,
> সঞ্চারিছে স্তন্য-ধারা স্তনে তার ; ভক্তি ধারা মনে।

* * * *

> সন্তান যাহার নাই এ সংসারে সেই তোমা ভোলে।

কবিশেখর 'স্বর্গাদপি গরীয়সী'র ব্যাখ্যা দি.া বলিয়াছেন—

> স্বর্গে যা' নাই তাও মিলিয়াছে। মায়ের স্নেহ
> পেয়েছি হেথায় অগাধ, অবাধ, অপরিমেয়।
> হেথা বৎসলা ধরণী শ্যামলা বক্ষ চিরি'
> অন্ন বিলিয়ে রেখেছে বাঁচায়ে আঁচলে ঘিরি'।
> প্রকৃতি মা হেথা ভরি' ফুলে ফুলে ছয় ফুলের ডালা,
> কণ্টক-ব্যথা সহিয়া কণ্ঠে পরায় মালা।
> হেথা নদী মাতা সহি কঙ্কর উপল-পীড়া
> আমারি জীবন জুড়াতে সতত স্নিগ্ধ নীরা।
> গগন-জননী বজ্রে ধমনী—গ্রন্থি ছিঁড়ে
> অবিরল হেথা মাতৃ-মমতা বরিষে শিরে।
> মাতৃ-মহিমা-মণ্ডিতা হেথা সরস্বতী
> জ্ঞান জীবনের পথে দিয়াছেন ঊর্দ্ধগতি।
> স্বর্গে রে মোর মর্ত্যজননী গিয়াছে জিতে,
> নেই কোন ক্ষোভ, স্বর্গের লোভ নেই এ চিতে।

এইরূপ মাতৃত্বের Pantheism তাঁহার বহু কবিতাতেই মিলে। রবীন্দ্রনাথের পর মাতা বসুন্ধরার মাতৃ-মাধুর্য্য কবিশেখরের কবিতায় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'ধরণীর প্রতি' কবিতার কিয়দংশ ইহার সাক্ষ্য হিসাবে তুলিয়া দিই—

> লক্ষ লক্ষ যুগ ধরি রে জননি এই বক্ষে তোর
> আসা-যাওয়া মোর।
> বার বার ফিরে এসে বাড়ায়েছি তোর বক্ষোভার
> সেই ভার জমে জমে হলো কি মা পর্ব্বত পাহাড়?
> বার বার শুষিয়াছি তোর স্তন্যধারা
> সে শোষণ রচিল কি শুষ্ক তালু বালুর সাহারা?

* * * *

আনন্দ দিয়েছি তোরে শিশু যবে। কত না সময়
ভাবে হাসে তা'ত মিথ্যা নয়।
তারই স্মৃতি মা কি তোর মাঝে মাঝে মনে জেগে উঠে?
রোমাঞ্চিয়া হয় তৃণ, তাই বুঝি ফুল হ'য়ে ফোটে?

* * * *

বহুদিন জমা দীর্ঘশ্বাস তোর মুক্তি পেয়ে
কাল বৈশাখীর রূপে আসে বুঝি ধেয়ে।
গেলাম বিদায় নিয়ে বার বার। হায়, তারি শোকে
অবারিত অশ্রু-ধারা ঝরেছে ও চোখে।
তোর চোখ-ঝরা সেই লবণাক্ত জল
মহাসিন্ধু হ'য়ে বুঝি তোরে ঘেরি' করে টলমল?

আর একটি কবিতায় জননী বসুন্ধরার মাতৃরূপ কী অপূর্বই না ফুটিয়াছে! মাতা বসুধা কবিকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—বৎস, ফুলেফলে আলো-করা কুঞ্জবন দেখেছ, তটিনী বক্ষে পণ্য ভরা লক্ষ তরণী দেখেছ, সোনার ধানে ভরা প্রান্তর দেখেছ, 'ফলভারে অবনত আম্র-কদলীবন দেখেছ—দূর দিগন্তে গিরিশ্রীতে আমার এলায়িত কুন্তল দেখেছ; কিন্তু বহুযোজন জুড়ে যে মরুভূমি ধু ধু করছে, গিরিশিখরে যে চির হিমানীর ভার, তা' তো দেখনি; আফ্রিকার রবিকররোধী শ্বাপদ-সংকুল বনভূমি দেখনি—

দেখনি অগ্নিগিরির কটাহ বিদীর্ণ জ্বালানলে
যেথা অবিরত পঞ্জর মোর 'লাভা' হ'য়ে দ্রুত গলে।
দেখেছ মায়ের হাসিমুখ আর হাতের ব্যজনী-খানি,
পিয়েছ স্তন্য, পেয়েছ অন্ন শুনেছ সোহাগ-বাণী।
দেখনি মায়ের ক্লান্ত করুণ নয়ন দীপ্তি-হারা।
দেখনি মায়ের শুকানো বদন লুকানো প্রপাত-ধারা।
ভয়ে ভাবনায় কত উদ্বেগে পরাণ তাহার জ্বলে,
দহিতেছে, তার আরাম বিরাম দাবানলে লাভানলে।
জাননা বৎস কেবল তোমার হাসিমুখখানি দেখে
আনন্দময়ী সেজেছে জননী সকল বেদনা ঢেকে।

প্রবন্ধের প্রারম্ভেই আমি বলিয়াছি—বাংলাদেশ মাতৃ-বাৎসল্যের দেশ। কবি তাহারই অপূর্ব ব্যাখ্যা দিয়াছেন 'মেনকা' কবিতায়—

মা মেনকা নগাধিরাজ হিমালয়ের রাণী। কিন্তু মা হইয়া বড় দুঃখিনী। একমাত্র পুত্র মৈনাক ইন্দ্রের বজ্রভয়ে সিন্ধু গর্ভে আশ্রয় লইয়াছে। একমাত্র কন্যা উমা শ্মশানবাসী ভিখারী শিবের করে অর্পিত। বৎসরে মাত্র তিনটি দিনের জন্য উমা মাতৃ-অঙ্ক আলো করে। বিজয়ার পর নয় মাস অতীত হইলেই মা মেনকা আর অশ্রুধারা সংবরণ করিতে পারেন না—তাই বাংলায় বর্ষা নামে, তাই ত হৈমবতা নদ-নদীগুলিতে বন্যা আসে। মেনকার অশ্রুধারাই বাংলাদেশকে মাতৃ-বাৎসল্যে—তার স্রোতভারে পরিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছে। কবি বলিয়াছেন—

ব্যথা তোমার ভিতালো সব মাতার হৃদয় বক্ষভূমে,
জননীরা চমকে কেঁপে বক্ষে চেপে বাছায় চুমে।
বাছনি যার নেই মা কাছে
কেমনে আজ সেই মা বাঁচে?
অশনিরাজ—শাসন যে আজ হ'রেছে তার চোখের ঘুমে।
শিহরে আজ সকল কুলের মাতৃকেশর বক্ষভূমে।
পক্ষিমাতা বুকের পাখায় শাবকগুলি আগ্‌লে রাখে।
গর্ভাধানে বলাকা ধায়, পাখী প্রসব-ব্যথায় ডাকে।
মীন জননীর ডিম্ব ফুটে
অম্বুতে তার বিম্ব উঠে
মক্ষীমাতা অসঞ্জাত বংশধারার জন্য চাকে
আপনি রয়ে বঞ্চিত সে প্রাণের মধু সঞ্চি' রাখে।
অশ্রু তোমার বন্ধ্যা-বুকেও দিল অকাল-স্তন্য এনে
সৎ মা হঠাৎ সৎ-মেয়েরে অঙ্কে টানে আপন জেনে
পুত্রহারা বিড়াল ছানায়
বক্ষে চেপে আদর জানায়
পূজারিণী স্নেহের বশে গোপালকে লয় বক্ষে টেনে
অশ্রু তোমার ফল্গু-বুকেও দিল স্নেহের বন্যা এনে।

কবি শেষে বলিয়াছেন—

গঙ্গাসাগর হোলো লোনা নয়ন-ঝরা তোমার স্নেহে।

এসব গেল মৃণ্ময়ী মায়ের কথা।

কবি বাংলাদেশের পানে তাকাইয়া বলিয়াছেন—এ যে মায়ে-ভরা দেশ। মাতৃরূপে অন্নদা, লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, সরস্বতী, চণ্ডী, মনসা, শীতলা ইত্যাদি দেবীরা সারা দেশে পূজা পাইতেছেন—কে বলে মাতৃকাদিগের, সংখ্যা ষোলটি?

'মাতৃকাগণে কেবা গুণে করে শেষ?'—পরিজন মহিলাদিগের বেশির ভাগ—মায় বৌমা পর্য্যন্ত সবই ত মা। কবির নিজের পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন—

যতদিন দড় মোর হয়নি ডানা
কাকীমার নীড়ে ছিনু কোকিল-ছানা।

শেষে কবি বলিয়াছেন—

যেন বা হাজার শিশু আমাতে রাজে—
আমি ঘেরা শত শত মায়ের মাঝে।
সব শেষে এক মায়ে কবির প্রণাম,
অন্তিমে যার কোলে চির-বিশ্রাম।

কবি বলিয়াছেন মায়ের মমতার শক্তি অলৌকিক। 'ষষ্ঠীতলা' কবিতায় কবি লিখিয়াছেন "পল্লীর জননীরা আপনাদের মমতাও আকুতি সম্মেলিত করিয়া বটতলের একটা পাথরে দেবতাকে জাগাইতে পারে।

"ঐ পাথরে কেন্দ্রীভূত শতেক মায়ের-বৎসলতা,
পাথরকে যে গলিয়ে ফেলে জননীদের গুপ্তব্যথা।
গভীর প্রাণের আকিঞ্চনে রেখেছে যে রাঙিয়ে ওকে
মোদের চোখে পাষাণ বটে, ননীর খনি ওদের চোখে।

ভাদ্রশ্রীকে কবি মাতৃ-রূপ দিয়াছেন "ভাদুরাণী এসো' কবিতায়। ভাদু

ভাদ্র-প্রকৃতির হারানো মেয়ে। হারিয়ে-যাওয়া কন্যার উদ্দেশে মা বলিতেছেন—

টোপর-পানায় পুকুর ভ'রেছে কোনখানে নেই ভাঙা
জলা বলে মনে হয় ডাঙ্গাগুলো, জলে মনে হয় ডাঙা।
ফুলে ভরা সব কোথায় ফেলিতে কোথায় চরণ পড়ে
এ হেন দুপুরে থেকো নাকো দূরে ভাদুরাণী এসো ঘরে।
ঘন বাড়ন্ত আখের পাতায় আলিপথ গেছে ঢেকে
কাঁকড়া, শামুক, মাছ, ব্যাঙে-ভরা নালী গেছে এঁকে-বেঁকে।
আজ পাটক্ষেতে হাতী ডুবে যায়, মন যে কেমন করে,
কাঁদিছে দাদুরী, আদরিণী মেয়ে ভাদুরাণী এসো ঘরে।

জন্মদিনে কবি স্বীয় গর্ভধারিণীকে স্মরণ করিবার পর পল্লী জননীকে স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন—

স্মরি পল্লী জননীরে, যার মুখ বায়ু
জীবনী-পাথেয় রূপে দিলশক্তি, দিল দীর্ঘ আয়ু।
স্নেহের ছায়ায় রাখি পরালো যে মায়ের অঞ্জন
দ্বিজত্ব লভিয়া যাতে অনাবিষ্ট—দৈহিক নয়ন।

পল্লী পরিত্যাগ করিয়া নগরে শিক্ষিত হইয়া অনেকেই পল্লী-জননীকে ভুলিয়া যায়। কবি পল্লী-জননীর এই ব্যথাকে একটি কবিতায় রূপায়িত করিয়াছেন—

ধনী বা মানী হইলে ছেলে জননী হয় খুশী
গরব তার মনের কোনে গোপনে রাখে পুষি।
পথটি চেয়ে বসিয়া থাকে একলা নদী তীরে
যায় কি ব্যথা ঘরের ছেলে যদি না ঘরে ফিরে।
যেখানে থাক থাকুক সুখে জননী শুধু যাচে
অনেক জ্বালা সহিয়া সে যে মানুষ করিয়াছে।
তবু যে হায় শুনিতে চায় মা ব'লে ডাকটিরে
ঘুচে না ব্যথা ঘরের ছেলে যদি না ঘরে ফিরে।

বহু বৎসর পরে পল্লী জননীর অঙ্কে ফিরিয়া গিয়া কবি বলিয়াছেন—

ভাঙা বাঁশী জোড়া দিয়ে বীণা ফেলে তাই নিয়ে
ফিরিয়া এলাম
বহু অপরাধ জমা স্নেহ ভরে কর ক্ষমা
লও মা প্রণাম।

কবি শুধু জন্মভূমিতে নয়, জন্মযুগেও মাতৃত্ব আরোপ করিয়াছেন—যুগমাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

হে যুগ জননী বন্দনীয়া
দেশ জননীর মতোই মা তুমি কবিগীতে অভিনন্দনীয়া।

এইবার গর্ভধারিণী মানবী মাতার কথা। এই স্নেহবিহ্বলা জননীকে কবি নানারূপেই দেখিয়াছেন।

কিশোরীর প্রথম সন্তানের জন্ম হইলে মাতৃহৃদয়ের বিস্ময়ের অবধি নেই। মেঘাবরণ হইতে বিমুক্ত চন্দ্রের মত স্বদেহ হইতে শিশুর আবির্ভাব—ইহার চেয়ে বিস্ময়ের বস্তু আর কি আছে। কবি সেই অননুভূত-পূর্ব্ব বিস্ময়কে মাতৃ মুখে ভাষা দিয়াছেন—

নেমে এলি এধরাতে সুধা নিয়ে এলি সাথে
ধরে বুকে ঝর্ণার রূপ,
মাঝ পথে দেহে মনে ছিলি কোথা সংগোপনে
এ দেহ যে বিস্ময়ের কূপ।
বিস্ফারিত দু'নয়ন বিস্ফারিত এ জীবন
স্তম্ভিত এ স্পন্দিত হৃদয়,
স্বপ্ন লভে সার্থকতা মূর্ত্তি ধরি! এ কি কথা
অলৌকিক এ কি এ বিস্ময়।

সন্তানের রোগশয্যার পাশে ছল-ছল আঁখি করুণাময়ী স্নেহ-বিহ্বলা জননীর রূপ—

স্মরি স্নেহমুগ্ধ তাঁর সচকিত নয়ন সজল,
উৎকণ্ঠা উদ্বেগে ত্রাসে ঘটাইত স্রোতের কমল।

পূজামণ্ডপে পুত্রহারা জননীর রূপটি বড়ই করুণ—বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। করুণাময়ী বলিয়া জগন্মাতাকে এই শোকার্ত্তা, পুত্রবিয়োগবিধুরা জননী আর সম্বোধন করিতে পারে না, প্রতিমার পানে সে শুধু অভিমান ভরে সজল চক্ষে চাহিয়া থাকে—

আনন্দময়ীর পূজা বলিয়া যায় না বুঝা
বড় কষ্টে দীন আয়োজন,
জননী সংবরি' শোক এক হাতে মুছে চোখ,
আর হাতে ঘষিছে চন্দন।
আলিপনা দিতে তা'র হাত কাঁপে বার বার
দীর্ঘশ্বাস নৈবেদ্যের 'পরে
চাহিতে প্রতিমা-পানে কাঁপে বুক অভিমানে
রুদ্ধ ক্ষোভে আঁখি জলে ভরে।

রাত্রি জাগিয়া ছেলে পরীক্ষার পড়া করিতেছে। চারিদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ। সমস্ত বাড়ী—সমস্ত পাড়া নিদ্রিত। শুধু ছেলের মা জাগিয়া আছে। তাহার চোখে ঘুম আসিতেছে না। সন্তানের কষ্টে সে ছটফট করে আর ভাবে—পরীক্ষার পড়া এমনই কী জিনিস। আগে বাঁচুক তো, তবে পড়া। হায় সে নিজে কতকটা ভার লইতে পারে না!

পড়িতে পড়িতে ছেলে একান্তই ঘুম পেলে
পুঁথি বুকে ঘুমাইয়া পড়ে।
সন্তর্পণে মাতা গিয়া মশারিটি খাটাইয়া
দেয় ধীরে, যেন চুরি করে।

কবি বলিয়াছেন—চুরি করা ছাড়া আর কি? ছেলের ক্লান্তি 'হরণ-করিবারই ত এই সতর্কতা!

ভাদ্র মাসে দুঃখিনী জননী তাল-বড়া ও কাঁটালের বীচি ভাজিয়া ছেলেদের হাতে হাতে দিয়া প্রবাসিনী বিবাহিতা কন্যা উমার কথা স্মরণ করিয়া বলিতেছে—'আহা উমা আমার কোলে বসে তাল বড়া খেতে, ভালবাসত, সে আজ কতদূরে! ছেলেরা হাসিয়া উঠিয়া বলে—বড়-

লোকের ঘরে বিয়ে দিয়েছ সে তোমার আর তালবড়া খেতে চাইবে না। সে অনেক দামী দামী উপাদেয় খাবার খাচ্ছে। তোমার কাঁটাল-বীচির ভিখারিণী সে নয়।

অরুচি হ'লে যা খেয়ে তুমি গরীবের মেয়ে
জীবনেও খাওনি তা কভু,
কাঁচুমাচু মুখখানি তায় সরে নাক বাণী
দুখিনী মা কয় শুধু 'তবু'—
বিজলী চমকে মেঘে ঝোড়ো হাওয়া ধায় বেগে
পাল তুলে তরী যায় ভেসে
জানালার ফাঁকে চেয়ে তার সাথে যায় ধেয়ে
মা'র মন কোন দূরদেশে।

আর একটি মায়ের চিত্র—

নব-বিবাহিত পুত্র মা'র কাছে নববধূর নামে অবিরত নালিশ করে। নববধূ শাশুড়ীকে বলে—'সব মিথ্যে কথা মা।' বিধবা শাশুড়ী বধূকে কোলে টানিয়া লইয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ছেলের নালিশ শুনিতে থাকে। মা জানে রসকলহের মাঝে প্রেমের চূড়ান্ত পরিচয়।

বধূরে টানিয়া কোলে বিধবা মা হাসে
উড়াইয়া দেয় সবি এক দীর্ঘশ্বাসে।
ত্রিশবর্ষ আগেকার আপনার বধূকাল স্মরি
মধুরাম্লরসে ভরে চিত্ত উঠে ভরি।

সব চেয়ে করুণ, মর্ম্মন্তুদ চিত্র পাওয়া যায় "মায়ের কাঁকন" কবিতায়। স্বর্গতা জননীর স্মৃতি চিহ্ন বলিয়া কাঁকন জোড়া কবি সযত্নে এতকাল রক্ষা করিয়াছিলেন—দারুণ অভাবের দিনেও তাহা বেচিতে পারেন নাই। কন্যাদায়ের সময় বেহাইয়ের হৃদয়হীন চাহিদায় কাঁকন ভাঙিয়া কন্যার গহনা গড়াইতে বাধ্য হইলেন। স্বর্ণকারের দোকানে বসিয়া কাঁকন গলাইয়া কতটা সোনা পাওয়া যায় দেখিতে হইল—

হাপরের দীর্ঘশ্বাসে রাঙা হোলো কাঠের আঙার
রক্তনেত্রে তিরস্কার যেন তাহা বহ্নি-দেবতার।
পুড়িতে লাগিল স্বর্ণ—তার সাথে আমার পাঁজর,
তরল হইল স্বর্ণ নয়নে ঝরিল ঝরঝর
পাষাণ গলিয়া অশ্রু। ফিরিলাম গৃহে আপনার
যেন রে দ্বিতীয়বার জননীর করিয়া সৎকার।

মৃতবৎসা জননীর বেদনা কবি 'গঙ্গার প্রতি' কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন। মৃতবৎসা মাতা গঙ্গাকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছে—

একে একে সাতটি ছেলে,
দিলি জলের গর্ভে ফেলে
চিরদিনের মত গেলি একটিকে ত রেখে পতির কাছে,
তেমনি একটি বাছায় রেখে
যেতে রাজী বিশ্ব থেকে
অভাগিনীর জীবন দিয়ে ঐটি যদি পতির কোলে বাঁচে।

যে অভাগিনী নারী মা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিল না, কবি তাহার আক্ষেপ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। আজকাল বন্ধ্যা নারীকেই সবচেয়ে ভাগ্যবতী মনে করা হয়। সন্তান একটা উপসর্গ। কবি যেকালে বন্ধ্যার খেদ লিখিয়াছিলেন, সেকালে নিঃসন্তানা হওয়ার অপেক্ষা রমণীর দুর্ভাগ্য আর ছিল না। আজকাল বন্ধ্যা নারীর স্বামী নিজেকে ভাগ্যবানই মনে করে। জানি না বন্ধ্যা নারী আজকাল কি মনে করে! সে-কালের গার্হস্থ্য জীবনের পরিবেশে কল্পনায় নিজের চিত্তকে প্রেরণ করিলে এ কবিতার রসবোধ সম্ভব হইবে। বন্ধ্যা নারী খেদ করিয়া বলিয়াছে—

আমার নারী-জীবন-চূড়ায় বাজল নাক ডঙ্কা রে
শূন্য আমার ময়ূর সিংহাসন
হলো না হায় গৃহে আমার ঝিনুক বাটির ঝংকারে
বাল-গোপালের সাদর আমন্ত্রণ।
ধুলায় কাদায় গড়াগড়ি অনেক ঘরে বাচারা,
ছেলের জ্বালায় হচ্ছে জ্বালাতন।
যাদের ঘরে ঠাঁই মোটে নাই, ভাত জোটে না তাছাড়া
তাদের ঘরেই পাঠাও অগণন।
চায় না যারা তাদের ঘরেই পাঠাবে আর কত বা
একটি দিয়ে পুরাও আমার সাধ
একটি যা-হোক কালো, খাঁদা, টেরা, কটা অথবা
সেই হবে মোর মাণিক সোণার চাঁদ।

ধরণী মা'র অঙ্কে ভূমিষ্ঠ হইয়া পল্লী জননীর স্নেহের অঞ্চল-ছায়ায় জননীর স্তন্য দুগ্ধে ও পিসীমা-কাকীমাদের স্নেহে যত্নে যে কবি মানুষ হইয়া বাণীর কৃপা লাভ করিয়াছেন, বাংলা ভাষা-জননী যে-কবির কণ্ঠে তীর্থ-বাস করেন—আজ বার্দ্ধক্যে যিনি মাতৃকাগণের সেবা লাভ করিতেছেন, তিনি শেষ মাতা সুরধনীর উদ্দেশে বলিয়াছেন—

পূর্বপুণ্যে তোমার পুলিনে জন্মেছি যবে বঙ্গদেশে,
আছে মা ভরসা পঙ্ক ধুইয়া অঙ্কে তুলিয়া লইবে শেষে
তব সিকতায় মা'র মমতায় অনল শয্যা পাতিয়া রেখ,
তারক-ব্রহ্ম নাম দিও কানে জননী আমার শিয়রে থেক।
ইহ জীবনের শেষ সম্বল চিতার ভস্ম অর্ঘ্য নিও,
তব তীরে নীরে কৃমিকীটও তরে যার গুণে,
মোরে দিও তা দিও॥

বাংলা সাহিত্যে দুইজন মাতৃসাধক।—বাৎসল্য রসের দিক হইতে কথা-সাহিত্যে চির-স্মরণীয় দরদী মরমী শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আর কাব্যসাহিত্যে বঙ্গভারতীর স্নেহাভিষিক্ত বরপুত্র কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়—এই দুই জীবন-শিল্পীর তুলনা নাই।

আমি বললাম "মা লক্ষ্মী আমাদের কেলোর সঙ্গে একটু দেখা করব।" অনেক বোঝানোর পরে বলল "ও, মিষ্টার রে—আপনার শ্লিপ পাঠান।" চেয়ারে ঠ্যাং তুলে একটু আরাম করে বসেছি বলে—"ঠিক করে বসুন। আপিসটা কি বাড়ীঘর পেয়েছেন?"

বিমল: ঠিকই তো বলেছে!

ভুতোদা: কাজকরা মেয়েদের আমি দুচোখে দেখতে পারিনা। ওদের বাড়ীঘরে মন থাকেনা। শুধু এদিক‌ওদিক ঘুরে বেড়ানো আর চটাং চটাং ইংরিজী বুলি।

বিমল আর বিনয়ের একবার চোখ চাওয়া চাওয়ি হয়ে গেল। ভুতোদাকে আর একবার জব্দ করা যাবে।

বিনয়: ভুতোদা, আজ তো রবিবার। চলুননা আমার পিসে মশায়ের বাড়ী। গড়পারের ওদিকটা আপনার দেখা হয়ে যাবে আর আলাপ পরিচয়ও হবে।

ভুতোদা: তা যাব এখন।

বিকেলে গড়পারে বিনয়ের পিসের বাড়ীতে ভুতোদা বিমল আর বিনয়।

বিনয়: এই যে ভুতোদা, আমার পিসতুতো বোন মিলি। ও একটা ব্যাঙ্কে চাকরী করে।

ভুতোদা (অপ্রসন্ন): চাকরী করে? তা বেশ, তা বেশ

মিলি: কেন চাকরী করা আপনি পছন্দ করেননা?

ভুতোদা: (ভয়পেয়ে): না, না, কেন করবনা। তবে মা আমরা বুড়ো মানুষ। মেয়েদের ঘরের কাজকর্ম্ম করাই পছন্দ করি।

মিলি: (মুখ টিপে হেসে) ও এই কথা।

বিমল: মিলি আমাদের খাওয়াবিনা?

মিলি: নিশ্চয়ই।

মিলি সযত্নে মেঝে পরিষ্কার করে সবাইকার আসন পেতে খাবার পরিবেশন করল। ভুতোদা অবাক হয়ে দেখছিলেন। হাবভাব দেখে তো ঘরের লক্ষ্মীই মনে হচ্ছে!

বিমল: (আড়চোখে তাকিয়ে) ভুতোদা, চাকরী করা মেয়ের কাছে যাবেন না। কামড়ে দিতে পারে।

ভুতোদা: থাম্।

খেতে বসে

ভুতোদা: খাবার তো অনেক করেছো মা। মাছের ঝাল, মাংস, আলুপটলের ডালনা। ঠাকুর রেঁধেছে নিশ্চয়ই।

মিলি: না, বাড়ীর রান্নাবান্না আমিই করি।

ভুতোদা: তা বেশ। কিন্তু আমি বুড়ো মানুষ। এতো খেতে পারবনা। কিছুটা তুলে রাখো।

মিলি: খানই না আপনি। না খেতে পারলে পাতেই রেখে দেবেন।

ভুতোদা: বাঃ বাঃ খাসা স্বাদ হয়েছে তো। নাঃ পড়ে আর কিছু থাকলনা। আর একটু ডালনা দাওতো। কি দিয়ে রেঁধেছ মা? তেল তো মনে হচ্ছেনা!

বিমল: কি দিয়ে আবার। 'ডালডা' দিয়ে।

ভুতোদা: (চটে)—আবার রসিকতা করছিস?

মিলি: না সত্যিই খাবার দাবার সব 'ডালডায়' রাঁধা!

ভুতোদা: আমি তো জানতাম ভাজাভুজি মিষ্টি ফিষ্টিই 'ডালডায়' হয়!

মিলি: না সব রান্নাই 'ডালডায়' ভাল হয়।

বিনয়: শেষ শেষ ভুতোদা। শেষে চাকরী করা মেয়ের কাছে রান্না শিখতে হোল।

ভুতোদা: আহা, আমাদের মিলিমা তো একজন। আরো যে হাজার হাজার মেয়ে কাজ করে তাদের মধ্যে এমনটি—

মিলি: না ভুতোদা, মেয়েরা চাকরি করে জীবনযাত্রা স্বচ্ছল করার জন্যেই। বাড়ীর কাজেও তারা কোন অংশে খারাপ নয়।

বিমল: ভুতোদা, এবার কি সব চাকুরে মেয়ের বাড়ীতেই খেয়ে দেখবেন নাকি।
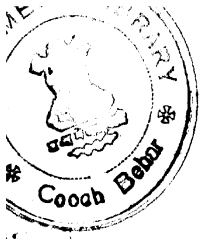
মেয়েদের কথা

নারী শুধু গৃহিণীই নয়

সুপ্রিয়া ঠাকুর

মেয়েদের আজকাল শুধু অন্দরমহল নিয়ে থাকলেই চলে না। বাইরে তো যেতেই হয়, এমন কি প্রয়োজন বোধে অনেককে আবার চাকরী-বাকরী ইত্যাদি করে রোজগারের চেষ্টাও করতে হয়। অতএব, ঘরের বাইরেও আপনার প্রতিষ্ঠা লাভ করা বিশেষ দরকার। আর তাই যদি করতে চান, তাহলে আগে আপনার বন্ধু এবং বান্ধবী মহলে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন। কারণ, তাঁদের সাহায্য এবং সহযোগিতাই যে আপনার বেশী করে দরকার। তাঁরাই তো আপনাকে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। নূতন নূতন সুযোগের সন্ধান এনে দেবেন। আপনার বন্ধুরা যদি আপনার ব্যবহারে মুগ্ধ হন তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা তাঁদের অন্য বন্ধুদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেবেন এবং আপনার সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে আপনার সুখ্যাতিও করবেন। এমনি ভাবেই আপনার পরিচিতের সংখ্যাও যেমনই বাড়বে তেমনই আপনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানুষেরও সংখ্যা বেড়ে যাবে। এইটুকু লাভ করতে পারলেই দেখবেন যে তার পরের ব্যাপারগুলো অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবেই আপনার হাতে মুঠোয় এসে যাচ্ছে।

এবার নীচের উপদেশগুলি খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে যান এবং এইগুলিকে অভ্যাস ও অনুশীলনের দ্বারা আপনার নিজের চরিত্রে স্থান করে দিন।

নিজের জ্ঞান জাহির করবেন না।

বিশ্ববিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস্ প্রায়ই তাঁর শিষ্যদের বলতেন, "সারা জীবন ধরে এই জ্ঞানই অর্জন করলাম যে এত বড় বিশ্বের কিছুই জানতে পারলাম না।" কথাটা সক্রেটিসের বিনয়ের নয়। তাঁর অন্তরের কথা। বেশী নয়, যে কোন একটা বিষয়েও মানুষের পক্ষে পুরোপুরি জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়, অথচ আপনার আমার মত সাধারণ মানুষ নিজেকে অন্যের চেয়ে সব সময় বেশী জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান মনে করে থাকি।

যাঁর কাছে নিজের শিক্ষা-দীক্ষা এবং জ্ঞানের পরিচয় আপনি দিতে গেলেন, তিনি কিন্তু দেখলেন আপনার ভেতরের অহঙ্কারটাই এবং আপনার ওপর বিরূপ হয়ে গেলেন। কেন বলুন তো? আপনার নিজের কথা বলতে বলতেই যে তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধির অভিমানে আপনি ঘা দিয়ে বসে আছেন। অতএব জ্ঞান লাভ করে যান। কিন্তু কারও কাছে তার দর্শনীয়তাকে কখনও প্রকাশ করবেন না।

অযাচিত উপদেশ দেবেন না।

এই চলতি কথাটা বোধহয় নিশ্চয়ই জানেন: পয়সা দিও তবু আক্কেল দিও না। আক্কেল বলতে এখানে অযাচিত উপদেশের কথাই বলা হয়েছে। না হলে আপনার কোন বন্ধু বা আত্মীয় সমস্যার মধ্যে পড়ে আপনার কাছে উপদেশ চাইতে এলে, দেবেন না! নিশ্চয়ই দেবেন, কিন্তু যখন তখন "এটা করো না।" "ওটা ভাল নয়।" "এমন ভাবে চলো।" "দুনিয়াটাকে চেনা এত সোজা নয়" ইত্যাদি যা আমরা সাধারণত বলে থাকি, কখনও কাকেও এমনিভাবে বলে উপদেশ দিতে যাবেন না। আপনি তাঁদের ভালর জন্যেই বলছেন সত্যি, কিন্তু তাঁরা আপনাকে এড়িয়ে চলতে থাকবে। এমন কি আপনার অসাক্ষাতে অন্যের কাছে, "বড় জ্ঞান দেয়" বলে আপনাকে ঠাট্টাও করবে। তবে কি আপনার কোন বন্ধুকে ভুল বা অসৎপথ থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা পর্যন্ত করবেন না? নিশ্চয়ই করবেন, এ সব ব্যাপারে কল্পিত দৃষ্টান্তের সাহায্য নিলেই সব থেকে ভাল ফল পাওয়া যায়,

অর্থাৎ তাঁকে এই ধরণের একটা গল্প বলতে হবে যে আপনার কোন বন্ধু ওই পথে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কি নাস্তা-নাবুদটাই যে হয়েছেন তা আপনি নিজে চোখে দেখেছেন। তাই আপনার এই বন্ধুটিকে ঐ পথে যেতে দেখে আপনি ভয় করছেন। মোট কথা আপনি যে তাকে উপদেশ দিচ্ছেন একথা যেন সে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে না পারে। কারণ সমপর্যায়ের লোকের গুরুগিরি আমরা কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। মনে হয় ও খুব বুঝদার হয়ে গেছে। অর্থাৎ ওঁর চেয়ে আমিও কম বুঝি না।

তর্ক এড়িয়ে চলুন।

যখনই কোন বিষয়ে কারও সঙ্গে আপনার মতের মিল হল না দেখলেন, তখনই সে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে অন্য কথায় চলে আসার চেষ্টা করবেন, কারণ তর্ক করে পুরো-পুরি জয়লাভ কখনও করা যায় না। হয় আপনি তর্কে হারবেন, না হয় আপনার বন্ধুটিকে হারাবেন। আপনার জোরাল যুক্তির কাছে শেষ পর্যন্ত তিনি হয়ত আত্মসমর্পণ করলেন এবং পরাজয়ও স্বীকার করলেন। আপনি সবারই কাছ থেকে বাহবাও পেলেন। কিন্তু আপনার বন্ধুটি তো বিরূপ হয়ে গেলেনই, সঙ্গে সঙ্গে আশে-পাশে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও আপনাকে এরপর থেকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবেন। আপনার সঙ্গ তাঁদের কাছে আর মনোরম হবে না। তাদের এমনই একটা ধারণা হয়ে যাবে যে আপনি কথায় কথায় বড় তর্ক করেন। তার চেয়ে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীকেই জয়ী হতে দিন। যদিও আপনি মনে-প্রাণে জানেন যে তাঁরই ভুল হচ্ছে—তবুও সেই ভুলটাকেই আপনি এই বলে মেনে নিন: "দেখ, আমার হয়ত ভুলও হতে পারে। তার চেয়ে ব্যাপারটা ভালভাবে জেনে নেওয়া যাক চল", কিংবা তাঁকেই বলবেন যে বিষয়টা তিনিই যেন আর একবার জেনে নিয়ে আপনার এই ভুলটাকে সংশোধন করে দেন। দেখবেন, তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে এমনি ভাবে মেনে নিলেন দেখে তিনি তো আপনার ওপর খুশী হবেনই, তারপর যখন আবার নিজের ভুলটা জানতে পারবেন, আপনার ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে যাবে অনেক গুণ।

ভুল ধরবেন না।

ভুলে যাওয়া বা ভুল করা মানুষের স্বভাবের মধ্যেই পড়ে। এমন মানুষ কি আছে যিনি বলতে পারেন যে জীবনে কখনও ভুল করেন নি। আমেরিকার ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মত করিৎকর্মা লোকও নিজের মুখে স্বীকার করেছেন যে তাঁর সারাদিনের কাজের মধ্যে শতকরা ৭৫এর বেশী ভাগ কখনও তিনি নির্ভুল করে উঠতে পারেন নি।

"এই সামান্য ব্যাপারটুকুও জান না ?"

"তোমার যে এটা ভুল, তা আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি।"

"তোমার থেকে আমার অভিজ্ঞতা অনেক বেশী।"

"আরও পড়াশোনা কর জানতে পারবে।"

সাধারণত এই ধরণের কথা বলেই আমরা অন্যের ভুল সংশোধন করে দেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু এমন সব কথা আপনি কখনও যেন আপনার কোন বন্ধু বা বান্ধবীকে ভুলেও বলবেন না। এতে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি এবং আত্ম-সম্মানে ঘা লাগবে। অতএব আপনার প্রতি বিরূপ হয়ে যাবেন। সত্যি সত্যিই যদি তাঁদের কোন ভুল আপনি সংশোধন করিয়ে দিতে চান তাহলে তাঁকে মোটেই জানতে দেবেন না যে আপনার উদ্দেশ্যটা কি।

এই ধরণের কথাগুলো অনেক সময় খুব সুফল দেয়।

(ক) এটা করার সময় বুঝি খুব অন্যমনস্ক ছিলে ? না হলে তোমার মত লোকের এমনটা হয় না।

(খ) আমার মনে হয় এমনিভাবে করলে হয়ত আরও ভাল হবে।

(গ) এটার সম্বন্ধে কেমন যেন একটু সন্দেহ হচ্ছে না ?

আর একটা জিনিষ খুব বেশী করে লক্ষ্য রাখবেন যে তিনি যেন আপনার কোন কথার সূত্র ধরে তর্ক করার সুযোগ না পান।

স্পষ্ট বক্তা হবেন না।

অনেককে এই কাজটি করে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করতে দেখা যায়, তাঁদের ধারণা এটা একটা বিশেষ বীরত্বের কাজ। "আমি অত কারও খাতির রাখিনা। সোজা কথা বলতে আমি একটুও ভয় পাই না।" এই সব

বলে বেশ গর্বও অনুভব করেন, কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন যে মানুষের সঙ্গে সদ্ভাব নষ্ট করতে এবং বন্ধুস্থানীয়দের শত্রু করে তুলতে এর চেয়ে সহজ পথ আর নাই। অতএব যে কাজ করলে আপনি একে একে সকলের অপ্রিয় হয়ে উঠবেন, তেমন কাজে গর্ব করার তো কিছু নাই-ই—বরং আপনি অসামাজিক হয়ে উঠছেন বলে তাহা লজ্জার কথা। সত্যি কথা বলতে,যারা নিজের মতামত কৌশলে প্রকাশ করতে পারে না তারাই স্পষ্ট বক্তা হয়ে নাম কেনার চেষ্টা করেন। ফলে শেষ পর্যন্ত নামের বদলে বদনামই কেনেন সবটুকু।

মিথ্যা আশ্বাস দেবেন না।

বন্ধু-বান্ধবদের উপকার করতে পারেন, খুবই ভাল কথা। না পারলেও তেমন কিছু এসে যায় না, কিন্তু আপনি যা পারবেন না এমন কোন কাজ, করে দেবেন বলে তাঁদের আশা দেবেন না। এতে আপনার আশায় বসে থেকে তিনি হয়ত আর অন্যভাবে চেষ্টা করলেন না। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। সাময়িক ভাবে আপনার উপর তাঁর শ্রদ্ধা হয়েছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনার উপর তাঁর আর বিশ্বাস থাকবে না। আপনার অন্য বন্ধুদের কাছে আপনি বড় বাজে কথা বলেন, বলে তাঁদেরও বিশ্বাস নষ্ট করে দিতে পারেন।

কথার খেলাপ করবেন না।

এ দোষটি অনেকের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়, খুব সতর্ক থাকবেন, কাকেও কোন কথা দেওয়ার আগে খুব ভাল করে ভেবে-চিন্তে তবে দেবেন। এতেও অন্যের শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস চিরকালের জন্য হারাতে হয়।

টাকাকড়ির ব্যাপারে খুব সাবধান থাকবেন।

বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে টাকা-কড়ির লেন-দেন যত কম করতে পারেন ততই ভাল, করলেও সোজা-সুজি এবং খোলাখুলি ভাবে আপনার সুবিধা-অসুবিধা এবং সমস্যার কথাগুলি সময় থেকে বলে দেবেন।

বক্তার চেয়ে শ্রোতা হোন।

আপনার কৃতিত্ব বা আপনার দুঃখ সমস্যা তাঁদের কাছে না বলে প্রথমেই আগ্রহের সঙ্গে তাঁদেরগুলি শুনুন। কারণ, আপনার কিছু শোনার চেয়ে তিনি তাঁর নিজেরটি বলতেই বেশী উৎসুক। দেখবেন, শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই আপনার কথাগুলিও জানতে চাইবেন। অনবরত আপনি নিজের কথাই বলাতে তাঁদের বিরক্তি আসতে পারে। ফলে আপনার সঙ্গ তাঁরা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবেন।

কারও হৃদয়-আবেগে বাধা দেবেন না।

বন্ধুদের প্রেম-প্রীতি বা স্নেহ-ভালবাসার ব্যাপারে, তা অসামাজিক বা অন্যায় হলেও সোজাসুজি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। এমন কি আপনার বিরুদ্ধ মতবাদ পর্যন্ত প্রকাশ করবেন না। কারণ, মানুষের এই হৃদয়-আবেগ কোন ন্যায়-অন্যায় বা যুক্তিতর্কের ধার মোটেই ধারে না। কেমন জানেন? ঠিক খরস্রোতা কোন নদীর একগুঁয়েমির মতই মানুষের এই হৃদয় আবেগ। মুখোমুখী একটা বাঁধ দিয়ে তার গতিকে প্রতিরোধ করতে গেলে, সে শতগুণ শক্তিশালী হয়ে তা ভেঙ্গে তচ্‌নচ করে দিয়ে চলে যাবে। এমনকি আশপাশের তীরের ক্ষতিসাধন করতেও ছাড়বে না। তার চেয়ে বাঁধ দেওয়ার আগেই যদি পাশ দিয়ে একটা খাল কেটে তার রাস্তা করে দেন' তবে তার গতিটাকে সহজেই ঘুরিয়ে দিতে পারবেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনার আসল কাজটাও অনেক সহজ হয়ে পড়বে। আপনার বন্ধুর বেলাতেও, যদি সত্যিই আপনি চান যে তাঁর কোন অন্যায় বা অসামাজিক হৃদয় আবেগে বাধা দেবেন, তবে তার আগে ঠিক অমনি একটি খাল কেটে দিন।

একজনের সামনে অন্যের সমালোচনা করবেন না।

অন্যের প্রশংসা বা নিন্দা দুটোই তাঁর মনে আপনার সম্বন্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। কারণ, মানুষের মন সব অবস্থায় অন্যের সম্বন্ধে ভাল বা মন্দ কোনটাই সহ্য করতে পারে না, ভাল বললে হিংসে হয়। মন্দ বললে মনে করে যে আপনি হয়ত অন্যের কাছে তার নিন্দা করেন। আপনার স্বভাবটাই এমনি, তার চেয়ে ওটা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন।

রাঙা আলুর পানতোয়া

উপকরণ—রাঙা আলু ৵১ সের, গোল আলু ৵।০, ঘি ৵।০ সের, ক্ষোয়া ক্ষীর ৵৶ পোয়া এবং কিছু ময়দা।

প্রথমে আলু ও রাঙা আলুগুলি বেশ ভাল করে সিদ্ধ করে নিয়ে ঠাণ্ডা হতে দেবেন। আর উনুনে ডেক্‌চিতে তিন পোয়া চিনি দিয়ে পানতোয়ার রস চাপিয়ে দিন। তারপর ময়দাগুলি নিয়ে তাতে ময়ান দিয়ে বেশ ভাল করে মিশিয়ে রাখুন, এতে কিন্তু জল দেবেন না যেন। তারপর সব আলুগুলি খোসা ছাড়িয়ে বেশ ভাল করে চট্‌কিয়ে নিন। তার সঙ্গে ময়ান দিয়ে মেখে রাখা ময়দাগুলি দিয়ে বেশ ভাল করে মাখুন। ময়দা পরিমাণ মত আন্দাজ করে নেবেন। মনে রাখবেন, আলু ও ময়দা যত ঠাসা হবে, পানতোয়া তত নরম হবে। তারপর ক্ষোয়াগুলি সামান্য জল দিয়ে মেখে নরম করে নিন। এমনি ক্ষীর হলে আর এই ভাবে মাখতে হয় না। সেইজন্য এমনি ক্ষীর হলে ভালই হয়। এখানে আর একটা কথা বলে রাখি, গোল-আলুগুলি ননিতাল আলু হলেই ভাল হয়। এইবার মাখা আলু অল্প করে হাতে নিয়ে পানতোয়ার খোল্ তৈরি করে ভেতরে ক্ষীরের পুর দিয়ে পানতোয়াগুলি আগে তৈরি করে নিন। তারপর উনুনে ঘি চড়িয়ে পানতোয়াগুলি ভেজে নিন। ঠাণ্ডা হলে রসে ভিজিয়ে দিন। পানতোয়ার রস যেন খুব বেশি পাতলা না হয়। বেশ কিছুক্ষণ রসে ভিজানো থাকার পর পরিবেশন করবেন।

—শ্রীমতী রাণী চক্রবর্তী

(চন্দননগর)

বাঁধন ভাঙার লাগি সাধনের খেলা

'বৈভব'

বিদায়ের লাগি এই
মিলনের মায়া—
শরতের আকাশেতে
শ্রাবণের ছায়া !

কত স্মৃতি বন্ধন
কত জনমে—
শত প্রীতি মায়া জাগে
শত করমে !

বাঁধন ভাঙার লাগি
বাঁধনের মেলা—
লীলার বিলাস লাগি
সাধনের খেলা।

ঢেউ-এর মতন উঠি
সাগরে মিলায়—
আকাশেরি পথে মেঘ
আপনা বিলায়।

ডাক্তার
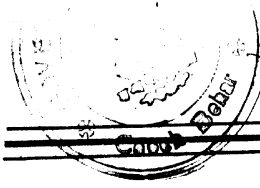
শ্রীসতীরঞ্জন রায়

চেম্বারের ভেতরে ঘড়িটায় তখন রাত দু'টো। বিস্ময়াহত মহানাথ রোগিণীর পাশে বসে আছেন জ্ঞান সঞ্চারের আশায়। এক সময় মেয়েটির গলার দিকে তাকিয়ে মহানাথের মনে হলো, যথাসময়ে পুলিশ গিয়ে উপস্থিত হ'তে না পারলে হয়ত মেয়েটি প্রাণ আর ফিরে পেতো না। কঠিন ষড়যন্ত্রের জাল মেয়েটিকে কেন্দ্র করে জড়িয়ে উঠেছিল। দুর্ভাগ্যের অট্টহাসির সুতীক্ষ্ণ ধ্বনি দিশেহারা করে দিয়েছিল মেয়েটিকে! তারপর একদিন কঠিন রজ্জু দিয়ে কণ্ঠরোধ করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিল তাকে।

কী সাংঘাতিক! হঠাৎ পাশের ঘরের ফোনটা ক্রীং ক্রীং করে উঠলো। চমক ভাঙলো মহানাথের।

ফোন তুলে ধরে মহানাথ জানালো, না, এখনও মেয়েটির জ্ঞান ফেরেনি।

থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার জানিয়ে দিলো, জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন থানায় সংবাদ দেওয়া হয়। পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই মহানাথ থম্‌কে দাঁড়ালো। বিমূঢ় ও স্তম্ভতের ন্যায় আতংকে মহানাথ শব্দ করে চেঁচিয়ে উঠলো, কে?

কৃষ্ণবর্ণ স্যুট পরিহিত দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি সম্মুখে দাঁড়িয়ে। চক্ষু দুটি ব্যতীত সমগ্র মুখখানি কালো কাপড়ে আচ্ছাদিত। মহানাথের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে অবাঞ্ছিত লোকটি দু'এক পা ক'রে অগ্রসর হ'য়ে ওরই সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

মহানাথের স্বর শিথিল হয়ে এসেছে। নিস্তব্ধ রাত্রির সঙ্গোপনে কৃষ্ণবর্ণ বিভীষিকার দূরাগত পৈশাচিক মৃত্যু-বিষাণ কেঁপে কেঁপে বেজে উঠলো। বিস্ফারিত চক্ষু দুটি মেলে পুনরায় মহানাথ জিজ্ঞাসা করলো, কে?

অপরিচিত লোকটি সহসা ডাক্তারের বাম হাতটি চেপে ধরে চাপা গলায় বল্‌লে, ডাক্তার তোমাকে অনেক টাকা দেবো! সমাজে আমার যে প্রতিষ্ঠা আছে, তাকে রক্ষা কর।

ডাক্তার ঘেমে উঠলো। উদ্‌ভ্রান্ত ঘন-কুটীল সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে ডাক্তার নিজের অস্তিত্বকে যেন খুঁজে আর পাচ্ছিল না। আর একবার ফিস্ ফিস্ করে অপরিচিত লোকটি বল্‌লে, অনেক টাকা দেবো!—বলে পকেট থেকে একটা প্যাকেট বার করে ডাক্তারের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বল্‌লে, এই প্যাকেটে ঘুমের ওষুধ রয়েছে, ঘুম পাড়িয়ে দাও।

হাত বাড়িয়ে মহানাথ ঔষধের প্যাকেট হাতে তুলে নিল। শব্দহীন বিকট হাসির প্রতিচ্ছবি অপরিচিত লোকটির চোখের কোণায় কোণায়—তারায় তারায়। ঘুমের ঔষধ খাইয়ে অনেক টাকা পাওয়ার তাৎপর্য ডাক্তারের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। ভীত ত্রস্ত ডাক্তার রোগিণীর মুখের দিকে তাকিয়ে এক মিনিট স্থির হ'য়ে রইলো। পুনরায় অপরিচিত লোকটি চেঁচিয়ে উঠলো, বল ডাক্তার, আমি তোমায় অনুরোধ করছি। তুমি আমার এ উপকারটি কর। আমার কাছ থেকে এত উপকার পাবে, ডাক্তার, যা' তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।

মহানাথ যেন নিজকে অনেকটা সহজ করে তুললো। সাম্‌লেও নিয়েছে সে অনেকটা। ভীত ডাক্তারের ব্লটিংএর মত সাদা মুখখানায় রক্ত যেন আবার প্রবাহিত হ'তে লাগলো। ইঙ্গিতে অপরিচিত লোকটিকে বস্‌তে বলে পাশের চেয়ারটায় আশ্রয় নিল নিজে। সহসা হাত দু'টি জড়িয়ে ধরে লোকটি বলতে লাগলো, তুমি আমায় রক্ষা কর। তোমার হাতেই আমার মানমর্যাদা, সম্ভ্রম—সব কিছুই নির্ভর করছে। সমস্ত প্রতিষ্ঠা আমার নষ্ট হ'য়ে যাবে।

অপলক-নেত্রে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ডাক্তার

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায়
—তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেণা

বল্‌লো, আপনি সমাজের গুণী ব্যক্তি। সমাজে আপনার প্রতিষ্ঠা রয়েছে। আপনার প্রতিষ্ঠার ইমারৎ দৃঢ় কর্‌বার জন্যই মেয়েটির জীবন নষ্ট কর্‌বার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। মেয়েটি যে বেঁচে উঠবে, তা' বুঝি ধারণা কর্‌তে পারেন নি ?

'তা' বুঝতে পার্‌লে কি ডাক্তার তোমার কাছে আসি !'

লোকটার মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে চিন্‌বার বৃথা চেষ্টা করে সে বল্‌লে, কিন্তু যার জ্ঞান ফিরে আসেনি, তাকে—

কথাটিকে শেষ কর্‌তে দিল না লোকটি। জের টেনে জবাব দিল, তাকেই ত মেরে ফেলা সহজ। জ্ঞান ফের্‌বার আগেই আমি তাকে সরিয়ে দিতে চাই।

ডাক্তারের মনে হলো, সে যেন সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে কারাবাসে আছে। বিভীষিকার ভীষণ আওয়াজ থৈ থৈ কর্‌ছে, শবের বিকট উল্লাস যেন লোকটির মর্মমূল ভেদ করে এসে ডাক্তারের বক্ষে নৃত্য সুরু করে দিয়েছে।

খানিকক্ষণ নীরব থেকে ডাক্তার বল্‌লো, সে কি ক'রে সম্ভব ?

উত্তর শুনে অপরিচিত লোকটির মুখখানা যেন ক্রমে কঠিন হ'য়ে উঠতে লাগলো। চোখের মণি দু'টো শাণিত ফলার মত জল জল কর্‌ছে। ভ্রুকুটি কুটীল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে লোকটি হাতের প্যাকেটটি পকেটে পুরে বল্‌তে লাগলো, সম্ভব নয় কেন শুনি ? জান, গুলি করে এখনই দুজনকে মেরে ফেল্‌তে পারি।

তারপর চক্‌চকে পিস্তলটি শক্ত হাতের মুটিতে উঠে এলো পকেট থেকে। এমনি সময় পাশের ঘরের ফোনটিতে ক্রীং ক্রীং করে আহ্বান-আওয়াজ বেজে উঠলো। ডাক্তার ফিরে তাকালো যাবার জন্য, সেই মুহূর্তে চাপা কঠিন সুরে ঘরখানা ভরে উঠলো—দাঁড়াও—বলে দ্বিরুক্তি না করে বাম হাতে ডাক্তারের ডানহাতখানা চেপে ধর্‌লো। লোকটি বল্‌লো, থানা থেকে খবর জানতে চাইলে বল্‌বে —মেয়েটি মরে গিয়েছে।

'না, তা' হয় না। এক্ষুণি তা'হলে পুলিশ চলে আস্‌বে !'...

ডাক্তার ফোন তুলে ধর্‌লো। সেই থানা থেকেই খবর জানতে চেয়েছে। কথার ফাঁকে কোন কিছু জানাবার উপায় ছিল না। শুধু সে জানিয়ে দিল যে এখনও তার জ্ঞান ফেরেনি। ফোন নামিয়ে ডাক্তার কি ভেবে বল্‌লো, আমি আপনার কথা চিন্তা কর্‌ছি।

সহসা বিহ্বল হ'য়ে লোকটি জবাব দিল, চিন্তা কর, ডাক্তার চিন্তা কর। আমি তোমায় পাঁচ হাজার টাকা দেবো। আমার মান বাঁচাও। কিন্তু ঘটনা জান্‌তে চেয়ো না। সহরের বিখ্যাত মানী ব্যক্তির মান-সম্ভ্রম যেতে বসেছে। রক্ষা কর। আমি কাল আবার রাত্রিতে আস্‌বো, দরজা বন্ধ করে রেখো না। দেখো কোন কিছুই যেন প্রকাশ না হয়ে পড়ে। আমি কিন্তু তা হলে গুলি কর্‌তেও দ্বিধাবোধ কর্‌বো না। তবে ভাবনা নেই, আমি সঙ্গে করে টাকা নিয়ে আস্‌বো।

লোকটি আর বিলম্ব কর্‌লো না। মুহূর্ত মধ্যে স্থান ত্যাগ করে সামনের খোলা দরজা দিয়ে বেড়িয়ে গেল। বাত্যাহত বৃক্ষের মত ডাক্তার যেন বিপর্যস্ত। অপস্রিয়মান ঋজু দেহটার দিকে তাকিয়ে থেকে নিজের মনে ডাক্তার চিন্তা কর্‌তে লাগলো, পাঁচ হাজার !

ধীরে ধীরে ডাক্তার রোগিণীর হাত তুলে নাড়ী পরীক্ষা করে হাতটি আবার নামিয়ে রেখে পাশেই স্থির হয়ে বস্‌লো। এই তো অসাড় দেহ। এই দেহটাকে কেন্দ্র করেই পংকিলতার বিষাক্ত বাতাস ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে। তবু পাঁচ হাজারের অনুরণন কান থেকে বুকের পাঁজর পর্যন্ত চিমে তালে হাতুড়ি পিটতে লাগলো। এই টাকা পাওয়া তো অসম্ভব নয়। মৃত্যুর দুয়ার পর্যন্ত যে গিয়েছে, তাকে দুয়ারের বাইরে বসিয়ে না রেখে একেবারে ঘরে প্রবেশের প্রবেশপত্র পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেই বা অপরাধ কোথায় ? আজ তার অর্থের বড় প্রয়োজন। হাসপাতালের ঔষধ চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে তার চাকরী গ্যাছে। কালই তার শেষ দিন। বাড়ীতে তার চার ছেলে, দুই মেয়ে, আর তার চির-পীড়িতা স্ত্রী। এদিকে দেনার দায়ে বাড়ীও যেতে বসেছে। বিপুলায়তন সংসারের ব্যয় শুধু কি ডাক্তারি করে সম্ভব ? সমস্ত কথা ভাবতে গিয়ে ডাক্তারের বুকের কোথায় যেন কাঁটা খচ খচ করে বিঁধতে থাকে। অব্যক্ত বেদনায় মুহূর্ত মধ্যে

ডাক্তার স্থির সিদ্ধান্তে পৌছায়—পাঁচ হাজার টাকা তার চাই-ই।

ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়ে এলোমেলো ঘুরতে লাগলো। কোথা থেকে যেন ডাক্তারি কর্তব্যবোধ সামনে এসে দাঁড়িয়ে ডাক্তারের স্থির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তোলে। যার চাকুরীর মেয়াদ শেষ, দেনার দায়ে বাড়ী যেতে বসেছে, পোষ্যগুলির প্রতিপালনও যার পক্ষে কঠিন, তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কর্তব্য কতক্ষণ আর পথরোধ করে দাঁড়াবে?

চিন্তায় ছেদ পড়লো। রোগিণী সহসা চেঁচিয়ে বল্‌লো, কে আছ, মেরে ফেল্‌লো। বড় কষ্ট, বড় কষ্ট।

হতাশ্বাসে সে যেন আবার স্থির হয়ে গেল। বাঁচবার প্রবল আবেগে সে উঠে বস্‌তে চায়, হাত তুল্‌তে চায়, ঠোঁট দু'টোও ঈষৎ কেঁপে ওঠে। কিন্তু—

ডাক্তার ঝুঁকে পড়লো রোগিণীর দিকে! অনেকক্ষণ স্থির হ'য়ে বসে রইলো আর কিছু শোনার জন্য। কিন্তু শোনা গেল না, মনে হলো, আবার তার চেতনা শান্ত ও সমাহিত।

রাত কেটে গেল। সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা এলো। এর মধ্যে রোগিণীর সেই নিঃসাড় দেহে চেতনার কোন লক্ষণই পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার কিছু পরে ডাক্তারের এক বন্ধু এসে খবর দিয়ে গেল যে তদ্বির করা সত্ত্বেও তার চাকুরী থাকবে কিনা সন্দেহ। অপরাধের গ্লানি কঠিন পাষাণের মত বুকের উপর চেপে বসে শ্বাসরোধ করে দিচ্ছিল। সমস্তই যদি তার যেতে থাকে শেষ পর্যন্ত, তবে সে নিশাচরের মৃত্যু-ফেনিল আহ্বানকে বরণ করে নেবে না কেন? দুনিয়ার সকল কর্তব্য তার সংসারকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। সংসারই যদি তার ব্যর্থ জীবনের সংক্ষুব্ধ তরঙ্গের দোলায় ভেসে যেতে থাকে, তবে কিসের কর্তব্য—কার জন্য কর্তব্য।

অপরাধের ঝুলি কাঁধে নিয়ে যখন তাকে হাসপাতালের সদর দরজা পেরিয়ে যেতেই হলো, তখন আর একটা কলংক তার জীবনের সঙ্গে জুড়ে দিতে বাধা কোথায়?

ওপরে নিশা নেমে এলো হাসপাতালের ঘরে ঘরে। ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের রাস্তায় রাস্তায় মাঝে মাঝে লোকের সাড়া পাওয়া যায়। দূরে অসংখ্য বৃক্ষের ছায়ার অন্তরালে পথের বিজলীবাতিগুলো যেন প্রেতিনীর মত দন্ত বিকাশ করে অট্টহাসি হাস্‌ছিল। হাসপাতালের আর একদিকের সমস্ত প্রাঙ্গণ যেন ডাকিনীর কৃষ্ণপক্ষে আচ্ছাদিত। মাঝে ট্রাম-লাইন পাতা পিচ-রাস্তার পাশে বিজলী বাতিগুলো যেন অস্পষ্ট আলোর শিখা ছড়িয়ে দিয়েছে। যানবাহন হীন নিশ্চল রাস্তাটা যেন কালো চক্‌চকে সরীসৃপের মত নিদ্রা-মগ্ন। রাস্তার এপারে চেম্বারে বসে বিশীর্ণ শংকিত ডাক্তার। অন্তর তার থেকে থেকে কাঁপছে। সমস্ত আঁধার জমাট বেঁধেছে এসে যেন ঘরের ভেতরটায়, কোথাও যেন আলো নেই—সমস্ত অন্ধকার।

বিনা দ্বিধায় কৃষ্ণ-কাপড় জড়িত সেই অপরিচিত লোকটি ঘরে ঢুকে টাকার তোড়াগুলো পকেট থেকে বার করে সামনের টিপয়ের উপর রাখলো। লোকটি উজ্জ্বল চোখ দু'টো ঠিক্‌রে পড়তে লাগলো। ডাক্তারের মনে হলো, এতক্ষণ যে আঁধার সে অনুভব কর্‌ছিল, সেই ঘরের দুর্ভেদ্য অন্ধকার লোকটির চোখের তীব্র জ্যোতিতে বুঝি আলোকিত হয়ে উঠলো। অপর পকেট থেকে একটা মোড়ক বার করে ডাক্তারের হাত দিয়ে বললো, আর দেরী নয়। জলের সঙ্গে গুলে খাইয়ে দাও।

নির্বিবাদে ডাক্তার শক্ত কাচের গ্লাসে জলের সাথে ঔষধটি মিশিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। লোকটি ডাক্তারকে ঝাঁকুনি দিয়ে বল্‌লে, দাঁড়ালে কেন? খাইয়ে দাও। কোথায় কখন কে এসে পড়বে।

ঔষধ মেশানো গ্লাসটি ডাক্তারের হাতে কঠিন হয়ে এঁটে গেল। কি এক দৃষ্টি যেন ডাক্তারের চোখে মুখে ভর কর্‌তে লাগলো। মানবত্ববোধ যেন হঠাৎ ডাক্তারের কঠিন দৃষ্টিতে উজ্জ্বল হ'য়ে জ্বল্‌তে লাগলো। ভুলে গেল ডাক্তার নিজের কথা, সংসারের কথা—ভুলে গেল লাভ-ক্ষতির হিসাব। কর্তব্য চিরকালই কর্তব্য। কঠিনস্বরে ডাক্তার জিজ্ঞাসা কর্‌লো, ওখানে কত টাকা?

লোকটা চকিতে জবাব দিল, কেন? পাঁচ হাজার।

'না, ওতে হবে না। আরো পাঁচ হাজার চাই।'

'আরো পাঁচ হাজার? আগে বলনি কেন? তাই না হয় দিতাম কুকুর। বলে লোকটি পকেট থেকে সেই নিশাচরের কুটিল ভয়াল চক্‌চকে পিস্তলখানা বার করে

উঁচিয়ে ধর্‌লো। টিপয়ের উপর থেকে কঠিন মুষ্টিতে টাকাগুলো তুলে নিয়ে পকেটে পুরে রেখে রুখে দাঁড়িয়ে বল্‌তে লাগলো, কুকুর কোথাকার, লোভের তোমার শেষ নেই। নাও, এগিয়ে চল ঐ গ্লাস নিয়ে।

ডাক্তার একটু ভেবে তার মুখের দিকে তাকালো। চাপা কণ্ঠের বিকট আওয়াজ, যাও।

ডান হাতে পিস্তল উঁচিয়ে ধরে লোকটি স্থির হয়ে রইলো। ডাক্তার ধীরে ধীরে গ্লাসখানা নিয়ে মেয়েটির মুখের দিকে ঝুঁকে পড়লো।

'তাড়াতাড়ি কর।'

এক মিনিট। মুহূর্তে সমস্ত ওলোট-পালোট হ'য়ে গেল। ডাক্তার বিষপূর্ণ গ্লাস কঠিন মুষ্টি থেকে সজোরে ছুঁড়ে মেরে দিল লোকটির চোখের দিকে। গ্লাসটি মুখে প্রতিহত হ'য়ে চূর্ণিত খণ্ড কয়েক চোখে বিঁধে গেল! ডান চোখের ধার ঘেঁসে কাচের খণ্ড সমূলে ঢুকে গিয়েছে। বাঁ'চোখের কিছুটা অংশও ক্ষত-বিক্ষত। মৃত্যু-বিষের সঙ্গে আততায়ীর অশান্ত রক্তধারা নাকের উপর দিয়ে বুকের উপর এসে জম্‌তে লাগ্‌লো।

লোকটি বিকট চীৎকার করে শুধু বলে উঠ্‌লো, শয়তান—

কাচের খণ্ডগুলি নীচে পড়ে ঝম্‌ঝম্ করে চৌচির হয়ে গেল। হাতের পিস্তলটি ছিট্‌কে পড়ে আওয়াজ হলো। সহসা ডাক্তার শব্দ করে হাঁটু চেপে ধরে কিছু দূরে গড়িয়ে পড়ে গেল। লোকটির চোখ দিয়ে তখনও দরদর ধারায় রক্ত ঝরে পড়ছিল। সমস্ত দেহটি তার কেঁপে কেঁপে মাটিতে পড়ে গেল।

রোগিণী তখনও নিঃসাড়ে পড়ে। এদিকে ফোনও ক্রীং ক্রীং শব্দ করে চলেছে।

জিজ্ঞাসা

প্রভা দত্ত

দক্ষিণে চলেছি আমি জিজ্ঞাসায় বলেছি উত্তর :
মনস্তত্ত্ব দীনতায় ভুগি আমি অন্ধকার প্রীতি,
রাত্রে দুঃস্বপ্নে জাগি লঘুমেঘ চলেছে সত্বর
যক্ষের বিরহ নয়, বার্ত্তা তার অনন্ত সম্প্রাতি।
প্রশ্নের উত্তর নয়—মীমাংসা পূর্বে ও পশ্চিমে
খাণ্ডব দাহন শেষে সে তক্ষক লুকালো কোথায়
সেদিনের শেষ কোথা—দ্বন্দ্ব চলে সীমা ও অসীমে :
মহাশূন্যে কার রাজ্য, বক্রগতি ক্ষেপণাস্ত্র ধায়।
মৃত্যুর জোনাকী জ্বলে—আলেয়াতো মনে হয় দূরে :
তবু তো জিজ্ঞাসা আজ, শক্তিশেল বুঝি লক্ষ্য ভেদে—
জীবন অরণ্যে শুধু, প্রতিধ্বনি জাগে অশ্বখুরে,
এমন সর্পিল গতি, ভেক বক্ষে চলে কোন বেদে,
উত্তরে চলেছি আমি, জিজ্ঞাসায় বলেছি দক্ষিণ,
কল্পনা বিমুগ্ধ তবু, চিরকাল রবো যুক্তিহীন।

শ্রী 'শ'—

॥ শ্রেষ্ঠ চিত্র ॥

বাংলা চলচ্চিত্র যে ভারতীয় চলচ্চিত্রের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ, "সাগর সঙ্গমে" ও "জলসাঘর" চিত্র দুটি ১৯৫৮র শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, আবার তা প্রমাণ করল! দেবকীকুমার বসু পরিচালিত "সাগর সঙ্গমে" চিত্রটিকে গত বৎসরের শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হবে এবং পুরস্কাররূপে চিত্রটির প্রযোজক পাবেন ২০০০০৲ টাকা ও পরিচালক পাবেন ৫০০০৲ টাকা। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "জলসাঘর" চিত্রটিকে গত বৎসরের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপে "সার্টিফিকেট্ অফ্ মেরিট্" পুরস্কার দেওয়া হবে এবং এর প্রযোজক ১০০০০৲ টাকা ও পরিচালক ২৫০০৲ টাকা পুরস্কার পাবেন।

বাংলা চিত্রের এই সাফল্যের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অভিনয়ের দক্ষতা ও পরিচালনার কৃতিত্ব ছাড়াও আরও একটি বিশেষ গুণে বাংলা চিত্র গুণান্বিত—এই গুণটি হচ্ছে সুলিখিত গল্প। গল্পই হচ্ছে ছবির প্রাণ। গল্প যদি চিত্তাকর্ষক হয় তাহলে সু-পরিচালনা ও সু-অভিনয়ের সমন্বয় ঘটালে সে ছবি দর্শক-মনোরঞ্জন করবেই। সুযোগ্য পরিচালক ও দক্ষ অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভাব অন্যান্য প্রদেশে না থাকলেও উপযুক্ত গল্পের বা প্লটের অভাব যে আছে তা বলা চলতে পারে। সে দিক দিয়ে বাংলা চিত্র যে সৌভাগ্যশালী তাতে সন্দেহ নেই, আর এই সৌভাগ্যের জন্য বাংলা চলচ্চিত্র ঋণী ঐশ্বর্য্যশালী বাংলা কথা-সাহিত্যের কাছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ করে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের মধ্য দিয়ে ও আধুনিক প্রতিভাশালী লেখক গোষ্ঠীর হাতে বাংলা কথা-সাহিত্য যে সম্পদে গরীয়ান হয়ে উঠেছে, তারই কিছু ভাগ নিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে; আর এই সমৃদ্ধি বাড়াতে হলেই শুধু নয়, বজায় রাখতে হলেও বাংলা চলচ্চিত্রকে আরও নিখুঁত হতে হবে সর্ব্ববিষয়ে, সর্ব্ববিভাগে—তবেই হয়ত দূর ভবিষ্যতে বাংলা চিত্র প্রাদেশিকতার গণ্ডি পেরিয়ে, এই উপ-মহাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে, বিশাল বিশ্বের চলচ্চিত্র বাজারে শ্রেষ্ঠত্বের স্থায়ী আসন লাভ করে, বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের অননুকরণীয় সৃজনী শক্তির পরিচয় প্রদান করে, বাঙালী শিল্পীর শিল্প সাধনাকে সার্থক করে তুলবে।

* * * *

দেশে-বিদেশে ঃ

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শরদ বাদক আলি আকবর খাঁন বিলাতে তাঁর বাজনা শোনাবার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে শীঘ্রই লণ্ডন অভিমুখে রওনা হবেন। তিনি লণ্ডনের Royal Festival Hall ছাড়াও Bath শহরে এবং Oxford, Birmingham প্রভৃতি স্থানে তাঁর বাজনা শোনাবেন। ওস্তাদ আলি আকবর খাঁনের এই ভ্রমণের আয়োজন করেছেন লণ্ডনের Asian Music Circle.

* * * *

বিশ্ব-বিখ্যাত ভারতীয় চিত্র "পথের পাঁচালী" নিউ-ইয়র্কের Fifth Avenue Cinema-য় ৩২ সপ্তাহ ধরে প্রদর্শিত হয়ে ঐ সিনেমায় প্রদর্শিত চিত্রের মধ্যে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। তিরিশ বৎসর আগে নির্ব্বাক যুগের বিখ্যাত জার্ম্মান চিত্র "The Cabinet of Dr. Calligari" এই সিনেমায় ২২ সপ্তাহ ধরে চলে যে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল এতদিন পরে "পথের পাঁচালী" সেই রেকর্ড ভালভাবেই ভঙ্গ করে ভারতীয় চিত্রের গৌরব ঘোষণা করেছে।

* * * *

দূর প্রাচ্যের অনেক স্থানেই ভারতীয় চিত্র ভাল রকম ভাবে পরিবেশিত হলেও হংকং-এর বাজারে এর চাহিদা তেমন নেই। হংকং-এর চীনা ও ইউরোপীয় দর্শকরা ভারতীয় চিত্রের তেমন পক্ষপাতী নন। হংকং-এর একজন ভারতীয় চিত্র-পরিবেশক এর কারণরূপে মনে করেন যে ভারতীয় চিত্রের অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য এখানকার দর্শকদের ধৈর্য্যহানি ঘটায় বলেই তারা ভারতীয় চিত্রের বিশেষ পক্ষপাতী নয়।

* * * *

ইন্দোনেশিয়ার Film Censorship Committeeর বিদেশী চিত্রের সেন্সর যে খুবই কড়া তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ছাব্বিশ জন পুরুষ ও সাতজন স্ত্রীলোক মিলে এই ফিল্ম সেন্সরশিপ্ কমিটি তৈরী হয়েছে, আর প্রায় প্রতিদিনই এই কমিটি বসে দেশী-বিদেশী চিত্রের ওপর কড়া সেন্সর আরোপ করবার জন্য। ইন্দোনেশিয় সমাজে চুম্বন প্রথার চলন নেই বলে এবং তাঁরা এ প্রথার বিরোধী বলে বিদেশী চিত্রের, বিশেষ করে হলিউডের ও ইউরোপীয় চিত্রে, স্ত্রী-পুরুষের চুম্বন দৃশ্যগুলি বাদ দিয়ে দেন। এমন কি সিনেমার পোষ্টারেতেও ঐ রকম কোনও দৃশ্য দেখাতে দেওয়া হয় না। নৈতিক চরিত্র, রাজনীতি ও ধর্ম্মীয় মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে এই সব সেন্সর আরোপ করা হয়। গত বৎসর এই কমিটি ১৮৭টি চিত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। এর মধ্যে ছিল ১৩৭টি মার্কিণ, ১১টি ব্রিটিশ, ৭টি চৈনিক, ৬টি ফিলিপিনো, ৯টি মালয়ান, ৪টি ফ্রেঞ্চ, ৪টি জাপানী, ৪টি ভারতীয়, ৩টি ইতালিয়ান ও ২টি পাকিস্তানী।

* * * *

খবরাখবর ঃ

গত ১লা বৈশাখ পশ্চিম বঙ্গের মুখ্য-মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্য, আকাডেমির (সঙ্গীত ভবন) নব ভবনের উদ্বোধন অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হয়েছে। ডাঃ রায় তাঁহার ভাষণে জানান যে ১৩৬৮ সালে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিক উৎসবে এই সঙ্গীত আকাডেমিকেই কেন্দ্র করে এবং এর সম্প্রসারণ করে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে উঠবে। সে দিনের সঙ্গীতানুষ্ঠানে সঙ্গীত বিভাগের কার্য্যের উচ্চ নিদর্শন ও যোগ্য শিক্ষা পদ্ধতির পরিচয়ও পাওয়া যায়। নাট্য-বিভাগে সর্বাধিনায়করূপে আছেন শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী এবং নৃত্য বিভাগ শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নায়কত্বে ও বিখ্যাত অধ্যাপকগণের সহযোগীতায় পরিচালিত হচ্ছে।

* * * *

ব্রহ্ম দেশের সমাজ ও জীবনের পটভূমিকায় লেখা শরৎচন্দ্রের "ছবি" নামক গল্প অবলম্বনে 'ইন্দো-বর্ম্মা ফিল্ম কর্পোরেশন'-এর নির্ম্মিত, গল্পের নামেরই চিত্রটি ব্রহ্মদেশে ও ষ্টুডিওতে সুটিং শেষ করে মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে। চিত্রটিতে অভিনয় করেছেন মালা সিন্‌হা, ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায় প্রভৃতি।

* * * *

'শ্রীমতী পিকচার্স'-এর নূতন চিত্র "ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত"-র কাজ ভাগলপুরে আঞ্চলিক সুটিং এর মধ্য দিয়ে আরম্ভ হয়ে গেছে। পরিচালক হরিদাস ভট্টাচার্য্য ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন, আর শ্রীকান্তের ভূমিকায় সজল ঘোষ, ইন্দ্রনাথের ভূমিকায় পার্থপ্রতীম চৌধুরী প্রভৃতি কয়েকজন তরুণ অভিনেতার সাক্ষাৎও এই চিত্রে পাওয়া যাবে।

* * * *

নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের জনপ্রিয় নাটক "ক্ষুধা"-কে 'এইচ্-এন্-সি প্রডাকসন্স' চিত্রে রূপায়িত করছেন। চিত্রনাট্য রচনা নাট্যকার নিজেই করেছেন এবং পরিচালনা ভারও তিনিই গ্রহণ করেছেন। নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হচ্ছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য ভূমিকায় থাকবেন ছবি বিশ্বাস, নরেশ মিত্র, তরুণকুমার প্রভৃতি। কালী বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুব সম্ভবত তাঁর বহু-প্রশংসিত 'সদা'-র ভূমিকায় দেখা যাবে।

* * * *

বিদেশী খবর ঃ

হলিউডে অনুষ্ঠিত 31st. Annual Motion Picture Academy Award প্রদান অনুষ্ঠানে এবার দু'জন ব্রিটিশ তারকাকে 'Oscar' পুরস্কার প্রদান করে সম্মানিত করা হয়েছে,—এই দু'জন হচ্ছেন বিখ্যাত অভিনেতা David Niven ও অভিনেত্রী Wendy Hiller. এঁরা দু'জনেই Terence Rattigan-এর "Seperate Tables" চিত্রে অভিনয় করে বৎসরের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও শ্রেষ্ঠা পার্শ্ব-অভিনেত্রীর সম্মান লাভ করলেন।

৩৯ বৎসর বয়স্কা প্রখ্যাতা অভিনেত্রী Susan Hayward-এর বহু দিনের স্বপ্নও সার্থক হয়েছে এবার,—তিনি শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীরূপে Oscar পুরস্কার লাভ করেছেন "I Want to Live" চিত্রে অভিনয় করে। "The Big Country" চিত্রে অভিনয় করে ব্যালে গায়ক Burl Ives শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব-অভিনেতার পুরস্কার লাভ করেছেন।

চলচ্চিত্রের মধ্যে সঙ্গীত মুখর রঙিন চিত্র "Gigi" শ্রেষ্ঠ চিত্রের পুরস্কার লাভ করা ছাড়াও নয়টি বিভিন্ন বিষয়ে পুরস্কার লাভ করে প্রায় রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

* * * *

রুশ সম্রাজ্ঞী Catherine the Great-এর উত্তরাধিকারী তথাকথিত "পাগলা রাজা" ("Mad King") Czar Paul I-এর নাটকীয় জীবনা চিত্রে রূপায়িত হবে Yul Brynner ও Anatol Litvak-এর যুগ্ম প্রযোজনায়। Yul Brynner Czar Paul-এর ভূমিকায় অভিনয় করবেন। চিত্রটি ১৯৪১ সালে মৃত রুশ লেখক Dimitry Merezhkovsky-র লেখা নাটকের অংশ অবলম্বনে নির্ম্মিত হবে।

* * * *

আর, ডি, বনশল প্রযোজিত ও মুক্তি-প্রতীক্ষিত "শশীবাবুর সংসার" চিত্রের একটি প্রণয়-মধুর দৃশ্যে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ও জীবেন বসু

***

শিল্পীর কথা

'গানের ফুলে যে হার গাঁথি'

কুমারেশ ভট্টাচার্য

সাঁইত্রিশ বছর আগের কথা। ময়মনসিং শহরের মাঝে একখানা সুদৃশ্য দ্বিতল বাড়ী। বাড়ীর মালিক মনোরঞ্জন ঘোষদস্তিদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীধরণীরঞ্জন ঘোষ দস্তিদার তখন ও অঞ্চলের একজন নামকরা শিকারী। রাইফেল ও রিভলবার নিয়েই তাঁর কাজ। বাড়ীতে ছিলনা সংগীতের কোনরূপ চর্চা। কিন্তু ধরণীবাবুর হঠাৎ একদিন কি খেয়াল হোল, তিনি কিনে নিয়ে এলেন ভাল একটি হারমোনিয়াম। বাড়ীর সবাই অবাক্ হ'য়ে জিজ্ঞেস করলেন, হারমোনিয়াম দিয়ে কি হবে? কে শিখবে গান? ধরণীবাবু দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন, আমার প্রথম সন্তান ছেলেই হোক, আর মেয়েই হোক, তাকে শেখাবো গান, আর এজন্যেই আমি কিনেছি হারমোনিয়াম। তাঁর উত্তর শুনে হেসে উঠলেন সবাই। কিছুদিন পরে এক শুভ মুহূর্তে একটি কন্যাসন্তানের আবির্ভাব হোল। সবার আদর আর যত্নের ভেতর দিয়ে শিশুটি বেড়ে উঠতে লাগল দিন দিন। তার বয়স যখন মাত্র দু'বছর তখন সে খেলার সামগ্রী ভেবে হারমোনিয়ামের কাছে গিয়ে তার ছোট্ট ও নরম আংগুল দিয়ে চেপে ধরতো রিডগুলো। সশব্দে বেজে উঠতো হারমোনিয়াম, আর শিশুটি খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠতো মনের আনন্দে। খেলার নানাবিধ সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও, পূর্বজন্মার্জিত সাধনা আর সংস্কারের ফলেই হারমোনিয়ামের আকর্ষণই সেই ছোট্ট মেয়েটীর কাছে প্রবল হ'য়ে উঠেছিল শিশুকাল থেকে।

১৯৩০ সাল। স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল ঢেউ তখন বাঙলাদেশকে ক'রে তুলেছে চঞ্চল; বাঙলার আকাশ-বাতাস মুখর হ'য়ে উঠেছে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে। দলে দলে বাঙালী হাসিমুখে কারাবরণ করছে। বক্ষে তাদের দুর্জয় সাহস, দৃষ্টিতে তাদের অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা। দেশের বিভিন্ন স্থানে রোজই প্রায় অনুষ্ঠিত হ'চ্ছে সভা, গড়ে উঠছে কত সমিতি। ময়মনসিং শহরেও এই আন্দোলনের ঢেউ তীব্র হ'য়ে ওঠে তখন। সেখানে প্রায়ই অনুষ্ঠিত হয় সভা আর সম্বর্ধনা উৎসব। এই সব অনুষ্ঠানে গান গাইবার জন্যে সাদর আহ্বান আসে সেই মেয়েটীর কাছে। তখন তার বয়স মাত্র ছ' বছর। কিন্তু এরই মধ্যে শান্তিনিকেতনের শৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের কাছে সে শিখেছে কয়েকটী স্বদেশী গান। জনসভায় সেই ছোট্ট মেয়েটী যখন টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে 'নীরব ভারতে কেন ভারতীর বীণা', 'সোনার বাঙলাদেশ', 'বন্দেমাতরম্', প্রভৃতি গান গাইত উদাত্তকণ্ঠে, তখন সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতো তার গান, বিস্মিত হ'ত বালিকার সংগীত-প্রতিভার পরিচয় পেয়ে। সেদিনকার সেই ছোট্ট বালিকাটি আর কেউই নয়, ইনি হ'চ্ছেন বাঙলা তথা সারাভারতের সর্বজনপ্রিয় সংগীত-শিল্পী, সুরের নিষ্ঠাবতী পূজারিণী কুমারী বিজন ঘোষ দস্তিদার।

তখনকার দিনে মেয়েদের মধ্যে সংগীত শিক্ষা আজ-কালের মত এত প্রসার লাভ করেনি। কিন্তু তবুও বিজন কয়েকখানা মাত্র গান শিখে সভা সমিতিতে গাইলেও তাঁর সংগীত শিক্ষার পরিসমাপ্তি যে সেখানেই হ'তে পারে না—একথা তাঁর পিতৃদেব ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন মনেপ্রাণে বুঝেছিলেন। তাঁরা লক্ষ্য ক'রেছিলেন সংগীতের প্রতি বিজনের গভীর অনুরাগ, মুগ্ধ হ'য়েছিলেন তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠের অপূর্ব সুরঝংকারে, বিস্মিত হ'য়েছিলেন তাঁর সংগীত-প্রতিভায়।

ময়মনসিং শহরে তখন একজন বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ ছিলেন। নাম ছিল তাঁর ললিত মোহন সেন। সেন মহাশয়ের পেশা ছিল কবিরাজী, কিন্তু নেশা ছিল সংগীতে। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ইত্যাদি মার্গসংগীতের তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান সাধক।

কাকা অবনীরঞ্জন একদিন বিজনকে নিয়ে গেলেন ললিতবাবুর কাছে। সবিনয়ে তিনি পেশ করলেন তাঁর ভাইঝিকে গান শেখাবার প্রস্তাব। ললিতবাবু মৃদু হেসে বললেন যে তিনি কাউকে কখনো গান শেখান না। তা'

ভিন্ন, মেয়েদের গান শিখিয়েও কোন লাভ নেই। কারণ, সংগীত অত্যন্ত সাধনার বস্তু। মেয়েদের পক্ষে ধৈর্য ও একাগ্রতাসহকারে সে সাধনা করা সম্ভব নয়, সহজসাধ্যও নয়। উত্তর শুনে অবনীবাবু হ'লেন নিরুৎসাহ, বিজনের আশায় উৎফুল্ল মুখখানার উপর নেমে এল বিষাদের ছায়া। বালিকার ম্লান মুখখানা লক্ষ্য ক'রেই বুঝি আঘাত পেলেন সাধক। তিনি তখন আগ্রহভরে বললেন, একটা গান শোনা তো মা, দেখি তুই কি রকম গাইতে শিখেছিস! গান গাইলেন বিজন—অতি মধুর ও দরদীকণ্ঠে। মাত্র সাত-আট বৎসরের বালিকার গানের সুর-ঝংকার ও মূর্চ্ছনায় বিস্মিত হ'লেন সুর-সাধক। আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে তিনি বললেন, আমি তোকে গান শেখাবো। সংগীতে তোর রয়েছে একটা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা, অসামান্য প্রতিভা।

এরপর থেকে ললিতবাবু অক্লান্ত পরিশ্রমে ও যত্ন-সহকারে তাঁর শিষ্যাকে গান শেখাতে আরম্ভ করলেন। উচ্চাংগ সংগীতের দুর্গম সাধনার পথে বিজনও এগিয়ে যেতে লাগলেন ক্রমে ক্রমে বিপুল উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে।

এদিকে স্কুলে ভর্তি হ'য়েও বিজন নিয়মিত পড়াশুনা করতে থাকেন। এ সময়ে তাঁর কাকারা শুধু যে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন তা নয়, ময়মনসিং শহরে তাঁদের বাড়ীর নীচতলাটায় জেলা কংগ্রেস অফিস স্থাপিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে উক্ত বাড়ীটি হ'য়ে ওঠে স্বাধীনতা সংগ্রামের একটী কর্মকেন্দ্র। ঐ সময়ে শরৎ বসু, প্রফুল্ল ঘোষ, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি বহু দেশপূজ্য কর্মীর শুভাগমন হয়েছে এ বাড়ীতে। এর ফলে, আট-ন' বছরের বালিকা বিজনের মনও স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে, স্বাধীনতার সুর এই বালিকার মনকেও ক'রে তোলে চঞ্চল।

উক্ত শহরে 'গুপ্ত সমিতি' স্থাপন ক'রে একদল বিপ্লবী যুবক তাদের কাজ চালাতে থাকে সংগোপনে। হাতে তাদের মারণাস্ত্র, চোখে তাদের বিদ্রোহের আগুন। বাঙলার সেই মৃত্যুঞ্জয়ী সন্তানদল অনেক সময় বালিকা বিজনকে দিয়ে অনেক কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিয়ে নিয়েছিল তাঁর অজ্ঞাতসারে। ললিতবাবুর ভাই ধীরেন্দ্র মোহন সেন মহাশয়ের নিকট বিজন নানারূপ ব্যায়াম, ছোরা ও লাঠি খেলা ইত্যাদি শিখতে থাকেন।

নানা কাজের মধ্যেও বিজনের সংগীত সাধনা কিন্তু এতটুকুও হয় নি ব্যাহত। ললিতবাবু তাঁর এই শিষ্যাকে অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে প্রায় ৭০টী রাগের ধ্রুপদ, খেয়াল ভজন, তারানা, চতুরংগ প্রভৃতি শিক্ষা দেন।

একবার তাঁর গুরু ললিতবাবু ভয়ানক অসুস্থ হ'য়ে পড়েন কঠিন রোগে। অসহ্য যন্ত্রনায় তিনি অস্থির হ'য়ে পড়েন। তখন তিনি ডেকে পাঠান বিজনকে। বিজন

কুমারী বিজন ঘোষ দস্তীদার

এলে তিনি বলেন, পূর্বজন্মে তুই ছিলি আমার মা। মা কাছে না থাকলে সন্তানের কি কখনও খাওয়া হয়, না ঘুম আসে? আমার মনে হয়, তোর গান শুনলে রোগ-যন্ত্রনা আমার কমে যাবে। শিষ্যা তখন গান আরম্ভ করলেন। সে গানের সম্মোহনী শক্তি গুরুর রোগ-যন্ত্রনা দিল দূর করে, চোখে এনে দিল ঘুম।

খুব অল্প বয়স থেকেই বিজন রেডিওতে গান গাইতে শুরু করেন।

এগারো বছর বয়সে তাঁর একটী আধুনিক গান রেকর্ড করা হয়। ঐ গান খানার বহু রেকর্ডও বিক্রী হয়। ক্রমে ক্রমে তাঁর খেয়াল, রাগপ্রধান, ভজন, গজল, কীর্তন, শ্যামা-সংগীত প্রভৃতি অনেকগুলো গানের রেকর্ড করা হয়। নজরুল ইসলামের রচিত শ্যামাসংগীতও তিনি নিজস্ব সুরে রেকর্ড করেন। এ ভাবে অল্পদিনের মধ্যে বিজনের নাম-যশ ও সম্মান বাঙলা দেশ পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র ভারতে।

১৯৩৮ সালে বিজন ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৩৯ সালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরক্ষার্থীদের জন্যে সংগীত সিলেবাস অনুসারে খুব সহজ পদ্ধতিতে রেকর্ড করেন একটী সংগীত শিক্ষার সেট্।

১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে আগ্রা, এলাহাবাদ, বেনারস, মীরাট, এটোয়া, বেরিলী প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনে আমন্ত্রিত হ'য়ে যোগদান করেন বিজন এবং প্রমাণ করেন সংগীত জগতে বাঙালী মেয়েদের অগ্রগতি। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যেখানেই তিনি গেয়েছেন গান সেখানেই লাভ ক'রেছেন বিপুল যশ ও সম্মান এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ সংগীত সাধকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ। এ ভিন্ন, বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আমন্ত্রিত হ'য়ে তিনি পরিচয় দিয়েছেন তাঁর অসামান্য সংগীত-প্রতিভার।

১৯৪০ সালে নিখিল বংগ সংগীত সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় বিজনকে পরিচয় করিয়ে দেন সংগাত-সাধক পণ্ডিত ওঁঙ্কারনাথ ঠাকুরের সংগে। পণ্ডিতজী বিজনের কণ্ঠে তাঁরই নিজস্ব সুরে গাওয়া কবীরের একখানা ভজন গান শুনে এত মুগ্ধ হ'য়েছিলেন যে তিনি সানন্দে বিজনকে ছাত্রীরূপে গ্রহণ ক'রতে সম্মত হন। অদ্যাবধি বিজন সুর-সাধক ওঁঙ্কারনাথ ঠাকুরের কাছেই শিক্ষা ক'রছেন উচ্চাংগ সংগীতের সূক্ষ্ম ও জটিল কলা-কৌশল।

স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫১ সালে দিল্লীতে প্রথম অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে বিজনই বাঙলার প্রতিনিধি-রূপে যোগদান করেন। মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা সভায় তিনি বহুবার ভজন গান গেয়েছেন এবং মহাত্মাজীর স্নেহ-লাভে ধন্য হ'য়েছেন।

১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত ক'লকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে বিজন নিয়মিত ভাবে সংগীত শিক্ষা দিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত সিলেবাস অনুযায়ী।

১৯৪৩ সালে সমগ্র বাঙলা দেশ যখন দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিপতিত, বাঙলার গরীব জনসাধারণ যখন জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে কোনরূপে বেঁচে থাকবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে, সে সময়ে বিজনের কোমল প্রাণ কেঁদে উঠল। তিনি ময়মনসিংয়ে গিয়ে 'চ্যারিটি শো' ক'রে বহু টাকা তুলে সাহায্য করেন বুভুক্ষু জন সাধারণকে।

১৯৪৪ সালে বিজন কলকাতা বেতার কেন্দ্রের ষ্টাফ আর্টিষ্ট রূপে নিযুক্ত হন। জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠানের বিভিন্ন ধরণের গান তিনিই প্রথম জনপ্রিয় ক'রে তোলেন বেতার-মাধ্যমে। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর পর পনেরো দিন পর্যন্ত কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে তিনি 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম' 'বৈষ্ণব জন তো তেনে কহিয়ে', প্রভৃতি যে সব ভজন গান পরিবেশন করেছিলেন তা আজও অবিস্মরণীয় হ'য়ে আছে জনসাধারণের মনে। ১৯৪৪ থেকে ১৯৫০ এর মার্চ পর্যন্ত তিনি উক্ত বেতার কেন্দ্রের ষ্টাফ আর্টিষ্টরূপে কাজ করেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় তারপর থেকে আজ পর্যন্ত বিজনের মত শিল্পীকেও বেতার প্রতিষ্ঠানের সংগে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়েছে।

রামধুন সংগীত রেকর্ড হবার ফলে কলম্বিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে রয়ালটী বাবদ বিজন যে ১৯৯৫৲ টাকা পেয়েছিলেন ঐ অর্থ তিনি দান করেন গান্ধী-স্মৃতি তহবিলে।

১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহু হিন্দু অনন্যোপায় হ'য়ে ঘরবাড়ী ছেড়ে যখন দলে দলে পশ্চিমবংগে চলে আসছিলেন তখন বিজনের বাবা, ছোট ভাই আর বোনেরাও চলে এলেন কলকাতায়। আর্থিক চাপে বিজন তখন দিশেহারা। গভীর চিন্তায় ভেঙে পড়ে তাঁর মন। আশ্চর্যের বিষয়, এমনি সময়ে একদিন ভগবানের আশীর্বাদলিপির মত তিনি পেলেন ঘড়ির পেছনে ছেঁড়া ঠোঙার একটুকরো কাগজ। সেই টুকরো

কাগজটুকু তিনি তুলে নিয়ে দেখলেন নিম্নোক্ত চারটী ছত্র লেখা রয়েছে :

God sent His singers upon earth
With songs of sadness and of mirth,
That they might touch the hearts of men
And bring them back to heaven again.
—Longfellow.

এই ছত্র চারটী পড়লেন বিজন। নিরাশার অন্ধকারে তিনি দেখতে পেলেন আশার আলো। তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করলেন যত অভাব-অভিযোগই আসুক না কেন, তিনি অনলসভাবে সংগীত-সাধনায় থাকবেন মগ্ন।

১৯৫০ সালে সুরাট সংগীত নিকেতনের সমাবর্তণ উৎসবে বিজন আমন্ত্রিত হন এবং সেখানে তিনি 'সংগীত বিদ্যালংকার' উপাধিতে ভূষিত হন। বাঙলার বাইরে আর কোন বাঙালী মহিলা সংগীত-শিল্পী এ সম্মান লাভ করেন নি।

'ভারতবর্ষ', 'সংগীতবিজ্ঞান' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় অনেক গানের স্বরলিপি লিখেছেন বিজন। এ ভিন্ন ভজন মালা, মীরাবাঈ, (ভজনে মীরা জীবনী), সন্ত কবীর (ভজনে জীবনী ও বাণী) বইগুলির প্রত্যেকটী ভজন গানের স্বরলিপিসহ লিখেছেন তিনি।

১৯৫২ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের সাহায্যকল্পে নিউ এম্পায়ার সিনেমা হলে এবং ঐ বৎসরেই মহাবোধি সোসাইটির সাহায্যার্থে রঙমহল থিয়েটার হলে বিজন তাঁর রচিত ও সুরসংযোজিত মীরাবাঈ নৃত্যনাটের অনুষ্ঠান করেন সাফল্যের সংগে।

১৯৫৪ সালের ৯ই জানুয়ারী রাজভবনে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনে বিজনের রচিত ও পরিচালিত সন্তকবীর নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান হয়। ঐ উপলক্ষে সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ চিত্তরঞ্জন স্মৃতি-ভাণ্ডারে ২২৫০৲ তদানীন্তন দেবতুল্য রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্র কুমার মুখার্জীর হাতে অর্পণ করেন।

'গানের ফুলে যে হার গাঁথি', 'দখিন বাতায়ণ রেখেছ খুলিয়া', 'জাগো ভারতরাণী', 'নিপীড়িতা পৃথিবী ডাকে' প্রভৃতি বহু গান বিজনের সুমিষ্ট কণ্ঠে রেকর্ড ও বেতারের মাধ্যমে পরিবেশিত হ'য়ে জনসাধারণকে দিয়েছে গভীর আনন্দ—পরম পরিতৃপ্তি।

বর্তমানে এই নিষ্ঠাবতী সংগীত সাধিকা বাগবাজার অঞ্চলে অবস্থিত কস্তুরীবাঈ সংগীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা। তিনি পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের ও বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটির সংগীত-পরীক্ষকের পদেও নিযুক্ত আছেন।

বিজনের চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। যেখানে অন্যায়, যেখানে অবিচার সেখানে তিনি প্রতিবাদ করেছেন দৃঢ়কণ্ঠে—নিজের স্বার্থ ও সুবিধার দিকে না তাকিয়ে। অন্যায় ও অবিচারের সংগে তিনি আপোষ করতে শেখেন-নি কোনদিন। অসামান্য তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ, অদ্ভুত তাঁর তেজস্বীতা। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন উচ্চাংগ সংগীত চিরকালই দেশবাসীর মনে উচ্চ শ্রদ্ধার আসন লাভ ক'রবে।

বিজনের বয়স এখন ৩৭ বৎসর। আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, অব্যাহত ভাবে চলুক তাঁর সংগীত-সাধনা। কামনা করি তাঁর শারীরিক সুস্থতা, সুদীর্ঘ ও শান্তিময়জীবন।

***

চলচ্চিত্র প্রসংগে

জীবনকৃষ্ণ দাশ

গল্পের সংগে চলচ্চিত্রের সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে, মনে পড়ে, জনৈক রসজ্ঞ ব্যক্তি এঁচড় আর এঁচড়ের ডালনার উপমা এনেছিলেন। ভেবে দেখলে কথাটা অনেকাংশেই সত্যি। এবং এ-উপাদানকে উপাদেয় করা যত সহজ বলে মনে করা হয় আসলে তত নয়। এঁচড় এবং মশলার নির্দিষ্ট আনুপাতিক যোগাযোগেই তা কুশলী রাঁধুনীর হাতে অমন হোতে পারে। এঁচড়ত্বের গণ্ডগোলে কিংবা মশলার বিশৃঙ্খলতায় ডালনা অখাদ্য হয়ে যায়। অবশ্য, রান্নার ফরমুলাই শুধু জানেন—রাঁধতে পারেন না, এমন ব্যক্তিকে রাঁধুনী বলে স্বীকার করিনে।

উল্লিখিত এঁচড়ের ডালনা অর্থাৎ আধুনিক বাংলা ছবির খুঁত কোথায় তা ধরাবার চেষ্টা করছি : এখন এদেশে ভাল গল্পের দুর্ভিক্ষ যাচ্ছে। আনাড়ী, মাথামুণ্ড-কাণ্ডজ্ঞানহীন গল্পের প্রাচুর্য দেখে আশান্বিত হবার কারণ নেই। ঐ সব ছাই পাঁশের সংগে সিনেমার মশলা মেশাতে

খাবার মানে হোল অর্থ ও সময়ের-অপব্যয়। গল্প লিখবেন কে? না, যাঁর নতুন বক্তব্য আছে। জীবন ও সমাজকে যিনি নতুন করে দেখতে পেরেছেন, নতুন বক্তব্য একমাত্র তাঁরই থাকে। সে জিনিষ না-থাকলে গল্প লিখতে যাওয়া বিড়ম্বনা। হোক না সিনেমার গল্প, সেও ত বাণীরই একনিষ্ঠ আরাধনা। কিন্তু এখনকার ব্যাপার হোল উল্টো। কয়েকটি জনপ্রিয় (?) ধরতাই "সিচুয়েশন" কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে দাঁড় করানো গেলেই আদর্শ গল্প হয়ে যায়। এক্ষেত্রে গল্প কৃত্রিম হবে না তো হবে কি?

তারপর তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের প্রশংসা পাবার লোভে সে-গল্প অবলম্বনে কাটা কাটা সংলাপ সহযোগে চিত্রনাট্য রচনা করা হয়। গল্প যখন কাগজের পাতায় থাকে তখন তার মমস্তত্ত্ব ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে; পর্দায় রূপায়িত হতে গেলে আংগিক ও উপস্থাপনের দিক থেকে তারও রূপান্তর ঘটে। চিত্রনাট্যকেই তখনকার দায়িত্ব নিতে হয়। নাট্যকার যথেষ্ট সতর্ক ও সংস্কৃতিবান না হ'লে গল্পের বক্তব্যের সংগে চিত্রনাট্যের দৃশ্যবিন্যাস ও সংলাপ আসমান জমিন ফারাক হয়ে যায়। চিত্রনাট্য হয়ে পড়ে অবাস্তব। আজকালকার প্রায় ছবিই অল্পবিস্তর অবাস্তবতার দোষে দুষ্ট।

হালফিলের বাংলা সিনেমায় যদি কিছুর উন্নতি হয়ে থাকে তবে সে হয়েছে ক্যামেরার। ক্যামেরাই হোল এখনকার ছবির "নায়ক"। কিন্তু একটা প্রশ্ন স্বভাবতঃই এসে পড়ে। ছবির সংগে অভিনয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করা উচিত নয় কি? ফোটোগ্রাফি যত ভালই হোক সে অনুপাতে যদি অভিনয়ের মান নেবে গিয়ে থাকে তবে তাকে সার্থক চিত্র আখ্যা দেওয়া অসংগত। ফোটোগ্রাফি এসেছে অভিনয়কে পরিস্ফুট করবার জন্য। অভিনয় রইল পিছিয়ে; যত মারামারি ফোটোগ্রাফি নিয়েই, এ কেমন কথা? শরীরের এক অংশকে বাদ দিয়ে যদি অপর অংশে বেশি রক্ত সঞ্চার হয় তাকে তো স্বাস্থ্যকর বলে না।

চলচ্চিত্রে সংগীত সন্নিবেশিত করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি না। তবে যেকথা বা ভাবাবেগ একমাত্র গানছাড়া আর কিছুতেই প্রকাশ করা চলে না সেক্ষেত্রেই গান আসবে। গান সুপ্রযুক্ত হওয়া চাই। সুপ্রযুক্ত গান যেমন ছায়াছবির গতিকে প্রাণবন্ত করে তোলে তেমনি খোস-পাঁচড়ার মত যেখানে সেখানে বেরিয়ে আসা গান ছবির গতিকে পদে পদে করে ব্যাহত। ভাল গান ক্রমশঃ দুর্লভ হচ্ছে এবং সেই সংগে নানা অসম্ভব, অপটু, বিকৃত রুচির গান ও কমার্শিয়াল ভক্তিমূলক গান প্রাধান্য পাচ্ছে। এটা মনে রাখা উচিত যে গান চলচ্চিত্রের সহায়ক—তার উপাদান নয়। হিন্দি ছবিতে নাচ ও গানকে ছবির উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলায় নাচটা এখনো তেমন আসেনি; হয়তো আসবে। নাচই হোক আর গানই হোক উপযুক্তক্ষেত্র ভিন্ন প্রয়োগ হলে বিপদ ডেকে আনে।

চলচ্চিত্রের পরিচালক মহোদয়রা আমাদের সব চাইতে বেশি ফ্যাসাদে ফেলেন প্রেমের চিত্র পরিবেশন করে। অন্ততঃ সব জিনিষ একটু আধটু বুঝলেও, মনে হয় প্রেম বস্তুটা তাঁরা আদপেই বোঝেন না। তাঁরা ভেবেছেন পাত্রপাত্রীর মুখে কয়েকটা হ্যাকা পাকা কথা দিতে পারলেই প্রেমের চিত্র হয়ে গেল। বর্তমান জীবনে ভেজাল প্রেম বা লালসা-সর্বস্বতার পঙ্ক রয়েছে বলে সাহিত্য-পঙ্কজে তারই রূপায়ণ চলচ্চিত্রেও কি সে-পঙ্ক উঠে আসবে? তাহ'লে দুদণ্ড হাঁফ ছেড়ে দাঁড়াব কোথায়; প্রেমের যে আন্তরিকতা বা একটা অকৃত্রিম সত্তা থাকে চলচ্চিত্র-পরিচালক বাহাদুরী দেখাবার জন্য সেটাকে পাঠিয়ে দেন নির্বাসনে। প্রেমের চিত্র, বিশেষ করে রোমান্টিক পরিবেশ ওঁদের হাতে বারবার নষ্ট হতে দেখেছি। সামান্য ইঙ্গিতে, নীরবতায় যেখানে প্রেমের সহজ স্বর্গ রচনা করা যায়, পরিচালকের 'হামবড়ি' ভাবের জন্য স্বর্গলোকের সমস্ত সম্ভাবনা ভেঙ্গে গিয়ে হয়ে ওঠে নরক গুলজার। বাংলা ছবির পরিচালকেরা দিন দিন এত বেরসিক হবেন, ভাবতেও দুঃখ লাগে।

অভিনেতাদের সম্পর্কেও কিছু না বললে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অভিনয়ের সার্থকতা জন্ম নেয় অভিনেতার ব্যক্তিত্ব থেকে। সে জিনিষ সাধনা, নিষ্ঠা ও জীবন-বোধের গভীরতা থেকে আসে। কয়েকটি ধারকরা "মুদ্রাদোষ", "ষ্টাণ্ট" আর নকল ভঙ্গি থেকে সে জিনিষ পাওয়া যায় না। শুধু বরাতগুণে জনপ্রিয়তা অর্জন করছেন এমন কয়েকজন শিল্পীকে আমরা এই বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

পরিশেষে, কোন দেশের চলচ্চিত্রের মানোন্নতি নির্ভর করে সার্থক সমালোচনার ওপর। চলচ্চিত্র সম্পর্কিত কাগজ এদেশে নেহাৎ কম নেই। কিন্তু তাতে আছে ভাল সমালোচনা ও পন্থা-নির্দ্দেশনের অভাব। কেবল অভিনেতা-অভিনেত্রীর জীবনযাত্রার খুঁটি-নাটি বিবরণ দিলে বা তাঁদের যেখানে সেখানে ধরে উত্তেজক ভঙ্গিমায় ছবি তুলে সাড়ম্বরে তা' প্রচার করলেই সিনেমাপত্রিকার উদ্দেশ্য সাধিত হোল না। চলচ্চিত্রের শিল্প-সম্মত ব্যাখ্যা চাই, সৎ সমালোচনা চাই। দূরদর্শিতা, নির্ভীকতা, বিচক্ষণতা ও সর্বোপরি রসবোধের মূলধন না থাকলে চলচ্চিত্র পত্রিকা পয়সা রোজগার ছাড়া অন্য কোন কাজ করতে পারে না। বাংলাদেশে যে চলচ্চিত্রের সর্বাংগীন উন্নতি হচ্ছে না তার অন্যতম প্রধান কারণ এখানে উপযুক্ত সিনেমা পত্রিকা নেই। কথাটা অপ্রিয় হলেও অসত্য নয়।

ফার্স্ট বয়
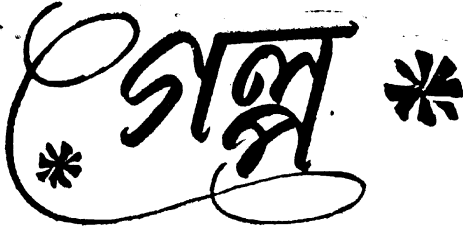
বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষ্ণুবাবু বললেন, সত্যদেব অঙ্কে আমার হাতে ছিয়ানব্বই পেয়েছে। ইচ্ছে করে আমি ওর চার নম্বর কেটে নিয়েছি। তিরিশ বছর মাষ্টারী জীবনে এমন আর একটিও ছাত্র আমি দেখিনি।

বাংলার মাষ্টার মশাই দ্বিজপদ বাবু মুখ তুলে তাকালেন। বললেন, সত্যদেব যা বাংলা জানে যে কোন বি-এ ক্লাসের ছেলেকে হারমানাতে পারে।

মোটা লেনসের ফাঁক দিয়ে তাকালেন হরিপ্রসন্নবাবু। তারপর মৃদু হেসে বললেন, ওছেলে আমার হাতে গড়া। আমি প্রথমদিনই বুঝেছি সত্যদেব একদিন বড়দরের কেউ হবে।

হলঘর ভর্ত্তি ছেলে আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। কারো মুখে রা-টি নেই। এবার স্কুলে চল্লিশটি ছেলে ম্যাট্রিক দিতে চলেছে। সকলে আজ ফর্ম ফিলাপ করে টাকা জমা দিতে এসেছি। বাকি কয়েকজন ছেলে মৌমাছির চাকের মতো ঝাঁক বেঁধে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে আছে। ওদের মুখ শুকনো। এবার ওরা কেউ টেষ্টে এলাউ হতে পারেনি। তবু শেষবারের মতো এসেছে অনুকম্পা ভিক্ষে করতে। ওরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বাকি তিনটে মাস খেটেখুটে তৈরি হয়ে নেবে। কয়েকজন পকেটে করে টাকাও এনেছে। বলাতো যায় না—

হেড মাষ্টার মশাই বকুলতলায় এসে দাঁড়ালেন। ঘামে ভিজে সপ্‌সপ্‌ করছে গায়ের কোট। মুখখানা রাঙা হয়ে গেছে রোদে ঘুরে ঘুরে। ছেলেদের পিঠে হাত রেখে বললেন, তোমরা ভেঙ্গে পড় না, মন দিয়ে পড়াশুনো করে যাও আসছে বছর নিশ্চয়ই পাশ করবে।

রতন এগিয়ে এল হেডমাষ্টার মশাইয়ের সামনে। পা দুটো জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

হেড মাষ্টারমশাই রতনকে বুকে টেনে নিলেন। গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, কেঁদোনা। তুমি এবার নিয়ে তিনবার ফেল করলে। গত বছর তোমায় আমরা 'এলাউ' করে দিলুম, অথচ তুমি ফিরে এলে। আর একবার চেষ্টা কর নিশ্চয়ই পাশ করে যাবে। জানত রবার্ট ব্রুসের গল্প—

রতন বাধা দেয় কথার মাঝখানে। বললে, এবার 'কম্পার্টমেণ্টাল' আছে স্যার। অঙ্কেই আমার ভয় বেশি। একটা মাস খেটে খুটে তৈরি হয়ে নেব স্যার।

হেড মাষ্টারমশাই হল ঘরে এসে ঢোকেন। আমরা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। কারো মুখে রা-টি নেই। এতক্ষণ সকলে বাইরের দিকে তাকিয়ে করুণ দৃশ্য দেখছিলুম।

হাতের ফর্ম আর টাকাগুলো গুণে নিয়ে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেন।

তোমরা এবার পরীক্ষা দিতে চলেছ। হাতে আছে মাত্র তিনটে মাস। ঐকটা মাস মন দিয়ে পড়াশুনো করবে। জীবনে আনন্দ করবার যথেষ্ট সময় পাবে। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমাদের দেহ মন সুস্থ থাকুক। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তাকালেন হলঘরের একোণ থেকে অপর কোণে। সত্যদেবের দিকে চোখ পড়তেই তিনি ডাকলেন।

সত্যদেব দেওয়ালের কোণে দাঁড়িয়ে কি ভাবছিল, হেডমাষ্টার মশাইয়ের ডাকে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল।

ওর দু'কাঁধে হাত রেখে একটা ঝাকুনি দিয়ে হেডমাষ্টার মশাই বললেন, সত্যদেব তুমি আমাদের ইস্কুলের আশা ভরসা। তোমার উপর মাষ্টার মশাইরা অনেক কিছু আশা করেন। তুমি ইস্কুলের মুখ উজ্জল কর ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই।

সত্যদেব কথা বলল না। ধীরে ধীরে হেডমাষ্টার মশাইয়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিলো।

তিন মাস পরের কথা।

ঐ কয়মাস আমরা পরীক্ষার জন্য পরিশ্রম করেছি খুব। দিনগুলো যে কেমন করে কেটে গেছে খেয়াল করেনি কেউ। কত রাত যে ভাল করে ঘুমুইনি তার নেই ঠিক। রাতে বিছানায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কত সব পড়া মুখস্থ বলে গেছি, মা ঠেলে দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি সব আবোল-তাবোল বকছিস।

আজ অনেকদিন পর পরীক্ষার হলের সামনে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হতেই সকলে আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠলুম। সকলের মনই আজ অজানা ভয়ে দুরু দুরু করছে। ইংরিজী বাংলা, অঙ্ক সব কিছু একাকার হয়ে যাচ্ছে মাথার মধ্যে।

ঘণ্টা বাজতেই সকলে ভীরু পদক্ষেপে হলে গিয়ে বিকেল বেলায় হল থেকে ক্লান্ত অবসন্নের মত বেরিয়েছি। ক্ষিদেয় পেট টন টন করছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি বাড়ির দিকে। পথে দেখা সত্যেনের সঙ্গে।

সত্যেন বললে, একটা খবর শুনেছিস ?

বললাম, কি খবর ?

সত্যদেব পরীক্ষা দেয়নি।

কেন ? যারপর নাই বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলুম।

তাত জানিনা। হেডমাষ্টার মশাই দ্বিজপদ বাবুকে বলেছিলেন তাই শুনলুম।

মনটা দমে গেল আমার। সত্যদেব পরীক্ষা দেয়নি একথাটায় যেন আমার মন সায় দিল না। সত্যদেব আমাদের ক্লাসের ফার্ষ্ট বয়। ও আমাদের ইস্কুলের গৌরব। ওকে ঘিরে যে আমরা স্বপ্ন দেখি। শুধু আমরা কেন মাষ্টার মশাইরাও। মনে মনে চিন্তা করতে লাগলুম কি এমন ঘটনা ঘটল যার জন্যে সত্যদেব পরীক্ষা দিলনা। আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম ষ্ট্রাণ্ডের রেলিংয়ের গায়ে। সত্যদেবের চেহারাটা ফুটে উঠল আমার চোখের সামনে। রোগা লম্বা ছিপছিপে একমাথা কোঁকড়ানো চুল। সহজ শান্ত দৃষ্টি। খেলা-ধূলায় তেমন আগ্রহ ছিল না। টিফিনের সময় গল্পের বই নিয়ে চুপচাপ বসে থাকত। আমরা হেড মাষ্টার মশায়কে বলে টিফিনের সময় ভলিবল খেলার ব্যবস্থা করেছিলুম। কতদিন সত্যদেবকে হাত ধরে টানা-টানি করেছি কিছুতেই সে খেলতে রাজি হয়নি। আমরা কত সময় ঠাট্টা করে কত কী বলেছি সত্যদেব হাসত রাগ করত না মোটে। সত্যদেবের চোখ দুটো এত উজ্জ্বল ছিল যে তাকালেই মনে হ'ত একদিন সে বড় হবেই। একই পোষাক পরে আসত ক্লাসে। একটা প্যাণ্ট আর সার্ট। সার্টের কোথাও কোথাও ছেঁড়া। ওর মা হাতে সেলাই করে দিয়েছে। তা থেকেই বুঝতাম সত্যদেবের সংসারের অবস্থার কথা। অনেকটা পথ ভেঙ্গে আসত সে ইস্কুলে। কত ঝড় ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে মাথার উপর দিয়ে সত্যদেব কিন্তু একদিনও ইস্কুল কামাই করেনি। মাষ্টার মশাইরা বলতেন, সত্যদেব ইস্কুলের আদর্শ ছবি। আজও যেন আমার জ্বল জ্বল করে চোখের সামনে ভাসছে।

শীতের সময়। আমি, সুধাংশু আর নীহার গিয়েছিলাম একদিন সত্যদেবের বাড়িতে। সত্যদেবের মাকে মা বললাম। তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই বাধা দিলেন। আমার হাত দু'খানা চেপে ধরে বললেন, ওকি করছ বাবা, তোমরা ঠাকুর। আমার পায়ে হাত দিতে নেই, ছিঃ! তারপর দেওয়ালে টাঙ্গানো কৃষ্ণরাধিকার পটের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে বিড় বিড় করে কি বললেন। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম তাঁর মুখের পানে। ছোট্ট একখানি ঘর আর তার কোলে ছোট্ট একটুকু ফালি বারান্দা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরের এককোণে ভাঁড়ার অপর কোণে একখানা চৌকি পাতা। চৌকির পাশে কাঠের ছোট একটা সেল্ফ। তাতে সত্যদেবের বইপত্তর সাজানো গোছানো রয়েছে। ঘরটা যেন ঝকঝক তকতক করছে।

কথাটা ধক করে আমার বুকে বাজলো। আমি চুপ করে থাকতে পারলাম না। বললাম, আপনি সত্যদেবের মা, আমারও মা। আপনাকে প্রণাম করলে আমার পাপ হবে কেন ? যদি হয় হোক্।

কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন তিনি।

খেতে বসে অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, এত রকম খাবার করেছেন কেন, এত কী খাওয়া যায়।

সত্যদেবের মা ম্লান হাসলেন। বললেন, কি আর এমন

বেশি করেছি বাবা। আগেকার দিনে জিনিস-পত্তর সস্তা-গণ্ডা ছিল, আর আজ? একটুকু দুধ তাও দিতে পারলুম না।

খাওয়া শেষ করে উঠতে যাচ্ছিলাম। সত্যদেবের মা বললেন, না বাবা উঠলে চলবেনা এই পায়েশটুকু খেয়ে নাও।

কী মিষ্টি তাঁর কথা। খাওয়া দাওয়ার পর বারান্দায় একটা মাদুর বিছিয়ে দিয়ে বললেন, শুয়ে পড় সব। রোদ পড়লে তবে বাড়ি যাবে। ফেরার সময় বললেন, আবার এস বাবা তোমরা। মায়ের একছেলে সত্যদেব, তাঁকে ঘিরে কত স্বপ্নের কথাই সেদিন দুপুরে আমাদের মাথার শিহরে বসে বললেন। সেই সত্যদেব কেন পরীক্ষা দিলনা আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলুম।

পরীক্ষার শেষদিন হল থেকে বেরিয়ে একটা সোয়াস্তির নিশ্বাস ছাড়লাম। মনে হল এতদিন পর জগদ্দল পাথর বুক থেকে নেমে গেল। সামনে ফাঁকা মাঠটায় এসে আমি আর শিবু বসলুম। একটা ঘাসের শিস্ চিবুতে চিবুতে শিবুকে বললুম, একটা কাজ করবি?

শিবু বললো, কী?

বললুম, চল সত্যদেবের বাড়িতে ঘুরে আসি। ব্যাপারটা আসলে কি জানতে হবে।

শিবু চুপ করে বসে রইল।

বললুম, চল। জোরে হাঁটলে বড় জোর এক ঘণ্টা লাগবে। সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসব।

আমি আর শিবু সত্যদেবের বাড়ির সামনে এসে বেশ অবাক হয়ে গেলুম। দরোজায় একটা বড় তালা ঝুলছে। পাশের বাড়ীর লোকের মুখে শুনলুম ওর মা অনেকদিন ধরেই হাঁপানিতে ভুগছিল, কদিন আগে মারা গেছে। দূর সম্পর্কের এক মামা এসে সত্যদেবকে শ্রীরামপুর না কোন্নগরে নিয়ে গেছে। আর কোন খবর কেউ জানে না। মনটা বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠল। আমরা দুজনায় পথে নামলাম। অন্ধকার নেমেছে। রাস্তাটা এবড়ো খেবড়ো। কতবার যে হোঁচট খেলুম তার নেই ঠিক। সারাটা পথ কেউ কারো সঙ্গে কথা বললুম না।

অনেকদিন কেটে গেছে। একদিন বিকেলবেলায় বাড়ির রোয়াকে বসে আছি। শিবু হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল। হাতে রেজাল্টের কাগজ।

বলল, এবার আমাদের ইস্কুলের রেজাল্ট খুব ভাল হয়েছে। মাত্র তিনজন ফেল করেছে। তারপর সুর নরম করে বলল, ওরাও যদি পাশ করত বেশ হ'ত।

বললুম, চল হেডমাষ্টার মশাইয়ের পায়ের ধুলো নিয়ে আসি।

ইস্কুলে ঢুকে দেখলাম হেডমাষ্টার মশাই অফিস ঘরে বসে আপন মনে কাজ করে চলেছেন। সামনে স্তূপাকৃতি খাতার বাণ্ডিল।

আমরা পায়ে পায়ে ঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম। হেডমাষ্টারমশাই আগেই আমাদের দেখতে পেয়েছিলেন। মুখ তুলে বললেন, কি খবর সব?

কথা বলবার আগেই আমরা দুজনায় তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিলাম।

চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে তিনি আমাদের একে একে বুকে টেনে নিলেন। বললেন, তোমরা মানুষ হও এই আশীর্ব্বাদ করি।

তারপর সত্যদেবের কথা উঠতেই তাঁর মুখখানা কেমন যেন ম্লান হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বললেন, বড় আশা করেছিলুম সত্যদেব আমাদের ইস্কুলের নাম রাখবে। বড় হয়ে দেশের একজন হবে।

দেখলুম হেডমাষ্টারমশাইয়ের চোখের কোণে জল টলমল করছে।

এরপর আরো একটা বছর কেটে গেছে। কলেজ জীবন সুরু হবার আগেই বাবা সাহেবকে বলে আমায় অফিসে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আরো পাঁচজন কেরাণীর মতো দশটা-পাঁচটায় অফিস করি। একদিন ট্রেনে ছাড়তে তখনও অনেক দেরি। হঠাৎ নজরে পড়ল ভিড়ের মধ্যে চেনা একটা মুখ। চোখাচোখি হতেই সে হাসলো। মুখ দিয়ে ফস্ করে বেরিয়ে এল, সত্যদেব না?

সত্যদেব ততক্ষণে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

পাশে একটু জায়গা করে দিয়ে বললুম, বস, কি খবর, কোথায় চললি?

সত্যদেব হাসল। দেখলাম হাসিটা ঠিক আগের মতই আছে।

বলল, চলেছি শ্রীরামপুর। ওখানেই থাকি।

বললুম, আমরা পরীক্ষার পর গেসলাম তোর বাড়ি। পরীক্ষা দিলিনা কেন?

সত্যদেব বলল, পরীক্ষা দেব কি করে বল। মা যে ঐ সময় মারা গেলেন। আস্তে আস্তে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

বললুম, হেডমাষ্টারমশাই পরীক্ষার হলে তোকে দেখতে না পেয়ে ভারি দুঃখ পেয়েছিলেন রে।

সত্যদেব বলল, আমার ত ইচ্ছে ছিল কিন্তু—

ইলেকট্রিক ট্রেন। হুহুশব্দে শ্রীরামপুর এসে গেল। সত্যদেব নেমে গেল।

আমি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম আরো হাজার ডেলিপ্যাসেনজারের মিছিলে আমাদের এককালের মেধাবী বন্ধু সত্যদেব বেমালুম মিশে গেল।

এরপর বছর ছয়েক কেটে গেছে।

অফিসে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছি। বুলা এসে ঢিব করে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

হেসে বললুম, কি ব্যাপার হঠাৎ প্রণাম যে?

বুলার মুখখানা হাসিতে চক্‌চক্ করছে। আন্দাজে বুঝলুম নিশ্চয়ই কোন সুখবর আছে।

হাতের কাগজখানা এগিয়ে দিয়ে বলল, জান কাকু আমি ফার্ষ্ট ডিভিশনে পাশ করেছি।

আটটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে, না হলে ট্রেন পাব না। দ্রুতগতিতে পাতা ওলটাতে লাগলুম। হঠাৎ একটা ছবির উপর নজর আটকে গেল! খুব চেনা বলে মনে হ'ল। যদিও বয়সের ছাপ সে মুখে পড়েছে তবুও উজ্জ্বল চোখ দুটি কী ভোলবার? দেখলাম ম্যাট্রিকের রেজাল্ট বেরিয়েছে। প্রথম তিনজনের মধ্যে একজন মধ্যবয়সী এই ছেলেটি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। নিচে মন্তব্য লেখা—চেষ্টা এবং অধ্যবসায় থাকলে চাকরীর ফাঁকেও পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হওয়া যায় তারই প্রমাণ তৃতীয় স্থান অধিকারী শ্রীসত্যদেব ঘোষ। কাগজখানির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলুম। বহুদিনের পর হেডমাষ্টারমশাইরের মুখখানা ভেসে উঠল চোখের সামনে। তিনি বলেছিলেন, আমি বিশ্বাস করি সত্যদেব একদিন সত্যকার মানুষ হয়ে উঠবে।"

হেডমাষ্টারমশাই যদি আজ বেঁচে থাকতেন।

শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা নীলরতন সরকার হাসপাতালে শ্রীল হরিদাস দাস বিসূচিকা রোগে হঠাৎ অকালে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৩০৫ সালের ১৩ই ভাদ্র নোয়াখালি জেলার ফেণী মহকুমার পশ্চিমে মধুগ্রামে এক সুবিখ্যাত পণ্ডিত বংশে তাঁহার জন্ম হয়—কাজেই মৃত্যুকালে বয়স ৫৯ বৎসর কয়েক দিন মাত্র হইয়াছিল। তাঁহার পিতামহ ৺গোলকচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও পিতা ৺গগনচন্দ্র তর্করত্ন ঐ অঞ্চলে খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। বাবাজী মহাশয়ের গৃহস্থাশ্রমের নাম ছিল হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী। তাঁহার এক মাত্র ভ্রাতা মণীন্দ্রকুমার বাল্যকালেই সন্ন্যাসী হইয়া যান। হরেন্দ্রকুমার ১৯১৮ সালে ম্যাট্রিক পাস করিয়া ১৯২৪ সালে সংস্কৃত সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে এম-এ পাস করেন। দারিদ্র্য নিবন্ধন পাঠাবস্থায় তাঁহাকে ছাত্র পড়াইয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইত। কিছুকাল শিক্ষকতা ও অধ্যাপকের কাজ করিয়া তিনি তাহা ছাড়িয়া দেন ও পরবর্ত্তী জীবনে দীর্ঘকাল (বোধ হয় ৩০ বৎসর কাল) নবদ্বীপে বাস করিয়া গ্রন্থ রচনা ও গ্রন্থ প্রকাশে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি যে স্থানে বাস করিতেন তাহা হরিবোল কুটীর নামে খ্যাত ছিল। মধ্যে মধ্যে তিনি পুরী জয়পুর ও বৃন্দাবনে যাইয়া সাধুসঙ্গ করিতেন ও বৈষ্ণব গ্রন্থ সংগ্রহ করিতেন।

মধ্যে মধ্যে যখন তিনি কলিকাতায় আসিতেন, তখন 'ভারতবর্ষ' কার্য্যালয়ে পদধূলি দান করিতেনও প্রকাশিত গ্রন্থ এই দীনকে উপহার দিয়া যাইতেন। একবার মাত্র নবদ্বীপধামে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও কিছুকাল গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে আলোচনার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। কেন জানি না, কলিকাতায় থাকার সময় অবসর পাইলেই তিনি আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বহুক্ষণ বসিয়া গ্রন্থের সন্ধান করিতেন। তিনি ৬৫ খানা গ্রন্থ প্রকাশ ও সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন—তন্মধ্যে মাত্র ৫ খানা তাঁহার নিজের লেখা—(১) পরতত্ত্ব গৌর (২) শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য (৩) গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ (৪) শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন ২ খণ্ড ও (৫) শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান—৪খণ্ড। শেষ গ্রন্থখানি তাঁহার জীবিতকালে ছাপা শেষ হয় নাই—পরে সরকারী অর্থানুকুল্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

অতি দরিদ্রভাবে তাঁহাকে দিন যাপন করিতে হইত। সকল দিন

পূর্ণ আহার জুটিত না। তৎসত্বেও তিনি প্রত্যহ প্রায় ১৭ ঘণ্টা কাল লিখন পঠনে ব্যয় করিতেন। শেষ জীবনে কয় বৎসর পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাকে মাসিক ৭৫ টাকা সাহিত্যিক-বৃত্তি দান করিয়াছিল। ভিক্ষালব্ধ অর্থে তাঁহাকে সকল গ্রন্থ প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। তিনি এমনই অভিমানশূন্য ছিলেন যে জীবনে কোনদিন কাহারও নিকট নিজের কার্য্যের কথা বা দৈন্যের কথা প্রকাশ করিতেন না। ভিক্ষালব্ধ সমস্ত অর্থ গ্রন্থ প্রকাশেই ব্যয় করিতেন। তাঁহার কোন ফটো পর্য্যন্ত তুলিতে দেন নাই। তাঁহার বহু গ্রন্থ এম-এ ক্লাসের পাঠ্য হইয়াছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ তাঁহার গ্রন্থের সাহায্য লইয়া ছাত্রগণকে পাঠ্য বিষয় জানাইয়া দিয়া থাকেন। আচার্য্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হরিদাস তাঁহার অন্যতম ছাত্র বলিয়া গৌরব অনুভব ও প্রকাশ করিতেন। বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছে—সেজন্য বাবাজী মহাশয় সর্বদা দুঃখ প্রকাশ করিতেন। তিনি যখন যে গ্রন্থ হাতে পাইতেন, তাহার সম্পাদনা, টীকা প্রণয়ন প্রভৃতি করিয়া তাহা প্রকাশ করিতেন। হাতের গ্রন্থের কাজ শেষ না হইলে অন্য গ্রন্থে হাত দিতেন না। হয়ত আরও বহুগ্রন্থ প্রকাশের কথা তাঁহার মনে ছিল—কিন্তু বিধাতার বিধানে তাহা সম্ভব হয় নাই। তাঁহার কৃপায় সেইরূপ নিষ্ঠাবান, সুপণ্ডিত, ভক্ত ও কর্মীর দ্বারাই তাঁহার অসমাপ্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। তিনি তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সম্পাদন করিয়া সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা ও দীক্ষা বিফল হয় নাই। তিনি অর্থ, যশ, মান কিছুর জন্যই লালায়িত ছিলেন না —এমন কি দেহের প্রাথমিক প্রয়োজন আহার ও বস্ত্রের কথা পর্য্যন্ত তিনি চিন্তা করিতেন না। শেষ জীবনে বন্ধুগণের চেষ্টায় সাহিত্যিক বৃত্তি লাভ করিয়া তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেন এবং সে জন্য জাতীয় সরকারকে সর্বদা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেন। তাঁহার গুণগ্রাহী বন্ধুর অভাব ছিল না—কিন্তু কাহাকেও তিনি কোন প্রার্থনা জানাইতেন না। বলিতেন—সকল প্রার্থনা ঐ একই চরণে প্রত্যহ নিবেদন করি—তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। এরূপ বিশ্বাসী মন কয়জন ভক্তের মধ্যে পাওয়া যায় জানি না। তাঁহার ৺ প্রাপ্তির এক বৎসর পরে তাঁহার কথা লিখিতে বসিয়া তাঁহার সম্বন্ধে বহু কথাই মনে হইতেছে। তাঁহার পণ্ডিতবংশে জন্ম নিষ্ফল হয় নাই, তাঁহার বিদ্যার্জন শুধু তাঁহাকে জ্ঞানবান করে নাই, দেববাসীকে তাহার অংশভাগী করিতে সাহায্য করিয়াছে, তাঁহার মধ্য দিয়া বর্ত্তমান যুগে যেভাবে ত্যাগ, সেবা ও প্রেমের ধর্ম প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এ যুগে দুর্লভ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার উদ্দেশ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া নিম্নে তাঁহার পুস্তকগুলির নাম প্রকাশ করিলাম। (১) শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা স্তব—২৷৷॰ (২) শ্রীশ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃত—১৷॰ (৩) আশ্চর্য্যরাস প্রবন্ধ—৷৷॰ (৪) গোপাল তাপসী (টীকাদ্বয়োপেতা) ৷৷৶॰ (৫) শ্রীকৃষ্ণাভিষেক—৷৷৶॰ (৬) শ্রীশ্রীমথুরা—মাহাত্ম্যং—৷৷॰ (৭) সামান্য বিরুদাবলী লক্ষণম্—৷৶॰ (৮) শ্রীগোপাল বিরুদাবলী—৷৶॰ (৯) শ্রীমাধব মহোৎসবং (মহাকাব্যং)—৪৲ (১০) শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চন দীপিকা—৷৷॰ (১১) ধাতু সংগ্রহ—৶॰ (১২) শ্রীশ্রীযোগ-সারস্তব টীকা—৷॰ (১৩) শ্রীভক্তিরসামৃত শেষ—১৲ (১৪) শ্রীশ্রীকৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদী—২৷৷॰ (১৫) শ্রীনিকুঞ্জকেলী বিরুদাবলী—৷৷৶॰ (১৬) শ্রীসুরত কথামৃত—৷৷॰ (১৭) শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা—৷৶॰ (১৮) শ্রীদানকেলি চিন্তামণি—৷৶ (১৯) সিদ্ধান্তদর্শন—১, (২০) ঐশ্বর্য্য কাদম্বিনী—৷৶॰ (২১) মুক্তাচরিতের পয়ারে অনুবাদ—১৲ (২২) শ্রীকৃষ্ণ বিরুদাবলী—১৲ (২৪) ছন্দকৌস্তুভ—৷৷৶॰ (২৫) শ্রীগৌরাঙ্গ বিরুদাবলী—৷৶॰ (২৬) দুর্লভসার—৷৷॰ (২৭) পরতত্ত্ব গৌর—৷৷॰ (২৮) কাব্যকৌস্তুভ—১৷৷॰ (২৯) শ্রীগোবিন্দ রতিমঞ্জরী—৷৷॰ (৩০) দশশ্লোকীভাষ্যম্—১৷॰ (৩১) সাধন দীপিকা—১৷৷॰ (৩২) নন্দীশ্বর চন্দ্রিকা—৷॰ (৩৩) আর্য্যশতকম্—৷৷॰ (৩৪) গৌরচরিত চিন্তামণি—১৲ (৩৫) গীতচন্দ্রোদয়—২৷৷॰ (৩৬) শ্রীকৃষ্ণভক্তি রত্নপ্রকাশ—১৷॰ (৩৭) সঙ্গীতসাধন—২৲ (৩৮) মুরারীগুপ্তের কড়চা—৩৷॰ (৩৯) ব্রহ্মসাহিত্য—৷৷॰ (৪০) শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য—৮৲ (৪১) ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—১৫৲ (৪২) প্রেয়োভক্তি রসার্ণব—২৷৷॰ (৪৩) শ্রীশ্যামচন্দ্রোদয়—২৷৷॰ (৪৪) শ্রীকৃষ্ণভক্তি রসকদম্ব—(৪৫) গোবিন্দলীলামৃত (মূল)—৩৲ (৪৬) গোবিন্দবল্লভ নাটক—১৷৷॰ (৪৭) রসকলিকা—১৷৷॰ (৪৮) ভাবনাসার সংগ্রহ—১০৲ (৪৯—৫১) পঞ্চভিত্রয়ম্—৩৷॰ (৫২) বৃহদ্ভাগবতামৃতকণা—৩৲ (৫৩) শ্রীপ্রবোধ ব্যাকরণম—১৷৷॰ (৫৪) শ্রীচৈতন্যমত মঞ্জুষা—৫৲ (৫৫) গৌড়ীয় বৈষ্ণব-তীর্থ—৩৲ (৫৬) গৌড়ীয় বৈষ্ণবজীবন, প্রথম খণ্ড—৭৲ (৫৭) ঐ দ্বিতীয় খণ্ড—৫৲ (৫৮) শ্রীনামামৃত সমুদ্র—৷৶॰ (৫৯) বৈষ্ণবানন্দিনী—১৷৷॰ (৬০) উজ্জ্বলনীলমণি—১৩৲ (৬১) হরিভক্তিতত্ত্বসার—২৲ (৬২) প্রযুক্তাখ্যাতমঞ্জরী—৷৷॰ (৬৩) শ্রীনিবাসাচার্য্য গ্রন্থমালা—৷৷॰ (৬৪) গীতগোবিন্দ (৬৫) শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান। তাঁহার শ্রীধাম প্রাপ্তিকালে অভিধানখানি যন্ত্রস্থ ছিল—পরে সরকারী অর্থসাহায্যে তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

আমাদের দেশে সংস্কৃত গ্রন্থপ্রকাশ শুধু অর্থার্জনের উপায় বলিয়া বিবেচিত হয় না—গ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচার ধর্মকার্য্য বলিয়া লোক মনে করে। বিশেষ করিয়া যে সকল দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ সংস্কৃত গ্রন্থ সচরাচর বিক্রীত হয় না—একহাজার ছাপিলে বিক্রয় হইতে ১০ বৎসর সময় লাগে—তাহার মুদ্রণ ত কেহই ব্যবসা বলিয়া মনে করেন না। শ্রদ্ধেয় হরিদাস দাস মহাশয় এই মহান্ ব্রতের ভার গ্রহণ করিয়া আপন কর্তব্য সম্পাদন ও জীবন দান করিয়া গিয়াছেন—তিনি দেশবাসীর শুধু নমস্য নহেন, তাঁহার কথা স্মরণীয় করার যোগ্য। অদূর ভবিষ্যতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন বিস্তৃতি লাভ করিবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। এককালে 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক সংবাদপত্র কার্য্যালয় হইতে বহু সংস্কৃত পুরাণাদি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া সুলভে বিক্রীত হইয়াছিল। বোম্বাই, পুণা প্রভৃতি স্থানে এখনও সংস্কৃত গ্রন্থপ্রকাশ নিয়মিতভাবে হইয়া থাকে। ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ও তদীয় সহধর্মিনী শ্রীমতী রমা চৌধুরীর পরিচালনায় প্রাচ্যবাণী মন্দির হইতে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও সম্প্রতি এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন। কাজেই শ্রদ্ধাভাজন হরিদাস দাসের অসমাপ্ত কার্য্যের ভার গ্রহণের লোকের অভাব হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সেই সঙ্গে বিদ্যোৎসাহী বন্ধুদের নিকট একটি প্রার্থনা জানাইব। শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী এ বিষয়ে যে কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া গিয়াছেন, সে কথা যেন দেশবাসী বিস্মৃত না হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেন তাঁহার স্মৃতিতে বৃত্তি বা অধ্যাপক-পদ সৃষ্টি করিয়া নীরব ও নিরভিমান কর্মীর প্রতি যোগ্য শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের ব্যবস্থা করেন।
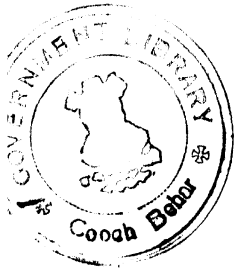
গ্রহ জগৎ

দশম বা কর্ম্মভাব

উপাধ্যায়

(ভৃগু সংহিতা অবলম্বনে)

মেষ লগ্ন জাত ব্যক্তির ফলাফল

মেষ লগ্নজাত ব্যক্তির কর্ম্ম স্থান মকর। ভৃগুসংহিতা মতে এখানে রবি থাকলে কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতির অন্তরায় ঘটে। রাজ-অনুগ্রহলাভ সম্যক্‌ভাবে হয় না। বিদ্যাবুদ্ধি উত্তম হয়, মাতৃভক্তি প্রকাশ পায়, সুখসম্পত্তির লাভ যোগও লক্ষ্য করা যায়। সন্তানদের সঙ্গে ভালো বনিবনাও হয় না। এখানে চন্দ্র থাকলে জাতকের মাতৃশক্তিলাভ হয়, পিতৃস্থানে আনন্দ বৃদ্ধি ঘটে। ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ, যশ, সম্মান ও প্রতিষ্ঠা দেখা যায়। মঙ্গল বিক্রমকারক হওয়াতে এখানে এই গ্রহের অবস্থিতি হেতু জাতকের শারীরিক শক্তি লাভ হয়, আর তার আত্মসম্মান বৃদ্ধি ও অহঙ্কার পরিলক্ষিত হয়। সুখ শান্তির দিকে লক্ষ্য থাকে না, জাতক পিতামাতাকে গ্রাহ্য করে না, ছেলেমেয়েদের ভালোবাসে। তার প্রকৃতি উদ্ধত হয়, নিজের ইচ্ছামত কাজ করে।

এখানে বুধের অবস্থিতি সম্পর্কে ভৃগু বলেছেন উৎসাহ ও পরিশ্রমের দ্বারা কর্ম্মোন্নতি ঘটে, পিতৃক্ষেত্রের শক্তি লাভ হয়, রাজসরকারে সম্মান প্রতিপত্তি হয়, সামাজিক প্রতিষ্ঠার যোগ দেখা যায়। মাতামহ পক্ষ থেকে সাহায্য লাভ হয়, কিন্তু মাতার সহিত বিরোধ ঘটে। বৃহস্পতি এখানে অবস্থান করলে পিতৃক্ষেত্র দুর্ব্বল হয়। ছোটো খাটো ব্যবসায়ে উন্নতি আর মাতৃপক্ষ থেকে সুখলাভ হয়, কোনরকম সম্মান বজায় থাকে। জাতক শান্তিলাভেচ্ছু হয়। ভৃগু বলছেন শনিরক্ষেত্রে দশমে শুক্র থাকা অত্যন্ত শুভ—উচ্চ স্তরের কর্ম্ম জীবন লাভ হয়। সমাজে আর রাজসরকারে পরম প্রতিপত্তি হয়। গৃহভূমি ও বন্ধুলাভ উত্তম হওয়াতে সুখের জীবন গড়ে ওঠে, স্ত্রী ও হয় মনের মত। জাতক সাংসারিক কাজে বেশ সুদক্ষ হয়। এখানে শনি থাকলে ভৃগুর মতে জাতক বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হয়, মাতার প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করে, সমাজ সংসারে ও রাজকীয় বিভাগে বেশ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হয়ে ওঠে, বহু জনকল্যাণকর কাজ তার দ্বারা ঘটে থাকে। দশমে রাহু থাকলে একাধিক স্থানে কর্ম্মলাভ, কর্ম্মে বাধাবিপত্তি ঘটে—সম্মান ও প্রতিষ্ঠার হানিও হয়। কেতু থাকলে কর্ম্মে বিপত্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা যায়।

বৃষলগ্নজাত ব্যক্তির ফলাফল

বৃষলগ্ন জাত ব্যক্তির দশম বা কর্ম্মভাব কুম্ভ। এখানে রবি থাকলে ভৃগু সংহিতা মতে পিতার সহিত শত্রু ভাব দেখা যায়। গৃহ ভূমি সম্পত্তি বিষয়ে জাতক সুখী হয়। কর্ম্মক্ষেত্রে নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হয়ে থাকে—উন্নতিতে বাধা উপস্থিত হওয়ায়, অস্বচ্ছন্দতা ভোগ করতে হয়—কর্ম্মোন্নতির জন্যে বহু প্রকার চেষ্টার সম্মুখীন হয়ে কষ্টভোগ ঘটে, আলস্য দোষে অনেক সুযোগ সুবিধা অন্তর্হিত হয়। ভৃগুর মতে এখানে চন্দ্রের অবস্থান শুভপ্রদ, ভ্রাতা ভগিনীদের বলে বলী হওয়া যায়। সমাজে ও রাজসরকারে পদার প্রতিপত্তি হয়, মায়ের দিক থেকে সুখলাভ হয়, মানসিক সুখ আশা করা যায়। এখানে মঙ্গলের অবস্থিতি শুভজনক নয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দুর্ব্বলতা, তাছাড়া বিদ্যায় বাধা, অশুভ পিতৃভাব, আর যৌনভাবের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। বুধের অবস্থিতি শুভপ্রদ, রাজ্যসরকারের সাহায্য পেয়ে বিশেষ উচ্চ শিক্ষালাভ, সন্তানদের উন্নতি, প্রচুর অর্থ, উত্তম গৃহ ও ভূসম্পত্তিলাভ হয়। মাতৃক্ষেত্র হ'তেও উন্নতি ঘটে। এখানে বৃহস্পতি থাকলে কর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারে বৈদেশিক যোগাযোগ লাভ ও ক্ষতি দুইই ঘটে, অর্থোপার্জ্জনের জন্যে নানাপ্রকার কৌশল প্রয়োগ করে—খুব পরিশ্রমের সঙ্গে কর্ম্ম করে জীবনের উন্নতি আনতে হয়। এখানে শুক্র থাকলে কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা ভাগ্য বৃদ্ধি করতে হয়, চাতুর্য্য বলে সমাজ ও রাজসরকারের কাছে সম্মান ও প্রতিষ্ঠালাভ করে—আভিজাত্য মর্য্যাদা রক্ষার জন্যে বিশেষ সচেষ্ট হয়। শনির অবস্থিতি হোলে পিতৃ প্রভাবে বিশেষরূপে সৌভাগ্য বৃদ্ধি ঘটে থাকে—সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্ব্বক্ষেত্রে খুব সম্মান লাভ হয়—বড়দরের ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়, দাম্পত্য সুখশান্তির অভাব ঘটে। রাহু থাকলে পিতার সঙ্গে মনোমালিন্য হয়ে থাকে আর নিজের পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করে। কেতু থাকলে পিতৃক্ষেত্র দুর্ব্বল হয়, সকল কাজে বাধা, সম্মান হানি, আশাভঙ্গ মনস্তাপ ও কর্ম্মবিপত্তি আসে।

মিথুনলগ্ন জাত ব্যক্তির ফলাফল

মিথুনলগ্নজাত ব্যক্তির দশম ভাব মীন। ভৃগু বলেন, এখানে রবি থাকলে উৎসাহ বলে অনেকটা কর্ম্মোন্নতি হয়ে থাকে, পিতৃ বলে বলীয়ান্

হয়, ভ্রাতার সহযোগিতা ঘটে, সম্মান সুখ সম্পত্তি হয়—বহু সৎকার্য্য জাতকের দ্বারা ঘটে—ভূসম্পত্তি উত্তম হয়ে থাকে। এখানে চন্দ্র থাকলে বিরাট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্যে প্রচুর অর্থলাভ, তজ্জন্য নানা-প্রকার সুখসম্পত্তিভোগ আর অপরের উপর কর্তৃত্ব করবার সুযোগ পাওয়া যায়। এখানে অবস্থিত মঙ্গল গ্রহ অপরিসীম শক্তি প্রদান করে—যার ফলে নানাভাবে উন্নতি হয়, শত্রু জয়ী হওয়া যায়, লেখাপড়ার জন্যে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় আর তার দ্বারা অবশেষে সাফল্য হয়ে থাকে। বুধ এখানে থাক্‌লে কঠোর পরিশ্রম করে সৌভাগ্য অর্জ্জন হয়—মাতৃক্ষেত্র দুর্ব্বল হয়। জাতকের দৈহিক সৌন্দর্য্যের অভাব হোতে পারে। বৃহস্পতি থাকলে উত্তম সম্মান ও মর্য্যাদালাভ, পার্থিবক্ষেত্রে সাফল্য। দশমভাবে মীনে শুক্র থাক্‌লে বিদ্যালাভ হয়, সন্তানদের শক্তি হেতু চিত্ত-প্রসাদ লাভ হয়। ব্যবসায়ী হোলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি। পিতৃ স্থান উত্তম। মানসিক শক্তিও জোরালো দেখা যায়। শনির অবস্থিতি দেখা গেলে বুঝ্‌তে হবে পিতার স্থানের কিছু ক্ষতি হয়েছে। জাতক দীর্ঘজীবী হয়। ব্যয়াধিক্য হয়। বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য সুনাম বৃদ্ধি। স্ত্রী-পুত্রের জন্য অশান্তি ও দাম্পত্য কলহ। রাহু থাক্‌লে ব্যবসায়ে ক্ষতি, পদমর্য্যাদা হানি ও মনস্তাপ। কেতু থাক্‌লে জীবনের উন্নতির পথ প্রশস্ত হয় না।

কর্কটলগ্নজাত ব্যক্তির ফলাফল

কর্কটলগ্নজাত ব্যক্তির দশম ভাব মেষ। ভৃগু বলেন এখানে রবি থাক্‌লে জমিজমাসংক্রান্ত ব্যাপারে জাতকের ঔদাস্য। ব্যবসায়ে অথবা কোনপ্রকার সম্ভ্রান্তপদপ্রাপ্তি থেকে প্রচুর অর্থলাভ—পিতৃস্থান সম্মান-জনক হয়,—মাতৃক্ষেত্র উত্তম হয় না, বৃহৎ পরিবার হয়। যশঃ সম্মান ও প্রতিষ্ঠা। রাজকীয় মর্য্যাদালাভ। চন্দ্র থাক্‌লে পিতামাতার কাছ থেকে লাভ, উ'চুদরের বৃত্তিগ্রহণ, ভূ সম্পত্তি হয়—সংসারক্ষেত্রে আধি-পত্যবৃদ্ধি আর উচ্চ আকাঙ্ক্ষা থাকে। মঙ্গল দশমে থাক্‌লে রাজকীয় পদলাভ হয়, কর্তৃত্ব, বহু সম্মান, প্রতিপত্তি, পিতা ও সন্তান সম্মানিত ও মর্য্যাদাসম্পন্ন হয়, খুব সম্মানের ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে সমাজের উচ্চ স্তরে জাতক স্থান লাভ করে। বুধ এখানে থাক্‌লে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হোলে অসাফল্য ঘটে, আর পিতাও ভ্রাতার স্থান দুর্ব্বল, আত্মসম্মান রক্ষা ও মর্য্যাদা লাভের জন্যে বহু ব্যয় হয়। বৃহস্পতি থাক্‌লে জাতক অত্যন্ত প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ও সৌভাগ্যবান হয়, পদোন্নতির উদ্দেশ্যে কঠোর পরিশ্রম করে, আংশিকভাবে স্বার্থপর হয়ে থাকে। শুক্র থাক্‌লে জাতক সুখী হয়, ভূসম্পত্তিলাভ, যানবাহনলাভ, সম্মান প্রতিপত্তি আর মাতৃ সুখ ঘটে। কর্ম্মস্থানে মেষে শনি। নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি আনে, পিতৃক্ষেত্রে নানা অশান্তি ও অশুভ ঘটনা ঘটে—দৈনন্দিন জীবন যাত্রার পথে কঠোর পরিশ্রম, স্ত্রী পুত্র পরিবার বর্গের সঙ্গে অসদ্ভাব হেতু কষ্টভোগ, অতিরিক্ত ব্যয়। রাহু এখানে থাক্‌লে পিতৃস্থান থেকে নানাপ্রকার কষ্ট ও নির্য্যাতন ভোগ করতে হয়, ব্যবসায়ে ক্ষতি আর অসুবিধার জন্যে কর্ম্মে বিশৃঙ্খলতা আসতে পারে—ভাগ্যভাব দুর্ব্বল হয় আর ভাগ্যোন্নতির জন্যে নানা-প্রকার অপকৌশল প্রয়োগে সচেষ্ট হয়। কেতু থাক্‌লে পিতৃস্থানের দুর্ব্বলতা, পিতার সহিত মনোমালিন্য, ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষতি, সম্মানহানি ও দারুণ পরিশ্রমের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন প্রভৃতি ফলভোগ হয়।

সিংহলগ্নজাত ব্যক্তির ফলাফল

সিংহলগ্নের দশম বা কর্ম্মভাব বৃষরাশি। এইভাবে রবি থাক্‌লে গৌরববৃদ্ধি হয়—আর হয় সম্মান যশ প্রতিষ্ঠা; সুখস্বচ্ছন্দতা সম্যকভাবে লাভ করবার অদম্য চেষ্টা দেখা যায়, পিতার সঙ্গে বড় একটা যোগসূত্র থাকে না, সদ্ভাব সম্প্রীতিরও অভাব ঘটে, মায়ের ওপর থাকে স্নেহের টান, জমি জমা সম্পত্তি গৃহ প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য হয়। সমাজেও বেশ পসার প্রতিপত্তি হয়। চন্দ্র থাক্‌লে ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে ঝোঁক হয়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হোতে হয়। গৃহসম্পত্তি আশানুরূপ হয় না, পিতামাতার ওপর তেমন টান থাকে না, অপরিমিত ব্যয় হয়, কর্ম্মোন্নতির ব্যাঘাত ঘটে। মঙ্গলের অবস্থান অবশ্য শুভপ্রদ, পার্থিব সুখসম্পদ আর সম্মান প্রতিপত্তিলাভ হয়—পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে উত্তম বিদ্যালাভ, বিশেষ কর্ম্মোন্নতি ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হেতু সুন্দর-ভাবে জীবন অতিবাহিত হয়। বুধ এখানে থাক্‌লে অর্থানুকূল্যে ব্যব-সায়ে উন্নতি, রাজসম্মানলাভ, গৃহ ভূসম্পত্তি প্রভৃতির সম্ভাবনা হয়। জাতক সংসারের সর্ব্বক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করে ও শ্রদ্ধাভাজন হয়। এখানে বৃহস্পতির অবস্থান ভালো নয়, পিতৃক্ষেত্র দুর্ব্বল হওয়ায় নানা অশান্তি ভোগ, সম্মান প্রতিপত্তি ও কর্ম্মোন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করতে হয়—তা' ছাড়া নিজের দাম্ভিকতার জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। শুক্র থাক্‌লে শুভ হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি লাভ, রাষ্ট্র ও সমাজের কাছ থেকে বহু সুযোগ সুবিধা পাবার যোগাযোগ হোতে থাকে। ভাগ্য লাভ হয়। ভ্রাতা ভগ্নী ও পিতার সঙ্গে জাতকের বনিবনাও হোতে পারে। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সম্পত্তি গৃহ প্রভৃতি হয়ে থাকে। শনি এখানে থাক্‌লে বিশেষ কর্ম্মোন্নতি, সমাজে প্রতিষ্ঠা ও গৃহসম্পত্তিলাভ, যানবাহনাদি যোগ। রাহু থাক্‌লে কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতিতে পৌনঃপুনিক বাধা আসে, বহু কষ্ট ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সৌভাগ্য লাভ হয়। সকলের নিকট জাতক সুপরিচিত হয়। এখানে কেতুর অবস্থান হেতু কর্ম্মনাশ, তাছাড়া আশা-ভঙ্গ, মনস্তাপ, শত্রু বৃদ্ধি প্রভৃতি জীবনে ঘট্‌তে পারে।

কন্যালগ্নজাত ব্যক্তির ফলাফল

কন্যালগ্নের দশম বা কর্ম্মভাব মিথুন রাশি। এখানে রবি থাক্‌লে কর্ম্ম বিষয়ক ফল আশানুরূপ হয় না। ব্যয়াধিক্য হেতু সঞ্চিত অর্থ নষ্ট হ'তে থাকে। মাতৃভাব দুর্ব্বল হয়। ব্যবসায়ে বা চাকুরীতে উন্নতি করা কষ্টকর হয়ে থাকে। চন্দ্র থাক্‌লে উত্তম কর্ম্মলাভ হয়, ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি আর সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে। যানবাহন সম্পত্তিভোগ। চব্বিশ বছর বয়স থেকেই উন্নতির সূচনা দেখা যায়। জাতক তীক্ষ্ণধী হয়—সমাজে সম্মানিত ব্যক্তিরূপে সমাদর লাভ করে। জীবনযাত্রার মান ও খুব উন্নত হয়। মঙ্গল এখানে থাক্‌লে পিতৃ বৈরিতা, কর্ম্মোন্নতিতে

বাধা, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট, দীর্ঘ জীবন, ভ্রাতৃ বিরোধ প্রভৃতির সম্ভাবনা দেখা যায়। এখানে বুধ থাকলে দৈহিক সৌন্দর্য্য, বিশেষ সম্মান, রাজদ্বারে পসার প্রতিপত্তি, কর্ম্মোন্নতি ও উচ্চ স্তরের পদমর্য্যাদা লাভ, আত্মম্ভরিতা ও প্রেমানুরাগ পরিলক্ষিত হয়। বৃহস্পতি থাকলে বড়দরের ব্যবসায়ী, প্রচুর ঐশ্বর্য্য, সমাজ ও রাজ্যসরকারের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার ও প্রফুল্লচিত্ত প্রভৃতি ফল ফলতে দেখা যায়। শুক্রের অবস্থিতি ও শুভ—কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা, বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকার, সম্পত্তি ও ধনৈশ্বর্য্য ভোগ হয়, মাতৃ পিতৃক্ষেত্র ও উত্তম হয়। শনি থাকলে নিজের বুদ্ধি বলে জাতক উন্নতিশীল হয়। সম্মান প্রতিপত্তি, পুরস্কার, জনপ্রিয়তা, ব্যবসায়ে সাফল্য, রাজনৈতিক কার্য্যে সুদক্ষতা প্রভৃতি ঘটে। রাহু থাকলে ব্যবসায়ে মর্য্যাদা লাভ হয় কিন্তু আভ্যন্তরীণ গোলযোগ হেতু অশান্তি ভোগ হয়, কেতু থাকলে অর্থ সঞ্চিত হয় না, পারিবারিক দুঃখ কষ্টভোগ ও কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষ স্থান বা উন্নতি হয় না, —নানাভাবে অর্থকষ্ট হয়।

তুলালগ্নজাত ব্যক্তির ফলাফল

তুলালগ্নজাত ব্যক্তির দশম বা কর্ম্মভাব কর্কট। রবি থাকলে সম্মানের সহিত আয়, বড়দরের ব্যবসায়ে সাফল্য, পিতৃ সম্পত্তিসুখ, মাতার সহিত অসদ্ভাব, ভূসম্পত্তি ও বাড়ী ভাড়া থেকে সুন্দর আয় এবং উত্তম জীবন যাপন হয়ে থাকে। চন্দ্র থাকলে উত্তম ব্যবসায়ী, রাজসরকারে প্রতিষ্ঠা, বুদ্ধিবলে বহু লোকের উপর কর্তৃত্ব, যশ, সম্মান ও প্রতিপত্তি হেতু আত্মপ্রসাদ লাভ ও অহঙ্কার ইত্যাদি হয়ে থাকে। এখানে মঙ্গল দারিদ্র্যকষ্ট আনে, কর্ম্মোন্নতিতে বাধা ঘটে, পিতা ও স্ত্রীর কাছ থেকে লাঞ্ছনা ভোগ, নিম্নশ্রেণীর পেশা বা চাকুরি হয়, অপমানিত হোলেও লজ্জাবোধ করেনা। বুধ থাকলে উত্তম ব্যবসায়ে সাফল্য, সৌভাগ্য বৃদ্ধি কর্ম্মোন্নতি, সম্মান লাভ হয়। বৃহস্পতি থাকলে মাতার ওপর টান থাকে না, পিতার দিকে টান হয়, মানসিক সুখ-শান্তির অভাব, ভ্রাতা-ভগ্নী পরিবেষ্টিত ও কঠোর পরিশ্রমী হয়। এখানে শুক্র রাজকীয় পদমর্য্যাদাদাতা, ব্যবসায়ে উন্নতিসূচক, অদম্য অধ্যবসায় ও সৌভাগ্যবৃদ্ধিকারক। এখানে শনি জাতককে বিদ্বান করে, নিজের সুখ-সুবিধা সৌভাগ্য ও কর্ম্মোন্নতির প্রসঙ্গ নিয়েই জাতক সময় অতিবাহিত করে, স্ত্রীকে দুর্ব্বাক্যের দ্বারা কষ্ট দেয়, সবার ওপর কর্তৃত্ব করে, উত্তম গৃহলাভ করে, অপরিমিত ব্যয়শীল হয়। রাহু থাকলে পিতৃস্থান দুর্ব্বল হয়, কর্ম্মোন্নতির জন্য বহু চেষ্টা করতে হয়, মানসিক অস্বচ্ছন্দতা, শত্রুবৃদ্ধি ও সম্মানহানি, রাজদ্বারে দণ্ডভোগ ও সামাজিক ক্ষেত্রে মর্য্যাদাহানি ঘটে। কেতু থাকলেও পিতৃক্ষেত্র অশুভ হয়, কর্ম্মহানি, ব্যবসায়ে ক্ষতি, বহুপ্রকার কষ্টভোগ, অন্ন-বস্ত্রের দুঃখ, রাজ্যসরকারের বিপক্ষতা ও মানসিক উদ্বেগ প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়।

বৃশ্চিকলগ্নজাত ব্যক্তির ফলাফল

বৃশ্চিকলগ্নজাত ব্যক্তির কর্ম্মক্ষেত্র সিংহ। এখানে রবির অবস্থান শুভপ্রদ। জাতক পদমর্য্যাদা সম্পন্ন হয়, আর শাসন বিভাগে উচ্চপদস্থ হয়ে বহুলোকের কর্তৃত্ব করে, পরিশ্রমী হয় আর কোন ব্যক্তিকে গ্রাহ্য করেনা, সিংহতুল্য পরাক্রমী হয়—পিতাকে গ্রাহ্য করে না, মায়ের বিরুদ্ধাচরণ করে—সমাজের সর্ব্বক্ষেত্রে সমাদৃত হয়। এখানে চন্দ্রের অবস্থানও উত্তম। জাতক ধর্ম্মপ্রাণ হয়, অধ্যাত্মসাধনার দিকে আগ্রহ প্রকাশ করে, নিজের চেষ্টায় ভাগ্যোন্নতি করে, উত্তমপদে অধিষ্ঠিত হয়—রাষ্ট্র ও সমাজের সম্মান পেয়ে উত্তম জীবন যাপন করে। এখানে মঙ্গল অত্যন্ত বলশালী, সুন্দর চেহারা, প্রখর বুদ্ধি, উত্তম বিদ্যা আর রাষ্ট্র ও সমাজের সম্মান লাভ হয়—উন্নত আদর্শ ও বলিষ্ঠ মানসিক শক্তি দেখা যায়। এখানে বৃহস্পতি থাকলে জাতক বুদ্ধিজীবী হয়ে সমাজ ও রাজসরকার থেকে বহু টাকা উপার্জ্জন করে। তার বৃত্তি হয় অত্যুন্নত—পিতৃস্থান ও ব্যবসা থেকে ঐশ্বর্য্যশক্তি লাভ হয়। এখানে শুক্র বৃত্তি সম্পর্কে শুভ নয়, বিশেষ কর্ম্মোন্নতি হয়না, স্ত্রীর আচার ও আচরণ অসঙ্গত হয়, মাতৃসুখ লাভ হয়, উত্তম গৃহভোগ আর বিলাসিতায় অযথা ব্যয় হয়। শনি থাকলে নানা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে শেষে কর্ম্মোন্নতি হয়, আর গৃহসুখ সম্পত্তি লাভ হয়, সম্মান বজায় রাখবার জন্য যথেষ্ট বেগ পেতে হয়, অতিরিক্ত ব্যয়হেতু মানসিক উদ্বেগ ঘটে। রাহু থাকলে পিতৃহানি বা পিতার সাংসারিক কষ্ট, সম্মান প্রতিপত্তি লাভ, উন্নতির পথে প্রথম বাধা, পরে উন্নতিলাভ, কর্ম্মক্ষেত্রে নানা বাধা ও অসুবিধা ভোগ, বৃত্তি বা ব্যবসায়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রম প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। কেতু থাকলে কর্ম্মক্ষতি, উন্নতিতে বাধা, বিলম্বে সাফল্য, মর্য্যাদাহানি, সমাজে লাঞ্ছনাভোগ প্রভৃতি ঘটে।

ধনুলগ্নজাত ব্যক্তির ফলাফল

ধনুলগ্নজাত ব্যক্তির দশম বা কর্ম্মভাব কন্যা। এখানে রবি অতীব সৌভাগ্যদাতা। সম্মান, যশ, প্রতিষ্ঠা ও ভাগ্যোন্নতি হয়। রাজানুগ্রহ লাভ জন্য চিত্তের প্রসন্নতা। জাতক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হয়, নানাপ্রকার লাভ ঘটে। পসারপ্রতিপত্তিও অত্যন্ত হয়ে থাকে। চন্দ্র এখানে থাকলে পিতার দিক থেকে বাধা প্রাপ্তি হয়, সুচারুরূপে সৌভাগ্যোদয় হয় না, কর্ম্মক্ষেত্রে অসম্মান ও লাঞ্ছনাভোগ হেতু চিত্তপীড়িত হয়। এই স্থানে মঙ্গল অবস্থান করলে জাতক শিক্ষিত ও জ্ঞানী হয়, প্রখর বুদ্ধির সঙ্গে কাজ করে, সন্তানভাব ভালো হয় না, পিতাকে কষ্ট দেয়, দারুণ ব্যয়শীল, সম্মান ও পদমর্য্যাদালাভে ক্রমাগত বাধা পেলেও তবু সম্মানলাভ করে, পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করে—খ্যাতি ও অখ্যাতি দুই-ই কর্ম্মক্ষেত্রেলাভ হয়। ভাগ্যোন্নতি ও উপার্জ্জনের জন্যে বিশেষ পরিশ্রম করতে হয়। এখানে বুধ থাকলে বড় ব্যবসায়ী হওয়া যায়, পিতৃক্ষেত্র থেকে শক্তিলাভ ঘটে, সমাজ ও রাষ্ট্রে সম্মান, অত্যন্ত সুন্দরী ও প্রতিপত্তিশালিনী স্ত্রী, বড়লোক শ্বশুর ইত্যাদি হয়—ভূসম্পত্তি তেমন হয় না। মাতৃস্থান দুর্ব্বল হয়, পার্থিব সুখ সম্পদ ঘটে। বৃহস্পতির অবস্থান ও এখানে শুভপ্রদ—পৈতৃকসম্পত্তি সম্পর্কে আশানুরূপ কিছু না হোলেও নিজের চেষ্টায় বহুদূর পর্য্যন্ত উন্নতিলাভ করতে সক্ষম হয়—ব্যবসায়ে ও উন্নতিযোগ। শুক্রের অবস্থান বিশেষ শুভপ্রদ নয়—পিতৃ স্থানের দুর্ব্বলতা সৃষ্টি

হয়। তাছাড়া, বৃত্তি বা ব্যবসায়ে অসাফল্য দেখা দেয়, সম্পত্তি সুখ থাকলেও সম্মানিত ব্যক্তি হয় না। রাজকীয় শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে উচ্চ পদমর্য্যাদালাভ হয় যদি শনি এখানে থাকে, আর আয়, প্রতিষ্ঠা, সম্মান, সম্ভ্রান্ত স্ত্রী প্রভৃতি ও পরিলক্ষিত হয় এই গ্রহের অবস্থিতির জন্যে। কিন্তু মানুষ হিসাবে জাতক উদ্ধত হয়। রাহু এখানে অবস্থান করলে চাতুর্য্যের দ্বারা কর্ম্মোন্নতি, সামাজিক মর্য্যাদা ব্যাহত হয়, নিজের সৌভাগ্য বৃদ্ধির জন্যে নানাপ্রকার অপকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে। এখানে কেতু থাকলে কর্ম্মক্ষেত্রে কেবল ক্ষতি হয়, চাকুরি ও এক জায়গায় থাকে না, ব্যবসাও নষ্ট হয়—নানাবিপত্তির পর শেষে সৌভাগ্য-লাভ ঘটে।

মকরলগ্নজাত ব্যক্তির ফলাফল

মকরলগ্নের দশম বা কর্ম্মভাব তুলা। এখানে রবি থাকলে পিতার দুঃখ দুর্দ্দশা হয়, জাতকের আয়ু হ্রাস হোতে দেখা যায়; জীবিকা উপার্জ্জনের জন্যে নানাপ্রকার কষ্টের সম্মুখীন হোতে হয়, সংসার চালাতে গিয়ে রোজই চিত্তের চঞ্চলতা ভোগ হয়, অর্থের জন্য কঠিন পরিশ্রম করতে হয়। এখানে চন্দ্রের অবস্থান শুভব্যঞ্জক, ফলে খুব উঁচুদরের লোক হয়, ব্যবসায়ে প্রচুর উন্নতি ঘটে, রাজ সম্মান হয়; লোক সমাজে শ্রদ্ধা অর্জ্জন আর স্ত্রীর আনুগত্যজনিত সুখলাভ হয়—মাতা-পিতার সহযোগিতা লাভ করা যায়। মঙ্গলের অবস্থান ও শুভ-উত্তম বিদ্যালাভ, কর্ম্ম উত্তম হয়, স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্যভোগ, মাতৃশক্তি অর্জ্জন, অর্থের প্রাধান্য সমৃদ্ধি সুখ-শান্তিলাভ ঘটে। বক্তৃতা দেবার শক্তি ও বেশ দেখা যায়। বৃহস্পতি এখানে পিতৃস্থানের ক্ষতিকারক, কর্ম্মহানি হয়, ভ্রাতৃবর্গের সহিত মনোমালিন্য, অর্থক্ষতি ও সৌভাগ্যোদয়ে বাধাবিপত্তি আসে। এখানে শুক্র থাকলে জাতক বিচারক হয়, খুব উঁচুদরের বিদ্যার্জ্জন হয়, দেশ-বিদেশে সুনাম যানবাহনও ধনৈশ্বর্য্যভোগ প্রভৃতি করায়ত্ত হয়ে থাকে। এখানে শনি থাকলে জাতক অত্যন্ত ধনী হয়। তার বহু টাকা হয়, মাতৃ স্থান দুর্ব্বল হয়। অর্থ-সঞ্চয়ই জাতকের বিশেষ লক্ষ্য হয়ে ওঠে। বড়দরের ব্যবসায়ী হয়, স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ভাব থাকে না এজন্য চিত্তের বিক্ষোভ দেখা দেয়। রাহু থাকলে অর্থের জন্য উদ্বিগ্নতা, কর্ম্মক্ষতি, পারিবারিক অশান্তি ও অর্থকৃচ্ছ্রতাভোগ। কেতু থাকলে বহু বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে কর্ম্মক্ষেত্র বিষাক্ত হয়ে ওঠে; পরিশ্রম করেও আশানুরূপ কর্ম্মসাফল্য হয় না, কর্ম্মোন্নতি সহজে হয় না।

কুম্ভলগ্ন জাত ব্যক্তির ফলাফল

কুম্ভলগ্ন জাত ব্যক্তির দশম বা কর্ম্মভাব বৃশ্চিক। এখানে রবি থাকলে মান প্রতিপত্তি, উত্তম কর্ম্ম রাজসম্মান প্রভৃতি হয়, জাতক কোন প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার হোতে পারে, প্রতিপত্তিশালী স্ত্রী লাভ হয়, পার্থিব সুখ সম্পদ ও সৌভাগ্য লাভ হয়। মাতৃভাব ভালো হয় না। এখানে চন্দ্র থাকলে বহু কষ্টভোগ হয়, মান মর্য্যাদা নষ্ট হয়, অর্থের জন্যে চিন্তা-গ্রস্ত হোতে হয়। বহু বাধাবিপত্তির পর কিছু পরিমাণে সৌভাগ্য লাভ হয়। এখানে মঙ্গল থাকলে স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করতে হয়। সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ হয়, রাজ্য সম্মান, পুরস্কার প্রভৃতি ও পাওয়া যায়, শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে উচ্চ শিক্ষালাভ হয়ে শাসন বিভাগে বড় চাকুরিলাভ হয় —সুদক্ষ আইনজ্ঞ হয়। সহজেই দৈহিক ক্লান্তি আসে। বহু মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। বুধ থাকলে কর্ম্মে বাধাবিপত্তি ও বিশৃঙ্খলতা ভোগ, মনস্তাপ ও আশাভঙ্গ। বৃহস্পতি থাকলে বড়দরের ব্যবসায়ী হয়, বহু অর্থলাভ হয়, আর নানাপ্রকার সুখ সুবিধা ও সুযোগ ভাগ্যোন্নতি ঘটে। শুক্র থাকলে জাতক খুব উচ্চপদ পায়—জমিজমা টাকা-কড়ি বেশ হয়। শনি থাকলে স্ত্রীকে কেবল অপমানিত হোতে হয়, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পথে অর্থকৃচ্ছ্র তার জন্যে ঘরে-বাইরে লাঞ্ছনা ভোগ হয়। এখানে রাহুর অবস্থান আশানুরূপ নয়। মন বিভ্রান্ত হয়, কাযে বাধা, সম্মানে ব্যাঘাত প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়, কেতু এখানে থাকলে পিতৃক্ষেত্রে দারুণ ক্ষতি হয়—সম্মানহানি, নিম্নশ্রেণীর কর্ম্ম, ব্যবসায়ে উন্নতি নেই। জাতক পরিশ্রমী হয়, দারিদ্র্য কষ্টভোগ।

মীনলগ্নজাত ব্যক্তির ফলাফল

মীনলগ্নজাত ব্যক্তির দশম বা কর্ম্মভাব ধনু। এখানে রবি থাকলে কর্ম্মী হয়, সমাজে জাতক আধিপত্য বিস্তার করে, পার্থিব সুখ লাভ হয়, অত্যন্ত পরিশ্রমী হয়। চন্দ্র থাকলে অতীব উত্তম শিক্ষালাভ হয়, নানা প্রকারে সুযোগ সুবিধা পায়। অর্থ সঞ্চিত হয়, এখানে মঙ্গল থাকলে জাতকের বিদ্যায় ক্ষতি, বড়দরের ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে, বহু উপার্জ্জন করে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করে জাতক রাখে। গৃহ সম্পত্তি যানবাহন সুখ হয়, বুধ থাকলে রাজকীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ, আড়ম্বরপ্রিয় স্ত্রী, জমিজমা ও গৃহ আর যানবাহন সুখ হয়। এখানে বৃহস্পতি থাকলে জাতক পিতাকে তার সমতুল্য ব্যক্তি বলে মনে করে। শত্রুদের ভয়ে পশ্চাৎপদ হয় না। এখানে শুক্র থাকলে ভ্রাতৃভাব ভালো হয় কিন্তু পিতৃসদ্ভাব হয় না। রাজ-দ্বারে সম্মানলাভ, জন সমাজে প্রাধান্য বিস্তৃতি ঘটে। শনি থাকলে অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য অশান্তি ভোগ, নানাপ্রকার কাজ করে জীবিকা উপার্জ্জন করতে হয়, ব্যবসায়ে ক্ষতি হয়, ভাগ্যের উন্নতির জন্যে সচেষ্ট হয়, সাধারণভাবে জীবন যাপন করতে হয়। এখানে রাহু থাকলে পিতৃ-হানি, কর্ম্মের জন্যে অশান্তি ভোগ, নানা অসুবিধা ও বিপত্তি, সকল কর্ম্মে বিমূঢ়তা, এখানে কেতু থাকলেও সম্যক্‌ভাবে ভাগ্যোন্নতি হয় না, বহুকষ্টে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে হয়।

***

বৈশাখ মাসের ব্যক্তিগত রাশিফল

মেষ

অশ্বিনী ও কৃত্তিকা নক্ষত্রজাত ব্যক্তির পক্ষেই শনি ও বৃহস্পতির অশুভভাবজনিত কষ্টভোগ বেশী হবে। জাতকের স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। রক্তের চাপ বৃদ্ধি, হৃদ্রোগ প্রভৃতি সম্ভব। পারিবারিক অশান্তি

চিত্তের উত্তেজনা ভোগ, কোন নিকট-আত্মীয় বা বন্ধুর বিয়োগ। আর্থিক স্বচ্ছন্দতার অভাব। অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষ নজর রাখা দরকার। জমিজমা, বাড়ী ভাড়া প্রভৃতি সম্পর্কে সন্তোষজনক পরিস্থিতি ঘটবে না। ভাড়া অনাদায়ের জন্য মামলা হোতে পারে, চাকুরির স্থান শুভ নয়, পদোন্নতিতে বাধা, কর্ম্মক্ষেত্রে শত্রুর প্রাধান্য। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীদের পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ যাবে না, পুরুষের সহিত ব্যবহারে নিজেকে সতর্ক রাখা উচিত—কলহ, বিচ্ছেদ, মতভেদজনিত অশান্তি। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় তেমন মনোযোগী হবেনা।

বৃষ

শুভাশুভফল। কৃত্তিকানক্ষত্রজাত ব্যক্তির পক্ষে বহুল পরিমাণে শুভ, তৎপরে রোহিণী ও সর্ব্বশেষে মৃগশিরাজাত ব্যক্তির পক্ষে শুভ হবে। মধ্যে মধ্যে শরীরে বায়ুপ্রকোপ, তাছাড়া সাধারণ স্বাস্থ্য ভালো। পারিবারিক অশান্তি। জায়াস্থানে অশুভ। আর্থিক অভাব অনটন হবে ব্যয়াধিক্য হেতু। মাসের প্রথমদিকে ভূম্যধিকারী বা বাড়ীওয়ালার পক্ষে অশুভ নয়, চাকুরিজীবীরাও কোন অশুভ ঘটনার সম্মুখীন হবে না। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীদের অবস্থা গতানুগতিকভাবে চল্‌বে। মাসের প্রথমদিকটা স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ, শেষ দিকটায় অশুভ ঘটনা ঘটবে। প্রণয়ভঙ্গযোগেও সন্তানাদির পীড়া। পরীক্ষায় ফল ভালো। বিদ্যার্জ্জন সন্তোষজনক।

মিথুন

আর্দ্রা ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রজাত ব্যক্তির পক্ষে কিছুটা ভালো, মৃগশিরা জাতগণের অবস্থা আশানুরূপ হবেনা। স্বাস্থ্য ভালো যাবেনা। রক্তের রোগ, পিত্তপ্রকোপ, ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদি হোতে পারে। চলাফেরায় সতর্কতা আবশ্যক, দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে। পরিবারবর্গের মধ্যে দুয়েকজন বিশেষভাবে পীড়িত হোতে পারে। ঘরে বাইরে বিবাদজনিত অশান্তিভোগ। আর্থিক কষ্ট সেরূপ হবে না, বরং অর্থ ও দ্রব্যলাভ হবে, নব পরিকল্পনায় অর্থবৃদ্ধি, সন্তোষজনক আয়। ভূম্যধিকারীও বাড়ীওয়ালার পক্ষে ক্ষতিকর পরিস্থিতি দেখা যাবে। চাকুরীজীবীর পক্ষে অনেকটা ভালো। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে বিশেষ শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রণয় সংক্রান্ত ব্যাপারে সাফল্য লাভ, কিন্তু গৃহস্থালী ব্যাপারে অশান্তির সম্ভাবনা আছে। পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে না। লেখাপড়ায় অমনোযোগ।

কর্কট

পুনর্ব্বসুনক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। পুষ্যা এবং অশ্লেষাজাত ব্যক্তির পক্ষে অপেক্ষাকৃত ভালো। চক্ষুপীড়া এবং পিত্তপ্রকোপের সম্ভাবনা। পারিবারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। দাম্পত্য মিলন এবং কলহের অবসান। সাময়িক বিচ্ছেদ পুনর্মিলনে পর্য্যবসিত হবে। আয়ভাব উত্তম, কিঞ্চিৎ ব্যয়াধিক্য, ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে শুভ সময়। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ মাস,—মান মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠা লাভ, প্রণয়ে সাফল্য। পরীক্ষার ফল শুভ,—লেখাপড়ার দিকে আগ্রহ।

সিংহ

পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রজাত ব্যক্তিগণের অপেক্ষা মঘা ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিদের সময় ভালো। রক্তের চাপবৃদ্ধি, অতিরিক্ত উত্তাপের জন্য শারীরিক কষ্ট, স্ত্রীর স্বাস্থ্য খারাপ হবে। পারিবারিক অশান্তি বা কলহ বিবাদ থাক্‌বে। সন্তানদের মধ্যে অসুখ হোতে পারে। নানা কারণে আর্থিক অবস্থা ভালো হবে না, আয়ের পথগুলি কিছু কিছু রুদ্ধ হোতে পারে—কতকগুলি প্রয়োজনীয় খরচের জন্য তহবিলে টান ধরতে পারে। স্পেকুলেশনে ক্ষতির সম্ভাবনা। ভূম্যধিকারীও বাড়ীওয়ালার পক্ষে সময়টি মোটামুটি যাবে। মামলা মোকর্দ্দমায় পরাজয়। চাকরীজীবির পক্ষে এ মাসটী ভালো নয়, কর্ম্মক্ষেত্রে সতর্কতার প্রয়োজন। উপরওয়ালার সঙ্গে সম্প্রীতি থাক্‌বে না। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীদের পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে সময়টী সাধারণভাবেই যাবে। লেখাপড়া ও পরীক্ষার ফল মধ্যম।

কন্যা

উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রজাত ব্যক্তিদের পক্ষে সবচেয়ে কম দুর্ভোগ, হস্তা এবং চিত্রাজাতগণ পক্ষে এদের তুলনায় কিছু কষ্টভোগ আছে। হজমশক্তির অভাবজনিত উদরের পীড়া, চক্ষু পীড়া, জ্বর, রক্তের হ্রাস, আঘাত রক্তস্বল্পতা প্রভৃতি সম্ভব। পারিবারিক অশান্তি। সামাজিক ক্ষেত্রে বন্ধুদের সঙ্গে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা। আর্থিক স্বচ্ছন্দতার অভাব। স্পেকুলেশনে ক্ষতি। ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালাদের পক্ষে এ মাসটী শুভ নয়। মামলা মোকর্দ্দমার সম্ভাবনা। চাকুরীজীবীরাও প্রতিকূল আবহাওয়ার ভিতর দিনযাপন করবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীদের পক্ষে কর্ম্মের উত্থান পতন হেতু বিশৃঙ্খলতা। স্ত্রীলোকের পক্ষে এ মাসটী অতীব শুভ—সামাজিকতার ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ,—প্রণয়ার্থীর সহিত মিলন, বিবাহাদি, গার্হস্থ্য জীবনে শান্তি। লেখাপড়ায় আশানুরূপ কৃতকার্য্য হোতে পার্‌বে না, পরীক্ষায় অসাফল্য।

তুলা

বিশাখাজাত ব্যক্তিগণের পক্ষেই বিশেষ শুভ—চিত্রা ও স্বাতিজাতগণের অনুরূপভাবে শুভ হবেনা। স্বাস্থ্য ভালো যাবে। পারিবারিক শান্তি। আত্মীয় স্বজনের সহিত সম্বন্ধ ও ব্যবহার মধুর হবে। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। নানা ভাবে অর্থাগম হবে। আয়বৃদ্ধি যোগ আছে। স্পেকুলেশনে সাফল্য লাভ। ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মধ্যম সময়। মামলা মোকর্দ্দমায় জড়িত হোলে জটিল পরিস্থিতি ঘটবে। চাকরিজীবীর পক্ষে শুভ মাস,—কর্ম্মক্ষেত্রে সুখ্যাতি লাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীর পক্ষে উত্তম সময়—কর্ম্মের প্রসারতা ও বিস্তৃতির জন্য আনন্দ উপভোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রণয়ভঙ্গ যোগ, মাসের শেষের দিকে সাফল্য লাভ। সংসারে কিছু অশান্তি। লেখাপড়া উত্তম হবে, পরীক্ষায় সাফল্য।

বৃশ্চিক

অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে কিঞ্চিৎ অশুভ, বিশাখার পক্ষে তদনুপাতে অপেক্ষাকৃত শুভ। নিজেরও পরিবারবর্গের পীড়া। দুর্ঘটনায় বিপত্তি। পারিবারিক অশান্তি ও কলহ। আর্থিক কষ্টভোগ, আয়হ্রাসের জন্য চিত্তচাঞ্চল্য। গৃহবিচ্ছেদ জন্য স্থানান্তরে গমনের সম্ভাবনা। বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে অত্যন্ত অশুভ। নানাপ্রকার বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হোতে হবে। চাকুরিজীবীরা অসুবিধা ভোগ করবে—আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, শত্রুবৃদ্ধি প্রভৃতি ঘটবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীদের অবস্থাও ভালো যাবে না, কর্ম্মক্ষেত্রে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা আসবে। লেখাপড়ার দিকে অবহেলা, পরীক্ষার ফল অশুভ।

ধনু

পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষেই অনেকটা শুভ। মূলা ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে কিঞ্চিৎ অশুভ যোগ আছে। স্বাস্থ্য মোটামুটিভাবে ভালো যাবে, কিন্তু রক্তপাতের আশঙ্কা থাকায় সতর্ক হওয়া আবশ্যক। এ মাসে মানসিক শান্তির অভাব। কেন না নানারকম আশঙ্কা ও দুঃখভোগের সম্ভাবনা আছে। কোন নিকট আত্মীয়ের পীড়ার জন্য উদ্বেগ। অবশ্য এসব ঘটনা গুরুতর হবে না। আয়ের পথ রুদ্ধ হবেনা, বরং বৃদ্ধি পাবে—তবে ব্যয় সম্পর্কে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। মাসের প্রথম দিকে বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারীরা নানা প্রকারে অসুবিধা ভোগ করবে, মামলা-মোকর্দ্দমারও সৃষ্টি হবে—কর্ম্মস্থানে অশান্তি ঘটবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী মোটামুটি ভালো। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীগণের পক্ষে সময় মধ্যম।

মকর

উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিগণের সময় শ্রবণা ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তি অপেক্ষা শুভ। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে কিন্তু সন্তানদের শরীর ভালো যাবে না, তাদের পীড়ার সম্ভাবনা আছে। পারিবারিক অবস্থা খারাপ হবেনা, মধ্যে মধ্যে গার্হস্থ্য ব্যাপারে কিছু কিছু বাধা আসতে পারে, তজ্জন্য মানসিক উদ্বেগ ঘটবে। আর্থিক অবস্থা সুন্দর হবে, লাভের যোগ আছে। স্পেকুলেশনে ক্ষতি। ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালাদের পক্ষে শুভ, গৃহনির্ম্মাণ সংস্কারাদির সম্ভাবনা। চাকুরিজীবিদের পক্ষে শুভ, বেকার ব্যক্তির চাকুরি পাবার সম্ভাবনা, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীদের পক্ষে মাসটী মোটামুটি ভালো যাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ।

কুম্ভ

পূর্ব্বভাদ্রপদজাত ব্যক্তিগণের সময়ই বিশেষ ভালো যাবে। ধনিষ্ঠা ও শতভিষাজাতগণের সময় মধ্যম। শারীরিক দুর্ব্বলতা। সন্তানাদির পীড়া। পারিবারিক অশান্তি মধ্যে মধ্যে সৃষ্টি হোলেও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সুখেই অতিবাহিত হবে। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। আর্থিক স্বচ্ছন্দতা, কিছু অর্থও সঞ্চিত হোতে পারে। বাড়ীওয়ালাও ভূম্যধিকারীদের অবস্থা ভালোই যাবে। চাকুরিজীবীরা কর্ম্মস্থানে প্রশংসা লাভ করবে, ভবিষ্যতে উন্নতির পথ রচনায় বর্ত্তমানে এই মাসটী সহায়ক হবে। উপরওয়ালার সহিত সদ্ভাব ও সম্প্রীতি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীরা সাফল্য লাভ করবে, এদের অর্থ বেশ জমবে। মেয়েদের পক্ষে দাম্পত্য জীবনের অশান্তি ভোগ। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীগণের সাফল্য লাভ।

মীন

পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে মাসটী উত্তম, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতীর পক্ষে মধ্যম। স্বাস্থ্য খুব ভালো যাবে না, মধ্যে মধ্যে উদরশূল, বুকের যন্ত্রণা, আমাশয় প্রভৃতি দেখা যাবে। যাদের রক্তচাপ বৃদ্ধি বা হৃদ্রোগ আছে, তাদের খুব সাবধানে থাকা আবশ্যক। সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে ক্ষতি। অর্থকৃচ্ছতার জন্য উদ্বেগ। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারীদের পক্ষে মাসটি মোটেই ভালো নয়, নানাপ্রকার নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির যোগ আছে। চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভময়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীগণের পক্ষে মাসটী মোটেই ভালো নয়।

ব্যক্তিগত লগ্নফল

মেষলগ্ন—

বিদ্যাভাব শুভ। শারীরিক অবস্থা শুভ। স্থান পরিবর্ত্তন। সাফল্যলাভ। ধনপ্রাপ্তি লাভ ও চিত্তপ্রসাদ। বন্ধু বিচ্ছেদ, দুর্ঘটনার আশঙ্কা বা বিপদ, ব্যয় বৃদ্ধি। কর্ম্মোন্নতি।

বৃষলগ্ন—

শারীরিক ভাব শুভ। অর্থব্যয়। বিদ্যাভাব মধ্যম। আশাভঙ্গ ও উদ্বেগ। সৌভাগ্য বৃদ্ধি, ব্যবসায়ে লাভ। সন্তান সম্ভাবনা। আয় বৃদ্ধি।

মিথুনলগ্ন—

নবোদ্যমে কর্ম্মপ্রচেষ্টা। মানসিক কষ্ট। দুর্ঘটনার ভয়। পারিবারিক পীড়া ও তজ্জনিত উদ্বেগ ও অশান্তি। আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ। আঘাতপ্রাপ্তি।

কর্কটলগ্ন—

ভয়, অপবাদ ও দুশ্চিন্তা। লাভ। সন্তান লাভ। কর্ম্মে সাফল্য।

সিংহলগ্ন—

সৌভাগ্য বৃদ্ধি, নানাপ্রকার লাভ, বিবাহ সম্ভাবনা।

কন্যালগ্ন—

ভয়। সন্তানাদির পীড়া, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট। কলহ অর্থলাভ।

তুলা লগ্ন—

ভ্রমণ। উত্তম আয়। ব্যয়। ভাগ্য বৃদ্ধি।

বৃশ্চিকলগ্ন—

মানসিক উদ্বেগ, নানাভাবে অর্থাগমের সুযোগ হবে। নূতন পরিকল্পনায় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করলে সিদ্ধিলাভ। স্থান ত্যাগ।

ধনু লগ্ন—

অগ্নি ভয়, শত্রু বৃদ্ধি, প্রবাস গমন বা ভ্রমণ, কার্য্যসিদ্ধি, গৃহ বিচ্ছেদ, শারীরিক অসুস্থতা।

মকরলগ্ন—

শত্রু বৃদ্ধি, পাওনাদারের তাগাদায় বিব্রত হওয়ার যোগ। শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা। চিত্তের উত্তেজনা। মনস্তাপ। আশাভঙ্গ। স্থান ত্যাগ। বন্ধুযোগ। অর্থপ্রাপ্তি। সন্তান লাভ বা সন্তানের উন্নতি। দুঃখভোগ।

কুম্ভলগ্ন—

শারীরিক স্বচ্ছন্দতা, সুখবৃদ্ধি, উপরওয়ালার নিকট সম্মান প্রাপ্তি, উৎসাহ, মধ্যে মধ্যে কর্ম্মে বাধা, উদ্বেগ, অর্থলাভ, শক্তিলাভ, বন্ধুলাভ—স্ত্রীলোকের প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা।

মীন লগ্ন—

অর্থ লাভে কিঞ্চিৎ বাধা, ব্যয় হেতু উদ্বেগ, মানসিক অস্বচ্ছন্দতা, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, আঘাতপ্রাপ্তি বা রক্তপাত, শত্রুবৃদ্ধি, স্ত্রীর পীড়া, ভ্রমণ, সন্তানের সহিত মনোমালিন্য, নানা প্রকার বিঘ্ন-বিপত্তির সম্ভাবনা।

ভবিষ্যদ্বাণী

১৯৬২ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান সোভিয়েট শাসন পদ্ধতি রুশিয়া থেকে তিরোহিত হবে। এই বৎসর পর্যন্ত বর্ম্মার রাজনৈতিক আকাশও মেঘাচ্ছন্ন থাকবে, এদেশের প্রকৃত শান্তি ও সৌভাগ্যোদয় হবে না। এখানে উত্তরোত্তর অশান্তি, বিদ্রোহ, রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবার্ত্তা আর গণ-আন্দোলন প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকেও চিন্তিত করে তুলবে। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার পৃথিবীতে হবে, সেগুলির অত্যন্ত সন্তোষজনক ক্রমবর্দ্ধমান গতি ১৯৬৮ থেকে ১৯৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ১৯৮০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ধ্বংসের পর পৃথিবীর যে অবস্থা স্বপ্নে দেখেছিলেন আর ছন্দে রূপায়িত করেছিলেন, তা বাস্তবে পরিণত হবে অর্থাৎ আবার মানুষ মাটি চষে ফসল ফলাতে যাবে যন্ত্রদানবের সমাধিক্ষেত্রে দেখতে দেখতে। সেদিনের মানুষ বুঝতে পারবে হিংসাচ্ছন্ন মদগর্ব্বিত ভাবধারায় পুষ্ট হয়ে পূর্ব্বপুরুষেরা কি ভাবেই না মারণাস্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীতে খণ্ড প্রলয় ঘটিয়ে গেল। ১৯৮০ খৃষ্টাব্দের পরের মানুষেরা বিশ্বসৌহার্দ্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নতুন পৃথিবীর স্বস্তিবাচন করবে—সকল বিভেদ, অর্থগৃধ্নুতা আর রাজনৈতিক জুয়াখেলা মানুষ ভুলে যাবে। ভালোবাসার দ্বারা সারা পৃথিবীর মানব সমাজ গড়ে তুলবে নতুন ঐক্যবদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতি।

আসন্ন মহাসমর ও খণ্ডপ্রলয়ের কথা যা আমরা ইতিপূর্ব্বেই গ্রহজগতে বলেছি, প্রতিধ্বনিত হয়েছে, উড়িষ্যার কটক থেকে। এখানকার মোহম্মদিয়া বাজারে ভবিষ্যদ্বাণী কার্য্যালয় স্থাপিত হয়েছে, এই সংবাদ পি, ই, এনের সুভেনিয়ারের (স্মারণিকী) মধ্যে লক্ষ্য করা গেল। এই পত্রিকায় উক্ত ঠিকানা উল্লেখ করে শ্রীসত্যনারায়ণ মিশ্র ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন পৃথিবীর আগত প্রলয়ের সম্পর্কে। ভবিষ্যদ্বাণীর পশ্চাতে তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর গ্রন্থে বিভিন্ন ধর্ম্মের শাস্ত্রবচন, মহাপুরুষগণের বাণী, গণিত ও ফলিত জ্যোতিষের সিদ্ধপুরুষগণের অভিমত। বর্ত্তমানে গ্রন্থখানি উড়িয়া ভাষাতে প্রকাশিত হয়েছে, শীঘ্রই ইংরাজী, হিন্দী ও অন্যান্য ভাষায় এ গ্রন্থের অনুবাদ হয়ে নানা দেশে প্রচারিত হবে। আমাদের কাছে এ গ্রন্থ এখনও আসে নি।

পি, ই, এনের রজতজয়ন্তীর স্মারক পত্রে (সুভেনিয়ার) শ্রীসত্যনারায়ণ মিশ্র লিখেছেন—কলিযুগ শেষ হোতে প্রায় পঞ্চাশ বছর বাকী। সত্যযুগ আরম্ভ হয়েছে পনরো বছর পূর্ব্বে। এখন চলেছে কলির সন্ধ্যা। এই সন্ধ্যাসমাগমে ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সঙ্কট দুর্য্যোগময় সময়। এর ভেতর দেখা দেবে আন্তর্জ্জাতিক অশান্তি ও দুঃখ দুর্দ্দশা, যুদ্ধবিগ্রহ, সৌরমণ্ডল ও জৈবদেহের পরিবর্ত্তন, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় প্রভৃতি। পরিণতি হবে শোচনীয় ও সকরুণ। মহাসমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হবে অনেক ভূখণ্ড ;—নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে পৃথিবী থেকে অদ্ধসংখ্যক অধিবাসী।

আমরা গ্রহজগতে ইতিপূর্ব্বে বলেছি ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর আধ্যাত্মিক বিবর্ত্তন ঘটবে, এ সম্বন্ধে লেখক কিছু বলেন নি।

১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের ব্যক্তিগত বর্ষফল

৮ই ফাল্গুন থেকে ৬ই চৈত্রের মধ্যে জাত ব্যক্তিগণের ভাগ্য মোটামুটিভাবেই চল্‌বে বর্ত্তমান ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে। এঁদের শরীর ভালো যাবে না, এজন্যে শরীরের দিকে বিশেষ নজর নেওয়া দরকার। অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম এঁদের পক্ষে উচিত হবে না, হৃদ্রোগ বা হার্নিয়ার সম্ভাবনা আছে। যাঁরা সূর্য্যোদয়ের সময়ে জন্মেছেন, এবিষয়ে তাঁদের সতর্ক হওয়া বিশেষ আবশ্যক। সন্তানের কাছ থেকে আঘাত পেতে পারেন আর ফাটকা বাজিতে লাভবান হোতে পারেন যাঁদের জন্ম দুপুর বেলায়। সূর্য্যাস্তের দিকে যাঁদের জন্ম, তাঁরা নানারকমই কষ্ট পাবেন গুপ্ত শত্রুদের কাছ থেকে। রাত্রি জাত ব্যক্তিরা বর্ষের প্রথম দিকে সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু লাভবান হবেন, গুরুস্থানীয়দের সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। ফাল্গুনের মাঝামাঝি সময়ে জাত ব্যক্তিদের পক্ষে সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে সুখকর ভ্রমণ হবে। তাছাড়া বর্ষের প্রথম দিকে নূতন বন্ধুলাভ ঘটবে আর চৈত্রমাসে সাফল্য লাভ হবে ব্যবসা বাণিজ্যে। ফাল্গুনের শেষের দিকে জাত ব্যক্তিদের কর্ম্মোন্নতি, পদপ্রাপ্তি, আর্থিক অবস্থার উন্নতি যোগ আছে। চৈত্রমাসের প্রথম দিকে জাত ব্যক্তিদের প্রণয়ভঙ্গ ও নানাপ্রকার অশান্তির সম্ভাবনা।

সুধাংশুকুমার চট্টোপাধ্যায়

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বনাম পাকিস্তান ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ৪৬৯ (কানহাই ২১৭, জি সোবার্স ৭২)

পাকিস্তান : ২০৯ ও ১০৪ (রামাধীন ২৫ রানে ৪, গিবস ১৪ রানে ৩ এবং এট্‌কিনসন্ ১৫ রানে ৩ উইকেট)

লাহোরে অনুষ্ঠিত ওয়েষ্টইণ্ডিজ বনাম পাকিস্তানের ৩য় টেষ্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস এবং ১৫৬ রানে পাকিস্তানকে পরাজিত করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ-যোগ্য, পাকিস্তান ১ম ও ২য় টেষ্ট খেলায় জয়ী হয় এবং 'রাবার' লাভ করে।

বিশ্ব টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপঃ

পশ্চিম জার্ম্মানীর ডর্টমুণ্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় জাপান ১৯৫৭ সালের মত পুরুষদের দলগত বিভাগে এবং মহিলাদের দলগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ ক'রে যথাক্রমে সোয়াথলিং কাপ এবং কোরবিলন কাপ জয়ী হয়েছে। বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপানের যোগদান খুবই সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। ১৯৫২ সালে ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপান প্রথম যোগদান করে। যোগদানের প্রথম বছরেই জাপান মহিলাদের দলগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ানসীপ পায় এবং ব্যক্তিগত বিভাগেও সাফল্যলাভ করে।

রাজনৈতিক কারণে জাপান ১৯৫৩ সালের প্রতি-যোগিতায় যোগদান করতে পারেনি। কিন্তু ১৯৫৪ সাল থেকে জাপান বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় নিয়মিত যোগদান ক'রে অসামান্য প্রাধান্য বজায় রেখেছে। পুরুষদের দলগত বিভাগে জাপান এ পর্য্যন্ত ৬বার যোগদান ক'রে উপর্য্যুপরি পাঁচবার (১৯৫৪-৫৭ ও ৫৯ ; ১৯৫৮ সালে প্রতিযোগিতা হয়নি) দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপের পুরস্কার সোয়াথলিং কাপ জয়ী হয়েছে। মহিলাদের দলগত বিভাগে ৬বার যোগদান ক'রে জাপান ৪বার চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে (১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৫৭ ও ১৯৫৯)।

বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার ব্যক্তিগত বিভাগেও জাপান প্রাধান্য রক্ষা ক'রে চলেছে। জাপানের এই সাফল্য সুদীর্ঘকালের ইউরোপীয় প্রাধান্য খর্ব্ব করেছে। জাপানই এশিয়া মহাদেশের সর্ব্ব প্রথম দেশ হিসাবে বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় জয়মাল্য লাভ করে; আর জাপানই আজ একটানা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে।

১৯৫৯ সালের প্রতিযোগিতা

পুরুষবিভাগে ৩৭টি দেশ যোগদান করে। ৪টি বিভাগে এই ৩৭টি দেশকে ভাগ ক'রে খেলানো হয়। জাপানের খেলা পড়ে সি গ্রুপে। এই গ্রুপে ভারতবর্ষ খেলে ৩য় স্থান পায়। চারটি গ্রুপ থেকে যথাক্রমে এই চারটি দেশ শীর্ষস্থান অধিকার করে—হাঙ্গেরী (এ গ্রুপ), চীন (বি গ্রুপ), জাপান (সি গ্রুপ) এবং ভিয়েৎনাম (ডি গ্রুপ)। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই চারটি দেশ তাদের নিজের নিজের গ্রুপে অপরাজেয় থেকে শীর্ষস্থান লাভ করে এবং এই চারটি শীর্ষস্থানীয় দেশের মধ্যে তিনটি এসিয়া মহাদেশের অন্তর্গত।

সেমি-ফাইনাল : জাপান ৫—৩ খেলায় ভিয়েৎনামকে পরাজিত করে। হাঙ্গেরী ৫-৩ খেলায় চীনকে পরাজিত করে।

ফাইনাল: জাপান ৫—১ খেলায় হাঙ্গেরীকে (ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ান) পরাজিত করে।

মহিলা বিভাগে ২৬টি দেশ ৩টি গ্রুপে ভাগ হয়ে যোগদান করে। জাপান সি গ্রুপ থেকে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করে। ভারতবর্ষ মহিলা বিভাগে যোগদান করেনি। মহিলা বিভাগের তিনটি গ্রুপ থেকেই এশিয়া মহাদেশের এই তিনটি দেশ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হয়—চীন (এ গ্রুপ), দক্ষিণ কোরিয়া (বি গ্রুপ) এবং জাপান (সি গ্রুপ)।

ফাইনাল পুল: দক্ষিণ কোরিয়া ৩-০ খেলায় চীনকে পরাজিত করে। জাপান ৩—০ খেলায় চীনকে পরাজিত করে।

ফাইনাল: জাপান ৩—২ খেলায় দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত করে।

চূড়ান্ত ফলাফল: ১ম জাপান, ২য় দক্ষিণ কোরিয়া, ৩য় চীন।

১৯৫৯ সালের বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় এশিয়া মহাদেশ প্রাধান্য রেখেছে। দুটি দলগত প্রতিযোগিতায় জাপান জয়ী হয়। পুরুষদের দলগত প্রতিযোগিতায় যে চারটি দেশ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ ক'রেছিল তাদের মধ্যে হাঙ্গেরী ছাড়া বাকি তিনটি দেশই এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত।

মহিলাদের দলগত প্রতিযোগিতায় যে তিনটি দেশ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ানসীপ পায় তারা সবই ছিল এশিয়া মহাদেশের।

ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় পাঁচটি বিভাগ ছিল এবং এই পাঁচটি বিভাগেই জয়ী হয় এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত দুটি দেশ—জাপান (চারটি বিভাগে) এবং চীন (একটি বিভাগে)।

আর একদিক থেকে এশিয়া মহাদেশের অটুট প্রাধান্য লক্ষণীয়। পাঁচটি বিভাগের ফাইনালে মাত্র হাঙ্গেরী এবং চেকোশ্লোভাকিয়া এই দুটি দেশ ছাড়া এশিয়া মহাদেশের বাইরের অন্য কোন দেশ পৌছতে পারে নি। হাঙ্গেরী পুরুষদের সিঙ্গলস এবং চেকোশ্লোভাকিয়া পুরুষদের ডাবলস ফাইনালে খেলে হেরেছিল। ব্যক্তিগত বিভাগে জাপানের প্রাধান্য প্রতিযোগিতার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। পাঁচটির মধ্যে জাপান চারটি বিভাগের ফাইনালে উঠেছিল—মহিলাদের সিঙ্গলস, ডবলস এবং মিক্সড ডবলস। এই চারটি ফাইনাল খেলার তিনটিতে—মহিলাদের সিঙ্গলস, ডবলস এবং মিক্সড ডবলসে কেবল জাপানী খেলোয়াড়রাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে; অর্থাৎ জাপানী খেলোয়াড় ছাড়া অন্য কোন দেশের খেলোয়াড় এই তিনটির ফাইনালে উঠতে পারেনি। প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস খেলার সেমি-ফাইনালে হাঙ্গারীর এফ্ সিডো (১৯৫৩ সালের সিঙ্গলস বিজয়ী) জাপানের ইচিরো ওগিমুরাকে (জাপান) পরাজিত ক'রে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। ওগিমুরা বিশ্ব টেবিল টেনিস খেলায় দু'বার সিঙ্গলসে জয়ী হন এবং এ বছরের প্রতিযোগিতায় ২নং বাছাই খেলোয়াড় হিসাবে নির্ব্বাচিত হ'ন। ওগিমুরা অবশ্য এ বছরের প্রতিযোগিতার দুটি বিভাগে বিশ্বখেতাব লাভ করেন—পুরুষদের এবং মিক্সড ডবলস খেলায়। জাপানী মহিলা এফ্ ইগুচী তিনটি বিভাগের (মহিলাদের সিঙ্গলস, মহিলাদের ডবলস এবং মিক্সড ডবলস) ফাইনালে খেলে কেবল মিক্সড ডবলস খেতাব লাভ করেন।

চীনের জাং কুয়ো তাং পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব লাভ করেন। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে চীন দ্বিতীয় এশিয়া মহাদেশ অন্তর্ভুক্ত দেশ হিসাবে বিশ্ব খেতাব লাভ করলো। আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় চীন প্রথম যোগদান ক'রে খেলায় যে পরিচয় দিয়েছে তাতে ১৯৬১ সালের প্রতিযোগিতায় চীনের সঙ্গে জাপানের সমানে সমানে লড়াই হবে মনে হচ্ছে।

এবছর পুরুষদের দলগত বিভাগের সেমি-ফাইনাল পর্য্যন্ত চীন উঠেছিল। পুরুষদের ব্যক্তিগত বিভাগের সিঙ্গলসের সেমি-ফাইনালে ৮জন খেলোয়াড়ের মধ্যে চারজন ছিল চীনের। তাছাড়া মহিলাদের দলগত বিভাগের সিঙ্গলসের সেমি-ফাইনালে ৮জনের মধ্যে একজন চীনা মহিলা খেলেছিলেন।

ভারতবর্ষের পক্ষে চারজন খেলোয়াড় বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিলেন। পুরুষদের সিঙ্গলসের খেলায় থ্যাকার্সি, ভোরা এবং দিভান প্রতিযোগিতার ১ম রাউণ্ডে বিদায় নেন। কে, নাগারাজ পুরুষদের সিঙ্গলস খেলার ৪র্থরাউণ্ড পর্য্যন্ত উঠে হাঙ্গারীয়ান খেলোয়াড়ের কাছে পরাজিত হ'ন। মিক্সড ডবলস খেলায় দিভান এবং তাঁর জুটী চোং হিলী (কোরিয়া) ৪র্থ রাউণ্ড পর্য্যন্ত খেলেছিলেন।

চীন থেকে ভারত ঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ঃ

বইখানি বুদ্ধ নির্ব্বাণের ২৫০০ জয়ন্তী বর্ষে প্রকাশ করে গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য আমাদের ধন্যবাদ অর্জ্জন করেছেন।

চীনদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ পণ্ডিত ও সাধক হিউয়েন সাঙ (৬০২-৬৬০) নিজে ভারতে ১৫ বৎসর (৬৩০-৬৪৫) কাটিয়ে যত অমূল্য গ্রন্থপাঠ ও সংগ্রহ করেন এবং স্বদেশে ফিরে চীন ভাষায় তাদের অনুবাদ করেন—সেই ত তাঁর অধ্যাত্ম অভিযানের অপূর্ব্ব কাহিনী।

১৮১২ সালে Abel Remusat ফ্রান্সে প্রথম চীন ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং তারপর Stanislas Julien, Edchavannes ও Paul Pelliot প্রমুখ বহু ফরাসী ও তথা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এক শতাব্দী ধরে ভারত ও চীনের সম্বন্ধ নির্ণয় করেছেন। তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে হিউয়েন সাঙ সে যুগের সাক্ষী হিসেবে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছেন। অথচ তাঁর জীবনী ও রোজ-নামচা এতকাল পরে ভালভাবে বোধহয় এই প্রথম বাঙলা ভাষায় রবীন্দ্রবাবু আমাদের উপহার দিলেন।

তিনি বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র। হয় ত সেই জন্যেই মানচিত্রের সাহায্যে এমন সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ এই ভ্রমণ কাহিনী লিখতে সক্ষম হয়েছেন। তাছাড়া এ তো শুধু কাহিনী নয়—এ যে সাধকের তীর্থ যাত্রা। যে কথা গ্রন্থকার সর্ব্বদা মনে রেখে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে লৌকিক ও অলৌকিক সব কিছুই লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ভৌগলিক তথ্য—পশ্চিম চীন থেকে গোবি মরুভুমি ও উত্তুঙ্গ পামীর পার হয়ে পারস্যের সীমান্ত বেয়ে হিন্দুকুশ পৌছান সেই ত যেন মহাকাব্যের এক বিরাট কাণ্ড—পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের চেয়ে কম বিস্ময়কর নয়। কিন্তু সাধকপ্রবর সাঙ মহাপ্রস্থানের পথ শেষ করে আরও ১১ বছর (৬৪৫-৬৬০) একাগ্র সাধনায় চীন ভাষায় এক বিরাট বৌদ্ধ সাহিত্য রেখে গেছেন। তাঁর সেই অমর কীর্তি স্তম্ভ আজ নব্যচীন ও স্বাধীন ভারতের মানুষদের যেন আহ্বান করছে নতুন সম্বোধি ও মৈত্রী সাধনার পথে।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চীন ভ্রমণের সময় মহাত্মা সাঙের মাতৃভূমি সো-ইয়াং পরিদর্শন করবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর স্মৃতিজড়িত কত মঠ মন্দির, মূর্তি ও প্রতিকৃতি দেখে ধন্য হয়েছি। জাপানের বৌদ্ধ মঠও দেখেছি। ভারতের অমূল্য পুঁথির শ্রেষ্ঠতম কয়েকখানি তাঁর পিঠে বেঁধে পরিব্রাজক সাঙ শ্রান্তি ক্লান্তি উপেক্ষা করে এগিয়ে চলেছেন। এসব গল্প শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথকে শোনাই এবং তিনি তাঁর অমর তুলিকায় সাঙকে সার্থকরূপ দান করে গেছেন। গ্রন্থকারকে ঋষিঋণ পরিশোধ করার জন্য সাধুবাদ করি; এবং সেই সঙ্গে অনুরোধ করি অবিলম্বে আর একখানি গ্রন্থে তিনি চীনদেশের অন্য তীর্থ যাত্রীদের কাহিনীগুলিও বাংলায় প্রকাশ করুন। হিউয়েন সাঙের প্রায় দেড় শ' বছর আগে ফা-হিয়েন গুপ্তযুগে ভারতবর্ষে এসে তার একটী মনোজ্ঞ বিবরণ লিখে গেছেন এবং প্রায় পালযুগের প্রারম্ভে ই-চিঙ ভারতের তথা বাঙলার তাম্রলিপ্ত বিহারে অধ্যয়ন করে কি বিপুল পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্র চর্চ্চার কথা লিখে গেছেন—বাঙালীদের সেটী এখন নতুন ভাবে বোঝান দরকার। সেই সঙ্গে এটীও গ্রন্থকার দেখাতে পারেন যে ভগবান তথাগতের কল্যাণব্রতী শিষ্যদল হিমালয় ও গোবি মরুর ভীষণ নিষেধ উপেক্ষা করে প্রায় প্রায় দু হাজার বছর আগে—কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্ম্মরত্ন, কুমারজীব ও গুণবর্ম্মন, বোধিধর্ম্ম ও দীপঙ্কর—চীনে ও তিব্বতে ধর্ম্মপ্রচার করে এসেছেন। তাঁরা ধর্ম্মের সঙ্গে নিয়ে গেছেন ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও আয়ুর্ব্বেদ, ব্যাকরণ ও সাহিত্য—যার সন্ধান এতদিন দিয়ে গেছেন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ। কিন্তু এখন সেই ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করতে হবে এই ভারতের কৃতী সন্তানদের। তাঁদের উদ্বুদ্ধ করবে আমি জানি রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের "চীন থেকে ভারত"।

এই গ্রন্থখানি প্রবীণ সম্পাদক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় "গল্প ভারতীতে" প্রকাশ করে তাঁর পত্রিকার নামটী সার্থক করেছেন এবং আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ অর্জ্জন করেছেন।

বইখানির বহুল প্রচার হোক—স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে—এই আমার প্রার্থনা।

প্রকাশক: কলিকাতা পুস্তকালয় (প্রাইভেট) লিঃ ৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ডাঃ কালিদাস নাগ

মেঘডম্বর ঃ প্রশান্ত চৌধুরী ঃ

আজ থেকে প্রায় আড়াইশো কি তিনশো বছর আগেকার বাংলাদেশ আর বাঙালী সমাজ। যখন সপ্তগ্রামের বন্দরে এসে নোঙর করতো পৃথিবীর নানাদেশের বাণিজ্যতরী বিচিত্র পণ্যসম্ভার নিয়ে, আবার ফিরে যেত বাংলার পণ্যের সঙ্গে পণ্য বিনিময় করে। যখন পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারে বাংলার জলস্থল ভীত শঙ্কিত আর

সেই সঙ্গে সামাজিক অনুশাসনে বাংলার সমাজ সন্ত্রস্ত বিব্রত। সেই সময়ের পটভূমিকায় এই 'মেবডম্বর' উপন্যাসখানি রচিত।

হরিহর মুখুজ্যের একমাত্র কন্যা লীলাবতীর বিবাহরাত্রে প্রকাশ পেল যে, হরিহরের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী হৈমবতী—যাঁকে গ্রামের সামাজিক প্রথা অনুযায়ী মাতব্বরেরা জোর করে সহমৃতা করতে শ্মশানে নিয়ে যান। নিয়ে যান তাঁর বাঁচবার সমস্ত আকুতি অগ্রাহ্য করে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে চিতায় অগ্নি সংযোগ করেও হৈমবতীর দাহলীলা দেখার আনন্দে বঞ্চিত হতে হয় তাঁদের।—সেই হৈমবতীর সেদিন মৃত্যু হয়নি। তিনি জীবিত। কিন্তু বর্তমানে তার নাম হৈমবতী নয়—রওশনবাঈ! সে যুগের চমকপ্রদ ঘটনার সুসন্নিবেশে গোটা বইখানি পাঠকের চিত্ত অধিকার করে থাকে। শেষ না হওয়া পর্যন্ত কৌতূহলেরও শেষ হয় না। কাহিনীর প্রত্যেকটি চরিত্র যেন জীবন্ত। জ্যোতিভূষণ, শিরোমণি, রাধাকান্ত, পর্তুগীজ জলদস্যু পেড্রো, আন্টিবুড়ী, শিবদাস, মহামায়া প্রভৃতি প্রত্যেক চরিত্রই সজীব হয়ে ওঠে যেন মনের মধ্যে পড়তে পড়তে।

ঐতিহাসিক কাহিনী এ নয়। সম্পূর্ণ সামাজিক উপন্যাস। কিন্তু যে সব নরনারী এতে ভিড় করে এসেছে তাদের কেউই এখনকার সমাজের নয়। কিন্তু তাদের অন্তরে যে প্রেম, যে ভালোবাসা ছিল তা শাশ্বত, তা চিরকালের। সেই প্রেমকে আশ্রয় করে প্রশান্তবাবু নিপুণভাবে এ কাহিনীর রূপ দিয়েছেন। এই উপন্যাসটীতে যে মুনশীয়ানার পরিচয় তিনি দিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। ছাপা বাঁধাই ভালো।

[প্রকাশক : বলাকা প্রকাশনী। ২৭ সি, আমহার্স্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯। দাম—৩৲]

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

কবিতা-মঞ্জুষা : রসরাজ শ্রীরাসবিহারী মল্লিক :

কবিতা-পুস্তক। কবির মনে যখন যে ভাবের উদয় হয়, তখন তিনি তাহা কবিতার আকারে প্রকাশ করেন। সমসাময়িক সকল মানুষ ও ঘটনা লইয়া এই সমস্ত কবিতা লিখিত। কবি চমৎকার কাগজে ভালভাবে নিজের মনের কথা ছাপিয়াছেন। তাঁহার কবিতা সম্বন্ধে প্রশংসা সূচক পত্রে গ্রন্থের অধিকাংশ পাতাই ভরা।

[প্রকাশক : আর, মল্লিক। ৬৭, পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ ; দাম—২॥০।]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "নীলকণ্ঠী"—৫৲

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু প্রণীত উপন্যাস "মণিবেগম"—৫·৭৫

ডাঃ শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী প্রণীত "শরৎ-সাহিত্যে পতিতা" (২য় সং)—২·৫০

শ্রীমন্মথ রায় প্রণীত নাটক "কোটিপতি নিরুদ্দেশ—বিদ্যুৎপর্ণা—রাজনটী—রূপকথা" (একত্রে নূতন সং)—৩৲

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত নাটক "সাজাহান" (৩৩শ সং)— ২·৫০ "মেবারপতন" (১৯শ সং)—২৲

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত নাটক "বুদ্ধদেব-চরিত" (৪র্থ সং)—২৲

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত "পরিবার-পরিকল্পনা"—২·৫০

নীহারবিন্দু চৌধুরী প্রণীত "রাগ ও তাল"—২৲

আরতি ঘোষ প্রণীত শিশুপাঠ্য "লব-কুশ"—১৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

জ্যৈষ্ঠ—১৩৬৬

দ্বিতীয় খণ্ড | ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

জগদীশচন্দ্রের আধ্যাত্মিকতা

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

একটি সাধারণ ধারণা আছে যে, বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের বিরোধ শাশ্বত ও সত্তাগত—বৈজ্ঞানিকের সম্পর্ক এই পরিদৃশ্যমান, স্থূল, জড় জগতের সঙ্গে; কিন্তু ধার্মিকের জগৎ ইন্দ্রিয়াতীত অজ্ঞাত জগৎ, যার সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের কোনোরূপ আদান-প্রদানই নেই। কিন্তু যাঁরা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তাঁরা "বিজ্ঞানী" অর্থাৎ "বিজ্ঞান" বা বিশেষ-জ্ঞানবিশিষ্ট, তাঁরা এই কৃত্রিম সীমারেখা স্বীকার করেন না। তাঁদেরই একজন ছিলেন বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, যাঁর শুভ জন্মশতবার্ষিকী বর্তমানে দেশবিদেশে সর্বত্রই শ্রদ্ধায় সঙ্গে পালিত হচ্ছে।

আমাদের শাস্ত্রানুসারে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" পরব্রহ্মই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অভিব্যক্ত হয়ে আছেন, জড়জগতেও তাঁরই বিকাশ—অজড়-প্রাণি-জগতেও তাঁরই বিকাশ। আচার্য জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও সেই একই মহাশক্তির মহাপ্রকাশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল পূর্ণতর মহিমায়। বহুদিন পূর্বে বিরচিত (১৮৯৫) একটী সুন্দর প্রবন্ধে আচার্যদেব বলছেন:—

"শক্তিও অবিনশ্বর। এক মহাশক্তি জগৎ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। প্রতি কণা ইহা দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট। এ মুহূর্তে যাহা দেখিতেছি, পরমুহূর্তে ঠিক তাহা আর দেখিব না। বেগবান্ নদীস্রোত যেমন উপলখণ্ডকে বারবার ভাঙিয়া অনবরত তাহাকে নূতন আকার প্রদান করে, এই মহাশক্তিস্রোতও সেইরূপ দৃশ্যজগৎকে মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঙ্গিতেছে ও গড়িতেছে।"

এই মহাশক্তি কিন্তু কেবল জড়শক্তি নয়, জীব-শক্তিও সমভাবে। জীবে এই শক্তি রূপধারণ করেছেন অজর, অমর প্রাণশক্তি রূপে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে, অথচ দার্শনিকের পরিপূর্ণ উপলব্ধি-লব্ধ বিশ্বাসে, আচার্যদেব পুনরায় আমাদের সেই বেদোপনিষদের শাশ্বত সত্যই প্রচার করে' বলেছেন—

"সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রতি জীবনে দুইটী অংশ আছে। একটি অজর, অমর, তাহাকে বেষ্টন করিয়া নশ্বর দেহ। এই দেহরূপ আবরণ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে।"

এই জীবন অনন্ত, অসীম, তার ধ্বংস নেই, মৃত্যু নেই, শেষ নেই, আরম্ভ নেই! বাহিরের রূপের আরম্ভ আছে, পরিবর্তন আছে, জরা আছে, মরণ আছে। কিন্তু সর্বব্যাপী মহাশক্তির বিকাশ আন্তর সত্তার, প্রকৃত স্বরূপের, অন্তর্নিহিত আত্মার আরম্ভ নেই, শেষ নেই, পরিবর্তন নেই, জন্ম নেই, বৃদ্ধি নেই, জরা নেই, মরণ নেই। অনুপম ভাবে আচার্যদেব বলছেন—

"জগতের শেষও নেই, আরম্ভও নেই। কোনো বস্তুরই বিনাশ নেই।"

"আজ যে পুষ্প কলিকাটী অকারণে বৃন্তচ্যুত করিতেছি, ইহার অণুতে কোটি বৎসর পূর্বের জীবনোচ্ছ্বাস নিহিত রহিয়াছে। কেবল তাহাই নহে। প্রতি জীবের সম্মুখেও বংশপরম্পরাগত অনন্তজীবন প্রসারিত। সুতরাং বর্তমান কালের জীব অনন্তের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। তাহার পশ্চাতে যুগযুগান্তরব্যাপী ইতিহাস ও সম্মুখে অনন্ত ভবিষ্যৎ।"

অনন্তের বুকে লালিত এই জীবের চরমোৎকর্ষ মানব। যে মহাশক্তি জড়ে প্রকৃতি রূপে, জীবে প্রাণ রূপে প্রকাশ্মান, তিনিই মানবে প্রজ্ঞারূপে, আনন্দ রূপে, আত্মা রূপে পূর্ণ-বিকশিত।

"অসংখ্য বৎসর ব্যাপী, বিভিন্ন শক্তি গঠিত, অনন্ত সংগ্রামে জয়ী, জীবনের চরমোৎকর্ষ মানব।"

মানব ক্ষুদ্র হয়েও বৃহৎ, জ্ঞানবলে অসীম-লাভের প্রয়াসী।

"আজ সেই কীটাণুর বংশধর দুর্বল জীব স্বীয় অপূর্ণতা ভুলিয়া অসীম বলধারণ করিতে চাহে। অধিক বিস্ময়কর কাহাকে বলিব? বিশ্বের অসীমতা, কিম্বা এই ক্ষুদ্র বিন্দুতে অসীম ধারণা করিবার প্রয়াস—কোনটা অধিক বিস্ময়কর? পূর্বে বলিয়াছি এ জগতের আরম্ভ নাই, শেষও নাই। এখন দেখিতেছি, এ জগতে ক্ষুদ্রও নেই, বৃহৎও নেই।"

সত্যই, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ দেহের উৎপত্তির কারণ বা আকারে হয়না, হয় আত্মার শক্তিতে, আত্মার উৎকর্ষে। সেইজন্যই, সাধারণ মানবেই সেই মহাশক্তির শেষ নয়, শেষ প্রকৃত মানবে, মহামানবে, ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন জীবন্মুক্তে। পরম বিশ্বাসভরে আচার্যদেব বলছেন :—

"জীবনের চরমোৎকর্ষ মানব! এ' কথা সর্বসময়ের জন্য ঠিক নয়। যে শক্তি আদিম জীববিন্দুকে মনুষ্যে উন্নত করিয়াছে, যাহার উচ্ছ্বাসে নিরাকার মহাশূন্য বহুরূপী জগৎ ও তদ্বৎ বিস্ময়কর জীবন উৎপন্ন হইয়াছে, আজিও সেই মহাশক্তি সমভাবে প্রবাহিত হইতেছে। ঊর্দ্ধাভিমুখেই সৃষ্টির গতি; আর সম্মুখে অন্তহীন কাল এবং অনন্ত উন্নতি প্রসারিত।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র মানবজীবনের এই অনন্ত উন্নতি সম্ভাবনাতেই ছিলেন আজন্ম বিশ্বাসী। এরূপ আশাবাদই হল ধর্মের প্রধান লক্ষণ। ঈশ্বরের বরপুত্র জগদীশচন্দ্রও জড় থেকে জীবে, জীব থেকে মানবে, মানব থেকে মহামানবে সেই একই পরমেশ্বরের, সেই একই মহাশক্তি, মহাপ্রাণ, মহাজ্ঞান, মহাসৌন্দর্য ও মহানন্দের ক্রমবিকাশ দর্শন করে ধন্য হয়েছিলেন। সমগ্র জগৎই ছিল তাঁর কাছে শ্রীভগবানের মূর্ত প্রতিচ্ছবি, সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা তাঁরই স্বরূপ প্রকাশের উপায়। সেইজন্যই, ধর্মপ্রাণ আচার্য জগদীশ তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিশ্রুত গবেষণাগারকে "মন্দির" আখ্যা দিয়ে "দেবচরণে নিবেদন" করে বলেছিলেন—

"বাইশ বৎসর পূর্বে যে স্মরণীয় ঘটনা হইয়াছিল,

তাহাতে সেদিন দেবতার করুণা জীবনে বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলাম। সেদিন যে মানস করিয়াছিলাম, তাহা এতদিন পরে দেবচরণে নিবেদন করিতেছি। আজ যাহা প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহা মন্দির,কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে।"

কিন্তু আচার্যদেবের পূত জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি তাঁর এই ধর্মকে, এই গভীর ঈশ্বর-বিশ্বাসকে প্রাত্যহিক জীবনের প্রতি পদে পদে, প্রতি পলে পলে মূর্ত করে তুলেছিলেন এক অপরূপ মহিমায়। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা তাঁর সঙ্গে তাঁর কলিকাতার আপার সার্কুলার রোডস্থ এবং বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের পার্শ্ববর্তী বাসভবনে বহুদিন বাস করেছি। আমাদের পিতামহী স্বর্ণপ্রভা ছিলেন জগদীশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী এবং তাঁর বিবাহ হয় পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ দেশ-সেবক আনন্দ-মোহন বসুর সঙ্গে। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বর্তমান ডিরেক্টর ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বসুর মাতা সুবর্ণপ্রভা ছিলেন আচার্যদেবের দ্বিতীয়া ভগ্নী এবং তাঁর সঙ্গে বিবাহ হয় আনন্দমোহনের ভ্রাতা মোহিনীমোহনের। আনন্দমোহনের ঋষিতুল্য চরিত্র, গভীর ধর্মানুরাগ ও স্থির ঈশ্বরবিশ্বাস জগদীশচন্দ্রকেও সুগভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। আনন্দমোহনকে দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। কিন্তু তাঁর প্রাণসহচর জগদীশচন্দ্রের মধ্যে প্রাত্যহিক জীবনের অতি নিকট সংস্পর্শে এসে, যে আধ্যাত্মিক দ্যুতি আমরা দেখে ধন্য হয়েছি, তা' সত্যই অপূর্ব। শিশুকালে, তিনি কত মধুর গল্পচ্ছলে আমাদের ধর্ম ও নীতির মূলতত্ত্বগুলি বুঝিয়ে বলতেন। বড় হয়েও সর্বদা দেখেছি—কি সুন্দর-ভাবে তাঁর প্রতি কথায়, প্রতি সাধারণ কাজেও তাঁর এই আধ্যাত্মিক মনোভাব সু-পরিস্ফুট হয়ে উঠত। প্রথম দর্শন পড়ে আমরা যখন বিশ্বপিতার অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব সম্বন্ধে তর্কে রত হতাম, তখন তাঁর অটল ঈশ্বর-বিশ্বাসের তুঙ্গ শিলাতটে ব্যাহত হয়ে সেই তর্কস্রোত মুহূর্তেই থেমে যেত। একটী কথা তিনি প্রায়ই বলতেন এবং সত্যই নিজের জীবনের মূলবস্তুরূপেও গ্রহণ করেছিলেন—"বিশ্বাস রাখ, সন্দেহ করো না, বিশ্বাসের প্রমাণ আপনিই পাবে।" ঋষিশ্রেষ্ঠ জগদীশচন্দ্রের এই বিশ্বাসের মন্ত্র, এই আশার বাণী, এই আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা আমরা জীবন-প্রারম্ভেই লাভ করে পরমধন্য হয়েছিলাম এবং তা'ই আজও হয়ে রয়েছে আমাদের অমূল্য জীবন-পাথেয়।

আচার্যদেবের সেই অনুপম বিশ্বাস-মন্ত্রই যেন আজ বর্তমান সার্বজনীন অবিশ্বাসের, অশান্তির যুগকেও উদ্বুদ্ধ করে :—

"কিন্তু আরও অনেক ঘটনা আছে, যাহা ইন্দ্রিয়েরও অগোচর। তাহা কেবল বিশ্বাস বলেই লাভ করা যায়। বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধেও পরীক্ষা আছে, তাহা দুই একটী ঘটনার দ্বারা হয়না, তাহার প্রকৃত পরীক্ষা করিতে সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার আবশ্যক। সেই সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্যই মন্দির উত্থিত হইয়া থাকে।"

কাগজের ফুল

সুনীল বসু

কাগজের ফুল, ক্ষণস্থায়ী আয়ুর বিরোধী
কী সুন্দর স্থির হয়ে আছো তুমি কাঁচের শোকেসে !
জল বিনা সজীবতা অঙ্গে ফোটে দৃষ্টিতে অক্লেশে,
হাস্যকর ভাব শুনি মৃত্তিকার ফুল হতে যদি।
আমাদের নাগরিক পেশাদারী মানুষী জীবন
তোমারি মতন জানি, প্রকৃতির ধারি না'ক ধার।
মুখের মুখোস এঁটে ভাবি কত শৌখিন এখন—
কল্পনায় এঁকে ফেলি নদী মাঠ কুহেলি পাহাড়।

মৃত্তিকার আলিঙ্গনে বীতস্পৃহা অশেষ তোমার
সুস্থ থাকো চক্ষু মেলে নক্সা কাটা
ফ্লাওয়ার ভেসে।
আমরাও পাড়াগাঁকে চক্ষে দেখি অশেষ ক্ষমার,
দিব্যি থাকি ভাড়া দিয়ে, বাসা কিংবা
হোটেলে, কি মেসে।
এতো নিপুন সাদৃশ্য, মধ্যবিত্ত সস্তা এ-জীবনে
তবু আয়ু দীর্ঘস্থায়ী বিরাজিত ক্ষুদ্র কক্ষ-কোণে॥

মায়াবিনী
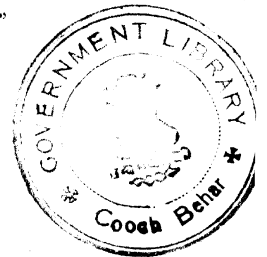
সুভাষ সমাজদার

শহরের একেবারে দক্ষিণদিকে শ্মশানের রাস্তা। লোকে ঐ পথটাকে বলে মহানির্ব্বাণ রোড।

একদিন রাত্রে মহানির্ব্বাণ রোডে একজনের পদশব্দ জেগে উঠল। রাস্তার দু'পাশে শালগাছের ঘন বিন্যাস চারিদিকে কালো থকথকে অন্ধকার ছড়িয়েছে! দূরে তমসাস্তীর্ণ আত্রাই নদীর ভোঁতা ছুরির মত রেখাটার দিকে তাকিয়ে একটা বিস্বাদ বিবর্ণ অনুভূতিতে ছেয়ে গেল তার মন। দেশ ভাগ হয়ে এখানে আসার পর থেকেই মাথার ওপরে উদ্যত খড়্গের মত সর্ব্বনাশের আশঙ্কা নিয়ে তার দিন কাটছে। এইভাবে লোক ঠকিয়ে ঠকিয়ে আর কতদিন সংসার চলবে? যে কোন মুহূর্ত্তে চরম বিপদও তো হয়ে যেতে পারে! তার বুকে ভয়ের ধুকপুকু! তবুও—

তবুও অদৃশ্য একটা দৃঢ়তার প্রলেপ লাগল তার মেরুদণ্ডের হাড়ে হাড়ে। সে মাথা উঁচু করে সামনের দিকে পা বাড়ালো।

শন শন করা একটা দমকা হাওয়ার আর্তনাদ আছড়ে পড়ল শালগাছের ডালে ডালে। তীব্র একটা সন্দেহের বিষ যক্ষ্মার জীবাণুর মত তাকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলতে লাগল। মাধব এতদিন তার কাছে রয়েছে কেন? চারিদিকে ঝিঁঝিঁর নূপুর বাজছে। ঘন কালো অন্ধকারের ভেতরে নিশিরাতের গা ছমছম করা নিথর স্তব্ধতার বুকে মৃদু পদশব্দ তুলে সেই ছায়াশরীর চলতে লাগল। তাকে যে যেতেই হবে সেখানে—

যেখানে শ্মশানের উত্তরপূব কোণে বাঁশঝোপের নীচে ছোট কুঁড়েঘরের ভেতরে ভৈরবী বসে রয়েছে। তার নিকষকালো পাথরে গড়া দেহের রেখায় রেখায় সমুজ্জ্বল যৌবনশ্রী। শিথিল দুটো রক্ত চোখের তারায় তারায় কেমন একটা অসুস্থ জ্বলজ্বলে দৃষ্টি। তার জটধরা রুক্ষ চুলের গোছা, আর দুচোখের ধারালো দৃষ্টির বিচিত্র সম্মোহনে সকলেরই বিবেক বুদ্ধি কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতায় ছেয়ে যায়। হয়তো—

হয়তো মাধবেরও তাই হয়েছে। তাই ভৈরবীর সঙ্গে একদিন আলাপ করতে এসে, সেই থেকে এখানেই রয়ে গেছে কেন? কেন যাই যাই করেও মাধব যেতে পারে নি? শহরের লোক বলে, ভৈরবী মাধবকে বশীকরণ করে তার নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। অমন ভরা বয়সের মেয়েমানুষ, শ্মশানে একা একা থাকে, তার পলায় পক্ষে যে কোন কাজ সম্ভব! শুধু তাই নয়। কুঁড়েঘরের এককোণে মাটির তৈরী মা ব্রহ্মময়ীর ভয়াল মূর্ত্তি। তাঁর হাঁস-মুরগী আর কবুতরের ছিন্ন মুণ্ডু ঝুলছে। ভৈরবীর ধ্যানের আসনের চারিদিকে ইতস্তত ছড়ানো মড়ার মাথার খুলি আর এককোণে মাটিতে পোঁতা সিঁদুর-মাথা ত্রিশূল—সব মিলিয়ে শহরের লোকের মনে একটা ভয়ের শিহরণ ছড়িয়ে দিয়েছে তান্ত্রিক এই সন্ন্যাসিনী।

গভীর রাতে আকাশে কালো মেঘ জমল থরে থরে। ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়তে সুরু হলো। আশ্রমের সেই ঘরে ভৈরবীর ধ্যানস্থ মূর্ত্তির সম্মুখে মুগ্ধ ভক্তের মত বসে রয়েছে মাধব।

—মাধব!

চোখ খুলল ব্রহ্মচারিণী। তার বিশাল দুটো অপলক চোখের তারায় তারায় বিচিত্র একটা হাসির আলো ঝলসে উঠল।

—আজ বলে দেবে—পুরানো কংগ্রেস ভবনের পিছনে বুড়া কালীতলার ঠিক কোথায় গুপ্তধন রয়েছে তা আজ বলবে?

তীব্র আগ্রহে তার কাছে ঘন হয়ে বসে মাধব।

আকাশের কোন অলক্ষ্য প্রান্ত থেকে গুম গুম করে ডেকে উঠল মেঘ। ঝড়ো বাতাসে ক্রুদ্ধ বাঘের গর্জন। বাইরের ঐ অশান্ত, বিক্ষুব্ধ রাত্রিটার দিকে তাকিয়ে হেসে মধু ঝরা গলায় ভৈরবী বলল—মাধব তুই সাধু সন্ন্যাসী বিশ্বাস করিস ?

—হ্যাঁ করি। না করলে, তোমার কাছে এতদিন কিসের আশায় রয়েছি। আর অবিশ্বাস করলে তুমি তা বুঝতেই পারতে।

—তোকে তো কতদিন আমি বলেছি, ধর্মের টানে আমি এই পথে আসিনি। আমি সন্ন্যাসিনী নই মাধব!

ভৈরবীর কথাগুলো কাতর কান্নার মত শোনালো।

—তুমি তাহলে বারো বছর ধরে শ্মশানে শ্মশানে তোমার স্বামীকে খুঁজছো! বেশ তা বুঝতে পারছো, আর তুমি তাকে পাবে না।

পাবে না! মাধবের কথাটা যেন তীব্র তীক্ষ্ণ তীরের মত ভৈরবীর বুকে বিঁধে গেল। ঘন বর্ষার মেঘের মত কি যেন টলমল করে উঠল তার দুচোখ। বাইরে অবিরল ধারায় বৃষ্টি ঝরছে। সম্মুখের বটগাছটায় আছড়ে ঝড়ো হাওয়ার ঝলক। তার সম্মুখে যেন একটা বিয়োগান্ত কাহিনীর পাণ্ডুলিপি পড়ছিল—একটা দমকা বাতাসে তার অনেকগুলো পাতা সামনের দিকে ফরফর করে উড়ে গেল। চলে গেল একেবারে প্রথম অধ্যায়ে—যখন তার জীবনে ছিল নিরুদ্বেগ গৃহীজীবন। ছিল স্বামী নামে একটি প্রেমিক পুরুষ, যার বুকে আত্মসমর্পণে আনন্দ ঘনাত, আর তার আদরে ভালবাসায় অনেকগুলো সোনা মোড়া দিন নীল আকাশে শাদা মেঘের মতই উড়ে গিয়েছিল—

হ্যাঁ। একদিন সেও বিয়ের বেশে সেজেছিল। শুভদৃষ্টির সময় সলজ্জ চোখে যার হাসিমাখা চোখদুটো দেখেছিল, সে তাকে ভালও বেসেছিল খুব। কত নিরালা রাতে গাঢ় গলায় সে বলেছিল—তোমাকে একদণ্ড না দেখলে থাকতে পারি না।

হ্যাঁ। সেই মানুষই আজ তাকে ছেড়ে বারো বছর ধরে কোন শ্মশানে, কোন তীর্থে যে ঘুরছে! কে জানে বেঁচে আছে কি না!

পূনর্ভবার তীরে গঙ্গারামপুরের তাদের নিস্তব্ধ বাড়ীতে অনাগত একটি অতিথির আগমন সম্ভাবনায় আনন্দের সাড়া পড়ল। তাদের প্রথম সন্তান এল। কিংশুককে নিবিড় আবেগে বুকে চেপে ধরে গৌরদাস কি আদরই না করতো! কিংশুককে ঘিরে তার চোখ দুটো সোনার স্বপ্নে অবাধ হয়ে উঠতো। বলতো—দেখ—দেখ বেলা, কিশু আমার দিকে চেয়ে চেয়ে কেমন হাসছে। কী দুষ্টই হয়েছে! রান্না ফেলে তাকে কিশুর হাসি দেখতে ছুটে আসতে হতো।

—বুঝলে বেলা, ওকে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়াবো। এখন কলকব্জার যুগ—আরও হাজারো কথার আবেগে গৌরদাসের মুখখানা উত্তেজনায় জলজল করতো। হয়তো কিশুকে খাওয়াতে একটু দেরী হয়েছে। সে কাঁদছে। অমনি গৌরদাসের কপালে বিরক্তির মেঘ ঘনিয়ে আসতো। বলতো—ঘরের কাজই তোমার কাছে বড় হলো? তুমি ছেলেটাকে মোটেই যত্ন করো না! অনুযোগে ভারী হয়ে উঠতো তার গলার স্বপ্ন।

কিশু, কিশু, আর কিশু! কিশু যেন তার সমস্ত চেতনাকে সুগন্ধী ফুলের মদির সৌরভের মত জড়িয়ে ছিল। একেক দিন সে বিরক্ত হয়ে বলতো—ছেলে যেন আর কারো হয় না। তুমি দিনরাত ওকে নিয়ে থাকো কেন? একটু বাইরে ঘুরে এলেও তো পারো!

—ওর ঠিকুজী তৈরী করেছেন যে জ্যোতিষী, জানো, তিনি কি বলেছেন?

—কি?

—রাজসম্মানের যোগ রয়েছে। ওরই যশসৌরভ দিকদিগন্তে ছড়িয়ে পড়বে।

কোন কথা বলতো না সে। কিন্তু তার মনের নেপথ্যে অশুভ একটা ইঙ্গিত বিষধর সাপের উদ্যত ফণার মত ছোবল দিয়ে উঠতো হয়তো কিশু বাঁচবে না।

তিন দিনের জ্বরে কিশু মারা গেল। এতটুকু কাঁদলে না গৌরদাস। কিন্তু তার নিষ্পলক শূন্যদৃষ্টির দিকে তাকিয়ে সে কেমন ভয় পেয়ে গেল। রাত্রে ভাল করে ঘুমায় না গৌরদাস। নিশি রাতে উঠোনে একটা প্রেতের মত পায়চারী করে বেড়ায়। একদিন গৌরদাস বলল, শোন, তুমি দীক্ষা নেবে?

—দীক্ষা! সে নিয়ে কি হবে?

—আমার সাধনায় সহায়তা করবে। তান্ত্রিক মতে দীক্ষা নেব বুঝলে। স্ত্রীযুক্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভ সহজ হয়—গৌরদাসের উত্তেজিত চোখদুটো সঙ্কল্পে কঠিন হয়ে ওঠে। তবুও সে তার হাতদুটো ধরে ব্যাকুল করুণ গলায় বলেছিল—শোন, তুমি এ পথ ছেড়ে দাও। ছেলে মরে গিয়েছে তাতে কি? কোলে আবার ছেলে আসবে।

পাথুরে একটা মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইল গৌরদাস।

সেদিনও রাত্রে এমনি গভীর শোকের মত আকাশ ভেঙে নেমেছিল শ্রাবণের বৃষ্টি। একটানা বৃষ্টির ঝরঝর শব্দে, ঝড়ো হাওয়ার ক্রুদ্ধ গর্জনে সমস্ত পৃথিবী যেন লুপ্ত হয়ে যাবে। শেষরাতে তার মনে হলো—তার পায়ের ওপর যেন ফোটা ফোটা জল ঝরছে! তাহলে ঘরের খড়ের চাল ফুট হয়ে জল পড়ছে! চমকে ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠল সে। ঘরের চারিদিকে কালী-ঢালা নীরন্ধ্র অন্ধকারে সে ঘুমমাখা চোখদুটোর দৃষ্টিকে জ্বালিয়ে নিয়ে দেখল গৌরদাসের বিছানাটা খালি। শুধু সাদা ধবধবে বিছানাটা অন্ধকারে যেন দাঁত মেলে হাসছে! ধক করে উঠল তার বুকের ভেতরটা। কানের কাছে হাহাকার করে উঠল গৌরদাসের কথাটা—দীক্ষা নেবে? তান্ত্রিকমতে দীক্ষা নেব বুঝলে··· তারপরে—

তারপরে একে একে বারোটা বছর কেটেছে। কত জেলার কত শ্মশানে তীব্র আশায় বুক বেঁধে সে ঘুরছে এই ভৈরবীর বেশে। দুস্থ, দারিদ্র্যজীর্ণ, অদৃষ্টবাদী হাজারো মেয়েপুরুষের শ্রদ্ধার উপহার—শত শত টাকা তার দুহাতের অঞ্জলির ভেতরে বিধাতার স্নিগ্ধ আশীর্বাদের মত ঝরে পড়েছে। কিন্তু—

কিন্তু সন্ন্যাস যে তার মনের কোথাও বাসা বাঁধে নি! বরং এই জীবনময় সংসারে সুখ দুঃখের বোঝা কাঁধে নিয়ে হেসে খেলে বেঁচে থাকার সাধ আজও তার রক্তের ভেতরে কেঁদে কেঁদে ওঠে। এই নির্জন শ্মশানে যখন রাত্রে নামে, তখন নিস্তব্ধ একক ঘরে বিনিদ্র শয্যায় শুয়ে সহস্র অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় তার বুকের ভেতরটা বিদীর্ণ হয়ে যায়। কবে—কবে তার দেখা পাবে! কিন্তু আবার কোলে আসবে; আবার নতুন করে সংসার পাতবে!

—কি এত ভাবছো!

একটু হেসে বলল মাধব।

চমকে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল ভৈরবী। যেন দুঃস্বপ্নের ঘোরে প্রলাপের মত বিড় বিড় করে বলল—তাকে পাবো না—তুই বলেছিস—তাকে পাবো না?

—হ্যাঁ আমার তাই মনে হয়।

—বারো বছর হয়ে গেল—চোখের কোণা দিয়ে তাকিয়ে কুটিল হেসে মাধব বলল।

বাইরে অবিরল ধারায় বৃষ্টি ঝরছে! দূরে তালগাছের উদ্ধত মাথাগুলোর ওপরে উদ্যত খড়্গের আভাস দিয়ে তীক্ষ্ণ সাদা আলোর বিদ্যুত ছুঁয়ে গেল খানিকটা। কড়—কড়—কড়াৎ করে দূরে কোথায় বাজ পড়ল।

—এ কী! তুমি কাঁদছো?

কোমল গলায় মাধব বলল। ঘরের ছায়াকাঁপা প্রদীপের আলোয় একটা নিষ্প্রাণ শিলীভূত মূর্ত্তির মত বসে রয়েছে ভৈরবী। তার গাল বেয়ে অশ্রুর শীর্ণ ধারা ঝরছে। দুটো কান্না-ভরা চোখের অপলক দৃষ্টি বাইরের দুর্যোগভরা কালো রাত্রির দিকে স্থির নিবদ্ধ।

মাধব তার পেশীবহুল হাতটা ভৈরবীর পিঠে রেখে নরম গলায় বলল—তুমি তো আর কাউকে বিয়ে করতে পারো। এখনও তোমার বয়স রয়েছে—তার কথার সুরে যেন অদৃশ্য সেতারের মধুর রাগিণী বাজতে লাগল।

বাইরে একটানা হু হু হাওয়ার আর্ত্তনাদ, সেই বৃষ্টি-ঝরা রাত্রি আর শ্মশানের সেই নিরালা ঘরে ভৈরবীর স্বাস্থ্য পুষ্ট কালো ঝকঝকে তনুদেহ, সব মিলিয়ে বিচিত্র একটা অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল মাধবের চেতনা। ব্রহ্মচারিণীর পিঠের ওপরে হাতটাকে পরম আবেশে বুলিয়ে দিতে লাগল।

—মাধব এ কী করছিস?

ভৈরবীর মনে হ'ল একটা বিষাক্ত মাকড়সা যেন তার পিঠের ওপরে ঘুর ঘুর করে ঘুরছে। কিন্তু—

কিন্তু মাধবের চোখে তখন আদিম রক্ত তরঙ্গের ভাষা উগ্র ক্ষুধায় জলে উঠেছে। তার ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে ঝড়ের তাণ্ডব বয়ে চলেচে—

—মাধব!

মাধবের সবল হাতের উন্মত্ত নিষ্পেষণে ভৈরবীর গলার স্বর অবরুদ্ধ হয়ে এল। আঃ—

আর পরমুহূর্তেই ঘনঘোর গর্জিত হাওয়ার উচ্ছ্বাসে-ভরা সেই বর্ষামুখর রাত্রিটা যেন বিপুল একটা অনুভবের সুখে আবিষ্ট হয়ে গেল।

বৃষ্টিটা একটু ধরে এল। রেখা জাগল। শেষরাতের ভোরের আকাশে রেখা জাগল। ভৈরবী বলল—আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবি না তো তুই ?

কেমন করুণ শোনালো তার গলা। বলল—দেখ—একা একা অনেকদিন ধরে তো থাকলাম, এক মুহূর্তও ভাল লাগে না। সব সময় মনে হয় কোন বিপদ বুঝি আনাচে কানাচে উঁকি ঝুঁকি মারছে—

—হ্যাঁ। একা জীবন কাটানো মেয়েদের পক্ষে সম্ভব নয়।

—আমার কাছে যা রয়েছে, তাতে তিন চারটা মাস স্বচ্ছন্দে দুজনের চলে যাবে। চল কালই আমরা অন্য কোথাও চলে যাই—

—গিয়ে কি হবে, তুমি তোমার ঐ ভৈরবীর পেশা, এই বেশভূষা ছেড়ে দেবে ?

—ছিলই না কোনদিন তো ছাড়বো কি ?

একটু থেমে বলল—আমরা অন্য কোথাও গিয়ে বাসা ভাড়া করে থাকবো। তোকে একটা দোকান টোকান কিছু করে দেব। তাতে দুজনের বেশ চলে যাবে—কি বলিস ?

স্বপ্ন নেমে আসে ভৈরবীর দুচোখে।—ধক—ধক—কি—বাইরে ঝাঁপের দরজায় কার ব্যাকুল দ্রুত হাতের করাঘাত বেজে উঠল। মাধবের মুখে ভয়ের ছায়া পড়ল। ভৈরবী বলল—এই শেষ রাতে আবার কোন ভক্ত এল।

—হয়তো ভক্ত নয়—আমার মনে হচ্ছে, সে এসেছে, অস্ফুট স্বরে বিড় বিড় করে বলল মাধব।

—ধক-ধক-ধক—

কি আবার শব্দ বেড়ে উঠল। দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালো ভৈরবী। কিন্তু বিস্ময়ের চমকে তার চোখ দুটো ছটফট করে উঠল। এই শেষ রাতে কোন বাড়ীর বৌ ঘর ছেড়ে কিসের আশায় শ্মশানে এসেছে।

—তোমার ঘরে আমার স্বামী আছে। তাকে ফিরিয়ে দাও দয়া করে—তোমার পায়ে পড়ি—তার জলভরা দুটো চোখ ম্লান নক্ষত্রের মত জ্বলে উঠল!

—না, আমার ঘরে কেউ নেই—তুমি মিথ্যা শুনেছো, সব ভুল।

—না, মিথ্যা নয়, তুমি তাকে বশীকরণ করে তোমার কাছে রেখেছো। ভাল করে বলছি, ফিরিয়ে দাও, তা না হলে কিন্তু পুলিসকে বলবো—বৌটীর চোখে আগুন ঝিকিয়ে উঠল। চোখের কান্নাটান্না কোথায় উড়ে গেছে।

—না, পুলিশকে ডেকো না, আর্তগলায় ঘরের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল মাধব—ও আমার যে ক্ষতি করেছে তার শাস্তি ওকে আমরা দুইজনেই দিতে পারবো। জানো লেখা—কী ভয়ঙ্কর মেয়েমানুষ ও—বুড়াকালীতলায় গুপ্তধন আছে কি না জানতে এসে, কী বিপদেই না পড়েছি, একটা তীরবিদ্ধ জন্তুর মত আর্তনাদ করতে করতে বেরিয়ে এল মাধব। লেখার হাতদুটো ধরে প্রবল ঝাঁকুনী দিয়ে বলল—আমাকে নিয়ে চল। বাঁচাও ঐ ডাইনীর হাত থেকে—

ভৈরবী যেন পাথর হয়ে গেছে। নিষ্পলক, শূন্য চোখে মাধবের দিকে তাকিয়ে রইল। আর লেখার ঠোঁটের কোণায় কোণায় হিংস্র একটা হাসির রেখা ছোরার ধারের মত বয়ে গেল। বলল,'শোন ওকে যে টাকা পয়সা দিয়েছে, সব ফিরিয়ে নাও—

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছো।

বলল মাধব। ছুটে ঘরের ভেতরে যেয়ে ভৈরবীর প্রাণের ধুকধুকির মত বেতের বারকোষটা ঘরের চালের বাতা থেকে টেনে নামালো। ক্ষিপ্র হাতে জীর্ণ কাঁথা আর গেরুয়া কাপড়ের স্তূপ সরাতেই ঘরের ম্লান অন্ধকারে ঝকমক করে উঠল কাঁচা পয়সা আর নোট।

—তুমি ওগুলো দাও নি। কেন তুমি নিচ্ছ? চীৎকার করে ঝাঁকিয়ে পড়ল ভৈরবী।

—চুপ কর—তীব্র আক্রোশে জ্বলে উঠল মাধব। বল—যদি বাঁচতে চাও,তাহলে চুপ করে থাকো। তুমি আমার যে সর্বনাশ করেছো তাতে তোমার ফাঁসি হওয়া উচিত—

—ঐ হার আর বালাদুটোও তো আমার—বাক্স থেকে তুমি চুরি করে নিয়ে এসেছিলে—বেতের ঝুড়ির ভেতরে উঁকি দিয়ে বলল লেখা।

—না, বালাদুটো আর হার তোমাদের নয়। ওটা

আমার বিয়ের সময়কার। আমার শ্বশুরমশায় দিয়েছিলেন—

কান্নাভরা গলায় চীৎকার করে উঠল ভৈরবী। দুহাত দিয়ে সজোরে আঁকড়ে ধরল বাক্সটাকে। ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল—তোমাদের পায়ে পড়ি—গয়নাদুটো আমার শেষ সম্বল। ওগুলো নিও না। তুমি যতদিন ছিলে আমাকে একটা আধলা ছোঁয়াও নি।

—তুমি বললেই শুনবো, খিঁচিয়ে উঠল লেখা—ধান বিক্রী করা টাকাও নিয়ে এসে তোমার পায়ে ঢেলে দেয় নি? তুমি জানো, আমার ছোট ছোট ছেলেদুটো দুদিন মুড়ি খেয়ে রয়েছে! তিনদিন থেকে হাঁড়ি চড়ছে না—

—তুমি বিশ্বাস কর, তোমার স্বামী আমাকে একটা পয়সা দেয় নি। আমি মেয়েমানুষ। একা থাকি। এমন করে আমাকে সর্ব্বস্বান্ত করো না—লেখার পায়ে লুটিয়ে অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল ভৈরবী। টাকা গয়নায় পকেট বোঝাই করে মাধব বলল, যা যা নিয়ে এসেছিলাম, ওর মোহে পড়ে, সবই কেড়ে নিয়ে নিয়েছি—চল—চল শীগগীর—ওরা মায়াবিনী—ওরা সব পারে—

এক ঝটকায় ভৈরবীকে চৌকাঠ থেকে সরিয়ে তারা দুইজনে বাইরের পাতলা অন্ধকারে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর—

আর খাদিমপুরের শ্মশানের নিথর শুব্ধতাকে শিউরে দিয়ে দুর্ভাগিনী এক নারীর একটানা করুণ কান্নার শব্দ ভোরের শন শন করা দমকা হাওয়ায় বহুদূরে মিলিয়ে গেল। তার মনে হল, চারবছর আগে পতিরামের শ্মশানেও মাধবের মতই আরেকজন, যাকে অবলম্বন করে সংসারে সুখ দুঃখে জড়িয়ে আর পাঁচটা মেয়ের মত বাঁচতে চেয়েছিল—সেও তাকে নির্মমভাবে ঠকিয়ে চলে গিয়েছিল; কিন্তু মাধবের মত চক্রান্ত করে সর্বস্ব লুটে পুটে নিয়ে এমন সর্বস্বান্ত তাকে আর কেউ করে নি!

বিগতদিনের দুঃস্মৃতির কথা মনে হতেই অসহ্য যন্ত্রণায় কপালটা টীপে ধরে গুম্‌রে গুম্‌রে কেঁদে উঠল সে।

তার চাপা কান্নার শব্দের সঙ্গে মিশে আত্রাইয়ের জল-কল্লোলটা একটানা মৃদু বিলাপের মত শোনা যেতে লাগল। আর ভোরের আবছায়া আলোর নীচে বাসনা কামনার জটিল পৃথিবীটা স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইল।

বিপিনচন্দ্র পালের—বুদ্ধিমানের কর্ম

শ্রীবলাই দেবশর্মা

বিপিনচন্দ্র পালের মণীষাকে বলা যায়—জ্যোতিষামপিতজ্জ্যোতি—তাহা জ্যোতিরও জ্যোতিঃ। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে তিনি যে সকল-প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা যেমন চিন্তাঢ্য, তেমনই প্রকাশ-ভঙ্গিমায় ভাস্বর অর্থাৎ উহা স্বরূপের মহিমায় মহিমান্বিত, আবার-রূপের গরবেও গরবিত। তাঁহার রচনাসমূহ বঙ্গ-সাহিত্যের এক বিশেষ সম্পৎ। জাতীয়তার সাম-মন্ত্রের উদ্গাতারূপে, ওজস্বী বাগ্মীরূপে, বাংলার নব জাগরণ যুগের রাজনীতিতে-চরমপন্থী দেশসেবকরূপে এবং 'বন্দেমাতরম' ও "নিউ ইণ্ডিয়ার" নির্ভীক সম্পাদকরূপে তাঁহার যে পরিচয়, তদ্ব্যতীত তাঁহার একটি মহিম সাহিত্যিক সত্তাও বিদ্যমান।

বর্ত্তমানে বিপিনচন্দ্রের কিছু কিছু রচনা পুনর্মুদ্রিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে ও তাঁহার মণীষার কথা কথঞ্চিৎ আলোচিত হইল। কিন্তু দূরবগাহী মননশীলতার সহিত কাঠিন্যধর্মী সাহিত্য রচনায় তিনি যে অদ্বিতীয় এবিষয়ে বিশেষ কোন আলোচনা হয় নাই। বঙ্কিমোত্তর যুগে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিপিনচন্দ্র পাল বাংলার মনস্বিতার দিব্য মূর্ত্তি।

বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যে আসিয়াছে একটা লঘুতা—যাহাকে বলা যায়—লৌল্য, চিন্তালেশশূন্য একটা প্রগল্‌ভতা, আর পরানুকরণপ্রিয়তা। যে মননশীলতা রহিয়াছে, তাহা পাশ্চাত্যের প্রতিধ্বনি, উহা অনুকরণে অথর্ব্ব, উহা আত্মসত্তা বিবর্জ্জিত। বাঙ্গালীর চিন্তাশক্তির বর্ত্তমান এই অবস্থাকে বলা যায় বুদ্ধি দৈন্য—intellectual bancrupcy.

গীতা-গীতিতে বুদ্ধির মাহাত্ম্য অত্যধিক। শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধির একটা আধ্যাত্মিক মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। ঈশ্বর প্রণিধানের জন্য বুদ্ধি-যোগ আশ্রয় লইতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব। গীতায় আরও বলা হইয়াছে—বুদ্ধি দৈন্যে, বুদ্ধি বৈপরীত্য আনিয়া দেয়—মহতি বিনষ্টি—বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি। এই

কারণেই, বিশ্বশক্তি জগন্মাতাকে বুদ্ধিরূপিণী বলিয়া স্তুতিনতি করা হইয়াছে—যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ।

ব্যক্তি-মানবের, জাতি-সত্ত্বার বুদ্ধি-দৈন্য ও বুদ্ধি-বৈকল্য তাহার অধঃপাতেরই পূর্ব্ব সূচনা। যে গায়ত্রী মন্ত্র বেদ-বিজ্ঞানের সারভূত, তাহাতে ধীলাভের জন্যই আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। বাংলার দুইটি বিরাট মানব—স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ বুদ্ধির ম্রিয়মানতাকেই মানব জাতির অধঃপাতের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। য়ুরোপের মনীষিগণও পাশ্চাত্য দেশসমূহের ইনটেল্‌লেকচ্যুয়াল ব্যাংক্রাপ্‌সি অবলোকন করিয়া আতঙ্ক প্রকাশ করিয়াছেন।

এই বুদ্ধিপ্রজ্ঞার দীপ্তিতে বিপিনচন্দ্রের চিন্তা একবার ভাস্বর প্রভায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। উহা একটা ইতিহাস। বাংলার মনস্বিতার অধ্যায়ও বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণযোগ্য। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে বাঙ্গালীর চিন্তনে ও মননে যে একটা উন্মার্গ ও বিমূঢ় ভাব আসিতেছিল, বিপিনচন্দ্রের তদানীন্তন দিনের একটি রচনা তাহার উপর একটা প্রচণ্ড আঘাত দিয়াছিল। স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন ইচ্ছার নামে যে একটা উন্মার্গগামিতা ক্রমশ: আত্মপ্রকাশ করিতেছিল, তাহার গতিবেগ প্রতিহত করিতে বিপিনবাবু বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই ইতিবৃত্তই করিতেছি। I think, you think, they think, ইহাই শেষ কথা নহে, ইহার সাধনক্রম আছে, বিপিনবাবু তাঁহার একটি বক্তৃতায় উহা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। ঐ বক্তৃতা পরে প্রবন্ধাকারে "নারায়ণ" পত্রে দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। রচনাটির নাম "বুদ্ধিমানের কর্ম"।

য়ুরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণান্তে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম" শীর্ষক একটি নিবন্ধ পাঠ করেন। ঐ রচনাটি তরুণ সমাজের পক্ষে এমনই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, বিশ্বকবিকে উহা কয়েকবারই পাঠ করিতে হইয়াছিল। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই প্রবন্ধ শুনিবার দক্ষিণা ছিল দশটাকা।

সেদিন তখন সবুজপত্রের যুগ। তখন সবুজ অবুঝ হইয়া উঠিয়াছে। আধ-মরাদের সঞ্জীবিত করিবার পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে ঘা মারিয়া বাঁচাইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। রাষ্ট্রে যাহারা ইংরেজ-শাসনতন্ত্রকে সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিয়া ক্রীতদাসের মত মনোবৃত্তি পরায়ণ হইয়া রহিয়াছে, তাহারাই মৃতপ্রায় কিনা তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই, কিন্তু যাহারা শাস্ত্রশাসন, সমাজশাসন, পিতৃপৈতামহিক ধর্ম-বিধানকে অস্বীকার করিয়া চলিতেছে, তাহারাই অর্দ্ধমৃত—আধমরা। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পতাকা উড্ডীন করিয়া অভিজাত গৃহের অন্তঃপুরিকা বাহির বিশ্বে স্বাধীনতা আস্বাদন করিতে যাত্রা করিয়াছেন। শ্রীচরণেষু পাঠ লেখায় জ্যেষ্ঠ মহাশয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে লিখিয়াছেন—আমা অপেক্ষা আমার পাই কি তোমার কাছে বড় হইল? ঐ সময় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও প্রাক্তন ছাত্র আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া "সবুজপত্রে" এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, সতীত্ব একটা মানসিক দুর্ব্বলতা।

য়ুরোপের 'প্রথম মহা-কুরুক্ষেত্র' শেষ হইয়াছে। বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ, "ডন সোসাইটির"—সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং অশ্বিনীকুমারের "ভক্তিযোগের" প্রভাব বিলীন হইয়া আসিতেছে, শশিভূষণ রায়চৌধুরী জাতীয় কর্মীদিগের শশিদাদার মহৎ কর্মপ্রচেষ্টা ও জাতি-সংগঠনের তপস্যা তাঁহার মৃত্যুতে স্তব্ধীভূত, মেঝ-বউ মৃণাল কূপমণ্ডুক স্বামীকে পদাঘাতে বিধ্বস্ত করিতেছেন,—সোনার বাংলার প্রতি সুনিবিড় ভালবাসা বিশ্বপ্রেমে রূপান্তরিত, সমসাময়িক দিনের বঙ্গভুবনের এই নবাগত অবস্থার ইতিহাস চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত "নারায়ণ" ও "সবুজ পত্রের" পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে।

রবীন্দ্রনাথের "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম" গুরুবাদের উপর প্রত্যক্ষ আঘাত হইলেও পরোক্ষে উহা সংরক্ষণপন্থী হিন্দু সমাজের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ। হিন্দু সমাজের গতানুগতিকতাকে উপহাস করিয়া উপমাচ্ছলে তিনি বলিয়াছিলেন—"চীৎপুর চিৎ হইয়াই রহিল।" তখনকার দিনের তরুণ সম্প্রদায় সমাজের বিধিনিষেধ, শাসন-অনুশাসন হইতে মুক্ত হইবার প্রেরণা ও নির্দ্দেশ পাইয়া যেমন অতি উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তেমনই প্রাচীনপন্থীদিগের মধ্যেও বিশেষ বেদনা বোধ হইয়াছিল। সেই বেদনাবোধের অভিব্যক্তিই—"বুদ্ধিমানের কর্ম"।

প্রাচীনপন্থী বলিয়া যাঁহাদিগকে অভিহিত করিলাম, তাঁহাদিগের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিতেছি। তাহা না করিলে তাঁহারা কি শ্রেণীর প্রাচীনতার অনুগামী তাহা বুঝা যাইবে না। ইঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতসমাজ নহেন, পরন্তু ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষার প্রফুল্ল কমল। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, টাকীর রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি এই দলের অগ্রণী ছিলেন।

কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম প্রবন্ধে গুরু, পুরোহিত, শাস্ত্র সিদ্ধান্ত, আপ্তবাক্য, আচার, অনুষ্ঠান, যেনাস্য পিতরোযাতাঃ—যেন যাতাঃ পিতামহাঃ প্রভৃতির অনুশাসন আনুগত্যকে ছিন্ন করিয়া স্বাধীন চিন্তার আত্ম-প্রত্যয়ের পথানুবর্ত্তী হইতে বলা হইয়াছিল। এই নবাগত অভিমতটি জনষ্টুয়ার্ট মিলের স্বাধীন চিন্তা হইতে আর একটু অগ্রবর্ত্তী। ইহা দার্শনিক নৈরাজ্য—philosophic anarcy.

বুদ্ধিমানের কর্মে বিপিনবাবু বলিলেন—না জানাই মানবতার পরমাদর্শ হইতে পারে, কিন্তু এই অস্বীকৃতিটা যেমন তেমন করিয়া কেবলমাত্র জীবত্বের সহজ আবেগ বেদনায় হয় না। উহাতে যাহা হয়, তাহা একান্তই স্বেচ্ছাচার, উহা মানসিক অধঃপাতেরই পরিচায়ক। উহা আধ্যাত্মিক স্বরাজ্য নহে, পরন্তু মানসিক অরাজকতা। এই অরাজকতা ব্যক্তি-মানব ও সমষ্টি-মানবের পক্ষে অতি ভয়ানক বস্তু, আত্মহত্যারই রূপান্তর। বিধি-বিধানকে অমান্য করিতে করিতে ক্রমশঃ মানুষ তাহার স্বকীয় কল্যাণ কর্মকেও অমান্য করিয়া চলে। উপনিষদে ইহাকে বলা হইয়াছে—মহতি বিনষ্টিঃ।

বিপিনচন্দ্র তাঁহার বক্তব্যে প্রতিপাদন করিতে চাহিলেন—এই না মানাটা—এই স্বাধীনতাটা চরম বুদ্ধিহীনতা। পরিপূর্ণ না মানা

যাহা, তাহা কোনও বিশেষ বস্তু বা ভাবে সীমাবদ্ধ নহে, মানিব না যখন, তখন কিছুই মানিবনা। গীতাও মানিব না, বাইবেলও নহে; গুরুপুরোহিতও নহে, আচার্য্য প্রচারকও নহে, টিকিও নহে, টাইও নহে, মন্দিরও নহে, চার্চ্চও নহে, যে আত্মপ্রত্যয়কে চরম ও পরম বলিয়া মনে করিতেছি, তাহাকেও নহে। এই অস্বীকৃতির একটা ক্রম আছে। না মানিতে মানিতে দেহ, দেহী, চিত্ত, বুদ্ধি, মন, এমন কি আত্মসত্তা পর্য্যন্ত সবই অমান্যের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়ে। বিপিনবাবু ইহাকেই বলিয়াছেন—ফিলজফিক এ্যানার্কি। উপনিষদের ইহাই নৈতিক্রম।

ঐ নৈতিক্রমের পরিচয় প্রসঙ্গে ঔপনিষদিক ঋষি বলিতেছেন:—তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্ অলোহিতম্ অস্নেহম্ অচ্ছায়ম্ অতমঃ অবায়ু অনাকাশম্ অসঙ্গম্ অরসম্ অগন্ধম্ অচক্ষুম্ অশ্রোত্রম্ অবাক্ অমনো অতেজস্কম অপ্রাণম্ অমুখম্ অমাত্রম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্।

প্রকৃত দার্শনিক নৈরাজ্য ইহাই। বিপিনচন্দ্র তাঁহার বুদ্ধিমানের কর্ম নিবন্ধে এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, কিছু না মানিতে হইলে প্রথমে অনেক বিধি নিষেধ মান্য করিতে হয়। একটা নিয়মানুগ জীবনের অধীনতা বা বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়। তবে, নৈরাজ্যসিদ্ধি লাভ করা যায়। আর উহাই স্বরাজ্য। শ্রুতি যাহাকে বলিয়াছেন—স্বমহিম্নি। তাহাও একটা জীবনের তপস্যায় হয় না, উহা বহু জন্ম জন্মান্তর তিতিক্ষা সম্পন্ন হইয়া সাধনা করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ ইহাকেই বলিয়াছেন—বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে। হটকারিতা, ভাবালুতা, সেন্টিমেন্টালিজিম্, জৈব আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপনা, এই সকল না মানা—আধ্যাত্মিক নৈরাজ্যসিদ্ধির অনুকূল নহে, বরং বিশেষ প্রতিকূল। ইহা দুশ্চর তপস্যাসাধ্য! শ্রুতির ভাষায় ইহা ক্ষুরধারা নিশিত পথ। ইহা কখনই উন্মার্গগামিতার দ্বারা লভ্য নহে। অনবদ্য কর্ম অনুষ্ঠানেই স্বারাজ্য সিদ্ধি সম্ভব হইয়া থাকে।

ক্ষুরধার বুদ্ধি ও অমোঘ যুক্তির দ্বারা বিপিনচন্দ্র পরিশেষে বলিয়াছেন—জগতের যাবতীয় সাধুসন্ত, ভক্ত যোগী একটা বৈধপথের অনুসরণ করিয়াই বিধিনিষেধের অতীত হইয়াছেন। গীতায় যাহাকে বলা হইয়াছে—সম লোষ্ট্রাশ্চ কাঞ্চন, তুল্য নিন্দাস্তুতি, মিত্র ও অরিতে সমভাব। কামকারতঃ—যাহা হয়, তাহা মহতি বিনষ্টি।

কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম করাই কর্ত্তব্য? না, বুদ্ধিযুক্ত কর্ম সাধনাই বিধেয়, সে মীমাংসা করিতেছি না, বিপিনচন্দ্রের চিন্তার একটি বিশেষ বিভাবের কথা বলিয়া বক্তব্য শেষ করিলাম।

শুভচেষ্টা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

তুমি নাহি দিলে দেখা কেহ কী দেখিতে পায়
তুমি না ডাকিলে কাছে সহজে কী চিত্ত ধায়—

সত্য কথা। কিন্তু দেখবে কে? ধাইবে চিত্ত কেমন ক'রে—নিজের চেষ্টায় চোখকে খুলে না রাখলে, চিত্তকে কাতর না করলে। দিবা-রাত্রি জোনাকীর পিছনে দৌড়িলে কিম্বা আলেয়ার ক্ষণিক ভাতিকে দিব্য রশ্মি ভেবে তার পিছনে ছুটলে আঁখির সাধ্য থাকেনা জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতি দর্শনের। দেখব বলে মন স্থির করলে তবে দেখার সৌভাগ্য মেলে। কারণ, তিনি তো বিরাজেন সর্ব্বঘটে বৈকুণ্ঠ হ'তে হিরণ্যকশিপুর স্ফটিক স্তম্ভে। তিনি ছুটে আসেন সেখানে যেথায় ভক্ত ব্যাকুল হয় তাঁকে দেখবার জন্য। তিনি স্বয়ং বলেছিলেন—

নহি তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, যোগিনাং হৃদয়ে ন চ
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।

বৈকুণ্ঠে থাকতে পারি না, পারিনা তিষ্ঠতে যোগিদের হৃদয়ে। যেথায় আমার ভক্ত গায় আমি থাকি সেথায়।

চাই চেষ্টা—একান্ত ভক্তি। শত সহস্র বাধা আসবে, তুফান উঠবে, মনের জোরে প্রেমের বলে চাই তাদের প্রতিরোধ। নিশ্চেষ্ট তমসাবৃতের সাফল্য নাই কোনো পথে। মোক্ষ-সাধনার সাত্বিক পথে চাই রাজসিক উদ্যম। নিজের পথ চিনতে হবে নিজেকে—চলতে হবে সে পথে বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা ক'রে তবে শ্রম হ'বে সফল। তাই উপনিষদে শুনি বজ্র-কঠোর নির্দ্দেশ—

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

বলহীনের লভ্য নয় এ আত্মা। বল—অবশ্য জ্ঞানের বল।

শ্রীকৃষ্ণ যোগ শিক্ষা দেবার পূর্ব্বে বোঝালেন যে আত্মা প্রতি জীবে অবস্থিত। কিন্তু সে অজ্ঞান গ্লানিতে নিমগ্ন। সেই ডোবা আত্মাকে টেনে তোলাই মোক্ষ সাধনা। তাকে তুলতে হবে উর্দ্ধে। তাকে অবসন্ন করলেও হবে না। অধোগামী করলে অনুভূতি হবে না। আত্মাই আত্মার বন্ধু। সাংসারিক অবিবেকীবুদ্ধি হ'তে পারে না আত্মার বন্ধু। যতই থাকনা তার মাঝে আপাত মনোরম প্রীতির লক্ষণ। আর আত্মাই আত্মার শত্রু। পরের কুমন্ত্রণা নিজে গ্রাহ্য না করলে তো কুবুদ্ধি অনিষ্ট সাধতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন অর্জ্জুনকে—

জীবাত্মার কর্ত্তব্য আপনিই আপনাকে উদ্ধার করা। আত্মাকে কখনও

অবসন্ন হ'তে দিওনা। কারণ আত্মাই আত্মার বন্ধু। আবার আত্মাই রিপু আত্মার।১

কিন্তু আত্মাকে বন্ধুরূপে পেতে গেলে আবশ্যক আপনাকে জয় করা। মানুষ হীন হয় আমিত্বের। আমার হাত অসি যুদ্ধে জয়ী হয়েছে, আমার পুষ্ট তো বচনে পাষাণের মত প্রাণ গলেছে, আমার বুদ্ধি প্রলয় ঘটিয়েছে—এই আত্ম-ভাব আত্মার শত্রু। কারণ আত্মা পরমাত্মার বিকাশ জীবে। ইন্দ্রিয়-লভ্য জ্ঞান, ইন্দ্রিয়ের সাহচর্য্যে কৃত-কর্ম্ম, জীবকে করে সঙ্কুচিত। কিন্তু আত্মা অনন্ত, অজর অমর। ইন্দ্রিয় ভোগ্য স্বার্থপর ভাব আচ্ছাদিত করে রাখে জগতকে। তাই যে জিতেন্দ্রিয়, সে নিজে নিজের বন্ধু। তার দ্বারা আত্মার উন্মোচন সম্ভব। যে আত্মা আপনাকে জয় করেছে সেই আত্মাই আপনার বন্ধু। আর যে আত্মা, আত্মাকে জয় করতে অসমর্থ সেই আত্মাই আত্মার শত্রু।২

আত্মোপলব্ধি ধর্ম্ম। আত্মার উপলব্ধিতে প্রকৃষ্ট পথে চলাই ধর্ম্ম-সাধনা। ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য আত্মানুভূতিতে আত্ম তৃপ্তি। সে আত্ম-তৃপ্তি জগৎ জোড়া সবার মাঝে আপনাকে উপলব্ধি করার তৃপ্তি—আর সবার মাঝে আপনাকে প্রতিষ্ঠা করার সাফল্য। এ কার্য্য নিজের উদ্যমেই সম্ভব। পরে পারে না আমাকে উদ্ধার করতে—আমি যদি নিশ্চেষ্ট হয়ে, অন্য মন হয়ে বসে থাকি। গুরু পথ দেখিয়ে দিতে পারেন. সে পথে চলতে হবে আপনাকে। সদ্‌গুরু অখণ্ডমণ্ডলাকারের স্বরূপ বোঝবার মন্ত্র দিতে পারেন। কিন্তু মন্ত্র জপতে হবে সাধককে।

এই শিক্ষা গীতার সর্ব্বত্র। কর্ম্ম চাই সব পথে। ক্লৈব্যং মাস্ম গম পার্থ—কাতরতার ফলে নির্বীর্য্য হ'লে কোনো কাজ হয় না। এই উপদেশ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণিক মোহগ্রস্ত অর্জ্জুনকে কর্ত্তব্য-পথ নির্দ্দেশ করেছিলেন। তিনি স্থিত-প্রজ্ঞের কথা বলেছেন, তার লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। বলা বাহুল্য সে সাধনার ফল অলসের লভ্য নয়। তিনি বলেছেন—নিরাহার ব্যক্তির শব্দাদি গ্রহণের শক্তি নিবৃত্ত হয়। কিন্তু সে সব বিষয়ের বাসনা শেষ হয় না। অভিলাষ যায় না অনুরাগ নিবৃত্ত হলেও। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার দ্বারা স্থিত-প্রজ্ঞের সকল বাসনার অন্ত হয়।৩

সুতরাং চাই সাধনা নিজের প্রয়াস। স্থিত-প্রজ্ঞ শান্তি লাভ করে। কিন্তু সে শান্তি মাত্র লাভ করা সম্ভব নিজের চেষ্টায় সকল কামনা ত্যাগে। সাধককে নিস্পৃহ, নির্মম, নিরহঙ্কার হ'তে হয়। স্পৃহা, মমতা, অহঙ্কার পরিবর্জ্জন করবার জন্য চেষ্টা করতে হয় অদম্য। সুতরাং শান্তি লাভ বহু চেষ্টা সাপেক্ষ। প্রয়াস বিনা সংযত হওয়া যায় না।

প্রবৃত্তিমার্গও যেমন কর্ম্ম সাপেক্ষ নিবৃত্তি মার্গও তেমনি কর্ম্ম সাপেক্ষ। চেষ্টায় মানসিক ও কায়িক কর্ম্মে আনা যায় নিবৃত্তি। তাই সন্ন্যাসী উপবাস করে রসনার প্রলোভনকে বর্জ্জন করবার জন্য তরুতলে শয়ন ক'রে দুগ্ধফেননিভ শয্যার বিলাস বর্জ্জনের উদ্দেশ্যে। অর্জ্জুন স্বয়ং সন্দেহে পড়েছিলেন জ্ঞানের প্রশংসা শুনে। সত্যই তো যদি কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞান হয় শ্রেষ্ঠ—কেন তবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যুদ্ধ-রূপ দারুণ এবং ভীষণ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করছেন।

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—কর্ম্ম না করলে তো কর্ম্ম ত্যাগ করা যায় না। কর্ম্মকে সম্যকরূপে টেনে নিতে গেলে, চাই কর্ম্মের বিধান—নিষ্কাম কর্ম্ম—তারপর মনকে শাসন করে মনের প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সকলকে মনের দ্বারা সংযত ক'রে অনাসক্ত হ'য়ে মাত্র কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কাজ করে সেই ব্যক্তিই বিশিষ্ট।১

সুতরাং অলসের পক্ষে ইহকাল বা পরকাল কোনোকাল সুখকর নয়। চেষ্টা, প্রয়াস, সাধনা এবং মূলে ব্যাকুলতা আবশ্যক।

তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলেছিলেন—"খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাকে দেখা যায়। স্ত্রী-পুত্রের জন্য লোকে একঘটি কাঁদে। টাকার জন্য লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে? ডাকার মত ডাকতে হয়।" আরও—"তিন টান হলে তিনি দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের উপর, মায়ের সন্তানের উপর—আর সতীর পতির উপর টান। এই তিন টান যদি কারও এক সঙ্গে হয়, সেই জোরে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে।"

গীতার মহা আশাপ্রদ শ্লোক—

মৎকর্ম্মকৃৎমৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।

হে—পাণ্ডব যে ব্যক্তি আমার কর্ম্ম করে, মৎপরায়ণ ও আমার ভক্ত, যে আসক্তিবিহীন, সর্ব্বভূতের অবিরোধী সেই ব্যক্তিই আমাকে প্রাপ্ত হয়।

বলা বাহুল্য শ্লোক যেমন আশাপ্রদ তেমনি কঠিন কর্ত্তব্য-পথের প্রদর্শক। নিজের চেষ্টায় প্রতি নিমেষে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত না করলে—সকল কাজের মাঝে বেছে নেওয়া যায়না কোন কাজটি ভগবানের কাজ। এইরূপ কল্যাণকর কর্ম্মকে বাছবার সময় মনের মাঝে সদা ভাবকে জাগিয়ে রাখতে হবে যে তিনিই পরম, তিনিই স্বামী। আমার কল্পিত বা কৃত কর্ম্ম তাঁর অভিলষিত কিনা একথা বিচার করতে হবে। অবশ্য আসক্তি আপনি ছেড়ে যাবে কর্ম্ম হ'তে যখন বোধ হবে নিশ্চয় যে—তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি। তারপর নির্ব্বৈর হওয়া সকল ভূতের প্রতি—আততায়ীকে ক্ষমা করা, দোষীকে অপরাধী না করা—ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রভু বুদ্ধ, প্রভু যীশু, মহাপ্রভু প্রভৃতি এ দোষ হ'তে মুক্ত করতে মানুষকে কত না উপদেশ দিয়েছেন। আনবিক শক্তির মহাতেজ আহরণ করবার জ্ঞান অর্জ্জন করেছে নর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জগতের হিতের কাজে তাকে না লাগাবার জ্ঞানও যমজ ভ্রাতার মত

১ উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনোবন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ। গীতা ৬।৫

২ বন্ধুরাত্মানস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বেবর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ। ৬।৬

৩ বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ,
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে। ২।৫৯।

১ গীতা ৩।৬

মানুষের মনকে অধিকার করে রয়েছে। এতো বড় জ্ঞানীও তো হ'তে পারছে না নির্বৈর।

তাই মনে হয় কবিতার ভাষা খুব মিষ্ট, ধর্ম্ম কথা সরল ও আশাপ্রদ—আমাকে পাবে—কিন্তু বাস্তব-জীবনের সাধনা ক্ষেত্রে পরামর্শ কতখানি দায়িত্ব চাপিয়ে দেয় ভক্ত কর্মীর স্কন্ধে—তা ভেবে ভীত হ'তে হয়। প্রতি-দিন ক্ষণে ক্ষণে অভ্যাস করলে নিশ্চয়ই জীব সাধু হ'তে পারে। অল্পে অল্পে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রয়াস। এর মাঝেও দেখি সেই শিক্ষা ও সাধনার ত্রিধারা। ভক্তিভরে তাঁকে জানতে হবে পরম বলে, জ্ঞানে বুঝতে হবে কোন কর্ম্ম তাঁর অভিলষিত এবং দেহ ও মনের শক্তির দ্বারা সে কর্ম্ম সাধন করতে হবে—এই কথা আবার বলেছেন ভগবান গীতার শেষে। বলেছেন মদ্‌গতচিত্ত হও, আমার ভক্ত হও, আমার যজনশীল হও, আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয়। আমি তোমাকে প্রতিজ্ঞা করছি—আমাকে পাবে এমন ভাবে জীবন যাপন করলে।

তারপর চরম উপদেশ—

সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

সকল ধর্ম্ম-ধর্ম্ম ত্যাগ কর, কর্ম্মে বাঁধা পড়বে না, সে অবস্থায় পৌছতে পারলে তখন মাত্র কাজ থাকবে আমার শরণ। তখন আর পাপের কথা বিচারের আবশ্যক হবে না। আমার শরণ নিয়ে, আমার কর্ম্ম বেছে নিয়ে জীবন যাপন করলে পাপের হাত থেকে ত্রাণ করবেন তিনি যাঁর শরণ হবে জীবনের সাধ্য—মনে, প্রাণে শয়নে-স্বপনে জাগরণে। তাঁকে ডাকাই যখন কাজ হবে তখন আঁধার যাবে কেটে। চেষ্টায় সাফল্য লাভ হবে।

ডাকি তব নাম শুষ্ক কণ্ঠে,
আশা করি প্রাণপণে
নিবিড় প্রেমের সরল বরষ
যদি নেমে আসে মনে।

শুষ্ক কণ্ঠের ডাকেও—

সহসা একদা আপনা হইতে
ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে
এই ভরসায় করি পদতলে
শূন্য হৃদয় দান,
সংসার যবে মন কেড়ে লয়
জাগেনা যখন প্রাণ।

মানুষের শুভ চেষ্টাকে প্রণোদিত করতে পারে শুদ্ধ ভক্তি। চাই ভক্তি শান্তিরস চেষ্টার পিছনে যে ভক্তি অমৃত—

সমস্ত জীবনে মোর হইবে বিস্তৃত
নিগূঢ় গভীর,—সর্ব্ব কর্ম্মে দিবে বল,
ব্যর্থ শুভ চেষ্টারেও করিবে সফল
আনন্দে কল্যাণে।

এই শুভ চেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণের বজ্র-গভীর অথচ মধুর কথা মানতে হবে—

নাত্মানং অবসাদয়েৎ।

কিন্তু এই শুভ চেষ্টা দারুণ বিফলতার কারণ হবে, যদি জ্ঞানের মাঝে অজ্ঞতা বা শ্রদ্ধার অভাব থাকে। যাকে সত্য বলে মানতে হবে তাকে মন স্থির করে বুঝতে হবে সত্য। নিজের চেষ্টা চাই জীবনের ইহকালের বা পরকালের শান্তির আবাহনে। কিন্তু পথ অনুসরণ করে যদি কোনো মানুষ মনে সংশয় নিয়ে আসে তার সাফল্য সুদূর পরাহত।

জ্ঞান লাভ হয় শাস্ত্র হ'তে। কিন্তু তার ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ জ্ঞানীর শিক্ষা সাপেক্ষ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন—তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানীর উপদেশ হ'তে লাভ হয় জ্ঞান। সে জ্ঞান উদ্‌বুদ্ধ হয় প্রণাম, পরিপ্রশ্ন এবং সেবায়।১

এ সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন ওঠে। প্রকৃত জ্ঞানীর নিকট জ্ঞান লাভ হ'তে পারে সেবায়। আমাদের পুণ্যভূমিতে বহু মহাপুরুষ শিক্ষার বীজ রেখে গেছেন। কিন্তু সে বীজ যিনি শিষ্যের মনে বপন করবেন, তিনি যদি স্বয়ং প্রকৃত জ্ঞানী না হ'ন—শিষ্যের অবস্থা হয় সঙ্গীন। এ ক্ষেত্রে দায়িত্ব উভয় পক্ষের।

যদি কেহ স্থির করে কোন মহাপুরুষের শিক্ষা হিতকর তার পক্ষে, তখন শ্রদ্ধা আবশ্যক। শ্রদ্ধা ভগবানে। ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে লাভ করতে হয় জ্ঞান। হ'তে হয় তৎপর, সংযতেন্দ্রিয়। কিন্তু পূর্ণ শ্রদ্ধা না থাকলে জ্ঞান হয়না পথ-প্রদর্শক। এ ক্ষেত্রে শুভ চেষ্টা অনুকূল হয় যদি নিঃসন্দেহ হয় সাধক। সংশয়ের স্থান নাই শিক্ষা ক্ষেত্রে বা সাধনার পথে। যদি গুরু বলে কাকেও মানতে হয় তাঁর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা আবশ্যক। সে পথ শাস্ত্র বা গুরু দেখিয়ে দেবেন সে পথ নিজের বিবেক এবং কর্ত্তব্য-বুদ্ধির প্রভাবে নিঃসংশয় সত্য পথরূপে না মানলে উপায় কী সত্যে পৌছবার। ভুল-ভ্রান্তি সম্ভব। তার সংশোধন অনিবার্য্য হয় জ্ঞানে। অজ্ঞান যেমন নূতন নূতন প্রহেলিকার সৃষ্টি করে প্রকৃত জ্ঞানও তেমনি আবিষ্কার করে সত্য—অনন্ত পথের।

গীতার নির্দ্দেশ এ বিষয়ে স্পষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—শ্রদ্ধাবান, ঈশ্বরের প্রতি একান্ত অনুরক্ত এবং সংযত যার ইন্দ্রিয়, সে লাভ করে জ্ঞান এবং অধিকারী হয় পরম শান্তির।২

তারপর বল্লেন—অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন এবং সংশয়-চিত্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। সংশয়াত্মার ইহলোক নাই, পরলোক নাই, সুখ নাই।৩

শুভ কর্ম্মপথে কর নঙ্গল গান
যত দুর্ব্বল সংশয় হক অবসান—

গেয়েছিলেম কবি।

---

১ তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ। গীতা ৪।৩৪

২ শ্রদ্ধাবানলভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি। ৪।৩৯

৩ অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ। ৪।৪০

মোট কথা মানুষকে নিজের উন্নতি করতে হবে ইহ জগতে এবং পর জগতে নিজের চেষ্টায়। কবি বলেছিলেন—

পরান্নভোজী পরবসতশায়ী
যজ্জীবতি তন্মরণম্
যন্মরণং সোঽস্য বিশ্রাম।

এ সংসারীর কথা। পরলোক পরের চেষ্টায় মোটেই নয় লভ্য। পথ নির্ব্বাচনে সহায়তা করে সত্য জ্ঞান, যদি তার পটভূমিতে থাকে ভক্তি। সেই জ্ঞানকে নির্দিষ্ট পথে নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা করতে হবে আত্মপ্রসার— পরকে ঈশ্বরের অংশ ভেবে আপনার করতে হ'বে—তবে মুক্তি। বহু কথা স্পষ্ট শিখিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্মের। নিঃসংশয়ে তাদের মানতে হবে—শুভ চেষ্টা করতে হবে আপনাকে। তাহ'লে শান্তিময় আনন্দলোকের পাওয়া যাবে সন্ধান। আমি থাকব নিশ্চেষ্ট—পরে আমার জন্য পরলোকে যাবার ছাড়পত্র এনে দেবে—এ বাতুল বুদ্ধি কল্যাণকর নয়।

বজ্র-গম্ভীর স্বরে উপনিষদ বলেছে—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্নিবোধত
ক্ষুরস্যধারা নিশিতং দুরত্যয়া-দুর্গং পথস্তৎ কবয়োর্বদন্তি

উত্থিত হও, জাগ্রত হও এবং আত্মজ্ঞান লাভ কর। পণ্ডিতগণ তত্ত্বজ্ঞানের পথকে দুরতিক্রমণীয় শাণিত ক্ষুরধারার ন্যায় দুর্গম বলেন।

এই সুরেরই বুদ্ধবাণী শুনি ধর্ম্মপদে।

উত্তিটঠে নপ্পমজ্জেয্য ধম্মং সুচরিতং চরে।
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্হি চ।

ওঠ, আলস্যের প্রশ্রয় নিওনা, সুচরিত ধর্ম্মের সেবা কর। ধর্ম্মচারী ইহলোকে এবং পরলোকে সুখ লাভ করে।

ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে তিনি আলোকের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দেন। তাই কবি গেয়েছিলেন—

আজ আলোকের এই ঝরণা ধারায় ধুইয়ে দাও।
আপনাকে মোর লুকিয়ে রাখা ধুলায় ঢাকা ধুইয়ে দাও।
যে জন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে
আজ এই সকালে তার কপালে
এই অরুণ আলোর সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দাও।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর কড়া ভাষায় বলেছেন—শাস্ত্রনির্ভরতাকে পরম পুরুষার্থ বলে নির্দ্দেশ করেছে। কিন্তু আমাদের দেশে লোকে যে ভাবে দৈব দৈব করে, ওটা মৃত্যুর চিহ্ন, মহা কাপুরুষতার পরিণাম।

সত্যই সাধনা—শুভ চেষ্টা—না হলে ঈশ্বর লাভ হয়না। মাত্র শাস্ত্র-পাঠে কিছু হয়না। মনে পড়ে ঠাকুর পরমহংস দেবের চোখ ফোটানো উপমা।

"পাঁজিতে বিশ আড়া জল' লেখা আছে, কিন্তু পাঁজি নেংড়ালে এক ফোঁটাও বেরোয়না। তেমনি পুঁথিতে অনেক ধর্ম্ম কথা লেখা থাকে, শুধু পড়লে ধর্ম্ম হয়না, সাধন চাই।"

জ্ঞানমার্গের বড় উপদেশক শঙ্করাচার্য্য বলেছেন—গোবিন্দকে প্রাণ দিয়ে ভজতে হবে, মাত্র শ্লোক উচ্চারণে, ব্রত পরিপালনে, দানে বা গঙ্গাসাগর তীর্থে ঘুরলে মিলবে না মুক্তি শত জন্মে।

কুরুতে গঙ্গাসাগর গমনং
ব্রতপরিপালনমথবা দানম্
জ্ঞানবিহীনে সর্ব্বমনেন
মুক্তির্ন ভবতি জন্মশতেন।

নিজের চেতনার মাঝে তীর্থ ভ্রমণ, ব্রত পালন বা দান না উপলব্ধি করলে কর্ম্ম ফলপ্রসূ হয়না। পরিশ্রম আবশ্যক সজ্ঞানে এই তাঁর মত। তবে গোবিন্দ ভজনা কল্যাণকর হবে। ধ্যান স্পষ্ট করে ধারণা, মূর্ত্তি প্রাণবন্ত করে ইষ্টদেবতার, ক্রমে জানিয়ে দেয় সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের অপরূপ।

আগামী

প্রশান্ত মৈত্র

আসন্ন স্বপ্নটাও যদি ক্লান্ত রাত্রির শীয়রে ভেঙ্গে যায়
জানালায় বহে যাওয়া ঝরঝরে হাওয়ার ডানায়
বিষাক্ত চেতন জাগে জাগে।
পাখীদের ক্লান্তি ভাঙ্গে, রাত্রির উন্মুক্ত শুদ্ধতা,
এ'রাতের পাথায় যেন গভীর সময় একতা—
বোনে সূক্ষ্ম জালে।

মাঝের রাত্রির তারা মিটমিটে আকাশেপ্রদীপ নিভন্ত,
তার পানে চেয়ে যদি পথের কথাও ভোলা যায়,
কেন তবে বার্দ্ধক্যের বীণাটার মসৃণ তারে গভীর
নিতান্ত ?
সবচেয়ে কাছে থেকে আজ যদি ফের এই পথে
আমাকে পাবেই তুমি মুখোমুখি স্বপ্নের রাতে॥

রবীন্দ্রনাথের বলাকায় গতিবেগ ও জীবন চেতনা

অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত এম-এ

রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' প্রধানতঃ গতিবাদের কাব্য—এই গতির যে-বেগ আছে, সে-বেগ যৌবনের জয়-সংগীতের সুরে যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তেমনি ঠাঁই পেয়েছে মানবাত্মার অবিরাম যাত্রায়। এই যাত্রার গতি-পথের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে জীবনের গভীরতর এক প্রেমানুভূতি জেগেছে এবং সেই জন্যই মনে হয় সমৃদ্ধতর এক জীবন-চেতনার সঙ্গে এই যাত্রা সার্থকতার পরিণামবাহী।

গতিবেগের মূলে আছে যৌবনের প্রাণ-চাঞ্চল্য। তাই কবির অন্তররাজ্য 'বলাকা'র যুগে যৌবনেরই উদ্বোধন ঘটেছে সর্বপ্রথম। যৌবনের বেগেই গতির বেগ। আধ্যাত্মিকতার যে-মানসিক ধর্ম কবি যৌবনের শেষপ্রান্তে এনে গ্রহণ করেছিলেন—'খেয়া,' 'নৈবেদ্য' থেকে আরম্ভ করে গীতাঞ্জলি-ত্রয়ী পর্যন্ত সে-নিগূঢ় ধর্মীয় রসে অন্তরকে পূর্ণ ক'রে তুলেছিলেন, সেই রসের গতিধারাকে অন্তরের তলদেশ থেকে একটু সরিয়ে নিয়ে প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় দাঁড়িয়ে কবি অন্তররাজ্যে অভিষিক্ত করবেন যৌবন ধর্মকে। নিত্য নূতন পথে অভিসার যাত্রাই রবীন্দ্র-কবিমানসের বৈশিষ্ট্য। ইউরোপ ভ্রমণে যেয়ে সেই দেশের প্রাণ-ধর্মের চঞ্চলতাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করলেন। অনুভব করলেন যৌবনের সজীবতাকে। রবীন্দ্রনাথের মানস-বলাকা সেই নূতন সজীবতার আবেগ নিয়ে যে-পথে যাত্রা করলো, সে-পথ নবতম এক গতিলোকের পথ। সে পথে যৌবনই সব চেয়ে বড় দিশারী।

এই গতিময় যৌবনের মধ্যে আছে এক বিপুল সৃষ্টি ধর্ম। এই সৃষ্টি ধর্মই যেন কবির প্রাণধর্মকে উজ্জীবিত ক'রে তুলেছে। এই প্রাণধর্মের প্রবর্তনায় কবি চাইলেন পৃথিবীর দিকে, যেখানে বহুযুগসঞ্চিত আবর্জনা পূর্ণ হয়ে রয়েছে। কবি এটাও খুব ভালো ক'রে উপলব্ধি করেছেন যে প্রাণের ধর্মই হচ্ছে সমস্ত পুরাতন অর্থহীন বন্ধনকে কাটিয়ে অজানার পথে যাত্রা করা। এই জন্যই বীজের প্রাণসত্তা অংকুরের রূপ ধরে তার আবরণটিকে সরিয়ে ফেলে আলোকের পথে এক স্বচ্ছন্দ বিস্ফূর্তিতে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। শাস্ত্রের গতানুগতিক বন্ধন-জড়তা যৌবনের জন্য নয়। যৌবন চায় সমস্ত কিছু ভেঙে দিয়ে সত্যকে প্রতি-পদে গ্রহণ করতে। কিন্তু এই সত্যোপলব্ধির পথে পদে পদে যেমন বেদনা আছে, তেমনি দুর্বিষহ আঘাতও আছে। তা' হলেও প্রবীণত্বের অন্ধকারে বন্ধকরা খাঁচায় সে কিছুতেই থাকতে চায় না।

বিশ্বের যা' চিরকালীন ধর্ম, তা' কেন্দ্রীকৃত হয়ে আছে যৌবনের মধ্যে। জরার জড়তার দুর্গবন্ধনকে ছিন্ন ক'রে দিয়ে যৌবন উড়াতে চায় জীবনের জয় পতাকা; এই জন্যই যৌবন দুরন্ত এবং প্রাণলীলায় জীবন্ত! কবির তাই আকাঙ্ক্ষা, ক্ষ্যাপা ভোলানাথের মত বাঁধন-ভাঙা নৃত্যের তালে তালে ঝড়ের মাতাল বিজয়-পতাকা উড়িয়ে দিয়ে যৌবন চলুক তার জয়-যাত্রায়! বন্ধনের পূজাবেদী পড়ুক ভেঙে, পুঁথির শাসনকে না মেনে যদি বিপদ আসে, সেই বিপদকেও বরণ ক'রে নিতে হ'বে। বিপদ বরণের মধ্য দিয়েই তো যৌবনের আনন্দ।

চিরযুবা যে, সেই চিরজীবী। কবি তাই বলেন—

> চিরযুবা, তুই যে চিরজীবী,
> জীর্ণ-জরা ঝরিয়ে দিয়ে
> প্রাণ অফুরাণ ছড়িয়ে দেদার দিবি। [১নং]

বসন্তের চির-নবীনতার মাল্য প'রে, বজ্র-বিদ্যুতের জয় পতাকা উড়িয়ে দিয়ে যৌবন চিরদিনকার অমর।

এই যৌবন-বেগের মধ্য দিয়েই দেখা দিয়েছে এক গভীর জীবন-চেতনা। কবির এই জীবন-চেতনার একটি দিক বিশ্বগত, আর একটি দিক ব্যক্তিগত। বিশ্বগত জীবন-চেতনা বিশ্বমানবতাবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করছে কবি-চিত্তকে, সেখানে তিনি বিশ্বপৃথিবীর এক যুগসন্ধির সংকটক্ষণে উদ্বেগাতুর হয়ে উঠেছেন। তিনি শুনতে পাচ্ছেন—রক্ত-মেঘের ঝিলিকের ভেতর দিয়ে, গহন পারের বজ্রধ্বনির মধ্য দিয়ে, কোন্ পাগলের অট্টহাসির পথ ধরে মরণ আহ্বান যেন জেগে উঠেছে। রবীন্দ্র-নাথের কাছে জীবন এবার—'মাতলো মরণ বিহারে।' সে-গতিকে নিয়ে তিনি যুগ-সংকটের এক জটিললগ্নে এসে উপস্থিত হয়েছেন, সেই সংকট-ক্ষণের মৃত্যুপাগল জীবনকেই কোন আগু-পিছু না ভেবে বরণ ক'রে নিতে হবে। কোন্ যেন এক নিরুদ্দেশের দেশে ডাক এসেছে, কিন্তু এই ডাকের পিছনে আছে ঝড়ের প্রচণ্ড মাতন, ধ্বংসের এক বিপুল উচ্ছ্বাস। ঝড়ের আকস্মিক আঘাতে সমস্ত কিছুর যেন ভিত্তি নড়ে উঠেছে, শয়ন শিয়রে প্রদীপ গিয়েছে নিভে, পথই একমাত্র আপন হ'য়ে উঠেছে। তাই কবির ডাক—

> কিসের তরে চিত্ত বিকল,
> ভাঙুক না তোর দ্বারের শিকল,
> বাহির নাচনে ছোট না সকল
> দুঃখ-সুখের শেষে গো। [২নং]

এই দুঃখ-সুখের শেষের পারে পৌছুতে যদি সর্বনাশের ডাক আসেই, তবে অন্তরের সমস্ত ক্লিষ্টতাকে দূর ক'রে দিয়ে, দ্বারের শিকল ভেঙে দিয়ে বের হ'য়ে আসতে হবে বাইরের দিকে। নবযুগের রক্তবর্ণ অরুণোদয় পূর্বাকাশে যেন দেখা যাচ্ছে। এই শুভ অরুণোদয়ের রক্ত আবীরকে বুক পেতে গ্রহণ করতে হ'বে, সর্বনাশের রুদ্রমূর্তি দেখে ভয় পেলে কিছুতেই চলবে না। বহুযুগের আবর্জনাময় পুরাতন ঘরকে ত্যাগ ক'রে যেতে হ'বে জীবনের বৃহত্তর পূর্ণতা লাভের জন্য, আর পা বাড়াতে

হ'বে বহু সম্ভাবনার কলোল্লাসে ভরা নূতন ঘরের উদ্দেশে। এমনি করেই বৃহত্তর মানব-জীবনের যৌবনের গানে কবির হৃদয় যেমন পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে, তেমনি সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছে বিপুলতর জীবন-চেতনায়। যৌবনের বাণী কখনো শুষ্ক পাতায় পুঁথির বাঁধনে বাঁধা থাকেনা'—তার বাণী জেগে ওঠে প্রলয় মেঘে ঝড়ের ঝংকারে, ঢেউয়ের উপরে বাজিয়ে চলে বিজয় ডঙ্কা। জীবন পিপাসার প্রাবল্যকে বুকে নিয়ে কবি তাই যৌবনকে ডেকে বলেন—

জীর্ণতারই বক্ষ দু'ফাঁক করে
অমর পুষ্প তব—
আলোক পবনে লোকে লোকান্তরে
ফুটুক নিত্য নব। [৪৪নং]

জীবনে এগিয়ে যাওয়ার যে সার্থকতা, সেই তো যৌবনের অমর পুষ্প। তারই মধ্যে আছে জীবনের অমৃত সঞ্চয়। তাই যৌবনের মধ্য দিয়ে কবি রুদ্রকে এবং রুদ্রের প্রসাদকে লক্ষ্য করেছেন।

পথে পথে অপেক্ষিছে কাল বৈশাখীর আশীর্বাদ
শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্ত-সর্প গূঢ়ফণা।
নিন্দা দিবে জয় শঙ্খনাদ,
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ। [৪৫নং]

যৌবন যাত্রার সঙ্গে বিশ্বের অন্তশ্চারী একটি একক শক্তির গূঢ় চারণাকে যেমন তিনি অনুভব করেছেন, তেমনি তাঁর রুদ্ররূপের অনন্ত নির্ঝর থেকে অনবরত যে প্রসাদকণা ঝ'রে পড়ছে, তাকেও মাথা পেতে নিচ্ছেন তিনি। রুদ্রের ভয়ংকর প্রসাদের মধ্যেও যে শান্তির অনন্ত আস্বাদ, এ-কথা তিনি ভুলবেন কি করে? তাই জীবননদীর এক কূল ভেঙে দিয়ে, অপর কূলের আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠতে হ'বে আমাদের। এই পুরাতন ঘরকে ভেঙে দেওয়ার যে ব্যক্তিগত বেদনা, সেই বেদনার মধ্য দিয়েই বিধাতাপুরুষ একটি বিশ্বজনীন সত্যের অভিব্যক্তি দান করেন এবং এই সত্যকে অভিব্যক্ত করার জন্যই এক রুদ্র আহ্বানে তিনি নবীনদের অন্তরাত্মাকেও জাগ্রত ক'রে তোলেন। এই ডাক যখন নবীনেরা শুনতে পায়, তখন তাদের জীবনকে গণ্ডির বাঁধা-ধরা প্রাচীরের মধ্য থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে অমৃতের প্রসাদপুষ্ট জীবনকে লাভ করার জন্যে পাগল হ'য়ে ওঠে, আর বাঁধন ছেঁড়ার সংগীত জাগিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে কেবল বলতে থাকে—

মৃত্যুসাগর মথন ক'রে
অমৃতরস আনব হ'রে,
ওরা জীবন আঁকড়ে ধ'রে
মরণ-সাধন সাধবে। [৩নং]

জীবনের অর্থই হচ্ছে বিপুল শক্তি অর্জন ক'রে অগ্রসর হওয়া। তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ই বলতে হয়, 'জীবনকে আঁকড়ে ধ'রে রাখতে গিয়ে জীবনকেই হারাবার মতো দুর্গতি আর কিছু আছে?' সে-জীবন অনড় হ'য়ে পড়ে থাকবে, সৃষ্টির মূলে জীবন-বেগের সে-প্রবাহধারা ব'য়ে চলেছে, তার কোনো খবরই রাখবে না সেই তো জীবনকে হারাবে। সে-স্পর্শে দীপক তানে ধ্বনিত হ'য়ে উঠবে 'দীপ্ত প্রাণের স্পর্শ।' এটাও কবি সমস্ত অন্তর দিয়ে বুঝতে পেরেছেন যে, আলস্য বা কর্মবিরতির জড়তা যখনই জীবনকে এসে জড়িয়ে ধরবে, তখনই বিধাতাপুরুষের অভয়শঙ্খ লুটিয়ে পড়বে ধুলায়; তাঁর কাছে আরাম চাইতে গিয়ে লজ্জিত হ'তে হবে সব চেয়ে বেশি। তখনই জীবনে আসবে নিত্য নূতন প্রচণ্ডতম আঘাত; কিন্তু সেই আঘাতকে সহ্য ক'রেও তাঁরই দেওয়া দুঃখকে বুকের গহনে বরণ ক'রে নিয়ে জয়ডঙ্কা বাজাতে হবে। তবেই আসবে জীবনে সার্থকতা, সংঘাতময়তার মধ্য দিয়েই জীবনের পূর্ণতম অভিব্যক্তি। কারণ চলার বেগে বিশ্বের আঘাত লেগে লেগে সব কিছু ঢেকে-দেওয়া আবরণ যেমন ছিন্ন হ'য়ে যায়, তেমনি 'বেদনার বিচিত্র সঞ্চয়'ও ক্ষয় হ'তে থাকে ক্রমে ক্রমে। আর সেই চলার অবগাহন স্নানে কবির জীবনও যেন পুণ্যময় হ'য়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, কবি উপলব্ধি করতে পারেন—

চলার অমৃত পবনে
নবীন যৌবন
বিকশিয়া ওঠে প্রতিক্ষণ। [১৮নং]

প্রতিক্ষণে বিকশিত হ'য়ে ওঠা নবীন যৌবনের অমৃত আস্বাদে কবির মন একটু ভালো করেই উপলব্ধি করতে পেরেছে—'যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ আজি অনন্ত গগন।' তাই কবির হাতে যৌবনকে পরাবার জন্যে বরণের ডালা। 'বার্ধক্যের স্তূপাকার আয়োজন' কবির আন্তরিক যৌবনধর্মকে আর ঢেকে রাখতে পারছে না। তাই বাইরের পাতাঝরা পউসের বনভূমি কবির অন্তরের বিগত-যৌবন জীবনকে মনে করিয়ে দিলেও, সেই বহুদিনকার ভুলে-যাওয়া যৌবন কবির কাছে উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের সাথে যেন এক সংগীতময় ইংগিতভরা লিপি পাঠিয়েছে। সে-লিপিতে—

লেখিছে সে—
আছি আমি অনন্তের দেশে
যৌবন তোমার
চিরদিনকার। [১৩নং]

শুধু তাই নয়, এই যৌবন 'বয়সের জীর্ণ-পথ শেষে মরণের সিংহদ্বার' পার হয়ে আসতে কবিকে আহ্বান জানিয়েছে। তাই এই যৌবন পৃথিবীর সীমারেখাকে পিছনে রেখে কবির শাশ্বত এক ভাবলোকে নিজের আসনটি প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। জরা যে জীবনের উপর মিথ্যা আবরণ মাত্র, সেই কথাটা বলতেই যেন যৌবন কবির জীবন-ভূমিকায় এসে একটি আদর্শায়িত মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাণের একটি প্রোজ্জ্বল রূপ ব্যক্তিগত জীবনের চেতনালোকে যৌবনের মাধুর্যময়তায় নিজেকে প্রকাশ করতে চাইছে এখানে। যৌবন-চেতনার বার্তাবাহী বসন্ত কবির প্রাণপদ্মের উপর তার দলগুলি মেলে ধরেছে, সেই চেতনাকে নিয়ে 'অলক্ষ্যের বক্ষের আঁচলে' ঢাকা বহু তপস্যার ফলে ফুটে'-ওঠা মাধবীর আনন্দচ্ছবিকে কবি প্রত্যক্ষ করছেন। এই ছবিই কবির জীবনকে যেমন আনন্দমধুর

করেছে, তেমনি করেছে যৌবন-মুখর। সারাটি জীবন দিয়ে তাই কবি এই জগতকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছেন, ভালোবেসেছেন এই জগতের আলোককে—এবং জীবনকেও তাই ভালোবাসেন গভীরভাবে। তাঁর কাছে জগতকে একান্ত ক'রে চাওয়া ও ছেড়ে যাওয়া দুইই সমান সত্য। এই সত্যের অনুসন্ধানে জীবনের গূঢ়তম জিজ্ঞাসাকেও জাগিয়ে তুলেছেন কবি।

এই জীবন জিজ্ঞাসায় কবিচিত্তে যে-বিশ্বগত-চেতনা জেগেছে, তার মধ্যেই ধরা পড়েছে আত্মার গতি এবং সৃষ্টির গতি। আত্মার গতির মধ্যে এক কল্যাণতপস্যা আছে এবং নিত্যকালের নাবিক সেই তপস্যাকেও করেন পুরস্কৃত। এই আত্মিক তপস্যার পূর্ণতর রূপ প্রকাশিত হয়েছে 'পাড়ি' (৫নং) কবিতায়। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রক্তোৎসব। ধ্বংসের উন্মাদনায় বিশ্বধাত্রীর ঈর্ষাকুটিল ভ্রূভঙ্গীর মধ্যে কবি-মানসের সুপ্ত চৈতন্যের কোণটিতে এক নূতন গতিসঞ্চারের বাণী জেগে উঠেছে,—জেগে উঠেছে গতিলোকের প্রাণসঞ্চয়কে নিয়ে এক বিপুল জীবন-চেতনা। মানব-জীবনের গতির সঙ্গে বিশ্বদেবতার গতিও যেন মিশে' গিয়েছে, কারণ তিনিও নিশ্চল থাকতে পারেন না। কবি যেন তাঁর শান্ত সমাহিত অন্তর্লোকে নিঃসংশয়ভাবে বুঝতে পারছেন, এই রণঝঞ্ঝার শঙ্কিল দিনে নিত্যকালের কর্ণধার যেন তাঁর নৌকোয় পাল তুলে' দিয়ে এই দুর্দিনের উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছেন। কিন্তু স্বতঃই প্রাণে প্রশ্ন জাগে, এই শংকিত রাত্রির ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারে তিনি এমন কি সম্পদ নিয়ে আসছেন এবং সেই আগমন এই প্রলয়-রাত্রির ঘনান্ধকারে কেন? যখন 'কালোরাতের কালিঢালা ভয়ের বিষম বিষে' মূর্চ্ছিত হ'য়ে রয়েছে আকাশ, তখন কোন্ ঘাটে এসে তাঁর তরীটি লাগবে, তা' কেউ জানে না, এবং এইজন্যই মনে কত আশংকা ও বেদনা। হাতে তাঁর একটি রজনীগন্ধা ফুলের গুচ্ছ,—সেই রজনীগন্ধার মালা নূতন আলোকোজ্জ্বল প্রভাতে তিনি যে কার গলায় পরিয়ে দেবেন, সে তো কেউ জানে না! যারা শক্তিমান বা ধনবান, যারা কামনা করেন রাজশক্তিকে, নিত্যকালের নাবিকের হাত দিয়ে তারা তো এই উপহার পাবে না। দুঃখের কালরাত্রির ভয়ংকর লগ্নটিতে যারা নিভৃত কল্যাণ তপস্যা নিয়ে নীরবে আত্মমগ্ন হ'য়ে আছেন, তারাই পাবেন এই শান্তিসৌন্দর্যের শাশ্বত পুরস্কার। তাঁর আগমনের লগ্নটিতে কোনো তূরীভেরী বাজবে না, কিন্তু আঁধার যাবে কেটে, আলোকে ভ'রে উঠ্‌বে তাঁর গৃহপ্রাঙ্গণ, তাঁর পুলকস্পর্শে জীবনের সমস্ত দৈন্য সার্থকতায় উঠবে ভ'রে। তখন—

নীরবে তার চিরদিনের ঘুচিবে সন্দেহ,
কূলে আসবে নেমে। [৫নং]

এই যে বিশ্বকল্যাণের জন্য আত্মার নীরব তপস্যা, এই তপস্যাই অন্য দিক দিয়ে পরিপূর্ণতার পিয়াসী মানবাত্মাকে মৃত্যুর মধ্য থেকে অমৃতকে খুঁজে আনতে যুগে যুগে প্রবুদ্ধ করেছে। অমৃতলোকের যাত্রাপথে আত্মার মাঝে বেগ সঞ্চার করেছে এই তপস্যার মঙ্গলবুদ্ধি আর বিশ্বকল্যাণের মন্ত্রধ্বনি। নিখিল বিশ্বের প্রাঙ্গণে যখন যুদ্ধের কলরোল রক্তকল্লোলের সঙ্গে জেগে উঠেছে, তখন শুধু এই কথাই মনে হয় যে, পুরাতন সঞ্চয় নিয়ে বেশিদিন আর বেচাকেনা চলবেনা। যখন 'মূর্চ্ছিত বিহ্বলকরা মরণে মরণে আলিঙ্গন' তখন কবি-আত্মায় জেগে উঠেছে নূতন স্বপ্ন,—'তুফানের মাঝখানে নূতন সমুদ্রতীর পানে, দিতে হ'বে পাড়ি।' মানব-ইতিহাসের যিনি কর্ণধার—কবি যেন তাঁর ডাক শুনতে পেয়েছেন। তাই 'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার'-পানে চেয়ে কবি এক শান্তির সত্যকে দেখতে চান। যুদ্ধের মৃত্যুময় অগ্নিসাগর পার হ'য়ে নূতন যুগের দ্বারে পৌঁছতে হবে। অজানা সমুদ্রতীর এবং অজানা এক দেশ,—অথচ সেই দেশের পবনেই যেতে হ'বে নব জীবনের অভিসারে। উন্মত্ত দুর্দিন যদি মাথার উপরে বিরাট এক বিভীষিকা নিয়ে বিরাজ করে, তবুও চিত্তে জাগিয়ে রাখতে হ'বে অন্তহীন আশা, পথে চলার জন্য রাখতে হ'বে অন্তরের সত্য এবং মঙ্গলের পিপাসা! এই দুর্দিনের গুরুভার বুকে বহন ক'রে কাকেও নিন্দা করা চলে না। দুর্দিন যে আসে সে একজনের পাপে নয়, বহুজনের পাপে। তাই দুর্দিনের এই কালোছায়ায় ঘেরা জীবনযাত্রার জটিল গ্রন্থিকে আমাদের তো উন্মোচন করতেই হ'বে। 'নূতন সৃষ্টির উপকূলে' 'নূতন বিজয়ধ্বজা তুলতে হ'বে। কিন্তু তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে অকম্পিত কণ্ঠে আমাদের সকলকে বলতে হ'বে—

তোর চেয়ে আমি সত্য, এ-বিশ্বাসে প্রাণ দিব দেখ,
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক। [৩৭নং]

আত্মিক গতির সত্যচিন্তায় বলীয়ান হ'য়েই প্রাণ বিসর্জন করা চলে। এই বিসর্জনের মধ্যে কোন ভয় নেই। কেন না, শান্তি ও মঙ্গলই চিরন্তন সত্য; অশান্তির ঘূর্ণি যে-প্রলয়-কল্লোলকে জাগিয়ে তোলে, তার বিরুদ্ধে এ যেন আত্মারই জয়ঘোষণা! কারণ আত্মা তার গতিপথে এগিয়ে চলার বেলায় এটুকু জেনে নিয়েছে, সত্যের সম্মুখে হীনতা, নীচতা, পাপ সর্বদাই নিজের কুণ্ঠিত লজ্জায় মুখ লুকিয়ে রাখতে চায়। তাই এই সত্যকে পাথেয় করেই মৃত্যুর অন্তরে আমাদের প্রবেশাধিকার নিতে হ'বে আর খুঁজে নিতে হ'বে আত্মাকে। ঠিক এইজন্যই সংগ্রামের রক্তাক্ত ভয়াবহতা স্বীকার ক'রেও সত্যকে লাভ করবার জন্য 'প্রভাত আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো' সহস্র বীর আত্মোৎসর্গ করার জন্য ছুটে চলেছে। যদি এই আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে নূতন স্বর্গ লাভ করা যায়, তবে সে বিশ্ববিধাতা এই আত্মত্যাগীদের কাছে ঋণী হ'য়ে থাকবেন! আত্মিক শক্তির গতিতে তারা যে মৃত্যুভয় লঙ্ঘন ক'রে নূতন জীবনের জয়ধ্বনি দিয়ে যাচ্ছে! মৃত্যুভয়কে লঙ্ঘন করেই তো মর্ত্যের সীমাকে পার হ'য়ে যাওয়া যায়। মৃত্যু ও দুঃখজয়ের মধ্য দিয়েই মানবাত্মা ভূষিত হ'য়ে ওঠে দেবত্বের অমর সৌন্দর্যে। মানবাত্মা তাই যাত্রা করেছে যুগ থেকে যুগান্তরে,—অনুপ্রেরণার মতো প্রিয়জনের অন্তরের মধ্যে বাস ক'রেও। স্থিরতাই তো সব কিছু নয়। সুদূর আকাশ-নীড়ের যে-নীহারিকা লোক, সেই লোকের অগণিত নক্ষত্রদল তো স্থিরতার মধ্যে থেকেও

আলোক-বর্তিকা জ্বালিয়ে নিয়ে অন্ধকারের পথেই যাত্রী হ'য়ে চলেছে। তাই ছবির দিকে তাকিয়ে স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে—

চির চঞ্চলের মাঝে তুমি কেন শান্ত হ'য়ে রও ? [৬নং]

ছবির রেখাবন্ধনটি হয়তো আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির কাছে কোন আবেদনই জানায় না ; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের স্পর্শশক্তির মধ্যে যা' পাই, তাই কি সব সত্য ? সত্য যা, তা' অন্তরের উপলব্ধির গোচরে এসেই ধরা দেয় এবং উপলব্ধ সত্যের মধ্যেই তো সৌন্দর্য, আনন্দ এবং রস আছে। সত্তায় যদি কিছুমাত্রও আমরা অনুভব করতে পারি, তাতে আমরা সৌন্দর্যকে দিতে পারি সম্মান, দিতে পারি অন্তরের মাধুরী-মেশানো স্বীকৃতি। স্নেহকাতর মানব-হৃদয় রেখাবন্ধনে শিল্পায়িত সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে এমনি ক'রে কতই না প্রশ্ন করে। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে, প্রতিকৃতিটি কবির পরলোকগতা পত্নীর। এলাহাবাদে এক আত্মীয়ের গৃহে লোকান্তরিতা পত্নীর ছবিটিকে দেখে যে-আবেগ-বিভোরতার মধ্য দিয়ে সত্যোপলব্ধি হয়েছিল কবির মনে, তারই প্রকাশ এই কবিতায়। ঝ'রে পড়া ফুলের পাপড়িকে দেখে মর্মকোষের শাশ্বত বস্তুর অনুভব এখানে ছন্দিত রূপের মধ্য দিয়ে ভাষামুখর হ'য়ে উঠেছে।

শুধু কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা যে-সৌন্দর্যদর্শন, সেই দর্শনের মধ্যে অনেক ফাঁক আছে। এই যে ধূলি আর এই যে ফুল, 'বসন্তের মিলন-উষায়' ধরিত্রীর অঙ্গে নূতন পত্রলেখা এঁকে দেয়, বিশ্বের চরণতলে যে-তৃণ লীন হ'য়ে গিয়েছে, তারাও চঞ্চল এবং এই চাঞ্চল্যের পথ ধ'রেই তাদের বীজরূপী অস্তিত্বের স্ফুরণ ঘটে। তাই তারা যেমন জীবন্ত, তেমনি সত্য। তেমনি নিশ্চয়তার অন্তঃপুরে বাঁধা প্রিয়জনের প্রতিকৃতির নিস্তব্ধতাই কি একমাত্র সত্য ? সেই প্রতিকৃতির জীবিতকালের আত্মা কি কোনরূপে আনন্দস্পন্দন জাগিয়ে তোলে না প্রিয়জনের অন্তরের গোপন দেশে ? এই প্রতিকৃতির যে-মানুষ, একদিন সে সকলের সঙ্গে পথে পথে চলতো, বিশ্বের লীলাছন্দে তার শ্রাবণের ছন্দ লীলায়িত হ'য়ে উঠ্‌তো। নিখিলের পটভূমিকায় রূপের তুলিকা ধ'রে রসের মূর্তি এঁকে দিত, এবং সেই যেন ছিল এই বিশ্বের সুগভীর আনন্দবার্তার মূর্তিমতী বাণী ! ধরিত্রীর তৃণ হ'তে আরম্ভ ক'রে শশী রবি পর্যন্ত যার যার গতি-চাঞ্চল্যের মাঝে প্রাণসত্তার পরিচয় দিয়ে চলেছে। কবিও আপনার সুরে দূর থেকে দূরে চলেছেন ; কিন্তু প্রাণহীন এক শুব্ধ আলেখ্য লেখায় সকলের আড়ালে ছবি নিস্তব্ধ হ'য়ে রয়েছে। তাই প্রশ্ন জাগে—'তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি !' ছবির দিক দিয়ে যে-নিস্তব্ধতা, তা' ভেবেই মনে হয়,—ছবি নিশ্চয়ই কেবলমাত্র 'ছবি' নয়। স্থির রেখার বন্ধনে 'শব্দহীন ক্রন্দনে'র ঢেউ তুলে' দিয়ে 'চির নিশ্চলের' রাজ্যে নিজের আসনটি পেতে রাখবে এতো হ'তে পারে না। কেননা, সে তো একদিন অন্তরের গভীরতা দিয়ে চিত্তস্পন্দনের নিঃসংশয় প্রকাশের দ্বারা জীবনের পথে, প্রতি পদক্ষেপের সচকিত ধ্বনির দ্বারা তাঁর জীবনকালের প্রাণ-কল্লোলকে প্রকাশ করতো এবং চিৎশক্তির এক সুগভীর আনন্দকে করতো রূপায়িত। অরূপ এবং চিন্ময় আনন্দের ভিতর দিয়েই তো বিভিন্ন রূপে জীবনের প্রকাশ ঘটে ! এই ছবির মধ্যে যে-রূপ আছে, সেই রূপেও সে আনন্দের সমুজ্জ্বল প্রকাশ। কারণ আনন্দ শাশ্বত, আনন্দ অমৃত ! 'আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্ বিভাতি।' তাই যদি হয়, তবে এই ছবির ভিতর শিল্পীর তুলিকাপাতে তার যে-প্রকাশ, যে তো আনন্দেরই প্রকাশ ! আনন্দের এই রূপগ্রহণ তো মিথ্যা হ'তে পারে না ! আনন্দের মাধ্যমেই সে প্রেরণা-রূপিনী হ'য়ে জেগে থাকে অন্তরে ! যাকে অন্তরের নিভৃতে গভীরভাবে ভালোবাসা যায়, তারই প্রেরণার স্পর্শপুলকে এই ধরণী যেন হ'য়ে ওঠে মধুময়ী। প্রকৃতির রূপসত্যে তার প্রাণ সৌন্দর্যকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে সৃষ্টির আনন্দবাণীকে মাধবীবনের মর্মর ধ্বনিতে মুখর ক'রে তোলে !

চল-ধর্মী বিশ্বের রূপবাসনা এক নিগূঢ় সুন্দর পরিণতিকে কামনা ক'রে যাত্রা করেছে অজানার উদ্দেশে,—আর শিল্প, শিল্পীর তুলিকা হ'তে তার সমস্ত সৌন্দর্যের পূর্ণতার সুষমা নিয়ে বিশ্বের রূপবাসনাকে চাইছে রূপায়িত করতে। আমরা পথ চলার বেলায় চোখে-দেখা ফুলগুলিকে ভুলে যাই। তাই একটি ভুলের শূন্যতাকে সুরে সুরে ভরে তুল্‌তে প্রয়াস পাচ্ছে, আর একটি বিস্মৃতির মর্মে বসে রক্তে দোলা দিয়ে যাচ্ছে ! বিশ্বের প্রাণসংগীতের একমাত্র সুর হ'লো চলা। এই চলার সুরে মেতে আনমনে পথ চলবার বেলায় অনেক কিছুর দিকেই আমরা ফিরে তাকাই না। কিন্তু তাই ব'লে তারা মিথ্যে হ'য়ে যায় না। সেইজন্যই হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনটি নয়নের সম্মুখে না থেকে নয়নের মাঝে ঠাঁই ক'রে নিয়েছে। এইজন্যই সে আজ কবির অন্তরে কবি। হারিয়ে-যাওয়া অন্ধকারে যে-জীবন গিয়েছে নিস্তব্ধ হ'য়ে, সে আজ শিল্পের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে 'আর্টকে' যেমন সার্থক করেছে, কবির অগোচরে কবিমানসকেও সত্য ও সুন্দরের পথে প্রেরণারূপিণী হ'য়ে পরিচালিত করছে। এক মানবীর আত্মা এখানে প্রেরণারূপিণী ! 'বলাকায়' ছবি নিশ্চলতার মাঝখানে থেকে চলার শক্তিকে প্রকাশ করার ছন্দ-আলেখ্য। ভবিষ্যৎ চলার পথে যেমন জীবনকে পরিচালিত করার বাসনা আছে 'বলাকায়', তেমনি অতীতের অনুভূতির অবিচ্ছিন্ন ধারাকেও স্বীকৃতি দিয়ে বিশ্বপ্রবাহের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার প্রয়াস আছে। কবি-জীবনের অতীত-অনুভূতির সত্য-চেতনার ধারা এসে মিশেছে 'বলাকার, এই 'ছবি' কবিতায়।

আর 'বলাকার' 'শাজাহান' কবিতার দিকে যখন তাকাই তখন দেখি, সম্রাট শাজাহান জানতেন 'জীবন যৌবন ধন মান' কালস্রোতে ভেসে যায় ; এবং জানতেন বলেই তাঁর ব্যথা গভীর দীর্ঘশ্বাস প্রতিদিন আকাশকে সকরুণ ক'রে তুলুক, এই তাঁর মনে আশা ছিল। তিনি জানতেন, 'হীরা মুক্তা মাণিক্যের ঘটা' দিগন্তদেশে ভেসে-ওঠা বর্ণবিলাসের মতো লুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর শোকের একবিন্দু অশ্রু কালের কপালে চির উজ্জ্বল হ'য়ে থাক এও তার অন্তরের আশা। কিন্তু এই আশাতেই সব শেষ নয়। মানব-হৃদয় কালের স্রোতে কোথায় যেন ভেসে চলেছে। তার কোনদিকে চাইবার যেন অবকাশ নেই। ভুবনের ঘাটে ঘাটে, জীবনের খরস্রোতে ভেসে ভেসে সমস্ত বোঝাই শূন্য ক'রে দিতে হয়। হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চয়কে পথপ্রান্তে দিগন্তে ফেলে যেতে হয়।

তাই সম্রাট তাজমহলের সৌন্দর্য-মালাটি গেঁথে নিয়ে মহাকালকে সৌন্দর্য-ব্যাকুলতায় ভুলিয়ে স্থিরতার মাঝখানে রাখতে চেয়েছিলেন। তার রাজ্যের ভাঙা-গড়াকে, জীবন-মৃত্যুর ওঠাপড়াকে তুচ্ছ ক'রে তাঁর সেই চিরবিরহের বাণী যেন বেজে উঠ্ছে—

ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া। [৭নং]

কিন্তু মানবাত্মাকে বিস্মৃতির পথ দিয়ে বের হ'য়ে যেতেই হয়; স্মৃতির পিঞ্জর দ্বারকে তাঁর খুলে দিতেই হয়। 'স্মরণের আবরণ দিয়ে' ঢাকা সমাধিমন্দির তাই চিরদিনের জন্য স্থির হয়েই থাকে। কারণ সমাধিকেই আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখতে পারে, জীবনকে কখনো বেঁধে রাখতে পারে না। কেননা, স্মরণের গ্রন্থি ছিন্ন ক'রে সে ছুটে যায় নিত্য নূতন পূর্বাচলে। তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে, তাই সে বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।' তাই মহারাজরূপী কোন মানবাত্মাকে কোন মহারাজাই বেঁধে রাখতে পারেনি। সমুদ্রস্তনিত পৃথিবীতে জীবনের উৎসব থাকতে পারে, কিন্তু সেই জীবনের শেষে এই ধরণীকে মৃৎপাত্রের মতো সেই আত্মা নিঃসংকোচে ফেলে চলে যায়; কেননা, তার কীর্তির চেয়েও সে মহৎ। তার চিহ্ন পড়ে থাকে, কিন্তু সে কোথাও বাঁধা পড়ে না। যে-প্রেম সম্মুখ পানে চলবার পাথেয় জোগায় না,—আর যে-প্রেম চলার পথের মাঝখানে নিজ হৃদয়ের সম্ভাষণ জানায়, তাকে পথের ধুলাতেই ফেলে দিয়ে অজানা পথের অগ্রগতিকেই স্বীকৃতি দেয়। সেই অজানার পথে চলার কালেই জীবনের মালিকা হ'তে যে-প্রেমের বীজটি খসে পড়ে সেই শুধু কেবল অজানার পথগামী পথিককে স্মরণ ক'রে বলে,—

প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,

রুধিল না সমুদ্র পর্বত—[৭নং]

স্মৃতিভারে বিজড়িত থাকে সেই প্রেমের বীজটি; কিন্তু মানবাত্মারূপী পথিকের সে যাত্রা 'প্রভাতের সিংহদ্বার পানে,—কারণ সে ভারমুক্ত।

শিল্পের দ্বারা প্রেমকামনার এক পূর্ণরূপ দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা মানবাত্মার আছে, কিন্তু যেহেতু সে নিজে জন্ম জন্মান্তরের গতিপথে পরিপূর্ণতার আকাঙ্ক্ষী, ঠিক সেইজন্যই শিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পীর জীবনে এক বিরাট অপূর্ণতাও আছে। জীবনের পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাকে আর্টের পূর্ণতার মাধ্যমে কিছুতেই রূপায়িত করা চলে না। মানবাত্মারূপী শাজাহান তাই বৃহত্তর পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষার গতিতে চির অজানার যাত্রী। এইখানেই রবীন্দ্র জীবন-দর্শনে আত্মার গতির অনিবার্যতা। সেখানে যেন কবির এই কথাই বারংবার ধ্বনিত হয়—

চলতে যাদের হ'বে চিরকালই

নাইকো তাদের ভার। [৪৩নং]

'ছবির মধ্যে কবি তাঁর প্রিয়ার ভালোবাসার অতীত চেতনাকে পরিস্ফুট ক'রে নিয়ে নিজের জীবনের অন্তরতর প্রেরণাকে খুঁজতে চেয়েছেন, আর 'শাজাহান' কবিতায় মানবাত্মার চিরন্তন যাত্রাকে প্রত্যক্ষ ক'রে জীবনের পূর্ণতাকে শিল্পগত পূর্ণতার উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। এইখানেই আত্মার গতির শ্রেষ্ঠত্ব।

এর পরে কবির উপলব্ধির জগতে রূপ ধ'রে এসে দাঁড়িয়েছে সৃষ্টির গতি। সমগ্র সৃষ্টিই যেন এক বিরাট গতির অনুপ্রেরণায় এগিয়ে চলেছে সম্মুখের দিকে। কোন্ যেন এক বিরাটের অভিসার-পথে যাত্রা করেছে আমাদের এই প্রত্যক্ষীভূত বস্তুবিশ্ব এবং আকাশব্যাপী নিরন্ধ্র অন্ধকারের পটভূমিকার ভ্রাম্যমান্ নিখিল চরাচরের অদৃশ্য গতিরূপ প্রত্যক্ষ করবেন কবি। এই গতিরূপের বিরাট প্রবাহই 'বিশ্বনদী। অন্ধকারই যেন গতিময় সৃষ্টিধারার বেগ-প্রবাহ, আর আকাশলোকে অগণিত নক্ষত্রের যে-পুঞ্জীভূত রূপ প্রকাশমান, তা' যেন সেই বিপুল বেগ থেকে জেগে ওঠা সৃষ্টিধারার উপরিস্থিত ফেনপুঞ্জ। এই যে বিরাট বিশ্বপ্রবাহ তার স্পন্দনে শিহরে শূন্য, রুদ্র কায়াহীন বেগে।

এই বিশ্বনদী তার চলার প্রবাহধারায় কখনো ভৈরবী রূপধারিণী, কখনো বা বৈরাগিণী; আর তার চলার রাগিণীতে নিরুদ্দেশ যাত্রার শঙ্কাহীন সুর। বিশ্বপৃথিবী অন্ধকারের আবরণে তন্দ্রাভিভূত, তখনও সে বয়ে চলেছে 'পথের আনন্দ বেগে'; তার অন্তরের যত কিছু পাথেয় চতুর্দিকে বিলিয়ে দিয়ে এক উদ্দাম গতিবেগের সঙ্গে চলার পথকেই বরণ ক'রে নিয়েছে। ওই উদ্দাম গতিবেগ আছে বলেই তার সমস্ত কিছু দুই হাতে ফেলে দিয়ে যায়; সঞ্চয়ও করে না, কুড়িয়েও কিছু নেয় না।

পূর্ণতার মধ্যেও একটা নিঃস্বতার ভাব আছে, কিন্তু নিঃস্বতার মাঝে একটি পবিত্রতার স্পর্শ আছে। যে-মুহূর্তে পূর্ণতা আসে, সেই মুহূর্তের শুভ লগ্নটিতে মনে হয় যেন কিছুই নেই এবং নেই বলেই পবিত্রতার এক স্নিগ্ধ আবেগ তার সমস্ত যাত্রাপথকে ভ'রে তোলে। তাই 'অলক্ষিত চরণের অকারণ আবরণ চলা'র ছন্দময়ী গতিতে চঞ্চলা অপ্সরী-রূপিণী বিশ্বমন্দাকিনী কবি-হৃদয়ে চিরচঞ্চলের পদধ্বনিকে জাগিয়ে তুলেছে, কবির নাড়ীর রক্তে জেগে উঠেছে তাই সমুদ্রের ঢেউ, অন্তরের কোণে বাতাসে জেগে-ওঠা আরণ্য-ব্যাকুলতার স্পন্দন-ধ্বনি। কবি উপলব্ধি করেছেন সৃষ্টির গতিকে আঁধাররূপিণী বিশ্বনদীর পানে চেয়ে। বিশ্বনদীর যে গতিপ্রবাহের বেগে আকাশ নির্মল নীলাঞ্চিত সজ্জায় সুন্দর ও পবিত্র, সেই গতিবেগের অনাদিকালের উৎসদেশ থেকে যুগে যুগে নির্ঝরের অবিচ্ছিন্ন ধারার মতো রূপ হ'তে রূপে, প্রাণ হ'তে প্রাণে স্খলিত হ'য়ে কোথায় কোন্ পরিপূর্ণ সার্থকতায় জীবনকে অভিষিক্ত ক'রে দিতে, জীবনের সমস্ত সঞ্চয়কে বিলিয়ে দিতে কবি-আত্মা ছুটে' চলেছে। এখানে সৃষ্টির গতি ও আত্মার গতি যেন এক হ'য়ে মিশে' গিয়েছে।

তীরের সঞ্চয়কে কবি তাই পিছনে ফেলে যেতে চান, কারণ সঞ্চয়ের মধ্যেই জমে' ওঠে মর্মলোকের শত সহস্র আবর্জনা। বিশ্ব-প্রবাহ ধারায় বিশ্বের অন্তরাত্মার যে-প্রকাশ ঘটছে তাই হচ্ছে গতির সত্য। এই গতির সত্যটিতেই কবিজীবনেরও পরম প্রতিষ্ঠা। জন্ম-জন্মান্তরের নিরবচ্ছিন্ন ধারাপ্রবাহে এ-জন্মের কোলাহলকেও পিছনে ফেলে অ-কূলের পবনে ভেসে চলেছে। গতির সত্য যে-আনন্দরূপের রূপায়ণ, তাই জীবনেরও অমৃতরূপ। কবির এই গতি-ভাবনা জীবন-চেতনার মর্মমূলে অমৃতরূপকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। যে-দ্বন্দ্বসংঘাতের

আবর্তলীলার মাঝখান দিয়ে জীবনের অগ্রগতি, সেই জীবনই এখানে গতির ছন্দকে অন্তরে নিয়ে বিশ্বদেবতার পূর্ণতম প্রকাশকে শান্তরূপে গ্রহণ করছে। অনন্ত জীবন-ধারায় শুচিস্নাত মানবাত্মার কল্যাণরূপ যেমন প্রকাশিত হয়, তেমনি পরমপুরুষেরও উপলব্ধি ঘটে। চঞ্চলের জন্য কবির সমস্ত অনুভবের মধ্যে এক গভীর ব্যাকুলতা সংগীতের মতো ছড়িয়ে আছে ; কারণ সৃষ্টির গতিচাঞ্চল্যের মধ্য দিয়েই আত্মার প্রকাশ ঘটে।

সৃষ্টির মধ্যে এই যে গতির দিক, তা' আমাদের চতুর্দিকের আপাত অচল বৃক্ষ এবং বীজের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করে। জড়প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই আত্মগোপন ক'রে রয়েছে এই সৃষ্টির গতি। চির-চঞ্চলের প্রাণসত্তা যৌবন-বসন্তের সমস্ত মাধুর্য নিয়ে প্রকৃতির প্রতিটি স্তরে এক আবর্ত সৃষ্টি করে রাখে। সেই চির চাঞ্চল্যের মর্ম-ধ্বনিটিই যেমন চকিত ক'রে তোলে 'অন্ধকারের গিরিতট তলে' সারি সারি দেবদারুতরুকে, তেমনি 'শব্দের বিদ্যুৎছটা'য় সন্ধ্যার গগনকে। মনে হয়, ঝঞ্ঝার মদিরা পান ক'রে আনন্দের অট্টহাসি তুলে' হংস-বলাকার দল 'বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে'। তপস্যা-মগ্ন স্তব্ধতার ধ্যান-গভীরতাকে যেন ভেঙে দিল দেবলোকবাসিনী অপ্সরা-গণের নূপুর-ঝংকার। উড়ে যাওয়া পাখীর পাখার বাণীতে জেগে উঠলো—

পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ। [৩৬ নং]

গতিচঞ্চল হংসবলাকা ধরিত্রীর যেন সমস্ত স্তব্ধতার আবরণ খুলে' দিল, এবং আবরণ উন্মোচনের মুক্তপথ দিয়ে 'লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা' অংকুরের পাখা মেলে দিয়ে প্রাণের এক অনন্তরাজ্যে নিজের আত্মাকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইল। শুধু তাই নয়, অরণ্যানীর নিশ্চল তরুরাজিও উন্মুক্ত ডানায় 'অজানা হইতে অজানায়' পাড়ি জমাতে চায়। স্থিরতার অচল বন্ধনে যে নক্ষত্র বাঁধা রয়েছে তাদের অন্তরে জেগে রয়েছে এক গতির আলো, এবং সেই আলোকে অন্ধকারও চকিত হ'য়ে উঠছে।

মানব-হৃদয়ের নিভৃততম যে-বাণী, তা' কোন্ অতীত যুগের বিস্মৃতির অতল থেকে বের হ'য়ে অলক্ষিতে যুগ থেকে যুগান্তরের পথে চলছে ; কারণ এই নিখিল বিশ্বে নিশ্চল বলে' কিছু নেই। 'বলাকা'র পাখার মতো মানব-হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা আলো অন্ধকারের রহস্যঘন পথ দিয়ে যাত্রা করেছে—এর শেষ কোথায় কে জানে। গতির মধ্যে বিশ্বসত্যের এক অনির্বচনীয়তা আছে বলেই নিখিলের পাখায় চিরন্তন ছন্দসংগীত—

'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে। [৩৬নং]

কিন্তু এ তো সৃষ্টির গতিসত্যের একদিক। জীবনে প্রেমেরও তো একটি দিক আছে। যে-প্রেমের বেগে জীবনের গতিপথ আরও সুন্দর হ'য়ে ওঠে, অন্তর ভ'রে ওঠে পরমতম উপলব্ধিতে, সেই কবি-অন্তরের প্রেমের বেগও সঞ্চারিত হয়েছে এই 'বলাকা' কাব্যে।

'বলাকা' কাব্যে মানব-ইতিহাসের তরীটিকে যেমন নবযুগের আনন্দতটে বাঁধবার ইচ্ছে আছে, তেমনি নিজ জীবনতরীটিকেও বন্ধন-সীমার অতীত তীরে মুক্ত উদার বিস্তৃত অসীমের ঘাটে নিয়ে অকূলের পানে ভাসিয়ে দেওয়ার বাসনা জাগে। এই বাসনার মূল থেকেই 'বলা-কার' যুগে বিশ্বদেবতার সঙ্গে কবি-হৃদয়ের নূতনভাবে পরিচয় ঘটে। এই-খানেই গড়ে উঠেছে 'বলাকার' গতিলোকের সঙ্গে কবি হৃদয়ে এক নূতন ভাবলোক। অসীমের প্রতি চিত্তের যে পিয়াসাভরা ভাবচেতনা, আর গতির যে দোলাচাঞ্চল্য, তাই গতির সঙ্গে ভাবমাধুর্যের সংগম করেছে। এই ভাবলোকেই কবির প্রেমের বেগ।

এই ভাবলোকের মধ্য থেকেই কবি যৌবন-চেতনাময় মনোভাবনা নিয়ে নারীর দু'টি রূপকে আবার ধ্যান করেছেন। 'বলাকার' যুগে এই নারীরূপের কল্পনায় গতির আকর্ষণ যে না আছে তা নয়,—কারণ গতি-শীলতার আবেগেই তাঁকে অসীমের অভিমুখী করেছে। এই গতিশীলতা ও জীবন চাঞ্চল্যের মধ্যেই তিনি অপরূপ সৌন্দর্যরূপিণী উর্বশীল গতির চঞ্চলতাকে প্রাণস্পন্দনে জাগিয়ে তোলে, আর কল্যাণী লক্ষ্মী শুভ্র নির্মল স্নিগ্ধ কামনায় এবং শান্তির পূর্ণতার মধ্যেও যে-আনন্দ, তাই জাগিয়ে দেয়। একজনের মধ্যে চঞ্চলতার আবেগ, আর একজনের মধ্যে পরি-পূর্ণতার 'লাবণ্যের স্মিত হাস্য সুধা।' নারীর একরূপ যৌবনকে জাগিয়ে দেয়, উতলা ক'রে তোলে অজানার আকর্ষণে, আর একটি রূপ জীবন-মৃত্যুর পবিত্র সংগমতীর্থে 'অনন্তের পূজার মন্দিরে স্নিগ্ধ শান্ত এক ভাব-জীবনে প্রবেশাধিকারও দেয়। সেইদিকেই কবিমনকে টেনে নেয়, কারণ সেখানে আছে শান্তির পূর্ণতা। নূতনভাবে কবিহৃদয়কে আকুল ক'রে তোলে।

আবার এই ভাবলোকের মধ্যে কবির জীবনচেতনা মৃত্যুকেও পরম বরণীয় ক'রে তুলেছে। মৃত্যুর ভূমিকাও জীবনের অনবচ্ছিন্ন গতিশীল-তার মধ্যে তুচ্ছ নয়, বরং বিশেষ একটি গুরুত্ব আরোপ করেছে এখানে। ভ্রমণশীল বিশ্বভুবনের অদৃশ্য এক বিরাট প্রবাহধারাকে উদ্দেশ ক'রে কবি বলেন—

তুলিতেছ শুচি করি
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।
নিঃশেষ নির্মল নীলে বিকাশিছে নিখিল গগন। [৮নং]

কবি বিশ্বাস করেন, মরণের শুচিস্নান না হ'লে বিশ্বজীবন যুগ যুগান্তরে পরিপূর্ণতার ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে না। আবার এই মরণের সিংহদ্বার পার হয়েই চিরদিনকার যৌবনকেও অনুভব করা যায়। কবির কাছে যৌবনের বার্তাবহ বসন্ত তাই বারংবার এসে বলে যায়—

মরণের সিংহদ্বার
হ'য়ে এসো পার ;
ফেলে এসো ক্লান্ত পুষ্পহার। [১৩নং]

শুধু তাই নয়, এই মরণের হাত ধরেই জীবনের এপারে ওপারে এই চিরন্তন যৌবনের সঙ্গে বারংবার দেখা হবে। জীবন চেতনার অঙ্গনে যৌবনের এই হচ্ছে নির্দেশ।

'বলাকা'র এই ভাব সৃষ্টির পর্যায়ে জীবন-চেতনার সঙ্গে কবির

অরূপের ধ্যান ভাবনাও এসে যুক্ত হয়েছে। কারণ, অরূপের অমৃত-ভাবনা নিয়ে গীতাঞ্জলির যুগেই কবি যাত্রা করেছিলেন—সেই অরূপ কবির কাছে অজানা। এই জন্যই 'বলাকা' যুগের জীবন চেতনার সঙ্গে একটি বৈরাগ্যের অনুরঞ্জন জড়িয়ে আছে। এই জীবন চেতনায় বস্তুময় পৃথিবীর ভোগাকাঙ্ক্ষার কোন রেশই যেন নেই। 'চিত্রা'র যুগে মাঝে মাঝে ভোগময়ী বস্তু পৃথিবীর জন্য কবিমানসে কামনা জেগেছে, বস্তু-নিরপেক্ষ সৌন্দর্যস্বর্গ থেকে বিদায় চেয়েছেন কবি—কিন্তু 'বলাকা'র যুগে কবি-মানসে সেই দ্বন্দ্বময়তা নেই। চিরন্তন সত্যের এক অনিবার্যতার ধ্যানে মগ্ন হ'য়ে শুভ্র-সুগভীর জীবন চেতনায় কবি জাগ্রত হয়ে উঠেছেন।

সৃষ্টির গতিসত্যকে উপলব্ধি করতে যেয়ে বিশ্বস্রষ্টার দিকে কবি দৃষ্টি না ফিরিয়ে পারেন নি। জগতের মধ্যে থেকে কবি যে-সত্যকে অনুভব করছেন, যে-সত্যের উপলব্ধি থেকে জগতের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা জেগেছে কবির মনে, সেই জগৎস্রষ্টা বিশ্বদেবতার প্রতিও হৃদয়-শতদলকে কবি তুলে ধরেছেন। বিশ্বদেবতার সমস্ত কিছুর পূর্ণতার মধ্যেও কবির একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। কবিকে না হলে তাঁর পূর্ণতার অনুভব সম্পূর্ণ হতো না। যেহেতু তিনি নিত্যপূর্ণ, ঠিক সেই জন্য তাঁর নিজের কোন আনন্দবোধ নেই; আনন্দের অমৃতস্বাদ গ্রহণ করতে হয় কবির হৃদয়-পাত্রটি একবার রসে পূর্ণ করে দিয়ে, আবার তা' গ্রহণ করে। এই দেওয়া আর নেওয়ার মধ্য দিয়েই কবির অন্তরের সঙ্গে বিশ্ব-দেবতার চিরদিনকার বন্ধন।

মানুষেরই শত সহস্র সুখ-দুঃখ, বাসনা-কামনার অপূর্ণতার মধ্য দিয়েই বিশ্বদেবতা নিজের সৃষ্টিকে অনুভব করেন, উপলব্ধি করেন নিজের পূর্ণতার ঐশ্বর্যকে। মানবের সঙ্গে বিশ্বদেবতার এই যে অন্তরতর সম্পর্ক, এই সম্পর্কের কথা চিন্তা করেই কবির মনে জেগে উঠেছে বিশ্বদেবতার প্রতি অফুরন্ত প্রেম এবং এই প্রেমের বেগ নিয়েই কবি সেই দিকে চলেছেন, যেখানে আছে অন্তরের বিকাশ। এই বিকাশের মধ্যে আছে আনন্দ। কবির অন্তর-বিকাশের প্রতীক্ষায় সেই আনন্দময় পরম দেবতা বসে' থাকেন, আর সেই বিকাশ যখন প্রত্যক্ষ করেন, তখন তাঁর আনন্দ ফাল্গুনের বিকশিত পুষ্পস্তবকের হাসি-মাধুর্যে ধরা দেয়। এই উপলব্ধিতে কবি তখন পরম তৃপ্তির সঙ্গে বলেন—

জীবন হ'তে জীবনে মোর পদ্মটি যে ঘোমটা খুলে খুলে
ফোটে তোমার মানস-সরোবরে—
সূর্যতারা ভিড় ক'রে তাই ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কূলে কূলে
কৌতূহলের ভরে। [৩৩]

বিশ্বদেবতার মানসসরোবরেই কবির জীবন-পদ্মটি দলগুলি তার খুলে দেয়। একজনের মানসসরোবরে আর একজনের জীবনপদ্মের বিকাশ-সাধনা; এই সাধনার মধ্যেও একটি গতি আছে। জীবন থেকে জীবনের পথ-পরিক্রমায় প্রাণপদ্মের দলগুলি খুলে খুলে এই সাধনা।

প্রেমের বিকাশ-চেতনায় জন্ম জন্মান্তরের ব্যাকুলতা রূপময় হয়ে ওঠে, প্রেমের রহস্য সম্পূর্ণতায় পরিণতি লাভ করে; কারণ সেই বিশ্বদেবতা রসস্বরূপ। রসের সাগরে ডুব না দিলে জীবনের গতিসত্যের রহস্যও ধরা পড়ে না। এই জন্যও 'বলাকা'র গতিবাদের মধ্যেও কবির মনে রস-স্বরূপের আনন্দধ্যান জেগে উঠেছে। তরঙ্গের গতিময়তায় সৌন্দর্যের রূপপদ্ম দেখা দিয়েছে। এইখানেই ফরাসী দার্শনিক বার্গসোঁর গতি-তত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গতিতত্ত্বের পার্থক্য। বার্গসোঁর গতিতত্ত্বে কেবল উদ্দেশ্যহীন, পরিণামহীন চলার জয়গান, আর রবীন্দ্রনাথের গতি-তত্ত্বে অধ্যাত্মদৃষ্টির স্থির বিশ্বাস। গতিতত্ত্ব দু'জনেরই, Elan vitalএর অপ্রতিহত শক্তিকে দু'জনেই স্বীকৃতি দিয়েছেন, কিন্তু একজন সৃষ্টির মূলে দেখেছেন শুধু নিরবচ্ছিন্ন গতিধারার প্রচণ্ডতাকে, আর একজন পরম সুন্দরের অলক্ষ্যকূলে শান্ত মধুর পরিণামকে, জীবনের মুক্তি সন্ধানের সঙ্গে অন্তরের মিলন-মাধুর্যকে। একজন অজানার দেশে 'বঁধুর দিঠি'র সন্ধান পান নি, আর একজন পেয়েছেন আর গভীর উপলব্ধিতে গেয়ে উঠেছেন—

তারে নিয়ে হলো না ঘর বাঁধা,
পথে পথেই নিত্য তারে সাধা—
এমনি ক'রেই আসা-যাওয়ার ডোরে
প্রেমেরই জাল বোনা। [৪৩নং]

এ-প্রেম চির যাত্রার পথের প্রেম। কিন্তু এ-প্রেমে যে-চেতনা, তাতে কেবল এই বাণী—

বঁধুর দিঠি মধুর হয়ে আছে
সেই অজানার দেশে। [৪৩নং]

বার্গসোঁর কাছে সেখানে বিশ্বসত্য কেবল 'unceasing life, action, freedom' এবং 'there are no things, there are only actions'—সেখানে রবীন্দ্রনাথের কাছে—

সেখানে আমি শোনাব তার কাছে
নূতন আলোর তীরে,
চিরদিন সে সাথে সাথে আছে
আমার ভুবন ঘিরে। [৪৩নং]

চিরন্তন গতিধারার সঙ্গে নিজের জীবনকে ভাসিয়ে দিয়ে 'নূতন আলোর তীরে' পৌঁছে কবি শুধুই পরিতৃপ্তিই লাভ করবেন না, সেই পরমতম সত্য যে তাঁর চিরদিনকার সঙ্গী, এই আত্মোপলব্ধিটিকেও জানাতে তিনি এতটুকু দ্বিধা করেন না। ভারতীয় আধ্যাত্মবাদের প্রজ্ঞা ও আত্মানুভূতি রবীন্দ্রনাথের জীবন-বেগের মধ্যেও এমনি করে মিশে গেছে। বিশ্বব্যাপী আনন্দ-চৈতন্যকে জীবনের চলার গতি সত্যের সঙ্গে মিশিয়ে না দেখলে অধ্যাত্মবাদী রবীন্দ্রনাথের মন শান্তি পায়নি এবং ঐক্যদর্শী ভারতীয় ধর্মের সাধক-মন জীবনের দুর্নিবার গতি সত্যকে স্বীকৃতি দিয়েও পরমতম প্রেমের প্রকাশ-মহিমার রূপদেহটিকে ছন্দলাবণ্যে গড়ে তুলেছে। আনন্দের অমৃত-চিন্তা জীবনের পরিণামহীন গতিচ্ছন্দকেই একমাত্র সত্য বলে মেনে নিতে পারে নি। চাঞ্চল্যের মাঝে এসেছে উপনিষদের রসবাদ। 'বলাকা'-কাব্যে সৃষ্টির মূলে গতিসত্যকে স্বীকৃতি দিয়েও রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন শান্ত-সুন্দর রস-স্বরূপকে প্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' তাই গতিতত্ত্বময় জীবন-চেতনায় আনন্দ-পরিণামের বার্তাবাহী।

'ভারতবর্ষে' শরৎচন্দ্রের আত্মপ্রকাশ

মণীন্দ্র চক্রবর্তী

প্রেরণা থেকেই সৃষ্টি। মানব জীবনের এই সনাতন মনোভাবটি না থাকলে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে গড়ে তোলা যায় না। শরৎচন্দ্রের জীবনে এমনি একটা অনুপ্রেরণা ছিল বলেই তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথম-প্রস্তুতি একটা সাধারণ রূপ নিতে পেরেছিল। অপরিণত বয়েসে তাঁর 'কাশীনাথ' সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথম যৌবনের সৃষ্টি হয়েছিল—'অনুপমার প্রেম', 'কোরেল গ্রাম,' 'বড়দিদি', চন্দ্রনাথ, হরিচরণ, দেবদাস, ও বাল্যস্মৃতি। শুভদা নামে একখানি উপন্যাস অসমাপ্তই ছিল। তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস পরে সেটা প্রকাশিত হয় অর্থাৎ ৫ই জুন ১৯৩৮ সাল।

শরৎচন্দ্রের বড়দিদিই সাহিত্যের হাটে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল ভারতীর পাতায় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। 'এ লেখা রবীন্দ্রনাথের না হয়ে যায় না' বলে বাংলার পাঠক সমাজ তা মেনে নিয়েছিল। তার কারণ ছিল, শরৎচন্দ্রের নাম ঘোষণা কয়েক সংখ্যায় করা হয়নি বলে। কিন্তু শরৎ-চন্দ্রের কাছেও এ সংবাদ ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত!

শরৎচন্দ্র নিজেকে বড় দুর্বল বলে মনে করতেন, যার ফলে তাঁর জীবনে একটা লক্ষণ দেখা দিয়েছিল—অধ্যয়নানুরাগী হয়ে থাকা। তাই বর্মার-প্রবাস জীবনে লেখার চাইতে বই পড়ার নেশাটাই ছিল শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে বেশী।

অথচ তাঁর এই সাধনার মধ্যে একটি মাত্র উপন্যাসের কথা আমরা জানতে পারি। সেটা হলো 'চরিত্রহীন।' চরিত্রহীনের কথা রেঙ্গুনের বন্ধুমহল ঘুণাক্ষরেও প্রথমে জানতে পারেন নি। কিন্তু একজন যিনি জেনেছিলেন তিনিই হলেন শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুন জীবনের অন্যতম সাহিত্যিক বন্ধু—যোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়। এঁর লিখিত 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র' নামে একখানি গ্রন্থ আছে। সেটা পড়লে আমরা শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুন জীবনের অনেক ঘটনার কথা জানতে পারি। তিনি যেমন শরৎচন্দ্রকে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছিলেন, তেমনি মনে জ্ঞানে জেনেছিলেন শরৎচন্দ্র একজন উচ্চস্তরের লেখক। অথচ শরৎচন্দ্র নিজেকে তা মনে করতেন না। তিনি ছিলেন আত্মপ্রচারের সম্পূর্ণ বিরোধী। কথায় কথায় একদিন যোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়কে শরৎচন্দ্র আক্ষেপ করে বলেছিলেন—"সরকার, আমাকে পিটিয়ে সাহিত্যিক করতে চাও, না? তাই বুঝি তোমাদের এত সমানুভূতি আর উৎসাহ! দুঃখ হয় সরকার, আমার দ্বারা বোধহয় আর কিছুই হবে না।"

এ কথার অর্থ আছে, তাৎপর্যও আছে। কারণ শরৎ-জীবনে নানা সংঘাত ঘটেছিল। যার ফলে তাঁর মনোবল ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়েছিল। ১৯১২ সনে রেঙ্গুনে গৃহদাহই তাঁর সাহিত্য জীবনে চরম বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। 'চরিত্রহীনের' পাণ্ডুলিপি ও 'নারীর ইতিহাস' ৪০০।৫০০ পাতার উপন্যাস দুটি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্র যে আবার সাহিত্য চর্চা শুরু করবেন এমন ধারণা তাঁর ছিল না। তিনি নিজেই একথা বলেছেন—"আমি তখন বিদেশে···প্রায় বছর দশেক পূর্বে কয়েক-জন তরুণ সাহিত্যিকের আগ্রহ ও একান্ত চেষ্টার ফলেই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়ে পড়ি।"

শরৎচন্দ্রের সত্যিকারের সাহিত্য জীবন শুরু হয় ১৯১৩ সালে। অখ্যাত 'যমুনার' পাতায়—'বিন্দুর ছেলে' 'পথ নির্দেশ', 'রামের সুমতি', প্রকাশিত হওয়ায় বাংলার পাঠক-মনে অনেক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সেটা সম্ভব হয়েছিল ১৯১২ সনে তাঁর কোলকাতায় আকস্মিক আগমনের ফলে। এই সময় প্রমথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে মহাকবি দ্বিজেন্দ্রলাল পরিকল্পিত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় লেখা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে চলে যান। কিন্তু যেদিন প্রমথনাথ শরৎচন্দ্রকে পৃথকভাবে পত্র লিখে জানিয়েছিলেন তাঁরা সত্বর 'ভারতবর্ষ' নামে একখানি পত্রিকা বের করবেন, সেদিন শরৎচন্দ্র আনন্দে অধীর হয়ে পত্রখানি বন্ধুবর যোগেন্দ্রনাথ সরকারকে দেখিয়ে বলেছিলেন—"ওহে সরকার, মস্ত এক সুখবর। আজ প্রমথর চিঠি পেলাম। সে লিখেছে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়(গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স) 'ভারতবর্ষ' নামে একটা কাগজ বের করবেন। বিলাতের 'ষ্ট্রাণ্ড' ম্যাগাজিন বা 'উইণ্ডসর' ম্যাগাজিন-এর মতোই বলা চলে।

তাছাড়া নবকলেবরে 'ভারতবর্ষ' প্রকাশিত হওয়ার সংবাদ শুনে শরৎচন্দ্র যেমন আনন্দ পেয়েছিলেন তেমনি পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতিকৃতিসহ প্রকাশিত 'ভারতবর্ষ' তাঁর হস্তগত হলে দুঃখ করে যোগেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন—"সরকার, পত্রিকাটি নেহাৎ মন্দ হবে না। কিন্তু আসল মালিকই চলে গেল হে!"

এই 'ভারতবর্ষে' অনেক চিন্তা করেই শরৎচন্দ্র 'চরিত্রহীনের কিয়দ-অংশ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তা প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তিনি মনক্ষুণ্ণ হননি। কারণ শরৎচন্দ্র নিজেকে তখনও পাকা লেখক বলে মনে করতেন না। সে হিসাবে প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লেখার জন্য তাগাদা শুরু করার ফলে শরৎচন্দ্র তাঁকে যে পত্রখানি দিয়েছিলেন সেটা পড়লেই 'লেখা' সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবটি কী ছিল বোঝা যায়। তা এইরূপ—

প্রমথ,

একটা অহঙ্কার করবো মাপ করবে? যদি করতো বলি। আমার চেয়ে ভাল Novel কিংবা গল্প এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ লিখতে পারবে না; যখন এই কথাটা মনে জ্ঞানে সত্য বলে মনে হবে, সেইদিন প্রবন্ধ বা গল্প উপন্যাসের জন্য অনুরোধ কোরো। তার পূর্বে

নয়। এই আমার এক বড় অনুরোধ তোমার উপর রইলো। এ বিষয়ে আমি অসত্য খাতির চাই না ; আমি সত্য চাই।

ইতি—তোমার শরৎ। ৭ঠা এপ্রিল—১৯১৩।

শরৎচন্দ্রের এই পত্রাঘাতে প্রমথনাথ নিরাশ হননি। পত্র আর টেলিগ্রাম করে শরৎচন্দ্রের কাছে অন্য কিছু পাবার আগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন বলেই সম্ভবতঃ সৃষ্টি হয়েছিল—'বিরাজ বৌ'। এই 'বিরাজ বৌ' পড়ে রেঙ্গুনের বন্ধুমহল উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই করেছিলেন। শরৎচন্দ্র সেই সাহসের জোরেই 'ভারতবর্ষে' 'বিরাজ বৌ' পাঠাবার সঙ্কল্প করেছিলেন। কিন্তু বইয়ের নামকরণ তখন করা হয়নি। 'ভারতবর্ষে' বইয়ের প্রথম কিস্তি পাঠাবার সময় শরৎচন্দ্র যোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়কে বলেছিলেন—"আচ্ছা, কী নাম দেওয়া যায় বলতো সরকার?"

—"কেন? বিরাজ মোহিনী।"

—"বেশ নাম। তার চেয়ে 'বিরাজ বৌ' নাম দেওয়াই ভাল। ছাখো সরকার মোহিনী চরিত্র তেমন ইম্‌পর্টান্ট নয়।"

—"এই যেমন ধরুন না শরৎ দা, যোগেন চাটুজ্যের 'কনে বৌ', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজবৌ' আর তৃতীয়টি হচ্ছে শরৎ চাটুজ্যের 'বিরাজ বৌ'।"

—"ঐ তো তোমাদের কেমন একটা রোগ! তাঁদের 'কনে বৌ', মেজবৌ', যতখুশী থাক আমার কিছু লোকসান নেই।"

শরৎচন্দ্র তাঁর এই 'বিরাজ বৌ' গল্প বলেই 'ভারতবর্ষে' পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ সরকার প্রতিবাদ করে বলেছিলেন—"ওকি শরৎ দা, উপন্যাসকে গল্প বলে ছেড়ে দিচ্ছেন? প্রমথনাথ ভটাচার্য্য মহাশয় কি গল্প পাঠাতে লিখেছিলেন?"

শরৎচন্দ্র তাঁর এই কথায় 'বিরাজ বৌ', গল্প নয়, উপন্যাস-বলেই 'ভারতবর্ষে' পাঠিয়েছিলেন এবং রচনা শৈলীর একটা নূতন দিক নিয়েই 'ভারতবর্ষে' তা আত্মপ্রকাশ করেছিল।

রেঙ্গুন ত্যাগ করে শরৎচন্দ্র যখন ৪নং বাজে শিবপুর ফার্ষ্ট বাইলেনে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন তখন থেকেই 'ভারতবর্ষে' তাঁর লেখার পথ প্রশস্ত হয়। অখ্যাত 'যমুনায়' তাঁর অনেকগুলো রচনা প্রকাশিত হয়েছিল বটে, কিন্তু পরে সে পত্রিকায় লেখা দিতে চাননি আর, তার মরো-মরো ভাব দেখে। অবশ্য ১৯১৭ সালে যমুনায় চরিত্রহীনের কিছু অংশ প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের লেখায় ভয়ানক কুঁড়েমি ছিল। রায় বাহাদুর জলধর সেন মহাশয় 'ভারতবর্ষের' সম্পাদক হয়েছিলেন বলেই শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে লেখা আদায় করে নিয়ে আসতে পারতেন এ কথা বললে ভুল হবে না। কারণ শরৎচন্দ্র জলধর সেন মহাশয়কে অগ্রজের মতোই স্নেহ করতেন। ১৯০৩ সনে 'কুন্তলীন পুরস্কার' প্রতিযোগিতায় তিনি 'মন্দির' গল্পটি পড়ে (মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে প্রকাশিত) যে মন্তব্য করেছিলেন—"এই লেখকটি যদি চর্চ্চা করেন তা হলে ভবিষ্যতে যশস্বী হবেন"—এই আশীর্বাণীর জন্যেই শরৎচন্দ্র জলধর সেন মহাশয়কে আপনজন মনে করতেন। তা ছাড়া তাঁদের মধ্যে লেখক সম্পর্কও ছিল।

বাজে শিবপুরে জলধর সেন মহাশয়ের যাতায়াত ছিল ঠিক একই সূত্রে। নানা পত্র-পত্রিকার তাগাদা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রকে তিনি 'ভারতবর্ষে' লেখা চাইবার জন্য প্রায়ই গিয়ে বলতেন—"শরৎ, এখন কি লিখছ ভাই? এবার নূতন কিছু একটা দিচ্ছ তো?" তাঁর এমন কথা শুনে শরৎচন্দ্র মনক্ষুণ্ণ হতেন কিনা বলতে পারি না। তবে 'জলধর দাদার' আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চেষ্টা করতেন বলেই 'ভারতবর্ষে' শরৎচন্দ্রের একটির পর একটি লেখা আত্মপ্রকাশ করেছিল।

মনের দাবী

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

কাজে কাজে ভুলে যাই আমাদের আসল কি কাজ?
ভুলে যাই আমাদের সমাহিত হৃদয় সমাজ
ছোট বড় কতই না গুরুভার ব'য়ে নিয়ে চলে
কিছু যেন বাকি প'ড়ে ঠিক থাকে তারি তলে তলে।

আমরা করছি সাজ রঙিণ কল্পনা নিয়ে চোখে,
রঙের ঝারায় মন ঝেড়ে ফেলে দেয় যত শোকে,
একটি গহনে কোন স্পর্শবতী নরম শরীর
যদি ছুঁয়ে দিয়ে যায় ;—হোক না সে ছোঁয়ায় নিবিড়।

হৃদয়ের দাবী আছে সর্বাগ্রেই ; এ কথাটি বুঝে
কাজে কাজে ভুলে থাকা চলে না তো
চোখ দু'টো বুজে!
হঠাৎ মহৎ কিছু ভেবে নিয়ে এ কথা বলার
বৃহৎ জরির ছটা ছড়িয়েই দিন যে আশার।

হৃদয়ের গুহায়িত খাঁজে খাঁজে রকমারি কাজে
আমাদের সেখানে যে মনের দাবীই শুধু সাজে।

বিভূতিভূষণের কথাশিল্প

অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম পর্ব : স্রষ্টা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এমনি করিয়া 'ডাকগাড়ী' গল্পে প্রসন্ন প্রভাত সূর্যালোকে রাধার রিক্ত-জীবনের কুয়াশা কাটিয়া গেল। এই আশ্বাসের বাণী শুনাইয়া বিভূতি-ভূষণ যে প্রত্যক্ষভাবে কোন পথনির্দেশ করিলেন তাহা নহে; কিন্তু হতাশার অন্ধকারে তিনি ভৈরবীর রেশ আনিলেন। অমৃতের সন্তান মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে সুবিপুল সম্ভাবনা, জড়তার দৈন্য যে তাহাকে গ্রাস করে, তাহাই তাহার ট্র্যাজেডি। বিভূতিভূষণ সহজ কথায় জীবনের জয়গান গাহিয়াছেন। আঘাত-সংঘাতে যে জন বিপর্যস্ত, এই আশ্বাস বাণীটুকুর মূল্য তাহার কাছে অনেক। রাধা যেমন ঝকঝকে দার্জিলিং মেল আর তাহার পরিচ্ছন্ন যাত্রীদল দেখিয়া মনে বল পাইল, ঝাড়িয়া ফেলিল দুঃখ-অবসাদের সমস্ত জড়তা, সেইরূপ সকলের জন্যই অজস্র সুযোগ পথে-ঘাটে ছড়াইয়া আছে। অস্তিবাদী ধার্মিক লেখকের কাছে ইহাই তো মঙ্গলময় ঈশ্বরের অস্তিত্ব। প্রকৃতির রূপ-মাধুর্যের মধ্যে, নরনারীর পবিত্রতার মধ্যে, শিশুর সরল সৌন্দর্যের মধ্যে এই কল্যাণী প্রতিশ্রুতিই ঝলমল করে।[৪৩] বিভূতিভূষণের এইরূপ আশ্বাসবাদী মনোভাবের পরিচয় আরও স্পষ্ট হইবে আমরা যদি তাঁহার 'জন্ম ও মৃত্যু' গ্রন্থের 'অকারণ' গল্পটি দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করি।[৪৪] গল্পটি মনোময়, হৃদয়ের ভাব-বিন্যাসের উপর রচিত। ইহাতে আছে :—মন ভাল ছিলনা বলিয়া গল্পের বক্তা জেলেপাড়া লেনের পুরোনো তাসের আড্ডায় গেলেন এবং সেখানেও ভাল না লাগায় কিছুক্ষণ পরেই বাহির হইয়া পড়িলেন পথে। পথ অপরিচ্ছন্ন, নিতান্ত সরু গলি, পাশেই মিউনিসিপালিটির একটি স্নানের জায়গা। হাত পাঁচেক লম্বা আর ওই রকম চওড়া একটা খোলার ঘরে স্বামী স্ত্রী ও দুটি শিশুসন্তানের সংসার। বৌটি ছোট ছেলেকে কোলে লইয়া রাঁধিতেছে, দারিদ্র্য-জীর্ণ শরীর, বয়স বোঝা যায় না, ত্রিশও হইতে পারে চল্লিশও হইতে পারে। দড়ির আলনায় ময়লা কাপড় জামা ঝুলিতেছে। মনটা আরও দমিয়া গেল। কি অর্থহীন অস্তিত্ব! কোথাও আশ্বাস নাই! রাস্তার মোড়ে বইয়ের দোকান, কিন্তু সেখানেও বাজে বইয়ের স্তূপ। ধর্মতলার গীর্জার সামনে এক বেহুঁশ মাতালকে ট্যাক্সি করিয়া কোথায় লইয়া গেল। আনন্দ-সন্ধানের ভ্রান্ত বিকৃত পথ! অবসন্ন মনে বক্তা ঢুকিলেন গড়ের মাঠে, কার্জন পার্কে। সন্ধ্যা হয় হয়। হঠাৎ কার্জন পার্কে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল ঝাঁকড়া সোনালী চুল ছোট্ট একটি ছেলের উপর। ছেলেটির সঙ্গে যে চাকর আসিয়াছিল সে তখন পার্শ্ববর্তিনী এক আয়ার সহিত গল্পে মশগুল। ছেলেটি মনের আনন্দে চাকরের মাথায় টুপি পরাইতেছে। গল্পে এইখানে আছে :—"আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রইলুম। নরম নরম কচি হাত পায়ের সে কি ছন্দ, কি প্রকাশ—ভঙ্গির কি সজীবতা, কি অবোধ উল্লাস, কি অপূর্ব সৌন্দর্য।...আমি আর চোখ ফেরাতে পারিনে। হঠাৎ অদৃষ্টপূর্ব, অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্যের সামনে পড়ে গিয়েছি যেন।

...খোকার মনের অর্থহীন আনন্দ অলক্ষিতে কখন আমার মনে সংক্রামিত হয়েছে দেখলুম। খোলার ঘরের সেই মেয়েটিকে আর নির্বোধ মনে হ'ল না।"

কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিভূতিভূষণের এই আশ্বাসবাদ শুধু মানবতামূলক কারুণ্যসঞ্জাত নয়। অসহায় বিপন্নকে তিনি সহানুভূতি দেখাইয়াছেন সত্য, তাহার সম্মুখে তিনি তুলিয়া ধরিয়াছেন আশার আলো, কিন্তু তাই বলিয়া যাহারা নিষ্ক্রিয় পরগাছা, তাঁহার সহানুভূতি তাহাদের জন্য নহে। অপরাজিত জীবন-মহিমার স্মারক-সংগ্রামী চরিত্র ফুটাইবার দিকেই তাঁহার প্রবণতা। তাঁহার মানসপুত্র অপরাজিতের অপু সংগ্রাম করিয়াছে, দৃষ্টিপ্রদীপের জিতু সংগ্রাম করিয়াছে, বিপিনের সংসারের বিপিন, অনুবর্তনের মাষ্টার মহাশয়েরা, আদর্শ হিন্দু হোটেলের হাজারি—ইহাদের প্রত্যেকেই কঠোর জীবন-সংগ্রাম করিয়াছে। তাহারা কেহ জিতিয়াছে, কেহ হারিয়াছে, কিন্তু বিভূতিভূষণ হারজিত নিরপেক্ষভাবে সহানুভূতির সহিত বর্ণনা করিয়াছেন তাহাদের জীবনযুদ্ধ। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মানুষকে খণ্ডিতভাবে না দেখিয়া তাহার স্বরূপ ফুটাইবার যে চেষ্টা বিভূতিভূষণ

---

৪৩. God with us is not a distant God, he belongs to our homes as well as to our temples. We feel his nearness to us in all the human relationship of love and affection, and in our festivities He is the chief guest whom we honour. In seasons of flowers and fruits, in the coming of the rain, in the fulness of the autumn, we see the hem of his mantle and hear his footsteps. We worship him in all the true objects of our worship and love him wherever our love is true. In the woman who is good we feel Him, in the man who is true we know Him, in our children He is born again and again, the Eternal child.—Rabindranath—Personality (1948) P. 27-28.

৪৪। এই গল্পেও বক্তা লেখকের মনোভাব পরিস্ফুটের সুবিধার্থেই 'আমি' রূপে উপস্থাপিত হইয়াছেন।

করিয়াছেন, করুণা বা সহানুভূতির ক্ষেত্রেও সৃষ্ট চরিত্রের মর্যাদা রক্ষার প্রয়াস সে চেষ্টার পরিপূরক। বলা বাহুল্য, এইভাবে মানুষ মর্যাদা পাইলে তাহাতে সমগ্রভাবে সমাজের লাভ, কারণ ইহাতে সক্রিয়তার আবেদন থাকে। প্রকৃতপক্ষে বিভূতিভূষণের মানবতাবোধী রচনাবলীতে এই মনোভাবই অধিক দেখা যায়, 'ইছামতী'র ভবানী, বা 'কেদার রাজা'র কেদারের মত প্রধান চরিত্র তিনি কমই সৃষ্টি করিয়াছেন।৪৫ বিভূতিভূষণের এই বিশিষ্ট সহানুভূতির সার্থক পরিচয় মিলিবে 'আরণ্যক' হইতে উধৃত নিম্নের পংক্তিগুলিতে।

আরণ্যকের প্রথম দিকে লবলুটিয়ার কাছারী বাড়ী পরিদর্শনে গিয়াছে জমিদারীর ম্যানেজার সত্যচরণ। সত্যচরণ তরুণ বাঙালী, দারিদ্র্য সে দেখিয়াছে, কিন্তু বিহারের জঙ্গল-মহালে নিরন্ন হতভাগ্যদের দারিদ্র্যের ভয়াবহতা দেখে নাই। কাছারিতে তাহার আসিবার সংবাদে দীর্ঘদিন পরে ভাত খাইবার আশায় বহু দূর-দূরান্তর হইতে অনেকগুলি দরিদ্র প্রজা আসিয়া জুটিল। ইহাদের কর্মহীন ভিক্ষাবৃত্তিকে ধিক্কৃত করা সহজ ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে লেখক বিভূতিভূষণ তাহা করিলেন না। তিনি সহানুভূতির সহিত তাহাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত কৃপণা প্রকৃতির দুর্ভাগ্য এই সন্তানদের সম্পর্কে সত্যচরণের জবানীতে লিখিয়াছেন :—"কেন জানি না, ইহাদের হঠাৎ এত ভাল লাগিল। ইহাদের দারিদ্র্য, ইহাদের সারল্য, কঠোর জীবন-সংগ্রামে ইহাদের যুঝিবার ক্ষমতা—এই অন্ধকার অরণ্যভূমি ও হিমবর্ষী মুক্ত আকাশ বিলাসিতার কোমল পুষ্পাস্তৃত পথে ইহাদের যাইতে দেয় নাই, কিন্তু ইহাদের সত্যকার পুরুষ মানুষ করিয়া গড়িয়াছে। দুটি ভাত খাইতে পাওয়ার আনন্দে যারা ভীমদাসটোলা ও পর্বতী হইতে ন' মাইল পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে বিনা নিমন্ত্রণে—তাহাদের মনের আনন্দ গ্রহণ কারবার শক্তি কত সতেজ ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম।"

সুন্দরের সহিত সত্যের ঐক্য-উপলব্ধি আর্টের লক্ষণ। যাহা প্রচলিত অর্থে সুন্দর, তাহাই পবিত্র বা মহৎ নয়—একথা জানিয়াও শিল্পী যখন সুন্দরকে ফুটাইয়া তোলেন তখন স্বভাবতই তাহার গৌরব সম্পর্কে তিনি সচেতন থাকেন। শিল্পীর সৌন্দর্যপ্রীতিই এই রূপকলার মূল। রবীন্দ্রনাথেও এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এ হিসাবে বিভূতিভূষণের বৈশিষ্ট্য হইল, চরিত্র ধর্মে তো নয়ই, চেহারার দিক হইতেও কুৎসিত—রূপাঙ্কনে তাঁহার বড় একটা আগ্রহ ছিল না। শরৎচন্দ্র বিরাজের পরিণতিতে বা জ্ঞানদার রূপায়ণে ট্রাজেডি ফুটাইবার যে সুযোগ করিয়া লইয়াছেন, শান্ত-ভাবাশ্রয়ী শিল্পী বিভূতিভূষণের পক্ষে তাহা একরূপ অসাধ্য ছিল। অবশ্য বিভূতিভূষণের এই সৌন্দর্য-প্রীতির ফল যে সর্বক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ সাফল্যলাভ করিয়াছে তাহা নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'বিধুমাষ্টার' গ্রন্থে 'সুহাসিনী মাসীমা' গল্পে দীর্ঘদিন সুহাসিনী মাসীমাকে পরমা সুন্দরী কল্পনা করিয়া শেষ পর্যন্ত বার্ধক্য-জীর্ণা শ্রীহীনা বৃদ্ধাকে দেখিবার হতাশা পাঠককে যতটা সহানুভূতি-শীল করিয়া তোলে, তাহার বিপরীতে বেণীগির ফুলবাড়ী গ্রন্থের 'কুয়াশার রঙ' গল্পে যেখানে গল্পের নায়ক প্রতুল অতীতদিনের মানসী কণার দারিদ্র্য ও দুশ্চিন্তায় জীর্ণ চেহারা দেখিয়া হতাশ মনে ফিরিয়া আসিয়াছে, সেখানে পাঠক অবশ্যই সেরূপ স্বস্তিলাভ করে না।*৪৬ পথের পাঁচালী-অপরাজিতে দুঃখ-দারিদ্র্য ভাসাইয়া দিয়া এই সৌন্দর্যের হিল্লোল বহিয়াছে। সেখানে প্রকৃতি রূপময়ী, মানুষের রূপও কম নয়। বল্লালী বালাইয়ের লোলচর্মা ইন্দির ঠাকরুণের যৌবনের তন্বী রূপের উল্লেখে লেখক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন, তরুণ সুঠাম লাবণ্যময় জামাই চন্দ্র মজুমদারের জন্য প্রৌঢ় বিগতশ্রী চন্দ্র মজুমদারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইন্দিরঠাকরুণ বিহ্বল হইয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছেন, জগদ্ধাত্রীর মত রূপসী রামচাঁদ চক্কোত্তির অন্নপূর্ণা ভ্রাতৃবধূ ও রায়বাড়ীর করুণাময়ী মেজবৌ চকিতে দেখা দিয়া গিয়াছেন, সর্বজয়া, অপু, দুর্গা, রানু, অমলা, মেজবৌরাণী, লীলা, অপর্ণার মা, অপর্ণা—অনেকেই সেখানে সুন্দর। বিভূতিভূষণের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'উপেক্ষিতায়' যে গ্রাম্য বধূটির কথা বলা হইয়াছে, তিনিও রূপে গুণে অনুপমা। বলিতে গেলে এই বধূটিই বিভূতিভূষণের অধিকাংশ গল্প উপন্যাসের নারী চরিত্রের আদর্শ স্বরূপা। সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়াই যে গল্পের তরুণ নায়ক তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছে সে কথা মিথ্যা নয়, কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই পরিচয় বা তৎপরবর্তী ঘনিষ্টতায় বিভূতিভূষণের নির্মল শুভ্রতা রক্ষা করিয়াছেন। ইহা নিঃসন্দেহে তাঁহার সৌন্দর্যপ্রীতি ও কল্যাণ ধর্মিতার স্মারক। সত্যকার সৌন্দর্য যে শুধু চিত্ত-পরিপ্লাবী, তাহা জৈবিক কামনা-বাসনা নিরপেক্ষ, কল্লোলযুগীয় সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাহা হঠাৎ বিশ্বাস করিতে সাহস হয় না, কিন্তু ইহাই যে সত্য এমন কথা বহু মনীষী বলিয়াছেন।*৪৭ প্রকৃতপক্ষে সেই বিশৃঙ্খলার সময় এই মনোধর্মী স্নিগ্ধ সৌন্দর্য

---

*৪৫ এই দুইটি চরিত্র সম্পর্কে বিভূতিভূষণের দিক হইতে কিছুটা কৈফিয়ৎ আছে। ভবানী উনবিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্মণ এবং কুলীন জামাতা। তখনকার সমাজ-ব্যবস্থা অনুযায়ী তাঁহার এইরূপ জীবন হওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া তাঁহাকে যখন গ্রন্থে আনা হইয়াছে, তাঁহার বয়স তখন প্রায় ৫০ বৎসর, পূর্বজীবন তাঁহার কর্মময়, অন্ততঃ বৈচিত্র্যময় এবং অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ।

কেদার রাজার কেদার সম্পর্কে বলা যায়, কেদার এক বিগত বৈভব জমিদারবংশের বংশধর। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত প্রথার পরশ্রম-জীবিত্বের তিনি নমুনা। তবু কন্যা শরৎ যখন কলিকাতায় হারাইয়া গেল, তাহার পর কেদার ভিনগাঁয়ে ব্যবসায়ার গদীতে হাড়ভাঙা খাটুনির কাজ লইয়াছেন।

*৪৬ তবে বিভূতিভূষণের ভক্ত পাঠক এ অবস্থায় আলোচ্য প্রত্যা-বর্তনের অর্থে একথাও ধরিয়া লইতে পারে যে, দুঃখ-দারিদ্র্যে কণার মনে যে ফাটল ধরিয়াছিল, প্রতুলের সান্নিধ্যে তাহা বাড়িয়া যাইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা ছিল বলিয়াই লেখক বিধবা কণাকে বাঁচাইতে এইভাবে কণাদের বাড়ী হইতে প্রতুলকে ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছেন।

*৪৭ 'প্রীতি, প্রেম, স্নেহ, ভক্তি প্রভৃতি সাধারণ হৃদয়বৃত্তি হইতে খাঁটি সৌন্দর্যপিপাসা যে স্বতন্ত্র, আধুনিক Aesthetics—শাস্ত্রের ইহাই

অঙ্কনের গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট। বিভূতিভূষণের বিচিত্র রোমাণ্টিক ভাবাবেগ সমকালীন তরুণ সতীর্থদের নয়া জীবনবেদ রচনার আত্মশ্লাঘা স্তিমিত করিয়া পুরাতন ও নূতন কালের মধ্যে সেতুবন্ধন করিল। রসে নয়,রসের পঙ্কিলাতে যে সময় বাংলা-সাহিত্যের কবরায়ণ প্রায় অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে, বিস্ময়কর মানসিক ভারসাম্য ও সৌন্দর্যমুগ্ধ কল্যাণধর্মী ভাবদৃষ্টি লইয়া বিভূতিভূষণ সেই সময় লিখিতে আরম্ভ করিলেন। বাস্তববোধের ক্ষেত্রে তাঁহাকে কেহ প্রাজ্ঞ বলিবে না, কিন্তু অনুভূতির রাজ্যে তিনি সম্রাট।*৪৮

আগেই বলা হইয়াছে, বিভূতিভূষণ ধার্মিক লেখক ছিলেন। তাঁহার ধর্ম পবিত্রতাবাচক তো বটেই, তাছাড়া বিশ্বপ্রকৃতির মূলে পরমাত্মার অস্তিত্ব তিনি বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া ধর্মের আচার-বিচারগত রূপে অথবা পুথি-প্রক্রিয়াগত সাধনায় তাঁহার মোহ ছিল না। সত্য, শিব ও সুন্দরের উৎসস্বরূপ ভগবান, ইহাদের সাক্ষাৎ ও স্বীকৃতিই ভগবানের পূজা,—ইহাই বিভূতিভূষণের ধর্মভাব। শান্তভাবাশ্রিত সহজ পথের পথিক বিভূতিভূষণ সহজ বিশ্বাসের আলোতে ভগবানকে দেখিবার ও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইজন্যই যাহা প্রশান্ত, সুন্দর ও কল্যাণকর, যাহাতে ক্লেদরতি নাই, তাহাই তাঁহার কাছে ভগবানের দ্যোতক। ইহার বিপরীতে প্রচলিত ধর্মীয় রীতিনীতির অন্তঃসারশূন্যতা যখনই তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, তখনই তাহার প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। শরৎচন্দ্র বামুনের মেয়ের গোলক চাটুজ্জের ধর্মের মুখোশ যেভাবে শ্লেষাত্মক বর্ণনায় খুলিয়া দিয়াছেন, সেরূপ তির্যক রূপায়ণ-শক্তি বিভূতিভূষণের ছিল না, কিন্তু হীনতা চোখে পড়িলে অনেক সময় প্রবন্ধের মত সরল স্পষ্ট ভাষায় তিনি তাঁহার প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। একদা স্খলিতচরিত্রা গিরিবালার (আচার্য কৃপালনী কলোনী গ্রন্থের গিরিবালা গল্প) হৃদয় যখন পরিবর্তিত হইয়াছে, ধর্মপ্রাণতার জন্য তাহাকে বিভূতিভূষণ অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন, কিন্তু দৃষ্টিপ্রদীপে সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ পরিবার জিতুর জ্যাঠামশাইদের ধর্মোন্মাদনার মূলে যে কুৎসিত স্বার্থবোধ রহিয়াছে, তাহা তিনি জিতুর জবানীতে বর্ণনা করিয়াছেন নিষ্করুণভাবে।*৪৯ কুশল পাহাড়ী গ্রন্থের 'কুশল পাহাড়ী' গল্পের বনবাসী সাধু ও তাঁহার আবাস-ভূমির রম্যতার আবেগোচ্ছিল বর্ণনার বিপরীতে কলিকাতায় ধনীগৃহের বিলাসিতার ঔজ্জ্বল্য আর কৃত্রিম কথাবার্তা তাঁহার প্রকৃতি প্রেমিক ধার্মিক মনটিকে চমৎকার ফুটাইয়াছে। 'জ্যোতিরিঙ্গণ' গ্রন্থের 'অনুশোচনা' গল্পে গীর্জার আচারনিষ্ঠ পুরোহিত বালাদাস গুপ্তের চিত্তচাঞ্চল্য সরল চাষীভক্তের পাশাপাশি তুলিয়া ধরিয়া তাঁহার হীনতা উদ্ঘাটিত করিতে বিভূতিভূষণ সঙ্কোচবোধ করেন নাই। 'দৃষ্টিপ্রদীপে' জিতু যেখানে মনিবদের দেশের মহোৎসব বর্ণনা করিতেছে সেখানেও বিভূতিভূষণ নির্মম। কলিকাতায় যাহাদের বিলাসী জীবন কাটে তাহারা সেখানকার পীঠস্থানের মোহান্ত। সরল ধর্মবিশ্বাসী গ্রাম্য নরনারী কষ্টার্জিত টাকা পয়সা প্রণামী দেয়, সেই প্রণামীতেই চলে তাহাদের সহরের বিলাস-ব্যসন। গরীব চাষী নিমচাঁদ তাহার ছেলের অসুখের জন্য স্ত্রীকে গোঁসাইয়ের কাছে ধর্ণা দিতে লইয়া আসিয়াছিল। বাবুদের রূপোর থালার উপর বাড়তি প্রণামী হিসাবে তাহারা তিনটি টাকা রাখিল, এ-ছাড়া প্রণামী ও পূজা দিল যথারীতি। এই মেলাতেই নিমচাঁদের কলেরা হইল, অবহেলায় নিভিয়া গেল তাহার জীবনদীপ। একটি সুখের সংসার ভাঙ্গিয়া গেল। ইহার কিছুদিন পরে কলিকাতায় বাবুদের বাড়ী বিবাহ। জামাইকে অষ্টিন গাড়ী যৌতুক দেওয়া হইল, অন্য আয়োজন তো হইলই। এই সময় জিতুর জবানীতে বিভূতিভূষণেরই বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে :—"ওদের রঙীণ কাপড়-পরা ঝি চাকরের লম্বা সারির দিকে চেয়ে মনে হ'ল এই বড় মানুষির খরচের দরুণ নিমচাঁদের স্ত্রী তিনটে টাকা দিয়েচে। অথচ এই হিমবর্ষী অগ্রহায়ণ মাসের রাত্রে হয়ত সে অনাথা বিধবার খেজুর ডালের ঝাঁপে শীত আটকাচ্ছে না, সেই যে বুড়ী যার গলা কাঁপছিল, তার সেই ধার করে দেওয়া আট আনা পয়সা এর

গোড়ার কথা। বাস্তব প্রয়োজনের মতই, বাস্তব হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে খাঁটি সৌন্দর্যপ্রীতির সম্পর্ক নাই। সৌন্দর্যবোধ মানব-মনের এমন একটা বৃত্তি যে, তাহার পূর্ণ স্ফূর্তির কালে intellect বা Emotion, এদুয়ের কোনটাই ক্রিয়াশীল থাকে না ;

—মোহিতলাল মজুমদার—আধুনিক বাংলা সাহিত্য (১ম সংস্করণ), পৃ:-৫৯।

*৪৮ বিভূতিভূষণের দিনলিপি হইতে উদ্ধৃত নিম্নের পংক্তি কয়টিতে পরিষ্কার হইবে :—"এবার গ্রামে এসে আমাদের ঘাটে নাইতে গিয়ে দেখি সলতেখালি আম গাছটা ঝড়ে ভেঙে গিয়েচে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম কতক্ষণ। সলতেখালি ঝড়ে ভেঙে গেল! ও যে আমার জীবনের সঙ্গে বড় জড়ানো ছিল নানা দিক থেকে। ওরই তলায় সেই ময়না কাঁটার ঝোপটা, যার সঙ্গে আবাল্য কত মধুর সম্বন্ধ।

সলতেখালির সঙ্গে আর দেখা হবে না। ওকে কেটে নিয়ে জ্বালানি করবে এবার হাজারি কাকা। সত্যিই আমার চোখে জল এল। যেন অতি আপনার নিকট আত্মীয়ের বিয়োগ অনুভব করলুম। গাছপালাকে সবাই চেনে না। এতদিনের সলতেখালি যে ভেঙ্গে গেল, তা নিয়ে আমাদের পাড়ার লোকের মুখে কোনো দুঃখ করতে শুনিনি।

পথের পাঁচালীতে সলতেখালির কথা লিখেচি। লোকে হয়তো মনে রাখবে ওকে কিছুদিন।

—ঊর্মি মুখর (১ম সংস্করণ), পৃ:—১

*৪৯...এদের ভক্তির উৎসের মূল এদের বিষয় বুদ্ধি ও সাংসারিক উন্নতি। ভগবান এঁদের উন্নতি করচেন, ফল বাড়াচ্চেন, মান খাতির বাড়াচ্চেন—এঁরাও ভগবানকে খুব তোয়াজ করচেন, খুশী রাখবার চেষ্টা করছেন—ভবিষ্যতে আরও যাতে বাড়ে।...এদের সত্যনারায়ণ পুজো স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি করার জন্যে, লক্ষ্মী পুজো ধনধান্য বৃদ্ধি করবার জন্যে, গৃহ-দেবতার পুজো, গোপীনাথ জীউর পুজো—সবারই মূলে—হে ঠাকুর, ধনে পুত্রে যেন লক্ষ্মীলাভ হয় অর্থাৎ তাহ'লে তোমাকেও খুশী রাখবো।"

(দৃষ্টিপ্রদীপ—প্রথম পরিচ্ছেদ)

মধ্যে আছে। ধর্মের নামে এরা নিয়েচে, ওরা স্বেচ্ছায় হাসিমুখে দিয়েচে।

সব মিথ্যে। ধর্মের নামে এরা করেচে ঘোর অধর্ম ও অবিচারের প্রতিষ্ঠা। বটতলার গোঁসাই এদের কাছে ভোগ পেয়ে এদের বড় মানুষ ক'রে দিয়েচে, লক্ষ গরীব লোককে মেরে—জ্যাঠামশাইদের গৃহদেবতা যেমন তাদের বড় করে রেখেছিল, মাকে, সীতাকে ও ভুবনের মাকে করেছিল ওদের ক্রীতদাসী।

সত্যিকার ধর্ম কোথায় আছে? কি ভীষণ মোহ, অনাচার ও মিথ্যার কুহকে ঢাকা পড়ে গেছে দেবতার সত্যরূপ সেদিন, যেদিন থেকে এরা হৃদয়ের ধর্মকে ভুলে অর্থহীন অনুষ্ঠানকে ধর্মের আসনে বসিয়েচে।"

কেহ কেহ হয়তো বলিতে পারেন—জিতুর বাল্যকাল চা বাগানে খ্রীষ্টান মিশনারীদের সাহচর্যে কাটিয়াছিল বলিয়া খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি আপেক্ষিক শ্রদ্ধাবান জিতু এভাবে হিন্দুর ধর্মানুষ্ঠান সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছে। কথাটা যে সত্য নয় এবং জিতুর মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে বিভূতিভূষণেরই বাণী, তাহা বিভূতিভূষণের ইছামতী হইতে উদ্ধৃত নিম্নের পংক্তিগুলিতে বুঝা যাইবে। উদ্ধৃতিটি দেওয়ান রাজারাম রায় সম্পর্কে। সাহেবদের স্বার্থে রাজারাম সব কুকার্যই করেন। পয়সাকড়ি করিয়াছেন তিনি অনেক। রাজারামের পূজার্চ্চনার ঘটা বিশ্লেষণ করিয়া বিভূতিভূষণ বলিতেছেন,—"রাজারাম...অনেকক্ষণ ধরে সন্ধ্যা-আহ্নিক করলেন। ঘণ্টা খানেক প্রায়। অনেক কিছু স্তব স্তোত্র পড়লেন।

এত দেরী হওয়ার কারণ এই, সন্ধ্যা গায়ত্রী শেষ করে রাজারাম বিবিধ দেবতার স্তব পাঠ করতে থাকেন। দেবদেবীদের মধ্যে প্রতিদিন তুষ্ট রাখা উচিত মনে করেন লক্ষ্মী, সরস্বতী, রক্ষাকালী, সিদ্ধেশ্বরী ও মনসাকে। এদের কাউকে চটালে চলে না। মন খুঁত খুঁত করে। এঁদের দৌলতে তিনি করে খাচ্ছেন। আবার পাছে কোন দেবী শুনতে না পান এজন্যে তিনি স্পষ্টভাবে টেনে টেনে স্তব উচ্চারণ করে থাকেন।"

বিভূতিভূষণের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করিলে তাঁহার উদারতা ও আধুনিকতায় মুগ্ধ হইতে হয়। তিনি আদর্শবাদী লেখক, আদর্শের সহিত ধর্মের কিছুটা যোগ আছে বলিয়াই মনে হয়। মনকে যাহা পরম-মূল্যে আস্থাশীল করিয়া তোলে, এমনি এক ধর্মবোধে তিনি উদ্দীপিত ছিলেন। প্রচলিত ধর্মমতের কোন গোঁড়ামি তাঁহার ছিল না। নবাগত গ্রন্থের 'স্বপ্নবাসুদেব' গল্পে প্রেমের পূজা সার্থক করিতে গ্রীক হেলিওডোরস হিন্দুদেবতা বাসুদেবের স্বপ্ন দেখে, 'কুশল পাহাড়ীর' অন্তর্জলি গল্পে নিষ্ঠাবান সর্বজনপূজ্য ব্রাহ্মণ দীনদয়ালের অন্তর্জলির সময় গঙ্গাতীরের সমস্ত ব্যবস্থা ডিহিনবিশ কাশেমালি মল্লিক নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সুসম্পন্ন করে, আচার্য কৃপালনী কলোনী, গ্রন্থের 'নীলগঞ্জের ফালমান সাহেব' গল্পে ফালমান সাহেব খৃষ্টান হইয়াও মেমের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ভক্তিপূর্বক ব্রাহ্মণভোজন করায়, ইছামতীর নীলকর শিপটন সাহেব কুঠীতে আড়ম্বরে, দুর্গোৎসব করে। লেখকের দরদী মনের স্পর্শে সব অনুষ্ঠানই সার্থক হইয়াছে। 'অপরাজিত' উপন্যাসে তরুণী অপর্ণা নিজের খুশীতে এবং একক চেষ্টায় লক্ষ্মীপূজা করে। লক্ষ্মী প্রতিমার মত মেয়েটির মানস-রূপের সহিত এই লক্ষ্মীপূজার সামঞ্জস্যটাই বড় কথা। আনুষ্ঠানিক দিক নয়, ইহার ব্যঞ্জনায় যে সৌন্দর্য ও পবিত্রতার কথা মনে আসে তাহাই সবার উপরে।' ইছামতীতে তিলু এবং গ্রামের মেয়েরা ইছামতীর তীরে 'তেরের পালুনি' করিতে যায়। সেখানে দেবতা কোথায় আছেন বুঝা যায় না, মুক্ত বিহঙ্গের মত আনন্দ মুখরিত গ্রাম্য মেয়ে-মজলিসের উচ্ছল সুরঝঙ্কারই সে অনুষ্ঠানের মুখ্যরূপ।

আবার প্রচলিত ধর্মরীতি যেখানে সত্যের সহিত এক হইয়াছে, সেখানে বিভূতিভূষণ তাহা সানন্দে বরণ করিয়াছেন। কুশলপাহাড়ী গ্রন্থের 'গল্প নয়,' গল্পে 'হরিবোল বল' বলিয়া শুধু সন্ন্যাসী নিজেকেই বাঁচাইলেন না, ডাকাত সতীশ বাগ্দীকেও উদ্ধার করিয়া বাঁচাইয়া দিলেন। অপরাজিতে দেবভক্তিপরায়ণা আচারনিষ্ঠা নিরুদিদি বরাবর দেবীর শ্রদ্ধা পাইয়াছে। 'কুশলপাহাড়ীর' 'অভিমানী' গল্পে প্রেমাস্পদকে ভাসাইয়া রাখনি যখন হরিদ্বারে কৃষ্ণমন্দিরে দেবতার চরণে আশ্রয় লইয়াছে, বিভূতিভূষণ তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করেন নাই। 'মৌরীফুল' গ্রন্থের 'জলসত্র' গল্পে আচারনিষ্ঠ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মাধব শিরোমণি কলু তারাচাঁদ বিশ্বাসের জলসত্রে জল খাইয়া কিছুমাত্র অপবিত্র হন নাই; 'অসাধারণ' গ্রন্থের 'পিদিমের নীচে' গল্পে বুনো সাধু পাগলা ঠাকুরকে তাচ্ছিল্য করিয়া আচারনিষ্ঠ পিসিমাই ছোট হইয়া গিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে বিভূতিভূষণের ভগবদ্বিশ্বাসও প্রকৃতিপ্রেমেরই পরিপূরক দিক। অবাধ উদার প্রকৃতিকে গভীরভাবে ভালবাসিয়া তাঁহার দৃষ্টি যে প্রসারিত হইয়াছে, তাহাই আশ্রয়লাভ করিয়াছে আত্মস্বার্থ-নিরপেক্ষ বিশ্বমানবপ্রেমে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে ইহাই 'বড় আমি'র সহিত মিল। এই বৃহৎ সত্তার মধ্যে আত্মোপলব্ধি চরাচরব্যাপ্ত শক্তির সহিত একাত্মতা আনিয়া দেয়। ইতিপূর্বে দেখানো হইয়াছে, সংস্কার-আচার উপকরণ-মন্ত্র দিয়া নয়, রবীন্দ্রনাথের মতই তিনি সহজ নির্মল প্রাণধর্মের আরতিতে ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন।*৫০ অলৌকিকত্বের প্রতি আস্থাভাব সত্ত্বেও ধর্মগত সংস্কার হইতে বিভূতিভূষণ যে মুক্ত ছিলেন, ইহা আশ্চর্য্যের কথা। সত্যসুন্দরের প্রতীকরূপে মঙ্গলময় ভগবানের অস্তিত্ব

---

*৫০ বিভূতিভূষণ ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন সুন্দরের আলোতে, জাগতিক অসুন্দরের অস্তিত্বের নিরিখে ডক্টর ভক্তির মত ঈশ্বর-বিচারের জটিলতায় তিনি প্রবেশ করেন নাই। ডষ্টয়ভস্কির 'দি ব্রাদার্স ক্যারামাজোভ' উপন্যাসে বৃদ্ধ ক্যারামাজোভের অন্যতম পুত্র আইভান শ্রীমতী এলয়শাকে প্রভুর প্রিয় কুকুরের গায়ে একটি ঢিল ছোঁড়ার অপরাধে ধনী প্রভুর আদেশে মায়ের চোখের উপর দাস বালককে শিকারী কুকুরের দ্বারা টুকরো করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলার ভয়াবহ কাহিনী শুনাইয়া প্রশ্ন করিয়াছে, ভগবান যদি থাকেন এই দুষ্কৃতি বন্ধ হয় না কেন? এইভাবে সৎ নিরীহ লোকের দুঃখ পাওয়া যদি অনিবার্য হয়, তাহা হইলে আইভানের মতে হয় ঈশ্বর পাপিষ্ঠ, আর না হয় অস্তিত্ব নাই (God either is evil or does not exist)। বিভূতিভূষণে মানবতাবোধের গভীর পরিচয় থাকিলেও তাঁহার ঈশ্বর বিশ্বাস এরূপ প্রশ্ন-কণ্টকিত নয়।

অনুভব করিবার আকুতি তিনি দেখাইয়াছেন অথচ পূজাপদ্ধতির জন্য তাহার গরজ ছিল না; তাহার ধর্মবোধ মানুষের মহত্ত উদ্বোধনের অনুপূরক;—এই হিসাবে বিভূতিভূষণ নিঃসন্দেহে আধুনিক লেখক।

ধর্ম বা ঈশ্বরের ক্ষেত্রে যেমন, ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষেত্রেও তেমনি বিভূতিভূষণ সত্য এবং পবিত্রতাবোধ সম্মুখে রাখিয়াই যেন সাহিত্য-সৃষ্টি করিয়াছেন। অবশ্য এজন্য তাঁহার সৃষ্টির সাবলীলতা বা স্ফূর্তি সঙ্কুচিত হইবার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু সম্ভবত বিভূতিভূষণের আবেগ-প্রধান মনোধর্মের জন্য এরূপ ঘটে নাই। সাধারণ বিষয়বস্তু বা পটভূমিকার জন্যও এই নির্মলতার আবেদন রচনার গতি-পরিণতিতে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। 'আদর্শ হিন্দু হোটেলে' গ্রন্থের হাজারি ঠাকুর বা 'বেণীগির ফুলবাড়ী' গ্রন্থের 'শান্তিরাম' গল্পের শান্তিরামের মত কেহ কেহ সততার জন্য পুরস্কৃতও হইয়াছে। তবে এইরূপ পুরস্কারের প্রশ্ন এক্ষেত্রে গৌণ, পুরস্কার মিলিয়াছে কর্মক্ষেত্রেই, আসলে নির্মলতার রূপায়ণেই লেখকের প্রয়াস সীমায়িত এবং তাহাতে যেটুকু আবেদন সৃষ্টি হয়, তাহাই রচনার ফলশ্রুতি। 'যাত্রাবদল' গ্রন্থের 'সার্থকতা' গল্পে ননী অনেকদিন পরে গ্রামে আসিয়া কিছু ভাল কাজ করিয়া গেল। একদিন নিজে সে গরীব ছিল, গরীবের দুঃখ সাধ্যমত দূর করিয়া সে পাইল আনন্দ, বিভূতিভূষণের বক্তব্যও এইখানেই সীমাবদ্ধ হইয়াছে। এ গল্প পাঠক-মনে যেটুকু আলো ফেলিবে, তাহাতেই যেন লেখক বিভূতিভূষণ কৃতার্থ। 'বেণীগির ফুলবাড়ী' গ্রন্থের ফিরিওয়ালা, 'অসাধারণ' গ্রন্থের 'অসাধারণ' গল্পের হাড়ি দাই অথবা 'রূপো বাঙাল' গল্পের রূপো চাকর সততার জন্য পায় নাই কিছুই, কিন্তু সততার গৌরব তাহাদের উজ্জ্বল করিয়াছে। 'কুশল-পাহাড়ী' গ্রন্থের 'শিকারী' গল্পে জংলি দেহাতী বালক মাগ্‌নিরাম নিজের জীবনের বিনিময়ে পাগলা হাতীকে মারিয়া পিতাকে একশত টাকা পুরস্কার পাওয়াইয়া দিল, তাহার মৃত্যুবরণ অনবধানী পাঠককেও অশ্রু-সজল করিয়া তোলে। 'আরণ্যকের' মহাজন ধাওতাল সাহু সততার জন্য পুরস্কারের পরিবর্তে লোকসান দেয়, কিন্তু এই সততাই তাহাকে বড় করিয়াছে। বিভূতিভূষণের এই নির্মাল্যশক্তি সমকালীন বাংলাসাহিত্যে নিঃসন্দেহে আশ্বাস সৃষ্টি করিয়াছিল।

বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্য ধনীর সাহিত্য নয়, দরিদ্রের, বড় জোর, মধ্যবিত্তের সাহিত্য। মানবতাবাদী বিভূতিভূষণ ধনীদের সম্পর্কে সহানুভূতিহীন না হইলেও তাঁহার সাহিত্যে বিত্তবান যাহারা আসিয়াছে, প্রধানত তাহারা দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত চরিত্র ফুটাইবার জন্য অথবা পরিবেশ উজ্জ্বল করিবার জন্যই আসিয়াছে, তাহারা নিজেরা প্রধান চরিত্র নয়। পথের পাঁচালী—অপরাজিতে সর্বজয়ার মনিববাড়ী, দৃষ্টি-প্রদীপে জিতুর জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ী অথবা তাহার কলিকাতার মনিব-বাড়ী, আদর্শ হিন্দু হোটেলে হরিচরণবাবু বা গোপালনগরের কুণ্ডুরা, দুই বাড়ীতে লালবেহারীবাবু, আরণ্যকে সত্যচরণের মনিব অবিনাশ,—ইহাদের কেহই রচনার প্রাণ নয়। কাজেই মূলত দরিদ্র-মধ্যবিত্তের রূপাঙ্কনের ফলে জাগতিক দুঃখ-রিক্ততার বাস্তবচিত্র অধিকতর রূপায়িত হওয়ায় বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যে সুখ বস্তুটি দুর্লভ। এই সুখ বলিতে বস্তুতান্ত্রিক লাভ বা প্রাপ্তিই বুঝাইতেছে। কিন্তু সুখ দুর্লভ হইলেও বিভূতিভূষণের সাহিত্যে আনন্দের অভাব নাই। তিনি নিজে আনন্দধর্মী, জাগতিক লাভালাভ-নিরপেক্ষভাবে প্রকৃতি-সৌন্দর্যে বা মানুষের কমনীয় হৃদয়বৃত্তির স্পর্শে তিনি মুগ্ধ ও বিগলিত, তাঁহার সৃষ্টিতে আনন্দের সন্ধান সহজেই মিলে। সবচেয়ে বড় কথা অনেকক্ষেত্রেই এই আনন্দ আসিয়াছে অতি তুচ্ছ সূত্র হইতে (ডাকবাড়ী গল্পে দার্জিলিং মেল দেখিয়া রাধার মানস-পরিবর্তনের কথা আগেই বলা হইয়াছে)। পাড়াগাঁয়ে বর্ষার দিনে হঠাৎ কই মাছের ঝাঁক ডাঙায় উঠিয়া আসে, সহরের ছেলে দুলাল তাই দেখিয়া আনন্দে উচ্ছল হয়, ইহাই হইল 'কুশলপাহাড়ী' গ্রন্থের 'আবির্ভাব' গল্পের কাহিনী। সুখের জন্য নয়, আনন্দের জন্যই অপরাজিতের অপু তাহার একমাত্র পুত্র শিশু কাজলকে গ্রামে পরের কাছে রাখিয়া নিজে অজানা সুদূরের যাত্রী হয়। এই আনন্দ হারাইয়াই কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত জীবনেও আরণ্যকের সত্যচরণ অসংখ্য অভাব-সমাকীর্ণ আরণ্যক-জীবনের জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। 'নবাগত' গ্রন্থে 'দ্রবময়ীর কাশীবাস' গল্পে দ্রবময়ী যে তীর্থ ছাড়িয়া বৃদ্ধবয়সে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন, সেও সুখের জন্য নয়, আনন্দের জন্য।

বিভূতিভূষণ গ্রামীণ শিল্পী, সহরের জটিল চিত্র বা সহরের মানুষের জটিল রূপ তিনি বহুলাংশে এড়াইয়া গিয়াছেন।*৫১ গ্রামের সরল সামান্য মানুষের সহজ জীবনযাত্রার আলেখ্য তাঁহার সহানুভূতি স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে অসামান্য হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক 'পথের পাঁচালীতে' অপু-দুর্গার বাল্যজীবনের যে দীর্ঘ কাহিনী তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যে উপন্যাসে লেখা যায়, ইহাই বাংলা-সাহিত্যে অভাবিত ছিল।*৫২ 'মেঘমল্লার'

---

*৫১ বিভূতিভূষণের অধিকাংশ রচনা গ্রামীণ পটভূমিকায় লেখা; সহরের কথা যেখানে বলা হইয়াছে, সেখানে অনেকক্ষেত্রেই গ্রাম্যজীবনের সারল্য বা সৌন্দর্যের বৈপরীত্য সৃষ্টির চেষ্টা আছে। স্বাভাবিক জীবনের তাগিদে 'অপরাজিতে'র বা আদর্শ হিন্দু হোটেলের মত কোথাও সহর জীবন বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেখানে সহরজীবনের জটিলতার উপর জোর পড়ে নাই। 'অনুবর্তন' বইখানি বিভূতিভূষণের বিচিত্র রচনা, ইহাতে প্রকৃতি-প্রেমিক বিভূতিভূষণের পরিচয় সামান্য, এ উপন্যাসের পটভূমিকা প্রধানতঃ কলিকাতা। কিন্তু এখানে একদল শিক্ষকের জীবনসংগ্রামের সাধারণ কাহিনীর সহজ গতিতে বহুবিচিত্র কলিকাতার নগর-জীবনের সন্ধান কমই পাওয়া যায়।

*৫২ 'পথের পাঁচালীর ছাপা ফর্মা এক একদিন সন্ধ্যা বৈঠকে পড়া হ'ত। অধ্যাপক পণ্ডিতেরা অনেকে থাকতেন, তাঁরা আনন্দিত হতেন। যেদিন অপুর নিশ্চিন্দিপুর ত্যাগ ক'রে রেলযাত্রার অংশটি পড়া হয়, সেদিনকার অপুলক বিস্ময় বিশেষ করে আমাদের মনে আছে। কবি মোহিতলাল বারবার বললেন, কি কাণ্ড করেছে রেললাইন আর ডিস্ট্যান্ট সিগন্যাল নিয়ে।

—গোপাল হালদার—পথের পাঁচালী—শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ—১৩৫৭

গ্রন্থের 'পুঁইমাচা' গল্পে ক্ষেন্তি দুর্গারই প্রতিরূপ, নবোদ্ভিন্ন সতেজ পুঁই-ডাঁটার শ্যামলশ্রীতে আপন কৈশোর লাবণ্য সাজাইয়া দিয়া এই যে মেয়েটি জগৎ হইয়া বিদায় লইয়াছে, তাঁহার কাহিনী সংবেদনশীল বিভূতি-ভূষণের হাতে অদ্ভুত ফুটিয়াছে। বিভূতিভূষণের 'ক্ষণভঙ্গুর' গ্রন্থে 'হাট' নামে একটি গল্প আছে। এই গল্পে কুড়োন মণ্ডল হাটে চড়া দরে পটল বেচে, বাজারদর, হাটে বসবার জায়গা, এই ধরণের সুখ দুঃখের দুটো সাধারণ কথা বলে অন্যান্য হাটুরেদের সঙ্গে, তারপর সন্ধ্যায় হাট ভাঙ্গিলে বাড়ী ফিরিয়া যায় ;—ইহাই কাহিনী। কিন্তু ঘনভূত কাহিনী না থাকা সত্ত্বেও এই সাধারণ গল্পটি হইতে পাঠক বিভূতিভূষণের সহজধর্মী মানস-লোকের পরিচয় পায়।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যে অলৌকিক বা অতি-প্রাকৃতের সমাবেশ তাঁহার আধুনিকতার বিরুদ্ধে সমালোচনার সর্বপ্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। ভূত প্রেত পরলোকে যিনি বিশ্বাস করেন এবং দ্বিধাহীনভাবে সেসব আপন রচনায় সন্নিবিষ্ট করেন, তাঁহাকে আধুনিক সাহিত্যিক বলা যায় কি করিয়া? অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক গ্রন্থের 'বিভূতিভূষণের শিল্পীসত্তা' প্রবন্ধে অপেক্ষাকৃত সহানু-ভূতির সহিত বিভূতিভূষণকে মানাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনিও বিভূতিভূষণের এই অলৌকিকত্ব বা অতিপ্রাকৃতত্বের যথার্থ মূল্যায়ণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি লিখিয়াছেন :—"তিনি (বিভূতিভূষণ) অতি-প্রাকৃতে বিশ্বাস করিয়াছেন—তারানাথ তান্ত্রিকের গল্পগুলি এই বিশ্বাসসিদ্ধ ; 'দৃষ্টিপ্রদীপ' তাঁর কাছে সহজ স্বাভাবিক—দেবযান নাকি তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধির ফল। প্রকৃতি সম্বন্ধে আত্মতন্ময়তা ছাড়াও ধর্মসংস্কারের প্রতি এই অনুরাগ এবং অর্ধস্ফুট অতীতের প্রতি একটা বিমূঢ় আকর্ষণ বিভূতিভূষণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এগুলি যুক্তিসিদ্ধও। বর্তমানের স্পষ্টরেখ বাস্তবতা এবং নিষ্ঠুরতার কাছ থেকে অপসৃত হওয়ার পক্ষে এদের সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। মানুষ যে মুহূর্তেই বাস্তবাতীত কোন নির্ভরযোগ্য শক্তির আশ্রয় পায় সেই মুহূর্তেই নিজের ভার সে তার ওপরে চাপিয়ে দিতে চায়। তখন তার ভূমিকায় আর প্রশ্নকর্তা থাকে না, থাকে একটি কৌতূহলী মন—যে বিহ্বল বিমুগ্ধচিত্তে সব কিছু দেখতে চায়, সুতীক্ষ্ণ সজাগ বুদ্ধির আলোকে বিচার করতে চায় না।*৫৩

অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় যথার্থ ই বলিয়াছেন যে, যে লেখক বাস্তবকে এড়াইয়া যাইতে চান, বাস্তবাতীত নির্ভরযোগ্য কোন শক্তির সন্ধান মিলিলে তাঁহাকে তিনি আশ্রয় করেন। কিন্তু বিভূতিভূষণ তো 'স্পষ্টরেখ বাস্তবতার নিকট হইতে অপসৃত হইতে চাহেন নাই। তিনি আসলে বাস্তব লেখক, তাঁহার এই বাস্তবতা ধরিয়া লইয়া তাঁহার অলৌকিকত্ব বা অতিপ্রাকৃতত্ব বিচার করিতে পারিলে তবেই তাঁহার প্রতি সুবিচার হইবে। প্রকৃতপক্ষে বিভূতিভূষণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত হইলেও অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ মূল্যবান মন্তব্য করিয়াছেন :—"বাস্তবনিষ্ঠ হইয়াও স্বভাবসিদ্ধ সপ্রেম অনুভূতির গুণে তিনি নিতান্ত পরিচিত ভাবগুলিকে তাঁহার বর্ণিত কাহিনীতে অনাস্বাদিত রসের আধার করিয়া তুলিয়াছেন।*৫৪ বিভূতিভূষণের সবচেয়ে বড় পরিচয় হইতেছে প্রকৃতি-প্রীতি ও মানবপ্রীতি। প্রকৃতি প্রীতির গভীরতায় অতীতচারিতা, রহস্য-ময়তা এবং ঈশ্বরানুভূতি প্রশ্রয় পায় একথা ইতিপূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। মানবতাবাদের দিক হইতে দেখিলেও তাঁহার অতিপ্রাকৃতত্বের বাস্তব ব্যাখ্যা মিলে। সাধারণ কথাসাহিত্যিকের মতই বিভূতিভূষণ জগৎ ও জীবনের রূপায়ণ করিয়াছেন, তবে তাঁহার বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, তিনি অতিপ্রকৃত পটভূমিকা সৃষ্টির দ্বারা হয় পরিবেশ বা ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করিয়াছেন, আর না হয় বক্তব্য স্পষ্টতর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আশ্রয় গ্রহণের প্রশ্ন নয়, তাঁহার অস্তিবাদী মনোধর্মের সহিত অতিপ্রাকৃত প্রত্যয়ের সামঞ্জস্য আছে। তবে নিজে বিশ্বাস করিলেও তাঁহার রচনা-বলী ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে একথা স্পষ্ট হইবে যে, এই বিশ্বাসকে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করিয়া দিবার কোন চেষ্টাই তিনি করেন নাই। বরং পাছে পাঠক মনে এ সম্পর্কে কোন দুর্বলতা দেখা দেয় তজ্জন্য তিনি অতিপ্রাকৃতত্ব বর্ণনার পর এই বর্ণনার যৌক্তিকতায় দ্বিধা জন্মাইবার উপ-যোগী মন্তব্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাই 'জন্ম ও মৃত্যু' গ্রন্থের 'তারানাথ "তান্ত্রিকে'র গল্পের শেষে শ্রোতা গল্পের বক্তার প্রসঙ্গে বলিতেছেন :—আমি দেখিলাম তারানাথের বকুনি থামিবে না, যতক্ষণ এখানে আছি। উঠিয়া পড়িলাম, বেলা বারোটা বাজে। আপাততঃ চন্দ্রদর্শন অপেক্ষাও গুরুতর কাজ বাকি। তারানাথের কথা বিশ্বাস করিয়াছি কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ইহার আমি কোনো উত্তর দিব না।" বিভূতিভূষণের 'রূপহলুদ' গ্রন্থের বিরজা হোম ও তাহার বাবা এই ধরণের আর একটি অলৌকিক পটভূমিকার গল্প। এই গল্পের শেষেও বক্তা ভৈরব চক্রবর্তী বলিয়াছেন :—"এ ব্যাপারের কোনো ব্যাখ্যা দিতে রাজী নই। যা ঘটেছিল অবিকল তাই নিবেদন করলাম আপনাদের কাছে। বিশ্বাস করুন বা না করুন।"

ক্রমশঃ

---

*৫৩ অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—সাহিত্য ও সাহিত্যিক, ১ম সংস্করণ, পৃঃ—১১

*৫৪ অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ—বাংলা সাহিত্য, ১ম সংস্করণ, পৃঃ—৪২৭

দিদি

শ্রীসুধীররঞ্জন গুহ
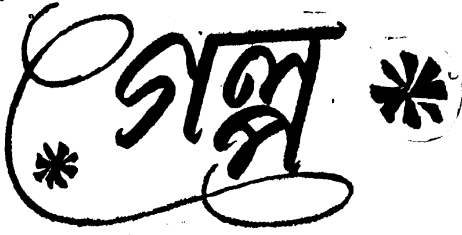
বেশ হৈ-চৈ করে কাটে ওদের সময়। চোর ডাকাত নয় তো, রাজনৈতিক বন্দী। মান আছে। দুপুরে কেউ ঘুমায়, কেউ বই পড়ে। কেউ গলা সাধার পালা জেলের দেয়ালের কানে রেখেই বের হ'তে চায় গায়ক হ'য়ে। বিকেলে যখন রোদ পড়ে—মাঠে গিয়ে ওরা খেলে, কেউ খেলা দেখে।

নীরেন এদের দলে নয়। সে একা। সে সকলের কাছে এক রহস্য!

বাজে জেলের ঘণ্টা—বন্দীদের আয়ু! নীরেন শোনে। ঐ ঘণ্টা মুক্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে তাকে।

না—ছেদ পড়ে ভাবনায়। মনে মনে থেকে যায় নীরেন। পাঁচ বছর কেটে গেল! যৌবনের ঐ মূল্যবান দিনগুলোতে সোনার ফসল ফলাতে পারত সে—তা' সব বৃথা গেল। দিন, মাস, বছর সব পচে পচে স্তূপাকার হয়ে রইল এই জেলে!

রক্তে গতি আসে নীরেনের। মুক্তির সংকেত নয় ঐ ঘণ্টা; তা'র জীবনের বেলা যায় ধ্বনি! উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে নীরেন, চোখে আগুন! গরাদে মাথা কোটে বার বার।

অফিসার আসে। জিজ্ঞেস্ করে, কি চাই আপনার নীরেনবাবু?

ধন্যবাদ! কিছু দরকার নেই আমার।

বন্দীদের বিচিত্র বায়না শুনতে শুনতে অফিসারের কান ঝালাপালা। অতিষ্ঠ সে। নীরেনের কাছে এলে সে একটু নিঃশ্বাস ছাড়ে। পরক্ষণেই নীরেনের চাহিদা না থাকায় আরেকদিক থেকে ভাবনা হয় তার। অফিসারের পুলিশী মন চলতে থাকে বাঁকা পথে। গভীর মনে আরেকটি ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে না তো নীরেন!

লাল দাঁত বের করা জেলের দালান। সেলের মাথার ওপরে একটা জানলা। প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগের ঐ একটু পথ। এক ফালি নীলাকাশ তারই পথে এসেছে নীরেনের সেলে!

পাশের সেল থেকে এলো অজয়, মুকুল আর অরবিন্দ। বিনা কাজের কাজে। এসেই থমকে দাঁড়াল ওরা। চোখের সামনে নিত্যদিনের সেই একই দৃশ্য। উদাস নীরেন। নিজেকে ছেড়ে দিয়ে একমনে বসে আছে আকাশের দিকে তাকিয়ে।

বিরক্ত হ'ল মুকুল, দূর দূর। পুলিশ নিশ্চয়ই ভুল রিপোর্ট পেয়ে ওকে ধরে এনেছে।

কেন যে সরকার ওর জন্য খরচ করছে। বলল অজয়। বলতে বলতে ফিরে যায় সব।

কোন কোনদিন আবার নীরেনের জন্য অলক্ষ্যে করুণা জেগেছে ওদের, খেলাধুলো নেই, মিশছে না কারোর সঙ্গে, কথা বলে না মোটে—পাগল হ'য়ে যাবে নাকি?

বন্ধুরা তাই জোর করেই অনেক সময় হৈ-চৈ করতে চেষ্টা করেছে, যে-লগ্নে নীরেনের মন ছুঁয়ে আছে সেখান থেকে মনটাকে একটু অন্যদিকে ঘুরিয়ে অন্যমনস্ক করাতে। কিন্তু তাতেও ফল হয়নি কিছু। কোনদিন নীরেন হেসেছে একটু ম্লান হাসি, কোনদিন-বা মুচকি হাসি একটু।

কিন্তু নাছোড়বান্দা অরবিন্দ। অন্য বন্ধুদের সঙ্গে তার বাজী। তাই মৌনীকে নিয়ে তার মুখরতা। নীরেনকে একলা পেতে এসেছে সময়-অসময়ে। বলেছে, তুই তাই কি? আগুনে লোহা গলে যায় আর আমাদের সান্নিধ্যে তোর মুখ দিয়ে একটা কথা বের হ'ল না। হয়েছিস্ না হয় বিপ্লবী। তাই বলে কি মনের কথা থাকতে নেই।

মনের কথা!

এই মানে···একটু দখিনা বাতাস···একটু ফুল···একটু ইয়ে···

আমি অলি নই।

এ্যা···তা' হ'লে কথা জানিস্। বলে ফেল্ সোনার চাঁদ। তা' ছাড়া এতো ওপেন্ সিক্রেট্!

কিছু বলার নেই আমার।

তুই কি আমাদেরও আই-বি-র লোক মনে করছিস্ নাকি? সবটাতেই নিগেটিভ!

বিপ্লবীদের আগুন নিয়ে কারবার···

অনেক রকম আগুন! আমি বলছি···ঐ যে, সে-ই আগুন নিয়ে খেলা।

তুমি সে-আগুনের সংস্পর্শে এসেছ?

এসেছি—ভীষণভাবে এসেছি। কিন্তু আমার কি দোষ? প্রকৃতির খেলায় আমরা পুতুল। সত্যি! সব সময় হৈ-চৈ করে ভুলে থাকতেই তো চেষ্টা করি, তবুও পারা যার না। দু' এক সময় যখন বীণার কথা মনে পড়ে তখন ইচ্ছে হয়···

পালিয়ে যেওনা যেন অরবিন্দ।

পালিয়ে যাবো কেন! ভালোবাসা জীবনের লক্ষণ। শুধু ইচ্ছে হয়, ওর কথা একটু আলোচনা করি। কিন্তু সকলের কাছে সব কথা বলা চলে না; মনের মতো লোক চাই—Only to the lovers ear alone.

আমাকে বুঝি তোমার মনের মতো লোক মনে করেছ?

হ্যাঁ।

কারণ?

চুপ করে বসে থাকিস্, উদাসভাবে তাকিয়ে থাকিস্ আকাশের দিকে; চোখের তারায় কা'কে যেন দেখবার একটা আকুল আকুতি, এক কথায় আধুনিক প্রেমিকদের সব ক'টী লক্ষণই···

হেসে উঠল নীরেন, খুবই ভুল করেছ অরবিন্দ! বিপ্লবী একমাত্র ভালোবাসবে তার মাকে—দেশ-মাতাকে।

আমরাও তা' ভালোবাসি, কিন্তু সে তো বাইরে গিয়ে।' জেল হ'ল আমাদের রিক্রিয়েশন ক্লাব। নিষ্ঠুর দিনগুলোকে কাটানোর জন্থই তো ব্যক্তিগত মন নিয়ে টানাটানি। কাজেই ঐ অফিসিয়ালটী বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত কিছু থাকবে না?

থাকা উচিত নয়।

'উচিত নয়' কথাটী আবার নিজের মনেই ভাবিল নীরেন। মনের মধ্যে কেমন যেন টন্‌টন্ করে উঠল তার। ফিরে তাকাল পেছনের দিকে। ধীরে ধীরে খুল্‌ল স্মৃতির দুয়ার। গিয়ে দাঁড়াল উষার সাম্‌নে। মনের কানেও যেন ভেসে এলো তার কথা: মা কাঁদছে—এগিয়ে যা বীরের মতো।

আরেকদিনের কথা মনে হ'ল নীরেনের। উষা তাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে কানে কানে বলেছিল সে-কথাটী।

ভাবতে ভাবতে এসে পৌছাল চরম ঘটনায়। উষার বরও একজন বিপ্লবী। বম্ কেসে অনেক বছর জেল হয়েছিল তার। যেদিন 'রায়' বের হ'ল, সেদিন নীরেন ম্লান মুখে উষার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই উষা বলেছিল, পরাধীন ভারতই একটী জেল; আমরাও তো জেলে নীরেন। এ-জেল থেকে মুক্তির কথাই চিন্তা কর।

অবাক হয়েছিল নীরেন। অগ্নিময়ীর কথা শুনে দুঃখেও আনন্দ পেয়েছিল অনেক। অপলক চোখে তাকিয়ে ছিল উষার দিকে। তার চোখে এখন জল নয়—আগুন। তারই একটু স্ফুলিঙ্গ যেন ছিট্‌কে এসে বিপ্লবের আগুন জেলে দিয়েছিল নীরেনের মনে।

সে-আগুনেই নীরেনের শিক্ষা; সে-মন্ত্রেই নীরেনের দীক্ষা!

ওদিকে সংবাদের প্রতীক্ষায় যারা ছিল, তা'রা সব ঘিরে ধরেছে অরবিন্দকে—কিরে বিন্দে! মুনির মৌনব্রত ভাঙ্গাতে পেরেছিস্?

না।

টাকা ফেল্ তবে। গভীর জলের মাছ! বল্‌ল মুকুল।

বীণা বলে এক কাল্পনিক মেয়েকে কল্পনা রংয়ে উজ্জল করে তুললাম, তবুও নীরব। দেখা যাক্। টোপ বদলাতে হবে। হয়তো ওর টন্‌টনে ব্যথার জায়গায় ছোঁয়া দিতে পারিনি। কিন্তু যেদিন সেই ছোঁয়াটী লেগে যাবে সেদিন দেখবি জোর করে শোনাবে আমাদের।

দিন যেতে লাগল—কিন্তু কিছু শোনাবার কোন লক্ষণই প্রকাশ পেল না। নীরেন তেম্‌নি নির্বিকার; সে একা।

জেলের অফিসার জানে, নীরেনের কোন চাহিদা নেই। তবুও তার কর্তব্য সে করে। জিজ্ঞেস করেই যায় নীরেনকে। সেদিনও নীরেন মাথা নেড়ে না জানাতেই অফিসার বল্‌ল, আজ পর্যন্ত একটা জিনিষও কিন্তু আপনি চাইলেন না।

প্রয়োজন হয় না আমার।

অন্তত একটা দিন একটা কিছু···

দিন তবে···বলেই থামল নীরেন। চলে গেল ফেলে আসা দিনে: ছোটকালে বাবা মাকে হারিয়েছে। উষার কাছে মানুষ। দুনিয়ায় উষা ছাড়া আপন বলতে তার আর কেউ নেই। সে-ও দুর্ভাগা। স্বামী তার জেলে। উষা জেলে না হ'লেও একা! এক বাড়ীতে একা—দ্বীপবাসিনী !!

উৎসাহিত হ'য়ে উঠল অফিসার—কি! কি চাই আপনার বলুন তো?

রং তুলি আর ক্যানভাস্।

আপনি বুঝি ছবি আঁকতে পারেন? হেসে উঠল অফিসার।

না।

তবে?

একবার চেষ্টা করে দেখতাম।

নীরেনের চাহিদা যখন ছিল না তখন অবাক হ'য়েছিল অফিসার। চাহিদা শুনেও বিস্মিত হ'ল সে। দিনে দিনে এমন আরো কতো শুনবে। চোর ডাকাত, খুনী, বদ্‌মাস, দেশপ্রেমিক, দেশনেতা সবই তো এখানে; গোটা দেশের সূচীপত্র জেল। চাহিদাও রকমারী। এই বৈচিত্র্যের মাঝে নীরেনও এক বিচিত্র চিত্র! দীর্ঘ নীরবতার পর কথা বলতে চাইছে তুলির মুখে। নীরবতা থেকে গভীর নীরবতায়।

বাতাসের কান আছে। স্বাভাবিক এবং সাধারণ চাহিদা কোন আলোচনার বিষয় নয়। নীরেনের অসাধারণ চাহিদা বলেই মুখ-রোচক হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ল অনেকের কানে কানে।

শুনে মুকুল, অরবিন্দ এবং অজয় উল্লসিত হয়ে উঠল। বল্‌ল অরবিন্দ, এতোদিন পরে তবে ঢেউ উঠল।

কি ক'রে বুঝলি?

প্রেন সায়কোলজী!

অর্থাৎ?

নীরেন নিশ্চয়ই তার প্রেয়সীকে আঁকবে।—অনেকদিন দেখ্‌ছে না! এবার রং তুলি দিয়ে কাছে টেনে আনবে।

তা' হ'লে রাতারাতি শিল্পী হ'য়ে যাচ্ছে?

হোপ্‌লেস্—রাতারাতি কেন। ঐ যে চুপ্ করে বসে থাকে—সেটা তো বাইরে! ভেতরে ভেতরে মনের কলালয়ে তুলির টান চলেছে সমানে। এখন হবে শুধু ফিনিসিং।

সত্যি সত্যি নীরেন তখন রং আর তুলি নিয়েই বসে-ছিল। ইজেল; ছবি আঁকবে সে। হঠাৎ একটু শিহরণ। গাছে পাতা কেঁপে উঠল। গরাদের ফাঁক দিয়ে ঝিরঝিরে বাতাস এলো ঘরে। মিষ্টি ছোঁয়া।

চম্‌কে উঠল নীরেন। এই বাতাস! কতোদূর থেকে এসেছে। ছুঁয়ে এসেছে নিশ্চয়ই। তাই কি এতো মিষ্টি?

মনের কূলে কূলে অনুভূতি। অলক্ষ্যে মাথা উঁচু করে নীরেন। চোখ দুটাকে ছেড়ে দেয় জানলার অন্তর ছিঁড়ে তাকায় দূরে, সেই দূরে!

অরবিন্দ-প্রভৃতি দূর থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে ছবি আঁকা দেখ্‌ছিল। ছবির আউট-লাইন দেখেই সুরু করেছিল হাসতে। পরে যখন ফুটে উঠল শাড়ীর পাড় আর চুলের খোঁপা তখন ওদের সন্দেহের হাসি বাস্তবে! অরবিন্দ চাপা গলায় চীৎকার করে উঠল, শিথিল কবরী দেখা যাচ্ছে রে অজা! এবার অলকে কবরী!

ওর পেটে পেটে এতো ছিল, বল্‌ল অজয়। দেখতে একেবারে গোবেচারী, ভিজে বেড়াল!

কিন্তু শিঁকে ছেঁড়ার যম, বলেই অরবিন্দ পা' চালাল গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে, "কবে ফুটেছিল ফুল গন্ধ ব্যাকুল পবনে"।

একখানা ছবি। প্রথম আঁকা তবুও ভারী সুন্দর। 'স্রষ্টা বারে বারে দেখছিল নিজের সৃষ্টিকে। একবার কাছে বসে', একবার একটু দূরে গিয়ে।

পেছন থেকে অরবিন্দ গিয়ে তুলল ঠাট্টার সুর। তাই

নীরেন। রংয়ে আর তুলিতে রাঙিয়ে তুল্লেই চলবেনা, এবার তোর মুখের কথায় ছবির প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর। কা'র ছবি ভাই ?

মন থেকে এঁকেছি।

শুধু কি তাই! মনের গহন গভীর থেকেও নিশ্চয়ই।

শান্ত চোখ তুটি নীরেন তুলে ধরল অরবিন্দের দিকে। ধীরে ধীরে বল্ল, আমাকে এখন একটু একা একা থাকতে দাও অরবিন্দ—প্লিজ!

অপেক্ষায় ছিল মুকুল ওরা। অরবিন্দ গিয়ে কাছে দাঁড়াতেই মুকুল জিজ্ঞেস্ করল, কি বারতা-রে বিন্দে দূতী ?

বাস্ রে ঘুঘু! ওকে ডাকাতিই করতে হবে। তখন বলবেই···

বলবেই···গণৎকার এসেছিস যে।

ইচ্ছে করে কেউ পাগল হ'তে চায় না জানিস্। অনুভূতির বোঝাকে ছবিতে রূপ দিয়ে মন হাল্কা ক'রেছে। এবার বুক হালকা করতেই হবে।

আবার তোর সেই হবে—সবই ভবিষ্যৎ।

ভবিষ্যতের কোলে সব লুকিয়ে থাকে; সময় না হ'লে ফল পাকে না—দেখ্বি।

কিন্তু এই ভবিষ্যৎ বেশী দূরে ছিল না। কয়েকদিন পরেই দেখা দিল সে-দিনটা।

সেদিন বিকেল চারটা হবে। নীরেনের সংগে ইণ্টারভিউ দিতে তার ঘরের দিকে এগোচ্ছিল একটা মেয়ে। বারেন্দা দিয়ে সে হেঁটে যাচ্ছিল। অরবিন্দ ওরা তা'কে দেখল। প্রথম দেখাতেই মিলিয়ে নিল প্রাথমিকটা। তারপর আরো দেখে' আরো। একেবারে মিলে যাচ্ছে—উঁচু নাক, টানা ভুরু, ছবির মতোই খোপা বাঁধা।

চাপা হাসি খেলতে লাগল ওদের সকলের চোখে। বলেই ফেল্ল অরবিন্দ, এতোদিন পরে একেবারে হাটে হাড়ি ভেঙে গেল অজা! হ'ল তো···

চুপ কর অরবিন্দ শুনবে, ধমক দিল অজয়।

কিন্তু ঔৎসুক্য সকলেরই ষোল আনা। ধীরে ধীরে বারেন্দা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল ওরা। হঠাৎ অরবিন্দ বলল, বেরসিকগুলো! তাড়াতাড়ি চল্। জেলখানা নন্দনকানন হ'য়ে উঠবে যে! অনেকদিন বিরহ ব্যথা সইবার পর···প্রথম দেখার সেই তরতর আঁখি কাঁপা, নীরব নয়নের চুমুকে চুমুকে তুঁহু দোঁহার রূপসুধা পান যদি না দেখতে পেলি তবে আর কি দেখবি ?

বৈদ্যুতিক হ'য়ে উঠল সকলে। মেয়েটা তখন নীরেনের ঘর ছোঁয় ছোঁয়।

সময় হ'য়েছে বলে নীরেন ও হ'য়েছিল চঞ্চল। তা'র সারা চোখে উপ্ছে পড়ছে তৃষ্ণা! কতোদিন পরে দেখা হবে। কিন্তু আসছে না কেন ? চারটা তো বাজে! ঘড়ির দিকে আরেকবার তাকিয়ে দোর গোড়ায় এগোল সে।

ঠিক তখনই তুই প্রতীক্ষার প্রত্যক্ষ মিলন! প্রত্যাশার সকল ছবি! চোখের পলকে মেয়েটার তু'বাহুর আকর্ষণে নীরেন ঝাপিয়ে পড়ল তা'র বুকে। সঙ্গে সঙ্গে নীরেনের সম্বোধন 'দিদি' ডাকের ধ্বনিতেও সচকিত হ'য়ে উঠল সেল, বারেন্দা—গোটা জেল!

অরবিন্দ—ওরা তখন অবাক!

আজ

হাসিরাশি দেবী

হায়রে মন, অবোধ মন,—বুঝেও বুঝি না যে
তোর সাথে তো মুখোমুখি'র এমন চেনা শোনা,
ফিরিস্ কেন কুড়িয়ে তবু লাগেনা যেটা' কাজে,
বাতিল দেওয়া যা কিছু হেলা-ফেলার আবর্জ্জনা!

এমনি ক'রে অর্থহীন ভাবনা ভেবে ভেবে
শুধুই যদি দিন্ কাটাবি, রইবি যদি ব'সে,
দেওয়া নেওয়ার ওজোনটুকু কুন্‌কে মেপে মেপে
খাতার পাতা ভরাবি রোজ অঙ্ক ক'ষে ক'ষে!

মযুচে ধরে বুকের মাঝে শিষের তলোয়ার,
চোখের কোণে জল আসে যে ঘুমের রসে ভরা,
ফুল্‌বাগানে চৈতিদিনে হাওয়ার হাহাকার,—
রঙিণ ধূলো মুঠোয় তুলে সিঁথেয় কেন পরা!

হায়রে মন, অবোধ মন, ঘরের কোণে কোণে
এ-কী-আঁধার জমালি' তুই জালতে গিয়ে আলো,
চেনা-জানার মাঝখানে যে ঝাপসা মায়া বোনে
নতুন চোখে দেখছি সে আজ ধোঁয়ার রঙে কালো॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু প্রসঙ্গে

১০৮ শ্রীহৃষীকেশ আশ্রম (তারকেশ্বর)

আজ হইতে ৪৭৩ বর্ষ পূর্ব্বে বাংলার ভাগ্যাকাশে এক সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল—যাহার স্নিগ্ধ কিরণ বিচ্ছুরণে তদানীন্তন ভারতবর্ষ এক নব প্রেরণা পাইয়াছিল।

নবদ্বীপের শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহে মহাপ্রভু আবির্ভূত হন শুভ ফাগুন-পূর্ণিমার পুণ্য মুহূর্ত্তে। প্রেমাবতার তাঁর সরস জীবনটীকে উজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া নিখিল প্রাণীকে উদ্‌বুদ্ধ করেন ভগবদুন্মুখতার প্রতি।

ভারতবর্ষের ধর্ম্মজীবন তখন মহান্ বিপর্য্যয়ের মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। যখন সাম্রাজ্যের অত্যাচার মানুষকে দিশেহারা করিয়া ফেলিয়াছিল সেই সঙ্কটজনক সময়েই শ্রীগৌরাঙ্গ এদেশে আসিয়াছিলেন—পথহারা পথিককে পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন—আনন্দকামী মানুষকে প্রভূত আনন্দের প্রস্রবণের দিকে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁর প্রথম জীবন কাটে নবদ্বীপধামের গঙ্গাতটে শ্যামল বাংলার মাটীতে। শেষজীবন নীলাচলে মহোদধির তীরে প্রভু জগন্নাথের পাবন-অধিষ্ঠানে। মহাপুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সন্ন্যাসাশ্রমে তাঁর নাম হইয়াছিল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী। সন্ন্যাসের জন্য তাঁহাকে কারুণ্যরসের প্রতিভূ মাতা শচীদেবীর স্নেহ বন্ধন ছিন্ন করিতে হইয়াছিল এবং মহীয়সী সতীসাধ্বী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর প্রেমপাশ তাঁহাকে বাঁধিতে পারে নাই। জীবনের সব হইতে প্রিয়তমকে পাইতে হইলে অন্য সবকে ত্যাগ করিতে হইবে। প্রিয়তম শ্রীভগবানের মধুর সান্নিধ্য যদি সত্যই একান্ত আকাঙ্ক্ষিত হয়, স্ত্রী পুত্র পরিবার পরিজনের স্নেহবন্ধনকে ছিন্ন না করিলে তাহা পাওয়া যাইতে পারে না। মাতৃরূপে স্ত্রীজাতির স্থান আর্য্যশাস্ত্রে অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত বলা হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রসিদ্ধান্তানুসারে ইহাও স্থিরীকৃত যে স্ত্রী-সান্নিধ্য শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির মূলতঃ বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া থাকে। তাই হরিদাসকে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন :—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্‌ভজনোন্মুখস্যপারং পরং
জিগ্‌মিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হাহন্তহন্ত-
বিষভক্ষণতোহপ্যসাধু॥

অর্থাৎ যিনি ভবসাগরের পরপারে যাইতে চাহেন তাঁকে প্রথমেই 'নিষ্কিঞ্চন' হইতে হইবে অর্থাৎ বৈরাগ্য ব্যতিরেকে মোক্ষের পথে চলিবার অধিকার নাই। বৈরাগ্যের সহিত থাকিবে ভগবদুন্মুখতা—ভগবৎপরতা। ভগবদুন্মুখতা এত প্রবল হইবে যাহার নিকট বিষয়, বিষয়ী ও স্ত্রীজাতির অবকাশ থাকিবে না। বস্তুতঃ মোক্ষের পথে ভগবানের চরণারবিন্দে নিজেকে সমর্পণ করিবার পথে বিষয় প্রভৃতি বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন :—

স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গীনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বাদূরতাত্মবান্।
ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ॥

ইহার তাৎপর্য্য ইহাই দাঁড়ায়—অতন্দ্রিত অর্থাৎ নিরলসভাবে বস্তুতঃ অনন্যভাবে শ্রীভগবানকে চিন্তা করিতে হইলে তাঁকে অবিচ্ছিন্নভাবে ধ্যান করিতে হইলে রমণীসঙ্গ হইতে বহুদূরে নিজেকে রাখিতে হইবে। শাস্ত্রের এই আদেশ—শাস্ত্রের এই তাৎপর্য্যকে শ্রীচৈতন্যদেব নিজের জীবনে দেখাইয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাই আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে আপাততঃ হরিদাসের লঘুতম অপরাধে দণ্ড হইয়াছিল পরিত্যাগ। ভারতের অতীত যদি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় ইহা অনুভূত হইবে। যখনই ধর্ম্মের উপর একটা প্রচণ্ড ধাক্কা আসিয়াছে, ধর্ম্মপরায়ণরা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, তখনই একটা ঘটনা হইয়াছে—যদ্দ্বারা পুনরায় ধর্ম্ম আবার স্থির হইয়াছে, ধর্ম্মাচরণপরায়ণরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন। এমনই এক বরণীয় ও স্মরণীয় ঘটনা শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব। তখনকার কলুষিত আবহাওয়ায় যে পাপ-পঙ্কিল অবস্থা আর্য্যধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সর্ব্বাংশে না হইলেও অনেকাংশে পরিবর্ত্তনের সূচনা করিয়াছিল

শ্রীচৈতন্যদেবের অভ্যুদয়। তাঁর প্রভাবে সারা ভারতবর্ষ সেদিন পুনরায় অন্ধকারময় বিচ্যুতির আশঙ্কা হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। জগৎ—অর্থাৎ গমনশীল জগতে যাহা কিছু আসে তাহা একদিন চলিয়া যায়। জগতের সেই চিরন্তন নিয়মের স্বীকৃতিতে শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর লীলা সম্বরণ করেন। অপ্রকট হন তিনি। কিন্তু জগতের মাঝে যে আদর্শ তিনি রাখিয়া যান, যে প্রেম-সরস সাধনার পথ নির্দ্দেশ করিয়া যান, যে উদাত্ত বাণী বলিয়া যান—আজও তাঁহার আদর্শ গ্রহণেচ্ছু সাধন-পথের পথিক জিজ্ঞাসুর নিকট তাহা চির অম্লান রহিয়াছে—থাকিবে। শ্রীচৈতন্যদেবকে বর্ত্তমান সঙ্কীর্ত্তনের জনক বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। হরিকীর্ত্তন সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের একটি শ্লোক এইস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"চেতো-দর্পণ-মার্জ্জন, ভবমহাদবাগ্নি নির্ব্বাপণম্
শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥"

কীর্ত্তনের ফলপ্রসঙ্গে মহাপ্রভু প্রথমেই বলিয়াছেন—'চেতোদর্পণ-মার্জ্জনম্' চিত্তের মালিন্য কাটিয়া যায় নামামৃতরসের প্রভাবে। বস্তুতঃ সঙ্কীর্ত্তন কেবল প্রচলিত অর্থে খোল করতাল-সহ গান করাকেই বুঝাইবে তাহা হইতে পারে না। কীর্ত্তন শব্দের ব্যাপক অর্থ ধরিলে জপ প্রভৃতিকে ইহার অন্তর্ভূক্ত করা যায়। যোগদর্শনে 'তজ্জপস্তদর্থভাবনম্' এই সূত্রের পর বলা হইয়াছে—"ততঃ প্রত্যক্ চৈতন্যাধ্যানঃ অন্তরায়া-ভাবশ্চ" নিরন্তর অভিমত মন্ত্রের শাস্ত্রানুমোদিত এবং শাস্ত্র ও গুরু নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে জপ করিলে মনের ময়লা কাটিয়া যায়।' আর মন শুদ্ধ না হইলে শ্রীভগবানকে অশুদ্ধ বিষয়ানৃত-পূতিগন্ধময় মন দ্বারা মনন করা সম্ভবপর নহে। মন-মুকুরে যে জন্মজন্মান্তরে সঞ্চিত আবর্জ্জনা স্তূপ রহিয়াছে তাহা পরিষ্কার করিয়া মনকে আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে এই জপ কীর্ত্তন উৎকৃষ্ট উপায়। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে যে কৃষ্ণকীর্ত্তনের মহিমা স্বয়ং মহাপ্রভু কর্ত্তৃক উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে সেই কীর্ত্তন করিতে হইলে সেইরূপ অধিকারীও যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া দরকার।

তাই মহাপ্রভু বলিয়া গিয়াছেন :—

"—তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

মহাপ্রভুর পবিত্র স্মৃতির কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বর্ত্তমান পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত করিলে বলিতে হয়—মহাপ্রভুর আদর্শকে নিজের জীবনে রূপ দিয়াছেন বলিয়া যাঁরা বলিয়া থাকেন আমরা—যতদুর জানি বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁরা কতকটা শিথিলতার ভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন। আমাদের মনে হয়—বেদ বা শাস্ত্রকে বাদ দিয়া ভগবদুপাসনা হইতে পারে না। তাই গীতায় স্বয়ং শ্রীভগবান নিখিল বিশ্ববাসীকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন :

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং।

প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাসানুযায়ী শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থটী প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে :—

'বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হইল নাস্তিক'

—অর্থাৎ বেদের প্রামাণ্য মানা না মানার উপর আস্তিকতা বা নাস্তিকতা বিচার করা হইবে। বেদও তদুপজীবী ঋষিপ্রোক্ত অনুশাসন বাক্যরাজিই শাস্ত্র এবং শাস্ত্রানুসারী আচার অনুষ্ঠান, ধ্যান ধারণা, ভক্তিপ্রেমকেই ধর্ম্ম বা কর্ম্ম অথবা উপাসনা বলিয়া গণ্য করা যাইবে। বেদ-বিরোধী যে কোন আচরণ অধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে।

"বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্ম অধর্ম্মস্তদ্ বিপর্য্যয়"।

এই নীতি অনুসারে যাঁরা বেদ-বিরোধী মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হইবেন তাঁহারা অধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইবেন এবং ধর্ম্মজগতের তাঁহারা অতি বড় শত্রুরূপে গণ্য হইবেন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ বোধ করি নাই। শাস্ত্রে আছে—

শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

শ্রুতিঃ স্মৃতি মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে।
আজ্ঞাচ্ছেদী মমদ্বেষী মদ্‌ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ॥

আর মনে রাখিতে হইবে যে শাস্ত্র 'নাম' করিবার নির্দ্দেশ দিতেছেন সেই শাস্ত্রই, সেই ঋষিই বলিয়াছেন :—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃপুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে সম্যক্ নান্যস্ততোষকারণম্!

শাস্ত্র সিদ্ধান্ত ও মর্ম্মানুসারে বলিতে হইবে বর্ণাশ্রমীর পক্ষে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাকে অস্বীকার করিয়া যদি কেবলমাত্র 'কামকারতঃ' আচরণ করা যায় তাহা হইলে রাগমার্গে বিচরণ করিলেও তাঁর নিকট নরকের দ্বাররক্ষীরাই স্বাগত সম্বোধন জানাইয়া থাকে।

কবি সম্মেলন

"……উঠে যাও, আরও উঠে যাও ; পাহাড়ের গা বেয়ে চূড়ায় ; চূড়া হতে চূড়ান্তরে ! নীচে বসে থাকা, নীচে পড়ে থাকা, নীচে পচে থাকা, গলে থাকা, মরে থাকা, ও কিছু নয়। উঠে যাও, আরও উঠে যাও। উঠে যাও সর্পিল পথের বাধা ভিন্ন করে ; পিচ্ছিল গতির নিষেধ ক্ষিপ্ত করে ; স্তিমিত নিঃশ্বাস আহরণের দুর্ধর্ষতাকে ছিন্ন করে। ওঠো, আরও ওঠো। যেখানে ঐ পাইনের বনে দোল লেগেছে ; যেখানে ঐ শাখে শাখে স্ত্রী 'কোণ' গুলি পুংকেশরের সমাগম প্রতীক্ষায় চঞ্চল ; যেখানে ঐ কুমারী ভূমির অঙ্গবাস সজ্জা ঝরাপাতার বেদনালালিত্যে শোভায়িত। ঐখানে ঐ যে একফালি সূর্য্যালোকে স্নান করছে নবোদ্গত পাইন চারাটী ওর কাছে গিয়ে গান গাও, মাটীর গান, আলোর গান, শিকড়ের গান, শ্যামল জগতের গান। গান গাও, ছবি আঁকো, তুষার-কিরীটী ঐ নীলছেঁড়া শিখরগুলির চমকে চোখ রাখো। চোখ রাখো নীচের ঐ স্ফীতায়িত গর্জন-ভৈরব লীদারের নীলে-শাদায় আঁকা আঙ্গরাখাটার পানে। উঠে যাও, উঠে যাও।"

একুশে সকালে ডায়েরীতে এই গান লিখেছি মম্মল থেকে ফিরে এসে।

বলেছি একটা ঘরে আমরা সাতজন। দুটী ছোটো ছেলে অতিরিক্ত, জলের কল নীচের তলায়। ছোট্ট একটা নামমাত্র বাথরুম ঘরের সঙ্গে। বড় জোর দুজন প্রাণীর প্রয়োজন মেটায়। চাকর এক বালতি গরম একবালতি ঠাণ্ডা জল দিয়ে যায়। এরপর প্রতি বালতি চার আনা। কাজেই স্নান হোলো সমস্যা।

আমি বলি অসিতকে—ভাবছো কেন ? পহাল গামে কি মন্দির নেই ? আছেই। মন্দির থাকলেই স্নানের ব্যবস্থা আছে।

অসিত বলেছিল লীদারে স্নান করতে। কিন্তু ক্যাম্পে কাশ্মীর সরকার ইস্তাহার দিয়ে গিয়েছিলো লীদারের জলে স্নান যেন না করি, পান তো নয়ই। জলটা নানা রোগের আকর।

সকালটায় নীচে গিয়ে দেখি মাঠে বাসনমাজা কলটাকে ঘিরে ছেলের দল দিব্যি এক স্নানের আড্ডা তৈরী করেছে। ম্যুনিসিপ্যাল স্কুলের সতেরোজন ছেলে, আরবী স্কুলের একুশ জন ছেলে, সবজীমণ্ডী স্কুলের কুড়ি জন ছেলে—সকলেই এখানে। আরবী স্কুল স্থান পেয়েছে খানিক তাঁবুতে খানিক হোটেলের ঘোড়া রাখা জায়গায়। এখন বহুকাল ঘোড়া তাতে থাকে না অবশ্যই।

এই কলতলায় মজীদের সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ। দিল্লীতে মুখচেনা ছিল। বক্সীসায়েবের বাড়ী আলাপ হয়েছিল। এখানে এসে কপাল চাপড়াচ্ছেন আর বলছেন "সবার ভাগ্যে সব কিছু, আমার ভাগ্যে ঘোড়া-শালা ; সবার ভাগ্যে সব কিছু হোসেনের ভাগ্যে খঞ্জর।"

মৌলবী সাহেবকে নিয়ে অনেক গাল-গল্প জমলো কলতলায়। হুকুম আর ধনেশে জল ভরে বেণুর স্নানের ব্যবস্থা করে দিলো। বাসনমাজার একটা হিড়িক পড়লো। হুকুম জোর করে নোংরা জামা কাপড়ের ডাঁই সংগ্রহ করে দুই টিন ভর্ত্তি করে মাঠের মাঝে পাথরের উনুন করে ফোটাচ্ছে সাবান জলে। ঝকঝকে রোদ। তাতে খালি গায়ে ওরা নানা কাজে ব্যস্ত। আমাদের স্নান হয়ে গেল। হুকুম আমার গেঞ্জি কাপড় নিয়ে সাবান দেবেই। বেণু শেষ অবধি দিলো তো না-ই ; ও আর অসিত বসে গেল হুকুমকে সাহায্য করতে।

স্নান সেরে পুল পার হয়ে বেড়াতে চলেছি ওপারের পাহাড়ে। নদীর ওপারে পাইন ভরা একটা পর্বত শিখর। শিখর যেন একটা উদ্ধত আহ্বান, দ্বন্দ্ব যুদ্ধে স্পর্দ্ধা জানাচ্ছে। দেখলেই আমি যেন ক্ষেপে উঠি। উঠতে হবে।

সুতরাং আজ সকালে ঐ পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ। সেই পাইন-ঢাকা পাহাড়। পাইন-ঢাকা পাহাড়ের গায়ের মতো বিপজ্জনক চড়াই বড় কম পাওয়া যায়। পাইনের পাতা তেলালো ছুঁচের মত বিছিয়ে থাকে গাদা গাদা। পা হড়কাবেই, অনিবার্য্য।

তবু উঠতে হবে। নদীর দেহ এখন ক্ষীণ। আসল দেহ বিস্তারের রেখা পার হবার পর প্রথম চড়াই কেবল এঁটেল মাটি। এতো পিচ্ছল যে চলা দুষ্কর। এ মাটি শেষ করে একটি পথ, অনেকটা উঁচুতে। পথের পরেই সোজা খাড়া পাহাড় আরম্ভ হয়েছে।

কিন্তু পথের ওপর এক মন্দির।

আমি মন্দির দেখেই চিৎকার করে উঠলাম "মম্মল্, মম্মল্।"

কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের বাড়ীর মেয়েরা। খর্বকায়া, জ্বলন্ত বর্ণ। আগা-গোড়া আলখোল্লা ঢাকা দেহ। মাথায় তিনকোনাকার বাঁধা কাপড়ের টুকরের তৃতীয় কোনটা ঝুলছে পিঠে—আর তার সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা কাপড়ের ফালির ডগায় ঝুমকো দুলছে প্রায় গোড়ালীর কাছাকাছি। আলখাল্লা পরে আছে বলে পায়ে লাগছে না।

হাতে পূজার সামগ্রী নিয়ে বেরুচ্ছে। পরণে গহনাগুলি কাশ্মীরী প্রথার ওজনে আর পাথরে গুরুভার।

মম্মল আছে পাহালগামের কাছে কোথাও জানতাম। এই মম্মলকে উদ্দেশ্য করেই বলেছিলাম পহালগামে ও মন্দির আছে এবং স্নানের

ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারবে। লীদারের বাম ধারে সরকারী রেষ্ট হাউস্। দক্ষিণে নদীর উঁচু খাই ভেঙ্গে পাহাড়ের নীচে মমলক বা মম্লেশ্বর শিব মন্দির। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাশ্মীরের রাজা জয়সিংহ মম্লেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এ মন্দিরের তলা দিয়ে ঝর্ণা বইছে। তার ওপর ছোটো মন্দির।

ভিতরে গিয়ে দেখি ছোটো শিব মন্দির। মন্দিরের ঠিক তলায় ঝর্ণা। সেই ঝর্ণার জল দিকে দিকে বইয়ে দিয়েছে মন্দিরের সেবায়েতরা। একধারা পড়ছে একটা কুণ্ডে। স্নান করা যায় পরম আনন্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। পুরুষেরা স্নান করছে। তার মধ্যে মেয়েরা। বাইরে ছোটো স্রোতস্বিনীর ধারা বইছে এদিক ওদিক সেদিক। কেউ কাপড় কাচছে, কেউ মুখ ধুচ্ছে, কেউ বাসন ধুচ্ছে। মম্লেশ্বরের মন্দিরের ঐতিহ্য নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে।

আমরা উঠেছিলাম সেদিন সেই গিরিশৃঙ্গে। অনেক বাধা অনেক বিপত্তির পর গিরিশৃঙ্গে ওঠা। কিন্তু ওঠার পর কী আনন্দ। যেদিকে তাকাও ছবির পর ছবি। তেমন জোরালো ক্যামেরা কই যে ছবি নেবো। পাইনের ডালে সকলকে বসিয়ে একটা ছবি নিলাম। এ বনে কজনই বা এসেছে, এ বনের এমন শান্তি কজনই বা ভোগ করেছে।

মনের স্বভাব এই বনের মতো। সমস্ত প্রত্যহের সমতল ভেদ করে সে চায় কোথাও একা একা কোনও উচ্চতায় উঠে যেতে, যেখান থেকে প্রতিটি প্রত্যহকে অবলোকন করা যাবে তুচ্ছ বস্তুর মধ্যে বিজড়িত সমগ্র একটি সুষমা। সমগ্র জীবনের সমতলকে এমনি এক দৃষ্টিতে দেখা যায়—মনের এই উচ্চতা পাবার তৃষ্ণাই মানুষের একাকীত্বের তৃষ্ণা। সঙ্গ-ও সমাজে থেকেও একটা সমাজ-সঙ্গ-অগোচর বৈরাগ্যের তৃষ্ণা। এখানে পর্বত শিখরের সঙ্গে আমার মনের ভারী মিল।

এই পাহাড় জয় করার পরেই ফিরে গিয়ে ডায়েরীতে লিখি ঐ কয়েকটী পংক্তি। ফিরতে দেরী হয়েছে। দুপুরের খাওয়া প্রায় সব শেষ। মিসেস শর্মা নিজে আজ রান্নার ভার নিয়েছিলেন তাঁর বিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষায়িত্রী আর বারোজন মেয়েকে নিয়ে।

মম্মল পাহাড়ের চূড়ায়

কান্তার আজ ভারী আনন্দ। মিসেস শর্মা-ওকে সম্মান করেছে, মর্য্যাদা দিয়েছে। রান্নাঘরে ও বালতি ভরে ভরে খাবার দিচ্ছে। মেয়েরা তাই গিয়ে পরিবেশন করে আসছে।

একটা কোণে বসে ওদের খাওয়া দেখছি। একটি মেয়ে একখানা চেয়ার আর টেবিল এনে বল্লে—"মাটীতে বসবেন না। উঠে বসুন।"

অবাক মানি,—সে কি! আমার জন্য এই কষ্ট করেছো তুমি? কেন?

মেয়েটি সেদিকে চেয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসছে সেদিকে চেয়ে দেখি মিসেস শর্মা। সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের চারিধারে এসে দাঁড়ালো জগজীবন, অসিত, বেণু, গুপ্তাজী, বিহারীলাল।

"থালা-বাটী—কুপন? এসব কৈ?"

মিসেস শর্মার হাতে বালতি। মেয়েরা ডিস আর চামচ দিয়ে গেল। "তখন থেকে খুঁজছি। কি কষ্ট করে আজ রান্না করিয়েছি কি বলবো। এক মিনিট রান্নাঘরের বাইরে যাইনি। আমার লক্ষ্য পাবার ছিল আপনারই কাছে। এখন এলেন। সব ফুরিয়ে গেছে। বেলা তিনটে বেজে গেছে, চারটের চা। আর থাকে কখনও?"

সান্ত্বনা দিই, 'কিছু হয়নি ওতে।' কিন্তু মানে না।

"কষ্ট করে করলাম। তৃপ্তি করে খাওয়াতে পারলাম না।"

কিন্তু সেদিন সত্যিই তৃপ্তি করে খেয়েছিলাম। পেলাম ডাল, ভাত আর একটু দই। কিন্তু খাদ্য আর তৃপ্তি যেন রূপ আর অরূপের সম্বন্ধ।

এখন থেকে ক্যাম্পে এই ব্যবস্থাই রইলো। মেয়েরাই খাদ্য পরিবেশনই করে না শুধু, রন্ধনশালায় দাঁড়িয়ে থেকে রাঁধায়ও। এক একদিন এক এক মেয়ে-স্কুলের ভার।

বিহারীলাল আমায় বল্লে "চলুন মজিদের ঘরে আজ মুশায়রা আছে, চলুন।" প্রায় টেনে হাতে একটা সিগারেট গুঁজে দিয়ে আমায় নিয়েও বসালো মজিদের ঘরে।

বর্তমান কাশ্মীরী ভাষায় কবিতার আলোচনা চলছিল। বর্তমান কাশ্মীর, নব-কাশ্মীরের বড় বড় কবিদের মর্মকথা ; প্রেম নয়, কাব্য নয় ; --দেশ, জনতা, মাটীর প্রেরণা, জীবনের সংবাদ। বিশ্বমানবসমাজের বড় বড় দুটো প্রভাব সেমেটিক আর এরিয়ান। সেমেটিকরা যেমন বস্তুবাদী, যথার্থবাদী, জীবনবাদী, এরিয়ানরা তেমনি তত্ত্বাশ্রয়ী, আদর্শবাদী, জীবনোত্তর বাণীর প্রত্যাশী। এই সেমেটিক দর্শন প্রভাবিত করেছে কাশ্মীরকে। তাই কাশ্মীরের মাটির গুণ সে সমাজতন্ত্রের মূল কথা সহজে গ্রহণ করতে পারে, সাম্রাজ্যবাদের খোলস অকম্পিত হস্তে চড় চড় করে টেনে খুলতে পারে।

আজ কাশ্মীরের বড় কবি জিন্দা কাউল, মহজুর, আজাদ। আজাদের গান আজ কাশ্মীরের ঘরে ঘরে। জিন্দা কাউলের একখানা গান লিখে এনেছিলেন।—

কাঁদবেই মানুষ কাঁদবে
গিলে ফেলবে না সে তার অশ্রুজল
কিন্তু তবু ফল কিবা তাতে বল্?
ফল কি তাহার যদি আঁখি হতে রক্ত ঝরে
ফল কি তাহার পাথরে মাথা সে কুটিয়া মরে
সে জানে তাহার অপেক্ষা নেই কারো
তবে কেন তাড়া জাগাইতে সাড়া
জনের করুণা দোরে
তবে কেন তীর দুর্নীরীক্ষ্য লক্ষ্য করিয়া বৃথা
কেন বাধ্যতা? কেন অসহায় দৈন্য?

এ কাব্যে জিন্দা কাউল বেদনাকে স্বীকার করেছে ; মানুষের আর্তনাদকে অবশ্যম্ভাবী মনে করেছে মহাকালের অট্টহাস্যের মতো। কিন্তু আরও গভীর বেদনার কথা বলা হয়েছে অন্য এক কাব্য খণ্ডে।

মরছে মানুষ মরছে
পলে পলে আর তিলে তিলে মানুষ মরছে, মরছে।
মরছে ক্ষুধায়, মরছে শীতে, মরছে নিরুদ্ধ তৃষ্ণায়
চিৎকারের ওপর যবনিকা টেনে।
রোগে বিপন্ন, শ্রমে অবসন্ন সে মরছে।
ভয় তার, অভাব তার, শোক দুর্ভাগ্য তার ; সে মরছে,
কিন্তু দুঃখ পায় অবসান
আশা শত ছলায় করে লোভাতুর
মন ওঠে দুলে ;
পায় না সে শান্তি কোনো ঐহিকে
কি যেন তাকে হাতছানি দেয়, ডাকে, ভোলায়,
সে জানেনা সুন্দর শিব আছে কি নেই কোথাও
দেখেনি সে, পায়নি।
তবু তার আশা তার হারানো জিনিষ হয়তো
সে পাবে একদিন পাবে,—
মাতাল যেমন স্বপ্নে পায় হারানো পেয়ালার মদের স্বাদ!

অভাব-বাসনার মাঝে একী দুর্গতি না জীবন? জিন্দা কাউল এখন বৃদ্ধ। লোকে জানে 'মাষ্টারজী' নামে। রবীন্দ্রনাথ যখন কাশ্মীরে যান তখন জিন্দা কাউল তাঁকে কবিতা শোনান। বিশ্বকবি তাঁকে কবিতা শোনান। বিশ্বকবি তাঁকে অভিনন্দিত করেন। খুব সামান্য ঘরে জন্ম নিয়ে বহু কষ্টে শুধু বি-এ পাশই করেন না, অনেকগুলো ভাষা শিখে ফেলেন। এঁর গুরুও কবি ছিলেন। একটা কবিতার শেষ চরণ লিখতে গিয়ে তিনি পড়েন সমস্যায়। তখন জিন্দা কাউল কিশোর। তিনি একটি চরণ রচনা করে দেন। গুরু মহাখুশী। গুরুর আশীর্বাদ আর রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ নৈলে এমন কাব্য রচনা করা যায়না।—

আমারে পরিহরি কেন গো যাও সরি
কেন গো রাখনি তা যে কথা দিয়েছিলে
তোমারি গান গেয়ে, তোমারি পথ চেয়ে
তোমারি ভালবাসা চেয়েছি অবহেলে
আসিবে যবে তুমি জাগায়ে বনভূমি
কি কথা কহিব গো, কহিতে বাধে ভাষা
বিরহ তাপে মম শুকালো প্রিয়তম—
এদেহ ; শুকালোনা তবু তো ভালবাসা।

বেশ পাওয়া যায় এ গানে হাব্বার সুর, রবীন্দ্রনাথের সম্মোহ।

পহলগামের মাঠের পারে তাঁবুর ঘরের মধ্যে দশ বারোটী মুসলমান যুবক। সঙ্গে ঐ বৃদ্ধ মজিদসাহেব। কাশ্মীরী গানের বন্যা ছুটেছে, কাশ্মীরী কবিতার ঢেউ। লীদারের শব্দ আসছে ভেসে যেন সাগরের গর্জন। বাতাস বইছে পাহাড়ের বনের মধ্য দিয়ে পথ করে। আকাশে মেঘ। ঝির ঝির করে পড়ছে জল।

আজাদের কাব্য সুরু হোলো। আজ কাশ্মীর আজাদের নামে বিহ্বল।

তুমি বলেছো যা আজাদের কানে কানে
সে বাণী বিলোয় সারা কাশ্মীর মাঝে
কেন ছেলেমী এ ধর্ম ধর্ম করে
কুফর্ দীনের কেন আলোচনা বাজে?
হিন্দু মুসলমান
প্রদীপ শিখার আলোর বখ্রা
সবার একসমান
সমুখে বিশাল একের মহিমা

কে আপন কেবা পর
হিন্দুই বা কে মুস্লিম বা কে
কে চাহে কাহার ঘর
আমার ধর্ম নেই
ভাই যদি ভাই না চায় তাহোলে
ধর্মেতে কাজ নেই
কাজ নেই আলো কাজ নেই শিখা
দিলনা যে মোরে আলো
সবারে আপন করিতে দিল না
বাসিতে দিলনা ভালো।

নদীম এ কালের কবি। এ কালের ধ্বনি পেলাম তাঁর কাব্যে। সুর করে গায় এরা গান।

"হোশিয়ার তুই খুন-পিয়াসা লড়াই বাজ !
কিসের রে তোর দেমাক আজ ?
কাগজ বারুদ বোমার তোপ ;
যুদ্ধ-বিবাদ রুদ্র কোপ ;—
সোনা-রূপা আর ডলার পাউণ্ড,
দেমাক তাতেই রে ব্লাড-হাউণ্ড।
দেখলি কি তুই, দেখিস কি তুই শ্রমিক চাষীর আস্ফালন ?
দেখ রে দেখ না, দেখ এখন !
ভূমিকম্পে নিঃশঙ্কে এলো রে এলো এ প্রবর্ত্তন।"

নাদীমেরই অন্য কবিতা ;—

বাহিরের ডাক এসেছে রে শোন
বার হতে হবে আজ
আজই-আজই-আজ।
গড়বো নতুন পথ ;
ভাঙবো দেয়াল, তুচ্ছ সে বাধা।
জগন্নাথের রথ
হাঁকিয়ে ফিরবো ; শত্রুর চোখে নির্ভয়ে রেখে চোখ
ডাকাতের দল খেঁটিয়ে তাড়াবো ; রুখবে কেমোর রোখ ?
তফাৎ যাও, যাও তফাৎ
গর্জন করি দিনও রাত,
হাতেতে আমার কাস্তে হাতুড়ি, আর কলমের কালি,
বক্ষে শপথ, লাল-অক্ষরে জ্বালি,
ঘুরে ঘুরে ফিরে এখানে-ওখানে
ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তার সন্ধানে
সর্বগ্রাসী কে সে শয়তান ; ভাঙবো তাদের ভুল
কাস্তে-হাতুড়ি-কলম-অস্ত্রে হবে তারা নির্মূল।

কিন্তু আশ্চর্য্য লাগলো বর্ত্তমান কাশ্মীরের অন্যতম সাহসিক মন্ত্রী মীর্জা গুলাম বেগের কাব্য শুনে। 'অরিফ' ছদ্মনামে বা কাব্যিক নামে ইনি লেখেন। উর্দু, হিন্দী প্রভৃতি উত্তরাখণ্ডের ভাষায় কবি নাম গ্রহণ করা একটা কায়দা। অরিফের কাব্য সমাজবাদ, সংগ্রামিক সমাজবাদে সামূহিক বিপ্লবে বিশ্বাস রাখে। প্রশ্ন আছে ; সমাধান নেই। না থাক্, এ প্রশ্নই সমাধানের একটা সিঁড়ি। কাশ্মীরী শাল কারিগরদের ওপর প্রসিদ্ধ কবিতাটির পরিচয় আগে দিয়েছি। কবিতাটা এখানেই শুনি। আরও দুটী ছোট্ট গজল শুনি তাঁরই লেখা ;—

'শুনেছি ছানি কেটে দৃষ্টি দিতে পারে কতো সে শহরের গুণী
পারি কি পারি আমি তাদের কাছে যেতে ?
আমি যে বসে বসে বুনি।
অন্ধ পরশের মমতা বিনিময়ে অন্ন দুই মুঠী গুণি।'

'দৌলত তব ভাগ করে দিতে কেন এ গণ্ডগোল ?
যদি দিতে সব সমান বখ্‌রা মেপে
আকাশে দেবতা থাকতেন সুখে
ধরায় মানুষ সুখ পেতো বুকে
পাতালের যতো শয়তান তারা
মরে যেতো কেঁপে কেঁপে।

মজহুর গায় অন্য গান অন্য সুরে—

বুলবুল চায় তার গোলাপে
মৌমাছি চায় নারগিশে হায়
কাশ্মীর চায় কাশ্মীরী ভাই
কাশ্মীরী কাশ্মীরে শুধু চায়।
* * *
আমাদের দেশ কানন ভরা এ স্বর্গ
আমাদের দেশ সকল ধরার দর্প
ভালবাসো এরে ভালবাসো আরো বাসো
এরে বুকে ধরে স্বাধীন চিত্তে হাসো।

মজহুর বলেছে—

হিন্দু চালাবে বৈঠা,
মুস্লিম ধরে হাল
এখানে আবার ভেদাভেদ কোথা
তীরে তীরে আর কোলাহল কোথা
একতার গণি এক মন জানি
মাঝি তুলে ধর পাল
হিন্দু নিয়েছে বৈঠার ভার
মুস্লিম ধরে হাল।

এসব গানের সুরে ছন্দে কাশ্মীর আজ মাতোয়ারা। কাশ্মীরে ভারতের পতাকা উড়বে না অন্যদেশের—এ কথা কাশ্মীরের চিত্তকে কখনও কোনও দিন ব্যাকুল করেনি। কোটারাণীর সময়ে করেনি, হাব্বার সময়ে করেনি। আজের মকবুল শেরওয়ানীর সময়েও করেনি এখনও করে না। কাশ্মীরের অন্তর্লোকের কথা কাশ্মীরে কাশ্মীরী থাকবে কি থাকবে না। হিন্দুও কাশ্মীরী, মুসলমানও কাশ্মীরী এই বাণীই কাশ্মীরের সম্পদ। জিন্নাকে এই বাণী শোনানোর অপরাধেই বারামুলায় শের-

গুণীকে মারা হয়। জনমত বা গণভোট তো রাজনৈতিক একটা দাবাখেলার দান। কিন্তু তারও ওপর য চিরন্তন সত্য সে কাশ্মীরীর দৃঢ়বিশ্বাস আপন ঐক্যে, আপনার দেশের মমতায়।

মজিদ সাহেব নিজে কাশ্মীরী জানতেন, তাই আসরটা জমেছিল খুব। কাশ্মীরে প্রথম কাব্য রচনা হয় হাব্বার সময়ে। এর আগে প্রাকৃত ভাষায় অর্থাৎ দেশের মাটীর ভাষায় সাহিত্য রচনার আদর ছিল না। তখন ছিল সংস্কৃতের প্রচার। আর্য্য সংস্কৃতির'এই একটা দাপট এককালে খুব জোর করেছিল। দেবভাষা বলে সংস্কৃতকে এরা উচ্চে স্থান দিলো তো এমন দিলো যে—অন্য ভাষাকে মাথা তুলতে দিলোনা। আজ আবশ্যিকভাবে হিন্দী শিক্ষার বিপক্ষে আমরা যা যা বলছি এককালে কাশ্মীরী বা মাদ্রাজী-রা যে সংস্কৃতের বিপক্ষে সে কথা বলেনি এ কথা বলি কি করে। কিন্তু তখন আর্য্যরা কৃতসঙ্কল্প ধনে প্রাণে মনে জয় সুসম্পন্ন করার। কাজেই লোকসাহিত্যকে অন্ত্যজ, নগণ্য করে রেখে একটা স্তোকাশ্রয়ী বিশেষ সাহিত্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। মরে যায় দেশের কথা। তবু মরে না। বটের চারার মতো অক্ষয় প্রাণ দেশের ভাষার। মিথ্যায় রচা মরশুমী ফুলের বাহারকে দমিত করে মহাকালের সাক্ষ্য এই বটবৃক্ষ একদিন সব গ্রাস করে। কোনও বিবর্ত্তনবাদের ফলে সংস্কৃত হয়েছে পালি, প্রাকৃত পরে দেশীয় ভাষা—এ কথার যথার্থ্য ও সঙ্গতি মানতে সাড়া পাইনে। মনে হয় কে যেন কবে জুলুম দিয়ে এই দেব ভাষা বানরদেব ওপর চাপিয়ে দেয় আবশ্যিক ভাবে। যারা মারেনি তাদের অন্ত্যজ, অন্ত্যেবাসী করে রেখেছে, অনধিকারী করে রেখেছে স্ত্রী, শূদ্র এবং প্রথম তিনটী দ্বিজবর্ণেতর অন্যান্য বর্ণের মধ্যে। এতে যে বিশেষ একটা গোষ্ঠীর সৃজন হোলো তার সাহায্যে কোটী কোটী নিগৃহীতকে উৎপীড়ন করা চলতে লাগলো যুগের পর যুগ যাতে তারা মনে প্রাণে সিদ্ধান্ত করে নিলে যে তারা হীনের হীন, সভ্যতার মাপ কাঠীতে অত্যন্ত খাটো। এই ধরণের সাংস্কৃতিক অত্যাচার মানুষের মূল্যকে যে কতো ছোট করে দিতে পারে তার কথঞ্চিৎ বিকাশ তো আমরাই আমাদের সাম্প্রতিক কালে লক্ষ্য করেছি ইংরাজীর মাধ্যমে। কিছুদিন আগেও গ্রামে গ্রামে ইংরেজী জ্ঞানকে পরমজ্ঞান মনে করা হোতো। ইংরাজী বক্তাকে দেবলোকের প্রতিনিধি মনে করা হোতো, ইংরাজী জ্ঞানে অপারদর্শী দেশী পণ্ডিতের পক্ষে শিক্ষার বিড়ম্বনাকে আমরা সহজ চক্ষে দেখেছি। আশার কথা দিনটা এখন শেষ হয়ে এসেছে। যারা আপত্তি করছে আজও, তারা স্বল্প ও ক্ষীণদৃষ্টি। ইংরাজী একদা প্রাণ দিয়ে শিখেছে বলে, ইংরাজী ভাষার মাধুর্য্য রস জীবনে উপলব্ধি করেছে বলে তারা এখনও আপত্তি জানায়। কিন্তু সত্য যা তা বটের গাছের মতো আত্মপ্রকাশ করবেই।

মজিদ সাহেবের সঙ্গেই এ বিষয়ে আলোচনা চলতে লাগলো। "সামান্য ইংরেজী যাবৎ না শিখলাম তাবৎ কেউ পাত্তা দিলো না। জীবনে দু'টা ভাষা শিখেও দুখানা রুটী সংগ্রহ করতে পারতাম না। প্রথম স্ত্রী মারা গেলেন গর্ভাবস্থায় এনিমিয়া রোগে। বুঝলাম খেতে দিতে পারিনি তাই মরে গেল। আর বিবাহ করিনি; করতাম ও না। কিন্তু মুহব্বতের খেল। আমি পই পই করে পাড়া প্রতিবেশীদের দিয়ে অবধি বললাম আমার দারিদ্র্যের কথা। কিন্তু জনাব হামিদাবেগম আমার জন্য দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগলো। তার বাপ ছিল বড় উকীল। আমায় এসে জোর করে ধরলে। আমি তখন ঠিক করেছি ইংরিজী না জেনে, রোজগার না করে সংসার করবো না। জনাব আমার ইংরিজী শেখা হামিদা বেগমের কাছে। শ্বশুরের সুপারিশে এই চাকরি। হিব্রু, ফার্সী, আরবী, উর্দ্দু, ইজীপ্সিয়ান, পোস্তু, তুর্কী এই সব ভাষাগুলোর দরবারে আদাব করার পরেও ইংরিজী না শিখে বদনার জলে হাত দেবার হুকুম পেলাম না জীবনে।

পহালগামের বাজার

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

ছেলেরা মেয়েরা সব বেড়াতে বেরিয়েছে সেজেগুজে। কেউ যাচ্ছে পাহাড়ে, কেউ নদীর পাড়ে, কেউ ঘোড়ায়, কেউ পায়ে হেঁটে।

এঁদের সহজ আনন্দে কোনও রকমের খাঁজ ছিল না। দেখলে মন ভরে যায়।

আমি আফিস ঘরে কথাবার্ত্তা সেরে একা একা নেমে চলেছি লীদারের ধারে ধারে। তাঁবুর পর তাঁবু। কত পরিবার কত পরিবেশে নবতার স্বাদ নিচ্ছে। শোভা আর মীনাক্ষীকে এখানে দেখতে পেলাম। মীনাক্ষী নমস্কার করলো। শোভা করলো না।

ক্লাবের পিছনে নতুন সুইমীং পুল তৈরী হচ্ছে। তার পাশে একটা বড় পাইন একেবারে নদীর ওপর প্রায় ঝুঁকে পড়েছে। সেই পাইনের তলায় কাঠের রেলিং ঘেরা দিব্যি বসার জায়গা। বেঞ্চি পাতা আছে। একটু গাছ ঢাকা নিবিড় নিরালা জায়গা। লোভ হয় একটু বসি।

কিন্তু বসবো কি। বেশ বুঝলাম যেতে নেই। প্রকৃতিস্থ নেই তুঙ্গভদ্রা। ক্লাবের আর্দালীটা ট্রেতে করে দুটো গেলাস নিয়ে গেলো। খালি গেলাস দুটো ফিরিয়ে নিয়ে গেলো। ভদ্রলোকটী ভারতীয় নয়। তুঙ্গভদ্রার জীবন কী দুঃসহ ভাবতে লাগলাম।

ডিপ্রেশনে থেকে এক ধরণের চাপা দেওয়া প্রবৃত্তি জাগে। উচ্ছৃঙ্খলতার দুটো ধারা আছে। একটা ধারা চলে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের বেগ ধারণ করার যোগ্য—পরিসরের অভাব হলে, বন্যার মতো দুকূল ভেঙ্গে; অন্যটা চলে অস্বাস্থ্যকর জীবন বহন করার কষ্টে, বাইরের নেশা সংগ্রহ করে, বেদনাকে অস্বীকার করার চেষ্টায়। দ্বিতীয়টা বেশী ক্ষতিকর। মন যখন জীবনের আস্বাদ পায়না, ক্ষুধা যখন প্রবল নয়; তখনও বেঁচে থাকার দায়কে মানুষ বহন করে কি করে? কাজেই এধার ওধার থেকে নানা উপায়ে জীবনের স্বাদকে বাড়িয়ে তুলতে চায়। অজীর্ণ রোগীর পক্ষে লঙ্কা বা অম্লের তৃষ্ণার মতো তারা অপাচ্যকে বন্ধু মনে করে।

পহলগামে আমি যেন একটা বদ্ধ সমাজে এসে পড়েছি। আমার চোখ কিছুতেই আমি প্রকৃতির দিকে মেলে ধরতে পারছি না। কেবল দেখছি মানুষ। ভাল লাগছে না।

আরও ঘুরতাম। বৃষ্টি নামলো। তাড়াতাড়ি ক্যাম্পে ফিরে দেখি ওরা আমার আশায় অপেক্ষা করে আছে! এ বেলাও খাওয়া ভালোই হোলো।

অনেক রাত্রে শুয়ে শুয়ে কথা হতে লাগলো মজিদ সাহেবের। লোকটা এতো গুণী অথচ এতো নিরীহ।

কে যেন সেতার বাজাচ্ছে, ভারি মিষ্টি. সকরুণ দেশ। তারপরে মালকোষ। কে বাজায়। হোটেলে কে হবে হয়তো।

(ক্রমশঃ)

চক্ষু-দান

শ্রীসুধীর গুপ্ত

(১)

কুয়াশা-কুহকে ধরণী ধূসর হোলো;
শীতের শিশিরে শিহরে খেজুর-পাতা,
ঘোর সন্ধ্যায় ভুতুড়ে দেখায় বুঝি
খেজুর গাছের ঝাকড়-মাকড় মাথা।

(২)

আঁধারে আঁধারে ছায়ায় ছায়ার মত
এমন সময়ে সহসা আসিয়া চাষী
খেজুর-গাছের বদনাবরণ তুলে
চক্ষু ফুটায়ে ছায়ায় মিলালো হাসি'

(৩)

গলায় বাঁধিল মাটির কলসী দড়ি,—
ফাঁস তো তাহার ছড়ানো যায় না মোটে,
চক্ষু ফাটিয়া নির্যাস ফোঁটা ফোঁটা
রাত-ভোর ঝ'রে কলসী ভরিয়া ওঠে।

(৪)

শিশির ঝরিছে—জাড় পড়িয়াছে খুবই;
হঠাৎ কেবল দমক মারিছে হাওয়া;
বক্ষের মধু চক্ষু ছাপায়ে ঝরে,—
চাষারই কেবল যায় নাকো দেখা পাওয়া।

(৫)

চক্ষু ফুটালো রুক্ষ—রসিক চাষা
শান্তি কি তা'র হবে না রাতেও ভঙ্গ?
ভাণ্ড ভরিয়া ধরিয়া বক্ষ-মধু
চক্ষু হ'য়ে কি কাঁদিবে গাছেরই অঙ্গ?

(৬)

রসের রসিক আসিবে নিশির শেষে,
মাথায় তুলিয়া ল'বে সে রসের ভাণ্ড;
সে রস রসিয়ে হয়তো করিবে গুড়—
হয়তো বা তাড়ি,—হায় রে অবাক্ কাণ্ড!

(৭)

যেমন বিটপী—তেমনই তাহার চাষা;
চোখ-ফুটানোর নেশার এমনই টান
রসের চক্ষু যে কভু ফুটাবে যা'র
ফিরে সে করিবে তা'রেও চক্ষু-দান।

জেবউন্নিসার আত্মকাহিনী

ডক্টর শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শাহজাদা আকবরের নিকট বাদশাহ আলমগীরের পত্র :

আমার প্রাণাধিক পুত্র মহম্মদ আকবর,

আমার অন্তরের নিকটতম, আমার নয়নের মণি, আমার অকপট অনুকম্পা সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তোমাকে জানাচ্ছি, আল্লাহ সাক্ষী, আল্লাহ জানেন যে তোমাকে আমি আমার সকল পুত্রের চেয়ে বেশী ভালবাসতাম এবং তুমি আমার সবার চেয়ে প্রিয়পাত্র ছিলে। কিন্তু রাজপুতদের ছল চাতুরী তোমাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। এই রাজপুত জাতি মনুষ্যরূপী শয়তান। এই রাজপুতগণ তোমাকে স্বর্গের নিধি থেকে বঞ্চিত করেছে। তুমি তাদের প্ররোচনায় দুর্ভাগ্যেরই অজানা পথে ঘুরে বেড়াচ্ছ। তোমার শোচনীয় উদ্বেগ, আশঙ্কা এবং দুর্ভাগ্যের সংবাদে আমার হৃদয় শোক এবং দুঃখের অতল তলে নিমগ্ন হয়েছে। উঃ! জীবন আমার বিষময় হয়ে উঠেছে। এর বেশী আমি আর কি বলতে পারি? ধিক! সহস্র ধিক! তুমি মুঘলবংশের মর্য্যাদা এবং শাহজাদার আভিজাত্য দূরে নিক্ষেপ করেছ। তুমি যে শাহানশাহ আলমগীরের পুত্র সেকথা ভুলে গিয়েছ। তুমি যৌবনের উচ্ছলতায় তোমার সারল্য বিস্মৃত হয়েছ। তোমার পত্নী এবং সন্তানগণের প্রতি কর্ত্তব্য ভুলে গেছ। তুমি পশু অপরাধী, পশুমনা, দুষ্ট—রাজপুতদের আশ্রয়ে তুমি একটি ক্রীড়নকের মত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছ। একবার তোমার উত্থান, পর মুহূর্ত্তেই তোমার পতন; তারপর তোমার পলায়ন। উঃ! তৈমুর বংশের সন্তানের কি দুর্ভোগ।

বিশ্বপিতা, এই জগতের সমস্ত পিতার অন্তরে পুত্রস্নেহের বীজ বপন করেছেন। তোমার শত গুরুতর অপরাধ সত্ত্বেও আমি ইচ্ছা করি না যে তোমার কৃত পাপের জন্য যেন তোমার প্রতি যথেষ্ট শাস্তি বিধান করা হয়।

পুত্র পিতার প্রতি ভস্ম নিক্ষেপ করেছে কিন্তু মাতা পিতা সেই ভস্ম দ্বারা চোখের অঞ্জন রচনা করেছেন।

হে আমার প্রাণাধিক! অতীতে যা ঘটেছে তা বিস্মৃতির অতলে ডুবে যাক। যদি তুমি ভাগ্যবান হও, তবে তোমার কৃতকর্ম্মের জন্য তুমি অনুতাপ করবে। যে কোন স্থানে ইচ্ছা করলে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পার। তোমার সমস্ত ভুল, সমস্ত অপরাধ আমি এক মুহূর্ত্তে মার্জ্জনা করব। তোমাকে আমি এমন অনুগ্রহ, এমন পুরস্কার দেব, যা তুমি কল্পনা করনি। তোমার সমস্ত দুঃখ, সমস্ত উদ্বেগ নিঃশেষ হয়ে যাবে। অবশ্য পুত্রের প্রতি পিতার অনুগ্রহ সাক্ষাতের অপেক্ষা রাখে না। তবুও বলব যে তোমার অপমানের পাত্র বিধাতারই বিধানে পূর্ণ হয়েছে। তুমি একবার আমার সম্মুখে এস এবং তোমার সমস্ত অপমানের লজ্জা দূরীভূত কর। রাজপুত কুলতিলক যশোবন্ত সিং দ্বারা শিকোকে সাহায্য করেছিল, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। কি ফল হয়েছিল জান? পরাজয় আর অপমান। তোমার ভাগ্যলিপি নিশ্চয়ই তুমি জান। আল্লাহ্ তোমার সহায় হউন। আল্লাহ্ তোমাকে সুপথে চালিত করুন।

মহম্মদ আকবরের প্রত্যুত্তর

শাহানশাহের দীনতম পুত্র, শাহজাদা মহম্মদ আকবর, যথাবিহিত সম্মান, শ্রদ্ধা, নতি এবং অভিবাদন অন্তে নিবেদন করছে;—দাসের প্রতি অনুগ্রহ করে সম্রাটের লিপি দীনতম পুত্রের নিকট এসেছে—অতি শুভ মুহূর্ত্তে এবং অতি শুভস্থানে। সম্রাটের পবিত্র লিপিখানি আমার শিরে ধারণ করলাম। পত্রের অপূর্ব শ্বেত অংশ আমার নয়নে আলোক সম্পাত করেছে এবং কৃষ্ণবর্ণ অক্ষরগুলি আমার নয়নে অঞ্জন হয়ে উঠেছে। পত্রে বর্ণিত সংবাদগুলি আমার অন্তর এবং নয়নকে দীপ্তি দিয়েছে। আমি জাহাপনার সম্মুখে পত্রের উপদেশ ও অনুগ্রহগুলির সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিবেদন করছি। সত্য জগতের সমস্ত বিষয়ের মূল এবং ন্যায়ের অনুসরণ করে।

সম্রাট লিখেছেন—"আমি আমার এই পুত্রকে অন্যান্য পুত্র অপেক্ষা অধিকতর ভালবাসি; কিন্তু সেই পুত্র দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার অতুল সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং নিজের স্বদৃষ্ট আবর্ত্তে নিজেকে নিক্ষেপ করেছে। স্বাগতম হে দৃশ্য এবং অদৃশ্য জগতের বিধাতা, তোমাকে অভিনন্দন করি। পিতার তৃপ্তি সম্পাদন এবং পিতার সেবায় পুত্রের আত্মনিবেদন যেমন কর্ত্তব্য, পিতারও তেমন কর্ত্তব্য যে সমস্ত পুত্রদের সমদৃষ্টিতে প্রতিপালন করবেন? তাদের নৈতিকও জাগতিক প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন এবং তাদের ন্যায্য অধিকার দান করবেন। আল্লাহ্‌র জয় হউক। আমি আজ পর্য্যন্ত পুত্রের কর্ত্তব্য সম্পাদনে ত্রুটি করি নাই বা পরাঙ্মুখ হই নাই। আমার প্রতি সম্রাটের অনুগ্রহ এবং পুরস্কারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া আমার পক্ষে কি করে সম্ভব হতে পারে! সম্রাটের অনুগ্রহের সহস্রভাগের একভাগ কি বলা সম্ভব? কনিষ্ঠ পুত্রের নিরাপত্তা এবং যত্ন সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বস্থানে পিতার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সম্রাট পৃথিবীর এই চিরাচরিত নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন। কনিষ্ঠ পুত্রদের তুচ্ছ করে জ্যেষ্ঠপুত্রকে শাহ উপাধি দান করে সম্মানিত করেছেন। নিজের উত্তরাধিকারী স্থির করেছেন। কোন ন্যায় এবং নীতির বিচারে সম্রাটের এই কার্য্য সমর্থন যোগ্য? সমস্ত পুত্রেরই পিতার সম্পত্তিতে সমান অধিকার। পবিত্র কোরাণ ও ধর্ম্মের কোন

বিধি অনুসারে এক পুত্রকে সম্মানিত করে অন্য পুত্রদের অবনমিত করেছেন। অবশ্য দুনিয়ার মালিকের বিধানকে প্রশ্ন করবার অধিকার মানুষের নাই। হিন্দুস্থানের মালিক দুনিয়ার মালিকের পথ অনুসরণ করার গর্ব্ব করেন। আপনি দুনিয়ার লোকের পথপ্রদর্শক—দুনিয়া আপনার পথ অনুসরণ করে। আপনার পথ যে অনুসরণ করে তার কি কখনও অন্যায় হতে পারে! সেই লোক কি কখনও দুর্ভাগ্য হয়? এ দীন পুত্র তো তার পিতার পথ অনুসরণ করছে।

হে অমর জগতের মণি, মানুষ দুঃখ কষ্ট নিজের কর্ম্মের জন্যই ভোগ করে। আমাদের পূর্ব্বগামী সম্রাট জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ইচ্ছা করেই গোলযোগ সৃষ্টি করেছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত অভীষ্ট লাভ করেছিলেন। ইতিহাস কি প্রমাণ করে না যে আলেকজাণ্ডার অনাচারের মধ্য দিয়েই জীবনে অমৃতের স্বাদ লাভ করেছিলেন। কণ্টক বাদ দিয়ে গোলাপ হয় না। গুপ্তধনের বিবরে সর্প বাস করে এবং গুপ্তধনকে রক্ষা করে।

পরিশ্রমের পরিশেষে আসে শ্রান্তি, তৃপ্তি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে আল্লাহর অনুগ্রহে আমার অন্তরের অভিলাষ পূর্ণ হবে। আমার সমস্ত উদ্বেগ আশঙ্কা পরিশ্রম আনন্দে, উৎসবে পরিণত হবে।

জাঁহাপনা লিখেছেন—"যশোবন্ত সিংহ রাজপুত কুলমণি ছিলেন। তিনি দারা শিকোকে কি সাহায্য করেছিলেন তাহা কারো অবিদিত নয়। সুতরাং এই বিশ্বাসঘাতক জাতিকে বিশ্বাস করা চলে না। জাহাপনা যথার্থ কথাই বলেছেন। দারা শিকো রাজপুত জাতিকে ঘৃণা করতেন। তাঁকে সে ঘৃণার ফল ভোগ করতে হয়েছিল। যদি প্রথম থেকেই দারা শিকো রাজপুতদের সহযোগে কাজ করতেন তবে তাঁর এই বিপর্য্যয় হত না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আকবর রাজপুত জাতির সঙ্গে মৈত্রী ও প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলেন—তাদের সহায়তায় হিন্দুস্থান জয় করেছিলেন। মহাবৎ খান এই রাজপুতদের সাহায্য নিয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীরকে বন্দী করেছিলেন। শঠ ও প্রবঞ্চকদের যথাযোগ্য শাস্তি দিয়েছিলেন। জাঁহাপনার নিশ্চয় মনে পড়ে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণের কাহিনী। সেদিন তিনশত মাত্র রাজপুত যে অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখিয়েছিল সে কাহিনী সর্ব্বজন বিদিত। সে এক অভূতপূর্ব্ব কাহিনী। নিশ্চয়ই জাঁহাপনা বিস্মৃত হন নি যে শাহজাদা সুজার সঙ্গে যুদ্ধের সময় যশোবন্ত সিংহ অমার্জ্জনীয় অবাধ্যতা দেখিয়েছিলেন। জাঁহাপনাকে অপমানও করেছিলেন। জাঁহাপনা তো সম্পূর্ণ সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে সেই যশোবন্ত সিংহকে স্তোকবাক্য দ্বারা ভুলিয়েছিলেন, দারা শিকো থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন! এই যশোবন্ত সিংহ জাঁহাপনাকে জয়যুক্ত করেছিলেন। এই রাজপুত জাতি অকৃতজ্ঞ নয়, দ্বিধাহীনভাবে রাজপুতজাতি তাদের প্রভু পুত্রের জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়েছে। তিন বৎসর পর্য্যন্ত তারা জাঁহাপনার বীরপুত্র খ্যাতনামা মন্ত্রী এবং সম্ভ্রান্ত উজীরদের বিভ্রান্ত করেছে—অবশ্য এটা সংগ্রামের পূর্ব্বাভাষ মাত্র।

এরূপ হবে না কেন? জাঁহাপনার শাসনে মন্ত্রীগণ ক্ষমতাহীন, আমীরগণ অবিশ্বাস্ত, সৈন্যগণ স্বপ্নচেতন ভোগী। লিপিকারগণ কর্ম্মহীন, বণিকগণ উপার্জ্জন বিবর্জ্জিত, কৃষককুল পদদলিত—সুতরাং সর্ব্বত্রই অসন্তোষ। দাক্ষিণাত্যের অবস্থাও সেইরূপ। বিস্তীর্ণ সেই ভূখণ্ড ভূস্বর্গ—বর্ত্তমানে জনহীন মরুভূমিতে পরিণত। বুরহানপুর ধরিত্রীর বরণীয় কপালে তিলকের মতন সুন্দর লুণ্ঠিত ধ্বংস স্তূপ। জাহানারার পবিত্রনাম সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আওরঙ্গাবাদ (আওরঙ্গজেবের নগর) পারদের মত স্পর্শ কাতর ও পরিবর্ত্তনশীল হয়ে উঠেছে—শত্রুর আঘাতে সেই পবিত্র নগর চঞ্চল হয়ে উঠেছে। হিন্দুজাতি আজ দুইটি বিপদের সম্মুখীন—তারা জিজিয়া কর দিতে বাধ্য হয়েছে; শত্রুর আঘাতে তাদের দেশ বিধ্বস্ত। একটা জাতির উপর এত দুঃখ দুর্দ্দশা চারদিক থেকে মাথার উপর দিয়ে ঝড়ের মতন বয়ে গেছে যে তারা আর সম্রাটের মঙ্গল কামনা করতে পারছে না। অভিজাত প্রাচীন পরিবারগুলি প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। জাঁহাপনার পরামর্শদাতা হয়েছে বাজারী ব্যবসায়ী হীনচরিত্র; তারাই রাজকার্য্য পরিচালনা করে; তাদের হস্তে জপমালা, মুখে কোরাণের বুলি; পক্ষপুটে শঠতার জাল। জাঁহাপনা ত এইসব ধর্ম্ম বিদ্বেষীদের বিশ্বাস করেন; তারাই সম্রাটের নিকট দেবদূত। আপনার গুপ্তচর কি জনগণের মধ্যে প্রচলিত গান শোনেন নি?

রাজ্যের কর্ম্মচারী লোভের আকর্ষণে বণিক বৃত্তি অবলম্বন করেছে। উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর পদ স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রীত হচ্ছে; আরও জঘন্য উপায়ে ও রাজপদ ক্রয় করা যায়; সেটা উল্লেখ নাই করলাম। যে ভাণ্ডার স্বর্ণপ্রসূ, সে ভাণ্ডার অকাতরে লুণ্ঠিত হচ্ছে। এই বিরাট সাম্রাজ্যের ভিত্তি আজ শ্লথ। সেদিন খুব দূরবর্ত্তী নয়—এ সৌধ ভূমিসাৎ হয়ে পড়বে।

আমি সাম্রাজ্যের এই ধ্বংস কল্পনার চোখে দেখছি—সম্রাটের মনোবৃত্তি সংশোধনের কোন উপায় এবং সম্ভাবনাও নেই। আমার ধমনীতে আমাদের পুণ্যশ্লোক শাহানশাহ আকবরের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে—সেই হিন্দুস্থানের উর্ব্বর ভূমি থেকে কতকগুলি স্থান উচ্ছেদ করতে আমাকে প্রণোদিত করছে। আবার হিন্দুস্থান জ্ঞান গরিমায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক—অত্যাচার ও নীচতা দূরীভূত হউক। হিন্দুস্থানের প্রজা পুনরায় সহজ ও শান্তজীবনযাপন করুক। দ্বিতীয় আকবরের নাম ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

আল্লাহর অনুগ্রহে যদি জাঁহাপনা তাঁর কার্য্যভার সুযোগ্য পুত্রদের হস্তে ন্যস্ত করে পবিত্র মক্কায় তীর্থযাত্রা করেন—এমন অভিপ্রায় তো সম্রাট বহুবার ব্যক্ত করেছেন—তবে বিশ্বজগৎ সম্রাটের গুণকীর্ত্তন করবে।

আজ পর্য্যন্ত জাঁহাপনা একমাত্র পার্থিব দ্রব্যের লোভে জীবন অতিবাহিত করেছেন—আপনি তো জানেন যে পার্থিব জগৎ স্বপ্নের চেয়েও অলীক, ছায়ার চেয়েও ক্ষণস্থায়ী। আজকে সময় এসেছে যখন জাঁহাপনা পরলোকের পাথেয় সঞ্চয় করবেন। দুষ্কর্ম্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবেন। এই ক্ষণস্থায়ী জগতের স্বার্থে আপনি পরমপূজ্য পিতা ও

সহোদরদের প্রতি কি ব্যবহার করেছেন—আপনি নিশ্চয় বিস্মৃত হয়েছেন যে আপনি অশীতি পর বৃদ্ধ—মৃত্যু আপনার জীবনের সীমান্তে অপেক্ষা করছে।

সম্রাট তাঁর পত্রে আমাকে যে উপদেশ দিয়েছেন—তা পড়ে আমি লজ্জিত হয়েছি। আপনি পিতার প্রতি যে আচরণ করেছেন, আপনার পুত্রের নিকট তার বেশী আর কি প্রত্যাশা করেন। সকল পিতাই আশা করেন পুত্র পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে সন্তুষ্ট হবেন—এটাই স্বাভাবিক।

জাঁহাপনা আমাকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হতে উপদেশ দিয়েছেন। স্বীকার করি পিতার সম্মুখে পুত্রের উপস্থিতি মানুষের জীবনে একটা আশীর্ব্বাদ। কিন্তু জাঁহাপনার ভীষণ প্রতিহিংসার কথা স্মরণ করে আমি সাহস পাচ্ছি না; কারণ জাঁহাপনা পিতা ও ভ্রাতাদের প্রতি যে অমানুষিক অবিচার করেছেন তার স্মৃতি এখনও সলিল হয়ে যায়নি। আপনার কি ভীষণ প্রতিহিংসা! আমি প্রস্তাব করছি যে জাঁহাপনা যদি অল্পসংখ্যক রক্ষী নিয়ে আজমীরে যাত্রা করেন তবে আমি নির্ভয় হতে পারি। জাঁহাপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি। তারপর জাঁহাপনার সমস্ত আদেশ আমি পালন করব।.........

কি দুর্ভাগ্য, পুত্রের আমার বুদ্ধি ভ্রংশ হয়েছে। আমার পুত্র পিতার প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছে। এই শ্রদ্ধাই তো পিতা-পুত্রের সম্বন্ধের মূল বস্তু। আজ আমার সেই পুত্র কর্ম্মে ক্রুর, মনোবৃত্তিতে অসৎ, ময়ুর সিংহাসনও রাজমুকুটের লোভে পিতার বিরুদ্ধে তরবারি আস্ফালন করছে। বলত, ভারতের সম্রাটদের ইতিহাসে কোন্ পুত্র তার পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে। মহম্মদ আকবর, তুমি অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ করেছ। তোমার যদি সত্যই অস্ত্রে পারদর্শিতা প্রমাণ করার অভিলাষ হয়ে থাকে, যদি তুমি রাজ্য অধিকার কর্ত্তে চাও তবে এর চেয়ে আর আনন্দের বিষয় কি হতে পারে? তুমি বিশ্বস্ত সৈন্যাধ্যক্ষ ও অনুচর নিয়ে পারস্যের বিরুদ্ধে অভিযান কর। পারস্য সম্রাট শাহ আব্বাক তোমার পিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন—কান্দাহারে তোমার শক্তি প্রতিহত করেছেন। তোমার কর্ত্তব্য শাহ আব্বাকের রাজ্য ধ্বংস করা—এই তো হল প্রকৃত পুত্রের কর্ত্তব্য। কিন্তু তুমি তো সিংহাসনের লোভে পিতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছ। যুদ্ধে জয়ের কর্ত্তা বিশ্ব বিধাতা স্বয়ং, রাজ্যাধিকার বিধাতার পবিত্র দান। ইহার চেয়ে মূল্যবান আর কি বস্তু হতে পারে? হে আমার প্রিয় পুত্র, তুমি পরাজয় এবং নতি স্বীকার করে তোমার প্রচেষ্টাকে নবরূপ দান কর। তুমি নক্ষত্রের মত কেন্দ্রের দিকে আকর্ষিত হও। তুমি সম্রাটের সিংহাসনের সম্মুখে নিজেকে অবনমিত কর। তোমার উপর নিশ্চয়ই আমার অনুগ্রহ বর্ষিত হবে। মনে রেখো আমার এই ইচ্ছা সত্যই প্রতিপালিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। আমার আদেশ প্রতিপালন করতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করো না।

ক্রমশঃ

অমীমাংসা

সাধনা মুখোপাধ্যায়
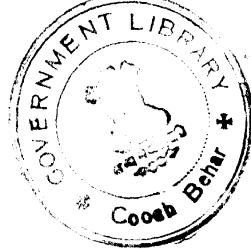
প্রত্যহ সকালে, সুরু হয় ক্লান্ত আরোহন
একঘেয়ে অনুবৃত্তি, রদ্দুরে ভিজিয়ে নিয়ে মন,
দিনের বিষণ্ণ সিঁড়ি ভেঙে ধীরে ধীরে,
পৌঁছলো রাতের শিবিরে।
মধ্যমা বিকেলে মেঘের নটীরা নাচে,
ঝিরঝিরে বন-ঝাউ গাছে,
পাতাদের শীর্ষ-চূড়োয়,
ভরে যায় আবীর গুঁড়োয়।
তবু সে প্রলেপটুকু ক্ষীণ সান্ত্বনা ম্লান বুকে,
রাতের বাদুড় আছে ডানা তার
মেলে সম্মুখে।

চাঁদের উদ্যত হাতে প্রশ্নের একটি ধনুক,
আঁধারের বিষমাখা তূণে তার বহু শিলামুখ।
কালকে কি হবে আর আজকে কি হল,
তারার আঙুরগুচ্ছে জিজ্ঞাসারা জলে থোলো থোলো।
দৈনিকের সরণীতে যে মনটি নিরন্তর ওঠে,
থামবে একটি ধাপে, আকাশের নীলবর্ণ ঠোঁটে
যেখানে দেয়না তুলে আলোকের পেয়ালা রঙীন
প্রত্যূষ, আলোছায়া আলপনা আঁকেনা
যেখানে রাতদিন;
সেখানে মীমাংসা বুঝি গ্লানিহীন শান্তির প্রসাদে,
গীতা বলে ঠিক্ ঠিক্ বিজ্ঞানের মত নেতিবাদে।

আধুনিকা

(রচনা : অন্তন শেখভ্)

অনুবাদ : শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্র

অলগা আইভানোভ্‌নার আজ বিয়ে।

পরিচিত বন্ধু-বান্ধবীরা সকলেই এসেছে ওর বিয়েতে।

স্বামীকে দেখিয়ে বান্ধবীদের চুপি চুপি বলে, "দেখ্, দেখ্, চেয়ে দেখ্, কী সুন্দর দেখাচ্ছে!"

স্বামীর চেহারার মধ্যে দেখবার মতো কিছুই ছিলো না। তবুও ও-কথা ব'লে অলগা বোঝাতে চায় কেন ও একটা সাধারণ লোককে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে।

অলগার স্বামী ওসিপ ডিমভ্ নামেই কাউন্সিলার, আসলে সে একজন ডাক্তার। দু'টো হাসপাতালে ওকে দেখাশোনা করতে হয়, একটাতে এখন অস্থায়ীভাবে কাজ করছে। সকাল ন'টা থেকে দু'পুর পর্যন্ত তার ওয়ার্ড এবং বাইরে যে সব রুগী আসে তাদের দেখাশোনা করে। বিকেলে অন্য হাসপাতালে যায়, সেখানে মরা চেরাই করে। সারা বছরের আয় খুবই অল্প প্রায় পাঁচশো রুবল। এইটুকু বল্‌লেই লোকটার সম্বন্ধে সবই বলা হয়, বেশী কিছু বলার বাকি থাকে না। এদিকে অলগাও তার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবেরা ডিমভের মতো সাধারণ লোক নয়, প্রত্যেকেরই একটা না একটা বিষয়ে কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে; একেবারেই অখ্যাত কেউ নয়। পুরোপুরি নাম করতে না পারলেও কিছুটা নাম করতে আরম্ভ করেছে, ভবিষ্যতে হয়তো আরো নাম করতে পারবে। ওদের মধ্যে একজন অভিনেতা এরই মধ্যে অভিনয়ে বেশ কিছুটা নাম করেছে। সুন্দর, সুপুরুষ চালাক-চতুর লোকটা আবৃত্তি করতেও জানে। কী ভাবে বক্তৃতা দিতে হয় অলগাকে তাই শেখায়। আমুদে, মোটা লোকটা একজন গায়ক। সে প্রায়ই দুঃখ করে বলে যে, অলগা নিজেকে নষ্ট করছে। অলগা যদি কুঁড়ে না হতো, অলগা যদি একটু মন দিয়ে খাটতো, তাহলে ও একদিন না একদিন নামকরা গায়িকা হতে পারতো। এ-ছাড়া কয়েকজন শিল্পীও ছিলো ওদের দলে। তাদের মধ্যে রিয়াবভ্‌স্কী নামকরা। পঁচিশ বছরের অপরূপ সুন্দর যুবক রিয়াবভ্‌স্কীর ছবি নিয়ে প্রদর্শনীতে হৈ-চৈ পড়ে গেছে—শেষ ছবিটায় সে পাঁচশো রুবল পুরস্কার পেয়েছে। অলগার ছবিগুলোতে টান দিতে দিতে ও বলে—আমার মনে হয় ছবি আঁকায় অলগা নতুন কিছু দিতে পারবে। অপর লোকটা বেহালা বাজায়, ওর বেহালার সুরে যেন কান্না ঝরে পড়ে। ও স্পষ্টই বলে—যে-সব মহিলাদের ও জানে তাদের মধ্যে একমাত্র অলগাই তার সমকক্ষ। অপর যুবকটি লেখক, ছোট ছোট উপন্যাস গল্প ও নাটক লিখে ইতিমধ্যে বেশ কিছুটা নাম কিনেছে। বাকি রইলো কে? ওহো, ভ্যাসিলি ভ্যাসিলিভিচের কথা বলাই হয়নি। ভদ্রলোক জমিদার, প্রচ্ছদপট শিল্পী। দেশীয় কৃষ্টি ও পৌরাণিক মহাকাব্যের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক টান। রোগে না পড়লে এই সব শিল্পী, উদারনৈতিক ভাগ্যবান ধনী ভদ্রলোকদের ডাক্তারের কথাই মনে পড়ে না। ডিমভ্‌কে তারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, ওকে সাধারণ লোক মনে করে, যেমন মনে করে সিডোরভ্ আর টারাসভ্‌কে। বেনিয়ানের মতো একগাল দাড়ি ও বেমানান কোট গায়ে ডিমভের প্রয়োজনই ওরা বোধ করে না। অবশ্য ডিমভ্ যদি লেখক হতে পারতো কিংবা হতে

পারতো·কোন শিল্পী তাহ'লে সকলে বলতো "ঠিক জোলার মতো দেখতে ওকে।"

অভিনেতা অলগাকে বলে"এই বিয়ের সাজে তোমাকে ঠিক সাদা ফুলে ঢাকা লাল গাছ মনে হ'চ্ছে।"

ওর হাতটা ধরে অলগা বলে "না···না শোন। ঘটনাটা কী ভাবে ঘটলো তাই বলছি। বাবা আর ডিমভ দু'জনে এক হাসপাতালেই দেখাশোনা করতো। বাবা অসুখে পড়লে ও নিঃস্বার্থভাবে দিনরাত বাবার সেবা করে। রিয়াবভ্স্কী, তুমিও শোন, ওহে তোমরাও সকলে শোন। ও কী হচ্ছে? আরো কাছে এগিয়ে এসো। রাতে আমার ঘুম হ'তো না, বাবার পাশে ঠায় বসে থাকতাম। হঠাৎ একদিন মনে হলো ডিমভ্ যেন আমার প্রেমে পাগল হয়ে উঠেছে, আমি যেন ওর হৃদয় জয় করতে পেরেছি। কী অদ্ভুত ভাগ্যের খেলা, তাই না? বাবা মারা গেলেন। মধ্যে মধ্যে ও আমার কাছে আসতো, কখনো কখনো বাইরেও আমাদের দেখা সাক্ষাৎ চলতো। একদিন ও আমাকে সবকথা খুলে বল্লে। সারারাত কাঁদলাম, বুঝতে পারলাম আমিও ওর প্রেমে পাগল, আমিও ওকে ভালোবাসি। আজ আমার বিয়ে হলো। পাশ ফিরে মুখ ঘুরিয়ে বসে আছে, মুখটা ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। আমাদের দিকে মুখ ঘোরালে ওকে ভালো করে লক্ষ্য করো। ডিমভ্, তোমারই কথা হ'চ্ছে। এখানে সরে এসো, ওর হাতে হাত মেলাও···। থাক্···থাক্ ···হয়েছে, আজ থেকে তোমরা দুজনে বন্ধু হলে, কেমন?"

মুচকি হেসে ডিমভ্ রিয়াবভ্স্কীর দিকে হাত বাড়িয়ে বলে "খুব খুসী হলাম। রিয়াবভ্স্কী নামে এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে পড়তেন, বোধকরি তিনি আপনার কোন আত্মীয় নন!"

(২)

অলগার বয়স বাইশ, ডিমভের একত্রিশ। বিয়ের পর থেকে ওদের দিনগুলো সুখে কাটে। বান্ধবীদের সঙ্গে নিয়ে ফ্রেমে বাঁধানো ও ফ্রেম ছাড়া খোলা ছবিগুলো বসবার ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে দেয়। বড় পিয়ানো ও আসবাব পত্রগুলোর চারপাশে ছোট ছোট চীনা ছাতা, রঙিন টুকরো কাপড় এবং ফটোগুলো সাজিয়ে রাখে। রান্নাঘরের দেয়ালে টাঙায় সস্তাদরের আঁকা ছবি ও জুতো। ঘরের কোণে জড়ো করে রাখে বিদ্ ও কাস্তেগুলো। "সিলিং" ও দেয়ালে কালো কাপড় দিয়ে ঢাকে, ঘরটাকে করে তোলে একটা গুহা বিশেষ। বিছানার ওপর ঝোলানো "ভেনিটিয়ান্" আলো, দরজার সামনে দাঁড় করানো মূর্ত্তির হাতে টাঙ্গি। যে-ই দেখে সে-ই বলে "খাসা ছোট্ট একটা নীড় রচনা করেছে ওরা।"

রোজ এগারোটার সময় অলগা ঘুম থেকে ওঠে, কিছু পরেই পিয়ানো বাজাতে বসে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে ছবি আঁকে। বারোটার কিছু পরে মেয়ে দর্জির কাছে যায়। স্বামী-স্ত্রীর আয় খুবই অল্প, কেবল মাত্র দরকারী জিনিসটুকু কেনা চলে। অলগার নতুন পোষাক দরকার হলে, দর্জি ও অলগাকে নানারকমের ফন্দি-ফিকির করতে হয়। আর সেই জন্যে বারবার অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। পুরনো রঙীন ফ্রকটাই নানা রংয়ের টুকরো জরি ও ফিতে দিয়ে সেলাই করে দেয়,ফলে সেটা জামা না হয়ে কিম্ভুতকিমাকার একটা বস্তু বিশেষ হয়ে দাঁড়ায়। সেখান থেকে যায় এক অভিনেত্রী বান্ধবীর কাছে, প্রথম রজনীর কিংবা কোন "চ্যারিটি" শোয়ের টিকিট জোগাড়ের চেষ্টা করে। ওখান-কার কাজ সেরে হয় ষ্টুডিওতে আসে, নয়তো·কোন সিনেমা হলে ঢোকে। পরে কোন এক নামজাতা বন্ধুকে নিজের বাড়ীতে আসবার জন্যে নিমন্ত্রণ করে আসে। সকলেই অলগাকে পছন্দ করে ওর সুখ্যাতি করে। সকলেই বলে—অলগা ভালো, অলগা সুন্দরী, অলগা অসাধারণ···নামকরা যারা, তারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে যে, ও যদি নিজেকে এ-ভাবে নষ্ট না করে তাহ'লে এক সময়ে ও বেশ নাম করতে পারবে। অলগা গান করে, পিয়ানো বাজায়, ছবি আঁকে, মাটির মূর্ত্তি গড়ে, সখের দলে অভিনয় করে। কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে এ-সব করে না, যথাসাধ্য চেষ্টা করে ভালোভাবে করতে। যা-কিছু সে করুক না কেন—আলো জ্বালা, বেশভূষা করা কিংবা কারোর গলায় টাই পরিয়ে দেওয়া—সব কিছুই সে নিখুঁৎভাবে করবার চেষ্টা করে। নামকরা বন্ধুদের এবং পরিচিত লোকদের সঙ্গে সহজ মেলামেশার মধ্যে তার যে-রকম দক্ষতা ফুটে বেরোয় অন্য কিছুতেই তেমন ফোটে না। কোন লোকের মধ্যে নতুন কিছু

দেখলেই অলগা তার সঙ্গে পরিচয় ক'রে বন্ধুত্ব পাতায়, ওর বাড়ীতে যাবার জন্তে অনুরোধ করে। যেদিন কোন নতুন লোকের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়, সেদিনটা ওর কাছে সত্যিই মধুর বলে মনে হয়। নামকরা লোকদের ও শ্রদ্ধা করে, গর্ব করে, রাতে তাদের স্বপ্ন দেখে। তাদের সঙ্গে পরিচয় করতে ও সদাই ব্যগ্র, আর সে ব্যগ্রতা কিছুতেই ও মন থেকে দূর করতে পারে না। পুরনো বন্ধুদের ভুলে যায়, নতুন বন্ধুদের নিয়ে উঠে পড়ে লাগে। কিছুদিন পর তাদেরও ভালো লাগে না, তাদের সঙ্গ বিরক্তিকর মনে হয়। নতুন বন্ধুদের জন্তে সে ঘুরে বেড়ায়, তাদের দেখা পেলে অন্তদের খোঁজ করে। কেন? অলগা এরকম করে কেন?

চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে সে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে খেতে বসে। স্বামীর সহজ সরল রসিকতায় আনন্দে আটখানা হয়ে অলগা মাঝে মাঝে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে, হাত দু'টো দিয়ে স্বামীর গলা জড়িয়ে চুমু খায়।

স্বামীকে বলে "দেখো, তুমি সবই জান, সবই বোঝ, উদার মন তোমার। কিন্তু মস্ত বড় তোমার দোষ যে, আর্টের দিকে তোমার কোন উৎসাহ দেখি না। ছবি আঁকা বা গান বাজনা নিয়ে তুমি তো মোটেই মাথা ঘামাও না, কেন বলো তো?"

"ও-সব আমি বুঝি না। জীবন ভোর শুধু বিজ্ঞান ও ওষুধপত্র নিয়ে ঘাটাঘাটি করলাম। ওদিকে মন দেবার ফুরসোত হলো কই?"

"আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ না দেওয়াটা খুব খারাপ দেখায়।"

"কেন? তোমার বন্ধুরা তো বিজ্ঞান বা ওষুধপত্রের বিষয় নিয়ে কোন আলোচনা করে না। কই, তুমি তো তাদের দোষ ধরো না? যে যার নিজেরটাই নিয়ে আছে। ছবি বা সিনেমার বিষয় আমি কিছু জানি না বা বুঝি না। দেখো, একদল চালাক লোক জীবন-ভোর শুধু ঐ সব নিয়ে মেতে থাকে আর একদল ঐগুলোর পেছনে অজস্র টাকা খরচ করে—দুই দলেরই প্রয়োজন। আমি ও-সব বুঝতে পারি না, তাই বলে এই মানে করো না যে, আমি ও-গুলো অবজ্ঞা করি।"

"কই, তোমার হাতটা দেখি!"

খাওয়া-দাওয়া সেরে অলগা বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে বেরোয়। পরে থিয়েটার বা অর্কেষ্ট্রা পার্টিতে যায়। কোনদিনই রাত দুপুরের আগে ফেরে না। রোজই এক-ভাব চলে।

বুধবার ও কোথাও বেরোয় না। কেন না ঐ দিন সন্ধ্যের সময় সকলে ওর বাড়ীতে আসে, ওদের নিয়ে চলে আর্টের আলোচনা। নামকরা অভিনেতা বন্ধুটি আবৃত্তি করে, গাইয়ে গান গায়, কেউ কেউ বা অলগার "এ্যালবামে" ছবি এঁকে দেয়, বীণা-বাদক বীণা বাজায়। অলগা নাচে, গান করে, ওদের আনন্দ দান করে। আবৃত্তি, অভিনয় ও গানের মধ্যে বিরামের সময়টুকু চলে সাহিত্য, অভিনয় ও শিল্পকলা নিয়ে আলোচনা। বান্ধবীদের কাউকে দেখা যায় না। কেন না অভিনেত্রী ও ঐ মেয়ে-দর্জি ছাড়া অলগা মেয়েদের হেয় জ্ঞান করে। প্রত্যেক বুধবারে কেউ না কেউ নতুন অতিথি আসে। ওদের এই আসরে ডিমভকে দেখা যায় না, কেউ ওর জন্তে ভাবেও না। ঠিক সাড়ে এগারোটার পর রান্নাঘরের দরজা খুলে যায়, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাত দু'টো ঘসতে ঘসতে সহজ সরলভাবে হেসে ডিমভ্ বলে খাবার দিয়েছে, আপনারা আসুন।"

সকলে সারি হয়ে দাঁড়ায়, পরে খাবার ঘরে চলে আসে। টেবিলের ওপর ডিসে করে সাজানো ঝিনুক, একতাল মাংস, পানীয় ও নানারকম শাক্-সবজী আর মদ ঢালবার দু'টো গ্লাস—একই রকমের খাবার চলে আসছে চিরকাল ধরে।

আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে অলগা, বলে "তোমাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে! কপালটার দিকে চেয়ে দেখো তোমার, ঠিক যেন "বেঙ্গল টাইগার।"

খেতে খেতে ওরা ডিমভের দিকে চেয়ে দেখে "না, সত্যিই লোকটা ভালো।" ঐ পর্যন্ত, পরক্ষণেই ওরা ওর কথা ভুলে যায়, আবার অভিনয় ও গানের আলো-চনা আরম্ভ হয়।

বিয়ের পর প্রথম দু'সপ্তাহ ওদের বেশ সুখে কাটে। তৃতীয় সপ্তাহ কিন্তু ভালো ভাবে কাটে না। চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে ডিমভ্‌কে হাসপাতালের বিছানায় দু'দিন

শুয়ে থাকতে হয়। সুন্দর কালো চুল কেটে ছোট করে দেওয়া হয়েছে। অলগা স্বামীর পাশে বিছানায় বসে কাঁদে। একটু ভালো হলে মাথায় একটা শাদা রুমাল বেঁধে দেয়, স্বামীকে যাযাবরের মতো সাজায়। ওরা দু'জনেই এতে আমোদ উপভোগ করে। তিনদিন পর ডিমভ্ সম্পূর্ণ সেরে ওঠে এবং হাসপাতালে যাওয়া আরম্ভ করে। আবার নতুন করে বিপদ দেখা দেয়।

একদিন খাবার সময় ডিমভ্ বলে "আমার সময়টা এখন ভালো যাচ্ছে না। আজ চারটে মরা কেটেছি, বাড়ী এসে দেখি দু'টো আঙুল কেটে গেছে।

অলগা ভয়ে শিউরে ওঠে। ডিমভ্ হেসে বলে" ও কিছু না, মরা কাটতে গিয়ে ও-রকম কতবার কেটেছে।

কখন ডাক্তারের রক্ত বিষাক্ত হয়ে ওঠে এই চিন্তায় অলগা ভয়ে ভয়ে দিন কাটায়। ভালোয় ভালোয় যাতে বিপদ কেটে যায় তার জন্যে রোজ রাত্রিতে প্রার্থনা করে। দিন কয়েক কেটে গেল, ডাক্তারের কোন ক্ষতি হ'লো না। ফিরে এলো সুখ ও স্বস্তিতে ভরা দিনগুলো। বর্তমান দিনগুলো হয়ে উঠলো আনন্দ ভরপুর। শীঘ্রই আসবে বসন্ত আনন্দের ডালি সাজিয়ে, তাদের জীবন বহে যাবে চিরসুখের মধ্যে দিয়ে। এপ্রিল, মে ও জুন মাসের জন্যে রয়েছে গাঁয়ের ছোট্ট বাড়ী, শহর থেকে অনেক দূরে। সেখানে চলবে পায়ে হেঁটে বেড়ানো, চলবে ছবি আঁকা, লেকে মাছ ধরা, আর চলবে নাইটিঙ্গিলের মিষ্টি গান শোনা। জুলাই থেকে শরৎ পর্যন্ত চলবে শিল্পীদের ভল্গা অভিযান। অলগা শিল্পীগোষ্ঠীর একজন স্থায়ী সদস্যা, তাই ঐ অভিযানে সে অংশ গ্রহণ করবে। এরই মধ্যে অলগা একজোড়া ভ্রমণের পোষাক তৈরী করিয়েছে, ভ্রমণের জন্যে সে কিনেছে রং, তুলি ও ব্রাশ্, ক্যান্ভাস ও নতুন একটা রঙদানি। রিয়াবভস্কী প্রায়ই অলগার কাছে আসে, দেখে যায় অলগার কী রকম ছবি আঁকা চলছে। অলগা আঁকা ছবিগুলো দেখালে ও হাত দুটো পকেটে পুরে একটু ঠোঁট চেপে জোরে জোরে নিঃশ্বাস টেনে বলে, বাঃ! বাঃ! মেঘ-গুলো যেন গর্জন করছে, সন্ধ্যেবেলার আলোটা ভালো ফোটেনি……সামনের জমিটা জগাখিচুড়ি হয়েছে, ছবিটার মধ্যে এমন একটা জিনিষের অভাব…আমি যা বলতে চাইছি বুঝতে পারছো?……ছবিটা ভালো ভাবে ফুটে ওঠে নি। কুঁড়ে ঘরটা মণ্ডের মতো হয়ে উঠেছে…ঐ কোনটা আরো কালো হওয়া দরকার। সব মিলিয়ে মন্দ হয়নি ছবিটা—আমি খুশী হয়েছি। সত্যি বলছি আমি খুশী হয়েছি।"

(৩)

একদিন সোমবার বিকেলে ডিমভ্ কিছু ফল ও মিষ্টি কিনে শহরের দিকে বেরিয়ে পড়ে। পনেরো দিন হলো ও স্ত্রীকে দেখতে পাইনি, তাই তাকে দেখতে যাচ্ছে। রেলগাড়ীর কামরায় বসে ওর ভীষণ খিদে পায়। জঙ্গলের মধ্যে স্ত্রীর ছোট্ট বাড়ীটা খুঁজে বেড়াবার সময় খিদে আরো বেড়ে ওঠে। কল্পনা করে যেন ও স্ত্রীর পাশে বসে একসঙ্গে খাওয়া শেষ করে বিছানায় শুয়ে পড়লো। খুশী মনে ও হাতের মোড়াটার দিকে তাকায়—ওর মধ্যে আছে নোন্তা খাবার, ক্ষীর ও মাছ।

সূর্য তখন ডুবুডুবু এমন সময় ডিমভ্ স্ত্রীর ছোট্ট বাড়ীটা দেখতে পায়। বুড়ো চাকর জানায় অলগা বাড়ী নেই, এখুনি ফিরবে। সাদাসিদে ছোট্ট বাড়ী, খুব বেশী উচু নয়। দেয়ালের ওপর টুক্রো চিঠির কাগজ মারা, গর্ত ভর্তি এবড়ো-খেবড়ো মেঝে, বাড়ীর মধ্যে মাত্র তিনটে ঘর। একটার মধ্যে বিছানা পাতা, পরেরটায় ক্যানভাস, আঁক-বার তুলি, ময়লা কাগজ, চেয়ারে ও জানলার ওপর পুরুষ-দের কোট ও টুপী। তৃতীয়টার মধ্যে তিনজন অচেনা লোক বসে আছে, ওদের মধ্যে দু'জনের গায়ের রঙ কালো মুখে একগাল দাড়ি। অপরজনের দাড়ি কামানো, দোহারা শরীর, খুব সম্ভব একজন অভিনেতা। টেবিলের ওপর কেটলিতে জল ফুটছে।

ডিমভের দিকে তাকিয়ে নীচু গলায় অভিনেতা জিজ্ঞেস করে "কাকে চান? অলগা আইভানোভাঁকে? ওরই সঙ্গে দেখা করতে চান?

ডিমভ অপেক্ষা করে। একজন দাড়িওয়ালা লোক ঘুম ঘুম চোখে ওর দিকে তাকিয়ে দেখে, কাপে চা ঢেলে ওকে জিজ্ঞেস করে "এক কাপ হবে নাকি?"

খিদে ও তেষ্টা থাকা সত্ত্বেও ডিমভ্ চা খায় না। কিছু পরেই পায়ের ও হাসির শব্দ শোনা যায়। দরজায় জোরে ধাক্কা দিয়ে অলগা ঘরে ঢোকে, ওর মাথায় টুপী,

হাতে একটা বাক্স। পেছনে ঢোকে রিয়াবভ্স্কী, হাতে বড় ছাতা ও মোড়া টুল একটা।

আনন্দে আটখানা হয়ে অলগা চিৎকার করে ওঠে, "ডিমভ! ডিমভ্ তুমি! ডিমভের বুকের ওপর মাথা ও হাত দু'টো রেখে অলগা থেমে থেমে বলে "ডিমভ্... আমার ডিমভ্, এতোদিন কেন আসনি? কেন?...কেন আসোনি এতোদিন?"

কী করে আসি বলো? আমি সব সময় কাজ নিয়ে ব্যস্ত। এদিকে যখন আবার অবসর মেলে, ওদিকে তখন আসবার গাড়ী জোটে না।"

তোমাকে দেখে কী-যে আনন্দ হচ্ছে, কেমন করে বলি সে কথা। রাতের পর রাত তোমার স্বপ্ন দেখেছি, মনে মনে ভেবেছি হয়ছো তোমার কোন অসুখ করেছে। আমি যে তোমাকে কতো ভালোবাসি। ভাগ্যিস্ তুমি এসে পড়েছো, তা না হলে যে কী হতো ভাবতেই পারছি না। তুমিই আমাকে উদ্ধার করতে পারবে, এ বিপদের হাত থেকে তুমিই পারবে আমাকে বাঁচাতে।" ডিমভের টাইটা বাঁধতে বাঁধতে হেসে বলে, কাল এখানে একটা বিয়ে আছে। ষ্টেশনের টেলিগ্রাফ্ অপারেটারের বিয়ে। ছেলেটা দেখতে শুনতে ভালো, চালাক-চতুরও বটে। আমরা সকলেই তাকে পছন্দ করি, তাকে কথা দিয়েছি তার বিয়েতে আমরা সকলেই যাব। সে গরীব, সে সঙ্গীহীন, সে লাজুক। তার বিয়েতে না-যাওয়াটা খুব খারাপ দেখাবে। গির্জার প্রার্থনা শেষ হলে ওদের বিয়ে হবে। আমরা গির্জা থেকে সোজা কনের বাড়ীতে যাব......। সেখানে আছে লতা-বীথিকা, পাখীর কাকলি, ঘাসের ওপর রোদের ঝিলিমিলি আর থাকবো আমরা রং-বেরংয়ের পোষাক পরে প্রকৃতির শ্যামল কোল জুড়ে। মুখ শুকনো করে অলগা বলে কিন্তু কী পরে আমি গির্জায় যাব। জামা নেই, দস্তানা নেই, ফুল নেই—আমার কিছুই নেই যে ডিমভ্...। তুমি আমাকে বাঁচাও এ বিপদ থেকে। আমাকে রক্ষা করো। কপাল ভালো যে তুমি এসে পড়েছো, এ যাত্রা তুমি আমাকে বাঁচাও। এই নাও চাবিটা নাও, শীগগির বাড়ী চলে যাও। আমার বেগুনি রংয়ের জামাটা নিও, ওটা সামনেই ঝুলছে দেখতে পাবে...। যে ঘরে আমরা গান-বাজনা করি, সেই ঘরের মেঝেতে দুটো পিচবোর্ডের বাক্স দেখতে পাবে। ওপরের বাক্সটা খুললে টুকরো টুকরো জরি ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না, তারই তলায় ফুলের তোড়া আছে। সবগুলোই নিয়ে এসো, দেখো নষ্ট করো না যেন। ওরই থেকে পছন্দ মতো নেবো। আর আস-বার সময় আমার জন্যে একজোড়া দস্তানা কিনে এনো, ভুলো না যেন।

"ঠিক আছে, কাল গিয়েই ওগুলো পাঠিয়ে দেবো।"

ভয়-ভয় চোখে তাকিয়ে অলগা বলে, "কাল! কাল হয়তো তুমি ঠিক সময়ে গাড়ী ধরতে পারবে না। সকাল ন'টায় প্রথম গাড়ী ছাড়ে, এখানে এগারোটায় ফেরে। না, না, লক্ষীটি, আজই চলে যাও। কাল যদি নিজে না আসতে পার লোক দিয়ে জিনিষগুলো পাঠিয়ে দিও। নাও ওঠো, দেরী হয়ে যাচ্ছে। এখুনি গাড়ী ছাড়বে।

"আচ্ছা, যাচ্ছি।"

অলগার চোখ জলে ভরে ওঠে। ও বলে "তোমাকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হয় না। কী করি বলো, এখন বুঝতে পারছি অপারেটারকে কথা দিয়ে কী বোকামিটাই না করেছি।"

এক গ্লাস চা গোগ্রাসে গিলে, বিস্কুটটা তুলে নিয়ে ডিমভ্ হেসে ষ্টেশনের দিকে পা বাড়ায়। কালো লোক দু'টো ও অভিনেতা বাকি খাবারগুলো শেষ করে।

(৪)

জুলাই মাসের নিঝুম চাঁদনী রাত। ভল্গার ওপর জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে অলগা, একবার জলের দিকে আর একবার সুন্দর নদী তীরের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে, পাশে দাঁড়িয়ে বলে চলে—জলের ওপর ঐ যে কালো ছায়া, ওটা সত্যি ছায়া নয়—ওটা স্বপ্ন। সব কিছুই ভুলে যাওয়া ভালো, মরে গিয়ে মানুষের স্মৃতিতে জেগে থাকা ভালো। চার পাশে এই কুহেলিকা ভরা চকচকে জল, ঐ অসীম আকাশ, শোকাকুল বিষণ্ন এই নদীতীর সব কিছুই আমাদের অন্তঃসার শূন্য জীবনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। স্মরণ করিয়ে দেয় এমন কিছু—যা মহৎ যা অনন্ত, যা বরণীয়। অতীত নগণ্য অনুরাগ বিহীন, ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এমন কী এই সুন্দর চাঁদনী রাত, যা আর কখনো ফিরে আসবে না, এখুনি শেষ হবে—অনন্তের মাঝে হবে বিলীন। কেন? তবে কেন এই জীবন?

অলগা কখনো ওর কথা শোনে ; কখনো-বা ও মগ্ন হয়ে পড়ে রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে। অলগা মনে মনে ভাবে—আমি অমর আমি কখনো মরবো না। যে-জিনিষ সে আগে কখনো দেখেনি—জলের ওপর আলোর সেই ঝিলিমিলি, ঐ আকাশ, এই নদীতীর, কালো ছায়া আর অপার আনন্দ ওর মন ভরিয়ে তোলে, প্রাণে জাগায় আশা। ওর মনে হয় একদিন সে নাম-করা শিল্পী হতে পারবে। সুদূর জ্যোৎস্নালোকের পরপারে, অনন্ত অসীম শূন্য ছাড়িয়ে যে জগৎ সেখানে আছে তার সফলতা, তার যশ, আর তার প্রতি মানুষের ভালোবাসা...। দূরের পানে তাকিয়ে দেখে, মনে হয় যেন ভীড় লেগেছে ওখানে,আলো হয়ে উঠেছে জায়গাটা, গান-বাজনায় আর আনন্দে মেতে উঠেছে সকলে। গায়ে ওর সাদা পোষাক, চারিদিক থেকে যেন পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে ওর ওপর। গরাদের ওপর হেলান দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছে যে লোকটা, অলগার মনে হয় সত্যিই ও মহৎ, সত্যিই ও প্রতিভাবান। আজ পর্যন্ত ও যা করেছে সবই অদ্ভুত, সবই নতুন, সবই অসাধারণ। ভবিষ্যতে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যখন ওর ঐ অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ হবে, তখন ও যা করবে সবই হবে সুন্দর, সবই হবে মহৎ। সব কিছুই প্রকাশ পাবে ওর চোখে-মুখে, ওর চাল চলনে ওর কথা বলার ধরণে, আর ওর দৃষ্টি ভঙ্গিতে। দিনের অবসানে প্রকৃতির বুকে ফুটে ওঠে যে আরক্তিম বর্ণচ্ছটা—ওর তুলিতে তা মুর্ত হয়ে ওঠে অনবদ্য ব্যঞ্জনায়। চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না আর রাতের ছায়া—কুহেলিকা সজীব হয়ে ওঠে ওর তুলির আঁচড়ে। এক কথায় সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে অনায়াসেই ও সঞ্চার করে মোহিনী-মায়া—যার ফলে ওর ছবি দেখে সবাই মুগ্ধ হয়। স্বাধীন জীবন ওর, ঠিক যেন মুক্ত বিহঙ্গ।

অলগা কাঁপতে কাঁপতে বলে—"শীত করছে।"

ওর গায়ে নিজের কোটটা জড়িয়ে দিয়ে রিয়াবভ্স্কী উত্তর করে—"তোমার মোহে মুগ্ধ আমি। কিসে আজ তোমায় এতো মনোহর করে তুলেছে?"

ও একদৃষ্টে অলগার দিকে তাকিয়ে আছে, ভয়াল সে চাহনি। ওর দিকে তাকাতে পারে না অলগা। কানের কাছে মুখ রেখে ও অলগাকে বলে—"আমি তোমার প্রেমে পাগল হয়ে উঠেছি। অতি মাত্রায় উত্তেজিত হয়ে ও বলে চলে আমি সব কিছু ছেড়ে দেবো, একটিবার মাত্র বলো ...আমাকে ভালোবাস...ভালোবাস আমাকে..."

চোখ বন্ধ করে অলগা বলে—"ও-ভাবে বলো না, বিশ্রী শোনায়। ডিমভের কী হবে?"

"ডিমভের এতে কী আসে যায়? ওর কথাই বা উঠছে কেন? ওর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? ওর কথা আজ নয়—আজ শুধু অল্‌গা, শুধু আকাশের ঐ চাঁদ, প্রকৃতির এই সৌন্দর্য, আমার প্রেম, শুধু তুমি আর আমি...আজ শুধু আনন্দ। আজ কিছু মানবো না, পিছনের দিকে তাকাবো না...আমি চাই ক্ষণিক একটি মুহূর্ত।"

অলগার বুকের ভেতরটা জোরে জোরে কাঁপতে আরম্ভ করে, স্বামীর কথা মনে করবার চেষ্টা করে। অতীতের সব ঘটনা—তার বিয়ের কথা, ডিমভের কথা, আজ অস্পষ্ট মনে হয়, মনে হয় অনেক দূরে সরে গেছে তারা। সত্যিই তো ডিমভের কথা আজ কেন? ওর জন্যে সে কী করতে পারে? সত্যিই ডিমভ্ বলে কেউ ছিলো, না সবই স্বপ্ন?

হাত দু'টো দিয়ে মুখ ঢেকে ও আপন মনেই বলে চলে —"যতটুকু আনন্দও দিয়েছে ডিমভ্‌কে, একজন সাধারণ পুরুষের পক্ষে ততটুকুই যথেষ্ট। যা ইচ্ছে হয় তারা করুক, দিক তারা আমায় অভিশাপ। নিজের ওপর প্রতিশোধ নিয়ে দেখাবো আমি ওদের কত ঘৃণা করি...একবার অন্ততঃ চেষ্টা করতে দোষ কী? হায় ভগবান কী ভয়ানক অথচ কী সুন্দর!

রিয়াবভ্স্কী ওকে জড়িয়ে ধরল, অলগা দু'হাত দিয়ে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। রিয়াবভ্স্কী বলে—"কী সুন্দর রাত! তুমি কী আমায় ভালোবাস না?"

"হ্যাঁ, কী সুন্দর রাত।" ওর দিকে তাকিয়ে দেখে ওর চোখে জলের ধারা। আবেগে ওকে জড়িয়ে ধরে অলগা।

ডেকের অপর দিক থেকে কে যেন বলে ওঠে—এক মিনিটের মধ্যে আমরা "কিনেস্‌মায়" পৌঁছবো। খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে লোকটা জোরে জোরে পা ফেলে ওদের পাশ দিয়ে চলে যায়।

হাসতে গিয়ে অলগা কেঁদে ফেলে, যেন হরিষে-বিষাদ। বলে "আমাদের জন্যে খাবার আনাও।"

উত্তেজনায় রিয়াবভ্স্কী ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে, বেঞ্চির ওপর বসে পড়ে। মাথাটা গরাদের ওপর রেখে অলগার দিকে তাকিয়ে বলে "আমি শ্রান্ত, আমি ক্লান্ত, আমি অবসন্ন।"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বেলেঘাটা বুনিয়াদি বিদ্যাপীঠ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে বুনিয়াদী শিক্ষার জন্যে বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। এদিকে জনসাধারণের যেমন দৃষ্টি আছে তেমনি সরকারের লোকহিতকর এই অনুষ্ঠানের দিকে বিশেষ আগ্রহ দেখিতে পাই। ছেলেদের ও মেয়েদের কি ভাবে তাহাদের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া যায় সেদিকেও লক্ষ্য পড়িয়াছে। ছেলেদের বিশেষতঃ এক হিসাবে শিশুদের যেমন বয়স অনুযায়ী শিক্ষার আবশ্যক, তেমনি বালিকাদের বয়স উপযোগী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার প্রয়োজনীয়তাও দিন দিনই আমরা সকলে অনুভব করি। প্রথম কথা—বালক ও বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থাটা আলাদা রকমের হওয়া চাই। ছেলেমেয়েদের মনের অবস্থা, গতিবিধি সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে আমরা দেখিয়াছি—সে বেশীদিনের কথা নয়,ইংরেজ আমলেই শিক্ষার সম্বন্ধে আমাদের আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই, তাহার কারণ তাহারা ছিলেন পরদেশী।

ছাত্রছাত্রীদের সমবেত প্রার্থনা

তাহাদের আদর্শ ছিল ভিন্নরূপ। মানুষরূপে জাতিকে গড়িয়া তুলিবার মত মনের ভাব তাঁহাদের অনেকেরই ছিল না। তাঁহারা চাহিতেন একটা অধীন জাতি গড়িয়া তুলিতে—সেজন্যে শিক্ষার আদর্শও ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। সে সময়ে ইংরাজের শাসনাধীনে থাকিলেও যাঁহারা এদেশে শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নাম উল্লেখ করিতে হয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকের নাম করা যাইতে পারে—যাহারা দেশের শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর কত দিক দিয়া সে আমাদের জাতীয় জীবনে নবজীবন দান করিয়া গিয়াছেন তাহা দু এক কথায় বলা চলে না। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তাঁহার দান ছিল অসাধারণ। আমরা ছেলেবেলা তাঁহার লেখা বর্ণপরিচয় হইতে বর্ণমালা শিখিয়াছি। বোধোদয় হইতে নূতন নূতন বিষয় জানিয়াছি এবং সত্য কথা বলিতে কি—বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে তিনি যে নূতন শক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন একথা আমাদের সকলকেই মানিতে হইবে। আমাদের এখানে সেকথা বলিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। বিদেশীর মধ্যে খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক কেরী, মার্সমেন, ডেভিড হেয়ারের নাম আমরা ভুলিতে পারি না। শিক্ষার জন্য—এক কথায় কেরী সাহেব বাংলা সাহিত্যের একজন বড় স্রষ্ঠা বলা যাইতে পারে। তাঁহার লেখা শিশুপাঠ্য গ্রন্থের সংখ্যা বড় কম নয় তাহা সকলেই জানেন। একবার যদি শতবর্ষ পূর্ব্বের বাংলা সাহিত্যের কথা আলোচনা করিতে হয়, তবে আমরা কখনও ডেভিড হেয়ারের নাম ভুলিতে পারিব না। হেয়ার সাহেব ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। স্কটল্যাণ্ড দেশে ১৭৭৫ সালে ডেভিড হেয়ার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঘড়ির ব্যবসা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮০০ সালে তিনি কলিকাতায় আসেন। সে সময়ে এই দেশে ঘড়ির ব্যবসায়ে কোন প্রতিযোগিতা ছিল না, কাজেই সহজে তিনি অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে একটি বেশ সুন্দর গল্প আছে। রাজা রামমোহন রায়ের বাড়ীতে হেয়ার সাহেব মাগুর মাছ খাইতে ভাল বাসিতেন। তিনি বাঙ্গালীদের বড় ভালবাসিতেন। বন্ধুভাবে লোকের বাড়ী যাইতেন, সকলের সুখ দুঃখের সংবাদ লইতেন। তিনি বাঙ্গালী জাতির কল্যাণের জন্য আপনার জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে ইংরেজী শিক্ষার ছিল বড়ই দুরবস্থা—বাংলা সাহিত্যের ত কথাই নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মনসামঙ্গল, ধর্ম্ম-জ্ঞান, কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, গুরু-দক্ষিণা, কবিকঙ্কণ চণ্ডী—এইরূপ কয়েকখানি প্রচলিত পুস্তক মাত্র ছিল। বালকবালিকাদের পড়িবার উপযুক্ত পুস্তক কিছুই ছিল না। গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা পাইত। এই হেয়ার সাহেবের যত্নে কলিকাতায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। সে সময়ে কি ভাবে ক্রমে ক্রমে চারিদিকে ইংরেজী ও বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল এবং ধীরে ধীরে জাতীয় উদ্দীপনার এক নূতন ভাব এবং নবশক্তির অভ্যুদয় এবং জাতীয় জীবনের উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সেকালের কথা লিখিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন, "সচরাচর ত্রিবিধ উপায়ে এই সকল ভাব জাতীয় হৃদয়ে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, প্রথম রাজনীতি প্রভৃতির আন্দোলনাদির দ্বারা, দ্বিতীয় সংবাদপত্রাদি দ্বারা, তৃতীয় জাতীয় সাহিত্যের দ্বারা। এইজন্য সর্ব্বদেশেই এই তিনটীর প্রতি বিদেশীয় রাজাদিগের তীব্র দৃষ্টি থাকে। তিনটীকেই তাহারাও শাসনে রাখিবার চেষ্টা করেন। তাহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের নহে; তাহাকে স্বাভাবিক বলিয়াই জানা উচিত। আমরাও দেখিতেছি, আমাদের রাজ-পুরুষগণ এই তিনটীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেছেন।

এমন কি শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী হইতে জাতিয় উদ্দীপনার অনুকূল যাহা কিছু সমুদয় যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিতেছেন। জাতীর ভবিষ্যতের প্রতি যাঁহাদের দৃষ্টি তাহাদিগকে শিশুদের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট তাহা রাখিতেছেন। দুঃখের বিষয় এই, দেশের লোকের এ বিষয়ে মনোযোগ না থাকাতে শিশুদিগের শিক্ষার যথেষ্ট দুর্গতি হইতেছে, যাহাতে মানুষ মানুষ হইতে পারে সে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে না, অনেক স্থলে সত্যের নামে অসত্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

যাক সে কথা ; শিশুপাঠ্য সাহিত্য ছাড়িয়া দিলেও সাহিত্যের সুদূর-প্রসারিত ক্ষেত্র পড়িয়া থাকে, যাহাতে স্বদেশ-প্রেম ও স্বজাতির উন্নতির আদারপ্রসারের ক্ষেত্র আছে। সাহিত্য স্বজাতিপ্রেমিকদিগের হস্তে একটা মহা যন্ত্রস্বরূপ। প্রাচীনকালের ঋষিগণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"হে ইন্দ্র—বণিকের অর্ণবপোত যেমন ধান বহন করিয়া আনে, তেমনি তুমি আমাদের জন্য ধন বহন কর।" সাহিত্য কি বণিকের অর্ণবপোতের ন্যায় নয়? ইহাতে করিয়া কি আমরা স্বদেশ ও বিদেশের প্রাচীন সাহিত্যের খনি হইতে, বিদেশীয় চিন্তার সাগর হইতে, মণি মুক্তা বহন করিয়া স্বদেশের ও স্বজাতির চিন্তাসম্পদ পোষণ করিতে পারি না? এ প্রশ্নের উত্তর এখন আমরা দিতে পারি।

স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের চলিয়াছে শিক্ষা, সংস্কৃতিও স্বাধীনতা লাভের নূতন যুগ। এই এগারো বৎসরের মধ্যে নানাভাবে আমরা অগ্রসর হইতেছি এবিষয় কাহারও অজ্ঞাত নয়। নূতন নূতন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী জাতি চলিয়াছে প্রগতির পথে। আমাদের ভারতের গণতন্ত্রের পরিচালকগণ সকলেই বুঝিয়াছেন—প্রাথমিক শিক্ষা অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্যে ছোটবড় সকলকেই শিক্ষিত করিয়া তোলা একান্ত দরকার। আমি ব্যক্তিগতভাবে বলিতে পারি এইদিকে সরকার অর্থব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। বর্ত্তমান সময় বুনিয়াদী শিক্ষার দিকে বিশেষভাবে চেষ্টা চলিতেছে। আমি এ বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি শিক্ষার সুসংযত ব্যবস্থার দিতে কিছুদিন পূর্ব্বে মাদাম মণ্টেসরী এদেশে আসিয়াছিলেন। এই মণ্টেসরীর নাম আজকাল পৃথিবীর সভ্যদেশের সকলেই জানেন। আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই—বাড়ীতে ও বাহিরে যে সব ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করে না, তাহারা অনেক সময় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রত্যেক পাড়ায়ই কি শহরে কি পাড়াগাঁয়ে এমন ছেলে দেখিতে পাওয়া যায়—তাহারা বাড়ী ঘরের কোন খবর রাখে না। যাহাদের বাড়ীর অবস্থা ভাল নয়, বাপ মা অর্থের অভাবে স্কুলে পাঠাতে পারেন না সেইজন্য তাহারা রাত দিন ঘুরিয়া বেড়ায়, গল্প করে, মারামারি করে, নিরীহ কুকুর বিড়ালকেও প্রহার করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না—ফলে ইহারা বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের শত্রু হইয়া পড়ে। চুরি করিতে শিখে, পকেট কাটিয়া হয় ঘৃণ্য, হয় অপ্রিয়।

আমি এমনও দেখিয়াছি যে অনেক সময় গুরুমহাশয়ের ভয়ে ছেলে-মেয়েরা পাঠশালায় বা স্কুলে যাইতে রাজি হয় না। আমাদের পাড়ায় কেহ কেহ বলিয়াছেন যে—পাঠশালায় বা স্কুলে যাইব বলিয়া ছেলে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায়—সারাদিন পথে ঘাটে খেলিয়া বেড়ায়—সন্ধ্যার সময় বা রাত্রিতে বাড়ী যায়। এরূপ অবস্থায় কি ভাবে এই শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের এমন ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়—যাহাতে তাহারা আনন্দের সহিত লেখাপড়া শিখে—পড়িবার জন্য স্কুলে যায় এবং সেখানে গিয়া শিক্ষকেরা যাহা শেখান এবং ছেলেমেয়েরা নিজেদের চেষ্টায় যাহা শিখে তাহা বেশ আনন্দের সহিত শিখিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে।

এইরূপ একটি আনন্দময় পরিবেশের চেষ্টা করিয়া ইটালি দেশের ডাক্তার মণ্টেসরী নামে একজন বিদুষী মহিলা প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে কয়েকটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মণ্টেসরী চিকিৎসা বিদ্যায় বেশ পারদর্শী ছিলেন। তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে প্রায় ২০ বৎসর ধরিয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্বভাবও কাজকর্ম্ম বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। শেষকালে স্থির করিলেন যে ছেলেমেয়েরা যাহাতে বেশ আনন্দে লেখাপড়া শিখিতে পারে তাহার জন্য একটি আদর্শ বিদ্যালয়

ব্যায়াম

স্থাপন করিতে হইবে। যেমন কথা তেমনি আরম্ভ হইল কাজ। তিনি ইটালির রাজধানী রোম শহরে তাঁহার আদর্শমত কয়েকটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। বিদ্যালয়গুলি হইল ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য। ছেলেমেয়েরা সেই বিদ্যালয়ে আসিয়া নিজেদের ইচ্ছা মত বেড়িয়ে বেড়ায়, বিদ্যালয়ের বাগানে মাঠে খেলিয়া বেড়ায়, ঘুরিয়া বেড়ায় মনের আনন্দে—যেমনি খেলে তেমনি লেখাপড়াও করে। আমাদের দেশে এক সময় পাঠশালার ছেলেরা পড়িতে যাইবার সময় একখানা ছোট মাদুর নেয়—যেমন সাথে নেয় বই সিলেটগুলি, তারপর মাদুর বিছাইয়া বসে—তেমনি মণ্টেসরী বিদ্যালয়গুলিতে প্রত্যেক ছাত্র এবং ছাত্রীর এক একখানি ছোট কার্পেটের আসন থাকে। সেই কার্পেটের আসনের উপর বসিয়া সেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাহাদের কাজ করে। তাহাদের হাতে অক্ষরের টিকিট দেওয়া হয়—তারপর সেই অক্ষর সাজাইয়া তাহারা একটি বাক্য রচনা করে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে বিদ্যালয়ের ঘরে তাহাদের লেখাপড়া শিখিবার জিনিষপত্র রাখিবার জন্য ছোট ছোট টেবিল দেওয়া

হয়, আর সেই টেবিলের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা একখানি চেয়ার পায়। যাহারা ছোট তাহাদের জন্য ছোট ছোট টেবিল চেয়ার থাকে। মন্টেসরী তাহার বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের নিজেদের কাজগুলি নিজেদের দিয়া করাইয়া ফেলেন। এই ভাবে ছেলেমেয়েরা সকল রকমের কাজ করিতে শিখে এবং তাদের চলাফেরা কথাবার্ত্তা সুন্দর হয়। কোন জিনিষ শিখিবার সময় শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে আসিয়া বসেন। তাহাদের নাম ধরিয়া বেশ স্পষ্ট করিয়া ডাকেন এবং সেইদিন যাহা শিখাইবার শিখাইয়া দেন, তাহারাও আনন্দের সহিত প্রফুল্লমনে শিখিয়া থাকে। বিদ্যালয়গুলিতে নানারকমের খেলনা থাকে, অক্ষর তৈরী করবার সরঞ্জাম থাকে। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিবার জন্য নানারকম জিনিষ থাকে। প্রত্যেক ছাত্র বা ছাত্রী যখন এই জিনিষগুলি পায়, তখন তাহারা সেই জিনিষগুলি তাহাদের নিজেদের বলিয়া মনে করে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক বাক্য রচনা বা প্রত্যেক অক্ষর লেখা নিজে নিজে করিতে করিতে তাহাদের নিজেদের উপর বিশ্বাস বাড়িয়া যায় এবং

ব্রতচারী নৃত্য

তাহাদের কাজের মধ্যে ও সুন্দর শৃঙ্খলা আসে। আমাদের দেশে যেমন বস্তি আছে—তেমনি রোম শহরে ও অনেক পল্লী আছে যেখানে অনেক গরীব বাস করে। সেই পল্লীর নাম ঘোচে। শ্রীযুক্তা গ্যালী নামে একটী মহিলা সেখানকার গরীব ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য তার এমনি আগ্রহ ছিল যে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিয়া তিনি যে কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তিনি সেই সব টাকা দিয়া গরীব ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতেন। যাহাদের কেহ ডাকে না, যাহাদের বস্তীর ছেলেমেয়ে বলিয়া উপেক্ষা করে সেই সব ছেলেমেয়েদের মায়ের মত ডাকিয়া আদর করিয়া তিনি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন; তখন তাহারা দেখিল এক স্বপ্নের রাজ্যে আসিয়াছি। এখানে তাহারা মনের আনন্দে খেলা করে, গান গায়, দৌড়াদৌড়ি করে, হাত পা সঞ্চালন করিতে পারে তাহাদের স্বাধীনতায় কেহ হাত দেয় না। এইরূপ একটা নুতন রাজ্যে আসিয়া নুতন মানুষ হইয়া গেল।

সাইমরা গ্যালী ভাল করিয়া তাহাদের স্নান করিতে শিখাইলেন, পোষাকপরিচ্ছদ যতদূর সম্ভব পরিষ্কার রাখিতে শিখাইলেন। সবদিকেই তাহাদিগকে সুন্দর করিবার জন্য করিলেন অক্লান্তভাবে চেষ্টা এবং যত্ন। ডাক্তার মন্টেসরী যখন এই বিদ্যালয়ের কথা শুনিলেন তখন তিনি নিজে আসিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

একবার তদানীন্তন ইটালির মহারাণী মার্গারেটা একটি মন্টেসরী বিদ্যালয় দেখিতে আসিয়াছিলেন। একটি মেয়ে তখন তাহার অক্ষরের বাক্স হইতে অক্ষরগুলি বাহির করিয়া সাজাইতেছিল। মহারাণী তাহার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন, মেয়েটি কিন্তু তাহার কাজ একমনে করিয়া যাইতেছিল। সেখানে একজন শিক্ষক দাঁড়াইয়াছিলেন—তিনি মেয়েটিকে বলিলেন—রোজা, মহারাণী এসেছেন—একবার তুমি দেখ। মেয়েটি উত্তর করিল—হাঁ জানি মহারাণী এসেছেন, কিন্তু মহারাণী জানেন—আজকে পড়াশুনার আগে বানান শিখবার জন্য অক্ষরগুলি সাজিয়ে রাখতে হবে।

ডাক্তার মন্টেসরী এইভাবে ছেলেমেয়েদের চোখের সামনে ভাল জিনিষ—যেমন ভাল ছবি, ভাল খেলনা ও পশুপাখীর চিত্র রাখিয়া তাহাদের সব জানিবার কৌতূহল বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন মনে করিতেছেন।

মন্টেসরীর এই শিক্ষার আদর্শ এখন ইউরোপের ও আমেরিকার সর্ব্বত্র অনুসৃত হইতেছে। সুইজারল্যাণ্ড ইউরোপের একটি সাধারণতন্ত্রী দেশ। সেখানকার প্রত্যেকটি অঞ্চলে মন্টেসরীর আদর্শ অনুসৃত হইতেছে। আমাদের ভারতবর্ষেও মন্টেসরীর শিক্ষাপ্রণালী বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শে চলিতেছে।

সেদিন আমি বেলেঘাটা অঞ্চলের বুনিয়াদী বিদ্যালয় দেখিতে গিয়াছিলাম সেদিন ছিল বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা দিবস; পরিবেশটি মনোরম। রাস্তার একদিকে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের বড় বড় সারি সারি অট্টালিকা—পূর্ব্বদিক উন্মুক্ত। দেখিতে বেশ লাগে। অনেকদিন পরে এ অঞ্চলে আসিয়াছি বলিয়া সবই নূতন লাগিল। চওড়া প্রশস্ত পথ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—কাজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শুনিলাম পূর্ব্বে এই বিদ্যাপীঠ একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ছিল; সম্প্রতি নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের উদ্যোগে উক্ত সম্মেলনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে বিদ্যাপীঠ একটি সুন্দর দ্বিতল বাড়ীতে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি বাড়ীটিকে ত্রিতল করিবার চেষ্টা হইতেছে।

এই বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য—বেলেঘাটা অঞ্চলের বস্তীর ছেলেমেয়েদের এবং শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের বালকবালিকাদের শিক্ষা দিবার জন্য, তাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে। দিন দিনই ছাত্র ও ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। শিক্ষিকারা সকলেই প্রায় উচ্চশিক্ষিত। এখানে নৃত্য, সঙ্গীত, বস্ত্রবয়ন, কুটির শিল্প এবং অন্যান্য হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প বলিতে অনুরোধ করা হইল। আমি গল্প বলিলাম, তাহারা হাসিতে হাসিতে গল্প শুনিল। তাহাদের মুখে ফুটিয়াছিল আনন্দের হাসি। তাহাদের সমবেত প্রার্থনা শুনিলাম, ব্রতচারী নৃত্য দেখিলাম, ছায়ায়

দেখিলাম তাহাদের আঁকা ছবি, গড়া পুতুল, তৈরী রুমাল, জামা, কাগজের বিবিধবর্ণের ফুল। সুন্দরভাবে সাজানো বাগানে সৃষ্টি করিয়াছে নিজেরা যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া কত সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ। প্রত্যেক দিকেই দেখিলাম আনন্দ ও উৎসাহ—ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সকলের মধ্যেই দেখিলাম নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে।

শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলাম। তাহারা বালক-বালিকাদের দরদী প্রাণ লইয়া ভালবাসেন, স্নেহ করেন এবং শিক্ষা দিতেছেন—তাঁহাদের সকলের মুখেই দেখিলাম প্রসন্ন সুন্দর হাসি। আলাপ হইল এখানকার প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী বিভাদেবীর সঙ্গে, পরিচয় হইল। তিনি যত্ন করিয়া আমাকে প্রত্যেকটি বিভাগ দেখাইলেন এবং কিভাবে ছাত্র ও ছাত্রীদের শিক্ষা চলিতেছে তাহাও দেখাইলেন। এই বিদ্যাপীঠের পারিচালিকামণ্ডলীর মধ্যে যারা আছেন তাদের কাহারো কাহারো সঙ্গে আলাপ হইল—শ্রীমতী সান্ত্বনা সেন, শ্রীমতী সান্ত্বনা দেবী প্রভৃতির সহিত। সকলেরই এই বিদ্যাপীঠের প্রতি দেখিলাম অসীম অনুরাগ। শ্রীমতী অশোকা গুপ্তা, শ্রীমতী মায়া গুপ্তা প্রভৃতিরও অকৃত্রিম স্নেহ ও যত্ন রহিয়াছে এই বিদ্যাপীঠের প্রতি।

আমার মনে পড়িল যোগবাশিষ্ট রামায়ণের একটি কথা—

কর্ম্ম না করিলে পৃথিবী শস্যশূন্য, সূর্য্য আলোকশূন্য, অগ্নি তেজ-শূন্য, গ্রহগণ জ্যোতিঃশূন্য, বায়ু স্পন্দন ও জীবনী শূন্য এবং তজ্জন্য ভুবন অস্তিত্ব শূন্য হইত। তুমি, আমি, সে—কেহই থাকিতাম না। সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি শূন্য হইত। মেঘ আর জল দিত না, পর্ব্বত আর পৃথিবী ধারণ করিত না, নদী আর প্রবাহিত হইত না, সাগর আর সলিলের আধার হইত না। পৃথিবী আর বহন করিত না। ফলতঃ সবই লোপ পাইত। অতএব কর্ম্মই জীবন ও অকর্ম্মই মৃত্যু ভাবিয়া সর্ব্বময় কর্ম্ম সাধনে তৎপর হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।"

গল্পের আসর

বিদ্যাপীঠের পরিচালকমণ্ডলী এবং শিক্ষা কর্ম্মে যাহারা ব্রতী আছেন, তাঁহাদের নিকট এই সৎবাণী উদ্ধৃত করিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিলাম। আমি আশা করি দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে এইরূপ শিশু ও বালক বালিকাদের শিক্ষার জন্য বিদ্যাভবন গড়িয়া উঠিবে।

বৃথা

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মণ্ডল

পুতুল খেলার দিনগুলোকে
ফিরিয়ে আনা যায় না—
রাজা রাণী হারিয়ে গেছে
কোন সে মনের অন্ধকারে
খোকা খুকুর বিয়ে খেলা
কেহ বা আজি খোঁজে তারে
আকাশ ভরা বাদল যে আজ
মনের আকাশ ছায় না—
পুতুল খেলার দিনগুলোকে
ফিরিয়ে আনা যায় না।

অচিন দেশের রাজকন্যা
সোনার কাঠি নিয়ে
ঘুমিয়ে ছিল হয়ত সেদিন
আপন সঙ্গোপনে
খুঁজতে গেলে আর পাবে না—
হারিয়ে গেছে মনে
রাজ পুত্তুর আসবে না আজ
হবে না কো বিয়ে
অচিন দেশের রাজকন্যা
সোনার কাঠি নিয়ে।

খুঁজে ফেরা বৃথা সে আজ
রোদ ছোঁয়া এই দেশে
হারিয়ে যেটা গেছে সে যাক্
সত্য হয়ে উঠবে শুধু
পাঁচ বছরের এইটুকু দাম
বিশ বছরে এসে
খুঁজে ফেরা বৃথা সে আজ
রোদ ছোঁয়া এই দেশে।

ময়ূর-নৃত্য

"ময়ূর-নৃত্য" নৃত্য সঙ্গীতময় ক্ষুদ্র নাটিকা, তিনটি অঙ্কে সমাপ্ত। প্রতি অঙ্কের ভাবানুযায়ী মঞ্চ দিগন্ত-পর্দার পট, মঞ্চ-দৃশ্য ও ময়ূর নৃত্য-শিল্পীর সাজ-সজ্জা পরিবর্তিত হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের পরে কিছুক্ষণের জন্য হবে যবনিকা পাত ; ঐ সময়ের অবকাশে শোনা যাবে ময়ূর-নৃত্যশিল্পীর মৃদু-নূপুর নিক্কণ ও গীতবাদ্য। তৃতীয় অঙ্কের পরে হবে যবনিকা-পতন।

প্রথম অঙ্ক

নাচেরে! ময়ূর নাচে, ময়ূর নাচে!
নাচে,
নাচে,
ময়ূর নাচে!
বিজয়ার বীর্য্যবিভায়
দীপ্ত ময়ূর নৃত্য বিলায়
আমার মাঝে।
নাচে সে মৃত্যুহরণ-বহ্নিচরণ মর্তে রাখি'
যুগান্তের ঐ সমর সাঁঝে
ভীষণ মধুর ভঙ্গে নাচে
কালভুজঙ্গ সূদন পাখি :

মোর হৃদয়ের রক্তধারা
দিগ্বিজয়ের নর্তনে তার
আত্মহারা!
শুনি তার কণ্ঠরবে, চিরন্তনীর
জয়ধ্বনির
শঙ্খ বাজে :
আমার জীবন
শঙ্খে বাজে।
বিজয়ার বীর্য্যবিভায়
দীপ্ত ময়ূর নৃত্য বিলায়
আমার মাঝে॥

কথা—শ্রীনিশিকান্ত

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

II প্‌া সা না | সা রা সা I রা গা রা | গা মা ধপা I
না চে রে না চে রে ম য়ূর্ না চে ম য়ুর্

I মা -া গা | রা পা পমা I গা রসা সা | সা সা -া I
না ০ চে না চে না চে ম য়ুর্ না চে ০

I সা সা ন্ | সা রা সা I রা -া া | রা গা রা I
বি জ য়ার্ বীর্ য বি ভা ০ য়্ দীপ্ ত ম

I গা -া -া | গা মধা ধা I পা পা পাধ | মগ রগা মা -া I
য় ০ র্ ন্ ত০ বি লায়্ আ মার মা ০০ ঝে ০

I রা পা পমা | র্গা রসা সা I সা -া সা | -া -া -া II
না চে না চে ম য়ূর্ না ০ চে ০ ০ ০

II গা সা রা | গা পা ক্ষা I পা -া -মগা | গা মপা পমা I
না চে সে মৃ ত্যু হ র ০ ০ণ্ বণ্ হিং চ

I গা -া -া | গা মধা পা I ধা -া -া | সধা ধা ধা I
র ০ ন্ মর্ তে০ রা খি ০ ০ য়্ গান্ তের্

I ধা ধা পা | নধা র্সা -া I -া -া -া | সধা ধা ধা I
ঐ স মর্ সাঁ ঝে ০ ০ ০ ০ ভী ষণ্ ম

I ধা ধা পা | নধা র্সা -া I -া -া -া | ধা -র্রা র্সা I
ধুর্ ভ ঙ্গে না চে ০ ০ ০ ০ কা ল্ ভু

I ধা পা গা | গরা -গা রসা I সা -া -া | সধা ধা পা I
জঙ্ গ সু দ০ ন্ পা খি ০ ০ মোর্ ছ ন্দ

I ধর্সা -নর্সা -া | ধা ণধা পক্ষা I ধপা -া -া | সা -রা -রা I
য়ে০ ০ ০ র্ রক্ ত০ ধা০ রা ০ ০ দিগ্ বি জ

I রা -া -া | রা রা রা I রা -া -গা | রা গপা পমা I
য়ে ০ র্ নর্ ত নে ভা ০ র্ আত্মা০ হা

I গা -া -া | গা সা রা I গা পা ক্ষা | পা -া -া I
রা ০ ০ শু নি তার্ কণ্ ঠ র বে ০ ০

I গা পা ধা | ধা -া -া I সধা ধা ধা | ধা ধা পা I
চি রন্ ত নী ০ র্ জ য় ধ্ব নির্ শঙ্ খ

I নধা -র্সা র্সা | -া -া -া I ধা র্রা র্সা | ধা পা গা I
বা ০ জে ০ ০ ০ আ মার্ জী বন্ শঙ্ খে

I রসরা রা -সা | -া -া -া I
বা০০ জে ০ ০ ০ ০

"বিজয়ার বীর্য্যবিভায়·········মাঝে, নাচে নাচে ময়ূর নাচে" II

II সা সরা না্ | সা রা সা I রা -া -সনা্ | সা গা রা I
ভু বং নের্ গ হন্ ঘু মে ০ ০র্ অন্ ধ কা

I গা গা রা | গা পা হ্মা I পা পা পা | গা মপা হ্মা I
রে তা রি ন্ধ পের্ আ লো আ মার্ ঘুম্ ভাং ঙা

I পা -া -া | পা র্ধা মা I মা পধপা মা | গা -া -া I
লো ০ ০ না চা লো সে আ০০ মা রে ০ ০

I -া -া -া | পা গা পা I ধা র্সা না | সা -া -া I
০ ০ ০ ভা র তের্ দিগ্ বা লি কা ০ য়্

I পা ধা র্সা | র্সা -া -া I র্সর্গা র্গা র্গা | র্রা র্সা র্সা I
দি গম্ ব রী ০ র্ দী পা লি কায়্ পাই যে

I না -র্রা র্রা | -র্সা -া -া I পা পা পা | পা ধা ধা I
তা ০ রে ০ ০ ০ অ সী মার্ সেই শি খী

I ধনা- নধা পা | পা না নধা I ধা পা হ্মা | গহ্মা হ্মা- পা I
ও০ ০ ই জ গৎ নি শার্ নি দ্রা হা০ নে ০

I -া -া -া | গা ধা ধা I ধপা -া -া | গা রগা রা I
০ ০ ০ ম হা নি শা ০ র্ ল ক্ষ০ তা

I সা -া -া | সা ধা ধা I ধা ধা পা | নধর্সা র্সা -া I
রা ০ য়্ পে থম্ তো লে আ মার্ গা০ নে ০

I -া -া -া | সা রগা রা I গা রা সা | রগা গা -া I
০ ০ ০ শ্রী বায়্ সৌ দা মি নীর্ ফ০ ণী ০

I -া -া -া | গা পা হ্মা I পা -া -া | পা ধা ধা I
০ ০ ০ তন্ দ্রা হা রা ০ ০ দুই চো খে

I ধা ধা পা | নধর্সা র্সা -া I -া -া -া | পা গা পা I
বৈ দুর্ য মং নি ০ ০ ০ ০ মু খে তার্

I ধা র্সা না | র্সা -া -া I পা ধা র্সা | র্সা -া -া I
চন্ দ্র ক লা ০ ০ চু ড়ায়্ শি খা ০ ০

I র্গা র্গা র্গা | র্রা র্সা র্সা I র্সনর্রা র্রা -র্সা | -া -া -া I
সু নীল্ প্র ভায়্ ব ক্ষ সা০০ জে ০ ০ ০ ০

I ধর্রা র্রা র্সা | ধা পা গা I রসরা রা- সা | -া -া -া I
আ মার্ জী বন্ ব ক্ষে সা০০ জে' ০ ০ ০ ০

"বিজয়ার বীর্য্যবিভায়·········মাঝে, নাচে নাচে ময়ূর নাচে" II

তালফের—ঝাঁপতাল

I প্‌া সা | সা -া সা | সা -া | সা সা -রা I ন্‌া সা | রা রা রা | রা -া | রা জ্ঞা জ্ঞা I
মা টি তে ০ ম হা ০ দে বী র্ উ দ য় ক্ষ ণে তা র্ মা ন বী

I জ্ঞা মা | রা রা সা | সা মা | মা -া মা I মা পা | পা -া পা | ণণা -মা | পা পা -া I
লী লা র স নে ম হা দে ব্ ঐ অ প রূ প্ ম য়ু০ র্ হ য়ে ০

I মা -া | ধা -া ধা | ধা -া | ধা -া ধা I ধা -পা | ধা ণা -া | -া -া | -া -া -া I
না ০ চে ০ আ মা ০ র ০ মা ন ০ ব তা ০ ০ ০ ০ ০ য়্

I মা -া | ণা -া ণা | ণা -া | ণা -া ণা I ধা -পা | ধা র্সা -া | -া -া | -া -া -া I
না ০ চে ০ আ মা ০ র ০ ত নু ০ ল তা ০ ০ ০ ০ ০ য়্

I ণা -া | র্রা -া র্রা | র্রা -া | র্রা -া র্রা I র্রা -র্সা | র্রা র্জ্ঞা -া | -া -া | -া -া -া I
না ০ চে ০ আ মা ০ র ০ প্রা ণে ০ ম নে ০ ০ ০ ০ ০ ০

দ্রুতলয়ে

I সা -া | মা -া মা | মা -া | মা -া মা I মা পা | পা পা পা | পা ধা | পা ধা ধা I
না ০ চে ০ ঐ থৈ ০ থৈ ০ থৈ থি য়া থি য়া থ ম ল থ ম ল

I ধা ণা | ণা -া ণা | ণা -া | ণা ণা -া I ণা -ধা | র্সা -া র্সা | র্সা র্সা | র্সা -া র্সা I
যু গ ল ০ ডা না র্ দো লা য়্ না ০ চা য়্ প্র ল য় ব ০ জ্

I র্রা র্রা | র্গর্গা -র্রা র্গা | র্মা -া | -া -া -া II
সৃ জ ন০ ০ ক ম ০ ০ ০ ল্

উল্লিখিত স্বরলিপি যে সুরে গীত হইবে সেই সুরের মধ্যম অর্থাৎ "মা"কে সুর করিয়া নিম্নলিখিত স্বরলিপি গীত হইবে।

তালফের—তেওরা

II ধা -র্সা ধা | র্সা -া | ধা -া I মা- পধপা মা | রা -া | সা -া I
ঐ ০ না চ ০ নে র্ ছ ০ ০ন্ দে মা ০ তা ল্

I{ ধ্া সা সা | সা -া | স্া -া I (সা -রা রা | রা -া | সা -রা)} I
মা ন ব লো ০ কে র্ স ঙ্ গো না ০ চে ০

I রা -া মা | পা -ধা | ধা -া I ধা -া ধা | পা -ধা | মা -পা I
স ঙ্ গে না ০ ০ চে ০ স্ব র্ গ পা ০ তা ল্

I ধা -র্সা ধা | র্সা -া | ধা -া I মা -পধপা মা | রা -া | সা -া I
ঐ ০ না চ ০ নে র্ ছ ০ ০ ন দে মা ০ তা ল্

I ণ্া সা -া | সা -া | সা -া I রা রপা- পমা | রা -া | সা -রা I
ন ট ০ রা ০ জ্ ০ বি হং ০ ঙ্ গ ০ মে ০

I ণ্া সা -া | সা -া | সা -া I সা ধা ধা | ধা -া | ধা -া I
ন টে ০ শ্ব ০ রী র্ নি খি ল না ০ টে র্

I পা -ধা ধা | ধপা -মপা | মা -া I{ পা ধা মা | পা -র্সা | ধা ধা I
র ঙ্ গ রা০ ০ জে ০ আ মা র জী ০ ব ন

I ধা -া পমা | পা -পমা | মা -া }I ণ্া সা -া | সা -া | -া -া I
র ঙ্ গে০ রা ০ জে ০ বি জ ০ য়া ০ ০ র্

I সা -ধা ধা | ধা -া | ধা -া I পা -ধা ধা | ধপা -মপা | মা -া I
বি র্ য বি ০ ভা য়্ দী প্ ত ম০ ০ যূ র্

I{ পা -ধা মা | পা -া | পর্সা -ধা I ধা ধা পমা | পা -পমা | মা -া } I
নৃ ০ ত্য বি ০ লা০ য়্ আ মা র০ মা ০ ঝে ০

I ণ্া সা -া | সা -া | -া -রজ্ঞরা I ণ্া সা -া | সা -া | -া -রজ্ঞরা I
না চে ০ রে ০ ০ ০০০ না চে ০ রে ০ ০ ০০০

I ণ্া সা -া | সা -া | -া -া I সা ধা -া | ধা -া | ধা -া I
না চে ০ রে ০ ০ ০ ম যূ র্ না ০ চে ০

I পা ধা -া | ধপা -মপা | মা -া I পা ধা -মা | পা -া | পর্সা -ধা I
ম যূ র্ না০ ০ চে ০ না চে ০ না ০ চে০ ০

I ধা ধা -পমা | পা -পমা | মা -া I পা ধা -মা | পা -া | পর্সা -ধা I
ম য়ূ ০র্ না ০ চে ০ না চে ০ না ০ চে০ ০

I ধা ধা -পমা | পা -পমা | মা -া I ণ্া সা -া | সা -া | -া -রজ্ঞরা I
ম য়ূ ০র্ না ০ চে ০ না চে ০ রে ০ ০ ০০০

I ণ্া সা -া | সা -া | -া -রজ্ঞরা I ণ্া সা -া | সা -া | -া -রজ্ঞরা I
না চে ০ রে ০ ০ ০০০ না চে ০ রে ০ ০ ০০০

I ণ্া সা -া | সা -া | -া -া II II
না চে ০ রে ০ ০ ০

দ্বিতীয় অঙ্ক

ভুবনের গহন ঘুমের অন্ধকারে
তারি রূপের আলো
আমার ঘুম ভাঙ্গালো,
নাচালো সে আমারে ;
ভারতের দিগ্বালিকার
দিগম্বরীর দীপালিকায়
পাই যে তারে।
অসীমার সেই শিখী ঐ জগৎ-নিশার নিদ্রাহানে,

মহানিশার লক্ষ তারায়
পেখম তোলো আমার গানে !
গ্রীবায় সৌদামিনীর ফণী,
তন্দ্রাহারা দুই চোখে বৈদুর্যমণি ;
মুখে তার চন্দ্রকলা, চূড়ায় শিখা,
সুনীল প্রভায় বক্ষ সাজে :
আমার জীবন বক্ষে সাজে।
বিজয়ার বীর্য্যবিভার দীপ্ত ময়ূর নৃত্যবিলায়
আমার মাঝে ॥

তৃতীয় অঙ্ক

মাটিতে মহাদেবার উদয়-ক্ষণে
তার মানবী লীলার সনে
মহাদেব ঐ অপরূপ ময়ূর হয়ে
নাচে আমার মানবতায়,
নাচে আমার তনুলতায়,
নাচে আমার প্রাণে মনে।
নাচে ঐ থৈ-থৈ-থৈ থিয়া-থিয়া থমল-থমল !

যুগল ডানার দোলায়
নাচায় প্রলয় বজ্র সৃজন কমল !
ঐ নাচনের ছন্দে মাতাল
মানবলোকের সঙ্গে নাচে স্বর্গ পাতাল ;
নটরাজ বিহঙ্গমে নটেশ্বরীর নিখিল-নাটের রঙ্গরাজে :
আমার জীবন রঙ্গে রাজে।
বিজয়ার বীর্যবিভায় দীপ্ত ময়ূর নৃত্য বিলায়
আমার মাঝে ॥

বেদান্ত-দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

ঈশ্বর

ব্রহ্মসূত্রের "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (১।১।২), এই সূত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্কর লিখিয়াছেন "অস্য জগতঃ নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্য, অনেক-কর্ত্তৃ-ভোক্তৃ-সংযুক্তস্য, প্রতিনিয়ত-দেশ-কাল-নিমিত্ত-ক্রিয়া-ফলাশ্রয়স্য মনসাপি অচিন্ত্য-রচনা-রূপস্য জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গং যতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাৎ ভবতি, তৎ ব্রহ্ম। অর্থাৎ নামরূপে ব্যাকৃত, অনেক কর্ত্তা ও ভোক্তার সহিত সংযুক্ত, ব্যবস্থিত দেশ-কাল, নিমিত্ত, ক্রিয়া ও ফলের আশ্রয় অচিন্ত্য-রচনা-কৌশল এই যে জগৎ, তাহার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় যে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ কারণ হইতে হয়, তাহাই ব্রহ্ম। কিন্তু এখানে ব্রহ্মের যে লক্ষণের বর্ণনা শংকর করিয়াছেন (জগতের সৃষ্টি-স্থিতি ও লয় কর্ত্তৃত্ব) তাহা ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ নহে, তটস্থ লক্ষণ।

কিন্তু জগতের পারমার্থিক সত্তা নাই; জগৎ ব্রহ্মে অধ্যস্ত ও মায়িক। যাহার পারমার্থিক সত্তা নাই, তাহার স্রষ্টৃত্ব, পালনকর্ত্তৃত্ব ও সংহর্ত্তৃত্ব ও মায়িক—এই মীমাংসা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। জগতের অস্তিত্ব যেমন ব্যাবহারিক, ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্ব প্রভৃতিও তেমনি ব্যাবহারিক ব্রহ্ম—নির্গুণ ও একমাত্র পারমার্থিক সত্য।

জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। জগৎকে আমরা সজ্ঞানে কল্পনা করি না, বাজিকরের মায়া যেমন, তেমন তাহা আমাদের চেষ্টা ব্যতীত আপনা হইতেই আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয়। কিন্তু বাজিকর প্রত্যক্ষ জগৎ স্রষ্টা ঈশ্বর আমাদের দৃষ্টিগোচর নহেন। আমরা জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-লয়ের ব্যাখ্যার জন্য ব্রহ্মের কল্পনা করি, অথবা শ্রুতিতে তাঁহার কথা আছে বলিয়া, আমরা তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করি এবং তাঁহার উপাসনা করি।

ব্রহ্মের দুইরূপ—নির্গুণ ও স-গুণ, নিরুপাধি ও সোপাধিক, নির্বিশেষ ও সবিশেষ ব্রহ্ম। সত্যং, জ্ঞানং, অনন্তং এবং সৎ, চিৎ, আনন্দ বলিয়া শ্রুতিতে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ।

ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, সুতরাং সৃষ্টিকার্য্য তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় কিরূপে? এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য "মায়া" ও "অবিদ্যার" কল্পনা। এই জগৎ নির্গুণ ব্রহ্মের সৃষ্টি নহে, মায়া-উপহিত (মায়া-উপাধিযুক্ত) ব্রহ্মের সৃষ্টি। মায়া উপহিত ব্রহ্মই ঈশ্বর। মায়া ঈশ্বরের উপাধি। এই মায়া বিশুদ্ধ-সত্ত্ব প্রধানা প্রকৃতি। ত্রিগুণা প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের মধ্যে বিশুদ্ধ সত্ত্ব যখন প্রধান হয়, তখন তাহা বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-প্রধানা। আর অবিশুদ্ধ-সত্ত্ব-প্রধানা প্রকৃতি অবিদ্যা—ইহা কেহ কেহ (তত্ত্ববিবেককার) বলিয়াছেন। এই বিশুদ্ধ সত্ত্ব-প্রধানা প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই ঈশ্বর। ব্রহ্ম যখন অবিশুদ্ধ সত্ত্ব-প্রধানা প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হন, তখন তিনি জীব। মায়াই প্রকৃতি। কিন্তু ব্রহ্মই একমাত্র পদার্থ—ইহাই অদ্বৈতবাদ। মায়া যদি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র ব্রহ্মের উপাধি হয়, তাহা হইলে দ্বৈত স্বীকৃত হইয়া পড়ে। তাই মায়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পূর্ণ স্বীকৃত হয় নাই। মায়াকে অনির্ব্বাচনীয় বলা হইয়াছে। একদিক হইতে মায়ার অস্তিত্ব আছে, অন্য দিক হইতে নাই। সৎ অথবা অসৎ ইহাকে কিছুই বলা যায় না।

এবংবিধ মায়াগত ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই ঈশ্বর। আর অবিদ্যা-গত ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব জীব। মায়ার আবরণশক্তি ফলে ব্রহ্ম-চৈতন্য আবৃত হন, তাহাকে দেখা যায় না; বিক্ষেপ শক্তির ফলে জীব ও জড় জগতের আবির্ভাব হয়। মায়ার আবরণ শক্তির আধিক্য হইলে তাহাকেই অবিদ্যা বলে, তাহাতেই পতিত ব্রহ্ম-চৈতন্য জীব। এই অবিদ্যা বা অজ্ঞান জীবের উপাধি, ঈশ্বরের নহে! জীব আপনাকে অজ্ঞ বলিয়া জানে। ঈশ্বরের সঙ্গে অজ্ঞানের সম্বন্ধ নাই। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, মায়াধীশ। ব্রহ্ম অচিন্ত্য বলিয়া তাঁহার উপাসনার জন্য ঈশ্বর যে কেবল কল্পিত, তাহা নহে। মায়াতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই ঈশ্বর। এই প্রতিবিম্ব মিথ্যা নহে, কেন মায়াকে সৎ বা অসৎ বলা যায় না—তাহা অনির্বচনীয়! সেইজন্য কিরূপে নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ ঈশ্বর-

রূপে প্রতিভাত হন, তাহা অচিন্ত্য হইলেও ঈশ্বরকে অসৎ বলা যায় না।

জীব ও ঈশ্বর উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে চিৎ-প্রতিবিম্ব। যাঁহার প্রতিবিম্ব তিনি বিম্ব। মায়া ও অবিদ্যায় (বা অন্তঃকরণ) যাহার প্রতিবিম্ব পতিত হয়, সেই বিম্ব ব্রহ্ম। তিনি বিশুদ্ধ চৈতন্য, কোনওরূপ উপাধি দ্বারা তিনি পরিচ্ছিন্ন নহেন।

চৈতন্য চতুর্বিধ বলিয়া কেহ কেহ বর্ণনা করিয়াছেন। জীব, কূটস্থ, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম। ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে একই, তাহাতে ভেদ নাই। এই সকল ভেদ ঔপাধিক বা ব্যবহারিক। একই আকাশ যেমন উপাধি ভেদে ঘটাকাশ, জলাকাশ, মেঘাকাশ ও মহাকাশ নামে পরিগণিত হয়, তেমনিই একই চৈতন্য উপাধি ভেদে চতুর্বিধ প্রতীত হয়। সমস্ত জগৎই ব্রহ্মে কল্পিত। জীবের স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীরও চৈতন্যেই কল্পিত। চৈতন্য স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের অধিষ্ঠান। চৈতন্য স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের অধিষ্ঠান বলিয়া, চৈতন্য উক্ত শরীরদ্বয়দ্বারা অবচ্ছিন্ন। এই শরীরাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের নাম কূটস্থ। ইহা নির্বিকার, এই জন্য কূটস্থ। সূক্ষ্ম শরীর কূটস্থ চৈতন্যে কল্পিত বলিয়া তাহার অন্তর্গত বুদ্ধি বা অন্তঃকরণও কূটস্থে কল্পিত। এই অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য জীব—চিদাভাস। চিদাভাস সংসারী, কিন্তু কূটস্থ চৈতন্য নির্বিকার। অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যই ব্রহ্ম। ব্রহ্মে মায়া আশ্রিত। ব্রহ্মাশ্রিত মায়ায় জগৎ সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত। জগতের অন্তর্গত যাবতীয় প্রাণীর বুদ্ধিও সূক্ষ্মরূপে মায়ায় অবস্থিত। এই মায়ায় অবস্থিত সূক্ষ্ম-বুদ্ধিকে বুদ্ধিবাসনা বা ধী-বাসনা বলে। এই মায়ায় অবস্থিত সকল প্রাণীর বুদ্ধি বাসনাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই ঈশ্বর। বুদ্ধির বিষয় হইতেছে যাবতীয় বস্তু। সকল প্রাণীর সমস্ত বস্তুবিষয়ক বুদ্ধি-বাসনা (যাহা মায়ায় অবস্থিত) ঈশ্বরের উপাধি। এইজন্য ঈশ্বর সর্বজ্ঞ সুতরাং সর্ব্বকর্ত্তা।

ঘটের মধ্যে জলে প্রতিবিম্বিত আকাশ দ্বারা ঘটাকাশ যেরূপ তিরোহিত হয়, কূটস্থ চৈতন্যে কল্পিত জীবদ্বারা কূটস্থ সেইরূপ তিরোহিত হয়—প্রতিভাত হয় না। জীব ও তাহার অধিষ্ঠান কূটস্থের অবিবেককে মূল অবিদ্যা বলে।*

বেদান্ত মতে আত্মা সর্ব্বব্যাপী। সুতরাং জগতে অচেতন কিছুই নাই। আত্মচৈতন্যহীন স্থান বা পদার্থ জগতে নাই। অথচ জাগতিক বস্তুদিগকে চেতন ও অচেতন এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। চৈতন্য সর্ব্ব-বস্তুতে থাকিলেও যাহাতে বুদ্ধিগত চিদাভাস আছে তাহাকে চেতন ও যাহাতে তাহা নাই, তাহাকে অচেতন বলা হয়। প্রাণীদিগের চিদাভাস আছে বলিয়া তাহারা চেতন, জড়-পদার্থে নাই বলিয়া তাহা অচেতন।

অন্তঃকরণাদি মায়ার কার্য্য। মায়া ও তাহার কার্য্যাদি পরমাত্মা বা ব্রহ্মের উপাধি। সর্ব্ব উপাধি বর্জিত পরমাত্মা বা ব্রহ্ম শুদ্ধ চৈতন্য। মায়া উপাধিযুক্ত পরমাত্মা ঈশ্বর। যাবতীয় সূক্ষ্ম শরীরের সমষ্টি রূপ উপাধি-বিশিষ্ট পরমাত্মা হিরণ্যগর্ভ নামে অভিহিত এবং যাবতীয় স্থূল শরীরসমষ্টিরূপ উপাধিযুক্ত পরমাত্মা বিরাট বা বিরাট পুরুষ।

চিৎ বা চৈতন্য ত্রিবিধ—জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম। কূটস্থ চৈতন্য জীবের অন্তর্ভূত।

লিঙ্গদেহ অধ্যস্ত হয় কূটস্থ চৈতন্যে। লিঙ্গদেহে বর্ত্তমান অন্তঃকরণে চিদাভাস বা চিৎ প্রতিবিম্ব পতিত হয়। কূটস্থ চৈতন্য, লিঙ্গদেহ ও চিদাভাস মিলিত হইয়া জীব।

"বিবরণ"-গ্রন্থ অনুসারে জীব ও ঈশ্বর উভয়েই প্রতি-বিম্ব নহেন। জীব প্রতিবিম্ব, ঈশ্বর বিম্ব। অজ্ঞানগত চিৎ প্রতিবিম্ব জীব। জীব ও ঈশ্বর উভয়েই প্রতিবিম্ব হইলে ভিন্ন ভিন্ন উপাধির প্রয়োজন হয়। কিন্তু কাহারও মতে অজ্ঞানগত চিৎ প্রতিবিম্ব ঈশ্বর। অন্তঃকরণগত চিৎ প্রতিবিম্ব জীব। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, মায়াতে (বিশুদ্ধ সত্ত্ব-প্রধানা প্রকৃতিতে) প্রতিবিম্বিত ব্রহ্ম ঈশ্বর এবং অবিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতি বা অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত ব্রহ্ম জীব।

কোনও কোনও প্রাচীন আচার্য্যের মতে প্রতিবিম্ব ও বিম্বের মধ্যে কোনও ভেদ নাই। বিম্ব যেরূপ সত্য, প্রতিবিম্বও তেমনি। প্রতিবিম্ব মিথ্যা নহে। প্রতিবিম্ব সত্য বলিয়া মুক্তিতেও জীবের অস্তিত্বের নাশ হয় না। বিম্ব ও প্রতিবিম্বের অভিন্নত্ব প্রমাণের জন্য বলা যাইতে পারে, বিম্ব কখনও চক্ষুর মধ্যে প্রবেশ করে না, তাহাতে পতিত আলোক প্রতিফলিত হইয়া চক্ষুতে পতিত হইলে বিম্ব

* ফেলোসিপের লেকচার, ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, চতুর্থ পর্ব্ব—৬৭ পৃষ্ঠা।

দৃষ্টিগোচর হয়। প্রতিবিম্বের বেলাতেও সেই বিম্ব হইতে প্রতিফলিত আলোক রশ্মিই স্বচ্ছ পদার্থকর্তৃক প্রতিহত হইয়া যখন চক্ষুতে পতিত হয়, তখন প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়। একই আলোক-রশ্মি বিম্ব ও প্রতিবিম্ব উভয়ের দৃষ্টিজ্ঞানের কারণ। যাহারা প্রতিবিম্বকে সত্য বলেন, তাহারা বলেন—প্রতিবিম্ব মিথ্যা হইলে জীব মিথ্যা, সংসার মিথ্যা, মুক্তি মিথ্যা হয়। কিন্তু বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন ইহাই তো বেদান্ত সিদ্ধান্ত। গৌড়পাদ বলেন—

> ন নিরোধো ন বোৎপত্তি র্নবদ্ধো নচ সাধকঃ
> ন মুমুক্ষু র্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা।

নিরোধ নাই, উৎপত্তি নাই, বন্ধ নাই, সাধক নাই, মুমুক্ষু নাই, মুক্তিও নাই। ইহাই পরমার্থতা। কিন্তু প্রতিবিম্বের সত্যতাবাদিগণ বলেন—প্রতিবিম্ব যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপন্ন হয় না। যদি ব্রহ্ম সত্যও হয় জীব মিথ্যা, তাহা হইলে উভয়ে অভিন্ন হইবে কিরূপে। সত্য ও মিথ্যা কখনও অভিন্ন হইতে পারে না।

কিন্তু কেহ কেহ বলেন—চিতের প্রতিবিম্বই হইতে পারে না। প্রতিবিম্ব হয় দ্রব্যের। যাহার ক্রিয়া ও গুণ আছে এবং যাহা সমবায়ী কারণ, তাহা দ্রব্য, ইহাই কণাদের মত। কিন্তু ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ, তিনি সমবায়ী কারণও হইতে পারেন না। সুতরাং ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব অসম্ভব। ইহার উত্তরে বলা হয়—দ্রব্য না হইলেও প্রতিবিম্ব হইতে পারে, যেমন প্রতিধ্বনি। শব্দ দ্রব্য নহে, কিন্তু তাহার প্রতিধ্বনিই তাহার প্রতিবিম্ব। সে যাহা হউক বৈশাসিক দর্শনে আত্মা দ্রব্য বলিয়া স্বীকৃত এবং ব্রহ্ম পরমাত্মা।

শংকর বৃহদারণ্যকের ভাষ্যে বলিয়াছেন—অবিকৃত ব্রহ্ম স্বীয় অবিদ্যা দ্বারা জীবভাব প্রাপ্ত হন এবং স্বীয় বিদ্যা দ্বারা মুক্ত হন। ঈশ্বরের সহিত সমস্ত প্রপঞ্চ জীব দ্বারাই কল্পিত হয়।

ঈশ্বর সম্বন্ধে বিভিন্ন মত উপরে বর্ণিত হইল। জগৎ স্রষ্টৃত্ব ব্রহ্মের তটস্থ অর্থাৎ আগন্তুক লক্ষণ। জগৎ না থাকিলেও ব্রহ্মের স্বরূপের হানি হয় না। জগৎ-সম্বন্ধ-বর্জিত ব্রহ্ম সৎ-চিৎ-আনন্দরূপে নিত্য বর্ত্তমান। কিন্তু সৃষ্টি-প্রবাহ যখন অনাদি, তখন জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধও অনাদি। সুতরাং অনাদিকাল হইতে ব্রহ্ম জগৎ স্রষ্টা। কিন্তু সৃষ্টি-প্রবাহ ও ব্রহ্মের জগৎ-স্রষ্টৃত্ব মায়া-কল্পিত। মায়ার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্রহ্ম জগৎস্রষ্টারূপে প্রতিভাত হন। জগতের মধ্যে জীব ও প্রপঞ্চ উভয়ই বর্ত্তমান। ভান কেবল—জীবের নিকটই হইতে পারে। জীবের উক্ত ভান হয় জীবের নিকট। জীবের নিজের অস্তিত্বের ভানও হয় জীবেরই নিকট। জীব ও জড়ের ভান ব্রহ্মের নিকট হয় না। ঈশ্বরের নিকট হইতে পারে। কিন্তু শঙ্কর বলেন—ঈশ্বর ও জড় জগৎ জীবেরই কল্পিত অর্থাৎ উভয়ই জীবকর্তৃক ব্রহ্মে অধ্যস্ত হয়।

ব্রহ্ম, জীব, ঈশ্বর ও জগৎ

> "জগৎ যোনিরযোনিস্ত্বং, জগদন্তো নিরন্তকঃ।
> জগদাদিরনাদিস্ত্বং, জগদীশো নিরীশ্বরঃ॥
> আত্মানং আত্মনাবেৎসি, সৃজস্যাত্মানমাত্মনা।
> আত্মনন্যেবাত্মনাতুষ্টঃ, আত্মন্যেব প্রলীয়সে॥"
>
> (কুমার-সম্ভব)

ঈশ্বর জগতের কারণ; কিন্তু তাঁহার কারণ নাই। তিনি জগতের সংহার করেন, কিন্তু তিনি নিত্যও অবিনশ্বর। তিনি জগতের আদি, কিন্তু তাঁহার আদি নাই। তিনি জগতের ঈশ্বর, কিন্তু তাঁহার ঈশ্বর নাই। তিনি আপনি আপনাকে জানেন, আপনি আপনাকে সৃষ্টি করেন (জগৎরূপে), আপনি আপনাতে তুষ্ট হন এবং আপনাতে বিলীন হন। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা যিনি, তিনি ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম। নির্গুণ ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়। বড়জোর তাহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে তিনি সৎ-চিৎ আনন্দস্বরূপ ও অনন্ত। নির্গুণ ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞানের অতীত। মায়াতে তাঁহার যে প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহাই ঈশ্বর। কিন্তু দ্রষ্টা না থাকলে প্রতিবিম্ব হয় না। এই প্রতিবিম্ব দর্শন করে জীব, ব্রহ্ম করেন না। মায়ার মধ্যে জীব ব্রহ্মের যে রূপ দর্শন করে, তাহাই ঈশ্বর।

কিন্তু জীব কি? অবিদ্যা বা অজ্ঞানের মধ্যে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব জীব। এই প্রতিবিম্ব অচেতন নহে, চৈতন্য। প্রকৃতপক্ষে এই তথাকথিত প্রতিবিম্ব ব্রহ্মই। অবিদ্যারূপ এক অচিন্ত্য পদার্থ কর্তৃক অনন্ত জ্ঞানময় ব্রহ্ম নিজে অবিকৃত থাকিয়াও বহুসংখ্যক সসীম জীবে পরিণত হন। ব্রহ্ম অধিকারী, সুতরাং তিনি জীবে পরিণত হন বলা যায়

না। *জীবের উদ্ভব হয় বলিতে পারা যায়। কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ কেবল জ্ঞানের পরিমাণের ভেদ। জীব সসীম বলিয়া তাহার সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানই অসম্পূর্ণ, ব্রহ্মের জ্ঞান পূর্ণ। যখন অবিদ্যা অপগত যায়, তখন জীবের জ্ঞান প্রসারিত হয়, তখন তাহার জ্ঞান ও ব্রহ্মের জ্ঞানের মধ্যে কোনও ভেদ থাকে না, জীব তখন ব্রহ্ম হয়।

ব্রহ্মকে সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ বলা যায় কিনা সে সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, কেননা ব্রহ্ম নিগুর্ণ কিন্তু 'সৎ' ও চিৎ ও আনন্দ শব্দত্রয় গুণ বাচক। বিজ্ঞান-ভিক্ষু তাঁহার সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যে সাংখ্যের গুণকে দ্রব্য অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। জীবকে গুণের (দড়ির) ন্যায় বন্ধনকরে বলিয়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ। ব্রহ্মকে যখন নিগুর্ণ বলা হয়, তখন তাহার অর্থ ইহা নহে, যে তাঁহাতে কোনও গুণই নাই। তাহার অর্থ ব্রহ্ম সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ গুণ বর্জ্জিত। জাগতিক সমস্ত বস্তুই সত্ত্বঃ রজ ও তমো গুণাত্মক। ব্রহ্ম তাহা নহেন, এই অর্থেই ব্রহ্ম নিগুর্ণ। আমাদের পরিচিত কোনও গুণই তাহাতে নাই। তিনি ত্রিগুণাতীত—ত্রিগুণ জগতের অতীত (transendent).

এক ব্রহ্ম কিরূপে অসংখ্য জীবরূপে প্রতীত হন, তাহা দুর্বোধ্য। এই প্রতীতি কাহার? ব্রহ্ম ব্যতীত তো দ্বিতীয় বস্তু নাই। সুতরাং এই প্রতীতি ব্রহ্মেরই বলিতে হয়। কিন্তু ব্রহ্ম বিশুদ্ধ চিৎ, তাঁহাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভেদ নাই, তাহার পরিণামও নাই। সুতরাং তিনি যে আপনাকে অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপ অনুভব করেন, ইহা বলা যায় না। মায়াবশতঃই ব্রহ্ম জীবরূপে অনুভূত হন। কিন্তু মায়াবশতঃ যে সকল জীব উদ্‌ভূত হয় এই অনুভূতি তাহাদেরই। এই অনুভূতি ও জীবের উদ্‌ভব একই। কেননা জীব না থাকিলে যেমন এই অনুভূতি হইত না, তেমনি এই অনুভূতিতেই জীবের উৎপত্তি। তাহা হইলে দাঁড়ায় এই, যে এক অদ্বিতীয় চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম মায়াতে অসংখ্য কেন্দ্র—অসংখ্য জীবরূপে প্রতীত হন, যেমন একই চন্দ্র জলাশয়ের বিভিন্নস্থানে ভিন্ন ভিন্ন চন্দ্ররূপে দৃষ্ট হয়। এবং এই প্রতীতি সেই সকল জীবেরই। মায়াতে যে সকল প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহারা চিতের প্রতিবিম্ব বলিয়া চিতের ধর্ম্মবিশিষ্ট। তাহারা আপনাদিগকে (সান্ত বলিয়া) ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অনুভব করে। জড়ের প্রতিবিম্বের সহিত চিতের প্রতিবিম্বের পার্থক্য এইখানে। নিগুর্ণ চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম কেবল প্রতিবিম্বিত হন না, প্রতিবিম্বের মধ্যে জ্ঞাতারূপে আবির্ভূত হন। কিরূপে হন তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

ব্রহ্ম কেবল ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপেই প্রতিবিম্বিত হন না, তিনি সমগ্র মায়া উপাধির মধ্যে ঈশ্বররূপেও প্রতিবিম্বিত। মায়া ও অবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য সত্ত্বগুণের ন্যূনাধিক্য মাত্র। জীবের সত্ত্ব প্রধান বুদ্ধিতে ব্রহ্ম ঈশ্বররূপ প্রতীত হন।

জড়জগৎ জীবকর্ত্তৃক ব্রহ্মে অধ্যস্ত হয়। ইহার কারণ অবিদ্যা ও অজ্ঞান। এই অবিদ্যাবশতঃই জগৎ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রতীত হয় এবং ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা বলিয়া প্রতীত হন।

বিশুদ্ধ চৈতন্য

বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বয়ং-প্রকাশ। ইহা কখনও জ্ঞান ক্রিয়ার বিষয় হয় না। জ্ঞানের বিষয় না হইলেও ইহা আমাদের যাবতীয় জ্ঞানক্রিয়ায় বর্ত্তমান। জ্ঞানের বিষয় না হইয়া সমস্ত জ্ঞান ক্রিয়ায় বর্ত্তমান থাকিবার যোগ্যতাই স্বয়ং-প্রকাশত্ব্তা। যখন কোনও বস্তুতে জ্ঞানের বিষয় বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তখন সেই বস্তুর জ্ঞেয়ত্ব তাহার এক গুণ বলিয়া বিবেচিত হয়। সেই জ্ঞেয়ত্ব সেই বস্তুর মধ্যে অবস্থিত হইতে পারে অথবা নাও পারে। ইহা সময় বিশেষে বস্তুর মধ্যে অবস্থিত, অন্যসময়ে অবস্থিত না হইতেও পারে। এই জ্ঞেয়ত্ব নির্ভর করে জ্ঞেয়ত্ব উৎপাদনক্ষম অন্য বস্তুর উপরে। কিন্তু বিশুদ্ধ চৈতন্য তাহাকে প্রকাশিত করিবার জন্য অন্য কিছুর অপেক্ষা করে না। পরন্তু তাহা অন্য সকল বস্তুকে প্রকাশ করে। এক সংবিদকে প্রকাশিত করিবার জন্য যদি অন্য সংবিদের প্রয়োজন হইত—তাহা হইলে দ্বিতীয় সংবিদের প্রকাশের জন্য অন্য সংবিদের প্রয়োজন হইত। তাহাতে অনবস্থার উদ্‌ভব হইত। কোনও বিষয়কে জানাইবার সময় যদি সংবিদ আপনাকে প্রকাশিত না করিত, তাহা হইলে কোনও বস্তুকে দেখিবার অথবা জানিবার পরেও, জ্ঞাতা তাহা দেখিয়াছে অথবা জানিয়াছে কি না সে সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ হইতে পারিত। এই স্বয়ং প্রকাশ বিশুদ্ধ চৈতন্য বা সংবিদই আত্মা। আত্মা কোনও জ্ঞানের বিষয় না হইয়াও সর্ব্ব অনুভূতির মধ্যে

প্রকাশিত। সকল জ্ঞানে আত্মা প্রকাশিত বলিয়া কেহই তাহার আত্মার অস্তিত্বে সন্দিহান হয় না। আত্মা সকল বস্তুর প্রকাশক, কিন্তু নিজে কখনও জ্ঞানের বিষয় হয় না। যাহা আত্মানুভূতি রূপে প্রকাশিত হয়, তাহা অহংকার—আত্মা নহে।

জীব ও ঈশ্বর বিশুদ্ধ চৈতন্যের ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে পতিত প্রতিবিম্ব। বিশুদ্ধ চৈতন্য বিম্ব। জীব ও ঈশ্বর প্রতিবিম্ব। চৈতন্য বিশুদ্ধ কোনও উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। তাহার মধ্যে চৈতন্য ভিন্ন অন্য কিছু নাই। তাহার মধ্যে জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞানের ভেদ নাই।

গ্রীষ্মের ব্যথা

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

(১)

রুদ্রদেব, রৌদ্রে তব প্রাণ বাঁচে না যে
জানোনা-ত দাহজ্বালা শিরে তব হিমগঙ্গা রাজে।
তোমার তো হুঁস নেই, নেইক খেয়াল-ও,
তোমার জটার বনে মা-গঙ্গা কি শুকালো লুকালো?
কালবৈশাখীর ঝড়ে তোমার তাণ্ডব হোক সুরু।
জটার বাঁধন তায় ঢিলা হোক ওগো নটগুরু।
ঝরিয়া পড়ুক তায় ফাঁক পেয়ে কিছু রুদ্ধ জল,
মহীতল হউক শীতল।

(২)

জষ্টি মাসের দিন দুপুরে হাঁকছে ফেরিঅলা
'হিমসাগর আম—চাই বাবুজী', শুক্‌নো তাহার গলা।
নামিয়ে ডালা বল্‌লে বুড়ো—'গোটা পঁচিশ আম,
আছে বাকি নাও বাবুজী যা খুশী দাও দাম।'
গামছা পেতে পড়ল শুয়ে চাইল আমায় জল।
নির্বিচারে কিনে নিলাম তাহার ক'টা ফল।
হিমসাগরও মাথাতে যার তার এ কাতরতা!
খালি মাথায় খাটছে যারা ভাবছি তাদের কথা।

(৩)

দূর্বাভরা শ্যামল মাটি পথ হয়েছে আজ
কয়লা কাথে ময়লা দেহ বদ্‌লে গেছে সাজ।
জষ্টি মাসের দুপুর বেলায় তপ্ত ঘন শ্বাসে
দুটি ধারের বাড়ীগুলোয় তার অভিযোগ আসে।
আমরা দুয়ার জানলা রুধি চাইনা পথের পানে
কাদের কাছে নালিশ করে হায় রে সে কি জানে?
তার এ দশা কার গরজে হায় কি সে তা ভাবে?
তপ্ত হাওয়ায় জ্বালায় যেবা সে কী দরদ পাবে?

(৪)

জষ্টিমাসের দুপুর বেলা সাইকেলী রিক্‌শোতে
চলেছিলাম বর্ধমানে রেল ইষ্টেশন হ'তে।
ঘেরাটোপের মধ্যে ব'সে থাকি,
সাম্‌নে পাশে চেয়ে চেয়ে ঝল্‌সে পড়ে আঁখি।
দুপুর রোদে পথে কোথাও নেইক কোন ছায়া।
রিক্সাওয়ালার পানে চেয়ে হলো বড়ই মায়া।
তায় শুধালাম—হ্যাটে কেন ঢাকিস্ না তোর মাথা?
দাণ্ডিতে তো বাঁধতে পারিস একটা ছোট ছাতা!
জবাব দিল—"দুপুর বেলায় বাবু,—
দু-এক আনা ভাড়া বাড়াই হই না তাতেই কাবু।
পেটে খেলে পিঠে কেন, মাথায়ও সব সয়।
সুয্যিমামা ঘামায় বটে, মামায় কী বা ভয়?"

(৫)

দুপুর রোদে বেরুত না মেয়েরা এই দেশে,
এখন তারা বেরিয়ে পড়ে সেজে নানান বেশে।
তাদের মাথায় খোঁপা থাকে চুলও ঘন আছে,
যতই রাগুক সুয্যিঠাকুর জব্দ তাদের কাছে।
মোদের মাথায় চুলের অভাব, অনেক মাথায় টাক।
দুপুর রোদে যাতায়াতে মোদেরি বিপাক।
ছাতা নিলেও ছাতার তাতে মাথা মোদের ঘামে,
টাকের পিছল ঢালু পথে তাপ্তী ধারা নামে।

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

তরঙ্গভঙ্গ

ফটো : বিমলকৃষ্ণ সরকার

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

সাগর-সন্তান

ফটো : অতীনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনের লক্ষ্য

উপানন্দ

চরিত্রের প্রধান অন্তরায় স্বার্থপরতা। চরিত্রবলের অভাবে কেবল যে নিজের অনিষ্ট হয়, তা নয়—সমগ্র জাতিও দুর্বল হয়ে ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। নিজের সুখের জন্য অপরকে প্রতারণা করা অনুচিত। পরকে নিজের মত দেখ্‌বার অভ্যাস করলে হৃদয়ে মনুষ্যত্ব বোধ হয়। তখন স্বার্থপরতা আর অন্তরে থাকে না। সমাজের সঙ্গে আর সমগ্র জগতের সঙ্গে রয়েছে আমাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও সম্বন্ধ। সমাজ দেহের আমরাও এক একটা অংশ, আমাদের চরিত্র দুর্বল হোলে, সমাজের ও জীবনীশক্তি হ্রাস পাবে। সমাজকে বলিষ্ঠ রাখা দরকার।

দেশের ও দশের ভালোমন্দ ভাব্‌তে মানুষ বাধ্য। তোমাদের পাশের দশজনের স্বাস্থ্য, স্বচ্ছন্দতা, সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগ সম্পর্কে তোমাদের দেখ্‌তে হবে, নতুবা তোমরা সুখী হোতে পারো না। তোমাদের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির জন্যে যখন তোমরা অবিরত পর-মুখাপেক্ষী, তখন পরের কল্যাণের দিকেও তোমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। জগতটাকে আপনার মত করে দেখার নামই বিশ্বপ্রেম। এই বিশ্বপ্রেমেই পাওয়া যায় পরম আনন্দ, অপরিসীম সন্তোষ, আর অপূর্ব্ব পরিতৃপ্তি। পরার্থপরতা বোধ না থাক্‌লে আত্মোন্নতি হয় না।

প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে একটা না একটা লক্ষ্য থাকে। যার জীবনের কোন লক্ষ্য নেই, সে সংসারে কিছুই করতে পারে না। ছেলেবেলায় জ্ঞানের অভাব থাকে, তাই আদর্শেরও স্থিরতা থাকেনা। বিদ্যাশিক্ষার মাধ্যমে যখন ক্রমেই জ্ঞানের উন্মেষ হোতে থাকে, আর বিচারবুদ্ধি জাগ্‌বার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ জীবনের আদর্শের সম্বন্ধে চেতনা জাগে, তখন নিজের জীবনের শুভ পথ রচনার দিকে মানুষের লক্ষ্য হয়। চরিত্রবলের অভাব ঘটলে সম্যক্‌ভাবে পথ রচনা হয়না। চরিত্রবল যেমন প্রয়োজনীয়, মহৎ আদর্শের দিকে লক্ষ্যও তেমনই আবশ্যক, নতুবা পথভ্রষ্ট হয়ে জীবনে বহু দুঃখকষ্ট ভোগ করবার সম্ভাবনা থাকে। নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়ে কিভাবে বৃহত্তর জাতীয় আদর্শ রক্ষা করা যায়—আর সমাজের সকলপ্রকার কল্যাণের জন্যে কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব পালন করা যায়, সেদিকে অবহিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। যে ব্যক্তি এ বিষয়ে উদাসী, সে মনুষ্যপদবাচ্য নয়। দুঃখে তার জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

শিক্ষার অভাবেই সঙ্কীর্ণতা, কুসংস্কার, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মানুষের অন্তরে দূষিত ক্ষতের মত বিস্তৃত হয়, ক্রমে ক্রমে এই ক্ষত বিষাক্ত আবহাওয়ায় পচনশীল হয়ে চারিত্রিক শক্তিকে নষ্ট করে, ফলে শোচনীয় পরিণতি ঘটে। আজ শিক্ষার দোষে আর চরিত্রবলের অভাবে বহু মানুষই হীনতাকে আলিঙ্গন করে পথে পথে আর্ত্তনাদ করে বেড়াচ্ছে। বিশ্বমানবের কল্যাণ ধর্ম্মকে অন্তরে মহাসত্য বলে স্বীকার করে নিয়ে তাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ কর্‌বার এসেছে সময় বারে বারে, কিন্তু যারা একে স্বীকার করে নিয়ে জীবনে প্রয়োগ করতে পারলো না, তারা মানবসমাজের কোন মহত্তর বিকাশের সম্ভাবনাকেও উপলব্ধি করতে পারলো না—অপকলঙ্ক নিয়েই ঘট্‌লো তাদের অপমৃত্যু। আগামী পৃথিবী অপেক্ষা করে আছে তার নতুন মানবতার জন্যে—এই মানবতার বীজ বপন করে যাবে তোমরা যাতে—তোমাদের নৈতিক চরিত্রবলে ও মহৎ আদর্শে মানুষের সভ্যতার ক্ষেত্র প্রচুর সোনার ফসলে পরিপূর্ণ হয়। একটু লক্ষ্য করলেই তোমরা দেখ্‌তে পাবে, আজকের দিনে মানুষের চিন্তার মধ্যে প্রবেশ করেছে আবিলতা, তাকে দূর করা আশু প্রয়োজন। এজন্যে তোমাদের আত্মোন্নতি আবশ্যক—'আপনি আচরি ধর্ম্ম পরেরে শিখাও'—সভ্যতা বিরোধী, মানব কল্যাণ বিরোধী বহু কাজ দেশের সর্ব্বত্র নির্ব্বিবাদে চলেছে স্বার্থের প্রয়োজনে—এর প্রতিকারের জন্যে অগ্রসর হওয়াই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। মানব সভ্যতার মহানায়কদের জীবন আর বাণীর সঙ্গতির মধ্যে যে সাহিত্য জন্মগ্রহণ করে, সে সাহিত্য হোক্ তোমাদের আলোচনার বস্তু, যাতে করে তোমরা গড়ে তুলতে পারো নিজেদের জীবন সত্যশিবসুন্দরের আদর্শে। সত্যাশ্রয়ী

হয়ে মানুষ সভ্যতার প্রত্যাকেই তোমরা দেশে দেশে বিকীর্ণ করে তুলবে, এরূপ আশাই আমাদের ভেতর জেগে উঠেছে,—তোমাদের অন্তরলোকের সৃজন ক্ষেত্রে যেন না নেমে আসে হিম-নীরবতা। চিত্তের বিশুদ্ধতাই এনে দেয় মানবমনের অপরাজেয় তেজস্বিতা, এই তেজস্বিতাই সত্যের প্রকাশের পথ উন্মোচন করে আদর্শের অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে নতুন সুর ধ্বনিত করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মানবতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। যেখানে দেখেছেন অন্যায়, সেখানেই তিনি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করেছেন নিজের সর্ব্বপ্রকার স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিয়ে। রাশিয়ার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে সাহায্য করবার জন্যে যখন তিনি বিশ্বমানবতার আদর্শ আমাদের সামনে তুলে ধরে দেশবাসীকে আহ্বান করেছিলেন, তখন তাঁকে ভগ্নচিত্তে, আহত অন্তরে জনতার ধিক্কারকে মাথা পেতে সহ্য করতে হয়েছে। চিত্তের বিশুদ্ধতাই কবিগুরুকে সত্যাশ্রয়ী করেছিল, তাই তিনি বিশ্ববরেণ্য হোতে পেরেছেন। তিনি ছিলেন সত্যধর্মের শ্রেষ্ঠাবহ মানবতার উদ্গাতা।

আজ চারিদিকে চলেছে রাজনৈতিক বাণিজ্য, তাই আমরা এসে দাঁড়িয়েছি ভয়াবহ সঙ্কটের মুখে—কেমন করে আমরা সমাজ, জীবন, ধর্ম্ম, সাহিত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবো সে সম্বন্ধে আজ ভাববার যথেষ্ট অবকাশ এসেছে। এমন দিনে নিদারুণ অস্তিত্বের সঙ্কটে একমাত্র ত্রাণ অস্ত্র হচ্ছে তোমাদের চরিত্রবল, মহত্তর আদর্শ, মানবিকতাবোধ, উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্তি, সামাজিক উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য, সৎসাহস আর জনসেবা—তোমাদের মধ্যে আছে মানবিকতার বিপুল সম্ভাবনার ঐশ্বর্য্য—সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে তোমরা উদাসীন হয়ে পড়লে, এ জাতির শোচনীয় মৃত্যু ঘটবেই। জাতির ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলা আর রক্ষা করাই তোমাদের প্রধান প্রাণধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম পালন করতে হোলে কিশোর অবস্থাতেই নিজেদের চরিত্র গঠনে অবহিত হও—যাতে দেশের অগণিত বুভুক্ষু ও তমসাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে নবজীবন দান করতে পারো সত্য সাধনার বলে—শুধু বিদ্যার্জ্জন করে নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে অর্থোপার্জ্জন করাই যেন তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য না হয়, জন্মভূমির ঋণ শোধ করবার যে বিরাট দায়িত্ব জন্মসূত্রে তোমরা নিয়ে এসেছ, সে দায়িত্ব পালন করতে কোনদিন কার্পণ্য করো না—এইটুকুই আমাদের মিনতি। জাতির সঙ্কট দুর্য্যোগে তোমরাই তার আশা ভরসা স্থল—তাই তোমাদের মানুষ হয়ে উঠতে হবে। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় বলতে ইচ্ছে হয়—'গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ'। তোমরা মানুষ হোলে, সমগ্র জাতিও বড় হবে—একথা ভেবে দেখো।

উপনিষদের ভূমিকা

চিত্রিতা দেবী

গত বারে তোমাদের উপনিষদ সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেছি, এবারে আরও কিছু বলছি—শোন। উপনিষদ মানুষের অজ্ঞানের আবরণ, অন্ধকারের জাল ছিন্ন করে, তার অন্তরে জ্যোতি উৎসের পথ খুলে দেয়। সেই আলোয় মানুষ বিশ্বের সত্যস্বরূপকে চিনতে পারে, বুঝতে পারে, এতদিন সে শুধু অপরকে নয়—নিজেকেও চিনতে পারেনি। মানুষ সাধারণত নিজের ইচ্ছে, নিজের ভাবনার রংটাই বিশ্বের উপরে মাখিয়ে থাকে—যার যেমন শক্তি, সে তেমনি ভাবেই এই সৃষ্টিকে দেখে থাকে। 'জণ্ডিস' রোগের নাম নিশ্চয় শুনেছো, এই রোগে সব কিছুই হলদে দেখায়। সেই রকম তোমার চোখে যতটুকু দেখ, তুমি হয়ত ভাবো—সত্য বুঝি ততটুকুই। আচ্ছা আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। তুমি হয়ত এক এক সময় ভাবো, তোমার খুবই দুঃখ। তুমি যা চাও তার কিছুই পাওনা—তোমার চেয়ে কত সুখী তোমারই ক্লাসের ওই রঞ্জিত,—মুখের কথা খসতে না খসতে যার সমস্ত অভাবপূর্ণ হয়। এই তো সেদিন, না চাইতে ওর বাবা ওকে Parker 51 কিনে দিয়েছেন, আর তোমার ভাগ্যে জুটেছে একটা দু'টাকা দামের কলম, যা থেকে বেশীর ভাগ সময়েই কালি 'লিক্' করে, আর অপরিচ্ছন্নতার জন্যে মাস্টারমহাশয়ের কাছে বকুনি খেতে হয় তোমাকেই।

আবার রঞ্জিত হয়ত ভাবে, ওর তুলনায় তুমি কত সুখী। কেমন নির্ভাবনায় পকেটে করে ঝাল ঝাল ছোলা ভাজা নিয়ে ঘুরে বেড়াও। যখন ইচ্ছে টুক্ টুক্ করে মুখে ফেল। পরীক্ষায় প্রথম অথবা দ্বিতীয় হয়ে ভালো ভালো প্রাইজ নিয়ে বাড়ী যাও। তোমার মা, বাবা, ভাই-বোনেরা তখন তোমাকে ঘিরে কেমন আনন্দ করেন।

কিন্তু উপনিষদের ঋষি বলেছেন, তোমাদের মনের মধ্যে আলোটী জ্বললেই দেখতে পাবে, যে তোমরা দুজনেই মিথ্যে করে দেখছিলে। অজ্ঞানের মায়ায় তোমরা ভ্রান্ত হয়েছিলে—ভুল বুঝেছিলে। জানতে না, তাই দুঃখ

পাচ্ছিলে। যেই আলো জ্বলবে অমনি দেখতে পাবে, দুঃখ কিছু নয়—তোমাদের দুজনের মধ্যে সেই একই ভগবানের আনন্দ, যিনি—"সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ" অর্থাৎ যিনি সদা সকলের হৃদয়কেন্দ্রে আছেন সন্নিবিষ্ট। যিনি কারো বিশেষ সম্পত্তি নন, অথচ সকলেরই একান্ত আপনার ধন। সকলের মধ্যে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব দেখতে পেলে নিজের সুখ-দুঃখকে আর জগৎজোড়া মনে হবে না। তখন অন্যকেও যেন অনেকটা নিজের মত করেই ভাবতে পারবে। পরস্পরের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হওয়া সহজ হবে।

উপনিষদের আর এক নাম বেদান্ত। বেদের অন্তে অথবা শেষে গ্রথিত আছে বলেই এই নাম। কিন্তু বেদান্তের কথা বলতে গেলে, আগে বোধহয় একটু বেদের কথা বলে নেওয়া উচিত। ভূমিকা বাদ দিয়ে উপাখ্যান সুরু হতে পারে কি? সিঁড়ি বাদ দিয়ে দোতালা?

কবে কোথায় বেদ রচনার সূত্রপাত হয়েছিল এবং কবেই বা তা সমাপ্ত হয়েছিলো তার সন তারিখ এখনো তেমন করে কিছুই ঠিক করতে পারেন নি পণ্ডিতেরা। তবে এটুকু তাঁরা স্থির করেছেন, যে আর্য্যভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ হচ্ছে বেদ। হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে, হিমালয়ের তুষারস্নাত অরণ্যবন্ধুর ক্ষীণ পথ-রেখা ধরে নীলচক্ষু আর্য্যরা যখন ভারতে প্রবেশ করেন, অনেকে বলেন, তখনই তাঁদের কণ্ঠে ছিল বেদমন্ত্র।

অবশ্য এ নিয়ে আলোচনার সময় নেই আজকে। আমি এখন শুধু বেদের বর্তমান রূপ নিয়ে দুয়েকটা কথা বলব। কথিত আছে মহাভারতকার ব্যাসদেব 'বেদ' সম্পাদনা করে চার ভাগে বিভক্ত 'বেদে'র এই নূতন রূপ প্রবর্তন করেন। তার আগে কতকাল ধরে যে এর কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে কে তার হিসাব রাখে।

একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, চারে বেদ—অর্থাৎ বেদ চারটি—ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব। এই চার বেদের আবার চার ভাগ—মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্। প্রথমে মন্ত্র ভাগ অথবা সংহিতা। এতে আছে মন্ত্র অথবা শ্লোক। ছন্দে গাঁথা স্তব, দেবতার উদ্দেশে। কারা এই দেবতা? কোথায় তাদের বাস? তাদের বাস দ্যুলোকে। দ্যুঃ এবং দিব্, অর্থাৎ দীপ্তি। দিব্যরূপ তাঁরা দেবতা, জ্যোতিস্বরূপ।

"ঘনজটার ঘটা ঘনায় আঁধার আকাশ মাঝে"—সেই মেঘ ঢাকা কালো আকাশ হঠাৎ চিড় খেয়ে ফেটে গেল তীব্র বিদ্যুতে। পৃথিবীতে ছাই হয়ে পুড়ে গেল গাছ। বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলেন আর্য্যঋষি, বললেন—ইন্দ্রদেব হানলেন বজ্রের অভিশাপ মর্ত্য পৃথিবীতে।

সূর্য্য, চন্দ্র, জল, আকাশ, অগ্নি প্রভৃতি প্রকৃতির দিব্য-শক্তির বিচিত্র রূপের দিকে শ্রদ্ধা বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখতেন সে যুগের ঋষি-কবিরা, আর তাঁদের মুগ্ধ কণ্ঠ থেকে উচ্ছ্বসিত হোত স্তব অথবা মন্ত্র। এই মন্ত্রগুলিই সঙ্কলিত হয়েছে বেদের প্রথম ভাগ 'সংহিতা'য়।

এই সব মন্ত্রপাঠ করে তাঁরা দেবতাদের উদ্দেশে এক রকম পূজা করতেন—তার নাম যজ্ঞ। যজ্ঞে তাঁরা অর্ঘ্য দিতেন দেবতাকে, যা তাঁদের প্রিয়—ক্ষেতের শস্য, বনের ফল, হবি এবং সোমরস। তাঁদের এই অর্ঘ্য দেবতাদের কাছে বহন করে নিয়ে যেত অগ্নি। 'অগ্নয়ে স্বাহা' বলে তাঁরা অর্ঘ্য ঢেলে দিতেন হোমকুণ্ডের আগুনে। অগ্নি লেলিহান হোত, আর ধূম উঠত ঊর্দ্ধ দিকে। তাঁরা মনে করতেন, তাঁদের উপহার পৌঁছে গেল ঊর্দ্ধে দেবলোকে। যজ্ঞকালে ঐ বেদমন্ত্র তাঁরা কখনো পাঠ করতেন, কখনো গান করতেন নানাভাবে।

নানা যজ্ঞে নানা বিধি নিয়ম। এর প্রত্যেকটি খুঁটি-নাটি নিয়ম ছিল তাঁদের কাছে অবশ্য পালনীয়। এই সব যজ্ঞবিধি লেখা আছে 'বেদে'র 'ব্রাহ্মণ' ভাগে।

তোমরা জান, বেদের চার ভাগের মতন মানব জীবনকেও চার ভাগে ভাগ করেছিলেন সে যুগের ঋষিরা, চতুরাশ্রম—প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। আট বছর বয়স থেকে প্রায় চব্বিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে হোত। এই সময়টা ছিল তাঁদের শিক্ষার যুগ। এই বয়সে, কখনো তাঁরা আরাম বিলাস অথবা আলস্যে দিন যাপন করবার অনুমতি পেতেন না। গুরুগৃহে অধ্যয়ন এবং অধ্যবসায়ের কঠোর অনুশীলনে দিন কাটত।

পাঠ শেষ হলে গুরুর কাছ থেকে যাকে বলে সার্টি-ফিকেট পেতেন তাঁরা। তখন তাঁদের বলা হোত স্নাতক ব্রাহ্মণ। স্নাতক হয়ে গুরু দক্ষিণা দিয়ে গৃহে ফিরে এসে বিবাহ করে সংসারী হতেন। সেই গৃহীরা প্রায় পঁচিশ তিরিশ বছর ধরে সংসার ভোগ করতেন। ভোগের মধ্যেও অবশ্য

অনেকখানি ত্যাগের চর্চা হোত, ঐ যজ্ঞের দ্বারাই। যজ্ঞে বহু দান করতে হোত, বহু ব্রত নিয়ম পালন করতে হোত। এমনি করে ভোগকে তাঁরা সর্বদাই ত্যাগের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে ভালোবাসতেন। শুধু মাত্র ভোগকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতেন না। এই বিষয়েই উপদেশ আছে উপনিষদে—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, তাই তুমি ত্যাগের দ্বারাই ভোগ কর, শুধু ভোগের দ্বারা নয়। পাঁচজনকে দিয়ে-থুয়ে সুখ পাও তুমি—পাঁচজনকে খাইয়ে তৃপ্তি। শুধু নিজে খেয়ে দেয়ে ঢেকুর তুলতে তুলতে পেট ফাটিও না। জীবনের এই সংসারী অংশটাকে সে যুগে 'বেদে'র 'ব্রাহ্মণ' ভাগ সর্বদা পরিচালিত করত।

সংসারের শেষে, ৫০।৫৫ বছর বয়সে, পৌত্রমুখ দর্শন করে, পুত্রকে গৃহে-প্রতিষ্ঠিত করে গৃহী তাঁর সমস্ত ধন-দৌলত পরিত্যাগ করে কখনো সস্ত্রীক, কখনো বা একাকী বনে চলে যেতেন—

"হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি,
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড, সিংহাসন ভূমি।
ধরিতে দরিদ্র বেশ।"

বনে গিয়ে কুটীর রচনা করে, অধ্যয়ন, তপস্যা ও শাস্ত্রালোচনায় দিন কাটাতেন তাঁরা। কিন্তু তখনো অনেক সময়েই তাঁদের যজ্ঞ করার বাসনা থাকত। চির-দিন যাকে ধর্ম কার্য্য বলে জেনে এসেছেন, বনে এসেই তা থেকে বিরত হতে মন সায় দিত না। কিন্তু তপোবনে কোথায় পাবেন তাঁরা যজ্ঞের অত সহস্র রকম উপকরণ। ধন-জন সবই তো তাঁরা ফেলে এসেছেন। তাই তাঁরা ধ্যানে বসে মনে মনেই করতেন যজ্ঞক্রিয়া। যজ্ঞের এই মানস আয়োজন অথবা ধ্যানের কথা লেখা আছে বেদের আরণ্যক ভাগে।

'বেদে'র মধ্যে একটা আশ্চর্য্য পরিণতির আভাস আছে। প্রথমে মন্ত্রের উচ্ছ্বাস, পরে কর্মের বন্ধন, তার-পরে ত্যাগের দ্বারা ধ্যানের যোগ এবং সর্বশেষে উপনিষদ্।

আরণ্যক ধ্যান তপস্যার দ্বারা তপোবনের ঋষি যে জ্ঞান লাভ করেছিলেন আপন চিত্তে, তারই কথা বলেছেন তাঁরা উপনিষদে।

উপনিষদ্‌গুলির কিছু গদ্যে, কিছু বা মন্ত্রের মত ছোট ছোট শ্লোকে গাঁথা। এই শ্লোক বা গদ্য বচনগুলির মধ্যে জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে গভীর তত্ত্বালোচনা রয়েছে। তত্ত্বালোচনা বটে, কিন্তু ছন্দে, ভাবে ও মাধুর্য্যে, এই বচন-গুলি কোন কবিতার চেয়ে কম সরস নয়। এ শুধু দার্শনিক ব্যাখ্যা নয়। এ তাঁদের প্রত্যক্ষ দর্শন, এ তাঁদের উপলব্ধি। —তাই বেদকার ঋষি কবিদের এক নাম মন্ত্র-দ্রষ্টা। মন্ত্র-গুলি তাঁরা ভেবে ভেবে বানিয়ে বানিয়ে লিখতেন না। সেগুলি যেন তাঁদের মনের আয়নায় ছবির মত ফুটে উঠত, প্রত্যক্ষ করতেন তাদের রূপ।

কখনো চিত্তে আকুল হয়ে উঠেছে প্রশ্ন, বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বলে উঠেছেন—

"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং
মনঃ, কেন প্রাণঃ প্রথম প্রৈতি যুক্ত?"

কার ইচ্ছায় এই মন সর্বদা সচল হয়ে রয়েছে—কে এই প্রাণকে প্রথম পাঠাল। 'কার এষণায় এ মন সচল, কার প্রেষণায়—প্রাণ চঞ্চল—চোখ দেখে কার জন্যে?

কখনো হৃদয়ে ভাস্বর হয়ে উঠেছে সমাধান, বুঝতে পেরেছেন তিনি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত—তিনি অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান"—

অণু হতে অনীয়ান, মহৎ হোতে মহীয়ান,
গোপন গুহায় নিহিত রয়েছে জীবের আত্মপ্রাণ।

সেই আত্মাই তিনি, যাঁকে আমরা ভগবান বলে জানি। সেই আত্মাই প্রতি জীবের মধ্যে পরমানন্দরূপে বিরাজ করছেন। জীবের হৃদয়ে সেই আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মার আসন যদি না থাকত, তাহলে কেমন করে মানুষ শত দুঃখের মধ্যে থেকেও আবার হেসে-খেলে নিজের প্রাণকে উদ্ধার করত? উপনিষদ্ বলেছেন—জীবের অন্তরস্থিত এই আনন্দকে জ্ঞানের মধ্যে উপলব্ধি করাই জীবনের পরম উদ্দেশ্য।

আজ উপনিষদের কথা বলতে এসে শুধু তার একটু-খানি ভূমিকামাত্র করা গেল। কারণ এত অল্পে এই মহৎ গ্রন্থের কতটুকুই বা প্রকাশ করা যায়।

আজ শুধু এইটুকু জেনেই শেষ করি, যে উপনিষদ্

বলেছেন, সকল মানুষের অন্তরে লুকানো আছে ঈশ্বরের আনন্দ অমৃতরূপ। এমন কি পরম দুঃখীও তাঁর প্রসাদ থেকে বিচ্যুত নয়। দুঃখকে দুঃখ মনে করি বলেই সে বিকট মুখভঙ্গী করে আমাদের ভয় দেখায়।

সুখ, দুঃখ এই উভয়কে মিলিয়ে এবং তাদের অতিক্রম করেও বিরাজ করছেন আনন্দস্বরূপ। তাঁকেই জানতে হবে সমগ্র জীবনের কর্মে এবং জ্ঞানে।

তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম।

সত্যি কি তুমি চাও?

'বৈভব'

সত্যি কি তুমি চাও পৃথিবী আরও ভালো হোক?
শোন বলি কি করতে হবে!
তোমার নিজের কর্মগুলির ওপর দৃষ্টি রাখো
সেগুলি যেন সর্বদা সত্য ও সরল হয়।
স্বার্থ প্রেরণা মন থেকে মুছে ফেল।
চিন্তা তোমার হোক স্বচ্ছ ও উন্নত।
তুমি যেখানে আছ সেখানে একটি
ছোট্ট স্বর্গ রচনা তুমি করতে পারো।

*

সত্যি তুমি চাও মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার বাড়ুক?
ভাল, তুমিই তার আরম্ভ করনা!
তোমার মনের ছেঁড়া খাতাতেই
জ্ঞান সঞ্চয় শুরু করে দাও না।
একটি পাতাও বাজে কথায় নষ্ট কোরো না।
তুমি যদি মানুষকে জ্ঞান দিতে চাও
তার আগে তোমাকে জ্ঞান লাভ করতে হবে।
তুমি কি সত্যি চাও মানুষ সুখী হোক?
তা হ'লে প্রতিদিন মনে রেখো—
চলার পথে তোমাকেই ছড়াতে হবে
দয়া ও প্রীতির বীজ!
প্রায়ই দেখা যায় বহু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য
নির্ভর করে একজনের বদান্যতার ওপর—
অজ্ঞাত কোন একটি হাত চারাগাছ লাগিয়ে যায়
কত দিন ধরে কত লোক তার ফল খায়
কত দিন ধরে কত যাত্রী তার ছায়ায় বসে বিশ্রাম করে।

কাজল-প্রদীপ

শ্রীআশাবরী দেবী বি-এ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

গহন বনের মধ্যে দিনের পর দিন কাটতে থাকে। রোজ ওরা উদয়-অস্ত দেখে সূর্যের—পূবে পশ্চিমে। তমসা ঢাকা রাতের পর যখন পূবাকাশ রাঙা হ'য়ে ওঠে—বনের মাঝে কতো শোভাই না ওরা দেখে। সারাদিন গহন বনে ঘোরা আর রাতে কোনও বিরাট বনস্পতিতে আশ্রয়—এইভাবে থাকেন দুই কুমার। মাঝে মাঝে বীরত্বের পরীক্ষাও হয় হিংস্র জন্তুর আক্রমণে। কতো দিন কেটে গেলো—না পাওয়া গেলো রৈবতকের সন্ধান—না পাওয়া গেলো কোনোদিন একটু লোকালয়ের সূত্র। দানবের আস্তানার দিকে কাজল প্রদীপ আর যান নি—রাতের গভীরে অনেক সময় তার বিরাট শরীরের পেষণে মড় মড় করে বনতল দলিত করে যাবার শব্দ পাওয়া যেতো—কখনো বা তার গর্জন ভেসে আসতো দূর হ'তে।

সেদিন ভোরে ওরা গহন বনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ ঘেঁষে এগোতে শুরু করলো। চলতে চলতে এক সময় প্রদীপ থমকে দাঁড়ালো—"যুবরাজ—কাজল! ছাখো ওই দিকে যেন বন হাল্কা হয়ে এসেছে আর নিবিড় বনের ছাউনী হঠাৎ ফাঁক হয়ে কেমন উজ্জ্বল নীল আকাশ দেখা যায়—ছাখো!" "হাঁ প্রদীপ! একটা ধূসরাভ রেখাও মাঝখানে লক্ষ্য কোরে ছাখো—বোধহয় পাহাড়-শ্রেণী।"

শ্রান্ত দেহ মন নিয়ে দুই বন্ধু আবার এগোতে থাকেন। রাতে আবার আশ্রয় অজানা বনস্পতির স্নেহছায়ে। ভোরে প্রদীপ গেলো ফলের সন্ধানে—কাজল পাখী-শিকার করেছে—এক ঘন ঝোপের আড়ালে আগুন ধরিয়েছে। একটু পরেই প্রদীপ ছুটে এলো ফিরে—তার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। কাজল অবাক হয়ে চেয়ে দেখে প্রদীপের কাঁধে অপূর্ব সুন্দর একটি টিয়াপাখী—নতুন আমপাতায় যে রং থাকে—তারই আমেজ তার গায়ে। গলায় লাল কালো টানা।

"কথা কইচে! কাজল এ কথা কইচে! আর ছাখো পায়েতে এর সোনার শিকল জড়ানো—"

"পারলো না—পারলো না! রত্না—কেউ পারলো না!" প্রদীপের কথায় বাধা দিয়ে টিয়ার তীক্ষ্ণ মধুর কণ্ঠ বনভূমি সচকিত করে তোলে।

"তাহলে কাছেই লোকালয় আছে প্রদীপ—" কাজল দাঁড়িয়ে উঠে

বলে—"কিন্তু এ টিয়া বলে কি প্রদীপ? রত্না কে? কি পারলো না কেউ?"

দুজনে আবার এগোতে শুরু করেন সমুখে। কোথাও বনের শেষ পাওয়া যায় না। রাতে দুজনে টিয়া নিয়ে গাছে আশ্রয় নেন। "ঠিক হয়েচে!" এক সময় চিন্তামগ্ন কাজল বলে ওঠে।

"কি ঠিক হলো কুমার?" প্রদীপ চকিত হয়ে ওঠে।

"কাল আমরা নদীর বুকে পাড়ি জমাবো।"

কয়েকটি শুকনো ডাল লতা দিয়ে বেঁধে দুই বন্ধু অজানা নদীর ঢেউ বেয়ে চললো। সঙ্গে রইলো নতুন সাথী টিয়া।

ক্রমাগত পায়ে চলেও যে-দূরের পাহাড়কে ওরা কাছে আনতে পারেনি—এবার কখন যে তারই কাছ ঘেঁষে ওরা চলেছে জানতেও সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো—জ্যোৎস্না ঝিকিমিকি নদীর বুকে উঁচু-নীচু নীলাভ ধূসরাভ পাহাড়ের সারি কেমন মুখ দেখছে—দুই বন্ধু দেখেন অবাক হয়ে। হঠাৎ ওদের চমক ভাঙলো তীব্রভাবে ভেলা বাঁক নেওয়াতে।

"কুমার, কুমার! আমাদের এখুনি ভেলা ছেড়ে দিতে হবে, নইলে নদী উৎস-মুখে আবর্তের মাঝে আমরা ভেলা শুদ্ধ তলিয়ে যাবো।" জল গভীর হলেও তীর খুব দূরে নয়। কাজল প্রদীপ দুইজনে বহু কষ্টে সাঁতরে কূলে এসে ওঠে। অবসন্ন শ্রান্ত দেহে সিক্ত বসনে দুই বন্ধু ধীরে ধীরে বর্শা হাতে পায়ে-চলা পাহাড়ে পথে চলতে শুরু করেন। প্রদীপের কাঁধে নূতন সঙ্গীটী টিয়া বসে থাকে, আর মাঝে মাঝে বলে—"পারলো না, কেউ পারলো না—রত্না, রত্না!"

গিরিপথ দিয়ে চলতে চলতে দুই বন্ধু লক্ষ্য করেন পাহাড়ের সে পায়েচলা-পথ বড়ো অস্পষ্ট—জায়গায়-জায়গায় মুছে গিয়েছে যেন। যেন বহুদিন আগে বহু লোক, বহু অশ্বারোহী এই পথে এসেছিলো বা গিয়েছিলো। পাহাড়ে-পথের শেষে সমতল-ভূমিতে দুই বন্ধু যখন এসে পৌছুলেন—তখন রাত গাঢ় হয়ে এসেছে। চাঁদের পরিষ্কার আলোয় দূরে দিগন্ত-বিস্তীর্ণ শস্যের ক্ষেত হাওয়ায় দোলে দেখা যায়। আরও দূরে দেখা যায়—কোন অচিন রাজ্যের মানুষের ঘরে ঘরে জ্বালা অনেক আলো।

সংশয়ভরা হৃদয়ে দুই বন্ধু নগর-দ্বার পার হয়ে সমুখেই যে কুটীর দেখেন তারই দুয়ারে গিয়ে দাঁড়ান। একটি কিশোর বেরিয়ে আসে তাড়াতাড়ি বলে "ওগো তোমরা কে?"

"ঘুরে-বেড়ানো ছেলে আমরা।" আত্মপরিচয়-গোপন করে দুই বন্ধু বলেন। দীর্ঘ বনবাসে রূপে ও বেশে কোনো চিহ্নই নেই পরিচয়ের। তবু দীর্ঘ সুঠাম দেহ তরুণ পথিকের পানে চেয়ে পথচারীরা জমে।

"ভাই সব! মহর্ষির দুই বরপুত্র কি আজ এলেন এই অভাগা দেশকে ত্রাণ কোরতে?" কেউ বলে। "যেন ভস্মে-ঢাকা আগুন দুই নবীন পথিক!" আর একজন বলে।

"যুগল সূর্যের মতো এমন দুই ছেলে ছেড়ে এদের মা কোন্ প্রাণে আছে গো!" এক বৃদ্ধা বলে ওঠে। কিশোর ছেলেটি ওদের হাত ধরে ছোট্ট কুটীরের ভিতরে এনে বসায়। তার বৃদ্ধা মা বাতাস করতে থাকেন দুই শ্রান্ত পথিককে। ফল মূল, পানীয়, অন্নব্যঞ্জন ও শয্যা দিয়ে মধুরতম আন্তরিক যত্নে কিশোর ও তার মা দীর্ঘ দিনের সকল ক্লান্তি মুছে দেয় দুই বন্ধুর। কিশোরটির নাম বাদল। দুই বন্ধুকে বাতাস দেয় আর নানা কাহিনী শোনাতে থাকে সে। এ সোনার রাজ্যের নামও সোনারপুরী। প্রকৃতি দেবী তাঁর দান দু'হাত উপচে দিয়েছেন এ রাজ্যে—অভাব অনটন—দুখ শোক কেউ জানতো না এই অপূর্ব পুরীতে। সোনার পুরীর চারিদিকে জরীর আঁচলের মতো রূপবতী নদী—আর নীল পাহাড় গড়েছে এর মাথার মুকুট।......তারপর সুখ শান্তির দিন কবে শেষ হয়েছে—বাদল তখন ছোট। নীল পাহাড়ের গহ্বর-বাসী এক প্রচণ্ড দানব দেবতার অভিশাপের মতো সোনারপুরীর প্রান্তে এসে সব ছারখার করে দিয়ে যায়—যায় কতো প্রাণ আর শস্য-সামগ্রী। এ অত্যাচার বারে বারেই চলতে থাকে। তাই......" বলে আবেগরুদ্ধ স্বরে বাদল থামে। তারপর বলে "তাই এ দেশের দেবতার মতো রাজা চন্দ্রচূড় বিপুল সেনা বাহিনী নিয়ে ঐ নীল পাহাড়ের অজানা বনে দানবের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে, স্বয়ং যান। কিন্তু বনে ঢোকবার মুখে প্রথম সন্ধ্যাতেই ক্ষিপ্ত, প্রলয়ঙ্কর মূর্তি গরিলা-দানব মহারাজাকে আক্রমণ কোরে বজ্র নিষ্পেষণে নিহত করে। আর সেই বিরাট বাহিনীরও হয়েছিলো তার হাতে শোচনীয় পরিণতি। যে গুটিকতক অশ্বারোহী পালিয়ে এসেছিলো তাদের মুখে সেই ভয়ঙ্কর গরিলার সেদিনের তাণ্ডব নৃত্যের কথা এখনও শোনা যায়। গরিলা-দানবের প্রতিহিংসা-তৃষ্ণা এখনও তৃপ্ত হয়নি—মাঝে মাঝে ঐ নীল পাহাড়ের ওপর হ'তে তার হিংস্র গর্জন শোনা যায়—হয় তো আবার কোনদিন এসে হানা দেবে সোনার পুরীতে। মহারাণী শোকে জীর্ণ, তবু তিনিই পরিচালনা করছেন রাজ্যভার আর ঘোষণা করে দিয়েছেন—যে বীর মারবেন দেশের শত্রু তাঁর স্বামীহন্তা এই দানবকে, তিনিই পাবেন রাজকন্যা রত্নাবলীকে, আর সোনার-পুরীর রাজমুকুট!"

"রত্না, রত্না! কেউ পারলো না রত্না!" রত্নাবলীর নাম শুনে সুমিষ্ট উচ্চকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে টিয়া। "একি! এ যে রাণীমার টিয়া—আমি আগে বুঝতে পারিনি তো! একে কোথায় পেলে ভাই?"

"ওকে আমরা নীল পাহাড়ের বন হতে পেয়েচি বাদল!"

"সত্যি বলো ভাই—তাহলে কি মহর্ষিই তোমাদের পাঠিয়েছেন? তিনি বলেছিলেন—দুটি কুমার আসবেন নীল পাহাড়ের বন পার হয়ে আমাদের ত্রাণ করতে!" বিস্ময়ে আশায় বাদলের চোখে আবার জল এসে পড়ে। রাণীমার ঘোষণা নিয়ে দেশে দেশে পায়রা গিয়েছিল পত্র নিয়ে। কতো বীর, রাজা, রাজপুত্র এসে প্রাণ হারালেন গরিলার বজ্র নিষ্পেষণে। এক এক করে এক একটী বীরের মৃত্যু সংবাদ আসে আর মহারাণী বলে ওঠেন "পারলো না কেউ পারলো না—রত্না, রত্না।" সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়েন জ্ঞান হারিয়ে। সেই কথাই তাঁর সাথী এই টিয়া বলচে—একে কাল সভায় নিয়ে যেয়ো ভাই—কতো খুশী হবেন।" দুই বন্ধু বিচিত্র ভাবনায় আর উত্তেজনায় স্তব্ধ হয়ে শোনেন বাদলের কথা। একসময় প্রদীপ ধীরে বলেন—"মহর্ষির কথা বলো বাদল!"

"তিনি এক মহা তপস্বী—সারা ভারত তীর্থ পর্যটন কোরে বেড়াতে বেড়াতে কৃপা কোরে আমাদের এই আতঙ্ক-অবশ সোনারপুরীতে এসে আশার বাণী দিয়ে গেছেন যে—দুই বীর আসছেন তোমাদের রক্ষা কোরতে। সেও তো আশায় আশায় দুই বৎসর কেটে গেলো—বলো না ভাই—তোমরাই কি সেই ?'

দুই বন্ধুর মনে সে রাতে কতো যে চিন্তার তুফান ওঠে কে না জানে। কাঞ্চনপুরীর মহাসাধক কুলগুরু এই দানব-ত্রাসিত পুরীতে এসে কি তাদেরই আগমনী জানিয়ে গেছেন ? এই দুস্তর বনভ্রমণের কথা তারা তো স্বপ্নেও কোনদিন কল্পনা করেনি—হাঁ তবে এই অজানাকে জয় করার নেশা তাদের গুরুর আশ্বাসেই রঙীণ হয়ে উঠেছিলো। দারুণ বনবাসে দুইজনের অবস্থা ভবঘুরের মতো—ক্লান্ত শীর্ণ। কতোদিন কাঞ্চনপুরী ছাড়া তারা—কি দুঃখের আঁধারেই ফেলে এসেছেন দুই কুমার কাঞ্চনপুরীকে।

রাত শেষ হয়ে আসে। ভাবতে ভাবতে কাজল কখন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে—সহসা ঘুম ভাঙে প্রদীপের করস্পর্শে!

"বন্ধু, সখা, যুবরাজ!" ভাঙা গলায় প্রদীপ বলে—আমায় তুমি একা যেতে দাও মহারাণীর সভায়। আমার হাতে পিতার দেওয়া অজেয় অস্ত্র—আমি একা যাবো সেই দানবের সন্ধানে নীল পাহাড়ের গহ্বর-মুখে। যদি তাকে হত কোরতে পারি—তোমায় উপহার দোবো কাজল সেই দানবের হত্যা-কলঙ্কিত হাত দুটো। তুমি রাজকন্যা ও রাজ্য পাবে। আর……যদি আমি মরি তার বজ্র-নিষ্পেষণে……তাহলে—তুমি তো জানো একটি ভাগ্যহতেরই জীবন্মুক্তি লাভ হবে……!"

প্রদীপের দুই হাত রাজপুত্র চেপে ধরেন—"না বন্ধু! তোমার দেওয়া রত্নাবলী আমি নেবো না—সে তোমাকেই নিতে হবে জেনো! তাহলে তো সোনার-পুরীও হবে তোমার। রত্না ও রাজমুকুট যদি পাও—তাহলে তো চিত্রাও হবে তোমারই!" কাজলের কণ্ঠ শেষকালে একটু কেঁপে যায় আর প্রদীপের মনে ওঠে ঝড়! বীর্যদৃপ্ত ক্ষত্রিয় তরুণ—তার হাতে শাণিত অজেয় অস্ত্র—দানব মারতে পারবে না? রত্না তো উপলক্ষ্য। সোনারপুরী ও রত্না! রাজমুকুট পেলেই চিত্রার গাঁথা বরণ-মালা দুলবে প্রদীপের গলে। শৈশব-কৈশোরের সহচরীকে সে যে একটি বৎসর ধরে দ্বিযামা রাত্রি স্নান শেষে দেবীর চরণে ফোটাপদ্ম অর্পণ কোরে ব্রত সমাপন কোরেছিলো জীবনে ফিরে পাবার জন্যে!

আর কোনো কথা হয় না। পরদিন বাদল ওদের সঙ্গে করে নিয়ে যায় মহারাণী সুদেবীর রাজসভায়। রাণীমার মহিমান্বিত রূপে বেদনা মিশে মিশে পাণ্ডুর হয়েছে দেহের লাবণ্য। কুমারদের দুই হাত ধরে স্বাগত জানালেন। বাঁধন ছেঁড়া হারানো টিয়াকে পেয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়লো তাঁর—"আমার কথা বলার সাথী একে যে আবার ফিরে পাবো—তা' স্বপ্নেও ভাবিনি?" "পারলো না, পারলো না—রত্না কেউ পারলো না—" হঠাৎ টিয়া তীব্র মধুর স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে। "হ্যাঁ!" ম্লান হেসে মহারাণী বলেন "আজও আমার স্বামী-হন্তা সোনারপুরীর আতঙ্ক গরিলা-দানবকে কেউ মারতে পারেনি। রত্না-মাকে আর এই আমার মহারাজার রাজমুকুটটীকে কবে সেই বীর শত্রুবধ কোরে এসে নেবেন আমার হাত হ'তে!" সুদেবীর দুই চোখ হতে অঝরে অশ্রু ঝরে।

দুই বন্ধু মহাসমাদরে আশ্রয় পেলেন রাজপ্রাসাদে। নীরবে বসে থাকেন দুই কুমার। যুবরাজ একসময় বলেন "প্রদীপ আমি যাবো!" "আমিও!" প্রদীপ বলে ওঠেন। দুই বন্ধু মেতে ওঠেন রাজহন্তাকে নাশ করবার সংকল্পে।

প্রভাতে মহারাণীর দরবারে আরজি পেশ করলেন দুইবন্ধু। ছল-ছল করে উঠলো রাণীমার চোখ দুটি—"দেখেই বুঝেছিলেম তোমারই সেই হঠাৎ আসা মহাতপস্বীর দুই বরপুত্র তোমাদের আসার জন্যে প্রতিদিন প্রতি প্রহরে দেবী বিশালাক্ষীর চরণে প্রার্থনা জানিয়েছি—কুমারেরা! কিন্তু আমার যে মন মানছে না বৎস—কোন মায়ের এমন ধনকে আমি পাঠাবো সেই মহাভয়ঙ্করের মুখে?" "দেবি! আপনি ভয় পাবেন না—আমরা ফিরে আসবো!" দুই বন্ধু স্মিতমুখে বলে।

* * * * মহারাণীর দেওয়া সকল অস্ত্রশস্ত্র, হাতীঘোড়া, লোকজন, সব ফিরিয়ে দিয়ে নীল পাহাড়ের বাঁকে কুমার দুইজন ঘোড়ার পিঠে মিলিয়ে গেলেন। রাখালিয়া বাদল ছিলো রাজপুত্রের ঘোড়ার পিঠে—তারই হাতে দুটি ঘোড়ারই রাশ দিয়ে দুই বন্ধু বনপ্রান্তে নেমে পড়লেন। বাদলের কাছে বিদায় নিয়ে দুইকুমার নদীতীরের ঘন বন-শ্রেণী ধরে চলে গেলেন। বাদল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ফিরে এলো কুটিরে।

নদীর উৎসের কাছে এসে যুবরাজ থামলেন—অটলস্বরে বলেন প্রদীপকে—"আজ আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা প্রদীপ! তোমার আমার দুজনারই মনে সংশয়ের ঝড় উঠেছে। আমাদের মনের ডোর এই যে আলগা হয়ে এসেচে—জানি না আর এর গ্রন্থি বাঁধা যাবে কি না! এই নদী-উৎস হতে আমরা আলাদা আলাদা পথে যাবো।"

……দীর্ঘ দিন আর রাত্রি, ক্লান্ত নিঃসঙ্গ যুবরাজ নীল পাহাড়ের বনে অবসন্ন দেহ টেনে দানবের সন্ধানে ঘুরছেন। প্রথম প্রথম বড়ো একা লাগতো রাজপুত্রের—নিজের পায়ের শব্দে নিজেই চমকে উঠতেন। ……ঘোর অন্ধকার রাত্রে গরিলার গহ্বরের শিয়রে ডানধারের দেওয়ালের পাথরের খাঁজের আড়ালে লুকিয়ে রাজপুত্র অতন্দ্র-চোখের সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে দাঁড়িয়ে আছেন—যদি শত্রুর দেখা পান—যদি অভীষ্ট সিদ্ধ হয়?

…ক্রমে গভীর রাত নিথর নিশ্চুপ হয়ে ঘনিয়ে আসে—কখন ক্লান্ত চোখের পাতায় তন্দ্রার পরশ লেগেছিলো রাজপুত্র জানেন না—হঠাৎ কিসের একটা শব্দে ঘুমের ছোঁয়াটুকু চকিতে টুটে গেলো! কৈ কিছু তো না—তেমনি নিথর বন আতঙ্কে থমথম করচে! কিন্তু সম্বিৎ ফিরে আসতেই যুবরাজ স্পষ্ট অনুভব করেন বনের দক্ষিণ

কোণ হ'তে একটা জমাট অন্ধকারের বিশাল পাহাড় বার হয়ে এলো। তারপরেই সে সমস্ত বনটা ভাঙতে ভাঙতে গহ্বরের দিকে দ্রুত এগিয়ে এলো। দুটো ভয়াল সবুজ চোখ আর দুই সারি হিংস্র দাঁত ঝক-ঝক করে জ্বলছে! গরিলার লোমশ গায়ের দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠলো। পলকে কর্তব্য স্থির করে রাজপুত্র অদ্ভুত কুশলী হাতে বিপুল শক্তিতে বর্শা হানলেন......একটা আকাশ-ভাঙা যন্ত্রণাভরা গর্জন তুলে জানোয়ারটা হুমকি খেয়ে দুই করাল-নখর ভরা বিশাল হাত বাড়িয়ে লাফিয়ে পড়লো—ত্রস্ত রাজপুত্র পেছু হটতে যাবেন এমন সময়ে অবাক বিস্ময়ে দেখলেন দানবের পর্বতাকার দেহটা যেন হঠাৎ অনড় হয়ে লুটিয়ে পড়লো। বিস্মিত যুবরাজ গহ্বরতলে নামতে যেতেই সুড়ঙ্গের ওপাশ হ'তে কার আবছায়া মূর্তি এগিয়ে এলো।

—"প্রদীপ!"

—"কাজল-যুবরাজ!" দুজনেই বিস্ময়ে অভিভূত...গরিলার বুকে পাশাপাশি দুটি বর্শা গাঁথা—যুগ্মশক্তিতে ওরা আজ রাজহন্তা দানবের প্রাণ নিয়েছে।

পরস্পরের হাত দুজনের হাতে বেঁধে বিচিত্র ভাবনায় দুই সখা কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে থাকেন।

......অবচেতনায় দুটি প্রশ্ন অহরহ অন্তর নিপীড়িত করতে লাগলো—রত্নাবলী! রাজমুকুট—চিত্রা! কার হবে পুরস্কার—বিজয়-তিলক?

সারা সোনারপুরী ভেঙ্গে পড়েছে—আজ সবার মুখেই একই কথা—কার হবে পুরস্কার? দুই বীর যুগল হাতে নিধন করেছেন সোনার-পুরীর শত্রুকে। কার হবে রত্নাবলী...রাজমুকুট?

বিরাট দানব-দেহ সভাপ্রাঙ্গণের একপাশে নীত হয়েছে। হর্ষে-বিষাদে আজ ভেঙে পড়েছেন মহারাণী। পরম সমাদরে দুই হাতে দুই বীরের হাত ধরে মহারাণী বলেন, "দেবতার বরপুত্র তোমরা বৎস! মিলিত-শক্তিতে তোমরা আজ উদ্ধার করলে অভাগা পুরীকে। দুই বীরকেই ন্যায্য পুরস্কার দানে ধন্য হবে সোনারপুরী—ঘোষণা আমার তিলমাত্র মিথ্যা হবেনা।...কিন্তু..." মহারাণী থামেন—বিশাল সভা রুদ্ধশ্বাস হয়ে শুনছে—বুঝি বা নিশ্বাসের শব্দও শোনা যাবে সেখানে!

"কিন্তু—না কিন্তু নয়। আজ হতে সাতদিন পরে হবে সকল সমাধান! পুরবাসী! রাজকন্যার শুভ বিবাহ আর নবীন রাজার অভিষেকের আয়োজন করুন!" স্থিরস্বরে ঘোষণা করে দিয়ে মহারাণী সভাভঙ্গ করেন।

সেই সাতটি দিন কি দুঃসহ ব্যবধানই এনে দেয় দুই তরুণের মধ্যে। রত্নাবলী ও সোনারপুরী! বাদলের মুখে রাজপুত্র নিশিদিন শোনেন রাজকুমারীর কথা। ত্রিভুবনে তাঁর তুলনা হয় না। সোনার মধ্যে যে বর্ণ-বিন্যাস তারই আমেজ এই সোনারপুরীর সোনার বরণী রাজ-কুমারীর দেহে! বিদ্যুতের বুকের দীপ্তিটুকু যেন স্পর্শ করা হয়েছে তাঁর লাবণ্য-বৃদ্ধিতে আর কালবৈশাখীর মেঘকেও হার মানায় রত্নাবলীর কেশ। প্রদীপ বেদনা-মলিন মুখে একা বসে ভাবেন—রাজমুকুট আর চিত্রা!

দীর্ঘ সাতদিনও যায় চলে। এলো অবশেষে সেই মহাক্ষণ! রাজ-কন্যা রত্নাবলীর পরিণয় আজ এই বসন্ত-পূর্ণিমা-রজনীতে আর কাল প্রত্যুষের মঙ্গল-মুহূর্তে হবে নবীন রাজার রাজ্যাভিষেক! বহুদিন পর সারা নগরী উৎসব-সজ্জায় সেজে আজ মাতামাতি করে। পথে পথে চন্দন-ছড়া লাজবৃষ্টি হচ্ছে? মঙ্গল-ধ্বনিতে আকাশ ভরা!

সন্ধ্যায় দুই বীর আসেন রাজকুমারীর বিবাহ-সভায়। সুসজ্জিত বিরাট সভামণ্ডপে দিকে দিকে মণিময় দীপ জ্বলে। সোনার পাদ-পীঠের ওপর বরের শূন্য সিংহাসনটি ঝলমল করে হীরা পান্নার দীপ্তিতে। পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করেন—শুভলগ্ন উপস্থিত। ধীরপদে মহারাণী এগিয়ে আসেন—ইঙ্গিত মাত্রে পলকে সরে যায় সিংহাসনের ডানপাশে হাতির দাঁতের জালির আবরণ—নিমেষে সভা যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেলো! দুইটি অপরূপ তরুণী মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে একই ভঙ্গী, একই বর্ণ, একই মুখ—একতিল ভেদ নেই!

"রত্নাবলীকে পাবেন দুজন বীরের একজন! স্বর্ণময়ী মাকে যিনি লাভ কোরবেন তিনি হবেন কাল এ রাজ্যের রাজ-সিংহাসনে অভি-ষিক্ত আর রত্নাবলীকে যিনি লাভ কোরবেন তিনি আর কিছুই পাবেন না?" মহারাণীর শান্ত কণ্ঠস্বরে সভা আবার সম্বিৎ ফিরে পায়।

মহারাণীর ইঙ্গিতে দুইজন প্রাচীন নাগরিক দুই কুমারের চোখ বেঁধে দেন নিশ্ছিদ্র বস্ত্রখণ্ড দিয়ে। সোনা সিঁড়ী দিয়ে কুমারেরা প্রতিমার পানে যান সোনার পাদপীঠ দিয়ে। রাজপুত্র আনন্দোজ্জ্বল মুখে তাঁর চোখের ঢাকা খুলে ফেলেন—তাঁর হাত দুটীর মধ্যে ধরা পড়েছে অতি সুন্দর কোমল একখানি হাত জীবনের স্পন্দনে তাপময়। আর প্রদীপ অপূর্ব আনন্দ-বিস্ময়ে দেখেন তিনি পাণিগ্রহণ করেছেন তুহিন-শীতল স্বর্ণময়ী প্রতিমাকে চোখে তার নীলকান্ত-মণি, নখে প্রবালের রক্তরাগ আর পদ্মরাগ-মণিতে গড়া অপরূপ ঠোঁট দুটি—সবই রত্না-বলীর উপমা! অভিভূত বীর প্রণাম করেন যুক্তকরে সেই দেবী মূর্তিকে!

সোনারপুরীর রাজমুকুট সিংহাসনে অভিষিক্ত প্রদীপকুমারের চন্দন-পরা ললাটে স্বহস্তে মহারাণী পরিয়ে দেন! রত্নাবলী ও যুবরাজ সহাস্যে সানন্দে রাজ-তিলক এঁকে দেন সলজ্জ প্রদীপের কপালে। রাণী-মা সোনারপুরীর রাজার সঙ্গে কাঞ্চনপুরীর রাজকুমারীর বিবাহপ্রস্তাব নিয়ে দূত পাঠিয়েছেন।

আনন্দে অধীর সারা কাঞ্চনপুরী নীল পাহাড়ের বন ভেঙ্গে বিরাট রাজপথ তৈরী করছে গানের তালে। সোনারপুরীর আত্মহারা উৎসবের ছোঁয়াচ কাঞ্চনপুরীতেও এসে লেগেছে।

ফুলবৃষ্টিতে আকীর্ণ রাজপথ দিয়ে যুবরাজ কাঞ্চনপুরীতে এলেন বধূ নিয়ে। মহারাণী সুদেবী বরবেশী প্রদীপকুমারের ঘোড়ার সঙ্গে আসেন শিবিকায়। সুগন্ধ হাজার দীপের আলোয় কাজলপ্রদীপের বিজয়ের প্রসাদে সমুজ্জ্বল ললাটে আশীষ-দূর্বা দিয়ে কুলপুরোহিত স্মিত-মুখে বলেন—"আজ আমার সকল আরাধন সফল হলো।"

দ্বারকার দ্বারে

ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

আরব সাগর উপকূলে পশ্চিম ভারতের শেষ সীমারেখার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। প্রত্যহ ভোর বেলা ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ-পত্র বহন করে নিয়ে আসে নানা সংবাদ। তার মধ্যে যুদ্ধ অথবা যুদ্ধের আশঙ্কার খবরটাই সবচেয়ে অস্বস্তিকর। রেলপথ, ব্যোমপথ, জলপথ, সব নিয়ে মানুষ আজ যুদ্ধ করছে। মনে হয় কোলকাতার বাইরে গেলে কিছুদিনের জন্য মন একটু মুক্তির আনন্দ পাবে। কিন্তু তাও কি উপায় আছে? রাজস্থান, গুজরাট, সৌরাষ্ট্রের পথে সঙ্গী মানুষদের মনেও সেই অশান্তি। গুজরাতীরা চাইছে মহাগুজরাট প্রতিষ্ঠা করতে, মারাঠীরা চাইছে স্বতন্ত্র মহারাষ্ট্র; কিন্তু কারো আবেদন নিবেদনে কর্ণপাত না করে ১লা নভেম্বর প্রতিষ্ঠা হবে (এখন প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে) দ্বিভাষিক বোম্বাই রাজ্য। কাজেই গুজরাট আর মহারাষ্ট্রের মানুষের মনে ঘোর অশান্তি। সর্বত্র অশান্তি। দ্বারকায় এসে জগৎ-মন্দিরে রণছোড়জীর বিগ্রহের পানে চেয়ে মনে পড়ে গেল সেই মহাভারতের ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রর কথা। সেই যুদ্ধ সর্বকালে সর্বদেশে সৃষ্টির পশ্চাতে ছুটে বেড়াচ্ছে। এর থেকে মানুষের আর মুক্তি নেই।

রাজকোট থেকে দ্বারকাধাম ১১৫ মাইল তিন ঘণ্টার পথ আমরা অতিক্রম করলাম ১০ ঘণ্টায়। সৌরাষ্ট্র এতবড় দেশ হলেও তার রেল-পথ বড় দুর্বল। সেই দিল্লীর পর থেকে সুরু হয়েছে মিটার গেজ লাইন। তার গতি ও বিরতির মধ্যে কোনও নিয়মানুবর্তিতা নেই। যখন খুশী চলে, যতক্ষণ খুশী থামে। আর গতিবেগও অত্যন্ত শ্লথ। সৌরাষ্ট্রের রেলপথে এই ব্যাপার চরমে পৌঁচেছে। মানুষের মূল্যবান সময়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে রেল কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া খুবই প্রয়োজন। সৌরাষ্ট্র দেশটার তিনদিক আরব সাগরে বেষ্টিত। তাই এর নাম কাথিয়াওয়াড় উপদ্বীপ। জলৈশ্বর্যে ভরা দেশ হলেও এর মাটিতে সবুজের চিহ্ন খুব কমই চোখে পড়ে। পথের দুধারে শুধু চীনাবাদামের ক্ষেত, আর কাঁটাবন। এরই আড়ালে কোথাও দলবেঁধে কোথাও একেলা ঘুরে বেড়াচ্ছে ভারী সুন্দর সুন্দর ময়ূর আর ময়ূরী। চিল্কার মত প্রকাণ্ড একটা হ্রদের পরে গোমতী নদীর সেতুর উপর দিয়ে আমরা চলেছি। এমন সময় ছন্দা, পাপড়ী সোল্লাসে ঘোষণা করল সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। সত্যি নীল আকাশের প্রান্তে তখন দেখা যাচ্ছে আরব সাগরের অসীম সুনীল বিস্তৃতি। ভাদুড়ী বললেন—ওটা সমুদ্রের খাত, আসল সমুদ্র নয়। কিন্তু মেয়েরা ওঁকে বোঝাবেই ওটা আসল সমুদ্র, খাত নয়। যোজন খানেক দূর হলেও সাগর পার্শ্বস্থ বালুময় স্থলভূমি দিয়ে আমরা বেলা প্রায় তিনটের সময় দ্বারকা ধামে এসে পৌঁছালুম। তোতাদ্রি মঠে আমাদের আস্তানা ঠিক ছিল।

সুন্দর সিমেন্ট বাঁধানো পরিষ্কার পথ। ষ্টেশন থেকে একেবারে শ্রীকৃষ্ণের মন্দির পর্যন্ত চলে গেছে। পথিপার্শ্বে গাছপালা বিশেষ না থাকলেও দ্বারকাকে সমুদ্র দিয়েছে অখণ্ড স্নিগ্ধতা, আর নিবিড় প্রশান্তি। আবহাওয়ায় এখানে উষ্ণভাব মোটেই নেই। সবচেয়ে মজা এখানে কাছাকাছি দুটা কূপ, তার একটার জল লোনা, অপরটার মিঠে। একই মাটী, অথচ জলের কি তারতম্য।

ষ্টেশন আর জগৎ-মন্দিরের ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে তোতাদ্রি মঠ। অন্যান্য হোটেল, আশ্রম, ধর্মশালা প্রভৃতি হয় ষ্টেশনের কাছে, নাহয় মন্দিরের কাছে অবস্থিত। তাই এই মঠের চতুর্দিকে বিশেষ লোকালয় না থাকায় ছিল তপোবনসুলভ মুক্ত প্রান্তরের শব্দহীন নিভৃত। মঠের স্বামীজি মহারাজ তখন দুর্গাপূজার জন্য জামনগরে ছিলেন। ষ্টেশনে ভাদুড়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেছিলেন যে দু একদিনের মধ্যে তিনি দ্বারকায় আসছেন। আমরা মঠে পৌঁছাতে রামবাবু আমাদের যথেষ্ট আপ্যায়িত করলেন। এখানে যাত্রীরা ভিন্ন সকলেই সন্ন্যাসী। পরিবেশটা

ভেট দ্বারকার মন্দির

বড় ভালো লাগল। দীর্ঘ পথ পরিক্রমান্তে একটা পরিচ্ছন্ন আস্তানা পেয়ে শ্রান্ত মন কথা কয়ে উঠল—"দেশে দেশে মোর ঘর আছে"।

আমাদের ইচ্ছা ছিল স্নানাহার করে সন্ধ্যার পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে যাওয়ার—কিন্তু মঠে সেদিন যাত্রীর অত্যধিক ভীড়ের জন্য কুয়োতলা খালি হতে অনেক দেরী হওয়াতে মন্দিরে যেতে আমাদের রাত্রি হয়ে গেল। সেদিন ছিল শারদ শুক্লা একাদশী। শিউলী ফুলী জ্যোৎস্নায় পথ প্রান্তর যেন কথা কইছে। অজানা পথ, অচেনা মানুষ, আমরা চলেছি। পথে লোক নেই বললেই হয়।—দূরে দেখা যাচ্ছে দ্বারকার বিখ্যাত সিমেন্ট ফ্যাক্টরী। ইন্দ্রপুরীর মত ঝলমল করছে তার বৈদ্যুতিক আলোক মালা। তার চলন্ত যন্ত্রের গর্জনে রাত্রির দ্বারকাপুরী প্রাণময় হয়ে উঠেছে। প্রশস্ত পথ, একটা গেছে ওখারোডের দিকে, অপরটা মন্দিরে। দোকান বাজারের মধ্যে দিয়ে ঘুরে একসময় আমরা এসে

পৌঁছালুম দ্বারকানাথের দুয়ারে। মন্দিরের প্রধান তোরণটার নাম স্বর্গদ্বার; আর গর্ভগৃহে প্রবেশদ্বারের নাম মোক্ষ দ্বার। স্বর্গদ্বারের পরেই, শিব পার্বতী, সত্যনারায়ণ ও লক্ষ্মীর মন্দির আছে। সেই সকল মন্দিরের চত্বরে সোপান রাজিতে বিক্রী হচ্ছে শুধু ফুল আর তুলসী পাতার মালা। মন্দির তখন লোকারণ্য। সবেমাত্র সন্ধ্যারতি শেষ হয়ে স্তোত্রপাঠ হচ্ছে। অতিকষ্টে সেই জনসমুদ্র অবগাহন করে গর্ভগৃহের সামনে উপস্থিত হয়ে আমরা দেখলুম সম্রাট বেশে শ্রীকৃষ্ণকে। মহামূল্যবান বেশভূষা ও রত্নৈশ্বর্যের মাঝেও স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করলুম নবঘননীল মুখকমল ও সুচারু চরণ দুটী। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ রাজত্ব করেছিলেন, তাই এখানে তিনি ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে দণ্ডায়মান—পীতবসনা বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ নন। এখানে তিনি রাজবেশধারী রণছোড়জী দ্বারকানাথ। আমার সামান্য তুলসীর মালাটী তাঁর কণ্ঠে দুলতে দেখে ভারী আনন্দ হোল। বন্দনা শেষে গর্ভগৃহের দ্বার বন্ধ হয়ে গেল। আবার দশমিনিট পরে খোলা হবে। ক্রমশঃ ভীড় কমে আসতে লাগল। আমরা মর্মর চত্বরে বসে রইলুম আবার মন্দির দ্বার মুক্ত হওয়ার আশায়। কারুকার্য খচিত সুন্দর রজত অর্গলটার পানে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হোল, চিতোরের রাজলক্ষ্মী কৃষ্ণ-প্রেমিকা মীরাবাঈ-এর কথা। আরাধ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের জন্য স্বামী সংসার পিছনে ফেলে পথে বেরিয়েছেন মীরা। আমার গিরিধারী তুমি কোথায়?" ঘুরতে ঘুরতে তিনি এলেন বৃন্দাবন ধামে, রূপ গোস্বামীর আশ্রম প্রাঙ্গণে। দীক্ষা নেবেন মীরা। গোঁসাইঠাকুর বললেন, তিনি কোনও স্ত্রীলোকের মুখদর্শন করেন না, তার দীক্ষা ত দূরের কথা। মীরা তাঁর অভিমত মেনে নিতে রাজী নন। ফলে উভয়ে নিমজ্জিত হলেন তুমুল তর্কসমুদ্রে। অবশেষে ভক্তির কাছে যুক্তি পরাজিত হোল। রূপগোস্বামী মীরাকে দীক্ষা দিলেন। নাম মন্ত্রে মীরা উন্মাদিনী। কিন্তু তাতেওত তাঁকে পাওয়া যায় না। তখন মীরা আদেশ পেলেন—"দ্বারকায় গেলে আমায় পাবে" দ্বারকা কতদূর? অবশেষে একদিন মীরা এলেন দ্বারকা। অগণিত যাত্রীর সঙ্গে তিনিও চলেছেন মন্দিরে। রণছোড়জী যে তাঁকে ডেকেছেন? এমন সময় ঘটে গেল এক অলৌকিক কাণ্ড। মীরা এসে যেই দাঁড়িয়েছেন কৃষ্ণ বিগ্রহের সামনে, অমনি তাঁকে নিয়ে আপনা থেকে গর্ভগৃহের দ্বার অর্গলরুদ্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর আবার যখন অর্গলমুক্ত হোল, তখন দেখা গেল পূজা বেদীকায় শুধু পড়ে রয়েছে মীরার পরিধেয় বস্ত্রখানি; মীরা তাঁর গিরিধারীলালের সঙ্গে লীন হয়ে গেছেন। এই সেই দ্বারকাভূমি, এই সেই মীরার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ। সৃষ্টির প্রবাহ বয়ে চলেছে অখণ্ড ধারায়। ভাঙনের মধ্যে দিয়ে জন্মলাভ করছে নিত্য নতুন নতুন প্রাণ। কিন্তু মানুষের প্রেম চির-শাশ্বত, কোনও যুগে কোনও কালে তার মৃত্যু নেই।

গোমতী নদী যেখানে গিয়ে আরব সাগরে মিশেছে ঠিক তারই বালু সৈকতে দ্বারকানাথের জগৎ-মন্দির। মথুরা থেকে চলে এসে শ্রীকৃষ্ণ এখানে রাজত্ব করেছিলেন। অতঃপর তাঁর পৌত্র বজ্রনাভ এইস্থানে তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সুদীর্ঘ পাঁচ হাজার বছরের অতীত ঐতিহ্য মানুষের বংশানুক্রমিকতার মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে অখণ্ড ধারায়। দ্বারকানাথ নামের উৎপত্তি হোল দ্বার—অর্থাৎ দুয়ার, নাথ—প্রভু; দ্বার—কা—নাথ। অর্থাৎ ভগবানের রাজ্যের দুয়ার এটা—মন্দিরের প্রাচীর গাত্রের শিল্প ও ভাস্কর্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সুন্দর ও ভাবময়। এই দেউলের সাতটি তলা আছে এবং সুউচ্চ চূড়ার শীর্ষদেশে একটি উজ্জ্বল পতাকা উড্ডীয়মান। স্বর্গদ্বারের মুখে একটি গণেশের মন্দির আছে। অনেকে মনে করেন এই মন্দির শিবের নামে উৎসর্গীকৃত। মন্দিরের একাংশে আর একটা মন্দিরে শঙ্করাচার্য ও তাঁর গুরুদেবের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তৎকালীন বৌদ্ধ ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য শঙ্করাচার্য ভারতের চতুর্দিকে যে চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তারমধ্যে পশ্চিম প্রান্তের মঠ গোবর্দ্ধন ছিল এইস্থানে। উত্তর ভারতের বদ্রীনাথের পথে যোশী মঠ; দক্ষিণ ভারতের রামেশ্বরমে শৃঙ্গারি মঠ, পূর্ব ভারতের পুরী জগন্নাথ ক্ষেত্রে পুরুষোত্তম মঠ, আর পশ্চিম ভারতের দ্বারকা ধামে এই গোবর্দ্ধন মঠ শঙ্করাচার্যের অবিস্মরণীয় কীর্তি।

রুক্মিণী আর ভদ্রকালী মন্দিরে যাওয়ার জন্য আমরা বেলা থাকতে বেরিয়ে পড়লুম। ওখারোতে সমুদ্র খাতের ধারে রুক্মিণী মন্দির। দুর্বাশাঋষি কর্তৃক শাপগ্রস্ত হয়ে রুক্মিণীকে কিছুদিনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের বিরহযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। মন্দিরটি বেশ সুন্দর। ভিতরে রত্ন চক্ষু বিশিষ্ট রুক্মিণী মাতার মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। দুই আনা করে পয়সা দক্ষিণা দিয়ে রুক্মিণীর সীমন্তে সিঁদূর দিলুম—ছন্দা পাপড়ী ও আমি। এখানে একটি চমৎকার মিঠে জলের কূপ আছে। মন্দিরের নিভৃত অলিন্দে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে আমরা রওনা হলুম, ভদ্রকালীর মন্দিরের পথে। ভদ্রকালী বা অম্বিকা মাতার মন্দির জগৎ-মন্দির থেকে আরও কিছুদূরে। এই মন্দিরে অনেক সাধু সন্ন্যাসী রয়েছেন। পূজা আরাধনা স্তোত্রপাঠ করছেন। এখানে অম্বিকা মায়ের ও ভদ্রকালীর মন্দির আছে। ভদ্রকালীর মন্দিরে, আমাদের কালীঘাটের দক্ষিণাকালীর একটি ছবি রয়েছে। এখানে দেবীর শ্রীঅঙ্গ, জরির পোষাকে সুন্দরভাবে সজ্জিত। মন্দির চত্বরে বসে আছি আমরা। নানা মানুষের বহমান স্রোতের মধ্যে দিয়ে দেখছি সৌখীন কাথিয়াওয়াড়-বাসীদের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য প্রিয়তা। এদের মেয়েরা সূচি শিল্পের কাজে বেশ পারদর্শিণী। মাথায় জলের কলস বহনের সামান্য খড়ের বিঁড়াটি পর্যন্ত সুন্দর পুঁতির কাজ করা। ছন্দা পাপড়ী অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে, বাচ্ছা মেয়েদের রেশমী ঘাগরার কারুকার্য দেখে। এদের গ্রাম্য পুরুষেরা কর্ণে কণ্ঠে অলঙ্কার পরে। আর এদের পোষাকও বেশ বিচিত্র ও বর্ণময়। মেয়েদের চোখের সুর্মা ও করবীর দোলানী ভুলিয়ে দেয় এদের দারিদ্র্যের কথা। গোমতী নদীর ওপারে লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দির। এখানে একদা পঞ্চপাণ্ডব এসেছিলেন। তাই এই ঘাটের নাম পাণ্ডব ঘাট। চারিদিকে অথৈ সমুদ্রের বালুবেলার মধ্যে পাঁচটি মিষ্টি জলের কূপ আছে। কূপগুলি বহুদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকলেও তারমধ্যে নির্মল জল টল টল করছে। এই কূপ নাকি পঞ্চ পাণ্ডব প্রতিষ্ঠা করে-

ছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে কিছুক্ষণ বসে পূজারীর কথকতা শুনে এপারে ফিরে এলুম ফেরী-নৌকায়। নৌকার মাঝি আমায় অনেকগুলো খুব সুন্দর ঝিনুক দিল। তার প্রীতির দান চিরদিন মনে থাকবে।
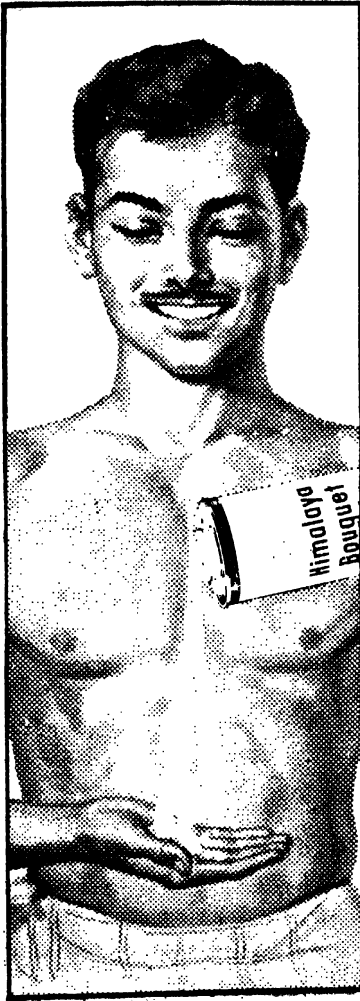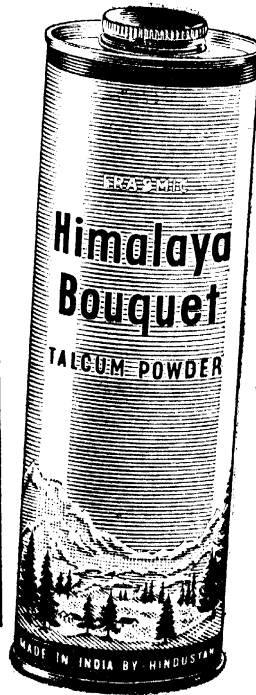
সন্ধ্যা হয়নি তখনও। আমরা এসে দাঁড়ালুম সমুদ্রের ধারে। এখানে গোমতী নদী এসে সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছে। গোমতীর হিল্লোলিত গৈরিক জলধারা, সমুদ্রের তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ নীল জলের সঙ্গে ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে বেশ বোঝা যাচ্ছে। চমৎকার প্রাণময় পরিস্থিতি। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলে মনে হয় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বুঝি ওই রকম ঘুরপাক খাচ্ছে মহাশূন্যের দিকে চেয়ে। জীবনের সঙ্গে মহাজীবনের চলেছে তুমুল সংঘর্ষ অনন্ত কাল ধরে। এর শেষ কোথায়, সাগর কি জানে? এখানকার প্রশস্ত বেলাভূমি নানা জাতের ঝিনুকে আচ্ছন্ন। বালু আর ঝিনুক মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। তার মধ্যে প্রবালের মত একরকম বিচিত্র ধরণের পাথর এখানে পাওয়া যায়। বর্ণে-গঠনে সেগুলি এত মনোরম যে কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা নেবো—তা ঠিক করা শক্ত হয়ে ওঠে। সাগর সেঁচা এই অমূল্য রত্নগুলি কি বস্তু, তার যথার্থতা নির্দ্ধারণ করতে সকলে অস্থির। ছন্দা বলে, "এগুলি শ্বেত প্রবাল,"—পাপড়ী বলে, "শুকনো সমুদ্রের ফেনা"—ভাদুড়ী বলেন, "কোনও সামুদ্রিক প্রাণীর ফসিল"—যাই হোক সমুদ্র যখন স্থল ভূমিকে উপহার দিয়েছে, তখন সে বস্তু মহার্ঘ।

পশ্চিম দিগন্তে তখন সূর্য্যাস্ত হচ্ছে। রক্তিম প্রবাল আলোয় নীল সাগরকে অপরূপ দেখাচ্ছে।—সেই অপরূপ সমুদ্রের অতলে, তিল, তিল করে ডুবে যাচ্ছে একটা প্রকাণ্ড রক্ত শতদল। সঙ্গে সঙ্গে আদিগন্ত ছেয়ে নেমে এল শৈবাল শ্যাম গাঢ় অন্ধকার। ওদিকে সমুদ্রে তখন জোয়ার আসছে। উত্তাল তরঙ্গগুলি তীরে এসে গম্ভীরভাবে আছড়ে পড়ছে।

তার মস্তকের হীরক চূড়া ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে যাচ্ছে।...তবুও উদ্দাম বেগে ক্রমশঃ সে তীরের উপর দিকে এগিয়ে আসছে। যাত্রীরা ধীরে ধীরে সব চলে যাচ্ছে। সাগর সৈকত প্রায় জনশূন্য। আমরা বসে বসে দেখছি সাগরের এই সাধনাতীত লীলা। প্রচণ্ড গর্জনে ঢেউগুলি যেন কানে কানে বলছে—"তোমরা যেওনা, আর একটু থাকো।"

ওদিকে অদূরে গোমতী নদীর তীরে নিমগাছের মাথায় শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ উঠেছে। রূপালী জ্যোৎস্নায় সৈকতের বালুকণাগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঠিক মনে হচ্ছিল কার যেন চোখের জল।

সেই পথে হেঁটে চলেছি আমরা মুক্ত পথের মুষ্টিমেয় পথিক।

দিল্লী সিমলাতে যেমন কালী বাড়ী, দ্বারকাতে সেইরকম তোতাদ্রি মঠ বিদেশী বাঙ্গালীদের একটা বিশিষ্ট আশ্রয়স্থল। এখানকার সন্ন্যাসীরা রামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত। এঁদের যত্ন আতিথেয়তা সত্যিই প্রশংসনীয়। স্বামীজী বাঙ্গালী হলেও তাঁকে দেখে মনে হবে দক্ষিণ ভারতীয়। তাঁর শিষ্য শিষ্যা সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে। মঠের মধ্যে একটা বিষ্ণুমন্দির আছে। সেখানে বিষ্ণুর সঙ্গে, লক্ষ্মী, রাধা, রুক্মিণী ও সত্যভামার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। রোজ আরতির সময় মন্দিরের প্রতিটী পাষাণ ফলক মনে হোত যেন প্রাণময় হয়ে উঠেছে। ঘৃত প্রদীপের কম্পমান উজ্জ্বল শিখায় থর থর করে কাঁপতো প্রত্যেকটী মানুষের প্রাণের প্রার্থনা।

মঠের ভবন-সংলগ্ন প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণটী নানা প্রকার তরুরাজিতে বেশ স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন। একটা নিমকুঞ্জের ছায়ায় দুটী পাষাণ বেদী আছে। বিশ্রামের জন্য। এই স্থানটী অদ্ভুত শান্তিময়। এখানে বসে স্বামীজি করতাল সহযোগে হরিনাম গান করেন। সময় পেলেই আমরা এখানে এসে বসতুম। দৃশ্য চক্ষুতে দেখলে এমন কিছুই নয়। শুধু প্রকাণ্ড কয়েকটী নিমগাছ সতেজ সবুজ শাখা পত্রে পরস্পরে একত্রিত হয়ে—আকাশকে প্রায় আবৃত করে রেখেছে। তারই নীচে লাল প্রস্তরে বাঁধানো দুটী আসন। অদূরে আর একটী প্রকাণ্ড কাঠাসন। সেটী স্বামীজির স্বর্গগত গুরুদেবের। নীচে পশ্চিম ভারতের রুক্ষ মাটীর পথ। স্থানের কোনও বিশেষত্ব নেই। তথাপি কুঞ্জটীতে প্রবেশ করলেই মনে হবে অন্য পৃথিবীতে এসেছি। হিমালয়ের বনভূমিতে ও ঠিক এই ধরণের মনোময়তা ছড়িয়ে আছে।

তথায় যাবার দিন শেষ রাত্রে জলের জন্য কূপের কাছে যাবার সময় আমি স্পষ্ট দেখলুম—সেই বেদীতে কে যেন বসে রয়েছে। আমি ভীষণভাবে চমকে দাঁড়িয়ে ভাবলুম এত রাত্রে কে এখানে? যাই ভাদুড়ীকে সঙ্গে ডেকে নিয়ে আসি। কিন্তু সেখান থেকে কুয়ো যতটা পথ আমাদের ঘর বোধহয় তার চেয়ে একটু দূর ছিল। আর সময় হাতে বেশী ছিল না বলে আমি ভগবানের নাম করে মাটীর দিকে চেয়ে সে পথ পার হয়ে গেলুম। ফেরার সময় দূর থেকে অস্তম্লান চন্দ্রালোকে দেখলুম সেখানে কেউ নেই।

একথা আমি তখন কাউকে বলিনি। ওই স্থানটি ভাদুড়ীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কোলকাতায় ফেরার দিন ভোর বেলা আমরা নিমকুঞ্জে বসেছিলুম। দূরে ঝাউবনের মাথায় সূর্য্যোদয় হচ্ছে। বাতাসে ভেসে আসছে ময়ুর ময়ুরীর নীরস আলাপন। আশ্রমের সন্ন্যাসীরা সাধন ভজনে মগ্ন। ভাদুড়ী বললেন, "তাঁকে স্বামিজী বলেছেন,—এই নিমকুঞ্জে রাত্রির খুব নির্জন প্রহরে অশরীরী মহাত্মারা এসে অবস্থান করেন। কথাটী শুনে আমার মনের মধ্যে কেমন যেন করে উঠল। পরশু রাত্রে, তবে কি আমি কোনও মহাপুরুষকে দেখেছি? এই আশ্রমে একজন মৌনী সন্ন্যাসী আছেন। বিষ্ণু মন্দিরের পূজার কাজ তিনি সমস্ত করেন। আমাকেও একদিন তিনি গৃহস্থালির কাজে খুব সাহায্য করেছেন। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত হয় তিনি ভাগবত পাঠ করেন, নয়, বেহালা বাজান। বয়সে তরুণ হলেও এমন একনিষ্ঠ সাধক আমি খুব কম দেখেছি।

ভোর চারটে। ভাদুড়ী আমাদের ঘুম থেকে ডাকলেন। উঠে বসে দেখলুম চারিদিকে গভীর অন্ধকার। শুক্লা রাতের চাঁদ অস্তোন্মুখ। আশ্রমের গেটে একটী ইলেকট্রিক আলো সারারাত্রি জ্বলে। দ্বারকার রাজপথেও আলোর কোনও বালাই নেই। (সৌরাষ্ট্রে ভোর হয় সাতটায়, আর সন্ধ্যাও হয় সাতটায়) এই অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে কুয়োর পাড়ে গিয়ে আমাদের হাত মুখ ধুয়ে তথায় যাবার জন্য তৈরী হতে হবে। মনে অদম্য উৎসাহ, দুরান্তে পাড়ি দেবার। কাজেই ভয় ভাবনা সেখানে

কিছুই থাকে না। ভাদুড়ী মুখ ধুয়ে ফিরে এলে, আমি গেলুম। আমি ফিরে এসে ছন্দা পাপড়ীকে নিয়ে উনি গেলেন। আমাদের সমস্তই গোছানো ছিল, কাজেই পথে বেরোতে বেশী দেরী হোল না।

মন্দিরের কাছে একটা জায়গার নাম তিনবত্তি চৌরাস্তা। সেখানে বাস স্ট্যাণ্ড। শেষ রাত্রির ঠাণ্ডা বাতাসে ঘুমন্ত দ্বারকাপুরীর মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। জনহীন নিঝুম চৌরাস্তা। চারিদিকে চারিটি পথ, আর মাঝখানে প্রকাণ্ড এক স্তম্ভে তিনটী বাতি জ্বলছে। বাস ড্রাইভার আমাদের আসতে বলেছিল সাড়ে পাঁচটার সময়। ছয়টায় নাকি বাস ছাড়ে। আমরা এসে ভূতের মত দাঁড়িয়েছি, কেউ কোথাও নেই। এমন সময় একটি চা এবং একটী পানের দোকানের দ্বার মুক্ত হোল। পানওয়ালার সঙ্গে ভাদুড়ীর বন্ধুত্ব হতে আমরা রাজপথে বসার জন্য একটি বড় কাঠাসন পেলুম। কিছুক্ষণ পরে এক গুজরাতী বালক চায়ের দোকানের চা নিয়ে এল। বসে বসে কাথিয়াওয়ারি-চা খাচ্ছি আর আকাশে আলো আধারির খেলা দেখছি, এমন সময় বাস এল। সঙ্গে সঙ্গে এক দুই তিন করে বহু যাত্রী। সকলেই স্থানীয়। চলেছে ওখা বন্দরে নানা কাজে। স্থান সংগ্রহ নিয়ে সে তুমুল হট্টগোল। তবে একটা নিয়ম আছে। নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশী যাত্রী বাসে উঠতে পারবে না। এখান থেকে আর একটি বাস গোপীতলাও হয়ে ওখা বন্দরে যায়। গোপীতলাওর আর এক নাম মায়াসুর কুণ্ড। দ্বারকা থেকে তেয়ো মাইল দূরে একটি সরোবর আছে। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নির্দেশে গোপিনীদের মোক্ষ প্রদান করেছিলেন। দ্বারকা থেকে ওখা প্রায় ২০ মাইল পথ। ওখা রোড ধরে আমাদের বাস ছুটে চলেছে। ক্রমশঃ সিমেন্ট বাঁধানো পথ শেষ হয়ে সুরু হোল সুরকী ঢালা পথ। দুপথের মুক্ত প্রান্তর শেষ হয়ে ঝিলমিল করতে লাগল সমুদ্রের খাঁড়ি। প্রকৃতির সে এক বিহ্বলারূপ। আকাশ মাটি সমস্ত জলে জলময়। জলের উপর উড়ে বেড়াচ্ছে বহু বিচিত্র বর্ণের বলাকা পাঁতি। এক সময়ে দূরে দেখা গেল আরব সাগরের নীলজল রাশি। ধারে ধারে সাগর এগিয়ে এল। আমরা চলেছি তার তীরভূমি দিয়ে। অবশেষে ওখা বন্দরে এসে বাস থামল। যেদিকে তাকাও শুধু উত্তাল তরঙ্গ-মুখর নীল জল। অদূরে ওখা রেল station। ছন্দা পাপড়ী আমাদের বোঝাচ্ছে ভারতবর্ষের মানচিত্রের যেখানটা আঁকতে ওদের কষ্ট হয় আমরা সেখানে এসে দাঁড়িয়েছি। ওখা বেশ বসতিপূর্ণ স্থান এবং বেশ বড় সুন্দর। করাচী, বম্বে, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে এই বন্দর থেকে জাহাজ বোঝাই মাল আমদানি রপ্তানি হয়। বসেরা থেকে কাল একটি খেজুরের জাহাজ এসেছে। এখানে একটি বেশ বড় হাসপাতাল আছে। টাটা ও বার্মাসেল কোম্পানীর প্রকাণ্ড গুদাম আছে। দূরে সাগর বক্ষে দেখা যাচ্ছে একটি দ্বীপ। ওই হোল বেট দ্বারকা। এর অপর নাম বীতশঙ্খধর। ছোট জাহাজের মত প্রকাণ্ড নৌকা ঘাটে বাঁধা রয়েছে। সঙ্কীর্ণ ঢালু পাথরের সিঁড়ি বেয়ে নেমে নৌকায় চড়তে হবে। এখানে যাত্রীদের মধ্যে হৈ হৈ নেই। সকলেই সন্তর্পণে নৌকায় উঠে স্থির হয়ে বসল। ভয়ে কি ভক্তিতে ঠিক বোঝা যায় না।

অকূল সমুদ্রে পাল তুলে দিয়ে নৌকা চলেছে। আমাদের চারিধারে তরঙ্গ পুঞ্জ—অসীম জলরাশি টলমল করছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হয় এই বুঝি নৌকা কাত হয়ে গেল। এমন সময় পাপড়ী দেখল, জলের মধ্যে একটা কালো মাথা। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য যাত্রীরাও চিৎকার করে উঠল জানোয়ার, জানোয়ার। সকলে সবিস্ময়ে দেখল, প্রচণ্ড শব্দে জলে প্রকাণ্ড আবর্ত সৃষ্টি করে কালো মাথা জানোয়ার জলের তলে তলিয়ে গেল। ধীরে ধীরে নৌকা এসে ভিড়ল ভেট দ্বারকা দ্বীপের কূলে। যথারীতি ট্যাক্স দিয়ে আমরা দ্বীপের মাটী স্পর্শ করলুম।

বীতশঙ্খধর, চলতি নাম বেটদ্বারকা অত্যন্ত পুরানো সহর। স্থানীয় মানুষদের জীবন যাত্রায় বিগত শতাব্দীর ইতিহাস লেখা রয়েছে। অসমতল বন্ধুর পথ সামান্য অগ্রসর হয়েই মন্দির দেখা গেল। সাবেকী

দ্বারকানাথের জগত মন্দির ফটো : মধুছন্দা ভাদুড়ী

প্রকাণ্ড সিংহদ্বার পেরিয়ে আমরা মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলুম। তখন সবেমাত্র আরতি সুরু হয়েছে। এখানেও দেখলুম রাজবেশধারী শ্রীকৃষ্ণকে। ক্ষমাসুন্দর দুটী চক্ষে অপার্থিব আলো। ঠাকুরের পূজাবেদীতে ঘৃতপ্রদীপ জ্বলছে। তার স্তিমিত আলোকে, ধূপ ধুনা ও পুষ্পের সুগন্ধে স্থানটি আরও রমনীয় হয়ে উঠেছে। মন্দিরের চতুষ্পার্শে দেবকী, বাসুদেব, অম্বিকাদেবী, ইত্যাদি আরও দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তারপাশে আর একটি মস্তবড় মন্দির। তাতে শ্রীকৃষ্ণের চার রাণী, রুক্মিনী, সত্যভামা, রাধা ও জাম্বুবতীর সুন্দর সালঙ্কারা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। বহুকালের প্রাচীন মন্দির। ভবন প্রাকারের ইষ্টক পঞ্জরে, আর অশ্বত্থ পাদপের কাণ্ডে, মূলে ও দীর্ঘ জটাজুটে, তারই স্বাক্ষর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে! একটি প্রকাণ্ড দালানে বহু জন সমাগম। ব্রতকথা হচ্ছে। তার মধ্যে একটি বেদীতে বসে আছেন একজন রমনীয় কান্তি

মানুষ। দেহের সর্বাঙ্গে তাঁর বর্ণময় পোষাক ও অলঙ্কারাদি থাকলেও, মুখখানি অপরূপ লাবণ্যে ঢল ঢল করলেও, তারমধ্যে কোথায় যেন একটা পৌরুষ ভাব ছিল। আমাদের অবস্থা বুঝতে পেরে সঙ্গী পাণ্ডা মহারাজ বললে, উনি রণছোড়জীর মন্দিরের প্রধান পূজারী। উনি সখী বেশে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন। তাই দেহে নারী বেশ ধারণ করেন। আসলে উনি পুরুষ। দেখে মনে হোল তিনি প্রকৃতই সমস্ত দেহ মন প্রাণ শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করেছেন।

এখানে শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল উৎসবের মঞ্চটি ভারী সুন্দর ও সুসজ্জিত। তার অদূরে মঞ্চ বেদী ইত্যাদিতে সুরক্ষিত আর একটি দালান রয়েছে। পাঁচ হাজার বছর আগে এইস্থানে একদিন সুদাম সখা প্রিয় সখা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। তাই অনেক স্থানীয় ব্যক্তি বলেন ভেট দ্বারকা নাম হয়েছে এইজন্য। ভেট অর্থে সাক্ষাৎ। ভেট দ্বারকা। অর্থাৎ দ্বারকানাথের সঙ্গে এইখানে সখা সুদামের সাক্ষাৎ হয়েছিল। ভাগবতে আছে, জরাসন্ধের আক্রমণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রাণীদের মহল এই দ্বীপে স্থানান্তরিত করেছিলেন। সর্বযুগ কালাতীতের শ্রেষ্ঠ সমরবিদ্ শ্রীকৃষ্ণর কোনও প্রচণ্ড শক্তির জন্য মনে ত্রাস ছিল বলে মনে হয় না। আমার মনে হোল সমস্ত রাজাদের বিশ্রামের জন্য যেমন জলমহল, থাকে, সেই রকম এই বেট দ্বারকাও ছিল শ্রীকৃষ্ণর, জলমহল, রাজঅন্তঃপুর। বেট দ্বারকা দ্বীপটি আয়তনে ২৪ বর্গমাইল। এর জনসংখ্যা প্রায় ৪০০ চারশত। সকলেই গুজরাতী। একটি গুজরাতী বিদ্যালয় আছে। সেখানে মেয়ে খুব কমই পড়ে। আরব সাগর চারদিক থেকে এই দ্বীপটিকে বেষ্টন করে রেখেছে। তাই এর বালুমাটিতে সবুজের বিশেষ চিহ্ন দেখা যায় না। মন্দিরের সামনে শুধু প্রকাণ্ড একটি নিমগাছ আছে। এখানের তুলসীগাছগুলি বেশ বড়। সবুজ শাখা পল্লবে সমাচ্ছন্ন শিউলী গাছের মত মনে হয়। এখানকার সমুদ্রে কেউ স্নান করল না। অদূরে একটি সরোবর আছে, সমস্ত যাত্রীরা গেল সেখানে স্নান করতে। সন্তোষ নামে একটি ছেলের হোটেল বাড়ীতে তার সযত্ন আপ্যায়িত আহার্য গ্রহণ করে মন্দিরে রাজভোগের পর্ব দর্শন করে আমরা ফিরে এলুম ঘাটে। সেখানে নৌকা বাঁধা রয়েছে। যাত্রীরা সকলে এলেই নোঙর খুলবে। মাঝিরা নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করছে। পশ্চিম ভারতের শেষ সীমারেখার তটপ্রান্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের চতুর্দিকে উত্তাল আরব সমুদ্র তরঙ্গাঘাতে আকুলি বিকুলি করছে। মাথার উপরে অনন্ত আকাশে অসীম ঔদার্য। নিকটে কোনও জনমানবের সাড়াশব্দ নেই। এই ঘাটের অদূরে একটী নতুন জেটি তৈরী হচ্ছে; সেখানে মেহনতী মানুষরা কাজ করছে, গল্প করছে। কিন্তু সাগর গর্জনের জন্য তার কিছুই শোনা যাচ্ছে না এখানে। আমরা শুধু শুনছি বায়ুতে ঝিনুকে প্রতিহত হয়ে সাগর তরঙ্গের নিভৃত মর্মকথা। এরই মধ্যে অস্পষ্টে উচ্চারিত হচ্ছে মহাভারতের শাশ্বত জীবন বাণী। গীতার অন্তর্নিহিত সত্যটুকু এইখানেই সার্থকরূপে সমুদ্ভাসিত। সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে উপলব্ধি করলুম ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যাহ্ন সূর্য স্বর্ণাভ কিরণ সম্পাতে বন্দনা করছে অনন্ত কালের জীবনাচার্য এই মহাসমুদ্রকে।

বসন্ত

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

জীবনের অপরাহ্নে আসিলে আবার,
হে বসন্ত, সাথে লয়ে পুষ্পের সম্ভার
পলাশে শিমূলে রাঙা কাননে কাননে।
আমার স্বাগত লহো। কবে সে যৌবনে
এমনি আসিতে তুমি! বাতাবীর ফুল
সেদিনও সৌগন্ধ্যে চিত্ত করিত আকুল!
আগন্তুক বিহঙ্গেরা আসি কোথা হোতে
এমনই নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গীতের স্রোতে
উদ্‌ভ্রান্ত করিত হিয়া! গেছে সে যৌবন!
তার সাথে যায়নি কি সেদিনের মন?
তবু আজও, হে বসন্ত, অনুভব করি
মর্ম্মের গভীরে তুমি বাজাও বাঁশরী।
যতদিন পৃথিবীতে জীবন আমার—
বর্ষে বর্ষে গেঁথে যাবো তব কণ্ঠহার!

(পূর্বানুবৃত্তি)

অবশ্য লোচনের প্রতি প্রশ্ন তুলে ধরার আগে একটু ভণিতা ক'রে নিল অভয়। ঘোষ মশায়ের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যে তার ধৃষ্টতা, তা' সে জানে। তিনি যেন নিজগুণে ক্ষমা করেন। অর্বাচীনের প্রলাপে যেন বিরক্ত না হন। ছেলের রূপ্‌চানিতে বাপ ভগবানের মত হাসেন।

লোচন ঘোষ হেসে বললে, 'গাইতে এসে শেষে পরের ছেলের বাপ হ'তে হবে ?' সবাইকে শুনিয়ে বলা নয়। তা' হলে হাসির রোল প'ড়ে যেত। কোন্ একজন চেঁচিয়ে বলল, রূপ্‌চানিটা শুরু হোক, তা' পরে বোঝা যাবে ছেলে এখনো রূপচায়, না, বচন দেয়।

অভয় ধুয়া ধরল,

একবার চেয়ে দেখ নিজের দিকে
আপনার অঙ্গ
মহাকালের কত রঙ্গ
ও ভাই, হায় দিন চলে যায়
কান পেতে কালের কথা শোন আপন বুকে।

ধূমাবতী আর দিতি অদিতির কথা, শুধুই কথা। পুরাণের কথা। কিন্তু সেকাল তো আর কোনদিন ফিরে আসবে না। কাল নিরবধি। নিয়তি মহাকালেরই চোখের মণি। সে বিধান ঠেকানো যায় না। সে সুন্দর, অপরূপ। কিন্তু পাষাণ কঠিন। ধন্বন্তরির মান রাখতে, শমনের হাত-ধরা প্রাণীও একবার বুঝি থমকে দাঁড়িয়ে যায়। আর কাল ? তার বুকে মাথা খুঁড়লেও সে এক পলক দাঁড়াবে না। তাই, সেই জন্যেই বলেছি, আপনার অঙ্গ, মহাকালের কত রঙ্গ। একবার আপনারা চেয়ে দেখেন নিজেদের দিকে।

আজ যে-নয়নের বানে পীরিতের আগুন ঝরে
কাল সে নয়নে কেন ছানি পড়ে গো।
যে-চাঁদ মুখে আজ রূপের হাট
কালে তা' করলে লোপাট
কাহারো কলমে কালো রেখা পড়ে গো।
মুকুতারো ঝিকিমিকি মুকুতারো দাঁতে
হায় সে মুকুতা হাসি কে হরণ করে গো।
একবার চেয়ে দেখ নিজের দিকে।

নিঃশব্দ আসর। অভয় গলা সরু ক'রে টেনে টেনে গাইছে। ঢোলক কাঁসী বাজছে আস্তে আস্তে। রাজু-বালা কিছুতেই চোখের জল চাপতে পারল না। অনেকেরই বুকের মধ্যে দীর্ঘশ্বাসের বাষ্প উঠেছে জমে। লোচনের বুকটাও যেন টনটনিয়ে উঠছে। ছোকরা কাকে বলছে এসব কথা!

লোচন ঘোষকে নাকি ? কই, সেই বিদ্বেষের ছায়া তো নেই অভয়ের মুখে। কিন্তু, শুধু কবিয়াল হিসেবে নয়, সব মিলিয়ে লোচনের প্রৌঢ় বুকে হঠাৎ একটা ফিক্ ব্যথায় কেমন যেন আড়ষ্ট লাগছে। সাধুবাদ দিতে গিয়ে টের পেল লোচন, তার গলার স্বর যেন ভাঙা। হেসে হেসে ঢলে ঢলে, অভয় যেন নির্দয় কালেরই মত কথায় সুর দিয়ে চলেছে। লোচনের মনে হল, এই শ্রোতার আসরে নয়, অন্তরের আসরে তার পরাজয়ের পালা যেন শুরু হ'য়ে গিয়েছে অনেকদিন। তার বড় সাধ হল একবার চির-প্রতিদ্বন্দ্বিনী রাজুবালার দিকে ফিরে তাকাবার। সাহস হ'ল না। কিন্তু রাজুবালা তাকিয়েছিল তার দিকেই। মনে মনে বলছিল, সত্যিই তো। এত আলো, কই, ঘোষকে তো আমি পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নে।

শৈলবালারও দু' চোখ ভেসে গিয়েছে। সে ফিস্‌-ফিস্‌ ক'রে বলছে, ঠিক বলেছ বাবা। যথার্থ কথা বলেছ।

সুবালার চোখে জল নেই। তার চাঁদমুখে এখনো রূপের হাট। চোখে অনেক আগুন। তবু সারা মুখে তার স্তব্ধ বিস্ময়। সে মুখের দিকে তাকিয়ে গিরিবালার চোখ ঘুমে ঢলে আসছে।

নিমির মন খারাপ। সংসারে বুঝি আর কথা নেই? কত কালের বুড়ো মানুষটি তুমি, যে, কেবল তত্ত্ব কথা চালিয়েছ? মানুষ একটু হাসতে চলতে এসেছে। তা' নয়, যত বাজে বাজে কথা ব'লে মানুষের মন খারাপ ক'রে দেওয়া কেন? মন খারাপ তো আছেই! গান শুনে মন খারাপ করার চেয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকা ভাল।

কিন্তু পাড়ার মেয়েরা তাকে চলে যেতে দিল না।

মহাজন শরতদাস কখন শহরের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ভবানী চৌধুরীকে রাস্তা থেকে ধরে এনে বসিয়েছে। তিনি ভাল ক'রে গুছিয়ে বসে বললেন, ছেলেটি ভাল গায় তো হে। থাকে কোথায়? মালী-পাড়ায়? শৈলবালার জামাই? কে শৈলবালা? যাক্‌গে, চিনি নে।

কিন্তু এ চালাক কবিয়ালের রীতি নয়। প্রথমেই কাঁদানো ভাল নয়। দীর্ঘশ্বাস তোলানো উচিত নয়। আসর জুড়িয়ে যাবার ভয় আছে। একবার হাই উঠতে আরম্ভ করলে, সকলেরই হাই উঠতে থাকবে।

তবে এখনো সে অবস্থা নয়। চারদিক থেকে সবাই সাধুবাদ দিয়ে উঠল। অভয় আবার গলার স্বর চড়িয়ে গানে গানেই বলল, ভাই এস, আজকের কথাই বলি। আজকের মানুষের খালি এক কথা শুনতে পাই।

জীবনের জ্বালা নাহি যায়
জীবনের ভাব বোঝা দায়।

কিন্তু কেন? না,

অ-ভাই, অনাদায়ে ভাবের তবিল খালি থেকে যায়।
ভাব দিয়ে ভাব ক'রে আদায়
জীবনের রঙ্গ বোঝা যায়।

ভবানীবাবু তাঁর মোটা লেন্সের চশমায় অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন, বাঃ।

অভয় গেয়েই চলল, জীবনের ভাব বুঝতে গেলে, বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে এ জীবনের কথা। প্রশ্ন নয়, ঘোষ মশায়ের কাছে শিখতে চাই, সংসারে সব চেয়ে কী দামী? সব চেয়ে সস্তা কী। খাঁটি মানুষ বলে কাকে? শরত দাশ মশায় রয়েছেন, ক্ষমা করবেন অভয়কে। কাকে বলে মহাজন? আর জগতে সবাই ভোগ করতে এসেছেন। একশ জনের একজন ভোগ করেন সুখ, নিরানব্বুই জনে দুঃখ। কেন?

মা'য়ের জাতি ব'লে ডাকলি যারে
আবার রাতে গিয়ে পয়সা দিয়ে কিনলি তারে।

কেন? প্রশ্ন নয়। শিখতে চায় অভয় লোচন ঘোষের কাছে। তার পোড়া মনে জেগেছে এসব কথা। তার মন হদিস খুঁজে মরছে। কী সেই বস্তু, যা দিয়ে জয় হবে এই সংসার।

আসরে গুল্‌তানি শুরু হয়ে গিয়েছে। এসব কথা কবি গানের অঙ্গ হওয়া উচিত কিনা, তাই নিয়ে তর্ক লেগে গিয়েছে কারুর কারুর মধ্যে। কারুর কারুর মুখে একটু অস্বস্তির ভাব উঠেছে ফুটে। কিন্তু লোচনের জবাব শোনার কৌতূহল আসর ত্যাগ করতে দিচ্ছে না। অভয়ের কথার মধ্যে কিছু নতুনত্ব আছে! এসব কথা বড় একটা ওঠে না। আর তর্কেতে কিছুই যায় আসে না। কারণ কবি গানের বিষয়বস্তুতে মহাজনেরা কোনো রীতকরণ করে যান নি। নতুন নতুন কথা ব'লে সবাই কবি গানের ক্ষেত্র বড় করেছেন। পৌরসভার ভোটের সময়, এই লোচন ঘোষ ভোটের কথা গেয়েছে। এখানে আগে কেউ গায় নি।

লোচন ঘোষের মুখে আর সেই সহজ হাসিটি নেই। সেই অপরাজেয় হাসি। যে-হাসি দেখলে প্রতিপক্ষের বুক কাঁপে। তবু সে স্বভাবসুলভ হাসিটি বজায় রাখতে চেষ্টা ক'রে প্রথমে সাধুবাদ দিল অভয়কে। যদিও সেই সাধুবাদের মধ্যে কিছু শ্লেষের ছোঁয়া আছে। কিন্তু তাতে তেমন ধার নেই। লোকে হাসল না প্রাণ খুলে। কথার জবাব দিতে গিয়ে আগেই সে জানিয়ে দিলে, অভয়ের কথার জবাব নানা রকম হয়। বিচারের ভার শ্রোতাদের ওপর।

শ্রোতাদের ওপর ভার দিয়ে লোচন সুবিধে করল না।

জবাব দিতে গিয়ে ধর্মের কথা টেনে আনল সে। কিন্তু আসরে কোনো উল্লাস উঠল না। উল্টে তাকে পুরাণেরই আশ্রয় নিতে হ'ল।

তা' ছাড়া, অভয়ের পরে লোচনের গলার স্বর যেন চাপা প'ড়ে গিয়েছে অনেকখানি। লোচনের স্বর মিষ্টি, কিন্তু তার ধার নেই, তেজ নেই। তেমন জোরালো নয়। তার স্বরে হারমোনিয়মের সুরের আবেশ আছে। অভয়ের গলায় আছে টান-টান-চামড়া ঢোলকের কড়া চাঁটির তীব্রতা।

লোচন ঘোষের উদ্দেশে কে যেন চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল—ঘোষের গায়ে একখানি নামাবলী চাপিয়ে দিলে হ'ত। নাম গান জমত ভাল।

ঘোষের ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি ঘামে ভিজে গেল। আসর নেতিয়ে গিয়েছে একেবারে। অভয়ের গানেও আসর খুব উত্তেজিত হয়নি, কিন্তু দোলানি ছিল একটি। ঘোষের অপেক্ষায় ছিল সবাই। কিন্তু উল্টো বুঝে লোচন নিছক ধর্মের কথা ব'লে জবাব দিল। আসর গেল জুড়িয়ে। ফাঁকে ফাঁকে অন্যান্য কথা বলে, রঙ্গ রসিকতা ক'রে গরম করার চেষ্টা করল। লোকে মানল না। লোচনঘোষের নিজের এলাকায় এই প্রথম পরাজয়।

অভয়ের নিজেরই লজ্জা করতে লাগল। লোক-চরিত্রের শিক্ষা পায় মানুষ এমনি ক'রে। ভাল লাগলে লোকে মাথায় করে। মন্দ লাগলে ঝেড়ে ফেলে দেয়। এইটি নিয়ম সংসারের। আর এই নিয়মের অধীনে মানুষ নিষ্ঠুর।

ঘোষ বসে পড়ল। রাজুবালার মনে হ'ল আসরটা যেন চারদিক বন্ধ ঘেরাটোপ। বাতাস নেই, আলো নেই। অন্ধকার আর দমবন্ধ গুমশোনি। দেহপোজীবী বুড়ি রাজুবালার প্রাণে জীবনের কিছু ছিঁটেফোঁটা অনুভূতি ছিল। পয়সা দিয়ে কোনোদিন ঘোষের সঙ্গে কেনা-বেচার সম্পর্ক ছিল না। যৌবনে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে একটি খেলার সম্পর্ক ছিল। ঘোষকে সে চিরদিন নিজের চেয়ে বড় মনে করত। কিন্তু তা প্রেম নয়। লোকে মনে করত পীরিত। বয়সে একটু পাখনাই সবাই দেয়। তবু লোচন পুরোপুরি গৃহস্থ। সম্পন্ন করেছে নিজেকে খেটেখুটে।

আজকেও যে রাজুবালার বুক টাটায়, তা মেয়ে-পুরুষের প্রেম বলতে সহজে যা বোঝায়, তা' নয়। বন্ধুর জন্য, অনেক বড়, অনেক শ্রদ্ধার ভালবাসার বন্ধুর জন্য রাজুবালার বুকে বড় কষ্ট। এত লোকের মধ্যে একলা তারই কষ্ট! শুধু তারই মনটি ব্যাকুল হ'য়ে উঠল, আহা! ঘোষকে কেউ একটু পাখার বাতাস করে না কেন? আজকে আর কেউ তার পাশে বসবার জন্য ছটফট করে না? ঘোষ যেন একঘরের মত একলা বসে আছে।

ভবানীবাবু বলছিলেন তখন শরত দাশকে—লোচনের বয়স হয়েছে, আর পারে না আজকাল।

লোচনের সারা মুখের রেখাগুলি যেন কিলবিলিয়ে উঠল। ক্রমশঃ
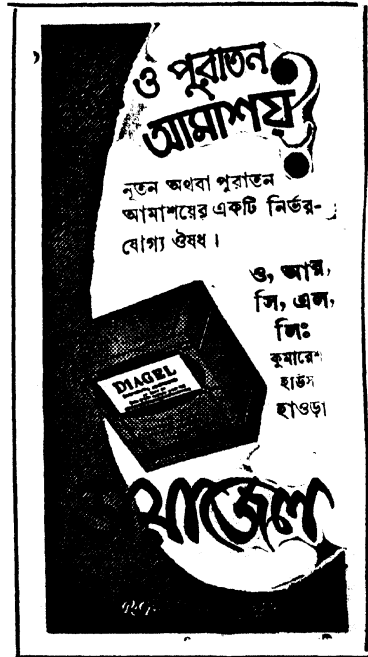
ভুতোদা ও বেলফুলের চারা

বিমল আর বিনয় মধুপুরে বেড়াতে এসেছে। সকালে তারা গেল ভুতোদার বাড়ী। গিয়ে দ্যাখে ভুতোদা পট্ পট্ করে বাগানে যত বেলফুলের চারা উপড়ে ফেলছেন আর নিজের মনেই গজগজ করছেন—

"তিনমাস ধরে জল দিচ্ছি আর মাটি কোপাচ্ছি কিন্তু ফুলের নাম নেই। দরকার নেই আমার এমন গাছে।

বিমল হন্ত দন্ত হয়ে দৌড়ে এল—

"আহা হা করছেন কি ভুতোদা।"

ভুতোদা : "করব না তো কি ?"

বিনয় : দোষ তো আপনারই। এ শক্ত মাটিতে কি শুধু জল দিলেই গাছ বাড়ে ?

ভুতোদা : তার মানে !

বিনয় : তার মানে মাটিতে সার মেলান দেখবেন গাছ চড়চড় করে বাড়বে। এখানকার মাটিতে রসকস কম কিনা।

ভুতোদা (অবিশ্বাসের সঙ্গে) : হ্যাঁ ঃ যতসব কলকাতার ছোকরা আমায় বাগান করা শিখিও না।

বিমল : সে কি ভুতোদা ? গাছ যে মানুষেরই মত, সার জল, আলো এগুলো গাছের খাবার। মানুষের যেমন পুষ্টিকর খাবার খেলে শরীর ভাল হয় গাছেরও তেমনি !

ভুতোদা : যাঃ যাঃ তোদের কাছে পুষ্টি মানে হচ্ছে গাছের জন্যে সার আর মানুষের জন্যে 'ডালডা'।

বিনয় : নিশ্চই—জানেন আজ লক্ষ লক্ষ পরিবার নিয়মিত 'ডালডা' ব্যবহার করছে ?

ভুতাদা : তাই বলেই কি আমায় মানতে হবে যে 'ডালডা' প্রাকৃতিক খাবারের মতনই ভাল ?

বিনয় : নিশ্চই ! আপনাকে এবং আপনার মত আর সবাইকে একদিন মানতেই হবে এ কথা। তবে কিছু সময় লাগবে। পুরনো বিশ্বাস ভাঙ্গতে একটু সময় লাগে। আর আমাদের রান্নায় বনস্পতির ব্যবহার তো সেই দিন আরম্ভ হোল।

বিমল : 'ডালডা' মাত্র ৩২ বছর হোল আমাদের বাজারে এসেছে। অনেকের ধারণা যে তৈরী করা খাবার সবসময় যেসব খাবার স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায় তার তুলনায় অনেক কম পুষ্টিকর।

ভুতোদা : কিন্তু সে ধারণা কি সত্যি নয় ?

বিমল : মোটেই নয়। বাজারে সবচেয়ে জনপ্রিয় বনস্পতি 'ডালডার' কথাই ধরুন না। এ কথা সত্যি যে 'ডালডা' তৈরী হয় বিশুদ্ধ ভেষজ তেল থেকে—যে কেউ গিয়ে দেখতে পারে 'ডালডা' কি ভাবে তৈরী হয়।

বিনয় : আর এ কথাও সত্যি যে 'ডালডায়' যে পরিমাণ শরীরের পক্ষে অপরিহার্য্য ভিটামিন 'এ' এবং 'ডি' যোগ করা হয় তা অধিকাংশ সাধারণ 'প্রাকৃতিক' খাদ্যের সমান বা বেশীও।

ভুতোদা : দাঁড়াও, দাঁড়াও। ব্যাপারটা আরও খোলসা করে বল। 'ডালডা' তৈরী করার সময় খাদ্যগুণ কি একেবারেই নষ্ট হয় না বলতে চাও।

বিনয় : একটুও না। পুষ্টি বিষারদেরা প্রমাণ করেছেন যেসব তেল থেকে 'ডালডা' তৈরী হয় সেগুলিতে তৈরীর সময়েও শক্তিদায়ী গুণগুলি পুরোপুরি বজায় থাকে। মনে রাখবেন 'ডালডা' তৈরী হয় কড়া সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী। ভারত সরকারের নিযুক্ত তদন্ত কমিটি বনস্পতি ভালভাবে পরখ করে দেখেছেন। তাঁরা দেখেছেন যে বনস্পতি শুধু যে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর নয় তাই না বনস্পতি শরীরের পক্ষে ভাল।

ভুতোদা : আচ্ছা আচ্ছা, সে তো বুঝলাম। কিন্তু আমার বাড়ীতে যে 'ডালডা' দিয়ে রান্নাবান্না হয় সেটাও যে বিশুদ্ধ আর পুষ্টিকর হবে তার কি মানে আছে ?

বিমল : আপনি যেখানেই থাকুন না 'ডালডা' আপনি কিনতে পাবেন একমাত্র শীলকরা টিনে যাতে ভেজাল বা ছোঁয়াচের কোন আশঙ্কা থাকেনা।

বিনয় : তাছাড়া 'ডালডা' তৈরীর সময় হাত দিয়ে ছোঁওয়া হয় না। 'ডালডা'র পেছনে রয়েছে ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি কোম্পানীর অঙ্গীকার যে 'ডালডা'র সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয় তার সবই সত্যি—যে 'ডালডা' একটি উৎকৃষ্ট রান্নার স্নেহপদার্থ যাতে যোগ করা হয় স্বাস্থ্যদায়ী ভিটামিন।

বিমল: এর পরেও কি ভুল ধারণা থাকতে পারে ?

ভুতোদা : কে বলেছে আমার ভুল ধারণা ছিল ? আমার বাড়ীর সব রান্নাবান্নাই 'ডালডায়' হয়। ওরে হরি আজ বাজার থেকে বেলফুলের চারাগুলোর জন্যে একটু সার আনিস তো।

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই।

DL/P1 B-X52 BG

স্রষ্টার মন

শ্রীগোরাচাঁদ কুণ্ডু এম-এ

আশ্রমিক ফলমূলাহারী সন্ন্যাসী হলেন সাহিত্যিক। রচিত হল অমূল্য সাহিত্য। কিন্তু কেন?...কিসের আশায় ব্রহ্মচারী নিলেন লেখনী; কোন ব্যথায় বা কোন প্রেরণায় তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন।

তা'হলে কি কল্পনার উত্তেজনায় সাহিত্য ও শিল্পের সৃষ্টি। সাহিত্যিক ও শিল্পীর উৎস কল্পনা, মানি। মায়ের কোলে শিশু বলে, "মা গল্প বল," আজো মায়ের গল্প বলা শেষ হয়নি। কল্পনার উপর নির্ভর করে যুগযুগান্ত ধরে মা গল্প বলে চলেছেন—শিশু তন্ময় হয়ে শুনছে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গল্পের ধারা ও সুর বদলেছে সত্যি। কিন্তু এখনও তার পূর্ণচ্ছেদ আসেনি। সাবলীল পাখনার উপর ভর করে মার কল্পনা উড়ে চলেছে অতীত থেকে বর্তমানে—প্রকাশ করছে বিভিন্ন যুগের ভিন্ন জীবন ধারা, চিন্তাপ্রবাহ ও বৈশিষ্ট্য। স্বপ্নাবিষ্ট শিশু অতীতকে জানতে পারছে। হৃদয়ে নতুন সঞ্জীবনা-শক্তি বাইরে দিচ্ছে সতেজ বলিষ্ঠ ভাবধারার প্রবাহ—সমস্ত উন্নত প্রবৃত্তি ও আদর্শবাদকে জাগরিত করে।

তবে কি এই সাহিত্য?

না, এ সাহিত্যের সূত্রপাত মাত্র। শব্দ চয়ন ও ভাষা বিন্যাসের দ্বারা কল্পনাকে ক্ষমতানুসারে রূপে রসে শোভিত করে সকলের সামনে উপস্থিত করার নাম সাহিত্য। যিনি এটা করেন, ভাষা ও শব্দের সাহায্যে যাঁর অবদমিত ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হয়, লিখনে সুখ অনুভূত হয়—তিনি সাহিত্যিক।

কিসের লোভে বা মোহে যারা শিক্ষাদীক্ষায় গরীয়ান হয়েও দু'বেলা স্ত্রী-পুত্রের জন্য দু-মুঠো অন্ন সংস্থান করতে পারে না, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহ বস্ত্র যাদের দুঃস্বপ্নের মত—ভবিষ্যৎ যাঁদের তমসাচ্ছন্ন—সর্ব্বদুঃখহারী জ্যোতি তাদের জীবন উদ্ভাসিত করবে কিনা জানে না—তবু সাহিত্যিক বাণীর চরণ আঁকড়ে পড়ে থাকে কেন? কিসের আশায়?

তবে কি যশের লোভে?

কেবল যশের লোভে বা মোহে বললে ঠিক উত্তর হবে না। কারণ যশাভিলাষ নেই এমন মানুষ ত' দেখা যায় না। যদি বলি সম্পদের আশায়—তা'হলেও ঠিক হবে না, যদি বলি অমরত্বের জন্য—না, সে জবাবও ঠিক নয়। এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা যে প্রশ্ন মনে জাগে তা হচ্ছে, একজন সাহিত্যিক অন্যজন অস্ত্রপ্রচারক, একজন ক্রীড়ক আরেক-জন সৈনিক, একজন অভিনেতা অন্যজন বিচারক কেন হয়? একই সমাজে বাস করে কেন মানুষ এমন বিভিন্ন জীবনধারা বেছে নেয়?

তবে কি এদের উদ্দেশ্য পৃথক?

তাও নয়, অহিংসা ও হিংসার দুই ভিন্ন পথের পথিক হয়েও দু' দলের উদ্দেশ্যই সমাজ কল্যাণ করা। একই সহজাত প্রবৃত্তি (innate) যশাভিলাষ থাকা সত্ত্বেও দু'দলে বিভক্ত হওয়ার মূলে রয়েছে এক আকস্মিক সংঘর্ষ (Accident)। এ সংঘর্ষ বাহিরে প্রকাশ্য নয়, মানবের মনোজগতে সংঘটিত। জীবনের অগ্রগতির পথে এই সংঘাতকে এড়িয়ে যাওয়া কোন রকমেই সম্ভব নয়, পরস্পরের ঘর্ষণ অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য মনোজগতে পরস্পরের ঘর্ষণ বহুল পরিমাণে নির্ভর করে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের (individuality) উপর। আবার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে প্রভাবান্বিত করে মানবের বুদ্ধি, শিক্ষাদীক্ষা এবং বংশগতি ও পারি-পার্শ্বিক অবস্থা।

অনেকের ধারণা ব্যক্তিগত পার্থক্যের কারণ বংশগতি। এই কারণে বংশগতিবাদীরা মনে করেন যে মানব জীবন গঠনে প্রধান অংশ গ্রহণ করে শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তি। শিক্ষার দ্বারা শিশুর গঠন কতদূর সম্ভব, তা নির্ণয় করে ঐ শক্তিগুলি। তাঁদের মতে, সকল শিক্ষালাভেরই একটা সীমা বা ক্ষমতা আছে। সেই সীমা বা ক্ষমতা নির্ভর করে শিশুর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিশেষ শক্তির উপর। ঐ শক্তি দৈহিক বৃদ্ধির সঙ্গে আপনি বিকশিত হয়। তাই শিক্ষা কিছু নয়—আসলে ওটা এক রকমের রঙীণ প্রলেপ—বাইরেটাকেই খালি চক্‌চকে করে তোলে, ভিতরের কাঠামোকে বদ্‌লাবার তার কোন ক্ষমতা নেই।

অন্যধারে পারিপার্শ্বিকবাদীরা বিশ্বাস করেন যে শিশুর মন একটি নরম বস্তু বিশেষ। পারিপার্শ্বিকই তাকে ইচ্ছানুসারে গড়ে তোলে। "যদি বংশানুক্রমে সেই আদিম মানুষ তার সেই আদিম গুণগুলিই আমাদের মধ্যে দিয়ে যেত, তা'হলে নিশ্চয়ই আমরা মানুষ হিসাবে এত বড় সভ্যতার অধিকারী হতে পারতাম না—গড়ে তুলতে পারতাম না কিছুতেই আজকের দিনের এই সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, কলা, শিল্প ও সমাজকে। এ কেবল সম্ভব হয়েছে মানুষের জ্ঞান, চিন্তা, শিক্ষা, অভ্যাস, অভিজ্ঞতার ফলে। মানুষের ভবিষ্যৎ সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় তার পারিপার্শ্বিকের প্রভাবেই।"

আমাদের মতে মানবজীবনের পূর্ণতালাভ শৈশবাবধি বংশগতি ও পারিপার্শ্বিকের অবিচ্ছিন্নভাবে অবলম্বন ও যোগাযোগের ফলে। এই দুই গুণনীয়কের (factor) সংঘর্ষের জন্যই ব্যক্তিগত পার্থক্যের সৃষ্টি। তাই অনেক সময় দেখতে পাই হিংসার ঘরে অহিংসার সৃষ্টি কিম্বা অহিংসার ঘরে হিংসার উদ্ভব। এরজন্য অবশ্য প্রয়োজন কোন না কোন উদ্দীপকের (Stimulus) প্রেরণা। যে উদ্দীপক আপতন (accident) ছাড়া আর কিছুই নয়। এইরূপ এক আপতনের ফলেই বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতরণ। তাঁর সাহিত্যিক উদ্দীপক প্রেরণা এক গ্রাম্য বালকের উপরোধ।

পূর্বোক্ত সংঘর্ষ একক সম্ভবপর নয়—প্রয়োজন দু'এর। মনোজগতেও

এর ব্যতিক্রম নেই। তাই মনোজগতে সংঘাতের সৃষ্টি নির্জ্ঞানের ও সংজ্ঞানের ইচ্ছার দ্বন্দ্বে। ইচ্ছাই মূলতঃ কর্মপ্রেরণা আনে অর্থাৎ আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত করে। ইচ্ছাসমষ্টি হতেই প্রক্ষোভের (emotion) উৎপত্তি। লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ইত্যাদি প্রক্ষোভ আমাদের ইচ্ছাকে অবদমিত করে এবং নির্জ্ঞানস্থিত হিংসা, দ্বেষ, ভালবাসা, প্রভৃতি প্রক্ষোভ অজ্ঞাতসারে আমাদের প্রভাবিত করে।

শৈশব অবস্থা হতেই কতকগুলি, কামনা, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি ইচ্ছাসকল বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিপুষ্ট হয়ে প্রকাশ লাভ করে। কিন্তু সমাজ অসামাজিক ইচ্ছা সহ্য করে না। এই কারণে বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে শিক্ষা, দীক্ষা, পারিবারিক ও সামাজিক শাসনে মনে ন্যায়, অন্যায়, পাপ, পুণ্য, কর্তব্য, অকর্তব্য, বিবেকবুদ্ধি জন্মায়। তখন বাঁধা নিষেধের অপেক্ষা না রেখেই অসামাজিক ইচ্ছা মনের গোচরে না থাকে তার চেষ্টা করি—অসামাজিক ইচ্ছাকে নির্বাসন দেই। অসামাজিক ইচ্ছাকে নির্জ্ঞান মনে নির্বাসনের নাম অবদমন। সমাজানুমোদিত পথে অবদমিত ইচ্ছা যখন রোগের সৃষ্টি না করে প্রতীকের সহায্যে গৌণরূপে প্রকাশ পায়, তখন তাকে উদ্গতি (Sublimation) হয়েছে বলা হয়।

এই উদ্গতি শিল্প, কলা, সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা আনে। অর্থাৎ রুদ্ধ ইচ্ছা সামাজিক রীতিনীতির আবেষ্টনে প্রকাশ করার ইচ্ছা। শিল্পী, চিত্রকর, বা সাহিত্যিক যখন কোন বস্তু বা প্রাণী সম্বন্ধে আমাদের মনে অযথা ভয় প্রীতি, ঘৃণা বা অপর কোন প্রক্ষোভের উৎপত্তির চেষ্টা করেন, তখন বুঝতে হবে তার পশ্চাতে প্রতীকের সঙ্গে কোন না কোন অবদমিত ইচ্ছা জড়িত।

চিত্রে, ভাস্কর্যে, সাহিত্যে যে রচয়িতার অবদমিত ইচ্ছা বা প্রক্ষোভ সবসময়ে জড়িত তা নয়। সময় সময় প্রণেতার সংজ্ঞানাস্থিত ইচ্ছা বা প্রক্ষোভ চিত্রে, ভাস্কর্যে বা সাহিত্যে প্রকাশিত হয় রূপকের সাহায্যে। এর প্রমাণ পাই প্রণেতার স্বীকার উক্তিতে। শরৎবাবু রাধারাণী দেবীকে লিখেছিলেন, "তারপর আছে ভুল বোঝা। স্নেহ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, প্রীতি, সম্পর্কের মধ্যে যত কিছু অঘটন ঘটে, তার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে সত্যকার অপরাধ বা ত্রুটির চেয়ে ভুল বোঝাটাই শতকরা আশি ভাগেরও উপর বর্তমান। ঐ ভুল বোঝাটাকেই আমি বেজায় ভয় করি। আমার বেশীর ভাগ বইয়েই তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছ এটা।"...এখানে বলা প্রয়োজন যে রূপকের অর্থ আমাদের অজানা নয়। তাই দেহতত্ত্বের গান যখন আত্মাকে পাখি বা দেহকে পিঞ্জর রূপে বর্ণনা করে, তখন হয় রূপক। অন্য-দিকে প্রতীকের অর্থ নির্ণয় করা সোজা কাজ নয়। প্রতীকের বিশেষত্বই এই, যে তার প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করলেও মন তা মানতে চায় না।

সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞানের দ্বন্দ্ব হতেই কল্পনার সৃষ্টি। কল্পনা বলতে বোঝায় যে মূল সামগ্রী বা বিষয়ের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও রূপের (Perception) পুনরুৎপাদন করা। কল্পনাই চিত্র, ভাস্কর্য বা সাহিত্য সৃষ্টির মূল কথা। কল্পনা রচয়িতার মনের উপর ভেসে বেড়ায় না, তাদের নিবাস মনের গভীরতম প্রদেশ—নির্জ্ঞান মনে! 'যেখানেই মন সৃষ্টির আনন্দে বিভোর—কাব্যে, গল্পে, গানে, চিত্রে, ভাস্কর্যে, সেখানেই এই নির্জ্ঞান মন ব্যক্ত করে আপনাকে, বিষয় নির্বাচনের ভিতর দিয়ে, ভাষায়, ভঙ্গিমায়, বর্ণের সমাবেশে স্থাপত্যের কৌশলে।' স্রষ্টার কল্পনায় রচয়িতার নির্জ্ঞান মনের কোন ভাবধারা, চিন্তাধারা বা ইচ্ছা প্রভাব বিস্তার করছে জানতে হলে প্রয়োজন—রচনার বিষয়, ভাষা, ছন্দ প্রণালী প্রভৃতি সূক্ষ্মভাবে বিচার করা। নির্জ্ঞান মন অবদমিত ইচ্ছার বাসস্থান। কল্পনা দৈনন্দিন ঘটনার অবদমিত ইচ্ছানু-যায়ী বিকার মাত্র।

কল্পনার সঙ্গে মনশ্চিত্রের (fantacy) প্রয়োজন শিল্পকলা ও সাহিত্য সৃষ্টির জন্য। কল্পনায় আকাশ কুসুম রচনাই মনশ্চিত্রের কর্ম্ম। শিশুর বেশীরভাগ মনশ্চিত্রের শব্দারম্ভ আমি যখন বড় হব। বয়স্কদের মধ্যেও ঐ মনোভাব বহুল পরিমাণ দেখা যায়। কবি লিখেছেন,—

> এখনো তো বড় হই নি আমি,
> ছোট আছি ছেলেমানুষ ব'লে।
> দাদার চেয়ে অনেক মস্ত হব
> বড়ো হয়ে বাবার মতো হলে।
> দাদা তখন পড়তে যদি না চায়
> পাখির ছানা পোষে কেবল খাঁচায়,
> তখন তারে এমনি বকে দেব
> বলব, "তুমি চুপটি করে পড়ো।"
> বলব, "তুমি ভারি দুষ্টু ছেলে"—
> যখন হব বাবার মতো বড়ো
> তখন নিয়ে দাদার খাঁচাখানা
> ভালো ভালো পুষব পাখির ছানা।

সামাজিক অনুভূতির সঙ্গে ক্ষমতা-লিপ্সার সংমিশ্রণ, মনশ্চিত্র সৃষ্টির আরেকটি কারণ। এই কারণেই দুর্ব্বল অসুখী শিশুদের ভিতর মনশ্চিত্রের বাহুল্য দেখা যায়।

মনশ্চিত্র গঠনের মূল কারণ কিন্তু প্রত্যাগতি (Regression) অজ্ঞাত মন থেকে আবেগীভূত ইচ্ছা সংজ্ঞান মনে যখন প্রকাশ লাভের চেষ্টা করে, তখন এই মানসিক ক্রিয়াকে আমরা গতি (Progress) আখ্যা দিতে পারি। কিন্তু কামবিবৃদ্ধির সময় এর উল্টো ব্যাপার হলে অর্থাৎ সংজ্ঞানের চিন্তা যদি কোন কারণ বশতঃ নির্জ্ঞানের দিকে ধাওয়া করে তবে তাকে প্রত্যাগতি বলা হয়।

কাম যখন সামান্য কিছু ফিরে গিয়ে স্থির, যখন বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মনোভাব প্রকাশ করে, তখনই মনশ্চিত্রের সৃষ্টি। প্রত্যাগতি যখন সর্বপ্রথম স্তর স্বতঃকামে শেষ হয় তখন মানসিক রোগের উদ্ভব।

শৈশব অভিজ্ঞতার বোধচ্ছবি আপনাদের পরিণত ভাবচ্ছবিরই রূপ-মূর্ত্তি। প্রত্যাগতি কল্পনায় ভাবনা-বিশিষ্ট হয়ে ঐ প্রাক্তন বোধচ্ছবিকে জাগ্রত করে। এই কারণে শিল্পকলায়, সাহিত্যে রচয়িতার বিস্মৃত ভাবচ্ছবি প্রভাবিত করে। স্রষ্টা শৈশবের সুখলীলায় অবগাহনের জন্য ব্যাকুল হন। কবিগুরু তাই বলেছেন—

'দেয়ালের মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আটকা পড়লে তবেই মানুষ স্পষ্ট করে আবিষ্কার করে, তার চিত্তের জন্যে এত বড়ো আকাশেরই ফাঁকাটা দরকার। প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আমি তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে লোকান্তরে বিস্তৃত। এই জন্যে কল্পনায় সেই শিশু লীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।"

কল্পনা, মনশ্চিত্র প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে গূঢ়ৈষাও (complex) মনের মাঝে চুপি চুপি এসে বাসা বাঁধে। গূঢ়ৈষা স্রষ্টা মন-সৃষ্টির অন্যতম গুণনীয়ক (factor) বলে বিবেচিত !

গূঢ়ৈষা হচ্ছে সেই অবদমিত ইচ্ছা, যে ইচ্ছা অজ্ঞাত থেকে প্রকাশিত হবার চেষ্টা করে। প্রত্যেকের জীবনে অভিজ্ঞতার ঘাত প্রতিঘাত, সাড়া ও স্ফূর্ত্তি, বেদনা ও ব্যঞ্জনা, সাধ ও সার্থকতার রূপ বিভিন্ন। কিন্তু সামাজিক ভাবে দেখতে গেলে অর্থাৎ একই সমাজের বিভিন্ন মানুষের জীবনে ঘটনার সাম্য থাকতে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও মোটামুটি সাম্য দেখা যায়। বাস্তবের সঙ্গে লিবিডোর (কামশক্তি) প্রতিক্রিয়ার ফলে মনের মানুষ জটিল হয়ে পড়ে। নানা বাঁকাচোরা পথে লিবিডো আত্মপ্রকাশে তৎপর হয়ে ওঠে। অনেকটা জলস্রোতের সঙ্গে তুলনা করতে পারা যায়। অস্থিতি, অনাশ্রয়, ও গতির বাধা তার সহজ সারল্যকে কুটিল পথে পরিচালিত করে। এই ভাবে ব্যাহত লিবিডো মানুষের চরিত্রে দু'রকম ক্ষতি সৃষ্টি করে—১। গূঢ়ৈষা (complex) ২। অপচার (perversion)।

গূঢ়ৈষা একটি ভাবনাবিকার মাত্র এবং অপচার হলো আচরণের বিকার। আচরণের ভেতর দিয়ে চরিতার্থতা লাভের অভাবেই লিবিডো গূঢ়ৈষা সৃষ্টি করে। অন্য দিকে, লিবিডো অপচার বা কদাচারের (যেটা অসামাজিক) ভেতর চরিতার্থতা লাভ করে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অপচার যেখানে থাকে গূঢ়ৈষার অস্তিত্ব সেখানে নেই। লিবিডো যেন নিজের ভীরুতায় অপচারের আশ্রয় নিতে পারে না বলেই নিতান্ত অভিমানের বশে মনমরা হয়ে থাকে—গূঢ়ৈষা সৃষ্টি করে।"

হিংসা, যৌন প্রবৃত্তি প্রভৃতি সহজাত হলেও অসামাজিক। অসামাজিক ইচ্ছা সংজ্ঞান সহ্য করে না তাই মনের প্রহরী নির্ব্বাসন দেয় এদের অসামাজিক—ইচ্ছা অবদমিত হয়। আচরণের ভিতর দিয়ে যখন ঐ অবদমিত ইচ্ছা চরিতার্থতা লাভ করে না তখনই গূঢ়ৈষা বা ভাবনা-বিকার ; কিন্তু নির্জনে চুপ করে থাকে না ; কল্পনা ও মনশ্চিত্রের সহায়-তায় শিল্পকলায় ও সাহিত্যে প্রকাশিত হয়ে চরিতার্থ লাভ করে।

হিংসা যখন অবদমিত না হয়ে সংজ্ঞানে বাস করে তখন মানুষ খুনী হয়। কিন্তু এই অসামাজিক প্রবৃত্তি অবদমিত হওয়ার পর, যখন উদ্গতির প্রেরণায় সমাজ কল্যাণকর রূপে প্রকাশিত হয় অনেকটা অসংস্কৃত (Raw) অবস্থায়, তখন মানব সৈনিক, অস্ত্রপ্রচারক, আইন-রক্ষক প্রভৃতি হয়। আবার এই অবদমিত ইচ্ছা যখন অধিক পরিমাণে সংস্কৃত (Refine) হয়ে, কল্পনা ও মনশ্চিত্রের সহায়তায় প্রকাশিত হয়, তখনই মানুষ শিল্পী বা সাহিত্যিক হয়। চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে শিল্পীর অবদমিত হিংসাপ্রবৃত্তির প্রকাশ সামান্য অনুসন্ধান করলেই আমরা দেখতে পাই। অন্যধারে সাহিত্যিকের হিংসাপ্রবৃত্তি প্রকাশ তার কাব্যে, রচনায় ও ডিটেকটিভ উপন্যাস, গল্প প্রভৃতিতে। বিদ্রোহী কবি লিখেছেন—

আমি দুর্ব্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল।
আমি মানিনাকো কোন আইন,
আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো আমি ভাম,
ভাসমান মাইন।
আমি ধূর্জ্জটী, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল বৈশাখীর
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী সুত বিশ্ব-বিধাত্রীর।

হিংসার ন্যায় যৌন-প্রবৃত্তিও অসামাজিক বলে বিবেচিত, তাই অবদমিত হয় আমাদের অজ্ঞাতে। যৌন-প্রবৃত্তি যখন অবদমিত না হয়ে সংজ্ঞানে বাস করে তখন লোকে পশুচিত ব্যবহার করে। এটা সর্ব্বজনবিদিত যে যৌন-প্রবৃত্তি অত্যন্ত ক্ষমতাবান। এই বলশালী প্রবৃত্তি অবদমিত হওয়ার পর উদ্গতির প্রেরণায় সংস্কৃত অবস্থায় প্রকাশ পায় বহু চিত্রে, ভাস্কর্য্যে ও সাহিত্যে।

সাহিত্যে প্রকাশ নরনারীর প্রেম সঞ্চারে। ফ্রয়েডের কথায় হল "সকল প্রণয় কলার প্রধান লক্ষ্য হল কাম তৃপ্তি। সব ভালবাসার সার কথা এই কামজ বাসনার চরিতার্থ।" মনের প্রহরীকে ফাঁকি দিয়ে সামাজিক রীতিনীতির আবেষ্টনে গৌণরূপে প্রকাশের জন্য প্রেমের পূর্ব্বে দেশ, মাতৃ, পিতৃ, ভ্রাতৃ, প্রভৃতি শব্দ সংযোজন। অথবা শিল্পানুরাগ, আত্মপ্রিয়তা, বাৎসল্য, পীড়িতের সেবা ইত্যাদি রূপে প্রকাশ।

ভালবাসার অভিব্যক্তি চুম্বনে। অসহ পুলকে চুম্বন কখন প্রকাশ্যে, কখন গোপনে—কখন অন্তরে, কখন বা মননে।

চুম্বন স্পৃহা রসের প্রকাশান্তর। আবার স্পৃহার রসের নামান্তর প্রেম। প্রেম দু'ভাগে বিভক্ত—"বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। মিলনের পূর্ব্বাবস্থাকে বলে বিপ্রলম্ভ, আর মিলনের পরবর্ত্তী ভাব সম্ভোগ।" প্রেমের পূর্ণতা প্রাপ্তি হয় বিরহে। গোস্বামী কবি বলেছেন—

সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতিলাভ হৈলে তারে প্রেম নাম কয়॥

প্রেমবৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহমান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥

এই মহাভাবই বিরহ!

শিল্পী ও সাহিত্যিকের রচনা যখন অপর লৈঙ্গিকের প্রতি প্রেম নিবেদন করে তখন রচয়িতার অজ্ঞাত ইতর কাম-বাসনা চরিতার্থ হয়। অন্যধারে সাহিত্যিক ও শিল্পী যখন নিজেকে অপর, লৈঙ্গিকের সমগোত্র মনে করে সাহিত্য ও ভাস্কর্য্যের সৃষ্টি করেন তখন নিজ্ঞানস্থিত সমকামিতা তৃপ্ত হয়। যেমন কোন এক বিখ্যাত পুরুষ কবি নিজেকে নারীরূপে কল্পনা করে লিখেছেন—

In vain, I entreated him not to be so rude, He sealed my lips with kisses and his game persued, Declaring, if that man might not do so thy beast, The world, in a short time, would ceased to exist.

সাহিত্য ক্ষেত্রে, কবি, উপন্যাসিক ও আনুবাদিকের ভিতর পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে। নিজের কল্পনা সুশোভিত করে অবদমিত ইচ্ছা পরিতৃপ্ত করেন যিনি, তিনি উপন্যাসিক বা গল্প লেখক। যাঁর অবদমিত ইচ্ছা অন্যের রচনার সহায়তায় পরিতৃপ্ত হয়, এবং ঐ রচনা যিনি এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদিত করেন,' তিনি অনুবাদক। আবার কল্পনাকে ছন্দে ও তালের সঙ্গে সঙ্গে যিনি আন্দোলিত করে অবদমিত পরিতৃপ্ত্যর্থে, প্রকাশ করেন তিনি কবি। কবির রচনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে কবির সমস্ত কল্পনাই তার জীবনের ব্যর্থ আশা, আকাঙ্ক্ষা ও বাসনার সঙ্গে সংযুক্ত। কিশোর কবি লিখেছেন—

আঁধিয়ারে কেঁদে কয় সলতে
চাইনা চাইনা আমি জ্বলতে।

ব্যর্থতার চরম প্রকাশ।

সাহিত্যিক ও শিল্পী মনের পার্থক্য প্রকাশ ভঙ্গিতে। লিখনে যাঁর কামসুখ অনুভূত হয় তিনি সাহিত্যিক; অন্যধারে যাঁর কল্পনা শব্দ ও ভাষার সাহায্যে প্রকাশ করা সত্ত্বেও অবদমিত ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হয় না, যেমনটি রেখা বা কুন্দনের সাহায্যে সম্ভব; যাঁর রেখা সংযোগে ও কুন্দনে কামসুখানুভব হয় তিনি শিল্পী।

আরেকটা বিশেষ পার্থক্য সাহিত্যিক ও শিল্পীর—সাহিত্যিক অপেক্ষা শিল্পী একটু বেশী পরিমাণে দর্শন জাতিরূপ (visual Type)। সাহিত্যিকের ন্যায় যা-ই শোনা তাই দেখা নয়। তাই অবদমিত ইচ্ছার তৃপ্তির জন্য কল্পনার একটা রূপ দিয়ে চোখের সামনে তুলে ধরতে হয় শিল্পীকে।

সর্বশেষে বলব যে সাহিত্য বা শিল্পকলা সেখানেই সার্থক যেখানে স্রষ্টার অবদমিত ইচ্ছা ও প্রক্ষোভ সৃষ্টির মাধ্যমে অন্যের মনে প্রক্ষেপিত হয়। স্রষ্টার অবদমিত বাসনা দর্শক বা পাঠকের মনকে প্রভাবিত করে রচকের ন্যায় তাদের মনেও যখন প্রক্ষোভ ও ইচ্ছাকে উন্মীলিত ও নিমীলিত করতে সক্ষম তখনই সার্থক সৃষ্টি—শিল্পী বা সাহিত্যিকও সার্থক।

উপসংহারে বলব যে কেবলমাত্র আয়তন, বা প্রেরণা বা উদ্গতি প্রভৃতির একটি গুণনীয়কের প্রভাবেই সাহিত্যিক বা শিল্পী হয় না। যখন সকল গুণনীয়কের কিছু না কিছু একত্রিত হয়ে যাঁকে পরিচালিত করে, তখন তিনিই সাহিত্যিক বা শিল্পী হন।

দুঃখ শুধু দুঃখ নয়

গোবিন্দ গোস্বামী

মুহূর্তের মৌনক্ষণে শান্তি যদি না-ই পেয়ে থাকো
রাখিওনা অভিযোগ দুরন্ত দুপুরে
নিবিড় নিরাশা ভরা রাত্রিতেই রাখো
না পাওয়ার ব্যথা যতো মনের মুকুরে।

স্ফটিকের স্বচ্ছ স্মৃতি যুগ যুগ ধরে
পান পাত্রে ভরে নেয় প্রণয় পিপাসা
কাচের কাকলী ঘেরা সুখের সফরে
মৃত্যু মূল্যে কেনে তারা জীবন-জিজ্ঞাসা।

ক্ষণস্থায়ী এই সুখে পৃথিবী প্রিয়ারে
পারো যতো দেখে নাও রাত্রি শেষ
নক্ষত্র নেশায়
পূবের পূরবী জাগে সোনার সেতারে
নদীর নিরীহ গানে বেদনা মেশায়।

দুঃখ শুধু দুঃখ নয়, ব্যথা নয় বেদনার গান
সাগর মন্থন করে পেয়েছিলে শুধুই কী
অমৃত সন্ধান?

মন্ত্রীদের দ্বারা গণসংযোগ—

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার সদস্যগণ গণসংযোগের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা গত ১লা মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় কলিকাতার ভার লইয়াছেন—তাঁহার কার্য্যে শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর ও কয়েকজন মন্ত্রী সাহায্য করিবেন। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীভূপতি মজুমদার ও জনাব জিয়াউল হক হুগলীজেলার ভারলইবেন। প্রফুল্লবাবু নদীয়া ও হাওড়ার ভার পাইবেন। নদীয়ায় উপমন্ত্রী শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হাওড়ায় শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। ২৪পরগণার ভার লইয়াছেন, ডাক্তার আর-আমেদ, শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ ও শ্রীমতী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়। মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমে শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, জনাব কাজেম আলি মির্জা ও শ্রীনিশাপতি মাঝি জনসংযোগ করিবেন। বর্দ্ধমানের ভার জনাব আবদাস সাত্তার একাই গ্রহণ করিয়াছেন। রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীঅনাথবন্ধু রায়, শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশঙ্করনারায়ণ সিংহদেব বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার ভার পাইয়াছেন। শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও উপমন্ত্রী শ্রীচারুচন্দ্র মহান্তি মেদিনীপুর জেলার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, জলপাইগুড়ী, দার্জিলিং ও কুচবিহার লইয়া গঠিত এলাকায় জনসংযোগ করিবেন। শ্রীশ্যামাপ্রসাদ বর্মন পশ্চিম দিনাজপুর এবং শ্রীসৌরীন মিশ্র মালদহের ভার পাইয়াছেন। এই সকল মন্ত্রী ছাড়াও জনসাধারণকে গণসংযোগ করিতে বলা হইয়াছে। এই তালিকা অনুসারে মন্ত্রীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া জনগণের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে খবর লইয়া তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থা করিলে জনগণ উপকৃত হইবে।

আচার্য্য চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত—

আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গত ১২ই বৈশাখ রবিবারের আনন্দবাজার পত্রিকায় মাধ্যমিক শিক্ষার ভাষা সঙ্কট নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন—মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদিগকে ৪ ভাষার স্থলে তিন ভাষা শিক্ষা দেওয়াই যথেষ্ট হইবে। মাতৃভাষা বাংলা, ইংরাজি ও সংস্কৃত—এই তিন ভাষাই ছাত্রদের পক্ষে যথেষ্ট। বাঙ্গালীদিগকে যেভাবে হিন্দী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহার ফলে তাহাদের উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী হইয়া থাকে। হিন্দী ভাষার বানান ও বাংলা ভাষার বানান ঠিক বিপরীত—তাহার ফলে ছাত্ররা বানান সমস্যার সম্মুখীন হয়। তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি বুঝাইয়া দিয়াছেন। ইংরাজি না শিখিলে জগতের সভ্য সমাজের সহিত মেশা যায় না বা জগতের জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে সম্বাদ সংগ্রহ করা যায় না। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা না করিলে ভারতের সংস্কৃতির পরিচয় লাভ করা যায় না—এ অবস্থায় যাহাতে অহিন্দী রাজ্যসমূহে জোর করিয়া হিন্দী শিখাইবার ব্যবস্থা বন্ধ করা হয়, আচার্য্য চট্টোপাধ্যায়ের সে জন্য সকলকে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

হিন্দীর বিরুদ্ধে নেতৃবৃন্দ—

ডাঃ সি-রাজাগোপালাচারী, শ্রীমির্জা ইসমাইল, শ্রীএম-কে-জয়াকর, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ ডি, ভি, কার্বে, মাষ্টার তারা সিং, শ্রীমুলুকরাজ আনন্দ, শ্রীও-সি-গাঙ্গুলী প্রভৃতি বিশিষ্ট ভারতবাসীরা দিল্লীর লোকসভার অধ্যক্ষ ও রাজ্যসভার সভাপতির নিকট এক আবেদনে জানাইয়াছেন—ভারতের একটি অংশের জনগণের উপর তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হিন্দীভাষা চাপাইয়া দেওয়া হইলে দেশে গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইবে—সেজন্য ভারতের সরকারী ভাষারূপে ইংরাজী বহাল রাখার দাবী মঞ্জুর করা হউক। ভারতের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ইংরাজির স্থলে হিন্দী প্রবর্তিত হইলে দেশের জনগণের ঐক্য বিনষ্ট হইবে এবং তাহাদের মানসিক যোগ ছিন্ন হইবে। এই আবেদনে দেশের বহু মনীষী স্বাক্ষর করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই

চিন্তাশীল পণ্ডিত এবং দেশের কল্যাণকামী বলিয়া পরিচিত। আমাদের বিশ্বাস, এ আবেদন নিষ্ফল হইবে না।

সরকারী ভাষা সম্পর্কিত রিপোর্ট—

গত ২২শে এপ্রিল দিল্লীতে লোকসভায় ও রাজ্য-সভায় সরকারী ভাষা কি হইবে, সে সম্বন্ধে সংসদীয় কমিটীর রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে—সকল রাজ্যে রাজ্যের নিজ নিজ ভাষা সরকারী ভাষারূপে চলিবে এবং কেন্দ্রে ১৯৬৫ সালের পর হইতে হিন্দীকে কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষারূপে গণ্য করা হইবে। অবশ্য যতদিন যেভাবে প্রয়োজন, ততদিন সেভাবে ইংরাজি ভাষার প্রচলন থাকিবে। প্রতি রাজ্যে সে রাজ্যের প্রাদেশিক ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে চালানো সম্বন্ধে কেহ আপত্তি করেন নাই—কিন্তু হিন্দী ভাষা বলিয়া কোন একটী ভাষা নাই। যাহাকে হিন্দী ভাষা বলা হয়, তাহা নানা প্রকৃতির—তাহার সাহিত্য সম্পদ বা শব্দ-সম্পদও অপ্রচুর—এ অবস্থায় হিন্দী ভাষাকে কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা করা হইলে ভারতের কতকগুলি লোককে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইবে ও কতকগুলি লোক বিষম অসুবিধা ভোগ করিবে। সেজন্য এই বিবরণ প্রকাশের পর ভারতের বহু স্থানের সুধী পণ্ডিতগণ এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

পলতায় কারখানা স্থাপন—

বারাকপুরের নিকট পলতায় কলিকাতা কর্পোরেশনের যে জলকল আছে, তাহাতে প্রতি বৎসর বহু পলিমাটি জমা হয়—এতদিন ঐ পলিমাটীর সুব্যবহারের কোন ব্যবস্থা ছিল না। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীএ-কে-চন্দের চেষ্টায় তথায় একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া ঐ পলিমাটি কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। গত ৩রা মে রবিবার শ্রীচন্দ এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী শ্রীবিধানচন্দ্র রায়ের সহিত আলোচনা কালে কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বহু উচ্চপদস্থ কর্মী তথায় উপস্থিত ছিলেন। যে সকল জিনিষ নষ্ট হইত, সে সকল জিনিষ কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা না করিলে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করা যাইবে না। আমরা এই পরিকল্পনাকে সত্বর কার্য্যে পরিণত হইতে দেখিলে আনন্দিত হইব—দেশের বেকার সমস্যা সমাধান ও সম্পদ বৃদ্ধির ইহা সহায়ক হইবে।

অধ্যাপকগণের বেতন বৃদ্ধি—

কলিকাতা কলেজসমূহের অধ্যাপকগণের বেতন বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৭-৫৮ সালে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে ৬ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা দিয়াছেন। কতক-গুলি কলেজকে এই সর্তে ঐ বর্দ্ধিত বেতনের টাকা দেওয়া হইয়াছে যে—ঐ সকল কলেজে আগামী ৫ বৎসরে পর্য্যায়ক্রমে ছাত্র সংখ্যা কমাইয়া ১৫০০ করিতে হইবে। বর্দ্ধিত বেতন প্রাপ্ত অধ্যাপকগণ সপ্তাহে ৪ ঘণ্টার বেশী প্রাইভেট টুইশান করিতে পাইবেন না। বেতন বৃদ্ধির ফলে শিক্ষাদান ব্যবস্থার উন্নতি হইলে এবং ছাত্ররা নূতন ব্যবস্থার দ্বারা উপকৃত হইলে এই অর্থদান সার্থক হইবে। অধিক বেতনপ্রাপ্ত অধ্যাপকগণ অতঃপর অধিকতর উৎসাহ ও মনোযোগের সহিত অবশ্যই অধ্যাপনা করিবেন।

সরকারী ও বেসরকারী শিল্প—

গত ২৬শে এপ্রিল নয়াদিল্লীতে ভারতীয় প্রশাসনিক পরিষদের পঞ্চবার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু বলেন—সরকারী শিল্পে নানারূপ ভুল ক্রটি হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা সত্বেও বেসরকারী শিল্প অপেক্ষা সরকারী শিল্প বহু গুণে ভাল। ভারতে সরকারী শিল্প আজ বেসরকারী শিল্প অপেক্ষা ব্যয়-সঙ্কোচ, কর্মদক্ষতা এবং সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়া বহুগুণে শ্রেয়। শ্রীনেহরু প্রশাসনিক পরিষদের সভাপতি। তিনি বার বার বলেন—আমাদের মূল উদ্দেশ্য হইল সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ গঠন। সরকারী অফিস সমূহের সম্মুখে এই মূল উদ্দেশ্যের কথা লিখিত থাকা উচিত।

কলিকাতা সহরের সম্প্রসারণ—

কলিকাতা কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েসনের উদ্যোগে গত ২৬শে এপ্রিল রবিবার কলিকাতা মোহন-বাগান ও ইষ্টবেঙ্গল মাঠে নূতন মেয়র শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডেপুটী মেয়র শ্রীকিশোরীলাল ঢন-ঢনিয়াকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। তথায় মেয়র বলেন—কলিকাতা সহরের সম্প্রসারণ ব্যতীত সহরের সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে। কলিকাতা আয়তনে ক্ষুদ্র ও ঘনবসতিপূর্ণ। পৃথিবীর সকল বড় বড় সহর অপেক্ষা কলিকাতার ঘনবসতি অধিক—কলিকাতায় গৃহ নির্মাণের

পূর্বে কোন প্ল্যান ছিল না। প্রতিদিন মফঃস্বল হইতে ১০।১৫ লক্ষ লোক কলিকাতায় আসিয়া থাকে। দেশ বিভাগের ফলে সহরের লোকসংখ্যা ৭।৮ লক্ষ বাড়িয়াছে। সহরের আয়তন বাড়াইয়া বস্তীবাসীদিগকে ফাঁকা স্থানে লইয়া যাইতে না পারিলে সহরের সমস্যার সমাধান করা যাইবে না। তিনি এ বিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করিয়াছেন।

চীনের নূতন রাষ্ট্রপতি—

গত ২৭শে এপ্রিল পিকিংয়ে চীনের জাতীয় গণ-কংগ্রেসের অধিবেশনে বিখ্যাত মার্কসীয় তত্ত্ববিশারদ লিউ-লাউ-চি মহাশয় মাং সেতুংয়ের স্থানে চীনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। নির্বাচনের পরই তিনি চৌ-এন-লাইকে আরও এক বৎসরের জন্য প্রধান মন্ত্রী মনোনীত করিয়াছেন।

শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

সমগ্র বঙ্গের সেচবিভাগের চিফ এঞ্জিনিয়ার রায় বাহাদুর শৈলেন্দ্রনাথ বান্দ্যাপাধ্যায় গত ৩০শে এপ্রিল ৭৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯৩৫ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। সেকালে তিনি ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

কালীপদ ঘোষ—

খ্যাতনামা সাংবাদিক কালীপদ ঘোষ ৮৪ বৎসর বয়সে গত ২৭শে এপ্রিল তাঁহার হুগলী শ্রীরামপুরের বাসগৃহে পরলোকগগন করিয়াছেন। গত ৫০ বৎসর কাল তিনি কলিকাতায় সাংবাদিকের কাজ করিতেন। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব পর্য্যন্ত তাঁহাকে কাজ করিতে দেখা গিয়াছিল। সংবাদ সংগ্রহ কার্য্যে তিনি কখনও অসত্য আশ্রয় করেন নাই।

মোকামায় নূতন পুল—

গত ১লা মে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু মোকামায় গঙ্গার উপর নির্মিত ৬ হাজার ফিট লম্বা পুলের উদ্বোধন করিয়াছেন। ভারত রাষ্ট্রে এই পুল লইয়া গঙ্গার উপর ৯টি পুল হইল। (১) কাশীর নিকট মালব্য পুল (২) এলাহাবাদের নিকট ইজত পুল (৩) কানপুরে গঙ্গার পুল (৪) ফারাকাটতে কার্জন পুল (৫) রাজঘাট নাজোরায় গঙ্গাপুল (৬) গড়মুক্তেশ্বর গঙ্গাপুল (৭) বালাওয়ালি গঙ্গাপুল (৮) কাছিয়া গঙ্গাপুল ও (৯) মোকামায় রাজেন্দ্র পুল। নূতন পুল হওয়ায় উত্তর বিহারের সহিত দক্ষিণ বিহারের যোগাযোগের ব্যবস্থা হইল।

কোশী বাঁধের ভিত্তি স্থাপন—

গত ৩০শে এপ্রিল নেপাল রাজ্যের ভীমনগরে নেপালের রাজা মহেন্দ্র কোশী বাঁধের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন—১৬ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঐ বাঁধ নির্মিত হইবে। ২ লক্ষ নেপালী ও ভারতীয় উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। চাতবা নামক যে স্থানে কোশীনদী সমতল ভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছে, সেথান হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণে হনুমান-নগর নামক নেপালী সহরের নিকট বাঁধ নির্মিত হইবে। ঐ স্থানে নদী ৪ মাইল চওড়া। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহর-লাল নেহরু ঐ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। তাহা ছাড়া বিহারের রাজ্যপাল ডাক্তার জাকীর হোসেন, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম, কেন্দ্রীয় ডেপুটী মন্ত্রী শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ, বিহারের সেচমন্ত্রী শ্রীদীপনারায়ণ সিংহও ঐ উৎসবে যোগদান করেন। বাঁধ, খাল প্রভৃতি সব সম্পূর্ণ করিতে ৪৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ঐ স্থানে যে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হইবে, তাহার শতকরা ৫০ ভাগ নেপালে সরবরাহ করা হইবে। বহু জমী ঐ কার্য্যের ফলে সুজলা সুফলা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা—

গত ২২শে এপ্রিল বারাকপুরে বারাকপুর ও কল্যাণী কর্মনিয়োগ কেন্দ্রের উপদেষ্টা কমিটীর সভায় পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী শ্রীআবদাস সাত্তার জানাইয়াছেন যে পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের বেকার লোকের সংখ্যা ১২ লক্ষেরও অধিক। তাহাদের মধ্যে ১ লক্ষ ২৫ হাজার বেকার শিক্ষিত। বহু নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন সত্বেও বেকার সমস্যার সমাধান হইতেছে না। লোক আর কেহ গ্রামে বাস করিতে চায় না—সকলে সহরে চলিয়া আসিতে চায়—তাহাই বেকার সমস্যার প্রধান কারণ। সে কারণে কৃষির উপযুক্ত উন্নতি হয় না ও খাদ্য সমস্যা দিন দিন বাড়িয়া চলে। বেকার লোকদিগকে কৃষিমুখী করিয়া গ্রামে বাস করাইবার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে দেশের

এই ভয়াবহ বেকার সমস্যা দূর হইবে না। ঢেঁকী ও হাতে-চালানো তাঁত প্রবর্তন দ্বারা বেকার সমস্যা সমাধানের কথা শুনা গিয়াছিল—সে বিষয়েও উপযুক্ত চেষ্টা হয় নাই। কে ইহা করিবে, কেহই বলিতে পারেন না।

পল্লী পরিচর্চা কেন্দ্র—

গত ২৫শে এপ্রিল ভারতের খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীঅজিত-প্রসাদ জৈন শান্তিনিকেতনে পূর্বভারতের কৃষিগত অর্থনৈতিক গবেষণার জন্য নূতন ভবন "পল্লী পরিচর্চা কেন্দ্রে"র উদ্বোধন করিয়াছেন। বিশ্বভারতীর উপাচার্য্য শ্রীক্ষিতীশ-চন্দ্র চৌধুরী ঐ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। কেন্দ্রীয় কৃষি বিভাগ প্রদত্ত একলক্ষ টাকা দানে ঐ কেন্দ্রের গৃহ নির্মিত হইয়াছে। কৃষি উন্নয়নের জন্য পল্লী সমস্যার আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন। শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ঐ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ হইয়াছেন। ঐ গবেষণা কেন্দ্র পল্লীর কৃষি সমস্যা সমাধানের কারণ নির্ণয় করিয়া সে বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা সার্থক হইবে। জনগণকে কিভাবে গ্রাম-মুখী ও কৃষি-মুখী করা যায়, আজ দেশের তাহাই প্রধান সমস্যা।

পশ্চিমবঙ্গে লৌহ সরবরাহ—

কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৮ সালের এপ্রিল হইতে জুন এই তিনমাসের জন্য পশ্চিমবঙ্গে ৯৯৫২ টন লোহা সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছিল—১৯৫৯ সালের এপ্রিল হইতে জুন তিন মাসে পশ্চিমবঙ্গ ২০৬৪০ টন অর্থাৎ পূর্ব বৎসর অপেক্ষা ১১ হাজার টন বেশী লোহা পাইবে। তাহা (১) গৃহনির্মাণ (২) সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনা ও (৩) কারখানায় ব্যবহার—তিনটি কাজেই ব্যবহৃত হইবে। গত কয় বৎসর যাবৎ সিমেন্ট সহজে পাওয়া গেলেও লোহা দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় বহু লোক নূতন গৃহ নির্মাণ করিতে পারেন নাই। লোহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেলে বহু নূতন গৃহ নির্মিত হইয়া গৃহ সমস্যার সমাধান হইবে।

পরলোকে অধ্যাপক মোহিতকুমার ঘোষ

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক মোহিত-কুমার ঘোষ মহাশয় গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী অকস্মাৎ হৃদ্‌-যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাঁহার নিউ আলিপুরস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৮ বৎসর হইয়াছিল, মাত্র আড়াই বৎসর পূর্ব্বে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার স্ত্রী ও তিন পুত্র বর্তমান। মোহিতকুমার ছাত্রজীবনে বিশেষ কৃতী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি পরীক্ষায় তিনি বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। এম-এ পাস করিবার পর তিন বৎসর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির লেকচারার ছিলেন। ১৯২০ সালে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়া তিনি বিলাত গমন করেন এবং লণ্ডন স্কুল অফ্ ইকনমিক্স হইতে
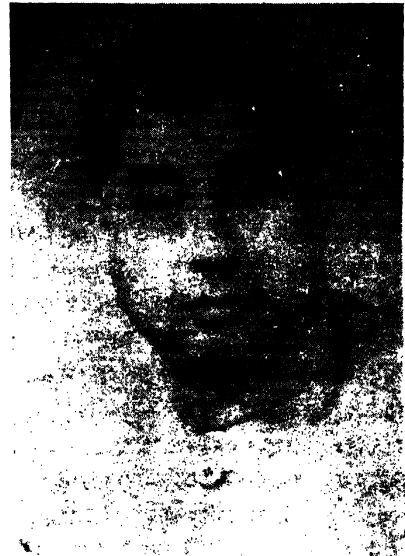
অধ্যাপক মোহিতকুমার ঘোষ

বি-কম্ ডিক্রী লাভ করেন। স্বদেশে ফিরিয়া ঐ বৎসরই তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের রীডার নিযুক্ত হন এবং কিছুকালের মধ্যেই ঐ বিভাগের কর্তৃত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। এদেশে বাণিজ্য বিষয়ক চর্চার তিনি একজন পথিকৃৎ ছিলেন। সাম্প্রতিক কালে যে সকল বাঙালী বাংলার বাহিরে থাকিয়া বঙ্গজননীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন মোহিতকুমার ঘোষ তাঁহাদের অন্যতম। দীর্ঘ ৩০ বৎসর কাল এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মধ্যে

তিন বৎসর, তিনি কলিকাতায় Govt. Commercial Institute এর অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯২৯ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ছয় বৎসর অন্তর ৫ বার তিনি অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ক ফ্যাকাল্‌টির ডীন নির্ব্বাচিত হন। অধ্যাপক ঘোষ কয়েকটি পুস্তক প্রণয়ন করেন এবং বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁহার কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সরল, অমায়িক ও অনাড়ম্বর মানুষ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা একটি সুসন্তান হারাইল। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

কবি রসরাজ সংবর্দ্ধনা—

কলিকাতার সুবিখ্যাত মল্লিক বংশের সুসন্তান রসরাজ শ্রীরাসবিহারী মল্লিক মহাশয়কে সম্প্রতি পুরীতে তত্রত্য বাঙালী উড়িয়া ও মাদ্রাজী সাহিত্যিকগণ কর্তৃক এক বিশেষ সভায় সংবর্ধিত করা হয় এবং কবিসূর্য মানপত্র প্রদান করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন আচার্য শ্রীত্রিলোচন মিশ্র। তিনি উচ্ছ্বসিত ভাষায় কবি রসরাজের কাব্যের প্রশংসা করেন এবং বলেন যে—আজ আমাদের সামাজিক জীবনের চারিদিকে নানা ক্লেদ নানা গ্লানি জমায়িত হইয়াছে। মানুষের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা প্রতি পদে ব্যাহত হইতেছে। কবি রসরাজ দরদী মন লইয়া সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার ব্যঙ্গ-কাব্যের মাধ্যমে সমাজের প্রত্যেকটি ত্রুটি দেখাইয়াছেন এবং তাহার কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। কবির সমাজ চেতনা ও মানব-মমত্ব অনস্বীকার্য। সভায় বহু জ্ঞানী গুণী ও মহিলা সমবেত হইয়া কবির দীর্ঘ জীবন কামনা করেন।

পশ্চিমবঙ্গের তীর্থ দর্শন—

কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই গত ৩রা মে রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের জন্মভূমি কামারপুকুর ও শ্রীশ্রীসারদামণি দেবীর জন্মভূমি জয়রামবাটী গ্রাম দুইটি দেখিতে গিয়াছিলেন। মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। গ্রাম দুইটি পূর্বে প্রায় দুর্গম ছিল—বর্তমানে নূতন পথ নির্মিত হওয়ায় মোটরে তথায় যাওয়া যায়। উভয় স্থানেই শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কর্মীদের চেষ্টায় মন্দির ও গৃহাদি নির্মিত হইয়াছে। ঐ সকল স্থানকে অধিকতর আকর্ষণীয় করিতে হইলে ঐ সকল স্থানে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গড়িয়া তুলিয়া স্থান-গুলিতে যাহাতে অধিক সংখ্যায় লোক বসবাস করে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শ্রীদেশাই ঐ স্থানগুলি পরিদর্শন করার ফলে ঐ অঞ্চলগুলি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। নানাভাবে মানুষকে গ্রামের মধ্যে লইয়া যাইতে না পারিলে, দেশও সমৃদ্ধ হইবে না—সহরের লোকসংখ্যাও কমানো যাইবে না।

নলিনীনাথ মৈত্র—

খ্যাতনামা দেশসেবক ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহ-কর্মী নলিনীনাথ মৈত্র গত ২রা মে ৮১ বৎসর বয়সে কলি-কাতা সুখলাল কার্ণানী হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি মৈমনসিংহ টাঙ্গাইলের লোক ছিলেন ও ১৯২১ সালে ওকালতী ত্যাগ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি কিছুকাল ওয়ার্দায় গান্ধীজির আশ্রমেও বাস করিয়াছিলেন। বহুবার তিনি কারাবরণ করিয়াছিলেন।

নিমতিতা-ধুলিয়ান নূতন রেল—

গঙ্গার ভাঙ্গনে ধুলিয়ানের নিকট আজিমগঞ্জ বার-হোয়ারা রেলের একাংশ নষ্ট হওয়ায় রেল কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই নিমতিতা হইতে ধুলিয়ান পর্য্যন্ত সাড়ে ৫ মাইল নূতন রেলপথ নির্মাণ করিবেন। রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীপি-সি মুখোপাধ্যায় গত ২৮শে এপ্রিল কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ খবর দিয়া গিয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রী বারাসত বসিরহাট রেল নির্মাণ যাহাতে দ্রুত সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে শ্রীমুখোপাধ্যায়কে যত্নবান হইতে অনুরোধ জানাইলে তিনি ঐ বিষয়েও সত্বর ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। রেলের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক জমীদখল কার্য্য শেষ হইয়াছে। বারাসত বসিরহাট রেল নির্মিত না হইলে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের দুঃখকষ্ট দূর করার অন্য উপায় নাই।

স্বদেশব্রত—

১৩১৪ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বদেশব্রত লিখিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মদিনের সংখ্যায় ভূদানযজ্ঞ

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায়

—সানলাইটের অতিরিক্ত ফেণাই এর কারণ

S. 260-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।

সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে। উহা সর্বকালের উপযোগী—আমরা সেজন্য নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম—"আর কিছু না পারো, খবরের কাগজের সঙ্গে নিজের সমস্ত সম্পর্ক ঘুচাইয়া যে-কোন একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কোনোদিন ডাকিয়া কথা কহে নাই, তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, তাহার সেবা করো, তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে, সে জগৎ সংসারের অবজ্ঞার অধিকারী নহে। অজ্ঞান যাহাকে নিজের ছায়ার কাছেও ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে—সেই সকল ভয়ের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার বক্ষপট প্রশস্ত করিয়া দাও। তাহাকে অন্যায় হইতে, অনশন হইতে, অন্ধ সংস্কার হইতে রক্ষা করো। নূতন বা পুরাতন কোন দলেই তোমার নাম না জানুক, যাহাদের হিতের জন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছ, প্রতিদিন তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস ঠেলিয়া এক পা এক পা করিয়া সফলতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকো। ইহাতে লোকে যদি আমাদিগকে সামান্য বলিয়া ছোটো বলিয়া অপবাদ দেয়, উপহাস করে, তবে তাহা অম্লান বদনে স্বীকার করিয়া লইবার বল যেন আমাদের থাকে॥"

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—

খ্যাতনামা কবি, লেখক ও সাংবাদিক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় গত ১১ই মে সোমবার সকালে ৬৭ বৎসর বয়সে হঠাৎ তাঁহার কলিকাতা মাণিকতলার বাটীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। পূর্বদিন সকালে তিনি এক সভায় বক্তৃতা করেন ও বিকালে এক সভায় ভাষণ দিবার সময় অজ্ঞান হইয়া যান। ১৮৯২ সালে নদীয়া জেলায় তাঁহার জন্ম, কাটোয়াতে ও বর্দ্ধমানে শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি ডাক বিভাগে কাজ করিতেন ও ১৯৩৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি দীপালি সাপ্তাহিক ও মহিলা মাসিকের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ও অবসর গ্রহণের পর প্রায় ৪০খানি বই লিখিয়াছিলেন। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ সকল বিষয়েই তিনি সুলেখক ছিলেন। তাঁহার মত বন্ধু বৎসল, সদালাপী লোকের সংখ্যা কম।

শেষপথের পাঁচালি

.. সাধনাপ্রসাদ দাশগুপ্ত এম-এ

সরকারী অফিসে কেরাণীর চাকরী পেয়ে গেলাম। সবাই বলে ভাগ্যটা ভাল। গবরমেণ্টের কাজ করা মানেই তো লিফটে ওঠা, দেখতে দেখতে দোতালা, তিনতালা এবং আরও উঁচুতে নিয়ে যাবে। ঢুকে দেখি, সহ-কর্মীরা সেই একতালায়ই পচ্চেন দশ পোনেরো বছর। মন দমলেও হাল ছাড়তে ইচ্ছা হয় না। উৎসাহ নিয়ে চেয়ারে বসি। পদোন্নতি আনতেই হবে জীবনে।

বিরাট অফিসের পেনসন বিভাগে কাজ। বেশ কয়েকজন কেরাণী এখানে। কর্ত্তব্য, অবসরপ্রাপ্তদের পেনসন দেওয়া। বড়বাবু বসেছেন ঘরের এক কোণে। অফিসাররা বসেন দূরে, ছোটো ছোটো ঘরে।

"এই বুড়োবাবু, ওধারে যাবেন না।" হুঙ্কার দিল কনষ্টেবল। ওখানে কাঁচা টাকা থাকে। পাহারা দিচ্ছে তাই দুজন সেপাই। চেয়ে দেখি, অতি বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক কেশিয়ারের ঘরের দিকে হাঁটছিলেন। ছফিট লম্বা তেজী নওজোয়ান কনষ্টেবল বাক্যাহত করে থামিয়ে দিয়েছে।

বৃদ্ধ যে এককালে লম্বা ছিলেন বোঝা যায়। তবে বয়সের ভারে এখন নুয়ে গেছেন অনেক। চুল সব সাদা, বড় বড়, আঁচড়ানো হয় না বলে সাধুদের মত জট বেঁধেছে। দাঁত একটাও নেই। চোখে পুরু চশমা। পা কাঁপছে, হাত কাঁপছে—আর কাঁপছে মাথাটা ঘাড়ের ওপর। একটু হাওয়া লাগলেই যেন পড়ে যাবেন।

মাথায় কুঁচকে-যাওয়া দোমড়ানো অতি পুরোনো টুপি, গায়ে ইস্তিরি-বিহীন খাকি হাপ-প্যাণ্ট আর নোংরা সার্ট। হাতে ছড়ি। পায়ে মোজা নেই, আছে কাবলী-সু।

এরকম অসহায় লোককে ওরকমভাবে ধমকানো উচিত হয়নি কনষ্টবলের। মনের কথাটা উপ-বড়বাবু কেষ্টবাবুকে বললাম। শুনে হেসে আকুল, বললেন, "বুড়ো দেখে অত উতলা হয়ো না ভায়া। পেনসন অফিসে কাজ করতে এসেছ। বুড়ো দেখে কুল পাবেনা।"

"তাই নাকি ?"

"হাঁ, ভায়া। আস্কারা দিয়েছ কি মরেছ। বুড়োদের সঙ্গে বাড়ীতে কেউ কথা বলে ? একবার কথা বলে দেখ, বক-বকানীর জ্বালায় অস্থির হবে। তার ওপর, জামা কাপড়ের আর গা-র গন্ধ তো আছেই।

"গন্ধ কেন ?"

"কজন স্নান করে ? অসুখ হবে না ? স্নান করলেও তো কাক-স্নান। আর জামাকাপড় ? ওদিকে একটু হুঁস থাকলে আমরা একটু শান্তি পেতাম।"

হেসেই চলেছেন কেষ্টবাবু। যোগ দিতে পারি না। চোখে ভাসে বড়দার শিশুটি। নিজের খাবার পরবার ক্ষমতা নেই। মানুষের সেই শৈশবাবস্থাই তো আবার ফিরে আসে বার্দ্ধক্যে। তাকে নিয়ে হাসবার কি আছে। কেষ্টবাবু কখনও বুড়ো হবেন না ?

এগিয়ে গেলাম। প্রশ্ন করি, ব্যাপার কি। কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট কোমলতা টেনে আনি।

"বলতে পার বাবা, এই বিভাগের বড়সাহেব কোথায় বসেন ? দেখা করতে চাই।" বড়সাহেবের চাপরাশী বসেছিল টুলে, বাড়ী উৎকলে, বটুয়া খুলে পানের ওপর চুণ দিচ্ছিল। বলি, "ইনির নাম লিখে বড়সাহেবকে দাও।" চাপরাশী শুনেও শুনল না। কর্ত্তার আরদালী সে। আমার মত কেরাণীর কথা শুনবে কেন। বৃদ্ধ তখন পকেট থেকে লম্বা কাগজ টেনে আনেন, লেখায় ভর্ত্তি, দরখাস্ত হবে হয়তো। চাপরাশীকে অনুরোধ করলেন, সাহেবের হাতে দিতে। চাপরাশী গম্ভীর হয়ে জবাব দিল, "সাহেবের হুকুম আছে, দেখা হবে না।"

পৃথিবী কেঁপে ওঠে। পাইপ টানতে টানতে, দুহাত

ট্রাউজারের দুই পকেটে ঢুকিয়ে, ভারে ভারে পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন খোদ বড়সাহেব। কোথায় নাকি যাবেন। আমরা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। বৃদ্ধ কিন্তু এগিয়ে গেলেন, বললেন, "আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম এই দরখাস্তটি নিয়ে।"

বড়সাহেব বয়সে ইনির আদ্ধেক। গতিতে বাধা এসেছে দেখে চোখ মুখ কুঁচকিয়ে দাঁড়ালেন। এর মাঝেই ভদ্রলোক তাঁর কাগজ কর্ত্তার হাতে দিয়েছেন গুঁজে। চোখ বুলিয়ে নিলেন একটু, তারপর দিলেন ছুঁড়ে মাটিতে। বললেন, "এসব সাধারণ ব্যাপার নিয়ে আমার সময় নষ্ট করছেন কেন? কেরাণীবাবুদের কাছে যান।"

কেষ্টবাবুর কাছে নিয়ে গেলাম তাঁকে। এতবছর কাশীবাস করছিলেন। আর ভাল লাগছে না, তাই ফিরে এসেছেন। এখন আমাদের এই অফিস থেকে যাতে পেনসনটা পান, সেই ব্যবস্থাই করতে তাঁর আগমন। মুখ না তুলে কেষ্টবাবু উত্তর দিলেন, "আপনার দরখাস্ত রাখলুম। দিনচোদ্দ পরে খবর নেবেন।" দরখাস্তটা পড়ে কাগজের গাদায় ছুঁড়ে কেষ্টবাবু কাজে মন দিলেন। হঠাৎ কেন জানি না কৌতূহল হল। দরখাস্তটা টেনে পড়ি, পড়ে হতবাক হয়ে চেয়ে থাকি। ইনি পুলিশের সুপারিনটেনডেন্টের পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। নামের আগে পেছনে অনেক উপাধি। এই লোককে একটু আগে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছিল এক কনষ্টেবল? যে টাকাটা ইনি প্রতিমাসে পেনসন পাচ্ছেন, সেই টাকাটা ঘরে তুলতে যে আমাদের মত লোকের লাগবে বছরের কাছাকাছি।

আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশসাহেব বলেন, "কনষ্টেবলের ব্যবহারে তুমি দুঃখিত হয়ো না। রক্তের গরমে অনেকে অনেক রকম কুকাজ করে। তারপর রক্তের আগুন যখন যায় নিভে, তখন জন্ম নেয় নতুন এক আগুন। অনুতাপের আগুন। সেই আগুনে আমি আজও জ্বলছি। সেই জ্বলনে যে কি জ্বালা, তোমাকে কি করে বোঝাবো বাবা। আগে যদি জানতুম, তবে অনুতাপ করবার কারণ জীবনে আনতুম না।"

পুলিশ সাহেবকে এগিয়ে দিলাম গাড়ীবারান্দা পর্য্যন্ত। আমি ধরে নিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বলেন, "এরকম অসহায় কিন্তু আগে ছিলাম না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অশ্বারোহণে জিলার এই প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্ত চষে ফেলেছি। কতবার আদেশ দিয়েছি, ফায়ার, সঙ্গে সঙ্গে কনষ্টেবলদের রাইফেলগুলো গর্জ্জে উঠেছে। চার্জ্জ-এর হুকুমও দিয়েছি অনেকবার। চোখের সামনে এখনও ভাসে, বন্দুকে সঙ্গীন চড়িয়ে সেপাইরা ধেয়ে চলেছে। আর আজ? পদ কত ক্ষণস্থায়ী। সেই পদের গর্ব্ব মানুষ করে। ছিঃ ছিঃ। দেহের কি পরিণতি। সেই দেহ নিয়ে মানুষের আবার তেজ। ছিঃ ছিঃ। আচ্ছা, বাবা, আজ তবে আসি।"

মাসের প্রথম দিকে আমাদের কাজ বেশী। দলে দলে বুড়ো নিজের নিজের দিনে এখানে পাশের ছুটো ঘরে বেঞ্চির উপর বসে থাকেন। নাম ডাকলে ছুটে আসেন, কাঁপতে কাঁপতে। কেউ নেন টাকা, কেউ বা চেক।

"রবিদাস পাল, রবিদাস পাল।" কোন উত্তর এল না। শুনলাম, প্রতিমাসেই নাকি দুচারজনের নাম ডেকেও কোন উত্তর পাওয়া যায় না। হেসে কেষ্টবাবু বলেন, "পটল তবে রবিদাস এতদিনে তুলল। কুড়ি বছর পেন্সন নিচ্ছে লোকটা। গবরমেণ্টকে ফতুর করবে।" আমি একটা বিপরীত কেস জানতুম। বলি, "কেন তা হবে। অটলবাবু যে মাত্র একবার একটি মাসের পেন্সন নিয়েছিলেন।"

অন্য নাম ডাকা হল। তারপর আরও নাম। এমন সময় টাল সামলাতে সামলাতে এসে হাজির রবিদাস পাল। ধমকে উঠলেন কেষ্টবাবু। মাথা চুলকিয়ে, একবার কেশে আর একবার চোখমুখ কাঁচুমাচু করে রবিদাসবাবু বলেন, "জানোই তো বাবা, ডায়েবেটিসের রোগী। তাই তো ঘনঘন ছুটতে হয় বাথরুমে।" আর একটা প্রচণ্ড ধমক দিয়ে কেষ্টবাবু বলেন, "আপনার পালা চলে গেছে। সবার হয়ে যাক, তখন ডাকব।"

"কিন্তু, বাবা, ডাক্তারের কাছে যাব।"

"তাই চলে যান। আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না। বুঝলেন?

রবিদাসবাবু মুখ মলিন করে একটু দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর আস্তে আস্তে ফিরে এসে নিজের সীটে বসলেন।

মুচকি হেসে আপন মনে কেষ্টবাবু বলেন, "ডিষ্ট্রিক ম্যাজিষ্ট্রেটের মেজাজ এখনও ছাড়তে পারেনি বুড়ো।"

"উনি ডিষ্ট্রিক ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন নাকি ?"

"হাঁ। তার ওপর রায় বাহাদুর, ইত্যাদি ইত্যাদি।"

"উনি কোন মেজাজ দেখিয়েছেন বলে তো মনে হচ্ছে না।"

"অন্ধ হয়ে বসে থাকলে দেখবে কি করে ?"

এককালে অগুন্তি দর্শনার্থীদের তিনি উপদেশ দিতেন, তাঁর মূল্যমান সময় নষ্ট না করতে। আজ তিনি সেই শুনলেন—কেরাণীর কাছে।

পেন্সনের কাজ চলেছে সমান ভাবে। একের পর একজন আসছেন। চারশ টাকার বন্দোবস্ত না করে কেউই যাচ্ছেন না। আমার এইদিকটায় কেবল উচ্চ-পদস্থদের নিয়েই কারবার।

দেবীপ্রসাদ রায় এসে থেমে গেলেন কেষ্টবাবুর কাছে।

"আপনি দেবীপ্রসাদ রায় ?" কি কঠিন কঠোর গলার স্বর।

"হাঁ।" বিনয়ী না হয়েই উত্তর দিলেন রায়।

"প্রমাণ।"

"প্রমাণ ?"

"হাঁ, প্রমাণ।"

"আমি মিথ্যা কথা বলছি ?

"বলতে পারেন।"

"আমাকে এরকম বলছেন। দেখে নেব।"

"জজিয়তি মেজাজ এখনও যায়নি দেখছি। মনে রাখবেন, এটা আপনার আদালত নয়। অন্য নাম ডাক হে।"

অন্য নাম ডাকা হল। ওধারে শুনতে পেলাম অন্যান্য পেনসন-ওয়ালারা রায়কে বোঝাচ্ছেন।

"বুঝেছেন, মশয়, আমরা এখন অস্তগামী সূর্য। গোল-মাল করলে টাকা পেতে দেরী হবে। ওতে একমাত্র আপনারই অসুবিধে।"

রায় শান্ত হলেন। হাতে কাজ ছিল না। বসলাম তাঁর পাশে। বলতে আরম্ভ করলেন নিজের কথা। সবে মাত্র তিনি বিচারকের পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। পাঁচ পাঁচটা লোকের প্রাণদণ্ডের আদেশ লেখা হয়েছিল তাঁর এই ডানহাত দিয়েই। তাঁর এই ডানহাতই প্রায় একশজনকে পাঠিয়েছিল পাঁচ থেকে বিশবছরের সশ্রম কারাবাসে। কত গণ্যমান্য লোককে ধরে এনে জরিমানা করেছেন আদালত অবমাননার অপরাধে। সেই লোককে কিনা মিথ্যাবাদী বলে দিল এক কেরাণী।

অবসর নেবার পরদিনই তিনি অসুস্থ হলেন। তাড়া-তাড়ি চলতে ফিরতে পারলেও দেখলেন, ডান হাত কিছুটা অবশ হয়ে গেছে। কলমকে তাই অন্য ভাবে ধরতে হয়। হাতের লেখাটা বদলালো বেশ, ঐ সঙ্গে সইটাও। তাঁর কাগজ-পত্রে যে সই আছে, ওর সঙ্গে মিললোনা তাঁর আজের সই। গোলমালটা তাই নিয়ে।

বড়বাবুর ডাকে কাজে বসতে হল। রায় সাহেব আর খানিকক্ষণ বসে চলে গেলেন।

বড়বাবুর সামনে ধূমপান চলে না। বাইরে এসে গাড়ী বারান্দার সামনে সিগরেট ধরিয়ে বসেছি। এমন সময় হেলতে দুলতে রায়বাহাদুর রবিদাস পাল এলেন। দুটো সিঁড়ি ভাঙতেই পা একটু ফসকে গেল। তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসে ধরে ফেলি।

"বাবা, বাবা, বাবা।" সাবেকী আমলের মোটর গাড়ী থেকে নেমে ছুটে এল এক আধুনিকা। ছোটো-খাটো স্বাস্থ্যভরা গঠন। সোনার মত রং। নিখুঁত একটি মুখ। ক্ষীণ-কটি ছাড়িয়ে নেমে গেছে লম্বা দুটো বেণী।

"না, না, আমার কিছুই হয়নি।"

গাড়ীতে উঠিয়ে দিলাম দুজনকে।

"বড্ড ভয় করছে। সঙ্গে এলে ভাল হয়। ভয়ঙ্কর একটা অনুরোধ করছি না তো ? বাবাকে আপনি না ধরলে যে কি উপায় হত।"

"যখন তখন অফিস ছাড়তে পারেনা কেরাণী। ঠিকানাটা দিন, ছুটির পর খোঁজ নেব।"

"আপনি তো বেশ স্পষ্টবাদী। এ রকম ছেলেই দেখে আমি অভ্যস্ত—যারা যা নয় তাই জাহির করতে ব্যস্ত। যেমন, যে শিকারের কিছু জানে না, সে আমাকে জানায়, সে বড় শিকারী। যে একাউনটেণ্ট সে পরিচয় দেয়, ডেপুটি একাউনটেণ্ট জেনারেল। আর আপনি জানিয়ে দিলেন আপনি কেরাণী। জানেন, এর কি প্রতিক্রিয়া হবে আমার মনে ?"

"বিরাগ। কিন্তু উপায় কই? না আছে ঢাল, না আছে তরোয়াল। কেমন করে বলি, মস্ত বীর আমি।"

ছুটির পর দাঁড়ালাম রায়বাহাদুরের বাড়ীর সামনে। দেখতে পেয়ে দৌড়ে এল মালতী। বিরাট বাড়ী। কিন্তু অবস্থা বড় মলিন। কুড়ি বছর আগে মালতীর মার চলে যাবার পর বাড়ী আর মেরামৎ হয়নি। ছেলেরা কাজ-কর্মে বিদেশে, মেয়েরা স্বামীর ঘরে। একা মালতী সামলায় সব দিক। মার ভাঙা তুলসী তলায় সে জ্বালিয়ে যাচ্ছে প্রদীপ। কিন্তু মালতীর পর?

চা খাচ্ছিলাম, কথা বলে চলেছে মালতী। বেড়িয়ে ফিরলেন রায়বাহাদুর। বলেন, "একদিন ছিল যখন লোকের জ্বালায় অস্থির হয়েছি। এখন কেউই আসে না আমার খোঁজ নিতে। ধন্যবাদ তোমাকে। আবার এসো।"

কয়েক দিন যাতায়াতের পর রায়বাহাদুর অনুরোধ করলেন মালতীকে গ্রহণ করতে। এ যেন চাঁদ হাতে পাওয়া। কিন্তু রাখব কোথায়? খাওয়াব কি? ব্যাপার বুঝে তিনি জানিয়ে দিলেন, থাকা খাওয়া এই বাড়ীতেই। কিন্তু আমি যে সামান্য কর্মচারী। তিনি বললেন, "ভয় পাচ্ছ কেন, বিভাগীয় পরীক্ষা পাশ করে ওপরে ওঠতে পারবে না? না পারলেও ক্ষতি নেই। আমার সবই তো রইলো মেয়ে-জামাইএর জন্য।"

দু-দিন সময় নিয়ে ভাবলাম, শুধু ভাবলাম। শেষে ঠিক করি, প্রস্তাব গ্রহণ করবই। এ যে রাজকন্যা আর অর্দ্ধেক রাজত্ব পাওয়া। পদে আমি ছোট। কিন্তু চেষ্টা করলে ওপরে উঠতে পারব না? ছুটে চলি। হেসে দরজা খোলে মালতী। চোখে-মুখে লজ্জা। বোধ হয় শুনেছে সব। মাথা নীচু করে বলে, "বাবা ঠাকুর ঘরে, ওপরে। আপনাকে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। চা আনছি আমি।" এই মেয়েটি আমার স্ত্রী হবে। এই বাড়ীর মালিক আমি হব। চেষ্টা করে পদোন্নতি আনব। কি আনন্দ, কি মজা। লাফাতে লাফাতে ওপরে উঠি।

তিনতালায় একটি ঘর। এই ঘরটাই ঠাকুর ঘর। দরজা খোলা। স্তব্ধ হয়ে গেলাম ভেতরের দৃশ্য দেখে। চোখ বন্ধ রায়বাহাদুরের, জল পড়ছে দু-গাল বেয়ে। আপন মনে আবৃত্তি করছেন:

"মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং, কুরুতনুবুদ্ধে মনসু বিতৃষ্ণাম।
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তম, বিত্তম তেন বিনোদয়চিত্তম॥
কাতব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াত তত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥
মা কুরু ধনজন যৌবনগর্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদম প্রবিশাশু বিদিত্বা॥
নিলনীদলগতজলমতিতরলং, তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম।"

মাথা ঘুরছে। আমি কোথায়? ঐ যে, ঐ যে, এক যুবক। ধেয়ে চলেছে। কে এই তরুণ? পেছনে পড়ে আছে স্ত্রী যশোদা আর মেয়ে। চিনতে পেরেছি। মায়া একে আটকাতে পারেনি। এর নাম বর্দ্ধমান মহাবীর জৈন। ঐ যে আর একজন, পাহাড় থেকে নামছে। একেও জানি। স্ত্রী যশোধরা আর পুত্র রাহুল ধরে রাখতে পারেনি এই তরুণকেও। এ যে আমাদের সিদ্ধার্থ। আবার কে যায়? শিবের মত সুন্দর। চিনেছি, চিনেছি, এ যে শঙ্করাচার্য্য। মার মায়া ঘরে রাখতে পারল না এই কিশোরকে। দু-হাত তুলে হরিনাম করতে করতে ওধার দিয়ে কে আসছে? বাঙলা একে ভালোভাবে জানে। এ যে নদীয়ার নিমাই, চলেছে নীলাচলে। মাতা শচীদেবী আর স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া কিছুতেই একে সংসারী করতে পারেনি।

ভারতের আকাশে বাতাসে লুকানো রয়েছে উদাসীনের বীজ। আমি না এসে পারলাম না এর অধীনে। দেহের এবং পদের কি পরিণতি তার প্রতিমূর্তি তো রয়েছে সামনে। তবে কেন এর মধ্যে যাব? কে মালতী? চিনিনা। পদোন্নতি? চাই না। পালিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াই। তারপর ছুটি। দু-হাত বাড়িয়ে মায়া ধরতে আসছে। সামনে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড। তাই ধরে দৌড়াই। তারপর? তারপর কেটে গেছে পঁচিশ বছরের এক যুগ। মঠে মন্দিরে তীর্থে আর গুহায় চলে চলে আজ এসেছে জীবনের শেষ দিন। কিন্তু মালতীর কথা ভুলতে পারছি কই। তাকে সব কথা না জানিয়ে গেলে ওধারেও শান্তি পাব না। কিন্তু এখন কি করে জানাই? ডাক্তার সাহেব, মালতীকে জানাবেন?

সন্ন্যাসীর কথা বন্ধ হল। ডাক্তার সাহেব মেজর সেন কলম আর লেখাটা পকেটে রেখে হাসপাতালের বাইরে এলেন।

শত শত তীর্থযাত্রী চলেছে দুঃখ কষ্টেভরা অমরনাথের পথে, দর্শনের আশায়। সঙ্গে যাচ্ছে মেজর সেনের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমান সামরিক হাসপাতাল। এক সন্ন্যাসী যাত্রী অসুস্থ হয়ে নিয়েছিলো আশ্রয় এই হাসপাতালে। তিনি আর উঠতে পারেননি। শেষ সময়ে তাঁর অনুরোধে মেজর সেন তাঁর শেষ জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন।

"কে?" দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ। একটু পরেই খোলে। দেখা গেল এক মহিলাকে। মাথায় কাঁচাপাকা চুল, চোখে চশমা। হাতে দুগাছি চুড়ী, গলায় সরু হার জামাইবাবু যে, হঠাৎ? সব খবর ভাল? এলেন কবে?

"ট্রেন থেকে সোজা আসছি! অনেক দিন তোমাকে প্রশ্ন করেও উত্তর পাই নি, কেন তুমি অবিবাহিতা আর কেন তুমি বাড়ী থেকে কোথাও যাও না। যার প্রতীক্ষায় ছিলে, তার শেষ জবানবন্দী এই যে। নাও, মালতী।"

মানবতার সাগর-সঙ্গমে, সুইডেনে আর সোবিয়েতে

শচীন সেনগুপ্ত

আগের বার মস্কো দেখে আসবার পর মডার্ণ রিভিউ কাগজে যে বিবরণী লিখেছিলাম, তাতে মস্কোকে ম্যাডোনার সঙ্গে তুলনা করেছিলাম। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তা করিনি। সত্যিই মস্কোর দিকে নিভৃতে কিছুকাল চেয়ে বসে থাকলে মস্কোর অমনই একটা রূপ মনের পটে ফুটে ওঠে। অনেক রুশী লেখকও মস্কোকে ওই রূপেই কল্পনা করেছেন। লেলিনগ্রাদ মস্কো থেকে অনেক বেশি সুন্দর। রুশ বিপ্লব শুরু হয় লেলিনগ্রাদে, সার্থকও হয় সেইখানে। জারদের উইন্টার-প্যালেস সেখানে, স্মলোনি সেখানে, অরোরা জাহাজও রয়েছে সেখানকার নেভার বুকে। ওই উইন্টার-প্যালেসে কেরেনেস্কির প্রভিশনাল গবর্ণমেণ্ট যখন বিপ্লবকে কি করে ব্যর্থ করা যায়, তাই নিয়ে গভীর গবেষণা করছিলেন, তখনই অরোরা জাহাজ থেকে বর্ষিত গোলা এসে পড়েছিল তাঁদের মন্ত্রণাকক্ষের ছাদ ফুটো করে, ওই উইন্টার-প্যালেসেই ঢুকে পড়েছিল বিপ্লবী জনতা প্রাসাদ-সংলগ্ন স্কোয়ার থেকে। স্মলোনির যে প্রাসাদোপম স্কুল-বাড়ীতে অভিজাতদের মেয়েরা পড়াশুনো করত, রেডগার্ডের উৎস হয়ে উঠেছিল যা, তারই একটি অপ্রশস্ত ক্ষুদ্র কক্ষে বসে লেনিন তখন বিপ্লব পরিচালনা করছিলেন। প্রথমে জারের অপসারণ, তারপর কেরেনেস্কির পলায়ন, রুশ বিপ্লবকে সফল করে তুলল প্রথমেই লেনিনগ্রাদে যেমন, তেমন লেনিনগ্রাদের ওই স্মলোনেভির ক্ষুদ্র কক্ষ থেকেই প্রচারিত হয় লেনিনের ঐতিহাসিক শান্তি ডিক্রী, আর কৃষকদের ভূম্যধিকার দেওয়া ল্যাণ্ড-ডিক্রী। কিন্তু তবুও লেনিনগ্রাদের প্রাকৃতিক, নাগরিক, বৈপ্লবিক এ বিস্ময়কর সম্পদপূর্ণ ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও লেনিনগ্রাদ মস্কোর মতো অন্তরের গভীরতম আবেগকে আলোড়িত করে না; অন্তত আমার মনকে করেনি। কেন করেনি, তা নিজেও বুঝতে পারি না। ভাবি, হয়ত চেকভের 'থ্রি সিষ্টার্স' আর তলস্তয়ের 'ওয়ার য়্যাণ্ড পীস'এর প্রভাব। আবার ভাবি, আলেক্সি তলস্তয়ের 'অর্ডিল' ত লেনিনগ্রাদকে অবলম্বন করেই শুরু হয়। ওই বই পড়েই ত রুশ বিপ্লবের এমন চিত্র পেয়েছি, যাতে করে আমার মনে হয়েছে লেনিন স্তালিন যদি চাইতেনও, তাহলেও রুশ বিপ্লবকে স্থগিত রাখতে পারতেন না। ও-কথা ট্রটস্কির 'রাশিয়ান রেভলিউশন' পড়েও বুঝিনি। অবশ্য কাউণ্ট তলস্তয় তাঁর 'ওয়ার এণ্ড পীস' উপন্যাসে তখনকার দুর্যোগ থেকে রুশের মুক্তির অনিবার্য্যতা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন নেপোলিয়ান মস্কোতে উপস্থিত হবার পর। মস্কো যেন বাংলার নবদ্বীপ, আর লেনিনগ্রাদ যেন কোলকাতা।

কিন্তু মস্কো লেনিনগ্রাদের কথা বিশদভাবে পরে বলব। উত্তরে চলেছি এবার। আগে সেই পথের কথাই বলে নি। এবার যাবার পথে আমাদের স্থান দেওয়া হয়েছিল মস্কোভা হোটেলে। সেবার ছিলাম ইয়োরোপীয়ায়। মস্কোভা হোটেল অন্যতম শ্রেষ্ঠ হোটেল। এখানে গরম ভাত গরম ঘি দিয়ে মেখে খাবার সুযোগ পেলাম। পরে যাঁরা যাবেন তাঁরা হয়ত শাক-শুকতো-বড়িভাজাও পাবেন। তত দিনে মঙ্গল-কাব্য ওদের ভালো করে পড়া হয়ে যাবে।

মস্কো শান্তি সংসদ হোটেলেই আমাদের একটি বিশেষ ভোজ দিয়ে আপ্যায়িত করলেন। খেতে হলে বক্তৃতাও করতে হবে, গাইতে হবে, বাজাতে হবে, পারলে নাচতেও হবে! বক্তা এবার আমাদের দলে অনেক ছিলেন। আর লীডারের কর্তব্য পালনের দায়ও এবার আমার ছিল না। কাজেই এবার আমাকে 'মাষ্টার জেনারেল অব এণ্টারটেইন-মেণ্টস'-এর কাজ করতে হয়। এ-ছাড়া এবার খাবার টেবিলে পাশেই পেলাম মাদাম কুপালোভাকে আর মিষ্টার চেলিসভকে—দুজনাই আগের বার বন্ধুত্ব দিয়ে আমাকে ধন্য করেছিলেন। মাদামের কথা টাসকেণ্ট প্রসঙ্গে আগেই লিখেছি।

মাদাম কুপালোভা সোভিয়েৎ শান্তি কমিটির একজন নেত্রী। তিনি যেমন স্নেহময়ী, তেমন শক্তিমতী। গতবার ছয় সপ্তাহকাল আমরা তাঁকে জ্বালিয়ে গেছি। কখনো তাকে ক্লান্ত বা বিরক্ত দেখিনি। তাঁর সম্বন্ধে আমি লিখেছিলাম যে, বিপ্লবোত্তর রুশ-নারীর তিনি একটি ফ্রেমিং ইলাষ্ট্রেশন, জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত! সত্যিই সংগঠনের অসাধারণ শক্তি তাঁর।

মিঃ চেলিসভ গতবার আমাদের হিন্দী-দোভাষীর কাজ করেছিলেন। তিনি ইংরেজীও ভালো জানেন। এখন মারাঠীও শিখেছেন। এখন তিনি মস্কো ওরিয়েণ্টাল ইনষ্টিটিউটে হিন্দী ভাষার ডিরেক্টর হয়েছেন। হিন্দী-রুশী শব্দকোষও তিনি একখানি তৈরি করেছেন।

মাদামকে কাছে পেয়ে গতবারে যাঁরা আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের সাহায্য করতেন, তাঁদের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। লিডা কোথায়? আন্দ্রে, মিশা, আঁরিয়েতা, তামারা? সকলের কথা তিনিও বলতে পারলেন না। নানা যায়গায় নানা কাজে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছেন। ইণ্টারপ্রিণ্টারদের বেশির ভাগই শিক্ষক-শিক্ষিকা। সকলেই কিছু সারা জীবন মাষ্টারী করে না, প্রয়োজন মতো অন্য-কাজেও কাউকে কাউকে সরিয়ে দেওয়া হয়। লিডা মস্কো রেডিওতে কাজ করছে, আন্দ্রেও তাই। অপর কারুর বিশেষ কিছু খবর পাওয়া গেল না।

সকলের খবর নিয়ে মাদামকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার খবর বল এবার।

—তোমাদের আসবার পথ চেয়ে বসে থেকে থেকে বুড়িয়ে যাচ্ছি।

—আমি কিন্তু তোমাদের পরশ নিয়ে-নিয়ে যৌবন ফিরে পাচ্ছি।

—তোমাকে দেখে তোমার কথা অবিশ্বাস করতে পারছি না।

চেলিসভ বল্লেন—আপ্ নও-যোয়ান হো গিয়া।

আমরা খাচ্ছি আর খোশ গল্প করছি, আর ওদিকে চলছে বক্তৃতা। আমরা বক্তৃতা শুনছিলাম না। তবে সকলের সঙ্গে মিলে তালি বাজিয়ে যাচ্ছিলাম।

তিকোনোভ উঠে দাঁড়ালেন—কবি তিকোনোভ, সোবিয়েৎ শান্তি কমিটির প্রেসিডেণ্ট। অত্যন্ত জনপ্রিয় কবি। তাঁর কবিতার বই সোবিয়েতে সবচেয়ে বেশি বিক্রী। তিনি বেশি কিছু বল্লেন না, শুধু আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

আমাদের পক্ষ থেকে পার্লামেণ্টের কংগ্রেসী-সদস্য গোবিন্দ রেড্ডী কৃতজ্ঞতা জানালেন। দেওয়ান চমনলাল আর ডাক্তার অনুপ সিংহও বল্লেন। তাঁরাও কংগ্রেসী দলের পার্লামেণ্টেরিয়ান।

ভারতীয় শান্তি কমিটির সেক্রেটারী পরমেশ্বরম এসে বল্ল—দাদাকে একটিবার মাদামের সান্নিধ্য ছাড়তে হবে।

একটা রোস্টেড হাঁসের ঠ্যাঙ চিবুতে চিবুতে জানতে চাইলাম—কেন?

—ভারতীয় শান্তি সংসদের পক্ষ থেকে কিছু বলতে হবে না?

আমি বল্লাম—পারব না। মুড্ নেই। তিন বছর পরে মাদামকে কাছে পেয়েছি, ভাই। একটু গল্প-গুজব করতে চাই এই ভিড়ের নিরিবিলিতে।

মাদাম বল্লেন—এইখেনে দাঁড়িয়েই বল, আমি তর্জ্জমা করব।

—থাক্ মাদাম, বক্তৃতা থাক্। ওঁরা যা বল্লেন, তারই ত প্রতিধ্বনি তুলতে হবে। তাতে করে বিশ্ব-শান্তি খুব বেশি এগুবে বলে মনে হয় না। উঠে দাঁড়িয়ে বল্লাম—এতক্ষণ আমরা জিহ্বাকে পরিতৃপ্ত করিছি সুখাদ্যের স্বাদ নিয়ে আর সুশ্রাব্য ভাষণ দিয়ে। এবার আমাদের শ্রুতিকে শান্ত করতে হবে। নইলে সে বেচারা বিদ্রোহ করবে। আর তাহলে আমাদের স্টকহোলমে যাওয়াই ব্যর্থ হবে, শত শত বক্তৃতা মাঠে মারা যাবে। আমি তাই প্রস্তাব করি ভারতীয় ডেলিগেশনে যাঁরা শিল্পি আছেন, তাঁরা অনুপম রুশী-আতিথেয়তার প্রতিদান স্বরূপ কিছু সঙ্গীত পরিবেশন করুন। উল্লাসধ্বনিতে ভোজগৃহ মুখরিত হোলো।

আমার ভরসা অজিত বসু আর শোভা চক্রবর্ত্তী। অজিতকে আগেই বলে রেখেছিলাম তার ঘর থেকে গীটারটা আনিয়ে রাখতে। সে সত্যিকারের শিল্পী মানুষ, হাত ধুয়ে বসেই থাকত। তার গীটার নিয়ে সে হোস্টের টেবিলের কাছে গিয়ে বাজনা শুরু করে দিলে।

শোভা চক্রবর্ত্তী দূরে বসে খাচ্ছিল। মুখ তুলতেই দেখতে পেল আমি তার দিকে চেয়ে আছি। সে সেইখান থেকেই সোপ্রাণোর সুর চড়ালে আমাকে কিন্তু গাইতে বলবেন না, শচীন দা।

আমি বল্লাম—অজিত বোসলেই তুমি উঠবে।

—না, না, আমি নার্ভাস হয়ে পড়েছি।

—অজিত সহজে বসবে না। হয়ত ধমকে ওকে বসিয়ে দিতে হবে। তুমি তৈরি হবার প্রচুর সময় পাবে, শোভা।

—মাপ করবেন। আমি কিন্তু টেবিল থেকে উঠে পালিয়ে যাব।

এ মেয়েকে নিয়ে কী করা যায়! নিজেকে এমন করে প্রচ্ছন্ন রাখতে ও চায় কেন?

আমার রাগটা পড়ল আমাদের জেনারেল-সেক্রেটারী রমেশচন্দ্রের ওপর। বল্লাম, ছাই একটা ডেলিগেশন এনেছ তুমি!

তিনি তাঁর স্বাভাবিক হাসি হেসে কোমল-কণ্ঠে বল্লেন—কেন, অপরাধটা দেখলে কোথায়?

—ডেলিগেশনে এমন একটি তরুণ আননি যে শোভা চক্রবর্ত্তীর রুদ্ধ হৃদয়-দ্বার খুলে দিতে পারে!

রমেশ বল্লেন—শোভাকে তুমিই রেকমেণ্ড করেছিলে। ওর স্বামীকে আনাও যে দরকার, তা ভাবনি কেন?

সত্যিই তা ভাবিনি। অজিত অবশেষে বাজনা শেষ করল। ভালোই বাজালে সে। সকলেই তালি বাজিয়ে তাকে সম্মান দিলে।

—গান, এবার একটা গান হোক্। হল থেকে দাবী উঠ্ল। শোভার দিকে চেয়ে দেখি সে অপর দিকে চেয়ে বসে আছে। মেয়েটা কি একগুঁয়ে। সকলে কত খুসি হোতো ও গাইলে। হঠাৎ ডাক্তার অনুপ সিংহ উঠে দাঁড়িয়ে গান ধরলেন। উনি যে গান গাইতে জানেন, তা আমার জানা ছিল না। বেশ গাইলেন উনি। বক্তৃতা হোলো, বাজনা হোলো, গানও হোলো যখন, তখন আর কিছু করবার রইলনা বলে খাওয়াও শেষ করতে হোলো।

পরের দিন বিকেলে আমরা রীগায় যাব ট্রেণে। রমেশচন্দ্র বল্লেন সকালে মিটিং বোসবে ভারতীয় ডেলিগেশনের।

—মিটিং ত ষ্টকহোলমে। আমি বল্লাম।

—সেখানে কি করব তাও ত ঠিক করতে হবে। তা ছাড়া সকলকে পরিচিতও হতে হবে ত।

সকালে মিটিং বোসল, পরিচয় হয়ে গেল; কে কোথা থেকে এসেছেন, কার কি এলেম। সেই মিটিংয়ে একটি কমিটি গড়া হোলো। সেই কমিটিই স্থির করবেন ভারতীয় ডেলিগেশনের কে কোন্ কমিশনে যোগ দেবেন, কোন কমিশনের দায়িত্ব কে নেবেন। পোলিটিকাল কমিশন, ইকনমিক কমিশন, কালচুরাল কমিশন, য়্যাটমিক এনার্জ্জি কমিশন প্রভৃতি। পোলিটিকাল কমিশনের দায়িত্ব পড়ল ডক্টর অনুপ সিংহের ওপর, ইকনমিক কমিশনের দায়িত্ব পড়ল কেরেলার আইন-সচিব ভি কৃষ্ণানের ওপর, কালচুরাল কমিশনের দায়িত্ব পড়ল আমার ওপর, য়্যাটমিক এনার্জ্জি কমিশন ষ্টকহোলমে পৌঁছে হবে ঠিক হোলো।

মিটিং শেষ হোলো লাঞ্চের সময়। লাঞ্চের টেবিলেই জানা গেল ডেলিগেশনে যাঁরা সাংবাদিক আছেন, তাঁরা আরো দু'দিন মস্কো থেকে যাবেন। খুরুশ্চেভ সাংবাদিকদের ইণ্টারভিউ দেবেন।

গোপাল হালদার জিজ্ঞাসা করলেন—থেকে যাবেন নাকি, দাদা?

—আমি যে সাংবাদিক, সে-কথা আজকার কোলকাতার ছেলে-মেয়েরাই মানবে না। নাটুকে হয়ে সবই যে হারিয়েছি! আপনি বরং থেকে যান। পরিচয়-সম্পাদকের মর্য্যাদা ওরা দেবে।

দিনের পর দিন প্রতিদিন...
রেক্সোনা সাবান
আপনার ত্বককে
আরও সুন্দর করে
যতবারই আপনি রেক্সোনা সাবান দিয়ে মুখ ধোবেন — আপনার ত্বক আরও মসৃণ, আরও মোলায়েম দেখাবে। তার কারণ, রেক্সোনায় আছে ক্যাডিল — অর্থাৎ কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার লাবণ্যকে সুন্দর করে এবং আপনার ত্বককে সুস্থ রাখে। রেক্সোনার সরের মত ফেনা মাখুন দেখবেন আপনার ত্বক প্রতিদিন আরও সুন্দর হয়ে উঠছে।
আপনার সৌন্দর্য্যের জন্যে··· রেক্সোনা
Rexona
BLENDED WITH CADYL

গোপাল বললেন—না, দাদা, আমিও থাকব না। চলুন এক' সঙ্গেই যাই।

কোলকাতায় এই গোপাল হালদারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার তেমন সুযোগ হয়নি। মাঝে-মাঝে নানা ধরণের মিটিংয়ে যা দেখা হোতো। আমি ও'র অনেক বই পড়িছি। কিন্তু উনি আমার কোন নাটকের অভিনয় দেখেছেন কিনা জানিনা। কিন্তু এবারকার সফরে ও'র চিত্তের মাধুর্য্য আর উদার দৃষ্টির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি। সর্ব্ব বিষয়েই ও'র এমন একটা সংযম আছে এবং এমন একটা সম্ভ্রমবোধ রয়েছে, যা শ্রদ্ধা টেনে নেয়। আগের বার বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় আর আমি যেমন প্রায়ই হোটেলে আর রেলগাড়ীতে অংশীদার হতাম, এক সঙ্গেই বেড়াতাম, এবার সেই রকম গোপাল হালদার আর আমি প্রায়ই অভিন্ন থাকতাম। গোপাল-অনুরাগিণী গোপিকারা চটে যেতেন।

লাঞ্চের সময়েই জানিয়ে দেওয়া হোলো যে, প্রত্যেকেই যেন একঘণ্টার মধ্যেই নিজের নিজের সুটকেশ প্যাক করে ঘরের বাইরে রেখে দেন, এবং সাড়ে চারটার সময় যেন হোটেলের দরজায় অপেক্ষমান বাসে আসন গ্রহণ করেন।

বিকেল পাঁচটার সময় আমরা মস্কো শহরের রীগা ষ্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। মস্কোয়ের অনেকগুলি ষ্টেশন টার্মিনাসের নামে নাম করা হয়েছে। ষ্টেশনে গাড়ী তৈরিই ছিল। দুই বার্থের কুপে, আর চার বার্থের কামরায় এই কোরিডোর গাড়ীগুলো গঠিত। কথা ছিল, ডেলিগেশনে স্বামী-স্ত্রী যাঁরা আছেন, তাঁরা কুপেতে স্থান পাবেন। চমনলাল দম্পতীর জন্য তাই একটি কুপে রাখা হয়েছিল। কিন্তু মস্কোতে তাঁদের ছেলে এসে জুটলেন বলে তাঁরা চার-বার্থের একটি কামরা নিলেন, আর তাঁদের জন্য নির্দ্দিষ্ট কুপেটি দখল করে বোসলাম, আমি আর গোপাল হালদার। অনেকে ঈর্ষান্বিত হলেও কেউ আপত্তি করলেন না।

রাত আটটার মাঝেই 'সাপার' শেষ হবার পর সবাই যখন নিজ-নিজ কামরায় এসে বোসলেন, তখন আমি রোঁদে বেরুলাম। কামরায় কামরায় গিয়ে বললাম—বাইরে কাক জ্যোৎস্না। এমন সন্ধ্যায় ঘুমোনো অশোভন। তাই কোরিডোরে জলসার ব্যবস্থা হয়েছে। যাদের ইচ্ছে হবে, তাঁরা তাতে যোগদান করুন।

একে একে অনেকেই বেরিয়ে এলেন। শোভা চক্রবর্ত্তী, উমা সেহনবীশ, রমেশচন্দ্র, চিত্ত বিশ্বাস, মাদ্রাজের ফিল্ম ডিরেক্টর জানকীরাম, পিকিং বিশ্ব বিদ্যালয়ের হিন্দীর অধ্যাপক পি. প্রসাদ, রাজেশ্বর সরণ, তাঁর স্ত্রী বিমলা সরণ, পিকিং বিশ্ব বিদ্যালয়ের উর্দ্দুর অধ্যাপক খেতার আহম্মদ। শেষের চারজন আনন্দ সাইবেরিয়ান রেলে পিকিং থেকে সাত দিনে মস্কোতে এসেছিলেন। চারজনই তারুণ্যে ভরপুর, উৎসাহে প্রদীপ্ত।

শোভা এসেই বললে—এখন যত গান গাইতে বলবেন, শচীনদা, তত গানই গাইব।

—কোন রাজকুমার সোনার কাঠি বুলিয়ে রাজকুমারীর ঘুম ভাঙিয়ে দিলে, গো?

—তেমন কেউ বাধ্য করালে ত দুঃখ ছিল না। উমার গঞ্জনা আর সইতে পারলাম না।

—সাপিনী-নন্দিনীরা আজও তবে অসাধ্য সাধনে সুদক্ষা রয়েছেন? শোভা, উমা, সেহনবীশের ভ্রাতৃবধূ। উমা স্বল্পভাসিনী। কিন্তু অশোভন কিছু সইতে পারে না। কেবল তখনই সে মুখরা হয়ে ওঠে। সে শোভাকে বলত—গান গাইবিনে ত এলি কেন?

শোভাও কম যায় না। সে বলত—জলসায় ত যাচ্ছি না, যাচ্ছি শান্তি-কংগ্রেসে।

কিন্তু শোভা গান গাইল। একটি নয়, দুটি নয়, গানের পর গান, অগণ্য গান, রকমারি গান।

রীগ-এক্‌সপ্রেস ছুটে চলেছে কাক জোছনায় মোহে মত্ত হয়ে, চড়াই উৎরাই অগ্রাহ্য করে। দুপাশের পাইন বন ত্রস্ত হয়ে তার পথ করে দিয়ে সরে দাঁড়াচ্ছে, মাঠগুলো অসহায়ের মত স্তব্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে, নদী-নালাগুলো এঞ্জিনের দ্রুততর গতি দেখে আনন্দ উচ্ছলে উঠ্‌ছে, কৃষক কুটীরের আলোগুলো কৌতুহলে চেয়ে দেখ্‌ছে। রীগা এক্‌স্‌প্রেস সব কিছু উপেক্ষা করে ঘন ঘন বাঁশী বাজিয়ে ছুটে চলেছে। তারই কোরিডোরে দাঁড়িয়ে আমরা পনেরো কুড়িজন ভারতীয় নর-নারী গান গাইছি, আর জানালা দিয়ে চোখ ভরে দেখছি মৃদু জ্যোৎস্নালোকে অর্দ্ধোদ্‌ভাসিত স্বপনপুরীর নানা অস্পষ্ট রূপ। রাজনীতির কথা, জড়বিজ্ঞানের কথা, বাস্তবধর্ম্মী জীবনের কথা একটিও মুহূর্ত্তের তরে মনে পড়ল না। কোথায় যাচ্ছি যে, তাও ভুলে গেলাম। যেন চিরকাল এমনই চলে এসেছি, এমনই চলব চিরকাল। সে এক বিস্ময়কর অনুভূতি!

গান একা শোভাই গাইলনা। অধ্যাপক প্রসাদ হিন্দী গান গাইলেন, অধ্যাপক খেতার আহম্মদ গাইলেন উর্দ্দু গান, আর সরণ দম্পতি শোনালেন একখানা চীনা গান। তারপর শুরু হোলো কোরাস্‌। 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা' থেকে শুরু করে যত স্বদেশী যুগের গান জানা ছিল, একে একে সব গাওয়া হোলো। রাত নটা থেকে সকাল দুটো পর্য্যন্ত রীগা এক্‌স্‌প্রেসের কোরিডোরে দাঁড়িয়ে কেন যে সেদিন বিভিন্ন বয়েসের, বিভিন্ন অঞ্চলের, বিভিন্ন ভাষা-ভাষী ওই পঁচিশটি ভারতীয় নর-নারী অমন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন, আজ কিন্তু তাঁদের কেউ সে-কথা বলতে পারবেন না। কিন্তু সেদিন তাঁদের পক্ষে তা অনিবার্য্য হয়ে উঠেছিল। আর তাই হয়েছিল বলেই শোভা-নির্ঝরিনীর আকস্মিক স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল —ননদিনীর গঞ্জনায় নয়।

রাত সওয়া দু'টায় আমি বললাম—ওগো, সুবোধ ছেলে-মেয়েরা, রাতের যৌবন উত্তীর্ণ। যে যার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়। জলসা শেষ।

দুয়ারে করাঘাত শুনে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম সকাল সাতটা। ধীরে ধীরে দরজাটা একটু ফাঁক করে ফোক্‌লা মুখ হাসিতে প্রদীপ্ত করে রুশী-ষ্টুয়ার্ড জিজ্ঞাসা করল—চায়?

তাড়াতাড়ি উঠে বললাম—পাসিভা, পাসিভা।

ওপরের বাঙ্ক থেকে গোপাল করুণ কণ্ঠে বল্‌লেন—সত্যিই কি চা পাওয়া যাবে ?

—পাওয়া যাবে মানে ? ইতিমধ্যেই এসে গেছে। ওপরের বাঙ্ক থেকে নামবার বেঁটে সিঁড়িটা এগিয়ে দিলাম। কাঠ বেড়ালীর মত ক্ষিপ্রগতিতে গোপাল নেমে পড়লেন।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে গোপাল বল্‌লেন—ব্যবস্থাটা ভালো, বলুন।

—হবে না, আপনার রাষ্ট্র ত !

—তারপর স্বয়ং আমি আপনার সঙ্গে রয়েছি।

গোপাল কমিউনিষ্ট বলে রাশিয়া সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করতে হলে আমি বলতাম—আপনার রাষ্ট্র। গোপালও বলতেন—প্রতিবার কথা বলবার সময় নজরাণা দেবেন কিন্তু। চায়ের বাটীতে চুমুক দিতে দিতে একে একে অনেকে এসে কামরায় ঢুকলেন।

হন্‌ হন্‌ করে চিত্ত বিশ্বাস এগিয়ে এসে ধম্‌কে দিলেন—একি ! এখনো আপনাদের চা খাওয়া শেষ হয়নি।

—এক পেয়ালা সাবাড়। আর এক পেয়ালার আশায় রয়েছি। গোপাল করুণ কণ্ঠে বল্‌লেন।

—ব্রেক্‌ফাষ্ট টেবিলে আবার পাবেন ত। আটটায় ব্রেক্‌ফাষ্ট। সাড়ে নয়টায় আমরা রীগায় পৌঁছুবো।

পৌঁছুলামও তাই। লাতভিয়া রিপাবলিক সোবিয়েৎ রাষ্ট্রের সব চেয়ে পশ্চিম অঞ্চল। বলটিক সাগরের তীরে অবস্থিত রীগা তার প্রধান শহরও ; প্রাচীন শহরও বটে। ষ্টেশনে ভয়াবহ ভীড়। এর আগে কোন ভারতীয় ডেলিগেশন রীগায় আসেনি। পুষ্পবৃষ্টি শুরু হোলো। আমাদের মেয়েরাই হলো তাদের বিস্ময়। শাড়ী তারা আগে কখনো দেখেনি। ফুলের তোড়ার পর তোড়া তাদের উদ্দেশে অর্পিত হলো। রাণী রায়চৌধুরীকে, মনে হোলো, তার কিড্‌ন্যাপ করতে চায়। মাদ্রাজী ডেলিগেটরা ধূপকাঠি বিতরণ করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু ও-বস্তু কি, তা তারা জানে না। একটা জ্বেলে যেই দেখিয়ে দেওয়া হোলো, অম্নি শত শত হাত উঁচু হোলো। সকলেই একটি করে কাঠি চায়। মেয়েরা রেহাই পেয়ে বাসে উঠে পড়ল।

কথা ছিল ডেলিগেশনের অর্দ্ধাংশ সেদিন রীগায় থেকে যাবেন, ষ্টকহোলমে সকলের হোটেল-একোমোডেশন সুনিশ্চিত হয়নি বলে।

গোপাল জিজ্ঞাসা করলেন—থেকে যাবেন নাকি, দাদা।

—উত্তুরে হাওয়ায় মন ভেসে চলেছে, থামতে ইচ্ছে করছেনা।

গোপাল বল্‌লেন—আমরাও তাই।

যাঁরা সেদিন রীগায় থাকবেন, তাঁরা দু'খানি বাসে হোটেলে চলে গেলেন। আর দুখানি বাস আমাদের বয়ে নিয়ে চল্ল তাড়াতাড়ি শহরের যতটা দেখানো যায়, তাই দেখিয়ে দিতে। সুন্দর শহর রীগা। মধ্যযুগের স্থাপত্যের পাশে পাশে আধুনিক বাড়ী। শহর দেখতে দেখতে ইতিহাসের ঘটনাগুলো ভিড় করে স্মৃতিকে তোলপাড় করে দিল। যুদ্ধ আর যুদ্ধ। এই শহরের পৌনঃপুনিক ভাগ্য বিপর্য্যয়। অনশন আর প্রাচুর্য্য, মৃত্যু আর নবজীবন, নৈরাশ্য আর নব-সংগঠনের সঙ্কল্প পালাক্রমে এই শহরের মানুষদের অভিভূতও করেছে, উদ্‌বুদ্ধও করেছে। তবুও যখনই অবসর পেয়েছে, এর মানুষগুলি হেসেছে, গেয়েছে, নেচেছে, ক্রাইষ্টের গুণগান গেয়েছে, ব্যবসা বাণিজ্যে, কৃষিকাজে মন দিয়েছে, শিল্প সৃষ্টি করেছে, মোহিনী প্রকৃতির মনোহারিণী শোভা প্রাণভরে উপভোগ করেছে।

দগ্‌ভা নদের তীরে আমাদের বাস গিয়ে থামল। আমরাও নেমে পড়লাম। দগ্‌ভা নদ শহরটিকে দুভাগে ভাগ করেছে। একদিকে প্রাচীন, আর একদিক নবীন রীগা। আমরা রয়েছি প্রাচীন অংশে। দুটি সেতু দেখলাম। একটি কাঠের আর একটি লোহার। শেষেরটি রেল-পথ। কাঠের সেতুটি পথচারীদের যাওয়া-আসার জন্য অতীতে তৈরী হয়েছিল। এখনো শক্ত আছে। দারু শিল্পের সুন্দর নিদর্শন এই সেতুটি।

অনেকগুলি চর্চ্চের চূড়া দেখা গেল। একটি চার্চ্চ দেখবার আমন্ত্রণ পেলাম। রবিবার। উপাসনা তখন শুরু হয়ে গেছে। চার্চ্চের সাম্নেকার প্রশস্ত অঙ্গনে পৌঁছে আমরা নেমে পড়লাম। কয়েক ধাপ সিঁড়ি বয়ে নীচে নেমে চার্চ্চের প্রবেশ পথ পেলাম। স্বল্পালোকিত চার্চ্চে তখন প্রার্থনা চলছে। উঁচু পুলপিটে দাঁড়িয়ে পুরোহিত বাইবেল থেকে আবৃত্তি করছেন, মাঝে মাঝে গান হচ্ছে। একটি আসনও খালি নেই। অনেকক্ষণ আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। সমগ্র অনুষ্ঠানটি আমার বেশ ভালো লাগল। কেরালায় যখন গিয়েছিলাম, তখনো একদিন আমি চার্চ্চে গিয়েছিলাম, মস্কৌতেও। আমার ভিতরের সাকি মানুষটি মাঝে মাঝে বেরিয়ে এসে আমাকে ধাক্কা দেয়, না ধিক্কার দেয়, আজও তা বুঝতে পারলাম না।

চার্চ্চ থেকে বেরুতেই আমাদের নিয়ে যাওয়া হোলো একটি ওপন-এয়ার থিয়েটারে। মঞ্চটি প্রকাণ্ড, হাজার খানেক শিল্পী এক সময়ে তার ওপর অভিনয় করতে পারে। তার সাম্নে হাজার দশেক দর্শক বসতে পারে, সারি সারি এত বেঞ্চি রয়েছে। মঞ্চের পেছন দিকে ত্রিতল একটা বাড়ি। তাতে যেমন সাজঘর আছে, তেমন একটি মিউজিয়ামও আছে। সে মিউজিয়ামে লাত্‌ভিয়ার আধুনিক ইনডাষ্ট্রির নানা জিনিষ-পত্তর।

এই থিয়েটারে এসে শুনলাম রাত্রে একটি উৎসব আছে। সোবিয়েতের নানা রাষ্ট্র থেকে নাচিয়ে-গাইয়েরা সমবেত হবেন এবং নাচ গান করবেন। আফ্‌সোস হোলো। গোপাল বল্লেন—থেকে গেলেই ভালো হোতো। কিন্তু তখন আর কিছু করবারও ছিল না।

রীগার মতো ছোট শহরে ছয়টা থিয়েটার আর অপেরা হাউস আছে ; লোক সংখ্যা লাখও নয়। মিউজিয়ামও আছে তিন চারটি।

শহর দেখে লাঞ্চের সময় এয়ারপোর্টে উপস্থিত হলাম এবং সেই-খানেই লাঞ্চ খেয়ে বিশ্রাম করলাম। রীগা এয়ারপোর্টটি চমৎকার।

বেলা চারটার সময় আদেশ হোলো—প্রসীড টু দি এয়ারক্র্যাক্‌ট।

বলটিক সাগর অতিক্রম করে প্লেন চল্‌ল সুইডেনের দিকে। প্লেনে বসে একটি আপেল কামড়াতে কামড়াতে সাগরের দিকে চেয়ে নীল্মিমার সন্ধান পেলাম না। মনে হোলো ঢেউ তোলা দিগন্ত বিস্তৃত একখানা কাঁচের সীটের ওপর দিয়ে আমরা যেন উড়ে চলেছি।

দেড় ঘণ্টার মাঝেই ষ্টকহোলম চোখে পড়ল। যতদূর দৃষ্টি যায় বন-বনানীর ফাঁকে-ফাঁকে লাল টালির ছাদ। তার যেন আর শেষ নেই। কতগুলি পাহাড়ী-দ্বীপের সমষ্টি হচ্ছে ষ্টকহোলম শহর। ক্রমশঃ

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রথম জীবনে আমরা রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে দেখিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভায় তাঁহাকে দেখিয়াছি—রিপণ কলেজে দেখিয়াছি—একবার তাঁহার পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটস্থ বাসগৃহে ও যাইয়া তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছিলাম। আমাদের যৌবনও ছাত্রজীবনের যুগে নানা ক্ষেত্রে নানা সুধীর আবির্ভাবে দেশ ধন্য হইয়াছিল—আমরাও সময় এবং সুযোগ পাইলে সে সকল মনীষীর সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করিতাম। বি-এ ক্লাসের ছাত্ররূপে পণ্ডিত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন মহাশয়ের গৃহে বাস করার সময় প্রায়ই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ও সুধী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের গৃহে যাইতাম। অধ্যাপক জানকীনাথ ভট্টাচার্য্যের অধ্যাপনা শুনিবার জন্য রিপণ কলেজে যাইতাম—কাজেই রামেন্দ্রবাবুকে বহু সময়ে বহুবার দেখিতে পাইয়াছি। অতি সাধারণ পোষাক পরা, খাঁটি বাঙ্গালী রামেন্দ্রসুন্দর ধুতি পরিয়া কলেজের অধ্যক্ষের কাজ করিতে আসিতেন। অবশ্য তাহাতে নূতনত্ব ছিল না—সে বৈশিষ্ট্য অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলাররূপে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় রক্ষা করিতেন। তখনও অসহযোগ আন্দোলনের যুগ আসে নাই—কাজেই সাহেবী পোষাক পরার রীতি পরিত্যক্ত হয় নাই।

ত্রিবেদী মহাশয় যেদিন (১৩২৬ সালের ২৩শে জ্যৈষ্ঠ) স্বর্গারোহণ করেন, সেদিনের কথাও বেশ মনে আছে। সে সময়েই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম কর্ণধার, সাহিত্যিকগণের সহৃদয় বন্ধু, অগ্রজ প্রতিম শ্রদ্ধাভাজন নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত পরিচয় ও ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হয়। তিনি যখন রামেন্দ্রসুন্দর সম্বন্ধে লেখা সংগ্রহ করিবার জন্য রামেন্দ্র-ভক্ত ও রামেন্দ্র-বন্ধুগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেন, তখনও প্রায় নানাস্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইত। তিনি ত কম লেখা সংগ্রহ করেন নাই—কর্মব্যস্ত বন্ধুগণের গৃহে বার বার যাইয়া ধরণা দিয়া তাঁহাকে লেখা সংগ্রহ করিতে হইত। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য পর্য্যন্ত কত লোকের লেখা তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীশিশিরকুমার মৈত্র কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, বিপিনবিহারী গুপ্ত, রমাপ্রসাদ চন্দ, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, গিরিশচন্দ্র বসু প্রভৃতির লেখা সংগ্রহ করার কাজ সহজসাধ্য ছিল না। তাহা ছাড়া খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা প্রভৃতির মত লোকের অর্থসাহায্য না পাইলে লেখাগুলি ছাপার ব্যবস্থা হইত না। নলিনীবাবু সত্যই অদ্ভুতকর্মী ছিলেন, তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তিনি অসাধ্য সাধন করিতে সমর্থ হইতেন। নানাস্থান হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি ৩১ পৃষ্ঠা ব্যাপী রামেন্দ্রজীবনী লিখিয়াছেন এবং ত্রিবেদী মহাশয়ের সহধর্মিণীর নিকট অনুমতি লইয়া ত্রিবেদী মহাশয়ের লিখিত 'সাহিত্য সম্মিলন' শীর্ষক ১৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ এই গ্রন্থের শেষে জুড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনি সে সময়ে এই কাজ না করিলে ৪০ বৎসর পরে আজ আমরা রামেন্দ্রবাবুর কথা এভাবে জানিতে পারিতাম না। নলিনীবাবু ১৩২৭ সালে 'আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর' নামক যে গ্রন্থপ্রকাশ করিয়াছিলেন, ৩৮ বৎসর পরে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র সাংবাদিক শ্রীমান সারদারঞ্জন পণ্ডিত তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়া দেশবাসী সকলের, বিশেষ করিয়া রামেন্দ্র-ভক্তগণের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থে ১৯০ পৃষ্ঠার মধ্যে বিভিন্ন লেখকের লেখা ১৪১ পৃষ্ঠা। বইখানির দাম ৫ টাকা, কলিকাতা—৬, ৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ডি-এম-লাইব্রেরী তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

সেকালে লেখা বিভিন্ন মনীষীর উক্তি নিয়ে কয়েকটি উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকের পরিচয় স্বরূপ প্রদান করিলাম। আজ রামেন্দ্রবাবুর কথা তাঁহার বন্ধু ও ভক্তগণের কথায় অতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—সেগুলি পাঠ করিয়া একটি মহৎ জীবনের আদর্শ লক্ষ্য করা যাইতেছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ঠিকই লিখিয়াছেন—"রামেন্দ্র দেশহিতের জন্য তিনটি অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন—একটি সাহিত্য-পরিষদ, একটি সাহিত্য-সম্মিলন, আর একটি সাহিত্য পরিষদের মন্দির।"

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় লিখিয়াছেন—"রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের মাধুর্য্য, হৃদয়ের ঔদার্য, চরিত্রের শুচিতা, তাঁহার বন্ধুবৎসলতা, অমায়িকতা, ও সদাশয়তার পরিচয় দিবার স্থান নাই, সময়ও নাই। তাঁহার প্রজ্ঞা বুদ্ধির তুলনা হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন—"প্রতিভার সহিত পূত চরিত্রের, কর্মনিষ্ঠার সহিত অবারিত আনন্দের অবাধ শুভসম্মিলনে রামেন্দ্রসুন্দরের জীবন সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। এইরূপ চরিত্রই বঙ্গদেশে সর্বকালে পূজিত হইয়া আসিয়াছে। ইহাই আমাদের সর্বকালের আদর্শ। আমাদের জাতীয় চরিত্র এইরূপ আদর্শেই গঠিত হইয়া উঠিয়াছে।"

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখিয়াছিলেন—"আমরা দীর্ঘকাল, প্রায় ২০ বৎসর, রামেন্দ্রবাবুর বন্ধুত্ব সম্ভোগের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। দীর্ঘকাল পরিষদের সম্পর্কে একযোগে কাজ করিয়াছি, কোনদিন রামেন্দ্রবাবুর উপর বিরক্ত হইবার কোন কারণ পাই নাই। মতান্তরের অবসর ঘটে

নাই ; কেন না রামেন্দ্রসুন্দর কখন অন্যায় মত পোষণ করেন নাই। পরিষদের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের যে সম্বন্ধ, তাহার স্বরূপ যাঁহারা দেখেন নাই, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না। তিনি বলিয়াছেন, ১৩০১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের স্থাপনাবধি তাহার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা বুঝাইবার ভাষা নাই। কেন না, রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না।"

পণ্ডিতপ্রবর জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য রামেন্দ্রবাবুর সহিত একই বৎসরে এম-এ পাশ করিয়াছিলেন এবং রিপণ কলেজে রামেন্দ্রবাবুর সহকর্মী অধ্যাপক ছিলেন—পরে তিনি কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহারই যোগ্য লেখা। আমরা তাঁহার অধ্যাপনা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম—রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলেজে রাষ্ট্রগুরুর মতই তিনি ছাত্রদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগাইয়া দিতেন—মাঠের বক্তৃতা দ্বারা নহে, কলেজ ক্লাসে অধ্যাপনার মধ্যে সুকৌশলে তাঁহার প্রচার কার্য্য চলিত। জানকীনাথ রামেন্দ্রসুন্দর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"স্বদেশ প্রীতিই আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের নিয়ন্ত্রীশক্তি ছিল। তিনি দেশসেবায় স্বেচ্ছাবৃত সৈনিক ছিলেন, লেখনী ছিল তাঁহার নির্বাচিত শস্ত্র। ভারতের অতীত গৌরবে গৌরববোধ করিতে ও বর্তমান অবনতিতে বেদনা পাইতে, তাঁহার মত আর কাহাকেও দেখি নাই। অতীত ও বর্তমানের এই সংমিশ্রণেই রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্য চেষ্টার বৈশিষ্ট্য। তাঁহার মধ্যে একদিকে ছিল ঋষিসন্তানসুলভ প্রশান্ত আধ্যাত্মিকতা, অপর দিকে ছিল, বর্তমান মুহূর্তের দ্বন্দ্ব কোলাহল, ক্রন্দন বিলাপের সজীব অনুভূতি। এই ভারত প্রেমের দ্বারাই তাঁহার জীবন চরিত ও কার্য্যকলাপ বুঝিতে পারা যায়। তাঁহাকে হারাইয়া আমরা যে একজন মহাপণ্ডিত বা অভিজ্ঞ শিক্ষক বা মহারথী সাহিত্যসেবক হারাইয়াছি, তাহা নহে; আমরা জাতীয় আদর্শের ভাবোন্মত্ত প্রচারকও হারাইয়াছি। ভারতের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক ভারতের নবভাবধারা আনয়নকারী ভাগ্য-নিয়ন্ত্রীবর্গের মধ্যে তাঁহার যথাযুক্ত স্থান নির্দেশ করিবেন।"

খ্যাতনামা সাংবাদিক ও পণ্ডিত, সুবক্তা পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রামেন্দ্রবাবু সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের সাধনা তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) ইউরোপের জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারের ভাগ ! ইউরোপের আধুনিক সায়েন্সে কি সব পদার্থ তত্ত্বের কি সব নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারই সমাচার তিনি বাঙ্গালী পাঠককে দিতে প্রথম যৌবনে উৎসুক হইয়াছিলেন। এই কার্য্যটি করিতে যাইয়া রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গলার গদ্যের ব্যাপ্তি ও ব্যঞ্জনাশক্তি শতগুণে বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। (২) তিনি ইউরোপের জ্ঞান বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে আমাদের ভারতবর্ষের দর্শনশাস্ত্র ও রসায়নাদি কষিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি ইউরোপ ও ভারতবর্ষকে তুলনার সমালোচনায় তুলিত করিয়া উভয়ের যাচাই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই যাচাই চেষ্টাও রামেন্দ্রের পক্ষে অপূর্ব। তিনি ইহাতেও তাঁহার প্রতিভার পরিচয় অতুল্যভাবে দিয়াছিলেন। কিন্তু এই তুলনায় সমালোচনা করিতে যাইয়া রামেন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতীয় সিদ্ধান্তের পুঁজি তাঁহার বড় কম। তিনি অমনি বেদ পড়িতে আরম্ভ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দর্শনশাস্ত্রেরও আলোচনা আরম্ভ করিলেন ও শেষে তন্ত্রের পরিচয়ও বেশ লইয়াছিলেন। (৩) তৃতীয় পর্য্যায়ে রামেন্দ্রের ব্রাহ্মণ্য-প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। এই সময়ে তিনি যে কয়খানি পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহার সাহায্যে বাঙ্গলার বিদ্বজ্জন সমাজকে তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ইউরোপের বিদ্যার মাপ কাঠিতে ভারতের বিদ্যা মাপিলে ছোট্ট ত হইবেই না, উপরন্তু ভারতে এমন অনেক জিনিষ আছে, অনেক ভাব আছে, যাহা ইউরোপের মাপ কাঠির বাহিরে ; ইউরোপ এখনও সে ভাব-জগতে প্রবেশ করিতে পারে নাই। বেদ সম্বন্ধে তাঁহার যে কয়টি সন্দর্ভ বাহির হইয়াছিল, তাহা এই ভাবেই ভরপুর এবং তেমন বৈদিক বিদ্যার পরিচয় দিয়া বৈদিক সন্দর্ভ ভারতবর্ষের আর কেহ লিখিতে পারেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।"

১২৭১ সালের ৫ই ভাদ্র জন্মগ্রহণ করিয়া ১৩২৬ সালের ২৩শে জ্যৈষ্ঠ তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার জন্ম শতবার্ষিক উৎসব করিয়া তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির নব সংস্করণ প্রকাশ করিলে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদের কথা লোক জানিতে পারিবে। তাঁহার কোন স্মৃতিসভারও অনুষ্ঠান হয় না। ২৩শে জ্যৈষ্ঠ তাঁহার মৃত্যুর পর ৪০ বৎসর পূর্ণ হইবে। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের বর্তমান কর্তৃপক্ষগণের সেদিনটি পালন করিয়া রামেন্দ্রসুন্দরকে সকলে যাহাতে স্মরণ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

আজ সকলকে তাঁহার সাহিত্য সাধনার কথা জানানো একান্ত প্রয়োজন। তৎকালীন রিপণ কলেজ ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁহার সেবা লাভ করিয়া সমৃদ্ধ ও ধন্য হইয়াছে। সে সকল প্রতিষ্ঠান তাঁহার কীর্তিস্তম্ভ হইয়া আছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যকে তিনি যাহা দান করিয়া গিয়াছেন—তাহাও সত্যই অতুল ! ২৩ বৎসর বয়সে প্রেসিডেন্সি কলেজে এম-এ পড়ার সময় তিনি অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবন' পত্রে প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পরে সাধনা, জন্মভূমি, দাসী, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শন, আর্য্যাবর্ত, মুকুল, উপাসনা, মানসী, ভারতী প্রভৃতি বহু পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ১৩০৬ হইতে ১৩১০ এবং ১৩২৪-২৫ সালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৩০৩ সালে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া তিনি 'প্রকৃতি' নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৩০৭ সালে তাঁহার পুণ্ডরীক কুলকীর্তি পঞ্জিকা নামে ফতেসিং জমীদারীর ইতিহাস প্রকাশিত হয়। ১৩১০ সালে দার্শনিক প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া জিজ্ঞাসা গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। ১৩১৭ সালে মায়াপুরী ও ১৩১৮ সালে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ সাহিত্য পরিষদ হইতেই প্রকাশিত হয়। ১৩২০ সালে চরিত কথা ও কর্মকথা, ১৩২১ সালে বিচিত্র প্রবন্ধ, ১৩২৪ সালে শব্দকথা এবং ১৩২৭ সালে যজ্ঞকথা ও বিচিত্র জগৎ—২ খানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১৩২৩ ও ১৩২৪ সালে ভারতবর্ষে তাঁহার যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত

হইয়াছিল, সেগুলি ঐ সময়ে বিচিত্র জগৎ নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তিনি ভূগোল ও বিজ্ঞান পাঠ নামেও ২খানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার লিখিত বহু প্রবন্ধ নানা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার সাহিত্য সাধনাই তাঁহাকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্ব দান করিয়াছে।

সাহিত্যকে তিনি কি দৃষ্টি লইয়া বিচার করিতেন, তাঁহার নিম্ন লিখিত লেখা হইতে তাহা বুঝা যায়—"বাংলা দেশের বাঙ্গালী জাতির ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, কিন্তু বাংলা দেশের অতি পুরাতন সাহিত্য আছে, সেই সাহিত্য বাঙ্গালীর পক্ষে অগৌরবের বিষয় নহে, এমন কি সেই সাহিত্য বাঙ্গালার পক্ষে একমাত্র গৌরবের ধন। * * * বাঙ্গালার ইতিহাস নাই বটে, কিন্তু এই সাহিত্য হইতে আমরা প্রাচীন বাংলার নাড়ী-নক্ষত্রের পরিচয় পাই।"

সর্বশেষে রামেন্দ্রবাবুর প্রাণের কামনা ও ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"সাহিত্য পরিষদের নূতন মন্দির বঙ্গের সাহিত্য সেবকগণের সম্মিলনের কেন্দ্রস্বরূপ স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহারা এই কেন্দ্রস্থলে সমবেত হইয়া সাহিত্যের উন্নতিকল্পে আলাপ ও পরামর্শ করিবার ও পরস্পর আত্মীয় সম্পর্কে আবদ্ধ হইবার সুযোগ পাইবেন। জ্ঞানান্বেষীগণ এই মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া নব নব তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত রহিবেন এবং দেশমধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার দ্বারা স্বদেশকে উন্নতিমার্গে প্রেরণ করিবেন। অতীতকালের মহাপুরুষগণের স্মরণ নিদর্শন সগৌরবে বহন করিয়া এই মন্দির বঙ্গবাসী মাত্রের তীর্থস্বরূপে পরিণত হইবে। অনাগত ভবিষ্যতে পরিষদের এই সকল ও অন্যান্য উচ্চ আশা যে পূর্ণ হইবে, পরিষদ এখন তাহার স্বপ্ন দেখিতেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য বর্তমানকালে বাঙ্গালীর একমাত্র গৌরবের বস্তু, এই পণ্ডিত জাতির যদি উদ্ধারসাধন হয়, তাহা সাহিত্যের বলেই হইবে, এ কথা ধ্রুব সত্য।"

পরাধীন বাঙ্গালী জাতি আজ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বপ্ন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাধনা প্রভৃতি সকল প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। এই স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামে বাঙ্গালার সাহিত্যিকগণের ও সাহিত্যের দান অবিস্মরণীয় হইয়া আছে। রামেন্দ্রসুন্দর সেই সংগ্রামীদের অন্যতম। স্বামী বিবেকানন্দের উদাত্ত বাণী হইতে আরম্ভ করিয়া কত কবিতা, কত গান, কত প্রবন্ধ স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিকদিগকে প্রেরণা দান করিয়াছে, তাহার সংখ্যাও নাই, হিসাবও নাই।

রামেন্দ্রবাবুর শেষ কামনা ও ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করিয়া বাঙ্গালী যেন গৌরবের অধিকার অর্জনে অগ্রসর হয়, আমরা রামেন্দ্রবাবুর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা প্রণাম জ্ঞাপন করিবার সময় সেই প্রার্থনাই জানাইতেছি।

আর কত দূরে

শ্রীপ্রবীরকুমার বিশ্বাস

কতদূর—আর কতদূরে—
তোমার গানের সভা মুখর নূপুরে?
বাজে রিনিঝিনি।
সপ্ত স্বরে তোলে তান তব বীণাখানি।
কাননে বসন্ত ঋতু কামনার ফুলের পরাগ
আবীরের গুঁড়ো হয়ে ঝরে ঝরে আনে অনুরাগ
পূর্ণিমার স্বপন মেখলা—
তোমার হৃদয় দেশে এনে দেয় যৌবনের মেলা।
ইন্দ্রনীল আকাশের সোনালী রেখায়
তোমার ফাগুন চিঠি দিকে দিকে অকাতরে
ছড়ায় বিলায়।
হৃদয়ের অন্তরের কাছে—
সমস্ত বিশ্বের প্রাণ টেনে নেয় সংগীতের মাঝে।
সে অগাধ প্রেমের সম্ভার
সে পেয়েছে কণামাত্র দানে—
তোমার করুণা দানে—
তৃষ্ণা তার নির্বাপিত, ছোটেনা সে মরীচিকা পানে।
কতদিন বিভাবরী জাগর হৃদয় মোর কাণ পেতে রাখে,
বুক পেতে থাকে
তোমার চরণখানি অসাবধানে যদি কভু পড়ে,
দুপায়ে নূপুর তব রুনু ঝুনু রুনুঝুনু সুরে
বেজে ওঠে চকিতে চমকে—
গমকে ঠমকে।
চলা গতি থেমে যায়, মিঠে হ'য়ে আসে আঁখি দিঠি
তারপর তোমার সভায় যাবার ফাগুনের
সেই রাঙা চিঠি!
হাতে দিয়ে বলে শুধু, একটিবার হে দেবী আমার
: এসো তুমি ফাগুনের গানের সভায়—
সেখানে সমস্ত বিশ্ব বাঁধা হ'য়ে আছে এক সুরে
অরূপ ললিত ছন্দ হৃদয়ের প্রেম অন্তঃপুরে।

হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

ফেরিওয়ালার সঙ্গে আলাপ জমিয়েছে নিবারণ। প্রয়োজনের তাগিদে যতখানি সে এগিয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশী তাগাদা তাকে দিয়েছিল অতসী···পুরুষ মানুষ, কুণে বেড়ালের মতন ঘরে বসে থাকলে অভাব কোনদিন মিটবে না। কাঙালের দুঃখ কাঁদলে ঘোচে না। মেহনৎ করতে হয়।···আমাকে না-হয় ভগবান বেবন্দে ফেলেছে।···মেয়ে-মানুষ। তার ওপর গতর ছরৎ খুইয়ে বসে আছি। ভিক্ মাগতে মন চায় না। খেটে খাবার গতরও নাই। কিন্তু তুমি?···আপনি?

নিবারণ উত্তর দেয়নি। কিন্তু ভেবেছে। অনেকবার ভেবেছে অতসীর কথাগুলো। তবুও ঠিক ভেবে উঠতে পারেনি কি সে করবে।

অতসী বেশী কথা কোনদিন বলে না। অল্পভাষী স্বভাব তার। কিন্তু নিবারণকে তাতিয়ে তুলবার জন্যে বারবার সে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছে: ধূলো বিক্রি করে একদিন চলে। চিরকাল চলে না।

নিবারণ চমকে উঠেছে: কি বললে?···ধূলো!

হাঁ, ধূলো। পথের ধূলো কুড়িয়ে লক্ষ বামুনের পদধূলি আর বিন্দাবনের রজ ব'লে গঙ্গাচানের ভিড়ে যাত্রী ঠকিয়ে-ছিলেন। একদিন চলেছে। রোজ রোজ সে চালাকি চলবে না।

কাণ পেতে নিবারণ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছে; ভাবতে পারেনি—কেমন করে অতসী টের পেয়েছে ওর কারবারের গোপন কথা।

অতসী থামেনি। আপন মনে বিড়বিড় করে বলেছে: জোচ্চুরি ক'রে নেশা-ভাঙ করা যায়, পেটের ভাত হয় না।

নিবারণ উত্তর দেবার আগেই অতসী পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে।

উঠানের ওপাশে পদ্ম চৌকাট ধরে দাঁড়িয়ে ছিল ঘরের সামনে। ওপরের কাটা-ঠোঁটের কোণটা নীচের ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে, আড়চোখে তাকিয়ে ছিল নিবারণের ঘরের দিকে।

গলির পথে কয়েক পা এগিয়ে হঠাৎ কি ভেবে অতসী আবার ফিরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল পদ্মর সামনে:

পদ্মদিদি!

কি?

পদ্ম হেসে ফেলেছিল অতসীর মুখপানে তাকিয়ে: নিবারণকে মানুষ না ক'রে ছাড়বি না দেখছি।

মানুষ সে ছিল পদ্মদিদি। কিন্তু নন্দা তাকে অধঃপাতের পথে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছে। দু-দিন পরে হয় পকেটমার হবে, না-হয়—

পাঁচসিকের একটা একতারা কিনে ভিক্ষেয় বেরোবে গেরুয়া প'রে। তোর পাল্লায় যখন পড়েছে, সহজে রেহাই পাবে না।

তাই।···ঝোঁকের মাথায় কি বলতে গিয়ে, অতসী নিজেকে সামলে নিয়েছে। পদ্মর ইঙ্গিতটুকু বুঝতে ওর দেরী হয়নি। তবুও কড়া জবাব দিয়ে পদ্মকে ও আর অসন্তুষ্ট করতে চায়নি।···দীনুকে যে পদ্ম সইতে পারতো না, তা নয়। সইতে পারতো না অতসীর কাছে তার থাকা। অতসী একটী দিনের জন্যেও চায়নি দীনুকে ভিকিরী করতে। কিন্তু উপায় ছিল না। আপনভোলা মানুষ। দিনের পর দিন না খেয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে। কলের জল খেয়ে, গোটা গোটা উপোসে দিন কাটিয়ে পড়ে থেকেছে ফুটপাতে, না-হয় কোম্পানী বাগানে। তবুও কারো কাছে হাত পাতেনি কোনদিন।···অতসী জানতো যে, দীনু না খেয়ে মরলেও ভিকিরীর মতন চেয়ে খাবে না কারো কাছে। দীনুকে যেদিন প্রথম সে পেয়েছিল,

সেদিনের কথা আজও অতসীর মনে জলজল করে। জোর ক'রে হাতে খাবারগুলো গুঁজে দিয়ে, রাস্তার কল থেকে এক বাটি জল এনে ধরেছিল তার সামনে।...ক'দিন উপোসী ছিল, ভগবান জানে! নইলে খাবারগুলো হয়তো ছুঁড়ে ফেলে দিত পাঁশকুড়ে।...যা হবার নয়, তা হয় না। যা থাকবার নয়, তা থাকে না। কতবার অতসী ধরে এনেছে সারা সহর খুঁজে। শান-বাঁধানো পথে কপালে চোট লেগে রক্ত ঝরে পড়েছে কাণশোপা বয়ে। তবুও বাড়ী ফিরবার নাম করেনি। হয়তো ফিরতোও না। আঁচলে রক্ত মুছিয়ে অতসী হাত ধরে ফিরিয়ে এনেছিল বাড়ীতে। নেক্ড়া পুড়িয়ে পলস্তারা করে দিয়েছিল। কিন্তু কিসের কি! পালাবার তালেই সে ছিল। শেষে এমন সময় ছিটকে পালিয়ে গেল যখন অতসীর উঠে দাঁড়াবার শক্তিটুকুও ছিল না।

কিলো! থমকে গেলি কেনে?...কি ভাবছিস অমন ক'রে?

কিছু না: অতসী ইতস্তত করেছিল।

তেরচা হাসির রেশ টেনে পদ্ম বলেছিল: দায়ের কাছে মন গোপন করিস না। মুখ দেখে পদ্ম পেটের ভাত গুণতে পারে।

তা জানি। ইচ্ছে করলে তুমি সবই পারো পদ্মদিদি। ...বলছিলাম কি, নিবারণের একটা হিল্লে করে দাও। ভদ্দরলোকের ছেলে। ভুল পথে পা বাড়িয়ে জাঁতিকলে এসে পড়েছে। হাতে এখনো যে দু'চার পয়সা আছে, তাই দিয়ে যদি পেলাস্টিকের খেলনা কিনে এনে পাড়ায় পাড়ায় বিক্রি করে, কোন রকমে দুবেলা দুমুঠো খেয়ে দিন কাটবে। নইলে—

নইলে তুই খাওয়াবি ভিক্ষে ক'রে। একটা মানুষ তো তোরও চাই!

না-না। আমার চাই না কিছু। সত্যি বলছি পদ্ম-দিদি। ঠাট্টা ক'রো না তুমি। নিবারণবাবুর একটা হিল্লে হলে আমি আমার পথ দেখে নিতে পারবো। মটর গাড়ীর ধাক্কা খেয়ে যে ক'দিন অচল হয়ে পড়েছিলাম, অনেক করেছে নিবারণবাবু। তার দেনা শুধতে পারবো না কোনদিন।...খোকা ছুটি দিয়ে গিয়েছে। এখন আমার ঝাড়া হাত-পা।

পদ্ম খোঁটা দিয়ে কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ অতসীর চোখে জল দেখে মনটা ভিজে উঠলো। হাত ধরে বললে: আয়, বসবি আয়।...ফেরিয়ালাকে বলবো, সে দোকান চিনিয়ে দেবে।

পদ্মর পিছু পিছু অতসী তার ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

এতদিন ওরা পাশাপাশি বাস করেছে, কিন্তু অতসী কোনদিন ঢোকেনি পদ্মর ঘরে। পদ্মকে এড়িয়ে যেতে পারলেই যেন সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচতো। পদ্ম ছিল মাণিক পেয়াদার আখড়ায় রাঁধুনি। দিনে রান্নার কাজ করতো। আখড়ার কানা-খোঁড়া ভিকিরীদের জন্যে শাকসিদ্ধ, খুদের জাও, আর লপসি রেঁধে রেখে সারাদিন এঘর-ওঘরে টহল দিয়ে বেড়াতো। রাতের আঁধারে ঘরের কোণে পিদিম জেলে রেখে মাণিক পেয়াদার চোখে ধুলো দিতো। আঁচল উড়িয়ে বেড়াতো বস্তির অন্ধকার আনাচে-কানাচে। অতসীকে কম হেনস্তা করেনি। দীনু যেদিন থেকে বস্তিতে এসেছিল, পদ্ম যেন ক্ষেপে উঠেছিল। থেকে থেকে চিলের মতন ছোঁ মারতো দীনুকে ছিনিয়ে নেবে বলে। অন্য বেটা ছেলে হলে ওর হাত থেকে রেহাই পেত না।

তুই বুঝি ভিক মাগা ছেড়ে দিবি?

হাঁ: অতসী নিস্পৃহভাবে উত্তর দেয়।

একটু থেমে পদ্ম নীচু গলায় বলে: তাই ভালো। কি লাভ দু'মুঠো চাল আর দুগণ্ডা পয়সার তরে লোকের দুয়োরে হাত পেতে! তুই ছুঁড়ি যে বোকা। নইলে তোর আবার ভাতের অভাব হয়। যাক গে, লোকটা যদি খেলনা বেচে দু'চার পয়সা ঘরে আনে, দুজন লোকের খাওয়া-পরা বেশ চলে যাবে।

হাঁ।

উত্তরটা সংক্ষিপ্ত ক'রে অতসী প্রসঙ্গটা শেষ করতে চায়। কিন্তু পদ্ম থামে না। নানা কথার ভিতর দিয়ে ঘুরে ফিরে নিবারণের সঙ্গে অতসীর অচ্ছেদ্য সম্পর্কটুকু প্রতিপন্ন করবার জন্যে যেন মরিয়া হয়ে ওঠে। সন্তুষ্ট না হলেও অতসী অসন্তুষ্ট হয় না। গা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে কোন রকমে পদ্মর সাহচর্যটুকু নিবারণের জন্যে ভিক মেগে নেয়। পদ্ম আত্মপ্রসাদে ভরে ওঠে।

নতুন কারবার সুরু করেছে নিবারণ। প্লাষ্টিকের খেলনা,

ঝুমঝুমি বাঁশী আর রকমারি পুতুল কিনে এনে এক-একদিন এক-এক রাস্তার-ফুটপাতে দোকান সাজিয়ে বসে। উদভ্রান্ত অবিশ্রান্ত চলাচল নানাশ্রেণীর লোকের কেউ কেনে, কেউ বা দর যাচাই ক'রে এটা ওটা নেড়েচেড়ে আবার নামিয়ে রেখে যায়। সারাদিনে যা বিক্রী হয় তাতে নিবারণের মন ভরে না। তবুও টাকা-পাচসিকে মুনাফা নিয়ে প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরে। যেদিন হাল্লায় ধরে, সিকি-দু'আনিটা গুঁজে দিয়ে আসিতে হয় ভোজপুরী হাল্লা দৈত্যের বাঁ হাতে। মনটা কুঁচকে যায়। দিনান্তের অবসাদ যেন অনেকখানি শ্লথ করে ওর ঘরমুখো পায়ের গতি।

অতসী!

কোন সাড়া আসে না অতসীর ঘর থেকে। কেরোসিনের কুপিটা নিবিয়ে অতসী হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে মাদুরখানা বিছিয়ে।

বেসাতির ঝোলাটা নামিয়ে রেখে নিবারণ একবার কাণ পাতে অতসীর রুদ্ধ দ্বারে।···কোন সাড়া শব্দ নাই।

কানিস্তারার দরজাটায় আস্তে আস্তে আঙুলের টোকা দিয়ে নিবারণ ডাকে: অতসী!

অতসী সাড়া দেয়। কিন্তু ওঠে না। হয়তো চোখ না খুলেই উত্তর দেয়: ঘরের কোণে শানকি-ঢাকা ভাত আছে মালসায়। তরকারি আজ ছিল না কিছু।··· দু'চার পয়সার তেলেভাজা কিনে এনে খেয়ে নেবেন।

তুমি?

আমি আজ আর খাবো না কিছু।

খাবে না?

না। শরীরটা ভালো নাই। সারাদিন রোদে ঘুরে মাথাটায় যেন হাতুড়ি পিটছে। নিবারণ ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, কি বলবে সে! তবে এটুকু অনুমান করতে দেরী হয় না যে, ভাতের চাল অতসীই ভিক মেগে এনেছে সারাদিন রৌদ্রে ঘুরে। একদিন নয়, দিনের পর দিন তা-ই করে অতসী। নিবারণকে চাল কিনতে দেয় না। হাতে পয়সা দিতে গেলে বলে: পয়সা এখন খরচ করবেন না। হাতে কিছু জমলে কারবারটা বড় হবে। ভদ্দরলোকের ছেলে, ভিকিরীদের আস্তানায় এসে শেষটায় আপনিও ভিকিরী হবেন। সেটা কি ভালো?

অতসীর কথার ওপর জোর করে কোন-কথা বলতে পারে না নিবারণ। ক্ষণকাল নীরব থেকে অনুনয়ের সুরে বলে: দিনের পর দিন না খেয়ে আর আধ-পেটা খেয়ে ক'দিন বাঁচবে অতসী?

অতসী হাসে। নিবারণকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে: আমার কথা ভাববেন না। মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মেছি, অত সহজে মরবো না। মরলে অনেক আগেই মরতাম। দিনের পর দিন না খেয়ে যখন মা-ভাই শুকিয়ে মরলো, রোগা বাপ অন্ধ হয়ে গেল, তখন তো কই মরিনি!···মরবার সুযোগ ভগবান দিয়েছিল যখন গাড়ী চাপা পড়েছিলাম। কিন্তু আপনি দিলেন না মরতে।···ওষুধ-বিসুধ আর দুধভাত খেয়ে দুদিনে চকচকে কপালটা আবার পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

অমন ক'রে মরে কি লাভ হতো শুনি?

লাভ!···বেঁচে কি আমার খুব বেশী লাভ হয়েছে!···

যাকগে সে কথা। আপনি বেঁচে উঠুন নিবারণবাবু! এই নরককুণ্ডে পড়ে আপনি যেন আর ডুবে যাবেন না।

নিবারণের সাড়া পেয়ে পদ্ম গায়ে-পড়া হয়ে এগিয়ে আসে: কি গো! আঁধারে ভূতের মতন দাঁড়িয়ে আছো কেনে? কুপিটা জ্বেলে দেবো?

উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই পদ্ম দরজা খুলে নিবারণের ঘরে ঢোকে। হাতড়ে কুলঙ্গী থেকে কুপিটা নামিয়ে নিয়ে পুঁটি গয়লানির ঘরের দিকে এগিয়ে যায় জ্বেলে আনবে বলে।

পদ্ম আজও তেমনি টুক কাটে। টিটকারি দিতে ছাড়ে না। কিন্তু অতসী কোন জবাব দেয় না। সন্তর্পণে বাঁশের সাঁকো বয়ে খাল পার হওয়ার মত পা টিপে টিপে পদ্মর পাশ কাটিয়ে চলে। পাছে, পদ্ম বিগড়ে গেলে নিবারণের ক্ষতি হয়। পদ্মই তো দিয়েছে নিবারণকে নতুন কারবারের সুযোগ-সুবিধে ক'রে।

ভিক-মাগা অতসীর আর ভালো লাগছিল না। কোন রকমেই যেন সে আর পারছিল না এই কদর্য

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করেন।

L. 273-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই কর্তৃক প্রস্তুত।

জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে। জীবনের কথা ভাবতে গিয়ে যেন মাঝে মাঝে ওর শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে।…কি লাভ! কি লাভ এমনি ক'রে জ্যান্ত মরার মত বেঁচে থেকে! বেঁচে থেকে! ওই তো দলে দলে আরও কত মানুষ বেঁচে আছে। ওরা পায়ে হেঁটে চলে! শিরদাঁড়ার হাড় ওদের কনকন করে না জলো বাতাস লেগে। চলে—ওরা চলে পায়ের পর পা ফেলে, হাসির ফিনকি ছড়িয়ে। পথের দুপাশে ছলকে পড়ে ওদের হাসি গল্প গান। মরতে ওরা আসেনি। তাই মরণের পথ তাকিয়ে ঘরের কোণে বসে থাকে না।…ও মরা মেয়ে মানুষ, তাই দীনুকে বেঁধে রাখতে চেয়েছিল বস্তির এই অন্ধকার ঘরে। ভূতের পুরীতে জ্যান্ত মানুষ এলে যেমন ক'রে ভূতগুলো তাকে আঁকড়ে চায়, তেমনি করে অতসী চেয়েছিল দীনুকে আঁকড়ে ধরে রাখতে।' কিন্তু, কেন থাকবে সে? আজও দিন তো তার ফুরিয়ে যায়নি। আবার বাঁচবে। আবার বাঁচবে দীনু, যেমন করে ধীরে ধীরে বেঁচে উঠছে নিবারণবাবু।

রাতের গভীরতা ঘন থেকে ঘনতর হয়ে ওঠে। বাইরের জগতে কখন কোলাহল থেমে গিয়েছে। কিন্তু অতসীর চোখে ঘুম নামে না! ভাবতে ভাবতে মগজের ভিতর কেমন একটা আগুনের শিখা যেন শীষিয়ে ওঠে। মনে হয় বুকের ভিতর খানিকটা রক্ত যেন টগবগ ক'রে ফুটছে!

বিছানায় পড়ে থাকতে পারে না। উঠে বসে। যন্ত্রচালিতের মত বাইয়ে গিয়ে দাঁড়ায়।…সারা বস্তি নিঝুম। অন্ধ কুঠে হুলো ভিকিরীগুলোও আর কাৎরায় না যন্ত্রণায়। ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছে সব।

নিবারণ ঘুমিয়েছে। ওঘরে ঘুমিয়েছে পদ্ম আর ফেরিয়ালা। পুঁটি গয়লানি ঘুমিয়েছে বাবাজীর সাত-তালি-দেওয়া ছেঁড়া কাঁথাখানার একপাশে। কোথাও কোন সাড়া নাই।

আস্তে দরজাটা ঠেলে অতসী নিবারণের ঘরে ঢুকে একবার দাঁড়ায়।…স্পষ্ট শোনা যায় নিবারণের নিঃশ্বাসের শব্দ। সারা দিনের শ্রান্তি নেমেছে ওর চোখে।

নিশ্চল প্রেতমূর্তির মত অতসী ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে থাকে নিবারণের বিছানার পাশে। তারপর পা টিপেটিপে আবার বেরিয়ে আসে। দরজাটা আস্তে আস্তে টেনে দিয়ে পদ্মর ঘরখানার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

সবাই ঘুমিয়েছে! কেউ আর জেগে নাই সারা বস্তিতে।

চালাঘিতে নেমে অতসী আর একবার থমকে দাঁড়ায়। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে গলির দিকে। কোথায় যাবে, তা সে নিজেও জানে না। তবু বেরিয়ে পড়ে। আর দাঁড়ায় না। গলি ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে নামে। একটিবারও পিছন ফিরে চায় নাবস্তিটার দিকে।

ক্রমশঃ

দূত

রত্নেশ্বর হাজরা

স্বর্ণ-রোদে-স্নান-করা পাখি
উড়ে গেল মহাশূন্যতায়—
আকাশ শুধায়:
'কে তুমি হে প্রাণ?
কেন এলে?'
বিহগ উত্তর করে:
'আমি দূত, মহাজীবনের
বার্তা দিতে এলাম
তোমায়।
তোমার দুয়ার খুলে দাও
মাটির আশিস্ লহ শিরে।'

আকাশ বিস্মিত হয়।
আবার শুধালে:
'কার ভালে
পৃথিবীর ছোঁয়া দিয়ে যাবে?'
উত্তর এবার:
'যুগান্তের অলক্ষ্য-তোমার।'

শ্রী'শ'—

॥ চলচ্চিত্রের চাহিদা ॥

ভারতীয় চিত্রের চাহিদা এদেশেই শুধু নয়, বিদেশেও যে বেড়ে চলেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিদেশের বাজারে ভারতীয় চিত্রের ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তা ও উপার্জ্জন থেকে। ১৯৫৬ ও ৫৭ সালে বিদেশে ভারতীয় চিত্র প্রদর্শন করে প্রায় দেড় কোটি টাকা আয় হয়েছে। শুধু তাই নয় এদেশীয় হিন্দী চিত্রগুলির প্রায় শতকরা পনের ভাগ আয় বিদেশের বাজার থেকেই হয়, আর চলচ্চিত্র রপ্তানিতে ভারতের স্থান বোধ হয় বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয়। তাছাড়া ১৯৫৭ সালের চলচ্চিত্র প্রস্তুতকারী দেশগুলির মধ্যে ভারত তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। ভারত প্রস্তুত করেছে ২৯৫টি, আর জাপান ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যথাক্রমে করেছে ৪৪৩ ও ৩৭৮টি। এদের পরে আছে হংকং (২১৭) ও ফ্রান্স (১৪২)।

তবে, বিদেশের বাজারে চাহিদা ও উপার্জ্জনের দিক থেকে ভারতীয় চিত্র মার্কিণ ও ব্রিটিশ চিত্রের তুলনায় এখনও অনেক পেছিয়ে আছে। কারণ, ভারতীয় চিত্র শুধু সেইসব দেশেই চলে যেখানে ভারতবাসীরা বহু সংখ্যায় গিয়ে বসবাস করছে ও যে সব দেশের আচার-ব্যবহার অনেকটা ভারতীয়দের মতন। তাই শুধু মধ্য-প্রাচ্য ও দূর-প্রাচ্যের দেশগুলিতেই ভারতীয় চিত্র প্রদর্শিত হয়। কিন্তু আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশগুলিতে ভারতীয় চিত্রের চাহিদা নেই বললেই চলে। যদিও "পথের পাঁচালী" প্রমুখ কয়েকটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার-প্রাপ্ত ভারতীয় চিত্র অধুনা পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সুনাম

সচ্চিদানন্দ সেন মজুমদার পরিচালিত "যাত্রী" চিত্রের একটি দৃশ্যে সবিতা, নতুনদি ও বীণাকে দেখা যাচ্ছে।

অর্জ্জন করেছে, কিন্তু কমার্সিয়াল্‌ভাবে প্রদর্শিত হয়ে বিদেশী অর্থ উপার্জ্জনে বিশেষ সফল হতে পারেনি। অবশ্য "পথের পাঁচালী" নিউ-ইয়র্কে ব্যাণিজ্যিক ভিত্তিতে অনেক সপ্তাহ ধরে প্রদর্শিত হয়ে ভারতীয় চিত্রনির্মাতাদের উৎসাহিত করেছে। আরও আশার কথা যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি, চিত্র-প্রযোজকগণ ও পরিবেশকদের নিয়ে একটি Film Export Advisory Committee গড়ে উঠেছে। এই কমিটি ভারতীয় চিত্রের রপ্তানি যাতে আরও বৃদ্ধি পায় তার জন্য চেষ্টা ও যত্ন করছেন।

ভারতীয় চিত্র বহুল পরিমাণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রদর্শিত হতে আরম্ভ করলে ভারতীয় চিত্রের আয়ই যে শুধু বাড়বে তাই নয়—ভারতীয় সংস্কৃতি, সাহিত্য, সভ্যতা প্রভৃতিরও প্রচার ও প্রসার হয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যের বৃদ্ধি হবে।

* * *

॥ রবীন্দ্র সাহিত্যের চিত্ররূপ ॥

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্প ও উপন্যাসকে ইতিপূর্ব্বে চিত্রে রূপদান করা হয়েছে। এর মধ্যে "কাবুলীওয়ালা" চিত্রটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জ্জনেও সক্ষম হয়েছে। এবারে রবীন্দ্রনাথের আরও চারটি বিখ্যাত গল্প, "ঘরে বাইরে", "গোরা", "ক্ষুধিত পাষাণ" ও "ডাকঘর"-কে চিত্রে রূপায়িত করবার আয়োজন হচ্ছে।

'ঘরে বাইরে'-র পরিচালনা ভার নিয়েছেন সত্যজিৎ রায়। নায়িকা বিমলার চরিত্রে অভিনয় করবেন সুচিত্রা সেন, আর প্রধান পুরুষ চরিত্র দু'টিতে অভিনয় করবেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও কালী বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিখ্যাত উপন্যাস 'গোরা'-র চিত্ররূপ দেবেন 'চিত্রাঞ্জলি পিক্‌চার্স'। সম্ভবত সুচিত্রা সেন সুচরিতার ভূমিকায় নামবেন, আর উত্তমকুমার থাকবেন নায়কের ভূমিকায়।

পরিচালক তপন সিংহর নবতম প্রচেষ্টা হবে অবিস্মরণীয় গল্প 'ক্ষুধিত পাষাণ'কে চিত্রে রূপদান। তিনি এখন সেই কাজেই ব্যস্ত আছেন।

আর, 'ডাকঘর'-এর পরিচালনা ও প্রযোজনা করবেন সুকুমার দত্ত। 'গ্রীন্ এণ্ড গোল্ড প্রোডাকসন্স' চিত্রটি নির্মাণ করবেন।

* * * *

খবরাখবর ঃ

পরিচালক তপন সিংহ তাঁর "ক্ষণিকের অতিথি" চিত্রটির কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন। চিত্রটিতে রাধামোহন ভট্টাচার্য্যকে অনেকদিন পরে এক চিকিৎসকের ভূমিকায় দেখা যাবে। নায়ক ও নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করছেন নির্ম্মলকুমার ও রুমা দেবী।

* * *

জে, এন্, পিক্‌চার্সের "উত্তরমেঘ" চিত্রটি জীবন গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, কমল মিত্র প্রভৃতি এতে অভিনয় করছেন।

* * *

"হাসপাতাল"-এর চিত্রগ্রহণ সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আরম্ভ হয়েছে। অশোককুমার ও সুচিত্রা সেন প্রধান চরিত্রদ্বয়ে অভিনয় করছেন।

* * *

নরেন্দ্র নাথ মিত্রের গল্প অবলম্বনে রচিত "আকাশের রং" চিত্রটিতে নায়িকার ভূমিকায় ইতালীয় চিত্র-তারকা Luisa Mattioliকে দেখা যাবে একটি ইতালিয় ভ্রমণকারিণীর ভূমিকায়—যে একটি বাঙালী তরুণের প্রেমে পড়েছিল। অন্যান্য ভূমিকায় অসিতবরণ, শোভা সেন প্রভৃতি আছেন।

* * *

"কামরূপ চিত্র"-র প্রথম অসমীয়া চিত্র "শকুন্তলা"-র পরিচালনা করবেন ভূপেন হাজারিকা। সঙ্গীত পরিচালনার ভারও তিনি গ্রহণ করেছেন।

* * *

প্রযোজক-পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের "হাত বাড়ালে বন্ধু"-র চিত্রগ্রহণ আরম্ভ করে দিয়েছেন। উত্তমকুমার, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস প্রভৃতি ভূমিকালিপিতে আছেন।

* * *

পরিচালক অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় "রায় বাহাদুর" চিত্রের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলছেন। প্রধান ভূমিকাদ্বয়ে আছেন কিশোরকুমার ও মালা সিন্‌হা।

* * *

'অমর বাণী চিত্র'-র প্রথম ছবি "ভুল"-এর কাজ শেষ হয়ে এসেছে। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, তপতী ঘোষ প্রভৃতি এতে অভিনয় করেছেন।

* * *

বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'সাহিত্য-তীর্থে'র প্রযোজনায় ও পরিবেশনায় বাংলা দেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিকবৃন্দ কর্তৃক প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত কৌতুক-নাট্য "উটরোগ" মহাজাতি সদনে অভিনীত হয়। অভিনয়ে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, মন্মথ রায়, স্বপন বুড়ো, মৌমাছি, মনোজ বসু, বারি দেবী, হিরণ্ময়ী বসু, প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করেন। সংগীত পরিবেশনে ছিলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক।

* * *

দেশে-বিদেশে ঃ

আগামী ২৬শে জুন যে নবম পশ্চিম বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন হবে তাতে এখন পর্যান্ত ৩৫টি দেশ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে এশিয়া ও আফ্রিকারও অনেক দেশ আছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—ভারত, পাকিস্থান, সিংহল, জাপান, ইউনাইটেড্ আরব রিপাব্লিক্, থাইল্যাণ্ড, দক্ষিণ কোরিয়া দক্ষিণ ভিয়েৎনাম্, তুরস্ক, টিউনিসিয়া প্রভৃতি। গত বৎসর ভারত তার "দো আঁখে বার হাত" চিত্রের মারফৎ এই উৎসবে দু'টি পুরস্কার লাভ করেছিল। এবারও ভারত একটি পূর্ণ দৈর্ঘের ও কয়েকটি ছোট চিত্র পাঠাবে।

* * * *

আগামী বৎসরের 'এশিয়ান্ ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল্'-এ ভারত প্রতিযোগিতায় যোগদান করবে বলে জানা গেছে। এর আগেও ভারত এই উৎসবে যোগ দিয়েছে কিন্তু প্রতিযোগী রূপে নয়, অতিথিরূপে—কোনও পুরস্কার গ্রহণে অধিকারী রূপে নয়। এই বৎসরের উৎসব Kuala Lumpur-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে, আগামী বৎসর টোকিওতে হবে।

* * * *

ভারতের কয়েকজন প্রগতিশীল চিত্র-নির্ম্মাতা ভারতের বাইরের দেশে আঞ্চলিক চিত্র-গ্রহণ করবার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁদের দৃষ্টি এখন সিঙ্গাপুরের ওপর পড়েছে। সিঙ্গাপুরের দৃশ্যাবলী ও পটভূমিকা ভারতীয় ও অ-ভারতীয় দর্শকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হবে বলে তাঁরা মনে করেন। চিত্র-নির্ম্মাতা শ্রীথাকার তাঁর আগামী চিত্র "কালা সোনা"-র চিত্র-গ্রহণ সিঙ্গাপুর শহরেই করবেন বলে জানা গেছে। চিত্রটিতে সুনীল দত্ত প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবেন এবং তাঁর বিপরীতে কোনও মালয় দেশীয়া অভিনেত্রীর অভিনয় করবার সম্ভাবনা আছে।

* * * *

বিদেশী খবর ঃ

বিশ্বের চলচ্চিত্র অনুরাগীরা জেনে সুখী হয়েছেন যে চার্লি চ্যাপ্লিন্ আবার তাঁর সেই বহু পরিচিত বাউলার টুপি পরিহিত, ছড়ি হাতে ছোট্ট মানুষটির সাজে একটি রঙ্গিণ চিত্রে অবতীর্ণ হবেন। ১৯৩৬ সালে "Modern Times" চিত্রের সময় চার্লি ঐ 'Little Man'-কে বিদায় দিয়ে তাঁর স্বরূপেই আত্মপ্রকাশ করেন। তার পর থেকে তাঁর অন্য চিত্রগুলিতেও তিনি স্বাভাবিক রূপেই অভিনয় করে আসছেন। সত্তর বৎসর বয়সে পদার্পণ করে চার্লি চ্যাপ্লিন্ জানিয়েছেন যে ঐ "Little Man"কে অপসারিত করে তিনি ভুল করেছেন, কারণ এই অত্যাধুনিক এ্যাটম্ যুগেও ঐ ছোট্ট মানুষটির দরকার আছে। তাই, তাঁর জন্ম দিনের উপহাররূপে বিশ্ববাসীকে ঐ ছোট্ট মানুষটির অভিনয় সংবলিত এই চিত্রটি উপহার দেবেন।

* * * *

Metro-Goldwyn-Mayer-এর বহু কোটি ডলার ব্যয়ে নির্ম্মিত "Ben Hur" চিত্রটিই M-G-M-এর সর্ব্ববৃহৎ চিত্র বলে ষ্টুডিও কর্ত্তারা মনে করেন। Ben Hur-এর বিখ্যাত chariot race ও সমুদ্র যুদ্ধের দৃশ্যগুলি অতুলনীয় হয়েছে বলে তাঁদের ধারণা। চিত্রটিতে যে সব আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তারকারা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে Charlton Heston, Jack Hawkins, Stephen Boyd, Haya Harareet, Martha Scott; Hugh Grffith প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। চিত্রটি এখনও সম্পাদনার স্তরে রয়েছে এবং এই বৎসরের শেষের দিকে নিউ-ইয়র্কে মুক্তি লাভ করবে।

* * * *

সাতচল্লিশ বৎসর বয়স্কা মার্কিণ চিত্রতারকা শ্রীমতী জিঞ্জার রজার্স'কে ব্রিটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশন (B.B.C.) তাঁদের টেলিভিশনে একবার মাত্র আত্মপ্রকাশ করার জন্য ২৫০০ পাউণ্ড পারিশ্রমিক প্রদান করবেন। B.B.C. আজ পর্য্যন্ত যত পারিশ্রমিক শিল্পীদের দিয়েছে তার মধ্যে শুধু একটি মাত্র শো-র জন্য Ginger Rogers-কে প্রদত্ত এই পারিশ্রমিকই সব চেয়ে বেশি। অবশ্য এই অঙ্কের মধ্যে যাতায়াত, হোটেল ও পোষাক-পরিচ্ছদ খরচাও পড়ছে।

*　*　*　*

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে—যাতে করে মার্কিণ কোম্পানীগুলি সাতটি সোভিয়েট চলচ্চিত্র কিনবেন এবং দশটি মার্কিণ চলচ্চিত্র রাশিয়াকে বিক্রয় করবেন। এই জন্য নিম্নের ছয়টি মার্কিণ চিত্র নির্ব্বাচিত করা হয়েছে : "Lili", "Roman Holiday", "The Old Man and the Sea", "Oklahoma", "The Great Caruso" এবং "Martyr". আরও চারটি চিত্র শীঘ্রই Sovexportfilms নির্ব্বাচন করবেন। নিম্নের চারটি সোভিয়েট চিত্রও নির্ব্বাচিত করা হয়েছে : "The Cranes Are Flying", "The Captains Daughter", "The Idiot" এবং "Swan Lake". অপর তিনটিও শীঘ্রই বাছাই করা হবে।

আরও ঠিক হয়েছে যে উভয় দেশই অপর দেশের চিত্রগুলি নিজেদের ভাষায় 'ডাব' করে বা সাব-টাইটেল্ যুক্ত করে নিজেদের দেশে প্রদর্শন করবে, আর কোনও চিত্রেরই বিষয়বস্তুর কোনও পরিবর্ত্তন করা চলবে না। তবে যদি কিছু অদলবদল করতেই হয় তাহলে সেই দেশের সম্মতি নিয়ে তা করতে হবে।

উপরোক্ত চিত্রগুলি ছাড়াও উভয় দেশের পনেরটি করে ডকুমেণ্টারী চিত্রও বিনিময় করা হবে। United States Information Agency এবং Soviet Ministry of Culture এই চিত্রগুলির চূড়ান্ত নির্ব্বাচন করবেন। দুইটি দেশের একটি কমিটি যুগ্ম-প্রযোজনায় ডকুমেণ্টারী চিত্র নির্ম্মাণ করার সম্ভাব্যতা নিয়েও আলাপ আলোচনা চালাবেন।

শিল্পীর কথা

'এস মদনমোহন বেশে নন্দদুলাল'

কুমারেশ ভট্টাচার্য

নাদরূপী ওঁকারধ্বনির মাধ্যমে অনাদিকাল থেকে চলে এসেছে সংগীতের ধারা এ বিশ্ব-জগতে—নিরবচ্ছিন্ন গতিতে। সংগীত অতি পবিত্র ও স্বর্গীয় সম্পদ। ভারতীয় সংগীতের আছে একটা বৈশিষ্ট্য—স্বাতন্ত্র্য। এ শুধু সুরের বহিঃপ্রকাশ নয়—ধ্যানের বস্তু। তাই ভারতের প্রকৃত সংগীত-সাধক আকুল হয়ে ওঠেন সুরব্রহ্মের পূজার ভেতর দিয়ে নিজেকে সমর্পণ করতে পরমপিতার চরণপ্রান্তে।

এই অমূল্য সম্পদ ভারতীয় সংগীতের ধারক ও বাহক হিসাবে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে বহু শতাব্দী থেকে। তাই বিষ্ণুপুর হয়েছে সংগীত-সাধনার অন্যতম পীঠস্থান এবং বাঙলার সুরতীর্থ। আজ পর্যন্ত বহু সুর-সাধক জন্মগ্রহণ করেছেন এখানে, সংগীত-সাধনায় লাভ করেছেন সিদ্ধি, খ্যাতি তাঁদের ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র ভারতে। তাঁদের অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে ভারতীয় সংগীত ভাণ্ডার। সংস্কৃত চর্চায়, কথকতায়, সংগীত সাধনায় এখানকার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের রয়েছে একটা বিরাট ঐতিহ্য—বিপুল খ্যাতি। উক্ত বংশের প্রত্যেকটি সন্তান যেন উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছেন সংগীতে সহজাত অধিকার ও অনুরাগ, ধন্য হয়েছেন সুরভারতীর আশীর্বাদ লাভে।

আজ থেকে ৫৮ বছর পূর্বের কথা। উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের দু'বছরের একটি সুন্দর শিশু একদিন হামা দিয়ে আস্তে আস্তে এসে উপস্থিত হয় বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে, যেখানে তার পিতা, পিতৃব্য এবং আরও দুচারজন প্রতিবেশী গান বাজনার চর্চায় রত। পিতা শ্রীপতিচরণ চমকে ওঠেন সে ঘরে শিশুপুত্রের এই অতর্কিত আগমনে, বিব্রত বোধ করেন সংগীতের ব্যাঘাত সৃষ্টিতে। পিতৃব্য কিন্তু স্নেহভরে তানপুরাটি এগিয়ে ধরেন শিশুটির হাতের কাছে। তখন সেই শিশুটি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে

তার ডান হাতের আঙুলগুলো বুলাতে থাকে তানপুরার উপর। ইতিমধ্যে সংগীতজ্ঞ পিতামহ রামকুমার ছুটে এসে তাঁর স্নেহের দাদুটিকে কোলে তুলে নিয়ে যান সেথান থেকে হাসতে হাসতে। পূর্বজন্মের সাধনা ও সুকৃতি আর ইহজন্মে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সংগীতের প্রতি অধিকার ও অনুরাগ অতি শৈশব থেকেই শিশুটিকে আকৃষ্ট করেছিল সংগীতের প্রতি। সেদিনকার সেই শিশুটি আর কেউই নয়, ইনি হচ্ছেন বাঙলার তথা ভারতের গৌরব, সুরের একনিষ্ঠ পূজারী, পরম উদারচিত্ত, বিশুদ্ধ-সংগীতের সংরক্ষক সংগীতাচার্য শ্রীসত্যকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৩০৬ সালের ভাদ্রমাসে এক শুভলগ্নে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহের চোখের মণি সত্যকিংকর তিন বছর বয়সে দাদুর গানের সংগে সংগে ঠাকুর-দেবতার গান ও বাউল গান গাইতেন নাচতে নাচতে। দাদুর কাছ থেকেই ক্রমশঃ তাঁর অন্তরে পুষ্টিসাধন হয় সুর ও ছন্দের। পাঁচ বছর বয়সে হাতেখড়ির সংগে সংগে শুরু হয় তাঁর পাঠশালার পাঠ—আর বাড়ীতে পিতার কাছে নিয়মিত চলতে থাকে ব্যাকরণ শিক্ষা ও সংগীত-চর্চা। ব্যাকরণ পড়তে বসে কিছুতেই তাঁর মনঃসংযোগ হত না, সুরের ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে যেতেন তিনি। দশ বছর বয়সে তাঁর উপনয়ন হয়। এ সময়ের মধ্যে তিনি পিতা ও পিতামহের নিকট ধ্রুপদ, খেয়াল ইত্যাদি প্রায় সত্তরটি গান শিখেছিলেন। পিতামহের কাছে সাগ্রহে তিনি শুনতেন রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প, শুনতেন ধ্রুব, প্রহ্লাদ, উপমন্যু প্রভৃতির আদর্শ চরিত্রের কথা। এদের কাহিনী গভীর রেখাপাত করে তাঁর কোমল অন্তরে। উপনয়নের কিছুদিন পরেই হঠাৎ তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়।

এ সময় তাঁর মেজকাকা সংগীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই নিযুক্ত ছিলেন বর্ধমান-মহারাজার সভাগায়করূপে। দাদুর ইচ্ছা, মেজকাকার আগ্রহ ও উত্তমরূপে সংগীত শিক্ষার স্বীয় উদগ্র বাসনায় দশ বছরের বালক সত্যকিংকর আসেন বর্ধমানে মেজকাকার বাসায়—উপযুক্ত গুরুর কাছে। বিপুল উৎসাহে চলতে থাকে বালকের সংগীত শিক্ষা ও সাধনা। বালকের অসাধারণ সংগীতপ্রতিভা ও গোপেশ্বরবাবুর আন্তরিক শিক্ষাদানের ফলে অল্পদিনের মধ্যে সত্যকিংকর আলাপ, ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ভজন, তেলানা ইত্যাদি সংগীতের উচ্চাংগ শ্রেণীর সমস্ত গানে হয়ে ওঠেন বিশেষ পারদর্শী। গোপেশ্বরবাবু সবাইকে বলতেন, অল্প দিনের মধ্যে কিংকর যে এমন সুন্দর ভাবে গাইতে পারছে তার প্রধান কারণ আমার উপর তার অপূর্বভক্তি, সাধনায় নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়। সেতার বাদ্যও তিনি শিক্ষা করেন গোপেশ্বরবাবুর কাছে।

বর্ধমান-মহারাজার উদ্যোগে একবার ঐ শহরে অনুষ্ঠিত হয় বিরাট এক সাহিত্য সম্মেলন। মহারাজার ইচ্ছাক্রমে

শ্রীসত্যকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

উক্ত সম্মেলনে দ্বাদশবর্ষীয় বালক সত্যকিংকর পরিবেশন করেন অপূর্ব সংগীত—শ্রোতৃবৃন্দ হন মুগ্ধ। মহারাজার পক্ষ থেকে উক্ত সম্মেলনের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অজস্র আশীর্বাদবর্ষণ ক'রে স্বহস্তে তার গলায় পরিয়ে দেন একটি সুবর্ণপদক।

এর কিছুদিন পরেই স্যার আশুতোষ চৌধুরীর সহধর্মিনী লেডী প্রতিভা চৌধুরাণী প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত

'সংগীত সংঘে'র বাৎসরিক উৎসবে যোগদান করতে গোপেশ্বরবাবু আসেন কোলকাতায়, সংগে আসেন সত্যকিংকর। উক্ত উৎসবে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন বহু সংগীতজ্ঞ, জমিদার, রাজা-মহারাজা। মেজকাকার নির্দেশে সত্যকিংকর ধ্রুপদ গান করেন উক্ত অনুষ্ঠানে। সংগীতে দ্বাদশবর্ষীয় বালকের অপূর্ব কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় বলেছিলেন; গান শুনে মনে হচ্ছে যেন যদুভট্ট আবার জন্মগ্রহণ করেছেন। তারপর মহারাজার অনুরোধে রাজকুমারকে সংগীত শিক্ষা দেবার জন্যে বালক সত্যকিংকর একাদিক্রমে ছয়মাস পর্যন্ত ল্যান্সডাউন রোডস্থ নাটোরের রাজবাটীতে অবস্থান করেন।

সত্যকিংকরের পিতামহ ভারতের বিভিন্নস্থান পরিভ্রমণ ক'রে কথকতা, ভাগবত পাঠ ইত্যাদির দ্বারা যা কিছু আয় ক'রতেন তা দিয়ে কোনপ্রকারে নির্বাহ হোত সংসার-যাত্রা। নাটোরের রাজবাটী থেকে এসে দাদুর সংগে বালক সত্যকিংকর ভারত ভ্রমণে বের হন—উভয়ের চেষ্টায় কিছু অর্থ উপার্জ্জন ক'রতে। সে সময়ে ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জলসায় ভারত-শ্রেষ্ঠ পাখোয়াজী শম্ভু-প্রসাদ মিশ্র বালকের সংগে পাখোয়াজ সংগত করেন। বালকের ধ্রুপদ ও ধামারের দুরূহ ছন্দ, অতীত, অনাঘাত ইত্যাদি লয়ের ক্রিয়া ও সুরের কলাকৌশল লক্ষ্য করে শ্রোতৃবৃন্দ হ'য়েছিলেন বিস্মিত, স্তম্ভিত ও মুগ্ধ।

১৯১৬ সালে লালগোলার মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন, একজন অতি সুদক্ষ প্রবীণ গায়ক ও বাদকের জন্যে। কিছুদিন পরেই গোপেশ্বরবাবুর আদেশে ষোড়শবর্ষীয় বালক সত্যকিংকর উপস্থিত হলেন মহারাজার দরবারে গায়ক ও যন্ত্রী হিসাবে যোগ্যতার পরিচয় দিতে। মহারাজা তো অবাক্! বালকের আপাদমস্তক লক্ষ্য করে অত্যন্ত কৌতূহল বশতঃ তিনি শুনতে চাইলেন তাঁর গান ও সেতার বাজনা। সত্যকিংকরের গান ও বাজনা শুনে তিনি মন্তব্য করেন, চোখ বুজে শুনলে মনে হয় যেন কোন প্রবীণ শিল্পীর কাছে বসে আছি, চোখ চাইলেই দেখি নিতান্ত বালক। তারপর সত্যকিংকর সেখানে নিযুক্ত হলেন প্রধান গায়কের সম্মানিত পদে। লালগোলায় থাকবার সময় মহারাজার খেয়ালে এবং নিজের প্রবল ঝোঁকে সত্যকিংকর এস্রাজ, তবলা, পাখোয়াজ, বাঁশী, ব্যাঞ্জো, জলতরংগ, ন্যাসতরংগ, সুরবাহার প্রভৃতি সমস্ত বাজনা নিজ প্রতিভায় আয়ত্ত করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এগুলোকে ভালভাবে রক্ষা করবার জন্যে তিনি শিক্ষা করেননি। তবে শিক্ষার পক্ষে তাঁর যুক্তি হোল, 'না শেখা থাকবে কেন ?' এ যেন শিল্পীর অপূর্ব প্রতিভার বিজয়নিশান উড়িয়ে দুর্গের পর দুর্গ জয় করবার মহা আনন্দ—পরম তৃপ্তি। লালগোলায় চার-পাঁচ বছর থাকবার পর সত্যকিংকর পঞ্চকোটের রাজার প্রধান গায়করূপে নিযুক্ত হন।

মাত্র ১৯ বছর বয়সে সত্যকিংকরবাবু বেনারসে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনে যোগদান করেন। সেখানে ধ্রুপদ গান গেয়ে ও সেতার বাজিয়ে সভাস্থ সকলকে করেন মুগ্ধ এবং লাভ করেন ভাতখণ্ডজী প্রভৃতি গুণীজনের অকুণ্ঠ প্রশংসা।

যখন প্রিন্স অব ওয়েলস্ ভারত পরিদর্শনে এসেছিলেন তখন কোলকাতায় তাঁর সংবর্ধনা উৎসবে তাঁরই ইচ্ছাক্রমে ভারতীয় সংগীতের ছয়রাগ ও ছত্রিশ রাগিনীর রাগ-রূপ প্রদর্শন এবং ছয়রাগ শোনাবার ব্যবস্থা হয়। এই ব্যবস্থায় ভারতের ছয়জন শ্রেষ্ঠশিল্পী নির্বাচনে পশ্চিম ভারতের তিন জন ও বাঙলার তিনজন বিশিষ্ট শিল্পী নির্বাচিত হয়েছিলেন। বাঙালী শিল্পী তিনজনের মধ্যে দুজন হলেন বিখ্যাত গুণী রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ও গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন একুশবৎসর বয়স্ক যুবক সত্যকিংকর। এঁর উপর ভার পড়েছিল 'মেঘরাগ' শোনাবার। তাঁর সংগীত প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তখন থেকে মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর সত্যকিংকরকে সভাগায়ক পদে নিযুক্ত করেন। এই রাজ-দরবারে থাকাকালীন হায়দ্রাবাদের নিজাম, গোয়ালিয়রের মহারাজা প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তাঁর গান-বাজনা শোনাবার সুযোগ পেয়ে তিনি বাঙলা ও বাঙালীর গৌরবই বৃদ্ধি করেছিলেন। সত্যকিংকর বিভিন্ন সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত নিখিলভারত সংগীত সম্মেলনে বহুবার যোগদান ক'রে প্রমাণ করেছিলেন সংগীতজগতে বাঙলার অগ্রগতি। প্রায় ৪০বৎসর পূর্বে বাঙালা গায়কদের ধ্রুপদেই ছিল অসাধারণ দক্ষতা, খেয়াল সংগীতে পশ্চিমী-

দের তুলনায় তাঁরা পিছিয়ে ছিলেন। বাঙালীদের এই পরাজয় কিছুতেই সহ্য করতে পারলেন না সত্যকিংকর। অপূর্ব প্রতিভার আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে এগিয়ে এলেন তিনি। তারপর দেখা গেল বাঙলাদেশেও খেয়ালী আছেন—এদেশে খেয়ালের নবযুগ প্রবর্তন করেন সত্যকিংকর।

একুশ বৎসর বয়সে কোলকাতায় অবস্থিত তদানীন্তন সংগীতের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় 'সংগীত সম্মেলনী'তে শিক্ষকতার পদ লাভ করেন তিনি। তাঁর সংগীত শিক্ষাদানের অপূর্ব পদ্ধতি অল্পদিনের মধ্যেই এখানকার বিশিষ্ট মহলে তাঁকে জনপ্রিয় ক'রে তোলে। গোখেল মেমোরিয়াল স্কুল, ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন, সেন্টমার্গারেট, ইউনাইটেড মিশনারী হাইস্কুল প্রভৃতি স্কুলের কর্তৃপক্ষ সত্যকিংকরকে সাগ্রহে সংগীত শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন। আজ প্রায় ১৮ বছর যাবৎ তিনি ডায়াসেসন স্কুলেরও প্রধান সংগীত শিক্ষকের পদে নিযুক্ত আছেন। নিজ প্রতিষ্ঠিত 'সংগীত শিক্ষাশ্রমে' আজ প্রায় ৩৩ বৎসর ধরে তিনি গড়ে তুলেছেন বহু শ্রেষ্ঠ সংগীত-শিল্পী। দেশবিখ্যাত পরলোকগত গায়ক জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী সত্যকিংকরের প্রেরণায়, উৎসাহে ও শিক্ষায় সংগীতজগতে প্রথম প্রবেশ করেন। সংগীত শিক্ষাদানকালে তিনি ছাত্রছাত্রীদের উপদেশ দেন, সংগীতজ্ঞদের আদর্শ হবে আত্মোন্নতি, ভগবদ্ভক্তি। গানবাজনার ভেতর দিয়ে এই ভাবটাই উপলব্ধি করতে হবে যে, গানবাজনা যেন ভগবানকেই শোনান হচ্ছে। তবেই হবে সংগীত শিক্ষা ও সাধনার সার্থকতা।

কোলকাতায় বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রথম কয়েকদিন উক্ত কেন্দ্রের ডিরেক্টার সাহেবের আগ্রহে ও স্বর্গীয় মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের ব্যবস্থাপনায় একমাত্র সত্যকিংকরই প্রত্যহ কয়েকবার করে নানাবিধ যন্ত্র ও কণ্ঠসংগীতের দ্বারা ভারতীয় উচ্চাংগ সংগীত পরিবেশন করেছিলেন এবং সেই সময় থেকে তিনি বেতার কেন্দ্রের প্রথমশ্রেণীর শিল্পীর মর্যাদা লাভ করে আসছেন।

দশবছর বয়স থেকেই তিনি বাঙলায় গান রচনার চেষ্টা করতে থাকেন এবং সংগীতগুরু গোপেশ্বরবাবু খুব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে উৎসাহিত করেন।

তাঁর এক সংগীতের ছাত্র অধ্যাপক শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য মশাই বললেন, গুরুজীকে কোন একটা রাগের নূতন ধরণের খেয়াল গান শেখবার বাসনা জানালে তিনি সংগে সংগে বেশ সুন্দর বন্দেজী গান রচনা ও স্বরলিপি করে শিখিয়ে দেন। গান রচনায় ও সংগে সংগে স্বরলিপি লেখায় তিনি সিদ্ধহস্ত। প্রয়োজনের তাগিদে বহুক্ষেত্রে হঠাৎ সময়োপযোগী বহু বাঙলা ও হিন্দীগান তাঁকে রচনা করতে হয়েছে। তাঁর রচিত ও প্রকাশিত 'সংগীত জ্ঞান প্রবেশ', 'সংগীতমুকুর', 'সংগীত ও কাহিনী', গ্রন্থগুলো সংগীত শিক্ষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে জনসমাজে সমাদৃত হয়েছে। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. মিউজ ও বি. মিউজের পরীক্ষকও নিযুক্ত আছেন সত্যকিংকর।

১৯৫০ সালে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত তানসেন সংগীত সম্মেলনে লোকবরেণ্য সংগীত নায়ক বর্ষীয়ান সাধক আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব যোগদান ক'রেছিলেন। উক্ত সম্মেলনে সত্যকিংকরবাবু ধ্রুপদ গান শেষ করে যখন উঠে দাঁড়িয়েছেন তখন খাঁ সাহেব নিজের আসন থেকে উঠে এসে সত্যকিংকরকে আবেগভরে আলিংগণ করেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। পুত্র আলিআকবর খাঁ কৌতূহলী হয়ে লক্ষ্য করছিলেন বৃদ্ধপিতার আকস্মিক ভাবাবেগ। তখন আলাউদ্দিন খাঁ সত্যকিংকরকে দেখিয়ে পুত্রকে বললেন, 'বর্তমান দিনে এঁরাই আচার্যস্থানীয়—এঁকে নমস্কার কর। কোলকাতায় যখনই আসবে এঁদের সংগে দেখা সাক্ষাৎ করবে।' জামাতা রবিশংকর সাগ্রহে বললেন, 'খুবই আশা করেছিলাম কনফারেন্সে ওঁর সেতার বাজনাও শুনতে পাব।'

১৯৫৭ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেস কমিটী দেশবাসীর পক্ষ হ'তে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সত্যকিংকরবাবুকে প্রদান করেন এক সুদীর্ঘ মানপত্র এবং সম্মানিত করেন 'সংগীত-সুধাকর' ও 'সংগীত-জ্ঞান-জলধি' উপাধি প্রদানের দ্বারা।

১৯৫৯ সালের ১০ই জানুয়ারী ভট্টপল্লীর পণ্ডিত সমাজ নৈহাটী সংগীত সমাজের মাধ্যমে মহাসমারোহে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রবীণ সংগীত সাধক সত্যকিংকরকে প্রদান করেন মানপত্র ও 'সংগীতশাস্ত্রী' উপাধি।

সত্যকিংকরবাবুর পাঁচটি পুত্রই লেখাপড়ার সংগে সংগে সংগীত সাধনাও করছেন নিয়মিত। এঁর জ্যেষ্ঠপুত্র

শ্রীঅমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ কণ্ঠ সংগীতে লাভ করেছেন বিশেষ পারদর্শিতা এবং গভর্ণমেণ্ট-প্রতিষ্ঠিত 'মিউজিক একাডেমীর' অধ্যাপক পদে নিযুক্ত আছেন। খেয়াল সংগীতে অমিয়বাবুর গায়কী ও তানের বিস্তার অভিনব।

সত্যকিংকর বহু সংগীত আসরে স্বরচিত যে সব বাঙলা খেয়াল গান করেন তার মধ্যে জয়জয়ন্তী রাগের 'নয়নে এসেছ তুমি মোর ওগো স্বামী', মালকোশ রাগের 'এস মদনমোহন বেশে নন্দদুলাল' কানাড়া রাগের 'ঝুলনে ঝুলিছে শ্যাম রায়', এবং ইমনের 'শূন্য গৃহে আজি কার পদধ্বনি বাজে' প্রভৃতি গানগুলি বিশেষ ভাবে স্থান পায়।

সংগীতজ্ঞদের সাধনা রক্ষাকল্পে তিনি বলেন, বর্তমানে যে সমস্ত উচ্চস্তরের গায়ক-বাদক আছেন তাঁদের প্রত্যেকের কয়েকটী ক'রে গান ও বাজনার টেপ রেকর্ডিং বা অন্য কোন স্থায়ী রেকর্ড করে রাখবার ব্যবস্থা করা উচিত প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের। তাহলে শিল্পীদের সাধনা হবে রক্ষিত, ভবিষ্যতেরও হবে কল্যাণ। আজ তানসেন, যদুভট্ট প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ গায়কদের শুধু বিরাট নামটাই আমাদের কাছে হয়ে আছে সম্বল।

সংগীত-সাধনার কথায় শিল্পী বলেন, "সংসার জীবনে সংগীতে শিল্প সাধনার কৃতিত্ব বড় বটে, কিন্তু তার সংগে অন্তর্জগতে সংগীতের অধ্যাত্ম সাধনা ও তপস্যা যদি না থাকে তাহলে সবই বৃথা হয়ে যায় বলে মনে হয়। একদিন গান গাইতে গাইতে এই অবস্থার কথা চিন্তা করে আকুল ভাবে কেঁদে ফেললাম। সেই সংগে কণ্ঠে আমার বেদনার মূর্তি নিয়ে বেরিয়ে এল এক গানের প্রার্থনা বাণী।

আসিতেছি গেয়ে যে কয়টি রাগ-রাগিণী
বৃথা গাওয়া হ'ল মন যে তোমাতে রাখিনি..."

কোন্ কোন্ রাগ গাইতে তাঁর ভাল লাগে জিজ্ঞেস করায় তদুত্তরে তিনি বলেন, ঠিক বুঝতে পারি না। যে রাগটা যখন গাই তখন মনে হয় সেই রাগটাকেই সারাজীবন ধরে সাধনা করে যাই। প্রধান রাগগুলোর শক্তি, সামর্থ্য ও মহিমা এমন যে, তাদের একটিকেই যদি সারাজীবন ধরে ধ্যান, চিন্তা ও সাধনা করা হয় তাহলেও শেষ হবে না তার অনন্তবিস্তারি রূপের।

সত্যকিংকরের কণ্ঠে আলাপ, ধ্রুপদ ও খেয়াল এবং সেতার বাদ্যে যে গায়কী ও বন্দেজ দেখতে পাওয়া যায়, যা কেবল পুরাণো ঘরোয়ানা থেকেই আসে—দুরূহ লয়দারী এবং অপূর্ব অলংকরণ ক্ষমতাসম্পন্ন বিচিত্র তানের সমাবেশ। এ যেন রাগের সৌন্দর্যময়ী মূর্তি রচনা করে তার মস্তকে নানা কারুকার্যখচিত স্বর্ণমুকুট পরিয়ে দেওয়া। তাঁর খেয়াল গানে ও সেতারে তানের অপূর্ব সমাবেশ দেখে বোদ্ধা শ্রোতার কেবলই মনে হবে ভারতের সকল স্থানের বৈশিষ্টপূর্ণ তানের যেন এক বিচিত্র প্রদর্শনী।

সত্যকিংকর সংগীতকে যে কি ভাবে ভালবাসেন, সুর-ব্রহ্মের স্থান যে তাঁর কাছে কত উচ্চে তা তাঁর জীবনে সংঘটিত বহু ঘটনার মধ্যে একটিমাত্র ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। বহু দিন পূর্বে একবার ভারতের কোন এক স্বাধীন মহারাজার সভায় আহুত হয়ে গান গাইতে গিয়েছিলেন তিনি। রাজ দরবারে বসল গানের আসর। শিল্পী দেখলেন, মহারাজার, তাঁর পারিষদবর্গের এবং বিশিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দের বসবার স্থান হয়েছে উচ্চে এবং সে তুলনায় গানের আসর সজ্জিত হয়েছে নিম্ন স্থানে। প্রতিবাদ করলেন সত্যকিংকর এ ব্যবস্থার। দৃঢ় কণ্ঠে তিনি বললেন, এ আসরে আমি গান গাইব না। সুরব্রহ্মের এমন অবমাননা হয় যেখানে, সেখানে আমার পক্ষে গান গাওয়া সম্ভব নয়। ইতিপূর্বে মহারাজা এরূপ উক্তি অন্য কোন শিল্পীর মুখেই শোনেন নি কোন দিন। বলা বাহুল্য, শিল্পীর ইচ্ছানুযায়ী গানের আসর উচ্চ স্থানেই পুনরায় সজ্জিত হল।

বর্তমানে সত্যকিংকরবাবুর বয়স প্রায় ৬০ বছর। আমরা আন্তরিকভাবে কামনা করি তাঁর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা এবং পারিবারিক শান্তি। আশা করি, তিনি আরও দীর্ঘকাল ধরে সুরব্রহ্মের পূজা করবেন এবং সংগে সংগে আত্মবিস্মৃত বাঙালী শিল্পীদের দেবেন সত্যিকারের পথের নির্দেশ—তাঁর শত শত ছাত্র-ছাত্রী দিতে শিখবে সংগীতের যথার্থ মর্যাদা।

গ্রহ জগৎ

আগামী ১৯৬২ সাল

উপাধ্যায়

মকররাশিতে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে আটটী গ্রহের একত্র সমাবেশ হবে। বিগত আটশো বছরের ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলে এরূপ গ্রহসমন্বয়ের ঘটনা পাওয়া যায় না। এক রাশি থেকে চারটী পাঁচটী গ্রহের একত্র অবস্থান হয়েই থাকে কিন্তু এই অষ্ট গ্রহের সম্মিলন অষ্টবজ্রের সংযোগ বলা চলে, তাতে সমগ্র পৃথিবীর ওপর দিয়ে খণ্ডপ্রলয়ের দুর্য্যোগই আসবে, তৃতীয় মহাযুদ্ধের দুন্দুভি বেজে উঠবে বলেই অনুমান করা যায়।

১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারীতে এই গ্রহগুলি মকরে সম্মিলিত হবে, এদের স্থিতিকাল হবে ঐ রাশিতে প্রায় তিন দিন, উক্ত তারিখে সূর্য্যগ্রহণ হবে,—পূর্ণগ্রাস। চার মিনিট ব্যাপী সূর্য্যমণ্ডল থাকবে তমসাচ্ছন্ন। এই গ্রহণ ভারতে অদৃশ্য হলেও নিউগিনি, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে দেখতে পাওয়া যাবে। বরাহমিহির বলেছেন, শ্রবণা অথবা ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে গ্রহণ হোলো গ্রহজনিত অশুভ কালের স্থিতি হয় সাত আট মাস। ৩১শে জুলাই ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে অঙ্গুরীয়াকার বিশিষ্ট সূর্য্যগ্রহণ হবে, ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারীতেও অনুরূপ সূর্য্যগ্রহণ দেখা যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে এই গ্রহণগুলির গভীর তাৎপর্য্য আছে। গ্রহণের পর মকর ও কুম্ভ রাশিস্থিত শনির ক্ষেত্রে অবস্থিত দেশগুলিতে দারুণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রাদুর্ভাব হবে। বহু লোককে অনিচ্ছাসত্ত্বেই দুর্য্যোগ সঙ্কটের মধ্যে এনে প্রাণ সংশয় অবস্থায় রাখা হবে। ভারতের উত্তরও পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলগুলির অবস্থা শোচনীয় হোতে পারে। পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও বিহারে ব্যাপক ভাবে বিশৃঙ্খলতার চরম অবস্থা লক্ষ্য করা যাবে—গ্রীক, ইরাণ, আফগানিস্তান, বুলগেরিয়া, লিথুনিয়া প্রভৃতি দেশগুলির অনুরূপ শোকাবহ পরিস্থিতির আশঙ্কা করা যায়। ভারতবর্ষ বিশেষতঃ পাঞ্জাব এবং বাংলার যে সব অঞ্চল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত সেগুলির বিপন্নতা গভীরভাবে অনুভূত হয়। মিসর, গ্রীস এবং তুরস্ক থেকে সুরু করে ভারতবর্ষের উত্তর ও পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত গ্রহদের প্রতিকূল আবহাওয়ার প্রভাবে অমঙ্গলের ব্যাপ্তি ঘটবে—উত্তেজনা, বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার মাধ্যমে দারুণ দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও ধ্বংস এতদঞ্চলে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। ঝড় ও ভূমিকম্প, জলপ্লাবন প্রভৃতি চলবে। চীনে মহা আকস্মিক দুর্ঘটনার সঙ্গে দারুণ জলপ্লাবন হবে। সমগ্র চীন জাতি ও চীনের সাম্প্রতিক শাসনতন্ত্রের পথে ঐ বৎসরে অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থা আসবে। অষ্ট্রেলিয়াতেও জলপ্লাবন হবে, তবে চীনের মত তার মারাত্মক অবস্থা হবে না। আমেরিকার বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটবে। বিশ্বের বিজ্ঞান ও সমাজের ভয়ানক ওলোটপালট হয়ে যাবে। রুসিয়ার বর্ত্তমান শাসন পদ্ধতির অবসান হবে—আর সাংঘাতিক রকমের অশুভ ঘটনা ঐ বৎসরে দেখা যাবে যা রোমাঞ্চকর ও ভয়াবহ বলেই পরিগণিত হবে। পাশ্চাত্য জ্যোতিষী মিষ্টার কার্টার বলেছেন—

I must summarise the brief review as (a) Great Scientific advances (b) Great Sociological Changes and (c) Possibility of floods and similar catastrophes on a vast scale.'

তিনি তাঁর গণনায় সারা বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখছেন না। যা আমাদের গণনায় সম্ভব হচ্ছে। আমরা দেখছি ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরে সুরু হবে খণ্ড খণ্ড ভাবে ছোটখাটো যুদ্ধ। যুদ্ধের নাট্যশালার অন্তর্ভুক্ত হবে উত্তর আফ্রিকার অংশগুলি—যেমন মিশর, ইউরোপের অংশগুলি—যেমন হাঙ্গেরি বুলগেরিয়া, গ্রীস ও তুরস্ক, আর আমাদের ভারতবর্ষের সীমান্ত অঞ্চলগুলি সমেত সমগ্র পশ্চিম এশিয়া। সর্ব্বত্রই মন্ত্রীমণ্ডলের দুরবস্থা আশঙ্কা করা যায়। আর ১৯৬২ সাল থেকে সৈন্যমণ্ডলী, নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তি, রাজনৈতিক কূটনীতিজ্ঞ, শাসন তন্ত্র এবং মজ্‌দুর মণ্ডলী অত্যন্ত দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে দিনযাপন করবে। আমেরিকা ও রুষিয়ার ভাগ্যাকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হবে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে কোনরূপ দুর্গতিগ্রস্ত আবহাওয়া দেখা যাবে। গৃহযুদ্ধ সুরু হবে দক্ষিণ ইউরোপ ও আফ্রিকায়। ১৯৬২ সালের প্রথমে আফ্রিকার জাতীয়তাবাদীরা বিপদের সম্মুখীন হবে। পাশ্চাত্য জাতির সমাধিক্ষেত্র রচনার কাজ সুরু হবে ১৯৬২ সাল থেকে। পৃথিবীর কোন জাতি এদুর্দ্দিনে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় বহাল তবিয়তে থাকতে পারবে না। খাদ্যদ্রব্য সরিয়ে রেখে যে পশ্বাচার সুরু হয়েছে, তার প্রতিশোধ দেবে সেদিন ধরিত্রী অষ্টগ্রহ সম্মেলনে। বাঙলার হবে শোচনীয় দুর্গতি। বৃশ্চিক রাশিতে শনির প্রবেশের সময় থেকে যে সব দেশে সামরিক স্বৈরতন্ত্র শাসন সার্ব্বভৌম শক্তি প্রদর্শন করছে সে শাসনের

আকস্মিক বিপত্তি ও যবনিকা পতন হবে ১৯৬২ সালে। মানুষ নতুন করে চিন্তা করতে থাকবে তার সামাজিক, ধর্ম্মবিষয়ক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জটিল সমস্যাগুলি সম্পর্কে। ফলে নতুন দর্শন বা মতবাদ সৃষ্টি হবে। ১৯৬৬ সালে নূতন নবোৎসাহী মধ্যবিত্ত সমাজ গ'ড়ে উঠ্‌বে। ১৯৬২ সালে জহরলাল নেহেরুর লগ্ন ও জন্মরাশির সপ্তমে আটটী গ্রহের সমাবেশ গভীর উদ্বেগের বিষয়। চার পাঁচ বছর ধরে ভারতের উপর দিয়ে নানা দুর্য্যোগ বয়ে যাবে ;—ভারতের লোকেরা বিপথে চ'ল্‌বে ;—সমাজদ্রোহী ধনলোলুপদের অপকৌশল চল্‌বে।' সমাজ ও দেশ ধ্বংসকারী নীতি অনুসৃত হবে, পঞ্চম বাহিনীর কার্য্যকলাপ নির্ব্বিবাদে চলবে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী-দেশগুলি প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত হবে, বাংলার অবস্থা হবে শোচনীয়।

১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত সময়টা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এনে দেবে দারুণ গোলযোগ। পাঞ্জাব, কাশ্মীর, উড়িষ্যা ও বাঙলার অবস্থা হবে সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় ও উদ্বেগজনক। আফ্রিকার পশ্চিমস্থ রাষ্ট্রগুলি মিশর, জার্ম্মানী ও রুষিয়ার দুঃসময় দেখা যায় উপরোক্ত সময়ের মধ্যে। ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা জটিল হবে। বর্ত্তমান বর্ষে রাজনৈতিকক্ষেত্রে, শাসন বিভাগে ও রাজকীয় কর্ম্মে কুম্ভ ও মীনরাশির লোকের পক্ষে উন্নতিযোগ ও প্রাধান্য বিস্তৃতির সম্ভাবনা আছে। পশ্চিম বাংলায় ভীষণ খাদ্য সঙ্কট ঘট্‌বে। বহুস্থানেই শোনা যাবে বুভুক্ষুর ক্রন্দন ধ্বনি।

মোটের উপর আগামী ১৯৬২ সালে পৃথিবীতে বহুলোকের মৃত্যু ঘট্‌বে, তৃতীয় মহাযুদ্ধের দুন্দুভি বেজে উঠ্‌বে, খণ্ড প্রলয়ের মত দুর্য্যোগ দেখা যাবে, আর ধনতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের বিশেষ দুর্গতি হবে,—সামাজিক বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধ পৃথিবীর বহুস্থানেই আশঙ্কা করা যায়। তৃতীয় মহাযুদ্ধ মধ্য এশিয়াকে কেন্দ্র করেই ১৯৬২ সালে সুরু হবার যোগ দেখা যায়।

* * *

জ্যৈষ্ঠ মাসের ব্যক্তিগত দ্বাদশ রাশির ফলাফল

মেষ

অশ্বিনী ও কৃত্তিকা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিদের পক্ষে অশুভ সংযোগ কম হবে। ভরণীনক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিরা সবচেয়ে বেশী কষ্ট পাবে। রক্তের চাপ বৃদ্ধি, উদরঘটিত পীড়া, বুকের বেদনা প্রভৃতি সম্ভব। পারিবারিক বিশৃঙ্খলতা, কলহ, প্রতিবেশীর সঙ্গে মনোমালিন্য এবং বন্ধুদের দুর্ব্ব্যবহার ও [illegible] নানাপ্রকার উদ্বেগ ও আশঙ্কার সম্ভাবনা দেখা দেবে। অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ হবেনা। কেননা নানাভাবে আয়ের যোগাযোগ আছে। ব্যয়বাহুল্য ঘটবে। দুষ্টলোকের প্ররোচনাতেই ব্যয়াধিক্য সম্ভব। বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মাসটী মোটের উপর ভালো। চাকুরিজীবীদের পক্ষে সতর্ক হওয়া উচিত, নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাট আসবে। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে মাসটী মোটামুটি ভালো বলা যায়। স্ত্রীলোকের পক্ষের অবৈধ প্রণয়ে সাফল্য লাভ ও সামাজিক ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত ঘটনায় উদ্বেগ ঘট্‌বে। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীদের পক্ষে মাসটী শুভ বলা যায় না।

বৃষ

কৃত্তিকা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিদের পক্ষে শুভ হবে, তারপর রোহিণীজাতগণের, কিন্তু মৃগশিরা নক্ষত্রাশ্রিতগণ এমাসে কোন শুভ সংযোগ পাবেনা। পিত্তপ্রকোপ, বায়ুপীড়া, রক্তের চাপবৃদ্ধি আশঙ্কা করা যায়। পারিবারিক জীবন অশান্তি ভোগ করবে। ভ্রমণে বিপত্তি বা দুর্ঘটনার ভয় আছে। আর্থিক অসঙ্গতির জন্য কষ্ট ভোগ, ব্যয়ের জন্য হবে ঋণ। অর্থোপার্জ্জনে বাধাও ঘটতে পারে। বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারীরা নানা যোগাযোগের মধ্যে পড়্‌বে, আয় কর আইনের চাপে অনেকে কষ্ট ভোগ করবে। চাকুরির ক্ষেত্রে উপরওয়ালার সহিত বিরোধ ও সহকর্ম্মীদের দুর্ব্ব্যবহার আশঙ্কা করা যায়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী ভাল বলা যায় না, প্রণয় ভঙ্গের সম্ভাবনা ও গৃহবিবাদ। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীদের পক্ষে মাসটী মধ্যম। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে মাসটী মন্দ নয়।

মিথুন

পুনর্ব্বসু নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে আশানুরূপ শুভ হ'বে না। মৃগশিরা ও আর্দ্রা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির শুভ ফল দেখা যায়। স্বাস্থ্যহানি, রক্তদোষ, পিত্তপ্রকোপ, তাপজনিত কষ্ট, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য ইত্যাদি সূচিত হয়। অগ্নি ঔষধ বা তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাত জনিত বিপত্তির ভয়। ঘরে বাইরে অশান্তি ও মনোমালিন্য। আর্থিক অবস্থা অনেকটা স্বচ্ছল হবে। বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যাধিকারীদের পক্ষে বহু প্রকার ঝঞ্ঝাট, মামলা মোকর্দ্দমা ও নানা অশান্তি ঘট্‌বে। চাকুরী জীবীর পক্ষে মাসের শেষভাগ খারাপ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে শুভ সময়। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ,—সামাজিক ও পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা ও প্রতিষ্ঠা, প্রণয় লাভ, উৎসাহ বৃদ্ধি ও বসন ভূষণ লাভ। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীদের পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নয়।

কর্কট

মাসটী শুভ। পুনর্ব্বসুনক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তি অপেক্ষা পুষ্যা ও অশ্লেষা নক্ষত্রাশ্রিতগণ বেশী শুভ ফল লাভ করবে। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে, তবে চক্ষুপীড়া, পিত্তপ্রকোপ, রক্তচাপবৃদ্ধি প্রভৃতি সম্ভাবনা আছে। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্র শুভ ও শান্তিপ্রদ হবে। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের যোগ আছে। বিলাসব্যসনের দ্রব্যাদি ক্রয়ের সম্ভাবনা। নানাভাবে অর্থাগম দেখা যায়, স্পেকুলেশনে সাফল্য। বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারীদের পক্ষে শুভ, লগ্নীকারবারে লোকসান যেতে পারে। চাকুরিজীবীদের পক্ষে বিশেষ শুভ, পদোন্নতি যোগ আছে। সর্ব্বপ্রকারে স্ত্রীলোকেরা সুযোগ সুবিধা পাবে—প্রণয়ের ক্ষেত্রে যোগাযোগ ও উৎসাহ বৃদ্ধি, অবৈধ প্রণয়ে সাফল্য যোগ, পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা, পুরুষের

আনুকূল্য লাভ, ভ্রমণ—সমাজ সেবায় সুনাম ও প্রতিষ্ঠালাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের শুভ সময়।

সিংহ

মঘা ও উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিদের অপেক্ষা পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রাশ্রিতগণ বহু অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করবে। শারীরিক অবস্থা ভালো যাবে না, মধ্যে মধ্যে ভগ্ন স্বাস্থ্য হয়ে পড়বে। ভ্রমণে কষ্ট, পিত্ত প্রকোপ, চক্ষুপীড়া, পরিবার বর্গের মধ্যে কলহ ও স্বজন বিরোধ সম্ভব। কোন স্বজন বিয়োগ হেতু শোক। আর্থিক অবস্থা শুভ হবে। মামলা মোকর্দ্দমায় অযথা ব্যয়ের সম্ভাবনা। ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালাদের পক্ষে মধ্যম সময়। চাকুরিজীবীদের পক্ষে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। মাসের প্রথম দিকে স্ত্রীলোকেরা নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা ও সুখশান্তি পাবে, শেষের দিকে সময়টী ভালো যাবে না—আশাভঙ্গ, মনস্তাপ ও শত্রুবৃদ্ধি ঘটবে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মধ্যম সময়।

কন্যা

মাসটী উত্তম নয়। কর্ম্মে বাধা ও বিশৃঙ্খলা শত্রুবৃদ্ধি, ভ্রমণে কষ্ট, অপ্রত্যাশিত ভাবে দুঃখজনক পরিবর্ত্তন ও মানসিক অস্বচ্ছন্দতার যোগ আছে। চিত্রানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে বিশেষ কষ্টপ্রদ হবে, উত্তর ফল্গুনী ও হস্তা নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে কথঞ্চিৎ ভালো। এমাসে শরীর ভালো যাবে না যদিও গুরুতর পীড়ার আশঙ্কা নেই। অতিরিক্ত গরমের জন্যে কষ্ট ভোগ, রক্তের চাপ বৃদ্ধি, দুর্ব্বলতা ও জীবনীশক্তির হ্রাস হবে। পারিবারিক অশান্তির সম্ভাবনা কম কিন্তু স্বজন বিয়োগ বা অন্তরঙ্গ বন্ধুর মৃত্যু। আর্থিক অবস্থা ভালো বলা যায় না, কোন উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটবেনা। কোন প্রকার নূতন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। স্ত্রীলোকের দ্বারা প্রতারিত হবার যোগ আছে। লগ্নীকারবারে ক্ষতি। বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারী পক্ষে শুভাশুভ সময়। চাকুরীজীবীর পক্ষে শুভ সময়। স্ত্রীলোকের পক্ষে সময়টী শুভ—পুরুষের সহিত মেলামেশায় সুখপ্রদ ঘটনা দেখা যায়। এমাসে স্ত্রীলোকেরা নানাপ্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবে।

তুলা

চিত্রা ও নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে কষ্ট ভোগ কম হবে। বিশাখা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিরা নানা অসুবিধা ও অশুভ ঘটনার মধ্যবর্ত্তী হবে। শারীরিক অবস্থা ভালো যাবে, কিন্তু কোন প্রকার আঘাত প্রাপ্তি ও দুর্ঘটনায় আশঙ্কা করা যায়। মানসিক উত্তেজনা বৃদ্ধি হবে। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান যোগ আছে, পারিবারিক শান্তি দেখা যায়। আর্থিক অবস্থা শুভ, আয় বৃদ্ধি যোগ আছে। ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালাদের পক্ষে মাসটী শুভ বলা যায় না। চাকুরীজীবীদের পক্ষে শুভ সময়, পদোন্নতি ও সুনাম হবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভাশুভ মিশ্রিত মাস। অবৈধ প্রণয়ে বিপত্তি, প্রণয় ভঙ্গ যোগ। ব্যয় বৃদ্ধি ও পারিবারিক গঞ্জনা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে শুভ।

বৃশ্চিক

বিশাখা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিদের চেয়ে অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে শুভ। বহুকার্য্যে বাধা যোগ, ব্যয় বৃদ্ধি প্রভৃতি ঘটবে। শারীরিক অসুস্থতা ও স্বাস্থ্যহানির জন্য কষ্ট ভোগ। জ্বর, অজীর্ণ দোষ, উদর পীড়া, সামান্য আঘাত, পারিবারিক কলহ ইত্যাদি সম্ভব। আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালো যাবে। ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালাদের পক্ষে মধ্যম সময়,—মামলা মোকর্দ্দমা পরিহার করা কর্ত্তব্য। চাকুরিজীবীদের পক্ষে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। স্ত্রীলোকের পক্ষে আদৌ শুভ নয়,—কোন প্রকার রোমান্টিকতা, প্রণয়ের ক্ষেত্রে পূর্বরাগ বা অবৈধ প্রণয় বিপত্তির কারণ হবে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মধ্যম সময়।

ধনু

মূলা ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রজাতগণের পক্ষেই ভালো সময়, পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রাশ্রিতগণ কিছু অসুবিধা ও অশান্তি ভোগ করবে। শারীরিক অবস্থা বিশেষ ভালো যাবে না। উদর ঘটিত পীড়ার আশঙ্কা—স্ত্রী ও সন্তানাদির অসুখ হোতে পারে। পারিবারিক কলহ ও গোলযোগ—ঘরে বাইরে কোন আত্মীয়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা। আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে না। বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারীদের পক্ষে মাসটী শুভ নয়। চাকুরিজীবীদের পক্ষে মধ্যম সময়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীরা আশানুরূপ শুভ ফল পাবে।

মকর

শ্রবণা ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্রাশ্রিতগণ অপেক্ষা শ্রবণা নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে শুভ। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। পারিবারিক শান্তি। স্ত্রীর পীড়া। চক্ষু ও উদর পীড়া। আর্থিক স্বচ্ছন্দতার যোগ আছে। বাড়ীওয়ালা ও ভূম্যধিকারীরা নানা প্রকার সুযোগও সুবিধালাভ করবে। চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি শুভ বলা যায়। স্ত্রীলোকেরা নানাপ্রকার সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করবে। বিদ্যার্থী ও শিক্ষার্থীদের পক্ষে উত্তম।

কুম্ভ

পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে অশুভ। ধনিষ্ঠা ও শতভিষা নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে অনেকটা শুভ। শারীরিক অসুস্থতা যোগ আছে যদিও উদরের গোলমাল, মাথাধরা ইত্যাদি ঘটবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজনের দুর্ব্ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে। পাওনা টাকা বা অনাদায়ী অর্থপ্রাপ্তি। ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালারা নানা জটিল সমস্যার মধ্যে এসে পড়বে। চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী

ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম সময়। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ সময়, তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। বিত্তার্থী ও শিক্ষার্থীদেরও সুসময় দেখা যায়।

মীন

রেবতী ও উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে শুভ সময়। পূর্ব্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে শুভফলের হ্রাস হবে। শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভালো যাবে না। গৃহবিবাদ, বিচ্ছেদ, আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ যোগ আছে। আর্থিক অবস্থা মন্দ নয় কিন্তু প্রতারিত হবার সম্ভাবনা। ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালাদের পক্ষে শুভাশুভ সময়। চাকুরিজীবীদের পক্ষে উত্তম সময়, বেকার ব্যক্তির কর্ম্মলাভ। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে উত্তম সময়—কর্ম্মে প্রসার বৃদ্ধি। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিত্তার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ সময়।

* * *

ব্যক্তিগত লগ্ন ফলাফল

মেষলগ্ন—

সহোদরের সহিত বৈষয়িক ব্যাপারে মতভেদ। বন্ধুভাব শুভ। সম্বন্ধলাভ। বিদ্যা বা সন্তান ভাবের ফল ভালো নয়। কর্ম্মস্থানে বাধা বিঘ্ন। ভাগ্যোন্নতির যোগ আছে কিন্তু শনির অবস্থান হেতু ভাগ্যোদয়ের বাধা বিপত্তি। পত্নীর স্বাস্থ্য মন্দ নয়।

বৃষলগ্ন—

বেদনাসংযুক্ত পীড়া, পাকযন্ত্রের পীড়া ভোগ করলেও এ মাসে অশুভ ফলের হ্রাস হবে। ধনভাব মধ্যবিধ। বিদ্যা বা সন্তান ভাবের ফল ভালো নয়। সন্তানের স্বাস্থ্যহানিও বিদ্যালাভে বিঘ্নের আশঙ্কা আছে। পত্নীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে। কর্ম্মস্থলে ক্ষতিও ভাগ্য বিপর্যয় যোগ, কর্ম্মস্থলে ক্ষতির আশঙ্কা কম। ধর্ম্মে বাধা। পিতার শরীর অশুভ। স্বাধীন ব্যবসা অপেক্ষা চাকুরীস্থলের ফল শুভ। সন্তানাদির বিবাহের আলোচনা বা বিবাহ।

মিথুনলগ্ন—

বেদনাসংযুক্ত পীড়া, দাঁতের পীড়া, মাতৃপীড়া, বন্ধুবান্ধবের সহিত মনোমালিন্য, কলহ। ধনাগম। বিদ্যাস্থান ও সন্তানস্থানের ফল শুভ। ভাগ্যোন্নতি, কর্ম্মোন্নতির অন্তরায়। পত্নীর অসুস্থতা—পত্নীর হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা, পাকাশয়ের দোষ, পিতার স্বাস্থ্য ভালো। সন্তানের বিবাহ যোগ।

কর্কটলগ্ন—

শারীরিক পীড়ার সম্ভাবনা নাই। ধনাগম। বিদ্যাস্থান ও সন্তানস্থান শুভ। পত্নীর স্বাস্থ্যহানি। অবিবাহিত ও অবিবাহিতাদের বিবাহের আলোচনা। পিতামাতার শারীরিক কুশলতা। কর্ম্মোন্নতি ও ভাগ্যোন্নতির অন্তরায়। শুভকার্য্যে ব্যয়বৃদ্ধি। সহোদরের ফল শুভ নয়। তীর্থভ্রমণ।

সিংহলগ্ন—

মধ্যে মধ্যে দেহপীড়া, বাত ও পিত্ত জনিত কষ্ট ভোগ। আর্থিকোন্নতি আছে কিন্তু ব্যয় বাহুল্য। বিদ্যাস্থানে বিঘ্ন ও সন্তানের দেহপীড়া। পিতামাতার স্বাস্থ্যোন্নতি। পত্নীর স্বাস্থ্যহানি। চাকুরি লাভ ও পদোন্নতি নূতন গৃহ নির্ম্মাণ, ভ্রাতা ও ভগ্নীর স্বাস্থ্য ভালো।

কন্যালগ্ন—

বেদনাসংযুক্ত পীড়া, রক্তঘটিত পীড়া, পাকযন্ত্রের পীড়া। ধনাগম। সহোদর ভাব শুভ। কপট বন্ধু লাভ। বিদ্যাস্থানে বাধা। ভাগ্যোন্নতি কর্ম্মলাভ বা পদোন্নতি।

তুলা লগ্ন—

দেহভাব শুভ। ধনাগম। ভ্রাতৃবিচ্ছেদ। সম্বন্ধলাভ। দাম্পত্যপ্রণয়। সন্তান ভাব শুভ। পিতার স্বাস্থ্যহানি। তীর্থভ্রমণ-ভাগ্যোন্নতি।

বৃশ্চিকলগ্ন—

শারীরিক ও পারিবারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা। ধনাগমে অন্তরায়। ব্যয় বাহুল্য। আশা ভঙ্গ। মনস্তাপ। সন্তানের পড়াশুনায় বাধা বিঘ্ন। বিবাহ জনিত সৌভাগ্য ও দাম্পত্য প্রণয় লাভ। কন্যা সন্তানের বিবাহ বা বিবাহের কথাবার্ত্তা।

ধনু লগ্ন—

শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভালো নয়। রক্তপাতাদি পীড়া, উদর সংক্রান্ত পীড়া, যকৃত দোষ। অর্থাগম। ব্যয় বাহুল্য। কপটবন্ধুর দ্বারা প্রতারণা। সন্তানের লেখাপড়ায় উন্নতি। পত্নীর শারীরিক অসুস্থতা, কর্ম্মস্থলে বিশৃঙ্খলতা, বিবাহ সম্ভাবনা। বিবাহে সৌভাগ্যোদয়।

মকরলগ্ন—

শারীরিক ফল অশুভ। ব্যয়াধিক্য। বিদ্যোন্নতিযোগ; সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তম ফল লাভ। সন্তানাদির বিবাহ আলোচনা। স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক কষ্ট। কর্ম্মস্থলে উন্নতির আশা কম। মাতার স্বাস্থ্য ভালো।

কুম্ভলগ্ন—

মনস্তাপ, পাকাশয়ের দোষ, রক্তপাত বা রক্তবৃদ্ধি। অর্থাভাব, ব্যয়বৃদ্ধি জনিত ঋণ। পত্নীর পীড়া, সম্বন্ধলাভ। সন্তানভাব অশুভ। মাতাপিতার শরীর ভালো যাবে।

মীন লগ্ন—

পাকাশয়ের দোষ, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, স্বাস্থ্য হানি। ব্যয়াধিক্য, মানসিক চাঞ্চল্য, মনস্তাপ, আশা ভঙ্গ, কলহ। বন্ধু বান্ধবের সহিত মতানৈক্য। দাম্পত্য প্রণয়, কর্ম্মস্থলে ক্ষতি, শিল্প সাহিত্য চর্চ্চায় খ্যাতি, শুভকার্য্যে ব্যয় বৃদ্ধি।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুকুমার চট্টোপাধ্যায়

হকি লীগ ঃ

১৯৫৯ সালের প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১৮টা খেলায় ৩৩ পয়েণ্ট পেয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। ২য় স্থান পেয়েছে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব (৩০ পয়েণ্ট) এবং ৩য় স্থান কাষ্টমস (২৭ পয়েণ্ট) এবং গত চার বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান ক্লাব (২৭ পয়েণ্ট)।

ডেভিস কাপ ঃ

টোকিওতে অনুষ্ঠিত ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চলের সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষ ৩—২ খেলায় জাপানকে পরাজিত ক'রে পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইনালে ফিলিপাইনের সঙ্গে খেলবার অধিকার লাভ করে।

ফিলিপাইন ৫—০ খেলায় থাইল্যাণ্ডকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে।

ক'লকাতায় সাউথ ক্লাবে অনুষ্ঠিত পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইনাল খেলায় ভারতবর্ষ ৪—১ খেলায় ফিলিপাইনকে পরাজিত করে। এরপর ভারতবর্ষের খেলা পড়বে আমেরিকা বনাম ইউরোপের ইণ্টার-জোনাল বিজয়ীদলের সঙ্গে।

প্রথমদিন রামনাথন কৃষ্ণান এবং নরেশকুমার সিঙ্গলস খেলায় জয়ী হ'লে ভারতবর্ষ ২—০ খেলায় অগ্রগামী হয়। ২য়দিন নরেশকুমার এবং রামনাথন কৃষ্ণান জুটি হয়ে ডবলসে জয়ী হ'লে ভাবতবর্ষ ৩—০ খেলায় অগ্রগামী থেকে পূর্ব্বাঞ্চলের চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করে। ৩য়দিনের খেলায় ভারতবর্ষ আরও একটি সিঙ্গলসে জয়ী হয়। অপরদিকে ফিলিপাইনের এম্পন ২ ঘণ্টা ১৭ মিনিট ধরে খেলে শেষ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের প্রেমজিৎলালকে পরাজিত করায় ফিলিপাইনের পক্ষে এই সিরিজে মাত্র একটি খেলায় জয়লাভ হয়।

গোল্ডকাপ হকি ঃ

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত গোল্ড কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে পাঞ্জাব পুলিস ৩—২ গোলে সেণ্ট্রাল রেলদলকে পরাজিত ক'রে উপর্য্যুপরি দু'বছর গোল্ডকাপ জয়ী হয়েছে। প্রথমদিনের ফাইনাল খেলাটি গোলশূন্যভাবে ড্র যায়।

পাঞ্জাব পুলিস এবং সেণ্ট্রাল রেলওয়ে এনিয়ে উপর্য্যুপরি তিনবছর ফাইনাল খেললো। ১৯৫৭ সালের ফাইনালে রেলদল এবং ১৯৫৮ সালের ফাইনালে পাঞ্জাব পুলিস কাপ বিজয়ী হয়।

এফ এ কাপ ফাইনাল ঃ

ইংলণ্ডের বিখ্যাত উইম্বলি ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ১৯৫৯ সালের এফ এ কাপ (ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েসন কাপ) ফাইনালে নটিংহাম ফরেষ্ট দল ২—১ গোলে লুটন টাউন দলকে পরাজিত ক'রে এফ এ কাপ জয়ী হয়। নটিংহাম দলের জয়লাভ খুবই কৃতিত্বপূর্ণ; ৯০ মিনিট খেলার মধ্যে তারা ৫৫ মিনিট সময় দশজন খেলোয়াড় নিয়ে খেলেছিল।

৯০৭

বাইটন কাপ ফাইনাল ঃ

১৯৫৯ সালের বাইটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার

ফাইনালে গতবছরের রাণার্স-আপ কোর্স অব্‌ ইঞ্জিনিয়ার্স (কির্কি) ২-১ গোলে দিল্লীর আর্মি একাদশকে পরাজিত করে বাইটন কাপ জয়ী হয়। ফাইনালে এই দুই সামরিক দলের খেলার ফলাফল নিয়ে ক্রীড়ামহলে রীতিমত গবেষণা চলেছিল। সেমি-ফাইনালে কোর্স অব্‌ ইঞ্জিনিয়ার্স দল ২-০ গোলে কাষ্টমস দলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠে। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে দিল্লীর আর্মি একাদশ দল ১-০ গোলে ইষ্টবেঙ্গলকে পরাজিত করে।

এ বছরে প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান মহমেডান স্পোর্টিং দল ১—৩ গোলে দিল্লীর সামরিক একাদশ দলের কাছে কোয়ার্টার-ফাইনালে পরাজিত হয়। অপরদিকে গত বছরের বাইটন কাপ বিজয়ী মোহনবাগান ০—৩ গোলে কোর্স অব ইঞ্জিনিয়ার্স (কির্কি) দলের কাছে কোয়ার্টার-ফাইনালে হেরে যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, গত বছর মোহনবাগান প্রতিযোগিতার ফাইনালে ১—০ ১-০ গোলে কোর্স অব ইঞ্জিনিয়ার্স দলকে পরাজিত করেছিল।

ভারতবর্ষ বনাম আমেরিকা ঃ

আমেরিকার পাঁচজন এ্যাথলেট ভারতসফরে এসে দিল্লী, মাদ্রাজ এবং ক'লকাতায় ভারতীয় এ্যাথলেটদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। দিল্লী এবং মাদ্রাজে ভারতীয় এ্যাথলেটরা একেবারে গোহার হেরে যায়। দু'জায়গাতেই প্রতি সাতটি অনুষ্ঠানের মধ্যে ভারতীয় দল মাত্র একটি ক'রে অনুষ্ঠানে জয়ী হয়। কিন্তু ক'লকাতায় উভয় দলের সঙ্গে রীতিমত লড়াই হয় যদিও শেষ পর্য্যন্ত আমেরিকা ৪-৩ বাজিতে জয়ী হয়।

ইংলণ্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দল ঃ

সতেরজন খেলোয়াড় পুষ্ট ভারতীয় ক্রিকেট দল ইংলণ্ড সফরে গেছে। দলের অধিনায়ক হয়েছেন, ডি কে গাইকোয়াড় (বরোদা), সহ-অধিনায়ক পঙ্কজ রায় (বাংলা) এবং দলের ম্যানেজার বরোদার মহারাজা। গত ২৫শে এপ্রিল থেকে ভারতীয় ক্রিকেট দল সরকারী সফর তালিকা অনুযায়ী খেলা সুরু করেছে। ভারতীয় দল পাঁচটি টেষ্ট ম্যাচ খেলবে। টেষ্ট ম্যাচ খেলার তারিখ নির্দ্ধারিত হয়েছে—১ম টেষ্ট (ট্রেণ্ট ব্রিজ) ৪ঠা জুন ; ২য় টেষ্ট (লর্ডস) ১৮ই জুন ; ৩য় টেষ্ট (লিডস), ২রা জুলাই ৪র্থ টেষ্ট (ওল্ড ট্রাফোর্ড) ২৩শে জুলাই এবং ৫ম টেষ্ট (ওভাল) ২০শে আগষ্ট।

ইংলিশ টেবল টেনিস ঃ

ইংলিস ওপ্‌ন টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপস প্রতিযোগিতায় জাপানী খেলোয়াড়রা পাঁচটি বিভাগেরই ফাইনালে জয়লাভ করেছে। এই প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৩৭ বছরের ইতিহাসে জাপান ছাড়া আর কোন দেশ প্রতিযোগিতার পাঁচটি বিভাগেই জয় লাভ করতে সক্ষম হয়নি।

জাতীয় হকি ঃ

হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত ১৯৫৯ সালের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে রেলদল ১—০ গোলে সার্ভিসেস দলকে পরাজিত ক'রে উপর্য্যুপরি তিনবছর রঙ্গস্বামী কাপ জয়ী হয়েছে। রেলদল ১৯৫৭ এবং ১৯৫৮ সালের ফাইনালে বোম্বাইকে পরাজিত করে। সার্ভিসেস দল ১৯৫৫ এবং ১৯৫৬ সালে কাপ জয়ী হয়। খেলা শেষ হবার তিন মিনিট আগে রেলদলের ইন্‌সাইড লেফ্‌ট অনিল দাস জয়সূচক গোলটি দেন। পাঞ্জাবকে ৩—১ গোলে হারিয়ে বাংলা প্রতিযোগিতায় ৩য় স্থান লাভ করে। সেমি-ফাইনালে বাংলাদল রেলদলের কাছে এবং পাঞ্জাব দল সার্ভিসেস দলের কাছে হার স্বীকার করে।

সাহিত্য সংবাদ

স্বপন ... কথামালা—শ্রীঅখিল নিয়োগী

বড়ি ... র সংসারের কথা শুনিয়েছেন ছেলেমেয়েদের প্রিয় ... শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো) ফড়িং, টিকটিকি ... ব্যাঙ, ব্যাঙাচি, মাকড়শা, মৌমাছি, মশা, বাঘ ... বাচ্চা, হাতী, কুমীর, কাকাতুয়া, কাক, কাঁকড়া ... রের কথামালার নায়ক নায়িকা। এরা ছড়া কেটে ... নানারকম সুরসুড়িও ... লক্ষ্মী প্যাঁচার প... সুন্দরী, পোনামাছ কেমন করে রাজকন্যার অ... দিয়ে আদর খেতে গিয়ে প্রাণ হারালো, কুমীরের সঙ্গে টুনটুনির ভাব ভালোবাসার শেষ পরিণতি কোথায়, ব্যাঙের দলের সঙ্গে ব্যাঙাচির কলহ, বাঘের বাচ্চাকে ছাগলের স্তন্যদান, কোকিল বউ আর কাক বউর কথা কাটাকাটি, আজগুবী দেশের রাজা মুখ-সর্ব্বস্ব কর্ণের বিচার প্রভৃতি বেশ উপভোগ্য হয়েছে। প্রত্যেকটী গল্পই রচিত হয়েছে গ্রন্থকারের মৌলিক চিন্তাধারার অভিব্যক্তিকে—আলোচ্য গ্রন্থেও তাঁর প্রতিভা কোথাও ম্লান হয়নি। এ ধরণের মজাদার ছেলে-মেয়েদের মন ভুলানো কথামালা বাংলার শিশু-সাহিত্যে বিরল। আমরা পড়ে খুব খুসী হয়েছি, ছেলে-মেয়েরাও খুসী হবে, বইখানি পড়ে এ ধারণাও হয়েছে। গ্রন্থখানি উপহারোপযোগী, প্রচ্ছদপট বর্ণাঢ্য, ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ উত্তম।

[প্রকাশক—ইউ, এন, ধর অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২, মূল্য দেড়টাকা মাত্র।]

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মন্দিরের চাবি—শ্রীকালীকিংকর সেনগুপ্ত।

সম্প্রতিকালে প্রকাশিত এই কয়টি কবিতার বই কাব্যামোদীদের নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে আকৃষ্ট করেছে। প্রবীণ কবি শ্রীকালীকিংকর সেনগুপ্তের 'মন্দিরের চাবি' তদ্‌রচিত ও প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের পরিবর্ত্তিত ও বর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৯৩১ সালে গ্রন্থখানি সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়ে ও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে সরকার ঐ নিষেধ আদেশ প্রত্যাহৃত করেন। বাঙলার পাঠক-পাঠিকা আজ 'মন্দিরের চাবি' পাঠের অধিকারী। স্বাধীনতাকামী বাঙালীকে উদ্বুদ্ধ করতে এ কাব্যগ্রন্থ যে সাফল্য লাভ করেছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। স্বাধীনতালাভ করলেও আমাদের স্বাধীনতা বোধ ততটা জাগেনি। তাই দেশপ্রাণ কবির বজ্রগম্ভীর কণ্ঠের জাগরণী গান আবার সহস্র কণ্ঠে উদ্‌গীত করার প্রয়োজনীয়তা আছে। এ কাব্য গ্রন্থের প্রচার হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

[প্রকাশক—দি বুক কোম্পানী লিমিটেড ৪।৩ বি কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২, মূল্য—দুই টাকা।]

নীরঞ্জনা—কানাই সামন্ত।

রবীন্দ্রোত্তর যুগে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে অস্বীকার করে কাব্য রচনায় একটা বাহাদুরি কেউ কেউ দাবী করেছেন। কিন্তু সে বাহাদুরি মিথ্যা, অহংকার মাত্র। সে মিথ্যা অহংকারে বিভ্রান্ত হয়ে কেউ কেউ এমন কবিতা রচনা ক'রছেন যার অর্থ আমরা সহজে বুঝতে পারি না—এমন কি একেবারেই পারি না। রবীন্দ্র প্রভাবকে সহজ ভাবে স্বীকার করে শুধু নয়—রবীন্দ্রনাথের পথে চলে যাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছেন, কবি কানাই সামন্ত তাঁদের অন্যতম। তাঁর রচিত 'নীরঞ্জনা' কাব্য-গ্রন্থই এর বড় প্রমাণ।

[প্রকাশক—এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ১৪.বংকিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, মূল্য—চার টাকা।]

ফুল পিঁড়ি—শচীন দত্ত।

কবি শচীন দত্তের "ফুলপিঁড়ি" প্রকাশের সংগে সংগে বইখানার যথেষ্ট সমাদর হয়েছে পাঠক মহলে—প্রশংসার গুঞ্জরণ শোনা গিয়েছে সমালোচকদের কণ্ঠে। আধুনিক কবিদের মধ্যে যাঁরা শুধু কাব্য রচনা করেই তুষ্ট নন, যাঁরা অন্তরের নিবিড় অনুভূতিকে প্রকাশের বেদনায় কাতর, যাঁদের কথায় গানে-সুরে সে-বেদনার অনুরণন ধ্বনি—তাঁদের দলের শক্তিমান্ কবি শচীনবাবু। প্রমাণ দিচ্ছি তার—

> আবার আমাকে দিলে এই নীল
> সময়ের সুর?
> কেন দিলে সমুদ্র নূপুর!
> আমি তো চাইনি তার ভালোবাসা, চাইনি কখনো—
> কেবল চেয়েছি এক ক্ষত-রিক্ত হৃদয়ের ঝরা পাতা—দূর
> নক্ষত্রের ছেঁড়া চিঠি কোনো।'

[প্রকাশক—কবিতা প্রকাশ সংস্থা, ২৮,৩ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯ মূল্য—দুই টাকা।]

সামুদ্রিক—অজিত দাশ।

আর একটি কাব্য গ্রন্থ কবি অজিত দাশের 'সামুদ্রিক' প্রকাশিত হয়েছে। মনে হয়, ইহা কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এরি মধ্যে কবি যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। কবির মত যদি আমাদের দেশের সব ছেলে আর সব মেয়েরা বলতে পারত—

> ভারতবর্ষ, আমি যে তোমারি ছেলে,
> তোমার সাধনা রক্তে দিয়েছে ঢেলে।

গৌরব তাই দৃঢ়তা আমার মনে
মনুষ্যত্ব বিকাবো না প্রলোভনে।

[প্রকাশক—শ্রীপৃথ্বীশ সরকার, ২৩, পদ্মপুকুর রোড। কলিকাতা মূল্য—দেড় টাকা।]

মালিকা—মালিনী বসু।

'মালিকার' রচয়িত্রী মালিনী বসু [illegible] বছরের মেয়ে। অবাক হয়েছি তাঁর রচনা দেখে। এমন বাগ্‌বিভূতি, এমন ভাষা আর ভাব কোনও বার বছরের কবির থাকতে পারে, তা ভাবতে পারি। শুনুন একটিবার [illegible] লাইন—

"কর্মমেঘ ঘন রাত্রি [illegible] নিবিড় তিমিরে,
আশা দীপ জ্বালি' ধীরে ধীরে
কর্তব্যের পথ চেয়ে নিস্তব্ধ আঁধারে,
জীবন চলেছে অভিসারে।"

শ্রীমতী মালিনী বসুর কাব্য-সাধনার বিস্তৃত পরিচয় জানাতে পারলে তা বিশদ আলোচনা করা যেত। আজ শুধু তাঁর কবি-জীবন সুগন্ধ কুসুমের মত প্রস্ফুটিত হোক, সার্থক হোক এ শুভ কামনা জানাচ্ছি।

[প্রকাশক—শ্রীঅখিলচরণ বসু, ৫নং লাভলক প্রেস, বালীগঞ্জ কলিকাতা-১৯। মূল্য—এক টাকা আট আনা।]

—স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের প্রতি

[illegible] মাসে যে সকল বাৎসরিক [illegible] তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক ২৫শে জ্যৈষ্ঠের পূর্বে মনি-অর্ডার যোগে বাৎসরিক ১২৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৬৲ টাকা চাঁদা [illegible]য়া দিবেন। টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করিবেন। ডাকবিভাগের নিয়মানুযায়ী ভি. পি.তে কাগজ পাঠাইতে হইলে, পূর্বাহ্নে আদেশপত্র পাওয়া প্রয়োজন। ভি. পি. খরচ [illegible] লাগিবে।

কর্মাধ্যক্ষ—**ভারতবর্ষ**

নতুন রেকর্ড

হিজ্ মাস্টার্স ভয়েস্ ও কলম্বিয়া রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

"হিজ্ মাস্টার্স ভয়েস"

N 82811—শিল্পী মৃণাল চক্রবর্তীর কণ্ঠে দুখানা আধুনিক গান—'ঘুম ভরা চাঁদ' ও ঠুংঠাং ঠুং ঠাং চুড়ির তালে।

N 82812—জনপ্রিয় শিল্পী তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'চৈতীসুরের হাওয়াতে' ও 'কে যায়রে কে যায়'—দুখানা আধুনিক গান আমাদের খুব ভাল লেগেছে।

N 82813—'তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি' ও 'আমি চিরতরে দূরে চলে যাবো' গান দুখানা সর্বজনপ্রিয় শিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সুরের পরশে অনবদ্য হয়ে উঠেছে।

N 82814—শিল্পী উমা সেনের মধুর কণ্ঠে 'গান হয়ে এসো তুমি' ও 'সোনালী চন্দ্র কলা' দুখানা আধুনিক গান অপূর্ব হয়েছে।

কলম্বিয়া

GE 24923—'কত রাগিনীর ভুল ভাঙাতে' ও 'আকাশ প্রদীপ জ্বেলো না' গান দুখানা সর্বজনপ্রিয় শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সুরলালিত্যে ও ভাব-ব্যঞ্জনায় অনবদ্য হয়েছে।

GE 24924—শিল্পী নির্মলা মিশ্রের মধুরকণ্ঠে 'আকাশ মেঘ দে' ও শিল শিলাটন শিলেবাটন' গান দুখানা আমাদের ভালই লেগেছে।

GE 24925—'আকাশে আজ রঙের খেলা' ও 'নাচ ময়ূরী নাচরে' দুখানা আধুনিক গান জনপ্রিয় শিল্পী শ্রীমতী আশা ভোঁসলের মধুরকণ্ঠে চমৎকার পরিবেশিত হয়েছে।

GE 24926—সুমিত্রা মিত্রের গাওয়া দুখানা গান 'সাদা মেঘ ভেসে যায়' ও যদিও ক্লান্ত 'নয়নে ঘুম'—সত্যিই অপূর্ব হয়েছে।

GE 24927, 24928—দুখানা রেকর্ডে পংকজ কুমার মল্লিকের পরিচালনায় পশ্চিমবংগ লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীদের গাওয়া চারখানা সুন্দর লোকগীতি।

GE 24929—দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের নিজস্ব সুরে গাওয়া দুখানা আধুনিক গান—ঐ চাঁদ যদি ডুবে যায়', ও 'ঐ দেবদারুবন।'

GE 24930—নবাগতা কুমারী মন্দিরা ঘোষের মধুর কণ্ঠের দুখানা আধুনিক গান—ঐ তো আকাশ, এই তো মাটী,' ও 'বকুলবনে ভীড় জমালো।'

GE 24931—অমল মুখোপাধ্যায়ের দুখানা আধুনিক গান 'ধান ভানে ধান ভানে' ও 'বোশেখ আসে, বোশেখ যায়।'

GE 24932—'আকাশ অনেক দূর' ও 'কত চন্দ্র ঝরা'—অনবদ্য দুটি আধুনিক গান পরিবেশন করেছেন কুমারী আরতি মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত